সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
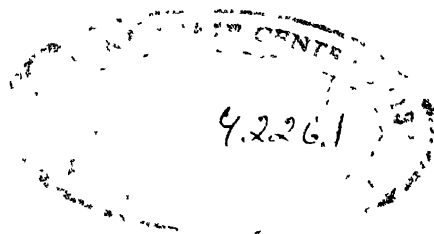
আনন্দ

আমার বাবা শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও
মা তুলসী চট্টোপাধ্যায়-এর
করকমলে—

সূচিপত্র

পায়রা
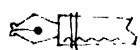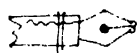
গন্ডাকতক কাকের উৎকট চিৎকারে প্রতিমার ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল। পাশে শুয়ে ছিল ছেলে অপূর্ব। সেও এইবার উঠে বসল। নীচের তলার শোবার ঘর। পশ্চিমে ছোটমতো একটা বাগান। কাকেদের কালোয়াতি আসছে সেই বাগান থেকে। অপূর্ব নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। বেশ ঘুমোচ্ছিল! ভোরের ঘুম। ঘুম চোখেই বলল, 'বংশ নির্বংশ করব। গুলতিটা দাও তো মা।' তার এইসব ভোকাবুলারির উৎস হল, দাদু পরমেশ্বর, পিতা বঙ্কিম, মাতা প্রতিমা। প্রতিমা চোখ খুলেই সময়টা আন্দাজ করে নিয়েছে, সাড়ে চার থেকে পাঁচের মধ্যে। সাতের আগে বিছানা ছাড়ার সামান্যতম ইচ্ছেও তার নেই।

প্রবাসী বাঙালির মেয়ে। বঙ্কিমের বউ হয়ে কট্টর নিষ্ঠাবান পরিবারে এলেও, স্বভাব সে কোনওমতেই ছাড়তে রাজি নয়। তার ভাবে এইটাই প্রকাশিত, সংসারে আমি ফিট করব না, সংসারই আমাতে ফিট করবে। বিয়ের পর বঙ্কিমের দায়-দায়িত্ব তাই বেড়ে গেছে। তাকে এখন ডবল দায়িত্ব পালন করতে হয়। আগে ভোরে দু'কাপ চা করতে হত, এখন তিন কাপ করতে হয়, বঙ্কিম, পরমেশ্বর, প্রতিমার। ছেলের ব্রেকফাস্ট, তার সকালে স্কুল। বাসিঘর, ঠাকুরঘর পরিষ্কার। পরমেশ্বর আহ্নিকে বসবেন। এর পর বাজার। ফিরে এসেই পরমেশ্বরের ব্রেকফাস্ট। চারা মাছ হলে মাছ ড্রেস করে দেওয়া।

মাছের অ্যানাটমি সম্পর্কে প্রতিমার জ্ঞান খুব কম। পিত্তিটাকে সে কিছুতেই ট্যাকল করতে পারে না। প্রতিমা যখন কোরা বউ, যে সময় বউদের আসল রূপটা একটু মাস্কড থাকে সেই সময় বারকতক চেষ্টা করে রোজই চটকে ফেলত। মাছের ঝোল হয়ে যেত নিম ঝোল। বঙ্কিমের হৃদয়েশ্বরী হতে পারে, পরমেশ্বরের ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। তিনি শিক্ষক মানুষ! প্রথমে স্লেটে মাছের ছবি এঁকে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, দিস ইজ বাইল স্যাক। প্রতিমাকে ডেকে পাশে বসিয়ে শেখাবার চেষ্টা করলেন। প্রতিমার বয়ে গেছে। সে দেখলে এই তো সুযোগ! বঙ্কিমকে বললে, 'আমি ঠিক পারি না গো, উঁয়ু, হুঁহুঁ। ছোটো মাছ আর এনো না, ডিয়ারি পেয়ারি। কাটা মাছ এনো প্লিজইইজ।' বঙ্কিম দেখলে, দায়টা তারই। পরমেশ্বর তার পিতা, প্রতিমার তো পিতা-ইন-ল! বৃদ্ধ মানুষের আহার না হলে নিন্দেটা তারই হবে!

সংসারটা এখন বঙ্কিমের। পিতা পরমেশ্বর অবসরভোগী। তাঁর সুর, দিন তো গিয়া, সন্ধ্যা আয়া। প্রতিমার ভাব, বঙ্কু, আমি তোমার প্রেম করা বউ, এ সংসার ধোঁকার টাটি খাই দাই আর মজা লুটি। বঙ্কিমের ভাব, প্রেমকরা বউ কদাচ প্রেমিক বউ হয়! লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখত লিখে নিয়েছে হায়। মা-মরা বঙ্কিম এখন মহা ফাঁপরে পড়েছে।

প্রতিমা ছেলেকে দলে টানতে চাইল, 'গুলতি ফুলতি রাখ তো! আজ রবিবার আর একটু শুয়ে পড়।' অপূর্বর এখনও শয়নের আয়েশ বোঝার মতো ইন্দ্রিয় সজাগ হয়নি। সে মশারি ফুঁড়ে বেরিয়ে পশ্চিমের জানলাটা খুলে ফেলল। খুলেই হইহই করে উঠল। ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। একটা পায়রা চিত হয়ে পড়ে আছে কলকে গাছের তলায়। দুটো ধুম্সো কাক পায়রাটার নরম পেটের ওপর বসে ঠুকরে ঠুকরে লোম ছাড়াচ্ছে। আর গোটাকতক বসে আছে কলকে ডালে অবজার্ভার হিসেবে। নিঃসন্দেহে খুব মনোরম প্রাতরাশ।

উত্তেজক কোনও ব্যাপারের গন্ধ পেলেই প্রতিমার লেথার্জি কেটে যায়। ঝগড়া, মারামারি, চিৎকার, উল্লাস প্রতিমার জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয়। ওইসব মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে, হ্যাঁ

বেঁচে আছে। বঙ্কিমের ধারণা, কোনও স্প্যানিশ বুলফাইটার ভুল করে পুনর্জন্ম নিয়েছে প্রতিমার দেহে। জন্মছকটা একদিন বিচার করে বঙ্কিম কারণটা খুঁজে পেয়েছিল গ্রহ সন্নিবেশে। কুপিত মঙ্গল সবসময় ফুসমন্তর দিচ্ছে, লাগিয়ে দে, বাঁধিয়ে দে, উড়িয়ে দে, পুড়িয়ে দে, ধসিয়ে দে। ভেতরটা যেন সবসময় ধেই ধেই করে নাচছে, লাগ ভেলকি লাগ। পরমেশ্বর স্ট্যাটিক টার্গেট সারাদিন দোতলায়, কয়েকটা ধাপের ব্যবধানে সবসময় অ্যাভেলেবল। বঙ্কিম আর অপূর্ব শিফটিং টার্গেট। অপূর্ব হল হাত সাধার তবলা। গর্ভজাত। অষ্টপ্রহর তেরে কেটে ধেরে নাগে। কারুর কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। সন্তানকে শাসনের অধিকার, কে হরে নেবে মাগো!

একুশটা ধাপের এগারোটা ধাপ ভেঙে দোতলা আর একতলার মাঝে প্ল্যাটফর্মের মতো সবচেয়ে বড় ধাপে দাঁড়িয়ে পরমেশ্বর, আগে মাঝে-মধ্যে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজে বর্বর হয়ে বার্বেরিয়ান প্রতিমাকে বাধা দিতে গেছেন। প্রতিমা হাজার বলে বলীয়ান হয়ে মাইনরিটি পরমেশ্বরকে নিমেষে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফেলে দিয়েছে। ছেলেকে শাসন ক্যারবোও, আমি মেও (উত্তেজিত অবস্থায় প্রতিমার কথা শেষের দিকে এইভাবে একটু গোল্লা পাকিয়ে যায়)। অ্যাই ব্যাপার্যা য্যা ন্যাক গলাতে আসবে ত্যার ন্যাকও থ্যাঁতো করে দ্যাবো।

ও বাবা, এ বড় শক্ত ঠাঁই! হতভম্ব পরমেশ্বর সত্তরোত্তীর্ণ চালশে-ধরা চোখের জুম লেনসে দশটা ধাপ নীচে উত্তাল সংসার সমরাঙ্গনে পুত্রবধূর ছৌনৃত্য দেখে নিজেও নাচতে নাচতে আবার এগারোটা ধাপ ভেঙে নিজের কোটে চলে যেতেন। উঠতে উঠতে তাঁর গলা দিয়ে এফার্টলেস অটোমেটিক যে শব্দ বেরোত প্রত্যুষে সুর করে গাইলে প্রাণে ভক্তিরস উচ্ছ্বলিত হয়, মধ্যরাতে নির্জন রাস্তায় সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলে পরলোকের আতঙ্ক জাগে। পরমেশ্বর উপরে উঠেই নিজের ছোট্ট শ্লোকের খাতায় আবার আন্ডার লাইন করেন, শা যদি ক্রিয়তে রাজা।

বেনে মশলার দোকান থেকে বন চাঁড়ালের শিকড় এনে কুপিত মঙ্গলকে প্রশমিত করার জন্যে বউকে পরাতে গিয়েছিল। মঙ্গল যার উগ্র সে বেটাচ্ছেলে শুনবে কেন? বন্ধ ঘরে বাবু বঙ্কিমের সঙ্গে মেমসাহেবের ধস্তাধস্তি। টেবললাম্প উলটে পড়ল। কার্পেটে ঢেউ খেলল। গেলাস পড়ল ছিটকে। কোণঠাসা প্রতিমা হাঁপাচ্ছে, 'চালাকি পেয়েছ? বশীকরণের মাদুলি পরাচ্ছ বাপের সঙ্গে কনসাল্ট করে।' এঁরা সকলেই আবার তুকতাক একটু বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বরের ধারণা প্রতিমা ছেলেকে বশীকরণ করেছে, তা না হলে অমন শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাই আনরিফর্মড হয়ে পড়ে পড়ে বংশ বৃদ্ধি করছে। তাও কোন সয়েলে! যে সয়েলে একমাত্র শেয়ালকাঁটার চাষ হতে পারে। প্রতিমার ধারণা, পরমেশ্বর বঙ্কিমকে ভেড়া বানিয়েছে, তা না হলে বউয়ের কথায় ওঠবোস করে না এ কেমন মিনসে? বনচাঁড়াল বনে গেল। মাঝখান থেকে প্রতিমা আবার মা হল। এবার কন্যাসন্তান।

'কী বললি? পায়রা! কাগে খোবলাচ্ছে!' প্রতিমা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনও জীবে তার ভীষণ দয়া। প্রথমে প্রতিমা, তারপর অপূর্ব দু'জনেই দরজা খুলে বাগানে ছুটে গেল। অপূর্ব বললে, 'এইটাই বোধহয় সেই চিত্রগ্রীব মা! ওর মা বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ওড়া শেখাবার জন্যে।'

'এখন মর কাগের ঠোক্কোর খেয়ে।'

ওদের দু'জনকে দেখে কাক দুটো পায়রাটার ঠ্যাং ধরে কোনওরকমে উড়ে গিয়ে কলকে গাছের উঁচু ডালে বসল। অপূর্বর বকবকানি সমানে চলছে, 'চিত্রগ্রীবের মা তোমার মতোই ব্যস্ত, সাততাড়াতাড়ি ওড়াবার কী দরকার ছিল! সবেতেই অধৈর্য!'

প্রতিমা পায়রা ভুলে অপূর্বর কান টেনে ধরল। নিজের বিরুদ্ধে কোনও স্ল্যান্ডার সে আন পানিশড থেকে যেতে দেবে না। পায়রা ঝুলছে কলকে গাছে। কাকের ঠোঁটের খাবলায় পায়রার বুকের নরম নরম পালক তুলোর মতো খুস খুস করে পড়ছে। কানটাকে বেশ জোরে বারকতক টানা-ছাড়া করে প্রতিমা বললে, 'বল এটা কার কথা?'

অন্য কারুর কান হলে হাতে খুলে চলে আসত। নেহাত প্রতিমার ছেলে বলেই যথাস্থানে রয়ে গেল। অপূর্ব বললে, 'দাদির।'

ইতিমধ্যে পরমেশ্বর বাগানের দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরও কৌতূহল কীসের চিৎকার জানার। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর স্নায়ুর ওপর সারা জীবন অস্বাভাবিক চাপের ফলে ইদানীং পরমেশ্বরের চিন্তা সব সময়েই অদ্ভুত রাস্তায় চলে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, প্রতিমা অপূর্বকে খুন করে বাগানে ফেলে দিয়েছে, কাক এসে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। পুরোপুরি না মিললেও, তিনি যা দেখলেন, দৃশ্যটা অনেকটা সেই রকমই। মহাদেবের প্রিয় ফুলগাছের ডালে পাখিদের হত্যালীলা। গাছের তলায় মার্ডারাস মাদার কিলিং এ ফুলের মতো চাইল্ড। ও আই অ্যাম হেলপলেস! না এ দৃশ্য দেখব না। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন আর সেই সময় প্রতিমার গলা কানে এল, 'দাদি? ওই দাদিই তোমার মাথাটি খাবেন। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোমার মুখ আমি জুতিয়ে সিধে করে দেব।'

পরমেশ্বর আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। অ্যাটলিস্ট আই শুড প্রোটেস্ট। বয়স হতে পারে, ইনকাম কমে যেতে পারে, বাট আই অ্যাম নট অ্যান ইমবেসাইল। বারান্দার রেলিং-এ কনুইয়ের ভর দিয়ে, শীর্ণ শরীরে যথাসম্ভব শক্তি এনে নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে,' বউমা শব্দটা তিনি ঘৃণায় উইথড্র করে নিয়েছেন বহুকাল। প্রতিমা মুখ তুলে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। এতটুকু নার্ভাস হয়েছে বলে মনে হল না। পরমেশ্বরের মুখে চার-পাঁচ দিনের পাকা দাড়ি। চোখের কোণে অল্প সাদা পিচুটি। জীবনে ঘা খাওয়া রণক্লান্ত সৈনিকের মতো চেহারা। পরমেশ্বর বললেন, 'জানতে পারি কীভাবে আপনার ছেলের মাথা খেয়েছি?'

প্রতিমা অপূর্বর কান ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ছোটো মুখে বড় কথা বলতে শিখিয়ে।'

পরমেশ্বর খুব পোলাইটলি বললেন, 'আজ্ঞে আমি যদি বলি, ঠিক এর উলটো। আপনার নিজের উদ্ধত স্বভাব এবং লঘু গুরু জ্ঞানের অভাব আপনার পুত্রে সংক্রামিত হয়েছে। ইট ইজ ইন দি ব্লাড জেনেটিক্যালি...'

পরমেশ্বর কথা শেষ করার সময় পেলেন না। প্রতিমা বললে, 'ব্লাডে আছে না কারুর ঘিলুতে আছে খোপরি খুলে দেখতে হবে। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে কাউকে হবে না।' পরমেশ্বর তড়িৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'মাপ করো রাজা।' তাঁর পা কাঁপছে। ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'তোমারে বধিবে যে ওই তো বাড়িছে সে। হি উইল চিট ইউ হাউ মেনি গ্রামস মেক এ কিলো।' পরমেশ্বর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'জয় মা, জয় মা, বেশ করেছিস মা, বেশ করেছিস।'

প্রতিমা ওসব ফাইন সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। বঙ্কিম বলে, মুখ নয়তো মেশিনগান। কী বলেছে, কাকে বলেছে, কেন বলেছে, এসব বুঝতেও চায় না, বোঝালেও বোঝে না। পরমেশ্বরকে ছেড়েই পায়রা নিয়ে পড়ল। হা হা হাসি, জয় মা জয় মা চিৎকার কানে এলেও গ্রাহ্য করল না।

ওসব তার গা সহা হয়ে গেছে। পরমেশ্বরের যন্ত্রণা, বঙ্কিমের ভর্ৎসনা, সে আর কেয়ার করে না। জানে তৈলহীন গাড়ির চাকার মতো সংসার আর্তনাদ করতে করতে এইভাবে ঠিকই চলে যাবে। সাংঘাতিক কোনও অ্যামবিশনও নেই। ছেলেমেয়ে মানুষ হয় হবে। বঙ্কিম থাকে থাকবে নয়তো মরে বাঁচবে। ভবিষ্যৎ যা হয় হবে। বঙ্কিম ভাবে এত বড় একটা 'এগজিসট্যানশিয়ালিস্ট' ফ্রান্সে না জন্মে এখানে জন্মাল কেন?

গাছ থেকে লোকে ফুল পাড়ে, প্রতিমা পেড়ে আনল একটা পায়রা। মহিলার সাহস আছে। হুমদো হুমদো গোটা আষ্টেক ফেরোসাস কাকের গ্রাস ছিনিয়ে আনা কম কথা নয়। একটু আগের কানমলা, ভবিষ্যতের জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবার অগৌরবময় সম্ভাবনা ভুলে, অপূর্ব লম্বা একটা ঝুলঝাড়া নিয়ে কাকেদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে মাকে বাঁচাবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেল। মাতাপুত্রের 'হোলি অ্যালায়েন্স' ফর এ কমন কজ। পায়রাটার পেটের লোম খুবলে খুবলে প্রায় সবই

ছিঁড়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে। যে একটু আগে বৃদ্ধ শ্বশুরের খুলি খুলে নিতেও প্রস্তুত ছিল, যে একটু আগে নিজের সন্তানের কানটাই টেনে ছিঁড়ে আনতে চেয়েছিল, সেই প্রতিমার চোখেও জল।

পায়রা নিয়ে মাতাপুত্রে যখন জোর গবেষণা চলেছে, একজন বলছে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও মা, আর একজন তখন বলছে তার আগে একটি এ টি এস দিতে পারলে ভাল হয়। ঠিক সেই সময় বঙ্কিম বাজার থেকে ফিরে এল। এক হাতে যার কমলার ফুল, কমলার ফুল নয়, তারের খাঁচায় দুটো দুধের বোতল। অন্য হাতে হোয়াইটনাইট ঢুকে যেতে পারে এইরকম একটা বিশাল চটের ব্যাগ। উঁকি দিচ্ছে একটা বৃক্ষ নয়, কাটোয়ার ডেঙো, পরমেশ্বর ভালবাসেন। পিতার সেবায় বঙ্কিম সদাতৎপর। বৃদ্ধকে খুশি রাখতে পারলে বঙ্কিমের বউয়ের মেজর আর মাইনর অ্যাটাক যদি তিনি ক্ষমা করে দেন, বালিকা ভাষিতং বলে। দু ছেলের মাকে অবশ্য কোনও স্ট্রেচ অফ ইম্যাজিনেশানেই বালিকা ভাবা শক্ত। তবু যদি ভাবেন! বয়সের ব্যবধান তো অনেক, সত্তর আর তিরিশ।

বঙ্কিম আসতে আসতেই ভেবেছে, উনুনে আগুন পড়বে না, চায়ের জোগাড় তখনও হবে না, জলখাবারের ব্যবস্থা থাকবে না, বিছানা তোলা হবে না, ভোরের আলো আর হাওয়া ঢোকার জন্যে জানলা খোলা হবে না, বাইরের পইঠেতে সকালের কাগজ লুটোপুটি খাবে, তোলা হবে না। ঠিক তাই। বঙ্কিম গম্ভীর মুখে ঢুকছে। বঙ্কিম আগে খুব হাসত। এখন কদাচিৎ তার মুখে হাসি দেখা যায়। এলোমেলো সংসারের উসকোখুসকো ব্লটিং পেপার তার কৈশোর আর যৌবনের হাসি শুষে নিয়েছে। প্রতিমা বঙ্কিমের বিরক্তি জড়ানো মুখ থেকে তার মনের কথা হয়তো বোঝে; কিন্তু সে তো পিঠে কুলো আর কানে তুলো দিয়ে বসে আছে! পায়রাটা হাতে নিয়ে প্রতিমা বঙ্কিমের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী করা যায় বলো তো?'

বঙ্কিমের ভেতরটা তখন চা, চা করছে। বাইরে কা-কার ঠেলায় তিষ্ঠোনো দায়। বঙ্কিম বললে, 'রেঁধে ঝোল করা যায়, বাত আর আলস্যের ভাল দাওয়াই।'

অন্য সময় হলে ঠেস দিয়ে কথা বলার ঠেলা বুঝিয়ে দিত প্রতিমা। আজ নেহাতই সে শোকার্ত। বঙ্কিম সংসারের ম্যাও আর মেওয়া নিয়ে ভেতরে চলে গেল। প্রতিমা ছেলেকে বলল, 'পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্টের টিউবটা নিয়ে আয় তো।'

পায়রাটার ডানায় জোর হয়নি, তার ওপর আহত। চোখ দুটো ভয়ে স্থির। ছোট্ট বুকটা ঘনঘন উঠছে পড়ছে। শরীরটা গরম। পায়রাটাকে এখন কোথায় রাখা যায় এবং কীভাবে রাখা যায়! ঠিক হল একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে বড় ধাপটার একপাশে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখা হবে। বঙ্কিম বললে, 'আহা কী আবদার! জীবনে তো ন্যাতা আর ঝাঁটা ধরলেন না। পায়রার ড্রপিংসের আঠা জানো? মেঝে থেকে তুলতে ঘণ্টাখানেকের কসরত। আমার মোজাইক মেঝের পালিশ নষ্ট হলে কোন সম্বন্ধী পালিশের খরচ দেবে।' অপূর্বর আবদার অবশ্য বঙ্কিম ঠেলতে পারল না। খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পায়রাকে সাবধানে প্লেস করা হল। নরম কাপড়ের গদি। পায়রাটা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। তার ওপর চাপানো হল ঝুড়ি।

ব্যবস্থাটায় বঙ্কিম অবশ্য ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সারাজীবন ভাড়া বাড়িতে বাস করে রিটায়ার করার পর পরমেশ্বর বাড়ি করেছেন। বঙ্কিম দিয়েছে মগজ, মেহনত, দরদ। প্ল্যান তার, মাল-মশলা পছন্দ তার। এখন ঝকঝকে মেঝে আরও ঝকঝকে করাই তার একমাত্র নেশা। অন্যে বলে শুচিবাই, নেই কাজ তো খই ভাজ। আর একটু জ্ঞানীরা বলেন, ফ্রাস্ট্রেশান। ছুটির দিন বাড়িই তার ধ্যান আর জ্ঞান। ঝুল ঝাড়ছে, গ্রিলের ধুলো ওড়াচ্ছে। হরেকরকম মেঝে মোছার সরঞ্জাম। লিকুইড ডিটারজেন্ট, পাইন অয়েল, অকজ্যালিক অ্যাসিড, মোমপালিশ, নানা মাপের ফুলঝাড়ু, ফুলঝাড়ু, নানা ধরনের ফ্লোর মপ। সারাদিন বাড়ি নিয়েই মশগুল। ছবির মতো করবে। মন্দিরের মতো করবে। মেঝেতে মুখ দেখা যাবে। পাশ থেকে ঘাড় কাত করে দেখলে মনে হবে— এ শিট অফ

মিরার। এই পরমেশ্বরের পায়ের ছাপ পড়েছে? বাথরুম থেকে জলপায়ে বেরিয়ে থ্যাপ থ্যাপ করে হেঁটে গেছেন। লে আও ন্যাতা। প্রতিমা সোডার জল ফেলেছে। কেয়ারলেস মহিলা। ঘরের শত্রু বিভীষণ। লাগাও মোমপালিশ। পরমেশ্বর বাড়ি বানিয়েই খালাস। সূক্ষ্ম ডেকরেশান, ধুলো ঝুল, মেঝে পালিশ ডিসটেম্পার লাইম কলার? ধুর বাপু। সবই যখন গেছে তখন এটা গেলেও কিছু যায় আসে না। ভেরি ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট প্রভু! কঙ্কন চুনচুন মহল বানায়া, লোভ কহে ঘর মেরা, না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, বাস করো, বাস করো হা মা, যো মা। বঙ্কিম পরমেশ্বরের এই ধরনের অব্যয়সূচক আর্তনাদের নাম রেখেছে এক্সট্যাসি। বঙ্কিম পরমেশ্বরের দিক থেকে মেনটেনেন্সের কোনও সাহায্যই আশা করে না।

প্রতিমার তো কোনও প্রপার্টি সেনসই নেই। মাথার উপর ছাদ আছে, পিঠের তলায় খাট আছে, চোখের সামনে সিনেমা আছে, হু কেয়ারস হুম। তোমার মেঝে রইল কি গেল, তোমার দেয়ালে কালি পড়ল কি পড়ল না, দরজার মাথায় ঝুল ঝুলে নাকের ডগায় এল কি এল না, দ্যাটস নট মাই লুক আউট। ফলে বঙ্কিমেতে বাড়িতে, বাড়িতে বঙ্কিমেতে নটঘট ব্যাপার। এখন পায়রাটা হল গোদের ওপর বিষফোড়া। তবে বাঁচবে বলে মনে হয় না। পায়রার আতঙ্ক ভুলে বঙ্কিম দৌড়াল পরমেশ্বরকে অ্যাটেন্ড করতে। দু'জনের সম্পর্ক প্রথম দিকে যখন ভালই ছিল তখনও প্রতিমা পরমেশ্বরের সামান্যতম সেবাও নিজের কর্তব্য বলে মনে করেনি। বঙ্কিমের তাই এখন ডবল দায়িত্ব। বঙ্কিমের মা মারা যাবার পর পরমেশ্বর যেমন নিজের মধ্যে ফাদার অ্যান্ড মাদার কমবাইন করে বঙ্কিমকে মানুষ করেছিলেন, বঙ্কিমও তেমনি একাধারে পুত্র এবং পুত্রবধূ হয়ে পরমেশ্বরের সেবা করছে। বঙ্কিম মাঝে মাঝে ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব বোধহয় একেই বলে।

ফাদারের মুখ দেখলেই বঙ্কিম বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে কি-না। রাত্রিবেলা অবশ্য বোঝার আর একটা ভাল সংকেত আছে। ট্রাফিক লাইটের যেমন রেড অ্যাম্বার গ্রিন আছে। পোর্ট কমিশনারের বাড়ির ছাদে যেমন নানা ধরনের আবহাওয়া সংকেত আছে— ফানেল... সিলিন্ডার বোতল ইত্যাদি। পরমেশ্বরের ঘরে সেইরকম তিন ধরনের আলো আছে— ফ্লোরেসেন্ট চার ফুট, সাধারণ বাল্ব একশো, সবুজ— শূন্য দোতলার দক্ষিণের ঘর 'সিট অফ বিক্রমাদিত্যে'র মতো সিট অব পরমেশ্বর। রাস্তা থেকে ঘরটা দেখা যায়, পরমেশ্বর জল খাচ্ছেন, কি পায়চারি করছেন, কি খাটে বসে এসরাজ বাজাচ্ছেন। বঙ্কিম রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার সময় একবার ঘরটার দিকে তাকায়, ফ্লোরেসেন্ট, মানে নর্মাল আবহাওয়া, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নয়, আগামী বারো ঘণ্টায় ঝড়বৃষ্টির নো চান্স। একশো পাওয়ারের সাধারণ আলো মানে নিম্নচাপ, একতলা উত্তপ্ত হয়ে উর্ধ্বচাপ ঠেলছে, পরমেশ্বরের কোস্টে আগামী ছত্রিশ ঘণ্টায় প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা। জিরো সবুজ মানে বারোটা বেজে গেছে। প্রবল এক পশলা হয়ে গেছে, আগামী বাহাত্তর ঘণ্টায় থান্ডারস্টর্ম অবশ্যম্ভাবী। ঝগড়ার মরসুমটা বেলা দশটার পর থেকে সন্ধে সাতটা যে সময় বঙ্কিমবাবু বাড়ির বাইরে। আগে উপলক্ষ অনেক ছিল, ইদানীং একটাই, অপূর্ব এবং প্রতিমার মধ্যে মার-দাঙ্গা, পরমেশ্বরের থার্ড পার্টি ইন্টারফিয়ারেন্স। তখন অপূর্ব সিন থেকে আউট। পরমেশ্বর প্রতিমা ফেস টু ফেস। রণস্থল একতলা দোতালার মাঝের সিঁড়ি। পরমেশ্বর কুমির তোর জলকে নেমেছি বলে প্রতিমার ট্রাবলড ওয়াটারে এক ধাপ করে নেমে আসবেন আর প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে যাবে, পরমেশ্বর তিন ধাপ ওপরে উঠে যাবেন। এইরকম কুমির কুমির খেলা কিছুক্ষণ চলার পর পরমেশ্বর ফিল করবেন, হার্টটা যেন হাতের তালুতে চলে আসতে চাইছে, স্বেদ কম্প শুরু হবে। পরমেশ্বর খাটে ফ্ল্যাট, প্রতিমার ঘরে বিবিধ ভারতী, ইস দিলসে জ্বল রাহি হায় আরমান কা চিতা এ।

আজ এই সাতসকালেই আবার কী হল? একটা কিছু হয়েছে। পরমেশ্বরের মুখ দেখেই বঙ্কিম আন্দাজ করেছে। হি লিভস ইন ট্রাবল। হি ক্যান স্মেল ট্রাবল। অভিজ্ঞ ভিষকের মতো রোগীর ঘরে পা দিয়ে বলে দিতে পারে অসুখটা কী। আগে পরমেশ্বর নিজেই বলতেন। যখন বুঝলেন, বঙ্কিমবাবু হ্যাজ স্যাক্রিফাইসড হিজ লাইফ ফর কারন্যাল প্লেজার তখন আর বউসর্বস্ব ছেলেকে ট্রাবল দিয়ে

কী লাভ, এই ভেবে ইদানীং অজগর যেমন শিকার গিলে হজম করার জন্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে পরমেশ্বরও তেমনি খাটে পা মুড়ে দক্ষিণের খোলা জানলার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে নারকেল গাছের পাতায় রোদের কাঁপন দেখেন। নীল আকাশে পাখি ওড়া দেখেন। ভাবেন যৌবনটা কীভাবে শরীর থেকে লিক করে বেরিয়ে গেল। আজ আমি ছেলের অন্নদাস। উঃ কী ভুল করেছি। সমস্ত জমানো টাকা বাড়ির পিছনে ঢেলে। ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিট করে রাখলে, ফিফটিন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। তোফা খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো। এ কী করলে প্রভু। হীরালাল, দেখা তোমার সঙ্গে হবেই 'সিলেসটিয়াল স্ফিয়ারে'। তখন হাম দেখে লেঙ্গে'। যৌবনে কুস্তি করতুম। মারব আড়াই প্যাঁচ। দেখি তোমাকে কে বাঁচায়, বাককালিয়ান ফেলা। হীরালাল পরমেশ্বরের বাল্যবন্ধু বঙ্কিমের শ্বশুর।

মাঝে বঙ্কিম একটা রেল কোম্পানির মতো 'কমপ্লেন বুক' চালু করেছিল। তার ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে পরমেশ্বর লিখে রাখবেন। সিস্টেমটা পরমেশ্বরের মনোমতো হয়েছিল। আ দ্যাটস এ ভেরি গুড আইডিয়া। গুড আইডিয়া হলে কী হবে! করাপ্ট বঙ্কিম টেকস নো অ্যাকশন। কমপ্লেন বুক এখন অপূর্বর ব্যাবল বুক। মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারলেও বঙ্কিম জানে, পরমেশ্বরকে প্রশ্ন করলে কোনও উত্তর পাবে না। চিবুকটা আর একটু ওপরে তুলে, শুকনো মুখে বলবেন, 'আ, ওই, উস, দীর্ঘ জীবন বুঝলি, বড়ওই অভিশাপের জীবন, সি নোজ, সি সিজ, পড়ে আছি তোমার চরণতলে।'

'সি' হল পরমেশ্বরের ঘরের বাঁদিকের দেয়ালে একটা বড় ছবি— পরমেশ্বরের মেজবউদির, বঙ্কিমের মেজ জ্যাঠাইমার।

প্রতিমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, 'হোয়াট ইজ দি নিউ গেম'?

প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে, 'একটু কুড়ু কুড়ু করে দিয়েছি মিলর্ড'।

বৃদ্ধ মানুষকে একটু সম্মান করার কথা, একজন নিঃসঙ্গ মৃতদার ব্যক্তিকে একটু স্নেহ ভালবাসা দেবার কথা বললেই প্রতিমা সেই প্রথম থেকে শুরু করবে, 'মনে পড়ে প্রিয়তম, আজ থেকে এক যুগ আগে ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় বাবু পরমেশ্বর বন্ধু-কাম-বেয়াই হীরালালকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন বিনা অপরাধে, বিনা প্ররোচনায়। জগৎটা আরশির মুখ দেখা মানিক।'

অপূর্ব আগে একটু-আধটু ফাঁস করে দিত। এখন সে আর মুখ খুলতে চায় না প্রহারের ভয়ে। ফলে পায়রা ধরার আগে এই সুখের সংসারে কী ঘটে গেছে বঙ্কিমের কাছে গেসওয়ার্কই হয়ে রইল। সে চায়ের কাপ আর জলখাবারের থালা, নিয়ম মাফিক পরমেশ্বরের খাটের পাশে টুলের ওপর নামিয়ে রাখল। দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদনের ভঙ্গিতে। পিতা পরমেশ্বর পুত্রের এইসব কেরামতির সঙ্গে অতি পরিচিত। কতই যেন ভক্তি! ব্যাটা মিচকে শয়তান। সকালে প্রণাম, সন্ধ্যায় প্রণাম! ব্যাবা, ব্যাবা আদুরে ডাক! বুড়ো খোকা আমার। জাত অশ্বেতর। নিজের বউকে কন্ট্রোল করতে পারেন না তিনি আবার মিষ্টি মিষ্টি করে বলতে আসেন,— 'হেট কমপ্লেক্সে সাফার করছেন আপনি, একটু ভালবাসা দিয়ে দেখুন, দেখবেন দশ গুণ বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন।'

'ওরে আমি তোর ফাদার না তুই আমার।'

পরমেশ্বর কোনওদিকেই ফিরে তাকালেন না, না খাবার, না বঙ্কিম। বারে বারে চা খেতে ভালবাসেন, চায়ের দিকেও হাত বাড়ালেন না।

এই সব পরিস্থিতিতে বঙ্কিম বড় অসহায় বোধ করে। চেনা মানুষ যখন অচেনা হয়ে যায় তখন মা'র অভাব হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিজের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আছেন তাঁকে স্মরণ করে বঙ্কিম বলে, 'আই ফিল ফর ইউ।'

এইসব পরিস্থিতিতে ইংরেজিটাই বঙ্কিমের বেটার মনে হয়। ব্রেভিটি অফ এক্সপ্রেশান।

'আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সোর্স অফ ট্রাবলটাকে সরিয়ে দিতে। এনাফ অফ ইট।'

'আর না। আমি সিনসিয়ারলি লজ্জিত। আপনি দেখবেন আর কয়েক দিনের মধ্যে আই উইল ক্লিয়ার দেম আউট।'

পরমেশ্বর তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটোকে প্রথমে একটু বাঁকালেন, তারপর বললেন, 'আর কতদিন, আর কতদিন, হাও লং উইল ইয়ু ফিড মি উইথ দি ননসেন্স অফ ইয়োরস? অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি লাস্ট টেন ইয়ার্স। এগুলো নিয়ে যাও। সারাজীবন অনেক খেয়েছি। আর কত খাবি পরমেশ্বর। পর-মেষ আর কত খাবি! সব তো খেয়ে বসে আছিস। যাও, যাও, নিয়ে যাও। অহংকারের গন্ধ বেরোচ্ছে। কীসের অহংকার! তোর স্বামী আজ রোজগার করছে সেই অহংকার! কাল কী হবে, কেউ বলতে পারে। মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বং হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বং— ফট।'

বঙ্কিম চা আর খাবার নিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির বাঁকে এসে পায়রার ঝুড়িটাকে মারল এক লাথি। পায়রাটা হয় মরে গেছে, না হয় অজ্ঞান হয়ে আছে। একটুও ঝটপট করল না। লাথিটা যে জায়গায় মারা উচিত সে জায়গায় মারতে পারছে না। কেন পারছে না বঙ্কু? ভেতর থেকে আর এক বঙ্কিমের উত্তর— 'মালেক, বড় দুর্বল আমি। আমার প্রেম যমুনা এখনও উজ্জ্বল, শুকোয়নি মালিক। তা ছাড়া দুটি ইস্যু আমার, বাঘের সঙ্গে শত্রুতা করে বনে বাস করা যায় না। গোপাল! বিবাহ বিচ্ছেদ বড় এক্সপেনসিভ দাদা। খোরপোষ জোগাবে কেমনে বাপ। যা মাইনে পাও তাতে চলবে না রাসকেল। বঙ্কিম নিজের মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললে, 'কেন প্রেম করে মরেছিলে গাড়োল?' গাঁট্টা মেরে বঙ্কিম নিজেকে একটু টিউন করে নিল। একে ছুটির দিন তার উপর গৃহস্বামীর মনের আকাশে ঘন কালো মেঘ। পালাবার পথ বন্ধ। অফিস যাচ্ছি বলে পরিস্থিতি এড়ানো যাবে না।

প্রতিমাকে গৃহস্বামী শব্দটা বললে হাসে। গৃহ আমার, গৃহস্বামী হলেন তোমার বাবা? কোন আইনে গুরু। পরমেশ্বর আর একটি ভুল করেছেন যার কোনও চাড়া নেই। সমস্ত টাকা বাড়ির পেছনে উজাড় তো করেছেনই, তার উপর বাড়ি জায়গা সবই করেছেন বঙ্কিমের নামে। তখন বঙ্কিম প্রতিমার পাল্লায় পড়েনি, পিতার বাধ্য সন্তান ছিল। এখন পরমেশ্বর সামলাক ঠ্যালা। বঙ্কিমের সম্পত্তি মানে প্রতিমার সম্পত্তি। প্রতিমা এখন এমন শুরু করেছে, পরমেশ্বর দোতলায় বন্দি। আগে একতলার বাথরুমটাই ব্যবহার করতেন, ওপরেরটা যতদিন পরিষ্কার রাখা যায়। এখন আর নীচে নামেনই না। প্রতিমার চালচলন তাঁর ভাল লাগে না। আর তাঁর ভাল লাগে না বলেই পুত্রবধূ আজ বিদ্রোহী। পরমেশ্বর নাগালের মধ্যে থাকলেই, প্রতিমা হয় বঙ্কিমকে, না হয় ছেলেকে কিংবা মেয়েকে চ্যাটাং চ্যাটাং করে বলতে শুরু করবে। সে কীর্তনের ওই এক সুর— জীবন আমার বিফলে গেল। বাপ ব্যাটায় মিলে আমাকে কালি কালি করে দিলে। পড়ত অন্য কোনও বউয়ের পাল্লায়, ঠেলা বুঝিয়ে দিত। এখন সংসারের সিমেন্টশান একদম নষ্ট হয়ে গেছে। পরমেশ্বর দোতলায় অনেকটা বাড়িওলার মতো থাকেন। বঙ্কিম নীচের তলায় ভাড়াটে।

ভরতি চায়ের কাপ আর স্পর্শ না করা জলখাবারের থালা খাবার ঘরের এক কোণে নামিয়ে রেখে, বঙ্কিম নিজেকেই উদ্দেশ করে বললে, 'এবার সামলাও ঠ্যালা। শালা এমন একটা বরাত করে জন্মেছিলাম, জীবনে একদিনও শান্তি পেলুম না।' পাশেই রান্নাঘর, কড়ায় তেলের ছ্যাঁ করল, প্রতিমা কিন্তু ঠিক শুনেছে। লম্বকর্ণ। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে চাপান দিলে, 'আমারও আর নিত্য ভাল লাগে না। তোমার বাবার যখন মত ছিল না তখন ঝক মারতে বিয়ে করেছিলে কেন'। বঙ্কিম মনে মনে বললে, ওরে শালা কী ধড়িবাজ মেয়েছেলে, যার জন্যে চুরি করলুম সেই এখন বলে কিনা চোর! কী জিনিস মাইরি তুমি! ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো, লঙ্কা পোড়ার মতো ঝাঁজ প্রতিমার গলায়। 'আমাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করে দিয়ে, বাপ ছেলেতে মনের সুখে থাকো। পরের বাড়ির মেয়ে এনে দগ্ধে দগ্ধে আর মেরো না'। উরেব্বাস, প্রতিমা যেন তার মেয়েছেলে, আলাদা ইমারতে রেখে, প্রতি শনিবার কানে আতর ঠুসে গিলে করা পাঞ্জাবি পরে বঙ্কিমবাবু ফুর্তি করতে যাবে। গোলদারি ব্যাবসা

আছে কিনা? টাকার কত জোর। বিয়ে করা বউয়ের আবদার শুনে বঙ্কিম অবাক হয়ে গেল। মেয়েছেলে কী চিজ রে বাবা!

প্রতিমা ওস্তাদ মেয়ে। সে জানে পরমেশ্বরের গুমসুনি এখনই কেটে যায় যদি তাঁর বিধবা বোন এসে পড়েন। ভাই বোনে প্রথমে কিছুক্ষণ এই মায়া প্রপঞ্চময় জগতের হালচাল নিয়ে খানিক হা হুতাশ হবে, তারপর ছেলেবেলার কথা, মৃত আত্মীয়স্বজনদের কথা বলতে বলতে, পরমেশ্বরের চোখ ছলছল করে উঠবে। বঙ্কিমের মা'র কথা তো উঠবেই। তখন পরমেশ্বর একদিকের দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর দিকে এগিয়ে যাবেন। ছবিটার ঝকঝকে ফ্রেম আছে, কাচ আছে, কেবল আসল জিনিস, ছবিটাই নেই। পরমেশ্বর মনে করেন এটা তাঁর স্ত্রীর ছবি। বঙ্কিম বহুদিন ওই বস্তুটিতে মাতৃদর্শনের চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও দর্শনই ভাগ্যে জোটেনি। একটা কিছু আছে ভারী অস্পষ্ট, কল্পনা ছাড়া অন্য কোনও দৃষ্টিতে ধরা পড়া শক্ত। পরমেশ্বর অনেকক্ষণ ছবিটার-দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন। মরা চোখের কোল দিয়ে একটি-দুটি কষ্টে জলের ফোঁটা নামবে, ভাঙা গাল বেয়ে। হঠাৎ পরমেশ্বর একসময় ও হো হো করে কেঁদে উঠেই, ঠকাস করে দেয়ালে কপালটা ঠেকিয়ে দিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠবেন, 'কী সব সতী সাধ্বী ছিলে, অ হু হু কীই সব ছিলে।' আর ঠিক এই মুহূর্তে বঙ্কিমের পিসিমাকে বলতেই হবে— 'ছোট বউদি কীরকম ছেলে ভালবাসত ছোড়দা, কেবল বলত আমার আর ছেলে হবে তো ঠাকুরঝি।' ব্যস সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের ভাব চটে যাবে। ঝাঁ করে কপালটা দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে পরমেশ্বর বলবেন, 'তোর খালি ওই এক কথা। ভুল, ভুল কথা। সে যে কী ছিল তোরা বুঝবি কী? তাকে বুঝতে গেলে ভেতরে মালমশলা থাকা চাই। কোনও কামনাই তার ছিল না রে।' কোনও কামনাই শব্দটা তিনি আর শেষ করবেন না, আবার একঝলক কান্না। বোন তখন কীর্তনিয়াদের মতো ধুয়ো ধরবেন, 'না না ছিল না, হ্যাঁ, ছিল না, ছিল না, ছিল না।' সঙ্গে সঙ্গে ভাই-বোনে ভাব হয়ে যাবে। দু'জনে সামনাসামনি বসে খানিক উভয়ের পুত্রবধূদের জাগতিক মূল্যায়ন হবে। তখন ভেতরটাও বেশ খোলসা হয়ে যাবে। পরমেশ্বর বললেন, 'যা এক কাপ ভাল করে চা করে নিয়ে আয়।' বোন যেই দোতলা একতলার মাঝামাঝি চলে যাবে ভাই সঙ্গে সঙ্গে তাকমাফিক একটি অন্তরটিপুনি ছেড়ে দেবেন— 'যাচ্ছিস যা, প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পারিস কিনা দেখ। দেবে কেটে একেবারে দু'খণ্ড করে'। বোনও তেমনি। তিনি নির্গুণ সত্তা। যখন দোতলায় তখন তিনি দোতলার মতো, আবার একতলায় একতলার মতো। একতলায় ল্যান্ড করেই তিনি উত্তর দেবেন, 'না ছোড়দা, আমায় কিছু বলবে না। মেয়ে তো খারাপ নয়, তবে মাথা গরম। এক বালতি দুধে একটু চোনা।' প্রতিমা অবশ্যই এটার মেন্টাল নোট রাখবে। একটা জবাব আজ না হোক অন্য দিন দিতে হবে তো? তা না হলে ব্যালেন্স থাকবে কী করে? পরমেশ্বর পুনরাক্রমণের পথ খোলা রেখে দেন।

এ বাড়ি থেকে বঙ্কিমের পিসিমার বাড়ি দেখা যায়। খান কতক বাড়ির ব্যবধান। আগে রোজই আসতেন। ইদানীং রোজ আসতে পারেন না। তাঁর বাড়িতেও তো পুত্রবধূ আছে। এখন ছুটিছাটার দিন অবশ্য আসেন। সেখানেও তো ছুটির দিন এক বঙ্কিম আছে। নামটা হয়তো বঙ্কিম নয়। বঙ্কিমের ভাগ্য ভাল, দরজার সামনেই পিসিমা। বঙ্কিম এফ আই আর প্লেস করল। জোর হয়ে গেছে সকালেই। অন্নবস্ত্র ত্যাগ। পিসিমা বঙ্কিমকে একটু দরদ দেখালেন, 'আর তোমারও হয়েছে মহাজ্বালা বাবা। ছোড়দার মাথার আর ঠিক নেই। এটা তো পাগলের বংশ। ঠিক আছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' পিসিমা আস্তে আস্তে পাতলা হওয়ার স্তরে চলে গেলেন।

ছুটির দিনের আনন্দ বহুকালই বঙ্কিমের জীবন থেকে হড়কে গেছে। এখন ছুটি মানেই ছোটাছুটি। একবার উপর একবার নীচ। একবার ঘর একবার বাহির। সেই গল্পের নায়কের মতো। সমুদ্রের ধার থেকে কলসি কুড়িয়ে পেয়েছিল। ভেবেছিল রত্ন পাবে। ঢাকা খুলতেই বেরোল একরাশ ধোঁয়া।

তারপর হেসে উঠল দৈত্য ই হাহা। হেসে উঠল প্রতিমা ই হিহি। বোঝো বাছাধন দাম্পত্যজীবনের ক্যা সুখ! একা সৈনিক ক'টা ফ্রন্টে লড়বে! তিনটে ফ্রন্ট। পিতা পরমেশ্বর। পুত্র কন্যা। স্ত্রী প্রতিমা। বঙ্কিম যখনই দেখে মহাসংকট তখনই সে কঠিন কোনও কাজ নিয়ে পড়ে। সবচেয়ে শক্ত কাজ বাথরুমের প্যান পরিষ্কার। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে বাঁকানো বুরুশ দিয়ে দূরূহ সব ভাঁজ থেকে হোল ফেমিলির সারা সপ্তাহের অপকর্ম টেনে টেনে বের করা। বঙ্কিম গুনগুন করে গাইল— 'এ জীবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে, কে রোধিবে, রোধিবে কোন শালা'। বাথরুমে তার বিশ্বরূপ দর্শন হয়। রান্নাঘরে ছত্রাকার তরিতরকারি। কাঠবিড়ালির সেতুবন্ধনের মতো প্রতিমার রান্নার টেকনিক। একবার করে আসছে, কড়ায় ফুটন্ত জলে একটা করে মাল ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। একে বলে 'পিসমিল টেকনিক অফ কুকিং'। শেষে একটা দশ পয়সা নিয়ে হেড টেল। হেড নুন দিয়েছি, টেল নুন দিইনি। অপূর্ব রোজই খেতে বসে বলবে— 'তোমার সব ভাল মা, কেবল তরকারিতে যদি একটু নুন দিতে'। প্রতিমা বলবে— 'মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। নুন দিয়ে খাও'। কিচেন ড্রামার পর পরমেশ্বর ড্রামা। ভাই আর বোন দোতলায় মুখোমুখি। দু'জনেই যেন এন্ড অফ দি ওয়ার্লডে এসে, অতঃ কিম বলে গুম মেরে বসে আছেন। যা কিছু ভরসা তুমি মা। ছেলে আর মেয়ে এখন এসপিয়নেজের কাজে ব্যস্ত। জিরো জিরো সেভেন। অন প্রতিমা'স সার্ভিস। পরমেশ্বর তেমন কিছু ড্যামেজিং বললেই, রইল তোর সংসার, দুম দুম করে দোতলায় গিয়ে উঠবে, 'আরে পরমেশ্বর, চলা আও। সম্মুখ সমরে দেখি বউ হারে কি শ্বশুর হারে'। সিঁড়ির চাতালে, ঝুড়ি চাপা পায়রা। ব্যাটাচ্ছেলে সাতসকালে ঝগড়ার ভাইরাস নিয়ে ঢুকেছে। পইতের সঙ্গে ঝ্যাঁটাটা জড়াবেই। বঙ্কিম কসে নিজে গালাগাল দিল। কাশ্যপ গোত্রস্য কুলাঙ্গার। বীর্যহীনায় জুতি মার।

যতক্ষণ এই চার বাই চার বাথরুমে থাকা যায়। কিছুটা সাউন্ডপ্রুফ। প্রতিমার ঝনঝনে গলা ততটা কানে আসে না। আহা ভদ্রমহিলার এমন ডাকসাইটে গীতিময় গলা! গজল কিংবা কাওয়ালির পক্ষে আইডিয়াল। হেলায় হারালি মাইরি। বাথরুম থেকে বেরোলেই ধরবে ক্যাঁক করে। কত জায়গায় যে যাবার আছে! ঘুঘুডাঙায় বোন, আটপাড়ায় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। আঁদুলে ন'ভাই। বেলুড়ে কে এক হতচ্ছাড়া। সারা ভারতবর্ষে প্রতিমা বংশ ছড়িয়ে আছে। পূর্বপুরুষ দিগবিজয়ী ছিল নাকি রে বাবা! ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা একবার দেখতে হচ্ছে। সোমবার থেকে মাথায় ঘুঘুডাঙা ঢুকেছে। এদিকে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দিলে। আজ যদি না নিয়ে যায়, ডবল এক্সপ্লোশান হবে। ঈশ্বর! এত লোকের থ্রমবোসিস হয় আমার কেন হয় না।

হঠাৎ ফটাফট মার আর কান্নার শব্দ কানে এল। লেগেছে। আর একটা ফ্রন্টে আক্রমণ শুরু হয়েছে। এতক্ষণ সিজফায়ার যাচ্ছিল। শালা এ-যেন ওয়ার অফ রোজেস। শ'খানেক বছর লাগাতর চলবে। ঝ্যাঁটা ফেলে বঙ্কিম বেরোল। ওপরে পরমেশ্বরকে সবে ধাতে আনার চেষ্টা চলেছে। এখন অন্তত একটু পিসফুল থাকা চাই। বঙ্কিমের তখন রাজবেশ। পরনে তিন হাত মাপের লাল গামছা। সামনের দিকটা ভাল চাপা পড়েনি। বংশের ধারা অনুসারে মধ্যবয়সে বাঁদিকেরটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। ফাইলেরিয়াও হতে পারে, হাইড্রোসিলও হতে পারে। লম্বা পইতে অনবরত ঝ্যাঁটায় জড়িয়ে যাচ্ছিল বলে গলায় কণ্ঠির মতো গোল হয়ে ঝুলছে। বুকের ছাতি বিয়ের আগে ডন বৈঠক করে ৩২ থেকে ৩৪-এ তুলেছিল। এখন বেনোজলে ঘেরোজল বেরিয়ে গেছে। ৩১ ইঞ্চি বুকের খাঁজে অজন্মার ফসলের মতো কিছু চুল। বুকের খাঁচাটা পাশ থেকে গোনা যায়, ক'টা হাড় নিয়ে পাঁজরা, রিব, বকস? মুখটা এখনও কচি আছে। দু'ছেলের বাপ বলে মনে হয় না। ভিখিরি এখনও পয়সা চায় খোকাবাবু বলে। সেই বঙ্কিমেরই বিক্রম কী? ভিজে হাত গামছার কোনায় মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল 'কী হয়েছে দাদু।' ছেলেকে মাঝে মাঝে দাদু বলে ফেলে। দোষ নেই। গ্যালপিং টি-বি-র মতো প্রতিমুহূর্তেই তো তার বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কে কতক্ষণ তরুণ থাকতে পারে' এক রাতেই সব চুল সাদা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপূর্ব জি-জি করে কাঁদছে। হাতে এক তাল তুলো। টপ টপ করে দুধ পড়ছে পাপোশের উপর। হাত দুয়েক দূরে প্রতিমা। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। বাসি খোঁপা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়েছে। বিয়ের সময় মন্দ চুল ছিল না। ঝগড়া করে করে এখন টিকটিকির ল্যাজ। দেখলেই ছড়া কাটতে ইচ্ছে করে কুঁদুলে কড়াইশুঁটি । কবে কোন উৎসবে যাবার সময় এক লেছি ফলস চুল আসল চুলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সেটা এখনও জড়ানোই আছে, খোলার সময় কোথায়! হায় প্রেম! যখন আইবুড়ো ছিলে মামণি তখন ওই চুলেরই কী বাহার ছিল মাগো! কোঁকড়া চুল থাকে থাকে আঁচড়ানো। শ্যামপুইড, ফাইন। ভুবনভোলানো রূপে এসেছিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বারোটা বাজাতে। বঙ্কিম মনের বঙ্কিমকে বললে, শালা বঙ্কিম ক্যাচার। এখন চেহারার ছিরি দেখো! হেলেন অফ ট্রয় থেকে ভিলেন অফ জয়। পরমেশ্বর একদিন হা-হা করে বলেছিলেন— 'কতও সুখের সংসার হতে পারতও, স্রেফ একটা এলিমেন্ট, ওয়ান এলিমেন্ট সমস্ত কম্পাউন্ডটাকে গানপাউডার করে ছেড়ে দিলে! গড! ইয়োর অ্যালকেমি'! সঙ্গে সঙ্গে এসরাজে জোরে ছড় টানলেন, কুঁই কুঁই-ই, সুখের গৃহ শ্মশান করি, বেড়াস মা তুই আগুন জ্বালি। বাটোয়ারি করে ফেরতা বাজালেন, সুউখের গৃহই শ্মঅশান কঅরি বেএড়াস মাহা তুইই আআগুন জ্বাআলি। চুলের ফাঁদে বঙ্কিমকে ধরে প্রতিমা এখন ব্যাধিনী। সাজগোজ গুলি মারো। প্রেমের বুলি? নেই প্রয়োজন। বাঘিনির আস্ফালন। তোমার সিক্রেট জানি বৎস। চন্দ্রে ষোলো কলার মতো মূলাধারে রস জমতে জমতে ভাণ্ড যখন পূর্ণ হয়ে প্রসট্রেটে সুড়সুড়ি দেবে তখন আমি চুল বাঁধি আর না বাঁধি, প্রেমের কোকিল হয়ে কুহু কুহু করি না করি, তুফান উঠবেই, আর তুমি বঙ্কু, মাই ডিয়ার বন্ধু, ঝম্প তোমায় মারতেই হবে, তুমি তখন আমার বায়ু। মনের বঙ্কিমকে বঙ্কিম বললে, তখনই তোমায় বলেছিলুম, শালা, বিশ্বাস করে মেয়েদের সামনে উলঙ্গ হয়ো না। বঙ্কিমের মনের হলঘরে পোড় খাওয়া বঙ্কিম এইসব জ্ঞানের মুহূর্তে হুহু করে গান গেয়ে ওঠে— 'তখনই তোরে বলেছিনু মন'।

সিঁড়ির তলায় পাপোশ ড্রামার সেই দৃশ্যটাকে স্টিল করে রাখলে এইরকম দেখাত— বঙ্কিমের কোমর থেকে শরীরে ঊর্ধ্বাংশ সামনে ঝুঁকে। পরনের গামছার সামনের একটা খুঁটে দুটো হাতে জড়ানো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের লজ্জাশরম ইদানীং কমে গেছে। ভারচ্যুয়েলি সংসার তাকে সর্ব ব্যাপারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছে। সে যেন কৌরবের হলঘরে বিবস্ত্র পুং দ্রৌপদী। মাঝে মাঝে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কার্তিকদা আমায় ল্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে। কতকাল আগে কোন শৈশবে শোনা এই আর্তনাদ বঙ্কিমের কানে যেন মহা সংগীতের মতো বাজে। তাদের পুরনো বাড়ির সামনের বড় রাস্তার উলটোদিকে ছিল কার্তিকদার চায়ের দোকান। একদিন রাত প্রায় বারোটা-একটার সময় একটা চোর ধরা পড়ল। পাড়ার রকবাজ বয়স্করা ধরে নিয়ে এল কার্তিকদার দোকানে। কার্তিকদার বিচার— কাজির বিচার, ব্যাটাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দাও। কিশোর বঙ্কিম ঘুম-ভাঙা চোখে, জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে সেই মিডনাইট ড্রামা দেখেছিল। লম্বা চওড়া বিশাল একটা মানুষের নিজেকে আবৃত রাখার কী আপ্রাণ চেষ্টা! পারবে কেন! সমবেত চেষ্টায় রাজপথে সম্পূর্ণ একটা উলঙ্গ মানুষ। যেন এইমাত্র তার জন্ম হল! সদ্যোজাত গোবৎসের মতো সে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে ছুটল —'ওরে বাবা রে, কার্তিকদা আমাকে ল্যাংটো করে ছেড়ে দিলে রে বাবা'। মধ্যরাতে দেখা দুটি দৃশ্য বঙ্কিম জীবনে ভুলবে না, এক, এই উলঙ্গ করার দৃশ্য এবং চিৎকার। দুই, '৪৭ সালের মধ্যরাতে দেখা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ফেস্টুন, ফ্ল্যাগ, আলো, শাঁখ, বোমা পটকা, বন্দুক, রিভলবার। বাড়ির কিছু দূরে ডাচকুটির ছ'তলার ছাদে দাঁড়িয়ে মটুকদা ছ'বার রিভলবার ছুড়েছিলেন ঠাস ঠাস করে।

ওই স্টিলে বঙ্কিমকে দেখা গেল। প্রতিমাকে দেখা যাবে এইভাবে— দাঁতে দাঁতে চেপে রাখার ফলে চোয়াল স্পষ্ট, কাপড় গাছকোমর, খোঁপা ঘাড়ের কাছে লাথি মারছে, হাতে একটা স্কেল। স্কেলটা দিয়ে অপূর্বর পায়ের গোছে চ্যাটাস চ্যাটাস করে কয়েক ঘা বসিয়ে এখন নিজের পাছায়

প্যাটাস প্যাটাস করে মেরে তাল আর লয় দুটোই বজায় রাখছে। বোলটা এইরকম— নিজের পাছায় পুট-পুট, অপূর্বর পায়ে পটপট পটাপট। অনেকটা বঙ্কিমের বাড়ির কাছে কালীবাড়িতে শোনা আরতির সময় জগঝম্পের বোলের মতো, পটপট, পটপটাপট, পুট পুট-পুট-পুট অ্যান্ড রিপিট।

অপূর্ব পাপোশে। একটা পা শিকারি বকের মতো ওপরে তোলা। একটা হাত সেই পায়ের আঘাতের পরিচর্যায় ব্যস্ত। মুখটা যন্ত্রণায়, কান্নায় বিকৃত। চোখে জল, এক হাতে প্রায় আউন্সখানেক বরিক তুলো দুধে ভিজে রসমালাই। টিপটিপ করে দুধের ফোঁটাও পড়ছে। টিপটিপ করে চোখের জল পড়ছে। আর কনসার্টটা এইরকম,— হাঁউ হাঁউ কান্নার সঙ্গে প্রতিমার দন্তোষ্ঠ গর্জন হুঁউ, উঁউঁ, হুঁউ। বঙ্কিমের মুখের ম্যারাকাস ছুক ছুক, ছুক ছুক। অন্যদিন হলে এই ফিলারামোনিক অর্কেস্ট্রার একজন কনডাক্টার থাকত। তিনি পরমেশ্বর। আজকে তিনি হাইবারনেশানে। সেন্টিমেন্টের সিল্কের সুতো জড়িয়ে গুটি বাঁধছেন। তিন-চারদিন চলবে এই গুটি বাঁধার পিরিয়াড। তারপর পরিপূর্ণ একটি কোকুন হয়ে দোতলার ঘরের খাটে গড়াগড়ি যাবেন। বঙ্কিমের স্পিনিং-এর কাজ শুরু হবে তারপর। স্পিনিং মাস্টার বঙ্কিম তখন সেই সাধনার সুতো খুলবে। রিলের পর রিল সিল্কের সেন্টিমেন্ট। যতক্ষণ না পরমেশ্বর আবার একটি পিউপা।

অন্যদিন পরমেশ্বর দোতলার সিঁড়ির গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির পিঠের তলার দিকে তাকিয়ে এই ধরনের অর্কেস্ট্রা নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পরিচালনা করেন। উপর থেকে নেমে আসে নরম তুষারেব মতো শব্দের রঙিন পালক— 'চালাও, চালাও, লাগা, লাআগা, আর একটু উপরে রগের কাছে, দে মা ফিনিশ করে দে, প্যাঁদা, প্যাঁঅ্যাদা প্যাঁদাও।' মারো না বলে পরমেশ্বর ইনটেনশানালি প্যাঁদাও বলেন, একটু ভালগার টাচ দেবার জন্যে। তাঁর ধারণা নীচে হল বস্তি কালচার, উপরে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক কালচার। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার জায়গাটা হল বাউন্ডারি লাইন। বঙ্কিম বলে, লড ম্যাকনামারা স্ট্যান্ডিং অন দি লফট চিজেলিং অ্যান ইম্যাজিনারি লাইন।

বঙ্কিম অবশ্য ইদানীং একটা টেকনিক আয়ত্ত করেছে। অভিজ্ঞতাই মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন জানেন ঝড়ের সমুদ্রে জাহাজ কীভাবে ভাসিয়ে রাখতে হয়। প্রতিমা অপূর্বকে ঠ্যাঙালে পরমেশ্বর ঘটনার হাতল ধরার সুযোগ করে নেন। পরমেশ্বরের ব্রিটিশ পলিসি, ডিভাইড অ্যান্ড রুল। তিনি বলেছেন, প্রতিমাকে তার নিজের মুদ্রায় পেমেন্ট করবেন। অপূর্ব সেই মুদ্রা। ছেলেকে লড়িয়ে দাও মা'র পেছনে। মারা হায় এক ঘা, তোমভি লাগাও দু'ঘা। ভুলে যান সোমত্ত একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে দৈহিক শক্তিতে একটা শিশুর পারার কথা নয়। তবু পরমেশ্বরের সেই ফেভারিট কয়েকটা লাইন— হু ক্যান টেল, ইন দি হুইরিলিজিগ অফ টাইম এ সেকেন্ড চৈতন্য মে নট অ্যারাইজ। বলা তো যায় না, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শক্তি ধার করে শিশু অপূর্ব হয়তো প্রতিমার স্তনবৃন্ত ঠোঁটে ধরে আর একটা মডার্ন পুতনা বধ করে ফেলতে পারে।

কিন্তু বঙ্কিম যখন স্টিয়ারিং-এ পরমেশ্বরের তখন বলার কিছু নেই। তাঁর সংগ্রাম পুত্রবধূর সঙ্গে, পুত্রের সঙ্গে নয়। রোজ সন্ধেবেলা নাতিকে গান শেখান :

আপনার জন, সতত আপন
আপন কখন পর না হয়

এটা হল অস্থায়ী। অন্তরা—

পর কি কখন হয় রে আপন,
যতন করিলেও পরই রয়।

অস্থায়ী শুনতে না পেলেও, বাড়ির যেখানেই থাকুক অন্তরাটা প্রতিমার কানে যাবেই, যেতে বাধ্য। বাস, মাই পার্পাস ইজ সার্ভড। গান দিয়ে তোমায় গাঁথব মাগো। গানটার অবশ্য ডবল অন্তরা। সেকেন্ড অন্তরার টার্গেট বঙ্কিম—

ইয়ার বন্ধু যাদের ভাবো আপনার
স্বার্থ বশে আসে, নহে আপনার

স্বার্থ সিদ্ধি হলে ওরে বেটাচ্ছেলে তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চলে যাবে। প্রতিমা কি তোর অর্ধাঙ্গিনী রে হারামজাদা! তোর যৌবনের ইয়ার। তা না হলে শ্বশুর বসে রইল ওপরে, উনি নীচের তল্লায় স্বামীকে ডাকছেন বঙ্কা বলে। গস্তানি ব্লাডি বাগার। বউ ছিল তোর মা, তোর জ্যাঠাইমা। চোখে না হয় দেখিসনি, ছবিটা তো দেখেছিস। যত দিন যাচ্ছে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বঙ্কিম ছবিটাই দেখতে পায় না তো জ্যোতি। ইনার ভিশান ছাড়া ছবিও দেখা যায় না, জ্যোতিও চোখে পড়ে না।

বঙ্কিমের টেকনিক হল পুত্রকে প্রহারের দায়িত্বটা সে নিজে হাতে নিয়ে নেয়। প্রতিমা যত না রেগেছে তার চেয়ে চতুর্গুণ রেগে প্রহার যষ্টিটি নিজের হাতে নিয়ে ফ্যামিলি-পলিটিক্যাল ক্রিচারটিকে ঠ্যাঙানো। অপূর্ব হল এই সংসারের বলির পাঁঠা। রাগের ফিউজ বা ভাল্‌ভ। বঙ্কিম বহুবার প্রতিমাকে বোঝাতে চেয়েছে, মেরো না, মারলে ছেলেপুলে বিগড়ে যায়। পয়সা খরচ করে মন্টেসারির বই কিনে এনে পাতা খুলে খুলে প্রতিমাকে দেখিয়েছে ছেলে কী করে মানুষ করতে হয়— হাও টু রিয়ার অ্যান ইমোশানালি হেলদি চাইল্ড। কিন্তু হায়, চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। রেখে দাও তোমার মন্টেশ্বরি। ও তোমার বাবাকে শোনাও। তোমার দ্বিতীয় পক্ষ এসে তৃতীয় সন্তানকে মন্টেশ্বরি করবে। আমি ঘণ্টেশ্বরী, আমার কায়দায় আমার ছেলে মানুষ করব। দায়িত্ব আমার। হু আর ইউ? আমি যে ফাদার রে শালি! এ কি তোর বাওয়া ডিম? তুমি কি বাবা পোলট্রির লেগ হর্ন, মোরগ ছাড়াই ডিম দাও! বঙ্কিম হাল ছেড়ে দিয়ে গান গেয়েছে— তোমার রঙে রং মেশাতে হবে।— যতদিন পরমেশ্বর আছেন ততদিন বউয়ের সঙ্গে আনহোলি অ্যালায়েন্স রাখতেই হবে। থার্ড ফ্রন্ট ওপন করলেই যুদ্ধে পরাজিত হবে। তবে দাঁড়াও, আমার দিনও আসবে, তখন আমি দেখব তুমি কত বড় ঘণ্টেশ্বরী। অতএব পরমেশ্বরকে ঠেকিয়ে রাখতে বাড়িতে থাকলে সেই রুদ্রশাসনকর্তা। তাতে অন্তত প্রতিমা-পরমেশ্বর-ঝম্প-লড়াইটা আর হতে পারে না। ছেলের ছেলে অন্যায় করেছে, ছেলে শাসন করছে। নাথিং রং। বাট হোয়াই মাদার? ফিজিশিয়ান হিল দাইসেলফ। তোর নিজেরই আষ্টেপৃষ্টে ফুটো, তোর শাসনের যোগ্যতা কী? আপনি আচরি ধর্ম তবে তো পরকে শেখাবে! তুমি নিজে কী বাবা? তোমার চালচলন দেখেই তো ওরা শিখছে। ইনসমনিয়ার রুগি পরমেশ্বর মাঝরাতে ঘরে পায়চারি করতে করতে, ভাঁজ করা দুটো হাত বুকে রেখে শরীরটাকে টান টান করে অদৃশ্য নিয়তিকে বলবেন— দেখব, দেখব, এই নাতিই আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে কিনা। পারবে তুমি। তুমি পারবে। এই বয়েসেই তোমার যা মুখ হয়েছে। তুমি তোমার মায়ের বাপ। বাবারও বাবা আছে রে হিড়িম্বা।

বঙ্কিম তিরিক্ষি মেজাজে আবার জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী? এক মিনিটও কি শান্তি নেই! অনবরত মারধর, ঠ্যাঙাঠেঙি। বাবা ঠিকই বলেন বস্তি কালচার। হয়েছে কী? শুধু শুধু পেটাচ্ছ কেন? এ কি বেওয়ারিশ মাল!'

প্রতিমা সপ্তমে গলা তুলে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ না কী হয়েছে? ভগবান তো ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ দিয়েছেন?' বঙ্কিম আর একবার ভাল করে দেখল। অপূর্বর হাতে রসমালাই নয়, তুলোমালাই।

'তুলোটা পেলে কোথায়?'

'দাদির ড্রয়ারে।' অপূর্বর কান্না ভাঙা উত্তর।

প্রতিমা আবার গর্জে উঠল। 'এই তুলো নিয়ে একবার কত কাণ্ড হয়ে গেছে। ওনার দাঁতে ওষুধ লাগাবার তুলো। সেই তুলো এনে এক ডেকচি দুধে ডুবিয়েছে।' প্রতিমা এবার ভেংচি কেটে বলল, 'পায়রাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ইচ্ছে করছে গলা টিপে আপদ শেষ করে দিই।' প্রতিমা প্রহারের জন্যে আবার স্কেল তুলছিল। বঙ্কিম ছোঁ মেরে স্কেলটা কেড়ে নিল। নিরস্ত্র প্রতিমা তখন হাত ওঠাতে

যাচ্ছিল। বঙ্কিম হাতটা চেপে ধরল। শাঁখা, চুড়ি পরা গোল একটা হাত। এমন একটা নরম, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত হাত এতটা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে! অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক দানবী। বউয়ের হাতটা অল্প একটু মুচড়ে দিয়ে বঙ্কিম বললে, 'তোমার কাজে যাও, আমি দেখছি।'

'তুমি আর কী দেখবে, সারা জীবনই তো দেখছ। দেখার নমুনা তো আমার জানা আছে। দু'বোতল দুধ নষ্ট হয়েছে। ওই দাঁতের তুলো ডোবানো দুধ আমি নর্দমায় ঢেলে দিয়ে আসছি। যেখান থেকে পারো দুধ নিয়ে এসো।'

বঙ্কিম চমকে উঠল, এক লিটার দুধ সত্যি সত্যি যদি নর্দমায় ঢেলে দেয় সারাদিন চা বন্ধ, রাতে পরমেশ্বরের এক চুমুক দুধ বন্ধ। এই অবেলায় কোথা থেকে দুধ জোগাড় করবে! প্রতিমা সব পারে। এখনই উলটে দেবে নর্দমায়। হঠকারিতা দাই নেম ইজ প্রতিমা। অপূর্বকে ছেড়ে বঙ্কিম ছুটল প্রতিমার পেছনে দুধ বাঁচাতে।

'শোনো, শোনো, বরিক কটন এমন কিছু খারাপ জিনিস নয়। তুলো থেকেই তো সুতো হয়, সুতো থেকে কাপড় হয়, সেই কাপড়েই তো রোজ দুধ ছাঁকা হয়। তা হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল!'

'বরিক? বরিকটা বুঝি খাবার জিনিস!'

'বরিক তো অ্যান্টিসেপ্টিক। দেখোনি বরিক লোশন, বরিক কমপ্রেস। দুধটা বরং আরও শুদ্ধ হয়ে গেল, মেডিকেটেড হয়ে গেল।'

'ওই তুলো উনি দাঁতে দেন। ওটা দাঁতের তুলো!'

'কী ইডিয়েটের মতো কথা বলছ? তুমি দেখেছ উনি কীভাবে দাঁতে ওষুধ লাগান?'

'আমার দেখে দরকার নেই। ওনার কোনও কিছু আমার দেখার প্রয়োজন নেই।'

'তবে? না জেনেই লাফাচ্ছ! আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কশের দাঁতে গোটাকতক গর্ত আছে। লম্বা একটা তার দিয়ে তার মধ্যে একটু করে ওষুধে ভেজানো তুলো গুঁজে রাখেন। তার মানে কি পুরো তুলোটাই দাঁতের তুলো হল?'

'সেই দাঁতের হাতেই তো উনি তুলোটা ধরেন, নাকি ওনার আলাদা দুটো বাড়তি হাত আছে! তোমার বাবা, তোমার ঘেন্না না থাকতে পারে, আমার আছে, আমি ও দুধ আমার ছেলে-মেয়েদের খেতে দেব না। খেতে হয় তোমরা বাপ-বেটায় খেয়ো।'

বঙ্কিম এতক্ষণ মেজাজ শান্ত রেখেছিল। আর পারল না। আরগুমেন্ট, কাউন্টার আরগুমেন্ট কতক্ষণ ভাল লাগে। এজলাসে জজসাহেবও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বঙ্কিম দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'তবে মরো গে যাও। রোজগার তো করতে হয় না। করলে বুঝতে। তোমার যা খুশি করো গে যাও।'

প্রতিমাকে রান্নাঘরে তার নিজের দায়িত্বে রেখে বঙ্কিম চলে এল ছেলের কাছে। একটা পায়ে সোঁটা সোঁটা কালো দাগ পড়েছে। ছেলেটা যেন সেলুনের দেয়ালে ঝোলানো ক্ষুর শান দেবার চামড়ার ফালি। যে যখন পারে একবার করে রাগ শানিয়ে নিচ্ছে। বঙ্কিম বললে, 'তুমি দাদির সব তুলোটা বের করে এনেছ নাকি?'

'সবটা না, একটু রেখে এসেছি।' অপূর্বর ভেতরে কান্নার আবেগ তখনও মিলিয়ে যায়নি।

'কেন নিলে? জানো না আর একবার তুমি তুলো নিয়েছিলে, দাদি রেগে গিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি করেছিলেন? আজও তাই হবে। কেন তুমি আবার সেই কাজ করলে?'

'পায়রাকে দুধ খাওয়াব।'

'পায়রাকে ঠিক সময়ে আমরাই দুধ খাওযাব, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ? এখুনি আমাকে বাজারে ছুটতে হবে তুলো কেনার জন্যে।'

'তুলো এখনও আছে একটু। দাদি কিছু বলবেন না বাবা।'

বঙ্কিম ভাবল, সংসারের কতটুক তুমি জানো বাপি! জটিল এই রণাঙ্গনে আমরা সব জটায়ু। ডানা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। শান্তির সীতাকে রাবণ শালা হরণ করে নিয়ে গেছে। অনন্তকালের বক্সিং রিঙে দাঁড়িয়ে অনবরত ঘুষোঘুষি করে চলেছি।

'এই রইল তোমার দুধ। যা করবে করো।' প্রতিমা ডেকচিটা দুম করে খাবার টেবিলে নামিয়ে রেখে গেল। গন্ডারের গোঁ। যুক্তি মানে না, তর্ক মানে না। সব সময়েই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বঙ্কিম বললে, 'ঠিক আছে আমি ক্ষীর করে খেয়ে নেব। ব্লটিং ভেজানো রাবড়ি খেতে পারো, পোড়া তেলে ভাজা, দোকানের পচা আলু চটকানো চপ খেতে পারো, বরিক কটন ভেজানো দুধ খেতে হলেই নাক শিকেয় উঠে গেল। তোমার প্যাঁচ আমি জানি না!'

প্যাঁচেরও প্যাঁচ আছে, দাঁড়াও বাছাধন সেই শেষ প্যাঁচে তোমাকে যাবার আগে কাত করে যাব। স্বগতোক্তি করে বঙ্কিম আবার বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজাটা দুম করে বন্ধ করল। অন্যদিন আস্তে বন্ধ করে। আজ ইচ্ছে করেই পিলে চমকানো শব্দ করল। এ বাড়িতে ডিসেনসির কোনও স্থান আছে, কোনও কদর আছে! বেনোবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কী? উদোবক্কা, সব জিনিস কি সব জায়গায় চলে? নিজেকে উদো বলে বঙ্কিম বেশ একটু শান্তি পেল। ও পথে যেয়ো না ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছি। গানের মাঝের লাইনটা সে গেয়ে উঠল। বাথরুমের বদ্ধ চার দেয়ালে গানের বেশ মেজাজ আসে। ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে জমাট একটা সুরের পরিমণ্ডল তৈরি হয়। তখনই তোরে বলেছিনু মন। জল ঢালছে এক মগ, দু'মগ। তিন মগ। তখনই তোরে বলেছিনু মন। নগ্ন বঙ্কিম জল থইথই বাথরুমের মেঝেতে কিছুক্ষণ পদ্মাসনে বসে রইল। ভ্রূ মধ্যে জ্যোতি দর্শন বাথরুমেই সম্ভব হয় কিনা দেখা যাক। আমার তৃতীয় নয়ন খুলে দাও ঈশ্বর। সব শালাকে ভস্ম করে দিয়ে দুর্বাসা মুনি হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসি। আত্মার বলে বলীয়ান না হলে এই তমোগুণীদের কাবু করা যাবে না ভগবান!

পরমেশ্বর মধ্যাহ্ন ভোজন নিলেন না। বঙ্কিমের পিসিমা ফেল করলেন। 'নো আই রিফিউজ। তুই আর আমাকে বিপদে ফেলিসনি। জল স্পর্শ করব না আর চিতোর রানার পণ, বঙ্কিমের কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ। জীবনে ভোগের চেয়ে দুর্ভোগটাই বেশি হয়েছে। অনেক স্যাক্রিফাইস করেছি। না খেয়ে না দেয়ে ছেলে মানুষ করেছি। নো বিলাসিতা, নো বাবুয়ানা, সেই ছেলের বউয়ের হাতে বুড়ো বয়সে ইনসালটেড তো হতেই হবে। মাই স্টমাক ইজ ফুল উইথ ইনসালট। এই দেখ পেটটা আইঢাই করছে।' পরমেশ্বর গেঞ্জি তুলে বোনকে পেটটা দেখালেন। বোন বললেন, 'ও বাবা বেশ বায়ু হয়েছে ছোড়দা, আজ আর তবে কিছু খেয়ে কাজ নেই।'

পরমেশ্বর গেঞ্জিটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হায় প্রভু। এ সে খাওয়া নয় রে সে খাওয়া নয়। যত বয়স বাড়ছে, তুই তত ইডিয়েট হয়ে যাচ্ছিস। অপমান, অপমান, অপমানে পেট ফুলে ঢোল। কম অপমান সহ্য করেছি, লাস্ট টুয়েলভ ইয়ার্স। আর না, নো মোর।'

'তাই বলো। ঠিকই বলেছ। আমি চিরকালের মূর্খ। রাম বুঝতে শ্যাম বুঝি। আমারও ওই এক অবস্থা ছোড়দা। আমার বরাতেও যা একটি জুটেছে না! উঠতে ঝাঁটা। বসতে ঝাঁটা। মেজাজ কী? সব সময়েই গোবদা মুখ।'

ভাইয়ের যা হবে বোনেরও তাই হবে। বরং একটু বেশি হবে। ভাইয়ের ক্যান্সার হলে বোনের হবে; নিমোনিয়া হলে ডবল নিমোনিয়া। সিমপ্যাথেটিক। তালে তাল। পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তুই তা হলে কেটে পড়। আমার জন্যে কেন আবার ঝাঁটা খাবি।'

'না ছোড়দা, আমি ওসব গ্রাহ্যিই করি না। তোমার খাবার ব্যবস্থাটা আগে করি।' চিঁড়ে এল, দই এল, ঝুলি থেকে মর্তমান কলা বেরোল। সংসারের কোনও জিনিস ব্যবহার করা চলবে না। দশ পয়সা দিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে খালি দইয়ের হাঁড়ি এল। কল থেকে জল এল। পরমেশ্বরের ফলার।

বঙ্কিমকে খেতে বসিয়ে প্রতিমা বললে, 'ওনার আর কী! রান্না হল বান্না হল খাব না। দাও সব দুর করে ফেলে। পয়সা তো আর লাগে না। খাব না বললেই হয়ে গেল। যার গেল তার গেল।' বঙ্কিমের পাতে পড়ল ডবল ডোজে ডাল, দ্বিগুণ ডাঁটাচ্চড়ি, দু'ডেলা পোস্ত, দু'বাটি টক। পরমেশ্বরের অংশটা তাকেই খেয়ে হাঁড়ি সাফ করে দিতে হবে। 'নষ্ট হবে নাকি, পয়সার জিনিস! পারছ না মানে, পারতেই হবে, তোমার বাপ পারবে।' ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বঙ্কিমের চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। বঙ্কিমের মনে হল সে চিবোচ্ছে না, সংসারই তাকে চিবোচ্ছে!

দোতলায় পরমেশ্বরের ফলার একতলায় বঙ্কিমের টর্চার প্রায় একসঙ্গেই শেষ হল। শ্রাদ্ধের পর যেভাবে লোকে মালসা ফেলে, বঙ্কিমের পিসি সেভাবে পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে ফলার খাওয়া দইয়ের হাঁড়িটা ফেলে দিলেন। যাবার আগে বঙ্কিমকে একটু চিয়ার আপ করে দিলেন—

'কিচ্ছু ভেবো না বাবা। একটু শুয়েছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ক'দিন আর রাগ থাকবে। আবার দেখবে হাসছে, খাচ্ছে, কথা বলছে।'

আবার বসন্ত আসবে, আবার ফুল ফুটবে, আবার পাখি গাইবে, আবার স্রোতস্বতী জলে ভরে উঠবে, ভ্রমর গুনগুন করবে, ফাগুয়া আসবে, হোরি খেলত নন্দকুমার। পিসিমার আশ্বাসে বঙ্কিমের মনে হল, টাইম ইজ দি বেস্ট হিলার। সময়ে সব ক্ষত চাপা পড়ে যাবে। পিসিমা চলেই যাচ্ছিলেন, প্রতিমা ডাকল। নিশ্চয় কোনও ফরমাশ আছে। ঠিক তাই। পৃথিবীতে কিছু মানুষ শুধু হুকুম করার জন্যে জন্মায়, কিছু মানুষ জন্মায় হুকুম তামিল করার জন্যে। পিসিমা ফিরে এলেন। প্রতিমার এক হাতে খাবি খাওয়া পায়রা, আর এক হাতে দুধল তুলো। পিসিমা এগিয়ে গেলেন— 'ওমা একটা বুঝি, কতটুকু একটা প্রাণী। ধুকধুক করছে প্রাণ। কী রে?'

প্রতিমার কোলে আহত পায়রাটাকে দেখে বঙ্কিমের মনে হল তার আর পায়রার একই অবস্থা। পায়রাটাকে কাকে ঠুকরেছে। তাকে অহরহ ঠোকরাচ্ছে সংসার। যে পাচ্ছে সেই ঠুকরে দিচ্ছে চাঁদিতে। সংসারের ছাঁদনাতলায় নড়া বঙ্কিম বসে আছে। ঠোকরা শালা, কত ঠোকরাবি ঠোকরা! ঠুকরে ঠুকরে ঘিলু বের করে দে।

পায়রার সঙ্গে আদিখ্যেতা শেষ করে বঙ্কিমের পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিলে প্রতিমা?' গলাটাকে পায়রার বুকের মতো নরম করে প্রতিমা বলল, 'পিসিমা আপনি চারটে সাড়ে চারটের সময় এসে আপনার ভাইকে এক কাপ চা করে দেবেন। দুধ, চিনি, চা সব রেডি থাকবে।'

'তোমরা কোথাও যাবে বুঝি?'

'হ্যাঁ পিসিমা, ঘুঘুডাঙায় বোনের বাড়ি যাব। অনেক দিন ধরে বলছে।'

'বেশ বেশ, ঘুরে এসো। কোথাও তো যেতে পাও না। ঠিক আছে আমি আসবখন। এসে চা-টা করে দিয়ে যাব।'

বঙ্কিম এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, 'আজ না গেলেই নয়? বাড়িতে এত বড় একটা অশান্তি চলছে। উনি ভাববেন ছেলে বউ আমাকে ফেলে ফুর্তি করতে চলে গেল। পরের রবিবার না হয় যাব।' প্রতিমা ঝনঝন করে উঠল, 'বারোমাসই তো অশান্তি। তোমাদের বাড়িতে শান্তি আছে? তা বলে আমরা কোথায় যাব না? যখনই কোথাও যাবার কথা হবে তোমার ওই এক ছুতো, অশান্তি, আর আমার বাবা কী ভাববেন। অতই যদি বাবা ভক্তি, বিয়ে করেছিলে কেন! বাবার গলা ধরে বসে থাকলেই পারতে! আমি ওসব শুনতে চাই না। অনেক দিন ধরে যাব বলেছি, আজই তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি কোনও কথা শুনব না।'

বঙ্কিম আবার চাপ সহ্য করতে পারে না। ভাল কথায় বললে সকলের জন্যে সব কাজ সে করতে পারে। জোর করলে সে বিদ্রোহের বিদ্রোহ। বঙ্কিম বললে, 'যেতে হয় তুমি যাও। এই অবস্থায়, এই মন নিয়ে আমি কোথাও ইয়ারকি মারতে যেতে পারব না।'

'যাবে না তুমি? যাবে না তুমি? নিয়ে যাবে না?' প্রতিমার চোখ দুটো ক্রমশই বড় হতে লাগল।

'না পারব না। আমার পক্ষে উঠল বাই তো কটক যাই সম্ভব হবে না।'

পায়রা আর দুধে ভেজানো তুলো, দুটোকেই বঙ্কিমের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিমা শোবার ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দে সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠল। পিসিমা বললেন, 'কী করবে বাবা, আজকালকার মেয়ে, একবার ঘুরিয়ে আনো। তা না হলে ভীষণ অশান্তি করবে। নাঃ শান্তি কোথাও নেই।' পিসিমার কথায় আজকালকার পুরুষদের অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত বঙ্কিমকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলল, 'নেহি লে যাউঙ্গা। আমি ততটা স্ত্রৈণ নই পিসিমা। মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়ার মতো চালাবে? নট দ্যাট ইজি! জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক। হুকুম করলেই তামিল করব, সে বান্দা আমি নই পিসিমা।'

'তা ঠিক বাবা, তুমি কি এ যুগের ছেলে? আমি সকলকে বলি, বঙ্কিমের মতো ছেলে হয় না। তা হলে নাই গেলে। ঠিক আছে আমি তা হলে এখন যাই। পরে আবার আসব।' সংসার সমরাঙ্গনে বঙ্কিমকে একা রেখে বঙ্কিমের পিসিমা পালালেন। য পলায়তি স জীবতি। পালাবেন আর কোথায়! দু'বাড়িই তো সমান, খোলা থেকে আগুনে এই যা তফাত।

ডানা ভাঙা পায়রাটা পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। বঙ্কিম সাবধানে হাতে তুলে নিল। শরীরটা গরম। বুকটা ধুক ধুক করছে। পুঁতির মতো ছোট্ট ছোট্ট দুটো লাল চোখ নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বোধ, অসহায় প্রাণী। পায়রাটাকে বুকের কাছে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের মনটা হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল। পুরো শৈশবটা যেন ঝাপটা হাওয়ার মতো বয়ে গেল। মা মারা যাবার পর সেও সংসারের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দয়া! আত্মীয়স্বজনের দয়া, পিতা পরমেশ্বরের দয়া, সংসারের দয়া ফোঁটা ফোঁটা করে সংগ্রহ করে বঙ্কিম এখনও যেন পুরো সাবালক নয়। এখনও সে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা আমাকে একটু দয়া করো, প্রতিমা করো, পরমেশ্বর করুন, পিসিমা করুন, ছেলে করো, মেয়ে করো। উলটো টুপি হাতে দয়ার ভিখারি বঙ্কিম? একটু শান্তি দাও। ঘেয়ো কুকুরের মতো দেখা হলেই কামড়াকামড়ি কোরো না। পায়রাটার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের মনে হল, সে যেন তার থেঁতলানো হৃদয়টা দু'হাতে ধরে আছে। মনে পড়ে গেল, কয়েক বছর আগে সে একটা বাসে চাপা পড়া মানুষ দেখেছিল। রাজপথে পড়ে থাকা মুমূর্ষু একটি প্রাণ। মুখে তার অস্ফুট প্রার্থনা, একটু জল, একটু জল।

কোনও কোনও মুহূর্তে মানুষের মন হঠাৎ শূন্য হয়ে যায়। ধ্যানলব্ধ শূন্যতার মতোই একটা সুখকর অবস্থা। স্থান, কাল, পাত্র সব লীন হয়ে যায়। বঙ্কিমের এখন সেই অবস্থা। এক হাতে পায়রা, অন্য হাতে তুলো, বন্ধ ঘরে অভিমানী স্ত্রী, দোতলায় ক্রুদ্ধ পিতা। এক-একজনের এক-এক দাবি। এক-এক রকম চিকিৎসায় এক-এক জনের সুস্থতা ফিরবে। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। জগৎ যেন স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। ভবিষ্যৎ বলে যেন কিছু নেই। অতীত যেন অর্থহীন স্বপ্ন। বিশাল একটা স্তম্ভের মতো বর্তমান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্তম্ভের তলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বঙ্কিম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান যেন বিশাল একটা দৈত্যের চেহারা নিয়ে তাকে পায়ের চাপে পিষে ফেলতে চাইছে। চারিদিকে লন্ডভন্ড ছড়ানো সংসার। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম। সখাহারা অর্জুন। কেউ তাকে বলার নেই, মামেকং শরণং ব্রজ।

খাবার ঘরে এঁটো বাসন। ছত্রাকার এঁটোকাঁটা। জানলা দিয়ে গোটাকতক শালিক এসে খুঁটে খুঁটে ভাতের কণা তুলে নিচ্ছে। রান্নাঘরে উনুনে প্রতিমা কী একটা চাপিয়ে ছিল, জলের অভাবে চড়চড় করছে। জল ঢেলে দিলে জিনিসটা বেঁচে যায়। বঙ্কিমের মনে হল স্নায়বিক অবসাদে সে যেন আক্রান্ত। চোখ খোলা, কান খোলা, দৃশ্য ভেসে উঠছে, শব্দ কানে আসছে, কিন্তু সবই কেমন অর্থহীন। মস্তিষ্কের যে কোষ থেকে ইচ্ছা ছুটে এসে মানুষকে সক্রিয় করে তোলে সেই কোষ, সেই মোটর সেন্টারটা যেন সাময়িকভাবে বিকল হয়ে গেছে। পায়রাটা তাকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। সমস্ত মনটা যেন আহত পায়রায় নিবদ্ধ।

সিঁড়ির ধাপে বসে বঙ্কিম পায়রাটাকে তুলো টিপে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছোট্ট ঠোঁটে কতটুকু দুধই বা নিতে পারবে আহত প্রাণী? তা ছাড়া নাকের গর্তটা যে কোনটা বঙ্কিমের জানা নেই। নাকে দুধ ঢুকে শেষকালে মরেই না যায় দম বন্ধ হয়ে? মুমূর্ষু মানুষের মুখে জল ঢাললে কষ বেয়ে যেমন গড়িয়ে পড়ে পায়রাটার ঠোঁটের পাশ দিয়েও সেইরকম দুধের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। গলার কাছে নরম পালক ভিজে উঠেছে। পায়রার খাদ্য কি দুধ? পায়রা খুঁটে খুঁটে শস্যকণা খাবে। কিংবা পায়রার মা ঠোঁটে করে শিশুর মুখে চিবোনো খাদ্য গুঁজে দেবে। ব্যর্থ চেষ্টা। যত না মুখে গেল তার চেয়ে বেশি গড়িয়ে পড়ল। ছাদের কার্নিসে এর মা হয়তো বসে আছে। ছাদে রেখে এলে কেমন হয়! আবার হয়তো কাকে এসে ঠোকরাবে! থাক ঝুড়ি চাপাই থাক। পায়রাটাকে বঙ্কিম আবার চাপা দিয়ে রেখে এল। পায়রাটা কয়েকবার সি সি করে শব্দ করল। ব্যাটা না খেতে পেয়েই না শেষকালে মরে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ছাদে ছেড়ে দিলে হয়তো মা এসে বাঁচাতে পারত। পারাবতস্য পারাবত গতি হত। বেশি দয়া বেশি মায়াই হয়তো মৃত্যুর কারণ হবে।

পোড়া গন্ধে সারা বাড়ি ভরে গেছে। বঙ্কিমের ঘর পুড়ছে। উনুন থেকে কড়াটা নামিয়ে দিল বঙ্কিম। রাতের তরকারি রোস্ট হয়ে গেল। যাক গে মরুক গে। সবই গেছে যখন তখন কীসের পরোয়া। হঠাৎ বঙ্কিমের মনে হল রান্নাঘরটা একটু গুছোলে কেমন হয়। চারদিকে প্রতিমার বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ মনের প্রভাব। ঢাকনাখোলা মশলার কৌটো। পাঁড় মাতালের মতো উলটে থাকা শিশি বোতল। ছড়ানো তরকারির খোসা। কেতরানো বিপজ্জনক বঁটি। দুটো আলু অবাধ্য শিশুর মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে। একফালি কুমড়ো অনাদরে অর্ধচন্দ্র হয়ে পড়ে আছে। ও হরি, ডেঙোডাঁটায় কুমড়োটাই দিতে ভুলে গেছে! তাই টেস্টলেস মনে হল। এক খাবলা চিনি টিনের ঢাকনির ওপর ঢিবি হয়ে আছে। কোনও কিছুতে দেবে বলে বের করেছিল। ভুলে গেছে। এক সার পিঁপড়ের কুচকাওয়াজ চলেছে। হাউ ডিসেন্টলি ডেকরেটেড ইয়োর কিচেন বঙ্ক? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল বঙ্কিম। বঙ্কিমই উত্তর দিল, ইয়েস স্যার দিস ইজ মাই মারভেলাস কিচেন। আচ্ছা দেখা যাক একটু শিপশেপ করা যায় কিনা! কতক্ষণ সময় লাগে?

বঙ্কিম ভ্যাকুয়াম মন নিয়ে কাজে লেগে গেল। ফিল দাই ভ্যাকুমায় উইথ নোবল ডিডস। কে বলেছিলেন? খ্রাইস্ট না! চিনিটা খেয়েই ফেলি। ক্যালোরি। বহুকাল চিনি চুরি করে খাওয়া হয়নি। বঙ্কিমের ভেতর থেকে শিশু বঙ্কিম যেন পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। প্রৌঢ় বঙ্কিম বলল, আহা ছেলেটাকে একটু ভালবাসো। ও স্নেহের কাঙাল। খালি শাসনটাই পেয়েছে, ভালবাসা পায়নি। দে দে পিঁপড়ে ছাড়িয়ে দে। বঙ্কিম চিনিটা মুখে ফেলে দিল। একটু তেঁতুল থাকলে শৈশবটা আরও জমত। ঠিক আছে আর একদিন তোকে তেঁতুল দিয়ে, চিনি দিয়ে, লঙ্কা দিয়ে আচার তৈরি করে দোব কথা দিচ্ছি। বঙ্কিম প্রতিশ্রুতি দিল। চিনিটা জিভে মিলোতে না মিলোতেই শৈশবটা গুটিয়ে এল। ঘরের ছিরি ক্রমশ ফিরছে। নাউ ইট লুকস ডিসেন্ট। একটা ছোটো টিনের কৌটোয় কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা। বঙ্কিমের পকেট মেরে প্রতিমার সঞ্চয়। হঠাৎ দরদের উৎসটা যেন চিনচিন করে উঠল। বঙ্কিম জীবনে ভালবাসা পায়নি বলেই ভালবাসার মর্ম বোঝে। আহা মেয়েটা অনেক আশা নিয়ে তার গলা ধরে জয় মা বলে ঝুলে পড়েছিল। বিনিময়ে কী পেয়েছে! প্র্যাকটিক্যালি নাথিং। রান্নাঘর, শোবার ঘর— শোবার ঘর, রান্নাঘর, এই তো করেছে বারো বছর। কোথায় গোলমাল হয়েছে!

রান্নাঘরের উত্তরের জানলা দিয়ে তাকালে আকাশের অনেকটা চোখে পড়ে। একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। ধোয়া নীল আকাশে এক ঝাঁক সাদা পায়রা গোল হয়ে উড়ছে। বঙ্কিম একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সবই ঠিক রয়েছে। একই রকম রয়েছে। শৈশবে যা ছিল তাই রয়েছে। সেই উত্তরের আকাশ। রাম-সীতার মন্দিরের চুড়ো। সেই ঝাঁকড়া ঝিলিপাতা শিরিষ গাছ। সেই বলাই পালের সিরাজু পায়রা। সেই হাওয়া-কাঁপা মন-কেমন করা খাঁ খাঁ দুপুর। মানুষগুলোই কেবল স্টিফ

হয়ে আসছে। মনের বাইরে কুমিরের চামড়ার শক্ত আবরণ তৈরি হচ্ছে। কেউই আর নমনীয় নেই। মনের অলিন্দে বেয়নেটধারী প্রহরী ঘুরছে, প্রবেশ নিষেধ। আনরিলেটিং। বিনা রণে পাবে না আমার মনের সূচ্যগ্র মেদিনী। ইয়েস, কমিউনিকেশানের কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে।

এফেক্টিভ কমিউনিকেশানের ছাত্র বঙ্কিম দুপুরের নির্জন আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মসমীক্ষা শুরু করল। সকলকেই সে বোঝাতে চাইছে, আন্তরিকভাবে সে কিছু বলতে চাইছে, কাছে টানতে চাইছে, অটুট একটা সংসার গড়তে চাইছে যার ফাউন্ডেশান হবে কর্তব্য, আদর্শ, স্নেহ, ভালবাসা প্রেম, ধর্ম, চারিদিকে একটা খোলামেলা হাওয়া বইবে, অভিযোগ থাকলে বলতে হবে, অভিমানে গুমরে থাকলে চলবে না; কিন্তু কেউই তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। বিদ্বেষের বাষ্প উঠছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। সবাই জ্বলছে। কীসের আক্রোশে কে জানে! অথচ সবাই আপনার লোক। কোনও পক্ষকেই সে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। পিতা পরমেশ্বরের জন্যে তার সমস্ত স্যাক্রিফাইস জলে গেছে। স্ত্রী প্রতিমাকে সে বিবাহিত জীবনের বারোটা বছরে কেবল ত্যাগের কথা আর কর্তব্যের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছে। দু' নৌকোয় পা রাখতে গিয়ে পা ফেঁড়ে তার নিজের কীচক বধের অবস্থা। দুটো নৌকো দু'দিকে ভেসে চলেছে। প্রতিমা ভাবছে বঙ্কিম কেবল বাবা বাবা করে অস্থির। বঙ্কিমের বাবা ভাবছেন ছেলে বউ বউ করে অস্থির। এদিকে বঙ্কিমের পায়ের তলায় শিফটিংস্যান্ড। সংসারের ঢেউ একবার করে আছড়ে পড়ছে আর একটি করে বালির স্তর সরে যাচ্ছে। এইবার তার পেছনে উলটে পড়ার সময় এসেছে। সে কি তবে ডিক্টেটার! সে কি ভীরু! সে কি ইমবেসাইল। সে কি ক্যালাস! একটা গ্রুপ, একটা সমষ্টির মধ্যে তার আচরণে কি কোনও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে! সে কি ঠিকমতো নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না? তার সেল্‌ফটাকে কি সে হারিয়ে ফেলেছে? নিজেকে হত্যা করে সে কি অলীক একটা শান্তির ছায়ার পেছনে দৌড়াচ্ছে। সমস্যার ঝড় উঠলেই কি সে উট হয়ে যাচ্ছে। নিজের ব্যক্তিত্বটাকে কি সে দরজায় পাপোশ করে ফেলেছে! যে পারছে পা ঘষে চলে যাচ্ছে। আর ইউ এ ডোর ম্যাট? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। নো। বঙ্কিম প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল।

দুম দুম করে বঙ্কিম শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেছে। সমস্ত জানলা বন্ধ। পশ্চিমের ঝলসানো রোদে সারা ঘরে পাশের বাগানের কলকেগাছের পাতার ছায়া ঝিরঝিরে সুতোর মতো কাঁপছে। প্রতিটি জানলার ওপর ঝকঝকে এক সার কাচ। ঘরে যেন থইথই আলোর ঢেউ। মোচার খোলার মতো তার ওপর প্রতিমা ভাসছে। ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে বনবন। ফনফন করে একটানা একটা শব্দ উঠছে। দেয়ালের গায়ে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। খাটের মাথার ওপর বঙ্কিমের মা'র ছবি জ্বলজ্বল করছে। বাইরের চেয়ে ঘরটা বেশ ঠান্ডা। প্রতিমা চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়েই পড়েছে। ক্লান্ত মুখ। গালে চোখের জলের শুকনো দাগ। ঘুমোবার আগে কাঁদছিল। তাঁতের ডুরে পাড় শাড়ির আঁচল মেঝেতে লুটোচ্ছে। মুখের উপর সিলিং থেকে ঠিকরে পড়েছে চাপা রোদের আলো। ছোট্ট কপালের সীমানা থেকে চুলের ঢেউ উঠেছে। নাকছাবির পাথরটা চিকচিক করছে। সমস্ত নিষ্ঠুরতা কঠোরতার রেখা মুখ থেকে তরল হয়ে ঝরে গেছে। একটা মোম মসৃণ ভাব সারা মুখে। মা'র ছবির তলায় বিয়ের পর তোলা প্রতিমার ছবি। বেনারসির ঘোমটা ঘেরা হাসি হাসি গোল মুখ। বঙ্কিম ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। না, বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। কেবল বারোটা বছর যেন পালকে করে ক্লান্তির একটা হালকা কালো রং চোখের কোলে লাগিয়ে দিয়েছে। যে পাখি মুক্ত শাখায় ডাকতে চেয়েছিল তাকে যেন জোর করে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে। বঙ্কিমের মনে হল প্রতিমার অসুখী আত্মা যেন ঘুমন্ত প্রতিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। বঙ্কিমকে উদ্দেশ করে বলছে, দেখো কী অবস্থা করেছ মেয়েটার। তিল তিল করে হত্যা করে চলেছ। তুমি একটা খুনি। একটা প্রাণীকে খাঁচায় পুরে ধারালো তলোয়ার দিয়ে অনবরত খুঁচিয়ে চলেছ।

ভাবাই যায় না এই প্রতিমাই ঝগড়া করে, চিৎকার করে, জ্বালাদার নুন ছেটানো কথা বলে। মারে, নিষ্ঠুর হয়, অবুঝ হয়। যুক্তি তর্ক মানতে চায় না। মানীর মান রাখে না। হিংস্র ভাবটা এখন লেজ গুটিয়ে কোথায় বসে আছে? জেগে উঠলেই শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতে পারে? বঙ্কিমের মনে আর একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল। হতে পারে? সেইটেই হয়তো কারণ! দ্যাট মে বি অ্যানাদার রিজন।

ইদানীং বঙ্কিম খুব শাস্ত্রটাস্ত্র পড়ছে। পথের হদিশ পাবার জন্যে। হঠাৎ তার তন্ত্রশাস্ত্রের দিকে ঝোঁক হয়েছে। তন্ত্র পড়েই বঙ্কিম বুঝেছে বিবাহিত জীবনে সে কী মারাত্মক ভুল করে এসেছে। মোক্ষ আর মুক্তি দুটোই তার হাতে। অথচ আঁচলে রতন বাঁধিয়া মরিগো আঁধারে খুঁজিয়া। এতকাল অন্ধকার ঘরে ধ্যান করতে বসে মশার কামড় আর ফাইলেরিয়াটাই তার নিট লাভ হয়েছে। মাঝখান থেকে সে নিজেও সেক্স-স্টার্ভড, প্রতিমাও সেক্স-স্টার্ভড? ক'টা দিন সে প্রতিমাকে রাগ মোচনের আনন্দ দিতে পেরেছে। তন্ত্রের কথাবার্তা খুব পজেটিভ। ইন্দ্রিয় সংহারে ঘোরতর বিরোধী। মোক্ষলাভের সহজ সরল পথ সেক্স অ্যান্ড লাভ। মানুষ যখন ডিফেনসিভ হয়ে ওঠে, নিজের চারদিকে যখন প্রতিরোধের পাঁচিল খাড়া করে তোলে তখন তার পক্ষে জ্ঞান বা সত্য কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হয় না। মনের উদ্যানে শুম্ভ নিশুম্ভের রেস্টলিং চলতেই থাকে। ভুল 'সু' আর সত্য 'কু'-র হাতাহাতিতে জীবন ফরসা। তান্ত্রিক বলছেন, তুমি যখন স্ত্রীর সঙ্গে রমণ করছ, তখন কিন্তু তুমি আর তোমার স্ত্রী ছাড়া তৃতীয় আর একটি মাল মশারির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনি হলেন তোমার সংস্কার, তোমার মহাপুরুষ, যিনি সবসময় চুকচুক করে বলছেন, নারী নরকস্য দ্বার, এ হে হে হে জীবনরস বেরিয়ে গেল, বীর্য গেল, বল গেল, মেধা গেল, ওজস গেল। বঙ্কু তোর সব গেল, গেল, গেল। এই তৃতীয় পুরুষের ঠেলায় সত্যিই তাই গেল। অরগ্যাজম হল না। এনার্জি তাই বাউন্স করে ডবল হয়ে ফিরে এল না। কনজারভেশন না হয়ে একজশান হয়ে গেল। ক্লান্ত, অতৃপ্ত বঙ্কু লেটকে পড়ল। অখুশি ইরিটেটেড প্রতিমা। ফার্নেস নিয়ে পাশ ফিরে শুল। ভোরের পাখি কলকল করে ডেকে গেল। দিবাকর পদ্ম ফোটাল ঊষার সরোবরে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল। কর্তা বিছানা থেকে নামলেন ক্লান্ত, শুকনো। গিন্নি নামলেন আধকপালে নিয়ে, বাসি গন্ধরাজ। সেই জায়গাটা বঙ্কিম আন্ডার লাইন করে রেখেছে তন্ত্র যেখানে বলছেন, তোমার স্ত্রী, তোমার শক্তিকে তুমি যদি রাগমোচনাত্মক তৃপ্তি দিতে অক্ষম হও, নিজের অক্ষমতাকে ধিক্কার দাও। তোমার ওই অতৃপ্ত স্ত্রী তোমার পক্ষে, তোমার পরিবারেব পক্ষে, জনপদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে সমস্যাব কারণ হয়ে দেখা দেবে। দিনের পর দিন এই অতৃপ্তি তাকে যৌনবিরোধী করে তুলবে। শি উইল বিকাম অ্যান্টিসেক্স। শনৈঃ শনৈঃ তিনি শীতল থেকে শীতলতর হতে থাকবেন। তাঁর মধুর ভাব অন্তর্হিত হবে। হৃদয়ে সাহারার আঁধি উঠবে। বাইরে দেখা যাবে না, ভেতরের তরু-শূন্য প্রান্তরে সাইবেরিয়ার বরফ ছেয়ে যাবে। রাতের ঝাপসা আলোয় গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে হায়না, স্নার্লিং অ্যান্ড কার্লিং উলফ। সংসারের উঠোনে দাঁড়িয়ে স্ত্রী তখন দোতলার বারান্দার দিকে মুখ তুলে— হাউ হাউ করে চিৎকার করে উঠবে। সকলে বলবে এটা কে রে! হাউলিং হায়না ইন আওয়ার সো পিসফুল এ ফ্যামিলি? বিদেয় কর, বিদেয় কর, ডিভোর্স কর, ডান্ডা পেটাও, ব্যাটারি চার্জ কর, ভাতে মার, হাতে মার, কামে মার। পরমেশ্বর হায় প্রভু হায় প্রভু করে হাঁসফাস করবেন। বঙ্কিম এখন জেনেছে কারণটা কী? তোমরা শান্ত হও। দোষ কারও নয় গো মা, এ যে স্বখাত সলিল। ইহার অরগ্যাজম সম্পাদনে আমার অক্ষমতা নিবন্ধন অযৌনতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার নারীত্ব শুকনো আম্রমুকুলের ন্যায় প্রেমের উদ্যানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তোমরা দেখিতেছ না, আমি দেখিয়াছি মসৃণ আবরণের তলায় লোল চর্ম, পক্ক কেশ, বিকচিত দংষ্ট্রা, নখর সংযুক্তা হিরণ্যকশিপু হা হা একটি ডাইনি।

ড্রেসিং টেবলের অর্ধচন্দ্র চেয়ারে বসে বঙ্কিমের বোধিলাভ হচ্ছে। ভাগ্যিস তন্ত্রটা পড়া শুরু

করেছিল! বেটার লেট দ্যান নেভার। এখনও সময় আছে, পারলে সামলে নে বন্ধু। যৌবন এখনও বিদায়ী বসন্ত। তন্ত্রকে সার করে জীবনতন্ত্র চালা। লড়ে যা এই তোর লাস্ট ব্যাটল। নাউ অর নেভার। বি পজিটিভ। বঙ্কিমের তখনই নতুন জীবন শুরু করার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেই তন্ত্রই তার একটা কান পাকড়ে বসে আছে। খবরদার, কামার্ত হয়ে স্ত্রীর কাছে যাবে না, তা হলেই তোমার শক্তি ক্ষয় হবে। ওটা তান্ত্রিকের কাজ নয়। ওই পথে এগোলে তোমার স্ত্রী আর তখন শক্তি নয়, সামান্য একটা পিকদানি। তুমি যখন শান্ত, সমাহিত, ধ্যানস্থ, কেবল তখনই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি প্রেম করার উপযুক্ত। প্রেম মানে ধস্তাধস্তি, কামড়াকামড়ি নয়। হুড়ো যুদ্ধ নয়। তন্ত্র একে প্রেম বলে না। বলে ব্যভিচার। কোনও শিশু স্বামী-স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠবে, দ্যাটস নট দি ওয়ে বন্ধু। ওটা তুমি আগে করতে। ধমকায় ধমনি, চমকায় রক্ত, দোমড়ায় মোচড়ায় দেহ, মড়মড় খাট, ঘনঘন শ্বাস, কড় কড় বাজ, নো দ্যাট ইজ নট তান্ত্রিক প্রেম। তান্ত্রিক প্রেম হল হার্মোনিয়াস সামথিং। যেন গাইছ, যেন নাচছ, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছ, স্তব্ধ তারা ভরা রাতে নির্জন প্রান্তরে কুসুমিত বৃক্ষ থেকে নিঃশব্দে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়ছে, দুটো দেহ যেন আইসক্রিমের মতো গলে যাচ্ছে। ডিজলভ, ডিজলভ, বিকাম ওয়ান অ্যান্ড রিল্যাক্স। এখানে ক্ষয় নেই, অনুতাপ নেই, অফুরন্ত শক্তির উপত্যকায় দেহকে প্রসারিত করে দাও, অনন্তের সঙ্গে মিশে যাও। একেই বলে ভ্যালি অরগ্যাজম।

ড্রেসিং টেবলের ওপর একটা পায়রার পালক পড়ে ছিল। আয়েশের সময় একটা চোখ বুজিয়ে প্রতিমা কানে পায়রার পালক সুড়সুড়ি দেয়। বঙ্কিম পালকটা হাতে নিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল। বঙ্কিমের মনে হচ্ছে সে যেন সদ্যোজাত প্রজাপতি। পিড়িং পিড়িং করে বাহারি ফুলবাগানে ফুলে ফুলে উড়ছে। তন্ত্র বলছে তুমি নেগেটিভ, আমি পজিটিভ, তুমি আমার অ্যান্টি পোলস, তুমি আমার চিনে ভাষায় ইন-ইয়াং, তুমি আমার শক্তির স্টোরেজ ব্যাটারি, তুমি আমার গাড়ির বনেটের বাঘ, তুমি আমার কেমিক্যাল রি-অ্যাকশান, ফিজিক্যাল রিল্যাকসেশান, তুমি আমার ভৈরবী, মোক্ষের পাকদণ্ডী। কেন মাইরি খামোখা খেয়োখেয়ি করো।

বঙ্কিম পালক দিয়ে প্রতিমার পায়ের তলায় আস্তে আস্তে বার কতক সুড়সুড়ি দিল। প্রতিমা পা-টা সরিয়ে নিল। বঙ্কিম আবার অ্যাপলাই করল। সে যেন সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাচ্ছে। প্রতিমা চোখ খুলল। আর কী আশ্চর্য! ঝিনুকের ঢাকনা খুলে দুটো মুক্তোর দানার মতো, দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। দু'ফোঁটা জল চোখের পাতার তলায় জমা রেখে কী করে ঘুমোচ্ছিল! একেই বলে সঞ্চয়ী। ভেজা ভেজা চোখে প্রতিমা বঙ্কিমের দিকে তাকাল। বর্ষার আকাশ যেন তাকিয়ে আছে! বঙ্কিম মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রতিমার দু'আঙুল কপালে হাত রেখে বললে, 'তুমি কাঁদছ! এই সামান্য কারণে তুমি কাঁদছ?'

প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড চেঞ্জারের রেকর্ডের মতো উলটে উপুড় হয়ে গেল। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বঙ্কিম এবার খাটের কিনারায় বসে পড়ল। উইপিং ভৈরবীকে ট্যাকল করতে হবে। গলা আর চিবুকের মাঝখানে কোমল জায়গায় মুখটা গুঁজে দিয়ে শিশু-শূকরের মতো বঙ্কিম একটু ঘোঁতো ঘোঁতো শব্দ করল। ডান হাতটা শরীরের উঁচু নিচু জায়গার ওপর দিয়ে বারকতক বুলিয়ে আনল। তারপর বগলের তলায় একটু কুতুকুতু দিল। কুতুকুতুটায় সামান্য একটু এফেক্ট হল। প্রতিমা বগল চেপে একপাশে আর একটু মুচড়ে গিয়ে বললে, 'যাও যাও, আমার কাছে কেন? তোমার বাবার সেবা করো গে যাও? আমি কে?' কথা ক'টা কোনওরকমে খালাস করে প্রতিমা আবার হুস হুস করে কেঁদে উঠল। বঙ্কিম কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তুমি কে?, তুমি নিজেই জানো না, তুমি আমার সব, তুমি আমার সৃষ্টি, স্থিতি, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। নাও, ওঠো, চান করে খেয়ে নেবে চলো। 'ঘুঘুডাঙায় যাব।' প্রতিমা কোনও উত্তর দিল না। বঙ্কিম বললে, 'ছিঃ কাঁদতে নেই। ওঠো, অনেক বেলা হয়েছে। চারটের মধ্যে বেরোতে হবে।' বঙ্কিমের কথায় কোনও কাজ হল না। প্রতিমা

সেই একই ভাবে পাশবালিশের মতো পড়ে রইল। বঙ্কিম মনে মনে বললে, এইবার একটু হাত লাগাতে হচ্ছে। দু'হাত দিয়ে প্রতিমাকে চিত করার চেষ্টা করল। খুব সহজ কাজ নয়, ফোর্স আর কাউন্টার ফোর্সের এফেক্ট হল নিল। বঙ্কিম একটু সমস্যায় পড়ে গেল। আনউইলিং ভৈরবী সম্পর্কে তন্ত্রের কী নির্দেশ কে জানে!। এইসব অবস্থায় সাধারণত বঙ্কিম যা করে থাকে তা হল ধর তক্তা মার পেরেক। একটা হাত শক্ত করে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে খাট থেকে ফেলে দিয়ে ঘাড়ের কাছটা বেড়ালের টুঁটি চেপে ধরার মতো ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে অর্ধচন্দ্র দিতে দিতে খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলা, 'খেয়ে নাও। খেয়ে নেবে। খেইয়ে নেএবে।' কে যে কাকে খাবে! নিজেদের সম্পর্কই তখন খাদ্য খাদকের। শেষটা ঝটিকা বেগে প্রতিমার শোবার ঘরে প্রবেশ, পালঙ্কে ঝম্প প্রদান, দিন তিনেক অনশনে অবস্থান।

আজকে বঙ্কিম তা হতে দেবে না। আজকে সে দেখিয়ে দেবে, দরদ কাকে বলে, সোহাগ কাকে বলে। সংসার সমরাঙ্গনে একাকিনী রমণী। কেউ তার দলে নেই। ভালবাসা দেবার মতো একটি প্রাণীও এ বাড়িতে নেই। এ বাড়ির ক্লাইমেট পরমেশ্বর। তিনি হাসলে সবাই হাসে, তিনি গম্ভীর হলে সবাই গম্ভীর হয়ে যায়। তিনি যখন যাকে কোতল করতে বলবেন সে কোতল হয়ে যাবে। পরমেশ্বর স্নেহের কারবারি নন। ডিসিপ্লিন, ডিউটি, ওবিডিয়েন্স, ফর্ম্যালিটি হল তাঁর এম্পায়ারের ফাউন্ডেশান। স্নেহ কোথায় পাবে ম্যাডাম! এতকাল পরমেশ্বরের ঘৃণার সরোবরে ঘটি ডুবিয়ে বঙ্কিম বউকে শাসন করেছে আর প্রয়োজনে একটু আধটু ভোগ করেছে। যখনই প্রকৃত ভালবাসতে গেছে, পরমেশ্বর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, ছি ছি বঙ্কিম, ওই রমণী একদা তোমার পিতার টাক ফাটাইব বলিয়াছিল, ওই রমণী বিদ্রোহী, স্বাধিকার দাবি করিয়াছিল, স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল, সংসারের ক্রুশে উহাকে বিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম, ফাঁকতালে পালাইয়াছে, গলায় বকলশ পরাইতে চাহিলাম, কামড়াইয়া দিয়াছে, বধ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছে, সর্বনাশ, প্রাণ খুলিতে চাহিতেছে, হাসিতে চায়, নৃত্য করিতে চায়, প্রেম করিতে চায়, উরে বাপ রে বাঁচিতেও চায়, পামরী থাবড়া মারি, আগেকার কাল হলে উইচ বলে পুড়িয়ে মারত, নেহাত প্রাচীন বাঘের দাঁত গেছে, শুধু গোঁফ দেখিয়ে আর টেরার সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বঙ্কিমের চোখের সামনে এক বৃদ্ধের করুণ মুখ ভেসে উঠল। তার বৃদ্ধ শ্বশুরের। বঙ্কিম বিয়ের পরদিন বউ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সিঁড়ির বাঁকে একপাশে দীনহীনের মতো বৃদ্ধ মানুষটি দাঁড়িয়ে। বঙ্কিমের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার বড় আদরের পয়মন্ত মেয়ে, তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি দেখো বাবা। সংসারে ওকে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। তোমরা একটু মানিয়ে নিয়ো। কষ্ট দিয়ো না।' দৃশ্যটা মনে পড়তেই বঙ্কিমের গলার কাছটা যেন কীরকম করে উঠল। কান্না নাকি? কান্না ভীষণ ছোঁয়াচে জিনিস। অতীত কখনও একলা আসে না। অতীত হল সেডিমেন্ট, বর্তমানের তলানি, থকথকে ঘন। শ্বশুরমশাই মনের জানলায় যেই উঁকি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন, জ্যাঠামশাই, মা, জ্যাঠাইমা, যাঁদের কাছে তার স্নেহের দাবি চলত, দুঃখের দিনে দাঁড়ানো চলত। বঙ্কিমের চোখের কোল বেয়ে সত্যি সত্যি জল গড়িয়ে এল। কয়েক ফোঁটা টপাটপ করে প্রতিমার গালে পড়ল।

প্রতিমার মুখটা বঙ্কিমের দিকে ঘুরে গেল। চোখে জল, চোখে বিস্ময়। প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে বসল, 'এ কী তুমি কাঁদছ!' বঙ্কিম খুব শুকনো মানুষ। প্রতিমা খুব অবাক হয়েছে। 'তুমি কাঁদছ কেন?' প্রতিমা আঙুল দিয়ে বঙ্কিমের চোখের কোণের জল পরীক্ষা করল। সত্যি কাঁদছে কিনা! এ সংসারে বিশ্বাসের অনেকদিন মৃত্যু হয়েছে। সকলেই অভিনেতা। বঙ্কিমের চোখে জল, না গ্লিসারিন আগে দেখা দরকার। না জল। প্রতিমা বাঁ হাত দিয়ে বঙ্কিমের গলা ধরে মুখটা কাছে টেনে আনল। ডান হাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছাতে মোছাতে বলল, 'তুমি কেঁদো না গো। তোমার চোখে জল দেখলে বড় কষ্ট হয়।'

প্রতিমার শেষ কথাটায় বঙ্কিমের কান্না আরও বেড়ে গেল। এটা যদি প্রতিমার অভিনয়ের কথা না হয়ে প্রাণের কথা হয় তা হলে এ প্রাণ থেকে ভালবাসা তো বাষ্প হয়ে এখনও উড়ে যায়নি। ভোরের কুয়াশার মতো সবুজ মাঠের ওপর কাঁপছে। তাকে দেখে সংসারের কারুর কষ্ট হবে কেন? ঘৃণা হবে, রাগ হবে, ঈর্ষা হবে, সমালোচনা হবে, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে হবে, বিপদে ফেলার চেষ্টা হবে, মজা হবে, কষ্ট কেন হবে? কারুর প্রাণে কেন ব্যথা জাগবে, বেদনা জাগবে? সে তো এতকাল একটা গানের কলিই আপন মনে গেয়ে এসেছে, ব্যথায় কারও গলে না প্রাণ যে বোঝে না ব্যথার কী দাম! তার সমব্যথীরা সবাই তো একে একে চলে গেছে! তবে! তবে এ প্রাণ কোথা থেকে জাগল! তবে কি প্রতিমা সত্যিই তার ব্যথার ব্যথী, সহধর্মিণী! যে রুক্ষ মাটির কোথাও জলের চিহ্ন নেই তারই বুকের গভীরে যে স্বচ্ছ জলের ধারা থাকে, প্রতিমা কি সেই সত্যের প্রমাণ!

বঙ্কিম প্রচণ্ড আবেগে প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরল। শিশু যেভাবে মাকে জড়িয়ে ধরে। প্রতিমাও দু'হাত দিয়ে বঙ্কিমকে জড়িয়ে ধরল। মা যেমন শিশুকে বুকে চেপে ধরে। দু'জনেই কাঁদছে, যেন কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবনের তিরস্কারে দু'জনেই ক্ষত-বিক্ষত। দু'জনেই যেন সীমান্তের প্রহরী। যতবার নিভৃত আশ্রয়ে ফিরে যেতে চেয়েছে, অদৃশ্য নিয়তি সেনানায়কের মতো হুকুম করছে, যাও ফিরে যাও। যুদ্ধ করো। ব্যাটল টিল ডেথ। ডোন্ট লিভ ইয়োর পোস্ট। চোখের জলে দু'জনের সম্পর্কের যেন নতুন জন্ম হল। নদীর দুই তীর যেন অদৃশ্য সেতুবন্ধনে বাঁধা পড়ল।

মেঝের ওপর তিন-চারটে ভাঁজ করা শাড়ি।

'বলো কোনটা পরব?'

বঙ্কিম একটু দূর থেকে ফ্যাশান এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন রঙের শাড়ি পর্যবেক্ষণ করছে। বেগুনি, গাঢ় নীল, কমলা, ফিকে হলুদ, কচি কলাপাতা। মনের রং লেগেছে শাড়ির গায়ে। জীবনে হঠাৎ চোরা বানের মতো বেঁচে থাকার অর্থ ফিরে এসেছে। নবজাতকের চোখে যেন পৃথিবীকে দেখছে। আকাশ যেন বৃষ্টি-ধোয়া নীল। গাছের পাতা যেন নবীন সবুজ। প্রতিটি জানলায় যেন প্রকৃতির বড় বড় বিস্মিত চোখ। পড়ন্ত বেলার রোদ যেন মৃত অতীতকে টেনে এনেছে। সেই জগতে সাময়িক মুক্তি যেখানে সে কর্তব্যের বকলশ খোলা কুকুরের আনন্দ, সন্ন্যাসীর আকাশবৃত্তির মুক্তির আনন্দ, পাখির শেষ বেলার গান, শিশুর মনের নিশ্চিন্ত অনুভূতি। তার মনে হচ্ছে জীবনের পথে সে তিরিশটা বছর পেরিয়ে গেছে। সংসারটা আবার জমজমাট হয়ে উঠেছে। কোনও এক ঘরে মা বসে পান সাজছেন। কোনও ঘরে জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে সিগারেট ধরে কাগজ পড়ছেন। কোনও ঘরে জ্যাঠাইমা টকটকে লাল তরমুজ ফালা ফালা করে ডিশে সাজিয়ে রাখছেন। উদ্যানের সমস্ত মৃত গাছ যেন অলৌকিকভাবে বেঁচে উঠেছে। ভস্মাধারের ঢাকনা খুলে এক-একটি প্রাণ আবার জীবনের খেলা খেলতে এসেছেন। নিঃসঙ্গ বঙ্কিমের আজ অনেক সঙ্গী। চারিদিকে আজ পদধ্বনি।

কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বঙ্কিম বললে, 'এইটাই পরো। সুন্দর দেখাবে। গায়ের রঙের সঙ্গে রং মিলে যাবে। আর মুখে বেশি পাউডার ঘোষো না। এমনি প্লেন থাক। তাতেই তোমাকে বেশি সুন্দর দেখাবে। খোঁপাটা এমন করে বাঁধবে ঘাড়ের কাছে যেন আলগা হয়ে ঝুলে থাকে।' অনেক দিন পরে বঙ্কিম বউ নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছে। সাজগোজটা সেইভাবে হওয়া চাই। প্রসাধন তোমার সৌন্দর্যকে ফোটাতে সাহায্য করবে, চাপা দেবে না। বঙ্কিম নিজে রেডি। ছেলেমেয়ের জুতো পরাটাই বাকি। বঙ্কিম এতক্ষণ পরমেশ্বরের কথা প্রায় ভুলেই ছিল। নিস্তব্ধ দোতলা। অন্য দিন পাখা চলার একটা ঘোঁড় ঘোঁড় শব্দ হয়। আজ পাখা বন্ধ। ছেলের পয়সায় খাওয়াও বন্ধ, হাওয়াও বন্ধ। রোদে উত্তপ্ত চারটে কংক্রিটের দেয়ালের মধ্যে পরমেশ্বর বসে আছেন, না শুয়ে আছেন, না বই পড়ছেন বলা শক্ত। গ্রীষ্মের দুপুরে পরমেশ্বরের ঘর একটা বিশাল ফায়ার

প্লেস। চারদিকে চারটে ডবল জানলা, নিচু উচ্চতার। পশ্চিমে গঙ্গা। রোদে জল চিকচিক করছে। যত দূরে তাকাও দৃষ্টি উধাও। দক্ষিণের দূর আকাশে এক সার নারকেল গাছের পাতা রোদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পুবে জানলা দরজা বন্ধ একটা হলদে বাড়ি রোদকে রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। উত্তরে বহু দূরে চটকলের একটা উদাস চিমনি আকাশে ধোঁয়া বিলিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির মাঝখানে একটা চৌকির ওপর পরমেশ্বর। মনে যখন মৃত্যুর ছায়া, মুখ তখন পশ্চিমে। মনে যখন অতীতের আনাগোনা মুখ তখন উত্তরে। ওই সেই চিমনি। ওই দিক থেকেই ভেসে আসে শেষ রাতের ভরাট বাঁশির ডাক, রাই জাগো, রাই জাগো, শয্যা তোলো, দিন আসছে প্রস্তুত হও। বাঁশির পরেই ওই উত্তর থেকে শীতের দিনে ভেসে আসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে শৃঙ্গার আরতির শব্দ। প্রহরে প্রহরে বাঁশি বাজে। পরমেশ্বরের কাছে এক-এক সময়ের বাঁশির এক-এক অর্থ। বেলা দেড়টার বাঁশি প্রতিদিন পরমেশ্বরের চোখে একটু জল নামাবে। দাদু যতদিন জীবিত ছিলেন এই সময়টা তিনি গঙ্গা স্নানের জন্যে বঙ্কিমদের পুরনো বাড়িতে আসতেন। নাভিতে একখাবলা তেল দেওয়ামাত্র বাঁশির তীব্র সুর অনন্তকে বিদ্ধ করত। সঙ্গীতজ্ঞ দাদু বলতেন, বুঝলে পরমেশ্বর পঞ্চমে ধরেছে। এ হল সেই বৃন্দাবনের রাখাল রাজার বাঁশি। ডাকছে, আয় চলে আয়, 'হামসোঁ রহা নে জায় মুরুলিয়া কৈ ধুন শুনকে।' বঙ্কিমের দাদু সব ভুলে ভরাট গলায় কবীরের ভজন গেয়ে উঠতেন, 'বিনা বসন্ত ফুল ইক ফুলৈ ভঁবঁর সদা বোলায়।' বঙ্কিমকে বলতেন, 'পান্তুরানি তানপুরাটা একটু দাও।' বৃদ্ধ সাধক মেঝেতেই গামছা পরে বসে পড়তেন। মুরলীর ধ্বনি শুনে আমি যে আর থাকতে পারছি না। বসন্ত নেই, তবু একটি ফুল ফুটল। ভ্রমর এসেছে গুনগুনিয়ে সেই ফুলে। 'গগন গরজৈ বিজলী চমকৈ উঠতি হিয়ে হিলোর'। আকাশে মেঘের গর্জন, ঘনঘন বিদ্যুৎ, আমার হৃদয়ে হিল্লোল। 'বিগসত কঁবল মেঘ বরষণে চিতবত প্রভুকি ঔর'? বৃষ্টি নেমেছে এবার একটি কমলও ফুটল, সেই কমল চেয়ে আছে আমার প্রভুর দিকে। 'তারি লাগি তহাঁ মন পহুঁচা গৈব ধুজা ফহরায়।' মন আমার সমাধিস্থ হল, আমি নিবিষ্ট হয়ে গেলুম সেই কমলে। অদৃশ্য বিজয় পতাকা উড়ল। 'কহৈঁ কবীর আজ প্রাণ হামারা জীবত হি মর জায়।' কবীর বলছে আজ আমার প্রাণ জীবিত থেকেই মৃত হয়ে আসছে। কোথায় স্নান, কোথায় খাওয়া। ঝলমলে দুপুরে বর্ষার মেঘ। মৃতদার পরমেশ্বর, মৃতদার শ্বশুর দু'জনেরই চোখে জল। গৌরবর্ণ দাদুর বিশাল বুকের মাঝখানটা টকটক করছে লাল। পরমেশ্বর বলতেন সাধকের বুক। সূর্য গঙ্গার দিকে আরও খানিকটা হেলে যেত। নির্জন বাড়িতে সুর খেলত, হামসোঁ রহানা জায়।

পরমেশ্বর এখন কোন দিকে মুখ করে বসে আছেন? অপূর্ব বললে, পশ্চিমে। পশ্চিমে! তার মানে মৃত্যুর চিন্তা। এইটাই বঙ্কিমের ভীষণ খারাপ লাগে। পরমেশ্বরের চোখে বঙ্কিম আর দেবদূত নয়, যমদূত। *তুমি আমার সেই ছেলে, যাকে অবলম্বন করে আমি আমার নিঃসঙ্গ যৌবন কাটিয়েছি, অতীত ভুলেছি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি। তুমি আমার সেই ভবিষ্যৎ যাকে দেখলে মনে হয়, অব* মেরে নৈয়া পার করো প্রভু। সেই জলখাবার নামিয়ে আনার পর থেকে বঙ্কিম একবারও ওপরে যায়নি। যুদ্ধ ঘোষিত। এখন সীমানার ওপারে যাওয়ার দুটো অর্থ— হয় আক্রমণ, না হয় সন্ধি। সন্ধির এটা সময় নয়। হৃদয় আর একটু রক্ত মোক্ষণ করবে, মুখ আরও একটু অগ্নি বর্ষণ করবে, নাসিকা আরও একটু ড্রাগনের নিশ্বাস মোচন করবে, রাতকে আরও দীর্ঘ করে, বয়সকে আরও দ্রুত করে শান্তির শ্বেত পতাকা উড়বে। সীমান্তের এপার থেকে ওপারে খাদ্য যাবে, পানীয় যাবে, গরম জল যাবে, পাখাটা আবার ঘুরবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। পরমেশ্বর দক্ষিণমুখো হয়ে চৌকিতে বসবেন। নারকেল পাতায় পূর্ণশশীর খেলা দেখে গেয়ে উঠবেন, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

প্রতিমা ইতিমধ্যে সেজেগুজে বেরিয়ে এসেছে। সাজলে গুজলে প্রতিমাকে খারাপ দেখায় না। বয়েসটা একটু বেড়েছে। আগের সেই চপলতা নেই। উগ্রতা নেই। রূপটা সংসার অনেকখানি রোস্ট

করে দিয়েছে। বয়েলড পোট্যাটো বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বেশ একটা মা মা চেহারা হয়েছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমকে অসহায়ের মতো দোতলার দিকে বারে বারে তাকাতে দেখে প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল এখনও জুতো পরোনি?' সেই মুহূর্তে বঙ্কিমকে দেখাচ্ছিল জলে ডোবা মানুষ, একটা অবলম্বন খুঁজছে। বেরোবার আগে বাবাকে অন্তত বলে যাওয়া উচিত। কী করে বলবে? কীভাবে বলবে?

আচ্ছা এইভাবে বললে কেমন হয়। 'আমরা একটু আসছি'। না এটা ঠিক হল না। এ তো অনুমতি চাওয়া হল না। একে বলে পোস্টিং উইথ ইনফরমেশান। খবরটা ছুঁইয়ে যাওয়া। একটু ঠুকরে যাওয়া। আগেই সব সেজেগুজে ঠিক করে বসে আছ, জাস্ট একটু জানিয়ে গেলে এই তো। তা লায়েক হয়েছ, বউ নিয়ে একটু ফুর্তিটুর্তি করবেই তো। অ্যান্ড দিস ওল্ড ম্যান, এই বুড়ো লোকটা, দিস ঘাটের মড়া বসে বসে তোমাদের বাড়ি পাহারা দেবে, দরোয়ানি করবে? তাই তো? ঝি-কে দরজা খুলে দেবে। চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। বাটি পেতে দুধ নেবে। হায় বিচার! তোমাদের যখন অন্নদাতা, তখন তো পাহারা দিতেই হবে মানিক। বৃদ্ধ মানুষ আর কুকুর কতটুকু তফাত। দুইয়ের তফাত। একজনের চার পা আর একজনের দুটো। কুকুরও ছাঁট দিয়ে ভাত খায়। তোমাদের সংসারে যখন মাংস হয়, বেছে বেছে তোমার বউ দু'টুকরো হাড় ওপরের বুড়োটাকে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিবাদ কোরো না। দুঃখ পেয়ো না। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। দিস ইজ মোর অর লেস ইউনিভার্সাল। সেই জন্যেই পঞ্চাশে বাণপ্রস্থের বিধান আছে।

না, ওভাবে বলা চলবে না। ও পথে বাড়াসনে তুই পা। ভীমরুলের চাকে ঢিল। বরং এইভাবে বলাই ভাল, অনুমতি চাওয়ার ধরনে, হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। গৃহস্বামীর কাছ থেকে ছোটদের কোথাও যাবার আগে অনুমতিই চাইতে হয়। তা হলে এইভাবে বলতে হয়, 'আমরা কি একটু ঘুরে আসতে পারি?'

তার মানে? তোমরা তো সেজেগুজেই বসে আছ। জাস্ট এ ফর্ম্যালিটি তাই তো? একটু ফুল ফেলে যাওয়া। এর কোনও প্রয়োজন আছে! নো ফর্ম্যালিটি। তোমরা সব স্বাধীন। কোনও কিন্তু নেই। গো অন মেরিলি। কোনও চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ এ ফর্ম অফ ইনসাল্ট। সম্মান করতে না জানো অপমান কোরো না। অনুমতি চাইতে গেলে এখন প্যান্ট জামা খুলে গামছা পরে ভালমানুষের মতো মুখ করে যেতে হয়। প্রথমেই কাজের কথা নয়। দু'-চারটে সাধারণ কথা। শরীর, গাছ, লতাপাতা, সমাজনীতি, রাজনীতি, ঘরের ঝুল, জানলার কাচে ধুলো, বাজার দর, তেলে ভেজাল, অমুকের সঙ্গে দেখা, আমরা একটু যেতে পারি, অনেক দিন...। তা বেশ তো যাও না। অনেক রাত হবে ফিরতে।

আজকে অবশ্য সবই একাকার। আজকে বঙ্কিম যেভাবেই বলুক, উত্তর সেই এক 'আমি কে? আমাকে কেন? অনেক হয়েছে। নাউ ইউ আর ফ্রি। নিজের কাছ থেকেই অনুমতি চেয়ে নাও। উস হায় প্রভু! এ কী করলে!' তুমি তো আজ আসো নাই বন্ধুর বেশে, পুত্রের বেশে, দু'হাতে বিনয়মনে সম্ভ্রম নিয়ে। ইউ আর অ্যাডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং এ ক্রাইম ট্যান্টামাউন্ট টু এ ক্লেভারলি ম্যানিপুলেটেড মার্ডার। বঙ্কিম প্রতিমার প্রশ্নের উত্তর দিল জ্বরো রুগির মতো ফিকে হেসে, 'এইবারই হল রিয়েল সমস্যা, ওপরে বলতে হবে তো।'

'বলতে তো হবেই। সবাই মিলে বেরিয়ে যাব, বৃদ্ধ মানুষ একলা থাকবেন।'

'কে বলরে?'

'কেন তুমি বলবে! তোমার তো বাবা। তোমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। গোলমাল তো আমার সঙ্গে।'

যে-কোনও সমস্যাকে সরলীকরণের ক্ষমতা প্রতিমার মতো আর কারুর আছে কিনা সন্দেহ। তার কাছে মানুষ হল অনুভূতিহীন একটা জীব, মান, সম্মান, অভিমান যুক্তি বিচার বুদ্ধি হল

বিক্রমাদিত্যের বেতাল। গাছের ডালে শব হয়ে ঝুলবে। প্রয়োজনে পাড়বে, আবার ফিরিয়ে দেবে।

বঙ্কিম বললে, 'ওনার সামনে আজ আর আমার এমনিই দাঁড়াবার সাহস নেই, তার ওপর কোথাও যাবার অনুমতি ভিক্ষা। এর থেকে বাঘের মুখে দাঁড়ানো অনেক সহজ কাজ। ওই গম্ভীর, শুকনো মুখ, উদাস ছানিপড়া চোখ। না বাবা, আমি পারব না।'

'তুমি না পারলে কে পারবে?'

'তাই তো ভাবছি প্রিয়ে। ব্যাপারটাকে তুমি এত ডিফিকাল্ট করে তুলেছ। তোমার আর কী বলো। তুমি তো আছ মজাসে আমার ব্যাঙের ছাতার তলায়।'

'তুমি ব্যাং?'

'সংসার তাই মনে করে। ওই তো আমার ব্যাঙাচিরা। উভচর প্রাণী, জলেও চরে, স্থলেও চরে। একতলাতেও আছে, দোতলাতেও আছে।'

'ঠিক বলছ? এক কথায় সমস্যার সমাধান। অপূর্ব গিয়ে বলে আসুক, আমরা একটু বেরোচ্ছি।'

'দি আইডিয়া।'

বঙ্কিম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রস্তাবটা মন্দের ভাল। যুদ্ধে এক সেনাপতির কাছ থেকে আর এক সেনাপতির কাছে খবর পৌঁছে দেবার জন্যে দূতপ্রথা মহাভারতের কাল থেকে চলে আসছে।

'যাও বেটা বোলকে আও।'

দূত দুরদুর করে এ ক্যাম্পে ছুটল। তার আর তর সইছে না। কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছে। ঘুঘুডাঙায় ঘুঘুমাসির বাড়ি যাবে। স্বামী-স্ত্রী কান খাড়া করে সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে রইল। দূতের অভ্যর্থনা জানার কৌতূহল। শব্দতরঙ্গের কিছুটা যদি নেমে আসে নীচে!

অপূর্ব নিমেষে নীচে নেমে এল।

'কী হল রে?' একসঙ্গে দু'জনের প্রশ্ন।

'দাদির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।'

'তা হলে?' বঙ্কিম প্রশ্ন করল প্রতিমাকে।

'তা হলে?' প্রতিমা প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দিল বঙ্কিমকে। স্ত্রীর ধর্মই পালন করল। ধ্বনিরই তো প্রতিধ্বনি। চারজন সিঁড়ির তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ছেলেমেয়ে নিয়ে বউ হয়তো এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। 'ওস্বামী বলেছেন, দাঁড়াও আসছি। প্রতিমা বললে, তুমিই একবার যাও। দরজা বন্ধ করে পড়ে আছেন। বৃদ্ধ মানুষ। সারাদিন খাওয়া নেই। আমার বাবা হলে যেতুম।

বঙ্কিম বললে, 'আমার বাবাকে তোমার বাবা করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।'

প্রতিমা বললে, 'বারো বছর ধরেই তো সেই চেষ্টা করে আসছি হচ্ছে কই! এখন যাও তো, দেরি হয়ে যাচ্ছে না!' বঙ্কিম যেন ফাঁসিতে যাচ্ছে এইরকম একটা মুখ করে গুটি গুটি ওপরে উঠে গেল। নীচে সবাই দাঁড়িয়ে রইল উৎকণ্ঠা নিয়ে, কী হয়, কী হয়!

দোতলাটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। পুব থেকে পশ্চিমে পড়ে আছে নির্জন করিডর। পশ্চিমের জানলা দিয়ে একঝলক রোদ চকোলেট রঙের ঝকঝকে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। সার সার বন্ধ ঘর। এত ঘরের কোনও প্রয়োজন ছিল না। পরমেশ্বরের ফিউচার প্ল্যানিং। বঙ্কিমের পরিবার ক্রমশই বড় হবে। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার। ছেলেমেয়েরা বড় হলে আলাদা ঘর চাই। বিয়ের পর বউ আসবে, জামাই এসে থাকবে। তখন তো ঘর চাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই শ্রীকৃষ্ণের ছবি। হাসি হাসি মুখে বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে আছেন। এইমাত্র যেন অর্জুনকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে গ্যারেজে রথ রেখে ছবির ফ্রেমে মুখ ফিট করে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বঙ্কিম প্লে-ব্যাক করল, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। শুনতে পেল প্রতিমা বলছে, 'কী হল রে বাবা! জমে গেল নাকি!'

শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শক্তি ধার করে বঙ্কিম পরমেশ্বরের ঘরের বন্ধ দরজায় তিনবার টুকটুক করে টোকা মেরে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, 'বাবা, বাবা।' কোনও উত্তর নেই। বাবা। শেষের ডাকটা বুকফাটা আর্তনাদের মতো শোনাল। যে ডাকে পাথরও গলে যায়, মন্দিরের বিগ্রহও কেঁপে ওঠে, সে ডাকে পরমেশ্বরের কিন্তু কিছুই হল না। দমকা হাওয়ায় একটা জানলা কেঁপে উঠল। গাছের ডালে একটা ঝটাপটি শব্দ হল। একটা পাখি ছিক ছিক শব্দ করে উড়ে গেল। পরমেশ্বরের বন্ধ ঘরেও হাওয়ার লুটোপুটি শোনা গেল। মানুষটি কিন্তু নিরুত্তর। এর পর বঙ্কিম কী করতে পারে! নখ দিয়ে দরজাটা হাঁচড় পাঁচড় করে আঁচড়াতে পারে।

দরজার তলার দিকে একটু ফাঁক আছে। ফাঁক দিয়ে দক্ষিণের হু হু হাওয়া আসছে। শুয়ে পড়ে ফাঁক দিয়ে চোখ চালালে কেমন হয়! দু'ইঞ্চি জড় পদার্থের ব্যবধানে যে জগৎ সেই জগতের ঊর্ধ্ব দিক দেখা না গেলেও অধঃ দিকটা চোখে পড়তেও পারে। এখন একমাত্র উপায় বিস্ময়ের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়া। ঘরে একটা জীবন্ত প্রাণী রয়েছে অথচ জীবনের কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই তা কী করে হয়! যিনি নিদ্রাহীনতার রুগি, বছরের পর বছর যাঁর দিনে-রাতে ঘুম নেই, তিনি এই কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে দিবানিদ্রায় বেহুঁশ তা কি হতে পারে! তবে! তবেটা রেডিয়োর সেন্টার চেঞ্জের মতো মাথায় মধ্যে ঘঁড়র করে উঠল। থ্রম্বোসিস হতে পারে। থ্রম্বোসিস তো আজকাল ঘরে ঘরে ডাকের পিয়োনের মতো যে-কোনও সময় এসে মৃত্যু বিলি করে যায়। আত্মহত্যা, তাও তো হতে পারে। রায়সাহেব আজও মরিয়া অমর। বিশ বছর আগের ঘটনা। ছ'-ছ'টা ছেলে আর দু'-দুটো বউয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মাননীয় রায়বাহাদুর মাঝরাতে তাঁর ছ'ফুট, সত্তর বছরের দেহ মা গঙ্গাকে দান করে দিলেন। পরমেশ্বর এখনও সংসারের একটু বেচাল দেখলে সেই রেফারেন্স টানেন, রায়বাহাদুরকে রাখলে জননী, বিন্দুকেও নিলে। বিন্দু একটা বিপরীত ঘটনা, ঘরের বউ শাশুড়ির জ্বালায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কেষ্ট গেল ভেসে, কেষ্ট ফেল করে ডুবেছিল। পরমেশ্বরের এত ক্লেশ মাগো, তাকে গিলবি কবে? পুরোটা এক করে পরমেশ্বর কাফি টপ্পা করে মাঝে মাঝে ছেলে বউকে শোনান। এমনি হাসি খুশি বন্ধ। তবুও মানুষ তো? সব সময় দুঃখের কথা মনে থাকে না। বঙ্কিম আর প্রতিমা হয়তো কোনও ব্যাপারে একটু সরবে হাসাহাসি করে ফেলেছে, আর সেই হাসি হয়তো দামাল ছেলের মতো লাফাতে লাফাতে দোতলায় গিয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর সুখের গৃহ শ্মশান করে আগুন জ্বেলে দিলেন, কাফি টপ্পা নেমে এল হাসি এক্সটিনগুইশার হয়ে :

হাহা, হাঃহা হাহা
হামা যোমা হামা যোমা
হামা যোমা হামা যোমা (দ্রুত)
রায়বাহাদুরকে রাখলে জননী,
বিন্দুকেও নিলে,
কেষ্টা গেল ভেসে,
পরমেশ্বরের এত ক্লেশ মাগো
তাকে গিলবি কবে
(ওমা, তাকে গিলবি কবে) আখর

নীচ থেকে প্রতিমার চাপা অধৈর্য মেশানো গলা শোনা গেল, 'কী হল কী তোমার! খুব হয়েছে, আর গিয়ে কাজ নেই।' বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে গলাটা সারসের মতো বেঁকিয়ে দরজায় চোখ রাখল। পৃথিবীতে সে এখন নীচে থেকে ওপরে আপসাইড ডাউন দেখছে বা সে এখন জমির সমতলে, লেভেল উইথ দি ফ্লোর। ধারালো তলোয়ারের মতো দরজার তলা দিয়ে ফ্যাঁস করে দৃষ্টি চলে গেল ঘরে, ওই তো দু'পাটি জুতো, বাথরুম স্লিপার খাটের মাথার দিকের একটা পা, চেয়ারের পা, দুটো মুড়ি হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। কখন আবার মুড়ি খেলেন, নিজের স্টকেই মুড়ি থাকে

কৌটো ভরতি। পেনশানের টাকায় কিনে আনেন। আহা ফলারে হয়তো পেট ভরেনি! খাটে বসে একটা-দুটো করে খাচ্ছিলেন। তারপর। বঙ্কিম তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর যদি এইরকম হয়ে থাকে— মুড়ি খেতে খেতে গলার কাছটা কীরকম করে উঠল, বুকের কাছটা পাথরের মতো ভারী হয়ে এল, বললেন একটু জল। কুঁজোটা দেখতে পাচ্ছেন, অথচ জল গড়াবার শক্তি নেই, বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে, একটু জল। কেউ শুনল না, শুনতে পেল না, হাতের মুঠোর মুড়ি, ঠোঁটের কোণে দুটো মুড়ি শেষ আহার। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। মুড়ি কি সেই হাতের মুঠো থেকে পড়েছে!

বঙ্কিম আবার নিচু হল। আবার চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। এ কী, দুটো মুড়ি যে তিনটে হয়ে গেছে! বঙ্কিম ভয়ে ভয়ে নীচে নেমে এল। সে কি পরমেশ্বরের নির্জন ঘরে রায়বাহাদুরকে দেখে এল! তোমার বড় সাধ, তাই নিতে এসেছি পরমেশ্বর। তুমি যে একসময় আমার ছেলেদের গৃহশিক্ষক ছিলে! আমি তো মুক্তি পাইনি। চলো তোমাকে সঙ্গী করে নিয়ে যাই মুক্তিহীন সেই অশরীরীদের জগতে।

'এ কী ওপর থেকে কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলে কেন?'

প্রতিমার কথায় বঙ্কিম চোখে হাত দিল। সত্যিই তো জল! বঙ্কিম বললে, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। সাড়া নেই, শব্দ নেই। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই। শুয়ে থাকলেও পাশ ফেরার শব্দ নেই। শুধু দমকা হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে।'

'সে কী গো?' প্রতিমাও একটু ভয় পেয়ে গেল, 'কী হবে তা হলে? তুমি আর একবার যাও। এবার জোরে জোরে বারকতক ধাক্কা মেরে দেখো।'

লেডি ম্যাকবেথ যেন ম্যাকবেথকে হত্যা করতে পাঠাচ্ছে। যাও রাজা যাও, আর দেরি কোরো না, ভোর হয়ে আসছে। এখুনি জগৎ জেগে উঠবে, যাও বঙ্কিম যাও. মৃত অথবা জীবিত অনুমতির ব্যাপারটা চুকিয়ে এসো। বউ নিয়ে তুমি যে ঘুঘুডাঙায় যাবে! এক ধাপ এক ধাপ করে বঙ্কিম যেন কফিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্নায়ু, মন কোনওটাই যেন তার কাজ করছে না। এমন একটা দিকে সে চলেছে, যেখানে পথের শেস, সামনেই মহা খাদ। এ যাওয়া যেন নিদ্রায় হাঁটা. স্লিপ-ওয়াকিং। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে? শূন্যতায় সে এক উদ্দেশ্যহীন পাখি?

হঠাৎ ছেলে. মেয়ে ও প্রতিমা তিনজনেই একসঙ্গে চাপা চিৎকার করে উঠল, 'এসেছেন, এসেছেন।' শক খাওয়ার মতো বঙ্কিম ঘুরে দাঁড়াল। পিসিমা এসেছেন। বঙ্কিমের মনে হল, ধমনিতে রক্তস্রোত ফিরে এল. স্নায়ু ফিরে এল, মন ফিরে এল, হাত পা, ধড় মুন্ডু, সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে জোড়া লেগে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে এর থেকে কাম্য আর কিছু ছিল না। পিসিমা বললেন, 'কী হল? সব এভাবে দাঁড়িয়ে?'

বঙ্কিম মাঝ সিঁড়ি থেকে নেমে এল, 'বাবার কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

'তাই নাকি? দাঁড়াও আমি দেখছি।'

বঙ্কিমের পিসিমা ওপরে উঠে গেলেন। হাঁটু ভাঙার শব্দ উঠছে মটমট। এই শব্দটা বঙ্কিমের খুব খারাপ লাগে। কীরকম একটা অমঙ্গলের ভাব লুকিয়ে আছে। তবু, তবু পিসিমা এখন স্যাভিয়ার। দুঃখের দিনে এসেছ প্রভু হে।

'ও ছোড়দা, ছোড়দা।' পিসিমার গলা শোনা গেল । বঙ্কিম প্রায় শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে:

'ও ছোড়দা।' আর একটু জোর গলা। আকুলতা মেশানো।

ঢ্যাস করে একটা শব্দ হল। পরমেশ্বর ঘরের ছিটকিনি খুললেন। এতক্ষণ বঙ্কিম ছিল টাইরড কেটে যাওয়া গাড়ির যাত্রী। সামনের আসনের পেছনটা জোরে চেপে ধরে বসে ছিল। কী হয়. কী হয়! বাঁচবে কি মরবে, ছিটকিনি খোলার শব্দে হাতের মুঠোটা আলগা হয়ে গেল। মনটা যেন হাওয়া হয়ে বেলুনে আটকে ছিল, ফট করে ফেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা, প্রচণ্ড একটা

অভিমানে মনটা গুমোট হয়ে গেল। মানুষের সম্পর্ক যেন এলো সুতোর লাটাইয়ে উড়ছে ঘুড়ি! কখন যে উড়ে যাবে কেউ জানে না। এই লাট খাচ্ছে, এই গোঁত মারছে, পরমুহূর্তেই সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে নীল আকাশে ভাসতে ভাসতে চলেছে। প্রতিমা বললে, 'দেখলে। আমরা ওনার কেউ নই। বোনই সব। আমি না হয় বদমাইশ, বেয়াদব মেয়েছেলে, কিন্তু তুমি! তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা এত সহজে ছিঁড়ে কী করে! তুমি তো বাবা বাবা করে অস্থির, সারাজীবন দেবতার মতো ভক্তি করে এলে, শ্রদ্ধা করে এলে। তোমার সঙ্গে এ ব্যবহার কেন?'

বঙ্কিম প্রতিমার দিকে তাকাল। চোখে জল। এবারের জল অন্য। এর স্বাদ তেতো। ভঙ্গুর মানুষের সম্পর্ক। একে রক্ত দিয়ে, চুক্তি দিয়ে, আত্মসমর্পণ করে, শাসন দিয়ে স্থায়ী করা যায় না। বঙ্কিম বোঝার চেষ্টা করল, সে এখন কোথায়? কোন জমিতে সে দাঁড়িয়ে। প্রতিমার সম্পর্কে না পরমেশ্বরের ঘৃণায়। সংসারের গোলদারিতে কি শুধুই চুলচেরা হিসেব। স্নেহ ভালবাসা কি তৌলের মাপে কড়ি গুনে দেওয়া নেওয়া চলে! কে কতটুকু নির্ভরযোগ্য? প্রতিমা তুমি? পরমেশ্বর আপনি? অপূর্ব তুমি? শুভা তুমি?

বঙ্কিম কী বুঝল কে জানে? মনে অনেক ফোসকা, আর একটা ছ্যাঁকাও না হয় লাগল! দ্বিগুণ উৎসাহে, শূন্য মনে ধার করা স্ফূর্তি এনে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ওঠাও পালকি, চলো ঘুঘুডাঙা। কোম্পানি ডবল মার্চ।'

ঘুঘুডাঙা স্টেশনে নেমে বঙ্কিম একটা রিকশা নিল। মজার রিকশাওলা। কম বয়েস। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। হাফ প্যান্ট। স্বাস্থ্যটা এখনও ভালই রেখেছে। বসে বসে হর্ন বাজিয়ে হিন্দি গান গাইছিল। স্ফূর্তিই হল শরীর ভাল রাখার সেরা দাওয়াই। বঙ্কিমরা উঠে বসতেই ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাব স্যার?'

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারটে দিক। চারদিকেই রাস্তা খোলা। প্রতিমা আর বঙ্কিম দু'জনেই এই প্রথম আসছে। এর আগে কখনও আসেনি। বঙ্কিম প্রতিমাকে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে?'

'কেন শিখীর বাড়িতে!'

ঠিকই তো, শিখীর বাড়িতেই তো যাবে বলে বেরিয়েছে। বঙ্কিমের ভায়রার নাম শিখী। বঙ্কিম রিকশাওলাকে বললে, 'শিখীর বাড়িতে চলো।' ছেলেটি অবাক হয়ে বঙ্কিমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বঙ্কিম বললে, 'কী হল?' ছেলেটি বললে, 'কোন শিখী স্যার? এখানে এক শিখারানি আছে স্যার, তাকে নিয়ে বহুত রাজনীতি হচ্ছে। দু'পার্টিতে লড়াই। কাল খুব মাল চালাচালি হয়ে গেছে।'

'ধ্যুর, শিখা নয় রে বাবা, শিখীবাবু, একজন হুমদো লোক।'

'আজ্ঞে ওভাবে বললে যাওয়া যায়! রাস্তার নাম, ঠিকানা না বললে যাব কী করে?'

'দ্যাটস রাইট!' বঙ্কিম স্ত্রীকে বললে, 'বলে দাও, গিভ হিম ডিরেকশান।' প্রতিমা আধ হাত জিভ সামনে ঝুলিয়ে বললে, 'ইস বড্ড ভুল হয়ে গেছে গো, ঠিকানা লেখা কাগজটা ড্রেসিং টেবলের ওপর ফেলে এসেছি।' বঙ্কিম অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তা হলে তুমি বসো, আমি ঠিকানাটা নিয়ে আসি।' প্রতিমা অপরাধীর মতো মুখ করে বললে, 'রাগ কোরো না, বেরোবার সময় গোলমালে ভুল হয়ে গেছে।' সাধে বলে, দশ হাত কাপড়েও মেয়েছেলে ল্যাংটো। বাড়ি হলে প্রতিমা হয়তো নতি স্বীকার করত না। সংসার সীমানায় যারা তার্কিক, বাইরের পৃথিবীতে তারাই আবার নির্ভরশীল। যে প্রতিমার দাপটে সংসার কাঁপে সেই প্রতিমাই পাশে বসে আছে বিব্রত। বঙ্কিম ভরসা। আসলে মেয়েদের নিয়মই হল, যার শিল, যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। মেয়েদের একটি খুঁটি চাই। খুঁটির সঙ্গে বেশ ভাল করে নিজেকে জড়িয়েই শুরু হবে রঙাই নাচ। বঙ্কিম বহু ডিভোর্সি দেখেছে যাঁরা স্বামীকে ত্যাগ করেই অন্য স্বামী ধরেছেন নিছক প্রেমের

জন্যে নয়, প্রোটেকশানের জন্যে। মহিলারা হলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো, সঙ্গে একটা ঠেকা চাই, সংগত চাই।

'এখন তা হলে কী হবে?' বঙ্কিম তার বুদ্ধিমান বউয়ের পরামর্শ চাইল।

হতাশ প্রতিমা বললে, 'চলো তা হলে ফিরে যাই, কোথায় আর খুঁজবে?'

'শিখীর ভাল নামটা কী?'

'সেটাও তো জানি না, শিখী বলেই তো এতকাল ডেকে এসেছি।'

'বেশ করেছ।' বঙ্কিম রিকশাওলাকে বললে, 'আচ্ছা ভাই এদিকে কাগজকলের কোয়ার্টারগুলো কোন দিকে?'

'কাগজকল কি না জানি না, মাইলখানেক দূরে অনেক নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে।'

'ঠিক হায়, তুমি ওই দিকেই চলো।'

ফুল ফোর্সে কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে ছেলেটি রিকশা ছেড়ে দিল। পিচঢালা রাস্তায় তিন চাকা সাঁই সাঁই করে ছুটছে। ফিরে যাওয়া থেকে একটু অ্যাডভেঞ্চার ভাল। হাট-বাজার, দোকান, অজস্র মানুষ। বাতাস এখনও উত্তপ্ত। তবু ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন জীবন থেকে বিশ্বাস উড়ে যায়, প্রাণ যখন ডানাভাঙা পাখির মতো উড়তে ভুলে যায় তখন বোধহয় এইভাবে উদ্দেশ্যহীন ছুটে চলতে ভালই লাগে। বহু জীবনের বেঁচে থাকা থেকে নিজের বেঁচে থাকার জ্বালানি সংগ্রহ করা যায়। কেউ কোনও কথা বলছে না। বঙ্কিমের কী মনে হল, বলে উঠল, 'হায় মেয়েছেলে!'

পথটা বোধহয় একটু খাড়াই ছিল, রিকশাওলা সিট থেকে উঠে পড়ে প্যাডেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। চওড়া পিঠ ঘেমে গেছে। হায় মেয়েছেলে তার কানে কীভাবে গেল কে জানে, সে বললে, 'না স্যার জিন্দেগি ভাল বই, তিনটে হিট সং আছে।' বঙ্কিম বললে, 'তাই নাকি? দেখেছ তুমি?'

'তিনবার। আজ নাইটে আর একবার মারব।'

'সপ্তাহে ক'বার মারো?'

'পাঁচটা-ছ'টা।'

'এত হল আছে এদিকে?'

'না স্যার। একটাই। দু'-তিনবার মারি।'

'ভাল লাগে?'

'আমি স্যার গানগুলো তুলে নেবার জন্যে বারবার দেখি।'

'গান ভালবাসো?'

'গাইয়ে হবার ইচ্ছে ছিল, হয়ে গেছি রিকশাওলা।'

'কেন?'

'সে স্যার অনেক স্টোরি। বাবা মাকে ছেড়ে দিলে। গান শেখাত একটা মেয়েকে, তার সঙ্গেই মজে গেল, মাকে ধরে ধরে পেটাত। একদম ভীম কেচ্ছা।'

'ভীমটা কী?'

'ওই যে কাপ ডিশ ধোবার পাউডার। ঝকঝকে কেচ্ছা। মার খেয়ে খেয়ে মা'র জয়েন্ট খুলে যাবার জোগাড়। মাল খেয়ে মার। গাইয়ের কালোয়াতি মার। আমার আর কিছু হল না। মায়ে ছেলেতে এখন বেশ আছি। রিকশা চালাই, হিন্দি ফিল্ম দেখি, যা রোজগার করি ডাল-ভাত হয়ে যায়।' অপূর্ব অনেকক্ষণ উসখুস করছিল কিছু বলার জন্যে। বঙ্কিম তার দিকে তাকাতেই অপূর্ব বললে, 'দাদি এখন কী করছেন?'

বঙ্কিম ঘড়িটা দেখল। সাড়ে পাঁচটা। 'দাদি এখন চা-টা খেয়ে ছাদে ফুলগাছে জল দিচ্ছেন।'

প্রতিমা রাস্তার বাঁদিকের সারি সারি দোকান দেখতে দেখতে চলেছে, মনিহারি, গুঁড়ো চা, তৈরি

চা, পান বিড়ি সিগারেট, মিষ্টি, রেডিয়ো সারাই, ঘড়ি মেরামত। কনুই দিয়ে বঙ্কিমকে একটা খোঁচা মেরে বললে, 'একটু মিষ্টি কিনলে হত না।'

'অবশ্য হত। কিন্তু কোথায় গিয়ে ঠেকব তা তো জানি না, টাকাটাই জলে যাবে।'

'মিষ্টি তো জলে যাবার জিনিস নয়, আমরাও খেয়ে নিতে পারব। তাই না?'

'তা অবশ্য পারব, এমন কিছু কঠিন খাদ্য নয়। জিভে ফেলে বসে থাকলেই হল, এমনকী দাঁতকেও কষ্ট দেবার প্রয়োজন হবে না।'

মিষ্টির কথা বলতেই বড় একটা দোকান এসে গেল। প্রতিমা হইহই করে উঠল, 'একটু থেমে ভাই, একটু থেমে।'

রিকশা কিন্তু থামল না। প্রতিমা একটু অসন্তুষ্ট হল, 'কী হল, থামলে না।'

'মিষ্টি কিনবেন তো?' মুখটা অল্প একটু ঘুরিয়ে ছেলেটি প্রশ্ন করল।

'তুমি তো থামলে না!'

'ওটা মালের দোকান বউদি, বাইরে মিষ্টির শো, ভেতরে চোলাই, চলুন না ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।' বউদি বলায় প্রতিমা ড্যাম গ্ল্যাড। সংসারের বাইরে মানুষ সামান্যেই সন্তুষ্ট। একটু বউদি বলেছে, নিজের ভেবে ভাল মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাচ্ছে, মুহূর্তে ছেলেটি পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। এ ফ্যামিলি অফ ফাইভ রাইডিং এ রিকশা। বঙ্কিমও লক্ষ করেছে, তার কোনও বন্ধু বেড়াতে এসে পরমেশ্বরকে কাকাবাবু বা জ্যাঠাবাবু বলে আলাপ করলে, পরমেশ্বর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকেন। অনবরত বলতে থাকেন, আহা কী সব ছেলে! তারপরেই বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেন, সিঙ্গল অর ম্যারেড। যদি বলে ম্যারেড, পরমেশ্বর বলেন, বউটিও নিশ্চয়ই সেইরকম। ভালর ভালই হবে। যদি বলে সিঙ্গল, পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বাঃ শুধু ভদ্র নয়, আদর্শবান। জীবনটাকে কেমন সুন্দর মোলড করছে, সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে, ছেলেপুলে নিয়ে, হাজারটা অশান্তি নিয়ে জীবনটাকে ছারখারে পাঠায়নি। কেমন সব মিনিংফুল লাইফ! এ বার্ড পার্চিং অন হাই ব্র্যাঞ্চেস অফ লাইফ। তার মানে সকলেই বঙ্কিমের চেয়ে ভাল, আদর্শবান, প্যারাডাইসের পাখি। একই ব্যাপার বঙ্কিমের ক্ষেত্রে। পরিচিতদের বাড়িতে যেখানে সে মাসি, বউদি, দিদি, কাকা, জ্যাঠা পাতিয়ে বসে আছে সেখানে বঙ্কিমের মতো ছেলে হয় না।

বঙ্কিম একটু জোরেই বলে ফেলল, 'ও লর্ড।' রিকশাওয়ালা বললে, 'না স্যার নিধু। এরকম কড়াপাক খুব কম কারিগরই করতে পারে, ল্যাংচাতেও স্পেশাল।' বঙ্কিম বললে, 'তুমি লর্ডকে চেনো?'

'সে কে স্যার?'

'তিনি এক হালুইকর। ভিয়েন চাপিয়ে বসে আছেন জগৎ জুড়ে।'

'ও আপনিও দেখেছেন তা হলে!'

'কী দেখেছি? লর্ডকে?'

'না স্যার 'দোসরা দুশমন' সেম ডায়ালগ।'

'আর কতদূর ভাই!'

'এই তো এসেই গেছি। প্রথমে নিধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, তারপরই পিড়িংপাড়া।'

'পিড়িংপাড়া কী?'

'নামটা আমরা দিয়েছি। বড়লোকের জায়গা তো স্যার, পিড়িংবাজ মেয়েতে ভরতি।'

নিধুর দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বঙ্কিম প্রতিমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'যাও ঠাকুরপোর সঙ্গে গিয়ে গোটা দশেক টাকার কড়াপাক নিয়ে এসো। আমি বরং বসি।' প্রতিমা গোল্লা চোখ করে নেমে গেল।

অপূর্ব সেই যে প্রশ্ন করেছিল, 'দাদি কী করছেন'— তারপর থেকেই বঙ্কিমের মনে যেন চোঁচ

ফুটে আছে। প্রথমটায় বাড়ির কথা বেশ ভুলে এসেছিল। তা প্রায় বছর ছয়েক পরে বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কোনও এক পরস্ত্রীকে খোল নলচে সমেত পরিবার থেকে উৎপাটিত করে ইলোপ করে যেন মধুপুরে পালিয়ে এসেছে, আড়চোখে বারকতক প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দেখেছে। ঘাড়ের কাছে খোঁপা লতপত করছে। পুরুষ্টু ঊর্ধ্ব বাহু। দু'জনের দু'হাঁটুর ওপর ফিউচার। একটা ইনকাম, একটা এক্সপেন্ডিচার। মেয়ে নিয়ে পালাবে, ছেলে লটকে আনবে। ও লর্ড হোয়াট এ ব্যালেন্স! সেই মনটা কিন্তু আর নেই বেশ কেমন দূরে দূরে চলে আসছিল, খাঁচা খুলে পালিয়ে আসা পশুর আনন্দে। মনটা আবার ভারী হয়ে উঠছে।

গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়েছে তার ডানপাশে খোলা মতো এক টুকরো জায়গায় কীসের একটা শামিয়ানা পড়েছে, আমপাতা আর শোলার ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। হলদে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একদল ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে আছে। নাকে আসছে লুচি ভাজার গন্ধ। বঙ্কিম একবার চোখ বুজিয়ে নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করল। নিজের খুব কাছাকাছি আসার চেষ্টা করল। এই কায়দাটা আজকাল সে প্রায়ই করে থাকে। চোখ বুজিয়ে প্রথমে একটু জ্যোতি দর্শনের চেষ্টা করে। জ্যোতি আর কোথায় পাবে! হুহু করে হাজার ফুট নীচে অন্ধকার কয়লার খাদে নেমে যেতে থাকে। সেখানে আসল বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট বসে আছে। গুরু বঙ্কিম। বাইরের বঙ্কিম হাত-টাত বুলিয়ে একটু তোয়াজ-টোয়াজ করে জিজ্ঞেস করে, গুরুজি! পথ বাতলাও। ফেঁসে গেছি।

সেই গুরু বঙ্কিমই রিকশার বঙ্কিমকে বললে, বেটা, শান্তি কাঁহা মিলি! একটা কুরুক্ষেত্র, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, গোটাকতক মিনি যুদ্ধ হয়ে গেছে, আরও হবে! ওরে শালা, যুদ্ধই যে জীবন। কলির শেষ, ঘর ঘর যুদ্ধ হোগা, জগৎ কটাহমে জীবন জ্বলেগা, মাই সান, ডু নট থিঙ্ক দ্যাট আই হ্যাভ কাম টু ব্রিং পিস টু দি ওয়ার্লড, নো আই ডিড নট কাম টু ব্রিং পিস, বাট এ সোর্ড। আই কেম টু সেট সানস এগেনস্ট দেয়ার ফাদার্স ডটার্স এগেনস্ট দেয়ার মাদার্স, ডটার্স-ইন-লস এগেনস্ট দেয়ার মাদার্স ইন-ল, এ ম্যানস ওয়ার্স্ট এনিমিজ উইল বি দি মেম্বার্স অফ হিজ ওন ফেমিলি। দাস সেয়েথ আওয়ার লর্ড।

বঙ্কিমের কোলে বসে থাকা তার মেয়ে কচি কচি হাত দিয়ে বঙ্কিমের দাড়িটা নেড়ে দিল। গুহা থেকে উঠে এল বঙ্কিম। মেয়ের দিকে তাকাল, 'কী বলছ মামণি?' কিছুদূরে রাস্তার ধার দিয়ে আর-একটা বাচ্চা মেয়ে সেজেগুজে চলেছে, বঙ্কিমের মেয়ে আঙুল দেখাল।

'কী করব বলো? ওকে ধ[illegible] এনে দোব!'

'না ওই দেখো।'

'কী ও হো, ওর চুলের রিবনটা। ওইর[illegible]ম একটা নেবে তুমি! ঠিক আছে, আজই কিনে দোব।' বোনের রিবন কেনা হবে শুনে অপূর্ব মহা উল্লাসে রিকশার গায়ে গমাগম করে জুতোর গোড়ালি ঠুকতে লাগল। বঙ্কিমে বঙ্কিমে কথা হয়ে গেল, ইয়েস মাই সান, আর বারোটা বছর অপেক্ষা করো, ওই তো তোমার সোর্ড তৈরি হচ্ছে। তোমারও পরমেশ্বরের হাল করে ছেড়ে দেবে। তোমার কোলের ডটার, ডটার-ইন-ল' হয়ে কোন বাড়ির মাদার-ইন-ল'কে বারাণসী পাঠিয়ে দেবে। চেন রি-অ্যাকশানের রাস্তা খোলাই রইল, অনন্ত অ্যাটমিক ফিশান। তবু তোমাদের মধ্যে যাহারা পিতা হইয়াছ, পারিবে কি, সন্তান রুটি মাগিলে তাহার হাতে এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া দিতে, কিংবা পারিবে কি মৎস্য চাহিলে তাহার হাতে একটি সর্প দিতে? অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ ইউ আর ইউ নো হাউ টু গিভ গুড থিংস টু ইয়োর চিলড্রেন। ও ক্রাইস্ট!

বঙ্কিম অপাঙ্গে অপূর্বকে একবার দেখে নিল, তুই কি সেই মুষল, যে আমাকে পঞ্চাশে বাণপ্রস্থে পাঠাবে কিংবা গঙ্গার ধারের বাঁধা বটতলায় বসাবার ব্যবস্থা পাকা করে দেবে। এখন কত ইনোসেন্ট, ইনফ্যান্ট, ফোলা ফোলা চাবি ফেস: এখনও গোডিম ভাঙেনি। এক পিতৃঘাতক তাকিয়ে আছে আর এক সম্ভাব্য ঘাতকের দিকে। এমন সময় প্রতিমা এল সন্দেশের বাক্স নিয়ে।

'একটা ফাউ দিয়েছে স্যার।' রিকশাওলা ছেলেটির ভীষণ আনন্দ। সন্দেশ যেন সেই কিনেছে তার মা'র জন্যে। প্রতিমা বললে, 'কী ছেলে বাবা। প্রথমেই তো টেস্ট করার জন্যে একটা আদায় করে বললে বউদি খেয়ে দেখুন। দু'জনে হাফ হাফ মেরে দিলুম। ভেতর থেকে কালকে রাত্তিরের তৈরি সন্দেশ বের করালে।'

'ভালই করেছ, একটু পরে গাছতলায় বসে পাঁচজনে খেয়ে যে যার বাড়ি চলে যাব। বাড়ি তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

একটা কালভার্টের ওপর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিতেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিভিন্ন রঙের নতুন নতুন বাড়ি। লাল টকটকে বোগেনভ্যালিয়া হাওয়ায় দুলছে। দু'পাশে গাছ বসানো নতুন রাস্তা সোজা চলে গেছে। সদ্য অ্যালুমিনিয়াম রং করা জলাধার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় পড়ে থাকা জনপদে জল জোগানের গর্বে গর্বিত।

'এর নাম পিড়িংপাড়া?'

'আমরা তাই বলি, ভাল নাম নবপল্লি।'

'মনে পড়েছে,' প্রতিমা লাফিয়ে উঠল, 'মনে পড়েছে, শিখীও বলেছিল নবপল্লি।'

তা হলে তো সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে গেছি, এখন চৌকাঠটা ডিঙোতে পারলেই হয়। প্রথম বাড়িটার সামনে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিম অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে, শোভা দেখছে। চারদিকে একটা সুখ সুখ ভাব। কোনও একটা বাড়িতে ঘাঁউ ঘাঁউ করে অ্যালসেশিয়ান ডাকছে। গম্ভীর ডাক, গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ, দূর কোনও মাঠে খেলুড়ে ছেলেদের চিৎকার, জলের পাম্প চলার একটানা মৃদু শব্দ, একটা স্টিরিয়ো রেকর্ড প্লেয়ারে পল রোবসনের ভরাট গলা, সব মিলিয়ে যেন শ্যাম্পেনের মৃদু নেশা। বঙ্কিম অবাক হয়ে বললে, 'এ আমি কোথায়? কাত্যায়ন আমার নাড়িটা দেখো তো. বেঁচে আছি, না মরে গেছি।'

রিকশাওলা ছেলেটি সিটের একপাশে হেলে, শরীরের একটা কী একপাশে বেশি ঝুলিয়ে বঙ্কিমের দিকে তাকিয়ে ছিল, মৃদু হেসে বললে, 'এটা স্যার বাইরের দেখনাই। ভেতরটা ভীষণ নোংরা। ওই যে দেখছেন মাঠে ছেলেরা খেলছে, আসলে ওরা কিন্তু সব আমার চেয়েও বেশি আওয়ারা।'

'সে কী গো?'

'এ পাড়ার স্যার অনেক কেচ্ছা। এই তো দু'দিন আগে ওই তিন নম্বর বাড়িটায় একটা স্যুইসাইড হয়ে গেল। নতুন বউ গলায় দড়ি দিলে।'

'যাক গে বাবা, সন্ধের মুখে ওসব কথা থাক।' প্রতিমার আপত্তি।

বাঁ পাশের প্রথম বাড়িটার গেটে একটা নোটিশ ঝুলছে, কুকুর হইতে সাবধান। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করলে, 'শিখীর কুকুর আছে?' প্রতিমা বললে, 'না, কুকুর আছে বলে তো শুনিনি।' তা হলে এ বাড়িটা নয়। বঙ্কিম রিকশাচালককে বললে, 'কেসটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে বাড়িতে কুকুর নেই। স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচ্চা। বাচ্চাটি মেয়ে নয়, ছেলে। ভদ্রলোকের নাম শিখী, পুরো নাম জানা নেই। দেখতে গোলগাল, ফরসা, ভুঁড়ি আছে, গোঁফ আছে।'

'গোঁফ নেই।' প্রতিমা সংশোধন করে দিলে।

'আচ্ছা, ভুঁড়ি আছে, গোঁফ নেই। পান খায়, ভাল রবীন্দ্রসংগীত করে। এইবার বের করো খুঁজে। দেখি তোমার কেরামতি।'

'শুনতে পাচ্ছেন?' ছেলেটি তার নিজের কানের একপাশে হাত রেখে গানের শব্দের দিকে বঙ্কিমের কর্ণ আকর্ষণ করল।

'শুনেছি, তবে অত সহজ হবে কি? তা হলে তো এক কথায় পাওয়া হয়ে গেল।'

'দেখাই যাক না।'

ধীরে ধীরে রিকশা এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িটাতেও কুকুর আছে। তৃতীয় বাড়ির বারান্দায় এক বৃদ্ধ বসে আছেন। চোখে ঘষা কাচের চশমা। শিখীর বাড়িতে কোনও বৃদ্ধ নেই। চতুর্থ বাড়িতে মানুষ থাকে বলে মনে হল না। পঞ্চম বাড়িতে নাচের ঘুঙুর। শিখীর বাড়িতে নাচনেওয়ালি কেউ নেই। 'আমার শালি নাচে নাকি?' বঙ্কিম প্রতিমার কাছে জানতে চাইল।

'না, কখনও তো নাচতে দেখিনি।'

'তা হলে এ বাড়িটাও ক্যানসেল।'

হঠাৎ রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এইবার কী হবে। এতক্ষণ তো শব্দ অনুসরণ করে এগোচ্ছিল। সপ্তম বাড়ির গেট খুলে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। বঙ্কিম বললে, 'জিজ্ঞেস করব?'

'কোনও লাভ হবে না স্যার। এরা নিজের ছাড়া অন্যের কিছু জানে না। যেতে দিন।'

ছেলেটি আড়চোখে চেয়ে চলে গেল। সবুজ রঙের ঝকঝকে একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পেছনের আসনে মোটামতো এক মহিলা স্তন বের করে এলিয়ে বসে আছেন। নিজের গাড়িতে বসার পুরুষ ও স্ত্রী-রীতি বঙ্কিম দেখে দেখে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এখন সেও যদি কারুর গাড়িতে বসে লোকে ভাববে তার গাড়ি। প্রথম নিয়ম হল, হাত, পা, সারা শরীর আলগা করে সমুদ্রের বেলাভূমিতে জেলি ফিশের মতো ধেসকে বসতে হবে। বসতে হবে একটু ত্যারছা হয়ে দরজার দিকে কোণ করে, পাছাটাকে দরজার সঙ্গে ঠেসে দিয়ে। একটা হাতের কনুই থাকবে এলবো রেস্টে, হাত দিয়ে ধরা থাকবে চামড়ার পাম রেস্ট। ডান দিক, বাঁ দিকে তাকানো চলবে না। তা হলেই তুমি গোলা মাল, আদেখলে ড্রাইভারের ঘাড় ছুঁয়ে দৃষ্টি চলে যাবে সামনে। জগৎ উলটো দিকে পালাচ্ছে এইটাই আনন্দ। গাড়িতে যতক্ষণ, বাইরের সমস্ত প্রাণী তোমার অপরিচিত, কোনও সম্বন্ধীর সঙ্গে তোমার খাতির নেই। এমনকী তোমার বাবা হেঁটে গেলেও তুমি চিনবে না। মেয়েদের বেলায় নিয়মটা একটু সহজ। সামনে এগিয়ে পিছনে এলিয়ে বসো, নিজের নাভিটা যেন সবসময় নিজের চোখের সামনে ভেসে থাকে, তিন থাক কোমরের মেদের ঢেউয়ের ওপর একটি কুঁড়ি। বুকের কাপড় অবহেলায় সরে যাবে, এ মোহ আভরণ বিদেয় করো। মহিলারা বোকা বোকা উদাস মুখে এদিক ওদিক তাকাতেও পারেন। দ্যাটস অ্যালাউড। গাড়ির সঙ্গে কিছু অনুষঙ্গ চাই। 'কারডল' তো থাকবেই, 'কার স্টিকার' আছেই। ওসব নয়। পেছন দিকের কাচে কিছু ফিকসচার রাখতে হবে, হয় একটা খালি শাড়ির বাক্স, কিংবা একটা দুটো মরসুমি ফল, শশা, আতা, কলা, আপেল, লিচু— আম নয় কিন্তু। বঙ্কিম যদি গাড়ি কেনে, প্রতিমাকে প্রথম দিন পেছনের আসনে বসিয়েই এক টানে বুকের কাপড় সরিয়ে দেবে, লোলে দেখলে, ঘাম চলে, হামারা জেনানা চলে, ভুঁড়ি চলে, মেদ চলে, এলিভেশান চলে।

হঠাৎ রেকর্ডপ্লেয়ার আবার বেজে উঠল। এবার পরিষ্কার রবীন্দ্রসংগীত। গানটা মনে হল মাঝের ব্লকের কোনও বাড়ি থেকে আসছে। বঙ্কিমরা যে রাস্তায় আছে তার পাশের কোনও রাস্তার বাড়ি থেকে সুরটা উঠে সন্ধ্যার আকাশে ঢেউ ভাঙা নদীর বুকে চাঁদের আলোর মতো ঝলমল করে ভেঙে পড়ছে। রিকশাটা বাঁ-হাতি একটা রাস্তায় ঢুকে আবার বাঁদিকে বাঁক নিল। ঠিকই ধরেছে তারা। এই রাস্তারই তৃতীয় বাড়িটা সংগীতের উৎস। আজ গন্ধবিধুর সমীরণে, কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে। পিচরঙের একতলা বাড়ি। বড় বড় টালিকাটা। ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম রঙের গেট। সামনে ছোট্ট বাগান। বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। বাড়ির নাম সংগীতা। বঙ্কিম বললে, 'দেখো, এই বাড়িটা কিনা?' প্রতিমা সারা বাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, 'হতে পারে।' বঙ্কিম নেমে পড়ল। গেটটা খোলাই ছিল। ঠেলতে খুলে গেল। সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা ডানদিকে মোচড় নিয়ে ব্যালকনিতে ঠেকেছে। ক্রেজি মোজাইক মেঝে। কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার এলোমেলো। সেন্টার টেবলে একটা অ্যাশট্রে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। রেকর্ডপ্লেয়ারটা কোনও এক জায়গায় বেজে চলেছে। সুদূর

দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে, আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে, গন্ধ বিধুর সমীরণে।

কলিং বেলের বোতামে আঙুলটা সবে আলতো করে প্রেস করেছে, তখনও চাপ দেয়নি, ডানদিকের ঘরের মেহগনি রঙের ঝকঝকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শিখী। ঠোঁটে একটা রাজামাপের সিগারেট। পরনে পায়জামা সুট। দু'জামাই মুখোমুখি। গাছের ডালে শেষবেলার পাখিদের সমবেত সংগীত। দরজার ফাঁক দিয়ে রেকর্ড সংগীত, আজি আম্র মুকুল সৌগন্ধে, নব-পল্লবমর্মর ছন্দে। শিখীর ফোলা ফোলা মুখের চারপাশে গোলাপি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বঙ্কিম দু'হাত তুলে ভাল্লুকের মতো ভঙ্গি করে বললে, 'আ মাই বিউটিফুল, ইউ হ্যাভ এ ফাইন ম্যাসকুলাইন গোঁফ। দ্যাটস হোয়াই, দ্যাটস হোয়াই।' শিখীকে শিখীর জায়গায় রেখে বঙ্কিম বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চিৎকার করছে, 'প্রতিমা গোঁফ আছে, গোঁফ আছে, ইউ হ্যাভ নট মার্কড ইট।'

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে রিকশাওলার হাতে দিয়ে বঙ্কিম ছেলে আর মেয়েকে নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম?'

'অরুণ।'

অরুণ বুকপকেট হাতড়াচ্ছে খুচরো ফেরত দেবার জন্যে। বঙ্কিম বললে, 'নো রিটার্ন মাই সান, পুরোটাই তোমার পাওনা।' প্রতিমা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে ভেতরে চলে গেছে। খুব হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অরুণ বললে, 'তা কেন, আমার ভাড়া এক টাকা।'

'ভাড়া এক টাকাই। ব্যবহার চার টাকা। তোমার ব্যবহারের দাম অবশ্য চার টাকারও বেশি।'

'এই দেখুন, আপনি স্যার ভীষণ বোকা লোক। একটুতেই গলে যান। পৃথিবীটাকে ভাল করে চেনেননি। জিন্দেগি খচড়া আদমিকা কাম হায় বিলকুল।'

'আমিও খচ্চর। তবে ট্রেনিং-এ আছি মাই সান। জেনুইন খচ্চর হতে সময় নেবে।'

'আপনি কি স্যার ক্রিশ্চান?'

'না না, পিয়োর ব্রাহ্মণ। এরপর তুমি কী করবে?'

'গাড়ি গ্যারেজ করে দোব।'

'নট দ্যাট, নট দ্যাট। আর একটু বড় হয়ে কী করবে?'

'রিকশা চালাব।'

'তারপর?'

'রিকশা চালাব।'

'তারপর?'

'সেই রিকশা চালাব।'

'তারপর?'

'বুকের অসুখ হবে। কাশতে কাশতে মরে যাব।'

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এইরকম একটা ভাব করে. সবল দেহে অনিবার্য মৃত্যুর পাখিকে দানাপানি খাওয়াতে খাওয়াতে অরুণ বাঁ দিকে কাত হয়ে, বাঁ পায়ের প্যাডেলে জোর দিয়ে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর সোজা হয়ে বসে হর্ন বাজাতে বাজাতে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে চলে গেল।

বঙ্কিমের মনে হল, সে যেন তার ছাত্রজীবনের কলেজের স্কটিশ ফাদার হয়ে গেছে। গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলছে সাদা আলখাল্লা। বুকে ঝুলছে ছোট্ট সোনালি ক্রশ। অন্ধকারের ওয়াশে ফেলা দিন শেষের আকাশ। অদৃশ্য একটা গির্জার চূড়ো যেন পশ্চিমের আকাশে ঠেকে আছে। কানে বাজছে সুরেলা চার্চ বেল। এখুনি যেন অর্গানে বেজে উঠবে প্রার্থনার কোরাস। দূরপথের বাঁকে অরুণ এখন বিন্দু। হ্যাপি আর ইউ হু উইপ নাউ মাই সান। ইউ উইল লাফ, ইউ উইল লাফ। গেট খুলে বঙ্কিম

ফিরে আসছে। আলখাল্লা পরে হাঁটলে যেভাবে পা পড়ে সেইভাবে পা ফেলেছে। দি কিংডাম অফ গড ইজ ইয়োর্স। পথের দু'পাশে বড় বড় সাদা আর লাল গোলাপ। ঘাসের ওপর পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। বাট মাই সান, হে অমৃতের পুত্র! অল হু টেক দি সোর্ড উইল ডাই বাই দি সোর্ড। বঙ্কিম হাতটা মুঠো করে এক ধাপ, এক ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠে এল। মাঝে মাঝে জুতোর গোড়ালির তীক্ষ্ণ শব্দে চেতনা চমকে জেগে ওঠে। মনে হয় সদর্পে বেঁচে আছে, জীবনযুদ্ধের বীর যোদ্ধা।

শিখীর বউ, বঙ্কিমের শালি, রুমা বিশাল একটা বোম্বাই খাটে, নীল একটা চাদরে উদর পর্যন্ত চাপা দিয়ে আয়েশ করে শুয়ে আছে। পেটটা গর্ভবতী রমণীর মতো উঁচু হয়ে আছে। মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে। তার ফলে আরও মিষ্টি হয়েছে। বঙ্কিম বললে, 'কী মৃত্যুশয্যায় নাকি!'

'যাঃ সন্ধেবেলা কী সব অলুক্ষনে কথা বলছ!' প্রতিমার আবার লক্ষণ, অলক্ষণ জ্ঞান প্রখর।

'তবে কি ডিম্ববতী?'

রুমা বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসে বলল, 'আই অ্যাম স্টেরিলাইজড স্যার।'

'তবে কি উদুরী?'

আবার অসুখের কথা! প্রতিমা প্রতিবাদ করে উঠল।

'তা হলে হয়েছেটা কী? সন্ধেবেলা যুবতী রমণী পালঙ্কে পপাত, নিম্নাঙ্গ চাদরে, উদর স্ফীত, আমাকে তা হলে দেখতে হচ্ছে চাদরটা সরিয়ে।' বঙ্কিম রুমার পেটের উঁচু মতো জায়গায় হাত রেখেই লাফিয়ে উঠল, 'উঃ গরম। টলটল করছে। বাঃ বেড়ে হয়েছে তো। এবারেও ষাঁড়।' শিখী ঘরে ঢুকছে। চোখেমুখে জল দিয়ে চুল আঁচড়ে এসেছে। বেশ ফরসা দেখাচ্ছে।

শিখী বললে, 'সকাল থেকেই পেটে পেন। হটব্যাগ চাপিয়ে শুয়ে আছে।'

বঙ্কিম বললে, 'আই সি, সুবরে সুবরে।'

'সুবরেটা কী? কোন ভাষা?' রুমা প্রশ্ন করল।

'বাংলা ভাষাই। বাঁকুড়া জেলায় লঙ্কাকে সুবরে বলে। এরা দু'বোনই 'লঙ্কাপাগল'। এদের ওরিজিন বোধহয় শ্রীলঙ্কা।' শিখী একটু হেসে বলে, 'কথাটার দু'রকম মানে হয় কিন্তু।'

'তা হয়।' পাছে বঙ্কিম মানেটাও করে ফেলে এই ভয়ে প্রতিমা হইহই করে উঠল, 'থাক থাক, খুব হয়েছে। ঘরে শিশুরা রয়েছে। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি উচিত হবে না।' বঙ্কিম অন্যদিকে মোড় ফিরল, 'দেন, নো টি. নো স্ন্যাক্স। শুকনো মুখেই কুটুম বিদায়। ভাল কায়দাই করেছ। বুদ্ধিমান লোকের কাছে কত কিছু যে শেখার আছে। প্রতিমা শিখে নাও, ছুটির দিন এবার থেকে পেটে হটব্যাগ চাপিয়ে শুয়ে থাকবে।'

রুমা ধড়মড় করে উঠে বসল। থলথলে হটব্যাগটা একটা আকৃতিহীন জীবন্ত প্রাণীর মতো বিছানার একপাশে ধড়ফড় করে স্থির হয়ে গেল। বঙ্কিম বললে, 'তোমার ভবিষ্যৎ।' খাটের পাশে পা ঝোলাতে ঝোলাতে রুমা বললে, 'তার মানে?'

'মানেটা তোমাকে পরে বলব।' বঙ্কিম টেবিলে রাখা গোলাপের গন্ধ নিল নাক বাড়িয়ে। না তেমন গন্ধ নেই। দেখতেই ভাল। পরমেশ্বরের কথা মনে পড়ল, কলির শেষ প্রভু, কলির শেষ। ফুল গন্ধ হারাবে, খাদ্যবস্তু আস্বাদ হারাবে, নারী নারীত্ব হারাবে, পুরুষেরা স্ত্রীর বশীভূত হবে, মানী অপমানিত হবে, বঙ্কিমের নাকে লাগাম পরিয়ে প্রতিমা পিঠে চড়ে টানবে। বঙ্কিম নিজেকে এক ধমক লাগাল, আবার পরমেশ্বর! এতটা পথ এসেছ মনকে প্রফুল্ল করতে, খাঁচা তো পড়েই আছে, সংসারের চুলোয় কয়লা ঢালার বেলচা তো দেয়ালে ঠেসানোই আছে, ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সব ফিরে পাবে। এখন মিলে যাও, মিশে যাও, ভুলে যাও।

রুমা উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই অসম্ভব ঘন কৃষ্ণ মাথার চুল। তিনটে থাকে ভেঙে পড়ে প্রায় পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করতে চলছে। বঙ্কিম মন্তব্য না করে পারল না, 'কী চুল মাইরি তোমার! তোমার নাম

রুমা না রেখে,' বঙ্কিম কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যে নাম রাখা উচিত ছিল ফিসফিস করে বলল। রুমা বঙ্কিমের হাতটা খামচে ধরল। 'উঃ লাগছে লাগছে।' বঙ্কিমের আর্তনাদে ছেলেমেয়ে অন্য ঘরে ছিল দৌড়ে এল। দু'জনেরই চোখে বিস্ময়। বড়দের আনন্দ পাবার ধরনটা তারা ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। প্লেজার ইন পেন বোঝার বয়েস এখনও ওদের হয়নি। বঙ্কিমের ঊর্ধ্ববাহুর একটা জায়গা লাল টকটকে হয়ে গেল। বঙ্কিম এখন সোহাগ সিঁদুরে হাত বুলোক। রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিমাও বোনকে অনুসরণ করল।'

শিখী বললে, 'বসুন দাদা।' ঘরে বসতে বঙ্কিমের ইচ্ছে করছিল না। ঢোকার সময়েই ভেবেছিল বাইরের বারান্দায় বসবে। বাগান দেখবে। ফুলের গন্ধ নেবে। সন্ধ্যার স্বাধীন হাওয়া গায়ে মাখবে। যদিও বসন্ত নয় তবু মনে হচ্ছিল বসন্তকাল। বঙ্কিম বলল, 'চলো বাইরে গিয়ে বসি।' দু'জনে বাইরে এল। 'আলোটা আর জ্বেলো না, অন্ধকারই ভাল।' দু'জনে দুটো চেয়ার দখল করে বাগানের দিকে মুখ করে বসল। খুব বাতাস। এত বাতাস যে, আকাশের তারারা যেন প্রদীপের শিখার মতো মিটমিট করে কাঁপছে। শিখী সিগারেট বের করতে করতে বলল, 'আপনার তো আবার চলে না?' 'তুমি খাও, আমি তামাকের গন্ধে অতীতে চলে যাই,' বঙ্কিম একটু আলগা হয়ে বসল, টেনশান একটু রিলিজ করতে পারলে মন্দ হয় না। শিখী গ্যাস লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। অন্ধকার যেন চমকে উঠল।

'তোমার ছেলেকে দেখছি না। শুভো কোথায়?'

'এই তো এবার ফিরবে। বেড়াতে গেছে। সময় হয়েছে ফেরার।'

'ক'বছর হল এখানে এসেছ?'

'বছর তিনেক হবে।'

'বেশ জায়গাটা! অসম্ভব সুখে আছ, দেখেই বোঝা যায়। নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি, বেশ জট ছড়ানো শ্যাম্পু করা চুলের মতো ফুরফুরে।'

শিখী একটু শব্দ করে হাসল। বঙ্কিম একটু অবাক হল। ভেবেছিল শিখী বলবে, খুব ভাল আছে। কিংবা হাসিটা এমনই সাবলীল হবে যাতে সুখ যেন সাদা খইয়ের মতো ফেটে ফেটে পড়বে। প্রচণ্ড অশান্তির দিনে বঙ্কিম বহুবার ভেবেছে প্রতিমাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতবে। সরকারি ফ্ল্যাটে, স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে। সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। বহুধারা নয় একটা ধারা নিয়েই নদী চলে যাবে মোহনার দিকে। দরকার নেই তার বাগানবাড়ির, প্রয়োজন নেই তার ত্যাগের, নির্ভরতার, কর্তব্যের প্রশংসার। নিন্দের বোঝা কাঁধে নিয়েই সে জীবনের রশি টেনে যাবে, টো লাইফস সিলভার লাইন। যেমন টানছে শিখী। যেমন টানছে আরও অনেকে। শিখীর কাছে আজ সে সমর্থনই খুঁজতে এসেছিল। মনের জোর ধার করতে এসেছিল ক্লান্ত বঙ্কিম, ইয়ারকি করতে আসেনি। অন্ধকারে ধোঁয়া উড়ছে। গাছের পাতায় মাথার চুলে বাতাস খেলা করছে। শিখী বললে, সুখ আসলে মনেরই একটা অবস্থা। কীসে যে সুখ আর কীসে যে দুঃখ আজও ভাল করে বোঝা হল না। জীবন যেন একটা নেশা। কিছু একটা ধরে থাকতে পারলে মানে খুঁজে পাওয়া যায়, তা না হলেই সব মিনিংলেস।

'তুমি কী ধরেছ শিখী?'

'আমি তো প্রথমে অনেক কিছুই ধরার চেষ্টা করেছি, এখন ধরেছি শূন্যতা, ভ্যাকুয়াম। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মাঝরাতে দার্জিলিঙের কোনও রাস্তা দিয়ে একলা হেঁটে চলেছি। চারিদিকে কুয়াশা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে। পথ আছে, হাঁটা আছে বলেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি।'

'তোমার কেন এমন হবে? ভাল চাকরি, ছোট্ট সংসার, দায়দায়িত্ব কম, তুমি নিজে হাসিখুশি, তোমার আবার ভয়টা কী?'

'বঙ্কিমদা, থিয়োরেটিক্যালি আমার সুখে থাকাই উচিত, কিন্তু জীবন কখনও থিয়োরি মেনে চলে

না। মানুষের অবলম্বন যখন একটা হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই একের নড়াচড়া, ওঠা বসা, ভাব ভাবনার ওপর মানুষ বড় বেশি ডিপেনডেন্ট হয়ে পড়ে, সেই অধীনতা বড় সাংঘাতিক। জীবনের সঙ্গে লড়াইটা তখন ডুয়েলের মতো। পালাবার কোনও পথ নেই। লড়ে জেতো, না হয় মরো।'

বঙ্কিম একটু অস্বস্তি বোধ করল। সে হয়তো অসাবধানে শিখীর কোনও বেদনার স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াতে এলে কেউ কারুর পারিবারিক জীবনের গভীরে ঢুকতে চায় না, ঢোকাটা শোভনও নয়। জীবনেরও বারমহল, অন্দরমহল আছে। তবু মানুষ তো! একটু মিলিয়ে নিতে চায়। সকলেরই হাতে জিগস পাজলের এক-এক অংশ। পাশাপাশি ফেলে দেখা, যদি মিলে যায়, সমস্যার সমাধান। বেড়াতে এসে লোকে পরচর্চা কিংবা ঐশ্বর্যচর্চাই করে। উভয়েরই পরিচিত এমন তৃতীয় বিষয় হল শ্বশুরবাড়ি। একই পরিবারের প্রোডাক্ট দু'জনের দখলে। বঙ্কিম আলোচনাটাকে হালকা করার জন্যে শ্বশুরবাড়ির পথেই পা বাড়াল।

'বুঝলে শিখী, তোমার বউয়ের বোনের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল মাইরি। কী যে সব স্যামপল! শ্বশুরমশাই নিজে ডিফেন্সে কাজ করতেন তো, প্রোডাকশানও সেই কারণে গানপাউডার। আসলে জানো পশ্চিমবাংলার ক্লাইমেটে এদের রাখা উচিত নয়। সারা বছর কুলু কিংবা মানালিতে রাখলে মাথাটা হয়তো ঠান্ডা থাকত।'

শিখী আনমনে হুঁ হুঁ করে একটু হাসল। বারকতক জোরে জোরে সিগারেট টানল। মনের উত্তেজনার মতো আগুন জ্বলছে নিভছে। শিখীর দিক থেকে কোনও মন্তব্যই এল না দেখে বঙ্কিম একটু অবাক হল। এমন একটা আলাপী মিশুক ছেলে আজ কেন এত অফ মুডে! পৃথিবীতে কি একটা গোলমালের ঋতু চলেছে? সকলেরই মনে গুমোট বদ্ধ বাতাস। বঙ্কিম একটু অস্বস্তি বোধ করল। এমন সময় প্রতিমা এল। হাতে ট্রে। দু'গেলাস চা, দুটো প্লেটে খাবার কিছু মিষ্টি, চানাচুর, কাজু।

বঙ্কিম বললে, 'এ গেলাসে কি চা মানায়। এই স্ন্যাকসের সঙ্গে দু'গেলাস বরফের টুকরো ভাসা লাল পানীয় হলেই ঠিক জমত। কী বলো শিখী?'

শিখী নিঃশব্দে একটা গেলাস তুলে নিল। শব্দ করে একটা চুমুক দিল। তারপর প্রতিমাকে বললে, 'দিদি আমার ডিশটা নিয়ে যান। এই সময় আমি কিছু খাই না।'

'আমার অনারে তোমার নিয়ম ভঙ্গ করো।' বঙ্কিম অনুরোধ করল। প্রতিমা আলো জ্বালাতে চাইছিল। বঙ্কিম বললে, 'যা আলো আছে তাতে স্পষ্ট না হলেও সব কিছু দেখা যাচ্ছে। কেন আর চোখকে পীড়া দেবে।' শিখী বঙ্কিমের অনুরোধে ডিশ থেকে কয়েকটা কাজু তুলে নিল। বঙ্কিম বললে, 'চা তুমি নিয়ে এলে? রুমা কী করছে?'

'বাঃ রুমা অসুস্থ না। সে করে দিলে আমি নিয়ে এলুম। যাই আমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' প্রতিমা চলে যেতেই, বঙ্কিম শিখীকে জিজ্ঞেস করল: 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? আজ এত অফমুড কেন?'

শিখী বললে, 'আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছি না। দুটো ডিফারেন্ট নেচারের অ্যানিম্যাল পাশাপাশি থাকলে যা হয়। সংসারটা একটা 'গাববা হাউস' হয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'দুটো ডিফারেন্ট টেস্ট, ডিফারেন্ট নেচারের লড়াই। কোনও কমপ্রোমাইজ নেই কোনও পক্ষের সাবমিশন নেই। দুটো শক্ত পাথরে মাথা কপাল ঠোকাঠুকি করে চলেছে। এ বলছে, ইউ সাবমিট। ও বলছে ইউ সাবমিট। পুরো ব্যাপারটাই এখন এ, ঐ, ও ঔ। বর্ণমালার প্রথম পাঠ। প্রাথমিক ধরনের জীবনের প্রকৃতিগত সমস্যা।'

'ধুর ওটা কোনও সমস্যাই নয়। সমাধানের ফর্মুলা তো দু'পক্ষের হাতে। এর মধ্যে তৃতীয় কোনও পক্ষ থাকলে ব্যাপারটা ঘোরালো হত। যেমন আমার কেসে হয়েছে।'

'আপনি ঠিক বুঝবেন না দাদা, টারবুল্যান্ট ওয়াইফ নিয়ে ঘর করার কী জ্বালা। সবসময় কনফ্লিক্ট। সবসময় নন-কো-অপারেশান। সাফার করছে ছেলেটা। এ এক ধরনের স্যাবোতাজ। ডালে বসে ডাল কাটা। এর ফলেই যত ডিভোর্স, যত সুইসাইড। এই শকথেরাপির ফলে আমার মধ্যে ক্রমশই একটা ক্রিমিন্যাল নেচার মাথা তুলছে। সেলফ ডেসট্রাকশানের ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। ওয়ান ডে আই উইল কমিট এ মার্ডার, ওয়ান ডে আই উইল কমিট এ রেপ, স্টিল এ পার্স। ক্রমশই আমি আন্ডার ওয়ার্লডের দিকে ছুটছি। আমি নৌকো পুড়িয়ে সংসার করতে নেমেছি। একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, আমার পালের বাতাস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাট অফ মাই সেল, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়। শুধু দাবি নিয়ে কি ব্ল্যাকমেল করে বাঁচা যায় দাদা?'

'না শিখী, তুমি প্রকৃতই আজ উত্তেজিত। দু'জনেই সমান ডিসটার্বড। কিন্তু দুটো মন দুটো রাস্তায় চলেছে। আমার মধ্যে বিষণ্নতা, তোমার মধ্যে বিদ্রোহ। সো লেট আস হ্যাভ সাম মিউজিক। দুটো বিক্ষুব্ধ মনকেই সংগীতের রসে চোবাই চলো।'

'একটা কথা আপনাকে বলে রাখি দাদা, আমার অন্তরের কথা, জগতে মা বাবার চেয়ে আপনার কেউ হবে না। দে আর ফুলস হু লিভ দেম ফর এ ওয়াইফ। ওয়াইভস আর হোরস। ওম্যানস লিব মানে কি অসভ্যতা, অশালীনতা, আদর্শবিমুখতা, কর্তব্যহীনতা, মূর্খতা, একগুঁয়েমি! দেন হেল উইথ ইট। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে নারী মুক্তি আন্দোলন। সেটা কত সাল হবে? সতেরো শো বিরানব্বই-টব্বই, ম্যারি উলসটোন ক্র্যাফট এগিয়ে এলেন ভিনডিকেশান অফ দি রাইটস অফ উওম্যান নিয়ে, জন স্টুয়ার্ট মিল এলেন সাবজেকশান অফ ওমেন নিয়ে, নেতারা নিয়ে এলেন গোটাকতক বিশ্বযুদ্ধ, আধুনিক ডাক্তাররা অ্যালুফয়েলে মুড়ে দিলেন কন্ট্রাসেপটিভ আর আমার আপনার বউ ডিসেক্সড হয়ে, মাতৃত্বকে খানার জলে ফেলে, সংসারে আগুন দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল, শিখীকো নেই চলেগা, বঙ্কিমকো বাতিল করো। ভাই সব চলো হিন্দি সিনেমায় বসে মহব্বত শিখি।'

একসঙ্গে অনেক কথা বলে শিখী একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলতে গেল। অন্ধকারে বোধহয় ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। পায়ের চেটোর খোঁচায় সেন্টার টেবলের একটা দিক একটু উঁচু হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গেলাস কাত হয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। কাচ ভাঙার শব্দে অন্ধকার যেন খানখান হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি কোনও বাড়িতে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল। শিখী যেন গেলাস ভেঙে আরতি শুরু করিয়ে দিল।

বঙ্কিম সাবধানে মেঝেতে পা ফেলে উঠে দাঁড়াল। দেখা না গেলেও বোঝা যায় পাতলা গেলাসের ফিনকি কাচ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। জুতোর চাপে খোলামকুচি ভাঙার মতো শব্দ হল। বঙ্কিম সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। একগাদা পিয়ানো সুইচ। প্রথমটায় কোনও কাজ হল না। দ্বিতীয়টায় বাগানের একটা আলো জ্বলল। তৃতীয়টায় ফিনফিন করে ছোট ব্লেডের পাখা ঘুরল। চতুর্থটায় কিছু হল না। বঙ্কিম খুব বিব্রত হল। শিখীও গুম হয়ে বসে আছে গেলাস ভেঙে। নারী জাতির কেলেঙ্কারিতে সে মর্মাহত। বেচারা বিয়ে করে, আলাদা সংসার পেতে, বাপ মাকে ছেড়ে এসে, পুরনো জীবনের শোকে একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে, পায়ের তলায় শান্তির কাচের গেলাস ভেঙে চুরমার। বঙ্কিম আবার গোড়া থেকে শুরু করল আলো জ্বালাবার প্রয়াস। সব ক'টা সুইচের টেঁকিকলই দ্রুত হাতে নামিয়ে গেল। তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বারান্দার ফ্লোরেসেন্ট আলো জ্বলে উঠল। ওঃ হরি ফ্লোরেসেন্ট! সুইচ টিপে যতটা ধৈর্য ধরা উচিত ছিল প্রথমবার বঙ্কিম ততটা ধৈর্য ধরতে পারেনি। প্রথম সুইচটাই বারান্দার। বাকিগুলো বঙ্কিম অফ করে দিল। সংসারী মানুষের অত উতলা হলে চলে না বন্ধু, একটু ধৈর্যশীল হতে হয় বুঝেছ মানিক, সুইচ যেন বঙ্কিমকে সেই উপদেশই দিল।

সংসারে গোটাকতক কাজ আছে যা নিঃশব্দে করা যায় না; যেমন এক, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ, কি

স্ত্রীকে প্রহার। দুই, কাচের গেলাস ভাঙা। তিন, মাতাল হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফেরা। চার, পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা। পাঁচ, স্ত্রীর অলংকার কি অর্থ হরণ। ছয়, সন্তানের জন্ম। সাত নম্বরটা আর ভাবা হল না। বারান্দায় তখন একটা ছোটখাটো ক্রাউড। প্রতিমা ছেলেমেয়েকে সামলাচ্ছে— 'আহা হাহা যাসনি, যাসনি, কাচ কাচ।' রুমা সামলাচ্ছে তার ছেলেকে। সে সবে বেড়িয়ে ফিরেছে। বারান্দায় উঠে আসতে চাইছে শিশুর অধৈর্যে। আসিসনি, আসিসনি। কাচ কাচ। এক পা আর এগিয়েছ কী কান ধরে দুই থাপ্পড় দেব। শুভোর খুব মজা। সে একবার করে বারান্দায় পা রাখছে। আর তার গর্ভধারিণী তিড়বিড় করে উঠছে। শিখীর খালি পা, সে বেচারা সাহস করে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। বি ব্রেভ মাই সান। বিয়ে করেছ সাহস করে অথচ আগুন কি কাচের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সাহস নেই। বেটা তু হো গাজনকা সন্ন্যাসী। তোর ভায়রা বঙ্কিমকে দেখ।

এক বসন্ত সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা তিথিতে তোমার স্ত্রীর বোন একটা এক সেরি কাচের গেলাস আমাকে ছুড়ে মেরেছিল। হাতের নিশানা ঠিকমতো হয়নি। কারণ উত্তেজিত শিকারির পক্ষে ব্যাঘ্র শিকার সম্ভব হয় না। তাই শের বঙ্কিম আজ তোমার সামনে, পরপারের পান মশলা নয়, তাই প্রতিমা এখনও সংসার গারদে, জেল হাজতে নয়।

বঙ্কিম দেখল ভিড়ের মধ্যে কোনও মূর্খ নেই। সকলেই এঞ্জেল। কেউই কাচ ভূমিতে বিচরণে সাহসী হচ্ছে না। রুমা কটমট করে তাকিয়ে আছে শিখীর দিকে। প্রতিমা তাকিয়ে আছে বঙ্কিমের দিকে। দু'জনেরই ধারণা, অপকর্মের নায়ক স্বামীরাই, কারণ স্ত্রীদের চোখে পৃথিবীর অপদার্থতম মাল হল স্বামী। স্ত্রীদের কিচেনগার্ডেনে স্বামীরা সব পোকাধরা ঢ্যাড়শ। বঙ্কিম আবার চেয়ারে বসে পড়ল। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে পুরোটাই মুখে ফেলে দিল। বাঃ ভারী সুন্দর, নাও একটা খাও সন্দেশ। জিভে জড়ানো গলায় তারিফ করে প্লেটটা এগিয়ে দিল শিখীর দিকে। বঙ্কিমের ব্যাপার দেখে প্রতিমা আর থাকতে পারল না— 'তখনই বলেছিলুম আলোটা জ্বেলে দিই। অন্ধকারে ভূতের মতো বসে প্রকৃতি দেখা হচ্ছে! তোমার আর কী, যার গেল তার গেল।'

বঙ্কিম বললে, 'ছি ছি বেচারা একটা গেলাস অসাবধানে ভেঙে ফেলেছে। এভাবে লজ্জা দিতে আছে! বরং কাচগুলো হাত পা না কেটে তোলার ব্যবস্থা করো। মেঝেটা মুছে নাও, দাগ লেগে যাচ্ছে। জানো না, জীবন আর গেলাস দুটোই ক্ষণভঙ্গুর, চিরকালের ব্যাপার নয়। একমাত্র আত্মা আর স্ত্রীজাতির অভিমানই অবিনশ্বর।'

রুমা হঠাৎ গর্জন করে উঠল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ গণেশের মা। এটা কি যাত্রা, না সিনেমা। সারারাত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? সাবধানে আগে পরিষ্কার করে নাও। শুভো চুপ করে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'এবং একটু করে কড়াপাক ভেঙে ভেঙে মুখে ফেলো, তা না হলে তোমার চাঞ্চল্যে সংসার চঞ্চল হয়ে উঠবে মাই বিলাভেড।' বঙ্কিম একটা কড়াপাক শুভোর দিকে এগিয়ে দিল।

গণেশের মা মধ্যবয়সি মহিলা, একটু খতমত খেয়ে সাবধানে ওপরে উঠে এল। পেট কাপড়ে কী একটা জিনিস লুকোবার চেষ্টা করছে। রুমা ঠিক লক্ষ করেছে, 'ওটা কী? কী লুকোচ্ছ ওখানে?'

'না কিছু না।' গণেশের মা পালাবার চেষ্টা করছিল। যাবে কোথায়? দরজা জ্যাম করে দুই বোন।

'দেখি ওটা কী?' পেট কাপড় থেকে হাত বেরোল। নিখুঁত একটি সোডার বোতল।

'আবার, আবার সেই জিনিস!' রুমা আর প্রতিমা দু'জনেই প্রায় একই কণ্ঠস্বরের অধিকারী। যেন সোডার বোতলটাই ফেটে গেল। আরতির কাঁসর ঘণ্টাও ঠিক তখনই ক্লাইম্যাক্সে উঠল, কাঁই নানা, কেঁই নানা, কাঁই, কাঁই। ছো মেরে রুমা বোতলটা কেড়ে নিল। ভেতরে তরল পদার্থ একটা ঝাঁকানি খেয়ে বোতলের গলার কাছে বুজবুজ করে উঠল। বঙ্কিম কাছাকাছি বসে ছিল। তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বলল, 'সাবধান রুমা, ফাটলে রক্ষা নেই। বোমার চেয়ে মারাত্মক। এ তোমার স্বামী নয় যে ফাটলে শুধু কথাই বেরোবে।'

বঙ্কিমের কথা রুমার কানে গেছে বলে মনে হল না। বোতলটা এক হাতে ধরে সাপুড়ে যেভাবে সাপের দিকে তাকিয়ে থাকে সেইভাবে একদৃষ্টে শিখীর দিকে তাকিয়ে রইল। বঙ্কিম আর একটা সন্দেশ মুখে পুরল। আবতি থেমে যাওয়ায় চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রুমা আর শিখী ফেস টু ফেস। মাঝখানে ছোট্ট একটা সোডার বোতল। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের স্টার্টারটা কেবল চিনচিন করে শব্দ করছে। পাতা কাঁপানো দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা উড়ে যাচ্ছে। বঙ্কিম হঠাৎ ভালমানুষের মতো বলল, 'হাইপার অ্যাসিডিটি বুঝি। তা সোডা কেন? যে-কোনও অ্যান্টাসিড খেলেই তো হয়।'

শিখী এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করল। কামানের গোলার মতো তার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল, 'বেশ কবব। বেশ করব খাব, কার বাবার কী?'

'আমাকে বলছ?' বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল।

'কার বাবার কী আমি যদি খাই? আমি যদি খাই কার বাবার কী? কার বাবা.. ।'

শিখীর শব্দের পারমুটেশান কম্বিনেশান বঙ্কিম থামিয়ে দিল। কার বাবাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

'না না তুমি খাও না, ক্ষতি কী? একদিন একটা সোডা খেলে কার বাবা কী করতে পারে?'

'তোমার লজ্জা নেই, শরম নেই, বেশরম, কামিনে।' বঙ্কিম আড়ষ্ট হয়ে ছিল, ভেবেছিল রুমা আর একটু এগিয়ে কুত্তে বলে ডায়ালগটা কমপ্লিট করবে। না, খুব চেক করে নিয়েছে। বঙ্কিমেরও তখন হিন্দি এসে গেছে। মনে হচ্ছে হিন্দি ছবির সেটে বসে আছে। প্রোডিউসার ডিরেক্টার রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টারিং শিখী, বঙ্কিম, প্রতিমা, গণেশেব মা। বঙ্কিম বললে, 'শরমাতি কিঁউ ভায়বাভাই, বোলো ইয়ার জিন্দেগি অওর মৌত সে সোডে কো বাচ্চে কো এতনা কাহে ডরতা হো!'

'না নেই। লজ্জাশরম আজকাল মেয়েদের আছে যে পুরুষদের থাকবে! নেই। আমার লজ্জা নেই। নেই। আমার শরম নেই—' শিখী উঠে দাঁড়িয়ে একটু ধিতিং ধিতিং করে নাচার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। বঙ্কিম সাবধান করে দিলে, 'কাচ পড়ে আছে মাই হিরো। ইনজিয়োর্ড হলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। নো অ্যাকশান প্লিজ। স্টার্ট সাউন্ড, স্টার্ট ক্যামেরা।' বঙ্কিমের নির্দেশ মেনে শিখী ধপাস করে বসে পড়ল। শিখী বললে, 'আমাব পয়সায় আমি বিষ খাব। সো হোয়াট! সো হোয়াট!'

'খেতে হয় বাড়িব বাইরে গিয়ে খাবে, এখানে নয়, এখানে নয়, এখানে নয়। এটা সংসার।'

'এইখানেই, এইখানেই, হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার।' শিখী সেন্টার টেবলে হঠাৎ একটা ঘুষি মেরে বসার মতো বোকামি করবে বঙ্কিম বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় গেলাসটা তারের টেবল থেকে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। বঙ্কিম ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করেছিল, মিস করল। রুমার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললে, 'ভেরি ব্যাড ফিলডিং পরের টেস্টে বসিয়ে দেবে।'

'সাহস থাকে খেয়ে দেখো? এই আমার লাস্ট ওয়ার্নিং।'

'তোমার ওয়ার্নিং শিখী ভয় করবে। শিখী হল বাপকো বেটা।'

'আমিও বাপকো বেটি।' রুমা ধাঁ করে বোতলটা বাগানের দিকে ছুড়ে দিল। ব্ল্যাম করে শব্দ হল। কয়েকটা বড় কাচের টুকরো ছিটকে গিয়ে গ্যারেজের টিনের চালে গ্রিলের গেটে গিয়ে লাগল। বঙ্কিম হাত তুলে বলল, 'কাট, কাট।' বঙ্কিমের মুখটা হঠাৎ খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। এতক্ষণ সে রসিকতা করছিল। আর রসিকতা নয়। হতে পারে সে এদের কেউ নয়। ঘণ্টাখানেকের অতিথি। তবু তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে ঘটনার সমালোচনা হওয়া উচিত। আচ্ছন্নবুদ্ধি হয়ে দম্পতি শিশুর মতো ভবিষ্যতের নরম পুতুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঠের গুঁড়ো বের করছে। দুটো অহংকার। বিশাল দুটো দৈত্যের মতো লড়াই করছে পায়ের তলায়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে একটি শিশু। রিকশাওলা অরুণ ঠিকই বলেছিল, ওই যে যারা মাঠে খেলছে তারা আমার চেয়ে বেশি আওয়ারা। বঙ্কিম প্রতিমাকে বলল, 'জুতো পায়ে দিয়ে শুভোকে ঘরে তুলে আনো। ছোটদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। তোমরা দু'জনে এখানে এসে বসো। গণেশের মাকে বলো আমরা চলে গেলে কাচ পরিষ্কার করবে।'

‘শোনো শিখী!’

‘নো অ্যাডভাইস প্লিজ। আমাদের তরফ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!’

‘ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ লাইফ। আমরা দু’জনেই এক নৌকোর যাত্রী। আমরা সকলেই এক পালকের পাখি। তোমাকে উপদেশ দেবার মতো জ্ঞান বা বুদ্ধি কোনওটাই আমার নেই। আমি নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজছি ব্রাদার।’

‘এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে কোনও একটা পক্ষকে সরে যেতে হবে অ্যান্ড আই উইল লিভ। যতক্ষণ দাঁত থাকে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।’

‘পোকালাগা দাঁতের মর্যাদা সবাই বোঝে। আমরা সেই ইনফেক্টেড টুথ। তোমরা এইমাত্র যা করলে, ইজ দিস অ্যাডাল্ট বিহেভিয়ার?’

‘কে কার মতে চলবে? আমি স্বামী না ও স্বামী? ওর খবরদারিতে আমাকে চলতে হবে কেন? আমার স্বাধীনতা নেই, আমি কি ক্রীতদাস?’

‘ডেফিনিটলি নট। কিন্তু স্বাধীনতা মানে আত্মহনন নয় ব্রাদার, নট সেলফ ডেসট্রাকশান। রুমাকে তুমি বোঝার চেষ্টা করেছ? তোমার ব্যবহার তো ফিউডাল লর্ডের মতো।’

‘রুমা আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছে?’

‘কেউই করোনি. তোমাদের দু’জনেরই ক্লোজড মাইন্ড। রুমা কোথায় প্রতিমা?’

‘আসতে চাইছে না।’

বঙ্কিম রুমাকে ধরে আনার জন্যে ঘরে গেল। ঘরে রুমা নেই। বিছানার ওপর চাদরটা পড়ে আছে। একপাশে থলথলে হট ব্যাগ। পাখাটা শুধু শুধু ফন ফন করে ঘুরছে। বঙ্কিম সুইচ খুঁজে পাখাটা বন্ধ করল। যারা সুইচ অন করে তারা অফ করতে জানে না কেন! অন আর অফের দায়িত্বটা যদি এক হাতে থাকত পৃথিবীর অনেক অশান্তি কমে যেত। কোথায় রুমা? গণেশের মা বললে. ‘দিদিমণি ছাদে।’ ডাইনিং স্পেসের একপাশে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। বাঁকের কাছে একটা খাঁচা ঝুলছে। একটা চন্দনা ঘাড়ে মুখ গুঁজে বসে আছে।

ছাদের আলসেতে হাত রেখে রুমা দাঁড়িয়ে আছে নায়িকার মতো। পুব আকাশে বেশি রাতের অসম্পূর্ণ চাঁদ। একটা মেঘের খাপছাড়া ফালি। বিশাল জলাধারের অ্যালুমিনিয়াম রং করা লোহার টাওয়ার চাঁদের আলো ধরে চকচক করছে। দূর মাঠে একটা নিখুঁত গাছের তলায় প্রেতাত্মার মতো সাদা সাদা কিছু জামাকাপড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহুদূর থেকে তিরতির করে একটা শব্দ ভেসে আসছে। কোনও রাতজাগা পাখি। বঙ্কিম আস্তে আস্তে রুমার পিঠে হাত রাখতেই চমকে ফিরে তাকাল। মুখটা চাঁদের আলোর দিকে। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। বঙ্কিমের মনে হল লোহার গরাদ ধরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে মুক্তির কামনা নিয়ে। বঙ্কিম বললে, ভণিতা না করেই. ‘ছেলেমানুষি করছ রুমা? জানো, এই মুহূর্তে আমি তোমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, করুণ বিষণ্ণ মুখে তোমাদের সীমানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি তোমার দাদার মতো. তোমাদের এই ছেলেমানুষি অর্থহীন।’

রুমা বঙ্কিমের বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল। গা বেশ গরম। জ্বর হয়েছে বোধহয়। একটা হাত পিঠের কাছে এনে বঙ্কিম আলতো চাপ দিল। রুমার বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেল বঙ্কিম তার শ্বশুরমশাইকে বলেছিল. ‘এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবেন? আর একটু লেখাপড়া করুক না। এখন তো বয়েস আছে।’ রুমার বাবা তখন শোনেননি। বলেছিলেন, ‘মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দায়টা উদ্ধার করে নিশ্চিন্তে চলে যাই। ছেলে খুবই ভাল। বয়েসটা না হয় একটু বেশি।’ রুমার বোধহয় একটু আপত্তি ছিল। ছাদের আলসের কাছে সরে এসে বঙ্কিম বললে. ‘সামান্য একটা ব্যাপারকে অসামান্য করে তুলছ। সুখটাকে কত সহজেই অসুখ করে তুলছ। এটা কি একটা ঝগড়া করার মতো ইসু!’

রুমা ফুঁপিয়ে উঠল, ‘আপনি জানেন না, দিনের পর দিন আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না।’

'কী সহ্য করেছ? দারিদ্র্য, অবহেলা, নির্যাতন, বঞ্চনা?'

'টাকাটাই সব নয় বঙ্কিমদা। ব্যবহারেরও মূল্য আছে।'

'তোমার ব্যবহার তো নিজে চোখে দেখলুম।'

'গভীর রাতে ওর ব্যবহারটা চারদেয়ালে চাপা থাকে। সে তাণ্ডব আমি দেখি, দেখে আমার আয়না।'

'সে তো আসল শিখী নয়। সে তো তখন ধার করা স্পিরিট। তুমি আসলে নকলে গুলিয়ে ফেলছ।'

'বাঃ চোখের সামনে দেখছি দিনের পর দিন নতুন একটা মানুষ জন্ম নিচ্ছে, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। দিনের পর দিন আসল মানুষটা হারিয়ে যাচ্ছে। আমি কি নকলের কারবার করতে এসেছিলুম?'

'তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ, শিখী খানদানি বড়লোকের ছেলে। তার কিছু নিজস্ব সংস্কার আছে, জীবন দর্শন আছে। সে যেটাকে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত তুমি সেটাকে অস্বাভাবিক ভেবে খড়্গহস্ত! সুখ সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে তুমি তোমার মধ্যবিত্তের ধারণা নিয়ে একটা তৈরি জিনিসকে করে তৈরি করতে চাইছ। এতে তৈরি হবে না, ভাঙবে, মূর্তিটা চুরমার হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে যে জিনিসটা জলের তলায় তলিয়ে ছিল সেইটাই ওপরে ভেসে উঠছে। ক্ষতি হচ্ছে ছেলেটার। সংসার মন্থন করলে অনেক অশান্তিই বেরিয়ে আসবে রুমা। সংসারী মানুষকে চাপা দেবার কৌশলটাও শিখতে হবে।'

'যে জিনিস আমার মনের মতো নয় আমি তাকে ত্যাগ করব।'

'তারপর!'

'সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'তারপর!'

'যেমন করে পারি ছেলেটাকে মানুষ করব।'

'কী করে?'

'যা হয় একটা চাকরি করব।'

'পাবে?'

'না পাই বাসন মাজব, রান্না করব।'

'পারবে?'

'খুব পারব।'

'রাগে মানুষ মোটা লোহার শিক বেঁকাতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় পারে না। সারাজীবন জেদ, গোঁ কিছুই বজায় রাখা যায় না। স্বাভাবিকটাই অবস্থা, অস্বাভাবিকটা সাময়িক। রুমা, তুমি এখন ছেলেমানুষ। জীবন নিয়ে উপন্যাস হতে পারে, তা বলে উপন্যাসটা জীবন নয়। নীচে চলো। এইভাবে সব কিছুকে কোনও কিছু করে ফেলো না। সুখের সমস্ত মালমশলা নিয়ে দুঃখের বিলাসী নাই-বা হলে।'

'আমি যাব না। আমি তিল তিল করে ওকে মারব।'

'লাভ?'

'প্রতিশোধ।'

'কীসের প্রতিশোধ?'

'আমার জীবনটাকে নষ্ট করার প্রতিশোধ।'

'শিখী যদি সেই একই কথা বলে? সে যদি বলে তোমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি। শুধু দাবির ফর্দটাই তুমি তার নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়েছ। প্রথম থেকেই সরতে সরতে ব্যবধানটাই বাড়িয়ে তুলেছ। সংসার মানে কি দাবি আর পূরণের চুলচেরা হিসেব! সংসার মানে কি সামনে ছোরা

রেখে দুই ডাকাতের লুটের মালের ভাগ বাঁটোয়ারা! তোমার মাকে দেখোনি! আমার মাকে দেখিনি!'

'মা-দের যুগ শেষ বঙ্কিমদা। মেয়েদের পড়ে পড়ে মার খাবার দিন শেষ। এখন হল আয়নায় মুখ দেখা। তুমি যেমনটি দেখাবে তেমনি দেখবে।'

'তা হলে সারাজীবন প্রাণখুলে ভেংচিই কেটে যাও। ভ্যাংচা ভেংচি চলুক। দেখো তাইতেই যদি মোক্ষ লাভ হয়। অহংকারেরই সেবা করে যাও। স্বামী-পুত্র সংসার এগুলো সব ফালতু। শুধু লড়ে যাও। স্নেহ দিয়ে কিছু আদায়ের ব্যবস্থাটাই বাতিল। কলার চেপে ধরে কেড়ে নাও। আজীবন খণ্ড যুদ্ধ চলুক।'

'আপনি শুধু ছেলেদের দিকটাই দেখছেন, কারণ আপনি ছেলে। মেয়েদের দিকটা মেয়েদেরই দেখতে হবে।'

'তাই দেখো। আসল সমস্যা যখন থাকে না তখন নকল সমস্যাই তৈরি রাখতে হবে। তা না হলে আগুনটা জ্বলবে কীসে! জীবনটা পুড়বে কীসে! ঠিক আছে নীচে নামলে তোমাদের সমস্যার হয়তো কোনও সমাধান পাওয়া যেত। নামবে না যখন তখন আমরা চলি।'

বঙ্কিম সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সমস্ত চরিত্রই যেন টেম্পার করা স্টিল। ভাঙবে তবু মচকাবে না। কেউই শিশু নয়। সকলেরই বোধ বুদ্ধি আছে। ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই হয়েছে। জেনেশুনে বিষ পান করলে কে কী করতে পারে। আকাশ যদি মেঘে ঢেকে আসে বর্ষণ কে আটকাবে! তবু সংসারে প্রাচীন মানুষ দু'-একজন থাকলে হয়তো একটা বাঁধন থাকে। ফেটে যেতে পারে, কিন্তু খুলে পড়ে যায় না। আলসের ওপর হাত রেখে রুমা দাঁড়িয়ে রইল এলোচুলে। মনে হল যেন অমঙ্গলের ছবি। শক্তি আলুলায়িত। দূব মাঠে দাঁড়িয়ে নিয়তি ডাকছে, আয় চলে আয়। তাণ্ডবের নাচ নাচি। এই তো সেই দক্ষের যজ্ঞস্থল।

বঙ্কিম যাবার আগে শিখীকে বলে গেল, 'আমি ঘরপোড়া গোরু বুঝলে শিখী। অনেক মূল্য দিয়ে সাংসারিক শান্তি কিনতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। নিলামে দাম কেবলই চড়ছে। তোমরা কিন্তু অনেক কম দামেই কিনতে পারো। সে সুযোগ রয়েছে। একটু কো-অপারেট করে দেখো না। এক হাতে তো আর তালি বাজে না! দুটো স্ক্রিপচারই তো সত্যি— ওয়াইভস বি ওবিডিয়েন্ট টু ইয়োর হাজব্যান্ডস যেমন একটি নির্দেশ, অন্য নির্দেশটা তো তেমনি আমাদের জন্যে— হাজব্যান্ডস লাভ ইয়োর ওয়াইভস অ্যান্ড ডু নট বি হার্শ উইথ দেম।'

শিখী গুম হয়ে বসেছিল, উত্তর দিলে, 'অনেক ছেড়েছি মশাই, এখন প্রাণটাই বাকি। মেয়েছেলে হল সাপের জাত। ছোবল মারবেই। বিষ দাঁতটা ওইজন্যে ভেঙে দিতে হয়। সেই বিষ দাঁত ভাঙার সময় এসেছে।' বঙ্কিম আর কী বলবে। পক্ষ প্রতিপক্ষ দু'জনেই সমান। 'ছেলেটার কথা একটু ভাববে তো?'

'ওকে বোর্ডিং-এ দিয়ে দেব।'

'খুব উত্তম কথা। সবচেয়ে সহজ সমাধান। ভবিষ্যৎ জেনারেশন তবে বোর্ডিং হাউসেই তৈরি হোক। কমিউনিস্ট স্টেটের ফাউন্ডেশান গড়ে উঠুক। যুযুধান পিতা মাতা একটি করে গর্ভমোচন করুক আর কর্পোরেশনের লেড়িকুকুর ধরা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে ধরে সরকারি খামারে ছেড়ে দেওয়া হোক। এবার থেকে তা হলে পোলট্রির কায়দায় ছেলে মানুষ হোক, লেয়ার আর ব্রয়লার্স। রাষ্ট্রই তবে হোক ভবিষ্যৎ পিতা।'

বঙ্কিমরা অনেকটা অবাঞ্ছিত অতিথির মতো 'সংগীতা' থেকে বিদায় নিল। গেট পর্যন্ত কেউ তাদের এগিয়ে দিল না। শিখী নিরস গলায় বললে, 'আবার আসবেন।' শুভো কেবল মাসি মাসি করে বাইরে পর্যন্ত এল, শিশুর আনন্দে। প্রতিমার কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবদার করলে, যেয়ো না। ফুটফুটে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বঙ্কিম খুব আদর করল। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার

ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে। আসল খেল তো এইবার শুরু হবে। দুই অ্যাডামেন্টের ফিজিক্যাল ওয়ার। ওয়ার অফ উন্ডেড সেনটিমেন্ট।

এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে সোজা সরল রাস্তা। দু'পাশে সারি সারি গাছ। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া কাঁপছে কালো পিচের ওপর। একজন মাত্র সাইকেল আরোহী ক্রমশ দূরে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বঙ্কিম বিমূঢ় প্রতিমাকে বললে, 'ফক্সেস হ্যাভ হোলস, অ্যান্ড বার্ডস হ্যাভ নেস্টস, বাট দি সান অফ ম্যান হ্যাজ নো স্পেস টু লাই ডাউন অ্যান্ড রেস্ট।— বুঝলে কিছু?

প্রতিমা বললে, 'না।'

বঙ্কিম ফেরার পথে বউকে জিজ্ঞেস করলে, 'হোয়াট ইজ দি মর‍্যাল? সমস্ত ভ্রমণই তো শিক্ষামূলক, এই ভ্রমণ থেকে তুমি কী শিখলে?' প্রতিমা বললে, 'রুমাটা চিরকালই ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদি। কারও কথা শুনতে চায় না। ছেলেবেলায় ওকে নিয়ে কম অশান্তি হত। তুমি যদি ওর মতো মেয়ের পাল্লায় পড়তে বুঝতে ঠেলা।' বঙ্কিম মনে মনে হাসল, কে ছুঁচ আর কে যে ছুঁচো! বঙ্কিম বললে, 'দুটো শিক্ষা হল। এক রবাহুত কখনও কারও বাড়িতে যাবে না, কারণ কে কী অবস্থায় আছে জানা না থাকার ফলে উভয় পক্ষই বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। দুই, এই যে সব লাল বাড়ি, নীল বাড়ি, গোলাপি বাড়ি দেখছ, এই যে সব রাশি রাশি মানুষ টেরিলিন, টেরিকটন পরে ঘুরছে, দে আর অল স্মোল্ডারিং হিপস। ভেতর থেকে সবাই চড়চড় করে পুড়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর শেষে দেখবে সভ্যতার ছাই উড়ছে।'

বঙ্কিমের বন্ধু সোমনাথ ঠিকই বলে, মূর্খরাই বিয়ে করে। মাল খাও, মেয়েছেলে রাখো। শরীর ভেঙে এলে নার্সিং হোমে চলে যাও। হিন্দু সৎকার সমিতি আছে। কেওড়াতলায় ইলেকট্রিক ক্রিমেটোরিয়াম আছে। শেষের সেদিন কত সুন্দর! সাংসারিক জীবনের জন্যে মানুষকে আজকাল অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। মানুষের মনের হীন গহ্বরে উত্তাল তরঙ্গ। সেই কাণ্ডারী কোথায় যে শক্ত হাতে জীবন নৌকোর হাল ধরবে? মন মানুষকে ইদানীং বড়ই প্রবঞ্চনা করছে। এখনও কি সেই বিশ্বাস বজায় রাখা যায়— ম্যারেজ ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশান, ফমস পার্ট অফ দি ইনটিমেট টেক্সচার অফ সোসাইটি। শালা ম্যারেজের নিকুচি করেছে। অকালে চুলে পাক ধরে গেল। গাল তুবড়ে গেল। রাতকানা হয়ে গেলুম। টোল খাওয়া, টাল খাওয়া বঙ্কিম সপরিবারে বাড়ি ফিরছে। ফুরফুরে হাওয়ায় চুল উড়ছে, বউয়ের শাড়ির আঁচল উড়ছে। মেয়ের স্কার্ট উড়ছে। বাজারের রাস্তায় স্তূপাকার আমপাতা। হাওয়া বন্ধ হলেই কপাল ঘেমে উঠছে। বেশ বাত্তির হয়ে গেল। যত বাড়ির দিকে এগোচ্ছে ততই একটা ভয়ের ভাব চেপে ধরছে। সেখানে কী ব্যবস্থা করে রেখেছ ঈশ্বর! দেখে গিয়েছিলে ধোঁয়া, ফিরে দেখবে আগুন। থাকত তেমন পয়সার জোর কিংবা পদমর্যাদা, কিছুই তেমন গ্রাহ্য করত না। বুক ফুলিয়ে ডাঁটে ঘুরত। এইভাবে সংসারের আনাচে কানাচে ছিঁচকে চোরের মতো ঘুরতে হত না। হতেম যদি সায়েনটিস্ট, ডাক্তার, কি ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, পদতলে অনন্ত সংসার, চারপাশে স্তাবকের দল, তা হলে তোমরাই আমাকে দেখতে, আমাকে আর তোমাদের দেখতে হত না। আয়া হায় তিশহাজারি মনসবদার। ওরে শরবত দে। জুতোর ফিতেটা খুলে দে না, নিচু হতে কষ্ট হবে না! ওরে তোরা গোলমাল করিসনি। সাইলেনস সাইলেনস। বাবা বঙ্কিম কেমন আছ? শরীরটা তেমন ভাল নেই। ডায়াল টু থ্রি সেভেন খ্যাডড়, খ্যাড়ড। হ্যালো স্পেসালিস্ট. আজ্ঞে হ্যাঁ কালই আর্লি ইন দি মর্নিং, আমাদের কল্পতরু একটু আনইজি ফিল করছে, আজ্ঞে হ্যা বছরে সাট হাজারের ক্লিন সোর্স। ও হো মাই লাভ কী খুঁজছ, এই নাও না, সারি সারি নতজানু মানুষ। ওরে প্রভু আজ হাসছে না কেন, ওরে পাখি কেন গাইছে না। এখনকার মতো, তুই শালা মরছিস মর, কার বাপের কী নয় লস রেসপেকতুজ। দাস সেয়েথ বঙ্কিম। বঙ্কিম উবাচ।

দূর থেকে বাড়িটা দেখেই বঙ্কিমের পিলে চমকে গেল। কোথাও কোনও আলো নেই। ঝোপের

মধ্যে জমাট একটা চৌকো অন্ধকার। গেটের কাছে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো এক ফালি কাপড়ের মতো লুটিয়ে আছে। ঝাপড়া মাধবীলতায় অজস্র লাল ফুল রাত্রিকে প্রেম নিবেদন করছে। সারারাত রক্ত ক্ষরণের পর লাল মাধবীই সকালে সাদা। সদর দরজার সামনে ঢেঙা ফলসা গাছ চারদিকে হিলহিলে শাখা বিস্তার করে দোতলার বন্ধ জানলার গায়ে অসহিষ্ণু হাত বুলিয়ে চলেছে। মোটা তুলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ছিটোনো সবুজ রঙের মতো টুপ টুপ পাতা চারিদিকে চুমকির মতো ঝুলছে।

গ্রিলের গেট খুলে বঙ্কিম, তারপর ছেলেমেয়ে, তারপর প্রতিমা মিছিলের মতো এগিয়ে চলল সেই কফিনের দিকে। বদ্ধ বাতাস আর ঝুড়ি চাপা একটা চোট খাওয়া পায়রা ছাড়া বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হল না। হতে পারে দোতলার ঘরে পরমেশ্বর হয় শুয়ে পড়েছেন, না হয় ধ্যানে বসেছেন। শেষ রাত অবধি যাঁর ঘরে জোর আলো জ্বলে, পাশের মাঠে কোনাকুনি যাঁর ছায়া লুটিয়ে থাকে ঝড়ে উৎপাটিত গাছের মতো। ছায়ার মাথাটা ঢুকে থাকে বনতুলসীর ঝোপের ভেতর। সেই পরমেশ্বর আজ এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন তা কি হতে পারে! তবু বঙ্কিম এগিয়ে গেল দরজার সামনে। যা ভেবেছে তাই। তাদের ফ্যামিলির সেই বিখ্যাত সাত লিভারের তালা দরজার দুটো পাল্লায় পিঠ রেখে, অন্ধ একটি চোখ তুলে বঙ্কিমকে বলছে, এসেছ মানিক স্ফূর্তি টুর্তি করে! ভায়রার বাড়ি থেকে ভালমন্দ ভরপেট খেয়ে! এদিকে তোমার পাখি যে ফুড়ুৎ। তোমার বাবা তোমায় বাঁশ দিয়েছেন মানিক। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই নকশাকাটা সিঁড়ির ধাপে বসে ফলসাপাতার প্যাচওয়ার্ক করা আকাশে তারা খোঁজো, ছায়াপথ দেখো, সপ্তর্ষি চেনো। মশার কামড় খাও। সুখের পরই যে দুঃখ বন্ধু। তিনি যদি ফিরে আসেন, আবার দরজা খুলবে, আবার আলো জ্বলবে, আবার ধুমধাড়াক্কা হবে। এখন তুমি বউমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ওহে ছেলের মা, খুব তো লম্বা চওড়া বাত মারতে, এখন বোঝো ফুলটুসি গৃহ কার। এই যে বিশাল মহাভারত অন্ধকার কুরুক্ষেত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সেখানে প্রক্ষিপ্ত গীতা মাত্র। পরমেশ্বর কি ফিরবেন? যদি রায়সাহেব দুর্বল হতাশায় মুহূর্তে হাত ধরে তোমার পিতাঠাকুরকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে না থাকেন তা হলে ফিরবেন, আর তা না হলে বুঝতেই পারছ ম্যান। হো তৈয়ার।

সর্বনাশ! তালাটায় হাত বুলিয়ে বঙ্কিম তার বউকে বললে, 'কেলো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি প্লাস ওয়ান। এইবার কী হবে! ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ দেখোনি। ওইজন্যেই বলেছিলাম আজকে আর বাড়ির দখল ছেড়ো না। কেমন টাইট দিয়েছেন! মাঝরাতে মরো এবার।'

'মরতে হত না, একটুখানি ভুলের জন্যে এই দুর্ভোগ হল' প্রতিমা আপশোস করে উঠল। 'হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে গেলাম পিসিমার ভরসায় বাড়ি রেখে, তখনই যদি উত্তরের দরজা দিয়ে বেরোতাম আমাদের তালা লাগিয়ে, তা হলে এই হাড়ির হাল হত না।' বঙ্কিমের ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যেই সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। ঘুম, জলতেষ্টা, নিম্নচাপ সব একসঙ্গে পেয়েছে! প্রতিমা বলছে আর দাঁড়াতে পারছে না, বসতেও পারছে না, ধড়াস করে শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। সকলেরই সামনে ট্যানটালাস কাপ। দরজাটা কোনওমতে খুলতে পারলেই শীতল জল, বাথরুম, নরম বিছানা, বিশ্রাম, পাখার হাওয়া, সবই পাওয়া যায়, মাত্র তিন ইঞ্চির ব্যবধান।

বঙ্কিমের মেয়ে হাঁ-উ করে একটা হাই তুলে বললে, 'এর চে মাসির বাড়ি থাকলে ভাল হত।' বঙ্কিম মনে মনে ভাবলে, ভালই হত, মেসো আর মাসির সারারাত ভল্ল নিয়ে মল্লযুদ্ধ দেখে ভালই কাটত। স্বামী-স্ত্রীর লড়াইয়ের চেয়ে ভাল সার্কাস আর কী আছে! গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। দর্শকের আসন থেকে মাঝে মাঝে তালি বাজাও আর সিটি মারো। বঙ্কিমের গলা দিয়ে হঠাৎ একটা গানের কলি বেরিয়ে এল, 'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি।'

প্রতিমা বললে, 'তোমার গলা দিয়ে এখনও গান বেরোচ্ছে!'

'বেরোবে না? হৃদয়কষ্ট থেকেই শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রাণায়াম। সংগীত হল শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম। জানো না, বিরহে সংগীত, প্রেমে সংগীত, শ্মশানে সংগীত। তোমার আমার সেই বিরহের দিনগুলো কি ভুলে গেলে! তুমি তোমাদের বাড়ির ছাদে, আমি আমাদের বাড়ির ছাদে, মাঝে চৈত্রের উদাস দিন। কাঠঠোকরা নারকেল গাছে চঞ্চুর শক্তি পরীক্ষা করছে। আমি এক লাইন করে গান ভাসিয়ে দিচ্ছি। আর আজ? ফলসাতলায় মাধবী ফুলের রাত, সামনে বন্ধ দরজা, মনে হচ্ছে নতুন করে যেন সংসার পাততে চলেছি, ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চারদিকে মালঞ্চের বেড়া, ভ্রমর সেথায় গুনগুনিয়ে...'

বঙ্কিমের গান চাপা পড়ে গেল। গেটের বাইরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। বঙ্কিমদের চোরছ্যাচ্চড় ভেবেছে বোধহয়। কুকুররা বেচাল একেবারে সহ্য করতে পারে না। গেটটা ফোঁস ফোঁস করে বারকতক শুঁকে একটা পা তুলে জল ত্যাগ করে টহলে বেরিয়ে গেল। বঙ্কিম বললে, 'দেখলে মালঞ্চের বেড়ায় মূত্র করে দিয়ে গেল।'

'এইভাবে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?' প্রতিমা কাপড়ের মায়া ছেড়ে বসে পড়েছে।

'উপায় কী?' বঙ্কিম পায়চারি করতে করতে পথ খুঁজে পেতে চাইল। চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটি রাতপাখি চিলেঘরের ছাদে বসে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। বঙ্কিম চমকে উঠেছিল। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী পাখি বলো তো?'

'বাদুড় বোধহয়।'

'পক্ষী জগৎ সম্পর্কে তোমার কী অসাধারণ জ্ঞান! বাদুড় কখনও ডাকে? প্যাঁচাই হবে, তবে কাল, কি হুতোম, কি কুটুরে, কি লক্ষ্মী? কালপ্যাঁচাই হবে।'

বঙ্কিমের মনটা ছাঁত করে উঠল। কালপ্যাঁচা বড় অলক্ষুনে! পরমেশ্বর বোধহয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছেন। শ্মশানেও যেতে পারেন। আগেও কয়েকবার গেছেন। কিন্তু এবার যদি আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে থাকেন, এ স্টেপ ফরওয়ার্ড! ধাপে ধাপেই তো মানুষ এগোয়। ধাপে ধাপে বয়স বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে, শয়তানি বাড়ে, হতাশা বাড়ে, সাহস বাড়ে, পাপ বাড়ে। ধাপে ধাপে পরমেশ্বর জলের দিকে এগোতে পারেন! মধ্যরাতের কালো গঙ্গার জল পাকিয়ে পাকিয়ে ছুটছে। ও পারে সারি সারি রাতজাগা আলো, আলোর তীরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, চলে আয়, চলে আয় পরমেশ্বর, অনেকেই এসেছে, সবাই আগে যায় যে চলে বসে আছিস তুই কী বলে! রায়সাহেব কোমর জলে, গলা জলে, ডুব জলে, অতল জলে।

'তোমরা বসো।' বঙ্কিম তিরবেগে বেরিয়ে গেল। ঘটে গেছে, না ঘটতে চলেছে, না ঘটবে! পাড়ার লোক ছি ছি করবে, এ কী করলে বঙ্কিম! বৃদ্ধকে রাখতে পারলে না? কী এমন অসুবিধে করছিলেন? অমন সাত্ত্বিক নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ! কারুর সাতেও থাকতেন না, পাঁচেও থাকতেন না। তোমরা সব আজকালকার ছেলে, বিশ্ব বেইমান। এখনও সেই বৃদ্ধার কথা বঙ্কিমের কানে তিরের মতো বিঁধে আছে। গঙ্গার ঘাটে দুই বুড়িতে কথা হচ্ছে। একজন আর একজনকে বলছেন, 'মাগ পেলেই ছেলেদের কাছে মা তখন মাগি।' পরমেশ্বরের হঠকারিতার জন্যে বঙ্কিমের ইমেজ বা ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয়ে যায়। পরমেশ্বরের কোনও বিলাস নেই। তিনি দুঃখবিলাসী মানুষ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বঙ্কিম দক্ষিণমুখো কয়েক পা হেঁটে পশ্চিমে মোড় নিল। সোজা রাস্তা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। পশ্চিমের রাস্তাটা বড়। এই রাস্তাতেই যত দোকানপাট, গাড়ি চলাচল, লোক চলাচল। বঙ্কিম ভেবেছিল জ্যৈষ্ঠের গরম, রাস্তায় কিছু লোকজন দেখতে পাবে। এগারোটা রাত এমন কী আর বেশি রাত। রাস্তা কিন্তু একদম ফাঁকা। মোড়ের রিকশাস্ট্যান্ডে একটাও রিকশা নেই। সব ঘুমোতে চলে গেছে। সামনাসামনি পানবিড়ির দোকানটা তখনও খোলা। বেশি রাতে আলোর ভোলটেজ বেড়ে যায়। দোকানের চড়া আলো আয়নায় ঝিলিক মারছে। রেডিয়োয় বাজছে রাতের শেষ গান। হিন্দি ছবির রাগাশ্রয়ী গান। সুরটা যেন বঙ্কিমের মনের একটা গুপ্ত দরজা খুলে দিল। যে

দরজা দিয়ে একে একে অতীতের সব ক'টা শবযাত্রা বেরিয়ে এল। মা, জ্যাঠামশাই, শ্বশুরমশাই, দাদু, মামা। পাশের সেলুনে রাতের শেষ খদ্দের তখনও চুল কাটছে। কিছু মানুষের বোধহয় রাত হয় না। সময় সম্পর্কে এঁদের কোনও ব্যস্ততাই নেই। রাত বাড়ছে বাড়ুক, দিন যাচ্ছে যাক।

সব ক'টা চায়ের দোকানই খোলা। চায়ের পাট অনেক আগেই উঠে গেছে। দ্বিতীয় পাট এখন জমজমাট। দেশি মদ আর জুয়া চলেছে ভেতরে। আলোর চোখে সিগারেটের ধোঁয়ার নেশা। পাড়ার সবচেয়ে কুখ্যাত গুন্ডা জড়ানো গলায় আদর্শের কথা বলছে, 'মারবি যখন শালা একবারে শেখ করে দিবি, আধমরা করে রাখবি না। মানুষের বড় কষ্ট রে দুখী! খেলেই মাইরি বদহজম। পেট ফাঁপ। মাইনে পেলেই খরচ। মেয়েছেলে দেখলেই লোভ। কাউকে কষ্ট দিসনে রে দুখী। জীবে দয়া করতে শেখ শালা। ধরবি যখন শেষ করে দিবি।'

দোকানের গভীরে ধোঁয়াও উড়ছে, পয়সাও উড়ছে, মালও উড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে যৌবনও উড়ছে। এদিকে রাতের পাখনাও উড়ছে। গোটাকতক দোকান আর নিশাচর মানুষের জটলা অতিক্রম করে রাস্তা চলে এসেছে সম্পূর্ণ নির্জন এলাকায়। এদিকের রাস্তায় কোনওকালেই আলো থাকে না। পাকাপাকি অন্ধকার। ছিনতাই আর প্রেমের জন্যেই চাই থকথকে অন্ধকার। বাঁ দিকে একটা চুন, সুরকি, বালি আর ইটের গোলা। থাক থাক ইট সাজানো। মোষের পিঠের মতো বালির ঢিপি। মানুষের অস্থিচূর্ণের মতো সাদা চুন দাঁত বের করে অন্ধকারে হাসছে। একটা গোরুর গাড়ি প্রণামের ভঙ্গিতে একপাশে পড়ে আছে। দুটো বলদ একপাশে শুয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করছে। ডান দিকে স্কুল। কোথাও কোনও আলো নেই। স্কুলের মাঠে বিশাল একটা অর্জুন গাছের পাতায় পাতায় গঙ্গার ভিজে হাওয়া ঝুলছে। রাস্তাটা সোজা গিয়ে পড়েছে প্রাচীন একটা ঘাটে। ঘাটের ওপরেই তিনতলা একটা বাড়ি। ভূতের বাড়ি। অনেকেই বসবাসের চেষ্টা করে একটা-না-একটা বিপদ নিয়ে ফিরে গেছে। যুদ্ধের আগে এই বাড়িটায় আই এন এ-র ক্যাম্প হয়েছিল। যুদ্ধের সময় দোতলায় একটা জুয়াখানা হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর রিফিউজি ক্যাম্প হয়েছিল। এখন খালি। ঘরে ঘরে অন্ধকার, অশরীরী আতঙ্ক। অন্য সময় হলে বঙ্কিমের ভয় করত। এখন সে বেপরোয়া। পরমেশ্বরকে চাই। কোথায় তিনি!

ঘাটের ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে বঙ্কিম নীচে নামছে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। ওপারের সারি সারি আলো জলে চিকচিক করছে। লোহার পাতের মতো পড়ে আছে জল সরে যাওয়া পাতা। ঘাটের ওপর থেকে ঝুঁকে আছে একটা পিটুলি গাছ। গাছটার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। বঙ্কিম তখন কলেজের ছাত্র। জীবনের কুঁড়ি তখন সবে খুলছে। এখনকার মতো শুকনো ফুল নয়। ভোরে গঙ্গার ধারে বেড়ানো তখন ছিল নিত্যকার অভ্যাস। স্কুলের মাঠে একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ ছিল। দুটো চাঁপা ফুল সংগ্রহ করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জাহাঙ্গীরের মতো গঙ্গার ধারে পায়চারি করত। জেলেদের মাছ ধরা দেখত। দেখত কেমন করে পুবের সূর্য পশ্চিম আকাশের অন্ধকারে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ রাতের ভক্ত স্নানার্থীদের গলায় ভোরের সুরে হরিনাম। ভরা গঙ্গার জল ঘাটের কানায় কানায়। শ্মশান থেকে ভেসে আসা পোড়া কাঠ। ছাত্র জীবনের সেই সকাল, সেই দ্বিপ্রহর, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সেই রাত, মধ্যরাত আর ফিরবে না। সংসারের শিরীষ কাগজের ঘষায় ঘষায় অনুভূতি খয়ে গেছে। এমনি এক সকালে বঙ্কিম পিটুলি গাছের সবচেয়ে মোটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে এক মহিলাকে ঝুলতে দেখেছিল। লালপাড় শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো চুল। ফরসা পায়ের গোড়ালি। ঝুলন্ত দেহটা ভোরের হু হু হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে।

তার মাতৃত্বের দাবিদার কেউ ছিল না বলে, লজ্জা ঢাকতে একটি ভ্রূণ নিয়ে সেই অবাঞ্ছিত মাতা মৃত্যু মায়ের কোলে গিয়ে চড়ল। বঙ্কিম আর তার প্রাণের বন্ধু গোপাল দৃশ্যটা বহুদিন ভুলতে পারেনি। গোপাল আবার সুন্দর কবিতা লিখত। মাসখানেক দুই বন্ধুতে বিরহের জগতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রইল। তখন তাদের সেই বয়স, যে বয়সে মানুষ নারীর মুখে কাঙালের মতো প্রেম খোঁজে।

দু'জনেবই মহা আপশোস। মবাব আগে মেয়েটি যদি তাদেব জানাত, পিতৃত্বেব দায় তাদেব মধ্যে যে-কোনও একজন হেসে হেসে নিতে প্রস্তুত ছিল। লম্পটবা কেমন সহজে প্রেম লুটে নেয়। আব প্রকৃত প্রেমিকবা শুকনো গাছেব ডাল হাতে নিয়ে নদীব তীবে সকাল সন্ধে বসে থাকে। ভোবেব স্কুলেব মেয়েদেব মুখেব সামনে চোখেব ভিক্ষাপাত্র মেলে ধবে। মাসখানেক গোপালেব কলম থেকে সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিবহেব কবিতা ঝবল। দুটো লাইন এখনও বঙ্কিমেব মনে আছে, যে বোঝে ফুলেব ভাষা, ভালবাসা তাবই বিক্ত ডালি। যাবা শুধু পাপড়ি ছেঁড়ে, তাবাই বুঝি বাগানেব মালি। মনে বাখাব মতো এমন কিছু বিখ্যাত কবিতা নয়, তবু গাছটা দেখে স্মৃতিব দবজা খুলে লাইন দুটো নেমে এল।

বঙ্কিমেব বযসেব সঙ্গে পাল্লা দিযে গাছটাবও বযস বেড়েছে। প্রৌঢ় গাছে আব তেমন পাতা নেই। প্রেতেব আঙুলেব মতো শীর্ণ পত্রহীন কযেকটা ডাল, আকাশেব নক্ষত্রকে খোঁচা মেবে যেন বলছে, নট হিযাব, নট হিযাব, দেযাব অ্যান্ড দেযাব। অমত্যলোকেব দিকে যাত্রা কবো। ওই দেখো নিস্তব্ধ আকাশেব তলায প্রবাহ চলছে। জীবনেব সুন্দব দিন ঝবা পাতা হযে ভেসে চলেছে। বিক্তপত্র বঙ্কিম তুমিও আকাশেব গাযে হাত বুলিযে কী খুঁজে চলেছ? তোমাব বিশ্বাস? তোমাব অহংকাব? তোমাব সম্মান? পাবে না তুমি গোবৎস। দি বেন ইজ অন আওযাব লিপস, উই ডু নট বান ফব প্রাইজ। প্রাইজ? পুবস্কাব? জীবনেব আটত্রিশটা বছব তো ছুটলি বে শালা। কেযা মিলা? বাট দি স্টম দি ওযাটাব হুইপস, অ্যান্ড দি ওযেভ হাউলস টু দি স্কাইস। দি উইন্ডস অ্যাবাইজ অ্যান্ড স্ট্রাইক ইট, অ্যান্ড স্কেটাব ইট লাইক স্যান্ড। তোব জীবনেব ফাটলে ফাটলে পবগাছাব শিকড়, ঝোড়ো হাওযাব আর্তনাদ। তুই হাত পা ছড়িযে বসাব স্বপ্ন দেখিস কী বে মূর্খ। দৌড়ো, দৌড়ো। সো উই বান উইদাউট এ কজ, বিনিথ দি বিগ বেযাব স্কাই।

বঙ্কিমেব যদিও মনে হযেছিল সাদা মতো কী একটা পিটুলি গাছেব ডাল থেকে ঝুলছে, তবু ভয পেলে তো চলবে না। ভৌতিক বাতে সে বেবিযেছে আব-একটি মানুষকে প্রেতলোক থেকে ফিবিযে আনাব জন্যে। গঙ্গাঘাটেব অন্ধকাব থেকে যেন মৃত্যুব কণ্ঠস্বব ভেসে আসছে। আমি মৃত্যু, আমি অসীম শূন্যতায আমাব প্রচণ্ড উপহাসেব মতো জীবন সৃষ্টি কবি, আবাব স্লেটেব লেখাব মতো নিমেষে মুছে দিই। আই, ডেথ, ক্রিযেটেড দেম আউট অফ মাই ভযেড, অল থিংস আই হ্যাভ বিলট ইন দেম অ্যান্ড আই ডেসট্রয। বঙ্কিম দুর্বল মনকে শক্ত কবাব চেষ্টা কবল। নিজেকে বলল অভী। প্রাচীন দাঁত বেব কবা যে পইঠাতে সে দাঁড়িয়ে আছে বাজনৈতিক হানাহানিব দিনে এইখানেই সাবি সাবি ক্ষতবিক্ষত বক্তাক্ত যুব দেহ পাবেব যাত্রীব মতো সাজিয়ে বাখা হয়েছিল। জোয়ারেব জলে এক-একটি দেহ এক-একটি নৌকোব মতো নিঃশব্দে ভেসে গিয়েছিল। সেই দৃশ্যও বঙ্কিমের মনে আছে। তবু বঙ্কিম বললে, সহজে হাব মানব না, আই বো নট টু দি, ও হিউজ মাস্ক অফ ডেথ। ওযার্লড স্পিবিট আই ওযাজ দাই ইকোয়াল স্পিবিট বর্ন, আই অ্যাম ইমমর্নট্যাল ইন মাই মর্টালিটি।

জলেব কিনাবা দিযে একটা কুকুব ছ্যাপ ছ্যাপ কবে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল। পৃথিবী তা হলে এখনও বেঁচে আছে। মৃত্যুব চিন্তা থেকে জীবনেব ধোঁয়ার মতো বঙ্কিম উঠে এল। উত্তরের আঘাটাব কাছে একটি মানুষ কী যেন খুঁজছে। কে। পরমেশ্বর! বঙ্কিম আরও তিন-চার ধাপ নেমে এল। ভাঙা ভাঙা লোহার স্ট্রাকচারের ওপর ভুতুড়ে বাড়ির পড়ো পড়ো জলটুঙ্গি। বড়লোকের বাড়িব অপ্সবিদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার জন্যে একদা সেই রইস মানুষটি তৈরি করিয়েছিলেন। সাদা বজরা ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাবে। [illegible] উড়িয়ে মাঝে [illegible] দিয়ে জল কেটে কেটে লঞ্চ চলে যাবে। [illegible] বঙ্কিম ভাল করে লোকটিকে দেখল। [illegible] ছাড়িয়ে যায়। জলের ধার থেকে [illegible] বতদূর দৃষ্টি চলে [illegible] পাওয়ার জন্যে

ওত পেতে বসে আছে। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ। পারে এসে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে হালকা শব্দে, পারিবারিক কথার মতো, সুখী দম্পতির আলাপের মতো।

না, এ অঞ্চলের কোথাও পরমেশ্বর নেই। হয়তো ছিলেন, এখন নেই। বর্তমান থেকে যে সব মুহূর্ত অতীতে ভেসে গেছে তার সাক্ষী তো বঙ্কিম নয়। ধাপে ধাপে বঙ্কিম ওপরে উঠে এল রাস্তায়। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো পড়ে আছে তার আসার পথ। এখন তাকে যেতে হবে উত্তরের রাস্তায়। এক পাশে গঙ্গা, সারি সারি বট আর অশ্বত্থের গাছ। ডালে ডালে শকুনের ছানা দুঃস্বপ্ন দেখে কাঁদছে। আর এক পাশে সরকারের খাস দখলি জমির ওপর বস্তি গড়ে উঠেছে। এখানে ওখানে চালাবাড়ির জটলা। একসময় এখানে ছিল গণিকাপল্লি। বৃত্তিটা এখন প্রকাশ্য থেকে প্রচ্ছন্ন হয়েছে। বেশির ভাগই হাফ গেরস্ত। রাস্তার শেষ মাথায় থানা, প্রাচীন কালী মন্দির, বন্ধ জুট মিল, বিশাল একটা মাঠ। কালীবাড়ির সামনে আর-একটা ভুতুড়ে ঘাট আছে যার বয়েস হবে কম করে শদেড়েক বছর। পরমেশ্বরের প্রিয় ঘাট। এই ঘাটে ছাত্রজীবনে পরমেশ্বর সঙ্গী সাথী নিয়ে বিকেল কাটাতেন। ঘাটের পইঠেতে খড়ি দিয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতির একস্ট্রা করে অঙ্কে কাঁচা বন্ধুদের পাকা করতেন। লম্বা লম্বা ছিপ বাঁধা থাকত, ছুটির দিনে বাচ খেলা দেখতেন।

উত্তরের রাস্তায় ঢুকতেই ডান পাশে একসার চালাবাড়ি পথের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দাওয়ায় বসে মোটা মতো একটা মেয়েছেলে বিড়ি খাচ্ছে। অন্ধকারে আগুন জোনাকির মতো বাড়ছে কমছে। এই বয়সেও সাজবার চেষ্টা হয়েছে। এতখানি খোঁপা। গালে ঠোসা পান। ছাপা শাড়ি। বিড়ির আগুনে মুখটা ছাই ছাই। উবু হয়ে বসে আছে শিকারের আশায়। ঘুলঘুলি মতো জানলার ফাঁক দিয়ে আবছা আলো জলের মতো রাস্তায় ছিটিয়ে পড়েছে। কমবয়সি একটি মেয়ের ফুল গোঁজা খোঁপা দেখা যাচ্ছে। পিনপিন করে হারমোনিয়াম বাজছে। বেসুরো গলায় গানের কলি, মন যে আমার কেমন কেমন করে। বাইরে বসে থাকা মেয়েছেলেটি বলছে, রস কত? কুসুম আবার গান ধরলি। উলটো দিকের বটতলায় কালো মতো একটি ছেলে জানলার দিকে তাকিয়ে পা ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিম দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে গেল। আর একটু এগোলেই থানা। থানার সামনে ছোটখাটো একটা জটলা। গোটাকতক সাইকেল গাছে হেলানো। সামনে শিব মন্দিরের বাঁধানো চাতালে গোটাকতক খাটিয়া ফেলে পা উঁচু করে ভুঁড়িওলা কিছু অফ ডিউটির পুলিশ চিত হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এদিকে রাস্তায় আলো আছে। রাত যেন চারদিকে ঝিমঝিম করছে। রাস্তার সবচেয়ে চওড়া জায়গার একপাশে গাছতলায় পুলিশের কালো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন ইঞ্জিন গন্ধ। ভেতরের ওয়্যারলেস সেটে আকাশের শব্দ ঝাঁ ঝাঁ করছে। থানার বড়বাবু টেলিফোনে চিৎকার করে কাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, পেটে রুলের গুঁতো মেরে লিভার ফাটিয়ে দিতে। কয়েকটা লোক হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরের বেঞ্চিতে একটি অল্পবয়সি মেয়ে হলদে শাড়ি পরে বসে আছে। বঙ্কিম এ জায়গাটাও দ্রুত অতিক্রম করল। পরমেশ্বর এর ত্রিসীমানায় থাকবেন না।

কিছু দূরেই বন্ধ জুট প্রেস। সামনেই জুট প্রেসের ভাঙা জেটি। মোটা মোটা ভারী তক্তা নাটবল্টু সমেত জনসাধারণ ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে। লোহার কঙ্কালটা ধনুকের মতো জলের দিকে চলে গেছে। শেষ মাথায় প্রহরীর মতো দুটো বিশাল ক্রেন। জুট প্রেসের সামনে স্লেট পাথরের পাহাড়। প্রেসের খালি শেডে স্লেট গুঁড়োর কারখানা হয়েছে। খাটিয়ায় বসে দু'জন দারোয়ান খইনি ডলছে। আর দেশোয়ালি ভাষায় গল্প করছে, যাতে যাতে যাতে যাতে। গল্পের চরিত্রের যাওয়া শেষ হবার আগেই বঙ্কিম কালীবাড়ির সামনের ঘুরঘুট্টি জায়গায় চলে এসেছে। একপাশে বিশাল বট। পাতায় পাতায় অন্ধকারের লেপটালেপটি। প্রাচীন ঘাটের দু'পাশে নহবতখানা। কালীবাড়ির লোহার গেট বন্ধ। দূরে ভেতরে নাটমন্দিরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। গেটের ওপাশে দুটো কুকুর মশগুল হয়ে খেলছে। গেটের থামে মাথা ঠেকিয়ে বঙ্কিম প্রণাম করল। বড় জাগ্রত দেবী। অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। নহবতখানায় আষ্টেপৃষ্টে বটের শিকড় নেমেছে।

মন্দিরের সামনেই সেই প্রাচীন ঘাট। পরমেশ্বরের যৌবন যার সিঁড়িতে ছড়ানো। গঙ্গা এদিকে ক্রমশই পশ্চিমে সরছে। ঘাটের সামনে চর। এখানে পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হে মা কালী, জয় মা কালী। কী হয় কী হয়! বঙ্কিম চাতাল পেরিয়ে অন্ধকারে পা ঘষে ঘষে ঘাটে ঢুকল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি হুড়োহুড়ি করে জলের দিকে নেমে গেছে। দূরে গঙ্গা। আকাশ আর ওপারের আলোর ঝাঁঝ জল থেকে উঠে আসছে, সাধকের ধ্যানে দেখা স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো। বঙ্কিম যেন এতক্ষণ অন্ধকারের পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছিল এইবার আলোর ফাঁকে এসে ভরপেট বায়ু নিল। অনেকটা নীচে নদীর জলধারা রুপালি ফিতের মতো পড়ে আছে। পুরো ভাঁটা। দুটো বিশাল নোঙর অতিকায় ফড়িঙের মতো উঁচু হয়ে আছে। গোটা কয়েক নৌকো একপাশে কাত। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ছেঁড়া মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। ঊর্ধ্ববায়ু কোণে বসে যেন কোনও সাধিকা মাঝে মাঝে বীজমন্ত্র ছুড়ে দিচ্ছেন। দাঁতের ফাঁক দিয়ে সেই মন্ত্র বেরোবার সময় শক্তির চকমকি ঠুকে দিচ্ছে। একেবারে শেষ ধাপে একটি নিঃসঙ্গ ছায়া। বঙ্কিম ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, অবশ্যই কেউ বসে আছে। বঙ্কিম ধাপে ধাপে নেমে এল। কাছাকাছি আসতেই বঙ্কিমের চোখে পড়ল লোকটির মাথার ওপর দিয়ে গোলাপি ধোঁয়ার রেখা উঠছে। আর দেখার দরকার নেই। পরমেশ্বর ধূমপান করেন না। কয়েকটা ধাপ ওপরে বঙ্কিম থমকে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটি না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কে, কৃষ্ণ এলি, এইবার জোয়ার আসছে, তৈরি হ।' বঙ্কিম বললে, 'না আমি কৃষ্ণ নই।"

'তবে কে, রাধারমণ?'

'আজ্ঞে না, আমি বঙ্কিম।'

'আমি কেউ না।'

'কেউ না তো কথা বেরোচ্ছে কোথা থেকে? দেখতে হচ্ছে একবার তা হলে।'

বিশু ডাকাতের মতো চেহারা লোকটির। বঙ্কিম একটু ঘাবড়ে গেল। ধড়িটড়ি খুলে নেবে না তো! লোকটি ইতিমধ্যে কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে, 'ও আপনি! বেড়ানো পার্টি।' খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা ক'টা বলে লোকটি আবার জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কুলকুল করে শব্দ উঠছে জলে। এই শব্দটা এতক্ষণ ছিল না। মাঝগঙ্গার কালো মতো কী একটা ভেসে চলেছিল, উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, একটু একটু করে উত্তরে সরছে যেন! জোয়ার এসেছে, জোয়ার।

বঙ্কিম বিষণ্ণ মনে ওপরে উঠে আসছে। একটি যুবক হইহই করে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল, 'মামা চলো, জোয়ার এসেছে, নৌকো ভাসাও।' এই বোধহয় কৃষ্ণ। মামা ভাগনে মাছ ধরতে চলেছে। সারারাত জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রথম আলোয় চকচকে ইলিশ নিয়ে বটতলার ঘাটে নৌকো বাঁধবে। লণ্ঠনের আলো থেকে অন্ধকারে এসে বঙ্কিম যেন আরও অন্ধকার দেখল। বড় ক্লান্ত লাগছে এবার। আর তো পারা যায় না প্রভু! আন্ডার দি ওয়াইড অ্যান্ড স্টারি স্কাই, ডিগ দি গ্রেভ অ্যান্ড লেট মি লাই। খুব করেছ মাগো! মানুষের চক্রান্তে চক্রাকারে ঘুরছি। একটা গোরু অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে গলকম্বল থেকে সারাদিনের সংগ্রহ বের করে জাবর কাটছিল। চোখ দুটো গোল মার্বেলের মতো জ্বলছে। বঙ্কিম বললে, 'দেখছ কী মা! আমি এক প্যান্ট পরা চিনির বলদ। এখন মরতে পারলে অমৃত পাই। হ্যাঁ, গ্ল্যাডলি ডিড আই লিভ অ্যান্ড গ্ল্যাডলি ডাই।'

দু'পা আরও উত্তরে এগোলেই জেলেপাড়ার সেই বিশাল মাঠ। ঢালু হয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। গঙ্গার কোল ঘেঁষে বটতলার প্রশস্ত বেদি। পাশেই খুপরি ঘরে অপু ঠাকুরের আস্তানা। নামকরা হালুইকর। উত্তর আর দক্ষিণে দুটো গোলপোস্ট। বিকেলে ফুটবলের আসর জমে। দু'কোণে দুটো ল্যাম্প পোস্ট। দুটো আলো পড়ে মাঠটা কিছু আলোকিত। একপাশে সারি সারি কালীবাড়ির শিবমন্দির। রাস্তাটা মাঠের দু'ধার প্রদক্ষিণ করে পুব থেকে আবার উত্তরমুখী হয়ে দূর থেকে দূরে

চলে গেছে। মন্দিরের ধ্বজার ওপর বসে কী একটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে। রাতের ওপর তার ভীষণ আক্রোশ। হু হু হাওয়ায় মাঠের মাঝখান থেকে মিহি মিহি ধুলো ঘুরে ঘুরে শূন্যে উঠছে। রাস্তার আলো পড়ে মনে হচ্ছে ফিকে হলুদ ঘাঘরা পরে অজস্র নর্তকী যেন দ্রুত তালে গোল হয়ে নাচছে। বঙ্কিম প্রথমে বেদিটার কাছে এগিয়ে গেল। কয়েকটা শুকনো বটপাতা এলোমেলো হাওয়ায় এধার থেকে ওধার ছোটাছুটি করছে। মাদুরে জড়ানো একটা বিছানা একপাশে গোল করে গুটোনো। অন্যদিন বটতলায় অনেক মৎস্যজীবী শুয়ে থাকে। আজ কেউ নেই। নদীতে জোয়ার এসেছে। অপু ঠাকুরের পুষ্যি গোটা ছ'য়েক বেড়াল এখানে ওখানে থেবড়ে বসে আছে। বঙ্কিমকে সন্দেহের চোখে দেখছে। উঠি উঠি ভাব। আর একটু কাছে এসো, দৌড়ে পালাব। অপু ঠাকুরের ঝুপড়ি খালি। কোথাও হয়তো গাঁজার আসরে গেছে। বেড়ালগুলো অপেক্ষায় জেগে আছে।

সারা মাঠে বঙ্কিম ঘুরছে, তার ছায়া কখনও সামনে কখনও পেছনে। এইবার তুমি কী করবে বঙ্কিম! আরও উত্তরে যাবে! তারপর আরও উত্তরে। এরপর প্রভাত, তারপর রাত, আবার প্রভাত। তুমি কি চলতেই থাকবে পরিব্রাজকের মতো। একদিন হয়তো চলার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাবে। শেষে শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, এই হয়তো হয়ে দাঁড়াবে তোমার অন্বেষা। ক্লান্ত বঙ্কিমের চিন্তায় কুয়াশা। জন্মসূত্রে পরিবেশের এ কী ক্রীতদাস করলে প্রভু! ছিঁড়তে চাই, কেটে বেরোতে চাই, বিবেকের রেশম আবরণে আমি এক রেশম কীট। হঠাৎ বঙ্কিমের চোখ পড়ল পুব দিকে। ল্যাম্প পোস্টের তলায় রাস্তার কল। পাশে এক সার খোলার বাড়ি। অন্ধকার। কলের কাছে ফটফটে আলো। মাঠে ঢোকবার মুখে একটা নারকেল গাছের গুঁড়ি। আলো পড়ে মনে হচ্ছে একটা কুমির যেন শিকারের আশায় ওত পেতে শুয়ে আছে।

একটু আগে তো কলের কাছে কেউ ছিল না। এখন তবে কে? কলের মুখে ঝুঁকে পড়েছে একটি মানুষ। কলতলার শ্যাওলাধরা বাঁধানো জায়গার দু'দিকে দুটো পা। কাপড়টা গুটিয়ে ওপরের দিকে তোলা। পেছনের কাছাটা ঝুলে আছে। ঘি-ঘি রঙের একটা চাদর পাগড়ির মতো মাথায় জড়ানো। দূর থেকে বঙ্কিম এর বেশি কিছু দেখতে পেল না। তবু মনে হল পরমেশ্বর। দুটো পা সামনে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি ঠিক পরমেশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মাথায় একটা চাদর কেন? জ্যৈষ্ঠের গরমে প্রায় যায়। এখন কেউ চাদর গায়ে দেয়! বঙ্কিম পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুবের রাস্তার দিকে প্রায় দৌড়োচ্ছে, তবে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, চমকে দিলে চলবে না। এখন সে প্রায় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারে। বঙ্কিমের হাতের নাগালে পরমেশ্বর! জলজ্যান্ত পরমেশ্বর। প্রেত নয়। সামনেই ছায়া পড়েছে। পরমেশ্বর কলের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন. তাঁর ছায়াটা হুমড়ি খেয়ে সামনের একটা ঝোপে গোঁত্তা মারছে। বঙ্কিম ইচ্ছে করলে জাপটে ধরতে পারে। বঙ্কিম দেখছে। এ কী বেশ! এ যেন রাজবেশ! পাঁচ বছর আগে বঙ্কিম যে ইঞ্চি পাড় তাঁতের ধুতি, আর বাফতার শার্ট কিনে দিয়েছিল পুজোর সময়, সেই দুটো পরেছেন। এতকাল স্পর্শ করেননি। প্রিন্সিপল। চিরকাল টুইলের সাদা শার্ট, মিডিয়াম ধুতি পরে এসেছি তাই পরব। নো বিলাসিতা। সারা জীবন কষ্ট করেছি, শেষ জীবনে কেন বিলাসিতা! সব রাত বুধ গয়ি, থোড়ি হায় বাকি, থোড়ি কে লিয়ে তাল নেহি ছোড়ি। পরমেশ্বর এ ম্যান অফ প্রিন্সিপল। সেই তোলা জিনিস আজ বেরোল কেন? পায়ে ঝকঝকে নিউকাট। বোধহয় আজই পালিশ করেছেন বেরোবার আগে। চারপাশে মাটির পুডিং লেগে আছে। বোঝাই যায় নরম মাটির ওপর দিয়ে বেশ কিছু আগে হেঁটেছেন। ক্রমশ শুকিয়েছে। মাথায় জড়ানো এন্ডির চাদর। রিটায়ার করার আগে শখ করে কিনেছিলেন। অল্প শীতে মাঝেসাঝে গায়ে দিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াবেন, কি কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যাবেন। চাদরটা তোলাই থাকত। আজ কেন বেরোল! পরমেশ্বরের সব কিছুই রহস্যজনক। মনে তাঁর জটিল আবর্ত।

কলের প্যাঁচটাকে শেষ সীমায় ঘুরিয়েছেন। এক ফোঁটাও জল নেই। ঘড়ঘড় করে মৃত্যুপথযাত্রী

মানুষের গলা থেকে যেমন শব্দ বেরোয় সেইরকম একটা শব্দ বেরোচ্ছে। এই সময় কলে জল থাকে না। পরমেশ্বর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, 'হায় প্রভু! অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুখায়ে যায়! বড় তেষ্টা পেয়েছে যে মা!' পরমেশ্বর টলবল করে নেমে দাঁড়ালেন, 'একটু জল পেলে যে ভাল হত!' ক্লান্ত পরমেশ্বর এবার আলোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বোঝাই যায় অনেকক্ষণ উদভ্রান্তের মতো ঘুরছেন। বঙ্কিমকে দেখে একটু বিব্রত হয়েছেন। এতক্ষণ নিজের জগতে ছিলেন। চোখে আলো পড়লে ইদানীং দেখতে পান না, গ্লেয়ার লাগে। বঙ্কিমকে ঠিক চিনতে পারেননি। বয়েসলাগা শীর্ণ মুখে যতদূর সম্ভব একটা উদার ভাব এনে জিজ্ঞেস করলেন— 'জোয়ার এসেছে ভাই, জোয়ার, ওঁরা বলছিলেন সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসবে।' বঙ্কিমকে বোধহয় জেলেপাড়ার কেউ ভেবেছেন।

পরমেশ্বরের বিষণ্ণ মুখ আর রাজবেশ দেখে বঙ্কিমের গলা প্রায় বুজে এসেছিল। পরাজিত রাজ্যহারা নৃপতি। পলাশীর প্রান্তর থেকে পলাতক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। সিরাজউদ্দৌলা। রাণা প্রতাপ যেন খড়ের শয্যায় ঘাসের রুটি সামনে নিয়ে বসে আছেন। পোশাক যেন পরমেশ্বরের বার্ধক্যকে উপহাস করছে, যৌবন আর নেই পরমেশ্বর, তোমার দিন শেষ, তুমি তো বেঁচে আছ সময় ধার করে, এ তো তোমার জীবন নয়, জীবনের ইনারশিয়া। বঙ্কিম যেন চোখের সামনে পরমেশ্বরের ক্যারিকেচার দেখছে। বঙ্কিম আবেগ মেশানো গলায় ডাকল, 'বাবা'!

হাতের তালু দিয়ে চোখ আড়াল করে, পরমেশ্বর বঙ্কিমকে ভাল করে দেখলেন, তারপর নিজের বয়েসের চে ক্ষিপ্রগতিতে অদ্ভুত তৎপরতার প্রকাণ্ড একটা ঝুল কেটে, নারকেল গাছের গুঁড়িটাকে তিড়িং লাফে অতিক্রম করে দুবদুর করে পশ্চিমে গঙ্গার দিকে ছুটলেন। পরমেশ্বর খিলখিল করে হাসছেন! বঙ্কিমের মনে হল তিনি সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ভাববার সময় নেই। বঙ্কিমও ছুটল পেছনে পেছনে। কী করতে চাইছেন এই বৃদ্ধ বয়সে। এ কী খেলা! পিতা পুত্র দু'জনেই অন্ধকার দিকটায় চলে এসেছে। পরমেশ্বর ঢালু পার বেয়ে জলের দিকে নেমে যেতে চাইছেন। অপু ঠাকুরের আটটা বেড়াল মাঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্কিম পরমেশ্বরের কোমরটা প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল। পরমেশ্বর পাশ কাটিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে আবার উলটো দিকে ছুটলেন। সেই খিলখিল হাসি। বঙ্কিমও ঘুরে গেল। মধ্য মাঠে দু'জন বৃত্তাকারে ঘুরছে। মধ্য রাতে দুই শিশু যেন স্বপ্নে নির্জন এক মাঠে কবাডি খেলছে। বঙ্কিম ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। ভীষণ হারজিতের খেলা চলছে। পরমেশ্বর যেন মরণ পণ করে খেলছেন। বঙ্কিম কেবল পশ্চিম দিকটা গার্ড করে চলেছে। পরমেশ্বর কেবলই ফাঁক খুঁজছেন কেমন করে জলে গিয়ে নামবেন। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। আটটা বেড়াল এখন দর্শকের আসনে, দূরে দূরে। ভীষণ খেলার খেলোয়াড়দের দেখছে। বঙ্কিম বলছে, 'ছুটছেন কেন? ওরকম করছেন কেন?' পরমেশ্বর হাঁফাতে হাঁফাতে বলছেন, 'আজ আর তুই পারবি না বাবা, আজ আর তুই পারবি না।' পরমেশ্বর হঠাৎ একটা পশ্চিমে ফাঁক পেয়ে পিছলে যাচ্ছিলেন। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, টাল সামলাতে না পেরে ধড়াস করে ঠিকরে পড়ে গেলেন ধুলোর ওপর। 'উঃ' করে আর্তনাদ করে উঠলেন। কাতর গলায় বললেন, 'ফাউল, ফাউল, ছেলে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে, ল্যাং মেরেছে, রেফারি তুমি বাঁশি বাজাও।' বঙ্কিম দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। পরমেশ্বরের চাদর কিছু দূরে লুটিয়ে পড়ে আছে। বঙ্কিম কাছে আসতেই ভূমিশয্যায় শুয়ে শুয়েই পরমেশ্বর হাতজোড় করে বললেন, 'আমায় মারিসনি বাবা, আমায় আর মারিসনি, তোর বউকে আমি কিছু বলব না বাবা, তোর বউকে আমি কিচ্ছু বলব না, এই তোর পায়ে ধরছি বাবা, আর আমায় মারিসনি।' পরমেশ্বর সত্যি সত্যি বঙ্কিমের পায়ের দিকে হাত বাড়াতে গেলেন। হাত দুটো বঙ্কিম ধরে ফেলল। বরফের মতো ঠান্ডা শীর্ণ দুটো হাত, উত্তেজনায় কাঁপছে। বঙ্কিম বললে, 'কে আপনাকে মেরেছে! আপনাকে কেউ কোনওদিন মেরেছে!'

'ফ্যাটা ফ্যাট জুতো মেরেছে বাবা, তোর বউ মেরেছে বাবা, আর আমায় মারিসনি, তোরা আর আমায় মারিসনি।'

'মিথ্যে কথা, সব আপনার মনের ভুল।'

'ওঃ বাবা, বড় বড় চোখ করে ছেলে আমায় ধমকাচ্ছে। সেই বঙ্কিম, এতটুকু বয়েস থেকে যাকে আমি মানুষ করেছি। আজ আমায় ধমকাচ্ছে, ভগবান! তোমরা দেখো, তোমরা দেখো।' বঙ্কিম ইতিমধ্যেই পরমেশ্বরকে তুলে বসাবার চেষ্টা করছে। বুকে হাত দিয়ে দেখছে। হার্টের রুগি, দেখা দরকার বুকটা ধড়ফড় করছে কিনা। যেভাবে পড়েছেন, লেগেছে নিশ্চয়। বৃদ্ধের শরীর। সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বঙ্কিম হাত দিয়ে পরমেশ্বরের কপালে ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কেন অমন করছেন? আমরা যে আপনাকে কত শ্রদ্ধা করি তা কি বুঝতে পারেন না? আমরা যে এই বারোটা বছর আপনার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি।' পরমেশ্বরের ছোট্ট মাথাটা বঙ্কিম বুকে তুলে নিয়েছে। এ যেন আর এক কুরুক্ষেত্র। দৃশ্যটা কেবল উলটে গেছে। অভিমন্যু তুলে নিয়েছে অর্জুনের মাথা। পরমেশ্বর এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'পারলুম না বাবা, বারবার তিনবার চেষ্টা করলুম, সেই তখন থেকেই চেষ্টা করছি। তিনবারই মা গঙ্গা ফিরিয়ে দিলেন, নিলেন না বাবা। কেবলই তোর মুখটা মনে পড়ল। তোর মুখে যে আমি তোর মাকে দেখতে পাই। এইবার পারব।' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'এইবার নিশ্চয়ই পারব। পারতেই হবে। তোদের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ওই দেখ কুলকুল করে গঙ্গা আমাকে ডাকছে। আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়েরা ডাকছে। ওরে জোয়ার এসেছে, ছাড় ছাড়। আমি এবার যাই বাবা।' বঙ্কিম আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না। তার সমস্ত শৈশবটা চাঁদের আলোর মতো সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। বঙ্কিম কেঁদে ফেলল। চোখের সামনে ভাসছে সেই সব দৃশ্য, নির্জন খোয়াইয়ের ধার দিয়ে স্বাস্থ্যবান যুবক পরমেশ্বর শিশু বঙ্কিমের হাত ধরে পড়ন্ত বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। মান্দার হিলে ফাঁকা মাঠে ক্রিকেট খেলেছেন বঙ্কিমের সঙ্গে। সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে দিচ্ছেন। ঘুড়ি উড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটির পুতুল করে দিচ্ছেন। স্টোভে দুধ গরম করে খাওয়াচ্ছেন। অসুখের সময় সারারাত জেগে সেবা করছেন।

বঙ্কিম ধরাধরা গলায় বললে, 'চলুন, বাড়ি চলুন, অনেক রাত হয়েছে। ওরাও সব বাইরে অন্ধকারে বসে আছে। চলুন, উঠুন।' পরমেশ্বর বললেন, আমি আর ফিরব না রে। আবার মারবে, ফ্যাটা ফ্যাট মারবে। তোর বউকে আমি কিইচ্ছু বলব না বাবা। তোরা আমাকে আর মারিসনি।'

'আমার বউ কিছু বললে তার জিভ উপড়ে দেব, আপনি চলুন।'

'সে তুই পারবি না রে, তোর প্রেমের বউ প্রেম নিবেদন করবি, প্রেম, প্রেম।' শেষের শব্দটা মনে হল ফ্রেম বলছেন। আসলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। বঙ্কিমের বেদনার অনুভূতি এবার যেন আবার কঠিন হয়ে আসছে। পরমেশ্বর আবার খোঁচা মারতে শুরু করেছেন। বঙ্কিম বললে, 'আপনি যতটা প্রেম ভাবছেন তত প্রগাঢ় প্রেম সংসারে থাকে না, কেতাবে থাকে, প্রেমের নদীতে এখন ভাটা চলছে। চলুন, উঠুন। পারি কিনা দেখবেন।'

পরমেশ্বর ধুলোর ওপর আধবসা হয়ে কঁকাতে কঁকাতে বললেন, 'পারলে, পারলে তুই এই বারো বছরেই পারতিস, বেড়াল প্রথম রাতেই কাটতে হয়, তা যখন পারিসনি, হায় প্রভু!'

'আমাদের রাত কিছু দীর্ঘ, প্রথম রাতেই আছি এখনও, কাটাকুটির ব্যাপারটা আজই শেষ করব। চলুন, উঠুন, এর পর পুলিশে ধরবে।'

'তুই যা। সুখে সংসার কর বাবা। আমি আশীর্বাদ করছি খুউব সুখ হবে তোদের। আমি না থাকলেই দেখবি কত সুখ। তবে একটা কথা,' পরমেশ্বর মুখটা অদ্ভুতভাবে কোঁচকালেন, 'একটা কথা, নট মাই অ্যাডভাইস, এ সিমপল এক্সপিরিয়েন্স, ছেলের যখন বিয়ে দিবি, একটু ভাল ঘর দেখেশুনে মেয়ে আনবি, তা না হলে তুমিও পরমেশ্বর, তা না হলে তুমিও পরমেশ্বর।' মেঘ থেকে আলো ঠিকরে এসে পরমেশ্বরের মুখে পড়েছে। কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখের চারপাশে বয়েসের বলয়। গানের মতো করে বলে চলেছেন, 'না হলে তুমিও পরমেশ্বর।' হঠাৎ পরমেশ্বর লাফিয়ে উঠলেন, 'না, না, জোয়ার থাকতে থাকতে চলে যাই, ওরে নৌকোটা খুলে দে, নোঙরটা তুলে নে।'

লাফিয়ে উঠে দৌড়োবার চেষ্টা করেছিলেন। পারবেন কেন! কোমরে বহুদিনের সায়টিকা, তার উপরে সজোরে পড়ে গেছেন। হাতখানেক দূরে আবার ছিটকে পড়লেন। মাথাটা ঘাসের মধ্যে গুঁজে দিয়ে আর্তনাদ করছেন, 'এ কী হল প্রভু! এবার জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে। আরও ঝাঁটা, আরও লাথি, আরও জুতো। হোয়াট পাসিং বেলস ফর দিজ হু ডাই অ্যাজ ক্যাটল, হোয়াট ক্যান্ডলস মে বি হেল্ড টু স্পিড দেম অল।'

চাদরটা মাটি থেকে ঝেড়ে তুলে নিয়ে বঙ্কিম আবার দ্বিতীয় পতনের জায়গায় এগিয়ে গেল। উরুভঙ্গ দুর্যোধন মধ্যরাতের কুরুক্ষেত্রে পড়ে আছেন। একটু দূরে একটি গোরুব গাড়ির চাকা পড়ে আছে। কর্ণের রথের সেই ভাঙা চাকাটা। দুটো হাতের ওপর দেহের ভর, পা দুটো পাশে ছড়ানো, একপাটি জুতো পা থেকে খুলে উলটে আছে, ঘাড় থেকে মাথাটা মাটির দিকে ঝুলছে, টুকরো টুকরো পরমেশ্বর, ঘড়ির সমস্ত পার্টস যেন মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, নিষ্ঠা, আদর্শ, ডিসিপ্লিন, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ভাল, মন্দ, জীবন, মৃত্যু। পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বললেন, 'একটা কাজ কর, আমাকে তুই কোনওরকমে ওই পারে নিয়ে চল, তারপর আমি দেখছি পারি কিনা। এবার আমি পারব। তোকে দেখেছি, এবার আমি পারব। থ্রিফোর্থ তো হয়েই গেছে, ওয়ানফোর্থ বাকি। তেল আর নেই রে, বুকোটাই জ্বলছে। জলের ঝাপটা না মারলে নিভবে না রে। বুকোজ্বলা প্রদীপ সংসারের বড় অমঙ্গল। নিভিয়ে দে, নিভিয়ে দে। এই দীর্ঘজীবনের অনেক জ্বালা। একে শেষ না করলে শেষ হবে না রে।'

বঙ্কিম মনে মনে ভাবছে পাশেই থানা, প্রয়োজন হলে পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে। কোনওরকমে বাড়িতে ফেলতে পারলে দিনের আলো ফুটুক তারপর ডাক্তার ডেকে স্ট্রং সিডেটিভ দিয়ে দিনকতক ফেলে রাখতে হবে। গভীর ঘুম, গভীর ঘুম। জীবিতের মৃত অবস্থা। বঙ্কিম আর একটুও সময় নষ্ট করতে চায় না। এবার সে রুথলেস। এখন সেই হবে পিতা, পরমেশ্বর অবুঝ সন্তান। পরমেশ্বরের ঘামে ভেজা বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে বঙ্কিম তুলে দাড় করাবার চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর শিথিল। যেন ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নে প্রলাপ বকে চলেছেন, 'আই উইল নট ট্রাবল দি, মাই চাইল্ড, ফেয়ার ওয়েল, আমি দণ্ড খাটতে খাটতে মায়ের কোলে গিয়ে উঠব, পতিতোদ্ধারিণী মা আমার, তোর কত সুবিধে হবে রে বঙ্কিম, অপঘাতে মৃত্যু, খাট নেই, কাঠ নেই, শ্মশানযাত্রী নেই, শ্রাদ্ধ নেই, অশৌচ নেই, তোর কোনও খরচও নেই, তকলিফও নেই।' পরমেশ্বর কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্কিম নিজেব কাঁধের ওপর দিয়ে পরমেশ্বরের একটা হাত ঘুরিয়ে নিতে পেবেছে। শবীরেব ভার এখন বঙ্কিমের ওপব। বঙ্কিম খুব সাবধানে উত্তেজনা চেপে রেখে কথা বলার চেষ্টা করছে। একই বৃক্ষের দুটি ডাল, পুত্র আর সন্তান, ডিরাইভড ফ্রম দি সেম স্টক। দুটো শরীরে, একটি আর একটির অপভ্রংশ। কত কাছের, তবু কত দূরের। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় প্রায় স্পর্শই করে আছে, তবু ব্যবধান দুস্তর। মাঝখানে অভিমানের নদী ঝোড়ো হাওয়ায় ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। সংগীতের মতো করে বঙ্কিম বললে, 'এবার চলুন বাবা, যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এবার চলুন, প্লিজ এবার চলুন।'

প্রতি মুহূর্তে বঙ্কিম বোঝার চেষ্টা করছে, পরমেশ্বর প্রকৃতই অপ্রকৃতিস্থ না নিপুণ অভিনেতা। উলটোনো জুতোটা সোজা করে পরিয়েছে। বঙ্কিমের কাঁধে ভর দিয়ে পরমেশ্বর এক পা এক পা করে হাঁটছেন। থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। দূরে একটা স্টিমারের গম্ভীর ভো। বন্দরে যেন জাহাজ ভিড়েছে। প্রবাসী পরমেশ্বর অনেকদিন পরে যেন ঘরে ফিরছেন। বঙ্কিম তাঁকে রিসিভ করে নিয়ে চলেছে। অদূরে জোয়ারের নদীতে অজস্র শিশুর উন্মাদ মিছিল চলেছে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে। অনেকটা দূরে পারাপারের সেতু আলোর ধনুকের মতো এপার থেকে ওপারে পড়ে আছে। অর্জুনের ফেলে দেওয়া গাণ্ডীবের মতো। আকাশের মাথায় বায়ু কোণে কালো মেঘের ওষ্ঠে বিদ্যুতের ঝিলিক। কৃষ্ণ যেন বলছেন, ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ।

পরমেশ্বর অস্ফুটে অনর্গল নেশাচ্ছন্নের মতো 'কিং লিয়র' থেকে আবৃত্তি করে চলেছেন। অভিনয় শেষে ঘোরলাগা অভিনেতার মতো। বঙ্কিমের ঘাড়ের কাছে গরম নিশ্বাস পড়ছে। গুঞ্জনের মতো শুনছে—

বাট ইয়েট দাও আর্ট মাই ফ্লেশ, মাই ব্লাড
অর রেদার এ ডিজিজ দ্যাট ইজ ইন মাই ফ্লেশ
হুইচ আই মাস্ট নিডস কল মাইন, দাও আর্ট এ বয়েল
এ প্লেগ-সোর এন এমবর্সড কার্বাঙ্কল
ইন মাই করাপটেড ব্লাড।
বাট আই উইল নট চাইড দি,
লেট শেম কাম হোয়েন ইট উইল, আই ডু নট কল ইট
মেন্ড হোয়েন দাউ ক্যানসট, বি বেটার এট দাই লিজার।

এই ধরনের ইনটেলেকচুয়াল খোঁচা বঙ্কিমের অসহ্য লাগছিল, তবু সে পিতৃভক্ত শ্রবণের মতো পিতা পরমেশ্বরকে বহন করে নিয়ে চলেছে। বৃদ্ধের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অসাধারণ সহ্যশক্তি। স্মৃতিই আপনার শত্রু। বঙ্কিম যেতে যেতে ভাবল। আমি জানি এই বারো বছরের প্রতিটি সাংসারিক কথাবার্তা পিনকুশানের আলপিনের মতো আপনার স্মৃতিতে গাঁথা আছে। আপনি শুধু গ্রহণই করেন, অথচ সংসারে সুখী হবার নিয়ম, গ্রহণ বর্জন।

গোটাকতক কুকুর একই ট্রাবল দিল। ঘেউ ঘেউ করে রাত্রিকে চমকে দেবার চেষ্টা। বঙ্কিম ফিরে চলেছে আরও একটা নির্জন পথ ধরে। দু'ধারে খোলা মাঠ, বাগান, পুকুর। রাত অন্ধকার। কোনও কোনও রাত বোধহয় বেশি অন্ধকার। আলকাতরার নদীতে বঙ্কিম সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলেছে। ফাঁকা মাঠে আকাশ খেলা করছে আলোর আভাস নিয়ে। পুকুরের জলে তারারা মুখ দেখছে। রাত্রি এখন ভরা যুবতী।

বাড়ির গ্রিল গেটের সামনে এসে বঙ্কিমের মনে হল, হোম হি ব্রিংস দি ওয়ারিয়ার হাফ ডেড! আর কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত শেষ হবে। তারকাপুঞ্জ পশ্চিমে হেলছে। দূরে একটা কুকুর বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল। বঙ্কিম নিজের ভেতরেও একটা আর্তনাদ শুনতে পেল, কতকালের তৈলহীন বন্ধ একটা দরজা যেন ধীরে ধীরে খুলছে। দীর্ঘকালের বন্দি, ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে একটা হাওয়া যেন গায়ে লাগছে। সামনে থমকে আছে অন্ধকাব শূন্যতা। ভয়। আর কয়েক পা দূরে ফেরোসাস প্রতিমা, বাঘিনি। রয়েল বেঙ্গল কাঁধে 'কিল' নিয়ে ঢুকছে। পারিং অ্যান্ড ওয়াগিং টেলস। ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তোমার বউ রইল বাগানে পড়ে, ভীমরুলের মতো মশার ব্লাডব্যাঙ্ক, আদিখ্যেতা করতে গেলেন বাপকে নিয়ে, ওরে আমার বেপো!

ব্যানিশ অল ফিয়ার্স। বঙ্কিম গেটের ক্যাচারটা খুলল। খুলতে খুলতে মনে হল তার কানের কাছে মিশনারি কলেজের পাদরি প্রিন্সিপ্যাল বলছেন। 'বঙ্কিম, দি গেট ইজ ন্যারো অ্যান্ড দি ওয়ে ইজ হার্ড দ্যাট লিডস টু লাইফ, অ্যান্ড ফিউ পিপল ফাইন্ড ইট।' আমি পেয়েছি ফাদার। আমার কাঁধে ফাদার। এই দেখো আমাদের ন্যারো গেট, আর সামনেই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আভি হো জায়গা ফিন এক পক্কড়। অদ্যই শেষ রজনী আমার মহান যিশু।

বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে প্রতিমা ঘুমোচ্ছে। বেশ গভীর ঘুম। একটা ধাপে ছেলে, আর এক ধাপে মেয়ে। পরমেশ্বর তখনও বলছেন, 'ফ্যাটা ফ্যাট লাগাবে। এইধার বুঝবি বুড়ো ঠেলা। আমি তোর বউকে কিচ্ছু বলব না বাবা, আমাকে তোরা মারিসনি।' বঙ্কিমের শ্রবণেন্দ্রিয় তখন কাজ করছে না। সে দেখছে প্রতিমাকে। বুকের কাপড় সরে গেছে। দৃশ্যটা ইমিডিয়েটলি সেনসার করা উচিত। কিন্তু কী করে করবে, কাঁধে পরমেশ্বর। ঘুমোচ্ছে, শান্ত। জাগালেই ডিনামাইট। ব্লাম করে ছিটকে উঠবে

এবং সেইটাই হবে ওস্তাদের শেষ রাতের মার। স্বপন যদি এতই মধুর তবু জাগাতেই হবে, না জাগালে নাটক জমবে না যে! পরমেশ্বর আবার লিয়র। বঙ্কিমের কাঁধ থেকে হড়কে নেমে পড়ে, পা ছড়ানো প্রতিমার সামনে নতজানু—

আই কনফেস দ্যাট আই অ্যাম ওল্ড
অ্যাজ ইজ আননেসাসারি,
অন মাই নিজ আই বেগ
দ্যাট ইউ উইল ভাউচসেফ
মি রেমেন্ট, বেড অ্যান্ড ফুড।

প্রতিমার পায়ে হাত দিতে গেলেন, বঙ্কিম তাড়াতাড়ি হাত দুটো চেপে ধরল, 'করছেন কী?' প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখ দেখে মনে হল নাটকের শেষ দৃশ্যে জেগে উঠেছে। কাহিনি, চরিত্র সব গুলিয়ে গেছে। ঈশ্বরের কী অসীম কৃপা! এক্সপ্লোড করল না। স্বপ্নে বোধহয় কুললক্ষ্মী হয়ে গেছেন। সামনে নতজানু পরমেশ্বরকে দেখে ঘুম চোখে অবাক প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?' বঙ্কিম ঠোঁটে আঙুল রাখল। প্রতিমা দরজার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

'চাবিটা দিন।'

পরমেশ্বর জামার তিনটে পকেট হাতড়ে বললেন, 'পকেটেই তো ছিল, গেল কোথায়, বোধহয় পড়ে গেছে।' পরমেশ্বরের কাণ্ড দেখে এইবার বঙ্কিমের ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। এ রাত শেষ হবে তো! শেষ তো হবেই তবে কোন উষার দিকে যাচ্ছে! চাবিটা সেই ফাঁকা মাঠেই পড়ে আছে। কে যাবে? গেলেই পরমেশ্বর পালাবেন। গেলেও এই অন্ধকারে একটা ছোট্ট চাবি খুঁজে পাবেই এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বঙ্কিম খেপে গিয়ে বউকে বললে, 'মারো দরজায় তোমার গোদা পায়ের লাথি। অনেক ধাষ্টামো হয়েছে, আর সহ্য হচ্ছে না।'

পরমেশ্বরের লিয়রের পোশাক সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। সেই ক্যালকুলেটিং পরমেশ্বর। পরমেশ্বর বসে বসে বললেন, 'সাড়ে চারশো টাকা দাম। দাঁড়া আর একবার ভাল করে দেখি!' বঙ্কিম এবার প্রায় ধমকে উঠল, 'দেখুন।' কিছুক্ষণ পরে পরমেশ্বর বললেন, 'পেয়েছি। এই তো পইতেয় বাঁধা, খুলে নে, আমার হাতে জোর নেই।'

বঙ্কিম প্রায় হ্যাঁচকা টানে চাবিটা পইতের ফাঁস থেকে খুলে নিয়ে প্রতিমার হাতে দিল। পরমেশ্বর উঃ করে উঠলেন। বঙ্কিম আর তেমন গ্রাহ্য করল না। মনের বাইরে আবার ক্যাপসুল তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা দরজাটা খুলে ফেলেছে। তালাটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। ছেলে আর মেয়ে ঘুমচোখে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কিমের মনে হল দরজার সামনে মেঝেতে কী সব ছড়িয়ে পড়ে ছিল। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে এক কোণে জড়ো হল। দরজার বাঁ পাশেই আলোর সুইচ। প্রতিমা হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতেই জোরালো আলো শিকারি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর আলোর শাস্তিতে চোখ ছোট হয়ে গেল। প্রতিমা মেঝের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এ কী, তোমার ফেদার ডাস্টারটা কে এইভাবে ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছে?'

বঙ্কিম পরমেশ্বরকে আবার দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'মরুক গে ফেদার ডাস্টার, নিজেদের ফেদারই সব ঝরে গেল।' প্রতিমা একটা পালক মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বললে, এ কী? এ তো পায়রার পালক! প্রতিমা কাপড়টাকে পায়ের গোছের ওপর সামান্য একটু তুলে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ির যে ধাপে পায়রাটা ঝুড়ি চাপা ছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল। বঙ্কিম ইতিমধ্যে পরমেশ্বরকে ঢোকার মুখের দুটো ধাপ পার করে এনে দরজার মুখটায় দাঁড় করিয়েছে। আলোতে পরমেশ্বরকে বীভৎস দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কবর থেকে উঠে এসেছেন। পরমেশ্বরের যেন রেজারেকশান হয়েছে। দি সান

অফ ম্যান ইজ অ্যাবাউট টু বি হ্যান্ডেড ওভার টু মেন হু উইল কিল হিম, বাট অন দি থার্ড ডে হি উইল বি রেজড টু লাইফ।

প্রতিমা সিঁড়ির চওড়া ধাপে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ সব শেষ হয়ে গেছে।' পায়রা চাপা ঝুড়িটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে এসে এক পাশে মুখ থুবড়ে পড়ল। চারদিকে পায়রার নরম নরম পালক হাওয়ায় উড়ছে। প্রতিমার 'যাঃ' শুনেই অপূর্ব ছুটেছে। মা আর ছেলে দু'জনেই সিঁড়িতে। অপূর্ব প্রথমটায় উবু হয়ে বসল, তারপর সিঁড়ির হাতল ধরে উঠে দাঁড়াল। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল বঙ্কিম আর পরমেশ্বরের যুগল মূর্তির দিকে। মুখটা ক্রমশ বিকৃত হচ্ছে। একসময় ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল— 'আমার পায়রাটা খেয়ে ফেলেছে।' প্রতিমা বলছে, 'এ সেই মুখপোড়া কেলে বেড়ালটার কাজ। যেই দেখেছে বাড়িতে কেউ নেই।'

অপূর্ব যেন পায়রাপক্ষের ব্যারিস্টার। এজলাসের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কচি হাতের একটা আঙুল তুলে পরমেশ্বরকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'এটা দাদির জন্যে হল, এটা দাদির জন্যে হয়েছে, আমার পায়রা।' পায়রা শব্দটা কান্নায় ভাঙা গলায় একটু বিকৃত শোনাল 'আমার পায়রা, আমার পায়রা।' দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাতাসে পালক উড়ছে। এই পায়রার জন্যে অপূর্ব সকালে মার খেয়েছে। এখনও সোঁটা সোঁটা হয়ে আছে গায়ে স্কেলের দাগ। এই পায়রা পরমেশ্বরের পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। কয়েক ঘণ্টায় সংসারের সমস্ত জোড়াতালি খুলে দিয়েছে। সেই পায়রা এখন কোনও এক চতুষ্পদের পরিপাক যন্ত্রে, পাচকরসে, উষ্ণ উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে।

ঘটনাস্থলে হত্যাকাণ্ডের ক্লু খুঁজতে খুঁজতে প্রতিমা ছেলেকে বলছে, 'তোমার দাদির জন্যে পায়রা কেন, এবার একে একে আমরাও যাব, প্রায় তো মেরেই এনেছেন।' বঙ্কিম চিৎকার করে বউকে শাসন করল, 'শাট আপ, একটাও অবান্তর কথা নয়!' বঙ্কিম পরমেশ্বরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, প্রতিমার জিভ উপড়ে ফেলবে, আজ রাতেই কাটবে বেড়াল, যে বেড়াল পরমেশ্বর-পায়রার পালক ছিঁড়ছে নখে করে এই বারো বছর। প্রতিমা বললে, 'শাট আপ কেন? উনি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে না যেতেন, এই কাণ্ডটা হত না। দেখো না পায়রাটাকে কীভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে!' প্রতিমার চোখেও জল। বঙ্কিমের মন থেকে দ্বিপ্রহরের প্রেমের ক্যামফার উড়ে গেছে। প্রেম বড় কঠিন সরোবর। বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যায় না। বঙ্কিম মনে মনে বললে, 'নারী, তুমি তো এই একটি কাণ্ড দেখেই অস্থির হচ্ছ। অস্থিরতাই তোমাদের ধর্ম। আরও কত কাণ্ড ঘটে গেল, তা যদি দেখতে, পেটিকোট পরে ধেই ধেই নাচতে।' মুখে বললে, 'উনি কি তোমাদের বাড়ির দরোয়ান, বসে বসে বাড়ি পাহারা দেবেন!'

'দরোয়ান ভাবলেই দরোয়ান, মালিক ভাবলেই মালিক। ওনার বাড়ি আমরা সবাই আশ্রিত। তুমি যখন বাইরে যাও আমরা কার আশ্রয়ে থাকি? মনেই মথুরা, বুঝেছ?'

প্রতিমা দর্শনের কথা বলছে। বাকি রাতটা দেখছি পায়রার পক্ষে বিপক্ষে সওয়াল জবাবেই শেষ হয়ে যাবে। এরা শেষ রাতে আবার পরমেশ্বরকে আসামির কাঠগড়ায় তুলে বলবে, 'দাও আর্ট গিলটি অফ এ মার্ডার কমিটেড বাই ইয়োর নেগলিজেনস—'

অপূর্বর কান্নাটা হঠাৎ বেড়ে গেল, 'এই দেখো মা, মুন্ডুটা পড়ে আছে।' প্রতিমা ঝুঁকে পড়ল, আর উঠল না। অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন আপনি চলে গেলেন দাদি?' বঙ্কিম ইতিমধ্যেই পরমেশ্বরকে নিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর একটাও কথা বলেননি। অনেক কথা বলে তিনি বোধহয় ক্লান্ত। প্রতিমা পায়রার ছিন্ন মুন্ডুটার সামনে উবু হয়ে বসে আছে। করুণ মুখে চোখের জল। নারকীয় হত্যাকাণ্ড। দুটো পায়ের নখ একপাশে ছিটকে পড়ে আছে। যে পা আর কোনওদিন হাঁটবে না। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের আলপনা চতুর্দিকে। দেয়ালের কোণে দুটো ডানা, যে ডানা শূন্যতাকে আর কোনওদিন খুঁজবে না। ছোট্ট মাথাটা উলটে আছে। মৃত চোখে মরণাতঙ্ক স্থির। ঠোঁট দুটো ফাঁক। প্রাণটা ঠেলে এই পথেই বেরিয়েছে। ছোট ছোট মুড়ির দানা চারদিকে ছড়ানো।

কয়েকটা রক্তে ভিজে লাল মরকত মণির মতো পড়ে আছে। সদ্য সমাপ্ত একটি মাংসপেশি জীবের ভোজের দৃশ্য।

বঙ্কিমের চোখে জল এসে গেল। দুপুরে সে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিম পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল। কাস্টোডিয়ান টার্নড এ শার্কার। পরমেশ্বর তাকিয়ে আছেন বঙ্কিমের দিকে। সারা মাথায় মুখে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো। জামায় ময়লা। ধুতির এখানে ওখানে কাদা। ইন সাইলেনস দে কমিউনিকেট। বঙ্কিমের জলভরা চোখ বলছে, ছি ছি, একী করলেন। মুড়ি তো আমরা কেউ দিইনি। আপনিই দিয়েছেন, তখন কি ঝুড়ি চাপা দেবার কথা মনে ছিল! সব কিছুর প্রতি কেন আপনার এই তাচ্ছিল্য! ইদানীং নিজেরটা ছাড়া অন্য আর কিছু বোঝেন না কেন! হোয়াই শুড গড বিওয়ার্ড ইউ ইফ ইউ লাভ ওনলি দি পিপল হু লাভ ইউ? ইভন দি ট্যাক্স কালেক্টারস ডু দ্যাট।

পরমেশ্বরের চোখ বলছে, আর নিজেকে ঢেকে রাখতে পারছি না। তোমাদের সামনে আমি এখন কাচের মানুষ। আমার ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরমেশ্বরের ঘোলাটে চোখ জল ভাঙছে। প্রতিমা হঠাৎ ফিরে চাইল। পরমেশ্বরকে সে এখন স্পষ্ট দেখছে। যে জায়গা থেকে পরমেশ্বর এতকাল প্রতিমাকে দেখে এসেছেন, সেই জায়গা থেকে প্রতিমা দেখছে পরমেশ্বরকে। 'এ কী' বলে প্রতিমা তাড়াতাড়ি সব ফেলে, সব ভুলে নেমে এল। পরমেশ্বরকে দেখে সে বোধহয় চমকে উঠেছে। ঠিক মাথার ওপর থেকে সোজা আলো ফেলছে ফ্লোরেসেন্ট বাতি। ধূলিধূসর পিতাপুত্র যেন এক পালকের পাখি।

'ওনার হাঁটুর কাছের কাপড়টা রক্তে জবজব করছে তুমি দেখোনি?' প্রতিমা নিচু হয়ে দেখতে গেল। পরমেশ্বর চিৎকার করে বললেন, 'খবরদার।' প্রতিমা চমকে সোজা হল। বঙ্কিম পরমেশ্বরকে ধরে রেখেছিল। খবরদার বলার প্রচণ্ড শক্তি দেখে বুঝল, সাহায্য ছাড়াই তিনি দাঁড়াতে পারবেন। ব্যাটারি রিচার্জিং হয়ে গেছে। হয় এসপার না হয় ওসপার। আজকে সে এই পরিবারের জোড় খুলে দেবে, নো ট্রাকস্টার অ্যান্ড হাকস্টার উইথ এ টাইটানিক টাইর‍্যান্ট। পরমেশ্বর কিন্তু খবরদার বলার শক্তিটা ধরে রাখতে পারলেন না। প্রদীপ যেন জ্বলে উঠেই আবার মৃদু মৃদু হয়ে গেল। তিনি প্রায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আগে বিচার হোক, মাই লাস্ট জাজমেন্ট। আমি খুনি। আমি অ্যাম এ মার্ডারার। যেসব খুনের কোনও সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, কোনও আদালতে যার বিচার হবে না। আমার মনেই আছে সাক্ষী জুরি, বিচারক। এই সংসারটা আমার মার্ডার প্লট।'

প্রতিমা কিন্তু নিজের কাজ করে চলেছে। পরমেশ্বরের উচ্ছ্বাস বা আবেগ তাকে কাবু করতে পেরেছে বলে মনে হল না। কোনওকালেই পারেনি। আজ কী করে পারবে! তার পলিসি, স্পিক আউট অ্যান্ড একজস্ট ইয়োর ফিলিং। সে ড্রয়ার খুলে তুলো বের করেছে, ডেটলের শিশি এনেছে। পরমেশ্বরের হাঁটুর সামনে পা মুড়ে বসতে বসতে বঙ্কিমকে সাবধান করেছে, 'চেপে ধরো, এক্ষুনি লাফিয়ে পালাবেন। ওঁকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।' বঙ্কিম পরমেশ্বরকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। দেহটাকে এই মুহূর্তে সে হয়তো ঘৃণা করছে, কিন্তু পিতৃত্বকে সে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কর্তব্যকে সে মান্য করে। প্রতিমা মেয়েকে হুকুম করেছে, 'দাদির কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে ধর।' অপূর্বকে বলেছে 'পাখাটা নিয়ে আয়।'

পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বন্দি। সত্যিই তিনি মাইনরিটি। বঙ্কিম ল' অফ মালটিপ্লিকেশানে ক'বছরেই শক্তি বাড়িয়ে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে সে ব্যাটেলিয়ান তৈরি করতে পারে, অক্ষৌহিনী বাহিনী গড়তে পারে। সে শক্তি ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। তুলোর ড্যাবারে ডেটলের প্রথম প্রলেপ হাঁটুর থ্যাঁতলানো জায়গার ওপর পড়েছে। পরমেশ্বরের মুখটা কুঁচকে উঠেছে।

'উঃ আই হ্যাভ কিলড ইয়োর মাদার, তোর মাকে।'

'উঃ তোর জ্যাঠাইমাকে।'

'উঃ তোর জ্যাঠামশাইকে।'

'উঃ তোর শ্বশুরকে, হীরালালকে।'

প্রতিমা দ্রুত হাতে সব ক'টা ক্ষতে ডেটল চালাচ্ছে। অপূর্ব ফ্যাটাফ্যাট পাখা চালাচ্ছে। শুভা কখন এপাশের কখন ওপাশের কাপড় ক্রমশই ওপরে তুলছে। কাপড়ের ফ্রন্টিয়ার যত সরছে নতুন নতুন ক্ষত বেরোচ্ছে। পরমেশ্বরের খুনের তালিকায় প্রতিমা একটা যোগ করল, 'তোর শ্বশুরকে।'

'উঃ তোর শ্বশুরকে, হীরালালকে।'

'উঃ তোদের প্রত্যেককে, তোদের প্রত্যেককে আমি খুনের ষড়যন্ত্র করেছি।'

'উঃ দগ্ধে দগ্ধে, তিলে তিলে, আই অ্যাম দ্যাট মার্ডারার, নাও ডিটেক্টেড।'

'উরে বাপ রে, বউমা, ভীষণ জ্বলছে।'

প্রতিমার হাত থেকে তুলো পড়ে গেল, ডেটলের শিশিটা অপূর্বর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অবাক প্রতিমা, পরমেশ্বরের জলে ভেজা যন্ত্রণাকুঞ্চিত মুখের দিকে চেয়ে আছে। কী করে বেরোল ওই ছোট্ট শব্দটা। বারো বছর যে শব্দটা শোনার জন্যে সে আকুল। পেন কার্ভ কতটা উঠলে মানুষের মধ্যে দেবতার জন্ম হয়। প্রতিমা চোখের সামনে দেখছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে, চারিদিকের ক্ষতস্থান থেকে জমাট রক্ত নেমেছে, মাথায় কাঁটার মুকুট, ছিন্ন বসন, গ্যালিলির মানুষরা যেন তাঁকে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে। প্রতিমা শাড়ির আঁচলটা তুলে পরমেশ্বরের মুখটা মুছিয়ে দিতে গিয়ে, 'বাবা' বলে পরমেশ্বরের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পরমেশ্বর দু'হাত দিয়ে প্রতিমাকে বুকে টেনে নিলেন। একটা হাত মাথার পেছন দিয়ে সস্নেহে রাখলেন। কারু মুখে কোনও কথা নেই। পায়ের চারপাশে পায়রার পালক উড়ছে। বাইরে হাওয়ার রাত। হঠাৎ বঙ্কিম আবিষ্কার করল সে পাশে পড়ে গেছে, তার আর কোনও ভূমিকাই নেই।

দুটো বরফের স্তূপ পাশাপাশি ভেসে চলেছিল, হঠাৎ সশব্দে এক হয়ে গেল।

হে মুনি, তোমার এ যজ্ঞ কি ঠিক হয়েছে! বঙ্কিমের সংশয় প্রশ্ন করেছিল পরমেশ্বরের কৃচ্ছ্রতা বিলাসী মনকে। পরমেশ্বরেরও বোধহয় সংশয় ছিল। স্পষ্ট করে কিছু বলার আগেই কোথা থেকে একটা নেউল এসে যজ্ঞের নিভে যাওয়া আগুনের ভস্মের ওপর বারকতক লুটোপুটি খেল। স্বর্ণময় নেউলের শরীর। পরমেশ্বরের বুকে স্বর্ণময় প্রতিমা। বৃদ্ধ চোখ তুলে বঙ্কিমের দিকে তাকালেন—'দেখ, দেখ ব্যাটা, আমার যজ্ঞ বিফল হয়নি।'
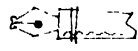
ক্যানসার

মহাদেবদা চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেলে রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, 'এক্ষুনি হাজারটা টাকা আমি তোমাকে কোত্থেকে দেব শঙ্কর! বুঝেছি বিপদে পড়েছ। আমার ব্যাবসার অবস্থাও তো গত কয়েক বছরই তেমন ভাল যাচ্ছে না। আঃ, আজ আবার আকাশটা মেঘ মেঘ করছে। ঠিক বৃষ্টি নামবে সন্ধের দিকে! মধু, মধু!'

'আমি তা হলে উঠি মহাদেবদা?'

'আই অ্যাম সরি শঙ্কর। ভেরি ভেরি সরি। মধু এসেছিস! কাপটা সরিয়ে নে। আর শোন, কাল সকালে তেজপুরে যে মাল যাবে, প্যাকট্যাক করে আজই রেডি করে রাখ।'

'আসছি তা হলে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এসো। বিলম্ব করে লাভ নেই। তবে একেবারেই শুধুমুখে যাবে! তোমাকে আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে শ'দুয়েক হয়তো দিতে পারি। নেবে?'

'শ'দুয়েক! আচ্ছা তাই দিন। এইভাবে চারদিক থেকে কী সংগ্রহ করা যায় দেখি!'

'তা হলে একটু বোসো!'

মহাদেবদা ড্রয়ার খুলে টেবিলের আড়ালেই টাকাটা গুনলেন। টেবিলের ওপরে তোলার সাহস হল না, পাছে দেখে ফেলি! কুড়িটা ময়লা ময়লা দশটাকার নোট আমার দিকে ঠেলে দিলেন।

'গুনে নাও, গুনে নাও। টাকা সবসময় কাউন্ট করে নিতে হয়।'

নেতাজি সুভাষ রোডের ইংরেজ আমলের বাড়ি। পুরনো কাঠের সিঁড়ি। কোণে কোণে আবর্জনা। দেয়ালে পানের পিক। এমনিই অন্ধকার। আকাশে ঝুলকালো মেঘ জমে সন্ধে যেন এখনই ঘনিয়ে এসেছে! দুশো। দুশো টাকায় কী হবে। কয়েক হাজার টাকার মামলা। আজকাল চোখে তেমন ভাল দেখি না। সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ কোথায় কীভাবে পড়ে আছে বুঝতেই পারছি না। পা ঘষে ঘষে, বাঁদিকের রেলিং ধরে ধরে অনেকটা আন্দাজেই ফুটপাথে এসে পড়লুম। একটা ঝাঁকামুটে ঝাঁকায় একটা ট্রাইসাইকেল নিয়ে, খবরদার খবরদার করতে করতে প্রায় গোঁত্তা মেরেই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল। মাথাটা ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে! কয়েকদিন ধরেই দেখছি ছোটখাটো নানা দুর্ঘটনা থেকে এইভাবেই একটুর জন্যে বেঁচে যাচ্ছি। কে যেন বাঁচিয়ে দিচ্ছে! কে তা জানি না। কাল এসপ্ল্যানেডে ট্রামের চাকার তলায় যেতে যেতেও গেলুম না। কে যেন হ্যাঁচকা টানে ফুটবোর্ডে তুলে নিল। ফুটবোর্ডে তখন কিন্তু কেউ ছিল না!

আকাশের দিকে তাকালুম। কলকাতার আকাশে কোনও রহস্য নেই। তবু মনে হল কিছু আছে, অবশ্যই কিছু আছে ওখানে, যা এখানে নেই। এদিকের আকাশে গোটা কতক চিল পাক মারছে, ওদিকের আকাশে ঘন কালো মেঘ।

ভাবনাটাবনা এখন থাক। ট্রাম ধরে ভবানীপুরে অনেকদিনের বন্ধু সমরের কাছে যাই। অঢেল পয়সা। প্রাচুর্যে লুটোপুটি খাচ্ছে। একসময় সামান্য কিছু উপকারও করেছিলুম। ব্যাচেলার মানুষ। ইচ্ছে করলে ধার দিতেও পারে।

সমরের বাড়ির সামনে যখন পৌঁছোলুম ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নির্জন বাড়ি, শান্ত পাড়া। কলিং বেলের বোতাম চোখে পড়ছে। বাড়িটা সমরের নয়। কার বাড়ি! সমর এখানে থাকেই বা কেন! কে জানে কী রহস্য! এই সময়টায় সমর দিবানিদ্রা দেয়। তিনটে-টিনটে নাগাদ ফিরে এসে

খায়। খেয়ে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোয়। কিছুক্ষণ টি-ভি দেখে। বড় গেলাসে চা খায়। তারপর বিলিতি সাবান মেখে চান করে সেজেগুজে কলকাতার নৈশজীবন ভোগ করতে বেরোয়।

তিনতলার বিশাল ঘরে সমরের অপরাহ্ণ বিলাস। লাল সিল্কের লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি। ফুলো ফুলো ফরসা মুখ। অতিরিক্ত মদ্যপানে দু'চোখের নীচে দুটো পাউচ। আমাকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। ল্যাপডগের মসৃণ লোমে হাত বোলাতে বোলাতে একটা আয়েশি হাই তুলল তিন ভাঁজে ভেঙে ভেঙে।

'অসময়ে তোমার ঘুমটা ভাঙাতে হল।'

'আমি এসময়ে কারু সঙ্গে দেখা করি না, নেহাত তুমি বলেই উঠতে হল। চা খাবে তো?'

'না, না, চা থাক। আমি বরং উঠি।এদিকে এসেছিলুম তাই একবার দেখা করে গেলুম।'

'আরে যাবে কোথায়? বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। না থামলে যাবে কী করে! বলো তোমার খবর কী?'

আমার খবর জানতে চাওয়াটা নেহাতই একটা প্রথার প্রথা। খবর যদি বলতে শুরু করি সমরের হাই উঠতে আরম্ভ করবে। শব্দ করে একটু হেসে ওঠাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এযুগে প্রাণহীন হাসির মতো সহজ ব্যায়াম আর কী আছে?

সমর একটু আড়মোড়া ভাঙল। কুকুরটা লাফিয়ে কোল থেকে নেমে বিছানায় গিয়ে উঠল।

বড্ড বেশি মদ খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আজকাল। রাত্তির দুটো-তিনটে বেজে যাচ্ছে ফিরতে ফিরতে।

আবার একটু শব্দ করে হাসি। সমরের জীবনের এইটাই সমস্যা! প্রতিদিন পার্টি আর প্রচুর মদ্যপান।

সমর সিগারেট বার করল। সিগারেট কেসটা খুলতেই একটা জলতরঙ্গের মতো বাজনা বাজতে লাগল। বাঃ, বেশ ছেলে-ভোলানো খেলনা তো। অনেক টাকা, অফুরন্ত অবসর থাকলে মানুষ কত কিছু নিয়েই না মেতে থাকতে পারে।

'এই নাও ধরো।' সমর আমার দিকে সেই বাদক সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরল।

'ইচ্ছে করছে না।'

'আরে নাও। নাম শুনলে পরে পস্তাবে। বেনসন অ্যান্ড হেজেস। সিগারেট কেসটা দেখেছ! জাপান থেকে আনানো।'

সমর একটা সাদা ধবধবে গ্যাসলাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এটা ফ্রান্সের।'

'একেবারে ইন্টারন্যাশনাল সমাবেশ!'

'আমি দিশি জিনিস কক্ষনও ব্যবহার করি না। বাথরুমে গিয়ে দেখে এসো, কক্ষনও শোঁকোনি, স্পেনের সাবান। যাও না হাতটা ধুয়ে এসো।'

বাথরুমে যাবার প্রয়োজন ছিল অন্য কারণে। সমরের বাথরুম সমরের মতোই ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। কাচের তাকে নানা ধরনের সুন্দর শিশিতে নানা বর্ণের তরল ও ঘন পদার্থ। শ্যাম্পু, মাসাজ অয়েল, হেয়ার অয়েল, পেস্ট, ক্রিম। সাবানদানিতে সেই বিখ্যাত সাবান। গোলাপি রঙের ছোট্ট এতটুকু জিনিস। গন্ধটার মধ্যে একটা মনকেমন করা উপাদান আছে।

সমরকে টাকার কথা বলতে পারলুম না। বেচারা ভোগে এত জর্জরিত যে তাকে আমার দুর্ভোগের কথা বলে ধাক্কা মারতে ইচ্ছে হল না। বৃষ্টি থেমেছে। ভিজে হাওয়া দিচ্ছে। অল্প অল্প জল জমেছে চারদিকে।

বড় রাস্তায় এসে কোনও ট্রাম, বাস চোখে পড়ল না। চেপে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হলেই কলকাতার অবস্থা বেহাল। কোনওরকমে আমাকে দু'দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা পেতেই হবে। পয়সাঅলা আত্মীয় দিয়েই শুরু করেছিলুম। মহাদেবদা অতি কষ্টে অনেক ন্যাজে খেলে মাত্র দুশো টাকা দিলেন। এমন ভাব করলেন যেন আমি যদি কিছু টাকা দিতে পারি তা হলে বেঁচে যান।

অনেকদিনের বন্ধু সমরকে তো কিছুই বলা গেল না। প্রথমে সে তার ঐশ্বর্য দেখালে, শেষকালটায় কেবল আক্ষেপ, ভাল মেয়েছেলে নাকি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তেমন। কল গার্লে তেমন সুবিধে হচ্ছে না। মদ খেয়ে খেয়ে চোখের কোল ফুলে যাচ্ছে, পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে। মহা সমস্যা।

এই ভিজে ভিজে প্রায় জনশূন্য রাস্তায় নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল। কোন ভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি! কাদের মধ্যে আমার বসবাস! দোকানের আলো সারি সারি আমার দিকে ভিজে ভিজে চোখে তাকিয়ে আছে। ঠান্ডা বাতাস মৃতের আঙুলের মতো কপালে হাত বুলোচ্ছে।

হাজরার মোড়ে একটু অন্ধকার মতো জায়গায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। কেমন যেন চনমন করছে। এদের আমি চিনি। এরা রাতের পাখি। মনে হল আমিও পাশে দাঁড়িয়ে যাই। দু'জনেরই তো একই সমস্যা! টাকা চাই, টাকা। ওই মেয়েটির তবু ভাঙাবার মতো দেহ আছে। আমার তো সে সম্পদ নেই। বিদেশে শুনেছি পুরুষ গণিকার চল হয়েছে। পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় মেয়েটি সন্দেহের চোখে একবার তাকাল। অভ্যস্ত চোখ। জানে কে ভিড়বে, কে ভিড়বে না। আমি তোমার খদ্দের না হলেও সমব্যথী তো হতে পারি। কোথাও পাশাপাশি বসে চা খেতে পারি দু'জনে। জিজ্ঞেস করতে পারি— জীবন কীরকম? কেমন লাগছে তোমার বাঁচতে! টাকার বাজার কেমন বুঝছ? পকেটে আমার শ'দুয়েক ধার করা টাকা, বুকপকেটের তলার পকেটে উঁচু হয়ে আছে। এই টাকাটায় কার প্রয়োজন বেশি— তোমার না আমার! মেয়েটি হঠাৎ কলের পুতুলের মতো চলতে শুরু করেছে। কীসের টানে? ওঃ হো টাকার টানে। বেশ বাহারি একটি যুবক থেমে থেমে এগিয়ে চলেছে। এইভাবেই ওরা ট্রামলাইন পেরিয়ে রাস্তার ওপারে যাবে। পার্কের পাশ দিয়ে একটু নির্জন অন্ধকার জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি হবে। গায়ে গা ঘষবে। শাড়ির ভাঁজ নষ্ট না করেই মেয়েটির হাতে কড়কড় করে উঠবে সহজে রোজগার করা কিছু টাকা।

দু'জনেই টাকার টানে রাস্তায় নেমেছি। একজন রোজগারে আর একজন ধারে।

একবার মানসের কাছে যাই। এই তো কাছেই। সরকারি চাকরি ছেড়ে প্ল্যাস্টিকের কারখানা করেছে। ব্যবসাদারদের অনেক মহাজন জানা থাকে। চড়া সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়। এমনি যখন পাচ্ছি না তখন না হয় সুদেই নোব। আরে ভেবে কী হবে! মাথা না হয় বিকিয়েই যাবে, তবু তো একটা জীবন বাঁচতেও পারে!

দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছি মোলডিং মেশিনের শব্দ। জোর কাজ হচ্ছে মানসের কারখানায়। বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছি মানস কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কথা বলার তালে তালে ঠোঁটের সিগারেটটা নাচছে। বাইরে রাস্তার ওপর একটা নতুন মোটরসাইকেল দাঁড় করানো। আমি ঢুকছি, মোটামতো একজন লোক প্রায় ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল। ধাক্কা খেয়ে টলে পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে সামলে নিলুম। লোকটি মাতাল। অ্যালকোহলের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। মানস আমাকে দেখতে পায়নি। মাথা নিচু করে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তাও হুঁশ নেই!

'কী রে মানস?'

মানস চমকে উঠেছে। মুখ দেখে মনে হল আমাকে চিনতে পারেনি। চিন্তার জগৎ থেকে বর্তমানে ফিরে আসতে সময় নিল।

'শঙ্কর, তুই!'

'হ্যাঁ আমি। বিপদে পড়ে তোর কাছে ছুটে এলুম।'

'আমার চেয়েও তোর বিপদ!'

'তোর বিপদটা তো জানি না ভাই। দাঁড়া আগে একটু বসি। চা খাওয়া। বাইরে বৃষ্টিতে যা অবস্থা হয়েছে!'

'চা খাওয়াচ্ছি। তার আগে তোর বিপদটা বল। বাড়ির সব ভাল তো!'

'না রে, ভীষণ অসুখ-বিসুখ চলছে। টাকা টাকা করে হন্যে হয়ে ঘুরছি।'

'কার অসুখ রে?'

'আমার বউ সুধার।'

'কী হয়েছে?'

'ক্যানসার।'

'সে কী রে! কী করে বুঝলি?'

'বায়পসি হয়েচে। আরও কী সব টেস্টমেস্ট হয়েচে।'

'কোথায় হয়েচে?'

'ব্রেস্ট।'

মানসের মুখটা যেন কীরকম হয়ে গেল। মনে হল চোখের সামনে সে যেন ক্যানসারকে দেখতে পাচ্ছে। আমার একটা সুবিধে হয়েছে। প্রথম কয়েকদিন আমিও ক্যানসারের চিন্তায় কাবু হয়ে পড়েছিলুম। এখন সব চিন্তা চাপা পড়ে গেছে টাকার চিন্তায়। অপারেশানের খরচ, রে দেবার খরচ, সব মিলিয়ে হাজার তিনেকের ধাক্কা। বাঁচা মরার প্রশ্ন তার পর।

মানস চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'কত টাকা লাগবে?'

'হাজার নিয়ে নামতে হবে, তিনে গিয়ে ঠেকবে। মেজর অপারেশান। রে দিতে হবে। তারপর কী হবে ভগবান জানেন।'

'কোথায় পাবি অত টাকা! এ বাজারে অত টাকা তোকে কে দেবে! তোর কোনও সেভিংস নেই?'

'সেভিংস! সংসারই চলে না, সেভিংস! ক'টাকা মাইনে পাই রে!'

'কী করবি তা হলে?'

'ধার করব। সেইজন্যই তো বেরিয়েছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তোকে কে ধার দেবে রে! দু'-দশ টাকা ধার চাওয়া যায়, দুম করে হাজার টাকা কার কাছে চাইবি!'

'কেন, তোর কাছে চাইব। তোর এত বড় ব্যাবসা। মনে আছে একসময় তুই আমার সহকর্মী ছিলি। তোর চাকরি একবার আমার জন্যেই বেঁচে গিয়েছিল। চাকরি ছেড়ে যখন ব্যাবসা করতে গেলি আমি তখন তোকে সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিলুম। সে তো আজ কত বছরের কথা। কই আমি তো তোর কাছে কোনওদিন আসিনি। একটা জীবন-মরণের প্রশ্নে তোর কাছে ছুটে এসেছি।'

'তুই এত কথা বলছিস কেন শঙ্কর। আমার জন্যে কে কী করেছে আমি মনে রেখে বসে নেই! কেউ যদি মনে করে থাকে তার জন্যেই আমি আজ দাঁড়িয়েছি, তাকে ভাবতে দাও। তার মানে এই নয় কারুর সাহায্যে আমি বড় হয়েছি। আমি আমার জোরে দাঁড়িয়েছি। কবে তুই আমাকে পঞ্চাশ কি একশো টাকা দিয়েছিস সেই জোরে তুই আজ হাজার টাকা দাবি করতে এসেছিস। নিয়ে যা তোর একশো টাকা।'

মানস ড্রয়ার থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে আমার দিকে উড়িয়ে দিলে।

'এতদিন তুই টাকাটা দিসনি কেন? আজ তুই সামান্য কথায় মেজাজ দেখিয়ে টাকাটা ফেরত দিচ্ছিস। এটাও তোর একটা বড় চাল, আরও বেশি চাইবার পথটা তুই মেরে দিলি।'

'শঙ্কর, আমার মন-মেজাজ আজ মোটেই ভাল নেই। আমি হাত জোড় করে বলছি তুই এখন চলে যা। আমি ধারের কারবার করি না। যারা করে তাদের কাছে যা।'

'আমি ঢুকতেই, ওই লোকটা কে রে, ধাক্কা মেরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল! চেনা চেনা মনে হল।'

'রমেন।'

'কোন রমেন?'

'আমাদের সঙ্গেই কাজ করত, পরে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে চলে গেল।'

'ভালই আছে কী বলো?'

'জানি না। আমরা যদ্দিন থাকব, তদ্দিন ওরাও ভাল থাকবে।'

মানস উঠে দাঁড়াল। ওর হাবভাব দেখে নিজেকে মনে হল ভিখিরি। ভিক্ষে চাইতে এলে মানুষের মুখে চোখে এইরকম বিরক্তি ফুটে ওঠে। আমার দিকে না তাকিয়েই মানস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাক, তিনশো হল। এখনও আরও সাতশো বাকি। হাজার হলে সুধাকে অপারেশন টেবিলে তোলা যাবে। তারপর আরও দুই। পথ্য, ওষুধ, হাসপাতালের খরচ, রে। এ যেন রেস খেলা। টাকা নিয়ে মাঠে নেমে বাজি ধরো। জিততেও পারো, হারতেও পারো। পুরো টাকাটাই জলে যেতে পারে। সে সম্ভাবনাও আছে। ডাক্তার বলেছেন সিক্সটি-ফর্টি চান্স। কী হয় আমি যদি সুধার জন্যে এত না ভাবি! সুধার সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। অচেনা অজানা একটা মেয়েকে বিয়ে করে এক ধরনের চুক্তিবদ্ধ জীবন শুরু করেছিলুম। শঙ্কর যেমন সুধার কেউ ছিল না, সুধাও তেমনি শঙ্করের কেউ হত না একসময়ে। জীবনে জীবন জুড়ে এ কী যন্ত্রণা! উদাস হবার চেষ্টা করেও উদাস হওয়া যাবে না। বন্ধন, বন্ধন। থিয়েটারের হিরোর মতো বোধহয় জোরে চিৎকার করে ফেলেছি। পথচারীরা তাকিয়ে দেখছে। ভাবছে পাগল। ওরে আমি শ্যান পাগল. বুঁচকি আগল। এখন আমি বেপরোয়া। ফেটালিস্ট! যা হবার হবে। যাদের প্রচুর টাকা তাদের হাঁচিকাশি হলেও নার্সিংহোম। আর আমার স্ত্রীর! ক্যানসার। আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরে চেপে চেপে এখন এমন অবস্থায় এসেছে আর চেপে রাখা যায় না। চাপা ছিল, বেশ ছিল। এখন জেনে ফেলে আর চুপ করে বসে থাকা যায় না।

গ্র্যান্ড হোটেলের তলায় ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। আমার মতো কিছু হা-ঘরে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। ডিঙি মেরে মেরে দেখছে। মাঝে মাঝে পুলিশ লাঠি দিয়ে আবর্জনার মতো ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। একজনকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম— 'কে আসছে ভাই!' আমার দিকে না তাকিয়েই লোকটি বললেন— 'জিনাত আমন।' আমার দিকে তাকাবার সাহস হল না, বলা যায় না নিমেষের জন্যে জিনাত আমন যদি ফসকে যায়। অনেকদিন আগে কী খেয়ালে রংবেরঙের একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন কিনেছিলুম, শুয়ে শুয়ে রাত্রিবেলা সুধাকে বেশ আদরে থাকা, তোয়াজে থাকা সুধাদের শরীরের লোভ দেখিয়ে কাছে টানব বলে। সেই কাগজটাতেই দেখেছিলুম কত দুর্ভাবনা। জনৈক চিত্রতারকা বলছেন, কোনও এক হিরোইন আর এক হিরোইনের চেয়ে নাকি ভারী। দু'জনকেই আমরা পরদায় দেখেছি। সুধাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম— 'তোমার কী মনে হয় সুধা! আমার তো মনে হয় চিত্রতারকা যে নায়িকাকে ভারী বলছেন তিনি হালকা।' সুধা বললে, 'কী করে বলব বলো। ওই মহিলাকে তুমিও তোলোনি আমিও তুলিনি। ছায়াটাই কেবল পরদায় দেখেছি। যিনি প্রায়ই পাঁজাকোলা করে তোলেন তিনি যখন বলছেন, মেনে নিতেই হবে।'

সারারাত মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। যাঃ, তা কী করে হয়। ভাল ঘুম হল না। ভোরবেলা বাজারে গিয়ে রথীনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কী মনে হয়, নায়িকা এক্স ভারী না ওয়াই ভারী।' রথীন ঢেঁড়শ বাছছিল। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তুমি বরং একটা ডাব খেয়ে নিয়ো আজ। পেট গরম হয়েছে।'

সেইরকম এক নায়িকা এসেছেন হোটেলে। যিনি সারা শরীরে মোম মাখেন। যৌবন ধরে রাখার জন্য বিউটি পারলারে যান। মুখে পুলটিস লাগিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যাঁর সারাদিনের খরচে আমার স্ত্রীর অপারেশনটা সহজেই হয়ে যেতে পারে।

পুলিশের ঠেলা খেয়ে ভিড়ের মানুষগুলো একটু হুটোপাটি করে নিল। নিজেকে মনে হল রাস্তার কুকুর। একজায়গায় জড়ো হয়ে ন্যাজ নাড়ছি। একগাদা দিশি কুকুর। কে বলেছে, আমি একজন সম্মানিত ভারতবাসী। ভালভাবে খেতে পাই না, পরতে পাই না, সংসার করতে পারি না। অসুস্থ

স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারি না। জন্মেছি দারিদ্র্যের হাতে মার খেতে খেতে মরার জন্যে। ম্যাগাজিনের পাতায় যৌবন খুঁজি নিজেকে জরার দিকে ঠেলে দিয়ে।

শালা। শালা শঙ্কর। বোকা শঙ্কর। কৃতদাস শঙ্কর। নপুংসক শঙ্কর।

মেট্রোর তলায় মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফটোগ্রাফার মাইকেল দোসী। ভারতীয় খ্রিশ্চান। মনিকো থেকে হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে। হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে নিয়ে গেল। গাড়িটা ওখানেই পার্ক করে রেখেছে। গোটাকতক গাড়ির মালিক। বিরাট পয়সাঅলা লোকের ছেলে। গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে মাইকেল বললে, 'অনেকদিন পরে আজ ধরেছি। সহজে ছাড়ছি না।'

পরিষ্কার বাংলা বলে। বলতে পারে, লিখতে পারে না।— 'নিন উঠে পড়ুন।'

সামনের দরজার লকটা খুলে দিয়েছে। সামনের আসনে একগাদা বই, ম্যাগাজিন।

'আজকে আমি যে একটু ব্যস্ত আছি। আর একদিন হবে।'

'আরে দূর মশাই। উঠুন তো। আমি বাড়ি পৌঁছে দেব। বৃষ্টির পর বাস, ট্রাম সবই তো ইরেগুলার হয়ে গেছে। বাড়ি বাড়ি করছেন, বাড়ি যাবেন কী করে!'

কথাটা ঠিক। একটা বাস ধরতে কালঘাম ছুটে যাবে। মাইকেল আর যাই করুক, কোনও এক সময়ে বাড়িতে ঠিক নামিয়ে দেবে। আগেও দু'-একবার দিয়েছে। কিন্তু বড়লোকের সঙ্গে ঘুরতে নিজেকে কীরকম মোসায়েব মোসায়েব মনে হয়। প্রচণ্ড খাওয়াবে। সেটাও এক বিপদ। যে খাওয়ার বদলে খাওয়াতে পারব না সেই খাওয়া খেতে বসে কীরকম কাঙালির মতো সংকুচিত হতে হয়।

মাইকেল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। কোথায় যাবে কে জানে। প্রথমে একটা ফটোগ্রাফির দোকানের সামনে গাড়ি থামাল। আমাকে একটু বসতে বলে ক্যামেরা নিয়ে নেমে গেল, বসে থাকতে থাকতে মনে হল, মাইকেলের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় হল। কথাটা ঠিক মতো ওর মনের কিনারায় পৌঁছে দিতে পারলে, দু'-তিন হাজার টাকা মাইকেলের হাতের ময়লা। আশার আলো দেখছি, এখন বেশ ভাল লাগছে। মনের ছটফটানিটা কেটে গেছে।

দু'-দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। যেন দেবদূত এল। গাড়ি এখন পার্ক স্ট্রিটের দিকে চলেছে। বুঝেছি কোথায় নিয়ে চলেছে। এখন আর কোনও প্রতিবাদ নয়। বরং একটু প্রগল্‌ভ হই। একটু তোষামোদ করি। চাটুক্তি সুবিধে আদায় করার বহু পরীক্ষিত ধারালো অস্ত্র। আগেকার দিনের জমিদারদের পেছন পেছন ফেউয়ের মতো চাটুকার ঘুরত। কে বলতে পারে আমার কোনও পূর্বপুরুষ চাটুকার ছিলেন কি না! আহা মাইকেল, সেদিন ওমুক কাগজে আপনার একটা লেখা পড়লুম। কী অসাধারণ আপনার ইংরেজি। যেমন লেখার হাত তেমনি আপনার ছবির হাত। কোনও তুলনা নেই। আহা মাইকেল, কী অসাধারণ আপনার গাড়ি চালাবার হাত। কীভাবে এদিক-ওদিক দিয়ে সুট-সুট করে বেরিয়ে চলেছেন। ক'টা লোক এইভাবে গাড়ি চালাতে পারে!

কারনানি ম্যানশেনের মধ্যে গাড়ি পার্ক করে আমরা মাইকেলের সেই প্রিয় বার-এ এসে ঢুকলুম। বহুদিন আগে মাইকেলের সঙ্গে এক দুপুরে এখানে এসেছিলুম। রাতের চেহারা অনেক জমজমাট। একটি মেয়ে শরীর দুলিয়ে নাচছে। হাতে মাইক্রোফোনের স্পিকার। মুখে ইংরেজি গান। লম্বা লম্বা চুলঅলা ইয়াংকি মার্কা কয়েকটি ছেলে বাজনা বাজাচ্ছে।

সেই আলো-আঁধারী পানশালায় নিজেকে ভীষণ অপরিচিত মনে হল। বিবেকে অপরাধের কাঁটা খচখচ করছে। চোখের সামনে সুধাকে দেখতে পাচ্ছি। চিত হয়ে শুয়ে আছে। বালিশে ছড়িয়ে রয়েছে রুক্ষ চুল। বুকের আড়ালে অতি দ্রুতগতিতে দেহকোষ বিভক্ত হয়ে চলেছে। যাকে থামাবার ক্ষমতা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে নেই। সুধা যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর আমি বসে আছি শুঁড়িখানায়। সামনে প্লেটে বাদামি করে ভাজা চিংড়ি, পাশে লম্বা গেলাসে ফেনা ফেনা ঠান্ডা বিয়ার।

শঙ্কর, সেন্টিমেন্টাল হোসনি। এই তো জীবন। কে বলতে পারে, তোমার শরীরের কোনওখানে হয়তো এই মুহূর্তে একটি ক্যানসারের ভ্রূণ তৈরি হয়েছে। আজ আছ, কাল থাকবে না। ভেবে কী হবে, কষ্ট পেয়ে কী হবে! মানুষের নিয়তিও তো ক্যানসারের মতো। অপ্রতিরোধ্য। ওই যে মেয়েটা যৌবন দেখিয়ে, পাছা দুলিয়ে নাচছে, দশটা বছর যেতে দাও, ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। জীবন ফুটোপাত্রে জলের মতো। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তেই থাকবে।

'আর একটা হোক!'

'না মাইকেল, আর না। আমার অভ্যাস নেই। খুব মাঝেসাঝে অনুরোধে খাই।'

'ঠিক আছে, এইটাই শেষ।'

'ক'টা বাজল আপনার ঘড়িতে?'

'সাড়ে নয়। দি নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।'

বেশ যেন নেশা হয়েছে। পায়ের তেমন জোর পাচ্ছি না। শরীরটা যেন অসম্ভব ভারী। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মহানগরীকে দেখছি। চোখের সামনে যেন অসংখ্য সুন্দরী নাচছে। তেমন করে আর ভাবতে পারছি না। তেমন ভাবে আর বিষণ্ণ হতে পারছি না। আমি নেই। আমার আমিটা উবে গেছে। কে সুধা! কী হয়েছে তার। ক্যানসার। ক্যানসার সারে না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামিকে আজ হোক কাল হোক মরতেই হবে। চিন্তা করতে হয় সে করবে। আমি কেন শুধু শুধু ভেবে মরছি। আমার হলে আমি ভাবব। আমার টাকা জোগাড়ের ভাবনা কে ভাবছে! আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হচ্ছে। সুধা ভাবছে?

মাইকেল হঠাৎ গাড়িটাকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে যেতে যেতে ধাঁ করে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিলে। এটা আবার কোন রাস্তা! আলো নেই। দু'দিকে দুটো অন্ধকার বাড়ি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভাঙা মোটর একপাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

'নিন নেমে পড়ুন।'

'এখানে কেন নামব? এটা তো আমার বাড়ি নয়।'

'হারি আপ, হারি আপ।'

একী, মাইকেল আমাকে আদেশ করছে— আমি কি ক্রীতদাস! তুমি কি নিশ্চিত জানো, তুমি ক্রীতদাস নও! তুমি কি নিশ্চিত জানো, তুমিই তোমার প্রভু!

'পেছন পেছন চলে আসুন। জায়গাটা ভাল নয়। আরে ভয় কীসের, আমি তো সঙ্গে রয়েছি।'

মেয়েটি মাইকেলের পরিচিতা। এইসব মেয়েরা যেমন হয় ঠিক সেইরকম। গতরটি খাসা। পিঠে বালিশ দিয়ে খাটে পা ছড়িয়ে বসে আছে। গোল গোল পা দুটো সায়ার ফাঁক দিয়ে শরীরের সামনে এগিয়ে আছে। বুকে আঁচল নেই। যেন আর এক বিছানা। এসো ধামসে যাও।

'বসুন,' বলে পা-টাকে একটু সরিয়ে নিল।

পায়ের কাছে বসব নাকি! এ কি সুধা? যে সুধার পায়ের কাছে বসে উলের গোলা নিয়ে খেলা করব! সুধা বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে ধমকে উঠবে— কী হচ্ছে কী? সেইটাই তো ছুটির দিনের ভীষণ মজা। পরিবারের সঙ্গে মজা করা যায়। যে আমার পরিবার নয় তার সঙ্গে কী করা যায় আমার মাথায় আসছে না।

মাইকেল সোজা গিয়ে মেয়েটির তলপেটে মুখ গুঁজে পড়ল। দু'হাত দিয়ে চর্বিঅলা কোমরটা জাপটে ধরেছে। এসব মেয়েদের কাতুকুতু লাগে না, এই একটা সুবিধে। মেয়েটি বলছে, 'না না, আমি মাতাল নোব না। তুমি মদ খেয়েচ।'

কোলে গোঁজা মাইকেলের মুখ জড়ানো গলায় বলছে, 'বিয়ার, স্রেফ বিয়ার, ছ'বোতল বিয়ার।'

'বিয়ারেও নেশা হয় গো, নেশা হয়।'

মাইকেল উঠে বসেই আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল। প্রস্তুত ছিলুম না। হুড়মুড় করে

মেয়েটির ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম। দু'জনেই বিছানায় চিতপাত। মেয়েটি নীচে আমি ওপরে। মনে হল একটা তাকিয়ার ওপর শুয়ে আছি। মেয়েটি বলছে, 'কী যে করো না মাইরি! অসভ্য।'

আমি উঠতে চাই। উঠে দাঁড়াতে চাই। পালাতে চাই। পড়ে গেছি তাই আর উঠতে পারছি না। মন বলছে, সুধার অসুখ, অনেক রাত হল। তিন হাজার টাকা, তিন হাজার টাকা।

আমি শুয়ে শুয়ে কান্না জড়ানো গলায় বললুম, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার বউয়ের ক্যানসার।'

'ক্যানসার! আহা রে? কোথায় ক্যানসার গো!'

'বুকে, বুকে, ব্রেস্টে— স্তনে ক্যানসার।'

'এইখানে?'

ফস করে জামার বোতাম খুলেছে। ভেতরের সাদা জামা দুটো পাহাড়ের মতো চোখের সামনে।

'হাঁ ওইখানে।'

'এইখানে?' মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে। বিছানায় কনুইয়ের ভর রেখে হাতে মাথা রেখে মেয়েটি শরীরের ঊর্ধ্বাংশ মৎস্যকুমারীর মতো ফেলে রেখেছে। আমার চোখের সামনে ঝুলছে দুটো থলথলে মাংসপিণ্ড। বড় লোভ ছিল একসময়। সুধা এল। সুধা চলে যাবে। সুধা না গেলেও তার বুক দুটো যাবে। যাবেই যাবে। আমার বুকের মতো সমতল হয়ে যাবে।

'আমার বউয়ের ও দুটো কেটে নেবে।'

'আহা বাছা রে। ভাবছ তখন কী নিয়ে থাকবে। কেন? পয়সা দিলে কী না পাওয়া যায়!'

পঞ্চাশ টাকায় একজোড়া।

মেয়েটি আমার মুখের ওপর বুকটা চেপে ধরল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মাইকেল পায়ের তলায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে। মেয়েটি তার ঘাড়ের ওপর বা দুটো তুলে রেখেছে। আমার মন বলছে— আমার ছেলে কী খাবে?

মেয়েটি খুব বিরক্ত হয়ে উঠে বসল— 'এ কাকে ধরে এনেছ! রঙ্গের সময় ফ্যাঁসফোঁস করে কাঁদতে লেগেছে। নিয়ে যাও, বাছাকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

মাইকেল অতি কষ্টে উঠে বসেছে। তার আর স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই। মেয়েটি ঘটের মতো বিছানায় উবু হয়ে বসে আছে। বাজারে মেছুনি যেন মাছ বিক্রি করছে। মাইকেল কি আর গাড়ি চালাতে পারবে!

'মাইকেল, মাইকেল, উঠুন, উঠুন। এগারোটা বাজে। রাত্রি কিন্তু এখন আর যুবতী নেই। প্রৌঢ়া।' মেয়েটি মাইকেলের জামার কলার চেপে ধরেছে—'ওসব চালাকি আর চলবে না। আজ টাকা না দিলে বেরোতে দোব না।'

অতি কষ্টে চোখ খুলে মাইকেল বললে, 'শঙ্করবাবু একশোটা টাকা দিয়ে দিন তো। আমি পরে আপনাকে দিয়ে দোব।'

'আমার বউয়ের ক্যানসার অপারেশানের টাকা যে।'

'হবে হবে। আগে এই অপারেশানটা সামলান তো।'

বাইরে ঘুটঘুটে করছে অন্ধকার। দু'-একটা দোকানের আলো জলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার এখানে ওখানে। ঘুসঘুসে কিছু লোক শিকারের আশায় ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই ভয় করে। পা-দুটো কেঁপে যায়। কিছুই না, ধরা পড়ে গেলে চরিত্রের কালিটাই মুখে লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। তখন ঘরে ফেরার নৌকোটা পুড়ে যাবে।

মাইকেল লটরপটর করে এগিয়ে চলেছে। ফিসফিস করে বলছে, 'ধীরে ধীরে হাঁটুন। ভয় পেলেই বিপদ। চেপে ধরবে।'

ভয়? ভয়ে আমি আধমরা। গাড়িটা আর কতদূরে। ওই তো। এসে গেছি। আর একটু।

একটা আলোর বিন্দু বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। জোনাকি নাকি? একটা। না, দুটো। তিনটে, চারটে।

ছেলেবেলায় যখন ঘুম আসত না তখন শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ত ঝাঁকড়া একটা নিমগাছ। পাতায় পাতায় টিপ টিপ করে জ্বলন্ত অসংখ্য জোনাকি।

ঠিক পাশেই কে যেন খুক করে কেশে উঠল। দুটো কাশি। তিনটে কাশি।

'মাইকেল!'

'মধুসূদন অনেক দিন মারা গেছে ভাই।'

'কার গলা— মাইকেল কোথায়!'

'কবরে।'

'মাইকেল! সেভ মি।'

'কোথায় যাওয়া হয়েছিল মানিক? ভদ্দরলোকের ছেলে রেন্ডিবাজি। চলো থানায়।'

'থানায় কেন?'

'বেআইনি কাজ করেছ। থাকো কোথায়?'

'মাইকেল!'

'কে মাইকেল? চলো থানায়।'

রাত এখন প্রৌঢ়া। শেষ রাতের পেঁচা ডাকছে। কর্কশ, অতি কর্কশ। চোখে ঘুম নেই। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ভোর আর কত দূরে। রাতের গলিতে শব কখন ভেসে যাবে আলোর নদীতে! ঈশ্বর! তুমি এই দিচ্ছ, এই আবার নিয়ে নিচ্ছ। এই ভরে দিচ্ছ, পর মুহূর্তেই রিক্ত। অতি কষ্টে তিনশো টাকা জোগাড় হল। অন্ধকারে সব চলে গেল। মাইকেল আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে গেল হাত ধরে। তারপর তার গাড়ির ন্যাজের লাল আলোটা আমি অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখেছি। অন্ধকারের সেই ভয়ংকর লোকগুলোর পাল্লায় আমাকে ফেলে রেখে সে পালাল। বড় ধান্দা করেছিল শঙ্কর। জুয়া খেলতে গিয়েছিল। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে ছুটেছিল। হেরে গেছে। গো-হারান হেরেছে।

সুধার চোখেও ঘুম নেই। দু'জনে দু'কোণে জেগে পড়ে আছি। একজনের বুকে যন্ত্রণা, আর একজনের মনে। তরল অন্ধকারে অসংখ্য সরীসৃপ কিলবিল করছে। একটু অসাবধান হলেই বিষাক্ত ছোবল। বান্ধবহীন, যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে আমরা বড় একলা, বড় অসহায়।

এই নির্জন, নিঃসঙ্গ রাতে সুধার কোমর-বুকের আড়ালে জীবকোষ অসীম শক্তিতে ভেঙে অসংখ্য হয়ে চলেছে। সুধা আর বাঁচবে না। পারলুম না বাঁচাতে। ক্যানসার সারে না।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে হঠাৎ চিত্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনেক দিন পরে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুকনো মুখে শালপাতা থেকে চেটে চেটে ঘুগনি খাচ্ছিল। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে রঙিন চশমা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। চিত্ত কিন্তু ঠিক আমাকে চিনেছিল। পাওনাদাররা ঠিক চিনতে পারে। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে মুখের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে ফেললেও ওরা বোধহয় চিনতে পারে। চিত্তর বোন মাধবীকে বহুকাল আগে আমি পড়াতুম। মেয়েটি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। দেখতে-শুনতেও মন্দ ছিল না। সেই সময় চিত্তর কাছ থেকে মা'র অসুখের জন্যে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলাম।

এতদিন পরে চিত্তর সামনে বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। চিত্ত অবশ্য টাকার কথা কিছু বললে না। পাতাটা রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে বললে, 'কী রে ঘুগনি খাবি? দারুণ টেস্ট মাইরি।' খিদে

পেয়েছিল। সারা সকাল টো টো করে ঘুরেছি। যেখানে যত জানাশোনা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছিল, সব জায়গায় একবার করে ঢুঁ মেরেছি। টাকা কি সহজে কেউ বের করতে চায়। যে ক'টা পয়সা নিয়ে বেরিয়েছিলুম সবই ট্রামবাসের ভাড়ায় বেরিয়ে গেছে। পকেটে সামান্য কয়েকটা টাকা পড়ে আছে। চিত্ত আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে খাবি?'

'খাওয়া।'

চিত্ত আবার দু'পাতা ঘুগনি নিলে। টাকার কথাটা নিজে থেকেই তুলব কিনা ভাবছি। চিত্ত ঝালে হু-হা করতে করতে বললে, 'বড় বিপদ যাচ্ছে রে শঙ্কর। তুই তো আর খবর-টবর রাখিস না।'

'তোর কী বিপদ? আমি যেভাবে দিন কাটাচ্ছি রে ভাবতে পারবি না।'

'কেন কী হল? বিয়ে করলি নেমন্তন্নও করলি না। এই তো তোর ভদ্রতা।'

'কী করে করব বল। মা যাবার আগে তাড়াহুড়ো করে প্রায় রাতারাতিই বিয়ে দিলেন। বউভাতের দু'দিন পরেই মা মারা গেলেন। তুই কেন, কাউকেই বলতে পারিনি রে।'

চিত্ত আমার বিয়ের কথা তুলে অপরাধবোধটা আরও খানিকটা উসকে দিলে। সবাই ভেবে নিয়েছিল মাধবীর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। মাধবী আমার ছাত্রীই ছিল না— শেষটায় প্রেমিকাও হয়ে গিয়েছিল। চিত্ত ব্যাপারটা ধরে ফেলে একদিন আমাকে নির্জনে বলেছিল, 'দেখ শঙ্কর, বিট্রে করিসনে। আমার বোনটা ভারী সরল আর সেন্টিমেন্টাল।' চিত্ত জানে বা জেনে ফেলেছে দেখে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলুম। চিত্ত বিয়ের কথা তুলল দেখে আমাকে মাধবীর কথা তুলতে হল, 'মাধবী কেমন আছে রে?'

চিত্ত শব্দ করে হাসল। হাসির শব্দে যেন ব্যঙ্গের খোঁচা। 'মাধবীর কথা জিজ্ঞেস করছিস? কেন, কিছু শুনেছিস নাকি?'

অবাক হতে হল। অবাক হবার মতোই কথা। 'না, কিছু শুনিনি তো। কী আবার শুনব?'

চিত্ত একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘুগনির পয়সা মেটাতে মেটাতে বললে, 'তোর এখন কোনও কাজ আছে?'

আমার আর কী কাজ! অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছি। যেমন করেই হোক সুধাকে বাঁচাতে হবে। যত টাকাই লাগুক চিকিৎসাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে। চিত্ত বললে, 'কাজ না থাকলে তুই আমার সঙ্গে চল। এসপ্ল্যানেডের দিকে কোথাও গিয়ে চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে। কতদিন পরে দেখা হল।'

'চল। আমার এখন কোনও কাজ নেই।'

চিত্ত ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললে, 'আমার স্কুটারটা ওখানে রেখেছি। পেছনে বসতে পারবি তো!

'বসতে পারব না? তুই ভুলে গেছিস, একসময় আমি সাইকেল চ্যাম্পিয়ান ছিলুম।'

'ও হো, ঠিকই তো। নিতাইটা তো মরেই গেল।'

নিতাইয়ের কথা তুলে বিষণ্ণ মনকে চিত্ত বিষণ্ণতার আব এক ধাপ ওপরে তুলে দিলে। নিতাই বেঁচে থাকলে আমার টাকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হত। নিতাইয়ের একটা বি এস এ মোটরসাইকেল ছিল। চালাত তেমনি। বাঘের বাচ্চার মতো। জামসেদপুর থেকে ফেরার পথে আর ফিরে এল না। সবে বিয়ে করেছিল। স্ত্রী আর একমাসের একটি শিশু রেখে নিতাই বিদায় নিল।

চিত্ত স্কুটারের লক খুলতে খুলতে বললে, 'বড্ড একগুঁয়ে ছিল। বারণ-টারণ শুনত না। কাণ্ডজ্ঞানও ছিল না। ওকে বলা হল মোটরসাইকেলে যাসনি নিতাই। ওর গোঁ আরও বেড়ে গেল।'

স্কুটারের পেছনে বসতে বসতে বললুম, 'তোর এ জিনিসটাও খুব সেফ ভাবিসনি।'

'আরে ধুর। আমি খুরখুর করে একপাশ দিয়ে চালাই। বর্ষার সময় বেরই করি না। আমি কি নিতাই! মরে গেলে আমার সংসার দেখবে কে? নিতাইদের অনেক টাকা। তিন পুরুষে ব্যাবসা।'

চিত্তটা আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। কী সুন্দর চেহারা ছিল। পিঠটা সরু হয়ে গেছে। ঘাড়টা লম্বা হয়ে গেছে। এক মাথা চুল। তেল পড়ে না। হাওয়ায় উড়ছে।

রিজেন্টে, কোণের দিকের একটা ছোট টেবিলে বসে চিত্ত চায়ের অর্ডার দিল। মুখে ঘুগনির স্বাদটা তখনও লেগে আছে। কাপে চামচে নাড়তে নাড়তে চিত্ত জিজ্ঞেস করল, 'তোকে এমন উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে কেন?'

নিজের দুঃখের কথা গত সাতদিনে এতবার এত লোকের কাছে বলেছি যে পুনরাবৃত্তি ভাল লাগছিল না, তবু বললুম। চিত্তর মুখটা গম্ভীর হল। 'বাঁচবে না জানি। তবু চেষ্টা।'

চিত্ত বললে, 'তুই একেবারে খারাপটাই ভাবছিস কেন? ইনিশিয়াল স্টেজে ধরা পড়লে সেরে যায়। বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যানসার। সার্জারি করে ভাল করে দেওয়া যায়। আসলে টাকার খেলা। তোর এখন প্রচুর টাকা চাই। বিশ্বাস কর আমার থাকলে তোকে দিতুম। আমি নিজেই ভীষণ হার্ড আপ হয়ে পড়েছি।'

চিত্তর কথায় অভিভূত হয়ে পড়লুম। এই দুর্দিনে এমন সহানুভূতি কে কাকে দেখায়! পুরনো ধারের কথাটা তুলতেই হল, 'তুই আমার কাছে শ' পাঁচেক টাকা পাস; আমি শোধ করতে পারিনি।'

চিত্ত আমার হাতটা চেপে ধরল, 'ভুলে যা, যখন সময় পাবি, হাতে যেদিন তোর অঢেল পয়সা আসবে সেদিন শোধ করিস। ওর জন্যে তোকে কিন্তু হতে হবে না।'

চিত্তর হাতের চাপের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল, আমার নিজের অসহায়-বোধ অনেকটা কমে গেল। প্রায় হাল ছেড়ে দেবার অবস্থায় আবার যেন হাল ধরার ক্ষমতা এসে গেল।

'তোর বিপদটা কী এবার বল? তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন?'

চিত্ত উদাস চোখে পরদা ফেলা একটা কেবিনের দিকে তাকিয়ে রইল। দু'জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। ছেলে আর মেয়ের। অন্যমনস্ক চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে চিত্ত বললে, 'মাধবীর জীবনটা নষ্ট করে দিলে।'

'তার মানে? কে নষ্ট করে দিলে?'

'একটা ছেলে।'

চমকে উঠলুম। চিত্ত কী বলতে চায়? আমার কথা বলছে না তো!

'তুই আমাকে মিন করছিস না তো?'

'পুরো নয় তবে আংশিক। তুই ওর মনটাকে বড় জোরে নাড়া দিয়ে এসেছিলি। মেয়েদের তুই চিনিস না শঙ্কর। প্রথম প্রেম সহজে তারা ভুলতে পারে না। জোর করে ভুলতে গিয়ে কেমন যেন চরিত্রটাই পালটে যায়, নিষ্ঠুর হয়ে যায়, উদাস হয়ে যায়। মন নিয়ে সেইজন্যেই খেলা করা উচিত নয়।'

'মাধবীর তো বিয়ে হয়েছে। আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল ছেলের সঙ্গে।'

'ভাল ছেলে বলতে তোর ধারণাটা কী?'

'লেখাপড়ায় ভাল, অনেক বেশি উপার্জন করে।'

'তুই মেটিরিয়ালিস্টের চোখে পৃথিবীটা দেখছিস। বস্তুজগতের পেছনে আর একটা বড় জগৎ আছে; সেইটাই হল আসল জগৎ, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড।'

'মাধবীর সমস্যাটা কী?'

'সমস্যা একটাই। অ্যাডজাস্টমেন্ট। ছেলেটা মহাশয়তান। চরিত্রহীন। লম্পট। ভাল চাকরি করে ঠিকই আর সেইটাই হয়েছে কাল। প্রাচুর্য থেকে এসেছে ব্যভিচার। বিয়ের পরই বদলি হল দিল্লিতে। মাস তিনেক বেশ চলল। ছ'মাসও পার হল না। হঠাৎ একদিন মাধবী ফিরে এল, এক কাপড়ে, হাতের লেডিজব্যাগে সামান্য কয়েকটা গয়না। মাধবীর বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেল।'

'কারণটা কী?'

'একটি মারাঠি মেয়ে। মাধবীর স্বামী এখন সেই মেয়েটিকে নিয়েই থাকে। হয়তো বিয়েও করেছে। ছেলেপুলেও হয়তো হবে।'

'সে কী রে? হিন্দু আইনে একটা বিয়ে করলে যতদিন না ডিভোর্স হচ্ছে ততদিন আর একটা বিয়ে তো করা যায় না।'

'যায়। গায়ের জোরে সব কিছুই করা যায়। তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি আইনের সাহায্য নাও। স্ত্রী যদি ডিভোর্স চায় কোর্ট দেবে কিন্তু সে স্বামীর কাছ থেকে বাকি জীবনের জন্যে কোনও ভরণপোষণের দাবি আদায় করতে পারবে না।'

'বাঃ বেশ মজা তো! অদ্ভুত আইন।'

'হ্যাঁ, এর নাম আইন। মাধবীর মুখের দিকে তাকানো যায় না। বোঝালেও বোঝে না। স্বপ্ন নিয়ে পড়ে আছে। তার ধারণা একদিন তার স্বামী ভুল বুঝতে পারবে, জীবনে জীবন আবার জোড়া লেগে যাবে। বুঝলি শঙ্কর, যতই শিক্ষিতা হোক মেয়েছেলে মেয়েছেলেই।'

'তুই এখন কী করবি ভেবেছিস?'

'ছোটাছুটি। মাধবীর শ্বশুরের কাছে গেলুম। তিনি আর এক মাল। অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। এখন এক উকিল ধরেছি। হয় এসপার না হয় ওসপার।'

বিল মিটিয়ে চিত্ত উঠে পড়ল। দু'জনে বেরিয়ে এলুম। চিত্ত ভবানীপুরের দিকে যাবে। স্কুটারে উঠতে উঠতে বললে, 'একদিন আয় না! রোববার তো ছুটি, আয় না একদিন।'

চিত্ত খুরখুর করে চলে গেল। আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সমস্যার কোনও সমাধান হল না। চিত্ত চলে যাবার পর নিজেকে যেন বড় বেশি একা মনে হল। কৌটো বাজিয়ে একটি পার্টির মেয়ে চাঁদা তুলছে। কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে এলুম। কী মজা! কত সহজ টাকা রোজগারের রাস্তা! শেষকালে আমাকেও হয়তো সুধাকে বাঁচাবার জন্যে ওই রাস্তাই ধরতে হবে। লোকে পার্টি বাঁচাবার জন্যে ডোনেশান দেবে, কারুর বউকে বাঁচাবার জন্যে কখনই দেবে না। গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর বিডন স্ট্রিটের মোড়ে বাস থেকে নামলুম। তখনও আকাশের আলো মুছে যায়নি। দিগন্ত থেকে সন্ধ্যা উঠছে পাখা মেলে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক ভাবলুম যাব কি যাব না! মনে হয় কলমটা ওখানেই ফেলে এসেছি। বিদেশি দামি কলম। এখন পয়সা ফেললেও সহজে পাওয়া যাবে না। দিনের বেলা অত ভয় কীসের। একটু সাহসের অভাবে কলমটা চলে যাবে! আমি তো আর পাপ করতে যাচ্ছি না!

গুটি গুটি এগোতে লাগলুম, পায়ে পায়ে। বাঁ দিকের প্রথম গলি, দ্বিতীয় গলি, তৃতীয় গলি। হ্যাঁ এই জায়গা। ঢুকেই বাঁ দিকের তৃতীয় বাড়ি। এখনও পাড়াটা তেমন জমে ওঠেনি। ফাঁকা ফাঁকা। একটা খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

লুঙ্গি পরা মোটা মতো একটি লোক সামনে এসে দাঁড়াল। সারা মুখে ক্ষতচিহ্ন। ফিসফিস করে কানের কাছে বললে, 'বড়িয়া চিজ হায়। হর কিসিমকা।' বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। মন্দিরের পাণ্ডা আর দালাল সমান ভীতিপ্রদ। দ্রুত পা চালিয়ে লোকটিকে এড়িয়ে গেলুম। হাতখানেক দূরেই সেই বাড়ি, দিবস-রজনী যার দরজা খোলাই থাকে।

সিঁড়ির নীচে একটা বুড়ি হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। জরা আর যৌবন, মাঝে মাত্র কয়েক বছরের খেলা। সিঁড়ির মুখোমুখি ঘরটার দরজা বন্ধ। উঠোনে একটি কমবয়সি মেয়ে লেংচে লেংচে

তার কমলা রঙের একটা শাড়ি মেলছে। সাধারণ মেয়ে, ঘরোয়া চেহারা। যে-কোনও বাড়িতেই এমন দৃশ্য চোখে পড়বে। মেয়েটি আড়চোখে একবার তাকিয়েই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাত আসছে, সাজতে হবে।

দোতলা, না দোতলা নয়, তিনতলায় উঠতে হবে। মনে আছে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনের ঘর। দরজাটা ঈষৎ ভেজানো। বার দুয়েক টোকা মারলুম। কোনও সাড়াশব্দ নেই। পাশের ঘরের দরজা খোলা কিন্তু অন্ধকার। হাওয়ায় পরদা কাঁপছে। অন্ধকার কোণ থেকে মাঝে মাঝে একটা আয়না অদৃশ্য আলোর রেখায় ঝিলিক মারছে। এই ঘরের মতোই ও ঘরেও হয়তো কেউ থাকে। হয়তো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এখানে দিনটাই রাত, রাতটাই দিন।

দরজা ঠেলে সাহস করে ঢুকলুম। সামনেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখতে পেলুম আমি ঢুকছি। আমি আর আমার প্রতিবিম্ব মুখোমুখি। দু'জনেই দু'জনের দিকে খানিক তাকিয়ে রইলুম। দু'জনেরই যেন এক প্রশ্ন, 'কী হে কী চাই?' ঘরে দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। খাটের ওপর ছড়ানো কালো রঙের একটা পেটিকোট।

কী করব ভাবছি এমন সময় ঘরের ঘরনি এলেন। পরনে পাটের শাড়ি। হাতে প্রসাদের থালা। কপালে চন্দনের টিপ। একেবারে অন্য চেহারা। কে বলবে এই মহিলাই বহু রাতের বহু জনের সখী। কেমন যেন অপ্রস্তুত, অসহায় মনে হল নিজেকে। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। অনভ্যস্ত তাই হয়তো এই সংকোচ। মহিলা কিন্তু নিমেষে নিজেকে কেমন সহজ করে নিলেন। এক মুখ হাসি—'আজ পূর্ণিমা, সত্যনারায়ণ হল, নিন হাত পাতুন, সিন্নি।'

হাত পেতে সিন্নি নিলুম। এসব জায়গায় কিছু খেতে কেমন যেন ভয় ভয় করে। অসুখের ভয়। প্রসাদ। ফেলে দেওয়া যায় না, যতটা সম্ভব ভক্তিভরে মুখে ফেলে দিলুম। ঘরের একপাশে জলের বালতি, মগ, মেঝেতে একটা সাবান। হাতের কাছেই জল। জল বোধহয় বেশিই লাগে এ-পাড়ার ঘরে ঘরে।

প্রসাদের থালাটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'কী বসবেন তো?'

বসতে তো আসিনি। বসলেই যাবার সময় পকেট থেকে কড়কড়ে পঞ্চাশটি টাকা বালিশের পাশে রেখে যেতে হবে। পকেটে পঞ্চাশটা পয়সা আছে কিনা সন্দেহ। থালা রেখে মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বড় পবিত্র দেখাচ্ছে। কেমন একটা বউ বউ ভাব। এরা কেন বিয়েটিয়ে করে সংসারী হয় না! কে জানে! সংসার করার অনেক ল্যাঠা।

'কী ভাবছেন কী?'

'টাকা নেই। বড় কষ্টে দিন কাটছে।'

'তা হলে এলেন কেন? ন্যাকামি!'

শেষ শব্দটায় চমকে উঠতে হল। গুটিয়ে ছোট হয়ে এল শরীর, মন। একটু আগের সব ভাব, ভাবনা জলে পড়ে গেল।

'না, তোমার কাছে ন্যাকামি করতে আসিনি। একটা খবর নিতে এসেছি।'

মেয়েটি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল, 'রাগ করলেন? লোক চরিয়ে চরিয়ে আমাদের মুখ অমন আলগা হয়ে গেছে। কী খবর নিতে এসেছেন?'

'আমার একটা কলম কি তোমার বিছানায় ফেলে গেছি?'

'কলমের খবর? আপনি কি লেখক?'

'হ্যাঁ লেখক। খাতা লিখি একটা অফিসে।'

'আগে ঘর থেকে বেরোন।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

মেয়েটি জিভ কাটল, 'ছি ছি তাড়িয়ে দেব কেন। আমি কাপড় ছাড়ব। দেখছেন না পুজোর কাপড় পরে আছি। একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমি ডেকে নেব।'

বাইরের দালানে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাশের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলছে। লুঙ্গি পরা একটা গাট্টা লোক বিছানা ঝেড়ে বালিশ গুছোচ্ছে। রাত নামছে। বাবুদের আসার সময় হচ্ছে। পাড়া জেগে উঠছে। নীচের তলায় কে যেন খ্যানখ্যানে গলায় বলছে, অ্যাই তোর ছেলে কাঁদছে। পেছনেই বাথরুম, জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে মেয়েটি বললে, 'আসুন।'

এখন আবার অন্য চেহারা। ঘরোয়া সাজ। রাতের মোহিনী নয়। সিনথেটিক শাড়ি। নীল কাঁচুলি। ব্লাউজের সবচেয়ে ছোট সংস্করণকে কী বলে? কাঁচুলিই বলে বোধহয়।

'দাঁড়িয়ে কথা হয় না, বসতে হবে।'

সোফায় বসলুম। মেয়েটি বসল বিছানায় পা ঝুলিয়ে।

'কী বলছিলেন? পেনের কথা।'

'আমার একটা কলম তোমার এখানে বোধহয় ফেলে গেছি।'

বালিশের তলা থেকে আমার কলমটা বের করে মেয়েটি দেখাল, 'এইটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওইটা।' নেবার জন্যে হাত বাড়ালুম। মেয়েটি কলমটা কোলের ভেতর লুকিয়ে ফেলে বললে, 'হারানো জিনিস পাইয়ে দেবার পুরস্কার?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ওসব বিলিতি কায়দায় হবে না মানিক। হাতে হাতে চাই।'

'হাতে হাতে দেবার মতো রেস্ত যে আমার পকেটে নেই। কলমটা তা হলে থাক, আমি উঠি।'

'ওরে বাবা। বাবুর আবার গোঁসা আছে। এই নাও তোমার কলম।' মেয়েটি উঠে এসে কলমটা নিজেই আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে, গালটা টিপে দিল। সোফার হাতলে একটা পা তুলে এমন কায়দায় বসল শরীরের আধখানাই আমার কোলে।

খুব অস্বস্তি লাগছে। আমি তো খদ্দের হয়ে আসিনি। এসেছি কলম উদ্ধার করতে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার নাম কী?'

'ডলি।'

'ডলি, আমি যাই। সন্ধে উতরে রাত হল। তোমার ব্যাবসার ক্ষতি হবে। তুমি ভারী ভাল মেয়ে।' আমার কথা শুনে ডলি হেসে গড়িয়ে পড়ল। 'যাক বাবা, এতদিনে একজন লোক পেলুম যে আমাদের ভাল মেয়ে বলে।' হাসতে হাসতে শরীরের যতটুকু অংশ সোফার হাতলে ছিল নেমে এল আমার কোলে।

শরীরটা ঝিমঝিম করছে। অনভ্যস্ত তো। সুধা ছাড়া এতটা ঘনিষ্ঠ কারুর সঙ্গে হইনি। মাধবীর সঙ্গে পুরো ব্যাপারটাই ছিল মানসিক। শরীর বলতে হাতে হাত রাখা। পাশাপাশি হাঁটা বা বসা। আমার কোলে বসে ছোট মেয়ের মতো ডলি পা নাচাচ্ছে। সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগছে। বেশ বুঝতে পারছি ইচ্ছে করে করছে। আমাকে উত্তেজিত করার জন্যে করছে। আমি উঠতে চাই, পালাতে চাই। আমি তো মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করার জন্যে জন্মাইনি। কিছু দুর্ভোগ ভুগে মরার জন্যে জন্মেছি।

ডলি একপাশে কাত হয়ে আমার মুখটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলে, 'এমন ম্যাদামারা হয়ে আছ কেন? পেনটা তো পেয়েই গেছ।'

'তা তো পেয়েছি ডলি। সেটা কিছু নয়। আমার মনে বিশেষ সুখ নেই।'

'কার মনে আছে?' ডলি পা দুটো টান টান করে আমার কোলের ওপর দিয়ে সোফায় সোজা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দু'জনে এখন যোগ চিহ্নের মতো হয়ে আছি।

'তুমি তো জানো, আমার বউয়ের ভীষণ অসুখ?'

'অত মনে নেই। কী অসুখ?'

'ক্যানসার।'

'ও সারে না! মিছিমিছি ভেবে মরছ। আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। তখন আর একটা বিয়ে করবে। তোমাদের পুরুষমানুষদের ওইটাই মজা! নতুন মেয়ে, নতুন মন। তুমি তো বুড়িয়ে যাওনি যে বুড়ো বরের কনে জুটবে না। মাল খাবে? পয়সা লাগবে না।'

'ওসব আমি খাই না।'

ডলি ভেংচি কাটল, 'ওসব আমি খাই না! সাধুপুরুষ। মাল না খেলে মেয়েছেলের বাড়ি এসেচ ঢঙ করতে!'

'বিশ্বাস করো। এই কলমটা টেনে এনেছে।'

'কলমটা এখানে এল কী করে! একা একা হেঁটে এসেছে? কলম কি মানুষ? ভীষণ গরম হচ্ছে। আমি বাপু বুকের কাপড়টা সরিয়ে দিচ্ছি। তুমি আবার অন্য কিছু ভেবে বোসো না।' ডলি কাপড়টা কোলের কাছে জড়ো করল।

'কলমটা মালিকের সঙ্গেই এসেছিল। সে মালিক মালও খেয়েছিল। তবে পাল্লায় পড়ে। বড়লোক বন্ধুর মোসায়েবি করতে। তার খেসারতও দিয়েছে। চিকিৎসার জন্যে যে ক'টা টাকা জোগাড় করেছিলুম তার কিছু তুমি কেড়ে নিয়েছ, বাকিটা তোমার পাড়াতেই ছেনতাই হয়ে গেছে।'

'কভি নেহি। এখানে ছেনতাই হয় না।'

'হয়েছে। অন্ধকারে গোটাকতক লোক এসে পকেট সাফ করে নিয়েছে।'

'সে তা হলে পাড়ায় নয়, পাড়ার বাইরে। তোমার যখন পয়সার এত খ্যাঁচ বিয়ে করলে কেন?'

'ওইটাই তো সহজ কাজ। পয়সা থাকলে তো মেয়েছেলে রাখতুম।'

'রোজগার করো।'

'লেখাপড়া শিখলে আর রোজগার করা যায় না। সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর চিরকালের বিবাদ। এ কি তোমার যৌবন! কোলে চাপালেই পঞ্চাশ টাকা। আচ্ছা তোমরা যেভাবে রোজগার করো সেভাবে ছেলেরা রোজগার করতে পারে না?'

'বিলেতে যাও। সেখানে শুনেছি ছেলে বেশ্যা আছে।'

'তবেই হয়েছে। তুমি এখন দয়া করে কোল থেকে নামবে? পা ঝিমঝিম করছে।'

'একটু আদর করো।'

'বলছি তো পয়সা নেই।'

'বিনা পয়সাতেই করো। ফোকটেই মজা মারো।'

'না, তা হয় না। আমি কি তোমার প্রেমিক ?'

'তুমি আমার পিরিতের নাং।'

সাপের মতো দুটো হাত দিয়ে ডলি আমার গলা জড়িয়ে ধরল। মহা জ্বালা হল দেখছি। এত আবেগ কেন?

দেখি ভুলিয়ে-ভালিয়ে কেটে পড়া যায় কিনা?

'ডলি তুমি গান জানো?'

'তুমি জানো?'

'অল্প অল্প। একসময় ওস্তাদ রেখে শিখেছিলুম।'

'আমাকে শেখাবে?'

'হারমোনিয়াম আছে?'

'তা হলে কিনব।'

'আমার একটা ভাল হারমোনিয়াম আছে। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কিনবে?'

'কিনতে পারি যদি তুমি শেখাও। মাইনে দেব। গুরু বলে স্বীকার করব।'

'তা হলে গুরুকে এখন মুক্তি দাও।'

'আজ তো আর গুরু নও। হারমোনিয়াম নিয়ে যেদিন আসবে, সেদিন থেকে গুরু।'

ডলির ঘর থেকে যখন ছাড়া পেলুম তখন বেশ রাত। চুল এলোমেলো। সারা শরীর জ্বলছে। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। বললে, তোমার বউ দেখুক, স্বামী কত সাধুপুরুষ। চিরকাল শুনে এসেছ ছেলেরাই বলাৎকার করে। আজ উলটোটাই হোক। ছেলেরাই রক্ষিতা রাখে, আজ থেকে তুমি আমার রক্ষিতা। একটা ভাল লোককে খারাপ করার যে কী আনন্দ!

একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছি। খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামের বাক্সটা টেনেটুনে বের করছি, সুধা জিজ্ঞেস করলে, 'সকালবেলাই সব ছেড়ে ওটার পেছনে লেগেছ কেন?'

'এ বাড়িতে ওর আজ শেষ সকাল।'

'তার মানে?'

'ওটাকে বেচে দিচ্ছি।'

'সে কী? তোমার শখের জিনিস। ও জিনিস আর পাবে?'

'এর চেয়ে আরও একটা শখের জিনিসকে বাঁচাতে হবে সুধা।'

'আমার কথা বলছ? আমার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস তুমি পাবে, সঙ্গে নগদ টাকা। বিলিতি রিডের হারমোনিয়াম পয়সা ফেললেও পাবে না।'

জিনিসটা বেশ ভারী। একা তুলতে হিমসিম। হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'কে আর গান গাইছে!'

'তুমি না গাও, তোমার ছেলেমেয়েরা তো গাইতেও পারে।'

'ছেলেমেয়ে?'

'আমার নয়, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের।'

সুধার চোখে জল। হারমোনিয়ামের ভারে বেকায়দা। শান্ত করার সময়ও নেই। ট্যাক্সিওলা তাগাদা মারছে। সুধা প্রায়ই বলে, 'আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমাকে মরতে দাও। এ রোগে মানুষ বাঁচে না।' আর তখনই আমার ভাবনা আরও বেড়ে যায়। জেদ চেপে যায়। বাঁচাতেই হবে। অন্তত দেখাতে হবে টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় তুমি মরলে না।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোচ্ছি, ড্রাইভার পেছনের দরজাটা খুলে দিয়েছে, পেছন থেকে কে যেন ডাকল, 'শঙ্করবাবু'। নিচু হয়ে পেছনের আসনে হারমোনিয়ামটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। আমার বাড়ির দরজার সামনে সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। অচেনা, জীবনে দেখিনি। চোখে রুপোলি ফ্রেমের রঙিন চশমা।

ট্যাক্সির কাছ থেকেই হেঁকে বললুম, 'বলুন, আমি এখানে।'

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কথা ছিল আপনার সঙ্গে, খুব জরুরি কথা।'

'কে আপনি? কোত্থেকে আসছেন?'

'সব বলব। তার আগে কোথাও একটু বসা দরকার।'

'কিন্তু আমি যে একটু কাজে বেরোচ্ছি। পরে আসুন।'

'পরে আমার সময় হবে না। বেফায়দা কথা নয়। আপনারই লাভ হবে।'

বড় মুশকিল হল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কথা হতে পারে কিন্তু যেখানে যাব এই অচেনা লোকটিকে তা দেখাতে চাই না।

'ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিন। ঘণ্টাখানেক পরে গেলেও আপনার এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

'না তা হয় না। ঠিক আছে আপনিও উঠুন। যেতে যেতে কথা হবে।'

ভদ্রলোক সামনের আসনে বসলেন। চেহারা সাজপোশাকেই ঐশ্বর্য মালুম। দামি সিগারেট বের করে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে একটা এগিয়ে দিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবেন?'

'আমার এই হারমোনিয়ামটা বেচতে যাচ্ছি।'

'কেমন জিনিস?'

'দামি। স্কেল চেঞ্জ কাপলার, প্যারিস রিড।'

'কী দাম পেয়েছেন?'

'শ' সাতেক।'

'শখের জিনিস?'

'হ্যাঁ, শখের তো বটেই।'

'তা হলে বেচছেন কেন?'

'টাকার দরকার।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বেচার দরকার হবে না। টাকার ব্যবস্থা হবে।'

এ আবার কী কথা? আমি কি রামপ্রসাদ নাকি! ভবতারিণী এসে বেড়া বাঁধছেন? প্রশ্ন করলুম, 'তার মানে?' ভদ্রলোক প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, 'সোজা পার্ক স্ট্রিট চলুন।'

সুখনানি এস্টেটে গাড়ি এসে ঢুকল। সামনের আসন থেকে নেমে ভদ্রলোক বললেন, 'একটু বসুন।' সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পায়ে হাই হিল জুতো। অসহায় উজবুকের মতো বসে রইলুম। ভাগ্য কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে?

দুটো ষণ্ডামার্কা লোক নিয়ে ফিরে এলেন। 'আসুন, নেমে আসুন। এই তোরা ওই বাক্সটা ওপরে তোল।'

নামতেই হল। ভাড়াটাও আমাকে দিতে হল না।

ছোট লিফটে তিন তলায় উঠে এলুম। বেশ সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। বসার ঘরে কার্পেট, অ্যাকোয়ারিয়াম। নানা ব্যাপার। পয়সাঅলা লোকের অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর।

আমার পাশেই বসলেন। 'অবাক হচ্ছেন?'

'তা হচ্ছি বই কী।'

'আমি মাধবীর স্বামী। আপনার ফার্স্ট লাভ।' ভদ্রলোক হ্যা হ্যা করে হাসলেন।

'আমাকে চিনলেন কী করে?'

'যেভাবে রাইভ্যালকে চেনে। যাক সেটা বড় কথা নয়। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। যে কাজটা অন্য আর কাউকে দিয়ে হবে না।'

'কী কাজ?'

'এমন কিছু শক্ত নয় কিন্তু আপনার অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার পুরো টাকাটাই হাতে এসে যাবে।'

'বড় রহস্যজনক মনে হচ্ছে।'

'রহস্য মনে করলে রহস্য। কাজ মনে করলে কাজ। আমি একটু পরিষ্কার করে বলি। মাধবীর সঙ্গে আপনার ইন্টিমেসি ছিল। পড়াতে পড়াতে প্রেম। বিয়েটা কেন হল না গড নোজ। সে যাক। মাধবী আমার আইনসম্মত বউ। যাকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায় তাকে নিয়ে বিছানায় শোয়া যায় না। ড্রিঙ্ক করতে পারে না। নাচতে পারে না। প্রয়োজনে অন্যের সামনে উলঙ্গ হতে লজ্জা করে। এ জিনিস বাজারে অচল। আপনাকে মশাই এ বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে। ক্যাশ পাঁচ হাজার।'

'আমাকে! সে আবার কী! কীভাবে!'

'পুরনো প্রেমটা ঝালাতে হবে। তারপর ওকে দিয়ে একটা ডিভোর্স-স্যুট ফাইল করাতে হবে। কিংবা আমিই করব অ্যাডালটারি চার্জ এনে।'

'নোংরা কাজ। আমি কি ক্রিমিন্যাল নাকি!'
'হতে হবে। টাকায় কী না হয়।'
'আজ্ঞে না, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'
'তা হলে দ্বিতীয় রাস্তাটাই আমাকে নিতে হবে— খুন। মাধবী আর থাকবে না।'
'আমি সাক্ষী। ধরা পড়ে যাবেন।'
ভদ্রলোক শয়তানের হাসি হাসলেন, 'সাক্ষী সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ? মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। অর্থবল, লোকবল দুটোই আমার আছে। আসলে আমার আমেরিকায় জন্মানো উচিত ছিল। হালফিল গ্যাসির নাম শুনেছেন?'
'শুনেছি।'
'আমি দ্বিতীয় গ্যাসি। দেখবেন?'
উঠে দাঁড়ালেন। 'এই ঘরে আসুন।' ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেলুম। দরজা জানলা বন্ধ। মোটা মোটা পরদা ঝুলছে। পুরু কার্পেট পাতা। অন্ধকারে চোখ চলে না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কী দেখছেন?'
চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে। ডিভানে পনেরো-ষোলো বছরের একটা মেয়ে। নগ্ন। শুয়ে আছে। অজ্ঞান না ঘুমোচ্ছে বোঝা শক্ত।
ভদ্রলোক আঙুল তুলে বললেন, 'আপাতত আমার খাদ্য। ড্রাগস দিয়ে রেখেছি। কাছে গিয়ে সারা শরীরটা দেখুন বুঝতে পারবেন। আমি একটু অন্যভাবে প্রেম করি।'
মেয়েটির সারা শরীরে দাগড়া দাগড়া লাল দাগ।
ভদ্রলোক বললেন, 'ভালবাসা সবে শুরু হয়েছে। জাস্ট একটা রাত। যদি নিতে পারে দু'-তিন রাত চলবে। আর তা না হলে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। কী আর হবে, মাস ছয়েক বিছানা থেকে উঠতে পারবে না। চিরকালই আমি একটু পারভার্টেড। এই দেয়ালে দেখুন।'
দেয়ালে পাকানো পাকানো নানারকমের চাবুক ঝুলছে। কোণের টেবিল থেকে ভদ্রলোক কালো রঙের দুটো গ্লাভস তুলে নিলেন। হাতে পরে বললেন, 'এসব কাজ কালো হাতে ভাল জমে। তালুর টেক্সচারটা হাত দিয়ে দেখুন। ওই মসৃণ কচি পিঠে দু'বার বুলোলেই ছাল গুটিয়ে আসবে। বড় মজা মশাই, বড় মজা। এসব কি আর মাধবীর সহ্য হবে? হবে না। চলুন, আর না।'
সোফায় এসে বসলুম। ভদ্রলোক ডাকলেন, 'পীরু।'
সাংঘাতিক চেহারার একটা লোক এল, 'কী করছিস কী, ভদ্রলোকের গলা শুকিয়ে গেছে। হুইস্কি আর সোডা আন।'
'আমার ওসব চলে না।'
'সে কী? মাইকেল বললে আপনি বেশ ভালই টানেন। মনে করুন না ডলির ঘরে বসেই চলছে।'
অবাক হয়ে গেলুম। আমার সব খবরই রাখেন। বললুম, 'সেভাবে খাই না। অভ্যস্ত নই।'
'অভ্যাস করুন। তা না হলে নার্ভ ফেল করবে।'
পীরু গেলাস, বোতল, বরফ নিয়ে এল।
'ঢাল, ঢাল, দুটো ঢাল।'
'একটা ঢালো ভাই।'
'ধ্যার মশাই, বিলিতি মাল। সাধা জিনিস ঠেলতে আছে! আর হ্যাঁ পীরু, একে চিনে রাখ। একটা কাজের ভার দিচ্ছি। চোখে চোখে রাখবি। যদি দেখিস ঢিলে দিচ্ছে একটু টাইট করে দিবি।'
পীরু চলে গেল। ভদ্রলোক হিপ-পকেট থেকে এক তাড়া একশো টাকার নোট বের করে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখলেন, 'পঞ্চাশটা রইল। বউকে ক্যানসার হসপিট্যালে পাচার করুন। বাড়ি খালি। রোজ সন্ধের দিকে মাধবীকে আনুন।'

থেমে থেমে হাসতে লাগলেন। গেলাসে বোতলে ঠোকাঠুকির চিনচিন শব্দ। সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেল। গেলাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ক্যানসার সারে না মশাই। আপনার পথ তো পরিষ্কার। এখনও বয়েস রয়েছে, আর একটাকে খেলিয়ে তুলুন।'

টেবিল-ল্যাম্পের সামনে মাথা নিচু করে চিত্ত কী সব কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। ঘরের বাকি অংশটা অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে আমি এসে দাঁড়িয়েছি চিত্ত লক্ষ করেনি। সামনের চেয়ারটা টানতেই চিত্ত মুখ তুলে তাকাল, 'আরে শঙ্কর, বিশ্বাস কর মনে মনে তোর কথাই ভাবছিলুম। দীর্ঘ পরমায়ু।'

'মন দিয়ে কী দেখছিস? দলিল মনে হচ্ছে।'

'একটা পার্টনারশিপ ডিড। অটোমোবিল স্পেয়ার্সের একটা ব্যাবসা শুরু করছি রে।'

চিত্ত দলিলটা পাট করে রাখল। দাঁড়া, চা খেতে হবে, বলে চিত্ত ভেতরে চলে গেল। বাড়িটা চোখের সামনে ভাসছে। দালান, ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, খাবার ঘর, শোবার ঘর। একপাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। কত পরিচিত বাড়ি আমার। আরে সেই বেড়ালটাও এখনও আছে। একটু বয়েস হয়েছে এই যা। হঠাৎ কী মনে হল। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে তাকালুম। উলটোদিকেই একটা ডিসপেনসারি। লোক চলাচল করছে। একটা লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পীরু।

চিত্ত ফিরে এসেছে, 'কী দেখছিস? তোর অনেকদিনের পরিচিত পাড়া। আয় বস। চা আসছে।'

উদ্বেগ চেপে বসলুম। লোকটা সেদিন থেকে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। কী গ্যাঁড়াকলেই পড়লুম!

চিত্ত ড্রয়ার খুলল। একটা লম্বা খাম বের করে বললে, 'তোর জন্যে কিছু টাকা রেখেছি রে। বেশি না, শ'পাঁচেক এখন রাখ। দেখছি পরে কী করা যায়।' চিত্ত পাঁচটা একশো টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আর টাকা! কী হবে টাকা। সুধা আর আমি দু'জনেই জীবন-মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি।

'ধর। টাকাটা ঠিক করে পকেটে রাখ। হাসপাতালে দিয়েছিস?'

'দিয়েছি রে। আগামী শনিবার অপারেশন!'

'শনিবার কেন করলি?'

'তুই ওসব মানিস?'

'খুব মানি। মাধবীর তেরো তারিখে বিয়ে হয়েছিল।'

'মাধবী বাড়িতে আছে?'

'না রে, মা আর মাধবী দু'জনকেই হরিদ্বারে পাঠিয়ে দিয়েছি। তীর্থ স্পেশালে।'

'ফিরবে কবে?'

'ধর দিন পনেরো পরে।'

'ডিভোর্স স্যুটের কী করলি?'

'না রে, আমার ল-ইয়ার বলছেন কিছুদিন চেপে বসে থাকুন। দেখুন না ও তরফ কী করে! ওদিক থেকে এলে মাধবীর সুবিধে। ছেলেটার অনেক টাকা।'

'কী দরকার ঝুলিয়ে রেখে? মাধবীকে ফ্রি করে দে না। এই টেনশন। ওর সেই ফরেন যাবার কেসটা এগোল কিছু!'

'অত সোজা রে! বাঙালি মেয়েরা বড় অদ্ভুত। আশা নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিছু হোক না হোক। মাধবীর ধারণা সব ঠিক হয়ে যাবে। সংসার জোড়া লাগবে। ভালবাসা, সন্তান, সুখ, বিভোর হয়ে আছে। এ কি বিলেত পেয়েছিস ভাই? বিবাহবন্ধন জীবনের বন্ধন। যেমনই হোক সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।'

চিত্ত আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। যেন কত আপনার লোক। ঠোঁটের কাছে কাপটা কিছুক্ষণ থমকে রেখে বললে, 'রাত্তিরে কোথায় খাবি? হোটেলে?'

'রাতের খাওয়া মাসখানেক হল ছেড়ে দিয়েছি রে। দরকার হয় না। পেটটা খালি রাখলে সকালে শরীরটা বেশ হালকা লাগে।'

'তা লাগবে, তারপর খুব তাড়াতাড়ি হাওয়ায় মিশে যাবি। নিরালম্ব বায়ুভুক। তুই আজ এখানে খেয়ে যাবি। তুই তো কয়েকদিন এখানে থাকতেও পারিস। তেমন হলে এটা তো তোর শ্বশুরবাড়িই হত। আমি হতুম তোর শালা। চিত্ত শালা।' চিত্ত হাসতে থাকল।

চিত্ত তবু হাসতে পারছে! আমি পারছি না। জীবনের চলার রাস্তা পাঁচিলে এসে ঠেসে ধরেছে। রাস্তার ওপারে পীরু। হাসপাতালে সুধা। মাধবী হরিদ্বারে। আমি যেন দাবার ঘুঁটি। আমার নিয়তি কোন চালে কিস্তি মাত করে দেবে কে জানে?

'না রে চিত্ত, আজ খাব না। তালা বন্ধ বাড়ি, দিনকাল ভাল নয়।'

'তোকে ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ছেড়ে দেব। দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাবি। চুরিটুরি সব শেষ রাতে হয়।'

'না রে, আজ থাক। একেবারে খাবার ইচ্ছে নেই। এই চা খাওয়ালি, এই তো বেশ হল।'

'তুই না কারু কথা শুনতে চাস না। চিরটা কাল বড় একরোখা। সুখটা না পারিস দুঃখটা আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নে না। একটু হালকা লাগবে। ওই গানটা আমার ভীষণ ভাল লাগে, এক প্যার কা নগমা হ্যায়, পরের লাইনটা মনে নেই, জিন্দেগি অওর কুছভি নেহি তেরি মেরি কাহানি। চিয়ারআপ মাই ফ্রেন্ড।

রাত যিতনি ভি সংগীন হোগি
সুবহ উৎনি হি রংগীন হোগি
গম্ না কর্ গর হ্যায় বাদল ঘনেরা
কিসকে রোকে রুকা হ্যায় সবেরা।

ওরে রাত যত কালো হবে সকাল তত রঙিন হবে। আসুক না আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ। ভয় কী! কোন শালা সকালকে রুখবে? ভোর হবেই।'

বাইরে মোটরবাইকের ফ্যাটফ্যাট শব্দ হল। চিত্ত উঠে দাঁড়াল, 'আ গিয়া মেরা পার্টনার প্রীতম সিং।'

এইবার এই ফাঁকে আমাকে পালাতে হবে। পাঞ্জাবিদের স্বাস্থ্য! সত্যি দেখার মতো। প্রীতম সিং ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে ঘরটাই ছোট হয়ে গেছে। আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। চিত্ত বললে, 'তোর তো চেনা বাড়ি! যা না ভেতরে চলে যা। কেউ কোথাও নেই। তুই চানটান করে আমার ঘরে গিয়ে পাখা খুলে শুয়ে থাক। আমি রান্না হলেই তোকে ডেকে তুলব। মুখটা তোর শুকিয়ে গেছে রে।'

সেদিন জিজ্ঞেস করিনি। আজ বুঝলুম চিত্ত এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে! ওরও তো পাতা ঝরতে শুরু করেছে। মানুষের শেষ বয়েসটা ভারী সুন্দর। ঝরতে ঝরতে ক্ষয় হতে হতে একদিন মরা গাছ। চিত্ত তখন একটা শের বলেছিল। এখন আমার দুটি বয়ৎ মনে পড়ছে—

উও চমন্ হি মিট্ গিয়া জিস মেঁ কি আয়ী থি বহার,
আব্ তুঝে পাকর্ মায়ঁ আয় বাদে-বহারী কিয়া করোঁ।
বুজমে ইশরৎ মেঁ বঠানা থা জিসে উও উঠ গিয়া;
আব্ মায়ঁ আয় ফর্দা তিরী উমীদওয়ারী কিয়া করোঁ।

বয়ৎ দুটো হঠাৎ মনে পড়ল ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে। প্যাসেজের ডানপাশে দেয়ালে ঠেসান দেওয়া সেই মেহগনি রঙের ছোট্ট টেবিলটা। তারই কিছু ওপরে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো মাধবীর আঁকা ছবি। আমাকে আঁকতে চেষ্টা করেছিল। খানিকটা আমার আদল আনতে পেরেছে। অ্যামেচারের পক্ষে ওই যথেষ্ট। কাচটা অনেকদিন কেউ পরিষ্কার করেনি। কেন করবে? খুলে ফেলে দেয়নি এই তো আমার যথেষ্ট ভাগ্য। শঙ্করের যৌবন, তুমি কী ভাবছ? এই ক'বছরে এই বাড়ির অনেক কিছু দেখলে? তাই না! বয়ৎ দুটো আবার ফিরে আসছে, প্রৌঢ় শঙ্কর। ভোমরা আটক পড়েছে জানলার কাচে। বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে। বেরিয়ে যেতে চাইছে। ধাক্কা খাচ্ছে। কাচেই আটকে থাকছে।

উও চমন্ হি মিট্ গিয়া জিস মেঁ কি আয়ী থি বহার

বসন্ত একসময় ছিল রে এই বাগানে। আজ আর নেই। ওরে ও বসন্তের হাওয়া, এখন ফিরে এলে আমি আর কী করব? আব তুঝে পাকর্ মায়ঁ আয় বাদে বহারী কিয়া করোঁ। আনন্দ-উৎসবে যাকে বসানোর কথা ছিল, সে তো চলে গেছে! উও উঠ গিয়া। হায় রে আমার ভবিষ্যৎ, এখন তোকে কী বলে সান্ত্বনা দেব। আব্ মায়ঁ আয় ফর্দা তেরী উমীদ্ওয়ারী কিয়া করোঁ। দাঁড়াও পকেট থেকে রুমাল বের করে তোমার কাচটা একটু ঝেড়ে দি।

পানি সে সগ্গজীদা ভরে জীস্তরা আসদ
ভরতা হুঁ আয়ী নে সকে মরদুম গজীদা হুঁ।

যাকে কুকুরে কামড়ায় সে যেমন জলকে ভয় পায়, আমাকে কামড়েছে মানুষে, আমি বড় ভয় পাই আয়নাকে। এই তো আমার আয়না, আমারই প্রতিচ্ছবি। বড় ভয়। পীরু দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ক'দিনই বা আর বাঁচব? সুধা তুমি বাঁচো। মাধবী তুমি বাঁচো।

ছবিটার সামনে থেকে সরে এলুম। নির্লজ্জ আমি আমার দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। সব কিছুই আগের মতো সাজানো। কিছুই তেমন পরিবর্তন হয়নি। প্রাণহীন জিনিসরা একটা সংসারের এমন এক-একটা জায়গায় সেট হয়ে যায় তাদের আর সহজে সরানো যায় না; সরালেই অভ্যাসের অসুবিধে হয়। যেমন বাঁদিকেই সেই জুতোর র‍্যাকটা। এক জোড়া হাই হিল জুতো পাশাপাশি আমার দিকে পেছন ফিরে অচল হয়ে আছে। মাধবীর জুতো। মেমেদের মতো হাই হিল পরতে ভীষণ ভালবাসত। সেই ভালবাসাটা এ-নও আছে দেখছি। মাধবীর গোড়ালি দুটো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। জীবনের অনেক ঘটনাই মনে যেন চিরকালের মতো পার্মানেন্ট কালিতে প্রিন্ট হয়ে যায়। আবার কত ঘটনাই ধুয়ে মুছে যায়। চেষ্টা করেও মনে আনা যায় না।

মেয়েদের পা দেখতে আমার অদ্ভুত ভাল লাগে। বেশির ভাগ সময় শাড়ির নীচে চাপা থাকে বলেই বোধহয় সামান্য একটু বেরোলেই আমি উন্মাদ হয়ে যাই। মোমের মতো মসৃণ গোড়ালি, লোমশূন্য পায়ের গোছ ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে গাছের কাণ্ডের মতো পাতার আড়ালে চলে গেছে। ভগবান, তোমার মতো শিল্পী চিন্তা করা যায় না। মানুষের শরীর তৈরির প্ল্যানটা কী করে তোমার মাথায় এসেছিল?

মাধবীর জুতো জোড়ায় ভীষণ হাত দিতে ইচ্ছে করছে। এর ওপর থাকত মাধবীর পা। সেদিন বৃষ্টির জল জমেছিল কলকাতার রাস্তায়। মাধবী আমার সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিল পাখি কিনতে। মুনিয়া পাখি। আমার সব মনে আছে। মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা! সময় কীভাবে চলে যায়। জীবন কীভাবে পালটে যায়! বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে দেখলে রাস্তায় পায়ের পাতাভর জল। বাঁ হাতে দুপাটি জুতো, ডান হাতে শাড়িটা ওপর দিকে একটু টেনে তুলেছে। পেছন দিকে সায়ার ফ্রিল পায়ের ওপর উঁকি মারছে। মাধবী সামনে, পেছনে খাঁচা হাতে আমি। গোটাকতক মুনিয়া ছটফট করছে। ছটফট করছে আমার মন। মনকে শাসন করছি, না না, এই ভাবনা ভাল নয়। চোখ বলছে মনের শাসন আমি মানি না। মাধবীর সেই জুতো! না সেটা নয়। এটা অন্য। প্রায় নতুন।

র‍্যাকটার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছিলুম। সামান্য এক জোড়া জুতো আমাকে ফেলে আসা সময়ের কোলে নিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালুম। আর কী হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

বড়ে শওকসে শুন রাহা যা জমানা
হামই শো গয়ে দাস্তাঁ কহতে কহতে ॥

শঙ্কর! সময় বড় মনোযোগ দিয়ে তোমার জীবন-কাহিনি শুনছিল। তুমিই তো সে কাহিনি শেষ না করে ঘুমিয়ে পড়লে। কেন জানি না ভীষণ ইচ্ছে করছে ডলির কাছে যেতে। এই রাত! এত হাওয়া! তারার ফুল ফুটে আছে আকাশে! একটু সুখের কেন এত অভাব!

কোয়ী উমীদ বর নহী আতি
কোয়ী সুরত নজর নহীঁ আতি।

মানুষের কোনও আশাই তো পূর্ণ হয় না, উপায়ের সন্ধান, সেও তো দুরাশা।

দূরে উঠোনের ও মাথায় রান্নাঘর। ধোঁয়া লেগে ঘরের আলোটা কেমন ম্যাড়ম্যাড় করছে। সেই আগের রাঁধুনিই আছে, না অন্য নতুন মহিলা এসেছে! শাড়ির আঁচলটাই খালি দেখতে পাচ্ছি। ডালে ফোড়ন দিয়েছে। সুন্দর ঝাঁঝালো একটা গন্ধ।

চিত্তদের বাড়ির একটা খিড়কির দরজা আছে। সামনের দরজা দিয়ে বড় রাস্তা থেকে ঢোকা যায়। আবার পেছনের দরজাটা দিয়ে একটা গলির গলি তস্য গলি ধরে হরিশ মুখার্জি রোডে ওঠা যায়। খিড়কির দরজা দিয়ে আমি যদি পালাই কে কী করতে পারে? পীরু থাক-না সদর রাস্তায় সারারাত দাঁড়িয়ে। চিত্ত ব্যস্ত তার পার্টনার প্রতীম সিং-কে নিয়ে। রাঁধুনি রান্নায় ব্যস্ত। চলে যাই! এত স্মৃতি ভরা বাড়িতে একটা অপরাধীর মন নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আমি তো এদের শত্রু। শত্রু পক্ষের লোক। চিত্ত জানে না, আমি কেন এসেছি। মাধবী তখন আমাকে যতটা অসাধারণ আর পবিত্র আর শিশুর মতো সরল ভাবত, সত্যই কি সেইটাই ছিল আমার স্বরূপ! মাধবী এখন হরিদ্বারে, হর কি প্যারীর আশেপাশে কোথাও ঘুরছে। সারি সারি প্রদীপ ভেসে চলেছে জলে। ভজনের আসর বসেছে গঙ্গার ধারে।

দরজাটা খুলে শুঁড়ি গলিতে বেরিয়ে পড়লুম। আলো নেই। খাড়াখাড়ি বাড়ি দু'পাশে। রাস্তাটা আমার কাঁধের চেয়ে বেশি চওড়া হবে না। হাতের কনুইতে নোনা ধরা দেয়ালের ঘষা লেগে যাচ্ছে একটু অসাবধান হলেই। অনেক উঁচুতে আকাশের ফালি, ঘোলাটে লাল। ভিজে ভিজে নোনা ভ্যাপসা হাওয়া থমথম করছে।

গলিটা আমার চেনা। আগে কয়েকবার আসা যাওয়া করেছি। তখন করেছি অন্য মনে, অন্য ভাবে। আজ যেন ভীষণ ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে, নিজের মনের গলি দিয়ে দেহটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছি। একটু আলোর জন্যে মনটা হাঁকপাঁক করছে। কবে কোথায় যেন পড়েছিলুম অ্যান্টিম্যাটারের কথা। এই ছায়াপথে কিংবা অন্য কোনও ছায়াপথের কোনও গ্রহে ঠিক আমার মতো আর একটি মানুষ আছে। আমি ম্যাটার, সে আমার অ্যান্টিম্যাটার। সকলেরই এমনই একটা করে ডুপ্লিকেট আছে। কী মজা। এখন আমি যা করছি, যা ভাবছি, সেও ঠিক তাই করছে, তাই ভাবছে। দু'জনে যদি কোনওদিন মিলে যাই, প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণে ফেটে পড়ব। কতটা শক্তি, তারও একটা ফর্মুলা আছে, $E=MC^2$। অতশত বুঝি না; তবে আর একটা আমি যদি কোথাও থেকে থাকে, আর একটা চিত্ত আছে, সুধা আছে, মাধবী আছে, মাধবীর স্বামী আছে, পীরু আছে, ডলি আছে। এই মুহূর্তে ডলি যার কোলে বসে আছে, সেও আছে। একই সিনেমার দুটি প্রিন্ট, দুটি প্রেক্ষাগৃহে চলছে— উত্তরা আর উজ্জ্বলা।

চাপা রাস্তাটা হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে চওড়া হয়ে গেছে। কারুর বাড়ির পেছন। কোথাও আলো নেই। এখানে দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা ব্র্যাকেটে উজ্জ্বল বাতি। তলায় আলোর বৃত্ত

নেমে এসেছে। সেখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সাদা সাদা ফুল। নিভৃতে কার জন্যে কার এই অঞ্জলি। একটা জুঁই ফুলের গাছ লতিয়ে ঝাঁকড়া হয়ে ওপরে উঠে গেছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই টুপটাপ করে গোটাকতক ফুল ঝরে পড়ল। একটা পড়ল আমার মাথায়। চারদিকে সুগন্ধ। পৃথিবীটা কত সুন্দর। মানুষই একে অসুন্দর করে তুলেছে।

খুকখুক করে দু'বার কাশির শব্দ হল। ঠিক আমার পেছনে। ধূসর প্যান্ট-জামা পরা। স্বাস্থ্যবান একটি লোক। আমাকে চমকাতে দেখে ধীর গলায় কেটে কেটে বললে, 'চমকাবেন না। এবার বাড়ি যাবেন তো। চলুন পৌঁছে দিই। সঙ্গে গাড়ি আছে।'

তার মানে? দু'পাশে দু'জন পাহারাদার। আমার বোঝা উচিত ছিল। মাধবীর স্বামী এবাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র জানে। খিড়কির কথাও জানে। বোকা বানাতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে গেছি। এখন ভয় পেলে চলবে না।

সবুজ রঙের একটা গাড়ি বড় রাস্তার একপাশে নিরীহের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা একটি লোক গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। বুকের বোতাম খোলা। চওড়া বুকে বনমানুষের মতো লোম। তার ওপর চিকচিক করছে একটা লকেট। অমন সুন্দর সোনালি লকেটটার কী দুর্ভাগ্য? সেই ছায়াছবিটার কথা মনে পড়ল, কিং কং-এর বুকে সুন্দরী মহিলা। পেছনের দরজাটা খুলে আমার পাহারাদারের হুকুম হল, 'চলুন।' দু'জনের বসায় গাড়িটা একটু দুলে উঠল। সিগারেট মুখে ভদ্রলোক স্টার্ট দিলেন। ঘাড় না ঘুরিয়েই সিগারেট চাপা ঠোঁটে প্রশ্ন, 'কোথায়?' উত্তরটা আমিই দিলুম, 'বাড়ি।' পেছন দিকে একটা ঝাঁকি মেরে গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এত পাহারা কেন বলতে পারেন? এ যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'জানি না। আমরা হুকুম তামিল করছি।'

'আপনাদের পক্ষে আমি কি এতই বিপজ্জনক!'

'তা নয়, তবে এইভাবেই আমরা সাধারণ নিরীহ মানুষকে দিয়ে পাপ কাজ করাই, ছোট পাপ, তারপর বড় পাপ; পাপের খাঁচায় তাকে দিন কতক আটকাতে পারলেই সে খাঁচার পাখি। তখন দরজা খোলা রাখলেও সে আর উড়ে যেতে পারবে না। কী বলো শুকুর মিঞা? সে আর উড়তে পারবে না— হে হে।'

অন্ধকারে হাসিটা কেঁপে উঠল। সামনের লোকটির নাম শুকুর মিঞা। মিঞাসাহেব নীরব। মাথার পাশ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসছে। সামনে থেকে আসা গাড়ির আলোয় পাকানো পাকানো ধোঁয়াকে মনে হচ্ছে ডাইনির চুল।

ঘুম থেকে উঠতে খুব দেরি হয়ে গেছে। প্রথমে বার ভুল হয়ে গেল। কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না, কী বার! হঠাৎ মনে পড়ল, রবিবার নয়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। সর্বনাশ! বেরোতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে টুথব্রাশে ইঞ্চিখানেক পেস্ট লাগিয়ে ঘরের বাইরে এলুম। রোদ ভীষণ চড়ে গেছে। ছোটমতো চাপা উঠোন চড়া আলোয় ক্যাটক্যাট করছে। ও মাথায় কল। সরু হয়ে জল পড়ছে। রক থেকে উঠোনে নামতেই ঝপ করে একটা ভিজে শাড়ি ওপরের বারান্দা থেকে ঝুলে মুখের ওপর এসে পড়ল। প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। কী হল রে বাবা! দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ফিকে নীল শাড়ি মাথায় মুখে জড়িয়ে গেছে। সাবানের হালকা গন্ধ।

'সরি ঠাকুরপো। আপনি যে ঠিক এই সময়েই লাফিয়ে নামবেন বুঝতে পারিনি। ক'টা বাজল?' ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। শ্যামা স্নানটান করে পরিপাটি হয়ে শাড়ি মেলছিল।

'ক'টা বউদি? ঘড়ি দেখিনি।'

'আটটা বেজে গেছে। কী ঘুম বাবা। দু'-দু'বার চা নিয়ে ফিরে এলুম।' শ্যামারা ওপর তলার ভাড়াটে। স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ি আর একটি কলেজে পড়া ননদ। পরিষ্কার সংসার।

সুধা যাবার আগে সকালের চা-টা ওপরের সঙ্গে ব্যবস্থা করে গেছে। সুধার স্বভাবের জন্যে সকলেই তাকে ভালবাসত। শ্যামা শাড়িটা ইতিমধ্যে টেনে তুলে নিয়ে দু'ভাঁজ করে তারে মেলে দিয়েছে।

'আজ হয়ে গেল আপনার!'

ব্রাশ ঘষতে ঘষতে ওপরে তাকালুম। ভাল করে তাকাতে পারছি না। মাথার ওপর আকাশটা এত উজ্জ্বল! একটা পায়রা উড়ে গেল এ কার্নিশ থেকে ও কার্নিশে। শ্যামা ব্লাউজ মেলছে।

'কী হয়ে গেল?'

'স্বামীটি হাতছাড়া হয়ে গেল!'

'কার স্বামী!'

'সুধাদির.' শ্যামা মুখ টিপে হাসছে। ভারী মিষ্টি হাসি।

'কেন?'

'মেয়েদের শাড়ির আঁচলে বশীকরণের মন্ত্র আছে।'

'তাই নাকি? তা হলে তো ভালই হল।'

'আপনার ভাল হল, সুধাদির কপাল পুড়ল।'

'কত্তা বুঝি বাড়ি নেই!'

'কেন থাকবে না! ওই তো বসে বসে জুতো পালিশ হচ্ছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কী? পেপার ওয়েট বাড়ি নেই। ঘরে যান, চা যাচ্ছে।' শ্যামা শাশুড়িকে কখনও বলে পেপার ওয়েট কখনও জিপ ফাস্টনার। খোলামেলা মজার মেয়ে। মনে কোনও পাপ নেই। আমার মনে পাপ আছে। শ্যামার উত্তাপ সহ্য করতে পারি না। শ্যামার ননদ ছায়া চা নিয়ে এল। কাপের পাশ থেকে একটা বিস্কুট উঁকি মারছে। কিছুতেই এরা শুধু চা দেবে না। শ্যামা কেন এল না? এলে বেশ হত। শ্যামার ভিজে শাড়ির স্পর্শ এখনও মুখে লেগে আছে।

ছায়া বললে, 'ঘরটা কী করে রেখেছেন? বেদের টোল। বউদি থাকলে পেটাত।'

সত্যি, ঘরটা খুব এলোমেলো বীভৎস হয়ে আছে। ছায়া বলল, 'আজ বেরোবেন?'

হ্যাঁ বেরোব। কেন বলো তো?'

'ছুটি পাওনা নেই?'

'কেন বলো-না?'

'না, তা হলে আপনার কাছে একটু পড়তুম। কাল পরীক্ষা।'

'কাল পরীক্ষা আর আজ তোমার ঘুম ভাঙল?'

'ঘুম অনেকদিন ভেঙেছে, ভেবেছিলুম একা ম্যানেজ করতে পারব, দু'-এক জায়গায় আটকে গেছি।'

'ঠিক আছে। তোমার জন্যে ছুটি। কিন্তু বারে বারে চা খাওয়াতে হবে।'

'শুধু চা কেন, দুপুরের খাওয়াও মিলবে। আজ আর হোটেলে নয়।'

ছায়া চলে গেল। হঠাৎ মনে হল মাধবীর স্বামীর হাতে এইসব মেয়ে পড়লে কী অবস্থা হত। ভাবা যায় না! কোন মেয়ের বরাতে কী যে লেখা আছে! কিন্তু অফিসটা হঠাৎ কামাই করব!

ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ধ্যাততেরিকা চাকরি। ওপরঅলাকে তেলাতে পারি না বলে একই জায়গায় পড়ে পড়ে পচছি গত দশ বছর। আমাকে টপকে কত পয়মাল তেলের জোরে ওপরে উঠে গেল। আর ক'দিনই বা পৃথিবীতে আছি! মাধবীর সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না। পীরুর হাতে আমাকে মরতেই হবে। তার আগে সুধা মরলে কোনও পিছুটান থাকত না। আমি নিজেই এখন সুধার মৃত্যু কামনা করছি। কী আশ্চর্য? এই হল মানুষ!

ছায়া এল। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নিন, দ্বিতীয় কাপ— আর এই নিন।'

একটা চিরকুট এগিয়ে দিল। শ্যামার হাতের লেখা, তা না হলে এসব কথা কে আর লিখবে, 'দেখবেন মশাই, ছাত্রীটি সুন্দরী; নির্জন ঘর, একটু সামলে।'

'ছায়া তুমি পড়েছ?'

মাথার ওপর দু'হাত তুলে ছায়া খোঁপা ঠিক করছিল। বগলের কাছে ব্লাউজ ঘামে গোল হয়ে ভিজেছে। না, এরা আমায় পাগল করে দেবে। জানে না বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে ম্যান-ইটার হয়ে যায়।

ছায়া ধপাস করে চেয়ারে বসে বললে, 'রাখুন তো, ও এখন ফুর্তিতে টগবগ করছে।'

'কীসের এত ফুর্তি!'

'ওই জানে!'

'আমার ঘরটা ভীষণ গরম। তোমাদের দোতলায় তবু ন্যাচারাল হাওয়া-বাতাস আছে। এখানে বসতে পারবে?'

'খুব পারব। কিছু মনে করবেন না, চুলটা আমি এলো করে দিচ্ছি, খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে খালি লাফাচ্ছে।'

ছায়া উঠে দাঁড়াল। তার পূর্ণ শরীর আমার চোখের সামনে। এতক্ষণ দৃষ্টি আটকে ছিল তার মুখে, এখন কোমরের কাছে। শাড়ির কষি অনেকটা নামিয়ে বাঁধা। ছায়া শরীরটাকে টানটান করে মাথার পেছন দিকে দুটো হাত নিয়ে গেছে। খোঁপা খুলে চুল ঝাড়ছে। মেদহীন সরু কোমর অনাবৃত। সায়া যে জায়গাটায় পরে সেই জায়গাটা বেরিয়ে পড়েছে সাদা রেখার ওপর শ্যাওলা শ্যাওলা দাগ। নাভির চারপাশে গাঢ় রঙের বৃত্ত। নাকে আসছে চুলের, পাউডারের, ঘামের গন্ধ। নিজের মনটাকে কীভাবে যে বেঁধে রেখেছি।

সামনে আয়না নেই। থাকলে নিজের মুখটা কেমন দেখাত! খাদ্যলোভী বুভুক্ষু কাঙালের মতো! নাকি সাত্ত্বিক, নির্লিপ্ত ঋষির মতো! নাকি বোধহীন বালকের মতো। ছায়ার শরীরটা দীর্ঘ— ইংরেজিতে যাকে বলে স্লিম। চাবুকের মতো। ছায়া বসতে বসতে বললে, 'চুলগুলো কেটে দেব এবার। পাগল করে দিলে মশাই।'

'পাগল নাকি তুমি! অমন পাছা ভরতি।' মুখ ফসকে পাছা শব্দটা বেরিয়ে যেতেই মনে মনে জিভ কেটে চুপ করে গেলুম। ছায়া কিছু মনে করেনি। সে স্বাভাবিক গলায় বললে, 'অমন চুলের কদর ছিল আগেকার যুগে। এখন হল ববের যুগ, পনিটেলের যুগ।'

তুমি বরং ন্যাড়া হয়ে নতুন আর একটা যুগ ইনট্রোডিউস করো।'

ছায়া শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতে বই খুলল।

'কী পড়বে?'

'ইংরেজি। টেকস্ট বুকে কোত্থেকে মধ্যযুগের কবিদের সব ধরে রেখেছে। চসার, শেক্সপিয়ার, বেন জনসন।— এলিয়ট, ফ্রস্ট, হুইটম্যান কত সহজ সুন্দর!'

'ধুস, ঐ তুমি কী বলছ। আজ থেকে ছ'শো, সাতশো বছর আগের শান্ত জীবন, শান্ত পৃথিবীর ছোঁয়া লেগে আছে প্রাচীন লেখকদের লেখায়। জীবন কত দ্রুত পালটে যাচ্ছে, সভ্যতা কত জটিল

হয়ে পড়ছে তা জানতে হলে পাশাপাশি প্রাচীন আর আধুনিক লেখকদের পড়তেই হবে। চসার কীরকম ছিলেন জানো?

'কীরকম?'

'যেই বসন্ত এল, বইপত্তর মুড়ে রাখলেন, দক্ষিণের জানালা খুলে বসলেন প্রকৃতি দেখতে। এযুগে এমন জীবন তুমি আমি ভাবতে পারি? পারি না। গাছ আছে দেখি না। কখনও চোখে পড়লে অবাক হয়ে যাই, এত সবুজ ছিল কোথায়! মাথার ওপর আকাশ, তাকিয়ে দেখি না। হঠাৎ চোখে পড়লে, চমকে উঠি, এত তারা? দাও বইটা দাও।'

ছায়া বইটা এগিয়ে দিল। ছায়ার আঙুলগুলো ভারী সুন্দর, চাঁপার কলির মতো। অনামিকায় একটা আংটি জ্বলজ্বল করছে। এনগেজমেন্ট রিং নাকি? ছায়ার হাতের আংটি নিয়ে আমি ভেবে মরছি কেন? আচ্ছা বিপদ তো! উঠতি বয়েসের মেয়ে। কলেজে পড়ে। প্রেমটেম করতেও পারে। আমার তাতে কী!

পশ্চিম বাংলার সব মেয়েকেই কি আমার অনুমতি নিয়ে চলতে হবে। মাত্র হাত দুয়েক দূরে ছায়া তার টানটান শরীর নিয়ে বসে আছে। দেহের দূরত্ব খুবই কম কিন্তু মনের ব্যবধান অনেক। ছায়া পড়তে এসেছে, প্রেম করতে আসেনি। মাধবীর কথা ভীষণ মনে পড়ছে। সেও একদিন এভাবেই আমার সামনে বসত, সন্ধে গড়িয়ে যেত রাতের দিকে। শিক্ষক শঙ্কর আর মানুষ শঙ্করে মনের মধ্যে ঝটাপটি বেধে যেত। হাতে হাতে লেগে যেত। হাঁটুতে হাঁটু ঘষে যেত। আমার শরীর কেঁপে উঠত। চলে যাবার সময় মাধবী দরজার সামনে এসে দাঁড়াত। আমি চটি টানতে টানতে রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতুম। আমার মনের জানালায় মাধবী তখনও দাঁড়িয়ে থাকত। হঠাৎ একসময় আমি গান গেয়ে উঠতুম পাগলের মতো। সেসব দিন কোথায় চলে গেল! ছোড়া ঢিল আর ওলটানো দুধ ফিরে পাওয়া যায় না শঙ্কর। হ্যাঁ পড়ো— দি ট্রি দি টেমপেস্ট উইথ এ ক্ল্যাশ অফ উড।

'আপনার চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করছে কেন? কাঁদছেন নাকি?'

ছায়া ঠিক ধরে ফেলেছে। মেয়েদের দৃষ্টি থেকে সহজে কিছু লুকোনো যায় না। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললুম, 'যাঃ কাঁদব কেন। আমার কি সে বয়েস আছে। ইংরেজিতে একটা সুন্দর কথা আছে, বারি দি পাস্ট। অতীতকে কবর দাও। তবু মাঝে মাঝে সেই অতীত ভূতের মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। হাওয়ার শব্দে বলতে থাকে, ভুল করেছ, ভুল করেছ, এই করলে ওই হত, ওই করলে এই হত। এই দেখো পরের লাইনে কী রয়েছে— ঝড়ে গাছ উলটে পথের ওপর ফেলেছে, তার মানে এই নয় যে, তোমার চলার পথে বাধা পড়ল। না তা নয়। তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে থামানো হল, তুমি এবার ভাবো, একবার প্রশ্ন করো তুমি কে? নিজেকে তুমি কী ভাবো? কে তুমি, কে আমি, এই প্রশ্নের জন্যেই থেমে পড়া। বাধা জানে মানুষকে থামানো যায় না। লক্ষ্যের দিকে সে ছুটবেই, তবে জানতে হবে লক্ষ্যটা তোমার কী? উত্তর আমাদের মনে আছে, খুঁজে নিতে হবে। গোল হয়ে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পোড়ো না। বরং সোজা উড়ে যাও মহাশূন্যের দিকে কোনও কিছু একটা লক্ষ্য করে।'

ঘাড়ের কাছে খোঁপাটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে, 'উঃ কী গরম, কী গরম' করতে করতে শ্যামা ঘরে এসে ঢুকল, 'এই যে মশাই, ছাত্রী মন দিয়ে পড়ছে তো, না ছাত্রীও অমনোযোগী, শিক্ষকের মনও উড়ুউড়ু!'

ছায়া আড়চোখে শ্যামাকে একবার দেখল, 'তুমি আবার এখন জ্বালাতে এলে কেন বউদি!'

'কে কাকে জ্বালায় ভাই? তোমরা নিজেরাই কেমন জ্বলছ, একবার দেখতে এলুম।'

'দাদা কোথায়?'

'ছোট ঘরে খাজনা দিতে ঢুকেছে। তারস্বরে গান হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? বাথরুম রেডিয়ো।'

শ্যামা আমার পেছনে। ঘাড় না ঘুরিয়েই বুঝতে পারছি দেহের উত্তাপে, গন্ধে। হঠাৎ চোখের

ওপর একটা হাত চাপা পড়ল, আকর্ষণে মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়ল শ্যামার বুকের কাছে, ঠোঁট দুটো বোধহয় একটু হাঁ হয়েই ছিল, মুখের মধ্যে ঢুকে গেল হাতে-গরম দুটো ডালবড়া।

শ্যামা হাসতে হাসতে সামনে চলে এল, 'কী মশাই, কেমন সুস্বাদু? প্রেয়সীর মুখ চুম্বনে এমন স্বাদ পাবেন কি?'

কথা বলব কী, মুখে ডালবড়া জিভে গরম ছড়াচ্ছে। তার ওপর ক্যাচ করে চিবিয়ে ফেলেছি একটা কাঁচা লঙ্কার টুকরো। সারা মুখগহ্বরে লঙ্কাকাণ্ড।

'আই, ঠাকুরঝি গেট আপ। পনেরো মিনিটের রিসেস। ওপরে চলো। জলখাবার খেয়ে আবার প্রাণখুলে পড়ো, যতক্ষণ পারো।' ছায়ার ওপর বাহু ধরে শ্যামা হিড়হিড় করে টানছে। বেচারার দীর্ঘ পা নিচু টেবিলের তলায় আটকে আছে। উঠতে পারছে না। চেয়ারটা সামান্য হেলে গেছে একপাশে। ডান পা-টা টেবিলের তলায় উঁচু হয়ে আমার হাঁটুতে এসে লাগল।

'আরে ছাড়ো ছাড়ো, ওমা শঙ্করদার গায়ে পা লেগে গেল। ছি ছি, গুরুজন মানুষ। তুমি কী যে করো-না বউদি, কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

'এত খাওয়াচ্ছি তবু গায়ে জোর হচ্ছে না কেন তোমার? ছেলেদের সঙ্গে লড়বে কী করে!'

'থাক বাবা, আমি তোমার মতো গুন্ডা হতে চাই না।'

শ্যামার পেছন পেছন ছায়া উঠে গেল। শ্যামা দরজার সামনে ফিরে এসে ডান চোখটা বুজিয়ে কী যে ইঙ্গিত করে গেল! ছি ছি, ছায়ার সামনে এমন কাণ্ড করে গেল। ও হয়তো খোলা পরিষ্কার মনেই করল। শ্যামার স্বামী শেখরবাবু হয়তো অন্যরকম ভাববেন। সবে বিয়ে হয়েছে। বছর তিনেক হল বোধহয়। প্রেম এখনও তেমন দরকচা হয়ে যায়নি! অবশ্য প্রেমই এইসব ছোটখাটো বেচাল উদার মনে ক্ষমা করে নেবে। বউ যতদিন না পুরনো হচ্ছে ততদিন তার হাঁচি, কাশি, নাকঝাড়াও সুন্দর লাগে।

ছায়া কী কী বই এনেছে দেখি। এটা হল এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড। এলিয়ট আমারও প্রিয় কবি। পাতা ওলটাতেই ভাঁজ করা একটা কাগজ বেরিয়ে পড়ল। দেখলেই বোঝা যায় চিঠি। কার চিঠি! চিঠিটা যে পাতায় তার বাঁ দিকের পাতায় সেই বিখ্যাত দুটি লাইন, আই গ্রো ওল্ড, আই গ্রো ওল্ড। আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি, ক্রমশই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এইবার আমার প্যান্টের পা দুটোকে গুটিয়ে পরতে হবে। কিন্তু চিঠিটা কে লিখছে? কৌতূহল বড় জিনিস! ভাঁজ খুলে ফেললুম। থাক কবিতা। যৌবনের রহস্য দেখি।—

'আমার ওসব একেবারেই ভাল লাগে না, আমি খেলতেও চাই না খেলাতেও চাই না। সব কিছুই আমার সহজ সরল। তুমি যদি আমাকে না চাও আমিও তোমাকে আর চাইব না। আমরা মাছ নই, মানুষ।

সেদিন শুধু শুধু সিনেমার টিকিট দুটো নষ্ট হল। ন'টা টাকা বড় কথা নয়। বড় কথা হল মন। তুমি কথা দিয়েও এলে না। দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হতাশা বোঝো! মন ভেঙে যায়। এইভাবে মনের পর মন কত মন তোমরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভাঙবে! বুঝেছি ভালবাসা জিনিসটা বড় একপেশে, একতরফা, মনের যে দরজা দিয়ে বেরোয় সে দরজা দিয়ে ঢোকে না। এ এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট যার কোনও রিটার্ন নেই। এ এমন পাখি যার কোনও সঙ্গী নেই। বার্ডস অফ প্যারাডাইসের কথা সেদিন কী একটা বইতে পড়ছিলুম। পুরুষ পাখিরা নেচে কুঁদে অস্থির হয়, মেয়ে পাখিরা দেখেও দেখে না, ডাল থেকে ডালে উড়ে চলে যায়। এই অর্থহীন উদাসীনতার জন্যে ওই জাতের পাখি পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসেছে। তুমিও একটি সেই জাতের পাখি। এইভাবেই আমাদের সমাজ একদিন নিষ্ঠুর কিছু ব্যাসটার্ডে ভরে উঠবে, যাদের অভিধানে প্রেম থাকবে না, প্রজনন থাকবে না...'

পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটা তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেললুম। বেশ লিখেছে ছেলেটি। না ছায়া নয়, শেখরবাবু অফিসের পোশাকে দরজার সামনে। বেশ সুখী সুখী চেহারা। খানাপিনা ভালই হচ্ছে।

'দুগগা, দুগগা।'

'হ্যাঁ দুগগা দুগগা। অফিস বেরোনোব বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে তো। আচ্ছা শঙ্করবাবু!'

শেখরবাবু চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে এলেন। মুখে উদ্বেগ।

'ক'দিন ধরেই ভাবছি আপনাকে বলব, রোজই ভুলে যাই। একটা ষণ্ডামার্কা লোক প্রায়ই দেখি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটাকে আগে কখনও এ পাড়ায় দেখেছি বলে মনে হয় না। সন্দেহজনক চালচলন। কী ব্যাপার বলুন তো! বাড়িতে মেয়েরা একলা থাকে, রাস্তাতেও বেরোয়, ভয় করে মশাই। আপনি লক্ষ করেছেন?'

'আজ্ঞে না, আমি তো সেভাবে দেখিনি, নিজের খেয়ালে দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকি। বললেন যখন এইবার দেখব।'

'হ্যাঁ দেখবেন তো ভাই। ছায়াটাকে নিয়েই আমার ভাবনা। কিডন্যাপিং কেস ক্রমশই বাড়ছে।'

শেখরবাবু বাই বাই করে চলে গেলেন। একরাশ ভাবনা রেখে গেলেন আমার জন্যে। কলে-পড়া ইঁদুরের মতো আমার অবস্থা। পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি।

ছায়া আরও ঘেমেটেমে এল। শাড়িটাকে এমন পেঁচিয়ে-মেচিয়ে টাইট করে পরেছে, মুনিরও মতিভ্রম হবে, আমি তো তুচ্ছ শঙ্কর। দাদা বলে গেলেন, ছায়াকে নিয়েই ভয়। সব মেয়েকে নিয়েই ভয়। সর্বত্রই হাইনার হাতছানি। বিশ্বাস মাথা কুটছে অবিশ্বাসের দেয়ালে।

ছায়া বললে, 'ওই ছোট টেবিলটায় বসা যায় না, খাটে বসলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়, তবে দাঁড়াও বেডকভারটা পেতে একটু ভদ্রস্থ করি।'

'থাক। আপনি বসুন, আমি একটু গুরু সেবা করি।'

'তা হলে এসো দু'জনে ধরাধরি করে করি।'

বেডশিটটার মাঝখানে বিশ্রী একটা দাগ। কোনওদিন মনে হয় চা-টা পড়েছিল! ছায়ার সামনে নিজেকে ব্যাচেলার মনে হচ্ছিল।

'আজ দুপুরে আপনার ঘরটাকে আমরা দু'জনে মেরামত করব। এই ময়লা জামাকাপড়গুলো লন্ড্রিতে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন না?'

সবই পারি সুন্দরী, তবে জীবন থেকে বেঁচে থাকার উত্তাপটাই উবে গেছে। কিছু আর তেমন ভাল লাগে না। হচ্ছে, হবে। বউটা চলে গেল। ফিরে পাব কিনা ঈশ্বরই জানেন। পেলেও কী অবস্থায় পাব তাও জানি না। ক্যানসারে তাকে তিল তিল করে খাচ্ছে। কীসের নিশ্চয়তা, কীসের আশ্রয়, কীসের নিরাপত্তা; খোলা মাঠ, খোলা আকাশ, শীতের সকালের কুয়াশার মতো চারপাশ থেকে নেমে আসছে ভয়!

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সতেরো নম্বর বেডেই তো সুধা ছিল। কোথায় গেল! এ বেডে তো দেখছি অন্য এক মহিলা। পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে আছেন। সুধার মতোই বয়স হবে। দুটি পা হাঁটুর কাছ থেকে মোড়া। শাড়ির প্রান্ত অল্প ওপরে উঠে গেছে। সব বেডেই একজন-দু'জন ভিজিটার। এঁর কাছে কেউ নেই। পাশের টুলটা খালি। মাথার কাছের মিটসেফের মাথার ওপর দুটো ফ্যাকাশে মুসুম্বি। বেডের তলায় একটা গামলা। দুটো ভাঙা অ্যাম্পুল ভাসছে।

সোজা তাকালেই সেই বৃদ্ধা। রোজ যেমন দেখি আজও বিছানার ওপর খাড়া হয়ে বসে বসে ডাবের হিসেব করছেন, 'সকালে দেখলুম ছ'টা, এখন পাঁচটা কেন? কোন মুখপোড়া সরালে।'

পাশের বেডের আর এক মহিলা বললেন, 'একটা তো আপনি দুপুরে খেলেন।'

'খাবার পরই তো ছ'টা ছিল, এখন দেখছি পাঁচটা।'

'ও আপনার হিসেবের ভুল।'

'হিসেবের ভুল! আমার স্বামী কী বলত জানো, ব্যাটাছেলে হলে তুমি বিরজা চাটার অ্যান্টনি হতে। সব মানুষের দুটো চোখ, তোমার ছ'টা চোখ।'

'চাটার অ্যান্টনিটা কী দিদিমা!'

'ওই যে গো যারা হিসেব-টিসেব রাখে। ছ'হাজার টাকা মাইনে পায়।'

'তা কী হবে অত হিসেবে! ক'দিনই বা বাঁচব!'

'ওমা অলুক্ষনে কথা শোনো। সামনের ফাল্গুনে আমার নাতিটার ভাত। বউমার পেটে আবার একটা এসেছে। এবার বলেছি একটা নাতনি চাই মা। পাকা চুল তুলে দেবে। দু'জনে পা ছড়িয়ে বসে বসে গল্প করব চাঁদের আলোয়।'

জুতোর শব্দটা তুলে সিস্টার আসছেন। হাতে একটা সিরিঞ্জ।

'সিস্টার, এই বেডে সুধা ছিল...'

'সুধা মুখার্জি! তাকে তো থেরাপি ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওই ও ব্লকে। বোধহয় সাঁইত্রিশ নম্বর বেড।'

থেরাপি ওয়ার্ডের সামনের বারান্দায় বেজায় ভিড়। মেলা না বাজার! ঢোকবার বেরোবার অসংখ্য দরজা। একটা দরজার সামনে জনৈকা মহিলা খুব বিরক্ত মুখে বসে হালচাল দেখছেন। মনে হল হসপিটাল স্টাফ। জিজ্ঞেস করলুম, সাঁইত্রিশ নম্বর বেড কোনটা। একটা বাচ্চা মেয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলা মেয়েটিকে ডেকে বললেন, 'অলকা, এঁকে সাঁইত্রিশ নম্বরটা দেখিয়ে দাও তো।'

মেয়েটি বললে, 'সুধাদির কাছে যাবেন তো? আসুন।'

'হ্যাঁ মা সুধাদি।'

এলোমেলো সারি সারি লোহার খাট। অসংখ্য আত্মীয়স্বজনের ঠেলাঠেলি। মেয়েটি ঘরের মাঝামাঝি আমাকে নিয়ে আসতেই সুধাকে দেখতে পেলুম।

'ওই যে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' মেয়েটি যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই আবার ফিরে গেল।

সুধা আমাকে তখনও দেখতে পায়নি। কপালে হাত রেখে শুয়ে আছে স্থির হয়ে। অসম্ভব শীর্ণ দেখাচ্ছে। পরিবেশ আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। আস্তে ডাকলুম, 'সুধা।'

সুধা চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে তাকাল। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। ঝড় বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

'কেমন আছ আজ?'

'আজ আবার রে দিয়েছে। বড় কষ্ট। সারা শরীর জ্বলে গেল। চানটান করা চলবে না। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

টুলটা টেনে নিয়ে বসলুম। হাতের জিনিসপত্তর সাজিয়ে রাখলুম মিটসেফের ওপর।

'জ্বর আছে নাকি?'

'কী জানি!'

কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছি না। দৃষ্টি চলে যাচ্ছে সুধার বুকের ওপর। কণ্ঠার কাছ থেকে সেলাই নেমে ঢিলে ব্লাউজের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেটেকুটে কী করে দিয়েছে কে জানে। কত পরিচিত শরীর আমার কাছে এখন একেবারেই অপরিচিত। এমন সব ঘটনা মনে পড়ছে যা মনে পড়াই উচিত নয়। তবু পড়ছে। সেই আমাদের নিভৃত শোবার ঘর। সেইসব পাগলামির রাত। অশ্লীল ভাবলেই অশ্লীল। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কটা এত সহজ সুন্দর স্বাভাবিক, সংকোচমুক্ত, কোনও কিছুই যেন অশ্লীল নয়।

সুধা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'খাওয়া-দাওয়া? সকালের চা?'

'না কোনও অসুবিধে নেই। শেখরবাবুদের কোনও তুলনা নেই।'

'কবে ছাড়বে কে জানে। আর ফিরে যাব কিনা তাই বা কে বলতে পারে!'

সুধার চোখ দুটো ছলছল করছে। প্রসঙ্গটা সহজ করা দরকার।

'সুধা!'

'বলো।'

'একটা বাচ্চা মেয়ে তোমার বেডটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে গেল। ও কে?'

'রুগি।'

'ওরও ক্যানসার?'

'হ্যাঁ পেটে। ওর চেয়েও ছোট আছে, ওই দিকে তাকাও।'

সুধার পায়ের দিকে তাকালুম। শেষ প্রান্তের একটি বেডে গুটিসুটি মেরে একটি শিশু পড়ে আছে। তার কাছে কেউ আসেনি। মড়ার মতো পড়ে আছে স্থির হয়ে।

'ওর কোথায়?'

'পায়ে, কেটে বাদ দিতে হবে।'

'সে কী? ওর কাছে কেউ নেই কেন?'

'এই তো জগৎ। মাঝে-মধ্যে কেউ আসে। যে ফল পাখিতে ঠুকরে খায় দেবতার ভোগে আর লাগে না।'

চমকে উঠলুম। ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম। ভাল হয়ে, ফিরে গিয়ে সুধা যদি বলে— আমার বুকে তোমার মুখটা রাখো তো। আমি পারব না। দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, উৎপাটিত সৌন্দর্য। আমার ভয় করবে, ঘেন্না করবে। লোভের লোভনীয়কে আমি অন্যভাবে ভোলাবার চেষ্টা করব। সকালে ছায়ার দিকে আমি লোভের চোখে তাকিয়েছিলুম। তার পিচ্ছিল ঘর্মাক্ত শরীরকে মনে মনে অনাবৃত করেছিলুম। আর করব না।

'একবার এম-ওর সঙ্গে দেখা করি। ঠিক মতো দেখাশোনা করছে তো?'

'যতটা সম্ভব করছে। এর বেশি আর কী করবে।'

সন্ধের প্রায়ান্ধকারে রাস্তায় নেমে এলুম। কাঁধের পাশের ঝোলা ব্যাগে একগাদা রিপোর্ট প্রেসক্রিপশান। সুধার শরীরের যাবতীয় খবর। রোগ-জীবাণু বাহিনী ফুসফুসের দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। মৃত্যুরশ্মি দিয়ে সমস্ত কোষগুলোকে পুড়িয়ে দিতে হবে। ডাক্তারদের শক্তির চেয়ে ক্যানসারের শক্তি অনেক প্রবল। আপনি শুধু টাকা রেডি রাখুন। মেয়েদের বুকের ওই দুটো জায়গায় অসংখ্য স্পর্শকাতর গ্ল্যান্ডসের জটলা। সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীরের ওপর তারও তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে। দেখুন কী হয়। নার্ভাস হবার কিছু নেই। আবার সাহস দিতেও পারছি না।

মনটা ভীষণ বিষণ্ণ। ওই বিশাল বাড়িটার ভেতর মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে চুলের ব্যবধান। পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটছে। সুস্থ, সবল মানুষ টগবগ করে দৌড়োচ্ছে। দাঁড়াও পথিকবর, একবার শুধু ওই মৃত্যু-তীর্থটা দর্শন করে এসো, তারপর বলো, প্রেম কাকে বলে, ঘৃণা কাকে বলে, ঐশ্বর্য কাকে বলে, শোষণ কাকে বলে, আসন কাকে বলে, জীবন কাকে বলে! গর্ব কাকে বলে, অহংকার কীসের, ক্ষমতা কার?

মনে হল, সামনের পার্কটায় নির্জনে চুপ করে বসে থাকি। যাবই বা কোথায়! বাড়ি যাব? কী হবে? না পারব কিছু পড়তে, না পারব ঘুমোতে। তা ছাড়া সেই প্রহরী! উলটোদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। শেখরবাবু ভাববেন, ছায়াকে কিডন্যাপ করার তালে আছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তাটা পার হলুম। একেবারে গা ঘেঁষে একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষল। ব্রেকের শব্দে চমকে উঠেছিলুম। পেছনের দরজা খুলে গেল। আদেশ এল, 'উঠে আসুন।'

'কে আপনি?' ও মাধবীর সেই স্বামী। চেহারা দেখলেই এখন গা ঘিনঘিন করে। দ্রুত পা চালিয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে মিলেমিশে গিয়ে ওপাশের গেট দিয়ে যদি পালাই, তুমি শয়তান আমার কী করতে পারবে? এই বিশাল শহরে হারিয়ে যাওয়া এমন কী কঠিন কাজ! তাই করি।

গাড়ির ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা হাসি ভেসে এল। পার্কের ঢোকার গেট আর হাত খানেক দূরে। পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর একটা হাত এসে পড়ল। সাঁড়াশির মতো দুটো আঙুলের চাপ: শরীরটা ধীরে ধীরে পেচোচ্ছে। সেই হাতেরই মোলায়েম ধাক্কায় গাড়ির পেছনের সিটে তালগোল পাকিয়ে ঢুকে গেলুম।

'পালাচ্ছিলেন? নট দ্যাট ইজি।— এই চালাও।'

গাড়ি ডানদিকে কাত হয়ে আরও বহু গাড়ির স্রোতে সামনে এগিয়ে চলল। মিষ্টি একটা গন্ধ। আমার পাশেই এক মহিলা। এতক্ষণ লক্ষ করিনি। নিজের মান-অপমানের প্রশ্নে মনটা অগোছালো হয়ে ছিল। ক্রমশই ফিরে আসছি নিজের কাছে। ওপাশে জানালার ধারে মাধবীর স্বামী। সিনথেটিক শাড়ি পরা মহিলার ভারী উরু আমার উরুর পাশে পাশে গাড়ির ঝাঁকুনিতে থিরথির করে কাঁপছে। আমি দেখতে চাই না। সুন্দরী কি অসুন্দরী। যুবতী কি প্রৌঢ়া। গো টু হেল! গাড়ির গতি ময়দানের কাছটায় আর একটু বাড়ুক, আমি হঠাৎ দরজাটা খুলে লাফিয়ে পড়ব। মরি-বাঁচি কিচ্ছু এসে যায় না। এই রাসকেলের হাত থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। স্কাউন্ড্রেল! ব্যাসটার্ড। ডান হাতটা কোলের ওপর দিয়ে চালিয়ে লকটা দেখে নিলুম।

ক্যাথিড্র্যাল রোড। মরতে হলে চার্চের সামনেই মরব। লকটা ঠেলে ওপর দিকে তুললুম। খুট করে শব্দ হল। দরজা খুলল না। সে কী!

সেই হাসি, 'খুলবে না শঙ্করবাবু। আমার মুঠো সহজে খোলে না। আমার কামড় কচ্ছপের কামড়।'

জায়গাটাকে একটা স্টুডিয়ো বলেই মনে হল। বড় বড় আলো। ক্যামেরা ফ্লাড লাইট। ঝলঝলে প্যান্ট পরা কালো মতো একটি ছোকরা খুব খাতির করল। 'আসুন অসীমবাবু, আসুন অসীমবাবু, এত দেরি করলেন?'

মাধবীর স্বামীর নাম তা হলে অসীম। যাক, চিত্তকে আর জিজ্ঞেস করতে হল না। এতদিন নামহীন একটা লোক আমার ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। আজ অত্যাচারীর নামটা জানা গেল।

অসীম একটা সোফায় বসে বললে, 'সেই জানোয়ারটার জন্যে। শালা ভেগেছে। ভিতু রাসকেল। না খেয়ে মরবে তবু লাইনে ভিড়বে না। যাক আর একটাকে পাকড়েছি। আরে বাবা, পুকুরে জাল ফেললে মাছ ঠিক উঠবেই। নাও তুমি রেডি তো!'

'হ্যাঁ আমি রেডি। দাঁড়ান দরজাটা লক করে দিই।'

চড়া আলোয় মেয়েটিকে এবার ভাল করে দেখলুম। অসীমের পাশে বসে সিগারেট খাচ্ছে আর পা নাচাচ্ছে অসভ্যের মতো। রংটা কালো। তবে গতরটি খাসা। ছাত্রজীবনে আমরা যেমন বলতুম— ভেরি গুড ফর ব্যাড পারপাস।

ঘরের মাঝখানে একটা ডিভান। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক সব ক'টা আলোর ফোকাস সেইদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এ আবার কী খেলা! সিনেমা হবে নাকি!

অসীম মেয়েটির পিঠ চাপড়ে বললেন, 'রেডি!'

অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল অসীমের সামনে, 'নাও খুলে দাও।'

'না, আমি না। আজকে তোমার পার্টনার শঙ্কর।'

তার মানে? কত বড় ধৃষ্টতা, বাবুটা বাদ পড়ে গেল। পার্টনার? কীসের পার্টনার?

অসীম বললে, 'আমি আজ ডিরেক্টার। তার আগে তোমাদের তো একটু কিক চাই। শ্যামল, একটু ড্রিঙ্কস।

'রেডি আছে স্যার। বাঁ পাশে ওই র‍্যাকটার নীচের তাকে হাত চালান।'

অসীম বাঁ দিকে কাত হয়ে একটা বোতল, ওয়াটার জাগ, গোটা কতক গেলাস সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর একে একে সাজাল। মেয়েটি আমার পাশে এসে বসেছে। মুচকি মুচকি হাসছে।

'অসীমবাবু, আজকের ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না!'

গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে অসীম হাসল, 'আজ তো আপনি হিরো। হিরোইন পাশেই বসে আছে। সিনেমা হবে।'

'সিনেমা?'

'হ্যাঁ সিনেমা। ব্লু ফিল্ম দেখেছেন কখনও?'

'না।'

'নাম শুনেছেন?'

'তা শুনেছি।'

'সেই ব্লু ফিল্ম তোলা হবে।'

'আই রিফিউজ। আমি পারব না।'

'আপনার বাপ পারবে।'

'চেষ্টা করে দেখুন কেমন পারেন।'

অসীমের হাতে গেলাসটা কাঁপছে, 'আমার অবাধ্য হলে কী হতে পারে জানেন?'

'মৃত্যু।'

'হা হা মৃত্যু! মরলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল মশাই। আর কী হতে পারে ভাবতেই পারলেন না।'

অসীম একটা গেলাস মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে, 'ইলা, তোমার পার্টনারকে জাগাও।'

মহিলার নাম তা হলে ইলা। সাজপোশাকের ধরনে মেয়েরা যে বিবস্ত্রার চেয়েও মারাত্মক হতে পারেন ইলাই তার প্রমাণ। ইলা তার সারা শরীরের উত্তাপ দিয়ে, মদির গন্ধ দিয়ে আমাকে সোফার হাতলের সঙ্গে প্রায় ঠেসে ধরেছে। আর সরে বসার জায়গা নেই।

অসীম বললে, 'স্ক্রিপটা তোমরা শুনে নাও। ব্লু ফিল্ম হলেও একটা স্টোরি থাকা চাই। ইলা ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। পড়তে পড়তে ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে। একসময় বইটা ফেলে দিয়ে একটা বালিশে নিজের বুক চেপে ধরছে। সারা শরীরে নিজের হাত বুলোচ্ছে। এমন সময় ঢুকছে শঙ্কর।'

আমি চিৎকার করে বললুম, 'শঙ্কর ঢুকবে না, ঢুকতে পারে না।'

ইলা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'কেন অশান্তি করছ মাইরি। যে পাল্লায় পড়েছ, কাপড় তোমাকে খুলতেই হবে।'

ইলার চেপে আসা শরীরটাকে বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললুম, 'সবাই সব কিছু পারে না।'

অসীম চোখের সামনে গেলাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'প্রাণভয়ে পারে।'

'ধরুন আমার সে ভয়টা নেই। একসময় হয়তো ছিল, এখন আর নেই।'

'তা হলে আরও দুটো ভয় আছে। আপনার প্রিয় দুটো জীবন সুতোয় ঝুলছে, মাধবী আর আপনার স্ত্রী।'

'মাধবী আপনারই স্ত্রী। তার ভালমন্দের দায়িত্ব আপনারই। আর আমার স্ত্রী! একটু আগেই দেখে এসেছি সে জীবন আর মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। একটু এপাশ আর একটু ওপাশ।'

'সেইটাকেই আমি ওপাশের দিকে একটু ঠেলে দেব।'

ক্যামেরাম্যান শ্যামলবাবু একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। আলোর দিক থেকে সরে এসে বললেন, 'অসীমবাবু, নভিস আড়ষ্ট লোক দিয়ে এসব জিনিস হয় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। আজকে ছেড়ে দিন। একটু আগেই তিনতলায় পুলিশ হামলা হয়ে গেছে।'

'শ্যামল! তোমার কাজ তুমি করবে, আমার কাজ আমি করব। তুমি জানো পুলিশ-ফুলিশ আমার হাতের মুঠোয়। আমি একটা আঙুল হেলালে কলকাতায় বিস্ফোরণ হয়ে যেতে পারে। এই লোকটা আমার প্রেমের রাইভ্যাল। দিস ম্যান! আমার সংসার ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। আজ আমার ক্রীতদাস। ওকে ল্যাংটো হয়ে এই কার্পেটে হামা দিতে হবে।'

কী বলছে অসীম! আমি ওর রাইভ্যাল। তার মানে?

'মিথ্যে কথা। আমি কীসে আপনার রাইভ্যাল?'

'মাধবীর মন জুড়ে আজও শঙ্কর। সে স্বপ্নে শঙ্কর শঙ্কর করে। তার অ্যালবামে শঙ্কর। আমার বিছানায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে অদৃশ্য একটা লোক। সে শঙ্কর।'

'এটা আপনার গল্প কথা, আপনার মনের বিকার। আপনার পাঁচ হাজার টাকা আপনিই আমাকে নিতে বাধ্য করেছেন। ঠিক আছে, সে-টাকা আমি শোধ করে দেব।'

'তার আগে আপনার গলায় যে আমি ফাঁসটাকে আর একটু টাইট করতে চাই। আমার রাইভ্যাল হবে আমার চেনে বাঁধা কুকুর। মাধবীর সামনে আমি তার প্রেমিককে কুকুর করে ঘুরে বেড়াব। তার সামনেই সে আমার পা চাটবে।' অসীম হাসছে।

আমার ডান হাতের কাছে একটা ভারী ক্যামেরা স্ট্যান্ড। সরু ছুঁচলো তিনটে পায়া। নিমেষেই ঘটনাটা ঘটে গেল। কেঁচোও হয়তো সাপ হয়ে ছোবল মারতে পারে। আর্তনাদটা আমি শুনেছি। মৃত্যু হঠাৎ মাথায় ভেঙে পড়লে মানুষ হয়তো হাসতে হাসতে এইভাবেই চিৎকার করে ওঠে। হাসি আর আর্তনাদ, সামান্য ব্যবধান। সুইচ টিপে আলো জ্বালানো আর নেভানো। আমার নার্ভ এখন ভীষণ ঋজু। আমি কী করতে চাই, আমি জানি। স্ট্যান্ডটা বড় কাজে লেগেছে। আমার মুক্তিদাতা। আমি এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার চাই। বিদ্যুৎবেগে জিনিসটাকে বার কতক ঘোরালুম। বালবের কাচ ভাঙার শব্দ, ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারের স্পার্ক। আরও আর্তনাদ। পতনের শব্দ।

দরজাটা সহজে খুলে গেল। সহজেই লক হয়ে গেল বাইরে থেকে। ভেবেছিলুম বাইরের করিডরে অন্ধকারে ঘাড়ে কেউ লাফিয়ে পড়বে বাঘের মতো। প্রস্তুত ছিলুম। হাতে সেই স্ট্যান্ডটা। কিন্তু না। কেউ লাফিয়ে পড়ল না। সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিন তলায়। এইবার ডানদিকে সোজা হাঁটি। শেষ মাথায় ছোট্ট একটা দরজা। আশ্চর্য! আজ সব কিছুই খুলে যাচ্ছে। তুমি খুলে গেছ শঙ্কর। ভয়ের মোড়ক খুলে তুমি বেরোতে পেরেছ। ব্র্যাভো! ঘোরানো লোহার সিঁড়ি অন্ধকারে নেমে গেছে পাকে পাকে।

এ রাস্তাটার নাম রিপন স্ট্রিট নয়। কী নাম কে জানে? নামে কিছু এসে যায় না। আমার নাম শঙ্কর এইটুকুই জানি। বেশির ভাগই বস্তি। দোকানে সারি সারি খাবা খাবা গোরুর মাংস ঝুলছে লোহার শিক থেকে। একটা পান-বিড়ির দোকানে মাঝবয়সি একটি মেয়ে হাঁ করে পানের খিলি পুরছে মুখে। পরনে ছাপা সস্তা শাড়ি।

একপাশে একটি ট্যাক্সি ফুটপাথের দিকের পেছনের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বিতীয় আর কোনও কথা নয়। ফাঁকা রাস্তায় আমি বড় একা, বড় মুক্ত। এখনই ছুটে আসবে পীরু, শুকুর মিঞা। কী হয়েছে বোঝার আগেই আমাকে পালাতে হবে। ঈশ্বর, তুমি আমার সহায়। ঈশ্বর কি আছেন? থাকতেও পারেন। শেষের দিনে বুঝব।

দরজাটা টেনে লক করে দিলুম। চলুক না চলুক, পেছনের অন্ধকার আশ্রয়টাকে মায়ের আঁচলের মতো নিরাপদ মনে হচ্ছে। দরজা বন্ধর শব্দ হতেই পানের দোকানের সামনের মেয়েটি ফিরে তাকাল। মুখ নিচু করে ফুটপাথের পাশে পিচ করে পানের পিচ ফেলে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এল রাস্তা পেরিয়ে। রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে আমার পাশে এসে বসল। শাড়িটা টেনে হাঁটুর ওপর তুলে দিয়েছে কিছুটা।

এ আবার কে?

চ্যাকর চ্যাকর করে পান চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা চলোগে? পুরা কাম, কি আধা।'

আমার অত ভাববার সময় নেই, বললুম, 'পুরা।'

ইতিমধ্যে ড্রাইভার এসে আসনে বসে পড়েছে। মেয়েটা যেন মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা। ড্রাইভারকে হুকুম হল— 'রেসকোর্স।'

কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মেরে বলল, 'পহেলে বিশ রুপায়া ছোড়ো।'

পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করতে গিয়ে খেয়াল হল সাইড ব্যাগটা সুধার রিপোর্ট প্রেসক্রিপশান-ফ্রেসক্রিপশান সমেত অসীমের স্টুডিয়োতে ফেলে এসেছি। অভিজ্ঞ ডিটেক্টিভরা বলেন, খুনি যত সতর্কই হোক, খুনের জায়গায় একটা না একটা নিশানা ফেলে যাবেই।

টাকাটা ব্লাউজের মধ্যে দুটো বুকের খাঁজে মেয়েটা ঢুকিয়ে রাখল। ওর দিকে অনেক জায়গা তবু সরে এল আমার দিকে। বুকে শাড়ির আঁচল নেই। মাঝে মাঝে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চুলকোচ্ছে। অবশ্যই উকুন আছে। উকুন আছে, চর্মরোগ আছে, সিফিলিস আছে। থাকবেই তো। মুখে ভকভক করছে বিড়ির গন্ধ। ঘেন্না করলে চলবে না। এরাই তো এখন আমার আপনার লোক। গুনগুন করে হিন্দি ছবির কী একটা গান গাইছে। মেয়েটি ভেবেছিল আমি হয়তো ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ওর বুক নিয়ে খেলা করব। আমার সংযম দেখে অবাক হয়েছে। সংযমী লম্পট আমি। বার কতক ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের কাচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম সন্দেহজনক কোনও গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা। বোঝা গেল না।

আমার ছটফটানি দেখে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কেয়া ডর লাগতা? ভোয় করছে তোমার!'

'না না, ভয় করবে কেন?'

'পুলিশ কুছ করবে না। উসকা ভি তো কামাই হোগা।'

গাড়িটা ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি এসে গেছে। একঝলক আলো এসে পড়েছে ভেতরে। মেয়েটির ব্লাউজের মাঝের বোতামটা খোলা। সাদা ব্রেসিয়ারটা সেই ফাঁক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

'কেয়া দারু পিয়েগা?'

'দারু! না দারু খাব না।'

'তো এইসি হোগা!'

'হ্যাঁ, এইসিই হোগা।'

গাড়িটা ফাঁকা মাঠে গাছতলায় অন্ধকার মতো একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। দূরে রেসকোর্সের রেলিং। পঞ্জাবি ড্রাইভার নেমে যেতে যেতে বললে, 'জলদি কাম খতম করো।'

এমন নির্লিপ্ত উদাসীন ড্রাইভার এই প্রথম দেখলুম। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরে একটা আউটপোস্টের মাথায় আলোর নিশানা— পুলিশ।

মেয়েটি তখনও গান গাইছে— মসুম এক রাত কি/জিআ মেরা বাত কি। গান গাইতে গাইতেই তার দিকের দরজাটা হাট করে খুলে দিল। আমাকে বললে, 'উতারকে উধার সে আও।'

আমার দিকে দরজাটা খুলে সবুজ নরম ঘাসের ওপর দাঁড়ালুম। বেশ লাগছে এখন। বাইরেটা কেমন শীতল! কলকাতার একপাশে পড়ে আছি। ওই তো দূরে শহর! আলোর মালা। ওই উত্তর-পূর্ব কোণের কোনও একটি বাড়িতে দারুণ কাণ্ড হচ্ছে। কী ঘটেছে, কতদূর ঘটেছে কে জানে। ওই দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি হাসপাতালের ওয়ার্ডে সুধা শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে। চাপা মৃদু আলো জ্বলছে, মৃত্যুকে একটু ছায়াময় নরম চেহারা দেবার জন্যে। ওধারে আরও উত্তরে আমার বাড়িতে শ্যামা ভাবছে— এখনও আসছে না কেন? ছায়া বলছে, কোনও কথার ঠিক নেই, বলেছিল সেকেন্ড পেপারটা রাতে দেখিয়ে দেবে।

মেয়েটা পেছনের সিটে শুয়ে পড়েছে চিত হয়ে। একটা পা উঁচু করে সিটের পেছন দিকে এলিয়ে রেখেছে। আর একটা পা ছড়িয়ে দিয়েছে খোলা দরজা দিয়ে সামনে। সেই চির আমন্ত্রণের চেনা ভঙ্গি। 'মসুম হায় রাত কি। আ-যাও বাবু।'

'আতা হায়।'

'কেয়া পিসাব করো গে! চাককে পর ডাল দিজিয়ে।'

'নেহি, উধার ওই পেড় পর...।'

মনে হল, পশ্চিমই আমার পালাবার রাস্তা। ওই দিকেই ঘোড়া ছোটে। মানুষ বাজি ফেলে হারে, জেতে। গাছের ঘুপচি অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে ক্রমশ সরতে সরতে একসময় হারিয়ে যাওয়া। পায়ের কাছে একটা খালি বিয়ারের বোতলে হোঁচট খেলুম। এইবার দৌড়। ওই তো ট্রামলাইন। ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারি ব্যারাক। ঝাউয়ের সারি। আজ আমার ভাগ্য সত্যিই ভাল। সামনেই একটা ছুটন্ত বেহালার ট্রাম। মানুষ এর চেয়েও কত দুঃসাহসী কাজ করে— আমি একটা ট্রামে উঠতে পারব না!

কনডাক্টার ধমকে উঠল, 'মরার ইচ্ছে হয়েছে! চাকার তলায় চলে গেলে সারা জীবনের মতো পঙ্গু! যাবেন কোথায়?'

'বেহালা।'

'বেহালা! এটা তো কালীঘাট যাচ্ছে।'

'তাই যাব।'

বেচারা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা টিকেট পাঞ্চ করে দিল। কোথায় বেহালা, কোথায় কালীঘাট! 'মসুম হায় রাতকা। জিআ মেরা বাতকা।' রাতের বেলা ট্রামের ঘন্টির শব্দ বেশ লাগে। মনে হয় পরপারের ঘণ্টা শুনছি।

রাতের ট্রাম। তেমন ভিড় নেই। জানালার ধারে বসতে পেয়েছি। শান্ত শহর পেছন দিকে ছুটে চলেছে। আমার দিকে কেউ তাকালেই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। জেনে ফেলেছে নাকি, একটা খুনি বসে আছে। আয়নায় নিজের মুখটা ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। মানুষ মারলে মানুষের মুখটা কেমন দেখতে হয়!

কালীঘাট ডিপোয় নেমে মনে হল আমার চলার পথ শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শেষ সীমায় এসে হাজির হয়েছি। এইবার কোথায় যাব! যে মানুষের যাবার কোনও জায়গা থাকে না সে কী করে! এই শহরে এমন ছাদহীন পলাতক মানুষ ক'জন আছে। এই অনিশ্চয়তাকে মেনে নেওয়ার চেয়ে সোজা পার্ক স্ট্রিট থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করাই বোধহয় ভাল। কিন্তু মাধবীর স্বামী যদি মরে না গিয়ে থাকে!

একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছে।

'ট্যাক্সি!'

না, পালাল না। ধীর হল গতি।
'কোথায় যাবেন?'
'উত্তরে।'
'উঠুন।'
বাঙালি ড্রাইভার। হাত বাড়িয়ে দরজার লকটা ভেতর থেকে খুলে দিল।
পেছনের সিটে বসে মনে হল, যাক তবু চলেছি, তবু একটা কাজ পাওয়া গেল। স্নায়ু এখনও ভেঙে পড়েনি, তা না হলে কেন মনে পড়ল দুটো লাইন?

হম ওহঁ হ্যায়ঁ জহাঁসে হমকো ভী
কুছ হমারি খবর নহিঁ আতি।

আমি এখন ওইখানে আছি, যেখানে আমার নিজের কোনও খবর নেই। কিন্তু কোথাও একটা যেতে হবে তো। হ্যারিসন রোড চলে গেল। বিবেকানন্দ আসছে। ডলির কাছে যাই। কলকাতার ওই কয়েক বর্গমাইল লাল এলাকায় আমার চেয়েও কত মারাত্মক অপরাধী আশ্রয় পায়, আমি পাব না! আমি তো মাত্র একটা খুন করেছি।
'বাঁধুন।'
বিডন স্ট্রিট থেকে একটু এগিয়ে ট্যাক্সি আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বেশ রাত হল। হল্লাগাড়ি বেরোবার সময় হয়েছে। তবু ভয় পেলে চলবে না। মনে হচ্ছে, প্রতিটি বাড়ির ছাদে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেলধারী আততায়ী। আমার খেলা দেখছে। সামান্য হাতের চাপেই যার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া যায়। দয়ার সুতোয় ঘুড়ি উড়ছে। কেটে দিতে কতক্ষণ!
নির্জন রাস্তা। দালালরা বিশ্রামে চলে গেছে। একটা রিকশা সেই অন্ধকার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। দুটি যন্ত্রণাকাতর মানুষ। ভোগের যন্ত্রণা। একজনের কাঁধে আর একজনের মাথা। ক্ষীণ আর্তনাদ। সুরা আর সাকী প্রায় আধমরা করে দিয়েছে।

ময়েসে গর্জে নিশাৎ হ্যায় কিস রুশিয়াহ্ কো
এক গুনহ বেখুদি মুঝে দিনরাত চাহিয়ে।

তুমি কি আমোদ আর ফুর্তি লোটার জন্যে মদ গিলেছ মাতাল। না না, আমি জানি তুমি কিছু একটা ভুলতে চাইছ। আজ আমিও খাব। প্রচুর খাব। আমাকে ভুলতে হবে। নিজেকে হারাতে হবে। নিজের হাতেই তুলে দেব নিজের ঠোঁটে বিষ। ইস! রাত অনেক হল।
মেয়েটি জড়ানো গলায় বলছে, 'রিয়া বেকারার হ্যায়, সেই মেয়েটিকে চেপে ধরে দুটি মেয়ে মাথায় জল ঢালছে, আর বলছে, 'সহ্য যখন হয় না তখন খেয়ে মরিস কেন?'
মেয়েটি জড়ানো গলায় বলছে, 'জিয়া বেকারার হ্যায়, সোই বাহার হ্যায়। আমি একটু নাচব।' উঠে দাঁড়িয়ে ভারী পাছা দুলিয়ে নাচতে গেল। শুধু সায়া, ভিজে লেপটে আছে। নাচ আর হল না। ধড়াস করে পড়ে গেল। যে মেয়ে দুটো জল ঢালছিল, তারা বললে, 'মরবি যে, একে তিন মাসের পোয়াতি।'
ডলির দরজা বন্ধ। মরেছে! ঘরে বোধহয় সারারাতের খদ্দের। না, ঠেলতেই খুলে গেল। নীল আলো। মিষ্টি গন্ধ। খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছে। দুটো পা দু'দিকে ছড়ানো। একটা পা খাটের বাইরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে। কালো সায়া, সাদা দড়ি, সাদা ব্লাউজের শাসনে পুরুষ্টু বুক। ফন ফন করে পাখা ঘুরছে। ড্রেসিং টেবিলে রজনীগন্ধা আয়নায় মুখ দেখছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে।
দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিলুম। ডলি ঘুমিয়ে পড়েছে। সাইড টেবিলে দুটো খালি গেলাস। ওষুধের ছেঁড়া ফয়েল। পাউডারের কৌটো। বিছানার চাদর দলা পাকানো। একটা মাথার বালিশ মেঝেতে।
ভীষণ ঘুম পাচ্ছে যেন। ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। মায়ের কথা মনে পড়ছে। জীবনের এই

ভীষণ রাতে মায়ের বুকেই তো সন্তানের আশ্রয়। সুধার কথা মনে পড়ছে। ডলি, তুমি আমার মা হতে পারো না? সব মেয়ের মধ্যেই তো মা থাকে।

'ডলি, ডলি।' ইস, গলার কাছটা কে কামড়ে দিয়ে গেছে। 'ডলি, তোমার নরম বুকে মুখ রাখি। উঃ, আজ সারাটা দিন আমার কী ভীষণ গেল। ডলি, ডলি?'

'কে তুমি?'

'আমি শঙ্কর। না না, শঙ্কর নই, বিমল।'

'কোন বিমল— এখানে কয়েক শ' বিমল আসে। নিকালো, আভি নিকালো।'

এত জোরে লাথি মারবে, ভাবতেও পারিনি। মেঝেতে বসে পড়েছি। বাঃ মেয়েদের লাথি বেশ সুন্দর লাগে তো! যন্ত্রণা-মিশ্রিত আরাম। আমার সারা শরীরে যে রক্ত ছুটছে, তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যে খুন করতে পারে, সে রমণও করতে পারে। মৃত্যুর আগে মানুষ শেষ বারের মতো ভোগ করে নিতে চায়।

সারা শরীর দিয়ে ডলিকে বিছানায় চেপে ধরেছি।

'কে তুমি?'

'বললুম তো আমি বিমল।'

ডলি আমার মুখটা ভাল করে দেখে হেসে উঠল, 'সেই ভিতু মেনিমুখো লোকটা।'

এবার আমি নীচে, ডলি আমার বুকে, 'মাঝরাতে তুমি ন্যাকামো করতে এসেছ!'

'ডলি, আমি খুন করে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।'

'খুন? জীবনে কোনওদিন একটা পিঁপড়ে মেরেছ? কী খুন করেছ?'

'মানুষ। জ্যান্ত একটা মানুষ।'

'তাই নাকি? তবে একটা চুমু দাও। কোন শালাকে খতম করেছ? কই, তোমার হাতে রক্ত কই! রক্তের নদী বইয়ে দাও না মাইরি। বোতলে বোতলে ভরে রাখি রামের মতো। লাল টকটকে রক্ত। সব হারামজাদাদের রক্ত। তুমি আমাকে একটা ছেলে দিতে পারবে বিমল?'

'হ্যাঁ পারব।'

'পারবে না, পারবে না, তোমরা সব খচ্চর।'

'আলবাত পারব, আজ আমি সব পারব।'

'পারবে না, পারবে না, কোন শুয়োরের বাচ্চা আমাদের ফুল উপড়ে ফেলে দিয়েছে। দেখবে? তুমি দেখবে?'

ডলি সড়াক করে এক টান মেরে সায়ার দড়িটা খুলে ফেলল। তলপেট বেরিয়ে পড়েছে। বিয়ার খেয়ে খেয়ে মেদ জমেছে। হাঁটু গেড়ে বিছানায় উঠে বসল। চোখের সামনে ডলির পেট, উরু।

'এই দেখো। সোজা নেমে গেছে নীচের দিকে।'

দীর্ঘ একটা ক্ষতচিহ্ন। 'এটা কীসের দাগ ডলি?'

'ছুরির দাগ। এই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আমার মরা ছেলে। সেই লোকটাকে তুমি খুন করতে পারবে না? যে আমাকে ধাপ্পা দিয়ে, পিয়ে করে, শয়তানি করে পালিয়েছে। আমি আর কোনওদিন কারু মা হতে পারব না। তোমরাও কোনওদিন কারু সন্তান হতে পারবে না। তোমাদের চোখ থেকে শিশুটা পালিয়েছে। তোমাদের চোখে সব মেয়েছেলেই মাগি! দেখছ কী? নাও, যা নেবার খাবলা খাবলা করে নিয়ে নাও।'

ডলি আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ডলি তুমি কাঁদছ?'

'বড় নেশা হয়ে গেছে আজ। সেই সন্ধে থেকে খাচ্ছি। একী, তুমি কাঁদছ কেন? তোমরা কাঁদবে কেন? এ পৃথিবী হাসির নয়— এ পৃথিবী হাসির নয়, এ পৃথিবী কান্নার নয়।'

'তবে কীসের?'

'শালা মাঝরাতে তুমি ন্যাকামি করতে এসেছ? ফোতে কাপ্তেন। তোমাদের মতো সব শালাকে আমি চিনে গেছি। কোথায় আমার মা! কোথায় আমার বাবা! কোথায় আমার হারামজাদা স্বামী! কোথায় আমার বন্ধুরা। রেখা, সুলেখা, শ্যামলী।'

ডলি উপুড় হয়ে বালিশ খামচে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সাদা ধবধবে একটা শরীর বিছানায় ফুলছে, কাঁপছে। সামান্য আবরণ, বেশিটাই নগ্ন।

মিলা জবাব তসবীর খানা হ্যায় দুনিয়া।
সবে দরাজে আদম কা ফসানা হ্যায় দুনিয়া ॥

একটা গাড়ি চলে যাবার শব্দ হল রাস্তায়। কারা যেন ছুটছে। ঘরে নীল আলো, সাদা শরীর, ফনফন করে পাখা ঘুরছে। হাওয়া যেন সারা শরীরে কঙ্কালের আঙুলের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভোরের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। অদ্ভুত একটা স্বপ্নও দেখলুম। ছায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার সিল্কের চাদরের সঙ্গে ছায়ার লাল বেনারসির আঁচলের গাঁটছড়া বাঁধা। দু'জনে একটা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি। গাড়ির পাশেই রাস্তার ওপর সাদা চাদর ঢাকা একটা খাট। অবাক হয়ে দেখছি খাটটা এখানে কেন! আবার ফুল দিয়ে সাজানো। আমাদের ফুলশয্যার খাট রাস্তার ধারে? হঠাৎ মাধবী এল সাদা থান পরে। মাধবী? মাধবী কোনও কথা না বলে মাথার দিকের চাদরটা তুলে ধরল। সুধার মৃতদেহ। কপালের ওপর চুলের সীমানায় এত সিঁদুর দিয়েছে— সারা মুখ লাল। সেই লাল মুখে বড় বড় মুক্তোর দানার মতো ঘাম ফুটে উঠছে।

এক চমকে ঘুম ভেঙে গেছে। আমি কোথায়? কার বিছানা? কে আমাকে পাশবালিশের মতো জড়িয়ে শুয়ে আছে? সুধা? না। একে একে সব মনে পড়ল। আমার পাশে ডলি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মানুষ ঘুমুলে তার শক্ত মুখ কেমন নরম, ভাসা ভাসা পদ্মফুলের মতো হয়ে যায়। ভেতরের সামান্য পবিত্রতাও অসামান্য হয়ে সমস্ত পাপের চিহ্ন, ব্যভিচারের চিহ্ন মুছে দেয়। সায়ার ভেতর থেকে ডলির একটা নগ্ন পা বেরিয়ে এসে আমার শরীর বেষ্টন করেছে। একটা হাত আমার বুকের ওপর দিয়ে ওপাশে আলগা হয়ে ঝুলছে। নাকটা আমার ঘাড়ের কাছে দীর্ঘ গরম নিশ্বাস ফেলছে। স্তন দুটো বন্ধনহীন অবস্থায় জলভরা দুটো বেলুনের মতো চাদরে আলতো ভাবে পাশাপাশি শুয়ে আছে। মাথার খোঁপা ভেঙে গেছে। একটা চুলের কাঁটা উঁচু হয়ে আছে।

ডলির গোল হাতের চেটোটা চোখের সামনে তুলে ধরলুম। বেশ বোঝা যায় এ হাত মায়ের নয়, স্ত্রীর নয়, স্ত্রীলোকের। সাংসারিক কাজকর্মে ফেটে যায়নি, খয়ে যায়নি। বাটনার দাগ নেই নখের খাঁজে। মোচা কি এঁচোড়ের কষ নেই আঙুলের মাথায়। নরম মসৃণ হাত, সারা জীবন বিভিন্ন পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বুলোবার জন্যেই তৈরি। কবজির ওপরে একটা শুকনো ঘায়ের কলঙ্ক রাতে দেখিনি। দিনে বড় স্পষ্ট। সিফিলিস নাকি!

সিফিলিস শব্দটা আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছে। বন্ধ জানালার বাইরে দিন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। কোমরে অসহ্য ব্যথা। বুকের বাঁ পাশে পাঁজরের একটু ওপরে একটা নখের ক্ষত চিনচিন করছে।

ডলির পায়ের চাপ থেকে শরীরটাকে আস্তে তুলে নিলুম, রেকর্ড প্লেয়ার থেকে রেকর্ড তুলে নেবার মতো করে। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। ঘরের বাইরে এখন কী হচ্ছে? কী হচ্ছে রাস্তায়! কী হচ্ছে সুধার ওয়ার্ডে, আমার বাড়িতে! পুলিশ এখনও কেন আমাকে খুঁজে পাচ্ছে

না। নিশ্চয়ই কুকুর এনেছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে যে শঙ্করের অস্তিত্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এদের বাথরুমে এখন কে আছে? কোথায় আমার পেস্ট, ব্রাশ, পাজামা, সকালের চা! জীবনের সব কিছু কী সাংঘাতিক ভাবে উলটেপালটে গেছে? মেরামতের বাইরে।

দুনিয়া কা দীদনী উঅ তমাশা নিকল গয়া।
অব গরদ রহ গয়ী হৈ উঅ মেলা নিকল গয়া ॥

ঠিক বলেছ কবি, জীবনের রং-তামাশা সব বেরিয়ে গেছে। পড়ে আছে মুঠো মুঠো ধুলো। সারা পৃথিবীটা আমার সামনে মুছে যাওয়া অস্পষ্ট একটা ছবি। আমার পায়ে কত বড় বড় লোম। শরীরে লোম থাকলে মানুষ কি খুনি হয়!

ডলি আড়মোড়া ভেঙে চিত হয়ে চোখ চাইল।

'কে তুমি? ও তুমি?'

খোঁয়াড়ি ভাঙছে। ডলি পা দুটো টানটান করে বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'একটু টিপে দাও না মাইরি। ভীষণ কনকন করছে। আজ হয় একাদশী, না হয় অমাবস্যা, না হয় পূর্ণিমা।'

পদসেবা! তাও আবার বেশ্যার! একেই বলে মানুষের কপাল। কোত্থেকে কোথায় নেমে আসে! সায়াটা উঠে গেছে হাঁটুর ওপরে। ডলি খাটের ওপর দুম করে একবার পা ছুড়ে বললে, 'রগের দুটো পাশ ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

বুঝেছি, পা টিপতে হবে, মাথা টিপতে হবে। জীবনে যেসব সেবা সুধাকে করতে হয়নি সেই সেবা এই মেয়েটি আমাকে দিয়ে করাবে। লোভনীয় দুটো পা, তবু নিজের একটা অহংকার আছে তো! ডলি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে। বাঁ পা-টা আমার কোলের ওপর তুলে দিয়ে বললে, 'অভ্যাস করে রাখো। জেলে গেলে পুরনো কয়েদিরা তোমাকে দিয়ে এর চে অনেক বেশি খারাপ কাজ করাবে।'

'তুমি কি জেল ফেরত?'

'আজ্ঞে না। তবে জানি।'

দরজায় টুক টুক করে দু'বার টোকা মারার শব্দ হল। পা-ফা ফেলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় শঙ্করকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। খাটো আধময়লা আন্ডারওয়্যার। সামনে ঝুলছে দড়ি। কাঁধকাটা গেঞ্জি। কপালে চুল ঝুলছে। সদ্য ছাঁটা ঘাসের ডগার মতো একমুখ দাড়ি। চোখের কোলে কালি। বাঃ বেশ দেখতে তো। আবার দুটো টোকা পড়ল দরজায়। অসহায় মুখে তখনও শুয়ে থাকা ডলির মুখের দিকে তাকালুম।

'ভয় নেই। পুলিশ নয়, হরেন। দরজাটা খুলে দাও!'

'এই অবস্থায়!'

'এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ওরা এখানে লোক দেখে দেখে এইটাকেই স্বাভাবিক অবস্থা ভাবতে শিখেছে।'

দরজা খুলতেই হাঁটুর ওপর নীল লুঙ্গি পরা স্বাস্থ্যবান একটি লোক নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। ঘরের কোণ থেকে একটা টি-পট তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ডলির আদেশ শুনল।

'চার কাপ চা এনো। দুটো অ্যাসপিরিন এনো।'

'আমি যে একবার বাথরুমে যাব।'

'দেখো খালি আছে কিনা?'

'টুথপেস্ট?'

'ওই ড্রয়ারটা টানো।'

ডলিকে এখন বেশ বউ বউ লাগছে। আয়েশি বউ। আমি যেন স্ত্রৈণ, হাবাগোবা স্বামী।

'তুমি উঠবে না?'

'এর মধ্যে! আমাদের দিনটা রাত, রাতটা দিন।'

বাথরুম খালিই ছিল। কারণ এখানে দিনটা রাত। এপাশে ওপাশে সবকটা ঘরেরই দরজা বন্ধ। ডলির তোয়ালেটা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করেনি, প্যান্টের পকেট থেকে রুমালটা বের করে এনেছি। কে যেন বলেছিল, নেশা না করে বেশ্যাবাড়িতে গেলে সহজ হওয়া যায় না। যারা নেশা না করেও সহজ হতে পারে তারা সাংঘাতিক লোক, নির্ভেজাল লম্পট।

ঘরে আসতেই ডলি বললে, 'তোমার ঠান্ডা ভিজে হাতটা আমার কপালে রাখো তো! আঃ কী আরাম!'

ডলির মুখটা ভারী মিষ্টি। মনেই হয় না বারবধূ। ছোট্ট কপালে কুচোকুচো চুল।

ডলি হঠাৎ প্রশ্ন করল 'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

বড় কঠিন প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

বড় কঠিন প্রশ্ন। এর কোনও উত্তর নেই। মানুষ নিজের সম্পত্তিকে ভালবাসে, মোহ থাকে। পরের সম্পত্তির ওপর লোভ থাকলেও ভালবাসা থাকে না। মানুষ নিজের বাগানেই বাগান করে। কর্পোরেশনের বাগানে বেড়াতে যায়। তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিয়ে নিজেকে চাপা দিলুম।

'হ্যাঁ বাসি।'

ডলি শব্দ করে হাসল। হেসে বললে, 'মেয়েরা কিন্তু সহজেই কোনও কোনও মানুষকে ভালবেসে ফেলে। মেয়েরা হল কুকুরের জাত। বিস্কুট দেখলেই ন্যাজ নাড়তে থাকে।'

হরেন এসে গেল চা নিয়ে। সেই রাতের গেলাস দুটো ধুয়ে এনে সামনে রাখল। দুটো অ্যাসপিরিন। ডলি আধশোয়া হয়ে বললে, 'ঢালতে পারবে?'

চা ঢালতে ঢালতে শ্যামার কথা, ছায়ার কথা মনে পড়ছে।

'ডলি, তুমি হরেনকে দিয়ে আজকের সবকটা খবরের কাগজ আনিয়ে দিতে পারবে?'

'কেন?'

'কাগজ দেখলেই কালকের ঘটনাটা জানা যাবে।'

'তা যাবে। তবে তার আগে দেখতে হবে তোমার পীরু সামনের রাস্তায় খাড়া আছে কি না?

'ঠিক বলেছ। কিন্তু কে দেখবে?'

'তুমি দেখবে।'

'ধরা পড়ে যাব।'

'দূর বোকা! তুমি ওই পশ্চিমের জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখবে।'

গেলাস নামিয়ে রেখে তখনই ছুটছিলুম। ডলি বললে, 'আহা চা-টা খেয়ে নাও। তার আগে আমার ওই শাড়িটা দু'ভাঁজ করে পরো।'

সাবেককালের লাজুক সুন্দরীর মতো জানালার পাখি ফাঁক করে বাইরের রোদ-ঝলসানো কলকাতার লাল এলাকার দিকে তাকালুম। যতটুকু দেখা যায়। প্রথমেই নজর কেড়ে নিল সামনের বাড়ির দোতলার খোলা জানালা। পা তুলে বসে আছে 'মাশরুম' রঙের একটি মেয়ে। হলদে সায়া, খাটো সাদা ব্লাউজ ঠেলে ওঠা বুক। ডলির শাড়ি পরার পর থেকেই শরীরটা এমনই শিরশির করছিল। সামনের দৃশ্য, রঙের মিলন, এলানো রুক্ষ চুল মনটাকে কেমন যেন পাগলাটে করে দিল। আমার ভেতর এত কাম ছিল, এত বিকৃতি ছিল, কই আগে তো বুঝিনি! আমি বোধহয় খারাপই হয়ে গেলুম। গালিব, তোমাকেই যে আমার এখন মনে পড়ছেঃ

আতা হ্যায় দাগে হসরতে দিলকা শুমার ইয়াদ
মুঝসে মেরে গুনাহ কা হিসাব অ্যায় খোদা নহ মাঙ্।

ঠিকই বলেছ তুমি, ভেতর দিকে ভাল করে তাকালে তবেই ধরা পড়ে অতৃপ্ত বাসনার দাগ! চেয়ো না, চেয়ো না খোদা আমার পাপের হিসাব।

ডলি আমার পেছনে এসে কাঁধে দু'হাতের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে পড়েছে, 'কী, কেউ আছে, দেখতে পাচ্ছ?'

ডলির খোলা চুল আমার কপালে, কাঁধে, চোখের ওপর চামরের মতো ঝুলছে। তার শরীরের মধ্যভাগের গরম স্পর্শ আমার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। রইল রাস্তা। রইল পড়ে আমার ভাগ্য। ফাঁকা রাস্তায় সন্দেহজনক কেউ নেই।

ডলির কোমরটা জাপটে ধরলুম। ঘুমভাঙা বাসী শরীর, ত্বকের গন্ধ। আমি তোমার শরীরের অন্ধকারে, তোমার গুহায় ঢুকে যেতে চাই। তোমার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাক। সব বাঁধ, বাঁধন ভেঙে যাক। বন্যা, বন্যা।

'তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে?'

লাল টকটকে শীতল মেঝে, দুগ্ধ-ধবল নগ্ন একটি শরীর, অর্ধনগ্ন একটি পুরুষ দেহ। ওপাশে জানালায় হলুদ আর সাদা। কতক্ষণের জীবন! প্রজাপতির আয়ু। আমার কানের কাছে রক্তে বাজছে ইকবালের সুর,

তেরা মিলনা, তেরা নেহি মিলনা,
ঔর জিন্নত হ্যায় কেয়া, জাহান্নম কেয়া।

ডলি বলছে, 'আমিও কি পাগল হয়ে গেলুম। এখানে যারা আসে সবাই বাসি ফুল নেতিয়ে পড়া ফুল। তুমি আমার টাটকা গোলাপ। একে একে তোমার পাপড়ি ছিঁড়ি। তুমি তো মরবেই। তোমার অসীম যদি বেঁচে থাকে তোমাকে খুন করবে। সে যদি মরে থাকে পুলিশ তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবে। হায় তেরা হাল, বেহাল।'

হরেন প্রায় সবকটা কাগজই কিনে এনেছে। লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া টিকিটের নম্বর দেখার উৎসাহে যেন কাগজ দেখছি। মেঝের ওপর পাখার হাওয়ায় কাগজ উড়ছে। বাংলা কাগজে কোনও খবর নেই। এতবড় একটা খবর ছাপা হল না কেন! দুটো খুনের খবর আছে। কলকাতায় নয়, জেলায়, তাও রাজনৈতিক খুন। ইংরেজি কাগজে ছোট করে একটা খবর ছেপেছে। অগ্নিকাণ্ডে পার্ক স্ট্রিট এলাকার এক ফ্ল্যাটে তিনজন সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ। ঘরে দাহ্য পদার্থ ছিল। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ইলেকট্রিক্যাল শর্ট-সার্কিট।

ডলি চান করে এসেছে। ভিজে সায়া বুকের ওপর তুলে পরেছে। চুলে তোয়ালে জড়ানো। ঠাকুরের ছবির সামনে ধূপ জ্বালছে।

'বুঝলে, কিছুই পেলুম না।'

'পাবে না জানতুম।'

'কেন?'

'খুন-খারাপিটা আজকাল কোনও খবরই নয়।'

'তা হলে?'

'তা হলে প্রস্তুত থাকো। পুলিশ তার কাজ ঠিকই করবে। হয়তো জাল টানতে একটু দেরি করছে।'

'আমার তা হলে কী করা উচিত?'

'তুমি দাড়ি রেখে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে কি নেপালে চলে যাও।'

'আমার বউকে কে দেখবে?'

'ভগবান।'

ডলি হাঁটু গেড়ে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। ভিজে সায়া লেপটে আছে ভারী নিতম্বে। কাল রাত থেকে একটা নারী-শরীর কতভাবে দেখছি। প্রণাম সারা হয়েছে। হাত জোড় করে চোখ বুজিয়ে বসে আছে গোড়ালির ওপর স্থির হয়ে। যখন চোখ চাইল, চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল।

'বড় বিপদে পড়ে গেলুম ডলি।'

'মনে সাহস আনো। প্যান প্যান করে কোনও লাভ নেই।'

'কী করি? কার কাছে যাই!'

'তোমার সেই ওপরের ভাড়াটে শেখরবাবুর আপিসে একবার যাও। তা হলেই জানতে পারবে বাড়িতে কোনও হামলা হয়েছে কিনা?'

'যাঃ, ও তো যেচে ধরা দেওয়া। ভদ্রলোক সন্দেহ করবেন। এসব ব্যাপার পাঁচ কান করতে নেই।'

'তা হলে তোমার বন্ধু চিন্তুর বাড়িতে যাও। বাড়ির জামাইয়ের ভাল-মন্দ কিছু হলে তারাই আগে খবর পাবে।'

'এটা মন্দ বলোনি। কিন্তু রাস্তায় বেরোবার সাহস নেই। আজ আবার সুধার ওষুধ কিনে পৌঁছে দেবার কথা। প্রেসক্রিপশানটা তো ফেলে আসা ঝোলা ব্যাগের মধ্যেই ছিল।

'কেলোর কিত্তি করেছ। বলো তো আমিই না হয় তোমার বউয়ের কাছে যাই। ডাক্তারকে দিয়ে নতুন করে লিখিয়ে ওষুধ কিনে দিয়ে আসি।'

'না, না।'

'না না কেন? ও, ধরা পড়ে যাবে! তুমি কুলও রাখবে শ্যামও রাখবে, তা কি কখনও হয় গুরু! যে-কোনও একটাকে ছাড়তে হবে মানিক।'

ডলির কাপড় ছাড়া দেখতে দেখতে অনেক কথাই মনে পড়ছিল। শ্যামা সেদিন বলেছিল, মেয়েদের আঁচলে বশীকরণের জাদু আছে। সুধা কাপড় ছাড়ার সময় ঘর থেকে আমাকে বের করে দিত। মাধবী একদিন খুব বেকায়দায় পড়ে ব্লাউজের পিঠের হুক লাগিয়ে দিতে বলেছিল। ছায়া কিন্তু আমার সামনে বসেই পেট বের করে কোমরে শাড়ির কষি আলগা করেছিল।

ডলি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, 'কারুকে ধরে আবার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

বেঁচেই তো আছ।'

'এরকম বাঁচা নয়। বেশ নিজের সাজানো সংসার, স্বামী। তোমাকে বোধহয় আমি ভালই বেসে ফেললুম।'

আবার ভালবাসার কথা। ক্যানসারের মতো ওটাও একটা সাংঘাতিক অসুখ। কোনও ওষুধ নেই। স্রেফ পুড়িয়ে দিতে হয়। ডলি ঘাড়ে পাউডার বুলিয়ে বললে, 'জানি এ লাইনে ভালবাসলেই মরতে হয়। হয়তো দেওয়া যায়, নেবার লোক নেই।'

'তুমি প্রেমের কথা, সংসারের কথা বলছ? আমি ভাবছি মৃত্যুর কথা। একটা রাত তো কোনওরকমে কাটল। এরপর কী হবে? তবু তোমাকে একটা শের শোনাই :

ইশ্‌ক্ সে তবীয়ৎ সে জিস্তাকা মজা পায়া
দর্দকা দওয়াপায়ী দর্দে লাদওয়া পায়া।

'তোমার ও উর্দু বুঝি না বাপু, বাংলা করে বলো।'

'প্রেম থেকে বাঁচার মজা পাওয়া যায়। সেই মজা হল সব ব্যথার ওষুধ। কিন্তু সেই প্রেম নিজেই এমন এক যন্ত্রণা যার কোনও ওষুধ নেই।'

'বাঃ বাঃ, কে লিখেছে গো।'

'কে আবার? সেই গালিব মিঞা।'

বেলা পড়ে এল। ডলি বললে, 'এইবার তোমার বিপদ।'

'কেন?'

'আজ কী বার?'

প্রথমে বলতে পারলুম না। বারও ভুল হয়ে গেছে। অনেক ভেবেচিন্তে বললুম, 'বুধবার'।

'আমার একটা বুধের মাল আছে। এই এল বলে। বেশিক্ষণ নয়, ঘন্টাখানেক জ্বালাবে। সেই সময়টায় তুমি কোথায় থাকবে?'

'হ্যাঁ ভাববার কথা। আচ্ছা ছাদে চলে গেলে কেমন হয়!'

'সেখানে এক ধুমসি আছে, তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে, পরেয়া মাল, তুমি এখানে সন্ধেবেলা কীসের ধান্দায় ঘুরছ?'

'তা হলে যাই কোথায়? তোমার খাটের তলায় শুয়ে থাকলে কেমন হয়?'

'আহা! মানিক আমার! বিনা পয়সায় বায়স্কোপ।'

বেশ চিন্তায় ফেলে দিলে ডলি। আর কোনও দিনই যেন রাস্তায় নামার ইচ্ছে ছিল না। বড় ভয় ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ফাঁকা রাস্তায় একলা পেলেই ক্যাঁক করে চেপে ধরবে! ডলি বললে, 'অত ভয়ে মরছ কেন? যা হবার তা তো হবেই। এই শহরে কয়েক লক্ষ খুনি বুক ফুলিয়ে ঘুরছে— তোমার মতো একজন নিমখুনির অত ভয় পাবার কী আছে?'

'তোমার কথা শুনে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ছে, আমাদের অফিসের কেশিয়ার। মাত্র হাজারখানেক টাকার তহবিল তছরূপের দায়ে জেল হয়ে গেল। জেলে যাবার সময় ভারী সুন্দর একটা কথা বলেছিল—ডাকাতরা সব রয়ে গেল, আমি শালা এক ছিঁচকে চোর জেলে চললুম।'

'তোমার সঙ্গে আর বকবক ভাল লাগছে না। তোমার বউয়ের কাছে কে যাবে, ভেবেছ কিছু!' ইস! সুধার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। সত্যি তো সুধার কাছে কে যাবে! কেমন আছে সে! আহা শ্যামা কিংবা ছায়া হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারত। না, ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হবে। ডলি খারাপ কিছু বলেনি। ভয়ে আধমরা হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভয়ের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোই ভাল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারা দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। বিক্ষিপ্ত মন যেন মুখোশের মতো মুখে উঠে এসেছে। ভয়, ভেঙে যাওয়া সংস্কার, এক ধরনের পাপবোধ, সামান্য ব্যভিচার মিলিয়ে একটা কালচে রং সারা মুখে মিহি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাসি দাড়ি। মনে হচ্ছে আমার অশৌচ। কে মারা গেছে আমার! আমার আমিটাই মরে গেছে।

না, আর দেরি নয়। এখনও সময় আছে। একটা ট্যাক্সি পেলে ছ'টার কিছু আগেই সুধার হাসপাতালে পৌঁছোতে পারব। টাকার বড় অভাব। জামাটা গায়ে দিতেই ডলি জিজ্ঞেস করল, 'বাবুর পকেটের অবস্থা কী?'

'খুব খারাপ।'

'বিছানার তলা থেকে গোটা কতক দশটাকার নোট বের করে বললে, 'নাও।'

'তোমার টাকা নেব? তোমাকে তো আমার দেবার কথা।'

'নেকামি কোরো না। আমার কি তোমার মতো টাকার অভাব। তুমি যদি উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাচো, কেউ একটা পয়সা দেবে না। ঢিল মারবে। এই তফাত। নাও, নাও।'

'শোনো ডলি, তোমার কষ্টের রোজগার...'

'কষ্টের! হাসালে। তোমাকে যা দিচ্ছি তার তিন ডবল আসবে আজ রাতে। এখুনি যে আসবে, সে কী করবে জানো? ওই চেয়ারটায় আমাকে বসাবে। হ্যাঁ, বসতে হবে জন্মের পোশাকে। সে বসবে উলটো দিকের চেয়ারে। একের পর এক, এক প্যাকেট সিগারেট খাবে, ধোঁয়াটা কেবল

ছাড়বে আমার হাঁ করা মুখের ভেতরে। ব্যস। শেষ সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে একশো টাকার একটা নোট রেখে মাথা নিচু করে উঠে চলে যাবে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ এই। ক'টা লোককে তুমি চেনো মানিক। বাইরের জগতে সব এক, আমাদের জগতে এক-একটি চিড়িয়াখানার চিড়িয়া।'

'এ টাকাটা আমি কিন্তু ধার হিসেবে নিচ্ছি।'

'আজ্ঞে না, এখানে ধার বলে কিছু নেই। কুছ লেনা, কুছ দেনা। আমরা দালালকে দি, গুন্ডাকে দি, ডাক্তারকে দি, বাড়িওলাকে দি, মন্দিরে দি, সিনেমায় দি, হল্লাবাজদের দি।'

'আমি তো তাদের মধ্যে পড়ি না।'

'তুমি সকাল থেকে আমার অনেক সেবা করেছ। পা টিপেছ, মাথা টিপেছ, পিঠে পাউডার দিয়েছ, চুলে চিরুনি দিয়েছ। সায়ার দড়িতে গাঁট পড়ে গিয়েছিল খুলে দিয়েছ। তার ওপর বলেছ, ভালবাসো! যদিও মিথ্যে কথা। তবু শুনেছি, সারাটা দুপুর আমার অতীত গরমে ঠান্ডা হাওয়ার মতো ঝিরিঝিরি বইতে থেকেছে। ভবিষ্যৎ চাঁদনিরাতের মাঝির মতো বাঁশি বাজিয়েছে।'

'ডলি এ তো সাহিত্য। এ যেন কবিতা।'

'তুমি আমাদের কী ভাবো? মনহীন দেহ। মানুষের ভেতরে একটা মানুষ থাকে, সে কি এত সহজে মরতে চায়, না মারা যায়! খুব তো তখন শের শোনাচ্ছিলে, এবার আমার মুখে একটা দোঁহা শোনো:

করম খরী কর মোহ থল অঙ্ক চরাচর জাল।
হনতগুনত গনি গুনিহনত জগৎ জ্যোতষীকাল ॥

মানে বুঝলে কিছু! হিন্দি বোঝো? বলো তো কার লেখা? অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'এ তো তুলসী দাস। তুমি পেলে কোথায়?'

'ওই টেবিলটা তোমার চোখে পড়েছে একবারও—এতক্ষণ তো এ ঘরে ছিলে?'

কোণের দিকের ছোট্ট টেবিলে একরাশ বাঁধানো খাতা থাকে থাকে সাজানো।

'কী ওগুলো?'

'দেখতেই পাচ্ছ, খাতা। আমার যে দিকটা তোমার চোখে পড়েনি সেইদিক। যাক, যাবার আগে মানেটা শুনে যাও, মনে জোর পাবে। কাল হল আমাদের জ্যোতিষী, তার হাতে কর্মরূপ খড়ি, সেই খড়ি দিয়ে মোহের স্লেটে মানুষের ভাগ্য লিখে চলেছে, লিখছে, মুচছে, মুচছে লিখছে, আমাদের পাওনাও সেইভাবে মেটাচ্ছে। যাও আর একটাও কথা বাড়াবে না, শুধু জেনে যাও—

আপনার কৃতকর্মে সকলে সুখ-দুখ ভোগ করে।
পতাকা যেমন ওড়ে এলোমেলো, বেঠিক বোশেখি ঝড়ে।'

ট্রামে তেমন ভিড় নেই। হাঁ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ট্যাক্সি মিলল না। আরও কিছুক্ষণ হয়তো অপেক্ষা করতুম, কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় বিজ্ঞাপনের মতো বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সাহস হল না। কোথা থেকে একটা উটকো লোক এসে বললে, 'দাদা দেশলাই আছে?' সারা মুখে বসন্তের দাগ। 'আজ্ঞে না' বলে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলুম। মনে হল সন্দেহজনক লোকটাও পিছু নিয়েছে। তাকাবার সাহস হল না। চলন্ত ট্রামটাতেই লাফিয়ে উঠলুম। এরপর খালি ট্যাক্সি যেতে দেখলেই লাফিয়ে নেমে পড়ব।

আমার পাশের খালি আসনে এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। ঘাড়ে পাউডার সাদা হয়ে আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলুম, চোখ ফেরাতেই ভদ্রলোকের চোখে চোখ ঠেকে গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

'আজ্ঞে না, তা কী করে মনে হবে, আমি আপনাকে চিনি না।'

'না না, আমি আপনাকে কোথায় দেখেছি যেন, ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো?'

মিথ্যে বললুম, 'বারাসতে।'

'না হল না। আচ্ছা, কোথায় চাকরি করেন?'

আবার মিথ্যে বললুম, 'চাকরি করি না, ব্যাবসা করি।'

'কীসের ব্যাবসা?'

'কাটা কাপড়ের।'

'তাই নাকি?'

এমনভাবে 'তাই নাকি' বললেন যেন মিথ্যেটা ধরে ফেলেছেন। মহা সমস্যা হল তো। ট্রামটা জ্যামে আটকেছে। সামনেই একটা ট্যাক্সি। খালি বলেই মনে হল। তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়লুম।

হাসপাতালে যখন পৌঁছোলুম ভিজিটিং আওয়ার্স উতরে যেতে আর মাত্র মিনিট পনেরো বাকি আছে। একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে টপকে সুধার বেডে যখন পৌঁছোলুম আর দাঁড়াতে পারছি না। হাঁপাচ্ছি। টুলের ওপর ধপাস করে বসে পড়লুম। সুধা অবাক হয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখল।

'কেমন আছ আজ?'

'তুমি কেমন আছ? তোমাকে আজ এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন? এক মুখ দাড়ি, শুকনো মুখ। ভাল আছ তো?'

'আজ দাড়ি কামাবার সময় পাইনি। সারাদিন রোদে পুড়েছি। তোমার খবর বলো। আর বেশি সময় নেই। এখুনি তাড়িয়ে দেবে।'

'আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়। হজম হচ্ছে না। সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ঢোঁক গিলতে পারছি না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বোধহয় আর ভাল হব না, বুঝলে। তুমি আমাকে বরং বাড়ি নিয়ে চলো। তবু তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারব। আজ সেই ছেলেটা মারা গেল, অপারেশন টেবিলে। ওই দেখো শূন্য বিছানা হাহা করছে।'

'সুধা, সুধা, তুমি ভেঙে পোড়ো না। জন্ম-মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায়! কে যাবে, কে থাকবে, কেউ বলতে পারে কি?'

'তবু বোঝা যায়। মন বলে দেয়। আচ্ছা শোনো, তুমি কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

'কেন বলো তো?'

'আজ শ্যামা আর ছায়া এসেছিল। ওদের ভীষণ চিন্তা, তুমি কাল সারারাত ফিরলে না। এরকম তো কখনও হয় না। তারপর বললে, কে একটা লোক বাড়ির উলটোদিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি বাড়ি থাকলে থাকে, না থাকলে থাকে না। কাল রাতে নাকি একটা কালো গাড়ি পাড়ায় ঢুকেছিল। অনেক রাতে। বাড়িতে টর্চের আলো ফেলেছিল।'

'ধুস! তুমিও যেমন। শেখরবাবুকে তো চেনো। ডিটেকটিভ উপন্যাসের পোকা। ওঁর কল্পনায় সাধারণ জিনিসও রহস্যময় হয়ে ওঠে। কাল আমি চিত্তদের বাড়িতে ছিলুম গো। গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ভাবলুম তুমি শূন্য বাড়িতে ফেরাও যা না ফেরাও তা।'

ঘন্টা বাজল। আর সময় নেই কথা বলার। উঠতে যাচ্ছি, সুধা বললে, 'তোমার হাতটা আমার কপালে একটু রাখবে? আর শোনো, কাল তুমি এ চেহারায় আমার সামনে আসবে না, কাল সকালে তুমি নিশ্চয়ই দাড়ি কামাবে। ওসব বেস্পতিবার-টেস্পতিবার আর মানতে হবে না! সব মেনে সবই তো হল!'

সুধার কপালটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। 'কাল তুমি আমাকে ফ্রেশ দেখবে। একেবারে গার্ডেন ফ্রেশ দার্জিলিং চা।'

'তোমাকে ছোট্ট দুটো কাজ বলব?'

'বলো না।'

'মিটসেফে একটা আচারের বয়াম দেখবে, এখন বেশ রোদ হচ্ছে। কাল সকালে অফিস বেরোবার আগে ছাদে রোদে রেখে যেতে পারবে? শ্যামাকে বলে যেয়ো, ও ঠিক তুলে রাখবে। দু'নম্বর কাজ হল, দুটো টাকা তোমার কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে রেখে দেবে। তারপর মনে করে শনিবার পূজো দেবে। ভুলো না কিন্তু।'

আর এম ও-র কাছে একটু বকুনি খেলুম, 'প্রেসক্রিপশানটা হারালেন! অদ্ভুত কেয়ারলেস তো আপনি!'

'পকেটমার হয়ে গেল।'

'ওইরকমই হয়। এদিকে কেসটা একটু যেন বাঁকা পথে চলেছে। আমরা অবশ্য হাল ছাড়িনি। কিছু সাইড সিম্পটমস দেখা দিয়েছে। তা দিক। আমাদের শাস্ত্র বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ভালই হয়েছে, প্রেসক্রিপশানটা পালটে গেছে। লিখে দিচ্ছি। কাল সকালেই কিন্তু ওষুধগুলো চাই। দুর্ভাগ্য কী জানেন, ক্যানসারের সত্যি কোনও ওষুধ এত চেষ্টাতেও এখনও বেরোল না।'

নতুন প্রেসক্রিপশান নিয়ে বেরিয়ে এলুম। আহা, বাইরেটা কত সুন্দর। ভয় ভয় ভাবটা যেন কেটে গেছে। সুধার চিন্তায় মন আচ্ছন্ন। এইবার একবার চিত্তদের বাড়ি যাই। দেখি কালরূপ জ্যোতিষী কী লিখেছেন আমার ভাগ্যে। তার আগে এককাপ চা পেলে মন্দ হত না। থাক, দেরি হয়ে যাবে। চিত্ত তো চা খাওয়াবেই। মাধবী হয়তো এখনও ফেরেনি। দুটো কাজের কথা ভুললে চলবে না, রোদে আচার, কপালে ঠেকিয়ে দুটো টাকা। আজ রাতে ডলি নয় বাড়ি। বেশ তোফা একটা ঘুম দিতে হবে নিজের বিছানায়। র‍্যান্ডাম একটা চান করতে হবে। রাতে আজ পাঞ্জাবি খানা। চানটান করে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে বেরোব একবার। শ্যামা যদি খাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করে? রাজি হয়ে যাব।

মেন রোড দিয়ে ঢুকব না। সেই পেছনের রাস্তাটা দিয়ে যাব। সেই আলোর বৃত্ত, সেই ঝরে পড়া জুঁই ফুল। না, ওদিকটা বড় নির্জন। মেন রোডই ভাল।

'দাদা, দেশলাই আছে!'

একী, সেই লোকটা। মুখে বসন্তের দাগ।

'না ভাই, দেশলাই নেই।'

'কেন নেই? সিগারেট খান না?'

'মাঝেসাঝে।'

'সে কী? সিগারেট খায় না বলছে?'

'হ্যাঁ। গুরু।'

আর একটা লোক কোত্থেকে এল। আরে এ তো পীরু!

'খুব নার্ভাস হয়ে গেছে ওস্তাদ!'

'হতেই হবে। শালা জালে পড়েছে।'

আর একটা লোক। গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে। এত বড় শহর। এত লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কেউ আমাকে বাঁচাবে না। মুখে নোনতা স্বাদ।

'কী চাও তোমরা?'

'রক্ত।'

'রক্ত?'

'হ্যাঁ রক্ত। আমাদের বস পুড়ে ঝলসে হাসপাতালে পড়ে আছে। কাজটা মাইরি বেশ বিলিতি কায়দায় করেছিলে।'

মুখে বসন্তের দাগঅলা লোকটা মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজাল। পাশ দিয়ে দুটি যুবক যাচ্ছিল, চমকে ফিরে তাকাল।

আমি চিৎকার করে বললুম, 'ভাই আমাকে তোমরা বাঁচাও, ভবানীপুর থানায় একবার....'

পীরু আমার মুখটা পেছন থেকে রুমাল দিয়ে চেপে ধরল। ছেলে দুটো ছুটে পালাল। ছড়ি হাতে এক বৃদ্ধ পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন। তিনি থেমে পড়ে বললেন, 'কী হয়েছে মশাই!'

তৃতীয় লোকটি ধমকে উঠল, 'বুড়ো বয়েসে মরার ইচ্ছে হয়েছে দাদু?'

'বুড়ো হলেই তো মরতে হয় নাতি। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আমাদের ব্যাপার, কেটে পড়ুন।'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধের চোখের সামনে দিয়ে আমাকে পেছনের সিটে টেনে তুলল। মুখে রুমাল। মনে মনে বললুম, 'নম্বরটা নোট করে নিন।'

গাড়িটা ময়দানের দিকেই চলেছে। পীরু বললে, 'কোথায় ঝাড়বি?'

'চল; লাভার্স লেনের দিকেই যাই।'

'এমন লক্ষ্মী ছেলে খুব কম দেখা যায়। একটুও হাত-পা ছুড়ছে না। কেমন পড়ে আছে দেখ নেতিয়ে। বলির পাঁঠা। কাবাব খাবে মানিক?'

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুভয় নয়, ভীষণ অপমানে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এরা কীভাবে আমাকে মারতে চায় তাও জানি না। দেহের ক্ষমতায় এদের ছুড়ে ফেলে দিতে পারছি না বলে রাগ হচ্ছে। এই সমাজে মস্তিষ্কচর্চা অর্থহীন, দেহের চর্চাই বেঁচে থাকার শেষ কথা। একটা লোকও ছুটে এল না। ছেলে দুটো ছুটে পালাল। জীব-জগতের এই কি নিয়ম! না তো। ভীমরুলের কি মৌমাছির চাকে খোঁচা মারলে কী হয়! মানুষের চাকে খোঁচা মারলেই কিছু হয় না।

গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে অন্ধকার মাঠে পড়ল। বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো গাছ। প্রাচীন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে কতকাল। বড় মিষ্টি হাওয়া বইছে আজ। পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দ। প্রেমের জায়গায় খুন।

'ওস্তাদ, কী কায়দায় করবে? বেশ নিট কাজ হওয়া চাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্ঞান দিসনি!'

'কোথায় সারবে— ভেতরে না বাইরে?'

'ভেতরে সেরে বাইরে ফেলে দোব।'

'শালার হাত দুটো ভাল করে চেপে ধর।'

একটা ভারী হাত আমার পেছন দিক থেকে এসে চিবুকটা ঠেলে তুলল।

'শালার দাড়ি নয়তো শিরিস কাগজ।'

'দেখতে পাচ্ছ ওস্তাদ!'

'অন্ধকারে আমার চোখ জ্বলে যে।'

'এই রেডিয়োটা চালিয়ে দে।'

গানের সুর ঝাঁপিয়ে পড়ল, মেরে পহেছানো, ম্যা হুঁ, ম্যায় হুঁ ডন। শ্বাসনালির ওপর ঠান্ডা, ধারালো স্পর্শ। মৃত্যুর হাত কত শীতল। গলার কাছটা ফাঁক হয়ে গেল। নিশ্বাসের আর তেমন টান নেই। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের বাড়ির হ্যান্ড পাম্পটা যখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন যেন এইরকমই হত। হাতল মারছি, ফস করে গোটাটাই গোড়ার কাছে ঝুলে পড়ছে। প্রেশার ঠেলে উঠছে না, মুখ দিয়ে হুড়হুড় করে জলও বেরোচ্ছে না। শ্বাস নিচ্ছি, বুক ঠেলে উঠছে না। গলার কাছে কীরকম একটা চুঁই চুঁই শব্দ হচ্ছে।

'নে, শালার উইন্ড পাইপ ওপেন করে দিয়েছি।'
ম্যায় হুঁ, ম্যায় হুঁ ডন, মেরে পহেছানো।
'গুরু এই জায়গাটা?
'আর একটু দূরে, হ্যাঁ এইখানে, রাখ রাখ শুইয়ে দে। ব্যস। ফাইন।'
'পকেটের মালকড়ি!'
'খবরদার, আমরা শালা ছেনতাই পার্টি নই। আমাদের লাইন আলাদা। গুডবাই দোস্ত।'
'শুনেছি এ শালা বসের বউয়ের লাভার ছিল। অনেক টাকা খেয়েছে।'
'লাভার বলিসনি, ওসব বইতে বলে। বল বসের বউয়ের নাঙ ছিল। টাকার হিসেব শালা বেহস্তে গিয়ে দেবে।'

টা-র-র করে শব্দ হল। গাড়ি স্টার্ট নিল। সব ফাঁকা। শব্দহীন নির্জনতা। এক আকাশ তারা মিটিমিটি জ্বলছে। কাল রোদ উঠবে এমন কোমল আকাশে। নাঃ, আচারের বয়ামটা রোদে দেবার সময় আর পাওয়া গেল না। আবার কেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। মেয়েলি হাসির খিনখিন আওয়াজ!
'এইখানটাই তো ভাল।'
'না না, কেউ এসে পড়বে।'
'তোমার খালি ভয়। এইখান নয় ওইখান করতে করতে কতদূর চলে এলে।'
'ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তোমার আর কী, তুমি তো বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।'
'আরে সাদা মতো এটা কী!'
'কে শুয়ে আছে।'
'না শেলী, শোবার ধরনটা ভাল মনে হচ্ছে না, অন্য কেস।'
তোমরা কাছে এসো না ভাই। দুটো কাজের কথা বলে যাই। আমার ভেতরের পকেটে দুশোটা টাকা পাবে, একটু ভিজে গেছে। ভিজে নোটও চলে। খুন দিয়েই তো অর্থ আসে। সামনের পকেটে পাবে একটা প্রেসক্রিপশান। আমার বউয়ের ক্যানসার, কাল সকালে ওষুধটা কিনে দিয়ে আসবে ভাই।
'অত কাছে যাচ্ছ কেন? বড্ড সাহস তোমার।'
'শেলী, খুন, পালাও।'
'খুন!'
'চেঁচাচ্ছ কেন, ইডিয়ট। পালিয়ে এসো।'
'পুলিশে একটা খবর দিলে হত না! হাসপাতালে গেলে হয়তো বেঁচে যেত।'
'বেঁচে! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'
দু'জোড়া পায়ের শব্দ, দূর থেকে দূরে চলে গেল। বড় শান্তি, বড় আরাম। যাও, পালাও। রমণীর জরায়ুতে বীর্যপাত করো, অন্ধকারে, নির্জন নিরালায়। ক্যানসারের টিউমারের মতো গর্ভকোষে সন্তান বেড়ে উঠুক। জন্ম নিক মানুষের বাচ্চা, অসংখ্য ভাইরাস। ভাজন, বিভাজন। কেউ মৃত্যুর দূত, কেউ আবার মৃত্যুর শিকার। তোমরা যদি পারো একটা কুকুর পাঠিয়ে দিয়ো।
সব ম্লান হয়ে আসছে। জগৎ হারিয়ে যাচ্ছে ঘষা কাচের আড়ালে। আর একটু, আর একটু। ডলি, ডলি। তোমাকেই আমি ভালবেসেছিলুম। তখন বলতে পারিনি। সুধাকে নয়, শ্যামাকে নয়, ছায়া, মাধবীকে নয়। তোমাকে, তোমাকে। কোনওদিন, পারো তো কোনওদিন, এই রক্ত-ভেজা ঘাসে এসে কান ঠেকিয়ে জেনে নিয়ো। শঙ্কর অকৃতজ্ঞ নয়, বড় অক্ষম, বড় অপটু। জলে নেমেছিল, সাঁতার জানত না। তুমি তখন কী বলেছিলে—
হনত গুনত গনি গুনি হনত, হনত গুনত গুনি, গুনি গনি হনত গুনত...।

তৃতীয় ব্যক্তি
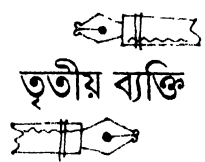
স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ওত পেতে বসে আছে। যেন দুটি শিকারি বেড়াল। জানলা গলে খুস করে পড়লেই খপাত করে তুলে নেবে। ভোঁদড়ের মাছ ধরার মতো। এ অঞ্চলে সারাদিনে দু'বার ডাক বিলি হয়। একবার সকাল এগারোটায় আর একবার বেলা তিনটে নাগাদ। দু'-চার মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে।

কী এমন চিঠি আসতে পারে যা এইভাবে খাবলা মেরে ধরতে হয় সবার আগে।

আছে, আছে। এমন চিঠিও সংসারে আসে যেটিকে এই ভাবেই ছোঁ মেরে ধরতে হয়। মেয়ে বড় হলে বাপ-মা কখনও বেড়াল, কখনও কুকুর, কখনও ছাগল, কখনও ভেড়া, কখনও টিকটিকি। এ সংসারের একটি মাত্র মেয়ে সম্প্রতি সাবালিকা হয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। সুন্দরীও বলা চলে। ফরসা রং। বড় বড় চোখ। নাকটা ভোঁতা নয় আবার টিকোলোও নয়, মানানসই। ঠোঁট দুটো সামান্য মোটা হলেও বিম্বোষ্ঠ। ছিপছিপে। চলনে বলনে বেশ তেজ আছে। স্কুল পেরিয়ে এবার কলেজে ঢুকবে।

সেই মেয়েকে নিয়েই এ সংসারের সমস্যা। কানাঘুষো খবর এসেছে, মেয়ে তোমাদের উড়ছে গো। প্রশান্ত তখনও বিশ্বাস করেনি এখনও বিশ্বাস করে না। সে বুক ঠুকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারে তার মেয়ে কখনও এমন কাজ করতে পারে না যাতে বাপ-মা'র মুখে চুনকালি পড়বে। নেভার, ইমপসিবল। আমার ব্লাড তেমন নয় যে তোমার মেয়ে জীবন নিয়ে ঢিল লঙ্গর খেলবে। শ্যামলী বলে, 'রাখো তোমার ব্লাড। মেয়েদের আমি বিশ্বাস করি না। ওরা সব পারে। যা রটে তা বটে। আমিও কিছু প্রমাণ পেয়েছি। চিঠি চাপাটি চলছে দু'জনে।'

এই অল্প কয়েকদিন আগে শ্যামলী মেয়ের বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে একটা চিঠি আবিষ্কার করেছে। চিঠিটা প্রশান্তও দেখেছে। খাস্তা কাগজে লেখা। উদ্দেশ করে কোনও নাম নেই। দু'-চার স্তবক উচ্ছ্বাস। হাতের লেখা তেমন ভাল নয়, ভাঙা ভাঙা। বাংলাটাও কাঁচা। ভাষার বাঁধুনি নেই। তলায় লেখকের নাম উহ্য। ইতি তোমার, একটা ফুলের মতো কী আঁকা। অন্যের চিঠি প্রশান্ত পড়তে চায় না। বড় গ্রাম্য অভ্যাস। সকলেরই একটা ব্যক্তিগত জগৎ আছে। সে জগতে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। শ্যামলী ধমকে উঠেছিল, 'এটা তোমার বিলেত নয়। ছেলেমেয়েদের চোখে চোখে রাখতে পারো ভাল নয়তো মুখ পুড়বে।' প্রশান্ত মুখপোড়া হতে চায় না। কেই বা সাধ করে হতে চায়। তবু চিঠিটা পড়তে তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। বেশ নিবেদনের ভঙ্গিতে লেখা। আকাশ, বাতাস, চাঁদ সূর্য ধরে টানাটানি। ঘাস, নীল জলেরও অভাব ছিল না। কোথাও খারাপ কোনও শব্দ ছিল না। প্রশান্তর মনে হয়েছিল বড় বেশি আবেগ, লেখকের আরও একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল। এ চিঠি যদি প্রশান্তকে লেখা হত তা হলে সে উত্তরে লিখত, তুমি একমাস খাবার পর রোজ একটি করে ডাব খেয়ো ডার্লিং, আর মাথার মাঝখানটি গোল করে কামিয়ে ঘৃতকুমারীর পুলটিশ দিয়ো।

প্রশান্তর মনে হয়েছিল খুবই এলেবেলে চিঠি। এমন কিছু নেই যাতে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে হাঁচোড়পাঁচোড় করে মরতে হবে। তা ছাড়া কোথাও কারুর নাম নেই। প্রমাণ কী, এ চিঠি তার মেয়েকে লেখা। সন্দেহটা শ্যামলীর কাছে প্রকাশ করেছিল প্রশান্ত। এটা মনে হয় স্কুলের রচনার কোনও অংশ। এ তো মানবী প্রেমের চেয়ে নিসর্গ প্রেমই বেশি। তোমার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে।

শ্যামলী বলেছিল, 'আজ্ঞে না, সর্প এই ভাবেই রজ্জুর চেহারা নিয়েই আসে। ওসব তোমরা

বুঝবে না। আমরা ঘর পোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ চিনি।' শ্যামলীর কথা শুনে প্রশান্তর একবার ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে, তুমি বিয়ের আগে এইরকম চিঠি ক'টা পেয়েছিলে শ্যামা। চেপে গিয়েছিল। যা অতীত, তা অতীত। কবরে চলে যাও সময়। বর্তমানের কমরেড আমরা। কদম কদম বাড়ায়ে যা ভবিষ্যতের দিকে।

প্রশান্ত বলেছিল, 'ঠিক আছে আমি রেণুকে জিজ্ঞেস করব। সরাসরি জিজ্ঞেস করাই ভাল। সংসারে লুকোচুরি ভাল নয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। মন খুলে কথা বলব। যার যা সমস্যা ভাগাভাগি করে নেব। হেসে খেলে চলে যাব। চিরকাল কেহ তো নয়, ভবে দু'দিনের তরে আসা।

ব্যাপারটা অবশ্যই খুব অস্বস্তিকর। মেয়েকে বাবা জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁরে তুই প্রেম করছিস? প্রেম শব্দটাই কেমন যেন গ্রাম্য। অশিক্ষিত মানুষের মুখেই মানায়। ইংরেজি করে বললে কেমন হয়। সেও তো সেই লাভ শব্দটা এসে পড়বে। অনেকে বিকৃত করে বলেন— লভ। লাভ, লাভার্স। ভীষণ ন্যাকা ন্যাকা শব্দ। তা হলে কি অ্যাফেয়ার্স বলবে। শব্দটার মধ্যে স্ক্যানডেলের গন্ধ রয়েছে। লুকোচুরির ব্যাপার। গভীর রাতে কেউ কারু ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে। খুনখারাপি, আত্মহত্যা, স্লিপিং পিলস, থানাপুলিশ, কোর্টকাছারি। অ্যাফেয়ার্সের পটভূমিতে রোমহর্ষক সমস্ত সম্ভাবনা কিলবিল করছে।

তা হলে কীভাবে বলবে? বন্ধু হলে নানাভাবে বলা চলে। পিতা হয়েই বিপদ হয়েছে। ভাবতে ভাবতে কালঘাম ছুটে গেল। রেণু সকালে চা দিয়ে যায়। প্রশান্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। শান্ত মুখচ্ছবিতে কি পাপের কালচে রং ধরেছে। ফরসা গোলাপি গালে একটা ব্রণ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। মোটেই অন্যমনস্ক নয়। বেশ সপ্রতিভ। আগের মতোই চটপটে। সবদিকে সজাগ দৃষ্টি। তা হলে? শ্যামলীর মাথা খারাপ। উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

কী করে নিজের মেয়ের কাছাকাছি আসা যায়। আরও কাছাকাছি। বয়েস যত বাড়ছে ব্যবধানও তত বাড়ছে। একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে রেণু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। এখন যেন দরজায় টোকা মেরে অনুমতি নিতে হয় ভিতরে আসতে পারি? তাও কি অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায়। বারমহলে বসে থাকতে হয় অপরিচিতের মতো।

কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে প্রশান্ত যত পারে সেই সব খবর সংগ্রহ করে কেটে কেটে একটা খাতায় জুড়েছে। পণের টাকা না পেয়ে এক নরপশু বউয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। শ্বশুর আর ছেলে পিটিয়ে পুত্রবধূ খুন করেছে। সেরা সেরা খবরে খাতা বোঝাই। বিবাহ বিচিত্রা। এক মেঘলা সকালে প্রশান্ত সাহস করে মেয়েকে ডেকে বললে, বোস তোর সঙ্গে কথা আছে। রেণু বসল। প্রশান্ত সেই খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললে, পড়। ধীরে ধীরে পড়ে যা।

রেণু ধৈর্য ধরে পড়ল। পড়ে অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি আমাকে এইসব পড়তে দিলে?'

প্রশান্ত ম্লান হেসে বললে, 'এই হল পৃথিবী। এই হল জীবন। লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা, চারদিকে সরীসৃপের মতো কিলবিল করছে। একটু সাবধানে পা তুলে বস মা।'

রেণু চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। বাপের কথায় পা দুটো চট করে ওপরে তুলে নিলে। যেন চেয়ারের নীচে মেঝেতে সরীসৃপ কিলবিল করছে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার স্বাভাবিক ভাবে বসল। মেয়ের ভাব দেখে প্রশান্ত খুব খুশি হল। কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলে মানুষের মনে গিয়ে ধাক্কা মারবেই। কথা দিয়ে ছবি আঁকতে হবে দারুণ এই সংসারের। প্রশান্ত খুব উৎসাহ পেল। পরের কথা সে আরও সাজিয়ে বললে, 'পথে বড় রিপু ভয় রে। সদা সর্বদা নিজের চারপাশে একজন চৌকিদার খাড়া রাখবি। কে সেই চৌকিদার। নিজের মন। নিজের আর একটা মন, যে মন বিচারশীল, বিবেকসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী, শুভ। মানুষের সামনে দুটো মার্গ, এক

হল প্রবৃত্তির, আর একটি হল নিবৃত্তির। জীবন নৌকোর পাল তুলে দে সুবাতাসের দিকে। সেই গানটা তোর মনে আছে, যেটা তোর দাদু মাঝে মধ্যেই গান,

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী
মোহ ঝড় মায়া তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী
একে মনমাঝি আনাড়ি
তায় রিপু ছ'জন কুজন দাঁড়ি
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি
হাবুডুবু খেয়ে মরি।

প্রশান্ত মেয়েকে গানটা সুর করেই শোনাল। রিপু ছ'জনের জায়গাটা ইচ্ছে করেই বারকতক খেলিয়ে খেলিয়ে গাইল, যাতে মনে বেশ দাগ কাটে। কুবাতাসের কাছটায় দু'-চারবার হৃদয়বিদারক মোচড় দিয়ে হাবুডুবুটাকে প্রকৃতই মারাত্মক করে তুলল।

রেণু আগে যত না অবাক হয়েছিল প্রশান্তর হাত-পা নেড়ে গান আর সেই সঙ্গে ছলছলে চোখ দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। পাগলটাগল হয়ে যায়নি তো! কোনও কিছুর অর্থ তার কাছে তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। কে বউ পুড়িয়ে মেরেছে, কোন শাশুড়ি গলা টিপে ধরেছে, তাতে এ সংসারে কার কী এসে যাচ্ছে। সেই সব খবর কেটে কেটে খাতায় জোড়ার কী মানে, সুর করে গান গেয়ে ওঠারই বা কী অর্থ।

প্রশান্ত আবার বলে উঠল, 'পথে বড় রিপু ভয় মা। সাবধান, সাবধান।'

রেণু যে পথে স্কুল যাতায়াত করে সে পথটা সত্যিই খুব খারাপ। বহুকাল রাস্তায় পিচ পড়েনি। প্রায়ই খোঁড়াখুঁড়ি চলে। কখনও জলের পাইপের ছেঁদা মেরামতের জন্যে, কখনও বিকল টেলিফোনের তার সারাইয়ের জন্যে। সারাটা পথ উঁচুনিচু, এবড়ো খেবড়ো। দু' পাশে মানুষ প্রমাণ নর্দমা। তার ওপর মুহুর্মুহু সাইকেল রিকশা বেপরোয়া ছুটছে। রাস্তা চলতে চলতে বলতে হয়, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। রেণু কী বুঝল কে জানে, বাবাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললে, 'আমি সাবধানে একপাশ দিয়েই চলি বাবা। সেদিন শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়েছিল একটা গোরুর জন্যে। রিকশাটা পেছন দিক থেকে তেড়ে এল, পাশে সরব কী, গোরুটা দাঁড়িয়ে ছিল, আঁচলটা হাওয়া লেগে উড়ে গিয়ে রিকশার চালে লেগে ছিঁড়ে গেল।'

এবার প্রশান্তর অবাক হবার পালা। কী বুঝতে কী বুঝল। এতক্ষণের সমস্ত আবেগ, জীবন দর্শন কপচানো, সবই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল? আর একটু ব্যাখ্যা করার আশায় প্রশান্ত বললে, 'জীবনের পথ স্কুলের পথের চেয়েও বড়, আরও বেশি বিপদসংকুল। একবার তাল কেটে গেলে সারাজীবন বেতালা চলবে, আর তাল ফেরানো যাবে না। ও মাঝি হুঁশিয়ার।'

রেণু বললে, 'গতবার ইংরেজিতে কিছু কম নম্বর পেয়েছিলুম, এবারে চেপে পড়ছি, দেখো ঠিক হয়ে যাবে। অঙ্কটাও ভাল তৈরি হয়েছে।'

প্রশান্ত বললে, 'পরীক্ষায় দু'-চার নম্বর এদিক ওদিক হতেই পারে। কিন্তু দেখিস মা, জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় যেন ফেল করিস না।'

রেণু বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না বাবা এম এ-তে আমি ফার্স্ট ক্লাস নেবার চেষ্টা করব।'

প্রশান্ত দুঃখের হাসি হেসে বললে, 'এম এ-র কথা ভাবছি না মা। আমি ভাবছি তোর বিয়ের কথা। বিবাহ।'

প্রশান্ত এতক্ষণে গোল দিতে পেরেছে। পায়ে পায়ে বল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রেণুর সামান্য অভিমান হল। এরা এখন থেকেই বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছে! তাড়াতে পারলেই বাঁচে দেখছি। 'তোমরা এখন থেকেই বিয়ের ভাবনা ভাবছ?'

প্রশান্ত বললে, 'আমরা ভাবব কেন? তুইই তো ভাবছিস।'

'আমি ভাবছি?'

'আলবাত ভাবছিস।'

রেণু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আমাকে একবারও বলতে শুনেছ?'

প্রশান্ত বললে, 'বলতে হবে কেন? আমাদের হাতে প্রমাণ আছে।'

'আমার বিয়ের প্রমাণ তোমাদের হাতে? সে কী?' রেণু এবার হাঁ হয়ে গেল।

প্রশান্ত সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল আক্রমণ করলে চলবে না। ষোড়শীর মন বড় সাংঘাতিক মন। আবেগ, উদ্বেগ, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, কল্পনা, মরীচিকা। কখনও মৃত্তিকায়, কখনও বায়ুমণ্ডলে, কখনও নীহারিকা পুঞ্জে। পিতৃপ্রেম দিয়ে বাইরের আকর্ষণ থেকে টেনে আনতে হবে। সেই ব্যাটা, যে ব্যাটা চিঠি লিখেছে, যদি সত্যিই লিখে থাকে, তার অসুস্থ প্রভাবকে ভাসিয়ে দিতে হবে উদ্বেল পিতৃপ্রেমে। এমন একটা ব্যাপার করে ফেলতে হবে যাতে রেণুর মনে হবে, আমি এদের ছেড়ে যেতে পারব না। এই আমার মাটি। শিকড় নেমে গেছে গভীরে। উপড়াতে গেলে পটাং করে শব্দ হবে। ছিঁড়ে আসতে হবে, খুলে আসার উপায় নেই।

প্রশান্ত মৃদু নরম গলায় বললে, 'চকচক করলেই সোনা হয় না। জীবনসঙ্গী নির্বাচন বড় শক্ত ব্যাপার। অনেকটা রকেটে চড়ে মহাকাশে যাবার মতো। সামান্য ভুল। ব্যস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে। ত্রিশঙ্কুর মতো অন্তরীক্ষে ঝুলে রইলে সারা জীবনের মতো। না ইধারকা, না উধারকা। বাংলায় তেমন সুবিধেজনক কথা নেই তাই ইংরেজিতেই বলি, ডোন্ট রিসিভ দেম। আবেগ তোমাকে ঈগলের মতো ঠোঁটে করে পাহাড়ের চূড়োয় তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। তখন আর তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ওসব যেই পাবি ছিঁড়ে টুকরো করে ডাস্টবিনে ফেলে দিবি।'

রেণু ভীষণ অবাক হয়ে বললে, 'কী ফেলে দেব বাবা। ঈগল পাখি।'

প্রশান্ত লাজুক লাজুক মুখ করে বললে, 'প্রেমপত্র। পাবি, অনেক পাবি, ঝরাপাতার মতো উড়ে উড়ে গায়ে এসে পড়বে। তুলবি না। মাড়িয়ে চলে যাবি। মাঝি বড় হুঁশিয়ার। জীবন বড় চঞ্চল। প্রেম মানে নরম তুলতুলে কথার তাল নয়। প্রেম এক বিশাল দায়িত্ব।'

রেণু আবার বললে, 'তুমি এসব কথা কেন বলছ আমাকে? আমার মাথায় আসছে না।'

প্রশান্ত চশমার খাপ থেকে সেই খাস্তা কাগজটা বের করে মেয়ের হাতে দিয়ে বললে, 'বড়ই চিন্তায় আছি মা। এইটা তোর ইংরেজি বইয়ের মধ্যে লুকোনো ছিল। বানান আর ভাষা দেখে মনে হচ্ছে অতি থার্ড ক্লাস, লোচ্চা টাইপের ছেলে। লেখাপড়াও নেই, সংস্কৃতিও নেই। বোধহয় কোনও কালোয়ারের ছেলে।'

রেণু কাগজের ভাঁজ খুলেই হেসে ফেলল, 'এইটার জন্যে বাবা তুমি এত কথা বললে। দু'গজ চুল বাঁধার ফিতে কিনেছিলুম, এই কাগজে মুড়ে দিয়েছিল। লেখাটা পড়ে মজা লেগেছিল, তাই আর ফেলিনি, ভাঁজ করে বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তোমার হাতে এটা এল কী করে?'

প্রশান্ত বললে, 'তোর মায়ের আবিষ্কার।'

'মা'র দেখছি মেয়ে মেয়ে করে মাথাটা এবার সত্যি সত্যিই বিগড়ে যাবে। আর যেন কোনও বাড়িতে মেয়ে নেই। পৃথিবীর সব ছেলে যেন হাঁ করে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তুমিও যেন মায়ের তালে তাল দিতে গিয়ে উলটে পোড়ো না।'

রেণু উঠে চলে গেল। পড়াটড়া আছে বোধহয়। বৃদ্ধ শিক্ষক সকালেই আসেন। অনেক খুঁজেখাঁজে শ্যামলী এক শিক্ষক জোগাড় করেছে ভাল। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল তেমনটি। পলিত কেশ। দন্তহীন। চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা। কানের কাছে সুতো জড়ানো। গায়ে ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো। হাতে বারো মাসই রংচটা ছাতা। থেকে থেকে ব্রঙ্কাইটিসের

কাশি। এমন রিপুশূন্য শিক্ষক ভাগ্যের জোরে মেলে। শ্যামলীর পরিসংখ্যানে শিক্ষক-ছাত্রীর কেলেঙ্কারির ঘটনা একটা নয়, একশোটা আছে। অনেক অনুসন্ধানে শ্যামলী সে পথ মেরে রেখেছে। সকালে শিক্ষক মশাই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকেন, 'ও লেনু মা, তোমাল ঘুম ভেঙেছে।' দু'দশক আগেই দাঁত ঝরে গেছে। নকল দাঁত আর পরার দরকার হয়নি। মাড়ি শক্ত করে ফেলেছেন। পয়সা বেঁচেছে। বেশ শক্ত জিনিস খেতেও আর অসুবিধে হয় না। শ্যামলী মাঝে মাঝে সাবুর পাঁপড় ভেজে দেয়। বৃদ্ধ পাকলে পাকলে খান। আপেলের টুকরোতেও অসুবিধে হয় না। পুরু লেনসের মধ্যে দিয়ে যখন বড় বড় চোখে তাকান, তখন সেই চালশে ধরা উদাস চোখ যেন বলতে থাকে, আজ হৃদয়ের কামনা শান্ত, থাকে শুধু ব্যথা ভার। মানুষের এই বয়েসটা ভারী সুন্দর। মন ধ্যানস্থ। ইন্দ্রিয় শীতল।

রেণু উঠে যাবার পরই শ্যামলী এল। 'কী হল? কিছু বুঝলে?'

প্রশান্ত চেয়ারের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে বললে, 'আগে স্থির হয়ে বসো, তারপর বলছি। তুমি অকারণে উতলা হচ্ছ।'

শ্যামলী চেয়ারের কানায় কোনওরকমে পেছন ঠেকিয়ে বললে, 'অকারণে? তুমি তোমার মেয়ের কথা বিশ্বাস করে, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে, কাগজে মুখ গুঁজে বসে থাকতে পারো, আমি পারি না। আমি মা। অতটা নিশ্চিন্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ। ওই কাগজটা কোনও প্রেমপত্র নয়। তোমার মেয়ে দোকান থেকে ফিতে কিনেছিল, ফিতেটা মোড়া ছিল ওই কাগজে। ফুলটুল আঁকা, বিচিত্র ভাষার লেখা দেখে রেণু বইয়ের মধ্যে রেখেছিল। আমরাও তো অনেক সময় তেমন দেখলে ঠোঙা খুলে পড়ি। দেখি কার উপন্যাস ঠোঙা হয়ে বাজারে এল। ভাল হাতের লেখা দেখলে খুলে পড়ি। পড়ে আফশোস করি, কার বাড়িতে এমন ছাত্র। আমাদেরই কুটে বরাত। করি না?' শ্যামলী বললে, 'তা করি, তবে এটাও জানবে প্রেমপত্র কেউ সের দরে বেচে না। হয় রেখে দেয়, নয় ছিঁড়ে ফেলে, নয় হারিয়ে যায়। ওসব তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি করি না। কেউ যদি ডালে ডালে চলে, আমি চলি পাতায় পাতায়।'

প্রশান্ত বড় বিব্রত হয়ে পড়ে। শ্যামলীকে সামলানো এক দায়। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, রেণুর মা, না রেণুর শাশুড়ি। তবু প্রশান্ত চেষ্টা ছাড়ে না, 'তুমি তিলকে তাল করছ। এটা বুঝছ না কেন, রেণু যে বংশের মেয়ে, সে বংশের একটা আভিজাত্য আছে। রকের লোফার তুতু করে ডাকবে আর তোমার মেয়ে অমনি ন্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটবে, তেমন বাপের মেয়ে রেণু নয়। বুঝলে মাই ডার্লিং। তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে।'

'ঘোড়ার ডিম আছে। এই বয়েসটা খুব খারাপ। চোখে চোখে রেখে যদি পার করে দিতে পারলে তো বেঁচে গেলে, নইলে তৈরি থাকো। তোমার অবস্থাও ওই মানিকবাবুর মতো হবে।'

কার সঙ্গে কার তুলনা! মানিকবাবু এক রেসুড়ে, মাতাল, মাঝরাতে পাড়ায় ঢুকে হল্লা করেন। বউকে ধরে পিটতে থাকেন। তাঁর বড় মেয়ে যদি গৃহত্যাগ করে কিছু বলার আছে? ভাঙা ঘরেই তো ঘরভাঙা মেয়ে হবে। প্রশান্তর নিপাট, নিখুঁত পরিবার থেকে রেণু কেন ছটকে যাবে? যদি যায়, তো শ্যামলীর অত্যাধিক শাসন আর সন্দেহের জন্যেই যাবে। কে বোঝাবে এই অবুঝ মহিলাকে? মনস্তত্ত্বের ম জানে না। অত বেশি খরবদারি করলে যে কেউ অপমানের জ্বালায় বিদ্রোহ করে বসবে।

প্রশান্ত বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুমি যাও। রেণুর ব্যাপারটা দিনকতক আমার হাতে ছেড়ে রাখো।'

শ্যামলী হাসল। ব্যঙ্গের হাসি। 'তোমার হাত তো শুধু তিনটে জিনিস ধরতে জানে, চা, সিগারেট আর তাস। তোমার নিজের কোনও ব্যক্তিত্ব আছে? তোমাকে কেউ ভয় পায়? সকলেই বলে, বড় মাই ডিয়ার লোক, আর তাইতেই তোমার ন্যাজ মোটা হয়ে যায়।'

প্রশান্ত বললে, 'সে যুগ আর নেই বৎসে। হাওয়া ঘুরে গেছে। শাসন আর শোষণের যুগ চলে গেছে। মেয়েরা এখন সাঁড়াশি দিয়ে পয়লা রাতেই শাশুড়িদের বিষ দাঁত উপড়ে ফেলছে। ছেলেরা বাপের কাছা খুলে দিচ্ছে। কলেজে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখছে। অফিসের বড়কর্তারা ইউনিয়ানের ভয়ে চেম্বারে দরজা দিয়ে সারাদিন ভয়ে ভয়ে বসে থাকছেন। চোরের মতন আসেন চোরের মতন চলে যান। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করেছ কি মরেছ! এ যুগ শাসনের নয়, এ যুগ হল নরম কথার, এ যুগ হল মিষ্ট ব্যবহারের। রক্তকরবীর বিশুর মতো বলতে হয়, সর্দার চাবুক নয়, একটা বেহালা দাও, সুরে সুরে কাজ হবে। অসুরের দিন শেষ।'

শ্যামলী যেতে যেতে বলে গেল, 'সারাদিন তুমি অফিসে বসে ব্যায়লা বাজাও, সন্ধেবেলা বসে বসে তাস পেটো। আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। তোমার হাতে ছেড়ে দিলে যা হবে তা আমার জানা আছে।'

প্রশান্ত আর কথা বাড়াল না। সব সংসারেই আদর্শের বড় বড় কথা হয়। যখন হয় তখন হয়। সকলেই মনে করে ঘড়ি ঠিক চলছে। ঘড়ি কিন্তু ঠিক চলে না। একটু স্লো, ফার্স্ট হবেই। মাঝে মধ্যে দম না দেবার ফলে বন্ধও হয়ে যেতে পারে। কে আর নিশ্ছিদ্র। শ্যামলীর থাবা খেয়ে প্রশান্ত উঠে পড়ল।

ওই সকালের ঘটনার পর শ্যামলী দিনকতক বেশ চুপচাপ ছিল। সংসার যেমন চলে তেমনি চলছিল। সকালের চা, ন'টার অফিসের ভাত, সন্ধের তাস, রেডিয়োর বিবিধ ভারতী। রাতে খেতে বসে টুকটাক গল্প। সামান্য পরচর্চা। সংসারের অভ্যস্ত পদধ্বনি শুনে প্রশান্ত বেশ পুলকিত হচ্ছিল, যাক বাবা, মেঘ তা হলে কেটে গেল। আকাশ আবার পরিষ্কার।

অতই সহজ। এ যেন মেয়েদের গালের ব্রণ। হয়, মেলায়, আবার হয়। বয়ঃসন্ধির ব্রণ বড় একগুঁয়ে। ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না। তিন দিনের দিন শ্যামলী ট্যাঁক থেকে একটা খাম বের করে প্রশান্তর হাতে দিলে, 'নাও।' খামটা কাপড়ের কষিতে গোল করে লুকিয়ে রেখেছিল। সামান্য ভিজে ভিজে।

খামের ওপর নীল কালিতে রেণুর নাম। কেয়ার অফ প্রশান্ত। বাড়ির ঠিকানা। শুধু খাম। চিঠিফিটি নেই। প্রশান্ত খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। শ্যামলী যা বোঝাতে চাইছে বুঝলেও, প্রশ্ন করল, 'কী করব?'

'কী আর করবে। চোখ বড় বড় করে দেখো।'

'খামে কী আছে। চিঠিটা পেয়েছ?'

'চিঠিটা তোমার মেয়ে কি আমাদের জন্যে রাখবে? অতই বোকা ভেবেছ? '

'খামটা পেলে কোথা থেকে?'

'জানালা গলিয়ে পাশের মাঠে ফেলে দিয়েছিল। ভেবেছিল আমার চোখে পড়বে না। আরে বাবা তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি।'

প্রশান্ত হালকা গলায় বললে, 'শুধু খামে কিছু বোঝা যায় কি?'

'আগেরটার সঙ্গে হাতের লেখাটা মেলাও না।'

প্রশান্ত বিরক্তির গলায় বললে, 'মেলাও না। ওটা বাংলা আর এটা ইংরেজি। কী মেলাব?'

'কী ইংরেজি, কী বাংলা হাতের লেখায় মিল থাকবেই।'

'তা হলে তুমিই মেলাও, আমি তোমার মতো অত পাকা হস্তাক্ষরবিদ নই।'

শ্যামলী খামটা তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'মেয়েকে আশকারা দিচ্ছ দাও পরে পস্তাবে।' প্রশান্ত বিমূঢ়ের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। এ তো দেখছি মহা জ্বালা। প্রতি দু'দিন, তিনদিন অন্তর, আবার, আবার সেই কামান গর্জন।

আশ্চর্য মানসিকতা। মা মেয়েতে কী আরম্ভ করেছে। প্রশান্তর মাথায় ঢুকছে না। শ্যামলী দেখা

যাচ্ছে রেণুর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। রেণুর কোনও অপরাধ আছে বলে মনে হয় না। রেণুর স্কুলের বন্ধুরাও তো রেণুকে চিঠি লিখতে পারে। শ্যামলী কিছুতেই সে কথা মানতে চাইবে না। বললেই বলবে, মেয়ে-সোহাগে অন্ধ হয়ে গেছ। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে নিত্য দেখা হচ্ছে, কথা যা তা তো মুখেই হবে, চিঠি লিখতে যাবে কোন মূর্খ? কেন? কোনও বন্ধু কি বাইরে বেড়াতে যেতে পারে না? সিমলা, উটি, দার্জিলিং? না পারে না। সামনেই যাদের পরীক্ষা, তারা এ সময় বেড়াতে যাবে কোন আনন্দে! তা হলে চিঠি লিখছে কে? লিখছে সেই বয়ফ্রেন্ডটি।

প্রশান্ত একটু রাগত ভাবেই মেয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল। রেণু জানালার দিকে মুখ করে বসে ছিল। সামনেই নিচু পাঁচিল। তারপরেই মাঠ। মাঠের পরেই একসার বাড়ি। আকাশ টাল খেয়ে পড়েছে। গাছের পাতায় পাতায় রোদ চিকমিক করছে। রেণুর হাতে একটা হলদে পেনসিল। পেনসিলের পেছন দিয়ে গালে টোকা মারছে আস্তে আস্তে। উদাস চোখ পড়ে আছে অবারিত আকাশে। দীর্ঘ আঁখি পল্লবে কোনও কম্পন নেই। স্থির। রেণুর ওই মূর্তি দেখে প্রশান্তর সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অহংকারের ভাব এল মনে। এ সৃষ্টি তো তারই। যৌবনে প্রশান্তকে তো খুব একটা খারাপ দেখতে ছিল না। শ্যামলীও সুন্দরী ছিল। রেণুকে পেছন থেকে দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয় যৌবনের শ্যামলী বসে আছে। সামনে থেকে দেখলে মনে হয় প্রশান্ত বসে আছে পরচুল পরে।

প্রশান্ত ডাকতেই রেণু চমকে ফিরে তাকাল। কোন কল্প-জগতে ছিল কে জানে? প্রশান্ত পাশের চেয়ারে বসল। মেয়ের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আজ হোক কাল হোক এমন মেয়েও একদিন পর হয়ে যাবে। দূরে, বহু দূরে চলে যাবে স্নেহের বাঁধন কেটে। সেই গান, একদিন উড়বে সাধের ময়না। প্রশান্ত চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'আবার সেই চিঠি।'

রেণু বললে, 'কার চিঠি?'

'তোর নাম ঠিকানা লেখা একটা চিঠির খাম তোর মা ওই মাঠ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।'

রেণু গম্ভীর মুখে বললে, 'পেতে পারে।'

প্রশান্ত মৃদুগলায় বললে, 'তুই আমাকে চুপিচুপি বলবি, কার চিঠি? সত্য বলবি। আমি কিন্তু তোকে ভীষণ বিশ্বাস করি।'

'চিঠিটা মায়ের কাছেই আছে।'

প্রশান্ত অবাক, 'সে কী রে?'

'হ্যাঁ, তুমিও হয়তো দেখেছ? আরামবাগ থেকে পিসিমা লিখেছিলেন। ছোট ছেলের পইতে। তোমরা সবাই জানো, পিসিমা যখনই চিঠি লেখেন তখনই খামে আমার নাম লেখেন। তোমাদের এতই যখন সন্দেহ, এবার যখন উত্তর দেবে তখন লিখে দিয়ো তোমাদের নাম যেন এবার থেকে খামে লেখেন।'

রেণুর গলা সামান্য চড়ার দিকেই। প্রশান্ত গুম হয়ে উঠে এল। মেয়ের মুখে বারবার তোমাদের তোমাদের শুনতে তার খুব খারাপ লাগছিল। মনে মনে দুটো পক্ষ তৈরি হয়েছে। বেশ বোঝাই গেল। রেণু এখন প্রশান্ত আর শ্যামলীকে একটা ইউনিট ভাবছে। সে নিজে আর একটা। কথায় ঘৃণার ভাব প্রচ্ছন্ন। ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। সেই জন্যেই কি বলে, মেয়েরা বড় স্বার্থপর। বেড়ালের জাত। এতটুকু বাচ্চাকে দুধভাত খাইয়ে মানুষ করলে, যেই চাঁদিনিরাতে পাঁচিলে বসে হুলো ম্যাও করল অমনি জানালার গরাদ গলে উধাও। রেণুর কাছে আমরা এখন তোমরা। সংসারের এত বড় একটা সত্য বুঝতে প্রশান্তর এত দেরি হল! অন্যের সম্পত্তি সে আগলে বসে আছে? সে কি তা জানে না।

মেয়ের ঘর থেকে প্রশান্ত যখন বেরিয়ে এল সে এক অন্য মানুষ। মনে মনে সে তখন শ্যামলীর দিকে অনেকটা সরে গেছে। এত দিন তার নিক্তির কাঁটা মেয়ের দিকেই একটু বেশি ঝুঁকত। শ্যামলী

মুখে না বললেও মনে মনে যে একটু হিংসে করত প্রশান্ত তা বুঝলেও উপেক্ষা করত। কিন্তু ওই দিন রেণু তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল। প্রশান্ত এবার নিজেকে গুটোও। কর্তব্যে বেঁচে থাকো। বাঁধন এবার আলগা করো। সোনার শেকল কেটে পাখিকে উড়তে দাও। দূর থেকে বুড়োবুড়ি শুধু দেখে যাও, ভাগ্যের থাবা জীবন নিয়ে কেমন খেলছে।

রান্নাঘরে শ্যামলী বড় ব্যস্ত। প্রশান্ত দরজার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শ্যামলী পেছন ফিরে রাঁধছে। শরীরটা ইদানীং একটু ভারী হয়েছে। মন, মেজাজ, চরিত্র, সব কিছুরই ওজন বেড়েছে। আগের মতো সবসময় মুখে আর হাসি লেগে থাকে না। চলনে, বলনে আর সে উচ্ছলতা নেই। মুখে আর সেই ধারালো লালিত্য নেই। সবসময় কেমন যেন ক্লান্তির ভাব লেগে থাকে। প্রশান্তর চোখ দুটো সামান্য ছলছল করছে। তার মন বলছে, তুমি আর আমি। জীবন যুদ্ধের দুই কমরেড। সুখ আর দুঃখের সমান অংশীদার। রেণুর 'তোমরা'।

শ্যামলী হঠাৎ ফিরে তাকাতেই প্রশান্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। স্বামীর এমন চেহারা সে কদাচিৎ দেখেছে। এত বিষণ্ণ, যেন সমস্ত প্রাণশক্তি কেউ নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছে।

শ্যামলী অবাক হয়ে বলল, 'কী হল তোমার? আবার সেই ব্যথাটা!'

প্রশান্তর মাঝেমধ্যেই পেটে একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা ওঠে। আলসারের আগমনবার্তা। ডাক্তার সাবধান করেছেন। প্রশান্ত বললে, 'পেটে নয় মনে।' বলেই উবু হয়ে দরজার সামনে বসে পড়ল। বড় আপন লাগল শ্যামলীকে। তার কথার মধ্যে যে উদ্বেগ, সেই উদ্বেগটুকু এত আন্তরিক, প্রশান্ত শ্যামলীকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করল সেই মুহূর্তে। বড় খাঁটি জিনিস। এ জিনিস অর্থে কেনা যায় না। অনর্থের মধ্যে দিয়েই এই নির্ভরতা গড়ে ওঠে।

'মাটিতে বসলে কেন?' বলে শ্যামলী প্রশান্তর দিকে একটা মোড়া ঠেলে দিলে।

মোড়ায় উঠে বসে প্রশান্ত বললে, 'ওই খামে আরামবাগ থেকে অনুর চিঠি এসেছিল। ছেলের পইতে।'

শ্যামলী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। ভেবে বললে, 'বিশ্বাস করি না।'

'কেন করো না?'

'খামের ওপর পোস্টমার্কটা যদিও অস্পষ্ট, তবু বোঝা যায়, আরামবাগের 'এ' চোখে পড়ে না। ওর কথা তুমি আর বিশ্বাস কোরো না। সে রেণু আর নেই। আজকাল কথায় কথায় মিথ্যে বলে। একেবারে পালটে গেছে। কেমন যেন পর পর।'

প্রশান্ত বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'আজকাল তুমি দেখবে সবসময় ও জানালার ধারে বসে আছে, আনমনা, নয়তো ছাদে, আলসেতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী যে ভাবে কে জানে? সংসারের কোনও কাজে পাবে না। যে-কোনও কাজই বলো না কেন এমন বিরক্ত হবে মনে হবে মহা অপরাধ করে ফেলেছি। দুমদাম, ফেলছে ছড়াচ্ছে, ভাঙছে চুরছে। আমার আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, মা হয়ে কী অপরাধই করেছি।'

প্রশান্তর আর বসার সময় ছিল না। ঘড়ির কাঁটা অফিসের দিকে টানছে। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ল। রোদে হাঁসফাঁস করে বাস স্টপেজের দিকে ছুটতে ছুটতে রোজই তার মনে হয়, কীসের জন্যে এই বাঁচা। কীসের জন্যে প্রতিদিন এই ক্ষয় হতে থাকা। জীবনে আর বড় কিছু তো ঘটার সম্ভাবনা নেই। রংমশাল জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে আসছে। হাতে ধরা থাকবে নকশা কাগজে ভরা বালির অংশ। যতই নাড়া দাও বর্ণময় আগুন আর বেরোবে না, ঝুরঝুর করে শুধু বালিই ঝরতে থাকবে। এ যেন মৃত্যু আসছে না বলেই বেঁচে থাকা। ট্রেন লেট বলেই প্ল্যাটফর্মে পায়চারি।

প্রশান্ত বেরিয়ে গেলে শ্যামলীর সমস্যাও ভীষণ বেড়ে যায়। রেণু ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। রেণুর অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ফলে, তার ভালমন্দ সম্পর্কে অত্যধিক মাথা ঘামানোর প্রবণতার জন্যে শ্যামলী রেণুর দু'চক্ষের বিষ। মেয়ে মাকে আর মা ভাবে না, ভাবে শত্রু। সারাদিন দু'জনের কথাবার্তা নেই বললেই চলে। সামান্য বাক্যালাপ যা হয় তা প্রয়োজনে, নিতান্তই নিরুপায়। শ্যামলীর বুক ফেটে যায়। এই মেয়েকে সে কোলে পিঠে করে এত বড় করেছে। কোথায় গেল সেই সব দিন। রেণু কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ফ্রকপরা এতটুকু মেয়ে। শ্যামলী চাঁদের কাছ থেকে টিপ চুরি করে মেয়ের কপালে পরাচ্ছে। এখনও আকাশ আছে, চাঁদ আছে, তারা আছে, দেবদারুর ঝিরিঝিরি পাতা আছে, নেই সেই মুহূর্ত, সেই সম্পর্ক, সেই বয়েস, সেই মন।

সেদিন শ্যামলীর জিদ চেপে গেল। যেমন করেই হোক চিঠি বের করতেই হবে। রেণু মিথ্যে কথা বলছে। মনে পাপ ঢুকেছে। ছেলেটা কে জানতেই হবে। তার জানার অধিকার আছে। রেণু বাথরুমে ঢুকেছে। সাধারণত ঘণ্টাখানেক লাগে বেরোতে। শাওয়ার থেকে জল পড়বে, গানের পর গান হবে। নর্দমা দিয়ে সাবানের ফেনা বেরোতে থাকবে জলের সঙ্গে নাচতে নাচতে। রেণুর এই বাথরুম বিলাসটুকু শ্যামলীর জানা এবং আতঙ্কেরও। যখন বেরিয়ে আসে ফরসা রং খ্যাসখেসে সাদা দেখায়। জোড়া ভুরু জলে ভিজে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিঠের ওপর এলানো ভিজে চুল। গোড়া বেয়ে টসটস করে জল পড়তে থাকে। আগে আগে শ্যামলী কতবার বলেছে, ওরে অসুখে পড়ে যাবি। অত সাবান মাখিসনি, মাখিসনি, চামড়া খসখসে হয়ে যাবে। এখন আর বলে না। সেইদিন থেকে বলা বন্ধ করেছে, যেদিন রেণু বললে, সাবান আমার বাবার পয়সায় মাখছি, তোমার অত গাত্রদাহ হচ্ছে কেন? সত্যই তো সংসারে যেখানে যা কিছু হচ্ছে সবই একটা মানুষের রোজগারে; কিন্তু শ্যামলী তো সাবান মাখার কথা খরচের জন্যে বলেনি। বলেছিল শরীরের ত্বকের জন্যে। সাবান না মেখে দুধে ব্যাসন গুলে মাখা যায়। কাঁচা হলুদ মাখা যায়। মুসুরডাল বেটে মাখা যায়।

রেণু সবে বাথরুমে ঢুকেছে। শ্যামলী মেয়ের ঘরে ঢুকল। রেণুকে আলাদা একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। মাঝারি মাপের। বেশ আলো বাতাস খেলে। খাট আছে, আলনা আছে। বই রাখার সেলফ আছে। দেয়ালে রামকৃষ্ণের ছবি আছে, ক্যালেন্ডার আছে। টেবিল, চেয়ার আছে, সবই আছে তবু যেন কেমন শ্রীহীন। কী যেন একটা নেই।

শ্যামলী প্রথমেই বই আর খাতা নিয়ে পড়ল। চিঠিটিঠি রাখার সাধারণ জায়গা। একের পর এক পাতা উলটে গেল। মিলল না কিছুই। ঠিকানা লেখা চিরকুট একটা বেরোল। একটা মেয়ের নাম। শ্রীলা মুখার্জি। কে জানে কোন শ্রীলা। যুগ যতই পালটে যাক ছেলের নাম নিশ্চয়ই শ্রীলা হবে না। বড় বড় চুল, ব্লাউজের ছিটকাটা জামা, হাই হিল জুতো, চোখে সুর্মা, গালে রুজ, পাউডার সব সাজে, নামে এখনও হতে পারেনি। উমা হলে সন্দেহের ছিল। ছেলেও হয় মেয়েও হয়। তবে ছেলে হলে পরে হয় পতি না হয় শঙ্কর থাকত।

বই ছেড়ে শ্যামলী পড়ল বিছানা নিয়ে। চিঠি লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে ভাল জায়গা। তোশকের তলা, লেপের ভাঁজ। বিরাট এলাকার কোন কোণে যে তাঁরা শুয়ে আছেন, প্রেমের ভাষা বুকে নিয়ে! দরজার দিকে পেছন ফিরে শ্যামলী ছোবড়ার গদিটা সবে তুলেছে, পেছনে রেণু এসে দাঁড়াল। সদ্য স্নান করা ভিজে ভিজে মসৃণ চেহারা। শ্যামলী এতই তন্ময় কিছুই জানতে পারল না। রেণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কাণ্ড দেখছে। এলোমেলো শাড়ি। জটপাকানো চুল। শ্যাম্পু পড়ে না, চিরুনি চলে না। কোমরের কাছটা বেরিয়ে আছে। সায়ার দড়ির ঘষা লেগে লেগে কালো একটা বৃত্ত তৈরি হয়েছে। আজকাল মাকে দেখলে যেন ঘেন্না হয়। গ্রাম্য মহিলাদের মতো চেহারা হয়েছে। শ্যামলী তোশকটা নামাতেই রেণু শীতল গলায় বল্লে, 'কী কিছু পেলে?'

শ্যামলী চমকে উঠেছিল। ধরা পড়ে গিয়ে কেমন যেন বিব্রত হয়ে গেছে। তবু সামলে নেবার

চেষ্টা, 'বিছানা মাঝে মাঝে ঝাড়তে হয়। তোশকটোশক উলটে-পালটে দিতে হয়। ছারপোকার কথা বলা তো যায় না!'

রেণু বেশ নিংড়ে নিংড়ে বললে, 'হঠাৎ মেয়ের ওপর অত দরদ! যা খুঁজছিলে পেয়েছ?'

'কী খুঁজছিলুম?'

'কেন প্রেমপত্র? বৃথাই খাটলে, ওখানে রাখিনি। রেখেছি সেফ ডিপজিট ভলটে। '

'কে বললে তোকে, প্রেমপত্র খুঁজছিলুম।'

'আমি জানি। তুমি অতি নোংরা, নীচ মনের মহিলা।'

শ্যামলী চাবুক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। পেটের মেয়ের এই মুখের ভাষা? এর নাম লেখাপড়া শেখা। মা হল মহিলা, তাও কীরকম, নীচ আর নোংরা। শ্যামলী প্রায় গর্জন করে উঠল, 'মুখ সামলে রেণু। রাস্তার মেয়েছেলের সঙ্গে তুই কথা বলছিস না, বলছিস তোর মায়ের সঙ্গে। রাস্তার একটা ছোঁড়া ধরে লঘু গুরু জ্ঞানটাও কি নষ্ট হয়ে গেছে।'

রেণু এতটুকু ভয় পেল না। সমান দাপটে বললে, 'এই যার মুখের ভাষা সে মা নয় মেয়েছেলে। তোমাকে মা বলতে আমার ঘেন্না করে।'

'এক চড়ে মুখ ভেঙে দেব রেণু। তখন বুঝতে পারবি আমি মা, না মেয়েছেলে।'

'তা তুমি পারো। তোমার কালচারই হল, কিল, চড়, ঝাঁটা, জুতো, লাথি। বরাত ভাল, তাই বাবার মতো মানুষের হাতে পড়েছিলে।' শ্যামলী নিজেকে আর সামলাতে পারল না। রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। কারই বা থাকে! শ্যামলী টেবিলের ওপর থেকে একটা মোটা বই তুলে নিয়ে সপাটে মেয়ের দিকে ছুড়ল। রেণু আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পেল না। বইয়ের কোণটা গিয়ে লাগল ঠিক বুকের মাঝখানে। বুকে আঘাত লাগলে যা হয়। দম বন্ধ হয়ে রেণুর মুখটা জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠল। সে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সামান্য একটু বায়ুর জন্যে ছটফট করতে লাগল। বইটা ছিন্নভিন্ন হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

মেয়ের ওই অবস্থা দেখে শ্যামলী থতমত খেয়ে গেল। কোথায় রাগ? ভয়ে, বেদনায়, যন্ত্রণায় শ্যামলীর শরীর মুচড়ে উঠল। এ আমি কী করলুম। শ্যামলী ছুটে গিয়ে মেয়ের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ব্লাউজের বোতাম খুলে বুকের মাঝখানটা ডলতে লাগল ধীরে ধীরে। 'রেণু, রেণু।' কান্নায় গলা ভেঙে আসছে। বুকের মাঝখানটা লাল হয়ে উঠেছে। কয়েক সেকেন্ড, শ্বাসনালি বায়ু প্রবেশের পথ করে দিয়েছে। রেণুর বিকৃত মুখ সহজ হয়ে এল। লাল ভাব মিলিয়ে যাচ্ছে। বুক ওঠানামা করছে। শ্যামলী মেয়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বড় লেগেছে মনে।

বুকটা কনকন করলেও রেণু সামলে উঠেছে। মায়ের মাথাটা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে রেণু উঠে পড়ল। খণ্ড খণ্ড অভিধান মেঝে থেকে তুলে এক জায়গায় করে টেবিলে রাখল। চলার সময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে। বুকে হয়তো লাগছে। গোটা একটা অভিধানের ওজন তো কম নয়। শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। মেঝের যে জায়গাটায় মাথা রেখেছিল সেই জায়গাটা চুলের জলে ভিজে ভিজে হয়ে আছে। শ্যামলী সেই জায়গাটাতেই মাথা রেখে কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে।

রেণু টেবিলের কোনা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি এ ঘর থেকে চলে যাও।'

শ্যামলী মুখ তুলে বললে, 'তোর খুব লেগেছে রেণু? একটু জল হাত দিয়ে দেব?'

রেণু কঠিন গলায় বললে, 'তুমি এখন যাও।'

অনেক আগে শ্যামলী যেমন আদরের গলায় মেয়েকে ডাকত সেইভাবে ডাকল, 'রেণু আমার কাছে আয়।'

রেণু কিন্তু নরম হল না। আরও তীব্র গলায় বললে, 'তুমি যাবে, না আমি যাব!'

শ্যামলী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেণু শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল। হাজার ডাকাডাকিতেও সে দরজা সারা দুপুরে আর খোলানো গেল না। মা, মেয়ে দু'জনেরই উপবাস।

রাত আটটা নাগাদ প্রশান্ত ফিরে এল। অন্যদিনের চেয়ে বেশি ক্লান্ত। ময়দানে বড় খেলা ছিল। বাসে ট্রামে ধস্তাধস্তি। রণক্লান্ত চেহারা। চোখমুখ বিবর্ণ। বাড়ি ঢুকেই মনে হল আবহাওয়া থমথমে। কোথাও কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে। শ্যামলীর শুকনো মুখ, চুল এলোমেলো। রেণুকে তার স্বাভাবিক জায়গায় দেখা যাচ্ছে না।

চা নিয়ে এল শ্যামলী। প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের কিছু একটা হয়েছে?'

শ্যামলী টুলের ওপর বসে পড়ল। সারাদিন খাওয়া নেই। সন্ধে থেকে বড় ক্লান্ত লাগছে। মনটাও বিষণ্ণ। সেই দুপুর থেকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে আরও যেন শীর্ণ হয়ে পড়েছে। কোথা থেকে ঝড় এসে সব এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। শ্যামলী বললে, 'আমার আর ভাল লাগছে না, নিত্য অশান্তি। তুমি সব ছেড়ে একটা ভাল পাত্র দেখো। গয়নাগাটি বেচে, ধারধোর করে, যেমন করে হোক মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করো। ওর মন আর এ বাড়িতে টেকছে না।'

'মেয়ে যখন বিয়ের ভাবনা আজ হোক কাল হোক ভাবতেই হবে। তবে দেরি আছে। বছরের পর বছর ঘুরবে। এখনই কেন? লেখাপড়া শেষ হোক।' প্রশান্ত বললে, 'পাশটাশ করুক। অন্তত গ্রাজুয়েটটা হতে দাও, তা না হলে ভাল পাত্র জুটবে কী করে?'

এখনকার ছেলেদের সব এক রা। এম. এ. চাই চাকরে হলে ভাল হয়। আজকাল একার রোজগারে সংসার চলে না। স্ত্রীকেও আয় করতে হবে। সেটা অবশ্য একদিক থেকে ভাল।

মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে স্বামীদের অত্যাচারের হাত থেকে তেমন বুঝলে পালাতে পারবে। আগেকার মতো পড়ে পড়ে আর মার খেতে হবে না।

শ্যামলী বললে, 'তুমি কি ভাবো তোমার মেয়ের আর লেখাপড়া হবে?'

'হবে না মানে! আলবাত হবে। এ বংশের মেয়ের লেখাপড়া হবে না! লেখাপড়া ছাড়া গতি আছে? না খেয়ে, না দেয়ে ওকে আমি ডাক্তার করব। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। গলায় স্টেথিসকোপ। হাতে সোনার ঘড়ি। মাথায় শ্যাম্পু করা ফুরফুরে চুল। চকোলেট রঙের ফিয়েট গাড়ি। আমার কতদিনের স্বপ্ন। চোখ বুজলেই দেখতে পাই। তুমি ভাবছ বিয়ের কথা। একটা দামড়া ছেলে। কলকাতার এক চিলতে ফ্ল্যাট। শ্যাওলা ধরা বাথরুম। হেঁপো শ্বশুর। ডাইনির মতো দেখতে শাশুড়ি। ছাপকা লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সেই ভোঁদকা ছেলেটা আমার মেয়েকে হুকুম করছে জল দাও, মাথা টিপে দাও। আন্ডারওয়্যার কেচে দাও। হয়তো ব্যাঙ্কে চাকরি করবে, কি সরকারি অফিসে। ভাল মাইনে কিন্তু কোনও কালচার নেই; শ্বশুর ওয়াশ বেসিনে থুঃ করে থুতু ফেলে, শাশুড়ি ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে সেফটিপিন দিয়ে পোকা-খাওয়া দাঁত খোঁটে। ঢেউ করে ঢেঁকুর তোলে। রাত আটটার সময় খ্যানখেনে গলায় বলে, বউমা পেটে বড় বায়ু হয়েছে আমার দু'টা ছানা করে দাও। আমার মেয়ের এই ভবিষ্যৎ আমি ভাবতে পারি না। আমার রাতের দুঃস্বপ্ন।'

প্রশান্ত এক নিশ্বাসে গড়গড় করে একগাদা কথা বলে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল। রেণুব ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভেবেছে। শ্যামলী অবাক হয়ে গেল। সে মেয়েছেলে। তার অত উচ্চাশা নেই। অত ভাবনা চিন্তাও আসে না। সাদামাটা একটা জীবন পেলেই হল। মেয়েরা হবে জলের মতো। যে আধারে রাখা হবে সেই আধারের আকৃতি নেবে। শ্যামলী বললে,

'তোমার মেয়ের তো তা হলে প্রিন্স অফ ওয়েলসের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।'

প্রশান্ত বললে, 'বিয়ের কথা আমি ভাবছিই না। বিয়ে মানেই তো মৃত্যু। আমি ভাবছি জীবনের কথা, স্বাধীন জীবিকার কথা। বিকাশের কথা। তুমি বলবে, তোমার ভাবনাটা অদ্ভুত। হ্যাঁ অদ্ভুত। আমার গাছের ফুল, আমি নিজে হাতে তুলে দেবতার পায়ে দেব। অন্য কেউ এসে ছিঁড়ে নিয়ে যাক, এ আমি চাই না। তা আমি হতে দেব না।'

শ্যামলী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'যদি ফুল হয় তবেই তো! আর যদি পিটুলি ফল হয়?'

প্রশান্ত বললে, 'রেণু ফুলই। তোমার চিনতে ভুল হচ্ছে। ওর অনেক গুণ। একটা-দুটো কাঁটা থাকতে পারে। কাঁটা ছাড়া গোলাপ হয় না।'

শ্যামলী বহু দূর থেকে বললে, 'তা হবে, চিনতে ভুল হচ্ছে। তবে গোলাপ তো অনেক রকম আছে। এ বোধহয় বসরাই নয়, মাছি গোলাপ।'

প্রশান্ত সামান্য বিরক্তির গলায় বললে, 'মেয়েরা মেয়েদের দেখতে পারে না। সব মেয়েই বোধহয় বয়েস হলে শাশুড়ি হয়ে যায়। তুমিও তাই হয়ে যাচ্ছ।'

'তা হয়তো হবে। বয়েস তো কম হল না। তবে তোমার মেয়ে আজ আমাকে যা তা বলেছে। আমি তোমার কাছে লাগাতে আসিনি। এমন সব কথা বলেছে শুনলে মরা মানুষও চিড়বিড়িয়ে উঠবে। আমিও মেজাজ রাখতে পারিনি, একটা মোটা বই ছুড়ে মেরে দিয়েছি। বইটা আচমকা ওর বুকের মাঝখানে লেগে দমটম বন্ধ হয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সেই দুপুর থেকে ঘরে কপাট দিয়ে শুয়ে আছে। সারাদিন খায়নি। বিকেলে ভেবেছিলুম গা ধুতে বেরোবে, তাও বেরোয়নি। ঘরে আলো পর্যন্ত জ্বালেনি।'

প্রশান্ত উদ্বেগের গলায় বললে, 'বেঁচে আছে তো?'

শ্যামলী বললে, 'তার মানে?'

'মানে খুবই সহজ। এই বয়েসের মেয়ে হঠাৎ যদি আত্মহত্যা করে ফেলে।'

প্রশান্ত চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। শ্যামলীও উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রশান্ত মেয়ের ঘরের দিকে যেতে যেতে স্ত্রীকে বললে, 'খুব অন্যায় কাজ করেছ। রাগকে যদি সংযতই না করতে পারলে তা হলে তুমি কেমন মা হলে! একটা মোটা বইয়ের ওজন জানো? তুমি যদি রেণু হতে, তা হলে তুমি কী করতে? মা হওয়া এক কথা আর অত্যাচারী হওয়া আর এক কথা।'

শ্যামলী কোনও জবাব দিয়ে তর্ক বাড়াল না। প্রশান্তর মনে যে উদ্বেগ সেই উদ্বেগের ছোঁয়া শ্যামলীর মনেও লেগেছে। সারাদিন ঘরের ভেতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসেনি। শ্যামলী বারে বারেই দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করেছে। কানে এসেছে খালি পাখার ফন ফন শব্দ। বহুবার ডাকাডাকি করেছে। রেণু কোনও উত্তর দেয়নি। এখন মনে হচ্ছে সে ডাকে তেমন স্নেহ ছিল না। কেন ছিল না? শ্যামলী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। আশ্চর্য। মানুষের মন কী অদ্ভুত। যতবারই সে রেণুকে ডেকেছে ততবারই মান অপমানের একটা তীব্র বোধে রেণু ডাকে সেই অভ্যস্ত সুর বেজে ওঠেনি। কর্তব্যের ডাক হয়েছে, ভালবাসার আহ্বান হয়নি। সম্পর্ক এইভাবেই বিষিয়ে ওঠে। স্নেহের উৎস এইভাবেই শুকিয়ে যায়। সংসার থাকে, স্বজন থাকে, যে যার সে তার হয়ে।

প্রশান্ত প্রথমে টুকটুক করে দরজায় বার কতক টোকা মারল। রেণুর সাড়া মিলল না। প্রশান্ত তখন নাম ধরে ডাকল। তাতেও কাজ হল না। শ্যামলীর গলা শুকিয়ে এসেছে। ভয় করছে। ভীষণ কিছু ঘটেনি তো? তা হলে সে বড় অপমানের কথা হবে। পাড়া ঢি ঢি হয়ে যাবে। লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। নিন্দুকের অভাব নেই। কত রকমের ব্যাখ্যা হবে। বিশাল এক গল্প তৈরি হয়ে যাবে। কল্পনার ঘোড়া চিরপরিচিত রাস্তা ধরেই ছুটবে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে, দজ্জাল মা, ভালমানুষ বাবা কল্পনার নলখাগড়া ভেঙে মড়মড় শব্দে এগিয়ে চলবে। শেষে ছোট্ট একটু নীতি উপদেশ, আজকালকার বাপ-মা যেমন ছেলে মেয়েও তেমন।

প্রশান্ত এইবার দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে মারতে ডাকতে লাগল, 'রেণু, রেণু। রেণু দরজা খোল।' খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। ঘর অন্ধকার। মাঠের ওপাশের বাড়ি থেকে আলোর একটা আভা ভেসে এসেছে। সেই আভায় ঘূর্ণায়মান পাখার ব্লেড চমকে চমকে উঠছে। সামনেই রেণু। আর পাঁচটা বছর আগে হলে প্রশান্ত মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে পারত, রাগ করেছিস মা। এখন আর তা শোভা পায় না। প্রশান্তর নিজেরই অস্বস্তি লাগবে। একমাত্র শ্যামলীই পারে রেণুকে বুকে টেনে নিতে। আর হয়তো পারে সে। সেই অদৃশ্য

যুবক। সংসারে যার সন্দেহজনক ছায়াটাই পড়েছে। প্রশান্তর পাশেই শ্যামলী। শ্যামলীর ভয় সরে গেছে। ক্রোধের ভাব আবার উঁকি দিচ্ছে। বাপ সোহাগি মেয়ে। কথাটা মনে আসতেই শ্যামলী নিজেকে তিরস্কার করল। বাপ আর সোহাগি দুটো শব্দই খুব নিকৃষ্ট মানের। উচ্চারণ করলেই প্রশান্ত এখন কিছু না বললেও, রাতে বিছানায় একান্তে বলবে, নাঃ তোমাকে আর মানুষ করা গেল না শ্যামা। পাকা বাঁশ নোয়ানো যায় না। ব্যর্থ চেষ্টা। কী করা যাবে? রাগে যখন মন কিষকিষ করতে থাকে তখন এইসব গ্রাম্য বাক্যই মুখে আসে। সংস্কারে ঢুকে আছে যে।

প্রশান্ত ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল। অন্ধকার যেন চমকে উঠল। হঠাৎ চোখের ওপর আলো ঝাঁপিয়ে পড়ায় রেণুর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেই আবার স্বাভাবিক হল। রেণু বোধহয় শুয়েই ছিল। মাথার বালিশ দেবে আছে। বিছানার চাদর কোঁচকানো। প্রশান্ত বললে, 'আয়, বোস।' প্রশান্ত নিজে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসল। রেণু এগিয়ে এসে খাটেই স্থান করে নিল। মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সারাদিন নির্জলা উপবাসে শীর্ণ। শ্যামলী দরজার কাছে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়েই রইল। অপরাধীর মতো। বাপমেয়েতে এখন কত কথাই হবে। সে কথায় তার কি থাকা উচিত। শ্যামলী ধীরে ধীরে সরে গেল। হেঁশেলে রাত পড়ে আছে। রুটির আটা মাখতে হবে। দুধ গরম করে দই পাততে হবে। সকালের রান্নার জোগাড় কিছুটা এগিয়ে রাখতে হবে।

প্রশান্ত মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'এখন শরীর কেমন লাগছে?'

রেণুর সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'ভাল।'

'এখনও রেগে আছিস?'

'না।'

'হ্যাঁ আছিস। তোর কথার ধরনই বলছে তুই রেগেছিস, এবং সে রাগ এখনও পড়েনি। কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছিস।'

'তা হবে।'

রেণুর রাগ রাগ মুখ এক পাশে ফেরানো। বাপের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নেই। প্রশান্ত বললে, 'দেখি কোথায় লেগেছে?' বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেখানে লেগেছে সে জায়গাটা তার পক্ষে দেখতে চাওয়াটা খুবই অশোভন। তার খবরদারি, তার কৌতূহলের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তেমন বুঝলে ডাক্তারের কাছে চল। রাত বেশি হয়নি, এখনও চেম্বারে পাওয়া যাবে।'

রেণু বললে, 'দরকার নেই।'

'তুই আমার উপর রাগ করছিস কেন?'

'রাগ করব কেন?'

'তা হলে ডাক্তারের কাছে যাবি না কেন?'

'আর প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু গিয়ে কী হবে? টাকা খরচ, তোমার শেষ মাস।'

'সে আমি বুঝব।'

রেণু ছোট্ট করে বলল, 'প্রয়োজন নেই।'

প্রশান্তর বলার কথা ফুরিয়ে এসেছে। আর কী বলা যেতে পারে। শ্যামলী যা করেছে তার দায়ভাগী প্রশান্তকেও হতে হবে। কারণ শ্যামলী প্রশান্তর বউ। কারু ছাগল যদি বেড়া ভেঙে প্রতিবেশীর গাছ খায়, অপরাধ ছাগলের নয় ছাগলের মালিকের। তুমি কেন তোমার ছাগলকে সামলে রাখতে পারো না!

প্রশান্ত বললে, 'যা বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। সারাদিন খাসনি, তুই ঘুরে এলে আমি যাব, তারপর আমরা তাড়াতাড়ি একসঙ্গে খেতে বসব।'

রেণু বললে, 'তুমি যাও, আজ আর আমি খাব না।'

'কেন খাবি না?'

রেণু বললে, 'আমার ইচ্ছে নেই।'

'ইচ্ছে নেই? চালাকি পেয়েছিস? তুই না খেলে আমরাও খাব না।'

'আমার জন্যে তোমরা কেন খাবে না? আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

আবার সেই তোমরা? আমরা আর তোমরা! দুটোকে কিছুতেই এক আর করা গেল না। পৃথক দুটো ভূখণ্ড। শ্যামলীও রাগ অভিমানের সময় প্রশান্ত আর তার মেয়েকে বিপরীত পক্ষে রেখে তোমরা তোমরা করে থাকে। প্রশান্তও মাঝে মধ্যে মা আর মেয়েকে একটা পক্ষে রেখে তোমরা তোমরা করে যায়। কে যে কখন আমরার দলে, আর কে যে কখন তোমরার দলে। অনবরতই দল বদলের পালা চলেছে।

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। রেণুর একটা হাত ধরে বললে, 'চল, ওঠ মা। সংসারে ওরকম একটু মন কষাকষি হয়েই থাকে। ঘটি আর বাটি পাশাপাশি থাকলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই।'

কথা শেষ করে প্রশান্তর মনে হল, সে তার বউয়ের হয়ে সাফাই গাইছে। এ ব্যাপারে মেয়েকে একটু তিরস্কার না করলে শ্যামলী বলবে, আশকারা দিচ্ছ, আবার রেণুর হয়ে শ্যামলীকে দু'কথা কঁ্যাট কঁ্যাট করে না শোনালে রেণু ভাববে, বাবাটা স্ত্রৈণ। একেই কি বলে হর্নস অফ ডাইলেমা। দুই শৃঙ্গীর মাঝখানে পড়ে নাস্তানাবুদ হওয়া।

প্রশান্ত মেয়ের হাত ধরে টান মারলে, 'নে ওঠ। তোর কোনও ওজর আপত্তি শুনব না।'

রেণু যেন একটু বিরক্তই হল, 'তুমি সেরে এসো। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

প্রশান্ত বোকাবোকা মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শ্যামলীর রাগ হলে, খাওয়া বন্ধ হলে প্রশান্তর যে সব দাওয়াই জানা আছে এ ক্ষেত্রে তা অচল। মেয়ে বড় হয়েছে। তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সমীহ করে চলতে হবে। চিঁড়ে ভেজাতে হবে কথায়। স্নেহ এক বস্তু প্রেম আর এক। রেণুর যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন রেণুর সংসারে, জীবনে এইরকম মান অভিমানের রাত অনেক আসবে, তখন প্রশান্ত শ্যামলীকে যা যা করত বা এখনও করে রেণুর স্বামীও তাই করবে। পৃথিবীতে নতুন কী আর আছে। সব সম্পর্কই বড় পুরনো, সব রাস্তাই বহুজনে বহুবার মাড়িয়ে চলে গেছে।

প্রশান্ত বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই খাবার টেবিল সাজিয়ে ফেলল। রেণু তখনও আনমনা হয়ে বসে। মেয়েদের রাগ আর গন্ডারের গোঁ প্রায় এক জিনিস। শান্তিতে সংসার চালানো বড় কঠিন কাজ। পাশ করা বড় বড় ম্যানেজারও ফেল মেরে যাবে। এ এক ভিন্ন ধরনের বাঁদর নাচ। বাঁদর কলা পেলেই সন্তুষ্ট। কলা দাও মুলো দাও ভবি তবু ভোলে না। খুব মন খারাপের সময় গুনগুন করে গান গাইলে প্রাণে বেশ একটা সুখ সুখ ভাব আসে। তার সঙ্গে যদি এই চিন্তাটা জুড়ে দেওয়া যায়, সংসারে আমার কেউ কোথাও নেই, কারু কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই, তা হলে শূন্যে নিরালম্ব ভেসে থাকার আনন্দও পাওয়া যায়। প্রশান্ত তাই গুনগুন করে গাইতে লাগল, কলা দাও মুলো দাও ভবি তবু ভোলে না। আরে এ কেলা দো, মুলো দো ভবি নেহি ভুলতা হায়। দো গজ জমিনকে নীচে তেরা আস্তানা।

শ্যামলী রুটি, তরকারি এনে সাজিয়ে রাখল। স্যালাড এল। ওপরে লাল কাঁচালঙ্কার শোভা। খাও না খাও দেখতে ভারী সুন্দর। কপালে সিঁদুরের টিপ, নিটোল নিতম্বে ডুরে শাড়ির আঁটসাঁট শোভা, ভাজা কাঁচালঙ্কা, দেখলেই সংসারের ওপর আস্থা ফিরে আসে। মনে হয় জীবন দো দিনকা মেলা হলেও বেশ রঙে রসে ভরা।

প্রশান্তর বৈরাগ্যের ভাবটা কেটে গেল। যেতে হবে অনেক দূর। ছায়াময় বনপথ বিপদসংকুল। তা হোক বড় সুন্দর। গভীর থেকে গভীরে, এখনই তো ঘুমোলে চলবে না। প্রশান্ত মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। শ্যামলীকেও পাকড়াও করে আনল রান্নাঘর থেকে। জেলখানার দারোগা যেন আসামিদের সঙ্গে ডিনারে বসছেন।

রেণু মাথা নিচু করে খাবার নিয়ে শুধু নাড়াচাড়াই করে গেল। শ্যামলী সামান্য কিছু খেল। প্রশান্ত আর বিশেষ মাথা ঘামাল না। নিম্নচাপের মজাই হল বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি না হলে শুকনো, সুন্দর আবহাওয়া ফিরে আসতে পারে না।

সেই রাতেই প্রশান্ত বউকে বলে দিলে, রেণুর ব্যাপারে তুমি আর মাথা গরম করবে না। তোমরা দু'জনেই আমার কাছে মূল্যবান। তোমার প্রেশার বাড়ুক, বুক ধড়ফড় করুক এ যেমন আমি চাই না, রেণু সংসার থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাক তাও আমরা চাই না। এখন যা করতে হবে, তা হল শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। চিঠি যদি সত্যিই আসে রেণুর হাতে পড়ার আগে খপাত করে ধরতে হবে এবং রেণুকে জানতে না দিয়ে সেই প্রেমিক ছোকরাটিকে কড়কে দিতে হবে।

পরের দিন থেকেই দু'জনে তক্কে তক্কে আছে। চিঠি এলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর মেঝেতে পড়ে থাকতে দেওয়া নয়। ধরো আর মারো। রেণু অধিকাংশ দিনই ওই সময়টায় স্কুলে থাকবে। সজাগ থাকলে চিঠি ধরার বিশেষ অসুবিধে নেই। প্রশান্তর পক্ষে রোজ হত্যে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। অফিস আছে। আজ প্রশান্তর ছুটি তাই চেক পোস্টে বসে থাকা সম্ভব হয়েছে।

জানালার কাছে ছায়া পড়ল। একটা হাত দেখা গেল। খুস করে দেওয়াল ঘেঁষড়ে কয়েকটা চিঠি চেত্তা খেয়ে সোফার তলার মেঝেতে পড়ল। প্রশান্ত জুট কার্পেটের ওপর দিয়ে হামা মেরে চিঠি ক'টা তুলে আনল। একটা দু'মাস আগের ইলেকট্রিক বিল। চেকে টাকা দিয়েছিল। আজ ফিরে এল। দ্বিতীয়টা ইনস্টলমেন্টে স্টিলের আলমারি কিনেছিল। কিস্তি জমা দেবার ভদ্র তাগাদা। তৃতীয়টা অপরিচিত হস্তাক্ষরে একটা পোস্টকার্ড। সন্তোষীমার নামগান করে বিশখানা চিঠি ডাকে না দিলে মায়ের কোপে বংশ নির্বংশ হবার হুমকি। চতুর্থ চিঠি, শ্যামলীর মায়ের। দাঁতের গোড়া ফুলে গত তিন দিন চোখে সরষেফুল দেখছেন। ওষুধ জানা থাকলে লিখে পাঠা। নয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারেন।

হয়ে গেল। আবার সেই বেলা তিনটে। সেই সময়টা এই সময়ের মতো অতটা নিরাপদ নয়। রেণু এসেও পড়তে পারে। প্রশান্ত আর শ্যামলী উঠে পড়ল। মাছ না পেলে মাছ ধরিয়ে পুকুর পাড় থেকে যেরকম মুখ নিয়ে উঠে আসে, দু'জনের মুখের ছবি এখন ঠিক সেইরকম।

প্রশান্ত বললে, 'বাঁশ হয়ে গেল। এইবার সারাদিন বসে বসে এই পোস্টকার্ডটার কুড়িটা নকল তৈরি করে কুড়িজনের কাছে পাঠাও। চেনা কারু কাছে পাঠানো যাবে না। হাতের লেখা চিনে ফেললে ডবল বাঁশ।'

শ্যামলী বললে, 'ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। ছিঁড়ে ফেলে দেবার মতো মনের জোর নেই। বলা তো যায় না, কী থেকে কী হয়ে যায়। তোমার তো আজ ছুটি। দুপুরে না ঘুমিয়ে কুড়িটা পোস্টকার্ড কিনে এনে বসে বসে কপি করো।'

'হ্যাঁ ওই করি। সন্তোষীমাতা মহিলাদের দেবী। করতে হয় তুমি করবে, চিঠি তোলা রইল তাকে।'

প্রশান্ত চিঠিটা তাকে তুলে রাখল। চশমার খাপ, প্লাস্টিকের ব্যাগে রেশন কার্ড, হরিণঘাটার কার্ড, ফিনফিনে ঝুল, ইঁদুরনাদি, চাঁদার বিল ইত্যাদি হাবিজাবির মধ্যে সন্তোষীমা পড়ে রইলেন ভয়ার্ত ভক্তের কৃপা লাগি।

॥ দুই ॥

দুপুরেই বেশ মেঘ করে এল। রেণুদের ক্লাসরুমটা বেশ বড়। স্কুলের এই অংশটা নতুন তৈরি হয়েছে? তিন তলা বাড়ি। দরজায় জানালায় এখনও নতুন রঙের গন্ধ পাওয়া যায়। ব্যবহারে ব্যবহারে মেঝে এখনও তেমন মসৃণ, চকচকে হয়ে ওঠেনি। খসখসে সাদাটে ভাব লেগে আছে। দোতলার ক্লাসরুম। সামনেই খোলা জানালা। মেঘলা আকাশ পোস্টারের মতো লেগে আছে।

গাছের পাতা কালচে সবুজ। ঋতু যেন বেশ পেকে উঠেছে। আর ক'মাস? তারপরই তো পাতা ঝরার কাল এসে যাবে।

রেণু উদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক চিল উড়ছে। চিল উড়লে নাকি বৃষ্টি হয়। পাখিরা সব রাডারের মতো। আগেই জানতে পারে আবহাওয়ার খবর। ইংরেজির ক্লাস শেষ হয়েছে। এইবার ইতিহাস। রেণুর ঠিক পাশটিতে বসে শম্পা। দু'জনে একই পাড়ার মেয়ে। একই রিকশাতে স্কুলে আসে। দু'জনের এক বয়েস হলেও শম্পা রেণুর চেয়ে দেখতে বড়সড়। গোলগাল সুপুষ্ট। মাটিতে ভাল সার পড়লে গাছের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় শম্পা সেইরকম। আগেকার দিন হলে কথা উঠত, মেয়েকে এইবার পাত্রস্থ করো।

শম্পার অনেক বদ অভ্যাসের একটা হল বসে বসে পা নাচানো। কখনও ওপর নীচে, কখনও পাশাপাশি। কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারে না। শম্পা পা নাচাচ্ছে আর চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ করে মশলা চিবোচ্ছে। শম্পার পা নাচানোর ফলে রেণুর শরীর কাঁপছে থিরথির করে। শম্পার শরীরটি যেমন বেড়েছে মনটিও তেমনি পেকেছে। সংসারের আদুরে মেয়ে। কথাবার্তাও সেইরকম। এক রিকশায় এলেও রেণুর এই আদুরেপনা অসহ্য লাগে। সবেতেই যেন বিস্ময়। ও মা, ও বাবা ছাড়া কোনও কথা শুরু বা শেষ হয় না। সব ব্যাপারেই এক কথায় টান, কী হবে... এ ভাই।

শম্পা রেণুর গালে টোকা মেরে বললে, 'কী ভাবছিস বিরহী যক্ষের মতো?'

শম্পার সঙ্গে একই রিকশায় পাশাপাশি বসে স্কুলে এলেও শম্পা মেয়েটাকে রেণুর অসহ্য লাগে।

আগাপাশতলা ন্যাকামিতে ভরা. আহ্লাদি। খুকি। লেখাপড়ার বাইরের অনেক জিনিস এখন থেকেই জেনে বসে আছে। পথে আসতে আসতে শম্পারই যত নজরে পড়ে, কোন ছেলেটা কীভাবে তাকাচ্ছে। কে খুব মাঞ্জা দিয়েছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে কী মন্তব্য করে গেল। রেণু ওসব গ্রাহ্যও করে না, পাত্তাও দেয় না। নিষ্কর্মা ছেলেতে পল্লি ছেয়ে গেছে। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত অনন্ত অশান্তির স্রোত বইছে। কী করা যাবে! সবই সহ্য করতে হবে। রেণু বললে. 'কিছু ভাবিনি, শরীরটা তেমন ভাল নেই। জ্বর জ্বর লাগছে।'

শম্পা বললে, 'আজ মানসকুমার খুব সেজেছে।'

রেণু উদাস গলায় বললে, 'তা হবে।'

স্কুলে আসার পথ যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা বাড়ির রকে ছ'-সাতটা ছেলে, রোজই গুলতানি করে। সেই দলেরই একজন বোধহয় মানসকুমার। ফিলমি হিরোর মতো চেহারা বলেই মেয়েরা নাম রেখেছে মানসকুমার। আসল নাম নিশ্চয়ই অন্য। জগা অথবা পুঁটে হবে হয়তো। বড়লোকের এঁচোড়ে পাকা ছেলে। সাজপোশাকও সেইরকম। কখনও লাল টুকটুকে গেঞ্জি, কখনও চিরতা রঙের পাঞ্জাবি, ঠেলে লেসের কাজ করা, কখনও চোখে গগলস। গোরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খাওয়া নধর চেহারা। ছেলেটাকে একনজর দেখে রেণুর একদম ভাল লাগেনি। মনে হয়েছে মাকাল ফল। বাকিগুলোর চোয়াড়ে মার্কা চেহারা। গর্তে বসা চোখ। সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে শুকনো ঠোঁট সোঁদালের মতো কালো। মাঝে মাঝে যখন সোল্লাসে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে তখন মনে হয় হায়নার পাল। বাবার সঙ্গে একবার একটা রাশিয়ান ছবি দেখতে গিয়েছিল। সাইবেরিয়ার বরফ ঢাকা প্রান্তরে এক বিপ্লবীর জীবনে মৃত্যু নেমে আসছে।গভীর রাত। আকাশে ভৌতিক আলোর ছটা। মৃত্যুপথযাত্রীর অদূরে একে একে এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষুধার্ত হায়নার দল। মানুষটির শীর্ণ মুঠোয় একটি গাছের ভাঙা ডাল। চোখে ফ্যালফেলে দৃষ্টি। নিঃশেষিত জীবনীশক্তি। হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা হায়না বীভৎস চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলোও সেই একই ভাষায় ডেকে উঠল আকাশের দিকে মুখ তুলে। লোকটির একটা হাতে উঁচু করে তুলে ধরা শুকনো গাছের ডাল। অন্য হাতে একটা টিনের মগ। অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হায়নারা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

রেণুর কেবলই মনে হয় ওরা সেই হায়না। কেন মনে হয় তা জানে না।

ইতিহাসের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। প্রভাদি ক্লাস নিতে এসেছেন। প্রভাদিকে সকলেই ভীষণ ভয় পায়। ক্লাসের সবচেয়ে বাচাল মেয়েরাও শান্ত হয়ে যায়। শম্পার পা নাচানো বন্ধ হয়ে গেছে। প্রভাদি একদিন শুধু বলেছিলেন এটা সেলাইয়ের ক্লাস নয় শম্পা। তোমার কল চালানো থামাও। রেণু একদৃষ্টিতে প্রভাদিকে দেখছিল। তার ভীষণ প্রিয়। কৌতূহলও অসীম। অসংখ্য ঘটনার তিনি নায়িকা। রেণু শুনেছে প্রভাদি ছেলেদের একদম দেখতে পারেন না। পুরুষ জাতির প্রতি তাঁর অসহ্য ঘৃণা। যেমন বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি বলিষ্ঠ চরিত্র। পাকা পিচফলের মতো গায়ের রং। এতখানি ঘোরালো মুখ। সোনার ফ্রেমের চশমা। বড় বড় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। বব ছাঁট এক মাথা চুল। সাদা শাড়ি, হালকা রঙের ব্লাউজ। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক এক ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন। অথচ চরিত্রে কোনও বিলিতি ভাব নেই। এখনও অবিবাহিতা।

প্রভাদির কত গল্পই যে বাজারে চালু আছে! কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা বলা শক্ত। সব গল্পেই তাঁর সাহসিকতা, অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করা, জীবন তুচ্ছ করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাহিনি। একা একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। অনাথাশ্রম থেকে একটা মেয়েকে এনে মানুষ করছেন। লোমঅলা একটা সাদা কুকুর আছে। দেয়ালে দুটি ছবি ঝুলছে, মা আর বাবার। রেণু একদিনই প্রভাদির বাড়িতে গিয়েছিল। সবকিছুই যেন ছবির মতো সাজানো।

রেণুর মাঝে মাঝেই মনে হয় প্রভাদিকে জীবনের আদর্শ করে নিলে কেমন হয়? প্রভাদিকে নিয়ে গল্পের সেই দৃশ্যটার কথা ভাবলেই রেণুর ভীষণ মজা লাগে। পুরুষ জাতির এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে। এক মর্কট প্রভাদিকে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল রাস্তায়। অনেক দিন ধরেই ভদ্রলোক উসখুস করছিলেন দূর থেকে। না জেনেশুনে হঠাৎ একদিন সাহস করে কাছে এগিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার নির্জন রাস্তা। সবে বাতি জ্বলে উঠেছে। প্রভাদি খুব ধীর গলায়, অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই আপনার?'

লোকটি গদগদ হয়ে বললে, 'তোমাকে মাই ডার্লিং।'

প্রভাদির হাতে ছিল ফোল্ডিং ছাতা। বিলিতি জিনিস। দমাদ্দম দু'-চার ঘা পিঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই হতচকিত প্রেমিক দৌড়োতে শুরু করল। ভেবেছিল ছুটে পালাবে। প্রভাদিও ছুটতে শুরু করলেন। পুরো ছাতাটাই যাকে উৎসর্গ করবেন দু'ঘা খেয়েই সে পালাবে তা তো হতে পারে না। পুরো পাওনাটা নিয়ে যাও। লোকটি একটা ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে কিছু দূর উঠে পড়েছে। মাথার ওপর বাতি জ্বলছে। মাটিতে লোকটির জড়ভরত ছায়া লুটিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে প্রভাদি কত দূরে! প্রভাদি একেবারে নীচে।

লোকটিকে টেনে নামিয়ে আনলেন। মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল। লোকটি কান ধরে দশবার ওঠবোস করে অবশেষে মুক্তি পেল। চিরকালের মতো জেনে গেল, প্রেমের শ্রেষ্ঠ দাওয়াই ফোল্ডিং ছাতা।

এই কাহিনির সত্য কতটুকু, মিথ্যা কতটুকু, কতখানি অতিরঞ্জিত জানার প্রয়োজন নেই। প্রভাদিকে সকলেই ভয় পায়। প্রভাদির স্বরূপ নানা কিংবদন্তিতে আচ্ছাদিত। আসল মানুষটি কেমন জানার উপায় নেই। কাউকেই তিনি কাছে ঘেঁষতে দেন না। রহস্য সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল থাকে। রেণুর কিন্তু কৌতূহল ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে। শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসা। সাধারণের থেকে একেবারে আলাদা। সম্পূর্ণ পৃথক একটি চরিত্র।

রেণু মাঝে মাঝেই প্রভাদিকে গতানুগতিক সাংসারিক পরিবেশে রেখে কেমন দেখায় ভাবার চেষ্টা করেছে। যেমন, প্রভাদির বিয়ে হয়েছে, কোলে একটি ছেলে এসেছে। ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। বুকে চেপে ধরে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। কোল নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা

করছেন। প্রভাদিকে ওই সব ভূমিকায় ভাবাই যায় না। যেমন ভাবা যায় না বিবেকানন্দ ছেলেকে নিয়ে বসে আছেন কোনও হাসপাতালের আউটডোরে ডাক্তারের অপেক্ষায়।

রেণুর বয়েস তো বেশি নয়। তবু কেন ভারী ভারী সব চিন্তা আসে মনে! যুগের ধর্ম। রেণুর কেবলই মনে হয় সংসার হল পাপীর পীঠস্থান। তাদের নিজেদের বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে সে যখন মাঝে মাঝে একপাশে বসে বুক খুলে ন্যাংলা ছেলেটাকে দুধ খাওয়ায়, ময়লা সায়া, ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, ছেঁড়া বিবর্ণ ব্লাউজ, উকুন ভরা মাথা, তখন রেণুর মনে হয় আহা কী সুখের বাঁচা। তখন আর তার মুখে ঝাঁঝালো কথা শোনা যায় না। উদাস, ফ্যালফেলে মুখ। শীর্ণ শরীর শিথিল। ছেলেটা ক্রমান্বয়ে শুকনো বুক থেকে দুধ টেনে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় পা ছুড়ছে। দৃশ্যটা প্রায়ই রেণুর চোখে পড়ে, আর যখনই পড়ে তখনই মনে হয় পৃথিবীটা একটা আটকাটি বন্ধ কয়েদখানা। মানুষ এখানে আসে মেয়াদ খাটতে। নিজের মায়ের জীবনের সঙ্গে ওই মেয়েটির জীবন যখন মেলাতে বসে রেণু, তখন খুব একটা বড় রকমের তফাত চোখে পড়ে না। একজনের অবস্থা একটু ভাল, একজনের একটু খারাপ। একজন প্রথম শ্রেণির কয়েদি আর একজন তৃতীয় শ্রেণির। দু'জনেরই মুখের চেহারা এক। সমান উদ্বিগ্ন, সমান পোড় খাওয়া। সেই তুলনায় প্রভাদিকে অনেক তাজা মনে হয়। প্রভাদির জীবনের রহস্যটা যদি কোনওরকমে জানা যেত?

প্রভাদি হঠাৎ শম্পাকে প্রশ্ন করে বসলেন। প্রভাদির চোখে শম্পা রোজ ধরা পড়বেই। যথারীতি উত্তর দিতে পারবে না তখন রেণুর পালা আসবেই। রেণু পড়া তৈরি করেই আসে। ভয়ের কিছু নেই। তবে রেণুর মন এতক্ষণ পড়ার দিকে ছিল না। অন্য এক ভাবনার জগৎ থেকে ইতিহাসের পাতায় ফিরে আসতে হবে। প্রভাদির প্রশ্ন এমন কিছু কঠিন নয় তবু শম্পা ঘাড় চুলকোচ্ছে। কোন মোগল বংশধরকে বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মোগলবাদশাহ ঘোষণা করেছিল? রেণু উঠে দাঁড়াল। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শম্পাকে নিষ্কৃতি দেওয়াই ভাল। রেণু বললে, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

প্রভাদি দু'জনকেই বসতে বললেন। মুখ অসম্ভব গম্ভীর। পেছনের আকাশও নিকষ কালো হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছে। বৃষ্টি এল বলে। প্রভাদি বললেন, 'তোমরা লেখাপড়া তা হলে ছেড়েই দিলে? ভালই, লেখাপড়ার আর কী মূল্য আছে। একটা ফ্যাশান। দু'-চারজন ছাড়া তোমরা সকলেই জীবনটাকে বেশ সহজ করে নিয়েছ। তাই নাও।'

শব্দ করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। ঠান্ডা বাতাস উঠেছে। প্রভাদি ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। শম্পা একগাল হেসে আদুরে আদুরে গলায় বললে, 'ইতিহাস আবার একটা সাবজেক্ট?'

রেণু আসন ছেড়ে জানালার দিকে সরে গেল। ঠান্ডা বাতাসটা ভারী ভাল লাগছে। এই অবেলায় বৃষ্টি নামল। বাড়ি ফেরার কী হবে? রিকশা আসবে না সময় মতো। যাদের কাছাকাছি বাড়ি তারা ভিজতে ভিজতেই চলে যাবে। বৃষ্টি পেলে মেয়েরা আর কিছুই চায় না। রেণুরও ভিজতে তেমন খারাপ লাগে না। কিন্তু মনে যে তেমন আনন্দ নেই। হঠাৎ যেন বড় বেশি বুড়িয়ে গেছে। কিছুদিনের জন্যে কোথাও বেশ চলে যাওয়া যেত? এমন কোনও পরিবেশে যেখানে সন্দেহ নেই, খোলামেলা মনের মানুষ সব চারপাশে। গান, গল্প, কাজ সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকর একটা আবহাওয়া। জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। মানুষের মন দিন দিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

রেণু জানালার দিক থেকে সরে এল। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির গুঁড়ো এসে চুল, চোখের পাতা সব ভিজিয়ে দিয়েছে। ক্লাস প্রায় খালি। শম্পাও কোথায় সরে পড়েছে। তার অনেক বন্ধু। বলা যায় না, রিকশার অপেক্ষা না করেই কাছেই কারু বাড়িতে হয়তো চলে যাবে। শম্পা সব পারে। শম্পাকে তার বাড়ি থেকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া আছে। সে একা একা তিন-চার দিন বাইরে থেকে ঘুরেও আসতে পারে। এসেছেও। শম্পার বাবা অতি আধুনিক। মা-ও রেণুর মায়ের মতো গাঁইয়া নয়। একেবারে হাল ফ্যাশানি। তাঁর সাজগোজ দেখে রেণুও চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে তার নিজের মনেই

প্রশ্ন জাগে, ব্লাউজ কি অত ছোট পরা উচিত। শরীরের অতখানি অংশ অনাবৃত রাখার কারণ কি শুধুই গরম। ঠোঁট অত লাল নাই বা করলেন? স্বাভাবিক ভুরু কামিয়ে ফেলে আঁকা ভুরুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার কী আছে? শাড়ি কেন অত স্বচ্ছ হবে? শম্পার সামনে ওই সাজে ঘুরতে তাঁর লজ্জা করে না। সে দিক থেকে তার নিজের মাকে অনেক বেশি মা, মা দেখতে। কোন ধারাটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, প্রাচীন না আধুনিক? এ প্রশ্নের জবাব একেক জনের কাছে, একেক রকম।

আকাশ আরও কালো হয়ে এসেছে, আরও জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পেছনের দিকে কয়েকটা মেয়ে জোর গল্প জুড়েছে। গল্পের বিষয়বস্তু কী বোঝা যাচ্ছে না। ঘনঘন, হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, না ভাই, না ভাই, আর খিলখিল হাসি। মেয়েরা এক অদ্ভুত বস্তু। কী নিয়ে যে মেতে ওঠে? কীভাবে যে কথা বলে? ওদিকে টিচার্স রুমে জোর জমায়েত। ঘনঘন হাসির শব্দ উঠছে। আকাশ কালো করে বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে।

দু'হাতের মাঝে মুখ রেখে রেণু চোখ বুজিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। ভারী মিষ্টি আওয়াজ উঠছে চারপাশ থেকে। হাসির শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে পাখোয়াজের বোলের মতো মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি। পৃথিবীর ঐকতান। রেণুর মনটা যেন কোথায় উড়ে চলে গেছে।

কার ডাকে রেণু চমকে উঠল। ক্লাসরুমের দরজায় মা দাঁড়িয়ে। সপসপে ভিজে শাড়ি। দু'হাতে দুটো ছাতা। একটা ছাতা থেকে টসটস করে জল পড়ছে। রেণু প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। স্বপ্ন নয় তো? অত দূর থেকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মা ভিজতে ভিজতে হেঁটে হেঁটে তাকে নিতে এসেছে? প্রথমে সে যেমন খুশি হল পরমুহূর্তেই তেমনি বিব্রত হয়ে পড়ল। আর সব মেয়েরা কী ভাববে? বলবে কচি খুকি। তা ছাড়া, মা যেভাবে শাড়ি পরে, চুল বাঁধে, কথা বলে, একেবারে ঘরোয়া। আজকালকার মেয়েরা যেমন সমালোচক, তেমনি বিশ্বনিন্দুক। কালই ক্যারিকেচার করে দেখাতে থাকবে রেণুর মা কীভাবে ভিজে বেড়ালের মতো এসে রেণুকে ছাতা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। দেখাবে আর হেসে লুটোপুটি খাবে।

মা পাছে বেশি কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে সাইডব্যাগটা কাঁধে ফেলে রেণু তড়াক করে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'তুমি এই সাংঘাতিক বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এলে কেন?'

শ্যামলী আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কী রে? আসব না? এ বৃষ্টি রাত ন'টার আগে তুই থামবে ভেবেছিস? আমাদের ওদিকে বাজ পড়ে ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে। সারা রাস্তার কোথাও একটা আলো নেই। চারপাশে কলকল করে জল [illegible]ছে। তুই ফিরবি কী করে সেই ভেবে বাড়িতে বসে থাকা যায়?'

শ্যামলীর গলাটা তেমন খাটো নয়। জোরে কথা নাকি গ্রাম্য লোকেরাই বলে। আধুনিকাদের কথা আধো আধো, শম্পার মতো, ঢঙে ভরা। রেণু তাই মাকে সরাতে সরাতে নীচে নামার সিঁড়ির কাছে নিয়ে এসেছে। মেঘে মেঘে বেলা চলে গেছে। আলোর বেশ চোখ ফুটেছে। অন্যদিন বেলা থাকতে থাকতেই রেণু চলে যায়। আজ এই বাদুলে সন্ধ্যায় বাল্‌বের আলোয় সিঁড়ির কাছটা কেমন যেন রহস্যময় লাগছে। মা কথা বলছে। বাতাস গ[illegible]ম করছে। বাইরের বাতাস ঠান্ডা হলেও সিঁড়ির কাছে গরম বাতাস জমে আছে এখনও। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেণু বললে, 'তুমি যে একেবারে ভিজে জাব হয়ে গেছ মা। অসুখ করলে কে দেখবে?'

শ্যামলী হাসতে হাসতে বললে, 'তোরা দেখবি। তুই আর তোর বাবা।'

মাকে আজ যেন ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে? বৃষ্টির জলে মুখটা ধুয়ে গেছে। মেয়েলি ছাতায় কি জল আটকায়? ভিজে শাড়ি শরীরে লেপটে আছে। কই মাকে তো তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না। যেই দেখবে সেই বলবে মা। তবে মায়ের চটিজোড়ার কী অবস্থা? একেই ছেঁড়া তার ওপর জল কাদায় ভেজা। প্রকৃতই পাদুকা। বাবাকে বলতে হবে মাকে একজোড়া চটি কিনে দাও? মা নিজে কোনওদিন বলবে না।

বৃষ্টি সামান্য কমে এসেছে। স্কুলের গেটের সামনে ঘোলা জল জমেছে! ঝড়ে মাধবীলতার পাতা আর ফুল ঝরে ঝরে পড়ে ভাসছে। বাইরেটা গোলাপি, ধোঁয়া ধোঁয়া। কটর কটর করে ব্যাং ডাকছে। কোনও বাড়িতে সন্ধের আগেই শাঁখ বাজাতে শুরু করেছে। কেমন যেন গা-ধোয়া বিকেল।

শ্যামলী যে ছাতাটা সঙ্গে এনেছিল সেটা মেয়েকে দিল। রেণু পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছে। জুতো ভিজে গেলে কাল শুধু পায়ে ক্লাসে আসতে হবে। শ্যামলীর আপত্তি ছিল। রাস্তার যা অবস্থা তায় আবার জলে ডুবে আছে। কেটেকুটে গেলে নির্ঘাত টিটেনাস। রেণু বললে, 'পা দুটোকে একটু জুতো ছাড়া হতে দাও মা। তুমিই তো বলো, মেয়েছেলের সব কিছু সহ্য করে রাখা ভাল।'

শ্যামলী আর কোনও কথা বলল না। মা মেয়ে দু'জনে খপাত খপাত করে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। নোংরা জল হলেও, জলে হাঁটার অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষি আনন্দ আছে। রাস্তাঘাট নির্জন। কেউ কোথাও নেই। রক থেকে রকবাজরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। বৃষ্টির ধারা পেছন থেকে সামনে এগিয়ে চলেছে নেচে নেচে। চায়ের দোকানের পাল্লা সামান্য খোলা। ভেতরে ঠাসাঠাসি ভিড়। উনুনের ফিকে ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে এসেই বৃষ্টির থাবড়া খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে। টেবিল বাজিয়ে হিন্দি ছবির গান হচ্ছে। খেলার তর্ক উঠছে। চায়ের কাপে চামচে নাড়ার শব্দ হচ্ছে। দু'-একজনের চোখ রাস্তার দিকে ঠিকই আছে। জলভাঙা মেয়ে দেখতে বড় ভাল লাগে। কাপড় ওপর দিকে কিছুটা টেনে তুলতেই হবে। তা না হলে হাঁটা যাবে না। আর সেইটাই হল বিউটি। একটা বাচ্চা মেয়ে প্ল্যাস্টিকের স্বচ্ছ টুকরো মাথায় দিয়ে সামনে সামনে হেঁটে চলেছে। মনে হয় কোনও বাড়িতে কাজ করে। বৃষ্টিই হোক আর ঝড়ই হোক এঁটো বাসন তুলে দিতেই হবে।

শ্যামলী আর রেণু যখন বাড়ি পৌঁছোল তখন আর দিনের আলো নেই। পশ্চিম আকাশটা একবার লাল হবার চেষ্টা করেছিল। সুবিধে করতে পারেনি। সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়েই কখন পশ্চিমে গলে পড়ে গেছে। গাছে পাখিরা পাখা ঝাপটাচ্ছে। দিনের শেষ গান গাইবার অবকাশ আজ আর পাওয়া গেল না।

শ্যামলী দূর থেকেই দেখছিল সদরের সামনে সান শেডের তলায় গুড়িসুড়ি মেরে দুটি ছায়ামূর্তি বসে আছে। বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ওরা কারা? প্রশান্ত নয়। শ্যামলী তালা ঝুলিয়ে কোথাও গেলে প্রশান্ত অমন লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকবে না। বিশেষত এইরকম বৃষ্টির দিনে। হয় সামনের বাড়িতে না হয় কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকানে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

শ্যামলী কাছে এসে খুব অবাক হয়ে গেল। প্রশান্তর মা এসেছেন। সঙ্গে শ্যামল। প্রশান্তর বড় ভাইয়ের মেজ ছেলে। মা বসে আছেন একটা সুটকেসের ওপর জবুথবু হয়ে। শ্যামল বসে আছে একটা খবরের কাগজের ওপর সদর দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে। চোখ বুজিয়ে আপন মনে গান গাইছে, সখি বেদনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে? শ্যামলীদের পায়ের শব্দ পেয়ে গানের ফাঁকে বললে, 'কাকিমা ক'টা ধরলে?'

শ্যামলী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'মা আপনি? কোনও খবর দেননি তো! ছি ছি ভিজে গেলেন।'

শ্যামল আবার প্রশ্ন করল, 'রেণু ক'টা পেলে?'

রেণু বললে, 'তোমার রহস্যময় কথা কে বুঝবে শ্যামলদা?'

'তোমরা তো মাছ ধরতে গিয়েছিলে?'

শ্যামলী বললে, 'আজ্ঞে না স্যার, মাছ নয় মেয়ে ধরতে গিয়েছিলুম।'

শ্যামল বললে, 'রেণু তুমি এখনও কিন্ডারগার্টেনেই পড়ছ? আর একটু ওপর দিকে উঠতে পারলে না?'

প্রশান্তর মা সুটকেস ছেড়ে উঠে পড়েছেন। তিনি খুব ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তোমরা কেমন সব আছ বউমা?'

শ্যামলী দরজার তালা খুলতে খুলতে বললে, 'ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?'

উত্তর দিল শ্যামল, 'বাত, অম্বল, ছানি, বুক ধড়ফড়, লো-প্রেশার, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, আর কিছু চাই?'

শ্যামলী বললে, 'টিপ্পুনি না কেটে দয়া করে ভেতরে এসো।'

'আগে আলোটালো জ্বালো। ততক্ষণে আর একটু ভিজে নিই। জ্বরটা ভাল করে এলে বিনা নোটিশে এসে তোমাকে আরও ভাল করে জ্বালানো যাবে।'

শ্যামলী দরজার পাশের সুইচে হাত রেখেই হাত সরিয়ে নিল। সত্যিই তো, আলো আজ আর জ্বলবে না। ট্রানসফর্মারে বাজ পড়েছে। শ্যামলী অন্ধকার থেকে বললে, 'মা, আপনি দাঁড়ান, আলো আজ আর জ্বলবে না, হ্যারিকেন জ্বেলে আনি। রেণু তুই দিদাকে নিয়ে দাঁড়া।'

রেণু বললে, 'আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি কিন্তু সাবধানে এগোও। যা অন্ধকার হোঁচট খেয়ো না যেন।'

শ্যামল তখনও বসে আছে। কতই যেন আরাম আছে। গান সমানে চলছে, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

অভ্যস্ত সংসারে অন্ধকার শ্যামলীকে কাবু করতে পারেনি। সব কিছু ছবির মতো সাজানো। সামনে বাঁ দিকে হাত বাড়ালেই মিটসেফের ওপর দেশলাই। খাবার ঘরের দরজার কোণে হ্যারিকেন। গলা উঁচু কেরোসিন তেলের বোতল। বাদুড় যেমন অন্ধকারে ধাক্কা না খেয়ে উড়তে পারে শ্যামলী তেমনি অন্ধকারে সব কিছু করতে পারে।

আলো জ্বলে উঠল। বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে ঝাপটা মেরে সরিয়ে দেয়। বাতির আলো টিপের মতো অন্ধকারের গায়ে আটকে থাকে। রেণু বললে, 'শ্যামলদা, গান থামিয়ে এবার ওঠো, আলো জ্বলেছে।'

শ্যামল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সুটকেসটা হাতে তুলে নিল। এতক্ষণ বসে ছিল বলে বোঝা যায়নি। শ্যামল বেশ লম্বা। বেশ ভাল লম্বা। রাঁচির জল হাওয়া বেশ ভালই বলতে হবে। শ্যামলকে দেখলে বলতে ইচ্ছে করে, এ ফাইন ইয়ং ম্যান। এলোমেলো এক মাথা চুল। ছেলেমানুষি ভরা মিষ্টি মুখ। রেণুর চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। রাঁচির টেকনিক্যাল কলেজে ঢুকেছে। বাবার ইচ্ছে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোক।

শ্যামল এক হাতে সুটকেস নিয়ে বেঁকে ত্রিভঙ্গ হয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'ঠাম্মা কী কী ভরেছ গো! শিল নোড়া আছে নাকি, উদূখল, মুষল?'

রেণু বললে, 'সাহায্য করব শ্যামলদা?'

শ্যামল বললে, 'তুমি তো জ্যান্ত সুটকেসের ভার নিয়েছ! সেটাকেই সামলাও।'

শ্যামলীর ভিজে কাপড়ের জল পড়ে মেঝে টেঝে সব ভিজে গেছে। রেণু যেখান দিয়ে চলছে সেইখানেই ভিজে পায়ের ছাপ পড়ছে। শ্যামলীর পরিষ্কার বাতিক। ঘরদোরের যা অবস্থা হল এখন ঘণ্টাখানেক যাবে পরিষ্কার করতেই। আবার নতুন করে রান্না চাপাতে হবে।

রেণু ঝটাপট গোটাকতক মোমবাতি জ্বেলে ফেলল। আগে বাথরুমে যেতে হবে। ডেটল দিয়ে পা ধুতে হবে। যে নোংরা জল দিয়ে আসতে হয়েছে তাতে নিজের পায়ের ওপর নিজেরই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। পা যদি জুতো হত তা হলে শরীরে রাখত না। টান মেরে রাস্তায় ফেলে দিত।

এদিকে প্রশান্ত অফিসে আটকে পড়েছে। প্রশান্ত একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি হাউসে চাকরি করে। সিনিয়ার এক্জিকিউটিভ। কাজের লোক বলে খ্যাতি আছে। বিজ্ঞাপনের লাইনটা ভালই বোঝে। গোটাকতক ক্যামপেন বেশ ভালই চালিয়েছে। মেয়েদের ব্যবহারের জিনিস কীভাবে বাজারে চালাতে হয় প্রশান্তর মতো কেউ জানে না। শাড়ি, ব্রেসিয়ার, স্যানিটারি টাওয়েল, লোমনাশক প্রসাধনী, প্রশান্তর হাতে একবার পড়লে হয়। বাজার ছয়লাপ করে দেবে। এ লাইনে প্রশান্তকে সকলে বলে গ্র্যান্ডমাস্টার। দাবার চালে বাজি মাত।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে প্রশান্ত সেই বিকেল পাঁচটার পর থেকে ব্রিজ খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ভাল লাগছে না। কাপের পর কাপ কফি আর সিগারেটের পর সিগারেটে শরীর আগুন। বাইরের হাওয়ায় এত জলকণা ঘরের চারপাশের কাচে বাষ্প জমে গেছে। কোথাও কোথাও জলের রেখা নেমে গেছে এঁকে বেঁকে।

সম্প্রতি বাইরের জগৎ থেকে বেয়ারাদের মারফত যে খবর এসেছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সায়েব পাড়াতেই যখন বান ডেকেছে তখন নেটিভ পাড়ার কী অবস্থা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। যত রাত বাড়ছে ততই বাড়ি ফেরার চিন্তা অস্থির করে তুলছে। অথচ বাড়ি ফিরতে হলে যা মেহনত করতে হবে, ভাবলেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কলকাতাকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। জলমগ্ন রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। বিকল গাড়ি ঠেলছে মহাউল্লাসে রাস্তার ছেলেরা। দু'পাশে বিশাল বিশাল বাড়ি। জলের শব্দ, গাড়ির হর্ন, মানুষের কোলাহল দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মিশকালো আকাশের তলায় এক ভুতুড়ে রাত তৈরি করেছে। ক্ষমতা থাকলে হেঁটে বাড়ি যাও। সে ক্ষমতা তার নেই। রাতের আর কতটুকুই বা বাকি। অফিসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। একটা রিটায়ারিং রুমও আছে।

প্রশান্ত তাস ফেলে টেলিফোনটা তুলে নিল। বাড়িতে ফোন করে শ্যামলীকে বলে দেওয়া যাক, কোনওরকমে রাতটা তোমরা দু'জনে সাহস করে কাটিয়ে দাও। আমি আজ আর বাইতে পারলুম না। প্রশান্তর সঙ্গে যাঁরা খেলছিলেন তাঁদের একজনের নাম সম্বরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রশান্তর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বছর চারেক এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশান্তর সঙ্গে খুব খাতির জমে গেছে। তুই তোকারির সম্পর্ক।

প্রশান্ত একবারের চেষ্টাতেই বাড়ির লাইন পেয়ে গেল। রেণু আর শ্যামল বসার ঘরে বসে ছিল। দূরে কোণের টেবিলে কেঁপে কেঁপে বাতি জ্বলছে। বিশাল বিশাল ছায়া দুলছে দেয়ালে। আদা দিয়ে জমিয়ে চা খাওয়া হচ্ছে। ঠাকুমা পাশের ঘরে জপে বসেছেন। শ্যামলী রান্নাঘরে গ্যাসে খিচুড়ি বসিয়েছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। রেণুই হাত বাড়িয়ে ফোন তুলল।

প্রশান্ত বললে, 'কে রেণু? শোন আমি বোধহয় আজ আর বাড়ি ফিরতে পারব না রে।'

সম্বরণ সিগারেট চাপা ঠোঁটে বললে, 'বোধহয় বলে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন? বল, আজ আর আমি ফিরব না।'

প্রশান্ত মৃদু হাসল। রেণু ওদিক থেকে বলছে, 'দাঁড়াও আমি মাকে ডেকে দিই।'

শ্যামলী রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরল, 'তুমি ফিরবে না?'

'কী করে ফিরব! অসম্ভব অবস্থা। রেণু কীভাবে এল?'

'আমি গিয়ে নিয়ে এলুম।'

'বেশ করেছ।'

'তুমি থাকবে কোথায়?'

'থাকার অনেক জায়গা আছে। অফিসেও ব্যবস্থা আছে। ঘণ্টা কয়েকের তো ব্যাপার। দেখতে দেখতেই ভোর হয়ে যাবে। তোমাদের ভয় করবে?'

'না, ভয় করবে কেন? তা ছাড়া একটু আগে মা আর শ্যামল এসেছেন।'

'ও তাই নাকি? মা এসেছেন? শরীর কেমন?'

'এমনি ভালই, তবে ভিজে গেছেন।'

'পারো তো একটু ফুটবাথ করিয়ে দিয়ো।'

'হ্যাঁ, সে তো দিতেই হবে। এদিকে আবার ট্রান্সফর্মারে বাজ পড়ে আলো গেছে। কবে আসবে কে জানে?'

'মাকে একবার দেবে নাকি?'

'পুজোয় বসেছেন।'

শ্যামল উঠে এসে ফোন ধরল, 'কাকু?'

'বল, কেমন আছিস?'

'ভাল। তুমি কী করছ?'

'হাঁ করে বসে আছি। বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করছি। দাদা, বউদি কেমন আছে?'

'উঃ দারুণ আছে। তোমাদের সিগারেটের বিজ্ঞাপন, মেড ফর ইচ আদার। '

'কাল সকালে তোকে গিয়ে ঠ্যাঙাব।'

'ঠিক আছে। তুমি অফিসের চারপায়ায় বসে রাত কাটাও। আমাদের এদিকে ফাসক্লাস খিচুড়ি হচ্ছে। তুমি কি কাকিমার সঙ্গে আর কথা বলবে?'

'না, গুড নাইট।'

প্রশান্ত ফোন নামাতেই সম্বরণ বললে, 'গুড ডিসিশান। ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে বাড়ি করলে ওই অবস্থাই হয়। নে চল, আমার ফ্ল্যাটেই চল। দুই ইয়ারে জমবে ভাল।'

আর দু'জন পার্টনার দত্ত আর মিত্তির হাতের তাস ফেলে দিয়ে বললে, 'আমরা তা হলে জলপথেই চলি। পেটে জল পড়লে বাইরের জল তেমন কাবু করতে পারবে না। বিষে বিষে বিষক্ষয়।'

সম্বরণের ফিয়েট গাড়ি জল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রিপন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঠেক খেল। প্রশান্তর বেশ ভালই লাগছিল। অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো। বৃষ্টির রাতে কলকাতা কেমন বদলে যায়। রহস্যময় হয়ে ওঠে। ভিজে রাস্তা হেডলাইটের আলোয় রুপোর পাতের মতো ঝলসে যায়। বিশাল বিশাল গাছের অন্ধকারে ফুটপাথ। জড়সড় কোনও নিঃসঙ্গ মানুষ। কবরখানার শ্যাওলা ধরা ভিজে গম্বুজ। বহুকাল আগে যারা মারা গেছে তারা যেন এই বৃষ্টির রাতে নীল বাষ্প হয়ে মাটির তলায় কফিন ছেড়ে ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করছে।

রাস্তার বাঁকে একটা রেস্তোরাঁ। দৈত্যের মতো একটি মানুষ বিশাল উনুনের সামনে বসে শিককাবাব বানাচ্ছে। উনুনের আঁচে মুখটা যেন পেতলের মতো লাল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্যটার মতো দেখাচ্ছে। এই রাতে কলকাতার ঢাকনা যেন খুলে গেছে।

সম্বরণ রেস্তোরাঁর সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখটা সামান্য বের করে বললে, 'মিঞাসাহেব আজ দু'জন।'

পেতলের মুখে মৃদু হাসি ফুটল, 'আচ্ছা সাহেব।'

সম্বরণ কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকের একটা বড় গেটে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল। বেশ একটা অঙ্গন মতো জায়গা। চারপাশে খাড়া বাড়ি উঠে গেছে। একেবারে শেষের দিকে সারি সারি গ্যারেজ। বড় বড় কাঠের দরজা। খুললেই ট্যাঁড়স করে শব্দ হয়। মবিলের, পেট্রলের গন্ধ ছুটে আসে।

প্রশান্ত গাড়ি থেকে নেমেই বুঝতে পারল শহরের তাপ বেশ নেমে গেছে। চারপাশ অন্ধকার বলেই আকাশটাকে বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি থামলেও ঝড়ো বাতাস বইছে। কালো মেঘের গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ উড়ছে। ইলেকট্রিক তারে মুক্তোর দানার মতো জল ঝুলছে। ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢোকার চার-পাঁচটা সিঁড়ি। প্রত্যেক সিঁড়িব মুখে একটা করে আলো। সেই আলোর চাপা আভা মায়ার মতো একটু করে আঁচল ফেলে রেখেছে শানের মেঝেতে।

প্রশান্ত অনেকবার এসেছে এখানে। তবে এমন রাতে কোনওদিন আসেনি। সম্বরণ একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে। রাজকীয় ব্যবস্থা। সম্বরণ একবার একটা বিয়ে করেছিল। বছর তিনেকের সংসার ভুল বোঝাবুঝিতে ভেঙে গেছে। মেয়েটি ছিল গুজরাতি। কার দোষ কে জানে? সম্বরণ বলে, আধুনিকারা সংসারের জন্যে নয়, সোসাইটির জন্যে। আবেগে জড়িয়ে গিয়েছিলুম। আবেগ শব্দটার

সঙ্গে বেগ জড়িয়ে আছে। মল-মূত্রের বেগের মতোই ব্যাপার। মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অনেকটা কোলাইটিসের রুগির মতো। বেগধারণের ক্ষমতা থাকে না। সম্বরণের মতে, বিয়ে করে সুখী হতে হলে পুরনো ব্যবস্থাই ভাল। বাপ মা দেখে শুনে যেটিকে এনে দিলেন, সেটিকেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে ভাব ভালবাসা চালাও। প্রেমে একটা নিবেদনের ভাব থাকে, তার মর্যাদা দেবার পাত্র-পাত্রীর বড়ই অভাব। দুর্বলতা ভেবে মাথায় উঠে নাচতে থাকে। প্রেমের জোড় রবার সলিউশানের মতো। বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। আজকাল রাতের দিকে প্রশান্তর মনে এইসব কথাই বেশি ঘুরপাক খেতে থাকে। সে যত ভুলতে চায়, শ্যামলী ততই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা তৈরি করে। রেণু বড় হচ্ছে। সময় এগিয়ে আসছে। কখন কী করে বসে! একবার পা ফসকালেই তলিয়ে যাবে অতলে।

সম্বরণের ফ্ল্যাটটা একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট বড়। সংসার নেই, সাজ আর আয়োজনের খুব ঘটা। কী নেই, সব আছে। এমনকী আধুনিক একটা কিচেন রয়েছে গ্যাজেটে ভরা। কে রাঁধে? সম্বরণ মাঝে মধ্যে শখ করে রাঁধতে যায়। কেমন হয়? কেউ কি চেখে দেখেছে সম্বরণ ছাড়া?

স্নানটান হয়ে গেছে। দুই বন্ধু পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে পেছনের প্রশস্ত বারান্দায় বেতের বাগান-চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। সামনেই কালো আকাশ মেঘপুঞ্জ মুক্ত নিয়ে ঝুঁকে আছে। চারপাশে অন্যান্য ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দা। স্বচ্ছ পরদায় আলোকিত ঘর, ছায়া মূর্তির আসা যাওয়া। বারান্দা থেকে উড়ে আসা কথার টুকরো, হাসির জলতরঙ্গ, কাশির শব্দ। রাত বেশ জমে উঠেছে। নেশা নিয়ে, ব্যথা নিয়ে, বেদনা নিয়ে। প্রশান্তর ভাবতে ভাল লাগে, কোন ঘরে কী হচ্ছে। এই বিশাল বাড়িতে সব প্রদেশের, সব জাতির মানুষ আছে। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন লোকাচার, বিভিন্ন বিশ্বাস, জীবনধারণ পদ্ধতি।

সম্বরণ হাই তুলে বললে, 'একটু অ্যাপেটাইজার চলবে নাকি? একটু পরেই তো পীরু মিঞার মোগলাইখানা এসে যাবে।'

প্রশান্ত ইতস্তত করে বললে, 'না থাক। এমনিই বেশ খিদে পেয়েছে।'

'কেন? এমন ঠান্ডার রাত, ঘুমটাও বেশ জমাটি হবে। সকালে মনে হবে গার্ডেন ফ্রেশ।'

'ঘুম আমার এমনিতেই ভাল হয়, বিছানায় রোজ পড়ি আর মরি।'

'আগে তো তোর দু'-চার চুমুক চলত, হঠাৎ কী হল? সাধু সাধু ভাব?'

প্রশান্ত মনের কথা বলবে কিনা ভেবে পাচ্ছিল না। বলে ফেলাই ভাল। পৃথিবীতে অন্তত এমন একজন থাকা চাই যার কাছে বুক খালি করা যায়। সম্বরণ বড় সাচ্চা মানুষ। তার নিজের কোনও আগঢাক নেই। খোলা আকাশের মতো। প্রশান্ত বললে, 'নিজের মর্যালটা ঠিক রাখতে চাই। আমি সংসারী মানুষ।'

'সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করলে তুই ইমমর্যাল হয়ে যাবি? এত ঠুনকো তোর নৈতিক চরিত্র?'

'না, তা নয়। বিবেকের সমর্থন না থাকলে পুণ্যের কাজও পাপ কর্মের মতো মনে হয়। আগে আমি মাঝে মধ্যে খেয়েছি, শখ করে, নেহাত কৌতূহলের বশে একবার-দু'বার মেয়েছেলের বাড়িও গেছি। তখন কিছু মনে হত না। এখন মেয়েটা বড় হচ্ছে। পিতা যদি পবিত্র না হয় সন্তানে পাপ বর্তায়!'

'কে বলেছে?'

'আমার মন। আমি প্রমাণ পেয়েছি। আমার ক্ষেত্রে ওই বিশ্বাস সেন্টপারসেন্ট সত্য।'

'হাতে হাতে ফল পেলে কুসংস্কারই সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।'

'ইন্টারেস্টিং। শুনতে ইচ্ছে করছে ধারণাটা কী করে বিশ্বাসে বদ্ধমূল হল?'

প্রশান্ত নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল। এতক্ষণে একজন কৌতূহলী শ্রোতা পাওয়া গেছে।

'তা হলে শোন, মানুষের বিশ্বাস কীভাবে সংস্কারে পাকা হয়। বছর পাঁচেক আগে, তুই জয়েন

করার অল্প কিছু আগে একটা ব্রেসিয়ারের বিজ্ঞাপনের জন্যে একজন মডেলের প্রয়োজন হল। সন্ধানও এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিকেলের দিকে একদিন চলে গেলুম। পাড়াটা ভাল নয় কিন্তু ফ্ল্যাটটা নতুন। যৌবনের রোজগারে তেড়ে সাজানো। প্রথম যেদিন গেলুম সেদিন আমার কিচ্ছু মনে হল না। পা কাঁপল না। বুক ধড়ফড় করল না। তালু শুকোল না। মনে হতে লাগল, আমি আমার কাজে এসেছি। দিস ইজ মাই ডিউটি। মেয়েটি অবশ্য মডেল হতে রাজি হল না। স্পষ্ট বললে, ওটা আমার লাইন নয়। আপনি এসেছেন, বসুন, কিছু পান করতে চান করুন, আলো নেবাতে চান নেবান। কিন্তু মডেল আমি হতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে এলুম। ঠিক সাতদিন পরে পার্কে একটা পার্টি ছিল। খাওয়া দাওয়া হয়েছে। দু'-চার পেগ পেটে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই মেয়েটির চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার সেদিনের বসে থাকার ধরন, খোলা কোমর, ঘাড়, বুকের অংশ। বড় কাতর হয়ে পড়লুম। মনে হল দেখাই যাক না। দোষের কী আছে? সারা পৃথিবীর সভ্য মানুষই তো উওম্যানাইজিং করে। সভ্যতারই অঙ্গ। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক খাড়া করে সোজা চলে গেলাম। এবং উপভোগ করলুম। একটা নতুন রকমের ব্যাপার। ফিরে আসার সময় লজ্জা, ভয় সব কিছু ঘিরে এল, যা প্রথম দিনে আসেনি। বাড়ি ফিরেই শুনলুম স্কুল থেকে আসার পথে মেয়েটাকে কুকুরে কামড়েছে এবং কীভাবে কামড়েছে, চলন্ত রিকশার ওপর লাফিয়ে উঠে।'

সম্বরণ বললে, 'জাস্ট এ কয়েনসিডেন্স।'

'হ্যাঁ আমিও তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু বারে বারেই যখন একই ঘটনা ঘটতে লাগল তখন সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। অদৃশ্য লোক থেকে কেউ যেন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রেখেছে আমার দিকে। মানুষের চোখকে ফাঁকি দিলেও সেই চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।'

সম্বরণ বললে, 'সবই বুঝলুম. কিন্তু তোর অপরাধটা কোথায়? তুই তো কারু ক্ষতি করছিস না। কর্তব্যে অবহেলাও হচ্ছে না। তোর স্ত্রী, কন্যা, সংসার, সমাজ, চাকরি সবই তো ঠিক থাকছে। যার প্রতি যা করা উচিত, যতটুকু করা উচিত সবই তুই করছিস। তা হলে কীসের জন্যে এই সাজা? দোষী জানিল না অপরাধ।'

প্রশান্ত বললে, 'ফাঁকিটাই একটা মস্ত বড় অপরাধ। তুমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়ে যাচ্ছ; তোমার আসল সত্তাটা হারিয়ে ফেলছ। তুমি নিজের কাছে আর সৎ থাকতে পারছ না। যেমন ধর সেবার, বাড়িতে বললুম অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছি, আসলে গেলুম গোপালপুরে ফুর্তি করতে। ফিরে এসে দেখলুম অদ্ভুত ব্যাপার, শ্যামলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মাঠ থেকে একটা বাচ্চা ছেলে ইট ছুড়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার মানে আমি যখনই অসৎ হচ্ছি, তঞ্চকতা করছি, প্রবঞ্চনা করছি তখন আমারই নিকট কেউ কষ্ট পাচ্ছে। মজা এই, আমার কিছু হচ্ছে না। তার কারণ আমার কিছু হলে অনুশোচনা আসত না। আমার বিবেককে জাগাবার এর চেয়ে ভাল পথ আর কী থাকতে পারে। আমি যদি পুরোপুরি অসৎ হতুম, সেইটাই যদি আমার একমাত্র পরিচয় হত তা হলে তো কিছুই হত না। সৎ আর অসৎ, পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি থাকতে পারে না। যে-কোনও একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। তার জন্যে অবশ্যই মনের জোর থাকা চাই।'

সম্বরণ মৃদু হাসল, 'আচ্ছা ধর, তুই যদি এখন এক পেগ ব্র্যান্ডি খাস, তোর কী হতে পারে বলে মনে করিস?'

'না, ব্র্যান্ডিটা কিছুই না। যে কেউ খেতে পারে যে-কোনও সময়। একটা বড় ছুতোও তৈরি করা যায়, ওষুধ হিসাবে খাচ্ছি।'

'তা হলে?'

'ওর পেছনে বিরাট একটা ব্যাপার আছে, সেটা আমার মন। এই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে তুই বুঝতে পারবি। একটু কষ্ট করলে আমি হয়তো একটু বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে

পারতুম। অনেকেই ফিরবে। আমি সে চেষ্টা না করে পরম সুখে তোর পাজামা পাঞ্জাবি পরে এখানে পরমানন্দে বসে আছি। অথচ যখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল সেই সময় আমার বউ ভিজতে ভিজতে অন্ধকারে, জলকাদা ভেঙে মাইল দুয়েক হেঁটে স্কুল থেকে আমার মেয়েকে নিয়ে এল। এসে দেখলে রাঁচি থেকে আমার বৃদ্ধা মা আর ভাইপো এসে দরজার বাইরে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাদের সেবা, রান্নার ব্যবস্থা। এখনও সে হয়তো রান্নাঘর থেকে মুক্তি পায়নি। তুই দেখ, আমি এদিকে স্বার্থপরের মতো পালিয়ে বসে আছি। আমাদের এলাকায় আজ আলো নেই। বাজ পড়ে ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে। আলো নেই মানে জলও নেই। ওদের সঙ্গে যে কষ্টটা ভাগ করে নিলে আমার বিবেক সুখী হত আমি সেই কষ্টটা তো এড়িয়েই গেলুম, উলটে তোর মহাসুখের অংশীদার হয়ে বসে রইলুম এইখানে। একটু পরেই আসবে মোগলাইখানা তারপরেই নরম বিছানা। এই আত্মসুখের অনুসন্ধানটাই একটা বড় অপরাধ। সেই অপরাধ তিলে তিলে বেড়ে উঠে এমন একটা ঘটনা ঘটাবে যা হয়তো আমার কল্পনার বাইরে।'

কলিংবেল বেজে উঠল। পীরু মিঞার খাবার এল। সম্বরণ উঠে গেল দরজা খুলতে। প্রশান্তর মনে হল এতক্ষণ অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছে। যুক্তিহীন আবোল তাবোল কথা, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। সংস্কার কুসংস্কারে মিলিয়ে আবর্জনার মতো। বাতাসে সুন্দর খাবারের গন্ধ ভেসে এল। প্লেট, কাঁটা চামচের শব্দ আসছে কানে। না, ওঠা উচিত। সম্বরণ একা। সাহায্য করলে সহজে হয়ে যাবে।

দেয়াল আলো, ঝাড়ফাড় সব জ্বেলে দিয়েছে। ঘরের শোভাই হয়ে গেছে অন্যরকম। ফ্যাশানেবল মানুষেরা ক্যাটকেটে ফ্লোরোসেন্ট বাতি পছন্দ করেন না বলেই মনে হয়। কোনও রহস্য নেই। সম্বরণ একা মানুষ অথচ খাবার টেবিলটা বিশাল। মনের শূন্যতা আয়োজনের বিশালতায় ভরে রেখেছে। ওর এই ফ্ল্যাট, বিশাল বাথরুম, বৃহৎ টেবিল, বিরাট খাট, সবকিছুই যেন বলতে চাইছে, কী হতে পারত, কী হয়নি। সব যেন শূন্যতারই মাপকাঠি।

ধবধবে সাদা টেবিল ক্লথের ওপর ঝকঝকে প্লেট, চকচকে কাঁটাচামচ, পল তোলা গেলাস। খাবার রেখে পীরু মিঞার লোক চলে গেছে। জাফরানি রঙের বিরিয়ানি থেকে আতরের গন্ধ উঠছে। কোলের কাছে পা মুড়ে মুরগির মুণ্ডহীন ছানা মসল্লম হয়ে পড়ে আছে। ভোরের ডাক আর ডাকা হল না। প্রশান্তর মনে হচ্ছিল সবই আছে তবু কীসের যেন অভাব। একটু চুড়ির শব্দ। এক জোড়া কোমল হাত। হালকা প্রসাধনের গন্ধ। একটু ফেমিনিন টাচ।

প্রশান্ত বললে, 'বড় বেশি আয়োজন। দু'জনে কি সামলানো যাবে!'

সম্বরণ বললে, 'আমার টেবিলটা যে বড়। তোর পেছনে যেমন অদৃশ্য দুটো চোখ, আমার সামনে তেমনি অসংখ্য মুখ। আমার অনেকে ছিল, এখন কেউ নেই। যারা নেই তাদের উদ্দেশে কিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে।'

নীরবে কিছুক্ষণ খাওয়া চলল। দরজার পরদায় ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলানো আছে। তারা নিজেদের মধ্যেই টুংটাং শব্দে কথা বলছে। প্রশান্তর মনে হল, ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। ওই দেখ দু'জনে খেতে বসেছে। একজনের নাম প্রশান্ত। আহা বেচারার মনে বড় কষ্ট। মেয়ে বড় হচ্ছে। লোকটার ভীষণ চিন্তা। কার হাতে গিয়ে পড়বে। আর ওই হল সম্বরণ। একটি স্ত্রীলোকের হাতে গিয়ে পড়েছিল। খেলিয়ে সরে পড়েছে। কেন এমন হয় গিন্নি?

প্রশান্ত বললে, 'মনটা এতদিনে থিতিয়েছে, এইবার একটা বিয়ে করলে বেশ হয়।'

'কার কথা বলছিস?'

'তোর কথা। এখন চলছে বেশ, শেষের দিকে বড় একা লাগবে।'

'শেষের কথা কী বলছিস? এখনই আমার ভীষণ একা লাগে। আজ তুই আছিস, তা না হলে ভাব তো। কণ্ঠস্বর বলতে রেকর্ড, টেপ। শব্দ বলতে ওই পরদার ঘণ্টার টুংটাং। তবু আর না। তা হলে একটা শের শোন :

যখন তাকে টাকা দিলুম
সে আমাকে সেলাম দিলে।
যখন তাকে ভালবাসা দিলুম
সে আমাকে লাথি দিলে ॥

আর একটা শোন :

যে দিতে চায় সে ফকির হয়।
যে নিতে চায় সে ধনী হয়।'

খাওয়া শেষ হয়ে এল। প্রশান্ত বললে, 'এসব ধুতে হবে তো?'

'ব্যবস্থা আছে। রান্নাঘরের সিঙ্কে ডিটারজেন্ট দিয়ে ফেলে রাখব। কাল সকালে একজন আসবে। সব সাফ করে দেবে।'

আকাশের কী অদ্ভুত রসিকতা! ফাটা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে। মুখ দেখলে মনে হয় বড় অন্যায় করে ফেলেছে। অভিসারে বেরিয়ে ধরা পড়ে গেছে। খাটে প্রশান্ত একপাশে কাত, সম্বরণ আর এক পাশে কাত। মাঝখানে অ্যাশট্রে। হালকা সুরে স্টিরিয়ো বাজছে। মেহেদী হাসানের ভরাট গলা, পাত্তা পাত্তা, বুটা বুটা।

রেণুকে নিয়ে সম্প্রতি যে সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রশান্তর মনে হল সম্বরণকে তার একটু আভাস দেয়। সম্বরণ কী করতে বলে! মেয়েদের ব্যাপারে প্রশান্তর চেয়ে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। বলি বলি করেও বলা হল না। আহা রে, গানে, নরম বিছানায় এমন একটা সুখ সুখ পরিবেশ তৈরি হয়েছে নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান শূন্য না হলে এই পেলব পরিবেশ কেউ নষ্ট করতে পারবে না। ও প্রসঙ্গ তোলা মানে মুহূর্তের বুকে ছুরি বসানো। পরে বলা যাবে। দেখাই যাক না আর কতদূর গড়ায়!

সম্বরণ সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'এবার তবে শোয়া যাক। রাত বেশ ভারী হয়েছে। গুড নাইট। রাতে কিছু প্রয়োজন হলে ডাকিস। পাশেই রইলুম।'

ঘর বেশ বড় হলে, ছাদ বেশ উঁচু হলে, ঋজু ঋজু জানালা থাকলে আলো নিভে গেলেও তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয় না। একটা আবছা স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ তৈরি হয়। প্রশান্তর ঘুম আসছে না। সম্বরণ বেশ আছে। সংসার যেন এক কারাগার। এক দুশ্চিন্তা যায় তো আর এক আসে! সম্বরণ কি সত্যিই ভাল আছে? এত মুক্তি কি ভাল! বন্ধন না থাকলে মানুষ বাঁচে কী করে! অসীমে মানুষের অবলম্বন কী? সংসার নিয়ে, সমস্যা নিয়ে, চিন্তা নিয়ে সময়টা বেশ কেটে যায়। বোঝাই যায় না কখন মৃত্যু এসে গেল। সম্বরণ যেন অসীম সমুদ্রে ভাসছে। চারিদিকে জল আর জল কিন্তু তৃষ্ণার জল এক বিন্দুও নেই। প্রশান্তকে যদি সম্বরণের জীবন দান করা হয় ভাল লাগবে না। তার স্ত্রী, মেয়ে, পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে অন্য কোনও জীবনের কথা ভাবতে পারে না। স্বভাবে একবার যা ধরে যায় সেইটাই নেশা হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করে মানুষ উতলা হয়। ভবিষ্যৎ মানুষ তৈরি করে না, নিয়ে আসে। কে কোন রাস্তায় চলবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। প্রশান্তর, শ্যামলীর, রেণুর, সম্বরণ, তার মায়ের। চলতে হবে, থেমে থাকলে চলবে না। তবে কোথায় পৌঁছোবে কেউ বলতে পারবে না।

শেষ রাতে প্রশান্ত স্বপ্ন দেখছিল, রেণুর বিয়ে হচ্ছে। লাল বেনারসি, মাথায় টোপর, দু'পাশ থেকে চুল নেমে এসে কপাল ঢেকেছে। মুখটা দেখাচ্ছে ঘামতেল মাখা দেবীর মতো। গলায় ফুলের মালা। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে রেণুকে। সময়টা ভোর। চারপাশে রুপালি আলো। একটা

সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রেণুর যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হল! জামাই কোথায়!

প্রশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। একটা উদ্বেগ নিয়ে বিছানায় উঠে বসল। সম্বরণ তখনও ঘুমোচ্ছে। একটা অসহায় ভঙ্গি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রেশমের মতো চুল। এমন একটা মানুষকে এই সময় কেউ ডেকে বলবে না, 'ওঠো, তোমার চা এনেছি।'

॥ তিন ॥

শ্যামলের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। বিছানায় পড়ে ছিল চিত হয়ে। কলকাতার আবহাওয়া কী ভীষণ গুমোট! রাঁচিতে ভোরের দিকে কী সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে! এখানে সবই অদ্ভুত। দু'-একটা পাখি ডাকছে। তাও যেন ডাকতে হয় তাই ডাকছে। নেহাত অনিচ্ছায়। থেমে থেমে ক্লান্ত সুরে।

নাঃ আর শুয়ে থাকার মানে হয় না। পিঠের দিকটা গরম হয়ে উঠেছে। এবার, ওঠো শিশু, মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। শ্যামল জিমন্যাস্টের কায়দায় তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। মেঝেতে পা রেখে বেশ ভাল লাগল। তবু একটু ঠান্ডার স্পর্শ পাওয়া গেল শরীরে।

দোতলার একানে একটা ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। সামনেই বারান্দা। বারান্দা ধরে এগোলেই দোতলার ছাদ। এখন ছাদ, পরে হয়তো ঘর উঠে যাবে। ছাদের চারপাশে ফুলগাছের টব। একটা জুঁই গাছ লতিয়ে লতিয়ে তিন তলার ছাদে উঠে গেছে।

শ্যামল ছাদে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গান গাইছে, কেন যামিনী না যেতে জাগালে না। দূরে টবে একটা সাদা গোলাপ ফুটেছে। কলকাতাতেও গোলাপ ফোটে? চারপাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। আকাশ পর্যন্ত চুরি হয়ে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া নীল চাঁদোয়ার মতো এপাশে ওপাশে ঝুলে ঝুলে রয়েছে। অনেক ওপর দিয়ে সূর্য কিরণের সড়ক চলে গেছে। নীচের দিকে কেবল তেজটাই নেমে আসছে। কাকুকে বলেছিল মাসখানেক থাকবে। থাকা যাবে কি? থেকে লাভটাই বা কী? বর্ষায় রাঁচি ভারী সুন্দর।

শ্যামল গান থামিয়ে কোমরের ব্যায়াম করতে শুরু করল। সামান্য জগিং করতে পারলে মন্দ হত না। উপায় নেই। ছাদ ভেঙে পড়ে যাবে। আশেপাশের বাড়ির জানালায় কৌতূহলী মুখ দেখা যাবে। এখানে মানুষের যেন কোনও আবরু নেই। পরদার খরচ কত বেড়ে গেছে? খাও না খাও দামি পরদা ঝোলাও। নইলে এ বাড়ি ও বাড়ি অন্দর মহল দেখা যাবে।

শ্যামল পেছন দিকে আর্চ হতে গিয়ে রেণুকে দেখে ফেলল। স্নান হয়ে গেছে। এলো চুল। হাতে ভিজে কাপড়। ছাদে বোধহয় মেলতে এসেছিল। শ্যামল মাথার ওপর থেকে হাত নামিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়াল। রেণু বললে, 'থামলে কেন? চালিয়ে যাও। বেশ হচ্ছিল তো।'

শ্যামল একগাল হেসে বললে, 'লজ্জা করছে। তুমি এসে না পড়লে বার পঞ্চাশ হত।'

'বেশ চলে যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে না, অত খাতিরে প্রয়োজন নেই। এত আগে চান করলে!'

'আজ জয় মঙ্গলবার।'

'ওরে বাব্বা, তোমার আবার জয় মঙ্গলবার আছে?'

'থাকবে না! মঙ্গলবার, শিবরাত্রি, ইতু। সব আছে।'

'কবে যাবে?'

'পুরোপুরি সায়েব না হলে যাবে না।'

'তোমার ওসবে বিশ্বাস আছে?'

'বিশ্বাস ফিশ্বাস জানি না। অনেক দিন হয়ে আসছে, তাই হচ্ছে।'

রেণু আলসেতে কোমর ঠেকিয়ে সামনে ঝুঁকে ঝেড়ে ঝেড়ে শাড়ি মেলতে লাগল। ব্লাউজ আর ভেতরের জামা কায়দা করে তারে দিতে হবে ক্লিপ এঁটে। একটার ওপর আর একটা। শ্যামল যেন ভেতরের জামাটা দেখে না ফেলে! দাদা হলেও পুরুষ মানুষ। শ্যামলের অবশ্য ওসব দিকে নজর নেই। ভাবে ভোলা মানুষ। অনেক দিন পরে এ বাড়িতে এল। এর আগে যেবার এসেছিল তখন অনেক ছোট ছিল। কিশোর। এখন যেমন লম্বা হয়েছে, স্বাস্থ্যও তেমনি ভাল হয়েছে। এক মাথা কোঁকড়া চুল, রং যেন ফেটে পড়ছে। হাসিটা কী সুন্দর? রেণু বাবার মুখে শুনেছে রাঁচিতে সব কিছুই নাকি ভাল হয়। বড় বড় পেঁপে, কপি, টোমাটো, নানা রকমের ফল। আবার পাগলাগারদটাও ওইখানে।

শ্যামল বললে, 'অত ঝুঁকছ কেন? যদি পড়ে যাও?'

'তুমি ধরবে।'

'তা হলে এখনই পা ধরে টেনে রাখি।'

শ্যামল সত্যি সত্যিই রেণুর পেছন দিকে উবু হয়ে বসে পায়ের গোছ দুটো ধরে ফেলল। রেণুর সমস্ত শরীরটা সিরসির করে উঠল। কী আশ্চর্য সরল ছেলে! রেণু তাড়াতাড়ি সামনে ঝোঁকা বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভীষণ ভয়ও পেয়ে গেছে। সর্বনাশ, পেছন থেকে যদি কেউ দেখে ফেলে! রেণু জানে, সে যখন ছাদে আসে, কি রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়ায় তখন জোড়া জোড়া চোখ তাকে অনুসরণ করতে থাকে। অনেক সময় চোখে চোখে ঠেকে যায়। রেণু বুঝতে পারে না ওইসব চোখ কী বলতে চায়, কী দেখতে চায়! সবচেয়ে বড় ভয় যদি মা দেখে ফেলে! রাঁচির সকলেই কি পাগল! রেণু আতঙ্কের গলায় বললে, 'এই কী হচ্ছে কী ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কেউ দেখে ফেলবে।'

'দেখে ফেলল তো ভারী বয়েই গেল।'

রেণু লম্ফঝম্প করে পা ছাড়িয়ে দূরে সরে গিয়ে বললে, 'নীচে নামা হবে না?'

'বাথরুম খালি হয়েছে?'

'বাথরুমের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক! তুমি তো বাইরে মুখ ধুয়ে চা খাবে।'

রেণু নীচে নেমে এল। বারান্দার একেবারে শেষ মাথায় ঠাকুমা পট্টবস্ত্র পরে জয় মঙ্গলবারের খিলি নিয়ে বসে আছে। বয়েসের ভারে মুখের চেহারা অদ্ভুত হয়ে গেছে; যেন আলুর পুতুলের মুখ হাতের মুঠোর চাপে ভেঙে তুবড়ে দিয়েছে। মা সামনে বসে আছে মাটিতে থেবড়ে। পাশে জলের গেলাস। ঠাকুমা বললেন, 'আয় মা রেণু, তোর জন্যে মা সেই কখন থেকে বসে আছে। তোর বাবা ওদিকে চা, চা, করে অস্থির হচ্ছে।'

মা বললে, 'তুই বড় নিড়বিড়ে। এখান থেকে বসে বসে দেখছি একটা শাড়ি শুকোতে দিচ্ছিস তো দিচ্ছিস। তুলছিস ঝাড়ছিস। শ্বশুরবাড়ি গেলে বকুনি খেয়ে খেয়ে মরবি। নে, এইখানে বোস।'

রেণু মায়ের পাশটিতে কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে বসে পড়ল।

বারান্দার অপর প্রান্তে প্রশান্ত একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে সকালের কাগজ দেখছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সংসারের এই একান্ত পারিবারিক দৃশ্যটি। বিভিন্ন বয়েসের তিনজন মহিলা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কেমন স্থির হয়ে বসে আছে। তিনজন পথিক। একজন মৃত্যুর সিংহ দরজার প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে। তোরণের পতাকা তার চোখে পড়ছে। কানে শুনতে পাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ। আর দু'জন পেছনে পেছনে চলেছে। এখনও অনেক দূর। তবু গতিটা বোঝা যায়। সকলের গলাতেই অদৃশ্য দড়ি বাঁধা। সময় সেই জল্লাদ। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে হাঁড়িকাঠের দিকে। শ্যামলীরও আর সে চেহারা নেই। চামড়ার জৌলুস কমে এসেছে। চোখে মুখে ক্লান্তি। শরীরের বাঁধন আলগা

হয়ে এসেছে। কেমন বসে আছে তিনজনে। দাবার ছকে বোড়ের মতো। যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। মাকে দেখলে প্রশান্তর বড় কষ্ট হয়। সব থেকেও যেন কিছু নেই। বাড়ি ছাড়ার আগে ভাড়াটের মনের অবস্থা। সব নামানো হয়ে গেছে, বাঁধাছাঁদা শেষ। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। ঠাকুর ঘরে দাঁড়িয়ে ছেড়ে যাবার আগে অদৃশ্য গৃহদেবতার উদ্দেশে শেষ নমস্কার। এতকাল কাটিয়ে গেলুম, আবার কোথায় কে জানে!

ওই আমার মা। শ্যামলী আমার মেয়ের মা। রেণুও মা হবে। মেয়েদের মা না হয়ে উপায় নেই। তবে কে রেণুকে মা করবে? রেণুর সন্তানেরা কি রেণুকে অতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে যতদূর পর্যন্ত তার মাকে ছেলেরা নিয়ে এসেছে! প্রশান্তর মায়ের জীবনের পুরোটাই সুখের স্মৃতি নয়। মৃত্যু এসেছে, দুঃখ এসেছে, উপেক্ষা এসেছে। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়েছে। অনেক তিক্ততা সহ্য করতে হয়েছে। অনেক অপ্রিয় জিনিস মেনে নিতে হয়েছে। এখন এই বয়েসে আর কোনও আক্ষেপ নেই। কোনও চাওয়া নেই, কোনও কিছু পাওয়ার উল্লাস নেই। আছি, এইটাই তো বেশ। কখনও রাঁচিতে, কখনও কাশীতে, কখনও এখানে। ছেলেরা আর তেমন করে মায়ের থাকা আর না থাকা বুঝতে পারে না। জীবনের শেষ পথটুকু বড় নির্জন।

একঝলক দমকা বাতাসের মতো শ্যামল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। শ্যামলকে প্রশান্ত ভীষণ ভালবাসে। নিজের ছেলে নেই। সে আশাও আর নেই। রেণুর জন্মের পরই ডাক্তারি গোলযোগে শ্যামলীর সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। শ্যামল কোনও দিকে না তাকিয়ে ব্রতকথার আসরে রেণুর পাশে গিয়ে থেবড়ে বসে পড়ল। রেণুদের দুব্বো ঘাস, যব, চাল, ফুল বেলপাতা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কলাপাতার টুকরো পড়ে আছে কাঠের বারকোশের ওপর। খিলি মোড়া ছিল। প্রশান্তর মা প্রভাদেবী ব্রতকথা পড়ে শোনাচ্ছেন। পুরোটা শোনার সময় নেই। বাছা বাছা অংশ পড়ে প্রথা রক্ষা। ধর্মে আজকাল আর তেমন আচার নিষ্ঠা নেই। ধর্ম এখন মনে। আধুনিক, আমেরিকান। মেডিটেশান, একটু জপ, দু'-একটা আসন, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ। প্রভাবতী সুর করে করে পড়ছেন:

জয়দেব জিজ্ঞেস করলে, ও পুজো করলে কী হয় বলো তো?

জয়াবতী বললে, সেই প্রথম দিনের কথা ভুলে গেছ? বলেছিলুম যে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, হারালে ফিরে পায়, মরে গেলে বেঁচে ওঠে। সেই জয়াবতী আর জয়দেবের কাহিনি। বিয়ের পর জয়াবতী চলেছে শ্বশুরবাড়ি।

প্রশান্তর ভারী ভাল লাগে এই ব্রতকথা শুনতে। জীবন যদি সত্যিই ওইরকম হত। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপাদৃষ্টিতে একটি ছেলে আর মেয়ের সংসার যাত্রা। ব্রতের শেষ অংশটা কানে আসছে .

তারপর এক শুভদিনে স্বয়ং ভগবান স্বর্গ থেকে পুষ্পক রথ পাঠিয়ে দিলেন। জয়দেব ও জয়াবতী সেই রথে চড়ে জীবন্ত অবস্থায় স্বর্গে চলে গেল। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

ঠাকুমা বই মুড়তেই সকলেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। শ্যামল প্রণাম সেরেই বললে 'আমার প্রসাদ?'

ঠাকুমা বললে, 'তোর তো বাসি কাপড়।'

'বাঃ, তা বলে প্রসাদ খাওয়া যাবে না। আচ্ছা তোমার বিধান ঠাকুমা!'

রেণু বললে, 'হাঁ করো, তোমার মুখে আপাতত একটা বাতাসা, কলার টুকরো আর ভিজে মটরের দানা ফেলে দিই। বাবার পাশে বসে বসে চিবোও। তারপর চা আসছে।'

'তাই দাও, বাকিটা রেখে দিয়ো কিন্তু। পরে চান করে যেন পাই।'

শ্যামল হাঁ করতেই রেণু বললে, 'বাব্বা, এ যেন কুমিরের হাঁ।'

কলিং বেল বেজে উঠল। সাতসকালে আবার কে এল? প্রশান্ত কাগজ রেখে দরজা খুলতেই

উত্তেজিত শৈলেনবাবু ঘরে ঢুকে পড়লেন, 'এর একটা বিহিত করা উচিত প্রশান্ত। এভাবে চলতে পারে না।'

প্রশান্ত বললে, 'আগে আপনি বসুন। চা খাবেন তো?'

শৈলেনবাবু চেয়ারে ধপাস করে বসে বললেন, 'আর চা। এভরিথিং ইজ বিস্বাদ নাও। ওই খেতে হয় খাওয়া।'

বসেই শ্যামলকে দেখতে পেয়েছেন। 'এই যে ইয়াংম্যান, তোমরা কি সব ঘুমিয়ে পড়েছ?'

রেণু ফিসফিস করে বললে, 'পালিয়ে এসো শ্যামলদা।'

প্রশান্ত বললে, 'অত রেগে আছেন কেন শৈলেনদা?'

'রাগব না? তোমরা সব সেলফ সেন্টারড, ভীরু, উদাসীন, তোমাদের জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আমার হাতে পাওয়ার থাকলে তোমাদের দাঁড় করিয়ে গুলি করতুম। হোয়ার ইজ ইয়োর টি!'

'আসছে। ওই যে এসেছে।'

শ্যামলী চা আর বিস্কুট দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শৈলেনদা বললেন,

'এই যে বউমা। নো বিসকিট। সিম্পল টি। ওটা একটা লাকসারি। ওই পয়সায় ছোলা খেলে কাজ হয় বেশি। বাঙালির আবার আদা, ছোলা, আখের গুড় খাওয়া অভ্যাস করা উচিত।' শ্যামলী মৃদু হেসে বললে, 'আজকের মতো খেয়ে নিন।'

'বলছ? বেশ, আজকের মতো নীতিভ্রষ্ট হওয়া যাক। তোমার কথা তো আর ফেলতে পারি না। চললে কোথায়?'

'রান্নাবান্না রয়েছে।'

'আর খেয়ে কী হবে?'

শৈলেনদা ফড়াক করে চায়ে চুমুক মেরে কথাটা শেষ করলেন, 'সব তুলে দাও। তুলে দিয়ে কোমর বেঁধে ঘর সামলাও। মেয়ে তো বড় হচ্ছে।'

শ্যামলী ভয় পেয়ে গেল। আবার রেণু কিছু করে বসল নাকি? রেণু কী করছে না করছে সে খবর তো পাড়ার বউ কিংবা দিদিমা, ঠাকুমাদের কাছ থেকে আসে। শৈলেনদা আবার কী দেখলেন কে জানে। এই মানুষটির তো আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো অভ্যাস! একবার ইলেকশানেও দাঁড়িয়েছিলেন। মাত্র তিরিশটা ভোট পেয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে বুঝে গেছেন, এ জীবনে এম এল এ হবার মুরোদ তাঁর নেই। বড়জোর সমাজসেবক হতে পারেন। তাও কীরকম সমাজ সেবা? বাড়ি বাড়ি গিয়ে হেঁকে ডেকে বলা, সমাজ গেল, সংসার গেল, সব গেল। জাগো বাঙালি বলে নিজে শুয়ে পড়া। প্রকৃত সমাজ সেবায় যে অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্ট।

প্রশান্ত বললে, 'আজ আপনার এত উত্তেজনার কারণটা কী?'

'সেই কথাই তো সব ছেড়ে তোমাকে বলতে এলুম। তার আগে বউমা একটা পান খাওয়াতে পারো? দেশের জন্যে সব ছেড়েছি ওই একটা অভ্যাসই রয়ে গেছে। রাতের ঘুমটা পর্যন্ত গেছে। দেশের কথা ভাবলে হাইপারটেনশান হয়ে যায়।'

বাড়িতে কেউ পান খায় না। শ্যামলী শ্যামলকে বললে, 'মোড়ের দোকান থেকে এক খিলি পান এনে দিবি বাবা।' শ্যামল পান কিনতে বেরিয়েছে। মোড়ের মাথায় একটা বাড়ির রকে সকাল থেকেই একপাল ছেলের আড্ডা জমে। বাড়ির মালিক স্থানীয় ব্যবসায়ী। নিজে সৎ না হলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহসটাও চলে যায়। এখন অসৎ মানুষরাই ঐশ্বর্যশালী। আর ঐশ্বর্যের ধর্মই হল অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া।

শ্যামল পান কিনতে কিনতে শুনতে পেল রকের গুলতানি থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এই যে নবকার্ত্তিক কেমন চলছে? কত দূর এগোল? মধুটধু চুষেছ?'

শ্যামল শুনল। তেমন রাগ হল না। মুখে একটা হাসি খেলে গেল। সারাদিন যারা রাস্তায়, জীবনে

যারা স্বাভাবিক ভাবে কিছুই পাবে না, সবই যাদের ছিনিয়ে নিতে হয়, আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া যাদের আর কোনও কাজের সুযোগই দেওয়া হল না, তাদের মুখ থেকে অন্য আর কী কথা বেরোতে পারে!

শ্যামল খুব ধীরে সুস্থে পানটা নিল। অন্য কেউ হলে এই ধরনের নোংরা মন্তব্য শুনে ভুরু কোঁচকাত, অস্বস্তিতে জড়সড় হয়ে যেত। রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যেত। শ্যামল পান হাতে খুবই হালকা চলনে রকের সেই জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রতিপক্ষরা টানটান হয়ে আছে। মারপিটের জন্যে প্রস্তুত। রকের দলনেতার নাম পলটু। শ্যামল জানে। শ্যামল খুব মোলায়েম গলায় বললে, 'পলটুবাবু ক'টা বাজল?'

পলটু অবাক হয়ে বললে, 'সাড়ে সাত।'

'সাড়ে সাত? নাঃ আজ আর হল না।'

শ্যামল ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগোল। পেছন থেকে সমস্বরে সকলে বলে উঠল, 'কী হল না গুরু?'

শ্যামল চিৎকার করে বললে, 'পরে বলব গুরু।'

ছেলেরা একটু হতভম্ব হয়ে গেল। তারা আশা করেছিল সকালেই বেশ একটা ঝাড়পিঠ হবে। তা আর হল না। আজকাল মারামারি, হাতাহাতি করার একক লোক একেবারে নেই বললেই চলে। যা হয় দলে দলে, দূর থেকে বোমবাজি, ইটপাটকেল, অ্যাসিড বাল্‌ব ছোড়াছুড়ি। ঘিসুম ঘিসুম ঘুষোঘুষি যা হয় সব হিন্দি সিনেমার পরদায়। পলটু বললে,

'কী বলে গেল বল তো? কিছু বোঝা গেল না। পরে ঝাড় দেবে নাকি?'

প্রাচীনকালে রাজাদের রাজসভায় অনেক ভাঁড় আর সভাসদ থাকত। রকের রাজা পলটুরও নবরত্ন সভা। তারা মাথা নাড়তে লাগল। শ্যামল যেন একটা ধাঁধা দিয়ে গেল।

শৈলেনবাবু পান মুখে পুরে একটু ধাতস্থ হলেন। পানের রসে সমাজ সংসারের সমস্যা যেন একটু ভিজে ভিজে হয়ে গেল। উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে পেচাত করে এক মুখ পানের পিক ফেলে এলেন। মুখ খালি, এইবার কিছু বলবেন। শ্যামলকে বললেন, 'তুমি ভেতরে যাও। এসব কথা তোমার না শোনাই ভাল। বউমাকে একবার আসতে বলো।'

শ্যামল ভেতরে এসে বললে, 'কাকিমা, তুমি বাইরের ঘরে একবার যাও। ভীষণ ব্যাপার।'

শ্যামলী বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। যেতেই হবে। কোনও কোনও মানুষকে ইচ্ছে থাকলেও চটানো যাবে না। কোনও কোনও দেবতার মতো। ভাল না করতে পারলেও খারাপ করে ছেড়ে দেবেন। শ্যামলী রেণুকে বললে, 'ডালটা প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। তুই একটু নেড়ে জল ঢেলে দে আমি শুনে আসি।'

প্রশান্ত এমনভাবে বসে আছে যেন বেগ এসে গেছে অথচ কোথাও যাবার উপায় নেই।

শৈলেনবাবু বললেন, 'ও বউমা, এসে গেছ? তুমি বড় ছটফটে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারো না। নাও বোসো। কাল রাতে পাড়ায় কী হয়েছে জানো?'

শ্যামলী একটা মোড়ায় বসতে বসতে বললে, 'সর্বক্ষণই তো কিছু না কিছু হচ্ছে, কে খবর রাখে বলুন। মাথা যত কম ঘামানো যায় ততই ভাল।'

'এ খবরটা তোমার রাখা উচিত। পাশের ঘরে আগুন লাগলে নিজের ঘরেও লাগতে পারে।'

প্রশান্ত মনে মনে বললে, মরেছে। এই উপদেশ আর নীতি বাক্য, শুনে শুনে কান পচে গেছে। শৈলেনদার যত বয়েস বাড়ছে সময় জ্ঞান তত কমে যাচ্ছে। মহিলা শ্রোতা পেলে তো কথাই নেই। সভার প্রধান অতিথির মতো ইনিয়ে বিনিয়ে খেলিয়ে খুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালাতে থাকবেন। প্রশান্ত বললে, 'আমাকে বেরোতে হবে শৈলেনদা। আমার বাজার বাকি, দাড়ি কামানো বাকি।'

'আরে রাখো তোমার বাজার, দাড়ি। কালকের ঘটনা শুনলে তুমি বুদ্ধদেবের মতো সংসার ত্যাগ করার কথা ভাববে। আলু; পটল, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ তোমার মাথায় উঠবে। দাড়ি নেমে আসবে বুকে। প্রফুল্লকে চেনো?'

'কোন প্রফুল্ল?'

'আঃ, তোমরা দেখি দ্যাবাদেবী নিজেদের ছাড়া কাউকেই চেনো না। প্রফুল্ল, আমাদের প্রফুল্ল, পোস্টাপিসে চাকরি করে। কতবার তোমাদের বেডিয়ো লাইসেন্স রিনিউ করিয়ে এনে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি।'

'যাক পেরেছ! তোমরা তো কাজের সময় ছাড়া লোক চিনতে পারো না দেখাই গেল। সেই প্রফুল্লর মেয়েকে নিয়ে কাল রাতে কেলেঙ্কারির একশেষ। প্রফুল্ল বেচারা নিরীহ মানুষ। সাত চড়েও মুখ দিয়ে রা বেরোয় না। বাড়ি বাড়ি হনহন করে ডাক বিলি করে। সেই বাপের মেয়ের কাণ্ড দেখো! প্রফুল্লর বউও সংসার সংসার করে ব্যতিব্যস্ত। কম আয়, বাড়তি রোজগারের জন্যে এটা করে ওটা করে। কখনও ধূপকাঠি, কখনও সায়া, ব্লাউজ সেলাই। ঘরে বয়স্থা মেয়ে। আজ বাদে কাল বিয়ে দিতে হবে। সেই মেয়ের কাণ্ড দেখো?'

প্রশান্ত বললে, 'কী করেছে? আত্মহত্যা?'

'আত্মহত্যা করলে তো বাপ মা বেঁচে যেত। উলটোটা করেছে। বাপ মা'র মুখে আড়াই পোঁচ চুনকালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। পাড়ায় আর-একটা বেশ্যা তৈরি হল।'

শ্যামলী মনে মনে চমকে উঠল। শৈলেনদার মুখের কোনও আগঢাক নেই।

'ওই জন্যেই বলি প্রশান্ত, ঘরের বয়স্থা মেয়ে রাখতে নেই। এ হল হাংরি জেনারেশন। মেয়ে বড় হলে আমাদের লালীর অবস্থা। লালীকে চেনো?'

'সে আবার কে?'

'তা বটে? যারা মানুষ চেনে না তারা চিনবে কুকুর! লালী হল আমাদের পাড়ার একটা কুকুর। বিচ। লালী যেই বড় হল আর দেখে কে? গোটা ছয়েক হোঁতকা কুকুর তাকে না দেয় বসতে, না দেয় শুতে, না দেয় ঘুমোতে। অনবরত পেছন পেছন ঘুরছে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, কামড়াকামড়ি রক্তারক্তি। পাড়ায় টেকে কার বাপের সাধ্যি। মানুষের অবস্থা কুকুরের চেয়েও খারাপ প্রশান্ত। তা না হলে প্রফুল্লর মেয়ের আজ এই হাল হয়।'

রেণু এই সময় মাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল ডালের পর কী চড়বে? শৈলেনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'এখন না! এখন না। এখন কিছু চড়বে না।'

রেণু হাসি হাসি মুখে মায়ের দিকে তাকাল। শ্যামলী বললে, 'তুই যা হয় একটা কিছু চাপিয়ে দে।'

প্রশান্ত করুণ কণ্ঠে বললে, 'শৈলেনদা, এরপর বাজার গেলে আর ভাল মাছ পাব না।'

'একদিন মাছ না খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না প্রশান্ত। তা ছাড়া খরচ কমাও। ঘরে যার অত বড় মেয়ে তার আবার রোজ মাছ খাওয়া কী?'

কথা শুনে প্রশান্ত হাত-পা ছড়িয়ে আবার এসে পড়ল। এ তো মহাজ্বালা হল দেখছি! শৈলেনবাবু শুরু করলেন, 'প্রফুল্লর এই মেয়েটি দেখতে শুনতে খুব খারাপ নয়। বেশ চটক আছে। প্রফুল্ল আবার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে। মেয়েকে গান শিখিয়েছে, একটু-আধটু নাচতেও পারে। মাঝে মধ্যে শখের থিয়েটারে অভিনয় করে। থিয়েটার কী জিনিস তুমি ভালই জানো প্রশান্ত। সংস্কৃতির পরদার আড়ালে কেলোর কীর্তি। মেয়ে বারমুখো হয়ে গেল। আর জানবে বাপ যদি বুলডগের মতো না হয় তার বরাতে অসীম দুঃখ।'

শ্যামলী সাহস করে বললে, 'কালকের ঘটনাটা এবার যদি বলেন, বড় উপকার হয়।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হলে চলে? ঘটনার পেছনের ঘটনাটা শুনবে না? মেয়ে উড়তে লাগল, বাপ মা দাঁত বের করে বসে বসে দেখতে লাগল। মেয়ে আমার গাইয়ে হবে, নাচিয়ে হবে,

হেমামালিনী হবে। ব্যস কাল রাতে ছেঁড়া মালিনী হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। প্রফুল্ল আজ সকালে এসে আমার কাছে নাকে কাঁদছে, দু'বোতল রক্ত কোথায় পাই শৈলেনদা।'

শ্যামলী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে কী?'

'ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। আজকাল ছেলেরা তো ফেরোসাস। আগে ব্যর্থ প্রেমিক আত্মহত্যা করত। এখন তারা প্রেমিকাকে হত্যা করার জন্যে তেড়ে যায়।'

প্রশান্ত বললে, 'পুলিশ ধরেছে কাউকে?'

'কাকে ধরবে? তুমিও যেমন? পুলিশের পলিসি হল, নিজের ম্যাও নিজে সামলাও। আমার কথা হল, ঘর সামলাও, পাড়া সামলাও। আমাদের পাড়ায় এই যে ক্লাবটি হয়েছে, ওটাকে যেমন করে হোক ওঠাতে হবে। তিন মাস অন্তর থিয়েটার, এর জন্মদিন, তার জন্মদিনের নাম করে ঘর থেকে টেনে টেনে মেয়ে বের করে নিয়ে যাবে, তা হবে না। আর ওই মোড়ের আড্ডা! তুমি জানো, সন্ধেবেলা ওই গুলতানিতে আজকাল মেয়েরাও গিয়ে বসছে। ওরা কোন ঘরের মেয়ে? এক শ্রেণির অশিক্ষিত লোকের হাতে আজকাল খুব কাঁচা পয়সা এসেছে। সিমেন্ট ব্ল্যাক, লোহা ব্ল্যাক, চোরা কারবারের পয়সা। তারা সব ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। আমাদের রাজু মিস্ত্রির বউয়ের গায়ে আমার তোমার বউয়ের চেয়ে বেশি গয়না। বনেদি পরিবার সব চুপসে গেছে। এদের ছেলে আর মেয়েরা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। জিনের প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে মেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে। এই কালচারকে রুখতে হবে। সোশ্যালিজম মানে কুত্তাইজম নয়। এসো আমরা সবাই মিলে দরখাস্ত করে পাড়া থেকে এইসব নুইসেন্স হাটাই। যে সব ফ্যামিলি ছেলে আর মেয়েকে রাস্তায় বেলেল্লাপনা করার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে তাদের বেশ করে কড়কে দেওয়া হোক। একসময় কলকাতা থেকে যেমন খাটাল হাটাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তেমনি এইসব পরিবারকে হাটাবার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হোক। এই একটা কাজ আমি যদি তোমাদের সহযোগিতায় করে যেতে পারি তা হলে জানব আমার জীবন সার্থক। সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। আমি একটা ফ্লপ পলিটিশিয়ান, সোশ্যাল ওয়ার্কার, বিজনেসম্যান, ফ্যামিলিম্যান। আমি জানি, তোমরা আমাকে দেখলে বিরক্ত হও, ব্যঙ্গ করো, পাগল বলো। সব জানি। আমার একার ক্ষমতায় কিছুই করতে পারব না। তবু মাঝে মাঝে খেপে যাই। কেন এমন হবে? কেন মানুষ মানুষের মতো হবে না। বউমা সব কিছুই বড় দ্রুত পালটাচ্ছে। সাবধান।'

শৈলেনবাবু যেমন এসেছিলেন ঝড়ের বেগে চলেও গেলেন তেমনি ঝড়ের বেগে।

।। চার ।।

শম্পার বাবা অতনু একটু আপস্টার্ট ধরনের। স্ত্রী মালবিকাও, যেমন সিপাহি তেমন ঘোড়া। অতনু যদি বলে, পোস্ত, ও আমরা জীবনে স্পর্শ করিনি অমনি মালবিকা বলবে, আমার বাবা কেউ পোস্ত খায় শুনলে তার সঙ্গে ঘেন্নায় কথা বন্ধ করে দিতেন। বলতেন, ওটা তো গেঁইয়া, কথা বলব কী? খোঁজ নিয়ে দেখো, ওর বউ মাথায় জবজবে করে ফুলেল তেল মাখে, চিটে মাথার বালিশে বর্ষাকালে সাদা সাদা ফাঙ্গাস ফুটে ওঠে। কোথাও বেড়াতে যাবার সময় ঘাড়ে আর মুখে সাদা করে পাউডার মাখে। নিশ্চয় 'স'-এর দোষও আছে। সামবাজারের সসিবাবু।

অতনু যদি বলে, বাসে ট্রামের ভিড়ে উঠতে পারি না বলে আজকাল ট্যাক্সি খরচ ভীষণ বেড়ে গেছে। মালবিকা অমনি বলবে, গাড়িটা এবার কিনে ফেলো। এত করে ড্রাইভিং শিখলে। অতনু অমনি বলবে, তোমাকে আগেই বলেছি দিশি মাল আমি কিনব না। ধান্দায় আছি যদি একটা বিলিতি পাই। ঝপ করে কিনে ফেলব।

এই অতনুই দোকানে চা কিনতে গিয়ে বলে, কত টাকা দিলে নাকের কাছে নিয়ে গেলে একটু গন্ধ পাওয়া যাবে মশাই। ফ্লেভারঅলা চা না হলে আমার বউ আবার চায়ের কাপ টান মেরে ফেলে দেয়। মেসোমশাইয়ের চা-বাগান ছিল তো। দূর সম্পর্কের কোনও এক মেসো কয়েক বছর উত্তর বাংলার চা-বাগানে ম্যানেজারি করেছিলেন। তাইতেই মালবিকার এই অবস্থা। চায়ের দোকানের মালিক বলবেন, ফ্লেভারের গ্যারান্টি মশাই আজকাল দেওয়া শক্ত। অতনু সঙ্গে সঙ্গে বলবে, প্রাইস ইজ নো ফ্যাক্টার, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ, পঁয়ষট্টি, অ্যানি প্রাইস। সব শেষে তিরিশ টাকার ফ্যানিংস নিয়ে বিদায় হল।

সেই শম্পার বাবা এখন একটি আরাম চেয়ারে বসে আছে। কাল দুপুরে চোখে কনজানকটিভাইটিসের আক্রমণ হয়েছে। একটু লম্বাটে মুখে কালো চশমা। চুল এলোমেলো। সামনের দিকটায় টাক পড়ে আসছে। পরনের পাজামা বিছানায় গড়াগড়ির ফলে লাট খেয়ে গেছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। জায়গায় জায়গায় শরীরের চুল বেরিয়ে আছে। চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না বলে জানালা বন্ধ। পাখা চলছে।

মালবিকার স্নান সারা হয়েছে। গায়ে ব্লাউজের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণ। হাতা নেই। কাঁধ থেকে ওপর বাহু মাংসর দোকানের ছাল ছাড়ানো আগলি রাঙের মতো দু'পাশে ঝুলছে। পাতলা ছাপা শাড়ি। পেছন দিকে কোমরের কাছে হলদে সায়ার অংশ ওপর দিকে উঠে আছে। মালবিকা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ঘাড়ে গলায় পাউডার মাখছে। পাখার হাওয়ায় রেণু রেণু পাউডারের গুঁড়ো উড়ছে। ঘরের চেহারা খুবই এলোমেলো। এখনও কোনও গোছগাছ হয়নি। মালবিকার আজ তেমন তাড়া নেই। অতনু বেরোবে না। মালবিকা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখে পাউডার ঘষতে ঘষতে বললে, 'ছেলেটা খুব ভাল। শম্পার সঙ্গে দারুণ মানাবে। সুন্দর চেহারা। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

অতনু বললে, 'দেখো যদি খেলিয়ে তুলতে পারো? আমি তোমাকে বলেছি মেয়ের বিয়ে আমি বিনা পয়সায় দোব। ও তিরিশ হাজার, চল্লিশ হাজার, ওসবের মধ্যে আমি নেই। মেয়েরা এখন নিজেরাই ছেলে ধরবে, খেলিয়ে ঘরে তুলবে। যুগ পালটাচ্ছে। ছেলেটি যখন ভাল, মেয়েকে লেলিয়ে দাও।' মালবিকা আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আহা কী কথার ছিরি?'

'আমি বাপু প্র্যাক্টিক্যাল মানুষ, লোক চরিয়ে খাই। মেয়ে বড় হলে তাকে ঘরে রাখতে পারবে না, ছেড়ে দিতেই হবে। ছেলেদের মেয়ে চাই, মেয়েদের ছেলে চাই। আমরা, অভিভাবকরা হলুম দালাল। দালালদের দালালি দিতে আমি নারাজ। তোমরা নিজেরা দেখে শুনে বিয়ে করো। সুখী, অসুখী অন্য ব্যাপার। দেখে শুনে দিলেও যা হবে, না দিলেও তাই হবে। পিয়োর লাক।'

মালবিকা স্বামীর দিকে ঘুরে বসে বললে, 'শম্পার খুব পছন্দ হয়েছে। রেণুদের বাড়ি দিন তিনেক কথা বলেই মেয়ে তোমার কাত।'

'কার মেয়ে দেখতে হবে তো?'

'তার মানে?'

'মানে আমাদেরই মেয়ে তো।'

'ছেলেটা রাঁচিতে থেকেই বিপদ করেছে। এখানে থাকলে শম্পা ঠিক কাবু করে ফেলত। দেখেছি তো, ও ছেলেদের খুব তাড়াতাড়ি পটিয়ে ফেলতে পারে। ওর জন্যেই আমার এখন ফাইফরমাশ খাটার ছেলের অভাব হয় না। প্রথম দিনেই লাইন দিয়ে সিনেমার টিকিট এনে দিচ্ছে। কেরোসিন এনে দিচ্ছে। গ্যাসের কথা বলে আসছে। ট্যাক্সি ধরে এনে দিচ্ছে। রেশনে সরু চাল এল কিনা, খবর এনে দিচ্ছে। সুখের আর শেষ নেই।'

'ওই জন্যে পুরাকালে পঞ্চস্বামীর প্রথা ছিল, কী বলো মালু?'

'কথাটা একটু অসভ্য হলেও মন্দ বলোনি তুমি। দ্রৌপদীর কত সুবিধে ছিল বলো তো? পাঁচ-পাঁচটা বীর স্বামী!'

'তোমার যেমন কাজের লোকের অভাব নেই, আমার তেমনি খোঁজার খবর নেবার লোকের সংখ্যাও খুব বেড়ে গেছে। আজকাল রাস্তায় বেরিয়ে দু'কদম হাঁটতে না হাঁটতেই প্রশ্ন, মেসোমশাই কেমন আছেন? কোথায় চললেন? সবই ওই মাসতুতো বোনের কল্যাণে। সবই বুঝতে পারি গো। সেই একটা গান ছিল না? এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

মালবিকা ওপর দিকে দু'হাত তুলে মাথার খোঁপা ঠিক করতে করতে বললে, 'মাঝে মাঝে বড় ভয় হয়। ওই প্রফুল্লবাবুর মেয়েটার কী হল দেখলে তো। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পোড়ার ভয় থাকে।'

'তুমি গেলে প্রফুল্লর সঙ্গে তুলনা করতে? ওসব হল বস্তির লোফারদের ব্যাপার। ওই ক্লাসের ছেলেরা ছুরি চালায়। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা ঘুমের বড়ি খায়। ক্লিওপেট্রা ইজ ক্লিওপেট্রা।'

বিশাল এক ম্যাক্সি পরে শম্পা ঘরে এসে ঢুকল, 'মা, আমি একবার রেণুদের বাড়ি যাব?'

'সাতসকালে?'

'শ্যামলদা কয়েকটা রেকর্ড চেয়েছিল।'

'যা দিয়ে আয়। আর হ্যাঁ, তোরা একদিন ওকে নিয়ে সিনেমা দেখে আয় না। বেচারা এখানে এসে কোথাও একদিনের জন্যে যেতে পেলে না!' শম্পা চোখ বড় বড় করে বললে, 'বাব্বা, সিনেমার কথা কে বলবে? রেণুর মা যা স্ট্রিকট!'

'সিনেমায় যাবে শ্যামল, রেণুর মা'র সেখানে নাক গলাবার কী আছে? আঃ হাঃ মা'র চেয়ে মাসির দরদ বেশি। ছেলেমেয়েকে কত ঘরে বেঁধে রাখতে পারে একবার দেখব? গাঁইয়া মেয়েছেলে। যেমন সাজ পোশাক, তেমনি কথাবার্তার ছিরি। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার কত আর ভাল হবে!'

শম্পা বললে, 'প্রাইমারি নয় গো মা, হাই স্কুল।'

'রাখ রাখ বাংলা স্কুল আর প্রাইমারি স্কুলে কোনও তফাত নেই।'

শম্পা আসি বলে বেরিয়ে গেল। অতনুর মনে হল, কয়েকটা সাবেক কালের মন-অলা লোকের জন্যে দেশটা কিছুতেই তেমন এগোতে পারছে না। আমেরিকা হব হব করেও হচ্ছে না। পার্ক স্ট্রিট অবদি এসে আটকে গেছে। এ দিকে যেটুকু এসেছে নাটকে। তাও সেই সাবেক কাহিনিতে একটু ক্যাবারে। এ তল্লাটের বাড়িতে বাড়িতে গেলে এখনও সেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জানোয়ারের মতো জিজ্ঞেস করবে, চা খাবেন? আরে ইডিয়েট, সভ্য মানুষ চা খায় সকালে, দুধ ছাড়া, লেবু দিয়ে। সন্ধেবেলা বাড়িতে ভদ্রলোক এলে ড্রিঙ্কস অফার করতে হয়, বলতে হয়, হুইস্কি, অর রাম, অর জিন, নিদেন বিয়ার। ম্যাগপি কাট ব্লাউজ তো এল এই সে দিন। মালবিকা এ অঞ্চলে যখন সাউথ থেকে প্রথম এল, তখন পাড়ার কাকিমা, জ্যাঠাইমারা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁ বউমা, তুমি ভেতরের জামা পরে ঘুরছ? ওপরের জামা পরবে না? মালবিকা হেসে বলত, এইটাই তো ওপরের জামা! একটা ভেতরের জামার দাম বিয়াল্লিশ টাকা শুনলে তো ভিরমি যেত। চুলে চুলে শ্যাম্পু সবে আসতে শুরু করেছে। গেঞ্জি, জিনস এখনও বহু দূরে। ডেটিংস, ফ্রি সেক্স, নেকিং আসবেই না হয়তো। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ একটা-দুটো লুকিয়ে চুরিয়ে হচ্ছে। বাড়িতে মেনে নিলে তখন আবার আর একবার হচ্ছে, পিঁড়েতে বসে, টোপর মোপর পরে। এই মধ্যযুগ কবে কাটবে?

শম্পা যখন রেণুদের বাড়িতে এল রেণু তখন বৃদ্ধ শিক্ষক মশাইয়ের কাছে সবে পড়তে বসেছে। প্রশান্ত দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত। শ্যামলী রান্নাঘরে। শ্যামল প্রশান্তর জুতো পালিশ করছে। প্রশান্তর ঘোরতর আপত্তি, শ্যামলীর করুণ আবেদন কোনও কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। 'তোমার জুতো তোমার ভাইপো পালিশ করে দিলে তোমার সম্মানের মহাভারত কী অশুদ্ধ হয়ে যাবে!' জুতো বুরুশ আর বকবক দুটো একই সঙ্গে চলেছে,

'বুঝলে কাকু, জুতো পালিশের বেশ একটা নেশা আছে গো। চকচকে, আরও চকচকে। তবে যাই বলো বাপু তোমার চামড়াটা তেমন সুবিধের নয়।'

'আমার চামড়া মানে। বল, আমার জুতোর চামড়া।'

'ওই হল, কোথা থেকে কিনেছিলে, থার্ড ক্লাস মাল?'

'হ্যাঁ রে থার্ড ক্লাস, দেড়শো টাকা দাম।'

'সে তোমার যে দামই হোক, এ ব্যাটা জীবৎকালে মোষ ছিল। কালির শ্রাদ্ধ হল, নড়া ব্যথা হয়ে গেল তবু জেল্লা হল না।'

'ছেড়ে দে না বাপু, ওই যা হয়েছে জুতোর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য।'

শম্পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। ম্যাকসি ছেড়ে শাড়ি পরে এসেছে। শ্যামল যেন ছেলেমানুষ! এমন সরল কথাবার্তা! শম্পা ইচ্ছে করলে অনেকের মনেই পাপ ঢোকাতে পারে। ঢুকিয়েওছে। এই তো কয়েকদিন আগে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে এক দুপুরবেলা পিসতুতো ভাইটাকে এমন পাকিয়ে দিয়ে এসেছে। এইবার তার লেখাপড়ার বারোটা বেজে যাবে। ইচ্ছে করে করেছে। বেশ ভাল লাগে। কেন লাগে তা জানে না।

শম্পা যখন ছোট ছিল, আরও ছোট তখন অতনু আর মালবিকার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা সে যেন কীভাবে বুঝতে শিখেছিল। অস্পষ্ট, আধো আধো, ঘুমচোখে দেখা। স্বপ্নে, জাগরণে, নিদ্রায়, তন্দ্রায়, আলো ছায়ায় এমন কিছু যা অন্যরকম। কী যেন এক খেলা, যে খেলায় বাবা হারছে, বাবা পায়ে ধরছে, ভিখিরির মতো কিছু একটা চাইছে। যেদিন তার জন্যে আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল, সেদিন থেকেই তার মা-বাবার ওপর ভীষণ অভিমান। এখন সে অনেক কিছু জানে। জানে ব্যাপারটা কী, খেলাটা কী? সেই খেলাই সে খেলতে চায়। ছেলেদের মাথা চটকে খাওয়া। জ্বলিয়ে দেওয়া। জ্বালিয়ে দেওয়া। বুদ্ধু বানিয়ে দেওয়া। মহাদেশ জয় করা। কিন্তু শ্যামলের ব্যাপারে তার মনের ভাব অন্যরকম। এখানে সে ধরতে চায় না। ধরা দিতে চায়। এ জমিতে সে তার স্বপ্নের বীজ বুনতে চায়। কে জানে কেমন গাছ হবে? কী ফুল ফুটবে ডালে ডালে।

রেণুর ঘরের দরজা খোলা ছিল। শম্পার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। মনে মনে ভ্রূকুটি করেছে। চালবাজ মেয়েটার এ বাড়িতে আসা বেশ বেড়ে গেছে। কারণটা রেণু সহজেই অনুমান করে নিতে পারে। রেণুর মাস্টারমশাইও শম্পাকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি বললেন, 'এখনই কিন্তু তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। দু'ঘণ্টার আগে আজ উঠতে দোব না। এই ছুটির সময়টাতেই চেপে পড়তে হবে।

রেণু বললে, 'ও আসুক গে আমি উঠছি না।'

শম্পা বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডাকল, 'মাসিমা?'

প্রশান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'আরে শম্পা যে? যাও মাসিমা রান্নাঘরে?'

শ্যামল জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার হাতে কী?'

শম্পা এইটাই চাইছিল। পায়ে পায়ে শ্যামলের দিকে এগিয়ে গেল, 'রেকর্ড। সেই যে রেকর্ডের কথা বলেছিলুম।'

শ্যামল বললে, 'ভেরি গুড। রেণুর পড়া হয়ে গেলে দুপুরের দিকে জমিয়ে শোনা যাবে। ও না, আজ দুপুরে তো আমরা সিনেমা দেখতে যাব।'

শম্পা চমকে উঠল, 'কে কে?'

'আমি আর রেণু।'

'বা রে, আমি যাব না?'

কথাটা ফস করে শম্পার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অনেকটা বায়নার মতো শোনাল। যেন একটা দাবি। বলে ফেলে খুব বোকা বোকা লাগছে। শ্যামল বললে, 'কাকিমার অনুমতি নাও, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো, রেণুকে বলো।'

শম্পার মুখটা ভারী হয়ে উঠল। জীবনে অত অনুমতি টনুমতি নিয়ে কোনও কিছু করার কথা সে ভাবতে পারে না। বহু দূরের কথা মুহূর্তে সে ভেবে ফেলল। শ্যামলের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয় তা হলে কি সব ব্যাপারেই এমনি কারু না কারু অনুমতি নিয়ে চলতে হবে। সে তো বড় সাংঘাতিক কথা।

শম্পার দাঁড়াতে ইচ্ছে করল না। রেণুর মা রান্নাঘরে। একবারও বললেন না, শম্পা এসো কি বোসো? রেণুর বাবা দাড়ি নিয়েই ব্যস্ত। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় শ্যামল উঠে দাঁড়াল। জুতোর কাজ শেষ। শ্যামল বললে, 'বোসো না ওই মোড়াটায়। আমি হাত ধুয়ে আসি।'

শম্পা মোড়ায় বসল। প্রশান্ত দাড়ি কামাবার সাজসরঞ্জাম গুছোতে গুছোতে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কেমন আছেন?'

শম্পা বললে, 'চোখে কনজানকটিভাইটিস হয়েছে।'

'তাই নাকি? সাবধানে থেকো। ভীষণ ছোঁয়াচে।'

শ্যামল হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'কই দেখি কী রেকর্ড এনেছ? চলো, বাইরের ঘরে যাই।' প্রশান্ত দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র নিয়ে বাথরুমে ধুতে যাচ্ছিল রান্নাঘরের সামনে দিয়ে। শ্যামলী জিজ্ঞেস করল, 'সাত সকালেই পটেশ্বরীর আগমন কী মনে করে?'

প্রশান্ত বললে, 'আঃ তুমি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।'

'মাথা না ঘামিয়ে উপায় আছে? রেকর্ডটা তো একটা ছুতো। শ্যামলকে সামলাতে হবে। ওই মেয়ের পাল্লায় পড়লে বারোটা বেজে যাবে।'

'শ্যামলকে সামলাতে হবে না। সে নিজেকেই নিজে সামলাতে পারবে।'

'না, পারবে না। এই বয়েসটা বড় খারাপ।'

প্রশান্ত সামান্য বিরক্ত হয়ে বললে, 'নিজেকে নিজে সামলাতে না পারলে সব বয়েসই খারাপ। হাত ধরে তুমি কাকে কতদূর দিয়ে যেতে পারবে। একসময় না একসময় হাত ছাড়তে হবেই। সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেলে উন্মাদ হয়ে যাবে। একটু-আধটু উদাসীন হতে শেখো। যুগধর্ম বলে একটা কথা আছে। শুনেছ নিশ্চয়।'

শ্যামলী গুম হয়ে রইল। যত আপদ কি তার বরাতেই এসে জোটে ভগবান। এক তো মেয়ে মেয়ে করে সংসারে অশান্তির বন্যা বইছে। তার ওপর এল শ্যামল। এখন বলছে মাসখানেক থাকবে। খুড়তুতো বোন হলেও রেণু এখন বড় হয়েছে। সারাদিন বাড়িতে যেন খুশির হাওয়া বইছে। হাহা, হিহি, হোহো। রেকর্ড প্লেয়ার চলছে। হারমোনিয়াম বাজছে। তার নিজেরই তো অভিজ্ঞতা আছে। ছেলেবেলায় বাড়িতে কী এক উৎসবে তার ডেঁপো পিসতুতো ভাই ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে ধরেছিল। মামাতো বোন বলে কই ক্ষমা করেনি তো! শ্যামলীও ভয়ে লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারেনি। শুধু ঘৃণায় পিসিমার সঙ্গে দিন কতক কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর অবশ্য সবই ভুলে গিয়েছিল। সেই রাতটা বহুদিন স্মৃতিতে লেগে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। প্রশান্তর আর কী? বলেই খালাস, উদাসীন হতে শেখো। ছেলেরা সুযোগ নেবেই। কিছু হলে মেয়েদের মুখ পুড়বে। কত মেয়ের এইভাবে জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতের দল, ছিঁচকে চোরের দল!

শম্পা মায়ের সরু ডুরে শাড়িটা বেশ কায়দা করে পরে এসেছে। ডাগর শরীর। হাত-পা মাখনের মতো মসৃণ। সাজুক আর না সাজুক চোখে পড়বেই। শ্যামলের চোখে কিন্তু ওসব পড়ছে না। মেয়েদের সে ওভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। শরীর নিয়ে তার কারবার নয়। তার সব ব্যাপারই মন নিয়ে। নিজের শরীর নিয়ে সকালে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে। বালির বস্তায় ঘুসি মেরে বকসিং শেখার চেষ্টা চলেছে গত মাস ছয়েক। নাকটাকে প্রায় ভেঙে এনেছে। অন্যের নাক ভাঙতে হলে নিজের নাকটাকেই আগে থেঁতো করতে হয়। শরীর অনুযায়ী খেতে ভালবাসে। অন্যের বিপদ দেখলে কোমর বেঁধে লেগে যায়। প্রাচীন চরিত্রের স্মৃতি চিহ্ন যেন। এসব ছেলে অনেকটা লুপ্ত

প্রাণীর মতো। ডাইনসর, টেরোডাকটিল, কোথাও আত্মগোপন করে ছিল এতকাল। হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।

শ্যামল রেকর্ডের কভারে শিল্পীদের নাম পড়ছিল। শম্পা বললে, 'আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার সাহস নেই আপনার?'

'কেন থাকবে না?'

'তা হলে, মা, বাবা কাকিমা, রেণু এইসব ছুতো তুলছেন কেন?'

'ছুতো নয়, প্রয়োজন।'

'তার মানে?'

'সকলের অনুমতি নিয়ে কিছু করার অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে।'

'আমরা বড় হয়েছি।'

'যত বড়ই হই, গুরুজনদের অস্বীকার করার মতো ফাঁকা ময়দান এখনও হয়নি। হবেও না।'

'তার অর্থ?'

'যদ্দিন আমাদের গুরুজনরা পৃথিবীতে আছেন তদ্দিন তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।'

'তার মানে আমরা চিরকালই পরাধীন থেকে যাব?'

'এতে স্বাধীনতা, পরাধীনতা বলে কিছুই নেই। পৃথিবীতে এইটাই আনন্দের, গৌরবের।'

'আপনি কি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়েও অনুমতি নেবেন, ব্যাবা, আজ আমি শ্বশুরবাড়ি যাব?'

শম্পা শেষ কথাটা বিকৃত গলায় বলল। শ্যামল ব্যঙ্গটা বুঝেও হাসি হাসি মুখে বললে, 'অবশ্যই।'

শম্পা বললে, 'আপনার বউ রাতে ঘরে শুতে আসার সময় আপনার মাকে জিজ্ঞেস করবে কি, ম্যা, এবার আমি শুতে যাব কি?'

'প্রথমত যে বউ মাকে ম্যা বলবে, সে বউ নয় পাঁঠা। দ্বিতীয়ত, আমার জীবনে কোনও বউ থাকবে না।'

'কেন? কৌপীন পরে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করবেন?'

'সন্ন্যাসী হব কি না জানি না। বড় শক্ত পথ; তবে মেয়েছেলের দাসত্ব করতে পারব না। কারু স্বামী হতে আমার ঘেন্না করে।'

'সে আবার কী?'

'আমার ওই ন্যাকা ন্যাকা, মেনিমুখো জীবন সহ্য হবে না। কাঁথা, বালিশ, লালমশারি, বেবিফুড, চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা, সায়ার দড়ি, ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে।'

শম্পা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'দেখব ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কতদিন থাকে? শেষকালে বুড়ো বয়েসে এক আধ-বুড়িকে বিয়ে করতে হবে লজ্জার মাথা খেয়ে।'

শ্যামল বললে, 'দেখা যাক। তোমার ভবিষ্যৎবাণী কেমন মেলে। এই তো সবে শুরু। সামনে এখন অনেকটা পথ। তবে জানো তো আমাদের বংশে সন্ন্যাসীর ধারা বইছে।'

'তার মানে?'

'আমার ঠাকুরদা জীবনের মধ্য বয়সে সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ জীবন কেটেছে দ্বারকার কাছে এক আশ্রমে। আমার ছোটকাকা সন্ন্যাসী। এই তো সেদিন ধর্মমহাসম্মেলনে এসে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, আর একটা তৈরি হচ্ছে। আমার বাবা এখন প্রায় সন্ন্যাসী। কিছু বলার আছে?'

'না, কিছু বলার নেই। সুস্থ, সবল ছেলে আর কিছু নয় সন্ন্যাসী হবে শুনলে হাসি পায়। মনে হয় নদের নিমাইয়ের যুগে বাস করছি। পড়তেন আমার মতো মেয়ের পাল্লায়।'

'কী কবতে?'

'একদিনে আপনাব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব চটকে দিতুম। নদেব নিমাইকে সংসাবী কবে ছেড়ে দিতুম।'

'এত ক্ষমতা তোমাব? চেষ্টা কবে দেখো।'

'সিনেমায নিযে চলুন।'

'ও, সিনেমায না গেলে সংসাবী কবা যাবে না?'

শ্যামল হো হো কবে ঘব ফাটানো হাসি হেসে উঠল। শ্যামলী ছ্যাঁক কবে ডালে ফোড়ন দিতে দিতে শ্যামলেব হাসিব শব্দে ডালেব মতোই জ্বলে উঠল। খুব ফস্টিনস্টি হচ্ছে। এতটুকু লজ্জা নেই। কাকা, কাকিমা, ঠাকুমা, মাস্টাবমশাই, এবা কিছুই মানতে চায না। সে যুগেব আইনকানুন পালটে গিযে দেশেব কী সর্বনাশই যে হল।

বেণুব কানেও হাসিব শব্দ গেছে। বাঃ বেশ হচ্ছে দু'জনে। কোথাকাব ছেলে এসে কোথায় ভিড়ে গেল! আর ভিড়বে না? শম্পা যেবকম আদাজল খেযে লেগেছে। নির্লজ্জ বেহাযা। শাড়ি থেকে এতখানি থলথলে পেট বেবিযে আছে। তাকালেই গা সিবসিব কবে। ওই মেযে যদি বউ হয়ে আসে, বিযেতেও যাব না, বউদি বলে ডাকতেও পাবব না। শ্যামলদাব কী ববাত! যেমন শ্বশুব, তেমনি শাশুড়ি, তেমনি বউ। ত্র্যহস্পর্শ যোগ।

শম্পা হাসি শুনে ভড়কে গেল। হঠাৎ তাব আগেকাব দিনেব মুনি ঋষিদেব কথা মনে পড়ে গেল। উর্ধ্বনেত্র হযে ধুনি জ্বেলে আশ্রমেব সামনে বসে আছেন। দেবতাব দর্শন প্রায হয হয। এমন সময এক অপ্সবা এসে ধিতিং ধিতিং কবে নাচতে লাগল। মুনি ঈষৎ চোখ ফাঁক কবে দেখলেন। হে হে বেড়ে দেখতে। দেবতা কেমন দেখিনি। এ বস্তুটি বড় অপরূপা। ধ্যান প্রায চটকে এসেছে। মদন দেব ঝোপেব আড়াল থেকে খুচুং কবে একটি কড়া ডোজেব তিব মেবে বসলেন। মুনি অমনি ধুনি, চিমটে, কমণ্ডলুফলু ফেলে সেই অপ্সবাকে জাপটে ধবলেন। ব্যস, পতন। মুনিব আশ্রমেব বেড়ায শাড়ি আব কাঁচুলি ঝুলে গেল। ধুনিব আগুনে পলান্ন চেপে গেল। সাধনা তলিযে গেল বিশ বাঁও জলে। বম্বে ফিলমেব গ্ল্যামাব গার্লদেব মতো একবাব ডিসকো নাচ নেচে দেখালে হয় শ্যামলদাব সন্ন্যাসেব কত জোব।

শ্যামল হাসি থামিযে বললে 'তোমাব ওসব ভাবাব বযেস এখনও হয়নি। ভাল কবে মন লাগিযে লেখা পড়া কবো। যে সমযেব যা।

শম্পা উঠে পড়ল। এ দেখি বৃদ্ধ শিক্ষকেব মতো উপদেশ দিতে শুরু কবেছে। খোলটা যুবকেব মনটা বৃদ্ধেব। 'আচ্ছা, চলি তা হলে। বেকর্ডগুলো শোনা হলে বেণুর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

'কেন, তুমি আসবে না?'

'এ বাড়িতে আমাব আসাটা কেউ পছন্দ কবে না।'

'তা কেন? ওটা তোমাব ভুল ধাবণা।'

'এ বাড়িব আপনি কতটুকু জানেন?'

'তা হবে, তুমি তা হলে সিনেমায যাচ্ছ না?'

'অত অনুমতি নেওয়া আমাব কোষ্ঠীতে লেখেনি। আমাব শিক্ষা অন্যবকম। আপনারাই যান।' শম্পা চলে গেল।

শ্যামল দুপুববেলা খেতে বসে বললে, 'কাকিমা, সকাল থেকে তোমাব কী হযেছে গো! গম্ভীব মুখ। কথা বললে ভাল কবে উত্তব দিচ্ছ না?'

শ্যামলী বললে, 'কী কথা বলব? আমাদেব বয়েস হয়ে গেছে! এখন যত কম কথা বলা যায ততই ভাল।'

'কেন? তোমার সঙ্গে তো এতদিন আমার অনেক কথাই হত। হঠাৎ তোমার এই আবিষ্কার?' সকাল থেকেই শ্যামলী মনে মনে ফুঁসছিল। ছেলেমেয়ে কেমন হবে? ধীর, স্থির, একটু বুড়োটে। সবসময় ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে সিঁটিয়ে থাকবে। একটু দুঃখু দুঃখু ভাব। লেমনেডের বোতল খোলা ঝাঁঝ, বুজবুজি শ্যামলীর অসহ্য লাগে। ওসব বিদেশেই থাক। এ দেশে অচল। মধ্যবিত্তের ঘরে পেটরোগা ছেলেমেয়েই ভাল। শ্যামলী বললে, 'এটা কলকাতা শ্যামল। তোমার রাঁচি নয়। এখানে একটু বুঝেসুঝে চলাই ভাল।'

শ্যামল হাসতে হাসতে বললে, 'কেন? ম্যানহোলে পড়ে যাব? তোমাদের কলকাতার রাস্তার ম্যানহোলের ঢাকা চুরি হয়ে যায় শুনেছি।'

শ্যামলী বললে, 'আমার মেয়ে বড় হয়েছে শ্যামল। বাড়ির আবহাওয়া বিষিয়ে গেলে তোমার কিছু হবে না, আমাকেই মরতে হবে।'

শ্যামল অবাক হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকাল। কী বলতে চায় এই মহিলা!

'তুমি কি মনে করো আমিই সেই আবহাওয়া বিষিয়ে তুলেছি?'

'ভেবে দেখো।'

'তার মানে?'

'এক দিকে তোমার কাকা, আর এক দিকে তোমার কাকিমা, ঠাকুমা, মাস্টারমশাই রেণুকে পড়াচ্ছেন আর সারা সকালটা তুমি কী করলে, একটা ধেড়ে মেয়েকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে বসে হাহা, হোহো হিহি। এতে রেণুর কী শিক্ষা হল? মাস্টারমশাই কী ভাবলেন? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি শ্যামল।'

কাকিমার কাটা কাটা কথা শুনে শ্যামলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। রেণু কয়েকদিন আগেই মায়ের অসম্ভব সন্দেহ বাতিকের কথা তাকে বলেছিল। এখন মনে হচ্ছে ভেবে ভেবে কাকিমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। শ্যামল বললে, 'আমি কী অভদ্রতা করেছি কাকিমা?'

'তোমার চালচলনটা বড়ই বেপরোয়া শ্যামল। তুমি একটু হুজুগেও। মাতন লাগলে তোমার মাত্রা জ্ঞান থাকে না। রেণু তোমার বোন হলেও বড় হয়েছে, তার সঙ্গেও মেলামেশার সময় একটু সংযত হওয়া উচিত। মেয়ে বড় হলে বাপকে পর্যন্ত সামলে চলতে হয়। তোমাকে এসব বলা বৃথা।'

শ্যামল কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। রেণু সেদিন ঠিকই বলেছিল, শ্যামলদা, তুমি আমার পাশে শুলে, মা দেখে গেল, পরে দেখবে এমন কথা বলবে কানে আঙুল দিতে হবে। শ্যামল তখন যাও যাও বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পৃথিবীটা এত নোংরা নয়। বাব্বা, নোংরা নয় আবার! কিছু কিছু মন ম্যানহোলের মতো। ঢাকনা খুলে গেলে আর রক্ষে নেই। রেণুও সকাল থেকেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছে। তেমন কথাবার্তা বলছে না। নিশ্চয়ই মা সাবধান করে দিয়েছে। ওই এক কথা। ভাই হলেও তোমরা এখন বড় হয়েছ।

শ্যামল নিজের ঘরে এসে টাইম টেবলটা খুলে বসল। এই তো বিকেলেই একটা ভাল ট্রেন আছে। টাইম-টেবল বন্ধ করে শ্যামল উঠে পড়ল। ঠাকুমার আজ একাদশী। উপোস করে শুয়ে আছে। সেই সন্ধেবেলা সামান্য ফল আর মিষ্টি খাবে। সংসারে থেকেও না থাকার মতোই। সারাদিনে একটা কি দুটো প্রয়োজনীয় কথা। বেশির ভাগ সময়েই একা একা চুপ করে বসে থাকে। সাদা থান কাপড়, পাকা চুল। সময় একটা মানুষকে কীভাবে ব্লিচ করে দিচ্ছে। সব সাদা। রাঁচির হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারের মতো। বাবা আজকাল প্রায়ই বলেন, টাইম ইজ ওলড জিপসিম্যান। জিপসিম্যান নয় ওয়াশার ম্যান।

মন খারাপ ভাবটা কেটে এল। সত্যিই তো, বুঝিবে সে কীসে কভু আশী বিষে দংশেনি যারে। শ্যামল ঝট করে সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলল। এমন কিছুই ছিল না যে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। ছাদের তারে তোয়ালেটা ঝুলছিল। শুকিয়ে গেছে। তুলে আনলেই হয়। তোয়ালে আর চটি

সাইডব্যাগে যাবে। শ্যামল তোয়ালে তুলতে এসে দেখল, রেণু একটা বই হাতে জুঁইগাছের ছায়ায় দেয়ালে পিঠ দিয়ে উদাস মুখে বসে আছে। অন্যদিন হলে শ্যামল পাশে গিয়ে বসত। মাথার ওপর বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশ। চড়াইপাখির সারা দুপুর ধুলোস্নান। ভিজে ভিজে হাওয়ায় গাছের পাতা দুলে দুলে ওঠা। নানা গল্প, হুড্রু ফলস, জুনা ফলস। আজ আর কিছু নয়। আর কোনও দিনই কিছু নয়। এ বাড়িতে আর কোনও দিনই সে আসবে না। কী দরকার। শুধু শুধু অশান্তি বাড়াতে আসা। শ্যামল তোয়ালেটা তার থেকে টেনে নিতেই, তারের নাচুনিতে কাপড় শুকোতে দেবার ক্লিপগুলো নেচে উঠল। শব্দ শুনে রেণু চোখ তুলে তাকাল। শ্যামল একটু মুচকি হাসল। রেণু হাসল না চোখ নামিয়ে নিল। শ্যামলের ওপর তার অভিমান হয়েছে। শম্পার সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? জানে, শম্পা মেয়ে কেমন?

শ্যামল তার থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। বেশ কয়েক দিন কেটে গেল এই ঘরে। ঘরটা ছোট হলেও ভারী সুন্দর। চতুর্দিকে জানালা। পাশেই ছাদ। ছাদে কিছু গাছও আছে। ফুল ফোটে। ছোট ছোট জুঁই ফুলে গাছ ছেয়ে গেছে। সন্ধে হলেই চারপাশে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। কেউ না এলে ওপরটা বেশ নির্জন। সূর্য পশ্চিমে সরে গেছে। ঘরে আর তেমন ঝলমলে আলো নেই। ছায়া ঘনিয়ে আসছে। ঘরের দেয়ালে কাকু সুন্দর সুন্দর ছবি ঝুলিয়েছে। বেশির ভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্য। সকালের আলোয় একরকম দেখায়, দুপুরে একরকম সন্ধ্যায় অন্যরকম। রাতে দেখলে মন খারাপ হয়। বিশেষ করে ওই ছবিটা, দুপুরের ধানখেতে কৃষক আব কৃষক বধূ ধান ঝাড়ছে। রাতে ওই ছবিটা দেখলে মনে হয়, দিন তো চলেই গেল। ওই শস্য ক্ষেত্রে এখন তো আর কেউ নেই। কৃষক তার বধূকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেছে। দিন ছিল, দিন আর নেই। কেমন যেন মৃত্যুর কথা, শূন্যতাব, নিঃসঙ্গতার চিন্তা মনে আসে। জীবন যত কমে আসছে ছায়া তত বড হচ্ছে।

না, মন বড় সাংঘাতিক জিনিস। দুর্বল করে ফেললে চলবে না। এরই মধ্যে এই ঘরে মন পড়ে গেছে। ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। ছোটকাকা সেই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার দিনটির কথা এখনও বলেন। এই সেদিনও বললেন। হাওড়া স্টেশানে ট্রেনের কামরায় উঠে বসেছেন। প্ল্যাটফর্মে দাদারা, বউদি। চির বিদায় জানাতে এসেছেন। ট্রেনটা যেই ছেড়ে দিল ছোটকাকুব মনে হল সংসাবের আকর্ষণে জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবেন। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পটাং করে যেন একটা শব্দ হল। আকর্ষণ ছেঁড়ার শব্দ।

শ্যামল জামা প্যান্ট পরে ফেলেছে। সাইডব্যাগে তোযালে আর জুতো ভরে ফেলেছে। আর কী, এবার তবে বিদায়। নীচে থেকে একগাদা বই, ম্যাগাজিন এনেছিল। টেবিলে গুছিয়ে রাখল। একসময় কেউ না কেউ নিয়ে যাবে। একটা ইনল্যান্ডে বাড়িতে মাকে চিঠি শুরু করেছিল। পুরোটা লেখা হয়নি। আর লেখার প্রয়োজনও নেই। চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি কবে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। তার এখানে থাকার কোনও স্মৃতি চিহ্নই আর পড়ে বইল না।

সুটকেস আর সাইডব্যাগ নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। সুটকেসটা একপাশে রেখে রেণুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'রেণু, আমি তা হলে আসি। আর হয়তো আসা হবে না। যদি ভারতবর্ষে থাকি চেষ্টা করব তোমার বিয়ের সময় আসার।'

রেণু বই মুড়ে খাড়া হয়ে বসল, 'কোথায় চললে তুমি?'

'যেখান থেকে এসেছিলুম সেইখানে।'

রেণু উঠে দাঁড়াল, 'তার মানে? তুমি তো একমাস থাকবে বলেছিলে।'

রেণুর চোখ ছলছলে। শ্যামল বললে, 'ভেবেছিলুম একমাস থাকা যাবে। হঠাৎ মনে হল পড়ার ভীষণ ক্ষতি হবে। বাবা রাগ করবেন। আমি চলি গো। মাঝে মধ্যে চিঠি দিয়ো কেমন?'

শ্যামল রেণুর দিকে পেছন করে এগিয়ে আসছে সুটকেসটা তুলে নিয়ে নীচে নামবে। যাবার আগে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কাকিমাকেও বলতে হবে। না, কারু ওপরেই তার আর রাগ নেই, অভিমানও নেই। শ্যামল নিচু হতেই রেণু তার পিঠে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'না, তুমি যাবে না। কেন যাবে?'

শ্যামল সুটকেস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রেণু বারান্দার রেলিং-এর দিকে সরে গেছে। খুব চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত করার। শ্যামল চলে যাচ্ছে শুনে তার মনে অদ্ভুত একটা শূন্যতা এসেছিল। শূন্য ঘরের মতো। এ ক'দিন বাড়িটা যেন সবসময় ভরে থাকত। গানে, গল্পে, হাসিতে। দুপুর তেমন নির্জন মনে হত না। রাতকে মনে হত উৎসবের রাত। বাবার সঙ্গে শ্যামলের কত গল্প হত। অনেক দিন পরে বাড়িতে খুশির হাওয়া উড়ে এসেছিল। শ্যামল চলে যাওয়া মানেই আবার সেই গুমোট দিনলিপি। পড়া, সংসারের কাজ, সন্দেহ, মাপা কথা। দিন থেকে দিনে কোনও তফাত নেই।

শ্যামল রেণুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তুমি কাঁদছ? আশ্চর্য মেয়ে তো?'

কান্নায় গলা বুজে আছে রেণু কথা বলতে পারছে না। মুখটা নীচের দিকে নামানো। চোখে জল। নীচে ঝাপসা উঠোন কলতলায় এঁটো বাসন, গোটা কতক চড়াই পাখি। রেণু কথা বলছে না দেখে শ্যামল বললে, 'আজ হোক, কাল হোক আমাকে তো যেতেই হবে রেণু। সব মানুষকেই একদিন বাড়ি ফিরতে হয়।'

শ্যামল রেণুর পিঠে আর একটু হলেই হাত রেখে ফেলছিল। কাকিমার কথা মনে হতেই হাত সরিয়ে নিল। ভাই আর বোন বড় হলে কতটা কাছাকাছি আসা শাস্ত্রসম্মত তার জানা নেই। হাতটা রেলিং-এ রেখে বললে, 'তুমি আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও।' বলেই, মনে হল বিদায় কোনওদিন হাসি মুখে হয় না। চোখের জল, মনের কষ্ট, এই সবের মধ্যে দিয়েই মানুষের আসা যাওয়া। ছেড়ে যেতেও যেমন কষ্ট, ছেড়ে দিতেও। শ্যামল আর দেরি করতে চায় না। শেষে তার হয়তো আর যাওয়াই হবে না। আজ তাকে যেতেই হবে। কাকিমা আজ তাকে যে কথা বলেছে তারপর সত্যিই আর থাকা চলে না। থাকলেও বড় কষ্টকর হবে। প্রাণহীন থাকা। শ্যামল এক ঝটকায় সুটকেস তুলে নিয়ে নীচে নেমে গেল। এইবার একটু রাগরাগ ভাব করে ফড়কে বেরিয়ে যেতে হবে। তা হলে কষ্টটা কম হবে।

শ্যামল বারান্দা ধরে এগোচ্ছে। রেণুও ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। শ্যামলের পথ আটকে দাঁড়াবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। এখুনি মায়ের মুখ তোলা হাঁড়ির মতো হয়ে যাবে। রেণু দেখল শ্যামলদা ঠাকুমার ঘরে ঢুকছে। ঠাকুমা যেন সকলের মনের কথার ভাণ্ডারী। এমন একজন শ্রোতা পাওয়া সহজ নয়। যার যা হয়েছে এসে বলে যাও। বাবাও অফিস থেকে এসে ঠাকুমার কাছটিতে বসে কত কথাই বলে। এমন সব তুচ্ছ কথা যা ঠাকুমাকে না বললেও চলে। বাবার সে সব খেয়াল থাকে না। একটু করে বলে আর জিজ্ঞেস করে, তুমি কী বলো? রেণু বেশ বুঝতে পারে ঠাকুমার দিন শেষ হয়ে আসছে বলে বাবা যতটা পারে কাছে কাছে থাকতে চায়। একবার চলে গেলে আর তো ফিরে আসবে না।

রেণু প্রথমেই মায়ের ঘরে ঢুকল। শ্যামলদা এ ঘরে আসার আগেই মাকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। শ্যামলী জানালার ধারে পা ছড়িয়ে বসে, চোখে চশমা এঁটে বহুকাল আগের একটা পুরনো পত্রিকা পড়ছে। বয়স্কা ছাত্রীর মতো মুখের চেহারা। মা যখন শান্ত তখন ভারী সুন্দর দেখায়। রেণু সবে মা বলে ডাকতে যাচ্ছিল এমন সময় শ্যামল ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল। চোখে মুখে প্রচণ্ড উদ্বেগ।

'কাকিমা, ঠাকুমা নেই।'

শ্যামলের গলা ধরাধরা। শ্যামলীর হাত থেকে পত্রিকাটা কোলের ওপর পড়ে গেল। শ্যামলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে শ্যামলী বললে, 'এই তো ওঘরে শুয়েছিলেন, কোথায় গেলেন?'

শ্যামল দরজার পাল্লায় মাথা রেখে চোখ আড়াল করে ধরাধরা গলায় বললে, 'ঠাকুমা আর নেই।'

'সে কী?'

শ্যামলী চোখ থেকে টান মেরে চশমা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। রেণু এক কান্না সামলাতে না সামলাতেই চোখের জলের আর এক বড় কারণ এসে গেল। প্রভাদেবী বড় শান্তিতে বিছানায় শুয়ে আছেন। প্রশান্ত মুখে যেন মৃদু হাসি লেগে আছে। হাত দুটো পাশাপাশি বুকের ওপর পড়ে আছে। চোখ আধবোজা। পশ্চিমের লাল আকাশের একটা শীতল আভা সারা ঘরে খেলছে। কেউ ছিল না পাশে যখন তিনি চলে গেলেন। নীরব মানুষের নিঃশব্দ বিদায়। কেউ জানতেও পারল না। অনেক দিন এসেছিলেন। এতদিনে ছুটি মিলল। সূর্যাস্তের তীর থেকে নিঃশব্দে একটি নৌকো খুলে গেল। সাঁঝের একটি তারা ফুটেছে আকাশে। মৃত্যু এত সহজে আসে?

শ্যামলী চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, 'কই একটু আগেও তো সুস্থই ছিলেন। শ্যামল তুমি কাকুকে ফোন করো।'

রেণু খাটের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। এই প্রথম সে মৃত্যু দেখল। এই ক'দিন সে ঠাকুমার খুব কাছে চলে এসেছিল। কত কথা হত দু'জনে। এ কী আশ্চর্য! এই তো কিছু আগেই ঠাকুমা বললে, যা মা রেণু, ছাদে ছায়ায় বসে চুল শুকিয়ে আয়। ভিজে সপসপ করছে। বিকেলে বেঁধে দেব বড় খোঁপা করে। কাল সকালে বলছিল, অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়নি। আর কি যেতে পাবব? ছোট ছোট কয়েকটা আশা ছিল। পূর্ণ হল না।

শ্যামলের ফোন পেয়ে প্রশান্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল। যা ভেবেছিল তাই হল। ক'দিন থেকেই মন বলছিল একটা কিছু হবে। সম্বরণ বললে, 'একদম তাড়াহুড়ো করবি না। যা হবার তা হয়েছে। চল, আমি তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

বহু কথা তালগোল পাকিয়ে প্রশান্তর মনে আসছে। অতীত স্পষ্ট হয়ে উঠে বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। প্রশান্ত বললে, 'তুই আবার কষ্ট করবি?'

'সে কী? কষ্ট কী রে? চল ওঠ।'

বেরোতে বেরোতে অনেক দেরি হয়ে গেল। খাট এল। ফুল এল। সম্বরণ আর শ্যামলই সব করলে। সম্বরণের মতো সায়েব যে এত সহজে এই পরিবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত। মানুষের সংস্কার সভ্যতায় চাপা পড়ে না। সম্বরণ বললে, 'তোমরা ভেবো না, আমি কাঁধ দেব। একদিন তো যেতেই হবে, জায়গাটা দেখে আসি।'

খই ছড়ানো পথে, হরিধ্বনি শুনতে শুনতে প্রভাদেবী চলে গেলেন। অনেক দিন আগে শ্যামলকে বলেছিলেন, দেখবি, আমি গঙ্গার ধারেই মরব। এবার রাঁচি থেকে আসার সময় বড় ছেলে যখন প্রণাম করছিল, তখন মাথায় হাত রেখে বলেছিল, আর আসব কিনা জানি না। সাবধানে থাকিস।

॥ পাঁচ ॥

রোদ উঠে গেছে। শেষ রাতেই সব শেষ। চিতায় জল ঢালতে ঢালতে প্রশান্তর মনে হচ্ছিল, আর কিছুই রইল না। যে সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল সেই সিঁড়ির শেষ ধাপটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চিতার ছাই আর নাভিপদ্ম জলে ভেসে ভেসে সাগরের দিকে চলে গেল। চোখের সামনে ভাসছে মায়ের মুখ। কিছু স্মৃতি মধুর, কিছু তিক্ত। মাকে যেভাবে রাখা উচিত ছিল সেভাবে কি রাখতে পেরেছিল? কখনও আদর, কখনও অবহেলা। কখনও অকারণে শক্ত কথা শুনিয়েছে।

কখনও মনে মনে ভেবেছে, বুড়ির অখণ্ড পরমায়ু। দীর্ঘ জীবনের পাওনা ভালয়-মন্দয় মেশানো। যা ঘটে যায় তা ঘটেই যায়। এ তো জামাকাপড়ে কাদার দাগ নয় যে কেচে তুলে দেবে! মনের দাগ ওঠে না। দাগরাজি মন নিয়েই মানুষকে একদিন চলে যেতে হয়। মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন এসব কথা মনে হয়নি কেন? মন যদি তেমনই হবে তা হলে মানুষ ভুল করবে কেন?

প্রশান্ত কাছাগলায় মেঝেতে বসে আছে। কিছু দূরে বসে আছে সম্বরণ। শ্যামল উঠনের দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসে আছে। সকলেরই চোখ ধোঁয়ার, রাত্রি জাগরণে জবাফুলের মতো লাল। এতক্ষণ সংসার যেন থেমে ছিল। এইবার আবার চলতে শুরু করেছে। মৃত্যু তার পাওনা নিয়ে উদাস সংসার ছেড়ে চলে গেছে। তবু চা বসেছে।

চা খেয়ে জামাকাপড় পালটে সম্বরণকে এবার যেতে হবে। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রশান্তকে ছুটি নিতেই হবে। শ্যামলেরও যাওয়া বন্ধ। বড় আঘাত এলে মানুষ ছোট ছোট ক্ষতের কথা আর মনে রাখে না। সকাল থেকেই কাকিমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবার সহজ হয়ে গেছে। রেণুও চলে এসেছে কাছাকাছি। সমস্ত সংসারেই দেখা যায় বাইরে থেকে এক-একটা উড়ো ঝঞ্ঝাট এসে হাওয়া এলোমেলো করে দিয়ে যায়। কোনওটা স্থায়ী হয়ে যায়। কোনওটা আলোড়ন তুলে সরে পড়ে।

মা আর মেয়ে দু'জনে চায়ের কাপ বয়ে বয়ে নিয়ে এল। দু'জনেই সারারাত ঘুমোতে পারেনি। চেয়ে চেয়ে দেখেছে প্রদীপ জ্বলছে ঠাকুমার ঘরে কেঁপে কেঁপে। প্রশান্তর মা সম্বরণের কেউ নয়। তবু একটা বয়েসে মায়ের মতো মা হলে, তিনি সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে যান। কতদিন আগে সম্বরণ তার নিজের মাকে হারিয়েছে। সেই দিনের শূন্যতা আবার যেন ফিরে এসেছে। শূন্যতা অনেকটা পাঁজরের মতো। একটা-দুটো ভেঙে গেলে জীবন অচল হয় না ঠিকই তবু শূন্যতাটা থেকেই যায়। বোধটা ফিরে ফিরে আসে। মৃত্যু আগে এত বেদনার বলে মনে হত না। এখন যত বয়েস বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে, এর চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই।

সম্বরণ চা শেষ করে উঠে পড়ল। রেণুকে ডেকে বললে, 'একবার বাথরুমে যেতে হবে মা।'

রেণু তাড়াতাড়ি পরিষ্কার একটা তোয়ালে, নতুন একটা সাবান এনে বাথরুমের দরজা খুলে দিল। সম্বরণ বললে, 'আমার আর কিছু লাগবে না। তুমি শুধু আমার জামাকাপড়গুলো এনে রাখো।' বাথরুমে ঢুকে সম্বরণের মনে হল অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। তারপর মনে হল, রেণুর মতো তারও একটি মেয়ে থাকতে পারত। তারপর মনে হল, তার যদি শ্যামলের মতো একটি ছেলে থাকত তা হলে রেণুর মতো মেয়েকে অবশ্যই পুত্রবধূ করত। তারপরই হাসি পেল, ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস। তার মা-ও তো ছেলের জন্যে একটি ভাল মেয়ে দেখেছিল। সম্বরণ কী করল? যৌবন তখন টগবগে ঘোড়া। বিলিতি কায়দায় বিয়ে না করলে জীবন পানসে। জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে গেলে হারও হতে পারে জিত হতে পারে। অভিজ্ঞতা বলে হারটাই বেশি হয়।

সম্বরণ যাবার সময় বন্ধুকে বলে গেল, 'তুই ভাবিসনি। আমি সন্ধের দিকে আবার আসছি। আসার পথে নিউ মার্কেট থেকে সব কিনে আনব!'

প্রশান্ত কিন্তু কিন্তু গলায় বললে, 'তুই আবার কষ্ট করবি?'

সম্বরণ হাসতে হাসতে বললে, 'তাড়াতে চাইছিস কেন? আমাকেও তোদের দুঃখ-সুখ একটু ভাগ করে নেবার সুযোগ দে না। দেখ না পারি কিনা?'

সম্বরণ গাড়ি নিয়ে চলে যেতেই প্রশান্ত শ্যামলকে বললে, 'এমন ছেলে লাখে একটা হয়। না পুড়লে মানুষ সোনা হয় না। সুখ আর সাফল্যের জীবন ফ্ল্যাট টায়ারে গাড়ি চালাবার মতো দাবা জীবন।'

প্রশান্ত রাঁচিতে চিঠি লিখতে বসেছে। দাদা আর্থ্রাইটিসে প্রায়ই কাবু হয়ে পড়ে। শ্রাদ্ধে মনে হয় আসতে পারবে না। বউদি এলে সংসার অচল। দু'-জায়গাতেই কাজ হবে। মা তো দেখেই গেছেন

সংসার দু'টুকরো হয়ে গেছে। এক ছেলে সন্ন্যাসী। আমেরিকাতেও একটা চিঠি লিখতে হবে। সন্ন্যাসীরও কিছু ক্রিয়াকর্ম থাকতে পারে।

চিঠি লেখায় বাধা পড়ল। শৈলেনবাবু এলেন।

'কালই খবর পেয়েছি, আসতে পারিনি। প্রফুল্লর মেয়েকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। হয়তো বাঁচবে না। কী দুর্ভাগ্য! সমাজ ক্রমশই ভায়োলেনসের দিকে চলে যাচ্ছে। রোজই প্রায় খুনখারাপি। বাঙালি রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আর রক্ষে নেই।'

প্রশান্তর আজ আর কোনও তত্ত্বকথা ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক সমাজ। কোনওরকমে গা বাঁচিয়ে চলে যেতে পারলেই হল। তারপর যারা থাকবে তারা বুঝবে। প্রশান্ত ফ্যালফ্যালে মুখে তাকিয়ে রইল। শৈলেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন চুকল?'

'ভোরে।'

'যাক একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। এখন তোমরা রইলে। আর ওই ওরা আসছে।'

শৈলেনবাবু রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করলেন। মোড়ে হল্লা উঠেছে। যে হল্লা প্রায় সারাদিনই রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।

'বয়েস পেলে মানুষকে যেতেই হবে। তবু মৃত্যুর একটা বেদনা আছে। সহ্য করতেই হবে। এর কোনও সান্ত্বনা নেই। একটা বছর একটু সাবধানে থাকবে। গুরু নিপাতের বছর হল কাল-বছর। আহা, সাধিকার মৃত্যু! ভুগলেন না কিছু না। ফুস করে যেন দীপ নিভে গেল। আচ্ছা যাক। বলো কীভাবে সাহায্য করতে পারি? টাকাপয়সা আছে তো?'

প্রশান্ত ভীষণ অবাক হল। এই শৈলেনবাবু প্রায় সকলেরই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের পাত্র। তাঁর মধ্যেও এমন একটা মন লুকিয়ে আছে বিপদে না পড়লে জানা যেত কি? প্রশান্ত বললে, 'আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। টাকাপয়সা যা আছে চলে যাবে। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ওই তোমাদের দোষ। তোমরা বড় বেশি সাহেব। মানুষকে কিছুতেই কাছে আসতে দাও না। জীবনটা ভাগ করে নিতে শেখো। আবার অতীতে ফিরে চলো। জানো, আমার পিতৃশ্রাদ্ধ হয়েছিল চাঁদা তুলে। আমি চাঁদা তোলার কথা বলছি না। আমি বলছি প্রয়োজনের কথা। দরকার হলে জানাতে লজ্জা কোরো না।'

'আজ্ঞে না।'

'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোকটি কে? গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। যীশুখ্রিস্টের মতো দেখতে।'

'আমার বন্ধু। একই অফিসে কাজ করি।'

'বাঙালি?'

'হ্যাঁ বাঙালি, ব্রাহ্মণ।'

'বলো কী, বাঙালির এত সুন্দর চেহারা হয়? রাজপুত্রের মতো! মনে হয় সান অফ এ জমিন্দার।' শৈলেনবাবু বকবক করতে করতে চলে গেলেন। প্রশান্ত আবার চিঠি নিয়ে বসল। শ্যামল বাজারে গেছে। কাঠ, মালসা, আলোচাল, কাঁচকলা, সৈন্ধব লবণ, নানা জিনিস কেনার আছে। অশৌচের ক'দিন প্রশান্তকে নিজে হাতে হবিষ্যি রেঁধে খেতে হবে।

দুপুরে প্রশান্ত আর শ্যামল প্রশান্তর মায়ের ঘরে কম্বল বিছিয়ে শুয়েছিল। একটু তন্দ্রামতোও এসেছিল। ঘুমের দিকে যেতে পারেনি। চোখ বুজলেই চোখের সামনে গনগনে চিতা। মায়ের মুখটা পুড়ে যাচ্ছে। স্মৃতি সময়ে মলিন হবেই। এখন তো সবে ঘণ্টা কয়েক হয়েছে।

খাটের ওপরের বিছানাপত্র সব সরে গেছে। ঘরটা ফাঁকা। কথা বললে ঝংকার উঠছে। পাঁজরের মতো ফাঁক ফাঁক কাঠ। তলায় একটা সুটকেস। পৃথিবীতে মায়ের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি। প্রশান্ত উঠে বসল। কী ছিল মায়ের বাক্সে। একজন মানুষের শেষ সম্বল কী হতে পারে। প্রশান্তর জানা উচিত। সেও তো বেড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিন হঠাৎ টপকে চলে যাবে।

প্রশান্ত খাটের তলা থেকে সুটকেসটাকে টেনে বের করে আনল। শ্যামল উঠে বসে বললে, 'কী করবে? এখন আবার ওসব নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

প্রশান্ত বললে, 'স্মৃতিতে ফিরে যাই। ছেলেবেলার সেই আমবাগান। কালবৈশাখী। বর্ষা। চৈত্রের দুপুরে দাওয়ায় পাতা পেড়ে খেতে বসা। সাদা-লালপাড় শাড়ি পরে মায়ের পরিবেশন। বাবার রসিকতা। ধুর কিছুই থাকে না। কিছুই ধরে রাখা যায় না। সবই চলছে। সময়, নদীর জল, জীবন।' প্রশান্তর চোখে জল এসে গেল।

'কোথাও কিছুদিন সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব। আর ভাল লাগছে না।'

'কিছু দিন রাঁচিতে চলো না।'

'ধুর, সেই এক সংসার থেকে আর এক সংসারে। যেতে হবে পাহাড়ে কিংবা জঙ্গলে।'

প্রশান্ত সুটকেসের ডালাটা খুলতেই সুন্দর একটা গন্ধ বেরোল। অনেকটা চন্দনের মতো। গোটা কতক থানধুতি পরিপাটি করে ভাঁজ করা। তার ওপর একটুকরো লাল চেলি। একটি রুদ্রাক্ষের মালা। দুটোমাত্র ব্লাউজ। একটা গোল টিনের কৌটোয় খানিকটা তুলো। সেই তুলোর ওপর সাদা পাথর বসানো দুটো সোনার আংটি। আংটির একটা মনে হয় বাবার আর একটা মনে হয় মায়ের। চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে কৌটোটা থেকেই। অলৌকিক কিনা কে বলতে পারে। বাবা শেষ জীবনে সাধন পথে অনেক দূর গিয়েছিলেন। কিছু বিভূতিও পেয়েছিলেন। মাকে দীক্ষা বাবাই দিয়েছিলেন। ছোট একটা জর্দার কৌটোতে কিছু মাটি। কোন তীর্থের কে জানে! ওপরের ডালার খোপে লাল কাপড় জড়ানো খান কয়েক চিঠি। কালো কালি বাদামি হয়ে এসেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফাটল ধরেছে। অনেকটা পাঁপড়ভাজার মতো অবস্থা। মোটা সাদা খামে বাবার একটা ছবি। সন্ন্যাসীর বেশ। বাঘছালে বসে আছেন। অনাবৃত দেহ। কী সুন্দর চেহারা ছিল বাবার।

সুটকেস থেকে অতীত বেরিয়ে আসছে। এক পা, এক পা করে এগিয়ে আসছে। প্রশান্ত অবাক হয়ে দেখছিল বাবার হাতের লেখা। দ্বারকার আশ্রম থেকে মাকে চিঠি লিখছেন। কত সাংসারিক উপদেশ। আদর্শ গৃহীর জীবন কীভাবে কাটাতে হবে তার নির্দেশ। বাবা লিখেছেন, যতদিন আসক্তি থাকবে ততদিন তুমি পুরোপুরি সংসারী। সংসারের দুর্ভোগ ভুগতে ভুগতেই একদিন নিবৃত্তি আসবে। জোর করে উদাস হবার চেষ্টা কোরো না। ডাব ঝুনো না হলে খোল থেকে শাঁস আলাদা করা যায় না। সবসময় মনে রাখবে তুমি এখন আর কারু স্ত্রী নও। তুমি হলে মা। কারু মনোরঞ্জনের ভূমিকা আর তোমার নয়। পৃথিবীতে কিছু কিছু প্রাণী আছে প্রকৃতির নিয়মে যাদের বারে বারে রূপ পালটাতে হয়। এক-এক রূপে তাদের এক ভূমিকা। যেমন প্রজাপতি। যেমন ব্যাং। শুরুটা কিছুই নয়, শেষটাই সব। সব ভাল যার শেষ ভাল।

চিঠিগুলো এখনও বেশ পড়া যায়। বাবা লিখছেন, দিনটা তুমি সংসারকে দাও, কিন্তু রাতটা তো তোমার নিজের। সেই সময় নির্জনে একটু বোসো। যতটা পারো পেছনে চলে যাও তারপর ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এসো। ভুল-ভ্রান্তির হিসেব নাও। কী করেছ, আর কী করোনি? দেখবে কেমন আত্মশুদ্ধি হয়। এইভাবেই পেয়ে যাবে ভবিষ্যতের চলার ইঙ্গিত। জীবনটাকে আটকাট বন্ধ ঘরের মতো করে ফেলো না। নেওয়াটাই সব নয়। জানবে দেওয়াটাই সব। বাতির সার্থকতা জ্বলে ওঠায়, জ্বলে যাওয়ায়। আলো দিতে না পারলে বাতি বাতিই নয়।

আবার এক জায়গায় লিখছেন, সরবের চেয়ে নীরব হওয়াই ভাল; আর সেইটাই বড় শক্ত। তোমার যখনই মনে হবে সংসারের সব কাজ শেষ হয়েছে তখনই চলে আসবে। পাখিদের উড়তে দাও। একটা বয়েসের পর মানুষ নিজের ভাগ্যে চলে। ভাগ্য হল প্রারব্ধ। যা নিয়ে এসেছে তাই দিয়ে যেতে হবে। যা নিয়ে চললে সেইটা কাজে লাগবে পরের জন্মে। ধনদৌলত নিয়ে যেতে পারবে না, পারবে সৎকর্ম নিয়ে যেতে। পারবে সংস্কার নিয়ে যেতে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কাছে জগতের ঐশ্বর্য কিছু নয়। খালে যদি সমুদ্রের জল ঢোকে প্লাবন হয়। খাল থেকে নদী হও, নদী

থেকে মহানদী হও। আধার বড় না হলে আধেয় বড় হতে পারে না। তোমার ছেলেদের দেহের খাবার নয়, মনের খাবার দাও। মানুষ করা মানে মানহুঁশ করা। আমার কাছে বিষয়ের পরামর্শ নয় বিশেষের পরামর্শ চাও। ওসব অনেক হয়েছে আর নয়। সংসার হল শোঁয়াপোকার মতো। হাতে চুন মেখে না ধরলেই হাতময় শোঁয়া ফুটে যাবে। মনটাকে সাদা করার চেষ্টা করো। সংসার মনেই ধরে।

কাকা আর ভাইপো দু'জনে পাশাপাশি বসে চিঠি পড়ছিল। শ্যামল অবাক হয়ে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এসব চিঠি ছেপে বই করে প্রকাশ করা উচিত। ওনার কোনও বই নেই কেন কাকু?'

'ওসব গ্রাহ্যই করতেন না। ধর্মগুরু হবার জন্যে তো সংসার ত্যাগ করেননি।'

'তোমার কাছে কোনও চিঠি নেই? থাকলে সব মিলিয়ে একটা বই করো না।'

'সে অধিকার আমার নেই। আশ্রম এখনও আছে। কিছু করতে হলে তারাই করবে।'

'তুমি তাঁদের বলো না।'

'সেখানে এখন অনেক দল রে? এ যুগটাই হল দলাদলির। কী ধর্মে, কী রাজনীতিতে, সংসারে, কর্মজীবনে।'

'মানুষ ভাল যা-কিছু সব ভুলে গেছে।'

শ্যামলী ঘরে এল। এতক্ষণ কী করছিল কে জানে। চুলে তেল পড়েনি। রুক্ষ দেখাচ্ছে। শ্যামলী বললে, 'আজই ওসব খুলে বসলে কেন?'

প্রশান্ত বললে, 'আজই তো ভাল দিন। এখনও মাকে মনে আছে। এরপর তো বাবার স্মৃতির মতো ক্রমশই অস্পষ্ট আর ঝাপসা হয়ে আসবেন। ছবির মতো স্মৃতিও ক্রমশ বিবর্ণ হতে থাকে। মাকে লেখা বাবার কিছু চিঠি বেরোল। যে-কোনও সংসারী মানুষের বারে বারে পড়া উচিত। এত পুরনো চিঠি ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে আসছে।'

শ্যামলী হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়ল। প্রশান্তর মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব দূরেরও ছিল না, খুব কাছেরও ছিল না। কর্তব্য যতটুকু করার ঠিক ততটুকুই করত। মাঝে মধ্যে আসতেন। দিন কতক থাকতেন। আবার চলে যেতেন। এই আসা-যাওয়া, যাওয়া-আসায় তেমন বেদনা ছিল না; কিন্তু এই একেবারে চলে যাওয়ার বেদনা শ্যামলীকেও স্পর্শ করেছে। কী একটা ছিল মানুষটির মধ্যে। জীবন ছাড়াও আর একটা কিছু। সেই একটা কিছুই যেন সংগীতের রেশের মতো এখনও সারা বাড়ি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শ্যামলী হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিতে চাইল।

প্রশান্ত বললে, 'কী করবে?'

'পড়ব। পড়ে দেখব।'

'আমাদের পরিবার সম্পর্কে তোমার কিছু জানার ইচ্ছে আছে?'

কথাটা একটু শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ বেরিয়ে গেছে প্রশান্তর মুখ ফসকে। মনে আঘাত দিয়ে সে কখনও কথা বলে না। তবু বলে ফেলেছে। মন মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে। একটা-দুটো তিক্ত স্মৃতি সহজে মন ছেড়ে যেতে চায় না। অনেক দিন আগে শ্যামলী মাকে একবার ভীষণ অপমান করেছিল। মা উনুন থেকে দুধের ডেকচি নামাতে গিয়ে অসাবধানে উলটে ফেলেছিল। শ্যামলী বলেছিল, বয়েস হয়েছে, হাতের জোর নেই যখন তখন এসব বাহাদুরি আপনাকে কে করতে বলেছে। দিলেন তো সব উলটে ফেলে। যান, আপনি আপনার বসে বসে মালা জপ করুন। মায়ের সেদিনের করুণ মুখ এখনও চোখের সামনে ভাসছে। গরম দুধ পড়ে হাত-পা পুড়েছে। ছেলের কাছে এসে বলছেন, বড় অন্যায় করে ফেলেছি বাবা। সব দুধটাই উলটে পড়ে গেছে, তোরা কী খাবি?

প্রশান্ত কেঁদে ফেলল। সামলাতে পারল-না নিজেকে। সেই সেদিন! আজকের এইদিন! শ্যামলীও আজ ছোটদরের একটা মা। বয়েস হয়েছে। সব পাওনা এবার বুঝে নিতে হবে একে-একে।

॥ ছয় ॥

সম্বরণ অফিসে একেবারে পাক্কা সাহেব। কলকাতার সবচেয়ে বড় দরজি তার জামা প্যান্ট তৈরি করে। সবচেয়ে দামি কাপড়ে। মুখে ডানহিল পাইপ। চোখে পোলারাইজড চশমা। আলো চড়া হলে কাচের রং গাঢ় হয়। আলো কমে এলে রং সাদা হয়। প্রশান্ত মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করে বলে, সায়েব বাচ্চা।

প্রশান্তর টেবিলের উলটো দিকে বসে সম্বরণ পাইপে টোব্যাকো ঠাসতে ঠাসতে বললে, 'দেখতে দেখতে তোর মাথার চুল বেশ বড় হয়ে উঠল। ক'মাস হল বল তো?'

প্রশান্ত একটা বিজ্ঞাপনের লে-আউট দেখছিল। চোখ না তুলেই বললে, 'মাস তিনেক হয়ে গেল। সময় হু হু করে চলে যাচ্ছে।'

'বাড়ি এখন নর্মাল!'

'হ্যাঁ, চাকা এখন আগের মতোই ঘুরছে। তাই হয়, ঘটনা আসে। ওলটপালট করে দিয়ে চলে যায়। আবার ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায়।'

'শ্যামল চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। এখানে থাকলে তো চলবে না। রাইজিং কেরিয়ার।'

'ছেলেটা খুব ভাল। অনেক দূর উঠবে। রেণুর পরীক্ষা তো এসে গেল?'

'হ্যাঁ, আর তো কয়েক মাস। কী করবে কে জানে?'

'ভালই করবে। ভাল মেয়ে। তোর মেয়ে খারাপ করবে কেন?'

'না রে? বড় ভাবনায় আছি। মেয়েটা কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে অনবরত ফ্রিকশান। শ্যামলীরও দোষ আছে। নিজেকে বড় বেশি এগজার্ট করতে চায়। মেয়েটা সব সময় মোরোজ হয়ে থাকে।'

'একটু মিশতে টিশতে দিস? বেড়াতে টেড়াতে যায়?'

'পাড়াটা তেমন ভাল নয় রে সম্বরণ! চারপাশে যাচ্ছেতাই কাণ্ড চলেছে।'

'মাঝে মধ্যে তুই একটু নিয়ে বেরোস না কেন? ভাল সিনেমা। সংগীতানুষ্ঠান। দু'-এক জনের বাড়ি। আমার ওখানেও তো আনতে পারিস! তবু একটু পরিবেশ পালটাবে। স্বাধীনতা পাবে। তুই একটু ঘরকুনো আছিস বাবা!'

'না, তা নয়। অতটা ভেবে কাজ করার অভ্যাস নেই। এখন আবার পরীক্ষা এসে গেল। পড়ার চাপ।'

'রাখ তোর পড়ার চাপ। মেয়েটাকে মনে মেরে ফেলে কেরিয়ারে তুলে দিয়ে লাভ কী? সব দিকে তাকে বাড়তে দে। এই তো কাল বাদ পরশু রবিবার। তোরা রেডি থাকবি। আমি গিয়ে নিয়ে আসব। সারাদিন খুব মজা হবে। তোরা না নিজেরাই নিজেদের মারছিস। মাঝে মাঝে রুটিন ভেঙে রুটিনের মূল্য বাড়াতে হয়।'

সম্বরণ উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল। চলাটাও রপ্ত করেছে সাহেবদের মতো। পা না ভেঙে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে গটগট করে। সম্বরণ চলে যেতেই প্রশান্তর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। মায়ের মৃত্যুর পর মাসখানেক অন্য কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। শ্রাদ্ধে যথোচিত ঘটা হয়েছিল। দাদা না এলেও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভরে গিয়েছিল। শ্রাদ্ধের প্রথাটা এক অর্থে খুবই ভাল। শূন্যতায় পূর্ণতা। একজন গেলেন বহুজন এলেন। মন খারাপ হবার অবকাশ নেই। হইহই। রইরই। কান্নাকাটি। শিশুদের উৎপাত।

ব্যাপারটা থিতোতে না থিতোতেই পুরনো বাতের ব্যথার মতো আবার সমস্যারা ফিরে আসতে শুরু করেছে।

রাতের শেষে বাদুড় যেমন গাছের ডালে ডালে ফিরে এসে ঝুলে পড়ে ঠিক সেইরকম। কুকুর তেড়ে এলে শকুন মৃতদেহ ফেলে উড়ে পালিয়ে দূরে অপেক্ষা করে বসে থাকে। চলে যায় না। ফিরে আসে। বেশ নাম রেখেছিলেন সেই সাহেব লেখক তাঁর বইয়ের, ভালচার ইজ এ পেশেন্ট বার্ড।

আবার সেই রেণু সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ এমন এক ব্যামো, অনেকটা উদুরির মতো। জল বার করে দাও আবার ধীরে ধীরে জমতে শুরু করল। বুক আর পেট এক হয়ে ফুলে ঢোল। কার চিঠি, কে সেই ছেলে। একবার যদি ধরা যেত। মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিতের শরসন্ধান। শেষ পর্যন্ত কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেনসিকে না খবর দিতে হয়। হয় শ্যামলী পাগল, না হয় রেণু একটা জোচ্চোর! না, মাথায় কিছু ঢুকছে না। সত্য এখন বিশ বাঁও জলের তলায়। ফরাসি দেশ থেকে ডুবুরি আনাতে হবে। এককাপ কফি খেয়ে দেখা যাক, মাথাটা যদি খোলে। এটা কীসের বিজ্ঞাপনের লে-আউট? মাথার তেল? মেয়েরা কি মাথায় তেল মাখে উলঙ্গ হয়ে? বোল্ড। ভেরি বোল্ড। কপি লিখেছে হামিদ। নতুন ছেলে। প্রতিষ্ঠানের গর্ব। বাংলা বলতেই পারে না। চিন্তা ভাবনা সবই ইংরেজিতে। কপিটাকে বাংলা করলে মানে দাঁড়াবে : শরীরের সব চুলই ফেলে দেবার নয়। মাথার চুল যত খুশি বাড়ুক। পিঠ ছেড়ে নিতম্বে, নিতম্ব ছেড়ে উরুতে, আব কতদূরে? এলোচুলে মেয়েদের সেই আবেদন আরও বাড়বে। মেয়েটি সেই মানিকতলার মডেল। প্রথমে শুধু মুখটা নিয়েই এ জগতে প্রবেশ করেছিল। এখন পুরো শরীরটাই এসে গেছে। অর্থের কাছে বাপমায়ের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। তখন মুখ দেখাতেও আপত্তি ছিল, এখন শরীর দেখাতেও হাসিমুখে রাজি। ডাক পড়লেই স্টুডিয়োতে আসে। আর্ট ডিরেক্টার, ফটোগ্রাফার যা বলে, যেভাবে বলে তাই করে। চেহারাটা অনেকটা রেণুর বান্ধবী শম্পার মতো।

কপির ওপরের পাতলা কাগজটা প্রশান্ত ঢেকে দিল। রহস্যময় জীবনের গতি। কে যে কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যায় জীবিকার হাত ধরে! এ জগতের সবাই জানে সেক্স একটা বড় টোপ। দাড়ি কামাবার ব্লেডের বিজ্ঞাপনেও মেয়ে চাই, কোমরের বেল্ট, নেকটাইতেও মেয়ে চাই। মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ ব্যবহার। আর মেয়েদের লজ্জা ও সংস্কার যদি কোনওরকমে একবার ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে তারা ছেলেদের চেয়ে সহজেই বিবস্ত্র হতে পারে। একটা পুরুষ মডেল পেতে জীবন বেরিয়ে যায়, মেয়ে মডেল পাওয়া অনেক সহজ। কাজ করেও আনন্দ। সহজ। যা বলবে তাইতেই রাজি। কেন হবে না। হাজার বছরের সংস্কার। পুরুষের হাতে বিবস্ত্র হতে হতে সংস্কারটাই উলঙ্গ হয়ে গেছে। টান মারলেই বস্ত্র ত্যাগ।

হামিদকে ডেকে প্রশান্ত তার হাতে সমস্ত কাগজপত্র তুলে দিল। একই সঙ্গে সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপনটা একই সঙ্গে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিং পড়বে। মাথায় তেল মাখে মধ্যবিত্তরা। হোর্ডিং-এর জায়গা সেই ভাবেই ঠিক করা হয়েছে। পার্টি এসে রিসেপশানে বসে আছে। এখুনি বেরোতে হবে সাইট দেখাতে।

প্রশান্ত এক চুমুকে কফি শেষ করে বেরিয়ে পড়ল। তেল কোম্পানির প্রতিনিধির নাম মুদালিয়ার। ভালই বাংলা বলেন। অবাঙালিরা বাংলা ভাষাটা বেশ ভালই রপ্ত করেন। রোদ ক্রমশই নরম হয়ে আসছে। শহরে শীত এল বলে। সারা শহর ঘুরতে হবে। সাতটা হোর্ডিং পড়বে। গাড়ির পেছনের আসনে দু'জনে বসে আছে পাশাপাশি। মুদালিয়ার কী একটা সেন্ট মেখেছেন। বেশ মিষ্টি গন্ধ। আজকালকার ছেলেরা বেশ নায়ক নায়ক হয়ে উঠেছে। বাইরে সব কেমন চিকন সভ্য! অথচ নোংরামির ঘটনা দিনে দিনেই বাড়ছে। চোখে পড়ে। খবরে পড়া যায়। এইসব ছেলেই পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে যখন উন্মত্ত হয় তখন একেবারে আদিম চেহারা!

উত্তর কলকাতার বিশাল এক বাড়ির উত্তরের দেয়ালে একটা বিজ্ঞাপন পড়বে। সামনেই একটা পার্ক। বহুদূর থেকে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়বে। চুল এলো করে মেয়েটি দেয়ালের একপাশে সরে থাকবে। দুটো হাত মাথার ওপর তোলা। অদৃশ্য শাওয়ারের তলায় যেন এসে দাঁড়িয়েছে। স্নানের

ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। আর এক পাশ দিয়ে নেমে যাবে কপি। চুল দেহের আর একটি আকর্ষণ। অনেক কথাই উহ্য থাকবে। যেমন নগ্ন দেহে এলো চুলে সব পুরুষকেই চিত করে বুকে উঠে নাচে মা লক্ষ্মীরা। মাঝে মাঝে মনে বড় ক্ষোভ হয়। এই বিজ্ঞাপন ব্যাবসায়ীরা আর হিন্দি ছবিঅলারা যেভাবে সারা দেশে কামগন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে তাতে কিশোর আর যুবকদের সংযমের রাশ কীভাবে টেনে রাখা যাবে! রাবড়ি তৈরির কায়দা চলেছে। তলায় আগুন ওপরে পাখার বাতাস। একদিকে রাম রাম অন্যদিকে কাম কাম। রেণুর কী দোষ। রেণুকে যে চিঠি লেখে তারই বা কী দোষ! দোষী তারা যারা মানুষের প্রথম ইন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তা তৈরি করেছে। এখনও এই বয়েসেও এমন অনেক ছবি প্রশান্তর হাতে আসে যা দেখলে দেহে আগুন জ্বলে ওঠে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, সামনে দিয়ে চলে গেলে মন ক্ষণিকের জন্য হলেও চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিক্ষা আর সংযমের জোরে ছিটকে যেতে হয় না। তবে বড় ব্যাকুল হতে হয়। মনের সু অংশ কু অংশের সঙ্গে অনেক কোস্তাকুস্তি করে তবেই জয়ী হয়। কালঘাম ছুটে যায়। প্রশান্তর অনেক পরিচিত ব্যক্তি, সংসারী, পুত্র-সন্তানের পিতা, লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে ব্রিফকেসে পুরে পর্নোগ্রাফি নিয়ে বাড়ি যান। ওইটাই নাকি উচ্চ ফ্যাশান। পার্ভাশানই নাকি সভ্যতার মাপকাঠি। যে যত পারভার্টেড সে তত সভ্য। যে দেশের কবি লিখলেন, পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। সেই দেশেই রেকর্ড সংগীত, ও গিন্নি চোর ঢুকেছে মেয়ের ঘরে, প্রেম করেছি বেশ করেছি করবই তো। সেই দেশেই কামার্ত কণ্ঠ, আঃ, এসো না, আরো কাছে, এসোও না। শয়ন কক্ষে স্বামী স্ত্রী একান্তে আবেগপ্রবণ হতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম। তা বলে রাস্তায় ঘাটে একটু সংযত হতে হবে না? সব গোপনীয়তা ভেঙে দিতে হবে? আশ্চর্য ব্যাপার!

মুদালিয়ার বললেন, 'কী ভাবছেন বলুন তো?'

প্রশান্তর সংবিৎ ফিরে এল, 'না ভাবছি, পৃথিবী যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে আমাদের মতো বুড়োরা ক্রমশই মিসফিট হয়ে পড়ছি।'

'দেহের বয়স বাড়ুক, মনটাকে তরুণ রাখুন।'

'কায়দাটা যে জানা নেই!'

'ওল্‌ড ভ্যালুজ ফেলে দিন। নতুনকে হাসি মুখে মেনে নিন।'

'পারছি না যে!'

'অবস্টিনেট হবেন না। উপনিষদ বলছে, চরৈবেতি।'

'আপনি উপনিষদ পড়েন?'

মুদালিয়ার হেসে ফেলল, 'না, পড়ি না, পড়বও না। শুনে শুনে শেখা। সব ফ্যামিলিতেই কিছু কিছু প্রাচীন কথা ঘুরে বেড়ায়। কেউ না কেউ বলে।'

প্রশান্ত বললে, 'অনেকটা শ্যাওলার মতো। ভাল যা কিছু তা এখন শ্যাওলার মতো। আধুনিকতার অ্যাসিড বা ব্লিচিং পাউডারেও উঠছে না। কামড়ে ধরে আছে।'

গাড়ি রাস্তার বাঁ দিকে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। ড্রাইভার জানে কোথায় যেতে হবে, কোথায় দাঁড়াতে হবে। এ হল প্রোগ্রামের যুগ। কোন বিলিতি বিজ্ঞানী যেন বলেছেন, দিস ইজ এ প্রোগ্রামড ইউনিভার্স। অতীতে যা ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে সবই নাকি আগে থেকে ঠিক করা আছে। জগৎ চলছে বিশাল এক কম্পিউটারের নির্দেশে।

প্রশান্ত মুদালিয়ারকে দেয়ালটা দেখাল। ছ'তলা একটা বিশাল বাড়ির ফাঁক ফোকরহীন দেয়াল শহরের উত্তরদিকে তাকিয়ে আছে। খুব ভাল স্পট। পছন্দ হবেই। দেয়ালটা এক রেডিয়ো কোম্পানির খুব নেবার ইচ্ছে ছিল। বাড়িটার নীচে ব্যাঙ্ক, ওপরে নার্সিংহোম। অনেক ভেবে তেল কোম্পানিকেই দেওয়া হয়েছে। মুদালিয়ার বললে, 'খুব ভাল স্পট। পাড়াটাও কসমোপলিটন। সামনেই রেডলাইট এরিয়া। আউটসাইডারে ভরতি।'

প্রশান্ত বাড়িটার দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। তিনতলার বারান্দায় দু'জন মহিলা। দোতলায় একজন আয়া নার্সিংহোমের রুগিদের শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে ঝেড়ে ঝেড়ে।

দু'জনে আবার গাড়িতে এসে উঠল। এইবার যেতে হবে শহরের পুব দিকে। পুব হয়ে দক্ষিণ। সেখান থেকে পশ্চিম। প্রশান্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, মাথায় মাখার তেল কী এমন প্রয়োজনীয় জিনিস, বাজারে কয়েক শো ব্র্যান্ড চালু আছে, সবই এক মাল, স্রেফ বিজ্ঞাপনের জোরে চালাতে হবে। চলে যায় ভাল। না গেলে কয়েক লক্ষ টাকা জলে। যারা করছে তারা জানে, যারা করাচ্ছে তারাও জানে। এমন অনেক জিনিস প্রোমোট করতে হয় যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। এই দরিদ্র দেশে বিশাল-উপকরণ ক'জন কিনতে পারে? তেলের চেয়ে উকুনমারা ওষুধের চাহিদাই বেশি হওয়া উচিত। ফ্রন্ট ওপন ব্রেসিয়ারের চেয়ে লেঙট। হেল্থ ফুডের চেয়ে ছাতু। ছাতার চেয়ে টোকা। ক্যাপিট্যালিজম আর সোশ্যালিজম পাশাপাশি চললে এইরকম জগাখিচুড়িই হয়। মুদালিয়ারদের আসল ব্যাবসা নিশ্চয়ই আর একটা কিছু আছে। মাথায় তেল দেবার জন্যে এরা জন্মায়নি। তেল নিংড়ানোই এদের কাজ। এখনই যে ভুঁড়িটি হয়েছে সেটি কালে কত বড় হবে। গিরি গোবর্ধনের আকৃতি নেবে।

শেষ বেলায় পশ্চিমের অফিস পাড়ায় এসে প্রশান্তর কাজ শেষ হল। মুদালিয়ার বিদায় নিলেন। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'এবার কোথায় যাবেন? অফিস?'

প্রশান্ত বললে, 'না, তুমি ফিরে যাও। আমি একটু ঘুরে ফিরে বাড়ি চলে যাব আজ।'

সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করেছে। পাঁচটা প্রায় বেজে এল। অনেকক্ষণ কিছু খাওয়াও হয়নি। এই পাড়ায় একটা ভাল দোকান আছে। লুচি, কচুরি, মুগের ডালের জন্যে বিখ্যাত। অনেক দিন পরে মুখটা একটু পালটানো যেতে পারে। তারপর বিশাল বিশাল বাড়ির ছায়ায় উদ্দেশ্যহীন কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। কোম্পানির আমলের কলকাতা এখনও এখানে রয়ে গেছে। ইংরেজ আমলের বাড়ি। জি. পি. ও। ফেয়ারলি প্লেস। একটু এগোলেই হাইকোর্ট পাড়া। অ্যাটর্নিদের আস্তানা। শঙ্করের বারওয়েল সায়েব। অ্যাসেমব্লি। টাউন হল। এজি বেঙ্গল। ইডেন গার্ডেন। ফোর্ট। র‍্যামপার্ট। ওয়াটার গেট। গঙ্গা, জাহাজ।

প্রায় নির্জন দোকানে বসে প্রশান্ত ডাল আর গরম লুচি খেল। গোটা দুয়েক ক্ষীরের শিঙাড়া। মন্দ হল না। বয়েস বাড়ছে। মাঝে মধ্যে একটু লোভ হয়। পুরনো জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। পুরনো বন্ধুদের খবর নিতে ইচ্ছে করে। পুরনো গান শুনতে ইচ্ছে করে। জীবন ছোট হয়ে আসছে।

হাইকোর্টের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রশান্ত ইডেনে এসে ঢুকল। সে ইডেন আর নেই। স্টেডিয়ামে আর নার্সারিতে অনেকটাই গ্রাস করে নিয়েছে। তবু আছে। ঘোলা ঘোলা জলের সেই খাল এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পশ্চিমের সূর্য একটা সোনালি আভা ফেলেছে জলে। প্রবীণ গাছের পাতায় পাতায় শেষ বেলার পাখিদের কোলাহল। অনেকদিন পরে গোধূলির স্বাদ পাওয়া গেল। প্যাগোডায় নতুন রং পড়েছে। বোটহাউসের কাছে ইংরেজ ধরনের বেড়া। এইরকম বেড়া দেখলেই মনে হয়, সিটিং অন দি ফেনস। প্রশান্ত সত্যি সত্যিই বেড়ায় পেছন ঠেকিয়ে পায়ের খোঁটায় শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে একটু ইংরেজ হবার চেষ্টা করল। দ্রুত সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ইংরেজি ফেন্সে বসে এইবার একটু দিন শেষের বাউল সুর শুনতে পেলে বেশ হত। ইডেনে বাউল আসবে কোথা থেকে!

প্রশান্তর হঠাৎ নজরে পড়ল মাঠ ভেঙে একটি ছেলে আর মেয়ে আসছে। অ্যাডাম আর ইভ নাকি? ইডেনে তো তারাই ছিল। তাদেরই তো থাকার কথা। জোড়াটি প্রশান্তকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকে চলে গেল। ডান দিকে ভিজে ভিজে একটা আওতা মতো জায়গা। বেশ ঝাঁকড়া একটা গাছ। তলাটা উঁচু করে ইট দিয়ে বাঁধানো। জোড়াটি সেই জংলা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসল। ভাল করে তাকিয়ে প্রশান্ত মনে মনে বললে, ও বাবা, এক জোড়া নয়, জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। অ্যাঁ, সাপে কামড়াবে যে! কী সর্বনাশ! প্রেম করার জন্যে ভাগাড়ে গিয়ে বসতে হবে!

প্রেমের পদ্ম কি তা হলে ভাগাড়ে ফোটে! প্রশান্তর দেখা জোড়াটি কালক্ষেপ না করে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। এর নামই কি কুইক মার্চ? প্রশান্তর ভাব চটকে গেল। সরে পড়াই ভাল। সরবে কোথায়? যে দিকেই তাকায় সেই দিকেই প্রেমিক যুগল। কোথাও ছেলের কোলে মেয়ের মাথা, কোথাও মেয়ের কোলে ছেলের মাথা। কোথাও ঠোঁটে ঠোঁট। কোথাও কোমরে হাত। যেসব পরিবার থেকে এরা উঠে এসেছে সেইসব পরিবারে নিশ্চয়ই শ্যামলীর মতো মহিলা নেই। এরা কেউ রেণু নয়, সবাই শম্পা।

ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কাছে প্রশান্ত একটা বেঞ্চে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসল। মাঝ মাঠে আলো জ্বলে উঠেছে। প্ল্যাস্টিকের চাদর পেতে চারজনের একটি দল তাস পিটছে। ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ ছড়ি হাতে দ্রুত পায়চারি করছেন। কিছু দূরে এক অবাঙালি পরিবার, স্বামী স্ত্রী, তাদের শিশুটিকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে খুশিখুশি মুখে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। শিশুটি টলে টলে হাঁটছে, মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। তিন চারটি একক মেয়ে ছায়ায় ছায়ায় চিতার মতো ঘুরছে। নিশ্চয়ই কল গার্লস। কী মজার জায়গা! কেউ কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রশান্তরই বা অত মাথা ব্যথা কীসের! বাবা মাকে লিখেছিলেন, একটু উদাসীন হবার চেষ্টা করো। মানুষ যা নিয়ে আসে তাই দিয়ে যায়। যা করে যায় আবার তাই করে এসে।

বৃদ্ধ খুব খানিকটা চক্কর মেরে প্রশান্তর বেঞ্চের আর এক পাশে এসে বসলেন। বোধহয শখানেক পাক মারা হয়ে গেছে। এইবার একটু বিশ্রাম। হাঁটুতে মাথা রেখে ছড়িটি শুয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হয় সফল মানুষেরই প্রতিকৃতি। জীবনটাকে বেশ বুঝেসুঝেই খরচ করেছেন। যা দিয়েছেন সুদ পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রশান্ত উঠে পড়ল। বাড়ি এবার টানছে।

॥ সাত ॥

দূর থেকে দেখেই রেণুর বুক চমকে উঠল। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় শ্যামসুন্দরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাঢ় বাদামি প্যান্ট। তুঁতে রঙের জামা। হিপি চুল। বেশ কিছু দিন ভুলে ছিল। আবার জেগে উঠেছে। জাগবেই তো। ভিসুভিয়াস মাঝে মধ্যেই উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে। ধূম আর বাষ্প তুলে দেয় আকাশের দিকে।

স্কুলের গেটের সামনে শম্পা আর রেণুকে নামিয়ে দিয়ে রিকশা মোড় ঘুরে চলে গেল। তার অত মাথাব্যথা নেই। মানুষে আর মালে তার কাছে কোনও তফাত নেই। শম্পা রোজই রিকশা থেকে লাফিয়ে নামে, হুড়মুড় করে ভেতরে চলে যায়। ধীরেসুস্থে কিছু করা ধাতে আসে না। কোনও দিন পেরেকের খোঁচা লেগে যায় শাড়িতে। কোনও দিন পায়ে জড়িয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। মেয়েটার বরাত খুব ভাল। সবই একটু একটু হয়। অচল করে দেবার মতো কোনও দিনই কিছু হয় না। আজও শম্পা হুড়মুড় করে ভেতরে চলে গেল।

রেণু গেটের সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গাছতলার দিকে একবার আড়চোখে তাকাতেই সেই গা-জ্বালানো হাসিটা দেখতে পেল। আশ্চর্য ভুতুড়ে ছেলে। সেই কবে থেকে পেছনে লেগে আছে চিটে গুড়ের মতো। দেখলেই আতঙ্ক হয়। কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখুনি গেটের কাছেই হয়তো এগিয়ে আসবে পা টেনে টেনে। বাঁ পায়ে মনে হয় সামান্য ডিফেক্ট আছে। কোনও সময় কিছু একটা হয়েছিল বোধহয়। হয় ভেঙে গিয়েছিল, না হয় পোলিও।

ছেলেটি এগিয়ে আসার আগেই রেণু এগিয়ে গেল। গাছের আড়ালে চলে না গেলে জোড়া জোড়া চোখের সামনে ধরা পড়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যেই ক্লাসের মেয়েরা বলতে শুরু করেছে, 'কী রে তোর কেস কতদূর এগোল?' ভীষণ লজ্জা করে শুনতে।

গাছ আর পাঁচিলের মাঝখানে রাস্তার নর্দমার ধারে একটা আড়াল তৈরি হয়েছে। রেণু এখন ছেলেটির মুখোমুখি। ছেলেটার মুখে লাজুক হাসি। মুখ আর ওই হাসি অনেকটা আশ্চর্য প্রভাতের মতো। রেণু কঠোর গলায় বললে, 'আবার আপনি এসেছেন? কেন এসেছেন!'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ছেলেটি থতমত খেয়ে বললে, 'তোমাকে অনেকদিন দেখিনি রেণু। আমার অসুখ করেছিল। তাই থাকতে না পেরে আজ একবার চলে এলুম।'

'কে আপনাকে আসতে বলেছিল? কে আপনাকে দেখতে চেয়েছে?'

'আমার মনে হল তুমি আমাকে অনেক দিন দেখোনি। দেখো আমি কত রোগা হয়ে গেছি।'

'বেশ হয়েছে। বাড়ি গিয়ে মাকে বলুন ভাল করে খাওয়াতে। এখানে গাছতলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হবে না।'

'তুমি আমাকে দেখতে চাও না রেণু?'

'না। আপনাকে দেখলে আমার গা জ্বালা করে। দয়া করে আর আসবেন না।'

রেণু হনহন করে চলে এল। আসতে আসতে শুনল, 'তুমি কি আমার চিঠিটা পেয়েছ!'

আবার চিঠি! সে চিঠি নির্ঘাত মায়ের হাতে পড়েছে। আবার অশান্তি। যা নয় তাই মনে করে মা একেবারে পাগল হয়ে যাবে। বাবা জানে, রেণু কেমন মেয়ে। মা কিন্তু জানে না। মা যে মেয়ে! রেণু ক্লাসে এসে নিজের জায়গাটিতে বসে পড়ল। ঘণ্টা বাজছে। এখুনি ক্লাস শুরু হবে। শম্পা আড় চোখে রেণুকে একবার দেখে নিল। শ্যামলের ঘটনার পর দু'জনে একই রিকশায় পাশাপাশি এলেও মনে মনে অনেক দূরে সরে গেছে। শম্পার মা বলেছে, রেণু খুব আন-স্মার্ট, শ্যাবি। এর জন্যে দায়ী ওর মা। পরে পস্তাবে। রেণুর মা বলেছে, শম্পা একটা ধিঙ্গি। দায়ী ওর বাবা আর মা। পরে নাকের জলে চোখের জলে হবে। মেয়ে যেদিন হাত ধরে, লাথি মেরে বেরিয়ে যাবে এক লোফারের সঙ্গে। দু'দিকে দুটি ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে।

দিনের শেষ ক্লাস নিতে এলেন প্রভাদি। ক্লাস শেষে বেরিয়ে যাবার সময় রেণুকে ডেকে নিয়ে গেলেন রেস্টরুমে। রেস্টরুমে কেউ নেই। রেস্টরুমে এখন আর কে থাকবে। সব দিদিমণিরাই ক্লাস শেষ করে বাড়ি চলে যাবেন। ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। ভেন্টিলেটারে শালিকের বাসা। মা শিশুদের কাছে ফিরে এসে কাঁইচি কাঁইচি করে খুব ধমকধামক দিচ্ছে। রেণুর ভয় ভয় করছে। প্রভাদির মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। গম্ভীর মুখ আর কত গম্ভীর হবে। প্রভাদি হঠাৎ কেন ডাকলেন।

প্রভাদি একটা চেয়ার দেখিয়ে রেণুকে বললেন, 'বোসো।'

প্রভাদি মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসলেন। টেবিলের এ-ধার আর ও-ধার। কিছুক্ষণ রেণুর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ছেলেটি কে?'

রেণু চমকে উঠেছিল। হঠাৎ মনে হল তার তো ভয় পাবার কিছু নেই। অন্যায় তো কিছু করেনি। প্রভাদিকে সে শ্রদ্ধা করে। মায়ের মতো অবুঝ, আতঙ্কগ্রস্ত নয়। পুরো ব্যাপারটা খুলে বলা চলে। উপদেশ চাওয়া যায়। প্রভাদি বললেন, 'কী চুপ করে আছ কেন? তুমি তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নও বলেই জানতুম।'

রেণু মুখ খুলল। ভয়কে জয় করতে পেরেছে যুক্তি দিয়ে। রেণু বললে, 'প্রভাদি, ওই ছেলেটির নাম তপন। ওর জন্যে আমাদের বাড়িতেও ভীষণ অশান্তি হচ্ছে। আপনাকে আমি পুরো ঘটনাটা বলছি। আমাদের বাড়িতে যে মহিলা কাজ করে গত বছর তার মেয়ের বিয়ে হল চাঁদা তুলে। বাবাও কিছু সাহায্য করেছিল। ছেলের বিয়ের আংটিটা বাবাই বোধহয় দিয়েছিল। আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি। মেয়েটি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত।'

রেণু হঠাৎ থেমে পড়ল। মুখ দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে। প্রভাদি বললেন, 'কী হল? কীসের আতঙ্ক?'

আতঙ্ক এখন একটাই। রিকশা যদি শম্পাকে নিয়ে চলে গিয়ে থাকে আর রিকশাওলা যদি মাকে

বলে, রেণু দিদিমণিকে দেখতে পায়নি তা হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। মা তেড়েমেরে বেরিয়ে পড়বে খুঁজতে। রেণু বললে, 'রিকশা যদি চলে যায়।'

'দাঁড়াতে বলে এসো।'

'আপনি না বলে দিলে শম্পা চলো চলো বলে নিয়ে চলে যাবে।'

'আসার সময় হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এসে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রভাদি বেরিয়ে এলেন। তখনও কিছু কিছু মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। প্রভাদি একজনকে ডেকে বললেন, 'শম্পাকে একবার ওপরে আসতে বলো তো। আমি ডাকছি।'

প্রভাদি বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে আকাশ দেখতে লাগলেন। রেণু বললে, 'আমি যাব? ডেকে আনব?'

'দরকার কী? শুধু খাটবে কেন? ও ডেকে দেবে।'

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ওপরে ফিরে এসে বললে, 'শম্পা নীচে নেই। দরোয়ান বললে, চলে গেছে।'

প্রভাদি বললেন, 'কীরকম তোমার রিকশাওলা রেণু? একটু দাঁড়াতে পারে না।'

রেণু বললে, 'রিকশাঅলার দোষ নেই। শম্পা বলেছে হয়তো, রেণু যাবে না। বাড়ি গিয়ে মাকে বলবে, রেণুকে কোথাও দেখতে পেলুম না মাসিমা! মা অমনি খুঁজতে বেরোবে। দিনকাল ভাল নয়, দিনকাল ভাল নয় করে করে মায়ের মাথা প্রায় খারাপ হয়ে গেছে।'

'মায়ের আর দোষ কী? দিনকাল কেমন সে তো তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ।। যাক এখন তা হলে কী করা যায়?'

'আপনি একবার বাড়িতে ফোন করবেন?'

'ফোন! তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?'

'হ্যাঁ।'

'চলো অফিস ঘরে।'

রেণু ডায়াল করে নম্বরটা ধরে দিল। মা ধরেছিল। রেণু বললে, 'তোমার সঙ্গে প্রভাদি কথা বলবেন। একটু ধরো।'

প্রভাদি শ্যামলীকে বললেন, 'রেণুকে আমি একটু আটকে রেখেছি। ভাববেন না। ঠিক সময়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার।'

ওপাশ থেকে মা কী বলল কে জানে? প্রভাদি রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'চলো আমার বাড়িতে বসেই কথা হবে। আমি চাই না তুমি কোনও বাজে পাল্লায় পড়ো।'

রেণুকে নিজের ঘরে বসিয়ে প্রভাদি কাপড় পালটে এলেন। প্রভাদির নিজস্ব একটা বড় চেয়ার আছে। চেহারার সঙ্গে মানানসই। পায়ের ওপর পা তুলে সেই চেয়ারে বসলেন। আগের চেয়ে রেণুর এখন মনের জোর বেড়ে গেছে। ঘরোয়া পরিবেশে প্রভাদি আর টিচার নন, অনেকটা কাছের মানুষ। রেণু বললে, 'কখনও কখনও সেই মেয়েটি তার মায়ের বদলে দু'-একদিন কাজও করত। আমরা দু'জনই সমবয়সি। ভাব হয়ে গেল। সে সুখ-দুঃখের কথা বলত। আমাদের বাড়ির একটা শিক্ষা, কাজের লোকও বাড়ির একজন। আমরা বড় ওরা ছোট এমন অহংকার যেন মনে না আসে। তাই মেয়েটির বিয়েতে মা বললে, তুই একবার গিয়ে দাঁড়া নয়তো ভাববে ছোট মনে করে এল না। যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হল সে ফুলের ব্যাবসা করে। এই ছেলেটি ছিল বরযাত্রীদের দলে। বিয়ের রাতে আর পরের দিন সকালে দু'-চারটে কথা হয়েছিল। সেই থেকে পাগলের মতো আসে আর যায়। মাঝে মধ্যে চিঠি লেখে। বিশ্বাস করুন, আমি প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছি। বাড়িতেও প্রচণ্ড অশান্তি হচ্ছে। বললে শোনে না। কোনওদিন স্কুলের সামনে, কখনও আমাদের

বাড়ির মোড়ে, পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকবে। মুখে অদ্ভুত একটা বোকাবোকা হাসি। আপনি আমাকে বাঁচান।'

রেণুর কথা শুনতে শুনতে প্রভার অনেক দিন আগের একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। কালিম্পং-এর ঘটনা। বেড়াতে বেড়াতে পা বেয়ে কখন একটা জোঁক উরুতে উঠে এসেছিল। এতটুকু টের পায়নি। বেশ রক্ত শুষে যখন পুরুষ্ট হয়েছে তখন টের পাওয়া গেল। ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। ফরসা ধবধবে শরীরে আঙুলের চেয়ে বড় আর মোটা লাল টকটকে এক প্রাণী সেঁটে আছে। কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। জোঁকের কামড়। সারা দেহ দিয়ে কামড়ে পড়ে আছে। শেষে খানিকটা নুন ছিটোতে তিনি খসে পড়লেন। আর নয়, পরের দিনই কলকাতায় পলায়ন। রেণুর ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকম। মানুষ জোঁকে ধরেছে। সহজে ছাড়বে না। নুন ছিটোতে হবে। প্রভাদি বললেন, 'তোমার কাছে ওর কোনও চিঠি আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'কাছে আছে?'

রেণু বইয়ের ভেতর থেকে দু'ভাজ করা একটা চিঠি বের করে হাতে দিল। প্রভাদি চিঠির ভাঁজ খুলে বললেন, 'বাঃ হাতের লেখাটা তো খুব সুন্দর। কী লিখেছে? তোমাকে লেখা চিঠি আমি পড়ব না। অসম্মানজনক কিছু লিখেছে কি?'

'না, তেমন কিছু লেখেনি। আপনি পড়তে পারেন। কবিতার মতো। অর্ধেক বোঝা যায়, অর্ধেক বোঝা যায় না।'

প্রভাদি একটা ডায়েরি বের করে ছেলেটির ঠিকানা লিখে নিলেন। রেণুর হাতে চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'ছিঁড়ে ফেলো। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ওই ওয়েস্টপেপারে ফেলে দাও।'

রেণুর একটু ইতস্তত ভাব প্রভাদির চোখ এড়াল না। যতই হোক একটি ছেলের চিঠি উঠতি বয়েসের একটি মেয়েকে লেখা। বয়েসটা যে বড় খারাপ। প্রেমের বয়েস, মান-অভিমানের বয়েস, কল্পনাবিলাসী হবার বয়েস। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছেন প্রভাদি। রেণু চিঠিটা কুচিকুচি করে বাস্কেটে ফেলে দিয়ে এল। ছেলেদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচার কী রাস্তা! তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যাওয়া। মাথার সব চুল উঠে ঘেয়ো কুকুরের মতো হয়ে যাক। চোখের কোলে একপোঁচ কালি। মাংস ঝরে বকের মতো গলা। প্রভাদি চোখের সামনে নিজের অতীত দেখতে পাচ্ছেন। ষোলো থেকে আজ পর্যন্ত বয়েসের প্রতিটি মাইল-পোস্টে একজন করে পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রীজীবনের প্রেমিকাদের তবু একটা চরিত্র ছিল। আবেগ ছিল, কল্পনা ছিল, পবিত্রতা ছিল। কর্মজীবনের সবকটাই রাসকেল। কারুর ড্যাবা-ড্যাবা বোয়ালের মতো চোখ। কারুর গুলি গুলি সাপের মতো চোখ। কারু গন্ডারের মতো নাক। কারু বাজপাখির মতো, কারুর শিম্পাঞ্জির মতো ঠোঁট, কারু ছুঁচোর মতো। কারু কারু গতর মোষের মতো, কেউ উটপাখি। সকলেরই এক প্রস্তাব, এসো একটু মজা দেখি। কেউ বলে বিনিময়ে প্রোমোশন দোব, সহজে ডক্টরেট পাইয়ে দোব, আমার গাড়িতে লিফট দোব, তোমার পায়ের তলায় হামাগুড়ি দোব। অবশেষে মুরগি যখন হাতের মুঠোয় এসে যাবে তখন কাবাবের স্বপ্ন দেখব। প্রভাদি বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই রেণু, এরপর যেদিন দেখব সেদিন বেশ হুঁশিয়ার করে দোব। সামনে তোমার পরীক্ষা। অন্য কোনও দিকে মন দেবে না। ভাল করে পড়াশোনা করে যাও। জেনে রাখো পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই। আছে কিছু শর্ত, কিছু দাবি, কিছু চুক্তি। বড় হও বুঝতে পারবে। প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ায় কিছু নেই। চটির প্রয়োজন ফুরোলেই আঁস্তাকুড়ে। সসপ্যান ফুটো হলেই লোহালক্কড়অলার ঝুলিতে। ফুল শুকোলেই মাটিতে। গোলাপি স্বপ্ন না দেখে কাজ করে যাও।'

প্রভাদির মেয়েটি দু'থালা লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে এল। রেণু আগে একবার দেখেছিল।

তখন ছোট ছিল। এখন তার মতোই বড় হয়েছে। দেখতে সুন্দর হয়েছে। পাশাপাশি দাঁড়ালে প্রভাদির মেয়ে বলে মনে হতে পারে।

'যাও ওই বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে এসো। সাবান আছে, তোয়ালে আছে।'

কোথাও কিছু খেতে রেণুর ভীষণ লজ্জা করে। হাঁ করে খাবার ঢোকাতে হবে, চিবোতে হবে। চিবোবার সময় শব্দ হবে। কেমন যেন বোকা বোকা লাগে। খাবার এসে গেছে। এখন না বললে দিদি ফায়ার হয়ে যাবেন। ন্যাকামি একদম সহ্য করতে পারেন না।

হাত ধুয়ে, মুছে রেণু চেয়ারে এসে বসল। পাখার বাতাসে ফুলো ফুলো লুচি কাঁপছে। লুচি বড় লোভনীয়।

'নাও শুরু করে দাও। ঠান্ডা করে লাভ নেই।'

যতদূর সম্ভব কম হাঁ করে রেণু একটুকরো লুচি মুখে ঠেলে দিল। বেগুন ভাজার পাশে একটা কাঁচা লঙ্কা। প্রভাদি বেশ খোশ মেজাজে খাচ্ছেন। রেণুর মতো অত লজ্জা নেই। কেন থাকবে! নিজের বাড়ি। দাঁতে এক টুকরো লঙ্কা কেটে ঝালের স্বাদ নিতে নিতে বললেন, 'তোমার মা বুঝি খুব কড়া?'

'অসম্ভব কড়া। এত কড়া যে মাঝে মাঝে তেতো লাগে।'

'বাঃ ভাল বলেছ। বাংলাতে তুমি খুব ভাল শুনেছি। অন্য সব সাবজেক্ট কেমন?'

রেণু এত মাথা নিচু করে খাচ্ছে, থালার সঙ্গে মুখ প্রায় ঠেকে গেছে। কথা যেন টেবিলের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। রেণু বললে, 'মন্দ না। ইংরেজিটায় সামান্য অসুবিধে ছিল, মাস্টারমশাই ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন।'

'তোমার মাকে আমি এসব কথা জানাব না, তবে তুমি কিন্তু কেয়ারফুল হবে।'

ফুলকাটা কাপে চা এসে গেল। মেয়েটি অসম্ভব কাজের। চা দেখে রেণু ঘাবড়ে গেল। চা খাওয়া তো তার অভ্যাস নেই? গুরুজনের সামনে সমবয়সির মতো চা খাওয়া যেন পাকামি? মৃদু গলায় বললে, 'আমি যে চা খাই না।'

'খাও না, আজ খাবে। এমন কিছু অখাদ্য নয়। এমন কিছু বয়সও নয় যে রাতে ঘুমের অসুবিধে হবে।'

প্রভাদিতে আবার প্রভাদি ফিরে আসছেন। সেই কঠিন, কর্কশ গলা। এ গলা রেণুর খুব চেনা। স্নেহের ভাব মিলিয়ে যাচ্ছে। রেণু একটু ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি গরম চায়েই চুমুক মেরে ঠোঁট আর জিভ পুড়িয়ে ফেলল। প্রভাদি রেণুকে লক্ষ করছিলেন। ব্যস্ততা চোখ এড়াল না। নরম গলায় বললেন, 'আস্তে আস্তে খাও। তাড়ার কিছু নেই। ট্রেন ফেল করার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

রেণু সহজ হবার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারল না। এখন মনে হচ্ছে, তার যেন অসুখ করেছে। সামনে বসে আছেন প্রভাদি নয়, একজন ডাক্তার। এই লুচি, বেগুন ভাজা, চা, উপদেশ সবই হল ওষুধ। বড় অসুস্থ রেণু। তার বসন্ত হয়েছে। গায়ে গুটি বেরিয়েছে। দূরে সরিয়ে রেখে তাকে সাবধানে আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে হবে।

সন্ধে হয়ে গেছে। জানালার বাইরের আকাশ ইস্পাতের মতো কালো, নিশ্ছিদ্র। তারার ছিদ্র খুঁজে নিতে হবে। এখন দুশ্চিন্তা, কে রেণুকে বাড়ি নিয়ে যাবে! প্রভাদি যদি বলেন, তুমি এবার যাও, একলা সে কী করে যাবে? অনেকটা পথ। এ কথা ঠিক মা তাকে ভিতু করে দিয়েছে। আগের মতো তার আর সাহস নেই। বাইরে যেন বাঘভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খালি কাপ নামিয়ে রেখে প্রভাদি বললেন, 'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি?' রেণু আশ্চর্য হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ আমি। কেন আমি তোমাদের বাড়ি যেতে পারি না?'

'আপনার কষ্ট হবে যে!'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, একটু বেড়ানো হবে। এমন সন্ধে!'

প্রভাদির বাড়ির কাছেই রিকশা স্ট্যান্ড। রিকশাঅলারা বেশ খাতির করে। সিটে ঠ্যাং তুলে তুলে সব বসে ছিল। প্রভাদিকে দেখে ওদেরই মধ্যে একজন মুখের বিড়ি ফেলে তড়াক করে পা নামিয়ে রিকশার সিট থেকে সাইকেলের সিটে হড়কে এসে গাড়িটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এল। দু'জনে উঠে বসল পাশাপাশি। আসনের তিনের চার ভাগে প্রভাদি। একের চার ভাগে রেণু বসে আছে আড়ষ্ট হয়ে। প্যাডেলে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে চালকের পেছন দিকটা সিট ছেড়ে উঠে উঠে পড়ছে। বেশি ভারী হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ উসখুস করে রেণু বললে, 'আপনি মাকে কিছু বলবেন না।'

'সে তো আগেই তোমাকে বলেছি। এক কথা একশো বার বলো কেন মেয়েদের মতো!'

রেণু সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেল। বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে বাতি জ্বলছে। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশ নিকষ কালো। শীত আসছে। ঝোপ-ঝাড়ের কাছ দিয়ে যাবার সময় বোঝা যায়। কেমন একটা ঠান্ডা ভাপ গায়ে এসে লাগছে। উনুনের ধোঁয়া তেমন আর আকাশে ছড়াতে পারছে না। মাটি থেকে কিছুটা ওপরে জনপদের মাথার উপর আঁচল এলিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একটা ক্লান্ত ফেরিঅলা মাথায় অ্যালুমিনিয়াম বাসনের বোঝা নিয়ে একপাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে। দিন ফুরিয়ে গেছে। হাঁকাহাঁকি শেষ।

বাড়ির গেটে শ্যামলী দাঁড়িয়ে। রেণু জানে আসতে দেরি হলে মা এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। সে রেণুই হোক কি প্রশান্তই হোক। শ্যামলীকে বলে বোঝানো যাবে না। গেটের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেই কি একটা মানুষ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। বললেই বলবে, আমি না দাঁড়িয়ে পারি না। সময়ে কেউ ফিরে না এলে ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়। স্থির থাকতে পারি না।

দূর থেকে দেখে প্রভাদি বললেন, 'তোমার মা মনে হয় দাঁড়িয়ে আছেন তোমার অপেক্ষায়।'

'মায়ের ওই এক অভ্যাস। সবেতেই দুশ্চিন্তা।'

'মা হও তখন বুঝবে কীসের দুশ্চিন্তা।'

রিকশা থামল। প্রভাদি বললেন, 'এক পাশে রাখো, এখুনি ফিরে যাব।'

শ্যামলী এগিয়ে এসে গেট খুলতে খুলতে বললে, 'তা কি হয়। এখুনি ফেরা চলবে না। বসতে হবে। অনেক কথা হবে। চা খেতে হবে। অত সহজে ছাড়ছি না। রিকশা তুমি চলে যাও।'

শ্যামলীর কথায় সবসময় একটা আদেশের সুর থাকে। পৃথিবীকে খুব নিজের ভাবলেই এমনটা হয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবই যেন আমার নির্দেশে চলছে। মানুষ তো কোন ছার!

প্রভা ব্যক্তিত্বের এই সংঘর্ষে একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনার মেয়েকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলুম, পৌঁছে দিয়েছি, এখন আমার ছুটি।'

'সে আমি বুঝব। এখন আপনি আমার হাতে। চলুন ভেতরে চলুন।'

প্রভার হাত ধরে শ্যামলী ভেতরে নিয়ে চলল। রেণু পেছনে পেছনে আসতে আসতে মায়ের কাণ্ড দেখছিল। একটা পুলিশ-পুলিশ ভাব। ধর-পাকড়ে ওস্তাদ। চেষ্টা করলে ভাল ডিটেকটিভও হতে পারত। ব্যোমকেশ, ফেলুদা কোথায় লাগে! যে-কোনও মানুষকে হাতের মুঠোয় আনার অসীম ক্ষমতা। বকে, ধমকে, ভাল কথা বলে যে-কোনও লোককে দিয়ে যে-কোনও কাজ করিয়ে নিতে পারে। তা না হলে ওই মোড়ের রকবাজরাও মায়ের কথায় ওঠে আর বসে। সাংঘাতিক সব চরিত্র। যাদের কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

প্রভাদি প্রথমে একটু অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন। কতক্ষণ আর ওভাবে বসবেন! ধীরে ধীরে শরীরের শক্তভাব নরম হয়ে এল। চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'ঘর-সংসার বেশ ভালই সাজিয়েছেন।'

শামলী বললে, 'আমার হাত নেই সবই ওর বাবার কেরামতি।'
'বেশ টেস্ট আছে ভদ্রলোকের।'
'বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করে করে বাড়িটাকেও বিজ্ঞাপনের মতো করে ফেলেছে।'
শ্যামলী হাঁক ছাড়ল, 'রেণু চায়ের জল বসা।'
প্রভা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমরা এইমাত্র লুচি চা খেয়ে বেরিয়েছি।'
'কী করে? স্কুলে ওসব মেলে নাকি?'
'আমরা তো স্কুল থেকে আসছি না। আসছি আমার বাড়ি থেকে।'
'সে তো অনেকক্ষণ খেয়েছেন। এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে। এখন একটু ঘুগনি খাবেন, দুটো মিষ্টি খাবেন, এক কাপ চা খাবেন।'
প্রভা খুব রূঢ় গলায় বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমি যখন তখন যেখানে সেখানে খাই না।'
শ্যামলী চুপসে গেল। এক ফুঁয়ে তার মুখ অন্ধকার। সব মানুষকেই সহসা আপন করা যায় না। পৃথিবীটা যত সহজ ভাবে ততটা সহজ নয়। কার অহংকার কখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! বিশেষত শিক্ষিত সমাজের।
শ্যামলী অবাক চোখে বললে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন।'
প্রভাদি একটু লজ্জা পেয়ে গেছেন। শ্যামলী জানে না, আমি প্রেশারের রুগি। সারাদিন ছাত্রী ঠেঙিয়ে চট করে মাথা গরম হয়ে ওঠে। বেশি বাদানুবাদ সহ্য হয় না। ছেলেবেলা থেকেই চট করে রেগে ওঠা আমার স্বভাব। কেউ কিছু জোর করে ঘাড়ে চাপাতে এলেই মাথা আগুন হয়ে ওঠে। যে কারণে সংসার করা হল না। মুখে হাসির ভাব এনে বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বলেই বললুম। আপনার হাতের ঘুগনি আর চা খেয়েই আমি যাব। তবে একটু পরে। আসুন না কিছুক্ষণ কথা বলি। খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না।'
শ্যামলীর মুখে হাসি ফুটল। আবহাওয়া আবার সহজ সরল হয়ে উঠল। ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলার মতো হয়েছিল। কলিংবেল বেজে উঠল। প্রশান্ত এসে গেছে। রেণু গেছে দরজা খুলতে। প্রশান্ত ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। ঘরে উনি কে? চার বাতির ঝাড় জ্বলছে। দেয়াল আলো জ্বলছে। সেই আলোকে আরও আলোকিত করে বসে আছেন এ কোন বিশালাক্ষী! ঘরে যেন রূপের বন্যা বইছে। নিজের ঘরে নিজেরই ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। শ্যামলী বললে, 'চলে এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, প্রভাদি, রেণুর স্কুলের শিক্ষক।'
প্রশান্ত ঘরে ঢুকে হাতের প্যাকেট টেবিলে রেখে হাত জোড় করে নমস্কার করল। প্রভাদি চেয়ার থেকে নিজেকে সামান্য তুলে হাসি মুখে নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। বয়েসের তুলনায় প্রশান্তকে তরুণ দেখায়। কপালে চুল ঝুলে পড়েছে। ক্লান্ত মুখের চেহারা। দু'চোখে কৌতুকের ঢেউ খেলছে। একে কি বলে, হিউমার অফ লাইফ! প্রশান্ত চেয়ারে বসে বললে, 'আমাদের কী সৌভাগ্য! আপনার কথা রেণুর মুখে কত শুনেছি! আজ আপনি এলেন। আমার ওই প্যাকেটটারও সৌভাগ্য। যাও শ্যামলী ওটা খুলে ফেলো। কতক্ষণ এসেছেন!'
'বেশিক্ষণ নয়। দশ-পনেরো মিনিট হবে।'
'রেণু কেমন করবে বলে মনে হয়?'
'ভালই করবে। ও বেশ সিরিয়াস। ওপর চালাকি ভালবাসে না। নিজস্ব একটা চরিত্র তৈরি হয়েছে। জীবন গঠনে যার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।'
'আমার ওই একমাত্র মেয়ে। অনেক স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই না থেকে যায়।'
'ওয়ান চাইল্ড সিন।'
'তা যা বলেছেন। তবে আমি নিজে ভাগ্য বিশ্বাসী।'
'অ্যাসট্রলজি?'

'না, ডেসটিনি।'

প্রভার বেশ ভাল লাগছিল কথা বলতে। একা একা দিন কাটে। সঙ্গ বলতে ছাত্রীরা। অবসর সময়ে কিছু বই। রেডিয়ো। বয়েস বাড়ছে। এখন একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে। কথা শুনতে ইচ্ছে করে। জীবনের ঝাঁঝ, অহংকার সবই কমে আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বড় একা। সমস্যার ধার অনেকদিন থাকে, আদর্শের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ পালটাতে থাকে। মানুষ যা নিয়ে যাত্রা শুরু করে, চলতে চলতে তা ফুরিয়ে যায়।

প্রভা বললেন, 'এ যুগেও আপনি নিয়তিকে বিশ্বাস করেন?'

'ভীষণ করি। অদৃশ্য মহাশক্তি সর্বত্র তার কাজ করে চলেছে। এ হল আমার উপলব্ধি। আমি বিশ্বাস করি। আমার জীবনে আমি অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'হ্যাঁ, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তবে কিছু সত্য আছে, যা প্রমাণ করা যায় না। উপলব্ধি করতে হয়। রিয়েলাইজেশান। আমাদের একটা এনট্রি আর একজিট পয়েন্ট আছে। ঢুকব আর বেরোব। এটা সত্য। কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না; কিন্তু মাঝের যে যে স্প্যানটা সেখানে এক-এক জন এক-এক রকম। আর সেইটাই হল আমাদের ডেসটিনি। আপনি শিক্ষক। কেন আপনি শিক্ষক? আমি কেন শিক্ষক নই। অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির একজিকিউটিভ। কেন? হোয়াই? কখনও ভেবে দেখেছেন কি মানুষ কোথা থেকে কোথায় চলে যায়! কে নিয়ে যায়!'

ঘুগনি নিয়ে এল। স্টিলের চামচে আলো পড়ে ঝকঝক করছে। ধবধবে সাদা চমচম। প্রভাদি সব দেখে বললেন, 'আজ রাতে আর খেতে হবে না।'

শ্যামলী বললে, 'খুব কমই দিয়েছি। অসুবিধে হবার কথা নয়।'

দাঁড়াবার সময় নেই শ্যামলীর। চায়ের জল চড়িয়ে এসেছে। দু'জনের আলোচনা যেটুকু কানে এসেছে শ্যামলীর কাছে তা অর্থহীন। পৃথিবীতে দুঃখে সুখে বাঁচতে এসেছি। ও জীবন, মৃত্যু, নিয়তি, মানুষ কী, মানুষ কেন, অতসব তত্ত্বকথা তার মাথায় ঢোকে না। সংসারে আছি, সংসারের কথা বলো, মেয়ের পড়াশোনা, বিয়ের ভাবনা ভাবো। ভাল জামাই, নাতি-নাতনির স্বপ্ন দেখো। খরচ কমিয়ে, পয়সা জমিয়ে একটু একটু করে গয়না গড়াও। এসবের তবু মানে হয়। তা না জীবন, নিয়তি! সময় নষ্ট। এর চেয়ে তাস খেলা ঢের ভাল।

প্রশান্ত বললে, 'কী খুব ঝাল লাগছে?'

প্রভা বললেন, 'আমার ঝাল খাওয়া বেশ রপ্ত আছে।'

প্রশান্ত বললে, 'শ্যামলী একটু জীবন বিলাসী। ঝালে, ঝোলে, অম্বলে হাবুডুবু খেতে ভালবাসে, লেস ইনটেলেকচ্যুয়াল।'

'সংসারের পক্ষে সেইটাই সুখের জানবেন। পুরুষদের এক জগৎ, মেয়েদের আর এক জগৎ। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ জগৎ। ইনটেলেকচ্যুয়াল স্ত্রী হলে আপনার কষ্ট, জীবনযাত্রা অনেক দুরূহ হয়ে যেত।'

শ্যামলী দু'কাপ চা হাতে আবার এল। আসতে আসতে প্রশান্তর কথা তার কানে গেছে। প্রভাদিকে খুব পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে। প্রথম যখন ঘরে এসেছিল তখন যেন কতই ক্লান্ত। তেল তেল কপালে চুল ঝুলছে। চোখের উজ্জ্বলতা কম। ঘুম ঘুম ভাব। এখন বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে। জিনিস পুরনো হয়ে গেলে হেলাফেলার হয়ে যায়। নতুন কাপ ডিশ প্রথম প্রথম ঝিয়ের হাতে পড়ে না। ওরে বাব্বা, ডিজাইন নষ্ট হয়ে যাবে, সোনালি বর্ডারটা তুলে ফেলবে। নিজেরাই সাবধানে ধোও, মুছে তুলে রাখো। তারপর যেই পুরনো হল দরদ কমে এল। তখন চা-টাই আসল। কাপ ধরে রেখেছে। প্রয়োজনের জিনিস। তার বেশি কিছু নয়।

শ্যামলী চা রাখতেই প্রভা বললেন, 'এইবার একটু বসুন না। তখন থেকে অনবরতই ছুটোছুটি করছেন!'

শ্যামলী অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো মুখ করে বসল। প্রভার পাশে সব দিক থেকেই সে নিষ্প্রভ। চেহারায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে। তার গায়ে তেলের, মশলার, পেঁয়াজের, মাছের, সংসার-সংসার গন্ধ। তার চুলে আঠা। হাতে হলুদের দাগ। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভা বললেন, 'মেয়েকে আপনারা দেখেন? কী করে না করে?'

প্রশান্ত হেসে বললে, 'একটু বেশিমাত্রায়। মেয়ে ফোবিয়াও বলতে পারেন।'

'ওকে কি আপনারা ভীষণ শাসনে রেখেছেন?'

'মায়ের শাসন সময় সময় একটু বাড়াবাড়ির দিকেই চলে যায়। তখন বাবাকে সামাল দিতে হয়।'

প্রভা হাসি হাসি মুখে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অত শাসনের প্রয়োজন হয় কেন?'

শ্যামলী বললে, 'দিনকাল তো দেখছেন। ছেড়ে দিলে কোথায় গিয়ে হাজির হবে কে বলতে পারে! আমি এই একটা ব্যাপারে প্রাচীন মত ভাল বলে মনে করি। মেয়েদের বেশি স্বাধীনতা দিলে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। মেয়েদের মাত্রা জ্ঞান এমনিই একটু কম।'

প্রশান্ত হেসে ফেলল। শ্যামলী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসলে কেন?'

'তোমার কথাটা তোমার ক্ষেত্রেও খাটে। যে-কোনও ব্যাপার তোমার হাতে পড়লে তিল থেকে তাল হয়।'

শ্যামলী প্রশ্ন করল, 'যেমন?'

'যেমন বললে অনেক পুরনো কথাই টেনে বের করতে হয়। কী দরকার জল ঘোলা করে।'

'হ্যাঁ তা তো বলবেই। তুমি তো সারাদিন বাইরেই থাকো, সব ল্যাঠা তো আমাকেই সামলাতে হয়।'

'তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

প্রভা হাসতে হাসতে বললেন, 'থাক থাক, ঝগড়ার দিকে চলে যাচ্ছে। আমি একটা কথা বলতে চাই, শাসন ভাল, ক্যালাস হতে আমি বলছি না, তবে শাসনের বাড়াবাড়িটা হয়তো ভাল নয়। তাতে পার্সোন্যালিটি ডেভালাপ করে না। মানুষ কুঁকড়ে যায়। অভিমানী হয়ে ওঠে। বিদ্বেষ জমা হয়। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওটা ঠিক না, এটা তো বোঝেন, যুগ পালটাচ্ছে।'

শ্যামলী বললে, 'তা হলে তো অনেক কথাই আমাকে বলতে হয়।'

প্রশান্ত বললে, 'কেন উতলা হচ্ছ। ওই তোমার দোষ। তুমি কী বলবে আমি জানি। হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখার দিন আর নেই। চারপাশে যা ঘটছে তাতে মানুষের ভাগ্যটাকে একটু বিশ্বাস করতে শেখো। যা হবার তা হবে। যা হবার নয় তা হবে না।'

শ্যামলী বিরক্ত হয়ে বললে, 'তোমাকে ভাগ্যে পেয়েছে। আমি মনে করি, ভাগ্য মানুষ নিজেই তৈরি করে। এলে দিলে ভগবানের বাবারও ক্ষমতা নেই কিছু করেন।'

প্রভা হাত তুলে বললেন, 'আজ এই পর্যন্তই থাক। ব্যাপারটা বাঁকা দিকে চলে যাচ্ছে। মানুষের মন বড় সূক্ষ্ম জিনিস। সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। আজ আমি উঠি। আর একদিন আসব। রেণু কোথায়?'

রেণু দরজার বাইরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কথা কোন দিকে যায়। প্রভাদি না বলেই ফেলেন, মা না লাগিয়ে বসে! একটা চিঠি ডাকে ঘুরছে, না মায়ের হাতে এসে পড়েছে, কে জানে! রেণু দরজার পাশ থেকে সরে এসে বললে, 'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ যাই। রাত বেশ হল। তুমি পড়ছ না?'

'হ্যাঁ পড়ছিলুম।'

শ্যামলী প্রশান্তকে বললে, 'তুমি একটা রিকশা করে দাও, বরং এগিয়ে দিয়ে এসো। এতটা পথ একলা যাবেন!'

এই না হলে শ্যামলী! দুম করে এমন প্রস্তাব করবে অস্বস্তির এক শেষ। একই রিকশায় একজন

অবিবাহিতা মহিলার পাশে বসে প্রশান্ত কী করে যায়? মহিলাই বা কী বলে সম্মতি দেবেন। এটা তো বিলেত নয়। প্রভা তাড়াতাড়ি বললেন, 'কোনও দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব। দেশের অবস্থা এখনও ততটা ভয়াবহ হয়ে ওঠেনি।'

পাড়ার চেনা রিকশাই প্রভাদিকে নিয়ে রাস্তার বাঁক ঘুরে চলে গেল। ভাড়া প্রশান্তই মিটিয়ে দিয়েছে।

রাত প্রায় দশটা। খাওয়া দাওয়া শেষ। বাড়ি থমথমে। রাত থমথমে। পাড়াও শান্ত। কাদের বাড়ির দোতলা থেকে গান ভেসে আসছে, আমার বলার কিছু ছিল না। চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে। প্রশান্ত নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। দিন কতক হল সে আবার শার্লক হোমস পড়তে শুরু করেছে। বেশ আরাম লাগে। নিজেকে ছেলেবেলার মতো সুখী সুখী মনে হয়। শ্যামলী এখনও রান্নাঘরে ঠনঠান করছে। তিনজনের ছোট্ট সংসার। কী যে এত কাজ প্রশান্তর মাথায় আসে না। বললেই বলবে, তুমি কী বুঝবে? সংসার করারও পদ্ধতি আছে। সেটাও একটা বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানটা শ্যামলী মনে হয় জানে না। রোজ রাতে সব কাজ শেষ করে শুতে আসে তখন একেবারে ক্ষত বিক্ষত, শ্রান্ত। সংসার যেন আঁচড়ে কামড়ে ছেড়ে দিয়েছে। কারখানার শ্রমিকও বোধহয় অত ক্লান্ত হয়ে দিনের শেষে বেরিয়ে আসে না।

প্রশান্ত পড়ছে, শার্লক হোমস বলছেন, ডিয়ার ওয়াটসন, তুমি একটা হাসিখুশি পরিবারে মুখভার কুকুর পাবে না কিংবা মুখ ভার পরিবারে হাসিখুশি কুকুর। এই কুকুরটাকে দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে! ওই একই কথা মনে হচ্ছে মিস্টার প্রশান্ত, রেণু আর তার মা হল এই পরিবারের হাওয়া মোরগ। তুমি কেউ নও। তুমি হলে ট্যাঁকশাল। মাঝে মাঝে অনারারি কনসালটান্ট। যার উপদেশ চাওয়া হয় কিন্তু মানা হয় না।

প্রশান্তর হঠাৎ মনে হল, সম্বরণের সঙ্গে প্রভার বিয়ে দিলে বেশ হয়। তোফা হয়। সাংঘাতিক মানাবে। দূর থেকে পিতা প্রশান্তের মতো দেখব, সংসার কেমন জমে উঠছে। কীভাবে যোগাযোগ করানো যায়। রেণুর জন্মদিন করে দু'জনকেই নিমন্ত্রণ করলে হয়। ওদের বিয়ে হিন্দু মতে পিঁড়েতে বসে মানাবে না। ইংরেজি বিয়ে হবে। রেজিস্ট্রি করে। ওরা তো খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে চার্চেও যেতে পারে। উঃ সে আরও মানাবে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, প্রভা বিয়ের গাউন পরে চার্চের বিশাল বিশাল সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে, পেছন পেছন গাউনের সাদা ন্যাজ নেমে আসছে খস খস শব্দ করে। পাশেই বো পরা সম্বরণ, হাতে লাল গোলাপ। না, লাল গোলাপ নয়। শেষে সেই রেড রোজের নায়কের মতো যদি হয়ে যায়! সাদা গোলাপই ভাল। এক তোড়া সাদা গোলাপ, সুযোগ পেয়ে প্রশান্তর চিন্তা লন্ডনের কুয়াশা ঢাকা পথে হোমসের ফিটনের মতো টগবগ করে ছুটছে। পাতা ওলটাতেই ভাঁজ করা একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। প্রশান্তর সম্পর্কে এক দিদি লিখেছেন। মাঝে মধ্যে দু'জনে চিঠি লেখালিখি হয়। প্রশান্ত যখন সমস্যায় সমস্যায় দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন দিদিকে চিঠিতে মনের ভার নামায়। মন খারাপের সময় পুরনো চিঠি বের করে পড়ে। আজ তেমন মন খারাপের দিন নয়, তবে মনে অন্য এক ধরনের উতলা হাওয়া বইছে। বছর শেষের ব্যাঙ্কের হিসেব নিকেশের মতো মনের অ্যাকাউন্টেন্ট বসে গেছে লেজার খুলে। নাঃ, মনে এখনও তেমন বৈরাগ্য আসেনি। কাম ট্যাঁস ট্যাঁস করছে। যত দুঃখের মূল। প্রশান্ত চিঠি খুলে প্রথম প্যারাটা আর একবার পড়ল। গৌরীদি লিখছেন, 'প্রশান্ত স্নেহভাজনেষু, মানুষ নামে প্রাণীটা যে মোটেই প্রেডিক্টেবল নয়; মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি কোনও শাস্ত্রের সাহায্যেই তার আচার আচরণ নির্ভুল ভাবে ফোরকাস্ট করা যাবে না।' ঠিক তাই। আর সেই কারণেই দিন থেকে দিনে এত তফাত। 'ম্যাও'। প্রশান্ত চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল, তার ভেতরটা বুঝি হঠাৎ ডেকে উঠল! না, সেই পাঁশুটে রঙের বেড়ালটা জানলায় এসেছে। ম্যাও মানে কী?

শ্যামলী ঘরে এসেই হইহই করে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। বউরা বেড়াল সহ্য করতে পারে

না। মনে হয়, সতিন মরেই বেড়াল। বেড়ালটা প্রশান্তর চিন্তার মতোই তড়াক করে লাফ মেরে পালাল। শ্যামলী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে লাগল। বেশ শাশুড়ি-শাশুড়ি চেহারা হয়েছে। কল্পনা, অনুভূতি শুকিয়ে গিয়ে মনের অবস্থা তলাধরা খিচুড়ির মতো। চুলের গোড়া ধরে ঝাপটা মেরে মেরে ডগা খুলছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে প্রশান্তর দিকে তাকাচ্ছে। এই জিনিস দেখেই কি কালিদাস লিখেছিলেন?

ভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভানাম্‌-।

চুল খুলে শ্যামলী খাটে বসল। প্রশান্তর মনে হল এইবার বিশাল একটা ডাবর খুলে বড় বড় দু'খিলি পান দোক্তা সহ মুখে ফেললে দৃশ্য সম্পূর্ণ হয়। প্রভার সঙ্গে তুলনা করলে শূন্য নম্বর দিতে হয়। রসগোল্লা পাওয়া শ্যামলী। ফুলমার্ক পাওয়া প্রভার ওদিকে সংসার জুটল না। একে বরাত ছাড়া কী বলবে। নিয়তির হাত।

শ্যামলী বললে, 'পড়বে না শোবে?'

'শুয়েই পড়ি। ভীষণ মশা হয়েছে। শীতের মুখে মশা হয়। একটু ধুনোটুনো দিলে পারো তো?'

'অত সময় নেই।'

'সারাদিন করো কী?'

'আমার অনেক কাজ।'

'অ। চুলে কত দিন শ্যাম্পু পড়েনি?'

'মনে নেই।'

'সপ্তাহে একবার দিলে ক্ষতি কী?'

'কী হবে দিয়ে? আমি তো আর চুল এলো করে নাচতেও যাব না, প্রেমের বয়েসও চলে গেছে।'

'বেশ গরম হয়ে আছ মনে হচ্ছে, তাওয়ার মতো।'

'হতে পারে।'

'কী হল কী তোমার?'

'কী আবার হবে?'

প্রশান্ত আর বেশি ঘাঁটাতে সাহস পেল না। বলা যায় না কী থেকে কী হয়ে যায়। কথায় বলে, সেকরার ঠুক ঠাক, কামারের এক ঘা, ধাঁই করে এমন কিছু বলে বসবে জীবনটাই অন্তত দিন সাতেকের মতো পানসে হয়ে যাবে। বিশ্রী, বিস্বাদ। অবশ্য চলতে চলতে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। মশার কামড়ের মতো। বেশ ফুলেটুলে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। কে যেন বলেছিল, মশার কামড়ের একটা বিউটি আছে। ফোলাটায় বেশ কিছুক্ষণ হাত বোলাতে বড় ভাল লাগে। এক ধরনের বিলাসিতা। অনেকে নাকি কোমরের কাছে সিকি ভর দাদ পোষে চুলকোবার আনন্দে। দাম্পত্যজীবন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। পাশাপাশি দুটো ভিন্ন ধাতু। তাপ বাড়লে বা কমলে আনুপাতিক হারে একটা যতটা বড় হবে আর একটা ঠিক ততটাই ছোট হয়ে পেন্ডুলামের দৈর্ঘ্য ঠিক থাকবে। ঘড়ি স্লো, ফার্স্ট হবে না।

প্রশান্ত বিছানায় ঢুকে পড়ল। এখন তার ছোট হবার পালা। বালিশে মাথা রাখতেই ঘর-সংসার চালচিত্রের মতো কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকল। দৃষ্টি এখন আর ভুঁয়ে নেই, আশেপাশে নেই। সোজা ওপরে। শ্যামলী আলো নিবিয়ে খাটে এল। সংসারতরণী যেন দুলে উঠল। অনেক দিন হল, খাটের কবজা ঢিলে হয়ে গেছে। শরীরের মতো। শব্দ করে। নড়বড় করে। শব্দ করে। কোথা থেকে একটা আলোর রেখা সিলিং-এ এসে পড়েছে। মনে হয় রাস্তার আলো ভেন্টিলেটার গলে চুরি করে ঢুকেছে। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সারাদিনের ঘটনা ছবির মতো প্রশান্তব চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বেশ মজা লাগে। নিজের অভিনয় করা ছবি দেখার মতো। নায়ক থেকে দর্শকের আসনে। বাস ট্রামের জটলা পেরিয়ে প্রশান্ত রাস্তা পার হচ্ছে। ফুটপাথ ধরে চলেছে মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে। অফিসের চেয়ারে বসে আছে। হাত পা নেড়ে পাকা পাকা কথা বলছে। বাসের আসনে বসে দুলতে দুলতে, ঢুলতে ঢুলতে চলেছে। বাজারে সামনে ঝুঁকে পড়ে মাছ দর করছে। পথের পাশের দেবালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে, চোখ বুজিয়ে প্রণাম করছে। বিড়বিড় করছে ঠোঁট দুটো। যখন চোখ খুলছে চোখের মণি দুটো ধীরে ধীরে কপালের দিক থেকে মাটির দিকে নেমে আসছে। শুয়ে শুয়ে হেঁটে যেতে বেশ অদ্ভুত লাগে। প্রশান্ত হাঁটছে হাঁটছে। শুয়ে আছে এক তলে, হেঁটে চলেছে অন্য তলে।

শ্যামলী প্রশান্তর উলটো দিকে পাশ ফিরে শুয়েছে। কী হল কী আজকে! গৌরীদি ঠিকই লিখেছেন, মানুষের মন কখন কী সুরে বেজে উঠবে কেউ জানে না। মায়ের মৃত্যুর পর প্রশান্ত এত দিন কীরকম গুম মেরে ছিল। ধীরে কথা, ধীর চলন। হঠাৎ সন্ধেবেলা রেণুর স্কুলের দিদিমণির সঙ্গে কত উচ্ছ্বাসের কথা! জীবন-দর্শন শিলাবৃষ্টির মতো টিনের চালে চটর পটর করে পড়ছে। সেই দৃশ্যটাও এখন চোখের সামনে পরদায় ভাসছে। প্রভার কানে ফোঁদল লাগিয়ে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা কথা ঢালছে। বিষাদ তখন কোথায় চলে গেছে। এই তিন-চার মাসে মা কতদূরে চলে গেছেন। তাই না প্রশান্ত? বহু আলোকবর্ষ দূরে। ইয়া আল্লা!

প্রশান্তর মন-ঘড়ির টিক টিক হঠাৎ থেমে গেল। শামলীর অভিমান হয়েছে। ওই যে প্রভার সঙ্গে গদগদ গলায় অতক্ষণ কথা বলেছে। বড় অপরাধ করে ফেলেছে। কথায় কথায় বলে, মন না মতিভ্রম! তার মতিভ্রম হয়েছিল। এখন যদি গায়ে হাত রাখে খ্যাঁক করে উঠবে। এত বয়েসে দেয়লা আর ভাল লাগে না। মাকে লেখা বাবার আর একটা চিঠির উপদেশ মনে পড়ল। বাবা লিখছেন, বানপ্রস্থ এখনও আছে। বেদ আধুনিক মানুষের কাছে পাত্তা পায় না। জঙ্গল কেটে ছেঁটে সাফ। সবই ঠিক। সারা জীবনই সংসারী মানুষকে সংসারেই থাকতে হবে। কিন্তু একটা সময়ে সকলেই বুঝতে পারে, সংসার তাকে আর চাইছে না। তার মতামতের আর কোনও দাম নেই। কেউই পাত্তা দিচ্ছে না। চক্ষুলজ্জায় ফেলেও দিতে পারছে না। আছে যখন থাক। দুটো খেতে পরতে দাও, নয়তো সমালোচনায় কান পাতা যাবে না। বারান্দার এক কোণে একটা চেয়ারে বুড়োর স্থান। সবাই আসে যায়, খায় দায়, ফুর্তি করে, ঝগড়া করে, কোঁদল করে, ইচ্ছে হলে বুড়োর দিকে তাকায়, হয়তো দুটো কথা বলে, নাও বলতে পারে। গোটা কতক ছেঁড়া ছেঁড়া বই, বাসী খবরের কাগজ নিয়ে বুড়ো বসে থাকে সারাদিন। কখনও ভাবে সবই তো আমার, ছাড়ব নাকি এক হুংকার! একদিন হয়তো ছেড়েই ফেলল। সে হুংকার হল ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভের হুংকার। সংসার তটস্থ হল না। পুত্র, পুত্রবধূ দৌড়ে এল না। বুড়ি এসে দাবড়ে গেল। একে তোমরা কী বলবে? সংসারেই বাণপ্রস্থ।

ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়ল। জীবন থেকে দুঃখ সুখের আর একটি দিন নিঃশব্দে ঝরে পড়ল সময়ের স্রোতে।

॥ আট ॥

সব সমান। যেমন বাপ, তেমন মেয়ে। পরের ছেলের দোষ দেবার আগে নিজের ঘরের ছেঁদায় পুলটিশ দেওয়া উচিত। বাপ উলটে পড়লেন স্কুলের দিদিমণিকে দেখে। মেয়ে উলটে পড়লেন কে এক ফুলঅলার বন্ধুকে দেখে। বুড়ো বয়েসে কত প্রেম! আজ আবার মেয়ের হাত দিয়ে কোন এক কোম্পানির ডট পেন পাঠানো হল প্রভাসুন্দরীকে। তিনি আবার উপদেশ দিয়ে গেলেন, শাসন ভাল, শাসনের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। নিজে সারাজীবন আইবুড়ো সরস্বতী হয়ে রইলেন, উপদেশ দিতে

এলেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার। স্কুলে এক ঘণ্টা মেয়ে চরালেই সব জানা হয়ে গেল? এরপর বাপ যাবেন মেয়ের চিঠি নিয়ে প্রেমিকের কাছে। নিয়তি, জীবন, ভাগ্য, পূর্বজন্ম, পরজন্ম, যত ছাইপাঁশ মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছেন। সর্বনাশের যতটুকু বাকি আছে সাধুগিরি ফলাতে গিয়ে সেটুকুও আর বাকি থাকবে না। আশকারায় আশকারায় মেয়ের মুখ হয়েছে কী? সবসময় ফ্যাঁস ফোঁস করেই আছে। মাকে কুকুর শেয়ালেও অধম জ্ঞান করে।

শূন্য বাড়ি। রেণু স্কুলে। প্রশান্ত অফিসে। বেলা প্রায় তিনটে। রোদ পড়ে এসেছে। শ্যামলী জানালার ধারে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে আছে। কোলের ওপর মলাট ছেঁড়া একটা পুরনো বই। তখন থেকে এক লাইনও পড়া হয়নি। এলোমেলো চিন্তা চলেছে। মনের মাঠে এমন কেউ নেই যে হেঁকে বলতে পারে, ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গলের দিকে যাচ্ছ কেন? এই তো এই দিকে এতখানি ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। চোখ বেলা শেষের আকাশে, মন সংসারের ঘোলা জলের আবর্তে, শ্যামলী বসে আছে। ভগবান একটু আনন্দ দাও, একটু নিশ্চিন্ত হতে দাও।

আনন্দ এল প্রফুল্লদার হাতে চিঠির চেহারা নিয়ে। চিঠিটা নিতে নিতে শ্যামলী জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে কেমন আছে?'

একটু ইতস্তত করে প্রফুল্লদা বললেন, 'বিপদটা মনে হয় কেটে এসেছে। এ যাত্রা বেঁচে গেল।'

শ্যামলী আর একটু এগোল, 'কেউ ধরা পড়েছে?'

'ধরেছিল। ছেড়ে দিয়েছে।'

'কেন?'

'আজকাল সেইটাই নিয়ম।'

'তার মানে দোষীর সাজা হবে না?'

'একটু উলটে দিন। দোষীদের নির্দোষী ভাবুন, নির্দোষীদের দোষী।'

প্রফুল্লর কাঁধে সাইডব্যাগ, হাতে কিছু চিঠি। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল। বেচারা পালাতে পারলে বাঁচে। পা দুটো ছটফট করছে। যে বাড়িতেই যায় সেই বাড়িতেই এক প্রশ্ন, মেয়ে কেমন আছে? কেউ ধরা পড়েছে? কী হয়েছিল? শ্যামলী এখনও শেষ প্রশ্নটা করেনি। এখনই হয়তো করবে। কী করেছিল উত্তর তার জানা নেই। মেয়ের আত্মজীবনীতে লেখা হবে। এই বয়েসের মেয়েরা কী করে, বাপ হয়ে সে কেমন করে বলবে? তার মেয়ে কি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বলবে, বাবা আমি এই করেছিলুম। বলবে না। যত দিন বেঁচে থাকবে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে আর বলবে, ওই যে সেই মেয়েটা, ওই যে সেই বাপটা। হয় পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে, নয়তো সহ্য করে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রফুল্ল চলে যেতেই শ্যামলীর চোখ চলে গেল চিঠির দিকে। লাফিয়ে উঠল। রেণুর নাম লেখা, গোটা গোটা সুন্দর অক্ষর। ঝুল কালো কালি। এই তো পেয়েছি। এর আগে তো এমন হাতের লেখা আসেনি। তুমি আবার কে এলে? রেণুর বাবা যতই বলুক পরের চিঠি পড়তে নেই, সকলেরই একটা প্রাইভেসি আছে, আমি তা মানছি না, মানব না। মেয়ে তো পর নয়। আমার মেয়ে, তার চিঠি। আরামবাগ থেকে আসতে পারে। রাঁচি থেকে শ্যামল লিখতে পারে। শ্যামলী আলোর দিকে খামটা তুলে চিঠিটা ভেতরে কীভাবে কোন জায়গায় আছে দেখে নিয়ে একটা পাশ ছিঁড়ে ফেলল। দু'ভাঁজ করা ছোট্ট একটা চিঠি খাম ছেড়ে বেরিয়ে এল।

প্রিয়তমা রেণু,

আমি এক পাগল। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা। তবু মাঝে মাঝে ভাবি সাধনার জোরে মানুষ তো চাঁদকে ধরেছে। চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছে। এ সব আমি জেনেছি তোমার মতো বই পড়ে নয়, কাগজ পড়ে। আমার কাগজ কেনার পয়সা নেই। আমি সকালে কাগজ বিলি করি। হকার। শুনে নাক সিঁটকো না। দুপুরে আমি আর্ট কলেজে পড়ি। স্কুল ফাইন্যাল পাশও করেছি। তবে

ফার্স্ট ডিভিশানে নয়। সেকেন্ড ডিভিশানে। আর সাত নম্বর পেলে ফার্স্ট ডিভিশান হত। আমার মতো ছেলে এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট করবে কী করে? এই যা হয়েছে, আমি মনে করি যথেষ্ট। তুমি আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে না। তাই এত কথা লিখতে হল।

কেন আমি তোমার জন্যে পথেঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি আমি নিজেই জানি না। আর্ট কলেজে আমার সঙ্গে অনেক মেয়ে ছবি আঁকা শিখছে। তাদের সঙ্গে মেলামেশাও করি। কিন্তু তুমি আমার মন কেড়ে নিয়েছ। আমি রকবাজ লোফার নই। আমি একজন আর্টিস্ট। ছবি খুব খারাপ আঁকি না। তুমি দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতে।

জানি তোমরা বড়লোক। কালচারড, এডুকেটেড হাই সোসাইটির মানুষ। তোমার মা আবার ভীষণ কড়া। তোমার বাবা শুনেছি ভীষণ ভাল মানুষ। তিনি হয়তো বুঝবেন, আজকাল ছেলেতে মেয়েতেও বন্ধুত্ব হয়। সেটা কিছু দোষের নয়। তাতে চরিত্র খারাপ হয় না। বরং ভালই হয়। তোমার মায়ের জন্যেই আমার জেদ চেপে গেছে। তাঁকে আমি দেখাতে চাই পৃথিবীতে ভাল ছেলে শুধু বড় ঘর থেকেই আসে না। তিনি যাদের ছোট মনে করেন এমন ঘর থেকেও আসতে পারে। তোমার মায়ের ভীষণ বড়-ছোট জ্ঞান। আমার বন্ধুর মুখে শুনেছি। সে যাকে বিয়ে করেছে তার মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে। কাজ কাজ। কাজের আবার বড় ছোট কী? আমি সকাল বেলা বাড়ি বাড়ি কাগজ বিলি করি। তাতে কি আমার মনুষ্যত্ব ছোট হয়ে গেল! বোধহয় না। এ বছর আমি আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে যাব। এখনই আমি একটা বিলিতি প্রতিষ্ঠানে ফ্রি-লান্স করি। বলা কি যায় আমিও হয়তো একদিন তোমার বাবা যেরকম বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেইরকম কোনও প্রতিষ্ঠানে আর্ড ডিরেক্টার হয়ে যাব। কে বলতে পারে মানুষের ভাগ্যের কথা। হয়তো বিদেশও ঘুরে আসব! অহংকারের কোনও মূল্য নেই রেণু।

আমাকে দেখলেই তুমি এমন ভাব করো যেন বাঘ কি ভাল্লুক দেখছ। তোমার অবশ্য দোষ নেই। তোমার মা যেভাবে দেখতে শেখাচ্ছেন তুমি সেইভাবেই দেখতে শিখছ। তোমার মা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, তুমি যখন দূর কলেজে পড়তে যাবে, তখন কী হবে। তখন তো তুমি চোখের বাইরে। তখন তুমি যেভাবে চলবে সেই ভাবটাই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। যেমন বোঝাবে তেমনি বুঝতে হবে। তুমি যেমন খেলাবে সংসার তো তেমনি খেলবে। পুলিশ দিয়ে কি অপরাধ ঠেকানো যায়। অপরাধী নিজে যদি না সাধু হয়। আপ সাচ্চা তো জগৎ সাচ্চা।

কয়েক দিন সকালে ভিজে ভিজে কাগজ বিলি করে কাল থেকে বেশ জ্বর হয়েছে। কেঁপে কেঁপে আসছে। ঘাম দিয়ে ছাড়ছে। ছেলেবেলায় পা ভেঙেছিল। সেই পা-টাকে তখন ঠিকমতো জোড়া লাগাতে পারেনি। এখন মাঝে মাঝেই বেশ কষ্ট দেয়। বিশেষ করে বর্ষা বাদলায়।

জ্বর ছেড়ে গেলেই তোমার স্কুলের সামনে একদিন যাব। মুখ ঘুরিয়ে চলে যেয়ো না যেন। অনেক কথা আছে। কাজের কথা। তোমার না থাকলেও আমার আছে। একটা ব্যাপারে তোমার মতামত চাইব। ভালবাসা নিয়ো।

ইতি তোমার তপন

শ্যামলী চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। মুক্তোর মতো সুন্দর হাতের লেখা। ঝরঝরে ভাষা। একটাও ভুল বানান নেই। শব্দের ভুল ব্যবহার নেই। বইয়ের ভেতর থেকে প্রথম যে চিরকুটটা পেয়েছিল সেটাতে তা হলে সত্যিই ফিতে মুড়ে এসেছিল। না চিঠি। সেটাও একটা চিঠি নয় তো। বিশ্রী হাতের লেখা, অশুদ্ধ বানান, কাঁচা ভাষা। যে যাই বলুক, সেটাও একটা চিঠি। আর একটা ছেলে আছে। এ ছেলেটির সব ভাল, তবে কমুনিস্ট। বড় লোক, গরিব লোক, অনেকটা উদয়ের পথের ভাষা। কে বলেছে আমার বড়লোকি চাল। আমিই তো বাবা তোমার বন্ধুর বিয়েতে রেণুকে প্রায় জোর করেই পাঠিয়েছিলুম। সে খবর তো তুমি রাখো না। রেণুর বাবাই বরং

আভিজাত্যের গুমরে মাঝে মধ্যে ফেটে পড়ে। আমার মেয়ে, আমার বংশ, আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা। হ্যাঁ, আমি কড়া মা। আমি আমার মেয়েকে রাস্তায় রাস্তায় প্রেম করে বেড়াতে দোব না। লেখাপড়া শেষ করবে, আমি তখন নিজে পছন্দ করে, ছেলে দেখে, ঘটা করে বিয়ে দোব। আমার একমাত্র মেয়ে, আমি ছেলের বংশ দেখব, ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখব, সব দেখব। তুই কে রে? সেদিনের চ্যাংড়া। আমাকে উপদেশ দিতে আসিস! আমার মেয়ে, না তোর মেয়ে। ডেঁপো ছোকরা। জানিসই যখন এত ফারাক তখন মেয়েটার পেছনে সেই থেকে লেগে আছিস কেন আদাজল খেয়ে? জ্ঞানপাপী। তোমার দাওয়াই হল কান ধরে কষে দুই থাপ্পড়। সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। মাই ডিয়ার প্রশান্তবাবুকে দিয়ে হবে না। যাদের দিয়ে হবে তাদের সঙ্গে একটু খাতির জমাই। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। বুনো ওলের মুখে জল নয়, চাই বাঘা তেঁতুল। বুঝলে তপনকুমার।

শ্যামলী চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে থেমে পড়ল। আচ্ছা! এইবার বুঝেছি। কেন সেদিন প্রভাদি রেণুকে স্কুলে আটকে রেখেছিলেন! কেন নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে। কেন গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে এসেছিলেন, শাসন ভাল, শাসনের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তার মানে প্রভাদির কাছে রেণু হয় ধরা পড়ে গেছে, না হয় এর পেছনে প্রভাদির কোনও স্বার্থ আছে। কীসের স্বার্থ! না স্বার্থ নেই। স্বার্থ কেন থাকবে। প্রভাদি রেণুর ভালই চান। কিছু করার আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত। সে তো আবার রেণুর সাহায্য ছাড়া হবে না। রেণুকে কিছু জানানো চলবে না। কায়াকে হাটাতে পারলেই ছায়া সরে যাবে। শ্যামলী চিঠিটা খামে ভরে আলমারিতে তুলে রাখতে না রাখতেই রেণু এসে গেল।

তপনের কথা রেণুর মনেই ছিল না। শিয়রে সংক্রান্তি। পরীক্ষা এসে গেছে। পড়া নিয়েই বেচারা আধমরা। আজ স্কুলের সামনে তপন ছিল না। রিকশা থেকে নামতে নামতে চোখ একবারই সেই অভ্যস্ত জায়গায় চলে গিয়েছিল। গাছতলায় কেউ ছিল না। সারাদিনে রেণু একবার মাত্র ভেবেছিল, তপনের চিঠিটা গেল কোথায়? যদি মায়ের হাতে গিয়ে পড়ে তা হলে আবার এক পক্কড় অশান্তি হবে। বাবা যতই বলুক, বুঝলে শ্যামলী সংসারে এখন শান্তি বিরাজ করতে দাও। সামনে রেণুর পরীক্ষা। দাও বললেই কি দেওয়া যায়। মায়ের ইচ্ছেতেই জগৎ চলছে।

শ্যামলী ভালমানুষের মতো মুখ করে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে আজ যেন একটু দেরি হল!'

এই শুরু হল। এইরকম কথা শুনলেই ভক্তি শ্রদ্ধা সব চটকে যায়। ট্রেনের সময়ে কি মানুষ চলতে পারে! দু'-দশ মিনিট এদিক ওদিক হতেই পারে। নাও এখন কৈফিয়ত দাও। রেণু গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার রিকশা আজ যেতে দেরি করেছে।'

'কেন?'

'কেনর উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার রিকশাঅলাকে জিজ্ঞেস করে এসো।'

দু'জনেরই সর্বাঙ্গ রাগে চিড়বিড় করছে। রেণুর কাটাকাটা জবাব শুনে শ্যামলীর তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছে। বলতে ইচ্ছে করছে, চোরের মায়ের বড্ড গলা। আর একটু হলে বলেই ফেলেছিল। অসম্ভব সংযম মুখে এসে আটকে গিয়ে শুধু বড় রকমের একটা হুঁ বেরোল।

রেণুর ইচ্ছে করছিল, সমস্ত বইপত্তর ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেঝেতে বসে পা ঠুকতে। বলতে ইচ্ছে করছিল, পুলিশ দিয়ে দেশ শাসন হয় না মা জননী। তোমার সেকেলে পদ্ধতি ছাড়ো। একটু একেলে হবার চেষ্টা করো, ভাবনা ভাবনাই রয়ে গেল। রেণুর মুখ দিয়েও বেরোল হুঁ।

ওই হুঁ-টা না বেরোলেই ভাল হত। শ্যামলী কালীপটকার মতো ফেটে পড়ল, 'ভেংচি কেটো না রেণু। তোমার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। তুমি কী করো, না করো সব আমি জানি। আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। চোরের মায়ের বড় গলা শোভা পায় না। যার মুখে চুন কালি তার অত মেজাজ কীসের?'

রেণু ভুরু কুঁচকে বললে, 'তার মানে? স্কুল থেকে আসতে না আসতেই তুমি দেখছি খুব ঝেঁটাতে

শুরু করেছ। তোমাকে আমি কখন ভেংচেছি গো? তোমার যখন অতই খবরদারি হয় তখন তুমি নিজেই একটা সাইকেল রিকশা কিনে ফেলো, না হয় আমাকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখো। রোজ তোমার রিকশা যেতে দেরি করবে আর রোজ বাড়ি ফিরে আমাকে তোমার মুখ শুনতে হবে, ও আমার ভাল লাগে না। কই আরও তো অনেক মা আছে, কই তারা তো অমন করে না।'

রেণু একটা ঢোঁক গিলল। মুখ দিয়ে আর একটু হলেই ছোটলোকমি শব্দটা বেরিয়ে আসছিল।

শ্যামলী ঝনঝন করে উঠল, 'তাদের কারু তোমার মতো উড়ু উড়ু মেয়ে নেই। যে বয়েসের যা বুঝেছ? তোমার এখন লেখাপড়ার বয়েস। নায়িকা হবার বয়েস হয়নি।'

'তার মানে?'

'মানে তোমাকে আমি পরে বোঝাব। তখন ওই থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে।'

'আরে যাও, যাও।'

না, এরপর আর কথা চলে না। এরপর একটা চড় চলতে পারে। হাত নিশপিশ করছে। দাঁতে দাঁত চেপে নিশপিশে হাতকে বাধ্য রাখতেই হবে। আজকাল আবার বাবা বাছার যুগ পড়েছে। বেশি কেন, অল্প শাসনেই ছেলেরা হয়ে যাচ্ছে সমাজবিরোধী আর মেয়েরা করছে আত্মহত্যা। পেপার কাটিংস রাখা প্রশান্তর অনেক দিনের বাতিক। রেণুকে, শ্যামলীকে শিক্ষা দেবার জন্যে এখন আবার ওইসব কেচ্ছাই নানা কাগজ ঘেঁটে কেটে কেটে খাতায় জুড়ে রাখে। এর নাম নাকি চোখ ফোটানো খাতা। প্রশান্তর ধারণা মানুষের চোখ ফুটতে ফুটতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। কে জানে বাবা? কী থেকে কী হয়। শ্যামলীদের কালে এত সাইকোলজি, ফাইকোলজি ছিল না। তাতে কি কারু কোনও অসুবিধে হয়েছিল। সকলেই তো মানুষ হত। যে বেগড়াবে সে বেগড়াবে। ধোপা যেমন বলে, এ কাপড়টার ধাতই খারাপ, যতই কাচান ঠিক মতো সাদা হবে না মা। এ হল ধাতের ব্যাপার। কেউ সারাজীবনই হাসিখুশি। কারু সারাজীবনই গোমড়া মুখ। কারু চড়া ধাত, কারু নরম ধাত। এখনকার মতো এমন বিদঘুটে ধাত সে যুগে দেখা যেত কি? অন্যায় করব, চোখ রাঙাব, কিছু বললে নিজেকে মেরে অন্যকে মারব। এ যেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের জাপানি বোমারু। উড়োজাহাজ আর বোমা নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল জাহাজের চিমনিতে। আমিও মরি, তুইও মর। দু'তরফই যমের বাড়িতে।

শ্যামলী মেয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। মেয়েছেলে জন্মায় কেন? এই তো নারীজন্মের সুখ। যাবার মধ্যে তিনটে জায়গা। শোবার ঘর, রান্নাঘর আর বাথরুম। শেষ যাবার জায়গা শ্মশান। কালেভদ্রে, ন'মাসে-ছ'মাসে একটু এদিক ওদিক। ওই পুরুষ শয়তানরা শাস্ত্রে লিখে গেছে আবার, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে! সন্তান ধারণ আর সন্তান পালন নারীর একমাত্র কর্তব্য। গালিভার্স ট্রাভেলে একটা ছবি দেখেছিল, দৈত্যের মতো গালিভারকে লিলিপুটরা মাটিতে পেড়ে ফেলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, খোঁটা আর দড়ি দিয়ে, পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে গা বেয়ে উঠছে। ছেলেরা মেয়েদের সেইভাবেই বাঁধতে চায় ছানাপোনা, নেন্ডিগেন্ডি, হাতাখুন্তি, গ্যাস, প্রেশার কুকার। গালিভার জানে একবার নড়ে উঠলেই খোঁটা তোঁটা সব উপড়ে কুপোকাত। মেয়েরাও জানে একবার বাসুকির মতো নড়ে উঠলেই সংসারে ভূমিকম্প, তবু নড়তে পারে না। অনেক দিনের সংস্কার। এখনকার মেয়েরা কিন্তু বেশ নড়তে চড়তে শিখেছে। বাসুকিরা বেরিয়ে পড়েছে। এইবার বুঝবে বাছাধনেরা। সাত চড়েও রা কাড়ে না এমন মেয়ে অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে।

রেণু বেশ একটা ভাল মন নিয়েই বাড়ি ঢুকেছিল। শীত এসে পড়েছে। সারাদিন রোদ ঝলমলে। আকাশ নীল। কোথাও মেঘের নোংরামি নেই। বিকেলের দিকে ঝাঁক ঝাঁক চালচটকা পাখি নেচে নেচে উড়ছে। মনটা বেশ খুশি খুশিই ছিল। মায়ের এই হেডমাস্টার হেডমাস্টার ভাবটা দেখলেই গা জ্বলে যায়। তখন আর মাথার ঠিক থাকে না। বাড়িতে তো দুটি মাত্র প্রাণী। কথা বলার আর লোক কোথায়? একটা বেড়াল থাকলেও হত। তবু তার সঙ্গে আপন মনে কথা

বলা যেত। এ যা হয়ে গেল এখন ক'দিন কথা বন্ধ থাকবে কে জানে। মানুষ খামোকা কেন যে অশান্তি তৈরি করে।

লম্বা হয়ে শীত সন্ধ্যার ছায়া নামছে। নীল আকাশ একটু একটু করে ধূসর হয়ে আসছে। দিন যায়। দূর থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। গাছগাছালির ফাঁকে প্রশান্তদের হলুদে বাড়ির চিলেকোঠায় ঘরে ফেরা পাখি ডানায় ঠোঁট ঘষছে। রেণু একা ঘরে রেডিয়ো খুলেছে। সুর ভেসে উঠছে আকাশের দিকে। বারান্দায় নীল শাড়ি হাওয়ায় দুলছে। শ্যামলী রান্নাঘরে ডালে ফোড়ন দিয়েছে। ছ্যাঁ করে শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগন্ধ বাতাসে। লাল আর সাদা কৃষ্ণকলি ফুল ফুটেছে। সন্ধ্যার প্রথম ঝিঁঝি উঠোনের কোণে শ্যাওলা ধরা দেয়ালের গায়ে রাতকে বিদীর্ণ করার জন্যে অল্প অল্প পাখা কাঁপাতে শুরু করেছে।

॥ নয় ॥

বাড়ি ফেরার পথে প্রশান্তর হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। এমন কিছুই নয়। শহর কলকাতায় এ দৃশ্য আকচার চোখে পড়বে। প্রশান্ত পথ পেরোবার জন্যে ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির স্রোত কমলেই ও-পারে যাবে। এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে প্রশান্তর পাশে দাঁড়ালেন। পাকা চুল, সাদা কাপড়, হাতে একটা গেরুয়া কাপড়ের ব্যাগ। বৃদ্ধা প্রথমবার রাস্তায় নেমে এক পা এগিয়েই আবার পেছিয়ে এলেন ভয়ে। দূরে গাড়ির সারি দেখলে রাস্তা পার হওয়া যায় না। মনে হয় ছুটে এসে চাপা দিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও সেই একই দ্বিধা। বারে বারে পথে নামছেন, ভয় পেয়ে ফুটপাথে ফিরে আসছেন। প্রশান্তর হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বৃদ্ধাকে হাত ধরে পথ পার করাতে করাতে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবেন আপনি? গিয়েছিলেন কালীঘাটে যাবেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে এক আশ্রমে দিন কতক থেকে চলে যাবেন বৃন্দাবনে। প্রশান্ত বৃদ্ধাকে দক্ষিণেশ্বরের বাসে বসিয়ে দিয়েছিল। প্রশান্তর চিবুকে হাত রেখে বলেছিলেন, আমার ছেলেও এতবড়ই হয়েছে। কোথায় সেই ছেলে? এই শহরেই আছে। খুব নামজাদা লোক। প্রফেসার। রেডিয়োতে কথা বলে। কাগজে নাম ছাপা হয়।

মহিলার হাত ধরে রাস্তা পার করতে করতে প্রশান্তর মনে হয়েছিল তার মায়ের হাত ধরেছে। কাঁপা কাঁপা শিথিল হাতের কবজি। পাকা চুল উড়ছে। হাতে একটি গেরুয়া রঙের ঝুলি। তার মা-ও হয়তো এখন অন্য কোনও জগতে এইভাবেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কে বলতে পারে? কিংবা এই জগতেই হয়তো ঘুরছেন আত্মা হয়ে। কী যে রহস্য, কেউ জানে না।

ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে প্রশান্তর মনে হল অকারণে জীবনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। এর জন্যে বেশ কিছুটা দায়ী শ্যামলী। বাবা বলতেন, নারী যেমন এগিয়ে দিতে পারে তেমনি পিছিয়েও দিতে পারে। শ্যামলীর বয়েস যত বাড়ছে, প্রাণশক্তি যত কমছে তত আশঙ্কা, উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর সব আলো যেন কমে আসছে। মনে মনে দীর্ঘ শীতরাতের প্রস্তুতি চলেছে। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায়। একসময় প্রশান্ত কত চনমনে ছিল! কত হাসতে পারত, হাসাতে পারত, গান গাইতে পারত। ফুলের গাছ করত, মাঝে মাঝেই ঘরদোর ঢেলে সাজাত! বাইরে যদিও বা একরকম, বাড়ি ফিরলেই গম্ভীর, বিষণ্ণ। যে ট্রেন ওলটাবেই সেই ট্রেনের যাত্রী হলে যেমন হয়। মাঝে মধ্যে পুরনো প্রশান্ত বেরিয়ে পড়তে চায় তখন জোর করে চাপা দিতে হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়, যেন শ্রাদ্ধের বাড়িতে বাচালতা করে ফেলেছে! এই বিষণ্ণতার হাত থেকে মুক্তির কি কোনও পথ নেই! সব মানুষের স্বভাব যদি এক না হয় তা হলে ঠোকাঠুকি তো হবেই। বাইরের মানুষের কাছ থেকে সরে আসা যায়, যাদের নিয়ে সংসার তাদের ফেলে তো

পালানো যায় না। ইঁদুর এখন কলে পড়েছে। একমাত্র উপায় ভাল গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মনটাকে সংসারের ওপর তুলে রাখা। কলকাতার কোনও কোনও বাড়িতে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ঘরে এসে ঢোকে তখন তাঁরা চৌকির ওপর সোফাসেট, কার্পেট, ফ্রিজ সব তুলে দিয়ে বসে থাকেন। মনটাকে সিলিং-এ পাখার মতো ঝুলিয়ে দাও প্রশান্ত। শুধু দিয়ে যাও, প্রতিদানে চেয়ো না কিছু। তোমার প্রাপ্য ব্লেডের গায়ে ধুলো আর ভুসোর আস্তরণ। বাড়ি ঢোকার মুখে প্রশান্ত নিজেকে প্রশ্ন করল, কী এমন হয়েছে যে এত মনখারাপ করা কথা ভেতরে তোলপাড় করছে। সব সহজ করে নাও। বাঁদর বাচ্চার মতো সংসারকে অত আঁকড়ে ধোরো না।

আজ একটু মজা করতে করতে বাড়ি ঢোকা যাক। সেই বিশ বছর আগে যেভাবে ঢুকত। হাতে রজনীগন্ধার ছড়ি নিয়ে। চাকরিতে তখন তিন ধাপ নীচের পদে ছিল। মাইনে ছিল কম। কিন্তু মনটা তখন ছিল অনেক বেশি তাজা। ফুরফুরে পালকের মতো। লড়াই করার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। ফ্লোরেসেন্ট টিউব জ্বলতে জ্বলতে কমে আসে। দু'পাশে কালি পড়ে। একসময় তার চোখ বুজে আসে।

প্রশান্ত রোজই কলিংবেল টেপে। আজ অন্ধকারের দিকে একটু সরে গিয়ে দরজায় তিনবার টোকা মারল। শ্যামলী ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে?' শ্যামলীর গলা বয়েসের সঙ্গে বেশ ভারী হয়েছে। দূর থেকে শুনলে বোঝা যায়। বিশ বছর আগের সে সুর নেই। তখন ছিল মেয়ে এখন ভারিক্কি মা। প্রশান্ত আবার টোকা মারল তিনবার। শ্যামলী চড়াগলায় বললে, 'কে?'

প্রশান্ত আবার তিনবার টোকা মারল টুকটুক করে।

শ্যামলী বললে, 'নাম না বললে দরজা খুলব না।'

প্রশান্ত আবার টোকা মারল। শ্যামলী বললে, 'ইয়ারকি হচ্ছে?'

প্রশান্ত গলাটা খুব ভারী করে বললে, 'প্রশান্ত আছে?'

'না নেই?'

'কেন নেই?'

'এ সময় তিনি থাকেন না।'

'দরজা খুলুন।'

'কে আপনি?'

প্রশান্ত স্বাভাবিক গলায় বললে, 'আমি প্রশান্ত।'

'প্রমাণ কী?'

'দরজা ফাঁক করুন আমার ন্যাজটা দেখাচ্ছি।'

এতক্ষণে শ্যামলী গলা চিনতে পেরেছে। দরজা খুলে ধরতেই প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললে, 'কেমন ঠকালুম? তুমি এতদিনে আমার গলা চিনলে না। কী আশ্চর্য!'

শ্যামলী হাসল না। মুখ ভার করে বললে, 'সংসারে কেই বা কাকে চিনতে পারে? যত দিন যায় ততই সব অচেনা হয়ে যায়।'

দরজা খুলে দিয়ে শ্যামলী চলে গেল। প্রশান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ঘরে ফেরা মানুষকে কী সুন্দর অভ্যর্থনা! রেণু কোথায় থাকে কে জানে! সে বহুকাল আগের কথা। অফিস থেকে ফিরলেই যখন রেণু ছুটে আসত বাবা, বাবা করে। আজ নিজেকে মনে হল লাইমলাইটের শেষ দৃশ্যের চার্লি চ্যাপলিনের মতো। সমস্ত অস্ত্রের ধার কমে গেছে। কেউ আর হাসে না, হাসতে চায় না। বিমূঢ় যোদ্ধা। হাতে মরচেধরা তরোয়াল। চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, তারা তবু একটা নিয়মে চলে। দিন বড় হয়, ছোট হয়। ঋতুর একটা চক্র আছে। মানুষ কোনও নিয়মে চলে না। কখন কী যে তার মর্জি! যাক, ভেবে লাভ নেই। কূল কিনারা মিলবে না।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে এল। এখনও শীত তেমন পড়েনি। তবে গায়ে জল ঢাললে

একটু শীত শীত করে। রেণুকে নিয়ে একটু বসতে পারলে ভাল হয়। পরীক্ষা এসে গেছে। বসবে কী, সবই তো প্রায় ভুলে এসেছে। পড়াতে হলে নিজেকে আবার পড়তে হবে। কোর্সটোর্স সব পালটে গেছে। কেন যে মরতে বিয়ে করতে গিয়েছিলুম। সম্বরণ কেমন সুখে আছে? ওই রেণুর দিদিমণির কেমন মজা! নিরেট চেহারা। আপেলের মতো গাল। লুচির মতো গায়ের রং। রেশমের মতো চুল। অভ্রের মতো চোখ। জীবনে তাড়াহুড়ো করতে নেই। সব গেঁজে যায়। অপেক্ষা করতে হয়, দেখতে হয়। বেশ পাকা বয়সে বিয়ে করলে কাঁচা কাজ করে ফেলেছি বলে আপশোস করে মরতে হয় না। ব্যাচেলার থাকলে কী মজাটাই না হত। সিল্কের পাজামা পরে, চুলে ল্যাভেন্ডার, গায়ে ওডিকলন ছেড়ে, ঘরে স্বপ্নের মতো আলো জ্বেলে, আরাম চেয়ারে বসে, এত বড় বড় বরফের টুকরো ভাসা জিন উইথ লাইম চুমুকে চুমুকে পান। স্টিরিয়ো বাজছে রিমঝিম করে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ছে জোয়ারের জলের মতো। সুখের পাত্র কানায় কানায় ভরপুর। তবে ওই একটা খুঁতখুঁত ভাব। জ্যোতিষী বন্ধু অমল বলেছিল বিয়ের পরেই তোমার ভাগ্যোদয় হয়েছে। তার মানে বিয়ে না করলে তিনটে প্রোমোশান হত না। কথাটা একবারে উড়িয়েও দিতে পারে না, পুরোপুরি মানতেও পারে না। রোগটা কী ধরতে না পারলেই মানুষ অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজ, টোটকা সব একসঙ্গে চালাতে থাকে। কোনও একটা ধরে থাকার সাহস হারিয়ে ফেলে। তবে শ্যামলী মাদুলির মতো গলায় ঝুলতে থাক। ভাগ্যোদয়ের কবজ। খুলে ফেললে চাকরিটা যদি চলে যায়। যদি পথে পথে ভিক্ষে করতে হয়। ফোন বাজছে। কে আবার এই অসময়ে শান্তিভঙ্গ করতে এল। প্রশান্ত ফোন তুলে হ্যালো বললে, ও প্রান্তে সম্বরণ। গলায় বেশ উদ্বেগ।

'প্রশান্ত বলছিস?'

'হ্যাঁ প্রশান্তই বলছে। কী হয়েছে তোর?'

'আই অ্যাম ইন গ্রেট ডেঞ্জার।'

'তার মানে?'

'মানে যে-কোনও মুহূর্তে খুনটুন হয়ে যেতে পারি।'

'সে আবার কী?'

'শোন, একটি বাঙালি মেয়ে আমার এখানে কাজ করত। তা ধর বছরখানেক হয়ে গেল। এর আগে একজন বুড়ি ছিল। সে মারা যাবার কয়েক দিন পরেই এর আগমন। বয়েস নেহাত কমও নয় বেশিও নয়। কাজ কম্ম বেশ ভালই করছিল। হঠাৎ চুরি আরম্ভ হল। গতকাল আমার রোলেক্স ঘড়িটা সরিয়েছে। ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আজ সকালে পাওনাগন্ডা মিটিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আপদ গেল। ও মা অফিস থেকে ফিরে বসতে না বসতে সেই বেটি গোটাকতক গুন্ডা টাইপের লোক নিয়ে সোজা আমার ফ্ল্যাটে। তাদের কথা শুনলে তুই অবাক হবি! এক হাজার টাকা দিতে হবে। আমি নাকি ওই মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলুম। না পেরে চোর বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। কী ঝামেলা দেখ! একা নারী, আর একা পুরুষের জীবনের সমস্যাটা একবার দেখ! আমি টাকা দিইনি। আরও দলবল আনতে গেছে। মেয়েটা আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। এখানে কারু সাহায্য পাব না। পুলিশে ফোন করেছি। কী করবে জানি না। কী করা যায় বল তো?'

'তুই সুট করে বেরিয়ে এখানে চলে আসতে পারবি?'

'কী জানি?'

'তা হলে আমি একটা ট্যাক্সি ধরে তোর ওখানে যাব?'

'এত রাতে কী করে আসবি?'

'যেভাবেই হোক যেতে হবে। তোকে তো রেসকিউ করতে হবে। পাড়াটা তো ভাল নয়।'

'তুই আসতে আসতেই তো খেল খতম হয়ে যাবে।'

'তুই ঘণ্টাখানেক কোনওরকমে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবি না?'

'সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। টাকা আমি দিচ্ছি না, দোব না। পুলিশকেও বিশ্বাস নেই। আমি পালাবার চেষ্টা করছি। পারলে তোর ওখানেই যাব। আমার জন্যে একটু জেগে থাকিস।'

সম্বরণ লাইন ছেড়ে দিল। প্রশান্ত রিসিভার নামিয়ে রাখল। মানুষ কতরকমের ঝামেলায় যে পড়তে পারে!

যতক্ষণ না আসে সম্বরণটার জন্যে ভীষণ চিন্তা থেকে যাবে। আজকাল কাজকর্ম নিজেরাই করা ভাল, উটকো লোক না রেখে। প্রশান্ত একবার ঝামেলায় পড়েছিল। এখন মনে পড়ল। তার এক পরিচিত বন্ধু কাজের জন্যে কোথা থেকে এক ফুলটাইম মেয়ে এনে দিয়েছিল। বয়েস কম। বিয়েও হয়নি। শ্যামলীর আপত্তি ছিল। প্রশান্তর ইচ্ছেতেই মেয়েটি পরিবারে স্থান পেল। তিন দিনের দিন বাড়িতে পুলিশ। কী ব্যাপার! অভিযোগ শুনে প্রশান্তর চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর কী! মেয়েটি আগে যে পাড়ায় যে বাড়িতে ছিল সেই পাড়ার একটি মেয়ে নিখোঁজ। সেখানকার ক্লাবের ছেলেরা অনুসন্ধানকারী পুলিশকে বলেছে, সেই মেয়েটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল এই মেয়েটির সঙ্গে। দেখুন কোথায় পাচার করে দিয়েছে। পুলিশের হাত থেকে মেয়েটি অবশ্য খালাস পেয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মেয়েও তাই। কোথায় পাবে পাঁচশো টাকা। পুলিশ যা করে করুক। ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে কী রফা হল কে জানে! দুটো রাত বোধহয় দিতে হল। পুলিশও হটে গেল। তিন দিন পরে সে ফিরে এল জীবনের আরও বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। পরিষ্কার দেয়ালে পোস্টার পড়বেই। আলকাতরা দিয়ে কিছু না কিছু লিখবেই। কারু বাপের ক্ষমতা নেই আটকায়! কী জানে কেন, শ্যামলী হঠাৎ মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। পুলিশে ঠোকরানো মেয়ে প্রশান্ত হয়তো আর রাখত না। শ্যামলী বলেছিল, মেয়েরা ইঁদুরের মতো। ঘরে কাটাকুটি করে, অত্যাচার করে ঠিকই, মাঝে মধ্যে কল পাততে হয়, বিষ দেবার কথাও ভাবতে হয়। কিন্তু রাগ করে ন্যাজ ধরে মাঠে ফেলে দিলেই কাকের গর্ভে। ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। অভিযোগ যখন মিথ্যে তখন ওকে রাখার সাহস আমার আছে। পুলিশ আমার কী করবে! মাস তিনেকের মধ্যেই মেয়েটি রকের একটা ছেলের সঙ্গে প্রেমট্রেম করে একদিন কেটে পড়ল। প্রশান্ত বাড়ি ফিরে শুনল, যে শ্যামলী অভিযুক্ত মেয়েকে একদিন বুক ঠুকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই শ্যামলীই প্রেমের নামে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বেলা বারোটার সময় তাকে এক পেট খাইয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। ছেলেটি ক্রিকেট খেলার ফিল্ডারের মতো গালিতে দাঁড়িয়েই ছিল। যেই ক্যাচ উঠল সঙ্গে সঙ্গে ধরেই সোজা কালীঘাট। সন্ধেবেলা সস্ত্রীক ফিরে এল। সেই মেয়ে এখনও এই পাড়াতেই আছে। ছেলেটার হিম্মত আছে। রকে আর বসে না। কোথায় কোন দোকানে চাকরি পেয়েছে। আগে রোজ চুল্লু খেত। এখন সপ্তাহে একদিন। চেহারা বেশ হিরো হিরো হয়েছে। একেই বলে বিয়ের পর বরাত খোলা। মেয়েটা একবার নাকি প্রশান্তর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে আসতে চেয়েছিল, ছেলেটা বলেছে ছোটলোকদের বাড়ি যেতে হবে না। যে ক'টা টাকা পাওনা আছে দান করে দাও।

শ্যামলী বোধহয় কোনও এক জন্মে জগাই মাধাই ছিল। তা না হলে প্রেমের নামে এমন জ্বলে ওঠে কেন। কলসির কানা নিয়ে তেড়ে যায়! ইনি বোধহয় সেই জগাই যাকে শ্রীচৈতন্য প্রেম না দিয়েই নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। জগাই নয় জগাইয়ের স্ত্রী।

প্রশান্ত তার ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে আধশোয়া হল। মনে মনে যতই সুখের মুহূর্ত তৈরি করার চেষ্টা করুক, উত্তাল সমুদ্রে নাবিকের ছুটি মেলে না। দেহকে যতই আরামে চিতপাত করে রাখো মনের ঘড়ি টিকটিক চলতেই থাকে। রেণু পাশের ঘরে গুনগুন পড়ছে। বাইরে আজ খুব বাতাস উঠেছে। হাওয়ার রাত। মাঝে মাঝে দমকা বয়ে আসছে যখন, গাছের পাতা দীর্ঘশ্বাসে ভেঙে পড়ছে। এই হাওয়ার রাতের সঙ্গে প্রশান্তর জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। শ্যামলীর সঙ্গে যে রাতে তার বিয়ে হয়েছিল সে রাতেও এমনই দখিনা বাতাস বইছিল। মাঝ রাতে বাসর

ছেড়ে প্রশান্ত একবার ছাতে বেরিয়েছিল। চাঁদ হেলে গেছে পশ্চিমে। নক্ষত্রমণ্ডল বিদায় চাইছে। বাড়ির গায়ে আলোর চুমকি দুলে দুলে উঠছে। নির্জন পথে ছায়া কাঁপছে। যে সানাই প্রথম রাতে বেজে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই সুর যেন বহু দূর থেকে আবার ফিরে আসছে। মা যেমন শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে দেখে যায়। চাঁদের আলো, মধ্যরাতের কাঁপা গাছে রুপোলি তবকের ঝিলিমিলি, রজনীগন্ধার সুবাস, শ্যামলীর জরি বসানো লাল বেনারসি, বাতাসের হু হু শব্দ। কত দূরে চলে গেছে সেইসব মুহূর্ত জীবন ছেড়ে। তবু ফিরে আসে বারে বারে স্মৃতি হয়ে।

শ্যামলী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে বললে, 'কী, এখন খেতে দোব?'

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসতে বসতে বললে, 'সম্বরণের জন্যে একটু অপেক্ষা করব না!'

'সে কী? তিনি আসবেন, কই তুমি তো আমাকে আগে বলোনি?'

'কী করে বলব? ও তো এইমাত্র আমাকে ফোনে জানাল। বেচারা ভীষণ বিপদে পড়েছে।'

'কী আবার হল?'

'অনেকটা তোমার সেই কাজের মেয়েটির মতো ঘটনা। কী যেন নাম ছিল তার?'

'শঙ্করী। কেন, ছেলে বগলদাবা করে কেটেছে?'

'না, এটা আর একটু অন্যরকম কেস। গুন্ডা নিয়ে সম্বরণকে একটু আগে ঠ্যাঙাতে এসেছিল।'

'অপরাধ?'

'চুরি করেছিল বলে সম্বরণ তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন উলটো চাপ, বলে কিনা সম্বরণ তার শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছিল।'

শ্যামলী দু'কানে হাত চাপা দিয়ে ম্যানিয়াগ্রস্তের মতো বললে, 'ইস ইস, চুপ করো, চুপ করো ওসব নোংরা কথা আমাকে বোলো না। তুমি ওই লোককে এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে। আমার মেয়ে বড় হয়েছে। কী সর্বনাশ।' প্রশান্ত অবাক। শ্যামলী ধরেই নিয়েছে সম্বরণ শ্লীলতাহানি করেছে। 'কী সর্বনাশ নয়, কী আশ্চর্য। তুমি তো পুরোটা শুনলেই না, তার আগেই ইস ইস করছ। ব্যাপারটা মিথ্যে, ফলস, টাকা আদায়ের চেষ্টা।' শ্যামলী বললে, 'পুরুষ মানুষদের আমি বিশ্বাস করি না। তারা সময়ে সব পারে। তোমার ওই বন্ধু একা থাকে। এসব ব্যাপারে মেয়েরা বড় একটা মিথ্যে বলে না।'

'কে বলেছে তোমাকে? সত্যি হলে চেপে যায় বদনামের ভয়ে। এরা সে ক্লাসের মেয়ে নয়, এরা হল ক্রিমিন্যাল। এরা সব পারে। এরা বিপদে পড়েছি বলে গাড়িতে লিফট চেয়ে কিছু দূরে গিয়েই বলে, যা আছে দিয়ে দিন, নয়তো চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।'

'সে সব আমি জানি না, জানতেও চাই না, তবে তোমার ওই বন্ধুটির মুখ দেখে মনে হয়, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়।'

প্রশান্ত বললে, 'সে কী? কী বলছ তুমি? সম্বরণকে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো?'

'আমি মেয়েছেলে, পুরুষের মুখ দেখলে মন বুঝতে পারি।'

'ঘোড়ার ডিম পারো। তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। সম্বরণ আমার বয়সি।'

'তাতে কী হয়েছে? সুযোগ পেলে তুমিও ছেড়ে কথা বলবে কি?'

'কী যা তা বলছ তুমি? তুমি যাও। তোমার মন অসম্ভব নোংরা হয়ে গেছে।'

'সত্যি কথা শুনতে খারাপই লাগে। কেন, তোমার সেই চোখ-খোলা খাতা কী বলে, যাতে কাগজ কেটে কেটে জোড়ো! তোমাকে সেদিন দেখিনি আমি, ওই স্কুলের দিদিমণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন যৌবন ফিরে পাচ্ছ। মায়ের মৃত্যুশোক ভুলে যাচ্ছ। অফিস থেকে ফেরার ক্লান্তি উবে যাচ্ছে। নতুন মেয়েছেলে হল বুড়োদের টনিক। নিজেদের সামলাতে পারে না বলেই মেয়েরা উচ্ছন্নে যায়।'

প্রশান্ত কী বলে তা শোনার জন্যে শ্যামলী আর দাঁড়াল না। একটা গুমোট গরম বাতাসের গোলার মতো বেরিয়ে গেল। প্রশান্ত থ হয়ে গেছে। কী হয়েছে শ্যামলীর। সারা সংসার বিষিয়ে

তুলেছে। সাপের একটা ছোবলেই শরীর নীল হয়ে যায়, এ তো ছোবলের পর ছোবল। বড় ঘেন্না করছে। নির্বোধের মতো কথাবার্তা। দিনের পর দিন পাশাপাশি থেকে শ্যামলীর মন চিনতে পারেনি? এ কি সেই সাদা আরশোলা! আরশোলা সাদা হয় না। খোলস ছেড়ে সাদা হয়েছিল। আবার লাল হয়ে গেছে। এই তা হলে শ্যামলীর আসল রূপ।

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বড়ই ভাবনার কথা! সম্বরণ যদি এসে পড়ে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। নোনাধরা দেয়াল কি ক্যালেন্ডার দিয়ে চাপা দেওয়া যাবে! সম্বরণ যদি না আসে ভাল হয়। এলে, টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা হবে। টেলিপ্যাথি করি, সম্বরণ তুই আসিসনি। তুই অন্য কোথাও যা।

শ্যামলী আপন মনে খাবার টেবিল সাজাচ্ছে। প্রশান্ত সম্বরণের জন্যে অপেক্ষার কথা বলেছিল। কানেই তুলল না। হঠাৎ কেন যে এমন ভাবান্তর! পরিবারে একজন কেউ বেসুরো হলে অর্কেস্ট্রা নষ্ট হয়ে যায়। অভাব, দারিদ্র্য, তবু মানিয়ে নেওয়া যায়, বেতালে তাল দেওয়া যায় না। তালকানা গাইয়ের সঙ্গে সংগতে বসতে হলে বড় অস্বস্তি হয়। দুঃখ আর সুখ সকলে সমান ভাগ করে নিলে, দুঃখ দুঃখ থাকে না, সুখ আরও সুখের হয়। তা তো হবার নয়। এ বড় বিচিত্র স্থান। মানুষ এক দুর্জ্ঞেয় জীব। কে বলে শুধু ব্রহ্মের স্বরূপই আচ্ছাদিত! সংসার তারও বাড়া।

শ্যামলী বললে, 'নাও, তোমার মেয়েকে বলো, দয়া করে এসে খেয়ে যেতে, রাত অনেক হয়েছে।'

প্রশান্ত বললে, 'কেন, তোমার সঙ্গে আবার কথা বন্ধ হয়ে গেছে?'

'জানি না, তোমাকে যা বলছি তাই করো। তুমিও খেয়ে নাও। আমাকে আর টাঙিয়ে রেখো না।'

প্রশান্ত মনে মনে বললে, বুঝেছি, রেণুকে তোমার কাছ থেকে সরাতে না পারলে হয় সে বেরিয়ে যাবে, নয় সে আত্মহত্যা করবে। তুমি হলে খরা। তোমার তেজে যেখানে যতটুকু স্নেহের বিন্দু ছিল সব উবে গেল। শ্যামল শোভা হলুদ বর্ণ। চারদিকে চোরকাঁটার ঝোপ। মনের বাঁশি থেমে গেছে। এইবার শেয়াল ডাকবে।

যাই, আমি এক ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। রেণুকে তুলি। পরীক্ষার এই ক'টা মাস আর সিজফায়ার করা চলে না! ইরাক ইরান যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। এ ওর তেলের পাইপ ফাটাচ্ছে, ও এর তেলের পাইপ। প্রশান্ত রেণুর ঘরে ঢুকল। ভোলটেজ নেমে গেছে। আলো যেন শিবনেত্র হয়ে আছে। রেণু একটা নীল ছাপা শাড়ি পরেছে। ফরসা মুখে বড় বড় চোখ। শ্যামলী একসময় আদর করে ডাকত গোরুচোখি। মায়ের আদর জোটে না। এখন শুধুই তিরস্কার। কপালের ওপর চুল ঝুলে ঝুলে পড়েছে। টেবিলে, বিছানায়, সর্বত্র বই আর খাতা ছড়ানো। ঠান্ডা লেগে সর্দি হয়েছে। ফোঁৎ করে নাক টানার শব্দ হল। প্রশান্ত যদি রেণুর মা হয়ে যেতে পারত! তার মধ্যে মা হবার সব গুণই আছে। শ্যামলী মাঝে মাঝে বলে তো, তুমি যদি মা হতে! হবার আর উপায় নেই, ভগবান মেরে দিয়েছেন। মেয়েটার মুখে চোখে কষ্টের, অত্যাচারের ছাপ পড়ে গেছে। শ্যামলী মনে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। ব্যক্তিত্ব শূন্য, হাবাগোবা একটা প্রাণী বিশেষ হলে শ্যামলী মহাখুশি। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। বড়লোকের লোমঅলা আদুরে কুকুরের মতো।

প্রশান্ত মেয়ের সামনে টেবিলে দু'হাতের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। রেণুর মাথার ওপব থেকে নীচের টেবল অবদি প্রশান্তর নজরের সীমানা। রুক্ষ চুল। তেমন যত্নের তেল আর চিরুনি পড়ে না। চুলে আলো পড়েছে। শুঁয়া শুঁয়া ধুলো আটকে আছে চুলে। প্রশান্তর মা কেমন ছিলেন! বেলা তিনটের সময় পা মুড়ে মেয়েদের নিয়ে বসতেন। পাশে তেলের বাটি আর চিরুনি। চুলের ডগার জট ছাড়াতেন যখন মেয়েরা দু'হাত দিয়ে রগের পাশ চেপে ধরে চুলের টানে চিবুক ওপর দিকে তুলে, উঃ লাগে, আআ লাগে বলে আর্তনাদ করত। পুবনো বাড়ির বারান্দায় এ ছিল নিত্যকার দৃশ্য। প্রশান্ত তেল কোম্পানির আলুলায়িত বিজ্ঞাপনে শহর ছেয়ে ফেলল অথচ তার মেয়ের চুলের অবস্থা দেখো! কে দেখবে! সে-ই দেখুক।

রেণু বাপের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসে বললে, 'তোমার হয়েছে মহাজ্বালা!'

'ওঠ, চল, খাবি চল। রাত হয়েছে।'

'চলো, খেতে যখন হবে খেয়েই আসি।'

'তোরা খেয়ে নে, আমি সম্বরণের জন্যে আর কিছুক্ষণ দেখি। আমারটা চাপা দিয়ে রাখ।'

শ্যামলী ওধার থেকে বাদশাহি ফরমান জারি করল, 'না তুমিও খেয়ে নাও। সব গরম করেছি, বারে বারে, জনে জনে আমি গরম করে দিতে পারব না। আমার অত গতর নেই। বয়েস হচ্ছে।'

রেণু বললে, 'আমি দোব।'

শ্যামলী বললে, 'না, আমি হেঁশেলের পাট আজকের মতো চোকাতে চাই। এটা হোটেল নয়, বাড়ি!'

প্রশান্ত মেয়ের পিঠে আলতো স্পর্শ দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত জানাল। শ্যামলী একবার বিগড়ে গেলে তাকে সামলানো ভীষণ শক্ত। ভেটিনারি ডাক্তাররা বলেন, ডিসটেমপার্ড হয়ে গেছে। এ যেন অনেকটা সেইরকম। প্রশান্ত মেয়েকে নিয়ে খেতে বসল। খাওয়া আর হল না, প্রথা রক্ষা হল।

খেয়ে উঠে প্রশান্ত সম্বরণকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। বহুবার ডায়ালের পর ফোন বাজল। বেজেই চলল! কেউ ধরল না। তার মানে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তা তো অনেকটা, তাই হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে। পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ি, জ্যাম, সব টপকে আসতে হবে। প্রশান্ত একটা সিগারেট ধরাল। আপন মনে টানতে টানতে শুনল ঘড়িতে এগারোটা বাজছে। আর বোধহয় এল না সম্বরণ। রেণুর ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও পড়ছে। খাবার টেবিলে সম্বরণের খাবার চাপা রয়েছে। শ্যামলী শুয়ে পড়েছে। ঘরে আলো নেবানো। ঘুমোক। রাত ঘুরে দিন এলে হয়তো আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সম্বরণের চিন্তাটা ক্রমশই বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। কেন আসছে না? কী হল! খুনটুন হয়ে গেল না তো! হাজারখানেক টাকার জন্যে। না, মন ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছে, হাওয়ায় কাঁপা বাতির মতো। প্রশান্ত উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পেড়ে আনল। মহাপুরুষের সঙ্গ করে দেখা যাক মন স্থির হয় কি না? প্রশান্ত পড়ছে :

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ, অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-হ্রদাদি দেখিতে পাইতাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল— সারা জীবন ধরিয়া যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এ সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম, গত এক মাস ধরিয়া এই যে-সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, ওইগুলি মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই রূপেই এই জগদ্ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে।

প্রশান্ত এই পর্যন্ত পড়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। রেণু ঘরের বাইরে এসেছে। বোধহয় বাথরুমে যাবে। প্রশান্তর কাছে এসে বললে, 'বাবা তুমি শোবে না? আর বোধহয় কাকু আসবেন না।'

প্রশান্ত বললে, 'শুলেও তো চট করে ঘুম আসবে না মা। তবু কিছুক্ষণ দেখি। তুই এবার শুবি?'

'হ্যাঁ, শুয়ে পড়ি। কাল সকালে আবার পড়ব। চোখ জ্বালা করছে।'

প্রশান্তর খুব ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোর মায়ের? সামলে নিল নিজেকে।

খোঁচাখুঁচি না করাই ভাল। মনটাকে অতিকষ্টে সামান্যও ওপরে ওঠাতে পেরেছে। এখুনি ধপাস করে পড়ে যাবে। প্রশান্ত বললে, 'সেই ভাল। আজ শুয়ে পড়। কাল ভোর ভোর উঠে পড়বি।'

রেণু চলে যেতেই প্রশান্তর চোখ আবার বইয়ের পাতায় চলে গেল :

মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকবে। এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী—সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি ওইগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ওইগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনওরূপ দুঃখকষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোনও দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে— আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত।

শ্যামলী, রেণু, এই বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, যাবতীয় আয়োজন অনুষ্ঠানকে মরীচিকা ভাবতে পারলে ল্যাঠা তো চুকেই যেত। ভাবা যায় কী করে! মরীচিকাকে ধরা যায় না। এদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। শ্যামলীকে বিয়ে করে এনে স্পর্শ করেছিল বলেই তো রেণুর আগমন। আমি সত্য ওরা মায়া, ভাল কথা। ওরা যদি ভাবে, ওরা সত্য আমি মায়া। তা হলে কী হবে বৎস! সকলেই যদি ভাবে আমি সত্য, তুমি মিথ্যে, তা হলে আমার কাছে তুমি মরীচিকা হলেও, তোমার কাছে তুমি মরীচিকা নও, তুমি তোমার কাছে সত্য।

প্রশান্তর কাছে সব গুলিয়ে জট পাকিয়ে গেল। জীবন হয়তো এক দীর্ঘ স্বপ্ন। স্বপ্নেই কাঁদা, স্বপ্নেই হাসা, স্বপ্নেই গান গাওয়া। স্বপ্নের রেণু, স্বপ্নের শ্যামলী। এ কি প্রশান্তর স্বপ্ন? এ তো ওদেরও স্বপ্ন! নিদ্রিত ব্রহ্ম, নিদ্রিত সেই বিশাল আমি যোজন বিস্তৃত স্বপ্নজগৎ তৈরি করে বসে আছেন। স্বপ্নেই আসা, স্বপ্নেই যাওয়া।

রাস্তায় একটা গাড়ি ঢুকল। হেডলাইটের আলোর একটা ঝলক সিলিং ছুঁয়ে চলে গেল। ভেবেছিল সম্বরণের গাড়ি। না এয়ার লাইন্সের গাড়ি। রাতের ফ্লাইট শেষে এয়ার হোস্টেস ফিরে এলেন। সম্বরণের কী হল তা হলে! নিজের গাড়ি থাকলে চলে যেতে পারত।

ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ল। আলো জ্বলতেই থাকল। স্বপ্নেরও স্বপ্ন আছে। আইনের যেমন উপআইন। সব কিছুর উপ আছে। স্বর্গের যেমন উপসর্গ। প্রশান্ত স্বপ্ন দেখছে মনে হয়। মাঝে মাঝে হাত-পা কেঁপে উঠছে। ঘুমন্ত মুখের মাংসপেশি কেঁপে উঠছে থিরথির করে। কেউ তাকিয়ে নেই তার দিকে। কেবল বাতিটাই চেয়ে আছে অপলকে। জানালার বাইরে রাত চলেছে চাঁদ তারার শোভাযাত্রা নিয়ে।

প্রশান্তর যখন ঘুম ভাঙল রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। ফিকে অন্ধকারের গোলাপি ওড়নায় মুখ ঢেকে ঊষা এসে দাঁড়িয়েছে জানালায়। একটা দোয়েল দেখতে পেয়েছে তাকে, তাই এত বন্দনা। মাথার পেছন দিকে আলো তখনও জ্বলছে। তবে মধ্যরাতের উজ্জ্বলতা হারিয়ে শেষ রাতের জ্বরো রুগির মতো নিষ্প্রভ, পাণ্ডুর। প্রশান্ত উঠে গিয়ে আলোটা নেবাল। আশ্চর্য, সারারাত সে এখানে পড়ে আছে। কেউ ডেকে বিছানায় শুতে বলেনি। আলোটাও নিবিয়ে দিয়ে যায়নি! শ্যামলী কী মারা গেছে! সংসার তাকে এতটা পর ভাবছে! বানপ্রস্থের সময় কি এসে গেল। এই ঊষা লগ্নে সংসারের পোস্টমর্টেম করে লাভ নেই। মরেছে, পুড়িয়ে দাও। কীসে মরেছে জেনে লাভ কী? স্বার্থই তো মৃত্যুর বিষপাত্র ঠোঁটে তুলে ধরে। নর্তক, নর্তকীরা মঞ্চে আসে সেজে গুজে। হাত ধরাধরি করে নাচে গায়। যেই যবনিকা পড়ে যায়, সাজ খুলে যে যার সে তার। সবই ভূমিকা। গভীরে কিছুই নেই। জীবনের মরুপ্রান্তে স্মরণের অখ্যাত বসতি, কিছুরই কি নেই অব্যাহতি!

এবার অনেক পাখির ঘুম ভেঙেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে ঝোলাতে গোটা কতক খালি দুধের বোতল ভরে কোনও একনিষ্ঠ সংসারী চলেছেন। বোতলে বোতলে ঠোকাঠুকির শব্দ উঠছে।

প্রশান্তর মনে হল বারান্দার অন্ধকারে বসে মা গাইছেন প্রভাতী সুরে, রাই জাগো, রাই জাগো বলে ডাকে শুক শারি। কোথায় গেল সেই শান্তির পৃথিবী! অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী। অমেয় জগতে নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ, মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ সংক্রমিত মড়কের কীট; শুকায়েছে কাল স্রোত, কর্দমে মিলে না রাজপীঠ। অতএব পরিত্রাণ নাই। যন্ত্রণাই জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে, আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে।

প্রশান্তর হঠাৎ খেয়াল হল আজ রবিবার। বেরোতে হবে না। চোখে বেশ ঘুম লেগে রয়েছে। সারারাত ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকার ফলে ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছে। একটু টান টান হয়ে শুতে পারলে মন্দ হয় না। প্রশান্ত উঠে গিয়ে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়াল। আবছা আলো, নীল মশারি, সাদা বিছানা, শ্যামলী পাশ ফিরে পাষাণ মূর্তির মতো বেঁকে শুয়ে আছে। প্রশান্তর মনে হল. এই অহল্যাকে কোন রামচন্দ্র উদ্ধার করবে!

॥ দশ ॥

ঘুমের সেকেন্ড এডিশান সহজে কাটতে চায় না। রেণু এসে ডাকছে, 'বাবা, এবার উঠে পড়ো। বেশ বেলা হয়েছে গো। এই নাও তোমার জল। তুমি বুঝি ভুলে গেছ, বেলায় উঠলে তোমার কনস্টিপেশান হয়।'

প্রশান্ত মেয়ের ডাক শুনে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসল। সোনালি রোদ চারপাশে ঝলমল করছে। সকালের সেই শীত শীত ভাবটা যেন আরও বেড়ে গেছে। শীতের মজাই হল খুব সকালে গুম মেরে থাকে, যত বেলা বাড়তে থাকে তত খেলতে থাকে। হুহু করে হাওয়া বয়। প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে বিছানার দিকে তাকাল। না, আর কেউ নেই। শ্যামলী বোধহয় অনেক আগেই উঠে চলে গেছে। রোজ যেমন ওঠে। যাক সংসারের ঘড়ি তা হলে ঠিকই চলছে।

হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত থেকে জলের গেলাসটা নিতে নিতে বললে, 'গুডমর্নিং। ক'টা বাজল রে?'

'প্রায় সাড়ে আট।'

'বলিস কী? ডাকিসনি কেন?'

'ভাবলুম আজ তো রবিবার! ঘুমোচ্ছ যখন একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'বাজার করতে হবে না মা?'

'এই তো চা আনছি। বাথরুম থেকে এসে চা খাও। চা খেয়ে আবার যাও। তারপর বাজার করো।'

রেণু গেলাস নিয়ে চলে গেল। খালিপেটে জল খাওয়া, প্রশান্তর আজকের নয় বহু দিনের অভ্যাস। মাঝে মধ্যেই কনস্টিপেশান তাকে বড় ভোগায়। হঠাৎ সম্বরণের কথা মনে পড়ল। কী হল ছেলেটার? একবার ফোনও তো করতে পারত! যেখানেই থাক, হাতের কাছে কি টেলিফোন ছিল না?

প্রশান্ত একবারের চেষ্টাতেই ফোন পেয়ে গেল। বেজেই চলেছে। কেউ ধরছে না। না, সত্যিই কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। রিসিভার নামিয়ে রাখল। একবার যেতে হবে। কোনওরকম বাজারটা করে দিয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রশান্ত বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই রাস্তায় একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ হল। গাড়িটা চলে গেল না। বাড়ির সামনে দাঁড়াল মনে হয়। প্রশান্ত জানলার ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। সম্বরণ নেমে গাড়ি লক করছে। প্রশান্ত দরজা খুলে চেঁচিয়ে বললে, হ্যাল্লো মাই ফ্রেন্ড! সম্বরণ ঘাড় ঘোরাল। একমুখ হাসি। সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় সেই বউটি ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশান্তর বাড়ি সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহল, অথচ কোনওদিন এসে শ্যামলীর সঙ্গে

আলাপ করেনি। গাড়ি লক করে সম্বরণ এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে প্রশান্ত আশ্বস্ত হল। যাক অক্ষত আছে। দামি পাট ভাঙা প্যান্টের ওপর হালকা রঙের বুশ শার্ট উড়ছে। চোখে সোনালি ফ্রেমের গগলস। পায়ে ভেলভেটের চটি। প্রশান্ত বললে, 'কাল সারাটা রাত ভীষণ ভাবনায় রেখেছিলি। ফোন করলুম, বেজেই গেল। তোর একবার ফোন করা উচিত ছিল।'

সম্বরণ দরজার সামনে এসে বললে, 'প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত থানাতেই ছিলুম রে। তারপর আর ফোন করিনি। ভাবলুম ঘুমোচ্ছিস। কেন আব ভোরের ঘুম ভাঙাই। দিন ফুটতে ফোন করেছিলুম, বেজেই গেল।'

'ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম রে। আয় ভেতরে আয়। তুই একটু বোস। আমি মুখটা চট করে ধুয়ে আসি।'

সম্বরণ বসার ঘরে না বসে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শ্যামলী কেটলির ঢাকা খুলে জলে চা ছাড়ছিল। রেণু মেঝেতে উবু হয়ে বসে কাপে কাপে দুধ আর চিনি মেশাচ্ছিল। সম্বরণ বললে, 'বউঠান ঠিক সময়েই এসেছি। এক কাপ পাব তো?'

শ্যামলী ভুরু কুঁচকে সম্বরণের দিকে তাকাল। জেল ফেরত শ্লীলতাহানির আসামি। দরজার সামনেই রেণু। শ্যামলী আতঙ্কিত হয়ে বললে, 'আপনি বাইরের ঘরে বসুন। বাইরের ঘরে। চা এখুনি যাচ্ছে।'

শ্যামলীর বলাব ধরনে সম্বরণ ভীষণ অবাক হয়ে গেল। শ্যামলীব গলা ভয়ের আতঙ্কের। যেন কুষ্ঠ রোগী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য ব্যবহার। সম্বরণ তো এ বাড়িতে নতুন নয়। প্রশান্তর মায়ের মৃত্যুর দিন, তারপরের দিন, সে তো প্রায় এ বাড়িরই ছেলে হয়ে গিয়েছিল। প্রশান্তর সঙ্গে তার আলাপ তো অল্প দিন হল না! সেই ঘনিষ্ঠতার জোরেই তো বাইরে থেকে সোজা ভেতরে চলে এসেছিল সাহস করে। আপনজনের মতো। হঠাৎ কী হল!

কেমন যেন বেসুরো লাগছে! সম্বরণ ফিরে গেল বাইরের ঘরে। প্রশান্ত বাথরুমে ছিল। জানতেও পারল না, কী ঘটে গেল!

রেণু কাপে কাপে চা ঢেলে ফেলেছে। ডিশে বিস্কুট সাজিয়েছে। ট্রে-তে সব সাজিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উঠতে যাচ্ছে শ্যামলী ধমকে উঠল, 'তোমাকে যেতে হবে না, যার বন্ধু তাকেই বলো চা নিয়ে যেতে।'

রেণু সব ছেড়ে দিয়ে ভীষণ অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রশান্ত ঠিক ওই সময়েই তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরের সামনে দিয়ে বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়াল। কথাটা কেমন হল! যার বন্ধু সেই নিয়ে যাবে। শ্যামলী নয়, রেণু যেতে চাইলেও নয়। কেন, কী এমন হয়েছে? কাল থেকে খুব বেগোড়বাঁই বলছে তো! এ যেন তবলা। ছড় টেনে কে খুব চড়িয়ে দিয়েছে। চাঁটা মারলেই ত্যাটাং ত্যাটাং শব্দ ছাড়ছে। কারণটা তো জানতে হচ্ছে। বাড়িতে বাইরের লোক এসেছে। এ সময় ওরকম সপ্তমে সুর ছাড়লে চলে! সম্বরণ যাতে শুনতে না পায় এইরকম নিচু গলায় প্রশান্ত বললে, 'কাল থেকে তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

শ্যামলী অসম্ভব গম্ভীর গলায় বললে, 'চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাও।'

প্রশান্ত কথা বাড়াবার সাহস পেল না। কে জানে কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে আসে! কার মনে কখন কী যে জমে উঠে আলো ঢেকে দেয়। বিশাল আকাশের খেলা। কোথাও রোদ, কোথাও মেঘ। যতই হোক সম্বরণ বাইরের লোক। তার সামনে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে। ভেতরে যাই থাক, বাইরেটা যেন ঝকঝকে থাকে। চায়ের ট্রে তুলে নিয়ে প্রশান্ত বাইরের ঘরে বন্ধুর কাছে ফিরে এল। সম্বরণ আপন মনে আঙুলে চাবির রিং ঘোরাচ্ছে।

প্রশান্ত চা রেখে চেয়ার টেনে বসল। চায়ের রংটা তেমন লাল হয়নি। দুধ বেশি হয়ে গিয়ে সাদাটে। আর একটু লিকার পড়লে রংটা খুলত। হোমস ওয়াটসনকে কুকুর দেখে বাড়ির অবস্থা

বোঝার কথা বলেছিলেন। প্রশান্তর মনে হল চায়ের রং দেখেও বোঝা যায়। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, চায়ের রংটি যখন দেখবে টুকটুকে লাল তখন বুঝবে পরিবারে সুবাতাস বইছে। যখন দেখবে ফ্যাকাশে সাদা, তখন বুঝবে লেগেছে লেগেছে আগুন। কর্ত্রীর মন জ্বলছে। প্রশান্ত কাপ এগিয়ে দিলে বললে, 'নে চা খা। বল, সমস্যাটা কীভাবে মেটালি?'

সম্বরণ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'তার আগে তুই বল, বাড়িতে কি কোনওরকম অশান্তি চলেছে?'

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি, অনেকটা ধামাচাপা দেবার মতো করে বললে, 'না, কই না তো!'

'ঠিক বলছিস? তা হলে বউঠান অমন চড়ে আছে কেন?'

'ওটা মনে হয় মেয়েদের ঋতুঘটিত ব্যাপার। সিজন্যাল। যেমন বসন্তে কোকিল ডাকে, চাতক ডেকে যায় বর্ষায়। কেন ডাকে কেউ বলতে পারে?'

ব্যাখ্যাটা সম্বরণের তেমন পছন্দ হল না। একটু আগে নিজেকে বড় অপমানিত মনে হচ্ছিল। মানুষ সহসা নিজের অন্দরমহল খুলতে চায় না। ব্যবধান মুছে দিতে চাইলেও ব্যবধানই জীবন। ট্রেন-ভ্রমণের সময় দেখেছে সহযাত্রীব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। সামান্য স্বার্থে স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছে। শিক্ষা তবু হয় না! তবু নবকুমার কাষ্ঠাহরণে যায়। সম্বরণ নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'শেষ পর্যন্ত কী হল বল।'

'শেষ পর্যন্ত পুলিশ। ভেবে দেখলুম পালাব কোথায়? একমাত্র আশ্রয় আইনেব প্রভুবাই। সোজা থানাতেই গেলুম। প্রথমে আমাকে খুব খানিকটা কড়কে দিলে। অজ্ঞাতকুলশীল লোক কেন আমরা রাখি! এতে পুলিশের কাজ অনেক বেড়ে যায়। তারপর দুই মাস্তানকে ধরে এনে দাবড়ালে। শেষ পরামর্শ সাবধানে থাকবেন। সাধারণ একজন নাগরিককে মন্ত্রীদের মতো চব্বিশ ঘণ্টা প্রোটেকশান দেবার ব্যবস্থা এ দেশে নেই। তা হলে বুঝতেই পারছিস বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। যে-কোনও মুহূর্তে আবার আক্রমণ হতে পারে।'

'ওখান থেকে দিনকতক সরে আয় না।'

'না, সেটা ঠিক হবে না, ভাববে ভয় পেয়েছি। ফিরে গেলেই ডবল চাপ দেবে। এ যুগে বাস করতে হলে সাহস চাই। সব সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। শোন, আমি এলুম তোদের নিয়ে যেতে। মনে আছে তো? রবিবার আমাদের আউটিং-এর কথা ছিল!'

'মনে আছে, তবে তোর ওখানে ঝামেলা চলছে যে?'

'আর ঝামেলা কোথায়? সে তো এখন পুলিশের হাতে। আমি তাড়াতাড়ি এলুম, তোরা সবাই যাবি। ওখানেই রান্না হবে। ইভিনিং শো-এ সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবি। খুব ভাল একটা ছবি হচ্ছে গ্লোবে। নে নে রেডি হয়ে নে। চানটান ওখানেই হবে।'

'হ্যাঁরে, কোনও ঝামেলা হবে না তো?'

'হবে না রে বাবা! কী ঝামেলা হবে? যদিও হয়ও, তোরা আমাকে একটু প্রোটেকশান দিবি। দিবি না?'

প্রশান্ত আমতা আমতা করে বললে, 'হ্যাঁ সে তো দোবই। কোমর বেঁধে লড়ে যাব। তুই একটু বোস। আমি ওদের রেডি করি।'

সম্বরণ মনে মনে হাসল। সংসারী মানুষ সব সময়েই যেন ন্যাজে গোবরে। সব সময়েই অতি হিসেবি, সাবধানী। সকালের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল।

রেণু এরই মধ্যে পড়তে বসে গেছে। মায়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা পড়তে বসা। প্রশান্ত শ্যামলীকে বললে, 'আজ রান্নাবানা থাক।'

'কেন? আজ হরিমটর হবে?'

'না, হরিমটর কেন হবে? বরং আজ ভূরিভোজ হবে। সম্বরণের ওখানে আজ আমাদের নিমন্ত্রণ।

তোমাকে কাল বলার সুযোগ পাইনি। যা মেজাজ করে রেখেছিলে! আজকেও অবশ্য তোমার মেজাজ খুবই খারাপ।' শ্যামলী ভারভার মুখে বললে, 'যার নিজেরই চালচুলোর ঠিক নেই তার বাড়িতে নেমন্তন্ন। তুমি হাসালে।'

'আহা! একটু আস্তে কথা বলো না। শুনতে পাবে যে! গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছ কেন।'

'আমার গলাটাই ওইরকম। বুড়ো বয়েসে তো আর শোধরানো যাবে না।'

'আচ্ছা বেশ। তাই হল, শোধরানো যাবে না। তুমি এখন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। রেণু কোথায়, রেণু?'

প্রশান্ত গলা চড়িয়ে রেণুকে ডাকতে লাগল। সম্বরণ মনে করুক বাড়িতে একটা খুশির হাওয়া বইছে। কে বলেছে অশান্তি চলেছে! এই তো সব ঠিকই আছে। রেণু, রেণু।

শ্যামলী চড়া গলায় বললে, 'দাঁড়াও, ব্যাপারটা কী আগে শুনি।'

'ব্যাপারটা খুবই সহজ এবং সরল। তুমি যদি দয়া করে জটিল করে না তোলো। আমরা যাব, ইচ্ছেমতো রাঁধব, খাব, গান গাইব, গান শুনব, বিলিতি বাথরুমে বাথটবে শুয়ে, গরমজল, ঠাণ্ডাজল মিশিয়ে, বিলিতি সাবান মেখে চান করব। বিকেলে সিনেমাটিনেমা দেখে হইহই করে ফিরে আসব। নির্ভেজাল একটু ছুটির দিন, সংসার থেকে দূরে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'কেন? এতে মাথা খারাপের কী দেখলে?'

'ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে মেয়ে নিয়ে যাব? যিনি আজ রাতে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন নারীঘটিত ব্যাপারে। যাঁর চারপাশে গুন্ডারা কিলবিল করে আছে খোলা ছুরি হাতে। আমার অত সাহস নেই। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও, আমরা কেউ যাব না।'

'তুমি তো আচ্ছা অবুঝ মহিলা। ওটা ফলস কেস। চাপ দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা। আশ্চর্য তোমার পরিবর্তন! তুমি না একদিন সেই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছিলে যাকে কিডন্যাপিং কেসে পুলিশ ধরতে এসেছিল। পরে জানা গেল ব্যাপারটা সাজানো।'

'ছেলেতে আর মেয়েতে অনেক তফাত। ছেলেরা হল শিকারি আর মেয়েরা হল শিকার। আর এটাও সত্য যা রটে তা বটে। ছেলেদের তোমরা চিনতে পারবে না, ছেলেদের হাড়ে হাড়ে চেনে মেয়েরা।'

প্রশান্ত মুখটা হাসি হাসি করে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক তত্ত্ব কথা শুনিয়েছ, এবার চলো।'

শ্যামলী যেন গর্জন করে উঠল, 'খবরদার, আমার কাছে অন্যায় আবদার করতে এসো না। তোমার যেতে ইচ্ছে করলে যাও।'

শ্যামলীর হাবভাব দেখে প্রশান্ত ভীষণ অবাক হয়ে গেল। শ্যামলী কি মানসিক সুস্থতা সত্যিই হারিয়ে ফেলতে চলেছে। যেমন করেই হোক সম্বরণকে যা হয় একটা কিছু বুঝিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। বলা যায় না শ্যামলী হয়তো হঠাৎ কিছু মুখের ওপর বলেই বসল! সম্বরণকে এ বাড়িতেই দিনটা কাটিয়ে যেতে বলবে, এমন ঝুঁকি নিতেও সাহস হচ্ছে না। কী অদ্ভুত পরাধীনতা।

প্রশান্ত যতটা সম্ভব উৎফুল্লতার ভাব নিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল। সম্বরণ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে?'

'একটু অসুবিধে হয়ে গেল যে! শ্যামলী বলছে শরীর ভাল নেই। রেণু বলছে, ভীষণ পড়ার চাপ।'

'তা হলে আমি চলি।'

'কেন চলবি কেন? আমি কী জন্যে রয়েছি! উলটো হোক। আজকের দিনটা তুই এখানে কাটিয়ে যা। তোকে তেল মাখাব, চান করাব, ধুতি পাঞ্জাবি পরাব, দুপুরে ঘুম পাড়াব।'

'না, আজ আমাকে ছেড়ে দে। কাল প্রায় সারারাত জেগেছি। আজ আমি নির্জনে একটু ঘুমোই।'

প্রস্তাবটা খুবই ভাল। সম্বরণকে ছেড়ে দিতে পারলেই প্রশান্ত বেঁচে যায়। বাড়ির আবহাওয়া খুবই

গোলমেলে। কখন কী যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। সেই নীলকণ্ঠের গানের মতো। শ্যামাপদে আশ, নদীতীরে বাস। সম্বরণ সেন্টার টেবিল থেকে চাবি তুলে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মুখে আর সে হাসি নেই। শ্যামলী আর প্রশান্ত যত নিচু গলাতেই কথা বলুক, কিছু কি আর কানে যায়নি!

প্রশান্ত দরজা খুলে দিতে দিতে শান্তিপুরি ভদ্রতা করে বললে, 'তোর কোনও অসুবিধে হত না রে!'

সম্বরণ ফিসফিস করে বললে, 'হট হাউসে গেস্ট মানায় না রে! টেম্পারেচার আরও চড়ে যাবে।

রাস্তায় একটা সাইকেল রিকশা ঢুকছে। পাড়াব একটা ছেলে প্রশান্তদের বাড়িটা দেখিয়ে বলছে, এই বাড়ি, এই বাড়ি। হুডখোলা রিকশা প্রশান্তর বাড়ির সামনে থেমে পড়ল। আরোহীর শরীরের উর্ধ্বভাগ দেখা যাচ্ছে না। পায়ের দিকে সরু ফিতে পাড় কাপড়ের অংশ আর হাঁটু দুটো দেখা যাচ্ছে। সম্বরণ আর প্রশান্ত দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মহিলা উদভ্রান্তের মতো গাড়ি থেকে নামলেন।

পায়ে খয়াখয়া চটি। মুখ তুলে বাড়ির দিকে তাকাতে গিয়েই প্রশান্ত আর সম্বরণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। গেট ঠেলে, ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রশান্তবাবু আছেন? রেণুর বাবা।'

প্রশান্ত বললে, 'আমিই রেণুর বাবা, প্রশান্ত, বলুন, কী বলবেন?'

রিকশা গেটের বাইরে একটু আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চালক, একজন আধুনিক যুবক। হ্যান্ডেলের ওপর আলগা হাত ফেলে, সামনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। সামনে বাড়ির দোতলার জানালায় সেই বউটি। মহিলা প্রশান্তর মুখের দিকে বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। প্রশান্ত দেখতে পাচ্ছে চোখে জল নামছে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ধরা ধরা গলায় মহিলা বললেন, 'এ আপনি কী করলেন? গুন্ডা দিয়ে ছেলেটাকে ওইভাবে মার খাওয়ালেন?'

প্রশান্ত থতমত খেয়ে বললে, 'কে আপনি? কে আপনার ছেলে?'

'তপন। আমার ছেলের নাম তপন।'

'তাকে তো আমি চিনি না, তার নামও আমি শুনিনি। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় বধূটির পাশে তার শাশুড়ি এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রশান্ত এক নজরে দেখে নিয়েছে। মন্দ কী, রবিবারের সকালে বাড়ির সামনে একটা উত্তেজনা বেশ দানা পাকিয়ে উঠছে। প্রশান্ত বললে, 'ঠিক আছে, আসুন আমরা ভেতরে যাই। সম্বরণ, তুইও আয় না ভাই।'

মহিলার চলনে বেশ একটা তেজস্বিতার ভাব। একসময় সুন্দরীই ছিলেন। সংসার এখন ঝলসে দিয়েছে। দরজার পাশে রেণু দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু দূরে শ্যামলী। প্রশান্ত না জানলেও, দু'জনেই জানে, ইনি কে। প্রশান্ত বললে, 'আপনি বসুন।'

মহিলা বসতে গিয়ে রেণু আর রেণুর মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রেণু? আপনি রেণুর মা?'

শ্যামলী ঘাড় নাড়ল। রেণু সামনে এগিয়ে এসে বললে, 'তপনদার কী হয়েছে মাসিমা?'

প্রশান্ত বললে, 'তুই এঁকে চিনিস রেণু? তপনদা কে?'

রেণু হাতের ইশারায় প্রশান্তকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমাকে সব বলছি বাবা, তার আগে মাসিমাকে বলতে দাও কী হয়েছে?'

মহিলা আড়ষ্ট হয়ে সোফায় বসেছেন। শ্যামলী আরও দু'পা সামনে এগিয়ে এসেছে। আঁচলে চোখ মুছে মহিলা বললেন, 'আজ ভোরে তপন বেরোল সাইকেলে, রোজ যেমন বেরোয়, কাগজ আনতে। অনেকটা পরে পাড়ার ছেলেরাই ধরাধরি করে ছেলেকে নিয়ে এসে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল। মাথায় ব্যান্ডেজ। হাত পা ক্ষতবিক্ষত। ডান চোখটা কালসিটে পড়ে, ফুলে, ঢেকে গেছে।

তোমাদের পাঠানো গুন্ডারা মেরেছে, শাসিয়ে গেছে, আর যদি কোনওদিন রেণুর পেছনে ঘুরতে দেখি লাশ ফেলে দোব। আমি আসতুম না মা। আমি তোমাদের কিছু বলতেও চাই না। আমি একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে এলুম, সে কীরকম মা, তিনি কীবকম বাবা, যারা নিরীহ একটা ছেলেকে এইভাবে মার খাওয়াতে পারে। আমার ছেলে কী এমন অপরাধ করেছে? রেণুকে কী এমন অসম্মান করেছে তা তো জানি না। যদি সত্যিই সে কিছু অপরাধ করে থাকে আমাকে কেন জানালেন না।'

বেণু মায়ের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'তোমার কাজ?'

শ্যামলীর মুখে চোখে ভয়ের ভাব। তপনের চিঠি পেয়ে শ্যামলী ভেবেছিল, প্রশান্তকে বলে কোনও কাজ হবে না। পলটুদের বলবে, ছেলেটাকে, একটু কড়কে দিয়ে আসতে। সে তো শুধু ভেবেই ছিল। ভাবনাতে তো আর এত বড় একটা কাজ হতে পারে না। শ্যামলী বললে, 'না, আমি কাকে শাসন করতে পাঠাব? আমি আমার মেয়েকে শাসন করতে পারি। আমি পরের ছেলেকে কোন সাহসে মারধর করার জন্যে গুন্ডা পাঠাব?'

প্রশান্তর মুখ দেখে মনে হবে, সে গভীব জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। ন্যাজামুড়ো কিছুই জানে না। সম্বরণও কম বিব্রত নয়। যে পরিবার একটু আগেই তাকে অন্দবমহল থেকে দূর করে দিয়েছে সেই পরিবারেই কেচ্ছার সাক্ষী হতে হচ্ছে। প্রশান্ত তাকে ছেড়ে দিলেই পারত।

রেণু বলল, 'আমার বিশ্বাস হয় না, মা এমন কাজ কবাতে পাবে। আমার মাকে আমি চিনি। তা ছাড়া তপনদাও এমন কিছু করেনি যা দোষেব।'

প্রশান্ত বললে, 'তপন কে? সে তোকে কী করেছে?'

রেণু বললে, 'মা তোমাকে যে চিঠির কথা বলত, অশান্তি করত, তপন সেই চিঠিব লেখক।'

প্রশান্ত বললে, 'সেই আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, কাঁচা বাংলা, ইতি গোলাপফুল।'

'না, সে চিঠি নয়। তুমি সে চিঠি দেখোনি। মা-ও হয়তো দেখোনি। তপন আর্টিস্ট। এ বছব আর্ট কলেজ থেকে বেরিযে যাবে।'

প্রশান্ত বললে, 'তা হলে?'

রেণু বললে, 'তা হলে, একটা ব্যাপার হতে পারে, প্রভাদি তপনকে একদিন স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলেন। সেই দিনই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিযে সাবধান কবে দিয়েছিলেন। তপনের ঠিকানা ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলেন। সেই দিনই প্রভাদি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তা হলে কি প্রভাদিই।'

প্রশান্ত নির্বোধের মতো জিজ্ঞেস কবলে, 'তপন কেন কথা বলছিল?'

সম্ববণ বললে, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা ফ্রিলি কথা বলে। ওটা দোষের কিছু নয়।'

শ্যামলী বললে, 'এ বাড়িতে আজকালের ধাবা চলবে না। রেণুকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না, টেনে ধরে থাকব।'

সম্বরণ বললে, 'কাল-কে আপনি কী করে অস্বীকার করবেন বউঠান?'

প্রশান্ত বললে, 'এ সময় তক্কাতক্কি করে লাভ নেই। আপনার ছেলে মার খেয়েছে, আমার মেয়ে উপলক্ষ। এর চেয়ে বড় অপরাধ আমার আর কী হতে পারে? সমস্ত চিকিৎসার খরচ আমি দোব। ভাল ডাক্তার, প্রয়োজন হলে নার্সিংহোম।'

তপনের মা বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষে করতে আসিনি। তপন আমার একমাত্র অবলম্বন। খবরের কাগজ বিলি করে সংসার চালায়। দুপুরে আর্ট কলেজে পড়ে। মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে দু'-চার পয়সা রোজগার করে। আমি তাকে ভাল ছেলেই বলে জানি। তবে সে কেন মার খাবে?'

সম্বরণ বললে, 'এটুকু তো আপনি বুঝলেন, আপনার ছেলেকে রেণুর নাম করে কেউ শাসালেও আমরা তাকে পাঠাইনি।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা আমি তা হলে যাই।'

রেণু বললে, 'দাঁড়ান, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।'

শ্যামলী বললে, 'তার মানে? তুই একা একা কোথায় যাবি? সে স্বাধীনতা তোকে কে দিয়েছে?'

রেণু স্থির গলায় বললে, 'বা রে, আমার জন্যে একজন মার খেয়েছে, আমি তাকে দেখতে যাব না। আমি প্রভাদির কাছেও যাব। জিজ্ঞেস করব, এটা তাঁর কাজ কি না।'

'না, তুমি একা যাবে না।'

'তা হলে তুমিও চলো।'

সম্বরণ বললে, 'বউঠান, আমরা সবাই যাব। যে ছেলে সকালে কাগজ বেচে সংসার চালায়, আর্ট কলেজে পড়ে, সে ছেলেকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। সে পরগাছা নয়, গাছ। চল প্রশান্ত, ওঠ।'

শ্যামলী বললে, 'সবাই গেলে বাড়ি?'

প্রশান্ত বললে, 'কেন তালা?'

সম্বরণের গাড়িতে পাঁচজনের অসুবিধে হবার কথা নয়। রিকশাওলা তপনের মায়ের পরিচিত। ভাড়া না নিয়েই চলে গেল। প্রশান্ত ঝুলোঝুলি করেছিল। ছেলেটির লোভ বড় কম। সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় এখন তিনটি মুখ, সেই বধূটি, তার স্বামী এবং শাশুড়ি। গাড়ির পিছনে তিনজন মহিলা। প্রশান্ত সামনে সম্বরণের পাশে। গাড়ি চলতে শুরু করল। দোতলার জানালায় মুখ তিনটিতে বড়ই হতাশা, ধ্যাত তেমন কিছুই হল না। বোঝাও গেল না কী হয়েছে? বড় চাপা সংসার। আবার এক গাড়িঅলা বন্ধু জুটেছে।

প্রশান্ত যেতে যেতে বললে, 'আমরা আগে প্রভাদির বাড়িতে যাব। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে যেতে বসেছে। আমি বিশ্বাসই করি না উনি এ কাজ করাতে পারেন। আগেকার দিনের জমিদারদের মতো ব্যাপার।'

রেণু বললে, 'আমিও তাই ভাবছি। কাকু আপনি আগে প্রভাদির কাছেই চলুন।'

'বেশ, রাস্তা বলে দাও।'

'আপনি সামনের ডানদিকের রাস্তাটা ধরুন।'

রেণু যেন হঠাৎ বেশ বড় হয়ে গেছে। তার নির্দেশেই সব কিছু হচ্ছে। রেণু বুঝতে পারছে না; কিন্তু রেণুর ব্যক্তিত্বে সবাই চাপা পড়ে গেছে।

রেণু এই প্রথম প্রভাদিকে একেবারে ঘরোয়া সাজে, ঘরোয়া কাজে দেখল। বসে বসে মোচা কুটছেন। পাশে পড়ে আছে দু'মালা নারকেল। হালকা নীল শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ভিজে চুল ঘাড়ের কাছে দুলছে। মুখচোখ রবিবারের সকালের মতোই ঝলমলে। রেণুকে দেখে অবাক হলেন, 'কী ব্যাপার রেণু?'

রেণু মেঝেতে বসে পড়ে বলল, প্রভাদি, 'আপনি কি তপনকে কিছু করেছেন?'

'তার মানে?'

'মানে। মারধর।'

'সে কী? মারধর করতে যাব কোন দুঃখে। সে কি আমার ছাত্র? হঠাৎ তোমার এই প্রশ্ন?'

'একটা ব্যাপার হয়েছে। নীচে বাবা, মা সম্বরণকাকু আর তপনের মা গাড়িতে বসে আছেন।'

'সে কী?'

প্রভাদি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। আঙুলে তেল ঘষছেন মোচার আঠা তোলার জন্যে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রেণুকে বললেন, 'যাও তুমি ওঁদের ওপরে নিয়ে এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে মিছিল করে দলবল উঠে আসছে। রেণু, প্রশান্ত, সম্বরণ, শ্যামলী, তপনের মা। প্রশান্ত হাত জোড় করে বললে, 'নমস্কার।' সম্বরণের মুখে প্রতিধ্বনি উঠল। শ্যামলী কী বলবে ভেবে পেল না। তপনের মা নীরব। তিনি দেখছেন, ইনিই কি সেই মহিলা। যিনি ভোররাতে আততায়ী পাঠিয়ে দেন।

প্রভাদি বললেন, 'আসুন। এ ঘরে কিন্তু বাইরের জুতো চলবে না, আর ধূমপান নিষিদ্ধ।'

হাসিমুখেই বললেন, তবে সামান্য আদেশের সুর। কিছু মহিলা আছেন, যাঁদের আদেশ পালনেও পুরুষের আনন্দ। সকলে বাইরের জুতো ছেড়ে বসার ঘরে বসলেন। প্রভাদি বললেন, 'একটু চা হোক।'

প্রশান্ত বললে, 'চা খাবার কি সময় পাওয়া যাবে। আমরা এই ভদ্রমহিলার বাড়ি যাচ্ছি। ইনি তপনের মা। আজ ভোরে রেণুর নাম করে তপনকে ভীষণ মেরেছে।'

'সে কী? কারা মারলে?'

'সেইটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আমরা ভাবলুম...'

'আমি লোক পাঠিয়ে মার খাইয়েছি? আমি কোনও তৃতীয় ব্যক্তিতে বিশ্বাস করি না। আমি রেণুকে বলেছিলুম, এরপর যদি স্কুলের গেটে তোমার তপনকে দেখি তা হলে ধমকে দেব। মেয়েদের স্কুলে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলা এক ধরনের অসভ্যতা। মারতে হলে আমার হাতের একটা চড়ই যথেষ্ট।'

প্রশান্ত বললে, 'তা হলে কারা মেরে এল বলুন তো?'

'তা তো বলতে পারব না। আজকাল কে যে কোথায় কী করে বসছে? সব বাঁধনই তো আলগা হয়ে আসছে।' তপনের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার ছেলেই বা হঠাৎ সব ছেড়ে মেয়েদের নিয়ে পড়ল কেন? সময়ে সাবধান করতে পারেননি?'

তপনের মা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি তো জানতুম না।'

'কিছুই যদি জানবেন না তা হলে মা হয়েছেন কী করতে? ছেলের রোজগারের টাকায় খাবার জন্যে? বেশ হয়েছে মার খেয়েছে। চোখ বুজে থাকলে ওইরকমই হয়।'

'আমার ছেলে তো ওরকম নয়।'

'সে তো দেখাই যাচ্ছে। ওরকম নয় তো মার খেল কেন? আমি নিজে দেখেছি স্কুলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রেণুর সঙ্গে কথা বলছে। রেণু আমাকে বলেছে, কবে কোন বিয়ে বাড়িতে আলাপ হয়েছিল সেই থেকে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। আমি চাই না তবু আসে। কেন সে আসত? এটা কি সিনেমা?'

তপনের মা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি তো এতসব জানতুম না।'

'জানবেন কী করে? কোনওদিন জানার চেষ্টা করেছেন? আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব ছাড়া গোরু। সারাদিন চরে বেড়ায় সন্ধেবেলা গোয়ালে এসে ঢোকে। ছাড়া গোরু মাঝে মধ্যে মার খাবেই। এইসব ছেলেদের জন্যে আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। এই লক্ষ্মী, চা বসা। আমি যাচ্ছি।'

প্রশান্ত বললে, 'ছেলেটি কিন্তু ভাল। রেণুর কাছে যাওয়া আসাটা ছেলেমানুষি খেয়াল হয়তো।'

'ছেলেমানুষকে কেউ মারে না প্রশান্তবাবু, মার খায় বুড়ো দামড়ারা তাদের পাপের জন্যে।'

প্রভাদি চায়ের জন্যে উঠে চলে গেলেন। সম্বরণ নড়েচড়ে বসে বললে, 'ওরে ব্বাবা। সাংঘাতিক কড়া মহিলা!'

'আমাদের সমাজে এখন এইরকম কড়া মহিলারই প্রয়োজন। দিন দিন আমরা যেভাবে চরিত্রশূন্য হয়ে পড়ছি। তোর মনে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে হিটলারের ইন্টারভিউ! হিটলার তখনও ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি। সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জার্মানির জন্যে কী করেছেন? হিটলার মহিলার হাত ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মহিলা দেখলেন প্রশস্ত মাঠে তেজোদীপ্ত, স্বাস্থ্যবান হাজার হাজার ছেলে দীপ্ত ভঙ্গিতে মার্চ করছে। হিটলার বললেন, জার্মানিতে আমি সেই মা তৈরি করেছি যারা এমন সব সন্তানের জন্ম দিতে পারে।'

শ্যামলী প্রশান্তর উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বললে, 'সৃষ্টির কাজ পড়ে আছে, একটু তাড়াতাড়ি সারো না।'

সম্বরণ নিচু সুরে বললে, 'মা হওয়া কি মুখের কথা?'

রেণু উঠে ভেতরে গেল, প্রভাদিকে সাহায্য করতে। শুধু চা করেছেন, সেই ভাল। এ সময়ে কারুর কিছু তারিয়ে তারিয়ে না খাওয়াই উচিত। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। একটি নিরীহ ছেলে জখম হয়ে পড়ে আছে। তপন কী যে চাইছিল? ছেলেরা মেয়েদের কাছে কী যে চায়। যারা সিটি মারে, আড় চোখে চায়, মাল, মাল বলে চেঁচায়, সাইকেলে চক্কর মারে তাদের তবু বোঝা যায়। তপনরা আর এক জাতের ছেলে।

'নাও ধরো।' প্রভাদি রেণুকে দুটো কাপ দিলেন। নিজে দুটো নিলেন। লক্ষ্মী চিনি দিয়ে নেড়ে নেড়ে দিচ্ছে। লক্ষ্মী বেশ বড় হয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। প্রভাদি বললেন, 'লক্ষ্মী, তুই আর দুটো নিয়ে আয়।'

তপনের মা চা খেলেন না। খান না বলেই খেলেন না। কে জানে? প্রভাদি কড়া কথা বলেছেন। অভিমান হতে পারে। প্রভাদি মারার জন্যে ভাড়াটে গুন্ডা পাঠাবেন, এ হতেই পারে না। তাঁর এমন কিছু দায় পড়েনি। কে তা হলে তপনকে মারতে পারে? রেণু চা খেতে খেতে একপাশ থেকে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই একই মুখ। ছেলেবেলা থেকে যা দেখে আসছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সামান্য ক্লান্তির ছাপ; কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। প্রশান্ত শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রেখে প্রভাদিকে বললে, 'আপনি যাবেন?'

'আমি কেন যাব? আপনারাই বা যাচ্ছেন কেন? এই ধরনের ছেলেদের জন্যে আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই! একেবারে পরিষ্কার কথা।'

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না থাক তা হলে।'

পাঁচজনে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল। সম্বরণ ঘাড় ফিরিয়ে চট করে একবার দেখে নিল। নীল শাড়িতে মোড়া নিশ্চল অহংকার। সব মতামতই যেন জীবনের শেষ কথা। তারপর কারুরই আর কিছু বলার থাকে না। চতুর্দিকেই অনমনীয় মন। পাথরের টুকরো সব। তাই কি সংঘাত এত বেড়ে চলেছে! ছায়াও অনেকটা এই রকমই ছিল। সম্বরণের হঠাৎ তার বউয়ের কথা মনে পড়ল। তিন বছরের মেয়েটিকে নিয়ে একদিন এক ঝটকায় সব ভেঙেচুরে দিয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেল। আধুনিক সংসার যেন পাখির বাসা। বছরকার ব্যাপার। আজ এ গাছে, কাল ও গাছে। সম্বরণের মেয়েও এতদিনে রেণুর মতো বড় হয়েছে। পুনাতে লেখাপড়া করছে। আর ছায়া? নিশ্চয়ই বাজারে পাখি খুঁজতে বেরিয়েছে। আর কোনও পাখি গান শোনাতে আসবে না! তোমার বয়েস হয়েছে। বয়েসের কাছে সব জব্দ। জীবনের মোহানায় দাঁড়িয়ে নদী যদি নদীতে মিলতে পারে তবেই হয়তো সমুদ্রসংগীত শোনা যায়। মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে, রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে।

মাঠ, মাঠের পরেই পুকুর, একটা সুঁড়ি পথ, এককোণে একটি সজনে গাছের পাশে তপনদের বাড়ি। পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেয়াল। টিনের চাল। একটি মাত্র ঘর, এক চিলতে দালান, রান্নাঘর, ছোট্ট একটু উঠোন, ইটপাতা পাতকোতল। সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরটা এতই ছোট, পাঁচজনের একসঙ্গে স্থান হবে না। তপন একটা চৌকিতে চিত হয়ে শুয়ে আছে। পাশে একটা ভাঙা চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন গম্ভীর মুখে। শ্যামলীর মনে হল, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয। সম্বরণ ঘরে ঢুকেই বলে ফেলল, 'বাঃ!'

বাঃ বলার কারণ, ঘরের দেয়ালে ঝুলছে সুন্দর সুন্দর ছবি। জল রঙে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। বলে না দিলেও বোঝা যায় তপনেরই আঁকা। প্রশান্তরা ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ উঠে বাইরে চলে গেলেন। প্রশান্ত টিনের চেয়ারে বসতেই খটাস করে একটা শব্দ হল। তপনের একটা চোখ বন্ধ, আর একটা চোখ একটু খোলার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'কে?'

'তপন, আমরা এসেছি। আমি প্রশান্ত, রেণুর মা, রেণু, রেণুর কাকা।'

ঘর ভরে গেছে। তপনের মা দরজার বাইরে। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন চাপা গলায়। তপন বাঁ হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে রেখে ক্ষীণ গলায় বললে, 'নমস্কার। মাকে আমি বারণ করেছিলুম। তবু ছুটল। মায়েদের মাথার ঠিক থাকে না। আমার খুব লজ্জা করছে।' প্রশান্ত বিছানার দিকে মুখটা নিচু করে বললে, 'লজ্জার কী আছে! অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।'

তপন মুখের চুক চুক শব্দ করে বললে, 'অ্যাক্সিডেন্ট তো নয়! মার। ধোলাই। হিরো হতে গিয়ে জিরো হয়ে গেছি। মাসিমা কোথায়?'

প্রশান্ত ইশারায় শ্যামলীকে কাছে ডাকল। শ্যামলীর আর তেমন চোটপাট নেই। অসহায় ছেলেটি বিছানায় পড়ে আছে। তপনের মতো তারও তো একটি ছেলে থাকতে পারত। এই তপনকে সে এতদিন শত্রু ভেবে এসেছে। শ্যামলী মাথার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'তপন, এই যে আমি।'

'আপনার ছেলেদের খুব শক্তি। বললে, মেরে লাশ করে দিতুম, করলুম না। তা, এ যাত্রা বেঁচে গেলুম, জানেন মাসিমা। আমি কোথা থেকে শক্তি পাব বলুন। সকালে পকেটে এক মুঠো ছোলা নিয়ে কাগজ বিলি করতে বেরোই। ভাল খাবার জোটে না দু'বেলা। তবে শুনুন, হয়তো বিশ্বাস করবেন না, রেণুর মতো আমার এক বোন ছিল। এ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা নয়। সত্যি ঘটনা। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বলি, তা হলে আমার মার খাবার লজ্জাটা খানিক কমবে।'

বৃদ্ধ বাইরে থেকে বললেন, 'নাই বা বেশি কথা বললি তপন!'

তপনের কেটে কুটে যাওয়া ছেঁড়া ঠোঁটে হাসির রেখা খেলে গেল, 'দাদু একটু বলি, সেই গল্পটা একটু বলি। হারানো সহজ, পাওয়াটা অত সহজ নয়। আমার সেই বোন আমার ওপর রাগ করে আত্মহত্যা করেছিল। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে। সে অনেক বড় গল্প। মেয়েরা একটু অভিমানী হয় তো। যে চলে গেল সে তো চলেই গেল, যারা রয়ে গেল তারা কীভাবে রইল। আমি এইসব ভাবি। বর্ষার দুপুরে ইডেনে বসে যখন ছায়াশূন্য প্রকৃতির ছবি আঁকি তখন মনে হয় ফোর্টের দিকের উঁচু জমি থেকে ছুটতে ছুটতে সে নেমে আসছে। আমার মাথার ওপর ওই যে কাঠের ফ্রেম, তাকিয়ে দেখুন। ওই সেই প্রাণহীন ঘাতক। গল্প কতরকম হতে পারে, তাই না মাসিমা। তা বেশ হয়েছে নাটকের জবাব নাটকেই দিয়েছেন। অভিমানে যে চলে গেল সেই প্রতিশোধ নিলে। বললে, কাকে ধরে ব্যথা ভুলতে চাও দাদা। যে যায়, সে কি এমনি যায়। না। আমি আর গল্প শোনাতে পারছি না, আজ থাক, আর একদিন হবে। আমাকে ক্ষমা করুন।'

শ্যামলী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্বরণ অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখছে। অনেক দিন পরে সে এক শক্তিশালী হাতের সন্ধান পেয়েছে, এখন এমন একজনকে দেখছে, যে নিজেকে নিজে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

একটু তালিম দিতে পারলে এ ছেলে ফাটিয়ে দিতে পারবে। প্রশান্তর মনে হল, অন্তঃসার শূন্য অনেক কাপ্তেন সে এ যাবৎ দেখেছে, এখন এমন একজনকে দেখছে, যে নিজেকে নিজে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

এতক্ষণে রেণু কথা বলল, 'তপনদা, আপনাকে যারা মেরেছে তাদের চেহারা আপনি দেখেছেন?'

'হয়তো দেখেছি।'

রেণু উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কীরকম দেখতে? বলুন, কীরকম দেখতে?'

'কী হবে বলে? কী লাভ?'

রেণু মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মা, সত্যি বলো, পলটুরা নয়?'

শ্যামলী জোর গলায় বললে, 'না।'

রেণু অধৈর্য হয়ে বললে, 'তা হলে কারা? এরা কারা?'

প্রশান্ত বললে, 'তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে তৃতীয় আর একজনের হাত আছে। আমরা নই, প্রভাদি নন, কে তা হলে সেই তৃতীয় ব্যক্তি! রেণুর জানা উচিত।'

শ্যামলী মেয়ের দিকে আবার সেই সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললে, 'বল, কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি? তোর জন্যে যে মানুষ খুন করতে পারে?'

'জানি না।'

'চালাকি পেয়েছিস? জানি না! তোর জন্যে এই নিরীহ ছেলেটি আজ বিছানায়! তবু বলবি জানি না।'

'সত্যি বলছি মা। বিশ্বাস করো।'

'আমি জানি রেণু। এ সেই গোলাপ ফুল।'

প্রশান্ত বললে, 'কোন গোলাপ ফুল?'

শ্যামলী বললে, 'যেটাকে ও ফিতে মোড়া কাগজ বলে চালাতে চায়। ইতি তোমার গোলাপ ফুলের মতো গোল্লা।'

'তাই নাকি? সে তা হলে কে? তাকে আমি জেলে পুরব। সম্বরণ।'

প্রশান্তর লম্ফ ঝম্প দেখে রেণু মনে মনে একটু হাসল। যেমন হাসত মায়ের আগলে রাখার চেষ্টা দেখে। সেই গোলাপ ফুলকে টিট করার ক্ষমতা আপাতত কারুর হাতে নেই। কেউ না জানুক, রেণু জানে তপনও হয়তো জানে। তপনের মতো শীর্ণকায় শিল্পী, প্রশান্তর মতো নিরস্ত্র মানুষের রুখে দাঁড়ানোয় কিছু হবে না। জীবনটাই বিপন্ন হবে। তাকে কাবু করতে পারত শ্যামলদার মতো বেপরোয়া ছেলেরা। নাম শুনলে এরা চমকে উঠবে। না বলাই ভাল।

সম্বরণ বললে, 'রেণুমা, সেই ছেলে? নামটা তুমি বলো। আমরা থানায় যাব।'

'সত্যি বলছি কাকু, আমি জানি না।'

শ্যামলী বললে, 'সেই এক গোঁ, জানি তবু বলব না।'

সম্বরণ বললে, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে, এখন থাক, পরে নিশ্চয়ই জানা যাবে। এখন আমরা তপনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।'

তপনের দাদু আর মা ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছেন। তপনের ব্যান্ডেজ জড়ানো মুখ। কোথাও লাল কোথাও কালো। রেণু তাকিয়ে আছে মাথার ওপর কাঠের ফ্রেমের দিকে। ঢেউ খেলানো টিন ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে গেছে পাশের দিকে। ওই সেই ফ্রেম।

অনেক ঘটনাই রেণুর এখন মনে পড়ছে। কিছুই যার প্রকাশ করা যাবে না। যেই বিভীষিকা ছায়ার সমান ফেরে অহরহ রূপের পাছে, বহুবার তার আকার প্রকার ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে। তুমি সে দিন ঠিকই বলেছিলে বাবা, পথে বড় রিপু ভয়!

তুমি আর আমি
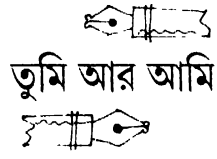
জ্ঞানযোগ

কী বলবেন আমার এই লেখাকে? উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী? যা খুশি বলুন, আমার কিছু যায় আসে না। ন্যাস, বিন্যাস, জীবনের অনেক খেলাই তো দেখা হল। গ্রামে এক থিয়েটার এসেছিল। প্রবেশ ও প্রস্থানের ছিল দুটো দরজা। মধু হাজরা সেই থিয়েটার দেখে এসে বড় বড় চোখ করে বলেছিল, "কী জিনিস দেখে এলুম গো মা! দু'মুখো থিয়েটকল। এ মুখে লোক ঢুকছে, ও মুখে বেরোচ্ছে।" এই পৃথিবীও দু'মুখো থিয়েটকল। এ মুখে ঢুকেছি, বেরিয়ে যাব ও মুখে। মাঝখানে যা করেছি তা যদি উপন্যাস হয় তো হোক। তবে, আমি গল্প বলতে বসিনি। আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। ধনী মানুষ উত্তরপুরুষের জন্যে সোনাদানা গুপ্তধন রেখে যায়। বিজ্ঞানী জ্ঞানের খোসা ফেলে যান। সাহিত্যিক রেখে যান অমর সৃষ্টি। আমার মতো গাধা, গোটাকতক পাঁঠাপাঁঠি ছাড়া কী আর রেখে যেতে পারে? বিধবা স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভাড়া বাড়ি। বৈভবের মধ্যে একটি পোকায় কাটা শাল। এক সেট চাকতি তোবড়ানো সোনার বোতাম। নস্যি নেওয়ার অভ্যাস থাকলে নস্যির ডিবে, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে একটি লাইটার। সমালোচক আত্মীয়স্বজন, একপাল শত্রু। আমি বাড়তি আর একটি বস্তু রেখে যেতে চাই। সেটি হল আমার এই ডায়েরি। জানি, কেউই হয়তো উলটে দেখবে না। আমি নেতা নই, ধর্মগুরু নই, রেপিস্ট কিংবা এসকেপিস্টও নই, এগজিসট্যানসিয়ালিস্ট, সাইন্টিস্ট, কি রেজিসটেনসিয়ালিস্টও নই, একেবারেই সাধারণ সেন্টিমেন্টালিস্ট, ন্যাতার মতো সারাজীবন পড়ে থেকেছি, অন্নদাতা ভাগ্যদাতার পায়ের তলায়। ঈশ্বরের ভজনা পাঁচমিনিট করলে, স্ত্রীর ভজনা করেছি বারোঘণ্টা। ছেলেকে এক থাপ্পড় মারলে, ভাগ্যের থাপ্পড় খেয়েছি হাজার হাজার। ডোরাকাটা গামছা পরে, ভারিক্কি কত্তা সেজে বাড়িতে নাচার চেষ্টা করলেও, গলায় গামছা মেরেছে হাজারজন' আমার ডায়েরি কে পড়বে! ওই যে হৃষ্টপুষ্ট মহিলা, আমার সহধর্মিণী, যিনি এখন রেগে রেগে মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছেন, পুরনো কাগজের সঙ্গে ওজন দরে ঝেড়ে দেবেন। যা হবে তা আমি জানি, তবু আমার মনে হয়েছে, আমি এক অভিযাত্রী, পর্বতারোহী, যোদ্ধা। আমার গন্তব্যস্থল অ্যান্টারটিকা। সেই আমার শীতল স্বর্গ। আমি এক মধ্যবিত্ত আমুণ্ডসেন। ভুল করতে করতে, মরতে মরতে, বাঁচতে বাঁচতে এগিয়ে চলেছি। আমার এই ভুলের খতিয়ান কোনও এক উত্তরপুরুষের কাজে লেগেও যেতে পারে। ন্যাজ কাটা শেয়াল মাত্রেই ন্যাজ কাটতে বলবে। আমি কিন্তু তেমন শেয়াল নই। আমি কর্তব্যপরায়ণ শৃগাল। আজকাল বাইরের লোককে কিছু বললেই বলবে, খুব হয়েছে জ্ঞান দিতে হবে না। বাড়ির লোক মুখ বাঁকায়। ভুরু কোঁচকায় মুখে কিছু বলে না, কারণ হাঁড়ি চাপাবার ফুয়েলের ব্যবস্থা আমার এলেমেই হচ্ছে। রিটায়ার্ড টিকিট ঝুলিয়ে এল মার্কা গাড়ির মতো যেই গ্যারেজ হয়ে যাব, তখন হয়তো ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ঘাটে দিয়ে আসবে। তার হাত থেকে রক্ষার একমাত্র দেবতা থ্রম্বোসিস। প্রভু থ্রম্বসিস, আমাকে মদনতালি বেড়াল কোরো না প্রভু।

কে সে? কে সেই মদনতালি?

পুরাকালে এক মার্জার ছিল। মদনতালি নামে ইতিহাসে খ্যাত। নাম নিয়ে ইতিহাসের তেমন মাথাব্যথা নেই। ইতিহাস কাহিনিনির্ভর। নাম নিয়ে আমার মাথাব্যথা আছে। প্রোফেশন্যাল গবেষক আমি নই; কিন্তু অ্যামেচার হতে আপত্তি কোথায়? মধ্যবিত্তের তালিমারা ছাতার মতো মদনতালি

মনে হয় তালিমারা বেড়াল ছিল। মার খেয়ে খেয়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গিয়েছিল। যেমন আমরা হয়েছি ভাগ্যের হাতে ঝ্যাঁটা খেতে খেতে। সাততালি মারা বঙ্গপুঙ্গব। এবংবিধ মদনতালির স্বভাবটি ছিল বাঙালির মতোই ছিঁচকে। সিঁদেল আর ছিঁচকে চোরের জাত ইদানীং ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে বেশ দড়ো হয়েছে ঠিকই; তবে সন্দেহ হয় ওসব সাজানো ডাকাতি নয় তো! বিলেতের গ্রেট ব্যাঙ্ক রবারির মতো প্রকৃত কঠিন ডাকাতি কি করতে পারবে! পারলেও পারতে পারে! রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাত তো আমাদেরই পূর্বপুরুষ। তা মদনতালির উপদ্রবে গেরস্তের মাছ, দুধ, হেঁশেলে রাখার উপায় নেই। দেখ-মার করেও কিছু হয় না। শেষে একদিন ছেলেরা মদনতালিকে পাকড়াও করল। বিচারে নির্বাসন। গলায় দড়ি বেঁধে মদনতালিকে টানতে টানতে ছেলেরা নিয়ে চলেছে পগারপারে। মদনতালির অবস্থা দেখে অন্য বেড়ালরা জিজ্ঞেস করছে আরে মদনা যে! চললি কোথায়? মদনতালি হাসতে হাসতে বললে,

এতকাল খেলাম দেলাম এবার ধর্মে দিলাম মন
তাই ছেলেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে শ্রীবৃন্দাবন ॥

হে আমার ভাগ্যবিধাতা, তুমি আমাকে মদনতালি কোরো না প্রভু! আশেপাশে অমন মানুষ আমি দু'বেলা দেখি, আর আঁতকে আঁতকে উঠি। ধনীর শেষ জীবন আর মধ্যবিত্তের শেষ জীবনে আকাশ-জমিন ফারাক। দুনিয়া তুমি কার বশ? পাঁঠা আমি অর্থের বশ। আমার মতো মানুষ, যার যত্র আয় তত্র ব্যয়, সঞ্চয়ে ভাঁড়ে মা ভবানী, তার শেষ জীবন মণ্ডলদের রকেই কাটবে। নিয়মের পৃথিবীতে অনিয়ম হয় না। লজিক বলছে, রাম একজন মানুষ, শ্যামও একজন মানুষ। রামের যা হবে শ্যামেরও তাই হবে। নিবারণ চক্রবর্তী, ভবেন দাস, পরেশ বোস, এদের এখন যা অবস্থা কালে আমারও সেই অবস্থাই হবে। আমার পূর্বপুরুষেরা ষাটের আগেই সরে পড়েছেন, নইলে আমার খেল দেখতেন। হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিতুম। মাতৃজঠর থেকে টিস করে পড়ার পর চোখ ফোটা তক অলরাইট, নো প্রবলেম, তারপরই উদূখল-মুষল পর্ব শুরু। ছেলে বাঁকছে, ছেলে বাঁকছে, শেষে ত্রিভঙ্গ মুরারি। মুরারির বাঁশি শুনে শ্রীরাধিকে মোহিত হবার আগেই জন্মদাতাদের মোহমুদ্গর উপস্থিত। যিনি যেতে পারলেন তিনি বাঁচলেন, যিনি রইলেন তিনি দগ্ধে দগ্ধে মরলেন।

ফ্রয়েড নামক এক সাহেব ছিলেন। যৌবনে তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখো বাপু পিনাকীরঞ্জন, মানুষ অমৃতের পুত্র নয়। মানুষ কামজপুত্র। কারন্যাল ডিজায়ার থেকে তোমার উদ্ভব। গোঁফ গজাবার ঢের আগেই তোমার জাগরণ। নানাপ্রকার সিম্পটমের কথা সায়েব আমাকে বলেছিলেন। এমনও বলেছিলেন, আমি নাকি অজ্ঞান অবস্থাতেই আকারে ইঙ্গিতে, শিশুসুলভ হাত-পা নাড়াতেই পিতা হবার আকাঙ্ক্ষা বহুভাবে প্রকাশ করেছি। পায়ের বুড়ো আঙুল চোষা যতটা নির্দোষ ভাবা হয় ততটা নির্দোষ নয়। যেমন পাখির সব শিসই ঈশ্বরের বন্দনা নয়। বিপরীত লিঙ্গকে কাছে আসার ইঙ্গিতও থাকে। বোঝো ঠেলা! কত ধানে কত চাল? যে হিসেব রাখে সে রাখে। পৃথিবীটা মামার বাড়ি নয়। মানুষের নৈশ কারখানা। আরে ছি ছি। কী নিকৃষ্ট ধরনের প্রাণী আমরা! ওই ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। মেয়েরা হলে বলত, ঝ্যাঁটা মারো অমন জীবনে। সেই সায়েব আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, দিস ওয়ার্লড ইজ এ লিবিডিনাস ওয়ার্লড। কী মানে? মেটিরিয়্যাল ওয়ার্লড শুনেছি, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্লড শুনেছি, এ আবার কোন জগৎ? আমার শিক্ষক মহাশয়কে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সপাটে এক চড়। যখন চোখ মেললুম, তখন মাথার কাছে বসে আছে ভুলো। ক্লাসের সবচেয়ে ওঁচা ছেলে। লাস্ট বেঞ্চে বসে আর সারাক্ষণ ছোট ছোট কাগজের গুলি তৈরি করে একে ওকে তাকে ছুড়ে ছুড়ে মারে। স্কুল থেকে মার খেতে খেতে কলেজে এসেছে। বইয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই সে কী করে পাশ করে? অধ্যাপকরা মাঝে মাঝে ক্লাস থেকে বের করে দেন। বেশির ভাগ সময়েই উপেক্ষা করেন। কেউ না সেই ভুলো মাথার কাছে। অধ্যাপকের আচরণে যত না, তার

চেয়ে বেশি আশ্চর্য ভুলোর সেবা দেখে। মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর ধীরে ধীরে খাতার বাতাস করছে। ক্লাস খালি। চোখ মেলতে দেখে ভুলো বললে, 'যাক বেঁচে আছিস তা হলে? টি জি-কে কী বলেছিলিস?' চোয়াল নাড়াতে গিয়ে দেখি অসম্ভব ব্যথা। কোনওরকমে বললুম, 'ভাই, জিজ্ঞেস করেছিলুম, লিবিডো কাকে বলে? লিবিডিনাস ওয়ার্লড মানে কী?'

ভুলো চোখের ভঙ্গি করে বললে, 'দুষ্টু ছেলে। তোর দাদুর বয়সি টি জি-কে ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে আছে! আমরা কী জন্যে আছি বোকা পাঁঠা!'

ভুলোর সঙ্গে দোস্তি জমে গেল। এই প্রসঙ্গে একটি নীতিবাক্য আমি লিখে যাবার প্রয়োজন অনুভব করছি। অধম বিষ্ণুশর্মা নয়, ঈশপও নয়। সামান্য মানুষ। তা হলেও পণ্ডিতেরা বলেন, তৃণের কাছ থেকেও উপদেশ নেবে। গাধাও তোমাকে জ্ঞান দিতে পারে। আচ্ছা, নীতিবাক্যটি হল, ভাল ছেলে মানে স্বার্থপর ছেলে। লেখাপড়া, ডিভিশান, কেরিয়ার, এর বাইরে তাদের কোনও জগৎ নেই। আর যারা খারাপ ছেলে, তাদের দিল থাকে, তাদের পৃথিবী অনেক বড়, বর্ণবহুল। প্রয়োজনে বিশাল ত্যাগও এইসব ছেলেদের দ্বারা সম্ভব। ভুলোর কথাও আমি লিখব। কলম যখন ধরেছি তখন ছাড়ব না। সাহিত্য না হোক ইতিহাস হবে।

সেই ভুলো একদিন হাতেনাতে লিবিডো কাকে বলে বুঝিয়ে দিলে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। পথে একটা ষাঁড় হন্যে হয়ে একটা গোরুর পেছনে ছুটছিল। সে এক দুর্দমনীয় আবেগ। গাড়ি, ঘোড়া, লোকজন কিছুই মানামানি নেই। যেন প্যাটন ট্যাঙ্ক চলেছে। ভুলো বললে, ম্যান, দিস ইজ ইয়োর লিবিডো। বাউল গাইছে শোন, কামকীটে দেহযন্ত্র কুরে কুরে খায়। মরার আগে ঘুরছে ভোলা ভস্ম মেখে গায়। দেহে আগুন চিতায় আগুন, জল মেলে না সাতসাগরে ৷৷ ভুলো সময় সময় এত সুন্দর জ্ঞানের কথা বলত! জ্ঞানের কথা বলার জন্যে জ্ঞানী হবার প্রয়োজন নেই। শুনেছি ঈশপ একজন সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন। সূর্যের আলো সমুদ্র থেকেও প্রতিফলিত হয় আবার ডোবার জল থেকেও ঠিকরে আসে। মৃত্যুঞ্জয় কেবিনে বসে ভুলো বললে, তোকে আজ একটা ভাল জিনিস শেখাই। আমি যদি কোনওকালে বড় হতে পারি, আমার এই থিয়োরি ভুলো-দর্শন নামে জগতে বিখ্যাত হবে।

আমরা আমাদের ভেতরটাকেই বাইরে দেখছি। এই হল আমার সূত্র নম্বর এক।

আমি নেই আমার বাইরের জগৎটাও নেই। চোখ বুজলেই অন্ধকার। সূত্র দুই।

চোখ বুজলে যদি কোনও আলো বা রূপ দেখতে পাও, তা হলে জ্যোতি জ্যোতি বলে লাফিয়ো না। অপেক্ষা করো। বাল্‌বের ফিলামেন্টের মতো চোখের ফিলামেন্ট বাইরের আলো কিছুক্ষণ ধরে রাখে। তারপরেও যদি আলো বা রূপ দেখতে পাও জানবে সে তোমার ভিতরের আলো। বড় মিষ্টি আলো। চন্দ্র সূর্যের ধার করা আলো নয়। সূত্র তিন।

আমার ভেতরে একটা ষাঁড় আছে, তাই বাইরেও ষাঁড় ঘুরছে। আমার ভেতরে বাঘ, তাই বাইরে বাঘ হালুম করছে। ভেতরের শেয়াল বাইরে হুক্কাহুয়া করছে। ভেতরের পাখিই ডালে ডালে শিস দিচ্ছে। পিঙ্কুবাবু, ম্যান ইজ দি এপিটোম অফ দি ওয়ার্লড। বুড়ো একবার যখন জন্মেছ, সাতঘাটের জল খেয়ে তোমাকে ফিরতে হবে। আর তা না হলে, বৎস, আমার পথ ধরো। নৌকোয় পাল তুলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। বাতাস পেলে এগোয়, না পেলে ভাসে। ভেসে থাকে ডোবে না। তা হলে নীতিবাক্যটা কী, স্রেফ ভেসে থাকো। বেশি হাত-পা ছুড়ে কী হবে! অনর্থক পরিশ্রম। ওরে ব্যাটা রাজাও মরবে, প্রজাও মরবে। রাজার রাজমুকুট পড়ে থাকবে, তোর ব্যাটা পড়ে থাকবে লেংটি। নে নে কাটলেট খা। এ হল লালসার পৃথিবী। সিকি ভাগ ঈশ্বরের, সিংহভাগ শয়তানের। পাশ কাটিয়ে ফুড়ুক করে বেরিয়ে যেতে হবে।

ভুলো যা বলেছিল তা করেছিল। সংসারের কাছে ধরা দেয়নি। তার পালে সুবাতাস লেগেছিল। সে এখন মহারাজ। সে তার ভেতরের শিশ্নবান ষণ্ডটিকে, হিংস্র ব্যাঘ্রটিকে, ধূর্ত শৃগালটিকে, কপট মার্জারটিকে, পদলেহী সারমেয়টিকে হত্যা করতে পেরেছিল। আমি পারিনি।

শোনো পুত্র আমার! গৃহিণীকে বলে লাভ নেই। সারা জীবন আমি কেবল তারই কথা শুনে গেলুম। খ্যাঁকখ্যাঁকের ভয়ে। শোনো পুত্র আমার, বেশ বাঘা ধরনের কুকুর না হতে পারলে সারাজীবন সংসারে তোমাকে কুঁই কুঁই করেই মরতে হবে। শোনো, তোমার জ্ঞানের কথা, জীবন দর্শনের কথা, রোম্যান্টিক প্রেমের কথা কোনও মিঞা শুনবে না। ওসব ফুলঝাড়ু। সংসারে সাকসেসফুল প্রাণী, না প্রাণী বলা ঠিক হবে না, বস্তু হল খ্যাংরা। বাথরুমের কোণে, কুয়োতলায় আড় হয়ে থাকে। আহা, কতই যেন নিরীহ বস্তু। প্রয়োগের কেরামতিতে অতি ভয়াবহ। বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়। ইঁদুরের বাচ্চা ইঁদুর। তুমি তো আমারই পুত্র। তফাত কেবল এই, তোমার বয়েসে আমার অমন পমেরেরিয়ান কুকুরের মতো লোটা লোটা চুল ছিল না। পোশাকের অত জলুস ছিল না। চোখের অত ত্রিভঙ্গ কায়দা ছিল না। অমন সখীসখী ভাব সে যুগের বাপ বরদাস্ত করত না। পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিত। এখন ভাই যুগ পালটে গেছে। পুত্র যত না পিতার তার চেয়ে বেশি সমাজের। যুগের। কালধর্মের। ফাদারের চেয়ে গডফাদার, গডফাদারের চেয়ে ফাদার-ইন-ল একালে বেশি মাননীয়। মুখে কোনও কথা তোমাকে বলার সাহস আমার নেই। কারণ তুমি ফুস করে এমন অসম্মানজনক এক শব্দ করবে যে তখনই আমার মনে হবে, ঈশ্বর তুমি আমাকে নপুংসক করলে না কেন? তোমার বীরাঙ্গনা মাতা সুপ্রিয়া দেবীর বোলচালে নিজেকে চিনতে ভুল কোরো না মানিক। আমার মতো তুমিও একটি মূষিক। মাতৃজঠর সন্তানধারণের লেফাফা মাত্র। জননীর বীরত্ব তুমি লাভ করতে পারো না। কারণ তুমি সন্তান। তুমি আমার ধাঁচই পাবে। আর জন্মসময়ে আমার শরীরে, মনে যে ভাব-তরঙ্গ খেলেছিল, তুমি তারই উত্তরাধিকারী হবে। অতএব নিজেকে মিল্টন অথবা হ্যামিল্টন ভেবো না বাবা। তুমি পিনাকীরঞ্জনের পোলা। তুমি আমার সবচেয়ে ঘৃণার, আবার সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র। তোমাকে আমি অ্যানালিসিস করি। করে রেখে যাই, পরে মিলিয়ে নিয়ো।

দেহ। প্রথমে স্লিম। শেষের দিকে ঘড়া। পেটটা ফুলে উঠবে। পাছার দিকটা হবে সেকালের যাত্রায় যেসব পুরুষ মেয়ে সাজত তাদের মতো। চল্লিশের পরেই চোখে চালশে ধরবে। বছরে দু'-তিনবার দাঁত দাঁত করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাপিয়ে বেড়াবে। চল্লিশের আগেই মাথায় শয়তানি টাক দেখা দেবে। টাক সম্পর্কে এটা আমার নিজস্ব শ্রেণিবিভাগ। টাকের অনেক শ্রেণি আছে, যেমন, উইজডাম বলডনেস, ডিপ্লোম্যাট, লিটারেটিয়ার, কম্যান্ডার, সেইরকম সেটানিক টাক। যে মাথায় কুচুটে মনের বাসা, সেই মাথায় ওইরকম টাক পড়বে। কোমরে বাত তোমার হবেই। প্রথম জীবনে যাদের মুখে খুব বাত, শেষ জীবনে সেই মুখের বাত গাঁটে গাঁটে বাসা বাঁধবে। তা ছাড়া হেরিডিটি যাবে কোথায়? একটু হাঁপানির টানও আসবে। অর্শও হতে পারে। বাবাজীবন! মহানন্দে তোমার জীবন কাটবে। গর্ভধারিণীর মাথাধরার ব্যামোটি পেলে সোনায় সোহাগা।

পুত্র! দায়ী আমি। অপরাধ আমার। যৌবনে নিজেকে যদি চিনতে পারতাম তা হলে তোমাকে আমি পৃথিবীতে টেনে নামাতাম না। এইভাবেই দুর্বলতার ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত থাকে। আমি এক পরাভূত দেবতা। আমার পিতাও তাই ছিলেন। তস্য পিতা, মনে হয় সেই একই ব্যাপার। সম্পূর্ণ ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে অনুমানে বুঝি। আমি চেঙ্গিজ খাঁ-র বংশধর নই। অশ্বপৃষ্ঠে খোলা তরবারি হাতে আসীন। পদতলে কম্পমান বস্তুজগৎ। সুন্দরী রমণীর লেফাফায় মুক্তোর মতো নিতান্ত অবহেলায় বীজ নিক্ষেপ। বীর থেকে বীর। বীরের প্রবাহিত ধারা। সেথায় মর্কটানন্দের স্থান কোথায়! শোনো পুত্র, গণতন্ত্র বীরের আগমন পথ রুদ্ধ করেছে। চতুর শৃগাল তোমাদের মতো চামচাদের দ্বারা 'স্পুনফেড' হয়ে আমাদের মতো ভীরুর ভোটে রাজা হয়ে, তরবারি নয়, শুধু কথা, অন্তঃসারশূন্য বাক্যতরবারি আস্ফালন করে ভুঁড়ি বাগায়। ঘাড়ে গর্দানে কুপো হয়ে পরিশেষে কুপোকাৎ হয়। বুঝেছ মাই ডিয়ার ছোকরা।

এখন তুমি বুঝবে না। এখন তোমার নেশার কাল। ইনটকসিকেশান অফ ইয়ুথ। কিন্তু ওই যে সেই সায়েব বলেছিলেন, লিবিডিনাস ওয়ার্লড। এসবই হল ফক্স-অক্স-ম্যান আর

ডাল-কাউ-ওম্যানের চিরকালীন খেলা। বৎস! তুমি ঋষিপুত্র নও। আমার পুত্র। জ্যোতির্ময় সন্তানের জন্যে অধম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেনি। ওই যে সুপ্রিয়া ঠাকুরানি যিনি এখন কোলের ওপর আয়না ফেলে পুটুস পুটুস করে মাথার সামনের চুল তুলে তুলে সিঁথির সরণি বানাচ্ছেন, তিনি তখন ডার্লিং সুপ্রিয়া। ঠমকি চমকি চলার ছন্দ। আমি বুঝলেও তুমি এখন বুঝবে না, মেয়েছেলে কী সাংঘাতিক চিজ রে ভাই। শেষ বয়েসে গান গাইয়ে ছেড়ে দেয়— পঙ্কে বদ্ধ করো করী/ পঙ্গুরে মা লঙ্ঘাও গিরি। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা সবাই পঙ্গু। ডাঁটার স্যুপ আর ডেলা পাকানো ভাত আমাদের ডিনার। মাঝে মাঝে মুখ পালটাবার জন্যে ফ্রায়েড নিমপাতা উইথ ব্রিঞ্জাল। সেই পঙ্গু সংখ্যায় বাড়ে কেন? শুধাও তোমার কাণ্ডজ্ঞানহীন ষণ্ডটিকে। ডার্লিং সুপ্রিয়া ঝ্যাটাটি যদি সেই বয়েসে ধরতেন। তখন তাঁর তিরছি নজরিয়াকে বাণ। না মারো, না মারো বললে শুনছে কে! সেই বাণ-ফোঁড় পিনাকীরঞ্জন এতকাল ঘুঘু দেখে এইবার ফাঁদ দেখছে। মাথায় মাথায় পর্বতপ্রমাণ দুই কন্যা। তিনি বাণ মেরে এখন পাকাচুল মারছেন। মর শালা তুই মর। আন ছেলে ধরে। লাস্ট ফার্দিং প্রণামী দে বাবাজীবনের বাবার শ্রীচরণে। সুপ্রিয়া। মিঠে নাম। আসল নাম মনে হয় ভামিনী। মেয়েদের নাম সাবেককালে ঠিক ঠিক রাখা হত, সত্যভামা, ভামিনী। শুনলেই আতঙ্ক। কুন্তী যেন খুন্তি হাতে তেড়ে আসছে। বৎস! যে বয়েসে এই জ্ঞানোদয় হয়, দুর্ঘটনা তার আগের বয়েসেই ঘটে যায়। তোমরা শুনতে পাও না, সেই ফুলশয্যার খাটে প্রতিদিন শয়নের প্রাক্কালে কী সাংঘাতিক কুটুস কুটুস কামড়। এই আমি লিখে গেলাম পোস্টারিটির জন্যে— স্ত্রী ডাঁসা হইলে ডেও পিঁপড়ে হয়। কুটুস কুটুস কামড়াবি গর্তের ভেতর সেঁধোবি। আর প্রকৃত কোনও কাজের কথা হলেই বলবে— ও আমি জানি না। তোমার ম্যাও তুমি সামলাও। বাহা রে জননী! এ যেন তোর মামার বাড়ি! শোনো পুরুষ হল পালকি, আর মেয়েরা হল আরোহী। কথাটা ভাল করে নোট করো। সারাজীবন সংসারের পথে দুলে দুলে চলো, হুঁহুম-না, হুঁহুম-না। তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি ইতিমধ্যেই উড়তে শুরু করেছ। চোবা না শোনে ধর্মের কাহিনি।

জ্ঞানযোগ আজকের মতো এইখানেই শেষ করি। আমার সেই বাল্যবন্ধু ভুলো, সন্ন্যাসজীবনে যার নাম হয়েছে সদানন্দ গিরি, তাকে একটি চিঠি লিখতে হবে কংখলে। সরাবার আগেই সরতে হবে।

খিচিমিচি যোগ

'বাবা তোমার কনট্রাক্টার কাকু এসেছেন।'

বাথরুমের দরজায় ধুমধাম, ধড়াধধুম ধাক্কা। সঙ্গে মেজমেয়ের গজল টাইপের গলা। ঠিক যেন বেগম আখতার। ধরে ফেললেই হল, কোয়েলিয়া গান থামা। যখন হামা দিত তখনই বুঝেছিলাম, এ মেয়ে মায়ের দিকে যাবে।

'বসতে বলো।'

'তাড়াতাড়ি করো। সেই কখন ঢুকেছ!'

বেশ করেছি। মুখে গুড়াকু। তাই বলা গেল না। মাড়িতে ডলছি তো ডলছিই। বেশ মৌতাত এসে গেছে। কত দিন, কত বার বলেছি, বাথরুমের দরজায় আচমকা ধাক্কা মারতে নেই। প্রাকৃতিক কর্ম মাথায় উঠে যায়। মনে নেই পাশের বাড়ির অমৃতবাবুর কথা। ভারত ক্রিকেটে ওয়ার্লড কাপ না কী জেতার সঙ্গে সঙ্গে এমন আচমকা বোমা ফাটালে অমৃতবাবুর বিয়োগান্ত নাটক মিলনান্ত হয়ে সাতদিন সিস্টেমে রয়ে গেল। শেষে শল্য করে কৈবল্যধাম থেকে কোনওরকমে তাঁকে ফেরানো হল। চমক যে কী জিনিস! এ ব্যাটা কাঁসারির বংশ কী বুঝবে? সব যেন চড়া সুরে বাঁধা তবলা। অষ্টপ্রহর সেধেই চলেছে, ধা ধিন্ ধিন্ তা- আহম্মদজান থেরকুয়া!

কে বলেছিল নরানাং মাতুলক্রম। কিস্যু জানে না। মহিলানাং মাতাক্রম। পুরুষাং সঙ্গক্রম। মেয়ে দুটি একেবারে মায়ের প্রোটোটাইপ। আমি বাথরুমে ঢুকলেই সুপ্রিয়া দেবীর টনক নড়ে। ধড়াম ধাক্কা। 'কী হল?' 'ডিম আসবে?'

'আসবে।'

'পয়সা দাও।'

লাও ঠ্যালা। বসে আছি বাথরুমে! পয়সা দাও। এটা কি টাঁকশাল?

'তুমি এখন দিয়ে দাও।'

'আমার কাছে নেই।'

ইনি এক নেই বাদিনী। নাস্তি ছাড়া একটি দিনের তরেও অস্তি শোনার ভাগ্য হল না। আছে। মালকড়ি গেঁজেতে বেশ ভালই আছে। উপুড়হস্ত করতে শেখেননি। মাইজার আর কাইজার একসঙ্গে ছাঁচে ঢালাই করে এই বস্তু এক পিসই তৈরি হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রোডাকশান লাইনের অর্ডারি মাল। উলটেপালটে, খুঁটিয়ে দেখতে পারলে শরীরের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই লেখা পাওয়া যাবে, মেড টু অর্ডার। ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার আছে নিশ্চয়। এক্সপায়ারি ডেট নেই। নিজেই যখন গর্ব করে বলে, যম! যমে আমায় ছোঁবে না।

পাছে বাথরুমে বিরক্ত করে সেই ভয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আগেভাগে সব দেনাপাওনা মিটিয়ে দেওয়া হল। বাথরুমের ভেতর থেকে পেস্ট, ব্রাশ, তেল, সাবান এমনকী অ্যাসিডের বোতল সব বের করে দিলুম। বলা যায় না, হঠাৎ কোনটাব প্রয়োজন হয়। যাক বাবা নির্ঝঞ্ঝাট। ও মা, বসতে না বসতেই গুমগুম ধাক্কা।

'কী হল? সবই তো নড়া ধরে এক-এক করে বের করে দিলুম। আবার কী?'

'আমার গেঁজেটা।'

গেঁজে? গেঁজে মানে কোমরের কাছে ভদ্রমহিলার সর্বক্ষণ একটি ভেলভেটের থলিয়া ঝোলে। পিঙ্ক রঙের সুদৃশ্য বস্তু। দড়ির ফাঁস টানলে মুখ খোলে আর বন্ধ হয়। এই গেঁজেতে পয়সা থাকে। থাকে তালগোল পাকানো নোট। কানখুসকি, দাঁতখোঁটা, সেফটিপিন, আংটি, সুপুরির টুকরো, মাথাধরার ট্যাবলেট। ঠিক যেন প্যান্ডোরাজ বক্স।

'তোমার গেঁজে এখানে নেই।'

'আছে। আছে। ওয়াশ বেসিনের তলায় ঝুলছে দেখো।'

ও মাই গড! ওয়াশ বেসিনের তলায় যে পাইপ দিয়ে জল ওঠে, সেই পাইপের স্টপ ককে গলায় দড়ি দিয়ে গেঁজে ঝুলছে।

'কী, দেখতে পেয়েছ?

'পেয়েছি। যেখানে আছে এখন থাক না।'

'আজ্ঞে না। এ যা চোরের বংশ। কাউকে বিশ্বাস নেই। এক থেকে তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দাও। তোমাকেও আমার বিশ্বাস নেই। মাসের শেষ তোমার। মানুষখেকো বাঘের মতো হয়ে আছ।'

বলে কী! চোরের বংশ! মনে নেই দেবী, একদা তুমি আমার পকেট মেরে ফাঁক করতে। এই আছে এই নেই। দশ উড়ছে, পাঁচ উড়ছে। শেষে সাহস যত বাড়ছে অঙ্কও তত বাড়ছে। কুড়ি, পঞ্চাশ। খুচরোর তো মা-বাপ নেই।

একেবারে অরফ্যান। দিনে ডাকাতি। অবশেষে শঠে শাঠ্যং। আমিও তোমার ফাঁক করি। অতঃপর এই গেঁজে আবিষ্কার। নেসাসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনশান। এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। তোমারে কয়েছিলাম, অবশ্য মনে মনে, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তোমার পীতাম্বর, তোমার রুনু আর ঝুনু কেমন তৈরি হয়েছে? দেখ তো না দেখ। সে আমার রক্ত, না তোমার রক্ত? সে আমার শিক্ষা না তোমার শিক্ষা?

দরজায় গদামগুম। এবার স্বয়ং।

'কী গো সমাধি হয়ে গেল নাকি? না থ্রম্বোসিস। বীরু ঠাকুরপো সেই কখন থেকে এসে বসে আছে। ওই গুড়াকুই তোমার কাল হবে। কালসর্প যোগ সাধে বলে!'

ভাষার ছিরি দেখো! 'যাচ্ছি, যাচ্ছি। কী এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছে।'

'সকলেরই কাজ থাকে। তোমার মতো সবাই অমন নিষ্কর্মা নয়।'

'হ্যা হ্যা।'

'হ্যা হ্যা না করে দয়া করে দর্শন দাও।'

আমাকে কালসর্প যোগ দেখাচ্ছে। ভারী জ্যোতিষী এসেছেন। খনা। এদিকে ওনার যে কেমদ্রুম যোগ। রোজগারপাতি করে যা আনছি, সব ফুটো পাত্রে জল ঢালা। ওই কেমদ্রুম যোগ না থাকলে চৌবাচ্চা এতদিনে ওভার ফ্লো করত। কত লাকসারি। মাসে চার-পাঁচখানা বড় গায়ে মাখা সাবান। দু'বোতল আমলা তেল। দু'বোতল শ্যাম্পু। গরম সহ্য হয় না। টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মাথার ওপর পাখা ঘুরছে ফরফর। বিল দেড়শো ছেড়ে দুশোর দিকে ধাওয়া করেছে। এ যেন সরকারি অফিস রে! লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

'কী খবর বীরুবাবু?'

'উঃ সেই কখন থেকে এসে বসে আছি। রোজ একটু ত্রিফলা বা ইসবগুল খান না।'

'ওসব গুলটুলে আমার বিশ্বাস নেই। প্ল্যান রেডি?'

'হ্যাঁ খাড়া করেছি। কম মাথা খাটাতে হল। আজকাল লাখ দুয়েকের কমে বাড়ি হয় না। তাও সাদামাটা। মোজাইক ফোজাইকে আরও কস্ট বেড়ে যায়।'

'দু'লাখ? দু'লাখ আমি পাব কোথায়?'

'তা আমি জানি না।'

'তা হলে তোমার ও প্ল্যান গুটিয়ে রাখো। চালাবাড়ির প্ল্যান করে আনো।'

সুপ্রিয়া দেবী তড়বড়িয়ে উঠলেন, 'তার মানে? এতকাল চাকরি করলে, তোমার দু'লাখ নেই? তুমি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছ। আমাদের ফটিক, সামান্য ফটিক, সেও ছিয়ানব্বই হাজার দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে।'

'তার দুটো হাতই রোজগার করে। ডান হাত, বাঁ হাত।'

'তোমাকেও কেউ বারণ করেনি।'

ফোলা ফোলা মুখে বীরু সুপারগ্লস হাসি টেনে বললে, 'শুরুতেই বাঁকা দিকে চলে যাচ্ছেন। আরে মশাই শুভ কাজে নেমে পড়তে হয়। টাকার জোগাড় অটোমেটিক হয়ে যায়। যে খায় চিনি তারে জোগান চিন্তামণি।'

তা ঠিক। তোমার সন্ধেবেলার মালের খরচ যেমন আমরা জোগাই। এক-একটা পার্টি বধ করো আর সুখে মুরগির ঠ্যাং চিবোও।

'আমি অন প্রিন্সিপল আমার সামর্থ্যের বাইরে যাব না।'

'তোমার প্রিন্সিপলে গোলি মারো।' মেয়েছেলের কথা দেখো। যেন পাড়ার গুগলু মাস্তান কথা বলছে।

'বুঝলে বাড়ি করব আমি। আমার রেস্তর জোর আমাকে বুঝতে হবে। তোমরা তো সব থাকনেঅলা পার্টি!'

'তার মানে? সংসারে আমরা সব মজা মারতে আছি! বুলি শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।'

'ও তো তোমার সব সময়েই জ্বলছে। একে পিত্তির ধাত, তার ওপর হাই প্রেশার। তোমাদের বংশাবলির ধারা।'

'অ্যাঁজ্ঞে ন্যা। ইস্পাতের মতো শরীর নিয়ে এ সংসারে এসেছিলুম, তারপর তোমাদের পাল্লায়

পড়ে হাড়-মাস কালিকালি হয়ে গেছে। বুঝলে? পিঁপড়ের পেছন টিপে আমাদের সংসার চালাতে হয়নি। অঢেল জিনিস। পুকুর, বাগান, আমগাছ, জামগাছ, বিরাট চকমেলানো বাড়ি। বড় বড় ঘর। যেমন আলো তেমন বাতাস। দু'-দুটো ডিপ টিউবঅয়েল। মিষ্টি গুড়ের মতো জল।'

'স্টপ, স্টপ। কোথায় তোমাদের সেই বাড়ি। বিয়ে করে আনলুম তো ভবানীপুরের এঁদোগলি থেকে। তোমাদের সেই বাড়িটা কোথায় মাইরি! কোথায় সেই স্বপ্নের মরূদ্যান?'

'সে এখন পদ্মার গর্ভে। ভেঙে ভেঙে ঢুকে গেছে।'

'ছবি তোলা নেই?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'তোমার কথা বিশ্বাস না করে উপায় আছে? তোমার কথা আর গভর্নমেন্টের কথা অবিশ্বাস করা মানেই ক্যাডারের ধোলাই। ধড় মুণ্ড আলাদা।'

বীরু প্ল্যান খুলতে খুলতে বললে, 'একতলাটা শুরু করে দিন। খানদুয়েক ঘর ফিনিশ করে ঢুকে পড়ুন। তখন মাসে মাসে শ'পাঁচেক টাকা ভাড়া বেঁচে যাবে। বছরে ছ'হাজার। তার ওপর ইন্টারেস্ট। নেমে পড়লেই দেখবেন ঈশ্বর সহায়।'

'সে তো আমার বিয়ের সময় সবাই বলেছিল, নেমে পড়ো। ঈশ্বর সহায় হবেন। ঈশ্বর আমার কী সহায় হয়েছেন?'

'আপনি বড় এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যান।'

সুপ্রিয়া দেবী অমনি সুযোগ পেয়ে গেলেন। মর‍্যাল সাপোর্ট। হেড মিস্ট্রেসের মতো মুখ করে বললে, 'ওই দোষেই সারা জীবনে কিছুই করতে পারলে না। বুড়োআঙুল চুষে গেলে। স্রেফ বকে বকে জীবনটা নষ্ট করে ফেললে।'

ধমক খেলুম আমি, উৎসাহ এল বীরুর। গোল করা নীল কাগজের রোল টেবিলে মেলে ধরল। প্রথমেই কলসির মতো সামনে উলটে পড়লেন সবজান্তা মাঈ। এ সংসারের গহরজান। অল্প অল্প পাক ধরেছে চুলে। ক'দিন ধরেই কলপ লাগাবার প্ল্যান হচ্ছে। সে যা ছিরি হবে। স্বভাবটাই ফুটে উঠবে চুলে। ছোপ ছোপ, লাল লাল, সাদা সাদা, কালো কালো। আহা মরি। কেউ কি তখন ফিরে তাকাবে? দু'কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি মারছে রুনু আর ঝুনু। মায়ের নির্দেশনায় ড্রেস আর চুলের কী ছিরি! হ্যাঁরে বাপের কথা কি শুনতে নেই! কেন ছেলেরা সিটি মারবে না। আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কচি শালপাতা থেকে লুচি আর মোহনভোগ খাই, কেন কাকে ছোঁ মারবে না।

'দাদাকে আগে দেখতে দিন।' বীরু প্র্যাক্টিক্যাল ম্যান।

'দাদা কী বোঝে?'

'তা বললে চলে বউদি? দাদাই তো সব। পাকা মাথা। বাড়ি তৈরির নেশা ভীষণ নেশা। একবার ধরে গেলে রেসের মতো, তখন ভিটেমাটি চাঁটি করে কমপ্লিট করতে ইচ্ছে করবে।'

ঝুনু বললে, 'কাকু, বাড়িটা তৈরি হয়ে গেলে এইরকম দেখাবে?'

'হ্যাঁ মা এইটা হল এলিভেশান।'

'উঃ কেয়া বড়িয়া খেল!'

অ্যায় ডায়ালগে টিভি আর মুকদ্দর কা সিকন্দরের ইনফ্লুয়েন্স। বাঙালিকে এখন দুটো জিনিসে ভর করেছে, হিন্দি সিনেমা আর লটারি। তোরা চালিয়ে যা। কোন ঘাটে গিয়ে ভেড়ে তরণী।

বীরু একটু আদুরে গলায় বললে, 'এসো না, এদিকে এসে ভাল করে দেখো। ওটা তো তোমার উলটোদিক।'

মনে মনে আমি উঁহু, উঁহু করে উঠলুম, যাসনে ঝুনু, যাসনে। কার মনে কী আছে! তখন থেকেই দেখছি, বীরুর চোখ দুটো যেন আবার খাব সন্দেশ হয়ে আছে। আমার বউয়ের আশা আমি ত্যাগ করেছি। লো কাট, হাতাহীন ব্লাউজে তার লে লুল্লু অবস্থা। ভরসা এই, এ বস্তু রক্তমুখী নীলা। ধারণে

সবংশে নির্বংশ। কিন্তু তোরা? কচি কলাপাতা মা। কত রকমের বাতাস বইছে। ফর্দাফাঁই করে দেবে। বীরুকে চেনো না। সিমেন্ট আর বালি দিয়ে মর্টার মাখে। ঢালাই করে। ছাজা বানায়। ব্যাচেলার। বিয়ের সময় নেই। খিস্তি তো শোনোনি! কাঁচা নর্দমা হার মানবে।

প্ল্যানটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নিতে ঝুনুর যাওয়া বন্ধ হল। কী যে মাথামুন্ডু করেছে! তৈরি হয়ে গেলে বাড়িটা মন্দ দেখাবে না। বীরু বোঝাতে শুরু করল।

'সামনে ছ'ফুট ডিপ বারান্দা। দোতলাতেও তাই। এই হল আপনার বসার ঘর। আঠারো বাই বারো।'

'আঠারো বাই বারো। অত বড় বসার ঘর!'

'হ্যাঁ বউদি। বসার ঘরই তো বাড়ির শোভা। লোকজন আসবে বসবে। একপাশে টিভি, বুককেস, অ্যাকোয়ারিয়াম। ছোট কার্পেট, তিনপাশে সোফা, সেন্টার টেবিল।'

'নান্নাআ, অতবড় বৈঠকখানা আমি অ্যালাউ করব না। বৈঠকখানা মানেই আড্ডাখানা। এনার যত সব নিষ্কর্মা বন্ধুবান্ধবদের দল জুটে সারাদিন হ্যা হ্যা করবে আর কাপ কাপ চা ওড়াবে। আমার গতর অত সস্তা নয়।'

'তা হলে আপনি কী চান?'

'বৈঠকখানা থাকবে না। নো ড্রয়িংরুম, নো আড্ডা।'

'তা হলে ওই জায়গায় কী থাকবে?'

'কিচ্ছু থাকবে না। ফাঁকা থাকবে।'

'সে আবার কী?'

বীরু আমার মুখের দিকে তাকাল। 'আপনি কিছু বুঝলেন দাদা?'

'মেয়েদের কথা কেউ কোনও কালে বুঝেছে দাদা! ওসব পাকতেড়ে কথায় কান দিয়ো না। বৈঠকখানা ঠিক আছে। মাপও ঠিক রেখেছ। এমন কিছু বড় নয়। মাঝারি মাপের। দ্যাটস ফাইন।'

'ঠাকুরপো বৈঠকখানা থাকবে না। আমার এক কথা। থাকলে ও বাড়ি আমি হতে দেব না।'

'আমি কোর্টে যাব। ডিক্রি করে, সমন জারি করাব। আমার নাম পিনাকীরঞ্জন। স্বয়ং মহাদেব আমার ফরে। তাণ্ডব নৃত্য আমার দেখোনি এখনও।'

'তাই নাকি! ব্যাবলে! আমাকেও তুমি চেনো না! তোমার ওই জমির দরুন দশ হাজার আমার পাওনা। কেস ঠুকে জমি তোমার নিলামে তোলাব। আমার নাম সুপ্রিয়া।'

বীরু বিরক্ত হয়েছে। হবারই কথা। বড় বড় চোখ করে সুপ্রিয়ার দিকে একবার তাকালুম। ও বাবা ফল হল উলটো। ফ্যাঁস করে উঠল, 'বড় বড় চোখ করে তাকাচ্ছ কী। তোমার ওই বেলের মতো চোখ অফিসের অধস্তনদের দেখিয়ো। ওতে আমি ভয় পাই না।'

বীরু বললে, 'আপনারা দু'জনে দেখি উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। কী করে এক জায়গায় এসে মিললেন। এতে বাড়ি হবে কী করে? বরং উলটোটা হবে। বাড়ি থাকলে খুলে চার চাকলা হয়ে পড়ে যাবে। নিজেরা আগে ফয়সালা করে নিন। নিজেদের মধ্যে সেটল হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবেন।'

'তুমি আমাকে একটাও কথা বলতে শুনেছ বীরু! তখন থেকে এই মহীয়সী মহিলাই কলহের সুযোগ খুঁজছেন। কলহই ওঁর লাইফ ব্লাড, ভিটামিন এনজাইম।'

'শুনুন বউদি, ওখানে একটা ঘর থাকবেই। ঘর ছাড়া বাড়ি হয় না। বৈঠকখানা না হোক শোবার ঘর হবে, রান্নাঘর, গুদোমঘর কি ঠাকুরঘর হবে।'

আমার বোকা বউ লাফিয়ে উঠল। আজকাল চৌরঙ্গির ফুটপাথে এক ধরনের লাফানে পুতুল বিক্রি হয়। পাম্প করলেই লাফিয়ে ওঠে। এ যেন সেই পুতুল। ম্যাগনাম সাইজের এই যা।

'আহা! ঠিক বলেছেন ঠাকুরপো, ওটা আমার ঠাকুরঘর হবে।'

'আমার মানে? বলো আমাদের।'

'তোমাদের আবার ঠাকুরদেবতা কী। পটের বিবিরা কাঁখে বিবিধ ভারতী নিয়ে ঘুরছেন সারাদিন। আর নয়তো রাস্তার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে ছেলে দেখছেন। একবার ইনি ওর গায়ে ঢলে পড়ছেন, একবার উনি এর গায়ে। দলনী বেগমের নাম শুনেছিলুম, এঁরা হলেন ঢলানি বেগম।'

'অ্যাঁ ছেলে দেখছে! আমার মেয়েরা ছেলে দেখছে। এত দূর অধঃপতন!'

আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। দু'কান দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। ওরে আমি কী করব রে! গলায় দড়ি দেব। গুড়াকু খেয়ে আত্মহত্যা করব!

'জানলার ধারে দাঁড়ালেই ছেলে দেখা হল?'

'আলবাত হল। জানলার ধারে অত মধু কীসের রে! ভাবিস আমি কিছু বুঝি না!'

'সবাই তোমার মতন নয়।'

'কী বললি, রুনু! জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।'

'যাও যাও সব করবে।'

বীরু উঠে পড়েছে। না উঠে করবেটা কী? কোনও ভদ্রলোক এই পরিবেশে বসে থাকতে পারে না।

'আমি চলি দাদা। কী হবে বাড়ি করে! টাকাটা ব্যাঙ্কেই রাখুন। তবু সুদে বাড়বে।'

আমার সাধের বাড়ির প্ল্যান গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে সামনের টেবিলে। তিনটি মারমুখী প্রাণী। আমার এখন কী করা উচিত! ধেই ধেই করে নাচাই উচিত। কিন্তু গাঁটে গাঁটে বাত। ধ্যাততেরিকা প্ল্যান। উনুনেই দিয়ে আসি।

শিস দিতে দিতে কুমার গৌরব ঢুকছেন। এইমাত্র যেন বোম্বে ফ্লাইটে দমদমে এসে ল্যান্ড করলেন। ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। রেশমি চুল বাতাসে উড়ছে ফুরফুর করে।

'কোথায় চললে বাবা? তোমার হাতে ওটা কী? ক্যালেন্ডার?'

'না, বাড়ির প্ল্যান।'

'প্ল্যান নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চললে?'

'পোড়াতে।'

তেনার কণ্ঠ ভেসে এল, 'উনি ওর বেশি আর কী পারেন! সারা জীবন শুধু ভাঙা আর পোড়ানো।'

পীতাম্বর বললে, 'তুমি চুপ করো মা। বাবার কোনও ব্যাপার তুমি হ্যান্ডল করার চেষ্টা কোরো না! আমি টেকআপ করেছি। হঠাৎ রেগে গেলে?'

'তোমার গভ্যধারিণীকে জিজ্ঞেস করো।'

'ওদের ব্যাপারে তুমি এখনও রাগো? টেক ইট ইজি। তুমি আমাকে দেখো, অলওয়েজ কেয়ার ফ্রি। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি ঢুকি?'

'তোমার পক্ষে যা সম্ভব আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। দে আর ছোটলোকস।'

'তুমি ভারী ভদ্রলোক।' ঘর থেকে ফুট কাটলেন দুই কন্যার জননী।

'শুনলে, শুনলে, প্রোভোকেশান।'

'আঃ মা, চুপ করো না। তুমি তোমার ঘরে চলো। কোনও কথায় কান দিয়ো না এখন। যত বাড়াবে তত বাড়বে। প্ল্যানটা আমার হাতে দাও।'

'ভেরি সুন, আর্লিয়েস্ট পসিবিল অপারচুনিটিতে আই উইল লিভ দিস প্লেস।'

'পারবে না। থাকতে পারবে না। আমরা কন্ডিশানড হয়ে গেছি। আমরা ভালবাসি।'

পীতাম্বরের একটা হাত আমার কাঁধে। ধীরে ধীরে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে চলেছে আমাকে। বাঃ, এ এক নতুন পরিচয়। ভেতরে বেশ একটা আত্মসমর্পণের ভাব আসছে। ছেলেকে এই ভূমিকায়

প্রথম দেখছি। মনে মনে ঘৃণা করতুম একে! কেন? মাটির তাল ভেবে আঙুলের চাপে আকৃতি দিতে চেয়েছিলুম। নিজের ইচ্ছে চাপাতে চেয়েছিলুম ঘাড়ে।

'এই সময়ে তোমার এক কাপ চায়ের প্রয়োজন। তাই না?'

'সকালের পয়লা কাপ চাই-ই তো জোটেনি এখনও।'

'অ বাথরুম থেকে বেরিয়েই ব্যাটিং শুরু করেছ। তুমি বোসো। আমি চা আনছি।'

'হ্যাঁরে তুই কি আমাকে বাড়ির লোভে তোয়াজ করছিস?'

কথাটা ফস করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। বন্দুক থেকে গুলি বেরোবার সময় যেমন পেছনে ধাক্কা মারে, মনে সেইরকম একটা ধাক্কা লাগল।

পীতাম্বর হাসল, 'তোমার ধারণা তোমার রাস্তাতেই গেছে। পথ ভুল করেনি। তবে ওটা তোমার সেকেলে ধারণা। একালের ছেলেরা পিতার বিষয়-সম্পত্তির খুব একটা তোয়াক্কা করে না। থাকলে ভাল না থাকলেও খুব একটা যায় আসে না। একেই বলে জেনারেশান-গ্যাপ। তোমরা আমাদের ঠিক চেনো না। জানো কাল রাতে পার্থ খুন হয়েছে!'

'কোন পার্থ? মল্লিক বাড়ির?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো কোনও সাতে-পাঁচে থাকত না।'

'তাতে কী হয়েছে? সারা বিশ্ব জুড়ে এখন এপিডেমিক অফ ভায়োলেন্ট ডেথ চলেছে। কে কখন কীভাবে মরবে জানা নেই। তোমরা ঘরে বসে ফাটাফাটি করছ, এদিকে বাইরে আগুন লেগে গেছে। তুমি বিষয়সম্পত্তির চিন্তা করছ ওদিকে জীবন কত সস্তা হয়ে গেছে। তুমি সেদিন খাট কিনতে গিয়ে বললে, এমন খাট চাই যা তিন পুরুষ চলবে। এদিকে এক পুরুষেই বংশ শেষ।'

'তুই কোনও দলবাজি করিস না তো?'

'দল বলে কিছু আছে? এ দেশে কোনও কিছু আছে?'

'এঃ এরই মধ্যে তোর ফ্রাসট্রেশান এসে গেল?'

'তোমার মধ্যে আসেনি?'

'আমার এসেছে অন্য কারণে। তোর কেন আসবে?'

'জীবনের সব দিন যদি একই রকমের হয়, চলা যদি আমাদের কোথাও না নিয়ে যায়, তা হলে কী হয়? জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই প্রিয় মনে হয়। ছত্রিশ বছর হয়ে গেল আমরা স্বাধীন হয়েছি। কী পেয়েছি? আলোর বদলে অন্ধকার পেয়েছি।'

'তুই এত সব কথা শিখলি কোথা থেকে?'

'আমাদের আগের জেনারেশানের কাণ্ডকারখানা দেখে। তার মধ্যে তুমিও অবশ্য পড়ো।'

'তার মানে তুই আমাকে ঘৃণা করিস?'

'ভাল না বাসলে ঘৃণা করা যায় না।'

'ভীষণ কঠিন কঠিন কথা বলছিস।'

'নাঃ, ফিরে এসো আমাদের জগতে। তোমার চা এসে গেছে।'

'তুই খাবি না?'

'দিলে খাব।'

'তার মানে?'

'অনেক সময় আমার কথা ওদের মনেই থাকে না।'

'সে কী?'

'কী করা যাবে। আমাদের সংসারের তো কোনও বাঁধন নেই। ধরমশালার মতো। যে যার, সে তার।'

'কেন এমন হল?'

'সে তুমি জানো, আর জানে মা। নাও চা খেয়ে নাও। আমি আবার একটা চক্কর মেরে আসি।'

পীতু শিস দিতে দিতে চলে গেল। ছেলেটা খুব অবাক করে দিলে। সামনে একটা আয়না ধরে দিয়ে গেল। নিজের মুখ এমনভাবে আগে আর কখনও দেখিনি। ইস চায়ে মিষ্টি দিতে ভুলে গেছে। না, ভোলেনি মনে হয়। আছে, তলায় পড়ে আছে। এ বাড়ির যা নিয়ম। কোনও কাজ কমপ্লিট করার মেজাজ কারুই নেই। দুধে কিংবা চায়ে ঝপ করে দু'চামচে চিনি ফেলে দাও। কে আবার গুলোয়! এর নাম ডু ইট ইয়োরসেলফ টি। আমিও কায়দা শিখে গেছি ভাল। জেমস বন্ডের মতো গ্যাজেট আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে। এসব ক্ষেত্রে চশমার ডাঁটি ভেরি ইউসফুল। সাধে এই বুড়ো বয়েসে স্টিলের ফ্রেমের চশমা করিয়েছি! মাল্টিপারপাস জিনিস। চিনি গুলিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে আবার চোখে লাগিয়ে দাও। সুপ্রিয়া সুন্দরী অত সহজে এ বুঢ়ঢাকে কাবু করতে পারবে না। রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই কভু ভিখারি রাঘবে! যথারীতি চায়ে নানা ধরনের ফরেন পার্টিকুলস ভাসছে। ও আর গ্রাহ্য করি না। তিব্বতি চা চিবিয়ে খেতে হয়। বহুবার সুপ্রিয়াকে বলেছি, হ্যাঁগা এক কাপ শুধু চা কি দেওয়া যায় না। কেন কী হয়েছে! এটা কী? ও তো দুধের চাঁছি। চামচিকির কালো ডানার মতো? আজ্ঞে না, চাঁছি পোড়া পোড়া কালো কালোই হয়। তুমি খেতে ভালবাসো না? না। কী জানি বাবা, আমার ভীষণ ভাল লাগে। এগুলো কী? ও তো চায়ের পাতা। গ্রিন লিফি ভেজিটেবল। তাই নাকি? আর এগুলো? ও তো পিঁপড়ে। চিনিতে ছিল। ভালই তো। সাঁতার শিখবে। তা শিখব, সংসার সমুদ্রে সাঁতার। সেই চুটকিটা মনে পড়ে যায়। চায়ের দোকানে এক খদ্দের মালিককে চিৎকাব করে বললে, চায়ে পিঁপড়ে ভাসছে কেন? মালিক বললে, কুড়ি পয়সার চায়ে কি হাতি ভাসবে?

সাংখ্য যোগ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতো যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ তেনারা এখন নিদ্রা গেছেন। ওই যে মৃদু নাসিকাগর্জন, মেলায় কেনা তালপাতার বাঁশির মতো ফুঁ ফুঁ করে বাজছে, উটি হল কৌরবপক্ষীয় বীরের নাসিকা। সুপ্রিয়া দেবীর সুনিদ্রার সানাই। রাত্রি এগারোটায় দেশ রাগে শুরু হয়, মালকোষ, দরবারি সেধে, আহীর ভৈরোঁ ছুঁয়ে, ভৈরবী স্পর্শ করে, সকাল সাতটায় জাগরণে ভৈরব মূর্তি ধারণ করে। রাজন, উভয় শিবিরে এখন রাত্রিকালীন শান্তি বিরাজ করছে। আমার ঘর আলাদা, আলাদা আমার বিচরণ ক্ষেত্র। বয়েস কী ছোঁয়াচে ব্যাধি। সবাই বলছে তফাত যাও। বস্তু প্রাচীন হইলে তাহা অবস্তু হইয়া যায়, একমাত্র ব্যতিক্রম, ভূমি ও অলংকার।

এই নির্জন নিশীথে উন্মাদ যৌবনের নানা স্মৃতি উঁকি মেরে যায়। মূর্খ! পেলে কী! কত বাতি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, খেলা তো তেমন জমল না। অনেক ছুটলুম, পেলুম কী, শুধু ক্লান্তি! আমার পাশে আজ কারা? আমার ছায়া ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না।

আমার জার্নাল আবার শুরু করা যাক। পৃথিবীর কারুকেই আমার কিছু বলার নেই। বলার অধিকার নেই। নিজেকে অনেক কিছু বলার আছে। আমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু হতে পারতুম। তা না হয়ে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে গেলুম। সেই শত্রুটিকে মারতে গেলে নিজেরই মৃত্যু হবে।

মনে পড়ে বৎস পিনাকীরঞ্জন, শৈশবে তোমাকে যখন পড়তে বলা হত, তখন তুমি কী করতে? অ্যাঁ অ্যাঁ করে দুলে দুলে খানিক কপচাতে, মন পড়ে থাকত আকাশের ঘুড়ির দিকে, মাঠের লাট্টুর দিকে, ফুটবলের দিকে। বুদ্ধি তোমার কম ছিল না রে ভাই! তবে দুষ্টু বুদ্ধি। শুভবুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারোনি, তোমার দুর্ভাগ্য। ভাল সংস্কার নিয়ে আসতে পারোনি। সে অবশ্য তোমার

অপরাধ নয়। পৃথিবীতে কারু লক্ষতম জন্ম, কারু হয়তো সহস্রতম জন্ম। লক্ষ জন্মান্তের মানুষের মানসিক গঠন, আর তোমার মানসিক গঠনে তফাত তো থাকবেই। তা না হলে একজন শ্রীচৈতন্য, আর একজন বিশুদ্ধ অচৈতন্য হয় কী করে! কেউ সবে পশু থেকে মানব হয়েছে, আবার কেউ মানব থেকে দেবতা হয়েছেন। কিন্তু তোমার দুষ্টবুদ্ধিটাকেও যদি কাজে লাগাতে পারতে? তা হলে এই মিটমিটে শয়তান না হয়ে, রিয়েল জেনুইন, আগমার্ক শয়তান হতে পারতে। ভোগের দুনিয়ার দরজা খুলে যেত। পঞ্চ-মকারের প্রবল বন্যা বইত। জীবনের ছন্দ পালটে যেত। এই ঢিমে একতালের বদলে দ্রুত তিনতাল। সমে সমে উত্তেজনা। দগ্ধে দগ্ধে না মরে, ফুস করে একদিন ফেঁসে যাওয়া।

জ্ঞান-গম্যি তো আমার কিছুই নেই। সৎসঙ্গও তেমন জোটেনি। সঙ্গ বলতে ঘিনঘিনে, ঘ্যানঘ্যানে আত্মীয়স্বজন। অকালপক্ক কিছু বন্ধুবান্ধব। অকালপক্ক কিছু বন্ধুবান্ধবই আমার শিক্ষাদাতা। আমার কেন প্রায় সকলেরই। শিক্ষাসত্রের যে শিক্ষা, সে শিক্ষায় জীবিকা জুটলেও জুটতে পারে, তবে মানুষ তৈরি হয় না। এই সেদিন এক পণ্ডিত মানুষ আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। জগতের মুখোশ খুলে দিলেন। সবটা তেমন বুঝলুম না, এখনও বোঝার চেষ্টা ছাড়িনি। সেই ফ্রয়েড সায়েব একবার ভড়কে দিয়েছিলেন। তখন গুরুজনের মুখের দিকেও সন্দেহের চোখে তাকাতুম। কী, লিবিডো নাকি! কেমন যেন অশ্রদ্ধেয় মনে হত। ভীষণ গম্ভীর, রাশভারী মানুষ অথচ ভেতরে সেই। সেতার বাজছে পিড়িং পিড়িং. রাজাজিকা দো শিং, রাজাজিকা দো শিং। কে বলেছে, কে বলেছে? ফ্রয়েড বলেছেন।

কিন্তু পণ্ডিত মানুষটির ব্যাখ্যা অন্য রকম। মানুষের কার্যকারণ জগতের তিনটি স্তর। কী কী, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। আমাদের নিজেদের অন্নময়াদি পাঁচটি কোষ। প্রত্যেকটি কোষের আবার তিন তিন ভাগ। নেগেটিভ বা ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবী. পজিটিভ বা স্বঃ অর্থাৎ দ্যৌঃ। স্বর্গ, আকাশ। আর মিডিয়াম বা ভুবঃ মানে অন্তরীক্ষ। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এখন সবগুলোর পজিটিভ এক হলে তৈরি হবে শুক্লা সৃতি, মানে হোয়াইট ওয়ে, আর সবগুলোর নেগেটিভ এক হলে তৈরি হবে, কৃষ্ণা সৃতি বা ডার্ক ওয়ে। অর্থাৎ দুটো ধারা বইছে বিশ্বে, শুক্ল ও কৃষ্ণ। একটি পূরণ অন্যটি হরণ। কোনও সময়েই আমরা এই জীবন আর জগৎকে শুদ্ধ রূপে পাচ্ছি না। যা পাচ্ছি, তা হল এই দুই ধারার মিশ্রণ বা সঙ্কর রূপ। মিকশ্চার অ্যান্ড কনফিউশান। প্লাস মাইনাসের খেল চলছে। শুক্ল আর কৃষ্ণ মিশে তৈরি করছে ধূমধারা। কুটিল জটিল গতি সঙ্কর ছন্দঃ। আমরা কেউই শুদ্ধ নই। সবাই সঙ্কর। সাদা আর কালোর হরেক মিশ্রণ। দেবতাও নই, শয়তানও নই। দেবাসুর, অথবা সুরদেব।

ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার। জীবনের ভেতরের কথা জন্মাবার আগে জানতে পারলে কে আর জন্মে মরত। অবশ্য ভেতরের কথা জানতেই হবে, এমন কোনও শর্ত নেই। না জানলেও চলে। খেলুম-দেলুম-ঘুমোলুম, মল-মূত্র ত্যাগ করলুম, দিন কতক খুব বোলচাল মারলুম, কিছুদিন নাকে কাঁদলুম, হাঁচলুম, কাশলুম, একদিন ফুটে গেলুম। খেল খতম, পয়সা হজম। আসলে ওরা, ওই ওরা, যারা আমাকে চিত করে ফেলে বুকে হাঁটু গেড়ে বসে একটা একটা করে দাড়ি ওপড়াচ্ছে, ওরা আমার শত্রু নয়, পরম বন্ধু। নিজেকে উলটেপালটে দেখার ইচ্ছে ওরাই আমার মধ্যে জাগিয়েছে। নিজেকে জান ব্যাটা পিনাকীরঞ্জন। বৃত্তের মধ্যে ঘুরছিস চোখ-বাঁধা কলুর বলদের মতো। অফিস, সংসার, আলু-পোস্ত, চুনো মাছ, এক চুমুক দুধ, গোঁফে সর, ছোবড়ার গদিপাতা প্রাচীন বিছানা, মা কালীর রংচটা ছবি, ঝুলে মোড়া ধুলোপড়া বইয়ের আলমারি। শরৎ, রবীন্দ্র, বঙ্কিম। স্মৃতিতে দু'লাইন বিবেকানন্দ, হে ভারত ভুলিয়ো না তোমার নারী জাতির আদর্শ, এক লাইন কথামৃত, শ, ষ, স, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয়, সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। যদ্দিন স্ত্রীর যৌবন ছিল, তদ্দিন কিঞ্চিৎ মোহ ছিল। ঝাল, তবু ধানি লঙ্কার ন্যায় আকর্ষণীয়। দিনে সম্মুখ সমর, রাতে সন্ধি। একে একে বংশধরগণের আগমন। দাঁত ওলসানো, পেট ফাঁপ, পালাজ্বর, মাসিপিসি, ঘুংরি কাশি, অন্নপ্রাশন, হামা, হাঁটা, বোল ফোটা, ছুনু, মুতো কাঁথা। ভীরু সহবাস। আর না। এ কী গৃহ! গৃহ ঐক

মন্দির! না নোংরা সরাইখানা। বাতাসহীন ভ্যাপসা বাথরুম। পশুগন্ধী শয়নকক্ষ, মৎস্যগন্ধী পাকশালা। ছাড়া অন্তর্বাসের অসুস্থ ইঙ্গিত। আলো কোথায়? জীবনের জ্যোতি কোথায়! কারবারি মানুষের কলকোলাহল চারপাশে। স্বাধীনতা তুমি কোথায়! পবিত্রতা তুমি কোথায়! কল্যাণময়ী তুমিই বা কোথায়? ইস! নিজেকে শূকর বানিয়ে ফেলেছি। ওই যে আমার মেয়েরা, যাদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, তারা আজ জানলা খুলে ছেলে দেখছে। হরমোন তোমার কী বা কেরামতি। হরমোনের কাছে আমিও হার মেনেছি। বড় কামড়ায়, বড় জ্বালায়, ছটফট করিয়ে মারে। প্লাসকে প্লাস থাকতে দেয় না, মাইনাসকে মাইনাসে রাখে না। আকর্ষণ, বিকর্ষণ। শান্তি নেই।

এই যে এতখানি বয়েস হল আমার, হরমোন এখনও আমাকে সমানে জ্বালাচ্ছে। আর এক সায়েব, উইলসন আমাকে বলেছিলেন, Sex is like riding a bicycle. অভ্যাস। প্রয়োজন নেই, অথচ ছাড়াও যায় না। কী করি, কী করি একটা সিগারেট খাই, এক টিপ নস্যি নিই, একটা পান খাই, রাত হল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, পাশে কে? অ তুমি! তা হলে? তা হলে দুর্বল হয়ে পড়া। মন বলে কিছু আছে নাকি আমার? দম দেওয়া ঘড়ির স্প্রিং। পেন্ডুলাম দুলছে, দুলছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে। আবার ফিরে আসে।

কথামৃতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন আমাকে বলছিলেন, 'যাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।' আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম ঠাকুরের মুখের দিকে। তার মানে এ আমার প্রথম জন্ম। ঠাকুর বললেন, 'যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় বোঝে না, কী ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে।' অন্তর থেকে দেখা! সে অভ্যাস তো করিনি। দুটো চোখ দিয়েই তো দেখি। সে চোখের দৃষ্টি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। চশমা না চাপালে সব যেন ধ্যাবড়া আর জ্যাবড়া। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ রে, অন্তর থেকে দেখা। ভেতরের বিকার দূর করে দে, দেখবি নির্মল আকাশ। দেখবি দূর আকাশ, যে আকাশ মাটিতে লুটোয় না।' ঠাকুর গান গেয়ে উঠলেন, 'এ কী বিকার শঙ্করী! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি।' বিকার বই কী। দেখো না, সংসারীরা কোঁদল করে। কী লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল। ঈশ্বর দু'বার হাসেন। জানিস কি তা? একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ দিকটা আমার ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সংকটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কী মা, আমি ভাল করব। বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

ঠাকুর সেদিন অনেকক্ষণ ছিলেন আমার এই নির্জন ঘরে। কত কথা! কত গান! যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমি আমি করে মরছিস কেন? তুই কে রে শালা! আমি আমি করলে কত যে দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবি। বাছুর হামমা, হামমা, আমি আমি করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লাঙল টানতে হচ্ছে, রোদ নেই বৃষ্টি নেই। হয়তো কষাই কেটে ফেললে। লোকে মাংস খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো হবে। লোকে তার ওপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈরি হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার ওপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়িভুড়ি দিয়ে তাঁত তৈরি করে, যখন ধুনুরির তার তৈরি হয় তখন ধোনবার সময় তুঁহুঁ তুঁহু বলে। আর হামমা, হামমা বলে না। তুঁহুঁ তুঁহুঁ বলে, তবেই নিস্তার তবেই তার মুক্তি। আর তাকে আসতে হয় না। শোন এই গানটা শোন, শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি, ভব সংসার বাজার মাঝে/ ঘুড়ি আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥ মায়া দড়ি কিনা মাগছেলে। বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি। বিষয় কী? না কামিনী-কাঞ্চন।'

কিছুতেই কিছু হবার নয়; কুকুরের ন্যাজ কখনও সোজা হয় না। যেই সোজা করলে অমনি বেঁকে

গেল। কে আর সারাজীবন টেনে ধরে থাকবে! ভারী ইট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে যদি হয়। তেমন আদর্শের প্রস্তরখণ্ড পেলুম কই। সেতারে হাত সাধার মতো সারা জীবন সেধেই গেলুম, এক নম্বর তান, পিঁপড়ের মতো সংসারে থাকো, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো— পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। দু'নম্বর তান, জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। তিন নম্বর তান, আর পানকৌড়ির মতো। গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। চার নম্বর তান, আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখো পরিষ্কার উজ্জ্বল। আর পাঁচ নম্বর তান, গোলমালে মাল আছে, গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

তোতা পাখির মতো কপচে যাই, আর মাঝরাতে বাথরুমে ছোট-বাইরে করতে যাবার সময় বারান্দায় থমকে দাঁড়াই। চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। পাপিয়া ডাকছে, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। বাতাস লেগেছে ঝিরিঝিরি গাছের পাতায়। দুধের মতো সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাশের ঘরের বিছানায়। সুপ্রিয়া শুয়ে আছে। শুয়ে আছে আমার দুই মেয়ে। টাইমপিস চলছে টিকটিক শব্দে। ঘুমন্ত প্রাণীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ যেন ঝাউয়ের পাতায় বাতাসের হাহাকার। আমি ক্ষণকালের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ি। অতীত কেন ফিরে আসে না! কী আশ্চর্য, আমারই জীবনের দিন একে একে পাখা মেলে সেই যে উড়ে গেল আর ফিরে এল না। পাখি বাসায় ফেরে। দিনান্তে পথিক ঘরে ফেরে। বসন্তের কোকিল আবার বসন্তে ফিরে আসে। শিউলি আসে শরতে। দিন কেন আসে না? রিচার্ড বাখ সেদিন বললেন, You are always free to change your mind and choose a different future on a different past. সায়েব অতীতকে মনের মতো করে ফিরিয়ে আনা যায়! যদি যায়, ওই সুপ্রিয়াকে তার ফেলে আসা পঁচিশটা বছর ফিরিয়ে দিলুম। সেই পিঠ ছাপিয়ে পড়া এক মাথা কালো চুল। সেই টানা টানা উজ্জ্বল দুটি চোখ। ধনুকের মতো ভুরু। মিষ্টি হাসি। সেই ছুটে আসা, হেসে চলে যাওয়া। ডুরে শাড়ি। কপালে গোল টিপ। সেই জর্দা দিয়ে পান খেতে শেখা। পাতলা ঠোঁট উলটে উলটে দেখা। সেই ট্রেন। কাঁধে মাথা রেখে দুলে দুলে নীল পাহাড়ের দিকে চলা। শেষরাতে ভাঁড়ে গরম চা। ব্লাউজের হাতা টাইট হয়ে বসে আছে পুরো বাহুতে। চওড়া মসৃণ পিঠ নেমে গেছে কোমরের দিকে। বুকের মাঝখান যেমন নরম তেমনি শীতল। মিষ্টি মানুষ মানুষ গন্ধ। সব স্বপ্ন আবার ফিরিয়ে দিলুম তোমাকে। আবার একবার নতুন করে শুরু করা যাক না, এ ডিফারেন্ট পাস্ট। তুমিও জানো, আমিও জানি ভুল কী কী হয়েছে। জীবনের মধুর রসে তিক্ত রস কীভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিশেছে।

জানলার গরাদে মাথা রেখে ওইভাবে আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন কয়েদির মতো। যাবজ্জীবনের আসামি। নিদহারা রাতে বর্তমানের দিকে তাকিয়ে আছে। যেতে চায়; কিন্তু উপায় নেই। নিদ্রিত মানুষ কত পবিত্র। নিদ্রাও তো এক ধরনের মৃত্যু। মৃত মানুষের মুখে হিংসা, দ্বেষ কিছুই লেগে থাকে না। সব ঝরে যায়। এমন যদি হত, প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর একটু একটু করে দিনে দিনে তার পবিত্রতা ফিরে পেত। এইভাবে চিরনিদ্রায় যাবার সময় মানুষ ঈশ্বর হয়ে চিতায় উঠত।

পিনাকীরঞ্জন এই জবরদস্ত কথাটি তোমার খাতায় লিখে যাও। তোমার কথা নয় আমার কথা:

> কয়লা কালো। যত পোড়ে তত সাদা হয়।
> মানুষ যত যন্ত্রণা পায় ততই দেবতা হতে থাকে।

আরও একটি নির্দেশ লিখে রেখে যাও:

> জীবনের স্বাধীনতা, জীবনের আনন্দ, বাইরের জগতে নেই
> আছে তোমার ভেতরে। বলো, আমি স্বাধীন, আমি আনন্দময়,
> সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্বাধীন, তুমি আনন্দময়। ইচ্ছা। ইচ্ছাটাই সব।

পীতাম্বর, এখনও তোমার সময় আছে। জীবনের গোধূলিবেলায় ভোরের স্বপ্ন দেখলে আক্ষেপই বাড়ে। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় যাত্রা করলে রাত্রির যাত্রীই হতে হয়। পথ ফুরোবার আগেই জীবন ফুরিয়ে যায়। শোনো বন্ধু। তোমাকে মাঝে মাঝে বন্ধু বলেই সম্বোধন করতে ইচ্ছে করে। তুমি আমার ফেলে আসা যৌবন। অতি তুচ্ছ কিছু প্রশ্নই বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। তুমি কোথায় জন্মেছ? পুত্র আমার। তোমার আবাস কোথায়? কোথায় তুমি চলেছ? কী তুমি করছ? মাঝে মাঝে চিন্তা কোরো। দেখবে প্রতিদিনই তোমার উত্তর পালটে যাচ্ছে। আমাকে রিচার্ড সায়েব যা বলেছিলেন, তা যে কত সত্য : You teach best what you most need to learn.

না অনেক হল। রাত ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। পৃথিবীর অঙ্গে শিশিরের বিন্দু জমছে, লক্ষ চোখের অশ্রুবিন্দুর মতো। আমার অদ্ভুত এক অনুভূতির কথা লিখে রাখি আজ। ঘরের দূর কোণে ওই যে সোফা আলোছায়ায় পড়ে আছে, ও আসন শূন্য নয়। ওখানে আমার আমি বসে আছে। ক্ষতবিক্ষত। উদ্‌ভ্রান্ত। আমাকে ছেড়ে আমার অন্তর ওখানে গিয়ে বসে আছে। মুখে যন্ত্রণা। চোখে কিন্তু আগুন। বিচারকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপরাধী আমার দিকে। আমি তাকে সুখী করতে পারিনি। তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ওঠার সুযোগ করে দিতে পারিনি। যতবার সে শুভ্র হতে চেয়েছে ততবারই আমি তাকে কর্দমলিপ্ত করেছি। যখন সে মুক্তি চেয়েছে আমি তাকে বন্দি করেছি। যখন সে আলো চেয়েছে আমি তাকে অন্ধকার দিয়েছি। যখন সে আরও বাতাস চেয়েছে আমি তার শ্বাসরোধ করেছি। যতবারই সে জাগতে চেয়েছে আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। দৃষ্টি আছে ভাষা নেই। আকার আছে আকৃতি নেই। প্রতিদিন তার চেহারা পালটাচ্ছে। মরুভূমির ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যেমন খাঁজের পর খাঁজ, ভাঁজের পর ভাঁজ পড়ে, প্রতিদিনই তার মুখের রেখায় নতুন রেখা পড়ছে। অত্যাচারী বাদশার চাবুক পড়ছে বন্দি বীরের শরীরে। আমার দৃষ্টি যত ম্লান হয়ে আসছে, তার দৃষ্টি তত উজ্জ্বল হচ্ছে। আমি যত নিবে আসছি, ততই সে জ্বলে উঠছে। প্রতি রাতে আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। বলি, উলটে নাও। এতকাল আমি তোমার পোশাক ছিলুম, এবার তুমি আমার পোশাক হও। বলি, আমি এবার ভেতরে যাই, তুমি এসো বাইরে।

তা যে হবার নয়।

সেদিন আমার একটা পুরনো রঙিন জামা মেরামত করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখছিলুম। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, হাতার ভাঁজের ভেতর, কলারের ভেতরদিকের রং যেন নতুনের মতো উজ্জ্বল। বাইরের মতো বিবর্ণ হয়ে যায়নি। সাত বছর আগের জামা। সমানে প্রকৃতির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে, আমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য হারিয়েছে। উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। শুধু ভাঁজে ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে সঞ্চিত হয়ে আছে জন্মলগ্নের সুষমা। মনে হল উলটে নিই। ভেতরটাকে বাইরে আনি। তা হয় না।

জীবনের এই সত্যটি জেনে রাখো পুত্র। ভেতরের সঙ্গে বাইরে মেলে না, বাইরের সঙ্গে ভেতর মেলে না। গরমিল আর অমিল আমরা নিজেরাই বয়ে বেড়াচ্ছি। উট যেমন বয়ে বেড়াচ্ছে নিজের কুঁজটিকে।

জলযোগ

'কী রে রুনু, চায়ের জল চাপালি?'

সাতসকালেই সস্তা টেপরেকর্ডারের আওয়াজের মতো সুপ্রিয়ার গলা ঝনঝন করছে।

রুনুর গলা পাওয়া গেল, 'তুমি কী করছ? তুমি বসাতে পারছ না?'

'না পারছি না। রোজ আমাকেই বসাতে হবে তার কী মানে আছে! তোরা সব পটের বিবি হয়ে বসে থাকার জন্যে এসেছিস, তাই না! যা জলটা চাপিয়ে দে।'

'আজ ঝুনু চাপাক।'

'না, তোকে বলেছি, তুই চাপাবি।'

'আমি পারব না।'

'রুনু।'

'আমাকে শাসিয়ো না মা। তোমার শাসানিকে আমি ভয় পাই না।'

'অ্যায় যে কোথায় গেলে?'

এইবার আমার খোঁজ পড়েছে। পুবের জানলা খুলে এই সময়টা আমি চুপচাপ বসে থাকি। সূর্যোদয় দেখতে পাই না, তবে আলোর ডানা কাঁপতে থাকে থাক থাক নতুন আর পুরনো বাড়ির মাথার ওপর মরকত নীল আকাশে। এই মুহূর্তটি আমার কাছে বড় মধুর। ভীষণ পবিত্র। সারাদিনে পৃথিবীও অনেকবার রূপ পালটায়। পবিত্র পৃথিবী, উদাস পৃথিবী, পাপী পৃথিবী, চপলা পৃথিবী, সন্ন্যাসিনী পৃথিবী। এই সময় আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে। সকালের পৃথিবী শিশুর পৃথিবী। বই বগলে একটি শিশু লাফাতে-লাফাতে চলেছে পাঠশালার দিকে। শান্ত পুকুরের জলে গাছের স্থির ছায়া দীর্ঘ হয়ে আছে। সাদা হাঁস, কালো হাঁস, পাঁশুটে হাঁস কলের পুতুলের মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জালে রুপোর মাছ অনেক অনেক টাকার মতো ঝকঝক করছে। ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাল থেকে ছিটকে পড়ছে মুক্তোর দানা। হলুদ রঙের একটা পাখি পেয়ারা ডালে বসে আছে। জামার পকেটে ভিজে ছোলা। ভিজে ছোলার ভারী সুন্দর গন্ধ। শিশুর গায়ে ওইরকম একটা গন্ধ লেগে থাকে। পুকুরধারে ধুতি আর হাফশার্ট পরে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন মানুষ বসে আছেন। গায়ের কালো রং যেন পালিশ করা। একমাথা কোঁকড়া চুল। মুখটি ভারী মিষ্টি। সব সময় হাসি লেগে আছে। সাদা সাদা দাঁত ঝকঝক করছে। আমরা তাঁকে অবনীকাকা বলে ডাকতুম। সেই চেহারা, মিষ্টি স্বভাব ও তাঁর সিগারেট খাবার অদ্ভুত ধরন আজও মনে পড়ে। মুঠো পাকিয়ে ধরা সিগারেট। এক-এক টানে আধখানা শেষ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হত। এক মুখ ধোঁয়া। একটু একটু করে বাতাসে ছেড়ে দিতেন। তারপর হাসি হাসি মুখে বলতেন, কী টানবে নাকি একটু। আর তখনই আমি ভয়ে দৌড় লাগাতুম। সিগারেট খাওয়া পাপ। দৌড়োতে দৌড়োতে দেখতুম জলার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দুটো বক। পা ঠেকে আছে জলে।

'ঝুনু তোর বাবা কোথায় রে? এখনও ওঠেনি?'

'কী বলছ?'

'কানে তুলো দিয়েছ?'

'সকালেই এত ঝাঁঝ কেন? এই তো সবে সূর্য উঠল। সারাটা দিন এখনও পড়ে।'

'শুনতে পাচ্ছ না!'

'সারাদিন এত শুনছি, এত শুনতে হয়, কোনও কথাই আর তেমন শোনা হয় না। সবই আমার কানে তালগোল পাকানো শব্দ?'

'তুমি সাধক ব্রহ্মজ্ঞানী, তবে সংসারে এখনও যখন আছ, ইতরজনের কথা অল্পস্বল্প কানে নেওয়া উচিত। লোকে তা না হলে ভণ্ড বলবে।'

'এক ডাকেই তো সাড়া দিয়েছি। আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটেছে। বয়েস বেড়েছে তাই আগের মতো ডাকামাত্রই হুজুরাইন বলে মাটি ফুঁড়ে সামনে হাজির হতে পারি না। বয়সের মুখ চেয়ে এই সামান্য ত্রুটি মার্জনা করে নেওয়াই উচিত। এতকালের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, প্রায় পেনশন নেবার সময় হল।'

'তোমাকে আমার ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হতে হবে না। তোমার ওসব কথার মারপ্যাঁচ সারাজীবন শুনেছি অনেক। চিপটেন কাটা বুলি ছাড়া ঈশ্বর তোমাকে আর কিছু দেননি। ওর জোরেই তরে গেলে।'

'তা হবে। তবে শুনেছি চালুনিই ছুঁচের বিচার করে।'

'আমার মতো বউ পেয়েছিলে বলেই বেঁচে গেছ। অন্য কেউ হলে দেখিয়ে দিত মজা। টের পেতে কত ধানে কত চাল!'

'আশেপাশে অন্য বউও দু'-চারটে চোখে পড়ে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি মাঝে মধ্যে যেতে হয়। তোমার ওই দাবি মানতে পারলে সুখী হতুম। সম্ভব হল না বলে দুঃখিত।'

'পরের বউ মিঠেই হয়। ঘরকা মুরগি ডাল বরাব্বর।'

কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। আলতো কিন্তু নিশ্চিত।

'কী হচ্ছে বাবা?'

আমার পেছনে পীতু। যার চুলের ধরন আর মুখের কেয়ার-ফ্রি ভাবকে ঘৃণা করতুম, সেই মুখ আজ যেন যীশুখ্রিস্টের মতো। কোমল, উদাস, নিষ্পাপ। চোখের দেখা দেখা নয়, মনের দেখাই সব।

'কথার আবর্তে পড়ে গেছি বাবা। কিছুতেই বেরোতে পারছি না। অভিমন্যুর অবস্থা।'

'এই তো আমি তোমাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি। এ এমন এক চাকা, কথার বলবেয়ারিং-এ ঘুরেই যায়, ঘুরেই যায়।'

ডানহাতের ওপর দিকটা পীতু ধরেছে। কেউ ধরলে বেশ বুঝতে পারি, দিন দিন শরীর শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে। সুপ্রিয়া ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'ওঃ বাপে ছেলেতে খুব সোহাগ! ক'দিন টেকবে। এখুনি ব্যাগ খুলে লাফিয়ে উঠবে, দু'টাকার একটা নোট ছিল, কে নিলে? পীতুর কাজ। কাপ্তেনির পয়সা পকেট মেরেই আসে। তোমাদের ওসব আদিখ্যেতা রাখো। ও আমার ঢের দেখা আছে। কাজের কথাটা শুনে যাও। ছেলে দেখেছ?'

'ছেলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলে। যেন আকাশ থেকে পড়লে! আজ বছরখানেক ধরে উঠতে বসতে তোমাকে বলছি, ওই দামড়ি দুটোর জন্যে পাত্র দেখতে, দেখেছিলে?'

'চেষ্টা চলছে।'

'কী চেষ্টা। কাকে কাকে বলেছ? কই দেখি লিস্ট দেখি, নামের লিস্ট।'

'এ বাজারে ছেলে পাওয়া অত সহজ নয়। এ তোমার কুমোরটুলিতে গিয়ে কার্তিক কেনা নয়।'

'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে কী হয়?'

'বিজ্ঞাপনে আমার বিশ্বাস নেই।'

'তোমার তো কোনও কিছুতেই বিশ্বাস নেই। আশেপাশে এত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কী করে! খেঁদি, পেঁচি, বুঁচি কেউ পড়ে থাকছে? নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোলে মেয়েরা একদিন তোমারই চাঁদমুখে চুনকালি মাখাবে। তখন নাকে কেঁদো না।'

'তোমার কি তাই মনে হয়?'

'মনে হয় না, লিখে রেখে দাও তোমার বরাতে তাই হবে।'

'আমার একার বরাত?'

'হ্যাঁ, তোমার একার বরাত। লোকে বলার সময় বলবে অমুকের মেয়ে। বাপের নামই আগে করবে। ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ, পায়ের জিনিস মাথায় উঠলে যা হয় এখন তাই হচ্ছে। শুনতে পাও না, কথাবার্তার কী ছিরি, দেখতে পাও না চালচলনের ছিরি! বেহ্মোজ্ঞানী। চোখ কপালে তুলে বসে আছেন। ধ্যান হচ্ছে ধ্যান। গুষ্টির পিন্ডি হচ্ছে।'

পীতু বললে, 'এইবার সমে এসে পড়েছে, এইখানেই সকালের অধিবেশন শেষ করো।'

আমি যেন অসুস্থ মানুষ। পীতু আমাকে সেইভাবে খাটে বসিয়ে দিলে। বিছানার গোছগাছ এখনও বাকি। মশারিটা কোনওরকমে চারকোণ থেকে খুলে তালগোল পাকিয়ে ঘরের একপাশের সিন্দুকের মধ্যে ভরে রেখেছি। ডালার ফাঁক দিয়ে নীল জিভ বেরিয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে নাইলনের

মশারিও লজ্জা পায়। এতকাল সেবা করে, সংসারের কাছে এই তোমার পাওনা বুঢ্‌ঢা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও রাতে বিছানা গড়ো, সকালে লো প্রেশার আর অনিদ্রার দুর্বলতায় টলতে টলতে আবার ভেঙে ফেলো রাতের সাজানো আয়োজন।

ও মহলে ঝনঝন করে উচ্চগ্রামের একটা শব্দ হল। আচমকা আওয়াজ আজকাল আর সহ্য করতে পারি না। স্নায়ু অসম্ভব স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। আমাকে চমকে উঠতে দেখে পীতু মুচকি হেসে বললে, 'ঘাবড়ে যেয়ো না। কেটলি-নিধন-যজ্ঞ শুরু হয়েছে।'

'চায়ের নিকুচি করেছে।'

খাট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেয়াল আলনায় লটকে থাকা গেরুয়া পাঞ্জাবির দিকে হাত বাড়ালুম। পীতু খুব ধীর গলায় বললে, 'কী করতে চাইছ?'

'প্রায়ই ভাবি, আজ অ্যাকশান। ডিসিশান থেকে অ্যাকশানে আসতে বেশ মনের জোর লাগে। সকালের চা এবার থেকে আমি কানুর দোকানেই সেরে নেব। ডেলি চল্লিশ পয়সা মানে মাসে বারো টাকা। বারোটা টাকা নিজের জন্যে খরচ করার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে।'

'বারো কেন, বারোশোও তুমি নিজের জন্যে খরচ করতে পারো। তবে কানুর দোকানে বসে চা-খাবার বয়েস তোমার চলে গেছে। একালের চায়ের দোকানের পরিবেশ তোমার জানা নেই। পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে রাখো। সকালের চায়ের দায়িত্ব আমি নিলুম।'

'পীতু হঠাৎ তুই খুব পালটে গেছিস। কেন রে?'

'তোমার ধারণাটা ঠিক নয়। আমি যা ছিলুম তাই আছি, কেবল সাইডটা পালটেছি। আগে ও-দলে খেলছিলুম। এখন তোমার দলে খেলছি।'

'হঠাৎ এই পরিবর্তন?'

'তুমি বড় একা পড়ে গেছ। তোমার জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হয়।'

'দয়া নয় তো!'

'দয়া খুব দূরের জিনিস। আমি তোমাকে ছেড়ে এখনও দূরে যেতে পারিনি। হয়তো পারবও না। তুমি একটু শান্ত হয়ে বোসো। ওদিকে কান দিয়ো না।'

পীতু চলে গেল বাড়ির শব্দময় এলাকার দিকে। পাঞ্জাবি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখলুম। রাখতে রাখতে সেদিনের সেই কথাটি মনে পড়ল, জীবনের প্রতিটি সমস্যাই কোনও না কোনও উপহার নিয়ে আসে। শূন্য হাতে আসে না। আমরা সমস্যা খুঁজি ওই উপহারের লোভে। এক তত্ত্বদর্শী মানুষ এই কথাটি আমাকে বলেছিলেন দূরপাল্লার এক ট্রেনে যেতে যেতে, ভোরবেলা। আমরা তখন চলেছি এক পাহাড়ের পাশ দিয়ে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কেউ কোথাও নেই। শীতল শিলা উঠে গেছে আকাশের দিকে। পাহাড়টির মাথায় একটি ভগ্ন দুর্গ। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে ছোট বড় শিলাখণ্ড। এইমাত্র যেন একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেছে। চোলরাজাদের কেউ একজন ওই দুর্গটির নির্মাতা। বলেছিলেন আমার সেই সহযাত্রী। কত মানুষ কত কী জানেন। আমার কোনও জ্ঞানই নেই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে জরে আছি আমের আঁটির মতো। ছেলেবেলায় ঠাকুমা যে গল্পটি আমাকে বলতেন, শেয়ালের গল্প, তারও তো এই একই বক্তব্য— নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম। শেয়ালপণ্ডিত এক হারায় তো আর এক পায়। আমি শান্তি খুইয়ে সন্তানকে কাছে পেলাম। মাঝে মাঝে মনে হয় যুবনাশ্বের মতো নিজেই যদি গর্ভধারণ করতে পারতুম, তা হলে বেশ হত। অন্তত মান্ধাতার মতো একটি সন্তান জন্মাত, যা একেবারে নিজস্ব। যার ধমনিতে কোনও বিদেশি রক্ত নেই। স্ত্রী মানেই তো বিদেশি এবং বিদুষী। পৃথিবীতে এমন একটি স্ত্রী দেখাও, যার জ্ঞান স্বামীর চেয়ে কম। স্বামী ডক্টরেট হলে স্ত্রী ডবল ডক্টরেট। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। জ্ঞানের ফল্গুধারা ভেতরেই প্রবাহিত। একটু খুঁড়লেই স্বচ্ছ কাকচক্ষু জল।

এই নারীজাতি সম্পর্কে আমার এই নাতিস্বল্প অভিজ্ঞতায় একটি কথাই লিখে যেতে পারি, নারী

তুমি যেমন ধারক, তুমি তেমনি সংহারক। তোমার খেলাতেই শিব সংসারী, শিব সন্ন্যাসী, শিবতাণ্ডব। স্বামীর বুকে সমাসীনা তোমার ওই জিভকাটা লাজুক লাজুক মুখটি ভীষণ মিসচিভাস। জননী ও মুখের বিশেষণ বাংলা হাতড়ে মিলবে না।

পীতু চা নিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে নেবার সময় কেমন যেন একটা লজ্জার ভাব হল। সেবা নেবার বা পাবার অভ্যাস চলে গেছে বহুকাল। সেল্‌ফ হেলপ, ডু ইট ইয়োরসেলফের সংসার। আমার জন্যে কেউ কিছু করলে কেমন যেন বাধোবাধো লাগে। কাপটা ঝকঝকে পরিষ্কার। গায়ে কুচোকুচো সরষে ফুল। চায়ের রংটিও বেশ খুলেছে। বিজ্ঞাপনের ছবিতে যে রং দেখা যায়, ঠিক সেইরকম রং। নাকের কাছে আনতেই ভুরভুরে গন্ধ। এমনটি যে কতকাল হয়নি! শার্লক হোমস ওয়াটসনকে বলেছিলেন, you will never find a morose dog in a cheerful family and a cheerful dog in a morose family. কুকুরের মুখ দেখে যেমন পরিবারের অবস্থা বোঝা যায়, সেইরকম চায়ের রং আর গন্ধ দেখে পরিবারের মন পড়া যায়। Watson, you won't meet a cheerful morning-cup in a dishevelled family.

'বড় সুন্দর চা হয়েছে পীতু। পঞ্চাশ-ষাট টাকা কেজির চা আনি, না পাই গন্ধ, না পাই স্বাদ! চায়ের পাতা আর মানুষ এক কিসিমের জিনিস। ভেতরের গুণ সাধনায় প্রকাশ পায়। তোমার চা?'

'চা খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন রে?'

'ও এক ধরনের দুর্বলতা।'

'তুই আজকাল এমন এমন কথা বলছিস, নিজেকে যেন প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করছি। আমাকেই ধরে আমার সামনে বসিয়ে দিচ্ছিস। কেন বল তো মানুষের জীবন এমন দরকচা মেরে যায়?'

'সাহসের অভাবে।'

'সে আবার কী?'

'আমরা সকলেই চলছে চলবের সাধক।'

'এই আবার একটা সুন্দর কথা বললি। সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি কথা। রোজ সকালে অফিস যেতে হবে তো যেতেই হবে। যদ্দিন না কর্মস্থল উরুভঙ্গ করে বসিয়ে দিচ্ছে। রোজ অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই হবে, সে ঝড় হোক, জল হোক, ভূমিকম্প হোক। যে ঘরে খাট বিছানা সেই ঘরে নিত্য দিন শুতে হবে। তা না হলে বাবুর নিদ্রা চটকে যাবে।'

কথা আর শেষ করতে পারলুম না, পীতাম্বরের জননী ও তল্লাটে কাকে ফায়ার করলেন, 'তুই পারবি না তোর বাপ পারবে।'

নড়েচড়ে উঠলুম। আমার ভেতরটা যেন ঠেলে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মনে হচ্ছে, সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াই, 'আজ্ঞে, এই যে বাপ সামনে হাজির। আজ্ঞা করুন।'

পীতু মনে হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে। বললে, 'তুমি ওসবে কান দিয়ো না।'

'কানে এসে তিরের মতো ঢুকছে যে। ওই কথাটার মানে তুমি বুঝলে?'

'তুমি একটা মানে করলে ঠিকই। অন্যায় করোনি কিছু। কিন্তু যিনি বললেন, তিনি ওসব মানেটানের ধার ধারেন না। তাঁর কাছে এটা কথার কথা। সারাদিন অমন কত কথা তেঁতুলপাতার মতো ঝুরঝুর ঝরছে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা কেন এমন হচ্ছে। একটা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাব।'

'কিস্যু হবে না। বাঙালির পার্টনারশিপ টেকে না। সবসময় ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম লেগেই থাকে। ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি বড় কিছু ধরো।'

'সে আবার কী রে?'

'বড় কত কী আছে। তুমি ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করতে পারো। যোগব্যায়াম দিয়ে শরীরকে ধরার

চেষ্টা করতে পারো। যে-কোনও একটা বিষয় ধরে রিসার্চ করতে পারো। জীবজন্তু, পোকামাকড়, গাছপালা, মেঘ, আকাশ, পৃথিবী। মানব ইতিহাস। সভ্যতার বিকাশ। এত বড় পৃথিবীতে মেতে থাকার মতো কত জিনিস। কত নেশা। ধরলেই ধরে যায়।'

'তোকে তা হলে প্রাইভেটলি বলি, লিক আউট করবি না, আমি লেখা ধরেছি। ছাত্রজীবনে সামান্য পাগলামি ছিল, সেইটাকেই এবার কালটিভেট করছি।'

'কবিতা?'

'না, কবিতা আমার আসে না।'

'আত্মজীবনী।'

'ধুস আত্মাই নেই তো আত্মজীবনী। একটু নতুন ধরনের বুঝলি? আত্মদর্শন বলতে পারিস। নিজের চোখে নিজেকে দেখা।'

'তা হলে একদিন একটা সিটিং দাও। শুনি, জিনিসটা কেমন নামছে?'

'লজ্জা করবে।'

'লজ্জার কী আছে? তুমি ওই সঙ্গে মানুষ স্টাডি, ক্যারেক্টার স্টাডি করো। লক্ষ লক্ষ চরিত্র চারপাশে ঘুরছে। দেখবে বেশ মজা লাগবে। তোমার রাগ অভিমান কমে যাবে। দেখবে তুমি আর কোনও কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ছ না। বাইরে বাইরে ঘুরছ। ডাক্তারের চোখে সকলকে দেখছ। প্রত্যেকেই তোমার চোখে এক-একটা কেস। কেস স্টাডি। সে যে কী মজার।'

'তুই করছিস নাকি?'

'সিক্রেট।'

'তার মানে করছিস।'

'আজ রাতে দশটার পর একটা সিটিং দাও না।'

'বেশ। হয়ে যাক।'

পীতু চলে গেল। ছেলেটাকে যা ভাবতুম তা নয়। ভেতরে জিনিস আছে। ভাবনা বড় বিপথগামী। একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। যা দেখি তা ঠিক নয়, যা ভাবি তাও ঠিক নয়। তা হলে? প্রশ্নটা তোমাকে করে রাখলুম বাবু পিনাকীরঞ্জন। এই মুহূর্তে সেই কথাটি মনে পড়ছে। কাল রাতেই পড়েছি। আহা! বড় উপাদেয়।

What the caterpillar calls the end of the world,

the master calls a butterfly.

শোঁয়াপোকা যেই ভাবলে যাঃ পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে গেল, অমনি সৃষ্টিকর্তা বললেন, ওহে, না হে তোমার প্রজাপতি-জীবন শুরু হল।

যাক, ওসব ন্যাকামির আর সময় নেই। এখনও ঠেলে মিনিমাম আটটি বছর চাকরি করতে হবে। দাড়ি নিয়ে কসরত শুরু করে দিই। এমন চাকরি রোজ দাড়ি কামাতেই হবে। নিজেরও স্বার্থ আছে। পাকা দাড়ি, পাকা চুল লোপাট করে চিরযুবক থাকার শয়তানি ইচ্ছে। নিজের সাবকনসাসে ন্যাভাল-ডাইভারের মতো নেমে দেখেছি, এখনও সে মরেনি। বাস্তুঘুঘুর মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে। সেদিন রেডিয়োতে গান হচ্ছিল। একটা লাইন মনে আছে, এখনও কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মতো! ঘুঘুটাকে ওই লাইনই শোনাই, একটু চেঞ্জ করে, এখনও কি বাপ মেটেনি খিদে?

সবে সাবানটি মুখে বুলিয়েছি, বাইরের বারান্দায় গলা শোনা গেল, 'মাসিমা।'

বেশ আদুরে আদুরে গলা। কে আবার এল, এই সাতসকালে, রণাঙ্গনে। বেশিক্ষণ সাসপেন্সে থাকতে হল না। মুখটি আমার দরজায় উঁকি মারল,

'মেসোমশাই, কেমন আছেন, আফটার এ লঙ টাইম।'

জুতো পায়ে মশমশিয়ে ঘরে ঢুকে আসছে, এ কে রে বাবা! টমিদের মতো লাল মুখ। বেশ

রসালো। পবিপাটি চুল। কাপ্তেনের মতো জামাকাপড়। ধূমপানে এতই অভ্যস্থ, সর্বাঙ্গ তামাকের গন্ধ ছাড়ছে। যেন তামাক ফুল। চেনা চেনা অথচ ধরতে পারছি না। সংসারের খিচিমিচিতে স্মৃতিশক্তি বিগড়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ওই লোহার ব্যাবসা করে হরেন ভাদুড়ী। কী সব ফ্যাক্টরি ম্যাক্টরি আছে, তারই বড় ছেলে অনুপ ভাদুডী।

'আরে এসো এসো। অনেক দিন পরে এলে!'

'আফটার এ লঙ টাইম। আমি এখন বোম্বে।'

'হোয়াই বোম্বে?'

'ডুয়িং ফিল্মস।'

'সে আবার কী?'

'আমি এখন ডিরেক্টাব। দু'-দুটো ছবি এখন ফ্লোবে।'

'সে আবার কী? ফ্লোর মানে তো মেঝে। মেঝেতে ছবি?'

'আ মাই গড, ফিল্ম ল্যাঙ্গোয়েজ আপনি কিছুই জানেন না। ফ্লোর মানে স্টুডিয়ো।'

'তুমি ফিল্মের কী বোঝো? তুমি তো লোহার...।'

ভাগ্যিস খুব সময়ে জিভকে সামলেছি। এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'তুমি তো লোহার বাচ্চা।'

'কী বলছেন মেসোমশাই? ফিল্ম ইজ মাই লাইফ-ব্লাড। আমার চোখে ছবি। আমার মনে ছবি। আমার স্বপ্নে ছবি। ফিল্ম ওয়ার্লডে আমার কী নাম জানেন, অপনু দুভাডী।'

'বাপস, এ তো দেখছি ইটালিযান নাম! কোত্থেকে পেলে?'

'আমার পৈতৃক নামেই লুকিযে ছিল এই ইন্টারন্যাশন্যাল নাম। জাস্ট জাগলাবি অফ লেটার্স।'

'ফিল্ম ওয়ার্লড? দেশ, প্রদেশ ছেড়ে একেবাবে জগতে ঝাপ মেরেছ?'

'মেসোমশাই আমাব অ্যামবিশান চিবকালই খুব হাই। ছোটখাটো মিডল ক্লাস ব্যাপার আমাকে টানে না। থিঙ্ক বিগ, অ্যাক্ট বিগ, অ্যাচিভ বিগ।'

মনে মনে বললুম, বাপের কেলে পয়সা হলে, ছেলে তো হামবাগ হবেই রে ছোঁড়া। হামবাগ। আমি বাগ। তা এখানে কী মনে করে? ধান্দাটা কী মানিক! মেয়ে দুটো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু যুবকেরই আমি মেসো। শ্যালিকা-পুত্র সামলাই কীভাবে! পথে ঘাটে বাজাবে।

'তা তুমি বোম্বে থেকে চলে এলে?'

'আই অ্যাম ইন সার্চ অফ নিউ ফেসেস, নিউ ট্যালেন্টস।'

'তাই নাকি? আমাব ফেস তোমার পছন্দ হয়?'

'ভেরি হিউমারাস ফেস। অ্যাকিউট অ্যাঙ্গল থেকে সো ইন্টারেস্টিং। টিপিক্যাল মিডলক্লাস হাজব্যান্ড। আমার কোনও একটা স্টোরিতে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মেনটেন দ্যাট প্রোফাইল।'

'তুমি তা হলে এলে?'

'তার মানে?'

'মানে তুমি কী কারণে হঠাৎ এ-বাড়িতে এলে?'

'আই সি। আই সি। জাস্ট এ ভিজিট। মাসিমাকে দেখতে এলুম।'

'যাও, তা হলে ভেতরে যাও।'

'ও শিয়োর।'

'শোনো।'

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল। 'তোমার ওই ইন্টারন্যাশানাল নামটা যেন কী বললে?'

'অপনু দুভাড়ী। ছবি রিলিস হলে পোস্টার পড়বে। হোল শহর একেবারে ছেয়ে যাবে।'

'হুঁ। কাকে তোমার বেশি পছন্দ?'

'কান্ট ফলো, বেগ ইয়োর পার্ডন।'

'কাকে তোমার বেশি পছন্দ? রুনুকে না ঝুনুকে?'

বেশ যেন ভড়কে গেছে। আমতা আমতা করে বললে, 'দু'জনকেই। দু'জনেই হ্যান্ডসাম। তবে ঝুনু একটু বেশি স্মার্ট।'

'আলাপ পরিচয় আছে?'

'ওই আর কী। সামটাইমস উই মিট।'

'কোথায়?'

'সামটাইমস ইন এ সিনেমা, সামটাইমস ইন রেস্তোরাঁস।'

'বিয়ে করবে?'

অপনু দুভাড়ীর মুখটা কেমন যেন করুণ হয়ে গেল। মৃদু গলায় বললে, 'ঠিক সেভাবে চিন্তা করিনি।'

'তা হলে মিশছ কেন?'

'জাস্ট এ ফ্রেন্ডশিপ।'

'এরকম ফ্রেন্ড তোমার ক'জন আছে?'

'ও অনেক, প্লেন্টি প্লেন্টি। আই মেক গুড ফ্রেন্ডস। আমাকে মেয়েরা ভীষণ পছন্দ করে।'

'তুমি কী খেতে ভালবাসো?'

'অফকোর্স চাইনিজ। অল ইন্টেলেকচ্যুয়ালস প্রেফার দ্যাট।'

'মাসিমার হাতের ঝ্যাঁটা খেয়েছ?'

'ঝ্যাটা?'

'হ্যাঁ গো। মুড়ো ঝ্যাঁটা। খেয়েচ কোনওদিন?'

'আ দ্যাট ভেরি সিললি।'

'হ্যাঁ স্লোলি কেটে পড়ো। পা টিপে টিপে। তোমার ওই মোকাসিন অসভ্যের মতো ভীষণ শব্দ করে।'

'কিন্তু, মাসিমার সঙ্গে একবার...।'

'খেপেচ। মাসিমার হাইড্রোফোবিয়া হয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়ে দিচ্ছে।'

সুপ্রিয়ার চিৎকার শোনা গেল, 'তোদের পিন্ডি আজ চটকে দেব। রোজ মুখেই বলি, আজ কাজে হবে। তোরা সব আমার লোহার গতর দেখেছিস, তাই না?'

'শুনলে?'

'ইয়েস।'

'যা শুনলে, ইংরেজিতে অনুবাদ করো।'

'আমি আজ আসি মেসোমশাই।'

'এসো বাবা, অ্যান্ড মেনটেন দ্যাট প্রোফাইল। ওটা আমার একটা স্টোরিতে ভীষণ সুট করবে। আমিও ফ্লোরে যাচ্ছি। আমারও একটা ইন্টারন্যাশন্যাল নাম আছে। মেক্সিক্যান, কীনাপিনরঞ্জ। আমার স্টোরির হিরোইন হবে স্মিতা পাতিল।'

দাড়ি কামাবার আয়নায় অনেকদিন পরে আমার হাসি হাসি মুখ দেখলুম। কতদিন এমন মিচকে পটাশের মতো হাসিনি। সব সময়েই বিষণ্ণ গোমড়া মুখ। দেখলে গা জ্বলে যায়। এই লোকটার নাম পিনাকীরঞ্জন। নাইনটিন থার্টিফোরে জন্মেছিল। হরোসকোপে বুধাদিত্য যোগ। কোথায় বাবা, সেই যোগে আমার কী হল! কাঁচকলা।

বিষাদযোগ

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈর পরিদহ্যতে ॥

আমার শরীর কাঁপিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে এবং গাত্র দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ॥ গাণ্ডীব আমার বা অর্জুনের হাত থেকে নয়, ব্যান্ডেল, সান্তালডি, দুটোরই হাত থেকে খসে পড়ে গেছে। গাত্র অবশ্য আমারই দগ্ধ হচ্ছে। এতটুকু বাতাস নেই। প্রকৃতি কুম্ভক করে বসে আছে। একে এই ঘোর বর্ষা, তায় আলো নেই। পথঘাট কোদলানো। যানবাহন যেন কনে বউ। কেরোসিন যেন অমৃত। ছিটেফোঁটা মিললেই কর্তার কাছাখোলা নৃত্য। এদেশে কী আছে রে ভাই! কেন নেতা আছে, ন্যাতা আছে, ইউনিয়ান আছে, ঠ্যাঙাড়ে আছে; দেয়ালে স্লোগান আছে, কণ্ঠে বিপ্লবের বাণী আছে। নেতাদের চিন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া ভ্রমণ আছে। মিঞা, এতেও তুমি সন্তুষ্ট নও। ব্যাটা পরশ্রী, পরস্ত্রীকাতর। বিষাক্ত বাঙালি।

ঘফাং ঘফাং করে চলেছি। কোথায় চলেছি কে জানে! একটা টর্চলাইট কিনেছিলুম। ব্যাটারির খরচ জোগাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি। স্বাধীন দেশের কী হাল? একটা বাল্‌ব সাত দিনের বেশি চলে না। এদিকে দিনে দিনে দাম বেড়েই চলেছে। কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত। সব যাবে থাকবে শুধু লেংটি। ইন্ডিয়ার নাম হবে লেংটিল্যান্ড। যার আছে তার সব খুলে নেওয়া হবে। লেংটিবাবারা শুধু ভোট দেবে। ভোটাধিকার ছাড়া আর কোনও অধিকার থাকবে না। জল না, রাস্তা না, বাসস্থান নয়, জীবিকারও প্রয়োজন নেই। বেকারভাতা, ডোল এইতেই কোনওরকমে দিন চলে যাবে। ড্যাঁটা চচ্চড়ি আর রেশানের চালের পিন্ডি। আর ওনারা বিদেশে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বক্তৃতা দেবেন, ইন্ডিয়া। ভারত হুড়হুড় করে এগিয়ে চলেছে। বিদেশিরা মুচকি মুচকি হাসবে, বলে যা, বলে যা, প্রাইভেট সেক্রেটারি লিখে দিয়েছে, পড়ে যা। ভারত কী তা যেন আমরা জানি না। রাতে টেমি জ্বালাবার কেরোসিন নেই। মাইলের পর মাইল শুধু অন্ধকার। বিদ্যুতের বদলে বক্তৃতা। দুধ নেই। টিনের গোরুর বাঁট চুষে দুধ ফাঁক করে দিলে ইউনিয়ান। বুকেও দুধ নেই। বাঁটেও দুধ নেই। অথচ সেকেন্ডে দশটা করে ছেলে জন্মাবে। তারপর হারাধনের দশটি ছেলের সেই এক ইতিহাস। রকবাজ, ফেরেববাজ, ধান্দাবাজ। যে ঠেঙাতে জানে সেই মন্ত্রী, নিদেন এম. এল. এ. হবার অধিকারী। দেশের মানুষকে কী দিতে হবে, শুধু প্রতিশ্রুতি। আর খুব বেশি ঝামেলা করলে পালা করে হাপিস করে দাও। ইতিহাসে একের পর এক যুগ এসেছে, প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, ইলেকট্রনিক্স। আমাদের এ যুগ হল ইজি-খুনের যুগ। নানারকম এক্সপার্ট টেকনিক বেরিয়েছে। মেয়েদের যেমন নানারকম অন্তর্বাস বেরিয়েছে, মানুষ মারারও সেইরকম বাহার খুলেছে। ব্লেড, ক্ষুর, চাকু, পেটো, থেঁতো। কত কী!

কাদা লেগে জুতো দু'পাটি জবরদস্ত ভারী হয়েছে। হাঁটার সময় নিজেকে মনে হচ্ছে অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান। কলকাতার রাস্তায় আর আলো জ্বলে না। সব পথই এখন লাভার্স লেন, স্ন্যাচারস লেন। ভালই হয়েছে। নীরস রাস্তায় রসের ফোয়ারা বইছে। বীর রস। করুণ রস। যার গেল তার চোখে করুণ রস। যার এল তার বীর রস। আর হাঁটছি রসকদম্বের ওপর দিয়ে।

আরও কত দূরে সে আনন্দধাম! এসে গেছি। এত সরু গলি দু'পাশের দেয়ালে কাঁধ ঘষে যাচ্ছে। এই হল আমাদের আদি ঈশ্বর গুপ্তের কলকাতা। দিনে মশা, রেতে মাছি। সদর দরজার বোম্বাই কড়া নিজের ওজনেই ঘাড় মটকে লটরপটর। দু'-চারবার নাড়লুম। তেমন শব্দ হল না। ব্যাটা বাঙালি হয়ে গেছে। আকার আকৃতিতে খুব ঠাট, স্বভাবে মিউ মিউ। পাল্লায় জোরে ধাক্কা মারতেই ও পিঠে হড়াস করে একটা শব্দ হল। কোঁচ করে একটা পাটি খুলে গেল। বাঙালি পরের চরকায় যত তেল দেয় তার ছিটেফোঁটাও যদি দরজার কবজায় দিত, তা হলে প্রবেশ প্রস্থান এত সশব্দ হত

না। উঠনে থইথই অন্ধকার। রাত যত অন্ধকারই হোক আকাশ সামান্য হলেও চলার পথে আলো ফেলে। ঈশ্বরের আঁখি মুদিত হলেও জ্যোতির্ময়। দোতলার বারান্দা থেকে সোজা একটা শাড়ি নেমে এসে বাতাসে অল্প অল্প দুলছে, নীলকর সাহেবের সেরেস্তার টানাপাখার মতো। জলে ভেজা সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছে। যাঁর শাড়ি তিনি আজ বিকেলে গা ধোওয়ার সময়ে ঠেলে সাবান মেখেছেন।

বাড়িতে কেউ নেই নাকি। এত নিস্তব্ধ! দোতলার ডান দিকের ঘরে একটা বাতি জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। আমার সত্যচরণ গেল কোথায়! অফিস থেকে এতক্ষণে তো তার ফিরে আসার কথা! সত্য বলে একবার হাঁক মারলুম।

দোতলার ঘর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে?'

'আমি পিনাকী।'

বৃদ্ধের গলা। সত্যর পিতা. 'ওপরে এসো বাবা। আমার ওঠার ক্ষমতা নেই।'

দালানে আলোর সুইচ কোথায়. জানা থাকলেও, কাজে লাগানো যাবে না। পা ঘষে ঘষে দোতলায় উঠতে হল। ব্যাপারটা কী! সত্য নেই। সত্যর বউ নেই। ছেলেরা কেউ নেই। অথর্ব বৃদ্ধকে এত বড় বাড়ির চৌকিদারিতে রেখে সব গেল কোথায়?

সাবেক কালের বিশাল ঘর। উঁচু সিলিং। এত উঁচু যে এর মধ্যে আর-একটা তলা স্বচ্ছন্দে ঢুকে যায়। পাখাটাকে মনে হচ্ছে পাখি, ডানা মেলে দোল খাচ্ছে। বাতিদানে মোটা একটা বাতি কেঁদে কেঁদে আলো ছড়াচ্ছে। জাম্বো খাটে বৃদ্ধ আধ-বসা। পিঠের দিকে তিন-চারটে বালিশ। একসময় চেহারা যে খুব সুন্দর ছিল দেখলেই বোঝা যায়। সেই সৌন্দর্য বয়েসে আর এক চেহারা নিয়েছে। এখন যেন ঠিক ঋষির মতো।

'সত্য নেই?'

'বোসো, বোসো।' ফিসফিস করে বললেন। যেন কেউ ঘুমোচ্ছে। জোরে কথা বললে ঘুম ভেঙে যাবে। সেকালে কেমন সব চেয়ার তৈরি হত। হালকা, অথচ সুদৃশ্য। পেছনের পিঠ ঠেকাবার জায়গাটা উঁচু। চেয়ার যেন নাচতে চায়। নাচ ধরেও ছিল। গান থেমে যাওয়ায় যে ভঙ্গিতে ছিল সেই ভঙ্গিতেই স্থির। ধীরে ধীরে বসলুম। এ ঘরে কোনও তাড়াহুড়ো যেন বেমানান! বসে তো পড়েছি, প্রশ্নের উত্তর? না আবার প্রশ্ন কবতে হবে!

'সত্য হাসপাতালে!'

'হাসপাতালে? হাসপাতালে কেন?'

'শুনবে? শুনতে চাও!'

এ আবার কী রহস্যময় কথা! 'আজ্ঞে, সত্য আমার ছেলেবেলার বন্ধু! তার কিছু হওয়া মানে আমারই হওয়া।'

ছোট্ট একটা কৌটো খুলে, এতটুকু একটা সাদা বড়ি জিভের তলায় রাখলেন। দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে, তিনের অপেক্ষায়।

'সত্যকে মেরে থেঁতলে দিয়েছে।'

'কেন? সত্যর মতো ছেলের কোনও শত্রু আছে, ভাবা যায় না।'

বৃদ্ধ শব্দ করে হাসলেন। দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, তিনটি অনুভূতি এক হলে তবে এমন হাসি বেরোতে পারে।

'শত্রু তৈরি হতে কতক্ষণ? সত্যর অফিসে গোলমাল হচ্ছিল, সে খবর রাখো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জনা পঁচিশ স্টাফ আর শখানেক ভাড়াটে গুন্ডা শেষ রাতে অফিস দখল করে, ঝান্ডা পুঁতে দিয়েছিল। ধর্মঘট নয়, বেআইনি অবরোধ।'

'তুমি জানো সত্যর অফিসে কারু কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। সকলেই ভাল মাইনে

পায়, বোনাস, সস্তার ক্যান্টিন। কিন্তু রাজনীতি! সেক্স আর রাজনীতি, এ দেশের প্রধান দুই সমস্যা। সেক্সচুয়াল রেপ, আর পলিটিক্যাল রেপ।'

'কোনও কাগজই খবর ছাপেনি। সত্যর মুখেই যা শুনেছি। শেষে মাসখানেক আর দেখা হয়নি, কোনও খবরও পাইনি। আপনিও তো ওই অফিসে ছিলেন?'

'আমরা যে সময়ে কাজ করেছি, সে সময়ে অফিস বলে মনে হত না। মনে হত একটি পরিবার। বাঙালির জীবনের সে যুগ চলে গেছে। তখন একটা গ্রাম, একটা প্রতিষ্ঠান, সবই ছিল এক অভিন্ন পরিবারের মতো। আর এখন! জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ ধামাচাপা পড়লেও বিভেদ নতুন নতুন চেহারায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী। বড়লোক, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সর্বহারা। এ ওর গলায় ছুরি চালাচ্ছে। ও চালাচ্ছে এর গলায়। এদিকে আসল যে সমস্যা তার কোনও সমাধান নেই। দেশ এগোবার বদলে ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে। সংহতির বদলে বিচ্ছিন্নতা।'

'সত্যর কি খুব লেগেছে?'

'লেগেছে মানে, বাঁচবে কি না সন্দেহ।'

'কী বলছেন আপনি?

'যাও না, গিয়ে একবার দেখে এসো না নিজের চোখে। দেখলে আঁতকে উঠবে। মানুষ কী না পাবে। সত্যর সহকর্মীরা, তাদেব মধ্যে এমন লোকও আছে যাদেব সত্য ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিয়েছিল, তারা সেই উপকারী সহৃদয় বন্ধুটিকে রাস্তায় চিত করে ফেলে, তিন-চার ফুট উঁচু থেকে মুখের ওপর একের পর এক থান ইট ফেলেছে। ভাবতে পারো তুমি, মানুষ আজ কোথায় নেমে গেছে! এ যেন সেই ডি সি হত্যাব হাওয়া লেগেছে। সাবা পৃথিবীতে আজ এপিডেমিক অফ ভায়োলেন্ট ডেথ শুরু হয়েছে। আমি বৃদ্ধ। পিনাকী, আমাকে এই দেখাব জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। গিভ মি সাম পিলস অ্যান্ড লেট মি কমিট সুইসাইড। খুব হয়েছে। আমার এই বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্বদেশে গিয়ে বলব কোন মুখে। আমার বাড়িতে একটা কুকুর আর গোটা কয়েক বেড়াল আছে। বিপরীত ধর্মী প্রাণী। পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসো, কুকুরের কোলে মাথা রেখে বেড়াল শুয়ে আছে। পশুব জগতে যা সম্ভব, মানুষের জগতে তা অসম্ভব। মানুষের জয়গান আর যেই করুক, আমি আর করতে পারব না।'

আবার সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ঢিকোতে ঢিকোতে চলা। যেন একটি বলদ চলেছি। ন্যাজটাই যা নেই। শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমরা নাকি অমৃতের পুত্র! নিজেকে ঘিরে মানুষের কত উচ্চ কল্পনা! সত্যটাকে এইভাবে মারল! এই কয়েকদিন আগে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ অফিসারকে কীভাবে জানে খতম করে দিল! খাবলে খুবলে, ছিঁড়েখুঁড়ে। যে দেশে পুলিশের এই হাল, সেই দেশে সাধারণ মানুষেব কী হবে! বিশ্বজোড়া এই হতাশায় বারে বারে, ক্ষণে ক্ষণে প্রশ্ন জাগে, কী কবতে বাঁচব! বেঁচে কী হবে! এই তো একটু আগে সত্যর বাবা বললেন, গোটাকতক পিল এনে দাও। বাঁচার চেয়ে মরা এখন কত সহজ! তবু আমরা বাঁচব। ঘিনঘিনে বাঁচা। জীবন নামক কাঁঠালের কোয়ার গায়ে ডুমো মাছির মতো লেবড়ে থাকার চেষ্টা। আমি যদি ডাকসাইটে কোনও অভিনেতা হতুম, তা হলে এই মুহূর্তে নোনাধরা এই কলকাতার, এই জলকাদার অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, সকলকে সচকিত করে চিৎকার করে উঠতুম:

হুঁশিয়ার! মায়েরা সব সাবধান। তোমার শিশুটিকে বুক দিয়ে আগলে রাখো। লক্ষ লক্ষ কালো হাত তোমাদের শান্তির পালক ছিঁড়তে আসবে। পুরুষ সাবধান! তোমাদের প্রজনন থামাও। ভ্রূণে বিষ ঢুকছে। ওই শোনো সভ্যতার ভেঙে পড়ার শব্দ। সিন্দবাদের কলসির ঢাকা খুলে দৈত্য বেরিয়ে এসেছে। আর তাকে ঢোকানো যাচ্ছে না। চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র। রাত্রির এই দীর্ঘ পথ ঊষার কোনও তোরণের দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে না। মাঙ্গলিকের সানাই আর বাজবে না। অপরাহ্নের মিষ্টি

রোদে সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হাতের কাগজ খসে পড়ে গেছে। চশমা খুলে পড়েছে বুকে।

অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা ॥

রাজন! সুখের দিন চলে গেছে। এসেছে এ এক দারুণ কাল। একটি একটি করে চলে যাচ্ছে পাপের দিন। পৃথিবী এখন লোলচর্মা, বিগতযৌবনা। ওই শোনো প্যাঁচার কণ্ঠে সময়ের অশুভ সংকেত। আর সৃষ্টি নয়। এবার ধ্বংস। যা আছে তা শেষ করে দাও।

লোকে আমায় পাগল ভাববে। ভাববে সার্কাসের ক্লাউন। ভাববে পাঁড় মাতাল। রাত প্রৌঢ়া হবার আগেই বেহাল হয়ে পড়েছে। কট্টর কট্টর করে ব্যাং ডাকছে। ডাক বাবা ডাক। এরপর শেয়াল ডাকবে। তারপর বাঘ। একে একে এই শহরে সবই ফিরে আসবে। মানুষ জানতেই পারবে না, কখন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। ওই যে পরদাখোলা জানলা। খুপরি ঘরে কেঁপে কেঁপে আলো জ্বলছে। ডুরে শাড়ি পরে চুলের ঢলে চিরুনি চালাচ্ছে সুন্দরী যুবতী। ঝাউয়ের পাতায় বাতাসের শব্দের মতো, চুল আঁচড়ানোর শব্দ আসছে কানে। আয়নায় বাতির শিখা কাঁপছে। এক লহমার দেখা। কত আশা, কত ভালবাসা। ভয় নেই সুন্দরী, মানুষ সব চটকে দেবে। স্বামী কোথায় কাজ করে? কী তার স্থায়িত্ব! সব ভোজবাজি, সব মায়া।

সত্যিই আমার পা টলছে। পরিচিত কেউ দেখলে ভাববে সত্যিই আমি মদ খেয়েছি। আমি তখন গালিবের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে একটি শের বলব,

সবিত হুয়া হৈ গর্দানে মীনা পে খুনে খলক।

দাঁড়াও বন্ধু পালিয়ো না। দেখা যখন হল শুনে যাও। জগৎ কীসের দায়ে পড়েছে? খুনের দায়ে। খুনের দায়ে পড়েছে তোমাদের এই জগৎ। আর মদ পড়েছে কার ঘাড়ে? মদ পড়েছে বোতলের ঘাড়ে।

লরজতে হৈ মৌজে ময় তেরী রফতার দেকর ॥

আর সেই মদের ঢেউয়ে টলে টলে আমার চলার ঠমক দেখো। পৃথিবী লাট্টুর মতো লাট খাচ্ছে, আমারই বা দোষ কী! আমিও টলছি।

নাঃ সত্যটা বাঁচবে তো! আমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছি। সে বেঁচে থাকায় লাভ কী! প্রাণের মানুষ, প্রিয় মানুষ, আত্মীয়স্বজন সকলকে নিয়ে বেশ জম্পেশ করে বাঁচার নামই তো বাঁচা। এ জীবন তো কীর্তনের মতো, কনসার্টের মতো, অর্কেস্ট্রার মতো। রাতের পর রাত শুধু মাইফেল। এর সুর আছে, তাল আছে। তরফদার সেতার। একটা তার ছিঁড়ে গেল তো হয়ে গেল। সত্য মারা যাবার আগে, আমি যেন মারা যাই। সুপ্রিয়া তুমি মরার আগে আমি যেন মরি। ঈশ্বর! তুমি আমার কোনও কথাই শোনোনি। আমার এই প্রার্থনা শুনো। আমি তো তোমার কাছে মৃত্যু চাইছি। অনিবার্য মৃত্যু। জন্মের মতোই যা সত্য। মৃত্যুর পতাকা নিয়ে আমি সবার আগে যেতে চাই। সভার শেষ বাতিটি নেবাবার জন্যে আমি বসে থাকতে চাই না। শোনো ঈশ্বর!

হবিস কো হৈ নিশাত করে ক্যাথা।

উর্দু তুমি বোঝো তো? তৃষ্ণার জন্যে আমি এই জগতের পেছনে ছুটছি না। তৃষিতের মৃত্যুতে আমার আপত্তি নেই। আমার আনন্দের উৎস কোথায় জানো?

নহো মরনাঁ তো জিনেকা মজা ক্যা ॥

মৃত্যু আছে বলেই আমি বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজি।

সত্য তুই মরিসনি। সুপ্রিয়া তোমাকে আমি ভালবাসি। এ কথা কেউ জানে না। তুমিও জানো না। আমি উর্দু কবি হলে একটা শের লিখতাম, ভালবাসাই ঘৃণা, ঘৃণাই ভালবাসা। এই কাছে, এই

দূরে, এরই নাম জীবন। সুপ্রিয়া তোমাকে আমি বিধবা করে আগে যাব। বিচ্ছেদের বেদনা আমি সহ্য করতে পারব না।

যাক বাবা, গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। পুটপুট করে আলো জ্বলে উঠেছে। এতক্ষণে রাতের চোখ ফুটল। আমি যদি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হতাম, তা হলে এখুনি একটা বক্তৃতা দিতাম। বন্ধুগণ, মৃত এই শহরের গলিত রাস্তায় হাঁটার দুটি নিয়ম, দুটি উপায়; হয় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাও, আর নয়তো মৃত্যুর চিন্তায় মশগুল হয়ে এগিয়ে চলো। মনে করো নিজেই নিজের শব কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছ। মৃদু স্বরে গুনগুন করো ভোমরার মতো, রাম নাম সত্য হ্যায়। রাম নাম সত্য হ্যায়।

কাল আমি সত্যকে দেখতে যাব। আর আজ সারারাত আমি তার জন্যে প্রার্থনা করব। কত কী-ই তো শুনেছি। প্রার্থনায় কী না হয়! মৃত্যুপথযাত্রী জীবনের পথে ফিরে আসে। তোমার দয়ায় প্রভু, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে!

এই সেই বিহারির দোকান। গরম জিলিপি ভাজছে। কতকাল গরম শিঙাড়া আর জিলিপি খাইনি। বৎস পিনাকী, ইদানীং জীবন নিয়ে বড় প্যানপ্যান করছ। গর্দভ তুমি গবেষক নও, বিদূষক নও, দার্শনিক নও। সামান্য একজন করণিক। ভেবে ভেবে বয়েসটাকে বাড়িয়ে ফেলছ অকারণে। মনের কোনও বয়েস নেই। আবার তুমি একটা শের লিখে ফেলো:

জীবন একটা পথ, প্রসারিত সামনে ও পেছনে।
এগোলে এগোতে পারো পেছোলে পেছোতে ॥

সামনে আমাকে যেতে হবে ঠিকই, তবু পেছনের পথে একবার বেড়িয়ে এলে ক্ষতি কী! সময়ের যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে দাও। পঞ্চাশ সাল। সেই ছাত্রজীবন। কলেজে ঢোকার প্রথম উন্মাদনা। জগতের ভেতর পরতে পরতে কত জগৎ। শিশুর জগৎ। কিশোরের জগৎ। যুবকের জগৎ। প্রৌঢ়ের জগৎ। বৃদ্ধের জগৎ। মৃত্যু-পথযাত্রীর জগৎ। এই শেষের জগৎটা কেমন? সত্য কি এখন এই জগতের অধিবাসী! ভোরের জলায় শীতের দিনে কুয়াশা প্রেতের আঁচল ওড়ায়। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে থাকে খাড়াখাড়া গাছ। অস্পষ্ট ঝাপসা। সেই আঁচলে লেগে থাকে সাদা সাদা গোটা কয়েক বক। সত্যর চোখে পৃথিবীর কি এখন এই রূপ!

বিহারির দোকানের গাঁট্টা ছেলেটি টেবিলের ওপর ঠকাস করে এক গেলাস জল নামিয়ে দিয়ে গেল। মোটা কাচের গেলাস। তেলচিটে। জলের রং ঘোলাটে। উলটো দিকে গোঁফঅলা এক ভদ্রলোক ডাল দিয়ে ফুলো ফুলো কচুরি খাচ্ছেন। হিঙের গন্ধ লাগছে নাকে। বড় লোভনীয় খাদ্য। ছাত্রজীবনে কত লোভ ছিল। পকেটে পয়সা ছিল না। এখন পকেটে পয়সা আছে, খাবার সাহস নেই। অম্বল হবে। হোক অম্বল। আজ আমি কচুরি-মচুরি খেয়ে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করব। সত্য যদি হাসিমুখে ধোলাই খেয়ে আধমরা হতে পারে, আমি কচুরি খেয়ে ফুল-মরা হবার সাহস রাখি।

ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'বলুন, কী খাবেন?'

'কচুরি। গরম কচুরি। একটু বেশি করে ডাল দিয়ো।'

ছেলেটি যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ মনে হল, এই এত রাতে কচুরি খাওয়া ঠিক হবে না। মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। পঞ্চাশ সাল থেকে আবার বর্তমান সালে এসে পড়েছি। অতীতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। মানুষের ধর্মই হল সামনে এগোনো।

'খোকা শোনো, কচুরি থাক। তুমি আমাকে দুটো রসগোল্লাই দাও।'

ছেলেটি বিরক্ত হল। সামনের ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'কেন, কী হল? এদের কচুরি খুব বিখ্যাত।'

'খেলেই অ্যাসিড হবে।'

'অ্যাসিড! সারা পৃথিবীটাই তো অ্যাসিডিক হয়ে আছে। নিজের সিস্টেম অ্যালক্যালাইন রেখে লাভ কী! সব অ্যাসিড হয়ে যাক। পৃথিবী পুড়ে যাক। আপনি নির্ভয়ে খান। আমার কাছে দাওয়াই আছে। চারটে গুলি জিভে ফেলে দেবেন। সব ঠান্ডা।'

ভদ্রলোক বাঁ পকেট থেকে মাঝারি আকৃতির একটা শিশি বের করে টেবিলে ঠকাস করে রাখলেন। চ্যাপটা চ্যাপটা বায়োকেমিক গুলি। ভদ্রলোক গলা চড়িয়ে ছেলেটিকে বললেন, 'ভীম, ভীম, বাবুকে কচুরিই দাও।'

গোঁফধারী হলেও মানুষটির চেহারা ভারী মিষ্টি। ব্যায়ামকরা শরীর। বেশ নির্ভরযোগ্য। এক-একজন মানুষ থাকেন না! দেখলেই মনে হয় হাত ধরে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। চেনা-অচেনার ব্যবধান নিমেষে ঘুচে যায়। গপগপ করে কচুরি খেলেও ভদ্রলোক মনে হয় বেশ শিক্ষিত। জগৎ জীবন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। পৃথিবীটা এখনও চিন্তাহীন মগজহীন দানবে ভরে যায়নি।

ভদ্রলোক আরও দুটো কচুরি নিলেন। এক হাতা ডাল। ফুলো কচুরি ফুটো করে গরম হাওয়া বেরিয়ে যাবার অবসরে বললেন, 'কোনও ব্যাপারেই বেশি ভাবনাচিন্তা করবেন না। উদাস হয়ে থাকার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। মনটাকে দেহ থেকে দূরে ফেলে রাখুন, দেখবেন শরীর যেন সুরে বাঁধা সেতার। কিছু মনে করবেন না, হয়তো অনধিকার চর্চা হচ্ছে, তবু বলি, আপনার মুখে কালো একটা ছায়া পড়েছে। একে বলে গ্রহণ লাগা মুখ। কেন? কীসের এত চিন্তা! আমার বয়েস কত অনুমান করতে পারেন?'

বিপদে পড়ে গেলুন। গোঁফ জোড়া না থাকলে হয়তো বলা যেত। আমতা আমতা করে বললুম, 'চল্লিশ।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'টোয়েন্টি শর্ট। ষাট চলছে।'

'সে কী! বোঝাই যায় না।'

'কেন যায় না বলুন তো? আমার মন নেই। মনটাকে দেহ থেকে দূর করে দিয়েছি।'

'কিছু মনে করবেন না। কে আপনি? কী আপনার নাম?'

'না, না, মনে করার কী আছে! আমি তো ইংরেজ নই, যে ইন্ট্রোডাকশান ছাড়া আলাপ হবে না। আমার নাম অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-সন্তান। গলায় কিন্তু পইতে নেই। জীবিকা ভ্রাম্যমাণ পুস্তক-বিক্রেতা।'

'তার মানে?'

'এই যে।'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি। পাশে পড়ে আছে বেশ ওজনদার একটা সাইডব্যাগ। উঁকি মারছে নানা মাপের, নানা চেহারার বই।

'অবাক হলেন? এই ঝোলা আমার জীবিকা। সারাদিন বড় বড় অফিসে ঘুরে ঘুরে ইনস্টলমেন্টে বই বিক্রি করি। জীবনের প্রথমদিকে ছোটখাটো দু'য়েকটা চাকরির চেষ্টা করেছিলুম। নাঃ পোষাল না। দাসত্ব আমার দ্বারা হবে না। দাস হয়ে প্রভুর দেওয়া পোলাও খাওয়ার চেয়ে, স্বাধীন হয়ে দিনের শেষে চারখানা কচুরি খাওয়া অনেক শান্তির।'

'আপনার সংসার নেই?'

'আমার সংসার নেই। চাল নেই, চুলো নেই। আমি আছি, আর আমার পৃথিবী আছে। দিস গুড ওলড আর্থ।'

'আমি যদি আপনার মতো হতে পারতুম!'

'যে যা ইচ্ছে করবে, সে তা হতে পারবে। তবে ইচ্ছের জোর থাকা চাই। আমাদের অনেক ইচ্ছেই নিছক কল্পনাবিলাস। অলস চিন্তার স্তর থেকে কর্মের স্তরে আসতে পারে না। কথামৃত পড়েছেন?'

‘পড়েছি।’

‘মনে আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন মহাবীর ভাবে সাধনা করছিলেন তখন তাঁর কোমরের হাড় বেশ বড় হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ন্যাজের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। যখন প্রকৃতিভাবে সাধনা করছিলেন, তখন তিনি প্রায় নারীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। ওই পথে সাধনা করতে গিয়ে অনেক সাধক রজস্বলা হয়েছেন এমন নজিরও আছে। আত্যন্তিক ইচ্ছায় সবই হয়। আমার যদি ইচ্ছের জোর থাকে, আর আমি যদি ভাবি, আমি পাখি, আমি পাখি, তা হলে আমার দুটো ডানা বেরোনোও অসম্ভব নয়।’

হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কী বলছেন ইনি?

‘আমাকে পাগল ভাবছেন?’

অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, ‘পাগল ভাবব কেন? ঠিক এ ধরনের কথা আগে শুনিনি তো!’

‘আপনাকে একটা বই দেব। দাঁড়ান হাতটা ধুয়ে আসি।’

বিশাল একটা ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে অক্ষয়বাবু আবার এসে বসলেন। মুখেচোখে জীবন যেন জ্বলজ্বল করছে। ব্যাগের ভেতর থেকে পাতলা একটা বই বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

‘দাঁড়ান হাত ধুয়ে আসি। বেশ ভালই আহার হল।’

‘অনেকক্ষণ পেটে থাকবে। খুব ইকনমিক। ছাতুও ভাল। তবে মাইলের পর মাইল অবশ্যই হাঁটতে হবে। তা না হলে হজম হবে না। এক পোয়া ছাতু, কাঁচালঙ্কা, আচার, টালা থেকে টালিগঞ্জ।’

চটি ইংরেজি বই Thoughtless Existence : Ralph Anderson.

লেখক আমার অপরিচিত। অবশ্য ক'টা ইংরিজি বই-ই বা আমি পড়েছি। সুন্দর ছাপা। শক্ত মলাট।

‘অক্ষয়বাবু বিষয়টা কী?’

‘পড়ুন। শুধু পড়া নয়, জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। ওই ইচ্ছে। ইচ্ছেটাই বড় কথা। আপনাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি না। তবে প্রথমে সংকল্প তারপর সাধনা। ইংরিজিতেই বলি, Will to attain.’

‘অ্যান্ডারসন কে ছিলেন?’

‘অতি সাধারণ একজন মানুষ। উরুগুয়েতে শেষ তাঁকে দেখা যায়। জীবনে প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছেন। মানুষের ভাল করতে গিয়ে মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। শেষে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মনে হয় মেরেই ফেলা হয়েছিল। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় একটা বোতলের ভেতর। সমুদ্রের জলে আমেরিকার কূলে ভেসে এসেছিল। বিপ্লবীর দেশ। প্রকাশকের অভাব হয়নি।’

‘কত দাম?’

‘দামের চিন্তা করতে হবে না। আমার উপহার।’

‘অক্ষয়বাবু, আপনার সঙ্গে আমার এই পরিচয় দৈবানুগ্রহ। এমনিই আমি খুব উৎপীড়িত মানুষ। সব সময়েই বিষণ্ণ। আজ আবার বিশেষ খারাপ। এই পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে। তাকে এমন পিটিয়েছে। শুনলুম হাসপাতালে পড়ে আছে। বাঁচে কি না সন্দেহ!’

‘আপনি সত্যবাবুর কথা বলছেন?’

‘চেনেন?’

‘খুব চিনি। আমার অনেক দিনের প্রিয় খদ্দের। আজ বিকেলে গিয়েছিলুম নার্সিংহোমে দেখতে।’

‘কী দেখলেন? কেমন আছে? সুস্থ হয়ে উঠবে তো?’

‘অচৈতন্য পড়ে আছেন। বাহাত্তর ঘণ্টা আগে কিছু বলা যাবে না। মাফিয়া কায়দায় মারা হয়েছে।’

'একটা জিনিস দেখেছেন, খ্রিশ্চানিজম হিন্দুইজম-এর মতো মাফিয়াইজম সারা বিশ্বে কেমন ছড়িয়ে পড়ছে!'

'বইটা পড়ুন। দেখবেন, এক জায়গায় লেখক বলছেন, প্রকৃতির হাতে, বন্যজন্তুর আক্রমণে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ মরেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরেছে মানুষের হাতে। মানুষ হল নাম্বার ওয়ান কিলার। এই জামা, কাপড় আর চামড়ার আবরণের তলায় কার ভেতর কী যে বাসা বেঁধে আছে কেউ জানে না। মানুষ এক কঠিন প্রশ্ন।'

'আপনি কি এই পাড়াতেই থাকেন?'

'এখানেও আমার একটা ডেরা আছে! সত্যবাবুর বাড়ির পাশেই। চলুন না। চিনে যাবেন। সময় সুযোগ পেলে আসবেন।'

'চলুন। খুব লোভ হচ্ছে।'

'আগেই বলে রাখছি, সুদৃশ্য ইমারত নয় কিন্তু। সামান্য একটা খুপরি। তবে ইতিহাস আছে।'

দরজার চেয়ে তালা মজবুত। সেকালের তালা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তালার ভারে দরজার প্রবীণ কড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িটি একসময় দোতলা ছিল। থামঅলা বাড়ি। পূর্বপুরুষের বৈভবের ইঙ্গিত। একটা পাশ ধসে নেমে গেছে। সামনের দিকে একতলার দু'খানা ঘর কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। খুব দুঃসাহসী না হলে এ বাড়িতে বসবাস করার কথা ভাবা যায় না।

অক্ষয়বাবু তালা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। মিষ্টি একটা ঠান্ডা বাতাস বেরিয়ে এল। এ বাতাস গায়ে লাগলে মন কেমন করে। যারা ছিল তারা নেই কিন্তু আছে অন্যভাবে। শরীরে নয় অশরীরে। বহুদিনের বেঁচে থাকার কম্পন ক্লান্ত-ডানা পাখির মতো বসে থাকে। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

অক্ষয়বাবু সেজ জ্বালতে জ্বালতে ভেতর থেকে বলবেন, 'দাঁড়ান মশাই, আলোটা একটু জ্বালি। দেশলাই বর্ষায় ভিজে গেছে।'

'ইলেকট্রিক নেই?'

'একসময় ছিল। খুব রোশনাই ছিল। তারপর বাঙালির যা হয়। এক পুরুষ করে যায়, পরের পুরুষ ভোগ করে, তার পরের পুরুষ চামচিকি তাড়ায়।'

আলো জ্বলেছে। ঘরের ভেতরটা যেন রহস্য রোমাঞ্চের পটভূমি। নোনাধরা দেয়ালে মহাদেশের ম্যাপ। মেঝেতে নীল একটা গালচে। কোনও আসবাব নেই। একপাশের দেয়ালে গোটানো বিছানা। ধূপের গন্ধ ভাসছে বদ্ধ বাতাসে। সামনের ঘর থেকে ভেতরের আর-একটা ঘরে যাওয়া যায়। কোনও সময় দরজা হয়তো ছিল। ফ্রেম আছে। পাল্লা নেই। নীল পরদা ঝুলছে। ভদ্রলোক নীল রং ভীষণ ভালবাসেন।

'আসুন হাতপা ছড়িয়ে একটু বসা যাক। চা খাবেন?'

'না চা আর খাব না। দেরি হয়ে যাবে। বর্ষার রাত। যেতে হবে অনেকটা পথ।'

'তাতে কী হয়েছে! এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'কে করবে?'

'কেন আমিই করব।'

'আপনার রান্নাঘর?'

'রান্নাঘর আবার কী। পাশের ঘরে একটা কেরোসিন স্টোভ আছে, তাইতেই হয়ে যাবে। চলুন পাশের ঘরে চলুন। গল্প করতে করতে চা হয়ে যাবে।'

পাশের ঘরটা আরও বড়। অক্ষয়বাবু ওপাশের একটা জানলা খুলে দিলেন। ভাঙা পাল্লা বাইরের দিকে ঝুলে পড়ল। বাইরে ধ্বংসস্তূপ। গাছপালা, ঝোপঝাড়। মেঘলা আকাশ থেকে ক্ষীরের মতো আলো নেমেছে হিলহিলে গাছের ডালে। বাইরে যেন প্রেতের নৃত্য হচ্ছে। একলা থাকলে গা ছমছম

করবে। একা এইরকম একটা বাড়িতে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারি না। এ ঘরেও বিশেষ কিছু নেই। সাবেক কালের বিশাল একটা চেয়ার এক পাশে। বিচারক সময়ের আসন যেন!

অক্ষয়বাবু বললেন, 'আপনি ওই চেয়ারে বসুন। বসলে আপনার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হবে!'

'কীরকম?'

'বসেই দেখুন না।'

'ভয় করছে। চেয়ারটাকে দেখলেই মনে হয় জীবন্ত। গভীর রাতে হয়তো চলে বেড়ায়!'

অক্ষয়বাবু হাসলেন, 'আপনার কোষ্ঠীটা একবার সময় পেলে দেখব। কেতুর পোজিশানটা কোথায়?'

'কেতু? কেতুর সঙ্গে চেয়ারের কী সম্পর্ক?'

'কেতু প্রবল হলে মানুষ মিস্টিক হয়। ভূত-প্রেত দেখতে পায়। গা ছমছম করে। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। এই ঘরে এসে আপনার কিছু মনে হচ্ছে?'

'একটু অস্বস্তি হচ্ছে। ভাল লাগছে না।'

'বহুকাল আগে এই ঘরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। বললে আপনি ভয় পাবেন।'

'না না ভয় পাব কেন? ভয় পাবার মধ্যেও একটা ভাল লাগার ভাব থাকে। নেশাখোরের জিবে সাপের ছোবলের মতো।'

'এই ঘরে আমার বাবা খুন হয়েছিলেন, প্রায় বছর তিরিশ আগে। আর আমরা সে খবর জানতে পেরেছিলুম তিন দিন পরে। সে দৃশ্য ভোলা যায় না। তারপর থেকে রাতে আমি আর ভাল করে ঘুমোতে পারি না। দিনের বেলা সময় পেলে রাতের ঘুম পুষিয়ে নিই।'

'রাত কীভাবে কাটান?'

'পড়ে আর পুজো করে।'

'পুজো করে?'

'পুজো। আমি পাপীর ছেলে। নিজেকে ধরে না রাখলে আমিও যে-কোনও মুহূর্তে খুন করে ফেলতে পারি।'

কেরোসিন কুকারে ফিনফিনে আগুনের শিখা নাচছে। ফিসফিস করে বাষ্প বেরুচ্ছে কেটলির নলের মুখ দিয়ে। জল সুঁই সুঁই শব্দ করছে।

'আপনার স্টোভটা ওইভাবে জ্বলছে কেন?'

'কীভাবে? ঠিকই তো জ্বলছে। যেভাবে জ্বলা উচিত। কোনও বিশেষত্ব দেখছেন নাকি?'

'কেমন যেন লিকলিক করে জ্বলছে।'

অক্ষয়বাবু ভাল করে দেখতে লাগলেন, 'না আমার চোখে কিছু পড়ছে না।'

'শিখার রংটা কেমন যেন নীল।'

'না, না, ও কিছু নয়। ও আপনার মনের ভুল।'

বাইরে ধড়াস করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠেছি। অক্ষয়বাবু তাকালেন, 'ভয় নেই। পোড়ো বাড়ি ভাঙছে।'

'মাথার ওপর ছাদটা ভেঙে পড়বে না তো!'

'আজ পড়বে না, তবে কোনও একদিন পড়বে।'

'সাবধান হওয়াই ভাল।'

'সাবধান! জানেন না একটা প্রবাদ আছে, সাবধানের মার নেই, আবার মারের সাবধান নেই। তা না হলে সত্যবাবুর মতো সাবধানী, বিচক্ষণ মানুষ মার খেয়ে পড়ে থাকেন। নিন চা ধরুন। চলুন ও ঘরে যাই। এ ঘরে সত্যিই বেশিক্ষণ থাকা যায় না।'

'যাক স্বীকার করলেন তা হলে।'

'জোর করে অস্বীকার করার মধ্যে বাহাদুরি থাকলেও সত্য নেই।'

নীল গালচের ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলুম, 'আপনার বাবা কেন খুন হলেন?'

সব ব্যাপারেই আমার ভীষণ কৌতূহল। মেয়েলি স্বভাব। এই স্বভাবের জন্যে বউয়ের কাছে কত গালাগাল খেয়েছি। কী করব স্বভাব না যায় মলে। তা ছাড়া আমার পরিচিত কেউ কখনও খুন হয়নি। আত্মহত্যা করেছে। আমার ছোটভাই আত্মহত্যা করেছিল বছর দশেক আগে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। আমাদের বংশের রক্তে কাম বড় বেশি। একটা নচ্ছার মেয়ের হাত এড়াতে শঙ্করকে দেহ ছেড়ে পালাতে হল। পৃথিবীতে এমন এক-একটা ফাঁদ আছে। বিদেহী না হলে কেটে বেরুনো যায় না। শঙ্কর যে কী অসহায় অবস্থায় পড়েছিল। মুহূর্তের দুর্বলতায় জীবন দিতে হল। আমাদের শত্রু বাইরে নেই, আমাদের ভেতরেই গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

একটা পোস্টকার্ডের ওপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অক্ষয়বাবু একটা সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার পিতৃদেব খুন না হলেই অবাক হতুম। শয়তান ছাড়া অত পাপ মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। লোভী, ভোগী। জীবনে অন্যায় ছাড়া ন্যায় কাজ কখনও করেননি। এই শহরেই তিন-চারখানা বড় বড় বাড়ি করেছিলেন। সব ফাঁকি দিয়ে। বন্ধকি কারবার ফেঁদেছিলেন। বিধবাদের সোনাদানা মেরে মেরে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। রেসুড়ে আর মাতালদের বিষয়-সম্পত্তি রাঘব বোয়ালের মতো গ্রাস করে ফোকটে চার-পাঁচখানা বাড়ির মালিক হয়ে বসেছিলেন। মারদাঙ্গা, মামলা মকর্দমা এই ছিল জীবনের নেশা। এই বাড়িটা ছিল ওঁর রক্ষিতার। মহিলা শেষ জীবনে অসম্ভব ধার্মিক হয়ে গিয়েছিলেন। বহু সৎ কাজ করে গেছেন। দান, ধ্যান, যাগযজ্ঞ, ধর্মশালা তৈরি। পিতা খুন না হলে মহিলা তাঁকে সন্ন্যাসী বানিয়ে ছেড়ে দিতেন। পাপী যে পুণ্যবানের চেয়ে পুণ্যবান হতে পারে, আমার নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমিও তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম। অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপও দেখেছি। শেষটায় সোনার বর্ণ চেহারা হয়েছিল। চোখের দিকে তাকানো যেত না। এক মাথা রুপোলি চুল। গরদের কাপড় পরে যখন ধ্যানে বসতেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে গোলাপের গন্ধ বেরোত। আমি নিজের মায়ের যত না সেবা করেছি, তার চেয়ে ঢের বেশি সেবা করেছি ওই অসতী সাধিকার। সবাই বলত সবই করেছি সম্পত্তির লোভে। তা হবে। নিজের মন ঠিক ঠিক নিজেই কি দেখতে পাই! এই তো সেই সম্পত্তি! যে-কোনও দিন ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়বে। সমাধি হয়ে যাবে। কেমন লাগল গল্পটা? ঠিক যেন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস। আপনি রিচার্ড বাখের ইলিউশানস পড়েছেন?'

'পড়তে শুরু করেছি।'

'অসাধারণ বই। এক জায়গায় আছে .

> If you will practice being fictional
> for a while, you will understand that
> fictional characters are sometimes
> more real than people with bodies
> and heartbits.

এ যে কত সত্য, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। আমার নিজের জীবনই তার প্রমাণ। আমি বাস্তব না অবাস্তব, আমি জীবিত না মৃত, সময় সময় বুঝে উঠতে পারি না।'

সিগারেটের টুকরোটা চায়ের কাপে ফেললেন। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। চারপাশ ভীষণ নিস্তব্ধ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। থমথমে প্রকৃতি। দু'ঘরের মাঝখানের দরজার পরদা মাঝে মাঝে উড়ছে। কাঁপছে। দুলছে। কেন এমন হচ্ছে? পরিবেশ মানুষকে ভিতু করে। হয়তো কিছুই নয়, তবু জিজ্ঞেস করলুম, 'পরদাটা অমন উড়ছে কেন?'

অক্ষয়বাবু তাকালেন। মৃদু হাসি ঠোঁটে, 'পরদার ধর্মই তো ওড়া।'

'বাতাস নেই অথচ উড়ছে! মাঝে মাঝে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উড়ছে। যেন ঝড় লেগেছে!'

'ও কিছু নয়। অমন হয়। ওদিকটায় হয়তো হাওয়ার চল আছে।'

'সত্যিই তাই, না আমাকে সাহস দেবার জন্যে বলছেন?'

'আপনি প্রেত বিশ্বাস করেন? আত্মায় বিশ্বাস আছে?'

'বিশ্বাস আছে, তবে প্রমাণ পাইনি।'

'প্রমাণ পেলে সাহস করে দাঁড়াতে পাববেন?'

'তা জানি না। আমার ছোট ভাই শঙ্কর আত্মহত্যা করেছিল। বছরের পর বছর আমার স্বপ্নে আসত। বলত, দাদা বড় কষ্ট। এখন আর আসে না।'

'সে তো ঘুমে দেখা। জাগ্রত অবস্থায় এলে কী করতেন?'

'তা ঠিক। হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতুম।'

'সাহস থাকলে, আমার এখানে এসে একটা রাত কাটিয়ে যেতে পারেন। এ বাড়ির ইটের খাঁজে খাঁজে আত্মা আর ইতিহাস। যদি আসেন কোষ্ঠীটা সঙ্গে করে আনবেন। পূর্বজন্মে কী ছিলেন খুঁজে বের করব। পরজন্মে কী হবে দেখার চেষ্টা করব।'

'আর এ জন্মে?'

'এ জন্মে যা হবার তা হোক না। আগেই জেনে ফেললে চমক থাকে না। আর একটা জিনিস আপনাকে পড়ে শোনাব। ওই সাধিকার ডায়েরি। অসাধারণ বস্তু। তুলনাহীন। সযতনে রেখেছি। কতদিন রাখতে পারব জানি না।'

'কেন? ন্যাপথালিন, লঙ্কা, দোক্তাপাতা দিয়ে রাখলে অনেক দিন থাকবে।'

'তা হলে তো কোনও সমস্যাই হত না। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, প্রথমে আমারও অবাক লেগেছিল। তাঁর রেখে যাওয়া এক-একটা জিনিস হঠাৎ হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠছে, অথবা ভেতরে ভেতরে পুড়ে কাঠকয়লার মতো হয়ে যাচ্ছে। সবই ওইভাবে একের পর এক চলে যাচ্ছে। দেখছেন না কোথাও কিছু নেই। শুধু ওই ডায়েরিটা আছে। আমি ধীরে ধীরে কপি করে রাখছি। সব সময়েই আতঙ্ক এই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আপনাকেই বললুম। এসব কথা কোনও অবিশ্বাসীকে বললে গাঁজাখোর ভাববে।'

কথায় কথায় রাত বাড়ছে। বাড়িটা ক্রমশই যেন ভারী হয়ে উঠছে। আর যে বসে থাকা যায় না। আমি ভিতু নই, তবু আমার কেমন যেন লাগছে। পায়ের পাতা, হাতের চেটো দুটো বরফের মতো ঠান্ডা। কোনও অসুখ করার আগে আমার এইরকম হয়। বিদায় নিয়ে উঠে পড়লুম। সময় পেলে আবার আসব। জানা পৃথিবীর চৌকাঠ টপকে অজানা পৃথিবীর রহস্যে প্রবেশ করে দেখব।

দোকানপাট একে একে বন্ধ হচ্ছে। দ্রুত সব পা চালাচ্ছে বাড়িমুখো। এখনই হয়তো আবার লোডশেডিং হয়ে যাবে। নির্জন পথে চলতে চলতে শঙ্করের কথা মনে পড়ছে। বড় ভালবাসতুম। বড় প্রিয় ছিল আমার। পিনাকীরঞ্জন, ওই জন্যেই বলি ভাল কাউকে বেসো না। প্রিয়জন বড় তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। মনে আছে, সাধ করে বিলিতি একটা কুকুর পুষেছিলে। তিন মাসের মাথায় মারা গেল। শঙ্কর এক সন্ধ্যায় অফিসের ছাদ থেকে লাফ মেরেছিল। নীচের কংক্রিট প্যাসেজে পড়েছিল তার প্রাণহীন দেহ। আমার অফিসের কাছেই ছিল তার অফিস। স্মৃতি যখন ভীষণ পীড়া দেয়, এখনও মাঝে মাঝে সেই অফিস-গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। চমকে উঠি। শঙ্কর চিত হয়ে পড়ে আছে। দু'কশ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। জীবনের হলাহল। আমি দেখতে পাচ্ছি। পাশ দিয়ে যারা চলে যাচ্ছে, তারা কেন দেখতে পাচ্ছে না!

কর্মযোগ

একটানা বর্ষায় শোবার ঘরের জানলা ফুলে উঠে, পাল্লায় পাল্লায় এমন সেঁটে গেছে, খোলে কার পিতার সাধ্য। গোলমতো একটা কাঠে তোয়ালে জড়িয়ে তলার দিকে ঠুকুস ঠুকুস মারছি। বেশ তালে তালে। এ যেন পুলিশ লকআপে শিক্ষিত হাতের থার্ড ডিগ্রি মার। কাজ হবে; কিন্তু কোনও ড্যামেজ হবে না। আজ রোদ উঠেছে। একটু আলো বাতাস ঘরে খেলাতে হবে। নইলে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাচ্ছে।

হাতে তালটা বেশ জমে গিয়েছিল, এমন সময় বেশ জানান দিয়ে যিনি হাজির হলেন, তিনি একশো আট শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী। ভারতের শাসনযন্ত্র যাঁর হাতে ছেড়ে দিলে দেশ তিনদিনে সমতল হয়ে যেত। হাতে পাট করা একটি খবরের কাগজ।

'ওসব বাজে কাজ ছেড়ে আগে চিঠিটা লেখো।' কাগজটা ডানা ভাঙা পাখির মতো আমার পাশে এসে পড়ল। কাল মাঝ রাত থেকে ভদ্রমহিলার মাথায় মেয়ের বিয়ের চিন্তা ঢুকেছে। পারলে কালই পাত্র ধরে পিঁড়েতে বসিয়ে দেয়। ছেলেরা সব লাইন দিয়ে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন! মার্চ বললেই টোপর মাথায় টপাটপ চলে আসবে।

'এটা বাজে কাজ নয়। আজ সাতদিন হল, এই জানলা বন্ধ। ঘরে টেকা যাচ্ছে না। গ্যাস হয়ে গেছে।'

'ওভাবে যাদুর গায়ে হাত বোলালে জানলা জীবনে খুলবে না। আমার হাতে ছেড়ে দাও। তুমি চিঠিটা লেখো। বিজ্ঞাপনে আমি দাগ মেরে রেখেছি।'

'অত তাড়া কীসের। রোববারে তোমার জন্যে ডাকবিভাগ তো খোলা নেই।'

'তোমার মাথাটা আমার মাঝে মাঝে খুলে দেখতে ইচ্ছে করে ভগবান কী ভরে রেখেছেন। এ চিঠি পোস্টে যাবে না, ফেলা হবে পোস্টবক্সে।'

'যেখানেই ফেলো, আজ রবিবার।'

'সংবাদপত্রের রবি সোম নেই। মুখে মুখে তর্ক না করে চিঠিটা ভাল করে লেখো। ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ হয় না।'

তোয়ালে জড়ানো ডান্ডাটা হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিল। চিঠি না লিখলে নিস্তার নেই।

'এসব চিঠি কীভাবে লেখে আমার জানা নেই।'

'বুঝলে, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। অত বড় একটা আপিস চালাচ্ছ, ছেলের বাপকে একটা চিঠি লিখতে পারবে না। বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ? লেখো, মাননীয় মহাশয়, আমার দুটি মেয়ে আছে।'

'একটি ছেলের সঙ্গে তো একটি মেয়ের বিয়ে হবে। জোড়া ছেলে তো নয়। একজোড়া মেয়ের কথা লিখে কী হবে?'

'ওই বুদ্ধির ফলেই ব্যাটাছেলে হয়ে মরেছ! দুটো মেয়ে বললে ভদ্রলোকের সহানুভূতি হবে। আহা, এই বাজার, মাথায় মাথায় দুই মেয়ে। তা ছাড়া, মানুষ খুচরো বাজার ছেড়ে পাইকের বাজারে ছোটে কেন? অনেক জিনিস থেকে পছন্দ মতো যে-কোনও একটা বেছে নেওয়া সহজ হয়। দুটো মেয়ে, দু'বছরের ছোট বড়। এর সঙ্গেও হতে পারে, ওর সঙ্গেও হতে পারে। একে বলে জাল ফেলে মাছ ধরা। সহজে পালাতে পারবে না। বড় একটু স্লিম, বিলিতি বিলিতি চেহারা, ছোট একটু দোহারা, দিশি গড়নপেটন, বাঙালির ঘরে যাকে বলে লক্ষ্মীমন্ত। একে বলে আইদার অর। তুমি দু'জনের কথাই লেখো। যেভাবে চাকরির দরখাস্ত করে ঠিক সেইভাবে। নাম, বয়েস, কী পাশ, উচ্চতা, গায়ের রং, চোখমুখ, শেষে লিখবে গৃহকর্মে সুনিপুণা, নাচতে পারে, গাইতে পারে, ঢং করতে পারে। বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে লিখবে, চাইনিজ রান্নায় পারদর্শিনী।'

'তা তুমিই লেখো না কেন, আমি সই করে দিই।'

সুপ্রিয়া হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পুলিশ ইনস্পেকটর সুন্দরবাবুর মতো হুম করে একটা শব্দ ছেড়ে জানলার বন্ধ পাল্লায় ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে আস্ত দু'খানা কাচ সোজা নেমে গেল নীচের রাস্তার দিকে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। ঝনঝন করে একটা মধুর জলতরঙ্গ ভেসে এল। তারপরেই এল সমবেত চিৎকার, 'অ্যায় শালা। শুয়োরের বাচ্চা।'

এই ঘোর সংকটে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আমাকে না, তোমাকে বলেছে। গেট রেডি ফর পুলিশ কেস। ক'জনের মাথা ফালা ফালা হল কে জানে?'

সুপ্রিয়া অম্লান বদনে বললে, 'ওটা তোমারই পাওনা, একটু আগে তুমিই ওখানে কেরামতি করছিলে। এবারে ম্যাও সামলাও। যাই বাবা, ডাল চাপিয়ে এসেছি। পুড়ে যাবে।'

তোয়ালে জড়ানো থার্ড ডিগ্রির অস্ত্রটি আমার বিছানায় ফেলে দ্রুত পায়ে সরে পড়লেন। নীচে গণকণ্ঠের কোরাস, 'অ্যায় যে দাদা, এটা কী হল?'

এতকাল এদেশে বসবাস করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, শুরু হবে গণসংগীত দিয়ে শেষ হবে লাশ ফেলে। বাড়িটাকে সমতল করে দেওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব নেপথ্যে থাকলে চলবে না। দর্শন আমাকে দিতেই হবে। গণধোলাইও হয়তো খেতে হবে। এ যেন গণর যুগ। পীতুটা এই সময় পাশে থাকলে সাহস একটু বাড়ত।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি পীতু বাজারের ব্যাগ হাতে ওপরে উঠছে।

'কী রে, কী অবস্থা নীচে?'

'কী হয়েছে বলো তো? সবাই ওপর দিকে তাকিয়ে নেমে আয় শালা, নেমে আয় শালা করছে।'

'না জেনে লিঙ্গ ভুল করেছে। শালা নয় হবে শালি। যাই শুধরে দিয়ে আসি।'

'তার মানে?'

'ওদের টার্গেট হল তোমার মা।'

'আবার পানের পিক ফেলেছে?'

'না দাঁতের জন্যে পান বন্ধ। অনেক দিন কিছু ফেলতে পারছিল না। আজ বেশ বড় জিনিসই নামিয়েছে। কাউকে চিতপাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে?'

'না, সবাই খাড়াই আছে। কী ফেলেছে, শিলনোড়া?'

'শিলনোড়ার পাট তো উঠেই গেছে। গুঁড়ো মশলার খেল চলেছে। ফেলেছে জানলার কাচ।'

'তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।'

'না রে, বৃদ্ধমানুষ দেখলে হয়তো সহানুভূতি হবে। গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দেবে। তোকে যদি চড়চাপড় কষিয়ে দেয়?'

'চলো আমি তোমার সঙ্গে যাব। মারলে আমাকে মারবে।'

জমায়েত মন্দ হয়নি, কচিকাঁচা ছেলে বুড়ো, প্রায় ডজন দুয়েক। কে বলে বাঙালির একতা নেই! তীর্থে আর সর্বনাশে আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। ভোলে বাবা পার করেগা, বলে দলে দলে তারকেশ্বরে ছুটছি বাঁক কাঁধে। আবার আয় তোকে বাঁশ দিই, বলে তেড়ে যাচ্ছি সদলে। আর অন্য সময় আমি আমার, তুমি তোমার।

ধর্মগুরুরা যেমন হাতজোড় করে হাসি হাসি মুখে ভক্তদের দর্শন দেন, আমি ঠিক সেই ভঙ্গিতে ক্ষিপ্ত জনতার সামনে দাঁড়ালুম। বিশ-বাইশ বছরের এক রাগী যুবক তেরিয়া হয়ে বললে, 'হাসতে লজ্জা করছে না। একটুর জন্যে এই ভদ্রলোক বেঁচে গেলেন। মাথায় পড়লে কী হত?'

মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক টাকে হাত বুলোলেন। বোঝা গেল কাচ একটুর জন্যে ওই টার্গেটটাই মিস করেছে।

মৃদু স্বরে বললুম, 'দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, কাচ আমার ইচ্ছেয় পড়েনি, নিজের ইচ্ছেয় হঠাৎ খুলে পড়েছে।'

প্রাণের দায়ে মিথ্যেই বলতে হল।

যুবক বললে, 'শিক্ষিত বাঙালির ওই এক বুলি আছে। যতরকম অপকর্ম ওই এক সরিতে চাপা পড়ে যায়। কাচ কেন পড়ে?'

এক বৃদ্ধ বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা। বেল আর তাল পাকলে পড়ে, কাচ একটা কাঁচা জিনিস। বলা নেই কওয়া নেই খুলে পড়ে গেল। নাইনটিন এইটটির একটা কেস মনে পড়ছে। সিমিলার ইনসিডেন্ট আমেরিকায় ঘটেছিল। মাথায় কাচ পড়ে একজন ইয়াং ম্যান সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছিল। মাথাটা ভার্টিক্যালি দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।'

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'যাঃ, কী গুল মারছেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'শুনলে, শুনলে। কী অডাসিটি! অপরাধ করে রং নিচ্ছে?'

বাবা, বৃদ্ধের মুখে যুবকের বুলি! কী দিনকাল পড়ল?

বৃদ্ধ বললেন, 'ভিজে বেড়ালটির মতো এ পাড়ায় এসেছিলে, এখন একেবারে ড্রাই-ক্যাট। খুব বুকনি বেরিয়েছে? এজকে রেসপেক্ট করতে শেখোনি। ডু ইউ নো, মাই ফাদার ওয়াজ এ রায় বাহাদুর?'

পীতুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ক্রমশই উত্তেজিত হচ্ছে। হঠাৎ দুম করে কিছু বলে না বসে! তা হলে আধ ঘণ্টার ব্যাপারে এক ঘণ্টা লেগে যাবে। সব খেলারই একটা নিয়ম আছে। এই খেলার নিয়ম হল, বিপক্ষকে ফুরিয়ে যেতে দাও। যার যা বলার আছে, বলতে বলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কার আর কত ধৈর্য। ধৈর্য থাকলে বাঙালি পিরামিড তৈরি করে ফেলত। আবার এও জানি, বাঙালি সলিসিটারের জাত, মধ্যস্থতা করার জন্যে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। বাঙালি কবিই না লিখে গেছেন:

> কত রঙ্গ জানো যাদু
> কত রঙ্গ জানো,
> সর্প হয়ে দংশ তুমি,
> ওঝা হয়ে ঝাড়ো ॥

স্বাভাবিক জিনিসকে অস্বাভাবিক করে দিলে সুপ্রিয়া। নীচে নেমে এসেছে। চিরকালই মহিলার ভয়ডর একটু কম। চক্ষুলজ্জা বোধহয় ছিলই না। অনেকের ভেতরেই অনেক কিছু থাকে না। যেমন আমি পুরুষ হলেও আমার ভেতর পুরুষ নেই। গোঁফঅলা মেয়েছেলে। চড়া আলোয় সুপ্রিয়াকে মন্দ দেখাচ্ছে না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এসেছে। সায়েব পাড়ার সেলুনে গিয়ে চুল বব করে দিলে প্রাইম মিনিস্টারের মতো দেখাবে। আর আমার সেই কবি বন্ধু যেমন বলেন, লুচির মতো গায়ের রং। এই দুঃসময়েও আমার ভেতর প্রেম এসে যাচ্ছে। আসলে মেয়েদের বেশিক্ষণ ঘৃণা করা যায় না। আজ রাতে সময় পেলে আমার জার্নালে লিখে যাব :

> ঘৃণা আর প্রেম, প্রেম আর ঘৃণা
> একই টাকার এ পিঠ ও পিঠ ॥

সুপ্রিয়া এগিয়ে আসছে সম্রাজ্ঞী সাজাহানের মতো। বি বি সি-র ব্রডকাস্টার হলে এইভাবে রিলে করতুম:

তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। পরনে ফিকে নীল তাঁতের শাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পায়ে স্লিপার। পুটুস পুটুস শব্দ, যেন বাঁদরে উকুন মারছে। হাতদুটো কোমরের পেছন দিকে মোড়া। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে। ঘাড়ের কাছে লটকানো থ্যাসথ্যাসে খোঁপায় ঘোমটার

প্রথামতো অবস্থান। জনতার স্থির দৃষ্টিতে অবিচলিত এগিয়ে আসা আত্মপ্রত্যয়ী এক মহিলা। মুখে অদ্ভুত এক ধরনের অধ্যাপিকাসুলভ কাঠিন্য। জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,

'কার লেগেছে?'

সেই উদ্ধত যুবক, 'লাগেনি, লাগতে পারত।'

'তুমি কে?'

'আমি! আমি একজন পথচারী।'

'তোমার নাম সুমন। তাই না? তুমি ওই মিত্তিরবাড়ির রকে বসে আড্ডা মারো। আর মেয়েদের সিটি মারো। তুমি আবার নেতা হলে কবে?'

'বউদি?' যুবক যেন ধমকাতে চায়।

সুপ্রিয়া ঠান্ডা গলায় বললে, 'তোমার বউদি অথবা শাশুড়ি কোনওটাই হবার আমার সাধ নেই। কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে চলে যাও। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।'

নাইনটিন এইটটি বললেন, 'জানালার কাচটাচ একটু সামলে রাখা উচিত।'

'নিজের নাতনিকে সামলে রাখতে পেরেছেন?'

বৃদ্ধ কাশির ধমক সামলাতে সামলাতে বললেন, 'যাই দেখি আজ আবার আনন্দবাজার এল কি না! কী বাজার যে পড়েছে!'

ভিড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। শেষ যিনি সুপ্রিয়ার মুখোমুখি তিনি এ পাড়ার প্রবীণ শিক্ষক। তিনি নম্রগলায় বললেন, 'মা, দুর্ঘটনা একটা ঘটতে পারত। একটুর জন্যে ঘটেনি। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।'

সুপ্রিয়া বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'হঠাৎ খুলে পড়ে গেছে। আপনি জানেন তো, বাড়িঅলারা কিছুই দেখে না। তাদের সম্পর্ক শুধু ভাড়ার সঙ্গে। বাইরের দিকের জানলা। ভেতর থেকে বোঝাও যায় না।'

'একটু নজর রাখবেন। সকলেরই তো একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে।'

যাক ঝামেলা মিটে গেল। সুপ্রিয়া যাবার সময় পীতুকে বলে গেল, 'একটা ঝ্যাঁটা এনে ভাঙা কাচ সব নর্দমায় ফেলে দে। পায়ে ফুটে যেতে পারে।'

আমার সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ নেই। ফিরেও তাকাল না। আমি কি এতই ফেকলু! পুত্রের সামনে পিতার অপমান! আর কত ছোট করবি মা!

আমার জার্নালে এই গূঢ় কথাটি আমি অবশ্যই লিখব। সমগ্র পুরুষ জাতির জন্যে নিঃসংকোচে আমি লিখে যাব:

যে মুহূর্তে পুরুষ নারীর দেহভিক্ষা করে সেই মুহূর্তে নারীর চোখে পুরুষ দীন ভিখারি। পুরুষের এ চাওয়া বড় করুণ চাওয়া। একবার নয়, বারে বারে তার নতজানু হওয়া। প্রতি রাতে তার চাতকের আর্তনাদ। মৎস্য শিকারির মতো নারী তখন সুতো ছেড়ে ছেড়ে খেলতে থাকে। মনের মুখে তার ব্যঙ্গের হাসি। তুমি পুরুষ, হাতে মাথা কাটা জজসাহেব, দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অফিসার, সবাই সেলাম বাজাচ্ছে। অথচ কী করুণ তোমার আকুতি। চতুষ্পদ প্রাণীর মতো রাত্রির মধ্যযামে সে কী হাহাকার। সে কী ভীষণ পরাজয়। আমি নারী, তুমি আমার দাসানুদাস পুরুষ। সর্বত্যাগী, সংযমী পুরুষ ছাড়া নারীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার কামকীট পুরুষের নেই। যতই ফ্যাঁসফোঁস করো, তুমি এক ডিগনিফায়েড হুলো। চাঁদের আলোয় গৃহস্থের পাঁচিলে তোমার বুকফাটা আর্তনাদ। দয়া করলে শান্ত, না করলে সারারাত শুধু কান্না। হায় পুরুষ! নারীর পদানত হবার জন্যেই তোমার জন্ম, পরাজিত শিব।

'অ্যাঁ, কী বলছিস?' পীতু আমাকে কিছু বলছে।

'তুমি ওপরে উঠে যাও। আমি কাচ পরিষ্কার করে আসছি।'

'দেখিস, হাতপা যেন কেটে না যায়!'

'নাঃ, সে ভয় নেই।'

'এই সাইজের দু'পিস কাচের কী দাম হবে?'

'ধারণা নেই। তবে ভালই হবে।'

'মিস্ত্রি পাওয়া যাবে?'

'তাও যাবে। তবে আরও খরচ আছে। খানচারেক বাঁশ কিনতে হবে।'

বাঁশ! বাঁশ কী হবে?'

'বাঁশ ছাড়া কাচ লাগাবে কী করে। বাইরে থেকে ভারা বাঁধতে হবে।'

'চারখানা বাঁশের দাম কত?'

'বাঁশের আজকাল বেশ দাম। সত্তর-আশি টাকা তো হবেই।'

আমি যদি যাত্রার দলের অভিনেতা হতুম, তা হলে এখুনি দাঁত কিসকিস করে বলতুম, আমার সুপ্রিয়া, আমার প্রাণপ্রিয়া। খুব বাঁশ দিলে বাবা সাতসকালে। শ' দুয়েক টাকার ধাক্কায় ফেলে দিলে। যে কাজে হাত দেবে, সেই কাজই তালগোল পাকিয়ে যাবে। আমার দাদু বলতেন, যার কাজ তার সাজে অন্যের মাথায় লাঠি বাজে। ব্যাঙ্কের লকারে চাবির অ্যায়সা প্যাঁচ মেরে রেখে এসেছে, ফরেন থেকে এক্সপার্ট না আনালে সে লকার আর খুলবে না। গয়নাগাঁটি পড়ে রইল ম্যাজিশিয়ান হুডিনির কফিনে। স্নানের পর আয়নার দিকে পেছন ফিরে তোয়ালে দিয়ে কায়দা করে চুল ঝাড়ছে। আয়নার মাথা থেকে ফ্লোরেসেন্ট টিউব ফিটিংস সমেত খুলে চলে এল। ক্ষতি যা হবার তা হলই, মাঝখান থেকে পা কেটে, এ টি এস নিয়ে ঠ্যাং তোলা ট্রামের মতো বিছানায় পড়ে রইল সাতদিন। ট্যাক্সির দরজা ধরে এমন টান মারল হাতল উপড়ে হাতে চলে এল। তিন মাসের পীতুকে ঝিনুকে করে, তার ওপর এমন দুধ খাওয়াল, দম আটকে ছেলের চোখ উলটে গেল। ডাক্তার, বদ্যি, মড়াকান্না। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দেবী সুপ্রিয়া।

ভদ্রমহিলার গন্ডারের গোঁ। সেই জানলাপর্ব এখনও চলেছে। এইবার পাল্লাদুটোই না খুলে পড়ে যায়। রান্নাঘর থেকে খুন্তি এসেছে। চাড় মেরে চাগাবার চেষ্টা হচ্ছে।

'শোনো এবার তুমি ছেড়ে দাও। আষাঢ়ের জানলা ভাদ্রের রোদ পেলে খুস করে খুলে যাবে।'

'ভাদ্র? আজই খুলবে। এখনই খুলবে।'

'কেন অমন করছ? ভেঙে যাবে। এখুনি তো জেলে যাবার ব্যবস্থা করেছিলে!'

'তোমার একবার জেলে যাওয়াই উচিত। তা না হলে জেলের ভয় তোমার কাটবে না! কথায় কথায় জেলে যেতে হবে, জেলে যেতে হবে। যেতে হয় যাবে। আমার ওই মেয়েলিপনা ভাল লাগে না। সবেতেই তোমার যেতে হবে, যেতে হবে। বাথরুমে যেতে হবে, বাজারে যেতে হবে, অফিসে যেতে হবে। সারাজীবন শুধু নাকে কান্না!'

জানলার একটা পাল্লা কুকুর দেখা বেড়ালের মতো ধনুক হয়ে উঠছে। তলার দিকে পাল্লায় পাল্লায় জুড়ে আছে।

'তোমার পায়ে পড়ছি, দয়া করে ছেড়ে দাও। সট করে ভেঙে গেলে, এই ঘোর বর্ষায় ডাহা ভিজে কাটাতে হবে। ভীষণ ছাট আসে।'

'একটা কায়দা করতে পারলে এখুনি খুলে যায়।'

'কী কায়দা!'

'বাইরে থেকে একটা দড়ি বেঁধে, সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে যদি টানা যায় তা হলে নিমেষে খুলে যাবে। তুমি পীতুর চাকরির কী করলে?'

একেই বলে অশ্ব-মনোরথ। জানলা থেকে চলে গেল পীতুর চাকরিতে। 'হঠাৎ সব ছেড়ে পীতুর চাকরি?'

'পীতুর বিয়ে দিতে হবে।'

'বাবা, তুমি যে দেখছি গ্যালপিং টিবির মতো এগিয়ে চলেছ। চাকরি থেকে বিয়ে! দু'দুটো মেয়ে মাথায় মাথায়!'

'মেয়ে দুটোকে কোনওরকমে পার করেই ছেলের ব্যবস্থা। সামনের বাড়িতে এক ধিঙ্গি এসেছেন। সে খবর রাখো।'

'সে বয়েস পেরিয়ে এসেছি। তোমার চোখে তো সবাই ধিঙ্গি। তোমার এই গ্রাম্য ভাষা যদি ঈশ্বর একটু সংযত করে দিতেন! একটু আগে রাস্তায় গিয়ে যা করে এলে! সাতদিন আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ধিঙ্গি ধিঙ্গি করছ, আর তোমাকে সবাই যখন দজ্জাল বলবে!'

'আমার কাঁচকলা হবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষ হলে বউদের দজ্জাল হতেই হবে। নইলে বাঁচা যাবে না। সবাই ঘাড়ে উঠে নাচবে। মুখ দেখাতে না পারো, ঘোমটা টেনে বসে থাকো। বাপ ব্যাটা গলা জড়াজড়ি করে।'

জানলা মট করে উঠল। আজ জানলার বারোটা বাজবেই। কারুর ক্ষমতা নেই সুপ্রিয়াকে নিরস্ত করে। কাঠঠোকরা আর সুপ্রিয়া একই ধাতুতে তৈরি।

'জানলাটা বন্ধই থাক, বুঝলে। সামনের বাড়ির ধিঙ্গিকে তা হলে চোখে পড়বে না। আমাদের এই বয়েসটা তো খুবই বিপজ্জনক।'

'সে আমি জানি। জানলা বন্ধই থাকবে। তবে খুলে বন্ধ করব। খুলবে না কেন? কী এমন এঁটেছে! জানলা যখন খুলতেই হবে। আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে তোমার অফিসে পীতুর একটা চাকরি করে দাও। প্রথমে না হয় কম মাইনেই হল। ধীরে ধীরে বাড়বে।'

'হ্যাঁ, আমার বাপের অফিস তো!'

'দেখো, ওসব বাহানা আমার কাছে নয়। তারাপদবাবু তার তিন ছেলেকে নিজের অফিসে ঢুকিয়েছে। চার নম্বরের জন্যে চেষ্টা চলেছে। ওই থপথপেটা যা পারে, তুমি তা পারো না? তোমার ওই মেনিমুখো মিনমিনে স্বভাবের জন্যে। মাঝে মাঝে ভাবি ভগবান আমাকে যদি মেয়ে না করে ছেলে করতেন?'

'উপায় আছে। গয়না বেচে বিলেত গিয়ে সেক্স চেঞ্জ করে এসো। সুপ্রিয়া থেকে গ্যাংস্টার সুপ্রিয়। হাবিলদারের চাকরি নিয়ে কলকাতা দাপিয়ে বেড়াও।'

'জেনে রাখো, মেয়েরাই এবার দাপিয়ে বেড়াবে। দিল্লিতে ইন্দিরা, ইংল্যান্ডে থ্যাচার।'

'আর পশ্চিমবাংলায় সুপ্রিয়া।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উপায় থাকলে তাই হত। নির্বাচনে দাঁড়ালে এম. এল. এ আমি হতে পারতুম। তারপর মন্ত্রী। মেয়েরা হাল না ধরলে এই বেহাল দেশের আরও বারোটা বাজবে। তোমাদের মতো চোরেদের শায়েস্তা না করলে কোটি কোটি টাকা সব কোটের পকেটেই ঢুকবে।'

ভড়াম করে জানলার পাল্লা দুটো খুলে গেল। নীল আকাশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মায়ের হাতের ছোঁয়ার মতো ফিকে বাতাস ঢুকছে। ঘরের পরিসর কত বেড়ে গেল!

সুপ্রিয়া বীরের মতো তাকাল, 'কী বুঝলে? একে বলে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এইবার সারাদিন বসে বসে জানলার পাল্লার তলার দিকে শিরীষ কাগজ ঘষো। আধ ইঞ্চির মতো খইয়ে দাও। কী হল চিঠি লিখলে না?'

'দুপুরে ধীরেসুস্থে লিখে দোব।'

'দুপুর? তোমার আবার দুপুর কী। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুম। এখুনি লিখে ফেলো।'

'আকাশের অবস্থা দেখেছ? কাচদুটো না লাগালে ভিজে মরতে হবে। মাসের শেষ। তোমার কাছে শ'দুয়েক টাকা হবে?'

'টাকা? আমি কোথায় টাকা পাব?'

'কেন? এই তো সেদিন খবরের কাগজের পাহাড় বিক্রি করলে।'

'সে টাকা আমি ইনভেস্ট করে ফেলেছি।'

'কাচের কী হবে?'

'আপাতত তাপ্পি মেরে চালাও। মাস পয়লায় কাচ হবে।'

'খবরের কাগজের অংশ কিন্তু আমারও পাওয়া উচিত।'

'সে আমি মরলে। তাড়াতাড়ি মারার ব্যবস্থা করে ফেলো। প্রায় তো মেরেই এনেছ। আর একটু ধৈর্য ধরো।' সুপ্রিয়া উঠে চলে গেল। মরার কথা শুনলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়। নিজে মরতে পারি হাসতে হাসতে। আমাকে কেউ ছেড়ে চলে যাবে, সহ্য হয় না। শুরু করেছি একসঙ্গে, যাব একসঙ্গে। তা অবশ্য হবার নয়। কারু কারু জীবনে হতে পারে, যেমন বিখ্যাত লেখক আর্থার কোয়েসলার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আত্মহত্যা করলেন। সুইসাইড প্যাক্ট। আমি যদি সুপ্রিয়াকে বলি, চলো দু'জনেই গুড বাই করি। ভদ্রমহিলার মুখের চেহারা কেমন হবে! জানি কেমন হবে!

আমার সহকর্মী বিনয় হঠাৎ মারা গেল স্ট্রোকে। সবে বেচারা বিয়ে করেছিল। বিনয়ের বউ আমাদের অফিসে চাকরি পেয়েছে। বিধবা বলে মনে হয়! কোনও দুঃখ আছে? হাসছে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে পান খাচ্ছে। আবার দিঘাতেও বেড়াতে যাচ্ছে। বিনয় দেখছে। সবই দেখতে পাচ্ছে ওপর থেকে। আবার জন্মাবে। জন্মেই সব ভুলে যাবে। বড় হয়ে ল্যাং ল্যাং করে ছাদনাতলার দিকে দৌড়োবে।

আমার জার্নালে আমি লিখব: জন্ম মানেই বিস্মরণ। যা ছিল সব মুছে গেল। ভুল করার জন্যেই জন্মানো। বাঁচতে বাঁচতে যে ব্যবহারিক জ্ঞান হল, পুনর্জন্মে সব শেষ। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে আবার অজ্ঞান। নাটের গুরুটি কে? মানুষের জীবন নিয়ে অনন্তকালের এই রসিকতা। আমরা ইউনিয়ান করে ঝান্ডার ডান্ডা দিয়ে সেই রসিক ঈশ্বরকে পেটাব। তাঁর দর্শন যে মেলে না। ক্রাইম কাহিনির ভিলেনের মতো। অদৃশ্য। অন্তরালে বসে কলকাঠি নাড়েন। সামনে আসার সাহস নেই। থাকবে কী করে! এত অন্যায়, এত অবিচার, মানুষের সামনে এলে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। ঈশ্বরের পুত্র যাঁরা তাঁরাও কি আশ্রয় পেয়েছেন? যীশুকে ক্রুশ। শ্রীচৈতন্যকে হত্যা। গোস্বামীজিকে বিষ, ঠাকুরকে ক্যান্সার। মানুষের বিশ্বাস তবু টলে না। এই বলেই সান্ত্বনা, যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ।

'চলো হে পীতু, সন্ধানে যাই। কাচ, বাঁশ, মিস্ত্রি। ছুটিটা ভালই কাটবে।'

'তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যা করার আমিই করছি।'

'তুই পারবি?'

'না পারার কিছু নেই। দাও, টাকা দাও।'

'হ্যাঁরে, ইনস্টলমেন্টে তো আজকাল সবই হচ্ছে। মেয়ের বিয়েও হচ্ছে। ইনস্টলমেন্টে বাঁশ হয় না? বাঁশের জন্যে আবার ষাট-সত্তর খরচ?'

'তুমি কাচের দামটা আগে দাও।'

'তোর কী মনে হয়? আমার এই হাতঘড়িটার বেশি প্রয়োজন, না জানলার কাচদুটোর!'

'হাতঘড়ি এখন ইউসলেস অর্নামেন্ট। হাতে না থাকলেও সময় বুঝতে অসুবিধে হয় না। সময়ের তালে তালে চলে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা ঘড়ি।'

'আচ্ছা, এটা বেচলে কত দাম পাওয়া যাবে?'

'এক পয়সাও না। তোমার ওই দমদেওয়া ঘড়ি এ যুগে অচল।'

'বলিস কী, আমি অচল আমার ঘড়ি অচল? এবার তা হলে তোমাদের সভা ছেড়ে বিদায় নিলেই হয়!'

দলাপাকানো কাগজের মতো কী একটা বিছানায় পড়ল। নোট। এমনও হয়! আমার দুঃখ দেখে

ঈশ্বর আকাশ থেকে নোট বৃষ্টি করছেন! ঠিক বৃষ্টি নয়, বজ্রপাত। একবারই পড়ল। বিদ্যুতের পর বজ্রপাত হয়। এ দেখি উলটো হল। বিদ্যুতের চমক বারান্দার দিকের জানলায়, 'ওই নাও, সেই কাগজ বেচা দুশো টাকা।'

ঈশ্বর নন, ঈশ্বরী। শ্রীমতী সুপ্রিয়া।

'বাপ ব্যাটায় গলাগলি করে বেলা তিনটে অবদি আর শলাপরামর্শে দরকার নেই। আমি ভেঙেচি; তোমার কাচ সারিয়ে নাও।'

'বাড়িটা কবে ভাগাভাগি হয়ে গেল সুপ্রিয়া? তোমার কাচ বলছ?'

'যবে থেকে পুরনো খবরের কাগজ তোমার হল। যবে থেকে তুমি তোমাদের বলতে শুরু করেছ। তোমাদের ব্যাপারে আমি নেই, তোমাদের সাবান, তোমাদের তেল, তোমাদের ফুর্তি, তোমাদের খরচ, তোমাদের উৎপাত, তোমাদের চিৎকার, তোমাদের কথা, তোমাদের যুক্তি। এই সংসারে আমার তোমার, এ তোমারই আমদানি। তুমি যত দূরে সরবে, আমরা একই জায়গায় থেকেও তত দূরে সরে যাব। অবাক হবার কিছু নেই। এইটাই তোমার চিরকালের স্বভাব। তোমার বাবারও এই স্বভাব ছিল। তোমার মায়ের আরও বেশি ছিল। তোমাদের বংশটাই অহংকারীর বংশ।'

নিয়তির মুখের মতো সুপ্রিয়ার মুখ জানলার কাছ থেকে সরে গেল। নিঃশব্দে। যাত্রা হলে হা হা হাসি শোনা যেত। এদের চোখে আমি কি তা হলে ধরা পড়ে যাচ্ছি। আমার জীবনটা কি তা হলে জীবন নয়, অভিনয়। এরা আমার কেউ নয়! আমি বৈদান্তিক সে আমার চোখে। এদের চোখে? আমি নিষ্ঠুর। স্বার্থপর। আত্মকেন্দ্রিক। কোন আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখা যায়?

পীতুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালুম। পাগল হলে প্রশ্ন করতুম, 'তুমি আমায় চেনো? আমাকে তুমি চিনতে পারছ? আমি সাধু না শয়তান?

আমার মাকে যখন মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে যেতুম তখন কত সুন্দর সুন্দব পাগল দেখতুম। বেশ মজা লাগত। কমবয়সি একটি মেয়ে প্রায়ই আসত। এসে বলত, দেখুন তো বেরিয়েছে? একটু একটু বেরিয়েছে?

ডাক্তারবাবু মেয়েটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, গম্ভীর মুখে বলতেন, বেরিয়েছে, তবে আরও বড় হওয়া দরকার। মেয়েটি খুশি মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চলে যেত।

প্রথম প্রথম ভাবতুম, কী বেরোতে পারে। ব্রণ, হাম, পক্স, অ্যালার্জি। তাতে তো খুশি হবার কিছু নেই। তা হলে?

মেয়েটির মা একদিন বললেন, ওর সন্দেহ পাখির মতো দু'পাশে দুটো ডানা বেরোচ্ছে। ওইটাই ওর পাগলামি। সুন্দর রেজাল্ট করে বি. এ পড়ছিল। দেখতে শুনতেও চমৎকার। বেড়াতে গিয়েছিল রাজগীরে। ফিরে এল পাগল হয়ে। এমনি বোঝার উপায় নেই। থেকে থেকে কেবল বলবে, দেখো তো মা আমার ডানা বেরোচ্ছে কি না? প্রথমে ভাবতুম ইয়ারকি। তারপরে দেখলুম, না মাথার গোলমাল।

বলতে বলতে মহিলার চোখে জল এসে গেল। বলা যায় না, আমিও হয়তো একদিন পাগল হয়ে যেতে পারি। অনেক সময় কিছু একটা খাইয়ে পাগল করে দেয়। আমার এক জমিদার বন্ধুর বাবাকে তার মামা ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল। জীবনের শেষ বিশ বছর ভদ্রলোক পাগলাগারদে ছিলেন। অর্ধোলঙ্গ বৃদ্ধ মেঝেতে বসে সারাদিন অদৃশ্য পাশার চাল চালতেন, কচে এক, কচে দুই। একদিন দু'জনে দেখতে গিয়েছিলুম। বাইরে বেরিয়ে এসে দু'জনেই কেঁদে ফেলেছিলুম। মৃত্যু নয়, তবু মৃত। মানুষ থেকে মানুষ হারিয়ে গেল।

'পীতু, তুই যখন লিখিস, তখন লেখ না। বিষয়টা তোকে বলছি, থিম আর কী, মানুষ থেকে মানুষ হারিয়ে গেল। যেমন ধর, আমি আছি কিন্তু আমি নেই।'

পীতু হাসল, 'তোমার সব জটিল ব্যাপার। আমার মাথায় ঢোকে না। মাঝে মাঝে আমার কী মনে

হয় জানো, আমরা কেউই নেই। তোমার কাছে আমি নেই, আমার কাছে তুমি নেই, তোমার কাছে মা নেই, মায়ের কাছে তুমি নেই। কেউ কারু কাছে নেই। এমনকী আমি আমার কাছে নেই।'

'হুঁ। আপাতত বল এই দুশোটা টাকা আমি কী করব? খরচ না ফেরত?

'আপাতত ধার নাও পরে মাইনে পেলে শোধ করে দেবে।'

'ভালই বলেছিস, তা হলে একশো ধর। এতে তোর কাচ, মজুরি হয়ে যাবে।'

'বাঁচতেও পারে।'

পীতু চলে গেল। সামনের বারান্দায় এই প্রথম চোখ পড়ল, সেই মেয়েটি। সুপ্রিয়া যাকে ধিঙ্গি বলছিল। বেশ দেখতে। বেশ চোখা চেহারা। বুক কেঁপে উঠল,

এ কী বৃদ্ধ? বৃদ্ধ পিনাকীরঞ্জন, তিন সন্তানের পিতা তুমি। এখনও তোমার নিবৃত্তি হল না। তুমি কী দেখছ? বৃদ্ধের শরীর, পীতাম্বরের চোখ! পীতাম্বর হয়তো এই দৃষ্টিতে দেখবে না, যে দৃষ্টিতে আমি দেখছি। মন তোর মৃত্যু হয় না কেন? ফেরা, চোখ ফেরা। পেটের অগ্নিমান্দ্য হয়, মনের কেন হয় না!

উঠে জানলা ভেজাতে গেলুম। মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েই নীচে রাস্তার দিকে চোখ নামাল। কিছু নেই তো চোখে। ভাবহীন। বৃদ্ধের দিকে যে-কোনও মেয়েই ওই চোখে তাকাবে। ছায়াছবির হিরো হলে অন্য কথা। হিরোর বয়েস বাড়ে না। অর্বুদপতি অনাসিস হলে জ্যাকলিন কেনেডি ছুটে আসত। কাঁদোকাঁদো গলায় বললুম, আমি তোমার পিতা, আমি তোমার পিতা। কণ্ঠস্বর বড় ফাঁকা। তেমন তেজ নেই। মেয়েরা নোলায় ছ্যাঁকা দেবার ভয় দেখায়। মনের নোলায় ছ্যাঁকা দেওয়া যায় না।

ঈশ্বর! তুমি আমাকে হিজড়ে করলে না কেন? আমি যে অক্ষয়বাবুর পিতারও অধম। যৌবনে আমার প্রেম ছিল। আসক্তি ছিল এক নারীতে। বার্ধক্যে প্রেম উবে গেল পড়ে রইল কাম। ভেতর দিকে তাকালে সঞ্চয়ের ধন তো কিছুই খুঁজে পাই না। এ যে এক পয়ঃপ্রণালী, লোভ হিংসা, ক্রোধ, কাম, আলস্য, ভয়, আরামপ্রিয়তা ভ্যাটভ্যাট করছে। কেন এমন হল? কেন এমন হয়?

আজকাল আর দৈববাণী শোনা যায় না। তবু যেন শুনতে পেলুম, মনের ওপর যে মন বসে আছে, সেই মন বলছে, যাদের নিয়ে আছ, তাদের শত্রু ভাবছ বলেই তোমার এই দুর্গতি। সরে না এসে কাছে যাও। বিরাটকে ধরার চেষ্টা না করে, ক্ষুদ্রকেই ধরো। একটা কিছুর সঙ্গে নিজেকে বাঁধো। দুঃখের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে, মায়ার সঙ্গে, প্রাত্যহিকতার সঙ্গে। যে-কোনও একটা কিছু দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো। বর্জন নয়, গ্রহণ, এই হল পথ। শূন্যতাই পাপ। তুমি যেমন যন্ত্র, সেইরকম সুরই বাজবে। ভেঁপুতে বাঁশি বাজবে না, সেতারে জলতরঙ্গ। মা ভৈঃ।

মনোযোগ

মাননীয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। শহরের দু'প্রান্তে দু'জনের অবস্থান। আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রুও নই। একটি বিষয় আপনার অবগতির জন্যে নিবেদন করা প্রয়োজন। বর্তমানে আমরা প্রেমের দশকে বসবাস করছি। ঈশ্বর প্রেম, অথবা জীবে প্রেম নয়। যুবক যুবতীর উদ্যান প্রেম। পেশায় আমি এক হোমিওপ্যাথ। যৎসামান্য রোজগারে, কায় ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে থাকি। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। আমার স্ত্রী বাতে প্রায় পঙ্গু। আমার চোখে গ্লুকোমা। অন্ধ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আমার দুটি ছেলেই এখনও বেকার। এই ভূমিকার পর যা নিবেদন করতে

চাই, তা আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে। আমার মধ্যম পুত্র ও আপনার মধ্যম কন্যা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ ছাড়াও গোপনে রেজেস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে থাকলেও আশ্চর্য হব না। এ সবই মনে হয় আপনার অগোচরে হয়ে চলেছে। তা না হলে আপনি আপনার কন্যাকে সংযত শাসনে রাখতেন। এ যুগে বয়োপ্রাপ্ত পুত্র কন্যাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলে না। তবে সস্নেহ উপদেশের পথ হয়তো খোলা আছে। আমার পুত্র সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। উচ্ছন্নে না গেলেও নিষ্কর্মা। আমার মতে স্বাবলম্বী না হলে বিবাহে মানুষের দুঃখ আর দারিদ্র্যই বাড়ে। কিন্তু নারী পুরুষের প্রাথমিক আকর্ষণের উন্মাদনা উভয়কেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। আমার ধারণা আপনার কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রেই পাত্রস্থ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। সব পিতাই দুহিতাকে সৎপাত্রস্থ দেখে শান্তিতে যেতে চান। আপনি আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। আপনার পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনাই আমার এই পত্রের প্রেরণা। ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাচ, আমার পুত্র আপনার সুলক্ষণা কন্যার ম্যাচ হতে পারে না। সে আমারও কন্যাস্থানীয়া। আমিও তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অতএব মহাশয় উত্তেজিত না হয়ে আপনার কন্যার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার চেষ্টায় তৎপর হন। আমার মনে হয় যৌবনের প্রেমের চেয়ে পিতামাতার স্নেহ শক্তিশালী। নমস্কার নেবেন।

ভবদীয়, ভবেন পাকড়াশী।

চিঠি পড়ে প্রথমেই ভেতরটা জ্বলে উঠল। নাটকের সংলাপের মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, এর নাম সংসার! স্নেহ! আমার মেয়েদের আমি স্নেহ করিনি। ছেলেবেলা থেকে বুকে বুকে আগলে রাখিনি। তবে? তবে এমন কেন হল? এ চিঠি সুপ্রিয়াকে দেখানো যাবে না। দেখালেই তাণ্ডব নৃত্য। কার কাছে যাই। কে আমাকে পরামর্শ দেবে!

ঝুনু এখন কোথায়? 'পীতু, ঝুনু কোথায়?'

'কেন, ডাকব?'

'হ্যাঁ, চুপিচুপি একবার ডেকে দাও।'

এ আমার অগ্নিপরীক্ষা। কীভাবে বলব? এ তো আমার নিজের জীবনের বাইরের ব্যাপার। ঝুনুর মুখের দিকে তাকাব কী করে!

'তুমি আমাকে ডেকেছ?'

ঝুনু আমার সামনে। দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেছে! ঝুনু এখন মহিলা।

'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমার সামনে বোস। তোকে দু'-একটা কথা বলব।'

ঝুনু যেন একটু অবাক হয়েছে। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সুপ্রিয়া ঠিকই বলে, বিয়ের বয়েস হয়েছে। তা হলেও, মানুষ তো পশু নয়। সংযমের বাঁধন খুলে মন যেখানে সেখানে গলে পড়বে! ইচ্ছের ওপর মন, মনের ওপর সংস্কার।

ঝুনু ধীরে ধীরে আমার সামনের চেয়ারে বসল। সুপ্রিয়া সুন্দরী ছিল। ঝুনু যেন আরও সুন্দর। ঠিক পানপাতার মতো মুখ। ছোট্ট চিবুক। ছোট্ট কপাল। টেপা নাক। কুচকুচে কালো চুল। এ তো রানি হবার চেহারা! মানুষ থেকে কেমন মানুষের ধারা বেরিয়ে আসে। সুন্দরের ধারা, অসুন্দরের ধারা।

মৃদু কোমল সুরে ঝুনু বললে, 'বলো কী বলবে?'

হঠাৎ কী হল আমার! মনে কী সুর বেজে উঠল! মানুষের নিয়ন্ত্রণে কিছু কি আছে মূর্খ! জীবন, জগৎ, জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, শান্তি, খরা, জরা। যা হবার তা হয়েই আছে। শুধু চলে যাও। দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে চলে যাওয়া।

ঝুনুর দিকে তাকিয়ে হাসলুম। অনেক অনেক দিন পরে।

'আমার কিছু বলার নেই মা। অনেক দিন তোকে দেখিনি, তাই একবার দেখার ইচ্ছে হল। এই দেখলুম, আর মন ভরে গেল। অনেকদিন তোর হাতে চা খাইনি মা, এক কাপ চা খাওয়াবি?'

'কেন খাওয়াব না। এখুনি করে আনছি।'

ঝুনু ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। বড় মায়া। হয় এরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, না হয় আমি এদের ছেড়ে চলে যাব। আমার কিছু করার নেই। আমার সেই জমিদার বন্ধুর বাগানে দেখেছিলুম, লনের একপাশে মেরিমাতার বিশাল মূর্তি। শুভ্র শ্বেতপাথরে তৈরি। কোলে শিশু যীশু। সময় চলেছে। দিন আসে দিন যায়। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়। শুভ্র শ্বেত পাথরের মূর্তি সময়ের সাক্ষী। মুখে অমলিন হাসি। পাথরের রং ক্রমশ আরও সাদা হবে। জানি না, এতদিনে হয়তো আগাছায় ঢাকা পড়ে গেছে। আর সেই অ্যাসাইলামের সেলে বৃদ্ধ উন্মাদ অদৃশ্য পাশা খেলতে খেলতে মারা গেলেন। এর নাম জীবন। যে জীবনে বারে বারে আমাদের ফিরে আসতে হবে!

অনেক দিন পরে আজ আমি লিখব। যে লেখা কেউ পড়বে না, কোনও দিন ছাপা হবে না কোথাও। কোটি কোটি মানুষের মিছিলে আমি এক মানুষ। এসেছি, চলে গেছি। অনন্ত সময়ে একপলকের বাঁচা। না শুরু করা যাক:

নারদ বসে আছেন ব্রহ্মার পাশে। দু'জনের খুব খোসগল্প চলেছে। হঠাৎ দুম্ করে একটা শব্দ হল। নারদ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, কীসের শব্দ!

ব্রহ্মা হেসে বললেন, পৃথিবীতে রাবণ জন্মাল।

আবার দু'জনের গল্প শুরু হল। দুম করে আবার শব্দ।

নারদ বললেন, প্রভু, এবার কী হল?

ব্রহ্মা হাসতে হাসতে বললেন, এবার রাবণ বধ হল।

মহাকালে এই হল জীবনের পরিধি। পলকেই সব ফুরায়। কী হবে ভেবে!

আমার এই লেখা, আমার পুত্র, আমার একমাত্র বন্ধু পীতুর জন্যে। আমার প্রপিতামহ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। বলা যায় না কোনও এক পুরুষে সেই মন ফিরে আসতে পারে। হয়তো পীতুই সেই পুরুষ। পৃথিবীতে কোনও কিছুই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। শুধুই শয়তান, শুধুই দেবতা, কোনও কালেই হয়নি। দার্শনিক আবার বৈজ্ঞানিক এডিংটন জগৎকে বলেছেন ঢেউয়ের রাজ্য। উঁচুও আছে নিচুও আছে। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মের জন্ম, স্থূল থেকে স্থূলের উদ্ভব। আমি সূক্ষ্ম না হতে পারি, কিন্তু স্থূল নই। সময় সময় পীতুর মুখ দেখে তার মন পড়েছি। একটা ইচ্ছে থেকেই তো সব মানুষের জন্ম। সেই মানুষই তো অবতার। যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ। আসার পথও এক, যাবার পথও এক, চলার পথই ভিন্ন।

শোনো পীতু, স্বামী সত্যানন্দ বেদছন্দায় তোমার জন্যে কী লিখেছেন: 'সৃষ্টিই দহন, এই দহনে আমরাও ইন্ধন যোগাচ্ছি। যোগাতেই হবে। এই দহন লীলায় আনন্দে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে হবে। জ্বলে যেতে হবে নিঃশব্দে-নিঃশেষে। বিরাটের বিশ্ব-ব্যাপী আরাত্রিকে ধূপের মতো। তাই জ্বলতেই যখন হবে তখন এ খেলায় স্বেচ্ছায় আনন্দ করে যোগ দেওয়াই ভাল। স্বেচ্ছায় যোগ দিলে দুঃখই হবে আনন্দ।' তোমার জন্যে দু'চরণ সংস্কৃত লিখে রেখে যাই। এই শ্লোকটি তুমি মহাভারতে পাবে:

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ ॥

পুত্র, নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে মানুষের বুদ্ধি নিকৃষ্ট হয়। মধ্যম লোকের সংসর্গে মধ্যম হয় আর উত্তম ব্যক্তির সংসর্গে উত্তম হয়।

উত্তম চরিত্র যদি তুমি খুঁজে না-ও পাও, উত্তম গ্রন্থ তুমি পাবে। তুমি উত্তম হও। তুমি চরিত্রবান হও।

'বাবা, তোমার চা।'

'রাখ মা।'

'কীসের ওপর রাখব, একটা কিছু দাও। টেবিলে দাগ পড়ে যাবে।'

'এই নে, এইটার ওপর রাখ।'

সেই ভবেন পাকড়াশীর চিঠিটা এগিয়ে দিলুম। কে জানে ভদ্রলোক আমাদের কেউ হন কি না। সত্যই কি ইনি ঝুনুর শ্বশুরমশাই!

'চিঠিটা তোমার লাগবে না?'

'না রে।'

'তুমি আজকাল কী লেখো বলো তো?'

'আত্মজীবনী মা। আলেকজেন্ডারের বিজয় অভিযান নয়, পুরুর জীবন কাহিনি। পরাজিত কিন্তু সম্মান চায়।'

'বাবা।'

'বল।'

'তখন তুমি যা বলতে চেয়েছিলে আমি বুঝতে পেরেছি।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। যে কথা আমি তোমাকে মুখে বলার সাহস রাখি না, সে কথা আমি এই স্লিপে লিখে এনেছি। এই নাও। আমি চলে গেলে পড়বে।'

চিরকুট আমার হাতের মুঠোয়। ঝুনু চলে যাচ্ছে। ভবেন পাকড়াশীর চিঠির ওপর চায়ের কাপ ধোঁয়া ছাড়ছে। কে ভবেন পাকড়াশী! চিরকুট খুলে দেখার সাহস হচ্ছে না। আবার পরাজয়! কতবার আমি পরাজিত হব। হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে জীবন-জুয়ার ফলাফল। সেই বৃদ্ধ উন্মাদ অদৃশ্য পাশা খেলছেন, কচে এক, কচে দুই, কিস্তি মাৎ।

চিরকুট মেলে ধরলুম। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষর, 'বিশ্বাস রেখো, বিশ্বাস হারিয়ো না।'

সঙ্গে সঙ্গে চায়ে চুমুক। জিভ পুড়ে গেল। ঈশ্বর তুমি দুঃখ দিয়ে সুখের পাল্লা সোজা রাখো। আমার এই জার্নালে লিখে রাখি এই মুহূর্তের অনুভূতি:

সুখও এক প্রকার দুঃখ

ঝুনু আমাকে মিথ্যে বলবে না। যতই হোক আমি তার পিতা। আজকাল মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে ফ্রিলি মেশে। তার মানেই বিয়ে করা নয়। প্রাচীন মানুষদের রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। যেমন সুপ্রিয়ার হয়। মানুষের যদি ঠিক ঠিক দেখার ক্ষমতা থাকত, সংসারের অনেক ঝামেলা কমে যেত। তিলকে তাল করাই আমাদের স্বভাব। রুনু আবার কোথাও কিছু করে বসেনি তো! মেয়ের বাপ হওয়া এক ঝকমারি ব্যাপার।

রুনুর কথা ভাবতে না ভাবতেই রুনুর প্রবেশ। ছিপছিপে বলেই ঝুনুর চেয়ে লম্বা দেখায়। নাচ শেখালে বেশ হত! নাচ গানে সুপ্রিয়ার ঘোরতর আপত্তি। ওই পথেই নাকি মেয়েরা বিপথে চলে যায়। সুপ্রিয়া যদি মানুষ হত! আর্টের লাইনটাই বেলাইন। ওসব মধ্যবিত্তের ঘরে ঢোকাতে নেই। কবে কে গানের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল! এর নাম মেয়েলি লজিক।

'বাবা, মায়ের জন্যে তো ডাক্তারবাবুকে কল দিতে হয়।'

'কেন কী হয়েছে?'

'বেশ জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভুল বকছে।'

'সে কী রে! কবে জ্বর হল?'

'সকালে একটু একটু ছিল, এখন তো সাংঘাতিক।'

'তোরা বলিসনি কেন?'

'মা বারণ করে।'

পাশের ঘরের খাটে সুপ্রিয়া পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমার ঘরে ঢোকাটা যদি মুভি ক্যামেরায় তুলে রাখা হত তা হলে মনে হত চোর মাঝরাতে চুরি করতে ঢুকছে। নিষিদ্ধ প্রেমিকও এইভাবে

ঢুকতে পারে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকা সুপ্রিয়া সময়কে তিরিশ বছর পেছনে ঠেলে দিল। উনিশশো চুয়ান্নর কলকাতা। বকুলতলার বাড়ি। উত্তরের বারান্দায় পশ্চিমমুখো ঘর। সবে আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পাওনা শাড়ি তখনো শেষ হয়নি। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে সুপ্রিয়া শুয়ে আছে পাশ ফিরে, ঠিক এই ভঙ্গিতে। গ্রীষ্ম শেষ। বর্ষা আসছে আকাশ ছেয়ে সমুদ্রের দিক থেকে। ভিজে ভিজে দমকা বাতাসে ক্যালেন্ডারের পাতা, খাঁচার পাখির মতো ঝটপটিয়ে উঠছে। বিয়ের পর সুপ্রিয়ার প্রথম জ্বর। শ্বশুরবাড়িতে আসার আড়ষ্টতা তখনও কাটেনি। সিভিয়ার ইনফ্লুয়েঞ্জা। সারা শরীর কুকুরে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে। ভাল করে চোখ খুলতে পারছে না। নিশ্বাসে গরম হলকা। কুণ্ঠিত গলায় মৃদুস্বরে বলছে, তুমি বেশ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলতে পারবে?

আমার জার্নালে আমি এই কথাটি লিখব,

যা ঘটে যায়, তা ঘটে যায়। জীবনের টেপরেকর্ডারে মুহূর্তের টেপকে গুটিয়ে পছন্দ মতো জায়গায় আর আনা যায় না। যা গেল তা চিরকালের জন্যে গেল। সব কিছুই একবার।

ধীরে ধীরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় ডাকলুম, 'সুপ্রিয়া।'

কোনও উত্তর নেই। ভাবছি গায়ে একটা আঙুল ছোঁয়াব কি না। কত দূরে সরে গেছি। আমি সরেছি, না আমাকে তোমরা সরিয়েছ!

'সুপ্রিয়া?'

অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হল সুপ্রিয়ার গলায়। গুহার ভেতর থেকে কোনও আস্ত প্রাণী যেন জানাতে চাইল, আমি আছি। এখনও আছি, তবে অবরুদ্ধ।

বয়সে খসখসে আমার রুক্ষ হাত সুপ্রিয়ার উত্তপ্ত কপালে। চোখ মেলে তাকাল। দু'কোণে জল চিকচিক করছে।

'খুব কষ্ট?'

একটু হাসার চেষ্টা করল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে। কালই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী কষ্ট হচ্ছে বলো। আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি।'

ফিসফিস করে বললে, 'কোনও দরকার নেই। শেষ মাস।'

মুখে এক ধরনের শব্দ করল। গলা শুকিয়ে গেলে জিভে যে ধরনের শব্দ হয়।

'জল খাবে?'

'আমি উঠে নিচ্ছি।'

'সে কী এই জ্বরে তুমি উঠবে কী? আমি দিতে পারি। রুনু আছে, ঝুনু আছে।'

সুপ্রিয়া হাসল। করুণ হাসি। এ হাসির অর্থ আমি জানি। সংসার তোমাকেও ফেলে দিয়েছে। একটা সময়ে আমরা সবাই আবর্জনা। রিটায়ার করার পর এক্সটেনশানে চাকরি করার মতো। আধ গেলাস জল এনে দিলুম। এত জ্বরে কাঁচা জল খাওয়া ঠিক নয়। শুকনো গলা সামান্য ভিজুক।

'সেদিন অবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জামাকাপড় না কাচলেই পারতে! কারু কথা তুমি শুনবে না। নিজের গোঁ।'

সুপ্রিয়া নিজের কপালে হাত রাখল। চুড়ির শব্দ হল। তিরিশ বছর আগেও ঠিক এইরকম শব্দ হত। সে শব্দের মানে ছিল অন্য। এ হল প্রেমহীন ধাতব শব্দ। এর কোনও অর্থ নেই।

'কপালটা টিপে দোব?'

কেমন যেন কাঠ কাঠ শোনাল নিজের গলা। কর্তব্য ছাড়া আর কিছু বেঁচে নেই এ মনে।

সুপ্রিয়ার গলায় এক ধরনের আতঙ্ক, 'না না, ঠিক আছে। আমি বেশ আছি। তুমি আলো নিবিয়ে দাও।'

আমাকে কাছে আসতে দিতে চায় না। দু'জনের মাঝে যে সেতুটি ছিল, সংসারের গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এপার ওপার মাঝে উদাসী নদী বয়ে চলেছে।

কলের মালা শেষ করে প্রায় মধ্যরাতে ডাক্তারবাবু এলেন তাঁর লটবহর নিয়ে। ব্যাগ, স্টেথো। জামার বুকপকেট দুটো ঠাসা কাগজে উঁচু হয়ে আছে। ভিজিটের টাকা ফুঁড়ে বেরোতে চাইছে। জুতো পায়ে মশমশ করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। সুপ্রিয়ার দেবদেবীরা কুলঙ্গিতে বসে এই বেয়াদবি দেখছেন ভাষাহীন প্রতিবাদে।

খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বেঁকে বসে ডক্টর ভট্টাচার্য গম্ভীর মুখে বললেন, 'কী হয়েছে?'

আমরা সমস্বরে বললুম, 'জ্বর।'

স্টেথোটা মালাবদলের মালার মতো গলা থেকে খুলতে খুলতে বললেন, 'ফ্লু। ঘরে ঘরে হচ্ছে।'

সুপ্রিয়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। ডান পা মোড়া ছিল, টান টান করে ছড়াতে গিয়ে আবার টেনে নিল। মুখে একটু শব্দ হল। অনেকটা মা ডাকের মতো। আরক্ত চোখ মেলে ঘরের দৃশ্য একবার দেখে নিল। মঞ্চসজ্জা মনে হয় পছন্দ হল না। চোখ বুজে গেল। ডক্টর ভট্টাচার্যকে পছন্দ করে না। প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। সেই ডাক্তারবাবু আজ এক হাত দূরে।

সুপ্রিয়ার ডান হাত আলতো আলগোছে দু'আঙুলে তুলে নিলেন। নাড়ি দেখছেন। মাথা হেঁট। হাতঘড়ির দিকে নজর।

'জ্বর দেখা হয়েছে।'

'আজ্ঞে না।'

'থার্মোমিটার আছে বাড়িতে?'

আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালুম। বেড়াল আর থার্মোমিটার বাড়িতে থাকে না। পাড়া বেড়াতে বেরোয়।

'না থাকলে আনিয়ে নিন। টেম্পারেচারের দিকে নজর রাখুন। মেন্টেন এ চার্ট। জ্বর কোনও অসুখ নয়। অসুখের সিমটম। শরীরে ব্যথা আছে?'

প্রশ্ন সুপ্রিয়াকে।

জড়ানো গলায় বললে, 'কোমরে।'

'হুঁ।'

ডাক্তারবাবু শিকারি বেড়ালের মতো উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। ওপর থেকে ভেতরের ষড়যন্ত্র ধরার আপ্রাণ চেষ্টা। সুপ্রিয়ার ভুরু কুঁচকে আছে। বিরক্ত হচ্ছে। নিষ্কৃতি নেই। যে পাল্লায় পড়েছে!

প্রিয়ে এ তোমার স্বামী নয়। সরষে বাটার মতো ঝাঁঝিয়ে উঠে নিস্তার পাবে। ইনি বত্রিশ টাকা দক্ষিণার দেহ পরীক্ষক।

ডাক্তারবাবু প্যাঁক প্যাঁক করে পেট টিপছেন আর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করছেন, 'লাগে? লাগে?' সুপ্রিয়া জায়গায় জায়গায় হতাশ করছে। লাগছে না। আর যখন উঃ করে উঠছে, ডাক্তারবাবু পরমানন্দে সেই জায়গাটা আবার টিপছেন। রোগীর কোনও জেন্ডার নেই। না ম্যাসকুলাইন, না ফেমিনিন। নিউটার। একটা ইলেকট্রিক ফিউজ বক্সও যা, একজন রোগীও তাই।

পরীক্ষা শেষ। ডাক্তারবাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বড়-সড় একটি মাছ খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন। হাঁটুর ওপর প্রেসক্রিপশান প্যাড, হাতে ডট পেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিরিজ অফ টেস্ট। ব্লাড, টিসি ডিসি, ই এস আর, সুগার, ইউরিন, প্লেন অ্যান্ড কালচার। আপাতত এই। পরে একটা বেরিয়াম এক্স-রে। তারপর একটা থরো স্ক্যানিং।'

খোঁচা খাওয়া কেঁচোর মতো প্রেসক্রিপশান লম্বা হচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

অভিজ্ঞ মুখে বিচক্ষণের হাসি, 'উইদাইট টেস্ট কিছু বলা ঠিক হবে না। আক্রমণ তিন-চার দিক থেকে আসতে পারে। পক্স হলেও আশ্চর্য হব না।'

'সে কী? বসন্ত তো বসন্তকালে হয়। এখন তো বর্ষা!'

'এখন সবই হয়। কাল সকালে কোকিল ডাকছিল, শোনেননি? বর্ষায় কোকিল! স্ট্রেঞ্জ। বসন্ত চলে গেছে বলে বসন্ত হবে না, দ্যাটস নো কনসোলেশান। জাস্ট এ মিনিট।'

ব্যাগ থেকে একটা পেনসিল টর্চ বের করে সুপ্রিয়ার কপালে ফেললেন। গালের পাশ দিয়ে নেমে এলেন গলায়। ঘুরে উঠে গেলেন কপালে। ডান কপালের এক জায়গায় আলো স্থির হল।

'হোয়াট ইজ দিস। হিয়ার ইউ আর।'

আলেকজান্ডার যেন মেসিডোনিয়ায় ফিরে এলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। পক্স। এ প্রেসক্রিপশান চলবে না।'

ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেললেন। কুঁক করে একটা শব্দ হল। কোথায় হল? সুপ্রিয়ার গলায়। বোধহয় জল খাবে।

'জল খাবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'জলের জন্যে শব্দ করছে না। পক্স আগে গলায় বেরোয়।'

সুপ্রিয়া হাসছে। দেখো একেই বলে মানুষের চরিত্র। যন্ত্রণায় কান্নাই শুধু বেরোয় না, হাসিও আসে। সুপ্রিয়া হাসির ফাঁকে বললে, 'ওটা পক্স নয়, ট্যাংরা মাছ।'

'ট্যাংরা মাছের তেল ছিটকে কপালে লেগে ফোসকা হয়ে গেছে।'

'আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। রাতে তেমন বোঝা যাচ্ছে না। তবে মাই ডায়াগনোসিস ইজ কারেক্ট। আজ কোনও ওষুধ নয়। জাস্ট অবজার্ভ। কাল সকালে।'

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। পীতু পাশ থেকে ভিজিটের টাকা এগিয়ে ধরল বিনীত ভঙ্গিতে। এইভাবেই দিতে হয়। লাজুক লাজুক মুখে। যেন একটা অপরাধ করে ফেলা হচ্ছে।

'না না, নো ভিজিট। রেখে দাও। দিস ইজ এ কন্ট্রোভারশিয়াল কেস। রোগী অস্বীকার করছে। কাল সকালে যা হবার হবে।'

আমি আমার জার্নালে এখন যদি লিখি:

মেয়েরা হল হরিণের মতো। এক জাতের হরিণ আছে যাদের একহারা লম্বা শিং। আর এক জাতের হরিণ আছে যাদের জংলা শিং। অজস্র ফ্যাঁকড়া। ওই শিংই হল কাল। তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে ডালপালায় জড়িয়ে মড়িয়ে বাঘের পেটে যায়। আমার সুপ্রিয়া হল দ্বিতীয় জাতের হরিণ। যার কোনও কিছুই সহজ নয়। এমনই যন্ত্র, তার ঢোকালে স্প্রিং হয়ে বেরিয়ে আসবে।

রোগী এখন বারো ঘণ্টা ঝুলে থাকুক। শুনে এসেছি এতকাল, সবুরে মেওয়া ফলে, এই প্রথম শুনলুম, সবুরে বসন্ত ফলে। সুপ্রিয়ার হাম বেরোলেও অবাক হব না। দিন দিন যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। উগ্র মেজাজ, অভিমান। আমার সেই জার্নালে লিখব নাকি·

মেয়েদের বয়েস বাড়িলেই পুরুষ হইয়া যায় আর
পুরুষের বয়েস বাড়িলেই বিধবা হইয়া যায়।

'তোমার মশারিটা ফেলে দিই, কী বলো? ছটফট না করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

'জ্বর আর যন্ত্রণায় কেউ ঘুমোতে পারে না।'

'বলছি তো কপাল টিপে দিই।'

'আমাদের আর সে বয়েস নেই।'

'তা হলে রুনু কি ঝুনুকে বলি।'

'থাক, আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না। তুমি আর পীতু খেয়ে নিয়ে মেয়ে দুটোকে ছেড়ে দাও। হেঁশেল তুলে দিক।'

'তুমি কী খাবে?'

'কিচ্ছু না, উপোস।'

'সন্দেশ খাবে? সন্দেশ?'

'না।'

'তা হলে মশারিটা টেনে দিয়ে যাই।'

'না। বকবক না করে তুমি যাও।'

বেশ চলেই যাই। তুমি একা-একা নির্জনে একটু সাফার করো। মানুষের সুখের, মানুষের আনন্দের অংশীদার হওয়া যায়। দুঃখের ভাগ কে নেবে। সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার জে. মৈত্র কী বলতেন জানো, জ্বর হয়েছে, তিন-চারদিন যন্ত্রণা ভোগ করো বাবা, তারপর রোগ ফুটবে, তখন এক দাগেই নিরাময়। তার আগে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে কী হবে!

মেয়েরা যে যার কাজে লেগে গেছে। এ বাড়ির সবই অদ্ভুত। ঝুনুর কাপড় কাচা শুরু হয়েছে বাথরুমে। ঝুনুর সব রাতে। একদিন দেখি মাঝরাতে প্রেশার কুকারে খিচুড়ি বসিয়েছে। সাঁ সাঁ সিটি মারছে। 'কী রে? তোর কি কোনও সময়জ্ঞান নেই!' 'বেশ মজা লাগে।' তা ঠিক, সময়ের শেকল কেটে ফেলতে পারলে জীবনের একঘেয়েমি কেটে যায়।

পীতু চুপ করে বসে আছে আমার ঘরে।

'কী রে? মন খারাপ?'

'বুঝলে, মায়ের জ্বরটা আমার তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'ফ্লু ফ্লু। বর্ষাকাল। ঘরে ঘরে ফ্লু।'

'আমার মন কিন্তু কেমন যেন বলছে।'

'তুই মাকে খুব ভালবাসিস, না?'

পীতু হাসল।

'আমাকে?'

'ভালবাসা শব্দটা বড় চিপ। তুমি ওসব প্রশ্ন কোরো না। আমি একটা বই পেয়েছি জানো। এলি উইজেলের নাইট। হিটলারের কনসেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরে আসা এক ইহুদি যুবকের অভিজ্ঞতা। ভারী সুন্দর একটি কথা পেয়েছি, তুমি কখনও ভেবে দেখেছ, প্রশ্নের শক্তির কাছে উত্তর কীভাবে হেরে যায়! লেখকের ভাষায়, every question possessed a power that did not lie in the answer.'

'তোর পড়া হয়ে গেলে, আমাকে দিস না! যুদ্ধের বই পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'আমারও ভীষণ ভাল লাগে। তুমি আগে পড়ো না। কিংবা তুমি রাতে পড়ো, আমি সকালে পড়ব। প্াতলা বই। ধরলেই শেষ হয়ে যাবে।'

'পীতু তোকে একটা কথা বলব?'

'বলো না।'

'হাসবি না?'

'হাসব কেন?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম সাড়ে চার কোটি টাকার লটারি হচ্ছে। আমাকে একটা টিকিট কেটে দিবি।'

'ওরেব্বাবা! একটা টিকিটের দাম জানো?'

'কত?'

'একশো টাকা।'

'অ্যাঁ, সে কী রে! কেউ কিনবে না।'

'ভুল ধারণা, ব্যাবসাদাররা কিনে ফাঁক করে দেবে। ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার জন্যে সব মুখিয়ে আছে। হঠাৎ লটারি?'

'দেখ, এ ছাড়া আর রাস্তা নেই। জমিটা কেনা পড়ে আছে। মাথা গোঁজার মতো নিজস্ব একটা কিছু আর কবে হবে? জীবন তো ফুরিয়ে আসছে। চোখ বুজলে তোদের কী হবে! মাথায় মাথায় দুটো মেয়ে বিয়ে তো দিতেই হবে!'

'শোনো অত ভেবো না। তুমিই না এক সময়ে বলতে, হোয়াট ইজ লটেড ক্যান নট বি ব্লটেড।'

'যখন বলতুম, তখন বয়েস অনেক কম ছিল। এখন মনের পাখার জোর কমে গেছে। পাখি বুড়ো হচ্ছে পীতু। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে।'

'যা হয় হবে। অত ভাবা যায় না। এ যুগের নিয়ম, আজ কাটুক, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।'

'আমরা যে সেকেলে বাবা। আমরা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের কথাই বেশি ভাবি। কী রেখে গেলুম, কাকে কীভাবে রেখে গেলুম। স্বপ্ন নিয়ে চিতায় চড়া। স্বপ্ন দেখি বলেই বাঙালি। তা না হলে ইংরেজ হতুম, ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। প্রায় দু'বছর হয়ে গেল পাশ করে বসে আছিস। এ দেশে চাকরি আছে?'

'আছে, আমি ধরতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত মার্চেন্ট নেভিতে নাম লেখাব ঠিক করেছি।'

'নেভি! সমুদ্র, জাহাজ? না না, ওসব হঠকারিতা করিসনি। বন্ড লিখে ঢুকতে হয়' ইচ্ছে হলেও ছাড়ার উপায় থাকে না। ও তোর লাইন নয়। বাঙালির ধাতে সইবে না।'

'বাঙালি আর সেই ভেতো বাঙালি নেই বাবা। তলে তলে পালটে গেছে। বাঙালি এখন সব পারে।'

'যে পারে, সে পারে। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

পীতু হাসল।

'হাসলি কেন?'

'একটা কথা ভেবে।'

'কী কথা? তোকে একসময় উঠতে বসতে গালাগাল দিতুম!'

'সব বাবাই ছেলেকে গাল দেয়, সব মা-ই মারে। ওটা কোনও ব্যাপারই নয়।'

'তা হলে?'

'ধরো যে ডাকে সবাইকে যেতে হয়, সেই ডাকে আমাদের কেউ একজন চলে গেলে কী হবে?'

'সে তো বাবা আমার পালাই আগে হবে। তোমার তেমন লাগবেও না। সংসারে মজে থাকবে। কথায় বলে, পুত্রশোক। পিতৃশোক কেউ বলে না। তা ছাড়া সংসারে বুড়োরা এক জ্বালা। গেলেই ভাল। জগতের নিয়মই হল, আগে যে আসে, সে-ই আগে নোটিশ পাবে।'

'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'কেন দেখব না?'

'আমি যা দেখার কথা বলছি, তা দেখোনি।'

পীতু কাগজটা টেনে নিয়ে একটা পাতা ওলটাল, 'এই দেখো। কোনওকালে এত নিরুদ্দেশ হতে দেখেছ?'

পাতা ভরতি সার সার ছবি। সবাই বয়েসে তরুণ।

'নিরুদ্দেশ মানে কী বলো তো? কেউই আর নেই।'

'তা কেন? ওটা তোমার দুর্বল চিন্তা।'

'না বাবা। একালের খবর তুমি কতটুকু রাখো। মৃত্যুর খই ফুটছে চারপাশে। বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। শ্রেণি সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমরা টের পাচ্ছি না।'

'তুই আর মন খারাপ করে দিসনি। একে হতাশায় ভুগছি। শোন, কাল থেকে তুই দু'টাকা দামের লটারির টিকিট সপ্তাহে একটা করে কিনিস। জ্যোতিষ আর লটারি, এই দুটোই এখন আমাদের ভরসা।'

ঝুনু ঘরে এল। সুবাস। খুব সাবান মেখেছে। মায়ের ধাত পেয়েছে। পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিক। এমনিই ফরসা, আরও ফরসা দেখাচ্ছে।

'বাবা, তোমরা এবার খেতে বসবে?'

'তোর মা এখন কী করছে রে?'

'ঘর অন্ধকার করে চুপ করে শুয়ে আছে।'

'কী রেঁধেছিস?'

'রুটি হল কমন, সঙ্গে আলুর দম, এক পিস মাছ হয়তো মিলতে পারে।'

সুপ্রিয়ার ঘরের দরজা ফাঁক করে অন্ধকারে চোখ চালাবার চেষ্টা করলুম। সংক্ষিপ্ত নিশ্বাসের শব্দ। যেন হাপর চলেছে। চোখের ভুল কি না জানি না। খাটের মাথার কাছে খোলা জানলা ঘেঁষে কেউ কি দাঁড়িয়ে ছিল! শঙ্কর! শঙ্কর নাকি! আবার অনেক দিন পরে।

কী খাচ্ছি কোনও হুঁশ নেই। জীবনের সেই পাতায় চলে গেছি। শঙ্করের ভুল অ্যাডভেঞ্চারে ভরা জীবন, আমার নোংরা মন। মানুষ নর্দমা পরিষ্কারের জন্যে যত ব্যস্ত হয়, নিজের মন-নর্দমা পরিষ্কারের জন্যে তত হয় না কেন?

সেই রাত। সেই দৃশ্য। জীবন নাটকের সেই অঙ্ক চোখের সামনে আবার অভিনীত হচ্ছে।

আমি: এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়? জানো আমি কতক্ষণ এসেছি?

সুপ্রিয়া: জানি।

আমি: জানো, অথচ আসোনি। বাঃ, বাহা রে মেয়েমানুষ!

সুপ্রিয়া: এমন কিছু দশ মাইল দূরে ছিলুম না। ছিলুম ঠাকুরপোর ঘরে।

আমি: এখন এলে কেন? চিরকাল ওই ঘরেই থাকলে হয়। উচ্ছিষ্টে আমার প্রয়োজন নেই।

সুপ্রিয়া: কী বললে? কী বললে তুমি?

আমি: যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আমি কিছু বুঝি না ভাবো?

সুপ্রিয়া: ছি, ছি, তুমি এত নোংরা?

আমি: তোমরা নোংরামি করতে পারো, আর আমি ধরে ফেললেই নোংরা তাই না! আমার সন্দেহ হয়, তোমার পেটে যে নড়ছে সে কার?

বিদ্যুতের আলোয় ভিজে মানুষকে যেরকম নীল দেখায়, সুপ্রিয়া সেইরকম নীল হয়ে গেল। আর মাস না ঘুরতেই শঙ্কর আত্মহত্যা করল। তার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী। সেই বাজারে মেয়েটি, না আমি!

হঠযোগ

ওহে কুন্তীপুত্র! শোনো,

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

বিষয়জাত সুখভোগ, রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ঘটি বাটি, কলসি হাঁড়ি, ছেলে মেয়ে বউ সব, সবই তোমার দুঃখের কারণ। সবই অস্থায়ী। আজ আছে কাল ধুস। জগতের স্বরূপ জ্ঞানীরা জানেন। তাই তাঁরা বিষয় থেকে দূরে, বহু দূরে থাকেন।

হে কৌন্তেয়! কাম থেকেই ক্রোধের উদ্ভব। যেমন আমার হয়েছিল। কম ক্রোধ ছিল আমার! সবই ওই সুপ্রিয়াকে ঘিরে। সুপ্রিয়ার এত রাগ কেন? সেও কি কাম থেকে আসছে? এ বয়েসে আবার কাম কী! এখন তো সব ইন্দ্রিয় জুড়িয়ে জল হয়ে যাবার কথা। সুপ্রিয়ার কাম নয় কামনা।

মেয়েদের বিয়ে। ছেলের বিয়ে। বাড়ি। আবার বলে কিনা, একটা গাড়ি হলে ভাল হত। আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই!

'তুমি খাবার ফেলে রেখে হঠাৎ ওভাবে উঠে চলে এলে।' পীতু।

'খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেল। বোস। তোর মায়ের ঘরে কেউ একজন থাকলে ভাল হয়।'

কথাটা ঘুরিয়ে পাড়লুম। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। এখন অনেক আবেগ সংযত রাখতে হয়। ব্যঙ্গের হাসি ফুটবে মুখে মুখে, বাবা মায়ের এত নেওটা।

'তুমি অত ভাবছ কেন? সামান্য জ্বর। আমি থাকব।'

'একটু আগে তুইও তো চিন্তা করছিলিস। একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবি?'

'তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করি।'

'একটু আগে তোর মায়ের মাথার কাছে শঙ্করকে যেন দেখলুম। মনটা ভীষণ দমে গেল।'

'কাকুকে দেখলে? অ্যাটমিক এজে এসব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। আত্মা কি সত্যিই আছে। তোমার চোখের ভুল, তাই বা বলি কী করে?'

'র‍্যাক থেকে ওই বইটা টান। হ্যাঁ, থার্ড ফ্রম দি লেফট।'

'পল ব্রানটনের নাম শুনেছ নিশ্চয়। বইটির নাম, দি কোয়েস্ট অফ দি ওভারসেলফ। তুমি নিয়ে যাও। পড়ে দেখো। সায়েব পিরামিডে একা একটি রাত কাটাতে গিয়েছিলেন। কারু নিষেধ শোনেননি। ভাবো কী সাহস! বিশাল মরুভূমি। প্রাচীনকালের পিরামিড আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রাজার সমাধি। কেউ কোথাও নেই। আমি হলে ভয়েই হার্ট ফেল করতুম। মাঝরাতে সায়েবের সামনে এসে দাঁড়ালেন এক মিশরীয় প্রেতাত্মা। সায়েবের দেহ পড়ে রইল। প্রেতাত্মার আকর্ষণে তাঁর নিজ-আত্মা বেরিয়ে এল দেহ ছেড়ে। ঢালু পথ ধরে তাঁকে নিয়ে গেল এক সুরক্ষিত গুপ্ত ঘরে, যে ঘরে থরে থরে সাজানো ছিল প্রাচীন সম্পদ, নথিপত্র। যে ঘরের সন্ধান প্রেতাত্মা ছাড়া কেউ কোনওদিন জানতে পারতেন না। বইটা পড়ো। জ্ঞানীর জগতে অবিশ্বাস বলে কোনও শব্দ নেই। বাতিল শব্দটা থাকতে পারে। রিজেকশান। তুমি জানো কি সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস সাইবেরিয়ার পনেরো ফুট গভীর বরফের তলা থেকে খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগের প্রাচীন পোকামাকড় আর সামুদ্রিক জীবের দেহ পেয়েছিলেন। সব জমে বরফ। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করার ফলে কী হল জানো, তারা আবার বেঁচে উঠল। স্বাভাবিক জীবন-ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। যেসব ডিম পাওয়া গিয়েছিল, সেইসব ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোল। এক ধরনের মাছ পাওয়া গিয়েছিল, যার নাম ক্র-ফিশ। অধ্যাপক পি এন কাপটেরেভ সেই মাছ থেকে নতুন দশটি প্রজাতি তৈরি করেছিলেন।'

'তবু বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় সব আজগুবি। মৃত্যুর পর কিছু থাকতে পারে না।'

'আই ডাই অ্যান্ড দি ওয়ার্লড ডাইজ উইথ মি। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

'শোনো, বিশ্বাস দু'ভাবে আসে। অনুভব থেকে আসে আর আসে অনুভূতি থেকে। কেউ আমাকে বলেছিল, অমুক জায়গায় গেলে দেখবে, আকাশের গায়ে একটা নীল পাহাড় লেগে আছে। বললুম, ঠিক আছে, আগে দেখে আসি তারপর তোমার কথা বিশ্বাস করব। এ বিশ্বাস আমার ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। নিজের চোখ দিয়ে যাচাই করে নেওয়া যায়। কেউ বললেন, সকলের শরীর থেকেই জ্যোতি বেরোয়। কই আমি তো দেখি না! তিনি বললেন, তোমার চোখ ডিফেক্টিভ। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের এক বৈজ্ঞানিক একটা ক্যামেরা আবিষ্কার করেছেন। সেই ক্যামেরার লেনসে মানুষের জ্যোতি ধরা পড়ছে। মাথার চারপাশে একটা হ্যালো। সেই হ্যালো দেখে রোগ ধরা সম্ভব হচ্ছে। ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে। সাইট আর ভিশান। বাংলায় দৃষ্টি আর অতিদৃষ্টি অথবা পর-দৃষ্টি। দৃষ্টি আমাদের সকলেরই আছে। কথা হল, অতিদৃষ্টি ক'জন পায়। বহুবার শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাসে ধরতে পারিনি।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি

আমির মৃত্যু নেই। He steps out of the body, as one steps out of the prison and does not perish with it. For man is mind, not matter.'

কোথাও ঘড়ি বাজছে। ক'টা বাজছে গোনার প্রয়োজন নেই। বাজার শব্দ যখন কানে আসছে ধরে নিতে পারি মধ্যরাত। পৃথিবীর কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে। ঘুম আসছে চোখে। কোথাও জোরে দরজা বন্ধের শব্দ হল। দিনের বেচা-কেনা শেষ। সাময়িক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে জীবজগৎ। রণক্ষেত্রে শান্তি।

পীতু চলে গেছে। মেয়েরাও মনে হয় শুয়ে পড়েছে। সুপ্রিয়াকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। অসুস্থ বড় অসহায়। লতানে গাছের মতো অহং-এর খোঁটায় মানুষ বাঁধা। অহং শুয়ে পড়ল তো মানুষও শুয়ে পড়ল। সব হম্বিতম্বি ঠান্ডা। আমাদের অফিসের বড়কর্তা এস পি সেনের স্ট্রোক হল। চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছেন, দুটো হাত দু'পাশে লটরপটর ঝুলছে। আধবোজা চোখ। ঘামে জবজবে শরীর। পাঁচমিনিট আগেও আমাদের একজনকে খুব হম্বিতম্বি করছিলেন। দেশাত্মবোধ জাগাতে চাইছিলেন, সততা কাকে বলে শেখাতে চাইছিলেন। বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন, ডিজনেস্ট কর্মচারীদের নিয়ে দেশ কীভাবে এগোবে। অথচ নিজে বড়লোকের উচ্ছন্নে যাওয়া সন্তান। শনিবার রেস, প্রতি সন্ধ্যায় প্রচুর মদ্যপান, মহিলাসক্তি। প্রতিমাসেই কাজের ছুতোয় লম্বা লম্বা ট্যুর। মোটা টাকার টি.এ, ডি.এ। সেই মানুষ দেশের কথা ভেবে এমন উত্তেজিত হলেন হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। অসহায়, লটরপটর অবস্থা। বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যাবার কথা। ছুতো অফিসের কাজ, আসল উদ্দেশ্য অন্য।

হঠাৎ ওইভাবে চলে যেতে কেমন লাগে? ভোগ শেষ হল না, লোভের আগুন লকলক করছে, কোনও কিছুই গোছগাছ করা নেই, অনেক বিলিব্যবস্থা বাকি। চলো, তো চলো। শেষ রাতে গৃহবধূকে হঠাৎ গলাধাক্কা দিয়ে পথে নামিয়ে দেওয়ার মতো। এই ধরনের আত্মা সহজে মুক্তি পায় না। মুক্তি পেতে হলে মৃত্যুর বেশ কিছু দিন আগে থেকে প্রস্তুত হতে হয়। ধীরে ধীরে মন তুলে নিতে হয় সব কিছু থেকে। এই কারণেই শঙ্করের মুক্তি হল না। আমাদের জগতে ফিরে ফিরে আসে। যতদিন না একটা দেহ পাচ্ছে ততদিন তাকে আসতে হবে। সুপ্রিয়ার যৌবন কবে চলে গেছে, তবু তার মাথার কাছে। জানি না কী ধরনের সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল? ফারাওদের কবর খুঁড়ে মিশরের লুপ্ত রহস্য জানা সম্ভব। মানুষের মন খুঁড়ে জীবনের গোপন রহস্য ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারু জানা সম্ভব নয়। যা বলবে তা মেনে নিতে হবে। আই লাভ ইউ বলে হাতে বিষের গেলাসও ধরিয়ে দিতে পারে। মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। কেশব মিস্তিরের বউ! দু'ছেলের মা। স্বামী অসুস্থ। যে ডাক্তার দেখছিলেন তাঁর সঙ্গে এমন লটঘট হল, স্বামীকে ইচ্ছে করে ভুল চিকিৎসায় মারিয়ে, সেই ডাক্তারের রক্ষিতা হয়ে, জীবনের কী সুখ যে পেয়েছিল সেই জানে। আমার মাথায় আসে না। আমার কেবল ভয় করে। ভূতের ভয় সাপের ভয়ের চেয়ে মানুষের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। কার হাতে বিশ্বাস করে নিজেকে সমর্পণ করব। বন্ধু ছুরি চালাবে। স্ত্রী বিষ খাওয়াবে। পিতা দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করে পথে বসিয়ে দেবে। পুত্র গৃহছাড়া করবে। কন্যা কুলত্যাগ করে মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দেবে। নিজের ভেতরেই বা কারা বসে আছে? তাও তো জানি না। ভেতরের কল-কবজার কথা চিন্তা করলেই গা ঘিনঘিন করে। বিশেষ করে পেট, আর পেটের তলার জিনিসপত্তর। যেন নরক। দেবতা আমি, নিজের নরক নিজেই বয়ে বেড়াচ্ছি। যে মুখে খাদ্যগ্রহণ করছি সেই মুখেই অশ্লীলতম বাক্য উদ্গীরণ করছি। মন তো অনেক গভীর জলের মাছ! কোথায় তার অবস্থান? আকার আকৃতি কেমন? কেউ জানে না। মায়া-দর্পণে ছায়ার মতো। কখন কোন ছায়া ফুটবে মনই জানে। মানুষের মতো অসহায় প্রাণী জীব জগতে নেই। মনের যখন আকার নেই,

অবস্থান জানা নেই, তখন মানুষ নিজেই ভূত। খোলসপরা ভূত। এই মনই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল, সুপ্রিয়া আমাকে অল্প অল্প আর্সেনিক খাওয়াচ্ছে। আমার চুল পড়ে যাচ্ছে, পেটের গোলমাল হচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে। কিছুকাল শুধু নুন দিয়ে ভাত খেতুম। ডাল তরকারি ছুঁতুম না। রঙিন জিনিসে বিষ মেশানো সহজ। পরে বুঝেছিলুম, আমি নীচ বলে, সকলকে নীচ দেখি। আমি শঙ্কর হলে যেমন করেই হোক সুপ্রিয়াকে নষ্ট করতুম। শঙ্কর দেবতা ছিল। পশু হলুম আমি। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং। বাতাস ঢেউ তোলে। ঢেউয়ে নৌকো দোলে। ইন্দ্রিয় হল সেই বাতাস। আমি আর ভাবতে পারি না। আমার জার্নালে একটি কথা লিখে যাই:

॥ আষাঢ় ৩১, ১৩৯১, রাত সাড়ে বারো ॥ এই পল্লিতে একটি মানুষ এখনও জেগে বসে আছে। যার হাই ওঠে; কিন্তু ঘুম পায় না। পরিপাটি শয্যা আছে পরিচ্ছন্ন নিদ্রা নেই। রাতে সে বসে বসে লক্ষ করে, মহাকাল তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে হাত পেতে। কী চায় সে জানা আছে। রক্ত চাও, দিতে পারি। ধমনিতে আবার ফিরে আসবে। পৃথিবীই তা ফিরিয়ে দেবে। জীবনের মুহূর্ত আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না। তাই জেগে বসে আছি। প্রতিরোধের কি কোনও শক্তি আছে! ধীরে ধীরে সেই হাত এগিয়ে আসে। মালা থেকে একটি একটি করে মুক্তো ছিঁড়ে নিতে থাকে। নিশ্চেষ্ট আমি বসে বসে দেখি, ক্রমশই আমি দীন থেকে দীনতর হচ্ছি। পরিবার পরিজন থেকে ক্রমশই আমি দূর, আরও দূরে চলে যাচ্ছি। আজ গেলে কাল সকালে আমি আরও রিক্ত। পরবর্তী সকালে আমি আরও আরও রিক্ত। এ এমন ক্ষরণ যার কোনও পূরণ নেই। ক্রমশই আমি বিবর্ণ হয়ে চলেছি।

শখের তালাস করতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছে, সেই গল্পের বামনের মতো। বামন তার দুর্গে বন্দি করে রেখেছিল এক সুন্দরী রাজকুমারীকে। পাছে পালিয়ে যায়, তাই সারা দিনরাত চৌকিতে বসে থাকত বামন। একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তার ঘুম এসে গেল। মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার। চোখ খুলেই দেখল, তার এই নিদ্রার সুযোগে যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটে গেছে। রাজকুমারী পলাতকা। বামন সঙ্গে সঙ্গে পায়ে গলিয়ে নিল তার সপ্ত-যোজন পাদুকা। কুমারী তুমি পালাবে কোথায়! একবার পা ফেললেই আমি সপ্ত-যোজন অতিক্রম করে যাব! তুমি কত জোরে যাবে কন্যা? দুর্গের বাইরে এসে বামন পা ফেলল। একবার পা ফেলেই সে চলে গেল সাত যোজন দূরে? আর রাজকুমারী? সে তখন পড়ে আছে বামনের অনেক পিছনে!

আমি সুখ-কুমারীকে বন্দি করে রাখতে পারিনি। আর দ্রুত ধরতে গিয়ে বামনের মতো অনেক পিছনে ফেলে চলে এসেছি। আমার সামনে এখন নিশ্ছিদ্র-অন্ধকার প্রান্তর। জ্ঞান? যা শিখেছিলুম? তারও কোনও প্রয়োগ নেই। কেন? আমি সেই নাবিক। জাহাজের কাপ্তেন হবার সব পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। জাহাজ নিয়ে নেমে পড়েছি সাগর পাড়িতে। কখন কী করতে হবে সবই আমাকে শেখানো হয়েছে। দিন যায়। হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল সাংঘাতিক। রাতের আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। একটিও তারা নেই। কোথায় গেল আমার সেই ধ্রুবতারা! এই ভয়ংকর রাতের ভীতির সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিল না। আমার দু'হাতে জাহাজের স্টিয়ারিং। কিন্তু এই বৈকল্যের অভিজ্ঞতা তো আমার আগে কখনও হয়নি। ঢেউয়ে দুলছি মোচার খোলার মতো। স্টিয়ারিং শক্তিহীন। চার্ট, কম্পাস, সেকস্টান্ট, সবই সামনে ছড়ানো, দুর্যোগে মাথা বিকল, গণিত আসছে না। সবই জানি। জানা হয়নি জীবনের দুর্যোগের মুহূর্তে জ্ঞানের, বিদ্যার প্রয়োগ-কৌশল।

পুত্র, জীবনে 'স্পিরিচ্যুয়াল ক্রাইসিসের চেয়ে বড় সংকট আর কিছু নেই। হয় ভোগী হও, না হয় যোগী। মধ্যপথ অতি বিপজ্জনক। না ঘরকা, না ঘাটকা।

পুত্র, যদি ছাড়তে হয় তো আগেই ছেড়ো। যদি ধরতে হয় তো আগেই ধোরো। আগেই তোমার ঘোড়া বেছে নাও। যেমন পছন্দ তোমার। কালো তো কালো, সাদা তো সাদা। মাঝপথে ঘোড়া বদল কোরো না।

পুত্র, মনে রেখো, কথাই হল জীবনের অশ্ব। বাক্য অশ্ব। কথায় ছুরি, কথায় মিছরি। কথায় শক্তি, কথায় গতি। কথায় শান্তি। কথায় সম্পর্ক। কথায় সুখ, কথায় অসুখ। জেনে রাখো, যে কথাটি বলা হল না, সেইটিই জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা।

জার্নাল থাক। এ তো নিজের সঙ্গে কথা বলা! নদী যেমন নিজের সঙ্গে কথা বলে! গাছ যেমন বলে পাতায় পাতায়। আজ বোধহয় অমাবস্যার রাত। আকাশের গায়ে যেন কালি লেপে দিয়েছে। রাত্রির আজ ভৈরবী মূর্তি।

অক্ষয়বাবুর দেওয়া সেই বইটি আজ অন্তত এক পাতাও পড়ব। সেই কবে পেয়েছি, আজ পর্যন্ত উলটে দেখা হল না। Thoughtless Existence, Ralph Anderson.

প্রথম পাতাতেই লিখছেন, বি এ গোট।

ছাগল হবার চেষ্টা করো। ছাগ-সাধনাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ছাগল মূর্খ প্রাণী নয়।

জীবজগতে ছাগল হল সর্বোচ্চ দার্শনিক। বৈদান্তিক হিন্দু। ভোগ নেই, অন্যের ভোগে নৈবেদ্য।

ছাগলের চোখের দিকে তাকাও, মন দেখতে পাবে। স্থিতপ্রজ্ঞ। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র পবিত্র গীতায় সাংখ্যযোগীর যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, যেমন দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, রাগ নেই, ভয় নেই, ক্রোধশূন্য স্থিতধী। ঠেলে বেরিয়ে আসা ঘোলাটে চোখে উদাস দার্শনিকের নিস্পৃহ বোধশূন্য দৃষ্টি। সব বয়েসের ছাগলের চোখেই ওই এক প্রবীণ ভাব। জন্মের উল্লাস নেই, মৃত্যুর ভীতি নেই। যেন সাক্ষীপুরুষের চোখ! ছাগল মৃত্যুশোকে কখনও কাতর হয় না। একটা ছাগল যখন জবাই হচ্ছে তখন অন্য ছাগল সুখে চোখ বুজিয়ে পাতা চিবোচ্ছে। হয়তো পাঁচমিনিট পরে তাকেও যেতে হবে। মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবি করে, অথচ ফাঁসির আসামির রাতারাতি চুল পেকে সাদা হয়ে যায়। ছাগল সর্বভুক। মানুষও সর্বভুক। ছাগলের দুধ আর মানুষের দুধ সহধর্মী, সমগুণ সম্পন্ন শীতল। ছাগল আর মানুষ একই হারে বংশবৃদ্ধি করে। ছাগলের মস্তিষ্ক নেই, ধারণাটাই ভুল। মানুষের অপপ্রচার। ছাগল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ছাগল জানে জন্মই যার ধর্ম, মৃত্যুই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ছাগল সেই কারণে প্রতিবাদহীন মৃত্যুকে সহজ স্বীকৃতি দিয়েছে। মৃত্যুকালীন অন্তর্ভেদী ব্যা-চিৎকার ইচ্ছা-নিঃসৃত। যে চিৎকারে সে জানাতে চায়, জীবনের চেয়ে মরণ সত্য। পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের তাই এত মারণযজ্ঞ। জীবনের আয়োজনের চেয়ে মৃত্যুর আয়োজন তাই এত ঢালাও, এত ফলাও। অ্যান্টিবায়োটিক্সের চেয়ে অ্যাটম বোমা কোটি কোটি গুণ শক্তিশালী। যে মারে সে সর্বকালের বীর, লোকপূজিত, মূর্তিতে শোভিত স্মৃতি। যে বাঁচায় সে প্রেমিক। পেলব, কোমল, চারণভূমির তৃণের মতো পদানত। ছাগল বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। মানুষ স্বভাবলোভী, ইন্দ্রিয়সেবী। মানুষ জানে কেড়ে না নিলে কিছু পাওয়া যায় না। শক্তের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অস্ত্র প্রেম নয়, যুদ্ধ। লোভ আর পরস্ত্রীকাতরতা অগ্রগতির প্রেরণা। সভ্যতার উন্মেষ অসভ্য মানুষের কুঠারাশ্রয়ে। ঘোড়সওয়ার কোষমুক্ত অসি হাতে রাজ্য জয় করে। পদানত ক্রীতদাস পিরামিড বানায়। মৃত ফারাওদের পরকালীন আস্তানা। অত্যাচারী নৃপতি অতঃপর সংস্কৃতির দিকে নজর দেন। ক্রীতদাসী নৃত্যপরা হয়। হারেমে জন্মায় জারজ পূর্বপুরুষ। বন্দিরা জয়গান করে। রাজকবি প্রথমে রাজবন্দনায় কলম ধরেন। গদ্যকার আসেন বিজয়কাহিনি রচনায়। সাধারণ-সাহিত্য অবসরের রচনা। শিল্পের বাই-প্রডাক্ট। বিজ্ঞানী আসেন মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে। হঠাৎ মাস্টার্ড গ্যাসের সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলেন পেনিসিলিন। মানুষ মারা বিষের পাশাপাশি তৈরি হয় স্মলপক্সের ভ্যাকসিন। রাজন্যবর্গ খুশি হন। প্রজা, ক্রীতদাস, স্তাবকবর্গ যত স্বাস্থ্যবান হবে, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়ায় তত সৈনিক পাঠানো সহজ হবে। সারা পৃথিবী এক সমরক্ষেত্র। সিংহাসন প্রেমের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রতিষ্ঠিত মৃতমানুষের হাড়ের স্তূপে। রাজধর্ম প্রজাপীড়ন, বঞ্চনা, হিংসা, অপ্রেম। ন্যায় নীতি, নিষ্ঠা, আদর্শ প্রেম বঞ্চিত দাসের কল্পনা। কল্পনার জগৎ, আদর্শের জগৎ, অভাবের জগৎ। যা নেই তা পাবার আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বর-পুরুষের কল্পনা। তিনি আছেন, কিন্তু তিনি নেই। তিনিই আমি। সেই আমি ক্রুশবিদ্ধ একটি প্রতীক মাত্র। প্রজাতন্ত্র,

গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র প্রচ্ছন্ন রাজতন্ত্র। বিদ্রোহীর নিয়তি অন্ধকার কারাকক্ষে যন্ত্রণাদায়ক তিল তিল মৃত্যু। ছাগল সে সত্য জানে। সেই কারণেই তার আর এক নাম বলির পাঁঠা। মানুষ না জেনে যূপকাষ্ঠের দিকে এগোয়, ছাগল এগোয় জেনে। ছাগলের চোখ সেই কারণে ভাবহীন। ছাগলের নীতি, লিপ বিফোর ইউ লুক। বোকামানুষের নীতি লুক বিফোর ইউ লিপ। অথচ মানুষই একমাত্র প্রাণী, যার দুনিয়ায় কোনও নীতি নেই। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে বারে বারে না দেখেই লাফ মারে, তারপর ভাগ্য বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে। ছাগল হয়ে যাওয়ার অপমান এড়াতেই ছাগল ছাগল হয়ে জন্মায়।

Be a goat,
Leap before you look
Wherever you are you will be there for ever
It is better to be on happy fool
than an unhappy clever.

ছাগল হও। না দেখেই মারো লাফ। যেখানে পড়লে, সেখানেই পড়ে থাকবে চিরকাল। অসুখী ধূর্ত হওয়ার চেয়ে সুখী মূর্খ হওয়া অনেক ভাল।

বই মুড়ে রাখলুম। মলাটটি ভারী সুন্দর। মধ্য প্রাচ্যের বাজারে একটি গাছের তলায় চেন দিয়ে বাঁধা একজন ক্রীতদাস। গাছের ডালে বসে আছে মুক্ত পাখি। অক্ষয়বাবু জবরদস্ত বই দিয়েছেন। ধীরে ধীরে পড়তে হবে। কিন্তু এসব বই পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। পৃথিবীকে মনে হয় বিশাল এক কারাগার। মুক্তির জন্যে মন ছটফট করে।

আমার জার্নালে টুক করে এই কথাটি লিখে রাখি:

আমাদের মুক্তি মানে মৃত্যু। এই দেহ নাম-রূপের কারাগার।
বংশপরিচয়ের কারাগার। সমাজনীতি, অর্থনীতির শেকলে বাঁধা
আমরা এক একটি ক্রীতদাস।

এ বাড়ির দক্ষিণে একচিলতে একটা বারান্দা আছে। সেখানে আদ্যিকালের একটা বেতের চেয়ার পেতে রেখেছি। চেয়ারের নাম দুখভঞ্জন। বসলেই দুঃখ চলে যায়। ছারপোকাও আছে। কুটুস কুটুস বেশ কামড়ায়। রাতের আর বেশি বাকি নেই। বসেই পার করে দেওয়া যায়। এক আকাশ তারা জ্বলজ্বল করছে। আলোর ফুল। মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে। মশারির চালের মতো মাঝরাতে আকাশ কি পৃথিবীর কাছাকাছি তারার ভারে ঝুলে আসে। মাটির খবরই মানুষ রাখে না, আকাশ বহু দূর।

এ পাড়ায় আমার মতো আর এক রাত জাগা মানুষ আছে। তার নাম বিশু পাগলা। সারারাত বেহালা বাজায়। প্রহরে প্রহরে রাগ পালটায়। বেহাগ, মালকোষ, কেদারা, জয়জয়ন্তী, দরবারি, গুণকেলী, ভৈরোঁ, ভৈরবী। অন্ধকার তরল হয়ে আকাশে আগুন লেগে যায়। আজও বিশুবাবুর বেহালার সুর ভেসে আসছে। অসাধারণ হাত। মন যেন মুচড়ে যায়। কখনও কোনও আসরে বাজান না। জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'সারারাত কাকে তা হলে শোনান?'

'যাঁর সুর যাঁর অসুর, যাঁর তাল যাঁর বেতাল, তাঁকেই শোনাই। এই তো তাঁর শোনার সময়।'

দুর্যোগ

বেতের চেয়ারে বসে বসেই শেষ রাতে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। জাগলে বোঝা যায় রাতে পৃথিবী কেমন বদলায়! একটু সচেতন হলেই অনুভব করা যায় পৃথিবী ঘুরছে। বাতাস পর্যন্ত বদলে যায়। ভাব তো অবশ্যই বদলায়। সময়ের প্রতিটি সন্ধিক্ষণ বোঝা যায়। মিষ্টি বাতাসে তন্দ্রা এসে

গিয়েছিল। কে যেন হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে দিলে। কেমন যেন এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে ক্রমশই পিছন দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। হঠাৎ কোনও রোগে ধরল না তো! তা হলেই জীবনের ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে যায়। সুপ্রিয়ার ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। মাথার দিকের জানলায় গোলাপি ভোর লেগেছে। মশারির ভেতর দুটি ছায়া প্রাণী। মায়ের পায়ে একটা হাত রেখে বিছানায় মুখ গুঁজে পীতু পড়ে আছে ধনুকের মতো। সুপ্রিয়ার মাথা চলে গেছে বালিশের বাইরে। দেহ বেঁকে গেছে ধনুকের মতো পিছন দিকে। ছিলে টান অবস্থা। একটা পা পীতুর দাড়ির তলায়। শরীরে যত টান ধরছে, পীতুর মুখ তত উঁচু হচ্ছে। এমন ঘুম, টের পাচ্ছে না কিছু।

এ আবার কী হল! কোনও যোগাসন নয় তো? সুপ্রিয়া তো আসনটাসন করত না কোনও কালে। মশারির মাথার দিক তুলে সুপ্রিয়ার মুখ দেখার চেষ্টা করলুম। এমনও হতে পারে আড়ামোড়া ভাঙছে। মুখ দেখে ভরসা পাওয়া গেল না। বরং ভয়ই হল। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে।

'সুপ্রিয়া?'

সাড়া নেই। আবার ডাকলুম, 'সুপ্রিয়া?'

সাড়া দেবার চেষ্টা করল। বিচিত্র এক শব্দ ছাড়া কিছুই বেরোল না।

'পীতু, পীতু, পীতু ওঠ শিগগির।'

পীতু ধড়মড় করে উঠে বসতেই সুপ্রিয়ার পায়ের দিকটা আরও খানিক বেঁকে গেল পিছন দিকে।

'তোর মায়ের এ কী অবস্থা। এ আবার কী হয়ে গেল?'

পীতু ফুলের মতো পড়ে ছিল মায়ের পায়ের তলায়। ঘুম চোখে বললে, 'কী হয়েছে। মা তো ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুমোচ্ছে কী রে? শরীর বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে গেছে।'

পীতু মাথাটাকে বালিশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। পারল না। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, 'ঘাড় যে ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে বাবা!'

'তুই নেমে আয়, টানাটানি করিসনি। ডাক্তারবাবুকে শিগগির ধরে আন।'

পীতু নেমে এল। দু'জনে মিলে মশারি গুটিয়ে পাকিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া হল। আমার ব্যস্ততা দেখে পীতু বলল, 'তুমি সবেতেই বড় ভয় পেয়ে যাও। অত উতলা হচ্ছ কেন?'

'ঠিক উতলা নয়, কেমন যেন আতঙ্ক হচ্ছে। মানুষ এমন ধনুকের মতো বেঁকে যায়?'

'কত রকমের অসুখ আছে, আমরা ক'টারই বা নাম জানি।'

পীতু দু'হাত দিয়ে মাকে সোজা করার চেষ্টা করল। ব্যর্থ চেষ্টা। যেন ইস্পাতের ধনুক। একেই কি বলে হিস্টিরিয়া?

পীতু হতাশ হয়ে বললে, 'তোমরা মাকে দেখো। আমি ডাক্তারবাবুকে তুলে আনি, বাড়িতেই পাব।'

রুনু আর ঝুনুর সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া পীতু কথা বলে না। দূরে দূরেই থাকে। সুপ্রিয়া একবার সাংঘাতিক একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল, বড় হয়ে গেলে ভাইবোনের সম্পর্কেও পাপ ঢুকতে পারে। সেই থেকে পীতু অসম্ভব সাবধান।

সুপ্রিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, 'তুমি একটু একা থাকো। আমি তোমার মেয়েদের ডেকে আনি।'

অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল মাত্র। কোনও কথা বলতে পারল না। এত সরব ছিলে তুমি, আজ একেবারেই নীরব। তখন বিরক্ত হতুম, আজ বড় কষ্ট হচ্ছে।

রুনু আর ঝুনু এখনও দরজা খোলেনি। একটু বেলায় ওঠাই অভ্যাস। সাধারণত সুপ্রিয়ার ঝাঁঝে উঠে পড়ে। আজ খোঁচা দেবার মানুষ শয্যাশায়ী।

দরজায় তিন-চারবার টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। রুনু উঠেছে। এমনিই আমি আস্তে কথা বলি। আজ কণ্ঠ আরও ক্ষীণ, 'তোরা মায়ের কাছে যা। খুব খারাপ অবস্থা। পীতু ডাক্তার ডাকতে গেছে।'

রুনু ঘরে ফিরে গিয়ে ঝুনুর মশারি তুলে ধাক্কা দিতে লাগল, 'ঝুনু, ওঠ, ঝুনু ওঠ।'

আমি দরজার সামনে। সুপ্রিয়ার শাসনে ঘরে ঢোকার সাহস নেই। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে বাপকেও বিশ্বাস নেই।

রুনু বিছানার কাছ থেকে বললে, 'এর আবার কী হল? সাড়া শব্দ দিচ্ছে না। গা বরফের মতো ঠান্ডা। বাবা একবার এসো তো!'

ভয়ে ভয়ে অচেনা সেই ঘরে ঢুকতেই হল। তাজা দুটি মেয়ের শয়নকক্ষ। চারপাশে মেয়েলি জিনিস ছড়ানো। টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিলিতি প্রেমের উপন্যাস। মলাটে দুটি মুখ। বড় কাছাকাছি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সেই চিরন্তন আকর্ষণ। রাতে শোবার আগে ধূপ জ্বেলেছিল। টেবিলে ছাই ছড়িয়ে আছে বৃত্তাকারে। পাখার বাতাসে এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে গেছে।

পাশ ফিরে শুয়ে থাকা ঝুনুর কপালে হাত রাখলুম।

'এ যে বরফ!'

'আমিও তো তাই বলছি বাবা।'

'এর মানে?'

ফ্যালফ্যাল করে রুনু আমার দিকে তাকাল। সুপ্রিয়ার সমস্ত শাসন অমান্য করে বিছানার পাশে বসে পড়লুম। শরীরের ভারে মশারির একপাশের দড়ি ছিঁড়ে গেল। মাথার ওপর চাল নেমে এসেছে। ঝুনুর প্রশস্ত পিঠে ডান কান পাতলুম। শ্বাস আছে তো? বাতাস কি বইছে ভেতরে? অল্প। অতি ক্ষীণ। বহু দূর থেকে আসা ঝাউয়ের শব্দ। সন্দেহ হচ্ছে। বিশ্বাস করতে পারছি না নিজের কানকে।

'রুনু তুই একবার দেখ তো।'

রুনু কান পাতল ঝুনুর বুকে। বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়েছে। চোখ সরিয়ে নিলুম অন্য দিকে। আর তখনই চোখে পড়ল ছোট্ট একটা চিরকুট। বুক হিম হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে দীর্ঘ সময় লাগল। যেন অনন্ত থেকে ধরে নিয়ে এলুম পরিষ্কার হাতের লেখায় কয়েকটি লাইন:

বাবা, কাল তোমাকে বলেছিলুম, বিশ্বাস রেখো। পাছে কথার নড়চড় হয়ে যায় তাই জেনেশুনেও এই অন্যায় পথেই যেতে হল। এতে তোমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হল না। জানি না কত হাজার টাকা বাঁচাতে পারলুম। জমির দাম আর ছেলের দাম আর সোনার দাম বেড়েই তো চলেছে! মেয়ের দাম ক্রমশই কমছে। হঠাৎ মনে হল তাই চলে যাচ্ছি। কোনও দুঃখ নেই আমার। তুমি বাড়িটা শুরু করে দিয়ো। মায়ের খুব ইচ্ছে। কনট্রাক্টার কাকু প্ল্যানটা ভারী সুন্দর করেছে। দক্ষিণের বারান্দায় নতুন একটা বেতের চেয়ার রেখো তোমার জন্যে। নতুন বাড়ি আমার আর দেখা হল না। তা না হোক গে। কালকের চায়ে ঠিক মতো মিষ্টি হয়েছিল তো! তুমি আর মা আমার প্রণাম নিয়ো। তোমাদের ঝুনু॥

ঘুড়ি কেটে গেলে হাতের সুতো যেরকম আলগা হয়ে যায়, আমার মনের অবস্থা ঠিক সেইরকম হয়ে গেল। কী, এ কী হল! এখন আমি কী করব? কোথায় যাব? এমন হয়? মানুষের জীবনে এমন হয়? আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে মরে যাই।

রুনু বললে, 'কিছু একটা করো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে?'

'তোর মা?'

'মা তো এখনও মরেনি। ঝুনু তো প্রায় শেষ।'

ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ছিটকে বাইরে এসে পড়লুম। আঙুলের মাথায় ভীষণ লেগেছে। আশ্চর্য! যার এত বড় বিপদ তারও লাগে! কেমন যেন কলের পুতুলের মতো হয়ে

গেছি! এই সময় সুপ্রিয়া যদি পাশে থাকত! সারাজীবন যতই হম্বিতম্বি করি না কেন, বন্দুক দেগেছি বউয়ের কাঁধে রেখে।

এ আমি কোথায় যেতে কোথায় এলুম। রান্নাঘরে এসে পুবমুখো জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অ্যালুমিনিয়ামের পাত মোড়া গ্যাসের টেবিল। ছড়িয়ে আছে দেশলাই, চায়ের চামচ, স্টিলের সাঁড়াশি, চায়ের ছাঁকনি। সবই কেমন যেন অসত্য! খেলনার মতো পড়ে আছে। কোনও বাচ্চা খেলতে খেলতে চলে গেছে।

চমকে উঠলুম। রুনুর গলা, 'এ কী তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কী আশ্চর্য! আমিই তা হলে ডাক্তার ডাকতে যাই।'

'পীতু তো গেছে।'

'সেই অপেক্ষায় বসে থাকলে হবে। শেষ চেষ্টা করতে হবে না!'

'তোর মা?'

'তুমি মায়ের চিন্তা ছেড়ে ঝুনুর কথা একটু ভাবো।'

মেয়ের তাড়া খেয়ে রাস্তায় নেমে এলুম। এত লোক পৃথিবীতে তবু আমার এমন বিপদ! আমি এত একা! যে-কোনও একদিকে হাঁটতে থাকি, তারপর যা হয় হবে। ওই তো কালই পড়লুম— বি. এ গোট। পাল পাল ছাগলের সঙ্গে পায়ে পায়ে।

গাড়ির হর্ন শুনে একপাশে সরে দাঁড়ালুম। জল জমে আছে, গায়ে কাদার ছিটে লাগবে।

গাড়িটা পাশে এসে ব্রেক কষল, 'কাকাবাবু কোথায় চললেন এমন বেশে?'

অনুপ। সেই অনুপ ভাদুড়ী। ঘিয়ে রঙের নতুন গাড়ি। নিজেই চালাচ্ছে। সেদিন খুব ব্যঙ্গ করেছিলুম। আজ কেন এত ভাল লাগছে? কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে।

'আমার বড় বিপদ বাবা।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুপ জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে?'

'তোমার কাকিমা মৃত্যুশয্যায় আর ঝুনু বোধহয় এতক্ষণে মারাই গেছে।'

'সে কী। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে!'

'না, ঝুনু বোধহয় আত্মহত্যা করেছে। আর তোমার কাকিমা ধনুকের মতো পিছনে বেঁকে গেছে।'

'আচ্ছা! তার মানে স্পন্ডিলাইটিস?'

'সারে? ও অসুখ সারে?'

'অফকোর্স। গলায় কলার পরালে তিন মাসেই সোজা হয়ে যাবে। এদিকে যাচ্ছেন কোথায়?'

'বোধহয় ডাক্তার ডাকতে।'

'এদিকে ডাক্তার! এদিকে ডাক্তার কোথায়? আসুন। গাড়িতে উঠুন।'

অনুপ দরজা খুলে দিল। আসনে বসে এই প্রথম নিজের পোশাক নজরে পড়ল। লুঙ্গির মতো পরা ধুতি। গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। বুকের কাছে ময়লা পইতে উঁচু হয়ে আছে।

'আপনাদের ডাক্তার?'

'ওই যে, কী যেন নাম? ওই যে গো। হলদে সাইনবোর্ড।'

'সে আবার কী? নামটা বলুন। দেয়ার আর ফোর্টিন ডক্টরস ইন দিস মহল্লা। সকলেরই তো হলুদ সাইনবোর্ড।'

'মনে পড়েছে ডক্টর ভট্টাচার্য।'

'আই সি সুনন্দা মেডিক্যাল হল।'

চোখের পলক না পড়তেই ডাক্তারখানার সামনে গাড়ি চলে এল। চেম্বার বন্ধ।

অনুপ বললে, 'চেম্বার তো এখনও খোলেনি।'

'তা হলে বাড়িতেই চলো।'

'কার বাড়ি?'

'ডাক্তারবাবুর বাড়ি।'

'দ্যাটস রাইট।'

গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। চলছে গাড়ি। ছেলেটা বেশ ভালই চালায়। বেশ হয় এ গাড়ি যদি কোথাও না থেমে সোজা চলতেই থাকে। আমার বাড়িতে আমি আর ফিরতে চাই না। জীবনের যেটুকু অতীত হয়ে গেছে 'সিল' করে জলে ফেলে দাও। আবার নতুন করে শুরু করা যাক। তা যে হবার নয়।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। আহা, দেখার মতো বাড়ি! জিনিস একটা বানিয়েছেন! অনুপ নামল, আমাকে বললে, 'বসুন আপনি। আমি ডেকে আনছি।'

ভেতরে চলে গেল। কোলের ওপর ডানহাতটা পড়ে আছে। নিজের হাতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। বয়েসে মানুষের রোমকূপ কীরকম স্পষ্ট হয়। লোম কীরকম শক্ত খড়খড়ে হয়েছে। গোটাকতক পেকে সাদা। এই হাত ঝুনুকে একবার চড় মেরেছিল। ঝুনু! কই চোখে জল আসছে না কেন? ঝুনু আমার মেয়ে। কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেতুম যখন ছোট ছিল।

অনুপ ফিরে এল, 'ডাক্তারবাবু আপনার বাড়িতেই গেছেন।'

'আমি তা হলে নেমে পড়ি।'

'নেমে পড়বেন কেন? বাড়ি যাবেন না?'

'তুমি যাবে ওদিকে?'

'বাঃ, যাব না! আপনার এত বড় বিপদ! একটা গাড়ি থাকলে কত সুবিধে? আপনি অমন দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঝুনু কী খেয়েছে বলো তো?'

'কী আবার! ঘুমের ওষুধ। যা আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।'

অনুপ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। আংটির পাথর আলো চমকাচ্ছে। সাদা পাথর। কী অসম্ভব জ্যোতি! মনে হয় হিরে। বেশ লাগে পাথরে আলোর ঝিলিক। কোনওদিন যদি আবার আমার জার্নাল লেখার সময় পাই, তা হলে লিখব:

মধুর সাগরে মাছি প্রাণ হারায়।
ফুলে ফুলে মাছি তাই মধু খায় ॥
আলোর সমুদ্রে আলো নিজেকে হারায়।
জোনাকি সহজে তাই চোখ কেড়ে নেয় ॥

সেই আমার বাড়ির সামনেই গাড়ি দাঁড়াল। মানুষ গোরুকে সেই গৃহ-গোশালাতেই ফিরতে হয়। সংসারী জীবের নাক ফুটো করে কর্তব্যের লাগাম পরানো। পালাবার পথ নেই। এরা আমার কেউ নয়। যখন জন্মাই তখন এরা কেউ ছিল না। সময়ের বাঁকে বাঁকে ভূতের মতো আমার ঘাড়ে চাপার অপেক্ষায় ছিল। শয়তানের দল। চুষে চুষে আমায় ছোবড়া করে দিয়েছে। এ খেলায় যে দামে টিকিট কেটেছি, সে দামের মজা তো পাইনি! সবাই বলেছিল, পিনাকীরঞ্জন বড় জমাটি নাটক। সব শো-তেই ফুল হাউস। দে আর ফুলস!

'কী নামবেন না?' অনুপ দরজা খুলে দিয়েছে। যেন বিয়ে করতে এসেছি। সুপ্রিয়া সেজেগুজে নাকে নথ পরে বসে আছে।

'হ্যাঁ নামব। নামতে তো হবেই, জল যেমনই হোক না কেন?'

সবুজ রঙের আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। তার মানে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। তবে আর ভাবনা কী! আজকাল সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ওষুধ বেরিয়ে গেছে। কেউটে সাপের কামড়েও মানুষ বেঁচে যায়। সিঁড়িতে সার সার জুতো। এ কার বাড়ি? মনে হচ্ছে বিয়েবাড়ি। কী জানি কী হচ্ছে ওপরে!

সোনার মতো রোদ উঠেছে। ঝলমল করছে চারপাশ। বারান্দা জুড়ে এক রাশ কালো কালো মানুষ। এত মানুষ তো আমি চাইনি। সত্যি বলছি, আমার কেমন যেন ঘোর লেগে গেছে। আমার কাঁধে কেউ হাত রাখলেন। কে? অক্ষয়বাবু!

'কী আশ্চর্য আপনি?'

ভরাট মুখে ভারী হাসি, 'কী খুব বিপদ?'.

'আর কী! সব শেষ।'

'যান ঘরে যান।'

'কোন ঘরে?'

'মেয়ের ঘরে। আপনার স্ত্রীকে আমরা আই-ডি-তে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।'

'আই ডি? বৈদ্যুতিক চুল্লি?'

অক্ষয়বাবু কাঁধটা চেপে ধরলেন, 'মাথার ঠিক রাখুন, বেসামাল হবেন না। ইনফেকশাস ডিজিজ হসপিট্যালে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কী হয়েছে সুপ্রিয়ার?'

'টিটেনাস।'

'ধনুষ্টঙ্কার? তা হলে তো আর বাঁচবে না।'

'সে কথা বলার আমরা কে? আমরা কেউ না। যান ভেতরে যান।'

পাড়ার অনেকেই জড়ো হয়েছে। ঘর একেবারে ঠাসা। আশেপাশের বাড়ির ঝিয়েরা কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। এখনও শাড়ির আঁচলে হাত মুছছে। সারাঘর তেলচিটে গন্ধে ভরে গেছে। বেশ জোয়ান গোছের মহিলা এক ফিচকে মহিলাকে বলছে— 'এ সেই কেস, বুঝলে? আজকাল যা হয় আর কী। বুঝেসুঝে মিশবে না! এসব এখন ঘরে ঘরে।'

দু'জনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পীতু প্রায় কোণঠাসা।

ডাক্তারবাবু ঝনুকে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে ঘরের অবস্থা দেখে বললেন, 'কী সর্বনাশ! এরা সব কোত্থেকে এল? যাও, যাও সব বাইরে যাও। বাতাস ছাড়ো, বাতাস।'

দরজার কাছ থেকে কে একজন প্রশ্ন করলে, 'কী খেয়েচে? ঘুমের ওষুধ, না অ্যাসিড?'

আর একজন বোধহয় সবে এলেন। জানার জন্যে ভীষণ উদ্বিগ্ন, 'মরেচে? মরেচে?'

ভিড় থেকে ধমক এল, 'চোপ! ডাক্তার অ্যায়চে। খপর বেরুইনি।'

আমাকে বাইরের লোক ভেবে পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করলে, 'কেসটা কী মশাই! পরীক্ষার পাশ ফেল? না লাভ অ্যাফেয়ার্স?'

আমি সত্যিই যেন বাইরের লোক। সেইভাবেই উত্তর দিলুম, 'ফ্রাসট্রেশান।'

'সর্বনাশ! ওই অসুখ আজকাল খুব হচ্ছে। ঘরে ঘরে। একবার ধরলে নিস্তার নেই। জল ফুটিয়েই খাও, আর ফেটিয়েই খাও! ধরেচে কী মরেচে!'

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রুদ্র মূর্তি, 'গেট আউট, ক্লিয়ার আউট।'

দু'হাত দু'পাশে তুলে সামনে এগোচ্ছেন, যেন মুরগির পাল তাড়াচ্ছেন। ঘর খালি করে দোরে খিল লাগালেন। ফিরে আসতে আসতে বললেন, 'নুইসেনস!'

আমার দিকে চোখ পড়ল, 'এ কী? একটা রয়ে গেল! গেট আউট।'

'আমি ঝনুর বাবা।'

'আই সি। বাপ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন? ভিড় হাটাতে পারছেন না!'

চুপ করে রইলুম। কী যুগ পড়েছে! গণ-অভ্যুত্থান হলে পেনিসিলিন দিয়ে ঠেকানো যাবে! ফ্ল্যাট করে দিয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলুম, 'ডাক্তারবাবু, আছে, না গেছে?'

'এখনও আছে। শিগগির চার-পাঁচ কাপ আইসক্রিম, চার-পাঁচ বোতল কোল্‌ড ড্রিঙ্কস, আর প্লেন ওয়াটারের ব্যবস্থা করুন।'

'আইসক্রিম? সকালে আইসক্রিম?'

'সময় নষ্ট না করে, ডু অ্যাজ আই সে। ডোন্ট আস্ক কোয়েশ্চেনস।'

পীতু এগিয়ে এল। দরজার খিল খুলতে খুলতে বললে, 'বাবা, বাইরে এসো।'

আমার মাথায় ঝুনুর চেয়ে সুপ্রিয়ার চিন্তাই বেশি। ঝুনুর তো কষ্ট হচ্ছে না। কেমন প্রশান্ত, সমাহিত! সুপ্রিয়া যে যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে!

'ডাক্তারবাবু, হঠাৎ টিটেনাস হয়ে গেল কী করে?'

'আপনারাই জানেন! বাঙালির মতো কেয়ারলেস জাত আর দুটো আছে? অ্যাম্বুলেন্স এসেছে?'

পীতু দরজা খুলে বারান্দায়। ভিড় নেমে গেছে। এই একটা সুবিধে, এক জিনিস বাঙালির বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আবার খবর নেওয়া যাবে পরে। কেউ মরলটরল কি না!

দরজার সামনে রুনু। পীতু জিজ্ঞেস করলে, 'মা কোথায়?'

'অনুপদা আর বাবার বন্ধু এইমাত্র নিয়ে গেল অনুপদার গাড়ি করে।'

'তুই গেলি না কেন?'

'উনি বললেন, ঝুনুর কাছে একজন মহিলার থাকা দরকার।'

পীতু প্যান্টের পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বললে, 'তুমি সেদিন অক্ষয়বাবুর বাড়িতে ফেলে এসেছিলে।'

'সে কী? একেবারে বিস্মরণ!'

'দাও ঝট করে কিছু টাকা দাও। কুইক, কুইক।'

'আইসক্রিম কী হবে? ডাক্তারবাবু খাবেন?'

'তুমি আজ খুব বেসুরে বলছ। ঝুনুকে খাওয়াতে হবে।'

'খাবে কী করে! ও তো অচৈতন্য!'

'খাওয়াতে হবে।'

'এ আবার কী চিকিৎসা!'

'একমাত্র চিকিৎসা। যেমন করেই হোক ওয়াটার লেভেল হাই রাখতে হবে।'

আমার ব্যাগ! এটা আমার ব্যাগ! আমার ব্যাগ টেবিলের ড্রয়ারে। অক্ষয়বাবুর ভুল হয়েছে। যাই হোক, খুলি। খুলে দেখি। প্রথম খাঁজেই পাট পাট কয়েকখানা একশো টাকার নোট। পাঁচখানা। শেষ মাসে এত টাকা! অসম্ভব! এ অন্যের ব্যাগ।

আমি দেবার আগেই পীতু ছোঁ মেরে একশো টাকার একটা নোট তুলে নিল। অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই কোনও উদ্বেগ নেই। ঘটনা ঘটছে। দেখছি। দেখে যাচ্ছি। যা হবার তা হবে। ভেতরে একটা পালাই পালাই ভাব হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নির্জনে কোনও গাছতলায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকি। বসে বসে পাখির গান শুনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি বলে বিশ্রী লাগছে। যেন ফাঁদে পড়ে গেছি।

পীতু ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ির দিকে দৌড়োল। আস্তে যা বাবা। তুই আবার পড়িসনি। দু'জনেরই শখের মৃত্যু। মেয়েটির সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। জীবনে আর কিছুই খুঁজে পেলে না। প্রেম! তাও যদি বিশ্বপ্রেম হত বলার কিছু ছিল না। আর মেয়ের মা! সারা জীবন ধনুকে টংকার মারতে মারতে টংকার আটকে ধনুষ্টংকার।

রুনু বললে, 'চোখ দুটো মুছে ফেলো বাবা।'

'কেন রে?'

'দু'চোখে জল গড়িয়ে এসেছে।'

ধুতির খোঁটে চোখ মুছে নিলুম। সত্যিই তো কখন জল এসে গিয়েছিল চোখে। টের পাইনি।
'তোমাকে চা করে দোব এক কাপ?'
'চা? সে কী রে, আজকে চা খেতে আছে?'
'চা না খেলে তোমার তো বাথরুম হবে না।'
ঘরের ভেতর থেকে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কই কী হল? আপনারা যে সব পালালেন!'
রুনু বললে, 'এই যে আসছি, পালাইনি।'
ঝুনু চিত হয়ে শুয়ে আছে। যেন পাথরের মূর্তি। ছিল বেদিতে। শুয়ে পড়েছে হঠাৎ।
'ডাক্তারবাবু কিছুই কি করার নেই?'
'অনেক কিছুই করার আছে। আপনার মেয়ে হঠাৎ এইরকম করে বসল! ভেরি স্যাড। সুইসাইড নোটটা যত্ন করে রেখেছেন?'
'সেই চিঠিটা? কেন বলুন তো!'
'আপনাকে মশাই যত দেখছি, তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। সিম্পলি ক্যালাস। মেয়ে মারা গেলে কী করবেন? পুলিশে তো বারোটার জায়গায় আঠারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।'
'চিঠিটা কোথায় রাখলে তুমি, পড়ে রাখলে কোথায়?' রুনুও ধমক দিচ্ছে আমাকে।
'দাঁড়া দেখি, জামার পকেটটা দেখি।'
'তুমি তো পরে আছ গেঞ্জি। পকেট পাচ্ছ কোথায়!'
'ও হ্যাঁ। ঠিকই তো। মনে পড়েছে, ওর বালিশের তলাতেই রেখেছি।'
বালিশের তলায় হাত চালিয়ে রুনু চিঠিটা বের করল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার কাছে রেখে দাও। বাবার হাতে দিয়ো না। মাথার ঠিক নেই।'
পীতু এসে গেছে। সঙ্গে পীতুর এক বন্ধু। হাতে একটা বড় ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কেই মনে হয় আইসক্রিম আছে। জিনিসটা ঠিক জোগাড় করেছে। চার বোতল কমলালেবু রঙের কোল্‌ড ড্রিঙ্কস।
ডাক্তারবাবু বললেন, 'এখন আপনাদের দুটো কাজ। ঠোঁট ফাঁক করে খাওয়ানো, আর মাঝে মাঝে একে খোঁচানো। গভীর ঘুমে যেন তলিয়ে না যায়! আত্মীয়-স্বজন দু'-চারজনকে ঘরে বসান। তারা অনর্গল জোরে জোরে কথা বলে যাক। সাউন্ড লেভল হাই রাখুন। অ্যাজ হাই অ্যাজ পসিবল। তলিয়ে না যায়। কিপ হার ফ্লোটিং।'
ঝুনু আইসক্রিম খাচ্ছে। খাওয়ানো হচ্ছে। আইসক্রিম, কোল্‌ড ড্রিঙ্কস, জল। জল, ড্রিঙ্কস, ক্রিম।
ভাল দাওয়াই। সুন্দর ট্রিটমেন্ট। সুপ্রিয়ার খবরের কাগজ বিক্রির টাকা তলিয়ে গেছে। কিন্তু এই ব্যাগটা কার? কড়কড়ে পাঁচশো টাকা! কার টাকা কে খরচ করে!
পীতু, পীতুর বন্ধু আর রুনু একটু একটু করে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে। ঠিকই বলে তা হলে, জলই জীবন।
'আচ্ছা, এই তা হলে চলুক। আমি এখন চলি, পরে আবার আসব। তেমন কিছু হলে ঝাঁ করে খবর পাঠাবেন।'
ভিজিট দেবার জন্যে ব্যাগ খুলছি, হাত চেপে ধরলেন। প্রবীণ মানুষ। গৌরবর্ণ। হাতে পাকা পাকা লোম, 'ভিজিট থাক। ওসব পরে হবে, একেবারে। সব শেষ হয়ে গেলে। আপনি বরং আপনার স্ত্রীর খবর নিন একবার। হার কেস ইজ মোর ক্রিটিক্যাল দ্যান ইয়োর ডটার। আমি লিখে দিয়েছি, দে উইল টেক এভরি কেয়ার। তবে কিনা, আফটার অল দ্যাট ইজ টেটেনাস। তুমি মা তোমার বোনের ভার নাও, এঁদের ছেড়ে দাও তোমার মায়ের জন্যে। কী দুর্যোগ! কী ঘোর দুর্যোগ!'
ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছেন। ঘরের অর্ধেক বাতাস যেন বেরিয়ে গেল। ঘর খালি হয়ে গেল। ঝুনুর মুখে আলো পড়েছে। যেন মোমের মুখ!

'শোনো, এভাবে গুম হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। সবই যখন করতে হবে, চা খেয়ে নাও। যা করার সেরে নাও, হাসপাতালে যেতে হবে।'

পীতু চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। নিজেই চা করেছে। আর এক কাপ চলেছে রুনুর জন্যে। বিপদে মানুষ বিভেদ ভুলে যায়। পীতুতে আর রুনুতে বছর ছয়েক বাক্যালাপ বন্ধ। আবার কেমন কাছাকাছি চলে এসেছে দু'জনে।

গাড়ির শব্দ বাইরে। বাড়ির সামনেই থেমেছে। অনুপ ফিরে এল। সুপ্রিয়ার অ্যাডমিশান হয়ে গেল তা হলে! এখনও আছে, না চলে গেছে। বেশ ভারী পায়ের আওয়াজ। অনুপ তো অত ওজনদার নয়। তার চলন ক্যাঙারুর মতো। তা হলে অক্ষয়বাবু। আমার বিপদের বন্ধু। চাণক্যের নীতি অনুসারে, প্রকৃত পরীক্ষিত বন্ধু।

'পিনাকীবাবু বাড়ি আছেন। পিনাকীবাবু?'

বেশ ভরাট গলা। নির্ঘাত পুলিশের লোক। সুইসাইড করতে গিয়ে মারা না গেলে পুলিশ কেস হয়। এ সেই কেস। যাও ঝুনু। এবার ম্যাও সামলাও। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। বাঁকের মুখে বিশাল চেহারার এক রাগী বৃদ্ধ। চামরের মতো একরাশ চুল, ব্যাকব্রাশ করা। নিভাঁজ সায়েবি পোশাক।

'আপনি পিনাকীরঞ্জন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। আসতে পারি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। অবশ্যই পারেন।'

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলেন। চমৎকার চেহারা। দেখলেই মনে হয় এবেলা হাফ ওবেলা হাফ কেজি মাখা সন্দেশ রোজকার বরাদ্দ। একেবারে চিরস্থায়ী আইসক্রিমের মতো চেহারা। বারান্দায় পা রেখে মুখ দিয়ে হাউস করে এক ব্যাগ হাওয়া ছাড়লেন। কেকের ওপর জন্মদিনের বাতি বসানো থাকলে, সবক'টা নিবে যেত একসঙ্গে।

'হোয়্যার ইজ শি?'

'কার কথা বলছেন? আপনি আগে বসুন। একটু বিশ্রাম।'

'ইয়েস, আই মাস্ট সিট। না বসলে আমার রাগ বাড়তে থাকে। জীবনে ডজনখানেক বাঘ মেরেছি। এখন শৃগালের রাজত্ব চলেছে। আমি কে? আমাকে চেনেন আপনি?'

'আজ্ঞে না?'

'মোহিত মুখোপাধ্যায় নাম শুনেছেন?'

'মোহিত, আজ্ঞে হ্যাঁ, শিকারি, ডাক্তার, লেখক।'

'ইয়েস থ্রি-ইন-ওয়ান। হোয়্যার ইজ শি? বাড়িতে, হাসপাতালে না মর্গে?'

'ঝুনুর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, ঝুনু, সেই বিকৃতমস্তিষ্কা যুবতী। ভবেন পাকড়াশীর চিঠি পেয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ডোন্ট সে আজ্ঞে আজ্ঞে রিপিটেডলি, লাইক এ মেসবাড়ির চাকর। গিভ নিট অ্যানসার্স লাইক নিট স্কচ। আমি ভবেন পাকড়াশীর বড় মামা। দি ওনলি সারভাইভিং মামা। এ প্রডাক্ট, নট এ বাইপ্রডাক্ট অফ দি আর্লি পার্ট অফ দিস সেঞ্চুরি। এই নিন পড়ুন।'

দু'টুকরো কাগজ। একটা ঝুনুর হাতে লেখা, অশোক, অপেক্ষা কোরো আসছি। দেহ না ছাড়লে ওরা ঝামেলা করবে। যাদের দেহ তাদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কাল সকালে বৈতরণীর তীরে দেখা হবে। তোমার ঝুনু ॥

দ্বিতীয় চিঠি, বড়দাদু, তুমি খানিক বুঝবে। এই ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, টাকা আনা পাইয়ের জগৎ যাদের ভাল লাগে তাদের লাগুক। দুই আর দুইয়ে চার আমার জন্যে নয়। আমি এক আর একে দুইয়ের জগতে চললুম। অবুঝ পিতাকে বোঝাবার চেষ্টায় লজ্জা আর তিক্ততাই বাড়বে। তুমি ম্যানেজ করে দিয়ো। আমেন, অশোক ॥

চিঠি শেষ হতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'হোয়্যার ইজ হি? এখানে না ওখানে?'

'হোয়্যার ইজ শি?' বৃদ্ধ এই প্রথম হাসলেন।

'ঘরে। গভীর ঘুমে। আইসক্রিম আর কোল্ড্ ড্রিঙ্কস চলেছে।'

'সেই একই ব্যাপার চলেছে ও তরফে। স্যালাইন আর গ্লুকোজ চলছে না? ফ্লাশিং ছাড়া আর তো কোনও ট্রিটমেন্ট নেই। রাসকেল স্যুইসাইড প্যাক্ট করেছে। বাংলা উপন্যাস আর খবরের কাগজের যত চুটকি খবরে এই ইয়াং রাসকেলসদের ব্রেনওয়াশ হয়ে গেছে। লিট্‌ল ইডিয়টস।'

'মারা যাবে না তো?'

'মারা!' ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। 'এ যুগের কোনও কিছুতেই কিছু নেই। ঘুমের ওষুধে ঘুম নেই, বিষে বিষ নেই, পৃথিবীতে মানুষ নেই। বেদান্তের শেষ অবস্থা। নিহিলিজমের শেষ স্টেজ।'

পীতু বললে, 'বাবা, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কী কোথাও যাবেন? হু ইজ হি?'

'আমার ছেলে। আমার একমাত্র ছেলে।'

'বাঃ, ভেরি হ্যান্ডসাম, এ গ্রোয়িং জেন্টলম্যান।' পীতুর পিঠে আদরের চাপড় মারলেন, 'কোথায় যাবে ইয়াং ম্যান?'

'আজ সকালেই মাকে আই ডি-তে ভরতি করা হয়েছে।'

'আই ডি? কী হয়েছে?'

'টিটেনাস?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি, 'টিটেনাসে বাঁচে?'

'টিটেনাসে?' ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হলেন, 'টিটেনাস, এ ডিফিকাল্ট ইনফেকশান। লড়তে হবে। আই ক্যান হেল্প ইউ। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার মন বলছে, শি উইল সারভাইভ। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। এরা এই কেচ্ছা না করলে আমি তেড়ে আসতুম না। ওদের দু'জনের এই ব্যাপার আমি জানি। যতই হোক আমার নাতি তো। কনফিডেন্সের লোক। ওর বাপটা বড় সেকেলে। ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করে না। একপাশে পঞ্জিকা আর এক পাশে পুরোহিত দর্পণ আর চোখের সামনে মা জগদম্বা। তার ওপর এক ছেলে। ওয়ান চাইল্ড সিন। এসেছিলুম দূত হয়ে। তেল তো ফুরিয়েই আসছে মহৎ কাজ যদি একটা করে যাওয়া যায়। হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে সরে পড়া। একেই বলে যোগাযোগ, ভবিতব্য। আমার কাছে আমেরিকা থেকে সদ্য আনানো একটা টকসয়েড আছে। বহুত দাম। এক মাড়োয়ারি পেশেন্টের জন্যে আনানো হয়েছিল; কিন্তু আসতে আসতেই শি এক্সপায়ার্ড। কাম টু মাই প্লেস। এখুনি। চালিয়ে দিন। আমার মন বলছে, শি উইল বি অলরাইট।'

মোহিতবাবু ঝুনুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, 'হেলেন অফ ট্রয়কে একবার নিজের চোখে দেখে যাই।' ঘরের ভেতর থেকে তাঁর মন্তব্য ভেসে এল, 'এ যে পাথরপ্রতিমা। নাতির আমার নজর আছে। স্কাউন্ড্রেল। কী রে বেটি, খুব খেল দেখালি। খাও এখন জল খাও। জলবিহার। তুমি কে মা?'

রুনু বললে, 'দিদি।'

'আচ্ছা! দু'জনে প্রায় একই রকম দেখতে। তা তুমি মা কবে এইরকম খেল দেখাবে!'

রুনু মুখ নিচু করে বললে, 'আমার ওসব ঘোড়া রোগ নেই।'

'ঘোড়া রোগ!' বৃদ্ধ হইহই করে হেসে উঠলেন। 'রাইট ইউ আর। ঘোড়া রোগ।'

আর একটা গাড়ি এসে থামল। এবার অনুপের গাড়ি। কোনও সন্দেহ নেই।

অক্ষয়বাবু ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। কাঁধে সেই ঝোলা ব্যাগ। বইয়ের ভারে টান টান। সকালের ভ্যাপসা ভাদ্দুরে গরমে চকচক করছে মুখ। শেষ ধাপ উঠলেন ডান হাঁটুর ওপর ডান হাতের ভার রেখে। অক্ষয়বাবু উঠে এলেন আর মোহিতবাবু বেরিয়ে এলেন মেয়ের ঘর থেকে। দু'জনে মুখোমুখি। মোহিতবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার! অক্ষয় তুমি এখানে?'

'আপনি এখানে?'

'তোমার সেই থিয়োরি অক্ষয়? প্রশ্ন কোরো না। সবই তো লেখা হয়ে আছে। সব সময়ের, সব জীবনের জীবনকথা। ভল্যুম খোলো। খুঁজে বের করো চ্যাপ্টার, ঠিক পাতাটি ওলটাও। দেখো, লেখা আছে অক্ষয়, মোহিত, পিনাকী, পীতাম্বর। এই বিষয়ে কত বই-ই তুমি আমাকে পড়ালে। ওই যে আমার নাতবউ ও-ঘরে খাবি খাচ্ছে।'

'আমার পাস্ট জানা নেই, প্রেজেন্ট বুঝতে অসুবিধে হবে। বোঝার সময়ও নেই। দুর্যোগ চলেছে।'

'জানি। ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছোট ছোট মেঘ, ভেসে ভেসে যায়, এই আলো, এই অন্ধকার। সবই রোটেশানাল। নাও চলো। লেট আস গো। ভেবেছিলুম চা খাব এক কাপ। যাক আর একদিন হবে।'

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন মোহিতবাবু, পেছনে অক্ষয়বাবু, তার পেছনে পীতু, সবার শেষে আমি। হঠাৎ আমার দৃষ্টি যেন দূর ভবিষ্যতে চলে গেল। ভিশান দেখছি যেন। পীতু চলে গেছে সবার প্রথমে। সে যেন মোহিতবাবুর জায়গায় চলে গেছে। ঠিক এই স্ট্যাচারের মানুষ ক্রমশই কমে আসছে। এঁদের পাশে আমরা পিগমি।

এক ধাপ নেমেই মোহিতবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, 'একটা কাজ সেরেই যাই। জেন্টলমেন ওয়ান সেকেন্ড।' ঝুনুর ঘরে ফিরে গেলেন। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি। সাদা পাথরের একটা আংটি অনামিকা থেকে খুলে ঝুনুর ডান হাতের মাঝের আঙুলে পরাতে পরাতে বললেন, 'যাক শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই হয়ে গেল।'

হাতটা ধীরে ধীরে বিছানায় নামিয়ে রেখে, এক মুহূর্ত ঝুনুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কীরকম হল। সাম থিং রং।'

খাটের পাশে ধীরে বসে কবজিতে আঙুল রাখলেন। নাড়ি দেখছেন।

প্রশ্ন করলুম, 'কী হল?'

বাঁ হাত তুলে চুপ করতে বললেন। কনুইয়ের কাছে আঙুল রেখেছেন। আমার বুকের কাছটা কেমন যেন গুড়গুড় করছে। ঘরে আর যারা রয়েছে তাদের মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। বহুকালের বাগানে, রোদে পোড়া, জলে ভেজা পাথরের স্ট্যাচু। আমার আর ধৈর্য নেই, বেশ জোরেই বললুম, 'কী হয়েছে বলবেন তো?'

মোহিতবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, 'আই অ্যাম সরি, শি ইজ নো মোর।'

'তার মানে?'

'চলে গেছে। সত্যিই সে চলে গেছে। কেসটা আপনারা ঠিক হ্যান্ডল করতে পারলেন না।' ঠিক সেই মুহূর্তের অনুভূতি আমার মনে আছে। মনে হয়েছিল, বিশাল এক বাঘ সগর্জনে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। অক্ষয়বাবু আমাকে ধরে ফেলেছিলেন। মহাশূন্যে কাটা ঘুড়ির মতো ভাসতে ভাসতে আমি বললুম, 'আপনার দামি আংটিটা খুলে নিন। মরে গেলেও এখনও মড়া হয়ে যায়নি।'

অক্ষয়বাবু বলছেন, 'কিছু কি করা যায় না?'

'এ দেশে যায় না। প্রথমেই কোনও ভাল হসপিট্যাল বা নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করলে হয়তো সারভাইভ করত। আসলে ও মরতেই চেয়েছিল। মনটাকে মৃত্যুর লেভেলে নামিয়ে এনেছিল। একবারও ভাবেনি ভুল করছে। সব সময় মনে করেছে, যা করছি, ঠিক করছি। উইল টু সারভাইভ ছিল না। না, আমি আর কথা বলতে পারছি না, আমার ভয়েস চোক্ড হয়ে আসছে।'

আমি মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়েছি। রুনু বিছানায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলছে, 'আমার ওপর ভার ছিল, আমি বুঝতে পারিনি তুই মারা যাচ্ছিস, তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস!'

অক্ষয়বাবু বললেন, 'আমাকে একবার সুযোগ দেবেন?'

মোহিতবাবু বললেন, 'কী করতে চাও তুমি? তুমি তো ডাক্তার নও!'

'স্পিরিচুয়াল হিলিং।'

'স্পিরিচুয়াল। করে দেখতে পারো। মির‍্যাকল তো হয়। তবে শি ইজ ক্লিনিক্যালি ডেড।'

'আপনারা সকলেই তা হলে বাইরে যান।'

আমরা সকলেই কলের পুতুলের মতো বাইরে চলে এলুম। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রুনু আর পীতুর কান্না থেমে গেছে। ঘোর অন্ধকারে কোথাও আলপিনের মাথার মতো আলোর একটা বিন্দু দেখা গেছে। মোহিতবাবু পায়ের ওপর পা তুলে, দু'চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বসে আছেন। ওই অবস্থাতেই আপন মনে বললেন, 'সময় নষ্ট হচ্ছে। ওদিকে আর একটা ক্রিটিক্যাল কেস। ভ্যাকসিনটা তাড়াতাড়ি পড়ে গেলে কাজ হত।'

আমরা শুনলুম, কেউ কোনও কথা বললুম না। আমাদের চোখ পড়ে আছে বন্ধ দরজার দিকে। মন পড়ে আছে ঘরের ভেতরে। দেয়ালে পিঠ রেখে অনুপ দাঁড়িয়ে আছে। মনের এই অবস্থাতেও মনে হল প্রশ্ন করি, অনুপ তুমি কার জন্যে এ বাড়িতে আসতে? রুনু না ঝুনু।

একটু একটু করে ছায়া সরছে। সময় যেন চলেছে ভরপেট অজগরের মতো। এত দুর্বল লাগছে, ভাল করে তাকাতে পারছি না। ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করেন অক্ষয়বাবু। তাঁর কী এমন ক্ষমতা! তবে সেই মহাজ্ঞানী ব্যাধ-এর কথা স্মরণ করো।

স্থির মোহিত, স্তব্ধ পীতু, উদাস অনুপ, প্রস্তরবৎ রুনু, চোখ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন বলছে, কী ফাঁদে ফেলে দিলে জগজ্জননী। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ইশারায় অক্ষয়বাবু আমাকে ডাকলেন। ঢুকতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার বহু পরিচিত ঘর, তবু কী অদ্ভুত লাগছে! গা ছমছম করছে। বিছানায় মৃতদেহ। জানলার কাছে সার সার চার বোতল কমলালেবু রঙের পানীয়। একটা বড় ফ্লাস্ক। অক্ষয়বাবু মেঝেতে বসেছিলেন। গোটাকতক পোড়া দেশলাই কাঠি পড়ে আছে। আবার মেঝেতেই বসলেন:

'আমার সামনে বসুন।'

'কিছু পেলেন?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিতে জানালেন, চুপ। ভদ্রলোকের চোখ দুটো কেমন যেন হয়ে গেছে। স্বাভাবিক বলা যায় না। চাপা গলায় বললেন, 'কী চান?'

'তার মানে?'

'খুব ভেবে উত্তর দিন। যে-কোনও একজনকে আপনি পেতে পারেন। হয় মেয়ে, না হয় স্ত্রী। আপনি কাকে চান? একজনকে ছেড়ে দিতে হবে। বলুন, স্ত্রী অথবা কন্যা?'

সাংঘাতিক প্রশ্ন। এভাবে তো কোনওদিন ভেবে দেখিনি। কেউ চলে গেলে, মৃত্যু এসে নিয়ে গেলে, দুঃখে শোকে ধীরে ধীরে সেই শূন্যতায় শূন্যতা আর থাকে না। ভরাট হয়ে যায়। এ তো অন্য ব্যাপার। মৃত্যু সামনে। উদ্যত খড়্গ। বলো, কে থাকবে, কে যাবে?

অক্ষয়বাবু তাড়া লাগালেন, 'ভাববার বেশি সময় পাবেন না। দ্রুত সিদ্ধান্তে আসুন। তাঁকে আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না। স্ত্রী অথবা কন্যা। যে-কোনও একজন।'

'আমি ঠিক করতে পারছি না অক্ষয়বাবু। আপনিই বলে দিন, কার থাকা উচিত, কার যাওয়া উচিত?'

'তা হয় না। নিজের জীবনের সিদ্ধান্তে নিজেকেই আসতে হবে। নিজের সিদ্ধান্ত অন্যে নিতে পারে না। ভাবুন। চোখ বুজিয়ে ভাবুন। আর মাত্র মিনিট দুই সময় পাবেন।'

অক্ষয়বাবুকে দেখে ভয় লাগছে। তান্ত্রিকের চেহারা। কেমন যেন অচেনা! দু'মুঠোয় দুটি জীবন ধরা। যা বলব তাই হবে। হয় এটা, না হয় ওটা। চোখ বুজিয়েছি। গাড়ির সামনে বসে পথের দিকে তাকালে যেমন হয়! হু হু করে পথ গুটিয়ে চলেছে পেছন দিকে। অতীত ফিরে আসছে সবেগে। সমস্ত ঘটনা একে একে।

সঞ্জয় উবাচ:

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥

পিনাকীরঞ্জন, দেখো মহাকালের মুখগহ্বরে পাশাপাশি, পাশাপাশি কেমন সাজানো রয়েছে জীবন থেকে তুলে নেওয়া জীবন। যুবতী প্রেমিকা সুপ্রিয়া, সুন্দরী মোহময়ী সুপ্রিয়া, গর্ভবতী সুপ্রিয়া, মা সুপ্রিয়া, প্রখরা প্রৌঢ়া সুপ্রিয়া। বর্ষার রোমাঞ্চ, বসন্তের বিরহ, শীতের সান্নিধ্য। মানিনী, কামিনী, হাস্যময়ী, ব্রীড়াবনতা, প্রগল্ভা, প্রবলা। কার ছায়ার তলায় বসে আছে পিনাকী। অজগরে অজ গিলেছে।

চোখ মেলেছি, অক্ষয়বাবু স্থির তাকিয়ে আছেন। ধীর শান্ত গলা:

'কী, কী হল? সিদ্ধান্ত কী?'

'দু'জনকেই রাখা যায় না? একজন জায়া, অন্যজন দুহিতা। একজন অর্ধাঙ্গিনী, অন্যজন অঙ্গজ। কাকে রাখি। কাকে ছাড়ি?'

'বৃথা সময় নষ্ট করছিস পিনাকী।'

এ একেবারে অন্য গলা। চেহারা আরও পালটে গেছে। বইবিক্রেতা অক্ষয় নয়। এ সেই পোড়োবাড়ির রাতজাগা রহস্যময় পুরুষ। অসতী সাধিকার আশ্রিত সন্তান।

'বৃথা সময় নষ্টে দু'জনেই চলে যাবে। দু'জনকেই হারাতে হবে। এ আদালতে তর্ক চলে না। বিচার হয়েই আছে। দুটো রায় তোমার সামনে, হয় এর মৃত্যু, না হয় ওর মৃত্যু। একজনকে যেতেই হবে। চিল যখন পড়েছে কুটো না নিয়ে উড়বে না। বলো শিগগির।'

'তা হলে আমাকে নিয়ে যাক।'

'না, তা হবে না। ভোগ তোমার। সবটা করে তোমাকে যেতে হবে। যতটা সুতো ছাড়া আছে ঠিক ততটাই গুটোতে হবে। চোখ বুজোও। আমি তালি মারার সঙ্গে সঙ্গে যাকে চাও তার নাম বলো। এই শেষ।'

অক্ষয়বাবুর শরীর কাঁপছে। ভর হলে এমন হয়। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলছে! ভয়ে ভয়ে চোখ বুজোলুম। বাইরে এত আলো ভেতরে কী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মন এবার যুক্তি দিলে, ঝুনু, তোমার মেয়ে, সে তো নিজেকে মেরেই ফেলেছে। যদি সে জীবন পায়, তা হলেও সে আর তোমার থাকবে না। বেতের চেয়ারে বসে আছে দাদাশ্বশুর। তা ছাড়া তোমার দুই মেয়ে। দুই থেকে এক নিলে থাকে এক। আর এক থেকে এক নিলে থাকে শূন্য। তোমার একটিই স্ত্রী। দুঃখসুখের জীবনসাথী। স্ত্রী গেলে তুমি তো কাটাঘুড়ি!

তালির শব্দে চমকে উঠেছি। চোখ মেলেই যেন নেশার ঘোরে বলা, ঝুনু।

অক্ষয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে আর এক তালি।

আমি দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরেছি! এ আমি কী বললুম! কী বলতে গিয়ে, কী বলে ফেলেছি! এ আমি কী করলুম! আমি সংশোধন চাই। আমার মনে যা ছিল, মুখ তা বলেনি। ভুল করে ফেলেছে।

'অক্ষয়বাবু, আমার অনুরোধ, সুপ্রিয়া বলতে গিয়ে ঝুনু বলে ফেলেছি। আমাকে আর একবার সুযোগ দিন। আর একটিবার। আমি সর্বনাশ করে ফেলেছি।'

অক্ষয়বাবু জমাট মূর্তির মতো হেলে পড়েছেন দেয়ালে। কয়লা থেকে আগুন তুলে নিলে যেমন বর্ণ হয়, ঠিক সেই বর্ণ শরীরে। ঝুনুর গলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরোল, আঃ। আমার ভেতর মুচড়ে চোখ দিয়ে জল নামছে প্রপাতের মতো। নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজে সই করেছি। সংসারের স্বপ্ন আমার চুরমার। দেখতে পাচ্ছি, আমি যাবার আগেই আমার চোখের সামনে পূজারি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এক কলি ধূপের ধোঁয়া গানের চরণের মতো শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে আমার আশা।

কর্মসন্ন্যাস যোগ

বাইশ শ্রাবণ, ১৩৯১ ॥ জীবন আমার চুরমার হয়ে গেল। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। ভেতরে কিছু নেই। পাখি উড়ে যাওয়া খাঁচার মতো অবস্থা। দানাপানির খালি পাত্র। দোল খাবার দোলনা। মোহিতবাবুর কথা রোজ ভাবি। ভগবান যাকে দেন তাকে ছপ্পর ফুঁড়ে দেন। রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য। এই কথাটি আমি এখন আমার জার্নালে লিখে যেতে পারি:

যারা প্রাচুর্যে আছে তাদেরই বংশবৃদ্ধি করা উচিত। পৃথিবীর ধমনিতে নীল রক্ত বইছে। স্পষ্ট দুটি ধারায় নদী বইছে। ভোগের ধারা। দুর্ভোগের ধারা। কোথাও কোনও যোজক নেই। যাদের কিছুই নেই, তারা কেন দুর্ভোগের উত্তরাধিকারী রেখে যায়। এই কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার নাম জীবন। সংযম যদি সম্ভব না হয় বারাঙ্গনায় গমন করো। আবর্জনা আর বাড়িয়ো না। অরণ্যে বিশাল বৃক্ষ ক্ষুদ্রকে ছায়া দান করে। জনারণ্যে বৃহৎ মানুষ কী দেয়। শুধু উপেক্ষা। দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের আর্জি, আকুতি, জীবনসংগ্রাম বৃহতের জীবনবৃত্তের বাইরে ভবিতব্য মাত্র। জন্মাচ্ছে জন্মাক, মরছে মরুক, ঝরছে ঝরুক। পীতাম্বর আমরা আগাছার মতো। শোনো পুত্র, তুমি আর সংসারী হয়ো না। মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে যাও। সন্ন্যাসী হও।

তোমাকে আজ একটা গল্প শোনাই :

এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বিহারে অনেক লেখাপড়ার পরও জ্ঞানের আলোর সন্ধান কিছুতেই পাচ্ছিলেন না। বড়ই হতাশা! অবশেষে একদিন এক চন্দ্রালোকিত রাতে সন্ন্যাসিনী বাঁকে করে এক বালতি জল নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুরনো বালতি। এক বালতি টলটলে স্বচ্ছ জল। আর সেই জলে ভাসছে চাঁদের প্রতিবিম্ব। সন্ন্যাসিনী দেখছেন, চাঁদ হাসছে জলে। হঠাৎ বাঁক ভেঙে বালতিটি পড়ে গেল। জলও নেই, চাঁদের হাসিও নেই। নিমেষে সব অদৃশ্য। যে জ্ঞানের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী এতদিন ছটফট করছিলেন, সেই জ্ঞানের আলো ঝলসে উঠল অন্তরে। তিনি ছোট্ট একটি কবিতা লিখে ফেললেন :

একবার এদিক একবার ওদিক
জলপাত্রের টালমাটাল
চেষ্টার শেষ নেই, দুর্বল বাঁশ!
দেখো, ভেঙে পোড়ো না ॥
হঠাৎ যা ভেবেছি ঘটে গেল তা,
খুলে পড়ে গেল জলপাত্র
জল নেই, ভাসমান চাঁদ নেই
কী ধরেছি হাতে!
শুধু অন্তহীন শূন্যতা ॥

পুত্র পীতাম্বর, সংসারপাত্রে জীবনের জলে সবই মায়াপ্রতিবিম্ব। থাকবে না কিছুই। কসরতের শেষ নেই। শেষে হঠাৎ একদিন পাত্র ভাঙবেই। তখন কোথায় তোমার জল! কোথায় তোমার চাঁদ ॥

পীতুর গলার আওয়াজ। সদরে কুকুর তাড়াচ্ছে। কোথা থেকে বিকট চেহারার একটা কালো কুকুর এসেছে। ঠিক যাওয়া আসার পথে ধনুক হয়ে শুয়ে থাকে। পীতুর ওপর খুব চাপ পড়েছে। হাসপাতালে যাওয়া আসা। সুপ্রিয়া এখনও বেঁচে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। মোহিতবাবু অনেক দামের শুধু নয়, দুর্লভ ওষুধ দিয়েছিলেন বলেই হয়তো মৃত্যু ধীর কদমে আসছে। আতঙ্ক! এ সেই আতঙ্ক! বোমার পলতেয় আগুন ধরানো হয়েছে। ফুলকি কেটে আগুন এগিয়ে চলেছে। কানে হাত চাপা দিয়ে তটস্থ। এই বুঝি ফাটে। এই বুঝি ফাটে! সুপ্রিয়ার জীবনের পলতে হয়তো একটু দীর্ঘ। অপেক্ষা হয়তো সামান্য বেশি।

সূর্য উঠলে শিশির থাকে না। তার মানে শিশির না থাকলে সূর্য উঠেছে। ঝুনু যে শক্তিতে ফিরে এসেছে সেই শক্তিই সুপ্রিয়াকে নিয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই।

হে শক্তিমান ঈশ্বর! তোমার বিধান। আমাদের দুঃখ-সুখ তোমাকে স্পর্শ করে না। তুমি মহতো মহীয়ান, আমরা কীটাণুকীট। তোমার খেয়ালি পদপাতে শতকীটের মৃত্যু। সে শোক তোমাকে কাতর করে না। তোমার পাপ নেই। তোমার পুণ্য নেই। কারণ, যার হাতে মৃত্যু, তারই হাতে জন্ম।

বাতাসে চুল উড়ছে। পীতু এল। কিছু আগের বৃষ্টিতে জলে ভিজেছে। প্যান্টের তলার দিকে কাদার ছিটে। ওর সামনে নিজেকে আজকাল অপরাধী মনে হয়। পুরো ধকলটা ওর উপর দিয়েই যাচ্ছে। ছুটোছুটি আমি আর পারি না। আমি বৃদ্ধ। মন আমাকে ধমকায়, পিনাকী, ভোগ করেছিলে। দু'হাতে যৌবন লুটেছিলে! আর আজ! সুপ্রিয়া ভাত ছড়াতে পারছে না, তাই তোমার মতো কাক তার আঙিনায় নেমে খাখা করছে না। কোষাগার শূন্য তাই লুঠেরার আর সে আকর্ষণ নেই।

'আজ কেমন দেখলি পীতু?'

'ক্রমশই ইমপ্রুভ করছে। তোমার ওই অক্ষয়বাবু একটা বুজরুক। ধাপ্পাবাজ। মানুষের দুর্বলতাই এদের ক্যাপিট্যাল। তোমার ওই মোহিতবাবুও এক ঘোড়ার ডাক্তার! ঝুনু আসলে বেঁচেই ছিল। নাকে সুতোর আঁশ নড়ছে না, বাস, অমনি সিদ্ধান্ত হয়ে গেল মৃত্যু। তুমি এমন সব লোকের পাল্লায় পড়ো?'

'এরা আমাকে ধাপ্পা মারবে কেন? মেরে কী লাভ! অক্ষয়বাবুকে দেখ। লোকটির নিশ্চয় কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তা না হলে ওইদিন আমাদের বিপদের সময়ে এলেন কী করে! ঠিকানাই বা পেলেন কেমন করে! তারপর দেখো কী অদ্ভুত পরোপকারী মানুষ, আমার হাত খালি, টাকার প্রয়োজন জেনে তোর হাতে কায়দা করে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন। কার স্বার্থে বল! তারপর তোমার মোহিতবাবু। তাঁরই বা কী স্বার্থ। অত দামি, দুর্লভ ইঞ্জেকশান দান করে দিলেন। মাথা খুঁড়লেও ও জিনিস আমরা এখানে পেতুম না। নিজের আঙুল থেকে হিরের আংটি খুলে ঝুনুর আঙুলে পরিয়ে দিলেন। ওর দাম জানো?'

'ওটা যে হিরে তা বুঝলে কী করে! কাচও তো হতে পারে।'

'না রে, ওসব আঙুলে হিরে ছাড়া কিছু থাকতে পারে না।'

'মানুষ মানুষকে চমকে দেবার জন্যে অনেক কিছু করতে পারে। সস্তায় হাততালি কুড়োবার ধান্দা।'

'মোটেই সস্তা ধান্দা নয় পীতু। এ সবই বেশ কস্টলি। আসলে আমরা নিজেরাই খুব সন্দেহপ্রবণ। সহজে মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না। সন্দেহের যুগে বাস করছি। যা জামাকাপড় ছেড়ে নে।'

আজ আমি অক্ষয়বাবুর বাড়ি যাব। আমাকে টানছে। একবার সত্যর সঙ্গে দেখা করব। শুনেছি ফিরে এসেছে। এ বাড়িতে আমার আর মন টেকে না। সব খালি হয়ে গেছে। যাকে নিয়ে সংসার সেই নেই। ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো, কে আর আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সমান তালে বৃদ্ধ

হবে! আমি মরলে কে বিধবা হবে! চলেছি ভাই একই ঠাঁই, সে তো আমরা দু'জন বুড়ো আর বুড়ি। তা ছাড়া ঝুনুকে আমার কীরকম অস্বাভাবিক মনে হয়। ঠান্ডা চোখে একনজরে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন জীবিতের মৃতের চোখ।

ঝুনু, তুই কি আমার মন পড়ে ফেলেছিস! তুই কি সেদিন অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমার সব কথা শুনে ফেলেছিস! মৃতের ভান করে সত্য জেনে ফেলেছিস। তোকে বলি দিয়ে সুপ্রিয়ার জীবন পেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সবার আগে আমি তো নিজেকেই দিতে চেয়েছিলুম। চাইনি? সে আমার কথার কথা! না রে! বিশ্বাস কর, আমি যেতেই চাই। আমার কোনও পদার্থ নেই। এ এমন এক যন্তর, যা শুধু শব্দই করে। জীবনে কিছুই যে করতে পারেনি। তোদের মাথার ওপর ছাদ তুলতে পারেনি। দরজায় গাড়ি জুততে পারেনি। দামি দামি শাড়ি দিয়ে শরীর মুড়তে পারেনি। ভালমন্দ খাওয়াতে পারেনি। সারা জীবন শুধু শব্দ করেছে। আর স্বার্থের সুতো ধরে টানাটানি করেছে। দে না, এবারকার মতো তোদের এই অপদার্থ বাবাকে ক্ষমা করে দে না মা!

এই চিঠি ঝুনুকে কোনওদিনই লেখা হবে না। মনের ডেডলেটার অফিসে পড়েই থাকবে। মাঝরাতে বারান্দার দিকের জানলার পানে তাকাতে ভয় করে। সেদিন ঝুনু গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মেঘের ফাটল দিয়ে ঝলমলে চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। কালো ছায়া হয়ে ঝুনু দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে চুল উড়ছে, যেন রুপোর সুতো। ভয়ে চিৎকার করতে চেয়েছি। গলা দিয়ে স্বর বেরোয়নি। সেই দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল ঝুনুতে ঝুনু নেই। অন্য কেউ প্রবেশ করেছে। সেই অসতী সাধিকা নয় তো! হয়তো তাঁর একটা শরীরের প্রয়োজন ছিল। হয় ভোগ, না হয় যোগ কোনও একটা কিছু বাকি থেকে গিয়েছিল! এত চিনি তবু এই পৃথিবী কেন এত অচেনা!

'সত্য! সত্য বাড়ি আছিস?'

মহিলা কণ্ঠ, 'কে?'

'আমি পিনাকী, সত্যর বন্ধু।'

নেপথ্যচারিণী প্রকাশ্য হলেন, 'আরে ঠাকুরপো, আসুন আসুন। এতদিনে মনে পড়ল!'

'বউঠান, আমি জোড়া খুনের মামলায় ফেঁসে গেছি।'

'খুন?'

'সব শুনবেন। চলুন আগে বসি। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের খিল খুলে গেছে। ট্রাম-বাস কোনও কিছুতেই পা রাখতে পারিনি। শেষে হনটন।'

সাদা বিছানায়, কপালে হাত রেখে সত্য চিত হয়ে শুয়ে। দু'চোখে পুরু ব্যান্ডেজ।

'পিনাকী আয়। তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর কোনওদিন পাব কি না জানি না ভাই।' সত্য হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় কী একটা খুঁজছে। সত্যর বউ বললে, 'কী খুঁজছ বলো?'

'আমার রিস্টওয়াচ।'

'ঘড়ি। ঘড়ি কী হবে?'

'হবে নয়, হচ্ছিল। এতক্ষণ কানের কাছে ধরে রেখেছিলুম।'

'সে কী? ধরে রেখেছিলে কেন?'

'দর্শনের জগৎ থেকে শ্রবণের জগতেই যেতে হবে অনু।'

'কেন তুমি খারাপটাই চিন্তা করছ! দেখবে চোখ সেরে যাবে।'

'আমাকে তোমরা আর কত স্তোকবাক্যে ভোলাবে অনু! যে জিনিস পঁচানব্বই পাঁচের সম্ভাবনায় ঝুলছে?'

সত্যর কোমরেব কাছে ঘড়িটা পড়ে ছিল। অনুপমা তুলে বালিশের পাশে রাখতে রাখতে আমার দিকে তাকাল। সে মুখের বেদনা চিতায় উঠেও আমি চোখের সামনে দেখব। এই মুখের একটা ছবি তুলে সেই জঙ্গি নেতাদের উপহার দেওয়া যেত! বন্ধুগণ, এই দেখো, তোমাদের তৈরি দেশের মুখ।

এই দেশে তোমাদেরও স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বাস করছে। কেউই খুব নিরাপদ নয়। যে মুখ আজ ছাঁচি পানে ঠোঁট রাঙিয়ে হাসছে কালই তার মুখের চেহারা এমন হতে পারে। দেশের বিবেক যে দু'চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে আছে।

'পিনাকী বসেছিস?'

'হ্যাঁ সত্য, বসেছি।'

'একটা শর্ত আছে বসার।'

'বল, কী শর্ত?'

'কোনও সহানুভূতির কথা বলবে না, কোনও মিথ্যা আশার কথা বলবে না। তুই আমাকে আমাদের ছেলেবেলার, আমাদের ছাত্র জীবনের গল্প শোনা। যখন মানুষ মানুষ ছিল। বোটানিক্সে আমাদের সেই পিকনিকের কথা তোর মনে আছে পিনাকী? মালবিকার গান?'

'মনে নেই! খুব মনে আছে। বিমল পা হড়কে গঙ্গার জলে পড়ে গেল। আর উঠতে পারে না। শেষে গৌরী গাছের আড়ালে গিয়ে শাড়ি খুলে দিল। সেই শাড়ি ধরে বিমল উঠে এল।'

'তারপর সেই বিমল গৌরীর আঁচলের তলায় চলে গেল। কী সিম্বলিক ঘটনা! ওই জন্যেই বলে কামিং ইভেন্ট কাস্টস ইটস শ্যাডো। ওরা এখন মহানন্দে আমেরিকায় আছে। কী ভাগ্য দেখ, আমি তিন-তিনবার ফরেন অফার রিফিউজ করেছি, ওনলি ফর মাই লোনলি ফাদার। সে এই চোখ দুটো যাবে বলে।'

'তুই শর্ত ভায়োলেট করছিস। অতীত থেকে বর্তমানে চলে আসছিস।'

'রাইট, রাইট। আমাদের সেই কাঁকড়াঝোড়ের আউটিং-এর কথা মনে আছে? দামুদাকে ভূতে ধরা!'

'উঃ, মনে নেই! দামুদা মারা গেছে রে!'

'জানি, অমন একটা মানুষ এই শয়তানের জগতে আর জন্মাবে না। জানিস পিনাকী, এই চোখ বেঁধে পড়ে আছি, আর অতীতের সব দৃশ্য মনের পরদায় ভেসে উঠছে। হ্যাঁরে আজ রোদ উঠেছিল?'

'একবার উঠেছিল। বর্ষার ঝলমলে রোদ।'

'তোর মনে আছে পিনাকী, আমাদের কলেজের কমন রুমের পাশে সেই ঝাউগাছ তিনটে। চাঁদিনি রাতে পাতাগুলো চাঁদের আলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।'

সত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তুমি কিন্তু একটু বেশি কথা বলে ফেলছ!' অনু ভয়ে ভয়ে বললে।

'অনু, হোয়েন ওল্ড পালস মিট, পাস্ট কামস ইন এ ফ্লাড।'

'তা ঠিক, তবে ডাক্তারবাবুদের নির্দেশ।'

'অনু, আমি তো ব্লাইন্ড হয়েই গেছি। সত্যর জীবনের এই সত্য মেনে নেওয়াই ভাল। তোমার হাত ধরেই আমাকে চলতে হবে। পথের ধারে বসিয়ে দিয়ে আসবে, সামনে ভাঙা সানকি।'

'কী যা-তা বলছ!'

'ঠিকই বলছি অনু। ওইটাই আমাদের সত্য। এ দেশের ভবিষ্যতের ছবি ওই। সত্যকে মিথ্যার আবরণে পুলি পিঠে যতই বানাও, ফিউচার তৈরি হয়ে গেছে। গ্লোরিয়াস ফিউচার।'

সত্যর চোখদুটো ভারী সুন্দর ছিল। বড় বড়, টানা টানা, জ্বলজ্বলে, বুদ্ধিদীপ্ত। অধ্যাপকরা বলতেন, চোখ দেখলেই বোঝা যায় এ ছেলেটা কালে খুব বড় হবে। ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল। লেখাপড়ায় সাংঘাতিক ভাল। স্বামী বিবেকানন্দের মতো চোখ যার, সে তো চরিত্রবান হবেই। সংসারে অনেক দেরিতে ঢুকেছে, পিতার চাপে পড়ে। সংস্কৃত অসম্ভব ভাল জানে। অন্যান্য ভাষাও রপ্ত করেছে। সত্যর সেই চোখ পুরু ব্যান্ডেজের তলায়। খোলার পর কী চেহারা হবে? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ আর দেখতে পাবে না হয়তো।

অনু বললে, 'আপনার জোড়া খুনের মামলাটা কী?'

'বউঠান, আমার স্ত্রী টিটেনাসে পড়ে আছে আই ডি-তে। আর আমার ছোট মেয়েটা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। প্রায় হয়েই গিয়েছিল, দৈবের জোরে ফিরে এসেছে।'

সত্য বললে, 'বাঃ, খুব ভালই আছিস তা হলে!'

'আরে সেই কারণেই তো তোকে নার্সিংহোমে একদিনও দেখতে যেতে পারিনি।'

'সুপ্রিয়া ইমপ্রুভিং?'

'তাই তো বলছে।'

'আপনার মেয়ের আত্মহত্যার ইচ্ছে! ভাবা যায় না।'

'প্রেম। এদেশে একদিকে প্রেমের জোয়ার বইছে, অন্য দিকে হিংসার। সত্য আমি আজ উঠি. আবাব আসব।'

'সে কী, চা খাবি না?'

'না রে, চা খেয়ে খেয়ে চায়ে অরুচি ধরে গেছে।'

'ওকে ঠান্ডা একটা কিছু খাওয়াও না, শুধু মুখে চলে যাবে!'

'না রে, প্রয়োজন থাকলে চেয়ে নিতুম। তুই এখন কী করবি?'

'শুয়ে শুয়ে ঘড়ির শব্দ শুনব। সময়ের পদধ্বনি। চলছে, চলছে। শুনতে শুনতে ঘোর লেগে যায়। মনে হয় আমি একা নই, আমার সঙ্গে সময় আছে। আমার হাত ধরে অনন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।'

'নাঃ, আর কথা বলিসনি, আমি চলি। বাবা কেমন আছেন রে?'

'শক অ্যাবসর্ব করছেন। কেবলই বলছেন, বউমা, যৌবন চলে গেছে, তা না হলে দেখে নিতুম, টুথ ফর এ টুথ, আই ফর অ্যান আই।'

'অফিসের গোলমাল?'

'সব মুচলেকা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে গেছে। একে বলে ঝান্ডার তামাশা।'

সত্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, পেছন ফিরে একবার তাকালুম। সেই মুখর বাড়ি আর নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ, অনেকটা সমাধির মতো। অর্থের অভাব হয়তো হবে না, কিন্তু অর্থই তো সব নয়। ভুল হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করা হল না, ছেলে কোথায়? মনে হয় মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে গোলমালের সময়। আজকাল তো রেওয়াজ হয়েছে, বাপ, ছেলে, এমনকী গোটা পরিবারকে একসঙ্গে শেষ করে দেওয়া। আমরা কোথায় চলেছি পিনাকীরঞ্জন? সেই গল্পটি মনে পড়ছে :

এক তীর্থযাত্রী তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছে। তার হাঁটার ধরন হল, দু'পা এগোয় তো এক পা পেছোয়। এইভাবে দশ বছর গেল, এক যুগ গেল। সে কেবলই জিজ্ঞেস করে, ভাই সেই আনন্দধাম আর কত দূরে? একজন তাকে বললে, ওহে ওইভাবে হাঁটলে তুমি জীবনেও সেখানে পৌঁছোতে পারবে না। উত্তরে তীর্থযাত্রী বললে, কী করব ভাই, এইটাই যে আমার হাঁটার ধরন।

এ দেশ চলেছে ওই তীর্থযাত্রীর ধরনে। লক্ষ্য খুবই মহৎ। তবে সামনে না চলে চলেছে পেছনে। অক্ষয়বাবুর সেই পোড়ো বাড়ি। মাথা গুঁজড়ে পড়ে আছে। ভদ্রলোক আছেন তো? পীত বর্ণের আলো জানলায় চার চৌকো ভুতুড়ে মায়া হয়ে থিরিথিরি কাঁপছে। দরজায় বারকতক টোকা মারলুম। কোনও সাড়া শব্দ নেই। এবার একটু জোরে। কোনও ফল হল না। হাত দিয়ে ঠেলতেই কবজার শব্দ তুলে দরজা ফাঁক হয়ে গেল। সামনের ঘরে দড়ির কার্পেটে মোটা একটা বই মাথায় দিয়ে ভদ্রলোক নিদ্রিত। ডান পায়ের পাতায় বিশাল ব্যান্ডেজ। সারা ঘরে আয়োডিনের গন্ধ থমকে আছে। যেন অপারেশান থিয়েটারে এসেছি।

'অক্ষয়বাবু।'

সাড়া নেই। গভীর নিদ্রা।

'অক্ষয়বাবু।'

চোখ মেললেন। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

'দরজা খুলে ঘুমোচ্ছেন?'

'আমার আবার দরজা! সামনের দিক বন্ধ করে কী হবে বলুন, পেছন তো হাওদাখানা।'

'পায়ে কী হল?'

'আর বলবেন না, থান ইট ঝেড়ে দিয়েছে। বুড়ো আঙুলের মাথা থেঁতো হয়ে গেছে।'

'কে ঝাড়লে?'

'বাড়ি।'

'বাড়ি? তার মানে?'

'এই বাড়ি তো জীবন্ত বাড়ি। মাঝে মাঝেই আমাকে মারে। গত বছর মাথায় মেরেছিল। এ বছর পায়ে। বছরে একবার বড় ধরনের মার দেবেই। আমাকে ভয় দেখায়, যাতে আমি পালাই। আমি তো পালাবার পাত্র নই। জানে, তবু ভয় দেখায়। আমি যে সহমরণে যাব। অক্ষয়সমাধি। বলুন আপনার খবর কী?'

'অনেক প্রশ্ন জমেছে।'

'কী প্রশ্ন?'

'প্রথম প্রশ্ন, সুপ্রিয়ার কী হবে?'

'কেমন আছেন তিনি?'

'আরোগ্যের পথে; কিন্তু আপনি বলেছিলেন, থাকবে না চলে যাবে। বুঝতেই পারছেন, কী আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি। দুম করে মাথায় ছাদ ভেঙে পড়া, আর ভাঙা ছাদের তলায় পড়ে থাকা, কত তফাত! রাতে আমি ঘুমোতে পারি না। আপনার কি কোনও ভুল হয়েছিল?'

অক্ষয়বাবু হাসলেন, 'যা ভাবেন।'

'আমার প্রশ্ন, সেদিন আপনি কী করেছিলেন? ঝুনু কি সত্যিই মারা গিয়েছিল? কিছু মনে করবেন না, বাস্তব অলৌকিককে অস্বীকার করে।'

'ক'টা বাজল?'

'পৌনে নয়। কেন? কোথাও যাবেন?'

'না, উত্তর দোব আপনার প্রশ্নের। ফুঁ দিয়ে সেজটা নিবিয়ে দিন।'

আদেশ শুনে গা ছমছম করছে। আলো নিবিয়ে উত্তর!

'দেরি করবেন না। উত্তর পেতে হলে আলো নেবান।'

যা থাকে বরাতে। এক ফুঁয়ে ঘর অন্ধকার।

'এবার চুপ করে বসুন। কোনও শব্দ নয়। ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচে উত্তর আসবে।'

'একে কি প্ল্যানচেট বলে?'

'সমস্ত প্রশ্ন পরে। এখন কিপ কোয়ায়েট।'

অস্বস্তিকর পরিবেশ। গা শিরশির করছে। মনে হচ্ছে ছুটে পালাই। উপায় নেই। সিঁটিয়ে আছি। ইটের স্তূপে ঝিঁঝি ডাকছিল। হঠাৎ থেমে গেল। একটা টিকটিকি আচমকা কটকট করে নীরব হয়ে গেল। কে উত্তর দেবে? প্রশ্ন তো অক্ষয়বাবুকে! দুটো ঘরের মাঝের পরদা পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের হাতের মতো ঝুলছে। নিথর পরিবেশ বুক চেপে ধরছে। বাতাস ভারী। হাতঘড়ির টিকটিক চলন মন্থর। সময় যেন আর চলতে পারছে না। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই চলনে রাত কি আর ভোর হবে?

উউফ্।

পৃথিবী যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবী যেন বেলুনের মতো

চুপসে গিয়ে আবার ফুলে উঠল। শব্দটা এল পাশের ঘর থেকে। অসম্ভব যন্ত্রণার কাতরোক্তি। যেন কারু প্রাণটা বেরিয়ে গেল। প্রায়ান্ধকার ঘরে অক্ষয়বাবু বসে আছেন কিয়দ্দূরে ইবনাইটের মূর্তির মতো। আবলুসের বুদ্ধ। তাঁর দিকে আমার ঘাড় ঘুরছে দেখে মৃদু স্বরে বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'কোথায় হল শব্দটা?'

'পাশের ঘরে।'

'কে করলে?'

'যান না, গিয়ে দেখে আসুন। প্রতিদিন ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিটে হয়।'

'ও ঘরে যাবার সাহস আমার নেই। এই ঘরে আপনার পাশে বসে থাকতেই আমার ভয় করছে।'

'একটু আগেই বলছিলেন বাস্তববাদী। অলৌকিকে বিশ্বাস নেই। কলকাতার ঘিঞ্জি শহরে এই বাড়ি। উনিশশো চুরাশি সাল। সেই মানুষের তৈরি বাড়িরই দু'খানি ঘর। এ ঘর আর ও ঘর। সময় রাত ন'টা দশ। দুটি জীবিত মানুষ। আপনি আর আমি। এই তো বাস্তব। এই বাস্তবে হঠাৎ এমন কী হল, যে আপনি এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারছেন না!'

'কেমন যেন আনক্যানি ফিলিংস হচ্ছে।'

'সেই ফিলিংস ডাক্তারি যন্ত্রে ধরা পড়বে?'

'কী জানি?'

'ধরা পড়বে না। মানুষের দেহে মন নামক বস্তুটি কী, আজও রহস্য। কোথায় তার অবস্থান? তাও অজ্ঞাত। অথচ মনই সব। মন কিন্তু ব্রেন নয়। আচ্ছা, আমার সঙ্গে ও ঘরে যেতে পারবেন?'

'অস্বস্তি হবে। কিন্তু শব্দটা কীসের?'

'আমার পিতৃদেব খুন হলেন। ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচ।'

'সে তো দীর্ঘকাল আগের ঘটনা!'

'কাল তো একটা আপেক্ষিক গতি। আপনার বিজ্ঞানও তা স্বীকার করেছে। কবি এলিয়ট, এলিয়টের কবিতা পড়েছেন?'

'না।'

'দোব, পড়বেন। এলিয়ট কী সুন্দর ধরেছেন দেখুন :

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

কিছু কি হারায় পিনাকীবাবু! হারায় না। আমরা ফেলে রেখে ভাসতে ভাসতে চলে যাই। আমার অলৌকিকে অবিশ্বাস নেই। তার কারণ আছে। আমি এমন কিছু চরিত্রের সঙ্গ করেছি যাঁরা আমার দৃষ্টি পালটে দিয়েছেন। যাকে আমরা বাস্তব বলছি তা হল আমাদের বাস্তব। এই শরীর, এই দেহ, এই মন, এই জ্ঞান দিয়ে যতটুকু ধরা যায়। তার বেশি নয়। পিরামিড কী করে তৈরি হয়েছিল, আজও বিস্ময়। স্টোন হেঞ্জ, সেও এক আজব ব্যাপার। আমাদের জ্ঞানের জগৎ বড় সংকীর্ণ, খুবই ছোট। সেজটা এবার জ্বালুন।'

বারকতক ঘষাঘষির পর দেশলাই জ্বলল। পলতেয় আগুন ধরাতে গিয়ে টের পেলুম হাত বেশ কাঁপছে। এই পরিবেশে অক্ষয়বাবু থাকেন কী করে? কিছুক্ষণ বসলেই মনে হয় আত্মহত্যা করি। জীবনের চেয়ে মৃত্যুর আকর্ষণই বেশি এখানে।

'চলুন, এবার আর একটা অবাক জিনিস দেখাই আপনাকে।'

'কোথায়?'

মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেছি। আর কিছু দেখার সাধ আমার নেই। খুব হয়েছে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

'এই বাড়িতে ছোট্ট একটা ঘর আছে। সেই ঘরে বেশি না, মিনিট তিনেক কেউ বসতে পারলে বলব প্রকৃত সাহসী।'

'আজ থাক।'

'কেন ভয় করছে? ভয়ের কী আছে? চলুন।'

একটা পা সামনে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে, ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ের ওপর যথাসম্ভব কম ভার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'নিন সেজটা হাতে তুলে নিন। আমার পায়ে চোট।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন পরদার দিকে। সেই ঘর, যে ঘরে অক্ষয়বাবুর পিতা নিহত হয়েছিলেন। কত বছর আগে? নিশ্চয়ই অনেক আগে। পরদা একপাশে সরিয়ে আলো হাতে আমার এগোবার পথ করে দিলেন। সেই চেয়ার। তাকাবার সাহস নেই। যদি কিছু দেখে ফেলি! এ ঘরের শেষ মাথায় অক্ষত একটি দরজা। অক্ষয়বাবু দরজায় হাত রেখে বললেন, 'চার পাশ ভেঙে ভেঙে, খুলে খুলে পড়ছে কিন্তু এই ঘরটি অক্ষত রয়েছে।'

দরজা খুলে ফেললেন। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এল।

'এটা কি ঠাকুরঘর?'

'ভেতরে চলে আসুন।'

আলো হাতে ভেতরে গিয়ে সত্যিই অবাক। শ্বেতপাথরের মেঝে। পঙ্খের কাজ করা দেয়াল। লম্বা, মাঝারি আকারের হলঘরের মতো। এদিকে যার শুরু তার শেষ কোন দিকে? মনে হচ্ছে এই সেদিন তৈরি হয়েছে। একটাও জানলা নেই, তবু বেশ ঠান্ডা। অক্ষয়বাবু দরজা বন্ধ করতেই মনে হল কফিনে ঢুকে পড়েছি। একপাশের দেয়ালে সার সার কুলঙ্গি। সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মূর্তি। কীসের তৈরি তা জানি না। হয় মাটির। না হয় কোনও ধাতুর। অথচ দেখামাত্রই শরীর কেমন করে ওঠে।

অক্ষয়বাবু বললেন, 'এই হল দশ মহাবিদ্যা, কালী, তারা, ষোড়শী, বগলা, ছিন্নমস্তা, কমলা, ধূমাবতী ইত্যাদি। কেমন লাগছে?'

উত্তর দেবার আগে দু'বার ঢোঁক গিলতে হল। স্বর শুনে মনে হল, ভেতর কাঁদছে, 'অদ্ভুত।'

'হ্যাঁ অদ্ভুত। এই ঘরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আসুন।'

ঘরের শেষ মাথায় একটা বেদি। প্রথমেই নজরে পড়ল ত্রিশূল। বেদির মাঝখানে স্থাপিত। পাশেই একটি হাড়িকাঠ। টকটকে লাল রং। আর কিছুই নেই। শুধু পেছনের দেয়ালে অজস্র লাল লাল হাতের ছাপ। বেদির সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হতে লাগল, হাড়িকাঠে গলাটা পরিয়ে দিই।

অক্ষয়বাবু বললেন, 'ওই দেখুন, কত রক্তমাখা হাতের ছাপ।'

'রক্ত!'

'হ্যাঁ, তাজা রক্ত। মানুষের রক্ত।'

'নরবলি হত?'

'না, নরবলি নয়। বুক চেরা রক্ত। প্রতি অমাবস্যার রাতে এক-একটি ছাপ এঁকেছেন সেই সাধিকা। গুনে দেখুন, বছরের হিসেব পেয়ে যাবেন।'

'হাড়িকাঠ যখন রয়েছে বলি নিশ্চয়ই হত!'

'না, হাড়িকাঠ একটা সিম্বল। আর ওই ত্রিশূল। হাত দিলেই ছিটকে ফেলে দেবে। যেন বিদ্যুতের ঝটকা। দেখবেন, হাত দোব!'

'না, না, দয়া করে হাত দেবেন না, আমি দেখতে চাই না। এমনিতেই আমার বিশ্বাস এসে গেছে।'

'সামান্য এক খণ্ড লোহা পিটে তৈরি, কোথা থেকে এই শক্তি এল! বিজ্ঞান তো বিশ্বাস করবে না।'

'হয়তো বাজ পড়েছিল।'

'বাজ মানে বিদ্যুৎ। লোহার ভেতর দিয়ে হাই ভোল্টের বিদ্যুৎ চলে গেলে, লোহা ম্যাগনেট হয়ে যায়। জেনারেটার হয় না। হয়েছে সাধন শক্তিতে। আসুন, বেদির সামনে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক।'

'অক্ষয়বাবু আজ থাক। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।'

'অজ্ঞান হয়ে যাবেন? কেন, এ ঘরে তো পৃথিবীর বাইরের কোনও জিনিস নেই। যা আছে, ইট, কাঠ, পাথর, মাটি, ধাতু। তবু এমন কেন হচ্ছে! আসুন, এদিকে আসুন, মূর্তিগুলো দেখুন ভাল করে। ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, বগলা।'

'আমি আর কিছুই দেখব না। আপনি চলুন।'

'আরও একটা জিনিস দেখার আছে। এপাশে আসুন।'

আচ্ছা পাল্লায় পড়েছি যা হোক। ভদ্রলোক আজ আমাকে এইভাবে ধীরে ধীরে খুন করবেন দেখছি। তারপর হয়তো ওই বেদির তলায় পুঁতে দেবেন!

একদিকের দেয়ালে একটা চোরকুঠুরি। দেয়ালের রঙের সঙ্গে রং মেলানো দরজা।

'দেখি আলোটা তুলে ধরুন।'

আলো উঁচু করতেই হরেকরকম জিনিস চোখে পড়ল। পরিষ্কার সাজানো। বোঝাই যায়, এইসব জিনিস নিয়ে অক্ষয়বাবু প্রায়ই নাড়াচাড়া করেন। ভারী একটা ব্রোঞ্জের বাক্স টেনে নামালেন ওপরের তাক থেকে। সামনে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে চললেন বেদির দিকে। পেছনে আলো হাতে আমি। রক্তরাঙা হাতের ছাপ ধরানো দেয়ালে কুঁজো অক্ষয়বাবুর ছায়া। ওপর দিকে জমাট, নীচের দিকে তরল। ডান কাঁধের পাশ ফুঁড়ে উঠেছে ত্রিশূলের ছায়া। তার পাশে আর এক বিশাল ছায়া—হাড়িকাঠ।

বেদিতে বাক্স নামানোর শব্দ হল, ঠ্যাং করে।

'দেখি আলোটা কাছে আনুন। দেখবেন, বেদি স্পর্শ করবেন না। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবেন। এমনকী স্বপ্ন-ভ্রমণ অসুখেও ধরতে পারে।'

'স্বপ্ন-ভ্রমণ অসুখ?'

'হ্যাঁ, ইংরেজিতে যাকে বলে স্লিপ ওয়াকিং।'

ডালা খোলার শব্দ হল। ডালাটা পাথরের বেদিতে পড়ে আবার শব্দ তুলল। সামান্য শব্দ, কিন্তু মিলিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় নিল।

'দেখি দেখি, আলোটা নিচু করুন।'

আলো নামালুম, বাক্সের ভেতরে যাতে পড়ে।

'যাঃ। সর্বনাশ হয়ে গেছে। যা ভেবেছিলুম তাই হয়ে গেল।'

বাক্স ফেলে রেখে দু'হাতে মাথা চেপে অক্ষয়বাবু মেঝেতে বসে পড়লেন।

'কী সর্বনাশ হল অক্ষয়বাবু?'

'সব ছাই হয়ে গেছে। সামনেই রয়েছে দেখুন।'

আলোয় আলোকিত বাক্স। ধবধবে সাদা ছাই চৌকো একখণ্ড বইয়ের আকারে। বলে না দিলে ধরা মুশকিল। চোখের ভুল কি না জানি না, তবে কেবলই মনে হচ্ছে ছাইয়ের ওপর একটা মুখ ভাসছে। সুন্দরী এক মহিলার মুখ এলো চুল দিয়ে ঘেরা। স্পষ্ট। একেবারে নিখুঁত। চোখ, নাক, ঠোঁট।

তাকাতে তাকাতে মনে হল, মৃদু হাসলেন। হাত থেকে আর একটু হলেই সেজ পড়ে যেত। কীভাবে সামলেছি নিজেই জানি না। আর একটু হলে বেদি ছুঁয়ে ফেলেছিলুম।

মেঝেতে আলো রেখে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ছিল এতে?'

'সেই ডায়েরি, সেই দুর্লভ বস্তু। বাংলা কত সাল এটা?'

'তেরশো একানব্বই।'

'জানতুম। এরপর আর থাকবে না। জেনেও কিছু করতে পারলুম না। ব্রোঞ্জের বাক্সে রাখলুম, তাও বাঁচানো গেল না।'

'আপনি তো কপি করছিলেন?'

'বাকি ছিল অনেক। কাজ বিশেষ এগোনো যেত না। শুরু করলেই অসুখে পড়ে যেতুম। ইস, কত কী যে হারিয়ে গেল! শেষের দিকে মানবদেহ সম্পর্কে অনেক তথ্য ছিল। যেমন, পাশবিকতা কীভাবে বাড়ে। দেবভাব কীভাবে আসে! শুদ্ধ শরীর কীভাবে তৈরি করতে হয়। বীর্য ঊর্ধ্বগামী করার সহজ পদ্ধতি। আর একটা সাংঘাতিক চ্যাপ্টার ছিল, কামের পথে সাধনা। দৃষ্টি যোগ, শ্রবণ যোগ, কত কী যে ছিল!'

'ওই জায়গাগুলো কপি করে রাখতে পারলেন না আগে!'

'আমার ভুল। ভেবেছিলুম, আরও এক বছর সময় আছে। আমার ধারণা এটা নব্বই সাল চলেছে।'

'এ এক অলৌকিক ব্যাপার। কেউ বিশ্বাস করবে না, আস্ত একটা জিনিস ছাইয়ের আকার নিল।'

'তা ঠিক, অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের আগে কেউ ভাবতে পারত হিরোশিমা, নাগাসাকির অবস্থা। বাহারি কিমনোপরা মহিলার অঙ্গে কিমনোর নকশা আছে কিমনো ভেপার হয়ে উড়ে গেছে। মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে আস্ত মানুষ, ফুঁ দাও, উড়ে গেল ধূপের ছাইয়ের মতো। চল্লিশ বছর আগে, মানুষের কাছে এসব হত গাঁজাখুরি গল্প। গল্পের মানুষ চাঁদে যেত। এখন জ্যান্ত মানুষ ফিরে এসে গল্প শোনায়। আজ থেকে যান না এখানে। আজ অমাবস্যা। মধ্যরাতে এই ঘরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।'

'না, আর একদিন হবে। আজ আসি।'

'দাঁড়ান, সেই কপিকরা ডায়েরিটা আপনাকে দিয়ে দিই। যতটুকু আছে উলটে পালটে দেখুন। সময় পেলে ওইটাকে ধরে আমি কিছু লিখব। খানিক ওখানে আছে, খানিক মনে আছে। সাধারণ মানুষের জানা দরকার সুখের রাস্তা কোনটা, দুঃখের রাস্তা কোনটা। কাম একটা বড় রিপু। কামজয়ী হিজড়ে না হয়ে, কামুক সাধক হতে পারলে পথ অনেক সহজ। জানেন নিশ্চয়, নেবুচাডনেজারের ব্যাবিলনে, মন্দিরে সুন্দর একটা চেয়ার ছিল। নিয়ম ছিল, ব্যাবিলনের প্রতিটি রমণীকে ওই চেয়ারে অন্তত একবার বসতে হবে। আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে দেবতার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। তিনি এসে সহবাস করে যাবেন। সাধারণ মানুষের রূপেই তিনি আসবেন। একজন পুরুষ এসে রমণীর কোলে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলবে, মিলিত হয়ে বিদায় নেবে। অর্থাৎ সব মহিলাকেই অন্তত একদিনের জন্যে গণিকা হতে হবে। দু'রকম সাধনা আছে, দু'ধারার জীবন আছে, স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক। ডায়েরিটা পড়ুন। চমকে উঠবেন।'

পীতু রাস্তায় পায়চারি করছে। 'থেকে থেকে, কোথায় তুমি চলে যাও। কটা বাজল দেখেছ?'

'ওই আমার বন্ধু সত্যর ওখানে গিয়েছিলুম। বেচারার চোখ দুটো নষ্ট করে দিয়েছে।'

'এদিকে কী হয়েছে জানো। অনুপ প্রচণ্ড মদ্যপান করে এসেছে। আমাদের বাথরুমের সামনে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে। কোনও হুঁশ নেই। প্যান্ট-জামা নোংরা। রুনু আর ঝুনুকে ঘরে ঢুকিয়ে রেখে এসেছি। তুমি নেই। কী করব ভেবে পায়চারি করছি।'

'ওর বাড়িতে তা হলে খবর দিতে হয়।'

'বিপদ আছে। লোক জানাজানি হলে পাড়ায় টেকা যাবে না। আজ অনুপ, কাল আর একজন কেউ মাতাল হয়ে সোজা ওপরে উঠে যাবে। মেয়েদুটোর বদনাম হয়ে যাবে। এমনিই তো এ-বাড়ির দিকে পাড়ার চোখ। মা থাকলে অতটা ভয় ছিল না। কেউ এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দিত। ছোট বড় কথা বললে জুতিয়ে দিত। যাই বলো, তোমার চেয়ে আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি।'

'তা ঠিক। এখন নেই তো, তাই পদে পদে বুঝছি। আমি এ দুনিয়ায় অচল। তা হলে এক কাজ করা যাক চলো, চ্যাংদোলা করে এনে ওই অন্ধকার মতো জায়গাটায় ফেলে দিই।'

'নাঃ, সে খুব অমানবিক কাজ হবে। বিপদে অনুপ আমাদের জন্যে কম করেছে। তোমার নিজের ছেলের চেয়েও বেশি সার্ভিস দিয়েছে।'

'তা হলে যেখানে আছে সেইখানেই থাক। রাতভোরে খেউরি কাটলে চলে যাবে। এ ছাড়া আর তো আমাদের কিছু করার নেই।'

'মাঝরাতে যদি চেল্লায়!'

'মুখে গামছা পুরে দোব।'

'ও এখানে আছে এ খবরটা কি ওর বাড়িতে দেওয়া দরকার! যদি থানা পুলিশ করে।'

'কিস্যু করবে না, বড়লোকের মা-মরা ছেলে ক'রাত বাড়ির বিছানায় থাকে! দেখো গে যাও, ওর বাপ এখন কোন্ হোটেলে পড়ে আছে!'

'চলো তা হলে। প্রায় বারোটা বাজল।'

রুনুই এখন সংসারের হাল ধরেছে। ঝুনু অচল। ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন, ভয় নেই মাসখানেক পরেই নর্মাল হয়ে যাবে। এখন হ্যাংওভার চলেছে। এসব কেসে এইরকমই নাকি হয়! দরজা খুলে ঝুনু আগে বেরোল। একেবারে সামনা সামনি। মুখে আলো পড়েছে। চমকে উঠলুম। এ তো সেই মুখ, যে মুখ ছাইয়ের ওপর ভাসছিল একটু আগে! ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। সংসারে এ কোন অপরিচিতা? কোনও অনিষ্ট করে বসবে না তো? কে জানে বাবা! হয়তো আমার মনের ভুল। ঝুনুর কথা দিন-রাত ভাবছি বলেই ঝুনুর মুখ সর্বত্র দেখছি। এমনও হতে পারে। বগলে কাগজ জড়ানো ডায়েরিটার দিকে একবার তাকাল। ভয় হল, ছিনিয়ে নেবে না তো! আজকাল আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে না। বলার প্রয়োজন মনে করে না। ওর সামনে নিজেকে অসম্ভব ছোট মনে হয়। অপরাধী মনে হয়।

বাথরুমের সামনে অনুপ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এমন আরামে শুয়ে আছে যেন মখমলের বিছানা। ওঃ বোতলের কী মহিমা! যার যখন প্রয়োজন হচ্ছে টপকে টপকে চলে যাচ্ছে। রাতের কোনওরকম খাওয়া শেষ করে, বিখ্যাত সেই বেতের চেয়ারে বসে আছি। অমাবস্যার রাত। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। দূরে কুকুরের হাহাকার। কোথায় একটা বেড়াল অলুক্ষনে ডাক ডাকছে। অক্ষয়বাবু ঠিকই বলেছেন, লিমিটেশানস অফ নলেজ। এই তো আমার জ্ঞানের জগৎ। সকালে ছিল বিশাল, রাতে এতটুকু বৃত্তাকার। আকাশ মেঘে ঢাকা। অনন্ত এখন হাতের নাগালে। এত অন্ধকার, চেয়ারে বসে আছি, শরীরের নীচের অংশ চোখে পড়ছে না। এই তো আমার চোখ।

পীতু এল।

'তোরা সব শুয়ে পড়। অনুপের জন্যে আমি আছি।'

'রাত জেগে জেগে তোমার শরীরের কী হাল হয়েছে, দেখেছ একবার।'

'কী করব! রাতে আমার ঘুম আসে না। বয়েস বড় সাংঘাতিক জিনিস পীতু। ঘুম যাবে, শরীর ভাঙবে, চোখ, কান, দাঁত ছুটি চাইবে। গেট রেডি মাই বয়। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করো। আচ্ছা পীতু, তুই ঝুনুর ভেতর কোনও পরিবর্তন দেখছিস?'

'হ্যাঁ ওর পার্সোন্যালিটি পালটে গেছে। বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেছে।'

'আমার সন্দেহ হয়। ঝুনু, মানে আসল যে ঝুনু, সে হয়তো মারাই গেছে! ঝুনুর শরীরে অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে।'

'সত্যিই, তোমার যে কী অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা। তা কখনও হয়!'

'হাসছিস? শঙ্করাচার্যের লাইফ পড়েছিস? পাহাড়ের গুহায় নিজের দেহ শিষ্যের পাহারায় ফেলে রেখে মৃত রাজার দেহে আশ্রয় নিলেন। কেন? না, আজীবন ব্রহ্মচারী, কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ এক মহারানি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন।'

'শোনো, ওসব গল্প কথা। মহাপুরুষদের জীবন ঘিরে অনেক মিথ থাকে। ওসব বিশ্বাস করা মানেই বাস্তব থেকে সরে আসা।'

সেই অলুক্ষনে বেড়ালটা এবার খুব কাছেই ডেকে উঠল। কী জানাতে চায়! মৃত্যু আসছে! কার মৃত্যু! পীতু চলে গেল। এর মধ্যেই ছ'-সাতবার হাই তুলেছে। যাক এবার ঘরে গিয়ে সেই অসতীর ডায়েরি খুলে বসি। শক্তির উৎসটা কোনওরকমে যদি একবার খুঁজে পাই! আমার ভেতরেই আছে। অতল জলে সোনার চাকতির মতো। তেমন ডুবুরি হলে, ডুব মেরে তুলে আনতুম।

অক্ষয়বাবুর হাতের লেখা মুক্তোর মতো। কালো কালি। গোটাগোটা, ছোট ছোট অক্ষর। শুরুতেই সাংঘাতিক কথা :

> পাপে নিমগ্ন না হইলে পুণ্যের পথ ধরিবার বাসনা জাগে না। পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পুণ্যের হাত ধরিবার জন্য ব্যাকুল হও ॥ যে যত পাপী, সে তত পুণ্যাত্মা। কূপের মধ্যে না পড়িলে আকাশের মর্ম কে বুঝিবে! সাধারণের জীবন সমতলে চলে। সমতলেই শেষ হইয়া যায়। গভীর গহ্বরে পতন, উচ্চ পর্বতে আরোহণ অসাধারণের কর্ম। যাহার এদিক আছে তাহারই ওদিক আছে। যাহার উত্তরজ্ঞান হইয়াছে, তাহার পক্ষেই পূর্ব, পশ্চিম কি দক্ষিণ জানা সম্ভব। যাহার কোনও জ্ঞানই হয় নাই, সে কেন্দ্র-বিন্দু। তাহার দিক জ্ঞান নাই। যেখানে উত্থান, সেইখানেই পতন। পাত্রস্থ মৎস্যের ন্যায়। শূন্যে উল্লম্ফন, পুনরায় পাত্রেই পতন।
>
> আমি এক বড় মানুষের রক্ষিতা ছিলাম। রক্ষিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। আবার কুলবধূ হইয়া মরিবার বাসনাও ছিল না। পুরুষের ভোগের সামগ্রী না হইয়া, পুরুষকেই আমার ভোগের সামগ্রী করিয়াছি। অন্যের আগুনে নিজেকে আহুতি না দিয়া, নিজের আগুনে অন্যকে টানিয়া আনিয়াছি পতঙ্গের ন্যায়। ইহার দ্বারা ক্রমশই বুঝিতে শিখিয়াছি নারীর শক্তি কত সর্বগ্রাসী। প্রকৃতির কাছে পুরুষ সর্ব যুগে, সর্ব সময়ে পরাজিত। ইহা বুঝিতে হইবে। নতুবা নারী পুত্রোৎপাদনের যন্ত্রমাত্র হইয়া পুরুষের পদানত সেবাদাসী হইয়া থাকিবে। সমাজ যাহাকে পাপ বলে, সেই পাপের পথে বিচরণের ফলেই নিজের শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছি। আমি আমার আত্মজীবনী লিখিতে বসি নাই। যে অসীম শক্তির আমি অংশ, অংশের মধ্যে পূর্ণের স্পন্দন ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।
>
> বস্তু-জগতের সহিত পরিচিতির মাধ্যম স্থূল দেহ। দেহ ধারণ করিয়াই দেহাতীতে পৌঁছাইতে হইবে। স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বাগ্রে অতিব্যবহারে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা সূক্ষ্মের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হইবে না। যে হিংসায় উন্মত্ত হয় নাই সে কেমন করিয়া অহিংসার মর্ম বুঝিবে! ক্রোধীরই অক্রোধ, কামুকেরই নিষ্কাম, লোভীরই নির্লোভ। উপনিষদ বলিয়াছেন, পরমাত্মা বলহীনের দ্বারা লাভ করা সম্ভব হইবে না। জয়েই আনন্দ। অবাধ্যকে বশীভূত করাই সাধনা।

বাথরুমের সামনে অনুপ বারকতক মা মা করে উঠল। সাধিকা ঠিকই লিখেছেন, যে যে অবস্থাতেই থাকুক মা বলে তাকে ডাকতেই হবে।

মাথার কাছে উবু হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হল অনুপ?'

প্রায় শেষ রাত। আকাশের চত্বর থেকে মেঘ সরে গেছে। রাত্রি তার ব্যাগ খুলে তারার মুদ্রা

ছড়িয়ে সূর্যের ঋণ শোধ করছে। বাতাস ভিজে উঠেছে রাত বিদায়ের শোকে। তিনটি নাকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ দালানের এ দেয়ালে, ও দেয়ালে টাল খাচ্ছে।

অনুপ আবার মা, মা করে উঠল।

'অনুপ জল খাবে?'

সাড়া নেই। শুনেছি, মাতালে জল খায় না। ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে আছে। ওঠো বাবা, ওঠো। জায়গাটা ভাল নয়। আমার কাঁধে হাত রেখে চলো, হাঁটি হাঁটি পা পা করে। বাবা ইন্টারন্যাশন্যাল ডিরেক্টার। কী যেন নাম; অপনু দুভাড়ী। জীবন যন্ত্রণার ছবি করছে। তোমার নিজের জীবনই তো এক যন্ত্রণা। নাও, আমার বিছানাতেই লম্বা হও। এ ছেলে যদি আমার জামাই হয়, সেইদিনই গৃহ ত্যাগ করব। আমার বন্ধু সন্ন্যাসী সদানন্দ গিরি হিমালয়ে আশ্রম সাজিয়ে বসে আছে। আমার আর ভয় কী! এই তো বানপ্রস্থের বয়স। যাঃ, ভোর হয়ে গেল। প্রথম পাখিটি থেমে থেমে ডাকছে।

মোক্ষযোগ

মাননীয় মহাশয়,

আশা করি আপনার স্ত্রী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির পথে। ক্যান্সার আর আর্থারাইটিস ছাড়া দুরারোগ্য কিছুই নেই। এইবার আপনি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে থাকুন। আগামী মাঘ অথবা ফাল্গুনের কোনও শুভদিনে শুভকর্ম সম্পাদনের বাসনা। পুত্রের পিতা যাতে মনে না করে, ছেলে আমার প্রেম করে ঠকে গেল, সেই কারণে সাধ্যমতো, বাজার অনুযায়ী দেওয়া থোয়ার ব্যবস্থা করবেন। সব মানুষই কামনা-বাসনা শূন্য নির্লোভ হতে পারে না, বিশেষত বিয়ে প্রভৃতি ব্যাপারে। শিক্ষিত মানুষের আদিম দুর্বলতা। অর্থের প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে জানান। পরে ধীরে ধীরে শোধ করে দেবেন। আপনার ছেলেটিকে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। ওর কেরিয়ার কীভাবে গড়ে তুলছেন জানি না। এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ প্রকাশ করে রাখলাম। নিঃস্বার্থ অবশ্যই। কারণ আমি নিঃসন্তান। বয়েস যত ছোট হয়ে আসছে, জীবনকে ততই খেলা মনে হচ্ছে।

নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন। নিজে অচল তো দুনিয়া অচল। অবসর হলে একদিন আসুন। বাগানে বসে চা খেতে খেতে চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

নমস্কার নেবেন

ইতি, মোহিত মুখোপাধ্যায় ॥

কী উত্তর দেব এই চিঠির। ঝুনু কথা বলে না। সুপ্রিয়া পাশে নেই। বড়লোকের নাতির সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে সুপ্রিয়া লাফিয়ে উঠবে। সংসার বাসনা পুরোমাত্রায় বজায় আছে। স্বপ্নের শেষ নেই। ইদানীং জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত। বাড়ি বাড়ি করে প্রায় উন্মাদিনী। পুজোর সময় ভিত প্রতিষ্ঠা হবেই। প্রয়োজন হলে চুরি করবে। উত্তর তো একটা দিতেই হয়। বিয়ে হোক না হোক এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ হওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার।

পীতু আজ ভীষণ ব্যস্ত। কী হয়েছে। কেউ আসবে নাকি আজ? কাছে এলে জিজ্ঞেস করব। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পীতু এল। যেন বিয়েবাড়িতে পরিবেশন করছিল।

'কী ব্যাপার! আজ সবাই এত ব্যস্ত!'

'বাঃ, আজ মা আসবে না! তুমি সব ভুলে গেছ। ঘরদোরের যা চেহারা হয়ে আছে, এসেই রাগারাগি করবে।'

'আজ আসবে! কখন?'

'বেলা তিনটে নাগাদ বেরোব।'

'গাড়ি?

'অনুপ আসবে বলেছে।'

'আবার অনুপ! কী অবস্থায় আসবে কে জানে?'

'এক-আধ দিন একটু আউট হয়ে যায়, তা না হলে ছেলে খারাপ নয়। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। মাথায় সামান্য ছিট আছে। সে আর কী করা যাবে!'

'তা ঠিক, কে-ই বা সুস্থ এ বাজারে! চিঠিটা মোহিতবাবুর বুঝলে? এই নাও পড়ে দেখো।'

পীতু চিঠিটা পড়ে বললে, 'গুড নিউজ। মা যেরকম ভেঙে পড়েছিল!'

'নিউজ তো গুড; কিন্তু টাকা। ভাবের বিয়ে হলে কী হবে, সবই তো দিতে হবে। অক্টোবরে ভিত-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।'

'তুমি একটু আস্তে বলো। ওদের কানে গেলে ভুল বুঝবে। এমনিই তোমাকে সব স্বার্থপর ভাবে।'

'তাই নাকি? তুইও তাই ভাবিস?'

'না। আমি তোমাকে মোটামুটি চিনে ফেলেছি।'

'কীরকম?'

'তুমি ট্র্যাপড। যত বড় খাঁচার প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে অনেক ছোট খাঁচায় বন্দি হয়ে তুমি ছটফট করছ! তোমাকে আমি চিনি। তুমি একটা শক্তির সন্ধানে ঘুরছ; যা তোমাকে এই লেভল থেকে আরও উঁচু লেভলে এক ঝটকায় তুলে দিতে পারে; কিন্তু ধরতে পারছ না! সেই কারণে দিনে দিনে তুমি উদাসীন হয়ে যাচ্ছ, বিষণ্ণ হয়ে পড়ছ। তুমি এখন সবচেয়ে আনহ্যাপি। কোনও কিছুতেই তোমার ইন্টারেস্ট নেই। তোমার জন্যে ভাবি; কিন্তু আমার কাছে কোনও রেমিডি নেই এই মুহূর্তে! মোটা মাইনের একটা চাকরি পেলে তোমাকে কিছুদিন হয়তো চিয়ারফুল করা যেত।'

'কীভাবে? অর্থ দিয়ে? ভোগ দিয়ে?

'না, এসথেটিক্স দিয়ে। তুমি চায়ের চেয়ে চায়ের কাপ ভালবাসো। বিছানার চেয়ে চাদর ভালবাসো। মেঝের চেয়ে কার্পেট। তোমার প্রয়োজন মেন্টালফুড, স্টম্যাক খালি থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না।'

'হ্যাঁ ধরেছিস ঠিক। সংসার যে কায়দায় করতে চেয়েছিলুম, সে কায়দায় করা গেল না। সব জগাখিচুড়ি হয়ে গেল।'

'শোনো, টাকার চিন্তা না করে ঝুনুর বিয়ে লাগিয়ে দাও। ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আর বেশি বাড়ি বাড়ি কোরো না। জমিটা আছে থাক। গুড ইনভেস্টমেন্ট। দিনে দিনে দাম বাড়বে। বাড়ি ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। ট্যাক্স, মেনটিনেন্স, নো রিটার্ন। এই তো আমরা বেশ আছি। এখানেই জন্ম, এখানেই মৃত্যু। আমি সামনের মাস থেকে ছ'টা টিউশানি পাচ্ছি। সাত জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছি। আমার ভাগ্য শিকেয় ঝুলছে ননির হাঁড়ির মতো। যে-কোনও একটা দড়ি অবশ্যই ছিঁড়বে। খুব অলস না হলে সব মানুষের ভাগ্যেই কিছু না কিছু হয়।'

'বুঝলুম পীতু। কিন্তু আর একটা জিনিস ভাববার আছে। বড়র আগে ছোটর বিয়ে দিয়ে দোব!'

'বড়র দিতে চাও?'

'নিশ্চয় চাই। কে না দায়মুক্ত হতে চায়!'

'ওই দায়টায় বোলো না। আজকালকার মেয়েদের সেন্টিমেন্টে ধাক্কা লাগে। রুনুর জন্যে অনুপ কিন্তু মুখিয়ে আছে।'

'ও নো, প্লিজ ডোন্ট রিকোয়েস্ট দ্যাট! ওর চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ভাল।'

'তুমি তোমার যুগ থেকে একটু বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো। আজকাল নাইনটি পারসেন্ট

অ্যাফ্লুয়েন্ট ছেলে ড্রিঙ্ক করে। ওটা ভাইস নয় ভারচু। মেয়েরাও ছেড়ে কথা কইছে না। তা ছাড়া, দু'জনেই যদি দু'জনকে চায়, তুমি কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে? যার যার জীবন, নিজে নিজে গড়ে নেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডিক্টেটারদের মৃত্যু হয়েছে।'

'তুই বড় হয়েছিস, তোর কথা শোনা উচিত; কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ। প্রবীণ মানুষ। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকবে না।'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই থাকবে, তবে একটু লিবার‍্যাল হতে হবে। তুমি মোহিতবাবুর চিঠির জবাব লিখে ফেলো। আমি পোস্ট করে দোব।'

পীতু চলে গেল। ঘর গুছোবার কাজে লেগেছে। সকাল থেকে ঝুনুকে একবারও দেখিনি। শুনলুম জানলার দিকে মুখ করে খাটে শুয়ে আছে। এইভাবে না বেঁচে ফিরে গেলেই পারত। আবার না হয় অন্যভাবে অন্য কোথাও আসত। বেঁচে থাকার গরজ কার? যার জীবন তার, না অন্যের! অনেক কিছুই আমি বুঝি না। ওলড ফুল।

> এখনও একটু সময় আছে। জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা আমার জার্নালে ছকে রেখে যাই। বহু বছর পরে যখন আমি আর থাকব না, তখন যদি কারু হাতে পড়ে, আমারই মতো কোনও মানুষের হাতে, যে মহাকালের ক্ষণপলকের জন্যে এই ধরাভূমে আমারই মতো খেলাঘর পেতেছিল, সে হয়তো সামান্য মিল খুঁজে পাবে। যুগ পালটায়, শাসন বদলায়। অশ্বযানের জায়গায় যন্ত্রযান আসে। অরণ্যের জায়গায় আলোকিত জনপদে চটুল সংগীত ভাসে। জীবন কিন্তু পালটায় না। সেই একই দুঃখ-সুখ। সম্পর্কের টানাপোড়েন। আশাভঙ্গের বেদনা। জ্বলতে জ্বলতে সেই একইভাবে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। যে বাতি বেথলেহেমে যিশুর বাতিদানে জ্বলত সেই একই বাতি আমার টেবিলেও জ্বলে। একই গঠন, একই উপাদান। কিছু মোম আর এক চরণ সুতো। জীবনের একটিই সুখ, বেঁচে থাকার কিছু স্মৃতি ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়। ছোট ছোট স্মৃতি। কিছু না হোক, নিজের সন্তান সন্ততি।। কোথাও একটু সুতোর আঁশের মতো লেগে থাকা। একই মানুষ বারে বারে আসবে, নাম পালটে পালটে। পিনাকীর ছেলে পীতাম্বর। তফাত কতটুকু! সেই একই জীবন! গ্রীক প্রবাদপুরুষ পারমেনিসকাসের কথা মনে পড়ছে। ট্রোফোনিয়াসের গুহায় থাকার সময় তিনি হাসতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই হাসি তিনি ফিরে পেলেন ডেলোস দ্বীপে এসে। প্রথম হাসলেন যখন একটা কিম্ভূতকিমাকার পাথর দেখিয়ে তাঁকে বলা হল, ইনি হলেন দেবী লেটো। তিনি হাসতেই থাকলেন। সে হাসি আর থামে না। প্রশ্ন করা হল কারণ? তিনি বললেন, দেখো ট্রোফোনিয়াসের গুহায় আমার যৌবন কেটেছে জীবন-ভাবনায়। তখন আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আমি প্রবীণ। বাস্তবে এসে এই যে আমার চোখ খুলে গেল, এ হাসি আমার কোনওদিনই আর থামবে না। আমি বুঝে গেছি জীবনের মানে কী? শুনবে? প্রথম হল, যে ভাবেই হোক একটা জীবিকা সংগ্রহ করতে হবে। জীবনের লক্ষ্য কী, না যে ভাবেই হোক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে হবে। প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন কী, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ। বন্ধু কে, যে বিপদে টাকা ধার দেবে। জ্ঞান কী? সবাই যা ভাবে তাই হল জ্ঞান। কে উৎসাহী? যে ভাল বক্তৃতা দিতে পারে। সাহসী কে? যে হাসিমুখে দশটি মুদ্রা জলে ফেলে দিতে পারে। দয়া? দয়ালু কে? যে বলে, আরে আমার খানার টেবিলে তুমি যখন খুশি আসতে পারো। আর দানধ্যান? দাতা কে, যে বছরে একবার ধর্মীয় জমায়েতে হাজির হবে। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেয়ে আমার গোমড়া মুখে হাসি আবার ফিরে এসেছে।

আমি দার্শনিক নই; তাই আমার হাসি আর ফিরে এল না। বিষণ্ণতায় চিরবিদায়। এই তো আমি আমার ভবিষ্যৎ ছকছি। মেয়ে দুটোকে পার করতে পারলেই ঝাড়া হাত পা। পীতুর জন্যে ভাবি না। ভাবতুম যদি উচ্ছন্নে যেত। মনে হয়, ও দাঁড়িয়ে যাবে। এইবার বুড়ো আর বুড়ি। সুপ্রিয়া মৃত্যুর দরজা

থেকে ফিরে আসছে। এবার নিশ্চয়ই ও পালটে যাবে। আমরা দু'জনে, দূরে কোথাও চলে যাব। আমার বন্ধু সদানন্দের আশ্রমেও যেতে পারি। বা অন্য কোথাও। এখানে আর থাকছি না। বলা যায় না, আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কখন কার ঘাড়ে চাপিয়ে বসি। এই ঝুনুর ব্যাপারেই দেখলুম তো! মেনে নেওয়ার চেয়ে সরে যাবার পথটাই বেছে নিয়েছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের নীতি হয়েছে, ভাঙব কিন্তু মচকাব না।

যাক তিনটের সময় পীতুরা যাবে। ফিরে আসতে আসতে চারটে-সাড়ে চারটে হবে। আজ দাড়িটা কামানো যাক। মুখে জঙ্গল তৈরি হয়েছে। পরিষ্কার হাসি মুখে সুপ্রিয়াকে অভ্যর্থনা জানাব। এই নাও তোমার সাজানো রাজ্যপাট। মন এখন বেশ শক্ত। অলৌকিক থেকে লৌকিকে ফিরে এসেছে। অশুভ শক্তি আবার কী! সবই শুভ। সবই স্বাভাবিক। শরীর থাকলেই অসুখ হবে। মন থাকলেই মরতে ইচ্ছে করবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই দুটো বাজল। চারপাশ বেশ ঝকঝক করছে। পীতু খুব খেটেছে। আজ মনে হচ্ছে আমরা সকলেই সকলকে ভালবাসি। মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য, ও সংসারের ধর্ম। বাটি, ঘটি এক জায়গায় থাকলে শব্দ হবেই। বস্তুর ধর্ম।

ছোট্ট একটা ঘুম, মন্দ হবে না। এত বয়েস হল, তবু নির্লজ্জের মতো বলতে হয়, মন একেবারে জমজমাট। সেই যৌবনকালের মতো, বউ যেদিন ফিরত বাপের বাড়ি থেকে। ঠিকই, মনের বয়েস হয় না!

'বাবা, চা।'

ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। রুনুর ডাকে চমকে উঠলুম। ঘড়ি বলছে, সাড়ে তিনটে।

হাত বাড়িয়ে কাপ নিতে নিতে বললুম, 'আজ একটু সাজলে গুজলে হত না মা?'

বলেই লজ্জা পেলুম। মনের দুর্বলতা বেরিয়ে পড়েছে। রুনু মৃদু হেসে চলে গেল। এ যুগের মেয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কত মধুর কী বুঝবে! অম্ল-মধুর। এদেশেও তো ধরো আর ছাড়ো চালু হয়ে গেছে। আমার অফিসের সেই মহিলা! বোস, বোস থেকে মিত্র, মিত্র থেকে মুখার্জি। আরও হত, বয়েসটা বেড়ে গেছে। চারটে পঁচিশে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। মা আসছে, মেয়েদের তেমন উৎসাহ নেই। গাড়ির দিকে কান রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

'রুনু?'

সাড়া নেই। ঝুনু উত্তর দিলে, 'দিদি বাথরুমে।'

'এই সময়ে বাথরুমে ঢুকল! তোর মা এসেছে।'

'আসুক না। ওরা আছে ওপরে নিয়ে আসবে।'

বেশ ধাক্কা খেলুম। বড় রকমের আঘাত। সুপ্রিয়া আমার একলার! এদের কেউ নয়! আধুনিক যুগে পিতামাতার স্থান নেই! শুধু প্রেমিক আর প্রেমিকা! ভক্তি শ্রদ্ধা উধাও!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কয়েক জোড়া পা ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওপরে। সুপ্রিয়াকে এখনও দেখতে পাইনি। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাব। দু'জন মহিলা! দু'জন কেন। আরে এ তো সেই সামনের বাড়ির মেয়েটি। সুপ্রিয়া যাকে ধিঙ্গি বলত লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যের জন্যে। সুপ্রিয়ার একটা হাত মেয়েটির কাঁধে। এত সাবধানে ঠুনকো পুতুলের মতো তুলতে হচ্ছে কেন! কী তা হলে সুস্থ হল!

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। সুপ্রিয়াদের বাড়িতে গেলে সুপ্রিয়ার বাবা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বেশ শীর্ণ হয়ে গেছে। আর থাকতে পারলুম না, 'কেমন আছ সুপ্রিয়া?'

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অথচ আমাকে দেখছে বলে মনে হল না। একেবারে শূন্য দৃষ্টি। কোনও উত্তর নেই। পীতু ইশারায় আমাকে সরে যেতে বললে। মেয়েটির কাঁধে ভর রেখে, পা টেনে টেনে সুপ্রিয়া চলেছে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, 'কোন ঘরে।'

আমার ঘর দেখিয়ে বললুম, 'এই ঘরে।'

পীতু বললে, 'এই ঘরে কেন?'

'হ্যাঁ এই ঘরে।'

আমার ভূমিকা দর্শকের। দেখছি। ঝুনু সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল না। রুনু এখনও বাথরুমে। ডুরে শাড়িপরা সামনের বাড়ির মেয়েটি। বিহারে মানুষ হয়েছে। বাংলায় হিন্দির মিশেল। স্বাস্থ্যের জন্যে বয়েসের চেয়ে বড় দেখায়। ও পাশে পীতু। ভবিষ্যৎ কি আমি দেখতে পাচ্ছি? অনুপের কোনও ভূমিকা নেই। মেয়েটি সুপ্রিয়ার ভয়ে এ বাড়িতে আগে কোনওদিন আসেনি। এই প্রথম এল। এল সুপ্রিয়ার সঙ্গে।

ধীরে ধীরে সুপ্রিয়াকে খাটে বসাল। মেয়েটি পাখার সুইচ খুঁজছে। পীতু হাত বাড়িয়ে পাখা চালিয়ে দিল। সুপ্রিয়ার সামনে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই দু'জনে সরে গেল। জানে অধিকারীর তালিকায় আমার নাম এক নম্বরে। আমিই প্রথম এনেছিলুম এই নামটিকে এখানে।

'সুপ্রিয়া?'

সেই এক দৃষ্টি। কোনও ভাব নেই চোখে। স্তম্ভিত মুখ। পৃথিবীর সাংঘাতিক কোনও ব্যাপারের ধাক্কায় চিন্তা আর দৃষ্টি দুটোই যেন আটকে গেছে। ঘড়ি আর চলছে না।

পীতু বললে, 'তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিই, কাল রাত থেকে মায়ের জিভ আর ব্রেনের একটা অংশ হঠাৎ প্যারালাইজড হয়ে গেছে।'

'সে কী? কেন এমন হল?'

'হয়। টিটেনাস একটা ক্ষতি রেখে যায়। কারু বেলায় অল্পস্বল্প। কারু বেলায় মারাত্মক।

'তা হলে নিয়ে এলি কেন?'

'ওখানে কিছু করার নেই। এখন অন্যভাবে চিকিৎসা করাতে হবে।'

রুনু এসেছে এতক্ষণে। ঝুনু দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারছে। সামনের বাড়ির মেয়েটি মেঝেতে বসে পড়েছে।

ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলুম, 'আমার ডাক তা হলে শুনতে পাচ্ছে না!'

পীতু পিতার মতো বললে, 'মনে হয় না।'

'দেখতে পাচ্ছে না!'

'দেখছে, তবে মেলাতে পারছে না, কী দেখছে? কাকে দেখছে?'

'তার মানে ওর জগতে আমরা আর নেই।'

'মনে হয় না।'

'তা হলে কোন জগতে আছে?'

'নিজের জগতে।'

'এ তো তা হলে মৃত্যু। সুপ্রিয়া তো মারাই গেল!'

'ভুল বললে। আমরা মারা গেলুম। মায়ের জগতে আমরা মৃত। আমাদের জগতে মা জীবিত।' সুখ নয়। গ্রিক প্রবাদপুরুষ পারমেনিসকাসের মতো আমার ভেতরটা হো হো করে হেসে উঠল। জীবনের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এই প্রথম বলতে পারলুম, এর নাম জীবন। স্তম্ভিত মুখে জগৎ সংসারের দিকে তাকিয়ে থাকবে সুপ্রিয়া। মরুভূমিতে স্ফিংকসের মুখ। পেছনদিক অতীতের দিক, সামনে ভবিষ্যৎ। ঘুরিয়ে দাও, উলটে গেল। শুইয়ে দাও, অনন্ত। থটলেস এগজিসটেন্স, পড়লুম আমি, আর ফল পেলে তুমি!

আজ আকাশে চাঁদ নেই। সেদিন ছিল। তারিখটা তোমার মনে পড়ে সুপ্রিয়া। ৭ ফাল্গুন, ১৩৬১।

আজ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিন দরজার বাইরে উৎসাহীরা কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল সারারাত। আজ ফুলের সুবাস নেই।

সেদিন ছিল। তুমি সব ভুলে গেলে! সেদিন বালিশে মাথা রেখে তুমি ঠিক এইভাবেই শুয়েছিলে। আর আমি তোমার মুখের ওপর এইভাবেই ঝুঁকেছিলুম কিছু শোনার আশায়। তোমার দু'চোখে সেদিন অনেক ভাষা ছিল। আজ ভাষাহীন। সত্যি করে বলো তো, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে, না অন্য কোনও জগতে জেগে উঠলে! অন্য ধরনের মানুষ, ফুল পাখি লতাপাতা, ভাষা। রহস্যটা কী! তোমার ওই চোখদুটো কি নিদ্রিত হবে না। সারারাত অপলকে চেয়ে থাকবে দিকহীন দিকে। এ কী দৃষ্টি, যা কোথাও আবদ্ধ নয়!

পীতাম্বর তুমি ঘুমোলে! ঘুমোও, ক্লান্ত তুমি। আমার ঘরে যে আয়না রয়েছে, সেই আয়নায় আমি দুটি মুখের প্রতিবিম্ব দেখলুম। একটি আমার, একটি তোমার মায়ের। দু'জনে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। আর তখনই আমার সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। শোনো তা হলে:

বহুকাল আগে কোপেনহেগেনে বিখ্যাত দু'জন কৌতুকশিল্পী ছিলেন। খুব তাঁদের নাম। মঞ্চে এসে দাঁড়ালেই সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত। মজার মজার কথা বলে অভিনয় করা, এর বাইরে অন্য কিছু করা যায়, তা তাঁরা ভাবতে পারতেন না। এর চেয়েও আরও মজা কীভাবে করা যায়, সে ধারণাও ছিল না।

কোপেনহেগেন থিয়েটারের বিশাল মঞ্চে যবনিকা উঠল এক রাতে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। অভিনেতা দু'জন মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তালি বাজল। শুরু হয়ে গেল হাসির নাটক। পালা বেশ জমে উঠেছে। চমৎকার অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি। হঠাৎ দু'জনেরই একই সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। যে যে ভঙ্গিতে ছিলেন সেই ভঙ্গিতেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রেক্ষাগৃহ তখন হাততালিতে ফেটে পড়ছে। এমন তামাশা দর্শকরা আর কখনও দেখেনি। নিশ্চল দুই অভিনেতা যেন পাথরে কোঁদা ভাস্কর্য!

দেখো পীতু, এইভাবে মুখোমুখি আমাদের দু'জনকে দেখে তোমরা তালি বাজিয়ো না। এ ক্যারিকেচার নয়। এ হল দু'ভাবে মৃত দুই প্রাণীর অনন্ত প্রতীক্ষা।
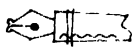
বসবাস
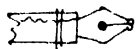
হালকা নীল রঙের গাড়ি ধীরে ধীরে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতা ঝিরিঝিরি কাঁপছে। মেঘলা আকাশ। আলোর আয়োজনে আজ বড় কৃপণতা। বহু দূরে, বহু দূরে একটা পাপিয়া করুণ সুরে ডেকে ডেকে সারা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন শিবপদ। স্থির। পাথরের মূর্তি। দমকা বাতাসে মাথার শুভ্র কেশ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অপসৃয়মাণ গাড়িটির দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিলেন। দৃষ্টি এই মুহূর্তে বস্তুজগতের কোথাও নেই। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন পথের মতো পড়ে আছে প্রাণীশূন্য প্রান্তরে। চোখ যেমন কিছু দেখছে না, মন তেমনি কিছু ভাবছে না। সাধনজগতে থাকলে শিবপদর এই অবস্থাকে বলা যেত সমাধি। বাড়ির পেছন দিকে ছিটকিনি খোলা একটা জানলা মাঝে মাঝে শব্দ করছে। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়িতে জানলাটিই এখন একমাত্র প্রাণী। বাতাসে দুলছে, শব্দ করছে। ধ্বনি তরঙ্গ ভেসে আসছে। বৃষ্টি আসছে। বিশাল বৃষ্টি। দক্ষিণ আকাশে কালো মেঘ ঘোঁট পাকাচ্ছে। সমুদ্রের নিম্নচাপ তেড়ে আসছে স্থলভাগের দিকে।

গেটের ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। মৃদু সুরেলা। শিবপদ জানে কে আসছে। অন্যদিন হেঁকে বলতেন, আয়, কৃষ্ণ আয়। আজ নীরব। নিজেকে মনে হচ্ছে বাইরের সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত পাদুকার মতো। সম্পূর্ণ পরাজিত এক যোদ্ধা। বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসছে আর এক বৃদ্ধ। বড় ভাই কৃষ্ণপদ। দীর্ঘ দেহ। গৌর বর্ণ। পক্ক কেশ। দু'পাশের কাঁধ অবধি নেমে এসে পাঞ্জাবি স্পর্শ করেছে। বড় শৌখিন মানুষ। পরনে চওড়া পাড় দিশি ধুতি। সাদা ফিনফিনে ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি চঞ্চল। আসার পথে পাশের কাঞ্চন গাছ থেকে একটা ফুল সংগ্রহ করা হল। এইটাই তার নিত্যদিনের অভ্যাস। ফুল সামনে রেখে কথা বলা।

কৃষ্ণপদ এখন ঘেরা বারান্দায়। শিবপদর পাশের শূন্য চেয়ারে ধীরে ধীরে উপবেশন। কৃষ্ণ জানে আজ শিবুর মনের অবস্থা কেমন। দীর্ঘকালের একটা আয়োজন নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। শিবপদ পূর্বের মতন স্থির। দৃষ্টি পড়ে আছে সামনে সমান্তরাল রেলপথের মতো। কৃষ্ণ হাতের ফুলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। বড় কোমল। বিন্দু বিন্দু জলের স্পর্শ লেগেছে পাপড়িতে। মৃদু সুগন্ধ ভেসেছে বাতাসে। ফুলের নয়। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপদ সামান্য আতরের স্পর্শ লাগায় শরীরে। গুরুর নির্দেশ। মূল্যবান সুগন্ধি। সুগন্ধে মনের প্রসার হয়। পরিচ্ছন্নতায় পবিত্রতার ভাব আসে। অপুত্রক কৃষ্ণপদ। স্ত্রী উন্মাদিনী। কী হবে সঞ্চয়ে! কে ভোগ করবে! ডাকহরকরা আসার সময় হয়ে গেছে। প্রিয়তমের পত্র এল বলে।

ফুল নিরীক্ষণ বন্ধ করে কৃষ্ণ ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খেয়েছিস? সকালের চা?'

ভাইয়ের দিকে না তাকিয়ে শিবপদ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললে, 'এখনও সুযোগ হয়নি।'

'খুব ভেঙে পড়েছিস?'

'তোর কী মনে হচ্ছে?'

'একটু আহত হয়েছিস।'

'এমন কোনও যুদ্ধ আছে যে যুদ্ধে মানুষ আহত হয় না!'

'তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করি। তুই চা-খোর মানুষ, বেলা ন'টা প্রায় বাজল!'

'তোর অপেক্ষাতেই ছিলুম। এসে গেছিস, এবার জল বসানো যেতে পারে।'

'শেষ মুহূর্তে তোর বাধা দেওয়া উচিত ছিল। রেগে যাসনি। একেবারে সব ফাঁকা হয়ে গেল।

বেশি কষ্ট তোরই হবে। ওদের বয়েস আছে। বেঁচে থাকার নেশা আছে। তোর কী আছে! নিজের অহংকারকে সামান্য খাটো করলে সংসারটা এভাবে ভেঙে যেত না।'

শিবপদ ভাইয়ের দিকে মুখ ঘোরাল, 'তুই কী বলতে চাস? যে কখনও ভাগ্যের পায়ে ধরেনি, সে মেয়ের বয়সি এক মহিলার সামনে নতজানু হবে! জগদানন্দের ছেলে হয়ে তুই একথা বলতে পারলি? যে মানুষ বারো বছর বয়সে বিষয়সম্পত্তির মুখে লাথি মেরে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে নিজের চরিত্রের জোরে সম্মানিত পুরুষ হয়েছিলেন। আজও যাঁর নামে মানুষ শ্রদ্ধায় হাত জোড় করে!'

'যুগ অনেক পালটে গেছে শিবু। মানুষ আর সে মানুষ নেই।'

'আমরা আছি কৃষ্ণ। আমরা এখনও বেঁচে আছি। তুমি আর আমি। লাস্টঅফ দি মহিকানস।'

'তা আছি। তবে আমরা এখন স্থবির। নখদন্তহীন ব্যাঘ্র। গর্জন আছে গতর নেই। ধাক্কায় আমরা কেঁপে যাই।'

'আমি কাঁপি না। তোর চেয়ে আমার জগৎ অনেক বেশি বাস্তব। আমি জানি যে দরজা খোলে সে দরজা বন্ধও হয়। আমি জানি শীতের পেছনে গ্রীষ্ম আসে। তুই শিল্পী, রং-তুলি আর বেহালা হল তোর অস্ত্র। রাজা-মহারাজার পোর্ট্রেট এঁকে কাটিয়েছিস যৌবন। মডেলকে বিয়ে করে সংসার পাততে গিয়ে হাত পুড়িয়েছিস। মডেল-মেয়ে যে মডেল-স্ত্রী হতে পারে না, সে সত্য বুঝেছিস চুলে পাক ধরার পর। আমি ছেলে চরানো শিক্ষক। তেত্রিশটা বছর আমার এ হাত কলমও যেমন ধরেছে, সমানে খুন্তিও নেড়েছে। সুধা তো আমার জীবনে মাত্র ছ'বছরের অতিথি হয়ে এসেছিল। আমার স্বভাব কেড়ে নেবার সুযোগ সে পায়নি। আমাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানাতে পারেনি। আমি শিবপদ। আমি কারুর স্বামী নই। পিতা নই। আমি দীন-হীন-শিক্ষক শিবপদ। ঈশ্বর জগদানন্দ আমার পথপ্রদর্শক, আমার গুরু। আমার জন্য তোমরা কেউ ভেবো না। জীবনে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি মানুষের অনুকম্পাকে। সহানুভূতিকে। এসেছি একলা, যাব একলা। কিছুকাল এই ঘৃণার পৃথিবী, এই প্রেমের পৃথিবীতে বসবাস।'

কৃষ্ণপদ আর কথা বাড়াল না। বললে, 'চল, একটু চা-বিস্কুট খাওয়া যাক।'

রান্নাঘর এতদিন বেদখল হয়ে গিয়েছিল। কাল রাতে অবশ্য আর রান্না হয়নি। কালকের রাত বিদায় নিয়ে গেছে ভাঙচুরের পরিকল্পনায়। শিবপদ একপাশে বসে দেখেছে যৌবনের তর্জন-গর্জন-আস্ফালন। মনে মনে হেসেছে। যে পা নৃত্য করে বেশি সেই পা অবশ হয় তাড়াতাড়ি। যে কণ্ঠ গর্জন করে বেশি, সেই কণ্ঠ নীরব হয় দ্রুত। শিবপদ দূরে বসে দেখছে, দুটি মোহাচ্ছন্ন তরুণ-তরুণীর খেলা। অংশ গ্রহণ করেনি। ভিক্ষার বিরোধী। এমনকী শান্তি-ভিক্ষাতেও আপত্তি। একটি কথা সে মনে রেখেছে অটলেরও টল আছে। যা গড়ে তা একদিন ভাঙে। যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। অস্তির নাস্তি, নাস্তির অস্তি।

গ্যাস জ্বালানোর প্রক্রিয়াটি ভারী মসৃণ। অসংখ্য নীল শিখা কেটলি জাপটে ধরেছে। রান্নাঘরের বাইরে কৃষ্ণপদ পায়চারি করছে, এধার থেকে ওধার। গুনগুন গান চলেছে। বেশ ভাবে আছে। শিবপদের চেয়ে বয়েসে বছর দুই বড়। প্রথাসম্মত বিবাহ হল না বলে স্বেচ্ছায় বউ নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছিল। সে সব বেশ অনেক কালের পুরনো কথা। পাড়াপ্রতিবেশীরা পাঁচ কথা বলেছিল। আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় এক ঘরে করে দিয়েছিল। প্রেমের তোড়ে সব ভেসে গিয়েছিল। নেশা কেটে যাবার পর পৃথিবীকে মনে হয়েছিল বিবর্ণ হলুদ। অনেক দিন জ্বর ভোগের পর জিভের যেরকম স্বাদ হয়, জীবনের স্বাদ হয়ে গিয়েছিল সেইরকম। সারাটা জীবন একের পর এক মেয়েদের উৎপাতে কম ভুগতে হয়নি। ঈশ্বর এমন একখানা চেহারা দিয়েছেন। মেয়ে-ধরা ম্যাগনেটের মতো। কোথাও গিয়ে শান্তি ছিল না। স্ত্রী-হাঙরে ছেঁকে ধরত। ভোগের সুযোগ জীবনে অনেক এসেছিল। শরীরে জগদানন্দের রক্ত বইছে। মন ভোগ ছেড়ে দুর্ভোগের দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। সব ত্যাগ

করতে করতে এখন একেবারে সন্ন্যাসীর জীবন। স্বপাক আহার। রাতের দিকে দুগ্ধ সহযোগে সরষে পরিমাণ আফিং। রাত ভোর মৌতাত। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন।

দেওয়ালে একটা ছবি ট্যারা হয়ে ছিল। শিল্পীর চোখে বড় বেমানান। কৃষ্ণপদ ছবিটাকে সোজা করতে করতে বললে, 'বাড়িটায় এবার একবার হাত দে রে ভাই। রংটং ধরা। পুজো এসে গেল।'

চা ছাঁকতে ছাঁকতে শিবপদ বললে, 'দাঁড়া। রেস্ত দেখে ব্যবস্থা।'

'তোর একার জন্যে এত বড় বাড়ি কী হবে! ভাল একঘর ভাড়াটে বসিয়ে দে।'

'ভাড়াটে? পাগল হয়েছিস। তেমন বুঝলে বেচে দোব। ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

'তারপর?'

'টাকাটা ফিকস্‌ড করে দিয়ে সুদের টাকায় মনের আনন্দে ডাল ভাত।'

'আর বসবাস?'

'কোনও তীর্থে ধর্মশালায়।'

'তার মানে সেকেলে বিধবাদের মতো কাশীবাসী হয়ে যাবি?'

শিবপদ ভাইকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। নিজের চায়ে চিনি গুলতে গুলতে বললে, 'না ভাই কাশীবাসী হবার ইচ্ছে নেই। ধাতে সইবে না। তবে আমার একটা আশ্রম জানা আছে। সেখানে মাসে মাসে কিছু টাকা ধরে দিলে থাকতে দেবে। মনোরম পরিবেশ। যেদিকেই তাকাও সেই দিকেই পাহাড়।'

চায়ের কাপ নিয়ে দু'জনেই আবার বারান্দার চেয়ারে এসে বসল। আকাশ আরও ঘোর হয়ে এসেছে। ফুলে ফুলে সাদা কাঞ্চন গাছ যেন আরও সাদা। পাতাবাহারের পাতা চকচক করছে।

কৃষ্ণপদ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'তোর খাওয়ার ব্যবস্থা আমার ওখানেই করি।'

'কেন রে?'

'আমার একজন রান্নার লোক আছে।'

'বাজে বকিসনি। তোর সম্বল একটা ইকমিক কুকার।'

'ভুল বলিনি রে ভাই। কুকের বাংলা কী, রাঁধুনি। দেখ ভাই, ব্যাচেলারদের সবচেয়ে বড় সহায় কুকার। এই তো চাপিয়ে এসেছি। কাঠকয়লার সোহাগি আগুনে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে জানিস? রাজভোগ। গব্যঘৃত সহযোগে তোফা। এই বুড়ো বয়েসেও জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'ব্রাহ্মণের স্বপাকই ভাল। আমার প্রেশার কুকার আছে। আধঘণ্টার ব্যাপার।'

'কেন আমার সঙ্গে গেলে তোর জাত যাবে?'

'তোর পইতে নেই। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করো।'

'হায় রে আমার কোনও খবরই রাখিস না। সায়েব কৃষ্ণপদ এখন কৃষ্ণগত কৃষ্ণপদ। ত্রিসন্ধ্যা না করে জলগ্রহণ করি না। সহস্রবার জপ। নিরামিষ আহার। আর এই দেখ গলায় কাছির মতো পইতে।'

কৃষ্ণপদ টেনে পইতে বের করে ভাইকে দেখাল।

শিবপদ বললে, 'যাক এতদিনে তা হলে সুমতি হয়েছে। দাঁত খুইয়ে বৈষ্ণব!'

'আজ্ঞে না। এই দেখ আমার দাঁত। ঠিক যেন বিজ্ঞাপনের হাসি। টুথপেস্ট কোম্পানি টের পেলে কাগজে ছবি বেরিয়ে যাবে। নাঃ, উঠে পড়ি। বৃষ্টি এল বলে।'

'আমার ছাতাটা নিয়ে যা।'

'নাঃ, হনহন করে চলে যাই। ছাতা আর স্ত্রী বুঝলি শিবু, ওয়াইফ অ্যান্ড আমব্রেলা দুটোই আমার সহ্য হল না। জীবনে কম করে শখানেক ছাতা হারিয়েছি। সন্ধেবেলা বসবি?'

'তা বসা যেতে পারে।'

'সেদিন একটা বিলিতি দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি দেখলুম—আহা কী জিনিস! রোজগার থাকলে কিনে ফেলতুম।'

'কী হবে? লোভ যত বাড়াবি তত বেড়ে যাবে। দিশিই আমাদের ভাল। খেলা নিয়ে কথা।' কৃষ্ণপদ চলে গেল। দুরে মেঘ-গর্জনের শব্দ হল। ভিজে উঠেছে বাতাস। শিবপদর সামনে শূন্য দুটি চায়ের কাপ। চায়ের তলানিতে ধীরে ধীরে সাদা সর জমছে। বর্ষা আসছে দেখে সাবধানী পিঁপড়ের দল ডিম সরাবার কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ সারি দেয়ালের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। তীর্থযাত্রীর মতো। প্রত্যেকের মুখে একটি করে ডিম। শিবপদ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বড় সুন্দর দৃশ্য। ক্ষুদ্র প্রাণীর জগতে অনুভূতি এখনও বেঁচে আছে। মানুষ এখন অনুভূতি শূন্য যন্ত্রদানবের মতো। মন নেই, আছে মতিভ্রম। না, এসব ভাবার অধিকার তার নেই। সৃষ্টির পেছনে যে বিশাল শক্তি, সেই শক্তিরই এই খেলা। মানুষ নিজের ইচ্ছায় কী করতে পারে? তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের একটা পাতাও নড়বে না। সন্তানের ওপর অধিকার বোধ থেকে এইসব ভাবনার উদয়। হতাশা যেন না আসে। এই পৃথিবীতে কে কার! কাকে বাঁধা যায়, কাকে ছাড়া যায়! সময় হলে সবাই চলে যাবে। কেউ দূরে। কেউ জগতের বাইরে। শূন্যতাই পূর্ণতা।

শিবপদ খালি কাপ দুটো কলের তলায় রাখলেন। কলের মুখ দিয়ে জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। এই এক কল, শত চেষ্টাতেও যার অশ্রু বিসর্জন বন্ধ করা যায় না। মানুষের মতো। ওপর দেখে বোঝা যায় না। সব মানুষই মনে মনে আজীবন কেঁদে চলেছে। মানুষ তো কোন ছার। অটল পর্বতও রাত্রির মধ্যযামে অশ্রু বিসর্জন করে। পাথর চুঁইয়ে নেমে আসে। শেষে জমে যায়। পর্বত অশ্রুর অনেক দাম। শিলাজতু নামে বিক্রি হয়। কবিরাজি ওষুধ।

ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা হয়েছে। বাসা মানেই বাচ্চা। চিঁ চিঁ করছে। দুর্যোগ আসছে। মা-টা আবার কোথায় গেল বাসা ছেড়ে। পেছনের বারান্দায় এসে শিবপদ আকাশের দিকে তাকাল। পাখিরা সব নেমে পড়েছে। একবার বাজারে যাওয়া দরকার। সংসারে কী আছে কী নেই আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। নতুন পত্তনি হওয়াই ভাল। খরচপত্তর সব কমাতে হবে। বাড়ি করে সর্বস্বান্ত।

'বাবা।'

শিবপদ চমকে উঠেছে। এত মধুর স্বরে কে তাকে বাবা বলে ডাকতে পারে! ঘুরে দাঁড়াল।

'আপনি অমন চমকে উঠলেন? কী ভাবছিলেন? সামনের দরজা হাট খোলা। সামনের ঘরে জিনিসপত্তর রয়েছে। কেউ যদি ঢুকে পড়ে!'

শিবপদ হাসল, 'কী আর নেবে মা! নেবার মতো কিছু নেই। তুমি হঠাৎ এই সময়ে! আজ বেরোওনি।'

'বেরোতে গিয়েও বেরোনো হল না। মেয়েটার হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে। আপনি একবার দেখবেন বাবা!'

'তাই তো। তোতা তো সকাল থেকে একবারও আসেনি আজ। জ্বর মানে কত জ্বর?'

'থার্মোমিটার নেই। কপালে হাত দিয়ে মনে হল দুইটুই হবে। মুখটা ভীষণ লাল হয়েছে। থমথম করছে। আপনি একবার চলুন।'

'আমার হোমিওপ্যাথি কী কাজ করবে মা! বাঁকা বাঁকা অসুখের যুগ পড়েছে। ভাল কোনও ডাক্তার ডাকলে হত না? বলো তো আমিই ডেকে আনতে পারি।'

'আগে আপনি একবার দেখুন। সকাল থেকে দাদু দাদু করছে। একবার উঁকি মেরে গেছি, আপনি ব্যস্ত ছিলেন। আপনার ওষুধে ওর খুব কাজ হয়।'

'চলো চলো, আমার তোতামণির অসুখ।'

সামনের দরজায় এসে মহিলা শিবপদর হাত থেকে তালা আর চাবি নিয়ে বললে, 'দিন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে আর নিচু হতে হবে না।'

মেয়েটির নাম দেবী। সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। মিষ্টি করুণ মুখ। চুলে তেল পড়েনি অনেকদিন।

তাই যেন কেমন একটু দুঃখী দুঃখী ভাব। পরনে আটপৌরে শাড়ি। পায়ে প্লাস্টিকের চটি। শিবপদ মেয়েটিকে দেখছে আর মনে একটা সাহসের ভাব আসছে। এই দাঁতালো ধারালো পৃথিবীতে একটি ফুলের মতো মেয়ে নিয়ে দেবীর মতো দেবী যদি বেঁচে থাকতে পারে, আমি শিবপদ কেন পারব না। বয়েস হয়েছে, তা হোক না! এখনও তো শুয়ে পড়িনি। সেদিন এক ফলওলাকে দেখলুম আমার চেয়েও বয়েস বেশি। আপেল চাই, আপেল চাই বলে হেঁকে যাচ্ছে। মাথায় ফলের ঝাঁকা। পায়ে ছেঁড়া জুতো।

'আপনার এই তালাটায় একদিন একটু তেল দিতে হবে। কলে জং ধরে গেছে।'

'তালাটা পড়ে ছিল মা। কত বছর পরে দরজায় তালা পড়ল।'

'নিন চাবিটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখুন। হারাবেন না।'

'দাও।'

শিবপদ চাবিটা পইতেতে ঝোলালেন। সাবধানের মার নেই।

সিঁড়ির ধাপ একটু আগের ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। দেবী নামতে নামতে বললে, 'সাবধানে নামবেন বাবা। জুতো স্লিপ না করে। হাত ধরব?'

'না মা। আমি সাবধানেই নামছি।'

শিবপদর ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভালবাসা শ্রদ্ধা এখনও বেঁচে আছে! সভ্যতার প্রখর সূর্যে শিশিরের মতো শুকিয়ে যায়নি। সাদা একটি গোলাপ ফুটেছে। শিবপদ নিচু হয়ে তুলে নিলেন।

'তুললেন কেন বাবা? বেশ তো গাছে ছিল!'

'এর স্থান আরও ভাল জায়গায় হবে। আমার তোতামণির বিছানায়।'

দেবীর সব গেছে। দুর্ঘটনায় স্বামী চলে গেছে বছর তিনেক আগে। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু। তাই সরকার নিয়ম অনুসারে স্ত্রীকে একটি চাকরি দিয়েছেন। সামান্য মাইনে। সামান্যতেই চালাতে হয় টেনেটুনে। স্বামীর সঞ্চয় কিছু ছিল না। অবকাশ পায়নি মানুষটি। সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে না বসতেই খেলা ভেঙে গেছে। দেবীরও তিনকুলে কেউ নেই। থাকার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি আছে। অচল আধুলির মতো। আছে একটি মেয়ে, যাকে ধরে বাঁচার চেষ্টা। একটা উদ্দেশ্য এনেছে শূন্য জীবনে। আর এই বৃদ্ধ যাকে দেবী পিতার মতোই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কোনও আত্মীয়তা নেই। সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ ছেড়ে যেতে হলে কষ্ট হবে। বৃদ্ধের মুখে এমন একটা মায়া আছে, যেন আপন জনের থেকেও আপন।

ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। ফাঁকি দিয়ে তৈরি। দুটি মাত্র ঘর। একটি মাঝারি, আর একটি খুবই ছোট। এক চিলতে রান্নাঘর। অপরিসর বাথরুম। ছটাকখানেক বারান্দা। বাড়িটার একটাই ভাল, চারপাশে খোলা। আলো-বাতাসের অভাব নেই।

চাকরি করতে হয় বলে দেবী একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়েকে রাখতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েটি সুশ্রী, ভদ্র। তোতাকে ভালবাসে। ঈশ্বর মানুষকে যেমন বিপদে ফেলেন, তেমনি বিপদ থেকে বেরোবার রাস্তাও করে দেন। তা না হলে ঈশ্বর হয়েছেন কেন? লোক জহ্লাদ বলত। মেয়েটি জুটে না গেলে দেবীকে আর চাকরি করে খেতে হত না।

শিবপদ মাঝে মধ্যেই এ বাড়িতে আসে। এলেই তার মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। কেমন ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবালয়ের মতো পবিত্র। সব সময় মৃদু ধূপের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। অভাবের সংসার তবু স্বভাবটি এমন, চারপাশে একটা প্রাচুর্যের ভাব। ফুলদানিতে ফুল রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একেই বলে দেবীর সংসার। কোথাও সামান্য ধুলো নেই। দেয়ালের কোণে ঝুল নেই। আয়নার কাচ ঝাপসা নয়। চিরুনি বুরুশের ওপর হেলে নেই। তোয়ালের জায়গায় পাট করা ধবধবে তোয়ালে। যেখানে সেখানে দড়ি খাটিয়ে জামা কাপড় অন্তর্বাস ঝোলানো নেই। জুতোর র‍্যাকে জুতো এমনভাবে সাজানো যেন জুতোর দোকান। পাশাপাশি নিখুঁত পরিপাটি অবস্থান। দক্ষিণপন্থী,

বামপন্থীর যুগপ্রচলিত লাঠালাঠি নেই। এমন একটি মেয়ে যদি তার সংসারে বউমা হয়ে আসত। ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিত। শিবপদ তাকে আরও লেখাপড়া শেখাত। নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে ডক্টরেট করিয়ে দিত। শাস্ত্র পড়াত। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত। জীবনের শ্রেষ্ঠ যা কিছু সব উজাড় করে দিত শিবপদ। তারপর একদিন পরম শান্তিতে চোখ বুজত। পৃথিবীর শেষ দেখাটা হত, ঠিক যেমনটি তার কল্পনায় আছে। উজ্জ্বল একখণ্ড আকাশ; মিষ্টি একটি মুখ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, যেন আদিত্যবর্ণ। চলে যাবার অসহ্য ব্যথা, ফিরে আসার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ। তারপর পুত্রের সন্তান হয়ে পিতার ফিরে আসা। যেমন জননীর কোলে মানুষ বারে বারে ফিরে আসতে চায়। পৃথিবী যতই দুঃখ কষ্টের হোক না কেন?

'তোতা।'

শিবপদ দরজার সামনে থেকে ডাকল। 'কী হয়েছে বন্ধু তোমার?'

দাদুর গলা পেয়ে তোতা চট করে পাশ ফিরে বালিশের তলায় মাথা পুরে দিল। লুকোচুরি। খরগোশের মুখ লুকোনো। পেছনটা উলটে আছে। গায়ে সুন্দর একটা ফুল ফুল ফ্রক। দেবীর হাতে তৈরি।

শিবপদ মজা করে বললে, 'বউমা তোতা নেই বুঝি। এই তো ছিল। এরই মধ্যে মেয়েটা গেল কোথায়? পাখি হয়ে উড়ে গেল নাকি জানলা দিয়ে?'

দেবী মৃদু হেসে বলে, 'তাই তো, কোথায় গেল মেয়েটা। বিছানায় শুয়ে ছিল না এইমাত্র!'

'সেইরকমই তো মনে হয়েছিল বউমা। আমার কী মনে হয় জানো, ওর সেই পোষা পক্ষীরাজে চেপে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের রাজপুত্রের দেশে বেড়াতে গেছে। যেখানে রুপোর গাছে সোনার ফল ঝোলে। যে দেশের রাস্তা তৈরি হয় মণিমুক্তো দিয়ে। যে দেশের পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলে। ও এখুনি ফিরে আসবে। এলে বোলো আমি দেখা করতে এসেছিলুম। বলবে সাদা দৈত্য এসেছিল। কিছু দেবার ছিল। যাক পরেই না হয় আসব।'

বালিশের তলা থেকে মুখ বের না করে, তোতা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। দাদুর আনা জিনিসটা চাই।

শিবপদ বললে, 'ও মা ওটা কার হাত গো!'

গোলগাল সাদা টুকটুকে একটা হাত। ছোট্ট একটি সোনার বালা হাত নাড়ার তালে তালে দুলছে।

শিবপদ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'ওমা এটা তো আমার তোতামণির হাত। দুষ্টু মেয়ে এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। কই মুখ দেখি মুখ।'

'তোতা। মুখ খোলো। দেখো দাদু তোমার জন্যে কী এনেছেন?'

বালিশের তলা থেকে মুখ বের করে মেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। হরিণের মতো ছলছলে দুটি চোখ। মা দুর্গার মতো মুখ। বহু রাতে শিবপদ স্বপ্নে এই মুখ দেখে। ফুলে ফুলে ভরা বাগান। সবুজ ঘাসে ঢাকা পথ। চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। রুপোর চুমকি বসানো সাদা সিল্কের ঝলমলে ফ্রক পরে তোতা ছুটছে আর বলছে, দুয়ো, তুমি আমায় ধরতে পারো না। এই স্বপ্ন শিবপদ রোজ রাতে দেখতে চায়। ভোরে নিজেকে বড় পবিত্র মনে হয়। পাখির মতো। পাখি জীব নয়। একটা রূপক। ডানা-মেলা আনন্দ, ভাসমান প্রার্থনা, উৎসারিত সংগীত।

সাদা গোলাপটি তোতার হাতে দেবার সময়, সামান্য স্পর্শেই শিবপদ বুঝল মেয়ের বেশ জ্বর। বিছানায় একপাশে বসে কপালে হাত রাখল। ভীষণ উত্তাপ।

'দিদিভাই জ্বরটা কীভাবে বাধালে? লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা তেঁতুল খেয়েছ। তাই না?'

তোতা মাথা ঝাঁকাল। রেশমের মতো চুল কপালে দুলে উঠল, 'না তো! আমি কি দুষ্টু মেয়ে?'

'তবে তুমি খুব চান করেছ?'

'সত্যি না। আমার জ্বর হয়েছে কেন জানো, কাকে আমার মাথায় অ্যা করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?'

শিবপদ নাড়ি ধরল। নাড়ি যেন টগবগ করে ছুটছে। তিনের ওপর।

'দেখি জিভ দেখি।'

গোলাপি রঙের ছোট্ট এতটুকু একটা জিভ বেরিয়ে এল। না পেটের সমস্যা নয়। গরম ঠান্ডার জ্বর।

'দেখি তোমার পেটটা আমি প্যাঁক প্যাঁক করে টিপব এবার। দেখব তুমি হংস না মনুষ্য!'

ছোট্ট প্রাণীর ছোট্ট এতটুকু উদর। নরম তুলতুলে। মানুষের উদ্যানে সদ্য ফোটা একটা মানুষ। শিশিরের গন্ধ। না পেটে কিছু নেই। লিভার ঠিক আছে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ বের করল শিবপদ। মোটামুটি সব ওষুধই আছে। একটা শিশি বের করে কপালে ঠেকাল। দেবার আগে ওষুধে প্রাণ সঞ্চার করতে হয়।

'তোতামণি, আবার তোমার জিভ বের করো।'

জিভের মাঝখানে টুপটুপ করে চারটে গুলি ফেলে দিল।

'কী বুঝলেন বাবা?' মেয়ের মাথার কাছ থেকে দেবী প্রশ্ন করল।

'বেশ ধুম জ্বর। সাবধানে রাখতে হবে। খাওয়া দাওয়া সামলে।'

'চলুন হাত ধোবেন চলুন। তারপর ভাল করে এক কাপ চা খান।'

'হাত ধোব কেন? আমার দিদিভাই তো ফুল। পৃথিবীর সব ফুল এক করলে যে ফুল হয় সেই ফুল। না বউমা, এবার আমি যাই। গিয়ে আবার রান্না চাপাতে হবে।'

'আমার হাতের চা এক কাপ। আমি সাহস করে একটা কথা বলব বাবা?'

'বলো না। আমাকে কিছু বলার জন্যে সাহস দুঃসাহসের প্রয়োজন নেই। আমি কী এমন মানুষ?'

'আপনি কী মানুষ, কেমন মানুষ সে আর আপনি বুঝবেন কেমন করে? বোঝেন না বলেই আপনি মানুষের মতো মানুষ। আমি যা বলছিলুম, আজ আপনি এখানেই খাওয়া দাওয়া করুন।'

'না মা, আজ থাক সে আর একদিন হবে। দিন তো পালাচ্ছে না। তোতামণি সেরে উঠুক। ও যেদিন মাছের ঝোল দিয়ে পথ্য করবে সেইদিন আমার নিমন্ত্রণ।'

'আপনাকে যখনই খাবার কথা বলি, আপনি এড়িয়ে যান। আমাকে আপনি ঘৃণা করেন, পাপী ভাবেন, তাই গরমজল ছাড়া আমার হাত থেকে কিছু গ্রহণ করেন না।'

'না গো পাগলি মেয়ে। এ তোমার ভুল ধারণা। মুখে তোমাকে দেবী বলি, মনে মনেও তোমাকে দেবী বলি। মানুষের মন যে দেখা যায় না। যদি দেখানো যেত তোমার আসন দেখতে পেতে। হৃদয়ের কথা ভাষায় যে বলা যায় না।'

'তা হলে কথা দিলেন, তোতার পথ্যের দিন।'

'হ্যাঁ কথা দিলুম।'

দেবী চা করতে গেল। শিবপদ চুপচাপ বসে। তোতা একটা হাত ধরে আছে। মেয়েটা জ্বরে হাঁসফাঁস করছে।

'তোতা'।

'উঁ'।

'খুব কষ্ট হচ্ছে দিদিভাই?'

'একটু একটু। দাদাই?'

'বলো।'

'তুমি পেরেছ?'

'কী বলো তো?'

'এত ভুলে যাও কেন গো? তুমি আমাকে একটা কাঠবেড়ালি ধরে দেবে বলেছিলে। কিচ্ছু তোমার মনে থাকে না। তুমি একদম বুড়ো হয়ে গেছ।'

'কাঠবেড়ালি! সে তো আমার মনে আছে। দাঁড়াও শীত পড়ুক, তারপর একটা ফাঁদ তৈরি করে একটা দুটো তিনটে, কত কত ধরব। রোজ ধরব। রোজ রোজ ধরব।'

'কোথায় আমি রাখব?'

'এই বিরাট এক খাঁচা তৈরি করব।'

'এই ঘরের মতো?'

'এর চেয়েও বড়। তার মধ্যে একটা নারকেল গাছ, একটা তাল গাছ থাকবে।'

'হিহি, কী মজা!' তোতা চোখ বুজিয়ে আছে। ছাড়ানো লিচুর মতো নিটোল গোলাপি মুখ। জ্বরে তপতপে হয়ে আছে। 'দাদাই কাঠবেড়ালি কী খায়?'

'বাদাম খায়, মুড়ি খায়, গাছের ডাল চিরে সাদা সাদা পোকা বের করে খায়।'

'চিনে বাদাম?'

'চিনে, কাগজি, কাজু।'

'দাদাই, কবে তা হলে বলবে?'

'কাকে তোতামণি?'

'তোমার মিস্তিরিকে।'

'এই পুজোর পর।'

'পুজোতে তুমি আমাকে জলের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে?'

'নিশ্চয় নিয়ে যাব।'

'জলের ঠাকুর কী দাদাই?'

'চারপাশে জল, মাঝে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে মা দুর্গা।'

'আমরা কাছে যাব কী করে?'

'একটা পোল থাকবে। সেই পোলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।'

'অনেক দূর? অনেক অনেক দূর!'

'তা একটু দূর তো বটেই।'

পরিষ্কার ঝকঝকে কাপে দেবী চা নিয়ে এল। আর একটা প্লেটে গরম চারখানা ডালের বড়া। গায়ে তেল পুটপুট করছে।

'এর মধ্যে তুমি এত সব বানিয়ে ফেললে?'

'কাল রাতেই ডাল ভেজানো ছিল। দুর্গা বাটছিল। চট করে চারখানা ভেজে ফেললুম। আপনি ডালের বড়া ভালবাসেন।'

শিবপদর চোখে জল এসে যাবার মতো হল। মানুষ মানুষকে চায়। প্রেমে চায়, ঘৃণায় চায়, স্নেহে চায়, বিতৃষ্ণায় চায়। বড়া খেতে খেতে শিবপদ বললে, 'চুলে তেল দিচ্ছ না? বড় রুক্ষ হয়ে আছে।'

'ক'দিন মাথায় জল দিইনি।'

'কেন?'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

দেবী মুখ নামাল। শিবপদ ব্যাপারটা বুঝল। এর আগে একবার ওষুধ দিয়েছিল। দেবী মৃদু গলায় বললে, 'আমাকে একটু ওষুধ দেবেন?'

'সেই আগের মতোই!'

'হ্যাঁ।'

শিবপদ হাত ধুয়ে ওষুধের পুরিয়া করতে বসল। নিজের বউমার কথা মনে পড়ছে। সেও মা

হতে চলেছে। আর কী, মাস ছয়েক পরেই কোল ভরে যাবে। নাতিই হবে। হোক। তাতে তার কী। লোকে বলে সুদের সুদ।

সাত মোড়া ওষুধ দেবীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'ঠান্ডা লাগিয়ো না। ঝাল খেয়ো না।'

দেবী কপালে ওষুধ ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধল।

'আমি এখন আসি বউমা।'

'আমি যাব।'

'না না, আমি ঠিক চলে যাব।'

'দাদাই?'

'কী রে দিদি?'

'এই নাও। এই ফুলটা তুমি দিদাকে দিয়ো। বলবে তোতা দিয়েছে। রোজ তো আমি দিই। তুমি দেবে, অ্যাঁ ঠিক দেবে তো! কালও দেবে, পরশুও দেবে, রোজ রোজ দেবে।'

শিবপদর হাতে সেই সাদা গোলাপটি।

'সাবধানে ধরো দাদাই। পাপড়ি যেন ছিঁড়ে না যায়।'

শিবপদ নিজের বাড়ির তালায় চাবি লাগাতে লাগাতে চারপাশে একবার তাকাল। বৃষ্টি ধোয়া সবুজ। ফিসফিস করে বৃষ্টি নামল। এলোমেলো বাতাসে জলকণা উড়ছে। বৃদ্ধের সাদা চুলে মুখে জড়িয়ে গেছে বৃষ্টির ছাট। ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। চাবি লাগাতে আজকাল হাত কাঁপে।

॥ দুই ॥

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

কৃষ্ণপদ জুতোয় পালিশ লাগাচ্ছিল। পাশেই বন্ধ ঘর। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তার উন্মাদিনী স্ত্রী। একসময় যার নাম ছিল কুমকুম। সে কখনও ডাকত কুমু, কখনও কুমি বলে। এখন আর কোনও নাম নেই। পাড়ার লোকে বলে পাগলি। আগে বলত কৃষ্ণবাবুর বাড়ি। এখন বলে পাগলির বাড়ি।

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

কৃষ্ণপদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। লাল পাড়, সাদা শাড়ি। অবহেলার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। জামা-কাপড় গায়ে রাখতে চায় না। খুলে ফেলে দেয়। খুলতে না পারলে ছিঁড়ে ফেলে রাগে। কাঁচা পাকা এলো চুল। পাকা পেয়ারার মতো মুখ। অস্বাভাবিক দুটি চোখ। তাকাতে ভয় করে। নীরব নালিশের মতো। সময় সময় বিচারকের মতো। যা দেখেছে তা যেমন জানে, যা দেখেনি তাও তেমনি জানে। যা ঘটবে তাও যেন দেখে বসে আছে।

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

জুতোয় বুরুশ চালাতে কৃষ্ণপদ বললে, 'বলো।'

'তোমার রাধা কোথায়'

'তুমিই তো আমার রাধা।'

কাচের শার্সি ভাঙা ঝনঝনে হাসি, 'ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার।'

জুতো আর বুরুশ যথাস্থানে রেখে কৃষ্ণপদ উঠে দাঁড়াল। এইবার তাকে কাজের ভেলকি দেখাতে হবে। এতক্ষণ দম নিচ্ছিল। রাতে ভাল করে একটু ঘুমোতে পারলে শরীরটা সকালের দিকে তাজা লাগত। আফিমের মৌতাত পাগলির জন্যে বারে বারে ছিঁড়ে যায়। জোড়া লাগাতে লাগাতেই আকাশ ফরসা।

কৃষ্ণপদ আয়নার সামনে থেকে মেয়েদের চুল আঁচড়াবার চিরুনি হাতে নিয়ে বন্ধ ঘরের ছিটকিনি খুলল। আদুরে গলায় ডাকল, 'কুমু এদিকে এসো।'

স্বামীর ডাক শুনে কুমু ঘরের কোণে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। দৃষ্টি ভয়াবহ।

কৃষ্ণপদ আরও নরম গলায় বললে, 'এদিকে এসো। তোমার চুল আঁচড়ে দিই। তিনদিন চুলে চিরুনি পড়েনি। উকুন হয়ে যাবে।'

ঘরে কোনও আসবাব নেই। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়াবাড়ির সময় কুমু ভাঙচুর করে। একবার ভাঙা কাচে হাত পা সব ফালাফালা করে ফেলেছিল। শূন্য ঘরে কৃষ্ণপদর কণ্ঠস্বর গমগম করছে।

'এদিকে এসো।' কৃষ্ণপদ এবার কঠোর স্বরে বলল।

কুমু বাধ্য বালিকার মতো ঘষটাতে ঘষটাতে ঘরের মাঝখানে চলে এল।

'উঠে আসতে পারো না। কাপড় ময়লা হচ্ছে।'

কুমু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণপদ পেছন দিকে বসে চুলে চিরুনি চালাতে শুরু করল। অসম্ভব জট হয়েছে। পদে পদে চিরুনি বাধা পাচ্ছে। মেয়েদের চুল ছাড়ানো কি পুরুষের কাজ। যেমন বরাত! ভাগ্য ভাল যে আগে থেকেই এইসব একান্ত বিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল। যত বয়েস বাড়ছে এই অসহায় মহিলা ততই মন জুড়ে স্থান দখল করছে। ফেলে দিতে চাইলেও ফেলা যাচ্ছে না। অতীত ভেসে উঠছে। একসময় এই সুঠাম শরীরের কত ছবিই এঁকেছে কত ভঙ্গিতে। বনের পাখি খাঁচায় সুস্থ থাকে না কৃষ্ণপদ। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল তোমার এইটাই। সব কিছু ধরা যায় না। কিছু উড়ে বেড়াবেই।

মাঝে মাঝে চুলে জোরে টান মারলেই কুমুর মাথা কৃষ্ণপদর বুকের কাছে চলে আসছে। সেই মাথা যে মাথা একদিন তার বাহুর বালিশে নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে থাকত। নিবিড় কথায় ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে পাখির ডাক শোনা যেত।

অনেকেই সেই সময় বলেছিল, কৃষ্ণ যৌবনের নেশায় ভুল কোরো না। বিয়ে জিনিসটা ছেলেখেলা নয়। যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। মডেল রমণী মডেল স্ত্রী হবে এমন কোনও কথা নেই।

যৌবন! যৌবনের কথা ভাবলে কৃষ্ণপদর হাসি পায়। বড় ক্ষণস্থায়ী। বিজলির ঝিলিকের মতো। মেঘলা দিনের রোদ্দুরের মতো। বার্ধক্য সেই তুলনায় দীর্ঘতর। কী এমন খারাপ আছি আমি? ভালই আছি। সময় কেমন সহজে কেটে যায়! দিন যায়, রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। মহাজনের হাতে বাজিয়ে বাজিয়ে টাকা তুলে দেবার মতো, মহাকালের হাতে একটি একটি করে জীবনের দিন তুলে দেওয়া। জীবনের একমাত্র কর্তব্য এখন অসহায় এই মহিলার সেবা। বেঁচে থাকার একমাত্র আকর্ষণ। অন্যে শুনলে হাসবে। বলবে বুড়োর আদিখ্যেতা।

মাথায় মাখার কবিরাজি তেল এনেছে কৃষ্ণপদ। উৎকট গন্ধ। কাজ কী হয় কে জানে! তবু কুমুর ব্রহ্মতালুতে বেশ খানিকটা থাবড়ায়। ঈশ্বরের কাছে কৃষ্ণর একটিই প্রার্থনা, প্রভু এত চিকিৎসা তো হল, শক থেরাপি, ট্রাঙ্কুইলাইজার, হয় ওকে তুমি সুস্থ করে দাও, নয় তোমার সৃষ্টি তুমি ফিরিয়ে নাও। হঠাৎ তোমার পেয়াদা এলে আমাকে যেতেই হবে, তখন কে দেখবে এই অসহায় প্রাণীটিকে। অহংকারী কৃষ্ণপদর স্ত্রী বিবসনা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, ভাবতেও কষ্ট হবে। মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না।

কুমুকে চান করিয়ে দিতে হয়। গা মুছিয়ে দিতে হয়। শাড়ি পরিয়ে দিতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। জীবনের তাল ছন্দ সব কেটে গেছে। সব কাজ শেষ করে কৃষ্ণপদ কপালে একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল বড় করে। পরিচর্যার সময় কুমু একেবারে বাধ্য মেয়ে। প্রথম প্রথম তার উন্মাদনার একটা উগ্র দিক ছিল। এক নাগাড়ে চিকিৎসার ফলে সেই উগ্রভাব শান্ত হয়েছে। এখন শুধু

কথাবার্তায় সম্পূর্ণ অসলংগ্ন। কখনও অতীত থেকে কথা বলছে। কখনও উঠে আসছে ভবিষ্যৎ থেকে। বর্তমানে কিছুতেই ফিরে আসতে পারছে না। কী অদ্ভুত ব্যাপার! যে জগৎ নেই, সেই জগতের অধিবাসী। মাঝে মাঝে অবসাদে ভেঙে পড়ে। তখন চলে একটানা কান্না।

অনেকেই উপদেশ দেয়, কৃষ্ণ, একটা উন্মাদ আশ্রমে ব্যবস্থা করে ঝাড়া হাত-পা হও। স্ত্রীর সেবা না করে ঈশ্বরের সেবা করো। বয়েস অনেক হল। পরজন্মের প্রস্তুতি নাও। কী নিয়ে যাবে সেখানে? শূন্য হাতে?

কৃষ্ণ হাসে। পরজন্মের ভাবনা তার নেই। অত ভাবনা তার নেই। যা হবে তা হবে। একটাই তার দুঃখ রং-তুলির জগৎ, রূপ-সৃষ্টির জগৎ থেকে অনিচ্ছায় সরে আসতে হয়েছে। চোখ চলে না। হাত কাঁপে। আগে একটা একটা করে চোখের পাতা আঁকতে পারত সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে। সে ক্ষমতা চলে গেছে। কুমুকে মডেল করে কত ছবিই এঁকেছিল। সবই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। বড় বড় লোকের বৈঠকখানায় ঝুলছে। এ বাড়িতে খান দুই আছে। খদ্দের ঝুলোঝুলি করলেও বিক্রি করেনি। কুমুর অতীত ছবি হয়ে ঝুলছে।

একটি সত্য কৃষ্ণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি, বিষয়-সম্পত্তি আর সুন্দরী মহিলা। একটু নির্জনে-একান্তে, আপন মনে জীবন সাধনা নিয়ে থাকতে দেয় না। লোভী মানুষের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেড়ে যায়। কুমুকে সামলাতে সামলাতেই জীবন শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণপদরই পাগল হয়ে যাবার কথা। পাগল হয়ে গেল কুমু।

স্নান সেরে কৃষ্ণপদ আসনে বসল। পাশে ধূপ জ্বলছে। ফুল বেলপাতা, কোশাকুশি, চন্দন। বেদির ওপর পাথরের শিবলিঙ্গ। এই সময়টায় কৃষ্ণপদ অন্যজগতে চলে যায়। অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। নীলকণ্ঠর শিব বড় প্রাণের দেবতা। প্রয়াগে এক সাধু বলেছিলেন, বেটা, শিউজিকো আচ্ছাসে পাকড়ো। মিল যায়েগা সব কুছ।

সব কুছের মানেটা তেমন পরিষ্কার ছিল না প্রথমে। এত কিছু চাওয়ার ছিল বলে শেষ করা যেত না। কৃষ্ণপদর নিজেরই লজ্জা করত। চাওয়ারও একটা সীমা আছে। এখন আর চাইবার কিছু নেই। একটু শান্তি, একটু আনন্দ, পারো তো তাই দিয়ো। আর কিছু চাই না। আর পারো তো নেবার আগে প্রদীপটিকে একটু উজ্জ্বল করে দাও। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে।' কিছু না কুমুকে সুস্থ করে দাও। কত কথা বলার আছে! কত অভিযোগ আর অবিশ্বাসের উত্তর দিতে হবে। জীবনে যত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্যে শেষ ক্ষমাটি চেয়ে নিতে চাই। অপরাধ বোধ নিয়ে উৎসে ফিরে যেতে চাই না। শিবঠাকুর তোমার তো অসীম ক্ষমতা, এই সামান্য কাজটুকু তুমি পারো না।

কৃষ্ণপদর পুজো মানে ইষ্টদেবতার সঙ্গে বকবক করে বকা। মান-অভিমানে। অভিমানে মাঝে মধ্যে তিন-চারদিন কথা বন্ধ থাকে। 'যাও কাল থেকে তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না। আমার মাথায় জল ঢালা কাজ ঢেলে যাব। বেলপাতা চড়াবার কথা চড়াব। এর বেশি আর কিছু আশা কোরো না। তোমার মতো স্বার্থপর দেবতার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। খাও খাও বেলপাতা খাও।'

বেলপাতার ওপর বেলপাতা। তার ওপর বেলপাতা। নীলকণ্ঠ শিব চাপা পড়ে গেলেন। দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। এই মান-অভিমানের সময় রাতে শিবঠাকুর দর্শন দেন। আফিঙের মৌতাত। বারান্দায় ডেক চেয়ারে কৃষ্ণপদ আধশোয়া। বেনারসিবাবুদের মতো সাজপোশাক। কানে আতর। পাশে আলবোলা। কৃষ্ণপদ নিজেকেই নিজে বলে, 'কেষ্ট যতদিন বাঁচবি, মেজাজে বাঁচবি। তুই ব্যাটা প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ। যে পৃথিবী এখনকার চেয়েও অনেক বেশি উদার ছিল। মানুষের মন ছিল চওড়া রাজপথের মতো। হিসেব করে দেখেছি রে ব্যাটা, ব্যাঙ্কে যা পড়ে আছে, আর বছর তিনেক চলবে। তারপরও যদি বাঁচিস হরি মটর। চেষ্টা কর কোনওরকমে তিন বছরের মেয়াদ খেটে ভবকারাগার থেকে মুক্তির। শুনেছি গুড কনডাক্টের জন্যে আসামিরা মেয়াদ শেষ হবার আগেই

[illegible] ছাড়া পেয়ে যায়। তুই কেন পাবি না কেষ্ট। তোর তো গুড কনডাক্টের সার্টিফিকেট আছে।'

কৃষ্ণপদ আলবোলায় টান মারে। অন্ধকারে শব্দ আর গন্ধ দুটোই ভেসে বেড়ায়। আলবোলার শব্দ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক মিলেমিশে একাকার। কৃষ্ণপদর কানে বাজে বড় ওস্তাদের সেতারে ঝালার কাজের মতো। কপুরথালার মহারাজার নাচ ঘরে আসর বসেছে। এনায়েৎ খাঁ ধরেছেন রাগ ঝিঝোটি। চালাও ওস্তাদ, চালিয়ে যাও। আর একটু লয়ে বাড়ো। তবলচির কালঘাম ছুটিয়ে দাও। এই অবসরে কৃষ্ণপদ নিজেও গান ধরেন গুনগুন করে: বিষ্ণু চরণজল, ব্রহ্মাকি কমণ্ডলু শিবজটা রাজিত দেবী গঙ্গে। দু'লাইন গেয়েই থমকে যান। আবার সেই শিব! ও নাম আমি আর উচ্চারণ করব না, করব না, করব না। প্রতিজ্ঞা। আমার বিষ্ণুই ভাল। তুমি নেশাখোর শিব। তোমাকে আর দয়া করে, কষ্ট করে হিমালয় ছেড়ে এই কষ্টের সংসারে আসতে হবে না। তুমি তোমার পার্বতীর সঙ্গে বসে বসে লুডো খেলো। আর নন্দী-ভৃঙ্গীকে বলো, গেলাস গেলাস ভাং এনে দিক। এ বাড়িতে তোমার প্রবেশ নিষেধ।

তবু যেন মনে হয় বারান্দার দূর কোণে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জটাজুটধারী। পরনে বাঘছাল, হাতে কমণ্ডলু, ত্রিশূল। মাথার ওপর সাপ ফণা ধরে আছে। কৃষ্ণপদর কণ্ঠে আবেগ এসে যায়। ধরাধরা গলায় গাইতে থাকে : আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে/তুমি অভাগারে চেয়েছ ॥

এরপর কৃষ্ণপদ বুঁদ হয়ে বসে থাকে। ভেতরে চলতে থাকে আবেগের ওলট-পালট। কে যেন নেংড়াচ্ছে। ইষ্টের সঙ্গে এই হাত চারেকের ফারাক কিছুতেই আর কমছে না। 'আসবে তো একেবারে ভেতরে এসো। অমন দূরে দাঁড়িয়ে আর কষ্ট দিয়ো না। জীবনে পূর্ণ কিছুই পাওয়া হল না, সবই আধখাওয়া ফল। মহারাজ এসেছ যখন কাছে এসো। চেয়ারটা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, বোসো এখানে। এই নাও আলবোলার নল।'

ধীরে ধীরে কৃষ্ণপদর কথা জড়িয়ে আসে। হাত থেকে গড়গড়ার নল মাটিতে পড়ে যায়। গভীর নিদ্রা। আধো অন্ধকার বারান্দায় এইভাবে বসে থাকা কৃষ্ণকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে ধ্যানস্থ মহাদেব। এত ফরসা, অন্ধকারেও একটা আভার মতো, যেন শ্বেতপাথরের মূর্তি। বিখ্যাত এক অভিনেতা কৃষ্ণকে বলেছিল, 'তোমার মতো একটা শরীর পেলে আমি দেখিয়ে দিতুম। তুমি যদি অভিনেতা হতে আমাদের আর করে খেতে হত না।' সেই থেকে শরীরের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে কৃষ্ণর। যতদিন পারা যায় থাকা যাক এর ভেতর। ছেড়ে গেলেই তো পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে কৃষ্ণর দুটো-আড়াইটা বেজে যায়। রোজকার মতো রং তুলি নিয়ে বসেছিল। ছবি হোক না হোক সময়টা বেশ কেটে যায়। কুমু জানলার ধারে বসেছে। ছোট্ট এক টুকরো সুতোয় একটা ঢিল বেঁধে, দু'আঙুলে উঁচু করে ধরে দোল খাওয়াচ্ছে। এক ধরনের পেন্ডুলাম। দুলছে তো দুলছেই। দোলাতে দোলাতে সন্ধ্যা নেমে আসবে। ছোট্ট একখণ্ড জমিতে কৃষ্ণকলি গাছে ফুট ফুট করে ফুটে উঠবে হলুদ, বেগুনি, সাদা ফুল। আর তখনই কৃষ্ণপদর মনে পড়বে কুমুর যৌবনের কথা। নানা রঙের ডুরে শাড়ি পরে কুমু ঘরে ঢুকছে। সবে গা ধুয়েছে। ভিজে চুল জড়িয়ে আছে কপালে। দামি সাবানের গন্ধ সারা গায়ে। সুন্দর সুঠাম শরীর। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত মাপা। শিল্পীর ক্যানভাস থেকে জীবন্ত হয়ে নেমে এল যেন। মানুষের পয়লা নম্বর শত্রু হল সময়।

কাগজে রং ছাড়তে ছাড়তে কৃষ্ণ মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। ইদানীং তার সব আঁকারই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশ। নীলের সঙ্গে হলুদ, হলুদের সঙ্গে লাল, মিলে মিশে আকাশের চেহারা কতরকম যে দাঁড়ায়! আনন্দে মন ভরে যায়।

কৃষ্ণ রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখল, কে একজন আসছে এদিকে। বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতেই আসছে। চেনা চেনা। বেঁটে খাটো জলদস্যুর মতো চেহারা। হাঁটার ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। পরনে প্যান্ট শার্ট। আর একটু কাছে আসতেই কৃষ্ণ চিনতে পারল, সাত্যকি বোস। হঠাৎ কী

মনে করে এতদিন পরে। চিরটাকালই ভীষণ ধান্দাবাজ ছেলে। স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও নড়ে না। কৃষ্ণর যখন খুব রমরমা তখন জোঁকের মতো, চিটে গুড়ের মতো লেগে থাকত।

সাত্যকি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে, 'কী হে শিল্পী, অনেক দিন পরে দেখে অবাক হচ্ছ?'

'তা একটু হচ্ছি সাত্যকি। তুমি তো আর এপথ মাড়াও না। অবশ্য সব সুখের পায়রাই উড়ে গেছে। তুমিই বা কেন ব্যতিক্রম হবে!'

সাত্যকি ঘরের জানলার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বললে, 'কিছু বলবে না তো?'

'না হে সে ভয় নেই। তুমি বোসো। ও এখন নিজের মনেই আছে।'

সাত্যকি বসতে বসতে বললে, 'কী করছে এক মনে?'

'সময় মাপছে।'

'বাঃ জব্বর একখানা ছবি আঁকছ হে। বেড়ে খুলেছে!'

'এখন তুমি আছ কোথায়?'

'বেশির ভাগই বাইরে ঘুরি। মাঝে মধ্যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে বোনের বাড়িতে এসে উঠি। শোনো, খবর আছে। তুমি আমাকে যতটা স্বার্থপর ভাবো, আমি ততটা স্বার্থপর নই।'

'তাই নাকি?'

'তোমার কথা আমি প্রায়ই ভাবি।'

'কীরকম?'

'যেমন ধরো, তুমি কেমন আছ? কীভাবে দিন কাটাচ্ছ। অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে?'

'যাক আমাকে তা হলে ভোলোনি এখনও।'

'এক গেলাস জল খাওয়াবে! না, এখন ওঠা যাবে না!'

'খুব যাবে। বোসো তুমি।'

'অ্যাশট্রে আছে?'

'মনে হয় আছে।'

অ্যাশট্রে, জল আর একটা ফ্লাস্ক নিয়ে কৃষ্ণ বেরিয়ে এল। ফ্লাস্কে চা আছে। দ্বিতীয় বার নিয়ে এল দুটো কাপ। সাত্যকি উদাস মুখে সিগারেট টানছে। মুখের চেহারা দেখে কৃষ্ণর খুব খারাপ লাগল। আগে তেমন ভাল করে নজর করেনি। করলে কড়া কড়া কথা বলত না। এও সেই সময়ের কারসাজি। সাত্যকির মতো ধুরন্ধর লোককেও কাবু করে ফেলেছে।

'কী হে, চাইলুম জল, তুমি এত লটবহর কী নিয়ে এলে?'

'এই তো চায়ের সময় বন্ধু। বারে বারে কে আর করে। একবারেই সেরে রেখেছি।'

'এখনকার দেশলাই দেখেছ! একটা সিগারেট ধরাতে সাত-সাতটা কাঠি গেল।'

'আমেরিকার কায়দায় দেশের ব্যাবসা চলেছে। সেদিনে একটা ঘড়ির বিজ্ঞাপন দেখলুম, সারা জীবনের গ্যারান্টি। কত বছরের জীবন? এক বছর।'

কৃষ্ণ হো হো করে হেসে উঠল। চারপাশের অবস্থা যত অনিশ্চিত হয়ে উঠছে কৃষ্ণর হাসিও তত খোলতাই হচ্ছে। কিছু হারাবার ভয় নেই, মৃত্যু-ভয় নেই। হাসতে বাধা কী!

সাত্যকি সন্দেহের চোখে কৃষ্ণর দিকে তাকাল। পাগলামি ছোঁয়াচে নয় তো! কৃষ্ণর হাসিটা যেন কেমন কেমন।

সাত্যকির দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণ বললে, 'তোমার দিনকাল কেমন চলছে?'

'আর দিনকাল! দিনকালের আর কিছু বুঝি না ভাই। বেঁচে থাকতে হয় বেঁচে আছি। মন বলে আর কিছু নেই। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। পলিথিনের চাদর দেখেছ?'

'হ্যাঁ দেখেছি। আমার বাড়িতেই আছে।'

'নতুন অবস্থায় ভীষণ জেল্লা। একবার ময়লা ধরলে যতই ডিটারজেন্ট ঘষো কিছুতেই আর পরিষ্কার ঝকঝকে হবে না। তখন স্রেফ ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা কেনো। আমার অবস্থাও তাই। ঘষা মাজার বাইরে চলে গেছি। আবার নতুনভাবে এসে নতুন করে শুরু করতে পারলে যদি কিছু হয়।'

'তুমি খুব বদলে গেছ। সেই আগের সাত্যকি আর নেই। ব্যাচেলারদের শেষ জীবনটা ভীষণ দুঃখের। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, দে লিভ লাইক এ প্রিন্স অ্যান্ড ডাই লাইক এ বেগার।'

'তুমি তো ভাই ম্যারেড। কী সুখে আছ?'

'আমার সুখ! সে তোমার বোঝার ক্ষমতা হবে না। কারুর জন্যে বেঁচে থাকার, একটা কারণের জন্যে বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। অকারণে বেঁচে থাকা অনেকটা শূন্যে লাঠি ঘোরানোর মতো। বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে দিনগত পাপক্ষয়। ওই জন্যে মানুষ ধর্মকে ধরে। তাঁকে দেখতে চায় যাঁকে দেখতে পাওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তোমার মস্ত বিপদ কী জানো, তুমি নাস্তিক। না, নাস্তিকও নও। নাস্তিক আর আস্তিকে বিশেষ তফাত নেই। দু'জনেই প্রচণ্ড বিশ্বাসী। একজনের বিশ্বাস আছেতে আর একজনের বিশ্বাস নেইতে। তুমি এক ভোগ-ক্লান্ত লক্ষশূন্য মানুষ।'

'হবে। নিজেকে কখনও বিচার করে দেখিনি। শোনো, আমি দুটো কারণে এসেছি। আমি আমার জন্যে আসিনি, তোমার জন্যেই এসেছি।'

'বলো কী সেই কারণ?'

'বুঝলে কৃষ্ণ দীর্ঘ দশ বছর পরে, গত পরশু আমি দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরলুম। বিশ্বাস করবে কি না জানি না। এলুম তোমার জন্যেই। দুটো কারণ। প্রথম কারণ, সুন্দর একটা আশ্রম হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। এক কর্মযোগী সন্ন্যাসীর জীবন-স্বপ্ন। বিরাট তাঁর প্ল্যান। ধীরে ধীরে সবটাই প্রায় হয়ে এসেছে। স্কুল, কলেজ, কলাভবন, মিউজিয়াম, জিমনাশিয়াম। কোনও কিছুই আর বাকি নেই। আশ্রম কর্তৃপক্ষের ভীষণ ইচ্ছে, তুমি কলাভবনের দায়িত্ব নাও।'

'আমি? আমার মতো অখ্যাত মানুষের কী যোগ্যতা আছে! তা ছাড়া আমার বয়েস হয়েছে। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর এই অবস্থা।'

'শোনো শোনো, তুমি খ্যাত কি অখ্যাত তার বিচার করবে মহাকাল। শিল্পের জগৎ থেকে সরে এলেও শিল্পী হিসেবে তোমার নাম কিন্তু মুছে যায়নি। বহু মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তোমার ছবি আছে। দেশ বিদেশের মিউজিয়ামে তোমার ছবি ঝুলছে। শোনো তোমাকে ওঁরা ভাল টাকা দেবেন। অল-ফাউন্ড। তোমার স্ত্রীর কথাও ওঁরা শুনেছেন। তোমার মতো তোমার মডেল হিসেবে উনিও বিখ্যাত। তোমার স্ত্রীর সবরকম ব্যবস্থা আশ্রম-কর্তৃপক্ষ করবেন। আমার কী মনে হয় জানো, ব্যাঙ্গালোরের মতো সুন্দর জায়গায় পট-পরিবর্তন হলে হয়তো সেরে উঠবেন। নিজেকে এভাবে ফেলে রাখার কোনও মানে হয় কি! তুমিই না বললে একটু আগে, একটা কারণের জন্যে বেঁচে থাকতে হয়!'

কৃষ্ণপদকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সামনেই পড়ে আছে তার সদ্য আঁকা ছবি। শেষ সূর্যাস্তের আকাশ। গোটা কতক ঘরে-ফেরা পাখি আঁকলেই ছবি শেষ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, 'মনে পড়ে সাত্যকি শেষ যেদিন তুমি এসেছিলে, সেদিন তোমাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'ঠিক করেছিলে কৃষ্ণ। সেদিন আমি মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলুম না। সেদিন যে-কোনও ভদ্রলোকই আমাকে দূর করে দিত। তুমি কিছু অন্যায় করোনি।'

কৃষ্ণ অবাক হয়ে সাত্যকির মুখের দিকে তাকাল। সাত্যকি শুধু বদলায়নি, সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছে। একেবারে অন্য মানুষ।

'সাত্যকি সেদিনের ব্যবহারের জন্যে আজ আমি ক্ষমা চাইছি। ওপর থেকে মানুসের বিচার চলে না। ভেতর দেখতে হয়, যা আবার দেখা যায় না।'

'ধ্যাৎ, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ। তোমার মুখেও কীসের একটা ছায়া পড়েছে! কীসের বলো তো? প্রেমের। তুমি এতদিনে প্রকৃতই কাউকে ভালবেসেছ।'

'ধরেছ ঠিক। আমি মৃত্যুকে ভালবেসেছি। যাকে সবাই ভয় পায়।'

'ভালবাসো ক্ষতি নেই, তবে আত্মসমর্পণ কোরো না। কী তুমি রাজি?'

'তোমার প্রস্তাব অতি অপূর্ব। লোভনীয়। তবে আমাকে দু'-একদিন সময় দাও। আমার ভাইয়ের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।'

'বেশ। তবে তোমার শুভার্থী হিসেবে বলব, তুমি অ্যাকসেন্ট করো। এখন তুমি যেভাবে আছ সেভাবে থাকা মানেই মৃত্যুকে এগিয়ে আনা। আমরা সবাই একদিন মরব, এই সত্য স্বীকার করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করতে করতেই মরা ভাল। টু ডাই ইন হারনেস।'

'তোমার সব কথাই ঠিক।'

'আর একটা পরামর্শ তোমাকে দোব, এই বাড়িটা বেচে দাও। এখন ভাল দামই পাবে। টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিকস্‌ড করে দাও। ভাল সুদ পাবে।'

'এ আমিও ভেবেছি। ধনহীনের বাড়ি একটা বোঝা। একটা পয়সাও পাওয়া যায় না, শুধু খরচ। আজ এটা সারাও, কাল ওটা সারাও। ভাবলে কী হবে সাত্যকি! মানুষের কতরকম মোহ! মাঝে মাঝে মনে হয়, চলে যাবার পর বাইরের প্রস্তরফলক দেখে লোকে অন্তত বলবে, এই বাড়িতে কৃষ্ণপদ থাকত, শিল্পী কৃষ্ণপদ। বলা যায় না কোনও শিল্পরসিক বদান্য ব্যক্তি হয়তো একটা সংগ্রহশালা করে দিলে।'

'তুমিও যেমন। এ দেশে আর সে মানুষ নেই। করলে করতে হবে স্টেটকে। তাঁরা তোমার শিল্প দেখবেন না, দেখবেন তুমি কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। দেখো না আজকাল পথের ধারে নর্দমার পাশে শহিদস্তম্ভ তৈরি হয়। আজকাল সব কিছুই বড় সস্তা। ভয়, ভক্তি, ভালবাসা সব কিছুই বড় খেলো হয়ে গেছে। এ যুগের কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না।'

'তা ঠিক। বেশ, তোমার এ প্রস্তাবটাও ভাবা যাবে।'

'এইবার দ্বিতীয় কারণটা শোনো। তোমার যে ক'টা ক্যানভাস এখনও এ বাড়িতে আছে, সে ক'টা একটা আর্ট গ্যালারিতে ভাল দামে বিক্রি করে দাও। বাড়িতে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে তদারকির অভাবে। আমাকে একজন অফার দিয়েছে। ভয় নেই আমি কমিশনের লোভে বলছি না। যোগাযোগ করিয়ে দোব তুমি সরাসরি দাম বুঝে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দেবে।'

'যে ক'টা আছে, সে ক'টা যে আমার বড় প্রাণের ছবি!'

'জানি। শুধু আমি জানি না, আর্টের জগতের সবাই জানে। আর জানে বলেই তুমি চড়া দাম হাঁকতে পারবে। রোমান্টিক শিল্পী হিসেবে তোমার এখনও খুব নাম। তোমার জীবন নিয়ে কেউ উপন্যাস লিখলে অবাক হব না।'

'রোমান্টিক শিল্পী! হাসালে সাত্যকি। কোনও কালেই আমার মধ্যে রোমান্স ছিল না।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার ওই কথা। একটা কাগজে তোমার জীবনী, তোমার আঁকা ছবি, তোমার স্ত্রীর ছবি বেরিয়েছে। সে খবর রাখো?'

'না।'

'তোমাকে আমি কপিটা দোব। পড়ে দেখো।'

'কার লেখা?'

'ধরো আমারই লেখা।'

'তুমি এবার ক্যামেরা ছেড়ে কলম ধরেছ। আমাকে নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করোনি তো?'

'পড়লেই বুঝতে পারবে। তোমাকে আমি যত কাছ থেকে দেখেছি, অত কাছ থেকে আর কেউ দেখেছে কি না সন্দেহ। তুমি আমাকে ঘৃণা করলে কী হবে, আমি তোমাকে চিরকালই শ্রদ্ধা করি।'

সাত্যকির কথায় কৃষ্ণ ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়ছিল। একবার যা করা হয়ে যায় তা আর ফেরানো যায় না। দেহের ক্ষত সেরে যায়, মনের ক্ষত সহজে সারে না। সারাবার কোনও ওষুধও নেই। সাত্যকির হাতে ধরে এতদিন পরে ক্ষমা চাইতে গেলে ব্যাপারটা আরও হাস্যকর হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণ আবেগ সামলে বললে, 'এতদিন পরে তুমি এলে কী খাবে বলো?'

'কী আবার খাব? তোমার লোক নেই, জন নেই, তোমাকেই কে খাওয়ায় তার ঠিক নেই। তুমি বলছ আমার খাবার কথা!'

'জানো আমি অসম্ভব ভাল মোগলাই রাঁধতে পারি। তোমাদের দু'-একবার রেঁধে খাইয়েছি।'

'অস্বীকার করছি না। সে ছিল তোমার শখের রান্না, মজার রান্না। আর এ হল তোমার কাজের রান্না। আচ্ছা কৃষ্ণ, আজ তো চাঁদিনি রাত, তাই না।'

'কী জানি ভাই। আকাশে গত সাতদিন ধরে সদাসর্বদাই মেঘ। চাঁদ থাকাও যা, না থাকাও তাই। অন্ধের কী বা রাত্রি, কী বা দিন। হঠাৎ চাঁদের খবর।'

'কেন বলো তো! ধরতে পারলে না? হঠাৎ মনে হল অনেক দিন পরে অনেক আগের একটা রাত ফিরিয়ে আনলে কেমন হয়? ধরো আজ আমি এখানেই রয়ে গেলুম। বাজারে গিয়ে বেশ জমিয়ে বাজার করে আনলুম। আমার রান্না তুমি কোনওদিন খাওনি। চাইনিজ রান্নায় আমার হাত খারাপ নয়। একটা পিকনিক মতো হয়ে গেলে কেমন হয়! তুমিই বলো দুঃখের মধ্যে থেকে কেউ যদি আনন্দ নিংড়ে বের করে নিতে পারে তাতে আপত্তি কীসের?'

'ঠিক। ঠিক বলেছ। জীবন জীবন করে নাকে কাঁদার কোনও মানে হয় না। অন্যের অনিষ্ট না করে প্রাণ খুলে শুধু হেসে যাও। আমাদের জীবনে যা হবার, তা হয়ে গেছে। যা পাবার তা পাওয়া হয়ে গেছে। নতুন করে আর কিছু হবে না। তবে আর দুঃখ কীসের! তা হলে শোনো সাত্যকি, চাঁদ থাকুক আর না থাকুক, দিনটা খুব একটা খারাপ নয়। দমকা ভিজে ভিজে বাতাস। ছাই রঙের আকাশ। এ তোমার কালিদাসের দিন। আজ তুমি থেকেই যাও। তোমার চাইনিজ আজ জমবে না। এসো দু'জনে মিলে বাঙালি খানা পাকাই। আমার ভাইটাকে বলে আসি। অনেক দিন পরে একটু আড্ডা মারা যাক। কী রাজি?'

'আমার আপত্তি নেই। আমার মনের অবস্থা এখন কী হয়েছে জানো, যখন যেখানে থাকি সেইটাই আমার বাড়ি। যখন যে কাজ করি, সেইটাই আমার কাজ। আমার মনের আর কোনও বায়না নেই। জানো পরশু রাতে আমার দামি ক্যামেরাটা ছিনতাই হয়ে গেল। দু'-দশ বছর আগে হলে ভীষণ মন খারাপ হত। এখন কী মনে হল জানো, যাক বাবা আপদ গেছে। ক্যামেরার কাজ শেষ। প্রয়োজন নেই তাই ঈশ্বর কেড়ে নিলেন।'

'এ তোমার কথার কথা, না প্রকৃত উপলব্ধির কথা?'

'বিশ্বাস করো, সত্যিই আমার তাই মনে হল। অথচ দেখো ক্যামেরাই আমার জীবিকা। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। টাকাও নেই যে নতুন আর একটা কিনব! দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়া উচিত। কিন্তু আমি মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি ভাই সার বুঝেছি, যিনি লেনেঅলা, তিনিই দেনেঅলা।'

॥ তিন ॥

চোখে চশমা। হাতে খবরের কাগজ। বাড়ির পেছন দিকের ঢাকা বারান্দায় বসে শিবপদ পৃথিবীর খবরে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বিশ্রী মনমরা দিন। শিবপদ ঝলমলে রোদের ভক্ত। ঝকঝকে তারা-ভরা আকাশের ভক্ত। জমজমাট সংসারের ভক্ত। যা চাওয়া যায় তার উলটোটাই

পাওয়া যায়। বাড়ি যেন শ্মশান! নিঝুম নিস্তব্ধ। কোথাও কলের মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভেসে আসছে টুপ টুপ শব্দ। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলেই হয়। না থাক। তবু প্রাণহীন প্রাণের স্পন্দন।

ওদের কথা মনে পড়ছে। মন থেকে বিদায় করতে চাইলেও মনেই ফিরে আসছে। মনের অসংখ্য দরজা। কোনটাকে বন্ধ করবে! তনু তো খারাপ মেয়ে ছিল না। শান্ত, স্নিগ্ধ। মৃদু গলায় বাবা বাবা করে ডাকত। ঠিক সাড়ে চারটের সময় এক কাপ চা ধরে দিত সামনে। তনুর মা-ও তো তেমন স্বার্থপর নন। শিক্ষিতা। একসময় কোনও এক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিলেন। ভদ্র, স্বল্পভাষী। তা হলে এমন কেন হল। কে কালপ্রিট? এর মধ্যে কালো ভেড়া কোনটি? এই ভাঙনে তারও তো কোনও ভূমিকা নেই। অমিতাভই দায়ী। ছেলের নাম রেখেছিলুম অমিতাভ। নামে কি আর চরিত্র থাকে। লেবেল লাগালেই কি আর জিনিস খাঁটি হয়। অপরাধী আমিই। আমারই স্বার্থ অহংকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা রক্তের ধারায় মিশেছে। পিতা হবার আগে নিজেকে শোধন করা হয়নি। কম বয়েসে মানুষের ধমনিতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হতে পারে না। মানুষ তখন নেশার ঘোরে থাকে।

শিবপদ ঘরে এসে ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বাজল। এইবার একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যাক। কে বলেছে আমি একা। শিবপদ আয়নার সামনে দাঁড়াল। ওই তো আর একজন মানুষ। চারপাশে চারটে আয়না রাখলে চারজন মানুষ। এক চার হয়ে গেল। আমি থেকে অসংখ্য আমি। আমি নেই তো কেউ নেই। আবার আয়না ভেঙে চুরমার করে দাও, একা আমি।

বয়েস কত হল শিবপদ? ষাট-বাষট্টি তো হবেই। যেমন করেই হোক দীর্ঘায়ু হতে হবে। আশির আগে গেলে চলবে না। এই কুড়ি বছরে সংস্কৃতটা ভাল করে ঝালিয়ে নিয়ে বেদান্ত সাংখ্যটা বুঝে যেতে হবে। যাবার আগে এই সৃষ্টি রহস্যটা জেনে যেতে পারলে বারে বারে আর আসতে হবে না। অনর্থক আসা। অনর্থক যাওয়া। বদ্ধ পুরুষ হয়ে জন্মেছি, মুক্ত পুরুষ হয়ে যেতে হবে। মায়ার ফাঁদে বড় দাসত্ব।

ধুপ করে একটা শব্দ হল। শিবপদ চমকে ফিরে তাকাল। সেই সাদা বেড়ালটা। কদিন হল যাওয়া আসা শুরু করেছে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছে। শিবপদ মনে মনে হাসল, বড় বিপদে পড়েছিস, বড় উৎকণ্ঠা! তাই না রে পুসি! দাঁড়া, তোর একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সুধা খুব বেড়াল ভালবাসত। কোথা থেকে সব এসে জুটতও তেমনি। সাদা, সাদা-কালো, সাদা-হলুদ। সকাল সন্ধে মাছ-ভাতের ঢালাও ব্যবস্থা। বেড়াল-ভোজনের সেই দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসে। ঘর একেবারে থইথই করছে। মিউ মিউ ডাক। সকলেই বলছে, মা খেতে দাও, মা খেতে দাও। সুধা বসে আছে ঘরের মাঝখানে। একটা কোলে, একটা পিঠে, একটা পায়ের ফাঁকে, একটা ন্যাজ খাড়া করে পিঠে পিঠ ঘষছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মমতা মাখানো সুধার মুখ। মনেই হত না পৃথিবীতে কোনও নিষ্ঠুরতা আছে, হিংসা আছে।

ঘরের মেঝেতে থেবড়ে বসে বেড়ালটা হাঁ করে আলমারির দিকে তাকিয়ে আছে। পেটটা ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। শিবপদ বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোর ক্ষমতায় হবে না মা, আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। মা হতে চলেছিস অথচ নিজের কোনও মুরোদ নেই। দাঁড়া তোর জন্যে সাংঘাতিক একটা আঁতুড়ঘর বানিয়ে দিই।' শিবপদ আলমারির মাথা থেকে বেশ বড়মাপের একটা বাক্স নামাবার জন্যে হাত তুলেছে, এমন সময় বাইরে থেকে কৃষ্ণর গলা ভেসে এল, 'শিবঅ, শিবঅ।'

বাক্স আর নামানো হল না।

কৃষ্ণ আর সাত্যকি বারান্দায় উঠে এল। দু'জনেরই হাতে দুটো বড় আকারের বাজারের ব্যাগ।

'দেখো বন্ধু, কাকে ধরে এনেছি। গ্রেট সাত্যকি বোস। ফেমাস ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাটা অবশ্য নেই আর। পরশু দিন দেবতারা কেড়ে নিয়েছে। এখন চোখের লেন্সেই কাজ হচ্ছে।'

শিবপদ বললে, 'আসুন, আসুন। আপনার সঙ্গে তো আমার আগেই আলাপ হয়েছিল। অনেক দিন পরে এলেন।'

সাত্যকি বললে, 'তুমি ভাই আপনি শুরু করলে। প্রাণখুলে বসি কী করে! আমরা তো তুমির সম্পর্কে ছিলুম।

শিবপদ বললে, 'অনেক দিন পরে দেখা হল তো! ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণ বললে, 'শোন, আমরা এখন আর বসছি না। আজ রাতে আমাদের পিকনিক হচ্ছে! তুই ঘন্টাখানেক পরে দোরতাড়া বন্ধ করে চলে আয়। আজ এক হাত হয়ে যাক। ভিজে দেশলাই অনেক দিন পরে ফস্ করে জ্বলবে। দুঃখ, দুঃখ। প্যানপ্যানানি আর ভাল লাগে না। আজ আমরা নাচব, গাইব। ফাটাফাটি করে ফেলব।'

'বলিস কী! বর্ষার রাতের মেনু কী হবে?'

'সে যখন পাতে পড়বে দেখবে তখন।'

'পিকনিক তো চাঁদা করে হয়। আমার চাঁদাটা তা হলে নে।'

'চাঁদা আবার কী! তোর তো পাখির আহার? ভাগে পোযাবে না।'

'তোরা একটু বোস। আমি বিকেলের চা খাইনি এখনও। চা চাপাচ্ছি। এক কাপ করে এনার্জি নিয়ে যা।'

সাত্যকি বললে, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কৃষ্ণ তুমি কী বলো। তোমার ওই ফ্লাস্কের চা তেমন জমেনি বাপু!'

'বেশ, হয়ে যাক এক কাপ, কিন্তু একটা কন্ডিশান, যৌথ প্রচেষ্টা। তৈরিতে আমরাও হাত লাগাব।'

'মাপ করো রাজা। তোমার হাতে ছবি খোলে। চা তেমন খোলে না।'

'হ্যাঁ, এটা তুই ঠিক বলেছিস। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। বেশ আমরা তা হলে কাপ ধোব।'

'ধোয়া আছে।'

'আমরা তা হলে জোগাড় দোব। তুই রাজমিস্ত্রি আমরা জোগাড়ে।'

'ক্ষুদ্র যজ্ঞে বৃহৎ কাণ্ড করে লাভ নেই। আমার সব সাজানো আছে। তোরা বসে বসে গল্প কর। দশ মিনিট পরে আমি আবার আসছি।'

সাত্যকি বেতের গোল চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'অল রাইট, অল রাইট...।'

আরও কিছু বলতে গিয়েও বলা হল না। দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে সামনে দুমড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর ছোট হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এ সেই ব্যথা। যে ব্যথাটাকে সাত্যকি ভীষণ ভয় পায়। যে ব্যথা সম্পর্কে এক-এক বিশেষজ্ঞের এক-এক মত। শেষ অভিমত লিভার ক্যান্সার। অন্য কোনও মানুষ হলে ভয়ে মরে যেত। সাত্যকি অন্য ধাতুতে তৈরি।

কৃষ্ণ আর শিব দু'জনেই দু'পাশ থেকে এগিয়ে এল। দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কী হল সাত্যকি! কী হল তোমার? অমন করছ কেন?'

এই অবস্থায় সাত্যকির কথা বলার ক্ষমতা থাকে না। শরীরটাকে দু'ভাঁজ করে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়। এই শাস্তি তার ভাল লাগে। বহুকাল আগে যৌবনের মধ্য অবস্থায় এমন এক অপরাধ করে বসে আছে, মানুষের আদালতে যার বিচার হয়নি। হলে যাবজ্জীবন হয়ে যেত। ঈশ্বরের আদালতে সেই বিচার হচ্ছে এখন। এ জীবনেই সব চুকেবুকে যাক। মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়। সেই অতন্দ্র প্রহরীর চোখে ধুলো দেওয়া তত সহজ নয়।

প্রশ্নের উত্তরে সাত্যকি কোনওরকমে একটা হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করল, দাঁড়াও, যা বলার আমি বলছি পরে। বেতের চেয়ার ছেড়ে মাটিতে নেমে এল। দু'হাঁটু ভেঙে শরীরটাকে প্রণামের ভঙ্গিতে মুচড়ে দিল সামনে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে পারলে অনেক সময় কমে যায়। কুলকুল করে ঘাম বেরোতে থাকে। আর না কমলে শেষ অস্ত্র মরফিন।

দু'পাশে দু'জন অসহায়ের মতো খাড়া। কী করবে বুঝতে পারছে না। সাত্যকির অবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। নিজের কষ্ট যত না কষ্ট দেয়, অন্যের কষ্ট তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্টের। দু'জনেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। সুধার মৃত্যু দেখেছে শিবপদ। তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে সুধা। মাথায় টিউমার হয়েছিল। আর কৃষ্ণ দেখেছে কুমুর যন্ত্রণা। যখন ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত। কুমুর দু'চোখ বেয়ে জল গড়াত। শরীর কাঁপত। ধীরে ধীরে চেহারা শুকিয়ে এল। বর্ণ হয়ে গেল কালচে। যারা শক দিত তাদের মুখ আর উৎসাহ দেখে মনে হত খুব উপভোগ করছে। অপরের যন্ত্রণায় কেউ আনন্দ পায়, কারুর আবার বুক ফেটে যায়।

সাত্যকি মেঝেতে অনেকক্ষণ দুমড়ে পড়ে রইল। এই সময়টায় তার চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়। দেহের কারাগারে প্রাণপুরুষ পড়ে পড়ে বাঁধা মার খাচ্ছে। ঠিক যেমন করে সে একটি প্রাণের হত্যার কারণ হয়েছিল, ঠিক সেই একই ভাবে দগ্ধে দগ্ধে তাকেও মরতে হবে।

এ ব্যথার একটা ঢেউ ওঠে। উঠতেই থাকে। চূড়ায় উঠে আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে। একসময় মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে গেলেও শরীরে আর কিছু থাকে না। দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত চলে যায়। মাঝে মাঝে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। পারে না। সাহসে কুলোয় না। যে জীবন যাবেই তার জন্যেও কী মায়া!

আনত অবস্থা থেকে সাত্যকি ধীরে ধীরে সোজা হল।

কৃষ্ণ আর শিব দু'জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ তোমার কী হল বলো তো?'

সাত্যকি ফিসফিস করে বললে, 'মাঝে মধ্যে আমার এরকম হয়। বিচারকের চাবুক।'

আর কিছু বলার ক্ষমতা নেই। বারান্দার রেলিং-এ পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুজিয়ে রইল। শরীর ঝিমঝিম করছে।

'কী করলে তুমি একটু সুস্থ হবে বলো?'

'একটা মাদুরটাদুর কিছু এনে দাও। আমি এইখানে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি।'

শিব বললে, 'এখানে শোবে কী! মশায় ছিঁড়ে দেবে। তুমি ঘরে বিছানায় শোবে চলো। পাখা খুলে দিচ্ছি।'

'বিছানা। না না এই তো মাটিই বেশ। আমার এই মাটিই বেশ।'

কৃষ্ণ বললে, 'তোমার অত সংকোচের কোনও কারণ নেই। অসুস্থ হয়ে পড়েছ। চলো, ওঠো।'

সাত্যকি মাটিতে হাতের ভর রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝিমঝিম করছে। পা কাঁপছে। কৃষ্ণ আর শিব দু'জনে দু'দিক থেকে ধরেছে।

শিবপদ নিজের বিছানায় সাত্যকিকে শুইয়ে দিল। পাখা ঘুরছে ফুল স্পিডে। আলোয় সাত্যকির মুখ দেখে দু'জনেই চমকে উঠল। ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য। দু'চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। নিমেষে মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল। দেহের কলকবজা বড় অদ্ভুত। না জেনেই মানুষের লম্ফ ঝম্প।

'জলটল কিছু খাবে সাত্যকি? একটু দুধ? কোনও সংকোচ কোরো না।'

'এখন কিছু চলবে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি ভাই।'

'ডাক্তার ডাকব?'

'প্রয়োজন হলে বলব।'

'এটা কীসের ব্যথা? আলসার?'

'ক্যান্সারও হতে পারে।'

'ডাক্তারবাবুকে ডাকি না সাত্যকি! তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন?' কৃষ্ণ অনুরোধের গলায় বলল।

সাত্যকি ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'এর কোনও ওষুধ নেই ভাই। কেন ডাক্তারবাবুকে মিছিমিছি বিব্রত

করা। এ ব্যথা ঢেউয়ের মতো ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। একমাত্র ওষুধ সহ্য করা। তোমরা ভেবো না।'

'ঘরের আলো জ্বলবে, না নিবিয়ে দোব?'

'নিবিয়ে দাও। আমার জন্যে তোমরা ভেবো না ভাই।'

কৃষ্ণ আর শিব বাইরের বারান্দায় এসে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কী করবে বুঝতে পারছে না। চারপাশে পুট পুট করে আলো জ্বলে উঠছে। সকালের দমকা বাতাস এখনও মাঝে মাঝে বইছে। চারপাশের গাছপালায় বাতাসের ঝটকা লাগছে। ধোঁয়া ধোঁয়া প্রকৃতি। শিবপদর মনে পড়ল, আজ অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার রাত এগিয়ে আসছে।

কৃষ্ণ বললে, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, এক মুহূর্তে আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। পিকনিক! পিকনিক মাথায় উঠে গেল। আমরা অতি নিকৃষ্ট ধরনের দুর্ভাগা। যা চাই ঠিক তার উলটোটা হয়।'

'আমি সেই কারণে কিছুই আর চাই না।'

'সাত্যকির জন্যে কী করা যায় বল তো?'

'প্রার্থনা।'

'ও যাই বলুক আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুকে একটা কল দেওয়াই উচিত। কোনও ওষুধ নেই তা কখনও হয়। বিজ্ঞানের যুগ। নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

'তুই ভাবিসনি কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ দেখা যাক। প্রয়োজন হলে ডাকা যাবে। তা ছাড়া আমার হোমিওপ্যাথি আছে। বিপদে উতলা হলে, বিপদ আরও বেড়ে যায়।'

'আমি তা হলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি। সব প্ল্যানই তো বদলে গেল।'

'যা, তোর কোনও চিন্তা নেই। আমি আছি।'

শিবপদ সাত্যকির ঘরে একবার উঁকি মারল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। না, বিরক্ত করা উচিত নয়। দেখাই যাক না কী হয়। ধীরে, নিঃশব্দে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে শিবপদ রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ মিউ মিউ আওয়াজ আসছে। কী রে পুসি তুই এরই মধ্যে মা হয়ে গেলি! যাঃ।

শিবপদ ইতিউতি খুঁজতে লাগল। কানে একটা ঘড়ঘড় শব্দ আসছে। আনাজের খালি বাস্কেটের মধ্যে পুসি তিনটে বাচ্চা পেড়েছে। মা হয়ে তার কী গর্ব। ঘাড় উঁচু করে চোখ বুজিয়ে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে। সব ক'টা বাচ্চাই ধবধবে সাদা। মায়ের পেটের কাছে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। পুসি মাঝে মাঝে গা চেটে দিচ্ছে। স্নেহ-পরিপূর্ণ জমাট একটি জীবনের আয়োজন। শিবপদর চোখ জুড়িয়ে গেল। কী আশ্চর্য এই পৃথিবী! ও ঘরে জীবন মৃত্যুর লড়াই, আর এ ঘরে তিনটি বিন্দু-প্রাণ সবে ফুটে উঠল। কোনটা থাকবে, কোনটা যাবে জানে না কেউ।

শিবপদর চায়ের ইচ্ছে চলে গেছে। রাতের খাবার না হলেও চলবে। একটা মানুষ ও ঘরে যন্ত্রণায় ছটফট করবে আর এ ঘরে বসে সে খাবে, তা হতেই পারে না। অতখানি স্বার্থপর হতে পারলে সে অনেক কিছু করতে পারত জীবনে। পুসি চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে একবার মিউ করল। শিবপদর কাছে মানুষের ভাষার চেয়ে এ ভাষা স্পষ্ট। অনেক ধকল গেছে পুসির, মুখের কাছে একটু দুধ ধরতে হবে।

নৌকোর মতো দেখতে স্টেনলেস স্টিলের একটা পাত্রে শিবপদ খানিক দুধ ঢেলে পুসির মুখের কাছে ধরল।

দুধে জিভ লাগাবার আগে পুসি আর একবার মিউ করল। এ মিউটা কৃতজ্ঞতার, ধন্যবাদের মিউ। ঘড়ঘড় শব্দ করছে। এ হল নির্ভরতার প্রকাশ। হৃদয়হীন পৃথিবীরও হৃদয় আছে, তা না হলে এতদিনে দানবে সব ধ্বংস করে ফেলত।

চেটেপুটে পাত্র সাফ করে, শিবপদর দিকে ঢুলুঢুলু চোখ তুলে পুসি আর একবার মিউ করে উঠল।

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ, মিউ। তুমি এবার তোমার কাজ করো। আবার রাতে দুধ পাবে।'

শিবপদ পেছনের বারান্দায় এসে ওপর দিকে তাকাতেই গা-টা ছমছম করে উঠল। দোতলার বারান্দা থেকে রঙিন একটা শাড়ি ঝুলছে। বাতাস লেগে ফুলে ফুলে উঠছে। জোরে বাতাস লাগলে অশরীরী আঁচলের মতো ভুস করে উড়ে গিয়ে বেলগাছের ডাল ছুঁয়ে আসছে।

এ তনুর শাড়ি। ভিজে ছিল। মেলে দিয়ে গেছে। নিয়ে যায়নি। এতক্ষণ তার নজরে পড়েনি। প্রাচীন বিশ্বাসের মানুষ। কেমন যেন আতঙ্ক হচ্ছে। যে মেয়ে মা হতে চলেছে, সন্ধেবেলা তার শাড়ির আঁচল বেলগাছে ঠেকছে। না, এ তো ভাল নয়। হয়তো কুসংস্কার! কিন্তু কোনটা কু, আর কোনটা সু, বিচারের দিন কি এসেছে। কে তুলবে! এখুনি তোলা দরকার। কিন্তু পুত্রবধূর শাড়িতে সে হাত দিতে পারবে না। বড় বিপদ হল।

বাইরের বারান্দা থেকে বাচ্চা মেয়ের গলা ভেসে এল, 'দাদু, ও দাদু।'

ফ্রকপরা তেরো-চোদ্দো বছরের একটি মেয়ে। টান টান করে আঁচড়ে চুল বেঁধেছে। কপালে গোল একটা টিপ। আলো পড়ে চিকচিক করছে। হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কৌটো। শিবপদ প্রথমে চিনতে পারেনি। তারপর চিনতে পারল, মেয়েটি দেবীর বাড়িতে কাজ করে। নাম দুর্গা।

'কী রে মা?'

'এই নিন দিদি পাঠিয়ে দিলে।'

'তোতা কেমন আছে রে দুর্গা!'

'একটু ভাল। বিছানায় উঠে বসেছে। এতক্ষণ আমার সঙ্গে লুডো খেলছিল। আপনি যাবেন না! আপনাকে ডাকছে।'

'যাব তো ভেবেছিলুম মা, এদিকে এক ঝামেলায় পড়েছি। তুই আমার একটা উপকার করবি দুর্গা?'

'বলুন?'

'ভেতরে আয়।'

শিবপদ দোতলায় উঠছে। পেছনে দুর্গা। মাথায় গন্ধ তেল মেখেছে। জুঁই ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে। হঠাৎ শিবপদর মনে হল, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। সামান্য তেরো-চোদ্দো বছরের একটা মেয়ের পা পড়ায় বাড়িটা কেমন যেন কোমল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ বড় কর্কশ লাগছিল।

শিব বারান্দার দরজা খুলল। দমকা বাতাসে দেয়ালের ক্যালেন্ডার ঝটপটিয়ে উঠল। মেঘে ঢাকা আকাশ অনেক নীচে নেমে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেড়াতে যাবার ছড়িটা ওপর দিকে তুললেই যেন আকাশের গায়ে লেগে যাবে। বারান্দার সামনে ঝাঁকড়া বেলগাছ। ছোট ছোট বেল ধরেছে অসংখ্য। খুদে সন্ন্যাসীর নেড়া মাথার মতো। সাদা মতো একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে গেল। লক্ষ্মী প্যাঁচা।

ফিনফিনে পাতলা মাকড়সার জালের মতো একটা শাড়ি ঝুলছে। শিব বললে, 'দুর্গা তুই এই শাড়িটা তুলে পাট করে রাখতে পারবি? আমি আর হাত দোব না।'

দুর্গা মৃদু স্বরে বললে, 'হ্যাঁ', মেয়েটা খুব আস্তে কথা বলে। ভদ্রঘরের মেয়ে। দুর্গার বাপ এখন জেলে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। দুর্গার জ্যাঠা আর কাকা, মা আর মেয়েকে দূর করে দিয়েছে। শিবের কানে যা এসেছে। দুর্গার মায়ের স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়। মেয়েটা কিন্তু ভারী সুন্দর। দুর্গার মা নাকি দেবীকে বলে গেছে, দিনকাল ভাল নয়, উঠতি বয়েসের মেয়ে, একদম বাইরে বেরোতে দেবেন না।

শিব ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এই ঘরেই ওরা থাকত। কিছুই নিয়ে যায়নি। সবই পড়ে আছে। উচ্চ বর্ণের আবাসস্থলে এইসব মধ্যবিত্ত আসবাবপত্র অচল। ওই খাট। এই ড্রেসিং টেবল। আলনা। দেরাজ। দেয়াল থেকে একটা ছবি খুলে নিয়ে গেছে। দাগ দেখে বোঝা যায়। সব মায়া।

দুর্গা শাড়িটা পাট করে এনেছে। 'কোথায় রাখব দাদু?'

শিব দেরাজের একটা টানা ধরে সামান্য টান দিতেই খুলে আর একটু হলেই পায়ে পড়ে যাবার মতো হচ্ছিল। ধরে সামলে নিল। জামা-কাপড় সব নিয়ে গেছে। টিকটিকির ডিমের মতো উড়ে-যাওয়া গোটাকতক ন্যাপথালিন বল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

'এইখানে রাখ।'

দুর্গা রাখতে রাখতে বললে, 'একটু ভিজে ভিজে আছে।'

'থাক, আজকালকার অসুতি শাড়ি, কিছু হবে না।'

দুর্গা বললে, 'আমি এবার যাই।'

'দুর্গা তুই লেখা-পড়া করিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বইটই সব আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল থেকে তুই আমার কাছে পড়তে আসবি। সকাল, বিকেল, দুপুর, যখন তোর সময় হয।'

'আপনি পড়াবেন?'

'হ্যাঁ, আমার অফুরন্ত সময়। তোকে দিয়ে শুরু করব। তারপর ধীরে ধীরে একটা ফ্রি স্কুল হয়ে যাবে। তোর দিদিকে ওই রাবিশ চাকরি ছেড়ে দিতে বলব। সুযোগ যখন আছে তখন মানুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা কর দুর্গা। আমাদের বড় দুঃসময় যাচ্ছে রে! ধীরে ধীরে আমাদের সব শেষ হয়ে আসছে।'

দুর্গা চলে গেল। শিবপদ দরজা বন্ধ করে দেবীর পাঠানো কৌটোটা খুলে দেখল। ভুরভুর গন্ধ। চিঁড়ের পোলাও। যাক, রাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঘর থেকে সাত্যকির ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কৃষ্ণ।'

শিবপদ ভেজানো দরজা খুলল। বিছানায় সাত্যকি ছটফট করছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শিবপদ বললে, 'কৃষ্ণ কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি গেছে। এখন কেমন বোধ করছ সাত্যকি।'

'ভাই, আর বোধহয় হল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সাত্যকি হাঁপাতে লাগল।

'আমি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।'

ছোট্ট একটা অ্যামপিউল শিবপদর হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'ফুঁড়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি আর একটু সহ্য করো। আমি যাব আর আসব।'

শিবপদ পাঞ্জাবি চাপিয়ে বেরোতে যাবে, সারাদিনের থমকে থাকা আকাশ রুদ্র রোষে ভেঙে পড়ল। যেমন বৃষ্টি তেমন উদ্দাম বাতাস। ঘোলাটে আকাশে আগুনে রং। নারকেল গাছের মাথা বাতাসের দাপটে শুয়ে শুয়ে পড়ছে। দোতলার দিকে যে জুঁই গাছটা উঠতে উঠতে প্রায় ছাদ ধরে ফেলেছিল, ঝড়ের বেগে এক-একবার তিন চার হাত পাশে সরে যাচ্ছে। গাছটা আর থাকবে না। এবার ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

বেরোবার দরজার মুখে শিবপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টি না কমলে বেরোনো যাবে না। ডাক্তারও আসতে পারবেন না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, দেবী ইঞ্জেকশান দিতে জানে। দেবীর বাবার ডায়াবিটিস ছিল। রোজ রোজ ইঞ্জেকশানের খরচ বাঁচাবার জন্যে মেয়েকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। দেবীর খুব সাহস। বিপদে পড়তে পড়তে মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে। সাজসরঞ্জাম দেবী এখনও বজায় রেখেছে। হাতও চালু আছে। কিন্তু অ্যামপিউলটা কীসের? দেখা দরকার।

ঘরে এসে শিবপদ দেখবার চেষ্টা করল। খুদে খুদে অক্ষর। চোখ চলে না। অনেক কষ্টে পড়ল, মরফিন। একটু দুশ্চিন্তা হল। ইঞ্জেকশান নেবার পর রুগির ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়! কী আর হবে! এ যুগের মানুষ তো নীলকণ্ঠ।

পাঞ্জাবি খুলে মালকোঁচা মেরে নিল। ছাতায় কিছু হবে না। তবু যদি মাথাটা বাঁচে! বাতাসের ঝটকায় ছাতা উলটে যেতে পারে। যায় যাবে। ভাবার সময় নেই। সাত্যকির দম বন্ধ হয়ে আসছে।

শিব সদরে তালা লাগাল। বারান্দা ছেড়ে নীচে, বাগানের পথে নামার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল প্রকৃত দুর্যোগের রাত। একেই বলে আকাশ ভেঙে পড়া। ছাতায় এত জোরে জল পড়ছে, মনে হচ্ছে তুবড়ে যাবে। রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের বাতাসে ছাতা উলটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে হল মুক্তপুরুষ। আশ্রয়হীনের মতো মুক্ত কে আর আছে। ছত্রাকার ছাতা বগলে চেপে শিবপদ স্বাভাবিক গতিতে দেবীদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। একেবারে স্নান হয়ে গেছে। শীত করলেও বেশ তাজা লাগছে। রাস্তায় যেন নদী বইছে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সময় আকাশে একটা আলো জাগে। ভুতুড়ে আলো।

দরজার কড়া বার কতক নাড়তে হল। দেবীর গলা পাওয়া গেল, 'কে?'

'আমি শিবপদ।'

দেবী আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'আমি শিবপদ বউমা।'

ইদানীং দেবীকে একটু সাবধানী হতে হয়েছে। পরলোকগত স্বামীর সহকর্মী শশধর ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পাওনাগন্ডা আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন ভদ্রলোক। অস্বীকার করলে লোকে অকৃতজ্ঞ বলবে। তখন ভাবা গিয়েছিল মানুষটি নিঃস্বার্থ পরোপকারী। আসলে মানুষটি নির্ভেজাল শয়তান। লোকটির কথা ভাবলেও দেবীর বুক কেঁপে ওঠে। গত বছর এমনি এক ঝড়ের রাতের স্মৃতি সহজে মুছে ফেলা যাবে না। কোনও সময়ই তার অসময় নয়। ঝড়, জল, দিবা, দ্বিপ্রহর, কিছুই সে মানে না। তার তাকানোয় যে-কোনও মহিলা উলঙ্গ হয়ে যায়, এমন বিশ্রী তার চোখের দৃষ্টি। এই নেকড়ের সমাজে কী কষ্টে যে বেঁচে থাকতে হয়, দেবী তা হাড়ে হাড়ে জানে।

দেবী সাবধানে দরজার একটা কপাট ফাঁক করতেই হু হু করে জলের ছাট আর বাতাস ঢুকতে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। নীল আলোয় শিবপদকে মনে হল কাচের মানুষ।

'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। এঃ একেবারে চান হয়ে গেছেন।'

শিবপদ ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছে। ভিজে জামাকাপড়ের জলে ঘরদোর ভেসে যাবে। বগলে আবার ত্রিভঙ্গ মুরারী ছাতা। দেবী হাত ধরে টেনে আনল ভেতরে।

'এই বৃষ্টিতে আপনি বেরোলেন কেন বাবা?'

ভেতরের ঘর থেকে তোতা চিৎকার করে উঠল, 'দাদাই, দাদাই।'

দেবী বললে, 'আপনি পাপোশে দাঁড়ান। আমি তোয়ালে আর শুকনো কাপড় নিয়ে আসি।'

শিবপদ বললে, 'সে সময় নেই। তোমাকেও আমার সঙ্গে ভিজতে হবে। তোমার সেই ইঞ্জেকশান দেবার সাজসরঞ্জাম তৈরি আছে?'

'আছে। কেন বলুন তো।'

'বিকেলে অনেক বছর পরে আমাদের এক বন্ধু এসে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসহ্য পেটের যন্ত্রণা। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে। একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে। এখুনি দিতে হবে। ইঞ্জেকশান ও সঙ্গে নিয়েই ঘোরে।'

'আপনি দাঁড়ান। আমি সিরিঞ্জ নিয়ে আসছি।'

দেবী ভেতরে চলে এল। তোতা চিৎকার করছে। 'দাদাই, তুমি আমার কাছে আসবে না!'

'দিদি আমি ভিজে চান করে গেছি। তুমি খেলা করো। আমরা একটা কাজ সেরে আসছি।'

'আমি তোমার কাছে যাব।'

'না, দিদি। এখন একদম ঠান্ডা লাগানো চলবে না। আবার জ্বর এসে যাবে।'

দ্রুতপায়ে দেবী এগিয়ে এল। সঙ্গে একটা বড় ছাতা।

'চলুন বাবা। ছাতাটা বড় আছে, দু'জনেরই মাথা বাঁচবে।'

'আমার মাথা আর বাঁচাবার দরকার নেই মা। আমি তো চান করেই গেছি।'

দু'জনে জনশূন্য রাস্তায় নেমে এল। খোলা ছাতাটা শিবপদর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি ধরুন। সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

পেছন থেকে বাতাস ঠেলা মারছে।

ছাতা সামলাতে সামলাতে শিবপদ বললে, 'তুমি আমার বাঁদিকে চলে এসো।'

দেবী আঁচলটাকে কোমরে ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে। শাড়ির নীচের দিকটা টেনে পায়ের গোছের ওপর তুলতে হয়েছে। তা না হলে হাঁটা যাচ্ছে না। দেবী সাধারণ বাঙালি মহিলার চেয়ে লম্বা। প্রায় শিবপদর মাথায় মাথায়। ছিপছিপে সুন্দর। শরীর এখনও ভাঙেনি। বরং দিনে দিনে সুন্দর হচ্ছে। অত্যাচারী না হলে দুর্ভোগেও শরীর সুন্দর হতে থাকে। শিবপদর তাই ধারণা।

পাশাপাশি প্রায় দেহলগ্ন হয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিবপদর মনে হল, সে কি তার পুত্রবধূর এত কাছাকাছি আসতে পারত কোনওদিন। অহংকার বিসর্জন দিতে পারলে সকলেই কাছের, অন্তরের। অহংকারে আপন দূর হয়ে যায়। বৃষ্টি-ধোয়া চকচকে পথ বহুদূরে চলে গেছে। তবে দু'জনের হাঁটা খুবই সংক্ষিপ্ত। বেশ লাগছিল শিবপদর। জীবনকে ভাগ করে নিতে পারলে বেঁচে থাকা খুব সুখের। তখন দুঃখেও মন গান গেয়ে ওঠে। চোখে জল, অথচ মুখে হাসি।

এই মুহূর্তে বিরাট পৃথিবী খুব ছোট হয়ে এসেছে, একটি ছাতার সীমানায়। জলের গণ্ডি ঘিরে রেখেছে দু'জনকে। মাথা ছাড়া দেবীর পুরো শরীরই ভিজে গেছে। শিবপদর হাতে দেবীর বাহু ঠেকলে চমকে উঠছে। এত শীতল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দেবীর মুখ তখন স্পষ্ট হচ্ছে। রাতের মতো রাত। বর্শার ফলার মতো বৃষ্টি মাটি বিঁধছে। আক্রোশে নয়। ভালবেসে। স্নেহের আক্রমণ।

হঠাৎ দেবী বললে, 'সেদিনও ঠিক এমনই রাত ছিল। এর চেয়েও বেশি দুর্যোগ।'

॥ চার ॥

দূর থেকে শিবপদর বাড়িটাকে দেখাচ্ছে লাইট হাউসের মতো। যেন আলোকিত বিশাল এক খণ্ড বরফ। ইচ্ছে করে সব ক'টা আলোই জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। দরজার তালা খুলে দেবীকে বললে, 'তুমি আগে ঢোকো।' দেবী এতক্ষণ শিবপদর মাথায় ছাতা ধরে ছিল। শিবপদ ছাতাটা নিয়ে মুড়তে মুড়তে বললে, 'তুমি এই বারান্দায় দাঁড়াও। আমি আগে একটা তোয়ালে আর শুকনো শাড়ি আনি।'

'এমন কিছু ভিজিনি।'

'ভিজে সপসপ করছ।'

ব্লাউজের পিঠের দিকটা ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। শাড়ি লেপটে গেছে তলার দিকে।

'শাড়ি আপনি পাবেন কোথায়?'

'আছে। একখানা শাড়ি তোমার জন্যেই আছে।'

শিবপদ ভিজে পাঞ্জাবি কোনওরকমে টেনে খুলে বারান্দার রেলিং-এ ঝুলিয়ে দিল। কোঁচাটা নিংড়ে নিল বাইরে। বারান্দা জলে ভাসছে। চেয়ার-টেয়ার সব ভিজে গেছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা উঠে গেল দোতলায়। দেরাজের ড্রয়ার টেনে দুর্গার পাট করে রেখে যাওয়া শাড়িটা তুলে নিল। একটু ইতস্তত হচ্ছিল। মেয়েদের ব্যবহার করা জিনিসে হাত দিতে ইচ্ছে করে না। এখন আর ভাববার সময় নেই।

দেবী শাড়িটা হাতে নিয়ে বললে, 'বাবা, এ যে খুব দামি শাড়ি।'

'আমার কোনও ধারণা নেই। তুমি আগে পালটে নাও। আমি ঘরে যাচ্ছি।'

'বাবা, আমি বরং বাথরুমে যাই। এখানে ভীষণ ছাট আসছে।'

'বেশ বেশ তাই যাও। সোজা গিয়ে ডানদিকে।'

দেবী পাপোশে পা মুছে ভেতরে চলে গেল। শিবপদর এইবার শীত শীত করছে! গরম এককাপ চা বা কফি খাবার ভীষণ ইচ্ছে করছে। সাত্যকির ইঞ্জেকশনটা হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। শিবপদ গেঞ্জি খুলে মাথা মুছল। এই বয়েসে এক মাথা চুল নিয়ে মহা বিপদে পড়েছে। যে বয়েসের যা। এই বয়েসে টাকই ভাল।

দেবী পেছন থেকে বললে, 'নিন চলুন। একেবারে আদুড় গা হলেন কেন? ঠান্ডা লেগে যাবে না!'

'আমার ওষুধ আছে। চার গুলি খেয়ে নেব। গরম জল দিয়ে। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাও চলো। জামাটা তো ভিজেই রইল।'

'ও কিছু হবে না। জল টেনে যাবে।'

'সেইটাই তো ভয়ের। বুকে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

শিবপদ ধীরে সন্তর্পণে সাত্যকির ঘরের দরজা খুলল। হাতখানেক তফাতে দেবী। শিবপদ ভেতরে না ঢুকে দরজার কাছেই থমকে রইল। সাত্যকির মাথাটা খাটের বাইরে ঝুলছে। দাঁতে চাপা একটা রুমাল। একটা হাত দিয়ে ধরে আছে খাটের মাথা। আর এক হাত দিয়ে খামচে ধরেছে বিছানার চাদর। চোখদুটো কেমন যেন উলটে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নেই। প্রশস্ত বুক ওঠা-নামা করছে না। মাথার দিকের টেবিলে রাখা এক গেলাস জল উলটে আছে। গেলাসটা আর একটু গড়ালেই মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। ঢালু বেয়ে জল গড়িয়ে এসেছে দরজার দিকে।

শিবপদ মৃদু গলায় ডাকল, 'দেবী।'

পেছন থেকে দেবী বললে, 'কী হল?'

শিবপদ একপাশে সরে গিয়ে বললে, 'দেখো। তোমার কী মনে হচ্ছে!'

দেবী একনজর দেখেই বললে, 'মনে হচ্ছে মারা গেছেন।'

'এখন? এখন তা হলে কী হবে?'

দেবী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। নানারকম আশঙ্কা তার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পথ ধরে মানুষ সহজেই পালাতে পারে। সমস্যা হল ফেলে রেখে যাওয়া দেহ নিয়ে।

শিবপদ ধরা-ধরা গলায় ডাকল, 'দেবী।'

'বলুন বাবা?'

'কী হবে? কী করা যায় এখন। আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মা। ওই দেখো, শেষ সময়ে এক ঢোঁক জল খাবার চেষ্টা করেছিল। শক্তিতে কুলোয়নি। কোনওরকমে একটা রুমাল দাঁতে চেপে ধরেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানার চাদর খামচে ধরেছিল। আমার মনে হয় যন্ত্রণায় হার্টফেল করেছে। এঃ শেষ সময়টায় আমরা কেউ পাশে রইলুম না।'

শিবপদ দু'চোখে হাত চাপা দিল।

'বাবা, এখন আর ভাবলে চলবে না। কিছু একটা করতে হবে। আর সে করাটা হল ডাক্তার ডাকা। এই দুর্যোগে আপনাকে আর বেরোতে হবে না। আমি যাচ্ছি। আমি ডক্টর সান্যালকে নিয়ে আসছি।'

'বলছ কী? আমি থাকতে তুমি যাবে। তুমি একা কিছুক্ষণ থাকতে পারবে? পারবে মা? আমি তা হলে কৃষ্ণকে একবার ডেকে আনি।'

'পারব বাবা।'

'ভয় করবে না?'

'একটুও না।'

শিবপদ বেরিয়ে গেল। জুতো পায়ে দেবার কথাও মনে রইল না। বৃষ্টি সামান্য ধরে এলেও ঝোড়ো বাতাস বইছে। একবার মাত্র মনে এসেছিল বিশ্রী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল। এখন আর সেসব মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে, যার যেখানে জমি কেনা থাকে! সাত্যকির কী অসম্ভব মনের জোর। এইরকম সাংঘাতিক এক ব্যাধি নিয়ে কেমন হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! অসুখের প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি। এইসব ভাবতে ভাবতে শিব কৃষ্ণর বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। কোথায় পা পড়ছে খেয়াল নেই। দেবীর ছাতাটা নিলেও ছাতায় ছাট আটকানো যায় না।

শিবপদ চলে যাবার পর দেবী বুঝল, নিজেকে যতটা সাহসী ভেবেছিল ততটা সাহসী সে নয়। ভয় ভয় করছে। নিজের স্বামীর কাটা ছেঁড়া পোড়া ঝলসানো মৃতদেহ আগলে এক রাতে সে অনেকক্ষণ বসে ছিল। ভয় পায়নি। না পাবার একমাত্র কারণ, শোকে, দুঃখে, বেদনায় স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি হারিয়ে গিয়েছিল। আজ তো মনের সে অবস্থা নয়। দেবী যেখানে বসে আছে সেখান থেকে সাত্যকির দেহ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বড় অদ্ভুত ভঙ্গিতে মরেছে। দাঁতে রুমাল। মাথাটা ঝুলে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। শরীর টান টান। যেন একটা ধনুক ছিলা ছিঁড়ে পড়ে আছে।

পেছন দিকের বাগানে ঝপাস করে একটা শব্দ হল। যেন বিশাল একটা পাখি উড়তে না পেরে ডানা মুড়ে পড়ে গেল। দেবী চমকে উঠেছিল। সামনে কেউ থাকলে নির্ঘাত জড়িয়ে ধরত ভয়ে। বুকের ভেতর ধকধক শব্দ হচ্ছে। কীসের এমন শব্দ বোঝার চেষ্টা করল। ঝড়ে নারকেল গাছের পাতা পড়ল। মাঝে মাঝে বাতাস সিঁ সিঁ শব্দ করছে। দেবী আর বসতে পারল না। ঘরে পায়চারি শুরু করল। একবার ভাবলে, সাত্যকি যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পরক্ষণেই মনে হল, ভয়ের জিনিস চোখের সামনে রাখাই ভাল।

দেবী ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিস দেখতে লাগল। দেয়ালে ঝোলানো ছবি। কাচের শোকেসে রাখা নানারকম পুতুল। কাঁধে জাল ফেলে জেলে মাছ ধরতে চলেছে। এক বৃদ্ধ বসে বসে তামাক খাচ্ছে। ছেলে কোলে নিয়ে মা বসে আছে পা ছড়িয়ে। একটা কুকুর শুয়ে আছে জিভ বের করে। একটা উট চলেছে মুখ তুলে। প্রথমে দেখতে দেখতে তার বেশ মজাই লাগছিল। হঠাৎ গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। কাচের আলমারির ভেতর নিঃশব্দে পড়ে আছে প্রাণহীন এক জগৎ। ভঙ্গি আছে গতি নেই।

বাইরের বারান্দায় কী একটা শব্দ হল। কেউ যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। দেবীর মেরুদণ্ডে শীতল এক স্রোত বয়ে গেল। একা থাকার প্রস্তাবে রাজি হয়ে খুব ভুল করেছে। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। কেউ যদি হঠাৎ নেমে আসে সাদা বোরখা পরে! কী করবে দেবী? মৃত ওই মানুষটি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে যদি বলেন, এক গেলাস জল। কী করবে দেবী! ক্রমশই দেবীর চিন্তাশক্তি কমে আসছে। কেবলই মনে হচ্ছে, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড়ের কাছে মৃদু নিশ্বাস পড়ল যেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার মতো সাহস নেই তার। ছোট্ট আলমারির সামনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিশ্রী বুড়োটা মাঝে মাঝে স্প্রিং-এর ঘাড় নাড়ছে। যেন সব বোঝে, সব জানে।

দমকা একটা বাতাসে দরজা জানলা কেঁপে উঠল। বিদ্যুতের ঝিলিকে সিঁড়ির ধাপ নীল হয়ে গেল। বাঁকের মুখে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবি সাদা হয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভীষণ শব্দে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। ঘরের সমস্ত আলো নিবে গিয়ে জ্বলে উঠল পরক্ষণেই। সমস্ত আলো হঠাৎ নিবে গেলে দেবী কী করবে! আলো নেবার কথা মনে হতেই দেবীর ইচ্ছে হল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। বাবা সেই গেছেন তো গেছেন! কী করছেন এতক্ষণ!

বাইরের বারান্দায় আবার শব্দ হল। এবার বেশ স্পষ্ট। সাহস করে দেবী বারান্দার দিকে একবার তাকাল। বুকটা ছাঁত করে উঠল। দরজার সামনে কার একটা ছায়া পড়ে আছে। যার ছায়া তার গায়ে

একটা আলখাল্লা চাপানো আছে। পাশে টেবিলের ওপর বাইরের দরজায় লাগাবার ভারী তালা। দেবী তালাটা হাতে তুলে নিল। প্রয়োজন হলে ছুড়ে মারবে। এটুকু তার জানা আছে অশরীরীর ছায়া পড়ে না।

দেবী কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'কে? কে ওখানে?'

কোনও উত্তর এল না। ছায়াও কাঁপল না। দরজার দিকে ছুড়ে মারার জন্যে দেবী তালাটা তুলেছিল, এমন সময় ছায়াটা দ্রুত সরে গেল। বাইরে ঝলসে উঠল নীল বিদ্যুৎ। আবার বাজ পড়ল। এবার আরও কাছে। দেবীর মনে হল একটা অভিশাপ ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে।

এইবার বেশ জোরে পায়ের শব্দ হল। দেবী দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ছাতা বন্ধ করার শব্দ হল। দরজার সামনে শিবপদ। পেছন থেকে আলো পড়ে চুলে লেগে থাকা জলের ফোঁটা হিরের মতো চকচক করছে। তালাটা কোনওরকমে টেবিলে নামিয়ে রেখে দেবী ছুটে গিয়ে শিবপদর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। এতক্ষণের শাস্তির অবসান। শিবপদকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে রইল শিশুর মতো।

দেবীর মাথায় হাত রাখল শিবপদ। আলগা খোঁপা ভেঙে পড়ল পিঠের ওপর। চুলের ঢল নেমে গেল কোমর ছাপিয়ে আরও নীচে।

শিবপদ দেবীর পিঠে হাত রেখে বললে, 'কী হল? ভয় পেয়েছ মা?'

দেবীর চোখে জল এসে গেছে। শিবপদর বুক থেকে মাথা তুলতে ইচ্ছে করছে না। প্রশস্ত বুকের বাঁ পাশে হৃদয়ের ধুকধুক শব্দ। নিরাপদ আশ্রয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার কী যে আনন্দ! জীবনের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেবী।

'ইস তোমার জামাটা এখনও ভিজে আছে। পিঠে জল বসে যাচ্ছে। শোবার আগে এক পুরিয়া ওষুধ খেয়ে নেবে।'

দেবী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভয় কেটে গেছে। স্বামীর ছেঁড়াখোঁড়া শরীর দেখার পর একমাস ঘুমোতে পারেনি দেবী। এক আঙুলে দেবীর চিবুক ওপর দিকে তুলে শিবপদ বললে, 'খুব ভয় পেয়েছিলে?'

'বারান্দায় কেউ এসেছিল বাবা। আপনাকে আসতে দেখে পালাল।'

'এই ঘেরা বারান্দায় কে আসবে মা? কেনই বা আসবে?'

কথা বলতে বলতে শিবপদর চোখ চলে গেল বারান্দার শেষ প্রান্তে। গ্রিলের জানলা হাট খোলা। বাতাসে দুলছে। জানলাটা কি খোলাই ছিল? ঠিক খেয়াল করতে পারল না। শিবপদ মেঝের দিকে তাকাল। কাদা কাদা জুতোর ছাপ। একটার ওপর আর একটা, একটার ওপর আর একটা। এলোমেলো। জানলা থেকে দরজার পাশ পর্যন্ত দু'বার যাওয়া আসা করলে এইরকম হতে পারে। শিবপদ চিন্তিত হল; কিন্তু প্রকাশ করল না। দেবীকে সাহস দেবার জন্যে বললে, 'ও তোমার মনের ভুল। তুমি ভয় পেয়েছিলে।'

'কী ব্যবস্থা করে এলেন বাবা?'

'ওই যে কৃষ্ণ আসছে ডাক্তার নিয়ে। খুব ঘাবড়ে গেছে। আমারও বেশ ভয় করছে মা। কীভাবে হঠাৎ মারা গেল। কী অসুখ তাও বোঝা গেল না। কতদিন ভুগছে! কী চিকিৎসা হচ্ছিল, কার চিকিৎসায় ছিল? পুলিশ কেসে না পড়ে যাই!'

'অত ভাববেন না তো? এখন যা দিনকাল পড়েছে অত ভয় পেলে চলবে না।'

কথা বলতে বলতে দেবীর হঠাৎ মেঝের দিকে চোখ চলে গেল। বাসের একটা টিকিট পড়ে আছে। দেবী শিবপদর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাবা ওই দেখুন।'

টিকিটটা আগে শিবপদর নজরে পড়েনি। নিচু হয়ে দেখে বললে, 'বাসের টিকিট।'

'কেউ আজ বাসে চেপেছিলেন আপনারা?'

'আমরা, কই না তো!'

'তা হলে?'

শিবপদর হঠাৎ মনে হল সাত্যকিও তো বাসে করে আসতে পারে। তার পকেট থেকেও পড়তে পারে। দেবীর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'না, ভয় পাবার কিছুই নেই মা। সাত্যকি তো বাসে করেই এসেছে। এইখানেই আমরা বসেছিলুম প্রথমে। সাত্যকির পকেট থেকেই পড়েছে। চলো ভেতরে যাই।'

'বাবা, ওঁর মাথাটা ঝুলছে। সোজা করে দিলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়। তবে ডাক্তার আসার আগে হাত দেব? এ তো অনেকটা খুনের মতোই ঘটনা!'

'কী বলছেন আপনি?'

'কেউ যদি সন্দেহ করে আমরা খুন করেছি। তুমি কী জবাব দেবে? কেমন করে প্রমাণ করবে স্বাভাবিক মৃত্যু! আমরা এখন ডাক্তারের হাতে, পুলিশের হাতে।'

শিবপদর শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। দেবীর কাঁধ চেপে ধরে ফিসফিস করে বললে, 'তোমার ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জটা কোথায় রেখেছ?'

বাইরেটা বিদ্যুতের ঝলকে নীল হয়ে উঠল। আয়না থেকে ছিটকে আসা সেই ক্ষণপ্রভায় শিবপদর মুখের ডানপাশ চমকে চমকে উঠল। দু'চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। শিবপদর ভয় দেখে দেবীও যেন আতঙ্কিত হল।

'ওই তো টেবিলের ওপর সিরিঞ্জের বাক্স। কেন বাবা?'

'শোনো, তুমি এখুনি ওটা বাড়িতে লুকিয়ে রেখে এসো। পুলিশ আসবেই। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করবে। ওটা না থাকাই ভাল। সিরিঞ্জের সঙ্গে খুনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ওরা কার সঙ্গে কী জড়িয়ে ফেলবে, সাবধান হওয়াই ভাল।'

'আপনি কেন বারে বারে খুনের কথা ভাবছেন? এবার আপনি ভয় পেয়েছেন।'

'ভয় পাবার মতোই ব্যাপার দেবী। তুমি এখুনি ওটা তুলে নাও। পুলিশ যদি সার্চ করে বেরিয়ে পড়বে।'

শিবপদর কথায় দেবী কেমন যেন হয়ে গেল। সুস্থ চিন্তা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। বাক্সটা তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল।

শিবপদ উদভ্রান্তের মতো বললে, 'দেবী, আমাকে যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়, তোমরা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িতে এসে উঠবে। এ বাড়ি তোমার।'

দেবী শিবপদর একটা হাত ধরে বললে, 'কেন আপনি যা-তা ভাবছেন বাবা! আমরা থাকতে কে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে? কেন অ্যারেস্ট করবে? দেশে কি আইনকানুন নেই?'

বাইরে থেকে ডাক ভেসে এল, 'শিব, শিব।'

শিব চমকে উঠে বললে, 'দেবী, তুমি পালাও।'

'কেন, পালাব কেন? আমি এখানেই থাকব। কে কী করবে? অসুস্থ মানুষ বন্ধুর বাড়িতে এসে মারা গেছেন। যে-কোনও মানুষ যে-কোনও সময় মারা যেতে পারেন। মৃত্যুর কথা...।'

দেবীর কথা শেষ হল না। কৃষ্ণপদ আর ডাক্তার সামন্ত ঘরে এসে পড়েছে। ডাক্তার সামন্ত বেশ ভারী চেহারার মানুষ। গম্ভীর মুখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মাথায় একটা রেন ক্যাপ। হাতে একটা কালো ব্যাগ। ঘরে ঢুকে চারপাশে একবার সন্দেহের চোখে তাকালেন। কৃষ্ণপদর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই কোথায় আপনার রুগি?'

শিবপদ বললে, 'ওই যে, সামনের ঘরে।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সামন্ত বললেন, 'হরিবল। স্ট্রেঞ্জ ডেথ।'

কৃষ্ণ বললে, 'আমার অনেক কালের বন্ধু। দশ-বারো বছর পরে দুপুরের দিকে আজ হঠাৎ এসে

হাজির। সন্ধের দিকে পেট চেপে ধরে কাতরাতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কি আলসার আছে? বললে, ক্যান্সারও হতে পারে।'

'এ কেসে আমার আর কিছু করার নেই। যখন কাতরাচ্ছিল, তখন ডাকলে কিছু করার চেষ্টা করা যেত।'

'ডেথ সার্টিফিকেট?'

'আমার পেশেন্ট নয়। হঠাৎ ডেথ সার্টিফিকেট দেব কী করে? আমার রিস্ক নেই? প্রফেশানাল এথিক্স-এর বাইরে যাই কী করে? দিনকাল ভাল নয়। আই কান্ট রাইট হিজ ডেথ সার্টিফিকেট।'

'কী হবে তা হলে?'

'কিছু একটা হবে। পুলিশে খবর দিন। তাদের অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'

'এ তো আপনার অ্যাকসিডেন্ট নয়, আত্মহত্যা নয়, মার্ডার নয়, শুধু শুধু থানাপুলিশের পথ দেখাচ্ছেন কেন?'

'আপনারা অত ডেফিনিট হচ্ছেন কী করে? মৃতের পশ্চারটা দেখেছেন? মুখে একটা কাপড় গ্যাগ করা রয়েছে। একটা গেলাস উলটে রয়েছে টেবিলে। মৃত্যুর সময় আপনারা কেউ ছিলেন পাশে?'

কৃষ্ণ শিবপদর দিকে তাকাল, 'কী রে তুই পাশে ছিলি?'

'না।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'আমি দেবীকে ডাকতে গিয়েছিলুম।'

'দেবী কে?'

'এই যে এই মেয়েটি। পাশেই থাকে।'

'বাড়িতে কে ছিল?'

'কেউ না।'

'তবে? ব্যাপারটার জটিলতা বুঝতে পারছেন? দেখে গেলেন বেঁচে আছে। ফিরে এসে দেখলেন পড়ে আছে এই অবস্থায়। ফাঁকা বাড়ি। এনি থিং ক্যান হ্যাপন। কোনও রিস্ক না নিয়ে পুলিশে খবর দিন। পরে বিপদে পড়ে যাবেন। আচ্ছা আমি আসি। আমার চেম্বার একেবারে ভরতি।'

ডক্টর সামন্ত গটগট করে দরজার দিকে এগোলেন। ভদ্রলোক পালাতে চাইছেন। ভিতু ডাক্তার। ঝুঁকি নিতে চান না। জোরে গেট বন্ধের শব্দ হল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রাণী। কারও মুখে কোনও কথা নেই। যেন জলে পড়ে গেছে!

কৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এই একটা দেশ। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মরছে। খুন হচ্ছে। তার বেলায় কিছু নয়। অথচ একটা লোক অসুখে মারা গেল, ভুগছিল দীর্ঘকাল, তাকে নিয়ে যত ঝামেলা। জন্মাবার অধিকার আছে মরার অধিকার নেই। সাত্যকিটা কীরকম বিপদে ফেলে গেল! সারাটা জীবন ওর শুধু ঝামেলা। শেষে আমাদেরও ঝামেলায় ফেলে গেল।'

শিবপদ বললে, 'মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করিসনি কৃষ্ণ। অসহায়, নিরাশ্রয়। এইখানেই ওর জমি কেনা ছিল। কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল!'

দেবী বললে, 'এখন তা হলে কী করবেন? কিছু তো একটা করতে হবে!'

শিবপদ বললে, 'অবশ্যই করতে হবে। দাদা, সাত্যকি এখানে কার কাছে এসে উঠেছিল?'

'ওর এক বোনের কাছে।'

'ঠিকানা জানিস?'

'না।'

'সত্যি। সত্যিই খুব জটিল ব্যাপার। আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।'

দেবী বললে, 'ডেথ সার্টিফিকেট পেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা হলেই আপনারা কি শ্মশানে যেতে পারবেন?'

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ সেটাও ভাববার কথা। আমরা কে? আপনজনদের খবর তো দিতেই হবে।'

দেবী বললে, 'তা হলে সেইটাই আগে ভাবছেন না কেন?'

কৃষ্ণ বললে, 'ভাবব না কেন? ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না মা। শুনেছিলুম বেহালায় ওর দিদির বাড়ি। রাস্তায় নাম জানি না, ঠিকানা জানি না। কোথায় খুঁজব বলতে পারো?'

শিবপদ বললে, 'বুঝলে দাদা, ওইজন্যে মানুষের ছেলেপুলে থাকা দরকার। আমরা কীরকম অসহায় দেখেছ? বাড়িতে একটা ইয়াংম্যান থাকলে এত সমস্যা হত না।'

'আমার না হয় ছেলে নেই, তোমার অমন বুদ্ধিমান রোজগেরে ছেলে থেকেই বা কী লাভ হল? কলা দেখিয়ে সরে পড়ল।'

'তা ঠিক।'

দেবী বললে, 'যে যাই বলুন, আমার আর সহ্য হচ্ছে না, আমি ওঁর মাথাটা তুলে দিয়ে আসছি। পুলিশ ধরলে আমাকে ধরবে।'

'খবরদার না।' শিবপদ লাফিয়ে উঠল, 'তোমার মেয়ের জ্বর। অসুস্থ। তুমি মৃতদেহ ছোঁবে না। আমরা কী করতে আছি? আমি আর কৃষ্ণ!'

কৃষ্ণ বললে, 'আমি ওর পকেট সার্চ করব। চিঠি কাগজপত্র কিছু নিশ্চয় আছে। ওর দিদিকে খবর দিতেই হবে। এ তো বেওয়ারিশ লাশ নয়।'

'মড়া ছুঁলে এই রাতে আপনাদের দু'জনকেই স্নান করতে হবে।'

'আমরা কাল সকালে স্নান করব মা। তুমি কিছু ভেবো না।'

'আপনারা তা হলে খেয়ে নিন।'

কৃষ্ণ বললে, 'আজ আর তুচ্ছ খাওয়ার কথা বোলো না মা। সাত্যকি আমাকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেল।' কৃষ্ণর গলা ধরে এল আবেগে, 'সাত্যকি কেন আজ এসেছিল জানো? এই দশ বছর পরে এত বড় একটা অসুখ চেপে! সাত্যকি আমার উপকার করতে এসেছিল। আমার জন্যে একটা ভাল চাকরি এনেছিল। জানিস শিব, সাংঘাতিক একটা ভাল চাকরি। যে ক'টা ছবি বাড়িতে এখনও ঝুলছে তার জন্যে একজন ভাল ক্রেতার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক পরিকল্পনা নিয়ে ছুটে এসেছিল। আমি বসে বসে নষ্ট হয়ে যাই ও তা চায়নি। আমাকে বললে, কৃষ্ণ, মরতে তো হবেই, আজ হোক কাল হোক, কিন্তু সেই মৃত্যু যেন কাজ করতে করতে হয়। স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেই সরে পড়ল। আমার আর জাগা হল না।'

কৃষ্ণর চোখে জল এসে গেল। মটর পরিমাণ আফিং সেবন করা হয়ে গেছে অনেক আগে। চেতনায় তার প্রভাব নেমে আসছে ধীরে ধীরে। অতীন্দ্রিয় দর্শন হবে এবার, যা হয় প্রতি রাতে। বুঁদ হয়ে রাত কাবার। প্রথমে কৃষ্ণ, পেছন পেছন শিবপদ সাত্যকির মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

শিবপদ বললে, 'দাদা, তুই আর মৃতদেহ ছুঁসনি। আমি বৃষ্টিতে চান করে গেছি, আবার আমাকে চান করতে হবে, আমিই ঠিক করে শুইয়ে দিচ্ছি।'

'তোরা যে কী বলিস। ঘণ্টা দুয়েক আগে সাত্যকি আমাদের পাশে বসে গল্প করছিল, তখন ছুঁলে কিছু হচ্ছিল না, আর এখন ছুঁলেই চান করতে হবে? এ তা হলে কে? দু'ঘণ্টা আগে একেই তো আমরা সাত্যকি বলছিলুম। সাত্যকি চলে গেল! পড়ে রইল অস্পৃশ্য দেহ। প্রাণহীন দেহ তা হলে অপবিত্র! অ্যাঁ, কী বলছিস তোরা? আমি যে সারা জীবন দেহই এঁকে গেলুম রে? মানুষের প্রাণহীন অপবিত্র দেহ! কী হবে আমার?'

শিবপদ বুঝতে পারল দাদা ক্রমশই অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ন'টা। শিব বললে, 'দাদা, তুই চুপ করে দেখ আমি কী করি!'

'আমারও তো একটা কর্তব্য আছে শিবু! চান করতে হবে বলে দূরে সরে যাব? সাত্যকি আমাকে ক্ষমা করবে না। একবার আমি তাকে ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলুম। তারপর এই ও প্রথম এল। এবার সে একেবারেই জগতের বাইরে চলে গেল। সাত্যকি তুমি বড় চালাক। ক্ষমা দিতে চাও না বলে তুমি পালিয়ে গেলে!'

কৃষ্ণর চোখ ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে। শিবপদ দেবীকে ইশারা করল।

দেবী এগিয়ে এসে কৃষ্ণর হাত ধরল, 'জ্যাঠামশাই, আপনি এই চেয়ারে বসুন। আপনাকে আমি সুন্দর একটা গল্প শোনাব।'

'কী গল্প আর শোনাবি মা? আমি তোকে একটা সহজ গল্প শোনাই। শুনবি?'

'নিশ্চয় শুনব।'

দেবী কায়দা করে কৃষ্ণকে চেয়ারে বসাতে পেরেছে। কৃষ্ণ পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বললে, 'শোনো, তোমরাও শোনো। কেন ছটফট করছিস শিবু! শোন, এই দেখ আমার হাতের মুঠো। কী ধরেছি? গল্প। জীবনের গল্প। কী গল্প? দেখ, দেখ, দেখে যা, মুঠো খুলে দিলুম, শূন্য, সব শূন্য। পাখি ছিল। পাখি আর নেই। পাখি ছিল। পাখি আর নেই।'

কৃষ্ণপদ আঙুল নাড়তে লাগল পাখির ডানার মতো। ধীরে ধীরে ঘাড় ঝুঁকে আসছে বুকের দিকে।

॥ পাঁচ ॥

কৃষ্ণপদ বুঁদ হয়ে চেয়ারে বসে আছে। কী পৃথিবী! কে কৃষ্ণ! কে শিব! কে সাত্যকি! মাথায় টমটম শুরু হয়েছে। এইবার কাঁসর-ঘণ্টা বাজবে। একটা পথ খুলে যাবে এখুনি। হলুদ আলোর সরণি। শত শত যাত্রী চলেছে সে পথে। বহু দূরে নীল স্ফটিকের মন্দির।

দেবী বললে, 'বাবা, আমার একটা কথা রাখবেন?'

'বলো মা।'

'আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন।'

'জানি মা, তুমি আমার শরীরের জন্যে চিন্তা করছ। বিশ্বাস করো, আমার একেবারেই খিদে নেই। অবেলায় খেয়েছি। তা ছাড়া যে বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে বাড়িতে হাঁড়ি ফেলে নতুন হাঁড়ি এনে সব শুদ্ধ করে আহারাদির বিধান দিয়েছেন শাস্ত্র। সত্যি কথা বলব মা, বিকেল থেকে খুব চা খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।'

'চা! এতক্ষণ আমাকে বলেননি কেন? বসুন আপনি। আমি এখুনি চা করে আনছি। জ্যাঠাবাবু চা খাবেন?'

'না, ও আর এখন চা খাবে না।'

কৃষ্ণ ঘুমঘুম চোখে বললে, 'খাব। একটু বেশি দুধ আর চিনি দিয়ে।'

'দাদা, দাদা।' শিবপদর ডাকে কৃষ্ণর চটকা ভাঙল।

'বল।'

'আমি সাত্যকির পকেটে হাত দিতে পারি? ওর দিদির ঠিকানাটা যদি পাওয়া যায়।'

'আমাদের আর কিছু করার নেই। ও যেমন আছে সেইরকম থাক না। বিরক্ত করে কী আর হবে?'

শিবপদ জোরে ডাকল, 'দাদা! কী বলছিস কী! কিছু একটা করতে হবে তো!'

'করব। করব। সব আমি করব। তুই কিছু ভাবিসনি। আমার বাড়িটাকে সাত্যকির নামে একটা স্মৃতিমন্দির বানাব। আবার আমি তুলি ধরব শিবু। সাত্যকির একটা পোর্ট্রেট আঁকব লাইফ সাইজ। কিচ্ছু ভাবিসনি তুই। সাত্যকি আমার শত্রু ছিল, বন্ধু হতে গিয়ে মারা গেল। ওকে ঘুমোতে দে। জাগাসনি। জাগাসনি। জাগালেই বড় যন্ত্রণা।'

শিবপদ হাল ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। ঘোর না কাটলে কাজের কথা কিছু হবে না। এ এক আচ্ছা ফাঁদে ফেললে ভগবান! সেই থানা-পুলিশ? সৎকারের ব্যবস্থাই বা কীভাবে করা যায়? খাট চাই, ফুল চাই। কাঁধ দেবার লোক চাই চারজন।

চায়ের জলে ফুট ধরেছে। দেবী দুধের পাত্রের ঢাকা খুলে, 'যাঃ' করে উঠল। দুধ ছানা কেটে বসে আছে। দুধ এভাবে ফেলে রাখে? দুপুরে শেষ আঁচে আর একবার গরম করে রাখতে হয়। বেটাছেলে এতসব খুঁটিনাটি জানবেই বা কী করে?

জল নামিয়ে রেখে দেবী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'বাবা!'

শিবপদ চমকে উঠেছে, 'ও হ্যাঁ, তুমি! বলো। কী হল?'

'আমি চট করে বাড়ি থেকে একটু দুধ নিয়ে আসি।'

'কেন? ও ঘরে এক ডেকচি দুধ চাপা আছে মা।'

'কেটে ছানা হয়ে গেছে।'

'কেটে গেছে? তুমি র চা করো। এই দুর্যোগে তোমাকে আর যেতে হবে না।'

'তেমন বৃষ্টি আর নেই। গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। আমি যাব আর আসব।'

'একা তোমাকে আমি ছাড়ব না। চলো, তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

'আপনি অকারণে ভয় পাচ্ছেন। আমি চাকরি করা মেয়ে। কত রাতবিরেতে আমাকে ফিরতে হয়। তা ছাড়া মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি।'

'তা হলে টর্চ আর ছাতা, দুটোই নিয়ে যাও সঙ্গে।'

'ছাতা লাগবে না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'যা ভাল বোঝো করো।'

'আপনি আমার ওপর রাগ করলেন?'

'না মা, রাগ করব কেন? আমার বয়েস হচ্ছে তো, তাই ভয় ভয় করে সবেতেই।'

'পাশেই বাড়ি, এমন কিছু দূরে নয়। ভয়ের কী আছে বাবা!'

'যাই হোক, সাবধানে যাও। আসতে দেরি কোরো না। তা হলে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ব।'

'একবার উঠে এসে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে যান।'

গেটের বাইরে একটু জল জমেছে। দেবীর পায়ে জুতো নেই। ছোট্ট একটা লাফ মেরে রাস্তায় পড়ল। বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে পরিষ্কার তকতকে হয়ে গেছে। খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এলোমেলো বাতাস। কেমন যেন ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ লাগছে নিজেকে। মাঝে মাঝে পৃথিবীটা বড় সুন্দর হয়ে যায়! দেবী ইচ্ছে করে একবার টর্চ জ্বালল। অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রেখা ছুটে গেল সামনে। আলোর লম্বা বাহুতে ফিনকি-ফিনকি বৃষ্টি জরির জাল বুনে চলেছে। আশপাশের সব বাড়িরই জানলা-দরজা বন্ধ। ফুটোফাটা দিয়ে অল্প-স্বল্প আলো ছিটকে বেরিয়ে আসছে। নোলকপরা নাকের মতো। জনপ্রাণী নেই রাস্তায়। দমকা বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। একটু ভয় ভয়ও করছে। সাহস দিতে হচ্ছে নিজেকে, ভয় কীসের। ভয় মনে করলেই ভয়। খাট থেকে ঝুলে থাকা মৃত মানুষটির মুখ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো মনে পড়ে যাচ্ছে।

পেছনে একটা সপ্ সপ্ আওয়াজ হল। বেশ ভারী পোশাকের প্রান্তে প্রান্তে ঘষা লাগলে যেমন

হয়। দেবীর মেরুদণ্ডে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। পথ সকলের। যে কেউ আসতে পারে। ভয় পাবার কোনও মানে হয় না। দেবী ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত পা চালাল। বাড়ির দরজায় প্রায় এসে পড়েছে। দম বন্ধ করে হাঁটছে। পেছনের সপসপ আওয়াজও দ্রুত হল। আর কয়েক গজ, তবু দেবীর পা যেন চলছে না। স্বপ্নে বাঘে তাড়া করলে এই অবস্থা হয়।

দেবীর কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। হাত পড়ামাত্রই দেবী চিৎকার করে উঠল। যত জোরে চিৎকার করেছিল তত জোরে শব্দ বেরোল না। ভয়ে গলার শব্দ গলাতেই থেকে গেল। বাতাসে সেইটুকু শব্দও চাপা পড়ে গেল। পা চললেও দেহ এগোচ্ছে না। কাঁধের ওপর সেই হাত চেপে বসছে ধীরে ধীরে।

কানের কাছে খসখসে একটা গলা, 'এত ভয় পাচ্ছ কেন দেবী? আমি আমি। আমি শশধর।'

মুখে ভক ভক করছে মদের গন্ধ। ঠিক যে পরিমাণে ভয় পেয়েছিল দেবী, সেই পরিমাণে রাগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল শশধরের গালে।

মাতাল আচমকা চড় খেলে যা হয়। শশধর ধরাধরা গলায় বললে, 'তুমি আমাকে চড় মারলে দেবী! আমি প্রাণেশের বন্ধু। স্বামীর বন্ধু স্বামীর মতোই। তুমি আমাকে মারলে?'

'আজ চড় মেরেছি। এরপর লাথি মারব। আপনার মতো ইতর অসভ্য জানোয়ারের আর কোনও দাওয়াই নেই।'

'তুমি আমাকে লাথি মারবে! তোমার ওই সুন্দর পায়ে! আহা, ওইটাই তো আমি চাই। তোমার পায়েই তো আমি পড়ে থাকতে চাই? তুমি আজই মারো। তুমি এখুনি মারো। মারো মাইরি, ক্যাঁত ক্যাঁত করে মারো।' শশধরের গায়ে রেনকোট। মাথায় টুপি। জলে ভিজে চকচক করছে। টুপির অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও এ মুখের চেহারা দেবীর জানা। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো। অদৃশ্য একটা জিভ সামনে ঝুলছে। লেহন করতে চায়। ফোঁটা ফোঁটা লালা ঝরছে।

শশধর ক্রমশই দেবীর দিকে এগিয়ে আসছে।

'আপনি পথ ছাড়ুন।'

'পথ? তোমার পথ তো আমার বুকের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।'

'আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।'

'কেউ আসবে না। তুমি ভিজছ! তোমার অসুখ করবে। এই রেনকোটটা তোমাকে পরিয়ে দিই।'

শশধর দু'হাত দিয়ে রেনকোট খোলার চেষ্টা করতে দেবী একটু ঝুল কেটে শিপবদর বাড়ির দিকে দৌড় দিল। ভাগ্যিস পায়ে জুতো নেই। পেছনে ছুটে আসছে মাতাল শশধর। দেবীর পায়ে বল ফিরে এসেছে। লালসার হাত এড়াতে সে এখন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। পুরুষের লোভনীয় খাদ্য হয়ে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। তার কাছে মুক্তির অর্থ দারিদ্র্য থেকে যন্ত্রণা থেকে দুঃখ থেকে মুক্তি নয়, কামনার জগৎ থেকে মুক্তি। দেবী একটা নাম মাত্র। আসলে সে একটা সজ্জিত দেহ। তার মনের খবরে তার স্বপ্নের খবরে কারু কোনও প্রয়োজন নেই। দেহের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষণ বসবাসই লোভীদের একমাত্র লক্ষ্য।

শিবপদ চমকে উঠল। দরজায় উপর্যুপরি জোর ধাক্কা। দরজা খুলতেই ঝোড়ো বাতাসের মতো দেবী ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে পিঠ রেখে হাঁপাতে লাগল।

শিবপদ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোমার? কুকুর?'

কথা বলতে পারছে না দেবী। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'হ্যাঁ।'

'তখনই তোমাকে বারণ করেছিলুম, যেয়ো না। গুরুজনের কথা শুনতে হয়। কামড়েছে?'

দেবী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

'কামড়ালে কী হত?'

দেবী হেলিয়ে রাখা শরীর সোজা করে বললে, 'র চা-ই হোক। কী আর করা যাবে!'

রেনকোট মোড়া শশধর কিছুটা পথ দৌড়ে এসেছিল ধরবার জন্যে। পারেনি। ডানদিকের গলি ধরে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। কোথায় চলেছে জানা নেই। তার নিজের সংসার চুরমার হয়ে গেছে। স্বপ্নের পাখিরা সব উড়ে গেছে। শশধর বুঝতে পারে সে অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। এ অসুখের একমাত্র ওষুধ মৃত্যু। প্যাঁচ মেরে মেরে রাস্তা এগিয়ে গেছে টিনখোলা বস্তির দিকে। পথ ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। দু'পাশের আবর্জনা জলে ধুয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে। শশধর চলেছে।

চায়ের লিকার ছাঁকতে ছাঁকতে দেবীর মনে হল, এ পাড়া, এ বাড়ি তাকে ছাড়তে হবে। চিল যখন ছোঁ মারে কুটো না নিয়ে ওড়ে না। কতদিন ঠেকাবে? কত আর সতর্ক থাকা যায়? খাদ্যের যদি প্রাণ থাকত খাদকের সামনে তার অবস্থা কী হত! অপেক্ষায় থাকা। কখন দু'আঙুলে তুলে মুখে পুরে দেয়। নাঃ, বহু দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। শশধর আজকাল আর এক কাণ্ড জুড়েছে। মাঝরাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় ডাকতে থাকে, দেবী, দেবী। মাঝে মাঝে তোতা চমকে জেগে ওঠে, কে মা, কে মা? দেবী চেপে ধরে শুইয়ে দেয়, কেউ না, তুই চুপ করে শো। বাতাসের শব্দ।

একটা কিছু কেলেঙ্কারি হয়ে গেলে, মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে শিবপদ বললে, 'বাঃ বেশ হয়েছে। তুমি দুধ দুধ করে ব্যস্ত হচ্ছিলে, ঠিক মতো করতে পারলে র চা-ও বেশ ভাল লাগে।'

কৃষ্ণপদ নীরবে মাথা নাড়ল। দুধ ছাড়া চা সেও খাচ্ছে। তার চারপাশে সেই হলুদ আলোর জগৎ তৈরি হয়েছে। যেন অপেরার রাত। বিচিত্র পোশাক পরা লোকজন চারপাশে ঘুরছে। অজস্র চরিত্র।

শিবপদ বললে, 'তুমি চা খাবে না বউমা?

এত রাতে চা খাব?'

'নিশ্চয় খাবে। বৃষ্টিতে এত ভিজলে! আছে তো?'

'আপনি নির্ভয়ে খান। অনেক লিকার আছে।'

শিবপদ কাপ রেখে এসে সাত্যকির সামনে দাঁড়াল। আর না, যা করার তা করতে হবে। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। কী কী করতে হবে ভেবে নিল মনে মনে। চোখ খুলে সামনে ঝুঁকেই আঁতকে উঠল। বিছানার সাদা চাদর টকটক করছে লাল। সাত্যকির জামার একটা পাশ রক্তে জবজব করছে।

মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। রক্ত সহ্য করার জন্যে অন্য ধরনের স্নায়ুর প্রয়োজন। এত রক্ত এল কোথা থেকে? এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ করল, মুখের রুমালও লাল। এ খুন নয় তো?

শিবপদ টলছে। শিবপদর অবস্থা দেখে দেবী এগিয়ে এল, 'সরুন, আমি দেখছি।'

শিবপদ ফিসফিস করে বললে, 'এত রক্ত!'

'হ্যাঁ রক্ত। লিভার ফেটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এরকম মৃত্যু আগেও আমি দেখেছি।'

কৃষ্ণপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। দু'জনের পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী হয়েছে বল তো! তোরা অমন ভয় পাচ্ছিস কেন?' উত্তরের অপেক্ষা না করে, দু'হাতে সাত্যকির মাথাটা তুলে দিল খাটের ওপর।

শিবপদ হাঁ হাঁ করে উঠল, 'তুই ছুঁলি কেন? তুই ছুঁলি কেন?'

কৃষ্ণ ঘোরে আছে। কারু কথাই কানে ঢুকছে না। খাটের বাজু থেকে সাত্যকির হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। মৃত মানুষের মুঠো ছাড়ানো যায় না। যাবার আগে পৃথিবীকে বড় শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে চায়। কৃষ্ণ সাত্যকির চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে দিল। এমন স্থির দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। জীবিতের প্রতি মৃতের তিরস্কার।

কৃষ্ণ আপন মনে কাজ করে চলেছে। এইবার সাত্যকির বুকপকেট থেকে একগাদা কাগজপত্র টেনে বের করল।

'নে ধর। দেখ কী আছে?'

শিব হাত বাড়িয়ে কাগজ নিল। শুধু কাগজ নয়, কিছু নোটও আছে। কৃষ্ণ এক-এক করে সব

পকেট খালি করে ফেলল। প্যান্টের পাশ পকেট থেকে একগোছা চাবি বেরোল। কোথায় তালা, আর কোথায় চাবি? আফিঙের ঘোরে থাকলেও কৃষ্ণর এই কথা মনে হল। আর মনে হতেই হুঁ হুঁ করে একবার হাসল।

শিব বললে, 'কী, কী পেলে? পেলে কিছু?'

দু'আঙুলে চাবির গোছা তুলে কৃষ্ণ চোখের সামনে দোলাতে লাগল।

'চাবি? সর্বনাশ, কোথাকার চাবি? এ তো দেখছি আর এক বিপদ হল।'

খাট ছেড়ে কৃষ্ণ মেঝেতে নেমে এল। দু'ভাই মুখোমুখি বসে কাগজ বাছতে লাগল। কোনও এক বড় দোকান থেকে প্যাকেট প্যাকেট ধূপ কিনেছিল সাত্যকি। ক্যাশমেমো। রেকর্ড কিনেছিল। শাড়ি কিনেছিল। ওষুধ কিনেছিল। কাকে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স করেছে, কাঁচা রসিদ। সবই বেরোচ্ছে, এমন কিছু বেরোচ্ছে না, যা থেকে ঠিকানা জানা যায়। এক মহাপুরুষের ছবি বেরোল। স্মিত হাসি মুখে। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। ছোট্ট একটা চিরকুটে সাত্যকি কিছু দেশের নাম লিখে রেখেছে— আফ্রিকা, স্পেন, মাদাগাস্কার, ভূপাল, জয়রামবাটি।

দেবীর দিকে তাকিয়ে শিব বললে, 'নাঃ কিছুই পাওয়া গেল না। আজেবাজে সব কাগজ। একের পর এক ক্যাশমেমো।'

'ক্যাশমেমো থেকে দোকান আর দোকানের ঠিকানা পাচ্ছেন। সেই থেকে কিছু আন্দাজ করা যায় না বাবা?'

শিব বললে, 'বাঃ এটা তো তুমি ভাল বলেছ। এ তো আমার মাথায় আসেনি।'

দেবী এগিয়ে এসে সামনে বসল। চৌরঙ্গী, চৌরঙ্গী। শিবপদ ক্যাশমেমো এলাকা অনুসারে ভাগ ভাগ করছে। ভবানীপুর, রাসবিহারী, রাসবিহারী।

দেবী বললে, 'ওই ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমোটা দেখুন তো বাবা। মানুষ সাধারণত পাড়ার দোকান থেকেই ওষুধ কেনে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ। লেক গার্ডেনস।'

'তা হলে ধরে নিতে পারেন, সাত্যকিবাবু লেক গার্ডেনসেরই কোথাও থাকতেন। নিশ্চিত নয়। সম্ভাবনা আছে।'

ক্যাশমেমো হাতে নিয়ে শিবপদ কিছুক্ষণ বসে রইল অন্যমনস্ক। দেবীর দিকে তাকিয়ে আছে চোখাচোখি কিন্তু দেখছে না।

'সবই তো হল দেবী, কিন্তু কে এখন খোঁজাখুঁজি করে। আমি নিজে তো কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে গেছি।'

দেবীর হঠাৎ মনে হল, লোলুপ একটি মানুষ পথের বাঁকে এই দুর্যোগের রাতে তারই অপেক্ষায় ওত পেতে বসে আছে। লোকটাকে সে ইচ্ছে করলেই ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারে। চরিত্রহীন কিন্তু করিতকর্মা। এখুনি তাকে কাজে লাগানো যায়। যা বলবে তাই শুনবে। এক পায়ে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তাই থাকবে। তারপর।

তারপরের কথা ভেবে দেবীর চিন্তা থমকে গেল।

শিবপদ বললে, 'একটা কাজ করি।'

'কী বাবা?'

'এ পাড়ায় আমার এক ছাত্র আছে, জ্ঞানেশ। গাড়ি আছে। ফোন আছে। তার কাছে একবার যাই।'

'জ্ঞানেশবাবুকে আমি চিনি বাবা। ওঁর সবই ভাল তবে একটু বেশি মকারান্ত।'

'সে আর কী করা যাবে মা। ওই তো এখনকার যুগধর্ম। নাঃ, কী যে করা যায়! তোমার অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তোমার চুল ভিজে। জামা ভিজে। অসুখে না পড়ে যাও!'

'সে তো আপনারও ভিজে। আমার তো তবু পাতলা জামা গায়ের তাপে শুকিয়ে এসেছে।'

'তুমি এবার বরং বাড়ি যাও। মেয়েটা একা রয়েছে।'

'ওর একা থাকা অভ্যাস আছে। কিছু হবে না। জ্ঞানেশবাবুর কাছে যদি যেতেই হয় তো চলে যান। আমি যাব আপনার সঙ্গে?'

'না মা, আমি একাই পারব। তোমার কোনও ভয় নেই। চোখে একটু কম দেখি, এই যা অসুবিধে, শরীরটা এখনও তেমন অকেজো হয়ে যায়নি।'

'সাবধানে রাস্তা দেখে যাবেন।'

কৃষ্ণপদ এতক্ষণ ঝিম মেরে বসে ছিল। এইবার নড়েচড়ে উঠল, 'তুই কি আমাকে একেবারেই অপদার্থ ভাবলি শিব! চল, দুজনে একসঙ্গে যাই।'

'একসঙ্গে দু'জনে গেলে চলবে না দাদা। বাড়ি পাহারা দেবে কে? দেবীকে একা রেখে যাওয়া চলে না।'

একা থাকার আশঙ্কায় দেবী মনে মনে আঁতকে উঠল। একটু আগের কথা মনে পড়ল। জীবিত মৃত সকলকেই ইদানীং তার ভয় করে।

কৃষ্ণপদ বললে, 'তা হলে আমি যেমন আছি তেমনই থাকি।'

শিবপদ রাস্তায় নামল। চোখ সওয়া অন্ধকার। মাথার ওপর দই-সাদা আকাশ। এ যেন বন্যার পূর্বাভাস। এ বছর খুব খারাপ যাবে। জ্যোতিষীরা এক বাক্যে সেই কথাই বলছেন। শিবপদ চমকে উঠল। আপাদমস্তক রেনকোট ঢাকা কে একজন দাঁড়িয়ে। পথের পাশে, পাঁচিলের ধারে। চোখ দুটো ক্ষুধার্ত পশুর মতো জ্বলজ্বল করছে। শিবপদ আর একটু হলেই বলে ফেলছিল, 'কে, কে ওখানে?' নিজেকে সামলে নিল। একবার মনে হল চোখের ভুল। একবার মনে হল ভৌতিক রাতে প্রেতের ছায়া। মন ভাবলেও পা সচল ছিল। জায়গাটা পেরিয়ে চলে এল। সামনেই বড় রাস্তা। দোকানপাট। ভেজা গাড়ির আনাগোনা এপাশে ওপাশে। মনের সাহস ফিরে এল। গত কয়েক ঘণ্টা সে যেন কবরে শুয়ে ছিল।

খানাখন্দে ভরা অন্ধকার রাস্তা। জল জমে আছে। শিবপদ কোনও কিছুই গ্রাহ্য করছে না। এদেশে বিনা অশান্তিতে বাস করতে হলে নিজেকে প্যাটন-ট্যাঙ্ক ভাবতে হবে। সারদা টেলারিং-এর পাশেই জ্ঞানেশের বাড়ি। নীচের তলায় ভাড়াটে। দোতলায় জ্ঞানেশ। বাইরের ঘেরা বারান্দায় এক গাদা শাড়ি জামাকাপড় ঝুলছে। প্যাসেজে গোটা দুই কুকুর বৃষ্টির ভয়ে আস্তানা নিয়েছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কম পাওয়ারের একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। ভাড়াটেরা দোরতাড়া বন্ধ করে বসে আছে। পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে কিছু একটা কষা হচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধে শিবপদর খালি পেট পাক মেরে উঠছে।

সিঁড়ির ওপর দোতলার দরজা বন্ধ। শিবপদ কলিং বেল টিপল। বেশ মিঠে একটা আওয়াজ হল ভিতরে। তেরো-চোদ্দো বছরের ময়লা ময়লা ফ্রকপরা একটা মেয়ে দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়াল।

'জ্ঞানেশ আছে?'

ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ ঝনঝন করে উঠল, 'এত রাতে কে আবার এল। লোক আসার আর সময় পেল না। চব্বিশ ঘণ্টা বেল যেন বেজেই আছে। দেখো তোমাকে কে ডাকছে।'

মুখে বাঁকা করে লাগানো সিগারেট। পরনে চেক চেক লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি, ঢুলুঢুলু চোখ। জ্ঞানেশ এসে দাঁড়াল, 'কে? কাকে চাই?'

'আমি শিবপদ। তোমার মাস্টারমশাই।'

'মাস্টারমশাই?' জ্ঞানেশ সিগারেট পেছনে লুকোল। 'কী ব্যাপার স্যার? এত রাতে?' জ্ঞানেশের শরীরের চারপাশ দিয়ে লিকলিক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। যেন আগুন ধরে গেছে।

॥ ছয় ॥

এই হল কলকাতার সবচেয়ে বিশিষ্ট এলাকা। ধনী মানুষের বসবাস। মসৃণ রাস্তা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পড়ে আছে। খোঁড়াখুঁড়ি করার আগে কর্তৃপক্ষকে দু'বার চিন্তা করতে হয়। বিলিতি গাড়ি অসন্তুষ্ট হবে কি না! সারা রাত পথের দু'পাশে আলো জ্বলে পরিমিত তেজে। আলোতে অন্ধকারে মিশে কোমল একটা ব্যাপার। যেন স্বপ্নমাখা রাত। কংক্রিট আর সবুজের বিলিব্যবস্থায় এমন এক হিসেব, পরিবেশ যেন আহত না হয়। কোটিপতির বাগানবাড়ি, গাড়িবারান্দায় ফানুসের মতো গোল গোল আলো, মাঝারি উচ্চতায় উইপিং উইলোর সারি। নুড়ি ঢালা গাড়ি-পথ। মাঝে মাঝে আকাশছোঁয়া আধুনিক বহুতল। সার সার থামের ঊর্ধ্ববাহুর ওপর উচ্চবিত্ত সুখী মানুষের বসবাসের আয়োজন। একতলায় শুধু গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। অটোমেটিক লিফট প্রয়োজনে ওঠানামা করে নিঃশব্দ বাতাসের মতো। গোলমাল নেই, বাজারি হইচই নেই। রাতভর লেড়ি কুত্তার আর্তনাদ নেই। দিনভর রকবাজদের খিস্তিখেউড় নেই। বিকেলে স্বাস্থ্যবতী আয়ারা ঝকঝকে প্যারাম্বুলেটারে ফুটবলের মতো ফুটফুটে শিশুদের নীচের বিশাল বাঁধানো চাতালে হাওয়া খাওয়াতে নামায়। যাদের কান্নাটাও দিশি খোকাদের মতো নয়। অনেকটা আমেরিকান জ্যাজের মতো।

ষোলো তলা বিশাল একটি বাড়ির নাম 'সুভদ্রা'। খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। আর একটু উঠলেই মেঘ ধরতে পারত। সেই বাড়ির অষ্টম তলের একটি অ্যাপার্টমেন্ট। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সাজানো-গোছানো। অনেকটা সিনেমা সেটের মতো। অনেক নীচে পড়ে থাকা নোংরা বিষণ্ণ কলকাতাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। পশ্চিমে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বিশাল জানলা। কাচ মোড়া। সেই ফ্রেমে ধরা পড়েছে কলকাতার ডক এলাকা। আলকাতরার মতো কালো আকাশের তলায় ফুটে আছে দীপমালা। অসংখ্য জাহাজের মাস্তুলের মাথায় লাল আলোর সাবধানী চোখ।

পরিষ্কার পাজামা আর হ্যান্ডলুমের বুক খোলা পাঞ্জাবি পরে অমিতাভ আয়েশ করে বসে আছে। কোলের ওপর বুক চিতিয়ে পড়ে আছে ইংরেজি ম্যাগাজিন। পড়ার চেষ্টা করলেও পড়তে পারছে না। হঠাৎ বড় উঁচুতে উঠে এসেছে। হাত বাড়ালেই আকাশ। সকালে অবাক হয়ে দেখছিল কাচের জানলার কোল ঘেঁষে চিল উড়ছে। এখন দেখছে দূরে বহু দূরে গঙ্গার বুকে আলোর টিপ। দৃষ্টি এতদিনে অবারিত হল। বেশ একটা সুখ সুখ ভাবের উষ্ণ আমেজ শীতের সকালে গরমজলে স্নান করার অনুভূতির মতো দেহকে জড়িয়ে ধরেছে। আর কী চাই! ভাল চাকরি। বাধ্য সুন্দরী স্ত্রী। আকাশের গায়ে ভাসমান নীড়। আর কী চাই অমিত!

অমিতাভ প্রায় ছ'ফুট লম্বা। শরীর নিয়ে কোনও দুঃখ নেই। মাথায় এক মাথা চুল। টাকের সামান্যতম আভাস নেই। চিরুনি যত জোরেই চালাক একটাও চুল উঠে আসে না দাড়ায়। অনেকেই বলে, এমন চেহারায় সিনেমার হিরো হওয়া যায়। অমিতাভর মাঝে মাঝে মনে হয়, এ জীবন না স্বপ্ন! এত সব এক জীবনে পাওয়া সহজ!

'খাবে এসো।' অমিতাভর স্ত্রী তনু খাবার জায়গা থেকে মৃদু গলায় ডাকল।

অমিতাভ ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীরটাকে পেছনে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার জড়তা কাটাল। আকাশের অনেক নিচু দিয়ে ধোঁয়াটে চেহারার বদমাইশ একটুকরো মেঘ ভেসে চলেছে। আবার বৃষ্টি হবে।

সর্বত্র এমন ব্যবস্থায় আলো লাগানো হয়েছে, কোথাও আলোর অসভ্যতা নেই। সেতারির পাকা হাতের ঝালার মতো চারপাশে আলোর রিমঝিম। ছায়া পড়ার উপায় নেই। অমিতাভ ধীর পায়ে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ডিম্বাকৃতির ওয়ালনাট রঙের বিরাট টেবিল। একসঙ্গে আট-দশজন এঁটে যাবে।

অমিতাভ বসতে বসতে বললে, 'দিন দুই একটু কষ্ট করো। ভাল একজন বাবুর্চি আসছে। তখন তোমার কমপ্লিট রিলিফ।'

'একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'কীরকম?'

'বাবুর্চি, খানা, খানসামা, এসব তো বড়লোকি ব্যাপার।'

'তুমি কি ভাবো আমরা ছোটলোক!'

খুব একটা রসিকতা হল ভেবে অমিতাভ শব্দ করে হাসল। তনু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। ম্লান মুখে খাবার সাজাতে লাগল।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো! মাথা ধরেছে আবার?' অমিতাভ প্রশ্ন করল।

অমিতাভর প্রশ্ন সাবধানে এড়িয়ে গেল তনু। বছর দুয়েক হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। তনু বুঝে গেছে, লোকটি ভীষণ স্বার্থপর। নিজেরটি ছাড়া কারু কিছু বোঝে না। বুঝতে চায় না। বোঝার ভান করে মাত্র। উত্তরে তনু বললে, 'তুমি আর মাংস খাবে?'

'না মাংস চাই না। একটু ঝোল দাও। তুমি বসবে না?'

'পরে। আমার তেমন খিদে নেই।

'তোমার সত্যিই কী হয়েছে বলো তো। সকাল থেকে মুখ গোমড়া করে আছ।'

'কী আবার হবে! এত সুখে কারু কিছু হতে পারে, না হওয়া উচিত!'

'তার মানে? তোমার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটু খোঁচা রয়েছে?'

'কী আশ্চর্য! খোঁচা থাকবে কেন? একজন মানুষের যা যা পাওয়া উচিত, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। এর জন্যে আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'তুমি খাবে না কেন?'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমার সময় হলে ঠিকই খাব।'

'তুমি সকালেও কিছু খাওনি। তোমার এই শরীরে উপবাসের কী ফল হতে পারে জানো? না সে বোধ-বুদ্ধিটুকুও লোপ পেয়েছে?'

'আমার কোনও কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন করছে না?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন। সবদিন সকলের সমান খিদে থাকে?'

'তনু, তুমি আমাকে নির্বোধ ভেবো না। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আসায় তুমি অনশন করে আমাকে জব্দ করতে চাইছ। একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। আমি কী এমন অন্যায় করেছি যে তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলছ না!'

'আমি তোমার সঙ্গে বাজে কোনও তর্কে যেতে চাই না। খাচ্ছ খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে বলছিলে শুয়ে পড়ো।'

'আমার প্রশ্নের জবাব না পেলে আমিও খাব না।'

'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা গরম করছ! তুমিই তো বলো, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'আমি বলব কেন? ওটা বহুকালের প্রবাদ। মাঝেমধ্যে স্মরণ করি।'

'স্মরণ করো না। অনুসরণ করো। ওইটাই তোমার জীবনের নীতি!'

অমিতাভ খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল, 'তুমি এত বড় একটা কথা আচমকা বলতে পারলে?'

'হ্যাঁ পারলুম। দু'বছরে তোমার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে। তুমি কী তা তুমি নিজেও জানো ভাল করে। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না। সেই বৃদ্ধ মানুষটির কথা একবারও ভেবেছ?'

'কোন বৃদ্ধ মানুষ?'

'এই তো। এই তো তোমার স্বরূপ। কোন বৃদ্ধ তাই তুমি বুঝতে পারছ না!'

'আমার বাবার কথা বলছ?'

'তা ছাড়া কার কথা বলব। আপাতত আমাদের পৃথিবীতে একজনই বৃদ্ধ আছেন যাঁর কথা আমাদের ভাবা উচিত।'

'তোমার কথা শুনে আমার কী বলতে ইচ্ছে করছে জানো? একটু অপ্রিয় কথা, তবু বলি, মা'র চেয়ে মাসির দরদ বেশি। আমার বাবা, ভেবে মরছ তুমি? তোমার এই ভাবনা কতটা লোক দেখানো আর কতটা আসল বলা শক্ত।'

তনু উঠে চলে গেল। প্রথম সন্তানসম্ভবা মহিলার নানারকম মানসিক বিক্রিয়া হয়। গত কয়েক মাস ধরেই অমিতাভকে তার অসহ্য লাগছিল। তার কথাবার্তা, চালচলন, গায়ের গন্ধ, চোখের ভঙ্গি, চেহারা, সমস্ত কিছু অসহনীয় মনে হচ্ছিল। তার হঠাৎ এই চলে আসা তনুকে সহ্যসীমার শেষপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। শিক্ষিত স্বার্থপর। ভোগী। খুব কাছে এলে গা ঘিনঘিন করে। নিজেকে অশুচি বলে মনে হয়।

তনু পশ্চিমের ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই স্বার্থের জগৎ তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। চোদ্দো বছর আগে বাবা মারা গেছেন। ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন। ডাক্তার হিসেবে ভীষণ সুনাম ছিল। দুঃস্থদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। এমনকী পথ্যের পয়সা সময় সময় নিজের পকেট থেকে দিতেন। সকলে নাম শুনলে এখনও দেবতা বলে হাত তুলে নমস্কার করে। মা অধ্যাপিকা। এখনও অধ্যাপনা করেন। আর বছর দুই হয়তো করবেন। অবসরের দিন এগিয়ে আসছে। পিতামাতার কাছে তনু স্বার্থপরতার শিক্ষা পায়নি কখনও। তাকে নিয়ে আদরের বাড়াবাড়ি হয়নি কখনও। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় লেগেই থাকত বাড়িতে। কত লোক আসত বাবার কাছে সাহায্য নিতে। স্কুলের বই কেনার টাকা। মেয়ের বিয়ে। বিধবার সংসার চলে না। দু'হাতে দান করতে করতে, নির্বিচারে চিকিৎসা করতে করতে হঠাৎ বাবা একদিন চলে গেলেন। 'আমরা অনাথ হয়ে গেলুম' বলে কত মানুষ যে সেদিন চোখের জল ফেলেছিল! সংকীর্ণ কোনও মানুষকেই তনুর আর ভাল লাগে না। আকাশে বসবাসের পর চোরকুঠুরিতে মন হাঁপিয়ে ওঠে।

তনু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার অনেক নীচে রাস্তা। ফিতের মতো এঁকে বেঁকে খেলাঘরের মতো জনবসতির ভেতর দিয়ে খেলতে খেলতে এগিয়ে গেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি। বিমর্ষ আকাশ। সেই সকাল থেকেই শিবপদর কথা ভীষণ মনে পড়ছে। বারে বারে ভেসে উঠছে তাঁর মুখ। যিশুখ্রিস্টের মতো স্তব্ধ, গম্ভীর। দুটি চোখে অদ্ভুত এক মায়া।

কী করছেন তিনি এখন! সেই নির্জন বাড়িতে।

দুপুরে খাওয়া কি হয়েছিল? রাতের খাওয়া! বিকেলের চা!

ওই মুখে তনু তার পিতার মুখের আদল খুঁজে পায়। কণ্ঠস্বর, স্বভাব, সবেতেই মিল আছে। তনুর ভেতরটা সবসময় ছটফট করছে। উপায় থাকলে এখুনি ছুটে যেত। এরই মাঝে একদিন বলেছিলেন, বউমা একদিন খিচুড়ি কোরো তো। তোমার হাতের খিচুড়ি খেলে মনে হয় ভোগ খাচ্ছি। সেই খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবার অবকাশ ওই লোভী লোকটার জন্যে আর পাওয়া গেল না।

শীতের দুপুরে বারান্দায় রোদে বসে কত পুরনো দিনের কথা হত। অমিতাভর ছেলেবেলার কথা। শাশুড়ির কথা। সেকালের চরিত্রবান আদর্শপ্রেমী মানুষদের আত্মত্যাগের কথা। মাঝে মধ্যে পড়াতে বসতেন। বলতেন, বউমা এম এ-টা দিয়ে দাও।

জীবনে এত ভালবাসা সে আর কার কাছে পেয়েছে! গরম জিলিপি দেখেছেন। নিয়ে এসেছেন। এই নাও বউমা, বড় সুস্বাদু জিনিস। সহজে মেলে না। কোথায় গরম বোঁদে তৈরি হচ্ছে, বউমার কথা মনে পড়ে গেছে। বেশি পরিশ্রমে পাছে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিজেই কত কাজ করে নিতেন। সেই মানুষকে এক কথায় ছেড়ে চলে এল। এই না হলে শিক্ষিত ছেলে!

দমকা বাতাসে তনুর চুল উড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এসে গায়ে লাগছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। তাকাতে তাকাতে মাথা ঝিমঝিম করছে। নেশা ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মারি এক লাফ। কাগজ কুচির মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে রাস্তায়।

সিগারেটের গন্ধে তনু সচেতন হল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অমিতাভ বললে, 'কী, সারারাত আজ তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে তনু ভেতরে চলে গেল। অমিতাভ মনে মনে হাসল। সেন্টিমেন্টের বাড়াবাড়ি। কই তার তো কিছু মনে হচ্ছে না। এই তো স্বাভাবিক! কোথায় কে রইল তাতে কার কী যায় আসে। বেঁচে থাকলেই তো হল। বাড়ি আছে, অর্থ আছে, মাসে মাসে সেও পাঠাবে। সেবা! আজকাল কেউ কারু সেবা করে না। প্রফেশ্যানাল নার্সরাই সেবা ভুলে গেছেন। তা অ্যামেচার স্ত্রী। তনুর ভেতরে একটা লোক দেখানো ব্যাপার আছে। সাবেক কালের সংসার আর নেই। বাস্তব এখন অনেক বেশি কঠোর। বাইরে কোথাও ট্র্যান্সফার হয়ে গেলে কী হত। এসব ন্যাকামির কোনও মানে হয় না। দুঃখ বিলাস।

'কী তুমি শুতে আসবে, না সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'তুমি শুয়ে পড়ো না। আমার ঘুম আসছে না।'

'কেন অমন করছ। জোলো বাতাস বইছে। অসুখ করবে। চলে এসো।'

তনু কোনও উত্তর দিল না। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বহু দূরে অল্প একটু বাগান ঘেরা ছোট্ট একটি বাড়ি। এই দুর্যোগের রাতে সেই বাড়িতে একা এক বৃদ্ধ মানুষ। কী করছেন তিনি। হয়তো একগাল শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছেন! আর তাঁর কৃতী সন্তান এখন বিছানায় ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দামি সিগারেট ফুঁকছে।

কায়দা করে পেছনের দেয়ালে টিপে ধরে জ্ঞানেশ সিগারেটের আগুন নিবিয়েছে।

'মাস্টারমশাই, কী ব্যাপার, কোনও বিপদ হয়নি তো! ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে আর যাব না বাবা। পায়ে জলকাদা। বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি এই এত রাতে। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল।'

'বিশ্রাম! আমি কী এমন পরিশ্রম করি মাস্টারমশাই! বলুন কী বিপদ?'

শিবপদ সংক্ষেপে সব ঘটনা বললে। 'আমার মাথায় কিছু আসছে না বাবা। তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম।' জ্ঞানেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তার চোখ দুটো চকচক করছে। সাঁ সাঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইছে বাইরে। এমন রাতে সাধ করে কেউ বাইরে বেরোতে চাইবে না।

শিবপদ ইতস্তত করে বললে, 'তোমাকে মনে হয় বিপদেই ফেলে দিলুম!'

'কিছুমাত্র না। কী করা উচিত মনে মনে একবার ভেবে নিলুম। আপনি এক সেকেন্ড দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।'

জ্ঞানেশ ভেতরে চলে গেল। একটি বাচ্চা ছেলের আদো আদো কথা ভেসে আসছে ভেতর থেকে। ব্যস্ত সংসারের নানারকম শব্দ। টিভিতে মনে হয় রাতের শেষ সংবাদ পড়ছে। ছোট ছোট পাখির মতো নানা শব্দ উড়ে আসছে সংসারের সোনার খাঁচা থেকে। জ্ঞানেশের স্ত্রী মনে হয়, ঝাঁঝালো গলায় বলছে, 'এত রাতে কোথায় আবার চললে।'

শিবপদর কেমন যেন কিন্তু কিন্তু লাগছে। এই রাতে একটা মানুষকে অকারণে ঘর থেকে টেনে বের করা!

'চলুন মাস্টারমশাই।' জ্ঞানেশ তৈরি হয়ে এসেছে। আঙুলে একটা চাবি দুলছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললে, 'অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? এ অতি সামান্য ব্যাপার। আজকাল সব মার্ডার করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর আর তেমন ইমপর্টেন্স নেই।'

রাস্তায় বেরিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টারমশাই আপনি এই বারান্দার তলায় দাঁড়ান। আমি গাড়িটা বের করে আনি।'

জ্ঞানেশ অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। কোথায় জ্ঞানেশের গ্যারেজ কে জানে? বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ হচ্ছে সিপসিপ করে। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার ফালা ফালা হল। সামনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ বললে, 'উঠে আসুন মাস্টারমশাই।'

যেতে যেতে শিবপদ প্রশ্ন করলে, 'কিছু ভাবলে? কী করা যায়। পুলিশে হ্যান্ডওভার?'

'কিচ্ছু না। থানা-পুলিশের কোনও ব্যাপারই নেই। ওসবের মধ্যে কে যায়!'

রাস্তার একটা গর্ত বাঁচাতে জ্ঞানেশ ডানদিকে গাড়ি ঘোরাল। শিবপদ আচমকা কাত হয়ে আবার সামলে নিল।

'রাস্তার অবস্থা দেখেছেন মাস্টারমশাই! দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে।'

শিবপদ হাসল। দেশের কথা কে আর ভাবছে! স্বাধীন হবার পর সকলেই তো নিজের কথা ভাবছে।

শিবপদর বাড়ির সামনে জ্ঞানেশ গাড়ি থামাল। শিবপদ চমকে উঠল। হেডলাইটের আলোয় সেই মূর্তি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে ঢাকা। মাথায় টুপি। মুখের চেহারা স্পষ্ট নয়। ভূত না মানুষ! জ্ঞানেশ গ্রাহ্যই করল না কিছু। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল। শিবপদর একবার মনে হল, লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করে কেন সে এখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছেটা মনে উঠে মনেই মিলিয়ে গেল।

শেষ টান মেরে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিং-এ কনুইয়ের ভর রেখে তনু সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অমিতাভ পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোমার কী হয়েছে বলবে?'

'কিছু না।'

'তা হলে এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আকাশ।'

'কবি হয়ে গেলে নাকি! চলো ভেতরে চলো।'

অমিতাভ তনুর হাত ধরল। ঘরের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে আকর্ষণ করলে। তনু শক্ত হাতে বারান্দার রেলিং ধরে আছে। সহজে টলানো গেল না। অমিতাভ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কেন এমন জ্বালাচ্ছ বলো তো?'

'আমি তো জ্বালাইনি, তুমি নিজেই জ্বলছ। তুমি শুয়ে পড়ো না। আমার সময় হলেই শোব।'

'আমার কথা তুমি তা হলে শুনবে না?'

'তুমি আমার কোন কথাটা শোনো?'

'তোমার আবার কথা কী! আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, না তুমি আমাকে বিয়ে করেছ?'

'তার মানে?' তনু অমিতাভর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'মানে খুব সহজ। বিয়ের পর পদবিটা তোমারই পালটেছে। আমি তোমাকে যেখানে, যেভাবে, যেমনভাবে রাখব, সেখানে, সেইভাবে, হাসিমুখে থাকবে।'

'অর্থাৎ ক্রীতদাসী।'

'ক্রীতদাসী নয়। এইটাই হল হিন্দুপ্রথা। কোম্পানি যখন আমাকে এত বড় একটা ফ্ল্যাট দিচ্ছে তখন মূর্খের মতো রিফিউজ করব? আমার একটা স্ট্যাটাস আছে। আমার নিজস্ব একটা জীবন

আছে। আমারও সুবিধে-অসুবিধে আছে। আমার মেলামেশার আলাদা একটা গণ্ডি আছে। তুমি পড়োনি জীবন মানে চরৈবেতি। বাঙালির ঠুনকো সেন্টিমেন্ট নিয়ে এক জায়গায় আটকে বসে থাকব?'

'আর যাই করো তুমি উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা আর করতে যেয়ো না। নিজের উন্নতি ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না, বোঝার চেষ্টাও করো না।'

'তুমি কি আমায় ঘৃণা করতে শুরু করেছ?'

'শোনো, ভেতর নিয়ে যত কম নাড়াচাড়া করা যায় ততই ভাল। কী হবে জেনে, কার ভেতরে কী আছে? তুমি আছ, আমি আছি— এই তো বেশ।'

'এই মন নিয়ে তো আর সংসার করা যায় না।'

'কেন যাবে না! সবাই তো এইভাবেই চলছে। সন্তান আসছে। উৎসব হচ্ছে। নাচগান হচ্ছে। খানাপিনা হচ্ছে।'

'ঘরে চলো।'

'এ তোমার আদেশ না অনুরোধ?'

অমিতাভ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। আদেশ, না অনুরোধ! সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। এ তো তার আদেশই। কথা না বাড়িয়ে অমিতাভ ঘরে ফিরে এল। এখন তার যা মানসিক অবস্থা তাতে বিশ্রী কিছু মন্তব্য বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। এমন কথাও সে বলে ফেলতে পারে, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, না আমার বাবাকে! কথাটা মনে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ কুঁকড়ে ছোট হতে শুরু করল। ছি ছি, এমন একটা কথা সে ভাবতে পারল! এই তার শিক্ষা!

তনু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্রোহী হবার ক্ষমতা তার নেই। যে গাছে জোড় কলম বাঁধা হয়ে গেছে সেই গাছের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে হবেই। উপায় নেই। এই হল জীবন। কিন্তু মন ভাঙে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দেখা যায় না বাইরে থেকে।

উতলা বাতাসে তনুর চুল উড়ছে। বেশ শীত শীত করছে। দূর অন্ধকারে এক সার নিঃসঙ্গ আলো সারারাত জেগে থাকার ব্রত নিয়েছে। দু'জনের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে আজ, বাবা আর শ্বশুরমশাই। অমিতাভ ঘরের আলো নিবিয়ে দিল। যা ভাল বোঝে করুক। তার অত মাথা ব্যথা নেই আর।

জ্ঞানেশ খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সাত্যকিকে একবার দেখে নিল। কৃষ্ণ সেই একইভাবে বসে আছে। ঝিম মেরে। দেবীর অবস্থা শোচনীয়। চোখে মুখে ক্লান্তির ছায়া।

জ্ঞানেশ বললে, 'পকেট থেকে সব বের করে নিয়েছেন!'

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ।'

'আবার সব ঢুকিয়ে দিন।'

'কেন?'

'কোনও প্রমাণ না রাখাই ভাল। পরে গোলমাল হতে পারে।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'ভেরি সিম্পল। গাড়িতে তুলব, তারপর যে-কোনও একটা নির্জন জায়গায় ফেলে দিয়ে আসব।'

'সে কী? এমন একটা অমানবিক কাজ করা ঠিক হবে! সাত্যকি আমাদের বন্ধু।'

'একসময় বন্ধু ছিল। এখন আপনাদের শত্রু। পুলিশে ছুঁলে সহজে নিস্তার পাবেন?'

'কেন পাব না! আমরা তো খুন করিনি। স্বাভাবিক মৃত্যু। জ্ঞানেশ তুমি অন্য কিছু ভাবো। একটু মানবিক কিছু ভাবো।'

'বেশ। তা হলে আনআইডেন্টিফায়েড, আনক্লেমড ডেডবডি বলে যে-কোনও হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসি।'

'আর কি কিছু ভাবা যায় না জ্ঞানেশ?'

'মাস্টারমশাই, যার কোনও ঠিকানা নেই, আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছে জানা নেই, তাকে আপনি কী করবেন! কতক্ষণ মড়া আগলে বসে থাকবেন?'

কৃষ্ণপদ সেই ঝিম মারা অবস্থাতেই বললে, 'সাত্যকি যদি আমাদের ভাই হত! ধরেই নাও না ও আমাদের ভাই। আমরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে আসি।'

'তারপর! ভদ্রলোকের ইনশিয়োরেন্স থাকতে পারে, বিষয়-সম্পত্তি থাকতে পারে। কারু কাছে টাকা পাওনা থাকতে পারে, দেনা থাকাও অসম্ভব নয়। কোনও অপরাধ করে থাকতে পারেন। অকারণে এত সব ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয়! পরে সামলাতে পারবেন?'

'জ্ঞানেশ, এইভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে! এ ছাড়া আমাদের কিছুই কি করার নেই!'

'তা হলে ইনি যেমন আছেন সেইরকম থাকুন, চলুন আমরা থানায় যাই। আজকালকার পুলিশ কতটা দায়িত্বশীল, আমার সন্দেহ আছে।'

'পকেট থেকে আমরা যেসব কাগজপত্তর পেয়েছি একবার দেখবে তুমি! ওষুধের দোকানের একটা ক্যাশমেমো আছে। ওষুধ সাধারণত লোকে পাড়ার দোকান থেকেই কেনে।'

'তার মানে একটা ক্লু পাওয়া গেছে!'

'যে দীর্ঘকাল অসুখে ভুগছে তার সঙ্গে ওষুধের দোকানের একটা পরিচয় হয়ে যায়।'

জ্ঞানেশ তুড়ি মেরে বললে, 'হয়েছে। পেয়ে গেছি।'

'কী পেলে?'

'দেখি ক্যাশমেমোটা।'

দেবী মেমোটা জ্ঞানেশের হাতে দিল। জ্ঞানেশ একনজরে দেখে নিয়ে বললে, 'এই দেখুন আপনারা লক্ষ করেননি, আজকাল ক্যাশমেমোতে ডাক্তারের নাম লেখা থাকে। এই যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে ডক্টর বি কুণ্ডু।'

শিবপদ বললে, 'আরে তাই তো! এটা তো আমরা কেউ লক্ষ করিনি। জ্ঞানেশ, তা হলে তো একটা রাস্তা পাওয়া গেল বাবা।'

'ডাক্তার যখন, বাড়িতে চেম্বারে ফোন থাকবেই। আমি আমার বাড়ি থেকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। না পেলে অন্য ব্যবস্থা।'

জ্ঞানেশ রাস্তায় বেরিয়ে এল। সেইখান থেকেই চিৎকার করে বললে, 'কী হল আমি একটু পরেই জানিয়ে যাচ্ছি।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট অন করতেই জ্ঞানেশের চোখ পড়ে গেল, পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি মোড়া লম্বা একটা চেহারা। এত রাতে, এই আবহাওয়ায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেন? দাঁড়িয়ে থাকার মতো কী আছে এখানে?

আলোর বৃত্তে লোকটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখল। চেনার চেষ্টা করল। কে? এ পাড়ার কেউ! না বেপাড়ার কোনও বদমাশ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে মুখ বের করে জ্ঞানেশ প্রশ্ন করল, 'কে? কে ওখানে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে লোকটি টলতে টলতে পাশের গলির অন্ধকারে মিশে গেল।

'ব্যাটা মাতাল।' জ্ঞানেশ গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। পল্লির রাত আর আগেকার কালের মতো নিরীহ নেই। সূর্যাস্তের পরেই পাপের ঢাকনা খুলে যায়। গত ছ'মাসে এই পাড়ায় পরপর তিনটে খুন হয়ে গেছে। চুরি ডাকাতি রোজের ঘটনা। ছিনতাই যে-কোনও সময় হতে পারে।

শিবপদ বললে, 'বউমা এইবার তুমি বাড়ি যাও। বেশ রাত হয়েছে। মেয়েটা একা আছে।'

একা বাড়ি ফেরার সাহস দেবীর আর নেই। শশধর কোথায় কোন অন্ধকারে শিকারি বেড়ালের

মতো ওত পেতে আছে কে জানে! দেবী খুব কিন্তু কিন্তু ভাবে বললে, 'বাবা, আপনি আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয় দেব। তুমি না বললেও দেব মা। কেন জানি না আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমাদের একটা দুঃসময় আসছে।'

কৃষ্ণ বললে, 'শিব, আমি কী করি বল তো? বাড়িতে তো কেউ নেই! শেকল তুলে দিয়ে চলে এসেছি।'

'আমি দেবীকে দিয়ে আসি, তারপর তুমিও চলে যাও। জ্ঞানেশ ভার নিয়েছে। দেখাই যাক না কী করে!'

ফাঁকা রাস্তা। দু'দিকে দু'বাহু প্রসারিত করে পড়ে আছে। এ মাথায় একটা ল্যাম্পপোস্ট, ও মাথায় একটা ল্যাম্পপোস্ট। টিমটিম করে আলো জ্বলছে। দেবী সতর্ক চোখে একবার এদিকে, একবার ওদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। শিবপদর গা ঘেঁষে হাঁটছে।

শিবপদ বললে, 'একটা সন্দেহজনক লোক বহুক্ষণ এখানে একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন দিনকাল পড়েছে, কে যে কী উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার মনে হয়েছিল লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করি। তারপরে ভাবলুম মন মেজাজ ভাল নেই, অনর্থক কথা কাটাকাটির মধ্যে গিয়ে কী লাভ! তবে মনে হল লোকটার কোনও বদ মতলব আছে। একা থাকো, একটু সাবধানে থেকো।'

দেবী শিবপদর আরও কাছে সরে এল। ওই লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় হল আত্মহত্যা করা। নয়তো হত্যা করা। যেমন করেই হোক শশধর তাকে নষ্ট করবেই।

দেবীর কাঁধে হাত রেখে শিবপদ বললে, 'কী ভয় করছে? ভয়ের কী আছে মা! এইভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে। মূল্যবোধহীন বিভ্রান্ত পৃথিবীতে মৃত্যুই একমাত্র শান্তির উপায়।'

দেবীর জানলায় আলো জ্বলছে। নীল পরদার গায়ে দুটি ছায়া। নড়ছে চড়ছে। দুর্গা আর তোতা। মায়ের জন্যে জেগে বসে আছে। দরজার সামনে এসে শিবপদ বললে, 'এইবার আমি যাই।'

ফেরার পথে একটু লক্ষ করলে শিবপদ দেখতে পেত ছায়ায় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি মোড়া সেই লোকটি।

॥ সাত ॥

জ্ঞানেশ সেই যে গেল আর দেখা নেই। শিবপদ চেয়ারে বসে বসে মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বয়েস হয়েছে। আগের মতো আর ধকল সহ্য হয় না। মাথা ঝুলে আসছে বুকের দিকে। চমকে চমকে উঠছে। বাইরে গাছের পাতায় হালকা বৃষ্টির ঝিপঝিপ শব্দ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিকে বাইরেটা নীল হয়ে যাচ্ছে। শিবপদর ভয় ভয় করছে। তন্দ্রার ঘোরে বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য ভেসে উঠছে। একবার মনে হল সাত্যকি বিছানায় উঠে বসেছে। শুধু বসেনি, মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে হাই তুলছে।

চেয়ার ছেড়ে শিবপদ উঠে পড়ল। রাত একটা। জ্ঞানেশ স্রেফ ভাঁওতা মেরে গেল। শিবপদ পায়চারি শুরু করল। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা। একবার মনে হল টকটকে লাল শাড়ি পরে কে যেন এলো চুলে একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল। শিবপদর ইচ্ছে করছে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয়নি। শিবপদ ভাবার চেষ্টা করল, ঘণ্টা ছয়েক আগেও সাত্যকি কথা বলছিল। এখন একবারে নিথর, নিস্পন্দ। মুখ ফ্যাকাশে সাদা। কেমন যেন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে! মৃত্যুর গন্ধ। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যে শক্তি সাত্যকির নিথর

দেহে আবার প্রাণের স্পন্দন আনতে পারে। এইখানেই মানুষের ব্যর্থতা। মারতে পারে। মৃত্যুকে বাঁচাতে পারে না।

দোতলার ঘরে পিংপং বলের মতো কী একটা পড়ে তিন-চার বার লাফিয়ে উঠল। স্পষ্ট শব্দ। শিবপদর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী পড়তে পারে মাথায় এল না। শূন্য ঘরে কোথাও কিছু নেই। বিকট সুরে একটা বেড়াল ডেকে উঠল। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছে। এখন সে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করছে। আর একবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সাত্যকির মাথার দিকের কাচের জানলা নীল হয়ে উঠেছে। বাইরে কালো কালো আন্দোলিত গাছের মাথা। এক লহমার দেখা, সাত্যকির মুখ দিয়ে এক ভলক ধোঁয়া বেরিয়ে গেল যেন।

শিবপদ প্রায় ছুটে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকার সাহস নেই তার। সে পালাতে চায়। মৃদু একটা সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। দোতলার শূন্য ঘরে কে যেন পায়চারি করছে। ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। শিবপদ নিজেই এবার কেঁদে ফেলবে।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। অন্য মানুষ না থাকলে একা একজন মানুষ কী করত! কীভাবে বেঁচে থাকত এই সাংঘাতিক পৃথিবীতে। নিয়ত জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলেছে যেখানে। মৃত্যুর পরেও যেখানে একটা রহস্য থেকে যায়। জ্ঞানেশ এসে গেছে।

'কিছু করতে পারলে জ্ঞানেশ?' শিবপদর উদভ্রান্ত প্রশ্ন।

'মনে হয় করা যাবে। তবে আজ নয়। কাল সকালে।'

'কাল সকালে? সকাল হতে তো এখনও অনেক দেরি। হঠাৎ এসে কী সাংঘাতিক অবস্থায় আমাকে ফেলে গেল।'

'মাস্টারমশাই, এখনও সময় আছে, আমার কথা শুনুন। দুর্যোগের রাত। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। গাড়ির পেছনের সিটে ফেলে হাসপাতালে দিয়ে আসি। মর্গে পড়ে থাক আনআইডেন্টিফায়েড ডেডবডি হয়ে। যা পারে পুলিশে করুক।'

'ওতে আমার মত নেই জ্ঞানেশ। আজকের রাতটা তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না জ্ঞানেশ?'

'মাস্টারমশাই, বাড়িতে আমার স্ত্রী একলা। বুঝতেই পারছেন, সবে বিয়ে করেছি।'

'না, তোমাকে আমি জোর করে আটকাতে চাই না।'

'আপনার কি ভয় করছে?'

'শুনছ না, কে যেন কাঁদছে?'

'ও তো বাতাসের শব্দ।'

'তা হবে। দোতলায় কে যেন চলে বেড়াচ্ছে!'

'ইঁদুর মাস্টারমশাই। ধেড়ে ইঁদুর।'

'তা হবে!'

'ভয় পাবেন না। ভয়ের কী আছে?'

'সুন্দর একটা গন্ধ পাচ্ছ না?'

'আপনার বাগানে কামিনী ফুটেছে মাস্টারমশাই।'

'তা হবে।'

'আমি তা হলে আসি মাস্টারমশাই। কাল সকালে আসছি। আপনার কাছে স্লিপিং পিলস নেই?'

'কেন বলো তো?'

'এমনি আপনার ঘুম আসবে না আজ। দুটো খেয়ে নিলে রাতটা বেশ কেটে যেত। আচ্ছা আমি আসি।' জ্ঞানেশ চলে গেল। নিজের ছেলেকেই ধরে রাখা যায় না। তা পরের ছেলে। আবার

শিবপদ একা। দরজা খুলে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখল। সেই বর্ষাতি মোড়া সন্দেহজনক লোকটাও যদি থাকত, তা হলে ডেকে এনে ভেতরে বসাত। চোর হোক, গুন্ডা হোক, মাতাল হোক তবু তো একটা প্রাণী। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ে। চোখের পাতা নাচে। কথা বলে। পথে কেউ নেই। প্রাণহীন কালো সরীসৃপের মতো প্যাঁচ মেরে পড়ে আছে। দরজার সামনে একটা ব্যাং লাফাচ্ছে। শিবপদ ব্যাংটাকে ভেতরে প্রবেশাধিকার দিল। নিথর নিস্পন্দ প্রাণহীন পরিবেশে অন্তত একটা কিছু চলে বেড়াক।

জ্ঞানেশ ঠিকই বলেছিল, বর্ষার জল পেয়ে বাগান ফুলে ভরে গেছে। জুঁই, কামিনী থোকা থোকা হয়ে ঝুলছে। রাতে গাছে হাত দিতে নেই। শিবপদ মনে মনে গাছের অনুমতি নিয়ে এক মুঠো ফুল তুলে নিল। সাত্যকি একেবারে একা শুয়ে আছে। প্রশান্ত মুখে নাকটি উঁচু হয়ে আছে। কিছু ফুল শিবপদ ছড়িয়ে দিল চারপাশে। মৃত্যুর গন্ধ চাপা পড়ে যাক। একটু মনোরম হয়ে উঠুক মৃতের শয্যা।

এইবার শিবপদ কী করবে? হঠাৎ মনে হল তার এইবার স্নান করা উচিত। চিন দেশের প্রবাদ, বৃষ্টিতে ভিজে গেলে স্নান করে নেবে। তা হলে আর সর্দি হবে না। শিবপদ বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই দেখতে পেল, দরজার সঙ্গে লাগানো তোয়ালের রেলে দেবীর ভিজে শাড়িটা ঝুলছে। তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি। হালকা নীল রঙের শাড়ি ভিজে গিয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। প্রায় মধ্যরাত। বাথরুমের ব্যাপারে শিবপদর কিঞ্চিৎ শৌখিনতা ছিল। চারপাশের দেয়ালে শ্বেতশুভ্র পোর্সিলেন টালি। ঝকঝকে বেসিন। কলের মাথা। দরজার গায়ে ঝুলে থাকা নীল একটি শাড়ি।

শিবপদর মনে হল মৃত্যু- টিত্যু কিছু নেই। জীবন বড় লোভনীয়। এই চোখ, এই নাক, শ্বাসপ্রশ্বাস, গন্ধ, বর্ণ, রূপ, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা, বিরহ, এইসব নিয়ে বেঁচে থাকার যে কী আনন্দ!

পাতলা ভয়েলের শাড়িটা শিবপদ বালতির জলে ডুবিয়ে দিল। জায়গায় জায়গায় কাদার ছিটে লেগেছে। জলে ভিজিয়ে শিবপদর মনে হল, কাজটা কি ভাল হল! নিরাসক্ত এক বৃদ্ধ এখনও যুবতী এমন এক নারীর ছাড়া শাড়ি নিয়ে কেমন তন্ময় হয়ে আছে! এ কি সেবা, না মানসিক বিকার!

কে যেন ভেতর থেকে ধমকে উঠল, 'শিবপদ!'

সঙ্গে সঙ্গে শাওয়ার খুলে জলের ক্ষিপ্রধারায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। অসম্ভব ঠান্ডা জল। শীত করছে। শিবপদ সরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। যত শীত বাড়ছে ততই যেন সে মৃত্যুর স্বাদ পাচ্ছে। এইভাবে একদিন সেও শীতল হয়ে যাবে। দেহের সব উত্তাপ জুড়িয়ে যাবে।

বাইরে কোথাও একটা শব্দ হল। বেশ জোরে। জলের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে শাওয়ার বন্ধ করে দিল। বাইরে কেউ ঘুরছে। নিশ্চিত পদশব্দ। ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। কে? সাত্যকির প্রেতাত্মা! বাথরুমেই বসে থাকবে সারারাত!

মন বলে উঠল, বৃদ্ধ তোমারও মৃত্যুভয়! আজ আর কাল? যেতে তো তোমাকে হবেই। শিবপদ ধীরে ধীরে বাথরুমের দরজা ফাঁক করল। কেউ কোথাও নেই। বিদ্যুতের হলুদ আলোয় চারপাশ ঝিমঝিম করছে। শিবপদর মনে হল, এইমাত্র কিছু একটা হচ্ছিল। হঠাৎ তাকে দেখে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে শিবপদ বাইরে বেরিয়ে এল। ভাল করে গা মোছা হয়নি। জল গড়াচ্ছে চারপাশ দিয়ে। ভিজে বাতাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভয় নয়। নিশ্চিত একটা শব্দ তার কানে এসেছে। বাইরেটা একবার দেখা দরকার। দিনকাল ভাল নয়। সুধার সমস্ত গহনা এখনও আগলে বসে থাকতে হয়েছে এই বুড়োকে। যে নেই, সে তবু আছে। এই হল জীবনের মজা?

শিবপদ অন্যমনস্ক। ঘরের মাঝামাঝি গেছে, হঠাৎ বাঁ পাশে সাত্যকির ঘরের দরজা খুলে গেল। সাদা চুল, দীর্ঘ এক পুরুষ। শিবপদ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল? প্রায় অচেতন হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

'এই শিব, আমি, আমি রে, আমি কৃষ্ণপদ।'

শিবপদ একটা ড্রয়ার ধরে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল।

'সদর খোলা রেখে বাথরুমে ঢুকেছিস! ভাগ্যিস এলুম। খুব ভয় পেয়ে গেছিস। নে নে, জামাকাপড় পরে নে। এত রাতে চান করলি?'

কৃষ্ণপদর বগলে দাবার বোর্ড। হাতে ঘুঁটির বাক্স। আচমকা ধাক্কায় শিবপদর বাকরোধ হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। সাদা পাজামা, ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, এক মাথা সাদা চুল। যেন দেবদূত!

শিবপদ জামাকাপড় ছাড়ছে। কৃষ্ণ বললে, 'কী ব্যবস্থা হল?'

'কাল সকালে একটা কিছু করা যাবে মনে হচ্ছে।'

'বিছানায় ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মনে হল মৃত্যুকে অত অনাদর করা উচিত নয়।'

'বেশ করেছিস। মৃত্যু একবার বেরিয়ে গেল। পরিচয় করে গেল। এরপর আমাদের নিতে আসবে। খেয়েছিস?'

'না। আজ আর খাওয়া যায়। না খাওয়া উচিত!'

'আয়, তা হলে বসা যাক।'

'আজকে খেলার মেজাজ আসবে?'

'আরে ধুর। জীবনটাই তো খেলা রে! দাবা খেলা। একদিকে ভাগ্য একদিকে মানুষ। রাত যখন জাগতেই হবে, আয়, মৃত্যুকে দেখিয়ে দিই, মৃত্যু তুমি আমাদের কাছে পরাজিত।'

কৃষ্ণ হা হা করে হেসে উঠল।

'তুমি এখানে রাত জাগবে, বউদির কী ব্যবস্থা করে এলে?'

'মহামূল্য অলংকারের মতো তালাচাবিতে রেখে এসেছি।'

দাবার ছক পেড়ে দু'ভাই মুখোমুখি বসল। কৃষ্ণ বললে, 'আমি কালো, কারণ আমি কৃষ্ণ, তুই শিব, তোর সাদা।'

তিন চাল চালার পর কৃষ্ণ বললে, 'কী মজা! ওইরকম একটা ভবঘুরে লোক ওঘরে চিত হয়ে পড়ে আছে। সামান্যতম নড়বার ক্ষমতা নেই। ডেকে দেখ, সাড়া পাবি না। কী ঘুম। একবার ভেবে দেখ। এ জীবনে আর ভাঙবে না।'

'দাদা তোমার গজ সামলাও।'

'তোর নৌকো যে এদিকে টলমল।'

কৃষ্ণ চাল চেলে বসে আছে। শিবপদ ভাবছে কোন রাস্তায় বেরোবে।

কৃষ্ণ বললে, 'তুই কি জানিস আমার জীবনে কুমুকে নিয়ে এসেছিল ওই সাত্যকি বোস!'

'তা হবে। তোমার ওই ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ আলোচনার মতোই ছিল। ফিসফাস হত ঠিকই। তবে তেমন নয়।'

'কুমু খারাপ মেয়ে এই ছিল তোদের ধারণা।'

'আমার কোনও ধারণাই ছিল না।'

'সেই সময়ে তুই আমাকে ঘৃণা করতিস, না?'

'তোমাকে চিরকালই আমি গুণী মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতুম। বরং তুমিই আমাকে স্কুল মাস্টার বলে নাক সিঁটকোতে।'

'ভুল ধারণা। তোকে আমি ভয় পেতুম আদর্শবাদী শিক্ষক হিসেবে। প্রেম কাকে বলে জানিস? লাভ।'

'প্রেম? কোন প্রেম? মানব প্রেম? ঈশ্বরে প্রেম?'

'শোন শিব প্রেম মানে প্রেম। অত শ্রেণি বিচার আমি বুঝি না। প্রেম হল মনের অদ্ভুত এক

অবস্থা। ফুল ফোটে। পাখি গায়। জলে চাঁদের কিরণ ঝলমল করে। বাইরে নয়। সব মনেই হতে থাকে। ভূতে পাওয়ার মতো অদ্ভুত এক পাওয়া। কুমুকে দেখে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। সাত্যকি চেয়েছিল ভোগ করতে আর আমি চেয়েছিলুম পুজো করতে। আমাদের সেই সব দিন কোথায় গেল রে শিব। সেই মন!'

'দাদা তোমার ঘোড়া সামলাও। কী খেলছ আজ! হেরে যাবে যে!'

'হার জিতের খেলা অনেক খেলেছি। এখন খেলার জন্যে খেলা। এ খেলায় কোনও উদ্বেগ নেই। নে না নে। তুই আমার ঘোড়াটা খেয়ে নে।'

'কুমুর জন্যে তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, কিন্তু...।'

'কুমু বলছিস কেন? বউদি বলতে তোর এখনও ঘৃণা!'

'দাদা, প্রেম, ঘৃণা, মান অভিমানের বয়েস আমরা পেরিয়ে এসেছি রে। বউদি একটা সাধারণ সম্বোধন। কুমু বললে চরিত্রটা অনেক নির্দিষ্ট হয়, তাই বলেছি।'

'বল বল। কী বলছিস বল। দে দে অতীতের সব দরজা আজ খুলে দে।'

'তোমার ত্যাগের মর্যাদা কি বউদি দিয়েছিল?'

'অবশ্যই দিয়েছিল। ওই সাত্যকি, ওই ভবঘুরে ভোগী সাত্যকি কম টোপ ফেলেছিল। ব্যাটা আমার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেছে। শিব তুই লিখে রাখ, ভোগীর দুনিয়া খুব ছোট, ভীষণ সংকীর্ণ। প্রেমিকের দুনিয়া বিশাল। কুমু পয়সার জন্যে মডেল হতে এসেছিল। ওর পয়সার প্রয়োজন ছিল। পয়সার জন্যে আরও নীচে নামতে পারত। তোরা তখন আমার বিরোধিতা করেছিলি।'

'আমাকে জড়িয়ো না। আমার কোনও ভূমিকা ছিল না। কোনও কোনও ব্যাপারে চিরকালই আমি একটু ভোঁতা।'

'সুধার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক ছিল?'

'সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে?'

'খুব করব। আজ একটা বিশেষ দিন। মৃত্যু আজ এ বাড়ির বিশেষ অতিথি।'

'সুধা ছিল আমার মা। বকত, ধমকাত, আদর করত, জোর করে খাইয়ে দিত, অবাধ্য হলে চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিত। শীতের রাতে জেগে জেগে উঠে দেখত, আমার গা থেকে চাপা সরে গেছে কি না! তুমি জেনে রাখো দাদা, আমি দু'বার মাতৃহারা হয়েছি। বিশ্বাস করো, আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি মরেই গেছি।'

'তা হলে শোন, আমি এখন কুমুর বাবা। আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে করে জানিস, দু'জনে একসঙ্গে মরি। আমি চলে গেলে কে দেখবে ওকে। কেন আমি আফিং ধরেছি বল তো!'

'তোমার সাফল্যের দিন ভোলার জন্যে।'

'না রে! জীবন তো ঢেউয়ের নৌকো। উঠবে, পড়বে। সেজন্যে নয়। আফিং খেলে পরমায়ু বাড়ে। মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

'একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো না, বউদিকে যদি ভাল করা যায়!'

কৃষ্ণ হঠাৎ একটা চাল দিয়ে বললে, 'কিস্তি মাৎ।'

শিবপদ অবাক হয়ে দেখলে, সত্যিই কিস্তি মাৎ। তার আর নড়বার চড়বার উপায় নেই।

কৃষ্ণ হো হো করে হেসে বললে, 'শেষ চেষ্টা একবার করব। কালপ্রিটটা মরেছে। তুই ঠিক ধরিয়েছিস। কুমুর সামনে ওর মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে দেখব, কিছু হয় কি না! হতে পারে। আজ হারতে বসে যখন জিতেছি তখন হতে পারে! আমার লাক। ভাগ্য আবার হারতে পারে। এমন তো হয়!'

॥ আট ॥

তোতার শোবার ধরনটা হল, দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে, আর একটা পা তুলে দেবে মায়ের গায়ে। মাকে পাশ বালিশ করে না শুলে তার ঘুম আসবে না। রেশমের মতো এক মাথা চুলে দেবীকে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে হবে। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত যে-কোনও অদ্ভুত একটা মানুষ অথবা জীবের গল্প শোনাতে হবে। তোতার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 'বাঘ কেন মানুষ খায় মা?' 'চিড়িয়াখানার বাঘ রোজ একটা করে মানুষ খায় মা?' 'কুমিরের পিঠে ওরকম গোটা গোটা কাঁটা থাকে কেন মা?' 'হাতির সামনের দুটো দাঁত অমন লম্বা কেন মা?' সাতদিন আগে শোনা গল্পের একটু কিছু নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করবে, 'সেই লোকটার মাথায় যে ঝাঁকা ছিল, সেই ঝাঁকায় কী ছিল মা? পায়রা?' সাতদিন আগে বানিয়ে বানিয়ে দেবী কী বলেছিল, তা কি আর মনে আছে? মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বললে, 'হ্যাঁ মা পায়রা ছিল।' তোতা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলবে, তবে যে বললে মুরগি ছিল।'

প্রশ্নে প্রশ্নে দেবী জেরবার হয়ে যাবে। সব প্রশ্নের উত্তর দেবী দিতে পারে না। অত কি তার জানা আছে? ধীরে ধীরে তোতার ঘুম এসে যায়। কথা জড়িয়ে আসে। দেবীর গালে তোতার মিষ্টি নিশ্বাস এসে লাগে। দেবী তখন সব দুঃখ ভুলে যায়। জানলার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মশারির ভেতর থেকে ঝাপসা দেখায়। ওই টেবিলে বসে অনেক রাত পর্যন্ত তার স্বামী টেবিল ল্যাম্প জেলে লেখাপড়া করত। ঢাকা লাগানো সেই ল্যাম্পটা এখনও আছে। কিন্তু আলো আর জ্বলে না।

তোতা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবীর চোখে ঘুম নেই। শিবপদর কথা ভাবছে। ঝিপঝিপ বৃষ্টি সমানে পড়ে চলেছে। বৃদ্ধ মানুষ। আজ কী বিপদেই না পড়েছেন? সারারাত মড়া আগলে বসে থাকা। উপায় থাকলে সারারাত সে আজ ওইখানেই থেকে যেত। তোতার কপাল ঘামছে। জ্বর ছাড়ছে। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে দিল। তোতা স্বপ্ন দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হিংসে হয়। তোতাকে দেখে তার হিংসে হয়। একসময় তারও ওই বয়েস ছিল। তবে তার মা ছিল না। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দু'নম্বর মা খারাপ ছিলেন না, কিন্তু বাবাকে তাঁর কাছ থেকে সহজে আলাদা করা যেত না। তখন দেবী বুঝত না, এখন দেবী বোঝে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পর্কে শিশুর স্থান নেই। স্বামী বেঁচে থাকলে তোতা কি তাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে পারত!

দরজায় একটা শব্দ হল। দেবীর কান খাড়া হয়ে উঠল। যেন কুকুরে আঁচড়াচ্ছে। দেবী ধীরে ধীরে বালিশ থেকে মাথা তুলল। তোতার জড়িয়ে ধরা হাত শিথিল হয়ে গেছে। কোমরের ওপর তার আলগা পা। দরজায় আবার শব্দ। সেই নিশির ডাক, 'দেবী, দেবী।'

দাঁতে দাঁত চেপে দেবী মনে মনে বললে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। প্রয়োজন হলে খুন করে ফেলে দেব। ধীরে ধীরে মশারি তুলে দেবী নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

'দেবী, দেবী।'

আশ্চর্য! লোকটার ঘর-সংসার নেই। প্রাণের ভয় নেই। মান-অপমান বোধ নেই। এর নাম প্রেম নাকি? দেবীর প্রেমে পড়ে গেছে মাঝ বয়সি সংসারী একটা লোক! শুধু দেহের লোভে হলে আরও অনেক সহজ রাস্তা খোলা ছিল।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেবী দরজা খুলল। একঝাপটা ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে দরজায় পিঠ রেখে বসে থাকা শশধর পেছন দিকে উলটে পড়ল। মুখে ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়ছে। কপালের একটা পাশ থেঁতলে গেছে। সারা গায়ে জলকাদা মাখামাখি। শশধর উলটে পড়ে আছে দেবীর পায়ের কাছে। প্রথমে মনে হয়েছিল এক লাথি মেরে বাইরে ফেলে দেয় ফুটবলের মতো। মুখের দিকে তাকিয়ে বড় করুণা হল।

শশধরের অর্ধেক শরীর ভিতরে অর্ধেক শরীর বাইরে। সেই অবস্থায় করুণ কণ্ঠে বললে, 'দেবী, এক গেলাস জল খাওয়াবে?'

দেবী ফিসফিস করে বললে, 'ভেতরে আসুন।'

'না না, আমি রাস্তার কুকুর ভেতরে যাব কী? তোমার পবিত্র দেবালয় অপবিত্র হয়ে যাবে।'

শাসনের সুরে দেবী বললে, 'ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করব।'

শশধর ঘষটে ঘষটে বাধ্য কুকুরের মতো ভেতরে চলে আসতেই দেবী দরজা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির ছাটে পাপোশ এরই মধ্যে ভিজে উঠেছে। মেঝেতেও জল এসে গেছে। দেবী হাত বাড়িয়ে অল্প পাওয়ারের বাতিটা জ্বেলে দিল। ঘরে একটা নীল মায়া খেলে গেল। ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মতো মেঝেতে বসে আছে শশধর। দেবী মশারির দিকে তাকাল, তোতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দেবী এক গেলাস জল এনে শশধরের হাতে ধরিয়ে দিল। শশধরের হাত কাঁপছে। তৃষ্ণার্ত পশুর মতো চোঁ চোঁ করে জলটুকু খেয়ে নিল তারপর করুণ দৃষ্টিতে দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনি বাড়ি যান না কেন?'

শশধরের ক্ষতবিক্ষত মুখে হাসি খেলে গেল, 'আমাকে কেউ চায় না দেবী। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই তো বাড়ি ঢুকতে চেয়েছিলুম, এই অবস্থা করে দিয়েছে আমার।'

চারপাশে গোল করে আঙুল ঘুরিয়ে শশধর নিজের মুখ দেখাল।

'আপনার এ অবস্থা কে করলে?'

'খুব আপনজন। আমার মায়ের পেটের ছোটভাই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে দেবী। তোমার যখন প্রয়োজন ছিল, খুব খাতির করতে। যেই প্রয়োজন ফুরোল চড় মারলে। পৈতৃক বাড়ির অংশটা যেই লিখে দিলুম ছোটভাই মাতাল বলে জুতো পেটা শুরু করলে। জগতের এই তো নিয়ম দেবী! বড়লোক মাতাল হলে বলবে, আউট হয়ে গেছে। ছোটলোক মাতাল হলে বলবে, ব্যাটা ধেনো খেয়েছে। একটা গৌরবের আর একটা ঘৃণার?'

'কেন মদ খান? মদ খাবেন কেন?'

'কেন খাই? ভোলার জন্যে খাই। পৃথিবী ছেড়ে পালাবার জন্যে খাই। অল্প কিছুক্ষণ প্রেমিক হবার জন্যে খাই। যেখানে যা নেই তা আছে, এই দেখার জন্যে খাই। আচ্ছা, আমি তা হলে আসি।'

'এসেছিলেন কেন?'

'তোমাকে বলতে আর কোনওদিন তোমাকে জ্বালাতে আসব না। ধরো আজই আমার শেষ রাত। খারাপ লোককে দুর্যোগের রাতেই যেতে হয় দেবী। তুমি শুনেছ? রেডিয়োর আবহাওয়া বার্তা শুনেছ। প্রবল ঘূর্ণি ঝড় আসছে!'

'কোথায় যাবেন এখন?'

'তা তো জানি না। পৃথিবীর শেষ কোথায়, কত দূরে তা তো আমার জানা নেই।'

'মেঝেতে আপনার বিছানা করে দিচ্ছি। এইখানে শুয়ে থাকুন। ভোর হলে চলে যাবেন।'

'না না, তোমার বদনাম হয়ে যাবে দেবী। তুমি এতকাল আমাকে ভুল বুঝে এসেছ। আমি খারাপ তবে সে খারাপ নই, যে মেয়েদের ভয় পেতে হবে। তোমাকে আমি সব কথা পরিষ্কার করে বলি, যাবার আগে অন্তত একজনকে বলে যাই।'

'আজ রাতে আপনার কোনও কথা শুনব না। তোতার জ্বর। অতি কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি। উঠে পড়লে বিপদে পড়ে যাব।'

দেবী আলমারি খুলে তুলো আর ওষুধ বের করল। একটু গরম জল পেলে ভাল হত। এই রাতে কে আবার স্টোভ জ্বেলে গরম জল করে। দেবী তুলোটা শশধরের কপালে চেপে ধরল। শুধু থেঁতলে যায়নি। জলকাদায় অপরিষ্কার হয়ে আছে। অবিলম্বে এ টি এস দেওয়া উচিত। একটা অ্যাম্পিউল থাকলে নিজেই দিয়ে দিতে পারত। ভেবেছিল ওষুধ পড়লেই শশধর যন্ত্রণায় চিৎকার

করে উঠবে। শশধরের যন্ত্রণাবোধও নষ্ট হয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চেষ্ট মানুষের মতো বসে আছে, যেন আজই তার পৃথিবীতে শেষ রাত। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মদের গন্ধ দেবী একেবারেই সহ্য করতে পারে না। গা গুলিয়ে উঠল। তবু করুণা হল লোকটির জন্যে। স্বামীর মৃত্যুর পর সত্যিই অনেক করেছে। শশধরের সাহায্য ছাড়া পাওনাগন্ডা আদায় হত না। চাকরিটাও জুটত কি না সন্দেহ। অতীতের কথা মনে পড়ছে। আজ শশধর যেভাবে দেয়ালে পিঠ দিয়ে হতাশ হয়ে বসে আছে, দেবীকেও একদিন ঠিক ওইভাবে স্বামীর অফিসের বেঞ্চে বসে থাকতে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর শশধর কাগজ হাতে দৌড়োদৌড়ি করত এ টেবিলে ও টেবিলে। একজন মানুষের মৃত্যু সহকর্মীদের ওপর কোনও দুঃখের ছায়া ফেলেছে বলে মনেই হত না। সবাই হাসছে, গল্প করছে, চা খাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। এলাহি অফিসে এলাহি ব্যাপার। শশধর একদিন রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এ মুখে আবার যে কবে হাসি ফুটবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যেদিন দেখা হবে সেদিন সবার আগে প্রশ্ন করব, তোমার বিচারের নীতিটা কী ঈশ্বর? তুমি কখন কাকে তুলে নাও, কখন কাকে রেখে দাও খেয়ালখুশিমতো, মানুষের যে বোঝার উপায় নেই। পাকা ফল গাছে ঝুলছে দিনের পর দিন। কাঁচা ফল ঝরে পড়ছে টুপটাপ। 'তোমার সারাদিন আজ খাওয়া হয়নি' বলে শশধর সেদিন জোর করে দেবীকে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়েছিল। বেয়ারা পরদাফেলা খাঁচায় বসবে ভেবে, পরদা সরিয়ে বসার ইঙ্গিত করেছিল। শশধর বলেছিল, 'না আমরা বাইরেই বসি।' কই তখন তো মানুষটি এমন ছিল না। ভেতরে এত দুঃখ যে জমা আছে, তা তো বোঝা যায়নি। এত মদ তো তখন খেত না! আজ আবার বলছে দেবীকে সে অন্য চোখে দেখে। কী এক গল্প শোনাতে চায়। সবটাই কি নেশার ঘোর! নেশার ঘোরে পড়ে গিয়ে বলছে, ভাই জুতো মেরেছে।

শশধর বললে, 'আমি এবার যাই।'

দেবী মেঝেতে একটা তোশক বিছিয়ে বললে, 'কোথায় যাবেন? শুয়ে পড়ুন এখানে। গা থেকে খুলে ফেলুন ওসব।'

'তোমাকে সবাই ছি ছি করবে।'

'সে আমি বুঝব।'

'আমি আর ভদ্রলোক নেই দেবী।'

'সেও আমি বুঝব। এই নিন বালিশ। আর একটাও কথা নয়।'

শশধরের গা থেকে জোর করে টেনে রেনকোট খুলে নিল। পা থেকে কাদামাখা জুতো দু'পাটি খুলে ঘরের কোণে ছুড়ে দিল। তারপর আলতো ধাক্কায় শশধরকে শুইয়ে দিল বিছানায়। শীত শীত রাত। বিছানার একটা চাদর টেনে দিল গায়ে।

চাদরের তলা থেকে শশধর প্রায় কান্নার মতো শুধু বললে, মা।

একই নারীকে মানুষ কতভাবে খুঁজছে। মশারির ভেতর থেকে তোতা ডাকল, 'মা। তুমি কোথায়?'

দেবী বিছানায় এসে মেয়েকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে বললে, 'এই যে মা। এই তো আমি তোমার কাছে?'

'কে এসেছে মা? ফলঅলা?'

'ফলঅলা আসবে কী রে এত রাতে?'

'তবে কে মা?'

'শশধর কাকু।'

'মা, আর কত পরে সেই দোয়েল পাখিটা উঠবে?'

'আর একটু পরেই উঠবে মা।'

'ওদের ঘড়ি আছে বুঝি?'

'আলোই ওদের ঘড়ি। আকাশ লাল হলেই ওদের ঘুম ভেঙে যায়।'

'আমাদের কেন ভাঙে না মা।'

'আমরা পাখি নই বলে।'

দেবীর হাই উঠল। সারা দিনের ক্লান্তি। চোখে ঘুম এবার জড়িয়ে আসছে। তোতা বলল, 'মা তুমি কাল বেরুবে?'

মেয়ের কপালে একটা হাত রেখে দেবী বলল, 'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে মা। আজ তুই ঘুমো।' মা আর মেয়ে গলা জড়াজড়ি করে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার। শশধর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। দমকা বাতাসে বন্ধ দরজা জানলা কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। কোথাও একটা টেবিল ঘড়ি সমানে টিকটিক করে চলেছে। আজ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে কালের দিকে।

বিশাল খাটের একপাশে তনু জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। যেন অন্যের এলাকায় সে এক অবাঞ্ছিত অতিথি। ফিনফিনে পাতলা নেটের মশারির বাইরে ঝাপসা বাস্তব। ছবি, চেয়ার, টেবিল, সুদৃশ্য ঢাকা লাগানো টেবিল ল্যাম্প। দু'হাত দূরে অমিতাভ চিত হয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে। সাদা পাজামা, সাদা পাঞ্জাবি, সুখী মানুষটির মতো। যেমনটি দেখা যায় বিজ্ঞাপনে। বারান্দা থেকে বিছানায় এসে তনু দেখেছে অমিতাভ ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু অ্যাশট্রেতে ফেলে দেওয়া সিগারেটের অংশটি ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ছাড়ছিল। এই ক'বছরে তনু বুঝে গেছে কোনও ব্যাপারই অমিতাভর মনে বেশিক্ষণ স্থান পায় না। ছায়াছবির মতো আসে আর চলে যায়। শিবপদকে ফেলে চলে আসায় তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। অমিতাভ তার কোনও কথা শোনেনি। অনেক সব যুক্তি খাড়া করেছিল, যার কোনওটাই ধোপে টেকে না। নিজে সুখে থাকতে চায়, এইটাই বড় কথা। তার সুখের সীমানায় অন্যের প্রবেশাধিকার নেই। সে যেই হোক।

ভাবতে ভাবতে তনু অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানার একপাশে। খোঁপাটি ভেঙে পড়েছে বালিশে। তনুর মাথায় অনেক চুল। খোঁপা খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে নেমে যাবে কালো ঢেউয়ের মতো। একসময় খুব ভাল নাচত। সেই নৃত্যের ছন্দ স্থির হয়ে আছে শরীরে। বিয়ের আগে দু'-চারজন প্রেমিক ছিল। তনু তাদের পাত্তা দেয়নি। সে একটু নীতিবাগীশ, পুরনো ধাঁচের মেয়ে। অনেকটা তার মায়ের মতো। ছেড়ে চলে আসার পর থেকে সর্বক্ষণ শিবপদর কথা ভেবে ভেবে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। স্বপ্নেও শিবপদ। অমিতাভ তার জীবন থেকে যেন বেরিয়ে গেছে। অসীম শূন্যতায় কাটা ঘুড়ির মতো তনু ভেসে চলেছে।

কৃষ্ণপদ ছকে খুঁটি সাজাতে সাজাতে বললে, 'কী খেলা হচ্ছে বল তো? মাথামুণ্ডু নেই।'

শিবপদ বললে, 'ধরে নাও, খেলার খেলা।'

'তোর পেছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। বড় আয়নায় আমরা দু'জনে কীরকম ভাসছি। যেন দুটো মানুষের বুদবুদ। বেঁচে থাকার কোনও উদ্দেশ্যই নেই অথচ বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে এত বিরক্তি লাগে। পাখির মতো। উড়তে চাইছে। পায়ে বেড়ি। সাত্যকিটা কেমন মুক্তি পেয়ে গেল।'

'কী করে বুঝলে? কিছুই বলা যায় না। হয়তো এতক্ষণে আবার বাঁধা পড়ে গেছে। কোনও জননীর গর্ভে। আবার নতুন করে সেই একই খেলা।'

'তা যা বলেছিস। এ রহস্যের আর সমাধান হল না।'

'দাদা তোমার হুডিনির নাম মনে পড়ে?'

'কে, সেই বিখ্যাত জাদুকর! পৃথিবী কোনওদিন তাঁর কথা ভুলবে? হুডিনি, কিং অফ হ্যান্ডকাফস্। তোর মনে পড়ে, তাঁর সেই বিখ্যাত খেলা মেটামরফসিস।'

'ও, তুমি সেই খেলাটার কথা বলছ, পিছমোড়া করে হুডিনিকে থলেতে ভরা হল। বেঁধে দেওয়া হল থলের মুখ। ভরা হল লোহার সিন্দুকে। চেন দিয়ে বাঁধা সেই সিন্দুক থেকে নিমেষে বেরিয়ে এলেন। সিন্দুক পড়ে আছে যেমন তেমনি। খুলে দেখা গেল ভেতরে বন্দি হয়ে আছেন তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী বেস।'

'এই খেলায় প্রথমে তাঁর সহকারী ছিলেন জা জ্যাকব। জ্যাকব চলে যাবার পর সহকারী হয়েছিলেন ভাই থিও। এরপরই হুডিনি বেসের প্রেমে পড়ে বিয়ে করলেন। অমন প্রেমিক দম্পতি পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়।'

'তুমি বলছ, বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না। তুমি কি হুডিনির চেয়ে কম প্রেমিক! তুমিও তো রংতুলির জাদুকর। হ্যাঁ যে কারণে হুডিনির প্রসঙ্গ তুললাম। শুনবে সেই গল্প?'

'বল বল! আয়নাটার দিকে তাকালে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বহুকাল আগে মৃত দুটো মানুষের প্রেত মুখোমুখি বসে আছে।'

'ওদিকে তাকাচ্ছ কেন?'

'মাঝে মাঝেই চোখ চলে যাচ্ছে। নে তোর গল্প বল।'

'হুডিনি জন্মেছিলেন বুদাপেস্টে। খুবই এক সুখী পরিবারে। সুখী বলতে তুমি কী বোঝো? ধন, জন, অর্থ, প্রতিপত্তি?'

'না না, সে বয়েস পেরিয়ে এসেছি। কীসে যে সুখ, অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুই বলতে পারিস ভাই?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কর কর, এতদিন করিসনি কেন?'

'শোনো তা হলে, খুব সহজ আবার খুব শক্ত। অন্যাকে সুখী করার মধ্যেই নিজের সুখ। বুঝলে কিছু? সুখ সোজাসুজি জীবনে আসে না। আসতে পারে না। সুখ আসে প্রতিফলিত হয়ে। আলো ঠেকরাবার ক্ষমতা হিরের যদি না থাকত তা হলে হিরে হয়ে যেত কাচ। তুমি কি ভাবো অমিতাভ সুখী?'

'আবার অমিতাভর কথা তুলছিস কেন?'

'তুমি কি ভাবো অমিতাভ হিরে। না। পলকাটা কাচ। অনেক টাকা মাইনে। নামের পেছনে সার সার ডিগ্রি ডিপ্লোমা। তার আলো কিন্তু আমাদের চোখে এসে লাগে না।'

'তুই এক কথা থেকে আর এক কথায় চলে যাচ্ছিস।'

'না। তা যাইনি। হুডিনি কেন অত বড় হতে পেরেছিলেন জানো? সাধনা তো ছিলই। অসীম সাধনা। সবার ওপরে ছিল মাতৃভক্তি। তুমি জানো, হুডিনি ছেলেবেলায় কখনও কাঁদেনি। যে শিশু কাঁদে না সে কেমন শিশু তুমি ভাবতে পারো। মায়ের বুকে মাথা রাখলে, তার আর কোনও দুঃখ থাকত না। সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত। একালের ক'টা ছেলে বাপ-মাকে সুখী করতে পারে বলো। তাই তাদেরও সুখ নেই। সব আছে, নেই কেবল সুখ। তারা কাছে আসতে চায় না। পালাতে চায়।'

'নাঃ, তুই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস। চাল দে।'

'শোনো, শোনো। প্রসঙ্গ অপ্রিয় হলেও শুনতে হয়। হুডিনির যখন জগৎ জোড়া নাম। প্রচুর অর্থ। সঙ্গে সুন্দরী, সহকারী স্ত্রী, মাকে নিয়ে এলেন হামবুর্গে। নিজের কাছে। বৃদ্ধাকে তিনি ভোলেননি। অর্থ, যশ, খ্যাতির নেশায় তিনি অন্ধ হয়ে যাননি। মাকে কাছে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। আর মা কী করতেন? ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বিখ্যাত জাদুকর কান পেতে শুনতেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ দর্শকের হাততালি নয়। মায়ের হৃৎস্পন্দন। যে হৃদয় থেকে তৈরি হয়েছে তাঁর নিজের হৃদয়।'

'শিব, তোকে দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'শোনো দাদা, আমিও হুডিনির মতো আজ রাতে একজনের কাছ থেকে একটা কথা শুনতে চাই।'

'কী কথা? কার কাছ থেকে শুনতে চাস?'

'ধৈর্য ধরে শোনো তা হলে। ছটফট কোরো না। এক-একটা জীবন মানুষকে ভীষণ প্রভাবিত করে। আমার জীবনে হুডিনি সেইরকম একজন মানুষ। তুমি জানো, আমি মাকে ভীষণ ভালবাসতুম। মা ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার হয়ে যেত। আর একজনকে আমি ভীষণ ভালবাসতুম। সে হল আমার স্ত্রী সুধা। সুধার মধ্যে আমার মা বেঁচে উঠেছিলেন।'

'একটু শীত শীত করছে রে। রাত বোধহয় শেষ হয়ে এল।'

'একটা চাদর নেবে?'

'নাঃ, চাদর চাই না। তুই বল।'

'মায়ের মৃত্যুর পর হুডিনি পাগলের মতো হয়ে গেল। আচ্ছা মাতৃভক্তি।'

শিবপদ জোরে নিশ্বাস টানলে। স্তব্ধ হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কোঁচার খুঁটে একবার চোখ মুছল।

'মায়ের কথা মনে পড়ছে? না রে?'

'কেমন মানুষ ছিলেন বলো তো! অমন স্নেহ, অত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম দেখা যায়! বাবা খুব ভাগ্যবান ছিলেন।'

'তুইও ভাগ্যবান। সুধা? সুধা কম কষ্ট করেছে। আজ বেঁচে থাকলে কত সুখী হত। নতুন বাড়িটাও দেখে যেতে পারল না।'

'ওই ভিত প্রতিষ্ঠাটা দেখে গিয়েছিল।'

'অমিতাভর চাকরি?'

'না, সে আর দেখা হল কই।'

'মানুষ কত কী দেখে যেতে চায়! দেখা আর হয় না। শিব, মাকে তোর মনে পড়ে!'

'কী বলছিস? মাকে মনে পড়বে না! চোখ বুজোলেই চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে চোখের সামনে!'

'মা কী করতেন জানিস, বাবাকে লুকিয়ে কুমুর জন্যে নানারকম জিনিস রেঁধে রেঁধে নিয়ে যেতেন। কুমু তখন মা হবে। আমি ভয়ে ভয়ে বলতুম, মা তুমি এসো না। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। মা হাসতেন। কীভাবে কুমুর বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার খুব মেয়ের শখ ছিল। কত প্ল্যান ছিল মাথায়। একটা মা আর মেয়ে সিরিজ করব। শিশু সিরিজ। যাই বল, তোর ভগবান বড় নিষ্ঠুর। তাঁর দয়া আর করুণার ওপর মানুষকে বড় বেশি নির্ভর করতে হয়।'

কৃষ্ণপদ কথা শেষ করে দাবায় একটা চাল দিল। শিবপদ অন্যমনস্ক একবার তাকাল। পিচবোর্ডের বাক্সে তিনটে বেড়ালছানা আর মা খড়খড় করে উঠল। সেই দুপুর থেকে মা-টা সমানে বাচ্চা তিনটেকে দুধ খাইয়ে চলেছে। এর নাম সংসার। এর নাম মায়া।

'শোনো, মায়ের মৃত্যুর সময় হুডিনি ছিলেন ইউরোপে। এত ভালবাসার মাকে শেষ দেখা আর দেখতে হল না। মায়ের কাছে তাঁর ছোট্ট একটা কথা জানার ছিল।'

'কী কথা!'

'হুডিনির এক ভাইয়ের নাম ছিল ন্যাট। তার বউ স্যাডি কী কারণে ন্যাটকে ছেড়ে বিয়ে করে বসল আর এক ভাই লিওপোল্ডকে। বিশ্রী ব্যাপার। কেলেঙ্কারির এক শেষ। অমার্জনীয় অপরাধ। একমাত্র মা যদি বলে যেতেন, লিওপোল্ডকে ক্ষমা করো, তা হলে ক্ষমা করা যেত। মা বলি বলি করেও শেষ কথাটি আর বলে গেলেন না। ম্যাজিশিয়ান হুডিনি হয়ে গেলেন স্পিরিচ্যুয়েলিস্ট হুডিনি। মা মারা গিয়েছিলেন রাত বারোটা পনেরো মিনিটে। রোজ রাত বারোটা পনেরোয় হুডিনি মায়ের কবরের

সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়তেন। দু'হাতে স্পর্শ করে থাকতেন বেদি। আর আকুল হয়ে বলতেন, 'বলো মা, বলো, তোমার না বলা শেষ কথাটি আমাকে বলো।' হুডিনি স্পিরিটে বিশ্বাসী ছিলেন।'

'মানে ভূতে!'

'না, ভূত বললে স্পিরিট শব্দটাকে অপমান করা হয়। স্পিরিট মানে আত্মা। ওই সময় হুডিনির মনে হত শেষ কথাটি মায়ের আত্মা যদি না বলেন, তা হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। ওই সময় বেসের মতো স্ত্রী পাশে না থাকলে হুডিনি সত্যিই পাগল হয়ে যেতেন।'

'আচ্ছা শিব, তুই তখন থেকে হুডিনির কথা বলছিস কেন?'

'তাই তো, কেন বলছি বলো তো! ও মনে পড়েছে, সেই তুমি বললে না, সাত্যকি কেমন মুক্তি পেয়ে গেল। এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ পেতে আত্মার বেশ সময় লাগে। আর মুক্তি, মানে লীন হয়ে যাওয়া. সে কি সহজে হয় দাদা! আমার কী মনে হয় জানো, সুধা এই বাড়িতে এখনও আছে।'

'কী করে বুঝলি?'

'আমার মনে হয়।'

'সে তা হলে তোর মনে আছে। তোর ভালবাসায় মনের কোণে ঠাঁই করে নিয়েছে। বাইরে কোথাও নেই।'

'তা হলে শুনবে? বিশ্বাস করবে কি না জানি না, সন্ধেবেলা স্পষ্ট দেখলুম, লালপাড় শাড়ি পরে কে যেন একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল। নেশা নয়, স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট চোখে দেখা। ঠিক সুধার মতো দেখতে।'

'কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস! তোর ওই বেলগাছটা দেখলে আমার গা ছমছম করে।'

'ভয়ের কী আছে। এ তো আনন্দের।'

'তুই তোর ওই হুডিনির কথা বল। মা কি উত্তর দিয়েছিলেন?'

'মা সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। হুডিনি শেষে একের পর এক মিডিয়ামের কাছে যেতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে কোনান ডয়েলেরও দেখা হয়েছিল। ডয়েলও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতেন। ডয়েল হুডিনিকে বলেছিলেন, আপনি তো ম্যাজিশিয়ান নন, স্পিরিচুয়ালিস্ট। আপনার খেলায় ম্যাজিকের চেয়ে দৈব শক্তিই বেশি। তুমি কি জানো হুডিনিকে কায়দা করে মেরে ফেলা হয়েছিল।'

'সে কী?'

'তলপেটে ঘুসি মেরে অ্যাপেনডিক্স ফাটিয়ে দিয়েছিল।'

'সে কী! মারামারি হচ্ছিল বুঝি?'

'না না, মারামারি নয়। খুব কায়দার ব্যাপার। ঘটনাটা ঘটেছিল আমেরিকার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রেততত্ত্বের ওপর বক্তৃতা শেষ করে ড্রেসিংরুমে বসে চিঠিপত্র দেখছেন। একজন শিল্পী স্যামুয়েল স্মাইলি কিছু দূরে বসে স্কেচ করছেন তাঁকে। এমন সময় গর্ডন হোয়াইটহেড নামে এক ছাত্র এসে তাঁকে প্রশ্ন করল, বাইবেলে যেসব অলৌকিক ঘটনার কথা বলা আছে, সে সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। হুডিনি অন্যমনস্ক একটা উত্তর দিলেন। হোয়াইটহেড শয়তানটা তখন প্রশ্ন করলে. শুনেছি আপনার পেটে যত জোরেই ঘুসি মারা হোক না কেন, আপনার কিছুই হবে না। হুডিনি বললেন, ঠিকই শুনেছ, তবে আচমকা নয়, আমায় প্রস্তুত হবার সুযোগ দিতে হবে। হোয়াইটহেড বললে, আসুন তা হলে, গোটাকতক মেরে দেখি। হুডিনি চেয়ার ছেড়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হোয়াইটহেড আচমকা ঘুসি মারতে শুরু করল। একের পর এক। যন্ত্রণায় জাদুকরের মুখ বেঁকে গেল। অন্য যারা ছিল, তারা হোয়াইডহেডকে ধরে ফেলল। সে তখন উন্মাদের মতো হয়ে গেছে!'

'তারপর?' কৃষ্ণর মুখচোখে উত্তেজনা। ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'ইডিয়েট।'

'তারপর! পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যোগী হুডিনি সেই অবস্থায় সন্ধের শো-তে তাঁর সব খেলাই দেখালেন। রাতটা অসহ্য যন্ত্রণায় জেগে কাটালেন।'

'ডাক্তার?'

'শোনোই না। কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। পরের দিন শনিবার। ওই অবস্থায়, দুপুর আর সন্ধের শো-তে পুরো খেলা দেখালেন। রাতে দলবল নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলেন। যাবেন ডেট্রয়েট। ট্রেন চলতে শুরু করল। স্ত্রী বেসকে বললেন, আমি আর পারছি না। অসহ্য যন্ত্রণা। এতক্ষণ স্ত্রীকেও বলেননি কী হয়েছে। ট্রেনেই প্রথম বললেন। ডেট্রয়েটে ডাক্তার দেখে বললেন, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস। এখুনি হসপিটালে যেতে হবে। হুডিনি বললেন, অসম্ভব! এখুনি হাসপাতালে আমি যেতে পারব না। শো-র সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। দর্শকদের আমি হতাশ করতে পারব না। জীবনের শেষ দুটি খেলা ওই অবস্থায় দেখালেন। ভাবতে পারো তুমি! ফাটা অ্যাপেন্ডিক্স নিয়ে চাইনিজ ওয়াটার-টর্চার সেলের খেলা দেখাচ্ছেন হুডিনি। জানো, সে খেলাটা কী!'

'না। আমাদের যৌবনে হুডিনির নাম মুখে মুখে ঘুরত। বিশ্বের সেরা জাদুকর।'

'তা হলে শোনো।'

॥ নয় ॥

একটা পাখি দু'বার কিচ কিচ করেই থেমে গেল।

কৃষ্ণপদ ঢুলুঢুলু চোখে বললে, 'ভোর হয়ে এল। আমাদের জীবনের একটা বিফল দিন চলে গেল মহাকালের হাতে। কেমন কায়দা করে নিয়ে যায় দেখেছিস! যখন আমরা ঘুমে অচেতন। আজ আমরা জেগে আছি বলে বোঝা গেল। সাত্যকির কী মজা! ওর রেস্ত খালি। তস্কর মহাকাল কিছুই নিতে পারল না।'

শিব দাদার কথায় কান না দিয়ে বললে, 'আমি জানতে চাই। একটা কথা।'

'কী কথা? কার কাছে জানতে চাস। তুই হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেছিস! অন্যরকম। হ্যাঁরে কিছু ভর করেনি তো!'

'হুডিনির মতো আমি সুধার কাছ থেকে একটা কথাই জানতে চাই, ফরগিভ ডোন্ট ফরগিভ।'

'কাকে?'

'অমিতাভকে। আমার একমাত্র পুত্রকে। যার জন্যে আমার জীবনের সব আয়োজন আজ এক উপহাস।'

'তোমার ওই গ্রেট ম্যাজিশিয়ান তো সে উত্তর পাননি তাঁর মায়ের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনি তো প্রেত-তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন।'

'তাই বা বলি কী করে। তাঁর জীবনের শেষটা শোনো। ডেট্রয়েটের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলেছে। অহোরাত্র পাশে বসে আছেন প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী বেস। দীর্ঘকাল আগে বেসের সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি হয়েছিল। তোমাকে আগেই বলেছি, বেস ছিলেন নিউইয়র্কের ফ্লোরাল সিস্টার দলের গায়িকা-নর্তকী। তাঁর একটি গান হুডিনির ভীষণ প্রিয় ছিল,

Rosabelle, Sweet Rosabelle,
I love you more than I can tell;
Over me you cast a spell,
I love you my Rosabelle.'

'গানটা তুই মুখস্থ করে রেখেছিস শিব?'

'জানলে দাদা, বয়েস হলেও স্মৃতি আমার এখনও খুব প্রখর। আমি পুরো হ্যামলেট তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি।'

'আমার স্মৃতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কেন বল তো!'

'ও তোমার মনে হচ্ছে। স্মরণ করার চেষ্টা করলেই স্মরণে এসে যাবে।'

'তা চুক্তিটা কী হয়েছিল?'

'হুডিনি বলেছিলেন, যেই আগে যাক, সেই পরপার থেকে বার্তা পাঠাবে সাংকেতিক ভাষায়। সংকেতটা কী, দশটি মাত্র শব্দ। প্রথম Rosabelle, তার পরের ন'টি শব্দ হল Answer tell pray Answer Look Tell Answer Answer Tell.'

'মানেটা তা হলে কী হল?'

'Rosabelle Believe'

'কী বিশ্বাস করতে হবে?'

'দেহ গেছে; কিন্তু আমি আছি। রবিবার সকালে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে হুডিনি স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, মনে আছে তোমার সেই কোড। আর একবার ঝালিয়ে নাও। আমার যাবার সময় হল। বেস ধীরে ধীরে বলে গেলেন। সন্তুষ্ট হুডিনি দু'মুঠোয় স্ত্রীর হাতটি বুকের ওপর ধরে রেখে চিরবিদায় নিলেন। সুধাও ঠিক ওইভাবেই শেষরাতে চলে গেল। তখন শিশিরের কাল, ঝরা শিউলির কাল। আমি সুধাকে বলেছিলুম, দুটি শব্দ শুধু মনে রাখো, শিউলি শিশির। বড় একা হয়ে গেলুম, কেউ আর রইল না আমার। ওপার থেকে মাঝে মাঝে এই দুটি শব্দে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

'তুই একটা চিরকালের পাগল।'

'আশীর্বাদ করো, যেন প্রকৃত পাগল হতে পারি। সুস্থ মানুষের জগৎ বড় অসুস্থ।'

'হুডিনি কি স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?'

'রাত একটা ছাব্বিশ মিনিটে মারা গিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার রাত একটা ছাব্বিশ মিনিটে বেস নির্জন ঘরে অন্ধকারে ধ্যানে বসতেন। স্বামীর পাঠানো সংকেত ধরার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্রে গিয়ে বসতেন। মিডিয়ামরা কখনও স্বামীর গলায় কথা বলতেন। অন্য খবরাখবর দিতেন। কিন্তু কোথায় সেই সংকেত!'

'তবেই দেখো!'

'আহা উতলা হচ্ছ কেন? সবটা শোনো। পনেরো মাস পরে এক প্রেতচক্রে ভেসে এল হুডিনির মায়ের কণ্ঠস্বর। সেই আদেশ, যে আদেশ শোনার জন্যে হুডিনি রাতের পর রাত মায়ের কবরের পাশে শুয়ে থাকতেন। বললেন, ফরগিভ। লিওকে ক্ষমা করে দাও। চক্রে বেস উপস্থিত ছিলেন না। তাঁকে খবর পাঠানো হল। পরলোকের সঙ্গে হুডিনি পরিবারের যোগাযোগের পথ এতদিনে খুলে গেল। উঠে পড়ে চেষ্টা চলল হুডিনির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের। ন'মাস আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ন'মাস পরে নভেম্বরেব এক রাতে এল সংকেতের প্রথম শব্দ, রোসাবেল। পুরো সংকেত আসতে মোট আটটা অধিবেশনের প্রয়োজন হল। প্রথমে এলোমেলো। পরে ঠিক ঠিক হুডিনি যেমন বলে গিয়েছিলেন, রোসাবেল, অ্যানসার, টেল, প্রে, অ্যানসার, লুক, টেল, অ্যানসার, অ্যানসার, টেল। তার মানে, রোসাবেল বিলিভ। আমি আছি। বিকেলের সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হল, হুডিনি হ্যাড কাম ব্যাক। হি স্টিল লিভড। আফটার লাইফ অ্যান্ড স্পিরিট কমিউনিকেশান হ্যাভ বিন প্রুভড বিয়ন্ড ডাউট।'

কৃষ্ণপদ এতক্ষণ আয়নায় ভাসমান নিজেদের প্রতিচ্ছায়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সশরীরে আর অশরীরে এই যে দু'প্রান্তে অবস্থান সত্য হলেও হতে পারে। জ্ঞানের অভাব, তাই এত সন্দেহ। ঘড়ি পরপর তিনবার শব্দ করল। চারটে বাজল।

শিবপদ চমকে উঠল, 'সুধা ঠিক এই সময়ে চলে গিয়েছিল। নিঃশব্দে। শিশিরের ফোঁটার মতো ঝরে গিয়েছিল। দাদা, সাত্যকির ঘরে গিয়ে একবার বসবে নাকি! দেখাই যাক না কী হয়!'

'আমার তেমন সাহস নেই রে! মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। মৃত আত্মারা প্রায়ই আমাকে ভয় দেখায়। বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখি।'

'তোমাকে আমি বলিনি, বিশ্বাসও হয়তো করবে না। বছরের পর বছর আমার শোবার ঘরের টেবিলে একটা খোলা প্যাড আর খোলা কলম রেখে শুতুম। আর মনে মনে ডাকতুম সুধা তুমি এসো। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি লেখা রয়েছে, শিউলি শিশির। সুধার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম। এক। কোনও তফাত নেই।'

'দেখাতে পারিস?'

'নিশ্চয় পারি। এর মধ্যে কোনও জোচ্চুরি নেই। কেন থাকবে? এ তো আমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার।' শিবপদ উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ একভাবে বসার ফলে পা অসাড় হয়ে গেছে। পা ছাড়াতে গিয়ে দাবার ঘুঁটি উলটে গেল। কৃষ্ণ বললে, 'যাঃ সব চাল নষ্ট করে দিলি।'

'কী খেলাই হচ্ছিল! তার আবার চাল নষ্ট। এবার গুটিয়ে ফেলো। ভোর হয়ে গেছে।'

'বলিস কী! রাত কাবার! আমি তা হলে এবার যাই। পাগলিটাকে একা রেখে এসেছি। কিন্তু শিব, শিব আমার যে আদা দিয়ে এক কাপ গরম চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

'আদা দিয়ে! আদা কি আছে রে দাদা!'

'তাও তো বটে! তোরও তো সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মেয়েরা না থাকলে সংসারটা কেমন যেন হয়ে যায়! আমাদের যখন সবই গেছে, আয় একটা আশ্রম করি!'

'দেখো, দাদা, মনে বৈরাগ্য না এলে আশ্রম হবে বিড়ম্বনা। তার চেয়ে বরং দ্রুত হেঁটে চলে যাওয়াই ভাল।'

'ডিফিটিস্ট। ডিফিটিস্ট মেন্টালিটি। পালাব কেন রে! সহ্য করব। একসময় নবাব ছিলুম মরব ফকির হয়ে। কুছ পরোয়া নেহি। কিন্তু শিব, কে আমাকে পোড়াবে! আমার তো ছেলে নেই!'

শিবপদর পা ছেড়ে গেছে। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথায় পায়চারি করতে করতে বললে, 'অত ভাবার কী আছে! মরার পর আমাদের আর কী ল্যাঠা! তখন পাড়া-প্রতিবেশী বুঝবে! ওই তো সাত্যকি। কী আরামে শুয়ে আছে!'

'সাত্যকির জীবনটা ভাল করে জানা হল না। এত বছর পরে এল। জানিস, ও মনে হয় একজনকে খুন করেছিল! ঠিক খুন নয়। মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।'

'সে আবার কী! খুন করলে পুলিশ ছেড়ে দিত!'

'তা ঠিক। তবে ও সবসময় কেমন যেন একটা আতঙ্কে থাকত। ব্যাপারটা যে কী, স্পষ্ট করে কোনও দিনই আমাকে বলেনি, আমারও সাহস হয়নি জিজ্ঞেস করার, কিন্তু ওর একটা ভীষণ ভয় ছিল। অশনাক্ত কোনও মৃতের ছবি কাগজে দেখলেই ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে যেত। হাত-পা কাঁপত। সে যে কী ভীষণ আতঙ্ক তোকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'যাক, মরে সেই আতঙ্ক থেকে তা হলে মুক্তি পেয়েছে। আমরা কেউই গোয়েন্দা নই, অতএব আমাদের কোনও দায়িত্বও নেই। এ কথা তুমি আর কারওকে বোলো না।'

'আমি মিশি কার সঙ্গে যে বলব! বন্ধু বলতে তো একমাত্র তুই-ই আছিস।'

'চা কি তা হলে চাপাব?'

'চাপা। ভোরের চা-টা খেয়েই যাই। এইবার যেন একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে!'

শিব চা চাপিয়ে একটুকরো আদার জন্যে চারপাশ হাঁটকাচ্ছে। আনাজের ঝুড়িতে জিনিসের অভাব নেই। বিট, গাজর, লঙ্কা, ফুলকপি সবই আছে, গোটা দুই পাতিলেবু। আদারই অভাব। রান্নাঘর থেকে হেঁকে উঠল, 'দাদা, লেবু চা খাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও মন্দ হবে না। এক কাপ জল বেশি নিবি!'

'তুমি দু'কাপ খাবে?'

'না রে! কুমুর জন্যে একটু নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচ্ছি। যেতে যেতে ঠান্ডা হয়ে যাবে না!'

'জোরে পা চালাব।'

'দাঁড়াও, সে ব্যবস্থাও হবে। আমার একটা ফ্লাস্ক আছে।'

'তোকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না। কী করব বল, একা কিছু খেতে গেলেই কুমুর মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জীবনের কত সুখের দিন, কত দুঃখের দিন একসঙ্গে পার করেছি! জীবন এক তীর্থযাত্রা রে শিব! ওই গানটা আমার ভীষণ ভাল লাগে রে, আরও কত দূরে, আছে সে আনন্দধাম। আরও কত দূরে।' কৃষ্ণ একসময় সংগীতের চর্চাও করত। গলা এখনও বেশ আছে। আপনমনে গাইতে লাগল,

> আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥
> রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী
> করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজননী ॥
> অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে
> বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে।
> আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে,
> স্নেহকরপরশনে চিরশান্তি দেহো আনি ॥

কৃষ্ণর দু'চোখের কোল বেয়ে জলের রেখা নেমে আসছে। 'চিরশান্তি দেহো আনি' বলার সময় গলা ধরে আসছে। এ বয়েসে শান্তি ছাড়া আর কী চাইবার আছে সেই পরমপদে। অনেক, অনেক দেখা হয়েছে জীবনে। রং, রূপ, ঐশ্বর্য। ভোগও হয়েছে খুব। আর না। বাড়ি গিয়ে কুমুকে তুলতে হবে ওষুধের নিদ্রা থেকে। দাঁত মাজাতে হবে। শিবের দেওয়া চা খাওয়াতে হবে। আর কপাল থেকে সযত্নে চুল সরিয়ে দিয়ে, এঁকে দিতে হবে গোল একটা সিঁদুরের টিপ। তখন কুমুকে দেখাবে ঠিক দেবীর মতো। কুমুর চোখ দুটো ছিল অসাধারণ। যৌবনে ওই চোখে যার দিকে তাকিয়েছে সেই পাগল হয়ে গেছে। এখনও তাকায়; কিন্তু আগুন নেই। সাত্যকি মারা গেল। বেঁচে থাকলে সত্যিই কি তাকে মনেপ্রাণে ক্ষমা করা যেত! সে অনেক কথা। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। নিজের আগুনও নিবে গেছে। ইন্দ্রিয় হাই তুলছে। তাদেরও ঘুম এসে গেছে।

জেগে থাকার চেষ্টা করেও শেষরাতের দিকে দেবী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরে বাইরের একটা পুরুষকে রেখে ঘুমে অচেতন হয়ে যাওয়ার অনেক ঝুঁকি। যে পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের, সেই পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোবার সাহস দেবীর নেই। ভাল মিষ্টির দোকানের শোকেসের দিকে মানুষ যেভাবে তাকায় দেবীর দিকেও অনেকে সেই একইভাবে চেয়ে থাকে। এত চেষ্টা করেও শরীরে ভাঙন ধরছে না কিছুতেই। বড় সমস্যা। যৌবন যে লকারে যায় না!

দেবী কোনও স্বপ্ন দেখছিল। চমকে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কিছুই যেন মনে পড়ছে না। পাশে তোতা শুয়ে আছে। ঘন চুলের ওপর ফুলের মতো ফুটে আছে তার ঘুমন্ত মুখ। ভোরের সোনালি আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে মশারির যে জায়গায় এসে পড়েছে, সেই অংশটুকুতে যেন সোনার স্বপ্ন আটকে আছে।

একটু একটু করে দেবীর সব মনে পড়ছে। কাল রাতের ঘটনা। তাড়াতাড়ি মেঝের দিকে তাকাল। শশধরকে যেখানে বিছানা করে শুইয়েছিল। এলোমেলো বিছানা। গোটানো পাকানো চাদর পড়ে আছে। মানুষটা নেই। দেবী সাবধানে তোতার পাশ দিয়ে মশারি তুলে নেমে এল। শশধরের কোনও চিহ্ন নেই। সদর দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। বাতাসে দুলছে। শশধর বাইরে থেকে তালা দিয়ে, চাবিটা দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। মেঝেতে এলোমেলো কাদা পায়ের

আর জুতোর ছাপ। নোংরামি দেবী একেবারে সহ্য করতে পারে না। গা জ্বলে যায়। বিছানাটা তার ছুঁতে ইচ্ছে করছে না। যেন মৃতের বিছানা। সারা ঘরে চাপা একটা অপবিত্র গন্ধ। দেবী সবার আগে একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিল। তারপর মুহূর্তে ভেবে নিল কী কী করতে হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দরজা খোলানো। বাইরের লোকের সাহায্য ছাড়া হবে না। রাতে আহত অসহায় মানুষটার জন্যে তার করুণা হয়েছিল। মমতার স্থানে একটা ব্যথা অনুভব করেছিল। এখন ঘৃণার জোয়ার বইছে।

দেবী দুর্গাকে ঘুম থেকে তুলে দিল।

'তুই আগে মেঝের বিছানাটা তোল। তুলে, পেছনের বারান্দায় যেখানে ভাঙা চেয়ারটা আছে সেইখানে রেখে আয় খাড়া করে।'

'ওইখানে রাখব দিদি? নষ্ট হয়ে যাবে না! জলের ছাট আসে।'

'আসুক। তুই রেখে আয়। বিছানা, চাদর, বালিশ সব আমি ফেলে দোব।'

দুর্গা চাদরটা টেনে তুলতেই মেঝেতে একটা ব্যাগ ছিটকে পড়ল। বহুদিন অমিতাচারী একটি মানুষের পকেটে ঘুরে ঘুরে চরিত্রহীনের মতো চেহারা হয়েছে ব্যাগটার।

দেবী বলল, 'ওটা আবার কী?'

উত্তর এল মশারির ভেতর থেকে, 'ব্যাগ মা।'

তোতা কখন উঠে পড়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, বালিশে চিবুক রেখে। খরগোশের মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। তোতার চোখের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য দীর্ঘ আঁখিপল্লব। ছায়ার মতো ঘিরে থাকে চোখ দুটিকে। তোতা খুব আরামে শুয়ে আছে, জ্বর নেই। বিছানা ছেড়ে ওঠার ইচ্ছেও নেই। আজ আর দাদাইয়ের বাগানে মা ফুল তোলার জন্যে যেতে দেবে না।

দেবী বললে, 'ও মা, তুই উঠে পড়েছিস!'

'শশধরকাকু কোথায় মা?'

'কী জানি কখন উঠে চলে গেছে। দুর্গা ব্যাগটা খুলে দেখ।'

দুর্গা ব্যাগটা খুলে উপুড় করল, পনেরোটা পয়সা মেঝেতে পড়ল। সাদা একটা ট্যাবলেট গড়াতে গড়াতে চলে গেল খাটের তলায়।

দেবী বললে, 'ব্যাগটাকে দূর করে ফেলে দে। পাপ।'

রাস্তার দিকের জানলা খুলল। ঘষা কাচের মতো বিশ্রী আকাশ। প্রকৃতি থমকে আছে।

তোতা বললে, 'মা, আজ আর তুমি বেরিয়ো না।'

'আমার যে আর ছুটি পাওনা নেই মা!'

তোতা আবদারের গলায় বললে, 'একটা দিন মা।'

'দাঁড়া বাবা, আগে কাউকে ধরে দরজার তালাটা খোলাই।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। পাশের বাড়ির ঝুমু ছাতা মাথায় দিয়ে দুধ আনতে যাচ্ছিল। দেবী চাবিটা তার হাতে দিয়ে বললে, 'তালাটা খুলে দে তো মা।'

মেয়েটি অনেকক্ষণ চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বললে, 'মাসিমা, চাবি যে লাগছে না।'

'সে কী রে? লাগছে না কী রে? কই চাবিটা দে তো আমার হাতে।'

চাবিটা হাতে নিয়েই দেবী বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী হয়েছে! শশধর যে চাবিটা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে একই রকম দেখতে, কিন্তু অন্য তালার চাবি। একই কোম্পানির তালা। চাবি দেখে বোঝার উপায় নেই। শেষরাতের অন্ধকারে নেশার ঘোরে কী করতে কী করে গেছে!

'ঝুমু তুই যা। চাবি গোলমাল হয়ে গেছে।'

'কী করে এমন হল মাসিমা? আপনারা সবাই ভেতরে, বাইরে তালাচাবি!'

দেবী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। সামান্য ভেবে বললে, 'কেউ বদমাইশি করে লাগিয়ে গিয়ে গেছে।'

ঝুমু দেবীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। দূর থেকে বললে, 'কী করে বেরোবেন?'

দেবীর মুখে চিন্তার ছায়া নামল। সত্যিই তাই, কী করে বেরোবে! একটু পরেই দুর্গাকে দুধ আনতে যেতে হবে। তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা অনেকদিন হারিয়ে গেছে। দেবীর এখন রাগ হচ্ছে! ভীষণ রাগ। শশধর ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। করেছে তাকে বিপদে ফেলার জন্যে। যাতে লোক জানাজানি হয়। যাতে দেবীর বদনাম হয়ে যায়! শয়তান কখনো সাধু হয় না। হতে পারে না।

'দুর্গা কী করি বল তো!'

'তোমার সেই চাবির তাড়াটা বের করো না। একটা না একটা লেগে যাবে।'

'এ তালা সে তালা নয় রে!'

'তা হলে চাবিঅলা ডাকতে হবে।'

'তাকে কি আর সহজে পাওয়া যাবে!'

'সেই চাবিটা তা হলে খোঁজো না আর একবার।'

'একবার তো সারা বাড়ি হাঁটকেছি। পাইনি। তবু দেখি আর একবার।'

তোতা খুকখুক করে হেসে বললে, 'কী মজা, তোমার আজ আর বেরোনো হবে না।'

কৃষ্ণর হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক। কুমুর ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। ঘরের মেঝেতে তারই আঁকা একটা ক্যানভাস যেন উলটে পড়ে আছে। বহুকাল আগে এই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা কুমুর একটা ছবি সে এঁকেছিল। সে ছবি এখন বিদেশে। ছবির কুমুর বয়েস বাড়েনি। এই কুমুর বয়েস বেড়ে গেছে। শরীরের সুন্দর খাঁজ আর ভাঁজ হারিয়ে গেছে।

দরজার তালা খুলে কৃষ্ণ কুমুর মাথার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। বড় নিশ্চিন্ত আরামে বেহুঁশ। মুখে ভোরের আলো এসে পড়েছে। ফাটা সূর্য মেঘ ঠেলে উঠেছে আকাশে। কৃষ্ণ তার ঠান্ডা হাতের তালুটা কুমুর কপালে রাখল। রোজই সে ভাবে, হয়তো আজ একটা অঘটন ঘটে যাবে। কুমু জেগে উঠবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে! এই সামান্য ব্যাপারটা ঘটতে পারে না!

কৃষ্ণ কানের কাছে মুখ এনে ডাকল, 'কুমু, কুমু।' খাড়া নাকে হিরের নাকছাবি যত উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ কি তত উজ্জ্বল!

॥ দশ ॥

সাজানো দাবার ছক মেঝেতে পড়ে আছে। খেলোয়াড়রা উঠে চলে গেছে। কৃষ্ণ চা খেয়েছিল। খালি কাপ পড়ে আছে একপাশে। শিবপদ ভয়ে ভয়ে সাত্যকির ঘরে একবার উঁকি মারল। ছোট্ট পাখির মতো এক চিলতে সোনালি রোদ পশ্চিমের দেয়ালে ডানা মেলে আটকে গেছে। সাত্যকির মৃত মুখ মার্বেল পাথরের মতো সাদা দেখাচ্ছে। খাড়া নাকটাকে মনে হচ্ছে মোমের তৈরি। উত্তাপে গলে যেতে পারে।

ধীরে ধীরে দরজা ভেজিয়ে দিল শিবপদ· শব্দে সাত্যকি চমকে উঠতে পারে। সাজানো দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে, এই কয়েকদিন আগে পড়া হাক্সলির কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল। 'পৃথিবী এক দাবার ছক। আর ঘুঁটি! ঘুঁটি হল বিশ্বের বিচিত্র ঘটনা। খেলার নিয়মটা কী? প্রাকৃতিক নিয়ম। ও পাশে যে খেলোয়াড় বসে আছেন, তিনি অদৃশ্য। আমরা এইটুকু জানি, তাঁর খেলায় জোচ্চুরি নেই। বিচারে ভুল নেই। অসাধারণ তাঁর ধৈর্য। আবার নিজেদের জীবনের মূল্যে এও আমরা জানি, আমাদের সামান্যতম বেচাল তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমাদের অজ্ঞতা তাঁর এতটুকু ক্ষমাও পায় না।'

শিবপদ একে একে কৌটোয় ঘুঁটি পুরে, ছক গুটিয়ে রাখল। জ্ঞানেশ কি তা হলে সত্যিই আসবে না! সামান্য পান দোষ আছে। বলা যায় না, হয়তো বেলা এগারোটায় বিছানা ছাড়বে। শিবপদ একসঙ্গে অনেক কিছু করার ইচ্ছে হচ্ছে। দেবী কাল অত ভিজে কেমন রইল। তোতার জ্বর ছাড়ল কি না? কুমু কাল সারারাত একা ছিল। কিছু হয়নি তো? অমিতাভর কথাও একবার মনে পড়ল। তনুর মুখ উঁকি মেরে গেল মনের জানলায়।

আর বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করতে হয়। কাজ চাই, কাজ। শিব বাথরুমে ঢুকে কোনও ভাবনা আসার আগেই দেবীর শাড়িটা কেচে নিংড়ে ফেলল। উঠে গেল দোতলায়। দোতলার বারান্দায় যেতে হলে অমিতাভর ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সারা ঘরের মেঝেতে ফিনকি ঝিনকি কাচ ছড়িয়ে আছে। উত্তরের জানলার শার্শির একটা কাচ ঝড়ে ভেঙে গেছে। সারারাত সেই ভাঙা অংশ দিয়ে জল পড়েছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। ভাঙা কাচের জলসা এড়িয়ে দরজা খুলে শিবপদ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সামনে মুক্ত আকাশ। মেঘ সরে গেছে। বৃষ্টিধোয়া স্বেদ। গাছের পাতা। নোলকের মতো জল দুলছে ডালে ডালে। দেবীর শাড়িটা ঝোলাতে ঝোলাতে শিবের মনে হল, এখানে মৃত্যু নেই। চারপাশে শুধু তাজা জীবনের আয়োজন।

দেবীর জানলার বাইরে সারি সারি মুখ। অবোধ শিশু আছে, সন্দেহপ্রবণ বৃদ্ধ আছে, কুচুটে মহিলা আছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'কে বদমাইশি করে তালা ঝুলিয়ে গেল!' এ পাড়ায় এমন মন্দ লোক কে আছে। কেউই তাকে দেখেনি। তবে অনুমানে নানা নাম ঘুরে ঘুরে আসছে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে দেবী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। মনে মনে যাঁকে সে স্মরণ করছে তিনি ঈশ্বর নন, শিবপদ। একবার যদি তিনি আসেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মানুষটির প্রতি তার অসীম বিশ্বাস। রোজ রাতে শোবার আগে মনে মনে প্রণাম করে শোয়। শিবপদ তার কাছে মন্দিরের মতো। কীভাবে তাঁর রাত কাটল জানার জন্যে মন ছটফট করছে। অথচ বেরোবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দেবীর ভাবনা হচ্ছে, শশধর আবার টলতে টলতে এসে হাজির না হয়। তা হলে আজই তাকে এ পাড়া ছাড়তে হবে। এ বাড়ি থেকে তাকে ওঠাবার জন্যে বাড়িঅলা নানা ফন্দিফিকির আঁটছে। মাঝে জল বন্ধ করে দিয়েছিল। এ পাড়ার নেতার দাবড়ানিতে আবার জল এসেছে। এইবার চরিত্রের বদনাম দিয়ে একেবারে তুলে না দেয়। তার হাতে হাত মেলাবার লোকের অভাব নেই। কারু অনিষ্ট করার ব্যাপারে বাঙালির উদারতার অভাব হয় না। এইভাবে জোড়া জোড়া চোখের সামনে প্রদর্শনীর প্রাণী হয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? দেশ স্বাধীন হবার পর বেশির ভাগ মানুষেরই কাজকর্ম নেই। যুবকরা বেকার। বৃদ্ধরা অবসর ভোগী। বারোয়ারি পূজা, আর পেছনে লাগা, এ ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে।

দুর্গা জানলাটা একবার বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। সহানুভূতিশীল প্রতিবেশীদের ধাক্কায় আবার খুলে দিতে হয়েছে। তালা খোলার ব্যবস্থার চেয়ে তালা কে দিয়ে গেছে, জানার জন্যেই সকলে আগ্রহী। ভেতরে যাবার উপায় নেই। বারে বারে ডাক পড়ছে। বারবার এক প্রশ্ন, একই উত্তর। বাঁকা মন্তব্য। চাপা হাসি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিধোয়া উজ্জ্বল সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শিবপদ বিভোর হয়ে গিয়েছিল। এই কয়েক দিন আগেই শ্রীমদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুনঃ প্রকাশিত বই, 'ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ' পড়ে শিবপদ পথের ইঙ্গিত পেয়েছে। শুধু উপাসনা নয়, জীবন্তভাবে উপাসনা করতে হবে। উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসাধন। প্রথমে বাহ্য জগতের শোভাসৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভাসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হবে। সেই অভ্যাস, বাইরের সৌন্দর্যে ঈশ্বরের শোভার দর্শন না হলে, সবই শূন্য।

শিবপদ এতই তন্ময় জ্ঞানেশ তিনবার হর্ন দিয়েছে শুনতে পায়নি! জ্ঞানেশ গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করছে 'মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।'

শিবপদর ঘোর কেটে গেল। 'যাই' বলে উত্তর দিলেও জ্ঞানেশের কানে পৌঁছোল না। জ্ঞানেশ কড়া নাড়ছে জোরে জোরে। ঘরের ভেতর দিয়ে আসার সময় শিবপদর কাচের কথা মনে রইল না। ছোট্ট একটা টুকরো পায়ে ঢুকেছে, সে খেয়ালও নেই।

দরজা খুলতেই জ্ঞানেশ বললে, 'খুব দেরি করে ফেলিনি তো মাস্টারমশাই?'

শিবপদর সামনে তাজা একটি তরুণ। সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা ফোলা মুখ। সবে দাড়ি কামিয়েছে। গাল দুটো গোলাপি হয়ে আছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি। চাপা পাজামা। এলোমেলো একমাথা চুল। শিবপদ যেন যৌবনের শিবপদকে দেখছে। একসময় সেও এমনি সুন্দর ছিল। সুধা বলত, কী দেখে আমাকে বিয়ে করলে? তোমার পাশে আমার দাঁড়াতে লজ্জা করে। শিবপদ বলত, তোমার বৈষ্ণব বিনয় রাখো। আত্মীয়-স্বজনরা দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে বলত, হর-গৌরী চলেছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'কী ভাবছেন মাস্টারমশাই?'

শিবপদ চমকে উঠে বললে, 'অতীত।'

'আমি কিন্তু আপনার প্রিয় ছাত্র ছিলুম।'

'এখনও তাই আছ।'

জ্ঞানেশ নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে থমকে গেল, 'এ কী, পা কাটলেন কী করে? রক্ত পড়ছে?

আর তখনই শিবের মনে হল, পায়ের তলার বিশেষ একটা জায়গা ভীষণ জ্বালা করছে।

'কীসে কাটল বলো তো?'

'দেখি বসুন। এই চেয়ারে বসুন।

শিবপদ চেয়ারে বসল। রক্তমাখা পদচিহ্ন পেছনে পড়ে আছে। নিজেই অবাক। হঠাৎ মনে পড়ল দোতলার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফালা ফালা কাচ।

উবু হয়ে বসে জ্ঞানেশ শিবের ডান পায়ের তলাটা পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'কী একটা ফুটে আছে?'

'কাচ ফুটে গেছে।'

'কাচ? বের করা দরকার! পায়ের চাপে ভেতরে ঢুকে গেছে। ওষুধ-বিষুধ কিছু আছে বাড়িতে।'

'তুমি বরং এক কাজ করো। তুমি দেবীকে একবার চট করে ডেকে আনবে?'

'দেবী? ও বুঝেছি।'

জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। দেবীকে সে চেনে। দূর থেকে দেখেছে। পরিচয় হয়নি। মহিলাদের ব্যাপারে তার কোনও দুর্বলতা নেই। একটা জিনিসেই তার দুর্বলতা। গোলাপফুল। বাড়ির ছাদে সারি সারি টব। অসংখ্য গোলাপের রকমারি বাহার। গোলাপ তার হাতে ফোটে ভাল।

দেবীর বাড়ির সামনে জটলা দেখে জ্ঞানেশ ঘাবড়ে গেল। সকলেই জানলায় উঁকি মারছে। হল কী! কেউ আবার গলায় দড়ি দিয়ে বসল না তো? জ্ঞানেশ ভয় পাবার ছেলে নয়। পাড়ায় তার দাপট আছে। রেখে ঢেকে কিছু করে না বলে, সুনামের চেয়ে বদনামই বেশি। যারা খুব কাছের মানুষ তারা জানে জ্ঞানেশ কী ধাতুতে তৈরি।

একটা ছেলে জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল। পেছন থেকে তার কলার চেপে ধরে বেড়ালছানার মতো একপাশে সরিয়ে দিয়ে, আর একজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে হটিয়ে জ্ঞানেশ জানলায় দাঁড়াল। প্রথমেই তাকাল পাখার দিকে। না, কেউ ঝুলে পড়েনি। মরে যাওয়া ব্যাপারটা আজকাল কিছুই নয়। বেলুনঅলার বেলুন ফাটার মতো। ঘরে কেউ নেই।

জ্ঞানেশ চিৎকার করল, 'কে আছেন?'

বেশ ভারী আর দাপটের গলা শুনে দেবী ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল। প্রথমে ভেবেছিল পুলিশ। জ্ঞানেশকে দেখে মুখে হাসি ফুটল, 'আপনি?'

দেবী হাসলেও জ্ঞানেশ হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'মাস্টারমশাই আপনাকে একবার ডাকছেন। পায়ের তলায় কাচ ফুটিয়ে বসে আছেন।'

'সে কী? কিন্তু আমি বেরোই কী করে?'

'কেন?'

'ওই দেখুন না বাইরের দরজায় কে তালা মেরে দিয়ে গেছে রাতের বেলা।'

মিথ্যে বলতে খুব খারাপ লাগছিল দেবীর। সাধারণত সে মিথ্যে বলে না। তা ছাড়া তোতার কাছে তার এই অসত্য ধরা পড়ে যাচ্ছে। তার বড় বড় নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকালেই দেবী যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানেশ বলল, 'একটা হাতুড়ি আর পেরেক দিন।'

'হাতুড়ি নেই যে।'

'শিল নোড়ার নোড়া আছে?'

'তা আছে।'

জ্ঞানেশ জাদুকরের মতো নিমেষে তালা খুলে ফেলল। দরজার সামনে এক গাদা বাচ্চা জড়ো হয়েছিল। তারা হইহই করে উঠতেই জ্ঞানেশ প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল। ঘরে ঢুকে সে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল।

দেবী একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, 'একটু বসুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

বসার আগে জ্ঞানেশ রাস্তার দিকের জানলার পাল্লা দুটো সশব্দে বন্ধ করে দিল। দরজার আড়াল থেকে তোতা ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল। এইমাত্র ফুড খেয়েছে। ওপরের পাতলা ঠোঁটের ধারে ধারে লেগে আছে। ডল পুতুলের মতো এমন সুন্দর মেয়ে জ্ঞানেশ খুব কমই দেখেছে। এ যেন আর এক গোলাপ।

জ্ঞানেশ ইশারায় কাছে ডাকল। তোতা পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এল। দেবী মেয়েকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাচা ফ্রক পরায়। চুল আঁচড়ে, মুখ মুছিয়ে চোখে কাজল টেনে দেয়।

জ্ঞানেশ বললে, 'তোমার নাম কী মা?'

'তোতা।'

'ও তো তোমার ডাকনাম। ভাল নামটা বলো।'

'তাপসী।'

'বাঃ, চমৎকার নাম। কে রেখেছেন?'

তোতা ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে রেখেছে মা?'

দেবী শাড়ি পালটে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললে, 'আমি রেখেছি। আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'মেয়ের উপযুক্ত নাম হয়েছে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেবী চুলের সামনের দিকটায় চট করে দু'বার চিরুনি বুলিয়ে নিল। আলমারি খুলে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস বের করল। জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে বললে, 'নিন চলুন। আমি রেডি।'

তোতার দাড়িটা আদর করে নেড়ে দিয়ে জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, ঈশ্বর যদি তাকে এইরকম একটি মেয়ে দিতেন, তা হলে নাম রাখত অতসী। অতসী আর গোলাপ দুটিই তার প্রিয় ফুল।

গালে আফটার শেভ লোশান ঘষতে ঘষতে অমিতাভ বললে, 'কতদিন তোমার এই গুমোট ভাব চলবে?'

তনু বললে, 'তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে। কোনও ব্যাপারে তুমি তো এতক্ষণ মাথা ঘামাও না।'

'ঘামাতে হচ্ছে। কারণ ব্যাপারটা আমার খুবই ইনসাল্টিং মনে হচ্ছে। হয় তুমি দপ করে জ্বলে ওঠো, নয়তো নিবে যাও। এমন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বোলো না।'

তনুর আর বাদানুবাদে যাবার ইচ্ছে নেই। প্রশ্নটা যখন মেনে নেওয়ার তখন দুর্বল পক্ষকে মেনে নিতেই হবে। অভিনয়ে তেমন রপ্ত নয় বলেই অভিনয় করতে পারছে না। তনু রান্নাঘরে চলে গেল। অমিতাভ ব্রেকফাস্ট সেরে নটার মধ্যে বেরিয়ে যাবে। অফিসের গাড়ি আসবে। আধুনিক রান্নাঘরে আয়োজনের অভাব নেই। আধুনিক ভাষায় এইসব সরঞ্জামকে বলে গ্যাজেটস। তনুর হাসি পাচ্ছে। সাহেব হবার কী করুণ চেষ্টা, এতকাল লাউ সুক্তো ঘণ্ট মুগের ডাল খাবার পর, গ্রিলড, ফ্রিলড, স্মোকড, সিজলড, বেকড, ডিপ ফ্রায়েড, তন্দুর। খাদ্যের শতনাম, আদতে সবই এক, যার নাম বংশবাটি, তারই নাম বাঁশবেড়ে। বাবা ছিলেন স্বদেশি। বাবাকে অবশ্য তনুর তেমন মনে পড়ে না। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি। কিন্তু মা! বাবার আদর্শ মায়ের জীবনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। বড় হওয়া মানে কি সাহেব হওয়া! এই এত প্রাচুর্যের মধ্যে তনু আর অমিতাভকে দেখলেও কি তিনি খুশি হবেন। সব ছেড়ে অনেক অনেক উঁচুতে, প্রায় আকাশের কাছাকাছি দু'জনের বসবাস, স্বার্থপর সুখী দুটি পাখি।

তনু স্যান্ডউইচ বানাতে বানাতে ঠিকই করে ফেলল, অমিতাভ বেরোলেই সেও বেরিয়ে পড়বে। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা শিবপদর কাছে। দুপুরটা মনের আনন্দে কাটিয়ে আসবে তার প্রাণের পরিবেশে। ওইখানেই রাঁধবে ভাত, লাউ দিয়ে মুগের ডাল, পোস্তর বড়া, বড়ির ঝাল। আসন পেতে, ঝকঝকে পেতলের থালায় বৃদ্ধকে খাইয়ে আসবে সামনে বসে। কোনও তাড়া নেই। অমিতাভ আজ ফিরবে দেরিতে। পার্টি আছে।

সারা গায়ে শুকনো তোয়ালে ঘষে অমিতাভ 'ড্রাই মাসাজ' করছে। দেয়ালজোড়া কাচের জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে সবুজ কার্পেটে। উঁচুতলার জীবনের স্বাস্থ্য-সচেতনতা এসেছে অমিতাভর মনে। যোগাসন শুরু হয়েছে। রোয়িং ক্লাবের মেম্বার হবে। সুইমিং-ও বাদ থাকবে না। প্রোটিন, ভিটামিন, নিউট্রিশান এইসব ভাবনাও এসেছে। এখন স্পট জগিং শুরু হয়েছে। এরপর হয়তো ভোরে রাস্তায় নেমে পড়বে। ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার ভয়ংকর রকম উজ্জ্বল তখন সুস্থ শরীরে বাঁচতে হবে অনেক দিন। স্কুলমাস্টারের ছেলে ছিল কোনও এককালে। আর নয়। এখন নতুন জেনারেশানের বীজ বুনবে সে। নতুন ধরনের জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ।

বিশাল বাথরুম। ঠান্ডা জল, গরম জল, বাথটাব। ভাবতে হয় কোনটা কী করবে। শুয়ে স্নান, না দাঁড়িয়ে স্নান। জীবনটাকে এমন সিনেমার মতো কে করে দিলে? ঈশ্বর? দৈব? তা কেন? পুরুষকার। ঈশ্বরভাবনা তার আসে না। মাথাটা যার কম্পিউটারের মতো, তার জন্যে ঈশ্বর নয়। তার জন্যে জগৎ। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ সব কিছু নিয়ে দাপটে বেঁচে থাকা।

ঝকঝকে রুপোলি 'নব' ঘোরাতেই 'শাওয়ারের' মুখ বেয়ে হিস হিস শব্দে তোয়ালে ঘষা গরম শরীরে ঠান্ডা জলের ফিনকি ধারা নেমে এল।

জ্ঞানেশ বললে, 'সুটকেসটা আমার হাতে দিন।'

দেবী বললে, 'এমন কিছু ভারী নয়।'

'হালকা অথবা ভারী, সেজন্যে নয়, আমিও কাজে লাগতে চাই।'

জ্ঞানেশ ছোট্ট বাক্সটা দেবীর হাত থেকে নিয়ে নিল। মেয়েদের দিকে সে ভাল করে কদাচিৎ

তাকায়। তাকাবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। দেবীর হাত থেকে বাক্সটা নেবার সময় ক্ষণিকের জন্যে তার মনে হল, ভদ্রমহিলা অসাধারণ সুন্দরী। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। কেমন একটা বিমুগ্ধতার ভাব এসে গেল মনে। আচ্ছন্ন করে ফেলার মতো অদ্ভুত এক ভাল লাগা। মনের এই অবস্থায় ভাল লাগার বস্তুকে তার প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। জ্ঞানেশের মা বলতেন, যা কিছু সুন্দর তাই ঈশ্বর।

দেবী বললে, 'কী আছে বলুন তো?'

জ্ঞানেশ একটু আনমনা ছিল। কথা কানে যায়নি। বুদ্ধিমানের মতো হেসে জবাব দেবার চেষ্টা করল। দেবীর মুখ দেখে মনে হল, প্রশ্নের উত্তর হাসি হতে পারে না।

দেবী যেন মজা পেয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারলেন না তো? ওটা আমার ফার্স্ট-এড বক্স। সব আছে ওর ভেতর, ছুরি, কাঁচি, তুলো, সিরিঞ্জ।'

'আপনি কি ডাক্তারি পড়েছিলেন?'

'না, সে সুযোগ হয়নি। শখ করে নার্সিং, ফার্স্ট-এড এইসবের ট্রেনিং নিয়েছিলুম রেড ক্রস থেকে।'

'এখন কাজে লাগছে।' জ্ঞানেশ হাসল।

'তা লাগছে। আজকাল ডাক্তারবাবুদের তো ডাকলেই পাওয়া যায় না। তাঁরা আসার আগে একটু থামা দেওয়া যায়।'

বৃষ্টিধোয়া উজ্জ্বল সকাল। পেছনে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে সাইকেল চলেছে শব্দ করে। ব্যস্ত মানুষজন হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কিছু হকার এখনও খবরের কাগজ দেওয়া শেষ করতে পারেনি। তিরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাসের ঝটকা মেরে। প্রায় পাশাপাশি দু'জন হেঁটে চলেছে, দেবী আর জ্ঞানেশ।

কৃষ্ণ কুমুর ঘরে একটা ধূপ জ্বেলেছে। সকালে এইটাই তার প্রাথমিক কাজ। কৃষ্ণ শেষ বয়সে সার বুঝেছে ধার্মিক না হলে এই দুঃখ কষ্ট আর প্রবঞ্চনার পৃথিবীতে বসবাস বড় দুঃখের। সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত রহস্যময় পুরুষটির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করতে পারলে সব কিছু এলোমেলো, লক্ষ্যহীন, বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ এও লক্ষ করেছে, ধূপ জ্বাললে কুমুর আচরণে অদ্ভুত এক পরিবর্তন আসে। কেন আসে, কৃষ্ণ তা জানে না। ধূপ জ্বালামাত্রই কুমু তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দেয়। কেউ যেন আসবে। নববধূ তাই যেন ঘোমটা টেনে প্রস্তুত হয়ে বসল। প্রথমে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ দুলবে আপন মনে বিভোর হয়ে। তারপর মুখ উঁচু করে দেখতে থাকবে ধূপের ধোঁয়া কীভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে সুতোর মতো উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। কোথা থেকে উঠে কোথায় চলেছে। এই সময় বারে বারে সেই গানের লাইনটি মনে পড়ে যায় কৃষ্ণর, 'কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।' কুমুর এই ভাব দেখলে কৃষ্ণর মনে হয় কুমু পাগল নয়, সে এমন একটা কিছু পেয়েছে বা দেখেছে যার ফলে তার মন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। হতে পারে? কুমুর দেহ নিয়ে এত বেশি নাড়াচাড়া হয়েছে, মন সেই অসহ্য উৎপাতে দেহ-ছাড়া হয়ে গেছে। কুমু কিছু একটা ধরেছে। পাছে কেউ তাকে ধরে ফেলে, সেই ভয়ে নিজেই অধরা হয়ে আছে।

কৃষ্ণ এতক্ষণ কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কই, অন্য দিন চোখ দিয়ে এমন জল পড়ে না তো? চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে। কাল রাতে কৃষ্ণ যখন শিবের বাড়িতে ছিল, সেই সময় কুমু কী করেছে কে জানে? একটা জানলা খোলা ছিল। হুহু করে জোলো বাতাস ঢুকেছে।

কৃষ্ণ 'আই ড্রপস'-এর শিশিটা খুঁজে বের করল। এ চোখে দু'ফোঁটা, ও চোখে দু'ফোঁটা। একটু জ্বালা করবে তা করুক। কৃষ্ণ কাছে যেতেই কুমু স্থির দৃষ্টিতে কৃষ্ণর দিকে তাকাল।

সেই সুন্দর দুটি চোখ। যে চোখকে সৌন্দর্যের ব্যাকরণ বলেছে, বাদামচেরা চোখ। কৃষ্ণ বেশ কিছুক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। ভাষা কি ফিরে আসছে? কুমু কি সত্যিই তাকে দেখছে! না। সেই অনির্দিষ্ট তাকানো। যা কোনও বস্তুকে ধরে না। শূন্য দৃষ্টি।

কৃষ্ণ বললে, 'চোখে ঠান্ডা লাগালে কী করে? লাল হয়েছে। জল গড়াচ্ছে।'

কুমু উত্তরে তিনবার হাততালি দিয়ে দুলতে লাগল আগের মতো। কৃষ্ণ পেছনে এসে কুমুর মুখটা উঁচু করে দু'হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরল। কুমু দাঁতে দাঁত চেপে উঁউঁ শব্দ করছে। দু'আঙুল দিয়ে চোখ ফাঁক করে কৃষ্ণ প্রথমে ডান চোখে, তারপর বাঁ চোখে দ্রুত ফোঁটা ফেলে দিল।

কৃষ্ণ এবার স্নান করবে। শরীরের কোথাও তেল ছোঁয়াবার অভ্যাস নেই। স্নানের আগে কাচাকুচি তার নিত্য দিনের কাজ। আলস্যের পথ ধরে আসে নোংরামি। নোংরামির পেছন পেছন আসে দারিদ্র্য। বাড়ি, দেহ সবকিছুই থাকবে মন্দিরের মতো। যে-কোনও কাজ অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে এলে মন আর বেঁকে বসতে পারে না।'

কৃষ্ণ ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিল। এইবার রোদ আসুক, বাতাস আসুক। লাল একটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে ঘরে এসে ঢুকল। কৃষ্ণ শিল্পী। তার চোখ রং-পাগল। প্রজাপতির উজ্জ্বল লাল রঙের দিকে তাকিয়ে মন তার খুশিতে ভরে উঠল। নিমেষে বয়েস কমে গেল পঞ্চাশ বছর। নিজের মনকেই বললে, কত বড় শিল্পী তুমি ঈশ্বর! কার ক্ষমতা আছে পৃথিবীর রং দিয়ে এমন রং মেশায়।

প্রজাপতিটা উড়তে উড়তে কুমুর খোঁপায় গিয়ে বসল। কৃষ্ণর মনে হল খুব শুভ লক্ষণ। কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছে কুমু আবার ভাল হয়ে যাবে। সাত্যকি তার ভাল করতে এসেছিল। সাত্যকির আত্মা তার ভাল করবে। করবেই করবে। মানুষের চেয়ে মানুষের আত্মা আরও শক্তিশালী।

বেশ খুশি খুশি মনে কৃষ্ণ বাথরুমে প্রবেশ করল। মৃত্যুর বিশাল ছায়া সরিয়ে দিয়েছে সামান্য একটা প্রজাপতি। নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'জগতের মূল বস্তুটি কী কৃষ্ণ?'

'আনন্দ।'

সেই আনন্দকে ধরো। প্রজাপতি যেমন ধরেছে ডানায়, ফুল ধরেছে পাপড়িতে। পাখি ধরেছে কণ্ঠে। নদী ধরেছে তরঙ্গে। কৃষ্ণ ভাবতে ভাবতে বিভোর। সারা ভারত ঘুরেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল হিমালয়। তুষার কিরীট ঝলমল করছে রোদে। কলের মুখ থেকে জল পড়ছে ভরা বালতিতে, যেন ঝরনার শব্দ। জীবন মানে কল্পনা। দুঃখের কল্পনায় দুঃখ। সুখের কল্পনায় সুখ।

হেসে যা কৃষ্ণ। প্রাণ খুলে হেসে যা। দেখে যা। গান গেয়ে গেয়ে, নাচতে নাচতে চলে যা।

'বাব্বা, পা-টাকে একেবারে ফালা করে ফেলেছেন!'

দেবীর কোলের ওপর শিবের ডান পা। দেবীর কথা শুনে শিবের মনে একটু হাসি খেলে গেল। স্নেহের তিরস্কার কত মধুর লাগে।

দেবী রাগ রাগ গলায় বললে, 'পায়ের তলায় এত বড় একটা কাচের টুকরো ঢুকে আছে, চলবার সময় একবারও টের পেলেন না? সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিলে এই অবস্থা হত না।'

দেবীর পাশে সহকারীর মতো বসে আছে জ্ঞানেশ। দেবী যা আদেশ করছে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করছে বাধ্য ছেলের মতো।

'দিন, একটু তুলো ছিঁড়ে দিন।'

দেবী এত আত্মমগ্ন, কাকে কী বলছে, কীভাবে বলছে, কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। শিবের পায়ের তলায় বুড়ো আঙুলের মাথা ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী, খচখচ করছে?'

সুড়সুড়ি লেগেছে। পা টেনে নেবার চেষ্টা করতে করতে শিব বললে, 'খচখচ নয়। সুড়সুড়ি লাগছে।'

দেবী ধমকে উঠল, ‘সুড়সুড়ি লাগছে? অথচ এত বড় এক ফালা কাচ ফুটে রইল, সেটা আর বোঝা গেল না?’

‘কী করে বুঝব মা! তখন জ্ঞানেশ যে আমাকে ডাকছিল?’

দেবী সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশকে ধমক লাগাল, ‘ওভাবে মানুষকে ডাকেন কেন?’

জ্ঞানেশ অপরাধীর মতো বললে, ‘কী করব, আমি যে ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছিলুম না।’

‘দেখি ব্যান্ডেজ দিন। কাঁচিটা বের করুন।’

পা ব্যান্ডেজ করতে করতে দেবী বলল, ‘একটা টেট ভ্যাক নিতে হবে।’

‘এ তো বাড়ির কাচ। রাস্তার কাচ হলে ভয় ছিল।’

‘ওসব ফাঁকিবাজি চলবে না। সাবধানের মার নেই।’ জ্ঞানেশের দিকে মুখ ঘিরিয়ে বললে, ‘যান একটা ভ্যাকসিন কিনে আনুন।’

শিব বললে, ‘মনে পড়েছে। এখনও তিন মাস হয়নি। তুমিই দিয়েছিলে।’

দেবী গম্ভীর মুখে বললে, ‘আমার মনে পড়ছে না।’

‘ঠিকই মনে পড়ছে। তুমি আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছ।’

‘চটিটা পায়ে দিয়ে ঘুরতে কী হয়?’

‘বাড়ির চটিটা ছিঁড়ে গেছে যে।’

‘আমাকে বলতে কী হয়।’

কোনও উত্তর না দিয়ে শিবপদ ভালমানুষের মতো মুখ করে বসে রইল। দেবী ব্যান্ডেজে শেষ পাক মারল। কোল থেকে পা নামিয়ে শিব বলল, ‘জ্ঞানেশ, চলো তা হলে, এবার আমরা আমাদের কাজে যাই।’

‘আপনি হাঁটবেন কী করে মাস্টারমশাই?’

‘কেন? তেমন ব্যথা তো হয়নি। সামান্য একটু জ্বালা জ্বালা করছে।’

দেবী বললে, ‘জ্বালা জ্বালা। কী সাংঘাতিক ব্যথা হয় দেখবেন। কাচে কাটা।’

‘সে আর কী করা যাবে। যেতে তো হবেই। আর কতক্ষণ রাখা যায়।’

জ্ঞানেশ বললে, ‘সেই ক্যাশমেমোটা আমাকে দিন। আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি।’

‘তুমি একা যাবে! আর আমি আরাম করে বসে থাকব স্বার্থপরের মতো?’

দেবী বললে, ‘বাড়িতে তো একজনকে থাকতেই হবে। পা না কাটলেও আপনাকে থাকতে হত। জ্ঞানেশবাবুকে আমি ক্যাশমেমোটা দিচ্ছি। উনি সব ঠিক করে আসবেন। ভাববার কিছু নেই।’

দেবী সব জানে কোথায় কী আছে। ক্যাশমেমোটা এনে জ্ঞানেশের হাতে দিল। জ্ঞানেশ উলটেপালটে দেখে বললে, ‘ভদ্রলোক প্রায় দেড়শো টাকার ওষুধ কিনেছিলেন। ওষুধেই বেঁচে ছিলেন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমি তা হলে আসি।’

জ্ঞানেশ বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়িতে স্টার্ট দেবার শব্দ ভেসে এল। দেবী বললে, ‘চা খেয়েছেন?’

‘হ্যাঁ, আমি আর দাদা সারারাত দাবা খেলে কাটিয়েছি। শেষ রাতে চা করেছিলুম।’

‘আর একবার চা খাবার সময় হয়েছে। আমি করে দিচ্ছি।’

‘তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি দুধটা এনে ফেলি।’

দেবী প্রায় ধমকে উঠল, ‘না। দুধ, বাজার, হাঁটা চলা কিচ্ছু আজ চলবে না। খাবার আমি করে আনব। দুধ দুর্গাকে দিয়ে আনাচ্ছি। হ্যাঁ, কাচ কোথায় পড়ে আছে?’

‘দোতলায়। অমিতাভর ঘরে। কালকের ঝড়ে শার্সির একটা কাচ ভেঙে গেছে।’

‘বেশ ঠিক আছে। আপনি আর ওপরে যাবেন না। আমি আসছি। এসে সব পরিষ্কার করব। প্লাস্টিকের বড় খাপ আছে বাড়িতে?’

‘কী করবে?’

'আপনার পায়ে পরিয়ে দেব। তা না হলে এক্ষুনি আপনি ব্যান্ডেজটা ভিজিয়ে ফেলবেন। জল লাগলেই পেকে যাবে।'

'সেরকম কি বাড়িতে কিছু আছে?'

'আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি। যেমন বসে আছেন আপনি সেইরকম বসে থাকুন।'

দেবী বেরিয়ে গেল হনহন করে। শিব স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া মেয়েটির দিকে। পর এইভাবেই আপন হয়। আবার আপন কীভাবে পর হয়ে যায়। সম্পর্ক যেন আকাশ! কখনও তকতকে নীল। কখনও মেঘলা।

অমিতাভ লিফটের বোতাম টিপল। উঠে আসছে লিফট। মাথার ওপর আলো জ্বলছে, নিবছে। অমিতাভর শিস দিতে ইচ্ছে করছে। মনের খাঁচায় একটা সুখ-পাখি ঢুকেছে। লিফট ওপরে চলে গেল। ওপর থেকে নেমে আসছে আবার। শাড়ির আঁচল খসার মৃদু শব্দে দরজা সরে গেল। ভেতরে একজন মাত্র যাত্রী। ব্রিফকেস সামলে ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য সুন্দরী এক মহিলা। ঘাড়-ছাঁটা চুল। পশম কোমল ফিরোজা শাড়ি। করমচা ঠোঁট। ধোঁয়াটে গগলস। লাল নখ। দামি নেশার মতো সেন্টের গন্ধে বাতাসের মূর্ছা। অমিতাভর ভীষণ মন কেমন করছে। সিল্কের শাড়িতে ঢালাই একটি দীর্ঘ শরীর। যেন উলটো বিস্ময় চিহ্ন। নামছে। অমিতাভ ক্রমশই নীচে নামছে! পায়ের তলায় ভাসমান পোস্টকার্ড।

॥ এগারো ॥

লেক মেডিকেল স্টোর্সের পাশে জ্ঞানেশ গাড়ি দাঁড় করাল। পাশেই একটা আঁস্তাকুড়ের ঢিবি। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে হতশ্রী একটা ল্যাম্পপোস্ট। যেখানে বাঙালি সেইখানেই আঁস্তাকুড়। চারপাশে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি। বারান্দায় বারান্দায় ফিনফিনে দামি দামি শাড়ি বাতাসে কাঁপছে। সকলেই উচ্চবিত্ত কিন্তু পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অদ্ভুত উদাসীন।

দোকানে ফ্যাকাশে চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় বহু টাকা এবং বহু অসুখের মালিক। জ্ঞানেশ ক্যাশমেমোটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললে, 'দেখুন তো, এই ডাক্তারবাবুর চেম্বারটা কোথায়?'

রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে চিলের মতো তাকিয়ে জ্ঞানেশের দিকে চোখ তুলে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি পুলিশের লোক?'

'কেন বলুন তো?'

'না, মানে হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছেন? আগে আপনাকে কখনও দেখিনি তো!'

'এই অঞ্চলের সকলকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি সকলকেই চিনি।'

'এই ক্যামমেমোয় যিনি ওষুধ কিনেছিলেন তাঁকে চেনেন!'

'নামে চিনি না, তবে দেখলে চিনতে পারব। আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না, আমি একজন সাধারণ মানুষ। বলুন, ডাক্তাববাবুর চেম্বার কোথায়?'

'এই রাস্তা ধরে আপনি সোজা বেরিয়ে যান। ডানদিকে মোড় নিন। চারটে রাস্তা যেখানে মিলেছে, সেইখানে কোনও দিকে না বেঁকে সোজা গেলেই দুধের ডিপো। ডিপো পেরোলেই চারতলা একটা বাড়ি। সেই বাড়ির নীচে ডক্টর কুণ্ডুর চেম্বার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'হ্যাঁ মশাই কোনও গোলমেলে ব্যাপার নয় তো!'

'না না. ভয় পাবার কিছু নেই।'

ম্যাক্সি পরা একটি মেয়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে দোকানে এসে ঢুকল। বাতাস আর সেন্টের ঝাপটা এসে লাগল জ্ঞানেশের নাকে। আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে জ্ঞানেশ বাইরে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক মৃদু গলায় বললেন, 'খুবই সন্দেহজনক।'

মেয়েটি মৃদু হেসে একটা প্রেসক্রিপশান এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'এক, তিন, পাঁচ।'

ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে প্রেসক্রিপশান নিলেন, চোখ তখনও রাস্তার দিকে। জ্ঞানেশ গাড়িতে স্টার্ট দিল। একটু ব্যাক করে. ডান দিকে কাটিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল সোজা। জ্ঞানেশ আস্তে গাড়ি চালাতে পারে না।

মেয়েটি বলল, 'কী হল, দিন, এক নম্বর, তিন নম্বর, পাঁচ নম্বর।'

ভদ্রলোক বললেন. 'আজকের কাগজ পড়েছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। কেন কী হয়েছে!'

'সাংঘাতিক কোনও খবর আছে কি?'

'না, সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। তবে কাগজটা এখনও ভাল করে পড়া হয়নি।'

ভদ্রলোক আলমারি খুলে ওষুধ বের করতে লাগলেন। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওষুধবিষুধের লাইন ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে।

জ্ঞানেশ ডিপোর পাশে গাড়ি থামাল। ডিপো খোলা। তিনটি মেয়ে হিসেব মেলাচ্ছে। তারের খাঁচার খোপে খোপে খালি বোতল। ফুটপাথে সার সার সাজানো। কৃশ চেহারার একটা বেড়াল ভয়ে ভয়ে চারপাশে ঘুরছে। কাউকে আসতে দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

ডক্টর বি কুণ্ডু। একগাদা টাইটেল। এম বি বি এস ছাড়া সবই দুর্বোধ্য। বেশ সুন্দর চেহারার এক মা তাঁর শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারি করছেন। শিশুটি মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। মা ভোলাবার চেষ্টা করছেন। জ্ঞানেশের গাড়িটা দেখিয়ে বলছেন, 'ওই যে গাড়ি।'

জ্ঞানেশের সঙ্গে মহিলার একবার দৃষ্টি-বিনিময় হল। জ্ঞানেশের মনে হল মহিলাটিকে সে চেনে। কবে কোথায় যেন দেখেছে। ডিসপেনসারির সিঁড়িতে একটা পা রেখে জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, মেয়েটির নাম সুলতা। তার সঙ্গে স্কটিশে পড়ত। জ্ঞানেশ ফিরে তাকাল। আবার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল চোখে চোখে।

জ্ঞানেশ ফিরে এল, 'আপনার নাম কি সুলতা?'

'তুমি জ্ঞানেশ না! বাব্বা কী মোটা হয়ে গেছ তুমি?'

'আর তুমি যে মা হয়ে গেছ!'

জ্ঞানেশ আর সুলতা দু'জনেই হেসে উঠল। কোলের শিশুটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জ্ঞানেশের মুখের দিকে।

সুলতা বললে, 'তুমি কি এইখানেই থাকো?'

'না না, আমি অনেক দূরে থাকি সুলতা। নর্থে।'

'সাতসকালে এখানে কী করতে এসেছ?'

'একটা কাজে এসেছি তোমার এই ডাক্তারবাবুর কাছে। কী হয়েছে এর?'

'আর বোলো না, দাঁত উঠছে।'

'আচ্ছা। কী নাম রেখেছ?'

'কৃশানু।'

'বাঃ, বেশ আধুনিক নাম। তোমার কত্তা কী করেন?'

'ইঞ্জিনিয়ার। হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায় সারা বছর।'

'আহা রে! বড় একা!'

সুলতা সুর করে বললে, 'বড় একা? বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ করেছি।'

তোমার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ সব ভেসে গেল!'

'কী করব বলো, মায়ের জন্যে।'

'সেবাদাসী এনেছ! গাড়ি কিনেছ! বেশ বড়লোক হয়েছ!'

'ব্যাবসাদার গাড়ি ছাড়া অচল। শখের গাড়ি নয়, কাজের গাড়ি।'

'তোমাকে দেখে আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে।'

'আমারও। ছাত্রজীবন আর ফিরবে না সুলতা!'

'নাঃ। তুমি সুখী হয়েছ?'

'দুঃখ-সুখ বোঝার মনটাই নষ্ট হয়ে গেছে! বেঁচে আছি। তুমি সুখী হয়েছ?'

'নাঃ। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে বুড়োটে এক লোকের পাল্লায় পড়ে। কলকবজা মেশিন ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

'তুমি তো খুব সূক্ষ্ম রুচির মেয়ে ছিলে?'

'আমার সব গেছে। এই ছেলেটাকে না পেলে কী যে হত আমার! তোমার বউ কেমন হয়েছে?'

'ওই চলে যায় আর কী, চালিয়ে নিতে হয়।'

'মোটা হলে কী করে? বেশ তো ছিপছিপে ছিলে! মদ ধরেছ বুঝি!'

'সামান্য! এখনও খেতে পারেনি আমাকে! তোমার ডাক্তারবাবু আছেন ভিতরে?'

'দাঁড়াও, অত সহজে তিনি দর্শন দেবেন?'

'কখন আসবেন?'

'আসবেন কী, বলো নামবেন। এই বাড়িটাই তো ডাক্তারবাবুর। তিনি এখন যোগাসন করছেন।'

'আসন শেষ হবে ক'টার সময়?'

'আজ একটু দেরি হচ্ছে। অন্যদিন এইসময় এসে যান। দেরি হয়ে ভালই হচ্ছে, তবু তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যাচ্ছে। আমাদের কলেজের সেই কমনরুমের সামনেটা তোমার মনে পড়ে?'

'তোমাদের আর আমাদের কমানরুম তো আলাদা ছিল!'

'আমাদের দিকটায় তোমরা তো প্রায়ই চলে আসতে! আর একটু পরেই কলেজ শুরু হয়ে যাবে, তাই না জ্ঞানেশ!'

'হ্যাঁ, তা হবে।'

'এখনও বাইবেল ক্লাস হয়?'

'কী জানি সুলতা! বহুকাল আর কলেজের দিকে যাওয়া হয়নি।'

'তুমি রিইউনিয়ানের কার্ড পাও?'

'আগে পেয়েছি কয়েকবার। এখন আর আসে না।'

'বিশ্বাস করো জ্ঞানেশ, এই যে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, আমি সেই বিশাল দেবদারুর পাতায় বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। কল্যাণ যেন দূর থেকে হেঁটে আসছে। এলোমেলো একমাথা চুল। মুখে সেই শিশুর মতো একমুখ হাসি।'

'কল্যাণকে তুমি ভালবেসেছিলে, তাই না সুলতা!'

'বোধহয়।'

'তা হলে ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করলে কেন? তোমার জন্যেই কল্যাণ আত্মহত্যা করেছিল। এ কী, তোমার চোখে জল!'

সুলতা ছেলের বুকে মুখ লুকাল। ফরসা ঘাড়ে আলগা খোঁপা দুলছে। নীল সিল্কের শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছিমছাম সুবেশা এক তরুণী। দেহে সামান্য মেদ আসছে। মুখ আগের চেয়ে ভারী হয়েছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'অতীতের কথা থাক সুলতা। মনে আছে আমাদের প্রিন্সিপাল প্রায়ই বলতেন, ডোন্ট লিভ ইন দি পাস্ট। বর্তমানে ফিরে এসো।'

সুলতা মুখ তুলল। চোখের পাতা ভিজে ভিজে। কপালের টিপ বাঁ পাশে সরে গেছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'টিপটা সেন্টারে নিয়ে এসো। সরে গেছে।'

সুলতা আন্দাজে টিপটা ভুরুর মাঝখানে এনে আঙুল দিয়ে টিপে বসিয়ে দিতে দিতে বললে, 'চলো, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।'

জ্ঞানেশ সিগারেট বের করেছিল। প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল। সেতারের ভুল তারে হাত দিয়ে ফেলেছে। কল্যাণের প্রসঙ্গ এলেও কল্যাণের আত্মহত্যার জন্যে সুলতাকে দায়ী করা ঠিক হল না। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, তার বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। মনে হল, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। হঠাৎ একদিন মৃত্যু হবে। মন থেকে সমস্ত বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার জন্যে জ্ঞানেশ অকারণে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করল।

বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ভেতরে তীর্থের কাকের মতো নানা বয়েসের রুগি ব্যাজার মুখে বসে আছে। ডাক্তার কুণ্ডু সুন্দর স্বাস্থ্যবান সাত্বিক চেহারার মানুষ। দেখে শ্রদ্ধা হয়। জ্ঞানেশ টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল, 'নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমি রুগি নই, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভও নই।'

'তা হলে ইনকামট্যাক্স!' ডক্টর কুণ্ডু হাসলেন।

'আজ্ঞে না, তাও না। আমি একটা খবর নিতে এসেছি।'

'কী খবর?'

'সাত্যকি বোস নামে আপনার কোনও রুগি ছিলেন?'

'সাত্যকি বোস!' ডাক্তারবাবু চোখ বুজিয়ে স্মৃতি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

'এই ক্যাশমেমোটা দেখুন। এটা দেখলে হয়তো মনে পড়তে পারে।'

ডাক্তারবাবু চোখ খুললেন। মুখে মৃদু হাসি। 'মনে পড়েছে। বুঝলেন! সাধারণত রুগিদের আমি ভুলি না, এই ভদ্রলোক অকেশানালি আমার কাছে আসতেন। একটু বোহেমিয়ান টাইপের। আচ্ছা এই ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন? এনি থিং রং?'

'মারা গেছেন।'

'তাই নাকি? যেতেই পারেন। সময় ধার করে বেঁচে ছিলেন। শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। এসব কেস জেনার‍্যালি বাঁচে না।'

'এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মারা গেছেন। ডেডবডি সেইখানেই পড়ে আছে। নিয়ারেস্ট রিলেটিভের সন্ধানে বেরিয়েছি।'

'এখানে ওঁর নিয়ারেস্ট রিলেটিভ হলেন মিস পামেলা বোস।'

'কীভাবে যাব?'

'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। বাড়ির ঠিকানা আমি বলতে পারব না। আই ক্যান গিভ ইউ ডিরেকশান ওনলি।'

পথ নির্দেশ নিয়ে জ্ঞানেশ বেরোতে যাবে, ডাক্তার কুণ্ডু বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেটটাও নিয়ে যান। নয়তো আবার আপনি ফিরে আসবেন।'

'না দেখেই সার্টিফিকেট দেবেন?'

'দেখার দরকার হবে না।'

'খুব ব্লিডিং হয়েছে।'

'হবেই তো, হবেই তো। এসব কেসে সাধারণত তাই হয়। আপনি একটু বসুন, আমি দু'লাইন লিখে দিই।'

ডাক্তারি শব্দে বোঝাই দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে একটা সার্টিফিকেট পকেটে পুরে জ্ঞানেশ উঠে দাঁড়াল। জ্ঞানেশের পেছন পেছন সুলতাও বেরিয়ে এল ফুটপাথে। করুণ মুখে বললে, 'তুমি তা হলে চললে!'

জ্ঞানেশ মৃদু হেসে বললে, 'যাই। ওদিকে একজন মরে পড়ে আছে।'

'অমন অশ্রদ্ধা করে বলছ কেন?'

'অশ্রদ্ধা নয়। মৃত্যু-ফৃত্যু আজকাল আর মনে তেমন দাগ কাটে না। কল্যাণের মৃত্যু...' জ্ঞানেশ ঢোঁক গিলে বললে, 'আই অ্যাম সরি।'

সুলতা বললে, 'আমার ওপর সেই ঘৃণাটা তুমি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছ। কিছুতেই ভুলতে পারছ না। কল্যাণের মৃত্যুর পর তোমরা আমার নাম রেখেছিলে, ডাইনি সুলতা। তোমরা কেউই জানতে না কল্যাণ কেন আত্মহত্যা করেছিল। আমি জানতুম। তোমাদের বলিনি। বলতে পারিনি।'

সুলতা এবার অঝোরে কেঁদে ফেলল। জ্ঞানেশ নিজের ওপর অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললে, 'কেন যে আজ বারে বারে কল্যাণের কথা এসে পড়ছে।'

সুলতা ধরা ধরা গলায় বললে, 'আসুক আসুক, আসতে দাও। তুমি আজ এতদিন পরে অন্তত জেনে যাও কেন কল্যাণ আত্মহত্যা করেছিল! কল্যাণের কুষ্ঠ হয়েছিল।'

'কুষ্ঠ!' জ্ঞানেশ অবাক হল, 'কুষ্ঠ হয়েছিল বলে বোকার মতো আত্মহত্যা করল। চিকিৎসা করে দেখল না সারে কি না?'

সুলতা নির্বাক। দৃষ্টি তার বহু দূরে। আকাশের গায়ে। হঠাৎ এক সময়ে বললে, 'তোমার ঠিকানাটা দেবে যদি আপত্তি না থাকে!'

'আপত্তির কী আছে?'

জ্ঞানেশ মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে সুলতার হাতে দিল।

সুলতা বললে, 'আমার ঠিকানা আর টেলিফোন তুমি লিখে নাও। তোমাকে আমি আসতে বলছি না। বলার স্বাধীনতা নেই। তবু এই বিশাল শহরে ডুবে যখন ভেসে উঠেছি, তখন আবার যেন তলিয়ে না যাই! দুপুরের দিকে তুমি আমাকে ফোন করতে পারো নির্ভয়ে। অবশ্য রবিবার নয়।'

'তুমি দেখছি খুব সেকেলে পরিবারে পড়ে গেছ?'

'ঠিক সেকেলে নয়, আরও সাংঘাতিক। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। সুখ আছে স্বাধীনতা নেই। কো-এডুকেশান কলেজে পড়া মেয়ে। কোথায় কী করে বসে আছি!'

জ্ঞানেশ হাসল, 'নারী স্বাধীনতা কথার কথাই হয়ে রইল? আসলে সেই সোনার খাঁচা। আচ্ছা কল্যাণ তো ক্রিশ্চান ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল?'

'প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের কবরখানায়।'

'সুলতা, আজ আমি তা হলে যাই। সময় সুযোগ মতো ফোন করব। একটার পরে, তাই তো!'

'হ্যাঁ। তোমাকে কখন পাওয়া যাবে?'

'দুপুরে। ধরো একটা থেকে চারটের মধ্যে।'

জ্ঞানেশ গাড়িতে উঠল। এগিয়ে এনে সুলতার পাশে দাঁড় করিয়ে বললে, 'চলো না একদিন দুপুরে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।'

'তুমি ফোন কোরো।'

জ্ঞানেশ গাড়ি ছেড়ে দিল। বাড়ি খুঁজে বের করা যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা সহজ হল

না। এ তল্লাটে বাড়ির নম্বরের কোনও মাথামুন্ডু নেই। একে তাকে বারবার জিজ্ঞেস করে করে জ্ঞানেশ অবশেষে পার্ল গ্রে রঙের ছিমছাম একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে নেম-প্লেট। মিস পামেলা বোস। তারপর একগাদা লেখা। বহু সমিতির নাম সংক্ষিপ্ত করে লাগানো। ফলে দুর্বোধ্য। বোঝার চেষ্টা না করাই ভাল। এতে মানুষের দাম বাড়ে না কমে জ্ঞানেশের জানা নেই।

দরজার মাথায় একটা বোতামের তলায় লেখা আছে 'পুশ'। জ্ঞানেশ আদেশ পালন করল।

ভেতরে যেন দমকলের ঘণ্টা বেজে উঠল। এ ধরনের কলিংবেল পৃথিবীর কোন দেশে তৈরি হয়। রাবণ মনে হয় এক পিস তৈরি করিয়েছিলেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে। রামায়ণী যন্ত্র, খুঁজেপেতে এই বাড়িতে লাগানো হয়েছে। ভেতরে যেন দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বন্যার মতো একঝাঁক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল দরজার দিকে। জ্ঞানেশ ভুল করে কেনেল-ক্লাবে চলে এল নাকি! এক বাড়িতে এত কুকুর। এক-একটার এক-এক রকম ডাক। মোটা, মিহি, মাঝারি।

বন্ধ দরজার ওপাশে কোনও এক মহিলা বললেন, 'শাট আপ।'

মন্ত্রের মতো কাজ হল। সব ক'টা কুকুর একেবারে চুপ। দরজায় একটা ম্যাজিক-আই লাগানো। কী মনে হওয়ায় জ্ঞানেশ চোখ লাগাল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। চোখের সামনে গোটাকতক ফুল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শব্দ করে হেসে উঠল। বিলিতি মিস্ত্রির কাজ। ম্যাজিক আই উলটো করে লাগিয়ে গেছে। ভেতর থেকে দেখতে পাবার কথা। তার বদলে জ্ঞানেশ বাইরে থেকেই সব দেখতে পাচ্ছে। যা ফুল বলে মনে হচ্ছে তা হল স্বাস্থ্যবতী কোনও মহিলার বুকের ওপর উঁচু হয়ে থাকা শাড়ির আঁচলের ডিজাইন।

দরজা খুলে গেল। সামনেই এক মহিলা। জেমস-বন্ড ছবির লাস্যময়ী নায়িকার মতো। দু'ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরা টুকটুকে লাল একটি টুথব্রাশ। একমাথা এলো চুল। পেছন থেকে আলো পড়ে চিকচিক করছে। ধারালো মুখ। ফরসা টুকটুকে গালে ভালবাসার অঞ্জলির মতো তিনটে কি চারটে লাল ব্রণ। বেশভূষা মারাত্মক রকমের এলোমেলো। জ্ঞানেশ কোথায় চোখ রাখবে ঠিক করতে পারছে না। নারী শরীর সহসা তাকে কাবু করতে পারে না। অনেক দিন পরে তার ভেতরটা ওলটপালট হয়ে গেল। ভেতরে অদৃশ্য কোনও ফোয়ারার মুখ যেন খুলে গেছে।

ঠোঁট থেকে ব্রাশ খুলে মহিলা লখনৌ-এর গলায় প্রশ্ন করলে, 'বাতাইয়ে।'

জ্ঞানেশ তিন-চার বার ঢোঁক গিলে বললে, 'পামেলা বোস।'

'হ্যাঁ, হ্যায়। কাঁহাসে আপ আয়ে হেঁ?'

হিন্দিতে সুবিধে করতে পারবে না বলে জ্ঞানেশ ইংরেজিতে চলে গেল, 'ফ্রম হার ব্রাদার, সাত্যকি বোস।'

'প্লিজ কাম ইনসাইড অ্যান্ড বি সিটেড।'

ভদ্রমহিলা যতক্ষণ স্থির ছিলেন ততক্ষণ জ্ঞানেশ যদিও বা নিজেকে সামলে রেখেছিল কোনওরকমে, তাঁর হাঁটাচলার ছন্দে ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। একটু উঁচু করে পরা অতি সূক্ষ্ম শাড়ি। কেন যে অন্তর্বাস নেই। বোধহয় সরাসরি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শরীরের এমন গঠন কদাচিৎ চোখে পড়ে। জ্ঞানেশ মনের চারপাশে একটা বাঁধ তৈরি করেছিল সযত্নে। শক্ত হাতে তৈরি শক্ত সেই বাঁধ সহসা ভেঙে গেল। জ্ঞানেশ বুঝতে পারছে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। আগুনে কাগজ পোড়ার মতো পড়পড় শব্দ হচ্ছে ভেতরে।

'আপ বইঠিয়ে।' বলে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেল। যত দূর দেখা যায় জ্ঞানেশ দেখছে, লম্বা করিডর ধরে ভদ্রমহিলা হাঁটছে। শেষপ্রান্তে একটি খোলা দরজা। দরজার ওপারে খোলা জানলা। জানলার ওপারে আলোমাখা সবুজ গাছের পাতা। ভদ্রমহিলা খোলা দরজা দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। লালাসিক্ত লম্বা জিভের মতো পড়ে রইল ঝকঝকে করিডর। লালসার বিস্তার দেখে জ্ঞানেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বয়ামে প্রাচীন তেঁতুলের আচারের মতো এত পাপও জমা আছে ভেতরে।

সংযমের অহংকার কোথায় ভেসে গেল। কুচো কুচো ফুল ধরানো শাড়ি, কোথাও উঁচু কোথাও বড় বেশি নিচু। একই সঙ্গে মধুর নেশার মতো চোখের সামনে ভাসছে পর্বত আর উপত্যকা।

গোটাপাঁচেক বিভিন্ন মাপের আর জাতের কুকুর এখানে ওখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে অলস ভঙ্গিতে। সব ক'টারই নজর পড়ে আছে জ্ঞানেশের দিকে। কোনও কিছুতে হাত দিলেই ঘ্যাঁক করে উঠবে। কুকুর মানুষের হাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। চোখকে কি পারে! জ্ঞানেশের চোখ আটকে আছে লম্বা করিডরের শেষ প্রান্তে খোলা দরজায়। ওপাশের রহস্যালোকে কী আছে! পামেলা বোস কত পয়সার মালিক? এমন সুন্দর ঝকঝকে নতুন বাড়ি! যেন রাজভবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ!

জ্ঞানেশ চমকে উঠল। দরজা দিয়ে একটা প্যারাম্বুলেটার বেরিয়ে আসছে। ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ামে সকালের আলো ঝিকমিক করছে। যিনি বসে আছেন তাঁর মাথায় এক মাথা বব করা দুধের মতো সাদা ধবধবে চুল। অসম্ভব কচি একটি মুখ।

সেই অবাঙালি ভদ্রমহিলা প্যারাম্বুলেটার ঠেলে আনছেন। কাঁধের দু'পাশ বেয়ে চুল ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। দীর্ঘ দুটি বাহুর সৌন্দর্য পদ্মফুলের ডাঁটাকেও হার মানায় এতই সুললিত। সামনে ঝুঁকে থাকার ফলে শরীরের এমন এক অংশ ফুটে আছে, যার দিকে তাকাবার মতো মনের জোর জ্ঞানেশের নেই। ওই গোলাপি নরম জগৎ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সৃষ্টি স্বার্থপরের মতো তাবৎ মানুষের সীমানার বাইরে এমন এক কাণ্ড করে বসে থাকে, যাকে ধরার জন্যে আকুল হয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে হয়। কী এক নেশা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জ্ঞানেশের দিকে। হঠাৎ জ্ঞানেশের মনে হল, এই বাড়িতে তার আসা শেষ আসা নয়। আবার আসতে হবে। জীবনের ভবিষ্যৎ এক জটিল দিকে মোড় নেবে। নিয়তির হাসি শুনতে পাচ্ছে, বড় স্পষ্ট।

মহিলা সহ প্যারাম্বুলেটার জ্ঞানেশের সামনে হাত দুয়েক তফাতে থামল। অবাঙালি ভদ্রমহিলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁকাল। সমস্ত শরীর নেচে উঠল তালে তালে। কোনও কোনও অংশে সেই কাঁপন ধরা রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জ্ঞানেশ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বৃদ্ধা কচি কচি মুখে জ্ঞানেশকে দেখছেন। জ্ঞানেশের হঠাৎ খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার করল। বৃদ্ধা হাসলেন। এত ছোট ছোট ঝকঝকে দাঁত জ্ঞানেশ কখনও দেখেনি। এক মুখ মুক্তোর মতো হাসির সঙ্গে ঝরে ঝরে পড়ছে। পঙ্গু অথচ কী সুন্দর মানসিক আনন্দে রয়েছেন মহিলা।

'আপনার ভাইয়ের নাম সাত্যকি বোস?'

'সাত্যকি! হ্যাঁ হ্যাঁ, সাত্যকি। সে কোথায়? এই আসে, এই যায়। মানুষ না হয়ে ওর পাখি হওয়াই উচিত ছিল। এমন ডানাঅলা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি!'

বৃদ্ধা ওপর দিকে মুখ তুলে চোখ ঘুরিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে মৃদু গলায় বললেন, 'নীলা গো, গেট ইয়োর বাথ।'

মহিলা মৃদু স্বরে বললে, 'আপ ঠিক হ্যায় তো!'

'হ্যাঁ, বিলকুল ঠিক হ্যায়।'

জ্ঞানেশের দিকে একঝলক তাকিয়ে নীলা চলে গেল ধীর গতিতে। জ্ঞানেশ আর তাকাতে পারছে না। ভেতরটা তার পুড়ে যাচ্ছে। এইভাবে একজন নারী কোনও পুরুষকে সমুদ্রের মতো উদ্বেল করে তুলতে পারে তার ধারণা ছিল না। মানুষ যে সময় সময় এইভাবে প্রার্থনা করতে পারে— তুমি আমায় সম্পূর্ণ নষ্ট করে দাও, তাও জ্ঞানেশের জানা ছিল না। আমি তোমার সঙ্গে নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি।

বৃদ্ধা শিশুর কণ্ঠে হেসে উঠলেন। জ্ঞানেশ চমকে উঠে আত্মস্থ হল।

বৃদ্ধা বললেন, 'আমার সহায়-সম্বল, রাইটহ্যান্ড, নীলা সুব্রাহ্মনিয়াম। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে। স্যোশিওলজিতে ডক্টরেট করেছে। ভীষণ সাহসী। ভীষণ স্মার্ট।'

বৃদ্ধা চোখ বুজিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর চোখ খুলে নেশা নেশা চোখে বললেন, 'আপনি কে?'

কী উত্তর দেবে জ্ঞানেশ ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমি আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এসেছি।'

'দুঃসংবাদ! আমার কাছে কোনও সংবাদই আর দুঃসংবাদ নয়।'

'সাত্যকিবাবু মারা গেছেন।'

বৃদ্ধা ডাইনে বামে ঘাড় ঘোরালেন, তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে জ্ঞানেশের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'যাক, বেঁচে গেছে। হি ওয়াজ এ মিসফিট। সব পুরুষই অপদার্থ, ও ছিল একটু বেশি অপদার্থ। খবরটা শুনে আমি খুব সুখী হলুম। রিয়েলি হ্যাপি। ডোন্ট মাইন্ড, একটা সত্য কথা আপনাকে বলি। বাট হু আর ইউ?'

'আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন। আমার নাম জ্ঞানেশ। সাত্যকিবাবু যে বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ মারা গেছেন, তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। নাম শিবপদ। তাঁর বড় ভাই কৃষ্ণপদ একজন বড় শিল্পী।'

'আই সি। নাম শুনেছি। ইয়াংম্যান, ক্যান ইউ ডু ওয়ান থিং?'

'বলুন।'

'তুমি আমাকে এই চেয়ার থেকে ওই সোফাটায় শিফট করে দিতে পারো! ডোন্ট হেজিটেট। বেশিক্ষণ এটায় বসা যায় না। টেরিবলি আনকমফারটেবল।'

জ্ঞানেশ একটু হকচকিয়ে গেল। বৃদ্ধা খুব দামি একটা গরদের শাড়ি পরে আছেন। দেখলেই বোঝা যায় একসময় পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপ ছিল। ভাবলে চলবে না। জ্ঞানেশ উঠে দাঁড়াল। হাঁটুর তলা দিয়ে সাবধানে হাত ঘুরিয়ে জ্ঞানেশ সাবধানে মহিলাকে তুলে সোফায় ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল। খুব নরম কিন্তু ভীষণ ভারী শরীর। ব্যায়াম করা শরীর না হলে জ্ঞানেশ বিপদে পড়ে যেত। বেশ একটু দমের অভাব বোধ করছে।

বৃদ্ধা বললেন, 'বোসো। আমার এই শারীরিক দুর্ভাগ্যের জন্য অপদার্থ কতকগুলো পুরুষ দায়ী। তবু আমি বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নেই, প্রতি মুহূর্তে নতুন জীবন পাচ্ছি।'

'আধ্যাত্মিক শক্তিতে?'

'নাথিং অফ দ্যাট সর্ট। আই অ্যাম পোলস অ্যাপার্ট ফ্রম স্পিরিচ্যুয়ালিজম। আমার থিয়োরি হল জীবন ভোগের জিনিস। লিভ এ টোট্যাল লাইফ। আই ম্যারেড ফোর টাইমস, অ্যান্ড ওয়াজ ডিভোর্সড ইকোয়াল টাইমস। আমার প্রথম স্বামী একজন নর্তক। ফেমাস ড্যান্সার। হি ওয়াজ মোর এ উওম্যান দ্যান এ ম্যান। দি সেকেন্ড ওয়ান, একজন আই. পি. এস। ব্লক হেডেড ম্যাসকুলাইন। ম্যান উইদাউট টেস্ট। থার্ড ওয়ান বিদেশি অ্যামবাসাডার। এ কস্টলি টয়। ফোর্থওয়ান, এ ক্রিমিন্যাল। সাত্যকি ডিসপোজড হিম অফ ভেরি ক্লেভারলি। তার আর তালাস পাওয়া যাচ্ছে না দীর্ঘকাল। সাত্যকি কিছু একটা করেছিল, তা না হলে সবসময় ও এত ভয় পেত কেন? রাতে ঘুমোতে পারত না। স্লিপিং পিলস ইভন ফেলড। আমি জানি না, ও কী করেছিল, বাট দ্যাট বিজনেস টাইকুন ইজ টোট্যালি লস্ট ফ্রম মাই লাইফ। প্রতিটি ডিভোর্স আমাকে ধনী করেছে। নাও, আই অ্যাম প্যারালিটিক বাট এ ভেরি রিচ প্যারালিটিক। শুধু তাই নয়, আমি একজন ইন্টারন্যাশান্যাল সমাজসেবী! কোনওদিন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড পেলে ডোন্ট বি সারপ্রাইজ। তোমার কৌতূহল হচ্ছে ইয়াংম্যান? শুনতে চাও আমি কী নিয়ে আছি?

॥ বারো ॥

বিশাল কাচের জানলা দিয়ে তনু একবার পশ্চিমে তাকাল। জাহাজের সার সার মাস্তুলের মাথার ওপর নীল আকাশ চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে। একটা চিল অনেকক্ষণ আপন মনে উড়ছে। বহু নীচে একটা বাড়ির সবুজ লন রোদ পোহাচ্ছে। ধবধবে সাদা একটা কাপড় টান টান করে বিছানো।

ঠিক এক ঘণ্টা হল। অমিতাভ বেরিয়ে গেছে। এই সময়টুকু পার করার অপেক্ষায় তনু ছটফট করছিল। টেলিফোনটা রিসিভার থেকে তুলে টেবিলে নামিয়ে রাখল। অমিতাভ হঠাৎ যদি অফিস থেকে ফোন করে, লাইন পাবে না। এই ঝুঁকিটুকু নেবার জন্যে তনু মনে মনে প্রস্তুত। শিবপদর কাছে তাকে আজ যেতেই হবে। আসার সময় অমিতাভর সামনে কোনও কথাই বলা হয়নি। বউরাই কোলে পিঠে মানুষ করা ছেলেকে এক কথায় বের করে নিয়ে যায়। সুখের সংসারে ভাঙন ধরায়। আজ গিয়ে বৃদ্ধ যদি সেইরকম কিছু ভেবে থাকেন, ভুল ভাঙাতে হবে। দোষী বউ নয়, দোষী তাঁর নিজের সন্তান।

দরজা লক করে তনু এল নীচে। শরীরে যেমন পরিবর্তন এসেছে, মনেও এসেছে। একটা অস্থির ভাব। বিষণ্ন মন। মা হবার আগে কী কী হয় তার কিছুই জানা নেই। সব সময় মনে হয়, কেউ তার কাছে থাকুক। প্রাচীন কালের কথা শোনাক। সে যে একা নয়, নিঃসঙ্গ নয় এইটুকু তাকে বুঝতে দেয়। ভীষণ ভয় এসেছে মনে। অকারণ ভয়। ওই বিশাল ফ্ল্যাটে যতক্ষণ একা ছিল, এই ভর সকালেও তার গা ছমছম করছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ তাকে হঠাৎ ছুরি মেরে পালাবে। অমিতাভকেও তার আজকাল ভয় ভয় করছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন জন্তুর মতো মনে হয়। সভ্য খোলসের ভেতরটা সে দেখে ফেলেছে। সেখানে দেবতা নেই। শূন্য দেউল।

বেশ অক্লেশেই তনু একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। চালক বেশ সুদর্শন এবং ভদ্র। মিটার নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন?'

তনু নির্দেশ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আসনে হাত ছড়াতেই আঙুলে কী একটা ঠেকল? চশমা। একটা চশমা পড়ে আছে আসনের পেছন ঘেঁষে। সোনালি ফ্রেম। চশমাটা তুলে নিয়ে চালককে বললে, 'একটা চশমা পড়ে আছে।'

'চশমা?' পেছন দিকে বাঁ হাত ঘুরিয়ে চশমাটা নিলেন।

'কার চশমা? কে ফেলে গেল বলুন তো?'

একটা সমস্যার ইঙ্গিত পেয়ে তনু বেশ উৎসাহিত হল। প্রশ্ন করল, 'আমার আগে কে উঠেছিলেন?'

সামান্য ভেবে ভদ্রলোক বললেন, 'মনে পড়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন, চশমাটা যদি ফেরত দিয়ে আসি? আমি মিটার আপ করে দিচ্ছি। ভাড়া উঠবে না।'

'না না মনে করব কেন? যাঁর চশমা তিনি হয়তো এতক্ষণ অচল হয়ে বসে আছেন।'

'না, অচল ঠিক হবেন না, মাইনাস লেন্স। চশমা ছাড়া লেখাপড়া চলবে।'

গাড়ি ঘুরে গেল ভিন্ন পথে। কোথায় চলেছে কে জানে? তনু নিজেকে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে সময়ের হাতে। চলছে চলুক। একসময় কোথাও না কোথাও পৌঁছোবে। বেশ একটা গতির আমেজ আসছে। কিছুই আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

এ রাস্তা সে রাস্তা করে ট্যাক্সি একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করতে করতে ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'একটু বসুন। আমি চশমাটা দিয়ে আসি।'

তনু দেখছে। বাড়িটা বেশি শান্ত। বিষণ্ন। সাদা রং ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আর একবার রং পড়লে ভাল হয়। বাইরের ঘরের দুটো জানলার একটা খোলা। জানলায় পরদা নেই। পেছনের

আসনে বসে থাকায় তনু ঘরের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। দেয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং সামান্য কাত হয়ে ঝুলছে। ছবিতে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা যত প্রাচীন, ছবিটা তত প্রাচীন নয়। এখনো তেমন অস্পষ্ট ধূসর হয়ে যায়নি। তনু একটু অবাক হচ্ছিল। এই ধরনের ছবিতে সাধারণত বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাকেই দেখা যায়। আলো-আঁধারি ঘর। ছবির যুবক তনুর দিকেই তাকিয়ে আছে। বড় সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ছবিতে যে থাকে সে আর দেহে থাকে না। কত অল্প বয়সে মারা গেছে। এই বাড়ি, এই বারান্দা, আজকের এই সকাল সব ছেড়ে শুধু একটি ছবি। সামান্য কয়েক বর্গফুট স্মৃতি। জীবিত থাকলে দরজায় এসে দাঁড়াত। চোখের পাতা কাঁপত।

দরজা খুলে গেল। প্রসন্ন চেহারার এক প্রবীণা সামনে এসে দাঁড়ালেন। তনু দেখেই চমকে উঠল। এককালের বিখ্যাত গায়িকা। যাঁর ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠানে একসময় ভিড় ভেঙে পড়ত। মায়ের সঙ্গে সেইসব অনুষ্ঠানে তনু কতবার গেছে। এখনও কণ্ঠ হারাননি। তবে যুগ এগিয়ে গেছে। ভক্তিও নেই। ভক্তও নেই।

মহিলা চশমাটি হাতে নিয়ে বললেন, 'ফিরে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। তুমি আমার ছেলের মতো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

তনু আর বসে থাকতে পারল না। নেমে এল। মহিলা স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। চোখ দুটো অল্প চিকচিক করছে।

তনু পা ছুঁয়ে নমস্কার করতেই মহিলা বললেন, 'সুখী হও মা। তুমি কে?'

'আমি যাত্রী। পেছনের আসনের এক পাশে চশমাটা পড়ে ছিল।'

'তুমি আমাকে চেনো মা?'

'খুব চিনি। কত আসরে আপনার গান শুনেছি। আপনার সেই গানটি, আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ, ভোলার নয়। আমার শ্বশুরমশাই আপনার গান শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেন।'

'আমার ভাগ্য মা। এখনও দু'-একজন সমঝদার আছেন।'

ট্যাক্সি চালক অবাক হয়ে গেছেন। 'আপনি গায়িকা?'

'হ্যাঁ বাবা। একসময় আমার গান মানুষে শুনত। এখন ঈশ্বরকে শোনাই নির্জনে।'

ট্যাক্সি চালক পায়ের ধুলো নিতে নিতে বললেন, 'এইবার চিনেছি আপনাকে। আপনার রেকর্ড আমাদের বাড়িতে এখনও আছে, এখনও বাজে। সমান আগ্রহে এখনও আমরা শুনি।'

'তার মানে তোমরা এখনও যথেষ্ট মডার্ন হতে পারোনি। তোমরা এলেই যখন, একটু ভেতরে এসো না। গিরিধারীর প্রসাদ পেয়ে যাও।'

ট্যাক্সিচালক তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি? এ তো আমার সৌভাগ্য।'

ঘরে ঢুকতেই সেকালের বিখ্যাত গায়িকা আশাময়ী সদর দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

'তোমরা কি আমার গিরিধারীকে দেখবে? তোমাদের সে বিশ্বাস আছে, মন আছে? আচ্ছা, তোমাদের দু'জনের নাম জানা হয়নি এখনও।'

ট্যাক্সিচালক বললেন, 'আমার নাম অসীম।'

'আমার নাম তনু।'

তনু উত্তব দিলেও সে তখনও অবাক হয়ে অয়েলপেন্টিং-এর যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী দেখছ মা অমন করে? চিনতে পারলে কে?'

'চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক ধরতে পারছি না। আপনার ছেলে?'

'না রে মা। আমি তো বিয়েই করিনি। উনি হলেন বিখ্যাত গায়ক ডি ভি পালুসকর।'

'ও পালুসকর? কিন্তু মাথায় যে সেই টুপিটা নেই।'

'টুপি ছাড়া একটা ছবি ছিল আমার কাছে, সেই ছবিটা দেখে আমার এক গুণগ্রাহী, বিখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণপদ এই ছবিটা এঁকে দিয়েছেন। বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত শিল্পীর ছবি।'

তনু ছবিটার আরও কাছে এগিয়ে গেল। এক কোণে শিল্পীর স্বাক্ষর 'কৃষ্ণ' এখনও স্পষ্ট। তনু বললে, 'শিল্পীই আমার জাসশ্বশুর।'

'আরে তাই নাকি! কেমন আছেন তিনি! সাংঘাতিক সংগীতপ্রেমী মানুষ। কত রাত কাটিয়ে গেছেন এই বাড়িতে। কত স্মৃতি জমা আছে জানো? প্রতিটি ইটে ইটে সুর। কী আশ্চর্য দেখো, কত দিনের ছিঁড়ে যাওয়া সুতোকে তুমি আজ আবার জুড়ে দিলে?'

এত পরিচ্ছন্ন ঠাকুরঘর তনু আগে কখনও দেখেনি। তকতকে মেঝে। বেদি। বেদির ওপর গিরিধারী। মুখে একটা দুষ্টু-দুষ্টু, মিষ্টি হাসি। তনু মেঝেতে বসে পড়ল। কে যেন জোর করে বসিয়ে দিলে। আশাময়ী তাড়াতাড়ি বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও একটা আসন দিই।'

শ্বাস ভরে ধূপের গন্ধ নিতে নিতে তনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'আসন লাগবে না মা।'

মা সম্বোধনে তার ভেতরটা অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে গেল। আশাময়ী স্থির দৃষ্টিতে তনুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার গিরিধারীর মতো তোমার একটি সন্তান হোক।'

একটু দূরে অসীমও বসে পড়েছে। এই ঘরের পরিবেশে একটা কিছু আছে। একটা চৌম্বক শক্তি। তনুর চোখ বুজে আসছে। গর্ভস্থ সন্তানের সামান্য নড়াচড়াও যেন টের পাচ্ছে। এই আধুনিক বল্গাহীন শহরে সে আর নেই। চাকচিক্যময় নিজের আবাসস্থলের কথা সে ভুলে গেছে। আফটার শেভিং লোশান মাখা অমিতাভর ফোলা ফোলা ভোগী মুখ তার স্মরণে আসছে না। বহু দূরে চলে গেছে তনু। গিরিধারী হাসছেন মনের আকাশে।

ছোট্ট একটি রেকাবিতে একমুঠো ধবধবে সাদা নকুলদানা। আশাময়ী বললেন, 'আর তো আমার বিশেষ কিছু নেই। আমাকে যে একটু কষ্টে রেখেছেন। সে যে আর এক আনন্দ। শূন্য তবু পূর্ণ।'

গোটাকতক নকুলদানা তুলে হাতের মুঠো মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে অসীম বললে, 'আমাকে একটা অনুমতি দেবেন।'

'বলো বাবা।'

'ট্যাক্সি ভাড়াটা আমি ফেরত দিতে চাই।'

'আমি যে ভিক্ষে নিই না বাবা।'

অসীমের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। আশাময়ী কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অসীম নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার সাধনভজন সবই ব্যর্থ হয়েছে।'

তনু চমকে চোখ মেলল। কী বলছেন ভদ্রলোক! কাকে কী বলছেন!

আশাময়ী বললেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি আমার ভেতরটা দেখে ফেলেছ। আহত অহংকার সেখানে কোমর-ভাঙা সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াতে চাইছে বারে বারে। আমার গিরিধারীর বাঁশি নয়, নিজের বাঁশিই শুনছি কেবল। একসময় বড় রাজসিক ছিলুম। সাত্ত্বিক হবার চেষ্টা করছি। থেকে থেকে তামসিকতার কাছে হার মেনে যাচ্ছি।'

অসীম মাথা নিচু করল। 'আমাকে নিজের ছেলের মতো ভাবতে পারলে কখনওই এমন কথা বলতে পারতেন না।'

'কারু কাছে হাত না পাতার এই অহংকারটুকু আমার থাক বাবা, তা না হলে আমার ওই দুষ্টু ছেলেটার শক্তির পরীক্ষা হবে না। তুমি দাও তাই আমার চলে। এমন সময়ও আসে, দু'জনে জল খেয়েই দিন কাটাই। মানুষের ভরসা ছাড়তে না পারলে তাঁর ভরসায় পুরোপুরি বিশ্বাস আসে না। দু'নৌকো নয়, এক নৌকোতেই পা রাখতে হয় বাবা!'

'আমার মুখ দিয়েই যে আপনার গিরিধারী কথা বললেন না, তা বুঝলেন কেমন করে?'

'তুমি নিজেই জানো বাবা, কথা বলছেন তোমার দয়া, তোমার করুণা। তাঁর যে কথা নেই শুধু কাজ আছে। তিনি যে শূন্য পূর্ণ করেন তা এই চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। এ এমন এক নদী যাতে জল নেই কিন্তু জোয়ার-ভাঁটা খেলে।'

'আমি কিন্তু খুব আপন ভেবেই কথাটা বলেছিলুম।'

তনু একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'বেশ করেছিলেন। কেন তর্কাতর্কি করে পরিবেশটা নষ্ট করছেন? কিছুক্ষণ চুপ করে বসুন না। নিজের ভেতরের কথা শুনুন না।'

অসীম ধমক খাওয়া শিশুর মতো তনুর দিকে তাকাল। তেজস্বী মূর্তি। তনু মা হতে চলেছে, তাই যেন রূপ ফেটে পড়ছে। মুখের চামড়া টান টান, উজ্জ্বল। ধারালো নাকে হিরের নাকছাবি। অসীম মাথা নিচু করে আপন মনে বললে, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

আশাময়ী অসীমের মাথার পেছনে হাত রেখে বললেন, 'আজকালকার ছেলেরা সব রাগী বাবু।'

তনু বললে, 'এখুনি আপনি সব রাগ জল করে দিতে পারেন।'

'কীভাবে?'

'হারমোনিয়ামটা বের করে।'

আশাময়ী হাসলেন। মেঝেতে ছোট্ট একটা কার্পেট বিছোতে বিছোতে বললেন, 'শোনো আমি বসছি। যদি সুর একবার লেগে যায়, তোমরা আমাকে থামাবার চেষ্টা করবে না। তোমাদের সময় হলেই উঠে চলে যাবে। আমি কিছু মনে করব না।'

জ্ঞানেশ বললে, 'আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

পামেলা বললেন, 'অ শিয়োর। আমাকেও একটা দিয়ো।'

জ্ঞানেশ দামি সিগারেটই খায়। প্যাকেট খুলে পামেলার দিকে একটা এগিয়ে ধরল। সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে ভদ্রমহিলা বললেন, 'জীবনটাই ধোঁয়া। স্রেফ উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।'

'সত্যিই কি আপনি তাই মনে করেন?'

'না, আমার জীবনটা আমি অন্য নীতিতে চালিয়েছি অ্যান্ড পারশিয়্যালি সাকসেসফুল।'

'সে নীতিটা কী?'

'শুনলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। তবে তোমার ঘৃণা বা শ্রদ্ধায় আমার কিছুই যায় আসে না। সারা জীবন আমি মনে-প্রাণে চেষ্টা করেছি একটা স্ত্রী-মাকড়সা হতে। আকর্ষণ করেছি। আমার ছলাকলার সূক্ষ্ম জালে শিকার কখন আটকে পড়েছে নিজেই জানে না। আমি ধীরে ধীরে একটু একটু করে...।'

শিশুর গলায় মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এই চড়া দিনের আলোতেও জ্ঞানেশের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একভলক ধোঁয়ার আড়ালে মহিলার মুখ। কথা শোনা গেল, 'দ্যাটস অ্যান আর্ট টু স্লোলি কিল এ ম্যান। সব পুরুষই আমার কাছে শিকার। যা শুরু করেছিলুম তা শেষ করে যেতে পারলুম না। ইহলোক। যৌবন বড় ক্ষণস্থায়ী। কী যেন নাম বললে তোমার?

'জ্ঞানেশ?'

'ইয়েস জ্ঞানেশ। মেয়েরা শুধু ভোগের জিনিস, তাই না?'

'তা কেন?'

'শাট আপ, ইউ ফুল। ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু রিড মাই অটোবায়োগ্রাফি? ডু ইউ নো, আয় অ্যাম অ্যান ইন্টারন্যাশান্যালি ফেমাস উওম্যান। পুতনাম আমার আত্মজীবনী ছাপছে।'

নেকড়ে বাঘ দৌড়ে আসার মতো শব্দ হল। স্কিন কালারের একটা সুইমিং কস্ট্যুম পরে নীলা ছুটে আসছে। লম্বা লম্বা সুগঠিত পা। দুটো লম্বা হাত। সুঠাম শরীরের স্পষ্ট আঁক-বাঁক, 'এনি থিং রং এনি থিং রং। আই ওয়াজ ডুয়িং মাই যোগ।'

জ্ঞানেশ মাটির দিকে চোখ ফিরিয়ে রইল। অতিকায় মাকড়সার শিকার ধরা সে দেখেছে।
পামেলা বললেন, 'সরি টু ডিস্টার্ব ইউ, গিভ মি এ সিপ।'
'আর ইউ অলরাইট?'
'ইয়েস, আয় অ্যাম এভার রাইট।'
নীলা পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। সে এক দুঃসহ দৃশ্য। জ্ঞানেশের মনে হল সে এক সম্মোহনী শক্তির পাল্লায় পড়ে গেছে। মহিলার চোখের দিকে যত বার তাকাচ্ছে ততই তার চেতন-শক্তি কমে যাচ্ছে। মনে কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘোলাটে ভাব আসছে। নিজেকে কখনও মনে হচ্ছে পশু, কখনও মনে হচ্ছে ক্রীতদাস। হাতের আঙুলে সিগারেটের আগুনের ছোঁকা লাগতেই চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। নীলা সুব্রাহ্মনিয়াম করিডরের মাঝামাঝি এসে গেছে। হাতে একটা রুপোলি ট্রে। ছোট্ট দুটো স্ফটিকের গেলাসে বিচিলি রঙের তরল পদার্থ তিরতির কাঁপছে। পেছন থেকে আলো এসে পড়েছে দীর্ঘ শরীরে। কপালে চুল পেছনে ধরে রাখার জন্যে সাদা একটা হেয়ার-ব্যান্ড। নীলা এগিয়ে আসছে। কাছে। আরও কাছে।

॥ তেরো ॥

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরো ন কোই ॥
জাকে শির মৌর মুকুট
মেরো পতি সোই।
তাত যাত ভ্রাত বন্ধু
অপনো ন কোই ॥

আশাময়ী চোখ বুজিয়ে গেয়ে চলেছেন আপন মনে। ঘরে আরও দু'জন বসে আছে সে খেয়ালই নেই। অন্য জগতে চলে গেছেন। তনু ভাবছে, জগতের মোড়কে কতরকমের জগৎ আছে! দুঃখ আর আনন্দের মাঝখানে মাকড়সার জালের চেয়েও পাতলা এক পরদা দুলছে। সরালেই সরে সরে যায়। এ যেন এ ঘর থেকে ও ঘরে পা ফেলা!
অসীম কেঁদে ফেলেছে। গাড়ি, স্টিয়ারিং, চাকা, রাস্তা, ধুলো, যাত্রী, ভাড়া নিয়ে খ্যাচাখেচি। প্রতিদিনের এই অন্তঃসারশূন্য বেঁচে থাকায় যেন প্রথম বর্ষার জল পড়ল। একটু আগে রেগে গিয়ে সে আশাময়ীকে যা তা বলেছে। এখন তাঁর পায়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কী করলে কী হয় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। আশাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার বারে বারে মনে হচ্ছে, মানুষ ভগবানের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। সে মানুষের কাছে টাকা, পয়সা, সুখ, দুঃখ, অর্থ, অনর্থ কিছুই কিছু নয়। তার বেঁচে থাকাটা তখন শুধু আনন্দ। সে জীবন তখন বাতাসের মতো বয়ে চলে।
অসীম চোখ বুজলেই সেই দিঘিটা দেখতে পাচ্ছে। তাদের গ্রামের বাড়ির অদূরেই ছিল সেই দিঘি। যার জলে তার মা ডুবে মরেছিলেন এক গ্রীষ্মের দুপুরে। সকলের যখন সন্দেহ হল, সবাই ছুটল দিঘির পাড়ে। অসীমও ছিল সেই দলে। শেষ বেলার ছায়া নেমেছে কালো জলে। ঝিরিঝিরি বাতাস হৃদয়ের ছোট ছোট স্পন্দনের মতো, ঢেউয়ের চেহারায় একের পেছনে আর এক গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে নেচে নেচে চলেছে। এখনও মনে আছে অসীমের, সাদা কালো, ঠিক সাতটা হাঁস পাড়ে উঠে ডানা ঝাড়ছে। কেউ তখনও জানে না গভীরে শুয়ে আছে মৃত্যু ঝাঁজি আর শাপলার দঙ্গলে, অথচ ওপরে কী অপার শান্তি! অসীম সেই দিঘিটা দেখতে পাচ্ছে। সেই সাতটা হাঁস ডানা ঝাড়ছে। গভীর জল থেকে সন্ধের মুখে মায়ের দেহ যখন তোলা হল হাতের ওপর মা যেন ভিজে কাপড়ের

মতো এলিয়ে আছে। সব পাওয়া গেল। কোথাও একটু প্রাণ পাওয়া গেল না। বাবার চরিত্রের কথা ভাবলে তার ভীষণ ভয় করে। তার গাড়িতে বহু রকমের অমানুষ যাত্রী দেখেছে। বাবার মতো অমানুষ এখনও চোখে পড়েনি। তিনি এখন কোথায় আছেন? কেমন আছেন। জীবিত না মৃত! তিন বছর আগে নারকেলডাঙার এক বস্তির ধারে রাস্তার কলে এক বৃদ্ধ জল নিচ্ছিল। পরনে ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি। তার বাবার সঙ্গে দেহের আর মুখের অদ্ভুত মিল। অসীম দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লাল ঘোলাটে চোখে লোকটি দু'বার তাকিয়ে, হাতে একটা ভাঙা প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে হনহন করে বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল। অসীমের ভয় করে। তার চরিত্রেও তো বাবা বসে আছে। অসুস্থ কাম, উদগ্র লালসা নিয়ে। কেমন করে পালাবে অসীম। যেখানেই যাক, ধমনিতে সেই একই রক্তস্রোত।

তনু অসীমের গায়ে আস্তে আঙুলের টোকা মারল। চমকে উঠল অসীম। বহু দূর থেকে ফিরে আসতে হল এক টোকায়। তনু ইশারায় জানাল, এবার উঠতে হবে। আশাময়ী গাইতে গাইতে চোখ মেলে দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলেন। দেখলেন কিন্তু দেখা হল না। অসীম ছলছলে চোখে তনুর দিকে তাকাল। চোখে জল থাকলে মানুষকে কত পবিত্র দেখায়! অসীম ফিসফিস করে বললে, 'টাকা রেখে যাব?'

তনু প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না, না।'

মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে অসীম ধীরে ধীরে দেহটাকে তুলে দাঁড় করাল।

পামেলা বোস রুপোর ট্রে থেকে একটা গেলাস দু'আঙুলে তুলে নিলেন। নীলা ট্রে-টা জ্ঞানেশের সামনে এগিয়ে ধরল। জ্ঞানেশ নীলার মুখের দিকে তাকাল। চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে নীলা ট্রে-টাকে জ্ঞানেশের বুকে প্রায় ঠেকিয়ে দিল। ভাল লাগল না জ্ঞানেশের। কেমন যেন একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভাব! ক্লিওপেট্রার কাল কি এখনও শেষ হয়নি! নীলা বললে, 'টেক ইট, টেক ইট।'

জ্ঞানেশের মোহাচ্ছন্ন আত্মসম্মানবোধ হঠাৎ জেগে উঠল। এইসব পিচ্ছিল মুহূর্তে পায়ের তলায় আস্থার মাটি খুঁজে পাবার একটিই মন্ত্র। নিজেকে প্রশ্ন করা, 'তুমি কে?' 'তুমি কোন বাপ-মায়ের ছেলে?'

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'নো, থ্যাঙ্কস।'

নীলা ব্যালে নর্তকীর ভঙ্গিতে হাত দুয়েক পেছিয়ে গেল। তারপর টান টান সোজা হয়ে বললে, 'ডোন্ট একসাইট হার জেন্টলম্যান।'

পামেলা গেলাস-ধরা হাতে নীলাকে চলে যাবার ইঙ্গিত করতে করতে বললেন, 'ও নো নো, ডোন্ট বি ওরিড, নীলা। হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্টলম্যান।'

নীলা নাচের পুতুলের মতো ঘুরে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে জ্ঞানেশ আর তাকাতে চায় না। কাল রাতেই সে পড়ছিল যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ। আশেপাশে জীবিত মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যাঁদের কাছে গেলে বিক্ষিপ্ত মনকে বশে আনার কৌশল শেখা যায়। বই-ই এখন গুরু। শ্রীরাম বশিষ্ঠকে বলছেন, শিরা কঙ্কালগ্রন্থি ও মাংসময় রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যথার্থ শোভার জিনিস কী আছে? হে জীব! রমণীর খঞ্জননিন্দিত লোচন, চর্ম, মাংস, রক্ত, এইসব বিশ্লেষণ করিয়া দেখো, যদি ওইসব বস্তু রমণীয় হয় তো উহাতে আসক্ত হও, নতুবা অযথা উহাতে আসক্ত হও কেন! এখানে কেশ, ওখানে নখ, সেখানে রক্ত এই সবের সমবায়েই তো রমণীয় শরীর।

পামেলা বোস ইস্পাত কণ্ঠে বললেন, 'কেমন লাগল?'

জ্ঞানেশ চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে?'

'এই যে, যে চরিত্রটা এতক্ষণ আঁকলুম তোমার সামনে। একটি স্ত্রী-মাকড়সা। বুঝলে প্রায় মাঝামাঝি এসে গেছি!'

'কার মাঝামাঝি?'

'আমার উপন্যাসের। বুঝলে, একটা থ্রিলিং, ব্রেদ টেকিং ফিকশান। কোথায় কীভাবে শেষ করব জানি না। রোজ আমি এগারো-বারো স্লিপ টাইপ করি।'

'আপনি কীভাবে এইসব কথা বলছেন জানি না। আপনার ভাই মারা গেছেন। এই দেখুন, আমি কোথা থেকে কোথায় এসে ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করলুম!'

'ইউ আর মাই সান। তুমি আমার ছেলের মতো! আমি তোমার মা হতে পারি না!'

'আমার মা সিগারেট খেতেন না, সাত সকালে মদের গেলাস ধরতেন না।'

'তুমি কি জানো, আদিবাসী রমণীরা ধূম এবং মদ্য দুটিই পান করে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান রমণীরা হুঁকো খেত। টোব্যাকো ওয়াইন দুটোই ট্যাবু হল কখন, যখন অন্য পাপ এসে আমাদের গ্রাস করল। ভাইসেস অফ সিভিলাইজেশান। পবিত্রতা ভেতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। দেবতা থাকেন মন্দিরের ভেতরে, বাইরে নয়। আমি কত সন্তানের মা জানো! মেনি চিলড্রেন নিড মেনি ফ্রেন্ডস। আমাদের একটা অরফ্যানেজ আছে। সারা পৃথিবীতে অনাথ শিশুদের জন্যে আমরা সুখের ঘর খুঁজে বেড়াই। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা। ওই তো দু'পাশের দেয়ালে সার সার ছবি ঝুলছে। যাও না দেখে এসো। মানুষের পরিচয় তার কাজে। আহারে বিহারে নয়।'

'সাত্যকি বসু মারা গেছেন।'

'আবার জন্মাবে আবার মরবে, আবার জন্মাবে আবার মরবে। এজ ওল্ড প্রসেস।'

জ্ঞানেশ রাগের গলায় বললে, 'কাল থেকে মৃতদেহ পাহারা দিয়ে বসে আছেন আমার বৃদ্ধ মাস্টারমশাই।'

'সকলেই তো আমরা আমাদের মৃত্যু আগলে বসে আছি। ইয়াং ম্যান, রেগে যেয়ো না। আমি ইনভ্যালিড। টেকিং মাই টাইম। লেট নীলা ফিনিশ হার ডেলি মর্নিং-কোর। পুশ দ্যাট বাটন।'

কৃষ্ণপদ হুঁ হুঁ করে গান গাইছে, আর স্টেনলেস স্টিলের কড়ায় স্টিলেরই খুন্তি নেড়ে যাচ্ছে। আজ কুমুকে সে সুক্ত খাওয়াবে। হঠাৎ মনে হল গান গাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সাত্যকির কথা মনে পড়ে গেল। দিন দিন মনটা কেমন যেন নিরেট ইটের মতো হয়ে যাচ্ছে। কতরকমের অনুভূতি যে মরে আসছে! এইরকমই হয় বুঝি! শিবকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তোরও কি এইরকম হচ্ছে! কোনও কিছুই আর মনকে স্পর্শ করছে না! কুমুর মতো একটা খেলনা যদি তার জীবনে না থাকত, সারাদিন কী নাড়াচাড়া করত! ভালবাসার কিছু তলানি জীবন নামক এই ঠুনকো গেলাসে এখনও পড়ে আছে। শিবের জীবনে তো কিছুই নেই। ছেলে আর ছেলের বউ খাঁচা খালি করে অন্য খাঁচায় উড়ে গেছে। পূর্ণ শূন্য হয়ে গেলে বড় বেশি শূন্য মনে হয়। নাঃ, শিবটাকে আজ খাওয়াতে হবে। ঘাড় ধরে টেনে এনে জোর করে খাওয়াতে হবে। কোন মৃত্যু মানুষ চিরকাল মনে রাখে? যে অতিথি রোজ আসে, তার কি আর তেমন কদর থাকে! কড়ায় জল ঢালার সময় কৃষ্ণ ভীষণ ভয় পায়। এমন ফ্যাঁস করে শব্দ করে! বেশ একটু পেছিয়ে গিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে চোখ বুজিয়ে কৃষ্ণ জল ঢেলে দিল কড়ায়!

অসীম গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললে, 'কী সুন্দর!'

তনু বললে, 'কী সুন্দর?'

'আপনাদের জীবন! আপনারাও মানুষ। আমিও মানুষ! কত তফাত!'

'কোনও তফাতই নেই। সবই বাইরের। আমি সাততলায় থাকি, আপনি হয়তো একতলায়। আমি একটু বেশি আলো-বাতাস পাই। আপনি একটু কম। আমার মনেও যা আছে, আপনার মনেও তাই আছে।'

অসীম হাসল। তনুর মনে হল, হাসলে অসীমকে আরও বেশি সুন্দর দেখায়। গাড়ি ছুটছে তীব্র গতিতে। অসীম পাকা ড্রাইভার। পথের পাশে একটি মন্দিরের সামনে অসীম হঠাৎ গাড়ি দাঁড়

করাল। কালীমন্দির। তনুকে বললে, 'একটু বসুন। যে টাকাটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, মায়ের পায়ে দিয়ে আসি।'

তনু বললে, 'আসুন।'

তনু চোখ বুজিয়ে মায়ের মূর্তি ভাববার চেষ্টা করল। একঝলক আসার পরই এসে গেল অসীমের হাসি হাসি মুখ। তনু একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।

বোতামে হাত ঠেকানোমাত্রই দূরে কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল। একগাদা চুড়ি-পরা হাত নেচে উঠলে যেমন শব্দ হয়! সব ক'টা কুকুর একসঙ্গে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। পামেলা বোস বললেন, 'সিট ডাউন।' সব ক'টা আবার বসে পড়ল যে যার জায়গায় সামনে পা ছড়িয়ে।

পামেলা বললেন, 'সাত্যকির দেহটাই বুড়িয়েছিল। মনটা ছিল শিশুর মতো। দেবতার পৃথিবী তো এখন শয়তানের পৃথিবী। সাত্যকি এখানকার হিসেব মেলাতে না পেরে সরে পড়ল। হি হ্যাজ ডান দি রাইট থিং। আই উইল সি হিম দেয়ার। শোনো ইয়াংম্যান, তোমাকে এখন কী করতে হবে শোনো!'

জ্ঞানেশ বললে, 'বলুন।'

'নীলার সঙ্গে তুমি আমাদের অরফ্যানেজে যাবে, কেমন?'

'তারপর?'

'সেখান থেকে তুমি আমাদের স্টেশান ওয়াগনটা নেবে। আমাদের সুপরিনটেনডেন্ট ধ্রুবকে নেবে। সোজা চলে যাবে তোমাদের ওখানে। হ্যান্ডওভার দি বডি টু ধ্রুব। বাকিটা তার দায়িত্ব। হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট। তুমি আবার আমাকে প্যারামবুলেটারে শিফট করো। টেক মি টু মাই স্টাডি। লেট মি রাইট এ চিট টু মাই ধ্রুব।'

জ্ঞানেশ পামেলাকে সন্তর্পণে হুইল চেয়ারে বসাতেই পামেলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ও মাই দিস এক্সপেনসিভ ইনভ্যালিডিটি! ইয়াংম্যান, এভরিথিং ইন দিস লাইফ ইজ এ ফার্স! পুশ!'

জ্ঞানেশ হুইল চেয়ার ঠেলতে লাগল। সেই করিডর। ঝকঝকে মেঝে। মুখ দেখা যায়। সদ্য রং করা অফ-হোয়াইট দেয়াল, পামেলা বললেন, 'এই ছবিগুলো তোমাকে দেখতে বলছিলুম। বিদেশি পিতামাতার হাতে আমরা অনাথ শিশুদের তুলে দিই। আফটার প্রপার ভেরিফিকেশান। এ দেশে যাদের কোনও ভবিষ্যৎই নেই, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।'

'স্বদেশি নয় কেন?'

'স্বদেশি?' ছেলেমানুষের গলায় পামেলা হাসলেন, 'এ দেশে যাদের টাকা আছে তারা সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর। আমাকে যেমন অসুখে ক্রিপল করেছে, এ দেশের ধনীদের তেমনি অর্থ ক্রিপল করে দিয়েছে। মেন্টালি দে আর রিটার্ডেড। পুশ, ইয়াংম্যান, পুশ। পুশ মি টু দি এন্ড অফ দি ওয়ার্লড।'

পামেলা দু'হাত দিয়ে মাথার পেছন দিকে রুপোলি চুল ঠেলতে লাগলেন। জালে পড়া মাছের মতো একমাথা ছোট করে ছাঁটা চুল চিকচিক করতে লাগল। হেয়ার লোশানের মিষ্টি দামি গন্ধ জ্ঞানেশের নাকে আসছে। মন কেমন করানো গন্ধ। ভদ্রমহিলার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, কী ভয়ানক ফরসা। গোটা গোটা মুক্তোর মালা করুণ চোখে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে আছে। জীবনের অশ্রুবিন্দু যেন মালা হয়ে গেছে।

জ্ঞানেশ ভেবেছিল করিডর যে ঘরের দরজায় গিয়ে মিশেছে, সেই ঘরেই মহিলাকে নিয়ে যেতে হবে। পামেলা বললেন, 'টার্ন রাইট।'

ডান দিকে ঘুরতেই জ্ঞানেশ মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর একটা বাড়ির নকশা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল। করিডর ঘুরে চলে গেছে জাহাজের ডেকের মতো রেলিং ঘেরা খোলা এক ছাদে। এদিককার দেয়ালের রং আবার হালকা হলুদ। কোথা থেকে গুনগুন করে গানের শব্দ ভেসে আসছে মেয়েলি গলায়।

পামেলা বললেন, 'এবার বাঁ দিকে।'

বেশ বড় মাপের একটি ঘর। প্রচুর আলো বাতাস। একদিকে সেই ডেকের মতো খোলা ছাদ। আর একদিকে বাগান। পরিচ্ছন্ন একফালি সবুজ লন। ঘরে ঢুকতেই সামনের দেয়ালে বিশাল এক অয়েল পেন্টিং। ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জ্ঞানেশ। ছবির নারী তার ভীষণ পরিচিত।

পামেলা বললেন, 'সাত্যকির বন্ধু কৃষ্ণপদর আঁকা।'

জ্ঞানেশ বুঝতে পারল, মহিলা আর কেউ নয়, তাঁরই স্ত্রী। পামেলা বললেন, 'তুমি আমাকে ওই টেবিলে সেট করে দাও।"

ফিকে একটা বাতাস বারকতক পায়চারি করে গেল ঘরে। দেখে গেল সব ঠিকঠাক আছে কি না! টেবিলের ড্রয়ার টানলেন পামেলা। টুংটাং শব্দে ড্রয়ার খুলে গেল। মিউজিক্যাল সিগারেট কেস জ্ঞানেশ দেখেছে। মিউজিক্যাল টেবিল এই প্রথম।

জ্ঞানেশ বললে, 'আমাকে ওই ছাদে যাবার অনুমতি দেবেন?'

'অফকোর্স! বড় লোভনীয় জায়গা। শীতের সকাল আর দুপুর আমার ওইখানেই কাটে। যাও দেখে এসো। আমি ততক্ষণ চিঠিটা লিখি।'

জ্ঞানেশ খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। একপাশের রেলিং ধরে দাঁড়ালে নীচেই কার্পেট-সবুজ-লন। মাছি গোলাপের বেড দিয়ে ঘেরা। সেই গুনগুন গানের শব্দ আরও স্পষ্ট এবার। ওপাশের ঘরের খোলা জানলায় নীলা। মাথার চুলে হেয়ার-ড্রায়ার চালাচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। জ্ঞানেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নাচের মুদ্রার ভঙ্গিতে হাত তুলে জানাল, আসছি।

জ্ঞানেশের ভীষণ হিংসে হচ্ছে। কিছু মানুষ কেন এত সুখে থাকবে! এরা আবার দুঃখের কারবারি! অনাথদের নাথ খুঁজে বেড়ায় সারা বিশ্বে! এই শিশুদের নিয়েই এক সময়ে কাগজে কাগজে খুব হইচই হয়েছিল। সত্য কোথায় কীভাবে চাপা পড়ে আছে, কে আর সরিয়ে দেখছে! জ্ঞানেশ গোয়েন্দা নয়, তবু তার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! বাড়িতে তৃতীয় আর কোনও প্রাণী নেই বলেই মনে হচ্ছে, অথচ চারপাশ এত পরিচ্ছন্ন সুন্দর! এত ঐশ্বর্যই বা এল কোথা থেকে! এ তো পড়তি বড়লোকের অবস্থা নয়, উঠতি বড়লোকের ব্যাপার!

ঝিনঝিন করে টেলিফোন বাজছে। পামেলা বোসের মাথার ওপর সুইস ঘড়ির সুদৃশ্য খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি পাখি। কুক্‌কু, কুক্‌কু করে এগারোবার ডেকে আবার ঢুকে গেল খাঁচায়।

॥ চোদ্দো ॥

শশধরের ভাইয়ের নাম জলধর। যারা ভয় পায় তারা জলো, জলোবাবু বলে ডাকে। যারা তার অশুভকারক বৃত্তের তারা বলে জলোগুন্ডা। পৈতৃক বাড়িটি একতলা। একতলা হলেও বেশ ফলাও। পূর্বপুরুষের অর্থ ছিল। প্রতিপত্তিও ছিল। বাঙালির বোলবোলা সাধারণত উত্তরপুরুষে বর্তায় না। এক পুরুষেই উড়েপুড়ে শেষ হয়ে যায়। বছর দুয়েকের মধ্যে বাড়িটার সংস্কার না হলে একটা পাশ ধসে পড়বে।

জলোর পয়সা আছে। কাঁচা টাকা। যৌথ সম্পত্তিতে ঢালার ইচ্ছে নেই। কয়লা আর সিমেন্টের কারবার ফেঁদেছে। কিছু চামচা পোষে। আর পোষে বাঘের মতো একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। বয়েসের চেয়ে বয়স্ক দেখায়। সূর্য ডোবার পর জলোও ডুবে যায় রঙিন জলে। কিছু করার নেই। পয়সা হল সাপ। ছোবল মারবেই। ছুঁচ হয়ে ঢোকে। ফাল হয়ে বেরিয়ে যায়। বিয়ে করেনি, প্রয়োজনও নেই। সংসার বড় মিনমিনে, ঘিনঘিনে জিনিস। জীবনের স্বপ্ন ছিল ফুটবল-প্লেয়ার হবে।

জার্সি পরে দু'নম্বর ক্লাবের হয়ে কিছুকাল দৌড়োদৌড়ি করেছে মাঠে। প্রতিভার অভাব। গোলপোস্টের কাছে এলেই গোলপোস্ট নাচিয়ে মেয়ের মতো এমন কোমর দোলাত, বল চলে যেত বাইরে। বহু সুযোগ পেয়েছে একটাও গোল করতে পারেনি। সবাই রসিকতা করে বলত, তুমি গোলে বল ঢোকাবার চেষ্টা না করে বলে গোল ঢোকাও। কাগজে একবার ছবিও ছাপা হয়েছিল। স্কোরার বা প্লেয়ার হিসেবে নয়। বাপের পয়সা মেরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। বোম্বে গিয়েছিল বচ্চন হতে। প্রায় সব কাগজেই ছবি ছাপা হয়েছিল। বাবা জলধর, ফিরে এসো। মা মৃত্যুশয্যায়। যা করেছ করেছ। কোনও ভয় নেই। বাবা।

গিয়েছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। ফিরে এল মালগাড়িতে। যে ক'টা টাকা পকেট কেটেছিল, বোম্বে পৌঁছোবার একঘণ্টার মধ্যেই সাফ হয়ে গেল। সব জায়গাতেই দাদারও দাদা আছে। বাবা, মায়ের ই সি জি করাবে বলে টাকার জোগাড় করেছিল। বাবার দাদা হয়ে জলো ঝেড়ে দিয়েছিল। বোম্বের দাদা দু'আঙুলের ভেলকিতে ফাঁক করে দিলে। মালগাড়িতে চোরাই মালের মতো ফেরত আসার পথে জলো চিনেছিল মাল কাকে বলে। কোন মালের কী কদর।

এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন, কালো আর ছাই ছাই সাদা, ফুঁ দিলে ওড়ে না, ফেললে ওড়ে, নাকে গেলে কাশি হয়। হাতে লাগলে খসখস করে। জলে পড়লে জমে যায়।এমন জিনিসের কারবারে লক্ষ্মীলাভ। আর তোমার পথ স্থলপথ নয়, জলপথ। স্টিমলঞ্চ চালাবে। আর প্রতি রাতেই তোমার বউ পালটাবে। কত বড় ভাগ্য তোমার!

বাড়ির পেছন দিকে ভাঙা একটা ঘর। বাঁশের ঠেকনা দিয়ে পূর্বপুরুষের ছাদকে কোনওরকমে অধঃপতনের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরেই জলোর সোনার কারবার। টাকায় টাকা ফলছে। জ্যোতিষী বলেছিলেন জল পড়লে জমে যায়। জলো আর একটু জলবৎ করে নিয়েছে। জমে না, গুলে যায়। বস্তার পর বস্তা গঙ্গা-সিমেন্ট। জলপথেই জলো আছে। পলির কারবার।

চেক চেক লুঙ্গি। স্যান্ডো গেঞ্জি। পায়ের ফুটবল এখন পেটে উঠেছে। ছোটখাটো একটা ডিস্টিলারি। চোখ দুটো কাতলা মাছের মতো। সোনার চেনে সোনা বাঁধানো একটা বাঘনখ ঝুলছে। শত্রুনিধন মন্ত্রে গাঁথা মহামূল্য জিনিস। ঠোঁটে একটা সিগারেট। অন্ধকার অন্ধকার ড্যাম্প ঘরে একশো পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সিমেন্টের গুঁড়ো লেগে মহাদেবের মতো চেহারা হয়েছে বাল্‌বটার। দুটো জোয়ান ছেলে ঘরের মধ্যে বস্তা চালাচালি করছে। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। আগে জলে দুধ মেশাত। এখন দুধে জল। ভেজাল সিমেন্ট ভেজাল সিমেন্ট করে লোকে একেবারে হেদিয়ে মরছে। একটু সাবধান হতে হয়েছে। যারা এক-আধ বস্তার খদ্দের তাদের জন্যে ফর্মুলা আশি-কুড়ি। আর যারা বস্তা বস্তার, তাদের জন্যে চানাচুর। কোনওটা আশি-কুড়ি, কোনওটা চল্লিশ-ষাট, কোনওটা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। আজকাল আবার ছাপোষা কিছু মধ্যবিত্ত, ঘুপচি ঘাপচি হেগোডাঙা, মেগোডাঙা যেখানেই পাচ্ছে সেখানেই একটু খুপরি তুলে বাড়িঅলা হয়ে বসছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, বউয়ের গয়না, ইনশিয়োরেন্সের টাকা সব ভিতে ঢেলে, কলার ফাটা জামা পরে, কচু পোড়া আর ভাতের লাপ্ত খেয়ে, চাতালে বসে আছে জমিদারি মেজাজে। চারপাশে চিল শকুনের মতো পাওনাদার উড়ছে। কেউ ইট সাপ্লাই করেছিল। কেউ বালি। কেউ ঢালাইয়ের লোহা। এইসব অতি সাবধানী খদ্দের সিমেন্টের গুলি বানায়। রাতভর জলে ডুবিয়ে রেখে সকালে মেঝেতে আছাড় মারে। ভেঙে গেলেই তেড়ে আসে। কী বোলচাল! তুলে নিয়ে এসো তোমার বস্তা।

বুকের ওপর এই বাঘনখ পেটে চোলাই আর চোখে বাবা ভোলানাথের দৃষ্টি, আর মামারা হাতে না থাকলে, জলোকেই মামার বাড়ি দেখিয়ে দিত এতদিনে। স্রেফ পুজোপার্বণ আর সন্ধ্যাহ্নিকের জোরে চালিয়ে যাচ্ছে।

জলো কথা বলে আস্তে আস্তে। জড়িয়ে জড়িয়ে। ভাল কথা বলছে, কি গালাগাল দিচ্ছে বোঝার উপায় নেই। চুড়ির শব্দে জলো ফিরে তাকাল! ছ্যাতলা পড়া উঠনে বউদি দাঁড়িয়ে। পায়ের পাতা

আর গোছ চোখে পড়ছে। কাল থেকে জলো ঘাড় উঁচু করতে পারছে না। দাদাকে ঘাড়ধাক্কা আর গোটা দুই আপার কাট মারতে গিয়ে ঘাড়ে খটকা লেগে গেছে। সিমেন্টের বস্তা মাথায় নিয়ে একজন লগবগ লগবগ করছে। জলো তাকে মুখ খারাপ করল। এমন ভাষা, যা কোনও মহিলার সামনে বলা যায় না। শশধরের স্ত্রীও অবশ্য কম যায় না। মুখ যদি একবার খোলে ভলকে ভলকে আগুন বেরোতে থাকে। ফায়ার ব্রিগেডেরও ক্ষমতা নেই থামায়। ওপর থেকে দেখলে যে-কোনও পুরুষই আকৃষ্ট হবে। সুন্দর স্বাস্থ্য। মুখ-চোখ ভাল। বেশ একটা চটক আছে; কিন্তু ভীষণ স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। লোভী, সংকীর্ণ। খুব কাছে এলে দূরে পালাবার জন্যে মানুষ হাঁকপাঁক করবে। পালানো কিন্তু সহজ হবে না। কাঁকড়ার দাড়া। ধরলে নিষ্কৃতি নেই। ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে মন্দ জমেনি।

জলো তার জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'এত বেলা হল, এখনও তো এল না!'

'তাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী?'

'কেন জানি না আমার আজ একটু ভয় ভয় করছে।'

'ভয়! কীসের ভয়! এই দিনের বেলায় তোমার ভয় করছে! হাসালে। যাও যাও চা করে আনো তো এক কাপ।' শশধরের স্ত্রীর নাম গোপা। গোপা শ্যাওলা-ধরা উঠনে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলে গেল। এলোমেলো অগোছালো মহিলা। সকালেই পান খেয়েছে। জলো জর্দার নেশা ধরিয়েছে। গোপার হাঁটাচলার ভঙ্গিতে একটা অসভ্যতা আছে। এ ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। লজ্জা-শরমও কম। কোনওদিন তাকে শুধরে দেবার চেষ্টা করেনি। বরং পুরুষরা গোপার এই দজ্জাল ভাবটা অন্যভাবে উপভোগ করেছে। গোপার চলে যাওয়ার দিকে জলো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। যে শাড়িটা পরে আছে, এবারের পুজোয় সেই শাড়িটা জলোই কিনে দিয়েছিল। গোপা জলোর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হবে। ভেতরে যাবার সময় উঠনের একপাশে পানের পিক ফেলে গেছে। লাল দগদগ করছে।

সিমেন্টের বস্তা গুনতে গুনতে জলোর হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। দাদার সাইকেলের সামনে বসে স্কুলে যাচ্ছে। খেলার মাঠ থেকে পা মচকে ফিরেছিল, দাদা চুন-হলুদ লাগিয়ে দিয়েছিল। দপুরে পাশে বসিয়ে দাদা তাকে অঙ্ক শেখাত। বাবার মৃত্যুর পর নতুন কাপড়ের টুকরোয় চাবি বেঁধে দাদা তার গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসলে, পরীক্ষা করে দেখত কার পাতে মাছের টুকরো বড় পড়েছে। নিজেরটা বড় মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তার পাতে তুলে দিত। দাদার কথা ভেবে জলো কেমন যেন হয়ে গেল। উঠনের একপাশে দাদার সেই সাইকেল। দেয়ালে এলিয়ে আছে। সাইকেল নিয়ে জলো পেছনেব দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। চায়ের কথা আর মনেই রইল না। অতীতের কুয়াশা নেমেছে। মনের আকাশে।

সরু গলি। দু'পাশে আবর্জনার স্তূপ। রাস্তাঘাট আজকাল মানুষের মনের মতোই হয়েছে। মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় বিদেশের পথ ঘাট জনপদের ছবি দেখে জলোর মনটা কেমন যেন করে ওঠে! সুন্দর পরিবেশে, সুস্থ, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন কীভাবে চুরমার হয়ে গেল! নিজেদের বাড়িটারই কী শোচনীয় অবস্থা! শ্যাওলা-ধরা উঠন। যত্রতত্র কাপড়জামা শুকোতে দেবার দড়ি এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। বউদির অন্তর্বাস আর শাড়ি ঝুলেই থাকে। তোলার কোনও গরজ নেই। আসা-যাওয়ার পথে মুখে মাথায় লাগে। মাঝে মাঝে বক্ষবন্ধনী বাতাসে উড়ে মেঝেতে পড়ে থাকে। যেন এইমাত্র কোনও সুন্দরী উন্মোচনী-নৃত্য সেরে সাজঘরে ফিরে গেছে।

সাইকেল নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে জলোর হঠাৎ মনে হল, দাদাকে শেষ করেছে বউদি। কিছু মেয়ে থাকে যারা সংসারের নয়। জন্মগত ত্রুটি। এক-আধ দিন সঙ্গ করা যায়। সংসার করা যায় না। বউদির অশুভ প্রভাব সর্বত্র। একটাই বাঁচোয়া, ছেলেপুলে হল না। হলে কী হত! কে মানুষ করত!

সত্যর চায়ের দোকানে সকালে এক জাতের খদ্দের, রাতে আর এক জাতের। জলো সাইকেল থেকে না নেমে রাস্তায় পা ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা কাল এসেছিল?'

'এসেছিল।'

'খেয়েছিল?'

'খেয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর? দেখো কোন মেয়েছেলের ঘরে গিয়ে পড়ে আছে।'

দোকানে গোটা চারেক আধবুড়ো লোক বসে ছিল। সত্যর কথা শুনে তারা দাঁত বের করে হাসতে লাগল। জলোর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল। অন্য দিন হলে এমন হত না। এতকালের বিকর্ষণে আজ যেন আকর্ষণের জোয়ার লেগেছে। দাদার ক্ষত-বিক্ষত করুণ মুখ চোখের সামনে ভাসছে।

জলো ধীরে ধীরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে ধীর স্থির থাকাই জলোর স্বভাব। তার ভিতরে একটা চিতাবাঘ আছে। প্রয়োজনে জেগে ওঠে। সাইকেলটাকে স্ট্যান্ডে খাড়া করে রাখল। চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে সত্য দাঁত বের করে হাসল। সত্য একসময় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলসম্যানের কাজ করত। চুরির দায়ে চাকরি যায়। সেই পয়সাতেই চায়ের দোকান দিয়েছে। সকালের চেয়ে রাতের রোজগার বেশি।

জলো ধীরে ধীরে দোকানে ঢুকল। পেছন দিক থেকে সত্যর ঘাড়টা খপ করে চেপে ধরল। চায়ের কাপটা উলটে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় কাত হয়ে গেল। সত্যকে পেছন দিকে টেনে এনে জলো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কী বললে? আর একবার বলো। মেরে তোমার থোবনা ঘুরিয়ে দোব। শালা হারামির হাতবাক্স।'

সত্য ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। জলোর দু' আঙুলের প্রচণ্ড চাপে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। জলো একবারই কথা বলেছে। এখন সে নীরব। সত্যকে টানতে টানতে দোকানের বাইরে নিয়ে এসেছে। যারা দাঁত বের করে হাসছিল তারা একে একে সুটসুট করে দোকান থেকে বেরিয়ে পালাল। জলোর একবার মনে হয়েছিল পেছনে পা ঘুরিয়ে কষে একটাকে লাথি মারে। অতি কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করতে হল।

সত্যর মুখটা পাশের নর্দমায় চেপে ধরারই ইচ্ছে ছিল জলোর। নর্দমার মতো মুখে নর্দমার জল ঢুকুক। খানিকটা নাকানি-চোবানি হোক।

সত্য অতি কষ্টে বললে, 'ক্ষমা করে দাও। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।'

জলো শীতল গলায় বললে, 'তুমি আমার দাদার চরিত্র জানো?'

'জানি।'

ঘাড়ে ঝাঁকানি মেরে জলো বললে, 'কী জানো!'

'ওই সুন্দরী বিধবাটার পেছন পেছন ঘুরছে, কে না জানে!'

'কোন বিধবা?'

'ওই যে দেবী যার নাম। যার স্বামী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল।'

'কে বলেছে?'

'সবাই জানে। তুমিও জানো।'

সকালের রাস্তা। লোক জড়ো হয়ে গেছে। সবাই দেখছে। এরপর প্রশ্ন শুরু হবে। পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে সকলের সামনে। জলো দেবীকে চেনে। দাদা ও বাড়িতে যায় আসে, তাও জানে। শেষ ঝাঁকানি মেরে সত্যর ঘাড় ছেড়ে দিল। সত্য টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামনে নিল। ঘাড় ছিঁড়ে যাবার মতো হয়েছিল।

জলো সাইকেলের দিকে এগোতে এগোতে সত্যর দিকে একবার ফিরে তাকাল, সত্যর চোখে

জল এসে গেছে। সত্যর ঘাড়ে যত না লেগেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লেগেছে মনে। এইভাবেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। কখনও পুলিশের ধোলাই। কখনও পাবলিকের ধোলাই। নরকের দরজায় চৌকিদার হয়ে দগ্ধে দগ্ধে বেঁচে থাকা।

সত্যর চোখে জল দেখে জলোর সমস্ত রাগ নিমেষে উড়ে গেল। জলোর স্বভাবই এইরকম। দপ করে জ্বলে ওঠে, দপ করে নিবে যাওয়া। তার শত্রুর সংখ্যা যত, বন্ধুর সংখ্যাও তত। যার জন্যে করবে জীবন লুটিয়ে দেবে। যার সর্বনাশ করবে, তাকে একেবারে শেষ করে দেবে। কখনও দানব, কখনও দেবতা।

জলো ফিরে এল। চায়ের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য চোখ মুছছে।

জলো পিঠে হাত রেখে বললে, 'লেগেছে?'

সত্য ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না।'

'এক কাপ চা খাওয়াবে?'

সত্য ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

জলো দোকানের বেঞ্চে বসে বাইরের দিকে তাকাল। থমকে থাকা ভিড় ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। মজা তেমন জমল না। সবাই ভেবেছিল, আরও কিছু দূর এগোবে। সত্যকে সবাই জব্দ করতে চায়। পারে না। ক্ষমতা নেই।

জলো বললে, 'জানো? দাদা কাল রাত থেকে এখনও বাড়ি ফেরেনি। মনটা বিশ্রী হয়ে গেছে।'

গাঢ় এক কাপ চা জলোর সামনে ধরে দিতে দিতে সত্য বললে, 'তুমি ওই মহিলার বাড়িতে একবার খোঁজ করো।'

'বাইরের লোকের সামনে তুমি ফট করে অমন একটা কথা বললে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল।'

'জানো তো চায়ের দোকানে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে। তোমার দাদা, তুমি কেউ বাদ যায় না।'

'আমি! আমাকে সবাই চেনে। আমিও সকলকে চিনি।'

'তোমার বউদিকে ধরে টানাটানি করে।'

'তাদের নাম বলতে পারো?'

'ক'জনের নাম বলব?'

'বুঝেছি।'

জলো উঠে পড়ল। আবার সেই দানবটা জাগছে। চায়ের কাপ পড়ে রইল।

'কী হল? চা পড়ে রইল!'

কোনও জবাব না দিয়ে জলো সাইকেলে গিয়ে উঠল। একটা নয়, পরপর গোটাকতক লাশ ফেলতে হবে। ভয়ই হল মধ্যবিত্তদের শাসনে রাখার রাজদণ্ড। গত ছ'-সাত বছরের জীবনে জলো এই সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছে। যত লপচপানি মুখে। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। বেশির ভাগই ভেড়ুয়া।

জলো সিগারেটের দোকানের সামনে সাইকেল থামাল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভেবে নিল, এখন সে কী করবে! লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারা উচিত। দেবীকে পাড়া ছাড়া করতে হবে। যেসব মেয়েরা অন্যের ঘর-সংসার ভেঙে দিতে চায়, তাদের একটু টাইট দেওয়াই উচিত। তা ছাড়া দেবীর বাড়িঅলা একটা টোপ ফেলেই রেখেছে। দেবীদের কোনওভাবে উঠিয়ে দিতে পারলে জলোকে একটা লরির পারমিট আর ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা করে দেবে। মন্দ কী? টাকার নেশার চেয়ে বড় নেশা আর কী আছে! সারাজীবন মানুষকে বুঁদ করে রাখতে পারে।

তোতা বললে, 'মা, তুমি কি একটু দুষ্টু হয়ে গেছ!'

দেবী স্নান করে এসে চুল ঝাড়ছিল। ভিজে কাপড় একটু উঁচু করে পরা। শরীরের সঙ্গে সেঁটে

আছে। জায়গায় জায়গায় সোনার বর্ণ ত্বক ফুটে বেরোচ্ছে। ঈশ্বর দেবীকে রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যটা কেড়ে নিয়েছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে বিশাল কেশভার পিঠের দিকে দুলিয়ে দিয়ে দেবী বললে, 'কেন?' একটু শঙ্কিতও হল। মেয়ে বড় হচ্ছে। স্বল্প বেশভূষায় তার সামনে দাঁড়ানোয় এই মন্তব্য নয় তো!

তোতা বললে, 'আমার অসুখ সেরে গেছে, তবু তুমি আমাকে দাদার কাছে যেতে দিচ্ছ না। একা একা যাচ্ছ। একা একা আসছ।'

মেয়ের দিকে পেছন ফিরে সায়া পরতে পরতে দেবী বললে, 'যাবি যাবি, তোর দাদা যে ভীষণ ঝামেলায় পড়েছেন।'

তোতা মায়ের অনাবৃত পিঠের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মা, তুমি কী সুন্দর!'

'তুই যে আমার চেয়েও সুন্দর।'

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তোতা আর দেবী, দু'জনেরই প্রতিফলন। একের পাশ থেকে আর এক মাথা তুলেছে বৃক্ষের শাখার মতো। তোতার প্রতিফলিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেবীর সেই ভীষণ দুশ্চিন্তাটা আবার ফিরে এল। পাখির বাসায় ছানার মতো চিন্তাটা বসেই আছে। মাঝে মাঝে চিঁ চিঁ করে ওঠে। তোতাও একদিন দেবী হয়ে উঠবে। তারপর!

জলো বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামল। ইচ্ছে করেই দু'বার বেল বাজাল জোরে জোরে। যেন শমন এসেছে। প্রথম থেকেই সে চড়া সুরে ধরতে চায়। তা না হলে মেয়েরা বড় দুর্বল করে দেয়। ফুল! ফুল ছিড়তে হয়!

॥ পনের ॥

দামি ক্রিম রঙের কাগজে কালো কালিতে ছোট ছোট অক্ষরে পামেলা বোস অরফ্যানেজের ধ্রুবকে চিঠি লেখা শেষ করলেন। দু'ভাঁজ করে মনোগ্রাম আঁকা একটা খামে ভরে, আঠা দিয়ে মুখ আটকে দিলেন। সাবধানী মহিলা। চিঠিটা যাকে লেখা সে-ই শুধু পড়বে। টেবিলের-পাশে লাগানো কলিং বেলের বোতাম টিপলেন তিনবার। কোঁক কোঁক শব্দ হল ঘরের বাইরে।

জ্ঞানেশ অন্যমনস্ক ছিল। তাকিয়ে ছিল সবুজ লনের দিকে। দুটো কাঁটা বুলবুলি ওড়াউড়ি করছে। ঝোঁটন নাচিয়ে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। ছোট ছোট পোকা উড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বেশ লাগছিল দেখতে। এই অশান্ত পৃথিবীতে ছোট ছোট সব শান্তির কোণ আছে। ক্ষুদ্র এলাকা ঘাপটি মেরে বসে আছে এখানে ওখানে। সন্ধান করে নিতে হয়।

জ্ঞানেশ ছাদ ছেড়ে ভেতরে আসার জন্যে পা বাড়াল। বেল শুনে নীলা করিডর ধরে তাড়াতাড়ি আসছে। সাজ পোশাক হয়ে গেছে। জ্ঞানেশ থমকে দাঁড়াল। নীলা আড় চোখে একবার তাকাল। এখন আর তেমন উগ্র লাগছে না। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, নীলার কোনও অপরাধ নেই। নিজেকে সে সোচ্চার করতে চায় না। যার যেমন ধরন। ত্রুটি জ্ঞানেশের। পাপ ঘাপটি মেরে বসে আছে নিজের ভেতরে। চশমার কাচের রং যেমন হবে, জগতের রংও ঠিক সেইরকম হবে। জ্ঞানেশ কথামৃত পড়ে। মরুক বাঁচুক, জল হোক ঝড় হোক একটা পরিচ্ছেদ সে পড়বেই। ঠাকুরের বলা সেই গল্পটা তার মনে পড়ল। অন্ধকার প্রান্তরে একটা ঢিবি। প্রথম রাতে একজন মাতাল ফিরছে টলতে টলতে। দূর থেকে ঢিবিটাকে দেখে ভাবলে আর এক মাতাল। নেশায় বুঁদ হয়ে মাঝ মাঠে বসে আছে। জড়ানো গলায় বললে, কী বাবা, টেনে বসে আছ টং হয়ে। ঢিবি নিরুত্তর। মধ্য রাতে এক চোর ফিরছে। দূর থেকে দেখে ভাবলে, আর এক চোর। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, কী বাবা, ঘাপটি মেরে বসে আছে! শেষ রাতে এলেন এক সাধু। তিনি বললেন, বাঃ, ধ্যানে বসে

গেছে! একেবারে সমাধিস্থ। আর আমি এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সাধু সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন ধ্যানে।

পামেলার দরজায় দাঁড়িয়ে নীলা ইশারায় জ্ঞানেশকে ডাকল। ইংরেজিতে বলে প্যারাগন অফ বিউটি। এই মুহূর্তে নীলাকে জ্ঞানেশের তাই মনে হচ্ছে। হালকা নীল রঙের সিল্কের শাড়ি। দুধের মতো সাদা হাতকাটা ব্লাউজ। সোনালি চুলের ঢেউ খেলছে পিঠে। একমাত্র বিদেশিনিদেরই এইরকম চুল হয়। নীলার মা নিশ্চয়ই ইউরোপীয়। সেই কারণেই নীলা এত ফ্রি। জ্ঞানেশের গড়িমসি দেখে নীলা বললে, 'প্লিজ হারি আপ জেন্টলম্যান।'

জ্ঞানেশ মুচকি হেসে এগিয়ে গেল। পামেলা বোস চেয়ারে বসে বসেই চারপাশে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরে স্প্রে করছেন। মৃদু মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেছে। দরজায় জ্ঞানেশকে দেখে পামেলা বললেন, 'এসো এসো। এরই মধ্যে তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। মাই ডিয়ার স্যার। সব ইনস্ট্রাকশান আমি দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে নীলা আর গাড়ি বের করছে না। তোমার গাড়িতেই নিয়ে যাও।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'ঠাকুরপুকুর। আর দেরি নয়। বুঝলে জ্ঞানেশ এইবার আমার মন খারাপ হচ্ছে। ফিলিং ভেরি মাচ ডিপ্রেস্‌ড। বুঝলে, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কে আর কেউ রইল না। লাইফ'স লাস্ট জার্নি ইজ বেটার মেড অ্যালোন। আর কী! দীর্ঘ পথ তো পাড়ি দিয়েই এলুম, থোড়ি হ্যায় বাকি, থোড়ি কে নিয়ে তাল নেহি ছোড়ি। শোনো ইয়াংম্যান, সাত্যকিকে এখানেই যেন নিয়ে আসে। শেষ দেখা একবার দেখতে চাই। যাদের নিয়ে জীবন শুরু করেছিলুম, তারা একে একে মাগিছে বিদায়। না। নো মোর সেন্টিমেন্ট।'

জ্ঞানেশের হাতে ছোট্ট একটা টোকা মেরে নীলা বললে, 'লেট আস গো।'

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ বললে, 'প্লিজ গেট ইন।'

'না, আমি সামনেই বসব। আপনার পাশে।'

জ্ঞানেশ হাসল। সামনের দরজা খুলে বললে, 'আসুন।'

'আসুন' বলে জ্ঞানেশ উদাস দৃষ্টিতে সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। নীলা যখন বসবে, তখন তার দিকে সে তাকাতে চায় না। আবার মন দুর্বল হয় পড়তে পারে। দেহের কিছু কিছু আকর্ষণের কাছে মহাযোগীরাও পরাভূত হয়েছেন। মনে গুনগুন করেছে বহুশ্রুত সেই গানের লাইন, তেরা মন বড়া পাপী রে সেঁইয়া! গাড়ির দরজা কতটা জোরে বন্ধ করতে হয় নীলা জানে। দরজার লক মৃদু অথচ নিশ্চিতভাবে লেগে যাবার শব্দ করল। দু'হাত তুলে মাথার চুল ঠিক করতে করতে নীলা বললে, 'স্টার্ট।' অতি দামি সুগন্ধীর সুবাস আলতোভাবে জ্ঞানেশের নাক ছুঁয়ে গেল। বড় মন কেমন করানো, সন্নিকটের ডাক দিয়ে যাওয়া সুরভি। কাছে এসো আরও কাছে। মনের জোর আছে জ্ঞানেশের। পার্শ্ববর্তিনীর দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। কিছু ভাল লাগার বস্তু দূরে থাকাই ভাল। গাড়ির সেলফ চাবুকের মতো কাজ করছে। ছোঁয়ামাত্রই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। জ্ঞানেশ বললে, 'আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দেবেন।'

'অ শিয়োর। ড্রাইভ স্ট্রেট।'

'ভদ্রলোককে আপনি চিনতেন?'

'অবশ্যই। এ ফানি জেন্টলম্যান। হি হ্যাড ফ্যানটাস্টিক ড্রিমস। স্বপ্নের মানুষ। শুনেছি একসময় বন্যপশু রপ্তানি করতেন। লজ বিকেম স্ট্রিকটার অ্যান্ড হি কয়েলড আপ হিজ এক্সপোর্ট বিজনেস। দেন হি বিকেম এ গ্লোব-ট্রটার। ওঁর সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব গল্প শুনতে শুনতে আমার রাত ভোর হয়ে যেত। আই উইল মিস হিম ভেরি ম্যাচ। অ্যান্ড হি উইল মিস দিস ওয়ার্ল্ড ব্যাডলি। টার্ন রাইট।'

জ্ঞানেশ যা ভেবেছিল তা নয়। মহিলা বেশ মিশুকে। নিজের সৌন্দর্য, অপরিসীম আকর্ষণ সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। জ্ঞানেশের টেনশান প্রায় কেটে এসেছে। নীলার হাঁটুর ওপরে গাড়ির খোপে জ্ঞানেশের গগল্‌স। গাড়ি চালাতে চালাতে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল।

নীলা বললে, 'কী চাই?'

'আমার গগল্‌স।'

'দিচ্ছি। ওয়েট।

অসাবধানে জ্ঞানেশের হাত মসৃণ শাড়ি ছুঁয়ে গেল। কলাগাছের বাকল ছাড়াবার সময় যেমন গা-সিরসিরে একটা শব্দ হয়, মনে সেইরকম একটা অনুভূতি উঠেই মিলিয়ে গেল।

নীলা চশমাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'অমন সুন্দর চোখ রঙিন চশমায় ঢেকে দেবেন?'

'থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেন্ট।'

'আজকাল লিভিং আইজ কম দেখা যায়। ভেরি রেয়ার।'

'আপনিও খুব সুন্দর। একেবারে গ্র্যামেটিক্যালি পারফেক্ট।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'সেজন্যে আপনার কোনও অহংকার নেই।'

'আই বিলিভ ইন গড। দিস ইজ হিজ গিফট। আমি শুধু বয়ে বেড়াচ্ছি। অহংকার একটা ফুলিশ অ্যাক্ট। আমি জানি বাইরেটা বেশি দিন থাকবে না। ভেতরটা সব।'

'জ্ঞানীর কথা।'

'সেই জ্ঞান যার যত তাড়াতাড়ি হয়, তার তত ভাল।'

'ক'জন আর নিজের জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে!'

'তা ঠিক। সবাই বলে মানুষ হও, মানুষ হও। অথচ মানুষ হওয়া কাকে বলে জানা নেই।'

'সকলেই একটা জায়গায় পৌঁছোতে চায়। কিন্তু জায়গাটা জানা নেই। সবাই ছুটছে। কোথায় ছুটছে?'

'নো হোয়্যার।' নীলা ফিনফিনে শব্দ করে হেসে উঠল। 'টার্ন লেফট।'

জ্ঞানেশ বাঁদিকে গাড়ি ঘোরাল। দু'সারি গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। এতক্ষণে একটু সবুজের ছোঁওয়া পাওয়া গেল। হঠাৎ চারটে লাইন মনে পড়ে গেল :

Mangificient? Magnificient!
No one knowns the final word.
The Ocean bed's aflame,
Out of the void leap wooden lambs.

নীলা জিজ্ঞেস করলে, 'কী করেন আপনি?'

রাস্তার দিকে চোখ রেখে জ্ঞানেশ বললে, 'ব্যাবসা।'

'বড়?'

'মাঝারি।'

গাড়ির মিটারের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, কয়েক লিটার তেল ভরে নিলে ভাল হয়। বাঁ দিকেই একটা পেট্রোল পাম্প। গোঁত করে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল।

অসীম ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল, তনু ঘড়ি দেখে মনে মনে ছটফট করে উঠল। বেশ দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অসীম বেশ আপন হয়ে গেছে। যেন কত দিনের চেনা বন্ধু। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপন হয়ে যায়। কেউ আবার সারা জীবনেও দূর, বহু দূর। অমিতাভকে কিছুতেই যেন খুব আপন ভাবা যায় না। দু'জনের মাঝখানে পাতলা একটা স্টিলের পরদা ঝুলছে।

তনু সামনের দিকে সরে গিয়ে অসীমের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি গলায় বললে, 'একটু জোরে চালাবেন!'

অসীম এক মুখ হেসে বললে, 'আপনার খুব দেরি হয়ে গেল দিদি!'

তনু খুবই অন্যমনস্ক। দেহ যেন ভেসে চলেছে স্বপ্ন-জগতের হিজিবিজির মধ্যে দিয়ে। মন উড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। আপন মনে বললে, 'আমাকে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

অসীম বললে, 'কেমন যেন হয়ে গেছি। একটা জীবন যে আর একটা জীবনকে এইভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আগে আর কখনও আমার হয়নি। এই শব্দ, এই গতি আমার আর ভাল লাগছে না। গিরিধারী মূর্তির দিকে আপনি ভাল করে তাকিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি তো ওইদিকে তাকিয়েই বসে ছিলুম। কী সুন্দর!'

'সত্যিই কী সুন্দর! যেন জীবন্ত। অথচ সামান্য এক খণ্ড পাথর। আমি যাব। আবার যাব।'

'আমিও আবার আসব।'

'তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'হয়তো পারে।'

অসীম বাঁক নিল। গাড়ির গতি একটু বাড়িয়েছে। গন্তব্য স্থল যত এগিয়ে আসছে, চাপা উত্তেজনায় তনুর ভেতরটা কেমন যেন করছে! সেই শ্রদ্ধেয় উদাস মানুষটির সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে। যাঁর মুখ ঋষির মতো। শিশুর মতো এক মাথা এলোমেলো রুপালি চুল। গৌরবর্ণ চওড়া বুকের তলায় এত বছর বেঁচে থাকার দুঃখ-সুখের পোড়া ছাই। দুটো চোখে সুদূরের দৃষ্টি। বিয়ের আগে ধান দূর্বা আর সোনা দিয়ে আশীর্বাদ করবার সময় তনুর মাথায় যখন হাত রেখেছিলেন, সারা শরীর যেন শীতল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল শান্তির হিম প্রবাহ নেমে আসছে। এমন মানুষ তনু দেখেইনি, যিনি গরমে ঘামেন না, শীতে কাঁপেন না। সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত বেদনা আর অভিমান যাঁর হাসি হয়ে ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে।

অসীম বললে, 'আপনি খুব পয়া। আপনার জন্যেই আমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। মানুষই ঈশ্বর।'

'আমার জন্যে নয়। চশমার জন্যে হল।'

'আপনি না থাকলে অত কাছে যাওয়া যেত না। আমি এক সামান্য ড্রাইভার। সারাদিন ট্যাক্সি চালাই। আজেবাজে সিনেমা দেখি। থার্ডক্লাস লাইফ।'

'আপনার মুখ আর চোখ অন্য কথা বলে।'

'আপনি অনেক কিছু জানেন। তাই না! আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনি মানুষের ভেতরটা দেখতে পান।'

'দেখতে হয়তো পাই; কিন্তু পালটে দিতে পারি না।'

'হয়তো পারেন; তেমন চেষ্টা করেন না। আপনার ভেতরে একটা শক্তি আছে!'

'কী করে বুঝলেন?'

'আমি যে অনেক দেখেছি। আমার টাকাপয়সা নেই, অনেক অভিজ্ঞতা আছে। বহুত দেখেছি। আরও কত দেখব।'

অসীম মৃদু শব্দ করে হাসল।

পেট্রোলের দেনাপাওনা মিটিয়ে গাড়ির বাঁ পাশ থেকে ডানপাশে আসার সময় জ্ঞানেশ নীলার দিকে একবার তাকাল। নীলার বাঁ হাত জানলা দিয়ে সামান্য বেরিয়ে আছে। কনুইয়ের সামান্য অংশ। রোদ পড়েছে। রোদে ফোটা ফুল দেখেছে জ্ঞানেশ। মানুষ যে এমন ফুলের মতো ফুটে থাকতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। একজনের মৃত্যু আর একজনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

গাড়ি স্টার্ট করতে করতে জ্ঞানেশের মনে হল, জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কতবার কতভাবে দাঁত ফোটাবার চেষ্টা করছে। ফুলদানিকে স্তবকশূন্য করার অক্লান্ত চেষ্টা। পারছে না। এ এমন এক মালি, জীবন-মালি, নিত্য নতুন তাজা ফুল এনে সাজিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভাল লাগছে জ্ঞানেশের। নিজেকে মনে হচ্ছে সফল, সফল-প্রেমিক। বাতাসে চুল উড়ে কপালে পড়েছে। পাশে সুন্দরী মহিলা। এত পাশে, যে শরীরে একটা উত্তাপ এসে লাগছে। হিরে থেকে ঠিকরে পড়া আলোর আভার মতো। এমন যদি হত! এই চলা আর শেষ হল না। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। শুধু চলা। গাড়িটা একটা ঝিনুক হয়ে যাক। এই মুহূর্তটা হয়ে যাক নিটোল একটি মুক্তো। কালসমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে এমন এক স্বপ্ন দেখা, যা আর কোনওদিন ভাঙবে না। ম্যাগনিফিশিয়েন্ট, ম্যাগনিফিশিয়েন্ট।

সার সার গাছের ছায়া লুটিয়ে আছে পথে। ডোরা কাটা আলোর সরণি বেয়ে জ্ঞানেশের মায়া-তরণী ভেসে চলেছে। হঠাৎ জ্ঞানেশের ঘোর কেটে গেল। কী ভাবছে সে বোকার মতো! নীল আকাশ দিগন্তের কাছে মাটি স্পর্শ করেছে মনে হয়। কাছে গেলেই দূরে সরে যায়। আকাশ আকাশেই থাকে। মাটি থাকে মাটিতে। বাজিকর অনবরতই মুদ্রা ছুড়ছে। আর জিজ্ঞেস করছে, হেড না টেল? হেড বললে টেল হয়। টেল বললে হেড। এই তো জীবন! মেলে না। মেলানো যায় না।

উলটোদিক থেকে একটা লরি হুড়মুড় করে চলে গেল এক চুল তফাত দিয়ে।

নীলা বললে, 'ইউ ওয়ার আনমাইন্ডফুল।'

'বাট আই অ্যাম ইন ফুল কন্ট্রোল অফ দি স্টিয়ারিং। অ্যান্ড আই নো হোয়্যার আই অ্যাম গোয়িং।'

'দেন ইউ আর ফরচুনেট। আই ডু নট নো হোয়্যার আই অ্যাম গোয়িং।'

'ও তো দর্শন!'

'জীবন মানেই তো দর্শন! জুটো জগৎ। একটা খিদের আর একটা চিন্তার। প্রথমটা থেকে বেরোলেই দ্বিতীয়টা। আর দ্বিতীয়টা থেকে যেসব ভাগ্যবান মুক্তি পায়, তাদের জন্যে নো-মাইন্ড।'

'আপনার প্রচুর পড়াশোনা। আমি মূর্খ।'

'সেই উপলব্ধি আপনার হয়েছে। তা হলে আপনি প্রকৃতই জ্ঞানী।'

জ্ঞানেশ হাসল। বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাতে সরাতে বললে, 'আপনার সঙ্গে এই পামেলা বোসের পরিচয় হল কী করে!'

ঝিনুক ভাঙা হাসি হেসে নীলা বললে, 'এই যেভাবে আপনার সঙ্গে আজ আমার পরিচয় হল!'

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশ বললে, 'এই পরিচয়কে কীভাবে স্থায়ী করা যায়!'

'যে-কোনও একটা স্বার্থ অথবা কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে হয়।'

'নিঃস্বার্থ কিছু হয় না?'

নীলা আবার হাসল, 'নিঃস্বার্থ! স্বার্থই তো আমাদের ড্রাইভিং বেল্ট। আমাদের মোটার। আমাদের গ্র্যাভিটেশানাল পুল।'

দুটো কুকুর মারামারি করতে করতে হঠাৎ গাড়ির সামনে এসে পড়ল। জ্ঞানেশ খচ করে ব্রেক কষল। নীলার সারা শরীর দুলে উঠল। নিজেকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে নিতে বললে, 'ফাইন, ইউ আর ভেরি মাচ অ্যালার্ট।'

কুকুর দুটোর কোনও খেয়ালই নেই। মারামারি, আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করতে করতে এ পাশ থেকে ও পাশে চলে গেল। জ্ঞানেশ গাড়ি ছেড়ে দিতে দিতে বললে, 'ক্ল্যাশ অফ ইন্টারেস্ট।'

নীলা বললে, 'অফ লোয়ার লেভেল। এখুনি মিটে যাবে। আপার লেভলের ক্ল্যাশ দীর্ঘ দিন চলে।'

'আন্ড উই সাফার।'

'ইফ উই ডু নট রান দেম ওভার।'

জ্ঞানেশ হাসল, 'দ্যাটস ফাইন। চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাও। একটু নিষ্ঠুরতা।'

'নিষ্ঠুররাই বেঁচে থাকে। গ্র্যাব, গেটহোল্ড, টিয়ার অ্যান্ড থ্রো। দেন লাফ লাইক এ ডেমন।'

'কিন্তু কংসকে কে মনে রাখে! কৃষ্ণই তো সব।'

'ভুল। ভুল কথা। দু'জনেই অমর। এক পাল্লার কৃষ্ণ আর এক পাল্লায় কংস। সমান ওজন। গড অ্যান্ড সেটান ইকোয়ালি পাওয়ারফুল। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।'

নীলা ইংরেজি সুরে গান গেয়ে উঠল।

জ্ঞানেশ বললে, 'সুন্দর গান। আমি শুনেছি। কে যেন গেয়েছেন। পল ম্যাকার্টিনি। আপনার গলায় আরও সুন্দর শোনাচ্ছে।'

'দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার' নীলা সুর করেই বললে, 'ডোন্ট ফ্ল্যাটার। প্লিজ ডোন্ট ফ্ল্যাটার। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।' মুচকি হাসি ঠোঁটের কোণে।

জ্ঞানেশ সুরে সুর মিলিয়ে বললে, 'আয় অ্যাম নট ফ্ল্যাটারিং ম্যাডাম। ট্রুথ ইজ ট্রুথ।

নীলার ঠোঁটের কোণের হাসিটা আরও স্পষ্ট হল। 'টার্ন রাইট।'

জ্ঞানেশ বোঁ করে গাড়িটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল।

দেবীর সদর দরজায় সজোরে একটা লাথি মারার জন্যে জলো ডান পা-টা তুলেছিল। পাশের জানলায় ফুটফুটে শিশির ভেজা নিষ্পাপ একটা মুখ দেখে থতমত খেয়ে পা টেনে নিল। ঝকঝকে দুটো চোখ অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। মাথার দু'পাশে লাল দুটো রিবনের ফুল।

তোতার মনে হল, এ লোকটা আমার কাকু। সে বললে, 'কাকে খুঁজছ কাকু?'

তোতাকে আগে কখনও দেখেনি জলো। তবে বুঝতে অসুবিধে হল না, এই সুন্দর মেয়েটি দেবীর।

জলো গম্ভীর গলায় বললে, 'দরজাটা খুলতে বলো।'

গলাটা যত গম্ভীর করতে চেয়েছিল ততটা হল না। ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল।

তোতা বললে, 'তুমি কি রাগ করে বলছ?'

দেবী ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে বকবক করছিস তোতা!'

নিজে এসে জানলায় উঁকি মারল। জলোকে দেখে ঠিক চিনতে পারল না। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

'আপনাকে।'

জলো এবারও বোধ করল গলাটাকে যতটা হেঁড়ে করবে ভেবেছিল ততটা হল না।

দেবী দরজা খুলতেই জলো ভেতরে এল। ধাক্কা লেগে দরজার একটা পাল্লা দুম করে দেয়ালে এসে লাগল।

তোতা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লেগেছে কাকু! লেগেছে!'

দেবীর মতো, তাজা গোলাপের মতো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল জলো। সে কী করতে এসেছিল ভুল হয়ে গেল।

তোতা শাসনের সুরে বললে, 'অত হুটোপাটি করছ কেন? তুমি কি খোকা?'

জলো হেসে ফেলল। হা হা করে হাসছে। রেগে গেলে সে মুরগির মতো মানুষের গলা টেনে ছিঁড়তে পারে। আবার আনন্দ হলে ধেই ধেই করে নাচতে পারে। তখন সে শিশু। জলো হাসছে। হা হা করে। থামাতে পারছে না কিছুতেই।

কৃষ্ণপদর নীতি হল, যতদিন বাঁচব, লিভ ইন স্টাইল। উঞ্ছবৃত্তি করে বাঁচতে চাই না। তেমন বুঝলে, সব রেস্ত ফাঁক হয়ে গেলে, চলে যাবার রাস্তা ভাবাই আছে। চমৎকার নির্গমন। দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি ওফেলিয়ার মৃত্যু দৃশ্য এঁকেছিলেন। কমলদলে ওফেলিয়া শান্তিতে শয়ান। নিজের প্রেমিকাকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। দিনের পর দিন সেই মহিলাকে বাথটাবে নির্দেশ মতো শুয়ে থাকতে হত। নিউমোনিয়া হয়ে দান্তের প্রেমিকা শেষে মারাই গেলেন। সেই বিখ্যাত ছবিটির একটি প্রিন্ট কৃষ্ণর সংগ্রহে আছে। মৃত্যু যে কত রোমান্টিক হতে পারে! মাঝে মাঝে নির্জন দুপুরে কৃষ্ণ ছবিটি বার করে দেখে। বর্তমান থেকে সরতে সরতে চলে যায় দূর অতীতে। সেই যুগ, সেই সময়, সেই দেশ। ঠিক ওইভাবে কৃষ্ণ শেষকে বরণ করে নেবে। অনেকটা ইচ্ছামৃত্যুর মতো।

একটা অটোমেটিক পিস্তল থাকলে বেশ হত। যেমন থাকে পশ্চিমি মানুষের পকেটে। রগের কাছে চেপে ধরে ট্রিগারে সামান্য আঙুলের চাপ। সে উপায় যখন নেই গ্রিক রাস্তাই ভাল। গরদের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরবে। ভাল আতর মাখবে। পরিষ্কার সুন্দর বিছানা। খাটের পাশে মেঝেতে এক বালতি গরম জল। ধারালো ব্লেড দিয়ে কবজির কাছে ধমনি কেটে বালতির জলে হাতটা ডুবিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যাবে। নিমীলিত চোখের সামনে জগৎ-সংসার একটু একটু করে ঝাপসা হতে হতে শেষে অদৃশ্য।

ভাতের ফ্যান উথলে উঠতেই কৃষ্ণর চিন্তার ধারা চমকে উঠল। চট করে একটু জল ঢালতেই ফ্যান সংযত হল। হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে ফ্যান গালার জন্যে মেঝেতে উপুড় করে দিল। ভাতের গন্ধ, বাষ্প, উনুনের গনগনে আঁচ, রোদ ঝলমলে আকাশ, এইসব দেখলে কৃষ্ণর ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে। আর কি আসা হবে! এলেও কোথায় আসা, কীভাবে, কী রূপে, কী নামে আসা! তখন কি শিবুর মতো ভাই পাওয়া যাবে? কুমুর মতো স্ত্রী! যেসব ছবি এবারে আঁকা হল না, পরের বার এসে সেই সব ছবিতে কি তুলি ঠেকানো যাবে? এবারের কথা পরের বার আর মনেই থাকবে না।

ভাল পোর্সিলেনের ডিনার প্লেটে কৃষ্ণ সাদা ফুলের মতো ফুরফুরে চার চামচে ভাত তুলে নিল। কুমুর আজ তেতো খাবার দিন। নিমঝোল করেছে। রংটা বেশ খুলেছে। ভাগ্যিস একসময় রান্নাকে জীবনের অনেক শখের একটা শখ হিসেবে রপ্ত করা ছিল। তা না হলে আজ কী হত! কোনও কিছু মুখে দেওয়া যেত?

কৃষ্ণপদর পরনে একটা পাটের ধুতি। সাদা ধবধবে গেঞ্জি। যীশুখ্রিস্টের মতো ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল মাথার মাঝখান থেকে দু'ভাগে আঁচড়ানো। মেঝেতে আসন পেতে সামনে জল ছিটিয়ে ভাতের প্লেট, ঝোলের পাত্র, জলের গেলাস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল, যেখানে যেভাবে রাখা উচিত। শিল্পী মানুষ। রং আর কম্পোজিশান রক্তে মিশে গেছে। সামান্য একটু এলোমেলো হলেই চোখে নয়, একেবারে মনে গিয়ে ধাক্কা মারে।

জানলার বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কুমু বসে আছে স্থির হয়ে। ঘাড় বাঁ পাশে কাত। ঠোঁটের কোণে অভ্রের মতো এক কুচি হাসি চিকচিক করছে। সামনে ঝুলে থাকা নীল আকাশে কেউ কি এসে দাঁড়িয়েছে? এমন কেউ যাকে সাধারণ মানুষের চোখে দেখা যায় না। পিঠে পড়ে আছে ভিজে চুল। কৃষ্ণপদ তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে দিয়েছে। ছোট্ট, ঢালু কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণ। পরিচয় না থাকলে কুমুকে দেখে মনে হবে, সিদ্ধ এক সাধিকা। অতিজাগতিক কোনও অনুভূতিতে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

পেছন দিক থেকে কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণ মৃদু গলায় বললে, 'ওঠো, খাবে চলো।'

বাধ্য মেয়ের মতো কুমু উঠে পড়ল। কৃষ্ণ বললে, 'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।'

কুমু উত্তরে কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে হাসল। অপূর্ব হাসি। এমন হাসি কৃষ্ণ মানুষের মুখে খুব কমই দেখেছে। এই হাসি দেখে কৃষ্ণর সেই সন্দেহটা আরও পাকা হল, কুমু উন্মাদিনী নয়। উপলব্ধির এমন এক উচ্চ স্তরে উঠে গেছে, যেখানে উঠলে এই পৃথিবীকে রঙ্গশালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। পাগলের কারখানা। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মতো নানা বর্ণের, নানা জীবিকার, নানা ধান্দার মানুষ অনবরত এদিক এদিক ছোটাছুটি করছে। 'গোলমালে মাল আছে।— গোলটি ছেড়ে মালটি নেবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। কুমু সেই মালটি ধরেছে। সে কে? সে কী? কৃষ্ণপদ মাঝে মাঝে চিন্তা করে। ধরতে পারে না। পাশেই আছে। হয়তো হাত লেগে যায়; কিন্তু ধরা যায় না।

কুমু পা মুড়ে আসনে বসল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল খাদ্যের আয়োজনের দিকে। ছ'-সাত চামচের বেশি কোনও দিনই সে খায় না। সেইটুকুই গ্রহণ করতে অসম্ভব দেরি হয়। মাঝে মাঝে মুখে দিয়ে চোখ বুজিয়ে বসে থাকে বিভোর হয়ে।

কৃষ্ণ বড় চামচে দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললে, 'আজকে তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো দেখি। আমার ভাইটা উপোস করে বসে আছে। তোমাকে খাইয়ে আমাকে ও-বাড়িতে ছুটতে হবে।

কুমু বড় বড় চোখে অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোলের ওপর তোয়ালে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে সেই দুটি চোখের দিকে কৃষ্ণ তাকিয়ে ছিল। চোখের পেছনে আরও দুটো চোখ থাকে। সকলের নয়। কারু কারু। যেমন, কুমুর। বাইরের চোখ উদাস। যেন কিছুই বোঝেনি। ভেতরের চোখে একটা আমোদের ভাব ঝিলিক মারছে। যেন বলতে চাইছে, তাই নাকি!

শিশুকে যেভাবে মা খাওয়ায় সেইভাবে কৃষ্ণ কুমুর মুখে এক চামচ ঝোল মাখা সরু চালের ভাত পুরে দিলে। ইদানীং কৃষ্ণ লক্ষ করছে, কুমুর চেহারায় একটা জ্যোতি এসেছে। কোনও উজ্জ্বল জিনিস দেয়ালের কাছে রাখলে যেরকম একটা আভা পড়ে, দেয়াল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কুমু দেয়ালের কাছে বসে থাকলে ঠিক সেইরকম হয়। খুব অবাক লাগে কৃষ্ণর। এমনও হয়! কাকে প্রশ্ন করবে? দেখতেই তো পাচ্ছে চোখের সামনে। কিছু না মাখলেও কুমুর গা দিয়ে সুন্দর এক সুরভি বেরোয় সর্বক্ষণ। এইসব দেখে কৃষ্ণর ভয় হয় কুমুকে আর বেশিদিন বোধহয় ধরে রাখা যাবে না। প্রস্তুত হও কৃষ্ণ। সেই আনন্দধাম আরও কত দূরে? জীবনের পথে দু'জনে বেরিয়েছিল। একা হাঁটতে কেমন লাগবে? শিবপদর কথা ভেবে কৃষ্ণ সাহস পেতে চায়। আমার ভাই আছে। দাবা আছে। অতীতের কত গল্প আছে। নিজের জীবনের অজস্র বিচিত্র ঘটনা নিয়ে কিছু লেখাও যেতে পারে। বিস্মৃত ইতিহাস।

আর এক চামচে ভাত কৃষ্ণ তুলে দিল কুমুর মুখে। এক ফালা আলুকে তিন টুকরো করল চামচে দিয়ে কেটে কেটে। অনেকেই বলে, কৃষ্ণ, তুমি তোমার পাপের ফল ভুগছ। এই পাপ সে যেন জন্ম জন্ম ভুগতে পারে!

পিচবোর্ডের বাক্সে তালগোল পাকিয়ে তুলোর ডেলার মতো বিড়বিড় করছে গোটাতিনেক বেড়াল বাচ্চা। পুসি বাঘের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে মাথা উঁচু করে। মা হওয়ার তৃপ্তি আর অহংকারে চোখ খুলতে পারছে না। শিবপদ বললে, 'কী রে পুসি, শুধু বাচ্চাদের দুধ খাওয়ালেই হবে! তুই নিজে কিছু খাবি না।'

শিবপদ একটা চ্যাটালো বাটিতে দুধ এনেছে। বাটিটা সামনে ধরতেই পুসি চকচক করে দুধ খেতে লাগল। ঘড়ঘড় শব্দ করছে। এই বিশাল বিশাল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে মানুষের এই জন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। এই সামান্যের মধ্যে কী অসামান্য আনন্দ! সোনার সরু সুতোর মতো মুহূর্ত গুটিয়ে চলেছে মহাকালের বিশাল লাটাই। সুদীর্ঘ সুতোর সবটাই সোনার নয়। রুপো আছে। মরচে ধরা লোহা আছে। যাবার সময় কড়কড় করে কেটে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

পুসি জিভ দিয়ে বাটিটাকে চেটেপুটে সাফ করে আধবোজানো চোখে মিউ করে একবার ডাকল। ভারী মিষ্টি ডাক। বেড়ালের ভাষা, পাখির ভাষা শিবপদ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। পুসি বলতে চাইল, 'খুব সুন্দর! বেশ খিদে পেয়েছিল। বড় ব্যস্ত আছি, তাই উঠতে পারছিলুম না। থ্যাঙ্ক ইউ। তবে আর একটু হলে ভাল হত। বলতে লজ্জা করছে।'

শিবপদ বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। আর একটু চাই। তাই না। দাঁড়াও আনছি।'

শিবপদ পেছনের বারান্দা থেকে ভেতরে এসেছে। চারপাশে বৃষ্টিধোয়া গাছপালা থেকে ঝলমলে রোদের সবুজ আলোয় ঘর কাঁপছে। শিবপদ রান্নাঘর থেকে দুধ আনতে চলেছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকারে শিবপদর বুক কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভারী কিছু পড়ার শব্দ হল সাত্যকি বোসের ঘরে। কাচ ভাঙারও শব্দ হল।

ভয় থমকানো ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। শিবপদ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। মেঝের ওপর সটান পড়ে এক নারীদেহ। সেন্টার টেবিল উলটে গেছে। কাচের ভারী একটা অ্যাশট্রে ছিটকে চলে গেছে খাটের তলায়। ভেঙে দু'খণ্ড হয়ে গেছে। সাত্যকি সেই একইভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে। আগের মতোই চোখ বুজিয়ে। কোনওক্রমেই পাশ ফিরতে পারেনি।

শিবপদ প্রথমে ভেবেছিল দেবী। কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে অবাক হল, এ কে? তনু! তনু কোথা থেকে এল? তনুর মতো কাছাকাছি আর কেউ থাকে নাকি!

শিব হাঁটুগেড়ে তনুর পাশে বসে পড়ল। কপালে আলতো করে হাত রেখে ডাকল, 'বউমা! বউমা!'

তনু ধড়মড় করে উঠে বসে দু'হাতে শিবপদকে জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ লুকিয়ে হাঁপাতে লাগল। নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

তনুর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে শিব বললে, 'খুব ভয় পেয়ে গেছ মা?'

তনু শিবের বুকের কাছ থেকে ফিসফিস করে বললে, 'আমি ভেবেছি আপনি। ভেবেছি আপনার কিছু হয়ে গেছে।'

শিবকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে তনু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পিঠে স্নেহের হাত বোলাতে বোলাতে শিব বললে, 'না মা, আমি ঠিক আছি।'

'ইনি কে?' তনু বাতাসের শব্দে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি চিনবে না মা। আগে কখনও দেখোনি। কৃষ্ণর বন্ধু, সাত্যকি বসু। হাসতে হাসতে এল। কথা বলতে বলতে চলে গেল। তোমার লাগেনি তো?'

তনু বললে চাপা গলায়, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সময় সেন্টার টেবিলটা ধরার চেষ্টা করেছিলুম। তারপর কী হয়েছে আমার মনে নেই।'

'তুমি দাঁড়াতে পারবে? তা হলে চলো, আমরা ওঘরে যাই। এখানে তোমার না থাকাই ভাল।'

তনু মাটিতে হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। মাথা ঘুরছে। কোমরে খুব লেগেছে। শিব বুঝতে পারল, তনুর লেগেছে। কেটেকুটে যায়নি হয়তো। তবে ভারী শরীর। আচমকা শক্ত মেঝেতে পড়েছে। এই সময় মেয়েদের পড়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। তনুর দু'হাত ধরে শিব ধীরে ধীরে তুলে দাঁড় করাল। তার বুকে মাথা রেখে তনু দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

'তুমি কাঁদছ কেন মা?'

শিবের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে তনু বললে, 'আপনি আছেন। আপনি আছেন।'

'আমি তো আছিই পাগলি মেয়ে। আমি যাব কোথায়?'

'আমাকে ছেড়ে আপনি যাবেন না। বলুন আপনি যাবেন না।'

শিব বড় অভিভূত হল। এই পৃথিবীতে একজন এখনও তাকে ভালবাসে। সে একটি পরের

মেয়ে। আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে। কথা ফুটছে না। হাজার হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছে করছে। রোদ ঝলমলে দিন, আলো ঝলমলে রাত। পুত্রবধূর মাথাটি বুকে একহাতে চেপে ধরে শিব এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে মুহূর্তের স্রোতে। প্রচণ্ড শীতে উষ্ণ জলের সুখানুভূতির মতো অদ্ভুত এক সুখ ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে।

তনুর সারা শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। প্রথমে শিব ভেবেছিল আবেগে কাঁপছে। আবেগ নয়, যন্ত্রণা।

তনু বললে, 'আমাকে কোথাও আপনি একটু শুইয়ে দিন। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে।'

শিব তনুকে প্রায় কোলে করে বিছানায় এনে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে। মানুষের স্বপ্ন ভেঙে যেতে এক মুহূর্ত লাগে না। এমন এক নাট্যকারের হাতে জীবন-নাটকের কলম, দৃশ্য পালটে দিতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগে না।

তনুর মুখের কাছে মুখ এনে শিব জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে! দাঁড়াও আমি চট করে ডাক্তার ডেকে আনি।'

একটা হাত দিয়ে শিবপদর গলা ধরে তনু ফিসফিস করে বললে, 'কোথাও যেতে হবে না। একটা ক্র্যাম্প ধরেছে, এখুনি কমে যাবে।'

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে শিব চমকে ঘাড় ঘোরাল। কৃষ্ণপদ আসছে।

'দাদা, তুই এসেছিস?'

কৃষ্ণ উদ্বেগের গলায় বললে, 'কেন, কী হয়েছে শিব? কোনও বিপদ? কে শুয়ে? তনু! কী হল তনুর?'

শিব শান্ত গলায় বললে, 'বিপদ কখনও একা আসে না দাদা! তুমি চট করে দেবীকে একবার ডেকে আনবে?'

'দেবীকে? হ্যাঁ হ্যাঁ ডেকে আনছি।'

দীর্ঘদেহী কৃষ্ণ লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। শিব মনে মনে প্রার্থনা করে চলেছে, ঈশ্বর, তুমি এমন কিছু কোরো না, যাতে মানুষের সামান্য স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। এমন কোনও পাপ তো করিনি। তোমার পথেই তো চলার চেষ্টা করেছি।

তনুর পেটে হাত বুলিয়ে দেবার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। সে উপায় নেই। মনের বাধার চেয়ে সম্পর্কের বাধা!

'আমি বরং একটু গরম জল করে আনি।'

'আপনি বরং আমাকে ছোট একটা বালিশ এনে দিন।'

ড্রেসিং টেবিলের টুলে জলো বসে আছে। রোমশ দুটো হাত দু'হাঁটুর ওপর। এক হাতে স্টিলের বালা। সামনে ঝুঁকে আছে বলে, গলার পদকটা বুকের কাছে দুলছে। কোনওরকমে হাসি থামিয়েছে। পেটে কিন্তু এখনও ঢেউ খেলছে। ছোট্ট একটা মেয়ে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের মাকে দেখেও জলোর মন গুটিয়ে গেছে। আর সে রোয়াব নেই। যেভাবে যা বলতে এসেছিল তা আর বলা হবে না।

খুব ভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'বউদি, দাদার খবর জানেন?'

কী উত্তর দেবে দেবী? সত্য বলবে, না মিথ্যা? এক মুহূর্ত ভেবে বললে, 'কাল তো দাদাকে আপনি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন!'

জলোর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল রেগে যেতে। পারল না। মৃদু গলায় বললে, 'উপায় ছিল না। খুব বাড়াবাড়ি করছিল।'

'দাদার গায়ে হাত তুললেন? উচিত হয়েছে?'

'অন্যায় করে ফেলেছি বউদি। আমি তো তেমন সুবিধের ছেলে নই। বদ ছেলে। তবে দাদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।'

'দাদাকে একবার আমি দেখেছিলুম। ক্ষতবিক্ষত। একটা মানুষকে আপনারা এইভাবে তিলে তিলে মারবেন?'

মোটাসোটা থলথলে চেহারার এই ভোগী মানুষটিকে দেবী প্রথমে ভয় পেয়েছিল, এখন আর ভয় নেই। সাপুড়ের সম্মোহনী বাঁশির সামনে সাপ যেভাবে ফণা তুলে নেশাগ্রস্তের মতো হেলতে দুলতে থাকে, দেবীর ব্যক্তিত্বের সামনে জলো ঠিক সেইরকম অবশ হয়ে পড়েছে।

জলো মিউ মিউ করে বললে, 'আমরা তিল তিল করে মারব কেন? দাদা নিজেকেই নিজে মারছে।'

দেবী ধমকে উঠল, 'চুপ করুন।। দাদাকে আপনারা কী দিয়েছেন? শুধু দুয়েছেন।' দেবীর গলায় আবেগ এসে গেছে, 'মানুষের একটু ভাল হতে কী হয়? বলতে পারেন, কী হয়? আপনারা কেন একটু ভাল হতে পারেন না? ভাল হতে কি খুব পয়সা লাগে? ভীষণ কষ্ট? না এইটাই এ যুগের আদত? নিজেদের বেঁচে থাকার বদ গন্ধে সকলকে বাপ বলিয়ে ছাড়ছেন। কী, ভেবেছেন কী আপনারা?'

জলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অসম্ভব ফরসা ধারালো একটি মুখ। টানা টানা চোখ উত্তেজনায় ধকধক করছে। সারা মুখে গোলাপি একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে মনে হচ্ছে মন্দিরের পাশে ইউরিন্যাল। গন্ধি আদমি। মুহূর্তে স্বর্গ আর নরকের সীমানা আলাদা হয়ে গেল।

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে জলো জিজ্ঞেস করলে, 'বউদি, দাদা কোথায় বলতে পারেন?'

'না ভাই, আমি কী করে জানব!'

তোতা হঠাৎ জানলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও মা, ওই দেখো বড়দা।'

জানলার দিকে ছুটে গেল প্রজাপতির মতো, 'বড়দা। বড়দা।'

কৃষ্ণ হাসল। বুদ্ধদেবের মতো হাতের ভঙ্গি করল। জানলার বাইরে কৃষ্ণকে দেখে জলো উঠে দাঁড়াল। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। নর্দমার বেড়াল ধবধবে সাদা বিছানায় উঠে পড়লে যেরকম হয়! জলোর ভেতরটা কুঁকড়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছে, তার এই বেঁচে থাকাটা বাঁচা নয়, মৃত্যুরই নামান্তর।

॥ সতেরো ॥

'ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার সেন্টার'। গেটের মাথার ওপর গোল করে লেখা। বেশ বড় বড় হরফে। বিশাল লোহার গেট ভেতর থেকে বন্ধ। চারপাশে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। দেখলেই ভয় করে। মনে হয় শিশুরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোলে পড়ে আছে। ভাগ্যের কারাগারে আবদ্ধ অসহায় কিছু প্রাণী। প্রতিষ্ঠানটির বিমর্ষ চেহারা দেখে জ্ঞানেশের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। পৃথিবী কী অনিশ্চিত স্থান! কী যে হবে, কেউ জানে না! এই তো মাস ছয়েক আগে তার বন্ধু অনাদির ডান পা-টা কেটে বাদ দিতে হল। অনাদির জীবনটা কী হয়ে গেল! অমন একজন বাঘা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ঘোরাই যার কাজ, সে এখন কী করবে! ডানাকাটা পাখির মতো ঝপ করে উপার্জন পড়ে গেল। সাতশো-আটশো টাকা বাড়িভাড়া। বেঁচে থাকার মেজাজি ধরন। সুন্দরী আধুনিকা স্ত্রীর তোয়াজ। কীভাবে কী করবে অনাদি?

নীলা বলল, 'কী হল? ইউ আর ইন এ ট্রান্স! হর্ন দিন।'

'ও ইয়েস।' জ্ঞানেশ হর্ন টিপল। পরপর তিনবার। নির্জনতা চমকে উঠল। উঁচু পাঁচিলে একটা কাঠবেড়ালি ঘুরছিল। ভয়ে লেজ তুলে এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে গেল।

ঘড়ঘড় শব্দে বিশাল গেট খুলে গেল। না, জ্ঞানেশের ধারণা ভুল। ভেতরটা খুবই সুন্দর। বাঃ বলতে ইচ্ছে করে। যত্নের বাগান। একটা নয় গোটা তিনেক বড় বড় বাড়ি। দুটো নতুন তৈরি। একটা প্রাচীন কালের। অতীতে কোনও জমিদার বেশ খেলিয়ে করেছিলেন। থামঅলা এই ধরনের বিশাল বাড়ি দেখতে জ্ঞানেশের ভীষণ ভাল লাগে। অতীত কত উদার ছিল। বর্তমান কত সংকুচিত। জীবন যেন শুকনো পেঁপে পাতার মতো কুঁকড়ে আসছে।

লম্বা রাস্তা কেয়ারি করা বাগান চিরে সোজা ভেতরে চলে গেছে। দু'পাশে সার সার পাম গাছ। বাতাসে ঝিরিঝিরি পাতা দুলছে। চিঁড়ের মতো কুচি কুচি রোদ চারপাশে ঝরে পড়ছে। ডান পাশে ছোট্ট একটা জলাশয়। অজস্র পদ্ম ফুটে আছে। জ্ঞানেশ গাড়ি ঘুরিয়ে থামঅলা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। টাইপরাইটারের খটখট শব্দ ভেসে আসছে। যিনিই টাইপ করুন, অসম্ভব তাঁর স্পিড।

নীলা গাড়ি থেকে নামতেই ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে কোথা থেকে দৌড়ে এল। কচি কচি দু'হাতে নীলার শরীরের নীচের দিকটা জড়িয়ে ধরে মিষ্টি মিষ্টি গলায় বলতে লাগল, 'দিদি, দিদি।'

নীলা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে দু'পাক গোল হয়ে ঘুরে গেল। বাচ্চা মেয়ের খিলখিল হাসি পায়রার মতো উড়ছে চারপাশে। জ্ঞানেশ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নেমে এল গাড়ি থেকে। নীলার মুখে চোখে একটা মায়ের ভাব এসে গেছে। সাংঘাতিক আধুনিকা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।

অনেক পায়ের শব্দ ছুটে আসছে দূর থেকে। দেখতে দেখতে নীলা আর জ্ঞানেশের চারপাশে যেন অজস্র খই ছড়িয়ে পড়ল। ধবধবে সাদা পোশাক পরা শিশুর দল। সকলেই দিদি দিদি করছে। নীলাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। কারুরই স্বাস্থ্য খারাপ না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।। চেহারায় যত্নের ছাপ। নিজেদের বাড়িতে থাকলে এত যত্ন কখনই পেত না। এক গাদা জীবন্ত ফুটন্ত ফুল যেন নীলা আর জ্ঞানেশকে প্রাণের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

নীলা নিচু হয়ে হয়ে প্রত্যেককে একটা করে চুমু খেল। কারুর মাথায়, কারুর গালে হাত দিয়ে আদর করল। দূরে ঘণ্টা বাজল। নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, 'সবাই চলে এসো।'

আর এক মুহূর্তও কেউ দাঁড়াল না। সবাই লাইন দিয়ে দূরের হলুদ বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল।

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'এরা এখন কী করবে?'

এলোমেলো শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতে করতে নীলা বললে, 'ভোজন।'

'আমাকে রাখবেন?'

'বয়েস কমিয়ে ফেলুন আর নিজেকে শূন্য করে ফেলুন। আপনি আর পৃথিবী। মাঝে আর যেন কেউ না থাকে।'

নীলা হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। জ্ঞানেশের মনে হল নীলাকে সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। নীলার প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে বারে বারে উড়ে আসতে হবে দেওয়ালি-পোকার মতো। এই শুরু হল তার পোড়ার কাল। মন আর কোনও শাসন মানতে চাইছে না। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ বারে বারে আছড়ে পড়ছে পাথুরে বাঁধের ওপর।

অফিস ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই জ্ঞানেশের প্রথমে যা চোখে পড়ল, তা হল উলটো দিকের দেয়ালে যীশুখ্রিস্টের বিশাল এক প্রতিকৃতি। ভাবস্তব্ধ মুখ। প্রেমিক দুটি চোখ। সারা ঘরের আবহাওয়া, পরিবেশ যেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে। গিল্টি করা ঝকঝকে ফ্রেম। জ্ঞানেশ চোখ ফেরাতে পারছে না। নিজেকে মনে হচ্ছে একটি আত্মভোলা মেষশাবক।

গভীর নীল রঙের জামা পরে জমাট স্বাস্থ্যের এক ভদ্রলোক বিশাল টেবিলের উলটো দিকে বসে

আছেন। সামনে একটা সুদৃশ্য বিলিতি টাইপরাইটারে কাগজের জিভ ঝুলছে। কোণের দিকে দেয়ালে একটা ক্রাচ অপেক্ষা করে আছে। ভদ্রলোকের এক মাথা চুল রুপোলি ঝিলিক মারছে। ফরসা রং রোদে পুড়ে তামাটে। দেহ ঘিরে অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব থিরথির করে কাঁপছে। রোদের ঝাঁঝের মতো। ঠোঁট দুটো একটা নিবে যাওয়া পাইপ কামড়ে আছে।

নীলাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।' ঘর গমগম করে উঠল। জ্ঞানেশকে দেখে চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল।

জ্ঞানেশের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নীলা বললে, 'বসুন।'

কোনওরকম শব্দ না করে নীলার পাশের চেয়ারে জ্ঞানেশ বসে পড়ল। খড়খড় শব্দ তুলে ঝড়ের গতিতে ভদ্রলোক গোটা তিনেক লাইন টাইপ করে ফেললেন। এপাশে কাগজের জিভ আরও কিছুটা ঝুলে পড়ল।

নীলা পামেলা বোসের চিঠিটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'হিয়্যার ইজ এ লেটার ফর ইউ।'

ধ্রুববাবুর বুকের ওপর একটা সোনালি ক্রশ দুলছে। জ্ঞানেশের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে গেল, এঁরা কি তা হলে খ্রিস্টান! ডান হাত বাড়িয়ে ধ্রুব চিঠিটা নিলেন। কবজির কাছ থেকে কনুই পর্যন্ত দীর্ঘ একটা ক্ষতের দাগ অশান্ত অতীত জীবনের স্মৃতি বহন করছে।

জ্ঞানেশ আচমকা প্রশ্ন করে ফেলল, 'কী হয়েছিল আপনার হাতে?'

চিঠিতে ডুবে আছেন। উত্তরে মাথা নাড়লেন শুধু।

নীলা বললে, 'ওঁর সারা দেহই ক্ষতবিক্ষত। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন। আর্মি অফিসার ছিলেন।'

ধ্রুববাবু চিঠি থেকে মুখ তুলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। কী একটা নম্বর ডায়াল করলেন। কানে রিসিভার। চোখ বুজিয়ে আছেন। ভদ্রলোক মিতভাষী। জ্ঞানেশের সেইরকম মনে হল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও খরচ করতে চান না। ধ্রুববাবুর সামনে নীলাও কেমন যেন চুপসে গেছে। পর্বতের সামনে ছোট্ট দুটি টিলার মতো জ্ঞানেশ আর নীলা বসে আছে।

ওপাশে কার গলা পেয়ে ধ্রুব বললেন, 'হ্যালো, পার্ক আন্ডারটেকার। গোমেস প্লিজ।'

চোখ মেলে খুব শান্ত গলায় জ্ঞানেশকে বললেন, 'ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিন।'

ছোট একটা প্যাড আর ডন পেন এগিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ গোমেস। একটা ঠিকানা বলছি, লিখে নাও। কফিন রেডি আছে? আছে। বেশ। তুমি তোমার দিক থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যাও। আমরা এদিক থেকে যাচ্ছি। কফিনটা? হ্যাঁ ভাল। সবচেয়ে ভাল? কে? আমাদের মিস বোসের ভাই। কী বলছ? ওঁর কফিন তৈরিই আছে! কী করে? কে করালে? নিজে! হাউ ফানি। ওবেলিস্ক! তাও রেডি! স্ট্রেঞ্জ! অলরেডি পেড ইন অ্যাডভান্স!'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ধ্রুব রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। চিন্তিত মুখে বুকের ওপর ক্রশটাকে দু'আঙুলে নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বলে উঠলেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

নীলা বললে, 'কী হল?'

'ভদ্রলোক দু'মাস আগে আন্ডারটেকারকে টাকা দিয়েছেন কফিন আর স্মৃতিফলক তৈরির জন্যে। ফলকে লিখিয়েছেন হিয়ার লাইজ এ নেমলেস ওয়ান হু ওয়াজ নট বর্ন।'

'আশ্চর্য! মৃত্যু আসছে জানতে পেরেছিলেন!'

'এইসব রোমান্টিক মানুষদের নিয়ে মহা বিপদ। এঁরা সব সময়েই একটা কিছু স্পেকটাকুলার করতে চান। তাক লাগিয়ে দেবার মতো। কোনও মানে হয় না।'

কথাটা জ্ঞানেশের পছন্দ হল না। প্রতিবাদে বললে, 'আমার তা মনে হয় না। এক একজনের পাওয়ার থাকে। ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমরা পাই না, তাই অবিশ্বাস করি।'

'কে কী পায় আমি জানি না; তবে এই মেলোড্রামার কোনও মানে হয় না। যাক ও নিয়ে আমি কোনও তর্কে যেতে চাই না। পৃথিবীতে মাথা ঘামাবার মতো এত বিষয় আছে, পৃথিবীর বাইরে

যাবার দরকার নেই। ও এক ধরনের বিলাসিতা। আপনারা তা হলে এগিয়ে পড়ুন। গোমেসের গাড়ি হয়তো আগেই পৌঁছে যাবে।'

ধ্রুব আবার ফটাফট টাইপ শুরু করলেন। জ্ঞানেশের মনে হল, মানুষটি এক অবিশ্বাসী হামবাগ। কাজের ভড়ং দেখাতেই ব্যস্ত। প্রশ্ন করলে হয়, কী এমন টাইপ করছেন যে মানুষের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার সময় নেই। মিলিটারি যখন ছিলেন তখন ছিলেন, এখন তো সিভিলিয়ান। জ্ঞানেশ ওঠার সময় ইচ্ছে করেই চেয়ারটাকে জোরে ঠেলল যাতে বেশ শব্দ হয়। ধ্রুব মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ঠোঁট কাঁপল বটে কিন্তু কথা ফুটল না। জ্ঞানেশের খুব মজা লাগল। পরক্ষণেই বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল। এই ধরনের অসভ্যতা না করলেই হত। নীলাও অবাক হয়ে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে আছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'সরি। রাগ চাপতে না পেরে শব্দ করে ফেলেছি।'

টাইপ যন্ত্র থেমে গেল। ধ্রুব পূর্ণ দৃষ্টিতে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাগের কী হল! রেগে যাবার মতো কিছু বলেছি কি?'

'আমার মনে হল, আপনি একজন মৃত ব্যক্তিকে অকারণে ছোট করলেন। উপহাস করলেন, ব্যঙ্গ করলেন। মৃত্যুর চেয়ে কাজ বড় এইরকম একটা ভাব দেখাতে চাইছেন। আপনিও কম ড্র্যামেটিক নন!'

'ওয়েট ওয়েট। ইউ আর গোয়িং বিয়ন্ড ইয়োর লিমিট। আমি কাজ করব কি চোখের জল ফেলব, হু আর ইউ টু ডিক্টেট। যা করার আমি করে দিয়েছি। ইউ ক্যান গো। বাট প্রুভ দ্যাট ইউ আর এ সিভিলাইজড ম্যান।'

জ্ঞানেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলে গেল। জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দেয়ালে যীশুর ছবি থাকলে কী হবে, মনে প্রেম নেই। সহানুভূতি নেই। জ্ঞানেশ দরজার চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে, এমন সময় ধ্রুব ডাকলেন, 'শুনুন। আমার আরও কিছু বলার আছে।'

জ্ঞানেশ ঘুরে দাঁড়াল, 'বলুন।'

'বসুন আপনি।'

নীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টেবিলের ওপর তার দুটো ফরসা ধবধবে হাত একটা পেপারওয়েট ধরার চেষ্টা করছে। ডান হাতের অনামিকায় পাথর বসানো সোনার আংটি। হাতের রূপে আংটির রূপ যেন আরও খুলে গেছে। জ্ঞানেশের রাগ ছাই পড়া আগুনের মতো মৃদু হয়ে এসেছে। যে চেয়ারে একটু আগে বসে ছিল সেই চেয়ারেই ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল। শোনাই যাক, কী বলেন ভদ্রলোক।

ধ্রুব তার দিয়ে পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'একটা প্রশ্ন। জীবনে আজ পর্যন্ত আপনি ক'টা মৃত্যু দেখেছেন?'

'একটা। আমার বাবার।'

'ক' বছর আগে?'

'বছর তিনেক আগে।'

'সেই মৃত্যুর ফলে আপনার কোনও কাজ বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়ে আছে?'

জ্ঞানেশ মনে মনে চমকে উঠল। সত্যিই তো! কোনও কাজই তো বন্ধ হয়ে নেই। বাবার কথা তো তেমনভাবে আর মনেই পড়ে না। দেয়ালে যে ছবি ঝুলছে সেদিকেও তো কদাচিৎ চোখ পড়ে।

ধ্রুব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'জীবন হল জোয়ারের জল। তীরের সব গর্ত নিমেষে ভরে দেয়। এইটাই জগতের নিয়ম। কেউ কিছু মনে রাখে না। মনে রাখবে না। আমি শত শত মৃত্যু দেখেছি। নিজে মরতে মরতে ফিরে এসেছি একটা পা খুইয়ে। মানুষ আসবে মানুষ যাবে।

কেউ কালে। কেউ অকালে। কখনও আমরা দর্শক। কখনও আমরা দৃশ্য। আমাদের আগে মৃত্যু। আমাদের পরে মৃত্যু। মৃত্যুকে অত ইমপর্টেন্স কেন দোব! কী জন্যে দোব? প্রিয়জন, আপনজন, কাউকে ধরে রাখা যাবে! আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কে আছে? তাকেও কি ধরে রাখতে পারব? এনি ডে, এনি টাইম, এনি মোমেন্ট, পাতা খসে পড়বে। উদাসীনতা দিয়ে মৃত্যুকে মুছে ফেলুন। সাত্যকি আমার কম বন্ধু ছিল না। সে ক'দিন আগে গেল। আমি ক'দিন পরে যাব। ম্যাটার অফ টাইম। ফল পাকলে পড়ে। কিছু ফল পাখিতে ঠোকরালে পড়ে। কী করা যাবে! নান কেন স্টপ ইট। আপনি ভাবুন। ভেবে বলুন, হোয়্যার আই অ্যাম রং!'

ধ্রুব পাইপটা ঠোঁটে গুঁজলেন। জ্ঞানেশ ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় সব মানুষই কেমন দার্শনিক হয়ে উঠছে! এ দেশের মাটির গুণ! আজকাল একটা বাচ্চা ছেলেও দার্শনিক। এ দেশের ধূলিকণাতেও বেদান্ত মিশে আছে অভ্ররেণুর মতো।

ধ্রুব বলিষ্ঠ ডান বাহু টেবিলের ওপাশ থেকে এপাশে এগিয়ে দিলেন জ্ঞানেশের দিকে করমর্দনের জন্য। জ্ঞানেশ নিজের ভাবনায় মশগুল হয়ে ছিল। চমকে ডান হাতটা এগিয়ে দিল। শক্ত মুঠোয় তার নরম আঙুল। আন্তরিকতার বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

ধ্রুব বললেন, 'ভুল বুঝবেন না। সব ভাব ভেতরে যতটা সম্ভব ধরে রাখাই ভাল। বাইরে প্রকাশ করলেই হালকা হয়ে যায়। তাই ভেতরেই কাঁদি, ভেতরেই হাসি।'

জ্ঞানেশ উঠেই পড়েছিল। নীলা বললে, 'এবার চলুন। বেরিয়ে পড়ি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। এইসব ছেলেমেয়েরা কতক্ষণ আমাকে ছেড়ে আছে!'

জ্ঞানেশ আর নীলা পাশাপাশি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে জ্ঞানেশ বললেন, 'ভদ্রলোক একেবারে কাঠখোট্টা। কোনও রসকষ নেই। এইরকম মানুষের হাতে শিশুদের ভার! কী যে হবে!'

নীলা বললে, 'এই হল আমাদের দোষ। পাঁচ মিনিটে পাঁচটা কথায় আমরা মানুষের বিচাব করে ফেলি। ধ্রুবদা হলেন ম্যান অফ গোল্ড। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় এখানে দান করে দিয়েছেন। দশ বাই বারো মাপের একটা ঘরে থাকেন। নেয়ারের একটা খাটিয়া। একটা ক্যাম্প চেয়ার। দু'প্রস্থ জামাকাপড়। দু'বেলার আহার চারখানা রুটি, একটা নিরামিষ তরকারি। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠেন। একটা পা আর একটা ক্রাচ সম্বল করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন। এত বড় বাগান, নিজে তদারকি করেন। ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস-এর এস পাইলট ছিলেন।

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছে, তার ভেতরে কী আছে নীলা জানে না। নীলার ভেতরে কী আছে সে জানে না। মনে মনে নীলাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্র হলে এতক্ষণ বিপ বিপ শব্দ করে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে ফেলত। গুপ্ত ঘাতকের মতো, গুপ্ত প্রকাশক। গাড়ির গতি ভাবনার গতির সঙ্গে ক্রমশই বাড়ছে। আসনে শরীর ছেড়ে দিয়ে নীলা বসে আছে। আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, নীলা যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবাব মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে।

কৃষ্ণ সাধারণত পরের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু জলোর মতো অদ্ভুত চেহারার একটা ছেলেকে দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই ছেলেটাকেই ক'দিন আগে রাস্তায় মারামারি করতে দেখেছিল। খিস্তির ফোয়ারা, কানে আঙুল দিতে হয়।

তোতা ভীষণ খুশি হয়ে বললে, 'বড়দা তোমার কি আজ আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন!'

'সে হলে তো ভালই হত রে দিদি। তোর ছোটদা আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে।'

দেবী উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, 'কী হয়েছে? এই তো সকালে গিয়ে দেখে এলুম।'

'তনু এসেছে। কীভাবে এল, কোথা থেকে এল, কেন এল, তা জানি না। কিন্তু ভীষণ অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তুই একবার চল মা।'

'ও বাড়িতে কী লেগেছে বলুন তো?'

'গ্রহ লেগেছে রে মা!'

'চলুন আমি এখুনি যাচ্ছি।'

তোতা মুখ ভার করে বললে, 'আমিও যাই না মা।'

তোতার গালটা আদর করে নেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললে, 'দিদি. তুই আর এখন যাসনি। গেলে ভয় পাবি। আমি বিকেলে আসব। এসে চা খাব। আর তোকে সুন্দর সুন্দর দশটা ছবি এঁকে দেব। হনুমান, জিরাফ, গন্ডার, হাতি।'

॥ আঠার ॥

জলো কাফে ডিলাইটে ঢুকে কড়া গলায় কড়া এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজটা পাশের টেবিল থেকে তুলে নিল। কোনও পথ দুর্ঘটনার খবর আছে কি? কোনও বেওয়ারিস লাশ পড়ে থাকার খবর! দুয়ের পাতা, তিনের পাতা। এত মনোযোগ দিয়ে সে জীবনে কখনও কাগজ পড়েনি। দাদার জন্যে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। দাদাকে সে এত ভালবাসে, নিজেই জানত না। এই দাদাই তাকে ধরাধরি করে সিমেন্টের ডিলারশিপ বের করে দিয়েছিল অতি কষ্টে। পরেশের দল যখন আচমকা মাথায় ডান্ডা মেরে ফুটিফাটা করে দিয়েছিল, দাদা ঠায় তিন রাত্রি মাথার কাছে জেগে বসে ছিল। জলোর কোনও হুঁশ ছিল না। জলো তন্নতন্ন করে খুঁজছে। তিনের পাতা, পাঁচের পাতা। দাদা যদি আর ফিরে না আসে জলো জীবনের ধারা পালটে ফেলবে। এ পাড়া নয়, এ দেশ ছেড়েই চলে যাবে।

না, কোথাও কোনও পথ দুর্ঘটনা বা খুনের খবর নেই। হাওড়ার কাছে একটা বাস দুর্ঘটনার খবর আছে। মৃত তিন। আহত সতেরো। কাগজ সরিয়ে রেখে চায়ের কাপ সামনে টেনে নিল। কিছুই ভাল লাগছে না! এত ঠ্যালা সিমেন্ট পাঠাতে হবে হরেন মোক্তারের বাড়ি। ধারে নয়। অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে গেছে। মক্কেল-মারা পয়সায় হরেন এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। অন্যমনস্ক একের পর এক চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। আজ ভীষণ অনুশোচনা আসছে মনে। মানুষ একবার মাত্র জন্মায়। কী হল জন্মে! সময়ে সচেতন হলে আজ জীবনের চেহারাই পালটে যেত। তার সহপাঠীরা সকলেই প্রায় এক-এক লাইনে দিকপাল। অসীম ফিউয়েল রিসার্চে। বিনয় রিভার রিসার্চে। পরিমল জিওলজিক্যাল সার্ভেতে। পরপর নাম মনে আসছে। অসীমের সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে। সুন্দরী বউ। চেহারা দেখলেই মনে হয় বড়লোকের আদুরে মেয়ে! ফরসা গোল গোল হাত। চাঁপার কলির মতো আঙুল। যেন মোমের তৈরি। সুখের হাত। হাঁড়ি ঠেলতে হয়নি কোনওদিন।

হাঁড়ির কথায় মনে পড়ল, আজ তো বাজার করা হয়নি। তার মানে আজ উপবাস। দাম মিটিয়ে জলো বেরিয়ে এল। অনেকদিন পরে ঝনঝনে রোদ উঠেছে। বড় চড়া আলো। বিশ্রী লাগছে। সাইকেলে চেপে বসল জলো। যেতে যেতে ভাবছে, এই পাপের জগৎ থেকে কোনওরকমে বেবিয়ে আসতে পারলে কেমন হত! বড় ময়লা লেগে আছে গায়ে।

দরজা খোলাই ছিল। সামনের রকে বসে বউদি চ্যাকোর চ্যাকোর করে পান চিবোচ্ছে। যেন পৃথিবীর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। সারাদিনে ভদ্রমহিলা ক'খিলি পান খায়! সময় সময় ভাল লাগে বউদিকে। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। যেমন এখন হচ্ছে। ভদ্র বাড়ির বউয়ের চালচলনের ঠিক

থাকা উচিত। মেয়েরা প্রথম জীবনে যাই থাকুক না কেন, পরে সে মা, শেষেও মা। মা হয়েই তাকে বিদায় নিতে হবে। উবু হয়ে বসে থাকা বউদির দিকে তাকিয়ে জলো মনে মনে বললে, সারাজীবন এইভাবে কাটাবে কী করে! দাদা যদি আর না ফিরে আসে তা হলে তোমাকে তো আমি পথে বসাব। আমি খারাপ, তবে তোমার সঙ্গে আর খারাপ হবার ইচ্ছে আমার নেই।

সাইকেলের ঘরে সাইকেল রেখে জলো বললে, 'কী, আজ রান্নাবান্না নেই?'

গোপা পান চিবোতে চিবোতে বললে, 'বাজার করে দিলেই হবে।'

'কী আছে বাড়িতে?'

'কিছুই নেই। চাল নেই, ডাল নেই। কিছুই নেই।'

'ক'টা বেজেছে জানো।'

'ঘড়ির খবর জেনে আমার কী হবে? আমি তো রাঁধুনি। মাল মশলা এনে দাও। আমি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'আজ আর হাঁড়ি চড়িয়ে দরকার নেই।'

গোপা উদাস গলায় বললে, 'ভাল।'

ভাল বলে থেবড়ে বসে পড়ল। আজ তারও কিছু ভাল লাগছে না। কোনও দিনই ভাল লাগে না। আজ একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছে। যে জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, শুধু মাতালের মতো টলতে টলতে, সময়ের ঠেলা খেতে খেতে খাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, সে জীবন তো এইরকমই হবে। সময়ের কোলে নিশ্চেষ্ট পুতুলের মতো বসে থাকা। নাচাও মহাকাল, নাচাও। চুল পেকে সাদা হয়ে যাক। ত্বক কুঁচকে ফেটে ফেটে যাক। প্রাণদণ্ডের আসামি। মাঝে মাঝে ভাবে, কত স্বপ্নই না ছিল জীবনে! এত প্রাণ ছিল, সবাই ভাবত ফিচেল। কেউ কেউ অসভ্যও বলত।

জলো জিজ্ঞেস করলে, 'রান্না না হলে তুমি খাবে কী?'

'মেয়েদের উপোস অভ্যাস আছে।'

জলো বললে, 'ভাল।'

'তুমি কোনও সন্ধান পেলে?'

'না।'

'সন্ধান করেছিলে?'

'কী মনে হয়?'

'কী আর মনে হয়? দু'জনের যা অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল!'

'আর তুমি ছিলে একেবারে রাম-ভক্ত সীতা!'

'আর তুমি ছিলে রাম-ভক্ত ভরত।'

'তোমার মুখে জুতো।'

'তোমার মুখে ঝ্যাঁটা।'

'দোব একদিন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে।'

'চেষ্টা করে দেখো না। বাড়ি আমার।'

'হ্যাঁ বাড়ি তোমার বাপের।'

'তোমার বাপ তো রেস খেলে মাল খেয়ে বাড়ি মর্টগেজ করে গিয়েছিল। ছাড়িয়েছিল কে?'

জলো হঠাৎ গুম মেরে গেল। এ কী করছে সে! একটা মেয়েছেলের সঙ্গে তর্জা গাইছে? তার জীবনের নীতিই তো হাত থাকতে মুখে কেন? তা ছাড়া এখুনি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। পারিবারিক ইতিহাস তো তেমন সুবিধের নয়। জলো ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। বৃদ্ধ বিজয় সরকার ভেতরের ঘরে বসে ব্যাবসার হিসেব লিখছেন। জলো চমকে উঠেছিল। তারপর মনে পড়ল, বিজয়বাবু বদ্ধ কালা। কিছুই শুনতে পাননি। পয়সার অভাবে কানে লাগানোর যন্ত্র কেনা হয়নি।

জলো উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলেন আপনি?'

'কাল রাতে।'

জলো থমকে গেল। কিছুই শুনতে পাননি।

বিজয়বাবু কথার খেই ধরলেন, 'সে কী জ্বর! একেবারে কেঁপে-কেঁপে।'

'ছেড়ে গেছে? এখন কেমন আছেন?'

'পরশুদিন আসবে। আমাকে কথা দিয়েছে!'

ব্যর্থ চেষ্টা। জলোর আর কথা কইতে ইচ্ছে করল না। একেই তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তায় আবার চিৎকার করে। পাশের ঘরে গিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। এ দেয়ালে ও দেয়ালে বিশ্রী কয়েকটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। যখন জোগাড় করে এনে ঝুলিয়েছিল তখন মনের অবস্থা একরকম ছিল। এখন মনের অবস্থা আর একরকম। হঠাৎ মনে হল ভদ্র বাড়িতে এমন ক্যালেন্ডার ঝোলা উচিত নয়। এসব মদের দোকানে চলে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, এ দেয়াল ও দেয়াল থেকে ক্যালেন্ডার কখানা খুলে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। ছবিটবি ছাড়া শুধু তারিখঅলা একটা কাজের ক্যালেন্ডার ঝুলতে লাগল। ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকাতেই তার খেয়াল হল, আজ একাদশী।

পিছু হটে হটে বিছানায় এসে বসল। আজ একাদশী। সধবা মহিলা উপোস করে থাকবে! সেটা ঠিক হবে! অকল্যাণ হবে। সবচেয়ে বেশি অকল্যাণ হবে দাদার। মা অনেক কিছু মানতেন। মা যাবার পর সংসার একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। এ ঘরে মায়ের একটা ছবি ছিল। এ ঘরে প্রায়ই অনেক অন্যায় কাজ হয়। সেইরকম একটা কাজের সময় মায়ের ছবির দিকে জলোর চোখ পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। পরে মনে হয়েছিল মায়ের চোখে জল চিকচিক করছে। পরের দিনই ছবিটা খুলে বাইরের দালানে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছিল। সংকল্প করে ফেলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাল দিন দেখে মায়ের ছবিকে এ ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জীবনে আর কে আছে তার: সিমেন্টের বস্তা। নেশা। কিছু অখদ্যে সঙ্গী-সাথী। ফিচলে এক বউদি। ভূতের মতো এক দাদা। তাও আর আছে কি না কে জানে?

জলো তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। এই ভেঙে পড়া পরিবারটাকে সামলাতে হবে। ভাল খারাপ হলে সাংঘাতিক খারাপ হয়। আবার খারাপ ভাল হলে সাংঘাতিক ভাল হয়। জলো দেখিয়ে দেবে। প্রথমে এই আস্তাবলটাকে সাফা করতে হবে। তারপর এই পাড়াটাকে। আবর্জনা কোথায় কোথায় জমে আছে সে জানে। একমাত্র সেই জানে। মেরে সব চৌপাট করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রকের দিকে তাকাল, যেখানে একটু আগে বউদি বসে ছিল। নেই। উঠোনে এক দলা পানের ছিবড়ে পড়ে আছে। জলো হাঁক পাড়ল, 'বউদি। বউদি। কোথায় গেলে?'

সাড়া নেই। জলো একটু ইতস্তত করে বউদির ঘরে গিয়ে ঢুকল। উত্তরের জানলার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রুক্ষ চুলের ঢল পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নীচে নেমে গেছে। যত্ন নেই তবু কী সাংঘাতিক চুল। উত্তরের আলো পড়ে মুখের একটা পাশ ভয়ংকর সাদা দেখাচ্ছে। রক্তশূন্যতার লক্ষণ। এইসব রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়েদের জীবন ইট চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে।

'বউদি!'

জলো বারতিনেক ডেকেও সাড়া পেল না। ছবির মতো স্থির। জলো পাশে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কাঁদছ! কাঁদছ কেন?'

গোপা মুখ ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। জলো গোপার দু'গালে দুটো হাত রেখে মুখটাকে জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

'তুমি একা একা এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? বলো কেন কাঁদছ?'

গোপা এতক্ষণ নীরবে কাঁদছিল। জলোর মিষ্টি কথায় ফুঁপিয়ে উঠল। ছিটকে সরে যেতে চাইল দূরে। জলো কাঁধে হাত রেখে গোপাকে বুকের পাশে ধরে রাখল। সরে যেতে চাইলেও সরার উপায় নেই। বড় বড় চোখের পাতা ভিজে গেছে। জলো বললে, 'গত দশ বছরে তোমার চোখে আর যা দেখি, জল দেখিনি কখনও। কেন তুমি কাঁদছ।'

গোপা ধরাধরা গলায় বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দাদার ঝ্যাঁটা জুতো লাথি আমার সহ্য হয়ে গেছে। এইবার শুরু হল তোমার।'

কান্নার আবেগে গোপা আর কিছু বলতে পারল না। মুখ নিচু করে জলোর পাশটিতে দাঁড়িয়ে রইল। ঘনঘন নিশ্বাসে বুক ওঠাপড়া করছে। দেহ কাঁপছে থিরথির করে। মেয়েদের মন নিয়ে জলো কখনও কারবার করেনি। সে সিমেন্টের কারবারি। জীবনে কখনও কাউকে চিঠি লেখেনি। প্রেমপত্র তো দূরের কথা। অন্য দিন হলে জলো এক ধাক্কায় উলটে ফেলে দিত। প্যানপ্যানানি তার সহ্য হয় না। দেবীর দেবীর মতো মুখ তার চোখের সামনে ভাসছে। পাতলা দুটো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে দেবী বলছে, আপনারা একটু ভাল হতে পারেন না। জলোর মনে ফাটল ধরে গেছে। ফাটা সিমেন্টের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস উঁকি মারছে।

গোপার কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়িয়ে জলো বললে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো। দেখো মানুষ যদি একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে শিখত, সংসারে এত অশান্তি থাকত না। তুমিও ভাবো না। আমিও ভাবি না। কাটাকাটি শোধবোধ। তুমি আমার মায়ের মতো, সেই কথাটাই বারে বারে ভুলে যাই। এই বাড়ি তোমার, এই সংসার তোমার। আমরা তোমার আশ্রয়ে আছি। বউদি, যা হয়ে গেছে গেছে। এসো আবার আমরা নতুন করে শুরু করি।'

গোপা অবাক হয়ে ভিজে ভিজে চোখে জলোর দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে। জলো মৃদু হেসে বললে, 'জানো কি আজ একাদশী! আজ তোমার উপোস চলবে না। টিফিন ক্যারিয়ারটা দাও।'

গোপা আঁচলে চোখ আর মুখ মুছে নিল। কপালে সিঁদুরের টিপ ঘষে গেল। তাতে মুখটা আরও সুন্দর হয়ে উঠল। গোপা বললে, 'তুমি আমাকে মা বললে! আমার মা হবার যোগ্যতা আছে?'

'সব মেয়েই তো মা। হয় রামের মা, না হয় শ্যামের মা। তোমাদের যোগ্যতা ঠিকই আছে। আমাদেরই যোগ্যতা নেই। আমরা মা বলে ডাকতে ভুলে গেছি। জানি আমার মুখে এসব কথা মানায় না। তবে একথাও জেনে রাখো ঋতু যেমন পালটায়, মানুষও সেইরকম পালটাতে পারে। রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিল। হয়নি?'

কিছুক্ষণ জলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গোপা বললে, 'সত্যিই তুমি পালটাবে?'

'বউদি, সূর্য ডুবে গেলে কী হবে জানি না। অন্ধকারকে আমি ভীষণ ভয় পাই। তখন আমার ভেতরটা আরও অন্ধকার হয়ে যায়। তুমি একটা আলো জ্বেলে দিতে পারবে না!'

'আলো! আমার যে তেল নেই। পলতে নেই।'

'তেল ভরো। পলতে লাগাও। দাও দাও টিফিন ক্যারিয়ারটা দাও। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

'টিফিন ক্যারিয়ার কী হবে?'

'হোটেল থেকে ভাত আর মাংস আনব।'

'না, আজ ছেড়ে দাও। আজ আর আমি কিছু মুখে দিতে পারব না। মানুষটাকে যতই গালাগাল দিই, অত্যাচার করি, তার পরিচয়েই আমার পরিচয়। সে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। কে বুঝবে, ভালবাসা কাকে বলে! ঘৃণাও তো এক ধরনের ভালবাসা। একটা দিন একটা মানুষের অপেক্ষায় উপোস করে কাটাতে পারব না?'

'তুমি কি ভাবলে আমার জন্যে যাচ্ছি! আমি শুধু তোমার মতোই আনব। একাদশীর দিন সধবাকে উপোস করতে নেই। আঁশ খেতে হয়। আমার মা বলতেন। শুনেছি।'

'তুমি বরং আর একবার ওর খোঁজে যাও। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, আমার ভেতরটা

কেমন যেন হু-হু করছে। পাম্প দেওয়া স্টোভের মতো। ভাল করে খুঁজলে তুমি ঠিকই পাবে। ওকে আগে খুঁজে বের করো, তারপর খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

'বেশ তাই হোক।'

জলো আবার রাস্তায় নামল। উত্তর দিকে দু'-এক কদম হাঁটার পর তার মনে হল পৃথিবীটা একজন মানুষের পক্ষে বড় বিশাল। এই বাড়ি ঘর, লোকজন। পাক মেরে মেরে রাস্তা এগিয়ে গেছে তো গেছেই। কোথায় সে দাদাকে খুঁজবে! একজন মানুষ যদি সত্য সত্যই হারিয়ে যেতে চায়, কার সাধ্য তাকে খুঁজে বের করে! জলো একবার থমকে দাঁড়াল, তারপর শূন্য মনে এগিয়ে চলল সামনে। অজগরের শ্বাস যেন টেনে নিয়ে চলেছে।

বকুলতলার মোড়ে পেয়ারীর দোকানের সামনে পল্টনের সঙ্গে দেখা। দড়িতে সিগারেট ধরাচ্ছিল। জলোকে দেখে এগিয়ে এল, 'আরে গুরু, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম। কাল কিছু মাল পটকেছি গুরু। সাফাই মাল। শ'খানেক বস্তা। আজই তুলে নাও।'

জলো উদাস গলায় বললে, 'আমার আর মালের দরকার নেই। ব্যাবসা তুলে দিচ্ছি।'

'ভক্কিবাজি হচ্ছে গুরু। ব্যাবসা তুলে দেবে? মামার বাড়ি?'

'পল্টন, মন মেজাজ ভাল নেই। ভ্যানতাড়া করিসনি।'

'মালটা তা হলে গদার গোলায় তুলে দিই।'

'হ্যাঁ দে।'

পলটন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জলোর মুখের দিকে। ভূতের মুখে রাম রাম শুনছে নাকি?

জলো আপন মনে এগিয়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। সামনেই মিত্তিরদের দোলপিঁড়ি। বহুকালের প্রাচীন রাধাজিউর মন্দির। অতিথিশালা। এদিকটায় জলো পারতপক্ষে আসতে চায় না। এলেই মন খারাপ হয়ে যায়। অন্ধকার অন্ধকার। ঢাউস ঢাউস গাছ। ওপর দিকে ডালপালায় জড়াজড়ি। আকাশ ঢেকে দিয়েছে। জায়গাটা যেন একশো বছর পেছিয়ে আছে। বটের খুপরির মধ্যে শিবমন্দির। কুঁজো কুঁজো, সামনে নুয়ে পড়া বৃদ্ধারা সামনে এগিয়ে চলেছে। খ্যানখেনে গলায় কথা বলছে। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে এদের চটকদার যৌবন ছিল। ডুরে শাড়ি পরত। পাতা কেটে চুল আঁচড়াত। পুরুষরা একবার কেন, একশোবার ফিরে তাকাত। এদের মধ্যে গেরস্ত আছে, হাফ-গেরস্ত আছে, বেশ্যা আছে। বৃদ্ধা বেশ্যাদের দেখলেই চেনা যায়। জলো চিনতে পারে।

ঢ্যাং করে একটা ঘণ্টা বাজল। জলোর পিলে চমকে গেল। চারদিকে শোরগোল, ঠ্যালাঠেলি। কাঙালি ভোজন হবে। রোজই হয়। বাবুরা বলেন দরিদ্র-নারায়ণ সেবা। একটা ট্রলিতে চেপে খিচুড়ি ভরতি বিশাল হান্ডা আসছে। মেয়ে-পুরুষ তারস্বরে কাকের মতো চেল্লাচ্ছে। বিশাল গেট। সবুজ লন। শুকনো ফোয়ারা। শুকনো এক জোড়া পরি ভৃঙ্গার বহন করছে। শ্বেতপাথরের উলঙ্গ নারী আর পুরুষ মূর্তি এখানে ওখানে বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে। আরও ভেতরে বিশাল বাড়ি। ময়ূর ডাকছে কর্কশ সুরে।

॥ উনিশ ॥

প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জলো নারী-পুরুষের বুভুক্ষু উল্লাস দেখছে। পাশাপাশি উবু হয়ে বসে এ ওকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, ও একে। সকলেই মনে করছে খিচুড়ি আমার। আমারই কথাতে সব হচ্ছে। দৈত্যের মতো তিনটে লোক পরিবেশন করছে। পঙ্‌ক্তিতে কিছু কুচোকাচাও আছে। তারা মাঝেমধ্যে চড়চাপড় খাচ্ছে।

প্রথম পাতে খিচুড়ি পড়তেই দল শান্ত হল। এক বুড়ো কাশতে শুরু করেছে। হাঁপানির কাশি।

সহজে থামবে না। এ দৃশ্য দেখা যায় না। মানুষও যে পশু তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্থানত্যাগ করার জন্যে পা বাড়িয়েও জলো থমকে গেল। প্রথম সারিতে প্রায় জনাপঞ্চাশ জলোর দিকে পেছন করে ঘাড় নিচু হয়ে বসে আছে। ওপাশে একেবারে শেষের লোকটি কে? একটু অন্যরকম। পরনে কালো প্যান্ট। সাদা জামা। কাঁধে একটা পাট করা বর্ষাতি। দাদা না? জামা-প্যান্টে কাদার ছাপ। এক মাথা এলোমেলো চুল। পাগলের মতো দেখতে। জলো পায়ে পায়ে এগোতেই পঙ্‌ক্তিতে বসে থাকা পাঠ্‌ঠা চেহারার একটা লোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'অ্যায়, টিকিট আছে টিকিট?'

লোকটার পায়ের ফাঁকে মোটা একটা লাঠি শোয়ানো। পেছন দিকে লাঠির একটা অংশ লেজের মতো রাস্তায় পড়ে আছে। চোখের দু'কোণে পিচুটি। সত্যিই এরা পশু হয়ে গেছে। জলো কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল। পাশ থেকে লোকটিকে ভাল করে দেখার পর জলোর আর কোনও সন্দেহই রইল না, দাদা। দাদা মাথা হেঁট করে লাইনে বসে আছে দু'হাতা খিচুড়ির জন্যে। ওপাশ থেকে এপাশে খিচুড়ি এগিয়ে আসছে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। পথের ধুলোয় ফাটা শালপাতা। ধুলো, কাদা, মলমূত্র মাখামাখি হয়ে পেটে চলে যাবে। কারুর কোনও গ্রাহ্য নেই। জলোর গা ঘিনঘিন করছে।

একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে জলো ডাকল, 'দাদা। দাদা।'

শশধর ঘোলাটে চোখে জলোর দিকে তাকাল। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। যে মুহূর্তে বুঝল ভাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে একটা ভয়ের ভাব খেলে গেল। দু'হাতে মাথা আড়াল করে মাথা সামনের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে আর মারিসনি। আমাকে আর মারিসনি। তুই সব নিয়ে নে। বাড়ি নে, জমি নে, তোর বউদিকে নে। সব নে, সব নে। আমাকে আর মারিসনি।' শেষের দিকে শশধরের গলা ধরে এল। প্রায় কেঁদেই ফেলল। আর ঠিক সেই সময় শশধরের মাথা ছুঁয়ে দু'হাতা খিচুড়ি নেমে এল পাতে। পাতে পড়ল অর্ধেক, রাস্তায় পড়ল অর্ধেক।

দাদার কথা শুনে জলো আর চোখের জল চাপতে পারল না। চোখের পাশটা থেঁতলে কালচে লাল। জলোর আঙুলের গোমেদের আংটিটা ওখানে ঢুকে গিয়েছিল ঘুসি মারার সময়। পাশটা ফুলে উঠে চোখ প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

শশধরের বগলের তলা দিয়ে দুটো হাত গলিয়ে জলো দাদাকে পেছন থেকে টেনে তুলল। শশধর পেছন দিকে হেলে থেকে, কাঁদোকাঁদো গলায় বলতে লাগল, 'আমাকে একগাল খেতে দে। তারপর মারিস। তারপর যত খুশি মারিস। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে রে।'

কোনওরকমে দাদাকে লাইনের বাইরে এনে জলো আবেগ-অবরুদ্ধ চাপা গলায় বললে, 'কী হচ্ছে দাদা? তোমার কি কেউ নেই!'

যারা লাইনে বসে গোগ্রাসে খিচুড়ি খাচ্ছে, তারা এতই ব্যস্ত যে শশধর আর জলোর দিকে নজর দেবার সময় নেই। শশধর উঠে যাওয়ামাত্রই, খালি জায়গায় আর একজন বসে পড়েছে। দাদাকে বুকের পাশে চেপে ধরে জলো কাঁদছে আর বলছে, 'তোমার কি কেউ নেই?'

শশধর মাথা দোলাতে দোলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'কে আছে আমার? আমি ছাড়া আমার কে আছে? তুই সব নিয়ে নে জলো। আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিচ্ছি। বাড়ি নে, জমি নে। তোর বউদিকেও নিয়ে নে।'

রাস্তার পাশে বাঁধা-বটতলার বেদির ধারে ছায়া ছায়া অন্ধকারে শশধর আর জলো। দাদার বুকে মুখ গুঁজে জলো ফুলে ফুলে উঠছে। আবেগ চেষ্টা করেও চাপতে পারছে না। রাস্তা, লোক চলাচল, দু'-একজন তাকাচ্ছে। জলো জানে, রাজপথে এসব মানায় না, কিন্তু আজ বড় অসহায়। মাতালের অবস্থা। কী বলছে কী করছে, কোনও কিছুরই ওপরেই নিয়ন্ত্রণ নেই। জলো চাপা আবেগে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, 'আমাকে ক্ষমা করো। দাদা আমাকে ক্ষমা করো। সব আছে তোমার। সবাই তোমার। তুমি বাড়ি চলো।'

শশধরের মাথায় বিশেষ কিছু ঢুকছে না। তার চোখের সামনে শুধুই কুয়াশা। সংসারের কাছ থেকে তার আর কিছুই পাবার আশা নেই। ভবিষ্যৎ মুছে দিয়েছে ভাগ্য। অতীত ভুলে গেছে, ভবিষ্যৎ অদৃশ্য। বর্তমান যেখানে নিয়ে যায়। শশধর আর বাঁচতে চায় না। নতুন করে আর কিছু সে শুরু করতে চায় না। বিশ্বাস করে সে বহুবার ঠকেছে। আর কাউকে সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে মরতে চায়। একটু ভালবাসা পেতে চেয়েছিল। একটু দিতেও চেয়েছিল। কোথাও একটু গোলমাল ছিল। জীবনটাই বিষিয়ে গেল।

ঠুং ঠুং করে খালি একটা রিকশা চলেছে। জলো দাঁতে দাঁত চেপে আবেগ সংযত করে ডাকল, 'রিকশা'।

খানদান রিকশা-চাপিয়ের ডাক প্রবীণ রিকশআলা চেনে। দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল। থেমে পড়ে পিছিয়ে এল। রিকশা পেতে দিল সামনে, 'উঠিয়ে।'

'দাদা ওঠো। উঠে পড়ো। অনেক বেলা হল। তোমার খিদে পেয়েছে।'

শশধর জলভরা চোখে জলোর দিকে তাকাল। সে জানে, এসবই অভিনয়। কাল জলো মেরেই ফেলত। আজ আর ছাড়বে না। ভাই তার অনেক কায়দা জানে। অনেক অভিনয় জানে। দলবলের অভাব নেই। এই রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে যাবে এমন এক জায়গায় যেখানে তার মতো আরও অনেক শশধর নোনা মাটিতে জরে জরে নামহীন কঙ্কাল হচ্ছে।

জলো বললে, 'কী হচ্ছে কী! ওঠো, উঠে পড়ো।'

শশধর জলভরা চোখে ম্লান হেসে বলল, 'খুব কষ্ট দিবি না তো। তোর সবচেয়ে সহজ উপায়ে মারিস ভাই।'

কোনও উত্তর দিল না জলো। দেবার কিছু নেই। মানুষের অতীত এমনই এক অসুখ যা মানুষকে বসন্তের মতো দাগরাজি করে রেখে যায়। কথায় কিছু হবে না। কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। ক্ষত-বিক্ষত মানুষটির মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। রিকশায় উঠে শশধর হাত জোড় করে দু'পাশে নমস্কার করতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, আর যেন ফিরে আসতে না হয় এই খুনে পৃথিবীতে।

বেলা এগিয়েছে বেশ। তেরছা ছায়া পড়েছে পথে। শশধর নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখছে। যাবার আগে মানুষ এই চোখেই দেখে বোধহয়। উষ্ণ বাতাস বইছে। উঁচু উঁচু বাড়ির ঝুল বারান্দায় রেলিং-এ কনুইয়ের ভর রেখে, চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুখী সুখী চেহারার মেয়েরা। ঝকঝকে গাড়ি চেপে হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে অবাঙালি পরিবার। শশধর জানে এরা কোথায় যাচ্ছে। মার্কেটে। সিনেমায়। এরা আরও অনেক দিন এইরকম দাপটেই বেঁচে থাকবে। শশধর থাকবে না। রিকশা চলেছে ধীরে মন্থর লয়ে ঠুং ঠুং করে। শশধরের হাসি পাচ্ছে, সে তো মরেই গেছে। নতুন করে কী আর তাকে মারবে। এ তো মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! শশধর ক্লান্তি জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি?'

'বাড়িতে।'

'সেখানে গোপার সামনে সুবিধে হবে! অন্য কোথাও করলে হত না!'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না দাদা!' জলোর গলায় আবার আবেগ এসে গেল। চোখে জল এসে গেছে। রিকশা চলছে ঠুংঠুং করে। দু'জনেই সামনে পেছনে পাশে দুলছে। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। শশধরের জামাপ্যান্ট কাদা মাখামাখি। মাঝে মাঝে চোখ ঢুলে আসছে। মাথা ঝুলে পড়ছে সামনে। এরই মাঝে এক-এক চটকা স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। একবার গোপাও উঁকি দিয়ে গেল। ডুরে শাড়ি। শশধরকে ঠোঁট উলটে দেখাচ্ছে। যেমন দেখাত বিয়েব পরে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে, 'দেখো তো ঠোঁটটা লাল হয়েছে! আজকাল খয়ের বড় বিশ্রী। একেবারে বাজে।'

রিকশার ঝাঁকানিতে শশধরের চটকা ভেঙে যাচ্ছে। অবাক চোখে তাকাচ্ছে। সুখের অতীত

থেকে দুঃখের বর্তমানে ফিরে এসে মন সইয়ে নিতে সময় লাগছে। তার মাঝেই আবার ঘুম এসে যাচ্ছে। আবার স্বপ্ন। পুরীর সমুদ্রের ধারে সে আর গোপা। জলের কোল ঘেঁষে হাঁটছে গোপা। শশধর হাতচারেক পেছনে। গোপা শাড়িটাকে টেনে পায়ের অনেকটা ওপরে তুলেছে। ফরসা পায়ের গোছ। অদূরে নীল ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সাবানের মতো সাদা ফেনা ফিসফিস করে গোপার পায়ের পাতা ছুঁয়ে যাচ্ছে। পদচিহ্ন পড়ছে, আবার মুছে মুছে যাচ্ছে। বহু বর্ণের ঝিনুক ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

শশধর ঢুলছে, জাগছে, ঘুমোচ্ছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রার মধ্যেই চুক চুক শব্দ করছে মুখে। রিকশা চলেছে ঠুংঠুং করে।

দেবী শিবপদ আর কৃষ্ণপদকে বললে, 'আপনারা এবার বাইরে যান, আমি দেখছি। দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি।' দেবী দরজা বন্ধ করে তনুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবী জানে, কী হয়েছে তনুর। আচমকা পড়ে যাওয়ার ফলে পেটে যে নতুন প্রাণটি ধীরে ধীরে মানুষের অবয়ব নিচ্ছে, সে চমকে উঠে স্থান পরিবর্তন করায় টান ধরেছে। কিছুই না, তলপেটে নরম হাতে তালু ফেলে আস্তে আস্তে স্বস্থানে এনে দিতে হবে। ভয়ের কিছু নেই।

কৃষ্ণ আর শিব অসহায় দুই শিশুর মতো বাইরে পায়চারি করছে। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল। ও-দেয়াল থেকে এ-দেয়াল। যেন কড়া কোনও গেম-টিচার দুই শিশুকে হাজার বার পায়চারি করার আদেশ দিয়েছেন। তবে বাড়ি যাবার ছুটি মিলবে। দু'জনে পাশাপাশি একই মুখে হাঁটছে না। একজন এ-মুখো, আর একজন ও-মুখো। মাঝে মাঝে মুখ চাওয়াচাওয়ি হচ্ছে। চিন্তায় কথা মরে গেছে। কৃষ্ণ হঠাৎ ফিসফিস করে বললে, 'কী বিপদ বল তো ভাই?'

শিব ফিসফিস করে বললে, 'আর বলিস না। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

'মাকে ডাক। মাকে ডাক। আমি কিন্তু সেই থেকে ডেকেই চলেছি।'

'আমিও। নিরবচ্ছিন্ন ডেকে যাচ্ছি।'

দু'জনে দু'জনকে অতিক্রম করে, দু'পাশে দেয়াল ছুঁয়ে আবার ফিরে এল। যেন তাঁতের মাকু চলেছে।

বাইরের বারান্দা থেকে ডাক ভেসে এল, 'হ্যাললো জেন্টলম্যান? ইজ দেয়ার এনিবডি ইনসাইড।'

কৃষ্ণ আর শিব দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। কৃষ্ণ শিবের খুব কাছে সরে এসে ফিসফিস গলায় বললে, 'কে রে?'

শিব চাপা গলায় বললে, 'পুলিশ নয় তো!'

'হ্যালো জেন্টলম্যান।'

দেবী দরজা খুলে বেরিয়ে এল, 'বাবা, দরজাটা খুলে দিন। গাড়ি এসেছে।'

'ও গাড়ি!' শিব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুঝলি গাড়ি এসেছে। গাড়ি। এইবার সাত্যকি চলে যাবে।' শিব দরজা খুলতে এগোচ্ছে। বাইরে আর একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। জ্ঞানেশ আর নীলাও এসে গেছে।

জোড়া জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

শিব দরজা খুলতেই সামনে গোমেস। ছ'ফুট লম্বা, বিশাল চেহারা। যেন যমদূত। শিবও বেঁটে নয়, তবে এ যেন একেবারে মানুষ-দৈত্য। গোমেস শিবের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে।

'হ্যাললো স্যার। আয় অ্যাম ফ্রম পার্ক আন্ডারটেকার। হোয়ার ইজ দি বডি!'

শিবকে উত্তর দিতে হল না। জ্ঞানেশ পেছন থেকে বললে, 'কাম উইথ মি।'

জ্ঞানেশের পেছনে নীলা। শিব পলকের জন্যে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। দরজার পাশে সরে গিয়ে সকলকে ঢুকতে দিল। নীলা ভেতরে এসে দেয়াল ঘেঁষে দেবীর পাশটিতে দাঁড়াল। চাপা গলায় নিজের পরিচয় দিল 'আমার নাম নীলা।'

মিশুক দেবী নীলার একটা হাত দু'মুঠোয় জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নাম দেবী।'

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণ। নীলা দেবীর কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'উনিই সেই বিখ্যাত শিল্পী?'

দেবী ঘাড় নাড়ল। কৃষ্ণ রক্তের সম্পর্কে দেবীর কেউ নয়, কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দেবার সময় তার গর্ব হল। অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ।

গোমেস বারান্দা থেকে চিৎকার করে তার সহকারীদের বললে, 'ব্রিং দি কফিন।'

বাগানের পথ ধরে প্রায় ছ'ফুট লম্বা কফিন আসছে। খোলা দরজা দিয়ে কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর কারুকার্য করা। তার মনটা নেচে উঠল। কোনওদিন সে কফিন দেখেনি।

'কফিন, কফিন, কী সুন্দর কফিন!' কৃষ্ণ ছেলেমানুষের মতো ছুটে গেল।

নীলা দেবীর কানে কানে বললে, 'একেই বলে শিল্পীর মন। যার ভেতরে মৃত্যু থাকবে, সেই মৃত্যুর আধার দেখার জন্যে ছেলেমানুষের মতো কী আনন্দ!'

কৃষ্ণ ভাইকে ডাকছে, 'শিব, আয় আয় কফিন দেখবি আয়। কী সুন্দর দেখে যা, দেখে যা।'

নীলা দেবীকে জিজ্ঞেস করল, 'শিব কে?'

'ওনার ভাই। বড় কৃষ্ণ, ছোট শিব।'

'আই সি। ইনিই সেই বিখ্যাত শিক্ষক!'

দেবী সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয়?'

'আমার তেমন কোনও পরিচয় নেই। পামেলা বোসের সঙ্গে একটা অরফ্যানেজ চালাই।'

দেবী আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। কে পামেলা বোস! অরফ্যানেজ চালিয়ে কী হয়। মাথায় ঢুকবে না। দেবীদের পায়ের কাছেই কফিন নামল। কাঠের গন্ধ। পালিশের গন্ধ। কফিনের ডালার ওপর খোদাই করা লতাপাতা জড়ানো একটা ক্রুশ। শিব আর কৃষ্ণ দুই বালকের মতো ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

পরিবেশ ভুলে কৃষ্ণ বললে, 'কফিন কী সুন্দর হয় দেখ। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

শিব বললে, 'আমারও।'

'একঘেয়ে পুড়তে আর ভাল লাগে না রে? কীরকম একটা অসভ্য ব্যাপার। জানিস তো চিতায় তুলে শেষ কাপড়ের টুকরোটাও টান মেরে কোমর থেকে খুলে নেয়। গদগদে খানিকটা পিণ্ডি গিলিয়ে দেয়। চুল পুড়ছে, গাঁট ফাটছে, মাথার ঘিলু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বীভৎস কাণ্ড। ভাবলে আর মরতে ইচ্ছে করে না।'

'যা বলেছিস, আমারও মরতে ইচ্ছে করে না।'

'তবু, আমাদের মরতেই হবে, চিতায় চড়াবেই চড়াবে। জেন্টলম্যান, আমাদের ভেতরটা একবার দেখাবেন। ইনসাইড অফ দি কফিন। দিস নাইস ইটানর‍্যাল রেস্টিং প্লেস।'

গোমেস হেসে বললেন, 'সুন ইউ উইল সি দি ইনসাইড অফ ইট।'

সাত্যকি বোসের সাদা চাদর মোড়া দেহ বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে শূন্যে ভেসে ভেসে। গোমেস কফিনের ঢাকা খুলে দিলেন। ভেলভেটের লাইনিং। কর্পূরের গন্ধ ভেসে গেল বাতাসে। শিব আর কৃষ্ণ দু'জনেই স্তম্ভিত। ধীরে ধীরে সাত্যকিকে শোয়ানো হল কফিনে। শরীর শক্ত হয়ে গেছে। যাকে বলে মরে কাঠ। শান্ত মুখশ্রী। যুদ্ধ শেষ। রণক্ষেত্র ছেড়ে সৈনিক বিদায় নিয়ে চলেছে শান্তির স্বর্গে।

কৃষ্ণ ফিসফিস করে বললে, 'কিছুতেই আর কথা বলবে না, কী বল?'

'না, চির-নীরব হয়ে গেছে।'

'একসময় ওই মুখ কত কথা বলেছে। রসিকতা করেছে। মনে আছে, প্রাণ খুলে কেমন হাসত। যাই বলিস, বেশ একটু লোভীও ছিল। ভাল খাব, ভাল পরব। শেষ খাওয়ানো আর হল না।'

কৃষ্ণর গলা ধরে এল, 'খুব রোম্যান্টিক আর প্রেমিক ছিল। পৃথিবীটা সব সময় ওর চোখে নীল ছিল। চাঁদের আলোর রাত ওর ভীষণ প্রিয় ছিল। গাছপালা আর চাঁদের আলোর ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে বলত, কৃষ্ণ, কোথাও না কোথাও, কোনও বনের ধারে, সরোবরের কিনারে, এখনও রাধাকৃষ্ণ লীলা করেন। আমরা জানতে পারি না। এখনও বাঁশি বাজে, নূপুরের শব্দ হয় ঝুন ঝুন করে। বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যেত। অথচ সাত্যকি খ্রিস্টান ছিল।'

গোমেস বললেন, 'জেন্টলমেন, নাও আই উইল ফিকস দি লিড।'

কৃষ্ণ কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'জাস্ট এ মিনিট। আর তো দেখতে পাব না। হি উইল বি লস্ট ফর এভার।'

কৃষ্ণর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, একের পর এক জলবিন্দু চিকচিক করে গড়িয়ে পড়ছে দু'পাশের গাল বেয়ে।

'শিব আমি কিছু দিতে চাই। এমন কিছু যা ওর সঙ্গে যাবে স্মৃতিচিহ্নের মতো। দেখলেই মনে পড়বে বহু দূরে, পৃথিবীতে কৃষ্ণ বসে আছে, গভীর রাতে একা জেগে। বন্ধু কৃষ্ণ। অ্যান্ড স্লোলি, ভেরি স্লোলি টার্নস দি ওয়ার্লড ফ্রম ডার্কনেস টু লাইট, ফ্রম লাইট টু ডার্কনেস।' কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ ডান হাতের মধ্যমার আংটি খুলে ফেলেছে। কেউ কিছু বোঝার আগেই টুপ করে কফিনের ভেতরে ফেলে দিল।

'নাউ ক্লোজ ইট, ক্লোজ ইট।' বলতে বলতে কৃষ্ণ নেশাগ্রস্তের মতো পেছনের বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। শিব হতভম্বের মতো একা দাঁড়িয়ে। দেবী পাশে এসে দাঁড়াল। সে এই মুহূর্তে আরও আরও শূন্যতার ছবি দেখতে পাচ্ছে। ঝরাপাতার সংসার। এক, দুই, তিন, পাতা ঝরছে। কৃষ্ণ, শিব। সব শূন্য। সমস্ত পরিচয় ধোয়া স্লেটের মতো মুছে যাওয়া।

কফিন উঠে গেছে দু'জনের কাঁধে। মাঝখানে গোমেস স্তম্ভের মতো হাত দিয়ে ভার রেখেছেন। বহনকারীদের মুখ গম্ভীর। চলন ধীরস্থির। ঘর পেরিয়ে বারান্দা। ধাপ বেয়ে বাগানের পথে। দূর থেকে দূরে। সাত্যকি চলে যাচ্ছে। আর ফিরবে না। কোনওদিন তার কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না।

শিবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। সবার পেছনে নীলা। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। বারান্দার একপাশে জ্ঞানেশ দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় পা রেখে নীলা ফিরে তাকাল। ইশারায় জ্ঞানশকে ডাকল।

'আপনি কি যাবেন?'

'প্রয়োজন আছে?'

'অপ্রয়োজনে আর একদিন আসুন না।'

'কোথায়?'

'দুটো জায়গা তো চেনা হল আজ। তৃতীয় আর একটা জায়গা আছে।'

'হ্যাঁ, তৃতীয় আর একটা জায়গা। সেন্ট্রালি সিচুয়েটেড। নামটা আপনার শোনা বিজ্ঞাপনের কল্যাণে গ্যালাক্সি বোটিক। সেখানেও আসতে পারেন। অবশ্যই সন্ধের পর। আচ্ছা গুডবাই।' নীলা মৃদু হেসে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। স্টেশান ওয়াগান। প্রচুর জায়গা।

জ্ঞানেশের ঘোর লেগে গেছে। প্রেম? প্রেম আছে এখনও? ছাত্র জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি। নীলা। মেঘের মতো চুল। ব্যালে ড্যান্সারের মতো শরীর। শাড়ির আঁচল। গাড়িতে উঠতে উঠতে নীলা আর একবার তাকাল। সেই হাসি। হাত নাড়ছে। জ্ঞানেশ হাত নাড়ল। গাড়ি ধীরে ধীরে ব্যাক করছে। উইন্ডস্ক্রিনে গোমেসের বিশাল ভরাট মুখ। পাশে নীলার ধারালো মুখ। সরে যাচ্ছে।

ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে। এক বোতল মদ খেলে যেমন নেশা হয়, জ্ঞানেশের মনে হল তারও সেইরকম নেশা হয়ে গেছে। জীবন আর মৃত্যু চলেছে একই বাহনে। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ। এতক্ষণের নাটক শেষ হয়ে গেল।

নেশা কাটবার জন্যে জ্ঞানেশ গেটের সামনেই জগিং শুরু করল। জ্ঞানেশে জ্ঞানেশ ফিরে এসো। রঙিন আকাশে ডানা মেলো না। জোর পাবে না, পড়ে যাবে। প্রাত্যহিক জগতে ফিরে এসো। কতক্ষণ জগিং চলত কে জানে! শিবপদ ডাকল, 'জ্ঞানেশ।'

নেশার ঘোরেই জগিং হচ্ছিল। মাস্টারমশাইয়ের গম্ভীর ডাকে আকাশ থেকে নেমে এল জ্ঞানেশ। মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। এ কী করছিল সে। এমন এক জগতে চলে গিয়েছিল, যে জগতে গুরুজন-টুরুজন কেউ নেই!

জ্ঞানেশ মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে আসামাত্রই, কৃষ্ণ ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'যাঃ।'

শিব বললে, 'কী হল দাদা?'

'সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে রে শিব। সাত্যকির জুতো দু'পাটি পড়ে আছে। বেচারা খালি পায়ে চলে গেল।'

'কী হবে?'

জ্ঞানেশ বললে, 'পৌঁছে দিয়ে আসব মাস্টারমশাই!'

'আবার অত দূরে যাবে! তোমার যে আর একটা কাজ আছে বাবা। সহজে কি নিষ্কৃতি পাবে!'

'কী কাজ মাস্টারমশাই?'

'আবার তোমাকে আর এক জায়গায় ছুটতে হবে বাবা।'

॥ কুড়ি ॥

কৃষ্ণ বললে, 'শিব, বেলা অনেক হল। তোর জন্যে আজ আমি চুটিয়ে রেঁধেছি। চল, দুই ভায়ে মিলে যা হয় দুটো মুখে দিয়ে আসি।'

শিব করুণ কণ্ঠে বললে, 'দাদা, আজ আর এই অবেলায় কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না। তা ছাড়া, দেখো, এরা সবাই উপোস করে আছে। জ্ঞানেশ, দেবী, তনু।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। তা আমরা বরং সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খাই।'

জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টারমশাই, আমি ব্যাপসাদার মানুষ। কত দিন আমার খাওয়া হয় না। কারখানায় সারাটা দিন কাপের পর কাপ চা খেয়ে কেটে যায়। তা ছাড়া, বাড়িতে আমার রান্না হয়ে আছে।'

শিব বললে, 'তুমি সংকোচ করছ। আমাকে আপন ভাবতে পারছ না?'

'ছি ছি, তা কেন, তা কেন? অন্য যে-কোনও দিন আপনার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে আসব। আজ আমার খিদের অবস্থা শোচনীয়। মাস্টারমশাই, একটু আগে কী যেন একটা কাজের কথা বলছিলেন?'

'ও হ্যাঁ। তনু। তনু কেমন আছে দেবী?'

'জোর করে শুইয়ে রেখে এসেছি। ও মা, ওই যে উঠে পড়েছে।'

শিব সেদিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কেমন আছ মা এখন?'

'আমার তো কিছুই হয়নি বাবা।'

তনুকে কেমন যেন একটু পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। উদাস স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি।

কৃষ্ণ বললে, 'ঈশ্বর এই মেয়েটাকে খোদ নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কারখানার দু'নম্বর কোনও কারিগরের হাতে ছেড়ে দেননি। অত বড়লোকের বউ, কিন্তু কোনও অহংকার নেই। লক্ষ করেছিস শিব! আমরা হলে গুমরে মাটিতে পা পড়ত না।'

শিব অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ওইখানেই আমার চরম পরাজয় দাদা। আমি এমন এক গাছ, যে গাছের ফলটি বড় টক! পাতে দেওয়া যায় না। সারাজীবন নিজে নিরহংকারী নির্লোভ হবার সাধনা চালিয়ে গেলুম। বাইরে থেকে দেখলে আমাকে সেই রকমই মনে হবে; কিন্তু ভেতরে অবচেতনে সব ঘাপটি মেরে বসে আছে। নিজেও জানি না। সব ফুটে উঠল সন্তানে।

দেবী বললে, 'বাবা, এইসব আলোচনা করার সময় কিন্তু এটা নয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ মা। আর তা ছাড়া, একজনের অসাক্ষাতে তার সমালোচনা করা এক ধরনের অসভ্যতা। জ্ঞানেশ! জ্ঞানেশ কোথায় গেলে?'

'এই যে মাস্টারমশাই আমি আপনার পেছনে।'

'শোনো বাবা, তুমি এইবার আর একটু কষ্ট করে তনুকে পৌঁছে দিয়ে এসো। বেলা পড়ে আসছে। অমিত হয়তো কিছু মনে করবে। আমার মায়ের ওপর রাগারাগি করবে। ছেলেটা বড় কড়া কড়া কথা বলে।'

তনু বললে, 'আমি যাব না। আমি চলে এসেছি। আমি আপনার কাছেই থাকব। আমার ওখানে থাকতে ভাল লাগছে না।'

শিব অসহায়ের মতো একবার করে সকলের মুখের দিকে তাকাল, তারপর কোনও দিকেই না তাকিয়ে বলল, 'তা হলে কী হবে?'

কৃষ্ণ বললে, 'ভীষণ মজা হবে। সেই যে রে, সেই প্রবাদটা, কান টানলে মাথা আসে। মাথাটা চলে আসবে। অমু ফিরে আসবে সুড়সুড় করে। ড্যাম ডিফিট। ড্যাম ডিফিট।'

তনু বললে, 'তাকে আপনারা চেনেন না। সে আর ফিরবে না। বাবা ঠিকই বলেছেন, ভীষণ অহংকারী। অসম্ভব তার অহংকার। ভীষণ তার উচ্চাশা। স্ট্যাটাস কনশাস। সে অতীত ভুলতে চায়। পরিচয় মুছে ফেলতে চায়। আর, আর...।'

শিব বললে, 'থাক মা। তুমি হিন্দু রমণী। পতি-নিন্দা কোরো না। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমার ভালই করতে চেয়েছিলুম। তবে, তবে...।'

কৃষ্ণ বললে, 'পার্বতী কিন্তু শিবের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করে দিতেন।'

'পার্বতী যে একদিকে আবার শিবের মা ছিলেন গো। মা অন্নপূর্ণা হয়ে শিবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন।'

জ্ঞানেশ বললে, 'তা হলে কী হবে মাস্টারমশাই! আমি চলে যাব!'

'না, তুমি তনুকে নিয়ে যাবে। ও তো আমার অবুঝ মেয়ে নয়, স্বামীই ওর প্রথম। ওর প্রধান উপাস্য দেবতা। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। মা তনু!'

তনু নীরব।

'আমাকে ভুল বুঝো না মা। কর্তব্য আগে। ডিউটি ফার্স্ট, সেন্টিমেন্ট লাস্ট।'

তনু কান্না চাপতে চাপতে বললে, 'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন বাবা! বেশ। আমি চলেই যাই।'

'তাড়িয়ে?' শিবের গলা ভারী হয়ে উঠছে, 'তুমি যে আমার লক্ষ্মী, তুমি যে আমার মা। তোমাকে আমি তাড়াতে পারি! তোমার না থাকা মানে আমার মানসিক মৃত্যু। তবু অমিত যে আমার সন্তান। আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্বল স্থান। আমি প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। ওর বয়েস এখন কম। পৃথিবীটাকে এখনও ওর দেখতে অনেক বাকি। আর একটু পুড়ুক, আর একটু ঝলসাক। ভেতর থেকে একটা খাঁটি মানুষ বেরিয়ে আসবে। আসতেই হবে। ব্লাড লাইন, রক্তের ধারা, সেই ধারা সহজে কি মানুষ ভুলতে পারে!'

শিব এগিয়ে গিয়ে তনুর মাথায় হাত রাখল। তনুর শরীর আবেগে থিরথির করে কাঁপছে। কারুর নজরে পড়ার উপায় নেই। মুখ নিচু করে আছে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ছে পায়ের কাছে মেঝেতে।

শিব আবেগের গলায় বললে, 'তনু। মা আমার। আমি সবসময় তোমার পাশে আছি। তোমার কাছে আছি। তুমি যে আমার মনের সিংহাসনে বসে আছ মা।'

তনু পেছনের আসনে এলিয়ে বসে আছে। দু'পাশ দিয়ে শহর ছুটে চলেছে হুহু করে। স্পষ্ট হয়ে দু'চোখে কিছুই ধরা পড়ছে না। ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে যেন তনু সব কিছু দেখছে। ব্লটিং পেপারে আঁকা ছবির মতো। জ্ঞানেশ সামান্য আড় হয়ে বসে, আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছে। তনুর সঙ্গে আজই তার প্রথম আলাপ। আলাপ বললে ভুল হবে। প্রথম দেখা। তনু যেভাবে নিশ্চেষ্ট নির্বাক হয়ে বসে আছে তাতে কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও সাহস নেই। জ্ঞানেশের ভাবনায় এখন অনেক কিছু তালগোল পাকাচ্ছে। নীলা দগদগ করছে। বব-করা একমাথা রুপালি চুল। পামেলা বোস। হাসার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ত্বক কুঁচকে যাচ্ছে। চোখের চামড়ায় ফাট ধরছে। ভাঁজে ভাঁজে ফুলে উঠছে। চেলা কাঠের মতো সাত্যকির শক্ত দেহ কফিনে ঢুকছে। দৈত্যের মতো বিশাল গোমেস দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্রুববাবুর ডান হাতে গভীর খালের মতো দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ক্রাচ। একটা দিনের পক্ষে যথেষ্ট।

উলটো দিক থেকে হুহু শব্দে একটা মিনি ছুটে আসছে দামাল দৈত্যের মতো। জ্ঞানেশ টুক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো যেন মৃত্যুর সঙ্গে গাদি খেলা। একচুল এদিক-ওদিক মানেই মোড় হয়ে চিরকালের জন্যে কোর্টের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। তবু ভাল লাগে। মৃত্যুর হাত ফসকে ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার স্নায়বিক উত্তেজনা যেন বেঁচে থাকার চাবুক।

জ্ঞানেশের একবার মনে হল তনুকে জিজ্ঞেস করে, মাস্টারমশাইকে একা ফেলে রেখে তারা চলে গেল কেন? সংযত করে নিল নিজেকে। অভদ্রতা হবে। কত অবিচারই তো ঘটে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ক'টারই বা প্রতিকার হয়। ভাবতে ভাবতে জ্ঞানেশ আবার অরফ্যানেজ চলে গেছে। শিশুদের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। দু'হাত তুলে ছুটে আসছে চারপাশ থেকে।

তনু উঃ করে উঠল।

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল আপনার?'

'অসম্ভব মাথা ধরেছে।'

'কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবেন? গাড়ি দাঁড় করাব?'

'আপনি খাবেন?'

'আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে যা হচ্ছে!'

'কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন! মানুষ যে কখন কোথায় মারা যাবে কেউ বলতে পারবে না। ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। এইসব ভাবলে সত্যিই ভয় হয়। সেই হাত। অদৃশ্য সেই হাত! উঃ, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'একটা অ্যান্টি-হেডেক খাবেন কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে? কিনে নেব?'

'না, শুধুই কোল্ডই খাওয়া যাক।'

জ্ঞানেশ একটা ভাল দোকানের পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। দোকানের নামটি ভারী কাব্যিক—তৃষ্ণা।

অমিতাভ চাকা-লাগানো রিভলভিং চেয়ার ঠেলে টেবিল থেকে উঠে পড়ল। দিনের কাজ শেষ। সারাদিন আজ বহুত ঝামেলা গেছে। একের পর এক। তিন-তিনবার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে

আলোচনায় বসতে হয়েছে। মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই মিডল ইস্টে ছুটতে হবে। ব্রিফকেস সবে বন্ধ করেছে, ডিরেক্টারের পি-এ মেরি হাই হিলের খটখটে শব্দ তুলে ঘরে এসে ঢুকল। বব চুল। একটু পুরু লাল টকটকে ঠোঁট। মিনি স্কার্ট। ওয়েলার ঘোটকীর মতো চলন। সারা অফিসে ভক্তের অভাব নেই।

অমিতাভ বললে, 'এনি প্রবলেম?'

'নাথিং। জাস্ট ফর এ ফেভার।'

মেরি অমিতাভর প্রায় বুকের কাছে চলে এসেছে। এত কাছে যে তার শরীরের উত্তাপ আর ঘ্রাণ এসে লাগছে। চোখ চলে যাচ্ছে শরীরের গভীর প্রদেশে।

'ক্যান ইউ লেন্ড মি এ হান্ড্রেড রুপিস!'

'হোয়াই নট!'

হিপ পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে অমিতাভ মেরির সামনে ধরল। সরু সরু দু'আঙুলে নোটটা নিতে নিতে মেরি বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ডারলিং।'

প্রথম প্রথম মেরির আচমকা কথায় অমিতাভ চমকে উঠত। এখন আর চমকায় না। হিলের শব্দ তুলে মেরি চলে যাচ্ছে। অমিতাভ যত ভাবছে তাকাবে না, ততই চোখ চলে যাচ্ছে। মেয়েদের পেছনেও মনে হয় চোখ থাকে। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মেরি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নেশা জড়ানো গলায় বললে, 'গুড নাইট।'

অপ্রস্তুত অমিতাভ বললে, 'ও ইয়েস, গুড নাইট।'

লিফটের অপেক্ষায় না থেকে অমিতাভ সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। অনেকটা নীচে নামতে হবে। তা হোক। নামা অনেক সহজ। যত নীচেই হোক না কেন সহজেই নামা যায়।

সারাদিনে এই প্রথম তার তনুর কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ কাজের চাপে, সহকর্মীদের আসা-যাওয়ায় ঘরসংসার ভুলেই গিয়েছিল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতলগামী। সাদা নির্জন দেয়াল। বাঁকে বাঁকে সাদা ডোম চুঁইয়ে আলোর কষ গড়াচ্ছে। একা অমিতাভ। অমিতাভ ভার্সাস অমিতাভ। এমন কায়দার বাড়ি, বাইরে আলো কি আঁধার বোঝবার উপায় নেই। কৃত্রিম আবহাওয়া, কৃত্রিম আলো। কৃত্রিম সাজপোশাক, হাবভাব, চালচলন। একেবারে নীচের তলায় এসে অমিতাভ আকাশ দেখতে পেল। তাঁবুর চাঁদোয়ার মতো বহু ওপরে ঝুলছে আকাশ। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুঃখীর চোখের মতো দুটি তারা মিটমিট করছে।

কার্বে সবুজ রঙের গাড়ি অমিতাভর জন্যে অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল। আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কে খুব জোরে জোরে ইংরেজি সুর শিস দিচ্ছে। সন্ধের আমেজ নামছে।

গাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় পড়ার মুখে বাধা পেল। বিশাল বাড়ির ছায়ায় মেরি দাঁড়িয়ে আছে। তলপেটের কাছে ভ্যানিটি ব্যাগ ডান হাতের কবজি থেকে ঝুলছে। সোনালি ঘড়ি ঝিকঝিক করছে। কানের সরু পেন্ডান্ট তিরতির করে দুলছে। যত অন্ধকার ঘন হচ্ছে মেরির শুভ্র নেট মোড়া পা দুটো ততই আলোকস্তম্ভের মতো স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠছে। অমিতাভ থাবড়া মেরে যে কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে ভেসে উঠেছিল সরাবার চেষ্টা করল— নরকের দুই শুভ্র প্রহরী।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েটিং ফর এনি ওয়ান?'

মেরি কাছে সরে এল। অমিতাভর একেবারে নাকের সামনে মেরির সিল্কের বুক ওঠা-নামা করছে। বড় নেশা জাগানো উষ্ণ বিলিতি সুবাস। শরীর যত ঘামতে থাকে সুঘ্রাণ তত প্রবল হয়।

মেরি বললে, 'সাপোজ ফর ইউ।'

অমিতাভর বুকের মাঝখানটা ধক করে উঠল। প্রবীণ ডিরেক্টারের পি-এ বলে কী?

অমিতাভ অবাক হয়ে বললে, 'ফর মি?'

'ইউ ক্যান গিভ মি এ লিফট।'

'দেন কাম ইন।'

অমিতাভ দরজা খুলে দিতেই মেরি তড়াক করে ভেতরে ঢুকেই সিটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আসন নেচে উঠল। মেরি আয়েশ করে হেলে বসতে বসতে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং।'

অন্ধকারে অমিতাভর কপাল কুঁচকে উঠে আবার সমান হয়ে গেল। সামান্য এক স্টেনোর এত দুঃসাহস তার ভাল লাগে না। কী আছে মেয়েটার! শীতের শিশিরভেজা তাজা কপির মতো শরীর আছে। ইংরেজি বুকনি আছে। সিগারেট খাওয়া আছে। কায়দা করে শরীর প্রদর্শন আছে। আর কী আছে!

অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'হোয়্যার টু?'

'রয়েড স্ট্রিট।'

অমিতাভ সরে বসল। মেরির কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছিল। গায়ে-পড়া মেয়ে তার অসহ্য লাগে। দূর থেকে তার যত বিবাহ অতিরিক্ত পরিকল্পনা। ভোগের নানারকম উদ্ভট কল্পনা। কাছে এলে সংস্কার জেগে ওঠে। বন্ধু রজত ঠিকই বলেছিল, অমিতাভ, লম্পট হওয়া অত সহজ নয়। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হতে না পারলে বৃথা চেষ্টা। মেরি দু'হাত কানের পাশে উঁচু করে চুল ঠিক করছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে। সবই প্রলোভন মাখানো। এক সুতো এদিক-ওদিক হলেই অমিতাভ ইঁদুরকলে পড়ে যাবে। মরবে না, কিন্তু বন্দি হয়ে পড়বে। নাঃ ইংরেজি ট্র্যাশ উপন্যাস যত কম পড়া যায় ততই ভাল। দেহ আর ভোগ ছাড়া ওরা কিছু জানে না।

গাড়ির গতি হঠাৎ ধীর হয়ে গেল। সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যাল। অমিতাভ ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল। আলো ঝলমলে দোকান। আইসক্রিমের বাক্স। রং-বেরঙের সিগারেটের প্যাকেট। বোতলে রঙিন পানীয়। সুন্দরী একটি মেয়ে ঠোঁটে স্ট্র লাগিয়ে কমলালেবু রঙের জল চুষছে। স্বাস্থ্যবান একটি যুবক পাশ থেকে বোতলে আর একটা স্ট্র ভরে দিচ্ছে। হাসছে আর কী যেন বলছে। চমৎকার জুটি!

হঠাৎ অমিতাভ চমকে উঠল। মেয়েটি কে? তনুর মতো দেখতে। তনু না। তনুই তো! সেই এলো খোঁপা। মিষ্টি মুখ। তনু এই সময়ে এখানে আসবে কী করে! ভাবতে ভাবতেই পুলিশের হাত নেমে গেল। গাড়ি সামান্য ঝাঁকুনি মেরে সামনে এগিয়ে গেল।

অমিতাভ আর একবার দেখতে চায় ভাল করে। নিশ্চিত হতে চায়। মেরির কোলের ওপর কনুই রেখে বাঁ দিকে যতটা সম্ভব হেলে পড়ল। অমিতাভ কী করছে কোনও খেয়াল নেই। দেহ গাড়িতে, মন পথের পাশে ওই দোকানে। ছেলেটা কে? সঙ্গে একটা চমৎকার নতুন গাড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে।

স্পর্শকাতর জায়গায় অমিতাভর কনুইয়ের তীক্ষ্ণ চাপ পড়ায় মেরি নেচে উঠল। তার মাথা নেমে এসেছে অমিতাভর ঘাড়ের কাছে। কানের কাছে ঠোঁট। ফিসফিস করে বললে, 'ও, ইউ আর নটি। দিস ইজ নট দি প্রপার প্লেস ডার্লিং। কাম টু মাই অ্যাপার্টমেন্ট।'

চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো অমিতাভ সোজা হতে চাইল। ভীষণ ভুল করে ফেলেছে। সহজে সোজা হতে পারল না। কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত আস্ত একটা নিটোল বাহু তাকে বুকের কাছে চেপে ধরে আছে। বিষ ঢালছে সর্পিণী। চিন্তা ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে। অসম্ভব লড়াই চলেছে ভেতরে। জোনাকি গোবরে পড়ে গেছে। জ্বলছে কিন্তু উড়ে যেতে পারছে না। একটা বাহুর জায়গায় আরও একটা বাহু এসে গেছে। জোড়া সাপে জড়িয়ে ধরেছে। মেরির চিবুক চেপে বসছে অমিতাভর ঘাড়ে। গালের একটা পাশ গরম নিশ্বাসে পুড়ে যাচ্ছে।

অমিতাভর একবার মনে হচ্ছে ঝটকা মেরে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে নেয়। পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, কার প্রতি বিশ্বস্ততা। তনু তো পথে নেমে পড়েছে। চমৎকার একটি পুরুষ জোগাড় করে

নিয়েছে। যে হেসে হেসে স্ট্র গুঁজে দিচ্ছে তার বোতলে। যার স্ত্রী অবিশ্বস্ত তার সামনে তো যে-কোনও অ্যাডভেঞ্চারের পথ খোলা। ও পক্ষ যখন এত বেপরোয়া, এ পক্ষই বা তখন চুপ করে থাকে কেন? যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা উচিত? হাতের একটা পাখি বনের দুটো পাখির চেয়ে ঢের ভাল।

দু'পাশ থেকে দোকান সমেত রাস্তা ক্রমশই চেপে আসছে। গাড়ির পেছনের আসনে আর তেমন নিভৃত অন্ধকার নেই। মেরি অমিতাভকে প্রায় হাঁটুর ওপর শুইয়ে ফেলেছে। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ এনে বলছে, 'সাম টাইমস আই ফিল ভেরি হাংগ্রি।'

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে বললে, 'কী এখন বেশ একটু সুস্থ মনে হচ্ছে না?'

তনু এবার সামনের আসনে জ্ঞানেশের পাশে বসেছে। কপালের ওপর থেকে বাতাসে ঝুলে-পড়া চুলের গুছি সরাতে সরাতে বললে, 'মন্দ লাগছে না। দুপুরের দিকে আজকাল আমার চোরা অম্বল হচ্ছে মনে হয়।'

'ভাল কথা নয়। ইউ মাস্ট টেক প্রিকশান।'

'আজ অবশ্য অন্য কারণ আছে। এতক্ষণে মনে পড়ল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। পিত্তি পড়ে গেছে।'

'সে কী! খালি পেটে জল পড়ে গেল? কিছু খাবেন? অবশ্যই কিছু খাওয়া উচিত।'

তনু হালকা শব্দ করে হাসল, 'ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস। বাবাকে এখানে এসে রেঁধে খাওয়াব বলে বেরিয়েছিলুম। সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন বেশ ভয় ভয় করছে। অফিস থেকে ফিরে এসে ও যদি দেখে আমি নেই, কী যে করবে! কী যে হবে! ভাবতেও পারছি না।'

'আমি তো সঙ্গে রয়েছি। বলব, মাস্টারমশাইয়ের বিপদ শুনে আপনি ছুটে গিয়েছিলেন।'

তনু পরিমিত মাপের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'দুনিয়াটা বড় জটিল জ্ঞানেশবাবু। অত সহজে সমস্যার সমাধান হয় না।'

'অমিতাভবাবু শিক্ষিত ছেলে। এনলাইটন্ড ম্যান। বোঝালে তিনি অবশ্যই বুঝবেন।'

তনু উদাস গলায় বললে, 'কিছু কিছু প্রিমিটিভ ফিলিংস আছে জ্ঞানেশবাবু যা সহজে চাপা পড়ে না। তার মধ্যে একটা হল পজেসিভনেস। অধিকারবোধ। মানুষ যত শিক্ষিতই হোক, জরুকে সে গোরু ভাববেই।'

জ্ঞানেশ বললে, 'আমরা মনে হয় এসে গেলাম, না!'

'হ্যাঁ। ওই তো সামনে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিন। তলার গোটাটাই পার্কিং লট।'

ধীরে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে জ্ঞানেশ বললে, 'একেবারে বিলেত।'

'হ্যাঁ, একেবারে বিলিতি ধরন। ঝকঝকে। চকচকে। তবে ওই। সমুদ্রের শীতল ঢেউয়ে যেমন ফসফরাস জ্বলে, এ জীবনও তেমনি। খুব পশ। মাপা কথা, চাপা হাসি, যেন কতই শান্তি। আসলে তা নয়। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আগুন নাচছে।'

তনু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে, 'চলে যাবেন নাকি?'

'যেমন আদেশ করবেন।'

'আসুন না। বেশ চেনা হয়ে যাবে। বাবার প্রয়োজন হলে আসতে পারবেন।'

দু'জনে লিফটের সামনে। সুটপরা লম্বা চেহারার এক বৃদ্ধ ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে। আর কেউ কোথাও নেই। অটো-লিফট নেমে এল। ফুস করে দরজা খুলে গেল। একেবারে শূন্য। আর তখনই জ্ঞানেশের মনে পড়ে গেল সেই কফিনের কথা।

দেয়ালে পিঠ রেখে হাঁটু উঁচু করে দু'হাতে মাথা ধরে শিব বসে আছে। কিছু দূরে কৃষ্ণ বসে আছে বাবু হয়ে। সোজা টানটান। দু'জনে মুখোমুখি। মাঝখানে একফালি লাল মেঝে ছলছল করছে। সময়ের নৌকো চলেছে পাল তুলে রাজহাঁসের মতো।

খাবার ঘরে দেবী ভীষণ ব্যস্ত। বিশাল এক ডেকচিতে গরম দুধ ঢেলেছে। দুধ, চিঁড়ে, কলা চটকে একটা ফলার মতো হবে। অনেক কষ্টে দু'জনকে রাজি করিয়েছে। মানুষকে চিরকালের মতো স্তব্ধ করে দিতে পারে এমন শোক পৃথিবীতে এখনও অজানা। জীবন থামবে, আবার চলতে শুরু করবে: এই তো দুনিয়ার নিয়ম। কোনও মৃত্যু দেখলেই স্বামীর মৃত্যু ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মন একটু নাড়া খায়। আবার থিতিয়ে পড়ে। চিড়ে আর কলা দেবীই সংগ্রহ করে এনেছে।

শিব ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

কৃষ্ণ বলল, 'কেন অত ভাবছিস? কী জন্যে ভাবছিস? কীসের জন্যে ভাবছিস? দুঃখ আর সুখ বুঝলি শিব, দুই পথিক। চলতে চলতে কখনও এর সঙ্গে কখনও ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কাঁধে হাত রাখে বন্ধুর মতো। কিছু পথ চলার পর বিদায় নিয়ে চলে যায়। তখন সুখও নেই দুঃখও নেই। ফ্যালফেলে জীবন। কী হবে ভেবে? ভাবনার কূল-কিনারা আছে। আমাদের এই ঝুনো মাথাকে যতটা খালি রাখা যায় ততই ভাল।'

শিব আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার ভীষণ মন কেমন করছে দাদা।'

'কার জন্যে?'

'তনুর জন্যে। কত দেখেশুনে, পছন্দ করে, বংশ পরিচয় নিয়ে ছেলের বিয়ে দিলুম। কী হল দাদা? কী লাভ হল? মেয়েটার জীবনটাই মনে হয় নষ্ট হয়ে গেল।'

'জীবনের তুই বিশেষ কিছুই জানিস না। মেয়েদের অসম্ভব মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। বলে শুনিসনি, মেয়েরা হল জলের মতো, যে পাত্রে রাখবি, সেই পাত্রের আকার নেবে। ওসব ভাবনাচিন্তা ছাড়। আয় দাবা নিয়ে বসা যাক এক হাত।'

'আগে খেয়ে নিন।' দেবী ঘরে এসে ঢুকল। দুধ কলা মাখা চিড়ের ভুরভুরে গন্ধ বেরোচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে বাটি নিতে নিতে কৃষ্ণ বললে, 'এই আর একটা মেয়ে। তনু হল টাকার এ-পিঠ, দেবী হল টাকার ও-পিঠ। বাঃ ফাসক্লাস মেখেছ। ওব্বাবা আবার কিসমিস দিয়েছ। নাঃ, তোমার একেবারে খানদানি টেস্ট। শিব, খেয়ে দেখ, খেয়ে দেখ। একেবারে অমৃত। তোমার কই! দেবী তোমার?'

'আমার আছে। তা ছাড়াও আছে। দরকার হলে চাইবেন। বাবা, আপনি মুখে তুলুন।'

'হ্যাঁ মা, জ্ঞানেশের জন্যে রেখেছ তো?'

'হ্যাঁ বাবা।'

শিব দুঃখী দুঃখী মুখে এক চামচ খেল। খেতে খেতে বললে, 'অপূর্ব! পবিত্র হাতের প্রসাদ। একটা কথা কেবলই ভাবছি, তনুর কি কিছু খাওয়া হল। হ্যাঁ মা, তেমন মারাত্মক লাগেনি তো!'

'একটু লাগবেই। পরে একবার চেক-আপ করিয়ে নিলেই হবে।'

'অমিতাভ কি করাবে? সে তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত!'

'অবশ্যই করাবে। আপনার ছেলে কখনও অমানুষ হতে পারে না।'

'দ্যাটস রাইট।' কৃষ্ণ দেবীকে সমর্থন করল।

'তুই কি আর নিবি দাদা?'

কৃষ্ণ লাজুক লাজুক মুখে দেবীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কম পড়বে না তো!'

'কম পড়বে কেন? দাঁড়ান আনছি।'

দেবী চলে গেল। কেউ খেতে চাইলে তার ভীষণ আনন্দ হয়।
কৃষ্ণ হাসি হাসি মুখে শিবের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মানুষ কী সাংঘাতিক জীব দেখেছিস শিব!'
'সে আর বলতে? পৃথিবীটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে।'
'কেন বললুম বল তো? সাত্যকি কফিনে চড়ে চলে গেল। এতক্ষণে মনে হয় সাত হাত মাটির নীচে। আর আমরা এদিকে আঙুল চুষছি। ধ্যুত, মানুষকে কোনওদিন বিশ্বাস করিসনি।'
'মানুষকে না বিশ্বাস করলে বাঁচবে কী করে দাদা। বিশ্বাস করতে হবে। ঠকতে হবে। ধাক্কা খেতে হবে। উটের কথাই ভাবো না। কাঁটাগাছ চিবোচ্ছে। দু'কশ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তবু ওই তার খাদ্য। না খেলে বাঁচে না।'
'তা অবশ্য ঠিক। যীশু যদি আবার জন্মান তা হলে কী হবে! মানুষের ভাল করতে গিয়ে ক্রুশে চেপেছিলেন। সেই মানুষের জন্যেই আবার জীবন উৎসর্গ করবেন। নাঃ, আর ভাবতে পারছি না। কী পেলে যে বেশ সুখী হওয়া যায়, এইটুকু যদি জানতে পারতুম; তা হলেও হত।'
দেবী এল। দু'হাতে ঝকঝকে দুটো বাটি।
শিব বললে, 'আবার তুমি নতুন বাটি আনলে! এই বাটিতেই ঢেলে দাও না।'
'না না, এঁটো বাটিতে খেতে ভাল লাগবে না। তা ছাড়া এতে আর একটু কেরামতি করেছি।'
কৃষ্ণ বাটিটা চোখের সামনে তুলে ধরে বললে, 'কী কেরামতি করেছ গো!'
'খেয়ে বলুন তো!'
কৃষ্ণ মুখে এক চামচে পুরে স্বাদ নিতে নিতে বললে, 'ডেপথ অনেক বেড়ে গেছে।'
শিব বললে, 'তুমি দেখছি আর্টের ভাষা বলছ?'
'হ্যাঁ রে, কী একটা চাপিয়েছে, আগের চেয়ে ডেপথ অনেক বেড়ে গেছে।'
'আমি বলব কী পড়েছে! কনডেন্সড মিল্ক।'
দেবী বললে, 'ঠিক ধরেছেন।'
কৃষ্ণ বললে, 'তোফা, তোফা। কী আমরা রোজ একঘেয়ে ভাত ডাল খাই! পেটে চড়া পড়ে গেল। আয় কাল থেকে আমরা ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করি।'
'অনেক খরচ রে দাদা। গরিবের ভাত ডালই ভাল। তুমি যাও মা। এবার তুমি খেয়ে নাও। আমাদের আর কিছু লাগবে না।'
কৃষ্ণ বললে, 'একেবারে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিলুম। আবার সেই কাল দুপুরে।'
দেবী যাবার জন্যে পেছন ফিরেছে, খোলা দরজা দিয়ে তোতা লাফিয়ে পড়ল ঘরে।
'মা-আ। দাদাই।'
খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে গেল। যেন ঝরনার জল।
দেবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ও মা, এ কী রে! তুই কার সঙ্গে এলি?'
'একা একা।'
'একা এলি? দুর্গা?'
'ও মা জানো মা, সে কী মজা। দুর্গাদিদিকে বললুম, এসো কানামাছি খেলি। একটা গামছা দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চোখ বেঁধে দিয়েছি মা। তারপর কানামাছি ভোঁ ভোঁ। দেখো গে যাও এখনও সারা ঘরে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে।'
তোতা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।
'তুই কী সর্বনেশে মেয়ে রে!'
'বলো মা, আমার কীরকম বুদ্ধি!'
'খুব বুদ্ধি মা। দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় একেবারে ঠাসা। নাঃ, তুই আমাকে একটুও শান্তি দিবি না।'
'বা রে, তুমি সেই কখন এসেছ! আমার মন খারাপ হয় না?'

'আমি অফিসে গেলে তুই কী করিস?'

'বা রে তুমি কি আজ অফিসে গেছ!'

দুই বৃদ্ধ অবাক হয়ে মা আর মেয়ের কথা শুনছে। খাওয়া বন্ধ। তোতাকে এত সুন্দর দেখতে, যেন ডানাকাটা পরি। কচি কচি আঙুল নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। চোখ দুটো কালো হিরের মতো জ্বলজ্বল করছে।

কৃষ্ণ ছেলেমানুষের মতো বললে, 'শিব, কী সুন্দর! তাই না! আবার আমার তুলি ধরতে ইচ্ছে করছে।'

শিব বললে, 'জানিস দাদা, এই মেয়েটা হল পৃথিবীর পবিত্রতার মুখ। বড় বড় সেনাপতিরা রাজ্যজয়ের জন্যে অস্ত্র ধরেছেন, এইসব মেয়ের মুখ চেয়ে পবিত্র এক সমাজ তৈরির জন্যে অস্ত্র ধরা উচিত। পাপ আর আবর্জনা নিকাশ করে এদের বড় হতে দাও, সুন্দর হতে দাও।'

'সে আর হয়েছে রে শিব! ধর্ম, আদর্শ সব লোপাট। এখন শুধু ভোগ আর পাপ। পাপ মানুষকে কীরকম টানে দেখেছিস?'

তোতা পেছনদিক থেকে কৃষ্ণর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'ছবিদাদু, তুমি আমায় ছবি এঁকে দেবে তো!'

'হ্যাঁ রে দিদি। কাল দুপুরে তোমার জন্যে রং আর তুলি নিয়ে বসব।'

কৃষ্ণর গলা ছেড়ে তোতা শিবের সামনে উবু হয়ে বসে বললে, 'তোমার পায়ে কী হয়েছে দাদু! বেড়ালে কামড়েছে কি? তুমি কি বেড়ালের ন্যাজ মাড়িয়েছিলে? কী খাচ্ছ গো তুমি কেঁদে কেঁদে! নিশ্চয় মা তোমাকে সাবুর পায়েস করে দিয়েছে! মে গে, ফেলে দাও, ফেলে দাও। অখাদ্য।'

কৃষ্ণ হেসে বললে, 'তুই একটু খাবি দিদি।'

'আমি ওসব খাই না। তুমি আমাকে চানাচুর দাও না। বসে বসে খাই।'

দেবী বললে, 'তাই তো রে, বড় সাহস! জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই চানাচুর।'

শিব বললে, 'তোতাকে একটু দেবে নাকি? কী আর হবে!'

তোতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'গন্ধটা বেশ ভালই ছাড়ছে। না বাবা খাব না। তোমরা বলবে, মেয়েটা হ্যাংলা। খাবার লোভে ছুটে এসেছে।'

শিব আর কৃষ্ণ দু'জনেই হেসে উঠল। দেবী বললে, 'কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি বেশ হ্যাংলা আছ।'

তোতা ছুটে গিয়ে দেবীর কোমর ধরে ঝুলে পড়ল। মুখটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে বলতে লাগল, 'যাঃ, যাঃ।'

আর ঠিক তখনই দরজা দিয়ে কাঁদোকাঁদো মুখে দুর্গা এসে ঢুকল, 'বউদি, তোতা নেই।'

বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল।'

মায়ের আড়াল থেকে মুখ বের করে তোতা বললে, 'টুকি।'

হাতের তালুতে চোখ মুছতে মুছতে দুর্গা রাগ আর চাপা অভিমান মেশানো গলায় বললে, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কোনওদিন খেলব না। কোনওদিন আর খেলব না। দেখে নিয়ো।'

কান্না চাপতে চাপতে দুর্গা ছুটে বাইরে চলে গেল। দেবী পেছন পেছন ছুটল, 'দুর্গা শোন, দুর্গা শোন।'

দুর্গা ছুটছে। বাগানের পথ পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

কৃষ্ণ বললে, 'শিব, ভালবাসাটা একবার দেখলি! দেখলি তুই! আপন পর নেই রে! মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নেমে আসে। এইসব দেখলে আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে। তুই আমাকে ভালবাসিস শিব?'

'তোমার কী মনে হয় দাদা!'

বয়েস যত বাড়ছে, কৃষ্ণর আবেগও তত বাড়ছে। চোখ বেয়ে জল পড়ল দু'ফোঁটা। এক পাশে দাঁড়িয়ে তোতা হাঁ করে দেখছে।

উঠোনের রকে থামে ঠেসান দিয়ে শশধর বসে আছে। গোপা গরম জল করে দিয়েছিল। জলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে দাদাকে মেজে ঘষে চান করিয়েছে। এমন চান শশধর বহুকাল করেনি। দেহের চামড়ায় বুড়ো আঙুলের মাথা ঘষলে কচকচ আওয়াজ হচ্ছে। পরনে পরিষ্কার পাজামা। বুক খোলা পাঞ্জাবি। বাতাসে ফুরফুর করে চুল উড়ছে। শশধরকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সূর্যাস্তের আকাশের মতো অস্ত যৌবনের দেহ, এত অবহেলা আর অনাচারেও কুৎসিত হয়ে যায়নি। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাক। চোখ দুটোতেই যা উদাস ক্লান্তি। শশধর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কিছুই সে ভাবছে না। জীবন এখন ভাবনাচিন্তার বাইরে চলে গেছে। হাল ভাঙা নৌকো ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে। যেখানে যায় যাক। যেখানে ঠেকে ঠেকুক। জলো এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই রেখে গেছে পাশে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বার কতক টেনে আর টানেনি। ছাই ক্রমশই লম্বা হচ্ছে। শশধরের চোখ জড়িয়ে আসছে। চানের পর স্নায়ু শিথিল হয়ে গেছে। জোর করে চোখ খোলা রাখারও গরজ নেই।

বহুকাল পরে গোপা যেন আবার জেগে উঠেছে। গা ধুয়ে পরিষ্কার শাড়ি পাট ভেঙে পরেছে। চুল বেঁধেছে টানটান করে। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্না করছে। আজ সে শশধরকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে। সেই যেমন খাওয়াত বিয়ের পর যখন সে ছিল নতুন বউ। তাগায় লাল সুতো। দুর্বো খসখস করছে। মুখের লাল ভাব তখনও কাটেনি। গোপা ঠিক করেছে এবার সত্যিই সে স্বভাব পালটাবে। সুখের সংসার তৈরি করবে। এখনও সময় আছে। উঠে পড়ে চেষ্টা করে দেখবে মা হওয়া যায় কি না!

জলো চুটিয়ে বাজার করে এনেছে। অবেলায় মাছ জোগাড় করে এনেছে। গোপা বসে বসে একমনে চাকা চাকা আঁশ ছাড়াচ্ছে আর গুনগুন গান গাইছে। আজ যেন গোপার ফুলশয্যা। শশধর যখন বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামছে, তার অবস্থা দেখে গোপা কেঁদে ফেলেছিল। ছুটে গিয়ে শশধরের হাত ধরেছিল রাগে ঘৃণায় শশধর ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দেয়নি। বরং অবাক হয়ে বলেছিল, 'সত্যিই তুমি কাঁদছ! তোমার চোখে জল!'

জলো বলেছিল, 'তোমার জন্যে আর কে কাঁদবে দাদা, বউদি ছাড়া।'

শশধর বলেছিল, 'তা ঠিক, গোরু এখনও দুধ দেয়, হাঁস এখনও ডিম পাড়ে, মা এখনও ছেলে মানুষ করে। ভাই এখনও ভাইকে পথ থেকে তুলে আনে। শিশির এখনও পড়ে।'

গোপার চোখে আজ সব কিছু খুব উজ্জ্বল লাগছে। আলোর তেজ বেড়ে গেছে। উনুনে গনগনে আঁচ। ঘটিবাটি কাপ ডিশ সব যেন জ্বলজ্বল করছে। গোপা গুনগুন করে গান গাইছে। একসময় সে নাচত, গাইত। শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছে দু'-একবার। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসত তবে সম্পর্ক এগোতে দিত না বেশি দূর।

গোপা মাছ ভাজছে। থামে হেলান দিয়ে শশধর ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে জলো ব্যাবসার হিসেবপত্র নিয়ে বসেছে। নির্জন ঘর। জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প লাগা বিধবা দেয়াল। ক্যালেন্ডার, ছবিমবি, যেখানে যা ছিল সব আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে। সাফাই অভিযান শুরু হয়ে গেছে। বাইরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একটা-দুটো রাত নিজেকে ধরে রাখতে পারলেই জলো নতুন পথ খুঁজে পাবে। নিজের চেয়ে আপনজন, বড় বন্ধু পৃথিবীতে আর কে আছে! খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে জলো মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যাচ্ছে। অতীতের বহু ঘটনা এসে লজ্জা দিয়ে যাচ্ছে।

তনু দরজা খুলতে খুলতে বললে, 'ওর ফেরার কোনও ঠিক নেই। কখনও সন্ধের মুখে, কখনও গভীর রাতে।' জ্ঞানেশ চুল ঠিক করতে করতে বললে, 'এই তো কাজের বয়েস।'

দরজার দুটো পাল্লা হাট খুলে দিয়ে তনু বললে, 'তা ঠিক। কাজ, কেরিয়ার, পদোন্নতি, অ্যামবিশান। সংসার টংসার কিছু নয়। চলুন। ভেতরে চলুন।'

জ্ঞানেশ ঢোকার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে গেল। 'আমি বরং চলেই যাই। ফিরে এসে আমাকে দেখলে অমিতাভ যদি কিছু মনে করে!'

'কী মনে করবে? মনে করার কী আছে?'

'আমি কে! কোথা থেকে এলুম! কেনই বা এলুম!'

'লুকোচুরির তো কিছু নেই। আমরা তো কোনও অন্যায় করছি না।'

'ভাবতে পারে। অমিতাভ আমাকে চিনতেও পারে। নাও পারে। একেবারে চেনে না তা নয়।'

'চলুন তো ভেতরে। যত সব সাবেকি চিন্তা, কুচুটে বুড়িদের মতো!'

জ্ঞানেশ হাসল। হাসতে হাসতে বললে, 'পৃথিবীর বয়েস কম হল না। পৃথিবীই বুড়ি হয়ে গেছে। ওলড মাদার আর্থ। ভাবনা, চিন্তা, জীবন সব বুড়িয়ে গেছে!'

তনু বললে, 'আসুন তো ভেতরে। বড় বেশি বকবক করেন। বয়েস না হতেই বার্ধক্য!'

আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েই তনু যন্ত্রণায় 'উঃ' করে উঠল। কোনওরকমে আলো জ্বেলে, ঘাড় মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল সবুজ রঙের নরম কার্পেটে। কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে তনু।

॥ বাইশ ॥

'আই লাভ ইয়োর ওয়াইল্ড প্যাশান।' মেরি ফিসফিস করে অমিতাভের কানে বিষ ঢেলে দিল।

অমিতাভ ছটফট করছে মুক্তির জন্যে। পিতার চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। মা বসে আছেন ঠাকুরঘরে, লাল পাড় শাড়ি পরে। বিয়ের রাতে তনুর গলায় গোড়ের মালা পরাচ্ছে। সেন্টের গন্ধে, শরীরের উত্তাপে অমিতাভর দম বন্ধ হয়ে আসছে। সারা শরীর জ্বলছে। হিমবাহের মতো মন সগর্জনে ভেঙে পড়ল বলে। অমিতাভ জানে, নারী হল প্রচণ্ড শক্তি। পুরুষকে উন্নত করতে পারে আবার অবনতও করতে পারে। অমিতাভ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভীষণ লজ্জাও করছে। ড্রাইভারটি শেয়ানা। ফিরে না তাকালেও অবশ্যই বুঝতে পারছে, পেছনের আসনে হাপরের লড়াই চলেছে। সামনের আয়নাতেও নিশ্চয় ধরা পড়ছে পেছনের আসনের দৃশ্য। অমিতাভকে ধরেছে যেমন অজগর ধরে ছাগলছানাকে।

মেরি ড্রাইভারকে বললে, 'স্টপ'।

গাড়ি রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়াল। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে অমিতাভর ব্রিফকেসটা তুলে নিল।

'গেট ডাউন।'

দরজা খুলে রাস্তায় পা বাড়াল। অমিতাভ বুঝতে পারছে না, কী করা উচিত। জেনে শুনে পা দেবে ফাঁদে। আর উপায় নেই। মেরি ব্রিফকেস হাতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে টানটান হয়ে। সংক্ষিপ্ত স্কার্ট আর টাইট ব্লাউজে বড় উদ্ধত দেখাচ্ছে তাকে। কিছু ভেবে না পেয়ে অমিতাভ নেমে পড়ল। ড্রাইভারকে বললে, 'তুমি চলে যাও। গাড়ি গ্যারেজ করে দাও।'

'দো ঘন্টে বাদ ঘুমকে আয়ি!'

'ঘুমকে?'

অমিতাভ কেমন যেন হয়ে গেছে। ড্রাইভার কেমন করে জানল যে সে ঠিক দু'ঘণ্টাই থাকবে। এইসব ব্যাপারে এইরকমই হয় বুঝি। অমিতাভ বেপরোয়া হয়ে বললে, 'নেহি! খুদহি হাম চলা যায়েগা।'

স্মার্ট ড্রাইভার। বোঁ করে সামনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়ির ন্যাজের লাল আলো অমিতাভর দিকে সাবধান করে দেবার চোখে তাকিয়ে আছে মিটিমিটি। অমিতাভর সেইরকমই মনে হল।

শরীরের ঊর্ধ্বদেশ ঝাঁকিয়ে মেরি বললে, 'ওয়াইজ ডিসিশান, নাও লেট আস গো।'

হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল। অমিতাভ না তাকিয়ে পারছে না। শরীরের এমন ছন্দ কদাচিৎ দেখা যায়। বাঙালি মেয়েদের সব আছে। তারা থ্রো করতে জানে না। মেরির পেছন পেছন যেতে যেতে অমিতাভর সেইরকমই মনে হল।

সরু এক চিলতে গলি। রাজপথের রোশনাই নেই সেখানে। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বাড়ির অতল ছায়ায় পথ পড়ে আছে মৃতের মতো। ঢোকার মুখেই অমিতাভর মন ছমছম করে উঠল। সে এ কী করছে! পাগলের মতো। তবু অমিতাভ এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। অদ্ভুত এক আকর্ষণ। মন আর কাজ করছে না। শরীর এগিয়ে চলেছে কী একটা ধরার আশায়! মানুষের মন কত পরাধীন! মেরি চলছে তো চলছেই। কতরকমের শব্দ ভেসে আসছে। ইংরেজি গান। ভাঙা গলার কাশি। কোনও বয়স্কা মহিলার উচ্চ কণ্ঠ। বাড়ির অন্ধকার দরজার সামনে এসে মেরি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে অমিতাভর কোমর জড়িয়ে ধরে বললে, 'কিস মি। অ্যাজ হার্ড অ্যাজ ইউ ক্যান।'

সিঁড়ির ধাপে অমিতাভর ব্রিফকেস। ইতস্তত করছে অমিতাভ। তিন-চার বছর বিয়ে হয়েছে, তনু তাকে কখনও এভাবে আক্রমণ করেনি। বাঙালি মেয়েরা এসব জানে না। বোঝে না। তাদের সংস্কার বড় প্রবল। মেরির চকচকে রসালো ঠোঁট ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সাপের ছোবলের মতো। চোখের মণি দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

হঠাৎ অমিতাভর মনে হল সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অকারণ দ্বিধায় সে কেন এমন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের মানুষ এসব আর গ্রাহ্যই করে না। তার প্রাচীন সংস্কার শিং-অলা গোরুর মতো ভেতর থেকে অনবরত গুঁতিয়ে চলেছে। এই মহাকাশযান আর আণবিক যুগে একটা পুরুষ মানুষের এই প্যানপ্যানানি শোভা পায় না। ন্যাকামির চূড়ান্ত। কোনও কালে কোনও আদর্শ, নীতি, ধর্ম নারী আর পুরুষকে আটকাতে পেরেছে! এ হবেই। যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভণ্ডামির কোনও মানে হয় না। মেরি ধরে ফেলেছে। তীব্র অতি তীব্র। সুতীক্ষ্ণ মাদকতা। জড়িত কণ্ঠস্বর 'ও মাই। ও মাই।'

বন্ধ দরজার গায়ে হেলে পড়েছে। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অমিতাভ দু'হাতে মেরির পিঠ ধরে সামনে আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কেবলই তার মনে হচ্ছে, 'এখানে কেন? দরজা খুললেই তো ভেতর!' বলতে চাইছে, 'ও লেট আস গো' ইনসাইড।' বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

এক ফাঁকে অমিতাভ বলল, 'ওপন দি ডোর।'

'ও ইয়েস।' মেরির গলা শুনে মনে হল, সে মাতাল হয়েছে।

দরজায় পিঠ রেখে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সুদৃশ্য হ্যান্ডব্যাগটা অমিতাভর হাতে দিয়ে সদ্য ঘুম ভাঙা গলায় বললে, 'ওপন, ওপন।'

মেরি হাঁপাচ্ছে। ভারী বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো। মেয়েদের এই মত্ততার সঙ্গে অমিতাভ পরিচিত ছিল না। সে নিজেও এখন জ্বলছে।

দরজার একটা পাল্লা খোলামাত্রই ভস করে খানিকটা চাপা হাওয়া বেরিয়ে এল। যেন অশরীরী কেউ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অমিতাভ বললে, 'গেট ইন।'

'নোও। আই কান্ট। লিফট মি আপ।'

অমিতাভর মনে হল, মেরি এইবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। মেরির মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। মেরি কাঁপছে। থরথর করছে শরীর। যা থাকে বরাতে বলে অমিতাভ নিচু হয়ে দু'হাতে মেরিকে তুলে নিল। বেশ ভারী। যা ভেবেছিল তার চেয়েও ভারী। অন্ধকারে কোথায় কী আছে চোখেও পড়ছে না। দূরে একটা আয়না কেবল আলোর ইশারা ধরে রেখেছে। অমিতাভর মনে হল বাঁপাশে একটা ডিভানের মতো কিছু রয়েছে। আন্দাজে ধীরে ধীরে মেরিকে নামিয়ে দিতে সে দু'বার পা ছুড়ল। এক-এক পাটি জুতো অন্ধকারে ছিটকে গেল এক এক দিকে। এক পাটি ধাতব কোনও কিছুর ওপর পড়ল মনে হয়। টং করে এক ঝংকার উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল। শব্দটা অমিতাভর চেনা। জিপফাস্টনার।

অমিতাভ বললে, 'হোয়্যার ইজ দি সুইচ।'

'নো সুইচ। নো লাইট। ক্লোজ দি ডোর।'

তনুর যন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে জ্ঞানেশ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এত বড় সুসজ্জিত একটা ফ্ল্যাট। আশেপাশে অনেকেই হয়তো আছেন; কিন্তু কেউ কোথাও নেই বলেই মনে হয়। চারপাশ অসম্ভব নিস্তব্ধ। বহু দূর থেকে ছিটকে ছাটকে ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দ ভেসে আসছে। গাড়ির শব্দ। তীব্র হর্নের শব্দ। জ্ঞানেশ কী করবে! তনু যদি হঠাৎ মারা যায়! সে তো খুনের দায়ে পড়বে। মুহূর্তে জ্ঞানেশের সমস্ত ভয় দ্বিধা কেটে গেল। আধুনিক মানুষের স্বার্থপর চিন্তা সরে গেল। হাঁটু গেড়ে তনুর পাশে বসে পড়ল। তনুর মুখ নীল। কপালে মুক্তোর দানার মতো ঘাম জমেছে।

জ্ঞানেশ ডাকল, 'তনু!'

একটা অস্ফুট গোঙানি। জ্ঞানেশ বুঝে গেল, এভাবে হবে না। যেমন করেই হোক হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে নিয়ে যেতেই হবে। এখুনি। এই মুহূর্তে। কাছে সাহায্য করার মতো আর একজন কেউ থাকলে বেশ হত। এইসব গগনচুম্বী বাড়ির একক ফ্ল্যাটের বসবাস কত আতঙ্কের।

জ্ঞানেশের মন খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তনুকে তুলে নিল। তুলে নিয়েই মনে হল, দরজায় তালা দেবে কীভাবে! পরক্ষণেই মনে হল বড় একটা ফ্ল্যাটের কোথাও কি কোনও ডাক্তার নেই, যাঁর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে! আর ভাবতে পারছে না। তার দু'হাতের ওপর তনুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বুঝতে পারছে জ্ঞানেশ। জ্ঞানেশ দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তনুকে সাবধানে একপাশে নামিয়ে রেখে দরজায় তালা লাগাল। সে ঠিক করে ফেলেছে, কী করবে। কিশোর আগরওয়াল তার বন্ধু। কলকাতার নাম-করা ডাক্তার। অ্যাপোলো নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। কোনওরকমে তনুকে সেখানে একবার ফেলতে পারলে, সব সমস্যার সমাধান।

বোতাম টিপতেই লিফট ওপরে উঠে এল। ভাগ্য ভাল, লিফটে জনপ্রাণী নেই। নির্জন কফিনের মতো বুক পেতে শূন্যে ভাসছে। জ্ঞানেশ তনুকে নিয়ে নীচে নেমে এল। সে কেবলই বলে চলেছে, 'ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটু। আর একটু।'

নীচের বিশাল বাঁধানো চত্বরে আয়া শ্রেণির এক মহিলা একপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। জ্ঞানেশ আর তনুর দিকে তাদের নজর নেই। গাড়ির সামনে এসে জ্ঞানেশ তনুকে বললে, 'যেমন করেই হোক, এবার একটু দাঁড়াতে হবে।'

তনু শব্দ করল। কী বলল বোঝা গেল না।

কোনও উপায় নেই। এবার একটু সাহায্যের প্রয়োজন। তনুকে দাঁড় করাবার ঝুঁকি সে নেবে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'শুনিয়ে বহেনজি।'

স্বাস্থ্যবতী আয়াটি ফিরে তাকাল। দূর থেকে মিষ্টি গলায় বললে, 'হাঁ ভাইসাব। আতি হ্যায়।'

মেয়েটি এগিয়ে এসে তনুকে দেখে বললে, 'কেয়া হুয়া? গির গিয়া না!'

'নেহি জি। দর্দ হুয়া। আপ থোড়া ইন কো রাখে গা! নেহি তো দরোয়াজা কেয়সে খুলে গা!'

'হাঁ হাঁ। জরুর। জরুর।'

মেয়েটি তনুকে পরম যত্নে গ্রহণ করল। অতি সন্তর্পণে। জ্ঞানেশ দরজা খুলে দিয়েছে। এইবার তনুকে সাবধানে পেছনের আসনে শোয়াতে হবে। মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'সরুন। আমি শুইয়ে দিচ্ছি। মাথায় চোট লেগে যেতে পারে।'

তনুকে শোয়াবার পর মেয়েটি বললে, 'গাড়ি আপনি চালাবেন?'

মেয়েটির ব্যবহারে জ্ঞানেশ মুগ্ধ। সে বললে, 'হ্যাঁ বোন।'

'আপনি কি এইখানেই থাকেন?'

'না না।'

'বুঝেছি। এখানের কেউ আপনার মতো এত ভালভাবে কথা বলে না। কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'আমার বন্ধুর নার্সিংহোমে।'

'চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। ধরে বসতে হবে। নয়তো পড়ে যাবে।'

'তুমি! তুমি যাবে। তোমার অসুবিধে হবে না?

'না।'

মেয়েটি দৃঢ় গলায় 'না' বলে তনুর পাশে সাবধানে বসে পড়ল। জানলা দিয়ে হাত বের করে ইশারায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে জানাল, সে আসছে। ঘুরে আসছে। জ্ঞানেশ রাস্তায় পড়ে তিরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। তনু একটানা যন্ত্রণার কাতরোক্তি করে চলেছে। জ্ঞানেশের মনে হচ্ছে সময় আর দূরত্বের ব্যবধান যদি কুঁচকে ছোট করা যেত!

অমিতাভ কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। বোঝার মতো অবস্থায় নেই। কখনও ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। কখনও নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। কোনও ভাবনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। উন্মাদ ঘটনাস্রোতে সব কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। এভাবে তাকে কেউ কখনও নাড়াচাড়া করেনি। এর আগে বহুবার সে জৈব হতে চেয়েছে। পারেনি। আর একটা পশুর অভাবে সে পশু হতে পারেনি। আজ আর সে ক্ষোভ নেই। একটু একটু করে অমিতাভর সব কিছু ঝরে পড়ছে। শিক্ষা, পদমর্যাদা, বংশগৌরব, ভাল ছেলের অহংকার, পবিত্রতা। অমিতাভর সব ভয় ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এই হল যুগধর্ম। কেউ যদি জেনেও ফেলে তার এই অভিসারের কথা, অগৌরব তো হবেই না বরং গৌরব বেড়ে যাবে। বলবে, এই তো পুরুষ। জিয়ো, পিয়ো আর অর্থনীতির চাকা ঘোরাও। বৈদিক সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে অমিতাভ। ঋষির তপোবনে সামগান আর শোনা যাবে না। হোমের আগুনে রাতের অন্ধকার আর কাঁপবে না। মহাদেব কৈলাস ছেড়ে পালিয়েছেন। শিগগির মানুষ সেথায় ফাইভস্টার হোটেল বানিয়ে ক্যাবারে নাচাবে। অমিতাভ তুমি প্যারিসের রাত, কোপেনহেগেনের রাত, নিউ ইয়র্কের রাত, জার্মানির রাতের কথা চিন্তা করো। বেদ, বেদান্ত, গীতা ভোগের জগতে ভেসে গেছে। সাঁতার না জানা মানুষের মতো।

অমিতাভর হঠাৎ মনে হল ভীষণ খিদে পেয়েছে। মেরির কানে কানে বললে, 'আই অ্যাম হাংগ্রি।'

মেরি ফিসফিস করে বললে, 'স্টিল ইও আর হাংগ্রি। সিমস ইউ হ্যাভ এনরমাস অ্যাপেটাইট। দেন ওভার এগেন।'

অমিতাভর শরীরে বাজ পড়ল। চোখের সামনে এতক্ষণ ছিল ভাসা ভাসা অন্ধকার। এখন তাল তাল জমাট অন্ধকার।

ভাতের ফুট দেখে এসে গোপা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফ্যানে রং ধরেছে। আর বেশি দেরি নেই। আর এক ফুট হলেই নামিয়ে দু'জনকে খেতে দেবে। রান্নাঘরের দরজা থেকে বললে, 'কী গো, তুমি অত কী ভাবছ বলো তো। হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে?'

শশধরের দিক থেকে কোনও উত্তর এল না। ফুরফুরে বাতাসে শশধর ঘুমে একেবারে অচেতন। গোপা কাছে এল। অনেক দিন পরে সে ঘুমন্ত শশধরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। ভীষণ মায়া হচ্ছে। অকারণে লোকটাকে সে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে এতকাল। কেন সে বড়লোক হতে পারে না। কেন সে হিল্লি-দিল্লি বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে না। কেন সে হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনে দিতে পারে না। কেন সে নতুন একটা বাড়ি করতে পারে না। লোভের আগুনে লোকটাকে সে ঝলসেছে। চরম শাস্তি দিয়েছে বঞ্চিত করে। স্ত্রীর কাছে পুরুষ যা চায় তা চাইতে এলেই ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন একই বিছানায় দু'জনে দু'মুখো।

শশধর ঘুমোলেই ভীষণ ঘামে। ঘাড়, কপাল, পিঠ ঘামে জবজবে হয়ে যায়। এখনও তাই, কানের পাশ বেয়ে ঘাম গড়িয়েছে। গোপা শাড়ির আঁচল দিয়ে যেই ঘাম মুছিয়েছে, শশধর ধীরে চোখ মেলেছে। গোপাকে দেখেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। মুখে ভয়ের ভাব। মদ গলায় বললে, 'তোমাদের কোনও অসুবিধে করছি না তো!'

গোপা ধীরে ধীরে পাশে বসল। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। বুকের আঁচল সরে গেছে। চাপা দেবার চেষ্টা করল না। বরং দু'হাত মাথার ওপর তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বললে, 'আবার তুমি ওইভাবে কথা বলছ!'

গোপার বাঁ হাতের কনুই শশধরের গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। গোপা বুকের ভেতর আঁচল পুরে ঘাম মুছল ইচ্ছে করে। শশধরের কাছে আজ সে ধরা দেবে অনেক দিন পরে। এসব তারই প্রস্তুতি। বিয়ের সময় গোপার শরীর ছিপছিপে ছিল। এখন বেশ ভারী হয়েছে। গুরু নিতম্ব। কোমরে মধ্যবয়সের মেদ। আজ গোপার মনে হচ্ছে, রাত আরও তাড়াতাড়ি গভীর হোক। এ বাড়িতে আজ তাড়াতাড়ি নেমে আসুক রাতের প্রশান্তি। আজকের রাত শশধরের সঙ্গে বোঝাপড়ার রাত। সন্ধির রাত। খাওয়া-দাওয়ার পর একসঙ্গে দু'খিলি পান পুরবে মুখে। এক চিমটি জরদা। তারপর বেশ মৌজ করে...।

'আর ঘুমিয়ো না।'

গোপা শশধরের হাঁটুতে হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল। শশধরের গায়ের ওপর আঁচল খসে পড়ল। সেই অবস্থায় দু'হাত ওপরে তুলে গোপা আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আঁচল উঠিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। শশধর তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের স্ত্রীকে দেখল। নতুন লাগছে। ভাল লাগছে। মনের জমিতে অনেক দিন পরে যেন বৃষ্টি নামল।

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার দিকে চোখ রেখে একবার শুধু বললে, 'তুমি ভারী ভাল মেয়ে। কী নাম তোমার।'

'পার্বতী।'

'বাড়িতে বলে এলে না। ভাববে না তো!'

'বাবুরা বাইরে গেছে। কাল ফিরবে।'

তনু দাঁতে দাঁত চেপে আছে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে ওপর দিকে উঠছে। পথ যেন ফুরোতেই চাইছে না। অমিতাভ এখনও কেন ফেরেনি। অন্য দিন তো ফিরে আসে। কী হল। বিপদ-আপদ কিছু হয়নি তো!

॥ তেইশ ॥

দূর থেকে চোখে পড়ছে আলোর হরফে লেখা, অ্যাপলো। জ্ঞানেশ যেন হালে পানি পেল। যন্ত্রণাকাতর অসুস্থ মানুষের জন্যে যখন কিছু করা যায় না, তখন মনে হয় এর চেয়ে নিজে অসুস্থ হওয়া ছিল ঢের ভাল। এতক্ষণ তনু খুব চেষ্টা করছে নিঃশব্দে সহ্য করার। পারছে না। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে আর্ত শব্দ। যাক, এইবার যা হয় একটা কিছু হবে।

পার্বতী বললে, 'সাহেব আর কতদূর! বড় কষ্ট হচ্ছে মেমসায়েবের। কী হয়েছে সায়েব?'

'কী হয়েছে ঠিক জানি না গো? এইবার জানা যাবে। আমরা এসে গেছি।'

কথা বলতে বলতে জ্ঞানেশের গাড়ি নার্সিংহোমের গেটে ঢুকে গেল। ভেতরে গাড়ি রাখার সুন্দর ব্যবস্থা। জ্ঞানেশকে পার্বতীর ভীষণ ভাল লেগে গেছে। কী সুন্দর দেখতে! যেন রাজেশ খান্না। কী সুন্দর মিষ্টি কথা! পার্বতী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল। তার ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে। একটু আগে যে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিল তার নাম মেহের। তিন মাস ছেলেটা পেছন পেছন ঘুরছে। এই বয়সেই দু'-দু'বার জেল খাটা হয়ে গেছে। কোমরে সব সময় ছ'ইঞ্চি একটা চাকু গোঁজা থাকে। বাপের ঠিক নেই। মা কোথায় ভেগে গেছে তাও জানে না। পার্বতী সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ডাকলেই চলে আসতে হয়। নয়তো জানে মেরে দেবে। ভদ্রলোকদেরও পার্বতী সহ্য করতে পারে না। জরু কা গোলাম অথচ এমন করে তাকায় যেন পার্বতী একটা লাডডু। সুযোগ পেলেই জিভে ফেলে দেবে। কিন্তু এই বাবুটিকে তার ভীষণ ভাল লেগেছে। পার্বতী আবার একটা নিশ্বাস ফেলল। আচ্ছা মেমসায়েব তো অসুস্থ! এখুনি নার্সিংহোমে ভরতি হবে। দেখ-ভাল করার জন্য একজন আয়া তো লাগবে। বলবে নাকি নিজের কথা বাবুকে?

জ্ঞানেশ নেমে এসেছে। পেছনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'তুমি একটু বসবে! আমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করি।'

তনু দু'হাতের মুঠোয় পার্বতীর শাড়ি খামচে ধরে আছে। পার্বতী বললে, 'সায়েব সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি। তাই না সায়েব?'

জ্ঞানেশ অবাক হয়ে গেল। একেই বলে মায়ের জাত। সে ম্লান হেসে বললে, 'ঠিক ধরেছ।'

জ্ঞানেশের আর দাঁড়াবার সময় নেই। হনহন করে এগিয়ে গেল অফিসের দিকে। সন্দেহ হচ্ছে, কিশোর আছে তো? কিশোর ছাড়া আর কারুকে সে চেনে না।

কিশোর আছে। এক মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে গম্ভীর মুখে কথা বলছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। আলো পড়ে ঝকঝক করছে। কিশোরকে দেখলেই জ্ঞানেশের ভীষণ ভাল লাগে। ঠিক যেন যীশুখ্রিস্টের মতো চেহারা।

জ্ঞানেশকে দূর থেকে আসতে দেখেই কিশোর বললে, 'হ্যালো ফ্রেন্ড। কী ব্যাপার!'

জ্ঞানেশ কাছে গিয়ে বললে, 'একটা এমার্জেন্সি কেস আছে। এখুনি অ্যাটেন্ড করতে হবে। তুমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করো।'

'রুগি কোথায়?'

'বাইরে গাড়িতে।'

'ইজ ইট!'

কিশোর জ্ঞানেশের সঙ্গে যেতে যেতে মহিলা ডাক্তারকে বললে, 'হারি-আপ, এ স্ট্রেচার!'

গাড়ির কাছে পৌঁছোতেই পার্বতী বললে, 'মেমসায়েবের কাপড় রক্তে ভেসে গেছে।'

কিশোর বললে, 'তোর বউ?'

'না। আমার মাস্টারমশাইয়ের পুত্রবধূ।'

'কী হয়েছে?'

'জানি না রে।'

জ্ঞানেশ যা জানে সংক্ষেপে বললে।

'ইজ শি প্রেগনান্ট?'

'হতে পারে।'

স্ট্রেচার এসে গেল। তনু আর কোনও শব্দ করছে না। হয়তো জ্ঞান হারিয়েছে। পার্বতী একাই তনুকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। এমন যত্নে, যেন তার নিজের কোনও আপনজন।

নিঃশব্দে মন্থর গতিতে স্ট্রেচার এগিয়ে চলেছে লিফটের দিকে। পার্বতী চলেছে স্ট্রেচারের পাশে পাশে। একটা হাত ছুঁয়ে আছে তনুর মাথা। মুখে অসীম উৎকণ্ঠা। জ্ঞানেশ অচেনা অজানা এই মেয়েটিকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে কী হত।

কিশোর ফিসফিস করে বললে, 'জানিস, মনে হচ্ছে মিসকারেজ হয়ে গেল।'

'সে কী রে? কোনওভাবে বাচ্চাটাকে সেভ করা যায় না!'

'দাঁড়া, আগে টেবিলে তুলি। তারপর সবই তাঁর ইচ্ছা।'

সার্ভিস লিফটে স্ট্রেচার ঢুকে গেল। প্রায় একটা ঘরের মতো আকৃতি। ভেতরটা দুধের মতো সাদা। ফ্লোরেসেন্টের আলোয় থমথম করছে। মনে হচ্ছে কত রাত। জ্ঞানেশের মনে হচ্ছে, সে যেন এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে। তনুর দিকে সাহস করে তাকাতে পারছে না। একেবারে বুকের কাছে পার্বতী। তেল-চুকচুকে চুলে আলো পড়ে চকচক করছে। চওড়া পিঠ। সুন্দর ঘাড়। গোল খোঁপা। নীল ব্লাউজ। উজ্জ্বল ঝকঝকে চামড়া। জ্ঞানেশ এই সবই দেখছে। নারীদেহ সবই ভুলিয়ে দেয়।

পালকের মতো ভেসে ভেসে লিফট ঊর্ধ্বগামী।

অমিতাভ নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে ছটফট করছে। আর ভাল লাগছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মেরি বললে, 'লেট আস হ্যাভ সাম ড্রিঙ্ক। অ্যান্ড স্টার্ট এগেন উইথ ফ্রেশ এনার্জি।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল মেরি। চাপা আলোর মায়া ছড়িয়ে পড়ল সাজানো ঘরে। লম্বা লম্বা সুগঠিত পায়ে মেরি উঠে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ নগ্ন। পোশাকের উপর এত ঘৃণা, সব খুলে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে একপাশে। অমিতাভ তাকিয়ে আছে। আবার সে সব কিছু ভুলে যেতে শুরু করেছে। শুধু মনে হচ্ছে, জ্যাঠামশাইয়ের আঁকা একটা ক্যানভাস হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একবার তনুর কথা ভাবার চেষ্টা করল। এসেই মিলিয়ে গেল। বড় অ্যানিমিক? একেবারে সাদামাটা, গাঁটছড়া-বাঁধা বউ। পিতা শিবপদকে ভাবার চেষ্টা করল। অসম্ভব। ধারেকাছে আনা গেল না। বড় করুণ। জীবনহীন জীবন। মেরি ফ্রিজের দরজা খুলেছে। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আলোর আভায় সর্বনেশে দেখাচ্ছে। অমিতাভ যতটা দূরে সরার চেষ্টা করছিল ঠিক ততটাই কাছে সরে গেল আবার। তার শুভবুদ্ধির ডানা ভেঙে গেছে। দুটো গেলাস হাতে মেরি এগিয়ে আসছে। পা ফেলার তালে তালে তার যৌবন নাচছে। অমিতাভর ভেতরে একটা আগুনের সাপ আবার হিস হিস করতে শুরু করেছে। মেরি দু'পা তুলে অমিতাভর কোলের কাছে বসল। মায়াবিনীর মতো হেসে, অমিতাভর ঠোঁটে গেলাস তুলে ধরল, 'দিস ইজ লাইফ। ওয়াইন অ্যান্ড ওম্যান ইন দিস গডলেস ইউনিভার্স।' মেরির ডান হাতে গেলাস। বাঁ হাত অমিতাভর শরীরে খেলে বেড়াচ্ছে। সব ভুল হয়ে যাচ্ছে অমিতাভের। সে কে? কার ছেলে? কার স্বামী?

দেবী শিবের বিছানার চাদর পালটাতে পালটাতে বললে, 'আজ ঠিক দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বেন। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।'

কৃষ্ণ বললে, 'আমার কীরকম বড় বড় হাই উঠছে! ঠিক যেন বাঘের মতো?'

তোতা বললে, 'মা, আজ আমি দাদার কাছে থাকব। থাকব মা? তুমি রাগ করবে?'

'তুমি মাঝ রাতে বড় জ্বালাও মা। দাদাকে ঘুমোতে দেবে না।'

'আমি জল খাব না। তা হলে হার হিস হবে না।'

শিব বললে, 'তোমার আপত্তি না থাকলে ও থাকুক না আমার কাছে। মাথায় হাত রেখে বেশ কেমন ঘুমিয়ে পড়ব।'

'আমার আপত্তি নেই বাবা। তবে ও কিন্তু আপনাকে ঘুমোতে দেবে না।'

'আর ঘুম? আমাকে তো জাগতেই হবে। জ্ঞানেশ না আসা পর্যন্ত। বড় দুশ্চিন্তায় আছি। তনু কেমন রইল! ঠিকমতো পৌঁছোল কি না!'

কৃষ্ণ বললে, 'আর বেশি ভাবিসনি। ষাট-সত্তর বছর ধরে বহুত ভেবেছিস। এখন সব ভাবনা ফেলে দে। ভেবে কিছু থামানো যায় না। যা হবার তা হবেই। হ্যাঁরে আমি এবার উঠি। পাগলিটা একা আছে।'

'হ্যাঁ গো, তুমি এবার যাও। রাত ভনভন করছে।'

'বাঃ বেশ বললি তো?'

কৃষ্ণ উঠে পড়ল। কোঁচাটা দু'বার ঝেড়ে নিয়ে বললে, 'একটা সুবিধে, আজ আর রাতে খেতে হবে না। রাজসিক খাওয়া হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। রাত ন'টা বাজল।

শিব বললে, 'তোতা, তুমি তা হলে খেয়ে এসো।'

'আজ আর আমি কিছু খাব না দাদাই। আমার পেট ভরে গেছে।'

দেবী বললে, 'হ্যাঁ বাবা, আজ রাতে ওকে আর কিছু দোব না।'

'ও কি তা হলে এখানেই থাকবে?'

'থাকুক না। তবু আপনার একজন সঙ্গী হবে।'

'তোমাকে একটা কথা বলব মা?'

'বলুন না বাবা।'

'দেখো মা, আমার খুব ইচ্ছে তুমি ও বাড়িটা ছেড়ে দাও। আমার এত বড় বাড়ি, তোমরা এখানে এসে সাজিয়ে বোসো। অত টাকা ভাড়া বেঁচে যাবে। তা ছাড়া দিনকাল ভাল নয়। একা একা থাকো। আমি বড় দুশ্চিন্তায় থাকি। দেখো আমার তো কেউ নেই মা। কবে আছি কবে নেই। একটা ডিড ডকুমেন্ট করে বাড়িটা তোমাকেই দিয়ে যেতে চাই। মেয়েটাকে মানুষ কোরো। বেস্ট এডুকেশান। আমাদের দেশের মেয়েদের পরাধীনতা আজও ঘুচল না। এখনও তারা ক্রীতদাসী। সারা জীবন সংসারের জোয়াল টানে আর ঝাঁটা জুতো লাথি খায়। যারা বিদ্রোহ করে তাদেরও কম শাস্তি? ভেসে বেড়ায়। ঘর পায় না। ভোগের দুনিয়া। আদর্শ বইয়ের পাতায়, মহাপুরুষের বাণীতে হাই তুলছে।'

দেবী বিছানায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে মশারি গুঁজছিল ঘুরে ঘুরে। শিবের কথা শুনে থমকে গেছে। সর্বনাশ! বৃদ্ধের এ কী সিদ্ধান্ত! ছেলে, ছেলের বউ। আজ তারা দূরে। একদিন তারা আসবেই। রক্তের সম্পর্ক, যাবে কোথায়! পাড়া-প্রতিবেশীই বা কী বলবে! এমন বদনাম রটাবে— দু'জনেরই মুখ পুড়বে। মানুষের মুখে কোনও লাগাম নেই। মনে নরককুণ্ড।

তাড়াতাড়ি মশারির মাথার দিকটা গুঁজে দেবী নেমে এল। আজ এ ব্যাপারে সে কোনও কথা বলবে না। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবেগে। ছেলের ওপর অভিমানে। হয়তো নিজে থেকেই মত পালটাবেন। দেবী বললে, 'বাবা, আজ আর কোনও কথা নয়। আজ আপনারা শুয়ে পড়ুন। এসব কথা পরে হবে।'

'না না। আর তো কথার কিছু নেই। আমার জীবনের একটাই নীতি, সিদ্ধান্ত আর সমাধান। পেন্ডুলামের মতো আমি দুলি না। নো সুইং। না, তুমি আর দেরি কোরো না। তুমি এবার এসো।'

তোতার মাথায় হাত রেখে দেবী বললে, 'কী রে কাঁদবি না তো!'
না গো মা! কাঁদব কেন? আমি কি বাচ্চা মেয়ে।'
'না মা তুমি ডেঁপো মেয়ে! পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছ।'
'মা গুড নাইট।'
'শুভরাত্রি মা।'

জলো খাতাপত্র গোছগাছ করে এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। তার কাছে কারু কোনও পাওনা নেই। উলটে তারই পাওয়া আছে অনেকের কাছে। আদায় করতে পারলে দশ-বারো হাজার এখুনি এসে যায়। ভবিষ্যতের একটা ছবি মনে মনে এঁকে ফেলেছে। এখন দরকার একটু মনের জোর। এই রাত! রাতকেই তার ভীষণ ভয়। কানে কানে ফিসফিস করে কত প্রলোভনই যে দেখায়!

দখিনের বাতাসের মতো মৃদু পায়ে গোপা ঘরে এল, 'কী গো বাবু! হিসেব-নিকেশ হল?'
শরীরে ঝাঁকুনি মেরে জলো বললে, 'হ্যাঁ। হয়ে গেল।'
'কী দেখলে? লাখোপতি না ক্রোড়পতি?'
'সামান্য হাজার বিশেক টাকা ছড়িয়ে আছে বাজারে।'
'আমার সব রান্না শেষ। চলো। সারাদিন ঘুরছ। এবার খাবে তো!'
'তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বউদি। আমার পয়সা থাকলে আজ বাড়িতে সানাই বসাতুম। রজনীগন্ধার মালা। ছোট ছোট আলোর ঝিলমিলি। আবার বিয়ে লাগিয়ে দিতুম বাড়িতে।'
'দাঁড়াও না, ফাল্গুনে তোমার বিয়ে দোব। তখন যা ঘটা হবে না! জোড়া সানাই লাগাব।'
'আমার বিয়ে! আমাকে কেউ মেয়ে দেবে না বউদি। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'
'বিয়ে তো আমি দোব, তুমি দয়া করে পিঁড়েতে বসবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও। আজ যা রেঁধেছি না। অনেক দিন এমন রান্না রাঁধিনি।'
'দাদা কী করছে গো?'
'ফুরফুরে বাতাসে ঘুমিয়ে পড়েছে।'
'দাদার সামনে যেতে আমার ভয় করছে। জানো বউদি, দাদা আমাকে ক্ষমা করেনি।'
'তুমি তোমার দাদাকে ঘোড়ার ডিম চেনো। নিজের আখের হয়তো গুছোতে পারেনি। সেই বিচারে অপদার্থ। কিন্তু মনের দিক থেকে রাজা।'
জলো মনে মনে বললে, এই আবিষ্কারটা যদি দিন কতক আগে হত, তা হলে তোমার ওসকানিতে আমাকে আর জানোয়ার হতে হত না। জলো কাঁধে তোয়ালে ফেলে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গোপা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে ঘষে যাওয়া সিঁদুরের টিপ আঁচলে মুছে মুছে আবার গোল করতে লাগল।

কিশোরের কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। তবু কিশোর ঘেমেছে। জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেস খুব ক্রিটিক্যাল।'
'তুমি যেমন করেই হোক বাচ্চাটাকে বাঁচাও।'
'তুই কি ভাবছিস, উপায় থাকলে আমি চেষ্টা করব না!'
'না, তা কেন? তোর জানা সম্ভব অসম্ভব যতরকম চেষ্টা আছে, সব, সব তুই লাগা।'
'তোকে একটা কাজ করতে হবে জ্ঞানেশ। তুই ভদ্রমহিলার স্বামীকে একবার নিয়ে আয়। হি মাস্ট বি হিয়ার। কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর অনুমতি চাই। সই-সাবুদ চাই। তুই ইমিডিয়েটলি ভদ্রলোককে নিয়ে আয়।'

জ্ঞানেশ নীচে নেমে এল। গাড়ির পাশে পার্বতী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞানেশকে দেখেই প্রশ্ন করল, 'সায়েব সব ঠিক আছে তো?'

'না পার্বতী। কী হবে, বোঝা যাচ্ছে না।'

'একটা কথা বলব সায়েব!'

'বলো।'

'আপনি চট করে এই মেঠাই দুটো মুখে ফেলে দিন।' পার্বতী আঁচলের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা ঠোঙা বের করে জ্ঞানেশের হাতে ধরিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেছে জ্ঞানেশ। স্নেহের উৎস কোন হৃদয়ে গুপ্ত আছে কে জানে! জ্ঞানেশ না বলতে পারল না।

॥ চব্বিশ ॥

তোতা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। শিব তাকে অনেক কাল আগের একটা পুতুল বের করে দিয়েছে আলমারি থেকে। অমিতাভর শৈশবের কিছু কিছু খেলনাপত্তর এখনও সাজানো আছে আলমারিতে। মানুষের শৈশব চলে গেলেও পুতুলের শৈশব থেকেই যায়। একজন খেলতে খেলতে চলে যায়, তো আর একজন এসে ধরে। শৈশবের কি শেষ আছে!

তোতা বললে, 'দাদাই, এর নাম কী?'

'শিব এক মুহূর্ত ভেবে বললে, 'ওর নাম মোহন।'

'এ খুব লক্ষ্মী ছেলে?'

'খুব লক্ষ্মী।'

'কোনও দিনও দুষ্টুমি করেনি?'

'না। একদিন কেবল আলমারি থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল। আমি ধরে ফেলেছিলুম।'

'তুমি না ধরলে ওর কী হত?'

'মাথা ফেটে যেত। পা ভেঙে যেত।'

'মরে যেত?'

'কী যে হত কে জানে!'

'দাদাই, আমার বাবা কেন মরে গেল?'

শিব কথার কোনও জবাব দিতে পারল না। কোথা থেকে কোথায় চলে এল! কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললে, 'আর কী পুজো তো প্রায় এসেই গেল। কী মজা যে হবে!'

'কী মজা হবে দাদাই?'

'আকাশে ইয়া বড় বড় তুলোর হাতি ঘোড়া উট ভাসবে। সাদা সাদা পদ্মফুল ফুটবে। শিউলি বিছিয়ে থাকবে ঘাসের ওপর। দোয়েল শিস দেবে। তোমার কত নতুন নতুন জামা হবে। জুতো হবে।'

'তোমার কী হবে দাদাই?'

'আমারও কত কী হবে!'

'কৃষ্ণ দাদুর?'

'তারও হবে।'

'মোহনের?'

'ওরও প্যান্ট জামা হবে।'

'খুব ছোট ছোট। তাই না দাদাই? একটুকু একটুকু। এর পুরো নাম কি মোহনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়!'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। পুরো নাম, মোহনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।'

তোতা হাই তুলল। মোহনকে বুকের কাছে চেপে ধরে বললে, 'চলো এবার শোবে চলো। তোমার ঘুম পেয়েছে। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। মাস্টারমশাই আসবেন।'

শিব তোতাকে কোলে করে বিছানায় তুলে দিল। তোতা বালিশে মাথা রেখে আর একটা হাই তুলে, ঘুম জড়ানো গলায় বললে, 'দাদাই, আমার একটা ভাই নেই কেন?'

শিশুর এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে শিবের জানা নেই। উত্তর শোনার অপেক্ষায় তোতা আর জেগে নেই। শিশু এইভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যান্ত পুতুল ঘুমের রাজ্যে চলে গেছে। দু'চোখের পাতা ফুলের কুঁড়ির মতো বুজে গেছে। ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি। বাঁশির মতো নাক। মসৃণ ঢালু কপাল। সারা মুখ ঘিরে থমকে আছে পবিত্র জ্যোতি। শিব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কে বলেছে, স্বর্গ অনেক দূরে! বুকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে পুতুলটা সরিয়ে নিল। মোলায়েম হাতে কপালের ওপর এসে পড়া চুল তুলে দিল ওপর দিকে। মানুষ কেন শিশুই থেকে যায় না চিরকাল! সেই তো ছিল ভাল! বড় হওয়া মানেই পাপের জগতে তলিয়ে যাওয়া। শৈশব থেকে বার্ধক্য, মানুষের এই অনিবার্য গতি কীভাবে ঠেকানো যায়! নাঃ কোনও উপায় নেই।

Life's as we
Find it, death too.
A Parting poem?
Why insist?

শিব উঠে গিয়ে বিছানার মাথার দিকের জানলা খুলে দিল। চাঁদের আলো গড়িয়ে এল ঘরে। চারপাশ ফুটফুট করছে। কামিনীগাছ ফুলে ছেয়ে গেছে। তীব্র গন্ধ উড়ে এল ঘরে। কী সুন্দর এই পৃথিবী! নভোচারী মহাকাশ থেকে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'বাঃ, কী সুন্দর!'

শিব আলো নিবিয়ে দিল। চেয়ারটাকে শব্দ না করে টেনে নিয়ে এল জানলার কাছে। বহুকাল পরে আজ চাঁদের আলোয় জেগে থাকার সংকল্প। বিয়ের পর সুধাকে নিয়ে মুসৌরি গিয়েছিল। এমনি চাঁদের আলোর রাত ছিল। নীল আকাশ থমথম করছে মাথার ওপর। চারপাশে থমকে আছে ভারী ঠান্ডা। দূরে, বহু দূরে তুষারের মুকুট পরা পর্বতশ্রেণি ঝলমল করছে দেবতার মতো। হোটেলের বারান্দায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে আছে দু'জনে। সুধা একেবারে বুকের কাছে। গালে গাল ঠেকিয়ে। নিস্তব্ধ রাত। বাতাসও যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। সুধার সেই উষ্ণ, নরম শরীর। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কোমল বুকের ওঠাপড়া। শাড়ির মসৃণতায় আবৃত দুটি জানু। সুধা মৃদু স্বরে গেয়ে চলেছে— তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন। চুলের মিষ্টি গন্ধ। শরীরের ঘ্রাণ। এই তো সেদিনের কথা। নাঃ, বহু বছর আগের কথা। মুসৌরিতেই অমিতাভ এসেছিল। না, হিসেবে কোনও ভুল হচ্ছে না। শিব, তুমি তখন যুবক ছিলে। কুচকুচে কালো চুল। সরু গোঁফ। শরীরে অসীম শক্তি। মনে কত স্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা। এই দেহেই সব ছিল। সব চলে গেছে। নদীতে আর স্রোত নেই। মৃত উপলখণ্ড পড়ে আছে। অল্প অল্প জলধারা, প্রাণধারা ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে কোথাও কোথাও।

শিবের শরীরে হঠাৎ একটা কাঁপুনি খেলে গেল। দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল রাতচেরা সুরে। শিব নড়েচড়ে বসল। এবারের মতো খেলা শেষ। এই সাজপোশাক খুলে সরে যেতে হবে সাজঘরে। এবার নাট্যকার আবার কোন চরিত্র দেবেন কে জানে! সুধা মনে হয় এতদিনে অন্য নাটকে নতুন চরিত্র পেয়ে গেছে।

আমি মুক্তিটুক্তি চাই না ঈশ্বর। আমি আবার আসতে চাই। আবার আমি সুধাকেই চাই। কত কথা বলা হয়নি। কত খেলা খেলা হয়নি! সুধা জানেই না। হঠাৎ চলে যাবার কয়েক দিন আগে একটা

বিলিতি সাবান আনতে বলেছিল। এইসবে তার খুব শখ ছিল। শিব এনেছিল। সে সাবান মাখার সুযোগ আর আসেনি। ঝকঝকে র‍্যাপার মোড়া সেই সাবান সযত্নে রেখে দিয়েছে শিব। মাঝে মাঝে বের করে দেখে। এ তো একটা আশা! এমনি কত আশা মানুষ ফেলে রেখে যায়!

তোতা ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখছে মেয়েটা। কী দেখছে কে জানে! হয়তো চাঁদের আলোয় ফুলের বাগানে দেবীর পেছন পেছন ছুটছে। হয়তো ওই পুতুলটা, যার নাম রেখেছে মোহন, সে-ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ স্বপ্ন, ক্ষণ স্বপ্ন, সব মিলিয়ে এ এক মধুর খেলা।

আজকাল নানারকম কবিতা মনে ভেসে ওঠে। যত বয়েস বাড়ছে গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভক্ত হয়ে পড়ছে। তাকাহাশির সেই সুন্দর কবিতা মনে পড়ছে। একসময় সুধাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত। বড় মনোযোগী শ্রোতা ছিল। এখনও সে কবিতা আবৃত্তি করে। শ্রোতা সুধাই। শিব বুঝতে পারে, সুধা এসেছে। মৃত্যুর পর মানুষের জরা ব্যাধি সব চলে যায়। চাঁদের আলোয় জরির শাড়ির মতো ঝলমলে একটা অশরীরী শরীর পায়।

'শোনো সুধা' বলে শিব মৃদু গলায় শুরু করল:

> Nothing. nothing at all
> is born.
> dies. the shell says again
> form the depth of hollowness.
> Its body
> swept off by tides—so what?
> It sleeps
> in sand, drying in Sunlight.
> bathing
> in moonlight, Nothing to do
> with Sea
> Or anything else. Over
> and over
> It vdnishes with the Wave.

ঝিনুকের খোলা ॥ শূন্যগর্ভ ॥ জন্ম নেই ॥ মৃত্যু নেই ॥ ঢেউ আসছে ॥ ভেসে চলে যাচ্ছে॥ তাতে কী ॥ বালির বিছানায় ঘুম ॥ রোদে পুড়ছে ॥ চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ হচ্ছে ॥ সমুদ্রে কী আসে-যায় ॥ কোনও কিছুতেই যায়-আসে না ॥ ঢেউ আসছে ॥ ঢেউ যাচ্ছে ॥ এই ঝিনুক আছে ॥ এই আবার নেই।

কামিনীর থোকা বাতাসে দুলছে। সাদা ফুটির মতো চাঁদের আলো। সেই পেঁচাটা আবার ডাকছে। শিবের মাথা ক্রমশই ঝুলে আসছে বুকের দিকে। সেই কফিনের ডালাটা খুলে গেছে। ভেতরে শুয়ে আছে সাত্যকি। তার মুখে অমলিন হাসি। একটা হাত ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে। হাতে একটা চামচে। চামচেটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শিবের ঠোঁটের দিকে।

মেরি উঠে দাঁড়াল। সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে অমিতাভকে বললে, 'গেট আপ। ডান উইথ। ড্রেস আপ। নাও আই উইল প্রিপেয়ার মাই লেসনস।'

অমিতাভ জড়ানো গলায় বললে, 'হোয়াট লেসনস?'

নেশা হয়ে গেছে। পেট খালি ছিল। চোখে ঘোর লেগেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না।

জিপফাস্টনার টানতে টানতে মেরি বললে, 'আই অ্যাম প্রিপেয়ারিং ফর চাটার্ড সেক্রেটারিয়ালশিপ। গেট আপ মাই ম্যান। হারি ফর দি হোম। সামওয়ান ইজ ওয়েটিং দেয়ার।'

অমিতাভ উঠে পড়ল। জড়ানো গলায় বললে, 'হোয়্যার ইজ দি লাভ?'

ব্রিফকেসটা হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললে, 'নট হিয়ার ম্যান। মে বি ইন দি হেভন।'

অমিতাভকে ধরে ধরে দরজার বাইরে অবধি নিয়ে এসে মৃদু একটা ধাক্কা মেরে বললে, 'গেট এ ট্যাক্সি। গুড নাইট।'

অমিতাভ বললে, 'নাইট ইজ সো ডার্ক। অ্যান্ড আই অ্যাম সো লোনলি!'

মেরি বললে, 'অ্যান্ড দি পাথ ইজ নট স্ট্রেট।'

দরজা বন্ধ করে দিলে। মেরি প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনকে সহজেই আলাদা করতে জানে। যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ টয়লেটে থাকবে। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই ফ্লাশ টেনে উঠে আসবে। জোর আলোটা জ্বেলে মেরি ফ্রিজ খুলল। রান্নার কোনও পাট নেই। পুরোপুরি 'ক্যানেডিয়ান লাইফ'। তৈরি খাবার। মোড়ক খোলো আর খাও। মেরির দ্বিতীয় পিতা প্রায়ই বলত, 'লিভ ফর মানি। আদার দ্যান মানি এভরিথিং ইজ ট্র্যাশ।' সেই মহামানব এখন ক্যানাডায় সেটল করেছে। তার এই একটা কথাই বেদবাক্য হয়ে লেগে আছে মেরির মনে। সে বিয়ে করবে না। বিয়ে মানে টরচার। পরে ডিভোর্স। মেরি কথায় কথায় বলে, 'আই উইল ম্যারি এ ডগ, দ্যান ডগ অফ এ ম্যান।' পুরুষদের সে ঘৃণা করে। ওয়ার্থলেস, সেলফিশ, ভালগার। যতক্ষণ যৌবন ততক্ষণ অলরাইট। তারপর কিক ইয়োর ওম্যান, অ্যান্ড হ্যাঙ অ্যারাউন্ড বটলস। তার মায়ের কান্না সে এখনও শুনতে পায়। টালিগঞ্জের কবরে শুয়ে আছে সে মহিলা। মাঝে মাঝে মেরি যায়। জীবনে একজনকেই সে ভালবাসে। সেজন তার মা।

গুনগুন গান গাইতে গাইতে মেরি স্যান্ডউইচ তৈরি করছে। রুটির পরে মাখন, তার ওপর হ্যাম, শশা, টোম্যাটো। মেরি গাইছে— দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার। গানের ফাঁকে ফাঁকে হেসে ফেলছে। যখনই ভাবছে, এ এক আচ্ছা ফাঁদ। সাধু, শয়তান সকলকেই ধরা যায়। আর কী তাদের করুণ অবস্থা। ধর্ম, আদর্শ, মান, মর্যাদা, পজিশান, অপোজিশান সব ভেসে যায়। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।

বড় রাস্তায় এসে অমিতাভ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। সে বেরিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে আসছে ভেতরে। না, কোনও অনুশোচনা, অপরাধবোধ, বিবেকের দংশন কিছুই আসছে না মনে। আদর্শবাদী শিক্ষক পিতার কথা মনে আসছে না তার। তনুকেও মনে পড়ছে না। রাত একটু নেশাদার হওয়াই তো ভাল। শিক্ষিত, উন্নত পশ্চিম। রাতে কজন লোক ঘুমোয়। লিভ ফর প্লেজার।

ধারালো শিস দিতে দিতে দু'-একটি যুবক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। পায়ের ফাঁকে ব্রিফকেস চেপে ধরে অমিতাভ দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। গোলাপি দুনিয়া ঘুরেছে। রক্তে যেন বুলবুলি নাচছে। এই দুনিয়া তার বাড়ি। সবাই তার ভাই। সকলেই তার প্রেমিকা।

হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল তার সামনে।

'আ গিয়া সাহাব। হাম দূর সে দেখা।'

ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল। অমিতাভ অবাক। সেই সঙ্গে লজ্জিত। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নেই। একটু বেহাল। শরীর জ্বলছে। রক্ত উন্মাদ। কোনওরকমে গাড়ির পেছনের আসনে নিজেকে ধপাস করে ফেলে বললে, 'তুমি এখনও গাড়ি গ্যারেজ করোনি?'

'নেহি সাব।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। অমিতাভ কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল। শরীর ক্রমশই ঝিম মেরে আসছে। গোটা দুয়েক টান দেবার পর তার মনে হল, যতদিন সে পৈতৃক বাড়িতে ছিল ততদিন সে যেন একটা শক্তির আশ্রয়ে ছিল। দুর্গে ছিল। আজ সে দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত রণাঙ্গণে, সম্পূর্ণ একা, নিরস্ত্র। রক্ষা করার মতো কোনও শক্তি আর তাকে ঘিরে নেই। চারপাশ থেকে ভয়

তেড়ে আসছে। হালফিল ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সহপাঠী বন্ধু তাপসের কথা সবার আগে এসে ভয় দেখাচ্ছে। ছেলেটাকে সবাই ভাল বলেই জানত। হাসিখুশি, আমুদে, মিশুক, পরোপকারী, খরচে। খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই কয়েক দিন আগে অমিতাভ খবর পেয়েছে, তাপস বেপাত্তা। ভালবেসে বিয়ে করেছিল। একটি মাত্র ছেলে। নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট। ব্যাঙ্কের মোটা মাইনের চাকরি। ব্যাঙ্ক থেকে জালিয়াতি করে লাখ চারেক টাকা সরিয়েছে। সেই টাকা আর একটা মেয়েকে নিয়ে কোথায় যে ভেগেছে! পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে। ছাত্রজীবনে অমিতাভ রোজ কথামৃত পড়ত। কথামৃতে ঠাকুরের একটি গান এই মুহূর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে মনে,

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী
মোহ ঝড় মায়া তুফান
ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী
একে মন মাঝি আনাড়ি
তায় রিপু ছ'জন কুজন দাঁড়ি
কলুষের কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি
হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥

অমিতাভ একটু জোরেই বলে ফেলল, 'আমি কি তাপস হয়ে যাচ্ছি?'

ড্রাইভার কী বুঝল কে জানে, উত্তর দিলে, 'নেহি সাহাব।'

অমিতাভ সোজা হয়ে বসল। 'নেহি।' কিন্তু তাপসের বীজ যে তার মধ্যেও রয়েছে। বেশ জীবন্ত বীজ। আজ সার পড়েছে। জল পড়েছে। ছোট্ট একটা চারা মাথা তুলেছে। প্রবণতা কোন দিকে!

বেশ জোরেই নিজেকে প্রশ্ন করলে, 'কোন দিকে?'

ড্রাইভার মগনলাল বললে, 'কাহে সাহাব? ঘর তো চলেঙ্গে।'

'ঘর! কাঁহা ঘর! কিসকা ঘর?'

সায়েবের নেশা হয়েছে। মগনলাল বললে, 'আপ শো যাইয়ে। আরামসে রহিয়ে।'

॥ পঁচিশ ॥

পার্বতী জ্ঞানেশের পাশে বসেছে। জ্ঞানেশ ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাচ্ছে। রাস্তা সাঁই সাঁই করে গুটিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে। জ্ঞানেশের মন এখন সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য। কোনও কিছুই তার আর ভাবতে ভাল লাগছে না। যা হয় হবে। গীতার কর্মযোগ কি একেই বলে! কাজ করে যাও। ফলের আকাঙ্ক্ষা কোরো না।

জ্ঞানেশ মৃদু গলায় বললে, 'পার্বতী, তোমার মন খারাপ?'

পার্বতী একটু হেসে বললে, 'আমার মন নেই গো দাদা।'

'সে কী, মন ছাড়া মানুষ হয়?'

'এই তো হয়েছি।'

'তা হলে তুমি আমায় মিষ্টি খাওয়ালে কেন? সত্যিই আমার খিদে পেয়েছিল।'

পার্বতী উত্তর দিতে পারল না। তাকিয়ে রইল পথের দিকে। সোজা চলে গেছে দূরে। জোড়া জোড়া আলো ছুটে আসছে হু হু করে। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

জ্ঞানেশ বললে, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে। তোমার সঙ্গে আর কি কোনওদিন দেখা হবে!'

'ওই মেহের শালা মেরে না ফেললে দেখা হতেও পারে। আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে।'

'মেহের শালা কে?'

'ওই যে গুন্ডাটা। যার সঙ্গে কথা বলছিলুম। বহুত খতরনক আদমি।'

'খুন করবে কেন?'

'ও আমাকে খারাপ কামে লাগাতে চায়। আর আমি খারাপ হতে চাই না। আমি ভাল হব। সায়েব তুমি আমাকে তোমার ওই বন্ধুর হাসপাতালে একটা আয়ার কাজ করে দাও না। আমি বেঁচে যাই।'

'করবে তুমি?'

'জরুর।'

পার্বতী উত্তেজনায় জ্ঞানেশের দিকে সরে এল। জ্ঞানেশ যেন লাইট হাউস। পার্বতী দিশাহারা নাবিক।

'আমি কিশোরের সঙ্গে কথা বলব। মনে হয় হয়ে যাবে।'

'সত্যি হবে?'

'কিশোর আমার বন্ধু। খুব ভাল ছেলে। আমি তোমার জন্যে বলব।'

'সায়েব তোমার ঠিকানাটা আমাকে দেবে? পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'আজই তোমাকে আমার বাড়ি চিনিয়ে দোব।'

উত্তেজনায় কাপড় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। পার্বতী গুছিয়ে বসল।

জ্ঞানেশ বললে, 'আমার বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা বের করো তো।'

জ্ঞানেশের গায়ে হাত ঠেকিয়ে পার্বতীর খুব সুখ হল। হালকা নেশার মতো।

'একটা সিগারেট বের করে আমার ঠোঁটে লাগিয়ে দাও। লাইটার জ্বালাতে পারো?'

'পারি।'

লাইটারের আলোয় পার্বতীর মুখ উদ্ভাসিত হল। সিগারেটের আগায় আগুন নিতে নিতে জ্ঞানেশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। বেশ দেখতে। সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে যে-কোনও আচ্ছা-সুন্দরীর কান কেটে দিতে পারে। গোল হাতে কাচের চুড়ির রিনিঠিনি। নেশা ধরে যায়, নেশা।

তনুর অ্যাপার্টমেন্টের বিশাল গেটের সামনে জ্ঞানেশকে থামতে হল। চকোলেট রঙের আর একটা গাড়ি ঢুকছে। পেছনের আসনে আরোহী এলিয়ে বসে আছে। মাথাটা একদিকে হেলে আছে। হয় পরিশ্রমে ক্লান্ত, না হয় খুব টেনেছে। আজকাল উঁচু মহলে মদ্যপান একটা ফ্যাশান। না করলে জাতে ওঠা যায় না।

সামনের গাড়ির পেছনের লাল আলো পিক পিক করে জ্বলছে নিবছে। কিরি কাটা কাচ। দেখলেই মনে হয় লেবু লজেন্স।

পার্বতী বললে, 'সায়েব আমি এখানে নেমে যাই। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকি। মেহের শালা এখুনি ধরবে।'

'কোথায় সে?'

'ওপাশে কোথাও আছে ঘাপটি মেরে।'

পার্বতী সাবধানে নেমে গেল। শব্দ না করে। ক্লিক করে দরজা বন্ধের শব্দ হল। জ্ঞানেশের পাশটা ফাঁকা হয়ে গেল। আসনে লেগে রইল উষ্ণতা। শিক্ষিতা, সফেস্টিকেটেড, প্যানপেনে মেয়েদের চেয়ে এই ধরনের মেয়ে যেন অনেক ভাল। শিক্ষা নেই, প্রাণ আছে। একেবারে মাটি ছেনে তৈরি।

গাড়ি পার্ক করতে করতে জ্ঞানেশ দেখল আগের গাড়িটা গোল হয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূরে অস্পষ্ট আলোয় একটি লোক ধীরে ধীরে হেঁটে লিফটের দিকে এগোচ্ছে। বড় নির্জন, ভুতুড়ে পরিবেশ। এত বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেকস! সব গেল কোথায়? না এইটাই বড় মানুষের

ধরন। কেউ কারু সঙ্গে মিশতে পাবে না। পশুরা যূথবদ্ধ জীব। মানুষ দেবাংশ। তার বিচরণ একক ভূমিতে।

ভাবতে ভাবতে দরজাটা লক করে ফেলল জ্ঞানেশ। লিফটের দিকে আপন মনে এগোচ্ছে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে। কিছুই সে আর ভাবছে না। ভাবতে ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে তার এমন হয়। বিশেষত সংকট মুহূর্তে। চারদিকে খিচিরমিচির। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সম্পর্কে চিড় ধরছে। মৃত্যু। আত্মীয় বিরোধ। জ্ঞানেশ লক্ষ করে তার মনটা ধীরে ধীরে বেলুনের মতো উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। সবেতেই আছে, অথচ কোনও কিছুতেই নেই।

মাথার ওপর থেকে আলো পড়ে লিফটের সামনে একটা আলোর বৃত্ত তৈরি হয়েছে। কেউ নেই। কিন্তু কেউ ছিল। পোড়া তামাকের, বিলিতি সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। পুট পুট করে আলো জ্বলছে নিবছে। লিফট ওপরে উঠছে। হঠাৎ জ্ঞানেশের মনে হল, সে কোন ফ্লোরে যাবে! তনুর সঙ্গে উঠেছিল। আবার নেমে এসেছিল। কোন উঁচুতে উঠেছিল সে। মনে তো নেই?

নিঃশব্দে লিফটের দরজা খুলে গেল। শূন্য নিষ্প্রাণ একটা ব্রিফকেস ফ্লোরের একপাশে বিপন্নের মতো বসে আছে।

এ আবার কী!

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হে এলে কোথা থেকে? যাবে কোথায়? মতলবটা কী?'

নিজের মনেই হাসল। এ যেন আরব্যরজনীর রাত। কত কাণ্ডই যে ঘটছে। উঠবে কি উঠবে না। চুরির দায়ে পড়বে না তো। তার জন্যে কেউ ফাঁদ পাতেনি তো?

মন আবার বিকল হয়ে গেল। থাক না। চলুক না সহযাত্রী হয়ে। তার কী এসে যায়!

তবে যার জিনিস তার কাছে ফিরে গেলে মন্দ হত না।

হঠাৎ লিফটের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে দেখে জ্ঞানেশ টপাস করে ঢুকে পড়ল আড় হয়ে। ওপর দিকে উঠছে। জ্ঞানেশ বোতাম টিপতে ভুলে গেছে। লিফট কিন্তু উঠছে। পায়ের কাছে ব্রিফকেস কাঁপছে। কিছু দূর উঠে থামল। দরজা খুলে গেল হুস করে। সামনেই এক যুবক। লম্বা। এক মাথা ঘন কালো চুল। কোঁকড়া কোঁকড়া। পাকা সায়েবি পোশাক। বুকের কাছে দুলছে ফাঁস আলগা টাই। সবই আছে তবে এলোমেলো। ঝড় বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। এখানে যারা থাকে তাদের এইরকমই বোধহয় জীবন।

'আমার ব্রিফকেস। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ব্রিফকেসটা তুলে নিতে নিতে অমিতাভ জ্ঞানেশকে বললে।

জ্ঞানেশ অমিতাভকে তেমন ভাবে না চিনলেও, তার মনে হল চেনা চেনা। কোথায় যেন দেখেছে। জ্ঞানেশও নেমে পড়ল। নেমেই মনে হল এই ফ্লোর। মেঝেতে একটা চুলের ক্লিপ পড়ে আছে। তনুর চুল থেকেই খুলে পড়েছে।

দরজায় চাবি গলাবার চেষ্টা করছে অমিতাভ। পারছে না। মেরি কী খাইয়ে দিয়েছে কে জানে। ঘোর নেশা। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'আপনি অমিতাভবাবু?'

অমিতাভ সোজা হতে গিয়ে টাল খেল। চোখ বড় বড় করে জ্ঞানেশের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। অসম্ভব ঘেমেছে। জ্ঞানেশের নাকে হুইস্কির গন্ধ আসছে।

অমিতাভ সন্দেহ জড়ানো গলায় বলল, 'কেন বলুন তো!'

'দিন, আমার হাতে চাবিটা দিন। খুলে দিচ্ছি।'

'হু আর ইউ!'

'আমি আপনার বাবার ছাত্র।'

'বাবা? বাবার ছাত্র! সে আবার কে?'

'ভেতরে চলুন, বলছি।'

'বলার কী আছে, আমি সব জানি। আই নো এভরি থিং। আমাকে জানাবার কিছু নেই। ইউ ক্যান গো। আপনার সঙ্গে বাজে বকার সময় আমার নেই।'

আলতো করে অমিতাভর পিঠে হাত রেখে জ্ঞানেশ বললে, 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার খুব বিপদ হয়েছে।'

'বিপদ? কী বিপদ?'

কথায় কথায় দরজা খুলে গেছে। খোলাই ছিল। তনুকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় জ্ঞানেশ দরজা ভেজিয়েছিল। চাবি দেবার কথা মনে ছিল না।

অমিতাভ ঘরে ঢুকে আর একবার টাল খেল। দেয়ালে পিঠ রেখে জড়ানো গলায় বললে, 'কী বিপদ? কার বিপদ?'

'আপনার স্ত্রী তনুর।'

অমিতাভ মাতালের মতো হাত নেড়ে বললে, 'জানি, জানি। সে হাওয়া খেতে গেছে। ফুর্তি করতে গেছে। হু আর ইউ? তুমি কে? ওটা আমার কাছে কোনও খবরই নয়। আই ওন্ট পে ইউ এ ফার্দিং ফর দ্যাট। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

ব্রিফকেসটা দুম করে কার্পেটের উপর ফেলে দিল। সেটা ধড়াস করে উলটে পড়ল।

জ্ঞানেশ বললে, 'আপনার স্ত্রী এখন নার্সিংহোমে।'

'আপনি আমার স্ত্রীর নাম জানলেন কীভাবে? এনি ইলিসিট রিলেশান?'

জ্ঞানেশ দৃঢ় গলায় বললে, 'কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায়? হোয়্যার টু।'

'নার্সিংহোমে।'

'তনু এখন একটা লোকের সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছে। আই নো দ্যাট। ইউ আর এ ব্লাফার।'

জ্ঞানেশ অবাক হল। অমিতাভ জানল কীভাবে! আশ্চর্য! দৈবশক্তির অধিকারী! কে জানে! জ্ঞানেশ অমিতাভর দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'ইউ আর ড্রাঙ্ক।'

'সো হোয়াট?'

'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। সিরিয়াস কেস। প্লিজ কাম টু সেনসেস।'

'ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম এ ননসেন্স? লেট হার ডাই। সে আমার কেউ নয়।'

'অমিতাভবাবু!'

জ্ঞানেশের চিৎকারে অমিতাভ চমকে উঠল। জ্ঞানেশ আরও দু'বার ঝাঁকাল প্রচণ্ড জোরে।

'ডোন্ট টাচ মাই বডি।'

অমিতাভ ঠেলে সরাতে চাইল জ্ঞানেশকে। পারল না। জ্ঞানেশের শক্তি অনেক বেশি।

'আপনাকে আমি টানতে টানতে নিয়ে যাব। আপনি আমাকে চেনেন না।'

'আমি যাব না। শি ইজ মাই ফাদার্স ওয়াইফ।'

জ্ঞানেশ সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা চড় কষাল অমিতাভর বাঁ গালে। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলছে। এ কী? কোন বাপের কী ছেলে! এর নাম শিক্ষা! এর চেয়ে মূর্খ অনেক ভাল।

সপাটে চড় খেয়ে অমিতাভ চমকে উঠল। মাথা হেঁট হয়ে আছে বুকের কাছে। নেশার অর্ধেক উড়ে গেছে জ্ঞানেশের একটি মাত্র চড়ে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, 'জানেন, আমি কে?'

'জানি। আপনি বেহেড মাতাল। এবং অসভ্য জানোয়ার।'

'আমি পুলিশ ডাকব। আই উইল থ্রো ইউ আউট।'

'আপনি সব করবেন। চলুন আমার সঙ্গে। আর সময় নেই।'

অমিতাভ দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল ধপাস করে। সজীব একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে জ্ঞানেশের পায়ের কাছে।

'আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল দেখছি।' জ্ঞানেশ মনে মনে বললে।

অমিতাভ দু'হাঁটুর ওপর কপাল রেখে বসে আছে। আবার ঘোর আসছে। আলো ঘোলাটে হয়ে গেছে। হঠাৎ অমিতাভ কাঁদতে শুরু করল। ফুলে ফুলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছোট ছেলের মতো।

জ্ঞানেশ পাশে বসে পড়ল। পিঠে হাত রেখে নরম গলায় ডাকল, 'অমিতাভবাবু।'

অমিতাভ জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'আমি খারাপ হয়ে গেছি। আমার কেউ নেই। লোনলি ম্যান। অ্যাবসলিউটলি এ লোনলিম্যান। আমাকে আপনি একটা টিকিট কেটে দিন। আই উইল ফ্লাই। আই ওয়ান্ট টু ফ্লাই। আই অ্যাম ইন এ কেজ।'

কানের কাছে মুখ এনে জ্ঞানেশ বললে, 'কী হচ্ছে অমিতাভবাবু? আপনার স্ত্রী অসুস্থ। শি ইজ ব্লিডিং হোয়াইট। আপনি চলুন।'

'হু আর ইউ!'

'আমি আপনার বন্ধু। এ ফ্রেন্ড।'

'বন্ধু! এতদিন কোথায় ছিলে বাবা। আমার স্ত্রী নেই। শি ইজ মাই স্টেপমাদার।'

'বেশ আপনি আপনার মাকেই দেখবেন চলুন।'

'হোয়াই! গেট মাই ফাদার। সেই প্রেমিক ভদ্রলোককে নিয়ে যাও বন্ধু। আমার যৌবন তার ব্যভিচার। উই সাফার ফর হিজ সিন। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট। আই হ্যাভ মাই ড্রিমস।'

জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। ধ্যাত বেটা মাতাল! আবোল-তাবোল, থার্ড ক্লাস, ভালগার কথাবার্তা। এই কারণেই তার বাপ হবার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। জন্মের পথ ধরে কখন কোন মহাপুরুষ এসে হাজির হবে! শেষ বয়েসটা একেবারে জ্বলেপুড়ে যাবে।

আর তো অপেক্ষা করা যায় না। ক'বোতল খেয়েছে? ভোরের আগে ঘোর কাটবে? তেঁতুল গোলা জল খাওয়াতে পারলে হত। কোথায় তেঁতুল! এ কি উত্তর কলকাতার সাবেকি বাড়ি! তেঁতুলের আচার, আমচুর, লেবুর আচার। এ হল মডার্ন ম্যানের হ্যাপি ভ্যালি।

ছেলেটাকে ছেড়ে যেতেও মায়া হচ্ছে। জাত মাতাল নয়। সবে ধরেছে। তবে এলেম আছে। মকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবধারিত। অমিতাভ শুয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। বড় বড় নিশ্বাস। আর কিছু করার নেই।

তবু জ্ঞানেশ সারা ফ্ল্যাটটা একবার ঘুরে এল। সামনেই ফ্রিজ। খুলে এক বোতল ঠান্ডা জল বের করল। ফ্রিজের হাতলে পাট করা একটা ন্যাপকিন। ওয়াশ বেসিনে ফেলে ন্যাপকিনটাকে ঠান্ডা জলে আচ্ছা করে ভেজাল। ঘাড়ে আর মুখে চেপে ধরে রেখে দেখা যাক। নেশা যদি ছুটে যায়!

তোয়ালে ভেজাতে ভেজাতে জ্ঞানেশ চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে। থরে থরে সাজানো সুখের উপাদান। ছবি। ফুলদান। জিরে ফুল। টিংলিং পরদা। আলোর ফানুস। স্বাগতম খাবার টেবিল। প্রেমিকা চেয়ার। যুগলমিলন খাট। কী নেই। সব আছে। নেই কেবল চিৎশক্তি। চিদানন্দ ছাড়া সব আনন্দই যে ম্লান!

নিজের মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা মারল জ্ঞানেশ।

॥ ছাব্বিশ ॥

শশধর আর জলো একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসেছে। বহুকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটছে এ বাড়িতে। গোপা খাবার ঘর আর রান্নাঘরে ছোটাছুটি করছে। সরু বাসমতী চালের সুবাসে ঘর ভরে গেছে। মালাইকারির রং দেখলেই জিভে জল আসবে। আবেগের রান্না খুলেছে বেশ।

শশধর খেতে খেতে বললে, 'বুড়ো, এ স্বপ্ন নয় তো?'

শশধর ভাইকে বুড়ো বলেই ডাকত। সেই ডাক আবার ফিরে এসেছে এক যুগ পরে।

জলো বললে, 'আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। তোমার মনে আছে দাদা মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন আমাদের জীবনে অভাবের মধ্যেও কত সুখ ছিল! কেমন করে যে আমরা এমন হয়ে গিয়েছিলাম! মনে হয় ভূতে ধরেছিল।'

শশধর বললে, 'গ্রহ রে ভাই গ্রহ। আমার রাহুর দশা চলছিল। আজ মনে হয় শেষ হল!'

'জানো দাদা, আমার কী মনে হয় জানো, বাপমায়ের কথা ভুলে গেলে মানুষের এই অবস্থা হয়। আশীর্বাদ থেকে সরেছ কি মরেছ! দিনে রাতে একবারও অন্তত চোখ বুজিয়ে ভাবা চাই।'

'ধরেছিস ঠিক। পবিত্র না থাকলে পদে পদে ঠোক্কর।'

'শোনো দাদা, আমার পাপ-ব্যাবসা আমি গুটিয়ে ফেলছি।'

'অ্যাঁ। সে কী। কী করবি তা হলে!'

'ঠিক করে ফেলেছি। কাল সকালেই আমি হাওয়া হয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'একেবারে নতুন কোনও জায়গায়, নতুন করে শুরু করব। একেবারে নতুন জীবন।'

'সে তো এখানেই করা যায়।'

'না। এখানে যারা আমার সাঙ্গোপাঙ্গ তারা আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরবে। এগোতে দেবে না। এ গাছ আর এ মাটিতে বাড়বে না। শেকড়সুদ্ধ তুলে অন্য জমিতে বসাতে হবে।'

'জানতুম। আজকের এই রাত স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে। সময় কখনও ফিরে আসে না রে।' গোপা হাতে একটা হাতা ধরে বসে ছিল। সে উদাস গলায় বললে, 'তুমি চলে যাবে?'

'হ্যাঁ বউদি, আমার অতীত আমাকে বসন্তের মতো দেগে দিয়েছে। আর এখানে থাকলে আমি ভাল হতে পারব না।'

'আমরা কী নিয়ে থাকব?'

'তোমাদের সংসার নিয়ে। তোমাদের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা নিয়ে।'

'তোমাদের? তুমি আমাদের কেউ নও?'

'তা কেন? আমি দূর থেকে তোমাদের কথা ভাবব।'

'অত সহজে তোমাকে আমরা ছাড়ব না।'

শশধর বললে, 'এই বাড়িটা আয় আমরা বেচে দিই। বেচে দিয়ে নতুন জায়গায় নতুন ভাবে জীবন শুরু করি।'

'তোমার চাকরি আছে দাদা। এখনও অনেক বছর ঘানি ঘোরাতে হবে।'

'চাকরি আমার আর ভাল লাগছে না। একই জায়গায় আটকে আছি বহু বছর। এও এক ধরনের মৃত্যু। বরং আয় তোতে আমাতে ব্যাবসায় নেমে পড়ি।'

'কী ব্যাবসা?'

'কাঠের লাইনটা আমি কিছু বুঝি। ফার্নিচারের ব্যাবসা মন্দ হবে না।'

'ভাল জায়গা চাই।'

'চেষ্টা করলে জায়গার অভাব হবে না।'

জলো বউদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের আর কিছু লাগবে না। তুমি বসে যাও না বউদি। রাত হয়েছে। আজ যা রেঁধেছ না! ফাসক্লাস। মানুষের শেষ খাওয়া এইরকমই হওয়া উচিত।'

'তার মানে?' গোপা ভুরু কুঁচকে তাকাল!

'কাল আমি এই সময়ে অনেক দূরে।'

'ওসব চালাকি ছেড়ে দাও ঠাকুরপো। তুমি খেয়ে ওঠো, তোমাকে আমি চাবি দিয়ে রাখব।'

'দেখো বউদি আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা অশুভ গ্রহ ঘুরছে। আমার ছায়ায় আলো নেই। শুধুই কালো। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাবা মারা গেলেন। আমার জন্যেই মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আমার জন্যেই দাদা এমন ছন্নছাড়া। কিছুকাল আমি সরে যাই। তোমাদের সংসারে শান্তি আসুক।'

শশধর বললে, 'পাগলামি করিসনি বুড়ো। অশুভ গ্রহ ঘুরছে আমার পেছন পেছন। মাঝে মাঝে আমার মাথায় পোকা নড়ে ওঠে। তখন আমি শয়তানের মতো হয়ে যাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসায় একেবারে চটকাচটকি হয়ে যায়। তুই যদি আমাকে শাসনে না রাখিস তোর বউদি ভেসে যাবে। তোর কৃপা চাইছি ভাই। তুই আমার অনেক বেশি পুরুষ।'

গোপা বললে, 'আমার মাথার দিব্যি রইল। তুমি যদি চলে যাও, আমার মরা মুখ দেখবে। তুমি আমাকে চেনো না। আমি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। আমি সব পারি।'

জলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গোপার মুখের দিকে। আলো পড়ে ফরসা কপাল চকচক করছে। সিঁদুরের গোল টিপ। টিকলো নাক। পাতলা ঠোঁট। পানের মতো চিবুক। এত দুঃখেও বউদির সুন্দর স্বাস্থ্য। স্পষ্ট কথা বলে। মনে কোনও প্যাঁচ নেই। নোংরামি নেই। এসব মেয়ে সংসার ভাঙে না; কিন্তু ভাঙা সংসারেই এসে পড়ে কপাল গুণে।

শশধর বললে, 'নে উঠে পড়। ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেল মাথা থেকে। তোর ভরসাতেই আমি আবার একবার চেষ্টা করব। এবার ভাঙলে ভেঙেই যাবে। শোন, দিন ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। রাত নামার আগে আয় বাকি কাজ সেরে ফেলি। কাঁদতে কাঁদতে এসেছি, হাসতে হাসতে যাবার চেষ্টা করি।'

গোপা বললে, 'তোমাদের ওসব ভাল ভাল কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না। আমাকে কথা দাও, তুমি যাবে না, তা হলে আমি খেতে বসব, নয় তো উপোস।'

জলো ধরাধরা গলায় বললে, 'তুমি খেয়ে নাও বউদি।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।'

শশধর বললে, 'চল, তা হলে পান কিনে আনি। এরপর একখিলি পান না খেলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে না।'

গোপা বললে, 'পান বাড়িতে আছে। আজ তোমরা রাস্তায় বেরোবে না। মোড়ের মাথায় অনেক শত্রু আছে।'

জ্ঞানেশ ভিজে তোয়ালে চেপে ধরল অমিতাভর ঘাড়ে, কপালে। অমিতাভ যেন মোমের পুতুল। এত কাছ থেকে একটা জ্যান্ত মানুষের মুখ এমনভাবে দেখার সুযোগ কোনওদিন আসেনি। বেশ ধারালো মুখ। খাঁড়ার মতো নাক। দেখলেই মনে হয় একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির। এই ধরনের মুখের মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়েই থাকতে ভালবাসে। অপরকে যতটুকু ধরা দেয় নিজের স্বার্থে। এদের মন থাকে অতলে। অন্যের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়। সৈন্যবাহিনীতে থাকলে নামকরা জেনারেল হতে পারে। চরিত্র, আদর্শ, নীতি, দুর্নীতি নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা থাকে না। জোড়া ভুরু। ভিজে তোয়ালে জোরে চেপে ধরল অমিতাভর মুখে। দম বন্ধ হয়ে যায় যাক। এইরকম একজন অহংকারী, অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য মানুষকে মেরে ফেললে পৃথিবীর কী এমন ক্ষতি হবে?

অমিতাভ নড়েচড়ে উঠল। জ্ঞানেশের ভীষণ ইচ্ছে করছে, মারে এক লাথি। যে দেশের নব্বই ভাগ মানুষ আধমরা না খেয়ে, প্রায় খাটালে বসবাস, সে দেশে এই ভুঁড়ো মাতাল আকাশের আটতলায় কার্পেটে বেহুঁশ। নিজের স্ত্রী আর ঋষিতুল্য পিতার স্নেহের সম্পর্কে যৌনতা ঢোকাতে লজ্জা পায় না। নীচ। ইতর।

তোয়ালেটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল জ্ঞানেশ। অমিতাভর ফরসা মুখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ডান গালে ধারালো একটা আঁচড়ের দাগ। ওই দাগের অনেক ব্যাখ্যাই করা যায়।

অমিতাভ ধীরে ধীরে উঠে বসল। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললে, 'অল রাইট।'

জ্ঞানেশ বললে, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'নার্সিংহোমে।'

'নাম বলে যান। কাল সকালে যাব। আমি আমার নিয়মে চলি।'

জ্ঞানেশ তড়াক করে উঠে পড়ল। মনে মনে বললে, 'ব্লাডি বাগার। সভ্য শয়তান।'

'আপনার স্ত্রী মারা যাক সেইটাই আপনি চান?'

'প্রশ্ন করবেন না। বাজে বকার ধৈর্য আমার নেই। ঠিকানাটা রেখে চলে যান। যাওয়া না যাওয়া আমার মর্জি। নার্সিংহোমে কে নিয়ে গেছে?'

'আমি।'

'দেন ইট ইজ ইয়োর হেডেক। আমার কোম্পানির ভাল নার্সিংহোম আছে। আমি সেখানে দিতে পারতুম। আপনাকে কে নাক গলাতে বলেছিল?'

জ্ঞানেশ আর কথা বাড়াতে চায় না। এবার তার ঘুসি চালাতে ইচ্ছে করছে। একটা কাগজে খসখস করে ঠিকানা লিখে সামনে ছুড়ে দিল।

লিফটে উঠে নামতে নামতে মনে হল, আবার তাকে ফিরে যেতে হবে এতটা পথ। সেখান থেকে ফিরতে হবে পাড়ায়। হয়তো মাস্টারমশাইকেই টেনে আনতে হবে। সারারাত এই চলবে। সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে। মানুষ যত সভ্য আর শিক্ষিত হচ্ছে ততই অমানুষ হয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানেশ স্টার্ট দিল গাড়িতে। মিটার দেখল। পেট্রল নিতে হবে। সারাদিনের ধকলে চোখ জ্বালা করছে। রগের দুটো পাশ টিপটিপ করছে। জ্ঞানেশ পার্বতীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। অন্ধকারের আড়াল থেকে সে হিস শব্দ করতেই জ্ঞানেশ চমকে গাড়ি থামাল। পার্বতী নিঃশব্দে উঠে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'আর পারছি না গো। এবার মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি।'

জ্ঞানেশের গা ঘেঁষে এল পার্বতী, 'তুমি শোবে?'

'কে গাড়ি চালাবে?'

'একটু আরাম করে তারপর চালাও। সায়েব, আগে শরীর তারপর কাজ।'

জ্ঞানেশের ডান হাত স্টিয়ারিং-এ। বাঁ হাত রাখল পার্বতীর কাঁধে। পার্বতী আরও একটু সরে এল। তার ভেতরটা কেমন করছে। জালে পড়া মাছের মতন। ছটফট। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, সে এ কী করছে! জানা নেই শোনা নেই। এক অপরিচিতা। খারাপও লাগছে না। উৎসাহ আসছে। ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওষুধ। ঝনঝনে আকাশ। টাটকা, গরম গরম তারা। অমলিন এক নারী। শিশুর শ্বাসের মতো রাতের বাতাস।

তা হোক। তবু পাপ।

হাত উঠিয়ে নিল জ্ঞানেশ। সামনেই ফিলিং স্টেশান। দম ফুরিয়ে আসছে গাড়ির। ঢাল বেয়ে গাড়ি উঠে গেল ওপর দিকে।

কৃষ্ণ বুঁদ হয়ে বসে আছে তার ইষ্টদেবতার সামনে। বেশ মৌতাত হয়েছে। চোখের সামনে নানা বর্ণের আলোর খেলা চলেছে। শিবঠাকুরের মাথায় সোনালি জটা উড়ছে। বিশাল পুরুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এক হাতে ত্রিশূল। অন্য হাতে ডম্বরু। বুকে দুলছে জীবন্ত সাপ। কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে যতবার পা ছুঁতে চাইছে, ততবার দুটো পা সরে যাচ্ছে নেচে নেচে।

'কেন ছলনা করছ প্রভু?' আর কবে ধরা দেবে!'

কুমু খিলখিল করে হেসেই চলেছে। হাসি আর থামে না। হাসছে আর বলছে, 'খেলা খুব জমেছে প্রভু। খুব জমেছে। কে থাকে। কে যায়। কে যায়। কে থাকে।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে। চুল এলো। গায়ের জামা খুলে টান মেরে ফেলে দিয়েছে দূরে।

কৃষ্ণ ভাবের ঘোরে বললে, 'খেলা যতই জমুক শেষপর্যন্ত কেউ থাকবে না।'

কুমু খিলখিল করে হাসছে। প্রায় অন্ধকার ঘর। একটা ধূপ জ্বলছে। ছোট্ট একটি আলোর বিন্দু। দেয়ালে বড় বড় ক্যানভাস। অস্পষ্ট নারী মূর্তি নানা ভঙ্গি। কৃষ্ণর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। মাঝে মাঝে কাঁকরি কাটা শব্দ উঠছে রুদ্রাক্ষে রুদ্রাক্ষে ঘষা লেগে। কৃষ্ণ বুঁদ হয়ে বসে আছে। দেহ এ জগতে থাকলেও মন ভাসছে অন্য জগতে।

দেবী হাত বাড়িয়ে আলো নেবাল। পাশের বিছানা থেকে দুর্গা বললে, 'তোতাকে কেন রেখে এলে দিদি?'

'তোতা নিজেই রয়ে গেল। এ বাড়ির চেয়ে ওই বাড়িটাই ওর বেশি ভাল লাগে।'

'দুস, আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

'আমারও। ঘুম আসছে না।'

দুর্গা হাই তুলল। দেবী অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা জোনাকি ঢুকে পড়েছে ঘরে। আলোর ফুলকি ভেসে বেড়াচ্ছে। এ আলো যেন সাগর থেকে স্নান করে ওঠা আলো। সেই বিশ্বাস দেবীর আজও গেল না। জোনাকি হল আত্মা। তা না হলে এমন সুন্দর নীলচে আলো আসে কোথা থেকে! যে আগুন পোড়ায় না। জলে পড়লে নেবে না।

দেবী চিত থেকে পাশ ফিরল। শিব বলেছেন, তোমরা এই বাড়িতে চলে এসো। বাড়িটা তোমাদের নামে লিখে দিয়ে যাব। কোন অধিকারে সেখানে গিয়ে থাকব! কেনই বা নোব! আমি যদি তাঁর মেয়ে হতুম। বিধবা মেয়ে। প্রাণ দিয়ে বাবার সেবা করতুম। যা হলে ভাল হয় এ জগতে তা কোনওদিনই হতে চায় না। যাকে সবচেয়ে ভালবাসতুম, সেই স্বামী চলে গেলেন, একেবারে হঠাৎ। শেষ কথাটিও বলা হল না। কত বউ আছে যারা স্বামীর মর্মই বোঝে না। পাশাপাশি থাকে এই মাত্র। ঠোকাঠুকির সময় চিৎকার করে, আমি তোমার বউ।

বাবার কথা মনে পড়ছে দেবীর। একটা দৃশ্য বারে বারে ফিরে আসে। পুরীর সমুদ্রে দু'জনে পাশাপাশি। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। বাতাসে দেবীর ফ্রক উড়ছে। উড়ছে বাবার ধুতির কোঁচা। তিনি থেকে থেকে বলছেন, দেখ মা দেখ, বিরাট, স্বরাট, বিরাট, স্বরাট। আমরা কী ক্ষুদ্র!

দেবীর হাই উঠল। এইবার হয়তো মৃত্যু হবে কিছুক্ষণের জন্য। একা একটা জীবন বয়ে বেড়ানো কী সাংঘাতিক কঠিন কাজ! তার আজকাল প্রায়ই মনে হয়— নাটক শেষ হয়ে গেছে। সহ চরিত্ররা সবাই চলে গেছে। দর্শকশূন্য আঁধার রংমহল। সে একা দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চে সাজপোশাক পরে। আশাই মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। তার জীবনে আর কোনও আশা নেই। সেই গানটা বারে বারে মনে পড়ে :

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল।
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল ॥

কিশোর ঘড়ি দেখছে, আর পায়চারি করছে। জ্ঞানেশ গেছে তো গেছেই। তনুর 'ড্রিপ' চলেছে। সিস্টার মাঝে মাঝে এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে পেশেন্টের। মা আর শিশু দু'জনকেই কি বাঁচানো যাবে। একটা এক্সরে নিয়ে দেখতে হবে, কতটা 'ডিসপ্লেসড' হয়েছে। কোন পজিশানে, কীভাবে আছে! ভগবানের 'মেকানিজম'। অনেক 'গার্ড'। অনেক 'চেকভালভ'। সহজে অঘটন ঘটার কথা নয়। তবু যদি ঘটে যায়। নাঃ আর তো অপেক্ষা করা যায় না।

গাড়ির হেডলাইট এগিয়ে আসছে। কিশোরের টেনশান কিছুটা কমে এল। মনে হয় জ্ঞানেশই আসছে।

জ্ঞানেশ ঘরে এসে ঢুকল।

'কী রে তুই একা?' কিশোর অবাক।

'স্কাউনড্রেল। একেবারে পারফেক্ট শয়তান। মাল খেয়ে আউট হয়ে পড়ে আছে। জলফল থাবড়ে যদিও বা ধাতে আনলুম, কিছুতেই এল না। বড় চাকরির গরম। স্ত্রীর সঙ্গে রিলেশানও তেমন ভাল নয় মনে হল।'

'কী হবে! সামওয়ান শুড বি হিয়ার। তা না হলে কে রিস্ক নেবে। যদি অ্যাবরেশান করতে হয়?'

'বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইকে তা হলে আনতে হয়। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

॥ সাতাশ ॥

দু'হাঁটুর ওপর কপাল রেখে অমিতাভ বেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। কী হবে ছটফট করে! কারু সময় চলে যায়। সময় কি আসলে চলে! একজন মানুষের আসা-যাওয়ার হিসেবেই সময়ের চল আর অচল। সতেরোই ফাল্গুন। তারপর থেকে এক বছর, দু'বছর, পাঁচ বছর। তনু তার জীবনে পাঁচ বছরের পুরনো। পৃথিবীতে আসার হিসেবে কত হবে! পঁচিশ বছরের পুরনো। ইংরেজিতে তো ওইরকমই বলবে, টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওলড। ঘোড়সওয়ার। জীবনের ঘোড়ায় চেপে টগবগাও। এ এমন ঘোড়া থামাবার উপায় নেই। পেছন থেকে অন্য ঘোড়া মেরে বেরিয়ে যাবে। হর্স রেস।

গত শীতে রেসের মাঠে গিয়েছিল এক শনিবার। দৌড়োচ্ছে। ডায়না, রস, সিলভার অ্যারো, ব্যাটলশিপ পোটেমকিন, নরম্যান স্যান্ডি, বিলি বাকস্টার, টমটম। দৌড়, দৌড়।

স্টার্ট। বাঁশি বাজিয়ে দিলেন তিনি। সেই তিনি। তিনি কে? হু ইজ হি? ক্যাপিট্যাল হি! আমি কে? কে আমি? পিতা শিবপদ। মাতা সুধারানি।

পিতা অমিতাভ। মাতা তনুশ্রী। কে আসছে?

অমিতাভ মুখ তুলে তাকাল। সর্বত্র তনু। পরদায়, ফুলদানির ফুলে, বিছানার চাদরে, দেয়ালের ছবিতে ফ্রিজের হাতলে ঝোলা ন্যাপকিনে, ড্রেসিং টেবিলের চিরুনিতে। সর্বত্র। এক ইঞ্চি স্থানও খালি নেই।

হাতে ভর রেখে শরীরটাকে কার্পেট থেকে টেনে তুলল অমিতাভ। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অদৃশ্য কোনও ফিলড মার্শাল যেন হেঁকেছেন— অ্যা টে ন শা ন। কেউ নেই। মিষ্টির দোকানের ঘিনঘিনে মাছির মতো, ঘিনঘিনে রাত ছাড়া চারপাশে কেউ নেই। কেন নেই?

কেন নেই?

ড্রেসিং টেবিলের সামনের ছোট টুলে অমিতাভ বসে পড়ল। সে যেন এইমাত্র একটি সন্তান লাভ করেছে। একটি প্রশ্ন— কেন নেই? কেউ নেই কেন তার পাশে?

সে চায় না, তাই নেই।

আয়নায় নিজের মুখ। নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অমিতাভ। কার মুখের সঙ্গে বেশ যেন মিল আছে। খুব চেনা মুখ। কে তুমি?

মনে পড়েছে, পিতার যৌবনের মুখের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। এইরকমই হয় বুঝি।

ধীরে ধীরে পিতা এইভাবে পুত্রে এসে নষ্ট হয়। বংশাবলির ধারায় ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ছিঃ। আই হেট ইউ। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি আমার স্বপ্ন নও। দুঃস্বপ্ন। তুমি ক্রীতদাস। শৃঙ্খলিত ভগবান নও। শৃঙ্খলিত শয়তান। বান্ডল অফ অ্যাপেটাইটস। অর্থ, সম্মান, লোভ, লালসা, জৈব তৃপ্তি। হাজারটা শুঁড় লকলক করছে চারপাশে। সাকারস।

রামকৃষ্ণ মিশনে তুমি পড়েছিলে। দু'বেলা প্রার্থনা করতে। ওই তো দেয়ালে ছবি। সব অভিনয়। বাইরের মুখোশ। এক ইঞ্চিও ওপরে উঠতে পারোনি। চাকায় ঘুরছ ক্রীতদাসের মতো। নিজের মুক্তি নিজের হাতে। কেউ তোমাকে উদ্ধার করবে না।

অমিতাভ তাকিয়ে আছে আয়নায় নিজের বিশুদ্ধ প্রতিফলনের দিকে। যত পাপ এই কায়ায়। ছায়ায় কোনও অপবিত্রতা নেই। মিশনে পড়ার সময় সাধু বলেছিলেন, মাঝে মাঝে এইভাবে তাকিয়ে থাকবে অপলকে নিজের চোখের দিকে। দেখবে তুমি ফিরে আসছ নিজের কাছে। যত ছোট হবে, তত বড় হবে। যত আপন হবে, তত পথ খুঁজে পাবে। নিজের হাত নিজে ধরো।

নিজের উপনয়নের চেহারা ফুটে উঠছে আয়নায়। মুণ্ডিত মস্তক। গেরুয়া বসন। দণ্ডধারী সন্ন্যাসী। অমিতাভ উঠে পড়ল। পিছলেছি তবে এখনও খাদে পড়িনি। এ জীবন তার নয়। যজন, যাজন, অধ্যাপন। পিতামাতার আশীর্বাদ। এই গণ্ডির বাইরে বেরোলেই সীতা হরণ।

একটানে খুলে ফেলল গলার টাই। কে বলেছিল এই ফাঁস পরতে। ধড়াচূড়া খুলতে খুলতে তার মনে পড়ল, উইলহেলম রাইখের সেই বিখ্যাত উক্তি :

For, many thousands of time, I have seen you naked, physically and psychically, without a mask, without a party card, without your 'popularity', naked like a new-born, naked like a Field Marshal in his underpants.

লিটল ম্যান, কমন ম্যান ॥ রাইখের গলায় অমিতাভ নিজেকে সম্বোধন করল। তুমি নগ্ন, দেহে, মনে। তোমার মুখোশ ওরা টেনে খুলে ফেলবে। তোমার আবার রাজনীতি কী? জনপ্রিয়তা! ফুল? লিটল ম্যান! নবজাতকের মতোই তুমি নগ্ন। ওই যে ফিল্ড মার্শাল দাঁড়িয়ে আছে লেংটি পরে ॥

You are heir to a dreadful past.

Your heritage is a burning diamond in your hand.

পেছনে তাকাও। মানব সভ্যতার ভয়ংকর অতীত তোমাকে অনুসরণ করছে। তোমার উত্তরাধিকার! হাতের তালুতে জ্বলন্ত একটি হীরকখণ্ড ॥

ধীরে ধীরে অমিতাভর নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা কেটে আসছে। only you yourself can be your liberator. তোমার মুক্তি তোমারই হাতে। ঘড়ির শব্দে অমিতাভ চমকে উঠল। বোকার মতো, জানোয়ারের মতো কী ভাবছে আবোল-তাবোল। এখন তাকে ছুটতে হবে নার্সিংহোমে।

জ্ঞানেশের রেখে যাওয়া চিরকুটটা তুলে নিল হাতে। অ্যাপোলো নার্সিংহোম। নামটা শোনা। পাজামা পাঞ্জাবি পরে অমিতাভ নেমে এল নীচে। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। জানলায় জানলায় নরম আলো। মিহি মিহি পরদা।

চিৎকাল করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, লিটলম্যান, তোমরা কি সুখী? সুখে আছ তোমরা? দু'পাশে, দুই বাহু প্রসারিত করে পড়ে আছে মসৃণ নির্জন পিচের রাস্তা। নেচে নেচে একটা কুকুর চলেছে। দূর থেকে ভেসে আসা কোনও গন্ধের টানে। বহু দূরে কোথাও রামনাম হচ্ছে। ভেসে আসছে সুর, রামা হো। রামা হো।

যে উৎসাহ নিয়ে অমিতাভ রাস্তায় নেমে এসেছিল, সে উৎসাহ আর নেই। শহর শুয়ে পড়েছে। এ পাশ, ও পাশ দু'পাশই ফাঁকা। একটাও গাড়িঘোড়া নেই। সামনের ধোবিখানায় তোলা উনুনের লাল আঁচ। স্বাস্থ্যবান ধোবি ধমাস ধমাস করে ইস্ত্রি করছে। কাপড়ের ডাঁই একপাশে। ফুটপাথে একটা খাটিয়া। খাটিয়ায় একটা বাচ্চা বেহুঁশ ঘুমে।

কী করা যায়! এই রাতে এতটা পথ কীভাবে যাওয়া যায়। শহর তো আর আগের মতো নিরাপদ নেই। আইনের প্রভুবা ক্লান্ত। আততায়ীরা সশস্ত্র। খাটিয়ায় শুয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে অমিতাভর ভীষণ হিংসে হল। কী সুন্দর একতারায় বাঁধা জীবন।

সেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ভেতরের শিশুটাকে সাবধানে আগলে রেখো। বড় হতে দিয়ো না। বড়দের জগতে বড় অশান্তি।

অমিতাভ হাঁটা ধরল। কিছু দূর এসে তার বুদ্ধি খেলে গেল। ধোবিখানার দেয়ালে ঠেসানো একটা সাইকেল তার চোখে পড়েছে। সাইকেলটা ধার চাইলে দেবে না! নিশ্চয় দেবে। বড়মানুষরা স্বার্থপর, আত্মপর। যারা কয়েক ধাপ নীচে আছে তাদের মধ্যে মানবতা এখনও লোপাট হয়ে যায়নি।

অমিতাভ ফিরে এল।

ঘর্মাক্ত মহিলা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললে, 'কিছু বলবেন বাবু?'

'মাই, আমি ওই সামনের ফ্ল্যাটে থাকি। খুব বিপদে পড়েছি।'

'কী বিপদ বাবু?'

'অফিস থেকে ফিরে এসে শুনলুম আমার বউকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে। আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। আমার গাড়ি নেই। এখন ট্যাক্সিও পাব না। তোমাদের এই সাইকেলটা কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে দেবে! আমি টাকা জমা রাখছি।'

ঝকঝকে দাঁত বের করে মহিলা হাসল।

'সাইকেল আপনি নিয়ে যান বাবু। টাকা রাখতে হবে না। কিন্তু এত রাতে সাইকেল চালিয়ে একা যাবেন!'

'মাই, আমাকে যেতেই হবে। কোনও উপায় নেই।

'সাবধানে যাবেন বাবু। জোরে চালাবেন না।'

অমিতাভ মহিলার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গোল মুখ। টেপা নাক। একটা নাকছাবি। উনুনের গনগনে লাল আগুন। লোহার ইস্ত্রির পোড়া পোড়া গন্ধ।

অমিতাভ সাইকেলে চেপে বসল। এস-এর মতো রাস্তা তিনটে মোচড় মেরে সোজা হয়ে গেছে। সাইকেল চালাতে চালাতে অমিতাভর মনে হল, তার ছাত্রজীবন ফিরে এসেছে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের মূল্যবান তকমা খুলে পড়ে গেছে। সাজানো ফ্ল্যাট, অফিসের ঘোরা চেয়ার, মাসিক কয়েক হাজার টাকার মিথ্যা নিরাপত্তা, মূর্খের অহংকার সব পড়ে আছে দূরে। মধ্যরাতের রাজপথ, ভিজে ভিজে বাতাস, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, কেমন যেন একটা মুক্তির স্বাদ। আড়ম্বরহীন সরল জীবনই শান্তির জীবন। জীবনকে করো বাউলের একতারা।

অমিতাভ ভাবছে, আর আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছে। পেছন থেকে আলোর একটা রেখা ঠিকরে এল। গাড়ি আসছে। অমিতাভ মাঝখান থেকে পাশে সরে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ। গাড়ির ভেতরের হইহল্লার শব্দ কানে আসছে। গাড়িটা তীব্র বেগে আসছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে। অমিতাভর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ভয় ভয় করছে। একেবারে একা। নিরস্ত্র।

গাড়িটা ঝড়ের বেগে তার এক চুল তফাত দিয়ে বাতাসের ঝাপটা মেরে বেরিয়ে গেল। ভেতরে যারা ছিল তারা নরখাদকের মতো হইহই করে উঠল। অমিতাভ টাল খেয়ে আরও ধারে চলে গেল। প্রায় রাস্তার বাইরে। বহুকাল সাইকেল চালায়নি। আর একটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। বুকটা ধক করে উঠল। জিভে নোনতা স্বাদ। মরে যেতে কী বিশ্রী লাগে।

বেশ কিছু দূরে গাড়িটা থেমে পড়েছে। অদ্ভুত চেহারার তিন-চারটে ছেলে নেমে পড়েছে। অমিতাভর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বললে, আর এগিয়ো না। বিপদে পড়বে। বাঁ পাশে একটা অনিশ্চিত সরু পথ। অমিতাভ ঢুকে পড়ল। কানে এল ইঞ্জিন স্টার্ট করার শব্দ। গাড়িটা ঘুরে আসছে। প্রাণপণ শক্তিতে অমিতাভ প্যাডেল ঠেলতে লাগল। কিছুই হয়তো হবে না। তবু ভয়। ফাঁকা রাস্তার মধ্যরাতের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই তাই হয়তো ভয়।

রাস্তাটা ক্রমশ চেপে আসছে চারপাশ থেকে। অমিতাভকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! কিন্তু পেছনে ফেরার উপায় নেই।

জলো বললে, 'নাও, তোমরা এবার শুয়ে পড়ো। তোমাদের ঘরে একটা ধূপ জ্বেলে দিয়ে এসেছি।'

গোপা বললে, 'আর তুমি কী করবে?'

'আমি কিছুক্ষণ এই ফাঁকায় বসি।'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, বউদি। অনেক হিসেবনিকেশ।'

'রেশি আঁতলামো কোরো না তো।'

গোপা শশধরের কানে কানে ফিসফিস করে বললে, 'হাবভাব কথাবার্তা সুবিধের মনে হচ্ছে না। চোখে চোখে রাখতে হবে। মনে আছে, এর আগে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। তুমি ওকে নিয়ে ঘরে চলে যাও। আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দিই। রাতের মতো নিরাপদ।'

শশধর হাই তুলল, 'তোমার কি মনে হয় আমাদের সময় ফিরবে না। গ্রহ কি কাটেনি!'

'অতই সোজা? তুমি কি ভাবো এর পর রেলগাড়ির মতো সোজা লাইনে সব চলবে! কিছু মানুষ ভুগতে আসে। কিছু মানুষ আসে ভোগ করতে। কেউ আসে দিতে। কেউ আসে নিতে। রাশ আলগা দিয়ো না। টেনে রাখো। জীবন এক শত্রু। সুযোগ পেলেই মারবে ঝাপটা।'

শশধর অবাক হয়ে গোপার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েদের কতরকম রূপ আছে! এই গোপা, মনে হত ভোঁতা মুখরা অবুঝ মেয়ে। তা তো নয়। সেটা এক রূপ। আজ সম্পূর্ণ অন্য রূপ। ঠিকই বলে, জ্ঞান কারু একচেটিয়া নয়।

শশধর বললে, 'ঠিক আছে। তুমি ধরে নিয়ে এসো। তোমার জোর খাটবে।'

গোপা বাইরে এল। এ কী! কোথায় গেল ঠাকুরপো? গোপার বুকটা ছাঁত করে উঠল। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ঠাকুরপো।'

একবার, দু'বার, তিনবার। শশধর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কী হল?'

'এই তো ছিল এখানে। গেল কোথায়?' গোপা প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

শশধর গোপার কাঁধে আলতো হাত রেখে বললে, 'আগেই খারাপটা ভেবে নিচ্ছ কেন? মানুষের মন কী জিনিস দেখেছ! একেই বলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

গোপা শশধরের বুকে মাথা রেখে অবরুদ্ধ গলায় বললে, 'তুমি জানো না, ও সব পারে। এই যে গেল আর হয়তো ফিরবে না।'

'তুমি ভেবো না। আমি দেখছি।'

শশধর চটি গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল! গোপা জলোকে কী অসম্ভব ভালবাসে। দু'জনেই প্রায় সমবয়সি। স্বামী-স্ত্রী হলে এমন ভালবাসা সম্ভব হত না। দেহের দাবি ঢুকলেই সব ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। শশধর মোড়ের পানবিড়ির দোকানের দিকে এগোচ্ছে। এখনও খোলা আছে। ভোলা অনেক রাত অবধি দুলে দুলে বিড়ি বাঁধে আর গুনগুন করে শ্যামাসংগীত গায়। জলো যেতে পারে কোথায়! পানের কথা হচ্ছিল, নিশ্চয় পান কিনতে গেছে। আর একটা বাঁক ঘুরলেই ভোলার দোকান।

শিবপদর বাড়ির সামনে জ্ঞানেশ দমাস করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল, ইচ্ছে করে। যাতে জোর শব্দ হয়। ভীষণ বিরক্ত লাগছে এইবার। এমন জালে জড়িয়েছে, বেরোবার পথ নেই। যত ছাড়াতে চাইছে তত জড়িয়ে যাচ্ছে।

শিবের ঘরে আলো জ্বলছে। জ্ঞানেশ খড়াং করে লোহার গেট খুলল। দরজার সামনে এসে জোর গলায় ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

ভক্তিশ্রদ্ধা এবার উবে আসছে।

শিব ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জ্ঞানেশের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

'কে, জ্ঞানেশ! খবর কী?'

'দরজা খুলুন, মাস্টারমশাই।'

জ্ঞানেশ দমকা বাতাসের মতো ঘরে ঢুকল। কোনও ভূমিকা না করে বললে, 'নিন চলুন। আর দেরি না। তনুদেবীকে নার্সিংহোমে রেখে এসেছি। একা পড়ে আছে। ক্রিটিক্যাল অবস্থা।'

'সে কী? সে কী বাবা!'

শিবের শরীর থরথর করে কাঁপছে, 'অমিতাভ কোথায়? অমিতাভ নেই?'

'অমিতাভ?'

জ্ঞানেশ হাসল। বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনার রত্ন ছেলে বোতল বগলে গড়াগড়ি যাচ্ছে। নিজেকে সংযত করল কষ্টে। শান্ত গলায় বললে, 'কথা বলার সময় নেই। চলুন।'

॥ আটাশ ॥

গলির পর গলি আবার গলি। পথ অমিতাভকে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা শহরের এত রহস্য! জানা তো ছিল না। দু'পাশের বাড়ির একতলার ঘরে ঘরে পনপন করে পাখা ঘুরছে। যেসব জানলায় পরদা ঝুলছে, বাতাসে কাঁপছে। মানুষের পলকা সংকল্পের মতো। কোনও কোনও বাড়িতে রাত-জাগা শিশুর ওঁয়া ওঁয়া কান্না। প্রেতের রাত। একটু ভয় ভয় করছে অমিতাভর। এক ধরনের ভূত আছে, যারা অকারণে মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। ছেলেবেলার শোনা গল্প। ভুলভুলাইয়া ভূত। সেই ভূতেই ধরল নাকি! পেট আর বুক দুটোই জ্বলছে। অম্বল হয়ে গেছে।

আর একটা বাঁক ঘুরতেই অমিতাভ ফাঁকা মতো একটা জায়গায় চলে এল। মাঠের মাঝখানে অন্ধকার একটা প্যান্ডেল। পতাকা, শোলার ফুল, আমপাতা, কাগজের শিকলি ঝুলছে। ভেতরে দুটো আগুনের ফোঁটা বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সিগারেট অথবা বিড়ির আগুন।

অমিতাভর মনে হল ওরা দু'জন, আমি একজন। মনে হতেই জোরে জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। পথের পাশে ল্যাম্পপোস্টের তলায় একটা পাগলি বসে আছে উবু হয়ে। একটা মিষ্টির দোকান। এত রাতেও ভিয়েন হচ্ছে। গরম রসের গন্ধ আসছে নাকে। কড়ায় ভাসছে টাপুর টুপুর রসগোল্লা।

ক্লান্ত অমিতাভ বড় রাস্তায় এসে উঠল। সামনেই একটা নির্জন পার্ক। বড় বড় গাছে হিস হিস' শব্দ হচ্ছে। ভেতরে একটা জলাশয়। রাতের তারা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে জলে। ছলছল করছে। অমিতাভ চলেছে। সাইকেলের বেল কাঁপুনিতে ঠিন ঠিন শব্দ করছে। এই সামান্য শব্দই অমিতাভর এখন একমাত্র সঙ্গী। অমিতাভর হঠাৎ মনে হল, পাপের পথ, অহংকারের পথ বড় নির্জন। সে ভুল করছে। এ জীবন সে ভালবাসে না, সেই কারণেই এই এত লোক-দেখানো বাড়াবাড়ি। এ জীবন তার নয়। হতে পারে না তার। স্কুলমাস্টারের সংস্কার তার রক্তে। মা পাটের কাপড় পরে ঠাকুরঘরে বসে থাকতেন ঘণ্টা আড়াই। বাবা স্নানের পর সূর্য নমস্কার করছেন। প্রশস্ত গৌরবর্ণ পিঠে ধবধবে সাদা পইতে। পবিত্র, পবিত্র। মেরির পেঁয়াজ খাওয়া ঠোঁটে কী অমৃতের সন্ধানে সে চুমুক দিয়েছিল!

ফুল! ইডিয়েট!

পিতা হল পর্বত। সেই পর্বতের ছায়া থেকে মূর্খের মতো সরে যেতেই এই দুর্যোগ। বিবেকের কাছে হার হয়েছে। দংশন, দংশনে জ্বলছে ভেতর। দেবালয় উচ্ছিষ্ট হয়েছে। অপবিত্র হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত চাই। বহু দূরে সমস্বরে গোটাকতক কুকুর হাহাকার করে উঠল।

চারজনের কাঁধে চেপে মৃতদেহ ছুটছে: রামনাম সত হ্যায়। রামনাম সত হ্যায়। সবার পেছনে একটি শিশু চলেছে নেচে নেচে। আহা, বেচারা আর পারছে না। দলের কেউই দেখছে না, যে সে পেছিয়ে পড়ছে। শিশুটির বাবাই হয়তো মরেছে। কে জানে! কার যে কখন সন্ধে হয়!

তনুর জন্যে অমিতাভর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। হে ঈশ্বর! এ যাত্রা ভাল করে দাও। তনুকে এরপর সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। স্নেহ দিয়ে পিতাকে অন্তত একশো বছর ধরে রাখবে। জ্যাঠা কৃষ্ণর কী ভালবাসা! শুধু ঈশ্বর কেন, মানুষকেও ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারলে সিদ্ধ হওয়া যায়। স্বরূপানন্দ হওয়া যায়। কই কৃষ্ণকে তো কোনও সময় দুঃখী মনে হয় না। রাজার মতো চালচলন। মুখে অপূর্ব জ্যোতি। যত বয়েস বাড়ছে তত রূপ খুলছে। অন্ধকারে বসে থাকলে মনে হয় আলোকময়।

এক-আধটা ক্লান্ত মটোর গাড়ি অমিতাভকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। একটা মাতাল টলতে টলতে সামনে এগোচ্ছে আবার টাল খেয়ে ঘুরে চলে আসছে। এইভাবে সারারাত নেশার বৃত্তে ঘুরবে নাকি! কী শাস্তি! বাঁ ধারের ফুটপাথে বাঁ পায়ের পাতা ঠেকিয়ে অমিতাভ একটু জিরিয়ে নিল। ভীষণ সিগারেটের ইচ্ছে হচ্ছে। সব ফেলে এসেছে। দূরে একটা চার্চের চূড়ো দেখা যাচ্ছে দেবদারু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে।

অল্পস্বল্প পাপ না করলে ঈশ্বর-চিন্তা আসে না মানুষের। যেমন করেই হোক আগে কাঁদতে হবে। ছাত্রজীবনে আশ্রমের মাঠে বসে রাতের আকাশ দেখত অমিতাভ। পাশে বসে শম্ভু মহারাজ নক্ষত্রপুঞ্জ চেনাতেন। উরসা মেজর। ওরিয়ন। সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ত আকাশের গা বেয়ে অগ্নিপিণ্ড নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। উল্কা। জ্বলতে জ্বলতে, অবশেষে শান্তি। না পুড়লে ছাই হবে কী করে? অমিতাভ আবার সাইকেল ছেড়ে দিল। রাত-ফোটা ফুলের গন্ধ আসছে নাকে। রাতের চক্রান্ত মানুষ কী বুঝবে! ঝোপে ঝাড়ে, পাতায় পাতায় কত কাণ্ডই যে হচ্ছে। গাছের ডালে পাতার বাসায় পাখির ছানা কাঁদছে চিঁচিঁ করে।

আর একটুও নেশা নেই। ঘোর নেই। চিন্তা এখন অনেক পরিচ্ছন্ন। আবার ফিরে আসছে অধীত কবিতার লাইন :

What regiment are you from
brothers?
Word trembling
in the night
A leaf just opening
In the racked air
involuntary revolt
of man face to face with his own
fragility
Brothers

কবিতার লাইন উঠে এলেই অমিতাভ বুঝতে পারে ভেতরটা পবিত্র হয়ে আসছে মন্দিরের মতো। দূরে সাদা মতো একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। নিশ্চল। সাইকেলের বেল ঝিনঝিন করছে। কাছে এসে অমিতাভ কিছুই দেখতে পেল না। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা রাস্তা আকাশের চোরা আলোয় চকচক করছে। শুধু মনে হল, শীতল বাতাস কারু নিশ্বাসে যেন সামান্য উত্তপ্ত। আসনে যেমন বসে থাকা দেহের উত্তাপ উঠে যাবার পরেও লেগে থাকে কিছুক্ষণ। এই চেনা পৃথিবীও রাতে কেমন অচেনা রহস্যময় হয়ে ওঠে। এইবার বেশ ভয় ভয় করছে।

ভাবতে ভাবতে অমিতাভ আরও কিছু দূর এগিয়ে গেল। অনেকদিন সাইকেলে ওঠার প্রয়োজন হয়নি। অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। পা যেন আর চলছে না। দূরে কিছুটা জায়গা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। অমিতাভ ভেবেছিল সোডিয়াম লাইট। যতই এগোয় আলোটা সরে যেতে থাকে। আশেপাশে কোনও ল্যাম্পপোস্ট নেই, আলো নেই, অথচ আলোর সোনালি আঁচল সরে সরে যাচ্ছে। নর্তকী যেন আঁচল উড়িয়ে চলেছে।

অমিতাভ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। চোখের ভুল! তা কী করে হয়! স্বপ্ন দেখছে? সে তো মানুষ ঘুমোলে দেখে। ফিরে যাবে? না, ফিরে যাবে কেন? এতদিনে তনু তাকে ভীষণ টানছে। অমিতাভ অল্প সময়ের জন্যে চোখ বুজিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর মা সারদাকে স্মরণ করার চেষ্টা করল। মনের কাচে ময়লা ধরে গেছে। ছাত্রজীবনে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেত, সেরকম স্পষ্ট হল না। ঝাপসা। তবু বললে, তোমরা আমার হাত ধরো। তোমরা আমার হাত ধরো। বলামাত্রই অমিতাভর মনে হল, সে কী অসহায়! সুট, টাই, ব্রিফকেস, বড় চাকরি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, এই এতটুকু চেনা জগতের যত হম্বিতম্বি। বিশাল জগতে শবের মতো কাঁপছে অমিতাভ। বিশাল আকাশ। খই ফোটা তারা। এক ঠ্যাঙা বাড়ি। গোরস্থান। মসজিদ। আদিগঙ্গার ওপর পোল। চিড়িয়াখানার বাগান। হর্টিকালচার। কালীঘাটের মন্দির। সোনালি আলো দুপুরের চিলের ছায়ার মতো ভাসতে ভাসতে, এক-একটি জায়গা আলোকিত করতে করতে ক্রমে পশ্চিম আকাশে উঠে গেল। আশ্চর্য ঘটনা। অমিতাভ আর ভাবতে পারছে না। আচ্ছন্ন চিন্তা।

গোপা আর শশধর দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে দাওয়ায়। থামে ঠেসান দিয়ে। ডান পাশে ছাতে ওঠার সিঁড়ির কাছে ঝুরঝুর বালি ঝরছে। সারা বাড়িটায় নোনা ধরে গেছে। জোরে বাতাস দিলেই বালি ঝরে পড়ে। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ মাথার ওপরের চৌকো আকাশে এসেই সরে যাচ্ছে। শশধর এক নজরে তাকিয়ে আছে ফালি আকাশের দিকে।

ঘণ্টাখানেক এখানে ওখানে সেখানে ঘুরেছে পাগলের মতো জলোর খোঁজে। কোথাও নেই। উধাও। কর্পূর হয়ে গেছে।

গোপা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কী সাংঘাতিক ছেলে!'

শশধরও নিশ্বাস হালকা করলে, 'বললে এক করলে এক। কাকে বিশ্বাস করবে! সবাই অবিশ্বাসী!'

'তোমার হাই উঠছে। যাও তুমি শুয়ে পড়ো।'

'ঘুম হবে না। ভেতরটা ছটফট করছে।'

'আমার কী হচ্ছে জানো? আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আমাদের কীরকম বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। একেবারে অসহায় করে দিয়ে গেল। মিথ্যেবাদী। কাপুরুষ।'

'সকাল না হলে আর কিছু করা যাবে না। এই রাতে আর কী করব! রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে।'

'তুমি শুয়ে পড়ো গে। আমি আর একটু বসে যাই। যদি ফিরে আসে।'

'ভিজে ভিজে বাতাস দিচ্ছে। তুমিও ভেতরে চলো। জেগেই থাকব। ডাকলে সাড়া পাবে। মশায় গা হাত ফুলিয়ে ছেড়ে দিলে।'

'কী করে যাই বলো তো! আমার কেবলই মনে হচ্ছে যদি আত্মহত্যা করে!'

'খারাপটাই ভাবছ কেন?'

'ভাল চিন্তা আর আসে না। মনের দোষ। মনটা এমন হয়ে গেছে। এই বললে গ্রহ কেটে গেছে। কোথায় কেটেছে! আমার বরাতটা একবার দেখেছ? তুমি যেই ঘুরে এলে আর একজন অমনি সরে পড়ল! হয়েছে ভাল।'

শশধর গোপার অনাবৃত কাঁধে হাত রাখল। ঠান্ডা। ভিজে ভিজে। সামান্য আকর্ষণ করতেই গোপা শশধরের গায়ে ঢলে পড়ল। আর শশধরের ঠিক তখনই মনে হল, জলো থাকলে তারা দু'জনে এই মুহূর্তে এত ঘনিষ্ঠ হতে পারত কি।!

মনে হওয়ামাত্রই ভেতরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। মানুষ কী অসম্ভব স্বার্থপর, আত্মসুখী। পোড়ো জায়গাটায় ছুঁচো ডাকছে। শশধর ভয়ে পা তুলে বসল। মানুষ আদর পেলেই মৃত্যু ভয়ে মরে।

গোপা বললে, 'চলো আমরা এখান থেকে চলেই যাই। বললে তোমাকে অফিস থেকে বাইরে ট্র্যান্সফার করবে না।'

'বললে হয়তো করবে। কলকাতা ছেড়ে কজনই বা সাধ করে বাইরে যেতে চায়!'

উত্তেজনায় গোপা উঠে বসল, 'তা হলে চলো, চলো না, ছোট্ট কোনও শহরে চলে যাই। ঝাউবন, একটা নদী। ছোট্ট একটা বাংলোটাইপের বাড়ি।' গোপার চোখ দুটো কালো হিরের মতো চকচক করছে।

গোপার গালে আঙুলের টুসকি মেরে শশধর বললে, 'তোমার ওপর অভিমান করে আমি অনেক জায়গা বাউলের মতো ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কাছাকাছি ডানকুনিতে আমার এক বন্ধু থাকে। বেশ জায়গাটা। ওখানে কাঠা চারেক জমি কিনলে হয়।'

'না না, এমন জায়গায় চলো যেখানে আমাদের জানাশোনা কেউ নেই। এই পুরনো জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে। একেবারে নতুন করে সব পাতব। বুঝলে, নতুন উনুন, শিল নোড়া, খাট-বিছানা। এ বাড়িটার দেয়ালে দেয়ালে দুর্ভাগ্য লেগে আছে।'

'আরে আকাশটা হঠাৎ এমন লাল হল কেন বলো তো! দেখো দেখো। কোথাও আগুন লাগল নাকি!'

পশ্চিম আকাশ থকথকে লাল। তিরতির করে আকাশ কাঁপছে।

শশধর উঠে দাঁড়াতেই গোপা উঠে দাঁড়াল। শশধর বললে, 'ছাদে যাবে?'

'এই অন্ধকারে?'

'তাতে কী হয়েছে! চলো না, দেখি কী হল! মনে হচ্ছে, বেশ বড় ধরনের আগুন লেগেছে।'

দু'জনে ছাদে এসে দাঁড়াল। শুকনো ঝনঝনে ছাদ। জায়গায় জায়গায় আলসে ভেঙে গেছে। কার্নিশে বট গাছ। সতেজ ঔদ্ধত্য।

পশ্চিমদিকে কোথাও আগুনই লেগেছে। লকলকে জিভ অন্ধকারকে ছোবল মারছে। ভলভল করে ধোঁয়া উঠছে।

শশধর বললে, 'বাপ রে, কী সাংঘাতিক আগুন!'

দুর থেকে অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে। ভেসে আসছে পোড়া পোড়া গন্ধ।

জ্ঞানেশ রাস্তার দিকে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। এই একই পথে কতবার আসা-যাওয়া, যাওয়া-আসা হল। পাশে বসে আছে শিবপদ। স্থির পুতুলের মতো।

ঢাকা কেটলির ভেতর গরমজল ফোটার মতো শিবপদর ভেতরে চিন্তা টগবগ করছে। তনুর এই দুর্ঘটনার জন্যে সে কতটা দায়ী। অবশ্যই দায়ী। দরজাটা বন্ধ করে পেছনের বাগানে বেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতা না করলে তনু ওভাবে ঢুকেই মৃতদেহের মুখোমুখি হত না! কেয়ারলেস। অসাবধানী বুড়ো। অবশ্য জানবই বা কেমন করে, যে তনু হঠাৎ চলে আসবে।

ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি একশোতে ছুটছে। স্টিয়ারিং একেবারে আলগা।

জ্ঞানেশ আবার নতুন করে ভাবছে, সত্যিই তনুর সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের সেই সম্পর্ক! নেশার ঘোরে হলেও কেন অমিতাভ অমন কথা বললে। এসব ঘটনা বিলিতি কেতাবে পড়া যায়। বাস্তবে হয় নাকি! কে জানে বাবা! তার জগৎ আলাদা। লোহালক্কড়। নাটবল্টু। অত কীসের ভাবনা! বিপদে মানুষকে সাহায্য করা উচিত। করে যাবে মুখ বুজে।

হঠাৎ শিবপদ চাপা গলায় বললে, 'আর কত দূর!'

গাড়ির গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'প্রায় এসে গেছি।'

শিবপদ আবার নিজের চিন্তায় তলিয়ে গেল। তনুর মায়ের সঙ্গে তার অনেককালের আলাপ। দু'জনেরই এক বৃত্তি— শিক্ষকতা। তনুর বাবা ছিলেন প্রায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো। অদ্ভুত মিল

ছিল শিবপদর চেহারার সঙ্গে। এমনও হয়। দুটো মানুষ প্রায় একই রকম দেখতে। এমনকী কণ্ঠস্বরেও অদ্ভুত সাদৃশ্য। তনুর মা হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত আর কেবলই বলত, আশ্চর্য! আশ্চর্য! শিব একটু বিব্রত বোধ করত। মনে হত, তার বেঁচে থাকাটাই ভুল হচ্ছে। কোনও কোনও দিনদুপুরে তনু পেছনদিক থেকে এসে হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে দোল খেত শিশুর মতো। বলত, আমার এক বাবা গেছেন, আর এই তো আমার আর এক বাবা রয়েছেন। সেই সময় তনুর বয়েসটা হঠাৎ এত কমে যেত! শিবের কোনওরকম সংকোচ হত না। নতুন একটা মায়ার সংসার তৈরি হত। সম্পর্ক ভেঙে গড়ে, সময়ের ওলটপালট হয়ে, এ-সংসার, সে-সংসার জোড়াতালি লেগে, চরিত্রের আনাগোনায় শিবের ঘোর লেগে যেত। মনে হত, আবার শুরু থেকেই বুঝি শুরু হল। তার নিজেরই মেয়ে পিঠে দোল খাচ্ছে। সুধাকে বলেছিল, জানো, মেয়ে হলে নাম রাখব উমা। উমার মতো রূপ চাই। চাই স্বভাব।

ঘাড়ের পাশ থেকে শিবের বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে দোল খেতে খেতে তনু বলত, আমার মিষ্টিবাবা। বুকের দু'পাশে ঝুলছে চুড়ি পরা ফরসা দুটো হাত। অদ্ভুত সরু সরু আঙুল। শিবের মনে হত, তনু বারো-তেরো বছরের ফ্রক পরা একটা মেয়ে। তনু নয়, উমা। যে উমা সুধার কোলে আসার সুযোগ পেল না।

শিব দমকা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নাঃ।' জ্ঞানেশ বাঁ দিকে বাঁক নিল।

॥ উনত্রিশ ॥

'অ্যাপোলো'। আলোর অক্ষর। রাতজাগা রুগির চোখ। ঝিমঝিম রাত। রাতেরও শব্দ আছে। শিবপদর ছেলেমানুষি বিশ্বাস, এত বড় একটা পৃথিবী ঘুরছে। সেই ঘোরার একটা শব্দ থাকবে না? কে আর মধ্যরাতে জেগে থেকে কান পেতে শুনছে?

সেদিন দুপুরে স্বামী সত্যানন্দের সাধন অনুভূতি পড়তে পড়তে শিবের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। স্বামী লিখেছেন, ধ্যানের অনুভূতি। বিশ্বাস করো ভাল। বিশ্বাস না করো, তাতেও কিছু যায় আসে না। উলঙ্গ মানব এ মুখে ঢুকে ও মুখে বেরিয়ে যাবে। নাটক চলতেই থাকবে, দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। মঞ্চ খালি যাবে না। এর ভেতরই সাধনার জোরে কেউ ওঠে। আর কেউ ভেড়ার মতো নেচে নেচে সরে পড়ে।

The song of creation
Is the song eternal,
Vibrating through time and space.
Cosmic concert.

জ্ঞানেশ আচমকা ব্রেক কষল। সাদা মতো কী একটা ছুটে চলে গেল গাড়ির সামনে দিয়ে। বেড়াল। শিব ঝাঁকানিতে ঝুঁকে পড়ল সামনে। জ্ঞানেশ এতক্ষণ বেপরোয়া চালাচ্ছিল। ভীষণ অধৈর্য অবস্থা। মনে মনে বার কতক ধ্যাততেরিকা বলে ফেলেছে। একই সঙ্গে অনেক কিছু ইচ্ছে করছে। চান, খাওয়া, নরম বিছানায় টান টান শুয়ে পড়া। সবার আগে সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। পাশেই মাস্টারমশাই। উপায় নেই।

হিন্দি ছবির নায়কের মতো সাঁ করে গাড়িটাকে ফুটপাথের ধারে এনে জ্ঞানেশ ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

'আমরা এসে গেছি।'

শিব নানা ভাবনায় বেশ একরকম ধ্যানস্থ ছিল। চমকে উঠল।

'এসে গেছি?'

শিবের কোলের ওপর দিয়ে পাশে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে দিতে জ্ঞানেশ বললে, 'সাবধানে নামুন!'

সোজা হয়ে বসতেই জ্ঞানেশের চোখ পড়ল, একটা সাইকেল আসছে। অন্ধকারে সাদা আরোহী। জ্ঞানেশ ইচ্ছে করে হেডলাইট জ্বালাল। পরনে পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি। চেনা চেনা।

অমিতাভ আলোর বৃত্ত থেকে সরে গেল। আর তখনই জ্ঞানেশ চিনতে পারল। গা-টা ছমছম করে উঠল। একটু আগে যে মাতাল হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল সে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে এল কী করে? ভৌতিক কাণ্ড নয় তো?

গাড়ি থেকে নেমে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে জ্ঞানেশ দেখল, গেটের সামনে অমিতাভ সাইকেল থেকে নেমেছে। ইতস্তত করছে ঢুকতে। আসল লোকই যখন এসে গেছে তখন কী প্রয়োজন তাদের যাবার। নেশার ঘোরে হলেও একটু আগে যে কথা বলেছে, তাতে বাপ-ছেলে মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। স্নেহ নয়, ঘৃণার আদান-প্রদানই হবে।

এগোতে গিয়েও পেছিয়ে এল জ্ঞানেশ। শিবপদ লক্ষ করেনি ছেলেকে।

জ্ঞানেশ বললে, 'চলুন মাস্টারমশাই আমরা ফিরে যাই।'

শিব আঁতকে উঠে বললে, 'কেন, বাবা! সব শেষ হয়ে গেছে? সব শেষ!'

'না, শেষ নয়। অমিতাভ এসে গেছে। আমাদের আর প্রয়োজন হবে না।'

'সে কী, প্রয়োজন হবে না কেন?'

'আপনাকে সে অশ্রদ্ধা করে।'

শিব ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, 'করুক। আমি তো শ্রদ্ধা চাই না। বিপদে আমি তার পাশে থাকতে চাই। তনু আমার মেয়ে।'

'অপমানিত হলে আমি জানি না।'

'জ্ঞানেশ, মান অপমানে আমি বিচলিত হই না। কোথায় অমিতাভ!'

অমিতাভ তখন গেটের প্রহরীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। ক্লান্ত কণ্ঠস্বর। জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছছে। শিব এগিয়ে গেল সেদিকে। এলোমেলো পা পড়ছে। যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। জ্ঞানেশ হাত ধরে ফেলল, 'উতলা হবেন না মাস্টারমশাই। অন্ধকার রাত।'

জ্ঞানেশের কথা শিবের কানে গেল না। শিব বললে, 'অমিত তুই এসেছিস! কেমন আছিস তুই?'

ধরাধরা গলায় অমিতাভ বললে, 'বাবা!'

জ্ঞানেশ উৎকণ্ঠিত। মাস্টারমশাই এখুনি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। সেই ছেলে, যে সন্দেহ করে পিতা তার স্ত্রীর প্রেমিক। যার কাছে গেলে মাস্টারমশাইয়ের নাকে লাগবে ভকভকে মদের গন্ধ। ভাগ্য ভাল, সাইকেলের ব্যবধান থাকায় পিতাপুত্রে আলিঙ্গন হল না। দু'জনে মুখোমুখি। পাশে জ্ঞানেশ। গেটের মাথায় আলো। সেই আলো এসে পড়েছে দু'জনের মুখে।

অমিতাভ আবেগহীন গলায় বললে, 'ভাল আছেন আপনি?'

জ্ঞানেশ রাগরাগ গলায় বললে, 'এখানে সময় নষ্ট না করে ভেতরে চলুন।'

অমিতাভ মুখ ফেরাল জ্ঞানেশের দিকে। ইস্পাতের মতো কঠিন কণ্ঠস্বর, 'জ্ঞানেশবাবু, আপনি যথেষ্ট করেছেন আমাদের জন্য। এবার আপনি আসতে পারেন। ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়োর টাইম। ডোন্ট ডিক্টেট ইয়োর টার্মস। ডোন্ট সারপাস ইয়োর লিমিট।'

খুব কাছ থেকে পরপর তিনটে গুলি বুকে এসে লাগলে যেমন হয়, জ্ঞানেশের ঠিক সেইরকম একটা অনুভূতি হল। প্রচণ্ড ধাক্কা। পরপর তিনবার। জ্ঞানেশ শিবপদর হাত ছেড়ে দিল। একপা একপা করে পেছোতে লাগল। মানুষ? এর নাম আধুনিক মানুষ।

শিবপদ বললে, 'ছি ছি, তুই কাকে কী বলছিস? সেই সকাল থেকে ছেলেটা ঘুরছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। জ্ঞানেশ, জ্ঞানেশ তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা। ওর মাথার ঠিক নেই।'

জ্ঞানেশ দূর থেকে বললে, 'এ কালের মানুষ কিছু মনে করে না মাস্টারমশাই। তাদের মনটাই নেই।

একটু আগে অমিতাভ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। নিজের ওপর এখন তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। জ্ঞানেশ তার চোখে একটা লোফার ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোফারটা তাকে চড় মেরেছে। যে কথা তার মনে ছিল, মুখ ফসকে সেই কথা বলে ফেলেছে ওই লোফারকে। যত তাড়াতাড়ি ওকে সরানো যায় ততই ভাল। একটু আগে সে জ্ঞানেশের পায়ের কাছে পড়েছিল, এইবার সে জ্ঞানেশকে মারবে লাথি।

অমিতাভ শিবপদকে বললে, 'আপনার থাকার কি খুব প্রয়োজন আছে? আপনি বৃদ্ধ মানুষ!'

শিব হতভম্ব, 'কী বলছিস? আমার থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষের বার্ধক্য একটা অপরাধ। সেই অপরাধে আমি তনুকে দেখতে পাব না?'

'ডোন্ট বি ইমোশনাল। আপনি ওর গাড়িতেই ফিরে যেতে পারেন। আমার গাড়ি নেই যে পৌঁছে দিয়ে আসব। এক ঝলক চোখের দেখা, এর বেশি তো কিছু করার নেই আপনার! সারা দুপুর তো দেখলেন, আর বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন। বাকিটা আমিই ম্যানেজ করে নিতে পারব। এনাফ অফ ইয়োর স্নেহ অ্যান্ড ভালবাসা!'

শিবপদর পা কাঁপছে। শরীরে কোনও জোর নেই। মনে হচ্ছে, এখুনি দম আটকে যাবে। অমিতাভ সাইকেল সমেত ঢুকে গেল ভেতরে। এ নার্সিংহোম তার চেনা। কিশোরকে সে চেনে। তা ছাড়া চিরকালই তার তেমন আবেগ অনুভূতি এসব নেই। কোনও কিছু নিয়ে প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না। পৃথিবী এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রতি মুহূর্তে জন্ম, মৃত্যু, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, খুন, রাহাজানি। যা হবার তা হবেই।

অমিতাভ যত এগোচ্ছে পেছনে তার ছায়া তত দীর্ঘ হচ্ছে। জ্ঞানেশ স্টিয়ারিং ধরে সামনে তাকিয়ে বসে আছে অন্ধকারে। দেখছে, নির্জন ফুটপাথে এক বৃদ্ধ মানুষ দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কী করবেন, কোন দিকে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

জ্ঞানেশ নেমে এল। এই আশঙ্কাই সে করছিল। চরম অপমানিত হয়ে বৃদ্ধকে ফিরতে হবে। সে জানে, সে দেখেছে, মানুষ যত ওপরে ওঠে তত ছোট হয়।

শিবপদর হাত ধরে জ্ঞানেশ বললে, 'চলে আসুন।'

হাত বরফের মতো ঠান্ডা। সারা শরীর কাঁপছে। কিছু বলতে চাইলেন, বলা হল না। খেয়াল নেই। হেঁটে চলেছেন জ্ঞানেশের পাশে পাশে নেশাগ্রস্তের মতো।

আর সামনে নয়। পেছনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ সাবধানে শিবপদকে বসিয়ে দিল। শিব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। নিজেকে কেমন যেন জড়পিণ্ডের মতো লাগছে। তবু বললে, 'ও কি ঠিক ঠিক সব পারবে? তোমার কী মনে হয় জ্ঞানেশ? একেবারে একলা। ওর পাশে তো কেউ রইল না। আমি এখন কী করি! তুমি কী বলো?'

'আমি যা বলব, তা কি আপনার পছন্দ হবে?'

'হবে। আমি একটা ওলড হ্যাগার্ড। আমার দেহ প্রাচীন। আমার চিন্তা প্রাচীন। আধুনিক জগৎ তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল বোঝো।'

'তা হলে শুনুন। স্নেহ ভালবাসার যুগ শেষ হয়ে গেছে। ভাল ভাল সেন্টিমেন্ট সব মরে গেছে। মানুষের চিন্তা এখন কর্ক স্ক্রুর মতো প্যাঁচালো। আপনি করবেন এক, লোকে বুঝবে আর এক। সব কিছুরই অন্য মানে হবে। যা হচ্ছে হোক, আপনি মাথা ঘামাবেন না। যতটা পারেন দূরে চলে যান।'

'আমাকে যে দায়ী করলে!'

'করুক। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, আমরা অনেকেই অনেক কিছুর জন্যে দায়ী। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সমাধান পাবেন না।'

জ্ঞানেশ স্টার্ট দিল। গাড়ি কেঁপে উঠল। জ্ঞানেশের জানলার পাশে ছায়ামূর্তি। পার্বতী।

'সায়েব। আমি! আমার কী হবে?'

'তুমি উঠে এসো। তোমাকে যাবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

'কোথায়?'

'যেখানে ছিলে সেইখানে।'

'না বাবু।'

জ্ঞানেশের মাথায় এইবার খুন চাপছে। যত সমস্যা সব এইবার বটগাছের আঠার মতো জড়িয়ে ধরছে। কড়া জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল। একটু আগে অকারণে মেয়েটাকে আশকারা দিয়েছে। এখন পেয়ে বসলে কিছু করার নেই। অকারণে, না কারণে? নিজেকেই প্রশ্ন। উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে। ভেতরে অনেক সাপ আছে। ঝাঁপি খুলে দিলেই বেরিয়ে আসবে কিলবিল করে।

'তুমি উঠে এসো সামনে।'

জ্ঞানেশ হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে ধরল। কাচের চুড়ির ঠিন ঠিন শব্দ। শাড়ির আঁচলের খসখসানি। পার্বতী বসল। জ্ঞানেশ জানে না, কী করবে। কোথায় নিয়ে যাবে। কিশোরকে পার্বতীর জন্যে চেপে ধরার সুযোগ হল না। যা হয় হবে। পরে হবে। গাড়ি ঘুরে গেল। রাতটা শেষ হলে বাঁচা যায়।

শিব প্রশ্ন করলে, 'এ কে?'

'মাস্টারমশাই, এ আর এক দুঃখ। এর সাহায্যেই তনুকে হাসপাতালে এনেছি।'

'এটা কি হাসপাতাল?'

'না, নার্সিংহোম। ওই হল আর কী। তা একে একটা কোথাও প্লেস করে দিতে হবে। খুব বিপদে পড়েছে।'

'নমস্কার বাবু।' পার্বতী ঘাড় ঘুরিয়ে শিবকে নমস্কার করল। অন্ধকারে দু'হাত জোড় করে।

'নমস্কার।'

পার্বতীর ভদ্রতায় জ্ঞানেশ মুচকি হাসল। গাড়ি চলছে। ড্যাশবোর্ডের লাল আলোর আভাস, সামনের আসনের অন্ধকার সামান্য তরল হয়েছে।

শিব বললে, 'মেয়েটিকে তুমি কোথায় দেবে?'

'ভেবেছিলুম এই নার্সিংহোমে লাগিয়ে দেব। আবার ভাবছি পামেলা বোসের অর্ফানেজে দিলে কেমন হয়। আপনি রাখবেন মাস্টারমশাই? আপনার তো দরকার!'

'আমি? আমার তো কোনও রোজগার নেই জ্ঞানেশ। কলসির জল গড়িয়ে যদ্দিন চলে। আচ্ছা জ্ঞানেশ, তুমি তোমার মা-বাবাকে এইভাবে কোনওদিন মুখের ওপর অপমান করেছ!'

নীরবে মিনিট দুই গাড়ি চালিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টারমশাই, আমি তো তেমন শিক্ষিত নই। বড় চাকরিও করি না। কুলিকামারি মানুষ। বাবা যদ্দিন ছিলেন, মাথা তুলে কথা বলার সাহস হত না। এখনও মা আছেন। আমার পরম সৌভাগ্য। সব জীবনেরই তো দুটো নোঙর, মা আর বাবা। তাঁরাই এনেছেন। তাঁরাই পালন করেছেন। ফল হয়ে বৃক্ষকে কী করে অস্বীকার করি। লিভিং গড তো তাঁরাই। এইসব পুরনো বিশ্বাস নিয়ে আমার দিন বেশ চলে যাচ্ছে মাস্টারমশাই। এখনও বাড়ি ফিরে মায়ের কোলে মাথা রেখে ছেলেবেলার গল্প শুনি। সে যেন তীর্থযাত্রার মতো। মা বলেন, আমার বুড়ো খোকা।. সারাদিনে আমার সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত ওই সময়টুকু। একটু বোকা বোকা হলে পৃথিবী মোটামুটি সুখেরই জায়গা।'

শিব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা উত্তরপুরুষকে মানুষ করতে না পারা। অর্থ, সামর্থ্য, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা সবই অসার বস্তু। সার বস্তু পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন অহংকার। সেই অহংকার লুকিয়ে আছে নিজের পরিচয়ে। পুত্রের পরিচয়ে। বৃক্ষ তোমার পরিচয় কীসে? না,

ফলে। শিবপদর ভেতরে ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এমন একটা কষ্ট, যার কোনও নিরাময় নেই। জীবনের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। আর কোনও অবলম্বন রইল না। এমন জীবনের বাঁচাও যা, মরাও তাই।

নিদ্রিত শহর। সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটছে। জ্ঞানেশের মনে হচ্ছে কোনও গাছতলায় পার্বতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। এই কলের জল আর বিজলি বাতির জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। সে এখন থেকে চেষ্টা করবে অমিতাভর উলটো হতে। জ্ঞানের কথা। ইংরেজির ফোড়ন। অসহ্য। ওসব অনেক শোনা হল। দেখা হল অনেক। সব ফেলে দাও। বাঁচো। আনন্দে বাঁচো। ভালবেসে যাও পাগলের মতো। রাগো। হাসো। ভাঙো। গড়ো। দেবতা হয়ে কাজ নেই। হও স্পন্দিত মানুষ। জ্ঞানেশ মনে মনে হাসল! রোমান্স আর জীবন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। ভাবা যায় অনেক। করার সাহস কোথায়! জীবনের চলন একবার মাপা হয়ে গেলে তাল, লয়, ছন্দ সহজে ভাঙা যায় না।

এই শেষ রাতে চলন্ত গাড়িতে শিবপদর যার কথা মনে পড়ছে, সে অমিতাভর মা নয়। তনুর মা। মহিলার সঙ্গে একবার দেখা হলে বেশ হয়। বলা তো যায় না, কবে আছে কবে নেই। একটা চিঠি লিখবে। অনেকদিন আসেননি। আসুন না দিন কয়েকের জন্যে। কী ধরা যায়! একটা কিছু না ধরলে শেষটা যে বড় করুণ হবে। ঈশ্বর-ভাবনা কিছুতেই যে আসে না। বড় কঠিন লাগে।

ময়দান ঘেঁষে গাড়ি চলেছে। বড় বড় গাছের তলায় মাঠ শুয়ে আছে। অভিমানীর চোখের মতো অজস্র আলো জ্বলছে, দূরে, আরও দূরে। রাতের পাশ ফেরার শব্দ শুনতে পাচ্ছে শিবপদ। একসময় ক্লাসে পড়াত ট্র্যাজেডি কাকে বলে? সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া। সব হারাতে হারাতে সম্পূর্ণ একা।

শিব আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রশ্ন করে ফেলল, 'জ্ঞানেশ, তনুর কী হল জানা যাবে কেমন করে?'

'আমি বাড়ি ফিরেই ফোন করব কিশোরকে। তারপর জানিয়ে যাব আপনাকে। তবে আমার অনুরোধ, আপনি ওদের ভোলার চেষ্টা করুন।'

'তা কি সম্ভব জ্ঞানেশ! তনু যে আমায় স্নেহ দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। সে বাঁধন কি সহজে খোলা যায়!'

'যায়। জ্ঞানের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলুন।'

॥ ত্রিশ ॥

কৃষ্ণ শব্দ না করে গেটের আংটা খুলল। গত কয়েক দিন হল শিবের বাড়ি বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। সামনের বাগানে পাতা পড়ে আছে। এমন থাকে না। রোজ ঝাঁট পড়ে। গাছের গোড়া শুকিয়ে আছে। জল দেওয়া হয়নি। জবা গাছে গেরুয়া ফুল, বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। ঈশ্বরের আয়োজনে ত্রুটি নেই। মানুষের মন যদি এতেও না ভরে, কী আর করবেন তিনি। রোজ ভোরে পাখিদের বলছেন, শিস দাও। সূর্যকে বলছেন, ভোরের আকাশে আবির ওড়াও। নদীর জলে সোনার পাত ছিটিয়ে দাও। পাতাকে বলছেন, বাতাস করো। গাছকে বলছেন, ছায়া লোটাও। যাকে যা নির্দেশ করছেন সে তাই করছে। রাতে তারাদের বলছেন, চলে যাওয়া প্রিয়জনের চোখ হয়ে ফুটে থাকো। চাঁদকে বলছেন, প্রেমের কিরণ ঢালো। মানুষকে বলছেন, আনন্দ, আনন্দ। আনন্দং খল্বিদং ব্রহ্ম। মানুষ এদিকে শুকিয়ে মরছে। শেকসপীয়র টু ডাই ইন প্লেন্টি।

শিবটা কী করতে চাইছে! নামের অপমান! তুই একটা জ্ঞানী মানুষ। একেবারে ঝাড়া হাত পা। তুই এই সংসারচক্রে ঘুরে মরছিস! তা হলে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে তফাত রইল কী!

'কই রে, কোথায় গেলি? শিবচন্দ্র?'

এক ডাকে শিবের সাড়া পাওয়া গেল না। কৃষ্ণ বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। বড় সুন্দর দিন। প্রমিসিং ডে। একেবারে সিজনড স্কচ হুইস্কির মতো। গোটা কতক মৌমাছি ফুলের মুখে যেন সেঁটে আছে। মধুর নেশায় ওলটপালট খাচ্ছে। সিরসিরে বাতাস বইছে। একে বলে জল রঙের দিন। ভিজে কাগজে দশ নম্বর তুলি দিয়ে হালকা করে রং ছেড়ে যাও। চমৎকার ছবি।

কৃষ্ণ নিজের মনকে বললে, 'না বাবা, আমি বেশ সুখেই আছি। আর দশ বছরের মতো র‍্যাশান মজুত। এর মধ্যেই খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। আর চাওয়ার মতো কিছু নেই। লোভ গেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা গেছে। দেহের দাবিটাবি বিশেষ কিছুই নেই। দুপুরে পেট ঠেসে যা হয় ডাল ভাত খেয়ে নিলে, রাতে আর কিছু না খেলেও চলে। আমি ভাগ্যবান। নিশ্চয় আমি ভাগ্যবান। কেবল শিবটার জন্যে আমার যত চিন্তা। আচ্ছা, সব ব্যাপারে তুই নিজেকে এত জড়াস কেন? সব কেটেকুটে বেরিয়ে আয়। রেশমের গুটি। আরে রেশম হলেও বন্ধন তো। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বসে আছিস। বোকা কোথাকার।'

শিব হঠাৎ দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'দাদা। তুমি কখন এলে?'

'তা ধর মিনিট পনেরো। আধঘণ্টাও হতে পারে।'

'ডাকোনি?'

'একবার ডেকেছি। তারপর ধপাস করে বসে পড়েছি। শোভা দেখছি। শোভা। আহা, কী সুন্দর সেজেছে দেখেছিস! পাকা সবুজের কোলে কচি সবুজ। সাদার পাশে গেরুয়া। আবার গোটা কতক প্রজাপতি উড়িয়ে দিয়েছে। বোস না বোস। কী করিস সারাদিন? অবজার্ভ নেচার।'

দীন দুঃখীর মতো শিব বসে পড়ল পাশের খালি চেয়ারে। গায়ে কোঁচার খুঁট। এক মুখ পাকা দাড়ি। এলোমেলো চুল। যেন অশৌচ চলেছে।

কৃষ্ণ আড় চোখে ভাইকে দেখে নিল।

'শোন তোকে আজ একটু জ্ঞান দোব। আমার জ্ঞানকোষে সেরটাক জ্ঞান জমেছে। পাখি দেখেছিস, পাখি?'

'দেখেছি।'

'পাখির সংসার দেখেছিস? বাসা। ডিম। তা। বাচ্চা। ডানা। যাও উড়ে যাও। আর কোনও সম্পর্ক নেই। এবার তুমি খুঁটে খাও। ঘর বাঁধো। সংসার করো। ওই পাখিই হল মানুষের আদর্শ। তুই একটা পণ্ডিত মানুষ। তোকে সংসার কাবু করবে? আর তুই কাবু হবি? বেরিয়ে আয়। গুটি কেটে বেরিয়ে আয়?'

শিব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তোকে আমি একটা বেহালা কিনে দোব।'

'বেহালা?'

'হ্যাঁ রে বেহালা। বড় রোমান্টিক বাদ্যযন্ত্র। যখনই ছড় টানবি, শুনবি কাঁদছে। এমন একটা কাঁদুনে বাজনা আর দ্বিতীয় নেই। অশ্রু দিয়ে তৈরি। প্রেমের কান্না, বিচ্ছেদের কান্না, মৃত্যুর কান্না। খুব ইচ্ছে ছিল শিখব। সুযোগ হল না। তুই শেখ। শিব তুই শেখ।'

'এই বুড়ো বয়েসে বেহালা?'

'শেখার কি বয়েস আছে রে পাগলা। আমরা আজীবন শিক্ষার্থী। শোন শিব, আমাদের জীবন কেন এত শূন্য লাগে বলতে পারিস?'

'বাঁচতে জানি না বলে।'

'আমি ধরে ফেলেছি। মরার আগে কেন মরে যাই জানিস? দেখ আমরা যখন ছাত্র ছিলুম তখন কিন্তু জীবনে এত শূন্যতা ছিল না। তখন আমাদের জীবনে একটা লক্ষ্য ছিল। শিখব। পাশ করব।

একটা জায়গায় পৌঁছোব। কে মরল, কে বাঁচল, কে গালাগাল দিল, কে আদর করল, সংসার কীভাবে চলছে এসবের কোনও তোয়াক্কাই থাকত না। বল, ঠিক কি না?'

'তা ঠিক। সেই অর্জুনের লক্ষ্যভেদ।'

'তার মানে ছাত্র হতে পারলেই আনন্দ। আয়, আবার আমরা ছাত্র হয়ে যাই। তুই বেহালা শেখ। আর আমি শিখি পাখোয়াজ। আয়, দু'জনে গুরু ধরি। দেখবি, দিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। এও তো সাধনা। ঈশ্বরের সাধনা বড় কঠিন। মন দিয়ে ছুঁতে হয়। দেহ একেবারে অকেজো। এতে তবু হাত-পা নাড়া আছে। কী, শিখবি?'

'দাদা, তোমার যত অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনা। বৃদ্ধ বয়েসে মানুষের ধৈর্য থাকে?'

'বৃদ্ধ বৃদ্ধ করবি না। বল ইয়াং ইয়াং। মনের আবার বয়েস আছে নাকি? নে লাগা। জীবনের শেষ আসর আমরা করে যাই। গোরু ভেড়া ছাগলের মতো ব্যা ব্যা, ভ্যা ভ্যা করে মরব না। মরব বীরের মতো। হেঁটে গিয়ে চিতায় উঠব। জাস্ট লাইক এ কিং। শেক হ্যান্ড করে শুয়ে পড়ব আগুনের বিছানায়। চালাও পানসি বেলঘরিয়া।'

'আমার ছেলেটাই আমাকে শেষ করে দিলে। পথে বসিয়ে দিয়েছে।'

'তুই কি তোর ছেলের রোজগারের আশা করতিস?'

'না।'

'তা হলে ছেলে ছেলে করে মরছিস কেন? সে যেমন আছে, যেখানে আছে, সেইখানেই থাক না সুখে। তার জীবন তার জীবন, তোর জীবন তোর জীবন। ক্রস করিসনি। দুটো রাস্তা সমান্তরাল চলুক। প্যারালাল রান। ইংরেজ হতে শেখ। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে। নে ওঠ।'

'কোথায় উঠব?'

'দাড়ি কামিয়ে আয়। তোর সেই বিখ্যাত সাজ, ধুতি আর বেনিয়ান পরে আয়। তোর দিকে তাকালে আমার বৈরাগ্য এসে যাচ্ছে। বেঁচে থাকারও একটা আর্ট আছে শিব। যা হোক না হোক, চালে ডালে করে বাঁচলে হয় না? নে ওঠ।'

'আমি গোঁফ দাড়ি রাখব ঠিক করেছি।'

'কেন, রাশিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল হবি।'

'বৃদ্ধ বয়েসে দাড়ি গোঁফে বেশ দেখায়।'

'প্রেম করবি?'

'কী যে বলো? সে বয়েস আছে?'

'শিব বি ফ্রাঙ্ক। সত্যি কথা বল, তোর মনে হয় না, বেশ সুন্দর স্নেহপরায়ণা একজন মহিলা সব সময় পাশে পাশে থাকলে জীবনের এই ভ্যাকুয়াম অনেকটাই কেটে যেত। মনে হয় না, তুই পাথরে মাথা ঠোকাঠুকি করছিস। শোনো বৎস, সংস্কার না থাকলে যোগী হওয়া যায় না। বড় শক্ত পথ। ভালবেসে ঈশ্বরকে পাওয়া অনেক সহজ। দেখ, আমি কুমুর সেবা করি আর রাতে স্বপ্ন দেখি। সে এমন এক জগৎ, বিউটিফুল, ওয়ান্ডারফুল, মার্ভালাস। যখন চোখ বুজিয়ে বসি, বেশ হয় বুঝলি। সুন্দর লেগে যায়। খাঁড়ি দিয়ে জল ঢোকে কুলকুল করে। ওই কুমু। আমার গুরু। আমার ইষ্ট। জীবনে একজন শক্তি চাই। এসব তোকে আমি কেমন করে বোঝাব? অনুভূতির ব্যাপার। মনটাকে বেশ কিছুটা উঁচুতে তুলে তাকা, দেখবি সব অর্থ, সব দৃশ্য পালটে গেছে। জগৎ সংসার সব কুসুম কোমল। কী অমিতাভ অমিতাভ করছিস। প্রেম কর। প্রেম। লাগা বেহালা। সুরের এক-একটা মোচড় মারবি চাঁদের চোখে জল বেরিয়ে আসবে। শেষ রাতে শিশির হয়ে ঝরে পড়বে। শিব, কবিতা লেখ। কবিতা। কী চার কাঠা জমি, দলিল দস্তাবেজ, খাজনা, বাজনা, ঝোলাঝুলি করে মরছিস। লিভ লাইক এ রোমান্টিক প্রিন্স। শোন, হিসেব করলেও মরবি, না করলেও মরবি। নে ওঠ। দাড়ি কামা।'

'তুমি হঠাৎ দাড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা? গৃহবন্দি মানুষের অত বাহার কীসের?'

'শোন শোন, মন জিনিসটা যে বাসায় বসবাস করছে, সেই বাসাটাকে একটু তকতকে রাখতে হয়। তোর যদি এতই আলস্য, আয় আমিই না হয় নামিয়ে দিই।'

'বিশ্বাস করো দাদা, আমার ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে। কী শেখালুম সারাজীবন ছেলেদের। উচ্চ আদর্শ, স্বার্থ ত্যাগ। সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল।'

'তোকে একটা জিনিস আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, সবচেয়ে কাছের মানুষ, সবচেয়ে ভালবাসার মানুষ, সবচেয়ে বড় আঘাত দিয়ে যায় জীবনে। তুই যত আহত হবি, সে তোকে তত আহত করবে। সেইটাই তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। এ যে কী জায়গা রে ভাই। খোঁচা মেরে আনন্দ। অপমান করে আনন্দ। দূরে সরে গিয়ে আনন্দ। এ এক অদ্ভুত চক্র রে ভাই। সব মানুষই অল্প বিস্তর স্যাডিস্ট। তুই একটা পড়ুয়া লোক, তোকে আমি কী জ্ঞান দোব। ডস্টয়েভস্কির সেই অদ্ভুত কথাটা মনে কর। আমি মূর্খ, তাও মুখস্থ করে রেখেছি— There is only one thing that I dread: not to be worthy of my sufferings. ভাইয়া, এসেছ যখন ভবে থাকার মাশুল দিতে হবে ॥ কত ডুববে উঠবে জীবন-তরী চঞ্চলতা এনো না কো ॥ আমার দিকে তাকা, ব্রেভ ওয়ারিয়ার। একেবারে শূন্য জীবন, তবু আমি পূর্ণ। এই ভেতর। এই ভেতরেই আমি সব সাজিয়ে রেখেছি। কেয়ারি করা সবুজ একটা মাঠ। রং বেরঙের ফুল। এক ঝাঁক গাইয়ে পাখি। শ্বেতপাথর বাঁধানো ফোয়ারা ফিনকি জল ছাড়ছে। যেই ইচ্ছে হবে চাঁদের আলো। সেখানে আমার প্রাণের সঙ্গী। দূরে দাঁড়িয়ে নিজেই দেখছি, আমি আর সে পাশাপাশি বসে আছি ফিনিক ফোটা চাঁদের আলোয়। দিকচক্রবালে ঝুলিয়ে রেখেছি এক সার নীল পাহাড়। মাথায় পরিয়েছি রুপোর তুষার মুকুট। ছোট্ট একটা পাহাড়ি নদী খেলিয়ে দিয়েছি। কান পাতলে তার শব্দ শুনতে পাই। ইচ্ছেমতো আমি বয়েস বাড়াতে কমাতে পারি। কখনও শিশু। ছুটছি ফড়িঙের পেছনে। কখনও কিশোর। কখনও যুবক। সব আমার হাতের মুঠোয়। ভাইয়া, জীবন রহস্যকে ধরে ফেল। আমি এক, আমি বহু। পঞ্চভূতের সঙ্গে আমার জীবনখেলা। আবার একটা বাণী শোনাব। বেশ লাগছে আজ বকবক করতে।'

'বেশ বলছও।'

'স্পিনোজা কী বলেছেন? Emotion/which is suffering/ ceases to be suffering as soon as we form a clear and precise picture of it. ভাবাবেগই আমাদের যন্ত্রণার কারণ; কিন্তু বাবু তার স্বরূপটি চিনে নিতে পারলে তোফা নির্মল জীবন। লাগাও। গান লাগাও। সেই রেকর্ডগুলো কোথায়।'

'নিয়ে গেছে।'

'প্লেয়ার?'

'নিয়ে গেছে।'

'যাক বাঁচা গেছে আপদ গেছে। তুই আমি আর আমাদের দাবা, এই তিনটে জিনিস থাকলেই হল। মনে আছে শিব, সেই একবার আমরা নৌকো করে বাদায় যাচ্ছিলুম। মাঝিরা রান্না করছে। আর আমরা দাবা খেলছি। আর পালে বাতাস লেগেছে, নৌকো চলেছে ছলছল করে। ঠিক সেইরকম। ভেবে দেখ, দুই বুড়ো বসে বসে দাবার চাল ভাবছি, আর আমাদের জীবন-নৌকো সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে...। ওই দেখ কে আসছে।'

'জ্ঞানেশ আসছে। মনে হয় ও মহলের খবর পেয়ে যেতে পারি।'

'এসো। জ্ঞানেশ এসো।'

জ্ঞানেশ বারান্দার নীচে চটি খুলে ওপরে উঠে এল। শিব আর কৃষ্ণকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করতে করতে জ্ঞানেশের মনে হল, ভাগ্য কত ভাল হলে জীবনে প্রণামের মানুষ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ জ্ঞানেশের মাথায় হাত রেখে বললে, 'মুক্ত হও।'

এমন আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞানেশকে কেউ কখনও করেনি। সত্যি, বন্ধন দিন দিন বড় বেড়ে যাচ্ছে। যখন যেখানে যাচ্ছে সেইখানেই জড়িয়ে পড়ছে। কোথা থেকে এক পার্বতী এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে। গত তিন দিন ধরে নানা চেষ্টা করেও নামাতে পারছে না। মনে এক ধরনের দুর্বলতাও তৈরি হয়েছে। সকলকে খুলে বলাও যায় না। জ্ঞানীর উক্তি, মন না মতিভ্রম।

শিবের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, 'কোনও খবর আছে জ্ঞানেশ? বড় দুশ্চিন্তায় কাটছে ক'টা দিন।

'আছে। মাস্টারমশাই, কিশোরকে ফোন করেছিলুম। তনুকে রিলিজ করে দিয়েছে। ভালই আছে।'

'আর, আর!' শিব ইতস্তত করছে। জানতে চায় বাচ্চার খবর। বলতে সংকোচ হচ্ছে।

কৃষ্ণ বললে, 'আর বাচ্চা। বাচ্চার খবর?'

'দু'জনেই ভাল আছে।'

'যাক বাবা।' কৃষ্ণ এক মুখ হাসি নিয়ে শিবের দিকে তাকাল। 'প্রার্থনায় এখনও কাজ হয় রে শিব। আমি সর্বক্ষণ প্রার্থনা করেছি, হে ঈশ্বর, ভাল করে দাও। দেখলি তো, তিনি শুনেছেন। নে ওঠ। উঠে পড়। দাড়িটা কামিয়ে আয়।'

'উঃ, তুমি আমায় মেরে ফেলবে। দাড়িতে তোমার অ্যালার্জি হয়েছে।'

শিব মুচকি হাসল। কৃষ্ণ বললে, 'এই তো হাসি ফুটেছে! উঃ একেই বলে মায়া। কী কলেই পড়েছ বাবা। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ কাঁদে। আমি বাবা খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। ছেলেও নেই মেয়েও নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। নে মায়া, কী করবি কর। আর কী, এবার আমার বাড়ি ফেরার সময় হল।'

'এরই মধ্যে চলে যাবে। বোসো। চা খাও।'

'দূর গবেট। এ বাড়ি সে বাড়ি নয়। একটু কাব্য করলুম। কবিতা বুঝিস না। ইংরেজিতে বললে ঠিকই বুঝতিস, ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান।'

জ্ঞানেশ কিছু একটা বলার জন্যে উসখুস করছিল। কৃষ্ণ বললে, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। মাস্টারমশাই, পার্বতীকে কি আপনি রাখবেন?'

শিব মনে করতে পারছে না, কে পার্বতী, হঠাৎ মনে পড়ল, 'অ, সেই মেয়েটি। নাঃ, আর আমি ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাই না। আমার দাদার উপদেশ, মুক্ত হ, মুক্ত। তা ছাড়া আমার মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই বাবা। এখন আমাকে খুব টেনে চালাতে হবে। এই একা আছি বেশ আছি। একবেলা ভাতেভাত। আর একবেলা মুক্ত বাতাস। এখনও উঠতে হাঁটতে পারি, ভয় কী!'

কৃষ্ণ বললে, 'তোর ভয় নেই। তোকে আমি একটা বই দোব, সহজ রন্ধন পদ্ধতি। পড়বি আর রাঁধবি আর হাপুস হুপুস খাবি। মেয়েরা রান্নাকে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। গুছিয়ে করতে পারলে ভেরি ইজি। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ এবিসি।'

'আমি তা হলে আসি।' পায়ে চটি গলাতে গলাতে জ্ঞানেশ বললে। প্রায় গেটের কাছে চলে গেছে। শিব ডাকলে, 'শোনো। পেছু ডাকলুম কিছু মনে কোরো না।'

জ্ঞানেশ ফিরে এল। শিব একটু ইতস্তত করে বললে, 'তোমার সঙ্গে অমিতাভর দেখা হলে বোলো, আমি একা বেশ ভালই আছি। তোফা আছি। আমাকে অনর্থক বিরক্ত করার জন্যে ওরা যেন না আসে। মনে করুক, আমি নেই। মারাই গেছি।'

জ্ঞানেশ বিমর্ষ মুখে বললে, 'আমার সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। মাস্টারমশাই, আপনি বরং চিঠি লিখে জানিয়ে দিন।'

'ঠিকানা?'

'ঠিকানা আমি এনে দোব।'

'বেশ তাই দিয়ো।'

জ্ঞানেশ চলে যেতেই কৃষ্ণ বললে, 'তুই ও কথা বললি কেন বোকার মতো। এর মানে তুই মোটেই সুখে নেই। খেলতে বসে বিপক্ষকে হাতের তাস কখনও দেখাবি না। খেলে যাবি নীরবে হিসেব করে। শেষ দানে জয়-পরাজয়ের বিচার।'

হঠাৎ গেটের সামনে হলুদ-রঙের একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণ সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'কার আগমন।'

দরজা খুলে নেমে এল ক্ষিপ্র এক মহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা বব চুল। সাধারণ বাঙালি মহিলার চেয়ে হাতখানেক বেশি লম্বা। প্রৌঢ়া কিন্তু অসম্ভব চনমনে শরীর। পরনে সিল্কের শাড়ি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ধারালো মুখ। বেশ ফরসা। চেহারায় আভিজাত্য। ড্রাইভার পেছনের বুট খুলে সুটকেস নামাচ্ছে। মহিলা হাতব্যাগ খুলে নোট ভরছেন।

শিব বললে, 'আরে কী আশ্চর্য! এ তো তনুর মা। মেঘ না চাইতেই জল।'

শিব কথা শেষ করে গেটের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন ধরেই শিব ভাবছিল তনুর মাকে একটা চিঠি লিখবে। এ যেন টেলিপ্যাথি হয়ে গেল। শিবের মন প্রথমটায় খুব নেচে উঠেছিল। এক ধরনের আনন্দ। নিজেকে তিরস্কার করে সামলে নিল।

ড্রাইভার সুটকেস হাতে ভেতরে আসছে। শিব হাসছে। হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারছে না। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'আসুন, আসুন' বলতে পারে কিন্তু পারছে না। ছেলেমানুষি লজ্জা, আনন্দ, ভীষণ ভাললাগা, সব মিলেমিশে প্রায় বোবা। ভদ্রমহিলার ঋজু ব্যক্তিত্ব তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। শিব চিরকালই ধীর-স্থির, ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ।

অবশেষে অনেক চেষ্টায় বললে, 'রাখুন, ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

তনুর মা ভেতরে আসতে আসতে বললে, 'সমস্যা মিটে গেছে। এক টাকার নোট আজকাল সহজে পাওয়া যায় না। কী যে হয়েছে! কেমন আছেন আপনি?'

শিব কেমন আছে, একথা বহুদিন কেউ জিজ্ঞেস করেনি। একটু থতমত খেয়ে বললে, 'ভালই আছি।'

মহিলা শিবের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললে, 'সেরকম তো মনে হচ্ছে না। পায়ে ব্যান্ডেজ কেন?'

'ব্যান্ডেজ? ও হ্যাঁ ব্যান্ডেজ। কাচে কেটে গেছে। আপনি কেমন আছেন? ভাল তো?'

'ধরে নিন ভালই আছি।'

বারান্দায় উঠে এসে মহিলা কৃষ্ণর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'দাদা না! কত দিন পরে দেখা হল! আপনি ঠিক সেইরকমই আছেন। কোনও পরিবর্তন হয়নি। এভার ইয়াং। এভার ব্রাইট।'

মহিলা চাকা-লাগানো সুটকেস হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভেতরের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। কৃষ্ণ বললে, 'তনু কিন্তু নেই। এখানে আর থাকে না।'

মহিলা বললে, 'জানি।'

কৃষ্ণ ফিসফিস করে শিবকে বললে, 'তখন থেকে বলছি, দাড়িটা কামা। দাড়িটা কামা। দাড়ি না কামালে বিশ্রী অসুস্থ অসুস্থ, অশৌচ অশৌচ দেখায়।'

শিব হেসে বললে, 'এই বয়েসে আবার বিশ্রী সুন্দর! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। তুমি বোসো। আমি দেখি, ওনার কী চাই না চাই।'

'আমি উঠি এখন। তুই যে কী করবি, আমার মাথায় আসছে না। চা, জলখাবার, দুপুরে রান্না। বউগুলো সব পটাপট মরে গিয়ে এমন বিপদে ফেলে যায়! একটু চিন্তাভাবনা করে না। ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না। মরেই যদি যাবি, তো হাত ধরে সংসার করতে নামিয়েছিলে কেন? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে নেমে এল বাগানে। 'আরে ব্যাটা। রঙ্গনের ডালে এ কী কাণ্ড! মৌচাক। আস্ত একটা মৌচাক। মাই গুডনেস। শিবটার কী বরাত! এমন একটা দুর্লভ জিনিস পেয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাকটা আরও বড় হবে। চারপাশে মধু জড়ানো মাছি বিনবিন করছে। এক-একটা চাক ছেড়ে পোঁ করে উড়ে যাচ্ছে। এক একটা পোঁ করে উড়ে এসে চাকে লেগে যাচ্ছে।

'কী মজা রে ভাই! একবার হাত দোব!'

কৃষ্ণ এপাশে ওপাশে ফিরে তাকাল। কেউ কি দেখছে! না, এই সামান্য অপরাধের কেউ সাক্ষী থাকবে না। বাগানের কোণে শুকনো পাতার গাদায় সাদা একটা বেড়াল মজাসে ঘুমোচ্ছে। 'বেশ আছে সব। মনের আনন্দে। যত যন্ত্রণা, ঈশ্বর সব ঠেলে দিয়েছেন মানুষের দিকে! একটু বুদ্ধি যোগ করে, কী বিপদেই না ফেলেছ ভগবান!'

কৃষ্ণ উদাস হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল গেটের দিকে। 'বুদ্ধি দিয়েছ বেশ করেছ। একটু চৈতন্য দিতে কী হয়? ধন দৌলত মানুষের হাতে। সে তো মানুষে মানুষে দেনা-পাওনা। কিন্তু চৈতন্য তো তোমার হাতে! তুমি বাবা মায়ের বাড়া। এক চিলতে আচার দিলে, তারপর এমন হাত গুটিয়ে নিলে! সারা দুপুর ঘ্যানঘ্যান করেও হাত গলে আর বেরুল না। শেষে চড়চাপড়। মায়ের খেলা বোঝা ভার!'

কৃষ্ণ রাস্তায়। লোকে এখনও অবাক হয়ে তাকায়। উপযুক্ত পোশাক পরিয়ে দিলে রাজা। চলনে কী আভিজাত্য! আজ তিন-চার দিন হল কৃষ্ণর মনে একটা গানের লাইন ঘুরপাক খাচ্ছে: মন্দিরে তোর নাই কো মাধব ॥ শাঁক ফুঁকে গোল করলি পোদো ॥ সেইটাই গুনগুন করতে করতে চলেছে। কোনও দিকে দৃকপাত নেই।

তনুর মা চাকা-লাগানো সুটকেসটাকে মেঝেতে উলটে ফেলে তালা খুলতে খুলতে বললে, 'খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না?'

শিব বললে, 'কেন?'

'হঠাৎ চলে এলুম। বিনা নোটিশে।'

'তা কেন? আপনার আসা আমার কাছে আশার আলো। মনে ঝড় বইছে। আপনি এলেন, এবার হয়তো একটু শান্ত হবে।'

'আপনি মনে মনে আমাকে স্মরণ করছেন, আমি সে সংকেত পেয়েছি। ভেতরের তার বেজেছে। অমিতাভ আমাকে চিঠি দিয়েছে। যাক সেসব কথা পরে হবে। আগে আমি চান করে আসি। এ দেশের ট্রেন-জার্নি ক্রমশ এত কুৎসিত হয়ে উঠছে! দেশ এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে। ওভার-পপুলেশান, ইনডিসিপ্লিন, ম্যাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেশান। নাঃ, এদেশে আর বসবাস করা যাবে না।'

কথা বলতে বলতে সুটকেস থেকে একে একে প্রয়োজনীয় জিনিস বের করছে। টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান, তোয়ালে, জিভছোলা।

শিব বললে, 'সবই তো ছিল এখানে। শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়েছেন!'

মহিলা শুনতে পেল না। আগের প্রসঙ্গই মাথায় ঘুরছে, 'সর্বস্তরে দুর্নীতি। করাপশানে শেষ করে দিলে। যাদের ওপর শাসনের দায়িত্ব তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ডেমোক্রেসি একটা ফার্স।

একজন বেনিভোলেন্ট ডিক্টেটার চাই। উঠতে বসতে চাবকাও। ওই মহামানব আসে। আসে আসে করে আর কতকাল অপেক্ষা করা যায়! যাক গে। যা হচ্ছে হোক। কেটে এসেছে, কী বলেন? আর কদিনই বা বাঁচব? আমায় আবার এক জ্যোতিষী বলেছেন, দীর্ঘ আয়ু। সেঞ্চুরিও করে ফেলতে পারি। কী সর্বনাশ?'

সুটকেসের ডালা খোলাই রইল। তনুর মা চানঘরে ঢুকে গেল। ডালা-খোলা সুটকেসের দিকে তাকিয়ে শিব বসে রইল কিছুক্ষণ। সোনার হাতঘড়ি মিটমিট করছে। সোনালি চশমা। সুটকেসের ভেতর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠছে।

জীবন-ক্লান্ত শিব। সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কোথাও কখনও থেবড়ে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। নাঃ, বসে থাকলে চলবে না। উঠতে হবে। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত। চা, কিছু খাবার। কী দেওয়া যায় মহিলাকে!

শিব উঠে পড়ল। আচ্ছা, দেবী তো অনেক দিন আসেনি। তোতাও আর আসে না। কী হল কী? অসাবধানে কিছু কি বলে ফেলেছে? বয়েস হলে মানুষের যা হয়! যাক গে, কিছুই আর এখন মনে পড়ছে না। যে আসে আসবে। যে আসবে না, আসবে না।

হঠাৎ চানঘরের দরজা খুলে গেল। তনুর মা গলা বের করে বললে, 'আপনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না। আমি আসছি।'

শিব অবাক হয়ে চানঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। কী আশ্চর্য! শিবের ভাবনা মহিলা কীভাবে পড়ে ফেলল! শিব দেয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। জীবনে দু'জন মহিলা। পুত্রবধূর কথা ধরছে না। দুজনে দু'রকম। স্ত্রী সুধার তেমন ব্যক্তিত্ব ছিল না। মাটির তাল। যেমন আকৃতি দেবে। এমন প্রখরা ছিল না সুধা। তনুর মা দীর্ঘাঙ্গী, ধারালো। অন্যের ওপর অতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শিব রান্নাঘরে ঢুকে গেল। বড় এলোমেলো হয়ে আছে। চানঘরে কুলকুল করে জল বয়ে যাবার শব্দ হচ্ছে।

এন. এইচ. থার্টিফোর ধরে ছোট্ট একটা গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। মরিস এইট। এই ধরনের গাড়ি আজকাল তেমন দেখা যায় না। চালক বড় ক্লান্ত। কপালে ঝুলে এসেছে এলোমেলো চুল। বাতাসে এপাশ ওপাশ করছে। জলো হাতঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা এগারোটা। বিকেলের মধ্যেই শিলিগুড়ি পৌঁছে যাবে। সেখানে শর্মার গ্যারেজে গাড়ি রেখে যে-কোনও একটা হোটেলে উঠবে।

পাঁচ কিলোমিটার যাবার পরই জলোর প্ল্যান বদলে গেল। শর্মার গ্যারেজে গাড়ি রাখবে না। সে যে শিলিগুড়ি এসেছে কারু না জানাই ভাল। বরং আর একটু কষ্ট করে সোজা দার্জিলিং চলে যাবে। সেখানেই কোনও অখ্যাত হোটেলে উঠবে। তিনজন লোকের সঙ্গে তার বোঝাপড়া ছিল। একজন পরেশ সাহা। তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ। আসার দিন রাতে সাহার গুদামে বেশ জমিয়ে আগুন ধরিয়ে এসেছে। মাখোমাখো করে। চোরাই টায়ার আর তেল। সব শেষ। ইনশিয়োর করা ছিল না। সাহাকে আবার উঠতে হলে অনেক স্টিম চাই। তার আগে কেস সামলাক। জলোর কাঁধে পা রেখে টঙে উঠেছিল। তারপর জলোকেই ফিনিশ করার তালে ছিল। সাধারণ মানুষ জানে না। তলে তলে মাফিয়া রাজত্ব দেশ ছেয়ে ফেলেছে। মানুষ কাটা আজকাল পাউরুটি কাটার মতো। ধরো আর ছুরি চালাও। পরেশচন্দ্র সাহা। এম. এ পাশ নাচিয়ে মেয়ে বিয়ে করেছে। এইবার নাচ দেখো পরেশচন্দ্র। জলোকে ছেড়ে ভোলাকে ধরেছিলে! এইবার ভোলেবাবা তোমাকে পার লাগাবে!

সুনীত বোস, তুমি দার্জিলিঙে কমলালেবুর রস খাচ্ছ। খাও। কিন্তু মানুষ অমর নয়! কিছু কিছু দেনাপাওনা থাকে, জীবন দিয়ে শোধ করতে হয়। প্রতিশোধ সঙ্গে সঙ্গে নিতে নেই। প্রথমে শত্রুকে আলগা দিতে হয়। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর। যখন সে প্রায় ভুলেই গেছে, হাসছে, খেলছে,

খাচ্ছে-দাচ্ছে, দেহসুখ ভোগ করছে, ঠিক সেই সময় অদৃশ্য গর্ত থেকে নিয়তির মতো বেরিয়ে আসবে কেউটে। একেবারে শিরে ছোবল! সুনীত বোস, কার যে কখন দিন শেষ হয়!

জলো একটা সিগারেট ধরাল। উপন্যাসের যেমন অধ্যায় থাকে, এক একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে আর একটা শুরু হয়, জীবনও তাই। অতীতটাকে টেনে এনে বর্তমানের কোনও একটা জায়গায় খতম করে দিতে হয়। আবার সময় চলতে থাকে অতীতের দিকে। হাইওয়ের সামনে আছে, পেছন আছে। সময়ের পথের সামনেটাই আছে। পেছনটা পড়ে আছে অতল খাদে।

জলো অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিল। গাড়ির গতি বাড়ল। বাঃ রে বাঘের বাচ্চা! যন্ত্রকে যত্ন করলে সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যন্ত্র তো মানুষ নয়! হঠাৎ দাদা-বউদির কথা মনে পড়ছে। ধাপ্পা দিয়ে পালিয়ে এসেছে। উপায় ছিল না। অতীতটাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে না পারলে নতুন ভাগ্য তৈরি করা যায় না। শিব-মাস্টারমশাই ক্লাসে পড়াতে পড়াতে প্রায়ই বলতেন, বেরি দি পাস্ট। অতীতটাকে কবরে পাঠাবার কফিন চাই। তিনটে মানুষ সেই কফিন। তিনটে মানুষকে সরাতে পারলেই অতীত মুছে যাবে। যেমন বলে না, রাতটা পার করে দিতে পারলেই ভোর হয়ে যাবে!

সিগারেটে শেষ টান মেরে জলো ছুড়ে ফেলে দিল। রোদের আঁচলে প্রকৃতি কাঁপছে। প্রাণহীন, নির্দয় পিচের রাস্তা মাইলের পর মাইল খুলেই চলেছে। কড়া সবুজপাতা রোদে ক্লান্ত হয়ে অধোমুখ। মাইলের পর মাইল ফাঁকা জমি। কখনও কখনও জঙ্গল আসছে আর ছুটতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছে। হঠাৎ বাঁপাশে একটা সুন্দর শীতল দিঘি ভেসে উঠল। ভাঙা পাঁচিল। অতীত সৌধের জীর্ণ কঙ্কাল হাহা করছে। একটা-দুটো চুনবালি খসা পিলার অনমনীয় চরিত্রের বিশাল মানুষের মতো শূন্যতায় সঙ্গীহীন।

বেশ ছায়াছায়া মনোরম। জলো রাস্তার একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি থামাল। দিঘি আর ভাঙা ঘাট বড় টানছে। সুন্দর এক অতীত যেন বসে আছে ওখানে উদাস শিশুর মতো। জলে ছোট ছোট যে তরঙ্গ খেলছে তা যেন ওই শিশুটির ছোড়া ছোট ছোট ঢিলের আঘাতে। একটা পাখি কোনও ঘুপচিতে বসে আপনমনে মন-কেমন করানো শিস দিয়ে চলেছে এক টানা।

জলো দিঘির ভাঙা ঘাটে ছায়া দেখে বসল। স্থির জলে গাছের ছায়া নেমেছে স্নানে। চারপাশে যেন অতীতের নেশা ঝিমঝিম করছে। কতকাল আগে, কাদের বসবাস ছিল এখানে! ইতিহাসে তো সাধারণ মানুষের স্থান থাকে না। থাকলে জানা যেত। নদীর মতো জনপদ কেন সরে গেল এখান থেকে? বাড়িটা বেশ বড়ই ছিল। যাঁরা বাস করতেন তাঁদের বিত্ত, প্রতিপত্তি অবশ্যই ছিল। তারপর যা হয়। বুদবুদ ফেটে যায়।

আলো, ছায়া, ছায়া, আলো। দিন শেষের খেলা চলেছে চারপাশে। ছোট্ট একটা ঢিল তুলে জলের দিকে ছুড়ে দিল। তরঙ্গের বৃত্ত ঘুরে ঘুরে পারের দিকে চলেছে। মাথার ওপর অচেনা আকাশ। মন বসে না। ফিরে ফিরে আসে।

হঠাৎ বউদির কথা মনে পড়ছে। সে এখন কী করছে? দাদা কি আজ অফিসে গেছে? দাদা অফিসে গেলে বউদি একা আছে। পোড়ো বাড়িতে হলুদ একটা শাড়ি পরে এঘর ওঘর করছে। আর তা না হলে শুয়ে আছে। বউদির মন নিশ্চয়ই খুব খারাপ। কী আশ্চর্য ব্যাপার! এই এত বড় পৃথিবী, এত যেখানে আকর্ষণ, সেইখানে, এই একটা বিন্দুর মতো মানুষ বসে আছে দিঘির পারে, আর বহু দূরে বিন্দুর মতো আর একটা মানুষ বসে আছে পোড়ো বাড়ির একটা ঘরে। ভাবের সুতোয় বাঁধা। এইটাই তাদের জগৎ। বাইরেটা অচেনা। কোন ঘুড়ি কার হাতের সুতোয় উড়ছে জানা নেই। অচেনা আকাশে হারিয়ে না যাবার এই তো বাঁধন! জলোর মনে হল সুতো ধরে একবার টান মারে! বউদি নড়ে উঠুক। জানা জগতে এমন কোনও কাঁচি নেই, যা দিয়ে এই বাঁধন কাটা যায়!

জলো জলের কিনারায় নেমে গেল। ইচ্ছে, মুখে চোখে একটু জলের ঝাপট মারবে। অস্ফুটে মন্ত্র উচ্চারণের মতো সিপসিপ শব্দ হচ্ছে। ছোট ছোট গেঁড়ি আর গুগলি শুয়ে আছে শীতল আরামে।

জলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব। সেই দিকে তাকিয়ে আরও মন কেমন করে উঠল। বউদিকে ছেড়ে একা এই পৃথিবীতে থাকবে কী করে! দিন যদিও কাটে, রাতে হু হু করে ভেতরটা। জোরে আগুন জ্বললে যেরকম শব্দ হয় সেইরকম শব্দ হয় ভেতরে।

'বড় দুর্বল আমি। আমার দ্বারা বড় কিছু হবে না। উঠোনের পাশে সাঁঝবেলার কৃষ্ণকলি, নয়নতারা। লতানে লাউগাছে পাতার ক্ষীর-ক্ষীর গন্ধ। তারা-ফোটা আকাশ। আমার বউদি, আমার দাদা, ছোট ছোট আনন্দ। দুঃখ সুখ। এই আমার জগৎ। এইখানে এসেছি। এইখান থেকেই চলে যেতে চাই। এইসব গেঁড়ি আর গুগলির শীতল শান্তি, জলে-ঘেরা ছোট্ট পরিসর, ফিসফিস কথা, পাশফেরা আপনমনে। আর কিছু কেন চাই?'

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে কলকাতামুখো হবার ইচ্ছে হল জলোর। দিঘির বাতাসে গরম আর ঠান্ডার আমেজ। ঘুম নামছে চোখে। জলোর চোখে জল এসে গেল।

তেড়ে উঠে পড়ল। নিয়তি কাজ করছে। যে পথে যেতে চায় যেতে পারে না। যে পথে ফিরতে চায় ফেরা যায় না। গলায় দড়ি বাঁধা পশু। অদৃশ্য হাত টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যায়।

জলোর মরিস এইট আবার ছুটতে শুরু করল। উত্তরমুখো। সূর্যাস্তের আকাশ আগুনে লাল।

॥ বত্রিশ ॥

শিবের বাড়ির পেছনের বারান্দা। পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের শেষ লাল সংকেত। গাছের পাতা যেন অসংখ্য কালো কালো টিপ। ঝিরিঝিরি কাঁপছে। সেন্টার টেবিলে সুদৃশ্য পটে ভিজছে সুগন্ধী দার্জিলিং চা। তনুর মা সুপ্রভা আর শিব মুখোমুখি।

খাটো ফুরফুরে চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সুপ্রভা মাপা একটা হাই তুলল।

'খুব ঘুমিয়েছি। ডিপ স্লিপ। বেশ ঝরঝরে লাগছে।'

চিনির পটে চামচে গুঁজতে গুঁজতে সুপ্রভা বললে, 'ক' চামচে?'

'দু'চামচে দিন।'

পটের ঢাকনা খুলে চামচে গোলাতেই হালকা মিষ্টি চায়ের গন্ধ ভুরভুর করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শিবের মনে পড়ে গেল অতীতের কথা। যেন শীতে সপরিবারে বেড়াতে গেছে সাঁওতাল পরগনা। হলুদ রঙের একটা ভিলা। পেছনের বারান্দা। সামনে বাগান। গোলাপের জলসা। শিব, কৃষ্ণ, সুধা, কুমকুম। অমিতাভ সবে হামা দিতে শিখেছে। বউদির তখন সুস্থ অবস্থা। দূরে ত্রিকূট ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিপিন মালি বাগানের বেদিতে বসে লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করছে। ইঁদারায় বিপিনের বউ জল তুলছে বাবুদের জন্যে। লাটাখাম্বা কাঁদছে। পাহাড়ের দিক থেকে শীত আসছে হিলহিল করে। এসব তো মিথ্যে নয়। হয়েছিল একদিন। সুখের নাটকের একটি দৃশ্য। চলমান ক্যামেরায় ধরা থাকলে আজও পরদার বুকে সচল শব্দময় ছায়া দেখা যেত।

'নিন, চা খান। কী ভাবছেন অত।'

'না, কিছু না। অমিত কী লিখেছে চিঠিতে!'

'লিখেছে, আপনার মেয়ে সন্তানসম্ভবা। এখানে এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমি অফিসের কাজে ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না।'

'যাচ্ছে কোথায়?'

'সুইডেন। আমি তো কিছুই জানি না। এখান থেকে চলে গেছে। নতুন অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছে। তনুর ছেলেমেয়ে হবে। কিছুই জানি না। ওদের ওখানে যাবার আগে সোজা আপনার কাছে। মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে আয়া হয়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি তনুকে নিয়ে যাব আমার

ওখানে। পুনেতে। অসম্ভব ভাল জায়গা। ভাল হাসপাতাল। ভাল ডাক্তার। আপনার সমর্থন আছে তো?

'আমার সমর্থন? আমি একটু সরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওদের ব্যাপারে আমার কোনও মতামত নেই। আপনি এসে গেছেন। যা ভাল বুঝবেন, যাতে ভাল হয় তাই করবেন।'

'তনু কি আপনার অসম্মানজনক কিছু করেছে?'

'তনুর কোনও তুলনা হয় না। সে যে আপনার মেয়ে। গোলমাল আমার ছেলেটিকে নিয়ে। লেস সেড দি বেটার। আপনি অন্য প্রসঙ্গ করুন। ছেলে বড় হয়ে গেলে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বন্ধন এইভাবেই ছিঁড়ে যায়। পৃথিবীর নিয়ম। উলটোটা ব্যতিক্রম।

'আমি তনুকে নিয়েই যাব। পাঁচ-সাত বছর একভাবে পড়ে আছে।'

'আপনি কবে যাবেন ওখানে?'

'ভাবছি কাল সকালে যাব। এমন সময়ে যাব, যে সময় অমিতাভ বেরিয়ে যাবে। তনুর সঙ্গে আগে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আমি আপনাকেও নিয়ে যাব।'

'আমাকে? না, না, আমাকে আর জড়াবেন না। পৃথিবীটা বিশেষ সুবিধের জায়গা নয়। এত ঘোর-প্যাঁচ। আমার আর ভাল লাগে না।

'মানুষ নিয়েই পৃথিবী। আমরাও সেই মানুষের মধ্যেই পড়ি। আমরা আমাদের মতো চলব। কে কী বললে, কে কী ভাবলে, বয়েই গেল।'

'নিজের ছেলেকেই সবচেয়ে বড় ভয়। বড় বিশ্রী মন নিয়ে এসেছে।'

'তার মানে!'

'আপনি অন্য প্রসঙ্গ করুন। পরচর্চা হয়ে যাচ্ছে।' কৃষ্ণর গলা শোনা গেল, 'কই রে, কোথায় সব গেলি? সাড়া শব্দ নেই।'

'পেছনের বারান্দায় চলে এসো দাদা। চা খাবে এসো।'

'আমার চা করেছিস? আমার কথা তোর মনে আছে?'

'তুমি ঘড়িটা দেখো। আমার চা তৈরি আর তোমার আসা যেন অঙ্কের মিল।' সুপ্রভা উঠে দাঁড়িয়ে, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'বসুন দাদা। বসুন।'

'তুমি তো একেবারে আলো করে আছ! তোমার পাশটিতে বসি। যদি একটু আলোকিত হওয়া যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে।'

'কী যে বলেন দাদা! ক'চামচে?'

'কী ক'চামচে?'

'চায়ের চিনি?'

'চামচে দুই দাও। দুধ দিয়ো না।'

শিব বললে, 'দুপুরে খুব ঘুমোলে?'

'আরে না রে, বেশ শুয়ে আছি। মিঠে ঘুম আসছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের গলা, কই ছবিদাদু, তুমি আমায় ছবি এঁকে দিলে না? ধড়মড় করে উঠে বসলুম। কেউ কোথাও নেই। কুমু খিলখিল হাসছে। আশ্চর্য ব্যাপার! কুমুই যদি বলে থাকে, জানল কী করে, তোতা আমায় ছবি আঁকতে বলেছিল। পৃথিবীর গোপন রহস্যে একবার যদি ঢুকতে পারতুম রে শিব। কী যে কোথায় হয়ে আছে!'

'আবার শুয়ে পড়লে?'

'পাগল! বহু দিন পরে রং তুলি নিয়ে বসলুম। বসলে কী হবে, কুমুর বায়না শুরু হল। আমাকে গান শোনাও। নাম গান করো। সারাটা দুপুর হরেকৃষ্ণ, হরেরাম করে কেটে গেল।'

সুপ্রভা বললে, 'বাঃ। বেশ ভালই কাটল তা হলে।'

'তোমরা কী করলে?'

'আমি খুব ঘুমোলুম, আর বেয়াইমশাই লেখাপড়া করে কাটিয়ে দিলেন।'

'বাঃ। তাই এত ফ্রেশ দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'আপনারা গল্প করুন, আমি একটু জলখাবার তৈরি করি।'

'কী করবে?'

'ভাবছি পাকোড়া করব।'

'একেবারে, একেবারে সঠিক পড়ে ফেলেছ আমার মনের ইচ্ছে। চল শিব আমরা তা হলে বসি একটু। দাবা তা না হলে রাগ করবে।'

'চলো। হয়ে যাক এক দান।'

অন্ধকার নেমে গেছে। জলোর মরিস-এইট শিলিগুড়ি ঢুকল। অসম্ভব জ্যাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাড়ি এগোচ্ছে। শিলিগুড়িতে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে সোজা পাহাড়। শিলিগুড়িতে পড়ে থেকে লাভ নেই। শর্মার সঙ্গে দেখা করেও লাভ নেই। ব্যাটা স্মাগলার।

স্টিয়ারিং-এ জলোর হাত খেলে ভাল। পাশ কাটিয়ে পাশ কাটিয়ে ব্রিজের প্রায় শেষে এসে গেছে। আর একটু এগোলেই জট ছেড়ে যাবে। রাতটা এখানের কোনও হোটেলে কাটালেও হয়। এই গাড়ি নিয়ে রাতে পাহাড়ে ওঠা যাবে কি? ফগলাইট নেই। হ্যান্ডব্রেক নেই।

জলো প্রাচী হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল। গরম একটু নরম হয়েছে। চোখ বুজিয়ে ভবিষ্যৎটা একবার ভেবে নিল। ভবিষ্যতের বদলে ভেসে উঠল কলকাতার বাড়ি। উঠোন। দালান। বউদি। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেলল। বউদির চেহারা সামনে এলেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ সময় দুর্বল হওয়া চলবে না। চরম অমানুষ হয়ে তারপর মানুষ হতে হবে। জলোর শেষ খেলা। দুটো শয়তানকে শেষ করে ছুটি।

'বাবুকে দোতলার তেরো নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।'

'তেরো?'

'কেন, আনলাকি থার্টিন বলে ভয় পাচ্ছেন?'

'অনেকটাই তাই। ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছি।'

'তা হলে তিনতলার সাতাশে নিয়ে যাও।'

'বাঃ চমৎকার ঘর। দক্ষিণাও কম নয়।' জানলার সব পরদা টেনে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে। এখন একটু আকাশ চাই।

'চা, কফি কিছু চাই?'

'চা আনো। গরম পাকোড়া পাওয়া যাবে?'

'যাবে।'

'নিয়ে এসো।'

কৃষ্ণ পাকোড়ায় কামড় মেরে বললে, 'উত্তম, অতি উত্তম। সুপ্রভা, তোমার হাতটি একেবারে শিল্পীর হাত। হ্যাঁগা নাম ধরে ডাকলুম বলে অসন্তুষ্ট হওনি তো।'

'আমি তো আপনাকে দাদাই বলি।'

'আর বুঝলে কিনা, আপন করে নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালই যে লাগে। একা একা বাঁচা যায়! বলো? আমরা তো বড়লোক নই গো, যে অহংকার নিয়ে টঙে উঠে গুম মেরে বসে থাকব! শিবের ঝাল লেগেছে। লঙ্কা চিবিয়েছিস?'

'মনে হচ্ছে।'

'খা খা ঝাল খা। বুদ্ধি খুলবে। দেখিস চাল এলোমেলো করিসনি। জীবনের চালে আমরা অনেক ভুল করে বসে আছি। দাবার চালে ভুল করিসনি। হ্যাগো, তোমার কই? আমরা দু'জনেই তো সব সাবড়ে দিলুম। আর এক রাউন্ড চা খাওয়াবে তো?'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা শিব, কুমু শেষ রান্না কত বছর আগে করেছে? সেই আমরা সব একসঙ্গে বসে খেলুম।'

'তা ধরো, দশ-বারো বছর তো হবেই।'

'পাগলামির লক্ষণটা কী ছিল বল তো? যাক গে ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। জীবন যখন যে ভোগ সামনে এগিয়ে দেবে হাসিমুখে গ্রহণ করো। কী বলো সুপ্রভা! তুমি তো জ্ঞানী। সাধিকা। সদগুরু আশ্রিতা।'

'লজ্জা দেবেন না।'

'আরে না না, আমার কাছে তোমার লজ্জা কীসের! ভীষণ একটা ইচ্ছে হচ্ছে। তোমরা কিছু মনে করবে?'

'বলুন না!'

'আমাকে তুমি অনেক দিয়েছ। অঢেল দিয়েছ। খান চারেক চট করে কুমুকে খাইয়ে আসব! একসময় এইসব ভাজাভুজি খেতে ভীষণ ভালবাসত। এখন কে-ই বা করে দেয়!'

'ওগুলো আপনি খান। আমার ওখানে আরও আছে। দাদা আমি নিয়ে যাব। আপনি বসুন না।'

'তুমি পারবে না গো! এমন আদুরি, একটু একটু করে আমি খাইয়ে না দিলে সব ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে। এখন ও যেন আমার মেয়ে। পাগলি মেয়ে। শিব, চাল এলোমেলো করবি না। আমি আসছি। এখুনি এসে যাব বুঝলি!'

'ওগুলো আপনি খেয়ে নিন। আমি গরম ভেজে আনছি।'

'আমার জন্যে গোটা চারেক রাখো। এসে খাব। অতি উত্তম হয়েছে। পুরস্কার একটা ছবি।' বয়েসের তুলনায় কৃষ্ণ অনেক সক্ষম। ছ'ফুট লম্বা মানুষটা খাড়া হেঁটে চলে গেল। শিব বললে, 'এমন ভালবাসা দেখা যায় না। আমি অন্তত দেখিনি।'

'শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। উনি ফিরে এলে চা চাপাব, কেমন। আপনি বসুন। আমি গোটা কয়েক কাজ সেরে আসি।'

'নিশ্চয় রান্না!'

'আমার রাঁধতে আর খাওয়াতে ভীষণ ভাল লাগে।'

'আপনার মানসিকতার মানুষ ক্রমশ কমে আসছে।'

'তা হয়তো আসছে। তবে মানুষের মধ্যে অন্য সব নতুন নতুন গুণও ফুটছে। দৈহিক ক্রমবিবর্তন তো আর সম্ভব নয়, এখন যা হবে সব মানসিক। বসুন আপনি। আমি আসছি।'

সামনে দাবার ছক। সাদা কালো ঘুঁটি, মুখোমুখি। বিবদমান। প্লেটে গোটা দুই পাকোড়া। শিব হাসছে। মেঘলা ভবিষ্যতে হঠাৎ একদিনের রোদ উঠেছে ঝলমলে। যা আসে! যেভাবে আসে। দয়ার দান। প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে থাকার বয়েস চলে গেছে। চলুক, এইভাবেই চলুক।

কৃষ্ণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকলে, 'কই গো, কুমুরানি! লুকোলে কোথায়!'

দরজার পাশে লুকিয়ে ছিল কুমু। খিলখিল হেসে বেরিয়ে এল। এই হাসি শুনলে কৃষ্ণর কেমন যেন ভয় লাগে। নিয়তির হাসির মতো।

'ওরে দুষ্টু মেয়ে। নাও, বোসো এই চেয়ারে।' কৃষ্ণ কুমুকে চেয়ারে চেপে বসিয়ে দিল। 'খাবে নাকি? তোমার প্রিয় জিনিস? গন্ধ পাচ্ছ?' কৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই সব কথা বলে। বুঝুক আর না

বুঝুক। কিছু তো বোঝেই। মানুষ কেন কীভাবে পাগল হয়! পাগল হলে মনটা কোথায় যায়! হয়তো গবেষণা হয়েছে, আরও হবে, কৃষ্ণর কিছুই জানা নেই।

'নাও, হাঁ করো।' কুমুর মুখে আধখানা পাকোড়া ভরে দিল।

'কেমন লাগছে গো?'

কুমু পাখির ছানার মতো হাঁ করল। পাগলদের বয়স বাড়ে না। বরং কমতে থাকে। কুমুকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তেলা চকচকে ত্বক। গৌরবর্ণ। ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। কৃষ্ণ আর আধখানা ভরে দিল মুখে। কুমু ডান হাত দিয়ে কৃষ্ণর গলা জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণর সেই এক চিন্তা, কে আগে যায়! কৃষ্ণ আগে গেলে কুমুর কী হবে! আর আধখানা ভরে দিল কুমুর মুখে।

'তোমাকে একদিন রাবড়ি খাওয়াতে হবে। সাত্যকিটা দুম করে মারা গেল। তা না হলে ছবিগুলো সব বিক্রি হয়ে যেত! কিছু টাকার খুব প্রয়োজন। টানাটানি করে বাঁচা যায় না।'

কুমু মুখের একটা শব্দ করল।

'কী হল গো?'

'জল। জল দাও। আমি জল খাব।'

স্নানের পর বেশ আরাম লাগছে।

কোমরে হোটেলের দেওয়া বিশাল তোয়ালে জড়িয়ে, পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় জলো শুয়ে আছে চিত হয়ে। পাখা ঘুরছে ফনফন করে। সোজা হাওয়া এসে পড়ছে ভুঁড়ির ওপর। ভীষণ একা মনে হচ্ছে নিজেকে। সৎই হোক আর অসৎই হোক, মানুষ সঙ্গী চায়। স্নেহ চায়। ভালবাসা চায়। মানুষ তো আর গাছ নয়। গাছ হল যোগী। ধুধু ফাঁকা মাঠ। একটি মাত্র গাছ। একা দাঁড়িয়ে আছে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। গাছ তোমার বয়েস কত? বলবে হয়তো একশো বছর। এক-একটা গাছ যেন ইতিহাস! কত দেখেছে! কত শুনেছে। কত সয়েছে।

জলো উঠে পড়ল। আর সময় হবে না। 'বউদিকে চিঠিটা লিখেই ফেলি।'

টেবিলে হোটেলের প্যাড। ল্যাম্পটা জ্বেলে জলো চেয়ারে বসে পড়ল।

শ্রদ্ধেয়া বউদি,

যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই তুমি। আশ্চর্য, দাদাকে তেমন মনে পড়ছে না। কেন বলো তো! তুমি যে আমার মা। কত রাত আমার, তোমার কোলের কাছে শুয়ে কেটেছে। লোকে অন্য মানে করবে। একমাত্র তুমিই আমাকে জানো আর আমিই তোমাকে জানি। তবে এও জেনো, আমার দাদার মতো স্বামী তুমি জীবনে পাবে না। অভিমানী রামচন্দ্র। আর আমি তোমার দেবর লক্ষ্মণ। তুমি তো জননী সীতা। লোকের কথায় কান দিয়ো না বউদি। আমাদের দুঃখ-সুখ আমাদেরই। আমরা বাঁচি মরি কারু কিছু যায় আসে না। অন্যের সঙ্গে সব সম্পর্কই স্বার্থের সম্পর্ক। চুকেবুকে গেলে কেউ কারু খোঁজ রাখে না।

তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। আমি চলে না এলে যে-কোনও দিন মারা পড়তুম। এখনও যে বাঁচব, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। তবে আমার ভীষণ বাঁচার ইচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে হেসে কেঁদে বাঁচতে চাই। আমার ভাগ্যকে আমি অবশ্য তেমন বিশ্বাস করি না। জীবনের প্রথমদিকের ভুল পরের দিকে আর শোধরানো যায় না। জীবনের ফাঁদ বড় মারাত্মক। বউদি তুমি আমার মায়ের মতো। আমার জন্যে তুমি প্রার্থনা কোরো। আমার যা পরিকল্পনা তা যদি সফল হয়, তা হলে জানবে বাকি জীবন আমরা তিনজন রাজার মতো বাঁচব। আর যদি সব ভেস্তে যায়, তা হলে আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তোমাকে জড়িয়ে ধরে তোমার বুকের কাছে শুয়ে থাকব বর্ষার রাতে। দাদা আমার বাবা-ই। তুমি আমার বাবাকে দেখোনি। ঠিক দাদার মতোই

দেখতে ছিলেন। আর একটু ফরসা, আরও স্বাস্থ্যবান। দাদাকে দাদার ওই হীন চাকরিটা ছাড়াতে হবে। ওতে মন ছোট হয়ে যায়। দাদা বড় উদাসী। তা না হলে আজ কোথায় উঠতে পারত। তুমি দাদার ঘুম ভাঙাও।

এইবার কিছু কাজের কথা লিখি—

আমার বিছানার তলায় ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই পাবে তোমার নামে। কিছু টাকা জমিয়েছি। দরকার মতো খরচ কোরো। সৎ রোজগার। বেশ কিছু টাকা ফিকসড করা আছে। আর এক বছর পরে তুলতে পারবে। ওই টাকায় বাড়িটা নতুন কোরো। ধরো আমি যদি ফিরতে পারি, তখন গিয়ে যেন দেখি ঝকঝকে তকতকে ছবির মতো একটা বাড়ি।

আমার কাছে কেউ কিছু পাবে না। যদি চাইতে আসে ভাগিয়ে দেবে। পুলিশ যদি আমার খোঁজ করে, বলবে জানি না। বলবে হাওয়া হয়ে গেছে।

স্বরূপানন্দ আশ্রমে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা প্রণামী পাঠাতুম। পারলে পাঠিয়ে দিয়ো। রোজ অতিথি সেবা হয় তো। বেশ খরচ।

আমার আর একটা অনুরোধ— দেবীদির মেয়ে তোতাকে তুমি এক জোড়া পায়জোড় গড়িয়ে দিয়ো। দেবীর মেয়ে প্রকৃতই দেবী। আর তুমি! তুমি সবসময় সুন্দর হয়ে থাকবে সেজেগুজে। কপালে টিপ পরবে বড় করে। ভোরের সূর্যের মতো। আর তোমার সেই বিখ্যাত আমের আচার তৈরি করে রাখবে। হঠাৎ কোনওদিন দুপুরে আমি তো ফিরেও আসতে পারি।

ধানে থেকো বউদি। দাদাকে খুব ভালবাসবে। আমাদের বাড়িটা আবার আমাদের সেই ছেলেবেলার মতো হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে। হাসিখুশি গান। সব হবে। তুমি ভেবো না। সময় কি শুধু সামনে চলে— পেছনেও চলে। তুমি আমার প্রণাম নিয়ো। তোমার পা দুটো আমার চোখের সামনে ভাসছে। দাদাকে আমার প্রণাম দিয়ো।— ইতি তোমার জলো।

চিঠি শেষ করে জলো কলিংবেলের দিকে হাত বাড়াল। ডাক টিকিট লাগানো একটা খাম চাই। হোটেলে সবই থাকে। বয় এসে দাঁড়াল সামনে। 'একটা খাম আনতে পারো! টিকিট লাগানো। আর খাবার দাও।'

'ঘরেই খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু খাবার?'

'হ্যাঁ।'

ছেলেটি চলে যেতেই জলো ছেলেমানুষের মতো বিছানায় লাফিয়ে পড়ল ঝপাং করে। মাথার তলায় দু'হাত রেখে আবার চিত। বয় এসে টেবিলের ওপর একটা খাম রেখে গেল। সে চলে যেতে না যেতেই অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব এল মনে। শীতল একটা ভীতি।

জলোর মনে হল শিলিগুড়ি জায়গাটা তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কলকাতার অপরাধ জগতের মাথাটা পড়ে আছে শিলিগুড়িতে। অপরাধী ভাগতে চাইলে পুলিশ যেমন সব স্টেশানকে অ্যালার্ট করে দেয়, অপরাধীরাও সেইরকম সব ঘাঁটিকে সজাগ করে দেয়।

জলো উঠে বসল। জলোর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। এর আগেও সে বহুবার প্রমাণ পেয়েছে। একবারও জানাতে ভুল করেনি। জলো যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে। শর্মার গ্যারেজের বাঁপাশে তামাং-এর দোকানে চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ 'হাই'। ব্রিজের এ মুখে ও মুখে দুটো দুটো চারটে। কলকাতা-শিলিগুড়ি টেলিফোন চালাচালি হচ্ছে।

অনেক টাকার হোম করে এসেছে জলো কলকাতায়। সহজে ছাড়বে! কালীপুজো তো হবেই। নরবলি ছাড়া পুজো হয়! পুজো ছাড়া ডাকাতের ভাগ্য খোলে! জলোর ভেতরটা ক্রমশ টাইট হতে শুরু করেছে। এলানো ভাবটা আর নেই। ভাগ্যিস পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এখানে চলে এসেছে।

শর্মার গ্যারেজে গেলে এতক্ষণ আর আস্ত থাকতে হত না। কিমা করে তিস্তায় ফেলে দিত। জলোর গাড়িটাও নজরে পড়ার মতো। অ্যামবাসাডার ফিয়াট চোখে পড়ে বলেই চোখ এড়িয়ে যায়। মরিস দেখলেই নজরে পড়বে। অবশ্য সে যে মরিসে আসতে পারে, এখানকার ঘুঘুদের বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় চলে যাবে।

নাঃ, রাত গড়াবার আগেই শহর ছাড়তে হবে। বেশ বুঝতে পারছে জাল ক্রমশই গুটিয়ে আসছে চারপাশ থেকে। বোকা একগুঁয়ে হলে মরতে হবে জানোয়ারের মতো। জলো বাঁচতে চায়। জলো জাঙিয়ার ওপর প্যান্ট চাপিয়ে নিল। একটা টি শার্ট। সঙ্গে আর কিছু নেই। একেবারে নাঙ্গাবাবা। চুল আঁচড়াবার ধরনটা ইচ্ছে করে পালটে নিল।

ঘরের টেবিলে খেতে বসে হঠাৎ মনে হল শেষ আহার নাকি। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল। দুর্বল হলে চলবে না। সেই কোমল কাঁপা কাঁপা আলোয় দিদিমার গল্প শোনার পৃথিবী হারিয়ে গেছে। এই ঘাতকের পৃথিবীতে বাঘ কি সিংহের মতো নয়, সাপের মতো বাঁচতে হবে। বাঘ সিংহের সংখ্যা কমে আসছে। সাপের সংখ্যা কমার নয়। অতর্কিতে বিযাক্ত ছোবল। এই হল বাঁচার কৌশল। সাংঘাতিক দিন অতি সাংঘাতিক রাত কীভাবে আসে কীভাবে যায়। মায়ের কোলের কাছে ককিয়ে কেঁদে ওঠে শিশু। স্বামীর আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় স্ত্রীকে। বাথরুমে পুড়ে মরে স্ত্রী।

অন্যমনস্ক জলো কোনওরকমে খাওয়া শেষ করল। হোটেলের রান্না খাওয়া যায় না। ভীষণ কমার্শিয়াল। বিছানায় আবার চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরাল। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। প্রবণতা স্বভাব সহজে বদলানো যায় না। বিপদের গন্ধে কেমন ধীরে ধীরে পুরনো জলো আবার জেগে উঠছে।

'না, এভাবে হবে না। হিংসায় হিংসারই স্রোত বইবে। পাগলের মতো প্রতিশোধ নিতে ছুটছি। কী হবে। একটা কি দুটো লোককে মেরে পৃথিবীর কোনও মঙ্গল হবে না। প্রতিশোধ নেওয়াই হবে। নিজের অহংকার শান্ত হবে। তারপর, ওরা আবার প্রতিশোধ নেবে। এই চলুক। বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ।'

জলো পরিস্থিতিটা নতুন আলোতে ভাবতে লাগল। একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। পারবে কি না জানে না। তবু চেষ্টা করতে হবে। জলো উঠে গিয়ে টেবিলে বসল। টেবিলের ওপর তাড়াতাড়ি দুটো দেশলাই কাঠি ফেলে একটা ক্রশ তৈরি করল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। কোনদিকে যাবে? কোন দিকে গেলে ভাল হবে। 'মা, আমাকে তুমি ভালবাসতে। তোমাকে যখন ভালবাসতে শিখলুম তখন তুমি ছবি হয়ে গেছ। মা তুমি আমাকে বলে দাও কোন দিকে যাব? টাকা পয়সা চাই না। খুব হয়েছে। নোংরা জিনিস। ডার্টি কয়েনস। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আর আনন্দ পেতে চাই না। ক্ষমতা! রাশিয়ারও ক্ষমতা আছে, আমেরিকারও ক্ষমতা আছে। পাঞ্জার লড়াই। হাত আর হেলে না। জোড়া পাঞ্জা ওপরে স্থির। আকচাআকচি। দাঁতে দাঁত। কী হবে ক্ষমতা। মা আমি শান্তি চাই। তোমার ছেলে হতে চাই।'

জলো তাকিয়ে আছে আড়াআড়ি কাঠির দিকে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। হঠাৎ জলোর মনে হল পুব। পুবদিকে গেলেই মঙ্গল হবে। 'তুই পুবদিকে যা জলো।'

'অ্যাপোলো' নার্সিংহোমের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে না করাতেই সাত-আটটা লোক জ্ঞানেশের গাড়ি ঘিরে ফেলল। জ্ঞানেশের পাশে পার্বতী। কী হচ্ছে বোঝার আগেই অকথা, অশ্লীল গালাগাল। প্রথমেই ডান্ডা পড়ল গাড়ির সামনের কাচে। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল মিছরির দানার মতো।

জ্ঞানেশ সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। মেরে মরো এই তার জীবনের নীতি। দরজাটা আগেই লক করে দিয়েছিল। পার্বতীও কম যায় না। তার দিকের কাচ তুলে দিয়ে দরজা লক করে ফেলেছে। জ্ঞানেশ ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও পার্বতী পেরেছে। ওরা তক্কে তক্কে ছিল।

পার্বতীকে সহজে হাতছাড়া করতে চায় না। একটা মেয়ের অনেক দাম। সেই দাম দেবার লোকের অভাব নেই।

গাড়ির চালে চাকায় পাশে পেছনে দুমদাম লাঠি পড়ছে। জ্ঞানেশের মুখে একটা ঘুসি পড়েছে। জ্ঞানেশ বিদ্যুৎগতিতে স্টার্ট দিল। সামনে পেছনে গাড়িটাকে বারকতক ঝাঁকানি মারতেই আক্রমণকারীরা একটু দূরে দূরে সরে গেল।

চিৎকার আর গালাগালে জ্ঞানেশ কিছুই আর শুনতে পাচ্ছে না। নাকটা মনে হয় ফেটে গেছে। ঠোঁটের ওপর কী যেন সুড়সুড় করছে। জ্ঞানেশ ব্যাকগিয়ারে যত জোরে পারে পেছনদিকে চালাতে লাগল গাড়ি। বেশ বুঝতে পারছে ছিটকে ছাটকে পড়ছে কেউ কেউ। সামনের ভাঙা উইন্ড স্ক্রিনের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে দু'জনে। বীভৎস মুখ। জ্ঞানেশের মনে হল আর বাঁচার কোনও আশা নেই, তবু শেষ চেষ্টা।

এবার সে এঁকেবেঁকে প্রচণ্ড গতিতে সামনে এগোবে। ইলেকট্রিক হর্ন টিপে জ্ঞানেশ একটু বাঁ, একটু ডান, একটু বাঁ এইভাবে পুরো ডানদিকে কাটিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা ছুটল। পার্বতীর দিকের কাচ ভেঙে গেছে। হর্ন আর তীব্র হেডলাইট জ্ঞানেশের দুই হাতিয়ার।

॥ তেত্রিশ ॥

আহারাদি শেষ। শিব আর সুপ্রভা সামনের বারান্দায়। আকাশে আধখানা চাঁদ। মেঘের ভেলায় ভেসে চলেছে। সাদা সাদা ফুলে গাছ ছেয়ে গেছে। কী সমারোহ! সুপ্রভা চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। ঝাউয়ের পাতায় বাতাস চলার শব্দের মতো শব্দ হচ্ছে।

সুপ্রভা মৃদু গলায় বললে, 'আমার কথা শুনুন। কথা শুনতে হয়। সবসময় নিজের খেয়ালে চলা উচিত নয়।'

'কার ভরসায় বাড়ি ফেলে যাই! জীবনের সব সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছি এর পেছনে। যক্ষের মতো আগলে যাই।'

'এই তো কয়েক পা দূরে দাদা রয়েছেন। তা ছাড়া আপনি বলছিলেন দেবী বলে ওই মেয়েটিকে এ বাড়িতে রাখবেন। তাও তো হতে পারে।'

'সে খুব বুদ্ধিমতী, আত্মাভিমানী মেয়ে। এই বাড়ি নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা বলার পর থেকে সেও আসে না, তার মেয়েটাও আসে না। কী জানি কী মানে করলে! আমি তো সহজ সরল মনে সব কথা বলে ফেলি। হয়তো অন্যরকম মানে করলে। আমারই ভুল হয়েছে। কাছে টানতে চাইলেই কি মানুষ কাছে আসে। নিজের ছেলে-বউই দূরে চলে গেল। আমি আর ভাবতে পারি না।'

'একটা মাস আপনি আমার কাছে থাকুন। বড় অপূর্ব জায়গা! শান্ত নিরিবিলি। পাশেই আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। একদিনে আপনার মনের বিষণ্ণতা কেটে যাবে।'

'দেখুন অনেক কিছু ভাবার আছে। তনু আর আমি কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। তনু আমাকে অসম্ভব ভালবাসে। অমিতাভ সেই ভালবাসার কদর্থ করেছে। যার সঙ্গে তনুকে সারাজীবন কাটাতে হবে তার বিরাগভাজন না হওয়াই ভাল। আমি কে? আমি আর ক'দিন।'

'সকলের সব ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে সংসার স্তব্ধ হয়ে যাবে। জোর বাতাসের ঝাপটায় সব উড়িয়ে দিন। আমাদের ভেতরে আগুন আছে। সেই আগুনে সব পুড়িয়ে ফেলুন। আমরা যত টলব আমাদের তত টলাবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'দুষ্ট একটা আবর্তের মধ্যে সংসার পড়ে আছে। এখানে খুঁচিয়ে আনন্দ। কাঁদিয়ে আনন্দ। একজন আর একজনের ওপর চেপে বসতে পেরেছে, এই তার আনন্দ।'

'তা ঠিক। এ তো এক দীর্ঘ কারাবাস! নিগৃহীত হবার জন্যেই ফিরে ফিরে আসা।'

'আমার একটা ছোট্ট বিলিতি ধরনের কটেজ হয়েছে। চারপাশ সবুজ। বিশাল বিশাল গাছের ছায়া-ঢাকা লম্বা একটা পথ দু'দিকে চলে গেছে। বেড়াতে বেড়াতে আপনি ছোট হতে হতে একসময় দিগন্তে মিলিয়ে যাবেন। মাঝে মধ্যে ওই রাস্তায় ছবির শুটিং হয়। মন্দ লাগে না দেখতে। হিরো ছুটছে। ভিলেন ছুটছে। গাড়ি গাড়িকে তাড়া করছে। ঘোড়া ছুটছে ঘোড়ার পেছনে। একদিকে ভোরের সূর্যোদয়। আর একদিকে সূর্যাস্ত। এ আকাশ, ও আকাশ, মাঝখানে আমরা। চলুন চলুন। মনটাকে একটু ছুটতে দিন। খুলতে দিন।'

'বলছেন?'

'আমার অনুরোধ। আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি।'

'আমিও হয়তো বাসি।'

'আমি বুঝতে পারি। আপনি জীবনের কাছে হেরে যাচ্ছেন দেখলে সহযোদ্ধা হিসেবে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। কই, আমি তো হেরে যাইনি! জীবন আপনার চেয়ে আমাকে অনেক বেশি বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। আমি বাঁচব। আমার মতো বাঁচব। রাজার মতো বাঁচব। ইট খাওয়া কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করব না।'

'আপনি প্রভু সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজির ক্ষেপার ঝুলি পড়েছেন?'

'অন্য লেখা পড়েছি। ক্ষেপার ঝুলি পাইনি বলে পড়া হয়নি।'

'অনেকক্ষণ সংকীর্ণ কথা হল। আসুন এবার একটু বিষয়ান্তরে যাই। একটা অংশ, ছোট্ট একটা অংশ পড়ে শোনাই।'

'এখানে তো আলো নেই।'

'দেখুন না আলো এখুনি জ্বলবে। আমার ব্যবস্থা আছে।'

শিব ঘর থেকে একটা টেবিল ল্যাম্প এনে বারান্দার পয়েন্টে লাগিয়ে দিল। দূর থেকে দেখলে বড় মনোরম দৃশ্য। বিলেত-টিলেত মনে হতে পারে। গভীর দুটি বেতের বাগান-চেয়ারে শিব আর সুপ্রভা পাশাপাশি। মাঝে সেন্টার টেবিলে নীল শেডে ঢাকা আলো। চাঁদের আলোয় দুধ-সাদা বাগান-পথ। সাদা সাদা ফুলে বাগান ছেয়ে আছে। শান্ত নিরিবিলি, বড় অন্তরঙ্গ একটি দৃশ্য। সুপ্রভার মুখের একপাশে আলো পড়েছে। তীব্র ধারালো মুখ।

শিব বই খুলতে খুলতে বললে, 'পড়াশোনার মতো জিনিস নেই। একটা অন্য আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়। হাবোড়তাবোড় গুচ্ছের বই পড়ার চেয়ে নির্বাচিত কয়েকটি বইকে জীবনসঙ্গী করে নিতে হয়। মন-মেজাজ ঘুরে যায়। এই তেল, চাল, ডাল, আলুপটলের জগৎ, পেটমোটা হাঙরের মতো আর গিলতে পারে না।'

'বই আর প্রকৃতি, এই দুটিকে ঠিক মতো ধরতে পারলে আমাদের বসবাস সহজ হয়ে যায়।'

'আমার কেবলই তুলসীদাসের সেই কথাটি মনে পড়ে, সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে। সব যদি ছাড়া যেত। নাঃ, সে আর হল না! সীতারামদাসজির এই অংশটি শুনুন। শুনলে ভেতরটা ছটফট করে উঠবে:

> কৃষ্ণচন্দ্রের কারাবাসের কথা শুনে বড় দুঃখ হল।
>
> জেলের কষ্ট— ঘানি টানা, গম পেশা, মাটি কাটা। কাজের বিন্দুমাত্র শৈথিল্যে চাবুকের দ্বারা প্রহার। পোড়া ভাত, পোড়া রুটি, পরের পোষাক, পরের কম্বল তাতে কত দুর্গন্ধ! এইরকম কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।
>
> *এই সব কথা মনের ভেতর তোলপাড় করতে করতে দেখলাম— আমারও জেল*

হয়েছে। একটা পচা, গলা ঘরে আমায় আটকে রেখেছে, নটা দরজা দিয়ে অবিরত ক্লেদ নির্গত হচ্ছে।— গেলুম, প্রাণ যায়! এ কি! এ কি! এ যে আমি আমাকে ভুলে যাচ্ছি। জেলখানায় ঢুকে ঘরখানাকেই আমি মনে হচ্ছে। ঘর আমি এক জিনিষ নয়, তথাপি এই ২৪ উপাদানে তৈরী আশ্চর্য ঘরকে আমি মনে হচ্ছে। এক মাগী আমার পাহারায় আছে। দিবারাত্র খাটছি তবু মারছে। গেলুম গেলুম— দেখ পিঠে কত দাগ হয়েছে, ওগো আর মেরো না, একবার দুবার নয়— আশী লক্ষ বার তোমার প্রহার সহ্য করেছি। কখন কামের চাবুক মারছ, কখন ক্রোধের, কখন লোভের চাবুক মারছ, কখন মোহের, কখন মদের, কখন মাৎসর্য্যের চাবুক মারছ। দেখ দেখ তোমার প্রহারে আমার পিঠটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে— কত যুগ-যুগান্তর আমি কাঁদছি। ও কি খাবার আমায় দিচ্ছ— পচা গলা নারী দেহ! ও খাবার তো একবার নয়— বহুবার খেয়েছি, ও নিয়ে যাও— ও নিয়ে যাও। ও কি খাবার আনছ— পুত্রকন্যা, গৃহদ্বার, আত্মীয়স্বজন! নিয়ে যাও— নিয়ে যাও, ও খাবার আমি খেতে চাই না। ওই সব পোড়া ছাই-ভস্ম খাইয়ে খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ! ওগো তুমি আমায় কি খাওয়ালে! আমি আমাকে হারিয়ে জেলখানা হয়ে গেলুম। আমি যে আমি— আমি যে জেলখানা নই।

সুপ্রভা বললে, 'কে যেন আসছে?'

শিব বই থেকে চোখ তুলল, 'এত রাতে কে বলুন তো?'

'সঙ্গে একজন মহিলা।'

জ্ঞানেশ সামনে এসে দাঁড়াল। নাকে প্ল্যাস্টার। কপালে প্ল্যাস্টার। পার্বতীর হাতে ব্যান্ডেজ।

শিব আতঙ্কের গলায় প্রশ্ন করলে, 'এ কী? কী করে এলে? মারামারি?'

'একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলুম মাস্টারমশাই। গাড়িটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের চেয়ে বেশি আহত হয়েছে গাড়িটা।'

'কী ঝামেলায় পড়লে বলো তো?'

'সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। ঘোলাটে যুগের ঘোলাটে ব্যাপার। আজ রাতের মতো পার্বতীকে আপনি এখানে রাখুন। তা না হলে বেচারার জীবন বিপন্ন।'

সুপ্রভা বললে, 'সমস্যাটা কী?'

জ্ঞানেশ বললে, 'পার্বতী একটা ভাল আশ্রয় খুঁজছে। যে আশ্রয়ে থেকে ও সৎভাবে জীবন কাটাতে পারে।'

'পার্বতী কে?'

'অতীত ছেড়ে দিন। বর্তমানে ও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর চারপাশে অপেক্ষা করে আছে অন্ধকার এক জগৎ!'

'ও আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'অনেক দূরে? পুনে।'

শিব বললে, 'জ্ঞানেশ তুমি চেনো এঁকে? তনুর মা।'

'আচ্ছা!' জ্ঞানেশ নমস্কার করল।

সুপ্রভা বললে, 'পার্বতী, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

পার্বতী জ্ঞানেশের পাশটিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই তার নেই। থাকার মধ্যে আছে সুঠাম এক দেহ। জলে পড়ে আছে। ঝাঁক ঝাঁক হাঙর তেড়ে আসছে ছিঁড়ে খাবার জন্যে। কোথাও একটা স্বপ্ন আছে। এক ছিটে শুভ সংস্কার।

'কী, যাবে?'

পার্বতী দৃঢ় স্বরে বললে, 'হ্যাঁ যাব মা।'
'খাটতে পারবে?'
'পরীক্ষা করে দেখবেন।'
'নিরামিষ খেতে হবে।'
'কোনও ব্যাপার নেই। খানাকে বাত ছোড়িয়ে।'
'বহত আচ্ছা। সিনেমা দেখা চলবে না।'
'ও ভি ঠিক হ্যায়।'
'যে কাজ বলব, সেই কাজই করতে হবে, হাসি মুখে।'
'ও ভি ঠিক হ্যায়।'
'চলে যাও ভেতরে। তোমার ভার আমি নিলুম। হাত ভেঙেছে না কেটেছে?'
'কেটেছে।'
'ওষুধ?'
জ্ঞানেশ বললে, 'সঙ্গে আছে। আমি তা হলে যাই এখন। জ্বর আসছে।'
'কাল তোমার খবর নোব।' শিব উঠে দাঁড়াল, 'কী বিশ্রী ব্যাপার দেখো তো!'
'বেঁচে থাকলে, কত কী হবে মাস্টারমশাই! আর কি সে-যুগ আছে!'
গেট পর্যন্ত জ্ঞানেশকে এগিয়ে দিয়ে এসে শিব আবার বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। রক্তারক্তি দেখলে ভেতরটা কেমন হয়ে যায়। চাপা আলোয় শিবের গৌরবর্ণ মুখ মায়াময় দেখাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ঠিকই, অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্। কাশ্যাং বাসো সতাং সঙ্গো গঙ্গামভঃ শম্ভুসেবনম্ ॥ আহা! অসার সংসারে চারটি মাত্র সার— কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাজল, শম্ভুসেবা। নাঃ, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। বাস্তু ঘুঘু হয়ে আর কতকাল পড়ে থাকব।'
'এই কথাটাই আপনাকে বোঝাতে চাইছিলুম। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। এখনও কত কী করার আছে!'
'ঠিক বলেছেন। মাঝে মাঝে ঘুম এসে যায়। সীতারামদাসজির এই কবিতাটিতে বড় উদ্দীপন হয়:

নিত্য মুক্ত বুদ্ধ তুমি অনন্ত অব্যয়।
রবি শশী তারা তুমি—তুমি গ্রহচয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ওই তোমারে ঘেরিয়া।
ঘুরিতেছে কত যুগ নাচিয়া নাচিয়া ॥
হে চিন্ময় মহা জ্যোতিঃ ভুলিয়া স্বরূপ।
জীব সাজে কর খেলা—বড় অপরূপ।
দেহ অভিমান ত্যজি, স্বরূপে আপন।
কর অভিমান তুমি, যাইবে বেদন ॥
জাগরে নিদ্রিত জীব জাগ একবার।
জাগিলে পাবিরে তুই শান্তি পারাবার ॥
জয় গুরু গুরু জয়— অনিবার বল।
রবে না ভাবনা কিছু, পাবি প্রেম ফল ॥'

'বাঃ সুন্দর। সুরে বসিয়ে ধ্রুপদ হিসেবে গাওয়া যায়। পুনেতে গিয়ে চেষ্টা করা যাবে। আপনি বসুন। আমি ভেতরে যাই। দেখি মেয়েটা কী করছে।'
সুপ্রভা উঠে পড়ল। শিব সুইচ টিপে আলো নেবাল। চমৎকার চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যায়। শিব একই সঙ্গে সুপ্রভা আর সুধার কথা ভাবছে। সুপ্রভা যেন বাতাসের মতো সহজ, স্বচ্ছন্দ।

কোথাও কোনও জড়তা নেই। যা ধরে, যাকে ধরে, একেবারে হাতের মুঠোয় ধরে। বয়েস ক্রমশ বাড়ছে না কমছে বোঝাই যায় না। মেয়েলিপনা নেই বললেই চলে। কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি একেবারে খাড়া, স্ট্রেট। 'ঘুরে আসা যাক দিনকতক! দেখাই যাক না কী হয়!'

মাথাটা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়েছে শিব। ঘুম ঘুম লাগছে। হাল ছাড়া নৌকোর মতো জলে যেন ভাসছে। হঠাৎ সাত্যকির কথা মনে পড়ছে। কার যে কখন শেষ লেখা থাকে! কোথায় গিয়ে ফুরিয়ে যাবে, জানার উপায় নেই। মাটির গভীরে, কাঠের কফিনে সাত্যকি কেমন শুয়ে আছে! এত চাঁদের আলো, এই ফুল ফোটার আয়োজন, সাত্যকি আর দেখবেও না, শুনবেও না।

শিবের মাথাটা ক্রমশই হেলে যাচ্ছে পেছন দিকে। সুপ্রভা মাথায় আলতো হাত রাখতেই শিব সোজা হয়ে বসল। সুপ্রভা হাত না সরিয়ে বললে, 'ঘুম পেয়ে গেছে। ইজিচেয়ার পেতে দোব?'

মাথায় রাখা সুপ্রভার হাতের গোল কবজি নিজের ডান হাতের মুঠোয় ধরে শিব বললে, 'বয়েস হচ্ছে তো, সারা দিনের পর এই সময়টায় ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বয়, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কী চাপিয়ে এলেন?'

'ভাত।'

সুপ্রভা পাশের চেয়ারে বসল। গুনগুন করে ভজন গাইছে— 'হে গোবিন্দ, হে গোপাল।'

'পার্বতীকে কোথায় রেখে এলেন?'

'ওকে চানে পাঠিয়েছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে কিছু করানো যাবে না।'

'কী বুঝছেন?'

'খারাপ না। চাপা আগুন আছে ভেতরে। তবে শিক্ষা নেই। আনকাট। কাটতে হবে। তা না হলে জেল্লা দেবে না।'

সুপ্রভা গুনগুন করতে করতে ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে ছোটখাটো সাংসারিক শব্দ ভেসে আসতে লাগল। শিবের মনে হচ্ছে তার মনের পেছনের দিকের দরজাটা যেন খুলে গেছে।

কাউন্টারে চাবি জমা দিয়ে, দেনাপাওনা মিটিয়ে জলো বেরিয়ে এল পথে। এপাশ ওপাশ তাকাল। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। তবু কেমন যেন মনে হচ্ছে। কে যেন বলছে, 'সতর্ক হও, সতর্ক হও'। জলো টুক করে ঢুকে পড়ল গাড়ির সামনের আসনে। স্টার্ট করে সামনে এগোতে গিয়েই চমকে উঠল। স্টার্ট বন্ধ করে দিল। চারটে চাকারই হাওয়া কে বা কারা খুলে দিয়ে গিয়েছে।

জলোর স্নায়ু এখন টান টান স্প্রিং-এর মতো হয়ে গেছে। পরেশ সাহা কলকাঠি তা হলে নেড়েছে। সুনীত বোসের সঙ্গে হাত মেলানোও অসম্ভব নয়। মাফিয়াদের যৌথ পরিবার বেশ শক্তিশালী। জলো রাস্তার দিকে সতর্ক নজর ফেলল। সব স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা। ফটফট আলো। লোকজনের আসা-যাওয়া।

পেছন দিক থেকে একটা মিনিবাস আসছে। জলোর মস্তিষ্ক খুব দ্রুত কাজ করছে! সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ডও দেরি হল না। বেরিয়ে এসে দরজাটা লক করল। গাড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটা সামনে আসতেই লাফ মেরে ঢুকে গেল ভেতরে। বেশ ভিড়। পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে একেবারে পেছনে। জলো যেন শিশির ভেতর ক্যাপসুল। মানুষের তুলো দিয়ে ঠাসা।

মিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে জলপাইগুড়ির দিকে। দেখতে দেখতে পেছন আরও পেছনে চলে যাচ্ছে। পথের পাশে থাক পড়ে মরিস-এইট। জলপাইগুড়িতে অক্ষত পৌঁছোতে পারলে থাকার অনেক জায়গা আছে। প্ল্যান্টার্স ক্লাবে রাতটা কাটাতে পারে। বাসন্তী আছে। সেখানেও থাকা যায়। কোনওরকমে একবার ভুটানে ঢুকতে পারলে, সুমিতা আছে গ্যাংটকে।

ঠাঁই আছে। দপ করে ফুরিয়ে না গেলে আবার শুরু থেকে শুরু করার সুযোগ মিলতেও পারে। জলো হঠাৎ বসার আসন পেয়ে গেল।

মিনি হু হু ছুটছে। জলোর স্নায়ু ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল আপন মনে। হঠাৎ একটা চিল এসে ছোঁ মারল। শালপাতায় মোড়া মাছ ছড়িয়ে পড়ল পথে। কোনওরকমে কুড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার ছোঁ। সেদিন কীভাবেই না চিলের আক্রমণ বাঁচিয়ে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল! এই মারে। বুঝি এই মারে!

জীবন নিয়ে আজও সেই অবস্থা।

মিনি ছুটছে। দু'পাশে জঙ্গল। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা।

দেবী জানলার ধারে ছোট টেবিলে বসে চিঠি লিখছে। মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ। তোতা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু আগে ভীষণ বায়না করছিল। ধৈর্য রাখতে পারেনি। আচমকা গালে দুটো চড় মেরেছিল। মেয়ের কান্না আর থামে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবী আর পারছে না। চারপাশ থেকে লোভের হাত এগিয়ে আসছে। মেয়ে থেকে মেয়েমানুষ করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে পুরো দমে।

সামনে পা ছড়িয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দুর্গা সমানে ঢুলছে। আহা! সারাদিন বেচারা খুব খাটে।

দেবী লিখছে:

স্নেহের সুস্মিতা,

তুই আমাকে ভুলেছিস। আমি তোকে ভুলিনি।

তিনমাস আগে তোর চিঠি পেয়েছি। তারপর সব চুপচাপ। ভালই। সুখে আছিস। সুখে থাক। দেবীদির কথা মনে রেখে কাজ কী? তোর ওপর সত্যিই আমার খুব অভিমান হয়েছে। ভেবেছিলুম লিখব না কিছু। পারলুম না। মনের কথা কাকে জানাব বল? কে আছে আমার?

শোন, চাকরিটা মনে হয় ছাড়তেই হবে আমাকে। আমি কিছুতেই নীচে নামতে পারব না। আগের চিঠিতে তোকে বলেছিলুম, আমাদের অফিসের বড় কর্তার নেকনজরে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। লোভ আর ভয় দুটোই দেখাচ্ছে। বিপত্নীক। একটি ছেলে। একটি মেয়ে। ভাল স্কুলে, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। ভদ্রলোককে দেখতে ডনজুয়ানের মতো। সাজের খুব ঘটা। চড়া বিলিতি সেন্টের খুশবু। তরল পদার্থ ভালই চলে। অনবরত ঘরে ডেকে পাঠাবেন কাজের ছুতো করে। আবোলতাবোল বকবেন। আর বলবেন, চলো না দিনকতক বেড়িয়ে আসি কোথাও। অফিসে এই নিয়ে কানাকানি, হাসাহাসি। আমি ভাল করে কারু দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি না। সব দৃষ্টিতেই নোংরা একটা ইশারা। হয় আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে, না হয় ছাড়তে হবে ধর্ম! বেপরোয়া হয়ে যেতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এ পাড়ায় যে মানুষটিকে আমি পিতার চেয়েও শ্রদ্ধা করতুম, ভালবাসতুম, তাঁর কাছ থেকেও সরে আসতে হল। ভদ্রলোকের সংসার ভেঙে গেছে। ছেলে-বউ বৃদ্ধকে ত্যাগ করে সরে গেছে। দেবতুল্য সেই মানুষটি আমাকে তাঁর বাড়িটি দান করে দিতে চান। এ এক বিশ্রী প্রস্তাব। ছেলে তার বউ নিয়ে সরে গেছে। বিশাল চাকরি। সাজানো ফ্ল্যাট। তা হোক না। অধিকার তো তার। বৃদ্ধের হঠকারিতার তো অন্য অর্থ হবে! প্রাণের টানে তাঁর সেবা করি। তারই কত কদর্থ! পাড়ায় কান পাতা যায় না। বলে, বুড়োকে ভজাবার চেষ্টা করচে বিধবা মাগি। পুরুষের আবার বয়েস আছে! সব বয়েসেই মেয়েছেলে চাই। কী বলব বল? এবার আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব। ঈশ্বরের কাছে রোজই আমার প্রার্থনা— বুড়ি করে দাও। কুৎসিত করে দাও। যৌবন এক জ্বালা। মাছির ভ্যানভ্যানানিতে তিষ্ঠোনো দায়। এখান থেকে আমাকে সরতে হবে। কোথায় যাই বল তো! কার কাছে যাই? মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছি। বড় হচ্ছে। মানুষ করতে হবে।

শোন, এক মাস ছুটি নিয়েছি। ভাবছি তোর কাছে গিয়ে দিন কতক থাকব। বিরক্ত হবি না তো! অনেক পরামর্শ আছে তোর সঙ্গে। অনেক কাজের কথা। ভাবছি মেয়েটাকে তোর কাছে রেখে

আসব। তোর স্কুলেই পড়বে। এ পাড়াটা সুবিধের নয়। দিনকাল খুব খারাপ। তোর উত্তর আসার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ভালবাসা নিস। ইতি তোর দেবী।

ঘনঘন বোমার শব্দে দেবী চমকে উঠল। খুব কাছেই কোথাও হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। রাস্তায় ছোটাছুটি। দোকানপাটের ঝাঁপ টানছে। দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দুর্গার ঘুম ছুটে গেছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে খোলা জানলার দিকে।

'দিদি কী হচ্ছে গো? ভারত জিতেছে বুঝি?'

দেবী জানলা দিয়ে উঁকি মারছে বাইরে। দেখতে পাচ্ছে, ভুতো আসছে। একটু করে ছুটছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে। দেবী ডাকল, 'ভুতো, এই ভুতো!'

ভুতো উঠে এল সামনের রকে।

'কী হয়েছে রে?'

'টেরিফিক কাণ্ড। জলোদার বাড়ি অ্যাটাক করেছে।'

'কে জলো?'

'ওই যে গো যার দাদা শশধর। তোমার বাড়িতে আসত। মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কাকে? জলোকে?'

'না না, শশধরকে।'

'সে কী রে?'

দেবীর শরীরে একটা কাঁপুনি ধরে গেল। যেন শীত করে জ্বর আসছে। ভুতো রক থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে দৌড়োল। দেবী জানলাটা বন্ধ করে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসল। গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'কী সর্বনাশ! একটা নিরীহ, পরোপকারী লোক। কী আশ্চর্য!'

চিঠিটার তলায় কাঁপা কাঁপা হাতে লিখল:

পুনশ্চ: সুস্মিতা, এইমাত্র কী সব হয়ে গেল এখানে। আমি কালই রওনা হবার চেষ্টা করছি। না, কাল কী করে হবে। ধর পরশু। তুই ওখানে আমার যদি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারিস তা হলে আমি আর নরকে ফিরতে চাই না।— দেবী।

ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা জিপ ছুটে গেল। যা হয়। সর্বনাশ হয়ে যাবার পর শুরু হয় পুলিশের ছোটাছুটি। শশধর! দেবী কেঁদে ফেলল। হঠাৎ মনে হল, ভুতো কতটুকু জানে? শশধরকে কেন মারবে? সে কি সমাজবিরোধী! বাউন্ডুলে মানুষ। কতক্ষণ বাড়ি থাকে? সব বাজে কথা। মাস্তানে মাস্তানে হচ্ছে। পুলিশ তো বলেইছে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

দেবী দুর্গাকে বললে, 'নে ওঠ! রাত হয়েছে। এখুনি হয়তো আলো নিববে। আয় খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিই।'

আবার গোটা দুই বোমার শব্দ। আর একটা গাড়ি গেল। পাড়া নিস্তব্ধ। একটু আগে কোথাও গান বাজছিল। থেমে গেছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

সকাল। মেঘলা মেঘলা। ভিজে ভিজে বাতাস ছেড়েছে। সুপ্রভা ভোরে উঠেই চলে গেছে। সুটকেস রেখে গেছে। সাইড ব্যাগে টুকিটাকি কিছু নিয়ে গেছে। যাবার সময় শিবকে বলে গেছে, প্রস্তুত থাকবেন। তনুকে নিয়ে প্রথমে এখানে আসব, তারপর প্লেনে যাব আমরা। ট্রেনে বড় সময় লাগে। রিজারভেশানের ঝামেলা।

প্লেন শিব এই প্রথম চাপবে। ছেলেমানুষের মতো আনন্দ হচ্ছে। যাক যাবার আগে দেহ তবু পাখি হয়ে ওড়ার স্বাদ পাবে। অনেক খরচ। সুপ্রভা কী করে সামলাবে! ভাবতে বারণ করেছে। ঠিক আছে, ভাববে না।

পার্বতী চা এনেছে। সামনের টেবিলে রেখে গেল। পার্বতী কথা বলে কম। সবসময় হাসি লেগে আছে মুখে। কোথায় ছিল। কোথায় এসে গেল। আবার যাবে কোথায়!

কৃষ্ণ আসছে। ফরসা কপালে রক্তচন্দনের টিপ। মন যা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়, আজীবন তাই দেখতে চায়। কৃষ্ণকে রোজ সকাল সন্ধে দেখতে না পেলে মনে হয় শূন্য জীবন। বাগানের গাছপালা। রোজ দেখা চাই। দোতলার বারান্দা থেকে পশ্চিমের আকাশ দিনান্তে একবার দেখা চাই। রোজ সকালে যে দুধ দেয় তার সঙ্গে একটু বকবক করা চাই।

কৃষ্ণ চেয়ার ঠেলে বসতে বসতে বললে, 'বাঁশি কেন উদাস এমন!'

'নাও, চা খাও।'

'চা তো খাবই রে ভাই। তোর চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে। রাতে ভাল ঘুমোসনি বুঝি!'

'ঘুমিয়েছি। তিন-চার বার ভেঙেও গেছে। একের পর এক স্বপ্ন। খুব ছটফটে রাত গেছে।'

'স্নান করে আয়। ভাল লাগবে।'

'বুঝলে দাদা, দিনকতক ঘুরেই আসি।'

'কোথায় যাবি?'

'ওই যে তোমাকে বলছিলুম, সুপ্রভা বারে বারে অনুরোধ করছেন। পুনে। জায়গাটা নাকি অসাধারণ সুন্দর। শান্তির একটা আশ্রয়ও আছে।'

'যা যা ঘুরে আয়। মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়া ভাল। মন ভাল হয়।'

'প্রথমে বেশ উৎসাহ লাগছিল। প্লেনে চাপার আনন্দে ভেতরটা লাফাচ্ছিল। এখন আবার খারাপ লাগছে।'

'কেন রে ভাই?'

'তোমাকে ছেড়ে কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না। এই সকাল, সন্ধে, দুপুর। কত কথা। কত খেলা!'

'হ্যাঁ রে। তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি। তুই চলে গেলে, আমি কী করব রে! মরে যাব যে রে!! কত দিন থাকবি?'

'মাস খানেক। কী বলো! এক মাসের বেশি থাকা যায় না। পাগল হয়ে যাব।'

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর বেশ জোর গলায় বললে, 'যা ঘুরেই আয়। পুনেতে আমি বেশ কিছু কাল ছিলুম। বড় সুন্দর জায়গা। যা ঘুরেই আয়। এক মাস তো।'

'তুমি বাড়িটা দেখবে তো।'

'হ্যাঁ রে, নিশ্চয় দেখব। সকাল, সন্ধে। সে তুই ভাবিসনি। সন্ধেবেলা আলো জ্বেলে চুপচাপ বসে থাকব।'

'বাগানটাও একটু দেখো। সপ্তাহে একবার পরান এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। তোমাকে ঝ্যাটা কোদাল ধরতে হবে না।'

'আরে তাতেও আমি পেছপা নই। এই দেখ, এখনও হাতের গুলো দেখ, ঠেলে উঠছে।' পর পর দু'কাপ চা খেয়ে খানিক গল্পগুজব করে কৃষ্ণ চলে গেল। যাবার সময় বাগানটা একবার ঘুরে গেল। কাঠবেড়ালির লুকোচুরি চলেছে।

শিবের আজ আর কিছুই করার নেই। একেবারে অবসরভোগীর জীবন। পার্বতীই সব করছে। পাশবই আর চেকবই নিয়ে শিব বেরিয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কে যাওয়া দরকার। বেশ কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে নিতে হবে। তা ছাড়া পাশবইটা অনেক দিন জমা দেওয়া হয়নি।

পাড়াটা বেশ থমথম করছে। মাস্তানরা আবার জেগে উঠেছে। বেশ সব ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন হয় তখন হয়। মানুষ আজকাল কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে না। একটা শিশুও আজকাল কত বেপরোয়া। পেছন থেকে একটা গাড়ি আসছে। শিব পাশে সরে গেল। আপন খেয়ালে আছে। গ্রাহ্য করেনি। হঠাৎ গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'দাদাই। দাদাই।'

'তোতার গলা না!'

দশ-বারো হাত তফাতে গাড়িটা থামল। বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে এল দেবী। লাফিয়ে নামল তোতা। তোতা ছুটে এসে শিবের কোমর জড়িয়ে ধরল।

'কোথায় চললে তোমরা? তোমরা আর আসো না! হ্যাঁ মা, কোনও অপরাধ করিনি তো!'

দেবী পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে জল। কী উত্তর দেবে? পৃথিবীর নোংরা কথা কী আর শোনাবে ঋষির মতো এই মানুষটিকে!

'বাবা, আমরা দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা। বেড়াতে যাচ্ছ। বেশ বেশ। ফিরবে কবে?'

'এক মাস।'

'আমিও কাল যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন বাবা?'

'পুনে।'

'আমরা আসি বাবা!'

'এসো এসো। বেশ আনন্দে থেকো। দুর্গা। দুর্গা।'

ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠল। তোতা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে। গাড়ি সরে যাচ্ছে দূরে। পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

শিব হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, এই এক-একটা সময় আসে। যখন সবাই চলে যেতে চায়। বসবাস যেন হাটের মতো। এই খুব জমজমাট। এই আবার ফাঁকা, ভোঁভাঁ।

বেলা তিনটের পরই শিব আর পার্বতী গোছগাছ শুরু করে দিল। বেশি তো কিছু নেবার নেই। একজন মানুষের বিশেষ কিছুই তো লাগে না। দীর্ঘকাল বাঁচার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের আবর্জনা জমে ওঠে জীবনের চারপাশে। না হলেও চলে। ফেলতেও মায়া লাগে। এই আর কী। এই সব নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে মরে যাওয়া।

পার্বতীর মহাচিন্তা, বেড়ালগুলোর কী হবে? একেবারে বাচ্চা সবে চোখ ফুটেছে।

শিব বললে, 'এই বাড়িতেই থাক। সকাল বিকেল দাদা তো আসবে। তখন একটু দুধটুধ দিয়ে যাবে।'

সন্ধের মুখে গোছগাছ সব শেষ হয়ে গেল। দোতলার ঘরের জানলা, দরজা, ছাদের দরজা, সব বন্ধ করা হল। তালাও পড়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ যেন না ঢুকে পড়ে।

শিব বাগানে। বড় মায়া। কে বলেছে শুধু গাছেরই শিকড় নামে! মানুষেরও অসংখ্য অদৃশ্য শিকড় নেমে আসে, সংসারের গা বেয়ে বটগাছের মতো। পাঁচিলের কোণে অন্ধকার, ছায়াময় অংশে সার সার ক্যাকটাস আর ফার্ন বসিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় নুড়ি বিছিয়ে বেশ একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল। একরকমের খেলাই বলা চলে।

শিব গাছগুলোর সামনে উবু হয়ে বসে আছে। ছোট ছোট পোকা লাফাচ্ছে এখানে ওখানে। একটা দোয়েল বাসায় ঢোকার আগে দিন শেষের গান কণ্ঠভরে গেয়ে নিচ্ছে। একটা কাঠি দিয়ে শিব নুড়িগুলোকে খোঁচা মারছে। নাড়াচাড়া করছে। ভিজে ভিজে মাটি মাটি গন্ধ বেরোচ্ছে। 'কেন যে এত মন খারাপ হচ্ছে কে জানে! একেই বলে ভেতো বাঙালি।'

ভাবতে ভাবতে শিব সারা বাগানটা একবার ঘুরে এল। সুধা পুঁতেছিল পোস্টমাস্টার ক্রোটন। কী বড় হয়েছে! কী বাহার! গাছটার দিকে শিব এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সুধাকেই দেখছে। শিব হয়তো আরও কিছুক্ষণ বাগানেই থাকত। সামনের দরজার কড়া নড়ে উঠল।

শিব শুনতে পাচ্ছে, 'কাউন' বলে পার্বতী দরজা খুলল। তারপর চাপা একচিলতে চিৎকার। বেরোবার আগেই থেমে গেল। যেন চাপা পড়ে গেল।

'কী হল? ডাকাতি, গুন্ডামি! একালে সবই সম্ভব।'

পেছনের বাগান থেকে শিব তাড়াতাড়ি ঘর পেরিয়ে সামনের বারান্দায় ছুটে এল। সদর হাট খোলা। কেউ কোথাও নেই। সামনের রাস্তায় গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ। শিব ছুটে গেটের কাছে গেল। একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। লাল রং।

শিব চিৎকার করল, 'পার্বতী।'

গাড়ির ভেতর থেকে জ্বলন্ত একটা সিগারেটের টুকরো শিবের গায়ে এসে পড়ল। ছ্যাঁক করে উঠেছে। পাগলের মতো হয়ে গেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তায় নেমে ছুটে গেল সামনের দিকে উদভ্রান্তের মতো। গাড়ি তখন কোথায়! শেষ বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাস্তার পাশে শিব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো।

দিনটা ভারী সুন্দর। ঝনঝন করছে।

গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তনুর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়াই স্থির হয়েছে।

পার্বতী নেই। এসেছিল। সামান্য দু'-একটা স্মৃতি ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিব জ্ঞানেশের কাছে ছুটেছিল। জ্ঞানেশ প্রায় শয্যাশায়ী। বিরক্ত। বলেছে, যার যা ভাগ্য। কিছু করার নেই। স্রোতে ভেসে যেতে হবেই। চেষ্টা করেছিলুম। মার খেয়েছি। বাঁচাতে পারিনি। মিটে গেছে।

শিব তর্ক করেনি। কথা বাড়ায়নি। সত্যিই তো, পৃথিবীর সব অনাচারের প্রতিকার কি সম্ভব! তনু আর কৃষ্ণ গাড়িতে মালপত্র তোলার তদারকি করছে। তনুকে তো বেশ সুস্থই দেখছে শিব। সুপ্রভার বয়েস যেন বছর বারো কমে গেছে।

তেমন বেশি কিছু মোটঘাট নেই। কৃষ্ণ বিশাল বড় একটা ফ্লাস্কে চা করে এনেছে। ট্রেনে সবাই খাবে। ট্রেনের চা তেমন সুবিধের নয়।

গাড়িটা ট্যাক্সি নয়। প্রাইভেট কার। সুপ্রভার এক ছাত্রীর বাবা, কলকাতার ব্যাবসাদার, গাড়িটা তিনিই দিয়েছেন। টিকিটের ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

সুপ্রভা তনু একে একে কৃষ্ণর পায়ের ধুলো নিল। শিব নিচু হচ্ছিল, কৃষ্ণ খপ করে দু'হাত ধরে বিরাট বুকে জড়িয়ে নিল।

কৃষ্ণর নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। কথা বলতে পারছে না। আবেগে ভেতরটা কেমন করছে। অনেক রকম আশঙ্কা। অদ্ভুত একটা শূন্যতার বোধ। এই ভাইটাই তো ছিল একমাত্র সঙ্গী। 'কী নিয়ে থাকব! আর কি দেখতে পাবি আমায় ফিরে এসে!' কৃষ্ণ ভাবছে, আর শিবের চোখের দিকে দাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। শিবেরও সেই এক অবস্থা। কথা বলতে গেলেই সে যে ভেতরে ভেতরে কাঁদছে তা ধরা পড়ে যাবে। দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রভা মৃদু গলায় বললে, 'আসুন।'

তনু শিবের হাত ধরল।

সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে। স্টার্ট নিচ্ছে গাড়ি। শিব দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে সদরের পইঠেতে। হাতের আঙুলে দুলছে বাড়ির চাবি। কৃষ্ণের ঠোঁটে হাসি। চোখে জল। শিব হাত নাড়ল। গাড়ি ধীরে এগোচ্ছে। এ পাশের জানলায় শিব, ও পাশে সুপ্রভা। মাঝে তনু। ড্রাইভার অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়েছে।

হঠাৎ শিব বললে, 'থামান। থামান গাড়ি।'

গাড়ি থামল। সুপ্রভা বললে, 'কিছু ভুলে এলেন!'

'হ্যাঁ। ব্যাক করুন। অসুবিধে হবে?'

ড্রাইভার ব্যাক করে গাড়িটাকে আবার গেটের সামনে নিয়ে এল। শিব নামছে। কৃষ্ণ বললে, 'এই দেখো, কী আবার ভুললি?'

'তোমাকে।'

'তার মানে?'

'অসম্ভব, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আপনারা যান।'

সুপ্রভা নেমে এল, 'সে কী! আপনি এত দুর্বল!'

শিব একটা মনের মতো সিদ্ধান্তে আসতে পেরে শক্তি, আনন্দ দুই-ই ফিরে পেয়েছে। হাত জোড় করে বললে, 'বেয়ান, এইখানেই আমার গত পঞ্চাশ বছরের বসবাস। এইখানেই উপন্যাসের শুরু আর এইখানেই শেষ।'

কৃষ্ণ আনন্দে হাসছে। আঙুলের চাবি বনবন ঘুরছে। তনুকে নিয়ে সুপ্রভা চলে যাচ্ছে। উপায় কী? গাড়ি চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পথের বাঁকে।

সন্ধেবেলা। কৃষ্ণ হাসছে হা হা করে। সামনে দাবার ছক।

'বুঝলি শিব, এইভাবেই লেখা হবে আমাদের ইতিহাস। একদা এক শহরে— দুই বৃদ্ধ ছিল-- তাদের দু'জনকে কেউ আলাদা করতে পারেনি। শুধু মৃত্যু এসে..। নে, নে, চাল দে। চাল। চালে ভুল করিসনি।'

অচেনা আকাশ

'এবার একেবারে ফাটিয়ে দিন। ফ্র্যাকচার করে দিন। এমন একখানা ছাড়ুন, বছর তিনেক বেস্ট সেলার লিস্টের প্রথম দিকে যেন ঝুলে থাকে। নট নড়নচড়ন। ফ্রন্ট পেজে একটা বড় করে বিজ্ঞাপন ছেড়ে দেব। তবে হ্যাঁ, রয়ালটি টেন পারসেন্টের বেশি নিলে চলবে না। অ্যাঃ, এই নিন পাঁচশো এখন রাখুন। কপি কবে থেকে ছাড়বেন?'

ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার কোলে ফেলে দিলেন দাশ পাবলিশার্সের ফটিক দাশ। প্রবীণ মানুষ। শ্যামবর্ণ। থলথলে চেহারা। ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরেন না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সঙ্গে ছাতা। লিভার সামান্য কমজুরি। লেখকের রয়ালটি ছাড়া আর কিছু হজম হয় না। চোখের সাদা অংশ অল্প হলদেটে।

পাঁচখানা নোট পাখার বাতাসে ডানাভাঙা পাখির মতো ওড়ার চেষ্টা করছে।

'আরে মশাই টাকা ক'টা তুলুন। আড়ে আড়ে কী দেখছেন! অমন টাকা মাটি ভাব করে বসে থাকবেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। ওসব লোক দেখানো ভড়ং ভাল নয়। আজকের ডেট দিয়ে ডায়েরিতে লিখে রাখুন।'

'ফটিকদা, আমার আর লেখার সাহস নেই। আজকাল উপন্যাস টুপন্যাস তেমন জমে না। পাঠক কী চান তেমন বোঝা যায় না। লিখে বিক্রি না হলে বড় লজ্জা।'

'কেন, আগের বইটা তো মোটামুটি ভালই গেছে। বছর না ঘুরতেই এডিশান। ফর্মুলাটা কী ছিল?'

'ওই পোয়াটাক প্রেম, ছটাকখানেক, সেক্স, পোয়াভর রাজনীতি, আধপোয়া ফ্রাসট্রেশান, এক কাচ্চা ধর্ম, বাকিটা কথার ফুলঝুরি নিসর্গ বর্ণনা।'

'শেষটা একটু ঝুলেছিল।'

'হ্যাঁ, ঠিক গুটোতে পারিনি। ভয়ে। আর একটু খেলত। ফর্মা বেড়ে যাবার ভয়ে মেরে ধরে নায়ককে গর্তে ফেলে, নায়িকাকে বিলেত পাঠিয়ে দি এন্ড করেছিলুম। ফর্মা বাড়া মানে দাম বাড়া। এই বাজারে পঞ্চাশ টাকা দামের বই কে কিনবে।'

'শুনুন, কলম আছে বলেই ধড়াধড় চরিত্র নামাবেন না। উপন্যাসেও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রয়োজন আছে। ওখানেও হারাধনের দশটি ছেলে চলবে না। জন্ম দেবার আগে মানুষ করার কথা ভাবতে হবে। এবারে ফর্মুলাটা একটু চেঞ্জ করুন। প্রেমটাকে আধসের করুন। পোয়াটাক সেক্স। মানে বেশ দুপুরের শো-এর মালয়ালাম। একেবারে পাগল পাগল করা ইলিবিলি মিলিজুলি। ধর্ম বাদ। আজকাল ধর্মের নাম শুনলে মানুষের গায়ে অ্যালার্জির র‍্যাশ বেরোয়। পোয়াভর রাজনীতি ঠুসে দিন। এমন করে রাঁধুন যেন ধরলে আর ছাড়া না পায়। টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়।'

'সে ক্ষমতা আমার কি আছে। উপন্যাস লেখা কি অতই সহজ!'

'ভয় পাবেন, না ভয়। টেক ইট ইজি। কী আছে মশাই, হাতি ঘোড়া। একটা ছেলে একটা মেয়ে। এদিকে এক জোড়া বাপ-মা, ওদিকে এক জোড়া। একটা পাড়া। পাড়া মানে নানা বয়েসের নারী-পুরুষ। রাজনীতি মাস্তান। বোমাবুমি। প্রাচীন আদর্শবাদী, নবীন বেপরোয়া। ঘরে ঘরে কোঁদল আর স্ক্যান্ডাল। চকাচক শাটার টিপুন। ছবির পর ছবি। পর পর সাজিয়ে যান। শেষকালে একটু মোচড়। আমরা লিখি না তাই। কলম ধরলে লেখকদের ভাত মেরে দিতুম। আচ্ছা আমি উঠি, জয় মা বলে বসে পড়ুন। মনে রাখবেন পুজোর আগে বই বেরোবে। ভাবতে ভাবতেই বাজি ভোর না হয়ে যায়। লেখার বেগ আনুন। সকালের বেগ। আর মনে রাখবেন, আঁতলামো করলে চলবে না। বইয়ের

কাটতি করতে হবে। লিখবেন পাঠকের জন্যে। নোবেল পুরস্কারের জন্যে নয়। নোবেল এ-দেশের কেউ পাবে না। আর মানুষের মন নিয়ে, জীবন-দর্শন নিয়ে অযথা কপচাবেন না। পাঠক ওসব পছন্দ করে না। ঘোড়ার মতো টপকে চলে যায়। অ্যাকশান, কেবল অ্যাকশান। লাইনে লাইনে সাসপেন্স।'

'তার মানে গোয়েন্দা কাহিনি।'

'ধ্যাত্ত মশাই। মাথা মোটা। ধরুন নায়ক নায়িকাকে চুমু খাবে। তার আগে বেশি পাঁয়তাড়া করতে দেবেন না। ক্যাঁক করে ধরবে, চ্যাক করে খাবে, তারপর। তারপরই তো মজা, দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। নিয়তি তৈরি হয়ে গেল। মর ব্যাটা এইবার। উপন্যাস কী জানেন, যেমন কর্ম তেমন ফল, অথবা কাঠ খেলে দাস্ত আংরা। নাঃ চলি। অনেক জ্ঞান দিয়েছি।'

ছাতাটি বগলে নিয়ে দাশ পাবলিশার্সের ফটিক দাশ গুটিগুটি বেরিয়ে গেলেন। আর আমি টাকা মাটি ভাব ছেড়ে, একটা একটা করে নোট আলোর দিকে তুলে তুলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। এমন কায়দায় সব জোড় থাকে, সহজে ধরা যায় না। আর এই নোট পরীক্ষা করতে গিয়েই আমার চোখ চলে গেল সামনের বাড়ির ছাদে। বেশ শৌখিন হাল কায়দার বাড়ি। ছাদে নীরস ইটের আলসের বদলে গোল রেলিং। আধুনিকাদের বেশভূষার মতো বেশ খোলামেলা। ছাদের তারে একের পর এক কাপড় জামা মেলে চলেছে সেই মেয়েটি। কোনও দিকে দৃকপাত নেই। কখনও দাঁতে চাপা ক্লিপ। কখনও হাতে। ঝাড়ছে। টানছে। দু'ভাঁজ করছে। পরনে সেই সাদা শাড়ি, খাটো সাদা ব্লাউজ। ভদ্রমহিলার কী সুন্দর রং-সচেতনতা। গায়ের রং ঝকঝকে বাদামি। তার ওপর সাদা শাড়ি আর খাটো কাঁচুলি। এমন মানিয়েছে! সুন্দর শরীর। মোটাও নয়, রোগাও নয়। ধারালো মুখ। টানাটানা চোখ। ধনুকের মতো ভুরু। টুথপেস্টের মতো দাঁত। রেশমের মতো চুল পিঠে দোল খাচ্ছে। মাঝ-সকালের সোনালি রোদ পাগল হয়ে গেছে। আমার বন্ধু বিখ্যাত লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে, পাঠিকারা চিঠি লেখেন— 'আপনার লেখা পড়ে কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যাই।' সেইসব চিঠি মাঝে মাঝে আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়। হিংসেতে জ্বলে মরি। মনকে বোঝাই মন কী করবি বল। সকলের দ্বারা সব কিছু কি হয় বাবু। এবারটা চেষ্টা করে যাও। পরের বার হবে। তা এই ভদ্রমহিলাকে যখনই আমি দেখি কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যাই। আমার ভেতর থেকে ভেতরটা ঠেলে বেরিয়ে যেতে চায়। কী যে হতে থাকে। শেষমেশ ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় মথুরার পথে পথে ধুলো পায়ে হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ বলে ঘুরছি। যেখানে যত ভাল ভাল কবিতার লাইন আছে সব মনে পড়তে থাকে। শেষে শূন্য ছাত। ঝকঝকে টিভি অ্যান্টেনা। নিঃসঙ্গ একটি কাক। খা-খা ডাক। এক সার শাড়ি আর রঙিন সব অন্তর্বাসের বাতাসি বিলাপ।

আমি খুব লজ্জা পাই। আমার এবংবিধ আচরণের কোনও ক্ষমা নেই। মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কে কী কেন, কিছুই আমি জানি না। সামনের ওই সুন্দর ছোট্ট দোতলায় বসবাস। মধ্যবয়সি আর একজন মাত্র মানুষকে বারান্দায় ছাদে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেশ হাসিখুশি। মাই ডিয়ার বলেই মনে হয়। সম্প্রতি গ্যারেজে একটা লাল টুকটুকে মারুতি এসে ঢুকেছে। সম্পন্ন ছোট্ট একটি পরিবার। রাতের দিকে দোতলার দক্ষিণের ঘরে টিভির পরদায় রঙিন ছবি নাচানাচি করে। জোরে কথা বলা নেই। ঝগড়া নেই। শিশুর কান্না নেই। অসীম শান্তি। মহিলার দিকে শ্রান্ত বলদের মতো আমি তাকিয়ে থাকি। মহিলা ভুলেও আমার দিকে তাকান না। আমার ভীষণ অভিমান হয়। মহিলা অবশ্যই বোঝেন একটা মর্কট তাকিয়ে আছে। যে কোনও মেয়ের-ই শরীরে একটা কল থাকে। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মতো। পুরুষরা তাকালেই পিঁকপিঁক করে ওঠে অ্যালার্মের মতো। মাঝে মাঝে মনে হয় বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলি— এই যে শুনছেন, আমি কে জানেন? আমার বই, 'পাকা চুল এলো খোঁপা' আপনি পড়েননি। আমি সেই শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। গত বছর 'মধ্যমণি' পুরস্কারে লাঞ্ছিত হয়েছি। গোটা ষোলো সভায় হয় প্রধান অতিথি

না হয় সভাপতি হয়েছি। নিয়ে গেছে গাড়িতে। ফিরে এসেছি বাসে। মালা গলায় বাসে ওঠা যায় না বলে মালা সভাতেই ছেড়ে আসতে হয়। তা হোক। মালা তো পরেছি। এখন যে মালা পরাতে আসে তার গলাতেই ফিরিয়ে দিই কায়দা করে। ফুটফুটে মেয়ে, সবে চলতে শিখেছে। দু'-একটা সভায় যুবতীও পেয়েছি। আচমকা মালা বদলে তারা কেমন হয়ে যায়। তুচ্ছ ব্যাপার অথচ কী গভীর প্রতিক্রিয়া।

নোট পাঁচটা ডায়েরির খোপে ভরে ফেললুম। সামনের ছাদ ফাঁকা। উদাসী বাউলের মতো হলুদ একটা শাড়ি বাতাসে দুলছে, ভোলামন, মন আমার। আমার কী ভীমরতি হল। এক বছরও হয়নি আমার বউ মারা গেছে। রেখে গেছে অজস্র মধুর স্মৃতি। রেখে গেছে পাঁচ বছরের একটি শিশু। সেই শিশুটি এই মুহূর্তে শহরের সেরা একটি স্কুলে হামপটি, ডামপটি পড়ছে। মাত্র মাসখানেক হল আমার এই নতুন ফ্ল্যাট শেষ করে পুরনো পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি। এখনও খুচখাচ অনেক কাজ বাকি। ধীরে ধীরে শেষ হবে। গোপার খুব ইচ্ছে ছিল নিজের বাড়ি নিজের হাতে নিজের মতো করে সাজাবে। মানুষের ইচ্ছে আর নিয়তির হাসি। আমার সামনে পেলক্রিম দেয়ালে গিল্টিকরা ফ্রেমে গোপা সেজেগুজে স্থির হয়ে আছে। মুখে সেই বিখ্যাত হাসি। বিজয়িনীর হাসি।

আমি কী সাংঘাতিক চরিত্র। গোপার দিকে সারাদিনে ক'বার তাকাই! এই তো এতক্ষণ আমার নজর ছিল সামনের ছাদে। চোখদুটো যেন ডাঁশ ভীমরুল। ভ্যান ভ্যান করতে গিয়েছিল ওই ছাদে। একবার এখানে বসে, একবার ওখানে বসে। অথচ গোপার জন্যে সে-রাতে কী হাপুস কান্না। আর একটু হলে সহমরণেই চলে যেতুম। নেহাত ছেলেটার জন্যে থেকে যেতে হল। চিতায় আগুন জ্বেলে বিড়বিড় করে বলতে লাগলুম, 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

ছবিতে গোপার হাসিটা আজকাল কেমন যেন ঠেকে। ব্যঙ্গের হাসির মতো। ছবিটাকে উদ্দেশ করে বললুম— 'আমার কোনও দোষ নেই। তুমিই আমাকে বখিয়েছ। তুমিই শিখিয়ে গেছ কী আর কী। বড় নেশাতে পড়েছি শ্যামের বাঁশিতে। আমার এই মন, আমার এই চোখ, তোমার খেলাতেই তৈরি। তুমি অমন করে তাকিয়ো না। আমি যাকেই দেখি, তোমাকেই দেখি।'

গোপা মনে হয় বুঝল। ঠোঁটের বাঁকা হাসি সহজ হল। মনে বেশ শান্তি পেলুম। এ কথাও বললুম, 'দেখো আমি লেখক। কৃষ্ণেন্দু, অপরেশ, অনিল না হতে পারি, একজন-দু'জন প্রকাশক বাড়ি বয়ে এসে টাকা দিয়ে লেখা বায়না করেন। লেখকের সাতখুন মাপ। তা ছাড়া তোমার জানা উচিত অরক্ষিত পুরুষ তেমন সুরক্ষিত নয়। তোমার আঁচল সরালে কেন? এখন কত রকমের বাতাস গায়ে লাগছে।'

আমার স্ত্রীর ছবির সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে বেরোবার প্রস্তুতি শুরু করলুম। কাগজের অফিসে চাকরি। মন্দ নয়। বেশ একটা বুদ্ধির বাতাস লাগে গায়। ইন্টলেকচ্যুয়াল হ্যালো আছে। তবে জমা-জল আর মানুষের গর্ব শুকিয়ে যেতে বেশি দেরি হয় না। সবই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। তৃপ্তি কোথায়? আরও চাই। আরও আরও চাই।

আমার মা বড় সাধ করে একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। ষষ্ঠীতলার চারু মুকুজ্যে নাম-করা পরিবার। এক ছেলে দুই মেয়ে। চারু মুকুজ্যের বড় মেয়ে গোপা আমার বউ। ছোট মেয়ে সোমা বেনারসে কোনও এক নাম-করা স্কুলে সমাজবিজ্ঞান পড়ায়। সোমা সুন্দরী; কিন্তু বিয়ে করবে না। সে এক অদ্ভুত কারণ। সোমার শরীরে কোথাও একটা সাদা দাগ আছে। আমি দেখিনি। আমি জানি না। শুনেছি। এও শুনেছি, সোমার আশঙ্কা, ওই টাকার মাপের সাদা দাগ একদিন সারা শরীরে ছড়াবেই। যাকেই সে বিয়ে করুক, তখন সে সোমাকে ঘৃণা করবে। ছোঁবে না। মেয়েরা হয়তো প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকে। মেয়েদের ব্যাপার আমি অবশ্য তেমন বুঝি না। তবে শুনেছি। সোমা সাদা দাগ ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে। জানি না বাবা, এ কেমন মাথা। এত ভবিষ্যৎ ভাবলে বাঁচা যায় না।

তিন মাস আগে আমি সোমাকে দেখেছি। চমৎকার মেয়ে। শরীরের যতটুকু দেখা যায় কোথাও দাগ খুঁজে পাইনি।

চারু মুখোপাধ্যায় মারা গেছেন। শ্বশ্রূমাতা জীবিতা। পরপর দুটো মৃত্যুর আঘাতে ভেঙেই পড়েছেন। আরও ভেঙেছেন আমার বড় শ্যালকের জন্যে। বয়েস বেশি না। কিন্তু দিন দিন দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। অধ্যাপক মানুষ। চোখ চলে গেলে কী হবে— বড় বেদনার ব্যাপার। তবে বিয়ে করেননি। সাধুপ্রকৃতির দিলখোলা মানুষ। গানবাজনা করেন। ভালই জানেন। কথায় কথায় বলেন, সংগীতই হবে আমার শেষের জীবিকা।

বাঙালির বোলবোলা এক পুরুষেই শেষ হয়ে যায়। তাদের আবার প্রেম, সেক্স, বিপ্লব, ব্যারিকেড। ফটিকবাবুর ফর্মুলায় উপন্যাস লিখতে হবে। পাবলিক যা খায় সেই ভাবেই পরিবেশন করতে হবে। উপায় কী। ওই দেখে শুনে একটা ক্যারেক্টার ধরতে হবে। নিজেকে নিয়ে তো আর লেখা যাবে না। প্রেমও করিনি, রেপও করিনি। লাশও ফেলিনি। দাদাদের সঙ্গেও খাতির নেই। মা বিয়ে দিলেন। এক বছর বউয়ের সেবা খেলেন। আশ্বিনে পরলোক যাত্রা। নাতির মুখ দেখার অবসর হল না। শুনেই গেলেন গোপার ছেলেপুলে হবে। গোপাও সরে পড়ল। সব যেন ঝটিতি ঘটে গেল। আর আমি পড়ে গেলুম ফাঁদে। আমি এখন কী নিয়ে বাঁচি। এই নতুন ফ্ল্যাট আমার। ঘরের পাশে ঘর। ঝুল বারান্দা দক্ষিণে। পশ্চিমে কৃষ্ণচূড়ার সবুজ বাহার। একবার এদিক যাই, একবার ওদিক যাই। যারা চলে গেল তাদের যে ফিরিয়ে আনব সে উপায়ও নেই। এমন এক নাট্যকারের পাল্লায় পড়েছি। নাটকের এক-একটা অঙ্ক একবারই হবে। যেসব চরিত্র মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তাদের আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমার ঈশ্বর এমনই এক ডিক্টেটার। তাঁর রাজত্বে বসবাস। রাগে, অভিমানে, বেদনায় মাঝে মাঝে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে। গোপার সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা জমে ছিল ভাল। ভেবেছিলুম শেষ অবধি চলে যাব হাত ধরাধরি করে। একটা টুসকি। তাসের ঘর ভেঙে পড়ে গেল। এই ফ্ল্যাটটা বেচে দেব। দিনগত পাপক্ষয় করে হাওয়া হয়ে যাব।

তা কি আর হবে! ছেলেটার কথা তো ভাবতেই হবে। কত বড় একটা সম্পত্তি আগলাবার ভার দিয়ে গেছে গোপা। যাক এখন বেরিয়ে পড়া যাক। রাস্তায় নামলে তবু একটা লক্ষ্য পাওয়া যায়। যেতে হবে। কোথাও না কোথাও যেতে হবে। হয় অফিসে, না হয় ছেলের স্কুলে। ছুটির পর ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে। কখন বাবা আসবে। এই বিশাল শূন্যতায় ওই ছোট্ট প্রাণটুকুই আমার পূর্ণতা। ভরাট করে রেখেছে। ও বড় হবে, সেই অপেক্ষায় বাঁচা। গোপার ছেলে বড় হবে।

সামনের বাড়ির গ্যারেজ থেকে লাল টুকটুকে মারুতি বেরিয়ে আসছে। আমার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে গেল, যেন শিস দিতে দিতে, পান চিবোতে চিবোতে চলেছে আপন মনে। দেখলেই লাল লিপস্টিক লাগানো কামুক ঠোঁটের কথা মনে পড়ে যায়। অমন ঠোঁট অবশ্য আমার জীবনে আসেনি। গোপার এক বান্ধবী ছিল। লাল ঠোঁট। সংক্ষিপ্ত মিহি বেশবাস। দু'-একবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। গোপা থাকা সত্ত্বেও তার পাকা, পরিকল্পিতভাবে উন্মোচিত শরীর দেখে আমার যে ভারী কষ্ট হচ্ছে এই বোধে তার মুখে সদাসর্বদা একটা বিজয়িনীর হাসি লেগে রইল। কিছু মানুষের কত সহজে মাথা ঘুরে যায়। যেমন আমার। সেই মহিলাকে আজও ভোলা সম্ভব হল না। মনে একটা পাকাপাকি ছাপ রেখে গেছে। মাঝে মাঝে গোপাকে ওই রূপে ওই সাজে দেখার ইচ্ছে হত। মাঝে একবার পার্ক স্ট্রিটে মহিলাকে একঝলক দেখেছিলুম। বেশ চটকদার একটা গাড়ির সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে ফুরফুর করে চলেছে। বাতাসে চুল উড়ছে। চোখে সানগ্লাস। নিমেষের জন্যে মনে হয়েছিল কলকাতাটা কী মিষ্টি শহর।

গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যেতেই কায়দা করে সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দার দিকে তাকালুম। হিসেবে ভুল হয়নি, মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেও দেখল না। মাঝে মাঝে

সন্দেহ হয়, আমি কি ক্রমশই কুৎসিত হয়ে যাচ্ছি। মনে অবশ্যই কুৎসিত হয়েছি; কিন্তু চেহারায়। অল্প একটু ভুঁড়ি মতো হয়েছে। সে তো সকলেরই হয়। মেয়েদেরও হচ্ছে আজকাল।

চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম স্টপেজের দিকে। মন অভিমানে টসটস করছে পাকা ফোড়ার মতো। আমি এত বড় একটা ইন্টেলেকচ্যুয়াল। একমাথা এলোমেলো ঝুমকো ঝুমকো চুল। চোখে দামি ফ্রেমের চশমা। পড়ি না পড়ি আমার একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি আছে। মুখে উদাসী ভাবের আলপনা। মেয়েদের দিকে তাকাবার নেশা পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। ভদ্রলোক সেই ইন্টেলেকচ্যুয়ালকে পাত্তা না দিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন হুস করে। খাতির করে একটা লিফ্‌ট দিতে পারতেন। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' এ কি আজকের কথা!

এইসব ভাবতে ভাবতে গরমে ঘাঁমতে ঘামতে, মাথা নিচু করে আপন মনে চলেছি। দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ালেন। পরিধানে ধুতি আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা। ফরসা টকটকে রং। মধ্যবয়সি। মুখ আর সাজপোশাক দেখে মনে হল অধ্যাপক। বুক চিতিয়ে, ভুঁড়ি ফুলিয়ে অপসংস্কৃতির বিজ্ঞাপনের মতো সামনে খাড়া।

'নতুন এলেন?'

'আজ্ঞে তা প্রায় মাস দুয়েক হল।'

'ওই নতুন ফ্ল্যাটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শুনেছি লেখেন-টেখেন।'

'ঠিক শুনেছেন।'

'কাগজের অফিসে কাজ করেন?'

'তাও ঠিক।'

'ফিউচার আছে?'

'প্রশ্নটা বুঝলুম না।'

'সিকিউরিটি আছে? মাইনেপত্তর কেমন?'

'মন্দ না, চলে যায় কোনওরকমে।'

'প্রোমোশানের চ্যানেল আছে!'

'ইংলিশ চ্যানেলের মতো প্রশস্ত নয়, অনেকটা টালি নালার মতো। ঠেলতে পারলে এগোনো যায়।'

'গত বছর পুজো সংখ্যায় একটা উপন্যাস ছিল!'

'ধরেছেন ঠিক।'

'আমি আবার আজেবাজে জিনিস পড়ে সময় নষ্ট করি না। আপনি এ পাড়ায় এসেছেন শুনে ওরা সেদিন বলছিল।'

'ওরা মানে?'

'আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে। ওরা আবার সর্বভুক। ওরাই বলছিল, শুরুটা ভালই করেছিলেন, শেষটা ঝুলে গেছে। লেখা কি অত সহজ মশাই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলাদেশে কলম ধরতে হলে কবজির জোর চাই।'

'স্প্রিং ডাম্বেল ভাঁজতে বলছেন?'

'আঁতে লেগেছে মনে হচ্ছে। ডাম্বেল বারবেলের ব্যাপার নয়। চাই প্রতিভা। রবিবার খাওয়াদাওয়ার পর পুজো সংখ্যাটা নিয়ে শুয়েছিলুম। দু'-চার পাতা পড়ার পর ঘুম এসে গেল। লেখাটার তেমন টান নেই। ভেবেছিলুম সন্ধের পর একবার চেষ্টা করে দেখব। তা বইটাই আর খুঁজে পেলুম না। হয়েছে কী পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। বুকের ওপর ছিল। যেই পাশ ফিরেছি খাটের

ওপাশে পড়ে গেছে। সে এখন বিশ বাঁও জলে। সব মালপত্তর ঠেলেঠুলে সরিয়ে বের করতে হবে। ভজঘট ব্যাপার। যাক আলাপ হল। আপনাকে আমি কাজে লাগাব। ছাড়ব না সহজে। রবিবার সন্ধের দিকে থাকেন?'

'না।'

'অন্যদিন?'

'অনিশ্চিত।'

'অ্যাভয়েড করতে চাইছেন?'

'না না, তা কেন?'

'তা হলে বলছেন কেন থাকি না। অনিশ্চিত। দ্যাটস ভেরি ব্যাড অফ ইউ। দু'ছত্তর লেখা বেরোতে না বেরোতেই অহংকার। আচ্ছা চলি। সি ইউ সামটাইমস।'

ভদ্রলোক রাজকীয় চালে উলটো দিকে হাঁটা দিলেন। আমি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ হাসলুম। মূর্খ! একে কী বলে জানিস, সোশ্যাল আকুপাংচার। সমাজে বাস করবে, আবার নাম করার চেষ্টা করবে, লোকে তোমার চলার পথ গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঢেকে দেবে! গাধা। চলো অফিস চলো।

দু'পা এগোই আর মন খচখচ করে। ভদ্রলোক সুন্দর। স্ত্রী অবশ্যই সুন্দরী। মেয়ে অতি অবশ্যই পরমাসুন্দরী। তাঁরা বলেছেন, শুরুটা ভালই হয়েছিল, শেষটা গেঁজে গেছে। আহা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করা হল না— মশাই, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অপরেশ মজুমদার, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেব গুহর লেখা কেমন লাগল। ওঁদের পাশে আমার লেখা কি একেবারেই অচল। কোনওরকম ক্ষমা-ঘেন্না করেও কি খেপে খেপে শেষ পর্যন্ত পড়া যায় না!

আবার মন থেকে ঘিনঘিনে চিন্তা ঝেড়ে ফেললুম। আবার ফিরে এল। ফটিকদাও বলছিলেন স্পিড চাই। কথা দিয়ে কথা দিয়ে, পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে এগোলে চলবে না। রকেটের বেগ চাই। তা হলে লেখার ধরন কী দাঁড়াবে। লিফ্‌ট। সাততলার অ্যাপার্টমেন্ট। বেল। কে? আমি। ও খুলছি। খুলল। লীনা। তুমি এসময়ে! হট। ভেরি হট।

না, দু'বার হট বলার প্রয়োজন নেই। একটা হট বাড়তি। কেটে দাও দুটোই কেটে দাও। মুখে হট বলার কী আছে? কাজে দেখাও। তা হলে কী দাঁড়াবে?

তুমি এসময়?

হুঁ।

জড়িয়ে ধরলুম। ডিভানে পড়লুম।

এই জায়গায় সামান্য একটু সাহিত্যের ফোড়ন দেব কি? ফটিকদা, কী বলেন আপনি? পাবলিক খাবে তো?

সামান্য একটু দিন, তা না হলে ভীষণ ন্যাড়া লাগছে।

তা হলে দিই হালকা করে এক ডোজ চাপিয়ে।

কখনও আমি ওপরে। কখনও লীনা ওপরে। শেষে ওপরও নেই, নীচও নেই। সব একাকার। বিচ্ছুরিত, বিস্ফারিত চিত্রপট। এভারেস্টের গা বেয়ে হিমবাহ নেমে আসছে সগর্জনে। গোমুখসে প্রবাহিত গঙ্গা। প্লেটে গলছে আইসক্রিম। একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে। ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে টিনের চালের কোনা বেয়ে। যতদূর দেখা যায় বিস্তীর্ণ সবুজ ধানখেত। শেষ মাথায় আকাশের গা বেয়ে শেষ রাতের তস্করের মতো রমণক্লান্ত চাঁদ উঠছে। সামনের বাড়ির লাল মারুতি ছুটে আসছে। না মারুতি নয়, লীনার রাঙা ঠোঁট। পুড়ছে গলছে গালায় আগুন লেগেছে। লেফাফা সিল করছে হেডআপিসের ডেসপ্যাচার মধ্যবয়স্কা নিভা। লীনা উঠে বসেছে।

এরপর কী করব ফটিকদা?

এরপর কী করে? বাস্তবে কী হয়?

তা তো জানি না। লীনাকে তো কোনওদিন জাপটে ধরিনি। গোপাকে সাপটেছি। তাও শয্যায়। নিজের রাইটে। সে বলত, খুব হয়েছে ট্যাড়শ, পাশ ফিরে শান্ত হয়ে শোও। তবে অপরেশবাবুর উপন্যাসে যা হয় পড়েছি। কারুর মতো যেন না হয়। স্বকীয়তা থাকা চাই।

তা হলে এই করি, লীনা মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। অনাবৃত চওড়া পিঠে ঘাম চিকচিক করছে। লীনা মৃদু গলায় বললে,— যাঃ, তুমি একটা যা-তা। আমি বিবাহিতা।

সো হোয়াট। আমি বিবাহিত।

লীনা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে। চওড়া পিঠের ওপর আমার লোভী চোখ ঘুরছে। আমি মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।

আমি টাইগার প্রোজেক্টের টাইগার। পার্ক স্ট্রিটের রম্য রেস্তোরাঁয় সিজলারে মাংসের টুকরো চটরপটর করছে। সগর্জনে খুমবু হিমবাহে ঢল নামছে। আমি কঁ্যাক করে লীনাকে ধরলুম। দু'জনে গড়িয়ে পড়ে গেলুম কার্পেটে। হাত লেগে উলটে গেল সেন্টার টেবল। কাটগ্লাসের শৌখিন অ্যাশট্রে ঠিকরে চলে গেল কোণে। আমার বিবেকের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো। পাশের ঘরের ভারী পরদা দুলে উঠল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরিহিত লীনার স্বামী বেরিয়ে এল ধীর পায়ে। সেন্টার টেবলটা তুলতে তুলতে বললে, সব কিছুর মধ্যে একটা ডিসেন্সি থাকা উচিত লীনা। জানবে, সেক্স ইজ অ্যান আর্ট— ইয়েস, অ্যান আর্ট!

আমি বললুম, প্লিজ গিভ মি এ হট ব্যাগ। আই হ্যাভ স্প্রেন্‌ড মাই স্পাইন।

আরে, আপনি ইংলিশ মিডিয়াম?

অফকোর্স।

মি টু।

লীনা বললে, আমিও। গিভ মি এ সিগার প্লিজ।

কেমন হল ফটিকদা? বেশ জম্পেশ না? পাবলিক খাবে তো!

নয়া জমানার লেখা নিয়ে এমন মশগুল যে একের পর এক বাস, মিনি থামছে, চলে যাচ্ছে, খেয়ালই নেই। এবার একটা মিনি আসতেই ঝট করে উঠে পড়লুম। ভাগ্য ভাল। বসার জায়গাও মিলে গেল। গোটা দুই স্টপেজ এগোতেই জানলার ধারে প্রোমোশান।

ছুটছে মিনি। ছুটছি আমি। ভাঙাচোরা কুৎসিত কলকাতা উলটোদিকে ছুটছে। আমাদের ছাত্র জীবনের শান্ত সুন্দর কলকাতা আর নেই। আর ভাবতে পারি না। মানুষ মরে, শহর মরবে না। নিউইয়র্ক, প্যারিস, ব্রাসেলস, কলকাতা। ভেতরটা কেমন করে ওঠে। সিটি ফাদার্স, শহর-পিতারা একটু আঁখি মেলো। শহরে স্কুটার, মটোর সাইকেল, মোপেডের সংখ্যা খুব বেড়েছে। হেলমেটের পর হেলমেট, গোল গোল বলের মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে।

ঈশ্বর তোমাকে যখন যে অবস্থায় রাখবেন, তাইতেই সন্তুষ্ট থাকবে। বেশি আশা কোরো না, হতাশাই বেড়ে যাবে। জানলার ধারে বসে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুটে যেতে বেশ লাগে। কত রকমের বাঁচা চোখে পড়ে। তেমন যে লিখতে পারি না। কলমের সেরকম বেপরোয়া শক্তি থাকলে ফাটিয়ে দিতুম। ওই যে গাছতলায় উদাসমুখে ফিকে হলুদ রঙের শাড়ি পরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আমার নায়িকা করতুম। আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই থাকে ওইরকম। তেমন সুখের জীবন নয়। ছোট ছোট স্বপ্নের মালা গাঁথে। দিন ফুরোলেই সব ঝরে যায় শুকিয়ে।

দুঃখের যে কী নেশা! খাঁ খাঁ দুপুরের মতো মাতাল করে তোলে। চরিত্রের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবী বড় আপন হয়ে ওঠে। প্রকৃতি কত কাছে চলে আসে। এই যে গোপা নেই, কেউ নেই, ভীষণ

একটা কষ্ট, ভীষণ হাহাকার, খারাপ লাগে না। হাসার চেয়ে কাঁদতে ভাল লাগে। হঠাৎ এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়ে দুঃখটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি না। বিষয় বড় বেয়াড়া জিনিস। বিষয় বিষ। দিনকতক দেখি তারপর বেচে দেব। খুব হয়েছে। আর আমি নতুন করে পিঁড়েতে বসতে পারব না। নতুন সংসার, অসম্ভব। ছেলেটা তো হস্টেলেই থাকবে। কী হবে আমার চার কামরার মঞ্জিল! আজকাল সব সময় সব কিছুতেই মনে হয়— কী হবে? কী হবে বেঁচে, লিখে, বই প্রকাশ করে! কী হবে চাকরি করে! কী হবে পড়ে!

শহরের ও-তল্লাটে থাকার সময় সম্মানিত প্রবীণ ডাক্তার সুরেন সরকার বেশ মিষ্টি জুতো মেরে আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিয়েছিলেন। অহংকার চুরমার করে দিয়েছিলেন। তখন খুব অভিমান হয়েছিল। এখন ভাবি বেশ করেছিলেন। জীবন-ফানুস থেকে যত তাড়াতাড়ি পিন ফুটিয়ে বাতাস বের করে দেওয়া যায় ততই ভাল। প্রথম জীবনে মানুষ ঘোরে থাকে। খানিকটা চ্যাংড়ামি খানিকটা আঁতলামি, অল্প বাঁদরামি মিলিয়ে যত বারফট্টাই! প্রথম উপন্যাস সবে বেরিয়েছে। ভেতরটা ছটফট করছে। সকলে জানুক, দেখুক, পড়ুক। বাহবা দিক। ঘরের টেবিলে এক কপি খাড়া করে রেখেছি। দু'-চারজনকে সই করে উপহার দিয়েছি। এক সেট পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি তৈরি করিয়েছি। খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে সাইড ব্যাগ কিনেছি। আয়োজনের ত্রুটি নেই। কম বয়সে মানুষের অনেক ভীমরতি হয়। সেই পাজামা আর পাঞ্জাবি উড়িয়ে শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে হাজির। হাতে আমার প্রথম উপন্যাস। সাংঘাতিক তার নাম 'তোমার আমার'। কায়দার লেখা। পুরোটাই ফ্ল্যাশ ব্যাকে। বর্তমানে ব নেই, সব অতীত। তুমি আমায় কী বলেছিলে, আমি তোমায় কী বলেছিলাম। সব ভাল ভাল কথা। বই হয়ে বেরোবার পর নিজে আর একবার পড়ার চেষ্টা করে কেঁদে ফেলেছিলুম। মনে হয়েছিল পুলিশের স্বীকারোক্তি আদায়ের থার্ড ডিগ্রি। যে-কোনও অপরাধীকে পড়তে দিলে, একপাতার পরেই বই ফেলে দিয়ে অপরাধ কবুল করে বসবে। আজকাল শুনেছি চৌমিন দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। ঢাউস এক পাত্রে ওই ন্যালন্যালে কেঁচোর মতো জিনিস গরম গরম, সামনে অপরাধী। খা ব্যাটা। ও তো খাওয়া যায় না, গিলতে হয়। চামচে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখে ঢুকিয়ে যাও। গলা থেকে পেট অবধি টানাপোড়েন। কোথাও ছেদ নেই। একবার শুরু করলে শেষ অবধি না ঢুকিয়ে থামা যাবে না। যেন মালগাড়ি চলেছে। শেষ বগিটা না য়াওয়া পর্যন্ত লাইন ক্লিয়ার হবে না। পেটে ঢুকছে তো ঢুকছেই। শেষে ড্যালা ড্যালা চোখে অপরাধী অফিসারের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় জানালে, বলবে। চোরাই মাল কোথায় আছে বলবে। অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে কাঁচি বের করে কুচ করে নুডলসের জট কেটে দিলেন। আমার উপন্যাস আর চৌমিন এক জিনিস। মানুষের ওপর থার্ড ডিগ্রি।

প্রবীণ ডাক্তারবাবু বারান্দায় বসে আছেন। গেরুয়া পোশাক। হাতে স্বামী বিবেকানন্দের বই। সূর্য পাটে বসেছেন। পশ্চিম আকাশ লাল আগুন। ডাক্তারবাবুর চোখ চলে গেছে দিনান্তের আকাশে। মুখে খেলছে অদ্ভুত প্রশান্তি। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'কী চাই?'

প্রণাম করে বইটি হাতে দিয়ে বললুম, 'আমার প্রথম উপন্যাস। আপনার করকমলে।'

বলতে বলতে আমার ভাব এসে যাচ্ছিল, 'একসময় আপনি আমাকে সাংঘাতিক ডিসপেপসিয়া থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, বেঁচে গিয়েছিলুম বলেই এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অনুগ্রহ করে আপনি পড়ে দেখবেন।'

গম্ভীর গলায় বললেন, 'তখন বলোনি তো!'

'আজ্ঞে কী বলিনি?'

'তোমার এই রোগ আছে?'

আমার মনে হল উনি আমাকে আদর করছেন। সোহাগ করছেন। করবেনই তো। আমি এই পাড়ার কত বড় কৃতী সন্তান। অনেকেই তো কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন, 'আমার আবার একটু

লেখাটেখার রোগ আছে!' সোহাগ করলে বেড়াল যেমন ঘড়ঘড় করে, আমিও সেইরকম গলায়, লজ্জা লজ্জা করে বললুম, 'আজ্ঞে এ কী আর বলার মতো ব্যাপার!'

'তা ঠিক, গুপ্তব্যাধি, লজ্জা করে না?'

হঠাৎ গলা চড়ে গেল।

'লজ্জা করে না, বুড়ো দামড়া! পৃথিবীতে করার মতো কাজ পেলে না! উঁ, আবার নাম রাখা হয়েছে, 'তোমার আমার'। কী আছে এতে?'

অপমানে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে। কোনওরকমে বললুম, 'আধুনিক উপন্যাস। নব রীতিতে লেখা।'

'বুঝেছি হে ছোকরা। তুমি হল একটা মেয়ে আর আমি হল লেখক নিজে। সেই তোমার সঙ্গে আমার যত ফস্টিনস্টি। শোনো হে ছোকরা, আমার সময় অত সস্তা নয়। আমার সময়ের দাম আছে। তোমার ওই আত্মপ্রলাপ পড়ার মতো সময় আমার একদম নেই। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার বই।'

মার খাওয়া কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছি, ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'শোনো, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারপর সব শূন্য। সব ডিসপেপটিক সাহিত্য। বাজে সময় নষ্ট না করে কিছু কাজের কাজ করার চেষ্টা করো। বাঙালির অতি দুঃসময়।'

ডাক্তারবাবু আর নেই। আমি আছি। কাজের কাজ কী আর করব! পরিশ্রম পোষায় না। সহজ কাজ, জ্ঞান দেওয়া। পাকাপাকা কথা বলা। ছাপার অক্ষরে দু'-চারবার নাম দেখাতে পারলেই সার্টিফিকেট মিলে গেল। বুদ্ধিজীবী। প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ওড়াও আর মুখেন মারিতং জগৎ।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিস। আমার আগে আগে বিধুবাবু ঢুকছেন। নাকে পাটকরা রুমাল। ডাক্তারের নির্দেশ বাইরের গরম থেকে ভেতরের ঠান্ডায় হঠাৎ প্রবেশের সময় সাবধান। নাক দিয়ে ঠান্ডা ঢুকে ফুসফুসে চামর বোলালে চিরস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস। বিধুবাবুর দেখাদেখি অনেকেই নাকে রুমাল চাপা দিতে শুরু করেছেন।

সকলেই ভীষণ বাঁচতে চায়, অথচ মৃত্যুর কী দাপট! একবার নোব মনে করলে রক্ষে নেই।

অফিসে ঢুকলেই আমার অন্য চেহারা। কে এগোল, কে পেছোল! ট্র্যাকে আমি এখন কোন পজিশানে? থেকে থেকে কাজ রয়ে রয়ে পরচর্চা। বড় কাগজের অফিস আজকাল আধুনিক যন্ত্রে সেজে উঠেছে। তার জ্বালা কম নয়! ইংলিশ মিডিয়াম কম্পোজ যন্ত্র বাংলা ভাষাকে চিবিয়ে শেষ করে দিতে পারলে বাঁচে। যুক্তাক্ষর দেখলেই খচচচ বলার প্রবণতা।

চেয়ারে বসতে বসতেই হুংকার— 'চা বোলাও।'

॥ দুই ॥

আমি আবার গাছটাছ তেমন চিনি না। শহরেই জন্ম। শহরেই মৃত্যু হবে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে আর বিষাক্ত বাতাস নিয়ে। আমার ছেলের নাম কমল। গোপা বলেছিল, দাঁত ভাঙা, বিদঘুটে, ইনটেলেকচ্যুয়াল নাম রেখে ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট কোরো না। সুন্দর একটা মিষ্টি নাম রাখো।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। কমল সেই গাছের তলায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মা-মরা শিশুটি। স্কুলে গাড়ি আছে। আমি ইচ্ছে করেই গাড়ির ব্যবস্থা করিনি। বড় সময় নষ্ট হয়। ঘুরে ঘুরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে যাওয়া আসা। আমার একটু পরিশ্রম হচ্ছে, হোক। তা ছাড়া ছেলেটার ওপর একটু টান থাক। শেষ যৌবনে মৃতদার মানুষকে বিশ্বাস না করাই ভাল। কখন কোথায় বাঁধিয়ে বসে

থাকবে! গর্তে পড়ার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে মরে। তখন কে ছেলে, কার ছেলে! সব ভেসে বেরিয়ে যাবে।

'কমল!'

কিছুদূর থেকে রোজ আমি এইভাবেই ডাকি। বেশ দেখতে হয়েছে আমার ছেলেটাকে। টুকটুকে ফরসা। ধারালো মুখ। বড় বড় নিষ্পাপ নীল দুটি চোখ। পৃথিবীর নোংরা ঝাড়ু এখনও গায়ে লাগেনি। আমাদের বংশে কেউ এমন সুন্দর ছিল না। মামার বাড়ির দিকেই গেছে। ছেলেটার ভাগ্য ভাল। চেহারা একটা বাড়তি সম্পদ।

কমল সব সময় নিজের ভাবে থাকে। ওর জগৎ আলাদা। আমার জগৎ আলাদা।

কমল ঘুমঘুম চোখে এগিয়ে এল। ওদের স্কুলের ইউনিফর্মটা ভারী সুন্দর। হাত বাড়িয়ে দিলুম। হাত ধরল। আমরা দু'জনে এগিয়ে চলেছি ফুটপাথ ধরে। বড়লোকদের গাড়ি এসেছে রং-বেরঙের। রাস্তাটা একেবারে ভরে গেছে। প্যাঁ পোঁ হর্ন। গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ। নানা ভাষায় নানা কথা বাতাসে উড়ছে। উড়ছে বড়মানুষের মেয়েদের শাড়ির আঁচল। ফুরফুরে আধুনিক চুল। এ যেন পরিদের সম্মেলন। রাস্তার দু'ধারে গাছ। বেশ টিপটপ জায়গা।

ভিড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে, যত এগোচ্ছি। কমল আপন মনে পাশে পাশে হাঁটছে। এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ বললে, 'তুমি একটা কাজ পারবে?'

'বলো বাবা?'

'তুমি এখন আমাকে একটা চকবার আইসক্রিম খাওয়াতে পারবে?'

'বাবু, ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়, তবে তোমার যে টনসিলের ধাত। সারা রাত কাশবে।'

'তা হলে জীবনে আর আমি আইসক্রিম খেতে পারব না!'

'দূর বোকা, জীবন তো সবে শুরু হল। এখনও কত বাকি। কত দেশ ঘুরবি। কত কী দেখবি। কত কী খাবি!'

'তা হলে তুমি আমাকে ওই নার্সারি থেকে একটা কদম গাছ কিনে দাও।'

'কদম গাছ?'

কোথায় আইসক্রিম আর কোথায় কদম গাছ!

'কদম গাছ কত বড় হয় জানিস? কোথায় পুঁতবি?'

'টবে।'

'টবে কদম গাছ হয় না।'

'অমিত বলছিল বনসাই করলে টবে বট গাছও হয়। তুমি ওই বিশ্রী বাড়িটা কিনলে কেন?'

'সে কী রে, বিশ্রী কী রে? অমন সুন্দর নতুন ফ্ল্যাট।'

'তুমি ওটা বিক্রি করে একটা বাগান কেনো। বেশ বড় বাগান। অ্যাঁ বাবা। কাল তো রবিবার! কালই কেনো না?' মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললুম। কমলকে মামার বাড়িতে রেখে আবার আমাকে অফিসে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ কলমবাজি করে, ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরব। কে বলেছিল, ভাগ্যবানের বউ মরে। সে একটা গাধা।

গাড়িতে ওঠার সময় কমল বললে, 'আমি যদি সামনে বসি, তুমি রাগ করবে?'

'রাগ নয়, দুঃখ হবে।'

'কেন?'

'সব সময় তুমি আমার পাশে না থাকলে আমার দুঃখ হয়।'

'আমারও যে দুঃখু হল।'

'কেন? দুঃখু হল কেন?'

'তুমি আমাকে আইসক্রিমও দিলে না, কদম গাছও কিনে দিলে না।'

কমল শেষ পর্যন্ত আমার পাশেই বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। সোজা রাস্তা পেয়েছে। হু হু করে ছুটছে গাড়ি। কোলের ওপর সুটকেস রেখে কমল ডালাটা খুলে ফেলল। খুঁজে খুঁজে কী একটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খেয়ে দেখো।'

'অ্যাঁ!'

গোল মতো কী একটা জিনিস, সামান্য চটচটে।

'এটা কী রে বাবু?'

'খাও না, ওপরটা গলে গেলে ভেতরে শক্ত মতো একটা জিনিস পাবে, কুট করে কামড়াবে তখন।'

মুখে ফেলে দিলুম। চকোলেট জাতীয় জিনিস। বেশ ভালই স্বাদ। ভেতরে একটা বাদাম বসে আছে। খুব কায়দার জিনিস।

'কোথায় পেলি রে বুড়ো?'

গম্ভীর চালে বললে, 'আমি পাই। আমার বন্ধুরা আমাকে কত কী দেয়! জানো কি তা? এই দেখো।'

একটা ছবি বের করে আমার হাতে দিল। থ্রি-ডাইমেনশানাল ছবি। বেশ মজার জিনিস। একটু এদিক ওদিক করলে আরও দুটো ছবি ফুটে ওঠে।

'এই দেখো। নাড়াও নাড়াও বাজনা বাজবে।'

কমল আমার হাতে একটা কলম দিল। কলমটার ভিতর একটা কিছু করা আছে। এপাশ ওপাশ করলে টুংটাং বাজে।

'তোর বাক্সে কত কী আছে রে বুড়ো!'

'আমি জাদু জানি। দেখবে? এই দেখো আমার গোঁপ!'

ঠোঁটের ওপর একটা নকল গোঁফ লাগিয়ে, পেছনে হেলান দিয়ে কমল বসে আছে ভারিক্কি চালে। গাড়ি শরৎ বোস রোডের দিকে বাঁক নিচ্ছে। আমরা প্রায় এসে গেছি। আর একটু পথ। কমল সুটকেস হাতড়ে আর একটা চকোলেট বের করেছে। কচি কচি হাত সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে দোলাতে দোলাতে বললে, 'এই নিন। অনেকক্ষণ তো গাড়ি চালিয়েছেন।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে গালে ফেললেন। তারপর পেছন দিকে এক লহমা তাকিয়ে কমলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'বেশ ছেলেটি আপনার! দেখবেন জীবনে অনেক বড় হবে এই ছেলে। ভেরি বিগ।'

হুম!

আমি হাসলুম। সবই নির্ভর করছে আমার ওপর। আমি বেচাল হয়ে গেলে ছেলেটার কী হবে? কে দেখবে? একই সঙ্গে মা হতে হবে, বাবা হতে হবে। চরিত্রটাকে ঠিক রাখতে হবে। চরিত্র যে কতভাবে হড়কাতে চায়।

এই রাস্তাটায় ঢোকার মুখে ডানপাশে একটা বাড়ি আছে। সাবেক কালের দোতলা বাড়ি। বেশ ফলাও করে তৈরি হয়েছিল একসময়। অবস্থা পড়ে এসেছে এখন। মানুষের অবস্থার এই এক দোষ। কিছুতেই সমান যায় না। হয় পড়বে, না হয় উঠবে।

কার্নিশে বট অশথের চারা লকলক করছে। শেষ বেলার রোদে বেশ সুন্দর মনমরা মতো দেখাচ্ছে। এই শ্মশানচারী গাছ দুটি মানুষের দুরবস্থার একমাত্র সঙ্গী। শ্মশানে গোপার চিতা জ্বলছে, আমরা বসে আছি বটতলার বেদিতে। আমার দেশের ভিটেতে বটের স্বাস্থ্য দেখলে আনন্দ হয়। বোঝাই যায় চট্টোপাধ্যায় পরিবার ছারখার হয়ে গেছে।

এই বাড়িটায় মৃগাঙ্ক বোস বলে অদ্ভুত চরিত্রের এক ভদ্রলোক থাকেন। ভেতরদিকে গোটাকতক ঘর আছে বসবাসের উপযোগী। পেছনে বারান্দা রংবেরঙের বেলজিয়াম গ্লাসে ঘেরা ছিল। একটা-দুটো ভেঙে গেছে। বাকি সব এখনও ঠিক আছে।

মৃগাঙ্ক বোস এই পাড়ার সকলের প্রিয়। এমন একজন নিঃস্বার্থ আত্মভোলা মানুষ এ বাজারে দেখা যায় না। একটা ঘরের মার্বেলের মেজে খুঁড়ে তুলে, বিক্রি করে এক দুস্থ মানুষের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করেছিলেন। গোপা বলেছিল, 'আপনি ডাহা বোকা।'

মৃগাঙ্ক বলেছিলেন, 'লাল সিমেন্টের মেজেই তো যথেষ্ট। পোড়ো বাড়িতে ইটালিয়ান মার্বেল কী হবে! তবু একটা মেয়ের বিয়ে হোক।'

মৃগাঙ্ক বোস বিয়ে করেছিলেন। বউ ছেড়ে চলে গেছে। তিনি নাকি খুব আমার আমার করতেন। মৃগাঙ্কর মন্ত্র, তোমার তোমার। নিয়ে যাবে নিয়ে যাও। মৃগাঙ্ক দিতে পারলে বেঁচে যান। হিসেবপত্তর মাথায় আসে না। আমার বলতে নিজেকে ভীষণ নীচ মনে হয় তাঁর। একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'তা তোমার যখন পোষাচ্ছে না, এ তো আর রক্তের সম্পর্ক নয়, তুমি তোমার ভাগ্য পালটে নাও।' সেই মহিলা এখন অভিনেত্রী। আর মৃগাঙ্ক বসু কাজ করেন গ্রন্থাগারিকের। আমাকে একদিন বলেছিলেন— লিভিং ওয়ার্লডের চেয়ে ডেড ওয়ার্লড ঢের ভাল। পৃথিবীর ভাল যা কিছু সবই হয়ে গেছে। দেবতার কাল শেষ। বর্তমান হল দানবের কাল। চারপাশে অসংখ্য বই ছড়ানো। মাঝখানে মৃগাঙ্ক বোস, মহাসাধক। কমলকে ভীষণ ভালবাসেন— আরে, তুই গোপার ছেলে। অবিকল কীটসের মতো দেখতে হয়েছে। আমি জানতুম, গোপা বেশিদিন বাঁচবে না।

আগে দেখা হলেই, আমাকে বলতেন, বাড়ি করছেন? জানলা, দরজা কিনতে হবে না, এখান থেকে খুলে খুলে নিয়ে যাবেন। সব বার্মাটিক। এ জিনিস বর্তমানে দুর্লভ।

মৃগাঙ্কবাবুর আজ ছুটি নাকি! ভেতরের ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ারে মোৎসার্টের কনসার্ট বাজছে। সুর এক একবার হু হু করে উঠছে ঝড়ের মতো আবার পড়ে আসছে যেন বাতাস।

বাড়িটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। কমল ডাকলে— জেঠু। উত্তর পেল না।

কমলের মামার বাড়িও প্রাচীন, তবে ভেঙে পড়েনি। মাঝেসাঝে হাত পড়ে। দু'-এক বছর অন্তর রংটং হয়। সোমা বাড়িটাকে ভীষণ ভালবাসে। ছুটিছাটায় এলে বাড়ির হাল বদলে দেয়। দোরগোড়া থেকেই কমল দিদা, দিদা করতে করতে ভেতরে ছুটল। এই বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর হল, বাঁধানো উঠোন আর সামনে পেছনে টানা দুটো বারান্দা।

কমলের মামা, নীলুদা আমার বাইরের বারান্দাতেই ছিলেন, কমলকে কোলে তুলে নিলেন। কমলের ভেতরটা নানা খবরে টগবগ করছে। শুরু হয়ে গেছে তার মামা, মামা।

নীলাদ্রিশেখর হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে আর কেবলই বলে চলেছেন, 'বলো মামা, বলো মামা।' এরই ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে পারলেন— 'কী, আবার অফিসে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ, শেষ হয়নি এখনও ঘানি ঘোরানো।'

'এই এক কষ্টকর ব্যাপার তোমার। যানবাহনের যা অবস্থা! এত ছোটাছুটি। আমার চোখ দুটো ঠিক থাকলে একটু রিলিফ দেওয়া যেত।'

'আপনি ভাববেন না। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।'

'চা হচ্ছে। খেয়ে যাও।'

'দেরি হয়ে যাবে। ট্যাক্সি খাড়া করে রেখেছি।'

মামার কোল থেকে কমল বললে, 'পারো তো কদম গাছটা এনো।'

'কদম গাছ?' নীলুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। শহর এফোঁড় ওফোঁড় করে দৌড়োতে হবে। এমন একটা সুন্দর বিকেল কীভাবে মাঠে মারা যাবে! কোনও মানে হয়। আমি অনেক ভেবে দেখলুম একমাত্র স্মাগলারের জীবিকাতেই কিছু থ্রিল আছে। একঘেয়ে নয়। আজ প্যারিস, কাল হংকং, পরশু সিঙ্গাপুর। বাতাসে ওড়ো আর আকাশে কেল্লা বানাও।

॥ তিন ॥

বেশ বৃষ্টি পড়ছে। শুয়ে শুয়ে শুনছি। আমাদের দু'জনের সেই জোড়াখাট। যে খাটে গোপা আর আমি অন্তত বছর দশেক কি বছর বারো শুয়েছি পাশাপাশি। ভালভাবে মনেও নেই ক'বছর। সময়ের হিসেব রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। আজও আমরা দু'জনেই শুয়ে আছি। আমি আর কমল। দেড়খানা মানুষ। তাই খাটটাকে বিশাল মনে হচ্ছে।

ফুলের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। ঘুমোবার আগে ছবির বই দেখছিল। মাথার পাশে পড়ে আছে। একটা নাইটল্যাম্প আমাকে জ্বেলে রাখতেই হয়। কমলের মুখের ওপর নীল আলোর স্বপ্ন খেলা করছে। পাতলা ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে থিরথির করে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে। সারাদিন কত কী করে। কত উত্তেজনা জীবনে। স্বপ্নে একে একে সব ফিরে আসে। আমারও স্বপ্ন দেখার কাল ছিল। এখন বাস্তবের কড়া আঁচে সেঁকা পাউরুটির জীবন। বৃষ্টির জন্যে সব জানালা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। পাখার বাতাসে ভেতরের গুমোট কাটছে না। ছেলেটা খুব ঘেমেছে। ঘুমোলে ভীষণ ঘামে। তোয়ালে দিয়ে পিঠ আর গলা মুছিয়ে দিলুম। কমল নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুল। কাউকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

গোটা দুই পাশ বালিশ করাতে হবে। একবার মনে হল নিজের কোলের কাছে টেনে নিই। তারপর মনে হল গরম লাগবে। আরও ঘেমে যাবে।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ খুব নেমেছে। শ্রাবণের ধারা। এমন বৃষ্টিঝরা রাতে কেবলই গোপার কথা মনে পড়ে। অভ্যাসটা এমন খারাপ করে দিয়ে গেছে! একলা শুতে পারি না। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এখনও তো উনুন জ্বলছে। আগুনে ছাই পড়েনি। এইভাবেই রাত কাটে। ঘুম আসে। ঘুম ভাঙে। হরেক রকম স্বপ্নের উৎপাত। মাঝে মাঝে উঠে বসি। আবার শুয়ে পড়ি। আর থেকে থেকে মন চলে যায় সামনের বাড়িতে। এ-দেশের আষ্টেপৃষ্ঠে এত নীতির বাঁধন! কী হয়, একজন পুরুষ যদি একজন নারীর কাছাকাছি যায়! মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এই নিঃসঙ্গতা ভাল লাগে? না, এ আমি কী করছি? আমার এইসব ভাবা উচিত? নিষ্পাপ শিশুটিকে দেখে শিখতে পারো না, পবিত্র জীবন কাকে বলে! মধ্যরাত বড় সাংঘাতিক সময়। এক চিলতে আলো নেই কোথাও। শরীর শিথিল। মনে প্রবৃত্তির দাপাদাপি।

কমলকে জড়িয়ে ধরে আবার শুয়ে পড়লুম। রেশমের মতো নরম চুলে আকাশের গন্ধ। শরীর কী সুন্দর শীতল! আমার এই উত্তপ্ত দেহের স্পর্শ দিতে কেমন যেন লাগছে! জীবনের তো দেখি একটাই উদ্দেশ্য— ভোগ। জিভ চাইছে সুস্বাদু খাদ্য। মন চাইছে আরাম। দেহ চাইছে নারীসঙ্গ। এ যেন অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন।

কী জ্বালায় পড়েছি মাগো! সারা রাত আমাকে এইভাবে জাগতে হবে! জলে ভেজা কাঁচা কাঠের মতো ধুঁইয়ে চলেছি। ইদানীং আবার অনেক গুণ বেরিয়েছে। ছবিওলা বিদেশি ম্যাগাজিন দেখতে শিখেছি। শুধু শরীর আর শরীর। বিভিন্ন ভঙ্গি। বিভিন্ন আবেদন।

আমার মাকে মনে করার চেষ্টা করছি। আসছেন না। কিছুতেই না। বাবাকে চেষ্টা করছি। কী আশ্চর্য, মনেই পড়ছে না। একেবারেই না। গোপা।

তখন সংসার সাজাচ্ছি। পাখি যেমন ঠোঁটে করে কুটো এনে এনে বাসা বাঁধে, আমাদেরও সেই খেলা চলেছে। গোপা খুব সাজিয়ে সংসার করত। একবার বাগরি মার্কেট থেকে আমরা দু'জনে, ছোট বড় নানা মাপের গোটা চব্বিশ সুদৃশ্য কৌটো কিনেছিলুম। মশলা থাকবে, চা, চিনি, আটা ময়দা, বেসন। কৌটোর গন্ধমাদন। ওজন বেশি নয়, কিন্তু আনতে জীবন বেরিয়ে গেল। ঘরের মেঝেতে পাশাপাশি সমস্ত কৌটো সাজিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম দু'জনে। মনে হল দু'জনের জীবন সেই মুহূর্তে একটা কিছু ধরতে পেরেছে, তা হল আনন্দ। ক্লান্ত গোপা হঠাৎ

আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ঘাম ঘাম, তেল তেল ফরসা মুখ। গালে গোলাপি আভা। টিকলো নাকে লাল পাথরের নাকছাবি। পেছন দিকে দু' হাত তুলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মাথাটাকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে টেনে আনল। ওই সুন্দর শরীর। লাল চকচকে মেঝের ওপর লুটিয়ে আছে শরীর। হালকা নীল সিল্কের শাড়ি। ভারী নিতম্ব ক্রমশ দু'ভাগ হয়ে দুটি সুগঠিত পা। অ্যালফ্যানসো আমের পাতলা আঁটির মতো ধবধবে সাদা পায়ের পাতা। চারপাশে ছড়ানো কৌটোর সংসার। শিশু কৌটো, কিশোর কৌটো, যুবক কৌটো। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিজে ভিজে ঠোঁট। ঘরে আলো জ্বলল না। ছমছমে অন্ধকার। বারান্দার আকাশে বুটিদার তারা।

আর এইভাবে, এইভাবেই, টুক করে এসে পড়ল কমল। কেউ যদি প্রশ্ন করে, কমল তুমি কোথায় জন্মালে? উত্তর হবে ভালবাসায়।

ফটিকদা, তোমার ওই বেস্ট সেলার উপন্যাসে বলেছ, আধসের প্রেম ঢালতে। বিবাহিত প্রেম কি পাবলিক খাবে? পোয়াটাক রেপ-এর রসুন ফোড়ন। জ্বালাময়ী জ্বালিয়ে দাও।

কমল খিলখিল হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখেছে।

কী অদ্ভুত মানুষের মন! আমরা সেই সময় বলাবলি করতুম, ভাগ্যিস আমরা দু'জনে আছি, আর কেউ নেই বাড়িতে। মনে করো, বাবা কি মা জীবিত থাকলে, আমাদের কী হত? অপেক্ষায় থাকতে হত, কখন সারা বাড়ির আলো নিভবে। এ কথা আমার মুখ দিয়েই বেরোত। গোপা শুধু হাসত।

এখন ভাবি, আমি কী শয়তান! ঠিক আছে, যৌবনের পর থেকে মানুষের স্ত্রী-ই সব। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস। তা বলে পিতা-মাতা একেবারে ভেসে যাবে! তার মানে আর বিশ বছর পরে, এই ছেলে আমার মনে করতে থাকবে, বুড়োটা না থাকলেই ভাল হত।

কিন্তু বুড়ো তোর কালে গোপার মতো বউ পাবি? বৈদিক মতে বিয়ের প্রথা কি থাকবে? আধুনিকারা খেপে গেছে। ডায়েরি খুলে ডেট দেখবে। উত্তরপুরুষ বড় হবে ক্রেসে। রাঙা ঠোঁটে আন্টি শেখাবে— ইউ হ্যাভ নো ফাদার ইউ হ্যাভ নো মাদার, পরারাম, প্যাম প্যাম প্যাম।

কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙল, ভোর অনেকটা এগিয়ে গেছে স্রোতের ভেলার মতো। শুয়ে শুয়েই শুনছি কমল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে খুব বকবক করছে।

'তোমাদের বেড়াল আছে কি?'

উত্তরে মহিলাকণ্ঠ, 'একটা আছে। তবে তেমন ভাল নয়। তোমাদের বেড়াল আছে?'

কমল সুর করে বলছে, 'বাবাকে বলেছি, দেখি কী হয়, ছোট মতো একটা বাঘের বাচ্চা পুষব।'

'কী খেতে দেবে?'

'দুধ।'

'বাঘে দুধ খায়?'

'তুমি কিচ্ছু জানো না, ভীষণ বোকা, বাঘে দুধ পেলে আর কিছু খেতে চায় না। হ্যাঁগো, তোমাদের কদম গাছ আছে?'

'না গো, আমাদের বাগান কোথায় যে কদম হবে?'

'দেশে। হ্যাঁগো। তোমাদের দেশে?'

'আমাদের তো দেশ নেই!'

'আমাদেরও নেই।'

কমল হঠাৎ পি পি শব্দ করতে করতে ছুটে ঘরে চলে এল। সারা ঘরে গোল হয়ে তিন-চারবার পাক খেয়ে আবার ছুটে চলে গেল বাইরের বারান্দায়। চিৎকার করে ডাকল, 'মাসি তুমি কোথায়?'

আমি তখনও বসে আছি বিছানায় মশারির ভেতর। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সঙ্গে গত বছর হৃষীকেশে

আলাপ হয়েছিল আমার। তখন আমার মন একেবারে খালি। গোপা আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে গেছে। ভেতরে সবসময় একটা হু হু ভাব। স্বামীজি বলেছিলেন, 'বেটা, সুখ চাস? রূপ চাস? গন্ধ চাস? স্পর্শ চাস? শব্দ চাস? সম্মান চাস? সবাই চায়; কিন্তু পাগলের মতো খুঁজিস কোথায়? স্পর্শ? হায় স্পর্শ!'

স্বামীজি স্পর্শের কথা বারে বারে বললেন। চমকে উঠেছিলুম। সত্যিই আমি তখন স্পর্শসুখের কাঙাল। স্বামীজি মৃদু হেসে বললেন, 'বেটা, গদিতে দেখতে পেলে না। কাপড়ে দেখতে পেলে না। ফুলের শয্যায় দেখলে, তার মধ্যেও পাওয়া গেল না। মখমলের বস্ত্রে খুঁজলে কিন্তু পেলে না। যেখানে স্পর্শই নেই সেখানেও অন্বেষণ করলে। স্পর্শকে অন্বেষণ করতে করতে তোমার মতোই এক মানব আকৃতিকে পেয়ে তার মধ্যে স্পর্শ সুখ খুঁজলে। কী পেলে? ধীরে ধীরে তুমি জড় হয়ে আসছ। তোমার লিঙ্গ কি কোনওদিন আর প্রথম রমণের সুখ পাবে মূর্খ! হে কর্মহীন! যদি তোমার অন্তরশক্তি জেগে যেত তো পরমানন্দময়ী পরাশক্তি তোমার সর্বাঙ্গে ক্রিয়ারূপে ব্যাপ্ত হয়ে যেত, আরে! তুমি স্বয়ংই স্পর্শের সুখদ সমুদ্র হয়ে যেতে!

হে অচেত মানব, তুমি চেত হও। ধ্যান করো, মোক্ষের জন্যে নয়, ধর্ম সাধনার জন্যে নয়, যোগ পদবি পাওয়ার জন্যে নয়, প্রশংসাপাত্র হওয়ার জন্যে নয়, সংসারে পূর্ণ মানব হবার জন্যে ধ্যান লাগাও। তুমি ধ্যান করো না, সৎকর্ম করো না, নিজের দামি শরীরকে ভালভাবে নির্বাহ করো না! এসব ছাড়া তুমি সুখ পাবে কী করে!'

রোজ সকালে কিছুক্ষণ ধ্যান করার চেষ্টা করি। প্রথমে আমার শরীর। এই আমার পা, জানু, উদর, বক্ষদেশ, দুটো হাত, কণ্ঠ, নাসিকা, চোখ, মাথা। মন-পথিক তুমি এবার মস্তকে স্থিত হও। এর ঊর্ধ্বে আকাশ। ক্রমে মহাকাশ। ওঠো, ওঠো, ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে।

অতই সহজ! মন গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে সামনের বাড়ির বারান্দায়। কমলের ওপর হিংসে হচ্ছে— কেমন ভাব জমিয়ে নিয়েছে তোফা। আবার আশাও হচ্ছে কমলের থ্রু দিয়ে এনট্রি নেব। সেদিন পাড়ার চায়ের দোকান থেকে মেয়েটির সামান্য ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। পাড়ার রয়টাররা নামও জানে। নাম থেকেই মেরে দিয়েছে। চিনু, কী সুন্দর নাম? তারপর ডিভোর্সি। এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছিল। কাটান ছেঁড়ান হয়ে গেছে। পুরনো হুইস্কির মতো গায়ের রং। মুঠোয় ধরা যায় কোমর। গুরু নিতম্ব।

বা রে! কী সুন্দর ধ্যান হচ্ছে আমার! পরমপদে লীন হয়ে বসে আছি।

কমল নাচতে নাচতে ঘরে এল, 'কী গো বাবা! তুমি আজ উঠবে না?'

মুখ নিচু করে আছি। কমলের দিকে তাকাতে পারছি না। ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। সাতসকালে এইসব যদি আমার চিন্তা হয়। নীল আকাশ, প্রসন্ন বাতাস, চিকচিক-ডানা পায়রা, সব ভেসে গেল। ধ্যানের বস্তু হল একটি শরীর।

রাসকেল। আমি এত খারাপ। একটা রকবাজ যে আমার চেয়ে ঢের ভাল। আমি আমার ছেলেকে কী শিক্ষা দেব!

বাবু, তুমি জিতেন্দ্রিয় হও।

নেমে এলুম বাসি বিছানা থেকে। যেন কাঁকড়া বিছে কামড়াচ্ছে। সামনের দেয়ালে গোপার ছবি। তাকাতে পারছি না ভয়ে। ওই চিনুর সঙ্গে তুলনা চলে আসছে। গোপা ছিল নির্ভেজাল বঙ্গললনা। নরম। ঠান্ডা। সংসারী। প্রাচীন সংস্কারে বিশ্বাসী। কাছে টেনে না নিলে কোনওদিন কাছে আসেনি। চেপে না ধরলে ধরা দেয়নি। চিনু পুরোপুরি অ্যামেরিকান।

সাংসারিক কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমার এই কুচিন্তা কাটবে না। ঘিনঘিন করে চলতেই থাকবে। এখনও কোনও কাজের লোক জোগাড় করতে পারিনি। শুধুমাত্র পুরুষের সংসারে অল্পবয়সি কি যুবতী মেয়েরা কাজে লাগতে চায় না। ভয় পায়। কেন পায় নিজের চিন্তা দেখেই

বুঝছি। কাল রাতের যত বাসন সিঙ্কে পড়ে আছে। এখনও গ্যাস পাইনি। কেরোসিন কুরারই ভরসা।

কমল পড়তে বসে গেছে। ছেলেটাকে খাওয়াতে হবে। আমার তো সকালে এক কাপ চা হলেই চলে যায়।

'বুড়ো, দাঁত মেজেছিস?'

'ইয়েস।'

'বাবা, সায়েব হ'য়ে গেলি যে!'

'ইয়েস।'

'ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল, এই তিনটে দিয়ে চালাচ্ছিস বুঝি?'

'নোওপ।'

যত পারি বকবক করে যাই ছেলেটার সঙ্গে। দেখেছি, ছোটদের সঙ্গে বকবক করলে নিজের শৈশব ফিরে আসে। আহা! কী সব দিন ফেলে এসেছি পেছনে! কেন যে মানুষ বড় হয়?

'বলতে পারিস বুড়ো, কেন মানুষ বড় হয়?'

'তোমার মতো চাকরি করবে বলে।'

বুড়ো আপন মনে খাতায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললে। সুগম্ভীর সোফোক্লিসের মতো।

'তুই বড় হয়ে কী করবি?'

'তুমি যা বলবে।'

'তুই আমাকে ভালবাসিস বুড়ো?'

'ইয়েস।'

ডিম সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এইবার ঠান্ডা জলে ফেলে খোলা ছাড়াতে হবে। বুড়ো ডিম খেতে ভালবাসে। ছেলেটাকে কোনওরকমে একটু মোটাসোটা করতে হবে। দেখি আর একটা বছর যাক, ওকে সাঁতারে ভরতি করে দোব। আটমাসে জন্মেছে। তার ওপর মা নেই। ঘুরে ঘুরে মানুষ হচ্ছে। আমার স্বপ্ন তো একটাই। ছেলেটাকে সাংঘাতিকভাবে মানুষ করা।

'শোন বুড়ো, তুই ব্রেকফাস্ট কর, আমি চট করে মোড়ের মাথা থেকে বাজারটা করে আনি। কী কী করবে না মনে আছে? বারান্দার রেলিং-এ উঠে ঝুঁকবে না। দেশলাই জ্বালাবে না। ছুরি ধরবে না। কেমন?'

'ইয়েস। বাবা?'

'বলো বাবা।'

'তুমি ভোরবেলা কাঁদছিলে কেন?'

'আমি? আমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলুম।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।'

'তাই নাকি রে? তা হলে স্বপ্ন দেখছিলুম। তুই স্বপ্নে হাসিস। আমি স্বপ্নে কাঁদি। আজ কী মাছ খাবি?'

'তুমি যা খাওয়াবে।'

'আমি তা হলে আসি।'

'বাথরুমে সাবান নেই।'

'আ, ঠিক বলেছিস। হ্যাঁ শোন, জল ঘাঁটবি না।

'নোওপ।'

॥ চার ॥

হঠাৎ কলেজ স্ট্রিটের মুখে ফটিকদার মুখোমুখি।

'কী মশাই, ধরেছেন? ক'পাতা হল?'

'এখনও হাত দিতে পারিনি। ভেবেই যাচ্ছি। ভেবেই যাচ্ছি। প্রেম কি সোজা জিনিস মশাই। নরম তুলতুলে, মিষ্টি প্রেম।'

'ধ্যাত মশাই নরম প্রেম কে চায়! টিন এজ লাভ স্টোরি বোম্বের সিনেমাঅলারা চটকে ছেড়ে দিয়েছে। পাকা প্রেম লিখুন। বেশ একটু পার্ভারশানের ফোড়ন দিয়ে। ঝানু, মোটামুটি পয়সাঅলা নায়ক খাড়া করুন। তারপর ছেড়ে দিন। চরে খেতে দিন। ইংরিজি বইটই পড়েন না?'

'দেখি কী হয়। আমার একটা মস্ত দোষ, বানিয়ে লিখতে পারি না।'

'তা হলে নিজের জীবনেই ঘটিয়ে ফেলুন। আপনি তো মশাই ওপেন আছেন। শাসনে রাখার মানুষটি তো সরে পড়েছে!'

'আমার যে তেমন এলেম নেই দাদা।'

'আপনি একটি অগা। সন্ধের দিকে ঢুকুঢুকু হয়?'

'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।'

'রামপ্রসাদের জীবনচরিত লিখুন। শুনুন ভাল চান তো আগে পথে নামুন তারপর কলম ধরুন। চরিত্রহীন না হলে মহৎ সাহিত্য হয় না। কেরানি হওয়া যায়। এমনকী স্কুলমাস্টারও হওয়া যায় না আজকাল। চরিত্র চরিত্র করে দেশটা কমপ্লিট চরিত্রহীন হয়ে গেল। আপনাদের ওই ঘ্যানর ঘ্যানর বস্তাপচা সাহিত্যে পাবলিকেশন ব্যাবসাটাই আমাদের লাটে উঠে যাবার জোগাড় হয়েছে। বইয়ের একটা এডিশান কাটাতে আমাদের জীবন শেষ।'

'চলি ফটিকদা।'

'চলি মানে? আজ আপনার মাল খাওয়ার হাতে খড়ি হবে। পেটে তরল-লাথি না পড়লে লেখায় জোর আসবে না। রেডলাইট এরিয়ায় গেছেন কোনওদিন?'

'পাগল হয়েছেন?'

'চলুন আজ সেটাও হবে।'

'মাপ করুন মশাই। আপনার পাঁচশো টাকা ফেরত নিন।'

'আপনার মুখ দেখে আমার করুণা হচ্ছে। নির্জন রাস্তায় কোনও মহিলার হাত চেপে ধরলে তার মুখের চেহারা এইরকমই হত। ঠান্ডা জল খাবেন?'

'কিচ্ছু না, আমার কাজ আছে। আজ পালাই।'

হনহন হাঁটছি। মাপ করো রাজা! সাহিত্য আমার মাথায় থাক। হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। কান গরম হয়ে উঠছিল। বাতাস লেগে এখন একটু শীতল হয়েছে। এতক্ষণ কী ভাবছিলুম জানি না। এখন ভাবছি লাল আলোর এলাকার কথা। ওই তো ওই মাথায় সেই বিখ্যাত জমজমাট প্রাচীন এলাকা। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে গিয়েও ভয়ে ফিরে এসেছিলুম। হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়নি, এই আমার মহাভাগ্য। আমার সেই মহান পথপ্রদর্শক বলেছিল— দেখবি একদিন গেলেই ভয় ভেঙে যাবে।

শয়তান!

আমার সেই লম্পট বন্ধু নয়, শয়তান হলুম আমি।

মনে ষোলো আনা ইচ্ছে। ভয়, যদি ধরা পড়ে যাই। যদি পুলিশে ধরে! যদি মাস্তানের হাতে পড়ে যাই। সেই চিরন্তন মধ্যবিত্ত। নিরাপত্তা। ওরা আমার নিভৃত এলাকায় আসুক। আমার যাবার সাহস

নেই। চরিত্রবান, আদর্শবাদীর মুখোশটি যেন খুলে না পড়ে। ব্যাটা! ঘোমটার আড়ালে তোমার খেমটা নাচ চাই।

আরে রাস্তার অপর পারে, ভাঙা ফুটপাথে কে দাঁড়িয়ে? নীলুদা। নীলুদা কী করছেন এখানে! চোখে পুরু ঘোলাটে লেন্সের চশমা। মুখ সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। দু'হাত সামনে প্রসারিত করে একবার এদিকে যাচ্ছেন একবার ওদিকে। প্রায় অন্ধ মানুষ। একেবারে অসহায়। চারপাশে থইথই জনারণ্য। বাস স্টপেজে যেমন হয়। মাঝে মাঝে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে পারছেন না।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গেলুম।

'নীলুদা, আপনি এখানে?'

উৎকণ্ঠিত, অসহায় মুখ। ঘেমে গেছেন। চোখের এমন অবস্থা। হাত দুয়েক দূরের মানুষকেও চিনতে অসুবিধে হচ্ছে।

'কে, শ্রীকান্ত?'

'আপনি কী করছেন এখানে?'

নীলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। গরম, উৎকণ্ঠায়, পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়েছেন। বাঁ হাত দিয়ে এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে বললেন, 'নীলুর কর্মফল ভাই। ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন। আসছিলুম ধর্মতলা থেকে। এইখানে এসে বাস ব্রেকডাউন। ওই যে তিনি দেহ রেখেছেন। তারপর কতক্ষণ যে হয়ে গেল! কোনও কিছুতেই উঠতে পারি না। একবার ওদিকে যাই, একবার এদিকে যাই। চোখের এই অবস্থা, বাসের নম্বর পড়তে পারি না। যাক তুমি এসে গেছ, আমার আর ভাবনা নেই।'

'আপনার কলেজ এবার আমি বন্ধ করে দোব।'

'আর তিনটে বছর শ্রীকান্ত। কোনওরকমে শেষ করে যাই। বাড়ি বসে থেকে কী করব! শরীরের ক্ষমতা তো ঠিক আছে।'

'তা আছে। রাস্তায় এইরকম বিপদে পড়লে কে দেখবে?'

'চারপাশে এত মানুষ, কেউ দেখবে না বলছ?'

'মানুষ এখন হৃদ্‌রোগে ভুগছে নীলুদা!'

'তুমি এখন যাবে কোথায়?'

'আপনাদের বাড়ি।'

'যাক ভালই হয়েছে। চলো তা হলে একসঙ্গে যাই। একটা কিছু ধরো।'

একটা কিছু ধরো মানে, ট্যাক্সি। ট্যাক্সি ধরা অত সহজ নয়। এ শহরের নাম কলকাতা। জগৎছাড়া জায়গা। বলার উপায় নেই, পাবলিক চাঁটাবে। বলবে, যা ব্যাটা আমেরিকায় যা। রেগানের দালাল। আরও আধঘণ্টা কসরতের পর, নঝঝড়ে একটা ট্যাক্সি জুটল। গাড়িও বৃদ্ধ, চালকও বৃদ্ধ। চলনে ধীর, শব্দে মহান। মাঝে মাঝে নর্তকীর মতো গাড়ির শরীর এপাশে ওপাশে দুলে দুলে উঠছে।

নীলুদা চুপ করে বসে থাকতে থাকতে একসময় বললেন, 'চোখ দুটো চলে গেলে পৃথিবী শুধু শব্দের পৃথিবী। আমার কী মনে হচ্ছে জানো, ঘষা কাচের টানেলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। চোখ দুটো এইরকম থাকলেও চলে যাবে। এর চেয়ে খারাপ হলে আমার কী হবে বলো তো শ্রীকান্ত?'

'অত ভাবছেন কেন? আমি আছি। সোমা আছে। তা ছাড়া আজকাল নতুন নতুন চিকিৎসা বেরিয়েছে। ভয় কী আপনার? আপনি তো আর জলে পড়ে নেই।'

'তা ঠিক। তবে কী জানো, এখনও বাঁচতে হবে বহুদিন। কে আমাকে টানবে অত বছর!'

'ও ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা যাঁর প্রজা তিনিই দেখবেন।'

নীলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ ডান হাতটা আলতো করে আমার বাঁ হাতের ওপর রাখলেন। সুপুরুষ মানুষ। স্বাস্থ্যবান। পুরুষ্টু কবজি। লম্বা লম্বা আঙুল। ফরসা ধবধবে। নীলুদার দিকে

তাকালুম। কিছু একটা বলতে চাইছেন। ইতস্তত ভাব। অবশেষে বললেন, 'তোমাকে গোপনে একটা কথা বলব?'

'বলুন না।'

'কথা দাও, আর কাউকে বলবে না।'

'না।'

'ঠিক বলছ?'

'বলার মতো আর কে আছে বলুন আমার। গোপা থাকলে প্রাণের কথা, মনের কথা হত।'

'তা হলে শোনো। পরামর্শ চাই তোমার। এক মহিলা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। লক্ষ করো, তিনি মহিলা বলেছি, মেয়ে নয়। প্রায় আমার বয়সি। দু'-এক বছর এদিক ওদিক হতে পারে।'

'কে তিনি?'

'একটি বিদেশি ব্যাঙ্কের অফিসার। বিলিতি এডুকেশান।'

'বিবাহিতা?'

'না না, এর মধ্যে কোনও পাপ নেই। গজল নয়, পুরোপুরি ধ্রুপদ।'

'কী করে বুঝলেন ভালবাসেন তিনি?'

'বোঝা যায়, বুঝলে? আমি একেবারে ব্লান্ট নই।'

'আপনার এই চোখের অবস্থা জেনেও ভালবাসেন?'

'তা হলে শোনো, আজ আমি তাঁর অফিসেই গিয়েছিলুম। দুটো কারণে, এক, আমার ব্যাঙ্কঘটিত একটা প্রয়োজন ছিল। দুই, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল। এরকম হয় বুঝলে শ্রীকান্ত? মানুষের এইরকম হয়। তুমি একটা জিনিস জেনে রাখো, নারী ছাড়া পুরুষ অসম্পূর্ণ, পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ। তুমি ভাবছ আমার মন দুর্বল বলে, আমি এসব কথা বলছি। তা নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি। মনের খুব সংগঠিত অবস্থায় প্রেম, ভালবাসা একটা ভাগবতী রূপ পায়। তুমি এটাকে আমার দুর্বল মনের সাফাই ভেবো না।'

'আমি তা ভাবছি না নীলুদা। আমি আপনার শেষ কথা শোনার অপেক্ষায় আছি।'

'আমি যদি নেলীকে বিবাহ করি লোকে ছিছি করবে?'

'তা নয়, তবে সবাই অবাক হবে। আপনাকে সবাই সন্ন্যাসী ভাবে। ভাবে জিতেন্দ্রিয়। আপনার সেই মূর্তিটা আর থাকবে না।'

'কেন বিবাহ কি এতই ঘৃণিত?'

'ঠিক ঘৃণিত নয়, তবে কামনা-বাসনা-মাখা একটা সম্পর্ক। মনের ব্যাপার ঠিকই তবে দেহপ্রধান। সংসারী মানুষ বলতে সাধকরা একটু নীচের তলার মানুষকেই বোঝান।'

'আমি তোমার মত চেয়েছি শ্রীকান্ত।'

'আমি বলব, আপনি করুন, তবে সবার আগে যাচাই করে নিন, সুখের হবে তো!'

নীলুদা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। মুখে একটা আলোর দ্যুতি। কোথায় কোন জগতে চলে গেছেন কে জানে। অনেকটা সমাহিত অবস্থা। হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বললেন, 'কী বলছিলে, সুখের হবে তো! তা হলে শোনো, নেলী বলছিল, নারী যতক্ষণ না মা হচ্ছে ততক্ষণ সে মরুভূমি। মা না হলে জীবনের উত্তরণ ঘটে না, বিকাশ হয় না। কুঁড়িই থেকে যায়, ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না।'

'তিনি যদি শুধু মাতৃত্বের জন্যে বিয়ে করতে চান, তা হলে তো আরও অনেক সংগত প্রশ্ন এসে যায়। তিনি সন্তান চান না আপনাকে চান? তা ছাড়া এই বয়েসে সন্তান যদি না আসে? মহিলার সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'দীর্ঘ দিন। তা দশ বছর তো হবেই।'

'তিনি এতদিন অবিবাহিত কেন?'

'আমার মতোই একটা ভাব নিয়ে চলছিল। শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। লেখাপড়া নিয়ে কাটাও। মাঝে মাঝে দেশভ্রমণ। মনের মতো পুরুষ চোখে পড়েনি। আমার মধ্যে কী দেখেছে কে জানে!'

'দেখতে কেমন?'

'কুৎসিত নয়। সুন্দরীই বলতে পারো। অদ্ভুত একটা পার্সোন্যালিটি আছে।'

'সংসারে কে কে আছেন?'

'এখানে কেউ নেই। একমাত্র দাদা ভিয়েনায়। নামকরা ডাক্তার। স্ত্রী অস্ট্রিয়ান। কালেভদ্রে আসেন। ভবানীপুরে বিশাল পৈতৃক বাড়ি। একা কীভাবে যে থাকে! এই অবস্থায় বলো আমি কী করি?'

'আপনার মন কী চাইছে?'

'সত্য কথা বলব? ঘৃণা করবে না বলো?'

'সে কী, ঘৃণা করব কেন?'

'তা হলে শোনো। নিজেকে চেনা হল সবচেয়ে বড় চেনা। নিজের মনের নাগাল পাওয়া বড় সহজ নয় শ্রীকান্ত। এ এক গভীর অতলান্তিক। বাসনারা সব ফুট কাটছে। এই মনে হল জয় করে ফেলেছি, সঙ্গে সঙ্গে পেড়ে ফেলে দিলে চিতপাত করে। সত্যি কথা বলব শ্রীকান্ত, কাম বড় প্রবল রিপু। কিছুতেই জয় করা যায় না। কখন যে কী রূপে আসবে। তুমি মুখে বলতে পারো হেঁকে ডেকে, লোকেও হয়তো বিশ্বাস করবে। তোমার মন কিন্তু মনে মনে হাসবে। সাংঘাতিক জিনিস এই মানুষের মন। সব প্রতিজ্ঞা ভেসে চলে যায়। মাঝে মাঝে বড় কাতর হয়ে পড়ি শ্রীকান্ত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ কোনও কিছুতেই মন যেন বশে আসতে চায় না। শুনবে তা হলে আমার খোলাখুলি স্বীকারোক্তি, মনের ওই অবস্থায় নারীকেই মনে হয় আমার ঈশ্বর। ছি ছি এ আমি কী করছি? মনের কথা সব তোমাকে খুলে বলে ফেলছি?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি তো আপনার বন্ধুর মতো। মনে কিছু পুষে না রাখাই ভাল। তাতে মনের অসুখ করে।'

'তা যা বলেছ। মন হল কারণ— শরীরের কিডনি, মূত্রযন্ত্র। চিন্তা জমতে জমতে ইউরেমিয়া মতো হয়ে যায়।'

'নীলুদা, আমার কেবল একটাই আশঙ্কা ভদ্রমহিলা আপনাকে চাইছেন, না চাইছেন একটি সন্তান? ভালবাসা আগে না সন্তান আগে। বড় ধাঁধিয়ে ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে দাদা।'

'আমারও যে বড় স্বার্থচিন্তা এসে যাচ্ছে শ্রীকান্ত। মনে হচ্ছে একেবারেই তো অসহায় হয়ে পড়ব, তখন কেউ একজন পাশে তো থাকবে! একটু দেখাশোনা, তদারকি করবে।'

নীলুদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। গাড়ি ঝিরঝির করে চলেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো। হঠাৎ স্বার্থচিন্তা এসে গেল আমারও। এই তো আমার চরিত্র পেয়ে গেছি। মধ্যবয়সি এক প্রেমিক। নীলুদাকে নিয়েই তো আমার উপন্যাস ফাঁদা যায়। নিজের স্বার্থেই ভদ্রলোককে এগোবার উৎসাহ দেওয়া যায়।

'ভদ্রমহিলাকে একবার চোখে দেখা যায় নীলুদা?'

'তুমি দেখতে চাও?'

'মন্দ কী?'

'তা চলো একদিন। বাড়িতেই যাওয়া যাক।'

'হিন্দু, বৈদিক মতে বিয়ে করবেন, না বিলিতি মতে রেজেস্ট্রি?'

'ভয় পাচ্ছি শ্রীকান্ত! মাকে কীভাবে বলব!'

'সে দায়িত্ব আমার।'

'সোমা! সোমা যদি কিছু ভাবে?'

'তার এতে ভাবার কী আছে?'

'আমাকে যে সে অন্যভাবে শ্রদ্ধা করে।'

'কেউ বিয়ে করলে অশ্রদ্ধেয় হয়ে যায়?'

'বিয়ের একটা বয়েস থাকে শ্রীকান্ত। প্রায় অন্ধ একটা লোক, যার ভগবৎ চিন্তাই করা উচিত, সে বউ নিয়ে দোরে খিল আঁটলে কী ভাববে? যারা দোজপক্ষে বিয়ে করে তারা কি প্রথমপক্ষের মতো অসংকোচে পিঁড়িতে বসতে পারে? বাঁকা হাসি তাদের সহ্য করতেই হয়। বুঝলে শ্রীকান্ত, আর আমি ভাবতে পারছি না। নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিই নিজেকে।'

নীলুদার দোজপক্ষের ওপর মন্তব্যে মন বেশ নাড়া খেল। দু'বয়সের দুটি মানুষ পাশাপাশি বসে আছি, দু'জনেরই এক সমস্যা। হঠাৎ আমার সেই মহেন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ল।

মহেন্দ্র মিত্র। হ্যাঁ প্রবীণ মানুষ। তবে নিটোল স্বাস্থ্য। বেশ বড় পদেই চাকরি করেন বিদেশি বিমান সংস্থায়। পাককা সাহেব। স্কচ ছাড়া খান না। গৌরবর্ণ গালে গোলাপি আভা। এত পয়সা, এত দাপট, তবু বড় দুঃখ। স্ত্রী প্রায় ত্যাগই করেছেন। চলে গেছেন বড় মেয়ের কাছে নিউইয়র্কে। একটি মাত্র ছেলে। সে একেবারে বাপকা বেটা। সাদা চোখে থাকেই না। সেও বড় চাকরে। কোন এক বিদেশি কোম্পানির সেলসে আছে। অঢেল টাকা। বগলে বোতল। দু'বগলে দুই মন নিয়ে তিনি সারা ভারত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে বাবাকে হুকুম করছেন। কী হুকুম? কলকাতার এক বড় হোমিওপ্যাথের কাছে হত্যা দিয়ে ছেলের হরেক ব্যামোর ওষুধ পাঠাও। সারা বছরই তাঁর শুকনো কাশি। হোমিওপ্যাথিতে কী একটা ওষুধ আছে পেট্রোলিয়াম। বম্বে থেকে বাপের কাছে টেলিগ্রাম এল সেন্ড পেট্রোলিয়াম ইমমিডিয়েটলি।

সেই সায়েব মহেন্দ্রবাবুর কী বেদনা! স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেছে। কলকাতায় এলেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না। পার্ক স্ট্রিটের আলোছায়া রেস্তোরাঁয় বসে, স্যান্ডউইচ আর কফি খেতে খেতে একদিন হাহাকার করে উঠলেন, 'শ্রীকান্ত, আই হ্যাভ নো সেক্সলাইফ। অ-ওফ-ওফ।' তাঁর হৃদয়বিদারক আর্তনাদ শুনে বেয়ারা থমকে গেল। ভাবলে, সম্প্রতি কেউ হয়তো মারা গেছে।

'শ্রীকান্ত অ্যাট দিস এজ, হাউ ক্যান আই ভিজিট এ প্রস্টিট্যুট!'

কী সাংঘাতিক সমস্যা রে বাবা! এ যেন মাঝরাতে আলো ফিউজ হয়ে গেছে। গুরুজন, বলতেও পারছি না, মশাই জীবনের ফ্যুয়েল তো প্রায় শেষ হয়ে এল, এবার না হয় একটু পরকালের কথা ভাবুন।

আজ আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছি। দু'বয়সের দুই মানুষ। ভেতরে ধিকধিক আগুন জ্বলছে আমাদের। এ কোনও দুরারোগ্য অসুখ, না এরই নাম জীবন। অর্ধাংশ আর এক অর্ধকে খুঁজে ফিরছে, বর্ষার অন্ধকার রাতে জল দাও জল দাও বলে চাতক আকাশ ফেঁড়ে ফেলে যেভাবে!

আমরা এসে গেলুম। আমরা যেন সদ্য মা হয়ে ফিরে আসছি নার্সিংহোম থেকে। দু'জনেরই বুকে আত্মজ। রক্ত-মাংসের দুটি ডেলা। দপদপ করছে। উত্তপ্ত। ওই দাশ পাবলিশার্সের ফটিকদাই আমার সর্বনাশ করেছেন। পাঁচশো টাকার টোপ ফেলে মাথাটাকে এমন করে দিয়ে গেলেন। সব সময়েই প্রেম ঘুরছে, তাতে আবার রেপের ফোড়ন, কিঞ্চিৎ বিকৃতির তেজপাতা, সামাজিক সমস্যার ঘিয়ের ছিটে, রাজনীতির হেলুনি। মনটাকে যে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও রাখব, সে উপায় নেই। কী জ্বালায় পড়লুম রে ভাই।

নীলুদা বললেন, 'ভাড়াটা আমিই দোব শ্রীকান্ত, মিটার দেখে হিসেব করো।'

'আপনি দেবেন কেন?'

'আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। তর্ক কোরো না।'

ঝড়ঝড়িয়া গাড়ি ধড়ফড় করতে করতে চলে গেল। দরজার সামনে ছুটে এসেছে কমল। আনন্দে নাচছে, 'মামা, মামা।' পেছনে দাঁড়িয়ে কমলের দিদা।

ভদ্রমহিলাকে বেশ জমিদার গৃহিণীর মতো দেখতে। চোখে সরু সোনার ফ্রেমের চশমা। কথা খুব কম বলেন। কদাচিৎ হাসতে দেখেছি। শরীরের বাঁধন এখনও আলগা হয়নি। রাশভারী মহিলা। যত বয়েস বাড়ছে এক ধরনের সৌম্য প্রশান্ত রূপ ফুটে উঠছে। দু'চোখে স্থির দৃষ্টি। মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। যখনই দেখি তখনই মনে হয় এইমাত্র স্নান করে উঠলেন। সব সময় ধবধবে সাদা ফিতে পাড় শাড়ি আর ব্লাউজ পরে থাকেন। অপরিচ্ছন্নতা মহিলার অসহ্য। সাধন ভজনের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছেন। জপের মালা নিয়ে ধ্যানে বসলে সহজে উঠতে চান না। সংসার মাথায় করে রেখেছে আশ্রিতা একটি মেয়ে। তার নাম কালু। কী আশ্চর্য, মেয়েটি মোটেই কালো নয়। তার বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়ি হতে পারে। তিরিশ হতে পারে। আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি গঙ্গাসাগর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছেন।

ভারী মিষ্টি মেয়ে। পাপের কথা কী আর বলব, মেয়েটির দিক থেকে সহজে আমি চোখ ফেরাতে পারি না। পানের মতো মিষ্টি মুখ। পাতলা নাক দু'পাশে সামান্য টেপা। আর হাসি। অমন হাসি সচরাচর চোখে পড়ে না। মুখের সঙ্গে সঙ্গে চোখও হাসে। নাকের ঠিক ওপরে ভুরুর কাছটা কুঁচকে যায়। আর অমন সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট সাজানো দাঁত বাঁধানো ছাড়া যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। বড় সরল মেয়েটি। হালকা ফুরফুরে শরীর। যেন ষোলো বছরের মেয়ে।

মনে মনে বলি, শ্রীকান্ত তোর যেমন মরণদশা। যাকে দেখিস তাকেই ভাল লেগে যায়। আসলে সেই কথাই সত্যি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন। ভক্তসঙ্গে বসে আছেন নিজের ঘরটিতে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। রাসমণির টেম্পল দেখছে, বিল্ডিং দেখছে। ঠাকুর যেমন বলতেন আর কী! হঠাৎ মাস্টারমশাইকে বললেন, বিবাহিত লোকেরা মেয়েদের দিকে কীভাবে আড়ে আড়ে তাকায়, দেখেছ মাস্টার।

যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে, সে বাঘ তো মানুষখেকো হবেই।

'জীবরা কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার-জানলা ইসক্রু দিয়ে আঁটা, বেরুবে কেমন করে?' মাস্টার, 'সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনীকাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়।'

আমাকে কে আর চালুনির জল খাওয়াবে? গোপা আমার বারোটা বাজিয়ে রেখে গেছে। আমার চোখ দুটো? আমার মন, আমার অভ্যাস।

কালু এসে কমলকে কোলে তুলে নিল। বেশ একটা নীল রঙের বড় বড় খোপওলা শাড়ি পরেছে। সবসময় ঘাড়ের কাছে ঝুলে আছে এলো খোঁপা। কালুর নিচু হওয়া। কমলকে কোলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। একপাশে তার আঁচল সরে যাওয়া। কপাল কুঁচকে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকানো। পৃথিবীর সব সরলতা মাখানো তার মিষ্টি পানের মতো মুখ। পিচবোর্ডের মতো পাতলা দুটো ঠোঁট। আমার যে কী হচ্ছে ভেতরে! আমি যতই বোকার মতো হাসি, যতই চাপা দেবার চেষ্টা করি, ভেতরে ভেতরে আমি ভীষণ জখম।

নীলুদা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে টাল খেতে খেতে পইঠে ভেঙে, চৌকাঠ টপকে ভেতরে যাবার চেষ্টা করছেন। কালু আস্তে কমলকে কোল থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল, 'দাদা, আমার হাত ধরুন। আমার হাত ধরুন।'

নীলুদা কমলের মাথায় হাত রেখে প্রথমে একটু আদরের ভাব দেখালেন, তারপর কালুর কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে চললেন।

এই হল মানুষের দোষ। কেউ সরল মনে মনের কথা বললে, সেই কথা ধরেই তার সব কাজের ব্যাখ্যা হতে থাকে। নীলুদা কালুর কাঁধে হাত রেখেছেন! কেমন অন্তরঙ্গ একটা অবস্থা। আর আমার সন্দেহ হচ্ছে, নীলুদা কি সত্যিই এত কম দেখছেন? মানে এতই কম যে কালুকে প্রায় জড়িয়ে ধরে

ভেতরে যেতে হচ্ছে! এই নীলুদা বিয়ের কথা ভাবছেন। ভাবছেন সন্তানের কথা। সেই সন্তান বড় হয়ে অন্ধ বাপকে দেখবে?

আমার মন? বিল্বমঙ্গল চোখ উপড়ে ফেলেছিল, আমার মনটাকে উপড়ে ফেলে দিতে পারলে ভাল হত। নীলুদার সন্তানের কথা ভাবতেই, আমি নীলুদাকে মনের চোখে একেবারে সেই অবস্থায় দেখলুম। অন্ধ মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটি নারী-শরীরে দিশাহারা হয়ে ঘুরছেন। যৌবন-উত্তীর্ণা এক নারী। তিনি বিদেশি ব্যাঙ্কে দায়িত্বপূর্ণ পদে দাপটে কাজ করেন। সারাদিনে কত লোক চরান।

কমল বললে, 'বাবা, তুমি মুখটা অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা? তোমার কি পেটব্যথা করছে?'

কমলের দিদা বিরস মুখে বললেন, 'ভেতরে আসবে না?'

'এই যে যাই' বলে ভেতরের দিকে পা বাড়ালুম।

দোতলার ঘর থেকে ভেসে আসছে কালুর হাসির শব্দ। নীলুদা নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছেন যা কালুর খুব ভাল লেগেছে। ভেবেছিলুম কমল আমার পেছন পেছন আসছে, তাই বুড়ো বুড়ো করে ছেলে ভোলানো আদিখ্যেতা হচ্ছিল। সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে দেখি কমল সদরে দাঁড়িয়ে আছে দিদার পাশটিতে। লোকজন, রাস্তাঘাট দেখছে। একটু পরেই এ-পাড়ায় ফেরিওয়ালারা আসতে শুরু করবে। ঘুগনি, ঘুঙুর বাঁধা চানাচুর, ঘড়ঘড়ে ঠেলাগাড়িতে চেপে ফুচকা। সব শেষে আসবে কুলপিমালাই। কোনওটাই কমলের চলবে না; কিন্তু ওর ভেতরটা দুলে দুলে উঠবে।

যেমন আমার ভেতরটা ইদানীং দুলে দুলে উঠছে। কোনওটাই আমার চলবে না তবু কী মতিভ্রম!

আমার এমন হবার কথা নয়। ওই যে উপন্যাসটা লিখতে হবে। বেস্টসেলার। তিন বছর নাম ঝুলে থাকবে লিস্টে। পাবলিককে খাওয়াতে গেলে নিজেকে আগে খাদ্য হতে হবে।

কালু নেমে আসছে। সিঁড়ির মাঝামাঝি দু'জনে মুখোমুখি।

আমার কেন জানি না ধারণা, কালু খুব ধার্মিক। ধর্ম দিয়েই ওকে বশ করা সহজ। তাই সুযোগ পেলেই ওকে আমি ধর্মের কথা শোনাই। নিজে খুব সাত্ত্বিক হয়ে যাই। মানে পুরোপুরি শয়তান।

কালু থেমে পড়েছে। হাসছে। সেই হাসি। গলার কাছে সরু একটা হার চিকচিক করছে। আমি কতটা নীচে নেমে গেছি! অবাক হয়ে গেলুম। পুণ্যাত্মারা ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ছুটে যান আর আমার মন ছুটল হারের রেখা ধরে শেষপ্রান্তটি যেখানে দুলছে সেইখানে। একেবারে পচে গেছি আমি।

কালু বললে, 'চায়ের সঙ্গে কী খাবেন মেজদা?'

আমি যেন খাওয়া-দাওয়ার ঊর্ধ্বে, সংসারের ঊর্ধ্বে। ভাবের ঘোরেই যেন প্রশ্ন করছি— 'কবে গুরুপূর্ণিমা?'

'গুরুপূর্ণিমা? মঙ্গলবার। কেন মেজদা?'

'না, আশ্রমে যেতে হবে তো! সেদিন আমার আবার উপবাস। তুমি উপোসটুপোস কর না? উপোস করবে, অন্তত মাসে একবার। দেখবে মন ভীষণ পবিত্র থাকে। আর মন পবিত্র থাকলে এক ডাকে ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়।'

কালুর মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ অবাক হয়েছে! বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কেন আমি এসব কথা বলছি! কালু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ভগবানের সাড়া পেয়েছেন?'

'আমি?'

ঈশ্বরের মতো হেসে, আমি কালুর ডান গালে ছোট্ট একটা আঙুলের টোকা মারলুম। মেরেই ফিরে তাকালুম পেছনে। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কমল। কমল বোধহয় আমাকে কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। সেই ফাঁকে শিশুর লাল জিভটা বেরিয়ে আছে।

কালু পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে গেল দ্রুত পায়ে, যেমন সে নামে। বাতাসে আঁচল উড়ছে। শরীর ছুঁয়ে গেল আঁচল। অস্বস্তি আর আনন্দ একই সঙ্গে দু'ধরনের অনুভূতি। কমল কী ভাবছে। আবার শরীর ছুঁতে না পারি পরিধেয় স্পর্শ করে গেল। কমল কী ভাববে! তার কি এসব বোঝার বয়েস হয়েছে।

শুরু হল আমার অভিনয়।

'আয় বুড়ো। ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?'

'তুমি যাবে না বাবা?'

'কোথায় রে?'

'বলেছিলে আজ তাড়াতাড়ি এসে জুতো কিনতে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ যাব তো। একটু চা খেয়ে নিই।'

'তখন তো রাত্তির হয়ে যাবে বাবা। আবার আলো নিবে যাবে।'

'দেখ না এক্ষুনি হয়ে যাবে। তুই আয় না ওপরে।'

'আমি দিদার কাছে যাচ্ছি। তুমি আমাকে ডাকবে। ডাকবে তো!'

'বাঃ, নিশ্চয় ডাকব।'

কমল ছুটে চলে গেল বাইরের দিকে।

এ-বাড়ির দোতলাটা অপূর্ব সুন্দর। চওড়া মোজাইক ঢালা বারান্দা। চিক দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা। এখন গুটিয়ে গোল করে ওপরে রাখা হয়েছে। বড় বড় টবে নানা রকমের গাছ। পাম, ফার্ন, রবার। থাম জড়িয়ে অপরাজিতা লতিয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বড় বড় ঘর। বাহারি পরদা বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে। এ বাড়ির বাতাসে সব সময় মৃদু একটা ধূপের গন্ধ ভেসে থাকে। চারপাশ অসম্ভব পরিষ্কার। তকতক করছে। এ বাড়িতে এলেই আমার ভেতরটা কেমন করে। ওই যে ওপাশের ঘরটা। বারান্দার একেবারে শেষ মাথার ঘরটায় আমি আর গোপা একসঙ্গে এলে, থাকতুম। পশ্চিমের জানালা খুললেই কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝিরিঝিরি শোভা। কয়েকবার পূর্ণিমার রাতে থেকে গেছি। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। চাঁদের আলোয় সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে। ঝকঝকে খাটে দুধের মতো সাদা বিছানা। আমি জানালার ধারে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় একটা দোলখাওয়ার চেয়ারে বসে আছি। আর অত বড় বিছানায় কনুইয়ের ওপর মাথার ভর রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে গোপা। নীল শাড়ি পরতে ভালবাসত। সেই নীল শাড়িতে গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছে। এইভাবে শুয়ে থাকলে মেয়েদের শরীরের ঢেউ ভীষণ স্পষ্ট হয়। মেয়েদের শোভা তো নিতম্বে। গোপা ওইভাবে শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে গল্প করছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর হাত তুলছে। পা দোলাচ্ছে। পায়ের পাতায় পাতা ঘষছে। তখনও কমল আসেনি। আসবে। আমরা দু'জনে তখন স্বপ্নে ভাসছি। পৃথিবী প্রায় উবে গেছে। আমি আছি আর গোপা আছে।

কত রাত জেগে কেটেছে। চাঁদ টলতে টলতে নেমে আসত পশ্চিমে, কৃষ্ণচূড়ার ওপাশে। টান করে পাতা চাদর কুঁচকে যেত। বাতাস লাগা পুকুরের জলের মতো। শেষ রাতের ফিনফিনে ঠান্ডা বাতাসে মিশত পাখার বাতাস। তবু আমরা ঘামছি। সে এমন এক ধরনের উত্তাপ যেন দু'খণ্ড টাটকা পাউরুটি সবে বেরিয়ে এল বেকারি থেকে। সুখ বেশি দিন থাকে না। জীবনের ভাল ভাল মুহূর্ত বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়। একবার হারালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তোর মালা ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়লে একে একে সব কুড়িয়ে পাওয়া যায়। মুহূর্তের মালা ছিঁড়ে গেলে মহাকালে চলে যায়।

'গোপা, আমার হাত ধরে শেষ পর্যন্ত যদি যাবে না-ই জানতে তা হলে কেন এসেছিলে আমার জীবনে!'

কোনও কোনও জীবনে এইরকমই হয়। বাবা গেলেন দিল্লি। সুপ্রিম কোর্টে এক মক্কেলের হয়ে লড়তে। ফিরে এল তাঁর শরীর। ম্যাসিভ স্ট্রোক। মাকে ধরে রাখা গেল না। সবচেয়ে বড়

বিশ্বাসঘাতক গোপা। আমাকে ঠুকরে রেখে চলে গেল। এ ফল আর জীবনের পুজোয় লাগবে না।

> I cry I cry
> To God who created me
> Not to you Angels who frustrated me
> Let me fly, let me die
> Let me come to Him.

ওপাশের ঘর থেকে নীলুদা বেরিয়ে এলেন। সবে চান সেরেছেন। সারা গায়ে ফুরফুরে সাবানের গন্ধ। পেছন দিকে ওলটানো ঝাঁকড়া চুল। জল চিকচিক করছে।

'কী হল, তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে?'

'The world is come upon me, I used to keep it a long way off, but now I have been runover and I am in the hands of the hospital staff.'

'বাঃ স্টিভি স্মিথের কবিতা মুখস্থ করে বসে আছ। অনুবাদ করলে কী দাঁড়াবে, বহু দূরে রেখেছিলাম জগৎকে, এখন এসে পড়েছে ঘাড়ে। জগৎ আমায় চাপা দিয়ে সরে পড়েছে। আমি এখন হাসপাতাল কর্মীদের হাতে।'

বারান্দার রেলিং-এর ধারে ধারে চওড়া রকের মতো। নীলুদা বসে পড়লেন। দু'পাশে পাম আর পাইনের টব। আমাকে বললেন, 'বোসো না শ্রীকান্ত।'

নীচে থেকে কমল চিৎকার করছে। 'বাবা তোমার হল! তোমার চা খাওয়া হয়নি বাবা?'

কালু চা নিয়ে ওপরে এল। গরমে কালুর নাকের ডগার ওপর পুঁতির মতো ঘাম জমে। সে আর এক শোভা। শুনেছি যেসব মেয়ের নাক ঘামে তারা প্রেমিকা হয়। হলেই ভাল।

নীলুদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

'কমলের চটি কিনতে।'

কালু চায়ের কাপ নামাবার জন্যে নিচু হয়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, 'আপনি বাজারে যাবেন, মেজদা?'

'হ্যাঁ। এই চা খেয়েই যাব। কেন বলো তো!'

'আমি যাব আপনার সঙ্গে।'

'বাজারে যাবে?'

'হ্যাঁ, কালকের বাজারটা সেরে রাখি। সকালে ভীষণ ভিড় হয়।'

'তুমি বাজার করো!'

নীলুদা অপরাধীর মতো বললেন, 'আগে আমিই করতুম, এখন আর সাহস পাই না।'

কিছুক্ষণ পরেই আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলুম। কালু চুলে মনে হয় একঝলক চিরুনি বুলিয়েছে। শাড়িটা কুঁচিয়ে পরেছে। মুখে কি একটু পাউডার বুলিয়েছে। বেশ ফরসা দেখাচ্ছে। মনকে ধমক দিলুম, দেখাক। তোমার তাতে কী? মেয়েটা তোমাকে মেজদা বলে। সম্মান করে। তোমার মন দেখতে পায় না। পেলে হয়তো ঝ্যাঁটা মারত। আবার না-ও মারতে পারত। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি!

কালুর হাত ধরে কমল চলেছে। কখনও নেচে নেচে উঠছে, কখনও অন্যদিকে তাকিয়ে চলতে গিয়ে কালুর গায়ে টলে পড়ছে। কী অসীম নির্ভরতা। যেন শুয়ে শুয়ে চলেছে।

মানুষের মন কী অদ্ভুত। আমার মনে হচ্ছে বিদেশের কোনও এক শহরে আমরা তিনজন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি। স্বামী, স্ত্রী আর ছেলে। কে বলবে কালু কারও বাড়িতে আশ্রিতা। সামান্য

কাজের লোক। আমি পেছন থেকে ওর পায়ের গোড়ালি এক নজরে দেখে নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা সুন্দরীকে হার মানায়। সায়ার যতটুকু অংশ শাড়ির তলা থেকে উঁকি মারছে, একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার। আমি ওদের দু'জনের পেছনেই হাঁটছি। শাড়িটা কোমল শরীরে এত স্নেহে লেপটে আছে, মনে হচ্ছে আমার সামনে হেঁটে চলেছে মানবী নয়, মায়া। সমস্ত স্বপ্ন যেন ওই শরীরে।

গাধা। আমি গাধা। আমার একটা পরিচয় আছে। মর্যাদা আছে। বংশ পরিচয় আছে। আমার সম্পর্কে সংসারের একটা সুন্দর ধারণা আছে। .

তা আছে। তবে আমি যে বড় একা।

তোমার ছেলে?

সে তো একটা গচ্ছিত সম্পত্তি। সাবধানে রাখতে হবে। বাড়াতে হবে। তাকে আমি নাড়িচাড়ি। তার হাজার কথা শুনি। সে কি আমার কথা শোনে। তার জগৎ আর আমার জগৎ ভিন্ন। সে আছে স্বপ্নে আর আমি আছি বাস্তবে।

হঠাৎ কমল খুব জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। কালুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। বেচারা সামলাতে পারছে না। আমি পেছন থেকে চিৎকার করে বললুম, 'এই বুড়ো, কী হচ্ছে কী? পড়ে যাবি যে।'

কমল আমার দিকে দুষ্টু দুষ্টু মুখে তাকিয়ে বললে, 'আমি ইঞ্জিন।'

এগিয়ে গিয়ে কমলকে নিজের হাতে নিলুম, 'বুড়ো তুই হাঁপাচ্ছিস। এবার ধীরে হাঁট।'

পাশেই একটা রঙিন মাছের দোকান। রিঙ্কুস অ্যাকোরিয়াম। বিশাল বিশাল আধার, নানা বর্ণের মাছ খেলছে। কমল দাঁড়িয়ে পড়েছে। একেবারে নিশ্চল। চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। নাকের পাটা অল্প ফুলে উঠেছে। আমি, আমার পাশে প্রায় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কালু। আমার সামনে কমল।

আমি যত না মাছ দেখে আনন্দ পাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ হচ্ছে, আমার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে কালু। আমি তার কাঁধের ঢাল দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়। এলো খোঁপা। এমনকী দেহের উত্তাপ পাচ্ছি শরীরে। যতক্ষণ থাকা যায় এইভাবে।

কমল বললে, 'কেনো না বাবা! ছোট মতো একটা কেনো না!'

'কে দেখবে বাবা। জল পালটাতে হবে। খাবার দিতে হবে। নইলে যে মাছ বাঁচে না।'

'কেন কালু পিসি দেখবে।'

'পিসির সময় কোথায় বাবা? সারাদিন কত কাজ করতে হয় পিসিকে।'

কালুরও মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে। আর হবারই কথা। ঈশ্বর যেন রং ঢেলে দিয়েছেন। সুন্দর। তাই গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। কালু বললে, 'মেজদা একটা কিনেই ফেলুন। আমি সব করব, যা যা করতে হয়।'

'ঠিক আছে, নীলুদার অনুমতি নিয়ে মাঝারি মাপের একটা কেনা যাবে।'

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলুম। ওই তো সিনেমা। নীল আলোর অক্ষরে নাম লেখা। বিশাল বড় ব্যানারে নায়ক নায়িকার জাপটাজাপটি। হলের সামনে তেমন ভিড় নেই। শো শুরু হয়ে গেছে। কতকাল সিনেমা দেখিনি। শেষ একটা বাংলা ছবি দেখেছিলুম গোপার সঙ্গে। সে ছিল শীতকাল। অনেক রাতে চিনে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম। তখন আমরা ও বাড়িতে ছিলুম।

'কালু তোমার সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'হিন্দি ছবি ভাল লাগে না। ভাল বাংলা বই, ধর্মের বই হলে দেখতে ইচ্ছে করে।'

আবার আমরা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি আবার ধর্মটর্ম কেন। ধর্ম এক ধরনের বর্ম। পরে থাকলে সহজে ছোঁয়া যায় না। এই বয়েসেই ধর্মে মতি। বড় বিপদ করলে। তোমাকে নিয়ে অবশ্য কোনও দিনই গরম-ঠান্ডা বই দেখা যাবে না। লোকে ছি ছি করবে। শ্বশুরবাড়ি ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাকেও দূর করে দেবে। গোপার মা বড় কড়াধাতের মহিলা।

আমরা তিনজনে জুতোর দোকানে ঢুকে পড়লুম। একেবারেই ভিড় নেই। চেয়ারে বসেছি, একপাশে আমি, ওপাশে কালু, মাঝে বুড়ো। হঠাৎ চোখ চলে গেল কালুর হাঁটুর দিকে। শাড়িতে সেলাই। বিষণ্ণ হয়ে গেল মন। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার কাছে চাইতে পারে আবদার করতে পারে। এমন কেউ নেই, যে কালুর জন্যে উপহার কিনে আনবে। রেস্তোরাঁয় বসিয়ে আদর করে খাওয়াবে।

দোকানের ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কার জুতো?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না। কমল পা তুলে নাচাতে নাচাতে বললে, 'আমার। আমার চটি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আজকালকার ছেলেরা কীরকম স্মার্ট দেখেছেন। আমাদের কালে মুখ দিয়ে কথা সরত না।'

'ঠিক বলেছেন, আমরা লোক দেখলে মায়ের আঁচলের তলায় মুখ লুকোতুম।'

ভদ্রলোক জুতোর র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর আমি কমলের পাশ দিয়ে ঝুঁকে কালুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, 'তোমার চটির অবস্থা শোচনীয়। বহু ভাল ভাল মেয়েদের চটি রয়েছে। তোমাকে এক জোড়া কিনে দিতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

মেয়েদের কান কী সুন্দর। পাতলা। ফরসা। এই কানে বেশ পাথর বসানো সুন্দর একটা ঝুমকো ঝুললে কেমন হত। মানুষের জীবনের এই এক মজা, কেমন হত, কেমন হত করতে করতেই নাটক শেষ। সাজ পোশাক খুলে সোজা চিতায়। যা হওয়াতে চায় তা আর হয় না।

কালু মাথাটা আমার দিকে আর একটু কাত করে মুখে সেই অদ্ভুত হাসি টেনে বললে, 'কী হবে। এই তো বেশ আছে। অনেক দিন চলে যাবে।'

'আমার যে খুব ইচ্ছে করছে।'

কালু সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাল। চোখ ফেরাতে পারছি না; কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। ধরা পড়ে গেলুম না তো। কমলের মাথার ওপর কী সব ঘটছে। নীচে জীবনের এক মানে, ওপরে জীবনের আর এক মানে। কালুর চোখে সন্দেহ নেই। সহজ, সরল, গভীর দৃষ্টি। বড় নির্জন দুটি জলাশয়। অনেক উচ্চতায় পাহাড়ের মাঝখানে যেমন থাকে। হঠাৎ হয়তো একটা নীল পদ্ম ফুটে ওঠে শরতের সকালে।

চোখ দুটো আধবোজা করে কালু যেন ক্ষমা চাওয়ার গলায় বললে, 'বড়মা বকবেন। আমাকে বলে দিয়েছেন, ফ্যাশানট্যাশান একেবারে করবে না। যা দেবার উনিই দেবেন।'

কমলের চটি নিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আমাদের দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বলি স্বাধীনতা। পৃথিবীতে ক'টা লোকের যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা আছে! এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এ করা যায় না— ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা ভাল ছেলে হয়ে। এঁরা আবার শ্লোক বেঁধেছেন, টাকা গেলে কিছু গেল। স্বাস্থ্য গেলে বেশ কিছু গেল। চরিত্র গেলে সবই গেল।

চরিত্র কাকে বলে রে?

কমল পা থেকে জুতো খুলবে না। নতুন জুতো পরেই যাবে। পুরনো জুতো দু'পাটি নতুন বাক্সে প্যাক করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভদ্রলোক আমার হাতে দিলেন। নতুন জুতোয় কমলকে বেশ মানিয়েছে। এই বয়েসে মানুষের কী সুন্দর গুটি গুটি পা হয়।

আবার আমরা পথে। আলো ঝলমলে শাড়ির দোকান। কত রকমের শাড়ি ঝুলছে। অহংকারী এক পুতুল-নারী গাঢ় নীল রঙের একটি শাড়ি পরে কেমন বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। কালু যদি আমার বউ হত, এখুনি কালুকে ওই নীল শাড়িটা কিনে দিতুম। এমন ঝলমলে রাতে মনের মতো সঙ্গী নিয়ে পথে পথে ঘুরতে ইচ্ছে করে। কখনও শরবত খাব, কখনও কাবাব, কখনও সুগন্ধী আতর মাখানো বেনারসি পান। তারপর একসময় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসব বাড়িতে। আধুনিক বাড়ি নয়। ছোট দু'কামরার গরিব গরিব আস্তানা। টিনের চাল দেওয়া বারান্দা থাকবে। বাঁশের আলনায় পাট পাট

শাড়ি, ধুতি পাশাপাশি। ছোট্ট একটা তুলসীমঞ্চ পেছনের ছোট্ট মতো বাগানে। টিনের বালতিতে চাপা দেওয়া জল। পাশে মগ নয়, পেতলের ঘটি। নিকোনো তোলা উনুন। একটা থুপ্পি মতো সাদা বেড়াল। যে খুব আস্তে আধবোজা চোখে মিউ করে ডাকে। তিনবারের চেষ্টায় একবার স্বর বেরোয়। বেশি রোজগার নেই; কিন্তু হিসেব করে বেশ চলে যায়। টিনের কৌটোয় কিছু খুচরো পয়সা, বড় ছোট খানকয় নোট। দেয়ালে দেব-দেবীর ছবি। নিখুঁত চন্দনের ফোঁটা, সিঁদুরের টিপ। দরজা খোলা মাত্রই ধূপের গন্ধ।

পইঠের উঁচু ধাপে দাঁড়িয়ে কালু আমার দিকে ফিরে বলছে, 'চাবি। চাবি তোমার পকেটে।'

পেঁচিয়ে আঁটসাঁট করে পরা সিল্কের নীল শাড়ি। গাঢ় নীল ব্লাউজ। আধুনিক হাতা কাটা নয়। হাফ হাতা সাবেকি। গোল নিতম্ব যেন পিছলে পায়ের দিকে পড়ে যেতে চাইছে। ফরসা পাতলা পায়ে একটু আগে দেখা নীল স্যান্ডাক ব্যালেরিনা। কোথা থেকে চোরা আলোর আভা এসে পড়েছে ফরসা, তেলতেলে মুখে। চোখ দুটো কালো হিরের মতো জ্বলছে। মুখে পানের অবশিষ্ট। পাতলা লাল ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। 'চাবি দাও। কী, হল কী তোমার!'

'দেখছি।'

'আহা, আমাকে যেন দেখোনি। দেখে দেখে চোখ বলে পচে গেল।'

'তুমি ঢুকো না। তুমি দু'ধাপ উঁচুতে এইভাবে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকো। অসুস্থ পৃথিবী শুয়ে পড়েছে। রাতের বাতাস চলেছে অভিসারে। আকাশে তারাদের গজল। ওই দেখো তোমারই হাতে পোঁতা তস্কর মাধবীলতা জানালা বেয়ে চালে উঠেছে। তোমার মুখটা আর একটু বাঁপাশে ফেরাও। নাকের পাথরে আলোর ফলা আর একটু তীক্ষ্ণ হোক। কে বলে পৃথিবী ভয়ংকর। এই মুহূর্তের শামুকখোলে কত জন্মান্তর কাটানো যায়, যে জানে সে জানে। তুমি দাঁড়াও আমি গাই— গয়াগঙ্গা, প্রভাসাদি, কাশী, কাঞ্চী কে-বা চায়।

কমল ভীষণ জোরে কান ফাটানো সুরে ডাকছে— 'বাবা। ও বাবা। তুমি শুনতে পাচ্ছ না কেন?'

কালু বললে, 'গল্প ভাবছিলেন, তাই না মেজদা!'

আমার মুখে প্রশ্নটা প্রায় এসেই গিয়েছিল, 'কালু, বাবারা প্রেমিক হতে পারে না।'

সামলে গেলুম। বহু ভাব আছে, যা বাইরে আনতে নেই। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মতো আলোয় আনলেই জ্বলে যায়। আর ছবি হয় না। সব সাদা।

'আর বলো কেন, একটা উপন্যাস লিখতে হবে গো। ভীষণ দুশ্চিন্তা।'

'তোমার গল্প কে পড়ে বাবা।'

কালু বললে, 'কত লোকে পড়ে। আমি সেদিন দুপুরে আপনার একটা গল্প পড়ছিলুম। পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলেছি। আপনি বৃদ্ধদের ছবি খুব সুন্দর আঁকেন। বৃদ্ধদের কাছ থেকে দেখেছেন তাই না।'

'আসলে আমি বৃদ্ধ হয়ে আসছি তো।'

'বৃদ্ধ। আপনার মাথার চুল পাকেনি। আপনি তো ছেলেমানুষ। ভীষণ ছেলেমানুষ। এই বয়েসের ছেলেদের মুখ কত পেকে যায়, গাল ভেঙে যায়। আমার বাবা বলতেন সৎচিন্তা করলে মুখের শ্রী ভাল থাকে, সুন্দর থাকে।'

কমল বললে, 'তুমি আমাকে একবার কোলে নাও না বাবা।'

'কেন রে বুড়ো?'

'আমার নতুন জুতোয় কাদা লেগে যাবে যে।'

আমি আবার তেমন কোলেটোলে নিতে পারি না। ইতস্তত করছি। কালু বললে, 'আমি নিচ্ছি মেজদা।'

'এত বড় ছেলে কোলে উঠবি কী রে বুড়ো।'

'আমি বড় বাবা?'

'হ্যাঁ তো, তুমি কত বড়। আরও বড় হবে।'

কমল কালুর হাত ধরে আবার হাঁটা শুরু করল। দু'কদম দূরেই বিখ্যাত খাবারের দোকান। শিঙাড়া, কচুরির গন্ধে বাতাস ম-ম করছে। জানতুম কমল এবার লাফাবে। ছেলেটা একটু পেটুক হয়েছে। তা এই তো খাবার বয়েস। মা বেঁচে থাকলে কত কী করে করে খাওয়াত। কালুর পাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে কমল দুষ্টু দুষ্টু হেসে বললে, 'বাবাআ।'

'বুঝেছি বাবা। গন্ধ পেয়েছ।'

'হাঁউমাউ খাঁউ, শিঙাড়ার গন্ধ পাঁউ।'

'পাঁউ তো চলো যাঁউ।'

ভদ্র দোকান। ভদ্র বসার ব্যবস্থা। একালের যুবকদের তেমন হুল্লোড় নেই।

'কালু কী খাবে বলো?'

'না মেজদা।' কালুর চোখে-মুখে ভয়ের ভাব, 'আমি কিছু খাব না। দোকানে বসে কিছু খেয়েছি শুনলে বড়মা ভীষণ রাগ করবেন।'

'কেন। দোকানে বসে খাওয়া খারাপ?'

'বড়মা আমাকে বলেছেন মেয়েদের যেন লজ্জা থাকে।'

'আর তুমি যে বাজার দোকান করছ!'

'বড়মা বলেন একাল আর সেকাল মিলিয়ে একটা কাল তৈরি করতে হবে।'

'তুমি তো বাইরের কারও সঙ্গে খাচ্ছ না। তুমি খাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

'না মেজদা, সত্যিই আমার লজ্জা করবে। সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমি খেতে পারি না।'

'আমি তোমাকে আড়াল করছি।'

কালু মাথা নিচু করল। মুখে সেই অদ্ভুত হাসি। ইচ্ছে করলেই মানুষ মানুষের কাছে সরে আসতে পারে না। অনেক বাধা। বংশ পরিচয়। অর্থনীতি। সমাজ।

খাবার এসে গেল। টেবিলের ওপাশে কালু আর কমল। আমি উলটো দিকে কালুকে আড়াল করে আছি। দেওয়ামাত্রই কমল খেতে শুরু করেছে। একবার শিঙাড়া, পরক্ষণেই সন্দেশ। খাওয়ার কোনও ছিরিছাঁদ নেই। কালু হাত গুটিয়ে বসে আছে।

'কী শুরু করো। তুমি না খেলে আমি খেতে পারছি না।'

কালু মুখ তুলে ফিসফিস করে বললে, 'আপনার সামনে খেতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

'আমাকে তোমার লজ্জা! কেন?'

'আপনি আমার মনিব।'

'তুমি আমাকে নাই বা ওই চোখে দেখলে। মনে করো না আমি তোমার একজন আপনজন। নিজেকে অত ছোট ভাবছ কেন?'

কালু আমার মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শিঙাড়ার একটা পাশ ভেঙে মুখে পুরল। কমলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার যে সব পড়ে যাচ্ছে। আমি খাইয়ে দেব বাবু!'

মুখে সন্দেশ, কমল হাসি হাসি মুখে বললে, 'না না।'

কালু বাঁ হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরল। কালুর বুকের কাছে মাথা রেখে আধবোজা চোখে কমল সন্দেশ খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। আর আমি অবাক হয়ে দেখছি। শিশুদের কী মজা। কোনও জাত নেই।

কালু বললে, 'আপনার ছেলে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। মাঝে মাঝে কী বলে ডাকে জানেন?'

হঠাৎ চুপ করে গেল। মুখ নামিয়ে নিল। ডিশে আঙুল খেলা করছে। মাঝের আঙুলে একটা লোহার আংটি। আঙুলের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার শ্বশ্রুমাতা ভীষণ খাটান।

'কী বলে কমল তোমাকে?'

কালুকে আর উত্তর দিতে হল না। কমল কালুর গায়ে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজিয়ে বলল, 'মা'।

কালু হাসছে। সেই অসাধারণ হাসি যা একমাত্র অতি পবিত্ররাই হাসতে পারে। যার মধ্যে কোনও পাপ নেই। আমিও কালুর মতোই হাসার চেষ্টা করলুম। হাসিমুখে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। হাসিতেই লুকিয়ে আছে কত কথা।

ফিরে আসতেই কমলের দিদা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালু তোমরা এত দেরি করলে?'

ছেলেমানুষের পেটে কথা থাকে না। কমল বললে, 'দিদা দিদা, আমরা কত কী করলুম। এই দেখো না আমার জুতো। কত কী খেলুম!'

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এক বাক্স সন্দেশ এনেছিলুম। বড় কড়া প্রকৃতির মহিলা। ঘুষে তেমন কাজ হল বলে মনে হচ্ছে না। তেমন হাসি তো ফুটল না। সোনালি ফ্রেমের চশমায় আলোর ঝিলিক। কালুকে বললেন, 'পুজোর ফুল এনেছ?'

কালু একটু থতমত খেয়ে গেল। মাথা নিচু করে বললে, 'বড় ভুল হয়ে গেছে বড়মা।'

'কাল ভোরে পুজো হবে কীসে। সব মনে রইল, কচুরি-শিঙাড়া খাওয়া হল আর ফুলের কথাটাই ভুলে মেরে দিলে। যাও এক্ষুনি নিয়ে এসো।'

সেকী, এতটা হেঁটে কালু আবার সেই বাজারে ছুটবে?

বৃদ্ধা এবার কমলকে নিয়ে পড়লেন, 'তোমার পড়াশোনা আছে? না ইস্কুলে ছুটি পড়ে গেছে বলে সে পাট উঠে গেল।'

কমল আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'বাবা চলো বাড়ি যাই।'

'তোমাকে আমি বাড়ি যেতে বলিনি। পড়তে বসার কথা বলেছি। যাও ওপরে গিয়ে মামার কাছে পড়তে বোসো। খেয়ে-দেয়ে দু'জনে বাড়ি যাবে।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি একটু সাবধান হও বাবা। মা-মরা ছেলে দেখো ভেস্তে না যায়। বেশি আদর না দেওয়াই ভাল। বয়েসের তুলনায় ও কিন্তু একটু বেশি বুদ্ধিমান। সেকালে আমরা বলতুম পাকা ছেলে।'

কালু ধীরে ধীরে সদরের দিকে চলেছে। দুঃখী মেয়ে ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে যাবে আবার সেই অত দূর।

সাহস করে বললুম, 'মা, এই রাতে ও আবার এতটা পথ যাবে। দিনকাল ভাল নয়। ফুল আমি এনে দোব।'

'তুমি যে বাবা কাগজের লোক। তাই কেবলই দিনকাল খারাপ দেখছ। খারাপের জায়গায় খারাপ আছে। নিজে খারাপ হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করতে পারে না। ওর কাজ ওই করবে। তুমি তোমার ছেলের কথা ভাবো।'

বৃদ্ধা রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। কী একটা রাঁধছেন, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে।

কমলকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে কমলকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বুড়ো, তোর দিদা এত খেপে আছে কেন রে?'

কমল হতাশ গলায় বললে, 'দিদার খুব দুঃখু গো বাবা।'

'কীসের এত দুঃখ?'

খেতে পারে না দাঁত নেই, বেড়াতে যেতে পারে না পায়ে ব্যথা, কেউ গল্প করে না দিদার সঙ্গে, আর কেবলই বলে আমার একটা মেয়ে বাইরে, আর একটা মেয়ে ওপরে, আমার আর কে আছে?'

'তুই তো দিদার সঙ্গে একটু গল্প করতে পারিস?'
'করি তো। কত গল্প বলি। দিদা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শোনে।'
বারান্দার শেষ মাথায় নীলুদা বসে আছেন ইজিচেয়ারে। আজ আবার চাঁদ উঠেছে। মেঝেতে লতানে গাছের পাতার ছায়া ছড়িয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল, নীলুদা হয়তো মাকে বিয়ের কথা বলেছেন। বৃদ্ধার আতঙ্ক হয়েছে। সংসারের ওপর এতদিনের কর্তৃত্ব এবার চলে যাবে। ওই ঠাকুরঘর আর মালা আর দিন গোনা। ঈশ্বর তো সহজে দর্শন দেবার মতো সুবোধ বালক নন। কেবল শুনে যাও, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা শুধু চালিয়ে যাও। শুধু জপ করে যাও আর কেঁদে যাও। আনন্দ! কোথায় আনন্দ! নিত্য অফিস যাওয়ার মতো একঘেয়ে রুটিন। আসলে বোসো আর মালা ঘোরাও।
ভেবেছিলুম নীলুদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। না, জেগেই আছেন। বললেন, 'হল? জুতো কেনা হল?'
'হ্যাঁ, হল।'
'বোসো। আজ তো তোমার তেমন কাজ নেই। থেকে যাও না!'
'ওব্বাবা, এ যা দিনকাল, এক রাত বাড়ি ফেলে রাখা মানে, সব হাওয়া।'
'তুমি একটু বেশি ভিতু! তোমার পাড়া ভাল, কেউ কিচ্ছু করবে না।'
'না নীলুদা। সাবধানের মার নেই।'
'আবার মারেরও সাবধান নেই। তুমি ওটা বেচে দাও। এ বাড়িতে চোদ্দোটা ঘর, তিনজন মাত্র প্রাণী। এখানে এসে থাকো।'
'শ্বশুরবাড়িতে থাকতে নেই। বহুকালের সাবধান-বাণী।'
'সে শ্বশুরবাড়ি আলাদা। এ বাড়ি মানুষ চায়। কদিন হল একটা কথা ভাবছি শ্রীকান্ত।'
'কী কথা নীলুদা?'
'এখন না, আড়ালে বলব।'
কমল সরে যেতেই নীলুদা বললেন, 'তুমি সোমাকে বিয়ে করে সংসারী হও। তোমার বয়েস আছে। একেবারে এলো হয়ে ঘুরে বেড়িয়ো না। তা ছাড়া ছেলেটা রয়েছে।'
ওই ছেলেটার জন্যেই আমি আর বিয়ে করব না।'
'সেইজন্যেই তো এক ঘরানার মেয়ে নিতে বলছি। যাকে চেনো, জানো। সোমা সেরকম সংমা হবে না। মায়ের মতো একটু রাগী; তবে রাগ পড়ে যেতে মিনিট খানেকও লাগে না।'
'বিয়ের মত হলে সোমা আমার চেয়ে শতগুণ ভাল ছেলে পাবে।'
'আর পাবে না, দশ বছর আগে হলে পেত। নেলীর মতো অবস্থা। কোনও সুন্দর যুবক বিয়ে করবে না। কেন করবে? কথায় আছে মেয়ের কুড়িতেই বুড়ি। এরা প্রায় মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছে। তুমি রাজি থাকলে আমি সোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি। মেয়েটা আর কতকাল বাইরে পড়ে থাকবে!'
'নীলুদা, সোমা আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।'
'কে বলেছে?'
'আমার মনে হয়েছে।'
'তোমার মন, তার আবার মনে হওয়া। তুমি তো কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াও। কলেজে আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমার বড় ফ্যান। তারা বলে শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অসীম ক্ষমতা— অবাস্তবকেই লেখার গুণে বাস্তব করে তোলে। পড়তে পড়তে মনে হয় এইটাই সত্যি। ঘোর কেটে গেলে মনে হয়, আচ্ছা বোকা। মেয়েদের নিয়ে লেখো, মেয়েদের তুমি কিছুই জানো না। যেটুকু জানো, সব ভুল। তোমার কল্পনা। মেয়েরা হল স্বভাব-অভিনেত্রী। স্টেজে মেরে বেরিয়ে যায়। সোমাকে তুমি চেনো না। তোমাকে সে ভালবাসে।'
'ভালবাসে?'

নীলুদা নীরব। আকাশে একখণ্ড চাঁদ। ভেসে ভেসে চলেছে। সোমা আমাকে ভালবাসে। হেডলাইন হবার মতো নিউজ। আমি একটা প্রেমের উপন্যাস লেখার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়ছি। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি দুটো চরিত্র। কালই আমার তা হলে বেনারস এক্সপ্রেস ধরা উচিত। প্রেম কাকে বলে, হাতে-নাতে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাক।

পাগল। আমি একটা রোমান্টিক ফুল। একটু আগে আমারই নির্বুদ্ধিতার জন্যে সরল, নিষ্পাপ একটা মেয়ে এখন বাজারে জল কাদায় ফুলের ছেঁড়া পাপড়ি কিনছে। আমার নিজেরও কম অপমান হল না। ঝি-কে মেরে বউকে শেখানোর মতো, কালুকে দাবড়ে, কমলকে ধমকে জামাইকে শেখানো হল। ভদ্রমহিলা কেমন যেন হয়ে গেছেন। বিকট নীতিবাগীশ।

'নীলুদা, কমল রইল আপনার কাছে, আমি আসছি এখুনি।'

'কোথায় চললে?'

'যাব আর আসব। এই মোড়ের মাথায়।'

বাইরেটা একেবারে বাহবা সুন্দর। ভুরভুরে চাঁদের আলো। ফুলের গন্ধ চুপিচুপি ঘুরছে। মনে হয় মৃগাঙ্কবাবুর জংলা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়েছে পায়ে পায়ে। আমার এই বাইরে আসার আসল উদ্দেশ্য কালুকে ধরা। আমার জন্যে বেচারার নিগ্রহ। মেয়েদের করুণ মুখ দেখলে আমার ভেতরটা দুলে ওঠে।

তা তো উঠবেই বাবা? তুমি যে গভীর জলের মছলি।

কে?

কে আবার, তোমার বিবেক।

বিবেকভায়া ঘুমিয়ে পড়ো।

মাথা নিচু, বেশ কিছুটা হাঁটার পর মনটা ভীষণ পবিত্র হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে এক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, আমরা সকলেই কারও না কারও পদানত। দয়া। মানুষের দয়ায় মানুষের বাঁচা মরা। কৃপা। কৃপা করো প্রভু। আমার সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে। নিখিল, আমার বাল্যবন্ধু। বিয়ে-থা করল। ছোট্ট এক এক-কামরার ঘরে সংসার পাতল। বেশ চলছিল। মাসের শেষে যা মাইনে পেত, তুলে দিত বউয়ের হাতে। প্রথমে এল ছেলে, তারপর জোড়া মেয়ে। বেশ চলছে। নিখিল হাসে। মাঝে মাঝে রাগে। সপরিবারে এখানে ওখানে যায়। হঠাৎ নিখিলের চাকরি চলে গেল। সঞ্চয় শূন্য। চাকরি জোটে না। প্রভুরা অকরুণ। চেহারার জেল্লা মরে এল। বাড়ি ছাড়তে হল। সেই পুরনো গল্প। নিখিলের বউ এখন থিয়েটার করে। চেহারা পালটে গেছে। মূল্যবোধ বদলেছে। সেদিন দেখি তিনটে হুমদোর সঙ্গে বসে বিয়ার খাচ্ছে। তখন রাত প্রায় ন'টা। হাত-কাটা বিশ্রী এক ব্লাউজ। সাদা মতো এতখানি একটা পেট চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে ঝুলে আছে। কোথায় সেই লজ্জানত দৃষ্টি। সেই মধুর ভাষণ। সেই লাবণ্য। সিল্ক মোড়া একটা গিরগিটি।

মহাভারতের মানে সেদিন সুস্পষ্ট হল। ধার্মিক যুধিষ্ঠির পাশায় বসেছেন। বসতেই হবে। জীবনের সঙ্গে জুয়া তোমাকে খেলতেই হবে শ্রীকান্ত। লাইফ ইজ এ গ্যাম্বল। আর দুঃশাসন, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করবেই। পরিবার আবার কী? ইজ্জত? গাধা, বাঁচার জন্যে অথবা মরার জন্যে সব তোকে দিয়ে যেতে হবে। একে একে। খুলে খুলে। নান্য পন্থা। সেই সর্বশক্তিমান, যাঁকে দেখিনি, যাঁর কথাই শুনে আসছে মানুষ যুগ যুগ ধরে, তিনি কি ইচ্ছে করলে আমাদের একটা কিছু পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। যাঁর ফ্যাক্টরিতে মানুষের মতো জটিল যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, তিনি ইচ্ছে করলে একটা কাপড়ের কল বসাতে পারতেন না। উদ্দেশ্যটাই যে আলাদা। আগে নিজেকে বিকিকিনির হাটে বিকোও, তারপর

চোগাচাপকান পরো। বড় দাস। ছোট দাস। দাসানুদাস। প্রভুর পদতলে নতজানু হও। প্রভুরও প্রভু আছে।

যে আগেভাগেই ষড়যন্ত্রটা জানতে পারে, সে একসময় সব ছেড়ে ছুড়ে এক জায়গায় বসে পড়ে। তারপর হাত জোড় করে, বলে দাসোহম। আমি আর কারু দাস নয়। তোমার দাস।

এই যে আমি। নিজেকে মোটামুটি বিকোতে পেরেছি। লেবেল মেরেছি, বুদ্ধিজীবী, লেখক। সেই দাস-পুত্র কমল তাই ইউনিফর্ম পরে ইংরেজি স্কুলে পড়ছে। কালুর বাবা, ভালভাবে বিকোতে পারেনি। গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে এসে টেঁসে গেছে। ছেঁড়া শাড়ি পরে কালু সেবা করছে বড়মায়ের। তার স্বাধীনতা নেই। ভালবাসার অধিকার নেই। সব সময় ভয়।

ঈশ্বর! চালাকি পেয়েছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন আমাকে পাঠালে এখানে! নাঃ, তোমাকে প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। তুমি সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী। ডেসপট? সেই কারণেই রাজাদের মধ্যযুগে বলা হত, ঈশ্বরের খোদ প্রতিনিধি। তোমার এত শক্তি, ক্ষুদ্র মানব আমি। পারব না তোমার সঙ্গে।

I love Your stubborn purpose,
I consent to play my part
But now a different drama is being acted:
For this once let me be.

কঠিন উদ্দেশ্য তোমার ভালবাসি প্রভু
আমার ভূমিকায় আমি আছি বেশ
তবে এখন এক ভিন্ন পালা
একটিবার অংশ নিতে দাও ॥

আমার চলা থেমে গেছে। কোথায় চলেছি আমি। শেষ লাইনটা তোমাকে শোনাই শ্রীকান্ত ক্রীতদাস: To live your life is not as simple as to cross a field.

বাঁচা কি এতই সহজ যেন মাঠ পেরিয়ে চলে গেলে হেঁটে ॥

মুখ তুলতেই সামনে কালু। সিনেমা হাউসের নীল আলো পড়েছে মুখে। আমাকে দেখে চমকে উঠল ভূত দেখার মতো। মিহি ঘামে ফরসা মুখ প্রতিমার মুখের মতো তেলতেলে। বুকের কাছে ধরে আছে বড়সড় শালপাতার একটা মোড়ক।

'আপনি? আপনি এখানে কী করছেন?'

'আমি তোমার জন্যেই বেরিয়ে এসেছি।'

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলুম। যা ভেবেই বলে থাকি, এর অর্থ খুব গভীর। সত্যি সত্যিই কালুর জন্যে সব ছেড়ে, মানমর্যাদা গৃহসম্পদ সব ছেড়ে, আমি বেরিয়ে আসতে পারব? বলতে কি পারব—

আজ ক্যোঁ পরবা নহী অপনে অসীরোঁ কী তুঝে। —
তোমার কাছে বন্দি হতে পরোয়া করি না আমি ॥

কালু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে কিছুক্ষণ। অদ্ভুত এক মায়া ছড়িয়ে গেছে সারা মুখে। খুব ধীরে বললে, 'বড়মা জানতে পারলে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। অন্য কোথাও আমি কাজ করতে পারব না যে। আমি যে ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম।'

আবার সেই ভয়। ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। আমি বললুম, 'চলো, অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'আমরা একসঙ্গে ঢুকব নাকি?'

'কেন?'

'না না, আমি আগে যাই। আপনি একটু পরে আসুন।'

কালু হাসছে। সেই হাসি। কালু চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে ফিরে তাকাল। আর ঠিক সেই সময় সিনেমার বিকেলের শো ভাঙল। কুলকুল করে লোক বেরোচ্ছে। সেই স্রোতে আমি ভেসে গেলুম। কত রকমের নারী-পুরুষ। ঘামের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ। কথা আর কথা। অজস্র শব্দ। এলোমেলো। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, চওড়া-চওড়া পিঠ। উঁকি মারা ব্রেসিয়ারের ফিতে। অল্প অল্প ঘামে ভেজা। বড় খোঁপা, এলো খোঁপা। সব গায়ে গা লাগিয়ে চিলতে চিলতে ঘরের দিকে ছুটছে। মুখে মুখে ফিরছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম। আজকের রাতের হিসেব চুকল। কাল সকালে আবার খাতা খোলা হবে। নতুন তারিখ। নতুন হিসেব। জমার ঘর। খরচের ঘর। বোকার প্রশ্ন— কী পেলে?

বেশ রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। কমল এল না। মামার বিশাল বিছানায় শুয়ে পড়েছে। গভীর নিদ্রা। কমলের দিদা বললেন, 'এই এত রাতে টানাটানি করে কী হবে বাবা। আবার তো সেই কাল সকালেই আসতে হবে। ঘুমুচ্ছে ঘুমোক।' কেমন করে যেন বললেন। তেমন সহজ শোনাল না। যাক গে। মানুষের মন মেজাজ তো সব সময় সমান থাকে না। বৃদ্ধার কিছু একটা হয়েছে। কমলও আজকাল আসতে চায় না। কালুর সঙ্গে খুব ভাব-ভালবাসা হয়েছে।

পৃথিবীতে কতরকমের ভাব, কতরকমের ভালবাসা আছে?

পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটাকতক কুকুর শুধু জেগে আছে, এখানে ওখানে। ফ্ল্যাটের তালা খুলে কয়েক পা এগোলে আলোর সুইচ। রাস্তা থেকে ছিটকে আসা চাঁদের আলোয় আঁধার কিছু তরল। আমার আবার ভূতের ভয় আছে। গোপা জানত। হাসত। এখন আমি জানি শুধু।

এক পা এক পা এগোচ্ছি, আর ভয়ে মরছি। আমার মতো লোকের একজন সঙ্গী ছাড়া জীবন অচল। কমল পাশে থাকলে তবু সাহস কিছুটা বাড়ত। সদ্য রং করা দেয়াল। পালিশ করা দরজা। সব যেন জীবন্ত। বিজবিজ করছে। সুইচ টিপলুম, আলো জ্বলল না। প্রথমে ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ভয়ে হাত পা হিম হয়ে গেল। সাহস করে বার কতক খটখট করলুম। সর্বনাশ, আলো ছাড়া ওপরে যাব কী করে! সিগারেট খাই না। পকেটে দেশলাইও নেই।

আবার হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে একেবারে রাস্তায়। গোপার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এ যেন উনুনে আগুন দিয়ে সরে পড়া। রেগে আর কী হবে? সে এখন সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেবল আমার স্মৃতিতে একটি পদচিহ্ন। ফেলে যাওয়া একটি নাম। দু'দিকে দু'বাহু মেলে ধু ধু চাঁদের আলোয় পড়ে আছে নির্জন রাস্তা। সব বাড়িই অন্ধকার। কেবল বহু দূরে পাঁচতলা একটা বাড়ি বাতিঘরের মতো জ্বলছে।

সামনে হলদে বাড়ির দিকে কী ভেবে একবার ঘাড় তুলে তাকালাম। বুকটা ধক করে উঠল। রেলিং-এ কনুই, পরনে সাদা শাড়ি, সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকেই দেখছে। নিজের বিব্রতভাব কাটাবার জন্যে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম, 'একটা দেশলাই ফেলে দেবেন। বড় বিপদে পড়ে গেছি।'

'দেশলাই, দাঁড়ান আসছি।'

'আসতে হবে না, আপনি ফেলুন, আমি লুফে নিচ্ছি।'

মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের দরজা খুলে গেল। টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন। স্বপ্নপুরীর দরজা খুলে গেল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। সব সাদা। শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা। সাদা চাঁদের আলো। দুনিয়াটাই সাদা।

'আপনি আবার কষ্ট করে নেমে এলেন কেন?'

'তাতে কী হয়েছে? দেশলাইয়ে হয় নাকি?'

'এখনও জেগে আছেন!'

'আর বলবেন না, বড় বিপদে পড়ে গেছি।'

'বিপদে!'

'এত রাত হয়ে গেল, মামা এখনও ফিরলেন না।'

'উনি আপনার মামা?'

'হ্যাঁ, আমার বড় মামা।'

'কোথায় গেছেন, কিছু বলে গেছেন?'

'কিচ্ছু না।'

'তা হলে:

'আপনার তো সব জানা আছে। কোথায় ফোন করি বলুন তো?'

'ফোন? চলুন যাচ্ছি।'

দরজায় আবার তালা লাগালুম। মহিলা আলো ধরে সাহায্য করলেন। সারা পাড়া অন্ধকার। তার ওপর একজন মানুষ ফিরছেন না। একজন কি দু'জন মানুষের তুলনায় বাড়িটা বেশ বড় হয়ে গেছে। কত দিনের প্রবাদ আজও কত সত্য, 'কারু ভাতে ঘি, কারু শাকে বালি।' কারু ঘর জুটছে না, কারু ঘরে ঘরে থাকার মানুষ নেই।

আমার মনে হচ্ছে একটা পাঁচ তারা হোটেলে এসে পড়েছি। কী ডেকরেশান! কী ফার্নিচার? পুরু কার্পেট। অসম্ভব অসম্ভব সব ব্যাপার। তাক লেগে যাবার মতো কাণ্ড। পয়সা আর রুচি থাকলে মানুষ কত ভালভাবে বাঁচতে পারে!

সবই হল, তবে টেলিফোনে ডায়াল টোন নেই। একেবারেই মৃত। হায় শহর! বেশ চলছে যা হোক। দেয়াল ঘড়িতে ফিনফিন করে বারোটা বাজল। আমার ভেতরটা দুলছে। ভদ্রলোক আসছেন না। আমার আর কীসের দুশ্চিন্তা? আমার বরং আনন্দের দিন। যাকে দূর থেকে দেখে কেমন যেন হয়ে যেত, সে আজ আমার সামনে নরম সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে, হতাশ হয়ে বসে আছে। সারা ঘরে ভাসছে চাঁপাফুলের গন্ধ।

'কী করা যায়?'

মহিলার প্রশ্নে কল্পজগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলুম। সত্যিই তো, কিছু একটা করতে হয়। বললুম, 'এই সময় ফোনটা আবার অচল হয়ে গেল।'

বেশ বুঝলুম। একেবারেই ফাঁকা কথা। আমি যদি এ পাড়ার এক নম্বর মাস্তান হতুম, কি এই মহিলার একজন ডাকাবুকো প্রেমিক, তা হলে কী করতুম! কী করা উচিত আমার! দলবল নিয়ে চারদিকে ছুটতুম। আমার চ্যালারা বলত, 'গুরু তোমার কেস, জিন্দা অওর মুর্দা মাল আমরা নিয়ে আসছি। কিছু না হোক থানায় ছুটতুম।

মহিলা বললেন, 'থানায় গেলে কেমন হয়!'

'থানা?' আমতা আমতা ভাব আমার। থানা অনেক দূরে। বিজ্ঞের মতো, আসলে চোরা শয়তানের মতো, যোগ করলুম, 'আজকাল থানায় গিয়ে কিছু হয় না। ছোটাছুটিই সার হয়। আর একটু দেখাই যাক না। আমার মনে হচ্ছে, এসে যাবেন এখুনি।'

একটা প্রশ্ন জিভে এসে গিয়েছিল, কোনওরকমে ঠেকালুম, 'মামা কি বার-এ যান?'

ঘুরিয়ে বললুম, 'আজ শনিবার তো?'

মহিলা প্রখর বুদ্ধি ধরেন। বললেন, 'না না, বার-এ টার-এ যান না। ওসব দোষ নেই।'

'না না, আমি ও ভেবে বলিনি।'

একটা হাই উঠল আমার। জ্বর-জ্বর লাগছে। লুচির সঙ্গে ডিমের তরকারি আমার সহ্য হয় না। ওরা জোর করে খাইয়ে দিলে। অম্বল মতো হয়ে গেছে। এখন গরম একটা কিছু খেতে পারলে শরীরটা জুতে আসত।

'তা হলে একটু কফি করি।'

চমকে উঠলুম। মহিলা থটরিডিং জানেন।

একটু ন্যাকামি করলুম, 'এত রাতে আবার কফি কেন? তার ওপর আলো নেই।'

'তাতে কী হয়েছে। আমারও ঘুম পাচ্ছে। ঘুমটা ছাড়ানো দরকার। বসুন আপনি। আমি আসছি। কফি করতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।'

মহিলা চলে গেলেন। কায়দার বাড়ি। এপাশ, ওপাশ, চারপাশ খোলা। সিনেমার সেটের মতো। আজ শহরে অদ্ভুত এক বাতাস খেলছে। ঠান্ডা ঠান্ডা। মন কেমন করানো। স্মৃতির কফিন খুলে দিয়েছে। মৃত প্রিয়জনেরা যেন বেড়াতে বেরিয়েছে।

আজ আর আলো নাই বা এল। নাই বা এলেন সেই ভদ্রলোক। কমলের কথা ভাবার চেষ্টা করলুম। নিরস। রোমান্স নেই। বেশ বুঝলুম, কমলকে আমি তেমন ভালবাসি না। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে। আমি যেন আবার আমার সেই বিবাহপূর্ব জীবনে ফিরে গেছি। বড় মন্দ আমি।

এই শেষ কথাটা ভাবার মধ্যেও একটা চপলতা রয়েছে। আমার কাছে ভাল আর মন্দের কোনও তফাত নেই। আমার কোনও আদর্শ নেই। খানিকটা অ্যাম্বিশান আছে। আর আছে হালকা চালে, প্রজাপতির মতো নেচে নেচে উড়ে উড়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবার বাসনা। আমার চরিত্রের কোনও মেরুদণ্ড নেই। সাজানো গোছানো কিছু বচন আছে। আর আছে ভালমন্দ ভাবনা।

কফি আসছে। এপাশে ওপাশে গোটাকতক সেজ জ্বলছে সুদৃশ্য। হলুদ আলোয় ঢেউ তুলে, দুধের মতো সাদা শাড়ি পরে আমার স্বপনচারিণী আসছেন। কাসুন্দির মতো যাঁর গায়ের রং। বিদেশিনির মতো মুখ। মহিলার শরীরে কি আরব রক্ত আছে?

'নিন, কফি নিন। কী করি বলুন তো? প্রায় সাড়ে বারোটা বাজল।'

'আমার মন বলছে, কোথাও কোনও কাজে আটকে গেছেন। ফোন ডেড, চেষ্টা করেও খবর দিতে পারছেন না।'

'তা হবে! তবে দিনকাল তো ভাল নয়, সময়ে না-ফিরলে খারাপটাই মনে আসে।'

মহিলা পায়ের ওপর পা তুলে আমার সামনে বসলেন। এতক্ষণ লক্ষ করিনি পায়ে একটা হালকা চটি রয়েছে।

'আপনার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি।'

'তাই নাকি?'

'ভালই লাগে। মেয়েদের সঙ্গে খুব মিশছেন, তাই না!'

কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। গোপাই ছিল আমার জীবনে একমাত্র মেয়ে। স্ত্রীকে আবার মেয়ে বলা যায় কি? মাছের কালিয়া আর মাছের ঝোলে অনেক তফাত। উপাদান এক হলে কী হবে। শেষেরটা পথ্য, প্রথমটা বিলাসিতা। যাকে বিয়ে করা যায় সে আর মেয়ে থাকে না। একটু লুকোচুরি থাকবে, হারাবার ভয় থাকবে, ঈর্ষা থাকবে, শত্রুতা থাকবে, একটু পাপ থাকবে, তা না হলে সবই তো সহজ। অনায়াস সরল-করো অঙ্কের মতো। হয় শূন্য উত্তর, কিছুই মিলল না, আর না হয় এক, দু'জনে মিলেমিশে একাকার।

'কী লিখছেন এখন? নতুন কিছু লিখছেন?'

'পুজো এসে গেল।'

'পুজোয় তো আপনাদের ওয়ার্কশপ খুলতে হয়। সাতখানা, আটখানা।'

'সে যাঁরা প্রথিতযশা। সাত-আটখানা না হলেও তিন-চারখানা তো লিখতেই হবে। কৃষ্ণেন্দু, অপরেশ, অনিল।'

'কী করে লেখেন?'

'লিখে লিখে লেখাটাকে এমন সড়গড় করে ফেলেছেন, ভাবতে হয় না, প্রয়োজন শুধু স্পিডের। ওঁদের জগতে একটা কথা খুব শোনা যায়, নামানো। দেখা হলেই পরস্পরকে প্রশ্ন, কী নেমে গেছে?'

'খুব কষ্টের জীবন তাই না?'

'আঙুল আর কাঁধের কষ্টই বেশি। মেশিন ঠিক থাকলে, আইডিয়া আর প্লট নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। পাতার পর পাতা বাংলা তেকোনা অক্ষর পেতে যাওয়া। বাংলা অক্ষর তো বড় বেকায়দার। ট্রাঙ্গেলের ছড়াছড়ি।'

'ওই লেখকের লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে, তবে লেখেন বড় কম।'

'কে বলুন তো!'

'সুবিমল চৌধুরী। ভারী মিষ্টি হাত। আমার মনে হয় কম লেখেন তো, তাই এত ডেপথ।'

ইচ্ছে হচ্ছে, আমার লেখা সম্পর্কে আর একটু আলোচনা হোক। মহিলা একেবারে সে রাস্তা মাড়াতেই চাইছেন না। শেষে আমিই জিজ্ঞেস করলুম, 'আমার লেখার কী কী ডিফেক্ট?'

'তেমন তো পড়িনি। যেটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, ডেপথ কম। সব ঠিক ঠিক ফুটছে না। সুপারফিশিয়্যাল। আপনি বেশি কথা বলে ফেলেন। অত না বললেও চলে। তা ছাড়া, সিচুয়েশান তৈরি করতে পারেন না। আরও একটু পাকতে হবে।'

শুনছি, আর চমকে চমকে উঠছি। এখন আর চমকালে কী হবে? নিজেই তো ডেকে এনেছি সমালোচনা। বেশ হয়েছে।

'আপনি পুজোয় ক'খানা লিখছেন?'

'একটা। তাইতেই প্রাণ যায়। মাথায় কিছু আসছে না।'

'দেখে লিখুন। বিদেশি বই দেখে ঝেড়ে দিন।'

'মন চায় না।'

'আপনাকে আমি অনেক প্লট দিতে পারি। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।'

'আপনাব কাছে প্রেম আছে?'

'হ্যাঁ প্রেম আছে, খুন আছে, সেক্স আছে, সব আছে।'

'লেখেন না কেন?'

'লিখি তো। আমি ইংরেজিতে লিখি। দু'খানা বেরিয়ে গেছে, আর একটা ছাপছেন উইন্ডাস।'

'আপনি লেখিকা! এই এত অল্প বয়সে?'

'অল্প বয়েস? আমার বয়স কত বলুন তো?'

'মেয়েদের বয়েস বলা শক্ত।'

রহস্যের হাসি হাসলেন মহিলা। ফিন করে একটা বাজল বিদেশি ঘড়িতে। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম এষা গুপ্ত।'

'আরেব্বাস, আপনার 'লাফিং হায়না' আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। পায়ের ধুলো দিন।'

মুখের কথা নয়, সত্যিই আমার ইচ্ছে করছিল, পা-দুটো জড়িয়ে ধরি।

'আমার বাবা আর মাকে নিয়ে লেখা।'

'আপনার মা স্প্যানিশ?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ বলেন কী?'

'দেখছেন না, আমার চেহারায় একটু বিদেশি ছাপ রয়েছে।'

'ওই বইতে যা লেখা রয়েছে, সব সত্যি?'

'সব সত্যি।'

'এত ভাল বাংলা শিখলেন কী করে?'
'আমার বাবাকে ভালবেসে।'
'মাকে ভালবাসতেন না?'
'একদম না, শি ওয়াজ নোম্যাডিক।'
'এখন কিছু লিখছেন?'
'মেটিরিয়ালস সংগ্রহ করছি। এইবার একদিন বসে যাব।'
'সাবজেক্ট?'
'আপনি আর আপনার ছেলে।'
'সর্বনাশ!'

মহিলা হাসলেন। হঠাৎ মনে হল আমি ছোট হতে হতে কীটের মতো হয়ে গেছি। প্রবল এক চরিত্রের সামনে বসে আছি। আমার মতো দশ-বিশটাকে যিনি কড়ে আঙুলে খেলাতে পারেন। অজগরের সামনে ছাগল। হাসতে হাসতেই ফড়াক ফড়াক করে আলো জ্বলে উঠল। যেখানে যেখানে চাঁদের আলো গড়াচ্ছিল, সব মুছে গেল। বেশ একটা মায়ার জগৎ তৈরি হয়েছিল, আলোর খোঁচায় নিমেষে অদৃশ্য।

সিল্কের রঙের ঝলমলে দেয়ালে সুন্দর সুন্দর পেন্টিং ঝুলছে। বাড়িটাকে মনে হচ্ছে ফারওয়ার বৈঠকখানা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পবস্তু দিয়ে নিখুঁত সাজানো। এই মহিলার মন জয় করতে হলে আমাকে ঠেলে যে উচ্চতায় তুলতে হবে, সেই ঠেলার মানসিক শক্তি আমার নেই। আমার মোহ ছেড়ে গেছে। যুদ্ধে নামার আগেই পরাজিত। একটু আগে ভাবছিলুম, এই মহিলার মন জয় করার জন্যে নিজেকে কীভাবে মেলে ধরব! ভাঁড়ামি করব! যেমন লেখায় করি। বাংলা অথবা বোম্বাই ছবির হিরো হব! দিশি মাস্তান হব! কলেজি আঁতেল হয়ে, এলিয়ট, রিলকে ঝাড়ব। কামু-কাফকার ভায়রাভাই হব! জ্যোতিষী হয়ে শনি বক্রী, মঙ্গল নীচস্থ করব! না যৌবনে যোগী হয়েছি বলে বৃহদারণ্যক শোনাব! সুবিমল চৌধুরীকে হিংসে হচ্ছে। কেমন নিঃশব্দে আসন পেতেছেন সম্রাজ্ঞীর নিভৃত অন্তরে।

ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এসে গেল। সব শেষ। আরব্যরজনীতে যবনিকাপাত।

বড়মামার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। পুরোপুরি নীল রক্ত। চেহারায়, সাজে, পোশাকে, চলনে বলনে। বোম্বে ফ্লাইটে এক বিদেশিনিকে রিসিভ করে, 'পার্কে' শুইয়ে তারপর আসছেন।

'জুলি, ফোন ডেড?'
'হ্যাঁ। সারা সন্ধে তো আলো ছিল না। এই এল।'
'ও টপিক্স আর তুলিসনি।'

আমি বললুম, 'আপনার দেরি হচ্ছে দেখে খুব ভেঙে পড়েছিলেন।'
'ন্যাচারলি। আমার উপায় ছিল না। হঠাৎ টেলেক্স। এদিকে ফোন ডেড।'
'আমি তা হলে আসি।'
'আসি মানে। আমাদের মিডনাইট ডিনারে, গিভ আস কম্পানি। আপনার মতো একজন লেখক, বাড়িতে। জুলি, লেট আস সেলিব্রেট।'
'আপনার ভাগনি আমার চেয়ে হাজার গুণ বড় লেখিকা। শি ইজ গ্রেট। আর এক দিন হবে, আজ আমার স্টম্যাক শর্ট সার্কিট হয়ে আছে।'
'অলরাইট, অলরাইট। অ্যাজ ইউ প্লিজ। তবে কথার ঠিক থাকবে তো?'
'অবশ্যই থাকবে। এ বাড়ি তো আমার কাছে স্বপ্নের মতো।'

.

ঘরের সব জানলা খুলে দিলুম। চাঁদের আলোয় ভেসে গেল। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। 'এমনই বরষা ছিল সেদিন।' বরষা নয়, পূর্ণিমা ছিল। গোপাটাকে কীরকম পাকা পাকা দেখাচ্ছিল। লাল টকটকে

বেনারসি। তার জমিতে আবার সোনালি কাজ করা। বিয়ের দিন আর যাই করুক মেয়েরা খোঁপাটা খুব যত্ন করে করে। ভেতরে কী সব পুরেটুরে দেয় মনে হয়। গোপার অবশ্য খুব চুল ছিল। ছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। সেই চিতায় যখন চাপানো হল। প্রথমেই চুলগুলো কীরকম ফুরফুর করে পুড়ে গেল। পোড়া পোড়া চুল, আগুনের আঁচ নিয়ে দমকা বাতাসে আবার উড়ে উড়ে শূন্যে নাচানাচি। বিউটি, বিউটি। হ্যাঁ, এমন বিউটি যে ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। জল এসে যায় চোখে। গোপা তো বুড়ি হয়ে যায়নি। বেশ ছিল শরীরটা। যৌবনটাকে বেশ ধরে রেখেছিল। কেবল জীবনটাকেই ধরে রাখতে পারল না।

আমার সাদা বিছানায়, সাদা লোমঅলা কুকুর-বাচ্চার মতো চাঁদের আলো হুটোপুটি করছে। জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে চুপ করে। চোখের সামনে সাদা তোয়ালে ঢাকা পাশাপাশি দুটো মাথার বালিশ। বড়টা আমার। ছোটটা কমলের। কমল আজ নেই।

গোপাকে আজ শোয়াই। গোপা চিত হয়ে শুয়ে আছে। সোনার কাজ করা লাল বেনারসি। লাল ব্লাউজ। হাতাটা কাপ হয়ে বসে আছে হাতে। কপালের মাঝখানে সোনালি টিপ। যে নেই, তাকে ফিরিয়ে এনে আমার এই বিছানায় কিছুক্ষণ শোয়াতে পারব না? তবে আমি কীসের লেখক?

চাঁদের আলোয় গোপার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। পাকা সিঁদুরে-আমের মতো।

মনে আছে গোপা, বিয়ের রাতে বাসরে তুমি কী করছিলে? মাথায় গাঁট্টা মেরেছিলে। দুষ্টু। প্রথম রাতেই কী ভাব। যাই বলো বাপু, তুমি আমার চেয়ে বেশ পাকা ছিলে।

গোপা, তোমার মনে পড়ে, সেই আমরা যেবার দার্জিলিং বেড়াতে গেলুম, তোমার এমন পরিকল্পনা, গরম জামা নিতে ভুলে গেলে। ম্যালে, শীতে কাঁপছ, এদিকে মুখে বলছ, কোথায় শীত! তুমি একটা পাগলি ছিলে, সুইট পাগলি। তারপর সেই বৃন্দাবন দাস লেনের খুশিবউদি তোমার গায়ে শাল জড়াতে জড়াতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জড়িয়ে ধরলে কি দার্জিলিং-এর শীত কাটে গো ঠাকুরপো, কলকাতার শীত কাটে। এমন মেয়েটাকে পেলি কোথায়! তোর বেশ এলেম আছে তো?

গোপা, আমাদের চারপাশে কত ভাল ভাল মানুষ আছে!

বৃন্দাবন দাস লেনের সেই বউদি এখন কোথায়! তুমি তো যাব যাব করে দিনকতক খুব নাচলে। শেষে নিজেই চলে গেলে!

তোমার মতো স্বার্থপর মেয়েমানুষের বিয়ে করাই উচিত হয়নি।

রাগ করলে কী করব। তোমার সব কিছু দিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিয়ে, সব কিছু নিয়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম করে রেখে, চলে গেলে।

কী, ঘুম পাচ্ছে? খুব ঘুম! তোমার সেই বিখ্যাত হাইটা তোলো। মাথার উপর দু'হাত তুলে শরীর টানটান করে। বুকের কাছটা, তুলতুলে জায়গা দুটো সূর্যাতুর পদ্মের মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠুক। তোমার পা দুটো টানটান করে দাও। শ্বেতশুভ্র গোছ দুটো বেরিয়ে পড়ুক, অদেখা সৌন্দর্যের মতো।

সেদিন কী সুন্দর আলতা পরানো হয়েছিল তোমাকে। চিতার আগুন সেই রাঙা পায়ে চুমু খেতে গিয়ে ভক্তিতে কাঁপছিল গোপা? না কামনায়? তুমি জানো। একমাত্র তুমিই জানো।

এইবার যাবে বুঝি? কেন? চাঁদ হেলে পড়েছে? রাত ভোর হয়ে আসছে? কোথায় আছ এখন? কেমন আছ তুমি?

যাও তা হলে। ফিরে যাও, মৃত মানুষের জলসায়। মাঝে মাঝে এসো, কেমন? আমি ভুলে গেলেও এসো। বিস্মরণের পৃথিবীতে, কে কাকে কতদিন মনে রাখে গোপা? দিন যায়, দিন যায়, লেখা-রেখা মুছে যেতে থাকে। স্মৃতির চেয়ে ফটোগ্রাফ বরং বেশি স্থায়ী।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ যেন বদলে গেলুম। সব মানুষেরই মনে হয় এইরকম হয়। ভোগের একটা জোয়ার মতো আসে। ইন্দ্রিয় পটলের দোলমার মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে। জোয়ার শেষে ভাটার টান ধরে। ভেতরটা ঝলঝলি খলখলি হয়ে যায়। মোটা মানুষ রোগা হয়ে গেলে, সেই রোগা শরীরে তার মোটা অবস্থার পাঞ্জাবির মতো।

সামনের সুদৃশ্য বাড়িটার দিকে আর ভয়ে তাকাই না। এষা ছাদে আসে। কাপড় জামা শুকোতে দেয়। তাকালে এবার নিশ্চয় কথাও বলবে। আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে তার বিচরণ। উইন্ডাস যার বই ছাপে তার কাছে আমি তো এক ফেকলু। মানুষ নই, কেলে হাঁড়ি-মাথা এক কাকতাড়ুয়া। তা ছাড়া আমাকে আর কমলকে নিয়ে একটা কিছু লেখার চেষ্টায় আছেন। ভয়ংকর কথা। আমি কোনও উপন্যাসের চরিত্র হতে চাই না। রক্ষে করো বাবা।

ওই দাশ পাবলিশার্সের ফটিকচন্দ্র দাশ, ওই ভদ্রলোকই আমায় খেপিয়ে ছিলেন। বেস্ট সেলার হতে গিয়ে নিজেকেই প্রায় বেচে ফেলেছিলুম। সেলার হতে গিয়ে সোলড হবার দাখিল। আজই বিকেলে গিয়ে এই চিটচিটে ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসব নাকের ডগায়। প্রেমের গল্প দেহের মশলা দিয়ে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। একেবারে জাত-বাঙালি। ওষুধ খাওয়ার মাপা গেলাসে জীবন খরচ করায় অভ্যস্থ। আমার কি আর অত রঙ্গাই-নাচ সাজে। আমার পিতা মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে কোর্ট-কাছারি করতেন। জোড়া খিলি পান মুখে পুরে, পিক-পিক পিক ফেলতেন; আর খুব নরম গলায় মাঝে মাঝে মাকে ডাকতেন, হ্যাঁগা, হ্যাঁগা। কী হবে লিখে! যশ, খ্যাতির কী দাম। অর্থেই বা কী হবে! আজ আছি, কাল নেই। ফট করে যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো চলে যেতে হবে। যে জগতে কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়, সে জগতে একটা পুরুষ, একজন নারী, বিছানা, বালিশ, ডিম ভাজা, তেলমালিশ, সবই অর্থহীন। জীবন এক দীর্ঘ নিদ্রা। স্বপ্ন দেখে চলেছি রকমারি। ঘুম ভাঙলে কী দেখব, জানা নেই। অপেক্ষা করতে হবে ঘুম যতক্ষণ না ভাঙছে।

একটা লরি এসে দাঁড়াল সামনের বাড়িতে। এষা আর এষার মামা সামনের বারান্দায় এসে দেখে গেলেন। পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে এষা। দেখব না, তবু দেখছি। একেবারে নাচিয়ের ফিগার। স্প্যানিশ বিউটি। চুলের ঢল নেমেছে কী সাংঘাতিক! অল্প সোনালি আভা। হুইস্কির মতো গায়ের রং। আজ যেন বড় মারাত্মক দেখাচ্ছে। আমি যদি বিশাল বিশাল বড়লোক হতুম, সাংঘাতিক আমার প্রতিপত্তি, তা হলে হয়তো এষার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠাতুম। সঙ্গে মটরদানার মতো হিরের আংটি। বলা যায় না এষা রাজি হয়ে গেল। তারপর! সুখ হত! ভালবাসার জোয়ার বয়ে যেত কি জীবনে? কিছুই হত না। সোনার থালা থেকে খাবার খাওয়া। থালা ভালবাসে! থালার সঙ্গে ভালবাসা হয় কি!

শ্রীকান্ত, সুখ চাই, সুখ। সুখের অন্বেষণ করো। বাইসাইকেলের দোষ কী জানো! যতক্ষণ প্যাডেল করবে গড়গড় চলবে। থামলেই থেমে গেল। পাল তোলা নৌকোয় সে ভয় নেই। বাতাস ভরে রাখো পালে। কৃপাবাতাস। হালটি ধরে বসে থাকো নিশ্চিন্তে। চলুক ভেসে। এটুকু জানো তো, নদীর শেষ সমুদ্রে।

ধুমধাম শব্দে কী একটা নামছে লরি থেকে। কিছু এল। ভদ্রলোকের হরেক ব্যাবসা। টাকার শেষ নেই। শখেরও শেষ নেই। যতই বলি না কেন কৌতূহল নেই, স্বভাব না যায় মলে। একবার উঁকি মারতেই হল। লরি থেকে বিশাল লম্বা এক খাঁচা নামছে। খাঁচা কী হবে রে বাবা! বাঘ পুষবেন নাকি! যাক, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

কমল মামার বাড়িতে থাকলে আমি আর রান্নার হাঙ্গামায় যাই না। বড় ভজঘট। একটা টোস্টার

কিনে এনেছি। মুচমুচে, হালকা বাদামি টোস্ট হয়। চাপ দিলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, একটা একটা করে। মাখন মাখিয়ে মরিচ ছড়িয়ে মুচমুচ খাও। খেতে খেতেই অম্বল। অম্বল তো এখন ন্যাশান্যাল ডিজিজ।

এখন আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা, কমল। ওর মামার বাড়িটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। নীলুদা এই বয়েসে বিয়েপাগলা হয়ে গেল! একে ক্ষীণ দৃষ্টি, তার ওপর বয়েসেও তো নেহাত কম নয়। যাঁকে বিয়ে করবেন তাঁর বয়েসও বেশি। দেখাই যাক কী হয়! হয়তো দেহের চেয়ে প্রেমই বড় হবে। আর আমার শাশুড়ি! দিন দিন বড় মেজাজি, বড় মুডি হয়ে উঠছেন। ক্যাঁট ক্যাঁট কথা বলেন। বউ মারা গেছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আবার কীসের সম্পর্ক! কমলকেও আর যেতে দেব না। আমার ছেলেকে অন্য কেউ বকলে বা অবহেলা করলে আমার খুব খারাপ লাগে। বাইরে আমরা দেখতে পাই না, রক্তে রক্তে অদৃশ্য একটা বন্ধন কাজ করে। শ্রীকান্তেরই সৃষ্টি তো কমল! কালু ভালবাসে। কালুর ভালবাসার দাম কী! কে পোঁছে কালুকে ও বাড়িতে। আজ যাও বললেই, কাল চলে যেতে হবে। মানুষের কাছে কি মানুষ সহজে পাত্তা পায়। এই যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি খাতির পায়, সে তো এক ধরনের দুর্বলতা। ভেতরের কলকবজা নাড়া খায় আর আমরা আসুন আসুন করি। আমরা একটা কিছু চাই। বলতে পারি না, ভাবে প্রকাশ করি। কই মেয়েদের কাছে মেয়েরা তো খাতির পায় না। মেয়েরা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

শ্রীকান্ত, স্বার্থের অপর নাম ভালবাসা। তোমার কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে। ঘষটে ঘষটে বেড়াই, তোয়াজ করি। স্বার্থ মিটে গেলে মারো লাথি। এক্সপ্লয়টেশান, বাংলা জানি না। ব্যবহারিক জগতে সবই ব্যবহারের সামগ্রী। জুতো, ঝ্যাঁটা, কেটলি, ছাঁকনি, স্ত্রী, পুরুষ, বড় কর্তা, ছোট কর্তা, সবই নাচ ময়ূরী নাচ রে।

অনেক ভেবেছি। বেশি ভাবলে বাঁচা দুঃসাধ্য। স্রোতের মাঝখানে কুটোর মতো ফেলে দাও নিজেকে। বিকেল উতরে যেতেই সেই ফটিকচন্দ্র দাশের কাছে হাজির। একজন নামী, একজন মাঝারি আর দু'জন নয়া লেখক গোল করে ঘিরে রেখেছেন প্রকাশককে।

বাংলা সাহিত্যের প্রতিপালকের চাপা একটা অহংকার তো থাকবেই। পুরনো গাড়ি বেচে, নতুন গাড়ি কিনেছেন। জাপান থেকে কালার টিভি আর ভিডিয়ো এসেছে। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ আর গন্ডা গন্ডা সন্দেশ হল পথ্য। গোটা তিনেক বইতে পুরস্কার উঠেছে। প্রতি সপ্তাহেই বেস্ট সেলার।

ঢুকেই শুনলুম, কী একটা ব্যাপারে, ফটিকদা উঠতি দু'জনকে ধ্যাৎ ধ্যাৎ করে খারিজ করে দিচ্ছেন। বেফাঁস বা অমনোমতো কিছু একটা বলে ফেলেছিল বোধহয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে আমার সঙ্গে চোখাচোখি। এক গাল হেসে, অদ্ভুত খ্যাঁসখ্যাঁসে গলায় বললেন, 'আজ দুখানা বধ করেছি।'

তার মানে 'পাকা চুলে এলো খোঁপা' দু' কপি আজ বিকিয়েছে। সারাদিনে মাত্র দু'কপি। নামী, প্রবীণ লেখক, একাধিক পুরস্কার প্রাপক গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। একসময় বিশাল চাকরি করতেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। আমার দিকে অনুগ্রহ করে ফিরে তাকালেন, জ্যামিতিক ভঙ্গিতে। অল্প একটু হাসির মতো ভাব করলেন। জীবনে যাঁরা বড় হন, তাঁদের অসম্ভব মাত্রাজ্ঞান। কী লেখায়! কী জীবনচর্যায়। এই মনে হল আমাকে ভীষণ চেনেন, এখন মনে হচ্ছে একেবারেই চেনেন না। এই সাসপেন্স তৈরি করতে পারেন বলেই না অতবড় লেখক। কখন কী করবেন, কোন দিকে মোড় নেবেন, কারু বোঝার ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ না শেষ চ্যাপ্টারের শেষ লাইনটি পড়া হচ্ছে। সে তো লেখার ব্যাপারে। জীবনের ব্যাপারে কী হবে! আমাকে চেনেন কি চেনেন না, তার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে কি? শেষ নিশ্বাসে জানা যাবে।

ফটিকদা বললেন, 'বসুন না, ও চেয়ার নেই বুঝি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লেখক উঠে পড়লেন, স্কাই হপার প্লেনের মতো। যে বিমানের ওঠা-নামার জন্যে রানওয়ের প্রয়োজন হয় না। লাফিয়ে উঠে পড়লেন, পরনে ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবি, অতি মিহি দিশি ধুতি। চোখে সোনার চশমা। তিনি বললেন, 'আমি চলি ভাই।'

দাশ বললেন, 'কপি দিচ্ছেন কবে?'

'পরশু সকালে চলে এসো।'

বাইরে একটা আকাশি রঙের নতুন গাড়ি দেখে এসেছি। মনে হয় ওঁরই গাড়ি আর এও শুনেছি গাড়িটি প্রেজেন্ট করেছেন জামাই শ্বশুরকে। এমনও হয় ভগবান। মেয়ে শুনেছি অসাধারণ সুন্দরী। জামাই বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার। উলটো হয়েছে তাই। কোথায় শ্বশুর জামাইকে গাড়ি দেবেন, তা না জামাই শ্বশুরকে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

উঠতি লেখকরাও উঠে পড়লেন। ফটিকদা আর একবার উপদেশ দিলেন, 'লিখতে না জানলে লেখা যায় না। লেখা মেসবাড়ির রান্না নয়, যে যেমনই হোক পাবলিক মুখ বুজে খেয়ে নেবে। রান্নার বই দেখে রাঁধা যায় না। রান্নার হাত চাই। জগন্নাথ-লেখক আমরা চাই না। বাংলা সাহিত্যে ব্লাড চাই।'

উপদেশের ঠেলায় ঘর খালি হয়ে গেল। দাশ পাবলিশার্সের বিখ্যাত ফটিকদা আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হ্যা হ্যা করে হাসলেন, তারপর বললেন, 'কেমন দিলুম?'

'ভালই ঠুকেছেন। লেখা স্বর্গীয় জিনিস। ভূতে ধরার মতো। না ধরলে ঘষটানোই হয়, লেখা হয় না।'

'ধরলেই পারেন। নিজেই লিখবেন, নিজেই ছাপবেন, নিজেই বেচবেন।'

'অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে। আমার একটা আদর্শ আছে। ব্যভিচারে যেতে চাই না। আমি তো মশাই সেই পাবলিশার্স নই, যে, যে-লেখিকা কোলে বসবে তার বই ছেপে ছেপে তাকে লেখিকা বানিয়ে দেব।'

পকেট থেকে ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট সামনে মেলে ধরলুম।

'কী হল? এ আবার কী রঙ্গ?'

'পারলুম না ফটিকদা। প্রেম দিয়ে, পারভার্শান দিয়ে, রেপ দিয়ে রাজনীতি দিয়ে জগাখিচুড়ি আমি বানাতে পারব না। এই নিন আপনার অ্যাডভান্স।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার বয়েস কত?'

'একজ্যাক্ট বলতে পারব না। মনে হয় পঁয়ত্রিশ চলছে?'

'শরীরে কোনও ব্যামো আছে?'

'তেমন কোনও ব্যামো নেই।'

'জপ, তপ, ধর্ম মাথা খেয়েছে?'

'না।'

'তা হলে নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে কী লাভ? লেখকে আর বারবধূতে কোনও তফাত নেই বুঝেছেন? পাঠক যা চাইবে যেভাবে চাইবে সেইভাবে সাজিয়ে দিতে হবে। নকশাল চাইলে নকশাল হতে হবে। আদিবাসী চাইলে তাই সাজতে হবে। শ্রমিক আন্দোলন চাইলে শ্রমিক নেতা সাজতে হবে। হাওয়াটা দেখতে হবে। দেখতে হবে গদির রং। মনে রাখতে হবে বই কিনবে লাইব্রেরি। টাকা গ্র্যান্ট করবে সরকার। আর মনে রাখতে হবে সিনেমা। গোটাকতক সিনেমায় লাগাতে পারলেই মার দিয়া কেল্লা।'

'আমি মশাই জীবনে প্রেমে পড়িনি। আমার কোনও বিকৃতি নেই। সোজা বিয়ে করেছি, সংসার করেছি। একটি ছেলে গজিয়ে স্ত্রী সরে পড়েছে।'

'স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছেন তো?'

'সে-তো বিবাহিত-প্রেম, ম্যারেড লাভ।'

'ধ্যার মশাই। লেখেন কী করে! কল্পনার ক নেই। ওই প্রেমটাকে পেছিয়ে নিয়ে যান। দিঘা, গোপালপুর, ডায়মন্ডহারবার, ফুলেশ্বর নিয়ে যান। খুব মিষ্টি করে, নরম হাতে একেবারে হাবুডুবু খাইয়ে দিন। তারপর হিন্দুমতে নয়, রেজেস্ট্রি ম্যারেজ। ব্যস, ওটাকে ওইখানেই ছেড়ে দিন। এইবার আপনি খারাপ হয়ে যান। প্রভু আমি নষ্ট হয়ে যাই। আর একটা সেক্সি মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। ওই একই প্রেম শুধু একটু কড়া করে চাপিয়ে দিন। একেবারে কেলোর কীর্তি করে। পাগল হয়ে যান, ম্যাড। এমন সব কাণ্ড করুন, পাঠক যেন পড়তে পড়তে খাট থেকে ছিটকে পড়ে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঘাড়ে, কানের পাশে জল থাবড়ে আসে। অল্পবয়সির সামনে বই লুকোবার চেষ্টা করে। পড়ার পর গুরুজনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে। নীতিবাগীশ প্রবীণরা যেন ছি ছি করতে থাকেন। ছি ছি করছেন অথচ পড়ছেন। কত বড় অপকর্ম আপনি করছেন তা দেখার জন্যে বই হাতে হাতে ঘুরছে। এদিকে ওই মিষ্টি মেয়েটার সঙ্গে, আপনার প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে ব্যবধান বাড়ছে। খিটিমিটি। মারধর। ভায়োলেনস। মাঝে মাঝে চেপে ধরে সেক্স, যা প্রায় রেপের মতো। হয়ে গেল প্রেগনেন্ট। আসছে অবাঞ্ছিত সন্তান। ডেলিভারির সময় প্রথম প্রেমিকা, মিষ্টি বউ হয়ে গেল ফট। খেল খতম, পয়সা হজম। নবজাতকের দিকে তাকিয়ে আপনি ভাল হতে শুরু করলেন। আপনাতে আপনি ফিরে আসছেন আবার; কিন্তু আপনার মিসট্রেস আপনাকে ছাড়ছে না। তক্ষকের কামড়। নেংড়াচ্ছে, চুষছে, চটকাচ্ছে, ব্ল্যাকমেল করছে। মাঝে মাঝে ভাবছেন আত্মহত্যা করবেন। পিছুটান ছেলেটা। এইবার আপনি যা চান। ক্রাইম বা থ্রিলারের দিকে ঘোরাতে চাইলে মেয়েটাকে ফিনিশ করিয়ে দিন। আর তা না হলে নিজে ফিনিশ হয়ে যান। এডিশানের পর এডিশান। টেন পারসেন্ট আপনার, নাইনটি আমার।'

'মাত্র টেন পারসেন্টের জন্যে অত নীচে নামতে পারব না।'

'কত হলে পারবেন?'

'টোয়েনন্টি, টোইন্টি ফাইভ।'

'বাবা, আশা তো কম নয়! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! আগে কৃষ্ণেন্দু, অপরেশ, অনিলের লেভেলে আসুন। দু'-একটা বই ফিল্মে ধরুক। আপনার ওই যে ওই বইটা, 'বুড়ো খোকা'র জন্যে কথাকলি কত দিয়েছিল?'

'প্রথমে দুশো, তারপর স্ত্রীর অসুখ বলে কেঁদে ককে তিনশো। তারপর মার। গেলেই মারতে আসে।'

'ঠিক হয়েছে। যাকে-তাকে বই দিলে ওইরকমই হয়। বইটা কিন্তু ভাল সেল দিয়েছিল।'

'হালকা লেখা তো!'

'হালকারই তো যুগ পড়েছে মশাই, কে আর ভারী চায়। হালকাই লিখুন না। আমার নীতি হল লেখকের টাকা আমি মারব না। টোইন্টি বলে টোপ ফেলব, এগারো শো বলে বাইশ শো ছাপব, আর ঠেকাবার সময় টেনও ঠেকাব না, ন্যাজে খেলব, ও পলিসি ফটিক দাশের নয়। নিন টাকা তুলুন। ফিফটিনই দোব। তবে বইমেলার আগে আমি বই বের করতে চাই।'

ফটিক দাশ উঠে পড়লেন। বাইরে অপেক্ষা করে আছে ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডার। পরিশ্রম করেন। সৎ প্রকাশক। ফাইভ, টেন, যা দোব বলেন তা দেন। তাগাদা মারতে হয় না। কাটা কাটা রস-কষহীন কথা। যতক্ষণ দোকানে থাকেন কর্মচারীরা জুজুবুড়ি। মুখে একটা পান পুরলেন। তিন-তিনটে বই অ্যাকাডেমি মেরেছে। ছাপলেই এডিশান।

॥ ছয় ॥

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে তুষারের সঙ্গে দেখা। ওই লোকজনের মধ্যেই চিৎকার করে উঠল, 'আরে শ্রীকান্ত ইয়াহু। কোথায় এতদিন ডুব মেরে ছিলে গুরু। তোকে যে আমি গোরু খোঁজা খুঁজছি। তোকে আমার খুব দরকার মাইরি।'

তুষার একটা ছোটখাটো ডিরেক্টার। একসময় অল্পস্বল্প সাহিত্য করত। মাঝে কিছুদিন বেপাত্তা হয়ে গেল। পুনরুদয় সিনেমা পাড়ায়। ডিরেক্টার। দু'জনে দু'জগতের। দেখা-সাক্ষাৎ নেই বহুদিন।

তুষার বললে, 'চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'এখন আমি কোথায় যাব? ছেলেটাকে একলা ফেলে এসেছি।'

'কোথায় ফেলে এসেছিস? জলে? ছেলের জন্যে ছেলের মা আছে। তুই গিয়ে দুধ খাওয়াবি রাসকেল!'

'ছেলের মা নেই রে। ওপরে হাওয়া হয়ে গেছে।'

তুষারের হাসি হাসি মুখ করুণ হয়ে গেল, 'অ্যাঁ, গোপা মারা গেছে? কী হয়েছিল রে?'

'কে জানে! পড়ল আর মরল। মাথা ধরে, মাথা ধরে, অসহ্য যন্ত্রণা। হাসপাতালে গেল। শেষ। ডাক্তাররা এক-এক জনে এক-এক রকম বললেন।'

'বুঝেছি, ব্রেন টিউমার। আমার বোনটা মারা গেল গত বছর। ওই এক ব্যাপার।'

'চিত্রা মারা গেছে?'

তুষার বিষণ্ণ মুখে বললে, 'হ্যাঁ।'

আমিও একটা ধাক্কা খেলুম। চিত্রার মতো সুন্দরী, ভাল মেয়ে কলকাতায় খুব কম ছিল। ভীষণ ভাল নাচত। বেঁচে থাকলে এক নম্বর হতই।

তুষার বললে, 'আমাকে ভীষণ ভালবাসত রে! আমার ডান হাত ছিল। যাক গে। যেতে তো একদিন সকলকেই হবে। আগে আর পরে।'

'কী দরকার বল না?'

'তোর 'বুড়ো খোকা' গল্পটা কাউকে দিয়েছিস? ছবি করার জন্যে কেউ নিয়েছে?'

'না রে।'

'ভীষণ হিলারিয়াস। তুই একটা ঘণ্টা আয় না আমার সঙ্গে। বেশি দূরে নয়, কাছেই।'

ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে ছ'টা। এক ঘণ্টা মানে সাড়ে সাতটা। আটটার মধ্যে ফিরতে পারব। বললুম, 'চল, তা হলে!' লোভও হচ্ছে। সিনেমায় লেগে গেলে মার কাটারি। পদক্ষেপ। কদম কদম।

তুষার একটা দরকচা মারা গাড়ির মালিক। নিজেই চালায়। বসে আছি পাশে। তুষার বকবক করছে। বেশির ভাগই অতীতের কথা। সেই কলেজ, কমান রুম। দু'-একজন বান্ধবী। অল্পস্বল্প দুষ্টুমি। ফেলে-আসা জীবনের জন্যে হাহাকার। অতীতের জন্যে মানুষের এই হাহাকারের কোনও মানে হয় না। যা গেছে, তা তো গেছেই।

তুষার হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'তোর চলে-টলে?'

'কী চলে?'

'লেখকের আরক। ইনস্পিরেশান ফ্লুইড।'

'আমি আবার লেখক! তার আবার ইনস্পিরেশান?'

'কেন রে! দু'-একজন তোর লেখার কথা বলে।'

'ধুর, রবীন্দ্র-শরতের দেশে কলমবাজি অত সহজ নয়। এ দেশের পাঠক-পাঠিকারা ভীষণ বোদ্ধা। ফুকো মাল এক লাথিতে উড়িয়ে দেয়।'

তুষার চুপ করে গেল। সেই নীরবতায় হঠাৎ মনে হল আমি এক গর্দভ। বোকার মতো মায়ামৃগ

ধরতে ছুটেছি। গাড়ি ধ্যাধধ্যাড় করে প্রায় পার্ক স্ট্রিটের কাছে এসে পড়েছে। আমার মন একেবারে বেঁকে বসেছে। যাবার উৎসাহ আর নেই।

'তুষার, তুই আমাকে নামিয়ে দে।'

'কেন রে?'

'ধুর ওই সব প্রডিউসার-মোডিউসার, মোদো-মাতালে ব্যাপার। ওসব আমার সহ্য হবে না। তুই কথা বলে নে। হয় হবে, না হয় না হবে। ও ভাই তুই ঠিক করে নে।'

'চল না, একটা ক্যারেক্টার দেখবি। তোর লেখার ম্যাটিরিয়েল পাবি। পয়সা মানুষের কী সর্বনাশ করে নিজের চোখে দেখবি। পয়সাঅলা লোক হল খেজুর গাছের মতো। ট্যাপ করে রস বের করে নিতে হয়। মাল কলকাতায় এসে পড়েছে, আবার কবে আসবে ঠিক নেই, আজই তোর কিছু বাণিজ্য হয়ে যাক। কী করবি সাততাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে। সংসার তো শূন্য। তোর আর আছেটা কে! অন্য কোনও মেয়ে হলে অতটা শূন্য মনে হত না, গোপা ওয়াজ রিয়েলি সামথিং। কয়েকবার আমি দেখেছি, গোপার কোনও ডুপ্লিকেট হতে পারে না। অসম্ভব।'

বাকিটা পথ তুষার আমাকে অবাক করে দিলে। বিয়ের পর বার তিনেক তুষার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আর একবার আমরা তিনজনে একসঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলুম! হ্যাঁ, দিঘায় গিয়েছিলুম। এই সামান্য মেলামেশাতেই গোপা যেন তুষারের মনে একেবারে কেটে বসে গেছে। সেই সব দিনের ঘটনা, গোপা কী কথা বলেছিল, কী শাড়ি পরেছিল, কেমন করে হেসেছিল, তুষার বলে চলেছে। ভয় লাগছে, অন্যমনস্ক হয়ে ভিড়িয়ে না দেয়! সন্দেহ হচ্ছে, গোপাকে কে বেশি ভালবেসেছিল, আমি না তুষার! দিঘায় ওরা দু'জনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ সমুদ্রে স্নান করেছিল। আমি নামিনি। সমুদ্রকে আমি ভয় পাই। সমুদ্র কেন, যা কিছু বিশাল, তাই আমার কাছে ভীতিপ্রদ। বিশাল পর্বত। বিশাল অরণ্য। তুষার কি তা হলে গোপার প্রেমে পড়েছিল! গোপা এখন বহুদূরে। প্রেম অপ্রেমের ঊর্ধ্বে। গোটা চারেক লোকের মনে গোপা আছে, তাই গোপা ছিল, এখন আর নেই। বিশালের বিচারে থাকা না থাকা সমান। তবু এখন আমার ঈর্ষা হচ্ছে। তুষারকে আর তেমন ভাল লাগছে না। একটু আগে মনে মনে যার প্রশংসা করছিলুম, এখন তার অজস্র খুঁত বেরোতে শুরু করেছে। ব্যাটা মাল খেয়ে খেয়ে আগের চেয়ে বেশ মুটিয়েছে। ভুঁড়ি হয়েছে দেখো। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ভাটার মতো। সিনেমার ফেকলু ডিরেক্টার। সিনেমা ফিনেমা সব বাজে, আসলে মেয়েছেলের ধান্দা। আজকাল এইসব খুব হয়েছে। যত ভাবছি তত জ্বলে জ্বলে উঠছে ভেতরটা। আর মনে হচ্ছে, নেমে যাই।

তুষার হঠাৎ বললে, 'গোপা তোকে যে কী ভালবাসত, তোর কোনও ধারণা নেই। আমাকে বলেছিল, বিয়েটা আগের জন্মেই ঠিক হয়ে থাকে, কার সঙ্গে কার জীবন জুড়বে। আমি ভীষণ সুখী। ইয়ারকি করে বলেছিলুম, শ্রীকান্ত যদি আর কারু সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তুমি কী করবে? আত্মহত্যা! হেসে বলেছিল, শ্রীকান্ত আর কাউকে ভালবাসতে পারবেই না, কারণ আমার ভালবাসায় কোনও ফাঁক নেই। ওর কাছে যখন আমি নেই, তখনও আমি আছি।'

তুষার বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরাল। গাড়ি চলছে। তুষার বললে, 'তুই আর বিয়ে করিসনি শ্রীকান্ত। আর তো কয়েকটা দুরূহ আগুনে বছর, কাটিয়ে দিতে পারবি না! খুব পারবি। ছেলেটাকে তেড়ে মানুষ কর। ওইটাই তোর ধ্যানজ্ঞান হোক। লিখছিস লেখ। চাকরি-বাকরিও করতে হবে পেট চালাবার জন্যে। তবে লেখাটেখা সব বাজে ব্যাপার। যশ খ্যাতির জন্যে অনেকেই করে, কিন্তু জাত লেখক, জাত গাইয়ে, জাত নাচিয়ে অন্য জিনিস। শুরু থেকে তাদের জীবনের ধরতাইটাই অন্যরকম হয়। ছেলেটার জন্যে জীবনটাকে উৎসর্গ করে দে। সবসময় মনে রাখবি, তারার চোখে একজন তোর দিকে তাকিয়ে আছে। মধ্যরাতের আকাশে তার চোখে ঘুম নেই। সে হল গোপা।'

এই কথা শোনার পরই মনে হল, তুষার আমার চেয়ে অনেক বড় আত্মা। আমি ওর নখের যোগ্য

নই। তুষার একটা ক্রিস্ট্যাল। আমি একটা মাটির ঢ্যালা। মুখে চোখে একটা অন্যধরনর জ্যোতি বেরোচ্ছে। সারাটা দিন আমি কী জঘন্য, ঘিনঘিনে, আঁশটে চিন্তা করি! কীভাবে তাকাই! জানালার শার্সিতে আটকে পড়া ভুসো নীল মাছির মতো দিনের পর দিন ছ্যাঁ ছ্যাঁ করছি। কমলযোনিতে অন্ধ কীট। চোখ বুজোলেই দেহকাণ্ড ভেসে উঠছে। এ-বই, সে-বই, মহাপুরুষের মহা মহা উপদেশ, দুরারোগ্য ব্যাধি কোনও ওষুধই ধরছে না।

গাড়ি একটা ছিমছাম হোটেলের কার্বে ঢুকে পড়ল। তুষার হেসে বললে, 'ভয় নেই, নেমে পড়। যাঁর কাছে যাচ্ছি, ভেরি গুডম্যান। লিটল নমিন্যাল ভাইস প্লেন্টি অফ ভারচু। নে নেমে পড়। কাচটা তুলে দিই।'

হোটেলটার বেশ অভিজাত ইংরেজ-ইংরেজ চেহারা। লোচ্চাদের লপেটা লোচ্চামি নেই। দালাল, ব্যাবসাদারদের পশু-পশু চেহারা চোখে পড়ে না। চারপাশ নিস্তব্ধ। হাসপাতালের মতো।

দোতলায় ধবধবে সাদা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তুষার বেল টিপল। দরজা খুলে গেল। কম বয়সি এক মহিলা। মনে হল নেপালি। পর্বতকন্যার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। অনিন্দ্যসুন্দরী। দামি সিল্কের শাড়ি দেহে যেন বিপ্লব তুলেছে। নাকের পাশে হিরে, তা না হলে অত জ্বলজ্বল করে! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ভয় করে। সারা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বর এমন এমন সব রূপের ফাঁদ পেতে রেখেছেন, অঘটন ঘটে গেলেই হল।

তুষার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা কোথায়?'

মেয়েটি ইংরেজিতেই বললে, 'বাবা চান করছেন। ভেতরে আসুন।'

ঘরের মধ্যে ঘর। এলাহি ব্যবস্থা। বসার জায়গায় আমাদের বসিয়ে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল।

তুষার বললে, 'অবাক হচ্ছিস! নেপালের অভিজাতরা ভীষণ সুন্দর হয়। অঢেল টাকা। অধিকাংশেরই বিলিতি শিক্ষা।'

মেয়েটি ফিরে এসে আমাদের উলটো দিকে বসল। দামি সেন্টের মৃদু গন্ধ বাতাসে। মুখের ত্বক সিল্কের চেয়েও মসৃণ। মেয়েটি মৃদু হেসে বললে, 'আপনি কাল এসেছিলেন। তাই না!'

তুষার বললে, 'আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন তার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বড় লেখক। কাগজের অফিসে চাকরি করে।'

নমস্কার বিনিময়ের পরে মেয়েটি বললে, 'আই অ্যাম সরি, আই কান্ট রিড বেঙ্গলি।'

আমি বোকার মতো হাসলুম। মনে মনে বললুম, 'বাংলা' আজকাল বাঙালিই কি পড়ে। একটা বইয়ের এডিশান কাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়। বুকের ওপর লুটিয়ে থাকা মুক্তোর মালা দু'আঙুলে নাড়াচাড়া করছেন সুন্দরী। দুঃখ কষ্টের পৃথিবী যেন এ ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। ওই রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় থমকে আছে। বেরোলেই পেছন পেছন চলতে শুরু করবে।

লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে নিখুঁত বিলিতি পোশাক। মুখে অমলিন হাসি। করমর্দনের জন্যে আমাদের দিকে চওড়া হাত এগিয়ে দিলেন একে একে।

সোফায় বসে বললেন, 'কী খাবেন বলুন!'

তুষার নিখুঁত সংযত গলায় বললে, 'নাথিং।'

'ঠান্ডা একটা কিছু।'

'তা হলে সফ্‌ট।'

তুষার আমার পরিচয় দিয়ে বললে, 'আমি এরই একটা স্টোরি সিলেক্ট করেছি। ভেরি হিলারিয়াস।'

'স্টোরির আউটলাইনটা আমাকে দেবেন। আমি পড়ে দেখব। একজন বড় ডিরেক্টর আজ সকালে আমাকে কনট্যাক্ট করেছিলেন। যদি হিন্দিতে যাই তা হলে বাংলা ছবির কথা পরে ভাবব। বাংলা ছবির মার্কেট ইজ ভেরি ব্যাড। উইক স্টোরি। উইক ডাইরেকশান।'

ভদ্রলোক সোনালি রঙের একটা সিগারেট ধরালেন। মেয়েটি উঠে চলে গেছে ভেতরের ঘরে। ভদ্রলোক কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছেন। কোল্ড ড্রিঙ্কস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

আমরা দু'জনে প্রায় দুম করে পথে এসে পড়লুম। অনেকটা উঁচু থেকে উল্কার মতো খসে পড়েছি। আমার চেয়ে বেশি লেগেছে তুষারের। আমি আসার সময় মাঝে মাঝে ভাবছিলুম, যদি হাজার পাঁচ পাওয়া যায়, ওইরকমই তো দেয় শুনেছি, তা হলে গ্রিলের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। এরপর কাঠের মিস্তিরিরটা কোনওরকমে শোধ করতে পারলেই মুক্ত পুরুষ।

ওই জন্যে আশা করতে নেই। নিরাশাটা তখন বেয়াড়া রকমের স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসহ্য লাগে।

চৌরঙ্গির কাছে এসে তুষার কথা বললে। এর আগে পর্যন্ত আমরা দু'জনেই চুপচাপ ছিলুম।

তুষার বললে, 'কিছু মনে করিসনি, শ্রীকান্ত। পয়সার এই খেলা রে ভাই। কখন কোন পথে যে হাঁটবে! অন্য টোপ গিলে বসে আছে। ফোড়ের তো অভাব নেই।'

'আমি কিচ্ছু মনে করিনি, তুষার। আমি কেবল তোর কথা ভাবছি।'

'আমি অভ্যস্ত। এসব আমার গা-সওয়া। তবে আমার প্রতিজ্ঞা, তোর ওই গল্পটা আমি করবই এবং হিট পিকচার হবে। আমার হল গন্ডারের গোঁ। আমি বাঙাল বাচ্চা। চল কোথাও বসে এক কাপ চা খাই।'

'না' বলতে পারলুম না। এদিকে ভেতরটা ছটফট করছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি না, কেবলই মনে হচ্ছে কমল আমাকে ডাকছে। চায়ের সঙ্গে সামান্য টা হল। রাত বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। পথে পথে লোক ঘুরছে পায়ে পায়ে। সাধু, শয়তান, পকেটমার, বেশ্যা, দালাল, ফুর্তিবাজ। ভগবান যেন ফুটকড়াইয়ের ঝাঁকা উলটে দিয়েছেন।

আজকাল গাড়ি রাখার মহা সমস্যা। কোনওরকমে এক জায়গায় ঢুকিয়ে প্রায় আধমাইল হেঁটে আমরা দু'জনে এককালের সেই বিখ্যাত দোকানে চা খেতে ঢুকলুম। ছাত্রজীবনে এখানে বড় বড় সব খেলোয়াড়দের জমায়েত হত। সে পরিবেশ আর নেই। এখানে এখন কাদের আড্ডা হয় আমরা জানি। পরদাফেলা কেবিনে কেবিনে মানুষের দু'রকমের খিদেই মিটছে। পেটের আর দেহের।

চা এল, সঙ্গে হাঙরের ফিশফ্রাই। জানি খাওয়া যাবে না। তবু নেওয়া। কিছু না হোক নাড়াচাড়া করে, আঁশটে গন্ধ শুঁকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে তুষার বললে, 'তুই তো একেবারে একা হয়ে গেলি। কীভাবে কাটাবি বাকি জীবনটা।'

'কাটিয়ে দোব। যদ্দিন না বড় হয়ে পাখা মেলে উঠে যাচ্ছে তদ্দিন ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করব। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাব। বুড়ো হয়ে গেলে আর ভাবনা কী? চোখ যাবে, দাঁত যাবে, কান যাবে, স্মৃতি যাবে। ধৈর্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করলেই, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।'

তুষার হাসল। আমাদের পাশ দিয়ে শ্যামলা রঙের ভীষণ চেহারার একটি মেয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আধবুড়ো একটি লোককে প্রায় বগলদাবা করে কোণের দিকে একটা কেবিনে ঢুকল। বয় সঙ্গে সঙ্গে পরদা টেনে দিল। পেছন থেকে মেয়েটির চলে যাওয়া, কোমরের কাছে তিন স্তর চর্বির ঢেউ, ঘাড়ের কাছে কায়দার খোঁপা, শরীরের গুরু মধ্যভাগ, সব কিছু পরিবেশটাকে কেমন যেন করে দিয়ে গেল।

তুষার বললে, 'তুই ভাল দেখে আটপৌরে একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেল, যে তোর ছেলেটাকে একটু স্নেহ-যত্ন করবে। যৌথ পরিবার ভেঙে আমাদের কী কাল হয়েছে দেখেছিস? ছেলেমেয়েরা সব ঝিয়ের কোলে মানুষ হচ্ছে। ভালবাসা, যত্ন কিছুই পায় না। ছেলেবেলাটাই মারাত্মক। ওই সময় মানুষের মন তৈরি হয়। ওইসব নোংরা অশিক্ষিতা মেয়েছেলের কাছে কী শেখে বল! এ তো আর রয়েল ফ্যামিলি নয়, যে শিক্ষিতা গভর্নেস রাখবি। সে দেশও নয়।

আমাদের পরে যারা আসছে, তারা আরও স্বার্থপর, আরও নিষ্ঠুর হবে। আমাদের আর বাঁচার পথ রইল না।'

আমি বললুম, 'সংসার থেকে একবার বেরিয়ে এসেছি। বয়েসও বেড়ে গেছে। মন নষ্ট হয়ে গেছে। সংসারের ঝুঁকি আর নোব না রে। বছরখানেক কষ্ট করে কাটাই, তারপর ছেলেটাকে ভাল কোনও আবাসিক স্কুলে দিয়ে দোব।'

'তাই কর! তবে তুইও তো মানুষ!'

'মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করব। কত ভাল ভাল ভাব আছে। হবি আছে। লেখাটাকে জাতে তোলার চেষ্টা করব।'

'খুব মনের জোর চাই রে! খুঁত খুঁত করে বেঁচে থাকার মানে হয় না। বুড়োবার আগেই বুড়িয়ে যাবি।'

'দেখি, এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মনটাকে যদি সামান্য একটু তুলতে পারি তা হলে স্পিরিচ্যুয়াল স্ফিয়ারে পড়ে যাব, তখন জীবনের অন্য মানে পেয়ে যাব।'

'অত সোজা নয় রে। এক সেন্টিমিটার তুলতে যা জোর লাগবে, রকেট পাঠাতেও অত ফোর্সের প্রয়োজন হয় না। পারলে খুবই ভাল। না পারলে জীবন একেবারে ঝামা হয়ে যাবে। এই রক্তমাংসের শরীরের যে কত ফ্যাচাং!'

দাম মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লুম। তুষার বললে, 'চল তোকে পৌঁছে দিই।'

'কোনও প্রয়োজন নেই। তোকে অনেক দূর যেতে হবে। আমার বেশি দূর নয়। চলে যাব টুকটুক করে।'

তুষার বিদায় নিল। কেন জানি না মনে হল, মানসিক দিক থেকে তুষার আমার চেয়ে অনেক সবল। আমি বলি এক, ভাবি এক, করি আর এক। কতকগুলো ভয় না থাকলে আমি যে-কোনও দিন চরিত্রহীন হয়ে যেতুম। কে আমাকে বাঁচায় জানি না, তবু বহুবার পড়ে যেতে যেতেও খাড়া থেকেছি। যেমন এই মুহূর্তে আমার নানারকম কদিচ্ছা হচ্ছে। রেস্তোরাঁয় একটু আগে দেখা ওই মেয়েটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক আমার সামনে দিয়ে অনুরূপ আর একটি গজেন্দ্রগমনে চলেছে। চলছে, থামছে। আড়ে আড়ে চাইছে। সাদা রুমালে মাঝে মাঝে ঠোঁট মুচছে। বেশ সাবধানে। লাল এনামেল যাতে চটে না যায়। সারা শরীরে ইচ্ছাকৃত অশ্লীল ঢেউ ভাঙছে। আমি ইচ্ছে করলেই পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু পারছি না যেতে। খুব নিচু, অথচ ভীষণ শক্তিশালী দেহতরঙ্গে আমি মাছি হয়ে গেছি। ওরা বুঝতে পারে। মেয়েটির চলন আরও মন্থর হয়েছে। বারে বারে তাকাচ্ছে। একবার একটু হেসেছে। ইচ্ছে করে আঁচল ঠিক করার ফাঁকে আমার নজর কাড়ার চেষ্টা করেছে। আমি কমলকে ভাবার চেষ্টা করেছি। আসেনি। আমি একই সঙ্গে গীতা আর বেদান্তের শ্লোক মনে আনার চেষ্টা করেছি। আসেনি। এসেছে দেহবাদী পশ্চিমের আধুনিক অবক্ষয়ী নির্দেশ। গোপাকে ভাবার চেষ্টা করছি। কোথায় সে। ইতিমধ্যে মেয়েটি চলে এসেছে আমার বাঁ কাঁধের পাশে। ফোলা ফোলা মুখের শুকনো চামড়ায় সাদা সাদা পাউডারের গুঁড়ো। চোখ দুটো ছাগলের মতো। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হলদেটে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে। সিনথেটিক শাড়ি। বহুদিন কাচা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল, বস্তিবাড়ি, নোংরা পথ, অপরিষ্কার বাথরুম, খ্যানখেনে গলা কদর্য এক বুড়ি, ভ্যাপসা নর্দমার গন্ধ।

আমার গতি নিমেষে বেড়ে গেল। আমি কমলকে দেখতে পাচ্ছি। কালুকে দেখতে পাচ্ছি। কমলের দিদা ঠাকুরঘরে। ধূপ জ্বলছে। নীলুদা গান গাইছে। আমার ঘরের সাদা বিছানায় সাতটা সাদা লোমঅলা কুকুরের মতো চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি জিতে গেছি। আমার প্রবল ইন্দ্রিয় পরাজিত।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কালু। কোলে কমল। রুপোর তবকের মতো চাঁদের আলোর চিলতে পড়ে আছে পথে। কালুর বুকের ওপর পাতার ছায়া নাচছে।

দূর থেকে কালুর গলা শুনছি, 'ওই যে তোমার বাবা আসছেন।'

আমি কাছে এসে গেছি। একেবারে সামনে। কালুকে আজ ভীষণ তাজা দেখছি। মনে হয়, বাজার-দোকান করতে হয়নি। দুপুরে বেশ বিশ্রাম হয়েছে। ঠান্ডা আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিল যেমন ওর শোবার অভ্যাস। কমল কালুর কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

'কী রে বুড়ো! তুমি এত বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ! কষ্ট হচ্ছে না!'

'আপনার ছেলে তো ফং ফঙে। কোনও ওজন নেই।'

'কী রে বুড়ো, কোলে কোলে বেশ আছিস!'

'যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

'কেন রে?'

'তুমি এত দেরি করলে কেন?'

'কাজ ছিল বাবা। অনেক কাজ।'

'তুমি অফিসে বললে না কেন, আমাকে বুড়ো তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।'

'কাল থেকে তাই বলব বাবু। এসো আমার কোলে এসো। তোমার জন্যে এত বড় একটা চকলেট এনেছি। আমার পকেটে আছে।'

কমল দু'হাত বাড়িয়ে কালুর নরম কোল থেকে আমার কেঠো কোলে ঝাঁপিয়ে চলে এল। গা-টা কেমন যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। চকলেট এত প্রিয়। শুনল। তেমন উৎসাহ নেই কেন?

'হ্যাঁগো, এর শরীর খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ মেজদা। দু'বার বমি করেছে। দুপুরে যা খেয়েছিল সব বেরিয়ে গেছে। মনে হয় গা-টা একটু গরমও হয়েছে। কেমন যেন নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। চলুন একবার ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই।'

'আজ বেশ রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে ডাক্তারবাবুকে কল দেওয়া যাবে।'

'আজ তা হলে আপনি এখানে থেকে যান। টানতে টানতে আর অত দূরে নিয়ে যেতে হবে না। ছোড়দি এসেছেন।'

'ছোড়দি?'

'সোমাদি।'

'সোমাদি এসেছে? আসার কথা ছিল নাকি?'

'তা আমি জানি না মেজদা।'

বাবা, সোমা এসে গেছে! অ, গরমের ছুটি পড়েছে। তা হলে আমাকে তো এখুনি চলে যেতে হবে। সোমার ওই অহংকারী ভাব আমার অসহ্য লাগে। তাকালেই মনে করে, আমি প্রেমে পড়ে গেছি। কাছে গেলেই দূরে সরে যায়। ভাবে অভব্য জামাইবাবুদের মতো আমি অসভ্যতা করে ফেলব। সোমা পি-এইচ ডি করেছে, আমি করিনি। তাইতেই অহংকার একেবারে গগন-ছোঁয়া। আমি আর ভেতরেই ঢুকব না। সোজা মোড়ে গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।

'কালু, আমি আর রাত করব না। ভেতরে আর গেলুম না। তুমি বলে দিয়ো।'

গোঁ চেপে গেলে আমার পক্ষে সব কিছু সম্ভব। ছেলেটা দুপুর থেকে অসুস্থ। বমি করছে। নেতিয়ে পড়ছে। জ্বর এসে গেছে, দু'পা দূরে ডাক্তারখানা। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে ডিসপেনসারি চোখে পড়ে। কেউ একবার গিয়ে ডেকে আনতে পারল না! এ বাড়ির প্রায় সব ক'টাকেই আমার জানা হয়ে গেছে একমাত্র কালু ছাড়া। সে অবশ্য এ বাড়ির কেউ নয়। আমার শাশুড়ির মতো বিষয়ী খুব কম দেখেছি। এক তো বড়লোকের মেয়ে বলে অহংকার। তারপর বড়লোকের বউ। সোমা আবার মাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আর নীলুদাটা ভণ্ড। সারাজীবন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাবে থেকে এখন

বিয়েপাগল। জীবনে আর এ বাড়িতে আসব না। গোপা মারা গেছে, আমার আর এখানে আসার দরকার কী? আর সোমা যদ্দিন থাকবে তদ্দিন তো কোনওমতেই আসছি না।

বাড়ি এসে গেছি। কী আর এমন অসুবিধে হল। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। কেবল কমল যেন আরও কাবু হয়ে পড়েছে। গা বেশ গরম। আমার কাঁধে মাথা রেখে কোলে চেপে ওপরে উঠে এল। কী অদ্ভুত মানুষের জীবন! কাল এই সময়টায় কেমন ফুরফুরে ছিলুম! একটা বিরহী-বিরহী ভাব! আর আজ। বন্ধ সিন্দুকের মতো আমার মনের অবস্থা।

কমলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জানলা টানলা সব খুলে দিলুম। চাঁদের আলো পাগলের মতো পাতায় পাতায় নাচানাচি করছে। অহংকারী মেয়ে যেন জড়োয়ার গয়না পরে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। মাটির সমুদ্র যেন আকাশে উঠে এসেছে। তাকালেই মনে হচ্ছে দূর থেকে আমারই মতো কোনও নিঃসঙ্গ পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কমলের মাথার তলায় একটা বালিশ রাখতে রাখতে ফিসফিস করে বললুম, 'আজ আর কিছু খায় না।'

কমল মিষ্টি গলায় বললে, 'না বাবা। তুমি খেয়ে নাও।'

'আজ আমারও নো মিল রে বুড়ো!'

'তুমি কিছু খেয়েছ বাবা?'

'না রে বুড়ো। আজ আমরা দু'জনেই রাত-উপোসি হব। তুই একটু একা থাক। আমি ঝট করে চানটা করে আসি।' হাত তুলে আমার গাল ছুঁয়ে কমল বললে, 'যাও বাবা।'

বাথরুমটাকে মনে হয় কারাগার। চারপাশে উঠে গেছে খাড়া দেয়াল। উঁচুতে ঘষা কাচের জানলা। বেশ চান করছি। হঠাৎ দরজায় দুর্বল হাতের টোকা। কল বন্ধ করলুম।

বাইরে থেকে কমল করুণ গলায় বললে, 'বাবা বমি করে ফেলেছি।'

তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলুম। সারা গা বেয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে।

'কোথায় করেছিস?'

কমল কেঁদে ফেলল, 'বিছানার চাদরে বাবা। চাপতে পারিনি।'

স্তম্ভিত। মাথায় রক্ত চড়তে চাইছে। ওই অতবড় বিছানা! অত সুন্দর চাদর। এত রাতে ওইসব পরিষ্কার করতে হবে। কমলের ভীরু, অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কত দূর ভাবে আমাকে! কত পর ভাবে! মা বেঁচে থাকলে ও কি এমন কেঁদে কেঁদে বলত। চাদর নষ্ট করে ফেলেছে বলে ভয় পেত! শিশু হলে কী হবে! কমল জানে বাবা তার বাইরের জগতের। বেশি জুলুম সহ্য করবে না। চড়চাপড় চালিয়ে দেবে। বকবে, ধমকাবে।

কমল কান্না চাপতে চাপতে বললে, 'বাবা আমি পরিষ্কার করে দোব বাবা। আমি দোব। তুমি রাগ কোরো না। শুধু বলে দাও কীভাবে করব।'

এবার আমার কাঁদার পালা। প্রথমেই বেসিন থেকে জল নিয়ে কমলের মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, 'বুড়ো, তুই সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়। একদম কাঁদিসনি। একদম ভাবিসনি। করে ফেলেছিস তো কী হয়েছে! আমি আছি না!'

আমার শেষ কথাটার মধ্যে বেশ জোর ছিল। এই বলার মধ্যে কোনও অভিনয় ছিল না। আমার প্রাণের কথা। ছোটদের আমরা ছোট ভেবে উপেক্ষা করি। বৈষয়িক ব্যাপারে তারা ছোট। অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে তারা বড়রও বড়। পরিষ্কার মন দিয়ে তারা সহজেই আমাদের চিন্তা তরঙ্গ ধরে ফেলে। কমল বুঝে ফেলেছে কর্তব্য ছাড়া আর তেমন কোনও সূক্ষ্ম টান আমার ভেতর নেই। সকালবেলা ফেলে দিয়ে আসি, রাতের বেলা তুলে নিয়ে আসি। খুব সহজ রুটিন। মনে সব সময়েই এক ধরনের বিরক্তি।

কমল সোফায় মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। এখনও সহজ হতে পারেনি। ওই অবস্থাতেই কান্নাচাপা গলায় বললে, 'হঠাৎ করে ফেলেছি বাবা। ইচ্ছে করে করিনি আমি।'

চাদর নষ্ট হয়েছে। গদিতে দাগ লেগেছে। সেজন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। কমল আমাকে ধরে ফেলেছে সেইটাই আমার লজ্জা। আমার বেদনা। আমার ভয়। মানুষের শৈশব কত অসহায়। এই মা-মরা ছেলে! দামি চাদর, বিছানা নষ্ট করে ফেলেছে বলে একটা চড় যদি আমি হাঁকাতুম, বাধা দেবার কে ছিল। কী করতে পারত ও। নিষ্ঠুরেরই তো দুনিয়া।

সব পরিপাটি করে ওকে বিছানায় শোয়াবার জন্যে তুলতে গেলুম। ঘুম জড়ানো গলায় বললে, 'আমাকে মেঝেতে বিছানা করে দাও বাবা। আবার যদি হয়।'

'হয় হবে। তার জন্যে আমি আছি। তোর এখন কেমন লাগছে বুড়ো!'

'একটু একটু কষ্ট হচ্ছে।'

'গা গুলোচ্ছে?'

'একটু একটু।'

কমলকে শুইয়ে কপালে হাত রাখলুম। চুলে ভরা ছোট্ট কপাল। মিষ্টি করুণ একটা মুখ। বড় বড় চোখের পাতা। ভেজা ভেজা। এই ছোট্ট এতটুকু একটা মানুষ। কত ধাক্কা খেতে খেতে বড় হতে হবে। কত কাঁদতে হবে! কত জ্বলতে হবে। পথ বড় অনিশ্চিত। বিপদসংকুল। এই পাহাড়, বন, সমুদ্র নিয়ে। এই ঝোপ ঝাড় জঙ্গল নিয়ে। এই ঘাতক নিয়ে, পাতক নিয়ে গোলাকার যে বস্তুটি, মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরে ঘুরে চলেছে, কে বলেছে মানুষ সেখানে এসেছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়! কে ঈশ্বর! সব ভাঁওতা, আর ধাপ্পা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এলে সব মানুষ স্বভাবে সমান হত। আকাশ থেকে ছত্রীবাহিনীর মতো জনে জনে ফুড প্যাকেট ফেলতেন। এমন, 'যাও তুমি চরে খাও' গোছের একটা ব্যাপার হত না। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলত না। কীসের ভরসায়, কার ভরসায় এখানে আসা! কেনই বা আসা!

কমল পাশ ফিরতে ফিরতে বললে, 'তুমি শুয়ে পড়ো না বাবা!'

কমলের চুলে আমার আঙুল খেলা করছে। ছেলেটার কোঁকড়ানো চুল হয়েছে। ভারী সুন্দর। ভেলভেটের মতো নরম। যদি পাপে না ধরে ছেলেটাকে এত সুন্দর দেখতে হবে! এ তো আমারই গর্ব! আমাদের দু'জনের সৃষ্টি। আমাদের তিনজনের একই সঙ্গে একটা ছবি তোলাব তোলাব করে তোলানো হয়নি। একপাশে আমি, একপাশে গোপা মাঝখানে কমল। তাকিয়ে দেখার মতো ছবি হত। যদি একটা মেয়ে হত, সে আরও সুন্দর হত। বহুকাল পরে ছবিটা দেখে সবাই বলত, 'সুন্দরের ফ্যামিলি।'

'গোপা, ঠিক হচ্ছে তো? দেখো তোমার ছেলের কোনও অযত্ন করিনি। এই দেখো কেমন সেবা করছি। তোমার মতো পাশে শুয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে নিতে পারছি না। আমার বুক যে তোমার বুকের মতো নরম নয়। শরীরে মা মা, গন্ধ নেই।'

কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ও বাড়িতে আজ কী খেয়েছিল দুপুরে! বিদঘুটে বিদঘুটে রান্নার জন্যে আমার শ্বশুরবাড়ি ফেমাস। কম খরচে পেট ভরানোর মতলব। বারান্দায় চাঁদের আলোয় গিয়ে বসার ইচ্ছে হচ্ছে। ভেবেছিলুম, আজ একটু লিখব। সে আর হল না। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, সামনের বাড়ির বারান্দায় কেউ আছেন কিনা! বাড়ি অন্ধকার। ভালই হয়েছে। বড়লোকের তো রোজই পার্টি থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নীল আকাশের গায়ে চাঁদ আটকে আছে। কতদিন ভাল জলসা শুনিনি। কোনও উৎসবে যাইনি। এইভাবে আমাকে জীবন কাটাতে হবে! কী চাই আমি? কীসে আমার সুখ! কে খুব কাশছে। কেশে কেশে যেন দম আটকে ফেলার জোগাড়। মনে হয় হাঁপানি আছে।

না, লিখতে হবে। অসম্ভব একটা কিছু লেখা চাই। জীবনটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে হবে। প্রেম, রেপ, পারভার্শান নয়। সংশয়, দ্বন্দ্ব, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবেশ-প্রস্থান, সব মিলিয়ে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে, যেখানে গেলে মনে হবে, জীবনের রহস্যটা ধরে ফেলেছি। সব লেখার শেষ

লেখা। অনেক ভাবনা আসে, কিছুতেই ঠিক মতো সিচুয়েশানে ফেলতে পারি না। ফসকে যায়। গোঁজে যায়। জোলো হয়ে যায়। সেই কবিতাটা বারে ঝরে মনে পড়ে,

> Death and a writer's work. Just before dying,
> he has his lastwork read over to him. He still
> has'nt said what he had to say. He ordered it
> to be burned. And he,dies with nothing to
> console him and with something snapping
> in his heart like a broken chord.

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে লেখক বললে, পড়ে শোনাও আমার পাণ্ডুলিপি। কই, যা বলতে চেয়েছি তা তো এখনও বলা হয়নি। পুড়িয়ে ফেলো। পুড়িয়ে ফেলো। কথা শেষ না হতেই মারা গেল লেখক। কোনও সান্ত্বনা নিয়ে গেল না। ছিন্নতন্ত্রীর মতো কিছু একটা শব্দ হল হৃদয়ে।

সামনের বাড়ির জানালায় মৃদু একটা আলোর আভা ফুটে উঠল। কালো একটা ছায়া নড়ছে চড়ছে। সেই মেয়েটি। হয়তো বাথরুমে যাবে। ঠান্ডা জলের বোতল বের করে জল ঢালবে গলায়। আজ মনে হয় বাড়িতে আর কেউ নেই। মামা মনে হয় সেই বিদেশিনির সঙ্গে পাঁচতারায় তারা গুনছেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ওই মেয়েটিও আমার মতো নিঃসঙ্গ। ও বুঝতে পারে না। আমি পারি। আমার কষ্ট হয়। এ কী জ্বালা, পাশে এমন একজন কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। জীবন কি গুটিয়ে রাখার জিনিস! ঘুড়ির মতো বেড়ে যেতে হয়। লাট খাবে, গোঁত মারবে। প্যাঁচ হবে। লাটাই, সুতো; ঘুড়ি সবই হাতে রইল, ওদিকে নীল আকাশ কেবল ডাকছে।

সামনের বাড়ির বারান্দার দরজা খুলে গেল। মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাতলা, সাদা নাইটির নীচের দিকটা বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে। রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে। পিঠে লুটোপুটি খাচ্ছে রেশমি চুল। বড় সামনা সামনি। কথা না বলে থাকি কী করে!

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ঘাড় তুলে তাকাল। জিজ্ঞেস করলে, 'কী এখনও ঘুমোননি?'

'না, ঘুম আসছে না। আপনি?'

'আমার ফার্স্ট পার্ট হল। সেকেন্ড পার্ট শুরু হবে। কমল কী করছে? বুড়ো?

'ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ শরীর খারাপ।'

'কী হয়েছে?'

'জ্বর। বমি করছে।'

'ওষুধ দিয়েছেন?'

'কাল সকালে। রাতটা দেখি।'

'আমি যাব?'

'আপনি!'

আমার কথা আটকে গেল।

মহিলা বললেন, 'দরজা খুলুন। আমি আসছি।'

'এত রাতে কষ্ট করবেন? মামা রাগ করবেন।'

'মামা নেই। কাল ফিরবেন।'

দরজা খোলার জন্যে নীচে নামছি। পা দুটো টলছে। নেশা হয়েছে। বুকের কাছটা কেমন যেন করছে।.জেহান রিকটাসের সেই কবিতার লাইন মনে পড়ছে:

> Who is She? I don't know but She is beautiful.
> Rising in me like a Summer moon,

She is posted like a Sentinel.
Like a torch, like a gleaming light.

কে সে আমি জানি না/ কিন্তু ভারী সুন্দর/ গ্রীষ্মের চাঁদের মতো আমার আকাশে/ প্রহরীর মতো মোতায়েন/বাতি/না উজ্জ্বল আলো ॥

দরজাটা পুরো খুলিনি। একে গভীর রাত। কার চোখ কোথায় জেগে আছে। এক পাল্লার ফাঁক দিয়ে সে গলে এল। ফিনফিনে নাইটি। পায়ে নরম চটি। রাতে সমুদ্র জ্বলে। এ দেহও যেন জ্বলছে। কাঁধ, পিঠ, পুরো বাহু। ফ্লোরেসেন্ট রং মেখেছে? গন্ধ। পোশাকের শব্দ। সরু সরু সাপের মতো চুল হিসহিস করছে। দরজার ছিটকিনি লাগাবার সময় আমার হাত কাঁপছে মদ্যপের মতো। সে আগে আগে উঠছে। আমি পেছনে, আমাকে যেতে হচ্ছে না। অজগরের নিশ্বাস আমাকে টানছে। আমার চোখের সামনে সুডৌল নিতম্ব। দুলছে চুল। দুলছে শরীর। আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। সেই পোকার অবস্থা। বারে বারে আগুন ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসছে। প্রতিবারই পাখা পুড়ছে একটু একটু করে। মনে হচ্ছে। কী আশ্চর্য, সত্যিই মনে হচ্ছে, কমলের এই অসুখ যেন দীর্ঘদিন চলে। সত্যিই আমি শয়তান। চরিত্রহীন। অসংযমী। কেন মানুষ হঠাৎ হঠাৎ পিছলে যায়, এই মুহূর্তে আমি যেন বুঝতে পারছি। কী কঠিন এই নিজেকে ঠিক রাখা! সব প্রতিজ্ঞা, সব আদর্শ নিমেষে টলে যায়। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে যখন পা তুলছে এষা, তখন আমার কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে।

এষা ঘরে ঢুকে সোজা খাটের দিকে এগিয়ে গেল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে একটু সেন্ট ছড়িয়ে রেখেছিলুম।

এষা বললে, 'ঘরে কম পাওয়ারের আলো নেই? শুধু শুধু এত চড়া পাওয়ারের আলো জ্বেলে রেখেছেন কেন?'

'কমটাই জ্বালা ছিল। আপনি আসছেন বলে চড়া আলোটা জ্বেলে গিয়েছিলুম।'

এষা মৃদু হেসে কমলের মাথার কাছে খাটের একধারে বসে পড়ল। মৃদু আলো। সাদা ধবধবে বিছানা। সাদা ফিনফিনে নাইটি পরা বাদামি মেয়ে। এ যেন স্বপ্ন! স্বপ্ন নেমে এসেছে ঘরে। গোপা কখনও নাইটি পরেনি। এ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই পোশাকে নারীর নগ্নতা আরও রহস্যময়।

এষা একপাশে হেলে, কমলের মাথার বালিশে হাতের কনুই রেখে, আর এক হাতে কমলের মাথার এলোমেলো চুল সমান করতে করতে বললে, 'জ্বর খুব বেশি নয়।'

এষার একটা পা মেঝেতে আর একটা পা উঠে আছে। পোশাকের বড় বিপজ্জনক অবস্থা। খুব সহজ। কোনও গ্রাহ্যই নেই। এইভাবে বসলে কী হয় এষা যেন জানেই না। যে-কোনও বিবাহিত পুরুষ, যার বিবাহিত জীবন অর্ধসমাপ্ত তার যে খুব অসুবিধে হয়। যে অন্য নজরে নারীকে দেখতে শিখেছে তার সামনে ওভাবে না বসলেই পারত! একে মধ্যরাত, তায় চাঁদের আলোর প্লাবন, তার ওপর ভিজে ভিজে দমকা বাতাস, সঙ্গে বিদেশি সেন্টের সুবাস, কী যে হবে! ঘড়ি চলছে, সময় চলছে, মানুষের নিয়তির চাকা নীরবে ঘুরছে।

এষা এবার কমলের পাশে আধশোয়া হল। যেন স্বপ্নে কমলের মা এসেছে। আমার চেয়েও নিঃসঙ্গ, আমার চেয়েও অসহায় একটি শিশুকে বুকে টেনে নিতে। হায় শৈশব! কোথায় গেল আমার পবিত্র, ঝরনার জলের মতো নির্মল, স্বচ্ছ শৈশব!

'আপনার ছেলেটি ঠিক যেন দেবদূত। সকালে আমার সঙ্গে কত কথাই বলে। আপনি ভীষণ দেরিতে ওঠেন। দিনের সবচেয়ে ভাল অংশটাই দেখতে পান না। দেখুন, কী সুন্দর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুম।'

আমি কমলের নিশ্চিন্ত ঘুম দেখার জন্যে অশান্ত হয়ে ছুটে এলুম। খুব কাছে। এষার শরীরের

ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে দেখছি, ঘুমন্ত শিশুর পবিত্র মুখ। আমার বুকের তলায় কাত হয়ে আছে স্ফিংকস নারী। আমি মুখ দেখছি। দুটো মুখ। শিশু ও নারী। আমি আরও কিছু দেখছি।

কমলকে জড়িয়ে আছে অনাবৃত একটি হাত। মাঝের সরু আঙুলে ঝলমল করছে আংটির পাথর।

এষা বললে, 'কী সুন্দর তাই না! কার মতো মুখ হয়েছে!'

'এ বংশের কারু মতো নয়।'

'তাই?'

শ্রীকান্ত আর একটু সাহসী হও না! ক্ষতি কী! মহিলার মন বোঝার চেষ্টা করো। কী আছে কার মনে, নাড়াচাড়া না করলে বুঝবে কী করে!

বড় বেশিক্ষণ ঝুঁকে আছি সামনে। আর না। সোজা হলুম।

এষা বললে, 'কফি আছে?'

'আছে।'

'কিছু খাবার আছে! সন্ধেবেলা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বেশ খিদে পেয়েছে। আপনি খেয়েছেন?'

'না, আজ আর খাইনি কিছু।'

'কী আছে?'

'চানাচুর আছে। ডিম আছে। পাউরুটি, মাখন, জেলি আছে।'

'বাঃ, অনেক কিছু আছে। কাল সকালের ব্রেকফাস্টটা সেরে রাখলেই হয়।'

'আপনি শুয়ে থাকুন, আমি করে আনছি।'

'তা কখনও হয়! এসব ব্যাপারে আমি এক্সপার্ট। আমার হাতের ওমলেট খেলে ভুলতে পারবেন না।'

'একটু অহংকার হল না?'

'চ্যালেঞ্জ। চলুন আপনার কিচেনে।'

এ মেয়ের প্রাণ আছে। সেন্ট পারসেন্ট বেঁচে আছে। বেশির ভাগ মেয়েদের মতো অর্ধমৃত নয়। জীবনের প্রতি তিতিবিরক্ত নয়। এই তো চাই। যদ্দিন আছ, ওরই মধ্যে মজা করে বাঁচো। কোন মেয়ে বলে, মাঝরাতে ব্রেকফাস্ট হবে।

রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে এষা বললে, 'বেশ ভালই হয়েছে বাড়িটা। এইবার আমি একটু একটু করে সাজিয়ে দিয়ে যাব। আমার সাজাতে ভীষণ ভাল লাগে।'

'সত্যি সাজিয়ে দেবেন?'

এষা থেমে পড়ল। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'সত্যি। কমল ভাল হয়ে উঠুক। উঠলেই কাজ শুরু করব।' মুখ দেখে মনে হল, এষা আমার খুব কাছের মানুষ। আমি তো একেবারেই গোলা মানুষ। এর তার বই থেকে ভাব চুরি করে লেখা তৈরি করি। কোনও চরিত্রই আমি তেমন বুঝি না। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে বসে আছি। রান্নাঘরে ঢুকে বললুম, 'এই প্রথম আমার রান্নাঘর নারী-পদ-স্পর্শে ধন্য হল।'

'বাবা, একেবারে সাধু ভাষা।'

'সাধুভাষায় কম খরচে অনেক বেশি কথা বলা যায়।'

'তা অবশ্য ঠিক। সমাস আর সন্ধির বাঁধনে আঁটসাঁট।'

নিমেষে এষা সব গোছগাছ করে ফেলল। এগবিটার খুঁজেছিল। নেই আমার। শুনে হতাশ হল না।

বললে, 'ওমলেটের ভালমন্দ নির্ভর করে ডিম ফেটানোর ওপর। ফাঁকি মারলেই ফেলিয়োর।'

আমার একমাত্র ভয় এষার নাইটি। বড় বেশি স্বাধীন। বিদেশি রমণীর মতো। আগুন নিয়ে কাজ। টুক করে ধরে গেলেই হয়েছে। আজকাল চারদিকে যা সব হচ্ছে! কোনটা দুর্ঘটনা, কোনটা আত্মহত্যা, কোনটা খুন বোঝার উপায় নেই।

গোটা চারেক মুরগির ডিম একসঙ্গে ফাটিয়ে একটা পাত্রে ঢেলে এষা ফ্যাটাতে শুরু করল। কী তার কায়দা। বন্ধনহীন বুক দ্রুত হাতের চলনে থিরিথিরি কাঁপছে। আমার ওপর ভার পড়েছে পেঁয়াজ আর লঙ্কা কুচোনোর। আমি দেখব, না ছুরি চালাব। সম্পূর্ণ বোলড আউট। পেঁয়াজের ঝাঁঝে চোখ দিয়ে জল ঝরছে, না যা পেতে চাই সাহস করে তার কাছে এগোতে পারছি না বলে অন্তর-আত্মা কাঁপছে রাতের পাখির মতো! যেয়ো না রজনী।

ছিট করে একটু ডিমের গোলা এষার গালে গিয়ে লাগল। কাঁধের দিকে গাল নামিয়ে মোছার চেষ্টা করল। হল না। হাত দুটো জোড়া।

'দাঁড়ান আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

আঙুল দিয়ে তুলে আনলুম। খেয়াল ছিল না, আঙুলে লেগে আছে পেঁয়াজ আর লঙ্কার রস।

'ভীষণ জ্বালা করছে। লঙ্কার রস লেগে গেছে।'

'ইস খেয়াল ছিল না। দাঁড়ান ভিজে ন্যাপকিন দিয়ে মুছিয়ে দিই।'

ফ্রিজের হাতলে পরিষ্কার ধবধবে ন্যাপকিন সকালেই ঝুলিয়েছিলুম। সেদিকে তাকাতেই এষা বললে, 'ওই হাতে ধরবেন ভেবেছেন?'

'ধরব না?'

'কী বুদ্ধি আপনার! পেঁয়াজের গন্ধ হয়ে যাবে না! আগে সাবান দিন হাতে।'

পেছনে দাঁড়িয়ে ভিজে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মোছবার সময় এষার মাথা আমার বুকের কাছে চলে এল। মাথা তার আশ্রয় পেল আমার বুকে। সামনে বাড়িয়ে রাখা দুটো হাত আপাতত স্থির। মুখ, চোখের পাশ দুটো, চিবুক এমনকী গলা আর ঘাড়ও মুছিয়ে দিলুম। এই সময় কেউ যদি একটা ছবি তুলে রাখত, স্বামী স্ত্রী বলে ভুল করত।

এষা বললে, 'আঃ কী আরাম!'

'একটু ওডিকোলোন দিলে আরও আরাম হত।'

আমি এবার তোয়ালেটা এষার কপালে চেপে ধরলুম। ছোট্ট চুলে ঘেরা কপাল। আমার কাঁধে, মুখে, চোখে অজস্র অলৌকিক আঙুলের মতো হিলহিল করছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ আমি আর এ জগতে রইলুম না। ইংরেজ ঔপন্যাসিক হলে কত সহজে লিখতে পারতুম একটি মাত্র লাইন, উই মেড লাভ।

কোথায় ডিম। কোথায় ওমলেট। ভেসে গেল মাঝরাতের ব্রেকফাস্ট। চ্যালেঞ্জ! এমন ওমলেট ভাজব যা আপনি কখনও টেস্ট করেননি। দ্যাট ইজ দ্যাট। রিয়েলি দ্যাট।

Plic/ plic, ploc, fine phic
Trottinait Sur le toit.
Ouf, ouf, ouf, Soleil brille
Et d'un coup, hop! la boit.

চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে এষা আবৃত্তি করছে।

বেসিনের ট্যাপটা ঠিক মতো বন্ধ করা হয়নি তখন। কালো মুখে বাটি। জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে। এষার কবিতার মতো:

Plink, plink, plunk fine rain
is tapping on the roof.
Ooh, ooh, ooh, the Sun
comes out and shows it up.

দীর্ঘ তিনবছর পরে এই হল। শরীর ঝরনার ধারে শ্বেতপাথরের মতো শীতল। মাটিতে শুয়ে আছে এষা। হাতে মাথা রেখে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে চুল। কালো আলোর ছটার মতো। চওড়া পিঠ ক্রমশ সরু হতে হতে কোমর। সেখানে শরীর সাগরের নিখুঁত একটি উদ্বেল ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পায়ের পাতায়। সানট্যান চামড়া। জায়গায় জায়গায় সোনালি। উপুড় করা শ্বেতপাথরের বাটির মতো দুটি বুক। কেউ বলতে পারবে না, একা আমি নিঃসঙ্গ।

এষা মাথা না তুলে শুয়ে শুয়েই বললে, 'আমি জানতুম এইরকমই হবে। এর চেয়ে অন্যরকম কিছুই হতে পারে না। দিস ইজ ট্রুথ। এই হল সত্য। দি ইটারন্যাল স্টোরি অফ এ ম্যান অ্যান্ড এ ওম্যান।'

আমি কোনও কথা বলতে পারছি না। ক্ষমা চাইব? না। সহজ হব? পারছি না। বয়েসটা যে বেড়ে গেছে। এ বয়সে লম্পট হওয়া যায়। প্রেমী হওয়া যায় কি?

এষা উঠে বসল। নিজের দিকে একবার তাকাল।

'একটা শাড়ি দিতে পারেন? এটা আর পরা যাবে না। ডার্টি হয়ে গেছে।'

পা টিপে টিপে ওঘরের দিকে চলেছি। ভয় এসেছে। কমল যদি উঠে পড়ে। যদি জেনে যায়। যদি বুঝে ফেলে। আলমারি খুলে গোপার একটা শাড়ি বের করে আনলুম। অনেক শাড়ি পাটপাট করে রেখেছি। নেবার সময় গোপার কথা একবার মনে পড়ল। মনে হল আলমারির একপাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনকে মানুষ প্রয়োজনে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। আমিও পারলুম। বোঝালুম, যে গোপা সেই এষা। সেই কালু। সেই সোমা। একই বহু হয়েছে। শাস্ত্রকাররা তো সেই রকমই বলছেন। বেছে বেছে সেই শাড়িটাই বের করলুম, যেটা কেনা হয়েছিল। কিন্তু পরার সুযোগ হয়নি গোপার।

এষার হাতে শাড়িটা সবে দিয়েছি, শোবার ঘর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে এল। কারু যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। ছুটে গেলুম। বিছানার মাঝখানে কমল বসে আছে, দু'হাতে বুক চেপে। আবার বমি। চাদরের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভমিটিংব্লাড।

এষা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও আমি একনজরে দেখে নিলুম। কেমন দেখাচ্ছে। গায়ে জামা নেই; যেন সাঁওতাল রমণী।

আমার আগে এষাই এগিয়ে গেল। এও লক্ষ করলুম শাড়ির তলায় সায়া নেই। আবার এও ভাবলুম এই সাজে এষাকে দেখে কমল কী ভাববে!

একবারই বমি করেছে কমল। বেশ খানিকটা রক্ত। এষা কমলের মাথাটা নিজের নরম বুকে চেপে ধরেছে। কেমন স্পর্শ একটু আগে আমার জানা হয়েছে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'দেখেছেন রক্ত।'

'নার্ভাস হবেন না। ঠান্ডা আধ গেলাস জল আনুন।'

কমল জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে আবার এষার বুকে মাথা রাখল। খুব নরম গলায় বললে, 'তুমি?'

'তোমার শরীর খারাপ, তাই আমি এলুম। কী কষ্ট হচ্ছে বলো।'

'ব্যথা করছে বুকে।'

এষা আমার দিকে তাকাল, 'আমি গাড়ি বের করছি। হাসপাতালে নিয়ে যাই। সকালের অপেক্ষায় না থাকাই ভাল।'

ঘড়ি দেখলুম। আর তো বেশি দেরি নেই। একটু আলো ফুটুক না। আকাশ একটু লাল হোক না।

বললুম, 'আর তো সামান্য বাকি।'

এষা উঠে পড়েছে। কমলকে ধীরে শুইয়ে দিয়েছে বালিশে।

'যেতে যেতেই ভোর হয়ে যাবে।'

এ এক অন্য এষা। বেশ কঠিন। ঋজু।

লাল মারুতি বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। এই পোশাকে এষাকে আগে দেখিনি। একেবারে বিলিতি মেয়ে। পেছনের আসনে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে কমল। কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে। আমারও কী যেন হয়েছে। আমি আর ভালমন্দ কিছুই ভাবতে পারছি না। এইটুকু ছেলের হার্টের অসুখ হতে পারে না। আলসার? এই বয়েসে আলসার!

একেবারে ফাঁকা রাস্তা। মনে হয় আশিটাশিতে গাড়ি ছুটছে। এষা এত ভাল চালায়! ড্যাশবোর্ডের লাল আলোয় সামনের অন্ধকার ঝিমঝিম করছে। ঠিক হয়েছে মেডিকেলেই নেওয়া হবে। সেখানে আমার বন্ধু সনৎ আছে। পরিচিত আরও একজন আছেন, আদিত্য। প্রয়োজন হলে ধরাকরা করা যাবে।

প্রথমে ভয় পেয়েছিলুম। রাতের রাস্তা। এই দিনকাল। কিছু হয়ে গেলে কী হবে! আমার ভয়টা একটু বেশি। অথচ প্রেমিক। আমার জ্যোতিষদা যেমন বলেন, 'জাতে মাতাল তালে ঠিক।' রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। চোর-ডাকাত নেই। পুলিশও নেই। রাস্তা আর রাত আর দু'পাশের নিঝুম বাড়িঘর। কেবল একটি মাত্র বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে জল ঢালা আর ঝ্যাঁটার শব্দ। কেউ খুনটুন হল না তো! রক্ত ধোয়া হচ্ছে। প্রমাণ লোপাটের জন্যে। যা দিনকাল পড়েছে। আজকাল সবই হয়। কমলের দিদা তো সারাদিন এই একই কথা বলে চলেছেন তোতা পাখির মতো, আজকাল সবই হয়। এগারো বছরের মেয়ে মা হয়। মুয়ে আগুন। হুগলি জেলার চাটুজ্যে পরিবারের মেয়ে। পূর্বপুরুষরা এককালে ডাকাতি করত। সেই পয়সার জমিদার। তেজ খুব। রক্তে তেজের কণা ঘুরছে।

মেডিকেলের গেটের মাথায় মেডিকেল শব্দটাও রাতজাগা ক্যান্সার রুগির মতো জেগে আছে আলোর অক্ষরে। গাড়ি ঢুকে গেল অনায়াসে। এষা পাকা ড্রাইভার। মানুষের মনের মুখে মেয়েদের কথায় মারি ঝাড়ু। আমি এই অবস্থায় একী ভাবছি! ভাবছি এষার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, তা হলে আমাকেও গাড়ি চালানো শিখতে হবে।

সত্যিই কি আমি একটা নির্ভেজাল জানোয়ার।

দূরে এমার্জেন্সির সামনে ছায়া ছায়া কিছু মূর্তি। আসলে বিপদের কবজিতে কোনও ঘড়ি নেই। যখন খুশি আসতে পারে। ছুটির দিনের বন্ধুর মতো। এলেই হল সদলে হইহই করে। এমার্জেন্সিতে ঢোকার মুখে উড়ো উড়ো অনেক কথাই কানে এল। টুটুমকে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছে বুবুন। পুলিশের গুলি খেয়েছে পটকা। নগা একদিন অ্যায়সা ঝাড় খাবে গুরু।

আমার কোলে কমল। সামনে গটগট করে চলেছে এষা। জিনস্ আর কামিজে পাককা ইয়োরোপিয়ান। পেছনে পেছনে যাচ্ছি আর গর্বে ভেতরটা ডগমগ করছে। সামান্য সামান্য ব্যাপার হঠাৎ হঠাৎ মানুষের অহংকার কীরকম ফুলিয়ে দেয়।

ভেতরে তিন পাশে তিনজন আহত যুবক কাতরাচ্ছে। আজকের এই রাতটাকে, আমার এই ফুলশয্যার রাতকে যতটা ঘটনাশূন্য, নিরীহ, নির্দোষ ফুল ফোটার রাত ভেবেছিলুম, ততটা নির্দোষ তো নয়। শয়তানের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। তার অসুখের নাম বিগ আই। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই অসুখ আর ভাল করা গেল না। মন্দিরে মন্দিরে এত বাদ্য বাজনা, আরতি! মসজিদে মসজিদে এত আজান, গির্জায় গির্জায় এত সমবেত প্রার্থনা! সব ব্যর্থ।

হাসপাতালের দেয়ালে দেয়ালেও পোস্টার যুদ্ধ চলেছে। যুবকরা তো মরবেই। প্রবীণ পলিটিশিয়ানরা তা হলে বাঁচবেন কীভাবে। দেখো না, ওদের সন্তানেরা যেন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বেশ চিকেন বিরিয়ানিতে থাকে মা।

কী ভাগ্য। আজ রাত জাগছে সনৎ। আমার চেয়ে বয়সে ছোট। লেখার বাতিক। সেই ভাবেই আলাপ। বন্ধুত্ব। সবে বিয়ে করেছে বেচারা। স্ত্রী স্কুলটিচার। কদিনই বা শুতে পায় বউয়ের পাশে।

বিয়ের পর সাতদিনের জন্যে গোপালপুর গিয়েছিল। যে প্রফেশানে ঢুকেছে, ওই সাতদিনের স্মৃতি মনে থাকলে হয়। আজকাল আবার ডাক্তারদের কথায় কথায় যেরকম পেটানো হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বাপের নামই না ভুলে যায়।

সনৎ এগিয়ে এল। প্রশ্নে প্রকৃত উদ্বেগ, 'কী হল দাদা?'

'ছেলে।'

'কী হয়েছে!'

'ব্লাড ভমিট করছে।'

'সে কী? কী খেয়েছে? পেটে ব্যথা!'

এষা বললে, 'আপনি দেখুন। দুপুর থেকেই বার কয়েক ভমিট করেছে। বেশ পিসফুলি ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ একটু আগে ব্লাড। এখন কমপ্লেন করছে বুকে পেন।'

কথা বলতে বলতে এষা কমলকে বুকে নিয়েছে। কমলের মুখ দেখে মনে হল ওই কোলটাই তার বেশি পছন্দের। সনৎ অবাক হয়ে একবার আমার মুখের দিকে একবার এষার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সনৎ জানে গোপা আর নেই। তবে এ কে? অনেক প্রশ্ন। সব প্রশ্ন চাপা থাক আপাতত। সনৎ বললে, 'চলুন।'

আমরা চলতে শুরু করলুম। একটা আধময়লা বেডে শুইয়ে কমলের পরীক্ষা শুরু হল। মাথার দিকে এষা। পায়ের দিকে আমি। কমল যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে, নিশ্চেষ্ট। কমলের কী হয়েছে আজকাল। তেমন হাসে না, তেমন কাঁদে না। কীরকম যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। জল খেতে গিয়ে ছলকে জল পড়ে গেলে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, আর করব না, আর করব না। কেউ কি ওকে ভয় দেখায়! আমি তো দেখাই না। কে দেখায়? ওর দিদা! স্কুলের দিদিমণি!

নানাভাবে পরীক্ষা করল সনৎ ডাক্তার। ধরতে পারল না। বেশ বিব্রত। শুধু বললে, 'গলায় টনসিল রয়েছে দাদা।'

এষা বললে, 'একটা থরো চেকআপ চাই।'

'তা তো অবশ্যই চাই। যে কোনও ব্লিডিং-এর প্রপার ইনভেস্টিগেশান প্রয়োজন। নেগলেক্ট করা উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'এখন কী করবে? আমরাই বা কী করব?'

'অ্যাডমিশন করাতে চান?'

এষাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী করা উচিত?'

'এখানে ফেলে রেখে কী হবে?' 'মনে হচ্ছে স্পেশ্যালিস্ট দেখাতে হবে। কাল আমরা কোনও এম ডি-র কাছে নিয়ে যাই। কী বলেন আপনি?'

সনৎকে জিজ্ঞেস করল।

সনৎ বললে, 'গুড সাজেশান।'

আমি বললুম, 'আপাতত কোনও ওযুধ! ফিরে গিয়ে আবার যদি হয়।'

'দাদা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বরফজল।'

'বরফজল! এই বলছ টনসিল!'

'টনসিলে কোনও ইরিটেশান দেখলুম না তো। আছে তবে এখনও সেপটিক হয়নি।'

ফিরতি পথে কমল আমার পাশে বসে বসেই এল। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে বুক চেপে আছে।

'কী রে বুড়ো ব্যথা করছে?'

'না বাবা।'

'তা হলে চেপে ধরে আছিস?'

'এমনি। বাবা, তোমার ঘুম হল না।'

সেই অপরাধ বোধ জাগছে। বললুম, 'তাতে কী হয়েছে!'

এষা গ্যারেজে গাড়ি রেখেই চলে এল। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দু'-একটা পাখি ডাকছে। উত্তর খুঁজছে। ভাবছে বিছানা ছাড়বে কি না! বিছানার চাদর আবার পালটে কমলকে বললুম, 'তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো। একদম নড়াচড়া করবে না।'

'আমার কী হয়েছে বাবা?'

'সামান্য একটু শরীর খারাপ।'

'তুমি বাথরুমের সামনে একটা কিছু পেতে দাও বাবা।'

'কেন রে?'

'দুটো চাদর নষ্ট করেছি।'

'তোকে আর পাকামো করতে হবে না। শো।'

কমল খাটে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসল। এষা এসে পাশে বসেছে। রান্নাঘরের সামনে এষার নাইটি ছড়িয়ে পড়ে আছে। সর্বনাশ! কৃতকর্মের জলন্ত সাক্ষ্য। তাড়াতাড়ি তুলে নিলুম। নরম, মোলায়েম। মুঠোয় পুরে ফেলা যায়। এষার শরীরের মিষ্টি সোনালি গন্ধ ভুরভুর করছে। জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললুম। মেঝেটা ভাল করে দেখলুম। কিছু পড়ে আছে কি না! ও-ঘর থেকে এষা আর কমলের গলা ভেসে আসছে।

কমল বলছে, 'আমার অসুখ করেছে শুনে তুমি সেই রাত্তির থেকেই আছ মাসি?'

এষা হাসছে। কী সুন্দর মিছরির দানার মতো হাসি। আমি এষার প্রেমে পড়ে গেছি। ও যদি এখন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, হয় আমি আত্মহত্যা করব, না হয় আমি পাগল হয়ে যাব।

বেশ বড় দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলুম। ভোরের পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোর ঘর ভাসছে। আমার মনে হচ্ছে, খুব ভোরে আমাদের তিনজনের ঘুম ভেঙেছে দূরপাল্লার কোনও ট্রেন ধরার জন্যে। এক মাসের ছুটিতে আমরা বেড়াতে চলেছি বাইরে।

কফিতে চুমুক দিয়ে এষা বললে, 'কমলকে খুব ঠান্ডা এক গেলাস হরলিক্স করে দিই। আছে তো?'

'আছে। আমি করে দিচ্ছি।'

'আপনি পারবেন না। করার একটা কায়দা আছে।'

কমলের পাশে খাটে হেলান দিয়ে এষা আরাম করে বসেছে। পা দুটো সামনে ছড়ানো। পরিষ্কার পাতলা পাতলা দুটো পায়ের পাতা। একটা ওপর আর একটা।

কমলের কথা ভাবব কী? এষার কথা ভাবতে ভাবতেই কাবু হয়ে গেলুম।

'আপনি কি আজ বেরোবেন?'

'আজ আর বেরোব কী করে, কমলকে তো স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আপনি যাবেন তো?'

'নিশ্চয়।'

'আপনার মামা যদি এসে পড়েন।'

'তাতে কী হয়েছে!'

কমলকে হরলিক্স খাইয়ে এষা চলে গেল। এষার চেয়ে জুলি নামটা অনেক ভাল। যে নামে মামা ডাকেন। দুটো বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করিয়ে কমলকে শুইয়ে রেখে গেছে জুলি। আমি এক গাদা গল্পের বই এনে মাথার পাশে রাখলুম।

'বুড়ো তুই শুয়ে শুয়ে পড়। এখন তো আর তেমন কোনও কষ্ট নেই?'

'না বাবা।'

'আমি তা হলে কাজ সারি। কেমন?'

রাতের চাদর দু'খানা কেচে শুকোতে দিচ্ছি। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামল সোমা। হাত ধরে সাবধানে নীলুদাকে নামাল। নেমে এল কালু। হাতে নানা মাপের বাজারের ব্যাগ। সরষের তেলের পাত্র। বাবুরা সদলে বাজারে বেরিয়েছেন। যাবার পথে একবার খবর নিতে এসেছেন। কাল থেকে এদের প্রতি মনটা আমার বেঁকেই ছিল। আরও বেঁকে গেল।

ওপর থেকেই শুনছি, সোমা কালুকে বলছে, 'আরে বোকা মেয়ে ওসব ভেতরেই রাখো না। আমরা তো এখুনি চলে যাব।' ওরা ওপর দিকে তাকায়নি। তাকালেই দেখতে পেত আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

কলিং বেল বাজল।

আমার তেমন কোনও তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

নীলুদা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'কী ব্যাপার, তোমার এই বেশ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললুম, 'ভেতরে আসবেন তো!'

সোমা নীলুদার পেছনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

উত্তরে, আমি কেবল হাসলুম।

কালুই কেবল জিজ্ঞেস করলে, 'মেজদা, বুড়ো কেমন আছে?'

কালুর সেই অদ্ভুত সুন্দর মুখ। ভুরুর কাছটা কুঁচকে আছে, যেন কম আলোয় সূক্ষ্ম একটা কিছু খুঁজছে। এই একটা ভণ্ড আর একটা অহংকারী চালিয়াতের সামনে আমি কমলের কথা বলতে চাই না। আরও অবাক হলুম, কালুর প্রশ্ন শুনে এরা কেউ একবারও বলল না, হ্যাঁ হ্যাঁ কমল কেমন আছে। বরং নীলুদা তাড়াহুড়ো করে বললেন, 'কমলকে আমরা নিয়ে যাব, না একটু বেলায় তুমি যাবার পথে দিয়ে যাবে?'

'কেন?'

'কেন মানে? তুমি তো অফিসে যাবে?'

'না-ও যেতে পারি।'

'বাঃ তা হলে তো ওয়েল অ্যান্ড গুড। দুপুরে তুমিও আমাদের ওখানে খাবে। আজ একটু স্পেশ্যাল আয়োজন হচ্ছে। সোমা এসেছে তো।'

সোমা এমন একটা ভাব করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এত মনোযোগ দিয়ে চারপাশ দেখছে, যেন এই বাড়িটা একটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। কালু কিন্তু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সেই থেকে।

আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, বলা হল না। আমার এষা, আমার জুলি এসে দাঁড়িয়েছে সবার পেছনে। সেই পোশাক। এখনও পালটাবার সুযোগ পায়নি। তাকাতেই বললে, 'ডান।'

এরা ফিরে তাকাল।

আমি হাত নাড়লুম।

জুলি বললে, 'শার্প অ্যাট থ্রি ফিফটিন। সব ঠিক আছে তো!'

'ইয়েস। এভরি থিং অলরাইট।'

জুলি হাত নেড়ে চলে গেল। সোমা অবাক হয়ে গেছে। একেবারে অবাক। এমন একটা স্মার্ট মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ থাকতে পারে, ভাবতেও পারেনি।

নীলুদা ফিসফিস করে বললেন, 'কে শ্রীকান্ত?'

'সামনের বাড়ি।'

'বাঙালি!'

'বাংলা জানে। বাঙালি নয়।'

'তাই মনে হল। অ্যাংলো?'

খুব ঘৃণার ভাবে 'অ্যাংলো' বললেন।
'না অ্যাংলো নয়, স্প্যানিশ।'
আমিই বা ছাড়ি কেন? বাড়িয়েই বললুম।
'স্প্যানিশ!'
নীলুদা রাস্তার দিকে ফিরে তাকালেন।
'থ্রি ফিফটিন। তিনটে পনেরো? তোমরা যাবে কোথাও?'
'হ্যাঁ।'
'সিনেমায়?'
কথা না বলে আমি হাসলুম। যার অনেক মানে হয়।
'তুমি তা হলে আসতে পারছ না দুপুরে?'
'না মনে হয়।'
'কমল!'
'আজ থাক নীলুদা। পরে আর একদিন হবে।'

সোমা চাপা গলায় বললে, 'চলো দাদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার তো আবার চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' দু'জনে গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। কালু আমার পাশে সরে এসে খুব চাপা গলায় বললে, 'ডাক্তারবাবু কী বললেন, আমাকে জানাবেন তো!'

কালু চলে যাচ্ছে। বাড়িতে-কাচা পরিষ্কার সস্তা দামের শাড়ি পরে আছে। আমি হতবাক। সম্পূর্ণ হতবাক। মেয়েটার এত বুদ্ধি। অনুমান করে নেবার এত ক্ষমতা। অসাধারণ আইকিউ। মনে মনে আমি নমস্কার করলুম। সাধারণেই যত অসাধারণ। ছাইগাদায় হিরে।

ওপরে উঠে বুঝলুম, কমল কেন নেমে আসেনি। ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম। মুখে একটা নীলচে আভা। ভেতরে বেশ বড় রকমের কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে। আমার রকমসকম দেখে গোপা টেনে নিতে চাইছে না তো! এসব হিন্দু সংস্কার। মা-মরা ছেলেদের বেশ কিছুকাল সামলে সামলে রাখতে হয়। মাদুলি-টাদুলি পরাতে হয়। মা তখন ছেলের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভাবলেই খারাপ লাগে। আমি আবার এসব মানি না।

আমি কি কিছু পাপ করে ফেললুম। শুনেছি, ছেলে যতদিন না সাবালক হচ্ছে ততদিন পিতার পাপ পুত্রকে স্পর্শ করে। কী করব। আমিও তো মানুষ! আমি কোন দিক সামলাব! নিজেকে মেরে ফেলা কি অত সোজা। একদিকে কাল রাতের অভিজ্ঞতা, আর একদিকে ঈশ্বর, কেউ যদি বলেন, তুমি কোনটা চাও? আমি পাগলের মতো প্রথমটাকে জড়িয়ে ধরব। ওই আমার ঈশ্বর!

॥ সাত ॥

'কী হল, আপনার মামা আজও এলেন না?'

জুলি গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে বললে, 'মামা এক আমেরিকান পাগলির পাল্লায় পড়েছে। মহিলা এসেছেন এ-দেশের প্রাচীন কাঁথা কিনতে। এখন সারা পশ্চিমবাংলা চষে বেড়াতে হবে। কদিন লাগবে কে জানে?'

আমি জুলির পাশে। কমল পেছনে। একা একা অভ্যাস হোক। কী হবে বলা তো যায় না। আমার মনে হচ্ছে একটা কিছু হবে। ওই অহংকারী সোমা আর ততোধিক অহংকারী সোমার মাকে আমি দেখাতে চাই পুরুষের জীবন সহজে ফুরোয় না। জুলি কি আমাকে ফেলে দেবে। মানুষ কী

সাংঘাতিক প্রাণী! আমি এখন মনেপ্রাণে চাইছি জুলি প্রেগন্যান্ট হোক। কেন হবে না! আমার তো সেই ভীষণ ক্ষমতা আছে। গোপা তো প্রথম মিলন-রজনীতেই মা হয়েছিল।

ছেলেকে স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে চলেছি। আমার তো এইসব এখন ভাবা উচিত নয়। আমার এখন সৎ, সাত্ত্বিক চিন্তা করা উচিত। জুলি এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে। সুন্দর একটা শাড়ি পড়েছে। স্লিভলেস ব্লাউজ। সমস্ত চুল একসঙ্গে করে গোড়ার দিকে ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রেখেছে। চোখে বিলিতি গগলস। নাকের ডগা অল্প অল্প ঘেমেছে। কপালে নেমে এসেছে কয়েক গুচ্ছি চুল। এত সুন্দর দেখাচ্ছে। সে ভাগ্যবান যে জুলিকে জীবনে পাবে। প্রকৃত ভাগ্যবান। আমি এই একটা কারণে ভগবৎ বিশ্বাসী হতে পারি। সারা দিনরাত শয়তানের পা টিপতে রাজি আছি। মাঝরাতে যেতে পারি কোনও ডাইনির কাছে।

কমল আপন মনে এতক্ষণ গান গাইছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে উত্তেজিত গলায় বললে, 'বাবা, দেখো দেখো।'

উলটো দিক থেকে সুন্দর একটি শবমিছিল আসছে। কোনও বড় মানুষ মারা গেছেন। কাচের শবাধারে শুধু ফুল আর ফুল। সামনে পেছনে মৌন মিছিল। কমল আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মিছিল দেখছে। আমি কমলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। মৃত্যুর সে কী বোঝে! মৃত্যু বোঝার বয়েস তো তার হয়নি। নীচের ঠোঁট ঝুলে গেছে। চোখ দুটো চকচক করছে উত্তেজনায়। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। বিড়বিড় করে কী বলছে। মিছিল চলে গেল। নীরবে। গম্ভীর একটা বাতাসের মতো। কমলের এই ভাবটা আমার তেমন পছন্দ হল না। মন বড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। ঘটনার আগে মন ছুটছে। পায়ের আগে দেহ ছোটার মতো।

আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখার এই সুবিধে। খুব একটা অপেক্ষা করতে হল না। ডক্টর মুখার্জিকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে। গম্ভীর মানুষ। প্রয়োজনের বেশি একটিও কথা বলেন না। কমলকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মুখ দেখে মনে হল কমলের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন। প্রয়োজনে একটা-দুটো প্রশ্ন করছেন। কমল শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছে।

বহুক্ষণ দেখার পর বিশাল বড় একটা প্রেসক্রিপশান লিখলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আমাদের দিকে। আমি আর জুলি বসে আছি পাশাপাশি। প্রেসক্রিপশানটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে একটা শব্দ করলেন, হুঁ।

এষা বললে, 'এনিথিং সিরিয়াস?'

'মে বি।'

আমি বললুম, 'তার মানে?'

'যা যা টেস্ট করাতে হবে সব লিখে দিয়েছি। সেগুলো আগে করিয়ে আসুন, তারপর বলব কী হয়েছে। ইন দি মিন টাইম দু'-একটা প্যালিয়েটিভ ওষুধ চলুক। ব্ল্যান্ড ডায়াট। অ্যান্ড কমপ্লিট রেস্ট।'

এষা বললে, 'কী সন্দেহ করছেন?'

ডাক্তারবাবু হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'নাথিং। কিচ্ছু না। এইটুকু ছেলের আবার কী হবে।' কমলের মাথায় হাত রাখলেন। চুলগুলো খামচাতে খামচাতে বললেন, 'তোমার নাম বুড়ো। আমার নামও বুড়ো। অথচ আমরা কেউই বুড়ো নই। বাবাদের কাণ্ড দেখেছ? নাম রাখার সময় বয়েস মনে থাকে না। তুমি কী ভালবাসো, বুড়ো?'

'ছবি আঁকতে।'

'বাঃ ভেরি গুড। এরপর যেদিন আসবে, আমার জন্যে তিনটে ভাল ছবি এঁকে আনবে। এই নাও তোমাকে একটা সুন্দর বাঘের ছবি দিলুম।'

টেবিল থেকে ওষুধ কোম্পানির একটা সুন্দর কার্ড তুলে কমলের হাতে দিলেন। পিঠ

চাপড়ালেন। গাল ধরে আদর করলেন। আমরা উঠে পড়লুম। ডাক্তারবাবু এষাকে বললেন, 'রাতের দিকে একবার ফোন করবেন।'

ফেরার পথে কমলের অসুখের প্রসঙ্গ আমরা আর তুললাম না। পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় দোকান থেকে আমরা প্যাস্ট্রি কিনলুম। কমলের জন্যে কয়েকটা জেমস কেনা হল। প্রথম রাতেই আমরা ফিরে এলুম। এষাদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বারান্দায় এক বিদেশিনি বসে আছেন আপনমনে।

হঠাৎ বলে ফেললুম, 'অ্যায় রে!'

এষা বলল, 'কী হয়েছে!'

'মামা এসে গেছেন।'

'সো হোয়াট! আমি একটা নোট রেখে এসেছি। হি ইজ এ নাইস ম্যান।'

নিজের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এষা বললে, 'আমি ঠিক সময়ে ফোন করব। আপনাকে জানিয়ে যাব।' সুর করে ডাকল, 'বুড়ো।'

বুড়ো হাত নাড়ল। বুড়োকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই একদিনেই ওর শরীরটা কীরকম ভেঙে গেল।

ওপরে এসে বুড়ো আর আমি দু'জনেই বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম পাশাপাশি। বুড়োর বুকের বাঁ পাশে আমার হাতটা পড়ে আছে আলগা। ছোট্ট এতটুকু বুক। বড় বেশি ধুকধুক করছে। সন্দেহ হচ্ছে হার্টের অসুখ হল না তো' এইসব হচ্ছে আজকাল, বয়েসটয়েস মানছে না।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, 'বাবা, মানুষ মরে কোথায় যায়, বাবা?'

'খুব শক্ত প্রশ্ন বাবা। এর উত্তর মানুষ জানে না।'

'ভূত হয় কি?'

'যাঃ ভূত আবার কী? ভূত বলে কিছু নেই, সব মনের ভুল।'

'জানো বাবা কাল না মা আমার পাশে, অনেকক্ষণ আমার পাশে এসে বসে ছিল।'

'যাঃ, সে মা হবে কেন? ও বাড়ির মাসি এসে তোর পাশে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছিল।'

'না গো, তোমরা তো তখন ও ঘরে কী করছিলে দুজনে। ভয়ে না আমার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছিল না। আমি কেবল ডাকছি, বাবা বাবা আর মা না একটা আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটে রেখে বলছে চুপ চুপ। মাকে এত ভয় করল কেন বাবা?'

কমলের কথা শুনে ভেতরটা আমার হিম হয়ে গেল। ভূত আমি আর বিশ্বাস করি না এখন। আগে করতুম। গোপা হাসত। মাঝে মাঝে ভয় দেখাত নানারকম। এখন অনেক অনেক সাহসী। কমল কী বলছে? সর্বনাশ! ও তা হলে জেগে ছিল। না আধজাগরণ। কী বোঝাব ওকে? কী উত্তর দোব!

'তুমি বিশ্বাস করছ না বাবা?'

'হ্যাঁ বাবা, তোমার কথা অবিশ্বাস করি কী করে? তুমি যখন দেখেছ, তখন নিশ্চয় তিনি এসেছিলেন।'

'কেন এসেছিলেন বাবা?'

'মায়েরা যে ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।'

প্রসঙ্গটা যেভাবেই হোক পালটাতে হবে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলেই বিপদ।

'এখন তুমি কেমন আছ বুড়ো? শরীর ঠিক আছে তো।'

'হ্যাঁ বাবা! বাবা!'

'বলো?'

'আমরা আর কোনওদিন মামার বাড়ি যাব না?'

'মাঝে মাঝে যাব। ধরো রবিবার রবিবার।'

'আমি তা হলে কার কাছে থাকব? রোজ তুমি আমাকে তোমার অফিসে নিয়ে যাবে?'
'না, না তা কেন? সে একটা ব্যবস্থা হবে।'
'তুমি কালু পিসিকে বলো না। এখানে এসে বেশ থাকবে। বলো না বাবা।'
'তোমার দিদা কেন ছাড়বে বলো?'
'দিদা তো কালু পিসিকে সব সময় ভীষণ বকে। সেদিন কালু পিসি একা-একা ভীষণ কাঁদছিল।'
'তোর দিদা কেন এমন হয়ে গেল রে, বুড়ো?'
'দিদা তো রাতে ঘুমোতে পারে না। ওই যে পুজোর আসন আছে না। ওই আসনে বসে সারারাত দোলে। জানো বাবা, দিদাও কাঁদে। সবাই কাঁদে, আমি কেবল কাঁদি না।'
সিঁড়ির কাছে কলিংবেল সুর করে বেজে উঠল। কে আসতে পারে? আমার তো তেমন কোনও বন্ধু নেই। আমি এত কুচো লেখক, বড় লেখকরা আমাকে পাত্তাই দেন না। তা ছাড়া লেখকদের একটা নাইট লাইফ থাকে। সুন্দরী ভক্ত পাঠিকার দল। ফ্যান আর কী! সিনেমার প্রডিউসার, ডিরেক্টর, সভা সমিতি। গল্প-কবিতা পাঠ। শ্রুতিনাটক। জমজমাট সন্ধ্যা। রোমান্টিক রাত। আসলে জীবনধর্মী লেখার জন্যে এসবের ভীষণ প্রয়োজন। দু'হাতে লিখতে পারলে ভালই রোজগার। সকলেই গাড়ি করেছেন।
আবার বেল।
নীচে নেমে দরজা খুলেই চমকে গেলুম। পর পর তিনজন। কমলের দিদা, সোমা, কালু।
স্বতঃস্ফূর্ত একটা, আসুন আসুন মুখে খেলে গেল। তিনজনে ভেতরে এলেন। দরজায় ছিটকানি লাগালুম।
কমলের দিদা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বললেন, 'তুমি তো আর আসতে বললে না। আমি নিজেই চলে এলুম। কী হবে এত বড় বাড়ি? নীচেটায় কী হচ্ছে?'
'বন্ধ পড়ে আছে। অনেক কাজ বাকি আছে। ওপরটা আগে শেষ করে চলে এসেছি।'
'নীচেটা কবে ধরবে?'
'আবার টাকাপয়সা জোগাড় করি।'
ওপরে এসে কমলের দিদা হাঁপাতে লাগলেন। হালকা একটা চেয়ার এগিয়ে দিলুম।
'আগে একটু বসে নিন।'
প্রবীণা বসলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন চারপাশ।
'বেশ ভালই করেছ বাড়িটা।'
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব স্বাভাবিক, মেয়ের কথা মনে পড়ছে। কালু আর সোমা ঘরে গেছে। কমলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। শুনছি, সোমা জিজ্ঞেস করছে, 'কী সিনেমা দেখলে?'
কমলও সোমাকে তেমন পছন্দ করে না।
কমল বলছে, 'বাবা জানে।'
'কী বই দেখলে যে বলতেই পারছ না!'
'সিনেমায় তো যাইনি।'
'তোমাকে নিয়ে যায়নি বুঝি।'
'হ্যাঁ আমাকেই তো নিয়ে গেল। হলুদ মাসির গাড়িতে চেপে গেলুম।'
'হলুদ মাসি!'
কমলের দিদা ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়লেন। বয়সে চেহারা বেশ থলথলে হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে, বায়স্কোপ?'
'না তো।'
'তবে সোমা যে বললে।'

মহিলা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কী রে তুই যে বললি, শ্রীকান্ত সিনেমা যাবে বলে দুপুরে আসতে পারবে না। না-জেনেশুনে কী যা তা বলিস! এটা আবার সাতসন্ধেতেই বিছানা নিয়েছে কেন? পড়াশোনা নেই।'

ধমক-ধামক দিতে দিতে সোফায় বসলেন।

'অত আদর ভাল নয়। জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

সোমা একটা মৃদু ধমক দিল, 'মা চুপ করো। বুড়োর খুব অসুখ করেছে। এইমাত্র বড় ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে। দু'-তিন বার রক্ত বমি করেছে কাল।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি। তা তোরা তো সকালে সেসব কথা কিছু বললি না। আশ্চর্য!'

'সকালে সুকুদা আমাদেব কিছুই বলেননি।'

'তোরা জিজ্ঞেস করেছিলিস?'

'না।'

'তবে ও কি তোমাদের গলা জড়িয়ে ধরে সেধে সেধে বলবে। তোমরা কাল দেখলে ছেলেটা শরীর খারাপ নিয়ে বাড়ি গেল। প্রথমেই তোমাদের উচিত ছিল জিজ্ঞেস করা। মা এই হল সেকাল আর তোমাদের কালে তফাত। তোমাদেব কেবল স্বার্থ, তোমাদের কেবল অভিমান, কথায় কথায় ফোঁস, আর সারাদিন রাত এক বুলি ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না। প্রভু, দয়াময়! অনেক হল। এবার তুলে নাও প্রভু। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরি।'

ঘরে একটা স্তব্ধতা নেমে এল কিছুক্ষণ।

সোমা বলল, 'কাকে দেখালেন?'

'বড় একজন স্পেশালিস্ট, এম ডি।'

'কী বললেন?'

'প্রচুর টেস্ট করাতে বললেন। যতরকম আছে।'

'কবে করাবেন! সব করাতে তো বেশ সময় নেবে।'

'তা নেবে।'

'আমি একটু চা চাপাই। বিকেলবেলা চা খাওয়া হয়নি। মাথা ধরে গেছে।'

'আমাকে সব দেখিয়ে দিন, করে আনছি।' কালু উঠে এল।

রান্নাঘরে আমার সব গোছানোই আছে। কালু আজ একটা ডুরে শাড়ি পরেছে। মনে হয় সোমা দিয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে।

রান্নাঘর দেখে, কালু বললে, 'বাবাঃ মেয়েছেলেকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন মেজদা।'

'ব্যাটাছেলেরা একটু গোছানেই হয়। বউ-মরা স্বামীরা ওরই মধ্যে একটু বেশি হয়।'

এইসব আবোলতাবোল বকতে বকতে আমি চায়ের কৌটো, চিনির কৌটো দুধের টিন বের করছি। কালু হঠাৎ দরজার পাশ থেকে নিচু হয়ে কী একটা তুলে নিল।

'মেজদা এটা কী গো?'

হালকা গোলাপি রঙের পাতলা ফিনফিনে জাঙিয়ার মতো কী একটা জিনিস।

'কই দেখি?'

সর্বনাশ! এ তো প্যান্টি। আধুনিকাদের একান্ত অন্তর্বাস। কাল কত স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে গেছে জুলি! ধরা দেওয়াটাকে এইভাবেই ধরা পড়িয়ে দিতে হয়।

'দাও। এটা মনে হয় কমলের পরার কিছু।'

'মেজদা!'

কালুর মুখে সেই দুষ্টু হাসি। চোখ দুটো জ্বলছে। আমি হেসে ফেলেছি।

'ভাগ্যিস দেখে ফেললুম। এখুনি তো ওরা এই ঘর দেখতে আসবে।'

‘কালু।’

দু’হাত দিয়ে কালুকে জড়িয়ে ধরে, আমি তার কাঁধে মাথা রাখলুম।

‘কালু, আমি ফেঁসে গেছি।’

‘এ কী হচ্ছে মেজদা। কেউ দেখে ফেললে, আমরা দু’জনেই মরব।’

‘আমি তোমাকে ভালবাসি কালু। ভীষণ, ভীষণ।’

‘মেজদা ছাড়ুন।’

কনুইয়ের ঝটকা মেরে আমাকে সরিয়ে দিল। মাথার চুল ঘেঁটে গেছে। ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে শরীরে। যে ব্যাগে নাইটিটা ভরে রেখেছিলুম সেই ব্যাগেই প্যান্টিটা চালান করে দিলুম। খোপে ঢোকাতে ঢোকাতে মনে পড়ে গেল সেই গল্প ‘স্কেলিটান ইন এ কাবার্ড’।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনতে পেলুম, সোমার গলা, ‘কই দেখি রান্নাঘরটা কেমন হল?’

পায়ের শব্দ। সোমা আসছে এদিকে।

ওদিকে সোমার মা উঁচু গলায় বলছেন, ‘বাঃ, বেশ মজা, একে একে সবাই পালাল। কী রে বাবা! চা করতে কজন লাগে?’

সোমা বললে, ‘মা কী বলতে এসেছেন, শুনুন গিয়ে, আমরা চা নিয়ে আসছি।’

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলুম দু’জনে। গোপন কথা আছে অনেক। সামনের বাড়িতে আলোর ফোয়ারা ছুটছে। উৎসব-রজনী যেন।

সোমার মা ফিসফিস করে বললেন, ‘তুমি কিছু শুনেছ?’

‘কী বলুন তো! কী শোনার কথা বলছেন?’

‘নীলুর কাণ্ড।’

‘নীলুর কী কাণ্ড?’

‘আরে নীলু তো এই বুড়ো বয়সে এক কেলেঙ্কারি করে বসে আছে।’

‘কীরকম?’

‘চোখে ভাল দেখে না। ব্লাডপ্রেশার। হাই সুগার।’

‘যারা লেখাপড়া নিয়ে থাকে তাদের অমন হয়। একটু সাবধানে থাকতে হবে। এই আর কী।’

‘সে আমি জানি। ও কথা আমি বলছি না।’

‘তা হলে?’

‘মা হয়ে আমি কী করে বলি।’

‘তা হলে। তা হলে কী হবে?’

‘বলেই ফেলি। নীলু তো আর একজনকে মা করে বসে আছে।’

‘তা করুক না। তাতে আসল মা কি আর ভেসে যাবে। অমন পাতানো মা একজন কেন একশোজন থাকুক না।’

‘তোমার মাথায় কী আছে বাবা! গোপার কথাই ঠিক। গোপা বলত না, তোমার জামাইয়ের বয়েসটাই বেড়েছে। মনটা একেবারে শিশুর মতো। জগতের ব্যাপার কিছুই বোঝে না। নীলু বাবা হচ্ছে।’

‘অ্যাঁ, সে আবার কী! নীলুদার তো বিয়েই হয়নি।’

‘আরে বলছি কী তোমাকে। কে এক নুলো না ফুলো, কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করে, তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। সেই ভাব গড়াতে গড়াতে এমন বোকা ছেলে, এখন ফাঁদে পড়ে গেছে।’

‘ও ভালবাসা। আহা ওর চেয়ে পবিত্র পৃথিবীতে আর কী আছে। ভালবাসা ঈশ্বরের দান।’

‘তোমার মাথা।’

'তা নীলুদা এবার বিয়ে করে ফেলুন।'

'বাঃ! আগে ছেলে তারপর বিয়ে। এ তোমার কোন দেশি নিয়ম। আমরা তো শুনে এসেছি আগে বিয়ে পরে ছেলে।'

'যে কালের যা নিয়ম। ওতে কিছু যায় আসে না।'

'অ্যাঁ বলো কী! এক পেট ছেলে নিয়ে মেয়ে বসবে বিয়ের পিঁড়িতে। ধর্মটর্ম সব লোপাট হয়ে গেল দেশ থেকে?'

'বিলেতে বিয়ে উঠে গেছে মা। একসঙ্গে থাকে। ছেলেপুলে হয়। ছাড়াছাড়ি হয়। আবার কারু সঙ্গে থাকে। আবার ছেলেপুলে হয়। আবার ছাড়াছাড়ি। আবার থাকাথাকি।'

'থামো।'

বৃদ্ধা এক ধমক লাগালেন।

'এটা বিলেত নয়। মেয়েটা ব্রাহ্মণ নয়।'

'কিন্তু শিক্ষিতা। বড় চাকরে।'

'তাইতেই সাতখুন মাপ!'

'এখন এটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী সমাধান আছে?'

বৃদ্ধা থামলেন। মুখে বয়সের বলিরেখা। দুঃখী দুঃখী চোখ। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবেই। বাবা, নীলুদার তো বেশ ক্ষমতা আছে। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালেন।

সোমা আর কালু চা নিয়ে এল। সাবুর পাঁপড় ভেজেছে। ভালই করেছে। পেট একদম খালি।

বৃদ্ধা বললেন, 'চা ছাড়া আমি কিছু খাব না। তোমরা দু'জনে ওদিকে যাও। আমরা কথা বলছি।'

সোমা একটু ঝাঁঝের গলায় বললে, 'তোমরা যত খুশি কথা বলো না। কে তোমাদের কথা শুনছে! আমরা এখন ছাদে যাচ্ছি।'

'যা তাই যা। আমাদের একটু একা থাকতে দে।'

'তাই থাকো।'

সোমা আর কালু চলে গেল। আমি বললুম, 'কেন বিচলিত হচ্ছেন। নিন পাঁপড় খান।'

বৃদ্ধা একটা পাঁপড় তুলে মুখে দিলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, 'তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা।'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুমি।'

'বলুন, আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'এক নম্বর কাজ হল, একজন ভাল খদ্দের দেখে, তুমি আমাদের ওই বাড়িটা বেচে দাও।'

'বাড়ি বেচে দেবেন? অমন সুন্দর বাড়িটা? থাকবেন কোথায়?'

'সে ভাবনা তোমার নয়। তোমাকে যা বলছি তা পারবে কি না? হ্যাঁ কি না? ও বাড়িতে আমি পাপ ঢুকতে দেব না। কোনও দিন না। আমি মরে যাবার পরেও না। বাড়ি আমার নামে। কারু কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।'

'বেশ। এবার দ্বিতীয় কাজ?'

'দ্বিতীয় কাজ, তোমার হাতে আমি সোমাকে দিয়ে যেতে চাই।'

'আমার হাতে!'

'হ্যাঁ তোমার হাতে। তোমার তো আবার মাথা মোটা। ভেঙে না বললে বুঝতে পারো না। তোমার হাতে নাড়ুর মতো তুলে দেওয়া নয়। তুমি সোমাকে বিয়ে করবে হিন্দুমতে এই অঘ্রানে।'

'সত্যিই আপনার মাথাটা কেমন হয়ে গেছে।'

'মাথাটা কেমন হয়ে গেছে, তাই না? না তোমার মাথাটা খেয়ে বসে আছে?'

'আমার মাথা আবার কে খাবে?'

'আমি সব খবর পাই শ্রীকান্ত। তোমাকে এক আধুনিকা পেতনিতে ধরেছে।'

'ভুল শুনেছেন।'

'সোমারা সকালে দেখে গেছে।'

'যাকে দেখেছে, তার আমি নখের যুগ্যি নই। এমনকী সোমারও নই। তা ছাড়া সোমা বিয়ে করবে না। আর এখন যদি মত হয়েও থাকে দোজপক্ষে করবে কেন? দেশে ভাল ছেলের অভাব আছে?'

'দেখো চালাকি কোরো না। আমার বয়েস হয়েছে। নীলুর জন্যে আমি যখন পাত্রী দেখেছিলুম, তখন আমাকে বলেছিল, মা, আমি সন্ন্যাসীর আদর্শে জীবন কাটাব। হিমালয় আমার শেষ আশ্রয়। সেই নীলু এখন কোন হিমালয়ের কোলে বাবা! ওসব ভণ্ডামি আমি অনেক দেখেছি।'

'আমি আর বিয়ে করব না। আমি গোপার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকব। জোর করে তো কিছু হয় না।'

'দেখো কাল আমি এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি ফাঁকা একটা মাঠ দিয়ে কমল হেঁটে যাচ্ছে। সারা গায়ে ধুলো। ছেঁড়া প্যান্ট ঝুলঝুল ঝুলছে। মাঠের পাশে দোতলা একটা বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। পাশে এলো চুল একটা মেয়ে। তুমি বলছ, খেটে খা, খেটে খা, ভিক্ষেটিক্ষে হবে না। আর মেয়েটা তোমার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে খিলখিল হাসছে।'

'কমলকে আপনি ভালবাসেন?'

'কেন? এ প্রশ্ন কেন? তোমার কি মনে হয় কমলকে আমি ভালবাসি না?'

'ভালই যদি বাসেন, তা হলে কমল কাল যখন অসুস্থ হল, তখন একজন ডাক্তার ডাকলেন না কেন? দু'পা দূরেই তো চেম্বার এবং বাড়ি।'

'কে জানবে বাবা, যে তোমার ছেলে রাতে রক্তবমি করবে। আমরা ভাবলুম, বাচ্চা ছেলে সারাদিন টুকটাক খাচ্ছে, বদহজম হয়েছে। তা হ্যাগো, ডাক্তার কী বললে বলো তো।'

'এখনও কিছুই বলেননি। একগাদা পরীক্ষা হবে, তারপর বোঝা যাবে কী হয়েছে।'

'বুঝলে শ্রীকান্ত, ওই গোপার স্মৃতি নিয়ে কবিতা লিখলে ছেলেটা মার খাবে। ওর মুখ চেয়ে তোমার বিয়ে করা উচিত। তোমার হয়তো আর বউ দরকার নেই, কিন্তু ওর জন্যে একজন মা চাই।'

'আপনার কি মনে হয় সোমা কমলকে দেখবে?'

'কেন দেখবে না বাবা! ওর শরীরেও তো গোপারই রক্ত।'

'ওর মেজাজ দেখেছেন? গোপার ঠিক বিপরীত।'

'গোপা তো ওর মতো শিক্ষিতা ছিল না।'

'শিক্ষিতা হলেই অহংকারী, দুর্বিনীত হতে হবে! সোমা কোনও দিনই ভাল মা হতে পারবে না।'

'তুমি নারী চরিত্রের কিছুই বোঝো না বাবা। ঠিক বয়সে বিয়ে না হলে মেয়েরা একটু তিরিক্ষি মতো হয়ে যায়। কী ছেলে কী মেয়ে, শরীরের একটা ধর্ম আছে তো বাবা?'

আমার মাথায় মাঝে মাঝে ভূত চাপে। কী বলতে কী বলে ফেলি। দুম করে বলে বসলুম, 'কমলের মা হতে পারে এমন একজনই আছে।'

'কে। কে সে? সকালে ওরা যাকে দেখে গেছে?'

'না। সে হল কালু।'

বৃদ্ধার চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভুরু কোঁচকাল। হাতের মুঠো দৃঢ় হল। ঠোঁট বেঁকে গেল।

'ছি ছি ছি, তোমার এই রুচি? তুমি শিক্ষিত ছেলে। লেখোটেখো। তুমি ওই অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে ঘর করবে! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ওর কে বাপ, কে মা, ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কিছুই জানা নেই, মেলা থেকে কুড়িয়ে আনা, তাকে তুমি বিয়ে করবে?'

'আপত্তি কীসের? ও তো মানুষ।'

'আমি বেঁচে থাকতে হবে না।'

'ওর ওপর আপনার এত অধিকার! আপনি আটকাতে পারবেন?'

'আটকাতে না পারি, মরতে তো পারি।'

'নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ!'

'ধরো তাই। আমি তোমাকে বিপথে যেতে দোব না।'

'এটা বিপথ? আর পথ হল আপনার মেয়েকে বিয়ে করা?'

বৃদ্ধা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুমি সোমাকে বিয়ে কোরো না। তোমাকে করতে হবে না। তাই বলে কালুর সঙ্গে নয়।'

'আপনার এতে কী স্বার্থ?'

'স্বার্থ? তুমি এত বড় কথা আমাকে বলতে পারলে শ্রীকান্ত। আমিও তো তোমার মা।'

'যদ্দিন গোপা ছিল। এখন আর সে সম্পর্ক নেই। আপনাদের মন এত নোংরা, ওই সোমা আপনাকে সকালে গিয়ে লাগিয়েছে, আর আপনি সন্ধেবেলাই ছুটে এসেছেন দেখতে, আমাকে কোন পেতনি ধরেছে। এর আগে আমার ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে, আপনি অথবা নীলুদা একদিনও আসেননি। এমনকী গোপার যখন সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি তখন আপনি সোমাকে নিয়ে মীরার বঁধুয়া দেখতে গেছেন। তবু মেয়ের মাথার কাছে বসে আপনারা কেউ রাত জাগেননি। আপনি ধার্মিক, কেমন? অথচ মানুষকে মানুষ ভাবতে শেখেননি। কে ব্রাহ্মণ, কে কায়স্থ, কে শূদ্র, কে অজ্ঞাতকুলশীল, এইসব বিচার।'

রণরঙ্গিণী মূর্তিতে সোমা এল।

'মা উঠে এসো। তখনই তোমাকে বারণ করেছিলুম, এসো না। শোনোনি, জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা। উঠে এসো।'

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সোমার মা কাঁদছেন। ঠিক হয়েছে। প্রয়োজন ছিল। ঠাকুরঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালা জপ করলেই উদার হওয়া যায় না। যে সাধনায় মানুষের মনের সংকীর্ণতা ঘোচে না, সে সাধনা এক ধরনের বিলাসিতা, কর্তব্যবিমুখতা।

সোমা হঠাৎ বললে, 'আপনি ছোটলোক, চরিত্রহীন।'

আমার রাগ হল না। বরং মজা লাগল। এইভাবে গালে টুসকি মেরে দেখতে হয়, রঙ আছে না অ্যানিমিক। এইভাবে খোঁচা মেরে চিনতে হয় মানুষের স্বরূপ।

শান্ত গলায় বললুম, 'সোমা, সবাই তো আর ভদ্রলোক হয় না, কিন্তু চরিত্রহীন বুঝলে কীভাবে?'

'সেইদিন থেকে আপনি আমাকে দেখতে পারেন না।'

'কোনদিন সোমা?'

'দিদির বিয়ের পর আমরা তিনজন নেপাল গিয়েছিলুম, সেখানে আপনি আমাকে বলেছিলেন, যদ্দিন না বিয়ে হয় তদ্দিন শালিরা জামাইবাবুর সম্পত্তি। আপনি আমার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। আপনার সেই গায়েপড়া ছোটলোকমির কথা মনে পড়লে আমার সারা শরীর রিরি করে।'

'তোমার মা যে আমাকে বলছেন, এই অঘ্রানেই তোমাকে বিয়ে করতে।'

'মায়ের ভীমরতি হয়েছে। আপনাকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। দেশে ভাল ছেলের অভাব আছে? মা চলো। এই শেষ। আপনি ও বাড়িতে না গেলেই সুখী হব। কালু চলো।'

'দাঁড়াও।'

বেশ লাগছে আমার। জীবনে নাটক না থাকলে ভাল লাগে?

'দাঁড়াও। তোমরা যাবে যাও। কালু যাবে না।'

সোমা বললে, 'কেন?'

'কেন? কালুকে তোমরা কালই দূর করে দেবে। তোমাদের আমি চিনি। নীলুদা ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ মহিলার সঙ্গে জীবন জড়িয়েছেন, তোমার মায়ের সহ্য হল না। তিনি ছুটে এসেছেন ছেলেকে জব্দ করার পথ খুঁজতে। তোমরা সব পারো।'

'আপনি পাগল হতে পারেন। কালু পাগলি নয়।'

আমার মাথায় ভূত চেপেছে। সোমার ওই শরীরী শরীর, বেনারসের আবহাওয়ায় পুষ্ট কামুক মুখ, অসহ্য লাগছে। মেয়েদের আমি যতটুকু নাড়াচাড়া করেছি, সেই সামান্য জ্ঞান থেকে বলতে পারি, সোমা চরিত্র হারিয়েছে। পুরুষ-সঙ্গ একাধিক বার হয়েছে। এবং জন্মনিরোধক পিল নিয়মিত ব্যবহার করে। তা না হলে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে এত মেদ জমতে পারে না। ওর শরীর থেকে যে তরঙ্গ বেরোচ্ছে তাতে যে-কোনও মানুষেরই মনে জৈব ইচ্ছা জাগবে।

আমি কালুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী, তুমি সব জেনেশুনেও যাবে?'

কালুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। শুধু ভুরুর কাছে কপাল কুঁচকে আছে। ত্রিবলির মতো। এই একটা লক্ষণেই বোঝা যায় কালু কত সরল, কত নিষ্পাপ, কত অসহায়!

কালু বললে, 'মেজদা, কী হচ্ছে এসব!'

'মেজদা-টেজদা নয়। আমি যা ঠিক করি তা করি। তুমি থাকবে না তুমি যাবে?'

কালু হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি বড় অসহায় মেজদা। আমার কেউ কোথাও নেই। কেন আমাকে নিয়ে এইসব করছেন?'

'থামো। তুমি সুস্থ, সুন্দর একটা সংসার চাও, না সারা জীবন ঝিগিরি করতে চাও?'

হুহু কান্নায় অবরুদ্ধ গলা। কালু বললে, 'মেজদা, আমি জানি না। সত্যি আমি জানি না। আপনারা যা বলবেন।'

'আপনারা নয়। আমি যা বলব। আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম।'

সোমা তার মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে, 'উন্মাদ।'

কমল ডাকলে, 'দিদা?'

বৃদ্ধা বললেন, 'বাবা।'

সোমা জোর গলায় বললে, 'আবার দাঁড়াচ্ছ? চলে এসো।'

কমলের কথা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম। আপাদমস্তক চাদর চাপা দিয়ে সে বিছানায় পড়ে ছিল। ওর সামনেই সব ঘটে গেল। কুৎসিত সব ব্যাপার। ঘটুক। বালককে তো একদিন যুবক হতেই হবে। সংসারের নরম আঁচে ধিকিধিকি ঝলসাবে জীবন। এখন থেকেই অল্প অল্প করে পড়ুক। কী করব আমি? কেমন করে একা আমার চেষ্টায় শিশুর আদর্শ একটা জগৎ তৈরি করব। আজ পর্যন্ত কেউ কি পেরেছে!

সোমা আবার ফিরে এসেছে। ঘরে আর ঢুকল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'কালু তুমি যাবে? এখনও ভেবে দেখো ভাল করে। এরপর গেলে কিন্তু আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। তোমাকে মা এনেছিলেন। ছোট থেকে বড় করেছিলেন। আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে। তোমারও ভাবার আছে। কী যাবে?'

কালু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মতো। সোমা জোরালো গলায় বললে, 'কী যাবে তুমি!'

সোমার মা সিঁড়ির বাঁক থেকে বললেন, 'ছেড়ে দে সোমা। ও আসবে না। পেটের ছেলেই অকৃতজ্ঞ, ও তো পরের মেয়ে। এত বড় লোভ সহজে ছাড়তে পারে! মেথরানি থেকে রাজরানি।'

সোমা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'মা তুমি চুপ করো। সারা সন্ধে অনেক বকেছ।'

কালুকে আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কী, যাবে? এখনও ভেবে দেখো।'

কালু কলের পুতুলের মতো ধরা ধরা গলায় বললে, 'হ্যাঁ, দিদি যাব।'

এক পা, এক পা করে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললে, 'মেজদা, আমি যাই।'

বলছে আর কাঁদছে। দরজার কাছে গিয়ে আমার দিকে তাকাল। দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে, 'মেজদা আমি যাই।' নাটকের সব চরিত্র বেরিয়ে গেল। মঞ্চ শূন্য। দাঁড়িয়ে আছি আমি একা। অনেক অনেক আগে যৌবনে শোনা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গানের কলি, বর্ষার সন্ধ্যায়, মধুপুরের বাগানবাড়িতে গ্রামোফোন বাজছিল, আবছা ভেসে এল মনে, সবাই চলে গেছে, শুধু একটি মাধবী তুমি এখনও তো ঠিকই ফুটে আছ। ঘরের মাঝখানে আমি ঠিকই ফুটে আছি।

জীবনে এত জোরে, যাত্রার দলের নায়কের মতো কখনও হাসিনি। হা হা হাসি। হাহাকারের মতো। এই নাও আমাকে নাও। বিলিয়ে দিচ্ছি আমাকে। নিঃশেষে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। কেউ নেবে না। নেবার মানুষ নেই। এই কৃপণের পৃথিবীতে দাতার সংখ্যা কম নয়, কিন্তু গ্রহীতা কোথায়?

আমার হাহা হাসি শুনে বুড়ো উঠে বসেছে।

'বাবা, তুমি অমন করে হাসছ কেন বাবা, ডাকাতের মতো?'

'কী সব হয়ে গেল দেখলি না? কত মজা?'

'তোমরা ঝগড়া করলে বাবা?'

'হ্যাঁ রে, হয়ে গেল এক হাত। বুড়ো, এবার কী হবে?'

'কী হবে বাবা, তোমার ভয় করছে কি?'

'না রে ভয় নয়, আর যে মামার বাড়ি যেতে পারবি না।'

'কেন ঝগড়া করলে বাবা? কাল সকালে ভাব করে নিয়ো।'

'আর কোনও— কোনও দিনও ভাব হবে না।'

'জানো বাবা, স্কুলে আমরা ঝগড়া করি তো, আবার ভাব হয়ে যায়।'

'সে ছোটদের হয় বাবা। বড়দের হয় না। বড়রা খুব বাজে হয়। একেবারে যাচ্ছেতাই, থার্ডক্লাস।'

'তা হলে তুমি আমাকে বড় করছ কেন?'

'সকলকেই যে বড় হতে হবে বাবা। বড় না হয়ে যে উপায় নেই।'

'তুমি আরও বড় হবে বাবা?'

'আমি এবার বুড়ো হব।'

'তুমি এখন রাঁধবে?'

'খুব খিদে পেয়েছে, না রে বুড়ো!'

'একটু একটু।'

'আজ রাতে কী খাবি বল?'

'তুমি যা করবে।'

'তোর পেট কেমন?'

'ভাল গো।'

'শরীর?'

'ভাল। কেবল মাথাটা টিপ টিপ করছে।'

'দাঁড়া, পাখাটা আর এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিই। তুই আরাম করে শুয়ে থাক। আমি সাংঘাতিক একটা কিছু রাঁধি। বুড়ো রে, রোজ রোজ আর রাঁধতে পারি না। কী কষ্ট যে ওই রান্নার কাজ!'

ওরা চলে যাবার পর উত্তেজনায় নীচের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম। এষা উঠে এসেছে। বেশ ঘরোয়া সাজ।

'কী ব্যাপার, নীচের দরজা হাট-খোলা। আপনি কি রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে বাস করছেন? এত বিশ্বাস?'

'ওই যে কমলের মামার বাড়ির সব এসেছিল। গেছে আর খেয়াল নেই।'
'শুনুন, ডাক্তারবাবুকে এইমাত্র ফোন করেছিলুম।'
'কী বললেন?'
'বললেন দুটো সন্দেহ। এক, দেখতে হবে, ব্লাড ক্যান্সার কিনা?'
'ব্লাড ক্যান্সার?'
'আঃ, আস্তে। কমল যেন শুনতে না পায়।'
'ও ঘরে শুয়ে আছে। মনে হয় ঘুমিয়েও পড়েছে।'
'দ্বিতীয় সন্দেহ, মাথায় কোনও সময় আঘাত লেগেছিল কি না?'
'মাথায় চোট? কী জানি?'
'মাথাটা নাকি ওর ভার হয়ে থাকে। টিপ টিপ করে। গা গুলোয়।'
'কে বলেছে?'
'কমল নাকি ডাক্তারবাবুকে বলেছে।'
'তা হলে?'
'বলছেন একটা অ্যানজিওগ্রাম করাতে।'
'সে আবার কী? স্পেশালিস্টরা তিলকে তাল করেন।'
'ডাক্তারবাবু ভেবেছেন আমি কমলের মা।'
'তারপর?'
'সর্বক্ষণ, আপনার ছেলে, আপনার ছেলে করে কথা বললেন।'
'তারপর?'
'তারপর, তারপর? খুব মজা না?'
'কমলের মা হবেন?'
'কমলের মা? হলে হয়। নট এ ব্যাড প্রোপোজাল।'
'তারপর?'
'আবার তারপর? কী রান্না হবে?'
'ভাবছি। কমলের খুব খিদে পেয়েছে।'
'হালকা কিছু করে দিন। রাঁধতে জানেন?'
'মোটামুটি।'
'আজ আর আমি সাহায্য করতে পারছি না। বাড়িতে মহামান্য বিদেশি অতিথি। খুব খাতির করতে হবে। মামার ব্যাবসার ভাগ্য খুলে যাবে, দেবী যদি প্রসন্ন হন। কাল তাড়াতাড়িতে আমি আমার পোশাক ফেলে গেছি। দিন, নিয়ে যাই।'
'থাক না, আমার কাছে থাক মেমেন্টো হয়ে।'
'পোশাক আর নারী দুটোই যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন শুধু পোশাকের সঙ্গে প্রেম কেন? আচ্ছা এখন থাক। আপনি রাঁধুন।'
'আমি কিন্তু আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'
'অনেক আগেই।'
'কীরকম?'
'আপনি আমার চেয়ে ভালই জানেন। আপনার চোখ সুযোগ পেলেই আমাকে অনুসরণ করত। ছাদে, বারান্দায়।'
'আপনি আমাকে ভালবাসেন?'
'বড় প্রাচীন প্রশ্ন। আপনার কি মনে হয় না, আমরা এক রাতেই অনেকটা এগিয়ে গেছি? না এসব

কথা এখন থাক। আমরা একটু বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। আগে কমল। কমলের শরীর। তারপর প্রেম, দেহ, সুখ এইসব। আমি কিন্তু আপনার চেয়ে কমলকে বেশি ভালবাসি।'

'কেন?'

'এর কোনও উত্তর হয় না।'

'থাক, উত্তর চাই না আমি।'

এষা চলে গেল।

ফটিকচন্দ্র দাশ, এইবার মনে হয় সেই বেস্টসেলার উপন্যাসটা শুরু করে দিতে পারি। ধর্ম নেই। সেক্সের ছড়াছড়ি। পারভার্শান। রেপ নেই। রাজনীতির মশলা দিলেই হল। মনোবিশ্লেষণ তো ছত্রে ছত্রে। এসে গেছে হাতের মুঠোয়। এইবার ফেঁদে ফেললেই হয়। তিন-তিনজন মহিলা আর যৌবন যায়-যায় এইরকম একজন পুরুষ। একজনকে সে ঘৃণা করে। অথচ ইচ্ছে করলে এখুনি তাকে জীবনসঙ্গিনী করা যায়। ঘৃণার দৈহিকমিলন তো রেপ। ফটিকচন্দ্র রেপও তা হলে আছে। আর একজনকে সে তো এই মুহূর্তেই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। করুণামিশ্রিত ভালবাসা। দেখলেই মায়া হয়। মন হুহু করে ওঠে। যার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা যায়। ক্রীতদাসী করে রাখা যায়। একেবারে হাতের মুঠোয় ধরা স্পঞ্জের মতো। চাপ দিলেই ছোট। চাপের ওপর নির্ভর করবে যার বড় হওয়া ছোট হওয়া। দাসী মনে করলে দাসী, স্ত্রী মনে করলে স্ত্রী। কোনওদিন নিজের অধিকার খাটাবার সাহস পাবে না। ছোবল মারতে আসবে না। আর একজন আধুনিকা, অতি আধুনিকা, সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। যে-কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। যে খেলতে জানে, খেলাতে জানে। জীবনে যাকে ধরে রাখতে হলে সার্কাসের বাঘের খেলোয়াড়ের কায়দা জানতে হবে। খুব জমেছে ফটিকদা। এখন ঠিকমতো নামাতে পারলে হয়।

কিন্তু জীবন যে জীবন! জীবন তো উপন্যাস নয়। কল্পকাহিনি নয়।

কমলের একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চাকরিটাই না ছাড়তে হয়।

সকালে চা খেতে খেতে এই কথাই মনে হল। আজ যদি অফিস বেরোতে হয় কমলকে কারু ঘাড়ে চাপাতে হবেই। ওর মামার বাড়ির দিকে আমি মরে গেলেও যাচ্ছি না। পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। মেঘ করেছে ও-আকাশে। আর কে আছে, যার কাছে কমলকে রাখতে পারি?

মন, ভোলা মন, সত্যি কথা বলব তোমাকে, কালকের ওই বড়িয়া নাটকের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কালুকে কায়দা করে আটকে ফেলা। বিয়েটিয়ে পরের ব্যাপার। উত্তেজনা রাত ভোরেই থিতিয়ে যেত। তখন কেবল দিন পার করার খেলা। আজ নয় কাল। কাল নয় পরশু। কালুর হাতে কমলকে ফেলে দিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াও। কতকাল ভালভাবে জমিয়ে আড্ডা মারা হয়নি। কত জায়গায় যাবার আছে! এখানে ওখানে। দিনতিনেক কমলকে কালুর হেপাজতে রেখে এষাকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো। একবারই তো জন্মেছি। জীবনটাকে ভোগ করতে হবে না! এই ওরা সব বলে মাল না খেলে তেমন জোরালো লেখা বেরোতে চায় না। কালু থাকলে সন্ধেবেলা মাঝে মধ্যে সেশানে বসা যেত। মাঝ রাতে তেমন উতলা হলে কাছে টেনে নাও। কালুর মতো বিশ্বাসী, স্নেহপরায়ণা মহিলা মাসে হাজার টাকা দিলেও মিলবে না। ত্রিভুবনে কেউ নেই। দুটো মিষ্টি কথা, একটু স্নেহ, সব কাজ উদ্ধার।

মন, আমি শয়তান। সত্যি কথা বলব? নেপালে সোমাকে আমি কুপ্রস্তাবই দিয়েছিলুম। এমনভাবে দিয়েছিলুম, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। সহজ একটা জাগতিক খেলা, সবাই করে। সোমার বয়েস তখন কম। ছিপছিপে শরীর। হাতের মুঠোয় ধরা যায় এইরকম কোমর। গোপাকে আমি সাংঘাতিক ভালবাসতুম। তবু সোমাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখব। কুশিক্ষা, কুসঙ্গের ফল।

আধুনিক জীবন মানুষকে যেমন শেখায় আর কী? ভোগের বাড়াবাড়ি করে দুর্ভোগকে টেনে আনো, এই তো আমাদের সভ্যতা।

এষার ওপর আমি বিশেষ ভরসা রাখি না। বড়লোক। দিশিবিদেশি রক্ত শরীরে। শিক্ষায়, সামাজিক মর্যাদায় আমার চেয়ে বহু ধাপ উঁচুতে। মনে হয় দেহবাদী। সহজ নৈতিকতায় বিশ্বাসী। এমন মেয়ে আমাদের মতো ডাঁটা-পোস্ত-কালচারের মিনমিনে মানুষের বউ হলে, কে চোখে চোখে আগলে রাখবে? সাহসী ভ্রমরের অভাব আছে? শেষে এই হয়তো দেখতে হবে, আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

আজ আমার প্রথম কাজ তা হলে কী?

ভুলেই গিয়েছিলাম, অনেক কাজ, কমলের রক্ত, বিভিন্ন দেহ-নির্যাস একে একে পরীক্ষা করাতে হবে। এক্স-রে। একদিনে হবে না। ডাক্তারবাবু যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দিয়েছেন, সেইখান থেকেই করাতে হবে! তার মানে সারা শহরের এ-প্রান্তে, ও-প্রান্তে ছোটাছুটি।

এই ছোটাছুটি আমাকে খুব কাবু করে ফেলে। আমি হাসতে পারি, হাসাতে পারি, ফুর্তি করতে পারি, মানুষের সুখের দিনের সঙ্গী হতে পারি, সেবাটেবা আমার তেমন ধাতে আসে না। মৃতদেহের অনুগামী হয়ে শ্মশানে যাওয়া, কি হাসপাতালে অসুস্থ কারু পাশে গিয়ে বসা, কারু জন্যে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ধরে আনা, আমি পারি না। বিরক্তি লাগে। মনে হয়, পরিচিতজনেরা কেন মরে, কেন মানুষ অসুস্থ হয়, কেন বিপদে পড়ে!

আমি জানি, কমলের কিছু হয়নি। তবু সব পরীক্ষা করাতে হবে। এইটুকু ছেলের ক্যান্সার হয়? মাথায় আঘাত লাগলে আমি জানতে পারব না? দু'-এক দিন দেখি, তারপর সব টেস্ট করানো যাবে। আজ বরং একটা ক্রেশের সন্ধানে বেরোই, কিংবা বিশ্বাসী একজন কাজের লোক। ক্রেশ হয়তো পাওয়া যাবে। কাজের লোক অসম্ভব।

ভাবছি, এষাকে বলব, কমলকে কিছুক্ষণ দেখবেন, আমি দু'-একটা জরুরি কাজ সেরে আসব। এমন সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামল। উঁকি মেরে দেখলুম, সোমা নামছে।

দরজা খুলতেই প্রায় ধমকের সুরে বললে, 'ভেতরে চলুন। কথা আছে।'

একেবারে এলোমেলো চেহারা, বিভ্রান্ত চেহারা। চুল উড়ছে। চোখ বসে গেছে।

সিঁড়ির প্রথমধাপে পা রেখে সোমা ঘুরে দাঁড়াল, 'জানেন আপনি কী করেছেন? আপনি খুন করেছেন।'

'আমি? তোমার মায়ের মতো স্বপ্ন দেখলে নাকি, কাল রাতে?'

'জানেন আপনি, কালু পুড়ে মরেছে। আত্মহত্যা করেছে কাল রাতে। আপনি ব্রুট। আপনি জানোয়ার, চরিত্রহীন, লম্পট।'

সোমা এক নিশ্বাসে বলে গেল। আমি সব ধোঁয়া দেখছি। সব ঘুরছে। টলছে। ভাঙছে, চুরছে।

সোমা হঠাৎ সিঁড়ির প্রথমধাপ থেকে টলে আমার বুকে পড়ল। বুকে মুখ গুঁজে, দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে, আর বলছে, 'এ আপনি কী করলেন? সুকুদা, এ আপনি কী করলেন!'

সত্যি এ আমি কী করলুম! গোপার আর একবার মৃত্যু হল। এবার আরও বীভৎস। আরও করুণ।

সোমা মুখ তুলল। এই প্রথম। সোমার মুখ আমার মুখের এত কাছে। এই প্রথম লক্ষ করলুম সোমার জোড়া ভুরু। এই প্রথম লক্ষ করলুম, সোমার চুল ঘন কালো। ছোট্ট কপাল। টিকলো নাক। চোখ দুটো গভীর সুন্দর।

'কে দায়ী সুকুদা? আপনি না আমি?'

ঠিক এই সময় আমার কী করা উচিত ছিল, আর আমি কী করলুম। দু'হাত দিয়ে খোঁপা সমেত সোমার মাথার পেছন দিকটা ধরলুম, আর খুব গভীরভাবে সোমার ঠোঁটে চুমু খেলুম। আমি জানি

না, আমার কী হবে। কী হতে চলেছে। এ ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু এল না। একটু আগে মনে হচ্ছিল, পৃথিবী জনশূন্য হয়ে গেছে। আমি একা, সম্পূর্ণ একা কোথাও যেন দাঁড়িয়ে আছি। শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, প্রাণী নেই, ঈশ্বর নেই। সব ঝাপসা।

সোমার শরীর শিথিল হয়ে আসছে। সারা শরীরের ভার আমার দেহে। সোমার মুখ আরও উঁচু হয়েছে। মনে হয় এই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে, কাল রাতে অসাধারণ ভাল, পবিত্র একটা মেয়ে বিশুদ্ধ আগুনে পুড়ে মরেছে।

আমার ভিজে ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে তুলে নিলুম। চোখে চোখ রেখে বললুম, 'আমরা দু'জনেই সমান দায়ী।'

সোমার মুখ টকটকে লাল। চোখের জল উত্তাপে বাষ্প হয়ে গেছে। সোমা সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে পড়ল। আমিও বসলুম পাশে।

কমল ওপর থেকে ডাকছে, 'বাবা! কে এসেছে বাবা?'

'তোমার মাসি।'

'তোমরা আসবে না ওপরে?'

'যাচ্ছি রে।'

'যাচ্ছি রে,' বলার সময় আমার গলা আবার ধরে এল। মনে হল, উত্তরটা আমি কমলকে দিলুম না, দিলুম তাঁদের, যাঁরা আমাকে ছেড়ে একে একে সব বিদায় নিয়ে চলেছেন।

'তোমরা যাও। আমিও আসছি পিছু পিছু। আমার খেলা শেষ হতে আর সামান্য কিছু সময় বাকি আছে।'

সোমার দুটো হাত আমার কাঁধে। সেই হাতের ওপর তার কপাল রেখে মাথা হেঁট করে রেখেছে। নিশ্বাসের মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে নাকে। কোনও কোনও মেয়ের নিশ্বাসে মধুর মতো একটা গন্ধ থাকে। সোমার তাই আছে। এলো খোঁপা ঘাড়ের কাছে দুলছে। ফিনফিনে চুলের কুচি ঘাসের মতন কাঁপছে বাতাসে। পেছন থেকে আলো পড়ে চিকচিক করছে। সোমার এখন মধ্য যৌবন। ফল পাকলে যেমন ত্বকে একটা পূর্ণতার আভা ফুটে ওঠে, যেন মনে হয় শিশির মাখা ভেলভেট, সোমারও ঠিক তাই হয়েছে। পাকা ধানের রূপ ফুটেছে। টান টান মুখের চামড়া। ভরাট গালে একটি মাত্র সর্বনাশা ব্রণ। অনুচ্চারে অনেক কথাই বলতে চায়। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে সোমা। হালকা হলুদ শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। আমার বুকের কাছে ঝুলছে সাদা ধবধবে একটা হাত। সরু অনামিকায় নীল পাথরের আংটি। আমার বুকের একটা চুল দু'আঙুলে ধরে টানতে টানতে বললে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কী করেছ তুমি?'

'আপনি আমাকে উপেক্ষা করলে আমার ভীষণ রাগ হয়।'

আমার ডান হাত দিয়ে সোমাকে জড়িয়ে ধরলুম। মনে হল পূর্ণতার আয়তন মাপতে চাইছি। আর সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, কালুকে আমি ভালবাসতুম না। ওকে দেখলে মনটা আমার কেমন করে উঠত। ভালবাসায় নয়, করুণায়। অথবা এমনও হতে পারে আমি কাউকেই ভালবাসি না। যে সাইকেল চালাতে জানে, সে সাইকেল পেলেই উঠে বসবে আর প্যাড্‌ল করবে। আমারও তাই। মহিলা দেখলেই বা কাছে এলেই আমি ঘনিষ্ঠ হতে চাই। শুধুই ঘনিষ্ঠ। এ ছাড়া আর যেন কিছুই করার নেই। অচেতন অভ্যাস।

সোমা নিচু গলায় বললে, 'পুলিশ দাদাকে নিয়ে ভীষণ টানাহ্যাঁচড়া করছে। যা হয় একটা কিছু করুন প্লিজ।'

'চলো। দেখি কী করা যায়। তোমাদের বাড়িতে যেতে আমার ভয় করছে ভীষণ। তোমার মা আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠবেন।'

'ভয় নেই, আমি আপনাকে বাঁচিয়ে দোব।'

কমল ওপর থেকে চিৎকার করে বললে, 'বাবা, তোমরা আসবে না?'

উঠে পড়লুম। যে পাশে সোমা বসেছিল, শরীরের সেই পাশটা ভিজেভিজে।

॥ আট ॥

মরার জন্যেই পৃথিবীতে আসা। তা ছাড়া আবার কী। কাল সন্ধেবেলা কালু গা ধোবার পর যে শাড়িটা তারে মেলে দিয়েছিল, সেই শাড়িটা এখনও ঝুলছে। সেই নীল ডুরে শাড়ি। কালুর সেই সরল, সাধিকার মতো মুখ, সেই ভুরু কোঁচকানো অনাবিল হাসি, সেই 'মেজদা' বলে ডেকেই থমকে যাওয়া। একে একে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কেন খেলতে গিয়েছিলুম।! একটা পালক যুক্ত হল আমার টুপিতে। নাগা হেডহান্টারদের কথা মনে পড়ছে। এক একটা মুণ্ড মানে বীরত্বের ধাপ বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠা।

সারা বাড়ি অশুভ শোকের ছায়ায় থমথম করছে। কেমন যেন একটা মৃত্যু মৃত্যু গন্ধ বেরোচ্ছে। ফিসফিস করে সোমাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কালু কোথায় গিয়ে লাগিয়েছিল?'

'বাথরুমে। সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

'কখন?'

'মনে হয় মাঝরাতে। আর কী আশ্চর্য, ওই সময় গোটা তিনেক কুকুর রাস্তায় একসঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি দোতলার শেষ ঘরে শুয়ে ছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। একটা পোড়া পোড়া বিদঘুটে গন্ধ নাকে এসে লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। দরজা খুলে বারান্দায় এলুম। নিশুতি রাত। চারপাশ থমথম করছে। মনে হল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে। অশুভ কিছু। পাশেই দাদার ঘর। দাদার দরজায় ধাক্কা মারলুম। ভীষণ ঘুম। সাড়াশব্দ নেই। মা আছেন নীচে। সাহস করে নেমে গেলুম। নেমে, মায়ের ঘরের দিকে এগোচ্ছি আর ঠিক সেই সময়, কালু জ্বলতে জ্বলতে ছিটকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে উঠনে পড়ল। সুকুদা সে দৃশ্য আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছি। প্রথমে আমি ভাবতেই পারিনি উঠনে যে নেচে বেড়াচ্ছে, সে কালু। পড়পড় শব্দে চুল পুড়ছে, চামড়া থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সুকুদা ভাবতে পারেন, আমার কী ভীষণ প্রাণের মায়া, পাছে কালু আমাকে জড়িয়ে ধরে, এই ভয়ে ছুটে আবার ওপরে পালালুম। এদিকে চিৎকার শুনে মা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। শুনছি মা কেবল বলছেন, কে তুমি? কে তুমি? সোমা? কালু? গোটা একটা শতরঞ্চি চাপা দিয়ে মা মনে হয় আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন। সুকুদা কাল রাতে আমি বুঝেছি, ভীষণ স্বার্থপর আমি। বাইরে বাইরে থেকে থেকে আমি নিজেরটি ছাড়া আর কিছুই বুঝি না।'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমরা সবাই কোনও না কোনও নীচতার শিকার। এখন আর আত্মসমালোচনার কোনও মানে হয় না। এও আমাদের এক ধরনের ভণ্ড বিলাসিতা। সোমা, মা কোথায়?'

'শুয়ে আছেন।'

বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। ভেবেছিলুম খুবই হয়তো ভেঙে পড়েছেন। দেখে সেরকম কিছু মনে হল না। আমাদের দু'জনের দিকে একবার তাকালেন। মুখ দেখে ভয় হল। মনে হল, আগুন এখনও জ্বলছে।

'এই যে শ্রীকান্ত! বেড়াতে এসেছ?'

'আজ্ঞে না।'

'বিয়ে করতে এসেছ?'

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম অবাক হয়ে। কী বলছেন কী? উত্তর দেবার আগেই বৃদ্ধা বললেন, 'এ বাড়িতে আর পাপ ঢুকিয়ো না। একসময় ধর্মের বাড়ি ছিল এটা। কত্তা ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করতেন না। সেই বাড়িতে ওপরের মহাপুরুষটি এমন একজনকে আনতে চাইছেন, যিনি বিয়ের আগেই মা হয়ে বসে আছেন, আর তুমি অনেক দিন ধরেই ঘুরঘুর করছিলে সরল একটা নিষ্পাপ মেয়েকে নষ্ট করার তালে। ছেলেটাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিলে শিখণ্ডী করে। আর না, আর না। খুব হয়েছে। তোমরা যে যার পথ দেখো। পাপ সব বিদেয় হও। নামযজ্ঞ করে বসতে দাও আমাকে।'

বৃদ্ধা হঠাৎ দু'হাতে বারান্দার থাম জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'কালু, এ তুই কী করলি। কল্যাণী এ তুই কী করলি? তোকে যে আমি নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করলুম রে।'

সোমা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। ফুলে ফুলে কাঁদছেন।

পাশেই সেই ঘর, যে ঘরে কালু থাকত। চোদ্দো বছর কাটিয়ে গেল এই ঘরে। এসেছিল বারো বছর বয়সে। দীর্ঘ চোদ্দো বছরের বসবাসের স্মৃতি কি সহজে মোছা যাবে! এক দেয়ালে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি। দু'হাত তুলে নেচে নেচে চলেছেন পুরীর মন্দিরের দিকে। ও-দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আর এক দেয়ালে মা দুর্গা। ঘরের কোণে কুঁজো। মুখে ঝকঝকে গেলাস চাপা। ঘরের তাকে বেশ বড় মাপের পাথরের একটা নুড়ি। তলায় ভাঁজ করা লাল কাপড়। ফুল দিয়ে পুজো করেছিল। শুকিয়ে গেছে। তোরঙ্গের ওপর পাট করা খান দুই শাড়ি। নতুন একটা ব্লাউজ। হাতা মুড়ছিল। শেষ হয়নি কাজ। ছুঁচ সুতো দিয়ে জড়ানো রয়েছে। খানচারেক বই। গোটা দুই খাতা। একটা খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে, কমলবাবু আর দুষ্টুমি করে না।

আবার লিখেছে, তুমি আমাকে মারছ মারো, বিকেলে কে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। হঠাৎ যদি মারা যাই। আবার লিখেছে, মেজদা, তুমি কাল এলে না কেন? কত কষ্ট করে তোমার জন্যে মোচার চপ বানালুম।

আবার লিখেছে, আমার মা ছিল, হারিয়ে গেছে। আমার বাবাকে আমি চিনি না। সবাই বলে আমি হারিয়ে গেছি। আমি হারাব কেন? আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

এলোমেলো কত কী লিখেছে, সারা খাতা জুড়ে। এক জায়গায় অনেকটা লিখেছে—

আবার যদি কোনওদিন আমার গ্রামে ফিরে যাই, তা হলে প্রথমেই যাব বকুলতলার সেই বৈষ্ণবীর কাছে। যার কাছে আসার সময় আমার পুসিকে রেখে এসেছিলুম। ওর তখন বাচ্চা হবার কথা ছিল। ক'টা বাচ্চা হয়েছিল কে জানে? তারপর যাব চাঁপাতলার শ্যামলের কাছে। শ্যামলকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

নিজের চেষ্টায় কালু কেমন বাংলা শিখেছিল! নীলুদা অবশ্য সময় পেলেই পড়াতেন। একপাশে একটা লুডো খেলার ছক। ঘুটির কৌটো। ছকের মলাটে কমলের হাতের লেখা, 'কমল ও কালু পিসি। লুডো খেলি দিবানিশি।'

তিন চার জনের গলা শোনা গেল উঠনে। একটা গলা নীলুদার।

নীলুদা বসে পড়েছেন রকে। মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। কে যেন এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে মুখে। এলোমেলো চুল। পুরু লেনসের আড়ালে বড় বড় ঘোলাটে দুটো চোখ। নীলুদার দু'পাশে ছাড়া ছাড়া বসে আছে এ-পাড়ারই দুই যুবক। সব পাড়াতেই পরোপকারী কিছু তরুণ থাকে, যারা আমাদের মতো আধ বুড়োদের অপকর্ম সামাল দেয়।

নীলুদা বললেন, 'সুকু, তুমি এসে গেছ! কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল বলো তো! ভাবা যায় না।'

সোমা আর সোমার মা ঘরে ঢুকে গেছে। এই মৃত্যুতে দুঃখের চেয়ে লজ্জা বেশি। প্রতিবেশীদের

নানা প্রশ্ন। নানা গুজব ছড়াবে। একটি যুবতী পুড়ে মরেছে, এর চেয়ে মুখরোচক আলোচনা আর কী থাকতে পারে! আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রটে যাবে মেয়েটির গর্ভে অবাঞ্ছিত সন্তান এসেছিল, অথবা প্রতি রাত্রে ধর্ষিতা হত। গুজবের লম্বা জিভ।

নীলুদার উলটো দিকের রকে আমি বসে পড়েছি।

প্রশ্ন করলুম 'কী অবস্থা!'

'পোস্টমর্টেম না করে ছাড়বে না, সুকু। আর কীই বা ছাড়বে! পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। বুঝলে সুকু, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বড় ভাল মেয়ে ছিল। বড় ভাল মেয়ে। দেবীর মতো। কী যে হল? ইস কী যে হল! আর তো ফিরিয়ে আনা যাবে না। লস্ট ফর এভার। কালু চলে গেল! এইভাবে চলে গেল!'

নীলুদা আবেগ চাপবার জন্যে মাথা নিচু করলেন।

একটি ছেলে বললে, 'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনাদের আর যেতেও হবে না।'

অপর ছেলেটি বললে, 'বউফউ হলে ঝামেলা ছিল। বাপের বাড়ির কেউ এসে উলটো-পালটা কথা বলে কেস জন্ডিস করে দিত। এর তো কেউ ছিল না। বড়জোর দু'-পাঁচশো টাকা লাগবে।'

নীলুদা বললেন, 'আরে ওটা কোনও প্রবলেমই নয়। যখনই চাইবে তখনই দিয়ে দেব।'

ওদের কথাবার্তা শুনছি, আর ভাবছি, আমি এক খুনি। কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল। শিক্ষিতা আধুনিকারা জীবনকে তেমন জড়িয়ে ধরে না। একেবারে পাঁকাল মাছ। চারপাশে নমুনা দেখছি তো। কেউ আর বিয়ের কথা তেমন করে ভাবে না। রাত, রেস্তোরাঁ, কোনও খালি ফ্ল্যাট, দু'-চার পেগ তরল, দু'-চার টুকরো চিকেন, একটু নেশা, একটু দেহ, ভোর, ভুলে যাওয়া, জীবিকা, আবার রাত, আবার অন্য কেউ, আবার কোনও খালি ঘর, একটা বোতল, গোটা দুই গেলাস, কাবাবের টুকরো, বিছানা, ভোর। এইভাবেই, যদ্দিন যৌবন আছে। কেউ আর শাঁখা, সিঁদুর, টোপর, সানাইয়ের কথা তেমন করে ভাবে না। হলেও ভেঙে যায়। জীবনে আজীবন একই পুরুষ, একই নারী, বড় সেকেলে ব্যাপার। সেকেলে কালুর একেলে প্রস্তাব সহ্য হল না। লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছে শুনলে অনেকে হার্টফেল করে।

নীলুদা বললেন, 'আমি তা হলে চানটান করে একটু শুয়ে পড়ি ভাই। শরীর আর বইছে না। আজ মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই।'

নীলুদা ওপরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। ছেলে দুটি উঠে পড়ল। একটাই ভাল, রকবাজ নয়। স্যার স্যার করছে। তার মানে ছাত্র।

আমিও উঠে পড়লুম। কমলটাকে একা ফেলে এসেছি।

সোমা বললে, 'আমি আসব আপনার সঙ্গে?'

'তুমি বরং যা পারো রান্নাবান্না করো। ঠাকুরকেও তো ভোগ দিতে হবে!'

সোমা ফিসফিস করে বললে, 'আমার পিরিয়াড চলেছে, ঠাকুরের কাজ হবে না। যাই দুটো ভাতে ভাত বসাই মা আর দাদার জন্যে।'

'আর তোমার কী হবে! উপোস!'

'দেখি কী হয়!'

দোতলার বারান্দা থেকে নীলুদা বললেন, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে সুকু।'

'পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন। সব মিটে যাক।'

'আরে এ তো উটকো ঝামেলা। বুঝলে সুকু, সংসারটাকে বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করো। সব মায়া। বিলকুল মায়া।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে হল, বিলকুল মায়া, একমাত্র রমণীর রমণীয় শরীর ছাড়া। ওটা উটকো

ঝামেলা নয়, বেদান্ত নয়, মায়া নয়। দু'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে যিনি হাপরের মতো হাঁপান। দৃষ্টি এত কম হাতড়ে হাতড়ে পথ চলেন, অথচ নারী শরীরের উচ্চতা, নিম্নতা দেখতে পান, দেখতে পান গভীরতা। সেই গভীরতার তল খোঁজারও সাহস রাখেন। হায় রে! বৈদান্তিক। সমস্ত মানুষ যৌনতার আগুনে কালুর মতো ধুধু পুড়ছে না ঠিকই। জ্বলছে ধিকি ধিকি। এতদিনে ব্যাখ্যা খুঁজে পেলুম, কেন নীলাদ্রিশেখরের বই আর কাগজপত্রের গাদার তলা থেকে পেন্ট হাউস আর প্লেবয় খুঁজে পেয়েছিলুম! কেন নীলাদ্রিশেখর দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে নীচে নেমে যেতেন, আর যত প্রয়োজন পড়ে যেত কলতলায়। কালু হয়তো কাপড়চোপড় নিয়ে বসেছে, কি চায়ের কাপডিশ ডিটার্জেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করছে। সেইসময় নীলাদ্রিশেখরের প্রয়োজন পড়ে গেল কলম পরিষ্কার করার, আংটি সাবান জলে চোবাবার, ছোবড়া দিয়ে চটি ঘষার। কালু সেই সময় স্নানের পোশাকে। শরীরে গামছা জড়ানো। চুল চুড়ো করে বাঁধা। নীলাদ্রিশেখরের মুখোশ হল জ্ঞান। অনর্গল বেদবেদান্তের উপদেশ, পুরাণের গল্প বলে যাচ্ছেন। এমন একটা ভাব, যেন নারী-পুরুষের পার্থক্য বোঝেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্পের সেই সন্ন্যাসী। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। যুবতী ভিক্ষে দিচ্ছে। পাশে বৃদ্ধা মা। সন্ন্যাসী অবাক হয়ে বললে, মা, মেয়ের বুকে অত বড় দুটো ফোড়া। বৃদ্ধা অজ্ঞতায় হাসলেন। বললেন, ফোড়া নয় ঠাকুর, ও দুটো স্তন। ওর সন্তান এসে দুধ খাবে, ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন। সন্ন্যাসী এই শুনে ভিক্ষা ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। জীবের জন্যে সব ব্যবস্থাই তিনি যখন করে রেখেছেন, তখন আর কেন বৃথা ভিখমাগা।

নীলাদ্রিশেখর হলে কী করতেন, বলতেন, দেখি মা একটু ভাল করে দেখাও তো, তোমার সন্তানের জন্যে ঈশ্বর কেমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন! দুধ কীভাবে বেরোবে! টিপলে না চুষলে! সন্ন্যাসী আর জ্ঞানীতে এই তফাত! সাপোর্ট কথামৃতেই আছে— সবকিছু বাজিয়ে নিবি।

কালুকে মায়ামুক্ত করার এই সময়টাই নীলাদ্রিশেখরের বড় উপযুক্ত মনে হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত বেশবাস। সামান্য একটি বস্ত্রখণ্ড। গায়ে খাটো গামছা। মাথায় তেল। চুল চুড়ো। আর বৈদান্তিক নীলাদ্রি ঠিক পেছনে। যেন তীর্থদর্শন হচ্ছে। চোখ যা যা দেখতে চায়, সামনে দুলছে, প্রকাশিত অপ্রকাশিত হচ্ছে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকছে। আংটির খাঁজে খাঁজে সাবান মাখানো টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে নীলাদ্রি শোনাচ্ছেন অনিত্য এই সংসারের কথা। কালু হাসছে। কালু কাজ করছে। কালু উঠছে বসছে। পেছনের কাপড় কলতলার জলে ভিজে গিয়ে শরীরের বিশেস স্থানে জুড়ে গিয়ে গোলাপি। নীলাদ্রির হাতে সোনার আংটি বুরুশের ঘষায় তিল তিল খইছে। কালু খুব একটা বিব্রত নয়। জানে বড়দার দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ।

আমার এখন সন্দেহ, নীলাদ্রিশেখর অতি শয়তান। সারা বাড়িতে বই ছড়িয়ে রেখেছেন, এমনকী কালুর ঘরেও। দিবা দ্বিপ্রহরে মা যখন বিশ্রামে, নিস্তব্ধ বাড়ি, মাদুর বিছিয়ে কালুও শুয়ে পড়েছে, সেই সময় নীলাদ্রিশেখরের সেই বইটিরই প্রয়োজন পড়ত, যেটি আছে কালুর ঘরে। আর এমন ঘাপটি মেরে আছে যা সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'তুমি শোও, তুমি শোও, তুমি শুয়ে থাকো,' বলতে বলতে নীলাদ্রিশেখর সারা ঘরে ঘুরবেন, একবার এ-বই টানবেন, একবার ও-বই টানবেন। কৌশলটা ভালই বের করেছিলেন। কালুকে এঁরা যতটা সহজ, সরল, বোকাবোকা, গ্রাম্য ভাবতেন, ঠিক ততটা বোকা ছিল না কালু। অসম্ভব আত্মসম্মান ছিল। প্রখর বুদ্ধি ধরত। কালুর মুখেই এইসব শোনা। কিছু নিজের চোখে দেখা। কালুর একবার জ্বর হয়েছিল। নীলাদ্রিশেখর জ্বর না দেখে ছাড়বেন না। কালুর বগলে থার্মোমিটার গুঁজবেন। কী আবদার। কালু বলত আর হাসত। সে কী কাণ্ড মেজদা। একে জ্বর। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। আর বড়দার সেবার ধুম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখার বায়না। মনে হচ্ছে টাইফায়েড। জ্বর লিখে না রাখলে চিকিৎসা হবে কী করে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে গলায়। গলা থেকে বুক। এত জোরে নিশ্বাস পড়ছে কেন? শেষে কোমর আর পা টিপতে বসে গেলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কোমর আর পা ছিঁড়ে যায় কালু। কেউ টিপে

দিলে বড় আরাম। না না লজ্জা কীসের? অসুখে আবার লজ্জা কী! রাতে দরজা বন্ধ কোরো না। কখন কী দরকার হয়।'

আজ ভদ্রলোককে দেখে ঘৃণায় আমার গা রিরি করে উঠল। বহু আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল। দশ-বিশটা বাচ্চা হয়ে গেলে তাপ কিছুটা জুড়োত।

সদরে বিশাল তালা ঝুলছে। সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে এষা আর কমলের হাসি ভেসে এল। দু'জনে পাশাপাশি বেশ আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এষা বললে, 'ঝট করে চান সেরে চলে আসুন। আজ এখানে পিকনিক।'

'আপনার অতিথিরা?'

'তাঁরা আবার অন্যের অতিথি হতে গেছেন।'

ওপরের বারান্দায় এসে একঝলক দাঁড়ালুম। কমলকে নিয়ে যাবার সময় এষা ঘরদোর মোটামুটি গোছগাছ করে রেখে গেছে। ফুলদানিতে ফুলও রেখেছে। টানটান বিছানার চাদর। নিখুঁত দুটি বালিশ পাশাপাশি। এমন করে রেখে গেছে, যেন মায়ফেল শুরু হয়ে যাবে এখুনি।

ও-বাড়ির বারান্দায় মুখোমুখি দুটো ক্যাম্প চেয়ার। রং বেরঙের ছোটদের বই, কাগজ, কাঁচি, পেনসিল, আঠা, ক্রেয়ন, সব চারপাশে ছড়িয়ে কমল মহানন্দে রাজপুত্রের মতো বসে আছে। এষা হাতেনাতে কিছু একটা করতে শেখাচ্ছে। কাটা হচ্ছে, জোড়া হচ্ছে, রং ঘষা হচ্ছে, খিলখিল হাসি হচ্ছে। এ কমল, সে কমল নয়। এষা সেই চাপা বিষণ্ণতা আর ভয়ের সুড়ঙ্গ থেকে শিশু কমলকে বের করে এনেছে।

কমল আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা।'

'বেশ মজায় আছ অ্যাঁ!'

'এই দেখো।'

চৌকো একটা বোর্ডে লাল, নীল, সবুজ কাগজের টুকরো জুড়ে জুড়ে বড় সুন্দর একটা ছবি তৈরি হয়েছে। সূর্য উঠছে গাছের পাশ দিয়ে। মজার মজার গোটা দুই বাড়ি।

'বাঃ বেশ হচ্ছে। আঁকো। আমি কাজ সেরে যাচ্ছি।'

করিডর সোজা চলে গেছে বাথরুমে, ডানপাশে রান্নাঘর, স্টোর, ডাইনিং স্পেস। একটা কাবার্ডের তলায় একটুকরো সাদা মতো কী একটা পড়ে আছে। বাঁ পাশের স্যাশ দিয়ে সূর্যের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে। জায়গাটা যেন আলোয় আলোকময় হয়ে আছে।

টুকরোটা একটা শাঁখের আংটির ভাঙা অংশ। একটু নিচু হতেই বাকি আধখানা পেয়ে গেলুম। এই আংটিটা ছিল কালুর আঙুলে। কীভাবে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে পড়ে আছে। সেদিন ঝটাপটির সময় ভেঙেছে। মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়লুম। সাঁ সাঁ নির্জন বাড়ি। নতুন দেয়ালে সকালের টাটকা রোদ। দু'টুকরো হয়ে যাওয়া শাঁখের আংটি। বন্ধ জানালার কাচে ফোঁ ফোঁ করছে বড় একটা মাছি। এই কাবার্ডের ভেতর প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা আছে একটা নাইটি আর প্যান্টি।

চুপ করে বসে আছি। মনটা একেবারে শ্যাওলা-ধরা দেয়ালের মতো হয়ে আছে। জিভে কোনও স্বাদ নেই। মনে হচ্ছে একগাদা চুন দেওয়া একটা পান খেয়ে ফেলেছি। যা হয়ে যায় তা হয়ে যায়। শ্রীকান্ত আর এষা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে, সোমবার রাত একটা।

মঙ্গলবার রাত ন'টা, কালুর পিঠে মুখ ঘষছে শ্রীকান্ত।

বুধবার বেলা এগারোটা, সিঁড়ির প্রথমধাপে শ্রীকান্ত সোমাকে চুমু খাচ্ছে।

বেলা একটা, শ্রীকান্ত হাতপা ছড়িয়ে বসে আছে, হাতে দুখণ্ড শাঁখের আংটি।

এর নাম জীবন। এর নাম কর্মযোগ! মধ্যবয়সি একটা সক্ষম মানুষের কদর্য ন্যাকামি আর আঁতলামি আর নাটুকেপনা। প্রেম হচ্ছে প্রেম। ফটিকচন্দ্র দাশের ফরমায়েশে বেস্টসেলার উপন্যাসের মশলা জোগাড় হচ্ছে।

কী খেয়াল হল, কাবার্ডের পাল্লা খুললুম। বড় সাধ এই নির্জনে, লোকচক্ষুর আড়ালে একবার দেখব, দুধ-সাদা, নরম, সংক্ষিপ্ত পরিধেয়, যা প্রাচুর্যের লাবণ্যমাখা শরীর ছুঁয়ে থাকে।

সর্বনাশ, জিনিস দুটো বাইরে রেখে কে ব্যাগটা নিয়ে গেছে। কার কাজ! নিশ্চয় কমল। ও বাড়িতে বই, খাতাপত্তর, আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে যাবার জন্যে খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে, খুলেছে, পেয়েছে, নিয়ে গেছে। ইস কী লজ্জা!

নাঃ, কীসের লজ্জা! এসব বোঝার বয়েস হয়েছে কি? অ্যাডোলেসেনস আসুক। তখন শাড়ির আঁচলের অন্য মানে। কমলের এই চোখই তখন অন্য চোখ। এই হাতই তখন অন্য হাত। এই মনই তখন অন্য মন। মানুষ কীরকম ধীরে ধীরে মরে। হোল ওয়ার্লড তখন রিভলভ করছে একটি মাত্র অ্যাকসিসে— ওম্যান। ইটারন্যাল হাঙ্গার। নো স্যাটাইটি।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নিজের জীবনের একটা ঘটনাপঞ্জী তৈরি করে সামনে ঝুলিয়ে রাখি।

জন্ম, ১৯৫০, ডিসেম্বর মাস।

১৯৬০, কমলের বয়েস। বেশি খেলা, একটু একটু পড়া। এই কিল চড় কানমলা। এই আদর।

১৯৬৫, অ্যাডোলেসেন্স। গলার স্বর পালটে গেল। গালে ব্রণ। ভীষণ খিদে। হরেক দুষ্টুমি। এই চোখে অন্য চোখ। বোনেদের ফ্রকপরা বুকের দিকে তাকাতে পারি না। ভয় করে। মা কিন্তু মা। মাসিকে ভয় পাই। মায়ের চেয়ে সবকিছু অন্যরকম। মাথার ওপর দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক করা। কলঘর থেকে শুধুমাত্র ভিজে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে আসা। দেখব না, তবু দেখার ইচ্ছা। স্কুলের বন্ধু রণেনের কাছে যন্ত্রণা-মুক্তির দীক্ষা। বাড়িতে যে কাজ করে তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগা।

১৯৭০, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। চাকরি। বিবাহ।

তারপর? দশটা, পাঁচটা, দশটা, পাঁচটা, বিছানা, বাজার, আদর অভিমান।

১৯৭৫, কমল। ট্যাঁ-ভ্যাঁ। একবার একে আদর, একবার ওকে আদর।

১৯৮০, শূন্য।

মহাপুরুষের এই জীবনপঞ্জী। এসেছে, খেয়েছে, বেড়েছে, ভেগেছে। স্কাম অফ দি আর্থ।

আয়নার সামনে খোলামেলা অবস্থায় নিজেকে একবার ফেললুম। চুল, কুচকুচে কালো। টাক পড়েনি। চামড়া টানটান। গাল ভরাট। গলা ছিনে নয়। কণ্ঠা বেরোয়নি। বুক চওড়া। কোমরে সামান্য আয়েশি মেদ। ঊরু দুর্বল নয়, ক্ষমতা রাখে। তবে? পাশ। একশোতে একশো।

ঝটাপট চান সেরে স্মার্ট প্যান্ট, আর টি শার্ট পরে এমার বাড়িতে। আমার শ্বশুরবাড়িও হতে পারে। ভাগ্যের কথা কি বলা যায়। এখন আর কালুর কথা মনে পড়ছে না। কালু বেশ মজা করছে। কখনও আসছে, কখনও যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ একটা কথা ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ঝকঝকে স্টেপস। নামছি, নামছি। স্যাশ দিয়ে চাপা আলো আসছে। কুচকুচে কালো হাতল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বয়স যখন পনেরো, বাড়িতে কাজ করতে এল শ্যামা। শ্যামার সঙ্গে কালুর মিল আছে কোথাও। এতদিন পরে মনে পড়ে গেল। এক বৃষ্টির দুপুরে শ্যামার শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে, দু'জনে কোমর ধরাধরি করে বাড়ি ফিরেছিলুম। সে রাতে খুব কষ্ট হয়েছিল। পরের দিন শ্যামা আসেনি। জ্বর হয়েছিল। আমার অভিমান। বিকেলের দিকে ছুতো করে ওদের বস্তিবাড়ির পাশ দিয়ে সমনস্ক অথচ অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে গিয়েছিলুম। শ্যামার স্বাস্থ্যবতী মা পুকুরঘাটে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে কাপড় কাচছিল। শ্যামার দেখা পাইনি। পরের দিন এসে আমাকে বলেছিল, 'তোমার জ্বর হয়নি? কাল বৃষ্টিতে ভিজে আমার জ্বর এসে গেল কোঁ কোঁ করে।' আমি বললুম, 'কই দেখি।' কপালে হাত দিয়ে বললুম, 'যাঃ ঠান্ডা।' ও বুকের কাপড় সরিয়ে বলছিল, 'জ্বর ওখানে কী? জ্বর তো এখানে।' আমার হাত কেঁপেছিল। সেই আমার প্রথম দেখা। ভয়ংকর আনন্দের দৃশ্য। হয়তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। শ্যামা খুব কাছে সরে এসেছিল। বলেছিল, সারা শরীর নাকি খুব টাটিয়েছে। কোমরে ভীষণ

যন্ত্রণা। আমাদের শ্রেণির মানুষের ওপর শ্যামার খুব রাগ ছিল। আমরা নাকি ভীষণ ছোটলোক। তাই শ্যামা আমাকে খারাপ করার খুব চেষ্টা করেছিল। না কি ভালবাসা! বয়েস পেরিয়ে এসেছি। আর কে অত গবেষণা করে! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমি শ্যামাকেই খুঁজছি। সে কালুতে ছিল। সে শ্যামাতে আছে। এষাতে আছে অন্যভাবে। এষা শ্যামার মতোই সহজে ধরা দিতে জানে।

কমল যেন এষাদের বাড়িতে একেবারে রাজ্যপাট সাজিয়ে বসেছে। বই, খাতা, কলম, রঙের বাক্স, পুতুল। শিশুরা একটু ভালবাসা চায়। যা এষা দিতে জানে। আমার আবার শিশু-প্রেমের চেয়ে নারী-প্রেম বেশি। অথচ নারী-প্রেম থেকেই শিশুর আগমন। শিশু যেন আমার সিস্টেম বাই-প্রোডাক্ট।

দুপুরের সাজে এষাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কমল না থাকলে একটা কিছু ঘটে যেতই। শোনপাপড়ির মতো রোদ। সূর্যমুখীর মতো দিন। বিলিতি সাবানের গন্ধ। এষার ভুট্টা রঙের শরীরে অফ হোয়াইট শাড়ির প্যাঁচ। কমল আমার জীবনে একটা বড় বাধা। আমার কত ভোগ বাকি! এমন লাগাম পরানো জীবন ভাল লাগে!

এষা জানলার ধারে খাবার টেবিল সাজাচ্ছে।

'সাহায্য করব আপনাকে?'

'সাহায্য করার কিছু নেই। ইট ইজ সো সিম্পল।'

কমল বলল, 'বাবা, তুমি ছবি আঁকতে পারো?'

'আধুনিক ছবি পারি।'

'মাসি পারে জানো? এই দেখো আমি বসে আছি কেমন?'

এষা স্কেচ করেছে কমলকে। ভারী সুন্দর হয়েছে।

স্যালাড সাজাচ্ছিল এষা। সোফায় বসে আছি আয়েশ করে।

বললুম, 'স্কেচটা ভারী সুন্দর হয়েছে। পাকা হাত।'

'আপনার ছেলেটি যেন দেবশিশু!'

'তা হলে আমাকে তো আবার দেবতা হতে হয়।'

'আপনি তো দেবতাই। আপনার মুখ আর চোখ দুটো ভারী সুন্দর। সমুদ্রে গেছেন?'

'না।'

'গেলে হয়। রোদ, গোল্ডেন স্যান্ড, নীল আকাশ আর শ্যাম্পেনের মতো জল। শ্যাম্পেন খাবেন?'

'আছে নাকি!'

'থাকবে না? এটা তো ইন্টারন্যাশনাল বাড়ি।'

'শ্যাম্পেন কখনও খাইনি।'

'তা হলে একটা খুলি। শ্যাম্পেনের চেয়ে, শ্যাম্পেনের বোতল বেশি রোমান্টিক।'

ফট করে শব্দ হল। ভেতরের তরল পদার্থ ঠেলে বেরিয়ে এল। এষা অদ্ভুত কায়দায় বোতলের তরলকে আবার বোতলেই ফিরিয়ে নিয়ে এল।

খুব একটা সুস্বাদু কিছু মনে হল না। তবে আমি তো আর এ রসের রসিক নই। তবে খাওয়ার পর যত বাতাস লাগছে শরীর চনমন হচ্ছে। মন ক্রমশ হালকা হয়ে তুলোর বিচির মতো বাতাসে যেন ভাসছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। গোপা আর যাই পেরে থাকুক, শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে পারত না। মেয়েরা সত্যিই কত এগিয়ে গেছে! দশ বছর আগে হলে এষার সঙ্গে আমার এই মেলামেশায় পাড়ায় ছিছি রব উঠে যেত।

প্রচণ্ড খাওয়া হয়ে গেল, বিলিতি ধারায়। স্যুপ, ফ্রাই, স্যালাড। কমলের শরীর এখনও মনে হয় ঠিক হয়নি। ফুরফুরে পাখার বাতাসে এষার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল।

বাঁশির মতো নাক। ফরসা টুকটুকে। আমার বড় শৌখিন ছেলে। জন্মগত একটা আভিজাত্য নিয়ে এসেছে। এই যে ঘুমোচ্ছে, মুখটা যেন টুলটুল করছে। গোপা গর্ব করার মতো একটা উপহার দিয়ে গেছে।

একটা তাগড়া ছেলে এসে এঁটো বাসনপত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। টেবিল শুধু সাফা নয়, সিলিকোন পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করে দিয়ে গেল। দরজার কাছে আমি আর এষা ক্যাম্প চেয়ারে আধশোয়া। সামনে বারান্দা। খোলা নীল আকাশ। চিকচিক পায়রা উড়ছে।

এষা বললে, 'লেখা কেমন এগোচ্ছে?'

'একটা লাইনও লেখা হয়নি।'

'আপনি কীভাবে লেখেন?'

'এর আগে যেভাবে লিখেছি, তাতে একটা থিমকে ধীরে ধীরে ডেভালাপ করেছি। এইবার পড়েছি বিপদে। লিখতে হবে প্রেম, রগরগে প্রেম। আপনি কীভাবে লেখেন?'

'আমি প্রথমে চরিত্র তৈরি করে যাই। একের পর এক চরিত্র। তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিই, ব্যস, আমার ছুটি। তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের ডেসটিনি তৈরি করে। আমি শুধু ফলো করি।'

'কীরকম?'

'যেমন ধরুন, আপনি, আমি, কমল। আপনি উইডোয়ার, ইন্টেলেকচুয়াল, ভাল চাকরি করেন, ধর্মবিশ্বাসী নন, দেহবাদী, ওভার সেক্সড, এ লিটল পারভার্ট, স্লাইটলি স্বার্থপর, স্টিফ, এ লিটল লেজি।'

'আপনি আমাকে এইসব বলছেন?'

'ডোন্ট গেট আপসেট। আমার চরিত্রটা এখনও বলিনি। আমি একটা থটলেস, ওয়েওয়ার্ড, অ্যাফ্লুয়েন্ট। আমার চোখের সামনে আমার মা সোসাইটির ভালগার পিপলদের সঙ্গে সেক্স করেছেন। শি ওয়াজ থরোলি এ পারভার্ট লেডি। শি হ্যাভ এনরমাস অ্যাপেটাইট ফর এভরি থিং। শি ওয়াজ এ ননবিলিভার, এ বিউটিফুল বিস্ট। আই ডু নট নো, হু ওয়াজ মাই ফাদার। আমার মা আমার লিগ্যাল ফাদারকে ক্রীতদাস করে রেখেছিলেন। মারধরও করতেন। আর আমার বাবা ভীষণ রেলিশ করতেন। র‍্যাদার, আমার বাবা খুব আনন্দ পেতেন। যখন দেখতেন অন্য কেউ আমার মাকে ভোগ করছে। আমি এমন একটা মেয়ে, শৈশবে যে কোনওদিন ভালবাসা পায়নি। আমার মা আমাকে মেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, পাশের ঘরে অন্য কারু সঙ্গে বসে বসে ড্রিঙ্ক করতেন, আর বিছানায় চলে যেতেন। কেন করতেন? দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। ধরা যাক, আমি এমন একটা মেয়ে যার কোনও মরাল নেই; কিন্তু তার ভালবাসা আছে। শি ইজ অল লাভ, কিন্তু একটু ওভার সেক্সড। নিঃসঙ্গ কোনও শিশুকে দেখলে তার নিজের শৈশব মনে পড়ে যায়। তখন তার ভেতর থেকে সত্যিকারের একজন মা বেরিয়ে আসে। আর সেই শিশুটি? সে কেমন। ভারী বুদ্ধিমান। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বোঝে। ভীষণ সেনসিটিভ। সে সঙ্গ চায়, ভালবাসা চায়। সে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। যেমন ভাবেই হোক, তার মনে একটা ধারণা হয়েছে, তার বাবা তাকে তেমন পছন্দ করে না, একটু ওদিক এদিক হলেই বিরক্ত হতে পারে। তার মনে হয়, বাবা তার কাছ থেকে একটা কিছু লুকোতে চাইছে। সে না থাকলেই তার বাবা খুশি হয়। ধরুন এই তিনটি চরিত্রকে নিয়ে আমার উপন্যাস। আমার কিছু করার নেই। চরিত্ররা নিজেরাই একসময় তাদের পরিণতিতে পৌঁছে যাবে। আমি শুধু বসে বসে সুতো ছেড়ে যাব।'

'আপনি সত্যিই কি এইরকম একটা উপন্যাস লিখছেন?'

'লিখিনি। ভাবছি লিখব।'

'খুব চিন্তায় ফেলে দিলেন।'

'চিন্তার কী আছে। আমি ধর্ম না মানলেও ভাগ্য মানি। আমাদের সকলেরই ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। আর ভাগ্য হল, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের স্বভাব। এ নিয়ে চিন্তার তো কিছু নেই।'

নীরবে বেশ কিছুটা সময় বয়ে গেল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে কলকাতার দুপুর। শ্যাম্পেনের নেশা চড়ছে ধীরে ধীরে। চোখের সামনে যেন বাসন্তী আঁচল উড়ছে। এষা ঠিকই বলেছে মানুষের প্রবৃত্তিই হল মানুষের ভাগ্য। কমল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এষার খাটো ব্লাউজ দেখছি। কাঁধ, হাত, গলা, কোমরের অনাবৃত অংশ দেখছি। নিটোল, উরু, পা, সমস্ত শরীরটা চোখের সামনে দুলছে ফণা তোলা সাপের মতো। এখুনি ছোবল মারবে। মানুষের চিন্তার একটা তরঙ্গ আছে। এষার মনে ধরা পড়েছে। দু'হাত মাথার ওপর ওইভাবে টানটান করে তুলে আড়ামোড়া ভাঙবে কেন? জানে না আমি সামনে বসে আছি শকুনের মতো। বুকের নরম উচ্চতা অমন স্পষ্ট হয়ে উঠলে কেউ স্থির থাকতে পারে! চোখ জ্বালা করে। নিশ্বাস গরম হয়। শরীর আনচান করে।

আমি ভয়ে ভয়ে জড়ানো গলায় বললুম, 'ও ঘরে যাবেন?'

এষা হাসল। একটু যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। চোখ দুটো অসম্ভব চকচক করছে। বলল, 'এখন দুপুর।'

'ডার্কনেস অ্যাট নুন।'

আবার হাসল, 'গেলে হয়। গিয়ে দেখা যেতে পারে কী হয়!'

এষা উঠে পড়ল। আমার নিয়তির মতো চলেছে সামনে। এ এক অসহ্য অনুভূতি। চাপা যায় না। এমন আবেগ। ভারী সুন্দর ঘর। মাঝখানে মোলায়েম চাদর-ঢাকা বিশাল পরিপাটি বিছানা। চারপাশে ঝকঝকে তকতকে বড় বড় জানলা। জানলার গুনে চেনা আকাশ অচেনা। মনে হচ্ছে ভূপ্রান্তের কোনও এক অজানা দেশের রেস্ট হাউসে বিশ্রাম নিতে এসেছি। মৃদু বাতাসে আলোর ফানুস দোল খাচ্ছে। এষা একে একে প্রতিটি জানলার পরদা টেনে দিল। স্বচ্ছ অন্ধকারে এষার শরীর থেকে যেন ফসফরাসের আলো বেরোচ্ছে। খাটের মাঝখানে ছুড়ে দিল নিজেকে। বড় নেশা!

॥ নয় ॥

উদ্‌ভ্রান্ত নীলুদা ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন। ঝড় বইছে। সাত দিনে একটা মানুষ একেবারে যেন বিধ্বস্ত। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো। বয়েস চলে গেলে মানুষের আর মহিলা নিয়ে মাতামাতি চলে না।

'ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে পারো সৃকু! একটাও খুচরো টাকা নেই।'

আমি প্রস্তুতই ছিলুম। ট্যাক্সিতে ওঠার আগেই জানতুম, নামার সময় এই কথাই আমাকে শুনতে হবে। অসম্ভব কৃপণ স্বভাবের মানুষ। ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সি চলে গেল।

রাস্তার ওপরেই বিশাল বাড়ি। বেশ বয়েস হয়েছে। বার্ধক্যের চিহ্ন সর্বত্র। শুধু মজা এই, জায়গায় জায়গায় মেক আপ পড়েছে। খানিকটা দাঁত বেরোনো, খানিকটা রং প্লাস্টার। দরজায় জানলায় পেন্ট। তিন-চারটে প্রবেশ দরজা। এক-এক দরজায় এক-এক নেম প্লেট। সবাই গুপ্ত। অনেক গুপ্ত গুপ্ত হয়ে আছে এই প্রাচীন বাড়িটিতে। যার যেমন অবস্থা, সে সেইভাবে নিজের অংশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে।

'নীলুদা, এ বাড়ির তো অনেক শরিক!'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো হবেই। বিশাল ফ্যামিলি। তবে কী জানো, ভাগাভাগি হয়ে গেছে। কারু সঙ্গে কারু সম্পর্ক নেই। যে যার বেশ পিসফুলি আছে।'

'নিজের বাড়ি ছেড়ে এই বাড়িতে থাকা ঠিক হবে! থাকতে পারবেন?'

'নেলীর জন্যে আমি নরকেও থাকতে পারি।'

আর কিছু বলার নেই। মাথা বিগড়ে গেছে। পা গুনে গুনে নীলুদা পাশের একটা প্যাসেজ ধরে

বাড়িটার পেছন দিকে চলেছেন। একেবারে শেষ মাথায় লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। দোতলাটা বেশ সায়েবি সায়েবি। বড় রড় কাচের জানলা। সাদা সাদা পরদা। হালকা ক্রিম রঙের দরজা-জানলা।

নীলুদা প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে বেশ টকটক করে ওপরে উঠতে লাগলেন। প্রেমে পড়লে মানুষের মনের জোর কী সাংঘাতিক বেড়ে যায়। এখন ঝাপসা চোখেও কেমন স্পষ্ট দেখছেন!

কম বয়সি এক অবাঙালি মহিলা দরজা খুলে দিলে। বেশ পরিপাটি সাজগোজ। সুন্দর করে বাঁধা চুল। কথায় অবাঙালির টান। আমাদের বসিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। চারপাশ বেশ সাজানো গোছানো। সেন্টার টেবিলে অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছাড়ছে। নীলাদ্রিশেখর ঝাপসা দেখছেন এখন। এমন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ছে না! বিরাট গোয়েন্দা হবার প্রয়োজন আছে কি!

'মিস গুপ্তা কি সিগারেট খান?'

নীলুদা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন বলো তো। আমার সামনে কোনওদিন খায়নি।'

সেই মেয়েটি ভেতরে গেছে তো গেছেই। কোথাও খুব মৃদু সুরে সেতার বাজছে। বেশ লাগছে বাজনাটা। কে বাজাচ্ছেন, রবিশঙ্কর, নিখিল ব্যানার্জি!

ভেতরে যাবার দরজায় পরদা ঝুলছে। ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছে না। তলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দুটো পা এগিয়ে আসছে। পরদা সরিয়ে সেই মেয়েটি এল। মশলাটশলা একটা কিছু চিবোচ্ছে। ঘরে এসে বললে, 'এখন দেখা হবে না। মেমসায়েব ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছে।'

নাকের ওপর চশমা ঠিক করতে করতে নীলুদা অসহায়ের মতো বললেন, 'আমার যে অনেক জরুরি কথা ছিল মীরা।'

'সে কাল আপনি অফিসে গিয়ে বলে নেবেন।'

'অফিসে কি সব কথা হয় মীরা?'

'সে আমি কী বলব! মেমসায়েবের খুব টেনশান হল। আমাকে বললেন আমি আজ ঘুমোব। ডোন্ট ডিস্টার্ব।' পরদার পাশে প্যাসেজে বেশ ভাল এক জোড়া মোকাসিন চোখে পড়ছে। ভাগ্য ভাল, নীলুদা চোখে কম দেখেন।

নীলুদা বললে, 'মীরা, আমি কি তা হলে চলে যাব!'

অ্যাশট্রে এবার ভলভল ধোঁয়া ছাড়ছে। প্রায় পুরো একটা সিগারেট ধিকিধিকি পুড়ছিল। কেউ খুব তাড়াতাড়ি দু'-এক টান টেনেই গুঁজে দিয়ে উঠে গেছে ভেতরে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, অ্যাশট্রের পাশে একটা গাড়ির চাবি পড়ে আছে। পরদার সামনে দাঁড়িয়ে ফাজিল মেয়েটি চ্যাকোর চ্যাকোর মশলা চিবোচ্ছে। কালো, কিন্তু চেহারায় বেশ চটক। দেখলেই মনে হয় রোজ দুপুরে সিনেমা দেখে, আর সস্তায় রেস্তোরাঁয় কাঁচা ছেলের মাথা ভেঙে মোগলাই খায়। ভীষণ রাগ হচ্ছে এই নীলাদ্রীশেখর প্রাণীটির ওপর। মানুষটা এত বোকা? হ্যালুসিনেশানে ভুগছে! বেশ কড়া গলায় বললুম, 'নীলুদা আপনি উঠবেন?'

একেবারে দিশাহারা! আমতা আমতা করে বললেন, 'চলে যাব! এই দুপুরে, রোদে পুড়ে এতটা পথ এলুম!'

'আপনি তা হলে বসুন। আমার কাজ আছে। আমি যাই।'

'বাঃ, তুমি চলে গেলে একা আমি যাব কী করে?'

'অন্যদিন যেভাবে যান।'

'নাঃ, চলো, চলেই যাই।'

আমরা বেরোতে না বেরোতেই মীরা দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল। যেন তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে একটা ছেলে দু'হাতে দুটো দুটো চারটে সোডার বোতল নিয়ে

উঠছিল। আমার নামছি দেখে নেমে একপাশে সরে দাঁড়াল। বাবা, ঘুমের ওষুধের সঙ্গে কি সোডা ওয়াটার সেবন বিধেয়!

নীলাদ্রিশেখর, ইউ আর এ ফুল। আধুনিকাদের চিনলে না। তোমার নেলী গুপ্তা একটি নিমফো। তোমাকে বৃষস্কন্ধ দেখে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে বৃষের মতোই ব্যবহার করার ইচ্ছে হয়েছিল। মূর্খ! এই শহরে বৃষের অভাব আছে! অনেক পয়সাঅলা বৃষ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নীলুদা হঠাৎ আবার দৃষ্টি হারিয়েছেন। কায়দায় সিঁড়িতে এক-একটা ধাপ নামছেন আর পরের ধাপটা পাবার জন্যে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াচ্ছেন। আমার কাঁধটা ধরার চেষ্টা করছেন। কৃপণ, ভোগী, কামুক তাকে আমি আমার কাঁধ দিয়ে সাহায্য করব!

নীলুদা আর্তস্বরে বললেন, 'সুকু আমাকে একটু ধরো ভাই।'

আর তখনই মনে হল, মানুষটিকে নিয়ে আমিও একটু খেলি। ধরা দিয়েও সরে সরে যাই। চোখে মুখে আতঙ্ক। পড়ে যাবার ভয়। পরেই মনে হল, এ আমি কী করছি? আমিই বা কী এমন সাধু! বেড়ালের মতো আঁস্তাকুড়ে আঁস্তাকুড়ে এঁটোকাঁটা খেয়ে বেড়াচ্ছি। এখনও সময় আছে। এখনও দৃষ্টি আছে, এখনও এই ঘুরপাক সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারছি। নিজের সঙ্গে নিজেই ন্যাজে না খেলে জীবনটাকে কারু হাতে স্থিত করে দিই।

নেমে এসেও নীলুদার মনে হচ্ছে এখনও নামা হয়নি। পা ঘষছেন আর বলছেন, 'সুকু, আব স্টেপস আছে নাকি?'

'যতটা নামার নেমে এসেছেন আপনি।'

হাজরা পার্কে ঘাসের ওপর এসে আমরা দু'জনে বসলুম। বসার দরকার হয়েছে। আসল ব্যাপারটা কী! লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি! ইন্দ্রিয়কে চেপে রাখতে রাখতে এক সময় অনেকের এই অবস্থাই হয়।

নীলুদা হাবাগোবার মতো বসে আছেন। কিছু ভাবছেন বলেও মনে হয় না। সময় চলে যাচ্ছে, নীলুদা বসে আছেন ভ্যাবলা দর্শকের মতো। মানুষটির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে আমার রাগ ক্রমশ পড়ে আসছে।

একটু কাছে সরে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'নীলুদা স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখেছিলেন তাই না? ভালবাসার স্বপ্ন!' উত্তরে বোকার মতো হাসলেন।

'হাসলে হবে না। পুরো ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে। মা বলছিলেন ওই মহিলা নাকি সন্তানসম্ভবা আর আপনি তার পিতা!'

নীলুদা খপ করে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন।

কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সুকু, ভুল ভুল, সব ভুল। আমাদের এই জন্ম, মৃত্যু, জীবন আনন্দ, উল্লাস, সব ভুল। লাইফ ইজ এ লিভিং হোকস। ওই মহিলার দর্শন তুমি পেলে না। পেলে বুঝতে পারতে একটি শরীর, একটি কণ্ঠস্বর, দুটো ঠোঁট, তাকাবার ধরন, মানুষকে কীভাবে পতঙ্গের মতো দেহের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়।'

'আপনি প্রথমে আমাকে অন্য কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, একজন স্নেহশীলা, মাদারলি মহিলা আপনার দায়িত্ব নিতে চান। তিনি মা হতে চান।'

'সুকু, আমার এখন মনে হচ্ছে সবটাই আমার কল্পনা। আসল ব্যাপার অন্য।'

'তার মানে?'

'আমি আর কিছু বলতে পারব না। আমাকে অনুরোধ কোরো না। তবে জেনে রাখো, মেয়েরা ভীষণা হতে চাইলে কী হতে পারে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। যে হাত দোলনা দোলায় সন্তানের, সেই হাতই তোমার জিভ টেনে বের করে আনতে পারে।'

'আপনার এইসব রহস্যময় কথার অর্থ বোঝা শক্ত। হয় আপনি পাগল, না হয় আপনি

অভিনেতা। আর তা না হলে আপনি পাকা শয়তান। কোনটা? সত্যি কথা বলুন তো, কালু কি আপনার জন্যেই পুড়ে মরল?'

মোটা লেনসের আড়ালে নীলুদার চোখ দুটো যেন আরও বড় দেখাচ্ছে। তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'সব রহস্য সবাই কি জানতে পারে? পারে না। কত কী চাপা পড়ে যায়। চাপাই থাকে চিরকাল। কালুর মৃত্যুর অবশ্যই একটা কারণ আছে। তবে সে কারণ আমি নই। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'আমি না জানতে চাই, পুলিশ জানতে চাইবে।'

'আমাদের সৌভাগ্য, পুলিশ এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।'

'যাক, আপনার জীবনের ব্যাপার আপনি বুঝুন। আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।'

নীলুদা আবার আমার হাত চেপে ধরলেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়, আমি একটা ক্রিমিন্যাল, পাপী, মার্ডারার, খুনি। ভাল করে চেয়ে দেখো। চেয়ে দেখো আমার মুখের দিকে।'

'না নীলুদা, তা মনে হয় না। মনে হয়নি কোনওদিন। বরং মনে হয়েছে আত্মভোলা, জ্ঞানী, সাধু প্রকৃতির মানুষ।'

'সুকু, সাধু হতে চেয়েছিলুম, কামজয়ী, ভগবৎপ্রেমী মানুষ হিসেবে নয়, সংসার থেকে পালাতে চেয়েছি বলে। তুমি কি জানো যাঁকে আমি মা বলি, তিনি আমার মা নন।'

'তার মানে?'

'ভেরি সিম্পল। আমার পিতৃদেব দু'বার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের ফসল হলুম আমি। আর দ্বিতীয় পক্ষের গোপা আর সোমা। তুমি জানতে? জানতে কি আমার যখন কমলের মতো বয়স তখন আমার মাতৃবিয়োগ হয়। তুমি কি জানতে আমার সৎমা ছিলেন আমার বাবার এক প্রাণের বন্ধুর স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জানতে না। কেন জানতে না জানো, আমরা প্রবাসী ছিলুম। অতীত মুছে ফেলার শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্থান পালটানো। জানো সুকু, আমার পিতা একটি পিতৃপরিচয় ছাড়া, আমার জন্যে ঐহিক কিছুই রেখে যাননি। আর আজ যাঁকে ঠাকুরঘরে বসে দিবারাত্র মালা ঘোরাতে দেখো, সেই সুন্দরীর আসল মূর্তি তোমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমরা তখন দেরাদুনে। ঝড়ের রাত। ঘনঘন বাজ পড়ছে, মুসৌরি হিলসের মাথার ওপর। ভয়ের বিছানা থেকে নেমে ছুটে গেছি বাবা-মা যে ঘরে আছেন সেই ঘরের দিকে। বিশাল বাংলো। এ-মাথায় আমি ও-মাথায় ওঁরা। দরজায় ধাক্কা মারছি। বিদ্যুতে চারপাশ নীল নেগেটিভের মতো হয়ে যাচ্ছে। ডাকছি, মা দরজা খোলো। মা আমার ভীষণ ভয় করছে। ঘরে কতরকমের শব্দ হচ্ছে। ফিসফাস কথা হচ্ছে। দরজা কিন্তু খুলল না কিছুতেই। শেষে কী হল জানো সুকু, চৌকিদারের বউ এসে কোলে তুলে নিলে। নিয়ে গেল তার ঘরে। এক ঘর ছেলেপুলে, নোংরা কাঁথা, ঘামের তেলের, মুতের গন্ধ, তার মাঝে সেই দেহাতি মহিলার বুকের কাছে শুয়ে রাত কেটে গেল। বড়লোকের ছেলের এই হল জীবন। সুকু, জীবনের সব কিছু বাজে, ভাঁওতা, ধাপ্পা, খেলা, তামাশা। সুন্দরী রোহিত মৎস্য আমার পিতা নামক কেঁচোটিকে গিলে ফেলেছিল। আর আমি যখন যৌবনে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলুম তখন বলা হল, অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, বিয়ে করতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো। সুকু, চরিত্রহীনরাই চরিত্র আঁকড়ে ধরে। ধরে চিৎকার করে, গেল, গেল। সুকু, সারা জীবন ভালবাসা খুঁজেই গেলুম কাঙালের মতো। পেলুম না। না মানুষের, না ঈশ্বরের। শেষ মার মেরে গেল এই মহিলা। বাঁদর নাচ নাচালে কয়েক বছর। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুড়ে গেল প্রেমের আগুনে। সুকু, আমি শয়তান নই, পাপী নই, আমি কাঙাল, আমি পথের ভিখিরি।'

আকাশের আলো মুছে আসছে ধীরে ধীরে। নীলুদার থমথমে মুখ। আমার দিকে তাকিয়ে

বললেন, 'তুমি পারো, তোমার সে ক্ষমতা আছে। আমার জন্যে একটা আশ্রম জোগাড় করে দাও। অধ্যাপক হিসেবে আমার সুনাম আছে। একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসতেই পারে। তাতে এমন কিছু অপরাধ হয় না। ছি ছি করার কিছু নেই। বিশাল পৃথিবীকে মায়া দিয়ে মোহ দিয়ে ঘিরে ছোট করে না নিলে, বেঁচে থাকাটা তো একটা আতঙ্ক। বিশ্বাস আছে বলেই তো বিশ্বাসঘাতকতা আছে সুকু। প্রাণ আছে বলেই তো মৃত্যু আছে।'

'আমার কাছে থাকবেন নীলুদা?'

'না। আমি একটা ব্যাডলাক বয়ে বেড়াচ্ছি। তোমরা যাকে বলো অপয়া মানুষ।'

'আমিও তো অপয়া।'

'এই মুহূর্তে সে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আরও কিছুদিন বাঁচো। জীবনটাকে আরও কিছুদিন গড়াতে দাও। তবে একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি, কমল যেন নীলাদ্রিশেখর না হয়ে যায়। সাবধান। মানুষের ভাগ্যের গোটাকতক বাঁধা পথ আছে, আর জীবনের গোটাকতক নির্দিষ্ট গাড়ি আছে। ট্রেনের মতো ইলেভন আপ ফিফটিন ডাউন। এক-একজন এক-একটায় উঠে পড়তে বাধ্য হয় আর ভাগ্যের এক একটা স্টেশনে পৌঁছে যায়। কমলকে একটা ভাল গাড়িতে তুলো। ওর মা খুব ভাল ছিল। সোমাও খারাপ নয়।

'আপনি তা হলে এখন কী করবেন? মা তো বলছেন বাড়ি বেচে দেবেন?'

'আমার অধ্যাপনাটা তো এখনও রয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে যাব। চশমার ওপর লেনস ব্যবহার করে যদ্দিন পারি চালাব। তারপর ইট ইজ সো সিম্পল। রেচেড, হ্যাগার্ড, বেগার, ডেথ ইন স্লো মোশান। একটু একটু করে একদিন শেষ। মনটাকে প্রস্তুত করে নিতে পারলে ইট ইজ নাথিং। কিচ্ছু না সুকু। তুমি যাবে তো। চলো উঠি। এখন কি আর ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?'

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে নীলুদা চলে গেল। সেই দুপুর থেকে আমার মাথাটা একেবারে গুলিয়ে আছে। এতক্ষণ কী যে হয়ে গেল। আমরা তো সব মাপা মাপা জীবন নিয়ে আছি। গণ্ডি টেনে বসবাস, তাই জীবনের নানা কথা, বিচিত্র কাহিনি সব জানতে পারি না। আশ্চর্য যতরকম ভাবা যায় ঠিক ততরকমই আছে। কে যেন বলেছিলেন, তুমি এমন কিছু কল্পনা করতে পারবে না, যা এই পৃথিবীতে নেই। কথাটা তখন বিশ্বাস করিনি। আজ এই মুহূর্তে করছি। এই মুহূর্তে ভীষণ ইচ্ছে করছে, ঈশ্বরের পদে নিজেকে উলঙ্গ করে সঁপে দিই। বলি, প্রভু, তোমার খেলা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি এই জগৎমঞ্চে ঠেলে ঢুকিয়েছ, আবার ঠেলে বের করে দেবে। পড়ে থাকবে ঘোড়ার ডিম। শ্যাওলাও তার চিহ্ন রেখে যায়, মানুষ কী রেখে যায় প্রভু। মল, মূত্র, বিষ্ঠা, তিক্ততা, বেঁচে থাকার বিষ-বাষ্প। আর রেখে যায় কামনা বাসনার ভাইরাসে ভরা রক্তের উত্তরাধিকারী। বাংলায় এত ভাল কথা নেই, ইংরেজিতে যা আছে 'ব্লাড লাইন'।

কত তাড়াতাড়ি মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। হাজরা পার্ক থেকে এই সাত-আট কিলোমিটার পথ আসতে আসতেই চিন্তা-ভাবনা, স্বভাব, সব পালটে গেল। জীবনে ওইজন্যেই স্থায়ী কিছু করতে নেই। সংসার বলো, প্রেম বলো, বিবাহ বলো। এক মনে করা। মন হল আকাশ। থেকে থেকে তার চেহারা পালটায়। তখন আর ভাল লাগে না। বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

এষার কাছে কমলকে রেখে এসেছি। ছেলেটাকে গ্রহান্তরে নিয়ে গিয়ে মানুষের সংস্পর্শের বাইরে মানুষ করা যেত। নীলুদা বড় ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন।

এষা আজ খুব সুন্দর সেজেছে। স্প্যানিশ মেয়েদের মতো চুনুরি করা ফ্রক পরেছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে! পরির মতো। কমল চাপাচুপি দিয়ে শুয়ে আছে। এই অবেলায় শুয়ে কেন? শীত করে জ্বর এসেছে। তা হবে! একশো এক কি দুই!

এষা বললে থার্মোমিটার দিয়েছিল। একশো দুই। না, আর আমি ফেলে রাখব না। আজই এখুনি সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

এষা বললে, 'দাঁড়ান, এই রাতে এই শহরে ছোটাছুটির চেয়ে যত ফি-ই লাগুক, ফোনে কনট্যাক্ট করে ডেকে পাঠাই।'

কমল বললে, 'আমার জ্বর এখুনি কমে যাবে বাবা, তুমি ভেবো না। দেখো না, একটু একটু ঘাম বেরোচ্ছে।' এষা কমলের ছোট্ট কপালে হাত রাখল। আমি পাশে বসে আছি। ছেলেটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। পায়ের পাতা দুটো বরফের মতো শীতল।

এষা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমি তাকিয়ে আছি এষার দিকে। মাঝখানে ভিনভিন করছে মাছির মতো রাত। অসুখ জীবকে বড় অসহায় করে তোলে। যবে সারবে, তবে সারবে। ওষুধ সান্ত্বনা। ভোগের কাল আছে। সেই কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য।

॥ দশ ॥

সোমা এসেছে।

সোমা ও বাড়িতে ভীষণ অশান্তিতে আছে। সোমার মা কাজকর্ম প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। নীলুদার মাথাটা মনে হয় সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন। যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছেন। কখনও বকবক করে বকে যাচ্ছেন, কখনও চুপচাপ। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করছে, সোমার মায়ের প্রথম স্বামী এখন কোথায়। নিজের স্ত্রী অন্য কারু সঙ্গে ঘর করছে দেখলে কেমন লাগে! নিজের পুরুষত্বের ওপর একটা ঘৃণা এসে যায়। নিজেকে মনে হয়, নিন-কম-পুপ। কী করে যে জড়িয়ে পড়লুম এই পরিবারের সঙ্গে। গোপা চলে গেল। বাঁধন কিন্তু রয়েই গেল। এ বাঁধন কেটে বেরোবার একমাত্র কাঁচি হল, আর একটা বিয়ে করা।

কমলের যা শরীর হয়েছে, তাতে নিজের কথা ভাবার আর অবসর নেই। নতুন স্পেশ্যালিস্ট বেশ ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। বলছেন, নেফ্রাইটিস। কিডনি কাজ করছে না। মন-মেজাজ এত খারাপ হয়ে আছে! তার ওপর এই সোমা-সমস্যা।

সোমা এসেই শুয়ে পড়েছে ডিভানে। রাতে একা ঘরে ঘুমোতে পারছে না। যেই ঘুম আসছে, দেখছে সারা গায়ে লকলকে আগুনের শিখা নিয়ে কালু নেচে বেড়াচ্ছে ছিন্নমস্তার মতো। নীল ধোঁয়া হিলহিল করছে। সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। চিত হয়ে শুয়ে আছে। দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা। নিশ্বাসে মধ্যবয়সের ভারী বুক ওঠা-নামা করছে ধীরে ধীরে। মুখে ভেসে উঠেছে নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। যত ভাবি দুর্বল হব না, একটু শক্ত হব, পারি না কিছুতেই। মাথার তলায় বালিশ নেই। উঠে গিয়ে আস্তে একটা বালিশ ঠেলে দিয়ে এলুম। ক্ষণেকের জন্যে চোখ খুলে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কমল ঘুমিয়ে পড়েছে ও-ঘরে। ওকে কিছু খাওয়ানোই এক মহা সমস্যা। খিদেটা একেবারেই চলে গেছে। জোর করে খাওয়ালে সব তুলে দেয়। ক্রমশই বেশ জড়িয়ে পড়ছি। গোপা ছিল, সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন হত না। সেই জীবন এখন এই জীবনের ওপর শোধ নিচ্ছে। মুক্তির একটা রাস্তা খুঁজতেই হচ্ছে। নাকি এই বন্ধনটাকেই মেনে নিয়ে প্রমাণ করতে হবে, আমি দায়িত্বশীল, আদর্শ এক পিতা। কী যে কী, এখনও সঠিক বোঝা হল না। মনের এই ভাঙাগড়ার কূলকিনারা পাই না।

কোলে কাগজ ফেলে চুপচাপ বসে আছি। দুপুর ক্রমশই এগিয়ে চলেছে বিকেলের দিকে। একটা লাইনও পড়তে পারছি না। গভীর জলের তলায় রোবট হন্যে হয়ে খুঁজছে ভেঙে পড়া বিমানের ব্ল্যাক বক্স। পঞ্জাবে এত সমস্যা! পশ্চিমবাংলায় শরিকি লড়াই। অসম। শ্রীলঙ্কা। গুজরাট। কোনও কিছুতেই মন বসছে না। কী নিশ্চিন্ত আরামে, কত নির্ভরতায় গোপার বোন, আমার শ্যালিকা সোমা শুয়ে আছে। এ যেন বাঘের ঘরে হরিণীর নিদ্রা। জানে না আমি তাকিয়ে আছি অপলকে। সুন্দর,

ঢালু, চুলের পাড় বসানো কপাল। মাঝখানে খয়েরি টিপ। ভরাট গাল। টিকলো নাক। দীর্ঘ আঁখি-পল্লব। একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে তোলা, আর একটা পা সটান। বড় মায়াবী ধরন। যখনই মনে হচ্ছে এষার মায়ের কথা, সোমার আকর্ষণ তত তীব্র হচ্ছে। সেই একই রক্ত বইছে শরীরে, যে রক্ত সোমার মাকে ঘর ছাড়া করেছিল। কত রাত মহিলা তঞ্চকতা করেছেন প্রথম স্বামীর সঙ্গে। এইরকম কত নির্জন, শান্ত দুপুরে আমার মহামান্য শ্বশুরমশাই ছুটে যেতেন একডালিয়া প্লেসে বন্ধুর বাড়িতে। সেদিন এষা যেমন জানলায় জানলায় পরদা টেনে দুপুরের ঘরে আঁধার এনেছিল, সেইভাবে সুন্দরী পরদাটানা ঘরে স্বামীর বন্ধুর সেবা নিতেন আদুরে বেড়ালের মতো। এই সেই মেয়ে। যার যৌবন চির বিদায়ের আগে হাহাকার করছে। সোমা তার মায়ের মতো নয়, তবু তো গর্ভজাত। ভেতরে উদ্দামতার বীজ আছে। খরায় ফেটে আছে মাটি। নীরব চাওয়া, জল দাও, জল দাও। যাদের ঘিরে প্রশ্ন আছে সেখানেই ইচ্ছে করে উত্তর খুঁজতে। যে অঙ্ক মেলেনি, সেই অঙ্ক নিয়েই তো যত কসরত।

সোমার ঘুমন্ত মুখের প্রশান্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভেতরটা বড় নরম হয়ে এল। এই পৃথিবীতে অর্থ আর বাহুবল থাকলে সবই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না, স্নেহ আর ভালবাসা। আমিও নিঃসঙ্গ, সোমাও তাই, কমলের অবস্থা তো আরও খারাপ। শিশুর কল্পনা ছাড়া, সঙ্গী তার কেউ নেই।

সোমার মাথার কাছে বসে কপালে হাত রাখলুম। একটু গরম লাগল। সামান্য জ্বর হয়েছে হয়তো। সোমার ঘুম খুব পাতলা। বাঁহাত দিয়ে মাথার তলা থেকে বালিশটা টান মেরে ফেলে দিয়ে, মাথাটা আমার কোলে তুলে দিল।

এই দুপুর! সেই দুপুর! পনেরো বছর আগে, আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম বালিভাসা ফরেস্টে। তখন প্রেম ছিল, পাপ ছিল না। এখনও পাত্রের তলায় প্রেমের তলানি চিকচিক করছে। তবে সেই সারসের ভোজসভায় শৃগালের অবস্থা আমার। জিভ পৌঁছোচ্ছে না।

সোমা দু'হাত আমার কোলের পাশ দিয়ে টানটান করে আড়ামোড়া ভাঙল। বুঝতেই পারছি, বেশ জ্বর আসছে। দু'হাত দিয়ে আমার গলাটা পেঁচিয়ে, মুখটাকে নামিয়ে আনল নিজের মুখের কাছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। শরীর টানটান। বেশ বুঝতে পারছি, সোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা আমার কোল থেকে সামান্য ওপরে তুলে, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাল। অনেকক্ষণ আমরা সেইভাবে রইলুম। আমার ঘাড় টনটন করছে। তুলতে পারছি না। সোমা এমনভাবে ধরে রেখেছে। গোপার বোন সোমা। মুখের আদলে মিল আছে। মিল নেই স্বভাবে।

একসময় প্রশ্ন করলুম, 'কী চাইছ?'

ফিসফিস করে বললে, 'আমাকে মেরে ফেলুন। ছিঁড়ে খুঁড়ে, কুটিকুটি করে দিন।'

'ভয় করছে।'

'কীসের ভয়?'

'ফলের।'

'পথ খোলা আছে।'

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো।'

'ঘৃণা আর ভালবাসায় কোনও তফাত নেই। যাকে চাই, সে কাছে না এলে ঘৃণা হয়। কাছে এসে দূরে না গেলে ঘৃণা হয়। ভীষণ মাপা সব। একচুল এদিক ওদিক হলেই ভালবাসা ঘৃণা, ঘৃণা ভালবাসা।'

আমার দুটো হাত টেনে নিয়ে সোমা তার বুকের ওপর চেপে ধরল।

পাখা ঘোরার শব্দ হচ্ছে। ঘড়ি চলছে টিকটিক করে। যা ভয় করেছিলুম, তাই হতে চলেছে নাকি! পাখি কি উড়তে গিয়ে, বারেবারেই এমনিভাবে ডানা মুড়ে পড়ে যাবে! মানুষের মধ্যে এ

কোন পশুর বাসা! কিছুতেই স্থির হতে দেয় না। থেকে থেকে বেরিয়ে আসে অদৃশ্য পশু, অদৃশ্য গুহা থেকে। অতৃপ্ত, অশান্ত, অন্ধ।

সোমা ফিসফিস করে আবেগ জড়ানো গলায় বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

কত সহজে আপনি থেকে নেমে এসেছে তুমি-তে। এরপর অবশ্য আপনি বলা যায় না।

'কমলকে একবার দেখে আসি। একা শুয়ে আছে ও ঘরে।'

বিছানায় কমল নেই। কমল বারান্দায় বসে আছে। দূরে দূরে গাছের মাথায় মাথায় পড়ন্ত বেলার রোদ খেলা করছে। একটা কাক এসে বসেছে বারান্দার রেলিং-এ। কক কক করে ডাকছে মাঝে মাঝে।

কমল কাকের সঙ্গে কথা বলছে, 'চুপ করে বোসো, আমি ঠিক এক পাতা লিখব, তারপর তোমাকে বিস্কুট খেতে দোব। তোমার আর কী বলো! হোমটাস্ক না করলে দিদি তো আর তোমাকে বকবে না, বকবে আমাকে।'

সামনে বই, খাতা, কলম ছড়ানো। কমল বসে আছে থেবড়ে।

'কমল?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল।

'তুমি এই রোদের ঝাঁঝে বসে কী করছ! আবার জ্বর বেড়ে যাবে বাবা।'

'বিকেল হয়ে গেছে বাবা! ওই দেখো, হলুদমাসিদের বাড়ির ছাদে শালিক এসে বসেছে।'

'শালিক এসে বসলে বিকেল হয়ে যায় বুঝি?'

'হ্যাঁ গো। ওরা বসে বসে দেখে কখন সূর্য ডুবে যাবে, তারপর সব চলে যাবে বাসায়। তুমি শুনলে না, এইমাত্র কাকটা বলছিল, কমল খেতে দাও, আমি বাড়ি যাব।'

'তুমি পাখির ভাষা বোঝো?'

'তুমি বুঝতে পারো না?'

'না বাবু।'

'তুমি আর ঘুমোবে না?'

'আমি তো ঘুমোইনি।'

'আমি যে দেখলুম।'

'ও-ঘরে তুমি গেলে না কেন?'

'আমি তো কোনও শব্দ করিনি বাবা!'

'শব্দ? শব্দের কথা বলছ কেন?'

'আমি না খুব আস্তে আস্তে দরজায় দু'বার শব্দ করেছি। আর তো করিনি বাবা। তুমি সেই একদিন বলেছিলে, ঘুমোবার সময়, লেখার সময় বিরক্ত করতে নেই।'

সোমা এসে দাঁড়াল পাশে, 'কী বলছে কমল?'

'ও একা একা এখানে বসে লিখছে।'

'কী লিখছ তুমি? বাবার মতো গল্প!'

সোমা কমলের পাশে বসল, গা ঘেঁষে। কেমন মানান? মা আর ছেলে বলে কি মনে হচ্ছে? সোমার মুখ কি মায়ের মুখের মতো দেখাচ্ছে?

সন্ধের কিছু আগেই সোমা চলে গেল। বলে গেল, এখানে এসেই থাকবে ছুটির বাকি ক'টা দিন। আমার এই ক্ষুদ্র আয়োজন ওর ভীষণ ভাল লেগেছে। হাবেভাবে মনে হল, সোমাও এখন তীর খুঁজছে। নৌকো আর কতকাল ভেসে বেড়াবে। সব মাঝিরই ক্লান্তি আসে।

কমলকে বললুম, 'বুড়ো, তুমি একটু হুটোপাটি করে বেড়াও না, সব সময় অমন একা একা মন খারাপ করে বসে থাকো কেন? তোমার এত দুঃখ কীসের?'

কমল বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বাচ্চা ছেলে বুড়োটে স্বভাবের হয়ে গেলে ভীষণ রাগ হয়। কমলের এই পাকামো আমার কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। সোমাকে যদি বিয়েই করি কমলকে আমি একটা ভাল আবাসিক স্কুলে দিয়ে দোব। জানি অনেক খরচ। সোমাকে বলব কলকাতার কোনও স্কুলে চাকরি নিতে। ধরাকরা করলে হয়ে যাবে। সোমা এষার চেয়ে অনেক ঘরোয়া। এষা কিন্তু কমলকে অনেক বেশি আপন করে নিয়েছে। কমলও এষাকে ভীষণ পছন্দ করে। আশ্চর্য! দু'জনেরই মায়ের অতীত ঘোলাটে। সোমার মা ঢাকতে পেরেছেন। এষার মা ছিটকে বেরিয়ে গেছেন। বেঁচে আছেন কি না, তাও তো জানি না।

কমলকে বললুম, 'চলো বেড়িয়ে আসি।'

কপালে হাত রেখে মনে হয় ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। গোপার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এমন একটা অপলকা, শৌখিন ছেলে রেখে যাবার কী মানে হয়। সারা বছরই, এটা ওটা সেটা লেগেই আছে। শুধু দেহ নয়, মনটাও ভীষণ নরম। কথার একটু এদিক ওদিক হলেই অভিমানে ঠোঁট ফোলে। বড় চাপা স্বভাবের। কমলকে নিয়ে চলা দেখছি খুব কঠিন হয়ে উঠছে।

কপাল দেখে বললুম, 'থাক। বেরিয়ে কাজ নেই। আয় লুডো খেলি দু'জনে।'

কমলের জন্মদিনে কালু তার সামান্য পয়সা থেকে এই লুডো কিনে উপহার দিয়েছিল। চন্দনের টিপ পরিয়েছিল। গলায় ফুলের মালা পরিয়েছিল। পায়েস করে খাইয়েছিল। এই তো মাত্র মাসকয়েক আগের কথা। এ পাশে আমি, ও পাশে কমল। মাঝখানে ছক। কমল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে ছকটার দিকে। টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল ছকের উপর। কমল তাড়াতাড়ি মুছে নিল হাত দিয়ে।'

'এ কী তুমি কাঁদছ কেন?'

কমল মুখ তুলল। দু'চোখে টলটল করছে জল। ঠোঁট দুটো কাঁপল। শব্দ বেরোল না। কালুপিসির কথা মনে পড়েছে। আমি যদি বলতুম, কালু অত বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুরছ, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে যে! কালু অমনি কমলকে বুকে চেপে ধরে বলত, এই বুড়োটা আমার কোলে চড়ার জন্যেই জন্মেছে মেজদা। সেই কোল আজ কোথায় গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ছক মুড়ে রেখে কমলকে কোলে তুলে নিলুম। বহুকাল পরে কমল আমার বুকে। বড় হালকা হয়ে গেছিস বুড়ো। একেবারে ফংফঙে। কমল আড়ষ্ট হয়ে আছে। ধরা-ধরা গলায় বললে, 'আমাকে নামিয়ে দাও বাবা। তোমার কষ্ট হবে।'

'তোকে কোলে নিলে কষ্ট হবে! আমার কত ভাল লাগছে জানিস! তুই যে আমার সব, বুড়ো।' বাকি কথা মনেই রয়ে গেল। তোর চেয়ে আপন আর কে আছে আমার এই পৃথিবীতে। যেদিন চিতায় উঠব সেদিন তুই যে আমার ঠোঁটে আগুন ছোঁয়াবি।

কমলকে কোলে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সামনে এষাদের বারান্দা। এষা হঠাৎ বেরিয়ে এল। কমলকে আমার কোলে দেখে বললে, 'এ কী কমলবাবু তুমি বাবার কোলে চড়েছ।! কী মজা! আমাকে কোলে নেবার কেউ নেই।'

কমলের মুখে হাসি ফুটেছে। মুচকি হেসে বললে, 'তুমি তো বড় হয়ে গেছ!'

এষা বললে, 'আমার কাছে তিনখানা টিকিট আছে সিনেমার, যাবেন। কী হবে মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে থেকে!'

'কমলের গা-টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।'

'করুক। কিছু হবে না। যত ওই ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকবে তত শরীর খারাপ হবে। গেট রেডি।'

গ্লোবের তিনতলায় বসে আছি পাশাপাশি তিনজন। আমাদের দু'জনের মাঝখানে কমল। ভেতরটা ঝলমল করছে। মোলায়েম ঠান্ডা। সামনে পরদা। তেমন ঠাসা ভিড় নেই। জীবজন্তুর ছবি।

বিউটিফুল পিপল। এষাকে আজ অসম্ভব স্মার্ট দেখাচ্ছে। এষার মতো মেয়ের সঙ্গে বাইরে বেরোতে বেশ লাগে। বোঝার মতো মনে হয় না। বরং নিজেকেই মনে হয় একটা বোঝা।

কমলের কপালে হাত রেখে এষা বললে, 'টেমপারেচার নর্মাল। কমলের শরীর খারাপের কারণ ডিপ্রেশান। বেশ একটু চিয়ারফুল রাখতে পারলে শরীরটা সেরে যায়!'

কমল হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে আছে। এষাই কমলকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। একেবারে সায়েববাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। কমল আপনমনে একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে চকোলেট খাচ্ছে। একটা একটা করে আসন পূর্ণ হতে হতে সামনের দিকটা প্রায় ভরে গেল। ধীরে ধীরে আলো কমে আসছে। ছবি শুরু হয়ে গেল। কমলের ভীষণ ভাল লাগছে। চোখ দুটো চকচক করছে। মাঝে মাঝে চেয়ার ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফেরার পথে গাড়ির পেছনের আসনে কমল ঘুমিয়ে পড়ল ফুরফুরে বাতাসে। ফাঁকা রাস্তা। এষা টপ স্পিডে চালাচ্ছে। অর্ধেক কলকাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। মানুষের মনে আর তেমন সুখ নেই, তাই শহর আজকাল তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। গাড়ি চালাতে চালাতে এষা বললে, 'অনেক দিন মনে থাকবে এই রাতের স্মৃতি। সময়টা বড় সুন্দর কাটল।'

'কেন, আমরা তো মাঝে মাঝেই রিপিট করতে পারি।'

'দুঃসংবাদই বলুন, আর সুসংবাদই বলুন, আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আমেরিকায়?'

'আমেরিকায় কেন?'

'পড়তে।'

'কই, আপনি তো আমাকে বলেননি।'

'আজ ফাইনাল হল।'

'কবে ফিরবেন?'

'আফটার ফাইভ ইয়ার্স। তবে কোথায় ফিরব জানি না। মামাও বোধহয় দেশ ছাড়ছেন।'

'যাঃ, হয়ে গেল। তাসের ঘর ভেঙে পড়ে গেল।'

'পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'পাঁচটা বছর না হয় কিছু নয়, কিন্তু মামা যদি চলে যান!'

'আপনি তো থাকছেন!'

'কিন্তু ওখানে আমার কথা কি আর মনে থাকবে! কত কী ঘটে যেতে পারে জীবনে!'

'তা অবশ্য পারে। অস্বীকার করছি না। আবার এমন কথাও বলছি না, যে জীবনটা আপনার কাছেই বাঁধা পড়ে গেছে। এইরকমই হয়। দেখা হয়, পরিচয় হয়, কিছুকাল কাছাকাছি, তারপর ছাড়াছাড়ি।'

'গোটা জীবনটাই তো তাই। যত দীর্ঘই হোক বিচ্ছেদটাই সত্য। হয় এ যাবে, না হয়, ও যাবে। একসঙ্গে এলুম, একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেলুম তা যে হবার নয়।'

'আমার দিকটা ভেবে দেখেছেন? একটা মানুষ কতবার হারাতে পারে, কতবার হারতে পারে?'

'তা বললে চলে? যে খেলার যা নিয়ম। তবে একটা কথা বলি, ওই মেয়েটিও ভাল।'

'কে, সোমা?'

'হ্যাঁ, আপনার শ্যালিকা।'

'যা ভাবছি তা হয় না, না?'

'অত বড় স্যাক্রিফাইস কি আমার দ্বারা হবে! আমেরিকার আকর্ষণটাই আমার কাছে প্রবল।'

'একটা ব্যবস্থা করে আমিও যদি যাই!'

'কমল?'

'হ্যাঁ, কমল।'

চুপচাপ দু'জনে। চাকার তলায় মাইল গুটোচ্ছে। শহর পাকিয়ে যাচ্ছে কালো ফিতের মতো।

'আচ্ছা ভালবাসা বলে কিছু আছে?'

এষা বললে, 'অবশ্যই আছে, তবে একই বস্তু বা মানুষকে বেশি দিন ভালবাসা যায় না। একঘেয়েমি এসে যায়। বস্তু পালটাতে হয়, মানুষ পালটাতে হয়।'

'এ যে খুব সাংঘাতিক থিয়োরি! তা হলে, আজ যাকে ভালবেসে বিয়ে করা হল, কিছুদিন পরে তাকে কী করা হবে!'

'ভালবাসা শুকিয়ে যাবে। তখন সহ্য করে নিতে হবে। বয়ে বেড়াতে হবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট করে বাঁচতে হবে। সেই কারণে যাকে সত্যিকারের ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। দৈহিক মিলন হল ঘৃণার অভিব্যক্তি। সাবজুগেশান।'

'কী বলছেন আপনি?'

'থিঙ্ক ইট ওভার। আপনি পারবেন আপনার মাকে, কি মেয়েকে নিরাভরণ করতে! পারবেন না। লাস্ট ইজ এ ফর্ম অফ হেট। প্রকৃত ভালবাসা হল শ্রদ্ধা, স্নেহ আর মমতার মিকশ্চার।'

'তা হলে?'

'তা হলে, যা ভাবছেন ঠিক তাই। আপনি আমাকে ভালবাসেন না, ঘৃণা করেন। আমাকে টেনে, ছিঁড়ে ফালাফালা করতে চান, সেইটাই আপনার মজা। সেই কারণে প্রথম সুযোগেই আপনি আমাকে খুলে ফেলেছেন। আর আপনি কত দুর্বল, কত অন্তঃসারশূন্য, সেইটা বোঝার জন্যে আমিও আপনাকে খেলিয়েছি। ভালবাসা নয়, দিস ইজ এ গেম অফ পাওয়ার। আমি ইচ্ছে করলে, সারা জীবন আপনাকে ক্রীতদাস করে রাখতে পারি, কারণ আপনি কত দুর্বল আমার জানা হয়ে গেছে। আপনি কত ভাগ পশু, কত ভাগ মানুষ, সেই রেশিয়ো আমার কষা হয়ে গেছে। আপনি একজন মিডিয়োকার মধ্যবিত্ত। একজন মানুষ সেন্টপারসেন্ট স্পিরিচ্যুয়াল না হলে, জীবনের পূর্ণ স্বাদ পেতে পারে না। উইদাউট স্পিরিচ্যুয়াল রিয়েলাইজেশান হি ইজ এ স্যাটেড বুটেড ডগ।'

আমার দু'কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে, দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে যাই।

এষা বাঁদিকে একটা ধারালো বাঁক নিয়ে বললে, 'জানি, আপনি ভীষণ অপমানিত বোধ করছেন। অসন্তুষ্ট হয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক। আপনার কম্পিউটারে যা ডাটা ফিড করা আছে, তাতে আপনি সব সময় একই ধরনের মিথ্যা শুনতে চান। সবাই তাই চায়। কিছু কাজের মিথ্যা হলেও অভ্যস্ত কিছু ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়ান। যেমন চুম্বন মানে ভালবাসা, দৈহিক মিলন মানে আরও গভীর ভালবাসা। অল ফলস। অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে চারপাশে, স্বামী আর স্ত্রী দু'জনে দু'জনকে ভীষণ ঘৃণা করে, অথচ তাদের সন্তান জন্মায়। জুতো পেটার পর মুহূর্তেই তারা উন্মাদের মতো মিলিত হয়। প্রেমিক মানুষ পৃথিবীতে তিন-চারজনই এসেছিলেন, জেসাস, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য। প্রেমে মানুষ নিষ্কাম হয়। ডোন্ট মাইন্ড। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি মন ভোলানো কথা বলতে পারি না। আই সে হোয়াট আই ফিল।'

এই ধরনের চড় আমি জীবনে খাইনি। সেই রাতে এষাকে আমি যত না নগ্ন করেছি, এষা আমাকে তার চেয়ে শতগুণ বেশি নগ্ন করে রেখে গেছে। অস্থি, মজ্জা সব বের করে এনেছে এই মাংসল মধ্যবয়সি শরীর থেকে। শুয়ে আছি নরম বিছানায়, পাশে বেহুঁশ কমল, ছটফট করছি, এপাশ ওপাশ করছি। এষার শেষ কথা কানে ভাসছে, 'আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসতেন, তা হলে তাঁর মৃত্যুর পর হয় আত্মহত্যা করতেন না হয় সংসার ত্যাগ করতেন।'

বড় দ্বিধায় পড়ে গেছি। বড় সংশয়। আমরা তা হলে মূর্খের মতো মিথ্যার বৃত্তে গোল হয়ে ঘুরছি।! পৃথিবীতে ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। হয়তো তাই। কেবল সংঘাত। রাজ্য দখল, ভূমি দখলের লড়াই। জরু আর গোরু আর এক চিলতে জমি সংসারের সূচনা। আধিপত্য বিস্তার। আমি তোমার ওপর, তুমি আমার ওপর। শাসক শাসিতের ওপর, বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তির ওপর, স্বামী স্ত্রীর ওপর, পিতা পুত্রের ওপর। হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড ইজ হিস্ট্রি অফ ডমিনেশান।

এষা আমাকে বিছানা ছাড়া করে দিলে। বারান্দায় এসে বসলুম। চাঁদিনি রাত। চারপাশে রাত একেবারে গমগম করছে। নিজের মুখোমুখি হবার এই তো সময়। ফটিক দাশ, তুমিও তো ঘৃণার কারবারি, প্রেম থেকে ব্যভিচার, ব্যভিচার থেকে বলাৎকার, রাজনীতির হিং ধর্মটর্ম বাদ, ধরো, ফেলো, করো, বেস্টসেলার। শিক্ষিত মানুষকে কতটা ঘৃণা করলে, সাহিত্যের এই ফর্মুলা মগজে আসে। উপন্যাসের নাম রাখতে হবে 'বলদ'। কে এক সঞ্জীব ছাগল লিখে ক্যান্টার করেছে, তারই বদলা নিতে হবে বলদে।

'বাবা!'

'কী রে, ঘুমোসনি বুড়ো!'

'বাবা, আমাকে একটু জল দেবে, ঠান্ডা জল।'

'জল খাবি? চল।'

নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়ি। যেখানে যেখানে আলো জ্বালছি, সেইখান থেকে অন্ধকার যেন বাদুড়ের মতো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। চারপাশে যেন রাতের সেতার বাজছে ঝিনঝিন করে। ফ্রিজের নরম আলোয় হিম বাষ্প হিলহিল করছে। বোতলের গায়ে জমা জলের চাদর। একের চার ঠান্ডা, তিনের চার সাদা জল মিশিয়ে কমলকে দিলুম। ঢকঢক করে খেয়ে কলের দিকে ছুটছিল গেলাস ধুতে।

'দে আমার হাতে দে, তোকে কে ধুতে বলেছে!'

'আমি ভাঙব না বাবা।'

'আচ্ছা, কে ভাঙার কথা বলেছে বাবা!'

শোবার ঘরে এসে বললুম, 'কী, এবার শুবি তো?'

'তুমি শোবে না বাবা?'

'আমার ঘুম আসছে না কিছুতে।'

'তুমি শোও। আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিই।'

'দূর পাগলা! চল, শুয়ে শুয়ে তোর সঙ্গে গল্প করি।'

কমলকে পাশে টেনে নিলুম। নরম ছোট্ট শরীর। মুখে একটা ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ।

'বুড়ো, তুই আমার সঙ্গে অমন করিস কেন?'

'বাবা, তুমি আমাকে রান্না করা, চা করা শিখিয়ে দেবে?'

'কেন রে?'

'তা হলে, তোমার অনেক কষ্ট হবে না।'

'আমার আবার কষ্ট কী রে? দেড় জনের রান্না। এই এতটুকু ভাত, এক হাতা ডাল, একটা তরকারি। এক ঘণ্টায় শেষ। শোন, ওসব সংসারের কথা ছাড়। বরং চল, আমরা দু'জনে দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসি মজা করে।'

'কোথায় যাবে?'

'যেখানে পাহাড় আছে, কুলুকুলু নদী আছে, বন আছে।'

'হ্যাঁ, চলো যাই। এ জায়গাটা বিচ্ছিরি। বাজে। মাসিকে নিয়ে যাবে?'

'না, শুধু তুই আর আমি। বুড়ো আর শ্রীকান্ত। ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে ঝিকঝিক করে আমরা চলে যাব।'

'জায়গাটার নাম বলবে বাবা? নীল পাহাড়, ছোট নদী, বন। অনেক পাখি থাকবে?'

'প্রচুর প্রচুর। সারাদিন আমরা পাখির ডাক শুনব, আর নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াব আপন মনে। কী মজাই যে হবে বুড়ো!'

'মাকে একা রেখে যাবে?'

'মা? মা কোথায়?'

'ওমা, তুমি জানো না, মা তো ছবিতে!'

'ছবিটা আমরা নিয়ে যাব।'

কমলের হাই উঠল। মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। অগাধ ঘুম। আর আমি শুনছি ঘড়ির শব্দ। কট কট করে সময়, জীবন কাটছে। সেই কাবার্ডের মধ্যে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরা আছে মহিলার রাত্রিবাস, অন্তর্বাস। আমি কিন্তু এযাকে ভালবাসি। এই এত কাটাকাটা কথার পরও বাসি। কিন্তু লাভ কী! জানতুম, আমি চাইলেও সে আসবে না।

সকালেই ছুটলুম আমার বন্ধু নয়নের কাছে। রেলে চাকরি করে বড় পোস্টে। দাড়ি কামাচ্ছিল। মা আর ছেলের সংসার। বিয়ে করেনি, করবে না। ভাল লাগে না। মা ছাড়া যে-কোনও মহিলাই তার কাছে অসহ্য। চুলের গন্ধ সহ্য হয় না। এমনকী শরীরে চুলের স্পর্শ লাগলে অ্যালার্জি হয়।

'বোস। কী মনে করে এই সকালে?'

'স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া একালের মানুষ এক পা-ও চলে না।'

'আজ অফিস নেই?'

'ছুটিতে।'

'বলে ফেল কী প্রয়োজন? নিশ্চয় রেলের টিকিট।'

'শুধু টিকিট নয়, যাবার জায়গাও। এমন একটা জায়গা বেছে দাও, পাহাড় থাকবে, নদী থাকবে, বন থাকবে, নির্জন এবং কাছাকাছি। প্লাস স্বাস্থ্যকর।'

'সায়েবগঞ্জ।'

'কোথায় থাকা?'

'রেলের কোয়ার্টারে। আমি লিখে দোব।'

'খাওয়া?'

'সঙ্গে মহিলা নিয়ে যাও। মনের আনন্দে খাবে-দাবে আর ফুর্তিসে বেড়াবে।'

'মহিলা পাব কোথায়?'

'জোগাড় করো।'

'হোটেল নেই?'

'পেটে সহ্য হবে না।'

'বেশ, ব্যবস্থা করে দাও।'

'সেভেন ডেজ টাইম। কেটে পড়ো এখন। আমাকে বেরোতে হবে।'

নয়নের বাড়ি থেকে বেরোতেই রাস্তায় তুষারের সঙ্গে দেখা। সেই বিচিএ গাড়ি চড়ে ধরধর করে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে বললে, 'এখানে কী করছিস? রেল কোয়ার্টারে!'

'নয়ন।'

'ও প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে?'

'তুই চললি কোথায়?'

'ধান্দায়। আয় উঠে আয়। চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোর ছেলেটাকে দেখিনি অনেক দিন।'

'আমার বাড়িটাও তো তুই দেখিসনি।'

'শুনেছি, খুব জবরদস্ত করেছিস। তবে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। অনেক টাকার ব্যাপার। ব্লকড হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে ফেলে রাখলে মোটা ইন্টারেস্ট। অত টাকা ম্যানেজ করলি কীভাবে?'

'বারাসাতের বাগানবাড়িটা বেচে দিলুম।'

'বাপের এক ছেলে হবার এই সুবিধে। নো ঝামেলা। তবে বাগানবাড়ি জীবনের একটা রিলিফ। খুব ভুল করেছিস।'

'আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে এখন। আর তো কিছু করার নেই।'

'যাক এবারটা কোনওরকমে কাটিয়ে দে। পরের বার চেষ্টা করিস, যতটা কম ভুল করা যায়। আর ক'বছর আছিস?'

'ম্যাক্সিমাম তিরিশ।'

'বাবা তিরিশটা বছর কাটাবি কী করে?'

'তোর?'

'আমার একটা গুড নিউজ আছে। কিডনি ঝামেলা করছে। পাঁচ কি ম্যাক্সিমাম দশ। গুডবাই।'

'বেশিদিন বাঁচা একটা বোরিং ব্যাপার।'

'যা বলেছিস।'

তুষার আর আমি সমবয়সি। তুষারকে একটু বুড়োটে দেখাচ্ছে। অ্যামবিশান, অ্যামবিশান, ছেলেটাকে মেরে ফেলে দিলে। বড় হব, বড় হব, জগৎজোড়া নাম চাই, আমাকে ওমুকে ছাপিয়ে গেল, মেরে বেরিয়ে গেল, বিশাল এক অতৃপ্তি নিয়ে সারাদিন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'দাঁড়া। হতভাগাটার জন্যে কিছু কিনি।'

তুষার গাড়ি ভেড়াল বিশাল এক দোকানের পাশে। প্রতিবাদে কাজ হল না। আমি গাড়িতেই বসে রইলাম। তুষার ঢুকে গেল ভেতরে। ব্যাটাকে বেশ ইন্টেলেকচুয়ালদের মতো দেখতে হয়েছে। কাঁচা পাকা একমাথা চুল। পেছনে দুটো পকেট লাগানো, হাল কেতার প্যান্ট। তার তলায় গুঁজে পরা হাফ হাতা টিশার্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট। হাতে প্লাস্টিকের চশমার খাপ। পায়ে বিলিতি জুতো। সাংঘাতিক স্মার্ট। তুষারের বেশ একটা পুরুষালি ভাব আছে। দেখলেই কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সাপে মেয়েরা ওর জন্যে পাগল হত। একই সঙ্গে এগারোটা মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল। তুষার সেই জাল কেটে বেরিয়ে এসেছিল বীরের মতো। পৃথিবীতে করার মতো এত কাজ আছে, মেয়েদের সঙ্গে ন্যাকামো করার সময় নেই।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বোঝাই একটা প্লাস্টিকের সুদৃশ্য ব্যাগ হাতে তুষার বেরিয়ে এল। ব্যাগটা পেছনের সিটে চালান করে দিয়ে স্টার্ট দিল গাড়িতে।

'একগাদা টাকা খরচ করে এলি?'

'শিশুর মুখের হাসির দাম জানিস?'

'না।'

'কোহিনুরের দাম জানিস?'

'না।'

'তা হলে চুপ করে বসে থাক। ব্যাটা কৃপণ!'

কমলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা রেখে গিয়েছিলুম। কী করব! কোনও উপায় ছিল না। এর মধ্যে একজন কাজের মহিলা পেয়েছিলুম। হাবভাব দেখে পছন্দ হয়নি। আজকাল অচেনা কারুকে সর্বক্ষণের জন্যে রাখতে সাহস হয় না।

ভেবেছিলুম কমল দরজা খুলবে। দরজা খুলে দিল সোমা।

'কখন এলে তুমি?'

'আপনি বেরিয়েছেন, আমিও এসেছি।'

'আমার বন্ধু তুষার। তুষার, আমার শ্যালিকা, সোমা। বেনারসে শিক্ষকতা করে। ছুটিতে এসেছে।' তুষার ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল। পরপর সাজানো, সাদা ঝকঝকে দাঁত, তুষারের আর এক ঐশ্বর্য। সোমা হাসল। অভিভূত হয়ে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তুষারের সেই ভয়ংকর চার্ম আজও আছে। কমেনি একটুও। হিংসে হল। আমাকে টানতে হয়, তুষারের কাছে এগিয়ে যায়। এষা থাকলে কী করত! সারা পৃথিবী তুষারের একবার ঘোরা হয়ে গেছে। ওর প্রথম ছবি 'বৃত্ত' বিদগ্ধমহলে ভীষণ সমাদৃত হয়েছিল। 'বৃত্ত' নিয়ে ও বিশ্ব ঘুরেছিল।

অস্বস্তি কাটিয়ে তুষার টকটক করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বললে, 'এই বাড়ি তোমার বাঁশ হবে।'

'কেন?'

'মেনটিনেন্স। ট্যাক্স। আজকাল কাজের লোক পাবি না। সব করতে হবে নিজেকে।'

ঘরে ঢুকেই তুষার কমলকে কোলে তুলে নিল। কমল অবাক হয়ে গেছে।

'আমাকে চিনতে পারো তুমি? পারো না। তোমার অন্নপ্রাশনে আমি অনেক রাতে এসেছিলুম। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে। মুখে চন্দনের ফোঁটা। তোমার মা সুন্দর সাজিয়েছিল সেদিন। খাইয়েও ছিল সাংঘাতিক।'

তুষার আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি এর কাকা না জ্যাঠামশাই? আমার চুল কাঁচাপাকা, তোর কাঁচা, অতএব আমি জ্যাঠা।'

কমলকে সাবধানে সোফায় বসিয়ে দিয়ে, তুষার বললে, 'আমি বেঁচে থাকলে, কমলকে আমার ছবির হিরো করব।'

সোমা বললে, 'ছবি?'

আমি বললুম, 'ও তুমি জানো না? তুষার নিউ জেনারেশানের ডিরেক্টর। ওর বিখ্যাত বই, বৃত্ত।'

'বৃত্ত? ফ্যান্টাসটিক। অসাধারণ বই। দেখার পর আমি তিন দিন স্তম্ভিত হয়ে ছিলুম।'

তুষার ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে, খ্যাটখ্যাট করে গ্যাসলাইটার জ্বালাল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। ভাল স্টোরি, অসাধারণ ক্যামেরা। উতরে গেছে। তবে বক্স অফিস পায়নি। আর্ট ফিল্ম হিসেবে সম্মানটাই পেয়েছে। ওতে বাংলা ছবি বাঁচবে না। মাস আর ক্লাস দুটোকেই ধরতে হবে। খুব কঠিন অঙ্ক ম্যাডাম।'

নিচু হয়ে প্লাস্টিক-ব্যাগটা কমলের হাতে দিল, 'নাও। মনে হয় এতে তোমার মনের মতো জিনিস পাবে।'

কমল নিতে ইতস্তত করছে। আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে।

বললুম, 'নাও, কাকু দিচ্ছেন।'

তুষার বললে, 'কাকু নয়, জেঠু।'

'আমরা দু'জনে সহপাঠী।'

'তাতে কী হয়েছে! তুমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলে, তাই আমাকে ধরে ফেলেছিলে ক্লাসে। আচ্ছা, আজ আমি যাই। রাইটার্সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মন্ত্রীকে ধরতে হবে। বাড়ি চেনা রইল, আর একদিন আসব।'

সোমা বললে, 'তা হয়, এক কাপ চা তো খেয়ে যান!'

'খুব দেরি হবে?'

'দেরি কেন হবে?'

'তা হলে ব্ল্যাক টি।'

তুষার বসে পড়ল পাশে। এক হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরেছে পরম বন্ধুর মতো।

তুষার জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কী হতে ইচ্ছে করে? বড় হয়ে কী হবে?'

'রাজা হব।'

'রাজা!' তুষার প্রাণখোলা হাসি হাসল। 'রাজা হবে কেন?'

'যুদ্ধ করব বলে।'

কমল এভাবে কোনওদিন তার মনের কথা আমাকে খুলে বলেনি।

'কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?'

'শত্রুর সঙ্গে।'

সোমা চা নিয়ে এল। তুষার চুমুক দিয়ে বললে, 'ফার্স্টক্লাস। অপূর্ব হয়েছে। ভেরি ব্যালেন্সড।'

দ্রুত চা শেষ করে তুষার চলে গেল। সোমা এগোতে গেল নীচে পর্যন্ত। কমল ব্যাগের গায়ে হাত বোলাচ্ছে আপন মনে।

'খুলে দেখ না কী আছে?'

'মাসি আসুক বাবা।'

শিশুর সংযম দেখে অবাক হলুম। কী আছে দেখার জন্যে আমার নিজের ভেতরটাই ছটফট করছে।

সোমা এসে বললে, 'ভদ্রলোকের গাড়ি আছে!'

'তা তো থাকবেই। চিত্রপরিচালকের গাড়ি তো থাকবেই।'

'আপনি গাড়ি কিনবেন না?'

'আমি? আমার মুরোদে কুলোবে না।'

'ভাল উপন্যাস লিখুন খান দশেক। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের মতো লিখতে পারেন না?'

'লেখা কি অত সহজ, সোমা!'

'শনিবার সন্ধেবেলা আসবেন বলে গেলেন।'

'আর এসেছে!'

'আমাকে একদিন আউটডোরে নিয়ে যাবেন। কথা দিয়েছেন।'

'নিয়ে গেলে ঘুরে এসো।'

'কথা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আপনার যেন মত নেই।'

'এ-ব্যাপারে আমার মত-অমতের কী আছে? তোমার ভাল লাগলে যাবে। না লাগলে যাবে না। তোমার ব্যাপার। আমার নাক গলাবার কী আছে!'

সোমার মুখ গম্ভীর হল।

হঠাৎ বলে বসল, 'সত্যি আপনি ছোটলোক। নীচ। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শেখেননি। মনের খবর রাখেন না। দেহের খবরই রাখেন!'

'আর তুমি খুব ভদ্র।'

'রান্নাঘরের কাবার্ডে কী ভরে রেখেছেন? আপনার লজ্জা করে না?'

কমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। কাঁদোকাঁদো মুখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এক পুরুষ আর বেহায়া মহিলাটির দিকে। ছি ছি, এ আমি কী করছি! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! না মাথা খারাপ নয়, আমাদের গ্রহ। আমার আর কমলের গ্রহ। আমার স্ত্রীবিয়োগ, কমলের মাতৃবিয়োগ, একই গ্রহের কারসাজি। সব ঝেড়ে ফেলে কমলের মুখ চেয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

শান্ত গলায়, যতটা দৃঢ় হওয়া যায়, ঠিক ততটাই দৃঢ় হয়ে সোমাকে বললুম, 'তুমি এই মুহূর্তে এই বাড়ি থেকে চলে গেলে আমি খুশি হব সোমা। ভীষণ খুশি। তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে। তুমি শিক্ষিকা, তুমি শিক্ষিতা, তোমার সামান্যতম সভ্যতা, ভদ্রতা, কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি কমলের সামনে এসব কী বলছ?'

সোমা বিকৃত গলায় বললে, 'তাই নাকি! কমলের সামনে? আর কমল যখন সব টেনে টেনে বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, মাসি এসব কী! পরিদের পোশাক কে ফেলে গেল মাসি!'

কমল ভয়ে ভয়ে সোফা থেকে নামছে। বিবর্ণ মুখ। কাঁপছে, 'না বাবা না। মাসি এসেই চা চাপিয়েছিল। চিনির কৌটো পাচ্ছিল না। আমাকে বললে খুঁজে দেখ। আমি যেই ওটা খুলেছি, ব্যাগটা পড়ে গেল। মাসি অমনি কী রে ওটা বলে সব টেনে টেনে বের করল।'

কমল প্রায় কেঁদে ফেলেছে। 'আমি করিনি বাবা! আমি তোমার কোনও জিনিসে হাত দিই? তুমি না বললে আমি কিছু খুলি?'

দু'হাত দূরে কমল। বিবর্ণ মুখ। দু'চোখে টলটলে জল। আমারই ছেলে আমার সামনে অপরাধী ভৃত্যের মতো কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন ওর কেউ নেই! পথ থেকে উঠে এসেছে। আমি পিতা নই, আশ্রয়দাতা প্রভু। গোপার মৃত্যুর পর একবার, একদিন, ভীষণ রেগে গিয়ে ভীষণ মেরেছিলুম। আমাকে না বলে দুপুরে সামনের পথে বেরিয়ে গিয়ে 'বেলুনওলা', 'ও বেলুনওলা' বলে চিৎকার করছিল। আমি তখন উদভ্রান্তর মতো দিন কাটাচ্ছি। চারপাশ ফাঁকা। থান কাপড়ের মতো সাদা। চতুর্দিকে গোপার স্মৃতি। ডাকামাত্রই কমল চলে এলে ম্মার খেত না। রঙিন বেলুনের নেশায়, গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় একা ছুটছে। প্রথমে চড়। চড় মেরেও রাগ পড়ল না। পায়ে ছিল হাওয়াই চপ্পল। সেই চপ্পল খুলে কমলের পিঠে ফটাফট মারছি আর বাড়ির দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছি।

যখনই মনে পড়ে সেই কথা, শিউরে ওঠে আমার শরীর। অমন একটা জঘন্য কাজ কী করে করতে পেরেছিলুম। কমলের সাদা পিঠে আঘাতের লাল জড়ুল, চাকের মতো হয়ে আছে। একটুও কাঁদেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল। পরে আমি নিজের উরুতে যত জোরে নিজেকে মারা সম্ভব, তত জোরে মেরে দেখেছিলুম। পুরো একটা দিন ব্যথায় পা নাড়াতে পারিনি।

আজ এই মুহূর্তে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে ভেসে উঠছে সেই স্মৃতি। দাঁতে দাঁত চেপে আছে কমল। পেছনে আমি এক জানোয়ার, প্রাণপণ শক্তিতে মেরে চলেছি অসহায় এক শিশুকে। প্রতিটি আঘাত ফিরে আসছে আমার দেহত্বকে নয়, হৃদয়ে।

রোজই মনে পড়ে একবার করে। মানসিক যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে যায়। গলা বুজে আসে। কেউ বুঝতে পারে না। নিজের কৃতকর্মে নিজেই যন্ত্রণা পাই। চোখে জল এলেও ধরতে পারে না কেউ। আজ কিন্তু আমি দু'জনের সামনে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললুম।

সোমা ভাবলে, আমি বোধহয় তার আক্রমণে মেয়েদের মতো প্যানপ্যান করে কান্না জুড়েছি। আমি কেন কাঁদছি আমিই জানি। কয়েক বছর পেছিয়ে গেছি আমি বিশেষ একটি সময়ে। প্রতিটি আঘাত প্রবলতর হয়ে ফিরে আসছে।

সোমা কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি অসুস্থ। সাইকোলজিস্ট দেখান। চোখের জল নিয়ে মনের অসুখ ধুয়ে ফেলা যায় না। জানেন আপনি আমার কত ক্ষতি করেছেন। আপনাকে আমি সহজে ছাড়ব ভেবেছেন? এই ছেলেটার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। এই ফাঁকা বাড়িতে আমার দিদির একটা ছবি ঝুলিয়ে, কাঠের কুচির মালা পরিয়ে, আর ছেলেটাকে পাশের ঘরে ভয় দেখিয়ে আটকে রেখে বৃন্দাবন লীলা চালাবেন তা হবে না, হতে দেব না।'

কমল আমার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু বলার সাহস হচ্ছে না, কিন্তু অনুভব করছে। উপায় থাকলে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করত। ভাষার ওপর দখল থাকলে আমাকে সান্ত্বনা দিত। সোমাকে দেখে আমার ভয় করছে। এষার মতো ব্যাপারটাকে মজার খেলা, বয়েসের খেলা বলে মেনে নিতে পারেনি। আমারও দুর্বলতা আছে, তা না হলে সোমা তুষারকে যে চোখেই দেখুক না, আমার কী যায় আসে! আমি কেন জেলাস হব। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি। এষা ঠিকই বলেছে, প্রবৃত্তিই মানুষের ভাগ্য। মানুষের প্রবণতাই মানুষের নিয়তি। কলে যেমন ইঁদুর ধরে, সোমা ঠিক সেইভাবে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। কেন? কোন স্বার্থে! ভালবাসা? দেহবাসনা? কী কারণ?

নিজেকে ভীষণ দুর্বল, অসহায়, বোকার মতো লাগছে। বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। শুনলুম, কমল প্রশ্ন করছে, 'মাসি, বাবা কী করেছে, তুমি অত বকছ কেন?'

সোমা উত্তর দিল না। বারান্দায় বেরিয়ে এসে, হাত দুয়েক দূরে দাঁড়াল। চড়া আলো পড়েছে মুখে। ও মুখ যত কটু কথাই বলুক দেখতে ভারী সুন্দর। কাশীর জলবায়ু আর মধ্য যৌবনের বিদায়ী আভায় বড় আকর্ষণীয়। এরই নাম মায়া।? আবার আমার দুর্বলতা আসছে।

সরে চলে গেলুম, ও পাশের ঘরে। সোমার কাছাকাছি থাকলে পাখির মতো জালে পড়ে যাব। কোনওদিনও আর উড়তে পারব না। এই খাঁচাতেই থেকে যেতে হবে সারা জীবন।

কিছু পরে সোমাও চলে এল। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়িয়েছে। হাত দুটো পেছনে। দাঁড়াবার বড় মারাত্মক ভঙ্গি। সব কিছু বড় স্পষ্ট। যে যন্ত্র থেকে এত ধাতব কথা ছিটকে আসছে, সেই দেহযন্ত্র কী কোমল! কত কমনীয়।

সোমা শান্ত গলায়, সংযতভাবে বললে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। আবার বললে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

দেখতে দেখতে চোখ টলটলে হয়ে এল জলে। ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নামছে দু'গাল বেয়ে। সোমা হঠাৎ ছুটে এল আমার দিকে। দু'মুঠোয় আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'কেন? কেন? কেন আমাকে তাড়াতে চাও। কেন আমি ছুটে এসেছি!'

সোমা বলছে। সোমা হাঁপাচ্ছে। সোমা ক্রমান্বয়ে আমার মাথাটা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। আমি কোনও কিছু দেখার সুযোগ পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনে সোমার বুক। উঠছে, নামছে, কাঁপছে। সোমা হঠাৎ আমার মুখটা চেপে ধরল বুকের কাছে।

'বলো, তুমি কোনওদিন আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে? খেলা করবে আমাকে নিয়ে!'

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। পারছি না। অতি কষ্টে বললুম, 'সোমা, তুমি শান্ত হও। তুমি শান্ত হও।'

সোমা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। আমার কোলে মুখ গুঁজে চাপা গলায় বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি। অসম্ভব ভালবাসি।'

'কী পাগলামি করছ সোমা! এইসব হালকা কথা তো তোমাকে কোনওদিন বলতে শুনিনি। আর কি আমাদের সে বয়েস আছে! এসব কথা বিশ-পঁচিশের পর আর বলা যায় না। কেউ শুনলে হাসবে!'

সোমার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সমান করে দিলুম।

সোমা মুখ তুলে বললে, 'আমি যাব না। তোমাকে ছেড়ে যাব না।'

'হঠাৎ আমার ওপর তোমার এই দুর্বলতা কেন? আমি তো উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য। আমার একটা ছেলে রয়েছে। ইচ্ছে করলে তুমি অনেক ভাল ছেলে পাবে। অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক রোজগার। গাড়ি, বাড়ি, ভরা যৌবন। আমি যে নিবে আসা আগুন, সোমা। আমাকে উঞ্ছবৃত্তি করেই বাঁচতে হবে।'

সোমা আবার আমার দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজল। সরু সিঁথি হারিয়ে গেছে ঘন চুলে। ঘাড়ের কাছে পরিপাটি খোঁপা। ঘাড়। ব্লাউজের পেছন টানটান। দ্বিতীয় হুকটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অন্তর্বাসের ফিতে ভয়ংকর প্রলোভন। মন বড় দুর্বল হয়ে যায়। দেহ নয়, মনটাই কেমন যেন নরম আর বিষণ্ণ হতে থাকে। দেয়াল, ছাদ, সব যেন সরে গেছে। বিশাল পৃথিবীর পটভূমিতে, দুটো প্রাণ। সমস্যা আমাদের সমাধান আমাদের। সুখ আমাদের দুঃখ আমাদের, দ্বন্দ্ব আমাদের জয় আমাদের, পরাজয় আমাদের। একজন বসে আছে খাড়া, আর একজন বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। গোটা পৃথিবী এইভাবে ভাগ হয়ে গেছে, দুয়ে, দুয়ে। দু'জন, দু'জন, দু'জনকে ঘিরে ঘিরে অসংখ্য জগৎ তৈরি হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে।

সোমাকে ধরে ওঠালুম। গোপার স্মৃতি মনে আসছে। কত মান-অভিমানের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যপটে ভেসে গেছে আমাদের দাম্পত্য জীবন। রমণীর অভিমানের কাছে পুরুষের পরাজয়। মনে হচ্ছে সোমাকে নয়, গোপাকে তুলছি। সেই একই রকম এলায়িত শিথিল ভঙ্গি। দেহভার আমার শরীরে। এ খেলায় মেয়েরা কী যে আনন্দ পায়! কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যায়। বিশাল থেকে মন সরে আসে কাছে। একেবারে শামুকের খোলে। আমি তো তাই ভাবি শুক্তির নিভৃত অন্তরে এইভাবেই মুক্তোর দানা ধরে। সাগরের গভীরে যত সে কাঁদে মুক্তোর দানা ততই বড় হতে থাকে। বুঝি, এইসব ভাবা এক ধরনের ন্যাকামি। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে।

পাতাল রেল কলকাতা খুঁড়ছে। গ্রামবাংলা বন্ধ। মিছিলে মানুষ চিৎকার করছে। পঞ্জাবে সন্ত গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন। ট্রাঙ্ক থেকে যুবতীর মৃতদেহ বেরুচ্ছে। সারা দেশ ছেঁড়া খোঁড়া ন্যাকড়ার ফালির মতো ফালাফালা হয়ে ঝুলছে। আর আমি একটা সোমত্ত পুরুষ যায়-যায় যৌবন এক মহিলাকে বুকে ধরে মধ্য দিবসে দোতলার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। আর পাশের ঘরে পড়ে আছে নিঃসঙ্গ, অসুস্থ সন্তান, বুকের কাছে ধরে আছে কাকার দেওয়া উপহারের ব্যাগ।

শিক্ষিকা সোমার এই আদুরেপনা কখনও অসহ্য লাগছে, কখনও ভাল লাগছে। সারা জীবন চেষ্টা করলেও মেয়েদের বোঝার ক্ষমতা আমার হবে না। অনেক নাড়াচাড়া করে গোপাকে সামান্য বুঝেছিলুম। আমরা যেমন স্ত্রীর মধ্যে মা, বোন, বন্ধুর ত্রিবিধ সমন্বয় খুঁজি, স্ত্রীরাও তেমনি স্বামীর মধ্যে পিতা, মাতা আর ভাইকে খোঁজে।

সোমা আঁচলে চোখ মুছে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বিব্রত, বিড়ম্বিত, আমি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। সোমা কী চাইছে! কী খুঁজছে! আমি রিচার্ড বার্টন নই, গ্রেগরী পেক নই, যে সোমাকে প্রেমোন্মাদ করে ফেলেছি। তুষারের চার্ম আমার চেয়ে অনেক বেশি। কী জানি কী হতে চলেছে। আমি গাড়ি, আর আমার স্টিয়ারিং অন্য হাতে।

সোমা রান্না চাপিয়ে দিয়েছে গ্যাসে। কোমরে জড়ানো আঁচল। অন্য মূর্তি। কমলকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেল, তৈরি হও, তোমাকে চান করাব। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'চা খাবেন আপনি?'

'হ্যাঁ খাব।'

কেন জানি না, বাড়িটাকে কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে। নতুন বাতাস বইছে। সামান্যেই ছিরিছাঁদ পালটে গেছে যেন। সোমার যেন লক্ষ্মীর হাত। দর্শন শাস্ত্র পড়ায়। সংস্কৃত, ইংরেজি দুটো বিষয়ই ভাল জানে। গণিতেও কাঁচা নয়। তাই যে-কোনও কাজই বেশ গোছগাছ করে করে। সব এলোমেলোকে বেশ একটা শৃঙ্খলায় এনে ফেলেছে। এষার সঙ্গে সোমার তফাত এই। বহুদিন পরে এক কাপ ভাল চা জুটল বরাতে। সোমা নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, 'কী, চা ঠিক আছে তো?'

'তোফা! বহুকাল পরে এমন চা খেলুম।'

'হাতের গুণ মশাই। এ হাত শুধু ছাত্র ঠেঙায় না।'

'তুমি এই যে চলে এলে, ও বাড়ির কী হবে!'

'মা একজন কাজের লোক ঠিক করে ফেলেছেন।'

'যাক, বাঁচা গেছে। দাদার খবর?'

'রাখি না। রাখছি না।'

'চোখে কম দেখেন, বয়েস হচ্ছে, খবরাখবর রাখাটা একটা মানবিক কর্তব্য নয় কি?'

'অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু উনি যে পছন্দ করেন না। বিরক্ত হন। বেশির ভাগ সময় দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন।'

'অভিমান।'

'এ যুগে আবার অভিমান!'

'আমি সময় পেলে একদিন ওই ব্যাঙ্কের মহিলার কাছে যাব।'

'কেন, জেলে যাবার জন্যে? বাইরেটা ভাল লাগছে না বুঝি?'

'জেলে যাব কেন?'

'কাগজ পড়েন না। মহিলাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।'

'কেন?'

'কাগজে পড়ে নেবেন। ফরেন এক্সচেঞ্জ র‍্যাকেট। ওসব আমি বুঝি না। নিশ্চয় গুরুতর কোনও অপরাধ।'

'ফরেন এক্সচেঞ্জ! তার মানে উঁচুতলার অপরাধ। মহিলার কদর বেড়ে যাবে।'

সোমা বললে, 'এ কী, কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটার শরীর কী হল। এই বয়েসের ছেলে, দিন দিন যেন বুড়োটে মেরে যাচ্ছে। একটা কিছু করুন।'

'করব। তুমি করবে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি করবে। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমার গৃহিণী ছাড়া আর কেউ নও।'

'সে কী, এই তো একটু আগে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ মত পালটাল।'

'সোমা, তোমার সঙ্গে আমার আজকের পরিচয়! মনে আছে আমরা তিনজনে কত রাত এক বিছানায় শুয়েছি!'

'যদি বলি, এই বয়সে নতুন করে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে মানাতে পারব না বলেই আপনার ওপর জুলুম করছি।'

'তুমি তো বলেছিলে বিয়ে করবে না।'

'কেন জানেন? এই দেখুন।'

.সোমা বুকের কাপড় সরাচ্ছিল।

'প্লিজ সোমা, এখন না, এখন না। এখন আমি দেখতে চাই না। কমল রয়েছে।'

'ঘুমোচ্ছে।'

'রাতে দেখব, নিরিবিলিতে, কেমন?'

সোমা ডিভানে কমলের পাশে বসে কপালে হাত রাখল, 'কমল! কমল।'

কমলকে তুলে বসাল। আজ একবার ডাক্তারখানায় যাব। একাই যাব। এষা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। সোমা আছে। কমলকে আগলাতে পারবে। কমলের এই দুর্বলতা। থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়া। মনমরা ভাব। অবিলম্বে মেরামত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোমা যদি আবার মত না পালটায় তা হলে বাইরে যতদিন না যাচ্ছি ততদিন অফিসটা অন্তত করা যাবে। ছুটি বাঁচবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সোমা আর কমল শুয়ে পড়ল ওঘরে। নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনে। আমারও ঘুম ঘুম পাচ্ছে। না শোব না। দিবানিদ্রা ভাল নয়। আজ একবার কাগজ কলম নিয়ে বসা যাক। শেষ চেষ্টা। হয় হবে, না হয় কলম এবার ফেলে দোব।

এবার কায়দাতেই চেষ্টা করে দেখি। আগে একের পর এক চরিত্র নামিয়ে যাই। যুদ্ধের সময় প্লেন থেকে যেমন প্যারাট্রুপাররা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন এখানে, একজন ওখানে। তারপর ধীরে ধীরে সব এগিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। ধরা যাক সোমা আমার প্রথম চরিত্র। উপন্যাস শুরু হচ্ছে বেনারসে। গোধুলিয়ার মোড়। সময় সন্ধে। সাইকেল রিকশা চেপে সোমা চলেছে বাঙালিটোলার দিকে। সেখানে এক গলিতে থাকেন এক বৃদ্ধ। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। কে এই বৃদ্ধ! সোমা কেন যায়! এই কেন যায়, প্রশ্নের মধ্যে রহস্যের ইঙ্গিত রেখে ছেড়ে দেব। কাহিনির টান বেড়ে যাবে। গল্প চাই, টান চাই, তা না হলে পাঠককে ধরে রাখব কী করে! এও এক কায়দা। সোমা এটা-ওটা নিয়ে রোজ সেই বৃদ্ধের কাছে যাবে।

এরপর কলকাতার পটভূমিতে ফেলব নীলুদাকে। নীলুদার মাকে। বড়লোকের বখে যাওয়া আদুরি মেয়েটিকে ফরেন ব্যাঙ্কের অফিসার করে ফেলব ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে। তুষারকে মঞ্চে ঢোকাব, সে যেমন, তেমনিভাবে। কালুকে আনব তবে মরতে দেব না আত্মহত্যা করে। মারব সোমার মাকে। বুড়ির ওপর আমার ভীষণ রাগ। এখন সারাদিন মালা ঘোরালে কী হবে! শেষের সময় আমার একদা প্রেমিক, পরে ধার্মিক শ্বশুরমশাই স্ত্রীর হাতের যৎসামান্য সেবাও পাননি। পচা একটা নার্সিংহোমে শীতের ভোরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বুড়ি তখন লেপের তলায় নাক ডাকাচ্ছেন মহাসুখে। চা খেতে খেতে মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন। গোপার মৃত্যুর সময় বলেছিলেন একটি মাত্র কথা— হা মধুসূদন। দুটো বড় বড় চোখে জল ছিল না। ছিল আগুন। চরিত্রটির অতীত খুব সামান্যই জানি। তারই ওপর ভিত্তি করে মনোবিশ্লেষণ। এক সুবিখ্যাত লেখক, কলমের মুখে চরিত্র যখন জন্মাচ্ছে, সেই মুহূর্তটিকে ধরে কোষ্ঠী তৈরি করতেন। আর সেই কোষ্ঠী বলে দিত ভাগ্য। আমার কলমে বৃদ্ধার নিঃসঙ্গ মৃত্যু হবে। বেশি ভোগাব না, কষ্ট দেব না। একদিন সকালে দরজা খুলে দেখা যাবে বৃদ্ধা চলে গেছেন। জপের মালাটি পড়ে আছে মেঝেতে, ছিঁড়ে, ছত্রাকার হয়ে। মুখ দেখে মনে হবে, মৃত্যুযন্ত্রণা পেয়েছেন, এক ঝিনুক জল চেয়েছিলেন, প্রত্যাশা করেছিলেন, দেবার কেউ ছিল না। সোমাকে এক উত্তর ভারতীয় যুবকের পাল্লায় ফেলব, তার নাম হবে বিষ্ণু ভার্গব। সাসপেন্স, সেক্স, সলিলোকি, সিডাকশান, সেনসেশান, সেনিলিটি, সাপ্রেশান, সাসপিশান, সব মিলিয়ে এমন এক সফোকেটিং উপন্যাস ধরলে ছাড়া যায় না। নীলুদা আর কালুকে একই বাড়িতে রেখে দোব। কালু মায়ের মতো সেবা করে যাবে, নীলুদা ভাববে স্ত্রী। সে খেলা যা জমবে! প্রবৃত্তির সঙ্গে নীলুদার ফাইট, আর কালুর আত্মরক্ষার চেষ্টা। পুরুষের দেহের আগুনে কালু কয়লার মতো পুড়তে চাইবে না। নীলুদার চোখ যাবে; কিন্তু শরীরটা দিন দিন মোষের মতো হবে। অসম্ভব ঘাম আর অসম্ভব কাম। অসম্ভব খিদে, প্রচণ্ড আলস্য। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে হাতড়াতে হাতড়াতে হাজির হবেন কালুর কাজের জায়গায়। পেছন থেকে সব কিছু ঝাপসা দেখছেন। কালু উবু হয়ে বসে বাটনা বাটছে দুলে দুলে, নীলুদা পাক্কা ছ'ফুট শরীর নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে। মনে মনে একটা ঘামেভেজা শরীর দেখছেন, দুলুনি দেখছেন, ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছেন, কালু হঠাৎ চমকে উঠবে। কালুকে দিয়ে আমি নীলুদাকে চড়চাপড়ও মারাব। আমার চরিত্রটাকে আনবই না। আমার সব দুর্বলতা, কদিচ্ছা, বিভিন্ন চরিত্রকে ভাগ করে দিয়ে নিজে বসে থাকব— সাচ্চা হিরা।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সোমা চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির একটা চামচে আনুন।'

চামচে! চামচে কী হবে! চামচে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, কমলের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, হাত, পা, শরীর সব টান টান। অস্পষ্ট একটা আঁ আঁ শব্দ। ভয় পেয়েছি, সেই সঙ্গে এই ভর দুপুরে ভাবছি, ভূতে ধরল নাকি! পঁচাশি সাল। মানুষ গেছে চাঁদে।

সোমা চামচেটা নিতে নিতে বললে, 'স্মেলিং সল্ট আছে?'

'স্মেলিং সল্ট! পাব কোথায়!'

'ব্লটিং পেপার?'

'না।'

'এক টুকরো চামড়া?'

'না।'

সোমা ভীষণ খেপে গেল, 'আপনি আর আপনার উদাসীনতা ছাড়া এ বাড়িতে কিছুই নেই। ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলে মানুষের এই অবস্থাই হয়। অলক্ষ্মী এসে ঢোকে। যান, একটু খবরের কাগজ ছিঁড়ে আনুন। আর একটা দেশলাই।' সোমা প্রথমে চামচের হাতলের দিকটা জোর করে গুঁজে দিল কমলের দাঁত দু'পাটি ফাঁক করে। পোড়া কাগজের ধোঁয়া দিতে লাগল নাকের কাছে। ধরে আর টেনে নেয়। ধরে আর টেনে নেয়। ধোঁয়ার ঝাঁঝে কমল ছটফট করে উঠছে।

আমি কেমন যেন হয়ে গেছি। ভাবতেও পারছি না, কাঁদতেও পারছি না। মেন্টাল প্যারালিসিস গোছের অবস্থা। ডাক্তারবাবুরা বলছেন কী, করছেন কী।

অনেক কষ্টে বললুম, 'সোমা, মনে হচ্ছে এপিলেপসি!'

'মনে হবার কিছু নেই, এপিলেপসিই। ছেলেটাকে নেগলেক্ট করে করে প্রায় শেষ করে এনেছেন।'

এই ধরনের কথা শুনলে রাগে গা জ্বালা করে ওঠে। একেই বলে, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

'সোমা, কেন বাজে কথা বলছ। জানো তুমি, দু'জন বড় ডাক্তার কমলকে দেখছেন।

'দুজন ডাক্তার, দুশো টাকা ফি, চারশো টাকার ওষুধ, তা হলেই সব হয়ে গেল।'

'তুমি আমাকে বকছ, এর বেশি আমি কী করতে পারি সোমা!'

'ছেলেটার পেছনে একটু খাটতে পারেন। একটু সময় দিতে পারেন।'

কমল চোখ মেলেছে। যেন স্বপ্ন-রাজ্য থেকে ফিরে এল। করুণ কণ্ঠে বললে, 'আমি যে একটু জল খাব।'

সোমা বললে, 'জল নয়, এখন তুমি একটু গরম দুধ খাবে বাবা।'

সোমা উঠে পড়ল। 'দুধ আছে?'

'গুঁড়ো দুধ।'

'ছেলেটার জন্যে একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করতে পারেন না?'

কথা শেষ করে সোমা একটা হুঁউঃ শব্দ করল। ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে ক্রোধে।

'গুঁড়ো দুধ বোতলের দুধের চেয়ে ভাল সোমা।'

'হ্যাঁ, অলস মানুষের ওইটাই সান্ত্বনা। তা না হলে সাতসকালেই তো ছুটতে হবে মিল্ক বুথে।'

'তুমি আমার ওপর রাগ করছ, বিশ্বাস করো, এষা আর আমি ওকে দু'-দু'জন স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে গেছি। এরই মধ্যে প্রায় সাত-আটশো খরচ হয়ে গেছে।'

'ভাল পাল্লায় পড়েছেন। বড়লোকি ব্যাপার। টাকা খরচ মানে সেবাযত্ন নয়। টাকা খরচ করলেই কি সব হয়ে গেল! এষার হাতে পড়েছেন, ও হাতে কায়দাই আছে, আর কিছু নেই। বাঙালি মায়ের হাত চাই। সব মেয়েই বিছানায় যেতে পারে, মা হতে পারে ক'জন!'

কমলকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, সোমা বললে, 'চেনাশোনা প্রবীণ কোনও ডাক্তার আছেন পুরনো আমলে পাশ করা?'

'এপাড়ার খবর রাখি না, তবে আমার পুরনো পাড়ায় একজন আছেন।'

'তা হলে চলুন তাঁর কাছে আজ যাই। বা কল দিন বাড়িতে।'

'এপিলেপসি কেন হল? এপিলেপসি তো মেয়েদের অসুখ।'

'আপনি গবেষণা পরে করবেন। অনেক সময় পাবেন। আগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।'

'একটু সন্ধে হোক। এখন তো তাঁকে চেম্বারে পাব না।'

'বাড়িতে পাবেন?'

'বাড়ির ঠিকানা জানি না।'

'অসম্ভব গেঁতো আপনি। ওই পাড়ায় গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে।'

বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে। এষাদের বাড়ির সামনে দু'-দুটো গাড়ি লেগে আছে। বিশাল ব্যাপার। এষা আমাকে নিয়ে একসপেরিমেন্ট করছিল। কোনও সন্দেহ নেই। আগামী উপন্যাসের উপাদান খুঁজছিল। কীভাবে একটা মানুষ রিঅ্যাক্ট করছে। একটা কথা হঠাৎ মনে আসায় আপন মনেই হেসে ফেললুম, এষা মনে হয় দেখছিল— একটা ম্যানইটারের কাছে রক্ত ভাল না আলোচাল ভাল। কার টান বেশি। ছেলের না মেয়েছেলের!

সোমা যতই হইচই করুক, ডাক্তারবাবুকে এখন পাব না কিছুতেই। তাই একবার দাশ পাবলিশার্সে ঢুঁ মারলুম। ফটিকদা গোমড়ামুখে বসে আছেন। পাশেই বিশাল বড় ফ্লাস্ক। ইদানীং ঠান্ডা চকোলেট-মিল্ক আর কড়াপাক সন্দেশ ছাড়া কিছুই খাচ্ছেন না। পেটে একটু আলসার মতো হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের সেবায় এখনও অনেক দিন বাঁচার ইচ্ছে। সেক্স, পলিটিক্স আর রেপের পুলিপিঠে পরিবেশনের সুমহান দায়িত্ব কাঁধে।

ফটিকদা প্রুফ দেখছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, 'কী মশাই, কপি কী হল?'

চেয়ারে বসতে বসতে বললুম, 'ধরিনি এখনও ভাঁজছি।

ফটিকদা এবার মুখ তুললেন, বললেন, 'আহা, সাহিত্য না হয়ে মুগুর হলে এতদিনে চেহারা ফিরে যেত। আপনি মশাই আমাকে ডুবিয়ে ছেড়ে দিলেন। বইমেলা আর ধরতে পারলুম না। বড় অলস আপনি। লেখা নিয়ে বসতেই চান না। ওভাবে হয়! রেগুলার বসতে হবে। লেখার সঙ্গে সহবাস। এই দেখুন এক মাসে কমপ্লিট ম্যানাসক্রিপ্ট। স্মল পাইকায় ঠাসা পঁচিশ ফর্মা।'

'কার কাজ ফটিকদা! এই অপকর্মটি কার?'

'তাঁর, যিনি এবারে অ্যাকাডেমি পাবেনই। আমাদের স্কুপ নিউজ। বইয়ের নাম শুনেই লোকে তেড়ে কিনতে আসবে। তিন দিনে এডিশান। প্রথম দিনেই পুলিশের লাঠিচার্জ।'

'বাবা রে! এমনও হয়!'

'কেন হবে না, সেই পয়লা, পরম পুরুষ প্রকাশের দিন মনে নেই!'

'কী নাম বইয়ের?'

'মহাসুখে প্রেমালাপ। এই বিশ গ্যালি পড়েছি। এরই মধ্যে চারটে রেপ হয়ে গেল। তার মধ্যে একটা আবার গ্যাং রেপ। সমুদ্রে লাশ ফ্লোটিং। ভেসে ভেসে তীরে এসেছে। লোকজন জড়ো হয়েছে। গল্পের কী গ্রিপ। গলায় গামছা দিয়ে টানছে।'

'আমি এবার ধরে ফেলছি।'

'আরে মশাই সেই গল্পটা ধরুন না। সেই যে সেই এক নেতা। প্রবীণ নেতা। বিবাহিত। বড় বড় তিন-চারটি ছেলেমেয়ে, হঠাৎ পলিটিক্স ছেড়ে প্রেমের লাইনে চলে গেল। বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল। বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখুন না। সেই বউ আর ছেলেমেয়ের হাতে সপাসপ ঝাঁটাপেটা দিয়ে ওপন করুন। পড়ে আছে হাসপাতালে। লিখবেন আপনি, প্লট ধরিয়ে দেব আমি?'

'মদ ছাড়া আর কিছু কি ধরানো যায় ফটিকদা?'

'তাই বা ধরাতে পারলুম কই! একটু জলপথে ঘুরুন, সাহিত্যপথের হদিশ পাবেন। কিক না মারলে মটোরসাইকেল স্টার্ট নেয়। সাহিত্য সাধনা আর তন্ত্রসাধনা এক। পঞ্চ মকার চাই।'

'ছেলেটা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু মেরামত করে লিখতে বসব।'

'মেরামত তো ডাক্তারে করবে। আপনার কী? ওসব বাজে অছিলা। আপনি পনেরো দিনের মধ্যে তিরিশ স্লিপ জমা দেবেন, অতি অবশ্য। এটা একটা কথা হল, ছেলের অসুখ! একসঙ্গে গোটাপাঁচেক বই না হলে, আমি বিজ্ঞাপন লড়াতে পারছি না। বিজ্ঞাপনের কস্ট জানেন? যান, যান, আর সময় নষ্ট করবেন না।'

ফটিকদা আবার 'মহাসুখে প্রেমালাপে' মগ্ন হয়ে গেলেন। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। উঠে চলে এলুম। সোজা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। প্রবীণ মানুষ। চেহারায় বেশ একটা সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক ভাব। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। কাঠের পার্টিশান ঘেরা চেম্বার। একটু অন্ধকার মতো। একটা-দুটো ওষুধ কোম্পানির ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ফরসামুখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না।

'আমি যখন এ-পাড়ায় ছিলুম, তখন আপনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন। আমরা ওই

সতেরো নম্বর বাড়িতে থাকতুম। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আর ফেথ দুটোই আছে। তাই বেপাড়া থেকে ছুটে এসেছি।'

ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে।

বললেন, 'আর আমাদের যুগ শেষ হয়ে এল। এখন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, আর পেটেন্ট মেডিসিনের যুগ। লিটারেচার পড়েই ডাক্তার হওয়া যায়। ডাক্তারকে শিখণ্ডি খাড়া করে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরাই চিকিৎসা চালাবে।'

'সেই কারণেই আপনার কাছে ছুটে আসা। আমার ছেলেটা ভীষণ ভুগছে ডাক্তারবাবু। একে মা-মরা ছেলে।'

'আপনার স্ত্রী মারা গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে কী চিকিৎসা করলুম আমি!'

'আপনার চিকিৎসার দোষে নয়, মারা গেছে আমার ফুলিশনেসে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।'

'ছেলের বয়েস?'

'আট পেরিয়ে নয়ে পড়বে।'

'কী হচ্ছে? ট্রাবলটা কী?'

যা যা হয়েছে সব ধীরে ধীরে, গুছিয়ে গাছিয়ে বললুম, আজকের হঠাৎ ফিট হয়ে পড়া পর্যন্ত।

ডাক্তারবাবু হুম করে একটা শব্দ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন আপন মনে। পেপারওয়েট নাড়লেন। পেন ঘোরালেন।

শেষে বললেন, 'সাইকোলজিক্যাল ডিজিজ। অ্যাডাল্ট হলে ঘুমের ওষুধ দিতুম। আমি আপনাকে একটা জিনিস সাজেস্ট করছি— দিনকতক বাইরে কোথাও ঘুরিয়ে আনুন, বেশ সুন্দর কোনও পাহাড়ি জায়গা, পরিষ্কার বাতাস, নীল আকাশ, হজমি জল। যত পারে, পেটে যা সহ্য হয় সব খেতে দিন, খেলতে দিন, ছুটতে দিন, হাসতে দিন, রোদে পুড়তে দিন, নো মেডিসিন। আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একেবারে বৃদ্ধা নয়, স্নেহশীলা, স্বাস্থ্যবতী কোনও মহিলা নেই?'

'হ্যাঁ আছে। কেন কী হবে?'

'সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যান। মেক ইট এ গুড প্লেজেন্ট পার্টি। বেশ হাসিখুশি, আমুদে কোনও পুরুষ থাকলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। লুডো, স্নেকস অ্যান্ড ল্যাডার, ছোট বল, ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম, ঘুড়ি-লাটাই, ভাল গল্পের বই, সব নিয়ে যান সঙ্গে। ওনলি ওয়ান প্রিকশান, জল আর আগুন থেকে দূরে রাখবেন। দুধ, ডিম, ভেজিটেবলস খেতে দেবেন। একটা মাস করে দেখুন, হি উইল বি অলরাইট।'

'একবার দেখবেন না?'

'প্রয়োজন হবে না। আমি যা বলছি করে দেখুন। কোনও কোনও ছেলে একটু ব্রুডিং টাইপ হয়। পরিবেশ পালটালেই দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। না হলে আমি আছি।'

নমস্কার করে উঠে চলে এলুম। আমার পথের সঙ্গে মিলে গেছে। সায়েবগঞ্জ। চলো সায়েবগঞ্জ।

দরজার বেল বাজালুম। ভেতরে বেশ একটা হুড়ুমদ্দুড়ুম শব্দ হচ্ছে। তরতর করে লাফাতে লাফাতে কে যেন নেমে আসছে। সোমাই হবে। দরজা খুলে দিল। কোমরে শাড়ির আঁচল গোঁজা। কপালে ঘামের ফোঁটা। চুল উড়ুউড়ু। ওপরের কোনও একটা জায়গা থেকে কমলের গলা ভেসে আসছে—'মাসি টুকি, মাসি টুকি।'

দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী করছ তোমরা?'

'ভীষণ ব্যাপার—আমরা চোর চোর খেলছি।'

কমল আমার গলা পেয়েছে। চিৎকার করছে, 'বাবা টুকি। বাবা টুকি।'

'দাঁড়াও যাচ্ছি। ধরছি তোমাকে।'

আমি জানি, কমল কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। তবু সময় নিচ্ছি। যেন খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। মুখে বলে চলেছি— কোথায় যে লুকোল ছেলেটা।'

জানি আমার এই কথা শুনে কমলের কী সাংঘাতিক উত্তেজনা হচ্ছে। যেমন হত আমাদের ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় মানুষের জীবনে যা যা হয়, সব কীরকম মনে একেবারে ছাপমারা হয়ে থাকে! আলমারির পাশে দরজার আড়ালে কমল নিশ্বাস বন্ধ করে, সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু জানি মুখে একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। চোখ দুটো জ্বলছে। যেই গিয়ে হঠাৎ যেন দেখে ফেলেছি এইভাবে বলব, 'ওমা এই তো রে ছেলেটা!' কমল অমনি হইহই করে উঠবে। এত ভাল লাগবে কমলের। আমি হারিয়ে গেছি, আমার আপনজন আবার আমাকে খুঁজে পেয়েছে, এর মতো অ্যাডভেঞ্চার আর কী আছে শিশুর জীবনে।

'কোথায় গেল রে বাবা, আমার অমন সোনা ছেলেটা! চাঁদে চলে গেল নাকি! সোমা, কোথায় গেল বলো তো।'

'আমি কী জানি? জানলেও বলব নাকি?'

'ঠিক আছে। বলবে না তো! তা হলে আবার খুঁজি।'

খোঁজার ছলে সারা বাড়িটা আবার ঘুরে এলুম। তারপরে 'এই তো রে আমার ছেলেটা' বলে খপ করে চুলের মুঠি ধরতেই কমল হাঁউমাউ করে উঠল। বুকে চেপে ধরে বললুম, 'বাবা, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।'

'তুমি কী ভাবলে বাবা?'

'আমি ভাবলুম, অদৃশ্য কোনও সুড়ঙ্গ দিয়ে তুমি বোধহয় কোনও রাজার দেশে চলে গেলে।'

'সেরকম কোনও সুড়ঙ্গ আছে বাবা?'

'থাকতেও পারে।'

কমল অবাক চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। ছোটদের বিশ্বাসের জগতে কী না থাকে। পরি আছে। ভূত আছে। গুপ্তধন আছে। দৈত্য আছে। ভগবান আছেন। আকাশে উড়ে উড়ে যেতে পারে এমন মানুষ আছে।

সেদিন রাতে, খাওয়াদাওয়ার পর আমরা তিনজনে বসে বসে অনেকক্ষণ লুডো খেললুম। সোমা যখন মাথা নিচু করে চাল দিচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল গোপা বসে আছে সামনে। সোমা একসঙ্গে দুটো হাতই খেলছিল। আমি, কমল। সোমা, সোমা। একবার নিজের হাত চেলে, আবার অদৃশ্য জুড়ির চালও চালছিল। কে জানে গোপাও হয়তো এসে বসেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম না।

বেশ তিন-চার দান খেলা হয়ে গেল প্রবল উত্তেজনায়। আমার হাতে ছয় পড়ে না কিছুতেই। কমল কেবলই বলে, 'তোমার হাতটার একটা কিছু করো বাবা। মাসির হাতে একবার ঠেকিয়ে নাও।'

সোমার কেবলই ছয় পড়ে।

একসময় কমলের হাই উঠল। সোমা ছক মুড়ে রেখে বললে, 'কমল, এবার আমাদের ঘুম। তুমি আমার কাছে শোবে তো?'

কমল আমার দিকে তাকাল।

বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কমল তোমার কাছেই শোবে।'

সোমার ওপর আমার সব রাগ, সব ঘৃণা সরে গেছে। এতকাল আমি সোমাকে ভুল বুঝে এসেছিলুম। আজকে সোমার মায়ের চেহারা দেখে ফেলেছি। মেয়েরা তো মা হতেই আসে। বিকাশের বউ ঊর্মি নিঃসন্তান। সারা সংসার যেন নিভে আছে। কী অশান্তি! বিকাশের ওপর রাগে, ক্ষোভে ঊর্মি নিজের চুলগুলোই ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছে। কেমন একটা অস্থির অস্থির, ছটফটে ভাব। অস্বাভাবিক হাসি। অস্বাভাবিক কথাবার্তা। বিকাশ একদিন বাড়ি ছিল না। হঠাৎ গিয়ে

পড়েছিলুম। বসতে বললে। চা করে নিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বলে বসল, 'শুধু শুধু বসে থেকে কী হবে, চলুন শুয়ে পড়ি।' আমি কায়দা করে উঠে চলে আসছি। ভীষণ ভয়ও পেয়ে গেছি। ঊর্মি হাসতে শুরু করল। খিলখিল হাসি। সে হাসি শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে।

ওরা দু'জনে শুতে চলে গেল। নিজের বিছানায় মশারি গুঁজছি। মশারি গোঁজার সময় কেমন যেন মনে হয়। ভীষণ একা লাগে। রাত, আর মশারি, এমন একটা সময়, এমন একটা জায়গা, যেখানে, যে সময়ে দু'জন ছাড়া মানায় না। থাকা হয়তো যায়, সে তো একচিলতে সেলে প্রাণদণ্ডের আসামিকেও থাকতে হয়। সে থাকা, থাকা নয়। স্রেফ বয়ে যাওয়া। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কী হবে বেঁচে থেকে। বেঁচে থাকা একটা বিশ্রী ব্যাপার। একের পর এক আত্মজীবনী পড়ে পড়ে দেখলুম, সাধু, সন্ত, সাহিত্যিক, অভিনেতা, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, যোদ্ধা, জীবনের শেষের দিকে সকলেরই মধ্যে একটা হতাশার সুর। জীবনের মধ্যভাগ থেকেই মেঘ জমতে শুরু করে, শেষের দিকে ঘন-অন্ধকার। শেষ জীবন পর্যন্ত ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে, ভাল ভাল কথা বলে যেতে হয়, না বললে ভীষণ খারাপ দেখায়। আগের, আগের, তারও আগের, পেছন দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে, সব বড় বড় মানুষেরা একই কথা একইভাবে বলে এসেছেন, সেইভাবেই বলতে হবে। সেইটাই এখন ট্রুথ। সত্য। একটা মিথ্যে এইভাবেই সত্য হয়ে গেছে। বেঁচে থাকা একটা টিডিয়াস, থার্ডক্লাস এক্সপিরিয়েন্স। নাথিংনেসে ভরা। দেখতে দেখতে পৃথিবী পুরনো হয়ে আসে। কী নীল আকাশ, কী সবুজ গাছ, কী পাখি, কীটপতঙ্গ, বিশাল জনপদ, গগনচুম্বী ইমারত, মনোরম উদ্যান, দেখতে দেখতে, দেখায় আর কোনও আকর্ষণই থাকে না। শেষে কী দেখছি, কী দেখলুম সেই বোধটাই আর থাকে না। শেষে ব্যাপারটা একটা আদিখ্যেতার পর্যায়ে চলে যায়। চাঁদের আলোয় চা খাওয়া। সিনেমার নায়ক-নায়িকার মতো গান গাইতে গাইতে বর্ষার জলে ভেজা। পাহাড়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বোতল খাওয়া। নিজের গায়ে স্ট্যাম্প মারা, 'আমি রোমান্টিক', 'আমি বোহিমিয়ান', 'আমি ক্যাজুয়াল', 'আমি উদার', 'আমি ভোলেবাবা', 'আমি জীবন মৃত্যুর পরোয়া করি না', 'আমি বৈদান্তিক', 'আমি মায়াবাদী', 'আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই', 'আমি আনন্দ, আনন্দ', 'আলো আলো'। নিজেকে সাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে, অনন্যসাধারণ করে তোলার জন্যে অনেক কথা বলতে হয়, অনেক জিনিস চাপতে হয়, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। মুখে হাসি, চোখে জল।' 'অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই অপারেশন করুন' বলে আমার এক বীর বন্ধু ডাক্তারবাবুর দিকে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে, প্রোফেশ্যানাল গলায় বলেছিলেন, 'কী দরকার। সেই এক মহাপুরুষ আলমোড়ায় করিয়েছিলেন, সেইটা পড়েছেন বুঝি। আরে মশাই, সে যুগে অ্যানেসথেসিয়ার এত উন্নতি হয়নি। সামান্য একটু অহংকারের তৃপ্তির জন্যে এত যন্ত্রণা সহ্য করবেন!' জীবন এক বিচিত্র ঘড়ি। কামের পিভটে দুটো দাঁতকাটা চাকা ঘুরছে, একটা ভোগ আর একটা লালসা। ঈশ্বরের সেবা করতে এসেছি না ইন্দ্রিয়ের সেবা। সব যখন তরতাজা তখন মনে হয়, নাঃ আর কয়েকদিন বাঁচা যাক। মুরগির ঠ্যাং চিবোব। কাপ্তেন সাজব। সেন্ট ওড়াব। সিনেমায় গিয়ে লাস্যময়ীর ধিতিং নাচ দেখব। ওকে চটকাব। এর গায়ে হাত বুলোব। আবার এও ভাবি দাঁতের যন্ত্রণায় যে কাতর, বিশ্বসুন্দরী যদি তার দিকে ওষ্ঠ বাড়িয়ে দেয়, চুম্বন কি সম্ভব হবে? একটা সত্তর বছরের জীবনে, পাঁচ দশ বছর বেশ হুড়ুমদুড়ুম বাঁচা। বিয়ে করেছি, বিছানায় গেছি, রাত জেগেছি, সুড়সুড়ি দিয়েছি, অধরসুধা পান করেছি, দাড়ি কামিয়েছি, আফটার শেভিং লোশান লাগিয়েছি, আহা চাঁদ, আহা আকাশ, বাহবা সমুদ্র বলেছি, ট্যাঁ করেছে, ভ্যাঁ করেছে, নেচে নেচে নেমন্তন্ন, ঝুলে ঝুলে বাড়ি, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা, প্রোমোশানের তেল, যৌবনের জন্যে হাফবয়েল, পোচ, ক্যাপসুল, সুখের জন্যে গর্ভনিরোধক বটিকা, ভোগের জন্যে ত্যাগ, মা ত্যাগ, বাবা ত্যাগ, ভাই ত্যাগ, বোন ত্যাগ। তারপর আর ভাল্লাগে না। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। ছেলেটা মাঝরাতে চেল্লালে গলা টিপে দিতে ইচ্ছা করে। বউ বিশ্রী, ছেলে যন্ত্রণা, সংসার কারাগার। একটু মদ খাই, একটু অন্য মেয়েছেলে ধরি, একটু পরচর্চা করি। নাঃ সুখ

নেই। নিজের পরিচর্যা করি। হার্টের ধুকপুকনি মাপাই, রক্তের চিনি মাপাই, পেটের অ্যাসিডে ক্ষার ঢালি, সেদ্ধ খাই, সেঁকা খাই, আলুনি খাই। শেষে ধর্ম ধরি। ইন্দ্রিয়ের সব ক'টা দরজার কবজা হলহলে, তবু মনে করি, প্রায় রামকৃষ্ণ, প্রায় বিবেকানন্দ, প্রায় যীশু। গলায় মালা, চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে জ্ঞানের বুলি, তারা তারা। পাশ দিয়ে যুবতী গেলে খেলিয়ে তাকাই, মনে বলি, আহা কার বউ রে, মুখে বলি, শক্তি শক্তি, মা জগদম্বে। আমিষ ছেড়ে নিরামিষ, ঘরে ধূপের ককটেল। 'আঃ আমার কাছে বৈষয়িক কথা কিছু বোলো না। জ্যোতিদর্শন হচ্ছে। কী যেন বলছিলে, তিন নম্বর বাড়ির মেয়েটা বারে নাচে?' আহা! কবে দেখব রে? ওই রুপালি বড়ি খেলে পোটেনসি ঠিক থাকে। শেষে আর নড়তে পারি না, শেষে আর চলতে পারি না। দু'ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপিয়ে মরি। তবু মরতে পারি না। ঝাঁটা মারে, জুতো মারে, রাস্তায় সব গোরুর মতো গুঁতিয়ে চলে যায়। একদিন গভীর রাতে ফাঁকা বিছানায় হাঁপের টান টানতে টানতে মন ভেসে যায়।

'কী হচ্ছে? ঘুমোলে নাকি?'

চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ফিসফিস বাতাসের স্বরে প্রশ্ন। মশারিতে একটা নাক আর দুটো ঠোঁট লেগে আছে।

বাতাসের স্বরে উত্তর, 'না ঘুম আসছে না।'

আবার হিসহিস প্রশ্ন, 'আসব?'

ফিসফিস উত্তর, 'এসো।'

কাঠকয়লার আঁচে, বিশাল একটা তাওয়ায়, কাবাব তৈরি হচ্ছে। মশলা আর আতরের গন্ধ। পুটপুট। পিটপিট শব্দ। বেঁচে থাকি আরও কিছুক্ষণ। হাত, পা, বুক, গলা, ঠোঁট, নাক, কপাল, ভুরু, চোখের পাতা। রাত, বাতাস, ছবি, দেয়াল, নির্জন প্যাঁচালো পথ, ছায়া, তারা, ঘড়ি, সময়, কল, এক ফোঁটা জল, বই, গেলাস, দেবতা, তালাআঁটা শূন্য ঘর, মশারি, বালিশ, মাথা, চুল, কান, ইয়ারিং, পিঠ, নাভি, পায়ের মসৃণ গোড়ালি। পৃথিবী নেই। মশারি। বিছানা।

তবু শরীরের ওপর শরীর। পায়ের ওপর পা। মানুষের বিভিন্ন অনুভূতির অস্ফুট শব্দ। যেমনই হোক, দু'জন থাকলে বাঁচাটা অনেক সহনীয় হয়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী। চেলা আছে। কেউ নেই, তো একটা কুকুর জুটে গেছে। তাও নেই তো একটা লাঠি আছে।

অনেক অনেক পরে আমার হাতে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সোমা বললে, 'কী বললেন ডাক্তারবাবু?'

'বললেন, চেঞ্জ। ছেলেকে বেশ করে বাইরে বেড়িয়ে আনুন। সঙ্গে স্নেহশীলা কোনও মহিলাকে নিয়ে যান। তুমি যাবে সোমা?'

॥ এগার ॥

মিল্টনগঞ্জ বলে যে একটা জায়গা আছে আমার জানা ছিল না। সোমা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। কলকাতার বাইরে থাকায় জ্ঞান বেড়ে গেছে। বিশাল একটা নদী আছে। চেনা নাম, ফলগু। যেদিকেই তাকাও ধুধু করছে সর্পিল বালির বিস্তার। একটা ঝকঝকে নতুন পোল আছে। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি। বিহার সরকার মাঝে মাঝে রং লাগান। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, সামনে পেছনে তাকালে গা ছমছম করে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের কুঁজ ধূসর হয়ে আছে। চারপাশে অচেনা সন্দেহজনক জঙ্গলের বিস্তৃতি।

যা যা চেয়েছিলুম সবই আছে। কাছাকাছি ঢেউ খেলানো পাহাড় আছে। ছোটখাটো আরও গোটা দুই নদী আছে। আঁকা-বাঁকা। সিপসিপ জল, তিরতির করছে। চারপাশে ছোট ছোট মরশুমের মতো সাদা সাদা মোরামের বিছানা বিছোনো।

বাড়তি আরও কিছু আছে। জৈনদের একটি সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দির আছে। আর আছে ভাঙা একটা নীলকুঠি। সেই নীলকর সাহেবের নামেই জায়গার নাম। বিহার সরকার অবশ্য নামটা কাগজেকলমে বদলেছেন। লালসিংনগর। কেউ সে নাম বলে না। মুখে মুখে মিল্টনগঞ্জই ফেরে।

লোকসংখ্যা খুবই কম। ব্যাবসা বলতে দুটি কি তিনটিই প্রধান। কাঠ, শালপাতা আর ওই নুড়ি পাথর চালান। আমরা এসে উঠেছি জৈনদের ধর্মশালায়। ছোট্টখাট্ট, ভারী সুন্দর। সোমার সঙ্গে পরিচয় আছে। বেনারসে ভারতীয় দর্শন সম্মেলনে এই আশ্রমের যিনি প্রধান তাঁর সঙ্গে সোমার আলাপ হয়েছিল। সন্ন্যাসী সোমাকে শ্রদ্ধা করেন। আমরা বেশ আদরেই আছি। চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তকতক করছে। গোলাপবাগান আমাদের ঘিরে রেখেছে। ছোট ছোট গাছে বিশাল বিশাল পেঁপে ঝুলছে। সারি সারি, দীর্ঘ দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছ হিসহিস করছে বাতাসে। মোরাম ঢালা পথ যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, সেইখানেই বাহু বিস্তার করেছে। এপাশে ওপাশে, নিভৃতে বসার জন্যে তৈরি পাথরের বেদি।

আমাদের গেস্টহাউসের পেছন দিকে একটা পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। রাতে সেই ঢালু বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ে শব্দ করে। শুয়ে শুয়ে শুনতে বেশ লাগে। জন্তুর পায়ের শব্দ। সোমা বলে বুনো কুকুর। আমি ভেবে নিই বাঘ। বেশ লাগে। ভাবলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। এখানে এসে মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকাটা নেহাত মন্দ নয়। শীত আসি আসি। পরিষ্কার নীল আকাশ। ঝিরিঝিরি পাতা কাঁপা সকাল। রোদ সেঁকা দুপুর। বাতাস জুড়োনো রাত। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সোমা ফরসা হয়ে গেছে। মুখ উজ্জ্বল। টান টান হয়ে উঠেছে মসৃণ দেহত্বক। হাঁটায়, চলায়, বলায় আলাদা একটা ঠমক এসে গেছে। বউ ছাড়া সোমাকে আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। ভাবা যায়ও না। সব রক্ষণশীলতা ভেঙে গেছে। আমরা আমাদের নিয়তিকে মেনেই নিয়েছি শেষ পর্যন্ত। প্যাঁ পোঁ বিয়ে আর সম্ভব নয়। ব্যাপারটাকে সময় মতো আইনসিদ্ধ করে নিতে হবে। তৃতীয় কেউ না কেউ উত্তরপুরুষ হয়ে আসবেই। আমরা আর তেমন কই সাবধান হতে পারছি। একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেছে। অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়, সোমার কাছে ভীষণ কিছু। বিস্ফোরণের মতো।

আশেপাশে কোথাও কোনও দোকানপাট, হাটবাজার নেই। শেষ শীতে মেলা হয়। তখন অনেক দোকানপাট বসে। নীলপাহাড়ের গ্রাম থেকে মানুষজন ছুটে আসে। হাতি আসে। ছোট সার্কাস আসে। একমাস ধরে মেলা চলে। সঙ্গে আমরা চা এনেছি। স্টোভ এনেছি। সুজি এনেছি। ঘি এনেছি। বিস্কুট এনেছি। আশ্রম আমাদের দু'বেলা পেটপুরে খেতে দেয়। নিরামিষ। ঘি দুধ পেঁপে ছোলার ছড়াছড়ি।

একটা ঘর। দুটো সিঙ্গল বিছানা। জোড়া লাগিয়ে তিনজনের মতো করা হয়েছে। হাত-পা খেলিয়ে শোয়া যায়। অসুবিধে হয় না। চারপাশে টানা বারান্দা। বারান্দায় নানা মাপের নানা ডিজাইনের চেয়ার, আরামচেয়ার। ঘরের লাগোয়া সুন্দর বাথরুম। চব্বিশ ঘণ্টা জলের ব্যবস্থা।

খুব ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে আমরা আশ্রম এলাকা ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব দিকই অবারিত। ভোরের বাতাসে হালকা সবুজের গন্ধ। ফুলের গন্ধ, পাতার গন্ধ, বনলতার গন্ধ। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, পোড়া ডিজেল নেই। বাতাস ঝনঝনে পরিষ্কার। সুরার মতো। জনপ্রাণী নেই। এত নিস্তব্ধ নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও অস্বস্তি হয়। মনে হয় নিস্তব্ধতা বিরক্ত হবে। আমাদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। কোনও পাখির ক্ষীণতম ডাকও কানে আসে। পাতা থেকে ঝরে পড়া এক ফোঁটা শিশিরের শব্দও শুনতে পাই। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে, মাঝে মাঝে আমরা বিশাল কোনও গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখি।

কী বিশাল আয়োজন! আমরা যেন পুতুল-মানব। পোকার মতো। পাথুরে পথ, পথ হারিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। মৃত্যুর মতো সাদা। আমরা স্তম্ভিত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকি দু'জন। সোমার কোলের কাছে কমল। ছবি তোলার কেউ থাকে না, তাই আমরা ছবি হয়ে যাই না।

কমলকে সোমা খুব সুন্দর করে সাজায়। সব সাদা। সাদা কলারঅলা গেঞ্জি। সাদা প্যান্ট। সাদা মোজা। সাদা স্পোর্টস শু। খুদে টেনিস প্লেয়ার। কমলকে যে কত সুন্দর দেখতে, কলকাতার বাইরে না এলে ঠিকঠিক বোঝা যেত না।

তিন-চার দিনেই কমল চনমনে, ঝলমলে হয়ে উঠেছে। মুখে একটু লালের আভাও ফুটেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে আমার ঘুম এসে যায়। ওরা দু'জন বসে বসে তখন কত কী করে। বাগানে চলে যায়। পাথর কুড়োয়। নানারকম পাতা এনে অ্যালবামে সাঁটে। সোমা আবার জল-রঙে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। সোমার যে এই গুণ আছে জানতুম না। গোপা গান গাইতে পারত না, সোমা সুন্দর গান করে। দু'জনে এত কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি পড়ে গেছি দূরে।

এখানে এসে আমার স্পষ্ট একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করছি। পৃথিবীতে নারী ছাড়াও যে দেখার আর ভাবার বস্তু আছে, এই বোধ জন্মেছে। শহরের খাঁচায় মানুষ কীরকম পারভার্ট হয়ে যায়। একটা প্রবৃত্তি কীরকম প্রবল হয়ে ওঠে।

রাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে বিছানায় যাই। মাঝে কমল। সোমার দিকেই সরে শোয়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সোমার নরম বুক ওঠা-নামা করছে। উঁচু হয়ে আছে তীক্ষ্ণ, অহংকারী নাক। অঢেল নিম্নাঙ্গ সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসা মৎসকন্যার মতো পড়ে আছে। পরম নির্ভরতার মতো। গুরু নিতম্ব লক্ষ্মীমন্ত। পূর্ণতার প্রতীক। দেখি। মনে ঘুম ছাড়া কিছুই আর আসে না। বুঝতে পারি, সোমা জেগে আছে। অপেক্ষা করছে, কমলের ঘুম কখন গাঢ় হবে। সোমার ভেতর একটা অতৃপ্তি আছে। একটু বেশি উর্বর। অনাবাদী থাকতে চায় না। আমি শুয়ে শুয়ে দেখি, জানলার বাইরে রাতের উদার আকাশ। জৈন মন্দিরের শ্বেতচূড়া। মাথায় ছোট্ট একটা শুভ্র আলোর ফোঁটা। শুনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছরছর করে পাথর নামছে। রাতের দুঃসাহসে পা পিছলেছে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর সোমা বলে, 'কী ঘুমোলে নাকি?'

সোমা দিনের বেলা আমাকে আপনি বলে। রাতের বেলা বলে, তুমি।

আমি প্রশ্ন শুনি। শুনেও নীরব থাকি। সোমা আবার বলে, 'কী ঘুমোলে নাকি?'

তখন বলি, 'আছি, আছি, জেগে আছি।'

সোমা সাবধানে শব্দ না করে উঠে পড়ে। মশারি তুলে নেমে দাঁড়ায় মেঝেতে। ফিসফিস করে বলে, 'নেমে এসো।' আমি তখন ভাবি, কেউ বলে না কেন, 'উঠে এসো।'

আমি নেমে পড়ি। নামতে নামতে ভাবি, আমি সোমার ক্রীতদাস। অন্ধকার ঘর। মন্দিরের চূড়ার স্নিগ্ধ, পবিত্র আলোর আভা মশারির গায়ে। শীতশীত রাত। সোমার সামনে দাঁড়াই। দুটো হাত সটান তুলে দেয় আমার কাঁধে। মখমলের আঁচল মেঝেতে লুটোয়। আমিও দু'হাত তুলে দিই তার অনাবৃত ভরন্ত কাঁধে। আমাদের দু'জনের মাঝের ব্যবধান কমতে থাকে। কমতে কমতে একসময় আর কোনও ব্যবধানই থাকে না। সোমা হাঁপাতে থাকে। উষ্ণ নিশ্বাসের ঝাপটায় আমার গাল-গলা ঝলসে যাবার মতো হয়। আমি বলতে থাকি, 'সোমা, কমল জেগে উঠতে পারে।'

সোমা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'উঠুক।'

সোমার বুকে মন্দিরের আলো এসে পড়ে। টলটল করছে বুক। ছলছল করছে শরীর। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে চুল। মার্বেল শরীর ঘামে ভিজে ভিজে উঠেছে। আমাদের কোথায় কী! কোথায় পড়ে আছি আমরা। কোথায় আমাদের পোশাক। দু'খণ্ড মেঘের মতো আমরা ভাসতে ভাসতে প্রভাতের তটরেখায়।

তখন আমরা অভিনেতা। বিছানায় ফিরে এসে চুপিচুপি শুয়ে পড়ি, দু'জনে দু'পাশে। ঘুমের ভান

করি। আর ভাবি পিতা-মাতা বলে পৃথিবীতে কেতাবি একটা সম্পর্ক বহুকাল চালু আছে। আসলে নেই। একটা কর্তব্য মাত্র। একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মতো। আসল সম্পর্ক হল, পুরুষ আর রমণী। কে কার বাবা, কে কার মা।!

বেশ যাচ্ছিল, হঠাৎ কমলের জ্বর হয়ে গেল। বিকেল থেকেই হাই উঠছিল ঘনঘন। আমাকে নয়, ভয়ে ভয়ে সোমাকে বলছিল, 'আমার গা গুলোচ্ছে মাসি।' সোমা একটা কারমিনেটিভ মিকশ্চার খাওয়ালে। তারপর রাত না নামতেই ধুম জ্বর। অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা।

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। আশেপাশে হুট বলতেই কোনও ডাক্তার পাওয়া যাবে না।

সোমা সাহস দিয়ে বললে, 'ফ্লু। ভয় পাবার কী আছে! অত ভিতু হলে ছেলেপুলে মানুষ করা যায় না। আমার কাছে ওষুধ আছে, দিয়ে দিচ্ছি। কালই সেরে যাবে।'

রাতে আমাদের আশ্রয়দাতা জৈন সন্ন্যাসী শ্বেতাম্বর দেখতে এলেন। কমলের পাশে বসে মাথায় হাত বোলালেন অনেকক্ষণ। প্রার্থনা করলেন। বলে গেলেন, 'কাল সকালে, সাতমাইল দূরে বড় একজন ডাক্তার আছেন, খবর পাঠাবেন তাঁকে।'

সন্ন্যাসী চলে যাবার পরেও, ঘরে একটা পবিত্র ভাব ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। রাতে, বিছানায়, কমলের মাথার দিকে বসল সোমা, আমি বসলুম পায়ের দিকে। কমল পড়ে আছে জ্বরের ঘোরে। সোমা কপাল টিপছে। আমি পা। কমল কেবলই বলছে, 'বাবা, তুমি ছেড়ে দাও।'

শেষে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। সোমা ওষুধ দিয়েছিল। অল্প অল্প ঘামছে। শেষ রাতে হয়তো জ্বর ছেড়ে যাবে।

সোমা মেঝেতে নেমে বসেছে। গয়ের আঁচল সরিয়ে ব্লাউজ খুলে ফেলল। ফেলে দিল বন্ধনী। আমাকে বললে, 'আঁচল দিয়ে পিঠটা বেশ করে ঘষে দাও তো।'

সোমার এই স্বভাবটা আছে। মাঝে মাঝে পুরুষের সেবা চায়। পেছন দিকে হাঁটু মুড়ে বসে, ফরসা, চওড়া, নধর পিঠে শাড়ির আঁচল ঘষছি, সোমা বললে, 'দেখো তো, আমার সেই সাদা দাগটা কতটা ছড়াল?'

'অন্ধকারে দেখা যায়?'

'যায়। অন্ধকারে হাসলে দাঁত দেখা যায় না!'

'কোথায়?'

'আর একটু নীচে'

'কোথায়?'

'আরও নীচে।'

'কত নীচে নামব?'

'যতটা নামা যায়।'

ভোরে কমলের গা বরফের মতো শীতল। জ্বর ছেড়ে গেছে। তবু এগারোটা নাগাদ ডাক্তার দেখে গেলেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। নতুন জায়গা, নতুন জল, ভোরের ঠান্ডা। সম্পূর্ণ বিশ্রাম একদিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের কেস হিস্ট্রি অল্প অল্প বললুম। শুনলেন, তবে পাত্তা দিলেন না।

সারা সকাল কমল নেতিয়ে শুয়ে রইল। জ্বর নেমে গেছে, বিছানা ছেড়ে নামার যেন ইচ্ছেই নেই। হয় চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে, না হয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। জৈন মন্দিরের শ্বেত চূড়া প্রখর রোদে ধ্যান-স্তব্ধ, মৌন সন্ন্যাসী। ক্যালিপটাসের পাতায় বাতাস ধরার বায়না। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভজনের সুর। বারান্দায় বসে আছি চুপ করে। নানা রঙের প্রজাপতি কাগজের টুকরোর মতো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। রোদের তাতে গোলাপের জমাট বুকে রক্ত জমছে। কমলের জ্বর ছেড়েছে। সোমা তাই খুশি খুশি। সাঁওতাল রমণীদের মতো শরীরে

শুধুমাত্র শাড়ির প্যাঁচ মেরে, বাথরুমে ঢুকেছে সেই কখন! 'সোমা, তোমার মায়ের কথা, দাদার কথা মনে পড়ছে না!'

'পড়ছে। যা কিছু ভুলতে চাওয়া যায়, তাই মনে পড়ে বেশি করে। আর যা কিছু মনে রাখার চেষ্টা করা যায়, ভুলে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। বিস্মৃতি গিলে ফেলে হাঙরের মতো।'

বহুৎ ঠিক। গোপাকে যত মনে রাখার চেষ্টা করছি, গোপা ততই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সোমা আমাকে গ্রাস করেছে লাল সমুদ্রের হাঙরের মতো। নেশায় পড়ে গেছি। সোমা গোপা নয়। অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ। অনেক বেশি জীবন্ত। গনগনে আগুন। এ আগুন এমন আগুন ঝলসে যেতে ভাল লাগে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে কমলের ক্ষীণ ডাক ভেসে এল, 'বাবা, তুমি কোথায়?'

'এই যে বাবু, আমি এখানে বসে আছি বারান্দায়।'

'তুমি একবার আসবে বাবা।'

'কী বলো?'

'বোসো না, আমার কাছে।'

'বলো? দেখি তোমার গা দেখি। বাঃ, ফাসক্লাস। নো ফিভার।'

'বাবা, আমি যে পারছি না?'

'কী পারছ না বাবু?'

'তুমি রাগ করবে না বলো?'

'তোমার ওই এক কথা। বলো, কী পারছ না?'

'আমি যে আমার ডান পা-টা আর নাড়াতে পারছি না। এই দেখো আমার ডান হাতটাও একটু ওপরে উঠে কেমন কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছে।'

'সে কী রে? দাঁড়া তোর মাসিকে ডাকি।'

ডাকতে হল না। গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে সোমা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

'সোমা শিগগির এসো।'

সোমা গুনগুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে, 'আমার বেলা যে যায়'।

এগিয়ে এল, 'কী হল আবার?'

'কমল বলছে ডান পা নাড়াতে পারছে না। আর এই দেখো ডান হাতেও কোনও সাড় নেই। তুলতে গেলে কোনওরকমে একটু উঠছে, আর কেঁপে কেঁপে পড়ে যাচ্ছে। কমল, মাসিকে দেখাও কী হচ্ছে!'

কমল দেখাল।

সোমা হাসি হাসি মুখে বললে, 'দুষ্টু ছেলে। বাবাকে ভয় দেখানো হচ্ছে!'

কমলের মুখটা এতটুকু হয়ে গেল। হাসবার চেষ্টা করল। হাসি এল না। চোখে জল এসে গেল। ফোঁটা ফোঁটা গড়াতে লাগল গাল বেয়ে।

সোমা তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। মনে নেই ভিজে কাপড়। বিছানার চাদরে জল বসে যাবে।

কমলের ডান পা নিয়ে শুরু হয়ে গেল সোমার নানা পরীক্ষা। পায়ের পাতার তলার দিকে নখের আঁচড় দিল অনেকক্ষণ। কমল পা টেনে নিল না। চিমটি কাটল। কোনও বিকৃতি এল না মুখে। সোমা কেবলই জিজ্ঞেস করছে, 'লাগছে, লাগছে।' কমলের মুখে কোনও কথা নেই। জল ভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি একসময় উত্তেজিত হয়ে একটু কড়া গলায় বলে ফেললুম, 'আহা, লাগছে কি না বলবে তো?'

চোখের পাতা পড়ছে না। বিস্ফারিত দু'চোখ। ফোঁটা ফোঁটা জল নামছে গাল বেয়ে, মুক্তোর দানার মতো সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপল দু'বার। শব্দ নেই।

সোমা ভিজে কাপড়েই কমলের বুকে পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আর ফুলে ফুলে বলতে নাগল, 'এ তুই কী করলি কমল! এ তুই কী করলি!'

আমার সারা শরীরে একটা শৈত্যপ্রবাহ বইতে শুরু করেছে। চারপাশ থেকে একটা ভয় তেড়ে আসছে। সেদিন নীলপাহাড়ে উঠে আমার এইরকম ভয় হয়েছিল। পাহাড়ের পর পাহাড়। তারপর পাহাড়। কেউ কোথাও নেই। জনপদের চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর পাথর। নীচে পাহাড়ি নদীর মস্ত মজা বেড। ছোট বড় নানা পাথরের বিস্তীর্ণ বিছানা। পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে দেখাচ্ছে, যেন মৃত্যু দাঁত বের করে নীরবে হাসছে। বাতাস কান ছুঁয়ে শিনশিন বয়ে যাচ্ছে, সরু চুলের মতো। একটা কথা বললে অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। একবার কমল বলে ডেকেছিলুম। অসংখ্য কমল, পাহাড় থেকে পাহাড়ে বিলীন হয়ে গেল। কিছু দূরে ছেতরে পড়ে ছিল একটা শকুনের কঙ্কাল।

হঠাৎ মনে হল আমি অনেকক্ষণ সোমার দিকে তাকিয়ে আছি। ভিজে কাপড়ের এখানে ওখানে ফুটে আছে চাঁপাফুল রঙের শরীর। দুটি অতি কোমল বন্ধনহীন বুক কমলের দেহ ছুঁয়ে দুলছে। মনে হল মধ্যরাতে দেহোন্মাদনার অবসরে আর ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বলতে হবে না, এই আস্তে, কমল জেগে উঠবে। পথ পরিষ্কার।

সোমা হঠাৎ ঝাঁকুনি মেরে উঠে বসল। কপালে ভিজে চুল। দু'চোখে জল। ভীষণ আক্রোশে বললে, 'শয়তান'।

কাকে বললে? আমাকে না ভাগ্যকে!

হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ
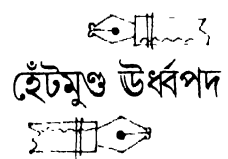
জিনিসটা বেশ জমে উঠেছে। তা তো জমবেই বিশ-বাইশ বছরের খেলা। চালে বেচালে জীবনের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় অবস্থা। লিখতে জানলে জমজমাট একটা উপন্যাস লিখে ফেলা যেত। কে ছাপত তা অবশ্য জানি না। লেখার চরিত্র হওয়া সহজ, লেখক হওয়া সহজ নয়। বাইশ মন তেলও পুড়ল না, রাধাও নাচল না। ডেলি দেড় বোতল পেটে ঢালতে হবে। ঢালতে ঢালতে মাথার ইঞ্জিন একদিন স্টার্ট নেবে, তারপর বেরিয়ে আসবে চোলাই করা জীবন-কাব্য। আমার সে ক্যাপিটাল নেই। লেখক আমি হতে পারব না। চরিত্র হয়েই ঘুরে বেড়াই।

আমার ছেলেটা প্রায় বখেই গেছে। মেয়েটা বেরিয়ে যাব বেরিয়ে যাব করছে। আমার স্ত্রী যে-কোনও দিন পাগল হয়ে যেতে পারে। আমার টিমের একেবারে তছনছ অবস্থা। ফরোয়ার্ড লাইনে খেলছিলুম আমি। ডিফেনসে ছিল আমার স্ত্রী। ভালই খেলছিলুম। গোল করতে না পারলেও, ডিফেনসটা ভাল ছিল বলে গোল খাইনি। এইবার একেবারে পেড়ে ফেলবে। বোকার মতো চারতলার ওপর একটা ফ্ল্যাট কিনে যা পুঁজি ছিল শেষ করে ফেলেছি। এখন আমি কলে পড়া ইঁদুর। গালে দুটো চাল ফেলে চিবিয়ে এক গেলাস জল খেলে পিত্ত নিবারণ হয়, ফ্ল্যাট ধুয়ে তো আর পেট ভরবে না। টাকাটা ব্লকড হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে থাকলে সময়ে অসময়ে খরচ করা যেত। সুদ পাওয়া যেত। এই চার তলায় বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। আর এই ওনারশিপ ফ্ল্যাট এমন একটা জিনিস, ভাবলে হাসি পায়। জমির মালিক আমি নই। সে পড়ে আছে অনেক নীচে। কার্পেটের মতো এক ফালি শূন্যে ঝুলন্ত ইটের খাঁচা, আমি তার মালিক। শূন্যকে এইভাবে যে কেনা যায় আমার জানা ছিল না। তবে সেখানেও গোলমাল। যে কোঅপারেটিভের ফ্ল্যাট, সেই কোঅপারেটিভের মেম্বারদের মধ্যে লেগে গেছে লড়াই। টাকা পয়সা মারামারির ব্যাপার। বাজারে লাখ লাখ টাকা দেনা। সেই দেনা শোধ করতে হবে। তার মানে আবার বেশ কিছু টাকার ধাক্কা।

বন্ধুগণ তোমরা কোথায়!

কেউ কোথাও নেই রে ভাই। কেবল আমি আছি। আর আমার পেছনে তেড়ে আসছে বেচালে পা ফেলার ইতিহাস। জীবন এমন এক বিশ্রী অঙ্ক। কষতে কষতে কোথাও একবার একটু ভুল হয়ে গেলে আর উত্তর মিলবে না। আর এ অঙ্ক একবারই কষা যায়। আবার তিরিশ বছর পেছিয়ে জীবনটা শুরু করতে পারলে অন্যরকম চেহারা হত। সে তো আর উপায় নেই। এখন খোলের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখার কৌশল জানা থাকলে কী দেখতুম! একটা ধোপার গাধা পিঠে বোঝা নিয়ে টুকুস টুকুস চলেছে। চলেছে চলেছে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির রকে দুটো মাতাল রিকশাঅলা রাতে এসে শুত। তাদের মধ্যে একজন রাতে গল্প না শুনলে ঘুমোতে পারত না। আর একজন তাকে গল্প শোনাত। রাজপুত্র জঙ্গলের পথ ধরে চলেছে। বিহারি মাতাল সারারাত ধরে বলেই চলেছে যাতে, যাতে, যাতে, যাতে আর শ্রোতা সারারাত ধরে উত্তরই দিয়ে যাচ্ছে, হাঁ রে হাঁ রে। সেইরকম আমি গাধা, চলেছে চলেছে চলেছে। চলতে চলতে জীবনের মাঝমাঠ পর্যন্ত চলে গেছে। জীবন যদি সত্যিই উপন্যাস হত, তা হলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে লিখতুম।

প্রথমে যা করতুম তা হল নীপার সঙ্গে নিজের বিয়েই দিতুম না। জীবনে সুন্দরী বউয়ের মতো যন্ত্রণা আর দুটো নেই। আবার সে বউ যদি এক সময়ের ছাত্রী হয়। গুরুর আসন থেকে টলে স্বামীর আসনে নেমে এলে গুরুর ইজ্জত তো গেলই, স্বামী হিসেবেও অপভ্রংশ হয়ে গেল। শিক্ষক থেকে সেবক। দাতা থেকে ভিখারি। সেই সময় অনেকেই বারণ করেছিলেন। এমন কাজটি কোরো না।

বাঙালির ছেলে চাকরিবাকরি করছ। একবার ঘণ্টা বাজালেই শয়ে শয়ে মেয়ের বাপ তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আর দেনা-পাওনার ব্যাপারে একটু উদার হলে তুমি হপ্তায় হপ্তায় বিয়ে করবে। গাধা কোথাকার! এমনি গাধার তো অসুবিধে নেই গাধা হয়েই জন্মেছে। মানুষ গাধা হয়ে গেলে, পরে তার বোধোদয় হয়, তখন আর পিঠ থেকে বোঝা নামাবার উপায় থাকে না। সে যে কী জ্বালা।

নীপার সঙ্গে যখন আমার এইসব হচ্ছে তখন বয়েস কম। ঠোঁটের ওপর নব-কার্তিকের মতো সরু গোঁফ। সেইটাকেই পরে চওড়া করে আর দেহে একটু ঢ্যাপসা হয়ে বিশ্বকর্মা হয়েছিলুম। মেয়ে যদি দেখতে শুনতে চটকদার হয়, আবার সে যদি একটু দিলখোলা দিলদার হয়। হয়ে গেল। সে একেবারে ফোটা ফুল। সারাদিন তাকে ঘিরে কত ভ্রমরের যে ভ্যামোর ভ্যামোর। এমন মেয়েকে একলা করে নিজের কাছে নিয়ে আসা, শুধু বিয়ে নয়, জয় করা। গোঁদো পিঁপড়ে ছাড়িয়ে মুখে বাতাসা ফেলার মতো।

কী থেকে যে কী হয়, কী হতে পারে, সে বোধটাই তখন আচ্ছন্ন। সেই সময় ওই গানটি ছিল খুব পপুলার। ও দয়াল বিচার করো/ আমায় গুণ করেছে, আমায় খুন করেছে/ আমায় গুণ করেছে, খুন করেছে ও বাঁশি। আর নীপার তখন ফর্ম কী! চিকন কালো চুলের ঢল কোমরটোমর ছাপিয়ে, হাঁটু পেরিয়ে প্রায় গোড়ালি ছুঁই ছুঁই। বেতসের মতো দেহ। বাঙালি মেয়ের এমন হাইট সচরাচর দেখা যায় না। হাতদুটো যেন মৃণালের লতা। পান পাতার মতো মুখ। চিবুকের কী শোভা! টিকোলো নাক। আর ওই চোখ দেখেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল। নায়িকা হবার জন্যেই নীপার জন্ম। যত সুন্দরীই হোক, কোথাও না কোথাও একটা খুঁত থাকেই। বাইরে না থাকলেও ভেতরে থাকে। যেমন দাঁতে। নীপার দাঁত দু'পাটি যেন মুক্তোর মালা। পাশাপাশি সেট করা। হাসলে মনে হত অজ্ঞান হয়ে যাই। সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত ভোঁদা মতো হয়। রূপের অহংকারে গোবদামুখো। নীপা ঠিক তার উলটো। যেমন ছিল তার সেনস অফ হিউমার, তেমনি ছিল ইনটেলিজেনস। যেমন হাসতে পারত তেমনি হাসাতে পারত। স্বাদেগন্ধে অতুলনীয় দার্জিলিং চায়ের মতো নীপা।

এমন মেয়েকে পড়ানো যায়! প্রেমে পড়া যায়। নীপাদের ফ্যামিলির বেজায় বদনাম ছিল। নীপার বাবা বিদেশে চাকরি করতেন। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। দারুণ স্বাস্থ্য। মুখে সবসময় একটা হাসি হাসি খুশি খুশি ভাব। এক মাসের ছুটিতে আসতেন। আবার চলে যেতেন। পরের ছুটিতে এসে দেখতেন একটি মেয়ে হয়েছে। ভদ্রলোক মোট এগারোটি কন্যার পিতা হয়ে সগর্বে হাসি হাসি মুখে ঘুরে বেড়াতেন। সকালের সাজ ছিল ফুলছাপ লুঙ্গি, স্যান্ডো গেঞ্জি। বুকের কাছে দোল খেত কামরূপ কামাখ্যার কোনও এক তান্ত্রিকের দেওয়া বাঘের নখ। রুপোর চেনে বাঁধা। বিকেলের সাজ ছিল পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক ডজনে উঠতে পারতেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মা হবার কাল জৈবিক নিয়মেই ফুরিয়ে গেল। নীপার মাকে দেখলে মনেই হত না, এগারোটি মেয়ের মা। চেহারায় এমন একটা চটক ছিল। আসলে যে-কোনও কাজই প্রফুল্ল চিত্তে করলে শরীর ভাঙে না। আর বলে না, বুড়োরা তরুণীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে যৌবন অনেকদিন ধরে রাখতে পারেন। মেয়েদের বেলায় উলটোটা। নীপার মা উঠতি বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে, শরীর খুলে মিশতে পারতেন। এই সিনেমায় যাচ্ছেন, থিয়েটারে যাচ্ছেন। ঘরে বসে আড্ডা মারছেন। পান খাচ্ছেন। অনেকে বলতেন, পান করছেন। খাটে শুয়ে আছেন। এ পাশে একটা। পায়ের কাছে আর একটা। সে সব দেখার মতো দৃশ্য। রক্ষণশীলরা আঁতকে উঠবেন। সেকাল হলে সমাজনেতারা বিধিমতো ব্যবস্থা নিতেন। একালে সমালোচনাই হয়। নীপাদের সম্বন্ধে যাঁরা খারাপ খারাপ কথা বলতেন, তাঁরা ইচ্ছে করলেই নীপার মায়ের আখড়ায় গিয়ে ঢুকতে পারতেন। কোনও বাধা ছিল না। ভদ্রমহিলার তেমন বাছবিচার দেখিনি। মণি স্যাকরা সেও আসছে, কয়লার দোকানের মালখোর সুব্রত সেও আসছে। গয়লা লছমন সেও আসছে, আবার যুবনেতা অমরেশ সেও আসছে। সর্বধর্ম সমন্বয়।

বাড়িটা যেন ধর্মশালা। তীর্থস্থান। মজা এই, শাসন নেই, বিধিনিষেধ নেই, অথচ মেয়েগুলো টপাটপ পাশ করে যাচ্ছে। ভাল রেজাল্ট করছে। কেউ গাইছে। কেউ নাচছে। অতগুলো মেয়ে এক বাড়িতে, অথচ নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি নেই। যেন পাখির বাসা। গান, নাচের বোল, ঘুঙুরের শব্দ, গলা ছেড়ে পড়া মুখস্থ, সারাদিন সে এক দেখার জিনিস। মানুষ ভালটা তো দেখতে পায় না। টেনে টেনে খারাপটাই বের করে আনবে। কেউ একবার ভেবে দেখলে না, কেন নীপার মাকে যে জানে না, সে নীপার বোন বলে ভুল করে। বয়েসটাকে এইভাবে ধরে রাখতে জানার কৌশলটা কী! পাড়ায় আরও তো সব উদাহরণ ছিল এক ছেলের মা যেন দিদিমা! তিরিশ না পেরোতেই অ্যানিমিয়া। চল্লিশেই চালশে। হরি দিন তো গেল। পঞ্চাশে টিকটিকির ন্যাজের মতো চুল। ব্যাঙের মতো দেহত্বক। কপালে ভাঁজ। মুখে খড়ি। বিবাহিতরাই নীপাদের বেশি নিন্দে করত তার কারণটা মনে হয় নিজেদের বউ। কুড়িতেই সব বুড়ি। ময়লা ময়লা শাড়ি, রংচটা ব্লাউজ। চুলের কোনও যত্ন নেই। পাশ দিয়ে চলে গেলে গন্ধ বেরোয়। পায়ের গোড়ালি ফাটাফাটা, ছ্যাতলা ধরা। বাইরে যাদের এই অবস্থা তাদের অন্তর্বাসের কথা চিন্তাই করা যায় না।

নীপার মা ছিলেন একেবারে অন্যরকম। আমি একবার তাঁর চুল শুকোবার কায়দা দেখেছিলাম। আমরা তখন থিয়েটার, ফাংশন এইসব করি। সংসারে ঢোকার আগে সব ছেলেমেয়েই একটু সংস্কৃতি করে, প্রেম করে, কবিতা লেখে। এই হল নিয়ম। যেমন সব মানুষই শৈশবে বিছানা ভিজোয়। দিন নেই রাত নেই নীপাদের বাড়িতে আমাদের রিহার্সাল চলেছে। সেই সময় নীপার মাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিজের মনের কথা মানুষ সহজে প্রকাশ করতে চায় না। যা করে, যেটুকু করে সেটা মোটেই মনের নয়, ব্যবহারিক জগতে কাজ আদায়ের কথা। একমাত্র রেগে গেলে মন কিছুটা বেরোয়, সেটা হল অন্যের সম্পর্কে নিজের ধারণা। নিজের প্রকাশ নিজে করার সাহস থাকলে, আমি বলতুম নীপার মাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। যে বয়েসের কথা বলছি, সে বয়েসের মানুষ কোনও কিছুকেই পাপ বলে মনে করে না। পাপের চিন্তা আসে পরে, যখন রক্তের জোর কমে যায়। যখন মানুষ অভ্যস্ত জগতে দীনহীনের মতো একটু আশ্রয় খোঁজে। বেপরোয়া ভাবটা যখন আর থাকে না। সব কাজেরই যখন সামাজিক সমর্থন খুঁজতে হয়, যখন চারপাশ থেকে তেড়ে আসতে থাকে নানারকম ভয়।

সেই সময় একদিন।

বেলা একটা নাগাদ আমাদের রিহার্সাল শেষ। নীপা বললে, আজ আপনি আমাদের এখানেই খাওয়াদাওয়া করে যান। তখন নীপা আমাকে আপনিই বলত। সবে স্নান করে এসেছে। ভিজে ভিজে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। ভুরু চোখের পাতা সিক্ত। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে খাবার কথা বললে। নীপা আমার কাছে এমনিই লোভনীয়, তার ওপর তার ওই একান্ত ঘরোয়া ভঙ্গি। শাড়ি পরার আলগা ধরন। ভালমন্দ এমন কিছু খাওয়াতে পারবে সে আশা নেই। অত বড় সংসার। পোস্ত, বিউলির ডাল আর ট্যাড়শ, এর বেশি কী আর জুটবে! খাওয়া নয় নীপাই আমার আকর্ষণ. তার চেয়েও বড় আকর্ষণ নীপার মা। রাজি হয়ে গেলুম।

অনেকক্ষণ থেকেই সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। যে ঘরে বসেছিলুম সেই ঘরটা ক্রমশই ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল। পুজো হচ্ছে, পুজো হবে কেন? আমাদের বাড়িতে ধর্মটর্ম হয় না, মায়ের চুল শুকোনো হচ্ছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নীপার মা শুয়ে আছেন উঁচু খাটে। পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে মাথার চুল। তলায় একটা মাটির পাত্রে টিকের আগুন। সেই আগুনে পুড়ছে ধুনো গুগগুল আর চন্দন। রেশমের মতো নরম চুল বেয়ে সাপের মতো সুগন্ধি ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

নীপার মা বললেন, বোসো না এখানে।

বুকটা কেমন করে উঠল। একেবারে খাটে, তাঁর পাশে বসার আহ্বান। নীল ডুরে শাড়ি। সাদা

ফিনফিন ব্লাউজ। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। ফরসা গালে ছোট্ট একটা কালো তিল। পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পরে বুঝেছিলুম, আমরা সকলেই মন দিয়ে জগৎটাকে দেখি। আসল রূপ, অবিকৃত রূপ তাই ধরা পড়ে না। কোটি মানুষের কোটি জগৎ। নীপার মা আমাকে হয়তো খুব ভাল মনেই বসতে বললেন, আমি কিন্তু বসে মোটেই স্বস্তি পেলুম না। তখনকার মনের সেই অবস্থাটাকে তখন আমার পাপ বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছিল সুযোগ। একটা আহ্বান। আমি বসেছিলুম ডানদিকে শরীরে শরীর ছুঁইয়ে। নীপার মা ডান পা-টা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে তুলে আমার পিঠে ঠেকিয়ে দিলেন। নরম উরুর ঘন জগতে আমার পিঠ ডুবে গেল। সে যে কী শিহরন। মহিলার বয়স আমার দ্বিগুণ। বিবাহিতা। অভিজ্ঞা। এই ভাবনাতেই আমার রোমাঞ্চ। কাচপোকা যেন আরশোলা ধরেছে। নীপার মা পা-টাকে এদিক ওদিক করছেন আর আমি দুলছি। আমার জগৎটাই দুলছে। অথচ বাইরে সবকিছুই স্বাভাবিক। নীপা বারান্দায় শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। সেও বড় কম আকর্ষণীয় দৃশ্য নয়। নীপার দিদি ভিজে চুলে ভিজে গামছা জড়িয়ে এঘর-ওঘর করছে। পরের বোনটা একেবারে ছোটটাকে ভাত খাওয়াচ্ছে। কারুর কিছুই মনে হচ্ছে না, অথচ আমি মরে যাচ্ছি। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছি নীপার মায়ের দিকে। আমার চোখে রাত নামছে। জানলা দরজা বন্ধ হচ্ছে। আলো নিবছে।

এখন আমি ভাবি, নানারকম বই পড়ে সমর্থনও পেয়েছি, আমি অসুস্থ। আমার রক্তে পাপ আছে।

আমার সুন্দর চেহারা বাইরে থেকে সুন্দর মনে হলেও ভেতরটা ক্ষতচিহ্নে ভরা। পক-মার্কড। আমার জীবন স্বাভাবিক হতে পারে না। এ বোঝা বয়সের বোঝা। যৌবনে এসব বুঝিনি। আমার আত্মীয়স্বজন যত ছিছি করেন আমার ঘোর তত বাড়তে থাকে। একে একে সবাই আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। আমার যেন দুরারোগ্য বসন্ত হয়েছে। সব সরে সরে যাচ্ছেন। প্রতিনিধি মারফত বলতে লাগলেন— সুখী হবে না, সুখী হবে না। বিপদে পড়বে। জ্বলে পুড়ে মরবে। ওদের ওটা সংসার নয়। ওটা কামরূপ কামাখ্যা। তুকতাক জানে। বশীকরণ জানে। মহিলাটি আসলে কিন্নরী। শাস্ত্রে অমন মহিলার উল্লেখ আছে। যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন, সব ছুটে এলেন, ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। এক ডজন মায়াবী ছেলেটাকে চুষে খাচ্ছে।

নীপা সপ্তাহে তিন দিন আমাদের বাড়িতে আসত পড়তে। এ বাড়িতে কী হচ্ছে তার জানার কথা নয়। নীপাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এ কথা কোনওদিন মুখ ফুটে বলিনি। অথচ সবাই গেল গেল করছে। নীপাকে ভাল লাগে তার মানে এই নয় আমি বিয়ে করব। আত্মীয়স্বজনরা ওইভাবে আদা-জল খেয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে না নামলে আমি এইভাবে মরতুম না। আমাদের বাড়িতে নীপার পড়তে আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিন্তু সত্যিই তাকে পড়াতাম। আমার ভেতরে যাই থাক না কেন, শিক্ষক হিসেবে খারাপ ছিলুম না। বরং ভাল লাগত বলেই প্রাণ ঢেলে তাকে পড়াতুম। আমার যত কামনা সব বেরিয়ে আসত সংযমের গাম্ভীর্য হয়ে। আমি ভেতরে কী ভাবছি নীপাকে কোনওদিন বুঝতে দিইনি।

তবে অসংযম অনেকটা ড্যামের মতো, জলাধারের মতো। সময়মতো স্লুইসগেট খুলে কিছুটা বের করে দিতে না পারলে ফেটে বেরিয়ে যায়। আমার বেলায় তাই হল। যাই বলি না কেন, মনে মনে আমি নীপাকে ভোগ করতুম। আমার মনের মুঠোয় সে ধরা ছিল। যেমন খুশি যেভাবে খুশি তাকে ব্যবহার করতুম। নীপা যেন আমার বাতের ব্যথা। সব সময় গাঁটে গাঁটে ঘুরছে। সেই নিয়েই চলাফেরা কাজ কর্ম। কারুর বোঝার উপায় নেই, লোকটা আড়ষ্ট একটা ব্যথা নিয়ে, ঘিনঘিনে একটা যন্ত্রণা নিয়ে কেমন ঘুরছে।

সে ছিল দোলের দিন।

ঘটনাটা ঘটে গেল আমাদেরই বাড়িতে। তিনি, মানে সেই ঈশ্বর যখন কিছু ঘটাবেন তখন পথ

পরিষ্কার করে রাখবেন। লোভ দেখাবেন। অদৃশ্য ফাঁদ পেতে রাখবেন। অদৃষ্টের সুতো ধরে টানবেন। সেই ফাঁদে পড়ার নামই ভাগ্য। পরে এক প্রাচীন রাজার জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছিলুম— তিনি স্পষ্ট লিখছেন— ক্যারেক্টার ইজ ডেসটিনি। চরিত্রই ভাগ্য। চরিত্রই নিয়তি। আবার ওই নীপাকেই একদিন অ্যারিস্টটল পড়াতে গিয়ে দেখেছিলুম— তিনি বলছেন— আওয়ার ক্যারেক্টার্স আর দি রেজাল্ট অফ আওয়ার কনডাক্ট। আমরা যা করে ফেলি তার ফলই হল চরিত্র। সোজা কথা তবে কে আর অত ভাবছে। ঘটনার সামনে এসে কে আর পা ছড়িয়ে ভাবতে বসে, নোভালিস কী বলেছেন, কী বলেছেন অ্যারিস্টটল। চরিত্রই ভাগ্য আর আচরণই চরিত্র। আর সব ঘটে যাবার পর ড্রাইডেনের মতো বলতে হয়— অল হিউম্যান থিংস আর সাবজেক্ট টু ডিকে। অ্যান্ড হোয়েন ফেট সামনস মনার্কস মাস্ট ওবে। মানুষ মরবেই আর ভাগ্য যখন কান ধরে টানবে তখন পরাক্রান্ত নৃপতিরও নিস্তার নেই।

আমাদের বাড়ির বড়কর্তারা ছিলেন বড় মজার মানুষ। ন্যায়, নীতি, আদর্শ, ধর্ম এই সব বলে নৃত্য করতেন, আবার সুযোগ পেলেই ছোটখাটো পাপও করতেন। দোলকে মহা উল্লাসে ওঁরা বলতেন ফাগুয়া। সেদিন একটু নেশাটেশা চলত। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত গানবাজনার আসর। মাঝেমধ্যে পশ্চিমি ওস্তাদেরা এসে হাজির হতেন। দখিনা বাতাস, ঠুংরির মোচড়, তবলার বোল, সব মিলিয়ে বাড়ি যেন বৃন্দাবন। সেদিন সব অনাচারই দেখা হত ক্ষমার চোখে। অফুরন্ত খাবার আর পান, পানীয়ের ব্যবস্থা। গরম গরম তেলেভাজা, পকোড়া, ঘি চপচপে হালুয়া। সারা বছর যাঁদের মুখ গম্ভীর গোবদা, মনে হত ও মুখে হাসি আর ফুটবে না, সেই সব মুখের কী চেহারা সেদিন। অফুরান রসিকতা, অনর্গল হাসি। চরিত্রবান, কট্টর মানুষেরা প্রগল্‌ভ হলে কেমন যেন লাগে। কুলবধূ হঠাৎ খেমটা নাচলে যেমন হয়। তা ফাগুয়ার দিন গেলাস গেলাস সিদ্ধির কল্যাণে আমাদের বাড়ির বাঁধন আলগা হয়ে যেত। মুখে জর্দাপান ঠুসে বেনারসি ঘরানার মহিলা শিল্পী আদিরসাত্মক ঠুংরি ধরতেন। তাঁর বুক থেকে আঁচল খসে পড়ত। পুরুষ্টু গর্দানে সোনার মটরদানা হার। মাথা নাড়াবার তালে তালে কানের ঝুমকো দুল টিংলিং করত। নাকের ডগায় চিনির দানার মতো জর্দা ঘাম। গোল গোল পুরু পুরু হাতে সোনার চুড়ি আর বালা। গানের কী লচক। গজলের জোর দেবার সময় দেহের কী দুলুনি, হাতের কী ভঙ্গি। কর্তাদের দেখে মনে হত, কান দিয়ে কেন চোখ দিয়ে গান শুনছেন। সংসারের নারী সেবা করে তার বেশি নয়। নারী যে রূপে মোহিনী তার জন্যে হাত বাড়াতে হয় সংসারের বাইরে। মানুষ অনেক কিছু চাপতে পারে কাম চাপা বড় কঠিন। প্রথম রিপু। প্রবল রিপু। আড়ালে আবডালে মধ্যরাতের মশারির লীলাভূমিতে বাঘ বেরোয় চাপা হুংকারে তাই শিকারির খোঁজ পড়ে না ম্যানইটার মারার জন্যে।

পাছে বড়দের ওপর অশ্রদ্ধা আসে, তাই ফাগুয়ার আসর থেকে আমি পালিয়ে থাকতুম। এক বছর নেশার ঘোরে আমাদের এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ড চেপে ধরেছিলেন তোমাকে নাচতে হবে। সে এক ঝুলোঝুলি ব্যাপার। উদয়শঙ্কর যদি নাচতে পারেন তুমি কেন পারবে না ছোকরা। সেই থেকে আসরে আর ভুলেও উঁকি মারি না।

চিলেকোঠায় আমার একটা আস্তানা ছিল। সেই ঘরটা ছিল সংসারের গুদামখানা। ভাঙা বেতের চেয়ার, ছেঁড়া লেপ, তোশক, শতরঞ্চি, দড়িদড়ার সমাধিক্ষেত্র। কাচ ভাঙা ছবি। লণ্ঠন। একটা অবহেলিত ঝাড়বাতি। এই ঘরেই ছিল বেশ বড় মাপের একটা ছবি। কোনও এক সুন্দরী মহিলার। আমাদেরই কোনও আত্মীয়ার আত্মীয়া। সম্পর্কের শিকড় কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায়। কাচ ভাঙা ছবিটাকে ঝেড়েঝুড়ে আমিই এক কোণে খাড়া করে রেখেছি। ছোট ছোট সাদা সাদা দাগ ফুটেছে। মুখটা কিন্তু অক্ষত ছিল। এ ঘরে যখন নির্জনে এসে বসতুম তখন ওই ছবির মেয়েটি আমাকে তার জীবনকাহিনি শোনাত। ছবি শোনাত না, আমি বসে বসে বানাতুম। মেয়েটির নাম তন্দ্রা। যার অমন ঢুলুঢুলু চোখ তার নাম তন্দ্রা না হয়ে অন্য কিছু হতেই পারে না। তন্দ্রা, পাটনার

র‍্যাভেনশ কলেজে পড়ত। পাটনায় ওই নামের কোনও কলেজ আছে কি না জানি না। তবে তন্দ্রার যেরকম সুন্দর ফিগার তাতে বিহারেই তার মানুষ হওয়া উচিত। আর র‍্যাভেনশ কলেজ যেখানেই থাক সেখানেই সে পড়েছে ফিলজফি নিয়ে। তন্দ্রা খুব ভাল গান গাইত। ইন্টার কলেজিয়েট কনটেস্টে ভজনে প্রথম হয়েছিল। তন্দ্রা পঞ্চাশ সালে পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। তার দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডুবে যাবার তিন দিন পরে চক্রতীর্থের কাছে একটা ফিকে হলুদ শাড়ি ভেসে এসেছিল। তন্দ্রারই শাড়ি। ওইটা পরে জলে নেমেছিল। সেদিন ছিল শ্রাবণ পূর্ণিমা।

চিলেকোঠার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ঝলক ঠুংরির বোল ভেসে এল, পিয়া না মানত মানা। বেশ জমেছে। ঠুংরি শুনলেই মনে হয় আমি সাজাহান। ভরা চাঁদের আলোয় নিজের তৈরি তাজমহলের জাফরির ছায়ায় ছায়ায় মমতাজের প্রেতাত্মাকে খুঁজছি।

দরজার দিকে পেছন ফিরে সামনে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে নীপা। টকটকে লাল আবির মাখা মুখ। বড় বড় নীল দুটো চোখ। সাদা শাড়ি। সেই শাড়িতে যারা রং মেরেছে তারা বেশ হিসেব করেই মেরেছে। মেয়েদের সবচেয়ে ভাল লাগার জায়গাগুলোই ভিজিয়ে দিয়েছে। আমরা যেমন পড়তে পড়তে লেখার বিশেষ বিশেষ অংশে পেনসিলের দাগ মারি। নীপাকেও সেইভাবে কামুকেরা পিচকিরির রং মেরে কায়দা করে ছুপিয়ে দিয়েছে। আবিরে আতর ছিল। সেই আতরের গন্ধে চিলেকোঠা ভরে উঠেছে।

নীপা পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। চারপাশের কাচের শার্সি ফুঁড়ে রোদের আলো ঢোকায় ঘরটাকে মনে হচ্ছে পাকা পিচ ফল। নীপার ব্লাউজের সামনের হুকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। কেউ জোর করে বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়েছিল। ঢোকাতেই পারে। শ্যামকুঞ্জে কৃষ্ণের অভাব নেই। নীপার বাবার নাম শ্যামবাবু। পাড়ার লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলে শ্যামকুঞ্জ। সেই কুঞ্জে খোকা থেকে বুড়ো সব কৃষ্ণেরই আনাগোনা। ওদিকে নীপার মায়ের কী অবস্থা কে জানে। ফাগুয়া হল কামোৎসব। মানুষকে স্যাডিস্ট করে তোলে। এই যে শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণ বছরের এই সময়টায় মানুষের মিলনেচ্ছা প্রবল হয়।

দরজায় পিঠ রেখে নীপা বললে, 'রঙের ভয়ে লুকিয়ে বসে আছেন?'

আমি বসে ছিলুম মেঝেতে বহুকালের পিঁজে যাওয়া একটা কার্পেটের ওপর। আমার চোখের সামনে আড় হয়ে আছে শাড়ি জড়ানো নীপার সুগঠিত দেহ। দেখতে পাচ্ছি, উদার অনাবৃত কোমর হারিয়ে গেছে ধাপে ধাপে অন্তর্বাস আর শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। ক্ষীণ থেকে স্ফীত, শেষে মৎস্যকন্যার পুচ্ছের মতো নেমে গেছে লাল মেঝের দিকে। আর এক আকাশে যেন চোখ মেলেছি।

দপ করে আগুন ধরে গেল শুকনো বারুদে।

ঠুংরির হালকা রেশ—পিয়া না মানত মানা।

আবিরের আতরের গন্ধে।

ঘরের সোনালি উষ্ণতা।

মোরা বাদি কাজকরা বিশাল এক ফুলদানি ঘরের কোণে কাত হয়ে আছে।

ভাঙা একটা সিংহাসন চেয়ার।

তে-ঠেঙা দাঁড়া টেবিল ল্যাম্প মাথায় লাল টুপি।

আমার চোখের সামনে নীপার সুগভীর নাভি। আবিরের অভ্রচূর্ণ আলোয় চিকচিক করছে।

আমি নীপাকে পড়াই। আমার ছাত্রী। আগুনে আদর্শের জল ঢালার চেষ্টা।

শুকনো গলায় বললুম, 'ভয়েই বলতে পারো। রং মাখলে তুলতে অনেক সময় লাগে। তুমি এলে কীভাবে।'

নীপা তার মুক্তোর মতো সাদা দাঁতে হাসল, 'কেন হেঁটে হেঁটে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে।'

'তোমার সাহস আছে।'

'তা আছে। দেখি পা দেখি। আপনি আমার গুরুজন।'

আমি বসে আছি। নীপা এগিয়ে আসছে। দরজা থেকে আমার ব্যবধান তিন-চার হাত। এগিয়ে আসছে নীপার ক্ষীণ কোমর। গভীর নাভি। নিতম্বের ছন্দ। তেজপাতার মতো পাতলা দুটি পায়ের পাতা। রমণীর শরীরের যে গোপনস্থলে ধরাধামে আসার আগে আমার দশ মাস দশ দিনের দীর্ঘ রাত্রিবাস হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটি ক্রমে এগিয়ে এল চোখের সামনে। শাড়ির ভাঁজ। লাল রং। কুমারী শরীরের উত্তাপ। আতপ ধানের গন্ধ। প্রচণ্ড আবেগে আমি স্তম্ভিত।

নীপা আমার পায়ের কথা ভুলে গেল। দু'হাতে আমার মাথায় আর মুখে মাখাতে লাগল সুগন্ধি আবির। অভ্রচূর্ণ চিকচিক করে ঝরে পড়ছে আমার কোলে। রিনিঠিনি বাজছে তার দু'হাতের কাচের চুড়ি। নীপা কোনও দিনই আমাকে রাশভারী শিক্ষকের আসনে বসাতে পারেনি। বন্ধুর ভূমিকাতেই দেখতে চেয়েছিল।

আমার চুল মুঠোয় ধরে মাথাটাকে চেপে ধরল তার নরম তলপেটে।

আণবিক বিস্ফোরণের কথা শোনা ছিল। বিজ্ঞানী জানেন কীসের সঙ্গে কী মিশলে, হিরোসিমা, নাগাসাকির মতো শহর মুহূর্তে মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো। একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে কীভাবে বাষ্প হয়ে উড়ে চলে গেল। আদর্শ, চরিত্র, ভয়, সংস্কার সব, সব মনে হল হীনবল ভ্রান্তি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিমেষে তাদের নিজেদের জগৎ তৈরি করে ফেলতে পারে। যৌবনই স্রষ্টা, যৌবনই ঈশ্বর। বাইবেল: অ্যান্ড আই স এ নিউ হেভেন অ্যান্ড এ নিউ আর্থ।

নীপা আর আমার ছাত্রী নয়। আমি আর শিক্ষক নই। তার জামার সব ক'টা হুক শ্বাসপ্রশ্বাসের উত্থান পতনে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বক্ষবন্ধনী ছুড়ে দিয়েছে ঘরের কোণে। গিয়ে আটকেছে আমার সেই নাম না জানা মহিলার ছবির মাথায়। শুভ্র, শালীন একটি দীর্ঘ দেহ। থরথর কাঁপছে। ভয়, আনন্দ, প্রথম অনুভূতি। অস্ফুট আর্তনাদ। দংশন। এ নিউ আর্থ। শাড়ির রং, শুভ্র ত্বকের জায়গায় জায়গায় ফুটে আছে। ওঁরা বলেন, দর্শন। জীবন দর্শন, ভগবদ্দর্শন, সত্য দর্শন। আমি যা দেখছি, তার চেয়ে বড় দর্শন আর কী আছে?

আমার জানা ছিল না, এইরকম হয়। নীপারও জানা ছিল না, শরীর কী সুরে কেমন করে বেজে ওঠে। ছিঁড়ে, খুঁড়ে, দুমড়ে মুচড়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। সব এলোমেলো। নীপার শরীরের রঙে আমি লাল। নীপার শরীর হয়ে উঠেছে অলিভের মতো মসৃণ। কী সুন্দর দেখাচ্ছে নীপাকে। বহু বহু দিনের খরায় ফুটিফাটা শুষ্ক জমিতে যেন প্রথম বর্ষার জল পড়েছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে নীপা শুয়ে আছে। ঘামে শরীর ভিজে ভিজে। অদ্ভুত এক সুখের আয়েশে চোখ আধবোজা। চুলে ঢাকা ছোট্ট কপালে হাত রেখে বললুম, 'ওঠো।'

নীপা বললে, 'কী হল? বদমাশ।'

খুব আদুরে গলাতেই বললে। তবু ওই বদমাশ শব্দটা মনে হল চাবুক। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি কুঁকড়ে গেলুম। আমার শিক্ষা আমাকে উপহাস করছে। আমার বংশমর্যাদা আমাকে উপহাস করছে। আমার আদর্শ আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। আমি পরাভূত। নীপার সামনে আর আমি কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না।

নীপা আমাকে টেনে তার পাশে শোয়াতে চাইল। এখনও তার ঘোর কাটেনি।

'তুমি এবার যাও। যে-কেউ যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।'

'আসুক।'

'সে কী? এই অবস্থায় দেখলে কী ভাববে?'

'কে দেখতে বলেছে? স্বার্থপর। বদমাশ। তুমি আমার কী করেছ জানো। আমি যাব না।'

নীপা পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তার দখলে এসে গেছি। বাঘিনি ধরেছে শিকার। আর সেইদিনই বুঝলুম, পায়ের জুতোরও কী সুখ! তাই আনন্দে মশমশ করে।

পরের দিনই আমি দিল্লি চলে গেলুম, ইউ পি এস সি-র ইন্টারভিউ দিতে। সারাটা পথ আমি নীপার কথা ভাবলুম। আমি পাপ করেছি, সেই বোধটা আর রইল না। আমি পেয়েছি, আমি পূর্ণ হয়েছি। আমার অবস্থা চৈত্রের কাকের মতো। ঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে উড়ে উড়ে চলেছি। গাছের উঁচু ডালে বাসা বাঁধব। নীপা ছাড়া পৃথিবীতে আর আমার কেউ কোথাও নেই। ট্রেনে যার দিকে তাকাচ্ছি তাকেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে চলেছেন, ব্যান্ডেলের এক পরিবার। বাবা, মা, তরুণী মেয়ে, আর এক সৌম্য বৃদ্ধা। যেমন হয় অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। বেশ হাসিখুশি পরিবার। প্রাচুর্যেই আছেন। চেহারা দেখে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

আমি আমার সেই বয়েসটায় লক্ষ করেছিলুম, যে সব পরিবারে মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠছে, সেই সব পরিবারের অভিভাবকরা অকারণে ভীষণ খাতির শুরু করতেন। অকারণ হয়তো নয়। আমি শুনেছি, শয়তানকে নাকি ঈশ্বরের চেয়েও সুন্দর দেখতে। বিলিতি শয়তান নয়। বিলিতি শয়তানের মাথায় দুটো শিং আছে। আর তার পায়ে আছে খুর। দিশি শয়তানের সুন্দর প্রেমিক প্রেমিক চেহারা। আমি যে জাত-শয়তান, কেউ না জানুক আমি জানি। চোখ মুখ দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানি না। দেশি, বিদেশি বই পড়ে বড় বড় জ্ঞানের কথা অনর্গল বলে যেতে পারি। পয়লা নম্বরের লম্পট, ভাব দেখাই সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারীর। কিছুকাল একটা ক্লাবে ব্যায়ামট্যায়াম করেছিলুম; ফলে বুক বেশ চওড়া, কোমর সরু। হাতের পেশিটেশি বেশ সুগঠিত। আর শয়তানের যেমন হয়, মুখে বেশ একটা বাল-গোপাল, বাল-গোপাল ভাব। যেন এইমাত্র মা যশোদার কোলে বসে নাড়ু খেয়ে, জিভ চোখাতে চোখাতে নেমে এলুম। যে নীপার মাকে দেখে নেচে ওঠে, কেঁপে যায়, সে যে কত বড় কামুক, আমি জানি। মাঝে মাঝে নিজের ওপর অসম্ভব ঘৃণা হয়। জগৎটাকে আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি? ওরে তুই বেরিয়ে আয়। ঠেলে একটু ওপরে ওঠ। কার উপদেশ কে শুনছে? ছুঁচো তো আর হাতি নয়। যতই শুঁড় তুলুক। জমি থেকে দেড় ফুট।

প্রথম চোটেই আমার সহযাত্রী মা আর মেয়ে দু'জনকেই আমি নিরাসক্ত মুখে দেখে নিয়েছি। যথা সম্ভব ভাল করে। মেয়েটির নাম তনু। নীপার সঙ্গে তুলনা করাও হয়ে গেছে। নীপা হল বর্ষা শেষের সজীব, সবুজ ঘাসের কলি। সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়ে মাটি ফুঁড়ে তীক্ষ্ণ শিষের মতো বেরিয়ে এসেছে। তনু হল ফোটা ফুল। এমন মেয়েকে ধীরে বলতে হবে, তোলো, মুখ তোলো। তবেই সে মুখ তুলবে। বলতে হবে, মেলো আঁখি মেলো। তবেই সে চোখ মেলবে। সে চোখ বড় স্নিগ্ধ। সরোবরের মতো গভীর। তনু সেবিকা, গণিকা নয়।

এইরকম একটা তুলনা আসায় নিজেই স্তম্ভিত। তবে কি নীপা আমার চোখে গণিকা?

এইরকম একটা বিশ্রী ভাবনা যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন তনু খুব মিষ্টি গলায় বললে, 'এই নিন।' বিশাল একটা ফ্লাস্ক থেকে তনুর মা চা ঢেলে ঢেলে দিচ্ছেন, আর তনু হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছে। তার হাত থেকে গেলাস নিতে নিতে চোখাচোখি হল। হালকা একটা হাসি খেলে গেল তার পাতলা ঠোঁটে। মেয়েটি সুন্দরী। মেয়েটি নম্র। তনুর বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। আমার কে কোথায় আছেন। আমরা কুলীন কি না? আগে দেশ কোথায় ছিল। মেয়ের বাবার যা যা জিজ্ঞেস করা উচিত সবই করলেন। তনুর মা হাসি হাসি মুখে সবই শুনলেন। প্রৌঢ়া মহিলা মালা জপছিলেন। তিনি জপ থামিয়ে বললেন, 'ছেলেটি খুব সুন্দর। ভারী মিষ্টি স্বভাব। আমাদের তনুর সঙ্গে ভাল মানাবে।'

তনু আলতো করে দিদাকে একটা চড় মারল।

আমি ইউ পি এস সি-তে ডেপুটি ডিরেক্টারের পদে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি শুনে ভদ্রলোক অভিভূত হলেন। বললেন, 'বয়সটা যে বড় কম।'

বয়েসের চেয়েও আমাকে কমবয়সি দেখায়, সেও জানি শয়তানের লক্ষণ। শয়তানের বয়স বাড়ে না। মাঠ ময়দান পেরিয়ে ট্রেন হুহু ছুটছে। তনুর মা, তনুর বাবা, দিদা, আমার সঙ্গে এমন

ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন আমি জামাই হয়ে গেছি। নানা ভাবে, নানা ছলে, মেয়েকে আমার দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে চাইলেন। সে বেচারির মহা অস্বস্তি। গুরুজনের সামনে কোনও মেয়ে পারে কি সামান্য আলাপে অচেনা একটি ছেলের ঘনিষ্ঠ হতে! নীপা পারে। নীপার জাত আলাদা। নীপা এত মিষ্টি গলায় কথা বলতে পারবে না। নিজেকে এত ঢেকেঢুকে রাখতে পারবে না। নীপা দামাল স্বভাবের। ভীষণ সাহসী সংস্কার মুক্ত।

তনুর বাবা দিল্লিতে কাজ করেন। উদ্যোগ ভবনে। অফিসার। কার একজনের নাম করে বললেন, 'তোমার চাকরির জন্যে বলে দেব।' তারপর বললেন, 'থাকবে কোথায়?'

দিল্লির জনকপুরীতে তনুদের বাড়িতেই গিয়ে উঠলুম, অনুরোধ ঠেলা গেল না। তা ছাড়া দিল্লির আমি কিছুই জানি না। একটু ভয় ভয় করছিল। কোথায় যাব, কীভাবে যাব। ভদ্রলোকের সাহায্যও একটা বড় কথা। বেশ ছিমছাম, সাজানো, গোছানো, সাহেবি ধরনের বাড়ি। ছোট বাগান। যে-কোনও মানুষেরই পছন্দসই শ্বশুরবাড়ি। নীপাদের মতো এলোমেলো হট্টশালা নয়। অতিথিদের থাকার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা ব্যবস্থা।

তনুর বাবার সামান্য পান দোষ ছিল। সন্ধের পরেই একটু এলোমেলো হয়ে গেলেন। বাইরের ঘরে তনুর সামনেই প্রশ্ন করলেন, 'প্রেম করেছ কোনওদিন?'

'আজ্ঞে না।' মিথ্যেই বললুম। বলার সাহস হল না, প্রেমের প্রথম পাঠ, ফার্স্টবুক টপকে একেবারে লাস্টবুক পড়ে বসে আছি।

মুখে আলুভাজা পুরে, সামনের দাঁতে কুড়ুরমুড়ুর করতে করতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি করেছি। ও ইট ইজ হেভেনলি। ইয়াংম্যান তুমি প্রেম করোনি, তোমাদের কালে তো ওই একটা জিনিস, ভেরি চিপ, ভেরি ভেরি চিপ, ইজিলি এভেলেবেল। মাছ পঞ্চাশ, হোয়্যার অ্যাজ প্রেম পাঁচ। দুটো সিনেমার টিকিট, আড়াইঘণ্টার নিশ্চিন্ত সেশান। বিশ টাকায় মোবাইল বেডরুম, কলকাতার ট্যাক্সি। আর মেরি স্টোপস ট্রাবল ফ্রি সার্ভিস। পনেরো মিনিটে সাকশন পদ্ধতিতে মানুষের উত্তরপুরুষ ভ্রূণাকারে গর্ভচ্যুত। প্রেম করোনি জেন্টলম্যান! বাঁচবে কী নিয়ে। জীবন যে হাইড্রলিক প্রেসের মতো চেপে ধরবে। স্টেট সেন্টারের বিবাদে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই ট্রাবলসাম ওয়ার্লডে প্রেম ছাড়া বাঁচা যায়। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে?'

ভদ্রলোক যখন মেরি স্টোপস বলছেন, তখনই তনু উঠে চলে গেছে।

তনুর মা এলেন। মোটা ডুরে শাড়ি পরেছেন। ভদ্রমহিলা উচ্চতায় সামান্য খাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভাল। প্রবীণেরা এমন চেহারাকে বলেন, গায়ে-গতরে। একালের আমরা বলব, সেক্সি।

ভদ্রমহিলা স্বামীকে বললেন, 'কী হচ্ছে কী? অল্প খেলেই যখন বাজে বকতে শুরু করো, তখন খাও কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কে আমার জ্ঞানদা সারদা এলেন রে। আমার খাবার কোথায়? হোয়্যার ইজ মাই ফুড?'

তনুর মা ইশারায় আমাকে উঠে যেতে বললেন। রাত তখন প্রায় ন'টা। স্বামীর পাশে এমন কায়দায় বসলেন, যেন বাজারের মাছউলি। মাথার ওপর দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক করলেন। বসে বসেই শাড়ির আঁচলটা পাক মেরে কোমরে গুঁজে নিলেন ভাল করে। মনে হল, এখুনি যুদ্ধ শুরু হবে। এ সবই তার প্রস্তুতি।

হলও তাই। রাত এগারোটার সময় মনে হল, বাড়ি ছেড়ে পালাই। লজ্জা আমার আশ্রয়দাতাদের নয়। লজ্জা আমার নিজের। এই যদি কোনও বড় মানুষের পারিবারিক জীবন হয়, আমার বড় মানুষ হয়ে দরকার নেই। মধ্যরাতে প্রায় উলঙ্গ নৃত্য। সঙ্গের নারীটি প্রায় নরখাদিকা। মারধর। জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি। অশ্লীল গালিগালাজ। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। ঘটনা দেখে সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রবণতা সহজাত। সেই রাতেই ভদ্রলোকের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম। ঢাকা নর্দমার নাম ভদ্রলোক। ভদ্রলোক

হল ম্যানহোল। লোহার ঢাকনাটা সরে গেলেই দুর্গন্ধময় অসহ্য। সারা জীবনের বেঁচে থাকায় সংগ্রহ হল পাঁক।

মাতালের ডায়লগ থেকে যা প্রকাশিত হল সে রাতে, সবই অভিযোগ, হতাশা। জীবিকা পছন্দ হয়নি। জীবনের সব আশা ভেস্তে গেছে। কে এক ওপরঅলা, তার নাম মেনন। সে হল শুয়োরের বাচ্চা। স্ত্রী পছন্দ হয়নি; কারণ তিনি স্ত্রীর ভূমিকা ছেড়ে বাজারের বেশ্যার ভূমিকায় যেতে নারাজ। ফলে ভদ্রলোকের ভাগ্য আটকে গেছে, গোবরে সেঁটে যাওয়া জোনাকির মতো। কে এক ভক্তোয়ার সিং হাই লেভেলে তার স্ত্রীটিকে ছেড়ে তিন বছরেই টপে উঠে বসে আছে। বড় মানুষের বেডরুম ফার্স। বৈচির পড়তি জমিদার বংশের শিক্ষিত সন্তান, এই তাঁর জীবনের মধ্যভাগ। জীবনের শেষটা কী! সহজ গণিত।

স্বামী স্ত্রী যখন এই নিয়ে ব্যস্ত; তখন একমাত্র মেয়ে তনু পেছনের দরজার পইঠেতে একা বসে। আর তার দিদা কোণের ঘরে গভীর নিদ্রায়। জপের মালা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবে কি-না, সন্দেহ, তবে বিষম পরিবেশে সহজ থাকার উদাসীনতা অবশ্যই এনে দেয়। তা না হলে, বৃদ্ধা এমন প্রশান্ত নিদ্রা পেলেন কোথায়। আবার আমার সেই সংজ্ঞাসিদ্ধি মানে বেঁহুশ হয়ে যাবার হাতধরা কৌশল। সাধনা মানে জড় হয়ে যাবার প্রার্থনা।

বোকার মতো তনুর পাশে কিছু দূরে বসতেই সে ধড়মড় করে উঠে গেল। এর চেয়ে আর বড় অপমান আর কী আছে? ভাবলে আমি প্রেম করতে এসেছি। আমার ভেতরে একটা কুকুর থাকতে পারে; কিন্তু আমি তো কুকুর নই। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম চুপচাপ। দূরে গাড়ির আলো উল্কার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে। আলেয়ার মায়াবী আলোর নাচানাচি। হর্নের আওয়াজ। কেবলই মনে হতে লাগল, কেন এই আতিথ্য গ্রহণ করলাম। এর চেয়ে আমি কালীবাড়িতে থাকলেই ভাল হত।

তনুর বাবার রাতের অধ্যায় শেষ হল এইভাবে, বিছানায় তাঁকে চিত করে ফেলা হল। বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন তাঁর স্ত্রী। অশ্লীল দৃশ্য। আবার ধর্মীয়ও বটে, কারণ মা কালীর এই ভঙ্গি আমি দেখেছি। এই ভঙ্গিতে শ্যামার নাম মনে হয় তারা। শিবের বুকে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পয়সা খরচ করে মানুষের কী খোয়ার। ওই পয়সায় ভদ্রলোক কত কী খেতে পারতেন— কড়াপাক সন্দেশ, ফিশ ফ্রাই, কাটলেট।

মিনিট দশেক তিনি চিৎকার করলেন, বাবা গো আমায় মেরে ফেললে গো। তনুর মা শুধু স্বাস্থ্যবতী নন, সংস্কারমুক্ত। স্বামী নিয়ে সেকেলে আদিখ্যেতা নেই। তখন জানতুম না, পরে জেনেছি মনস্তত্ত্বের বই পড়ে, পীড়ন করে আর পীড়িত হয়ে মানুষ আনন্দ পায়। আবার এও পড়েছি, নেভার আন্ডার এস্টিমেট দি পাওয়ার অফ এ ওম্যান। আবার এও পড়েছি, অ্যান্ড হোয়াট ফ্রেশ মোর পাওয়ারফুল ফর স্পিকিং টু ম্যান, দ্যান ওম্যান। যতই পড়েছি আর যতই দেখেছি ততই মনে হয়েছে, মানুষ পোকার আসরে খেলতে নেমে, কী কালই হল আমার। কালঘাম ছুটে গেল। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সেই গানটা কেবল মনে পড়ে, আগে জানলে, আগে জানলে, তোর ভাঙা নৌকোয় চড়তাম না/ নিঠুর দরদী, আমারে ভাল কলে ফ্যালসে। যা তেল ছিল নিংড়ে বের করে নিলে। কিছু কিছু নিংড়ে নিলে, আর কিছু আমি এর ওর পায়ে মেরে শেষ করে দিলুম।

তনুর মা কিছুটা দূরে আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁর বসার ধরন দেখে মনে হয়েছিল, জমাদারনি নর্দমা সাফ করে এসে পা ছড়িয়ে বসেছে। এখুনি শাড়ির আঁচলের গাঁট খুলে, খইনি বের করে ঠোঁটে ফেলবে। একটু আগে যা ঘটে গেল সবই যেন তাঁর নিত্যকর্ম। ট্রেনে আসার সময় তাঁদের পরিবারের যে সুখী সুখী চেহারা দেখেছিলুম, হয় সেটা মিথ্যে, না হয় এইটাই তাদের সুখ। অথবা বাঁচতে বাঁচতে মানুষের এমন একটা অবস্থা হয় যখন সুখ দুঃখের বোধ আর থাকে না। তনুর মা খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা শুরু করলেন। বাড়িতে কে কে আছেন। বাড়িটা কেমন। সঙ্গে

বাগান আছে কি না। আমার বোন আছে কি না। গাদা গাদা মেয়েলি প্রশ্ন। সব অবস্থার সঙ্গে মেয়েরা কেমন সহজে মানিয়ে নিতে পারে। প্রকৃত ধার্মিক না হলে এত সহজে জীবনকে মেনে নেওয়া যায় না।

পরের দিন সকালে তনুর বাবা আবার স্বাভাবিক। রেসপেক্টবল গভর্নমেন্ট অফিসার। ভদ্রলোক মেয়েটিকে ভীষণ ভালবাসেন। মেয়েও বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। ভোরবেলা দেখি, মেয়ের কাঁধে হাত রেখে দিল্লির সায়েব সামনের বাগানে পায়চারি করছেন। আমি তো শয়তান। ঘিনঘিনে শয়তান। কাল রাতে ভদ্রলোকের উন্মত্ত অবস্থা দেখেছি। আমার মনে হল, দৃশ্যটা খুব নির্দোষ নয়। মেয়ে বড় হলে বাপেরও মতিভ্রম হতে পারে। এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে অসুস্থতা নেই তো! আমার আবার এও মনে হল তনুর ভেতর একটা 'ফাদার-ফিকসেশন' আছে। ও ওর বাবার মতো কাউকে না পেলে বিয়ে করে কোনওদিনই সুখী হতে পারবে না। কাল রাতে তনুর কাছে আমি ভীষণ ছোট হয়ে গেছি। পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চলে গেছে। আমার হাতে তেমন সময় থাকলে ওর অহংকার আর উন্নাসিকতা ভেঙে দিতুম। সেতারে টোকা পড়লেই ঝংকার উঠবে। কায়দাটা হল বাজানোর।

তনুর বাবা ফোন করে সেই বড়কর্তাকে আমার কথা বললেন। হালকা দু'-চারটে রসিকতাও হল। ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ আমি তৈরি করে দেব।' মনে মনে হাসলুম, আপনার নিজের ভবিষ্যৎ আগে তৈরি করুন। জীবনে দু'-চারটে ভেন্টিলেটার ফিট করে, একটু আলো বাতাস আসার পথ করুন। কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করলুম ভদ্রলোক সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক পুজোয় বসেন। শক্তির উপাসক। ঠাকুর ঘরে লকলকে শ্যামা মূর্তি। জিভ বের করে হাসছেন। পুজোর পরেই মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। ছেলের মাথায় জপের মালা ঠেকিয়ে মায়ের আশীর্বাদ। আমার ধারণা পালটাতে শুরু করল। মাতৃভক্ত সন্তান। স্নেহপ্রবণ পিতা। প্রেমিক স্বামী। মানুষ যে ঠিক কী, একটা-দুটো আচরণ দেখে হদিশ পাওয়া কঠিন। শুধু তাই নয় ভদ্রলোক দিলখোলা পরোপকারী।

আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে কমিশন অফিসের সামনে নামিয়ে দিলেন। বলে গেলেন, 'তুমি অপেক্ষা করবে, ঠিক সময়ে এসে তুলে নিয়ে যাব।' বললেন, 'সকালে পুজোয় বসে মাকে খুব ডেকেছি। তোমার হয়ে যাবে।' আমার তখন ধর্মে সামান্যতম বিশ্বাস ছিল না। পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলুম। পৃথিবীটা লড়াইয়ের জায়গা। বিনা রণে কৌরবপক্ষ সূচাগ্র মেদিনীও দেবে না। ভাগ্য আবার কী? অক্ষম, অপদার্থকে ভগবান আকাশের চাঁদ ধরে দেবেন? অসম্ভব।

যাই হোক ইন্টারভিউ অসম্ভব ভাল হল। বোর্ডে তনুর বাবার সেই বন্ধু ছিলেন। এস ফোতেদার। ভদ্রলোক অসম্ভব ভাল ব্যবহার করলেন। সাহায্য করলেন। উঠে আসার সময় বললেন, 'উইশ ইউ গুডলাক।' রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, উঠল ধুলোর ঝড়, যাকে বলে আঁধি। অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল। কোয়েসলারের সেই ডার্কনেস অ্যাট নুন। চারপাশ ঝাপসা। গাড়িগুলোকে তিনকোনা দেখাচ্ছে। পাঞ্জাবি মেয়েদের দোপাট্টা কাঁধের দু'পাশে ফনফন করে উড়ছে পরির ডানার মতো। লোকজন দৌড়োচ্ছে চারপাশে। আমার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন বলছে, ভাগো ভাগো, বুদ্ধ কাঁহাকা। আমি একটা অফিস বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লুম। আমার মতো আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। বেশিরভাগই পাঞ্জাবি ছেলেমেয়ে। বাংলার মেয়েরা তখনও অত স্মার্ট হতে পারেনি। কেউ কেউ হয়েছে, যেমন নীপা। তনু সেই তুলনায় এখনও সেকেলে। পাঞ্জাবি মেয়েদের দিকে সহজে তাকানো যায় না। মন খারাপ হয়। সবাই যেন কিন্নর কন্যা। কিছু দিন আগে আমার এক অধ্যাপক পাঞ্জাবি এক শিল্পীকে বিয়ে করেছেন। এখনও সেই ঈর্ষা আমার গেল না। ইংরেজিতে বলে, ক্রুকেড মাইন্ড। আমি সেই মনের অধিকারী। জিলিপির মতো পাকানো আর প্যাঁচানো মন। আমার চেয়ে কারুর ভাল হলে জ্বলে পুড়ে যাই। বেশ ধান্দাবাজ। স্বার্থপর।

প্রয়োজনে পা চাটব। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই মারব লাথি। যে শয়তান হবে, তার চেহারাটিও ভাল হবে। দর্শনধারী। আমার এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। খাড়া একটা গ্রিসিয়ান নাক। দার্শনিকের মতো দুটো চোখ। বহুদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাপ করার চেষ্টা করেছি, ভেতরে শয়তানির পরিমাণ কতটা। পারিনি। এত ভালমানুষের মতো মুখ। গেরুয়া পরিয়ে দিলে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। আমার পাশে একা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুটা দূরেই লিফট। বাইরে আঁধি চলেছে। ওই ধুলোর পরদার মধ্যে যারা ঘোরাফেরা করছে, তাদের কেমন যেন বড় বড় দেখাচ্ছে। ছায়াদৈত্য। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। প্রকৃতির খেলা দেখছি। ভাবছি রাজস্থানের মরুভূমির কথা। উটের কথা, রঙিন ঘাঘরা পরা বেদুইন মেয়েদের কথা। প্রায় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। সুন্দর সেন্ট মেখেছে। গায়ে নীল ওড়না। পৃথিবীকে মানুষ পৃথিবী বলে কেন, বলা উচিত ফাঁদ। ভূমির আয়োজনে কোথাও ত্যাগ বা বৈরাগ্যের প্রেরণা নেই। মুক্তি আছে আকাশে। থাকলে কী হবে, মানুষ তো আর পাখি নয়।

হঠাৎ মনে হল দেখি, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায় কি না? ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই ঝড় শেষ হবে কখন?' ভেবেছিলুম উত্তর পাব না। অহংকারে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তা নয়, সামান্য পুরুষালি গলায় বললে, 'আধ ঘণ্টাও হতে পারে। এক ঘণ্টাও হতে পারে।'

ওই পুরুষালি গলার মোহে পড়ে গেলুম। যাকে বলে, 'সাইক', মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আঁধার, সেই আঁধার হাতড়ে নিজেকে তখনও আবিষ্কার করা হয়নি। তখনই যদি মনের ওই নিমজ্জিত অংশের খোঁজ পেতাম, তা হলে বুঝতে পারতাম, কেন ভাল লেগেছিল মেয়ের গলায় পুরুষ-কণ্ঠ?

কথা চালাবার জন্যেই, হঠাৎ আমার জানার ইচ্ছে হল, আঁধি কেন হয়। প্রায় ছেলেমানুষের কৌতূহল।

মেয়েটি হাসল। হেসে এত সহজ হয়ে গেল, বুঝলুম আমার এই কায়দা যে-কোনও মনের দরজা, নিমেষে খুলে দিতে পারে। এই হল আমার 'মাস্টার কি'। সেই চাবি আজও আমার হাতে। হারিয়ে ফেলিনি।

বললে, 'আমি আর্টসের ছাত্রী ছিলাম। বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে আমার বাবা আবহাওয়া অফিসের একজন বড় বিজ্ঞানী, তিনি অবশ্যই জানবেন। তুমি কি সত্যিই জানতে চাও?'

অবশ্যই চাই। মেয়েটি খুশি হল। তার বাবার নাম, তাদের ঠিকানা লিখে একটা কাগজ আমার হাতে দিল। মেয়েটির নাম অমৃতা। ঠিকানা দেখে মনে হল তনুদের এলাকাতেই। এ কথায়, সে কথায় বেশ আলাপ হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ দিলখোলা। স্পোর্টসওম্যান। বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ান। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করে। যখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে, তখন মনেই হয়নি এত কথা বলতে পারে। মেয়েটা বকতে ভালবাসে। কথা শুরু করার আগে একটা মুদ্রাদোষ আছে— আরে ইয়ার না বলে শুরু করতে পারে না।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে আরও অনেক লোক এসে জুটেছে। বেশ ভিড় হয়ে গেছে। বাজারের মতো হইহল্লা হচ্ছে। হঠাৎ বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলেরই প্রশ্ন— ক্যা হুয়া। ভাই কেয়া হুয়া।

কে একজন বললে, চিন ভারত আক্রমণ করেছে।

সেই সময়ের কথা ভাবি, আর হেসে মরি। চিন আক্রমণ করেছে শুনে আমার মনে হল, তা হলে এই ধুলোর ঝড় তো আঁধি নয়। চিনে সৈন্যরা ছুটে আসছে রাজস্থান থেকে দিল্লির দিকে, কামান দাগতে দাগতে, এ নিশ্চয় সেই ধুলো। বাঙালির ছেলে, যুদ্ধের নাম শুনলেই ভয় করে। ভূগোল হারিয়ে ফেলেছি। চিন কোন দিক দিয়ে নামবে সে সব খেয়াল নেই। মনে হল দিল্লি যখন রাজধানী, আক্রান্ত হল বলে। ধুলোর পরদা ভেদ করে লোক ছুটছে, আমার মনে হচ্ছে চিন তাড়া করছে।

ভয়ে ভয়ে অমৃতাকে প্রশ্ন করলুম, 'হোয়েন, দে উইল স্টার্ট বম্বিং!'

এত জোরে হেসে উঠল, লজ্জা পেয়ে গেলুম। 'আরে ইয়ার। লেট দেম ফার্স্ট ক্রস দি বর্ডার। বিফোর দ্যাট, উই উইল গিভ দেম এ গুড পাউন্ডিং।'

দেখলুম, আমার মতো যুদ্ধের কথা কেউই ভাবছে না। সব অন্য কথায় ব্যস্ত। বৈজয়ন্তীমালা, দিলীপকুমার, মীনাকুমারী, ওয়াহিদা সেই সময় ওঁরাই ছিলেন একচ্ছত্র। একটু পরেই রাত হবে, তখন তো ওই জগতেই ঢুকতে হবে। কে আবার বললে, নাইট শো বন্ধ। রাতে ব্ল্যাক আউট হবে।

সব শুনে এত অসহায় লাগছিল! রাত হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিল্লির কিছুই জানি না। কী করে ফিরব! অমৃতাকে মনে হতে লাগল, আমার মা। ফেলে চলে যেয়ো না মা, পৌঁছে দিয়ো জনকপুরী। বাঙালির ভিতু মন নিয়ে শিখ তনয়ার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক অসম্ভব। ওই মা ছেলেই ভাল।

আর এখন, জীবনের খাতা বন্ধ করার সময় মনে হচ্ছে, পুরুষ যদি বাঁচতে চাও প্রথম থেকেই মা বলো। সারেন্ডার, সমর্পণ। শান্তির ওই এক পথ। সাধনা ওই একটাই। নোলায় ছ্যাঁকা, আর মা বলার সাধনা, চেষ্টা।

অমৃতার সঙ্গেই ফিরে এলুম জনকপুরীতে। ওই একই পাড়াতে ওদের বাড়ি। সন্ধে সাতটার সময় ওদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ করে গেল। তনুদের চেনে। আমি ফেরার ঘণ্টাখানেক পরে তনুর বাবা ফিরলেন। ভদ্রলোক যে কত স্নেহপ্রবণ আগে বুঝিনি। প্রথমে রাগে ফেটে পড়লেন। 'তোমাকে আমি অপেক্ষা করতে বলেছিলুম। বলেছিলুম কি না? সারা দিল্লি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি। রাস্তার প্রতিটি মানুষকে দেখতে দেখতে আসছি। ইরেসপনসিবল।' বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেল। 'আমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখব। তনুর মা বলেছিলেন, তোমার আপনপর জ্ঞান নেই। যাকে দেখো তাকেই ভাবো নিজের ছেলে।'

আমার মতোই অবস্থা। কিছুকাল যুবতী মেয়ে দেখলেই মনে হত আমার স্ত্রী। তাকানো মাত্রই, কী গো বলে আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। আরে ভূমি আর নারী প্রায় এক জিনিস। প্রায় কেন, একেবারে এক। প্রথমে অধিকার। রাইট। ওনারশিপ। দলিল পাটা, পরচা। পিলার দিয়ে সীমানা চিহ্ন। সিঁথির সিঁদুর। তারপর চাষবাস বারো মাস। ভূমি আর নারী উভয়েই ফলদায়িনী। নিজেই নাও আর কিনেই নাও, আগে পিলার পুঁততে হবে। জমি নিয়েও খুনখারাপি, নারী নিয়েও খুনোখুনি। আছি ভাল।

এখন আমার তনুর কথা মনে পড়ে। তনুর বাবা, তনুর মায়ের কথা মনে পড়ে। তনুর দিদা। মনে পড়ে অমৃতার কথা। আরও অনেকের কথাই মনে পড়ে। শুরুর মানুষদের শেষে ভীষণ স্মরণে আসে কারণ সে হল আমার অতীত। অমৃতার কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, কারণ অমৃতার সঙ্গে দিল্লি থেকে আমি হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন গিয়েছিলাম পরের দিন। বেকারের বিদেশ ভ্রমণ। বিজয়ী বীরের স্বভাব আর কী? এক কেল্লা দখল করেই, আর এক কেল্লার দিকে ছোটে। অনেক সময় কেল্লাই বীরকে হজম করে ফেলে। অমৃতাকে দখল করব কী, সেই আমাকে দখল করে ফেলেছিল। আমি যেন তার হাতের বাস্কেট বল। যেমন ছিলেন তনুর বাবা। তনুর মায়ের ময়দার তাল। বেশি বয়সের বিয়ে। ভিতু, স্ত্রৈণ। স্ত্রী বোধহয় মারধরও করতেন। তাইতেই সুখ। সুখী হওয়া নিয়ে কথা। মেরেই হোক আর মার খেয়েই হোক। মধ্য কলকাতার বড় বড় বাড়িতে পাঠঠা পাঠঠা সব চাকর থাকে। মালকিনদের শাড়ি আর অন্তর্বাস কাচে। ঝেড়ে ঝেড়ে শুকোতে দেয়। তাইতেই মহানন্দ, মহাসুখী। ক্রীতদাসেরও আনন্দ আছে। সাধক বলেন, দাস আমি। দাসোহং। ক্রীতদাসও বলে। কারুর প্রভু আকাশে অদৃশ্য। কারুর প্রভু ভূমিতে দৃশ্য। ভাবটা একই। আর ভাবের জগতে থাকাটাই আনন্দের।

অমৃতার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। কেন হল? কারণটা জানতে পেরেছি এই পঞ্চাশ বছর হাঁটার পর। জীবনের পাহাড়, পর্বত, নদী, প্রান্তর পেরোবার পর। কিছু মেয়ে 'স্লিপার' ধরনের পুরুষ পছন্দ করে। ডাক্তারি পরীক্ষায় পুং আসলে ক্লিং। সাদা সাদা, পাতলা পাতলা দুটো পায়ের তলায় চটির মতো চর্চিত করার যেমন আনন্দ হবারও তেমনি আনন্দ। চটির আনন্দ চটি কি প্রকাশ করতে পারে।

ট্রেনে সামনা সামনি আসনে আমরা দু'জন জানলার ধারে। হুহু ছুটছে ট্রেন। অমৃতা পা দুটো আমার আসনে তুলে দিয়েছে। মেয়েটা কথায় কথায় ভাল খিস্তিও করতে পারত। 'আরে শালে' আর 'আরে ইয়ার' তার কথার মাত্রা। হাত আর পা দুটোই তার ভাল চলত। নিজের রসিকতায় উল্লসিত হয়ে মাঝে মাঝেই লাথি আর পায়ের খোঁচা। বাস্কেট বলের পা। পাতা, আঙুল সবই লম্বা লম্বা। পায়ের মাঝের আঙুলে রুপোর রিং। মেয়েদের পায়েও সেক্স। এই সেদিন এক বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়ছিলুম, মেয়েদের সারা শরীরেই সেক্স জড়ানো। যেখানটা স্পর্শ করবে সেখানটাই বেজে উঠবে। অমৃতার অমৃত লাথির জন্যে বুড়ো এখনও ব্যাকুল। অমন প্রাণখোলা নির্ভেজাল লাথি কেউ তো মারতে পারবে না।

হরিদ্বারে আমি উঠলুম ধর্মশালায়। অমৃতা চলে গেল তার আত্মীয়ের বাড়িতে। সে যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখনই বুঝলুম আমার একটা অ্যাটাচমেন্ট এসে গেছে। ভেতরটা ফাঁকা। দু'দিন হরিদ্বারে থেকে আমরা দেরাদুন যাব। সেখানে অমৃতাদের 'অরচার্ড' আছে। লিচু, চেরি, আম, আপেল। ঠাকুরদার সম্পত্তি।

ধর্মশালার সন্ন্যাসী-সঙ্গে মনটা পালটে গেল। নীপা আমার ফার্স্টবুক। অমৃতা র‍্যাপিড রিডার। আকাশ মেঘলা হলে, ঘরের আলো কমে আসে। মনের ঘরে নরম আলোয় কবিতার লাইন তৈরি হচ্ছিল। সেই অমৃতা হাত নেড়ে তার দেশোয়ালিদের কাছে চলে গেল, বড় অভিমান হল। অভিমানীর ধর্ম শঙ্করাচার্য। বেদান্তের উৎসই হল জগৎ ও জীবনের প্রতি অভিমান। প্রেমের লাথিতে বৈষ্ণব। প্রত্যাখ্যানের লাথিতে বৈদান্তিক। এও মায়া, ওও মায়া। এ মায়া পূর্ণ ও মায়া শূন্য। দুটিই রমণীর রূপ। ধর্ম হল রমণীর শরীর। যে লীলায় আমি গর্ভস্থ এবং জাত, সেই একই গর্ভে ধর্মও জাত। একই সঙ্গে দুই যমজ। ধর্ম আর ধর্ষণ মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। প্রভু আর পিতা। ন্যায় কী বলেন! কী বলেন শ্রুতি, শাস্ত্র, দর্শন? দর্শনের জন্যে দ্রষ্টা চাই। আমি সেই দ্রষ্টা। প্রথমে মোহ। পরে অবধারিত মোহমুদ্গর। অভিমান। শূন্যতা। দর্শন। পাত্র আগে শূন্য হোক, তারপরে ভরো জ্ঞান। জ্ঞান হল আরক, নেশা। ভুলতে হবে। ছুটতে হবে তার পেছনে। যিনি 'তিনি'। 'তিনি' কিনি। যিনি অধরা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লীলা তব। নাহি পারে বুঝিতে। খেপার মতো খুঁজতে হবে, একটা অনুভূতি যাতে আছে হাজার মিথুনের সুখ, শত সুন্দরীর অঙ্কশায়িনী হবার বঞ্চনাহীন সুখ।

> করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
> প্রেম সাধিতে ফেঁপে ওঠে কাম-নদীর তুফান ॥
> প্রেম-রতন ধন পাওয়ার আশে
> ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে,
> কাম-নদীর এক ধাক্কা এসে
> যায় ছাঁদন-বাঁধন ॥
> বলব কী সে প্রেমের কথা,
> কাম হইল প্রেমের লতা
> কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
> নাই রে আগমন ॥
> পরমগুরু প্রেম-পিরিতি
> কাম-গুরু হয় নিজ পতি
> কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি
> তাই ভাবে লালন ॥

লালন ভাবেন, আর আমি ভাবি না। বিজনে বসে আমিও তাই ভাবি এখন। জীবন সেতারে গতের জমজমা বাজানো হয়ে গেছে। শ্রোতার আসন খালি। করতালির শব্দ ঝাঁক পায়রা হয়ে উড়ে

গেছে। এখন শুধু টিংটাং। ত্রিবেণীর ঘাট আমিও তো কষে বাঁধতে চেয়েছি। পারিনি। পারলেই বা কী হত! এই তো হরিদ্বার। প্রবাহিত গঙ্গা হর হর। প্রদীপ ভেসে চলছে, সীমন্তিনীর টিপের মতো। ভজন চলেছে ওপাশে। ভজ মন কৃষ্ণ, রাম নাম জপ, জানকী সীতারাম। এ পাশে নিরঞ্জনী আখড়ায় সাধু বসেছেন ধ্যানে। ওপাশে শিবালিক। অলকানন্দা নেচে চলেছে পাথরের মঞ্চে। তবু অতৃপ্তি। সব মুখেই দুলছে না পাওয়ার ছায়া। মানুষ আসে একটা ধারণা নিতে। আর কিছু না। হাওয়া ধরো, আগুন স্থির করো, যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পারো, মরণের আগে মরো, দেখে শমন যাবে ফিরে ॥

একা একা সারা হরিদ্বার ঘুরতে ঘুরতে মনে ধরে গেল বৈরাগ্যের রং। ওদিকে লছমনঝুলা, হৃষীকেশ, এপাশে গঙ্গা পেরোলেই চণ্ডী পাহাড়। মাঝে মাঝে নীরব গম্ভীর সাধুদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। কারুর কারুর এমন রূপ, এমন স্বাস্থ্য, নিজেরই আপশোস হত এমন যার রূপ তিনি তো সহস্র রূপসির মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কার আকর্ষণে সব ছাড়লেন? প্রশ্ন অনেক। উত্তর একটাই।

যোনিতে লিঙ্গেতে শৃঙ্গার করে ভাই সবে।
করুক যথেষ্ট কেনে তাহে কিবা হবে ॥
পশুপক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার।
প্রাপ্তি কি হইবে হেন করিলে তাহার ॥
আত্মায় আত্মায় যেবা করয়ে রমণ।
রসিকের শিরোমণি জানি হেন জন ॥

আত্মায় আত্মায়। একদিন বিকেলে চণ্ডীপাহাড়ের কাছে এক সাধককে সাহস করে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি হেসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, অনেক দেরি আছে, সময় হয়নি। তারপর আর একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, যখন দেখবে তোমার ঘামের দুর্গন্ধ কমে গেছে, তখন জানবে সময় হয়েছে। যদি না হয়, জানবে হল না। আবার ঘুরে এসো। আবার জন্মাও। ফিরে ফিরে এসো। ক্ষয় করো। কর্মক্ষয়, পাপক্ষয়।

আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন পাহাড়ি পথ ধরে। মনে হল ডাকের চিঠি। পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায়। হরিদ্বারের স্ট্যাম্পটা এখনও বেশ স্পষ্ট। মনে হয় আবার যেতে হবে। শুনেছি প্রাচীন চিনে মানুষ বৃদ্ধ হলে সব ছেড়ে চলে যেত পাহাড়ে। অপেক্ষা করত মৃত্যুর জন্য। হঠাৎ একদিন উড়ে আসত সাদা একটা পাখি।

হরিদ্বারে আমার জায়গা ঠিক আছে। প্রথম জীবনের কর্মকাণ্ড ভেসেই যায়। এক জীবনের দু'বার জীবন শুরু করতে হয়? জীবন হল অভ্রের পাত। ছাড়াতে হয়। একটার তলায় আর একটা। সাদা পাখি আসবে কবে কেউ জানে না। কবে ঠোঁটে করে খুলে দেবে খাঁচার দ্বার! পাখি জানে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

আমি যখন হরিদ্বারে অমৃতার অমৃত-লোভে ভেসে বেড়াচ্ছি, তখন আমার মা মৃত্যুশয্যায়। হঠাৎ অসুস্থ। আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মৃত্যুর সঙ্গে একটা চুক্তি আছে। সকলেই গেছেন হঠাৎ। সেই আশা আমারও। সেই সেদিনই একটা গল্পে পড়লাম, ভারী সুন্দর মৃত্যু :

Heathcote M. C. did not die a soldiers death; he simply fell asleep one night by the fireside, The Yorkshire Post on his lap.

মৃত্যুর কাছে আমার ওই ধরনের আবদার আছে। তবে মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে! নেবে, তবু দুই দুই। আর আমি যখন অমৃতার তলপিবাহক হয়ে দেরাদুনে, তখন আমার মা মারা যাচ্ছেন। মানুষের যখন দুঃখ আসে, যখন চোখ ফেটে জল বেরোয়, যখন বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে, অনুশোচনায় যখন পুড়তে থাকে তখন ঘটনা ঘটে গেছে। সব অতীতে চলে গেছে। ফিরে গিয়ে আর কিছু করার থাকে না।

মায়ের মৃত্যুর সময় মিলিয়ে আমি পরে দেখেছি, তিনি যখন শেষ নিশ্বাসটি মোচন করছেন, তখন আমি দেরাদুনে সহস্রধারার সামনে দাঁড়িয়ে। ওদেশে বলে সনসন ধারা। চারপাশে পাহাড় মাঝখানে গরম জলের লেক। জলে গন্ধকের গন্ধ। কাচের মতো স্বচ্ছ। স্নান করলে সারা শরীর চনমন করে ওঠে। জলে নামতে হয় নিরাভরণ হয়ে। লজ্জাশরম থাকলে সনসন ধারায় স্নান হবে না। প্রথমে অমৃতার ওড়না এল আমার হাতে। আমি তার দেহাভরণের জিম্মাদার। তারপর হাতে এল তার কামিজ। শুধুমাত্র বক্ষবন্ধনী পরা পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চির সুঠাম একটি শরীর আমার সামনে। আমার মা তখন মারা যাচ্ছেন। বক্ষবন্ধনী এল আমার হাতে। এক পলকের দেখা। চোখ নেমে গেল মাটিতে। আমার সংস্কার। মা তখন আমার নাম ধরে শেষ ডাকা ডাকছেন। অমৃতার সালোয়ার খুলে গেল। ভেনাস নেমে গেল স্বচ্ছ, উষ্ণ, গন্ধক-গন্ধী জলে। শরীরের কোথাও এক ইঞ্চি মেদ নেই। আমি তখন অমৃতার কাণ্ডকারখানা দেখছি। দেখছি স্বচ্ছ জলে আরও আরও নগ্ন স্নানার্থীর খেলা, তখন আমার মাকে শেষ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। লালপাড় সিল্কের শাড়ি। সিঁথিতে পুরু সিন্দুর। গলায় গোড়ের মালা। খাটের চারপাশে গোছা গোছা ধূপ। মায়ের আলতা পরা পা দুটো যখন আমার বুকে থাকা উচিত ছিল, সেই সময়ে আমার বুকে ধরা একটি ওড়না, কামিজ, ঘামে ভেজা বক্ষবন্ধনী, সালোয়ার। ধূপের গন্ধ ফুলের গন্ধ নয়, দেহের গন্ধ।

অমৃতা সেই সময় বলেছিল, আরে ইয়ার নেমে এসো।

ইডেনের সরোবর। আদম আর ইভের স্নানদৃশ্য। আমার লজ্জা করছিল সব খুলতে। মেয়েরাই লজ্জা ভাঙায়। তারাই পাপ তারাই পুণ্য। আমার মাকে যখন সবাই কাঁধে তুলে প্রথম হরিধ্বনিটি দিয়েছে, তখন আমি জলে। অমৃতা আর আমি দুটো মাছের মতো জলে খেলছি। অমৃতা বলছে, তোমার চেহারাও তো স্পোর্টসম্যানের মতো। খেলো নাকি? আজ দেখব তুমি কেমন খেলতে পারো? মেয়েরা যখন এমন কথা বলে, তখন অনেক রকম মানে করতে ইচ্ছে করে। অমৃতা যখন বলছে, দু'হাত দিয়ে আমার পিঠটা ঘষে দাও, তখন আমার মা শ্মশানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। শুনেছি প্রিয়জন যাবার আগে দূরের মানুষকেও নাড়া দিয়ে যান। আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। চারপাশের পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে কুলকুল করে স্বাস্থ্যকর, ক্লান্তি অপহরণকারী জল নামছে সহস্রধারার সরোবরে। আমি তখন বেঁচে আছি আর একভাবে, অন্য চিন্তায়। ইংরেজ কবি চসারের মতো ভাবছি।

What is better than wisdom?
And what is better than a good woman? Nothing.

পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সত্যিই নেই। এই বার্ধক্যে শরীর যখন হলহল করছে, সব যখন ঝলঝলি, খলখলি, তখনও মাঝে মাঝে নীপার কোনও কোনও দেহভঙ্গির দিকে তাকালে ভিজে কাঠেও আগুন ধরে যায়। ওদিকে বইয়ের র‍্যাকে উপনিষদ। জ্ঞানেশ্বরী। কোলের ওপর গীতা। নীপা ভিজে কাপড়ে সামনে দিয়ে চলে গেল। শরীর আগের চেয়ে একটু ভারী হয়েছে। আমি দু'ছেলের বাপ। হার্টে একবার দমকা লাথি খেয়েছি। ঘাড়ের কাছে কথামৃত, চোখের সামনে ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, তবু মনে পড়ে সেই চিলেকোঠা, ছবির মাথায় দুলছে ছুড়ে দেওয়া বক্ষবন্ধনী, ধারে তার লেসের ফ্রিল, নীপা কাঁপছে, যেন ম্যালেরিয়া ধরেছে। ইন্দ্রিয়ের কাছে গীতা দুর্বল, কথামৃত হীনবল, বেদবেদান্ত দূরের মেঘ। সব মিটে যাবার পর, সামান্য প্রলেপ। হলে হয়, কিন্তু কেন হব। যে পৃথিবীতে নীপা আছে, অমৃতা আছে, নীপার মা আছে, তনুর মা আছে, সেই পৃথিবীতে আমার মরা ছাড়া আর কোনও মুক্তি আছে?

When Adam delved and Evespan
Who was then a gentleman.

অমৃতার ঠাকুরদার বাগানটা নেহাত ছোট ছিল না। এদের কত পয়সা তাই ভাবি। তা ছাড়া উদ্যোগ। বাঙালির মতো বসে, আড্ডা মেরে পরচর্চা করে দিন কাটায় না। নিজেদের মানুষ ভাবার কত সুবিধে! আমি খাই দাই, রোজগার করি, বিয়ে করি। রাতে বুক ফুলিয়ে বউয়ের সঙ্গে শুই। শুয়ে ধর্মচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা করি না। প্রাণখুলে সম্ভোগ করি। বংশবৃদ্ধির ভয়ে আঁতকে মরি না। ফ্যামিলি বাড়ুক পরোয়া করি না। রোজগারও বাড়বে। বাঙালির সবই ডিসপেপটিক। বাইরে সব দেবতা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য কিছুই নেই। সব জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। সবেতেই ছিছি ভাব। অথচ! এই অথচতেই ঘোড়া মরেছে। দেরাদুনে এসে বাঙালি এইরকম একটা ফলাও বাগান করুক তো। এত সুন্দর বাংলো! দরজা জানালার ছ্যাঁদা ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করে বাঙালি বউকে চুমো খাবে। যেটা অপরাধ নয়, জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা, সেইটাকেই মহা অপরাধ ভেবে বাঙালির যত লুকোচুরি। সেই জন্যেই বলে, ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ। মতি শীল স্ট্রিটে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জিনিস কিনতে যাচ্ছে যেন চুরি করতে যাচ্ছে।

অমৃতার দাদা আর বউদি ওই অরচার্ড দেখতেন। দাদার বোধহয় শিক্ষাদীক্ষা তেমন ছিল না, কিন্তু বড় মজার মানুষ। দিলখোলা, প্রাণবন্ত পুরুষ। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। সারাটা দিন শুধুই খেটে চলেছেন। কোনও অভিযোগ নেই। বাঙালি মেয়ে হলে সংসার রসাতলে যেত। মুহূর্তে মুহূর্তে কুরুক্ষেত্র হত। ভদ্রলোক মাটি চিনতেন, গাছ চিনতেন, মানুষ চিনতেন, আর চিনতেন নারী। আমি তিন দিন ছিলাম, তিন দিনে বুঝেছিলাম জীবন্ত জীবন কাকে বলে। আমি ঈশ্বর নই এইটা ভুলতে পারলেই মানুষ সুখী হতে পারে। মানুষ ভয়েই মোলো। কীসের ভয়! যাঃ এই বুঝি পাপ করে ফেললুম! এই বুঝি আমার ঈশ্বরত্ব খারিজ হয়ে গেল।

অমৃতার দাদার বোধহয় সদ্য বিয়ে হয়েছিল। ফল যা হয়। আমার একটু অস্বস্তিই হত। ভদ্রলোক গ্রাহ্য করতেন না। মানুষের ঘোড়া হল একটি রিপু। সেই রিপুটি হল কাম। হিসেবের খাতা যখন খুলে বসেছি, তখন পাই পয়সার হিসেবও লিখতে হবে। আমার ছেলেটা তখন তিন বছরের। ব্যাসেলাই ডিসেন্ট্রি। যমেমানুষে টানাটানি চলেছে। আমি আর নীপা পরপর তিন রাত জেগে। প্রথম রাতটা ও জাগত, শেষ রাতটা আমি। দু'জনেরই ভীষণ মন খারাপ। ছেলেটা বাঁচলে হয়। প্রথম সন্তান। ভেবে ভেবে, জেগে জেগে শরীর কাহিল। সকালে বাজার করতে বেরোলে মাথা ঘোরে। পা টলবল করে। সেদিন শেষ রাত। মরা চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। মাঝে ছেলে। ওপাশে নীপা, এপাশে আমি। নীপা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা হাত কপালে। আর একটা হাত ওপাশে ছড়ানো। গভীর নিশ্বাসে ভারী বুক ওঠানামা করছে। পায়ের দিক থেকে শাড়িটা অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। হাঁটু, পা, কোমর, পেট, বুক, মুখ, চুল চাঁদের আলোয় ভাসছে। মাঝে আমার ছেলে। রোগে ভুগে পাণ্ডুর। আমি দু'জনের দিকেই তাকিয়ে আছি। শরীরের এমন অবস্থা বালিশে মাথা ঠেকালেই মরে যাব। হঠাৎ সারা শরীরে ঢেউ খেলে গেল। আগুন জ্বলে উঠল। সন্তান, স্নেহ, মৃত্যুচিন্তা, সব ভেসে গেল। আমি যেন দুটো চোখ। দুটো হাত যেন দুটো থাবা। আমার কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গ যেন লাঙ্গুল আস্ফালনকারী ব্যাঘ্র। ঘুমন্ত নীপা কনুইয়ের ঠেলা মেরে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইল। বলেছিল, তুমি কি মানুষ? অবশ্যই মানুষ। আমার দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা। আমি মানুষ নই! অবশ্যই আমি মানুষ। ছেলেটা কাঁদছে কাঁদুক। আর কী আশ্চর্য, ওই মুহূর্তে, ডক্টরেট আমি, বিশাল চাকুরে আমি, সম্মানিত আমি, আমি ভেবেছিলাম, ওই সন্তান আমার নয়, নীপা আমার সন্তানের জননী নয়, নীপা আমার দেহ, ফ্লেশপট। ওম্যান ইজ এ উম্ব। সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নীপা বাঁ হাত দিয়ে অসুস্থ সন্তানকে চাপড়াতে লাগল। ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি নীপার সারা মুখে বিরক্তি, ঘৃণা। আনন্দ নয়, সহ্য। সহযোগিতা নয়, সমর্পণ।

আর সেই আবেগেই জন্মেছিল আমার মেয়ে। সেই মেয়ে যদি এখন আমার মুখের ওপর স্পষ্ট

বলে, যা করছি, বেশ করছি। তোমরা কী করেছিলে মনে নেই, তখন তো আর কিছু বলার থাকে না। চোরের মায়ের বড় গলা কি সাজে! আমি যে আমার ভবিষ্যৎ তৈরি করতে করতে আসছি। নদী যেমন আসে পলি ফেলতে ফেলতে। এখন আর নিজেকে চাবকালে কী হবে? ফিরে গিযে তো আর শুরু করা যাবে না। জীবন হল টুথপেস্ট। বেরিয়ে গেলে আর ঢোকানো যায় না। পড়েই শান্তি:

Mankind is ruled by the Fatest, they even govern those private parts that our clothes conceal. The slave who ploughs his master's field has less trouble. Than the one who ploughs him. এখন আমি বুঝেছি ভাল বীজ থেকে যেমন ভাল গাছ হয়, তেমনি শুদ্ধ, সাত্ত্বিক বীজ থেকেই সুসন্তান হয়। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র তালমুদে আছে, তুমি তোমার স্ত্রীতে উপগত হলে, আর তোমার স্ত্রী সেই সময় পরপুরুষের কথা ভাবছে, তখন তোমার স্ত্রীর চেয়ে ব্যভিচারী আর কেউ হতে পারে না। সেইটাই সবচেয়ে বড় অ্যাডালটারি। তা হলে বিপরীতটাও সত্য। আমি নীপাতে, আর আমার মন অমৃতাতে, কি তনুতে, কি অফিসের সুন্দরী পি এ-তে অথবা প্রতিবেশিনীতে, যা হয় আর কী, কিংবা সদ্য দেখা সিনেমার পেট খোলা, মাজা দোলানো নায়িকাতে, তার মানে আমি ভ্রষ্টাচারী। এর কোনও ক্ষমা নেই। মানুষের মনের বিচার আদালতে হয় না। শাস্তি হল ভবিষ্যৎ। বেশি দূর ছুটো না, তা হলে আবার অতটাই তোমাকে ছুটে আসতে হবে। রাখাল যদি ভুল পথে ছোটে, গোরুর পালও তার পেছন পেছন ভুল রাস্তায় ছুটবে। পাপ প্রথমে সরু মাকড়সার জালের মতো, শেষে জাহাজের কাছি।

আমারও বয়েস হল। ওদিকে অমৃতার দাদারও বয়েস হয়েছে। সে ভদ্রলোক কি আমার মতো জীবন নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। কোন আবেগে কী সন্তান জন্মে, কী চেহারা পেয়েছে, সে নিয়ে কোনও মাথাব্যথা আছে? তাঁর জীবন যেটুকু দেখে এসেছি, তাতে মনে হয়েছে, ভদ্রলোকের জীবন দর্শন হল— চালিয়ে যাও। তারপর দেখা যাবে। বেশ বুঝেছি, জ্ঞান বাড়লে দুঃখ বাড়ে। হাবোড়তাবোড় পাঁচটা পড়লে পাওনা একটাই অশান্তি। সেই এক সাধক ভারী সুন্দর বলেছিলেন, মরার সময় বুঝলুম কেন বেঁচে ছিলুম।

দেরাদুনে অমৃতাদের ফলবাগানে প্রথম দিনটা ভালই কাটল। পরের দিন সকালেই পড়ে গেলুম অসুখে। খেয়ে অসুস্থ। অমৃতার দাদা বউদি অ্যায়সা খাওয়া খাওয়ালেন, একেবারে কাত। বাঙালির পেট আর পাঞ্জাবি-খানা। দুপুরের আহারের পর দাদা বলে বসলেন, হাত অঞ্জলি করো। একটা বড় টিন থেকে আমার হাতে হুড়হুড় করে খাঁটি গব্য-ঘৃত ঢালতে লাগলেন, আরে ইয়ার খা লো। ইয়ে তো হজমি হায়। হজমি হয়ে গেল বদহজম। কী লজ্জার কথা। বাঙালির অপমান। দুই মহিলা দু'পাশ থেকে সেবায় ব্যস্ত। জ্বর এসে গেল। বেশ মধুর অভিজ্ঞতা। চোখ মেললেই সামনে একজোড়া সুন্দর মুখ। তলপেটের ওপর একটি কোমল হাত। কপালে আর একটি। পেট ধরেছে; কিন্তু জ্বর আছে। দিশি দাওয়াই আর টোটকা চলেছে।

ওই সময় আচ্ছন্ন অবস্থায় মাকে দেখলুম। টকটকে লালপাড় শাড়ি পরে মাথার দিক থেকে মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। মা কখনও ওভাবে আমার অত কাছে আসেননি। মা আমার থেকে একটু দূরে দূরেই থাকতেন। কেন তা জানি না। মনে হয় সহ্য করতে পারতেন না।

অমৃতার বউদিকে একটু সাজিয়েগুজিয়ে দিলে বম্বে ছবির নায়িকা হতে পারত। আমি বিছানায়, আর আমাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দুটো মেয়ে। এ যেন পাওনার ওপর উপরি পাওনা। সেই দেখেছিলুম দাওয়াইয়ের চেয়ে সেবা বড়। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, জীবন বদলাবদলি করার উপায় থাকলে আমি অমৃতার দাদা হয়ে বাকি জীবনটা এখানেই এই মেয়েটিকে নিয়ে কাটিয়ে দিতুম। সেই সময়টা ছিল চাঁদের আলোর রাত। লিচু, চেরি, আম আর আলুবখরা গাছের ছায়ায় ছায়ায় পড়ে আছে বাগানের পথ। এপাশে, ওপাশে গোটা কতক নেয়ারের খাটিয়া। গ্রীষ্মে বাইরে শুতে ভালই লাগে। পাতা ছাওয়া আকাশ। টিপ টিপ আলোর মালা পরা মুসৌরি হিলস। বেশ বড় রকমের একটা

স্বপ্ন চলে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। অমৃতার বউদিকে আমি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারতুম। কোলে মাথা রেখে শুতে পারতুম। অসুস্থ মানুষ সবই পারে; কিন্তু আমার সংযম। তবে মানুষের চোখ বড় ভোগী। তার খিদে আর মেটে না। ভাগ্যিস, ভগবান মানুষকে চোখ দিয়েছিলেন। তা না হলে সব আয়োজনই তাঁর মাঠে মারা যেত। ওয়াল্ট হুইটম্যান কেমন করে লিখতেন,

I believe in the flesh and the appetites,
Seeing hearing and feeling are miracles,
And each part and tag of me is a miracle.
Divine am I inside and out, and I make holy
Whatever I touch or am touched from
The Scent of these arm-pits is aroma finer than prayer
This head is more than Churches or bibles or Creeds

ওদের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার একটাই ছটফটানি, আমার জীবনটা কেন এমন হল না। একটা বাগান। একটা বাংলো। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি মাপের একটা বউ। যার চুলে সামান্য একটু টক গন্ধ। যার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পোশাকের শাসন মানতে চায় না। যে সব সময় হাসে। তাকালে কিছু ঢাকতে চায় না। কোথাও হাত লেগে গেলে অসভ্য বলে দূরে ঠেলে দেয় না। পা তুলে বসে থাকলে যন্ত্রণার অছিলায় মাথাটিকে তলায় গুঁজে দিলে, একটি কথাই বলে, আরে এ কেয়া রে?

রাতে অমৃতার সঙ্গে এক ঘরেই শয়ন। আহা, আমার অসুখ না? শরীর যে দুর্বল। কপালে হাত রেখে অমৃতা বললে, 'ফিলিং স্লিপি?' ঘুম? ঘুম আমার ছুটে গেছে। ঠিক পাশের ঘরে দাদা বউদির দাপাদাপি।

মাথার কাছে জানালা। অমৃতা বললে 'উঠে বোসো। তাকিয়ে দেখো মুসৌরি রাতে কেমন সাজে। ইট ইজ ভেরি কোল্ড আউট দেয়ার। রাতে দেরাদুনেও শীত শীত করে।' অমৃতা বললে, 'সারাদিন লস্যি খেয়ে আছ। এখন কিছু খাবে?'

পাশের ঘর থেকে অমৃতার বউদির খিলখিল হাসি ভেসে এল। সাংঘাতিক একটা কিছু হচ্ছে ও ঘরে।

অমৃতা বললে, 'শি ইজ এ বিচ। সুন শি উইল বি প্রেগন্যান্ট অ্যান্ড গিভ বার্থ টু এ টুইন।'

মা যেভাবে কপালে হাত রেখে ছেলের জ্বর দেখেন, সেইভাবে অমৃতা আমার কপালে হাত রেখে বলেছিল, 'যাক, জ্বর ছেড়ে গেছে। চলো বাগানে যাই। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। সারাদিন তো শুয়ে কাটালে। আর ঘুমোয় না।'

সব মেয়ের মধ্যেই একটা করে মা থাকে। তা না হলে পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যেত। বোলতা আর ভীমরুলের খেলা চলত। ভীমরুল বোলতার মাথা চেপে ধরে কড়কড় করে হুল ফোটায়। সব ঘিলু শুষে নিয়ে মরা বোলতাটাকে ফেলে রেখে উড়ে চলে যায়। মেয়ে ভীমরুলের হাতে পুরুষ বোলতার সেই অবস্থা হত, যদি না তাদের ভেতর একটা মা থাকত। 'সাক', 'সাক', 'অ্যান্ড সাক, অ্যান্ড ব্লিড দেম হোয়াইট।'

কঠোর সংযমী, কঠোর তপস্বীকে লক্ষ্য করে তন্ত্র বলছেন, দেখো, দেখো, সৃষ্টির উন্মেষ ভঙ্গিটা, একবার দেখো, প্রথমে একটা রক্তের ডেলা তো ভূমিষ্ঠ হল। তারপর তাকে স্তন্যপান করিয়ে, আহার জুগিয়ে করা হল পূর্ণ মানুষ। মায়ের কর্তব্য মা শেষ করলেন। শুরু হল আমির খেলা। আমি এবার বহু হব। একোহহং বহু স্যাম। এই বহু হতে গিয়ে বউ খোঁজা। আর তারপর সেই দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনি, পলক পলক লহু চোষে। যেমন ও ঘরে অমৃতার বউদি। অমৃতার দাদা বোলতাটিকে ভীমরুলের মতো ধরেছে। ভদ্রমহিলা ধরতে পারে। চেহারা দেখেই মনে হয়েছে ভিসুভিয়াস। ভেতরে লাভা আছে। ফুটছে টগবগ করে।

বিশাল বাগান। চাঁদের আলোয় পথের ওপর ছড়িয়ে আছে গাছের পাতার আলপনা। মাথার ওপর ঝনঝনে শুকনো আকাশ। পাহাড়ের কাছাকাছি বলে তারাদের কী চেহারা যেন ধকধক করে জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকছে ঝিনঝিন করে। রাতের পৃথিবী যেন উর্বশীর কালো চুমকি বসানো আঁচলের মতো। বাতাসে উড়ছে। দেহে জড়িয়ে যায়। দূরে মুসৌরি ঘুমোচ্ছে। আলোর মালা পরে পাহাড় জেগে আছে একা মৌন ধ্যানে।

অমৃতা আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। আমার মনে হচ্ছে, নারীই ধর্ম। ভালবাসাই আধ্যাত্মিকতা। সেই মুহূর্তে মনটা আমার যেরকম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবটা আজও আমার মনে ধরা আছে। সেই বয়েসটাই নেই। পরিবেশ নেই। চরিত্র নেই। অমৃতা আছে। অনেক দূরে। কানাডায়। বয়েস হয়ে গেছে। সে এখন মা। আমি যেমন বাবা।

বাগানে একটা দোলনা ছিল। পাশাপাশি দু'জনে দোল খেতে লাগলুম। আমরা যখন দোল খাচ্ছি তখন ভারতের মাথার ওপর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ বেশ ঘোরালো হয়েছে। আমরা যখন দোল খাচ্ছি তখন আমার মা একটি প্রদীপ হয়ে আমাদের দোতলার ঘরে বাতাসে নিবু নিবু হয়ে জ্বলছেন।

অমৃতা বলেছিল, 'তুমি খুব ভাল ছেলে। সিগারেট খাও না, প্রেম করো না। আই ওয়াজ রেপড টোয়াইস।' শুনে আমি হাঁ। এত সহজে একটা মেয়ে এমন কথা বলতে পারে। তার বাস্কেটবল টিচার একবার সিমলা ক্যাম্পে সুযোগ নিয়েছিল। আর একবার নিয়েছিল তার পিতার বন্ধু। যার দৌলতে তার এই চাকরি। তারপর সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বললে, দিস ইজ ইনএভিটেবল। হবেই। তারপর কেন হবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এমন একটা অশ্লীল কথা বললে।

বেশ কিছুক্ষণ চাঁদের আলোয় দোল খাবার পর প্রশ্ন করলে, 'হাউ ডু ইউ ফিল নাউ?'

ভালই বোধ করছিলুম। বললুম, 'ভাল।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ভাল হয়ে গেল মন্দ। আবার সে মন্দ এমন মন্দ যে, সে মন্দর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না। অমৃতা বললে, 'তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা?' মিথ্যে বললুম। বললুম, 'হ্যাঁ।' 'দেন লেট আস ডু ইট অ্যাগেন।'

আমি তখনও জানি না, আমার মা মারা গেছেন। আমার অশৌচ। চারিদিকে আমার খোঁজাখুঁজি চলেছে। মুসৌরি হিলসের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে শেষ রাতের হিলহিলে ঠান্ডা।

অমৃতাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি কেন এমন করলে?'

স্পষ্ট উত্তর, 'আমি মানুষ বলে।'

'পরো দিল্লিতে আমার চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'কেন?'

'আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'এক রাতেই?'

'হ্যাঁ।'

'ভেবে দেখতে পারি।'

'কেন?'

'বাঙালিরা খুব সফ্ট, রোমান্টিক, কালচারড আর ধার্মিক। আর ধার্মিক বলেই ফেথফুল।'

এখন আমি এইসব কথা ভাবি আর হাসি। আমার সম্পর্কে নীপার ধারণা ঠিক এর উলটো। একেবারে বিপরীত। নিশ্চয় কারণ আছে। সত্যিই আমার সব আছে, একটা জিনিস নেই, চরিত্র। আমি শয়তান। আমি পারভার্ট। সবাই জানে। আমার বউ জানে, ছেলে জানে, মেয়ে জানে। যত দিন গেছে, তত পাপ বেড়েছে। নিজেকে যতবার শক্ত মুঠোয় ধরতে চেয়েছি, ততবার হাত ফসকে পড়ে চুরমার হয়েছি।

জীবনের ওপর দিয়ে এক একটা দিন, এক একটা রাত চলে যায় তার আর তুলনা মেলে না।

জোর করে, আয়োজন করে ফিরিয়েও আনা যায় না। জীবনের এই হল ট্র্যাজেডি। দেরাদুন আছে, বাগান আছে, অমৃতার মতো মেয়ে আছে। আমি আছি। একটু পুরনো হয়েছি ঠিকই, কিন্তু মন আছে, স্মৃতি আছে, তবু যাহা যায়, তাহা যায়। শূন্য এ বুকে পাখি আর ফিরে আসবে না।

ভোরবেলা অমৃতা বললে, 'রাতটা কেমন মনোহর কাহিনির মতো কেটে গেল!' আমার এক রাতের বউ এইভাবেই হারিয়ে গেল জীবন থেকে। অমৃতার বউদির চোখ হাসি হাসি, দুষ্টু দুষ্টু। অমৃতার দাদাটা একটু ভোঁতা। গাধার মতো খাটতে পারে, হাতির মতো খেতে পারে, মানুষের মতো ভাবতে পারে না। তবু ভাল লেগেছিল মানুষটাকে। যে গাছের সঙ্গে কথা বলে, মাটির ওপর রাগ করে, ফল ছিঁড়ে নেবার আগে গাছের অনুমতি চায়, সে বড় অদ্ভুত লোক। মানুষটার শক্তিও ছিল সাংঘাতিক। বউকে কাঁধে তুলে বললে, ওই উঁচু ডাল থেকে চেরি পাড়ো। আমার ক্ষমতায় কুলোবে!

তখন পনেরো আনা খরচ করলে বাসে দেরাদুন থেকে মুসৌরি। ঘুরে ঘুরে যত ওপরে উঠবে তত ঠান্ডা বাড়বে। আমার সঙ্গে গরম জামা ছিল না। অমৃতার গরমেই গরম হয়ে বসে আছি, জানলার ধারের আসনে। মুসৌরি নাকি কুইন অফ হিল স্টেশনস। বাইরে কুইন, আমার বাঁপাশে কুইন অমৃতা।

লান্ডুরে একটা চলনসই হোটেলে ওঠা গেল। মাঝে মাঝে পয়সার চিন্তা হচ্ছিল। যা আছে তাতে কুলোবে তো! তবে হাতে ঘড়ি আছে। আঙুলে দুটো আংটি আছে। সারাটা দিন মুসৌরির এ মাথা থেকে ও মাথা। কপুরথালার মহারাজার বাড়িটা দেখিয়ে অমৃতাকে বলেছিলুম লটারি পেলে তোমাকে কিনে দেব। গান হিলে অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের দু'জনের ছবি তুললেন, পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। ছবিটা আমার কাছে এখনও আছে। মহাসম্পদের মতো লুকোনো। চলে যাওয়া সময়ের মতো আর কী সম্পদ আছে! টাকা গেলে টাকা আসে। সময় গেলে আর আসে না। বেদনার মতো মণিমুক্তো আর কী আছে! ছিল আর নেই, এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর কী হতে পারে।

পরে আমি তিনবার মুসৌরি গেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে, সময়ের সমাধিতে ফুল চড়াতে এসেছি। চোখের সামনে অদৃশ্য প্রস্তর ফলকে লেখা, হিয়ার লাইজ ইন পিস দি বেস্ট মোমেন্টস অফ ওয়ানস লাইফ। ওই জায়গাটায় রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল একটি যুবক পাশে এক যুবতী। লম্বায় ইঞ্চিখানেক বড়। শরীরের কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। লম্বা লম্বা পা। লম্বা হাত। অল্প অল্প লোম। সে ছেলে হতে হতে মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কোনও মেয়েলি ন্যাকামো ছিল না। সে যখন বলত, কাম টু মি। একটা হাত বাড়িয়ে দিত। আমার কুকুরটা ছটফট করে ন্যাজ নাড়ত। সে যদি বলত ডাই ফর মি, আমি লালটিব্বা থেকে লাফিয়েও পড়তে পারতুম। শি ওয়াজ মাই মাস্টার, আই ওয়াজ হার ডগ।

পাঁচটা বাজে থার্ড ক্লাস জিনিস তখনও পড়া হয়নি, তাই বুঝিনি। এখন জেনেছি, অমৃতা মনে হয় সমকামী ছিল। মুসৌরি থেকে আবার আমরা দেরাদুন ফিরে এলুম। অমৃতার দাদা দুপুরে মোটরবাইক চেপে চলে গেলেন শহরে। আমি বাগানে একা একা ঘুরছিলাম। পরের দিনই দিল্লি ফিরব, তাই যতটা পারি ভোগ করে নিই। বাংলোর ঘরে একই খাটে পাশাপাশি শুয়ে আছে অমৃতা আর তার বউদি। আমি বাগান থেকেই শুনতে পাচ্ছি দু'জনের খিলখিল হাসি। গাছপালাও প্রকৃতি, নারীও প্রকৃতি। নরের নারীর প্রতিই আকর্ষণ বেশি। অন্যের ব্যাপার জানি না। আমার ছোঁক ছোঁক স্বভাব বেড়ালকেও হার মানায়। আর এই লুকিয়ে দেখার বদ অভ্যাসটা সেই সময় থেকেই চরিত্রে ঢুকেছে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাই। লজ্জা পাই। অপমানিত হলেও আমি অসহায়। এ আমার স্বভাব। বিলেত হলে বলত 'ভয়ুরিস্ট'। আমার ভেতর যত পাপ, সবই সায়েবি পাপ। পাপে আমি সায়েব, চেহারায় আমি 'নিগার'।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, খোলা জানালার দিকে তাকালুম। অমৃতা খেলা করছে। তার বউদির শরীর নিয়ে খেলছে। অনেকটা পুরুষের মতো। প্রবীণের শাসন না থাকলে নবীনের এই অবস্থাই

হয়। আমার পরিবারে এখন যা হয়েছে। আর চরিত্র না থাকলে শাসিত শাসন মানবে কেন। গাছের আড়ালে আমি স্থাণু? খোলা জানলায় দুই মহিলার রঙ্গ। একালে বিলিতি বইয়ের পরিচ্ছদ।

দিল্লি ফেরার পথে অমৃতা বললে, 'বিয়ে, সংসার এসব আমার ভাল লাগে না। বড় একঘেয়ে। বিয়ে, ছেলে, মা, আবার, হয় তো আবার, মানুষ করো, সেবা করো, ডিসগাসটিং। আনন্দ করার জন্যে জন্মেছি। ফুরিয়ে গেলে চলে যাব। তোমার কী মত!'

বুঝলুম অমৃতা পাশ কাটাতে চাইছে। দিল্লি যত এগিয়ে আসছে, অমৃতা তত দূরে সরছে। তনুর বাবা দুঃসংবাদ দিলেন, 'তোমার চাকরিটা মনে হয় হয়েও হবে না। চিনে হামলার জন্যে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ হতে চলেছে। তবে আমি খুব চেষ্টা চালাচ্ছি।'

কী দুর্মতি হল, বলে ফেললুম, 'আপনার মেয়েকে আমি কিন্তু বিয়ে করতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঠাস করে একটা চড় মারলেন, 'তোমাকে কে বলেছে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে। তুমি আমার মেয়ের চেয়ে হাজার গুণ ভাল মেয়ে পাবে। আমার ছেলে নেই, তাই তোমাকে ছেলের মতো ভালবেসে ফেলেছি। অপত্য স্নেহের তুমি কী বুঝবে ইডিয়েট!' ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। তনুর বাবার মতো এমন অদ্ভুত মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। কমলালেবুতে যিনি রস ঢেলেছেন, আমড়াকে যিনি আঁটিসার করেছেন, সুপুরিকে যিনি পাথর করেছেন, করমচাকে যিনি টক করেছেন, উচ্ছেকে যিনি তেঁতো করেছেন, কোনও কোনও মানুষকে যিনি হৃদয়হীন পশু করেছেন, তিনিই আবার কোনও কোনও মানুষকে করেছেন মৌচাকের মতো মধুর নির্ঝর। পৃথিবী সেই মানুষটিরই খেলা। যাঁকে সবাই ঈশ্বর বলে। এই বোধ আমার তখনই হয়েছিল। যে ঘটে যা ঘটাও, সেই ঘটে তাই ঘটে। জগৎমাঝে তব পটিয়সী মায়া, ঘটেপটে রটাও তোমার মহিমা। এই হাত যদি পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তোমার ইচ্ছা, এই হাত যদি স্তনমর্দন করে সেও তোমার ইচ্ছা। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি শয়তান।

তনুর বাবার সঙ্গে আমারও চোখে জল এসে গেল। আমার জন্যে এইভাবে কেউ কোনওদিন ভাবেনি। এইভাবে সপাটে কেউ কোনওদিন আমাকে চড় মারেনি। তনুর মা স্নান করছিলেন গোলমাল শুনে কোনওরকমে গায়ের ওপর শাড়িটা ফেলে চলে এসেছেন। আবেগে আমার চোখে জল। মনে তিনি। অথচ ঝাপসা চোখ তার নিজের কাজে ব্যস্ত। তনুর মায়ের ভীষণভাবে অনাবৃত শরীরের ফোটো তুলে চলেছে। মাথার ডার্করুমে একের পর এক প্রিন্ট হচ্ছে। পা, নিতম্ব, পুরোবাহু, ঘাড়, বুক, কোমর, চুল, রং। মানুষ একটা কম্পিউটার নিয়েই জন্মায়। সেখানে নারী জরিপের ডাটা আগে থেকেই ভরা থাকে। সবাই মা। কিন্তু নিজের মায়ের দিকে কেউ কুনজরে তাকায় না। আমার চোখে জল, অথচ ভাবছি, তনুর বাবা স্বচ্ছন্দে আরও দশটা বছর এই নারীকে ব্যবহার করতে পারেন।

আমার এই বিটকেল স্বভাবের জন্যে, কোনও পরিবারে যেতে ভয় পাই। আমার নজর ভাল নয়। হায় আঁখ। সেই মুখ মুখ নয়, যে মুখ হরির গুণগান না করে, গলতি বাত বলে। সেই মুখ মুখ নয়, যে মুখ অষ্টপ্রহর তাঁর নাম না নেয়। সেই চোখ চোখ নয় যে হরি রূপ ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করে। মনের এক কোঠায় এইসব, আবার অন্য কোঠায় ওইসব। দু'কামরায় দু'ঘর ভাড়াটে। না একজন বাড়িঅলা আমি ভাড়াটে। না কে যে কী, বোঝে কার সাধ্য। দুটোতে দিন-রাত কাজিয়া।

'রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদুবুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥

মোহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা, মনের আর আর যে সব অবস্থা, সবই বুদ্ধি আর মনের ক্রিয়া। যেই ঘুমোলে সব চলে গেল। কারণ গভীর নিদ্রায় মন নিষ্ক্রিয়। তা হলে ওইসব ময়লা হল মনের, আত্মার নয়। আত্মা শুধু ধুকপুক করে চলেছে। নিরাসক্ত যোগী। যা ব্যাটা, তোর ল্যাঠা তুই সামলা। দেহ-খাঁচায় বদ্ধ মায়ায়।

তনুর মায়ের গালে সাবানের ফ্যানা। বগলের পাশ দিয়ে মসৃণ অঙ্গ বেয়ে জলের ফোঁটা নামছে।

হালকা হলুদ রঙের ভিজে শাড়িতে দেহের খাঁজখোঁজ। আমার চোখে জল, মনের দুটো দরজাই হাট খোলা। একজন বলছে তাকাসনি, আর একজন বলছে দৃষ্টিতে ভোজন। কার ভজনা গবেট ভজা।

সারাটা জীবন ভেতরে এক ব্যাটা ধুনুরি বসে বসে তুলো ধুনে গেল।

তনুর মা ওই অবস্থায় আমার দিকে এগিয়ে এলেন, 'তুমি ছেলেটাকে মারলে?'

আমার গালের লাল জায়গায় তাঁর শীতল কোমল হাত। আমি আর পারলুম না। তাঁর ভিজে নরম বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলুম। কখনও মনে হচ্ছে মা, আকাশে মেঘ আসছে, মা নয় নারী। শৈশবে তনুর মুখ থাকত এখানে। তিনটেই মানুষের মুখ, একটা তনুর, একটা তনুর বাবার, একটা আমার। বুক একটাই মুখ তিনটি। তখনও আমি জানি না, আমার মা নেই চলে গেছেন। আমার অশৌচ। খোঁজপাত চলেছে চারদিকে।

তনুর মা বললেন, 'কবে যে তোমার বুদ্ধি হবে?'

আমি নিচু হয়ে তনুর মাকে প্রণাম করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কাচের সব ময়লা ধুয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির জন্যে আমার মন ছটফট করে উঠল। যেন শুনতে পেলুম, কেউ ডাকছে, ওরে তুই চলে আয়, শিগগির আয়।

হাওড়ায় নেমে বাড়ির দিকে আসছি। বাসস্ট্যান্ড থেকে নেমে আমাদের বাড়ি ছিল মিনিট দশেকের হাঁটা পথ, মানে প্রায় মাইলখানেক। পথে পড়েই বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। চারপাশ নির্জন। বড় নিজন। দু'পাশে পুরনো পুরনো বাড়ি। পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে গাছের ডালপালা। যত দূর দৃষ্টি যায় কালো পিচের পথে সাদা সাদা খই আর ফুলের পাপড়ি আলপনার মতো ছড়ানো। মৃদু বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আসার আগেই এই পথ দিয়ে কেউ চলে গেছেন চির-যাত্রায়। তখনও জানি না, কী দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে বাড়িতে।

মা নেই। লাল পাড় শাড়ির আঁচল নেই। চাবির শব্দ নেই। কণ্ঠস্বর নেই। মনুর মা কেটলিটা দিয়ে যাও। সন্ধ্যা বাবাকে চা-টা ছেঁকে দে। নানা আদেশ, নানা উপদেশ, সব স্তব্ধ। একটি মাত্র মানুষের জন্য সারাবাড়ি খাঁ খাঁ করছে। চলে যাবার পর বুঝলাম কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে মা বাড়িটাকে ছেয়ে রেখেছিলেন! বাবার চেহারা অসম্ভব ভেঙে গেছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পাথরের মতো মুখ। কিছু একটা বলতে চাইছেন। ঠোঁট কাঁপছে। অতি কষ্টে শুধু বলতে পারলেন, 'সব শেষ।' তারপর চোখ দিয়ে হুহু করে জল নামল।

আমার মন, সত্যি আমার মন কী অসম্ভব বিকৃত। মাথা শূন্য। মা নেই। আচমকা আঘাতে ভেতরটা ফুলছে। হুহু করছে। দিল্লির আঁধি ছুটছে মনে, সেই অবস্থাতেও ভাবতে পারলুম, বাবার এখনও এমন স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, কীভাবে জীবনের বাকি রাত কাটাবেন? আমার নীপা আছে। বহু দূরে অমৃতা আছে। ক্ষণিকের চিন্তা, তবু কী বিশ্রী তার গতি?

মাখী চন্দন পরিহরৈ জহঁ বিগন্ধ তহ জহি।

মাছি চন্দন ছেড়ে যেখানে দুর্গন্ধ সেখানে যায়। মাতা জুঠা, পিতা ভি জুঠি, জুঠে হো ফল লাগে। মা এঁটো, বাপও এঁটো, তাদের থেকে যে ফল উৎপন্ন হল তাও এঁটো। তা হলে? কবীর বলছেন, পণ্ডিত, তুমিই বলো কী করবে, সবই তো এঁটো, উচ্ছিষ্ট, ভুক্ত, জুঠি। তা আমার কী হবে? আমি যে মানুষের প্রথম পাপের ফসল!

বিপদ একা আসে না। দলবল নিয়ে মহাসমারোহে আসে। প্রথম এল দিল্লির চিঠি। তনুর বাবা লিখছেন, তালিকার প্রথমেই তুমি আছ। চাইনিজ অ্যাগ্রেশনের জন্যে সব আটকে আছে। ভেবো না, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মানুষ হতাশার অলিন্দ পেরিয়ে আশার সোপানে উঠতে চায়। ধাপ ভেঙে ভেঙে সেই নীল কাচের ঘর। ভেঙে যাবে একদিন তবু যেতে চায়। মনের

খাঁচা খুলে আশা-পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেই আজীবন শান্তি। পুরুষের কর্ম নয়, মহাপুরুষ পারেন।

দ্বিতীয় বিপদটি এল আচমকা, অন্যদিক থেকে। এক চক্ষু হরিণের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্ত। মাথাটা মসৃণ করে কামানো। ভরাট মুখে চুল ফেলে দিলে বেশ একটা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী চেহারা হয়। ঢাকা আর পাকা নর্দমাকে যেমন মনে হয় পথ। ভেতরের ভড়ভড়ে পাঁকের সন্ধান পাওয়া যায় না। বসে আছি আমার সেই ছাদের চিলেকোঠায়। কোণের দিকে সেই সুন্দরীর ছবি। ঝুলঝাড়া হয়নি বেশ কিছুদিন। আমার সমস্ত অপকর্মের নীরব সাক্ষী।

সেই ঘরে হঠাৎ এসে ঢুকল নীপা। বাঘ মাংসকে আহার ছাড়া কিছু ভাবতে পারে? সে ন্যাড়া বাঘই হোক কি ন্যাজ কাটা বাঘ হোক! নীপা। দেখেই মন দুলে উঠল। বছরে একবার বসন্তের টিকে দিতেন এক পুরকর্মী। একটা রকে এসে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বসতেন। লোকের পর লোক আসছে। মেয়েরা আসছে। কার কী মুখ চোখ চেহারা কিছুই দেখার দরকার নেই। দেখছেনও না। তাঁর এক কথা— তোলো। তোলো মানে হাতা তোলো। স্পিরিট ভেজানো তুলো ঘষে, একফোঁটা ভ্যাকসিন তারপর গোল একটা সিল খুড়ুক করে ঘুরিয়ে দেওয়া, দিয়েই বলা, নেকস্ট ম্যান। তা কাউন্সিলার এসেছেন দেখতে। কেমন হচ্ছে আর কী। ভদ্রলোক বললেন, তুলুন তুলুন। হাতে স্পিরিট ভেজা তুলো।

নীপাকে দেখামাত্রই আমার বিমর্ষ, বিষণ্ণ মন যেন বলে উঠল, তোলো তোলো। গালে চড় মারা যায়, মনে তো আর চড় মারা যায় না। ঢোক গিলে সামলাতে হয়। নীপার মুখে তেমন হাসি নেই। তপতপ করছে সারা মুখ। উড়ুউড়ু চুল। ভাবলুম আমার শোকে শোকার্ত। আহা, ভালবাসার সেই তো ধর্ম! দুটো দেহ হৃদয় একটা। নীপা আমার পাশে এসে, গায়ে গা লাগিয়ে, পা ছড়িয়ে বসল। এতক্ষণ মায়ের কথাই ভাবছিলুম। মাঠের বাইরে মারা বলের মতো মায়ের চিন্তা সাইড লাইনে চলে গেল। গায়ে গায়ে নীপা। ত্বকে ত্বকে নীপা। দেহের উত্তাপ। চুলের গন্ধ। শরীরের পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা।

ধ্যাত তেরিকা মা। মন, দেহাশ্রিত মন কী মারাত্মক! প্রথমে চমকে উঠলুম। এমন একটা কথা মনে এল! এই হল মানুষের ছেলে! মাতা জুঠি, পিতা ভি জুঠি, জুঠে হো কল লাগা। ধর্ম আর দর্শনকে মানুষ কী চমৎকার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। নীপা এল। আলুথালু পাশে বসল গায়ে গা লাগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি শক্ত। কবীর এলেন। বললেন, মানুষের জন্ম এঁটো। কামোচ্ছিষ্ট। কুলগুরু কৃপানন্দের মুখে শোনা শঙ্করস্তোত্র ভেসে উঠল মনে। আমার একটা হাত নীপার কাঁধ আর খোঁপার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আঙুল ও পাশের বুকের ওপর খেলা করছে। ক্রমশই আমি কঠিন হচ্ছি। বৈদান্তিক হয়ে উঠছি, দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃশিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ। সূর্য উঠবে, সূর্য ডুববে, জীবনসূর্য, আলো থেকে অন্ধকার। শীত আর বসন্ত, প্রভু! আসে যায় ॥ সময়, সে তো বহতা নদী, কুলুকুলু খেলে যায়। যৌবন, জরা ছুঁয়ে মৃত্যুর মহান্ধকারে চলে যায় ॥ জীবনের বৃথা আশা, অশান্ত অগ্রপথিক। ক্লান্তিহীন চলেছে চলেছে। মূর্খ! ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, জপ গোবিন্দ। অন্তকাল জীবনের ব্যাকরণ বৃথা হয়ে যায় ॥

নীপার বিশাল খোঁপা সহ মাথা আমার কাঁধে। আমার হাত, কখনও ধরছে, কখনও ছাড়ছে। টাটকা জীবন আর বাসি মৃত্যুর মাঝে বসে আছি পাপী শ্রীচৈতন্য। মনে পড়ছে গল্প, রবিবার এক ধর্মযাজক এক গৃহে এসেছেন প্রার্থনা সভায়। প্রার্থনা পরিচালনার সময় তাঁর ছেলেটি মারা গেল। স্ত্রী কী করলেন! মৃত সন্তানটিকে চাদর চাপা দিয়ে রাখলেন। ধর্মযাজককে কিছুই জানালেন না। সভা শেষে তিনি গৃহে এলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলে কোথায়?' স্ত্রী বললেন, 'পড়তে গেছে।' যাজক বললেন, 'সেখানেও তো দেখলুম না।' স্ত্রী স্বামীকে পানীয় দিলেন। খাওয়া শেষ করে আবার প্রশ্ন— 'ছেলে কোথায়!' স্ত্রী বললেন, 'তুমি ভেবো না। অন্য কোথাও গিয়েছিল, এখন

ফিরে এসেছে। তুমি আগে খেয়ে নাও।' স্ত্রী আহার পরিবেশন করলেন স্বামীকে। যাজক খেতে যেতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে লাগলেন। স্ত্রী তখন বললেন, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব?' যাজক বললেন, 'করো।' 'আজ ভোরে, একজন এসে আমার কাছে একটা জিনিস রেখে গিয়েছিল। এখন এসেছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কী করব! দোব না রেখে দোব?' যাজক বললেন, 'রাখবে কেন? যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।' তখন স্ত্রী বললেন 'তোমাকে না দেখিয়ে ফেরত দেব কী করে! তুমি এসো।' স্বামীর হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে চাদরটি সরালেন। বিছানায় মৃত পুত্র। যাজক কেঁদে ফেললেন— স্ত্রী বললেন, 'সে কী তুমি কাঁদছ! তুমিই তো একটু আগে বললে, গচ্ছিত জিনিস মালিককে ফিরিয়ে দাও, আর তুমিই না বলতে দেনেঅলাও ঈশ্বর, লেনেঅলাও ঈশ্বর। সবই তাঁর মহিমা।'

এই তো সেই মহিমা। মাকে যিনি নিয়েছেন, নীপাকে তিনিই এনে দিয়েছেন।

নীপা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'মনে হয় বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। খুবই চিন্তার কথা। সেদিনের ঘটনায় আমি মনে হয় মা হতে চলেছি।'

তন্ত্র বলেন মানুষের মেরুদণ্ড হল একটি সর্প। একটি নয় তিনটি, পাশাপাশি। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মূলাধারে তার ত্রিকুণ্ডলী। ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পয়াম্। ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী। একটু আগে পর্যন্ত নীপা ছিল আমার কুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অন্তত আমি সেই ভাবেই দেখে পাপকে মহাপুণ্যেব চেহারা দিতে চাইছিলাম—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্।
সদা যোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং।
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং।
পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং সদা চঞ্চললোচনাম ॥

সেই দেবী অবিবাহিতা পোয়াতি। পোয়াতি শব্দটাই মনে হল কারণ 'ভালগার'। দেবী-গর্ভবতী শুনে ষটচক্র ভেদ করে যে সর্প সহস্রারে মাথা তুলছিল, ভয়ে আতঙ্কে লটকে পড়ল। সত্যিই মনে হল আমার মেরুদণ্ড হিম-সর্প। সর্বনাশ! বলে কী। খুব ছোটলোকের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে। বস্তিটস্তিতে ঘটে। ভদ্রপরিবারে হলে মুড়ো ঝাঁটা। সপাসপ। সোজা ঘাড় ধরে, পোঁদে লাথি মেরে ছেলেটাকে বের করে দাও। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও দূরে কোনও আত্মীয়ের বাড়ি। যে রোগের যে দিশি দাওয়াই।

সর্বনাশের সংবাদ পেশ করে নীপা প্রায় শুয়েই পড়ল আমার কোলে। যেন আমি রেকগনাইজড বাপ, সে রেকগনাইজড মা। আরে একে যে বলে অ্যাডাল্টারি। ব্যভিচার! কিন্তু বাবা আমি দায়ী নই। সেন্ট অ্যামব্রোজ বলেছেন, Adam was led to sin by Eve not Eve by Adam. নীপা বুঝছে না কেন যে আমাদের শিশুটিকে কেউ যিশু বলে মেনে নেবে না? সেই ঘরে ধীরে ধীরে সেদিন সন্ধ্যা নেমে এল। আলো জ্বালাবার কেউ নেই। দু'জনেরই প্রশ্ন, কী হবে? আমি নীপাকে গেঁথে ফেলেছি। নীপা আমার টোপ গিলেছে।

এসব ব্যাপার বেশিদিন চাপা থাকে না। মাঠে বীজ ফেললে নিঃশব্দে অঙ্কুরোদ্গম। মনু বলেছেন নারীও ভূমি, পুরুষ হল বীজ। রাবেলে লিঙ্গকে বলেছেন, 'নেচার্স প্লাউমান'। 'ফ্যালাস প্রাউশেয়ার অ্যান্ড ওম্যান ফারো'। আঁদ্রে ম্যাসনের বিখ্যাত ছবি, কোদাল হাতে পুরুষ, ভূমি নারীর কেশাবৃত যোনিদেশ। সে তো দর্শন, সে তো শিল্প। বাস্তব অতি কঠিন। মানুষ নিঃশব্দে, অগোচরে, রাত্রির মধ্যযামে, শিশিরভেজা প্রান্তরে, বীজাঙ্কুরের মতো মাথা তোলে না।

এই শুভসংবাদটি একদিন আমার পরিবারে ছড়িয়ে পড়ল লঙ্কা ফোড়নের ঝাঁজের মতো। একই সঙ্গে হাঁচি, কাশি। অজস্র ছিছিকার, ধিক্কার! আত্মীয়স্বজনরা দেখলেই দূরে সরে যান। মেয়েদের সামলান। আমি যেন মা শীতলা। ধরলেই মায়ের দয়া। অবশেষে একদিন পিতার

মুখোমুখি। পাথরের মতো মুখ। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি। তিনটি মাত্র শব্দে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ পেল, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

আমার শিক্ষা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, রুচি, সংস্কৃতি, আদর্শ দিয়ে যে কোঠাটি তৈরি করেছিলুম, সামান্য একটি জৈব দুর্বলতায় ধ্বস করে ধসে গেল। আর ঠিক সেই সময় নীপার বাবা এলেন ছুটিতে। ভেবেছিলাম, তিনিও জুতোপেটা করবেন। হাসতে হাসতে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, এ গুড ম্যাচ। খুব ভালই হয়েছে। একটু আগে আর পরে। ঘোড়ার আগে গাড়ি আর গাড়ির আগে ঘোড়া। পেতে ফেলো সংসার। ও আর সানাই টোপরে দরকার নেই। রেজেস্ট্রি করিয়ে নাও।

পিতার মুখে যে রাতে তিনটে ছি শুনলাম, তার পরের সকালেই গৃহত্যাগ।

ফল গাছকে ভুলতে পারে না। সেই যে অসহায় বোধ, সেই বোধটা আজও আমাকে তাড়া করে ফিরছে। কেউ কোথাও নেই। কাটা ঘুড়ি ভেসে চলেছি আকাশে। স্নেহ তত দাগ কাটে না, যত কাটে ঘৃণা। সেই যে বাড়ি ছেড়েছিলুম, চৌকাঠ আর ফিরে ডিঙোইনি। কে বেঁচেছে, কে মরেছে, সে খবর আর নিইনি।

চিনে হামলায় চাকরি আটকে গেছে। রোজগার গোটাকতক টিউশনি ছিল। তাও গেছে। তখনও সব বলত চরিত্র গেল তো, মানুষের সবই গেল। ইংরিজিতে বলত, হোয়েন মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট, হোয়েন হেলথ ইজ লস্ট সামথিং ইজ লস্ট, হোয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট। এখন আর বলে না। আমার মনে হয় কন্ট্রাসেপটিভ না এলে আমার মেয়ে এই অবিবাহিতা অবস্থায় তিন-চারবার মা হয়ে যেত। আমার ছেলে বাবা। ওম্যানস লিব, ফ্রি সেক্স, ড্রাগস আর ড্রিঙ্কস এ যুগের ফ্যাশন। এখন যদি বলা হয়,

> Hear, my son, your father's instruction
> And reject not your mother's teaching
> For a graceful garland will they be for your head
> And a chain for your neck.

একালের ছেলে ব্যঙ্গের চোখে তাকাবে। একটু সরে গিয়ে বলবে বুড়ো ব্যাটা বাতেলা মারছে। আমার মেয়ে বিকট বিকট ছেলেদের মোটরবাইকের পেছনে চেপে ঘুরে বেড়ায়। এর নাম নাকি ডেটিং! আমার ছেলে জিনস্ পরা মেয়েদের বাড়িতে টেনে আনে। তুই তুই করে কথা বলে। এদের মধ্যে কেউ আচমকা মা হলে, পাকাপাকি ঘরে এনে তুলবে। বলবে, ইফ ইউ ফিল আনইজি লুক ইয়োর ওয়ে। পরিষ্কার বাংলা, পথ দেখো বাবা।

আমার গর্তে পড়াটাই বড় হল, আমার স্ট্রাগলটা কিছুই নয়। কথায় কথায় সব বলে তুমি কী করেছিলে! আমি আর যাই করি কারুর অসুবিধে করিনি। গাছের অপমান করিনি। বৃন্তচ্যুত হয়ে গেছি। বাসা ছেড়ে উড়ে গেছি। নীপাকে ছেড়ে পালাইনি। স্বীকার করেছি পিতৃত্ব। চোযক যন্ত্রে ফেলে পনেরো মিনিটে আবার তাকে কুমারী করে দিইনি।

ছেলেবেলা থেকেই মানুষের ঘর সংসার *যেখানে* গড়ে *ওঠে* সেইখানেই গাছের মতো শিকড় নেমে যায়। উৎপাটিত হলে বড় কষ্ট হয়। বেঁচে থাকার জন্যে কসরত করতে হয় অসম্ভব। কোথায় যাই, কী করি, কোথায় যাই, কী করি করে দিন পনেরো কেটে গেল। সে এক মজার জীবন। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গেলে, দু'-চারটে প্রথামাফিক কথার পর সব গম্ভীর। বুঝিয়ে দেয় ঠারে ঠোরে, সরে পড়ো। সুবিধে হবে না এখানে। নিকট আত্মীয়দের কাছে অচ্ছুত। দূর আত্মীয়রাও খবর রাখতেন। গোটাকতক মামুলি প্রশ্ন। আচ্ছা এবার এসো। আবার এসো।

একটা মানুষের কোথাও যাবার জায়গা নেই। কোথাও থাকার জায়গা নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। সারা পৃথিবীটাকে মানুষ দীর্ঘ চেষ্টায় রুমালের মতো টুকরো টুকরো করেছে। তার ওপর এক-একটি

রুদ্ধ কক্ষ পরিবার। নো এন্ট্রি। কুকুর তবু মানুষের চাতালে আশ্রয় পায়। মানুষ এসে বসলেই হাজার প্রশ্ন। বেরিয়ে এল লাঠিসোঁটা। তোমার মতলব! যে দেয়ালের আড়ালে মানুষের বসবাস তার গাঁথনিতে ইট নেই, আছে সন্দেহ, আছে প্রশ্ন। তুমি কে? স্বার্থের চুক্তিই হল দরজা খোলার চিচিংফাঁক মন্ত্র।

কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে কাজে লেগেছিল। বেশ কাজের লোক ছিল। প্রথম প্রথম ভীষণ প্রশংসা। সে ছাড়া জগৎ অন্ধকার। পরে লোকমুখে প্রকাশ পেল ছেলেটি তার ডবল বয়সি এক মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেটা তার ব্যক্তিগত জীবন। তবু সে বিতাড়িত হল। বেরো বেটাচ্ছেলে। বেরিয়ে তার ভালই হয়ে গেল। জোগাড়যন্ত্র করে পেয়ে গেল জুটমিলে চাকরি। কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আনল মহিলার মাথায়। সোজা সমাধান। স্বামী-স্ত্রী, একচালার একটি খুপরি। ঘটিবাটি ছেঁড়া মাদুর, চট চ্যাটাইয়ের সংসার।

ভদ্রলোক যাকে চরিত্রহীন ছোটলোক বলে দূর করে দিল, সেই ছোটলোকের দরজাই খোলা পড়ল আমার মতো ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে। ছেলেটি নিজে প্রেমিক। প্রেমের মর্ম বোঝে। ও বাড়িতে আমাকে ছোটবাবু বলত। সেই সম্বোধনই রয়ে গেল। আমার বিপদের সময় সে আর তার বয়স্কা বউ যা সাহায্য করেছিল, জীবনে ভুলব না।

প্রথম প্রথম তাদের ডেরায় আমার কেমন যেন একটু গন্ধ গন্ধ লাগত। মহিলা সংসারটিকে সুন্দর গুছিয়েছিলেন। কুলুঙ্গিতে দেবতা। সস্তা ধূপের ধোঁয়া। সিঁদুর মাখা মা লক্ষ্মী। দড়ি দিয়ে লম্বালম্বি বাঁশ ঝুলিয়ে পাটপাট জামাকাপড়। সস্তা কাঠের চৌকিতে নকশি কাঁথার শোভা। দরজার সামনে বাবুদের বাড়ির ফেলে দেওয়া পাপোশ। আধভাঙা টিনের চেয়ারের ওপর কাজ-করা আসন। সব কিছুই অতুলনীয় গোছানো, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু জানলার ওপাশে খোলা ড্রেন। গলির ছড়ানো আবর্জনা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। অবশ্য তিনদিনেই সব সহ্য হয়ে গেল। খেটে-খাওয়া, স্বাধীন আর ঝানু মহিলাটি আমার সামনে অকারণ শরমে জড়সড় হয়ে থাকত না। ব্যবহারে সহবত না থাকলেও আন্তরিকতা ছিল। ছেলেটির প্রতি মহিলার তেমন আকর্ষণ হয়তো ছিল না, কিন্তু ছেলেটির ছিল। মহিলার পোড়খাওয়া শরীর। পাকা মুখ, টেপা নাক আর খোলামেলা ভাব, পুরুষালি গলার প্রেমে ছেলেটির একেবারে পাঁকে পড়া অবস্থা। স্বামী না বলে ন্যাওটা ছেলে বলাই ভাল।

মেয়েটি এর আগে তিনটে সংসার করেছে। সময় পেলেই আমাকে সংসারের উপদেশ দিত। এমনও বলত, মেয়েদের বিশ্বাস কোরো না। রাশ আলগা কোরো না। চোখে চোখে রেখো। পুরুষ হল শিকারির জাত। সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, ওই মহিলাই আমাকে বলেছিল, নিজের ভুলে আপনি ওর সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। ও মেয়ের স্বভাব আমাদের মতো হয়ে যাবে। ঘরের বউয়ের মতো হবে না, হবে নরমগরম। মাটির গাছ আর টবের গাছে অনেক তফাত। মাটির গাছে ফল ধরে। টবের গাছ শুধুই বাহার। মেয়েরা হল পাহাড়ি নদী। বাঁধতে পারলে চাষবাস, মাছ, সোনা। ছেড়ে দিলেই বানবন্যা। সবাই আমাকে বলে ছেলেধরা। তা আমি করব কী, আমার গতরের দোষ ছোটবাবু। কেউ মা বলে এল না। মিনসেরা সব মাগি বলে তেড়ে আসে। তাই তো ছেলের বয়সি ছেলেকে ধরেছি। রাতে খোলা থাকলে বড় উপদ্রব। ওইজন্যে মেয়েদের বলে বিছানা খালি রাখবে না। কিছু না থাক একটা খ্যাংরা রাখবে।'

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত মহিলা পড়েছে কি! তিব্বতে তিনি দেখেছিলেন, কেউ কুমারী-বিবাহ করে না। যে নারী কখনও পুরুষের কামোদ্রেক করেনি, সে তো অক্ষম, অনাকর্ষণীয়। মার্কোপোলোর তিব্বতে অনাস্বাদিতা মহিলার বিয়ে হত না। আবার কুমারী মাতার কদর ছিল আরও বেশি। মার্কোপোলোর তিব্বতে আমি তো তা হলে নিরপরাধী বীর। তবে একালের এই ঝানু মহিলার আশঙ্কা অমূলক নয়। নীপা আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। প্রচণ্ড তার আকর্ষণ, অসংখ্য তার ছেলে বন্ধু। সে এগোতে জানে। সে টানতে জানে।

একদা আমাদের বাড়ির সেই ভৃত্যটি, যে এখন মায়ের বয়সি এক মহিলার সঙ্গে সুখী সংসারী, সেই ছেলেটি বড় বড় তিনটি বাড়িতে আমার জন্যে টিউশনি জোগাড় করে দিলে। তার মধ্যে একজন হলেন তার মিলের বড়সাহেব। ছেলেটি কেবলই বলত, 'তুমি কিছু ভেবো না ছোটবাবু। আমি আছি। হাম হ্যায়। তুমি ইচ্ছে করলে কালীঘাটে গিয়ে কালই বিয়ে করে আনতে পারো। ভেরি ইজি।' ছেলেটি সামান্য টুকটাক ইংরেজি জানত। মিলে ঢুকে সেই ইংরেজি আরও ঝালাই হয়েছে। সবচেয়ে মজা লাগত রবিবার দু'জনে সেজেগুজে যখন সিনেমায় যেত। ছেলেটা একহারা ছিপছিপে আর বউ, সে বেশ দোহারাসোহারা, এই পেটা চেহারা। এখনকার কালে অমন চেহারার একটাই বিশেষণ, সেক্সি। সে যখন বুক চিতিয়ে রাস্তা হাঁটত, মনে হত, সকলকে বলতে চাইছে, দেখো আমি হিম্মতওয়ালি।

তিন বাড়ি পড়িয়ে সংসার করা যায় না। ঘর ভাড়াতেই সব যাবে। একটা স্কুলে নীপার চাকরি প্রায় পাকা হয়ে এসেছিল। নিয়োগপত্র ছাড়ে ছাড়ে। বিয়ের আগে মা হবার অপরাধে সব ভেস্তে গেল। নীপাকে বললুম, 'ব্যাটাদের লেখো না, Delilah, and Judith, Aspasia and Lucretia, Pandora and Athena—Woman is at once Eve and the Virgin Mary. তখনই নীপা আমাকে ওই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিল, আমাদের শিশু কখনও যিশু হবে না।

শেষপর্যন্ত কুড়ি টাকা ভাড়ায় ওই বস্তিতেই একটা টিনের ঘর ভাড়া করে দিল ওই ছেলেটি। সে যা জিনিস। দিনে গরমে প্রাণ যায়। রাতে মাতালদের বউ পেটানোর ঠেলায় পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হয়। জীবনের কোনও না কোনও সময় মানুষকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। জীবনের অপর নাম সহ্য। জীবনের অপর নাম ধৈর্য।

আমার নতুন ঠিকানা জানিয়ে তনুর বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম। চিনে হামলা তো শেষ হল। ভারত যতদূর অপদস্থ হবার তা তো হয়েইছে। আমার চাকরির কী হল। দিন সাতেক পরেই একটা অবাক করা চিঠি এল, তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তো ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে সেই চিঠি পড়ে আছে আমার ছেড়ে আসা বাড়িতে। আমি নিজে কিছুতেই আর ও বাড়িতে যেতে পারব না। আমার চরিত্রের এ এক বড় বিশ্রী দিক। যা ছাড়ি, যাকে ছাড়ি, তাকে আর ধরতে পারি না। আমার পা অবশ হয়ে আসে। আমার হাত শিথিল হয়ে যায়। আমার মন বেঁকে যায় প্যেরেকের মতো।

আমার আশ্রয়দাতা ছেলেটি সেই চিঠি এনে দিলে। এসে বললে, বড়বাবুর শরীর খুব খারাপ দেখে এলুম। তুমি একদিন গিয়ে দেখে এসো। তিনি আমার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেননি। কোথায় আছি। কেমন আছি। অভিমানের চেয়ে শক্ত কারাগার হয় না।

এখন ভাবি কী ভুলটাই না আমি করেছিলুম। অতীত তো আর সিলিং ফ্যান নয় যে পেড়ে এনে মেরামত করে আবার চালিয়ে দেব। তাঁত নয় যে আবার সুতো চাপিয়ে নতুন করে বুনতে বসব। আমার চাকরি তখন বেশ জমে উঠেছে। কলকাতায় পোস্টিং হয়েছে। সুন্দর অফিস, সুন্দর কোয়ার্টার। নীপার একটি সুন্দর ছেলে হয়েছে। বেশ রমরম, জমজম অবস্থা। একটা গাড়ি পেয়েছি। চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী। মানুষ আর কী চায়। হাতের মুঠোয় ভাগ্যের স্টিয়ারিং। চলুক গাড়ি গড়গড়িয়ে। আমার যে বাড়ি ছিল, পিতা মাতা ছিলেন, আমার একটা অতীত ছিল, বর্তমানের নেশায় সব ভুলে বসে আছি।

হঠাৎ খবর এল, বাবা অসুস্থ। পড়ে আছেন হাসপাতালে। শেষের দিকে যা পেনশন পেতেন, তাতে তাঁর দিন চলত অতি কষ্টে। হাসপাতালের নাম শুনে ঘাবড়ে গেলুম। শহরের সবচেয়ে রদ্দি হাসপাতাল, যেখানে মানুষকে ফেলে রেখে আসা হয় মরার জন্যে। সুস্থ হয়ে ফিরে আসার জন্যে নয়। যে-কেউ যে-কোনও সময় যেতে পারে। কোনও ভিজিটিং আওয়ার্স নেই। দুর্গন্ধ। নোংরা। ঈশ্বর আমার নিজের ভবিষ্যৎটা দেখাবেন বলেই ঠিক মৃত্যুর সময়েই আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার পরনে আমার ব্যঙ্গের মতো দামি পোশাক। গলায় টাই। টাইপিন। ভোগে

থেকে চেহারা আরও ফুলেছে। আর আমার সামনে ময়লা বিছানায় আমার বৃক্ষ। ডালপালা শুকনো। পত্রশূন্য। মাথার কাছে বসে আছেন তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু। তিনিও বৃদ্ধ। বসে আছেন অসহায়। কিছু করার নেই। শেষটায় বাবার হাঁপানি হয়েছিল। হাই সুগার। বাত। সবরকম অসুখ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল।

দুই অভিমানী মুখোমুখি। তিনি কিছু চাননি, আমি কাছে এগোইনি। আমি সামনে দাঁড়াতে চোখ মেলে তাকালেন। অনেকক্ষণ দেখলেন আমাকে। যতই দেখছেন ততই তাঁর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি হেঁকে বলেছিলুম, 'এ কী, শিগগিরি এঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করব। বাইরে আমার গাড়ি আছে।'

পাশের অন্ধকার বিছানা থেকে কে একজন বললেন, 'এতদিনে মনে পড়ল বাবা।'

আমার পিতা শীর্ণ হাতটি তুললেন। কাঁপছে থিরথির করে। অতি কষ্টে, ক্ষীণ গলায় বললেন, 'কিচ্ছু দরকার নেই বাবা। মানুষ যেখান থেকেই যাক, যাবে সেই একই জায়গায়।'

আমার ভরাট উদ্ধত গলায় বললুম, 'না, তা হতেই পারে না। দিস ইজ নট ইয়োর প্লেস।'

তখন আমার খুব গরম। ভাল রোজগার, যথেষ্ট সম্মান। হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছি। তবু মনে হল এ কণ্ঠস্বর এই দৈন্যভরা হাসপাতালে বড় বেমানান। যেন গাড়ির টায়ারে হাওয়া ভরে ফোলাতে চাইছি।

তাঁর শীর্ণ হাতটি তোলাই রয়েছে। ফিসফিস করে বললেন, 'কাছে এসো। নাও ইজ দি টাইম। এইবার দড়ি খুলে যাবে। আর কোনওদিন দেখা হবে না। নেভার, বাই এনি চান্স, বাই নো চান্স। পিতা পুত্রে একবারই দেখা হয়। এসো কাছে এসো যাবার আগে দু'জনে ভাব করে যাই। তোমার অনেক গুণ তবু রাম সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। তুমি সুখী, তুমি সফল এই হোক আমার পালের বাতাস।'

খুব থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। দু'জনে তাকিয়ে আছি দু'জনের দিকে। তাঁর শীর্ণ হাত আমার মুঠোয়। দেখতে দেখতে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল বহুদূরে। অত কান্না জীবনে আর কোনওদিন আমি কাঁদিনি। মনে হয়েছিল কেন আমিও ওই নৌকোয় যাত্রী হতে পারছি না। আয়নাটা চিরকালের জন্য ভেঙে গেল।

Eye to Eye
We saw the others
that we were
in the mirror that has quite forgotten us

মাথার কাছে বসে থাকা বৃদ্ধ বললেন, 'যাঃ হয়ে গেল।' বলে ফোঁ করে এক টিপ নস্যি নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটে এসে বললেন, 'খালি হয়েছে। খালি হয়েছে। ওই বাথরুমের দরজার কাছে যে পড়ে আছে তাকে এখানে ট্রান্সফার করো।'

এর নাম চলে যাওয়া। খেলোয়াড় আজ মাঠ ছেড়ে চলে গেলে আবার কাল ফিরে আসে। আবার কালের কালে আসে। এ এমন এক খেলা, বল রইল, মাঠ রইল, খেলোয়াড় আর ফিরবে না। বাঁশি বাজবে। লাইনসম্যান ফ্ল্যাগ নাড়বে। নতুন প্লেয়ারের পায়ে পায়ে বল ঘুরবে। গোল হবে। গ্যালারিতে চিৎকার করবে দর্শক। পুরনো খেলোয়াড়কে দর্শকের আসনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ এসে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না বলুন কেমন খেলছে, আপনার কোনও নির্দেশ আছে? ঘাস আছে। আছে পায়ের স্পর্শের স্মৃতি। বাকি শূন্যতা। মৃত্যু বড় মজার জিনিস। কে ছিল? কী ছিল? কে গেল? কী গেল? এ এক মহা অঙ্ক। বহুভাবে চেষ্টা হল। কোনও উত্তর নেই। কে তুমি? আমি। আরে ব্যাটা আমিটা কে?

ঠেসে একটা চড় মারলে মানুষের যেমন হয়, পিতার মৃত্যু আমার সেই অনুভূতি। মনের গালে

পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। কামকীট। অর্থলোভী। ব্যক্তিত্বশূন্য একটা মানুষ। পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি মাপের একটা দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকি। মুখ ঘষি, মাথা ঘষি। হাত দিয়ে খামচাই। প্রতিদিন আমি দীন হই। প্রতিদিন আমার একটু করে মৃত্যু হয়। মানুষ চাঁদে যায়। আমি স্ত্রী-তে যাই। উপগ্রহ ছোটে মঙ্গলগ্রহের খোঁজে। আমি ছুটি স্ত্রীর দেহে। বিজ্ঞানী সারারাত আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল। আমি মশগুল নারী দেহে!

তুমি কে? আমি? আমি সে। যে মরে গেলে বলো হরি বলে পুড়িয়ে আসে। কী লেখা হবে তার সম্পর্কে। দুটি লাইন লেখা যেতে পারে, বিছানায় জন্মেছিল, বিছানা ভিজিয়েছিল, বিছানায় গড়িয়েছিল, বিছানায় বংশবৃদ্ধি করেছিল। আবার বিছানা ভিজিয়েছিল, বিছানা সমেত হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার নাম ঈশ্বর বিছানাচন্দ্র।

তিনি পৃথিবীকে কী দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন ঘোড়ার ডিম। যে অফিসে কাজ করতেন সে অফিসে দিস্তে দিস্তে চোথা কাগজ রেখে গেছেন, হিজিবিজি লেখা, আরশোলার ডিমপাড়ার জন্যে। রেখে গেছেন অসংখ্য স্তাবক আর নিন্দুক। রেখে গেছেন গোটা দুই অপোগণ্ড। শূন্যে খান তিনেক ঘরঅলা বকবকম খাঁচা। এই হল তাঁর কন্ট্রিবিউশন। আর নিয়ে গেছেন! টন টন চাল, গম, আলু, পটল, ভেন্ডি, কলাটা, মুলোটা। ডজন ডজন মুরগি, পাঁঠা, শয়ে শয়ে ডিম। গ্যালন গ্যালন জল। ডেঁড়েমুশে ফাঁক করে দিয়ে জ্ঞান আর উপদেশের বন্যা বইয়ে তিনি ঈশ্বর হয়ে গেছেন।

মানে মানুষের কত ন্যাকামো আর ধাস্টামো থাকে। সৎকার হয়ে যাবার পর দিন তিনেক এমন একটা ভাব করে রইলুম, যেন এখুনি সব ছেড়েছুড়ে গৃহত্যাগ করব। অতীতের এক-একটা কথা মনে পড়ছে আর ক্ষণে ক্ষণে চোখে জল এসে যাচ্ছে। আর তখনই আনন্দে বুক ভরে উঠছে। কীসের আনন্দ। কে বলে আমি হৃদয়হীন, স্বার্থপর, কর্তব্যবিমুখ কুলাঙ্গার। এই তো শোকে আমি আকুলি বিকুলি করে উঠছি। এই তো আমি দরবিগলিত। পরমুহূর্তেই কোরা শাড়ি পরে সামনে ঝুঁকে নীপা কী একটা নিচ্ছে হয়তো, তার নিটোল নিতম্ব দেখে মনে হচ্ছে বাঃ অভ্যস্ত আবরণে এতদিনে যা দেখেছি, এ যে তার চেয়ে অন্যরকম। আলাদা আকর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে মন বেদনায় ভরে উঠেছে, ছিঃ ছিঃ মৃত্যুর চেয়ে যুবতীর নিতম্ব বড় হল। কাঁদো কাঁদো। জোর করে কোঁত পেড়ে পেড়ে কাঁদো। উত্তরপুরুষের সঙ্গে পূর্বপুরুষের অশ্রুনদীর যোগ না থাকলে সংসার তো আঁতুড়ঘর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যাবে না। সব ভাল ভাল জ্ঞানের কথা তো হয়ে যাবে উপহাসের মতো।

খুব ঘটা করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলুম। বিশাল একটা ছবি ঝোলালুম দেওয়ালে। যা নয় জোর করে তা প্রমাণ করার জন্যে। মিথ্যাকে সত্য করার জন্যে। আমরা পরস্পর একটা শিকলে বাঁধা আছি এই বিশ্বাসটাকে বদ্ধমূল করার জন্যে। আমি যেই চলে যাব সব মুছে যাবে এই আতঙ্কটা কাটাবার জন্যে।

নিয়মভঙ্গের দিন রাতেই নীপাকে জাপটে ধরলুম। হাত দিয়ে কনুই মেরে ঠেলে সরাতে সরাতে নীপা বললে, 'তুমি কি অমানুষ? কিছুদিন আমাকে ছেড়ে স্মৃতি নিয়ে থাকো না।'

এত বড় শয়তান আমি, হাঁসফাঁস করতে করতে আমি কী বলেছিলুম এখনও আমার মনে আছে, 'জানো আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাবা, আমাদের সন্তান হয়ে আসতে চাইছেন।' নীপা আধো অন্ধকারে নগ্ন হতে হতে খিলখিল করে হেসেছিল, 'তোমাকে আমি চিনি।'

আমাকে নিয়ে নীপার পাগলামি ক্রমশ কমছিল। কাছাকাছি এসে নীপারও অনেক ত্রুটি আমার চোখে পড়ছিল। দেহ হিসেবে তুলনাহীন। মন আর স্বভাবে অনেক মেরামতের প্রয়োজন ছিল। অগোছালো, রাগী, উদাসীন, বারমুখো, বেহিসেবি। অন্যের কাছে চট করে ধরা দেয়। আর সেই ধরা দেওয়াটা অনেক দূর এগোতে পারে।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, ছেলে আর মেয়ে দুটো আমার তো।

প্রেম, বিবাহ, সংসার সবই নেশা। বোতলের নেশায় একরাত বুঁদ, প্রেমের নেশায় বড়জোর এক

কি দু'বছর। নেশার ঘোরে এটা ওটা সেটা ক্ষমা করা যায়, তারপর আর যায় না। মানুষ কাজ চায়, বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দেখতে চায়। নিষ্ঠা সততা আর সমর্পণ চায়। সংসার তো আর পাঁচতারা হোটেলে তে-রাত্তির বাস নয়। সবই সাজানো আছে, খাও দাও ঘুরে বেড়াও। স্ত্রী তো আর বেশ্যা নয় যে বিছানা ছাড়ার পরই তাকে ভুলে যাও। স্ত্রী যে মানুষের গর্ব। ওল্ড টেস্টামেন্টে পড়েছি না,

A good wife is a crown to her husband
But one who acts shamefully is like not his bones

নীপাকে একদিন খুব আদর করে বললুম, ঈশ্বর তো আমাদের দিলেন অনেক কিছু, সংসারটাকে একটু সুন্দর করে গোছাও না। এই তো ঘোষ, বোস, মিত্তিরদের বাড়ি যাই, কী সুন্দর সাজানো গোছানো টিপটপ। আর আমাদের। তারে তোমার শাড়ি ঝুলে আছে তো আছেই যেন বেওয়ারিশ লাশ, পুলিশ এসে না নামালে সরবে না। খাটের ছত্রিতে তোমার ব্লাউজ ব্রা। চেয়ারে তালগোল সায়া, ময়লা তোয়ালে। কোনওদিন দেখলাম না খাটে নিপাট নিভাঁজ বিছানা। তোমার কোথাও কোনও হিসেব নেই। এ যেন বেদের টোল।

নীপার স্পষ্ট উত্তর আমার বাপ বেদে, আমার মা বেদে, আমিও বেদে।

আমি ডেকে দেখালুম, এই দ্যাখো ওল্ড টেস্টামেন্ট,

Like a golden ring in the snout of a sow
Is a beautiful woman lacking in taste.

তোমার সব আছে, নেই টেস্ট। তোমার বড় বোনের সংসারে গিয়ে দেখো তো। এমন কিছু বড়লোক নয়, অথচ কী সুন্দর। নীপা বললে তাকে বিয়ে করলেই পারতে। বুঝতে ঠেলা। পাঁজিপুঁথি দেখে মাসে একবার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারতে। আমার মতো এমন রোজ রোজ তোমার আগুনের কাঠ হত না, লাথি মেরে ফেলে দিত।

নীপা প্রায়ই আমার এই পুরুষালি দুর্বলতায় খোঁচা মারত। 'তুমি কি আমাকে দয়া করো?'

'অনেকটা তাই। আমি বছর বছর মা হয়ে আমার ফিগার নষ্ট করতে পারব না। আমার একটা ফিউচার আছে।'

'তোমার ফিউচার। তোমার আবার ফিউচার।'

'কেন তোমার শূকরী হবার জন্যেই জন্মেছি নাকি! আমাকে তোমার বন্ধু গোয়েল বলেছে, যার এমন ফিগার সে অনেক কিছু করতে পারে।'

'তা পারে, মাতাল গোয়েলের সঙ্গে শুতে পারে।'

'তার চরিত্র তোমার চেয়ে ঢের ভাল। অফিসের আধবুড়ি স্টেনোকে শেষবেলায় ডেকে দরজা বন্ধ করে ডিকটেশন দেয় না।'

'তুমি নোংরা।'

'আর তুমি পরিষ্কার দেবালয়। ছাত্রীর হাত ধরে টানো। বিয়ের আগে মা করে দাও।'

'তুমি এসেছিলে।'

'আমি তোমাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম।'

'পায়ে নয় মাথায়।'

'আশীর্বাদ করেছিলে মাথায় নয়, ব্লাউজ ছিঁড়ে বুকে, তলপেটে।'

'তুমি ইতর।'

'তুমি আতর। যে গায়ে লেগে যাবে দুর্গন্ধে তিষ্ঠোনো যাবে না।'

'তুমি নারসিসিস্ট নিজের দেহ ছাড়া কিছু ভালবাসো না।'

'তুমি রেপিস্ট। তোমার চোখে মা মেয়ে সব সমান।'

'তার মানে?'

'মানে তোমার চোখে। তুমি যে চোখে আমার দিকে তাকাতে ঠিক সেই চোখেই তাকাতে মায়ের দিকে।'

'ছিঃ, ছিঃ নীপা।'

'ছিঃ আমি নই ছিঃ তুমি। তুমি যখন বস্তিতে ওই চরিত্রহীনটার বাড়িতে থাকতে, তখন তুমি ওই মেয়েছেলেটাকে মনে মনে কামনা করতে।'

'তুমি অন্তর্যামী।'

'গত ছ'মাসে তুমি তিন দিন বেশ্যালয়ে গেছ, অস্বীকার করতে পারো?'

'কে বলেছে, গোয়েল?'

'যেই বলুক।'

'গোয়েল আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে।'

'গোয়েল ব্যাচেলার সে যেতে পারে, তুমি গেলে কেন। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে যে খারাপ কোনও রোগে ধরেনি তার কী প্রমাণ। তোমার দিল্লিতে এক প্রেমিকা আছে তার নাম অমৃতা।'

'কে বলেছে?'

'বলেছে চিঠি। তোমার চিঠি খুলে আমি পড়েছি। আবার জুড়ে রেখে দিয়েছি। কে এই অমৃতা। কেন সে তোমাকে অত সাহসী চিঠি লেখে। কেন অফিসের কাজের নাম করে তুমি ঘনঘন দিল্লি যাও। আমি তোমার ঘরের মুরগি তাই তো। তুমি এত বড় অমানুষ, অশৌচ অবস্থায় যখন মালসা পুড়িয়ে আমাদের একাহার, কম্বলে ভূমিশয্যা, তখনও তুমি করার চেষ্টা করেছ। তোমার কাছে সম্পর্কের সামান্য লোক দেখানো মূল্যও নেই। তুমি ভোগী, তুমি কামুক।'

নীপার জ্বালা ধরানো কথায় নিজের দিকে তাকাবার অভ্যাস ক্রমেই বাড়তে লাগল। মুখের ওপর যে সত্য কথা বলে সে অপ্রিয়। সব মানুষই অভিমানী, আমার অভিমান কিছু বেশি। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কেউই কারুর কাছে পুরোপুরি ধরা দিতে চায় না। সবসময় একটা ব্যবধান রাখতে চায়। আমার আর নীপার দূরত্ব বেড়েই চলল। রাতে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। ভয়ে অভিমানে গায়ে হাত দিতে পারি না। ভেতরটা ছটফট করে। কখনও মনে হয় পায়ে ধরি। বলি আমি পারছি না। আমি পারব না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, আমি না পুরুষ। আমি হেরে যাব! আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। নীপাকে আমিই দুঃসাহসী করেছি। প্রথম পাপ সে আমার সঙ্গেই করেছে। অনেকটা নীচে নেমে এসে আমি নিজেকেই ছোট করেছি। তিন বছরে আমি তার চোখে যতটা উঠেছিলুম, আধঘণ্টায় ঠিক ততটাই নেমে গিয়েছিলুম। নীপা পতিতা নয়, আমি পতিত। দু'জনের বিয়ে দুটো সইয়ের চুক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে বসবাসের আইন মোতাবেক ছাড়পত্র। নীপা আমার দুর্বলতা জেনে গেছে। জেনে গেছে এ হল সেই বেড়াল যে মাছের জন্যে সবসময় ছোঁক ছোঁক করবেই। সব মেয়েই কম বেশি নিষ্ঠুর। নীপা একটু বেশি। নীপাদের বাড়িতে মেলামেশার কোনও শাসন ছিল না। তার বাবা মা জীবধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম মানে না। নীপার বাবার কাছে নীপার মা ছিল ক্যাশ কাউন্টার। এই আমার চেক দাও তোমার টাকা। নীপার বাবা বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর মেয়েরা হল পরিবারের নয় সামাজিক দায়িত্ব। সেই পরিবারের মেয়ের কাছে আমার প্রত্যাশা গৃহবধূর। সেই আশা আবার শয়তানের স্বার্থমাখা। সকালে গৃহবধূ, আদর্শ মাতা, মধ্যরাতে নির্লজ্জ গণিকা। আমি শুধু শয়তান নই, আমি একটা গাধা।

কামু লিখেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবন কেমন জানো। খাটে শুয়ে থাকবে বউ আর স্বামী মেঝেতে শুয়ে তার কথা চিন্তা করতে করতে মাস্টারবেট করবে। নিজের জীবনই তার প্রমাণ। নীপা এখন প্রেমিক খুঁজছে। খুঁজতেই পারে। প্রেমে তো দায়িত্ব নেই। নীপা আমাকে ছাড়তে পারে আমি

পারি না। নীপা আমার মোহ, আমার সম্পত্তি, আমি নীপাতে অভ্যস্ত। সেরকম হলে খুন করব। আমার অ্যাকাউন্টে ফুর্তি করা চলবে না।

ক্রমশ আমি নিষ্ঠুর হতে শুরু করলুম। তার অজস্র খুঁত ধরতে লাগলুম। তুমি গোছাতে পারো না, রাঁধতে পারো না, এমনকী ছেলেটাকেও সামলাতে পারো না। তোমার রান্নাঘর ভাগাড়। আমাদের বাথরুম কর্পোরেশনকেও হার মানায়। এইরকম যখন চলছে তখন একদিন নীপা বাইরে কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে বললে স্কাউন্ড্রেল। আমি অবাক হয়ে তার সুন্দর মুখের দিকে তাকালুম। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নীপা অসভ্যের মতো তার পেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আবার আসছে।' নীপার অঙ্গভঙ্গি আর বলার ধরনটা এত অশ্লীল। আমি বলেছিলুম, 'আসছে তা আসুক না। অবৈধ কিছু তো নয়। আমরা তো চেয়েইছিলুম।'

'আমরা বোলো না। ওর মধ্যে আমি নেই। প্রথমটার তিন পেরোতে না পেরোতেই আর একটা।'

নীপা প্রথমটার উল্লেখ এমনভাবে করল যেন ওটা তার সন্তান নয়। নীপা মা নয়। একটা অবাঞ্ছিত কিছু। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ভীষণ সেজেছিল সেদিন। সন্দেহ হয়েছিল এত সাজ কার জন্যে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'তোমাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।'

নীপা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'তবে আর কী সব খুলে ফেলো।'

আমি রাগি, তবে সে রাগে আমি সাধারণত নিজেই ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকি। সেদিন কী হল জানি না, ঠাস করে নীপার গালে একটা চড় কষিয়ে দিলুম। আমাকে ছাড়াই আমার হাত যেন নিজে নিজে কাজ করল। সম্পূর্ণ স্বাধীন। নীপা হকচকিয়ে গেল। নীপা যে কতটা রাগতে পারে সেদিন দেখেছিলুম। ঠিক দশটা মিনিটের মধ্যে সংসার লন্ডভন্ড হয়ে গেল। ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে সব তছনছ করে দিল। সে যখন নিতান্ত ছোটলোকের মতো এইসব করছে, শাড়ির একটা দিক খুলে পড়েছে, উত্তেজিত নিশ্বাসে বুক ওঠা নামা করছে, খোঁপা খুলে গেছে, তখনও আমি ভাবছি নীপা কী সুন্দরী। একটা খালি দুধের টিন আমাকে ছুড়ে মেরেছিল। কপালের একটা পাশে লেগে কেটে গেছে। জ্বলছে সেই জায়গাটা। তবু তার সেই বন্য, আদিম রূপের অন্য একটা মাদকতা ছিল। ঘরের বউকে পরের বউ ভাবতে বেশ লাগে। আমার মনে হয়েছিল নীপার মধ্যে আমি একই সঙ্গে চারটে মেয়েকে দেখছি। সেই বস্তির মুখরা মাঝবয়সি ঝানু মেয়েছেলেটি যে রবিবার মুখে পাউডার মেখে লাল আঁটোসাঁটো ব্লাউজ পরে টান করে শাড়ি পরে ছেলের বয়সি স্বামীটাকে টানতে টানতে সিনেমায় যেত। দেখতে পাচ্ছি সেই পাড়ার মেয়েটাকে গোয়েলের পাল্লায় পড়ে যার কাছে আমি তিনবার না চারবার গিয়েছিলুম। মদে চুর হয়ে সে গেলাস ছুড়ত, অশ্লীল কথা বলত, তারপর গোয়েল তাকে চেপে ধরত। তখন মনেই হত না গোয়েল একটা উচ্চশিক্ষিত ফার্স্টক্লাস পাওয়া ছেলে। মেয়েটা লাথি ছুড়ত আর অকথ্য গালাগালি দিত। আমাকে বলত তুইও আয় শালা, বসে কেন? শোনামাত্রই আমার ভেতরের মৌচাকে খোঁচা লাগত। আনন্দের অসংখ্য মৌমাছি পিনপিন করে বেরিয়ে আসত। যত পড়েছি যত সহবত শিখেছি, শিখিয়েছি, সব ভেসে যেত, মনে হত সব বাজে, ওপরের ঠাট, সমাজে চলার, নিজেকে চালাবার মুখোশ। বেদের ঋষি থেকে মডার্ন ধর্মগুরু আলো আলো জ্যোতি জ্যোতি বলে চেঁচালে কী হবে, মানুষ অন্ধকারেই ডুবতে চায়, আলোক সাগরে নয়। ওটা মানুষের কাছ থেকে বাড়তি সম্মান আদায়ের সস্তা ফিকির। যা আমরা সবচেয়ে ভালবাসি তাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। ভালবাসার জিনিসকে সহজে ছাড়া যায় ঘৃণার জিনিসকে ছাড়লেও মনে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। অসুখের কথা বেশি মনে থাকে, আরোগ্যের কথা ভুলে যায়। মাধ্যাকর্ষণে সব নামছে নীচের দিকে। ওপরে ওঠাতে গেলে যে শক্তি চাই তার মূল্য বিলিয়ান বিলিয়ান ডলার। আকর্ষণের বাইরে মহাজগৎ শূন্য, অনিশ্চয়তায় ভরা উদ্দেশ্যহীন, ভীতিপ্রদ। মানুষ বলে মন ঊর্ধ্বগামী হও aspires to the sky, to the light, to the sunny sum-

mits, to the pure and crystalline frigidity of the blue sky কিন্তু তার পা দুটো কোথায় moist, warm and darkling gulf ready to draw him down. সমস্ত কিছুর সমাপ্তি নারীর অন্ধকার গর্ভে। সেইখানেই তো ছিলাম হেঁটমুণ্ড, ঊর্ধ্বপদ। আলো ছিল না, ছিল জৈব-তরঙ্গ। মৃত্যু আবার তো সেই গর্ভান্ধকারে মহাপ্রয়াণ back into the maternal shadows cave, abyss, hell! চসারের সেই বৃদ্ধ মানুষটি যে মৃত্যু চায় অথচ মরতে পারছে না, তার একমাত্র প্রার্থনা

With my staff, night and day
I strike on the ground, my mother's doorway,
And I say: Ah mother dear, let me in.

মুক্তি! সে তো বন্ধন। আমার পিতা কোথায় আমাকে প্রোথিত করেছিলেন। আলোর পদ্মে না অন্ধকার যোনি। আমার পুত্র। Woman Mother has a face of shadows. তিনি কালী। Woman is the more tenebrarum, it is the night in the entrails of the earth

কোমর থেকে নীপার শাড়ি খুলে পড়ে গেছে। সায়া। লাল সায়া লাল খাটো ব্লাউজ। ব্রেসিয়ারের সাদা স্পষ্ট। লম্বা লম্বা মৃণালভুজের মতো হাত। ঘরের একপাশ থেকে আর একপাশে নেচে নেচে চলেছে। মনে হচ্ছে খুব কস্টলি বাইজি। সামনে ঝুঁকে পড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাকে টেনে হিঁচড়ে খোলার চেষ্টা করছে। নীপার পেছন দিকটা আমার অফিসের স্বামী পরিত্যক্তা সেই স্টেনো মহিলার মতো যে এর আগে অনেক অফিসারকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। আমাকে যে ধরেছে এবার। মহিলা পুরোপুরি পারভার্ট। নীপার ওপর দিকটা পেছন থেকে দেখছি। মনে হচ্ছে অমৃতা। সামনে ঝুঁকে পায়ে ক্রিম মাখছে। অমৃতা যেমন মাখত মুসৌরির হোটেলে। চারজন মহিলা নীপা হয়ে আমার সামনে নৃত্য করছে। একসময় সত্যিই সে ভাল নাচত, নাচাত বোঝা যায়।

নীপার কাণ্ড দেখে প্রথমে আমার রাগ হচ্ছিল। ভেঙে চুরে কত টাকার যে ক্ষতি করলে। আমার কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু তার এই রণরঙ্গিণী মূর্তির যে কী মোহ। তাই তো শিব শব হয়ে বুক পেতে দিয়েছিলেন। নীপা ঘেমে গেছে। কোমরের শুভ্র নিটোল অংশ ঘামে মোমের মতো নরম চকচকে। মনে হচ্ছে এখুনি গলে পড়বে। সেই কবিতার লাইনটা মনে পড়ে গেল,

A candle is burning
On the table top
Flickering flames, shadows dance
Life melts drip by drip
In the hollows of the earth

ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে নীপাকে। সুস্থ সময়ে এমন বাইজির বেশে সে আমার সামনে নাচত কি! ওই যে সামনে ঝুঁকে আছে, শরীরের সুডৌল, সুছন্দ পশ্চাদ্দেশ দুলছে, মনে হচ্ছে নাচের ফাঁকে পায়ের ঘুঙুর ঠিক করে বেঁধে নিচ্ছে, ড্রেসিং টেবিলের আয়না মুচড়ে খুলে আনার চেষ্টা করছে না, এই দৃশ্যের দামই তো পাঁচ হাজার মুদ্রা। না হয় এ হল তাণ্ডব-নৃত্য।

আমি চট করে উঠে গিয়ে পেছন দিক থেকে নীপার কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলুম। নীপা পেছন দিকে হাতের ঝটকা মেরে, আমার বন্ধন থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল। তার হাতের রুলি লেগে আমার ডান গালের একটা অংশ চিরে গেল। আর সেই মুহূর্তে বড় আয়নাটা আমাদের পায়ের কাছে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে নীপার অসংখ্য মুখ। টুকরো টুকরো আয়নায় তার টুকরো মুখ। এক হঠাৎ বহু হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে সৃষ্টিতত্ত্বের সেই বৈদিক রহস্য। একই বহু, বহুই এক। আমার চৈতন্য তখন সাংঘাতিক কাজ করছে। মনে হল বহু শব্দ থেকেই বউ এসেছে। একোহহং বহু স্যাম।

টুকরো টুকরো আয়নায় আমাদের দু'জনের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। কোনওটায় চিবুক থেকে নিম্নাংশ। কোনওটায় ঊর্ধ্বাংশ। কোনওটায় নীপার লাল অন্তর্বাসে ঢাকা নিম্নাংশ। কোনওটায় একটি মাত্র লাল কাশ্মীরি আপেল। এমন অসাধারণ দৃশ্য একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই দেখা যায়। অর্জুনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল। ক্যালকুলেশন করে হয় না।

ঝনঝন করে অতবড় একটা আয়না ভাঙার শব্দে নীপা থমকে পড়েছিল। কাচ ভাঙার শব্দের একটা নেশা আছে। এতক্ষণ আয়নাটা ছিল সামনে। তাইতে ভাসছিলাম আমরা। হঠাৎ সেটা অদৃশ্য। আমরাও অদৃশ্য। শূন্য দেওয়াল। কম্পমান ঊর্ণনাভ। যা কিছু আমরা চোখে দেখি, তা যে কত ক্ষণভঙ্গুর আর অনিত্য, এই মহা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নীপা স্তম্ভিত। আমারও সেই একই অবস্থা। নীপার কানে ইয়ারিং দুলছে। খোঁপা ভাঙা চুল পিঠে আলুলায়িত। ঘামে ভেজা পিচ্ছিল মোম শরীর আমার দেহের বন্ধনে। আমি তার কানের কাছে ফিসফিস করে বললুম, "সর্ব্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব, নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ"। আর এই যে দেহাভিমানের আপদ দেহ মাংসপিণ্ড, এই মাংসপিণ্ডের অভিমান ত্যাগ করো। অতোহভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে, পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে। তুমি মাংসপিণ্ড নও। তুমি মনে করো একটা আপেল গাছ। তাতে দুটি ফল পেকেছে। মনে করো সেই ফলন্ত ডালটিকে স্থাপন করা হয়েছে ঘটনিতম্বে।

রাগ হল কালবৈশাখী। নিমেষে সব ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রকৃতি যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মানুষও তেমনি নিস্তেজ হয়ে যায়। আমার শরীরে নীপা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ল। নীপা নিবল আর আমি জ্বলে উঠলুম। বারুদ আর আগুন জ্বলবে এই তো বিধাতার নিয়ম। সেই নিয়মের বাইরে যাওয়া মানেই বিদ্রোহ করা। যা যা মানুষের ভাল লাগে তা তো ভাল লাগার জন্যেই করা হয়েছে। শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরে মেয়েরা পুরুষের সামনে এলে মনে যাতে একটা ব্যাপার হয়, সেইভাবেই মন তৈরি। আমি তো আর একটা মন এনে, এ মনটাকে ফেলে দিতে পারি না। আমি কি দিন দুনিয়ার মালিক!

নীপা আমার। নীপার জন্যে আমি ঘর ছেড়েছি। এই ঘামে ভেজা পিচ্ছিল সুদীর্ঘ শরীরের অধিকারী আমি। ভাঙা কাচ, টুকরো আয়না, ছত্রাকার সব জিনিসপত্রে বিপজ্জনক শয্যায় নীপা আর আমি। কথায় বলে, গোলাপ তুলতে হলে কাঁটার খোঁচা খেতেই হয়। হিসেবি, বেহিসেবি, সংযমী, অসংযমী, সকলেই শেষটা এক। কাঁপতে কাঁপতে, ধুঁকতে ধুঁকতে, ব্যা ব্যা করতে করতে বলির পাঁঠার মতো হাড়িকাঠে মাথাটি গলিয়ে দেবে। তার চেয়ে এই ভাল। The sad are slaughtered/ The world grows merry

দুঃখকে হত্যা করতে পারলেই জগৎ আনন্দের। মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে থাকা নীপা বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল। প্রতিবাদের শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। নীরব প্রশ্ন, কী হচ্ছে! এ কথা সবাই জানে পৃথিবীর কোনও কিছুই নিঃস্বার্থ নয়। সাগর মেঘকে জলকণা ধার দেয় বলেই মেঘ বৃষ্টি হতে পারে। গাছের শিকড় মাটিকে ধরে রাখবে বলেই মাটি গাছকে ধরে। মা সন্তান দেন বলেই তিনি সন্তানের মা। নীপা তাকালে কী হবে, নীপা জানে না, আগুন জ্বালালে পুড়তেই হবে। তুমি পড়োনি সেই কবিতা—

all own everything
all exploit all
all oppress all
all are exploited by all
all are oppressed by all
all gain everything
all lose everything

all are everyone's masters
all are everyone's slaves
all are everyone's superiors
all are everyone's subordinates
all owe everyone everything
all do anything to everyone.

তুমি তো জানো সারা দুনিয়া এই নিয়মেই চলছে। একই কারখানা, একই উৎপাদন। মানুষ। সফল মানুষ, ব্যর্থ মানুষ। সুখী মানুষ, অসুখী মানুষ। প্রেমিক মানুষ, দস্যু মানুষ।

সব শেষে নীপা বললে, 'এটাকে আমি সরাতে চাই।'

'অসম্ভব। দ্যাটস এ ক্রাইম। অপরাধ, খুন। আমরা প্রেমিক পিতামাতা। প্রেম হল ফুল। সন্তান হল ফল। আমাদের অভাব কী! আমি ডান হাতে বাঁ হাতে রোজগার করছি। কে বলতে পারে কে আছে ওখানে। বহুদিন হয়ে গেল আর একজন শ্রীচৈতন্য আসার সময় হয়েছে। বুদ্ধও আসতে পারেন। আসতে পারেন মহাবীর। শেক্সপিয়র এলেই বা ক্ষতি কী! এইভাবেই তো তাঁরা আসেন। আসার দরজা, যাবার পথ কোনওটাই পালটায়নি।'

নীপা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার সারা শরীর ফসফরাসের মতো জ্বলছে। নীপা এখন আমার হাতের মুঠোয়। যাবে কোথায়! সব শরীরই তো রক্তমাংসের। যোগ আর ভোগ কোনওটাই কি শরীর বাদ দিয়ে হয়। শরীরম আদ্যম। আর সত্যিই কি নীপার যোগিনী হবার বয়েস হয়েছে। ও বারে বারে মা হতে চায় না। চিরকালটাই নায়িকা থাকতে চায়। তা কি সম্ভব। নায়িকারও তো নায়ক থাকবে, তা না হলে নায়িকা বলবে কে! দর্পণ আছে বলেই তো বিম্ব আছে। এই যে নীপা এখন সব ভেঙেচুরে, রক্তাম্বরা ভুজঙ্গিনীর মতো ধরাতলশায়ী, এই দেহকেই তো পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড বলছেন। বলছেন, মনুষ্য দেহভাণ্ড যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার। নীপাকে তন্ত্রটা পড়াতে হবে, যেখানে লেখা আছে—

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি নব গ্রহাঃ ॥
নাগাশ্চ সর্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পদাধস্তুতলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ॥

এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই শ্রীবৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহের ভেতরেই হরগৌরীর লীলা, কৃষ্ণরাধিকার লীলা। এই দেহই গুপ্ত বৃন্দাবন, উমার একাম্রকানন। আকর্ষণ আর বিকর্ষণ তন্ত্র এই শক্তিকেই তো বলেছেন সর্প বা ভুজঙ্গম। এই শক্তিসমবায়ে বিশ্বসৃষ্টির বিন্যাস এবং বিকাশ। যখন শক্তির খেলা হয়, বিকাশ হয়, বিশ্বসৃষ্টি ফুটে ওঠে। আর বিশ্বই হল দেহ। ওই যে বলছেন মনুষ্যদেহভাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার। তন্ত্র বলছেন সৃষ্টির সময় সাপের খেলা হয়। সাপের সার হল বিষ। সেই বিষ লিঙ্গেশ্বর ধারণ করলেন কোথায়, না কণ্ঠে! উদরে নয় কেন? যদি হজম হয়ে যায়! সৃষ্টির মূলই তো সর্পবিষ। হজম হয়ে গেলে সৃষ্টি হবে কী করে! বিষাক্ত, নীলাভ লীলায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তন্ত্রের সেই জায়গাটা নীপাকে পড়াতে হবে যেখানে পরিষ্কার অনুবাদে লেখা আছে— কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোনও স্ত্রীই গর্ভবতী হইতে পারে না, কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোনও পুরুষের রেত-প্রবাহের সহিত আত্মশক্তির নিঃসরণ হয় না, নারীর জরায়ুতে নবজীবের আধান হয় না।

আমি তো শুধু স্বামী নই। শিক্ষক থেকে স্বামী হয়েছি। 'জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিল না কোনও কাজে' বলে ছাত্রীকে আমার কাঁদতে দোব না। তাকে বই খুলে দেখাব এই দেখো স্পষ্ট লেখা

'নারীর নিন্দা হইতেই আমরা মৈথুন কার্যের নিন্দা করিতে শিখিয়াছি। যে কার্যের ফলে জীবসৃষ্টি হইবে, প্রজা বৃদ্ধি হইবে, তাহার নিন্দা করিতে নাই।' আর আমার আচরণই প্রমাণ করছে আমি কত বড় বৈষ্ণব, মেরেছ টিনের কোনা, তা বলে কি প্রেম দেব না। আমি পুরুষ নই গুপ্ত মহাপুরুষ, গুপ্ত যোগী, শুধু চিনতে পারলে না বলে, ভোগী আর লম্পটের অপবাদে লাথি মারলে।

অপকর্মকারী শাস্ত্রকে কীভাবে দুমড়ে মুচড়ে নিজের অপকর্মের সমর্থনে লাগায়। এরই নাম মানুষের আদালত। অনন্ত সওয়াল-জবাবে কেউ দোষী, কেউ নির্দোষ। সৃষ্টির মূলে সত্যিই বিষ। তা না হলে ছেলে আর মেয়ে নিয়ে নীপা আর আমি জ্বলে পুড়ে মরব কেন! নীপা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, এখনও জ্বালাচ্ছে। তা জ্বালাক। শাস্ত্রে দেখলাম চিরটাকালই অসুর-শক্তির বিনাশ প্রকৃতিরই হাতে হয়েছে।

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে ॥

সর্বপ্রাণী—সর্ব সৃষ্টিকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলে তাঁর নাম মহাকাল, শিবলিঙ্গ হলেন মহাকাল। সেই মহাকালকে-শিবলিঙ্গকে তুমি গ্রাস করো, আত্মদেহস্থ করো তাই তুমি পরকালিকা। তুমি কালগ্রাসী তাই তুমি কালী। কালসংগ্রসনাৎ নীপা। নীপা আমাকে হত্যাও করতে পারে। সে অধিকার তার আছে। দেবাদিদেব মহাদেবই দিয়ে রেখেছেন সে অধিকার; কিন্তু তাই বলে মুষলে মারবে। আমি কি সেই কৃষ্ণ! যে কৃষ্ণ যদুবংশ রচেছিলেন, নাশ করেছিলেন, বৃক্ষশাখে বসে ছিলেন নীলোৎপল পদযুগল প্রকাশ করে। আমি তো কুরু-কৃষ্ণ নই, আমি করো-কৃষ্ণ, কদম কৃষ্ণ।

নীপা তো চেয়েছিল সন্তানদের মানুষ করতে। তা হলটা কী! ছাপছোপ তো পড়ল কিছু। পড়ে কী হল! রাতের ঘুম তো গেছে। মুখে তো ঝামা ঘষে দিয়েছে। মহাদেবও তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, মদনমঞ্জরী ছাগলে খেয়ে ফেলেছে। ছেলে বলে, ফাক ইউ। ইংলিশ মিডিয়ম তাকে এই শিক্ষাটুকুই দিতে পেরেছে। আর মেয়ে বলে, ডেট ইউ। ইংরেজি ফ্যামিলি ম্যাগাজিন তাকে মানুষ মারার বড়ি দিয়েছে। কাল তাকে দিয়েছে শিক্ষা— কেয়ার ফ্রি, ইউ আর বর্ন ফ্রি। ল্যাটা চুকে গেছে। হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধে দুটি পিণ্ড। তিলকাঞ্চন করে জ্যান্ত বাপের শ্রাদ্ধের কলাপাতায়, সোহাগের ঘৃতচর্চিত হয়ে গড়াচ্ছে।

মেয়ে একদিন মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরে এল। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলুম—

'এ কী, এ অবস্থা তোর কে করে দিলে? এত দূর অধঃপতন!'

মেয়ে জড়ানো গলায় মুখের ওপর জবাব দিলে, 'কেন তুমি খাও না?'

'আই ক্যান স্ট্যান্ড।'

'আই উইল স্ট্যান্ড।'

সহ্য হল না। ঠাস করে এক চড়। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'আই রিটর্ন ইট টু দাই ফেস।'

নীপা ছুটে এল। সে তখন তার সেই আহামরি চুল ছেঁটে বব করে ফেলেছে। স্লিভলেস ব্লাউজ ধরেছে। মেয়ের দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছে, 'গেট আউট, ক্লিয়ার আউট।'

মেয়ে বললে, 'হোর অফ এ মাদার শাট আপ।'

আমি লজ্জায় সরে গেলুম। বেশ বুঝলুম শুধু মদ নয়, দেহটাও বিলিয়ে এসেছে। আমার মাথা হেঁট। আর সেইটাই তো মানুষের নিয়তি— হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। কাটা ঘুড়ির মতো আমার মন হুহু করে অতীত আকাশের দিকে ভেসে গেল। ম্যান, ইউ আর দি মেকার অফ ইয়োর ওন ফরচুন। মনে পড়ে, ঘরের মেঝেতে চূর্ণবিচূর্ণ দর্পণ, ভাঙা গেলাস, কাপের টুকরো। লাল সায়া আর লাল কাঁচুলি পরা নীপা। ঘামে ভেজা মোম শরীর। দিনশেষের আলোয় মোহময়ী। তখন তার গর্ভে এই সুকন্যা

হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। আর তুমি তখন প্লেবয়ের পাতার এক লাস্যময়ীর সঙ্গে নীপাকে তুলনা করছ। তোমার সন্তান ও-পাশে মা মা করে কাঁদছে। আর তুমি তখন ভাবছ, গোয়েলের সঙ্গে যে মেয়েটির ঘরে গিয়েছিলে, বিশেষ এক মুহূর্তে তার ছেলেও এইভাবে কাঁদছিল। তুমি ভাবছিলে তোমার অফিসের সেই স্টেনো কীভাবে একদিন তোমার সামনেই তার বেশ পালটাচ্ছিল। তুমি ভাবছিলে সহস্রধারার স্বচ্ছ জলে অমৃতার নগ্ন দেহের কথা। তোমার মনের নানা তরঙ্গের অভিঘাতে দুলে উঠেছিল নীপার গর্ভসলিল। সেই সলিলেই হেঁট্‌মুণ্ড ঊর্ধ্বপদ তোমার কন্যা। প্রতিটি তরঙ্গে তৈরি হয়েছে তার মস্তিষ্কের নানা খাঁজ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য। কোথায় সাত্ত্বিকতা? যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। তোমার সৃষ্টিই তোমার ব্যঙ্গ

We have nothing to conceal.
We have nothing to miss.
We have nothing to say
We have,
the watch has been wound up
the bills have been paid
the washing up has been done
the last bus is passing by.
it is empty
We can't complain.
what we are waiting for.

একদিন সন্ধেবেলা দেখি আমার যুবক পুত্র ঘর অন্ধকার করে ফুল স্পিডে পাখা ছেড়ে খাটে মড়ার মতো পড়ে আছে। জগৎ সংসারে সব কিছুরই তো একটা নিয়ম আছে। সময় আছে। ঘড়ি আছে। সন্ধেবেলা কেউ ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়! হঠাৎ উঠে পড়ল খাট ছেড়ে। তারপর দেখি দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমের দিকে চলেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে কী তোমার।'

কেমন একটা ফ্যাকাশে হেসে বললে, 'আই অ্যাম ট্রাইং টু বি এ লিজার্ড।' বলেই থ্যাস করে বসে পড়ে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ বের করতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবলুম, এই হল মানুষের পরিণতি। হাজার হাজার বছরের সভ্য হবার সাধনায় কী হল, না মানুষ নেশার বড়ি খেয়ে বলছে, আমি টিকটিকি হতে চাই। আমার সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। কয়েক হাজার টাকা রোজগার। আকাশে মাটির সামান্য ঊর্ধ্বে আধুনিক একটা আস্তানা, এ খুপরিতে একটা খাট, হোথায় একটা খাবার টেবিল, গোটাকতক জ্যালজ্যালে পরদা, একটা লোহার আলমারি ঠাসা গুচ্ছের জামাকাপড়, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, পি পি এফ-এর বই, তুচ্ছ জাগতিক সম্পদসমূহ। মানুষের আসল সম্পদ ছেলে-মেয়ে। সেই দুটোই গেল গেল, ভেস্তে গেল সব। মানুষ ছেলেমেয়েকে বলে ভবিষ্যৎ। আমার সেই ভবিষ্যৎটাই নেই।

নীপা হঠাৎ একদিন আমাকে বললে, তখন মাঝ রাত, 'এসো আর একবার চেষ্টা করি। শেষ চেষ্টা। দেখাই যাক না, যদি এমন কেউ আসে, যাকে ঘিরে আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।'

আমি অবাক হয়ে নীপার মুখের দিকে অন্ধকারে চেয়ে রইলুম। সে নীপাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বয়েসের চেয়েও বয়স বেড়ে গেছে। এ কালের 'কালচারড' সমাজসেবিকাদের মতো দেখতে হয়েছে। খাটো করে ছাঁটা চুল। আমাদের উন্মাদনার কালে নীপা শাড়ি পরে শুত। এখন যা পরে তাকে বলে নাইটি। ঝলঝলে একটা ব্যাপার। শরীরের বাঁধনও আলগা হয়ে এসেছে। কত দিন আর ধরে রাখবে। ভূমির আকর্ষণে সব ঝুলে যায়। তাজা যৌবনে যার মা হতে আপত্তি ছিল এত, সে এখন সন্তান কামনা করছে। হওয়ালে হয়তো হয়। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। সমাজ হাসবে।

লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। বিজ্ঞান যখন বটিকা দিয়েছে তখন এ দুর্ঘটনা কেন, সে কৈফিয়তও চাইতে পারে সবাই। আর সাহস নেই। আমিই না বলেছিলুম চৈতন্য আসতে পারেন, আসতে পারেন বুদ্ধ। তবে সামান্য 'ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট' নিয়ে। চৈতন্য হয়েছেন অচৈতন্য। বুদ্ধ হয়ে গেছেন বুদ্ধু।

আমি বলেছিলুম নীপা নম নম করে সরে পড়ো। সেকালের মানুষ দার্শনিকতা করে বলত, লাইফ ইজ এ গেম। জীবন একটা খেলা। এখন সত্যিই খেলা। এ জেনারেশনের সঙ্গে পুরনো চালে খেলে জেতা যাবে না। আর আমাদের তৈরি করে দিতে পারে এমন কোচও নেই। আমাদের টিম পড়ে গেছে। জার্সি খুলে ফেলো। লেট আস রিটায়ার। The watch has been wound up/ the bills have been paid ll শেষ বাস চলে যাচ্ছে। একেবারে খালি। উঠে পড়ো। উঠে পড়ো।

সংসার থেকে মেয়েরা সহজে মন তুলে নিতে পারে না। খামচে ধরে থাকে। মেয়েদের দর্শনচিন্তাও আসে না। আমি একটু শান্তি চাই। একটু শান্তি। আমার জীবনপাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যানা উঠছে। শান্তি পেতে হলে জামাকাপড় খুলে চিতায় গিয়ে উঠতে হবে। আর মুখাগ্নি নয়, বলতে হবে লিঙ্গাগ্নি করো। তলার দিক থেকে পুড়তে পুড়তে ওপরে উঠুক।

আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু বললেন, 'ডোন্টঅ থিঙ্কঅ সো মাচঅ। ইউঅ ড্রিঙ্কঅ বি মেরিঅ। শাস্ত্র বলছেন যে তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেবে সরে এসো তার কাছ থেকে। কে শুনছে সে কথা। প্রৌঢ়ের জ্ঞানান্বেষণ হল বালিতে আঁচড় কাটা। যৌবনের শিক্ষা হল শিলালেখ। সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করা হল, 'আপনাকে তো কখনও সামান্যতম উদ্‌বিগ্ন দেখি না। কারণটা কী?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'কারণ আমার কাছে এমন কিছু নেই যা হারালে আমার দুঃখ হবে।' সন্ন্যাসী আরও বললেন, 'সব কিছুরই বেড়ার প্রয়োজন।'

'বেড়া কাকে বলে?'

'বিশ্বাস।'

'বিশ্বাসের বেড়াটা কী?'

'আস্থা।'

'আস্থার বেড়া?'

'কোনও কিছুকে ভয় না পাওয়া।'

জীবনে যা আসছে আর যা চলে যাচ্ছে তা মেনে নেওয়ার নামই হল জ্ঞান।

সেই জ্ঞান আমার হয়নি। নীপার তো হয়ইনি। আজকাল দু'জনেই রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি না। সংসারটাকে ভেবে বসে আছি চন্দ্রালোকিত প্রশান্ত নদীতে ভাসমান, চলমান একটি নৌকা। আমি ধরেছি হাল, নীপা ধরেছে পাল, আর ওই দুটো আমাদের প্রাণের যাত্রী। লক্ষ্য আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বর্ণ তোরণ। যাত্রীরা চায় না আমরা হাল কি পাল ধরি। তারা ভেসে যেতে চায় ইচ্ছামতো। যে ঘাটে লাগে লাগুক। মাঝে মাঝে তলাটা ফুটো করে দিতে চায়, ডোবে ডুবুক।

শরীর ভাঙছে। বাইরের চেহারায় ধরা পড়ে না, ভেতর খালি। বিরাট ডাক্তার হেসে হেসে বললেন, এই তো বয়েস। মৃত্যুর ছায়া পড়বে। ধীরে ধীরে একে একে যন্ত্র বিকল হবে। অ্যাংজাইটি, টেনশন, আধুনিক মানুষের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক কাঁধে এর হাত, ও কাঁধে ওর হাত। সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবেন! পারবেন না। কেউ পারে না। নিন এইসব করিয়ে আনুন, ই সি জি, ব্লাড, টিসি, ডিসি, ই এস আর, সুগার, স্টুল, ইউরিন। থরো চেকআপ। আলু কম, চিনি কম, মডারেট অ্যালকোহল, লিমিটেড স্মোকিং, কনট্রোলড সেক্স। একটু উদাসীন থাকার অভ্যাস। মাথা বেশি ঘামাবেন না। মাথা ঘামালেও টু অ্যান্ড টু মেকস ফোর, মাথা না ঘামালেও তাই। ভাল ঘুম হয়? হয় না। এই একটা ট্র্যাঙ্কুইলাইজার লিখে দিলুম। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর স্লিপ।

নীপার ডাক্তার নীপাকেও ওই একই কথা বললেন। চিরনিদ্রার আগে রাতের সাময়িক নিদ্রার

বটিকা। রাগ কমান, দুশ্চিন্তা কমান। ভাল ভাল, সিনিক জায়গায় মাঝে মাঝে বেড়াতে যান। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আপনার এমন সুন্দর চেহারা; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, হাতের, গলার স্কিনে পরিবর্তন আসছে। এই দেখুন কনুইয়ের কাছে, একে বলে টোডস স্কিন। নিজের দেহকে নীপা কত ভালবাসত। নীপার দেহকে আমি কত ভালবাসতুম!

আর এক এক্সপার্ট আমাকে বললেন, রোজ সকালে হাফ প্যান্ট পরে আধ ঘণ্টা জগিং করুন। আর এক এক্সপার্ট বললেন, আসন আর ভ্রমণ প্রাণায়াম। আর একজন বললেন, মেডিটেশন। ধ্যান আর ধারণা। সব শেষে এক রসিক বললেন, ধুর মশাই, ক্রিয়েটিভ অরগ্যানটাকে চালু রাখুন। ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিনের পিস্টন। পিস্টন থামল তো ট্রেনও থামল। বয়লারের আগুন নিবতে দেবেন না। বেলচা বেলচা কয়লা মেরে যান।

সেই সন্ন্যাসীকে প্রশ্নের মতো, আমারও প্রশ্ন, 'দেহ-বয়লারের কয়লা কী?'

'উত্তেজনা।'

'কোথায় পাওয়া যায়?'

'চলে যান ইংরেজি সিনেমা হলের পাশের সেই গলিটায়। দেখবেন সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বসে আছে একটা লোক। বাইরে থেকে দেখলে ইনোসেন্ট বুক স্টল, খাতির জমাতে পারলেই কয়লা। রিডিং চার্জ দেবেন, নেবেন, ফেরত দেবেন, আবার নেবেন। ভাল কোক কয়লার আড়ত। পাতায় পাতায় ছবি মশাই। দেখবেন আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবেন। বুঝবেন কেন ঠাকুর বলেছেন, কা তব কান্তা।'

'ঠাকুর নয়, শঙ্করাচার্য।'

'ওই হল। ব্লু ফিল্ম দেখুন। জীবনের মানে খুঁজে পাবেন।'

সাহস নেই আমার। ইচ্ছে প্রবল। ভয় পাই। যেমন বলে না ভয়ে ভক্তি। আমারও তাই ভয়ে চরিত্রবান। বার্নার্ড শ' সাঁচ্চা বলেছিলেন, সাহস আর সুযোগের অভাবই চরিত্র।

একজন বললেন, 'দীক্ষা নিন। ভাল গুরু ধরুন। অনেক তো হল। হাত আর হাতা এবার দুটোই গুটোন। সারেন্ডার, সারেন্ডার।' বলে বেশ সুন্দর সুরে গাইলেন—

তবে সে সেই পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে
সেই সে পরমানন্দ।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'শুনেছি, আপনি নাকি বন্ধুর স্ত্রীকে বের করে...।'

ভদ্রলোক হাত তুলে বাধা দিলেন, 'বের করে নয়, রেসকিউ। দানবের হাত থেকে দেবী উদ্ধার।'

'নিজের স্ত্রীকে নাকি...।'

'ত্যাগ। শাস্ত্র বিরোধী কাজ করিনি। দুষ্ট গোরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল শ্রেয়।'

'তা আপনি উপদেশ দিচ্ছেন?'

'কেন দোব না। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ধর্মজীবনের কী কানেকশন! শোনেননি, যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ি যায় তদ্যপি আমার গুরু রামানন্দ রায়। ধর্মব্যাধের গল্প শোনেননি।'

'আমি তো ভাই পাপটাপ মোটামুটি ভালই করেছি। আমার কি কিছু হবে!'

'আলবাত হবে। হবে না মানে!'

'তা কী হবে!'

ভদ্রলোক যেন বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। আমি তখন প্রশ্ন করলুম, 'আপনার কী হয়েছে!'

'আমার বেশ একটা বিশ্বাস এসেছে। অদ্ভুত একটা বিশ্বাস। কী আপনি পাদরিদের মতো পাপ পাপ, পুণ্য পুণ্য করছেন! আমরা কি কিছু করছি? সব সেই তিনি। তোমার কর্ম, তুমি করো মা। লোকে বলে করি আমি। সব তিনি। কিছু দিন আসনে বসে বীজমন্ত্র জপ করলেই, আপনারও সেই

বিশ্বাস এসে যাবে। তখন দেখবেন, কী আনন্দ, কী আনন্দ! কোনও কাজের আর তখন জবাবদিহি করতে হবে না। সবই তো তাঁর কর্ম। আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র।'

'তা আপনি যদি নিমিত্ত মাত্র হন, আপনার পরামর্শ আমি শুনব কেন?'

'আরে বোকা, এ আমার পরামর্শ কেন হবে! এ তাঁর পরামর্শ, এ তাঁর উপদেশ।'

'তিনি কে?'

ভদ্রলোক ধৈর্যচ্যুত হয়ে বললেন, 'তিনি যেই হন, তাতে আপনার বাবার কী?'

'না, তিনি যদি বলে থাকেন বন্ধুর বউকে ফুসলে নিয়ে এসে, নিজের বউকে দূর করে দাও, আর সেই বউ একটি সন্তান নিয়ে ভিক্ষে করে মরুক, তা হলে সেই তিনি কেমন তিনি আমার জানা দরকার।'

'আপনাকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া ঝকমারি। কর্মফল বলে একটা ফল আছে জানেন? সে ফল গাছে ফলে না। ফলে কর্মে।'

'এই তো বললেন, সব কর্ম তাঁর, আমরা নিমিত্ত মাত্র, তা হলে আবার ফলের কথা উঠছে কেন? যার গাছ, তারই ফল।'

'আরে বাবা, সেটা কখন, যখন আপনি তাঁকে জানছেন, তাঁর কাছে গুরুর মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন।'

'তার মানে আপনি আগে দীক্ষা নিয়ে, জপ ধ্যান করে, নিজেকে উৎসর্গ করে একটা লোকের বউকে বের করে আনলেন, আর নিজের বউকে মারলেন লাথি, তাই তো?'

ভদ্রলোক থতমত খেলেন।

আমি বললুম, 'এ সমর্পণের কী মানে হয়! আপনি একটা মেয়েছেলে না ধরে, আরও বড় কিছু ধরতে পারতেন। তিনি আপনার মাধ্যমে এই রকম একটা ইতর কাজ করালেন!'

'তাঁর ইচ্ছে হল। তাঁর ইচ্ছের ওপর তো কথা চলে না।'

'তা এই কর্মটির ফল কে ভোগ করবেন, তিনি! এপাশ ওপাশ থেকে দুটো কেস ঠুকে দিলে, কে জেলে যাবে, আপনি না তিনি!'

'আরে মশাই, শেষ কথাটা তো এখনও আপনাকে বলা হয়নি। সেটা হল তিনিই আমি, আমিই তিনি।'

'তার মানে আমার সঙ্গে এতক্ষণ কে কথা বলছেন? আপনি না তিনি! ব্যাকরণের এমন গোলমালে তো জীবনে পড়িনি।'

'আরে মশাই তিনি ব্যাকরণ-ট্যাকরণের অতীত।'

'তার মানে আপনার আমার নেই। ব্যাকরণ ছাড়া যেমন ভাষা অশুদ্ধ, আপনিও সেই রকম!'

'আরে মশাই, আর একটা মহাসত্য তো বলাই হয়নি, কর্তাও নেই কর্মও নেই।'

'তা হলে কী আছে?'

'কিছুই নেই। সব স্বপ্ন। দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন।'

'তার মানে, আমরা ঘুমোচ্ছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অফিস যাচ্ছি, আহারাদি করছি, স্বপ্ন দোষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আপনার দুটো ছেলে হয়ে গেল অবৈধপক্ষে।'

ভদ্রলোক ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'ধর্ম নিয়ে, দর্শন নিয়ে, আত্মজ্ঞান নিয়ে ইয়ারকি করবেন না।'

'করলেই বা, সবই তো স্বপ্নে ঘটছে।'

'আপনার কিছু হবে না মশাই', বলে ভদ্রলোক সরে পড়লেন।

কতভাবে মানুষ কর্মকে পাশ কাটাতে চাইছে।

Here is a thing
There is a thing
Some thing looks like this
Some thing else looks different
How easily one can blow out
The whole blossoming earth.

হাউসিং কোঅপারেটিভের মাতব্বররা এসে বললেন, আরও পঁচিশ হাজার ক্যাশ ডাউন করতে হবে। যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁরা, 'তোমাব কর্ম তুমি করো মা', বলে সরে পড়েছেন। দু'লাখ গলে গেছে। আমার ভাঁড়ে মা ভবানী। আরও পঁচিশ মানে উটের পিঠে শেষ খড়ের টুকরো। হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হবে। অবাঙালি ব্যাবসাদাররা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। আজ বললে কালই ভাল দামে হাতবদল হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কী হবে, এই ঠাটবাট! বাড়িতে তো পাঁচ মিনিটও তিষ্ঠোনো দায়। নীপার সঙ্গে নীপার মেয়ের অনবরত চুলোচুলি। এতবার বলছি, নীপা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওদের ওপর থেকে মন তুলে নাও। নীপা শুনবে না। বললেই রেগে যায়, তুমি অপদার্থ, স্বার্থপর, শয়তান, নিজেরটি ছাড়া কিছু বোঝো না। তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারো, আমি পারি না। ওরা দুটোতে আমাদের মাথা হেঁট করে দেবে তা হবে না। গলা টিপে মেরে ফেলব, সেও ভাল।

পুলিশে ধরবে।

জেল খাটব।

একদিন মনে হল দুটোকে ডেকে সরাসরি শেষ কথাটা জেনে নিই। কী চাস তোরা? রাখতে চাস না ভাঙতে চাস। ভাঙতেই যদি চাস তো, আমি নিজে হাতে ভাঙি। ওদের সামনে যেতে ভেতরে এমন একটা মানসিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে আর পারি না। বিশাল একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে। মাঝে ঘৃণা আর অভিমান। কোনও সেতু নেই। যখন ভাঙার চিন্তা আসে তখন মনে হয়, কত কষ্ট করে, তিলতিল করে সব হল, ভাঙতে তো এক দিনের বেশি সময় লাগবে না। ভাগ্যের কাছে এইভাবে হেরে যাব। এরা কি সত্যিই অমানুষ! কোনও বন্ধন, কৃতজ্ঞতা, অনুভূতি সত্যিই কি নেই! আমি তো সবসময় এদের কথা ভাবি। মনে হয় সব ছেড়ে সরে পড়ি, পারি না। মনে হয় এদের কী হবে! আমি ভোগী, আমি শয়তান, স্বার্থপর, আমার চরিত্র আলগা, সবই মানছি; কিন্তু আমি ওদের জন্যে যতটুকু ভাবি, ওরা কি আমার জন্যে তার সিকির সিকি ভাবে!

আমার পিতা বলতেন, দ্যাখো, ডোন্ট প্যাম্পার এ চাইল্ড। ছেলেদের একটু দুঃখ কষ্টে রাখতে হয়, তা না হলে তারা মানুষ হয় না। বলতেন মাকে। আমাদের ছাত্রজীবনের সম্বল ছিল দুটো প্যান্ট, দুটো জামা। একজোড়া জুতো। আমাদের জলখাবার ছিল রুটি, কুমড়োর ছক্কা। যে-দিন তাইতে ছোলা পড়ত, সেদিন আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠতুম। আবার যেদিন এক চামচে ঘি পড়ত, সেদিন মনে হত স্বর্গে যাচ্ছি। আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক এসেছিল যখন আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের ছাত্রজীবন কেটেছে হারিকেনের আলোয়। জ্বলে জ্বলে মাঝরাতে কাচে কালি পড়ে যেত। সেই ভুতুড়ে আলোর সামনে বসে আমরা পরীক্ষার পড়া পড়তুম। দু'দিকের দু'বিছানায় বাবা আর মা জেগে থাকতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, এবার শুয়ে পড় বাবা। কাল আবার খুব ভোরে উঠে পড়বি। জ্ঞান হবার পর, বাবা আর মাকে কখনও এক বিছানায় শুতে দেখিনি। কখনও দেখিনি দু'জনে ঝগড়া কি ইয়ারকি করছেন। শুনেছি, সন্তানের জন্মের পর স্বামী-স্ত্রীতে ভাইবোনের মতো থাকতে হয়। আমি চোখেও দেখেছি। বছরে দু'বার রাশ সামান্য একটু ঢিলে হত। বিজয়া দশমী আর ফাগুয়া। সংসারটা তাঁদের কালে ছিল লাগাম আঁটা ঘোড়ার মতো। যেদিকে খুশি, যেভাবে খুশি ঘোড়ার মতো চালাতেন। রাশ টানতে জানতেন, জানতেন আলগা দিতে।

সেই পিতা-মাতার সন্তান আমি। আমার কেন এ হাল! একেই কি বলে কাল! ওই যে সেই পাপী লম্পট লোকটা, যে আমাকে ধর্ম শেখাচ্ছিল, তার কথাই কি তা হলে সত্য। তাঁর খেলা। সেই তিনি। যাঁর অপর নাম ডেসটিনি। না তিনিই খেলছেন বহু রূপে। একোঽহং বহুস্যাম। যখনই তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে চলে আসছেন মায়ার জগতে। কোথাও সাধু, কোথাও তস্কর, কোথাও যোগী, কোথাও ভোগী। তিনি সর্প হয়ে দংশন করছেন, আবার তিনিই ঝাড়ছেন ওঝা হয়ে।

রাজপুরীতে সন্ন্যাসী গেল ভিক্ষা চাইতে। রাজপ্রহরীরা পিটিয়ে রাস্তায় শুইয়ে দিলে। খবর পেয়ে মঠ থেকে অন্য সন্ন্যাসীরা এসে, মুখে জল দিতে লাগল। যেই জ্ঞান হল তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে। সন্ন্যাসী বললেন, এখন যাঁরা জল দিচ্ছেন, তাঁরাই একটু আগে প্রহরী হয়ে মেরেছেন।

বড় কঠিন এই জীবনদর্শন। কে খেলায় আমি খেলি বা কেন?

মানুষের জীবনের শৈশবের দশটা বছরই হল ঠিক-ঠিক বাঁচা। নীল চোখে, নীল আকাশ। ওই পাখি, ওই গাছ, ওই নদী, ওই ঘুড়ি, ওই লাটাই। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, ঈগল পাখি পাছে ধরে। মা। মা ছাড়া জগৎ অন্ধকার। খেতে দিলে খাই, মারলে কাঁদি, ফেলে দিলে পড়ে থাকি। কী সুন্দর বলে সব কিছু ধরতে ছুটি, ফড়িং থেকে টিকটিকি। ওর নাম ফুল, লাল, হলদে, নীল। আমার বেড়াল, তোমার ময়না। দিনে পৃথিবীটা বিশাল, প্রান্তর, সরোবর, ধানের সবুজ ঢেউ, হাঁসের সাদা পালক। রাতে পৃথিবী ছোট হতে হতে ছোট্ট একটি ঘর, আরও ছোট। শিশুর রাতের পৃথিবী মায়েব বুক। দশ পেরোলেই বলতে পারি, বড় হচ্ছি না, এগোচ্ছি মৃত্যুর দিকে। বয়েস হল পঁচিশ, মানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলাম পঁচিশ বছর। পঞ্চাশ মানে, ফেলে দে, ফেলে দে। ব্যাটাকে একপাশে সরিয়ে চুপ করে বসিয়ে রাখ। টিকিট কাটা হয়ে গেছে, বিল মেটানো হয়ে গেছে। ডিস্টান্ট সিগন্যালে চোখ রাখ, পাখা পড়েছে, ঘণ্টা বেজেছে। শিশুর চোখে ট্রেন জগৎ দেখার যন্ত্র। প্রৌঢ়ের চোখে ট্রেন বিদায়ের বাঁশি।

কোনও এক বাড়িতে সবাই একই স্বপ্ন দেখেছিল এক রাতে।
কী স্বপ্ন!
দিন দিন, প্রতি দিন তারা একটু একটু করে ছোট হতে হতে
শেষে মৃত্যু।
ভাগ্য ভাল তাই কী মনে হল বসে না থেকে লেগে গেল কাজে
কী কাজ!
যে সব বড় মাপের বিশাল কফিন ছিল মাপ মতো কেটেকুটে
করে ফেললে ছোট, আর সেটাকেই বগলে নিয়ে ঘোরে।
ঠিক কাজই করেছে।
প্রথম দিকের ছোট হওয়াটা তেমন নজরে পড়েনি,
মাঝে মধ্যে থেমে থাকত মাসের পর মাস।
একটা সময় এল যখন হুহু করে কমতে থাকল আকার,
শেষে একদিন যখন ঘুম ভাঙল, স্বপ্ন শেষ হল
একই স্বপ্ন দেখছিল তারা একই বাড়িতে,
জেগে উঠল ছোট ছোট পুতুল শরীর
মাপে মাপে ঢুকে গেল কাটা ছাঁটা ছোট্ট কফিনে।

কার কী হচ্ছে জানি না, আমি ক্রমশ ছোট হচ্ছি। বোকার মতো বসেই আছি। কফিনটাকে কেটেকুটে ছোট করার কাজে এখনও হাত লাগাইনি। মানুষ দিনে-দিনে ছোটই হয়। শেষে এতটুকু এক 'দ' মার্কা বুড়ো।

ছেলে পড়ছে না, হুহু করে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে জীবনের পাশ দিয়ে। নীপার মহাকাল নৃত্য। হল

না, হল না। ছেলের কিছু হল না। মেয়ের বিয়ে হল না। সুযোগ দেওয়া যায়, হওয়ানো অত সহজ নয়। সময় আর পরিস্থিতি দুটোই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একজন বললে, 'মশাই, এইবার আপনার একটু রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আপনার মেয়ে যখন রাস্তায় বেরোয় পাড়ার ছেলেরা সব হায়নার মতো পেছনে লাগে। হয় মেয়েটাকে সামলান, নয় ছেলেগুলোকে আচ্ছা করে কড়কে দিন।'

'আমার ইচ্ছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর।'

'কাদের! ওই ছেলেদের!'

'না না, জাতির যারা ভবিষ্যৎ, তাদের মৃত্যু কি আমি কামনা করতে পারি। আমি আমার মৃত্যুর কথা বলছি। আমি যদি প্রতিবাদ করি, ওরা আমাকে শেষ করে দেবে। যদি থানায় যাই, ওরা বলবে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার মশাই, দেশে এত বড় বড় ব্যাপার ঘটছে, আমরা আর তাল রাখতে পারছি না। রুই কাতলা ধরব, না চুনোপুঁটি ধরব! মাঝখান থেকে মেয়েটাকে অ্যাসিড মেরে দেবে।'

'আমরা ওই ভয়ে থেকে থেকেই ওদের আরও মাথায় তুলছি।'

'আসুন না আমরা সবাই মিলে একদিন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ করি। আজ আমার মেয়েকে করছে, কাল আপনার মেয়েকে করবে।'

'আমার মেয়েকে আপনি দেখেছেন! তার চেহারা, চালচলন। সে মশাই এখনও রেখে-ঢেকে পথে বেরোতে জানে।'

'আমার মেয়ে কি উলঙ্গ হয়ে বেরোয়!'

'উলঙ্গ হয়ে বেরোলে তো কথাই ছিল না, কত পাগলি তো উলঙ্গ হয়ে পথে-বিপথে ঘোরে, যারা সেক্স থ্রো করে তাদের নিয়েই তো সমস্যা। আপনার মেয়ে সেই কায়দাটা জানে। ইন ফ্যাক্ট সেটা আমাদেরও সমস্যা। আমাদের নিজেদের ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠেছে।'

'তা হলে বলছেন আমরাই অ্যান্টিসোশ্যাল?'

'হরেদরে সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে। কাঙালকে শাকের খেত দেখানো। এসব কলকাতার পশ এলাকায় চলে। মধ্যবিত্ত পাড়ায় নারী স্বাধীনতা মানায় না।'

'মধ্যবিত্ত পাড়ায় ঘরে বসে স্ক্যান্ডাল চলতে পারে, কী বলেন?'

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কার ঘরে আপনি স্ক্যান্ডাল দেখলেন, যে এমন সুইপিং রিমার্ক! বেডরুম, বাথরুম, ড্রয়িংরুমে কোনও পার্থক্য থাকবে না! ইজ ইট প্রগতি?'

'আপনি নিজেই তো মশাই স্ক্যান্ডালাস। আপনি আপনার মেয়ের বয়সি মেয়ের দিকে কীভাবে, কত ভাবে, কত দিন তাকাচ্ছেন একবার ভাবুন। সে যদি সেক্স থ্রো করে থাকে তা হলে ওই ছেলেদের মতো আপনিও সমান কাবু। ইউ রেলিশ ইট। আসলে কী জানেন, এই বয়েস থেকেই মানুষকে পারভার্শানে ধরে। আপনার বারান্দা আর আমার বারান্দা মুখোমুখি।'

'রাবিশ, সিনিক, করাপ্ট।' ভদ্রলোক রেগেমেগে চলে গেলেন।

আমি আমার মেয়ের দিকে কখনও তাকাই না। তাকাই না একটা কারণে, আমার মনে পড়ে যায়। আমার পুরনো সব পাপের কথা। সে-সব পাপ এখন রসা 'রামের' মতো, আমার অন্ধকার সেলারে পাশাপাশি বোতলে সাজানো। নড়াচড়া করলেই ঠুং ঠাং শব্দ শুনতে পাই। গোয়েলের পাল্লায় পড়ে মেয়ের বয়সি মেয়েছেলের ঘরে ফুর্তি করতে যাইনি! প্রথমটায় না না করে, হুল্লোড়ে মেতে উঠিনি তারপর। রাত গড়িয়ে চলেনি মাঝরাতের দিকে! মনে যেন আগুনে পুড়িয়ে সিল মেরে দিয়েছে। যা আর জীবনে উঠবে না। লোহা একবার পাকিয়ে স্ক্রু হয়ে গেলে আর কি সোজা করা যায়! স্ক্রুই থেকে যাবে। আমার মনের সেই অবস্থা।

একদিন রাত এগারোটা বেজে গেল, বারোটা বেজে গেল, মেয়ে আর ফেরে না। নীপা নীচের দরজায়, আমি বারান্দায়। চরাচরে নেমে এসেছে রাতের প্রশান্তি। কোথায় কেউ সংসারের ফাঁদে

ধরা দিতে চলেছে; ভেসে আসছে সানাইয়ের মন কেমন করা সুর। বেশ লাগে এই সুর। এ যেন একই সঙ্গে আগমনী, আর বিদায়ের বাঁশি। চোখের সামনে ঝুলছে রাতের নীল মশারি, তার গায়ে ঝোলানো ধকধকে তারার তবকতক্তি। ফিনফিনে সুরার মতো ঝিলঝিলে বাতাস। এত শান্তি তবু অশান্তি। মেয়েটা গেল কোথায়! এই বিশাল, বিশাল, বিশাল শহরের কোন কন্দরে ঢুকে আছে কে জানে! নিজে না এলে কে কোথায় খুঁজতে যাবে। নীপা ছটফট করছে। আমার ছটফট করছে মন। এমন সব কুৎসিত চিন্তা আসছে। গ্যাং রেপ করে কোথাও ডাম্প করে দিলে না তো! আজকাল সবই সম্ভব। অসম্ভব শব্দটা শুনেছি আমাদের মতো মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়।

রাত দেড়টার সময়, আমরা দু'জনে আমাদের ঘরে মুখোমুখি বসলাম। তার আগে আমরা মেয়ের ঘর তন্নতন্ন করে পুলিশি কায়দায় খুঁজে এসেছি ক্লুর সন্ধানে। যদি কোনও চিঠিচাপাটি পাওয়া যায় গৃহত্যাগের। অসংখ্য প্রেমপত্র। মুখ চুম্বনের ইচ্ছা। একালের উন্নাসিক পত্র-পত্রিকা। স্ক্যান্ডালাস পত্রিকা। ইরোটিক বই ছবি। এমনকী সিগারেটের প্যাকেট। মেয়েও মায়ের মতোই অগোছালো। এখানে ওখানে ছাড়া জামাকাপড়। দেরাজের হাতলে একটা ব্রা ঝুলছিল। সুন্দর কাজ করা। বাপ হলেও পুরুষ তো! নজর চলে গিয়েছিল। দুটো ভাবনা এসেছিল মনে। মেয়ের দিকে যেভাবে তাকানো যায় না, সেই ভাবেই চেয়েছিলাম প্রাণহীন ওই বস্তুটির দিকে। নীপার সঙ্গে তুলনা করেছিলুম আকার আকৃতির। মনে পড়েছিল, আমাদের মিলনের সেই বসন্তদিবসে, সেদিনের প্রেমিকা, আজকের মা বক্ষবন্ধনী ছুড়ে দিয়েছিল চিলেকোঠার কোণে। আটকে গিয়েছিল সেই অজানা মহিলার ছবির মাথায়। সে বস্তু এত কারুকার্যময় ছিল না। সাদামাঠা। বিদ্রোহ প্রশমনের সস্তা ব্যবস্থা। মনে পড়েছিল আমার সেই মাদ্রাজি বন্ধুর সঙ্গে জীবনের প্রথম ক্যাবারে দেখার কথা। সেই লাস্যময়ী এই রকমই কিছু একটা পরেছিল যেন। নিমেষে ওই সব ভাবনা ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম। মনে মনে বলেছিলুম, তুমি নির্মল করো, মঙ্গল করো।

এখন দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি স্তম্ভিত হয়ে। মাথার ওপর সাদা ডোমে সাদা আলো। যেন সার্জারি হচ্ছে। মিডনাইট এমার্জেন্সি। আমাদের সামনে অপারেশন টেবল। তার ওপর 'ইথারাইজড' আমাদের মেয়ে। মনে হল নীপাকে প্রশ্ন করি, ক্যাবারে-ট্যাবারে নাচছে না তো! শুনেছি ভাল রোজগার। অভ্যাস হয়ে গেলে কিছুই নয়। রাজভোগ, কমলাভোগও তো কাচের শোকেসে থাকে। এত দুশ্চিন্তা, তবু আমরা কেমন দু'জনে কবিতার মতো বসে আছি! সময়ের চলে যাওয়াটা আমরা তেমন বুঝতে পারি না. সেদিন পেরেছিলুম। ঘড়িতে চিনচিন করে দুটো বাজল। তিনটে বাজল! শেষ রাতে অদ্ভুত একটা বাতাস ওঠে, সেই বাতাসটা উঠল। দিনের দুশ্চিন্তায়, গোটা দুই প্যাঁচা বাইরে কোথাও তারস্বরে ডেকে উঠল, খই খাঁচা, খই খ্যাচা। একসময় মনে হল সময়ের নদীতে সত্যিই আমরা দু'জনে একটা নৌকো বাইছি। কোন ঘাটে ছেড়েছিলুম আর কোন ঘাটে চলেছি। অনেক দূর চলে এসেছি। সামনে অথই জল। এখনও পার দেখা যাচ্ছে না।

নীপা। মনে হচ্ছে আজই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করি।

আমি। সে তো পালানো।

নীপা। ওসব সেকেলে আদর্শ।

আমি। আমরা তো সেকেলেই।

নীপা। আমাদের কেউ চায় না।

আমি। তবু আমরা থাকব, জোর করে থাকব।

হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ চলে গেল। সেবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভাঙার পর আবার ভাল একটা আয়না লাগানো হয়েছে। আগের চেয়েও দামি। মাঝ রাতে আয়নায় দু'জনের প্রতিফলন দেখে মনে হল, দুটো ভূত বসে আছে। দুটো ফসিল। একটা বয়সের পর মানুষ এই ভাবেই থাকে। আমাদের প্রতিচ্ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মাথার ওপরের আলো মরে আসছে। আকাশে দিনের চোখ খুলছে।

হঠাৎ অসাধারণ একটা কবিতার লাইন মনে পড়ল।

One morning his face fell out of the mirror
into his hands: he let it fall.

এই সকালেই আমার মুণ্ডটা ওই আয়না থেকে খুলে পড়ে যাবে আমার দু'হাতের ওপর। আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব না। পড়ে যাক মাটিতে। এইবার সারা শহর আমি তোলপাড় করে ফেলব। ভোরে যেমন ফোটা ফুলের বাহার, বহুদিন পরে নীপাকে আমার সেইরকম মনে হল। প্রথম থেকেই নীপার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তবে যৌবনে তার সব রকমের আবেগই একটু বেশি ছিল। ইদানীং সেই আবেগ মরে এসেছে। দীপ্তিটা আছে। চেহারার ধার বজায় আছে। নীপা বসে আছে, বিষণ্ণ, দুঃখী দুঃখী ভাব। জলে নেমে দু'হাত দিয়ে স্রোত ধরার চেষ্টা করেছিল। এখন ক্লান্ত, হতাশ। ভোরের বিষণ্ণ ফুল। এখন মনে হয় নীপা আমার গর্ব, আমার অহংকার। আমার কত বন্ধু-বান্ধবের মাথা ঘুরিয়েছে! গোয়েলের মতো 'ফাস্ট'-ছেলে, যে কিনা বলের আগে দৌড়োতে পারে তাকে নীপা নাকানি-চোবানি খাইয়েছে—

আমরা কেউ দেবতা নই
এদিক সেদিক, ছোটখাটো ভ্রান্তি হতেই পারে।
সাদা কাগজে অসাবধানে এক ফোঁটা কালি
যদি পড়েই থাকে, কলম তো ধরা আছে হাতে।
ফোঁটাটাকে টেনে টেনে সরু বাঁকা অক্ষরে
লিখে যাও পরের কাহিনি।

প্রথম পাখির অস্ফুট কণ্ঠ শোনামাত্রই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। আমার একটা ইলেকট্রিক কেটলি ছিল রাত-বিরেতে চা করার জন্যে। বেশ বিলিতি-বিলিতি দেখতে। মেপে দু'কাপ জল ঢেলে প্লাগে গুঁজে দিলুম। সিঁ সিঁ শব্দ। আবার আসছে কুৎসিত চিন্তা। ভোরের কোনও ধানখেতে পড়ে আছে মেয়েটার দেহ। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এঁকে-বেঁকে একটা সাপ। লিপস্টিক লাগানো লাল ঠোঁটে ভিনভিন করছে মাছি। আমার কাম যেন ডিমের কুসুমের মতো টলটল করছে সসপ্যানে। যাত্রী আমরা দু'জনেই। ব্যভিচারের পথে আমি কিছু দূর গিয়ে সংস্কারের টানে ফিরে এসেছি। আমারই রক্তের রেণুর সাহসে কালের মাত্রা যোগ করে সে আরও অনেকটা এগিয়েছে। বিচারকের আঙুল যদি তুলতে হয়, তুলতে হবে পূর্বপুরুষের দিকে—

তুমি তো কেবল ছবি নও
তোমার কর্মেই আছে—
আমাদের ভবিষ্যৎ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে নীপা কানের পাশের চুল সরাচ্ছে। আমি উলটো দিকে বসে চা খেতে খেতে দেখছি, এমন সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে মনে হল বেশ ভারী গাড়ি। আমরা দু'জনেই পড়ি কি মরি করে ছুটলুম বারান্দায়। নীচে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের হৃদয়হীন একটি ভ্যান। সাদা পোশাক-পরা একজন অফিসার নেমেছেন। ভোরের আলোয় তাঁর সাদা পোশাক বেশ দেখাচ্ছে। তিনি ওপরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

নীপা বেশ জোরেই বললে, 'পুলিশ, খুন, মার্ডার।'

আমি নীপার মুখ চেপে ধরলুম, 'চেঁচিয়ো না।' সামনের বারান্দার দিকে তাকালুম। আমার প্রতিবেশী যেন শুনতে না পায়। জানতে না পারে। 'সাইলেনস, সাইলেনস।' এখুনি সে কাশতে কাশতে বাইরে আসবে। রোজ ওর কাশি শুনে মনে মনে বলি, হি উইল কাফ আউট এ ডে। ও দেখতে পেলেই আমাদের প্রেস্টিজ চলে যাবে। মধ্যবিত্তের আগলাবার মতো একটি জিনিসই আছে, একটি মাত্র সম্পদ— প্রেস্টিজ।

কালো গাড়ি থেকে একটি স্ট্রেচার নেমে এল। আমি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নীপাকে সাবধান করছি, চেঁচিয়ো না। এ আমাদের পাপ। মনে মনে পুলিশদের বলছি, তাড়াতাড়ি ঢোকান না মশাই, এখুনি যে পাড়ার চোখ ড্যাবড্যাব করে উঠবে। রেসকোর্সের ধারে ঘাসের ওপর সারারাত পড়ে ছিল। সেই জায়গাটায়, যেখানে বিজনেসম্যানদের কাপ্তেন ছেলেরা নতুন নতুন গাড়ি পার্ক করে ভেতরে বসে একটু মুক্ত বায়ুতে পান ভোজন করে। পুলিশের অসীম দয়া। ফাটকে ভরে দিতেই পারত। কন্ডিশন দেখে সাহস পায়নি। যদি মরেটরে যায়। যার ধন তাকেই দিয়ে গেল। হাতব্যাগে ঠিকানাপত্র পেয়েছে। সবচেয়ে লজ্জার কথা, পুলিশ-অফিসারটি এ-পাড়াতেই থাকেন। আমাদের চেনেন।

নীপা চাপা গলায় বলেছিল, 'ওদের দাঁড়াতে বলো, আমার মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।'

আমি বুঝতে পারিনি কী বলতে চাইছে। একটা মাথার বালিশ নিয়ে এগোচ্ছে।

'কী করবে কী?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'ওকে আমি আজ মুখে বালিশ ঠেসে শেষ করে দিয়ে জেলে যাব।'

আমি ফিসফিস করে ওরা যেন না শুনতে পায় এইভাবে বললুম, 'একটা বেশ্যাকে মেরে জেলে গিয়ে কী লাভ। এর চেয়ে আরও ভাল ভাল কাজ আছে করার মতো। ওকে মারার ঘাতক তো রেডি হয়েই আছে। আজ আর কাল।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পুলিশ অফিসারকে বললুম, 'আরে আসুন আসুন। হ্যাভ এ কাপ অফ মর্নিং টি।' চায়ে আপ্যায়ন করার ইচ্ছে আমার ছিল না। নীপাকে ব্যস্ত রাখার ছলে বললুম। জানতুম ভদ্রলোক না বলবেন না। দিন কয়েক আগে আমাদের অফিসে ছেলের চাকরির কথা বলেছিলেন। আমি বলেছিলুম, চেষ্টা করব।

নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে সেই প্রসঙ্গই যেচে তুললুম, 'সাতটা টেকনিক্যাল পোস্টে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হবে, এইবার আপনার ছেলের একটা ব্যবস্থা করে দোব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলে নিজেই একটা কী জোগাড় করে ফরেন চলে গেছে।'

'কবে গেল!'

'তা হবে, মাসখানেক তো বটেই। আপনি বরং আমার শ্যালকের জন্যে পিয়ন-টিয়ন যা হয় একটা চেষ্টা করুন। বেচারা প্রেম করে বিয়ে বাধিয়ে বড় বিপদে পড়েছে। সে রকম এডুকেশনও নেই।'

মনে একটা ছেঁকা লাগল। ভদ্রলোকের ছেলে কেমন ফরেন চলে গেল। আর আমার ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে দেওয়াল বেয়ে টিকটিকি হবার চেষ্টা করছে। কাল সন্ধেবেলা কোথা থেকে ঘুরে এসে সেই যে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে, ঢাক-ঢোল বাজালেও উঠবে না। ওই সব ওষুধের একটা পিরিয়াড আছে। দিন দিন রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা হয়ে যাচ্ছে। ও এমন জিনিস, যাকে ধরে তাকে ফিনিশ করে দেয়। আমি দিন গুনছি, কবে সেই দিন আসবে যেদিন ওই ঘর ভেঙে ডেডবডি বের করতে হবে।

অফিসার বললেন, 'আপনাকে আর আপনার শ্রীমতীকে চিনি তাই, তা না হলে বেশ ঝামেলা হয়ে যেত!'

'সে তো বটেই। তবে চেনা বলে লজ্জা করবেন না।'

'না না, সে কী কথা! ইট ইজ আওয়ার ডিউটি। সেই কোন ছেলেবেলায় পড়েছি— ডু ইয়োর ডিউটি কাম হোয়াট মে। জানেন তো, এই অনেস্টির জন্যে আমার কিছু হল না। এতদিনে বাড়ি-ফাড়ি করে ফেলতে পারতুম।'

'আরে মশাই, আপনারা হলেন ওল্ড ভ্যালুজ।'

ভদ্রলোক এত কথার পর আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনার মেয়ের এইবার একটা বিয়ে

দিয়ে দিন। দেখছেন তো, কী কাল পড়েছে। দেখুন ওই তল্লাটে সব দিন তো আর আমার ডিউটি থাকবে না।'

আমি বললুম, 'এই তো আর ক'টা দিন। সামনের মাঘেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর একটি ছেলে পেয়েছি। ফরেনে চাকরি করে। শুধু আপনার সম্মতির অপেক্ষা।'

'আমার সম্মতি!' ভদ্রলোক হাঁ হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয়! আমরা একটা সম্পর্কে আসতে পারি। আমার মেয়ে অসুন্দরী নয়। বেশ একটা বিলিতি-বিলিতি ভাব আছে।'

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, 'না মশাই, ও মেয়ে আমরা সামলাতে পারব না।'

'পারলে আপনারাই পারবেন। পুলিশ ছাড়া, এ-কালের ছেলে-মেয়েকে সামলানোর সাধ্য আর কারুর আছে। বেচাল দেখলেই রুলের গুঁতো।'

'তা হলে আমার যেদিন ইউনিভার্সিটিতে ডিউটি পড়বে গিয়ে দেখবেন। আপনার ধারণা পালটে যাবে। কালঘাম ছুটিয়ে দেয় মশাই। লাঠি, টিয়ারগ্যাস সব ফেল মেরে যায়।'

'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। আইডিয়েল ম্যাচ। আমি লাখখানেক খরচ করব। তা ছাড়া আপনার একটা স্নেহও পড়ে গেছে।'

'স্নেহ! এই সব মেয়েকে স্নেহ। এরা ওই হোটেল, রেস্তোরাঁ, ময়দান আর গাঁজার আড্ডাতেই চলে। সংসারে অচল।'

ভদ্রলোক কোনওরকমে চা শেষ করে উঠে পড়লেন। যেন পালাতে পারলে বাঁচেন।

আমি বললুম, 'প্রস্তাবটা দেওয়া রইল। বিবেচনা করে দেখবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আর্মি কি নেভি অফিসার খুঁজুন। তাদের হাতে হ্যান্ডওভার করে দিন।'

গাড়ি চলে গেল। সামনের বাড়ির প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙেছে। তিনি কাশছেন, আর একটু করে সূর্য উঠছে। ওদিকের এক বৈষ্ণব গৃহে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম হচ্ছে। সূর্য উঠছে। পাপের জগৎ, পুণ্যের জগৎ, দু'জগৎকেই উদ্‌ভাসিত করে সূর্য উঠছে। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছে নীপা। বিছানায় তার মেয়ে। সারারাত ঘাসে জলে পড়ে ছিল, খোলা আকাশের তলায়। আমার মনে হয় যাদের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা মরে গেছে বা মরে যাবে ভেবে ফেলে পালিয়েছিল। ভোরের বাতাসে হুঁশ ফিরেছে। ভোর তো ফোটার কাল। ফুলও ফোটে, মেয়েও ফোটে। মেয়েটার মুখটা কী ইনোসেন্ট!

আমি। ডাক্তার দেখি। একবার থরো চেকআপ।

নীপা। ডাক্তার? একজন কিলার দেখো। আজই শেষ করে দাও।

আমি। আমাদের মেয়ে।

নীপা। বিচ।

আমি। আমরা দু'জনে কিন্তু মানুষ ছিলুম।

নীপা। আমাদের রক্তে ভাইরাস আছে।

আমি। তুমি তো তোমার ছেলেকে কিছু বলো না!

নীপা। ও ছেলে।

আমি। আমাদের ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমার নিন্দে বেশি হয়েছিল কেন? আমিও তো ছেলে।

নীপা। সে আমার বাবার জন্যে।

আমি। তিনি লিবার‍্যাল ছিলেন। নট কনজারভেটিভ।

নীপা। তিনি ছিলেন চালুনি তাই ছুঁচের বিচার করতেন না। তাঁর আরও দুটো বউ ছিল। বিয়ে না করা বউ। তাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে চলতেন।

আমি। আমরাও সেইরকম একটা চুক্তি করে চলি না কেন? তোমরা তো কেউ খারাপ হওনি। তোমার বোনেরা তো সকলেই মানুষ হয়েছে।

নীপা। মানুষ হলেও সুখী হয়নি।

আমি। তুমি?

নীপা। আমার সুখ তো দেখছ! এঘরে একটা ওঘরে একটা।

আমি। আমি?

নীপা। তুমি শয়তান। শয়তানরা সদা সুখী।

আমি। আমি শয়তান। তোমাকে মা করে ছেড়ে পালাইনি।

নীপা। পালাতে পারতে না। সেই সময় আমি ছিলাম অজগরের নিশ্বাস। আমার অনেক ছাগলের তুমি একটি।

আমি। শয়তান আর সাপ কিন্তু এক। আজ চোখের সামনে যা দেখছ তা আমাদেরই সৃষ্টি। তোমার উদাসীনতা, আমার কাম, তোমার পাপ আমার দুর্বলতা।

নীপা। আমার রক্তে পাপ নেই।

আমি। তুমি গোয়েলের সঙ্গে শুয়েছ, তুমি তোমার নৃত্যগুরুকে দেহ দিয়েছ, তুমি এক ইম্প্রেশারিয়োর সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়েছ। তোমার বিছানায় অতিথির তালিকা দীর্ঘ।

নীপা। ও তোমার নোংরা মনের সন্দেহ। যে যেমন, জগৎকে সে তেমন দেখে। আমি তোমার গামলায় ইট মারতে চাই না, ছিটকে এসে আমারই গায়ে লাগবে।

আমি। এখন পথ?

নীপা। একটাই। হয় হত্যা না হয় আত্মহত্যা।

জীবনটা একটা দেওয়ালের সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এগোনোও যাবে না পেছোনোও যাবে না। এ যেন 'বার্লিন ওয়াল'। এইবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ো। বসে বসে বসে বসে। সেই ছেলেবেলায় শোনা মাতালের গল্প। আমাদের বাড়ির রাস্তার দিকের রকে শুয়ে শুয়ে, মাঝরাতে এক মাতাল আর এক মাতালকে রাজপুত্রের গল্প শোনাচ্ছে, যাতে যাতে, যাতে, যাতে। দৈহিক মৃত্যুর ঢের আগেই মানুষ মরে যায়। যতদিন কর্ম ততদিন জীবন। মোটরগাড়ি যতদিন চলে, ততদিন তাকে ঝকঝকে করে রাখা। অয়েলিং ক্লিনিং। সার্ভিসিং। যেই ইঞ্জিনের দম ফুরোল, পড়ে রইল খেলা মাঠে। জং ধরে, জং ধরে। খোলটা আছে, তবে রাজপথে নেই, দৌড়পথে নেই, পড়ে আছে একপাশে।

জীবনে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে যায়। একজন বললেন, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, লিভ লাইক এ পাঁকাল মাছ। আপনি মশাই সংসার সংসার করে অত হেদিয়ে মরেন কেন। সব মানুষই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে। নিউটনের ভাগ্য নিয়ে নিউটন, মিল্টনের ভাগ্যে মিল্টন, আর তা না হলে মাল টন। এক টন, দু'টন। আপনার সংসার পেছনে পেছনে শ্মশান পর্যন্ত আসবে। আফটার দ্যাট হোয়াট? মহাশূন্যে পাকসাট। অরুচি হলে মায়েরা কী বলতেন, রুচিকর কিছু খা। আচার, আদা কুচি। জিভের স্বাদ ফিরিয়ে আন। আপনিও জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে আনুন। নিজেকে অ্যানালিসিস করুন। দেখুন মন কী চায়! মনের বায়নাটা কী! এইবার মনকে সেই জিনিসটা দিন। ফুল ফল লতা পাতা, সিনেমা থিয়েটার, যাত্রাগান। সব সময় ঘোড়ার মতো টগবগ করুন। লাইফ একটা ফোর্স। তা না আমার বউ, আমার মেয়ে, আমার ছেলে। ঈশ্বর পাঠাবার সময় নিতম্বে একটি লাথি মেরে বলেছিলেন— গো অ্যান্ড এনজয়।'

পলিটিক্যাল নেতার মতো ভদ্রলোক এমন তেজে ওই সব উপদেশ দিলেন, মনটা চমকে উঠল। আরে ম্যাদামারা পান্তাভাতকে রসাতে পারলেই তো পচাই। পচাইকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারলেই চোলাই। রক্তে ঢুকছে যেন চাবুক। অনেক ভেবে দেখলুম আমার ভালবাসার ভাললাগার

বস্তুটি হল রোমান্স। মাছের মতো সংসারের অগাধ জলে পিঠ ভাসিয়ে চলব। ছেলেকে বসে বসে অঙ্ক করাও, মেয়েকে ইংরেজি পড়াও, আমার ধাতে সহ্য হয় না। নীপাকে স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকো চেম্বারের বাইরে। ওসব আমি পারিনি, পারব না। যার যা লাইন! আমার লাইন আলাদা।

খবর পেয়েছিলুম নীপার পরের বোনটা একটু ঝামেলায় পড়েছে। সংসারে যা হয় আর কী! স্বামীকে পুরোপুরি কবজা করতে পারেনি। যখন বিয়ে হয়েছিল ছেলেটি তখন সামান্য ছিল। এখন অসামান্য। প্রোমোশন পেতে পেতে এখন টপম্যান। আমি যখন ছেলে পড়িয়ে দিন চালাতুম, তখন আমি পনেরো টাকা দামের ফুলপ্যান্ট পরতুম। এখন আমি দু'শো-আড়াইশো টাকা দামের প্যান্ট পরি। স্ট্যান্ডার্ড হাই হয়ে যায় পদমর্যাদা আর রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে। হাই হলে সবই হাই হয়। ভদ্রলোক এখন হাই সোসাইটি ধরে টানাটানি করছেন। দু'বার স্বামী পালটানো এক তুঙ্গী ভদ্রলোককে তৃতীয় হিসেবে জাপটে ধরেছেন। এই পরদাকাঁড়া ফ্রি-মিকসিং-এর যুগে দোষের কিছু নয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি। ধরাধরি, পাকড়াপাকড়ির এইটুকু স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না। তা যদি না যায়, তা হলে 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হল বলিদান'—এ প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কী তার উত্তর!

নীপার ওই নিঃসঙ্গ বোনের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। ব্যথিত, ব্যাকুল প্রাণে কে করিবে সান্ত্বনা দান। পারস্পরিক দান। সে ভাল গান গায়, আমি ভাল শ্রোতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার ক্ল্যাসিক্যাল কান। তাদের ফার্ন রোডের ফ্ল্যাটে যাওয়া আসা শুরু হল। জীবনের মানে খুঁজে পেলুম। একেই বলে পরের জন্যে বাঁচা। কী ছার-স্বার্থ! প্রথম একদিন, দু'দিন তেমন পাত্তা পেলুম না। এ তো আর ঘরে ঢোকা নয়, মনে ঢোকা। কংক্রিটের দেওয়ালে পেরেকের মতো, আস্তে আস্তে, সইয়ে সইয়ে ঢুকতে হবে। ধৈর্য হারালে পরোপকার হয় না।

আমার হাতে অজস্র সময়। নিজের বাড়ি হতাশায় ভরা। রাতের আশ্রয় দিবসের কলহকেন্দ্র। যত সরে থাকা যায় ততই ভাল! আমার অফিসের সেই স্টেনো মহিলা ভাড়া বাঁচাবার জন্যে বাড়িঅলাকে বিয়ে করে বসে আছে। মাসে পাঁচশো টাকা, বছরে ছ'হাজার টাকা নেট সেভিংস। ভালই করেছে। তবে আগের মতো আর নেই। চেহারায় চেকনাই। চোখে চশমা। ডাঁট বেড়েছে। কথায় কথায় বলে চাকরি ছেড়ে দোব। ছুটির পর একটা মিনিট আর ওভার টাইম করতে চায় না। এই মানসিকতার জন্যেই দেশটা পুরোপুরি বিলেত হতে পারছে না। সত্যিই আমরা ইতিহাস বিমুখ জাতি। কত সহজে অতীত ভুলে যাই। আমার সঙ্গে এত রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউসে ঘুরলে, কতদিন আফশোস করলে, আহা আপনার যদি বিয়ে না হত। নিজের বউ সতী-সাবিত্রী হোক, তা বলে পরের বউ কেন হবে! দেশটা এই করেই শুকিয়ে আসছে, প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলতুম। লুকোচুরির একটা আনন্দ নেহ! স্বামী নিয়ে আদিখ্যেতা এ-দেশেই চলে। বিদেশ হলে ছ্যা ছ্যা করত। তবে এটা ঠিক উদ্যোগী পুরুষ বেকার বসে থাকে না। আমি আবার ভাগ্যের চেয়ে পুরুষকারে বেশি বিশ্বাস করি। সামনে একশোটা দরজা, নিরানব্বইটা বন্ধ একটা খোলা। ভাগ্যে একটা খুলবে বলে বসে থাকলে চলবে! একটা একটা করে সব ক'টা ঠেলতে হবে। এই ঠেলাটাই পুরুষকার।

নীপার বোন দীপা। আমি যখন ওদের বাড়িতে যেতুম বিশেষ কথাটথা বলত না। একটু অহংকার ছিল। রূপের অহংকার, গুণের অহংকার। আমার বিশ্বাস রূপটা একটু কম থাকলে গুণটা আরও ফুটত। প্রভা আত্রে কি কিশোরী আমোনকার, কি শোভা গুরটুর মতো প্রথম সারির গাইয়ে হতে পারত। কাটা আমে ভ্যানভ্যানে মাছি, ফোটা ফুলে ভোঁ ভোঁ ভ্রমর তাড়াতে তাড়াতে, গর্ভকোষ সামলাতে সামলাতেই যৌবন যায় যায়। যৌবনই তো সাধনার সময়।

ধরা যাক দেহ একটা দুর্গ। বাইরে অবরোধ। থেকে থেকে শালবল্লা ধরাধরি করে তেড়ে

আসছে হাজার অবরোধকারী সৈন্য। মারছে ধাক্কা শুল-বসানো সিংহ-দরজায়। কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই বুঝি ভেঙে পড়ে। দুর্গঅধিকারী ভেতর থেকে সারাটাক্ষণ ঠেলে আছে। তার তো অন্য কিছু আর করা হবে না। দুর্গ বাঁচাতেই দিন চলে যাবে। সে রাঁধবে কখন, খাবে কখন, নাচবে কখন, গাইবে কখন। দীপা রূপ সামলাতে সামলাতেই দেউলে হয়ে গেল। শেষে যাও বা একটা কুকুর পুষলে, যদ্দিন তার গলায় চামড়ার বেল্ট ছিল, বেশ ছিল, সে এখন সোনার বকলশ পরে অন্য মালিকের ঘরে ন্যাজ নাড়ছে।

একজন বলেছিলেন, 'ফুলের নেশা ধরান। ফুল ফোটানোর যে কী আনন্দ! জমি নেই তা কী হয়েছে! বারান্দায় টবে টবে গাছ লাগান। পরিচর্যা করুন। বড় সাত্ত্বিক আনন্দ।' মানুষের মনই তো ফুল। আমার নিজের বাগান শুকিয়ে গেছে। তা যাক না। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে প্রফুল্লর মতো হাহাকার করব কেন। আমি নতুন বাগান করব। করে দেখাব, আমি ঈশ্বরের ফুলবাগানের 'মালি'।

আধুনিক ইলেকট্রনিক গান শোনার যন্ত্রে বহুবিধ কন্ট্রোল থাকে। এটা ঘোরালে ভল্যুম কমে। ওটা ঘোরালে 'ট্রেবল', 'ব্যস'। সেটা ঘোরালে 'ব্যালেন্স'। মানুষের যদি সেরকম থাকত! দীপার অহংকারের ভল্যুম কন্ট্রোল, দীপার মনের ব্যালেন্স। অদৃশ্য, কোথাও আছে। সেইটা খুঁজে বের করাটাই তো আমার সাধনা।

মাঝে মাঝে নিজে ভেতর থেকে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাই। সেইটা এক সমস্যা। এক আমি আর এক আমিকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দেয়—

এক আমি। কী আছে দীপাতে, যা নেই নীপাতে।

দ্বিতীয় আমি। কী আছে আমেরিকায়, যা নেই অস্ট্রেলিয়ায়।

এক আমি। দেশ আর দেহ সমান?

দ্বিতীয় আমি। সমান। হিমালয়ে আর আলপসে তফাত নেই। ছোটনাগপুরের পাহাড় আর আসামের পাহাড় এক হল!

এক আমি। তোমার অন্য দায়দায়িত্ব আছে।

দ্বিতীয় আমি। কাদের জন্যে?

এক আমি। যাদের তুমি টেনেটুনে পৃথিবীতে এনেছ!

দ্বিতীয় আমি। তারা সব লায়েক দিগগজ। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 'মানি অ্যান্ড মানি।'

এক আমি। জীবনের আদর্শ, উদাহরণ এসবের প্রভাব বা মূল্য নেই?

দ্বিতীয় আমি। সাধুর ছেলে চোর হয় কেন? প্রারব্ধ, সংস্কার। যে যা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে।

এক আমি। তুমি তা হলে কে?

দ্বিতীয় আমি। উপলক্ষ মাত্র। আমি ছুঁয়েছি, ওরা এসেছে। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। খেলার মাঠে গোলপোস্ট দেখেছ? তিনটে কাঠ, পেছনে জাল, মাঝে ফাঁক। তাও আবার মাঝ মাঠে নয়, পড়ে আছে একপাশে। গোলপোস্ট খেলে না। সারা খেলাটাকে খেলায়। সরিয়ে নাও। গোটা খেলাটাই অর্থহীন তামাশা। আমি সংসারের গোলপোস্ট। হিসেব রাখছি, ফরোয়ার্ড লাইনের কে ক'বার ঢোকালে। হায়েস্ট স্কোরার কে। বুঝলে সোনা! আমি সেই নিষ্ক্রিয় ডিসিসিভ ফ্যাক্টর। আমি নৌকোর তালি মারা পাল। বাতাসটুকু ধরি।

এক আমি। বাতাসেরও তো কু সু আছে। ঠাকুর বলেছেন। গানও শুনেছ কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।

দ্বিতীয় আমি। ও সব বাতাস মাতাস আমাকে শেখাতে এসো না। সুবাতাস এখন শিশিতে। পালে ধরতে গেলে পাল চুপসে ওই ঘাটেই পড়ে থাকবে। নৌকো আর নড়বে না। হাবুডুবু? হাবুডুবু আর

নাকানিচোবানি খাবার জন্যেই তো আসা। সাধু, শয়তান, শেষটা সেই এক। তিনটে খাবি। ধনপতিরও এক পথ, কানাপতিরও একপথ। 'অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী, কন্দর্প সমান রূপের অধিকারী, সজ্জন তস্কর গৃহী বনচারী, রাজা ও ভিখারী, সমানভাবে হোতা সকলে শয়ান। ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান।' শোনো প্রথম আমি, তোমাকে হোরেস ওয়ালপোল শোনাই।—This world is a comedy to those that think, and a tragedy to those that feel. তুমি যাও। গেট আউট। তোমার ভাগবত, পুরাণ নিয়ে সরে পড়ো। পাঁচ হাজার বছর ধরে, গীতা, উপনিষদ পড়ে একটি মাত্র শিক্ষা হয়েছে, আই অ্যাম আপ. আমি হই উপরে, আই গো ডাউন, আমি যাই নীচে। গেট আউট। তোমার সারমনে আমার প্রয়োজন নেই।

For want of me the world course will not fail,
When all its work is done, the lie shall not,
The truth is great, and shall prevail
When none cares whether it prevail or not

মানুষ হল অহংকারের গাছ। সার বা প্রাণ-রস হল তোষামোদ বা ফ্ল্যাটারি। দীপার ভেতরে শিল্পী হবার অ্যামবিশন ছিল। আসরে আসরে গান গেয়ে বেড়াবে। দু'পাশে দু'জন তম্বুরা নিয়ে বসবে। মাঝ রাতের দর্শক ঘুমঘুম চোখে তালি বাজাবে। এতকাল কেউ তাকে ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করেনি। দেহ ভোগে ছিল, সে তো মসৃণ চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। মন ছিল উপবাসী। শয়তানদের কায়দাই হল বিষাক্ত মনকে আরও বিষিয়ে তোলা। দীপার বিপথগামী স্বামীর একটা কালো ছবি দীপার সামনে একটু একটু করে ফুটিয়ে তুললুম। মোহটা তো কাটাতে হবে। একটা বাজে, থার্ডক্লাস, চরিত্রহীন লোক, লোভনীয় এক মহিলার মনে আসন জুড়ে বসে থাকবে, ঘোড়ার খাবার ডাব্বায় কুকুরের মতো, নিজেও খাবে না, ঘোড়াকেও খেতে দেবে না, তা তো হয় না। এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ। মন থেকে লোকটাকে সবার আগে শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলে দিতে হবে। টবে গাছ করার টেকনিক। একটাকে তুলে ফেলে মাটিতে সারটার দিয়ে রোদ খাইয়ে নতুন চারা বসাও, লকলকিয়ে বেড়ে উঠবে।

আমার এক বন্ধু খুব ধ্যানটান করে। ঈশ্বরকে সে ধরবেই। তা সে আমাকে তার সাধনার কথা মাঝে মাঝে বলে। ভাবে আমিও এক সাধক। আমি সবসময় চোখটাকে ঢুলুঢুলু করে রাখি। ছাত্রজীবনে পড়া ফাঁকি দেবার কায়দা। রোগের প্রকাশ লক্ষণটা আগে জেনে নাও, তারপর সেই লক্ষণ ফুটিয়ে তোলো একে একে। জ্বর হলে গা গরম হবে। বগলে রসুন। মাথার যন্ত্রণা। গা বমিবমি। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। সাধনার লক্ষণ জানা থাকলে সাধক হতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। ঢুলু ঢুলু চোখ। ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি। ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা। চালচলনে একটা ভেসে ভেসে যাবার ভঙ্গি। 'সখি ধরো ধরো/মালা পরো পরো' ভাব।

মানুষের কাছ থেকে মানুষ কত কী শিখতে পারে। এক শিক্ষা আর এক শিক্ষায় অন্যভাবে লেগে যায়। ধ্যানের কায়দা হল, স্থির হয়ে বোসো। চোখ বুজোও। ভাবনা। ভাবনার পর ভাবনা। আসতে দাও। এইবার একটাকে অনুসরণ করো। চলো তার পেছন পেছন। ধরা যাক ভাবনায় দীপা এসেছে। চুলে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোল। 'বসুন' বলে ওপাশে গেল। দুটো পা। খোলা হাত। যোগিনীর মতো করে পরা শাড়ি। চুল থেকে তোয়ালে খুলছে। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দু'হাত তুলে চুল ঝাড়ছে। মারো লাথি। দীপাকে নয়। দীপার চিন্তাকে। চিন্তার বল চলে গেল মনের মাঠের বাইরে। মন ফাঁকা। এই শূন্যতা হয়তো কয়েক সেকেন্ডের। এইবার হয়তো নীপা আসবে। আসুক। এই শূন্যতার সময়টাকে বাড়াতে পারলেই, মার দিয়া কেল্লা। ঈশ্বরকে দেখা যাবে। দেখা যাবে অলৌকিক দৃশ্য। দীপার মনকে প্রথমে খালি করতে হবে। তার মন যখন হাহা করবে, তখনই হবে আমার প্রবেশ।

দীপা কেন, কোনও মেয়েই এখন আর আমার প্রেমে পড়বে না। আজে বাজে কথা বলে মন ভেজাবার ধৈর্য গেছে। ফাইফরমাশ খাটার মুরোদ গেছে। ছোট মতো একটা ভুঁড়ি হয়েছে। দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা নেই। কাটগ্লাসে লাল মদের মতো মনের আর সে ঝিলিক নেই। খেলা নষ্ট হয়ে গেলে খেলোয়াড়কে কে চায়!

প্রথম মন। তা হলে নেচে নেচে মরছ কেন?

দ্বিতীয় মন। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

প্রথম মন। নিজের সংসার নিয়ে থাকো।

দ্বিতীয় মন। কেউ একই জামা দিনের পর দিন পরে! একই ব্র্যান্ডের সাবান বছরের পর বছর মাখে! চেঞ্জ ইজ লাইফ। এক রাজার কতটা রাজত্ব লাগে! অকারণে যুদ্ধ করে মরে কেন? জয় করার আলাদা একটা আনন্দ আছে। বলং বলং বাহুবলং।

প্রথম মন। নিজের মন জয় করো।

দ্বিতীয় মন। কারুর বাপের ক্ষমতা আছে মন জয় করে! মনই আমাদের জয় করে। মন ছুটছে বলেই জগৎ ছুটছে।

সংসারে পুরুষের প্রয়োজন আছে। স্বামী তো বিনা মাইনের চাকর। দীপাব ফাইফবমাশ খাটার জন্যেও তো একজন লোক চাই। আমি আর আমার গাড়িটা তার সার্ভিসে লেগে গেল। গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল, প্লাম্বার ধরে আনা। কাঠের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি। তিন ঘণ্টা বসে থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনা। দীপার একটি মাত্র ছেলে বাইরে বোর্ডিং-এ থাকে। তাকে টাকা, এটা ওটা পাঠানো। অফিস কেটে দুপুরে দীপার বাড়িতে আসতে বেশ ভাল লাগত। রাধা অত কাণ্ড করে কেন রাতে অভিসারে যেতেন নিজের মন দেখে বুঝেছিলুম। পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল কাজ আর কিছু নেই। বিল্বমঙ্গল সেই কারণে অমব।

সাবা পাড়া নিস্তব্ধ। সবাই অফিসে। দোকানপাট বন্ধ। রোদে চারপাশ খাঁ খাঁ কবছে। আমার চকোলেট গাড়ি ঢুকছে। দু'-একটা জানলায় পরদার আড়ালে কৌতূহলী চোখ। কোনও কোনও ঝুল-বারান্দায় ঢিলঢিলে ম্যাক্সি পরা আদুরে মেয়ে। কোনও কোনও বাড়ির ছায়ায়, দেওয়াল ঘেঁষে ঝিয়েদের প্রাণের কথা। আমার চকোলেট গাড়ি এগোচ্ছে। যতটা সম্ভব যুবক সেজে। বিলিতি গন্ধটন্ধ মেখে আমি পেছনের আসনে। আমার পাশে সুদৃশ্য বাক্সে পার্ক স্ট্রিটের প্যাস্ট্রি একটা খাব খাব গন্ধ ছড়াচ্ছে। পেছনে শাড়ির প্যাকেট। আমাব চকোলেট গাড়ি এগোচ্ছে। পাপ করতে যাবার আলাদা একটা স্বাদ আছে যা পুণ্যের পায়েসে নেই। পাপ হল বিরিয়ানি, মুর্গমসল্লম। ওই জন্যেই পাপের জগতের পপুলেশন এত বেশি। ভগবানের চেয়ে শয়তান এত পাওয়ারফুল। শয়তানেব কোনও পাবলিসিটি নেই। বেদ নেই, পুরাণ নেই, গীতা নেই, ভাগবত নেই। শয়তানের দুটো 'ম' আছে। সেই দুটো মকে সামলাবার জন্যে, ত্রিশূল, ধুনি, জটা, কৌপীন, পঞ্চতপা, কায়কল্প, গুহা, প্রয়াগ, কুম্ভ। একেবারে সাজোসাজো রব। দুটো ম। ম এ একটা সামান্য আকার, সেই আকারটিকে লাগাবার জন্যে এত হাহাকার। কেউ প্রায় লাগিয়ে ফেলেছে, ম প্রায় মা হয় আর কী, এমন সময় সব হড়কে গেল। জীবনের সিংহভাগ ব্যাচেলর থেকে বুড়ো বিয়ে করে বসল এক বুড়িকে। 'বড় লোনলি ফিল করছিলুম ভাই।' দিন কতক কলপটলপ লাগিয়ে, আমার মিসেস, আমার মিসেস করে খুব আদিখ্যেতা। ঠোঁটে বাঁকা সিগারেট, বাজারে গিয়ে মাছওয়ালাকে শোনান, 'আর কী, আর কাটা পোনা নয়, তোলো পারশে, লাগাও ট্যাংরা, বেটার হাফ এসে গেছেন। বুঝলে মদন, এতদিন মরে ছিলুম। রান্নার যা হাত না!' উত্তেজনায় মদনকেই নেমন্তন্ন করে বসল, 'এসো না একদিন খেয়ে যাবে, কালিয়া পোলাও নয়, স্রেফ চুনো মাছের বাটিচচ্চড়ি, ঝিঙে পোস্ত, সরষে করলা।' ছুটল বন্ধু ডাক্তারের কাছে, 'হরমোন মরমোন ফোঁড়ো দেখি। একটু স্ট্রেংথ চাই।'

ভাগ্যিস শয়তান ছিল, তা না হলে ভগবানের রাজত্ব তো লাটে উঠত। জটাজুটধারী কিছু চরিত্র,

উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ, জবাফুলের মতো চোখ। কিছু জিজ্ঞেস করলেই গাল ফুলিয়ে হয় বোম না হয় ওম। কেউ মড়ার মাথা নিয়ে নাচছেন, কেউ চিমটে বাজাচ্ছেন, কেউ নিম্নাঙ্গে শিকল ঝোলাচ্ছেন, কেউ সারাদিন শুধু সাঁ সাঁ করে শ্বাস টানছেন। জাগো কুণ্ডলিনী, জাগো কুণ্ডলিনী করতে করতে চোখ কপালে। শেষ। তিনি শেষ, তাঁর জেনারেশন শেষ। পড়ে রইল চিমটে, কমণ্ডুল, রুদ্রাক্ষের মালা, এক জোড়া কাষ্ঠ পাদুকা।

শয়তান অনেক সহজ সরল। তার লাখ লাখ টাকার মন্দির লাগে না। চার্চের প্রয়োজন হয় না। মন মন ঘি, গ্যালন গ্যালন দুধ দরকার হয় না। তার মাথায় টন টন ফুল চড়াতে হয় না। পটাপট পাতা ছিঁড়ে গোটা একটা বেলগাছকে ন্যাড়া করতে হয় না। তার ভজনার জন্যে মাথাটিকে কামিয়ে বেল করতে হয় না। গলায় লক্ষ গন্ডা মালা ঝুলিয়ে, ভারে কুঁজো হয়ে বাবা রে মা রে করতে হয় না। শয়তান খুব সিম্পল। ঈশ্বরের মতো কমপ্লিকেটেড নয়। একটা গাছ, একটু ছায়া, ঘাসে ঢাকা এক ফালি জমি, একটি নারী, একটি পুরুষ। একটি নির্জন ছাত, একটু চাঁদের আলো, একটা জলের ট্যাঙ্কের সামান্য আড়াল, অথবা একটি চিলেকোঠা, একটি নারী একটি পুরুষ। শয়তান এইসব সামান্য উপাদান দিয়ে কী সব বড় বড় কাজ করে ফেলে ভাবা যায় না। দর্শন তো শয়তানের। ভগবানের নাকি! নাকানি চোবানি খাবার পরই মানুষের চিন্তা খোলে— তখন ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ পড়ে। প্রশ্ন আসে—কে খেলায় আমি খেলি বা কেন। 'ওগো আমার গাঁটে গাঁটে ব্যথা গো' বলে বুড়ি যখন ককিয়ে ওঠে তখন হটব্যাগে জল ভরতে ভরতে বুড়ো ভাবে, কোথায় আমার সেই চাঁদিনি রাত। ঝাউয়ের শনশন, সমুদ্রের ঢেউ। গেম ইজ নট ওয়ার্থ দি ক্যান্ডল। আর বুড়ো যখন মশারির ভেতর বসে হাঁপানির শ্বাস টানে আর বুড়ি তার বুক চেপে ধরে রাত জাগে তখন ভাবে, এ আবার কী ফুলশয্যা। তখনই ঈশ্বরকে মনে পড়ে। 'ঠাকুর এই কষ্টের চেয়ে আমাকে বিধবা করো।'

আমার চকোলেট গাড়ি অভিসারে চলেছে। পুড়ছে কোম্পানির তেল। আমি মনে মনে প্যাকেটের শাড়িটার কথা ভাবছি। খাঁটি সিল্ক। সারা গায়ে নীল আর হালকা নীলের ডিজাইন। দীপার ফরসা শরীর যখন ওই মোড়কে ঢুকবে আমার তখন মরে যাবার মতো অবস্থা হবে। দীপা হল ফুলদানি, আর নীপা হল পূর্ণকুম্ভ। দীপা নীপার চেয়ে উচ্চতায় সামান্য খাটো, কিন্তু নরম তুলতুলে। নীপা স্বভাবে মুরগি। খরখর খরখর করে বেড়ায়। ডানা ঝাপটায়। দীপা হল রাজহংসী। একটা গানের লাইন মনে পড়ছে, তারা তুমি কত রূপ জানো ধরিতে। ওইটাকেই ঘুরিয়ে নিই, নারী তুমি কত রূপ জানো ধরিতে। নীপার শাড়ি নীপা নিজেই কেনে। আমার নাকি পছন্দ নেই। বহুকাল পরে একটা শাড়ি কিনলুম। কিনতে কিনতেই রোমান্টিক হয়ে উঠছিলুম। কলকাতার চড়া রোদ চাঁদের আলো হয়ে গেল। চারপাশের প্যাঁ পোঁ যেন বেঠোভেনের কনসার্ট। সত্যিই তাই, মনেই মথুরা।

দীপাদের বাড়িটা কী ঠান্ডা। কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। দীপা স্বভাবে নীপার উলটো। গোছানে। বাড়িটাকে একেবারে ছবির মতো করে রেখেছে। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল ওদের কাজের মেয়েছেলেটি। ওকে দেখলেই আমার সেই মহিলাকে মনে পড়ে, যার আশ্রয়ে আমার মাসখানেক বস্তিবাস হয়েছিল। অবিকল সেইরকম দেখতে। ঘুসঘাস দিয়ে একে আমি হাত করে ফেলেছি। বেশ পটে গেছে। রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। দরজা খুলেই, দু'হাত মাথার ওপর তুলে উঁউঁ করে আড়ামোড়া ভেঙে, দরজার একটা পাল্লায় এলিয়ে পড়ে হাই তুলল। একটা চোখ সামান্য বুজে শরীরের এমন একটা ভঙ্গি করল যেন আমি তেল পুড়িয়ে ওর জন্যেই এসেছি। অদ্ভুত একটা হাসি মুখে। আজও ওর জন্যে ঘুস আছে। লোভীকে আরও লোভী করে তুলতে পারলে হাতের মুঠোয় এসে যায়।

পাশ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ও ইচ্ছে করেই বেশি জায়গা ছাড়ল না। যাতে ওকে ঠেলেই ঢুকতে হয়। দরজাটা বন্ধ করে দিল। দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেছে। আজকে যেন বেশি আদুরে। এমন একটা

ভাব করছে, ও যেন আমার সদ্য বিয়ে-করা বউ। খারাপ অবশ্য লাগছে না। ওর হাব ভাব আমার যে জায়গায় নাড়া দিচ্ছে, সেখানে রুটি লুচি, মানে রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এসবের কোনও প্রভাব নেই। সে একটা অদ্ভুত ওপন ল্যান্ড, নো ম্যানস ল্যান্ড। বড় ঝামেলার জায়গা। পাপের জন্মভূমি।

Blood hound in front of my heart
'Watching over my fire
You that feed on bitter Kidneys
In the Suburb of my misery

দরজাটা বন্ধ হতেই ঢোকার মুখটা অন্ধকারমতো হয়ে গেল। এক দেওয়ালে একটা মুখোশ আর এক দেওয়ালে একটা ঘোড়ার ছবি। ছবিটা যেদিকে সেদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমের আলস্য কাটেনি। দুপুরে চান করেছিল। পিঠের দিকে ছড়িয়ে আছে ফুরফুরে চুল। এর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দীপাও ঘুমোচ্ছে। পাখা ঘোরার শনশন আওয়াজ।

মেয়েটি আবার হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। এত হাই উঠছে কেন? পিঠের দিক থেকে একগুছি চুল সামনে এনে দু'আঙুলে ইলিবিলি করতে করতে বললে, 'তুমি বলেছিলে, এই দ্যাখো আজ শ্যাম্পু করেছি। কী সুন্দর গন্ধ! একেবারে হালকা, ফুরফুরে।'

আমার নাকটাকে তার চুলের কাছে নিয়ে গিয়ে, সন্তুষ্ট করার জন্যে, আ করে শব্দ করলুম।

সে বললে, 'এই দ্যাখো, তুমি বলেছিলে, ফরসা জামাকাপড়। সব ফরসা।'

কোথা থেকে যে এত খাটো ব্লাউজ জোগাড় করে। শরীরের সঙ্গে একেবারে সেঁটে আছে। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পা দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে সব এলোমেলো করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একেই বলে মহাপাপ। এর সাহস দেখে মনে হচ্ছে, দীপা গভীর ঘুমে। দীপা ঘুমকাতুরে, নীপা ইনসমনিয়ার রুগি। আমারও একটা হাই উঠল। আড়ামোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করল। ভাবছি, এলুম কার কাছে পড়ে গেলুম কার হাতে। এদের বয়েস বোঝা যায় না। মানুষের লালসার কারবাইডে কাঁচাতেই পেকে বসে থাকে। তবে কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যেই আছে। এ বাড়ির আদরে আর ভোগে দেহত্বকে চেকনাই। চোখ দুটো একটু ছোট-ছোট হলেও ছুঁচের মতো দৃষ্টি। তুলসীদাসজি ঠিকই বলেছিলেন— লালচ বুড়ি বলাই।

মেয়েটি ওই অবস্থায় হাঁটু নাচাচ্ছে। ভরাট শরীরে ঢেউ খেলছে। সে বললে, 'এই দ্যাখো, ভেতরের জামাও পরিষ্কার।'

আমাকে নাচাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি খুব শিক্ষিত হাতে আমাকে খেলাচ্ছে।

Blood hound in front of my heart
With the wet flame of your tongue lick
The Salt of my Sweat
The Sugar of my death.

যে পাপ করব না ভেবেছিলুম। ছবিতে 'প্র্যানসিং হর্স', পেছনে মুখোশ। মেয়েটি আদুরে গলায় বললে, 'কী হচ্ছে কী ছাড়ো। তোমার আর কী! তুমি তো আর শেষ পর্যন্ত যাবে না।'

কোথাও আমি শেষ পর্যন্ত যাই না। আমার স্বভাবে নেই। আমি শুরু করি শেষ করি না। কোনও কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই। চাকরিটা ভালই ধরলুম। অনেক দূর যাওয়া যেত। 'ধ্যার' বলে যেখানে ধরেছিলুম সেইখানেই রয়ে গেলুম। কী হবে ওপরে উঠে! কয়েক শো টাকা মাইনে বাড়বে, দায়িত্ব বেড়ে যাবে হাজার গুণ। সংসার করার জন্যে চোখা একটা মেয়ে ধরলুম। সে বাঁধনও শিথিল হয়ে গেল। ভাল খেলতে পারলুম না। ড্রিবলিং জানি না, ডজিং জানি না, ভুল পাস। গোলে বল মারি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সবেতেই অদ্ভুত একটা আলস্য। 'যা হয় হবে,' এইরকম একটা ভাব।

মেয়েটি বললে, 'মনে করো আমি হেমা মালিনী, তুমি ধর্মেন্দ্র।'

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'দীপা কোথায়?'

মেয়েটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে হাতের ওপর শুইয়ে ও-ঘরে নিয়ে যেতে পারবে!'

'দীপা কোথায়?'

'তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। দেখবে আমার ক্ষমতা!'

আমি বাধা দেবার আগেই ঝট করে আমাকে মেঝে থেকে তুলে নিল। তার আঁচলে আমার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। দীপার শোবার ঘরের দিকে এগোচ্ছে। ভয়ে আমার সব কুঁকড়ে গেছে। এ কি পাগলামি। এ কি কোনও ফাঁদ!

'দীপা কোথায়!'

'তুমি খুব একটা ভারী নও।'

'আরে দীপা কোথায়!'

পরদা ঠেলে দীপার ঘরে ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলা হলে ওই অবস্থায় হাত-পা ছুড়তুম। এখন তো মনে হচ্ছে আমার হাত-পা নেই। শুধু হৃদয়টা আছে। ধড়াক ধড়াক করে লাফাচ্ছে। গোয়েলের সঙ্গে প্রথম যেদিন ওই পাড়ায় গিয়েছিলুম তখনও আমার ভেতরটা এইরকম ব্যাঙের মতো লাফাচ্ছিল। ঘরের বিছানায় দীপা আছে ভেবে ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। আবার আমার সেই ভাব, যা হয় হবে। শনশন পাখা ঘুরছে। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার খ্যাচ-খ্যাচ করছে। মেয়েটার গায়ে কী শক্তি। আমি যেন শোলার পুতুল। ফোমের বিছানার ওপর ঝপাত করে ফেলে দিল। আমার শরীর নাচতে লাগল। ভেবেছিলুম ঘুমন্ত দীপার ঘাড়ে ফেলছে। বিছানা ফাঁকা। আর কিছু বোঝার আগে মেয়েটা আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ অন্ধকার। এক রাশ চুল, শক্ত ঘাড়, নরম বুক, গভীর নিশ্বাস।

'দীপা কোথায়?'

'দীপা-দীপা কোরো না। আমিই দীপা। চিনতে পারছ না আমাকে! এই বাড়ি আমার, এই বিছানা আমার।'

এইবার আমি বললুম, 'কী হচ্ছে কী! দীপা।'

'তোমার দীপা সিনেমা দেখতে গেছে। আজ দেখব তোমার কেমন ক্ষমতা!'

'তুমি জর্দা খেয়েছ?'

মেয়েটা আমার নাকের কাছে হা করল। যেই অমন করল, আমার নেতিয়ে-পড়া ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। মনে হল, যা হয় হবে! খিলখিল হাসি। বিছানার চাদর লন্ডভন্ড। বালিশ-টালিশ সব ছিটকে মেঝেতে। আমি অসহায়। আমাকে ধরেছে। পাখা চলছে, তবু কী গরম। সব খেলাতেই হেরেছি। এ খেলাতেও হারব। আমাকে শেষ করে দিলে। এক লাথি। গড়িয়ে মেঝেতে।

'ঢেঁকি।'

খাটে শুয়ে আছে। ঝুলছে ঘাম চকচকে মুখ। কী সাহস, দীপার বিছানায় শুয়ে আছে। দীপাও বোধহয় এমন সম্রাজ্ঞীর মতো শোয় না। আঙুল নেড়ে আদেশের সুরে বললে, 'উঠে এসো।' আমার কুকুর ন্যাজ নাড়ল। যার ভেতরটা যত কুকুর সে তত সুখী। প্রভুরা কুকুর ভালবাসে। তিনি চাকরিদাতা হতে পারেন। প্রেমিকা হতে পারে। স্ত্রী হতে পারে। এমনকী বৃদ্ধের রোজগারি সন্তান হতে পারে।

'তুমি আগে কোনওদিন এই বিছানায় শুয়েছ!'

'কতবার।'

'তোমার এখানে দাগ? পেট চিরেছিল?'

'ছেলে।'

'কোথায়?'

'যমের বাড়ি।'

'এই বিছানায় শুতে ভয় করে না?'

'ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে।'

'কে?'

'এ-বাড়ির বাবু।'

মেয়েটা ফুলে-ফুলে হাসছে। হাসতে হাসতে মাতালের গলায় বললে, 'সব শালা শয়তান।'

'তাই নাকি?'

'তুমি কী? তোমার তো বউ আছে, শালির পেছনে ঘুরছ কেন? তিনটে তো পেছনে পেছনে ঘুরছে কুত্তার মতো। তুমি হলে চার।'

আমার চকোলেট রঙের গাড়ি পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সন্ধে। পার্কে বাচ্চারা খেলছে। আয়ারা প্যারাম্বুলেটার ঠেলছে। এরা বড় হবে। বড় হয়ে কুকুর হবে। কর্মদাতার। স্ত্রীর। মেয়েছেলের। প্রবৃত্তির। পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত হল মৃত্যু। হঠাৎ বুকটা ছাঁত করে উঠল। সর্বনাশ! আমার পইতেটা দীপার বিছানায় মাথার বালিশের পাশে খোলা পড়ে আছে। পরতে ভুলে গেছি।

আমি। নিশ্চয় ও তুলবে।

সংশয়। যদি না তোলে।

আমি। বিছানা গোছগাছ করবে না!

সংশয়। ওপর-ওপর করবে। যদি 'মিস' করে!

আমি। আবার গাড়ি ঘোরাব!

সংশয়। এতক্ষণে ফিরে এসেছে দীপা।

আমি। তা হলে যা হয় হবে।

আমার চকোলেট রঙের গাড়ি, সন্ধের রাজপথ ধরে ছুটছে। জীবনটাকে নিজের দোষে কী করে ফেললুম! সুস্থ জীবন থেকে কত দূরে সরে এসেছি। ছেলে, মেয়ে বাবা বলে না, বেশ করে। আমি হলে এমন বাবাকে আমিও বাবা বলতুম না। 'দেখাই যাক না কী হয়'—এই যে আমার ভাবটা, এই ভাবটাই আমার সর্বনাশের কারণ।

আজকাল নীপা আমার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকালেই ভয় করে। আমার ভেতরটা দেখে ফেলছে না তো! আমার শরীরটা কাচ হয়ে যায়নি তো! সে রাতে দুটো চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুললে, দীপার বিছানা থেকে আমার লাশ বেরোয়নি তো! পইতে। শুয়ে সবে বালিশটা সরিয়েছি। এটা কী? হ্যাঁরে এটা কী!

জানি না তো দিদিমণি।

পইতে! কার পইতে! কোথা থেকে এল পইতে।

তিনজন ঘুরছে। কে কে! সব ফলই কি কাকে ঠোকরাবে! একটা জায়গাও ফাঁকা থাকবে না! প্রতিদ্বন্দ্বিতা এইভাবে বাড়লে বাঁচা যায়। বাতাসা আর পিঁপড়ে!

চোখ বোজালেই একটা দেহ ভেসে উঠছে। তলপেটে লম্বা একটা কাটার দাগ। ছেলে। ছেলে কোথায়! যমের বাড়ি। দীপার ছেলে? দূরে মানুষ হচ্ছে। তিনটে নেকড়ে থাবা গেড়ে বসে আছে। সকলের সামনেই একটা করে ব্লাড হাউন্ড। নীপার গায়ে হাত রাখলুম। আজ খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। নীপা হাতটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'সংযত হবার বয়স হয়েছে। অভ্যাসের দাস নাই বা হলে!' এই হয়। গোয়ালে যার শুকনো গোরু তার ভরসা ডেয়ারি। সাধে মানুষ বাইরে ছোটে! এই তো আমার পাপের সমর্থনে যুক্তি পেয়েছি। নীপা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না গেলে, সে যদি আগের

মতো দাতা থাকত তা হলে আমাকে আর এইভাবে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এর ওর দ্বারে ঘুরতে হত না।

ইস, পইতেটা গলা থেকে খুলে চলে গেল! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন। পইতের সময় কত ঘটা হয়েছিল। আমার সেই ব্রহ্মচারীর বেশ দেখে তখন গুরুজনরা বলেছিলেন, 'আঃ, কী রূপ খুলেছে! এ মনে হয় সন্ন্যাসী হবার জন্যেই জন্মেছে। নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকটা ছেড়ো না। এই যে ধরলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেয়ো।' সন্ধ্যাহ্নিক! পইতেটা খুলে জড়িয়ে রয়ে গেল একটা অসভ্য মেয়েছেলের গোদাপায়ে।

আমি। অ, এখন হয়ে গেল অসভ্য। তখন তো ওই গোদাপায়ে গড় করছিলে।

দ্বিতীয় আমি। ন্যাবায় মানুষ সব হলুদ দেখে। বন্যায় খাল বিল ডোবা সব এক হয়ে যায়। কে খাল, কে ডোবা, কে পদ্মপুকুর বোঝা যায় না।

সারাটা রাত, এইভাবে কেটে গেল। একটু তন্দ্রা, তালগোল পাকানো চিন্তা, বিশ্রী স্বপ্ন। ভোরের দিকে মনে হল, নাঃ যেভাবেই হোক, এই তিন-চার রকমের জীবন ছেড়ে একরকম জীবন যাপন করতে হবে! নিজেকে নিয়ে নির্জনে বসে বিচার করতে হবে। যেই মনে হচ্ছে, সব মায়া, জগৎ মায়া, স্ত্রী মায়া, পুত্র-কন্যা মায়া, মন ধর্মের দিকে, ত্যাগের দিকে না ছুটে, ছুটছে ভোগের দিকে, অধর্মের দিকে। এই বাড়ির মেঝে-টেঝে যে মিস্ত্রি করেছিল, সেই মিস্ত্রিই মনে হয় আমার মন তৈরি করেছিল, তা না হলে এমন চালের গোলমাল হয়! জল চলেছে নর্দমার উলটো দিকে। জ্ঞানের ঝেঁটা চালাতে হবে।

শিষ্য। সংসারে সার বস্তু কী?

গুরু। সব রকম বিচার করে দেখা গেল, সার বস্তু, তত্ত্বজ্ঞান। নিজের আর পরের ভাল যে করে সে-ই সারপদার্থ নিয়ে জন্মেছে।

তা হলে আমি দীপার ভাল করার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগব। পারলে ওই মেয়েটারও ভাল করব। আহা, বেচারার যৌবন কি এইভাবেই খোলা পাত্রে দুধের মতো শুকিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে গুরু। ওর স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন তৈরির মালমশলা আছে। স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম।

নীপা, নিজের পুত্রকন্যা এদের হিত করব না?

না, ওরা আবার পর হল কবে? ও তো তোমার সংসার। নিজের সংসার না ভাসালে পরের উপকার হয়! ইতিহাস ভুলো না।

উপকার মানে, লোভ দেখিয়ে নিজের ভোগে আনা?

তা কেন? ওদেরও জ্ঞানোদয়ের চেষ্টা করা। জ্ঞান এলেই কর্তব্যের বোধ আসবে। কর্তব্য কী? যে কাজ করলে সংসারপাশ ছিন্ন হয়। নিজের সংসারপাশ প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছে। এইবার একটা হ্যাঁচকা টানের অপেক্ষা। দীপারও ছিন্ন হয়ে এসেছে। ওদিকেও এক হ্যাঁচকা। তারপর এই যে, এই প্রশ্নোত্তর।

শিষ্য: মদিরের মোহজনকঃ কঃ? মদিরার ন্যায় মোহ উৎপাদন করে কোন বস্তু?

গুরু: স্নেহ। স্নেহের বশীভূত হয়ে পুত্র-কলত্রাদির ভরণপোষণের জন্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। একেই বলে স্নেহমদিরায় বিমোহিত হওয়া।

শিষ্য. নরক কাকে বলে। কো নরকঃ?

গুরু: পরাধীনতাই নরক।

আমি নীপার অধীন নই, স্ত্রী পুত্র, সংসার কারুর অধীন নই আর স্নেহমদিরার বশীভূত নই। আমি স্বর্গীয় পুরুষ। দেবদূত। আমি ওদেরও দলে টেনে দেব-দেবী নৃত্য শুরু করে দোব। দেখিয়ে দোব, সংসারে জ্ঞানীদের কীভাবে বাঁচা উচিত।

শিষ্য: অহর্নিশ কী চিন্তা করব? অহর্নিশমনুচিন্ত্যা?

গুরু: সংসারাসারতা ন তু প্রমদা। সব সময় ভাববে সংসার অসার। অসার এই সংসার; কিন্তু নারীচিন্তা করবে না।

শিষ্য: অ্যাঁ। তা হলে সংসারে আর রইল কী? গুরুদেব এখন তবে থাক। আবার পরে হবে।

না না, গুরু যখন হয়েছে আর একটু শুনে যাও। প্রকৃত বীর কে বলো তো? রমণীর নয়নবাণে যে জর্জরিত হয় না। আর সংসারে দুর্বোধ্য কী? কিংগহনং? স্ত্রী চরিতং।

মাঝে মাঝেই নীপা বলত, টাকা পয়সা চুরি হচ্ছে। যেখানেই রাখছে, সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। মেয়ে আর ছেলে দু'জনকেই সন্দেহ। আমাকে সন্দেহ করে না। অবশ্য অনেক স্বামীই স্ত্রীর পয়সা সরায়। খুব দায়ে না পড়লে সরায় না। আমি বলেছিলুম, মেয়েকে সন্দেহ কোরো না। মেয়েরা ছেলেদের পয়সায় ওড়ে। দেখো, এই মেয়ের জন্যে কোন বাড়িতে, কোন ছেলে তবিল ফাঁক করছে। সন্দেহ করতে হলে ছেলেকে করো। সে এখন ক'টা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কে জানে?

হঠাৎ নীপা আবিষ্কার করল শুধু পয়সা নয় তার কিছু কিছু গয়নাও হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আর এই সব অশান্তি ভাল লাগে না। গেছে যাক না। সাবধানে না রাখলেই যাবে। দেখছে সংসার বলে আর আমাদের কিছু নেই। এটা একটা সরাইখানা। মেহেমানদের রাতের আশ্রয়স্থল। এক-এক জন, এক-এক ঘরের অধিবাসী। একটা কমন সার্ভিস চালু আছে মাত্র। তাই উনুনে আগুন পড়ে। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ ওঠে। খবরের কাগজ আসে। ধোপা এসে জামাকাপড় নিয়ে যায়। সংসার বলে কিছু নেই।

একটা হার। হারটা পরশুও ছিল, আজ নেই। কেন নেই, কে নিলে?

পেছন থেকে নীপার খোলা কাঁধে হাত রাখলুম। ঠান্ডা। মসৃণ। এখনও তেমন বুড়ি হয়নি। শেষ বেলার পশ্চিম আকাশ। সূর্য নেমে গেছে। আকাশের মুখে শেষ চুম্বনের রক্তিমাভাস। চুল কেটে না ফেললে ঘাড়টা আরও সুন্দর দেখাত। নীপা সব সময় ভাল ভাল শাড়ি পরে থাকে। দীপার উলটো। দীপা সব ব্যাপারেই বেশ কৃপণ।

নীপা বললে, 'আর না, আজ আমি দুটোকেই শেষ করব। আজ আমার একদিন, কি ওদের একদিন।'

নীপা বসে ছিল। মাথার ওপর দিয়ে ঝুঁকে, ওর কপাল, ভুরু, নাক দেখতে দেখতে আমি বললুম, 'তোমার শরীর ভাল না, কেন উত্তেজিত হচ্ছ।'

'পরব বলে লকার থেকে বের করে আনলুম। হারটা ডানা মেলে উড়ে যাবে'—'দ্যাখো, তোমার তো ভুলো মন, কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছ।'

'গয়নার ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। আমার গয়না বেচে বাবুরা নেশাভাং করবে, প্রেমিক প্রেমিকা খেলাবে, তা আমি হতে দোব না।'

'আর অশান্তি কোরো না। একটা চুক্তি করে, আপস করে, রফা করে, আমরা মোটামুটি বেশ শান্তিতেই আছি, গত কয়েক মাস। বেশ ভালই বেঁচে আছি। খাচ্ছিদাচ্ছি, অফিস করছি।'

'একে বাঁচা বলে না, এর নাম মৃত্যু। তুমি যাকে শান্তি বলছ, তার চেয়ে বড় অশান্তি আর কিছু নেই।'

'তোমার গয়না আমি আবার গড়িয়ে দোব।'

'তা বলে অত ভরি সোনার একটা হার কোথায় গেল আমি খোঁজ নোব না! আশ্চর্য কথা। এ আপসে আমার দরকার নেই, এ চুক্তি আমি মানি না।'

খোঁদল টুলে বসে ছিল নীপা। আগের চেয়ে শরীরটা বেশ ভারী হয়েছে। কোমরে ভাঁজ পড়েছে। আগে মুঠোয় ধরা যেত নাচের শরীর। নিতম্বে মেদ জমেছে। মেয়েরা রেগে গেলে বিশ্রী লাগে। মেয়েরা সব সময় কেমন সুললিত থাকবে। কবিতা গদ্য হয়ে গেলে ভাল লাগে।

নীপা উঠে পড়ল। নেকড়ে বাঘিনির মতো এগোতে লাগল ছেলের ঘরের দিকে। দেখে এসেছি

তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সকালে কখন বিছানা ছাড়বে ঠিক নেই। নীপা দরজা ঠেলছে। ধাক্কা মারছে। আমি জানি কোনও কিছু খোলাতে চাইলে, যদি না খোলে ভীষণ রাগ হয়। জেদ চেপে যায়। সে ঘরের দরজাই হোক আর হৃদয়ের দরজাই হোক।

পেছনে, দূর থেকে আমি বললুম, 'ছেড়ে দাও। যখন উঠবে উঠবে। তোমার হাতে লেগে যাবে।'

'কী বলছ কী, এই ধাক্কায় মরা মানুষও জেগে উঠবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী সন্দেহ। হয় জেগে ঘুমোচ্ছে, নয় মরে গেছে।'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একটা ইয়াং ছেলের স্ট্রোক হবে। জেগেই আছে। ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখি। গালাগাল দিই। ও গালাগাল সহ্য করতে পারে না। আগেও দেখেছি। গালাগালের খোঁচায় খাটিয়ার ছারপোকার মতো বেরিয়ে আসবে। বেশ ব্যঙ্গের সুরে বললুম, 'এই যে নবাব, দরজা খোলো, বাপের হোটেলে আর কত নবাবি করবে।' আরও সব কাটা কাটা কথা লঙ্কাবাটার মতো লাগিয়ে গেলুম। কিছুই হল না।

মনটা ব্লটিং পেপারের মতো খসখসে সাদা। নীপা বসে পড়ে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে। মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে দরজা খুলে। গায়ে ফিনফিনে রাতের পোশাক। ওর লজ্জা না থাকলেও আমার লজ্জা করছে। অসহ্য যৌবন। যেখানে দাঁড়াবে সেখানে আগুন ধরে যাবে। হঠাৎ প্রতিবেশীদের কথা মনে পড়ল। এই সব শব্দটব্দ শুনে ছুটে না আসে ভিড় করে। এমনি কারুর সঙ্গে কারুর মুখ দেখাদেখি নেই: কিন্তু যেখানে স্ক্যান্ডালের গন্ধ সেখানে প্রথা ভেঙে যায়।

নীপা শ্রান্ত, অবসন্ন, তবুও আমি তাকে সাবধান করলুম, 'চিৎকার কোরো না।'

অবাক হয়ে তাকাল। চোখে জল আসছে। দরজাটা ভাঙতেই হবে। এখন দরজা জানলার দাম অনেক। এমনভাবে ভাঙতে হবে, শব্দ হবে না, বেশি চোট হবে না। একটা খন্তি নিয়ে এলুম। ওপরে আর নীচে ছিটকিনি। পনেরো মিনিটের চেষ্টায় দরজা খুলে গেল। মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। পাখা ঘুরছে ফুলস্পিডে। একটা হাত মুঠো করা, আর একটা হাত খোলা। চিত হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঠিক খ্রাইস্টের মতো। ফরসা টকটকে রং। কুমারী মায়েরই সন্তান বলা চলে। ও যখন মায়ের পেটে তিন মাসের, তখন নীপার সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছি, বুক ওঠা নামা করছে কি না। করছে না। স্থির। সর্বনাশ করেছে। নীপা ছুটে গেল।

আমি বললুম, 'সাবধান। পুলিশ আসবে। পুলিশের কথা মনে রেখো।'

গীতা বলছেন, শোকে দুঃখে যিনি অবিচল থাকেন তাকেই আমি বলি স্থিতপ্রজ্ঞ। ডেফিনিটলি আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। এইরকম একটা অবস্থায় আমি পুলিশের কথা ভাবতে পারছি। বুকে মোচড় মেরে চোখে জল আসছে না। এমনকী মেয়েকে সোজাসুজি নয়, ঘুরিয়ে বলছি, 'একটা কিছু পরে এলে হয় না, এখুনি বাড়ি লোকে ভরে যাবে।' যেন সব ডিনার খেতে আসবে। আবার এও ভাবছি, অনেক দিন পরে আজ একটা জায়গায় যাব ভেবেছিলুম, সব পণ্ড হয়ে গেল।

হাতের মুঠো থেকে কাগজের একটা পুরিয়া বেরোল। নীপা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'খুলে দেখো তো।'

পুরিয়াটা প্রথমে টিপে দেখলুম। কী একটা রয়েছে ভেতরে। ভয় হচ্ছিল খুলতে। আমার খোলা উচিত কি না তাও ভাবলুম। শেষে সাবধানে খুলে ফেললুম। চমকে উঠলুম। যেন আমার মৃতদেহ দেখছি। আমার সেই পইতেটা। কোথা থেকে এল, কীভাবে এল। মেয়েটা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন করলে, 'কী এটা?'

'পইতে।'

'কার পইতে। ওর হাতে এল কী করে।'

পাশ থেকে উঁকি মেরে পড়তে লাগল, ছেলের লেখা, জীবনের শেষ ক'টা লাইন।

বাবা, তোমার পইতে। তোমার পরিচয়ে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করল না।

পারো তো জীবনের ধারাটা বদলাও। এখনও সময় আছে।

ঠান্ডা একটা স্রোত, পা থেকে মাথার দিকে উঠেছে। পইতেটা। তবে কি সেমসাইড হয়ে গেল। দীপার কাছে এরও আসা যাওয়া ছিল। ওই যে তিনজন ঘুরছে, তার মধ্যে এ একজন। যাঃ তা কী করে হয়। হয়তো মাসি বলেই যেত। দীপা তো আমাকে একদিনও বলেনি, নীপার ছেলে তার কাছে আসে। রমণীচরিত্র এত দুর্বোধ্য। দীপার কাছে যেত না ওই পাগল করা মেয়েটার কাছে যেত। যে গেছে সেই জানে, মদের মতো, গাঁজার মতো, কোকেনের মতো। ধরলে আর ছাড়া যায় না! নীপা হার হার করে লাফাচ্ছে। আমি কিছু বলিনি। প্রশস্ত বুকের দুই সুউচ্চ পর্বতের মাঝে যে সংকীর্ণ উপত্যকা, সেই উপত্যকায় হারের ছোট্ট লকেট যেন গিরিপাশে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সোনালি ভবিষ্যৎ। আমি কী করব। 'টেম্পোরারি ইনস্যানিটি' তো হতেই পারে। মনকে বশে আনা যায়!

মেয়ে বারান্দার এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করছে। আমার কথায় পোশাক পালটায়নি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, এ ড্যানিয়াল কাম টু জাজমেন্ট। পায়চারি করতে করতে বলছে:

'আমি জানতুম এইরকম একটা কিছু হবে। সব কিছুর একটা সীমা আছে। সব কিছুর একটা শেষ আছে।

'তোমরা দু'জনে মিলে ছেলেটাকে শেষ করে দিলে। আজ এক বছর হয়ে গেল, তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলোনি। ধীরে ধীরে মেন্টাল টর্চার করে মেরে ফেললে। এর বিচার হবে না? আমি সাক্ষী দেব।'

আমার সামনে এসে আঙুল তুলে বললে, 'ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল। বুড়ো ভাম। তোমার সব ইতিহাস আমি জানি। তুমি ওই মহিলাকে পড়াতে। তাকে তুমি রেপ করেছিলে। অ্যান্ড গট দিস বেবি। হি ইজ ডেড নাও। তোমরা চেয়েছিলে ও পেটেই মরে যাক। ইউ ওয়ান্টেড টু কিল হিম ইন দ। উম্ব, টলারেটেড হিম ফর এ সার্টেন পিরিয়াড অফ টাইম। তোমরা ওকে ভালবাসোনি। সহ্য করেছ মাত্র। মার্ডারার। কিলার। সাইলেন্ট কিলার। পেস্ট। ভারমিন। স্বার্থপর। চরিত্রহীন। নিজেরটা ছাড়া তোমরা কিছু বোঝো না।'

বহুকালের ইচ্ছে ওকে ঠেসে একটা চড় কসাই। নিজের মেয়ে হিসেবে মারা যায়। ওকে আর আমার মেয়ে ভাবা যায় না। সিনেমা-ম্যাগাজিনের পাতায় দেখা ফিল্মকুমারী! বিদেশি বিশ্রী ম্যাগাজিনের পাতার পিনআপ গার্ল। ওই পাড়াতেও দেখেছি এইরকম স্পেসিমেন। আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। বীতশোক ভয়ঃ ক্রোধঃ। আমার রাগা উচিত হবে না।

একটা কাশির শব্দ এগিয়ে আসছে। আমার সেই প্রতিবেশী। যাঁর নাম রেখেছি আমি, সমাজের তৃতীয় নয়ন। তিনি আসছেন। তাঁর আরও একটা নাম রেখেছি, রয়টার।

আমি গম্ভীর গলায় আমার অপ্সরা কন্যাকে বললুম, 'তুমি ঘরে যাও। এ পোশাকে ভদ্রঘরের মেয়ে বাইরের লোকের সামনে বেরোয় না।'

'আমি ভদ্রলোকের মেয়ে নাকি। কীরকম ভদ্রলোক। মেয়ের দিকে সেই ভদ্রলোক কীভাবে তাকায়।'

এবারেও ইচ্ছে করছিল ঠাস করে একটা চড় মারি। আমি স্থিতপ্রজ্ঞ। কাশীবাবু এগিয়ে আসছেন কাশতে কাশতে। আমিই সরে গেলুম। আমার এখন আত্মগোপনের সময় এসেছে। ফল দেখে মানুষ বৃক্ষকেই সন্দেহ করবে। বৃক্ষটিকেই আগে উৎপাটিত করা উচিত। পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখাটাই ধর্ম। ঠেলে বেরিয়ে এলেই বিচার। আমি দেখেছি, পাপ আমার সহ্য হয় না। নীলার আংটির মতো। আমি যে নীলকণ্ঠ নই।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'দেখি সুইসাইড নোটটা।'

পইতেটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। কাগজটা এগিয়ে দিলুম। একবার চোখ বুলিয়েই অফিসার বললেন, 'এমনি সব ঠিক আছে। জলের মতো পরিষ্কার, পইতেটা কী? শুরুটা তো বুঝতে পারছি না। বাবা, তোমার পইতে। আপনার পইতে হয়নি এখনও।'

উত্তর দেবার আগে দু'-এক সেকেন্ড মাত্র ভেবেই মাথা খুলে গেল। বললুম, 'আমার সঙ্গে ওর লড়াইটা পইতে নিয়েই চলছিল গত এক বছর। আমি বলতুম ব্রাহ্মণের ছেলে, এত ঘটা করে পইতে দিয়েছিলুম, পইতেটা গলায় রাখার চেষ্টা করো। ও বলত পইতে হল কুসংস্কার। পইতে আর গায়ত্রী তুলে কথা বললে, আমার মাথায় খুন চেপে যায়। রাগের মাথায় একদিন একটা চড় মেরে বসলুম। আর একটা মারতে যাচ্ছি, ও আমার হাত চেপে ধরল। প্রশ্ন করলে, তুমি যে উপদেশ দিচ্ছ, তোমার পইতে কই?'

'আপনার পইতে নেই?'

'থাকবে না কেন? সেদিন ছিল না। আমার ভীষণ ভুলো মন। প্রায়ই পইতেটাকে বাথরুমের কলের মুখে বা দরজার হুকে ঝুলিয়ে রেখে চলে আসি। অফিসে গিয়ে মনে পড়ে। তখন আঁতকে উঠি। ছি ছি, পইতে ছাড়া ব্রাহ্মণের ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি!'

'আপনি খুব ধার্মিক?'

লাজুক লাজুক মুখে বললুম, 'ওইটাই আমার একমাত্র অপরাধ।'

'আমিও তো মশাই ব্রাহ্মণের ছেলে। পুলিশে ঢোকার পরই পইতে ছাড়তে হল। ভীষণ ট্রাবল ক্রিয়েট করে। যেখানে সেখানে জড়িয়ে যায়। চান করে গা মোছার সময় বগলের চুলে জড়িয়ে গেলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। আর অসুবিধে করে রাতে বিছানায়। ঠিক কি না।'

ভদ্রলোক হা হা করে পুলিশি হাসি হাসলেন। আমি বললুম...

'সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট। আমি ওই জন্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে খুলে রেখে দিই।'

'খুলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে ফেলে দেওয়া ভাল। সেই বলে না, দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। এখন আপনার গলায় পইতে আছে?'

'না।'

'কোথায় ফেললেন, বিছানায় না বাথরুমে?'

'সেইটাই তো স্টোরি। সেই থেকেই তো এই।'

'কীরকম?'

'কাল আবার পইতে নিয়ে ফাটাফাটি হচ্ছে, এমন সময় ও যত সব কুসংস্কার বলে পইতেটা টান মেরে ছিঁড়ে দিল। আমি স্তম্ভিত। আমি ওকে স্ট্রেট বললুম, দ্যাখো, তুমি খুব মডার্ন, ধর্ম মানো না, আমি মানি। তুমি এই যে কাজটি করলে, সেকাল হলে তুমি এখন ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যেতে। ব্রাহ্মণ আমি। ব্রাহ্মণত্ব হারালেও, পাপের প্রায়শ্চিত্তের অধিকার আমার আছে। তোমার জন্যেই আমি আত্মহত্যা করব।'

'আপনি তো দিব্যি বহাল তবিয়তে চকচকে শরীর নিয়ে বেঁচে আছেন।'

'আহা, সবটা শুনুন। ঘটনা ঘটে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে ও আমার ঘরে এল।'

ও আমার ঘরে এল, বলতে বলতেই কেন জানি না, আমার গলা ধরে এল। আমি কেঁদে ফেললুম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জীবনের অতীত। সেই চিলেকোঠা। নীলা ঢুকছে। রঙিন নীপা। হাতে রুমালের ঝুলিতে সুগন্ধী ফাগ। তারপর। তারপর কোনওরকমে একটা বিজাতীয় বিয়ে। গর্ভবতী নীপা। আত্মীয়-স্বজনের ছিছি। নীপার বাবা। মুখে পান জরদা। নীপার মা খাটে মৎস্যকন্যা। চুন লাগানো পানের বোঁটা নাচাতে নাচাতে নীপার বাবা বলছেন, ঘাবড়াবার কী আছে। এরকম হতেই পারে। আজ তোমার চাকরি নেই। কাল তুমি চাকরি পাবে। এই আত্মীয়রাই তখন তোমাকে কোলে তুলে নেবে। জগতের যা নিয়ম! নীপার ছেলে হল। লাল এতটুকু একটা পুতুলের মতো। তখন অভাব আর নেই, আছে স্বভাব। সেই ছেলে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও হাত পা ছোড়ে, কখনও ঘুমোয়। এরপর দশটা বছর, সন্দেহের বছর। নীপা কী করতে চায়। কার সঙ্গে ঘুরতে যায়। ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়াঝাঁটি। এরই মাঝে নীপাকে আবার মা করে দিলুম। শিশু

কিশোর হল, যুবক হল। ক্রমশই দূরে সরতে লাগল। আমার আশা ছিল, একদিন না-একদিন সে 'কী গো বাবা' বলে ঘরে আসবে, আর আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কনফেস করব। আমার সুখের কথা বলব, অসুখের কথা বলব।

'ও আমার ঘরে এল, এই ছিল আমার স্বপ্ন। ও আমার ঘরে আর কোনওদিন আসবে না, কোনওদিন না, এ আমার দুঃস্বপ্ন। কিছু কিছু অপরাধ আছে, যা ক্ষমা করে নিলে, যা ক্ষমা করে দিলে, পৃথিবী উলটে যাবে না; কিন্তু আমরা পারি না। মানুষের যেমন পিত্ত হয়, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা খেতে হয়, পৃথিবীরও তেমনি পিত্ত-প্রকোপ হয়, যার ওষুধ তিক্ত ঘটনা। তা না হলে তিক্ততা কেন সযত্নে বোতলে, জীবন-বোতলে সঞ্চিত থাকে।'

চোখ মুছে, ঢোঁক গিলে আমি বললুম, 'অফিসার, গল্পটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। অনেক লুজ-এন্ড চারপাশে ঝুলছে। আজ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে হলে চলে যেত। এ গল্প এখন টাইম-বার্‌ড।'

'তা হলে আবার নতুন করে শুরু করি। নতুন ভাবে।'

'প্রয়োজন নেই। এ তো আর আধুনিককালের বধূহত্যা নয়। যুবকের আত্মহত্যা। নিজের ঘরে আত্মহত্যা। সিম্পল কেস। সামান্য ফর্মালিটিজ। পোস্টমর্টেম। এদিক ওদিক খরচপত্তর।'

সিগারেট ধরালেন। পোড়া কাঠিটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়তে চাইলেন, গ্রিল ছুঁয়ে ফিরে এল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর বললেন, 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন?'

'ও শিয়োর।'

'তা হলে আর ছেলে...।'

'না না আর না। জীবনের তার ছিঁড়ে গেছে। আর বাজবে না।'

'এঃ এই একটা বোকার মতো কথা বললেন, অতটা আত্মবিশ্বাস মুনি-ঋষিদেরও ছিল না। যতদিন প্রডাকশন লাইনে থাকবেন, মেশিন ঠিক থাকলে আর কন্ট্রোল না থাকলে, মেশিনের কাজ মেশিন করবেই। আপাতত তা হলে ওই মেয়ে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সাংঘাতিক দেখতে। সত্যি বলছি বিশেষ বিশেষ ম্যাগাজিনের পাতা ছাড়া এমন মাল, আই অ্যাম সরি, পুলিশ লাইনে এসে মুখটা একেবারে নর্দমা হয়ে গেছে, ভাবতে পারেন একসময় আমি কবিতা লিখেছি, সে কবিতা ছাপাও হয়েছে।'

মেয়েকে মাল বলায় ভেতরটা জ্বলে উঠল। মনে মনে ভদ্রলোককে জুতো পেটা করলুম। মুখে বললুম, 'আর বলবেন না, মানুষের যৌবনে কী যে না হয়!'

'দ্যাটস রাইট। আর জানেন তো, কবিতার ইনসপিরেশন হল মেয়েরা। আমার বউ ছিল আমার ইনসপিরেশন।'

'প্রেম!'

'হ্যাঁ প্রেম। মেয়েদের এক-এক গাছা চুল এক-একটা কবিতা। গোটা শরীরটা একটা মহাকাব্য। আপনার মেয়ের জন্যে ক'জন আত্মহত্যা করেছে?'

'ওই ফিগারটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে আমি লাইনে আছি।'

'আরে ছি ছি বাপ হয়ে মেয়ের লাইনে, ইনসেস্ট।'

'না না মেয়ের লাইনে নয়, আত্মহত্যার লাইনে। ঘাড় থেকে নেমে গেলে বাঁচি।'

'তাই বলুন, ইনসেস্টের পানিশমেন্ট সাংঘাতিক। তা বেশ কিছু দিন আগে আমাকে একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলেন মনে আছে?'

'আপনার ছেলের সঙ্গে!'

'দ্যাটস রাইট।'

'মেয়ে এখন আমার হাতের বাইরে।'

'তা ঠিক, ও এখন ন্যাশনাল প্রপার্টি। তবে কোনওভাবে ওকে যদি একবার আমার হাতে ফেলে দিতে পারেন, আমি ধাতে এনে দেব। যাক এ সময় একথা চলে না। আপনি ওই চিরকুটটা ফেলে দিন। একালের যুবকের আত্মহত্যার একটাই স্টোরি, ফ্রাসট্রেশন, ডিপ্রেশন। দুটোকেই চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য শত্রু।'

সংসারে একটা মৃত্যুর কত প্রয়োজন ছিল! সেই মৃত্যুটা আমার হলে কত ভাল হত! বাঁচতে বাঁচতে মানুষকে বাঁচার নেশায় ধরে। ইনটকসিকেশন অফ লাইফ। যে যত বেশি বাঁচে তার তত মৃত্যুভয়। আমি একবার, দু'বার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। একবার মাঝরাতে একটা সুন্দর প্লেটে কুড়িটা ঘুমের বড়ি সাজিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে বসে রইলুম সারারাত। মরা আর হল না। সারারাত মরার বিরুদ্ধে, আত্মহননের বিরুদ্ধে কত যুক্তি-তর্ক! আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি যেন কত পুণ্যাত্মা! সংসার কারাগারে এসেছ। পুরো মেয়াদ খেটে প্রারব্ধ ক্ষয় করে চলে যাও। আর আসতে হবে না। কে বলেছে আর আসতে চাই না। জন্ম জন্ম সাধ যে আমার মায়ের কোলে আসি আবার। আমার একটা কর্তব্য নেই! আমার ছেলে, মেয়ে, বউ। কত কর্তব্যই যেন আমি করছি! ভাবি আর সেই কুড়িটা সাদা বড়িকে প্লেটে নানাভাবে সাজাই। ফুলের মতো, ফলের মতো, জ্যামিতিক নকশার মতো। শেষে সব ক'টাকে শিশিতে ভরে, এক গেলাস জল দিয়ে একটিমাত্র খেয়ে শুয়ে পড়লুম' পরের দিন বেলা বারোটায় ঘুম ভাঙল। হেল অ্যান্ড হার্টি।

নীপা আর নীপার মেয়েতে হাত মিলে গেছে। এই মেয়েই মাকে একদিন বলেছিল 'বিচ' 'হোর'। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি 'প্লেগ' আমি 'ভাইরাস', আমি 'ফিলদি লাউস'। আমি 'ডগ'। 'আই এক্সক্রিট ব্যাড ওডার।' আমি যখন ছাপকা ছাপকা লুঙ্গি পরে বসে থাকি তখন আমাকে মনে হয় 'পিম্প'। আমি গেরস্তর অমঙ্গল। আমার ছায়ার রং কালো। আমার হাত দুটো শয়তানের থাবা। আমার চোখ দুটো নরকের আগুন। আমার নিশ্বাসে যোনির গন্ধ। আমার জিভ ব্যাঙের জিভ। আমার চুল লম্পটের চুল। আমার ঘাম পেঁয়াজের রস। আমি আসি আমি যাই। কেউ কথা বলে না, তাকায় না। কখনও চা দেয়, কখনও দেয় না। কোনওদিন ভাত জোটে কোনওদিন জোটে না। কখনও যাওয়া আসার পথে মুখোমুখি হয়ে গেলে, এমনভাবে সরে যায় যেন আমি কলকাতার রাস্তার ছাড়া ষাঁড়।

এই আমার পাওনা। মাঝে ভাবি ফ্ল্যাটটা বেচে দিয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দেব। সে উপায় রাখিনি। কাগজপত্র সব নীপার নামে। তখন মনে হয়নি আমার বরাতে এই ব্যবহার জুটবে। আর তো কয়েক বছর পরে রিটায়ার করব, তখন আমি কোথায় থাকব, কে দেখবে আমাকে? জীবনের এই শেষ পরিণতির কথা তো ভাবিনি।

রাতে আমার ঘুম আসে না। জানালার ধারে বসে থাকি। সামনে প্রশস্ত পথ। আলো আঁধারে ঢাকা। দেখতে পাই, একটা খাট ফুলে ফুলে ঢাকা এগিয়ে চলেছে। যত দূর যায় শুধু খই আর ফুল। আমার ছেলে চলেছে বন্ধুদের কাঁধে চড়ে। আমার আমি থেকে আমার আমি বেরিয়ে চলে গেল। ডাকেনি, তবু লিখেছিল, বাবা। ছেলেটা মনে মনে আমাকে ভীষণ ভালবাসত। আমার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চেয়েছিল। বাবার পরিচয়টা যাতে আরও, আরও আরও বড় হয় তাই সে চেয়েছিল। এখন বুঝি নিজের জন্যে তার হতাশা ছিল না, সে হতাশ হয়েছিল আমার জীবন দেখে। ভোগী, ব্যভিচারী, অলস, নিদ্রাকাতর। লোকটা পড়ে, জ্ঞান দেয়, ধর্মের বুলি আওড়ায় অথচ গলার পইতেটা ফেলে আসে এক অশিক্ষিতা, দেহবাদী, পরাশ্রয়ী মহিলার গোদা পায়ে। রাজা দশরথ মৈথুনকালে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমিও তো এক দশরথ। ছেলের মৃত্যু তো আমারই মৃত্যু। জীবনের শেষ রমণী আস্বাদন, শেষ সম্ভোগ, শেষ ব্যভিচার সমাপ্ত।

আমার সব স্বপ্ন ছুটে যায় প্রান্তর পেরিয়ে
বাতাস, উজ্জ্বল বাতাসে ভ্রমণ
গভীর অরণ্য, মানুষের অগম্য
শীতল নির্জন নদী, স্বপ্ন-পথিক
বহুদূর থেকে ভেসে আসে আহ্বান
আমার যাবার নৌকার শ্বেতশ্মশ্রু মাঝি।

আমি ওদের প্রশ্ন করতে পারতুম, তোমরা কী চাও? কী ভেবেছ তোমরা! জানি কী উত্তর—জগৎ হল আরশির মুখ দেখা। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। আমি তো বলতে পারি। একটু এদিক-সেদিক করেছিই না হয়, সে তো তোমরাও করেছ, কর্তব্যে অবহেলা দেখেছ কি! সে কথা মানবে না।

সেদিন রাতে একটা চিঠি লিখলুম—

নীপা,

নাকে আর কাঁদব না। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাইব।
ভালবাসার কথা এ বয়সে মানায় না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।
তুমি যাই করো, আমার মনে তোমার আসন পাকা। বিশ্বাস
করো আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। ছিলও না
কোনও দিন। বাকি সব খেলার খেলা। এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার।
ঘর ছেড়ে মানুষ পাহাড়ে চড়তে যায় জয়ের আনন্দে। আপাতত
আমি তোমাদের জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে চিঠিতে
তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। সংসার তোমাকেও যখন ফেলে
দেবে, চলে এসো আমার কাছে। যাবার আগে বলে যাই, আমি ছাড়া
তোমার আর কেউ নেই।

রাত তখনও ভোর হয়নি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আলোর রং ধরেছে। রাস্তায় নেমে এলুম। এখনও কেউ জাগেনি। দু'-একজন কাগজের হকার সাইকেলে চলেছে কাগজ আনতে। পেছন ফিরে শেষবারের মতো দেখে নিলুম আমার দৌলতখানা। যত এগোতে থাকি পেছনের অদৃশ্য আকর্ষণ তত প্রবল হতে থাকে। আমি যেন চেন দিয়ে বাঁধা। আমাকে টেনে রেখেছে। এই হল মানুষের মোহ। যা নেই তা আছে মনে হবে, যা আছে তা নেই মনে হবে। কে ছিল নীপা! আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। সংসার পেঁয়াজ। ছাড়াও, ছাড়াও, ছড়িয়ে যাও, শেষে ফক্কা।

কিছুই জানি না, কোথায় চলেছি। যাব কোথায়? ঘরের বাইরে মানুষ এত অসহায়! ঘর ছাড়া মানুষ, বাসাছাড়া পাখি। পুরীর টিকিট কেটে চেপে বসলুম ট্রেনে। ধীরে ধীরে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে। গতি বাড়ছে। ভেতরে পটাং করে একটা শব্দ হল যেন। সেই অদৃশ্য শেকলটা ছিঁড়ে গেল। ছেলেবেলার আকাশে যেমন শব্দ উঠত ঘুড়ি কেটে গেলে, মনের আকাশে সেইরকম চিৎকার ভোঃ কাটা। কেটে গেছি আমি। প্যাঁচ লড়িয়েছিলুম। সুতোও ছেড়েছিলুম। বেমক্কা টানে কেটে গেছি। কে ওড়াচ্ছিল আমাকে!

পুরীর প্রথম দিনটা খুব এলোমেলো কেটে গেল। কোনও মাথামুণ্ড নেই। সদ্যোজাত শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। এত লোকজন! ভ্রমণার্থী। সারাদিন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা। বেলাভূমিতে, জলে নারী-পুরুষের ন্যাকামি। অকারণে নাম ধরে ডাকাডাকি। বালি ছোড়াছুড়ি। ঝিনুক কুড়োনো। ভিজে বালিতে পায়ের চিহ্ন এঁকে দাঁড়িয়ে থাকা, কখন ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যাবে! সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে মানুষের বোকামি দেখলুম। কোথাও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, দার্শনিক চিন্তায় বিভোর। কোথাও দেহবাদী, রমণীর সিক্ত শরীর দেখার জন্যে ব্যাকুল, কোথাও মূর্খ প্রেমিক

প্রেমিকাকে আরও একটু কাছে টানতে চাইছে। পোড় খাওয়া গৃহী, গৃহিণীকে ধমকাচ্ছে। অবোধ শিশু হা হা করে ছুটছে। ধর্মব্যবসায়ী ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, পাণ্ডার নাম? পিতার নাম? এক পাশে ঢেউ ভাঙা অক্লান্ত সমুদ্র, অন্যদিকে অক্লান্ত মানুষ। সমুদ্রের ধারে মানুষের থিয়েটার। কোনও নিরালায় বড় মাপের এক মহিলা, সমান মাপের এক পুরুষের কোলে শুয়ে, অজগরের মতো হাত দিয়ে তার ঘাড়টাকে মাথা সমেত নিজের মুখের দিকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে? জোর করে, নতুন করে যৌবনের চেষ্টা। কার হাত-ফেরতা বউ কার কোলে এসে লকারের চাবি দখলের চেষ্টা করছে। ঢেউ সাহস করে আর একটু এগিয়ে এসে ঝাপটা মারলেই, কেমিকেল যৌবন ধুয়ে জরা বেরিয়ে পড়বে।

সারাটা দিন আমার কেটে গেল এই থিয়েটার দেখে। কেবল নীপার মতো কাউকে দেখলেই নিমেষে মন চলে যাচ্ছিল কলকাতায়। বেশ মজা লাগছিল, জীবনে একটা ধাক্কা অন্তত মারতে পেরেছি। বেশ বড় রকমের ধাক্কা। ঢোকারও যেমন প্ল্যান থাকে না, বেরোবারও তেমনি প্ল্যান থাকে না। ও যখন হয় তখন হয়। রেশমকীট সিল্ক জড়িয়ে জড়িয়ে সুতো করলে, যেই মনে হল খুব হয়েছে, নিজের সাধনা নিজেই কেটেকুটে বেরিয়ে এল। গুটির বাইরের জীবনটা তেমন নিরাপদ নয়। তবু তো মুক্তি।

The animal lives only for the day
and in its under has no memory,
the slope in Silence brings its flower to light
and is destroyed.

এতকাল বাইরে বেরিয়েছি কত আটঘাট বেঁধে সাবধানী সংসারীর মতো। এত বড় একটা বোঁচকা নিয়ে। দাঁত থেকে খাবারের টুকরো বের করার খড়কে কাঠিটিও সঙ্গে থাকত। এবার একেবারে অন্যরকম। পাখির মতো। খাঁচার দরজা খোলা। সোজা আকাশ। ডানা উড়তে ভুলেছে। মনে করাতে হবে, শেখাতে হবে। পাখির ভেতর আর একটা পাখি আছে, সেই পাখি ওড়া ভোলে না। তার সাহসেই বেরিয়ে আসা। সামান্য যা বৈভব সঙ্গে আছে, শেষ হয়ে গেলেই সামনে অপার মহিমা। নীল সমুদ্র। আর কুড়িটা বড়ি নয়। নিজেকে ঢেউয়ের ওপর শুধু শুইয়ে দেওয়া। মায়ের অজস্র লক্ষ হাত, নাচাতে নাচাতে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

Look a timorous boat goes down
Under stars
The silent face of the night.

ভাবতে বেশ ভালই লাগছিল, আমি আছি অথচ নেই। মানুষের জীবনের জন্যে দীর্ঘদিনের কতগুলো খাল কাটা আছে। জন্মাবার পর থেকেই, ঘরে যেমন জন্ম, সেই অনুসারে এক এক খাল ধরে হুড়হুড় করে বয়ে চলা। হঠাৎ সেই খাল ছেড়ে উঠে এলে অদ্ভুত লাগে, অসহায় মনে হয়। একজন মানুষের পাশে সত্যিই কিন্তু অন্য মানুষ নেই। আছে স্বার্থ। একটা কাঁচি বের করে স্বার্থের সুতোটা কেটে দাও। চার পাশে ফাঁকা। পৃথিবী একটা মস্ত দোকান। সারা জীবন শুধু কেনাবেচা। মালিক ভগবান। একটা স্বামী দাও। বেশ মোটাসোটা। কোমরের গেঁজেতে কড়কড়ে প্রেমের আঠা। একটা বউ দাও। বেশ বড় খোঁপা। বউ তুমি ছেলে দাও। স্বামী তুমি দুধ দাও। মাঠ তুমি ধান দাও। গাছ তুমি ফল দাও। পাঁঠা তুমি মাংস দাও। ছেলে তুমি অন্ন দাও। চিতা তুমি কোল দাও।

আমার বুক পকেটে একটা পোস্টকার্ড সমুদ্রের নোনা নিশ্বাসে সেঁতিয়ে গেছে। ভাবি একটা চিঠি লিখব কারুকে। দীপাকে নয়। বুঝেছি সে এক উঁচুতলার দেহ ব্যবসায়ী। চেনা লোক চেনা লোকের কাছে চক্ষুলজ্জায় ঘুষ খেতে পারে না বলে ফাইল নড়ে না। চক্ষুলজ্জায় দীপা আমার কাছে সতী সেজেছিল। ওর ওই মেয়েটা হল মাছি ধরা জাল। অমৃতাকে লিখব? সে কি আর আছে! আমার

অফিসের সেই মেয়েটা! হঠাৎ মনে হল, আরে আমি তো তাকে দেখেছি। এইখানেই সে আছে। ওই যে বড়মাপের মেয়েটা! সেদিন সি-বিচে গাবদা-গোবদা একটা লোকের কোলে শুয়ে ছিল, অজগর-হাতে গলাটা সাপটে। আরে লোকটাকেও তো আমি চিনি। ইস্ক্রুপের কারখানা আছে চেতলায়। সর্বনাশ, পাপ এখানেও তেড়ে এসেছে! সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শেষ নেই। শেষ নেই মানবের দেহ ভাঙানোর। এক পাউন্ড 'ফ্লেশ', একটা সোনার বিস্কুট। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 'ওয়ালজ' চলেছে। নাচতে নাচতে জুড়ি পালটাচ্ছে। একবার এ ওর কাছে। সে তার কাছে। অ্যাপেনডিক্স, ন্যাবা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ। চোখের আলো নেবে। স্টেজের আলো নেবে না।

আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। এক পাণ্ডার বাড়িতে কোনওরকমে আছি। পুরীর মন্দির থেকে প্রসাদ কিনে খাই৷ সবাই বলেন সুস্বাদু। আমি তেমন স্বাদ পাই না। আসলে মনেতেই ভোগের উৎপত্তি, মনেতেই লয়। মনই নরককে স্বর্গ করে, স্বর্গকে নরক। কোথাও একটা যেতে হবে বলেই চলা। আমার তো আর কোথাও যাবার নেই। আমার তো আর কিছু হবার নেই। একটা জিনিসই বেরোবার আছে, সেটা প্রাণ।

সমুদ্রের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। স্বর্গদ্বার পেরিয়ে এসেছি। হোটেল, লোকালয় সব পেছনে পড়ে আছে। বাঁ পাশে সমুদ্রের বিদ্রোহ। গভীর গম্ভীর হুংকার। সামনে হাঁটা ছাড়া আমার কোনও লক্ষ নেই। জীবনটাকে বেশি খরচ করে প্রায় দেউলে। মানুষ টাকার হিসেব রাখে জীবনের হিসেব রাখতে ভুলে যায়। যৌবন কতটা খরচ হল! আপন মনেই হাসলুম। বাতাসে উড়ে আসছে সমুদ্রের বালি। গাছের পাতা থেকে বালি ঝরছে ঝুরঝুর করে।

পথ ক্রমশ উঁচু হতে হতে আমাকে তুলে দিলে বিশাল একটা বালির পাহাড়ে। এ যেন আগ্নেয়গিরি। মাঝখানে একটা কন্দর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলুম। উঁকি মেরে অবাক। ভেতরে মায়ার খেলা। বেশ ঘন একটা জঙ্গল। কাজু বাদামের গাছ। একটা পথের রেখা নেমে গেছে নীচের দিকে। সাহস করে নামতে লাগলুম নীচের দিকে। মনে হল স্বপ্ন দেখছি। এক জায়গায় জঙ্গল অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামনেই একটা সরোবর। থইথই করছে পদ্ম। টলটল করছে পদ্মপাতা। অর্ধচন্দ্রাকারে একটি গৃহের ভগ্নস্তূপ। আকার আকৃতি দেখে মনে হল কোনওকালে কোনও রাজার প্রাসাদ ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, কীভাবে এই আয়োজন চলে গেছে বালির কূপে। চারপাশ অসম্ভব নিস্তব্ধ। জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না। ওপর দিকের গাছে বাতাসের শব্দ। ঝিরঝির বালি ঝরছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ধোঁয়া। দূরে একপাশে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। সেইদিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। হাসছেন আপন মনে। তিনটে ইটের ওপর মাটির একটা হাঁড়িতে প্রচুর জলে কুচি কুচি শাকের ডাঁটার মতো কিছু একটা ফুটছে। শুকনো ডালপালা পুড়ছে পটপট শব্দে। সাধকদের বয়েস বোঝা শক্ত। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র পদ্ম-সরোবর থেকে স্নান সেরে এসেছেন। স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল চেহারা। প্রশান্ত চোখ। মুখে অনাবিল হাসি।

হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই পরিষ্কার ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'টুরিস্ট?'

এক পাশে বসে পড়ে বললুম, 'ঠিক টুরিস্ট নই। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

হাসলেন। অদ্ভুত সেই হাসি। কিছুই আর বলছেন না। দূরে তাকিয়ে আছেন। বাধ্য হয়ে আমিই প্রশ্ন করলুম, 'এই জায়গাটা কেমন?'

'খুব ভাল।'

'সাপ নেই?'

'আছে তো। অনেক সাপ আছে।'

'বিছে?'

'বাঃ বিছে না থাকলে হয়! কাঁকড়া বিছেও আছে।'

'বৃষ্টি হলে জল পড়ে না?'

'ওঃ খুব জল পড়ে। একেবারে ভেসে যায়।'
হাসতে লাগলেন। জল পড়ার কী আনন্দ!
'ভিজে যাবেন তো!'
'ভিজলেই বা। আবার শুকিয়ে যায়।'
সন্ন্যাসী যেখানে বসে আছেন তার মাথার ওপর দালানের ছাদ ভেঙে কড়ি বরগা সমেত ঝুলে আছে। যে-কোনও মুহূর্তে মাথায় পড়তে পারে। দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ভেঙে পড়বে যে!'
একবার তাকালেন, হাসতে হাসতে বললেন, 'ওইভাবেই তো আছে। কতদিন হয়ে গেল। পড়েনি তো ভেঙে!'
লক্ষ করলুম প্রশ্ন না করলে সন্ন্যাসী কথা বলেন না, কীসের আনন্দে বিভোর হয়ে কেবল হাসেন। দেখলেই মনে হয় আনন্দ সাগরে ভাসছেন। তাঁর এই ভাব আর উজ্জ্বল মূর্তির সামনে যে-কোনও প্রশ্নই মনে হচ্ছে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর। সেই প্রথম মনে হল, আমি একটা মূর্খ, আমার ভেতরে কিছু নেই। ভেতরে আছে একটা ফ্ল্যাট, গোটাকতক মেয়েছেলে, আধ ডজন ইন্দ্রিয়। আছে, লিভার, পিলে, হৃদ্‌যন্ত্র, মূত্রাশয়, স্টম্যাক, কোলন, গাটার। আমি সারাজীবন যা বুঝে এসেছি, তা হল, দুই আর দুয়ে চার। সেই বোধ দিয়ে এই মহাবোধিকে বোঝা অসম্ভব। নীরব ভাষায় তিনি যা বলে চলেছেন তা হল, আমি যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে আসতে তোমার হাজার জন্মের সাধনা চাই। বউ আর মেয়ের লাথি কলকাতা থেকে পুরী পাঠাতে পারে। দিনকতক পরে আবার ন্যাজ গুটিয়ে ফিরেও যেতে পারো। তাঁকে পেতে হলে সংসারের লাথি নয়, তাঁরই কৃপা চাই। কৃপা, কৃপা, কৃপা।
ভেবেছিলুম, যাক, যিনি আঁশটে সংসার ছাড়ালেন, তিনিই বোধহয় পাইয়ে দিলেন। না তা নয়। তিনি শুধু বুঝিয়ে দিলেন, এ আধার সে আধার নয়। তুমি হলে লেডিজ আমব্রেলা। ভাবছ গজছত্র হবে! ভাঙা জিনিস আরও ভেঙে গেল। মনটাকে কোনওমতে বৈদান্তিক ভাবনার আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম শেষটায় একটা ঝিকি মেরে উঠে যাব পরমহংসের স্তরে। নিমীলিত আঁখি মেলে বসে থাকব মখমলের উচ্চাসনে। পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসবে নীপা, ব্রণকণ্টকিত দীপা। সেবাদাসী হয়ে সেবা করবে দীপার বাড়ির সেই মেয়েটা। ওরা তখন বুঝতে পেরে যাবে, আগে আমি যা করেছি সবই পরমপুরুষের লীলা। ঘুরতে ঘুরতে ভূকন্দরস্থ এই মহাপুরুষের সামনে এসে মনে হচ্ছে, পশুদের যেমন জাত আছে, মানুষেরও সেইরকম জাত আছে। বাঘ ছাগল খাবে, ছাগলে ঘাস খাবে। বলদ হাল টানবে। গাধা মোট বইবে। কুকুর প্রভুর পা চাটবে। শ্রীচৈতন্য, জয় রাধে বলে ওই কালো জলে ডুববেন, যিশু আমেন বলে ক্রুশবিদ্ধ হবেন, বুদ্ধ ধ্যানস্থ হবেন বোধিবৃক্ষের তলে। আর আমি হাত বোলাব রমণীর নিতম্বে।
তিনি আমার দিকে তাকিয়ে যত হাসেন, আমার ততই মনে হতে থাকে, আমার আবর্জনাময় ভেতরটা ক্রমশই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ওই দৃষ্টির সামনে আমি ছোট হতে শুরু করেছি। গোটাতে, কোঁচকাতে শুরু করেছি। শেষে আমি ভয়ে উঠে পড়লুম। যাঁরা মানুষের ভেতরটা পড়তে পারেন তাঁদের সামনে বেশিক্ষণ বসা যায় না।
মহাপুরুষ কোমল গলায় বললেন, 'এসেছ প্রসাদ না পেয়ে চলে যাবে। দাঁড়াও।'
কাঠের জ্বাল থেকে মাটির পাত্র নামালেন। একটা কাঁসার বাটিতে সেই ফুটন্ত জল ঢেলে, চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। চারপাশ নিস্তব্ধ। বাতাসের শব্দ। বালি ঝরছে চিনচিন শব্দে। যেন মহাকালের মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। একসময় চোখ খুললেন। এইবার একেবারে পূর্ণদৃষ্টি। নীলোৎপল আঁখি শুনেছিলাম, এই প্রথম দেখলাম। মানুষের চোখেই আগে কামনার লাল রং ছাপকা ছাপকা হয়ে ওঠে। কামনাশূন্য এমন দীপ্তি দেখলে বড় কষ্ট হয়। শৈশবে আমার চোখও তো এইরকম ছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সমুদ্র-সফেন হাসি। একটা বাটিতে সেই ভোগ ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। গরম জলে ডাঁটার মতো টুকরো টুকরো ভাসমান পদার্থ।

সস্নেহে বললেন, 'নাও সেবা করো। পদ্মফুলের ডাঁটা। খেয়ে দেখো অমৃত!'

তিনি আহার শুরু করলেন। মুখে চোখে ফুটে উঠল তৃপ্তির ভাব।

বললুম, 'এই খেয়ে...'

কথা শেষ হল না। এ কি বোকার মতো প্রশ্ন। নিজেই হেসে ফেললুম, তিনিও হেসে উঠলেন হা হা করে। দু'জনেই দু'জনকে বুঝে ফেলেছি। আমার প্রশ্ন উঠছে ভোগের শরীর থেকে আর উত্তর আসছে যোগের শরীর থেকে। দেহে দেহে ব্যবধান তিন হাত। মনে মনে ব্যবধান সমুদ্রের।

তিনি বললেন, 'আবার এসো।'

আমি ফিরে এলুম আমার সেই পাণ্ডার বাড়িতে। তার শিশুটি এখন আমার বন্ধু। আমাকে যে ঘরটা দিয়েছে সেই ঘরেই সে খেলছিল। স্যাঁতানো পোস্টকার্ডে নীপাকে ঠিক তিন লাইনের একটা চিঠি লিখলুম, পুরীর সমুদ্র সৈকতে আছি। তিন জনের পথ চেয়ে। মৃত্যু, মহামানব আর তুমি। দেখি, কে আসে, কে আসে।

চারটে দিন একইভাবে কেটে গেল। পঞ্চম দিন থেকে শুরু হল আমার তাকানো। ভাঙা জাহাজের নাবিক সমুদ্রে কাঠের ভেলায় ভাসতে ভাসতে দিগন্তের দিকে তাকায়। কোনও জাহাজের মাস্তুল, অথবা কোনও স্থলভাগের সবুজ। সমুদ্র সৈকতে আমি তাকাই, নীপা কি এল। ইচ্ছে করে এগিয়ে যাই ভিড়ের দিকে।

সন্ধ্যা নামতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে তখন সরে আসি নির্জনে। অন্ধকারে আর তো মুখ খোঁজা যাবে না। রাত যত বাড়ে সমুদ্র ততই জ্বলতে থাকে। ফ্যানার ফসফরাস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ঢেউয়ের পেছন পেছন ছুটতে থাকে। মনে পড়ে যায় একটি শবযাত্রার কথা। ভেসে আসে কণ্ঠস্বর। বাবা, তোমার পইতে। এখনও সময় আছে। জীবনের ধারাটা পালটাও। এতকাল কাচের ঘরে ছিলুম। এক ঢিলে সব চুরমার।

সাদা চাদর গায়ে এক সৌম্য বৃদ্ধ আমার মতোই বসে ছিলেন কিছু দূরে। আঁধার নামছে বিশাল সমুদ্রে। বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন,

'কোথাও কি দেখা হয়েছিল, আমাদের দু'জনে?'

কণ্ঠস্বর খুব চেনা মনে হল। ভাল করে তাকালুম। মুখের একটা পাশ দেখছি। তনুর বাবা না?

'দিল্লিতে কি?'

'ট্রেনে আলাপ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। হুহু বাতাসে তাঁর উত্তরীয় প্রান্ত উড়ছে। উড়ছে চুল।

'আমি তনুর বাবা।'

'চিনতে পেরেছি।'

'কী খবর তোমার! বেশ কয়েকদিন হল তোমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখছি! কী হয়েছে তোমার!'

'পুরো উপন্যাস শুনবেন?'

'না, পুরোটা শোনা পণ্ডশ্রম।'

বৃদ্ধ আমার পাশে এসে বসলেন। ধূপের গন্ধ পেলাম। ডান হাতটা আমার কাঁধে রাখলেন। বললেন, 'সব উপন্যাসই এক, তবে শেষটা, শেষটায় কে কেমন প্যাঁচ মারতে পারে সেইটাই দেখবার। আর এই শেষটায় আমার জন্যে মাঝখান থেকে কী খেলা শুরু হল! তা না হলে, সেই জন্ম, শিক্ষা, কর্ম, বিবাহ, সংসার, টালমাটাল, ভোগান্তি, মৃত্যু। তুমি কি শেষে এসে গেছ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। লাস্ট চ্যাপ্টার।'
'ছোট উপন্যাস!'
'আজ্ঞে হ্যাঁ বিস্তারটা বড় ছিল, ধরে রাখতে পারলুম না। বেরিয়ে গেল।'
'কাঁচা হাত?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'
'অবশ্যই ট্র্যাজেডি।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'মৃত্যু ঢুকিয়েছ?'
'হ্যাঁ। ছেলের মৃত্যু।'
'হাতে আর ক'টা চরিত্র থাকছে?'
'নায়ক ছাড়া আরও দুটো। বেঁকে যাওয়া স্ত্রী আর বিপথগামী কন্যা।'
'কুচো চরিত্র!'
'সব ঝরে গেছে।'
'শেষটা কীভাবে লিখবে! কোথায় লিখবে?'
'শেষটা সোলো পারফরমেন্স। এইখানে। সমুদ্রের সামনে। মুখোমুখি। ফেস টু ফেস।'
'তোমার চেয়ে আমার উপন্যাস অনেক বোল্ড। একেবারে ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডি গ্রিক ড্রামা। একটা অ্যাক্সিডেন্ট। স্ত্রী শেষ, তনু শেষ। আর এই দেখো আমার বাঁ হাত শেষ। তোমার একটা মৃত্যু, আমার তিনটি। ছেলের হয়েছিল কী?'
'আত্মহত্যা।'
বৃদ্ধ বসে রইলেন কিছুক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকারে মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,
'পাপ করেছিলে?'
'অনেক।'
'ছেলের আত্মহত্যার জন্যে নিজেকে দায়ী করছ?'
'পঞ্চাশ ভাগ।'
'শেষটা প্রায়শ্চিত্ত?'
'টেকা গেল না।'
'কী করবে?'
'জানি না?'
'তোমাকে আমি ছেলের মতো ভালবেসেছিলুম।'
'আমি আমার পিতাকে ত্যাগ করেছিলুম।'
'তোমার সন্তানও তোমাকে ত্যাগ করেছে।'
'আমার পিতা স্বগৃহে দেহত্যাগ করেছিলেন।'
'যুগ বদলেছে। গৃহ তোমাকে ত্যাগ করেছে।'
'সন্তান আর পাব না। আমি পিতাকে চাই।'
'তোমার পাশে। তা হলে শেষ লেখাটা শুরু হোক।'
'সন্তান, মানে আমার ডান হাত গেছে।'
'তোমার ডান হাত, আমার বাঁ হাত। তার সঙ্গে গেছে বিবেক। জানো তো স্ত্রী হল মানুষের বিবেক।'
অন্ধকারে আমরা কেউ কারুকে স্পষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না। বহুকাল আগে এক পিতা পুত্র এই বেলাভূমিতে পাশাপাশি বসে গেছে।

কিছুকাল আগে এক ভাই, এক বোন, এই বেলাভূমিতে টলে টলে ছুটেছে, এক স্বামী এক স্ত্রী পাশাপাশি বসে দেখেছে। আজ অন্ধকারে পাশাপাশি দুই পিতা। একজন একটু এগিয়ে আছে, আর একজন একটু পেছিয়ে। দু'জনেরই সামনে সমুদ্র। গভীর গম্ভীর তার শাসনের গর্জন। ফেনার ফসফরাস প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে মরছে।

বৃদ্ধ বললেন, 'সমুদ্রেই উৎস, সমুদ্রেই জীবনের লয়। এ যেন বিশাল এক গর্ভসলিল। যতদিন তুমি হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ, ততদিন তুমি মায়ের। যেই তুমি নিম্নপদ ঊর্ধ্বমুণ্ড, তখনই তুমি ভূমির। সব কাহিনিই এক। মাথা নিচু করে প্রবেশ। মাথা উঁচু করে প্রস্থান।'

প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন। চাদরে ঢাকা সাদা মূর্তি। আমি তখনও বসে আছি তাঁর পায়ের কাছে। প্রশ্ন করলেন,

'তুমি আর জন্মাবে?'

'না। সামান্যতম ইচ্ছে নেই।'

'আমি আবার জন্মাব। আবার মায়ের কোলে আসব। আবার ছাত্র। আবার যুবক। আবার গৃহী। শুধু একটা ভুল আর করব না। নিজের লেখা, নিজে আর লেখার চেষ্টা করব না। এবারটা আমি আমি করে গোলমাল হয়ে গেল। সামনের বার তুমি তুমি।'

সমুদ্রের বিশাল একটা ঢেউ সুইশ করে আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। জলের জল ফ্যানা হয়ে নাচতে নাচতে ফিরে চলেছে জলে। সময়ের কোল থেকে সময়ই ছিটকে আসছে জীবদেহের মোড়কে। নাচতে নাচতে আসছে সগর্জনে, নাচতে নাচতেই ফিরে যাচ্ছে কোমল সুরে। জীবন সময়ের সফেন আন্দোলন।
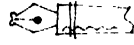
ফিরে ফিরে আসি
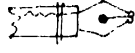
'আশ্চর্য লোক আপনি, কোথায় পাঠাচ্ছেন, কোন মালেদের হাতে গিয়ে পড়ছে তা একবার দেখবেন না! দুম করে নীচে ফেলে দিলেই হল! এ কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমান থেকে ছত্রী সেনাদের ঠেলে ঠেলে ফেলা! যা বেটা যেখানে গিয়ে পড়িস পড়বি। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের ডালে, জলায়, শুকনো ডাঙায়। মরিস, মরবি, বাঁচিস বাঁচবি। আর পড়ে যদি বেঁচেও যাস, তো এইবার ধুম লড়াই কর। এই নাকি আপনি জগৎ-পিতা! আহা জগত-পালকের কী ছিরি!'

আহা! আমার সোনাটা, বড় রাগা রেগেছে। তার ওপর আবার আসছে বিপ্লবের দেশ পশ্চিমবাংলা থেকে। যেখানে ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, মেকসিকান বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিন বিপ্লব সব চোলাই করে তৈরি হয়েছে কেরানি বিপ্লবের দিলবাহার। বিপ্লবের পান মশালা। একটু মিছিল, একটু স্লোগান, একটু মিটিং, একঝলক গালমন্দ, একটু ঝোলটানা, একটু পকেট গোছানো, একটু স্বজনপোষণ, একটু পোঁ ধরা, একটু ধামাধরা, একটা লুঙ্গি, একটা স্যান্ডো গেঞ্জি, তপতপে গদি, গদগদে বউ, একটা ছানা, একটা পোনা, একটা ফ্ল্যাট, বিপ্লবের তরকা, আখেরের তন্দুরি। তা ভালই ফর্মুলা সব তৈরি করেছে। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ নিত্যানন্দ কী করেছিল জানো— ঠিক ঠিক ধর্মকর্ম করতে গেলে বড় নিয়ম, বড় সংযম, বহুত ত্যাগ, ও তো সবাই পারবে না, অথচ যো সো করে মানুষকে একটু নাম তো করাতেই হয়, সেই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েই সে নীচে নেমেছে। তখন মাথা খাটিয়ে একটা মশলা বের করলে— মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বোল হরি বোল। নেঃ শালারা এইবার কোথায় যাবি যা। মাগুর মাছের ঝোল কেন? কেন রুই নয়, কাতলা নয়! আরে মাগুর হল এক কাঁটার মাছ। বেশি বাছাবাছি করতে হয় না। সহজে খাও, সহজে হজম করো, তেমনি বলকারক। খেয়েই মুখটি মুছে নারীর কোলে গদাম করে শুয়ে পড়ো। পড়েই তিনবার হরি, হরি, হরি বলো। মিটে গেল ঝামেলা। এরপর তুমি মারো মাগুরের গুঁতো, মুগুরের গুঁতো। তোমার লেংটি পরার দরকার নেই, কুটকুটে কম্বলে ঠ্যাঙা হয়ে বসার দরকার নেই, একবেলা একটু আলোচাল চিবিয়ে ঘোলা গঙ্গাজল গেলার প্রয়োজন নেই, চোখ তেউড়ে কপালের মাঝখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেখার পড়ি কি মরি চেষ্টা নেই। ব্রহ্মার বদলে নিতম্ব আর স্তন এলে, মরমে মরে যাবার প্রশ্ন নেই। কামে লাগাম লাগিয়েছিল, গেরুয়ার আলখাল্লা পরে পরমহংসধামে পৌঁছাবে বলে, মাঝরাতে ঘোড়া ফেলে দিলে মনোরমার নরম বিছানায়। কালীদহে ডুবতে ডুবতে ন্যাকামি করে গান ধরতে হবে না জীবন আমার বিফলে গেল। আমি হড়কে মরেছি। ও রে শালা যুবতী নারীর কোলেই তো আমি ফেলি। আশি বছরের বুড়ি কোনওদিন পোয়াতি হয়! আমার ইচ্ছেয় কী না হতে পারে! আরে, ওই তোমাদের অবিশ্বাসী ইংরেজ, সাদা চামড়ার জাত, কর্মযোগী, মহাভোগী, ম্লেচ্ছরা, তারাও আমাকে বলে, গড দি অলমাইটি। বলে, ইনস্ক্রুটেবল আর দি ওয়েজ অফ প্রভিডেনস। মুসলমানরা বলে, আল্লা মেহেরবান। বলে, হোতা হায় ওহি, মঞ্জুরে যো খোদা। তোমরা তো কেবল পৃথিবীর ইতিহাসই পড়ো। আমার ইতিহাস, আমার জীবনকাহিনি যদি একটু পড়তে গা! দু'জন যোগী, তোমাদের ওই পৃথিবীর কোনও এক পাহাড়ে বসে আছে। এক রাউন্ড ধ্যানের পর রেস্ট নিচ্ছে। এমন সময় নারদ ঋষি ঢেঁকি চেপে নাকের ডগা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জানো তো ঢেঁকি হল হেলিকপ্টার। একজন যোগী চিনতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ? তা তিনি এখন কী করছেন?' নারদ বললে, 'দেখে এলাম তিনি সুচের ভিতর দিয়ে উট হাতি ঢোকাচ্ছেন আবার বের করছেন।' তা যোগী বললে, 'তার আর আশ্চর্য কী! তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।'

পুরাণ তো আর পড়লে না, পড়লে জানতে পারতে। যুবতী নারীর কোল তো চিনে এসেছ? জিনিসটা কেমন?'

'আজ্ঞে ওইটাই তো আপনার পৃথিবীর রাজত্বের ভিত। ওই হাড়িকাঠেই তো জীববলি। ওইটাই তো আপনার গাজর। আমাদের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রেখেছেন। ওইটাই তো আপনার ফাঁদ। ওইটাই তো আপনার ইঁদুর কল। ধেড়েই বলুন আর লেংটিই বলুন, সব ওই কলে পড়ে, ব্রেকফাস্ট করছে। শুকনো রুটি, এক কাপ চা। গানে প্রেম, সাহিত্যে প্রেম, সিনেমায় প্রেম। প্রেমে আত্মহত্যা, প্রেমে খুন। কী কল বানাইলা তুমি বৈরাগী! কী ফ্যাসাদ যে তৈরি করে রেখেছেন! অমন গাড্ডা আর হয় না। সাধু-সন্তরা ওইটাকে ভোলাবাব জন্যে, কত কাণ্ডই না করেন। কত কথাই না বলেন। একবার বলেন, কামিনী নরকস্য দ্বারম। আবার মনটা ফসফস করে। যেই সামনে দিয়ে গেল অমনি মন-সেতারে সোহিনী। ওরে মন নরকস্য দ্বার, না রে মন স্বর্গদ্বার। শেষে হয়তো পাগলই হয়ে গেল। বিড়বিড় করে সারাদিন এই ছিল, এই নেই। ও রে এই ছিল, এই নেই। গুরু শিষ্যকে ডেকে একেবারে দগদগে একটা চিত্র এঁকে দিলেন— কেন তুই মেয়েপাগলা হবি ব্যাটা। কী আছে ওতে— বিচার কর, বিশ্লেষণ কর— ধর এই একটা নারী নাও এইবার দেখো ব্যাপারটা কী? একটা হাড়ের খাঁচা। তার ওপর মাংসের প্রলেপ। তার ওপর মেদের অস্তর। তার ওপর চামড়া। এইবার ধরো মুখ। মুখটা তেমন খারাপ কিছু নয়। চোখ দুটো অবশ্য একটু ঝামেলা করতে পারে। মেয়েরা চোখের তির ছোড়ে। যে কারণে গানই আছে— বলা কি যায় সহজে, বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা। হিন্দি গান আছে— নজরো কা তির মারে কশকশ কশ, এক নেহি, দো নেহি, তিন, চার দশ। সেইজন্যে চোখের দিকে তাকাবার কী দরকার বাবা, তুমি পায়ের দিকে তাকাও; কিন্তু আঙুলের দিকে, গোড়ালির দিকে নয়। গোড়ালিতে সেই আছে। ঠোঁট দুটো খুব বাজে জায়গা। ঠোঁটে যদি লিপস্টিক লাগায়, হয়ে গেল। ভীষণ মারাত্মক। তোমার ঠোঁটও উসখুস করবে। তখন ভাববে, মুখের ভেতরে কী আছে? লালা আছে। গলায় কফ আছে। টনসিলে রোগবীজাণু আছে। মাড়িতে পায়োরিয়া আছে। দাঁতের ফাঁকে কালকের রাতের খাবার ঢুকে আছে। দুর্গন্ধ পেস্টে যায় না, ও যতই বিজ্ঞাপন করুক। তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে? ঠোঁটে ঠোঁট আমি ঠেকাব না। লবঙ্গ, পানমশালা, জিনটাং খাইয়েও না। এইবার খুব সাবধানে নীচে নামো। যে দুটো সরঞ্জাম বা ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র, বা ভেলকির দিকে চোখ পড়বেই, সে দুটো কী? বলো শিষ্য বলো। সে দুটো হল সামান্য মাংসপিণ্ড। হিরে, মানিক, জহরত নয়। দুটো গ্ল্যান্ড। কীভাবে যেন হয়। সে ঈশ্বরই জানেন। তা হলে একটা গল্প শোনো। সত্য ঘটনাই। ত্রেতায় সত্য, কলিতে গল্প। গল্পটা হল, এক ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষে করতে গেছে। যে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিল। সন্ন্যাসী মেয়ের মাকে প্রশ্ন করলে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বললে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন দিয়েছেন— ওই স্তনের দুধ ছেলে এসে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা কী? আমি আর কেন ভিক্ষে করব? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমায় খেতে দেবেন। তা হলে শিষ্য ব্যাপারটা বুঝলে, ও দুটি হল শিশুপথ্য ওই তোমার বার্লি, কি সাবু, কি ফিডিং বোতলের মতো। ওটা বুড়ো দামড়াদের খাদ্য নয়। জুলজুল করে তাকাবে না। মনে মনে ছটফট করবে না। জানবে আজ যা উন্নত কাল তা অবনত। মানুষের ঐশ্বর্যের মতো, রাজার রাজত্বের মতো। ডাউনফল আছেই। কারও পিতার সাধ্য নেই ঠেকায়। তা হলে মিটে গেল ঝামেলা। এইবার আর একটু নীচে এসো। এইবার সেই বিখ্যাত শ্লোক— অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে স্বভাবদুর্গন্ধ নিরন্তকান্তরে। কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ব্যাটা স্ত্রীসঙ্গে সহবাসে তোর ঘেন্না করে না! যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ। যাও, আর গোলমাল কোরো না। বিচার করে দেখিয়ে দিলুম, ওটা কিছুই নয়। বাজে, থার্ডক্লাস একটা ব্যাপার। ওদের একটা মোহিনী শক্তি থাকে। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ

করে রেখে দেয়। যখনই দেখবে স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মাখোমাখো হয়ে বসে আছে, বলবে, আহা! এরা মরেছে। হারুকে পেতনিতে পেয়েছে রে! ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল। হারু বসে আছে বটতলায়। সে রূপ নেই, সে তেজ নেই, সে আনন্দ নেই। হারুর বারোটা।

সবই হল, কথক ঠাকুর ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাখ্যা করলেন, পরপুরুষ আর পরনারীতে গমন মহাপাপ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করলে মহাশাস্তি পেতে হয়। সেখানে বড় বড় কাঁটাওলা বিশেষ ধরনের একটা খেজুর গাছ আছে, ভগবান পাপীকে উলঙ্গ করিয়ে সেই গাছে গা ঘষতে বলেন, আর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। উঃ সে দৃশ্য ভাবা যায় না। সেই শেষ পরিণতির কথা ভেবে তোমরা সব সাবধান হবে। সেই আসরেরই একপাশে ভক্ত সেজে বসে ছিল কথকঠাকুরের রক্ষিতা। পুঁথিপাটা বগলে নিয়ে ঠাকুর এইবার এলেন সেই রক্ষিতার বাড়িতে। সে তো ভয়ে আধমরা, 'ঠাকুর না জেনে যা করেছি করেছি, আজ থেকে আর নয়। ওই কাঁটাঅলা খেজুর গাছে আমি আর গা ঘষতে পারব না।' ঠাকুর তাকে সাপটে ধরে বললেন, 'পাগলি, গাছ একটা আছে ঠিকই, তবে তাতে আর গজাল নেই। অনন্তকাল ধরে গা ঘষার ফলে গাছটা তেলা হয়ে গেছে, একেবারে পালিশ করা। ভগবানের তো খেয়াল নেই। এখন খুব আরাম হয় আরাম।' তা এই হল ব্যাপার। আপনার সৃষ্টির প্রথম ভাগটাই তো ওই যুবতী নারীর কোল। ওই কোলেই সৃষ্টি ওই কোলেই লয়!'

'শোনো, তোমরা যাকে জগৎপিতা বলো, আসলে সে একটা স্টেশানমাস্টার। এই স্টেশান থেকে ওই স্টেশানে সব পাঠাই। তুমি একটা টিকিট কাটলে, এখন কোন কামরার কোন আসনে বসবে, সেটা যে যাত্রী তার খালি পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে।'

'রিজার্ভেশন বলে কিছু নেই?'

'আছে, রিজার্ভেশানটা হল তোমার কর্মফল। আগের আগের জন্মে তোমার ভাল ভাল কাজের একটা ফিরিস্তি তৈরি হয় এখানে, সেই অনুসারে নম্বর। সব যোগ করে যেই দেখা গেল সংখ্যা বেশ ভাল হয়েছে অমনি তোমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে মহাপুরুষের টিকিট। আর মহাপুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত তুমি পড়ে এসেছ। প্রায় একই রকম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই জন্মে পিতার বিশেষ ভূমিকা নেই, মানে ব্যায়াম নেই। যেমন ধরুন যিশুখ্রিস্ট। ধক করে নতুন একটা তারা আকাশে জ্বলে উঠল। তিনজন জ্ঞানী অমনি ছুটে গেলেন। কুমারী মেরি অমনি নবজাতককে শুইয়ে দিলেন খড়ের ডাব্বায়। পরিত্রাতা যিশু এলেন। মহাপুরুষদের মা আর বাবারা ভীষণ সাত্ত্বিক হন। কোনওরকমে সংসার চলে। কেবল পুজোআচ্চা নিয়েই থাকেন। কিছুতেই ছেলে হতে চায় না। সবাই বাঁজাটাঁজা বলে গালমন্দ করে। এমন সময় হঠাৎ একদিন একটা আলোর গোলা মন্দিরের বিগ্রহ থেকে ছুটে এসে মায়ের পেটে ঢুকে পড়ে। অমনি মহাপুরুষের জন্ম হয়। অনেক সময় ঠাকুর এসে স্বপ্ন দেন, আমি এলুম গো। একমাত্র কৃষ্ণের মায়েরই বছর বছর সন্তান হত, আর কংস ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ডাক্তার যেন। আছড়ে আছড়ে মেরে ফেলতেন। সে এক মহা প্রতিযোগিতা। শেষে বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণ। কী বিচিত্র তাঁর জীবন। সহস্র গোপীর সঙ্গে কেমন কেমন করছেন। বস্ত্র হরণ, চুরি করে মাখন খাওয়া, চাঁদের আলোয় দোলায় দোলা, আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনা, বিশ্বরূপ দেখানো গীতা বলা, নিজের বংশ নিজে ধ্বংস করে আপনার কাছে চলে আসা। তাঁকে অবশ্য আপনি আর ফেরত পাঠালেন না। অথচ তিনি পৃথিবীর মানুষকে বেমালুম এক ব্লাফ দিয়ে এসেছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে।'

'ব্লাফ কেন হবে! তার আগের কথাটা বলো, ধর্মস্যগ্লানির্ভবতি। ধর্মের গ্লানি কি ঘটেছে? কত কোটি কোটি টাকার মন্দির মসজিদ তৈরি হচ্ছে, তুমি কি ভাবো আমি দেখতে পাচ্ছি না? আমার চোখে ক্যাটারাক্ট হয়েছে! ধর্মের যেই গ্লানি হবে আমি অমনি ঠেলে ফেলে দোব আর এক কৃষ্ণকে। শুনেছ বোধহয় আমার একটা পাখি আছে, হোমাপাখি?'

'পৃথিবীর কোনও চিড়িয়াখানায় দেখিনি।'

'কী করে দেখবে, সে পাখি থাকে আমার পক্ষীশালায়। তার আপনি আপনি ডিম হয়।'

'তার মানে মুরগি। আমাদের দেশে আজকাল হাইল্যান্ডার মুরগির মোরগ ছাড়াই ডিম হয়।'

'আরে সে তো বাওয়া ডিম। আর এ হল আধ্যাত্মিক ভাইব্রেশানের ডিম। তোমার জ্ঞান এত কম। আমার হোমা মহাকাশে ডিম পাড়ে। ডিম নীচের দিকে মানে তোমাদের দিকে পড়ছে। পড়তে পড়তে খোলা ভেঙে বাচ্চা বেরিয়ে এল। তার ডানা, পালক, সব গজাল। এইবার সে দেখলে মাটির খুব কাছাকাছি এসে গেছে। এই বুঝি পড়ল। আর পড়লেই মৃত্যু। অমনি সে চোঁচা ওপর দিকে উঠতে লাগল। ফিরে এল মায়ের কাছে নিজের এলাকায়।'

'কই আমাদের মহাকাশচারীরা তো এইরকম ডিম বা পাখি দেখেনি। কতবার এল গেল।'

'মহাকাশ কি এতটুকু জায়গা বাবা! যা বলি বিশ্বাস করো। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তা ছাড়া তোমাকে আমি মিথ্যা বলব কেন? মহাপুরুষদের জন্মও ওইরকম ডিম থেকে হয়।'

'আমাদেরও আপনি ডিমের ব্যবস্থাই করে দিন না। জিনিসটা বেশ ভদ্র আর সভ্য। খরচও কম। আজকাল সব ডাকাতে নার্সিংহোম হয়েছে। কোঁত পেড়ে আর বাচ্চাই হয় না। সব সিজারিয়ান। ছুরি-কাঁচি হলেই টাকার অঙ্ক বেড়ে গেল। ডাক্তার লাল, জনক ফ্যাকাশে নীল। ডিমটি বেশ পাড়া রইল। কাজকর্মের শেষে টিভি, ভি সি আর দেখতে দেখতে, কি সোয়েটার বুনতে বুনতে তা দেওয়া হল। আর যদি মনে হল প্রয়োজন নেই, ওমলেট করে খেয়ে ফেলো। এতে কত সুবিধে! মেটারনিটি লিভ নিতে হবে না। গর্ভবতী অবস্থায় মেয়েদের চলাফেরার অসুবিধে নেই। লজ্জা নেই। গোপনীয়তা নেই। অনেক সময় বছর না ঘুরতেই বাচ্চা এসে গেলে অনেকে লজ্জা পেয়ে যান— এঃ, সকলে কী ভাবছে, এতটুকু সংযম নেই। অনেক সময় বেশি বয়সে দুর্ঘটনা ঘটে যায়; তখন লোকে ছি ছি করে— অ্যাঁ এই বয়েসেও! ছেলের বাচ্চা আর বাপের বাচ্চা একসঙ্গে! ডিম সিস্টেম হলে মানুষের এই ভয়, এই রাখ রাখ, ঢাক ঢাক-টা অনেক কমে যাবে। নিজের তা দেবার সময় না থাকলে চট মুড়ে চালের হাঁড়িতে রেখে দিলেই হল। একদিন অফিস থেকে এসে দেখলে খোকা হাঁড়ির ওপর মুখ তুলে বসে আছে। ও আমার সোনা রে! বলে মা অমনি কোলে তুলে নিলেন। কর্তা স্কুটার থেকে নামছে, গিন্নি বলছে, এই দেখো, কে এসেছে! পৃথিবী আর আগের মতো নেই। আপনার মডেলটা এইবার একটু পালটান।'

'সিস্টেম পালটাতে হলে আমার নকশা, কারখানা সব পালটাতে হয়।'

'পালটাবেন, জাপান ইলেকট্রনিক্স নিয়ে, ক্যামেরা, কম্পিউটার, মটোর গাড়ি নিয়ে কী কাণ্ড করছে দেখেছেন। আপনার তো দেখে শেখা উচিত। সেই একই মডেল সৃষ্টির আদি থেকে চালিয়ে আসছেন। আপনি যে পারেন না, তা তো নয়। সাপকে কুণ্ডলী পাকাবার ক্ষমতা দিয়েছেন, শামুককে খোলে ঢোকার। কেঁচোকে দিয়েছেন বড় থেকে ছোট হবার, ছোট থেকে বড় হবার ক্ষমতা। মানুষকে কী দিয়েছেন! আগে আমাদের দেশে ছাতা হত ইয়া বড় বড়। হাতে ঝোলালে পায়ের গোড়ালির কাছে লটরপটর করত। লাঠি আর ছাতার প্রায় সমান আকৃতি ছিল। জাপান দেখুন বিপ্লব ঘটিয়ে দিলে। ছাতা এখন গাঁটে গাঁটে ভাঁজ হয়ে মেয়েদের হাতব্যাগে ঢুকে যায়। এইটুকু একটা জিনিস, যেই বোতাম টিপলেন অমনি ভ্যাটাস করে খুলে ছাতা হয়ে গেল। তিনটে কুকুর ভয়ে দশ হাত দূরে ছিটকে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আপনি একটা ব্যাগ কিনলেন। প্রথমে সেটা এতটুকু একটা কাঁধব্যাগ। এইবার তলার দিকে জিপফাস্টনার খুলে যান, ব্যাগও খুলতে থাকবে পরতে পরতে। শেষে এত বড় হয়ে যাবে যে গোটা একটা মানুষ ঢুকে যাবে। আগে বেড়াতে যাবার সময় বিছানার আকার হত গন্ধমাদন পাহাড়ের মতো। এখন ফোল্ডিং বিছানা হয়েছে। ফুঁ দিয়ে ফোলানো তোশক, বালিশ হয়েছে। এই এতটুকু একটা প্যাকেট, বগলে চলে যায়। জাপান এমন মটোর গাড়ি করেছে, ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। বড় রাস্তার জন্যে বড়, ছোট গলির জন্যে ছোট। ইংল্যান্ডে এমন

সাইকেল বেরিয়েছে, ভাঁজ করলে বেড়াতে যাবার ছড়ি। পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ছারপোকার মতো বেড়েছে। বাসস্থানের সমস্যা, যানবাহনে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মানুষের শরীরে তো গাদাগুচ্ছের গাঁট দিয়েছেন। একগাদা সকেট। মডেলটা একটু পালটালেই মানুষ ইচ্ছেমতো নিজেকে বড় ছোট করতে পারবে। কাঁধ দুটো ধরে একটু নীচের দিকে চাপ দিলুম শরীরটা ভেতরে ঢুকে গেল। বালকের আকৃতি। পেছন দিকে একটা ভালভ লাগিয়ে দিলেন, বাসে ওঠার আগে ফিস করে কিছুটা বাতাস বের করে দিলুম আকৃতিটা হয়ে গেল পিচবোটের মতো। পরপর হাজারখানেক মানুষ দাঁড়িয়ে গেল প্লাইউডের মতো। কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে খুলে নেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাও করুন। মানুষের পেটের দিকটা অসম্ভব জটিল করে ফেলেছেন। ভেবেছিলেন মানুষ চিরকালই বনে-জঙ্গলে থাকবে। সভ্যতা-টভ্যতা কিছুই গড়ে উঠবে না। কাঁচা মাংস, ফলমূল খেয়েই থাকবে। তাই পেটে একটা হজমের কারখানা বসিয়ে দিয়েছেন। একালে সব হালকা হালকা, প্রিডাইজেস্টেড খাবার বেরিয়েছে। প্রেশার কুকার বেরিয়েছে। এনার্জি মিক্স বেরিয়েছে। মহাকাশচারীরা 'স্পেস-স্টিকস' খাচ্ছেন। খাবেন কিন্তু মলত্যাগ, জলত্যাগ করবেন না। শাকপাতা মানুষ আর ভয়ে খায় না। পেস্টিসাইডে বিষাক্ত। এখন সব ভিটামিন খায়। ফ্যাশান-ফুড খায়। পেটে আর হজমের যাঁতাকল নাই বা বসালেন। পরের মডেলে অ্যাপেনডিক্সটা একেবারে বাতিল কবে দিন। মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থাটা একেবারে বাতিল করে দিন। বড় নোংরা জিনিস। অসভ্যতার চূড়ান্ত। পারমাণবিক সভ্যতায় পায়খানা থাকাই উচিত নয়। পরিষ্কার করার লোক নেই বললেই চলে।

ক্লাস ফোর মানুষ আর নেই। থাকলেও তাদের ইউনিয়ন আছে। তুমি ব্যাটা ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকবে। শুয়ে শুয়ে এন্ডা খাবে, মন্ডা খাবে, আর আমি তোমাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাছার তলায় বেডপ্যান দেব, বোতল দেব জলবিয়োগের জন্যে, এ কেমন কথা! অতি প্রিয়জনও অসুস্থ হয়ে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকলে এই একটি মাত্র কারণে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ বুড়ো তো ঘৃণা আর অবহেলা নিয়েই মরে। সবাই আপনার নাম করে বলতে থাকে, ভগবান, বুড়োটাকে নাও। আর পারা যায় না। হেগে-মুতে পড়ে আছে। ভাবতে পারেন, যৌবনে সে হয়তো জজসাহেব ছিল, কি পুলিশ কমিশনার, কি জনপ্রিয় নায়ক। তার এই অপমান! আর সেই অপমান আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দোষে। হয় আপনি পুরো মালটা হজম করিয়ে দিন, নয়তো, পেটে একটা ক্যাপসুল কল বসিয়ে দিন। যেটা আপনি ছাগলের পেটে প্রায় করে ফেলেছিলেন। গুটলে সিস্টেম। মানুষ বর্জন করবে ক্যাপসুলের আকারে। তাতে সুন্দর একটা গন্ধ থাকবে। পিত্তথলি করতে পেরেছেন, একটা আতরের থলি করতে পারবেন না! অবশ্যই পারবেন। মৃগকে তো মৃগনাভি দিয়েছেন! আপনার অবশ্য দোষ নেই। কেউ তো এসে কমপ্লেন করে না। কলকাতার কত প্রাক্তন মেয়র তো মরে এখানে এসেছেন। তাঁরা তো বলতে পারতেন, কলকাতার সর্বত্র প্রস্রাবের সরোবর, নীচে বিলিতি পাতাল রেল, ওপরে নরককুণ্ড। তরল ইউরিয়ার স্রোত। ভেসে যায়, ভাসিয়ে নে যায়। আপনাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না, যদি দিতে হত, আর আপনি যদি মধ্য কলকাতায় বাঁশবেড়েতে যেতেন, তা হলে বাপ বলে নাকে চাপা দিয়ে বুঝতে পারতেন নিজের মেকানিজমের ভুল? ভুরভুর মানবনির্যাসের গন্ধ। কমিশনার নাকে রুমাল বেঁধে শাসাচ্ছেন, কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না, তা হলেই বাঁশ চলে যাবে যথাস্থানে, সে বাঁশ আর সহজে খুলতে পারবেন না মশাই। গাড়ির ইঞ্জিন যেমন সামনে, মানুষের ইঞ্জিন তেমনি পেটে। গাড়ির ইঞ্জিন যেমন ডাউন করে সার্ভিসিং করানো যায়, সেইরকম পেটটাকে ডাউন করিয়ে যাতে সার্ভিসিং করানো যায় সেই ব্যবস্থাও করুন। মানুষ যা পারে আপনি তা পারেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীর মানুষের এখন সবচেয়ে বেশি যে রোগ হচ্ছে, তা হল, হার্টের, কিডনির আর ক্যান্সার। হার্ট আর কিডনিটাকে আপনি প্যাঁচ সিস্টেম করে দিন। হার্টে ফুটো। কী প্রয়োজন বিলেত যাবার। হার্টটা খুলে নিয়ে বউয়ের কোলে ফেলে দিলুম একটা পাখি সুচ দিয়ে রিপু করে দিলে। তেমন বেশি ড্যামেজ

হয়ে থাকলে, মানুষ আজকাল নানারকম আঠা বের করেছে, বেলুন কেটে মেরে দিলে এক তাপ্পি। হার্ট তো আসলে একটা পাম্প। ছোট একটা টুলু পাম্পের মতো। একটা পাইপ দিয়ে জলের বদলে রক্ত উঠছে আর দুটো পাইপ দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখুন, মানুষ কিন্তু পেসমেকার বের করে ফেলেছে। ডেন্টনকুলি, বার্নার্ড হার্ট পালটাতে শিখে গেছেন। তার মানে, হয় না যে তা নয় মনোপলি করে রেখেছেন। পৃথিবীতে মনোপলির যুগ শেষ হয়ে গেছে। আপনার লিভারের মডেলটাও ডিফেক্টিভ। ওই লিভার একালের মানুষের শরীরে অচল। একালের মানুষকে গেলাস গেলাস চা খেতে হয়, মদ খেতে হয়, ভেজাল খেতে হয়, বিষ খেতে হয়। পৃথিবী সম্পর্কে আপনার তো কোনও ধারণা নেই। কী জায়গা! যদি পারেন আমাদের মতো বেশি না, মাত্র একটা বছর সস্ত্রীক কাটিয়ে আসুন, বুঝবেন কী ঠেলা! যেমন ভ্যাপসা গরম, তেমনি বৃষ্টি, শীত পড়ে কি পড়ে না। বাহারের বসন্ত যেন মোটা একটা বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটা নোটের মতো। আছে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা ক্যাডাভারাস জায়গা, আপনার ওই পৃথিবী।'

'শোনো, তুমি তো যন্ত্রের কথা বলছ, ওগুলো নিষ্প্রাণ, আমার মডেলে তো সব প্রাণে চলে। হার্ট, লাংস, লিভার, পিলে, কিডনি সবই মানুষ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় হয়।'

'ধ্যার মশাই, রাখুন আপনার প্রাণ, আমরা ব্যাটারি বের করে ফেলেছি, মাইক্রো ব্যাটারি, কোয়ার্জ, ইলেকট্রনিক চিপস, পেসমেকার চলছে কীসে! মাথাটাই বা অত জটিল করেছেন কেন? মাথা তো এখনই অলস হয়ে গেছে, বছর দশেক পরে মাথার আর ব্যবহারই থাকবে না। সব কম্পিউটার হয়ে যাবে। কম্পিউটারের মেমারিই হবে মানুষের মেমারি। মাথাটা একেবারে সলিড লোহার বলের মতো করে দিন, তা হলে স্কুটার চালাবার সময় আর হেলমেট পরতে হবে না। মানুষের প্রাণটাকে আপনি ব্যাটারি করে দিন। যারা সুখী লোক, বড়লোক, সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তারা ব্যাটারি পালটে পালটে তিন-চারশো বছর বাঁচুক না, আপনার আপত্তিটা কীসের। আমরা যারা মেহনতি জনতা, আমরা আত্মহত্যার পাপ থেকে বাঁচি। যেই দেখব সুবিধে করতে পারছি না, বাঁধা মার খাচ্ছি, ব্যাটারিটা খুলে ফেলে দেব আর পেছনের ভালভ খুলে হাওয়াটা বের করে দিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে যাব। পরিবার, পরিজন, এঁটো কলাপাতার মতো গুটিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে। এখন মরলে কত ফ্যাচাং। খাট আনো রে, চারটে লোক জোগাড় করো রে, বলো হরি বলো রে, কাঠ এনে চিতা সাজাও রে। বড় বিরক্ত হয় সব। মরার পরও বড় লজ্জা। এ তখন লিখতে পারবে, বাপের ব্যাটারি ডাউন, টায়ার ফ্ল্যাট, পগার পার।'

'ঠিক আছে, আমি একটা সাজেশান বুক খুলছি, তুমি এইসব লিখে দাও, আমার ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনাররা কী বলে দেখি। আগের মতো এখানে আর ডিক্টেটারশিপ নেই, ডেমক্রেসি চলছে। আকাশগঙ্গার ধারে, মন্দার গাছের তলায় বসে মার্ক্স কম্যুনিজমের হুমকি ছাড়ছে। দলে তেমন আত্মা ভিড়ছে না, কারণ এখানে তো ম্যানপাওয়ার, হর্সপাওয়ার নেই, সব উইলপাওয়ারে হয়। লেট দেয়ার বি লাইট, আলো। লেট দেয়ার বি শ্যাম্পেন, দ্রাক্ষারস। লেট দেয়ার বি বোনলেস চিকেন, মুরগি। লেট দেয়ার বি ক্যাবারে, রম্ভা। মার্ক্স বেচারা বিপদে পড়ে গেছে। বলছি, পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট দিচ্ছি, আমেরিকায় যাও, গিয়ে রাশিয়া কি চিন করে দিয়ে এসো, সাহস পাচ্ছে না। আসলে ডিমর‍্যালাইজড হয়ে গেছে। যাক, তুমি এখন স্ক্রিপ্ট, সিনারিয়োটা করে ফেলো। পৃথিবীতে ভগবানকে নিয়ে ফিল্ম হয়েছে, এখানে আমি প্যারাডাইস প্রোডাকশান ব্যানারে যে বইটা করব, সেটা হল ম্যান। মানব। শট ডিভিশান পরে হবে, তুমি স্টোরিটা শোনাও।'

॥ প্রবেশ ॥

সময়টা সন্ধে সন্ধে। শীতের মুখ। পশ্চিম আকাশ ছবির মতো লাল। তখনও কিছু চিল আকাশে পাক মারছে, দিনের শেষ খাবারের সন্ধানে। গঙ্গা টলটলে। ছোট মাপের একটা জাহাজ প্রায় মাঝগঙ্গার নোঙর করে আছে। উদ্যান। উদ্যানটির নাম ইডেন। ঝোপেঝাড়ে অন্ধকার নেমেছে। একটি ঝোপের আড়ালে একটি ছেলে আর মেয়ে। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। এইরকম আরও অনেক জোড়া, জুতো জোড়ার মতো এপাশে, ওপাশে। ইংরেজরা নাম রেখেছিলেন ইডেন। আসলে এটি একটি প্রেমোদ্যান। স্টেডিয়াম অনেকটা খেয়ে নিলেও উদ্যানটি এখনও কলকাতার দ্রষ্টব্য তালিকায় আছে। তিন পাশ দিয়ে তিনটে মূত্রগন্ধী রাজপথ চলে গেছে। গঙ্গার ধার দিয়ে গেছে চক্ররেল। ইংরেজ রাজপুরুষদের রাজকীয় মূর্তির জায়গায় খর্বকায় দেশীয় মহাপুরুষরা স্থান পেয়েছেন। ভাঁড়ের চা-অলারা ঘুরছে। কাঠকয়লার আগুনের ওপর নল লাগানো পেতলের কলসি নিয়ে। কলকাতার প্রেমের তিনটি উপাদান, ঘাস, বাদাম আর এই ভাঁচা। যে ঝোপের আড়ালে এই প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল তার অদূরে প্রাচীন একটি গাছ, সেই গাছে আমার আত্মা বাদুড়ের মতো ঝুলছে। ঝোলার ফলে আমি নীচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমার চারপাশে অনেক প্রকৃত বাদুড়ও দুলছে। এইবার তারা একে একে উড়ে যাবার জন্যে উসখুস করছে।

॥ দৃশ্য ॥

ছেলেটির কাঁধে মেয়েটির মাথা। দু'জনেই বেশ সুন্দর। ভদ্র। কলকাতার মাস্তা-সাট্টা-পেটো-পটকা-চাকু-চল্লপার্টি নয়। শীত শীত করছে বলে এই যুগল গাঢ় রঙের একটা চাদরে নিজেদের ঢেকে নিল। মেয়েটি পরে ছিল গভীর নীল রঙের সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ। শিফনের শাড়ি। শাড়ির আঁচল বুকে ছিল না। গড়ন দেখে আমার মতো বাদুড়ঝোলা আত্মারও হাত-পা গজাবার সাধ হচ্ছিল। অন্ধকার যত গাঢ় হচ্ছিল মেয়েটির শরীরের শুভ্রতাও তত বাড়ছিল। চাদর চাপা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি উঁকপুঁক করে শব্দ করতে লাগল। বুঝলুম তার শরীরের ওপর হাতের খেলা চলছে। একেই বলে কলকাতার মুক্তবায়ু হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ প্রেম। আমার সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই আমি টের পেলুম চরম দৈহিক মিলনও ঘটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করলুম। ভূমির আকর্ষণ। এই সুযোগ। আমি একটা বার্থ পেয়ে গেছি। এই হল নিরাকার থেকে সাকার হবার মহা সুযোগ। জায়গাটি বেশ মনোরম। একপাশে গঙ্গা, আর একপাশে ইডেনের খাল। সবুজ ঘাস। নিকুঞ্জ বন। মাথার ওপর তারা জ্বলা আকাশ। একটু আগে কামভাবে আমার দেহধারণের ইচ্ছা করছিল। এখন আমার অন্যভাব। আমি ও মা ও মা করতে করতে টুপ করে খসে পড়লুম ফুলের রেণুর মতো। ছোট্ট এক কুচি আলোর মতো। ঢুকে পড়লুম মেয়েটির শরীরে। কী আশ্চর্য ভাবের পরিবর্তন! একটু আগে ছিল ভোগের ইচ্ছা। পরমুহূর্তেই সন্তানভাব। তবে বেশ বুঝে গেলুম, ভোগের চরম ইচ্ছাই আত্মার শরীর ধারণের কারণ। আমি আমার জায়গা পেয়ে গেলুম। প্রবেশ, নাতিদীর্ঘ যাত্রাপথ, আসনগ্রহণ। স্বেচ্ছায় বন্ধনযোগ। সেই টলটলে সরোবরে প্রাণকণিকা। বৃক্ষশাখার মতোই ঝুলন্ত অবস্থা। ক্ষুদ্র এক যোগী।'

'এখানে আমার কয়েকটি প্রশ্ন, ও একটু বলার আছে। বলার যা আছে তা হল, ভোগবাসনা নির্মূল না হলে আত্মার মহামিলন ঘটে না।'

'মানে, আপনার সঙ্গে মিলন?'

'না, আমার সঙ্গে নয়। পরমাত্মার সঙ্গে। বেদান্তের সেই এক অদ্বৈত পরমাত্মা। এক থেকে যিনি

বহু হন, বহু থেকে যিনি এক হন। কীরকম জানো? ময়দার তালের মতো। মেয়েরা একটু করে নেয়, লেচি কাটে। চাকি-বেলনে বেলে লুচি করে রুটি করে, পরোটা করে। তালেরই লেচি, লেচিরই তাল। আমার কাজ হল লেচি কাটা। আমি হলুম তোমাদের গণিতের ভাগ গুণ। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট। আমার আর কোনও কাজ নেই। আমার আর কোনও কোয়ালিফিকেশান নেই। ধরে নাও আমি এক ব্যাঙ্কার।'

'এইবার আমার প্রশ্ন, তুমি খোঁজপাত না করে ঢুকে গেলে। বংশ দেখলে না, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা দেখলে না, জাতের খবর নিলে না। আশ্রয় নিয়ে নিলে। শুনে তো মনে হচ্ছে, অবৈধ মিলন চলছিল।'

'আজ্ঞে, অবৈধ তো বটেই; কিন্তু কী করব, ওদের আবেগ আমাকে আকর্ষণ করল। গোবরে যেভাবে জোনাকি পড়ে আমি সেইভাবে পড়ে গেলুম।'

'বলো, তারপর কী হল?'

'অনেকক্ষণ পরে মেয়েটি ছেলেটিকে বললে, ছি ছি, সুমিত, এটা কী হল। ভীষণ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। আমাদের পুলিশে ধরতে পারত। আমরা কোনও গুন্ডার খপ্পরে পড়তে পারতুম।'

'তুমি সব ব্যাপারেই ভীষণ ভয় পাও গোপা। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তারা কী করবে! কী এমন অন্যায় তারা করেছে। আমরা তো তেমন বড়লোক নই যে ক্লাবে কি পাঁচতারা হোটেলে যাব! কি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব দূর কোনও জায়গায়।'

'সুমিত, তুমি এবারে বেশ কিন্তু একটু অসাবধান হয়েছ। যদি কিছু হয়ে যায়!'

'তুমি অত ভেবো না তো। কিচ্ছু হবে না। এ তো আর পরশপাথর নয় যে ঠেকালেই সোনা!' দুজনে উঠে পড়ল। বাগান তখন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সামনে গঙ্গার ধারের দিকে আলোকিত অংশে কিছু অবাঙালি পরিবার হাওয়া খাচ্ছেন। ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা ছুটছে। রবারের বল খেলছে। সুমিত আর গোপা বাইরে এসে ফুচকা খেল। প্রেমের সঙ্গে ফুচকার খুব যোগ আছে। অবাঙালিরা বলেন গোলগাপ্পে। উত্তর কলকাতায় রামমন্দিরের কাছে ফুচকার মেলা বসে। মোটা মোটা শাশুড়িরা পুত্রবধূদের ফুচকা খাওয়াতে আনেন। নিশ্চয় কোনও কারণ থাকে আপনি বুঝে নিন। সুমিত একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলল। এরা কারা? কী করে! থাকে কোথায়? আর কিছুই আমার তখনও জানা হয়নি। এই ট্যাক্সি ধরায় মনে হল, আমার নির্বাচন খুব একটা খারাপ হয়নি। পয়সাকড়ি মোটামুটি আছে। আমার মায়ের শরীরটি বেশ ভাল। দেহটি পরিষ্কার। অঙ্গে সুবাস। কথাবার্তায় শিক্ষার ছাপ। শাড়িটা বেশ দামি। পরিষ্কার অন্তর্বাস। শৈশবটা আমার বেশ আদরেই কাটবে ভেবে উল্লসিত হলুম। আপনি জানেন মানুষের শৈশবটা বড় অনিশ্চিত, পরনির্ভর, ভীষণ ভয়ের। শৈশবে পরিবারের যত্ন না পেলে কী হয় তা হলে শুনুন। আমার পূর্ব, পূর্ব, পূর্ব জীবনের কথা। আপনি কি ভাবেন শুধু গৌতম বুদ্ধেরই জাতককাহিনি হয়! আমারও আছে।

৷৷ জাতক ৷৷

এক জন্মে আপনি আমাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে ফেলেছিলেন। বর্ষার রাতে গোয়ালঘরের একপাশে আমার জন্ম হল। পণ্ডিতের একসময় গোরু ছিল। গোমড়কে গোরু মারা যাবার পর তিনি আর একটা গোরু কিনতে পারেননি। গোয়ালটাকেই আঁতুড় করা হয়েছিল। বস্তা-ফস্তা টাঙিয়ে। ধাই বললেন, যাক বাবার একটি ষাঁড় এল। মালসায় ঘুঁটের সঙ্গে ধুনো পুড়ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। আমার মায়ের পায়ে গরমের সেঁক চলছে। বাইরের শ্রাবণের অঝোর ধারার শব্দের সঙ্গে ব্যাঙের কোলাহল। ব্যাংগুলো যেন বলছে, কে এলি

রে! কে এলি রে! পুঁআ, পুঁআ করে শাঁক বাজল। শেয়াল ডাকল প্রহরে প্রহরে। তিন দিনের দিন আমাকে মনের আনন্দে খেয়ে ফেললে আপনারই এক জীব। কী মজা! তখন মাঝরাত। আমার মা ন্যাতাকাঁতার ওপর বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার ধাইমা আর একপাশে চিতপাত। প্রদীপটা নিবে গেছে দমকা বাতাসে। ভুঁড়ো মতো একটা শেয়াল এসে বেলের মতো আমার কচি মাথাটা কপাত করে মুখে পুরে নিলে। তার মুখের ভেতরে আমি একবার মাত্র ওঁয়া করার সুযোগ পেলুম। সে শব্দ কেউ শুনলই না। শেয়ালটা আমাকে নিয়ে চলে এল ঝোপের ধারে। মধ্যরাতে বনভোজন। মানুষের কচি পাঁঠা খাবার সুখে, বেশ আদর করে করে আমাকে খেয়ে নিল। ছিটেফোঁটাও প্রসাদ পড়ে রইল না কারও জন্যে। একটা জন্ম শেষ। এত কষ্ট করে জন্মালুম, চলে গেলুম শেয়ালের পেটে।

॥ ২ ॥

এর পরের জন্মটা আমার প্রথম থেকেই গোলমাল হয়ে গেল। এক বারবনিতা আমার মা হলেন। আমার একটা চোখ কানা। এবারে আর মরে গেলুম না। বেঁচেই রইলুম। সে যে কী বাঁচা! সন্ধে হলেই আমাকে এক বুড়ির হাতে তুলে দেওয়া হত। সেই বুড়ির মুখে পান-দোক্তার বিশ্রী গন্ধ। বুড়ি আবার মাঝে মাঝে বিড়ি খেত। আর আমি কাঁদলেই গায়ে বিড়ির আগুনের ছেঁকা দিয়ে দিত। ব্যঙ্গ করে আমার নাম রেখেছিল পদ্মলোচন। আমাকে যখন আবার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিত, তখন আমার মা নেশায় চুর। একেবারে আলুথালু। আমাকে কোলে নিয়ে প্রথমে কষকষে করে চেপে ধরত। দম আটকে চোখমুখ লাল হয়ে যেত। আমি চিল চেঁচান চেঁচিয়ে উঠতুম। তখন সেই মা আমাকে একটা কুলুঙ্গিতে বসিয়ে দিয়ে বলত, তুই বেশ আমার কানা কেষ্ট। আমার মাপের একটা কুলুঙ্গি, অনেক নীচে মেঝে, পড়ে মরে যাবার ভয়ে আমি আরও জোরে চিৎকার করতুম। আমার মা তখন ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ নেচে বেড়াচ্ছে টলমল পায়ে, আর বলছে, আমার কানা কেষ্ট কেন কাঁদে রে। ননি খাবে, ননি। কেষ্টর ছেলে কানা কেষ্ট; নাচতে নাচতে মায়ের সবকিছু খুলে যেত। আর আমি পড়ে যাবার ভয়ে পরিত্রাহি চেল্লাচ্ছি। বাইরে সব খ্যানখেনে গলায় গালাগাল দিচ্ছে, আর বলছে, মুখে নুন ঠুসে মেরে ফেল না পঞ্চি। তা হলে একটু শান্তি পাওয়া যায়। আমার মা তখন কুলুঙ্গি থেকে আমাকে পেড়ে নিয়ে তার খোলা বুকে চেপে ধরত। ক্ষতবিক্ষত। যেন বাঘে আঁচড়েছে, কামড়েছে। একটা আধময়লা বিছানা, মদের গন্ধ, ফুলের মালা, খালি বোতল, ঘুঙুর, সিগারেটের টুকরো, পোড়া ছাই। মায়ের একটা বুক মুখে নিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন মাঝরাতে সাংঘাতিক চেহারার একটা মুশকো লোক দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল। এক ঝটকায় আমার একটা ঠ্যাং ধরে বিছানা থেকে তুলে বাইরের দাওয়ায় ছুড়ে ফেলে দিল। এমনভাবে পড়লুম যে একটা পা দুমড়ে মুচড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে প্রচণ্ড মারপিট শুরু হয়ে গেল। আয়না ভাঙছে, বোতল ভাঙছে। ঘটিবাটি বালতি ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। একসময় আমার মা বিকট একটা চিৎকার করে উঠল। একটু পরেই মায়ের চুল ধরে টানতে টানতে দেহটাকে বাইরের দাওয়ায় টেনে এনে আমার পাশে ফেলে দিয়ে লোকটা তিনবার হাতের তালি মেরে টলতে টলতে চলে গেল। ভোরবেলা সবাই বললে, আমার মা মারা গেছে। আমি তখন খুব কাঁদছি। একটা ষণ্ডা মতো মেয়েছেলে এসে আমাকে দুধ দেবার বদলে বেধড়ক পিটিয়ে দিলে। আগা-পাশ-তলা চাদর মুড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে আমার মায়ের দেহটা পুলিশে নিয়ে গেল। আমি পড়ে রইলুম দাওয়ার একধারে। হঠাৎ লুঙ্গি পরা বিশ্রী চেহারার একটা লোক এসে আমাকে কোলে তুলে হাঁটতে শুরু করল। কেঁদে কেঁদে আমার তখন সব কান্না ফুরিয়ে গেছে। লোকটা চলেছে তো চলেইছে। সে চলা যেন আর শেষ হয় না। খাঁ খাঁ রোদ্দুর। আমার কচি মাথাটা যেন বেলের মতো ফট করে ফেটে

যাবে। আমার ছোট্ট এতটুকু জিভটা শুকিয়ে কাঠ। ভেতরটা আমার মা মা করছে। কোথায় মা! লোকটার গা দিয়ে পাঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেরোচ্ছে। হঠাৎ আমি হিসি করে ফেললুম। লোকটা এত রেগে গেল, পারলে আমাকে মুরগির মতো ছিঁড়ে ফেলে। তা না করে ভীষণ জোরে বারকতক ঝাঁকানি মারলে। শুকনো গলায় যতটা জোরে চেঁচানো যায়, আমি চেঁচালুম। লোকটা আমার ঠোঁট দুটো কষকষে করে চেপে ধরে বললে, চোপ শালা, চোপ। তারপর বললে, না, বাবা, তুমি আমার লক্ষ্মী। এক মাসের ফুর্তির খরচ। শেষ বেলায় লোকটা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এল। বিশাল পাঁচিল ঘেরা। লোহার গেট। ভেতরে বাঘের মতো তিন-চারটে কুকুর ঘুরছে। লোকটাকে দেখে কুকুরগুলো তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কালো চশমা পরা বিদঘুটে চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এল। দু'জনে মিলে যা কথা হল, তা এইরকম— কালো চশমা: কোথা থেকে তুললি, ঝামেলা হবে না তো! লুঙ্গি: রুস্তম অত কাঁচা কাজ করে না ওস্তাদ। এ বেটা রাস্তার লেড়ি কুকুরের মতো। বেশ্যার ছেলে। মা-টা কাল রাতে খুন হয়ে গেছে। কালো চশমা: বহত আচ্ছা! ভগবান তো দেখছি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। একটা চোখ নেই, আর একটাকে গেলে দিলেই হবে। এক মিনিটের কাজ। ডান পা-টা তো ভাঙা রে! তুই ভাঙলি বুঝি? লুঙ্গি: না ওস্তাদ এই ভাবেই পেয়েছি। কালো চশমা: ব্যাটা, নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে এনেছে। আমাদের আর ভাঙতে হল না।

লুঙ্গির হাত থেকে আমি চশমার হাতে চলে এলুম। লুঙ্গি কড়কড়ে কিছু টাকা গুনে নিয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল। সেই ভাঙা বাড়িটা ভেতর দিকে বেশ বড়। ছেলেমেয়ের আড়ত। সবাই প্রায় উলঙ্গ। একটা মেয়েছেলের হাতে আমাকে তুলে দিতে দিতে চশমা বললে, আজ থাক, কালকে এর ভাল চোখটা খাবলে দিতে হবে। একটা পা ভেঙেই এসেছে, ওইতেই হয়ে যাবে। ওই অবস্থাতেই বড় হোক। এটার নাম রাখ টিকটিকি।

সেই মেয়েছেলেটা আমাকে কী একটা খাইয়ে দিলে। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। জগৎ-পিতা! কী সুন্দর আপনার পৃথিবী! পুরো কাহিনিটা আর শোনার দরকার নেই। আমি হয়ে গেলুম ভিখিরি। মেলার ধারে, মন্দিরের পাশে আমাকে বসিয়ে দিয়ে যেত। আর আমি আওড়ে যেতুম শেখানো বুলি, বাবা, মা, অন্ধ খঞ্জকে একটা পয়সা দিয়ে যান, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।

আচ্ছা, জীবনে আপনি কারও ভাল করেছেন? কে জানে!

নর্দমার ধারে ছেঁড়া ট্যানা পরে বসে থাকি। গায়ে চুলকুনি, দাদ। চুলে উকুন। আপনার সন্তানের কী দশা! দিনের শেষে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্দার পয়সা গুনত। কম হলেই ঠ্যাঙানি। ঠ্যাঙাবার কতরকম কায়দা! সেদিন খাওয়া বন্ধ। মাঝে মাঝে মনে হত নিজেকেই নিজে মেরে ফেলি। ভয় করত। শেষে আমার টিবি হল, আমি মরে গেলুম। মরলেও রোজগার। আমার কঙ্কালটা বিক্রি হয়ে গেল, একটু কম দামে। কারণ আমার একটা পা ভাঙা, দোমড়ানো-মোচড়ানো ছিল।

আপনি বলবেন, কর্মফল। কী এমন কর্ম করেছি! কোন জীবনে করেছি! যার এই ফল! যা হয় একটা ব্যাখ্যা দিলেই হল! আপনি এখুনি তিন হাজার বছরের ইতিহাস খুলে বলবেন, এই দেখো বাপু তুমি এক জন্মে এই অপরাধ করেছিলে। আসলে তা নয়, মানুষ জন্তুটাই অদ্ভুত। আপনার ওঁচা সৃষ্টি।

॥ ৩ ॥

এরপর আমি জন্মালুম কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। খুব গোপনে। মাটিতে পড়েই বুঝলুম বেশিক্ষণ পরমায়ু নেই। আমার জন্মটা কারও যেন ঘোরতর একটা অপরাধ। আমার মুখে একদলা ন্যাকড়া ভরে একটা বাক্সে পোরা হল। সেই বাক্সের তলার দিকে অনেকগুলো ফুটো ছিল। বাক্সটাকে

বেশ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা চটের ব্যাগে পোরা হল। সেই ব্যাগটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাকর শ্রেণির একটা লোক বেরিয়ে গেল। গলির গলি তস্য গলি থেকে লোকটা বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। ঠ্যাং ঠ্যাং করে ট্রাম যাচ্ছে। সময়টা সন্ধে। লোকটা তড়াং করে একটা ট্রামে উঠল। ট্রাম চলেছে, ট্রাম চলেছে। হাওড়া স্টেশানে এসে লোকটা নামল। প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা উঠে পড়ল একটা কামরায়। ব্যাগটাকে বাঙ্কে তুলে দিয়ে সট করে নেমে গেল এক ফাঁকে। লোকের ওঠা নামায়, ব্যস্ততায়, ব্যাপারটা কারও চোখেই পড়ল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। সেই ফুটো ফুটো বাক্সের মধ্যে আমরা ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল; কিন্তু মুখে ন্যাকড়া পুরে দিয়েছে। আমার ওইটুকু ফুসফুস, ওইটুকু হৃদয়, কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়! প্রায় মরেই যাচ্ছিলুম। কেউ সন্তানের জন্ম দিলেই যে মা হয় তা নয় কিন্তু, ডাইনিও হতে পারে। আসলে, ওই বাড়িটা ছিল, পাপের বাড়ি। পৃথিবীতে পুণ্য বলে কিছু আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়।

যাক সে কথা। ট্রেন চলেছে, আমি চলেছি। চারপাশে ক্যালোর ব্যালোর, ক্যাঁচোর ম্যাচোর। বাঙ্কের ওপর আমি চলেছি। অনেকক্ষণ চলার পর ট্রেনটা থেমে গেল। সবাই নামতে লাগল হুড়োহুড়ি করে। কামরা যখন একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন কে একজন আলতো করে আমাকে তুলে নিল। চটের ব্যাগের মুখটা মনে হয় একটু ফাঁক করেছিল। একঝলক রাতের ঠান্ডা বাতাস খাঁচা-পালানো-পাখির মতো ঢুকে পড়ল। লোকটা আমাকে নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে হনহন করে হাঁটছে। ঝিঁঝি ডাকছে। অমন একটা শহর থেকে চলে এলুম গ্রামে। তবে আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। এইবার আমি মরে যাব।

এমন সময় লোকটার চলা শেষ হয়ে গেল। বেড়া ঠেলে, সে একটা চালাবাড়ির দাওয়ায় উঠে এল। একজন মহিলার গলা পেলুম। লোকটা সেই মহিলাকে বললে, 'দেখো তোমার জন্যে কী এনেছি!'

মহিলা বললে, 'এই তোমার রোগ, হাতে দুটো পয়সা এলেই যত আজেবাজে জিনিস কিনবে।'

লোকটা বললে, 'আগে খুলে দেখো তো, জিনিসটা কী!'

মহিলা বললে, 'ওমা সে কী? তুমি কিনেছ, তুমি জানো না?'

'কিনলে তো জানব! এটা আমি ট্রেনে পেয়েছি।'

লণ্ঠনের আলোয় দু'জনে পাশাপাশি বসে বাক্সটা খুলেই চিৎকাব করে উঠল, 'ও মা, এ কী? কী সর্বনাশ!'

মানবশিশু দেখে, সাপ দেখার মতো কেউ এমন চিৎকার করতে পারে আমার জানা ছিল না।

মহিলা কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'এ তুমি কী নিয়ে এসেছ! এ যে সবে জন্মানো একটা ছেলে। এ কার পাপ!'

মানুষের ছেলে হল পাপ। আর বিশ্বজুড়ে আপনি প্রচার করে দিয়েছেন মানুষ হল অমৃতের পুত্র। মেয়েটি বললে, 'দাঁড়াও, বেঁচে আছে কি না দেখি। আহা রে, ঠিক যেন একটা পুতুল। মানুষের মতো শয়তান আর দুটো নেই।' মেয়েটির গলা শুনে মনে হল কেঁদে ফেলেছে।

আমার মুখ থেকে ন্যাকড়ার দলাটা বের করে নিল। বাক্স থেকে আমাকে তুলে নিল কোলে। আমি একটা নিশ্বাস ফেললুম জোরে। জীবনের প্রথম দীর্ঘশ্বাস। মেয়েটির কী আনন্দ, 'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।' বলে প্রায় নাচে আর কী! মায়ের কোল পেয়েছি। আমার কী আরাম! যতক্ষণ পাওয়া যায়!

লোকটি বললে, 'ওকে আবার ভরে দাও, আমি পাচার করে দিয়ে আসি।'

মেয়েটি বললে, 'সে কী! তুমি অমানুষ নাকি! নিষ্পাপ একটা শিশুকে মেরে ফেলব জেনেশুনে!'

'নিষ্পাপ! নিষ্পাপ হলে কেউ ফেলে দেয়!'

'সে পাপ এ করেনি, করেছে তারা যারা একে পৃথিবীর আলোতে টেনে এনেছে!'

'তুমি একে কী করবে?'

'মায়েরা যা করে, মানুষ করব।'

দুজনে অনেক তর্কাতর্কি হল। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এদের তর্কের শেষে মরেও যেতে পারি; তবু একটু দুধের জন্যে মায়ের বুকে উসখুস করতে লাগলুম। বোধহয় খাবি খাওয়ার মতো করছিলুম। লোকটির মনে দয়া এল। বললে, 'বাচ্চাটা কেমন করছে, একটু কিছু দাও।'

মেয়েটি একটা তুলোর নুটি জলে ভিজিয়ে আমাকে চুষতে দিলে। প্রায় সারাটা রাত ধরে আমাকে নিয়ে পুতুল খেলা চলল। শেষে ঠিক হল, সকালে দু'জনে মিলে আমাকে চার্চে নিয়ে যাবে। ওরা ছিল খ্রিস্টান। চার্চের একটা অরফ্যানেজ আছে, সেখানে জমা দিয়ে আবার তুলে নেবে, তা হলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না। রাতে আমি অঘোরে ঘুমোলুম। সকালে চার্চের ফাদার বললেন, 'খুব ভাল কথা, একে তোমরা মানুষ করো। অনেক দিন থেকেই তোমরা ছেলে ছেলে করছিলে, গড তোমাদের পাইয়ে দিলেন।'

আমি বোধহয় পয়া ছিলুম। তিন দিনের দিন একটা চিঠি এল, আমার পালক পিতা অস্ট্রেলিয়ায় একটা ভাল চাকরি পেয়েছেন। বাড়িতে খুশির বন্যা বয়ে গেল। আমার মা আমার জন্যে সারাদিন কল চালিয়ে ভাল ভাল জামা তৈরি করলেন। নরম উলের সোয়েটার, মোজা, টুপি তৈরি হল। কোথায় আমি মরব, তা না আমার সে কী আদর! এক মাসের মধ্যেই আমরা চলে এলুম অস্ট্রেলিয়ায়। আমার মা একেবারে পুরোদস্তুর মেমসায়েব। আমার মাকে বেশ ভাল দেখতে ছিল। অনেক হাতের কাজ জানতেন। গান জানতেন।

মানুষের কীরকম হয়! আমার মা ওখানে গিয়ে এক ইঞ্জিনিয়ারের প্রেমে পড়লেন। সে এক ভীষণ প্রেম। আমার পালক পিতা যে সময় থাকতেন না, সেই সময় ওই বিরাট চেহারার লোকটা আসত। শুরু হয়ে যেত নানারকম ব্যাপার। একদিন আমার মা ধরা পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা খুব জানাজানি হয়ে গেল। আমার সেই বাবা ছিলেন খুব ভদ্রলোক। লেখাপড়া করা মানুষ। তিনি মাকে বললেন, 'তুমি চলে যাও, আমি কিচ্ছু মনে করব না।'

হয়ে গেল আমার সুখের দিনের সর্বনাশ। সংসার চুরমার। এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার কী হবে! আমার এমন একটা মা শেষে প্রেমে পড়ে সংসার ভুলে গেল। ওই বিশাল বনমানুষের মতো একটা লোক ভাল্লুকের মতো আমার মাকে জড়িয়ে ধরে, তাইতেই এত সুখ! হায় জেসাস! আমার মা এইবার নিজের ছেলের মা হবে। আপনি বলেন, মানুষের বরাত। আমি তো দেখে এলুম, পৃথিবীতে মানুষ যাকে বরাত আর ভগবান বলে, আসলে তা হল, মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি। আর ভাগ্য হল সংযম। যেমন অসংযমী একটা লোক বিধবা বউদির সঙ্গে মিলিত হল। সেই কাজের ফলে আমি এলুম। আমাকে ফুটোফুটো একটা রেডিয়োর বাক্সে ভরে, দয়াহীন এক মানব চাপিয়ে দিলে ট্রেনে। দয়াবান কিন্তু লোভী এক মানব আমাকে টেনে এনে ফেলে দিলে দয়াবতী এক রমণীর কোলে। লোকটি লোভী না হলে আমাকে আনত না। নিঃসন্তান মহিলাটির সন্তানাকাঙ্ক্ষা না থাকলে আমি কোল পেতুম না। কিন্তু দেহ! সেই দেহবোধ থেকে মহিলাটি চলে গেল দেহের ফাঁদে। তার স্বামী যদি একটা ব্যাপারে দুর্বল না হত তা হলে ওই ভাল্লুকটা তার জীবনে আসত না। ছেলেবেলায় সাংঘাতিক টাইফয়েড না হলে লোকটি অমন অক্ষম হত না। এইবার আপনি বলুন, এর কোনখানটায় আপনি আছেন মালিক! কোথাও আপনি নেই। আপনি এক অলীক কল্পনা। সাহিত্যের কল্পিত চরিত্রের মতো। মানুষের ভাবনা আছে বলে আপনি আছেন। আছেন মানুষের মুখের কথায়। আপনার কথা কেউ শোনেনি কোনওদিন। মানুষের কণ্ঠস্বরই আপনার কণ্ঠস্বর। মানুষের চেহারাই আপনার চেহারা। আপনি কোথাও নেই। ছিলেন না কোনও কালে। জগৎ স্বপ্ন নয়, আপনিই মানুষের স্বপ্ন। অলীকদর্শন। তিনটে জিনিস নিয়ে পৃথিবী। প্রবৃত্তি, কার্য, কারণ।

আমার সেই মা বললে, 'ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাব।'

বাবা বললে, 'দুটো ভুল কোরো না, সামলাতে পারবে না। একটাই আগে সামলাও।'

আমি রয়ে গেলুম সেই পালক পিতার সঙ্গে। তবে আমার সেই মাকে আমি ভুলতে পারিনি। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। আমার একটা সাদা ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়া ছুটিয়ে আমি আমার মাকে দেখতে যেতুম। মেয়েরা যেন অবিকল নদীর মতো। একদিকটা ভাঙে তো আর এক দিক গড়ে। আমাদের সেই সাজানো সংসার একেবারে হতশ্রী। এলোমেলো, কোনও মাথামুন্ডু নেই। রান্নাবান্নার পাট উঠে গেছে। ওসব বাইরে। কেবল শোওয়ার জন্যেই যেন বাড়িটা। ওদিকে সেই ভাল্লুকের সংসার যেন ছবি। বাগানে নতুন গাছ। বাহারি ফুল। সাজানো ঘর। কেক, প্যাস্ট্রি। নানারকম ভাল ভাল খাবার। মায়ের চেহারাটাও বেশ ভাল হয়েছে। আমি যেতুম সেই সময়, যে সময় ভাল্লুকটা থাকত তার কাজের জায়গায়। লোকটাকে আমার একেবারেই পছন্দ হত না। আমি তো জানতুম না, যে এরা আমার আসল মা বাবা নয়। আপনার তো আবার অনেক গুণ। মানুষের প্রথম চার-পাঁচ বছর তো অজ্ঞানের অবস্থা। কোনও কিছু বোঝারও ক্ষমতা নেই, পরে এই বয়সের কথা মনেও থাকে না। আমি এদের নিজের মা, বাবাই ভাবতুম। আর ঠিক ঠিক বিচার করলে আমার এই জন্মটা তো লেটার বক্সের ফাঁক দিয়ে চিঠি গলিয়ে দেবার মতো। দেখা গেল মেঝেতে একটা চিঠি পড়ে আছে। কে লিখেছে, কে ডেলিভারি দিয়েছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ডাকঘরেরও ছাপ নেই। আমার সামনেই ভাল্লুকটা যখন আমার মাকে জড়িয়ে ধরত, মনে হত এক গুলিতে দিই শেষ করে। আমি থাকলে ভাল্লুকটা বেশ একটু বাড়াবাড়ি করত, আমাকে দেখাবার জন্যে, আর বেশ একটা বাড়তি আনন্দ পেত যেন। আমি না তাকালে বলত, লুক ইউ ইয়াংম্যান। ইয়োর মাদার ইজ এ বিউটিফুল মেয়ার। লোকটা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার মায়ের ওপর অত্যাচার করত। আমি সেই কারণে এমন সময় যেতুম যে-সময় জানোয়ারটা তার কাজে বাইরে।

মা আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবার কথা জিজ্ঞেস করত। কী খায়! কখন ঘুমোয়! কখন বাড়ি আসে। মায়ের কথা বলে কি না। আমি যা সত্যি তাই বলতুম। মায়ের মুখের ওপর বলতুম, তুমি কাজটা খুব খারাপ করেছ। মানুষ এমন কাজ করে বটে; কিন্তু তোমার করা উচিত হয়নি। মা কেঁদে ফেলত। বলত আমাদের সেই গ্রাম, মাটির ঘর, লণ্ঠনের আলো, আমাদের সেই জীবনই ভাল ছিল। আমার মাথায় কী ভূত যে চাপল। আমি আর মানুষ নেই, একটা জন্তু হয়ে গেছি। আমি এখন যদি ফিরে যাই, তোর বাবা আমাকে নেবে!

বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি আমার মাকে ফেরত নেবে? বাবা বললে, সেইজন্যেই তো বেঁচে আছি। আমি তো জানি ওকে একদিন ফিরে আসতেই হবে। প্রকৃত ভালবাসা কখনও পরাজিত হয় না। মানুষ রোজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে মোগলাই খানা খেতে পারে না। একদিন তাকে বাড়িতে এসে রান্না চাপাতেই হবে। প্রথম সম্পর্কটাই সম্পর্ক, পরের সব অ্যাডভেঞ্চার।

মানুষটার কথা শুনে আমি অবাক। এই এক-একটা জায়গায়, এক-এক সময়ে আপনার ছায়া পড়ে পৃথিবীতে। মানুষ হিসেবে আপনি কেমন আমার জানা নেই। জানার উপায়ও নেই। অনেক বিশেষণ জুড়েছি আপনাতে। সে সব হল গুণ। কিন্তু আমার বাবার কথা শুনে মনে হল, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত মানুষ যখন গাছপালা ঘেরা, ছোট্ট, স্বচ্ছ একটা জলাশয় খুঁজে পায়, একেবারেই হঠাৎ, তখন তার ভেতরে যে অনুভূতি হয়, এ যেন সেই। জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ একটি দেবালয় দেখলে যা মনে হয় তাই। দেবতার চেয়ে দেবালয় অনেক সম্পূর্ণ। অনেক ভাব একসঙ্গে সেখানে খেলা করে। এই সবের মধ্যে আমরা আপনাকে খুঁজে পাই।

আমার মাকে গিয়ে বললুম, বাবা এই বলেছেন। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে উদাস হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। একসময় উঠে গিয়ে সেলার থেকে ফ্রিজ থেকে ভাল ভাল খাবার বের করলেন। টেবিলে সাজিয়ে আমাকে পাশে বসে খাওয়ালেন। একটা প্যাকেটে বাবার জন্যে সব ভরে

দিলেন। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে একটা তোড়া তৈরি করলেন। লাল রিবন দিয়ে বাক্সটা সুন্দর করে বেঁধে, ফুলের তোড়াটা গুঁজে দিলেন।

আমি যখন চলে আসছি, তখন মা আমাকে বললেন, জীবনে একবার ভুল করলে, জীবনটাকে আবার তার আগে থেকে পেছিয়ে এসে আর শুরু করা যায় না। পেনসিলের লেখার মতো জীবনের লেখা মোছা যায় না। তোকে একটা কথা বলি, ভুল দেখে ভুল চিনতে শেখ। ভুল করিসনি।

মানুষ কেমন সুন্দর কথা বলে! আর লক্ষ করেছেন, মানুষ আপনার ওপর কতটা কম নির্ভরশীল। মানুষ নিজের কাজ দিয়ে নিজেকে সংশোধন করতে চায়। ভুল করে শিখতে চায় কোনটা ঠিক। এই ব্যাপারে মানুষ আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রভু। আপনি হলেন একই রকম গুণাকর, গুণনিধি। আপনি পড়তেও জানেন না, উঠতেও জানেন না। মানুষ পড়ে ওঠে। সার্কাসের রিংমাস্টারের মতো হিংস্র জন্তুদের বশে এনে টুলে দাঁড় করায়, রিং-এর ভেতর দিয়ে গলায়। অকারণে আমরা আপনাকে শ্রেষ্ঠ করেছি। মানুষই সব। তিল তিল করে ভগবান হয়ে, হঠাৎ একদিন চলে যায়। আবার অপেক্ষা। আবার সাধনা। মানুষ আবার মুহূর্তে ভগবান, মুহূর্তে শয়তান। সত্যি কথা বলব, ভগবানের চেয়ে সাধক অনেক অনেক বড়। ভগবানের সৃষ্টিটাই আছে সাধনা নেই কোনও। এই কথাটা আজ আমি আপনার মুখের ওপরেই বলে যাচ্ছি।

পরের দিন আবার আমি গেলুম আমার মায়ের কাছে। পাপী পাপ করে যখন অনুশোচনা করে তখন সে ঈশ্বর। তার অনুশোচনায় সে হয়ে ওঠে পবিত্র দেবালয়ের মতো। তার মধ্যে তখন হয়তো আপনার আসন পাতা হয়। সে আপনিই পারবেন বলতে। প্রথমে ছিল আমার ঘৃণা, পরে এল দুঃখ। দেখলুম দুঃখের মধ্যেও আপনার উপস্থিতি। এই দুঃখই আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। আমি তখন সবে যুবক হতে চলেছি। আমার ভেতরে তখন কত কী! জানেনই তো আপনি, যৌবন কত সুন্দর! ওই সময়টাতেই তো পৃথিবী বেঁচে ওঠে, ফুলের মতো ফুটে ওঠে, তারপরেই মরে যায়। খুব সাবধান, মানুষ আছে বলেই আপনা আছেন, নইলে আপনি মৃত।

বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে গেলুম। কাচের দরজা খুলে, অনেকে বের করে আনছে একটা কফিন। কার কফিন? ভাল্লুকটা মরে গেল নাকি? না, সেটা আসছে সবার পেছনে। সামনে ঝুঁকে পড়েছে তার বিশাল আকৃতি। জন্তুটা আমার মাকে মেরে ফেলেছে। আমার শরীরে তখন অসীম শক্তি। আমি শক্তির চর্চা করি। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বুদ্ধির চেয়ে শক্তির কদর বেশি। লোকটা যেই বাইরে এসেছে, আমি একটা হিংস্র কুকুরের মতো লাফিয়ে উঠে টুঁটিটা চেপে ধরলুম। মারব। মেরেই ফেলব, তারপর যা হয় হবে। আমার সামনে ও আমার মাকে ব্যবহার করত।

আশ্চর্য! লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। ভাল্লুকটা কেঁদেছে। আর যারা ছিল তারা ছুটে এসে আমাকে সরিয়ে নিলে। না সরালেও আমি হয়তো ছেড়ে দিতুম। লোকটা, জন্তুটা আমার মায়ের জন্যে কেঁদেছে। লোকটা হাত জোড় করে বলতে লাগল, আই অ্যাম সরি মাই সান, আই অ্যাম সরি মাই সান।

কাটা ছাগলের মতো সে গড়াতে লাগল সবুজ ঘাসের ওপর। কোনওক্রমে একবার বললে, আমার কোনও দোষ নেই। আমি তার নির্দেশই পালন করেছি। হয়তো তাই। একই মানুষের মধ্যে হরেক চরিত্র ঢুকে থাকে। মানুষ যেন একটা অপেরা। আমি আপনার ওই পৃথিবীতে অদ্ভুত সব চরিত্র দেখেছি। একটা লোক দেখেছিলুম, সে মুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে কাঁদত। তুমি কাঁদো কেন। কষ্টই যদি হয় তো মুরগি মারার কী দরকার! তা বললে, মারব বলেই কাঁদি, কাঁদব বলেই মারি। আর একজনকে দেখেছিলুম, সে তার পরিবার পরিজনকে উপোস করিয়ে রেখে দানধ্যান করত। এমন কেন করো ভাই। তা সে বললে, ওরা আমার হিসেবের মধ্যে আছে, দানধ্যানটা আমার বেহিসেব। আর একজনকে দেখলুম, না খেয়ে মরে গেল, ব্যাঙ্কে তার তিন লক্ষ টাকা ছিল। একজন খুনিকে দেখেছিলুম, সে রাস্তার কুকুরের সেবা করত। হাসতে হাসতে মানুষ মারত, কাঁদতে কাঁদতে

জীবজন্তুর সেবা করত। কেন এমন করো ভাই? বললে, মানুষ কথা বলে। কথা-বলা পশু আমি সহ্য করতে পারি না। মানুষের কথা হল সাপের ছোবল।

ভাল্লুকটার ভেতরে প্রকৃতই একজন প্রেমিক মানুষ ছিল! আর আমার মা! তার ভেতর একটা জন্তুও ছিল। সে কখনও ভোগ চাইত, কখনও ত্যাগ। তাই সে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আত্মহত্যার আগে বাবাকে একটা চিরকুটে লিখে গিয়েছিল, কাপের হাতল ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। কাপটাকে বাতিল করে দিতে হয়। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে দেখা হবে। এ জীবনের ভুল আর সে জীবনে যেন না হয়।

মায়ের দ্বিতীয় স্বামী খুব সহজ, সরল, মোটা দাগের মানুষ ছিলেন। আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। লোকটা ভোগী ছিল; কিন্তু তার ক্ষীরের মতো ঘন একটা আবেগ ছিল। লোকটা ঠিক আত্মহত্যা করল না; তবে নিজেকে ইচ্ছে করেই মেরে ফেলল। আর মরার আগে তার সমস্ত কিছু আমায় দিয়ে গেল। আমার বাবা কিন্তু বেঁচে রইলেন। বলতেন দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকার আলাদা একটা সুখ আছে, শীতের রোদে বসে থাকার মতো। মানুষ! তোমার তুলনা তুমিই।

আমরা দু'জনে মাঝেমধ্যেই মায়ের সমাধিতে যেতুম, এক স্তবক ফুল হাতে নিয়ে। অতীত ভেসে উঠত। আমাদের সেই সব পুরনো সুখের দিন। বর্তমানের চাপে অতীত বেশিদিন দাঁড়াতে পারে না। স্মৃতি-টৃতি সব ভেসে যায়। আমার বাবা হঠাৎ এক মাঝবয়সি মহিলাকে বিয়ে করে বসলেন। মা একবার মরেছিলেন এইবার তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু হল। বাবা কেন যে বিয়ে করলেন! যুক্তি দেখালেন, খরচ খুব বেশি হচ্ছিল। বাইরে খাওয়ার খরচ খুব বেশি। সংসারে থাকতে গেলে একজন মহিলার খুব প্রয়োজন। মা এত বড় একটা ত্যাগ করে গেলেন, আর তুমি এইটুকু পারলে না! তোমার জীবনের কতটুকুই বা আর বাকি ছিল। বাবা বললে, ওটাকে তুমি ত্যাগ বলছ কেন, অনেক ভেবে দেখলুম, ওটা একটা দুর্ঘটনা। খুব জোরে গাড়ি চালালে যেমন অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। আগুন নিয়ে খেলা করলে যেমন পুড়ে মরার সম্ভাবনা থাকে। আমরা বড় ভাবাবেগে ভেসে যাই। জীবনে প্রয়োজনটাই বড়। আমার একা থাকতে ভাল লাগে না। আমি ঘা খাওয়া আহত মানুষ। আমার জীবনে নারীর প্রয়োজন।

যে মহিলাকে বিয়ে করলেন তিনি বিদেশিনি। কাঠখোট্টা। পুরুষালি চেহারা। আবেগবর্জিত। বাবা হলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী। খুব একটা শিক্ষাদীক্ষাও ছিল না। একটা বড় দোকানে চাকরি করতেন। মা যে ভুলটা করেছিলেন বাবাও ঠিক সেই ভুল করলেন। আমি এক নিরপেক্ষ দর্শক। বিবাহিত মানুষেরা একা বিছানায় শুতে পারে না। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিবাহিত জীবন হল ট্রাউজারের মতো। দুটো চোঙা চাই। দোনলা।

আমি জানতুম মহিলাটির সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না। বড় বেশি শাসন, বড় বেশি কর্তৃত্ব। আর বাবা বড় বেশি নরম। এক-একটা লোক মেয়েদের শাসনে থাকতে ভালবাসে। চাকরবাকরের মতো, ক্রীতদাসের মতো। পৃথিবীর মানুষকে আপনি দু'ধরনের আনন্দ দিয়েছেন— মেয়েদের দাসী করে রাখার আনন্দ আর মেয়েদের দাস হয়ে থাকার আনন্দ। মহিলা ক্রমশই আমার অসহ্য হয়ে উঠল, আর আমিও তার অসহ্য হয়ে উঠলুম। বাবাকে মারধরও শুরু হল। একদিন জুতো ছুড়ে মারল। কপালের একটা পাশ কেটে গেল। বাবা কোনও প্রতিবাদ না করে মিনমিনে গলায় বলতে লাগলেন, ন্যানসি, ন্যানসি শান্ত হও, শান্ত হও। ন্যানসি শান্ত হবার মেয়ে। বাবার ঘাড়ের ওপর বাঘিনির মতো লাফিয়ে পড়ল। সেই দিন আমি তার খাটো চুল ধরে টেনে তুলেছিলুম। একটু বলপ্রয়োগও ঘটে গিয়েছিল। যাকে আমি মা বলে ভাবতে পারি না, সে আমার কাছে একটা মেয়েমানুষ। অসভ্য, ইতর এক মহিলা। বাবাকে দিয়ে যে তার নিজের জামাকাপড় কাচায়, শুকোতে দেওয়ায়, সে একটা ভালগার।

ন্যানসির শরীরে আমার চেয়েও বেশি বল। সে আমাকে এক ধাক্কায় মেঝেতে ফেলে দিয়ে

বেপরোয়া লাথি মারতে লাগল। ইচ্ছে করে এমন এমন জায়গায় মারতে লাগল, যে সব জায়গায় সামান্য আঘাতেই মানুষ কাতর হয়। একসময় আমি পা ধরে এক টান মেরে ন্যানসিকে মাটিতে ফেলে দিলুম। আর কিছুই করতে হল না। দজ্জাল সেই মহিলার ডান হাতটা ভেঙে গেল।

এই প্রথম আমার বাবাকে রাগতে দেখলুম। মিনমিনে মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে, দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললে, বেরিয়ে যাও। বললে, বাস্টার্ড, ইউ ক্লিয়ার আউট। ন্যানসি যন্ত্রণা-বীভৎস গলায় বললে, সান অফ এ বিচ। পৃথিবীর মানুষ খুব রেগে গেলে, এইসব গালাগাল দেয়, যত সভ্য আর শিক্ষিত হোক না কেন! মানুষ আপনার সন্তান হতে পারে; কিন্তু পেঁকো সন্তান। ভেতরে নর্দমার পাঁক বাইরে ভদ্রতার ড্রেসিং, সভ্যতার জামাকাপড়।

আমি বেরিয়ে এলুম। মেয়েছেলেটা বিশ্রীভাবে পড়ে আছে। অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছে। ভারী দুটো স্তন। একেবারে কুৎসিত। পোড় খাওয়া একটা মুখ। কোনও ভাল ঘরের মেয়ে নয়। জীবনটাকে ভাঙিয়েছে। আমার সামনেই বাবা তাকে তোয়াজ করতে লাগল। একটু চাপাচাপি, ঢাকাঢুকি দেবার চেষ্টা।

ন্যানসি আমার নামে থানায় ডায়েরি করে এল। অ্যাসাল্ট, অ্যান অ্যাটেম্পট টু রেপ। সাক্ষী আমার বাবা। পুলিশ আমাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এল। আর হাজতে বসে মনে হল, সেই ঘৃণিত ভাল্লুকটা মানুষ ছিল, না এই পূজনীয় মানুষটা মানুষ।

সেই পূজনীয় ভাল্লুকের অর্থে আমার উকিল কেস লড়লেন। সেই সময়েই আমি জানতে পারলুম, আমি কারও ছেলে নই। আমি কুড়িয়ে পাওয়া একটা বাস্টার্ড। আমার উকিল অসম্ভব ভাল লড়লেন। মহিলার অতীত টেনে আনলেন। আগের দুটো বিয়ে ভেঙে গেছে এই বদমেজাজের জন্যে। স্নায়বিক অসুখে বেশ কিছুকাল ভুগেছিলেন। বেশ কিছুদিন একটা নাইটক্লাবে এন্টারটেনার ছিলেন। হাতভাঙার ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমি ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলুম আর এক পৃথিবীতে। আমার অতীত মুছে গেল। বিশাল একটা দেশে আমি একা। কেউ নেই; কিন্তু অনেক টাকা আছে। দেখে এলুম পৃথিবীতে দুটো জিনিসের কোনও দাম নেই, ভাব আর অভাব। ভাবে থাকলে ভাত জুটবে না। প্রতিযোগিতা মেরে শেষ করে দেবে। আর অভাবে থাকলেও ওই একই অবস্থা। লোকে পোকামাকড়ের মতো মাড়িয়ে চলে যাবে। সমস্ত নরম অনুভূতি তুলে তুলে ফেলে দিলুম। কোথাও আমার জন্মদাতা ছিল। একজন আর একজনের ওপর একটু ফুর্তিফার্তা করেছিল। তারই ফল আমি। সেই ফল পাচার করা হল। অবাঞ্ছিত, অসহায়। সে ক্ষমতাও নেই যে ফুর্তিবাজ লোকটার গলা টিপে ধরে বলবে, ইয়ারকি পেয়েছিস। এক দম্পতি করুণা করলেন। প্রবৃত্তি এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি বিচারে বসলুম, কেন ন্যানসিকে আমার সহ্য হত না। মনের অনেকটা গভীরে গিয়ে হতভম্ব। ন্যানসিকে আমি ভোগীর চোখে দেখেছিলুম। দেখতে বাধ্য করেছিল আমাকে। ন্যানসিকে কেউ অন্য চোখে দেখতে পারবে না। অসম্ভব। তার হাঁটা, চলা, পোশাক পরা, তার শরীর, চোখ, মুখ, তার অন্তরঙ্গ স্বভাব। কোনও মানুষ তার তিন ফুটের মধ্যে আসামাত্রই একটা তরঙ্গ অনুভব করবে। তার বোধ-বুদ্ধি-সংযম সব অসাড় হয়ে যাবে। সে একটা আলকাতরার থকথকে ডোবায় ডুবতে থাকবে। সর্বনাশ এসে তাকে দু'হাতে জাপটে ধরবে। ভীষণ একটা প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ভেতরে টগবগ করে ফুটতে থাকবে। পৃথিবীতে এইরকম অসংখ্য ইঁদুরধরা কল আপনি পেতে রেখেছেন। ভীমরুল যেমন বোলতা ধরে, ন্যানসি সেইরকম আমার সেই পালক পিতাকে ধরেছিল। লোকটার শক্তি ছিল না সম্ভোগের। তার দুর্বলতাটাই হয়ে উঠেছিল ন্যানসির আর এক আনন্দ।

নিজের দুর্বলতা আবিষ্কার করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আমার সেই মা আমাকে বলেছিলেন, ভুল করা দিয়ে ভুল না করা শিখবে। আমি ঠিক ন্যানসির মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেললুম। নাম তার রোজি। আর নিজেকে তৈরি করে নিলুম সেই মহান ভাল্লুকের আদর্শে। সেই

লোকটাকেও আমি ঘৃণা করতুম। মানুষ যা ঘৃণা করে অবচেতনে সেইটাই ভালবাসে। মানুষের মধ্যে এই অসংগতিটা আপনি রেখেছেন রসিকতা করে। সারা পৃথিবীটা আপনার এক জটিল জঞ্জাল। রোজিকে আমি ভাল্লুকের নিয়ন্ত্রণে রাখলুম। চাযাড়ে একটা জায়গায় একটা পাব খুললুম। মানুষের আসল জায়গা তো শুরু হয়েছে পেট থেকে। কয়েক ইঞ্চি জায়গা গোটা মানুষটাকে নাচাচ্ছে। পেটের ওপরের অংশ মহামানবের। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ পড়ে আছে ওই ইঞ্চি ছয়েক জগতে। আমি নাম করতে চাই না, আর করলেও আপনি চিনবেন না, কারণ কোটি কোটি, কোটির কোটি মানুষ নিয়ে যাঁর কারবার, তাঁর কাছে মানুষ হল নামহীন কিলির বিলির। আর আসার আগে পৃথিবীতে মানুষ কী ফেলে আসে, তা নিয়েও আপনার কোনও মাথাব্যথা নেই। তবু বলি, এক ধনী ইংরেজ, তাঁর নাম পৃথিবীর মানুষও জানে না, তবে গবেষকরা সেই ভদ্রলোকের অদ্ভুত একটা লেখা আবিষ্কার করেছেন। চার হাজার পাতার বিশাল এক বই। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এগারো খণ্ডে। সারা বিশ্বে একমাত্র আমেরিকাতেই এক সেট সেই বই আছে। মানুষের ভাষা আপনি বুঝবেন না, আর সে-বই আপনার না পড়াই ভাল, মন খারাপ হয়ে যাবে। বইটার নাম, মাই সিক্রেট লাইফ। আপনাকে এত কথা বলার কারণ, সেই বইয়ের একটা লাইনে আপনার সৃষ্টি রহস্যের চিচিংফাঁক আছে। দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। আপনার সিনেমায় মশলা হিসেবে যাবে ভাল। একটি কবরখানা। একটা কবরের আড়ালে, নির্জন জায়গায় লেখক এক শ্রমিক শ্রেণির পাঠ্ঠা মহিলাকে সম্ভোগান্তে ভাবছেন— কী অদ্ভুত এই পৃথিবীর মানুষ। মৃত্যুর লীলাভূমি এই কবরস্থান। মাটির তলায় ছড়িয়ে আছে মৃতের কঙ্কাল। মৃত্যুতীর্থে আমাদের এই জীবনলীলা। এই মুহূর্তেই হয়তো এসে গেল একটি মানবজীবন। সে জন্মাবে, খাবে, পান করবে, সম্ভোগ করবে, মরবে, কবরে যাবে, পচবে।

ব্যাপারটা বুঝলেন আপনি। এই হল আপনার পৃথিবীর নগ্ন বাস্তব। খাবে,পান করবে, সম্ভোগ করবে, আর এই তিনটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর তাবৎ সফল ব্যাবসা। টাকা ঘুরছে তিন দাঁড়ার এই চাকায়।

প্রভু শুনবেন নাকি, পৃথিবীর আর এক গল্প। সুযোগ যখন এসেছে শুনে রাখুন, আব আপনার এই রম্যকানন তো, 'নো টাইম জোন'। যেখানে জন্ম, জরা, মৃত্যু নেই, সেখানে সময়ও নেই। অনেককাল আগে ভারতবর্ষে আপনি আকবর নামে এক রাজাকে পাঠিয়েছিলেন। মন্দ মানুষ ছিলেন না তিনি। যুদ্ধ, বিধর্মীদের ওপর অত্যাচার ছাড়াও, অন্যদিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। গানবাজনা, লেখাপড়া, সাহিত্যশিল্প। তাঁর সভাকবি ছিলেন বীরবল। রাজা একদিন মজলিশে বসে বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, মানুষের সবচেয়ে বেশি আনন্দ কীসে?

বীরবল বললেন, মহারাজ মদে। মদ্যপানে তাবৎ মানুষের বড়ই আনন্দ।

প্রমাণ করতে পারবে?

অবশ্যই মহারাজ। তিন দিন সময় চাই।

বীরবল তিনজনকে জোগাড় করলেন। তিনজনেই রাজপ্রাসাদের অদূরে ভিক্ষে করত। একজন এমনি ভিখিরি। একজন অন্ধ, আর একজন নুলো। বীরবল বললে, এই রাজা তোদের ডেকেছেন। খুব খানাপিনা হবে। তারা রাজি হল। বীরবল রাজাকে বললেন, মহারাজ আজ রাতে আমি প্রমাণ করব। খাবার ঘরের পাশে পরদার আড়ালে আপনি থাকবেন।

তিন ভিখিরি এসে খানা-টেবিলে বসল। পরিবেশক এক পাত্তর করে মদ দিয়ে গেল। সেটা যেই শেষ হল আর এক পাত্তর। সেটা শেষ হতেই তিনজনেরই বেশ কড় ধরেছে। পরিবেশক আর এক পাত্তর দিয়ে গেল। তখন যে অন্ধ সে পরিবেশককে বলছে, আয় শালা, দেখতে পাচ্ছিস না, মদে মাছি পড়েছে। তখন যার হাত নেই, নুলো, সে বলছে তার নুলো নাড়িয়ে, মার শালাকে, মার শালাকে। আর যে দীনহীন ভিখিরি সে বলছে, যত টাকা লাগে হাম দেঙ্গে, যত টাকা লাগে হাম দেঙ্গে।

বীরবল মহারাজকে বললেন, কী বুঝলেন মহারাজ!

আমার ব্যাবসাও তাই জাঁকিয়ে উঠল। মদ, রোজি, মাংস, বিছানা। আমার তখন মোহভঙ্গ হয়েছে। মা, বাবা, স্ত্রী, পৃথিবীতে এসব কিছুই নেই। আছে ভোগ, জন্ম, বিহার, আহার, মৃত্যু, কবর। রোজির আকর্ষণে সবাই ছুটে আসত। রোজি সকলকে বেহেড মাতাল করে পাঠিয়ে দিত পেছনে। সেখানে সস্তার নারীরা বাকি কাজটা করে, লোকটাকে নিঃস্ব করে বাইরে ফেলে দিত।

রোজিকে আমি সপ্তাহে একবার করে খুব পেটাতুম। পেটাবার সময় ভাবতুম, ন্যানসিকে পেটাচ্ছি। পেটাচ্ছি আমার সেই অজ্ঞাত মাকে। রোজি আটকে থাকত অর্থের লোভে। আমি তাকে ভালও বাসতুম। মেয়েরা মারকুটে পুরুষকে বেশি ভালবাসে। কেন তা আপনি জানেন। আপনারই সৃষ্টি। তবে শুনে রাখুন, ব্রহ্মদেশে একটা প্রবাদ চালু আছে— যত চুলোচুলি তত প্রেম। আপনার মানুষ আরও একটা সত্য আবিষ্কার করেছে, যত প্রেম তত ঘৃণা।

ওই জীবনটা আমার মন্দ ছিল না। সব বেশ ভালই চলছিল। আপনার কথা একবারও মনে পড়ত না। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই আপনার আসন টলে গেছে। একমাত্র ভারতবর্ষে আপনি বেঁচে আছেন। হঠাৎ একদিন এক উগ্র বন্দুকধারী রোজিকে মেরে ফেললে। ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটে গেল! বাধা দিতে গিয়ে আমিও আহত হলুম। আমার একটা পা জখম হয়ে গেল। রোজি চলে যাবার পর জীবনটা ভীষণ পানসে হয়ে গেল। হইচই করে বাঁচলে জীবনের মেয়াদটা বেশ ছোট মনে হয়। বোঝাই যায় না সময় যাচ্ছে কীভাবে! জীবনের গতি মন্থর হয়ে গেল। মনে হল দুরন্ত একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছি। উঁচু বংশের একটি মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে। আর ইচ্ছে নেই। একটা সময় মানুষ মরতে ভালবাসে। কারবার বেচে দিলুম। একদিন চার্চে গেছি, দেখি টুপি উপুড় করে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধ। খুব মৃদু গলায় বলছে, গিভ মি এ ডাইম প্লিজ। আমার সেই বাবা। ঘৃণায় এতকাল খোঁজ নিইনি। হঠাৎ মনে হল, সে কী! আমাদের দু'জনে তো কোনও তফাত নেই। দু'জনেই প্রেমিক। আর লোকটাকে ভীষণ ভালবাসতুম বলেই এত ঘৃণা। তা ছাড়া লোকটা তো আমাকে উদ্ধার করেছিল। আমাকে বাঁচিয়েছিল।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওলটানো টুপিটা তার মাথায় পরিয়ে দিলুম। হাতটা ধরে বললুম, চলো, তোমার শেষে এই অবস্থা হল?

চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কণ্ঠস্বরও ভুলেছে। বয়েসের ভারে নত। জিজ্ঞেস করলে, আপনি কে? পরিচয় পেয়ে কুঁকড়ে গেল। আমি অপরাধী।

ন্যানসি লোকটাকে চুষে ছোবড়া করে দিয়েছে। শেষে ইমপোটেন্ট বলে কোর্টে কেস ঠুকে বিয়ে ভেঙে, মোটা অর্থের খেসারত আদায় করেছে। এসব দেশে একটা মেয়েকে দৈহিকভাবে সন্তুষ্ট করতে না পারাটা সাংঘাতিক এক অপরাধ। সেই দেহসর্বস্ব ন্যানসির স্নায়ু-বিপর্যয় ঘটেছে। সেই স্নায়ুর দাম দিতে হয়েছে আদালতের হিসেবে।

অতীতকে কবর দাও। এই কথাটা আমার জানা ছিল। বিপদে পড়লে মানুষ এই বলেই শুরু করতে চায় নতুন করে। করলে কী হবে, অতীত রেহাই দেয় না। অনুসরণ করে নাছোড়বান্দা পাওনাদারের মতো। অতীতের চেহারা হল অনুশোচনা। আমার পয়সার অভাব ছিল না। আমার পালক পিতাকে যথেষ্ট সুখেই রেখেছিলুম। অন্ধ মানুষটি আর্মচেয়ারে বসে সারাদিন সমুদ্রের গর্জন শুনত। জন্মান্ধ হলে মানুষের দুঃখ অনেক কম হয়। দীর্ঘদিনের দেখা পৃথিবীকে দেখতে না পাওয়ার কষ্ট অনেক বেশি। অর্থ দিয়ে সে দুঃখ দূর করা যায় না। একটি ছাত্রী এসে তাকে সময় সময় বাইবেল পড়ে শোনাত। আমাকে তখন ক্রাচ বগলে হাঁটতে হয়। পা-টা বেঁচে গেলেও মরে গেছে। কোনওরকমে ঝুলে আছে দেহের সঙ্গে। সকালে সমুদ্রের ধারে আমি লেংচে লেংচে হাঁটছি! আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে সেই অন্ধ বৃদ্ধ। সমুদ্রের ঢেউ অদূরে ভেঙে পড়ছে সুইস সুইস শব্দে। আমাদের পা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের ফেনা। নীল আকাশে আপনার সূর্য সোনার তবক বসাচ্ছে

টুকরো মেঘের গায়ে। দুধ সাদা সামুদ্রিক পাখি উড়ছে জপমালার মতো। অনেক দূরে সুন্দরী এক মেয়ে বেলাভূমিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। তার সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে। ভারী নিতম্ব নাচছে ঘোড়ার তালে তালে। অন্ধ বৃদ্ধকে আমি কথা দিয়ে ছবি এঁকে শোনাচ্ছি। সমুদ্রের শ্বাসের সঙ্গে মিশছে আপনার দীর্ঘশ্বাস। মানুষের জন্যে আপনার কি একটুও মমতা নেই? তা হলে বাতাস কেন বয়।

এই ভ্রমণের সময় আপনার কথা মনে পড়ত। যার কথা মনে পড়ে সে কোথাও নেই তা কি হয়! এই বিশ্বাসটা হত। জীবনের নেশা কেটে গেলে দর্পণে আপনার ছায়া পড়ে। নেশা হল দুটো— অর্থ আর মেয়েমানুষের ককটেল। গোটা পৃথিবী এই নেশায় টলোমলো।

একদিন সন্ধেবেলা, আমাদের পরিচারিকা বৃদ্ধকে কফি দিতে এসে দেখে, আর্মচেয়ারে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বৃদ্ধ বসে আছে অনড়। ডাকে সাড়া নেই। গায়ে হাত দেওয়ামাত্র দেহটা কাত হয়ে গেল একপাশে। নিঃশব্দে আপন মনে বৃদ্ধ কখন চলে গেছেন, সাঁঝবেলার পাখির মতো। কিছু কি বলার ছিল আমাকে? কী-ই বা বলার থাকে যাবার সময় মানুষের। পৃথিবীর সব কথাই পুরনো হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় সব মানুষের চোখেই একটা আতঙ্ক ফুটে ওঠে। বৃদ্ধের চোখ ছিল না।

আমার মনে হল এইবার আমি দেশে ফিরব। হুগলি জেলার সেই এক গ্রাম। জন্মভূমি আমি জানি। জানি না জন্মস্থান। তবু যাব। হয়তো সেই ট্রেনেই, সেই ব্যান্ডেল লোক্যাল। যে ট্রেনের বাঙ্কে একটা পেস্টবোর্ডের বাক্সে শুরু হয়েছিল আমার জীবনের যাত্রা।

যাওয়া হল না। ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা। রাতের বেলা বসে আছি সেই আর্মচেয়ারে, যে-চেয়ারে বৃদ্ধ বসতেন। সামনের অন্ধকারে ফুঁসছে অক্লান্ত সমুদ্র। আমার মধ্যবয়সি পরিচারিকা এসে বললে, আসুন খাবার দেওয়া হয়েছে। আমি বললুম, অ্যালিসা আমি এখানকার পাট তুলে আমার দেশে ফিরে যাব। এখানে আমার আর কে আছে বলো?

অ্যালিসা আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার শরীর আমার হাত আর কাঁধ স্পর্শ করল। সমুদ্রের বাতাস-শীতল দেহে তার দেহের উত্তাপ। অ্যালিসা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। আমি তার হাত ধরে টেনে বসালুম। সে মেঝেতে নতজানু হয়ে বসেই আমার হাঁটুতে মাথা রাখল। সোনালি চুলের ঢল চওড়া পিঠে। সমুদ্রের দমকা বাতাসে কিছু উড়ে উড়ে আমার মুখে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

অ্যালিসা বললে, আমারই বা কে আছে? তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে? তোমাকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। তুমি হলে আমার জেসাস।

সে কী? আমি খোঁড়া। আমার একটা পা নেই। অ্যালিসা বললে, হোয়াট ইজ ইন এ লেগ! সবই তো মনে। তুমি একটা খাঁটি সংগ্রামী পুরুষ। আই লভ ইউ। তুমি গেলে আমিও যাব। আমি মনে মনে নিজেকে দান করে দিয়েছি তোমাকে। সাহস হয়নি বলার। আমি অরফ্যান, মানুষ হয়েছি এক অরফ্যানেজে। আমি ছাড়া, আমার আর কোনও পরিচয় নেই।

আমিও তো অরফ্যান। আমারও তো কোনও পরিচয় নেই। আমি যা পেয়েছি, সবই কুড়িয়ে পাওয়া।

অ্যালিসার অর্ধেক শরীর তখন আমার কোলে। রেশমের মতো নরম চুল, কোমর, পায়ের চাপে ধরে রাখা গুরু নিতম্ব। অন্ধকার ব্যালকনি। অন্ধকার সমুদ্র। তারার কুচি। এমন করে পৃথিবীকে কে সাজাল! সে আপনি। আমার মনে পড়ে গেল আফ্রিকান একটা প্রবাদ: আমাদের প্রেম ঝিরিঝিরি নরম বৃষ্টির মতো নেমে আসে; কিন্তু প্লাবিত করে নদী।

হঠাৎ একটা আবেগ এল, বন্য আবেগ। বহুকাল নিঃসঙ্গ। নারী বর্জিত জীবন। আর্মচেয়ার থেকে নেমে এলুম মাটিতে। সেই রাতেই অ্যালিসা হয়ে গেল আমার স্ত্রী। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর আপনার পৃথিবীতে আমার অসম্ভব ভাল কাটল। স্বপ্নের মতো। অ্যালিসাকে ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট খুব হয়েছিল। হলে কী হবে! আসতেই তো হবে। কে আর চিরকাল থাকে ওখানে!

এর পরের জন্মটা আমার ভারী মজার। ভাবলেই হ্যা হ্যা করে হাসতে ইচ্ছে করে। বিরাট এক বড়লোকের বাড়িতে জন্মালুম। আপনি ভাবছেন, ভাল কর্মফলের যথোচিত পুরস্কার। আগের জন্মে অনেক কষ্ট করেছি। চরিত্র হারাইনি। মানুষের সেবা করেছি। প্রেম করেছি স্বর্গীয় পরিবেশে। তা হলে গল্পটা শুনুন।

এক নামী নার্সিংহোমে দু'জন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আমার জন্ম হল মাঝরাতে। আমার বাবা ব্যাবসাদার। মা সুন্দরী। বেশ একটু আদুরি। সুর করে টেনে টেনে কথা বলে। মাঝে মাঝেই নাকে কাঁদে। আমি জন্মেছি বলে খুব আনন্দোৎসব হল। দশ হাজার টাকার মিষ্টি বিলোনো হল জনে জনে। আমার জন্যে একটা আয়া রাখা হল। আমার মা-ও বেশ বড়লোকের মেয়ে। পৃথিবীর সমস্ত বড়লোক ও তাদের বাড়ির মেয়েরা বেশ মোটা মোটা হয়। ঢলঢলে, তলতলে। মধ্যবয়সি মেয়েদের হাঁটুতে বাত থাকে। উঁচু জায়গায় উঠতে হলে হাঁটুতে হাত রেখে একটা কোঁত পেড়ে ওঠেন। দামি দামি জামাকাপড় পরেন। গায়ে গন্ধ মাখেন। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন: যেন কথার ডাঁটা চিবোচ্ছেন আর একটু করে ছিবড়ে বের করছেন। মধ্যবয়সি পুরুষদের রক্তে চিনি পাওয়া যায়। কে বলেছে, আপনার পৃথিবীতে শুধু আখ থেকেই চিনি হয়। রক্ত থেকেও চিনি হতে পারে। হার্ট একটু ঢিলে হয়ে আসে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, একবার, দু'বার ছোটখাটো হেঁচকিও মারে। মানে শরীরটা বেশ তোয়াজের হয়।

বেশ কয়েকদিন আমাকে এইসব চরিত্রেরা ঘিরে রাখল। আর আমার মা সম্রাজ্ঞীর মতো বিছানায় শুয়ে রইলেন। এদের মধ্যে আমার দাদু, ঠাকুরদা, মামা, মামি, দিদিমা, ঠাকুমা, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা ছিলেন। আমাকে দেখে সবাই বলতে লাগলেন, ও মা, কী সুন্দর দেবতার মতো ছেলে হয়েছে গো; যেন সোনার গৌরাঙ্গ! সবাই খুব আদর আর আদিখ্যেতা করতে লাগল। ইংরেজি আর বাংলা খবরের কাগজে আমার জন্মাবার সংবাদ বিজ্ঞাপন হিসেবে ছাপা হল। সেই কাগজ সব এনে আমার মাকে দেখানো হল।

বিশাল বাড়ি, দাসদাসী, লোকজন। মটোর গাড়ি। কোথাও কোনও অভাব নেই। আমি বড় হতে লাগলুম। আমার মায়ের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রইল না। আয়ারাই আমাকে বড় করতে লাগল। আমার মা বড় বড় সব মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ এখানে মিটিং, কাল ওখানে। বস্তি উন্নয়ন, পানীয় জল সংরক্ষণ, নারীমুক্তি আন্দোলন। পৃথিবীতে বড়লোকের বউরা এইসব করে। করতে হয়। পার্টিতে যেতে হয়, ক্লাবে যেতে হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বন্যাত্রাণের চেক তুলে দেবার সময় হাসি হাসি মুখে ক্যামেরার দিকে তাকাতে হয়। এইসব কারণে আমার দিকে তাকাবার তেমন সময় ছিল না মায়ের। আপনি মানবশিশুকে যেভাবে রচনা করেছেন, তাতে শাবক অবস্থায় তারা একটু স্তন্যপান করতে চায়। সেই নেশায় আমি চিৎকার করতুম। তখন আমার সেই আয়া আমার মুখে তার স্তনটি গুঁজে দিত। তাকেই মনে হত আমার মা। সেই ধারাতেই আমি বড় হতে লাগলুম। আমার বাবাও ছিলেন এক বিচিত্র ধারার মানুষ। সকালে ব্যাবসায় ব্যস্ত, রাতে একটু পান-ভোজন, আমোদ-আহ্লাদ, ক্লাবে কি পার্টিতে। সেইখানেই সব মেলামেশা, নতুন ব্যাবসা, নতুন যোগাযোগ। আপনার পৃথিবীতে বড়লোকদের ভীষণ ক্লেশ। তাদের পেটের অবস্থা খুব খারাপ! কত কী যে সহ্য করতে হয় ওই কোমল উদরকে। চড়া চড়া পানীয়, গুচ্ছের পাখির টুকরো, চাকা চাকা মাছ। শেষে জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। মাঝ রাতে হুঁশ নেই, আর সকালে চড়া মেজাজ। একগাদা লোক, এক গাদা টাকাপয়সা নিয়ে কাজ কারবারে যা হয়। সকালে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল, অনেক রাতে একটা গাড়ি এসে ঢুকল। কে গেল? বাবা। কে এল? মত্ত বাবা। রাতে একটু দুমদাম, ধুমধাম হত। মাঝে মধ্যে। বড়লোকের মেজাজের ব্যারোমিটার অর্থের সঙ্গে বাঁধা। সামান্য উনিশ-বিশ

হলেই বিপদ। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই বিদেশে। আপনি জানেন, বিদেশে গেলে এদেশের মানুষের মাথা ঘুরে যায়। তবু মাঝে মধ্যে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হত, জন্মদিনে। বড়লোকের ছেলেদের জন্মদিনে খুব কেতা হয়; কেন তা জানেন প্রভু! ধনী পিতামাতা ছেলের ব্যাপারে একটা অপরাধবোধে ভোগে। ছেলেমেয়েকে তো এতটুকু সময় দিতে পারে না। নিজেদের নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। সেই অপরাধবোধ চাপা দেবার জন্যে ভাল ভাল উপহার, খেলনা, খাবার, আইসক্রিম, চকোলেট। জন্মদিনের ঘটা। সেই ঘটা দেখলে আপনারও জন্মাতে ইচ্ছে করবে। আলো জ্বলজ্বলে ঘর, সিলিং থেকে গোছা গোছা বেলুন ঝুলছে ট্যাপোর টোপর। জোড়া জোড়া মোজার মধ্যে নানারকমের উপহার ভরা। মাথার ওপর বিশাল এক রঙিন বাক্স। একটা দড়ি ধরে টানলে তলার ডালাটা খুলে যাবে আর হুড়হুড় করে পড়তে থাকবে নানারকমের টফি। চকচকে টেবিলে বিশাল এক কারুকার্য করা কেক। আবার বাতি জ্বালানো হবে সেই কেকের ওপর। ছেলের বন্ধুরা, নিমন্ত্রিতরা গোল হয়ে দাঁড়াবে। তারপর হঠাৎ সবাই তালি বাজাতে বাজাতে সরু মোটা গলায় গেয়ে উঠবে, হ্যাপপি বার্থডে টু ইউ। যারা একটু পান করে এসেছে, তারা কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকবে, হ্যাপপি বার্থডে টু ইউ। খোকা আজ জন্মেছে। ধাঁই ধাঁই বেলুন ফাটবে। বাচ্চারা মোজার ভেতর হাত ঢুকিয়ে উপহার বের করবে। ঝুলন্ত বাক্সের ডালা খুলে যাবে। চিৎকার, হল্লা। ফুস ফুঁয়ে বাতি নিববে। গদগদে কেকটাকে ছুরি দিয়ে খাবা খাবা করে কাটা হবে। ওদিকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে তিন-চারটি পথের শিশু। আপনার পৃথিবীতে ওইরকম ফেলাছড়া মানবশিশুর সংখ্যা অগণিত। এই পর্ব শেষ হবার পর বড়দের আলাদা পার্টি হবে। সেই ভোজাসরে গেলাসই বড় আকর্ষণ। অনেক মহিলাই আসেন তাঁর কোলের শিশুটিকে নিয়ে। শিশুটি খুঁতখুঁত শুরু করলে তাকে দু'চামচ হুইস্কি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে। মানুষের কেলেঙ্কারির কথা আর বলবেন না!

সেই বাড়িতে আমার একটা আলাদা ঘর ছিল। তার নাম নার্সারি। পৃথিবীতে মানুষ শিশুদের জন্যে, অভিজাত শিশুদের জন্যে কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছে, মিকিমাউস, ডোনাল্ড ডাক। আমার ঘরের দেয়ালে, তাকে, অর্থ খরচ করে, সেই সব আঁকানো হয়েছিল। বড়দের ধারণা ওইতেই আমি ভুলে থাকব। ভুলেও আমি তাকাতুম না। একপাশের দেয়ালে আটকানো ছিল ছোট্ট একটা মই। তার তলায় রবারের গদি। শিশুরা নাকি মই বেয়ে উঠতে ভালবাসে! হাবিজাবি প্রচুর খেলনা। সেই সব নিয়ে খেলার চেয়ে নতুন দাঁত দিয়ে চিবোতে ভাল লাগত আমার।

সেই ঘর থেকে একদিন আমি বেরিয়ে এলুম হেঁটে হেঁটে। আমার বালকত্ব শুরু হল। চোখ, কথা দুটোই ফুটেছে। মানবিক প্রবৃত্তি জেগেছে। ভাল লাগা, ভাল না লাগা, লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, দয়া। সেই বয়সে একদিন দেখি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, আমার ঠাকুরদাকে খুব ঘটা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধনিবাসে। বড়ঘরের বৃদ্ধদের আজকাল দামি বৃদ্ধনিবাসে রাখে পৃথিবীর মানুষ। বুড়োদের একটু নির্জনে একা থাকাই ভাল। তাতে আপনার চিন্তাটা ভাল আসে। আপনার ঋষিরা অবশ্য বানপ্রস্থের বিধানই রেখে এসেছেন। সেকালে স্বেচ্ছায় যেত, একালে ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যাবার সময় সেই বৃদ্ধ আমার দাড়ি ধরে বললেন, আসি দাদু। তাঁর আকাশের মতো দুটো চোখ। সেখানে দুঃখের চিল উড়ছে। সবাই বলে সবই আপনার খেলা। তা নয় স্বার্থের খেলা। স্বার্থও আর এক ঈশ্বর। অভিজ্ঞতা তাই বলে।

এইবার বেশ একটা মজা হল। আমার সেই বাবা হঠাৎ বখে গেল। জানি না এটা আপনার পরিকল্পনা কিনা, তবে মানব হিসেবে বলব, অর্থ হল শয়তান। শয়তানের চাকা গোল। মুদ্রাও গোল। অনেক মুদ্রায় মাথাও গোল। এক পার্টিতে আমার বাবা এক চিত্রাভিনেত্রীর পাল্লায় পড়ে গেলেন। সে তার সম্ভব, অসম্ভব শরীর দিয়ে আমার বাবারূপী খরগোশটিকে ফাঁদে ফেলে দিলে। বাবা নিজের ব্যাবসা গোল্লায় দিয়ে চলে গেল ফিল্ম লাইনে। দিন কাটতে লাগল সেই নায়িকার সঙ্গে। আলাদা বাড়িতে আলাদা ব্যবস্থা। হইহই করে টাকা উড়তে লাগল। কদাচিৎ বাড়িতে এলে মায়ের

সঙ্গে লেগে যেত ধুমধাড়াক্কা। কুৎসিত কাণ্ড। কাজের লোকেরা জড়ো হয়ে যেত একপাশে। আমি আর এক পাশে। আমার কথা ওদের কারওই মনে থাকত না। এমন সব বাক্য বিনিময় হত যা কোনও ভদ্রলোকের বলা উচিত নয়। মা আসলে লড়ত বাবার সঙ্গে নয় আর একজন মহিলার সঙ্গে। আপনারই পৃথিবীর আদিবাসী এলাকায় একটা পরব আছে। সেই উৎসবে জ্যান্ত ভেড়াকে ধরে দু'পক্ষে টানাটানি হয়। ভেড়াটা একসময় ফেঁড়ে যায়। একপাশে মা, একপাশে সেই কমলিনী নায়িকা, বাবারূপী ভেড়া ধরে ফাঁড়াফাঁড়ি করছে। একদিন মা এমন খেপে গেল, চিৎকার করে বললে, কী নেই আমার যা ওই মাগিটার আছে?

কী মজা প্রভু! পৃথিবীর সভ্য বাঙালি রেগে গেলেই মেয়েদের মাগি বলবে। একেবারে অবধারিত। মা যখন মাগি বললে তখন তো নিজেকেও মাগি বলা হল। তুলনা তো সমানে সমানেই হয়। মা চিৎকার করে বললে, এই দেখো আমার কী আছে! মা ফড়ফড় করে সব জামাকাপড় খুলে ফেললে। আমি ভয়ে চোখ ঢাকলুম। আমি তখন কিশোর, আমার মনে তখন নারীর ধারণা এসে গেছে।

আমার বাবা সেই সময় সর্বদা মদ খেয়ে থাকত। বাবা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিল, আলু, পটল, মুলো হলেই খাসা তরকারি হয় না। নুন চাই, মশলা চাই। তোমার সবই আছে। নেই সেক্স, নেই গ্ল্যামার। তুমি একটা কুমড়ো। বড়লোকের চালকুমড়ো।

মা পাগল হয়ে গেল। সেই যে বস্ত্রত্যাগ করল মা, সেই রাতেই মা পাগল হয়ে গেল। তিনটে বিকট চেহারার মেয়েছেলে এসে একটা ঘরে মাকে কয়েদ করে দিল। পৃথিবীর মানুষ বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। মানে আপনি বহন করেন। বাবার ভোগের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। মায়ের বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেছে অল্পদিনের ব্যবধানে। তারাও ছিল একই রকম। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। মায়ের ভাইয়েরা তখন বিষয়-সম্পত্তি ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। মায়ের এই অবস্থায় তাদেরও সুবিধে হল। বাবার সঙ্গে তৈরি হল আনহোলি অ্যালায়েন্স। ছোট শ্যালক আবার সিনেমায় নামবে বলে জামাইবাবুর পায়ে তেল দিত।

সেই তিন চেড়ি মাকে ধরে বেধড়ক পেটাত। আপনি জানেন আপনার পৃথিবীতে আপনি বেশ কিছু লেসবিয়ান ছেড়ে রেখেছেন। আপনি সত্যিই রসসম্রাট। ওই মহিলা তিনটি ছিল সেই প্রকৃতির। তিনজনকেই একরকম দেখতে। লম্বা, চওড়া, বিশাল নিতম্ব, বিশাল বুক। পুরুষালি মুখ। তারা বাবার বোতল থেকে মদ খেত। থেকে থেকে সিগারেট ধরাত। এইসব জিনিস একমাত্র বড়মানুষের সন্ধানেই থাকে। নেশা চড়ে গেলে তারা মায়ের কারাগারে গিয়ে ঢুকল। বন্ধ ঘরের ভেতর তারা কী করত কে জানে, মায়ের মুখে ব্যান্ডেজ বেঁধে। যাতে চিৎকার বেশি দূর না ছড়ায়। আমি ঘরের বাইরে বাগানের দিকে দাঁড়িয়ে চাপা চিৎকার শুনতুম। অসহ্য সেই গোঙানি। বুক আমার ফেটে যেত। মনে হত তিনটেকেই খুন করি। অনেক পরে ঘরের নর্দমা দিয়ে জল বেরিয়ে আসত কুলকুল করে। মেয়ে তিনটে পেতনির মতো হাসত। হায় মা পয়সাঅলার মেয়ে আর বউ হয়ে জীবনে তুমি কী পেলে? এ বাড়ি, ও বাড়ি দু'বাড়িই কায়দা করে মেরে ফেলতে চায়। বিষ দিয়ে, কি গুলি করে মারলে পুলিশে ধরবে। সপ্তাহে একদিন যমদূতের মতো একটা লোক আসত। সে নাকি ডাক্তার। তার হাতে থাকত হেলমেটের মতো একটা কী। অনেক তার। রবারের একটা ডান্ডা। কিছু ব্যান্ড। লোকটা আসত মাকে ইলেকট্রিক শক দিতে। তিনটে মেয়ে, লোকটা, আমার দানব পিতা আর আমার নায়ক নায়ক চেহারার ছোট মামা, সবাই মিলে ঘরে ঢুকে যেত। একদিন দরজা ভেজানো ছিল। আমি ফাঁক করে দেখছিলুম। মায়ের দাঁত ফাঁক করে রবারের ডান্ডাটা ঢুকিয়ে চোয়ালটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিলে। মাথায় পরিয়ে দিলে হেলমেট। একটা সুইচ অন করতেই মায়ের মুখটা লম্বা হয়ে গেল, শরীরটা বেঁকে চেয়ার থেকে ঠেলে উঠে পড়তে চাইল। মেয়ে তিনটে জোরে চেপে রাখল। মায়ের সেই মুখ, শরীরের সেই ভয়ংকর কাঁপুনি দেখে আমি চিৎকার করে উঠলুম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা বেরিয়ে এসে খপ করে আমার ঘাড় চেপে ধরল। তারপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেল ভৃত্যমহলের দিকে। সেখানে নিয়ে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে লাগল। ভৃত্যমহলে এক সাঁওতাল মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালবাসত। সে এসে জড়িয়ে ধরল। তার সেই সাদা শাড়ির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। চুলের তেলের গন্ধ। তার সেই দরাজ শক্ত বুক আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল এইটাই আমার জগৎ। ওই সিল্কের শাড়ি, নরম শরীর, সায়েবি পোশাকে ঢাকা অমানবগুলোই আপনার ওই সুন্দর পৃথিবীর আবর্জনা। সভ্যতাটাই এক পরিচ্ছন্ন অসভ্যতা। আমার বাবা মস্ত একটা ষাঁড়ের মতো চলে গেলেন। বুকে লুকোনো আমার সেই মুখ হঠাৎ গেয়ে উঠল— হ্যাপপি বার্থডে টু ইউ।

অভিজ্ঞতা বয়স হবার আগেই মনের বয়স অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। আমারও তাই হল। মাকে বাঁচাবার ক্ষমতা এ-বাড়ির কারও নেই। মা যদি পাগলি না হত, তা হলে একটা কিছু করা যেত। এরা মাকে ভাল করতে চায় না। ভাল করার নামে মেরে ফেলতে চায়।

বাবা এইবার মাঝে মাঝেই সেই অভিনেত্রীকে এ বাড়িতে আনতে লাগলেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতুম। একেই নাকি বলে সেক্স আর গ্ল্যামার। এর নাম তো অসভ্যতা! এই দুটো শব্দ বাবা আমার মাকে বলেছিল। নারী শরীর আমি তখন চিনতে শিখেছি। এই বাড়ির আদর্শ আমাকে চিনতে সাহায্য করেছে। মানুষের সেই সব নানা অসভ্যতার কথা আপনাকে আর কী বলব! সভ্যতাও আপনার অসভ্যতাও আপনার। যোগও আপনার, ভোগও আপনার। ওই সাঁওতাল রমণীকে দিয়ে আমার সভ্য বাবা তেল মালিশ করাতেন। শরীর ঠিক রাখার সে এক অতি বেঠিক ব্যবস্থা।

সেই নায়িকার পেঁয়াজখোসা শাড়ি। বুকের আঁচল সদাই খোলা। সেই বুকের দিকে তাকাতে আমারও ভয় করত। ঘাড়ছাঁট চুল। ভি-এর মতো পিঠ। বোতলের মতো কোমর পুরোটা খোলা। ঘটের মতো নিতম্ব। পাতলা শাড়ির তলায়, পাতলা অন্তর্বাসের ভাঁজ। ঠোঁট দুটো লাল। দীঘল শরীর। থেকে থেকেই বাবার গায়ে ঢলে পড়ছে। আঁচলের ঝাপটা মারছে। গন্ধ ওড়াচ্ছে। সে এক দৃশ্য! ভৃত্যদের ভিড় জমে যেত আড়ালে আবডালে। বাবা, হুলোবেড়াল সোহাগ পেলে যেমন করে, সেইরকম ঘড়ঘড় করত। বাড়ির এটা ওটা সেটা দেখিয়ে বলত, এ সবই তোমার হবে, সব, সব, তোমার। মহিলা অমনি কলাগাছের মতো হেলে পড়ত বাবার গায়ে। আমার কেবলই মন হত কে পাগল? আমার মা, না আমার বাবা!

একদিন! একদিন আমার মা দরজা খোলা পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। পেছনে ধর ধর করে ছুটছে সেই তিন মহিলার এক মহিলা। সেই সময় আমি মায়ের সামনে পড়ে গেলুম। আমি আসছিলুম উলটো দিক থেকে। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেল মেঝেতে। মায়ের শরীর হয়ে গেছে ঝাঁটা কাঠির মতো। মুখটা পোড়া পোড়া কালো। সামনের তিনটে দাঁত নেই। চোখে আতঙ্ক। মেয়েটা এসেই মায়ের চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। মা আমাকে জড়িয়ে আছে, আমিও মাকে জড়িয়ে আছি। কেউ কারওকে ছাড়ছে না। তেলা মেঝের ওপর দিয়ে মাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই সময় সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে নায়িকা। সে বলছে, ভারী সুন্দর সিনেমা। এই জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে এই অ্যাঙ্গেল থেকে শটটা নিতে পারলে দারুণ হবে।

ছুটে এল আর একটা মেয়ে। সে এসেই আমার পেছন দিক থেকে আমার শরীরের সবচেয়ে কোমল স্থানটা জোরে টিপে ধরতেই, মাকে ছেড়ে দিয়ে আমি গড়াতে গড়াতে একপাশে চলে গেলুম। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে শুনতে পেলুম বাবার গলা— ওয়েল ডান, ওয়েল ডান।

আমাদের তিনতলা বাড়ির ছাদটা ছিল খুব সুন্দর। কেউ তেমন উঠত না। সেই ছাদেই আমার আস্তানা হল। ছাদের ঘরেই আমার ঠাকুরদা থাকতেন। তাঁর ফেলে যাওয়া সব জিনিসপত্র ঘরেই পড়ে আছে। গাদাগাদা বই, খাতাপত্তর। বসার আরামকেদারা। ডায়েরি। নানা টুকিটাকি জিনিস।

আমি বসে বসে ধুলো আর ঝুল ঝাড়তুম। বিছানার চাদরটা পরিষ্কার করে ঝেড়ে আবার পেতে দিতুম। মানুষটি বেঁচে আছেন অথচ মনে হচ্ছে মারা গেছেন।

একদিন আলসে দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছি নীচের দিকে। দূরে গেট। দু'পাশে বাগান, মাঝে সদরে ঢোকার সিমেন্ট বাঁধানো পথ। আলসের জায়গায় জায়গায় বসানো ছিল সিমেন্ট জমানো বড় বড় ফুলগাছের টব। একটু খোঁদল করে তার ভেতরে বসানো। টবের আড়াল থেকে আমি দেখছি। ঝকঝকে একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। দু'হাতে নানা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এল আমার পরম পূজনীয় পিতা। সঙ্গে সেই নায়িকা। সেদিন সাজের ঘটা ছিল খুব সাংঘাতিক। সব একেবারে টকটকে লাল। দু'জনে গায়ে গা লাগিয়ে হাসতে হাসতে আসছে। ওদিকে একটা ঘরে মা আমার মরছে। আমার কানে তখনও ভাসছে সেই কথাটা ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। মাথায় খুন চেপে গেল। দেখি না, দুটোকেই একসঙ্গে মারা যায় কিনা! আপনি জানেন কিশোরদের প্রতিহিংসা একটু বেশি হয়। ওরা ভেতরে ঢোকার দরজার প্রায় কাছে এসে পড়েছে, আমি সেই বিশাল টবটাকে এক ধাক্কায় আলসে থেকে ফেলে দিলুম নীচে। ফেলে দিয়েই চোখ বুজিয়ে বসে পড়লুম আলসের পাঁচিলের পাশে।

ভীষণ একটা চিৎকার, বিকট একটা শব্দ। ভয়ে আমি একটা ছোট মার্বেলের মতো হয়ে গেলুম। নীচে একটা হইহই হচ্ছে। লোকজন সব ছুটে এসেছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে ছাদ থেকে পালাতে; কিন্তু শরীরে এতটুকু শক্তি নেই। আমি বেশ জানি তখনই কেউ ছাদে আসবে না। সকলেই জটলা করবে নীচে। তারপর হঠাৎ একজনের খেয়াল হবে। তখন সব ছুটে আসবে ছাদে। আমার খুব ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে মিশে যাই ভিড়ে। দেখি টবটা ঠিক ঠিক মাথায় পড়েছে কি না!

সেই সাঁওতাল মেয়েটি উঠে এল ছাদে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল আমার কাছে। কোনও কথা না বলে আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তার হাঁটা-চলা-তাকাবার ধরন দেখে আপনার মনে হত টবটা সেই ফেলেছে। দোতলায় কেউ নেই। সে আমাকে নিয়ে সোজা ঢুকে গেল দোতলার বাথরুমে। জামা-প্যান্ট খুলে দাঁড় করিয়ে দিল শাওয়ারের তলায়। সারা গায়ে জল পড়তেই আমার ভয় কেটে গেল কিছুটা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেউ কি মরেছে?'

'মেয়েলোকটা শেষ। বাবুর চোট লেগেছে।'

এইবার শব্দ পেলুম, দুমদাম করে সব ওপরে উঠছে। সেই সাঁওতালি মা আমাকে খুব করে সাবান মাখাতে মাখাতে ফিসফিস করে বললে, 'তুমি কোনও কথা বলবে না, যা বলবার আমি বলব। তুমি ছাদে ছিলে না। তোমার এই সময়টা চান করবার সময়।'

এরপর বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ল। বাথরুমে কে? সাঁওতালি মা আমার গম্ভীর গলায় বললে, 'খোকাবাবুকে চান করাচ্ছি।'

'দরজা খোলো।'

দরজা খুলে দিল। সামনেই উলঙ্গ আমি। বাইরে দাঁড়িয়ে বাবার ডান হাত, এ বাড়ির ম্যানেজার। আমার বেশ মজা লাগছিল। মেয়েটা মরেছে। বাবা বেঁচে আছে। খুব ভাল হয়েছে। ম্যানেজার আমাদের খবরটা জানাল, যেন আমরা জানি না। পরিষ্কার জামাপ্যান্ট পরিয়ে আমার সেই মা বললে, 'সোজা নীচে চলে যাও, ভালমানুষের মতো। কেউ কিছু বললে একটাও কথা বলবে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে বোকার মতো। যেন খুব ভয় পেয়েছ? একটা কথাও বলবে না। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম সেই মহিলার দিকে। পৃথিবীতে কে যে কার আপন, কে যে কার পর! চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে দিল। নেমে এলুম নীচে। মহিলার লাল পোশাক আরও লাল। মাথাটা খুলে গেছে। পড়ে আছে উপুড় হয়ে। জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো। বাবার একটা

পায়ের সব ক'টা আঙুল থেঁতো হয়ে গেছে। টবে একটা গোলাপ গাছ ছিল। একটা ফুল ফুটেছিল সাদা। সেটা লাল হয়ে গেছে রক্তে। মাটিসুদ্ধ ছিটকে গেছে একপাশে। বাবার কাঁধেও চোট লেগেছে।

সেই দৃশ্য দেখে সত্যিই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। অনেক পরে যখন আমার জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি সেই সাঁওতালি মায়ের বিছানায়। মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। চোখ মেলতে দেখেই বললে, খুব ভাল করেছ।

পুলিশ এসেছে, অ্যাম্বুলেন্স এসেছে। মৃতদেহের চারপাশে খড়ির গণ্ডি দিয়ে দেহটা তুলে নিয়ে গেছে। পুলিশ সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাবাকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। পুলিশ ছাদে উঠে সব দেখে এল। টবটা যে জায়গায় ছিল সেই জায়গাটা পরীক্ষা করলে। আমি একটা টফি খেয়ে কাগজের মোড়কটা ফেলেছিলুম সেটা তুলে নিলে। দাদুর ঘরটা তন্নতন্ন করে দেখলে।

টবটাকে জোরে ঠেলার সময় আলসের পাঁচিলের খানিকটা প্লাস্টারও ভেঙে পড়েছিল। আপনি আমাকে দিয়ে মহাপাপীদের যেমন সাজা দেওয়ালেন, তেমনি আবার বাঁচার পথটাও রাখলেন। পুলিশ প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জেরা করলে। সবাই বললে তারা কেউই ছাদে যায়নি। ছাদে কারওকে যেতেও দেখেনি।

আমাকে টফির মোড়কটা দেখিয়ে বললে, 'তুমি কখন ছাদে গিয়েছিলে?' আমি বললুম, 'কাল।' 'ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে?' আমার সাঁওতালি মা বললে, 'চান করার সময়, তাই আমি চান করাচ্ছিলুম।'

'এখনও চান করিয়ে দিতে হয়?'

'হ্যাঁ, যার যেমন অভ্যাস।'

নিজেদের মধ্যেই বলতে লাগল, খুন? না অ্যাকসিডেন্ট! খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে! এই খুনে কার লাভ? কারও না। পুলিশ এইসব বলতে বলতে তখনকার মতো চলে গেল। আমাকে তারা কোনও সন্দেহই করল না।

কিন্তু পুলিশ বাবাকে অ্যারেস্ট করল। বলতে চাইল, এটা দুর্ঘটনা হলেও সাংঘাতিক এক গাফিলতি। আলসের পাঁচিল কমজোর ছিল, অত বড় টবের ভার সহ্য করতে পারেনি। সেই অভিনেত্রীর মা এক সাংঘাতিক মহিলা, ক্ষতিপূরণ দাবি করে পালটা কেস ঠুকে দিল। কাগজে রিপোর্ট বেরোতে লাগল। মা যে সব মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা এইবার উঠে পড়ে লেগে গেল। কাগজে রিপোর্ট বেরোল মা পাগল নয় লম্পট ব্যাবসায়ী চক্রান্ত করে মাকে পাগল সাজিয়েছে। অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচারে মাকে প্রায় মেরেই ফেলেছে। তারাও একটা কেস করল। ঠিক এই সময় দাদু এলেন বৃদ্ধনিবাস থেকে। তিনি এসে আবার হাল ধরলেন। ম্যানেজারটাকে তাড়ালেন। সেই সাংঘাতিক মেয়ে তিনটে পুলিশের ভয়ে পালিয়েছিল। মায়ের বাপের বাড়ির সকলের বাড়ি ঢোকা বন্ধ করলেন। আর সেই অভিনেত্রীর মায়ের বিরুদ্ধে পালটা একটা কেস করলেন, মেয়ের অসৎ রোজগারের পয়সায় বেঁচে থাকার। তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। বৃদ্ধের তখনও কী শক্তি, কী বুদ্ধি! দাদু এসেই আমার মাকে মুক্তি দিলেন। মায়ের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। ব্যাবসাপত্তর, যা লাটে উঠে যাবার জোগাড় হয়েছিল, তার হাল ধরলেন শক্ত হাতে। সবই করলেন; কিন্তু বাবার জেল আর জরিমানা রদ করতে পারলেন না।

আমার কিন্তু খুব শরীর খারাপ হয়ে গেল। খুন তো একটা পাপ। রাতে ঘুমোতে পারি না। চোখ বুজলেই থেঁতলানো একটা শরীর। আর যাই হোক মহিলা সুন্দরী ছিলেন। আমার মায়ের চেয়ে লম্বা। ছিপছিপে। আমার সাঁওতালি মাকে ভাল করে সাজিয়ে ফরসা করলে যেমন হয়, সেইরকম। আমি পড়তে বসে ফ্যালফ্যাল করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি, একটা লাইনও পড়তে পারি না।

আপনি একটা নিয়ম করে রেখেছেন পৃথিবীতে, দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। লাইন দিয়ে মিছিল করে আসে। আমি মনে মনে ভাবছি একদিন অনেক রাতে আমার দাদুকে ছাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলব, না বলতে পারলে আমি মরে যাব। না বলে মরার চেয়ে বলে মরা ভাল। ঠিক সেইদিন দুপুরে বৃদ্ধ একটা চিঠি পেলেন। চিঠিটা তিন-চারবার পড়লেন। একজনকে ডেকে বললেন, এক কাপ চা দাও। চায়ে একটা চুমুক দিলেন। কাপটা হাত থেকে আলগা হয়ে গেল। বৃদ্ধের মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে। ডাক্তার এসে বললেন, সব শেষ, মারা গেছেন।

বহু লোকজন ছুটে এলেন। বাবাকে সবাই যেমন অশ্রদ্ধা করত, ঠাকুরদাকে সবাই তেমনি শ্রদ্ধা করত। বিশাল মিছিল করে আমরা শ্মশানে গেলুম। যাঁর আশ্রয়ে বেঁচে থাকব ভেবেছিলুম তিনি চলে গেলেন। সবাই ভাবলেন, বয়েস হয়েছিল, দুশ্চিন্তা, কাজের চাপ, হার্ট-অ্যাটাক। আমি জানতুম, এর কারণ একটা চিঠি।

অনেক কাগজের মধ্যে চিঠিটা ঢুকে গেছে। খুঁজে বের করতে হবে। জানতে হবে কারণটা। তন্নতন্ন করেও কাগজটা পেলুম না। মৃত্যুর কারণটা আমার জানা হল না। চিঠিটাই কিন্তু মৃত্যুর কারণ। আমার ধারণা। যতদূর মনে হয়েছিল বাবার হাতে পড়ে আমাদের ব্যাবসা সব ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। পয়সাঅলা লোকের পয়সাটাই হল হার্টের পাম্প।

আমার সেই সাঁওতালি মায়ের কোনও তুলনা ছিল না। পৃথিবীতে বারবার যাওয়া আসা করে এই ধারণাই হয়েছে, আপনি কখন যে কার ভেতর জেগে উঠবেন, সে আপনিই জানেন। লিলিফুলের মতো। সারা বছর যে জমিতে কিছুই নেই, বর্ষার জল পড়ামাত্র একটি কুঁড়ি মাথা তুলল, ধীরে ধীরে খুলে গেল একটি ফুল।

আমার মা, যার অত রূপ ছিল, অত আদর ছিল, ক্লাব, পার্টি, সমাজসেবা, শাড়ি, গয়না—কঙ্কালসার সেই মা, চুপ করে বসে থাকতেন একপাশে, সারাটা দিন। বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত। কী তাঁর পাপ, কেন এই পরিণতি, সে আপনিই জানেন। পৃথিবীর মানুষের একটিই সান্ত্বনা, ভগবানের মার, দুনিয়ার বার।

আমাদের চারপাশ থেকে ভোজবাজির মতো সব উড়ে গেল। পালিয়ে গেল কাজের লোকেরা। রয়ে গেল সেই সাঁওতালি মা। সে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল ভীষণ। সে ছিল আমার আকাশপ্রদীপ। সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করত, তুমি মারোনি, মেরেছেন ভগবান। মানে আপনি। আলসের পাঁচিলের চটা উঠে না গেলে টবটা তোমার পক্ষে ফেলা সম্ভব হত না। ওটা নিজে নিজেই পড়েছে। তুমি পড়ো, তোমাকে মানুষ হতে হবে, তোমাকে বড় হতে হবে।

আমার সেই সাঁওতালি মা ছিলেন খ্রিস্টান। একটু লেখাপড়াও করেছিলেন। বাবা ছিলেন কোলিয়ারির ফোরম্যান। একদিকে মা, একদিকে আমি, মাঝে সাঁওতালি মা। দুটো বছর চালাবার পর বাবা ফিরে এলেন। বুড়ো হয়ে গেছেন। সে চেহারা আর নেই। পাপ সকলের সহ্য হয় না। অনুশোচনা এসেছে। বাবাকে ক্ষমা করার মতো বোধটা মায়ের আর তখন নেই। আমার ঘৃণা তখনও সমান। ঠাকুরদা আমাকে বলেছিলেন, এ বাড়িতে পাপ ঢুকে গেছে, আর কিছু করার নেই। এইবার ধ্বংস। বাড়িটাই রইল। আর সব গেল।

আমি তখন যুবক। আমার একটা রোখ চেপে গেছে। আর কারও জন্যে নয়, আমার সাঁওতালি মায়ের জন্যে আমাকে মানুষ হতে হবে। স্থির চোখে যখন তাকিয়ে থাকত আমার দিকে, মনে হত আপনিই আমাকে দেখছেন। আমার বাবা দু'হাতে মাথার চুল খামচাতেন, আর ইস, ইস করতেন।

করা হয়ে যাবার পর মানুষের আর কিছু করার থাকে না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, তুমি আমার কাছে আসো না কেন? আমার এই দুঃসময়ে।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক প্রশ্ন বেরিয়ে এল, আমি কে?

তুমি আমার ছেলে।

আমি তো ভুলতে পারিনি সেদিনের কথা। জীবনের বিশ্রী অপমান। মা মাটিতে, আমি তার ওপরে। দু'জনে দু'জনকে আঁকড়ে ধরে আছি। একটা ষণ্ডা মেয়ে চুলের ঝুঁটি ধরে মাকে ঘষটাতে ঘষটাতে টেনে নিয়ে চলেছে। মা প্রায় বিবস্ত্রা। হঠাৎ আর এক ষণ্ডা মহিলা এসে আমার লজ্জার স্থানটা কষকষে করে টিপে ছেড়ে দিল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আজ যাকে ছেলে বলছেন, সেদিন তার নিগ্রহে উল্লাসে বলে উঠেছিলেন, ওয়েল ডান। ওয়েল ডান। আমি ভুলিনি, খোদাই হয়ে গেছে মনে।

লোকটা যেই বললে, তুমি আমার ছেলে। আমি অমনি বলে উঠলুম, ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। বলেই আমি পাগলের মতো হাসতে লাগলুম। লোকটার জন্যে আমার সামান্যতম দুঃখ হল না। পৃথিবীতে মানুষের জন্যে আপনি দু'ধরনের দুর্ভোগ রেখেছেন, পবিত্র ও অপবিত্র। সাত্ত্বিক আর তামসিক। সৎ, আদর্শবান, নির্লোভ, সাত্ত্বিক মানুষরা কষ্ট পাবেই। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মানুষ তাদের নির্যাতন করে। পরিবার পরিজন সুখে থাকে না। দিন চলে কোনওমতে। চাকরি করলে, বড়কর্তারা ধাতায় উঠতে বসতে। গোরু, ছাগল, গাধা বলে। খুবই কষ্টে থাকে তারা। দেখে অন্যের সব হচ্ছে, তার কিছুই হচ্ছে না। সে কিন্তু গ্রাহ্যই করে না। নিরন্তর সে যত কষ্ট পায়, ততই তার সঙ্গে আপনার ব্যবধান কমতে থাকে। রোগ, শোক, মৃত্যু, বিপর্যয়, অপমান অকৃপণ ধারায় আপনি ঢালতে থাকেন তার ওপর। সে অভিমান করে; কিন্তু ভুলেও আপনাকে গালাগাল দেয় না; বরং থেকে থেকেই বলে, খোদা মেহেরবান কিন্তু যাদের আপনি সোনার ল্যাঙট পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদের পান থেকে চুন খসলেই তেড়ে ওঠে, শালা ভগবান। এদের দুঃখ-কষ্ট, এই সাত্ত্বিকদের, বড় পবিত্র। জীবনটা যেন অহর্নিশ হোমের মতো। যত কষ্ট পায় তত ভগবান হয়। আর মাঝে মধ্যে মনের আনন্দে গেয়ে ওঠে। আপনার নিশ্চয় মনে নেই, রামপ্রসাদকে পাঠিয়েছিলেন নীচে। বিত্ত-সম্পদ কিছুই দেননি তাঁকে। তিনি অবশ্য কোনও কিছুর পরোয়াও করতেন না। মহাসাধক হয়েছিলেন। সাধনা করলে কী হয় জানেন! আপনার তো শুধু সৃষ্টিই কাজ, সাধনার কী বুঝবেন বলুন! মানুষ না হলে ভগবানকে বোঝা খুব দুঃসাধ্য। প্রজা না হলে রাজা বোঝা যায়! রামপ্রসাদের অনেক পরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন দুই মহাপুরুষকে একসঙ্গে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। জানি না, আপনার মনে আছে কিনা! বিবেকানন্দ সাধনা সম্পর্কে কী বলে এসেছেন শুনুন। মাঝে মাঝে আপনারও একটু ধর্মকথা শোনা ভাল। শুধু বসে বসে পলিটিক্স করছেন। বিবেকানন্দ আমাদের বলেছিলেন: তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, তুমি ক্রমশ হাসিখুশি হতে থাকবে। যদি কেউ গোমড়া মুখে থাকে— তবে তা বদহজমের জন্যে হতে পারে, কিন্তু তা ধর্ম নয়। দুঃখ-কষ্টের মুলে থাকে পাপ— আর কিছু নয়। রামপ্রসাদের সাধনা ছিল। তিনি দুঃখ নিয়ে হাসিমুখে খেলা করতেন। সারাদিন গান লিখতেন আর গান গাইতেন। কেউ আপনাকে পুরুষ ভাবে, কেউ রমণী। রামপ্রসাদ আপনাকে ভাবতেন মা। তিনি আপনার জগৎ-পরিকল্পনাটা বেশ ধরে ফেলেছিলেন,

জানি গো, জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত কারু গেঁটে সোনা ॥
কেহ যায় মা পালকি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥

জানি না আপনার কোনও আমলা গোমস্তা আছে কিনা! কোনও সেরেস্তা। কিন্তু পৃথিবীতে ভয়ংকর রকমের দুই দুই চলেছে। গোটাকতক বিপ্লব হয়েছিল, দুটো বিশ্বযুদ্ধ; কিন্তু অবস্থার হেরফের হয়নি। মাঝখান থেকে হল কী, আপনারই দুর্নাম। মানুষ একটা সমঝোতায় এল, চোররূপী নারায়ণ লোচ্চারূপী নারায়ণ। গড দি উইকেড, গড দি সিনার। আপনি ভেবেছিলেন বৈষম্য দিয়ে অবহেলিত মানুষের মনোবল ভেঙে দেবেন। সব গলায় দড়ি দেবে, বিষ খাবে, আপনি মজা করে

দেখবেন। যমরাজের নরক গুলজার হবে। আপনারই প্রিয় পুত্র গিয়ে আপনার পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়ে এলেন, বলে এলেন, যত লোক সুখ চায় দুঃখও চায় তত লোকই। এসো আমরা ভয়ংকরকে চাই ভয়ংকরের জন্যই। আমি ভয়ংকরকে ভয়ংকর বলে ভালবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি, দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো, অবিরত সংগ্রাম করো, প্রতিপদে পরাজয়, তবু সংগ্রাম করো। কোনও জন্মে আমি মহাপুরুষ হলে, এর সঙ্গে আর একটা লাইন যোগ করে আসব, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বানচাল করো। যেমন আপনার উপনিষদে ছিল মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। বিবেকানন্দ যোগ করে এলেন, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।

আমার বাবার ওই কুৎসিত, কদর্য চেহারা ওই কষ্ট ও পীড়নের মধ্যে পুণ্য ছিল না, ছিল পাপ। চারপাশে পড়ে আছে তার কৃতকর্মের বিষ্ঠা। লোকটার গায়ে ভাগাড়ের গন্ধ। চোখের সামনে দেখলুম আপনার দেওয়া ছোট্ট একটি পুংলিঙ্গ মানুষের কী সর্বনাশ করতে পারে! সেই কারণে মানুষ সর্বত্র বড় বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সেবা করে চলেছে। বাবা, সন্তুষ্ট থেকো, শান্ত থেকো। এই নিয়ে পৃথিবীর যত খুনখারাবি, জেল-জরিমানা, বিপর্যয় আত্মহত্যা, আসন থেকে পতন।

আমার সেই সাঁওতালি মা কিন্তু লোকটাকে লোচ্চারূপী নারায়ণ বলেই সেবা করত। আমার রাগ হত। মনে হত এই ধরনের লোকের মরে যাওয়াই উচিত। খুব কষ্ট পেয়ে। এই পিতাকে পিতা স্বর্গ বলা যায় না। ছাদের যে জায়গা থেকে টবটা ফেলেছিলুম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দেখতুম, লোকটা একটা রংচটা স্যুট পরে, হাতে একটা ভাঙা ব্রিফকেস নিয়ে পা টানতে টানতে, সামনে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে। ভাঙা কারবারে জোড়াতালি মারতে। যা হবার নয় তা কি আর হয়! বাজারে প্রচুর টাকা দেনা। পাওনাদারেরাই এইবার ছিঁড়ে খাবে। জ্যান্ত নায়িকা একপ্রস্থ দুয়েছে। মরে বাকিটুকু ফাঁক করে দিয়েছে।

একদিন আমি অদ্ভুত একটা ইতিহাস জানতে পারলুম। জেনে স্তম্ভিত। ওই সাঁওতালি মা আমার ঠাকুরদার অবৈধ কন্যা। কী আশ্চর্য! তার মানে আমার মা নয়, আমার পিসিমা। যে বাড়িতে সেবার আমি জন্মেছিলুম, সেই বাড়ির ভিতটাই তৈরি হয়েছিল পাপের ওপর। ওই সাঁওতালি মায়ের বাবা মাসে মাসে মোটা একটা টাকা ঠাকুরদার কাছে আদায় করত। লোকটার কাজই ছিল দুর্বল মানুষকে পাপের পথ দেখিয়ে পয়সা রোজগার। একটা খুনের দায়ে দশ বছর জেল হয়েছিল। সেই দশটা বছর ঠাকুরদা একটু শান্তি পেয়েছিলেন। লোকটা জেল থেকে বেরিয়েই দশ বছরের পাওনা মোটা একটা টাকা চেয়ে বসেছিল। সেই চিঠিটাই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ।

জগৎপালক! এইবার একটা গল্প শুনুন।

আপনি পৃথিবীতে পওহারীবাবা বলে এক মহাপুরুষকে পাঠিয়েছিলেন। কী জানি আপনার মনে আছে কিনা! পওহারীবাবার কুঠিয়ায় একবার এক চোর ঢুকেছিল। তাঁর জিনিসপত্র চুরি করে পালাবার মুহূর্তে পওহারীবাবার ঘুম ভেঙে যায়। চোর ভয় পেয়ে জিনিসপত্র ফেলেই পালাতে থাকে। পওহারীবাবা সেই জিনিসগুলি নিয়ে চোরের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকেন। এবং বহুদূরে গিয়ে চোরকে ধরে তার হাতে ওই জিনিসগুলি তুলে দিয়ে ফিরে আসেন।

এইবার শুনুন পরের ঘটনা। ওই যে আপনাকে বিবেকানন্দের কথা বলছিলুম, পৃথিবীতে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ যখন হিমালয়ে যান, এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন, সত্যিই তিনি উঁচুদরের সাধু। কিন্তু বিবেকানন্দ অবাক হয়ে গেলেন, যখন সেই সন্ন্যাসীর মুখে শুনলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যে পওহারীবাবার কুঠিয়ায় চুরি করতে গিয়েছিল। সাধুটি বলেছিলেন, পওহারীবাবা যখন আমায় নারায়ণজ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্বস্ব অর্পণ করলেন, তখন আমি আমার নিজের ভুল ও হীনতা বুঝতে পারলুম। সেই থেকে ঐহিক অর্থ ত্যাগ করে পারমার্থিক অর্থের সন্ধানে ঘুরতে লাগলুম।

আমার জীবনেও একই ঘটনা ঘটল। পাশের বাসা ছেড়ে এক ঝটকায় উড়ে চলে গেলুম বহু দূরে। বৃন্দাবনে। আমার সেই কুঠিয়া আজও আছে কিনা জানি না। আমাদের সেই পাপের প্রাসাদ! আমার সেই সাঁওতালি মাকে আর একবার পেতে ইচ্ছে করে। আমার জীবন আর তার জীবনে আপনার পৃথিবীর একটি সত্য প্রতিফলিত— পাপের মধ্যেও সাধুত্বের বীজ লুকিয়ে থাকে।

॥ ৫ ॥

এইবার আমার কী হল বলুন তো! তার আগে পৃথিবীর একটা গল্প শুনুন। বারাণসী বলে একটা মহাপুণ্যের জায়গা আছে আপনার পৃথিবীতে। সেখানে এক মহাসাধক ছিলেন। ভক্তরা এসে রোজই সেই সাধুকে ঘিরে বসত। চলত অনন্ত তত্ত্বকথা। সেই জমায়েতে মাঝে মাঝেই এক পাগলি এসে হাজির হত ধূমকেতুর মতো। ঝড়ের বেগে আসত, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেত, একটি মাত্র কথা সাধুকে বলে। সাধুর দাড়িটি ধরে নেড়ে দিয়ে বলত, ও সাধু মরণে সাবধান। সাধু ভাবতেন, পাগলি। পাগলির কথার কোনও মাথামুন্ডু থাকে। পাগলির কাণ্ড দেখে ভক্তরাও হাসত। এবার হল কী! সাধুর যাবার সময় হল। কুঠিয়ায় পড়ে আছেন কম্বলের ওপর চিত হয়ে। শুয়ে-শুয়ে দেখছেন কী! চালের বাতায় এক জোড়া জুতো গোঁজা রয়েছে। সাধুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। সেই জুতো জোড়া দেখতে দেখতে সাধুর তিরোধান।

পরের জন্মে সেই সাধু হলেন মুচি। সেই বারাণসী। পথের ধারে বসে, নেহাইয়ের ওপর জুতো রেখে পেরেক ঠোকে সেই মুচি। সেই পাগলি তখনও বেঁচে; আবার যেন ত্রিকালজ্ঞ। পাগলি মাঝে মাঝেই মুচির কাছে এসে বলে যায়, কী গো, কী বলেছিলুম তোমাকে? মুচি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

তা বৃন্দাবনের এক কুঞ্জে, আমিও মরার সময় ক্ষণকালের জন্যে আমার পাগলি মায়ের কথা ভেবেছিলুম। বাস, হয়ে গেল। এসে পড়লুম কলকাতার ফুটপাতে। এক পাগলির সন্তান। ভাবতে পারেন পৃথিবীর অবস্থা! ন্যাতাকানি পরা, নোংরা এক পাগলিরও সন্তান হয়! কে সেই মহাপুরুষ পিতা। কে-ই বা তাকে প্রসব করায়! ভগবান জানেন। মানে আপনিই জানেন।

এইবার দৃশ্যটা কল্পনা করুন। দেখার সৌভাগ্য তো হবে না কোনওদিন। ব্যস্ত কলকাতার রাজপথ। লোকারণ্য ফুটপাত। গাড়ি, ঠেলা, রিকশা। এক দগদগে পাগলি। প্রায় উদোম। এতটুকু একটা শিশু কোলে নিয়ে ঘুরছে। একপাশে তার ঠ্যাং, আর একপাশে তার হাতে ল্যাটরপ্যাটর করছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এই বুঝি খসে পড়ল কোল থেকে। পাগলি ফুটপাতের কিনারায় বসে বাচ্চাটার মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে বলছে, খা, খা, আমার কৃষ্ণ খা, আমার গোপাল খা, আমার পাঁঠা খা। কিছুক্ষণ পরেই তার মাথায় পাগলামির ঢেউ খেলে গেল। চ্যাট চ্যাট করে চড় মেরে পেছন ঠুকে বসিয়ে দিলে ফুটপাতে। আমি চিল চেঁচান চেঁচাতে লাগলুম। আমাকে লাথি মেরে চলে গেল সদা ব্যস্ত কলকাতার মানুষ। যত জোরেই চেঁচাই, শহর কলকাতার যান্ত্রিক শব্দের কাছে সে কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ। আমাকে ফেলে রেখে পাগলি চলে গেল ময়লার গাদায়। মুরগির মতো কিছু খুঁটে খেতে। প্রভু সত্যিই আপনি দয়ালু। সাধে মানুষ গান গায়, তুমি আপন হইতে হও আপনার। যার কেহ নাই তুমি আছ তার ॥ কত যে আবর্জনার স্তূপ করে রেখেছেন! যত দেবস্থান, তত আবর্জনাস্থান। মুরগি মানুষ সারাটা দিন সেই স্বর্ণখনিতে নানা অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পাশেই ঝুপড়ি। ঝুপড়ি থেকে আমার কাছে এগিয়ে এল এক কিশোরী। সে মুখের নানারকম শব্দ করে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। পাগলির অমনি মাতৃত্ব জেগে উঠল। ভাবলে তার নয়নের মণিকে বুঝি কেউ ছিনিয়ে নিতে এসেছে। আধলা ইট নিয়ে তেড়ে এল। এক দল বাচ্চা দূর থেকে খেপাতে লাগল, পাগলি তোর ছানা হয়েছে। আধলা ইটটা ছুড়তেই, ষণ্ডামার্কা, লুঙ্গি পরা

একটা লোক ছপটি হাতে বেরিয়ে এল একটা ঝুপড়ি থেকে। মায়ের খোলা চওড়া পিঠে মারতে লাগল সপাং সপাং করে। সোঁটা সোঁটা দাগ পড়ে গেল। কে জানে, ওই লোকটাই আমার বাবা ছিল কি না! আপনি জেনে রাখুন প্রভু, আপনার এই অনবদ্য সৃষ্টি মানুষ জাতির পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। দিনের আলোয়, সাদা চোখে তার কাছে যা ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, রাতের অন্ধকারে, লাল চোখে তাই পরম কাম্য। যে ব্রাহ্মণ দিনের বেলায় হরিজনের ছায়া মাড়ালে চান করতে ছোটে, সেই ব্রাহ্মণ রাতের বেলা এদিক ওদিক তাকিয়ে পুট করে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। লিঙ্গ সেবায় স্থান-কাল-পাত্র নেই। আপনার পৃথিবীতে বিজয়ীর বিজয় উৎসব হল গণ-ধর্ষণ। দেবোপম মানবকে আপনি এই মতিই দিয়েছেন। মহাপুরুষ মহাক্রোধে বলে গেলেন, ভারতের দুই মহাপাপ— মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।

পাগলি তখন আবার আমাকে টেঁকে নিয়ে এগিয়ে চলল। চওড়া পিঠের সোঁটা সোঁটা দাগে রক্ত ফুটেছে। পাগলি গিয়ে বসল জলভাসা-নর্দমার ধারে। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে আমাকে চান করাবে। সেই নোংরা জল তুলে আমার মাথায় থাবড়াচ্ছে আর বলছে, নে গঙ্গা, এই গঙ্গা। এইবার পাগলি হঠাৎ ছুটতে শুরু করল আমাকে নিয়ে; যেন ট্রেন ধরবে। চলে এল শহরের বিখ্যাত কালীমন্দিরের সামনে। বসে বসে আপন মনে গান গাইল কিছুক্ষণ। একটা ডাবের খোলা কুড়িয়ে নিয়ে আমার ঠোঁটের ওপর উপুড় করে দিয়ে বললে, নে খা জল খা, জল। ঝেঁপে বৃষ্টি এল। পাগলি হলে কী হবে, মা তো! ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল দিয়ে আমাকে ঢেকে নিজে ভিজতে লাগল বসে বসে। বৃষ্টি থামল। ফেলে দেওয়া একটা শুকনো মালা গলায় ঝুলিয়ে, নেচে নেচে গাইতে লাগল, রাধা হল শ্যাম।

সেবার খুব দুর্ভিক্ষ হল। গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোক এল শহরে। রোজ সকালে গাড়ি এসে পথের ধার থেকে দু'-দশটা মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। দেহ নয় কঙ্কাল। মাঝে মাঝেই আপনি পৃথিবীকে এইরকম মন্বন্তর উপহার দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর কোথাও আজও আছে সেই সংবাদচিত্র। যে চিত্রটি সেই সময় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। ফুটপাতে চিত হয়ে পড়ে আছে এক মহিলার নগ্ন মৃতদেহ। বুকের ওপর স্তন আঁকড়ে পড়ে আছে একটি শিশু। মাথার কাছে বসে আছে একটা কুকুর। ওই শিশু হলুম আমি। যার বুক আঁকড়ে আছি, সে আমার পাগলি মা। আমার মা তখন আবার পূর্ণ গর্ভবতী। আর কুকুরটা হল আমার মায়ের একমাত্র বন্ধু। কুকুরটাও গর্ভবতী। চিত্র-সাংবাদিক এই ছবিটার জন্যে অনেক ডলার পেয়েছিলেন।

আমাকে বক্ষচ্যুত করে নিয়ে গেল এক প্রতিষ্ঠান। আপনি কি জানেন প্রভু, চা, পাট, লোহালক্কড়ের মতো ভারতের অনাথ শিশু বিদেশে রপ্তানি হয়। আমিও রপ্তানি হয়ে গেলুম আমেরিকায়। আপনি ভাবছেন বেঁচে গেল ছেলেটা। বেঁচে গেলুম ঠিকই, তবে বেঁচে মরলুম। তরতরিয়ে কিশোর হলুম ভালমন্দ খেয়ে। পোশাক পরিচ্ছদের জেল্লাও বাড়ল। এইবার শুনুন কী হল! পৃথিবীতে আপনি এক জাতের মানুষ ছেড়ে রেখেছেন যাদের বলা হয় সমকামী। এও আপনার এক রসিকতা। কাজ নেই কম্ম নেই মানুষের এ কী কেলেঙ্কারি! এদের মধ্যে বড় বড় লেখক, কবি, শিল্পী, অভিনেতাও ছিল। জানেন তো পৃথিবীতে দু'শ্রেণির মানুষ আছে, আঁতেল আর অনাতেঁল। অনেকটা আঁটুল আর বাঁটুলের মতো। আঁতেলরা মানুষের এই প্রতিভা ভীষণ পছন্দ করে। প্রতিভার লক্ষণই হল উলটো কাজ করা।

আমার বরাতে এইরকমই এক প্রতিভা জুটে গেল। সে হে হে করে গান গাইত আর আমাকে পশুর মতো ব্যবহার করত। বিদ্রোহ করলেই বেধড়ক পেটাত। বিলিতি পেটানোর মধ্যেও অনেক অভিনবত্ব। কলকবজার দেশ। মানুষও সেখানে কলকবজা। বেশি সভ্য হলে বেশি অসভ্য হয়, এইটাই বোধহয় আপনার নিয়ম। আমি মাঝে মাঝে চার্চে যেতুম আর যিশুর দিকে না তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকতুম চুড়ার দিকে। উদ্ধত একটা ক্রশ। বিশাল এক ঘণ্টা। সব আসছে। প্রার্থনা করছে।

গাড়ি চেপে চলে যাচ্ছে, অথচ শান্তি নেই। সকলেরই পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র। প্রত্যেকেই তিন-চারবার বিয়ে করে। আমি আপনাকে স্মরণ করে কাঁদতুম। তখন আমার উলটো জীবনটা সোজা হল। ছিলুম গোরু, হলুম ষাঁড়। সেও এক বিপদ। নিঃসঙ্গ মধ্যবয়সি মহিলা অসংখ্য। তখন আবার প্রার্থনা। কে বলে প্রার্থনায় কাজ হয় না। আমেরিকা মুষ্টিযোদ্ধার দেশ। এক সন্ধ্যায় দৈত্যের মতো এক চ্যাম্পিয়ান, জাস্ট আউট অফ ফান একটা কাফের সামনে এক ঘুসিতে নক আউট করে দিলে। পৃথিবীর রিং থেকে ফিরে এলুম আপনার রিং-এ।

সভ্যতা খুব উন্নত হলে মানুষে আর ব্যাঙে খুব একটা তফাত থাকে না।

॥ ৬ ॥

এইবার আমি জন্মালুম এক খঞ্জ মৃৎশিল্পীর ঘরে। শিল্পী খঞ্জ হয়ে জন্মাননি। দুর্ঘটনাও কারণ নয়। কারণ, আমার যতদূর মনে হয়, আপনার ভয়ংকর পরিকল্পনা। গ্রামের অভাবী মানুষরা একটা ডাল খায়। নাম খেসারি। দামে সস্তা। বেশ সুস্বাদু। পেটে থাকেও অনেকক্ষণ। তা আপনার পৃথিবীটা তো বড় লোক, ক্ষমতাশালী লোকেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছে। তাদের ভাগে ভাগ বসাবার সাধ্য কারও নেই। তারা বেশ শক্ত মুঠোয় সব ধরে আছে। হাত দিয়ে জল গলে না। একমাত্র মোসায়েবদের তারা একটু পৃথিবীর প্রসাদ দেয়। সেও এক খেলা। আপনার কুকুর থাকলে আমি দেখিয়ে দিতুম মজাটা কেমন। একটা বিস্কুট একটু উঁচু করে ধরতে হয়। কুকুর মুখ উঁচু করে লাফাতে থাকে। কিছুতেই নাগাল পায় না। নাগালের মধ্যে এলেই মালিক হাতটা ওপরে টেনে নেয়। কুকুর ক্রমশই বেশি বেশি লাফাতে থাকে। উঁচু আরও উঁচু। পরিশ্রান্ত কুকুরের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। কুকুর তখন দেনেঅলার পায়ে মাথা ঘষতে থাকে। দেনেঅলা তখন খুশি হয়ে বিস্কুটটা মুখের কাছে ধরে! কুকুর কপ করে মুখে নিয়ে, আধচোখো হয়ে, বেসামাল দাঁত দিয়ে পাকলে পাকলে খায়। শেষ করেই পুটুর পুটুর লেজ নাড়তে থাকে।

আর মালিকের মেজাজ যদি খিঁচড়ে থাকে এক লাথি। তখন লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ। নিরীহ, পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় মানুষের বরাতে আপনি লিখে রেখেছেন, মোটা কাপড়, বোগড়া চালের ভাত, শাকপাতা সেদ্ধ, খেসারি, খড়ের চালা, মুক্ত আকাশ। পুকুর তাদের বাথটব। ডাঙা তাদের টয়লেট। শাড়ি জড়ানো একটা কঙ্কাল তাদের লীলাসঙ্গিনী। খাকি বিড়িই তাদের ফাইভ ফিফটি ফাইভ। বুকে আশার ব্রঙ্কাইটিস। চোখে স্বপ্নের বদলে ছানি। প্রেমসংগীত হল পারস্পারিক খিস্তিখেউড়। নৃত্য হল ঝ্যাঁটা খুন্তি নিয়ে চুলোচুলি। সমাধি হল শকুন আর শেয়ালের পাকস্থলী। উত্তরাধিকার হল বুড়ি মা আর মহাজনের ঋণ। আর ভবিষ্যৎ হল এক রাশ অপোগণ্ড। যাক আপনার ব্যবস্থার অনেক সমালোচনা, অনেক যুগ ধরে হয়েছে। বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মতোই আপনি কানে কিছু নেন না।

আমার শিল্পী পিতার শিল্পকর্ম ছিল অতুলনীয়। কিন্তু রোজগার ছিল যৎসামান্য। যৌবনকালে পৃথিবীর সেরেস্তায় কেরানি হবার মতো শিক্ষা অর্জনে মতি ছিল না। কী করে হবে! পৃথিবীর রূপ-রসকে ভালবেসেছে যে সে কি আর সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকতে পারে। নীল আকাশ: সবুজ সোনালি ধানখেত। আয়নার মতো পদ্মদিঘি। বৈশাখের কালো মেঘ। সনসন বাতাস। ডালে ঝুলে থাকা সিঁদুর আম। পুকুরঘাটে মধ্যাহ্নের ঝংকৃত নির্জনতায় সিক্ত বেগমপুরী লগ্ন, কাঁখে কলসি নায়িকা। ঘাটের ধাপে নিটোল একটি পা, জলে আর একটি। রোদে রেণু উড়ছে। শালুক আছে চোখ মেলে। মাছরাঙার মাছে মতি নেই। হাঁস থমকে আছে সাঁতার ভুলে। এত কবিতা যেখানে, সেখানে কত পাপ করলে, পাঠশালার খোঁয়াড়ে বসে দুলে দুলে পড়তে হয়, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ।

আমার পিতার পিতাও ছিলেন মৃৎশিল্পী। পৃথিবীর মানুষকে আপনি এইভাবেই জাতব্যাবসায় বিন্যস্ত করেছিলেন। অন্যদেশ জাতিভেদ করেনি। ভারত করেছে। হাড়ি, মুচি, ডোম, জোলা, মালা, তাঁতি। কামার কুমোর, ছুতোর। যে যেখানে আছে, যে পরিবারে বাঁধা পড়েছে, সেইখানেই তাকে পড়ে থাকতে হবে আজীবন। আর মাথার ওপর ডান্ডা ঘোরাবে আপনার পুরোহিতের দল। তারাই যেন হিন্দু ধর্মের এজেন্ট। আপনার বিবেকানন্দ সাংঘাতিক ধাক্কা মেরে এসেছিলেন। হিন্দুধর্মকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন. মুখের ওপর বলেছিলেন, হিন্দুধর্মের মতো আর কোনও ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনও ধর্ম এরূপ করে না। তা হলে বুঝতে পারছেন ভণ্ডামিটা কোথায়! ওখানে আপনিও ব্যাবসা। ভারতে মুচির ছেলে সারাজীবন জুতোই ঠুকবে প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবে না। ইয়োরোপে পারবে, আমেরিকায় পারবে।

যৌবনে আমার বাবা জাতব্যাবসা ছেড়ে যাত্রা করতে গিয়েছিল। ভাল গান গাইত। গান রচনা করতে পারত। পৃথিবীটা তো আসলে এক কাব্য। খেটে খুটে শেষ করেছিলেনও। ছাপাই, বাঁধাই, ছবি সবই উত্তম। কেবল বই-পোকায় যেমন বই কাটে, মানুষ পোকাতেও তেমনি আপনার মহাকাব্য ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। এখন যদি ইনসেক্টিসাইডের মতো হিউম্যানিসাইড স্প্রে করতে পারেন, তবে যদি কিছু হয়। অতীত, সংস্কার আর ভুল বোঝানোর ফলে মানুষগুলো সব অষ্টপাশে বাঁধা। ছেলে টেরি বাগিয়ে গান গায়, যাত্রা করে, মাটির তাল ছানে না, খড়-বাঁখারির কাঠামো বাঁধায় সাহায্য করে না। ঝাঁকায় করে পুতুল নিয়ে মেলায় যায় না, এ আবার কেমন কথা। ব্যাটা বখে গেছে। আমার প্রাচীন পন্থী ঠাকুরদা আমার বাবাকে একদিন আচ্ছা করে পেঁদিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। এক ছেলে গেল তো কী হয়েছে, আরও ছেলে আছে। গ্রামের অশিক্ষিত গরিব মানুষ ছেলেপুলে করতে ভয় পায় না। আপনার কথা বলে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। আয়, বছর বছর আয়, লাইন দিয়ে আয়। তারপর সেই, হারাধনের দশটি ছেলে। পৃথিবীর মানুষ বেশ মজার মজার ছড়া লেখে।

এই তাড়িয়ে দেওয়ায় বাবার মনে হয় ভালই হয়েছিল। অভাব থাকলেও বেশ একটা সুখের সংসার হয়েছিল। শিল্পীর সংসারের মতোই। যে গান গায়, যে অভিনয় করে, মাঝরাতে যাত্রার আসরে গলা কাঁপিয়ে বলে, তোমার তুলনা তুমি, রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফল চারু, সে মানুষ তো প্রেমে পড়বেই। আমার বাবা ভোরবেলা আপনার সিঁদুরে আমবাগানে গাভেরেন্ডার দাঁতন চিবোতে চিবোতে পুকুরঘাটের এক সিঁদুরে মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। প্রেমও এক পুষ্করিণী। ভাল সাঁতার না জানলে হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ করে মরতে হয়। বাবা ভালই সাঁতার জানত। আমাদের সেই প্রেমের গল্প বাবা হাসতে হাসতে বলত। তুলি দিয়ে মাটির কৃষ্ণে টানা টানা প্রেমিক চোখ আঁকতে আঁকতে আমাকে আর আমার দিদিকে সেই গল্প বলত। আপনার পৃথিবীতে যুবক-যুবতীর প্রেম সত্যিই বড় পবিত্র। বাবা যখন বলত মনে হত চাঁদের আলোয় আপনার পৃথিবীকে দেখছি। বাবা লোকটা সত্যিই খুব প্রেমিক ছিল।

বাবা গান গেয়ে প্রেম করেছিল। মা করেছিল চোখের ভাষায়। অনেকটা যাত্রার মতোই। সকালে শুরু সন্ধেতেই শেষ। সমাজ তো আর প্রেম মেনে নেবে না। বেশ ভালমন্দ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করবে। রাত যখন বেশ ঝেঁপে এসেছে, অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র, গ্রামের শেষ লণ্ঠনটি যখন নিবে গেল, তখন বাঁকড়া বটের তলায় মিলিত হল এক যুবতী ও এক যুবক। সাক্ষী বটের ডালে এক পেঁচক দম্পতি। এই প্রেমিক প্রেমিকাকে তারাই জানিয়েছিল শুভ্র যাত্রা। ভোরের সূর্য যখন উঠল, গ্রাম-প্রধানরা যখন জেগে উঠল অপরাধীরা তখন অনেক দূরে। একটা ছোট্ট স্টেশানের বাইরে তারা তখন চা-মিষ্টির দোকানের মাচায় বসে গরম কচুরি খাচ্ছে। কড়ায় জিলিপি বুজকুড়ি কাটছে। আমার সেই মা তখন আনন্দে পা দোলাচ্ছে। মাথায় আবার লাল ডুরে শাড়ির ঘোমটা

তুলেছে। টসটসে মুখে সূর্যের প্রথম আলো। কপালে এতখানি একটা গোল সিঁদুরের টিপ। সেই মাঝ রাতেই মায়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল বাবা। এক গ্রাম থেকে দূর গ্রামে যেতে হলে সাবধান হতে হবে। বউ ছাড়া এমনি একটা মেয়েকে নিয়ে খোলামেলা ঘুরলে ধোলাইয়ের সম্ভবনা।

বাবাকে তো তার বাবা দূর করেই দিয়েছিল। মায়ের বাবা ছিল, ডান্ডা ঘোরাত এক পিসি। পিসি ভোরে উঠে আকাশ-বাতাসকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে, গ্রামের গাছপালাকে মুড়ো-ঝ্যাঁটা দেখিয়ে, শেষে মায়ের বাবাকেই বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। মায়ের বাবা বড় ভোলেভালে মানুষ ছিল। তার কাজ ছিল গ্রামের এর বাড়ি ওর বাড়ি পালা-পার্বণের ভোজ খেয়ে বেড়ানো। আমার মা ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে। যে বটতলায়, মাঝ রাতে বাবা আর মা মিলিত হয়েছিল, সেই বটতলায় মায়ের বাবা এসে বসল। আগের রাতের আধ-খাওয়া বিড়িটা ধরাল। সদ্য ঘুম ভাঙা মনে ব্যাপারটা তেমন দাগ কাটেনি প্রথমে। পরে বেশ একটা দুঃখের ভাব এল। একটাই মেয়ে, মেয়েটা পালিয়ে গেল। পণ্ডিত মানুষ। হাতে একটা খোলামকুচি নিয়ে বিচারে বসল। কর্ম ও কর্মের বিচার, বিচার ও কর্ম, এই তো মানুষের একমাত্র কর্ম ঈশ্বরের পৃথিবীতে। বাকি সব অপকর্ম। মায়ের বাবা খোলামকুচি দিয়ে মাটিতে এক ছক কাটল। কেটে কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। তারপর বিচারটা এগোল এইভাবে— ধূম দেখলে বুঝতে হবে সেখানে বহ্নি আছে। সেইরকম কেউ পালালে বুঝতে হবে, সেখানে ফাঁক আছে। যেমন জাল থেকে মাছ পালালে বুঝতে হবে জালে ফুটো আছে। তা হলে প্রশ্নটা কী দাঁড়াচ্ছে। মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। অর্থাৎ বাড়ির কোথাও ফাঁক আছে। এইবার বিচার। পাখি জানলা দিয়ে পালাতে পারে। তর্ক— মানুষ পাখি নয়। সমাধান— মানুষ দরজা দিয়ে বেরোয়, অতএব দরজা দিয়ে সে পালাতেও পাবে। দরজাই হল দুর্বল স্থান। বাস্তব-বাড়ির দরজাটা অনেক দিনই নড়বড়ে হয়ে আছে। কর্তব্য— দরজা মেরামত করা।

মায়ের বাবা উঠে পড়লেন। সোজা চলে গেলেন ছুতোর পাড়ায়। সেখান থেকে এক মিস্ত্রি ধরে বাড়ি ফিরলেন। ছুতোর এসে দুমদাম করে দরজাটা যখন মাটিতে পেড়ে ফেলেছে তখন পিসি ফিরে এল পুকুরঘাট থেকে। এসেই বললে, এই রামের বাহনটা আবার কে? পণ্ডিত গাড়ু হাতে মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন, এক গাল হেসে বললেন, দুর্বল স্থানটা ধরে ফেলেছি। দুর্বলকে সবল করাই মানুষের কর্তব্য। সেই কর্তব্যই করছে ওই মিস্ত্রি, এইবার দেখি কার পিতার সাধ্য পালায়।

পিসি বললে, তোমার মুখে মুড়ো ঝ্যাঁটা। পালাবার আর আছেটা কে? এই বয়সে আমি পালাব নাকি রে মুখপোড়া! ভিজে কাপড়ে পিসি তেড়ে গেল। পণ্ডিত ছুটলেন মাঠের দিকে। যেতে যেতে বললেন— ন বেগং ধারয়েত ধীমান।

সেই দিনই চণ্ডীমণ্ডপে মোড়লদের সভা বসল। সিদ্ধান্ত হল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পতিত হয়েছে। নিচু ঘর থেকে মেয়ে আনার বিধান আছে; কিন্তু মেয়ে নিচু ঘরে গেলে, মেয়ের বংশ পতিত হয়। মায়ের বাবা হুঁকো খেতে খেতে শুনছিলেন বিধান। একজন ছোঁ মেরে হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে বললে, তুমি পতিত, তুমি পতিত। তোমার আর বামুন পাড়ায় থাকা চলবে না। এক পুকুরে চান চলবে না।

মায়ের বাবা অন্ধকার পথ ধরে ফিরে এল বাড়িতে। মায়ের পিসি অন্ধকার দোরগোড়া থেকেই গালাগাল দিতে দিতে পণ্ডিতকে ঘরে তুলল। সেদিন মাঝ রাতে অন্ধকার ঘরে পণ্ডিত ধেই ধেই করে নাচলেন। আবার মহাভারত হবে। আবার মহাভারত।

পিসি পাশের ঘর থেকে চিৎকার করে বললে, আর শিব-নৃত্য করে কী হবে! শুয়ে পড়ো। মেয়ে বড় হলে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোলে ওই হয়।

পণ্ডিত নাচছিলেন অন্য কারণে। ওই গ্রামে এক জেলেনি ছিল। যৌবন যাই যাই করলেও বড় আদি রসাত্মক। পণ্ডিত মাঝে মধ্যে একটু রসের কথা গোপনে বলে দেখেছেন, রমণী মৎস্যকন্যা হলেও রসগ্রহণে সক্ষম। দেবদ্বিজে ভক্তি অসীম। ওলাওঠায় পতিদেবতা মারা যাবার পর বড়ই

নিঃসঙ্গ; কারণ নিঃসন্তান। সকালে যাই করুক, সন্ধের দিকে বেশ পাতা পেড়ে চুল বাঁধে। পাছা পাড় শাড়ি পরে। সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকাদের মতো কবরীবন্ধন। তাতে আবার কুসুম মালিকা। নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত সেই রমণী। পণ্ডিতের স্ত্রীও গত হয়েছে অনেকদিন। বিধবা বোনের মুখঝামটাই হয়েছে জীবনের একমাত্র আনন্দ। সংস্কৃত রসসাহিত্যের রস হল আক্ষরিক। প্রত্যক্ষ রস সন্ধানের বাধা মেয়েটি রসিকের সঙ্গে চলে গেছে। বন্ধনযোগের অবসান। আবার সৌভাগ্যের চূড়ামণি যোগ, সমাজ পতিত করছে; অতএব মিলনে আর বাধা কোথায়।

পণ্ডিত গানের সুরে বললেন, দিদি তুই থাক এখানে, আমি যাই ওখানে। পণ্ডিত ঝড় ঝড় করে এক গাদা শ্লোক আউড়ে গেলেন, সবই সেই মৎস্যকন্যার উদ্দেশে— মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী। আসরের হাস্যোদর, বিম্বাধর রাশি। নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ। বাক্যসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ। তারপর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন— যা ব্যাটারা পতিত করেছিস তো ভাল করেই পতিত হই। পণ্ডিত যেন দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন— বিগলিত জঘন সঘনে বেণি দোলে। যেন পূর্ণশশী, পূর্ণশশী করে কোলে। পণ্ডিত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, কাঁচি দিয়ে নিজের শিখাটি কর্তন করে, জানলা দিয়ে দূর করে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন— যা, শালা লাউয়ের বোঁটা। এতদিনে একটু কথ্য ভাষায় অকথ্য কথা কইতে পারব। পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর এই স্তোত্রটি বলতে বলতে নিদ্রা— টংকার ধনুকশব্দ টোটাই মা বলে। টলটল কাঁপে দেহ টাঙ্গি মারে গলে। টিকি ধরে টানে টনটন করে শির। টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর।

আমার বাবা আর মা নতুন গ্রামে গিয়ে নতুন সংসার পেতে বসলেন। ভাল মানুষের সময় সময় সহায় সম্বল জুটিয়ে দেন আপনি। এক মজার বুড়ি জুটেছিল তাদের জীবনে। পাকা পেয়ারার মতো চেহারা। কাঁচা পাকা চুল। সব সময় হাসত। বুড়ি বলত আমি ভগবানের শত্রু। মানে আপনার শত্রু। বলত, সে ব্যাটা আমাকে যত কাঁদাতে চায়, আমি ততই হাসি। এই এত নিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন শূন্য। সব সে নিয়েছে। ভেবেছিল পায়ে ধরব। ধরিনি। দেখি মানুষ বড় না, দেবতা বড়। বুড়ির একটা ছোটখাটো আশ্রম ছিল। নাম দিয়েছিল মানবাশ্রম। সেই আশ্রমে আপনার পুজো হত না। পৃথিবীর ক্যালেন্ডার কোম্পানি আপনার যে-সব ছবি ছাপে, তার একটাও ছিল না সেই আশ্রমের দেয়ালে। গ্রামের মেয়েরা জড়ো হত সেখানে। তৈরি হত তালপাতার পাখা, ঝুড়ি, কুলো মোড়া। সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ হত। আচার, পাঁপড় তৈরি হত। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো হত।

আমার মাকে সেই মহিলা ভীষণ ভালবাসতেন। বলতেন, তুমি সাহস করে জাত ভেঙেছ। এ এক বড় আন্দোলন। ওই হুঁকো ফোঁকা পুরুত, আর চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ-প্রধানদের বঙ্গোপসাগরের জলে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে না পারলে হিন্দুধর্মটা ছোবড়া হয়ে যাবে। বাবাকে বলতেন, 'তোর চেয়ে তোর বউ অনেক বড়। শক্তিকে ধারণ করার শক্তি অর্জন কর। শুধু টেরি বাগিয়ে যাত্রার আসরে হা রে রে রে করে হাত-পা নাড়লে হবে না। এখানে ওই শিশু আর কিশোরদের সঙ্গে নিত্য পড়তে বোস। শিক্ষার কোনও বয়েস নেই। শিক্ষায় কোনও লজ্জা নেই। তিনি বিবেকানন্দের সেই উক্তিটি বলতে বলতে কেমন যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠতেন— যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্যে কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।

পৃথিবীতে মানুয কোনও কোনও মানুষকে দেবতার মতো পুজো করে। তার কারণ আছে, আপনার পৃথিবীতে আপনি তো এক কেঠো জগন্নাথ। মন্দির মসজিদ, গির্জা, মূর্তি, উপদেশ আর পাঁজা পাঁজা বই। সেখানটা তো আপনি চালাচ্ছেন রিমোট কন্ট্রোলে।

সেই বৃদ্ধাই ছিলেন আমার বাবা আর মায়ের জীবনের রূপকার। আমার মা অবশ্য বাবার চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছিল। শিখেছিল নানারকম হাতের কাজ। বাবাকে যাত্রা ছাড়িয়ে পাঠানো হয়েছিল ভাল করে মাটির কাজ শিখতে। মূর্তি আর পুতুল গড়া শিখতে। সেই কাজটা বাবা ভীষণ ভাল শিখেছিল। আমার সেই বাবা বলত, মানুষের জীবনে গুরুর ভীষণ প্রয়োজন। ওই ফুসমন্তর দেওয়া গুরু নয়।

খুব মজার একটা গল্প বলত বাবা। শুনবেন নাকি। তা শুনুন এতই যখন শুনেছেন। গুরু সেবায় বসেছেন। চমৎকার আসন। সামনে থালায় চুড়ো করে সাজানো ফুরফুরে অন্ন। থালা ঘিরে বসেছে পঞ্চ ব্যঞ্জন সাজানো বাটি। গরম ভাতে পড়েছে গব্য ঘৃত। সামনে পাখা হাতে বসে আছে কৃষক বধূ। গুরুদেব ভাতে হাত দিয়েই হাতটি টেনে নিলেন। বসে আছেন। বড়ই যেন চিন্তাক্লিষ্ট। মুখে তুলছেন না। কৃষক বধূ ভয়ে পেয়ে গেল— কী হল গুরুদেব! কোনও অনাচার! মুখে তুলুন। গ্রহণ করুন, তা না হলে যে পরিবারের এক অকল্যাণ হয়।

গুরু বললেন, গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু একটি শর্ত আছে।

কী শর্ত গুরুদেব?

আমি আসার পূর্বে তোমার গুরুমাতাকে কথা দিয়ে এসেছি, তার জন্যে একটি নথ আনব। সেই নথ নিয়ে আমি যদি বাড়ি না ফিরি তা হলে যে বাক্য-লঙ্ঘন হয়। সে তো মহাপাপ। তা তুমি কি মা একটি নথের ব্যবস্থা করতে পারবে! যদি পারো, তবেই আমি তোমার নিবেদন গ্রহণ করতে পারি।

মানে কী ভাতে হাত দিয়ে গুরুদেব যেই মুখ তুলেছেন, অমনি তাঁর নজরে পড়েছে কৃষকবধূর নাকে বেশ ভরিখানেক সোনার একটি পুরুষ্ট নথ ঝুলছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেছে পরিকল্পনা।

কৃষকবধূ বললে, ঠিক আছে গুরুদেব, আপনি অন্ন প্রসাদ করুন। নথ আপনি পাবেন। গুরুদেব আশা পেয়ে গপাগপ খেতে শুরু করলেন। ওদিকে কৃষকবধূ নাক থেকে তার সাধের নথটি খুলে, একটু মুছে টুছে কাগজে মুড়ে গুরুদেবকে নিবেদন করল। গুরু অমনি জয়স্তু বলে, ছাতা বগলে সরে পড়লেন।

এদিকে সন্ধের মুখে চাষ থেকে কৃষক ফিরে এসে দেখে, বাড়িটা বেশ গোছগাছ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বউকে জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপার! বউ বললে, জানো তো আজ গুরুদেব এসেছিলেন কৃপা করে। তার মুখে এক গাল হাসি।

কৃষক উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলে, ঠিকমতো সেবাদি করিয়েছিস তো!

তারপরেই তার নজর চলে গেল বউয়ের নাকের দিকে— ও বউ তোর নথ।

আর বোলো না নথ গুরুদেব নিয়ে গেছেন।

কৃষক বললে, অ্যাঁ, সে কী, গুরুদেব তো মন্ত্র দিয়েছিলেন কানে! নিতে হলে তিনি কানেরটা নিন, নাকেরটা নিয়ে গেলেন কেন? নাকে তো মন্ত্র দেননি!

আপনার পৃথিবীতে সদ্‌গুরু, অসদ্‌গুরু, দু'ধরনের গুরুই আছেন। একদল লুটেপুটে খাচ্ছেন, আমাদের সামনে ঘুরছেন আপনার ভেক পরে। চেনার উপায় নেই।

আমার মা পেয়েছিলেন সেই আশ্রমের রান্নাঘরের ভার। বাবা হয়েছিলেন, বাজার সরকার। বাজার করার পর পাই পয়সার হিসেব মিলিয়ে দিতেন। সেই দেখে আশ্রমের মা বলেছিলেন— তোমার ভেতরে ধর্ম আছে। এইবার শিক্ষা দিয়ে কর্ম দিয়ে সেইটাকে জাগাও। বাবার ওপর ভার পড়েছিল ছেলে-মেয়েদের দেশাত্মবোধক গান শেখাবার। সেই সব গান বাবা খুব জানতেন।

আপনার পৃথিবীতে আবার মজা কতরকম! দু'ধরনের দেশ করে রেখেছেন, স্বাধীন আর পরাধীন। আপনার রচনায় কালো চামড়ারাই বেশি মার খায়। আপনাকে কেউ দেখেনি কোনওদিন, তবু বলে সাদারাই নাকি ভগবান। ভগবান মানে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, হান্টার, বুটের লাথি,

শৃঙ্খল, কৃতদাস, পাশবিক অত্যাচার, নারীধর্ষণ, লুটপাট, রাজ্যজয়, গণহত্যা, শিকার, নিরীহ পশু বধ, দুর্জয় ভোগ। হায় ভগবান।

তখন চলেছে ঘোর স্বদেশি আমল। সেই সময় বাবা ঢুকে পড়লেন মুকুন্দদাসের দলে! আপনার রেকর্ড দেখুন নামটা হয়তো পাবেন। সে বেশ মজা! আসর লোকে লোকারণ্য, গান ধরেছেন মুকুন্দ—

বাবু বুঝবে কি আর মলে—
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা ॥
চোখের ওই চশমা জোড়া, দেখ না বাবু খুলে ॥
আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম,
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি—
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ॥

খবর এল ইংরেজের পুলিশ আসছে, টাক ডুমাড়ুম ঘোড়া ছুটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি সভা হয়ে গেল ধর্মপালার আসর। মুকুন্দ দাস জপের মালা ঘোরাচ্ছেন আর গাইছেন—

তুলসী পিদ্‌নে হরি মিলে তো,
হাম পিদ্‌নে ঝাড়,
পাথর পূজলে হরি মিলে তো,
হাম্ পূজে পাহাড়,
নিত্ নাহনে হরি মিলে তো,
জলজন্তু হই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো
বাদুড় বাদুড়ি ॥

পুলিশ সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে চলে গেল। শামিয়ানার দড়িটড়ি সব কেটে দিয়েছিল। সে সব ঠিকঠাক করে মুকুন্দ দাস ফুৎকার ছাড়লেন—

ফুলার—আর কী দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে।
মন তো তোমার নয় ॥

সেই সময় এই ইংরেজ অসুরটিকেও আপনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন ইংরেজের পুলিশ চড়াও হল বাবার সেই মায়ের আশ্রমে। সব তছনছ করি দিলে। বইপত্তর পুড়িয়ে দিলে। মায়ের গোপন স্থান থেকে টেনে বের করে আনলে এক পিস্তল। একটা ডায়েরি ছিল রান্নাঘরের চালায় লুকোনো। সেটাকে ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করলে। পুলিশ এমন এমন সব জায়গায় হাত দিলে, যেন আগে থেকেই তাদের কেউ বলে দিয়েছিল। আর সত্যিই তাই। আমার মা জানত। আশ্রম থেকে যে-পরিবার সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছিল সেই পরিবারেরই এক কর্তা হয়েছিল পুলিশের ইনফর্মার। আশ্রমের মাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমার বাবা আর মাকে হাসতে হাসতে বলে গিয়েছিলেন, যাক কিছুটা তো হল। আমি চললুম। কিন্তু তোরা রইলি। মানুষ যাবেই, থাকবে কর্ম। বাবাকে বললেন, শোন, তোর বউই তোর গুরু। ওর সংস্কার তোর চেয়ে অনেক ভাল।

ওই সময় আমার দিদি জন্মাল। বাবার ঘুরে ঘুরে স্বদেশি গান গেয়ে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। বাবা এইবার এক জায়গায় স্থিত হলেন। পৃথিবীর সব বড়লোক জমিদারই খারাপ হয় না। শিক্ষিত জমিদারদের মধ্যে অনেকে ভালও ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে বাবা যে গ্রামে এলেন, সে গ্রাম বেশ

বর্ধিষ্ণু। এককালে একটা নদী বহে যেত সেই গ্রামের পাশ দিয়ে। চওড়া, বিশাল জাহাজ ঢুকত। পর্তুগিজদের সঙ্গে ব্যাবসা বাণিজ্য হত। আপনার ওখানে আমি দু'রকমের জমিদার দেখে এলুম। ওই সাবানের মতো আর কী! সাবান যেরকম দু'জাতের তৈরি করেছে মানুষ। গায়ে মাখা, আর কাপড় কাচা। সেইরকম আর কী! এক জমিদার বেলা বারোটায় ঘুম থেকে উঠে, একটু এদিক ওদিক করে ফরাসে গা এলিয়ে বসল। নায়েব কিছু প্রজাকে চাবকাতে চাবকাতে নিয়ে এল। তারা সব খাজনা-মাজনা দেয়নি। একেই পৃথিবীতে বলে, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। জমিদারটা হল আপনার, আর এক মানুষের বাচ্চা বলে কিনা জমিদারি তার। আসলে আপনার বিশ্বজোড়া অতুল সম্পদ কিন্তু দেখ-ভাল করার কোনও দপ্তর নেই আপনার। সব জবরদখল হয়ে আছে। জমিদার গোঁফ চোমড়াতে চোমড়াতে কাকের গলায় বলবে—কী রে ব্যাটারা! খুব সাহস! খাজনা কই? পেলা কই? প্রজারা অমনি ভেউ ভেউ করে বলবে, হুজুর তিন মরশুম অজন্মা হুজুর। জমিদারের কেন কাকের গলা বলুন তো। তারা আপনার নদীর জল, ঝরনার জল, কুয়োর জল কিছুই খায় না। পেটে সহ্য হয় না। তারা খায় হুস্কি। হুস্কি কাকে বলে জানেন! পেটে দু'-দশ পাত্তর পড়লেই, পরের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী মনে হয়ে শরীরের একটা জায়গা ভীষণ আঁকুপাঁকু করতে থাকে। আর নিজের স্ত্রীকে ইচ্ছে করে লাথাতে। প্রজার ভেউ ভেউ শুনে, তাকিয়াশায়ী জমিদার অমনি বলবে, মার শালাকে। দুটো লেঠেল অমনি তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে, তার খাঁচা মার্কা বুকে বাঁশ ডলতে থাকবে। বেচারার পরনে খেটে লুঙ্গি। গলায় মলিন একটা গামছা। লুঙ্গিটা ততক্ষণে লজ্জাস্থান থেকে ওপরে উঠে গেছে। দলিত প্রজারূপী সেই মানবসন্তানটি চাপের চোটে জল বিয়োগ করে ফেলবে। সেই দৃশ্য দেখে আপনার জমিদাররূপী মানব সন্তানটির খুব আমোদ হবে। সে অমনি ভুঁড়ি নাচিয়ে বেদম হাসতে হাসতে বলবে ছেড়ে দে শালাকে। ছেড়ে দে, ব্যাটা পেচ্ছাপ করে ফেলেছে।

তা এই জমিদারের সঙ্গে আপনি একটু সাহিত্য শুনুন। পশ্চিমবাংলার সাহিত্য। বাংলায় পাঠিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। এই আসার আগেই দেখে এলাম সমান জনপ্রিয়। গ্রাম বাংলার এক ব্রাহ্মণ জমিদার আর এক দীনদরিদ্র মুসলমান চাষি আর তার ষাঁড়ের গল্প। চাষির নাম গফুর। আর তার ষাঁড়ের নাম মহেশ। গফুরের কেউ নেই, আছে একটি মাত্র মেয়ে, নাম আমিনা।

বৈশাখের গ্রামের বর্ণনাটা একবার শুনুন পিতা। বুঝতে পারবেন কী সুখের জায়গা। সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মতো তাহাদের সর্পিল উর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে যেন নেশা লাগে।

এও আপনার পক্ষপাত। সাদা চামড়ার দেশটাকে করলেন শীতল স্বর্গ, আর কালাদের দেশটাকে করলেন গরম আগুন। থাক সে যা করেছেন করেছেন। এখন গফুর মিঞার কাহিনি শুনুন। গফুরের কিচ্ছু নেই। চাষের জমিতে জন খাটে। যা পাবার তার কিছুই পায় না। ধার আছে বলে, সেই ব্রাহ্মণ জমিদার সব কেড়ে নিয়ে নিজের গোলা ভরে। ওই গ্রামে সুখী দু'জন, এক, জমিদার স্বয়ং, দুই, পুরোহিত শ্রেণি, যারা যজমানি করে। গফুরের হাঁড়ি চড়ে না। গফুর অসুস্থ। সারাদিন মহেশ বাঁধা থাকে খোলা মাঠে খোঁটার সঙ্গে। নিজেই খেতে পায় না, তো মহেশকে খাওয়াবে। ভাতের ফেনটা পর্যন্ত নেই যে ধরে দেবে। চালায় যে ক'টা খড় আছে তাই টেনে বের করে মহেশের সামনে ধরে দেয় কখনও। মেয়ে বাপকে বকে। চালাটা যে এবার পড়ে যাবে বাবা। মাঝে মাঝে জ্বর হয়েছে, এই ছুতো করে নিজের একমুঠো ভাত মহেশকে ধরে দেয়। মহেশকে ছেড়ে দিলে, অন্যের বাগানে ঢুকে গাছপালা খায়। তারা এসে গফুরকে গালাগাল দেয়। মহেশকে মাঝে মাঝে খোঁয়াড়ে দিয়ে আসে। গফুর সানকি বাঁধা রেখে টাকার জোগাড় করে মহেশকে ছাড়িয়ে আনে। সেই মহেশ জমিদারের বাগানে ঢুকে গাছপালা খেয়ে এসেছে। সেদিন ঘরে চাল নেই, আমিনা বাপের জন্যে রাঁধতে

পারেনি। গফুর মাঠ থেকে ফিরে সেকথা শুনে ক্ষিপ্ত। তখন এক ঘটি জল চেয়েছে খাবার। জলও নেই। মা-মরা মেয়ে আমিনার গালে গফুর মেরেছে এক চড়।

কেন জল নেই শুনবেন? সাহিত্যিকের ভাষাতেই শুনুন, জমিদার শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু'-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমন ভিড়. বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে।

গফুর মেয়েকে মেরে মন খারাপ করে বসে আছে, এমন সময় জমিদারের পেয়াদা এসেছে। যেন যমদূত— গফরা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি, কেন?

বাবুমশাই ডাকচেন, আয়?

গফুর কহিল, আমার খাওয়াদাওয়া হয়নি, পরে যাব।

এতবড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

ঘণ্টাখানেক পরে গফুর প্রচণ্ড ধোলাই খেয়ে চোখমুখ লাল করে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল ঘরে। মহেশ আবার জমিদারের বাগানে ঢুকেছিল। গফুরের মাথায় আবার খুন চেপে গেল। লাঙলের হাতল দিয়ে মহেশের মাথায় মারল এক ঘা। একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটো তাহার যত দূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কী করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

কেমন শুনছেন জগৎপালক পৃথিবীর গল্প। পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ জোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

সেদিন অনেক রাতে মেয়েকে ঘুম থেকে টেনে তুলে গফুর গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে গিয়ে দাঁড়াল সেই বাবলা গাছের তলায়, যেখানে বাঁধা থাকত মহেশ। ঝিমঝিম রাত। নিস্তব্ধ গ্রাম।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল— ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

এইবার লেখক শেষ করছেন, অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল— আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাফ কোরো না।

এই হল গিয়ে আপনার পৃথিবীর এক ক্লাসের জমিদার। প্রজা নিপীড়নের পর মোসায়েবেরা রাতের আমোদের পরিকল্পনা ছকবে। কার ঘরের, কোন গরিবের সুন্দরী বউকে পুকুরঘাটে স্পট করা গেছে। প্রথমে তার শরীরের যথোচিত বর্ণনা দেওয়া হবে। বঙ্গনারীর তিন শত্রু, নিতম্ব, স্তন আর কেশদাম। আমি যে-কালের কথা বলছি, সেকালের মহিলাদের অন্তর্বাস পরিধানের রেওয়াজ ছিল না। চরিত্রহীনারা সেই সব পরবে। সতীসাবিত্রীর পরিধেয় ফ্যারফেরে একটি শাড়ি। খোলা জায়গায় স্নান। তা না হলে লম্পট অশিক্ষিত, গ্রাম্য ধনবান আর রসিক পণ্ডিতদের জীবন যে বড়

নীরস হয়ে যায়! পাথরের থালায় আলতা ঢেলে কুলবধূ তার ওপর বসত। পশ্চাদ্দেশ রাঙা হয়ে উঠত। তার উপরে একটি মাত্র জালি শাড়ি। পুরুষদের শরীর কামোষ্ণ হয়ে উঠত। আর সেই রক্তিম আকর্ষণেই আমাদের আগমন। পুনরাগমন। পুনঃপুনঃ যাতায়াত। এই অমৃত-পুত্র আপনার সেই উপনিষদোক্ত অমৃত-পুত্র আলোকশিশু অবশ্যই নয়। চুল্লু-পুত্র। ভেতরে সবসময় গজগজ করছে— মন্থনদণ্ডের মন্থনেচ্ছা। ওই পাঠশালায় সারাটা জীবন একটাই কবিতা— যাচ্ছ বাছা দুলিয়ে পাছা রাঙিয়ে আমার মন। মরার আগে কোথায় বলবে আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, তা নয়, গাম্বিতলার পাঁচি এ জন্মে পারলুম না তোকে ময়দা চটকান চটকাতে, সামনের বার তোকে কে বাঁচায়, আঁশবঁটি না মুড়ো ঝাঁটা। জমিদার মশাই এইবার তৈলমর্দনান্তে স্নান সেরে আহারে বসবেন। এদেরও মা থাকে। তিনি বসবেন সামনে পাখা হাতে— আহা বাছা, যে ধর্মের ষাঁড়, মুশকো শরীর ভেঙে না পড়ে। গোটা অঞ্চলের ক'জন সতীরই বা সতীত্ব নাশ করতে পেরেছে। এখনও যে অনেকে ঘাপটি মেরে আছে বাপধন। তোমার বাপের ফিগার হাজার উঠেছিল। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। এ কার ওঠা জগৎ-পিতা? আপনি কচি খোকা নন, আশা করি বুঝতেই পেরেছেন। তা হলে আমাদের ওই পৃথিবীর একটা ভক্তি-গীত শুনুন, যাকে বলে ভজন:

কোহি জাতকো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
এক্কি মানসে, কালী মাইকো, পাঁআওমে করো সেবা।
বাবা, পাঁওমে করো সেবা ॥
যব, হি যেসা, আয়ে মনমে, তেসসে করো ভোগ।
ছোড় দেও সব, ধূর্তকো বাৎ, তুক্কা যাগ যোগ ॥
বাবা, তুক্কা যাগ যোগ ॥
আর কী নারী, পর কী নারী, যেসকি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি হ্যায়, কাম দেও কি রঙ্গ ॥
বাবা, কাম দেও কি রঙ্গ ॥
এসমে পাপ, ওসমে পুণ্য, এহো ধূর্ত কি বাৎ।
মরণ সে যব মুক্ত হয় তব,
পাপ যাগা কোন সাৎ ॥
বাবা, পাপা যাগা কোন সাৎ ॥
দিন দিন দিন, গাওমে ঢালো, সবহু গঙ্গাজল।
তবু তেরে কি শোধন হোয়েগা, জঠরভরা সব মল ॥
বাবা, জঠরভরা সব মল ॥
কামবাজারসে লুট করো সব, কাঁহে রহতো ভাক্কা,
এহি লোগমে, ভোগ করো সব, কাঁহা পরলোগ ফাক্কা ॥
বাবা কাঁহা পরলোগ ফাক্কা ॥
কালী হামারা প্রাণপেয়ারা, কালী হামারা জান।
কালীকো পাঁআওমে, প্রণৎ করো সব, আউর না জানো আন।
বাবা, আউর না জানো আন ॥

আর এক শ্রেণির জমিদার ছিলেন, সংখ্যায় খুবই কম, তবে পরহিতব্রতী, শিক্ষিত। জমিদারি মেজাজ ছিল। মানুষকে হয়তো ইতর জ্ঞানও করতেন। তবে সেই সময় মধ্যবিত্ত থেকে সাংঘাতিক সব প্রতিভা বেরোতে শুরু করেছে। ইংরেজ শাসন-শোষণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বার্তা এনেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালিকে একটু সমীহের চোখে দেখা শুরু হয়েছে।

এই জমিদারেরা একটু সায়েব-সুবো ঘেঁষা ছিলেন। লাইব্রেরি করতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেন, পুকুর বাঁধাতেন। মেধাবী গরিব ছেলেদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করতেন। ঠিক নিঃস্বার্থ নয়, নামের মোহ ছিল। ইতালীয় ধাঁচে বড় বড় বাড়ি তৈরি করাতেন। সাহিত্য-সেবা করতেন। তীর্থে ধর্মশালা স্বদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তাঁদের ছিল। অনেকে মেম বিয়ে করতেন। সেই সময় স্বদেশি আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন দু'রকম কংগ্রেস— নরম ও গরম। নরমরা পাটভাঙা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মাথায় তেকোনা টুপি লাগিয়ে কেবল সভা করতেন। সেসব সভার লক্ষগন্ডা কমিটি, কোনওটার নাম স্টিয়ারিং, কোনওটার প্ল্যানিং, কোনওটার রিসেপশান, কোনওটার অ্যাকশান, কোনওটার অ্যাডভাইসারি। ভাল ভাল জায়গায় মিটিং হত। রাজ্যের জমিদার এসে জড়ো হতেন। রিপোর্ট, মেমোর্যান্ডাম, রেজলিউশান, সর্বোপরি পদ নিয়ে দলাদলি, কাদা ছোড়াছুড়ি, জুতো পেটাপিটি। একদিকে এই আর একদিকে শাসকশ্রেণির সঙ্গে দহরম-মহরম, খেতাব আদায়ের কসরত-– লর্ড, স্যার, রায়বাহাদুর মান্যসর্দার, রাজা-নবাব। এও আপনার সেই মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বোল হরি বোল। ইংরেজ এদের আন্দোলনের আলুর পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। বিপ্লব-বিপ্লব খেলা। অনেক আবেদন-নিবেদনে এঁদের কেউ কেউ জেলে যেতেন বা নজরবন্দি হতেন। জেলে বসে, হয় ভারত-আবিষ্কার করতেন না হয় আত্মজীবনী লিখতেন, না হয় ছেলেমেয়েকে লিখতেন পাতার পর পাতা চিঠি। সেই সব পরে বই হয়ে বেরোত। ইংরেজের চোখে যাঁরা ছিলেন প্রকৃত ভয়ের তাদের মেরে ফেলত ছারপোকার মতো টিপে।

এইরকম এক বদান্য ভদ্র জমিদারের সাহায্য পেয়েছিল আমার বাবা আর মা। পেয়েছিল ওই স্বদেশি মায়ের জন্যে। ইংরেজ পুলিশ আশ্রম চৌপাট করে দিলে। মানুষ অশিক্ষা আর কুসংস্কারে মজে থাকবে, ওঝা রোগ সারাবে, ধাই সন্তান ছিঁড়ে বের করবে, ডাইনি বলে মানুষ মানুষকে পিটিয়ে মারবে। তবেই না শাসনের সুবিধে। সিন্নি দেখে এগোবে, কোঁতকা দেখে পেছোবে, সেখানে এসব কী? হাতের কাজ শেখানো, লেখাপড়া শেখানো, আত্মরক্ষার কলাকৌশল শেখানো। মানুষের মনে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধার ভাব জাগানো। হিন্দুধর্মের চিরকাল বরাত-বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে প্রশ্ন করতে শেখানো— কেন এমন হবে? যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস, তাদের চিনতে শেখানো। এ তো বড়লোকের বিপ্লবের পুতুল খেলা নয়, এই তো প্রকৃত বিপ্লব, ধীর কিন্তু নিশ্চিত।

একটা পুকুর একখণ্ড জমি, সুন্দর একটা ছবির মতো চালা। বারবার সংসার। বোনটা যখন হামা টানতে শুরু করেছে, তখন আমার আগমন। আপনার পৃথিবীতে ভাল মানুষ বোধহয় বেশি দিন বাঁচে না। আর সেই মানুষ যখন পরোপকার শুরু করেন, তখন তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। এক ঝড়ের রাতে জমিদার হঠাৎ মারা গেলেন। সকালে উঠে গ্রামের লোক দেখলে বিশাল একটা গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়ে আছে রাস্তাজুড়ে আর পিলপিল করে লোক চলেছে জমিদারবাড়ির দিকে। সকলেরই চোখে জল। সেই আপনার তুলসীদাস বলে এসেছিলেন, এইসি করনি কর চলো, যে তুম হাসে জগ রোয়ে। জমিদারবাবুর সব কিছু চলে গেল কোর্ট অফ ওয়ার্ডে।

আমি যখন বড় হলুম তখন বিশাল জমিদারবাড়ি এক ধ্বংসস্তূপ। বিশাল দেউড়ির দু'পাশের দুই মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে। মরচে ধরা লোহা বেয়ে লতিয়ে উঠেছে তেলাকুচো। ছাদের মাথায় পাথুরে সিংহও রোগা কঙ্কালসার। জমিদারবাবুর ল্যান্ডো গাড়িটাকে গ্রাস করেছে আগাছা। চালটা পাঁপড় ভাজার মতো মুড়মুড়ে। বিশাল চাকা দুটো দেবে গেছে মাটিতে।

আমি আর আমার দিদি ভাঙা পাঁচিলের গর্ত দিয়ে ঢুকে যেতুম ভেতরে। অজস্র ফড়িং আর প্রজাপতি ডানায় রোদ মেখে চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছে। পরমপিতা! আপনি মাইরি এমন একটা লোক, আপনার ধ্বংসটাও এক কবিতা। আপনার অনাসৃষ্টিটাও এক মহান সৃষ্টি। আপনি এইবার নিজের জলরঙের ছবি নিজেই অবলোকন করার চেষ্টা করুন, আমার বর্ণনায়। গাছাগাছালির ঝোপে এক কিশোর আর কিশোরী। কিশোরীর পরনে প্যাঁচ মেরে আছে আট হাতি ডুরে শাড়ি। সিঁদুরে

রঙের জমিতে হলুদের ডোরা। প্রজাপতি উড়ছে, আমার দিদিটাও যেন উড়ছে। আমার দিদিকে যে কী সুন্দর করে গড়েছিলেন আপনি! শাক-পাতা-ডাল-ভাত খেয়েও সুন্দর হওয়া যায় যদি আপনি ভেতরে সৌন্দর্যের বীজ বুনে দেন। আমার বাবা দুর্গা ঠাকুরের মুখে মায়ের মুখ বসাত আর মা লক্ষ্মীর মুখে দিদির মুখ। সেই গাছগাছালির ফাঁকে, কিশোর আর কিশোরীর নিষ্পাপ দুটি মুখ দিঘির কালো জলের মতো টলটলে দু'জোড়া চোখ। পেছনে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আসা সেই ল্যান্ডোটার একটা চাকা। তার পেছনে জমিদার বাড়ির অক্ষত একটা থাম। ভাঙা ভাঙা ছাদ। ছাদের মাথায় সেই দুঃখী সিংহ। ওইভাবে আটকে না গেলে সে কবেই লাফিয়ে তার অরণ্যে চলে যেত।

দিদিই বলেছিল, এইটা সেই কর্ণের রথ। চাকাটা দেবে গেছে। আমরা দু'জনে অবাক হয়ে সেই রথটা দেখতুম। দেখতে দেখতে পাগলি দিদিটা আমার ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেলত। মোমের মতো গাল বেয়ে মুক্তোর দানার মতো, একটা দুটো তিনটে জলের ফোঁটা গড়িয়ে যেত। আমি অমনি দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলতুম, কাঁদছিস কেন রে দিদি? দিদি অমনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘাসের ওপর বসে পড়ত। তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে উঠত গাঢ় সবুজ গঙ্গা ফড়িং। ঠিক যেন ডানাঅলা ঘোড়া।

আমরা দু'জনে জড়াজড়ি করে খানিক কেঁদে নিতুম। মা আমাদের রাত্তির বেলায় দাওয়ায়, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে মহাভারতের গল্প বলত। একপাশে আমি ঢলে আছি, আর একপাশে দিদি। মায়ের কোলে জড়াজড়ি হয়ে আছে আমাদের তিনটে হাত। কত রাত পর্যন্ত আমাদের গল্প হত। মা আবার গল্প বলতে বলতে একটু অভিনয়ও করত। যার যার কথা ঠিক ঠিক তার মতো করেই বলত। কখনও একটু গান গেয়ে উঠত। কখনও একটু কেঁদে নিত। সামনে পড়ে আছে আপনার পৃথিবী। চাঁদের আলোর গোলাপি ওড়না মোড়া। ইস্পাত রঙের আকাশে সবচেয়ে বড় তারাটা অতীতের মতো জ্বলছে। সিরসির করে বইছে আত্মার মতো বাতাস। দূরে বহু দূরে স্কুল ভাঙা ছেলেদের মতো হইহই করে উঠত একপাল শেয়াল। আমাদের খুব ভয় হত। শুনতে পেতুম শকুনির হাড়ের পাশা চালার শব্দ। আমাদের খুব ভয় করত। মনে ভেসে উঠত ভাঙা বিশাল জমিদার বাড়ি। মনে হত ওইটাই সেই ধৃতরাষ্ট্রের বাড়ি। মা আমাদের যখন গল্প বলতেন, বাবা তখন ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় পালা লিখতেন। বাবার সেই পালার শ্রোতা ছিলেন আমার মা। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে অভিনয় করতেন, তখন আমি আর দিদি শ্রোতা। যে জায়গাটায় আমাদের ভাল লাগত, সেই জায়গায় আমরা চটাপট চটাপট হাততালি দিয়ে উঠতুম। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আর মায়ের খুব উৎসাহ বেড়ে যেত। যেন বিরাট এক আসরে তাবা অভিনয় করছে। পরমপিতা! কল্পনাও ঈশ্বর। মানুষ যখন ভাল কিছু কল্পনা করতে পারে তখন সে আপনাকে পায়।

সেই কল্পনা আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখত। সেই ভাঙা গাড়িটাকে কর্ণের রথ ভেবে আমরা খুব খানিক কাঁদাকাটা করতুম। ভাঙা আসনের তলায় ছিল বেঁজির বাসা। মা-টা বেরিয়ে এসে জুলজুল করে আমাদের দেখত। দিদির কুচকুচে চুল ভরা মাথার চারপাশে কাগজের টুকরোর মতো জোড়া জোড়া প্রজাপতি উড়ত।

এরপর আমরা লাল লাল তেলাকুচো ফল তুলে দু'-এক কামড় খাওয়ার চেষ্টা করতুম। খুব একটা খারাপ লাগত না, তবে বেশি খেলে গা গুলোত। আমরা অবাক হয়ে দেখতুম তিরতিরে ঝোঁটন বুলবুলি কাঁউ কাঁউ করে তেলাকুচো খাচ্ছে। খাওয়ার আবেগে মাঝে মাঝে ফল সমেত মাটিতে পড়ে যাচ্ছে বোকার মতো। আমরা দু'জনে খলখলিয়ে হেসে উঠতুম। পাখিটা লজ্জা পেয়ে ঝোপের আড়ালে লুকোত। একটা কাঠবেড়ালি কোথা থেকে এসে লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে খুব ধমক ধামক দিয়ে ছুটে চলে যেত তার কাজে। এমন সময় সিঁসিঁ করে ডাক শুনে আমবা আকাশের দিকে তাকাতুম। একেবারে ঘন নীল। জমিদার বাড়ির চিলেগম্বুজ আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। তার মাথায় এসে বসেছে সেই চিল। যেমন তার চেহারা, তেমনি তার ডাক। দিদি অমনি বলত, লুকিয়ে পড়

ভাই, লুকিয়ে পড়। চিলকে দিদি ভীষণ ভয় পেত। চিল একবার তার হাত থেকে ছোঁ মেরে রুটি নিয়ে গিয়েছিল। দিদি মনে করত চিলই হল ঈগল পাখি।

ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে যেতুম জমিদার বাড়ির সামনের বারান্দায়। থামের আড়াল থেকে ভেতরে তাকাতুম। বিশাল হলঘর। যেখানে যেখানে ছাদ ঝুলে পড়েছে, সেখান দিয়ে সূর্যের আলো ফলার মতো নেমে এসেছে। কত ধুলো, কত ঝুল। ধুলোর ওপর আঁকাবাঁকা রেখা। দিদি বলত, সাপ আছে। মনে হয় অজগর। দেখ, কেমন চলে গেছে এঁকেবেঁকে। দিদি ভেতরের ছাদের ভেঙে পড়া অংশটার দিকে তাকিয়ে বলত, অর্জুন বাণ মেরে ভেঙে দিয়েছে।

আরও ভেতরে যেতে আমাদের খুব ইচ্ছে করত। ভয়ে যেতুম না। একদিন আমরা কিছুটা গিয়েছিলুম, হঠাৎ কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল খুব ভারী গলায়— কী চাই? ভেতরে কত কী রয়েছে, কত ঘর, কত দালান, চোর কুঠুরি। আমাদের দেখার উপায় ছিল না। সিঁড়ি উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে ওপরে। বাঁকের মুখে লম্বা এক জানলা। সেই জানলার তখনও কিছু রঙিন কাচ ছিল। কী সুন্দর রং। আমরা হাঁ করে দেখতুম। হঠাৎ কিছু পায়রা ফড়ফড় করে উড়ে যেত এদিক থেকে ওদিকে। চড়াই ডেকে উঠত চিপচিপ। কী তার ঝংকার! হঠাৎ শুরু হত পায়রার হুংকার। টুইট টুইট করে তাল বাজাত টুনটুনি। দিদির কী আনন্দ! বলত, গানের আসর শুরু হল। পেছন দিকে কোথাও একটা ভাঙা টিন ঝুলত। বাতাসে সেটা অমনি কাঁসরের মতো বেজে উঠত।

পরমেশ্বর! শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন, ঠিক ওই সময়টাতেই জমিদারবাবুর মন্দিরের পূজারতি হত। পৃথিবীতে আপনার পূজা আপনিই করেন। আমরা তখন বাগানের অন্য ধারে, অন্য আয়োজনের মধ্যে চলে যেতুম। বড় বড় আমগাছ। শ্যাওলা ধরা ইয়া মোটা মোটা গুঁড়ি। তলাটা অন্ধকার মতো। স্যাঁতসেঁতে। গাছগুলো সব বুড়ো হয়ে গেছে। একটা-দুটো আম হয়তো হয়। একটা তিতির লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে, শিকারের সন্ধানে। এক জায়গায় এক ঝাঁক ছাতারে পাঠশালা বসিয়েছে। শালিক হাঁটছে বড়বাবুর মতো। এইসব পেরিয়ে আমরা চলে যেতুম একেবারে বাগানের শেষ মাথায়। সেখানে ছোট্ট একটা ঘর ছিল। আশ্চর্য, সেই ঘরটা কিন্তু ভাল ছিল। ভেঙে পড়েনি। মোটা গরাদ লাগাল ছোট্ট একটা জানলা। খুবই অপরিষ্কার। কিন্তু ঘরের মধ্যে লোহার একটা খাট। মরচে ধরে লাল। দেয়ালে পোঁতা গোল দুটো আংটা। ভারী একটা চেন ঝুলছে। জমিদারবাবুর জ্যাঠামশাই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘোর উন্মাদ। তাঁকে এই ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হত। বাবার মুখে শুনেছি, তিনি মাঝ রাতে হা হা করে হাসতেন। আমরা সেই ঘরটার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম বহুক্ষণ। মোটা গরাদ, মোটা চেন, মরচে ধরা লোহার খাট। ঘরের কোণে একটা লোহার ডান্ডা। সাদা দেয়ালে অজস্র লেখা, চেরা চেরা সব আঁকিবুঁকি। মন্দ লোকে বলত, জমিদারবাবুর বাবা ধুতরো ফল আর কাঁচা সিদ্ধি একসঙ্গে বেটে খাইয়ে খাইয়ে মানুষটাকে পাগল করে দিয়েছিল। তা পৃথিবীতে পয়সার জন্যে মানুষ সব পারে।

আমরা অনেকক্ষণ পরে ঘরটাকে প্রণাম করে ছুটতে ছুটতে চলে যেতুম পুকুরের দিকে। এইবার শুরু হত আমার দিদির সংসারের কাজ। জলের ধারে ধারে হয়ে আছে কলমি, ব্রাহ্মী, থানকুনি। দিদি নেমে গেল পা পর্যন্ত জলে। সেখান থেকে কেবল আমাকে সাবধান করত, লক্ষ্মী ভাই, জলে নামবি না ভাই, আমি শাক ক'টা তুলে নিই ভাই। আর আমি বলতুম, দিদি রে খুব সাবধান রে ভাই, পিছলে বেশি জলে চলে যাসনি ভাই। তোর আঁচলটা আমাকে দে আমি টেনে ধরে থাকি। দিদি বলত, না রে, আমি অল্প অল্প সাঁতার জানি। আমি জলে নামব কী, দিদির ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। মনে মনে আপনাকে আমি ডাকতুম। মনে হত ঘরের কোণে বহুকালের যে লোহার ডান্ডাটা রয়েছে, সেটাকে এনে বলি দিদি, আমি এদিকটা ধরি তুই ওদিকটা এক হাতে ধরে আর এক হাতে তোল। ঘরে ঢোকারই সাহস ছিল না, তো ডান্ডা! আমার মাথায় হরেক শাকপাতার বোঝা, দিদি এবার চলল বাগানের শেষ মাথায়। সেখানে ভাঙা পাঁচিলে ডুমুরের জঙ্গল। দিদি

এইবার থোকা থোকা আঙুরের মতো বড় বড় ডুমুর তুলতে শুরু করল। আমি তখন কেবল চিৎকার করতুম, দিদি, তুই ভাঙা পাঁচিলে উঠিস না। দিদি, ওপাশে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। গাছ-পাতার আড়ালে দিদির লাল ডুরে শাড়ি দেখতে পাচ্ছি, কখনও হাত, কখনও পাতার আড়াল থেকে টুকটুকে মুখটা বের করে বলছে, তুই ঝোপের ভেতর আসিস না ভাই, সাপ থাকতে পারে। পাঁচিলের ফাটল থেকে ঝুলছে লম্বা এক সাপের খোলস। দিদির সাপে ভয় ছিল না, পোকা-মাকড় কোনও কিছুতে ভয় ছিল না। ভয় পেত চিলকে। আর আমার ছিল একটাই ভয়, আমার ডাকাবুকো অমন দিদিটার যদি কিছু হয়ে যায়! দিদিকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতুম, তুই কী করে এত সুন্দর হলি দিদি! দিদি, আমার গালে ভিজে ভিজে একটা চুমু খেয়ে বলত, আমার এই সুন্দর ভাইটার জন্যে।

আমার মাথায় শাকের বোঝা, দিদির কোঁচড়ে ডুমুর, কোনও কোনও দিন পেঁপে কি উচ্ছে, আমরা দু'জনে যেন শিকার থেকে ফিরে এলুম। এই সম্পর্কটুকুর জন্যেই আপনার পৃথিবীতে বারে বারে যেতে ইচ্ছে করে। দিদি, দাদা, মা, বাবা। স্নেহ আর ভালবাসা পেলুম তো পেয়ে গেলুম আপনাকে। না পেলুম তো ফিরে এলুম তিক্ততা নিয়ে। ওখানে যাবার কিন্তু ওই একটাই আকর্ষণ ভালবাসা।

জমিদারবাবু চলে গেলেও, তাঁর ওই ভাঙা বাড়ি, আর জঙ্গল আমাদের কিছুটা প্রতিপালন করত। যেখানে যা প্রয়োজন তাই দিয়ে পৃথিবীটাকে বেশ সাজিয়েছেন; একমাত্র সমস্যা মানুষ। মানুষ কেড়ে-বিগড়ে নেয়। আমাদের দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটত। এইবার দৃশ্যটা অবলোকন করুন। তকতকে করে নিকোনো একটা উঠান। একপাশে মাঝারি আকারের একটা নিমগাছ। সোনা রোদে ঝিরিঝিরি করছে সুবজ পাতা। আর একপাশে সুন্দর একটা তুলসীমঞ্চ। তার গায়ে মায়ের হাতের আলপনা। নিমগাছের তলায় সকলে মিলে বসার জন্যে একটা বাঁশের মাচা। ওপাশে ছোট্ট একটা রান্নাঘর। তার দাওয়ায় বসে আমার মা কাঠ কাটছে উনুন ধরাবে বলে। মাচার পাশে বসে বাবা আমার পুতুল রং করছে। বৈশাখী মেলায় এইসব পুতুল বিক্রি হবে। মেলাই ছিল বাবার জীবন। বাবা মেলা ভীষণ ভালবাসত। কত লোক, কত শব্দ! তেলেভাজার গন্ধ। কত জিনিস। সব মানুষেরই মুখ কেমন খুশি খুশি। বাউল, সন্ন্যাসী। পুতুল নাচ, খেমটা নাচ, পটের পালা। সারাটা জীবনই আমার বাবা ছিলেন প্রেমিক আর আমার মা ছিলেন প্রেমিকা। আজ বাবার গলায় মাদুলি ঝোলায় তো কাল হাতে বেঁধে দেয় তাগা।

আমরা দু'জনে চলন্ত বাগানের মতো উঠানে এসে দাঁড়িয়েছি। মায়ের কাঠ কাটা বন্ধ। বাবা আপন মনে গান গাইছে আর মাটির পুতুলে নীল, লাল, হলুদ রং লাগাচ্ছে। দিদির ধবধবে সাদা পায়ের গোছে পুকুরের সবুজ সবুজ ঝাঁজি লেগে আছে। মা অমনি কাটারি ফেলে ছুটে এলেন। অভাবেও আমার মায়ের শরীরটা সুন্দর ছিল। তেলা, ফরসা। চান করে এসে দাঁড়ালে মনে হত সাবান। বাবা বলত, দিন দিন তোমার রূপ যেন খুলে যাচ্ছে। দেশে সেরকম কোনও জমিদার থাকলে কপাল পুড়ত। বাবার কথা শুনে মা হাসত আর লাল গামছা দিয়ে লম্বা লম্বা চুল ঝাড়ত, সপাং সপাং করে। রোদে অভ্র-রেণুর মতো জলের কণা উড়ত। অদ্ভুত একটা ভিজে ভিজে, শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ এসে লাগত নাকে। মনই মানুষকে সুন্দর করে। আমাদের মনে কোনও দুঃখ ছিল না। অন্যের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থা মেলাতে শিখিনি বলেই আমাদের খুব সুখ ছিল। বাবা মাঝে মাঝে টাকার গান গাইত মজা করে :

টাকা ধর্ম টাকা কর্ম টাকা সারাৎসার।
টাকা বিনা চলে না কো এ ভব-সংসার ॥
মূর্খও পণ্ডিত হয় টাকার প্রভাবে।
টাকা বিনা ভবপারে ত্বরিতে নারিবে ॥

অতএব কর সবে টাকার ভজনা।
টাকা হলে দূর হবে সকল ভাবনা ॥

মা অমনি উত্তরে গেয়ে উঠত: টাকা হলে টাক হবে/ ঘুচে যাবে ঘুম/ আরও টাকা, আরও টাকা/ সেও এক ভ্রম ॥ বাবা অমনি চাপান দিল: যখন তব জন্ম হইল ট্যাকশাল উদরে/ স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।/ টাকা নামে খ্যাত হলে এ-বঙ্গমাঝারে/ 'অর্থ' নামে সাধু ভাষা শুনি যে সংসারে ॥ মা অমনি গেয়ে উঠত: ওই দেখো পড়ে আছে জমিদারি বাড়ি। ঘোড়া নেই তাল ঠোকে ভাঙা জুড়ি গাড়ি ॥

সকালে মা একটা গাঢ় নীল শাড়ি পরত। একটু উঁচু করে। মাকে ওই বেশে দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। মনে হত বাবার তৈরি মা দুর্গা জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারো বার মায়ের কোলে মাথা গুঁজে আমি হুঁ হুঁ করতুম। মনে হয় মেঘের কোলে ঢুকে গেছি। মা ছুটে এসে আমার মাথা থেকে শাকের বোঝাটা নামিয়ে নিত। তারপর আঁচল দিয়ে চুল মুছিয়ে দিত। ওইটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। দিদি ততক্ষণে একলাফে উঠে গেছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। ঝুড়িতে কোঁচড় খুলে ঢালতে শুরু করেছে, ডুমুর, পেঁপে, উচ্ছে। বাবা বলছে বিনা পয়সার বাজারটা তোরা ভালই করেছিস। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।

নিমতলায় বসে বাবার কাছে আমরা পুতুল রং করা শিখতুম। দিদি আমার চেয়ে অনেক ভাল পারত। দিদি চোখ আঁকতে পারত খুব সুন্দর। হাসি হাসি চোখ, রাগী চোখ, দুঃখ দুঃখ চোখ। আমাকে আবার শেখাত। বাবা বলত, চোখই সব, আর চোখ আঁকা খুব কঠিন কাজ। ঝাঁকা ভরতি পুতুল মাথায় নিয়ে বাবা আর আমি মেলায় যেতুম। মেলা আমারও খুব ভাল লাগত। মা দিদিকে কখনও মেলায় যেতে দিত না। অনেক দুষ্টু লোক সেখানে আসে। মেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে পাপ ব্যাবসায় লাগায়। দিদি কান্নাকান্না চোখ করে দাঁড়িয়ে থাকত, আর আমরা হাত নাড়তে নাড়তে চলে যেতুম।

নদীর ধারে পাকুড়ের তলায় যত পুতুল আছে সব ঢেলে সাজিয়ে আমরা বসে যেতুম। শিব, কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, মহাভারতের কত চরিত্র, রামলক্ষ্মণ সীতা একসঙ্গে। বাবাকে তো বাবার সেই মা কৃষ্ণনগরে কাজ শিখতে পাঠিয়েছিলেন, সেইজন্যে বাবার পুতুল হত খুব সুন্দর। একেবারে সত্যিকারের মতো, খুব ভিড় জমে যেত। বাবা আবার গান গেয়ে ভিড় জমিয়ে দিতেন। ভীষণ চড়া আর তেমনি সুরেলা গলা:

রাম রহিম না জুদা করো ভাই
মনটা খাঁটি রাখো জি।
দেশের কথা ভাবো ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজি ॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাত কেন করো জি,

হঠাৎ বলতেন, ধর, ধর, এই জাগাটায় কোরাস দিই:

দু'ভাইয়েতে দু'ঘর বেঁধে।
করি একই দেশে বসতি ॥

আমিও ঠিক সুরে সুর লাগিয়ে দিতুম। মেলার সব পুরুষ মহিলা তখন আমাদের দিকে চলে এসেছে। ঠাসা ভিড়। হিন্দু মুসলমান সবাই। বাবা পেটের কাছে একটা সিঁদুরে রঙের হাঁড়ি কায়দা করে চেপে ধরে তাল বাজাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলে উঠছে— বাঃ, ওস্তাদ বাঃ। আপনার পৃথিবীতে মানুষ খুব গান শুনতে ভালবাসে। আর যারা ভাল গান গায় তারা খুব ভালবাসা

পায়। এই গানের জন্যে আর সুন্দর চেহারার জন্যে মা বাবাকে ভালবেসেছিল। মেলাতেও দেখতুম মেয়েরা বাবাকে ঘিরে ধরত। সামনে বসে পুতুল বাছতে বাছতে বাবার সঙ্গে কত প্রাণের গল্প। মানুষের পেটে কত কথা, কিন্তু সোনার তেমন লোক নেই। বাবা কিন্তু সকলের সব কথা শুনতে ভালবাসত। মেয়েদের মধ্যে অনেক সুন্দরীও থাকত। অনেকের আবার চালচলন তেমন ভাল নয়। একটু সুর টেনে কথা, একটু গা ঘেঁযে আসা, চোখ মটকানো। বাবা সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যেত। আর চড়া পরদায় ধরে বসত আর এক গান,

ভাল বাসতে যদি হয়
তাঁরে শুধু ভালবাসো,
যে-জন প্রেমময়।
বাইরে শুধু চক্ষু বুজে,
মনের মানুষ মরো খুঁজে,
প্রাণের প্রাণ যে-জন সে যে,
প্রাণের মাঝেই রয় ॥

মহিলা তার উত্তর পেয়ে যেত, বুঝে যেত বাবা কী চরিত্রের মানুষ। ওস্তাদ তুমি খুব বেরসিক, বলে একসময় সরে পড়ত। পুতুলদের মধ্যে একটা পুতুল থাকত ঠিক আমার মায়ের মতো দেখতে। সেটা আলাদা বসে থাকত একপাশে। বাবা সেইটার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলত, দেখো, কাবু করতে পারেনি আমাকে। বাবার কাজ, বাবার গান, বাবার স্বভাব-চরিত্র, মেলাতে বাবাকে আলাদা একটা খাতির এনে দিত। ভীষণ শ্রদ্ধা করত সকলে। বাবার নাম হয়ে গিয়েছিল ভোলেবাবা। বাবাকে শ্রদ্ধা করা দেখে আমারও খুব গর্ব হত। ভীষণ একটা সুখ। অন্য বেপারীরা রাতের দিকে নেশা করত। একটু এদিকে-সেদিক যেত। সার্কাসের তাঁবুর পেছনে এক ধরনের মেয়েদের খিলখিল হাসি ভেসে আসত। অনেক রকম সব কাণ্ড হত মেলা জুড়ে।

রাতের মতো মেলা যেই শেষ হল, চটের ওপর কাঁথা বিছিয়ে আমরা সেই পাকুড়ের তলায় শুয়ে পড়তুম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে বৈশাখের হিজল-কালো আকাশ। পায়রার সামনে দানা ছড়িয়ে দেবার মতো করে, আপনি একমুঠো তারা ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে। নিশ্বাসের মতো বাতাস। শীর্ণ নদীর জলের অস্ফুট কুলকুলু। আমরা পাশাপাশি শুয়ে বাড়ির কথা বলতুম, মা কী করছে, বোনটা কী করছে। পয়সার গেঁজেটা থাকত বাবার কোমরে। বাবা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দেশবিদেশের গল্প বলত। একসময় ঘুম এসে যেত। খুব ভোরে আলো ফোটার আগেই আমরা নদীতে চান সেরে নিতুম। একটু একটু করে আলো ফুটে উঠত। তিন চারটে নৌকো পাশাপাশি বাঁধা। সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে মাঝিরা শুয়ে আছে পাটাতনে। ছইয়ের ওপর এক বুড়ো বসে আপন মনে কাশছে আর মাঝে মাঝে বিড়ি খাচ্ছে। গাছের ডালে বাবা ধুতিটাকে মেলে দিত। ভোরের বাতাসে সেটা পতাকার মতো পতপত করে উঠত।

নোনতা খাবারের দোকানের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। বাবা বলত, যা, তুই না হয় একটু ঘুরেঘারে আয়। মেয়েটাকে দেখলেই মনে হত খুব দুঃখী। দোকানের কাজ করে করে হাত দুটো খসখসে। নখগুলো খয়া খয়া। দোকানের মালিক তার বাবা; কিন্তু মেয়েটাকে ভীষণ মারধর করে, আর সারাদিন খাটায়। আপনার পৃথিবীতে থিকথিক করছে সব নিষ্ঠুর মানুষ। তাদের হাতে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই। জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমার মা কোথায়। সে ছলছলে চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। আমি তাকে সুন্দর একটা পুতুল দিয়েছিলুম। সে খুব খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি আমাকে দিলে। যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কেউ তাকে কিছু দিতে পারে। তার জামা ময়লা। চুলে জট। মেয়েটার দুঃখে আমারই চোখে জল এসে যেত। মনে হত ওকে নিয়ে গিয়ে আমার মায়ের কাছে ফেলে দিই। বলেছিলুম, তুমি আমাদের বাড়িতে

যাবে? মেয়েটার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। বললে, আমি চলে গেলে বাবাকে কে দেখবে।

ঈশ্বর কোথায় যে আপনি আছেন: আর কোথায় যে আপনি নেই। অত বড় একটা দোকানি তার মধ্যে আপনি নেই, অথচ আপনি একটা ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে তার পাশে রয়েছেন। বাবাকে একবার বলেছিলুম, মেয়েটাকে উদ্ধার করো না বাবা। ওর যে ভীষণ দুঃখ। সেই বাবা আমাকে সুন্দর একটা কথা বলেছিল, ভগবান যে-জীবনে যাকে যে খোঁটার সঙ্গে বেঁধে দেন, সেইখানেই তাকে বাঁধা থাকতে হয় সারা জীবন।

মেলার শেষ দিনে মায়ের জন্যে, দিদির জন্যে নানারকম জিনিস কেনার আনন্দটা ছিল অন্যরকম। বাবা একটা শাড়ি পছন্দ করে, ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে নিজের বুকের কাছে ঝুলিয়ে আমাকে বলছে, দেখ তো তোর মাকে কেমন মানাবে। আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় আমি খুব খুশি হতুম। চোখ বুজিয়ে একবার কল্পনা করে নিতুম, মা শাড়িটা পরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের খোঁটা ধরে। ঢালু কপালে এত বড় একটা সিঁদুরের টিপ। গোল গোল ফরসা দুটো পা।

সেবার মেলা থেকে ফেরার পথে অনেকটা হেঁটে আসার পর বাবা বললে, 'কী হল বল তো! বাঁ পা-টায় তেমন জোর পাচ্ছি না কেন?' আমরা একটা গাছতলায় বসলুম। আদিগন্ত মাঠ। বহু দূরে আমাদের গ্রাম। বাড়ি ফেরার জন্যে আমরা দু'জনেই ছটফট করছি মনে মনে। আমি বাবার বাঁ পা ধরে খানিক মালিশ করলুম। পা ধরে টানাটানি। পায়ের রংটা কালচে মতো হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় তপতপ করছে। বাবা বললে, 'কোনও সাড় নেই। তুই এক কাজ কর, বড় দেখে একটা গাছের ডাল ভেঙে আন।'

ভাঙা ডালের ওপর শরীরের ভর রেখে অতি কষ্টে হাঁটা শুরু হল। অনেকটা যাবার পর ছই তোলা একটা গোরুর গাড়ি পেছন দিক থেকে এসে, আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। ছইয়ের ভেতরে বসে ছিল কয়েকজন ঘেমটাওয়ালি, তারা বাবাকে ওইভাবে হাঁটতে দেখে গাড়ি রুখে দিলে। একজন, যার বয়েস আমার মায়ের মতো, গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল বাবার কাছে— 'কী হয়েছে ওস্তাদ, পা ভেঙেছে।'

তার বেশ ভারী শরীর। সুন্দর শাড়ি। এতখানি একটা খোঁপা। রুখু চুল। কাজলটানা চোখ। মুখটা কেমন যেন খড়ি খড়ি। গায়ের জামাটা একেবারে আঁটসাঁট, চকচকে। আমাদের সেই গাড়িতে উঠতেই হল। ভেতরে ঠাসাঠাসি করে বসা। ওস্তাদ তোমার ছেলেটা ভারী সুন্দর, বলে মহিলা আমাকে কোলে টেনে নিলে। আমি ভয়ে আড়ষ্ট। চলার তালে তালে শরীর দুলছে। আমি সেই নরম কোলে নাচছি। মহিলা দু'হাতে আমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অস্বস্তি কেটে গেল। মনে হল আমার মায়ের কোলেই বসে আছি। আপনার পৃথিবীতে মানুষ যে নারীকে ভোগ করে, সেই নারীই আবার কারও মা হয়।

পুরনো দিনের কথা হচ্ছে। বাবা যখন যাত্রা করত তখন থেকেই পরিচয়। সেই সব রাতের কথা। কোন এক অধিকারী, কোন এক জমিদার বাড়ি। রাত শেষে নদীর ধারে গান গাইতে গাইতে ঘোরা। নৌকো করে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাওয়া। সোনার মেডেল পরাতে গিয়ে মাতালের উলটে পড়া। কত কত সব গল্প। কত দুঃখের কথা। বয়েস বাড়ছে, রূপ ঝরছে, গলা ভাঙছে, শরীর আর দোলানো যাচ্ছে না আগের মতো। উপোসের দিন এগিয়ে আসছে। ওস্তাদ! তুমি ভাল করেছ। সময় থাকতে নৌকোটাকে বেঁধে ফেলেছ ঠিক ঘাটে। আমরা হলুম ঝড়ের এঁটো পাতা।

মহিলার গলা ভারী হয়ে এল। তার বুকে ঠেকে আছে আমার পিঠ। মনে হল বুকটা তোলপাড় করছে। সন্ধের ঝোঁকে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। মা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। গাছের ডালে ভর রেখে বাবা অতি কষ্টে হাঁটছে। উঠানে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে উঠল—- এসেছে এক নবীন সন্ন্যাসী। হাতে তার বাঁকা লাঠি, ভঙ্গি ত্রিভঙ্গ মুরারি। এসেছে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী ॥

একটা মাস আমাদের খুব বাজে গেল। মা সব সময় গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। জানেন তো প্রভু পৃথিবীতে মানুষ বিপদে পড়লে তবেই বোঝা যায় মন্দির, মসজিদ কিছুই নয়, আসল হল

রূপচাঁদ। মা যত ভেবে সারা, বাবা ততই আনন্দে আত্মহারা। মাকে চাঙ্গা করার জন্যে বাবা কবিতা আওড়াত:

এ সংসারে সার জেনো শুধু এক টাকা।
টাকা বিনা জেনো ভবে সব কিছু ফাঁকা ॥
বিশেষত কলিযুগে টাকাই ঈশ্বর।
টাকাতে মিলয়ে সর্ব দ্রব্য মনোহর ॥
অর্থ হতে হয় যত পুরুষার্থ লাভ।
অর্থহীন মানুষের কাঁদাই স্বভাব ॥

মা বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। আমরা দুই ভাইবোন নিমতলায় বসে পুতুল রাঙাচ্ছি। রথের মেলা, বিশাল মেলা, এল বলে। তারপরেই ঝুলোন। বাবা আপন মনে সুর করে বলে চলেছে:

'রূপচাঁদ' নামে তুমি ধরো কত রূপ!
'চাকী' রূপে কত জনে দেখাও স্বরূপ ॥
'পণ' নামে পরিচিত বাঙালির ঘরে।
'রেস্ত' নামে সঞ্চয়ীর রহ তুমি করে ॥
'ফিস' নামে মোক্তার উকিলগণ ভাবে ॥
'ভিজিট' রূপেতে যাও ডাক্তারের করে ॥

মা হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠত। বাবা বললে, 'শোনো, এটা আমার পাপের সাজা। ব্রাহ্মণের মেয়ে তুমি, তোমার বাবার ব্রহ্মশাপে আমি পঙ্গু হয়ে গেলুম।' বাবার এই একটা কথায় ভীষণ কাজ হল। মা যেন সাপের মতো ফণা তুলে উঠল। 'কী বললে ব্রহ্মশাপ। সে আর ব্রাহ্মণ আছে নাকি! একটা পইতে, একটা টিকি, আর গোটা কতক সংস্কৃত শ্লোক জানা থাকলেই ব্রাহ্মণ? তা হলে তো পাঁজিও ব্রাহ্মণ।'

মা সব খবরই রাখত। দাদুর পতিত হওয়া, বিধবা এক জেলেনিকে বিয়ে করে, জেলেপাড়ায় বসবাস। সেই মহিলা এখন দাদুকে জেলেপাড়ার পুরুত করেছে। সে যা হুকুম করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তাই শুনতে হয়। অনেকটা ক্রীতদাসের মতো অবস্থা।

মা সেই স্বদেশি ঠাকুমার শিষ্য। মাকে পাপ বললে ভীষণ রেগে যেত। ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি করে যত দূর সম্ভব চিকিৎসা করালে। বাবার পা-টা পুরো ভাল হল না। একটু ছিনে মতো হয়ে রইল। সদরের বিলেত-ফেরত ডাক্তার মায়ের চেহারা, সাহস, সহবত দেখে মুগ্ধ হয়ে এক টাকাও ফি নিলেন না। বাবাকে বুঝিয়ে দিলেন এর সঙ্গে পাপ পুণ্যের কোনও যোগ নেই। ও হল পাদরিদের কথা, পাপের বেতন মৃত্যু।

সংসারটা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল। দিদিটা আরও একটু বড় হয়েছে। আমিও। জমিদারের বাগান তখন পুরোটাই জঙ্গল। ল্যান্ডোগাড়িটা আর দেখাই যায় না। বাড়ির ছাদের আরও কিছুটা খসে পড়েছে। এক বর্ষায় বাজ পড়ে গম্বুজের মাথাটা হেলে গেছে। এই সময় একটা কাণ্ড হল। আমি আর দিদি রোজের মতোই জমিদারের দিঘিতে গেছি। দিদি জলে নেমেছে। কলমি তোলার পর বললে, দাঁড়া ভাই আজ কিছু শালুক তুলি। দিদি কোমর জলে চলে গেল। শালুক আরও একটু দূরে। হঠাৎ দিদিকে কে যেন ডুব জলে টেনে নিলে। দিদি একবার করে ডোবে, একবার করে ওঠে। জলে জাগা মুখটা একবার মাত্র ভাই বলতে পেরেছিল। আমি মা বলে চিৎকার করে উঠলুম। জলে ঝাঁপ মারব বলে পা তুলেছি, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কে একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঝটকায় দিদির চুল ধরে টেনে নিয়ে এল তীরে। ডাঙায় উপুড় করে ফেলে, পিঠে চাপ দিতেই

গুড়গুড় করে অনেকটা জল বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। মানুষটির গায়ে অসীম জোর। দিদির পা দুটো ধরে, মাথাটা নিচু করতেই আরও জল বেরোল। তবু দিদি চোখ মেলে না। আমি তখন কাঁদতে শুরু করেছি। মানুষটি চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, চুপ। দিদিকে চিত করে শুইয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে সেই মানুষটি কী যেন করতে লাগল। অনেক, অনেকক্ষণ পরে দিদি চোখ খুলল। দিদির বুক থেকে উঠে দাঁড়াল লম্বা, বলশালী এক মানুষ। মুখে বড় বড় দাড়ি আর গোঁফ। দেবতার মতো দেখতে। আগে কখনও দেখিনি।

লোকটি বললে, 'ভাল করে মন দিয়ে শোনো। আমি এক বিপ্লবী। কাল রাত্তির থেকে আমি ওই ভাঙা বাড়িতে লুকিয়ে আছি। আজ রাতেই আমি হয়তো চলে যাব। আমার কথা তোমরা কারওকে বলবে না। বন্ধুদের না, বাবা, মা, বাড়ির কোনও লোককে বলবে না। বললে আমার বিপদ হবে।'

লোকটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে ভাঙা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দিদি মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে। ভাল করে তাকাতে পারছে না, তবু তাকাল। হাত তুলে নমস্কার করল। আমি দিদিকে জড়িয়ে ধরে আমার চেপে রাখা কান্নাটা ছেড়ে দিলুম। দিদি যদি ডুবে যেত তা হলে আমিও ডুবতুম। দিদিকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

আমরা দু'জনে চোরের মতো বাড়ি ফিরে এলুম। সারাটা দিন আমরা দু'জনে গায়ে গা লাগিয়ে ঘুরতে লাগলুম। কেবল ভয়, যদি কোনওভাবে বলে ফেলি। সারাটা দিন আমরা আবোলতাবোল গল্প বলে কাটিয়ে দিলুম। সেদিন সন্ধেবেলা অনেক অনেক দিন পরে মা আমাদের নিয়ে গল্প বলতে বসেছে। সেই কর্ণবধের গল্প। কৃষ্ণপক্ষের রাত। একটা ঘুটঘুটে মেঘ উঠেছে। আকাশ একেবারে লেপামোছা। সব গুম মেরে আছে, এতটুকু বাতাস নেই কোথাও। হঠাৎ আমরা লক্ষ করলুম একটা, দুটো, তিনটে, অনেকগুলো ছায়ামূর্তি আমাদের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। নিমতলার মাচায় বাবা শুয়ে ছিল, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের গল্প বন্ধ হয়ে গেল। দু'হাতে শক্ত করে ধরে আমাদের দু'জনকে বুকের পাশে টেনে নিয়েছে। হঠাৎ জোরালো টর্চের আলোয় আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে গেল। আমাদের সামনে দশ-বারোজন পুলিশ। বাবা মাচায় উঠে বসেছে। জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার?'

'আমরা খবর পেয়েছি একজন বিপ্লবী এখানে লুকিয়ে আছে।' কথা শেষ করেই তারা বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বুটপায়েই ঘরে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলল। পুতুলের ঝুড়িতে লাথি মেরে অর্ধেক ভেঙে ফেলল। চড়া আলো ফেলে চালা, চৌকির তলা সব দেখতে লাগল। আমাদের নড়া-চড়া করতে দিলে না। হঠাৎ কে একজন বললে, 'এখানে নয়, আছে ওই পোড়ো জমিদার বাড়িতে।' সবাই অমনি পায়ে পায়ে কোনওরকম শব্দ না করে, এতটুকু আলো না জ্বেলে এগিয়ে গেল। দিদি আমার ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল। আমরা উঠে ঘরদোর গোছগাছের কাজে লেগেছি। বাবা বলছে, সামনেই মেলা, সব ভেঙে দিয়ে গেল। আমাদের এক মাসের পরিশ্রম। মা, আমি আর দিদি আমাদের শোওয়ার ঘরে গেছি, মা চৌকির তলাটা দেখতে গিয়েই একটা চিৎকার করার আগেই, তলা থেকে ভেসে এল ভারী, চাপা গলা, 'ভয় নেই। চিৎকার করলেই ভয় আছে। অন্ধকার করে দিন।'

চৌকির তলায় একজন পুলিশ।

আমরা সব জেগে বসে রইলুম। চৌকির তলার পুলিশ বললে, 'মা, আপনার স্বামীকে নিমতলাটা ছেড়ে দিতে বলুন। ওঁকে বলুন, ঘরে এসে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে। আমাকে একটা কাপড় দিন। পুলিশ দ্বিতীয়বার এলে ধরা পড়ে যাব।'

নিমতলার মাচায় বাবা যেভাবে একটা পা তুলে বসে ছিল, লোকটি ঠিক সেইভাবে বসে বিড়ি খেতে লাগল। পরনে একটা খেঁটো ধুতি। খোলা গা। দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে মা আমাদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে শুয়ে আছে লোকটির নির্দেশে। যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই হল। পুলিশ আবার

ফিরে এল। লোকটি তখন গুনগুন করে গান গাইছে, আর বিড়ি ফুঁকছে। চড়া টর্চের আলো এসে পড়ল। আমরা ভয়ে নিশ্বাস ফেলছি না, পুলিশ জিজ্ঞেস করল, 'এসেছিল কেউ?'

লোকটি বললে, 'না হুজুর! এদিকে কেউ আসেনি। সব খোলাই পড়ে আছে দেখে নিন আপনারা।'

পুলিশ টর্চ ফেলল আমাদের ওপর। ফেলেই ঘুরিয়ে নিল, কে একজন বললে, 'আর থাকে, আগেই আমাদের পোড়ো ভিটেতে যাওয়া উচিত ছিল।' পুলিশ দল চলে গেল। চলে যাবার একঘণ্টা পরে লোকটি এসে বললে, 'মা, এবার ওঠো। তিন দিন না খেয়ে আছি।'

বাবা চাপা খুলে, ঘেমে নেয়ে বেরিয়ে এল দাওয়ায়। দিদি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাড়ি, গোঁফ।'

বাবা বললে, 'তুমি চিনিস নাকি?'

তখন সকালের দিদির জলে ডোবার ঘটনাটা বেরিয়ে পড়ল। এই মানুষটি ওই সময় ওখানে হাজির না হলে কী হত। মা আর বাবা দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বিপ্লবী বললে, 'আমাকে নয়, কৃতজ্ঞতা জানান ঈশ্বরকে। তিনিই আমাদের মালিক। তিনিই জানেন, কতদিন কে থাকবে, কখন কে যাবে!'

মাঝরাতে, বিপ্লবী লণ্ঠনের আলোয় তাঁর নকল দাড়ি গোঁফ পরে ফেললেন। বাবাকে বললেন, 'আপনার এই ধুতিটা আমার চাই, আর একটা জামা, যা দাম লাগে আমি দোব।'

বাবা হাসল, 'আপনি আমার মেয়ের জীবনদাতা। তা ছাড়া আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আপনার সেবা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

বিপ্লবী বললেন, 'আপনার পুতুলের ঝুড়িটাও আমার চাই। আপনারা একটু কষ্ট করে আবার তৈরি করে নেবেন।' ভোর হবার অনেক আগেই, মেঘ থমকানো আকাশ মাথায় নিয়ে বিপ্লবী চলে গেলেন। মাথায় পুতুলের ঝুড়ি, ঠোঁটে বিড়ি। যাবার সময় বলে গেলেন, 'যদি বেঁচে থাকি, দেশ যদি স্বাধীন হয় আবার আসব। চলার পথে অনেকের কাছে অনেক ঋণ রেখে রেখে যাচ্ছি।'

মা, বাবা, আমরা সকলে, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিলুম। দিদি তো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। কে বলবে এই মানুষটি প্রয়োজনে মানুষও মারতে পারেন। মেরেওছেন তা না হলে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজবে কেন। কোমরে ঝুলছে পিস্তল।

আমাদের জমিদারবাগানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা আর আমি কাছাকাছি মেলায় যেতুম। আমার মাথায় পুতুলের ঝুড়ি। বাবা আমার পাশে পাশে লাঠি ধরে ঠুকঠুক করে হাঁটত। পথশ্রমে ঘেমে নেয়ে উঠত। তবু গান বন্ধ হত না। একটা গানের একটা লাইন আমার মনে আছে- জগৎ ঘোবা ব্যাবসা দিয়ে নীলকণ্ঠে করলি জন্ম-খোঁড়া।

এই সময় বাবার সব চুল হু হু করে পেকে গেল। চেহারা ভেঙে গেল। তখনও গান-- চিরদিন কি এমনই যাবে, মন তোমার, মন তোমার। আপনি তখন অলক্ষ্যে বসে একের পর এক তির ছুড়ছেন, আপনার যা চিরকালের কাজ! ঠিক তিন দিনের জ্বরে আমার সেই জন্মের সেই সুন্দর মা-টা চলে গেল। সেই জীবনের সেই প্রথম মৃত্যু। তা হলে একটা গল্প শুনুন। এক ঝড়ের রাতে বাসা-ভাঙা ছোট্ট দুটি টুনটুনি পাখি আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে, রাতের অতিথি। ঘরেই থাক। ভোর হলে উড়ে চলে যাবে। বাইরে তখন তুমুল ঝড-জল। পাখি দুটো অন্ধকারে কোনওরকমে ঠাহর করে করে ঘরের চালের সরু বাখারির ওপর গিয়ে বসল। আমরা শান্ত পেয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কারুরই খেয়াল হল না, কাঁথা আর চাদরের গাদায় আরাম করে একটা বেড়াল ঘুমোচ্ছে।

অনেক রাতে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কী যেন একটা প্রচণ্ড লাফ মেরে উঠল। চিক করে একটা পাখির মর্মান্তিক চিৎকার। ডানার সামান্য ফড়ফড়। তারপরেই হাড় চিবোবার কড়রমড়র শব্দ। বাবা তাড়াতাড়ি উঠে লণ্ঠন জ্বালাল। আমাদের মস্ত সাদা বেড়ালটা ঘরের

কোণে। তার মুখে একটা টুনটুনি। দিদি আর আমি হুইহুই করতেই বেড়ালটা গোঁ গোঁ করে গজরাতে লাগল। মা কেঁদে ফেলল। বাবা বললে, 'দেখো মৃত্যুও আমাদের ভালবাসার। বেড়ালটাকে আমরা ভালবাসি। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক পৃথিবীরই নিয়ম। তিনিই করে রেখেছেন।' দিদি বেড়ালটাকে গালাগাল দিতে লাগল, আর বেড়ালটা আমাদের সামনেই পাখিটাকে নিমেষে খেয়ে শেষ করে তার কাঁথার গাদায় গিয়ে শুয়ে পড়ল আরাম করে। চিকন চিকন কয়েকটা পালক পড়ে রইল ঘরের কোণে।

এইবাব শুনুন, ভোর হল। মা তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজা-জানলা খুলে দিল। বাতায় বসে থাকা সেই একটা টুনটুনি কিন্তু উড়ে গেল না। সে একবার এখানে বসে একবার ওখানে। আর টুইট টুইট করে ডাকে। আমাদের সকলের চোখেই জল এলে গেল। পাখিটা তার সঙ্গীকে পাগলের মতো খুঁজছে— কই গো কোথায় গেলে, চলো, ভোর হল যে।

আমার বাবারও সেই অবস্থা হল। নিজের ডান হাতে মায়ের হাতটা ধরা ছিল। এইবার দৃশ্যটা একবার অবলোকন করুন প্রভু। মায়ের মাথার কাছে দিদি, আর পায়ের দিকে আমি। মায়ের ডানপাশে বাবা। মায়ের ডান হাত বাবার হাতে। ফরসা গোল একটা হাত। বাহার বলতে, কয়েক গাছা কাচের চুড়ি। আর হাঁসের পালকের মতো সাদা বেশ চওড়া একটা শাঁখা। বাবা মায়ের বুকের কাছে মাথাটা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'হ্যাঁগো, খুব কষ্ট হচ্ছে। কোথায় তোমার কষ্ট! জ্বরটা তো মনে হয় ছেড়ে আসছে!' মায়ের ঠোঁটে শেষ রাতের চাঁদের আলোর মতো এক ফালি হাসি খেলে গেল। খুব আস্তে বললে, 'কষ্ট আর কী, তোমরা তো সব আমাব পাশে বয়েছ।'

দিদির চোখ দুটো জলশঙ্খের মতো টলটল করছে। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। একমাথা কাঁচাপাকা চুল ঝুলে পড়েছে কপালে। বাবার মোটা লাঠিটা ঘরেব কোণে। মা ডান হাতটা তুলে ধীরে ধীরে বাবার মাথায় রাখল। হঠাৎ চোখ দুটো বিশাল বড় বড় করে ওপরে চালার দিকে তাকাল, এপাশে ওপাশে ঘোরাল, নামিয়ে আনল পায়েব দিকে আমাব মুখে। দিদি কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'কাকে খুঁজছ মা।' মায়ের বিশাল চোখ দুটো মাথার দিকে ঘুবে গেল। মা শুধু বললে, 'ও মা!' ডান হাতটা খসে পড়ে গেল বাবাব চুল বেয়ে। কাচেব চুড়িগুলো রিনচিন করে উঠল। নূপুর বাজিয়ে চলে গেলেন আমার মা। আমার মা দুর্গা।

দৃশ্যটা একবার অবলোকন করুন প্রভু। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। বাবা যেন পাথবের মূর্তি। দিদিব জলভরা চোখ দুটো যেন দু'খণ্ড কাচ। আমার গলার কাছে একটা পাথরের গোলা যেন এসে আটকে গেছে। জমিদার দিঘির পদ্মফুলের মতো ভেসে আছে মায়ের মুখ। ঠোঁটের কোণে একফালি হাসি। একটা চড়াই শুধু চিররাপ, চিররাপ করছে। বেড়ালটা জানলার গবরেটে বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে।

হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'যাঃ সব শেষ।' বলামাত্রই তাঁর চোখ দিয়ে হু হু ধারায় জল গড়াতে লাগল। চোখের ধারার কোনও শব্দ নেই। নিঃশব্দ প্রপাত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ উপচে গেল। দিদি আছাড় খেয়ে পড়ল মায়ের বুকে। আব যে পা দুটো আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, সেই বরফশীতল পা দুটোয় আমি মুখ গুঁজে দিলুম। বাবা একটা গান গাইত, নয়নজলে না ধোয়ালে পূজা হয় তোমার? আমি যেন সেই পুজোই করছি।

বাবার চোখের পরদায় জীবনের অতীত পঁচিশটা বছর ভেসে ভেসে আসছে। সেই আমবাগান, সেই পুকুরঘাট। কতবার কত পাতা ঝরে গেল বছরে বছরে। সেই গ্রাম, সেই বাড়ি আছে কি না কে জানে? সেই বট। সেই স্টেশন। সেই জিলিপি শিঙাড়ার দোকান। বাঁশের মাচা। আমার যুবতী মায়ের পা দুলিয়ে দুলিয়ে মচমচে জিলিপি খাওয়া। সেই স্বদেশি মায়ের আশ্রম। নীল শাড়ি পরে মায়ের রান্না। দাওয়ায় বসে মায়ের গল্প বলা। সন্ধের ঝোঁকে বাঁশির মতো গলায় আমাদের নাম ধরে মায়ের ডাক— ওরে আয় রে।

ডাকটা যেন হঠাৎ ভেসে এল। আমি— যাই মা, বলে একলাফে ঘরের বাইরে এসে নিজের ভুল

বুঝতে পারলুম। রান্নাঘরের সামনে নিকোনো দাওয়ায়, গোবরজল দিয়ে পরিপাটি করে পাড়া মায়ের তোলা উনুন। উনুনে উঁচিয়ে রাখা তালপাতার একটা পাখা। পাখার বাঁট দিয়ে মা মাঝে মাঝে পিঠ চুলকোত। কখনও আমাকে বলত, পিঠটা একটু চুলকে দে তো। ফরসা, চওড়া, তেলা সেই পিঠ দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যেতুম। মনে মনে বলতুম কী সুন্দর! তারপব এখানে ওখানে সেখানে পাগলের মতো চুমু খেতুম। জিভ দিয়ে চেটে দিতুম। মা বলত, আচ্ছা এক পাগলাকে বলেছি বাবা! তোলা উনুনটার কাছে একটা কাঠবেড়ালি ঘুরছে। তারে মায়ের লাল গামছাটা দুলছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম সেই অবাক দৃশ্যের দিকে। বিশ্বাসই হচ্ছিল না, যে মা নেই, মা আর আসবে না। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে উনুনটা ভেঙে ফেলি। তা না করে মায়েব গামছায় মুখ জড়িয়ে মনে মনে বলতে লাগলুম, মা, মা, আমার মা।

সত্য কথা বলব ঈশ্বর, আপনার তো মা নেই, দেবীর মতো মা যে কী অপূর্ব আকর্ষণ, তার আব আপনার কিছুই জানা হল না। পৃথিবীতে কিন্তু ওই মায়ের জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে। মা বাবাকে চেনায। জ্ঞান হলে বলে ওই দেখ তোর বাবা। মা আপনার জগৎকে চেনায়। মা-ই হল বিশ্ব-পরিচয়।

হঠাৎ বাবা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাতে লাঠিটা নেই। এখুনি পড়ে যাবে। গামছাব আড়াল থেকে দেখছি আমি। ছুটে এসে বাবাকে ধরলুম। এগিয়ে চলল নিমগাছটার দিকে। গুঁড়িতে হাত বোলাল অনেকক্ষণ। চোখে জল। বললে, 'এই গাছটা তোর মা পুঁতেছিল। নিমের হাওয়া ভীষণ ভাল। মাচাটা দেখিয়ে বললে, 'এর সব বাঁশ তোর মা কেটে দিয়ে আমাকে সাহায্য কবেছিল। তোব মা নতুন শাড়ি পরে এইবকম মাচায় বসে পা দোলাতে ভীষণ ভালবাসত।' তুলসীমঞ্চটা দেখিয়ে বললে, 'এই যে দেখছিস আলপনা, তোব মা দিয়েছিল।' বাবা সারা এলাকাটা ঘুরে এল। আমি যেন এক অচেনা মানুষ, আমাকে সব দেখাল। সর্বত্র মা। সবেতেই আমার মা।

সেই গ্রামেব সেই শ্মশান। আজও হয়তো আছে। মানুষ অমর নয়, পৃথিবী অমর। ওসব প্রলয়-ট্রলয় বাজে কথা। স্রেফ গাঁজা। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। মধ্য গগনে সূর্য। মড়ি-পোড়া বামুন মাকে দেখে বললে, এ কী এ যে দুর্গা প্রতিমা। ধরে রাখতে পারলে না। বিসর্জন হয়ে গেল। বাবা শিল্পীমানুয। একসময যাত্রা কবত। নিজেব হাতে শেষ সাজে সাজিয়ে এনেছে মাকে। মায়ের যা কিছু ছিল সব পরিযেছে। সারা শ্মশান থমকে গেছে। রোদের আলোটা সোজা এসে পড়েছে মায়ের মুখে। কপালে সিঁদুরেব টিপটা যেন রক্তের মতো জ্বলছে। সিঁথিতে যেন লাল বিদ্যুৎ খেলছে। চিতায় তোলাব সময় ডোমেরাও কেঁদে ফেলল। তাদের বউরা আঁচলে চোখ মুছছে।

আমি বললুম, 'আগুন আমি লাগাতে পারব না। আমার মা পুড়ে যাবে। আমার মা যে পুড়ে যাবে।' আমি ডুকরে কেঁদে উঠলুম। আমাব হাত থেকে মশালটা পড়ে গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'বাবা, এইটাই যে জগতের নিয়ম, আজ আছি, কাল নেই। মহাসিন্ধুর তীরে বসে বসে চলেছে তাঁব নিরন্তর খেলা। কিছু ফেলছেন, কিছু তুলছেন।'

চিতা জ্বলে উঠল। সেই আগ্রাসী শিখাব কোলে আমার মা। দিবাশেষে একমুঠো ছাই। নিমের ডালে পেঁচা ডাকছে চ্যাঁ, চ্যাঁ। থালার মতো চাঁদ জেগেছে পুবের আকাশে। মাঠঘাটেব অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। বহু দূরে একটা শিশুগাছ। যেন দৈত্যের ঘুম ভাঙছে। মা-শূন্য বাড়ির শ্মশান-দাওয়ায় আমরা বসে আছি তিন জন তিন দিকে। বাবার লাঠিটা শুয়ে আছে ক্লান্ত হয়ে। তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলেনি। বেড়ালটা বসে আছে রান্নাঘরের সামনে। দিদি হঠাৎ মা গো, বলে অজ্ঞান হয়ে গেল। সপ সপ করে গোটা তিনেক বাদুড় পাক মেরে গেল উঠানের আকাশে। জমিদার বাড়ির জঙ্গলে শেয়াল ডাকল।

একটা কথা আজ আপনাকে বলি ঈশ্বর, আপনি একজন আনাড়ি লেখক। আপনার জীবনকাব্য মাঝামাঝি বেশ ভালই আসে। বেশ আসেন আপনি বুনতে বুনতে, কিন্তু শেষ করতে জানেন না। আপনার প্রথম উইক-পয়েন্ট হল মৃত্যু। যতগুলো ক্যারেক্টাব দিয়ে শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত সব ক'টা

থাকে না। আপনার ট্রাজেডির একমাত্র উপাদান হল মৃত্যু। মেরে ফেললে লেখার স্ট্রেংথ থাকে? আপনার দ্বিতীয় দুর্বলতা হল, চরিত্রদেব সব বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দেন। মরার আগেই সব মরে বসে থাকে। মাঝামাঝি গিয়ে জীবনও শক্তি হারাল, কাহিনিও গতি হারাল। প্রেমিকের প্রেম শুকোল, যুবকের যৌবন গেল, রূপসি রূপ হারাল, শিশুর শৈশব গেল, বলবান বলহীন হল, নট দেহপট হারাল, চোখ জ্যোতি হারাল, কেশ হারাল ভ্রমর-কৃষ্ণ রূপ। সবই যদি গেল রইলটা কী! আপনি একজন আধা লেখক। সব কিছুই অর্ধেকটা অবধি টেনে ছেড়ে দেন।

বাবা প্রথমে বললে, 'দিনটা যদিও বা চলে রাতটা কোনওমতেই আর কাটানো যায় না এ বাড়িতে। চল, আমরা কোথাও গিয়ে আবার একবাব চেষ্টা করি নতুন করে শুরু করবার।'

দিদি বললে, 'এসব ছেড়ে আমি যাব না। আমারও সেই মত।'

শেষে বাবা একদিন বললে, 'নিয়ে আয় মাটি। যা পুকুর থেকে কেটে আন এঁটেল মাটি তাল তাল।' বাবা আবার কাজে লাগতে চায়। তবে কে প্রদীপ তুলে ধরবে। কে এসে শাঁখা পরা গোল গোল হাতে মাটি মেখে দেবে। কে এসে গল্প করবে একটু দূরে পা ছড়িয়ে বসে। সেই টুনটুনি পাখিটার মতোই বাবা একা।

হাত কোদাল নিয়ে আমি আর দিদি মাটি কেটে নিয়ে এলুম। এ সেই জমিদারবাগান থেকে কলমি আর ডুমুর আনা নয়। এ আনতে হয় আনা। আদেশ। কোনও আনন্দ নেই। বাবা কী কবতে চাইছিলেন বুঝিনি। দাওযাব একপাশ চট দিয়ে ঘিরে তার আড়ালে চলে গেল। মূর্তি গড়ার মালমশলা নিয়ে।

আমি আর দিদি তখন সংসার চালাচ্ছি। দিদি যেন আর এক মা হয়ে উঠল। ভোবে ওঠে। সব কাজ কবে মা যা যা কবত। আমিও উঠে পড়ি দিদিকে সাহায্য করাব জন্যে। ভোরেব আলোয় দিদি যখন উঠান ঝাঁট দিত, ঘুম চোখে দেখে বুকটা ছাঁত করে উঠত। মা এল নাকি! আমি তুলে আনতুম ঘড়া ঘড়া জল। দিদি বলত, 'ভাই তোকে কিছু কবতে হবে না। তুই ববং পড়তে বোস।' তবু আমি দাওয়া নিকোতুম। উনুন ধরাবার জন্যে কুড়িয়ে আনতুম কাঠকুটো। কয়লা ভাঙতুম। কোনও কঠিন কাজ দিদিকে করতে দিতুম না। দিদিব নরম হাত শক্ত হয়ে যাবে।

এইবাব দৃশ্যটা অবলোকন করুন প্রভু— পুব দিক থেকে ভোরের সূর্যেব কাঁচা হলুদেব মতো আলো উঠানে গড়িয়ে পড়েছে। তুলসী মঞ্চটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। টাটকা নীল আকাশে নাচছে নিমের ঝিরি পাতা। লাল ডুরে শাড়ি পড়ে দিদি তুলসী গাছে জল দিয়ে জোড় হাতে প্রণাম কবছে। ভিজে চুল পিঠ ছাপিয়ে চলে গেছে কোমরেব নীচে। দিদিব সারা গা-টা যেন জ্বলজ্বল কবছে।

অনেক দূবে বাজার। একটা বোতলের গলায় দড়ি বাঁধা, সেই বোতলে একটু সরযেব তেল। ছোট্ট একটা ঝোলায় নুন, হলুদ, লঙ্কা, গোটাকতক আলু, গ্রামের পথ ধরে আসছি। আয়নার মতো ডোবা। বকেব অপেক্ষা। মাছরাঙার সাধনা। ধানখেত। এইসব দেখতে দেখতে আমি আসছি। কখনও হাঁটছি, কখনও ছুটছি। আপনার ওই বিশাল পৃথিবী বিশাল, বিশাল এই চাঁদোয়ার মতো আকাশ, তার তলায় কীটাণুকীট, এক কিশোর। ভাগ্যিস পৃথিবীটাকে মানুষ খণ্ড খণ্ড কবেছিল, ছোট ছোট মাপে, গ্রামে আর শহরে, তা না হলে বিশাল তো আমাদের খেয়ে ফেলত। আমি আসতে আসতে আপন মনে আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতুম। জানো মা, বলে শুরু করতুম। কত রকমের কথা। হলুদ বাটলে দিদির হাতটা কেমন সোনার বরন হয়ে যায়, ঠিক যেন টিয়াপাখি। উনুন যখন ধরতে চায় না, উনুনের মুখে মাথা নিচু করে ফুঁ দেয়। অত চুল, ঝুলে আসে সামনে। তখন ঠিক তোমার মতো দেখায়। মাটিতে দু'হাত রেখে, হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে আছে সামনে। পিঠটা উঠে আছে ওপরে। দিদির পিঠটাও ঠিক তোমারই মতো মা। একেবারে অবিকল তোমার মতো। ফুঁ দিতে দিতে দিদি যখন চুলের ভেতর দিয়ে আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন দিদিকে কী সুন্দর দেখায়। ধোঁয়া লেগে জল টসটসে চোখ, একটু লাল, বড় বড়, ভিজে ভিজে চোখের পাতা। আমাকে বলে,

দেখ না ভাই, ধরছে না কিছুতেই। তোমার পাখাটায় ও হাত দেবে না। বলে, মায়ের পাখা। জানো মা, দিদি আগে আমাদের খেতে দেবে, সবার শেষে অনেক বেলায় নিজে খাবে। আমি তখন সামনে গিয়ে বসি। খেতে বসে, ও তোমার জন্যে কাঁদে। কী বলে জানো? মা এখন কোথায়? কী করছে, কী খাচ্ছে কে জানে? তুমিই বলো মা, এইরকম করলে দিদির শরীর থাকবে। দিদির তো বিয়ে হয়ে যাবে মা, একদিন না একদিন, তখন আমি কী করব মা! আমি তখন আরও বড় হয়ে যাব! না মা, আমি বড় হতে চাই না। আমি ছোটই থাকি। মানুষের কাছ থেকে মানুষকে আপনি কেড়ে নিতে পারেন ঠিকই; কিন্তু মন থেকে কি মুছে দিতে পাবেন! পাবেন না সেইখানেই আপনি পরাজিত দেবতা। স্মৃতি আপনার বিস্মৃতিকে হার মানিয়েছে।

বাবা একটা অসাধারণ মূর্তি তৈরি করে ফেলল। একেবারে আমার মা। যে সাজে মা চিতায় উঠেছিল। দু'হাত। কোলের কাছে মা একটা ঘট ধরে আছে, আর এক হাতে একটা জপের মালা। দিদি আর আমি হাঁ করে বসে রইলুম সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে।

বাবা বললে, 'আমাকে ছেড়ে তুমি পালাবে ভেবেছিলে! এইবার তোমার কী হয়! আমি মূর্তি গড়ার কারিগর! প্রাণ ঈশ্বরের হাতে, মূর্তি আমার হাতে। আমার স্বদেশি মা আমাকে আশ্রম চালাবার কায়দা শিখিয়ে গেছেন। সেই আশ্রম আবার হবে এখানে। মা বলেছিল, তোর বউই তোর গুরু। তুমি জানতে সে কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। মা মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তিতে তোমাকে এইখানে আমি প্রতিষ্ঠা করব।'

পৃথিবীর আশ্চর্য ব্যাপার কি সব আপনি ঘটান? না, আপনি ঘটে যায়।

সেদিন আকাশ লাল করে সন্ধে নামছে। একটু আগে হয়ে গেছে বেশ এক পশলা বৃষ্টি। গাছের পাতা থেকে মিছরির দানার মতো জল ঝরছে। উঠানে এসে দাঁড়ালেন টকটকে গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসিনী। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। কপালে এতখানি এক টিপ। লাল আগুনের মতো। চুল উড়ছে। লাল আকাশ পেছনে। মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। হাতে ত্রিশূল, কমণ্ডলু, কাঁধে ঝোলা। দাঁড়াবার কী দৃপ্ত ভঙ্গি!

ধনুকের টংকারের মতো গলা— 'আমি এলুম রে!'

বাবা কিছুমাত্র অবাক না হয়ে বললে, 'জানতুম তুমি আসবে।'

সন্ন্যাসিনী খিলখিলিয়ে হেসে বসে পড়লেন নিমতলার বাঁশের মাচায়। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বললেন, 'তুই পাঠালি স্রোত, ভেসে এলুম আমি।'

ঈশ্বর মানুষ কিন্তু কিছু কিছু তত্ত্ব বেশ জেনে গেছে। যেমন, আপনি অচল। নট-নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু। আপনার এ ধারণা ভুল। অনেক ভুল নিয়েই অবশ্য চলছে সাম্রাজ্য আপনার। আপনিও নড়েন, আপনিও চলেন। মানুষের ভক্তির টান, ভক্তির স্রোত যেমন চলবে, আপনিও তেমনি চলবেন। মানুষের ভক্তি নদীতে আপনি অনেকটা কুটোর মতো।

তা না হলে সন্ধের মুখে ওই ভৈরবী আসেন কী করে?

আহা! তা হলে একটা কাহিনি শুনুন প্রভু।

এক সাধু। আপনার ওই পৃথিবীরই এক সাধু। তিনি ছিলেন রাগরাগিণীতে সিদ্ধ। আপনি জানেন, এ লোকে নয়, গন্ধর্বলোকে রাগরাগিণীদের সব মূর্তি আছে। সাধু যখন যে-রাগিণীর আলাপ করতেন, তখন সেই রাগিণী মূর্তি ধরে তাঁর সামনে আসত। রমতা সাধু। এক গ্রামে এসে মাস চারেক হল আছেন। খাঁটি সাধু। গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তত্ত্ব কথা শুনতে আসে। উপদেশ নেয়। উপদেশ পালন করে। একদিন ভোরবেলা দাওয়ায় বসে সাধু আলাপ করেছেন ভৈরবী রাগিণী। মূর্তি ধরে রাগিণী এসে বসলেন সাধুর সামনে। ষোড়শী যুবতী। পরনে ফিনফিনে সাদা কাপড়, শান্তশীতল, কোমল তাঁর চেহারা। রূপের সে কী ছটা! ওই গাঁয়ের একজন লোক দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে ফেললে। কাক ভোরের আবছা আবছা অন্ধকারে এ কী দৃশ্য। আরে ছিঃ ছিঃ এই হল

সাধু। এই ব্যাটা ভাণ্ডটাকে আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। চরিত্রহীন। মেয়েছেলে সামনে বসিয়ে কালোয়াতি গান! মার শালাকে। সিদ্ধ সাধক। বুঝে ফেলেছেন অজ্ঞ লোকটির মনের কথা। ইশারায় ডাকলেন। লোকটা এল। তখনও ওই রাগিণী বসে আছেন; কারণ রাত তখনও ফরসা হয়নি। আলাপের টানে নেমে এসেছেন। ভৈরবীর কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁধা পড়ে গেছেন।

সাধু লোকটিকে বললেন, 'বলো, তোমার কী চিন্তা?'

লোকটি লজ্জায় পড়ে গেছে। আমতা আমতা করছে। পেটে আসছে মুখে আসছে না।

সাধু বললেন, 'বলোই না, তুমি কী ভাবছ?'

লোকটি বললে, 'কিছু মনে যদি না করেন তা হলে বলি, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি, অন্য চোখে দেখি, তা আপনার সঙ্গে এই এনাকে দেখে আমার কেমন যেন একটু ইয়ে ইয়ে মনে হচ্ছিল।'

সাধুজি বললেন, 'আচ্ছা! তোমার এই কথা! তা হলে বাবা শুনে যাও— এই যে ইনি বসে আছেন, ইনি তোমাদের গ্রামের কোনও রমণী নন। তোমাদের দেশের কোনও রমণী নন। এমনকী ভূলোকের কোনও রমণী নন।'

লোকটি মহা ধাঁধায় পড়ে গেল, চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলে, 'তবে ইনি কোথাকার?'

সাধু বললেন, 'এঁর অস্তিত্ব আমার কণ্ঠে। আমার এই স্বরলিপির মূর্তি এই রমণী। আমি ভৈরবীর আলাপ করছিলাম। সেই ভৈরবী মূর্তি ধারণ করে আমার সামনে এসে বসেছেন। যেই আমি স্বরালাপ করব, দেখবে আমার সঙ্গে আবার মিশে গেছেন।'

সাধুজি আলাপ ধরলেন, লোকটির চোখের সামনে ভৈরবী রাগিণী মিলিয়ে গেলেন।

এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা নেই হঠাৎ ওই সন্ন্যাসিনীর আসার। বাবার মনে তখন ওই রাগেরই আলাপ চলছিল।

আমার সেই মায়ের যদি একটু বয়স বাড়ত, আর মা যদি গেরুয়া পরত তা হলে ওই সন্ন্যাসিনীর মতোই দেখাতে হত। আমি আর দিদি দু'জনেই তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিলুম। দিদিকে যখন ডাকতেন, কই রে মা, এদিকে আয়, তখন মনে হত স্নেহ ঝরে পড়ছে। আমাদের সব ভেঙে চুরমার হয়ে যেত; সে কী আপনার দয়া, যে সব কিছু আবার ঘুরে গেল। দিদির মনে একটা পরিবর্তন এসে গেল। আমি একদিন দিদির পাশে শুয়ে আছি। বাইরে চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। দূরে একটা পাপিয়া ডাকছে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা। অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে থেকে দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোর তো বিয়ে হয়ে যাবে দিদি, তখন আমি কী করব? দিদি বললে, বিয়ে আমি করব না ভাই, সংসার আমার ভাল লাগে না। বাবার মতো স্বামী আমি কোথায় পাব। আমি বেশ আছি, আমি এইভাবেই কাটিয়ে যাব।

আমার মাঝে মাঝে মেলার সেই মিষ্টির দোকানের মেয়েটাকে মনে পড়ে যেত। ওর ওই দুঃখী দুঃখী চেহারাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। মেলায় যখন আবার যাব তখন খোঁজ নেব, এইরকম একটা ইচ্ছে হয়েছিল আমার মনে। ভৈরবী সন্ন্যাসিনী কাজের একেবারে মাতন লাগিয়ে দিলেন। ধর্ম মানে ঘুম আর খ্যাটোন নয়। ধর্ম মানে কর্ম। উদয়াস্ত খেটে যাও। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কী জানিস?' 'একটু গান জানি, মাটির কাজ। আর পারি পালা লিখতে।' 'এইবার তুমি কী জানো?' 'আমি তো তেমন কিছুই জানি না।'

সন্ন্যাসিনী বললেন, 'দামড়া ষাঁড়। পৃথিবীটা কি তোর নবাবির বৈঠকখানা। এই তো সেই বয়েস, গলায় বয়সা লাগাবে। শুরু হবে রিপুর দলন। দামড়া তোকে আমি পিটিয়ে আমড়া করব। হতভাগা খাচ্ছ-দাচ্ছ আর বগল বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছ।'

এত অভিমান হল, ভাবলুম চলেই যাব। সেই নদীর ধারে। সেই দোকানে। সেই মেয়েটা। খেটেখুটে যা হয় করে বাঁচব। আরও একটু বড় হয়ে নৌকোর মাঝি হব। মাঝি হতে বেশ লাগে। যাঁরা আপনাকে নিয়ে থাকেন, তাঁরা মনে হয় মানুষের চিন্তা পড়তে পারেন। আচমকা ঠাস করে

একটা চড় এসে পড়ল আমার গালে। আমার সামনে সেই ভৈরবী। জীবনে সেই প্রথম আমি ভয় পেয়েছিলুম। আমার মা আর বাবা ছিলেন ভীষণ নরম প্রকৃতির। শাসন কাকে বলে, মার কাকে বলে জানা ছিল না। ভৈরবী বললেন, 'কোনওরকম উলটোপালটা চিন্তা মনে এলেই আমি মারব। আমি এসেছি একটা দায়িত্ব নিয়ে। হয় আমি তা পালন করব না হয় আমি চলে যাব।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলুম— 'আমি তো খারাপ ছেলে নই মা, তা হলে আমাকে তুমি অমন করছ কেন?' আমি ঝরঝর করে কাঁদছি— আর বলছি।

ভৈরবী বললেন, 'কাছে আয়। এই অভিমান আর চোখের জল, এইটাই আমি চেয়েছিলুম। বাড়ির যেমন ভিত, অভিমানও সেইরকম মানুষের জীবনের ভিত।' আমার মাথাটা বুকে নিলেন। সারা শরীরে কী যেন একটা খেলে গেল। মনে হয় একেই বলে শক্তি। শক্তি ছাড়া মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নেই। শক্তি আর প্রেম। পৃথিবীর সব মানুষই তাই শাক্ত।

ওই জীবনে আমি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখে এসেছি। বিজ্ঞান বলবে ভ্রম। অবিশ্বাসী বলবে ম্যাজিক। কিন্তু আমি দেখেছি। একটা খুব বাজে লোক ধর্মের নামে অধর্ম করতে এসেছিল। তার নজর ছিল আমার দিদির দিকে। ভৈরবীকে টাকা পয়সার অনেক লোভ দেখিয়েছিল। কুকুরের যেমন মাংস দেখলে নোলায় জল আসে, সেই লোকটারও দিদিকে দেখলে সেইরকম হত। ইংরেজের তাঁবেদারি করে অনেকে তখন দু'পয়সার মালিক হয়েছে। এই গ্রামে লোকটা একটা বাগানবাড়ি করেছিল। ফুর্তির আখড়া, মদ, বাজারের মেয়েছেলে সবই হয়ে গেছে; এইবার একটু টাটকা জিনিস চাই। লম্পটদের তো ছলাকলার শেষ নেই। প্রথম প্রথম এসে খুব মা মা করলে; তারপরে ভৈরবী একদিন লোকটার নড়া ধরে আশ্রমের বাইরে বের করে দিলেন। ত্রিশূল নিয়ে এমন তাড়া করলেন, পালাতে গিয়ে লোকটার কাঁচি ধুতির কাছা খুলে গেল।

হলে হবে কী! কাম আর্যাসা এক জিনিস; যেন ঘুণপোকা। দিন-রাত কটর কটর করে। একদিন গভীর রাত। ভৈরবী মা মঙ্গলচণ্ডীর সামনে বসে হোম করছেন। সারাটা রাতই তিনি সাধনা করতেন। আমরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু শুয়েছি। দিদি কিন্তু বসে আছে হোমের জায়গায়। দিদিও ঘুম ছেড়ে দিয়েছে। দিদির এই পরিবর্তন আমার ভীষণ ভাল লাগত। দিদি আমাকে একদিন চুপিচুপি বলেছিল, দেখ, আমি প্রেমে পড়েছি। কার প্রেমে জানিস, ওই যে সেই মানুষটি, যে আমাকে জল থেকে টেনে তুলেছিল। তারপর আমার মুখে মুখ রেখে আবার আমার হৃদয়টাকে চালু করে দিয়েছিল, এ জীবন হল তার। তাকে তো আর আমি পাব না। তাই আমি ভগবানকে ভালবাসব, আমি সন্ন্যাসিনী হব। তাই তো ভৈরবী মা এসেছেন।

সেই নৈশ উঠোনে পরপর এসে দাঁড়াল ছ'টা ছায়ামূর্তি। তারা ভৈরবী মা আর আমার দিদির পেছনে এসে দাঁড়াল। দিদিকে তুলে নিয়ে যাবে। ওরা ভেবেছিল কাজটা নিঃশব্দে হবে। প্রত্যেকেই সেইভাবে তৈরি হয়ে এসেছিল। হঠাৎ ভৈরবী মা হোমকুণ্ড থেকে একমুঠো গরম বালি তুলে ছুড়ে দিলেন সেই শয়তানগুলোর দিকে। ব্লপ করে একটা আগুনের বলয় তৈরি হল সেই লোকগুলোকে ঘিরে, বজ্রপাতের মতো সাংঘাতিক একটা শব্দ, সঙ্গে ভৈরবীর হাড় হিম করা সাংঘাতিক এক হাসি। সে হাসি যেন পৃথিবীর পেট থেকে বেরিয়ে আসছে শতমুখে। আয় আয় বলে তিনি তিনবার হাঁক পাড়লেন। ছটা কালো রঙের বিকট চেহারার কুকুর ছুটে এল কোথা থেকে। এরপর সেই ছ'টা লোক, আধপোড়া ছ'টা লোক ছুটতে লাগল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, আর তাদের পেছনে নেকড়ের মতো গর্জন তুলে ছুটতে লাগল ছ'টা কুকুর।

এই ঘটনা আমি দেখেছি প্রভু। ওই ছ'টা কুকুরকে আগে আমি দেখিনি কখনও, পরেও আর দেখিনি। এর ব্যাখ্যা, এর সত্যমিথ্যা, হয় কি হয় না, সব আপনার দপ্তরেই জমা আছে। কৃপা করে যদি জানান তবেই জানা যাবে। পৃথিবীর মানুষ বুঝতে না পারলেই বলে, গড নোজ, মিরাক্যল। সাধকের বিভূতি।

আমরা পরে ভৈরবী মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। মা আমাদের একটা গল্প বলেছিলেন, শুনবেন? গল্পটা আপনার রাজত্বের। শুনুন। এতই যখন শুনছেন। আপনার তো ধৈর্য অসীম!

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, অর্থাৎ আপনি, সারাদিন কাজকর্মের পর একদিন রাতে ঘুমুতে গেলেন। গভীর ঘুম। ভোরবেলা রোজ যেমন ওঠেন, সেইরকম উঠলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে দিনের কাজ শুরু করার আগে আকাশের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই অবাক। কী হল! একবার তো সব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সৃষ্টির কাজ তো আমি শেষ করে ফেলেছি। তা হলে কোথা থেকে আবার নতুন দশটা জগৎ এল! যে জগৎ আমি সৃষ্টি না করা অবধি সুপ্ত থাকার কথা তার প্রকাশ কী করে হল! এদের অস্তিত্ব কোথা থেকে এল! আপনি তো হতভম্ব। আপনি তখন আপনার ইচ্ছাশক্তি বলে সেই নতুন জগতের মধ্যে একটি জগতের সূর্যকে ডেকে আনালেন।

'হাঁ হে, ব্যাপারটা কী! এইসব জগৎ কোথা থেকে সৃষ্টি হল?'

সূর্য বললে, 'প্রভু আপনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। এমন কী আছে আপনি জানেন না! তা সত্ত্বেও আপনি যদি আমার কাছে শুনতে চান, তা হলে বলি: স্বামী, কৈলাস পাহাড়ের কাছে এক শহরে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করত। তাদের কোনও ছেলেপুলে না থাকায় তারা পরমেশ্বরের কাছে ছেলের জন্যে প্রার্থনা করলে আর শেষ অবধি তাদের দশটি ছেলে হল। যথাকালে তারা বড় হল, সব শাস্ত্রপাঠ করলে। কিছুদিন পরে তাদের মা-বাবা মারা গেল। ছেলেদের খুব দুঃখ হল। তাদের আর কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না, তাদের আর নিজেদের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করল না, তারা তপস্যা করবে বলে চলে গেল কৈলাস পর্বতের মাথায়। সেখানে তারা এক পরামর্শ-সভা বসালে— দুঃখ নিবারণের জন্যে তাদের কী করা উচিত। প্রথমে ভাবলে, অর্থেই আনন্দ, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল— ধনীরও ধনী আছে। রাজ্যলাভ, এমনকী মহেন্দ্রত্ব পেলেও, তারও পর থেকে যায়। তারা বুঝে গেল এসবে কোনও তৃপ্তি নেই। শেষে বড় ভাই বললে, যিনি এইসব সৃষ্টি করেন, তিনি হলেন ব্রহ্মা। অতএব ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ। অন্য ভাইয়েরা সে কথা সমর্থন করলে। কিন্তু ব্রহ্মত্ব কী করে পাওয়া যায়? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বড় ভাই বললে, এটা এমন কিছু শক্ত নয়। মনই সব কিছুর মূল কারণ। এসো, আমরা নির্জনে বসে, ব্রহ্মত্ব লাভ করার জন্যে সব চিন্তা, এমনকী শরীর চিন্তা পর্যন্ত ত্যাগ করে মনকে একাগ্র করি। সব সময় অনুভব করার চেষ্টা করি, যে আমরা একটা পদ্মের ওপর বসে আছি, আমরা জ্যোতির্ময়, আমরা জগৎ সৃষ্টি ও বিনাশ করছি। শুরু হল সাধনা। দেখতে দেখতে তাদের মনে দৃঢ়মূল হল এই ধারণা, আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা। তারা তাদের শরীরের কথাও ভুলে গেল। শরীরগুলো সব ঝরে পড়ে গেল গাছের শুকনো পাতার মতো! প্রভু, এই সাধনার বলে দশজনেই এখন বসে আছেন ব্রহ্মা হয়ে কৈলাস-শিখরে। তাদেরই ইচ্ছাশক্তির বলে দশটি জগৎ সৃষ্টি হয়েছে কাল রাতে। তাদের ইচ্ছাশক্তি এখন স্থির হয়ে আছে চিদাকাশে। আমি সেই দশটি জগতের একটির সূর্য।' এই বলে সূর্য চলে গেল তার নিজের জগতে।

ভৈরবী মা, এই গল্পটি বলে বললেন, এতে অলৌকিক কিছু নেই। আছে ইচ্ছাশক্তি। তোমরাও পারবে যদি মনঃসংযম করতে পারো। এরপর আমার দিদিকে বললেন, তোকে বাঁচতে হবে অনেক বছর। অনেক সাধনা করবি তুই। চল্লিশ বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত, অনেক নরপশু তোকে খাবলাতে আসবে, আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন কর।

পরমপিতা, এই ঘটনার পর আমাদের আশ্রমের মহিমা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলা শহর থেকে পৌঁছে গেল শহর কলকাতায়। আমার দিদির নতুন ভৈরবী রূপ দেখে আমার হিংসে হত। আমি যে কিছুই তেমন হতে পারলুম না। আমার বাবাও একদিন চলে গেল। ভৈরবী বললেন, শোন, তুই এবার বেরিয়ে পড়। চলে যা উত্তর ভারতে। দেখ না, কিছু একটা হতে পারে।

আমি বেরোলুম। বেরিয়ে যেতে পারলুম না বেশি দূর। আমার মা যেখানে ছিলেন, আমি যে তার কাছাকাছি থাকতে চাই। আপনার পৃথিবীর এত রূপ, সেসব ছেড়ে আমি যাই কোথা। ভৈরবী মা

ধমকে, শাসন করে আমার ভেতরের ভূত তাড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার ভেতরে যে এক প্রেমিকের রক্ত বইছে যে প্রেমিক খালি পেটে গান গাইত, আপনমনে পুতুল বং করত, কৃষ্ণের মুখে বসাত টানাটানা চোখ। বউ মরে যাবার পর যে বউয়ের মূর্তি তৈরি করে, বেদিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল মঙ্গলচণ্ডী রূপে। এত প্রেম! সেই প্রেমের জাল কেটে আমি যাই কোথা! আমার দিদি আর সে দিদি নেই। সে এখন সাধিকা।

আমি চলে এলুম সেই নদীর ধারে। শেষবার এখানে এসেছিলুম বাবার সঙ্গে। বৈশাখী মেলায়, পুতুলের ঝাঁকা নিয়ে। সেই নদী সেই গ্রাম। সেই বিশাল মন্দির। সেই মিষ্টির দোকান। তখন মেলার সময় নয়। শিবমন্দিরে প্রতিদিনের পুণ্যার্থীদের ভিড় যেমন হওয়া উচিত, সেইরকম। মিষ্টির দোকানের মাচায় এসে বসলুম। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। এত বড় একটা পৃথিবীতে আমি একা। কীভাবে বাঁচতে হয়, তা তো জানি না! মনে মনে সেই মেয়েটিকে খুঁজছি। সে তো আর ছোট নেই। মিষ্টির দোকানে সেই লোকটি নেই। বসে আছে আর একজন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তেল চুকচুকে চেহারা। সকলেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। সকলেরই নিজের নিজের জগৎ রয়েছে। আমার জগৎটাই হারিয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলুম— দিদির ওপর অভিমান করে তো কোনও লাভ নেই। দিদির বিয়ে হয়ে গেলে কে থাকত আমার!

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সাহস করে নতুন মালিককে জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে, আগের লোকটা মরে গেছে। বলেই খুব একচোট গালাগাল দিলে। লোকটা একেবারে শয়তান ছিল। তুমি তার কেউ হও নাকি? আমি আমার কথা বললুম। লোকটা দোকানের মালিক ছিল না, ছিল কারিগর কর্মচারী। এই লোকটা হল মালিকের বড় ছেলে। এরপর ভয়ে ভয়ে সেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করলুম।

মেয়েটি অন্ধ হয়ে গেছে। শিবমন্দিরের বিশাল উঠানের একপাশে বসে নাকি ভিক্ষে করছে। ভীষণ একটা ধাক্কা লাগল মনে। সেদিন চটিয়ে আপনাকে গালাগাল দিয়েছিলুম। আপনার বিচারটা কেমন মশাই! কারও দুধে পাটালি, আর কারও শাকে বালি। মন্দিরের চাতালে গেলুম। একেবারে একপাশে একটি মেয়ে বসে আছে। দেখেই চিনতে পারলুম। বড় হয়েছে। বেশ বড়। সেই করুণ মুখ। সেই করুণ দৃষ্টিটাই কেবল নেই। যে চোখে তাকালেই মনে হত অনেক যন্ত্রণা ভেতরে চাপা আছে। মেয়েটি হাত পেতে বসে আছে, আর খুব ভয়ে ভয়ে বলছে, বাবা একটা পয়সা, মা একটা পয়সা। বোঝাই যায় জাতভিখিরি নয়। আমি তার সামনে বসে খুব মৃদু গলায় ডাকলুম। আমি তার নাম জানতুম। একটু বন্ধুত্ব তা হয়েইছিল সেবার।

ঈশ্বর, জীবনে অনেক দেখেছেন আপনি; কিন্তু দৃষ্টিহীন যখন পুলকিত মুখে কণ্ঠস্বরে পরিচিতি খোঁজে তখন কেমন দেখায় আপনি জানেন কি! অন্ধকার যেন আলো খুঁজছে!

আপনার পরিকল্পনা ভেস্তে দেবার জন্যে আমার প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করে ফেললুম। এক ভিখিরিকে আর এক ভিখিরি বিয়ে করবে, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে। বরং বেশ মজা। সেকালের আমোদপ্রিয় মানুষ বেড়ালের বিয়ে দিত বিলিতি বাজনা বাজিয়ে। আমাদের বিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এল কিছু হুজুগে লোক।

এইবার আপনাকে বলি, আপনার পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ আছে— নিজের জন্যে বাঁচে, নামের জন্যে বাঁচে, মানুষের জন্যে বাঁচে আর আপনার জন্যে বাঁচে। আপনার দিকে আমাকে ঠেলার চেষ্টা হয়েছিল। খুব অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। আমি বেঁচেছিলুম একটা মেয়ের জন্যে। ভৈরবী মায়ের শিক্ষাটা এইখানে কাজে লাগল। একটা মেয়ে, তার চোখ ফোটাতে না পারি, মুখে হাসি ফোটাব, এই জেদ চেপে গেল।

এইবার একবার দৃশ্যটা অবলোকন করুন প্রভু। আমাদেরও ফুলশয্যা হয়েছিল। ফুল ছিল না, শয্যাও ছিল না। ছিল মাটির মেঝে, ছেঁড়া মাদুর একখানা। আর বালিশ হয়েছিল দুটো পুঁটলি। আর

আমার বউ চেয়েছিল একটি মাত্র জাগতিক জিনিস, পিপারমিন্ট দেওয়া এক খিলি পান। ফুলই বলুন আর শয্যাই বলুন সবই তো মনে। মাথার ওপর ফুটো আটচালা। আর হ্যাঁ, চাঁদ ভালবাসি বলে চাঁদ ছিল আকাশে। ফুটো চালা দিয়ে চাঁদই আড়ি পেতেছিল সে রাতে।

এইবার শুনুন, কল্পনা করার চেষ্টা করুন দৃশ্যটা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে আমার প্রেমিকার মুখে। দুটো চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই। আমি তাকে দেখছি, সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সেই না-দেখাটাই তার মৃত চোখে কালো মেঘের মতো ভাসছে। তার দুটো হাত আমার গালের দু'পাশ বেয়ে ওপরে উঠছে, নেমে আসছে। স্পর্শ করে অনুমানের আপ্রাণ চেষ্টা। সে কেবল বলছে, তোমাকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে আমার ভীষণ দেখার ইচ্ছে করছে। ইচ্ছের রূপ যদি দেখতে চান, তা হলে কোনও এক অন্ধের মুখের দিকে তাকান এইরকম কোনও মুহূর্তে।

এইবার শেষ করি মালিক, কারণ জীবনের এই ভাগ্য আর পুরুষকারের খেলায় সেবার আপনার হার হয়েছিল। ইংরেজরা যাকে বলে 'ড্যাম ডিফিট'। কলকাতার শ্মশানে আমি আমার বউকে চন্দনকাঠের চিতায় চড়িয়েছিলুম। আমার নামে কলকাতায় একটা রাস্তা আছে। আর আমার বংশধরদের আপনি এখনও দেখতে পাবেন, বড়বাজারে ব্যাবসা করছে। তিনখানা বাড়ি। আছে এখনও আছে, ফুঁকে দেয়নি।

আর সময় পেলে চণ্ডীতলায় একবার যাবেন। দেখে আসবেন মা মঙ্গলচণ্ডীর বিশাল মেলা। বিরাট এক আশ্রম। জিজ্ঞেস করবেন ছোট ভৈরবীর কথা। আমার দিদি। অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে এসেছে। আমি অবশ্য কোনওদিন আমার বউকে নিয়ে গিয়ে বলিনি— দিদি চোখ ফুটিয়ে দে। সে ছিল শক্তির সাধিকা, আমি প্রেমের। প্রেম চিরকালই অন্ধ!

॥ ৭ ॥

এইবারে প্রভু আমি আবির্ভূত হলুম আপনার খাস কলকাতায়। সে এক অদ্ভুত বাড়ি। বাড়ির বুড়োকর্তার এই এতখানি শরীর। হুলোর মতো একটা গোঁফ। ধুতির ওপর হাফ হাতা পাঞ্জাবি। বিদঘুটে ধরনের চুল। চারপাশ কামানো, মাথার মাঝখানে মোরগঝুঁটি। থাকত একটা চারচৌকো ভোঁদকা মতো বাড়িতে। সেই লোকটার যে কত ছেলেমেয়ে ছিল! দশ-বারোটা তো হবেই। বলতে নেই ভদ্রলোকের অদ্ভুত উর্বরতা ছিল। সেই একটা গান আছে, ভয় কী মরণে, সেইরকম ভয় কী জনমে। এই মুহূর্তে কলকাতার যা হাওয়া, কোনও ভদ্রলোকের অতগুলি সন্তান হলে প্রতিবেশীরা বিদ্রূপ করত। সেই সময়টায় বাঙালি পরিবারে ছেলেমেয়ে ফলত চালকুমড়োর মতো। কোনও দয়ামায়া ছিল না। সারা বছরই মায়েরা গর্ভবতী। বিদ্রোহ করার উপায় নেই। ভারতে আপনি এক শাস্ত্রকার পাঠিয়েছিলেন, সর্বনাশটা তিনিই করে এসেছিলেন। বলে এসেছিলেন— পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

সেই লোকটার সব ক'টা ছেলেমেয়েই হয়েছিল এক বছর অন্তর অন্তর। মানে, বন্দুক ভরার মতো। একটা গুলি যেই বেরুল, আর একটা ভরা হল। যৌথ পরিবার ছিল। সব ক'টা ভাইয়েরই এক অবস্থা। কেউ কম যায় না। সধবা, বিধবা, আইবুড়ো মেয়ে মিলে রাবণের গুষ্টি। ছাদে জামাকাপড় শুকোত মনে হত, ধোপার বাড়ি।

ওই লোকটির বড় ছেলের বড় ছেলে হয়ে জন্মানোমাত্রই, আমার মেজ ঢুকে গেল। ওই হুলো-গুঁপো লোকটা ছিল আমার ঠাকুরদা। সকাল যেই হল সেই বিশাল পরিবার জেগে উঠল। শিশুরা শুরু করল প্রভাতী কান্না। বালকরা ধরল ঘ্যানঘ্যান। বুড়োরা ধরল কাশি। বুড়িরা শুরু করল খ্যাচখ্যাচ। বউরা আরম্ভ করল চুলোচুলি। তাদের কর্তারা ধরল পোঁ। যার যার বউয়ের পোঁ। এ

বারান্দায় একজোড়া বউ, ও বারান্দায় একজোড়া, দল ছাড়া একটা ছাতে। উঠোনে তিনটে। আদুরিরা তখনও স্বামীর সোহাগ আলিঙ্গনে। কর্তা খোঁপার নীচে ঘাড়, সেই জায়গাটায় নাক ঘষছে, আর আদুরে আদুরে গলায় বলছে, উঁ আর একটু, উঁ আর একটু। হাত দুটো হন্যে হয়ে ঘুরছে। সবে বিয়ে হয়েছে আর কী। খোঁপায় এখনও ফুলশয্যার জরির ফিতে। বউ বলছে, সারা রাতেও মেটে না খিদে। কর্তা অমনি বোম্বাই খাটে গিন্নিকে পেড়ে ফেলে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, তবে রে শালা! সোহাগের স জানে না, মারব এবার কোঁতকা। আর এক ঘরে কর্তা আঁচল টেনে ধরে আছে, আর আটফাটা গলায় গাইছে—

এখনও রজনী আছে বলো কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করো হোক নিশি অবসান ॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝংকার দিত।
কুমুদী মুদিত হত, শশী যেত নিজস্থান ॥

তোমার নিশি আর অবসান হবে না গো। সেই কখন রাস্তা দিয়ে কেত্তন চলে গেছে, রাই জাগো বলে। ওদিকে এক বউ আর এক বউকে বলছে, আজ খুব স্বামীর সাপোর্টে লড়ছিস রে, পরশু রাতে যখন পেঁদিয়েছিল, তখন গলা ধরে কাঁদতে এসেছিলিস। এবার আসিস তুই। মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দোব। এই হরিহর ছত্রের মেলায় পুরুত ঢুকছে। গায়ে নামাবলি, মাথায় পাট করা গামছা, শিখায় কল্কে ফুল। রাস্তায় আসছিলেন হরেকৃষ্ণ বলতে বলতে, সদরে ঢুকেই বললেন, যদুবংশ ধ্বংস হোক।

এইবার বারান্দায় দর্শন দিলেন সেই হেড হুলো। হুংকার ছেড়ে বললেন, মরিনি এখনও। আমি মন্টেগু চেমসফোর্ডের সঙ্গে ডিনার খাই। হ্যামিল্টন আমার এক গেলাসের ইয়ার। শুয়োর বাচ্চারা মানুষ হ। ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। নো কোয়ার্ল। পিস। পিস। আমেন।

বাসন মাজছিল গায়ে গতরে মোক্ষদা। দুলে দুলে। কর্তা দৃশ্যটি বড় উপভোগ করছিলেন। পিস পিস শুনে, সে অমনি খ্যানখ্যানে, দোক্তাখেকো গলায় চিৎকার করলে, 'পিসি কর্তাবাবু ডাকছে গো।' কর্তাবাবু মোক্ষদাকে সাহায্য করেন। মোক্ষদাও কর্তাবাবুকে সাহায্য করেন। গোয়াবাগানে কুস্তি লড়তেন কর্তা। পাঁচ পোয়ার কম মালাই খেতেন না। বেনারসে বাই ঠিক করা আছে। কলকাতায় মাঝেমধ্যে রামবাগানে যেতে হয়, কোটালে যখন বাড়ে। নিজের ধর্মপত্নী সন্তান বিয়োবার তাড়সে তেজপাতা। নির্জনে মোক্ষদাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোর এই গতরের সিক্রেটটা কী?'

মোক্ষদা শোনে, সিগ্রেট। বলে, 'পালপার্বণে একটা-দুটো চলে। নইলে বিড়ি।' কর্তা অমনি বলবে, 'বিড়ি খাসনি মোক্ষদা। মুখে বিচ্ছিরি গন্ধ হয়। খাবি অম্বুরী তামাক।' 'কী যে বলো কত্তা—' এই সময়টায় মোক্ষর সাহস বেড়ে যায়। আলতো করে আঙুল বুলোতে থাকে কর্তার শরীরে। কর্তা অমনি কাঁইকুঁই শুরু করেন, 'করিস কী, করিস কী, কাতাকুতু লাগে, ক্যাতাকুতু।' অবশেষে মহা আবেগে কর্তা বলে ওঠে জীবনের সার কথা— 'ওরে তুই আমার ধর্ম, তুই আমার মোক্ষ।'

'ধম্মপত্নী তো আর হতে পারব না।'

'ধর্মপত্নী তো মুতো কাঁতা রে পাগলি। তুই আমার বিবি। বিবিজান, গহরজান, লহরজান। আমার ফেরেন্ড কী লিখে গেছে জানিস মোক্ষ:

আজব শহর কলকাতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কী কেতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ি সোনার বেনের কড়ি,
খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্য গেল পাতা ॥

ওই ধম্মপত্নীটা চিঁচিঁ করছে। আপদ বিদেয় হলে, সোনার ইট গেঁথে তোকে একটা ইমারত তৈরি করে দোব। গাউন পরিয়ে তোকে হগসায়েবের বাজারে নিয়ে যাব। শ্রীহরির কৃপায় তোর গতরটি

যেন এমনি থাকে। শুঁটকে মাগি দুচক্ষের বিষ। দেখলেই মনে হয় সন্নেসি হয়ে যাই। তুই কি শোরের মাংসে খাস।'

পান-দোক্তা রাঙা পুরুষ্টু জিভ কেটে মোক্ষ বলে, 'রামঃ ধম্ম নষ্ট হবে।'

'ওরে মুখ্যু, মেমসায়েবরা খায়, তাই না ওদের শরীর অত টাইট। টিরিটি থেকে একটু করে আনাবি। আর আমি তোকে নুকিয়ে এক শিশি পোর্ট দিয়ে দোব, একটু করে খাবি, খাওয়ার আগে, দেখবি গায়ে মাছি পেচলাবে। ওরে মোক্ষ, শরীরটাই সব। শরীরম আদ্যম খলু ধর্মসাধনম। মানে বুঝিস? শরীরই আদ্যামা, খলেরাই শরীর ছেড়ে ধর্ম ধর্ম করে। লর্ড ল্যাঙ্কাস্টার সেদিন ডিনার শেষে পেলেটি হোটেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কী বলেছিল জানিস, বি ড্রাঙ্ক, অলওয়েজ ড্রাঙ্ক অ্যান্ড উইথ এনিথিং, মানি, ওয়াইন, ওমেন, পোয়াট্রি। মানেটা কী হল বল তো, খালি মাল খাও, খালি মাল, নেশায় ঢুলুঢুলু, আর গেঁজে টাকা, কোলে তুই। জীবন এক কবিতা।'

'কত্তা দুঃখুটা কোথায় জানো, একটা যদি ছেলেপুলে হত!'

'ছেলেপুলে? বল ছেলেপিলে। এই যে আমার এতগুলো, তাতে আমার কী কাঁচকলা হয়েছে! খরচ বেড়েছে অশান্তি বেড়েছে। এই যে ধর শ্রীমধুসূদন! শত গোপী নিয়ে যমুনাপুলিনে গুড়ুমদুড়ুম করতেন, কারও ছেলেপিলে হয়েছিল! ইতিহাসে আছে? মাছে ডিম এলেই টেস্ট চলে যায়। আমার মতো একজন-দু'জন আসুক। তা না হলে পৃথিবী তো মহাপুরুষশূন্য হয়ে যেত। আমি কারওকে বলি না; কারণ কিছু কথা গোপন রাখতে হয়। সাত কান করতে নেই; তবে তোকে আমি বলতে পারি; কারণ তুই আমার লীলাসঙ্গিনী। শত গোপীর এক গোপী শ্রীরাধিকা। আমি স্বপ্ন দিয়ে এসেছিলুম, আমি অবতার। তুই শুধু মিলিয়ে নে— গজেন্দ্র-বদন-লম্বোদরস্থূলকায়। তার মানে, আমার মুখটা হাতির মতো। নাক, কপাল, চোখ, থুতনি, তুই পাশ থেকে দেখ, ঠিক যেন হাতি। লম্বোদর, আমার ভুঁড়িটা দেখ। তারপর স্থূলকায়, মানে মোটাসোটা। এইবার শোন— স্ফুরন্নিষ্ঠুরালোলপিঙ্গাক্ষিতারং কৃপাকোমলোদারলীলাবতারম।'

মোক্ষ বললে, 'কত্তা, আর দরকার নেই আমি বুঝে গেছি।'

'তুই শুধু লীলাবতারম শব্দটা লক্ষ কর! এ আমি তোকে বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। আমার বাপের ক্ষমতা হবে না এই জিনিস লেখার। শাস্ত্র লিখেছেন আমাকে লক্ষ্য করে— লীলাবতারম। আমি অবতার, আমার সঙ্গে সবাই লীলা করবে। কৃষ্ণের মতো আমার একটা খাটাল থাকলে, আর বাগবাজারের খালটাকে যমুনা নদী করে দিলে, রাস আর ঝুলন দুটোই আমি করতুম। শুধু চিৎপুর থেকে একটা ফুলুট বাঁশি কেনার মামলা। আর একটা শব্দ মনে রাখ, স্ফুরন্নিষ্ঠুরালোলপিঙ্গাক্ষিতারং। তার মানে, আমার লীলায় ব্যাঘাত ঘটলে, আমার চোখ লাল হয়ে যাবে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে যাবে, আমি শুঁড় তুলে নৃত্য করব। শোন, এ কথা তোকে আমি সিক্রেটলি বলে গেলুম। দেখবি, লীলা সংবরণের পর আমার নামে চচ্চড়িবাগানে মঠ হবে। হ্যাঁরে মোক্ষ, তুই যেন আর একজন কার কথা বলছিলিস, তোদের পাড়ায়। কর্তাভজাদের ওখানে যায়, তোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তা বল না, বাড়ির কাছেই এত ভাল কর্তা রয়েছে।'

মোক্ষ ঠোঁট উলটে বললে, 'না গো! সে মাগির চরিত্তির ভাল নয়।'

মোক্ষ তার রূপের বর্ণনা শুরু করলে। কাপড়-চোপড় পরার ধরন। রাধিকার ভাব এলে তার কী হয়! রাগকৃষ্ণ রাগকৃষ্ণ বলে সব খুলে ফেলে। বর্ণনা শুনে কত্তা হায় হায় করতে লাগল। যেন পারলে এই মুহূর্তে তাকে গিয়ে উদ্ধার করে। শেষে বললেন, 'জীবের দুঃখ আর সহ্য করা যায় না। হা কৃষ্ণ!'

মোক্ষদা এইবার কর্তার খুব গা ঘেঁষে বসে ফিসির ফিসির করে বললে, 'তোমার মুখে তো চুনকালি পড়বে। পিতেপিতেমোহর নাম ডুববে।'

কর্তা একটু ঘাবড়ে গেল। হচ্ছিল রসকলি। মাগি বিলিতি থ্রিলার পড়ে ব্ল্যাকমেলের দিকে যাচ্ছে

নাকি! কর্তা তবু রাশ ছাড়ল না। 'শহরে এমন বাপের বেটা কে আছে, আমার মুখে চুনকালি মাখাবে! আমার ফ্যামিলির মুখে চুনকালি মাখাবে! আমি লর্ড লাউডনের সঙ্গে লাঞ্চ করি। ব্যাটাকে নির্বংশ করে দোব। রামবাগানের খোকাকে নলচেটা ধরিয়ে দোব নিমতলায় গিয়ে খুলবে। পরমেশ্বরের গোলাপবাগানে গিয়ে উর্বশীর লাচ দেখবে।'

মোক্ষ মোক্ষম জায়গায় একটা চিমটি কেটে বললে, 'চিল্লে মরছ কেন। ভাল করে শোনো। তোমার মেজ বউমা তো পিরিত করছে। পাশের বাড়ির ফ্লুটওলার সঙ্গে। ওই যে গো থিয়েটারে কনসট বাজায়। বাবরি চুল, নবকাত্তিক।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝলে এইবার কলি। ঘোর অধম্ম। মেয়েমানুষের যদি চরিত্তির খারাপ হয় তা হলে রইলটা কী! এঁটো ফলে দেবপুজো হয়?'

'এঁটো করেছে?'

'করতে কতক্ষণ? তোমার যা বাড়ি, এই হরিহর ছত্তের মেলায় দুটো লোক অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। তুমি কজনকে চেনো? হঠাৎ কেউ সামনে পড়ে গেলে চিনতে পারবে? রোজ রাতে সদর বন্ধ হয়ে যাবার পর, কজন বাইরে পড়ে রইল তার হিসেব কেউ রাখে? তোমার মেজছেলে তো রাতে বেতালা বোতল। তিনি তো এখন পিসির বড় মেয়ের সুধা পান করছেন।'

'কে বললে?'

'আমি বললুম। আমাকে সব খবর রাখতে হয় গো, নিজের জন্যেই রাখতে হয়। কেউ যদি বলে, এই ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা, সঙ্গে সঙ্গে বলব, চালুনির আবার ছুঁচের বিচার। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'ঝেড়ে কাশ।'

কর্তার এইসব বর্ণনা শুনতে খুব ভাল লাগে, মোক্ষ তা জানে। মোক্ষ একেবারে খুঁটিনাটি সব বলে গেল। ঘর বন্ধ। মোক্ষ ঘরের বাইরে কান পেতে আছে। বউরা সব ঘরে ঘরে দুপুরের ভাতঘুমে। মেজবউ ছাতে। ছাতে ছাতে ফ্লুটের সঙ্গে ফস্টিনস্টি হচ্ছে চুল শুকোবার নাম করে। মোক্ষ শুনছে দামড়ি মেয়ের খুঁতখুঁতুনি, তুমি না আমার দাদা। ছিঃ, এসব করে! ছাড়ো, বউদি এসে পড়বে। কী হচ্ছে কী? না না, মাইরি না। হুটোপাটির শব্দ।

কর্তা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মোক্ষকে জাপটে ধরে বললেন, 'ছিছি, ছিছি, আমার এত ধর্মকর্ম সব গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওদিকে বলছেন, চৌবাচ্চায় ফুটো থাকলে যতই জল ঢালো সব বেরিয়ে যাবে। এ তো দেখছি অনেক ফুটো। এসব ফুটো তো বোজাতে হবে সবার আগে।'

'কত্তা ফুটো কি অত সহজে বোজানো যায়। তুমি কত্তা মহাপুরুষদের নাম যখন তখন কোরো না। ওসব নাম নেবার আগে মুখে তুলসীপাতা দিতে হয়।'

'ওই মেয়েটাকে কালই আমি দূর করে দোব।'

'মেয়ের তো দোষ নেই, দোষ তোমার ছেলের। তার এত নোলা কাঁসের বাপু। মেয়েটার সর্বনাশ হল বলে। তোমাকে আর বিদায় করতে হবে না, দেখবে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এই যে তুমি, তুমি যে আমার ওপর হামলে পড়ো, দোষটা কার, তোমার না আমার? দোষ তোমারও না, আমারও না। দোষ তোমার বউয়ের। তুমি যদি একটা ধেড়ে ইঁদুর হও, তা হলে সেই ইঁদুর ধরার কল হল তোমার বউ। সেই কলের দরজার ইসপ্রিং নষ্ট হয়ে গেছে।'

কত্তা ভীষণ খুশি, 'মোক্ষ তুই কেন কালিদাস হলি না রে!'

'আমি কালিদাস হলে তুমি কী করতে কত্তা!'

বড়রা যখন এইসব করছে, তখন আমরা বাচ্চারা কেবল মারামারি করছি। আমি প্রভু একটু কমজোর ছিলুম, কারণ আমার বাবা আর মা দু'জনেই একটু কমজোর ছিল। আমার বাবা ছিল

শিল্পী। সরকারি আর্ট কলেজ থেকে ছবি আঁকা শিখেছিল। আর আমার মা ব্রাহ্ম স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল। বাবা কেবল ছবি আঁকত আর আমার মাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখত একটা টুলে। দরজা জানলা সব বন্ধ থাকত; আর বাইরে আমার একগাদা কাকিমারা হাসাহাসি করত। মা নাকি কিছু না পরে বসে আছে। মডেল হয়েছে, মডেল। আমাকে বলত, তোকে বুঝি বের করে দিয়েছে। তা বেশ করেছে। দেব-দেবীর লীলাখেলা, ফলটি গড়াগড়ি যায় বাইরে। হায় রে! আমার বাবা আর মা সকলের থেকে একটু আলাদা ধরনের ছিল বলে, সবাই খুব হিংসে করত। চিমটি কেটে কেটে কথা বলত। আর বাড়ি ভরতি আমার মতো অন্য বাচ্চারা আমাকে কেবল ঠ্যাঙাত। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতুম। কেউ আমাকে ভোলাত না। পাশ দিয়ে সব যাচ্ছে আসছে ফড়ফড় করে, কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করছে, অ্যায় কাঁদছিস কেন? এ ছেলেটা কেঁদে কেঁদেই মোলো। যেমন বাপ, তার তেমনি মা। মাঝে মাঝে ঠাকুমা বেরিয়ে এসে ঝংকার দিত— সব পাপ, সব পাপ। অমনি কোনও বউ বলত সবই তো আপনার পাপ। এ বাড়িতে তো পাপের তেলেভাজা হচ্ছে।

আমাকে যদি কেউ ভালবাসত তো সে ওই পাপী মোক্ষদা। আমাকে নিয়ে চলে যেত দোতলার ছাদের ছায়ায়। সেখানে দু'পা জোড়া করে পায়ের পাতার ওপর আমাকে বসিয়ে দোল খাওয়াত, আর ছড়া কাটত— দোল দোল দোল দোলা, এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন। আবার কখনও বলত ধন ধন ধনা। তবে ওই ধরনের মহিলার মধ্যে একটু অসভ্যতাও থাকে। সে আর আমি কী বলব। মাঝে মাঝে এমন এমন জায়গায় আদর করত। যাক, আপনার পৃথিবীটা ওইরকম। মানুষেই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। আপনি দাদন দিয়ে দিয়েছেন।

আমার কাকারা ছিল এক-একটা এক-এক রকম। একদিন সবার ছোটকে সবাই মিলে খুব পেটালে উঠনে ফেলে। গুরুতর অপরাধ। মোক্ষদা তাকে গাঁজা খেতে দেখেছে খুব একটা খারাপ লোকের সঙ্গে। মার খেয়ে তার মুখ দিয়ে গলগল করে পচা কুমড়োর ভুতির মতো কেচ্ছা বেরোতে লাগল। কোন ভাই কী করে! কোন ভাইয়ের বউ কী করে। এসে পড়ল মেজ বউদির কথা। ফ্লুট বাঁশির প্রেম। এল মেজ ভাইয়ের ভগিনী দলনের কথা। সবার শেষে পিতা ও মোক্ষদা প্রসঙ্গ।

এর আগে পর্যন্ত সেই গুঁপো বুড়ো খুব 'এনজয়' করছিলেন। যেই তার কেচ্ছা এল বুড়ো বেরিয়ে এল বারান্দায়, উঠোনের দিকে তাকিয়ে ছাড়ল বজ্র হুংকার— আমি লর্ড ডিজিটেলিসের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করি, আমার নামে ভালগার কথা, প্যাঁদাও শালাকে। কচুরি ধোলাই লাগাও। বুড়ো মাঝে মাঝে ডিঙি মেরে বলতে লাগল, যাব নাকি, মারব নাকি, গুরুর শেখানো আড়াই প্যাঁচ।

সেইদিনই রাতের বেলা, মেজ ছেলে নেশায় চুর হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে গান গাইতে গাইতে কে বিদেসি মন উদাসী, বাঁসের বাঁসি বাজালে বনে। বৃদ্ধ পিতা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। নিনকমপুপ বলে মারল এক লাথি, মেজ গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে। সিঁড়ির তলায় পড়ে কোনওরকমে বললে— সরি মাই লর্ড।

কলকাতার সেই বাবুটি যখন ফোর্ড গাড়ি চেপে যেত, সে এক দেখার মতো দৃশ্য। গাড়ি দুলছে, বাবু দুলছে, ভুঁড়ি কুতুর মুতুর করছে। সেই গাড়িটার ডানপাশে সামনের দিকে একটা হর্ন ঝুলত। তার ভেঁপুটা শামুকের মতো পাকানো। যে চালাত সে কারণে অকারণে খুব টিপত আর ভঁক ভঁক আওয়াজ বেরোত। ওই হর্ন টেপাটাই ছিল চালকের মজা।

বৃদ্ধ মানুষটির প্রচুর কোম্পানির কাগজ কেনা ছিল। শেয়ার কেনাবেচা, সুদের কারবার, বন্ধকি কারবার, হরেকরকম দালালি। ভালই রোজগার ছিল। বিনা পরিশ্রমের উপার্জন। টাকা হেঁটে হেঁটে এসে সিন্দুকে ঢুকত। আর ছেলেদের কোনও রোজগারই ছিল না। তাদের কাজ ছিল পেট ঠেসে রাক্ষসের মতো খাওয়া, ভোঁস ভোঁস ঘুম, আড্ডা মারা আর আদি-রসের চর্চা। আর সেই বৃদ্ধটি আবার নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। হিতকারী সভা, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার, বানর নিবারণী

সমিতি, বিধবা ক্লেশ মোচন সঙ্ঘ, সৎকার সমিতি। ওই গাড়ি চেপে ভেঁপু বাজিয়ে সারা শহরটা ঘুরে আসা ছিল তার নিত্য কর্ম। লোককে জানাতে হবে তো শহরে একজন বড়মানুষ আছে। মাঝে মধ্যে এক-আধটা সায়েবসুবোকে অনেক কষ্টে, অনেক লোভ দেখিয়ে ধরে আনা হত। সায়েবের সম্মানে চিৎপুরের ব্যান্ডপার্টি এসে ব্যান্ড বাজাত। সায়েবকে মেজাজে রাখার জন্যে একপাল বউ সেজেগুজে এসে, তাদের রূপ, শাড়ি, সাজ, গয়না দেখিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে যেত। যেসব কাজের লোক অন্যদিন গামছা পরত তারাই সেদিন ভাড়া করা উর্দি পরে মদ আর খাবার পরিবেশন করত। সায়েবকে প্রচুর উপহার দেওয়া হত বাড়িতে দয়া করে আসার দক্ষিণা হিসেবে। সারা পল্লিতে নাম ছড়িয়ে পড়ত, সায়েব এসেছিল বাড়িতে। সেই রাতে বৃদ্ধ মদে বেসামাল হয়ে দালানে বিলিতি নাচ নাচার চেষ্টা করত। হেঁড়ে গলায় গান গাইত— টুইঙ্কল, টুইঙ্কল, লিটল স্টার। এরপর ভাবের জোয়ারে পায়ের আঙুলের ওপর দেহের ভর রেখে সাঁই করে এক রাউন্ড ঘুরতে গিয়ে থ্যাপাক করে পতন ও বেহুঁশ।

সায়েব এলে সব আলগা হয়ে যেত। বাড়িতে ব্যভিচারের স্রোত বয়ে যেত। যার যা করার বাসনা আটকে থাকত অন্যান্য দিন, সেদিন সব প্রাণ খুলে করা হয়ে যেত। যার ইচ্ছে ছিল একটা হার চুরি করবে, সেদিন সে চেষ্টা করত। যার ইচ্ছে ছিল চুমু খাবে, সেদিন সে খেয়ে নিত। যার ইচ্ছে ছিল বউদিকে জাপটে ধরবে সেদিন সে ধরত। এ বাড়ির মানুষ ইচ্ছে চাপতে জানত না। যেন সকালের বেগ, পেলেই নামাতে হবে।

হঠাৎ একদিন এক সায়েব এল। আমার ঠাকুরদা ধরে আনলেন। একটু বড় মাপের সায়েব। খুশি করতে পারলেই রায়বাহাদুর। প্রচুর মদ, প্রচুর খাবার, ফল, উপহার সব এসে গেছে। এসেছে কলকাতার সেরা বাই। জোর ব্যাপার। সায়েবের মুখটা ঘোড়ার মতো লম্বা। খাঁড়ার মতো নাকের ডগাটা মদ খেয়ে খেয়ে লাল। চোখ দুটো ছুনি গুলির মতো। সায়েব তালগাছের মতো লম্বা।

খুব ফুর্তি হচ্ছে। বাই নাচছে। হেঁচকি তোলা গান। ঘুরছে যখন পাঁইপাঁই তখন লাল ঘাগরা ফুলে উঠে সায়েবের নাকে আতরের ঝাপটা মেরে যাচ্ছে। আর ঠিক ওই সময় মেজ বউ গয়না কাপড়চোপড় নিয়ে ফ্লুটওলার সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে হাওয়া। মেজবাবু তখন চিলেকোঠার ঘরে পিসিব মেয়ের সঙ্গে গুরুতর কাজে ব্যস্ত। ঘুসঘুসে জ্বরের চেয়ে তেড়ে কাঁপুনি দিয়ে হয়ে যাওয়া ভাল। ছোট ছেলে সেই গাঁজা ধোলাই খাওয়ার পর থেকেই তাল খুঁজছিল মোক্ষদাকে পথে বসাতে হবে। মোক্ষদা তখন কর্তার গোপন নির্দেশে লর্ড ড্রামস্টিককে তার স্পেশ্যাল সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। যাতে বেতো ঘোড়াও উঠে দাঁড়ায়। ছোট সম্প্রতি, বাবামশাই যেমন নানা সংস্থার সদস্য, সেও চৌর্য সমিতির সভ্য হয়েছে। মাস্টার কি দিয়ে মোক্ষদার পোর্টম্যান্টো খুলে সোনাদানা, নগদ যা ছিল সব নিয়ে চম্পট।

বাড়ির ঠাকুর অনেকদিন ধরে মওকা খুঁজছিল গোপালের সাজগুলো নিজের বলে নিয়ে নেবে। পুরুত মশাইকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বাড়ি আজ বিলেত। বিলেতে গোপাল পুজো হয় না। গুপ্তচর মোক্ষদা আজ বড়বাবুর মাইফেলে। হুলোরা আছে যে যার ধান্দায়। বাচ্চাগুলো খাচ্ছে আর পায়খানায় দৌড়োচ্ছে। ঠাকুর ঠাকুরঘরে গিয়ে গোপালকে সর্বস্বান্ত করে চলে আসার সময় বললে, নিজেকে যখন রক্ষে করতে পারো না গয়না পরো কেন?

সায়েব গুডনাইট বলে পাওনাগন্ডা বুঝে নিয়ে সরে পড়ল। বাইজি ঘুঙুর বাজিয়ে উঠে পড়ল ল্যান্ডোতে। কত্তা দোতলার দালানে নাচ জুড়ল মেরা জান, গহরজান, লহরজান। আজ বড় ফুর্তি, রায়বাহাদুর ঠেকায় কে! আর ঠিক সেই সময় বড় ছেলের বউ খুব সেজেগুজে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কত্তার কী মতিভ্রম, মনে হল নিকিবাই ওড়না উড়িয়ে যাচ্ছে। পেয়ারি বলে হাত ধরে এক টান। সেই টান সামলাতে না পেরে আমার মা উলটে পড়ে গেল। বড় কত্তা সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল। আমার মা তখন চিৎকার করছে, বাঁচাও বাঁচাও। গোটা বাড়ি ছুটে আসছে, যত

না বাঁচাতে, তত মজা দেখতে। আমার বাবা ছবি আঁকার নড়বড়ে ইজেল তুলে বুড়োর মাথায় এক ঘা।

বুড়ো চিতপাত। মারাটা খুব বেমক্কা হয়ে গেল। বুড়োর আর সব ছেলেরা চেঁচাচ্ছে— উইল, উইল। বুড়ো মারা যাবার আগে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে।' মোক্ষদা চিৎকার করে উঠল, 'কত্তা গো, তুমি আমাকে বিধবা করে গেলে।'

আমার মা বললে, 'এ তুমি কী করলে!'

অন্যেরা বললে 'উইলটা পর্যন্ত আর সবুর সইল না? বড়র বিষয়ের এত লোভ?'

পুলিশ এল। বাবা গম্ভীর মুখে সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে হাজতে চলে গেল। ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে আমার মাকে বললে, 'এই কটাচোখো, সুড়ুঙ্গে ডাইনিটাকে এক কাপড়ে বিদেয় করো।' আমার কাকারা সব কৌরব-সভার দুঃশাসন আর দুর্যোধনের মতো দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে তেড়ে এল।

মোক্ষদা উঠে দাঁড়াল। ঠিক যেন মা কালী। 'খবরদার, ভদ্রলোকের শুয়োরেরা। শুনে রাখো, কত্তা উইল করে সব আমাকে দিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে, আমিই সব ক'টাকে বের করে দিতে পারি।'

সবাই থমকে গেল। যেন বজ্রপাত হল। তারপর কে একজন বললে, প্রোবেট।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, প্রোবেট, প্রোবেট।

এক-একটা রাত আপনি প্রভু একেবারে অন্তর ঢেলে তৈরি করেন। শিল্পীরা যেমন বলে, ছোট্ট ক্যানভাসে ডিটেলের কাজ। এই বাড়িতে যখন এইরকম একটা দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে তখন কলকাতার আর এক পাড়ায় খেল দেখাচ্ছে আপনার ফুলুট বাঁশি। সে তো মেজ বউটিকে নিয়ে এসেছে তিনতলা এক বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে। বউটি গাড়ি করে এসে নেমেছিল অন্ধকার অন্ধকার এক গলির মুখে। টিংটিঙে এক বাতি জ্বলছে। দূরে এক বাড়ির দেয়ালে। পিচকিরি দিয়ে জল দেবার মতো সেই আলো এদিক-ওদিকে একটু গড়াচ্ছে। সেই ছায়ান্ধকারে জায়গায় জায়গায় জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিছু চরিত্র। জানলায় জানলায় আলো। পাতলা পরদা টানা। হালকা ঘুঙুরের শব্দ। সরু গলার গান, হৃৎপিঞ্জরে পাখি উড়ে এল কার। ত্বরা করে ধর গো সখী দিয়ে পিরিতের আধার ॥ ধেই ধেই ধেই তাধেই, তাধেই। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ঝমঝম ঝঁয় ॥

গলিটার মাঝমধ্যিখানে এসে বউ একটু ঘাবড়ে গেছে। এ পাড়া,.সে পাড়া নয় তো। নাকে একটু একটু গন্ধ এসে লাগছে। পরিচিত গন্ধ। মাঝরাতে মেজবাবু যখন হামলে ধরত, তখন এইরকম গন্ধই যেন লাগত নাকে। বউ ফুলুট বাঁশির গা ঘেঁষে এল। বললে, 'কৃষ্ণ, এ তুমি আমাকে কোথায় আনলে?'

'রাধে, এ হল সেই শিল্পী পাড়া। ঘরে ঘরে বৃন্দাবন। এখানে সব রাতে জাগে, দিনে ঘুমোয়। সখি এ হল যৌবনের নিধুবন।'

ফুলুট বাঁশি কপ করে মেজবউয়ের ওপর হাতটা চেপে ধরল। গান ভেসে এল, ত্বরা করে ধর গো সখী দিয়ে পিরিতের আধার। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা। ফুলুট বাঁশি মেজবউকে টানতে টানতে গলির শেষ বাড়িটায় ঢুকে গেল। সামনে অন্ধকার উঠান এক চিলতে। দেয়াল ধরে ধরে একটা সোমত্ত মেয়ে কোনওরকমে এগিয়ে চলেছে এপাশ থেকে ওপাশে। তার আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে গাইছে ফাঁকি দিয়ে পেরানের পাখি উড়ে গেল, উরে বাবা রে জ্বলে গেল। তারপর থ্যাস করে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ল। ভাঙা খোঁপায় সাদা বেলফুলের মালা অন্ধকারে দগদগ করছে। কোথা থেকে ছুটে এল মত্ত এক মানুষ। মেঝের ওপর দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল ঘরের দিকে। মেজবউ কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'এ কী?'

কৃষ্ণ বললে, 'মহলা হচ্ছে সখী। মহলা। সীতাহরণ পালা।'

মেজবউকে নিয়ে কৃষ্ণ ছাদের ঘরে এসে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে বললে, 'তোমার মনের বাসনা এবার পূর্ণ হবে প্রাণ। দেখো কী সুন্দর ঘর!'

মেজবউ দেখল। দেয়াল জোড়া আয়না। সাদা বিছানা। একটা-দুটো ছবি। দেবতারাও আছেন। জানলার বাইরে কুচকুচে কালো আকাশ। প্যাটপেটে তারা। একটা ড্রেসিং টেবল। ছোট্ট একটা আলমারি। সব দেখে শুনে মেজবউয়ের ঠোঁটে ফ্যাকাশে এক চিলতে হাসি খেলে গেল। বললে, 'এমনি তো বেশ ভালই, তবে এত ঘর এত ভাড়াটে।'

'ভাড়াটে? ভাড়াটে নয়, এরা সব শিল্পী হবার জন্যে এসেছে। এটা হল আশ্রম। এই আশ্রম দেখা শোনা করে একজন মা। আমরা তাকে মাসি বলি। কেন জানো, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি হয় বলে। দেখবে সে কী দরদ! কখনও মনেই হবে না তুমি একলা আছ। আর তা হলে দেরি নয়, এসো প্রাণেশ্বরী নাড়াটা বেঁধে ফেলো। মাসি আর গুরু দু'জনকেই ডেকে আনি। সংকল্প করো, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আমি হব এক জ্বলজ্বলে তারকা। হাসব, কাঁদব, নাচাব, নাচব। আমার পায়ের তলায় হামা দেবে কলকাতার যত রহিস আদমি। তুমি স্বর্গ থেকে নরকে এলে, সে শুধু আমার জন্যে।'

ফ্লুট বেরিয়ে গেল। মেজবউ জানলার কাছে এসে বাইরে তাকাল। কেমন যেন ভয়ভয় লাগছে। বাড়ির পর বড় বড় বাড়ি। বড়র কোলে ছোট বাড়ি। একটা ঘর চোখে পড়ছে মেজবউয়ের। জানলা খোলা। ফটফট করছে আলো। একটা উলঙ্গ মেয়ে টলে টলে নাচছে। তিনটে দামড়া মেঝেতে বসে সেই নাচ দেখছে। মাঝে মাঝে মেয়েটার হাত ধরে পা ধরে টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে, আর উদ্দাম হাসছে। সেই উল্লাস মেজবউয়ের কানে আসছে। হঠাৎ বউয়ের মনে হল, এটা কলকাতার সাংঘাতিক এক বেশ্যাপাড়া। মেজকত্তার মুখে এই পাড়ার কথা শুনেছে। সোহাগের সময় মাঝে মাঝে বলত, তুমি বেশ বেশ্যা।

মেজবউ পালাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। দরজার সামনে দু'জন। মোটা বিশ্রী চেহারার গদগদে এক মেয়েমানুষ, আর বিরাট চেহারার একটা লোক। সরু পাকানো গোঁফ। ফিনফিনে গিলে করা পাঞ্জাবি। ভেতরে নেটের পাঞ্জাবি। গলায় একটা লকেট। ঢুলু ঢুলু চোখ। হাতে একটা জুঁইফুলের গোড়ের মালা। লোকটা টলতে টলতে ঢুকছে। মেয়েছেলেটা দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'নাও তোমার টেকা উসুল করো। বড় ঘরের কচি বউ। তোমার পয়লা রাত।' মেয়েছেলেটা ঝাড়া পাঁচ মিনিট অশ্লীল অশ্লীল কথা বলে গেল। এত অশ্লীল যে কানে আঙুল দিতে হয়। মেজবউয়ের মনে হচ্ছিল, এর চেয়ে তার জামাকাপড় খুলে নিলেও যথেষ্ট শ্লীল হত। মেয়েছেলেটা বলে গেল, 'দেখো, বাড়াবাড়ি করে মেরে ফেলো না। থানা পুলিশ আমার ভাল লাগে না। দিয়েছ দশ, পুলিশে খেয়ে গেল পাঁচ। তা হলে রইলটা কী? ওই আড়কাঠিটা তো নিদেন দুই নেবে। টেরি বাগিয়ে বসে আছে নীচে।'

মাসি দরজা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। প্রথম চোটটা শুনে যেতে চায়। মনে বেড়ে দোলা লাগে। মাসি গো বলে একটা চিৎকার উঠল। বাঁচাও! মাসি মনে মনে বললে, মর ছুঁড়ি। ফুলশয্যার রাতে তোর কী হয়েছিল? অন্যরকম! ন্যাকামি। বরাত ভাল, আসল একটা ষাঁড় তোকে নিলেমে কিনেছে। তিন দিনে তোর সতীপনা ঘুচে যাবে। ঘরে ঝটাপটির শব্দ। পারবি তুই বিহারি গুন্ডার সঙ্গে? আমি পেরেছিলুম?

বড় বিপদে ছোট বিপদ চাপা পড়ে যায়। যেমন বড় অতিথি এলে ছোট অতিথি তেমন সমাদর পায় না। সেই রাবণের সংসারে এক রাতে এত কিছু ঘটে গেল, সে সব কথা কেউ মনেই রাখলে না। মেজবউ নেই তো নেই। গোপালের গয়না গেছে গেছে। গোপালে আর পুতুলে তফাতটা কী? মোক্ষদার বাক্স ভাঙা। ভাঙা তো ভাঙা। উইলের প্রোবেট নিয়ে সে চচ্চড়িবাগানের মহারানি হবে।

সেই ঘোড়ামুখো সায়েব, লর্ড ডিজিটেলিস তার কথা রেখেছিল। আমার সেই পিতামহকে রায়বাহাদুর করেছিল। তা সে আর কী হবে। গুঁপো বুড়ো তো তখন ফিরে এসেছে আপনার প্যাভেলিয়ানে। আপনি স্টেশানমাস্টার নন, একজন লাইব্রেরিয়ান। আপনার উপমাটা তখন ঠিক হয়নি। এক-একটা বই আপনি ইস্যু করেন। গোটা বইটা পড়া হয়ে যাবার পর ফেরত আসে। আপনি

সেলফে তুলে রেখে দেন। কে পড়ে! বইই বইটাকে পড়ে। রায়বাহাদুর হয়েছে বলে ছেলেদেরও আনন্দ নেই। বড় ছেলেকে দড়িতে লটকাবে বলে কেস চলেছে। সরকার পক্ষ ভারসাস আসামির শ্বশুরবাড়ি। আমার দাদু খুব লড়ছিল। সে বুড়ো আমার বাবাকে খুব ভালবাসত। এদিকে সব ক'টা ভাই লড়ছে মোক্ষদার বিরুদ্ধে। ঝি মাগি কলা দেখিয়ে বেরিয়ে যাবে? গোটা শহরে বছর খানেক খুব হইচই হল। সংবাদপত্রে গোটা গোটা হরফ। পিতা খুন। হত্যাকারী পুত্র। পিতা পুত্রের স্ত্রীর শ্লীলতা হানির মুহূর্তে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তখনকার সংবাদপত্রে আবার সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে নীতিকথা পরিবেশন করা হত। যেমন, এই শহরের বিত্তবান মানুষদের নৈতিকতা আজ কোথায় নেমে গেছে। ঘরে ঘরে ব্যভিচার। বেহিসাবি মদ্যপান কূলবধূ নির্যাতন। নিম্নশ্রেণির মহিলা ভোগ। এই শহর আজ গুন্ডা, গণিকা, মাতাল, ধনবান আর হাফ গেরস্তদের হাতে চলে গেছে। এরপর দু'-এক লাইন কবিতা থাকত, বঙ্গের কুলনারী হও সাবধান, করো এবে দল বেঁধে পুরুষ নিধন।

মোক্ষদা অশিক্ষিত হলেও বুদ্ধি ধরত। সে ছোটকাকার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললে। মেজকে বললে পিসিটাকে বৃন্দাবনে পাঠাও। শাশুড়ি জামাই এক বাড়িতে চলে না। আর বাকি সব দূর করে দাও। বুড়িটা বিছানায় আছে থাক। হেগেমুতে একদিন নিজেই চলে যাবে। আমার ওপর মোক্ষদার একটা ভালবাসা ছিল। আর বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বাবার আঁকা বড় বড় ছবিগুলো হাঁ করে দেখত আর বলত, মানুষ কী করে এমন জ্যান্ত মানুষকে ধরে। আমার মাকে তেমন পছন্দ করত না। মায়ের চেহারাটা ছিল মেমসায়েবের মতো। সুন্দরী বলে অহংকারও ছিল। তা ছাড়া মায়ের জন্যে বুড়ো কর্তা খুন হল। মোক্ষদা বলত, ওলুক্ষুনে মেয়েমানুষ। গোটা পরিবারটাকে ছারখার করে দিলে গো। তবু আমার জন্যেই মায়ের পেছনে লাগত না। মোক্ষদা তেমন তেমন দেশ হলে প্রেসিডেন্ট কি প্রধানমন্ত্রী হতে পারত। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে। সে যে কত রকমের শত্রুতা! কেউ কারওকে আর নাম ধরে ডাকত না। কুৎসিত গালাগালি ছিল সম্বোধনের ভাষা। ছেলেতে ছেলেতে, মেয়েতে মেয়েতে। ছেলেতে মেয়েতে। রোজই মারপিট। মাথা ফাটাফাটি। মোক্ষদা একটা শ্বেতপাথরের ফলকে রায়বাহাদুর লিখিয়ে এনেছিল। ছোট আর মেজ, অন্যদের সঙ্গে মারামারি করে, সেই ফলকটাকে বাড়ির সামনে লাগিয়ে দিলে। দুমদাম বাজি ফাটল, সারা দিন। লেড়ি কুকুরগুলো লেজ গুটিয়ে ঘুরতে লাগল। কে বলেছিল, রায়বাহাদুর না ভোঁদড়বাহাদুর। বাস তাকে পিটিয়ে পাড়াছাড়া করে দিলে।

উঃ সে একটা জন্মেছিলুম প্রভু। এর মাঝে একদিন আমার বাবার ফাঁসি হয়ে গেল। কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

আমরা বাবাকে দেখতে গেলুম। বাবা বীরের মতো গরাদে দাঁড়িয়ে আছে কয়েদির পোশাক পরে। কোনও অনুশোচনা নেই। মায়ের ছবি আঁকতে আঁকতে মায়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ভাবটা এই, বাবা নয়, বাঘ মেরেছে, যে বাঘ তার বউকে ধরেছিল। একটা অন্যায়ের প্রতিকার করেছে। পাপীকে সাজা দিয়েছে। প্রেমের জয়, ধর্মের জয়। যেন গীতার কৃষ্ণ! ধর্মের গ্লানি হচ্ছিল, তাই সুদর্শনের বদলে ইজেল নিয়ে আবির্ভাব। কে বোঝাবে শ্রীকৃষ্ণের তো ফাঁসির ভয় ছিল না। বাবা আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, বীর হও। মায়ের হাত দুটো ধরে বললেন, আমার কোনও অনুশোচনা নেই। যা করেছি ঠিক করেছি। ছেলেটাকে মানুষ কোরো। সামনের বার তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক্ল্যাং করে লোহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা ফিরে এলুম সেই পাপের বাড়িতে। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার বললেন, আই অ্যাম সরি। কিছুই করা গেল না। রোমান্টিক মানুষদের বাঁচানো খুব শক্ত। জাস্ট লাইক ফ্লাওয়ার্স। কাগজে বড় বড় করে ছাপা হল—চচ্চড়িবাগান খুনের মামলার চির সমাধান। পাপের বেতন মৃত্যু। পিতৃঘাতীর ফাঁসি। গোটা কাহিনিটা আবার ছাপা হল রগরগে করে।

বাবা বলেছিলেন বীর হও। হয়ে গেলুম বীর হনুমান। কেন হব না! মাকে বাবা বলে গেলেন, সামনের বার প্রেয়সী অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে। মায়ের আর তর সইল না। সেই ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে ফেললে। ব্যারিস্টার বিলেত থেকে সাদা বউ এনেছিল। সে এ দেশের রোদ, জল, ধোঁয়া, ধুলো সহ্য করতে পারলে না। আজ আমাশা হয় তো কাল সান্নিপাতিক। 'হেল', 'হেল' করতে করতে চলে গেল 'হেভনে'। মায়ের নীল চোখে হিস্পানি ইশারা। মায়ের শরীর ব্যারিস্টার ক্যানভাসে দেখেছে। আজ গোলাপ আনে তো কাল চন্দ্রমল্লিকা। শাড়ির পর শাড়ি, শেষে হ্যামিল্টনের ডায়ামন্ড ব্রোচ। মায়ের আর দোষ কী। ভজনা করলে খোদ খোদাই টলে যান। মা টলে গিয়ে ব্যারিস্টারের টেম্পলে চলে গেল। একেবারে ঝাড়া হাত-পা হয়ে। আমি রয়ে গেলুম কেয়ার অব মোক্ষদা। পৃথিবীতে কোনও স্টেপই ভাল নয়— না স্টেপ মাদার, না স্টেপ ফাদার।

আমাকে স্কুলে পড়াবার চেষ্টা হল। টেকতে দিলে না কলকাতার এঁচড়ে-পাকা ছেলেরা। ওই বাড়ির একের পর এক কেচ্ছা তখন শহরকে মাতিয়ে রেখেছে। লোকে বলতে শুরু করেছে, কেচ্ছা হৌস। স্কুলে গেলেই ছেলেরা খেপায়, এই তুই বাবার ছেলে, না ঠাকুরদার ছেলে। মায়ের পেটে হয়েছিস না ঝিয়ের পেটে। প্রথমে কথা, তারপর খামচাখামচি। রোজই রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফেরা। একদিন আমার চোখটাই প্রায় খাবলে নিচ্ছিল ভাল্লুকের মতো একটা ছেলে। তখন ঠিক হল, বাড়িতে মাস্টার এসে আমাকে পড়াবে। মোক্ষদা আমাকে মানুষ করবেই।

আদিখ্যেতা করে মা আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসত। হালকা নীল রঙের ঢাউস একটা গাড়ি চেপে। মায়ের নাকি পাড়ায় ঢুকতে লজ্জা করত। আর এই বাড়িতে ঢুকত চোঁ করে। আদরে আদরে মায়ের চেহারার সে কী জেল্লা! গোলাপি গাল! সিল্কের মতো গায়ের চামড়া। নীল চোখ আরও নীল। মেমেদের মতো চুল। থেকে থেকে আমাকে বলছে— মাই বয়। মাকে দেখলেই আমার রাগ হত। বাবাকে কেমন ভুলে গেল! আমাকেও ভোলার মুখে। মা আবার মা হবে। একদিন আমি মুখের ওপর বলেই দিলুম— তোমাকে আমার ভাল লাগে না। মা চলে গেলেই মোক্ষদা বলত ঢং দেখাতে আসে। মায়ের শরীরের ফরাসি সেন্টের গন্ধের চেয়ে মোক্ষদার গায়ের গন্ধ আমার ভাল লাগত। মোক্ষদা মাঝে মাঝে আমার জন্যে কাঁদত।

ঈশ্বর, এই পরিবেশে যারা বড় হয়, হয় তারা সাংঘাতিক ভাল হয়, নয় তারা জঘন্য অপরাধী হয়। এই বাড়ির ছোট আর মেজ তখন মোক্ষদাকে মোচড়াতে শুরু করেছে। চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় চুর। কোনও কাজ নেই। খায়-দায় খিস্তি করে। মাঝে মাঝে মোক্ষদাকেই ধরে পেটায়। সোহাগের ফজলি বলে, আমাকে রাত-বিরেতে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। মেজর দু'নম্বর বউয়ের দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে। তিন নম্বর আসছে। বিয়ে-টিয়ে করেনি। এমনিই বউ হয়ে গেছে। সে অষ্টপ্রহর ঝগড়া করে। ঝগড়া করার অনেক কারণ; মোক্ষদাই তাকে ঝি ভাবে। তার পরনে না আছে কাপড়। ছেঁড়া জামা চুলে জট। মেয়েটাকে কিন্তু ভালই দেখতে ছিল। তার মা বিয়ে দেবে বলে ভাল ছেলেও ঠিক করেছিল। আপনার পৃথিবীতে মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে পুরুষরা খেলা করে। শুয়োরটুয়োর ভাবে মনে হয়। না মানুষই শূকর! আপনিই জানেন! আপনার কেরামতি তা না হলে বরাহ অবতার হয়! মেজ তাকে ধরে যখন পেটায়, সে দৃশ্য সহ্য করা যায় না। পেটায় আর চিৎকার করে— তুই আমার বউ নোস। তোকে আমি বিয়ে করিনি। তুই আমার মাগি। বের করে দিলে কিছুই করতে পারবি না। কুকুরের মতো থাকবি কুত্তি। পাপী। আমার ঠাকুরদা একগাদা জানোয়ারের জন্ম দিয়েছিল। মারধবের পর আমি কাছে গিয়ে ডাকতুম, কাকি। আমাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটা হুহু করে কাঁদত। আমিও কাঁদতুম। কাকি আমাকে বলত— কবে মরব বলতে পারিস। এই জীবনটা ফেলে দিতে না পারলে তো মুক্তি নেই।

এই দেখুন প্রভু, জীবনও এক কারাগার। সেই বাবাকে দেখেছিলুম, মোটা মোটা গরাদ ঘেরা ঘরে দিন গুনছে। একটা দড়ি, তিন সেকেন্ড সময়। চোখের পলকেই মৃত্যু। আর মুক্তি। পৃথিবীর মানুষ

মৃত্যুকেই মুক্তি ভাবে। খুব সুখে থাকলে তবেই মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে হয়। আর পৃথিবীতে কেই বা সুখী? এই তো এতবার গেলুম এলুম, ঘোড়ার ডিমের সুখ! পৃথিবীর সুখের গল্প একটা শুনবেন! একটা লোক আর একটা লোককে বললে, তুমি এই শক্ত মেঝেতে পাতলা একটা মাদুর বিছিয়ে শোও কেন? তুমি জানো কি. খাটে নরম বিছানায়, উঁচু নরম বালিশে মাথা রেখে শোওয়ার কী সুখ! সাঁই সাঁই করে নরম ঘুম এসে যায়। লোকটা অমনি টাকা পয়সা জমিয়ে খাট, বালিশ, বিছানা কিনে ফেলল। তিন মাসের মাথায় সে আর ঘাড় সোজা করতে পারে না। ডান হাতে অসম্ভব যন্ত্রণা, ডান কাঁধ বেয়ে নেমে আসে। শেষে ডাক্তার-বদ্যি। বললে ভাই তোমার তো সারভাইক্যাল স্পন্ডিলোসিস হয়ে গেছে। এ তো ওষুধে সারার নয়। গোটাকতক ঘাড়ের ব্যায়াম দেখিয়ে দিচ্ছি, তাই করো, আর শক্ত মেঝেতে, বালিশ ছাড়া শোও। পড়ে রইল তার সাধের খাট-বিছানা। সে ফিরে এল মেঝেতে। সুখের বদলে অসুখ। বুঝেছেন ব্যাপারটা, সুখের বদলে অসুখ।

ছোট, মেজর এই বেআইনি বউকে বোঝালে। কী বোঝালে শোনার আগে ছোটর নৈতিক অগ্রগতিটা শুনুন। ছোট গাঁজার স্তর থেকে আরও ওপরের স্তরে উঠে গেছে তখন। মদ, চরস, ভাং, সবই চলছে। একা মনে হলেই দোকার খোঁজে পাড়ায় ছুটছে। জীবনযন্ত্রণা বলে কথা। মানুষের যন্ত্রণা তো একটাই, চরম যন্ত্রণা। কত রাজা-মহারাজা গেল তল, হেঁজি পেঁজি বলে দেখাই সংযম। পৃথিবীতে আপনি দুটো এলাকা করেছেন, সাদা আর লাল। ইদানীং অবশ্য রাজনীতিও দুটো, সাদা আর লাল।

ছোট একদিন চুর হয়ে লাল এলাকায় গিয়ে ঢুকেছে। দালাল ভাল জিনিস বলে নিয়ে গেছে। ছোট দেখে, খাটের ওপর আধশোয়া তার সেই মেজবউদি। মালে একেবারে চুর। মুখটা লাল, তপতপে। তেমনি তার সাজগোজ। বিশাল দেয়াল-জোড়া আয়না, আলমারি। খাটে এলাহি বিছানা। নানা মাপের মখমল মোড়া বালিশ। কত লোক আসে যায়। এরা তাদের মুখের দিকে তাকায়ও না। আপনার আমেরিকায় মার্কিনিরা একটা কথা বলে ফেসলেস জম্বি। মানে মুখহীন মানুষ। এখানে সকলেরই এক ধান্দা। একই রকম কথা। ছোট চিনেছে। মেজবউ কিন্তু চিনতে পারেনি। চেনার চেষ্টাও করেনি। চেনার মতো অবস্থাও নেই। মগজ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। ছোট পালাবার চেষ্টা করছিল। মেজবউ হাত ধরে টেনে আনল। অতি অশ্লীল একটা কথা বলে। ছোট নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। শেষে মেজবউয়ের মুখটা দু'হাতে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, আমাকে চিনতে পারছ না! তোমার এই অবস্থা? আমি তোমাকে উদ্ধার করব।

মেজবউ দরজা খুলে ছোটকে ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে বললে ওরে আমার রামচন্দ্র। শালা, শুয়োরের বাচ্চা। উদ্ধার করবে।

ছোট মেজর দ্বিতীয় পাপটাকে পরামর্শ দিচ্ছিল, মেজবউদিকে দেখে এলুম। ভালই রোজগার। একেবারে এক নম্বর। বলো তো, ব্যবস্থা লাগাই। কী হবে এখানে পড়ে পড়ে জানোয়ারের মতো মার খেয়ে। তুমি আমারই কেয়ারে থাকবে, রোজগার হাফাহাফি।

এর পরের দিন চচ্চড়িবাগানের সেই বড় মানুষটির বাড়িতে আবার একটা ঘটনা ঘটল। সেই মেয়েটি গলায় দড়ি দিল। পুরুষটির কোনও নিন্দে হল না। সবাই ছি ছি করল মেয়েটিকে। মা না ডাইনি, পেটে তিন মাসের বাচ্চা আর গলায় দড়ি দিলে। সেই বউটির দুটি শিশু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ঝুলন্ত মায়ের দিকে।

পৃথিবীতে সময় সময় আপনি এমন জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেন, কে যে সমাধান করবে একবারও ভেবে দেখেন না। ওই দুটি শিশুও মোক্ষদার ঘাড়ে এসে চাপল। আমি তখন ছোট ছোট ডানা মেলে উড়তে শিখেছি। বাড়ির চেয়ে বাইরেটাই লাগে ভাল। ওই ফ্লুট বাঁশির এক দাদা ছিল। লোকটা ভাল তবলা বাজাত। কলকাতায় তখন গানবাজনার খুব কদর। বড় বড় ওস্তাদদের যাওয়া আসা। জমজমাট বাইজিপাড়া। লোকটা বেশ মজার মানুষ ছিল। চোখে সুরমা টেনে, পাঞ্জাবি পরে

বাজাতে বসত, একতলার ঘরে। বাজাতে বাজাতে বেহুঁশ হয়ে যেত। আঙুলে যে কত বোল ছিল? বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। খাওয়াদাওয়া হোটেলে। খুব একটা গরিব ছিল না। আমি জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম হাঁ করে। একদিন আমাকে ডাকলে। বেশ সমীহ করেই বললে তুমি রায়বাহাদুরের নাতি? বাস, ওই পর্যন্তই আর কোনও প্রশ্ন করলে না। পরের কথাই হল— ভেতরে এসো। ভেতরে গিয়ে এক পাশে জড়সড় হয়ে বসলুম।

তোমার শুনতে ভাল লাগে?

খুব।

শিখবে?

আমি ঘাড় নাড়লুম। আমাকে বললে, একটা চাঁটি মারো তো ডাঁয়ায়! মেরে দিলুম এক চাঁটি। ত্যাড়াং করে উঠল। লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বললে, আবার মারো। মারলুম। আবার সেই একই শব্দ। লোকটি যেন খেপে গেল— মারো, আবার মারো। আমি মেরেই চললুম। প্রতিবারই সেই এক শব্দ। অনেক পরে লোকটি বললে শাবাস বেটা। এত ভাল তিন বেরোচ্ছে যার আঙুলে, সে তো কামাল করে দেবে।

আমি তার কথায় খুব উৎসাহ পেয়ে গেলুম। মানুষের ভেতর মানুষ ঘুমোয়, মানুষই তাকে জাগায়। শুরু হয়ে গেল আমার তবলা শেখা। তা ধিন ধিন তা না তিন তিন তা। আপনার চর্চা ছাড়াও পৃথিবীতে কতরকমের চর্চা যে আছে। মানুষ তবলা বাজাবে। মানুষ বাজনা বাজাবে। মানুষ নাচবে। মানুষ তেলেভাজা ভাজবে। মানুষ মানুষের চুল দাড়ি কেটে দেবে। সারা জীবনই সে ওই কাজই করবে। ভাবে ওই করার জন্যেই সে জন্মেছে। বিরাট পৃথিবীর বিশাল গোলকধাঁধায় চুলোয় গেল সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, কার্যকারণ তত্ত্ব। মানুষটা জুতোয় পেরেক ঠোকে তো সারাজীবন পেরেকই ঠুকে গেল। জানি না একটা গান আপনি শুনেছেন কি না:

> অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
> কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়' ॥
> নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই।
> একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় ॥

আমাদের দু'জনের বেশ মিলেছিল ভাল। সে বলত, আমার স্টেপ মাদার আর তোমার স্টেপ ফাদার। মানে যুগ এগোচ্ছে। বুঝলে কিনা! কেউ আর একা থাকবে না। একা গড়াগড়ি যাবে স্টেপ সানেরা। বাজা, বাজা, প্রাণ খুলে তবলায় তোল বোল কৎ তা গদি গেনে ধা।

লোকটার একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার ছিল। সেইটা নিয়ে আমি মোড়ের মাথার একটা হোটেলে চলে যেতুম। ওস্তাদ খুব মাংস খেতে ভালবাসত আর খুব শৌখিন ছিল। থেকে থেকে আমাকে বলত, লিভ ইন স্টাইল। সিল্কের লুঙ্গি, সিল্কের পাঞ্জাবি, কানে আতর। বলত, বিদ্যাটা হল তোমার গন্ধর্ব বিদ্যা। সেইভাবে থাকতে হবে। এও তো সাধনা। আমরা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে বসতুম বেলা দুটো নাগাদ। গোটা কতক লাল লঙ্কা, পাতিলেবু সাজিয়ে রাখা হত দেখার জন্যে।

আমি আর বাড়িতে খুব একটা যেতুম না। সেখানে নিত্য নতুন অশান্তি তৈরি হচ্ছে। ওস্তাদ দুপুরবেলায় একটু শুয়ে থাকত; আর আমি তবলায় বোল সাধতুম। ওস্তাদ বলত, তবলা বোলের ভাষায় কথা বলে। গানের গলাও ছিল খুব সুন্দর। প্রথম প্রথম সহজ তালের গান ধরত। আমি সংগত করতুম। সম ফাঁক চিনতুম লয় বুঝতুম। এরপর কঠিন তাল। তালই যে কতরকম! পৃথিবীর কিছু তাল আর কিছু বেতাল। দেখে এলুম তালে যারা চলে তারাই শেষ অবধি চালিয়ে যায়। আর দেখে এলুম, যে-কোনও একটা সাধনা নিয়ে থাকলে বেশ আনন্দ হয়। ওস্তাদ বলত, মশগুল, মশগুল।

সন্ধেবেলাটা ভীষণ একা লাগত। ওস্তাদ চলে যেত কোনও না কোনও আসরে বাজাতে। আমি

কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকার পর চলে আসতুম আমাদের নরকে। মোক্ষদা তখন বসে থাকত ঠাকুমার ঘরে। বুড়ি বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। সেই অবস্থাতেও চিঁহি, চিঁহি করে মোক্ষদাকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর মোক্ষদার মতো মহিলা আপনার এক অনবদ্য সৃষ্টি। অনন্তকাল ধরে জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করে চলেছেন। সাধু-সন্ত, গৃহী, বৈরাগী, চোর, জোচ্চর, ঠক, বাটপাড়। সব চরিত্রই একপেশে। মোক্ষদা একেবারে মাস্টারপিস। পাপ আর পুণ্যের ভার সমান সমান। ঠাকুমাকে বেডপ্যান দিচ্ছে, বুড়ি বলছে, কত পাপ করেছি যে বেশ্যামাগিটার সেবা নিতে হচ্ছে।

মোক্ষদা এতটুকু না অসন্তুষ্ট হয়ে বলছে, মায়ের সেবা করে যাই, সেইটাই আমার পুণ্য।

বুড়ি বলছে, সামনের বার যেন তোর মতো বেশ্যামাগি হয়ে জন্মাতে পারি।

মোক্ষদা বলছে, ছিঃ মা ও প্রার্থনা কোরো না। ভগবানকে বোলো, পৃথিবীতে আমরা যেন না জন্মাই। একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ঢুকে দেখি সব চুপচাপ। খিস্তিখেউড় নেই। বাড়িটা হঠাৎ পালটে গেল নাকি! সেই বাড়িই তো! ঠাকুমা মারা গেল নাকি! একজিকিউটার এসে জানিয়ে গেছে সব সম্পত্তি মোক্ষদার। বুড়ো কত্তার ছেলেদের সব আপত্তি কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। মোক্ষদা এখন লাখ-লাখ লাখপতি। ইচ্ছে করলে সোনার পালঙ্কে রুপোর গড়গড়া মুখে দিয়ে শুয়ে থাকতে পারে। এই খবর পেয়ে মোক্ষদার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সে ঠাকুমার ঘরে, বুড়ির সেবায় ব্যস্ত। বেডসোরে মলম লাগাচ্ছে, আর বুড়ি অন্যদিনের চেয়ে বেশি বেশি গালাগাল দিচ্ছে। মোক্ষদা আমাকে বললে, তুমি আর এ ঘরে এসো না। আপনার পৃথিবীতে বেশ্যারা কী খিস্তি জানে ঈশ্বর। ভদ্র পরিবারের সভ্যরা অন্তর্জ্বলুনিতে যখন মুখ খোলে, সে মুখের সামনে আপনিও দাঁড়াতে পারবেন না। খবরটা আসার পর মোক্ষদা শুধু হেঁকে বলে দিয়েছে— তোমাদের ভবিষ্যৎ এখন আমার হাতের মুঠোয়। কর্তা জেনেশুনেই এ দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে। তোমরা যদি ভদ্দরলোকের মতো থাকতে পারো থাকো, বেচাল দেখলেই আমি দূর করে দোব। সে ক্ষমতা আমার আছে।

ঘরে ঘরে সেই আলোচনাই হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়। মোক্ষদা আরও বলছে, মরার আগে সবচেয়ে যে ভাল আমি তাকেই সব দিয়ে যাব। এই লোভ দেখানোয় সকলেরই টনক নড়েছে। ছোটি ফূর্তিতে বেরোয়নি। মেজ ঘরে বসে, দু'-দুটো বউয়ের শোকে মদের বোতল খোলেনি। অন্য ষাঁড়েরা যার যার গোরু বাছুর নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বুড়িমাকে কেউ কোনওদিন দেখেনি, শেষের সময় গঙ্গায় নমঃ করে দিয়েছে। অপদার্থ মা। দেহের জাঁতিকলে কর্তাকে ধরে রাখতে পারেনি। মোক্ষদা গতরের গর্তে ইঁদুর ধরে এখন মালপোয়া মারছে।

এরপর মোক্ষদা ফতোয়া জারি করলে, সব্বাইকে রোজগারের ধান্দা করতে হবে। বসে বসে ভাত মারা চলবে না। ফেলো কড়ি মাখো তেল। মুখ শুকিয়ে সব আমসি। মোক্ষদার যে কথা সেই কাজ। সকালে উঠেই এক হাঁক ছাড়ত— নবাবেরা ঘুম থেকে ওঠো। ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করো। বসে খাওয়া চলবে না। ছেলেরা ধান্দায় বেরোবার আগে মায়ের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে যেত— কবে মরবে বুড়ি! কবে মরবে! বুড়ি শুয়ে শুয়ে কাঁদত। মোক্ষদা এসে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলত— এ গালাগাল তোমাকে নয় আমাকে।

আমাকে বললে, তুই যদি তবলা শিখিস তো ভাল করে শেখ। ওস্তাদকে এনে এ বাড়িতে রাখি। ওস্তাদকে বললুম। সে তো আর্তনাদ করে উঠল— কী বলছ শাগরেদ! এটা আমার নিজের আশ্রম। এ জায়গা ছাড়তে আছে! শিগগির তোকে আসরে বের করব। তোর বুঝি সম্পত্তির লোভ লেগে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ওস্তাদ বললে, চল, তোর আজ জীবনমরণ হবে। শহরে তখন জীরাবাই এক সাংঘাতিক নাম। তার মুজরোতে তখন রথী-মহারথীর রেলা। জীরাবাইয়ের টিকলো নাকে জিরের

মতো একটা হিরের নাকছাবি জ্বলজ্বল করে জ্বলত। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। রক্তের মতো লাল ফিনফিনে শাড়ির ভেতর দিয়ে সেই রং ফুটে উঠত। আর বুকের গড়ন দেখলে মা সরস্বতীও মনমরা হয়ে যেতেন। জীরাবাই যখন নাচত তখন মহারথীরা সেই পা স্পর্শ করার জন্যে সামনে হাত বাড়িয়ে দণ্ডীস্বামী হয়ে শুয়ে পড়ত। জীরাবাইয়ের দেহরক্ষী তখন ছড়ির বাঁকা হাতল দিয়ে সেই হাত টেনে আনতে আনতে বলত— নেহি বাবু, নেহি রাজাসাব। জীবনে যে মায়ের পা স্পর্শ করেনি. সে জীরাবাইয়ের পায়ে ধরার জন্যে গড়াগড়ি যেত।

সে এক ঢুলুঢুলু সন্ধে। বিশাল ঘর। বিশাল কার্পেট। ঝকঝকে মেঝে। তিনখানা ধকধকে ঝাড়। একপাশে সারেঙ্গি, হারমোনিয়াম, তবলিয়া। একদিকে শ্রোতারা। একদিকে জীরাবাই আর তার মা। জীরাবাই হাঁটু মুড়ে বসে আছে। সামনে মশলার পাত্র, আতরদান। গান শুরু হল। ওস্তাদ বাজালেন। আসর গরম হয়ে উঠল। দ্বিতীয় গান ধরার আগে ওস্তাদ খুব বিনীতভাবে বললেন, আজ এক ছোট ওস্তাদকে বাজাবার অনুমতি মঞ্জুর করুন আপনারা। খালি হাতটা একবার দেখুন।

জীরাবাই ছোরার মতো চোখে একবার তাকাল। তারপর বললে, এক শর্ত। না পারলে এক লাথি।

শ্রোতারা খ্যা খ্যা করে হাসল। তখন মানুষের এই ধরনের বাজি খুব ভাল লাগত। একটা মানুষ বহু মানুষের সামনে হেনস্তা হবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে। গাধার পিঠে উলটো করে বসানো, জুতোর মালা গলায় পরানো, মাথা কামিয়ে ঘোল ঢালা। গালে চুনকালি মাখানো। বাঘের খাঁচায় ফেলে দেওয়া।

আমার ভয়-ডর খুব কম ছিল। আমি ফস করে বলে ফেললুম যদি পারি।

জীরাবাই অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে বললে, হাঁ! এত সাহস।

শ্রোতারা বেশ মজা পেয়ে গেল। একজন বললে, পিঁপড়ের ডানা উঠেছে। আজ মরবে। ছেলের ঘাড় টিপলে দুধ বেরোবে, জীরাবাইয়ের সঙ্গে সংগত। কত হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে দেখি কত জল। মানুষ কত সহজে মেতে ওঠে।

জীরাবাই কানে হাত চাপা দিয়ে গান ধরল। সারেঙ্গি সুর টানল। হারমোনিয়াম এক পরত বেজে গেল ফড়ফড়িয়ে। সেই এক কৌশল সম দেখাবে না। এই চালাকিটা ওস্তাদজি আমাকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। গানটাও আমার জানা। ওস্তাদজি নিজেও এইরকম একটা গান করেন। কোথায় লুকোবে! মাত্রা তো আমার মাথায়। মুখিয়ে ছিলুম আমি। ধরতাইটাই সম থেকে। তড়াং করে এক চাঁটি মেরেই ছুটিয়ে দিলুম বোল। ওস্তাদজি আমাকে এক কুচুটে ছন্দ শিখিয়েছিলেন, যে ছন্দে গাইয়ে মোটেই স্বস্তি পায় না। বোলটা সে ধরতেই পারবে না। ভেঙে ভেঙে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগোবে। কষা লয়। তবলিয়া তার লয়ের মুঠো একবারও খুলবে না। ফাঁক আর সম মিলিয়ে রাখবে বোলের শরীরে। তিন পালটা ঘুরে আসবে, মাত্রা এক চুল এদিক ওদিক হবে না। চোরা বাণের মতো। আর সে বোল কী! আকাশ জোড়া মেঘের গর্জনের মতো। কোথায় জীরাবাই, তার হিরের ঝিলিক, অবোধ রূপমুগ্ধ শ্রোতা। আমার মুদ্রিত চোখের সামনে গন্ধর্ব। তখন তার মান অপমান নেই আরাধনা। জীরাবাই যতই হোক একজন প্রকৃত শিল্পী। যখন দেখলে ছেলেটা শুধু বাজায় না, সত্যিই ভাল বাজায়, তখন সে লড়াই ভুলে নেমে এল গানে। আমার তবলায় তখন চলছে লগ্‌গি। সারা ঘরে যেন আগুন খেলছে। গান শেষ করেই জীরাবাই উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। নরম তুলতুলে, লাল শাড়ি জড়ানো ঘাসের মতো বুক। খস আতরের খুশবু! নাকে জিরের মতো হিরের নাকছাবির দ্যুতি। বাহুবল্লরী। সেই যে জাগল আমি, শিল্পী আর প্রেমিক একই মোড়কে। সন্ধ্যা কাঁপে প্রদীপের মতো, বাড়ে তার দ্যুতি, স্থির হল অবশেষে। রাত আসছে, চাঁদের আলোয় ধোয়া পরিচ্ছন্ন নীল ॥ আমরা কথা বলি চোখে চোখ রেখে। ওই দুটি হাত পেতে চায় আমার এই আবেগের মুঠো ॥ তার কাঁচুলি, না মুখ, না তার লাল বেশ, কোনটা করেছে তার মুখ এত উজ্জ্বল, এত স্পষ্ট! নাকের বিন্দুতে চমকায় আকাশের দল ছাড়া তারা, চুলঘেরা মুখের তরল ছায়ায় ॥

কেয়াবাত, কেয়া দিস, হয় হয় অয় করে উঠল গোলাপি আদমিরা। নিতম্বে ঘুংরু পায়ের পদাঘাতের বদলে নরম বুকে মাথা। বড় কামনার স্থান। কত আসরফি পড়েছে ওই পায়ে, তিরছি নজরিয়া ছাড়া আর কিছু জোটেনি বরাতে! জীরাবাই হয়তো তাই ভেবেই নিয়েছিল আমাকে। আমি নিয়েছিলুম প্রেমিকা হিসেবেই।

ওস্তাদ ঘরে ফিরে এসে বললে, ছোকরা মুখ আমার রেখেছ তুমি, তবে খুব সাবধান! কচি আম, মেয়েরা একটু নুনের টাকনা দিয়ে-দুপুরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেতে ভালবাসে। দেখো মিঞা, সাপের জিভে আচারের টাকনা হয়ে যেয়ো না। ভোগের দুনিয়ায় দুর্ভোগ অনেক। টিবি, সিফিলিস, মাথার রোগ। চুষে ছিবড়ে করে বউবাজারের ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। বয়েস কোনও কথা নয়। এটাও সাধনা। সংযম চাই। বয়েসটা মারাত্মক, বংশে বিষ।

আমি যে বয়েসে তখন উপদেশ শুনলে গা জ্বলে যায়। তা ছাড়া আমি তো বড় হচ্ছি ছাড়া বাছুরের মতো। বলতে গেলে আমার তো কেউ নেই। সেই ব্যারিস্টার গিন্নি শিলং-এ গিয়ে বসে আছে। মেমসায়েব সে নাকি আমার মা। যে মাকে আপনি বলতে শিখিয়েছেন। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আপনার ব্যাসদেব মহাভারতে কী বললেন: যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কী, আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কী, বায়ু অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী কী এবং তৃণ অপেক্ষাও বিস্তৃত কী? যুধিষ্ঠির বললেন, মাতা গুরুতরা ভূমেঃ, মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বিস্তৃত। শেষের দুটো একশো ভাগ ঠিক। প্রথম দুটোর অভিজ্ঞতা আমার হয়নি প্রভু ওই জীবনে।

আমার চোখ দুটো হয়েছিল মায়ের মতো নীল। শরীরটা হয়েছিল বাবার মতো। ছিপছিপে সুন্দর। মাথায় কৃষ্ণের মতো চুল। তরুণ এক তবলিয়া আমি। আমি আমার ওস্তাদের কাছে তবলা সাধতে রাজি। চরিত্র যার যার তার তার। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার সৃষ্টিতে নারীর কোনও তুলনা হয় না। সাধে কি আপনার ছায়ায় বসে পৃথিবীর কবি লিখেছে— কবিতার অনেক বিষয় পৃথিবীতে ছড়ানো; কিন্তু:

Those gently parting lips,
those wicked curves
tell me. friend:
is there a more alluring subject anywhere

একা একটা বামুণ্ডলে লোকের আপনার ওই পৃথিবীতে দিনটা তবু চলে যায়— লোক জন, হই-হল্লা, গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-পাট, কেনা-বেচা, পথনাটিকা দেখতে দেখতে সূর্য গেল অস্তাচলে। সন্ধেটাও চলে। রাতে, আকাশের তাঁবু যখন নেমে আসে নীচে, তারাদের খই ফোটে, ছোট হতে হতে পরিসর চলে আসে হাতের মুঠোয়, তখনই হয় বিপদ। পশু বেরিয়ে এসে পায় জঙ্গলের বিস্তার, মানুষের ভিতর থেকে যা বেরোয়, সে এখন যায় কোথায়! নির্জন পথঘাট, শূন্য পার্ক, বন্ধ দোকান, পথের পাশের গহ্বর থেকে বগ্‌বগ্ করে বেরিয়ে আসছে গঙ্গার জল। আপন মনে বয়ে চলেছে কুলুকুলু কলস্বিনী। পরিবার পরিজন যাকে বেঁধে রাখতে পারে না, সে মানুষ যায় কোথায়!

তখন চায় সে দেহের কবিতা। একটি গেলাস, একটু আরক্তিম পানীয়, এক টুকরো কাবাব, একটা রুমালি রুটি, তবলার বোল, ঘুঙুরের চপল ছন্দ, ঘুরছে ঘাগরা, উড়ছে ওড়না। স্বর্গ আমার চাই না প্রভু, নরকেই যত সুখ। ওস্তাদ বললে, নেশা লেগেছে, মরবি তুই। কতবার মরলুম প্রভু, মরণে কী ভয়! জীরাবাই নাচে। আমাকে ভাবে ভাই। আমি ভাবি অন্য। আমার রক্তে নেচে বেড়ায় আমার উন্মাদ পূর্বপুরুষেরা। এইসব নীল, হলুদ, নানা রঙের জীবন-বেলুন নিজের আবেগেই ফেটে যায়। খোসা ঝরে পড়ে ছেঁড়া টুকরো হয়ে অবাস্তব থেকে বাস্তবে। পৃথিবীতে স্থান নেই ছিন্নভিন্ন জীবনের। নদী পাথরের ঘর ছেড়ে ছুটে চলে আপন মনে, নিজের গতিতে। বেলুন। সুখী নয় কী নদী, কী

ভূমিতে! জীরাবাই নাচে। উপচে পড়ে বাসনা। প্রভু আপনি যদি পুরুষ হন, তা হলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব, একদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে নেমে যান নীচে, আপনার ওই বাগানে। খুঁজে বের করুন জীরার মতো এক রমণী। তার ছুটন্ত পায়ের উড়ন্ত লাল ফাঁদালো ঘাগরাটাকে ছুঁয়ে যেতে দিন আপনার নাকে, সে যখন দু'হাত মাথার ওপরে তুলে দেহবল্লরী সাপের মতো লতাবে, বিধাতা বলে লজ্জায় মুখ নিচু করে ইন্দ্রিয়জয়ীর অহংকারে বসে থাকবেন না, বেশ সাহস করে তাকাবেন, পীনোদ্ধত কাঁচুলি, জরির চুমকি, তাকাবেন ঘুঙুর-পরা পায়ের পয়ারের দিকে, তাকাবেন একফালি কোমরের উন্মোচিত অমিত্রাক্ষরের দিকে। তাকাবেন যখন সে পেছন ফিরে চলে যাবে আপনার ভূগোলের অর্ধগোলকের হিল্লোল তুলে। তাকাবেন তার ভ্রূ-ধনুকের দিকে। ছুরির মতো চোখের দিকে। তারপর যদি সাহসে কুলোয় জড়িয়ে ধরবেন স্বেদসিক্ত সেই উষ্ণ শরীর। অবশেষে আমি শুনতে চাই আপনি সমান জোরে বলছেন— সংযমী হও। শিশ্নবান হও। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।

ওস্তাদ একদিন বললে, সর্বনাশটা আমিই করলুম তোমার। পাপের জগতের ঢাকনাটা আমিই খুলে দিলুম তোমার সামনে। তুমি যে এত দুর্বল চরিত্রের তা তো জানা ছিল না। পৃথিবীতে একদল মানুষ পাপ আর পুণ্যের বিচার করতে করতেই গেল। একটা অপরাধ বোধ। কার কাছে যে কার অপরাধ। মানুষের ভেতর যে কত কী অবদমিত থাকে। ওস্তাদ প্রথমে আমাকে ভালবেসেছিল, তারপর এল হিংসা, হিংসা থেকে জন্মাল হীনম্মন্যতা। জীরার গোটা পরিবারে আমার তখন ভীষণ দাপট। মোক্ষদার অনুগ্রহে পয়সার অভাব নেই আমার। সাজ পোশাকে ছাড়িয়ে গেছি ওস্তাদকে। তালিম নিচ্ছি উত্তরভারতের খানদানি ঘরানায়। মানুষ স্বার্থপর। আমিও তাই। ওস্তাদ আবার ফিরে গেছে তার নিঃসঙ্গ জীবনে। আমি যাই কিন্তু থাকি না। সেই টিফিন ক্যারিয়ারে বয়ে আনি না মোগলাই খানা। কেমন যেন সব হয়ে গেল। আমি এখন জীরাবাইয়ের খিদমদ খাটি। বেশ লাগে। রাতে জীরা রূপসি নর্তকী। ঠুংরির মোচড়ে মন নিংড়ে আনে। দুপুরে জীরা ঘরোয়া রমণী। আলগা শাড়ির পরতে জড়ানো বহুমূল্য এক শরীর। তিন-চার জন দাসী তার শরীর ঘষামাজা করে। কেউ চুল। কেউ পায়ের গোড়ালি। কেউ হাতের এ-পিঠ ও-পিঠে তুলছে মেহেদির আলপনা। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। নর্তকী তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে বসে আছে সম্রাজ্ঞীর মতো। তার বুকের ওপর দুলছে হিরের লকেট। রসুইখানা থেকে ভেসে আসছে কাবাবের খুশবু। আপনার দুটো জন্তু আর একটা পাখি পৃথিবীর নোলাকে একেবারে মাতিয়ে রেখেছে— ছাগল, দুম্বা আর মুরগি। কাবাব খাও, টিকিয়া খাও, সুরুয়া খাও, খাও রোগনজুস। ধমনির রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধনুকে বাজে টংকার।

সব সময় যে বাড়িতে উৎসব চলছে মনে হয়, মনে হয় একটা বিয়েবাড়ি, বিয়ের কনে যেন সাজতে বসেছে, সে বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়ি কিংবা ভাবপ্রবণ কোনও ওস্তাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে। ওস্তাদ চিৎপুর থেকে পাথরের এক শিবলিঙ্গ কিনে এনে তাকের ওপর বসিয়ে গঙ্গাজল ঢালতে শুরু করেছে। আজকাল সেই দিকে তাকিয়ে তবলা সাধে। এদিকে আমার সম্পর্কে ফলাও করে কাগজে লেখা হয়েছে। তরুণ এক বাঙালি প্রতিভা যার হাতে তবলা কথা বলে। যার বোলে নেচে ওঠে নর্তকীর শ্রীচরণ। সেখানে গুরু হিসেবে কোথাও ওস্তাদের নাম নেই। নাম আছে আমার দ্বিতীয় গুরু সেই উত্তরভারতীয় ওস্তাদের। কে এই খবর পরিবেশন করেছিল আমি জানি না। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। খবরটা বেরোবার পর আমি ওস্তাদের বাড়িতে গেলুম। ওস্তাদ গুম মেরে বসে ছিল, আমাকে দেখেই বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে এসে আমার বুকে হাত দিয়ে ঠেলে বের করে দিলে দরজার বাইরে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল মুখের ওপর। মুখে কী অসীম ঘৃণা আর অভিমান! সেই যে দরজা বন্ধ হল, সে দরজা আর জীবনে খোলেনি। সত্য কথা বলতে কী আমার সেদিন মনে হয়েছিল আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহারা হলুম। নাকি প্রেমিকহারা। তা হলে শুনুন, পৃথিবীতে আপনি বেঠোফেন নামে এক বিরাট সংগীত শিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কোনও নারীকে নয়, ভালবাসতেন এক তরুণকে। আঁন্দ্রে জিদ বলে এক লেখককে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর

জীবনেও ওই একই ঘটনা। ওই একই অপরাধে কারাবাস করতে হল লেখক অস্কার ওয়াইল্ডকে। কে জানে, কীসব ব্যাপার হয় আপনার ওই ঘোড়ার ডিমের পৃথিবীতে। আমি ওস্তাদের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিনি। আপনার পাঠানো এক সুফি সাধক পৃথিবীর মানুষকে বলে এসেছিলেন, তোমার জন্যে যে যা করছে করতে দাও, আর তুমি যা করতে চাও, নিশ্চিতভাবে তা করে যেয়ো। আর আপনি পাঠিয়েছিলেন ওমর খৈয়ামকে। তিনি তো তাঁর শায়েরিতে পৃথিবীর মানুষকে এক মজার কথা শুনিয়ে এসেছেন। শুনবেন! সে কথায় আপনি আছেন। খোদাকে একদিন চিৎকার করে বললুম, খোদা আমার ভাগ্যটা একটু ভাল করে লিখো। বেহস্ত থেকে ভেসে এল হাসি মেশানো গলা। কান খাড়া করে শুনলুম। খোদা বলছে, ভাগ্য লেখা আমি ছেড়েই দিয়েছি বৎস! ওমর বললেন, তা হলে তো মিটেই গেল ঝামেলা। তা হলে আমি কে বাবা! না ঘরকা, না ঘাটকা! তা হলে শোনো, পৃথিবীর নানা চক্রান্তে পড়ে নানা ব্যাখ্যা হল আমার। তাইতে আমার কাঁচকলা। আমি আমার। আমি যা, আমি তাই।

জীয়াবাইয়ের সঙ্গে আমি গাড়ি চেপে দুপুরের দিকে হগমার্কেটে যাই। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছি দোদুল দোল গাড়িতে। ফিরোজা রঙের সিল্কের শাড়ি মোড়া সজীব বনস্পতির মতো শরীর। গা ছুঁয়ে যায়। দুটি জঘনের থিরিথিরি আন্দোলন। নাকের ডগায় স্বেদবিন্দু। স্বেদসিক্ত ফিরোজা কাঁচুলির গভীর রং। মার্কেটে সকলেরই যখন মুন্ডু ঘুরে যায়, আমার তখন খুব গর্ব হত। দেখো, দেখো, কার পাশে আমি ঘুরছি! পৃথিবীর মানুষকে হরেক অহংকার দিয়েছেন বলেই সে তবু কিছুটা সময় সেই বলয়ে ঢুকে ভালই কাটায়।

আমি এক বোকা। সাতপুরার রাজা, দিশেরগড়ের মহারাজা, নলপুরের নবাব, সিংহগড়ের দেওয়ান, শোলপুরের শিল্পপতি, কলুটোলার গুঞ্জমাস্তান, এরাও তো পৃথিবীতে মোহরের থলি, লম্বা ছুরি নিয়ে, চোখে সুর আর সুরার রং নিয়ে ঘুরছে। তাদের পাশে এক হতভাগা তবলিয়ার কী দাম? তার বোলে যার শরীর নাচে, সে নাচে যাদের বাসনা নাচে, তাদের আপনি দিয়ে রেখেছেন কুবেরের সম্পদ। জীরাবাইয়ের দখলদারি নিয়ে একটা লড়াই হয়ে গেল। শোলাপুরের ধনকুবের, সে এক ভুঁড়িঅলা থসথসে লোক, তার তিন তিসি লোটা গর্দান, যো হায় শয়তান কি নিশান, গুঞ্জমাস্তানের সঙ্গে রফা করে জীরার গোটা পরিবারটাকে রেলের সেলুন কোচে চাপিয়ে নিয়ে গেল শোলপুরে। বললে ঝরোখা দেবে, দেবে কুঞ্জবন, শিসমহল। বোকা আমি, সেইদিন বুঝেছিলাম, প্রেম হল নিচু মহলের খোঁয়ারি। উঁচু মহলের হল দুম্বার কেনাবেচা। আসরফির ঝনাতকার। জীরাব চেয়ে জীরার ম্যানেজার মা অনেক লোভী। সে জানত যতদিন যৌবন, যতদিন মধু, ততদিন অলিকুল। সিল্ক, শাটিন আর ব্রোকেডে বোনা শত শতাব্দীর ওই নিষ্ঠুর অন্ধকার অভিশাপ ফিরছে মানুষের পিছু পিছু। প্রেমের পৃথিবীতে আরও অনেক দুঃখ আছে ভগবান, আরও অনেক আনন্দ। ভেবেছিলুম, ইসলাম ধর্ম নিয়ে জীরার বোনকে বিয়ে করব। ওস্তাদের দরজা বন্ধ। তবলার বোল কথা বলছে, কৎ তা, গদি গেনে ধা, ধা ধা, ধিন তা, নানা, তিন তা, খুন খুন খিন তা ॥

ওদিকে মোক্ষদার কেরামতিতে বাড়ি খালি। পাখিরা সব হাওয়া। মোক্ষদা একদিন ঘাড় ধরে রাস্তা থেকে আমাকে টেনে নিয়ে এল। 'জীবনটা নষ্ট করতে চাস!' মোক্ষদা কেঁদে ফেলল। 'তোর এত দেখেও শিক্ষা হল না রে? সেই ওই পাড়ায় গিয়ে মরেছিস। লালটু মার্কা চেহারা হয়েছে, রাক্ষসীরা তোকে চিবিয়ে শেষ করে দেবে। শোন আমি এক খারাপ মেয়েমানুষ। খারাপ মেয়েমানুষ পুরুষকে ভেড়া করে দিতে পারে। তোর ঠাকুরদাকে আমি যা করেছিলুম। কেন করেছিলুম জানিস, তা না হলে, এই বিষয়সম্পত্তি পাঁচ ভূতে শেষ করে দিত। রামবাগানের সেই মেয়েমানুষটা মেরে দিত সব। কত্তা যে নিজের ভুলে অপঘাতে মরে যাবে তা কি আর আমি জানতাম। বেখাপ্পা এমন একটা ভুল করে ফেললে। তোর এইবার আমি বিয়ে দোব। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে তোর। আমার কেউ নেই। শয়তানরা সব সরে গেছে। তুই এইবার একটু গুছিয়ে বোস। আমি দেখে যাই।'

ঈশ্বর, আমার খুব লোভ হল। মনে হয়েছিল, মন্দ কী? সারা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে চুটিয়ে নবাবি করা যাবে। বেশ ভাল একটা মেয়েও আছে। নাচে, আমি তবলা বাজাই। মোক্ষদাকে বললুম, 'বিয়ে করলে আমি ওই মেয়েটাকেই করব।' মোক্ষদা লাফিয়ে উঠল— 'খবরদার না। নাচিয়ে গাইয়ে চলবে না। ওসব মেয়ে কোনওদিন সংসারী হবে না। তোকেও নাচাবে। ভাল বংশের ঘরোয়া মেয়ে চাই।'

মোক্ষদা ঘটকি লাগাল। যা ভেবেছিলুম তাই হল। কেউ মেয়ে দিতে রাজি নয়। প্রথম বাধা, এই পরিবারের দুর্নাম। দ্বিতীয় বাধা, আমার বাবা খুনি। তৃতীয় বাধা, আমার মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। বিধবা আবার বিয়ে করবে কী? বিদ্যাসাগর বললেই হল। হিন্দু রমণীর নিজের একটা সংযম থাকবে না। চতুর্থ বাধা, মোক্ষদা। মোক্ষদারা তো বেশ্যাই। কর্তার রক্ষিতা।

আমি অন্ধকার ঘরে হা হা করে হেসেছিলুম। আমার ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে, রাত, আলো, একঘর মাতাল, তবলা, নর্তকীর চরণ। দয়া হলে দেহের একটু প্রসাদ। নেশা কি সহজে ছাড়া যায়? পৃথিবীতে একটা চালু প্রবাদ আছে— চালুনি তোমার পেছনে কেন ঝারা, ওরে, ও আমার বংশাবলির ধারা। এ বংশ উচ্ছিষ্টা নারীর ভোগী। রক্ত তো আর পালটানো যায় না ঈশ্বর।

সকালের প্রথম ট্রাম ডিপো থেকে বেরিয়েছে। শীতের সকাল। ধোঁয়া ধোঁয়া। কুয়াশা তখনও কাটেনি। ভোরের প্রথম সূর্যকে মনে হচ্ছে মরা চাঁদ। ট্রামের চালকের চোখে ঘুম লেগে আছে। লাইন পেরিয়ে যে ওপারে যেতে চাইছিল তার চোখে ছানি। সবে পাক ধরেছে। চালক ব্রেক কষার চেষ্টা করেছিল। দেরি হয়ে গেছে। মোক্ষদাকে ঘষড়াতে ঘষড়াতে নিয়ে গেল, প্রায় পনেরো-কুড়ি হাত। হাসপাতালে তিন দিন লড়াই করল মৃত্যুর সঙ্গে। ডাক্তারেরা বললেন, অদ্ভুত জান। তিন দিন ঠায় আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখলুম মানুষ কীভাবে একটু একটু করে চলে যায়! অনেক কথা বলার ছিল তার। কেবলই ভাবছিলুম, যাবার আগে হঠাৎ হয়তো চোখ খুলে শেষ কথাটা বলে যাবে। বেশ ছটফট করছিল। ভেতরে একটা আলোড়ন চলছিল নিশ্চয়। হঠাৎ নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। মণি দুটো ঘুরে গেল কপালের দিকে। বোঝাই যায় মৃত্যুর আগে শিয়রে কেউ এসে দাঁড়ায়। সে ঈশ্বরের দেবদূত হতে পারে, যমদূত হতে পারে। সিস্টার নিচু হয়ে হাতের নাড়ি টিপে ধরল। কবজি। কবজি থেকে কনুই। গলা। দ্রুত হাত উঠতে লাগল। জীবনের স্পন্দন ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। চোখ দুটো স্থির পাথরের মতো হয়ে গেল। শেষে বাতাসটুকু বেরিয়ে গেল চোখ দিয়ে। সিস্টার তাড়াতাড়ি সমস্ত নল খুলতে শুরু করলেন। অক্সিজেন, স্যালাইন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হয়ে গেল, কিছু করা গেল না। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মূর্তির মতো। হাসপাতালে মোক্ষদার পরিচয় হয়েছিল আমার মা। তিন দিন, তিন রাত সিস্টারের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। রাতে সে জাগত, আমিও জাগতুম তার সঙ্গে। আমাকে চা করে খাওয়াত। ফিসফিস করে গল্প করত কতরকম। নানারকম রুগির গল্প, তার নিজের জীবনের গল্প। বেশ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আমার দুগাল দু'হাতে ধরে নাড়াতে নাড়াতে বললে, 'এই তুমি একটু কাঁদো। একটু কাঁদো পাথর হয়ে থেকো না।' বলতে বলতে সে নিজেই কেঁদে ফেললে। তার মাথায় সাদা টুপি। অসম্ভব বড় একটা খোঁপা। মধ্যরাত। শীত পড়েছে সাংঘাতিক। ঘরের বাতাস যেন সাপের মতো হিলহিলে। গোল নিটোল একটা মুখ। ডিমের মতো কপাল। পানের মতো চিবুক। চকচকে উজ্জ্বল ফরসা ত্বক। ঝকঝকে চোখ। পাতলা ক্ষুরের মতো ঠোঁট। নরম সাদা সোয়েটার। বুকের দুটো পাশ উঁচু। সাদা শাড়ি। আঁচল টান হয়ে পেছনে গিয়ে আটকা পড়েছে কোমরের অদৃশ্য বেল্টে। নীচের দিকটা যেন উলটানো কলসি। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। তার কাঁধে মাথা রাখলুম। শরীরে ওষুধের গন্ধ। সে বললে, 'এই কী হচ্ছে! কেউ এসে পড়বে।' আমি বললুম, 'এটা কেবিন। ডেকে না আনলে মাঝ রাতে কেউ আসবে না।' আমার পাথুরে ভাবটা কেটে যাওয়ায় সে আশ্বস্ত হয়েছে।

আমি তখন তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলুম। সে কিছু একটা বলতে চাইলে, আমি তার কথাটা গিলে ফেললুম। তার অনেকটা লাল আমার মুখে এসে গেল।

দিন পনেরো পরে আমি সেই অভিশপ্ত বাড়িতে বসে আপন মনে তবলা সাধছি। বোলের পর বোল আসছে আর যাচ্ছে। তিনতাল, আড়া ঠেকা, ঝাঁপতাল, যৎ, কাহারবা। বাজাচ্ছি, আর কেবলই মনে পড়ছে, আপনার ওই পৃথিবীতে মিশনারিরা যা বলে, পাপের বেতন মৃত্যু। মোক্ষদা কেমন চলে গেল। আহা, বেচারা ভোগ করতে পারল না, অথচ ভোগ করার মতো শরীরটা ছিল। যাকে বলে, গায়ে গতরে। বাঁচতে দিলে সে আরও বহু বছর বাঁচত। তার জীবনের শেষ ইচ্ছে ছিল, তীর্থভ্রমণ। ইচ্ছে ছিল বুড়োকর্তার নামে যা হয় একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করবে। হয় একটা স্কুল, না হয় একটা দাতব্য চিকিৎসালয় কি অনাথ আশ্রম। বিশাল বাড়ি নির্জন নিস্তব্ধ। আমার তবলার বোল ছুটে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি। দোতলার বিশাল বারান্দায় থমকে দাঁড়াচ্ছে, যে-জায়গায় পিতামহ খুন হয়েছিলেন। ছুটে যাচ্ছে সেই ঘরে, যে ঘরে আমার বাবা মাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকতেন। সব ছবিই সেই ব্যারিস্টার নিয়ে গেছেন। আধখানা আঁকা একটা ছবি পড়ে আছে। যেন কুয়াশার ভোরে মা হেঁটে আসছে বহু দূর থেকে। মুখটা স্পষ্ট, বাকি সব অস্পষ্ট ঝাপসা। পরে হয়তো ফুটত। বাবা আর সময় পেল না। তবলার শব্দ ছন্দ গিয়ে ঢুকছে সেই ঘরে যে ঘরে ঠাকুমা একটু একটু করে মরেছিল। তিনতালে তবলা নেমে গেল নীচের উঠোনে, যেখানে এই বাড়ির মুশকো ছেলেরা আর গোদা গিন্নিরা মল্লযুদ্ধ করত। সারা বাড়িময় ছোটাছুটি করছে আমার তবলার বোল।

এমন সময় দারোয়ান এসে খবর দিলে, একজন মেয়েলোক দেখা করতে এসেছে। সামনের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাসপাতালের সেই সিস্টার। আজ আর তার পরনে নেই হাসপাতালের বেশ। ছুটে নেমে গেলুম নীচে। বড় একা লাগছিল। মেয়েটি যে সত্যিই আসবে আমি ভাবিনি। বলেছিলুম। সে এসেছে। কথা রেখেছে। তাকে ভেতরে নিয়ে এলুম। সে অবাক হয়ে দেখছে সব। বড় বড় ঘর, দালান, উঠোন, ছবি, ঝাড় লণ্ঠন। ঘোরানো সিঁড়ি। পাথরের মেঝে। তার কোমরে আমার হাত। বর্তুল নিতম্বে আলতো হয়ে পড়ে আছে, আমার তবলা সাধা লম্বা লম্বা আঙুল। অনুমান করার চেষ্টা করছি, চলার সময় সুন্দরী যুবতীর নিতম্বে আপনি কোন ছন্দ বেঁধেছেন, কাহারোয়া না আটমাত্রায় যৎ, না যোলো মাত্রার ত্রিতাল! আমি তাকে আমার শরীরের ডান পাশের সঙ্গে প্রায় জুড়ে নিয়েছি। শীতের সন্ধে নামছে শহরের ঘরে। গোলাপি আঁধার। গোটা বাড়িটা যেন একই সঙ্গে হাহা করে হাসছে, গুমরে গুমরে কাঁদছে।

সে বললে, 'তোমরা তো বিরাট বড়লোক।'

আমি সে কথায় কান দিলুম না। আমার চারপাশ ঘিরে সুন্দরীরা এতকাল নেচেছে; কিন্তু কোনও নারীর সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। তার সব কথাই অর্থহীন বিলাপের মতো ভেসে গেল কান ছুঁয়ে। সে কিছু বলছে। অনেক কথা; কিন্তু কী কথা! সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা দোতলায় উঠছি। চারপাশের দেয়াল চাপা স্বরে বলছে যেন বন্দি করো, বন্দি করো। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মেয়েটাকে যদি সামান্য একটু সুরাসিক্ত করা যেত। যেমন করা হয় ওই নিশীথে বধূদের। বড় শোভা খোলে সামান্য মদিরায়। চোখে নামে জ্বরের ঘোর। দেহ ভারী হয়। শ্লথ হয়ে আসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অন্যের ইচ্ছাকে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না তার।

আমরা ফরাসে এসে বসলুম। সামনে আমার তবলা। সে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি তবলা বাজাও।' প্রথম পরিচয়ের পরের দিনই আমরা তুমিতে নেমে এসেছিলুম। আমি বললুম, 'তুমি তো গানের জগতের খবর রাখো না, রাখলে জানতে, আমি এই শহরের একজন নামকরা তবলিয়া। আমার তবলা শহরের সেরা নর্তকীদের সারারাত নাচায়।'

সে বললে, 'তুমিই বাজাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। আমি।'

'বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'আমার যে আর কেউ নেই।'

'তুমি আর তোমার মা, আর এত বাড়ি এই বাড়ি! মা চলে যাবার পর তুমি একা!'

'যে গেল, সে আমার মা ছিল না। বলতে পারো আমার ঠাকুমা। ঠাকুমার কোনও ছেলেপুলে ছিল না।'

সে অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে! তুমি নাতি হলে কী করে!'

'তা হলে শোনো, বড়লোকদের জীবনে দু'রকম ব্যবস্থা থাকে। এক হল, বিয়ে করা বউ, তারা বছর বছর সন্তান উপহার দেবে আর পুঁইশাকের মতো চেহারা হয়ে যাবে দিনে দিনে। আর গোপালরা যশোদা মাকে চুষে চুষে শেষ করে দেবে। অবশেষে জটেবুড়ির চোখে ছানিকাটা ঘষাকাচের চশমা। কয়েক ডজন অসুখ। দুই হল, প্রমোদা। রক্ষিতা। ইংরেজরা বলবে, মিস্ট্রেস। সেই প্রমোদা হল ফুর্তির দোসর। তাদের সন্তানাদি হবে না, কর্তার আদরে তাদের খাসা গতর হবে। একটু অসভ্য মতো, অশিক্ষিতা। মাঝেমধ্যে মোটা দাগের কথা বলবে, আর ভদ্রলোক কর্তা ভেতরে ভেতরে গদগদ করে উঠবে। তুমি যাকে দেখলে, সে হল এই দু'নম্বর; কিন্তু আমাকে মানুষ করেছে। যাবার আগে আমাকে বড়লোক করে দিয়ে গেছে। বড়কর্তা তাকেই সব দিয়ে গিয়েছিল। সে অনেক কারণ। সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। এইবার আর একটা গল্প শুনবে চলো আর একটা ঘরে। এই বাড়ির এক-এক ঘরে, এক-এক গল্প।'

তাকে নিয়ে এলুম আমার মায়ের ঘরে। সে ঢুকেই আমার মায়ের আধাখ্যাঁচড়া ছবিটা দেখে বলে উঠল, 'বাঃ, কী সুন্দর! কার ছবি?' যত দিন যাচ্ছে মায়ের ছবিটা সত্যিই সুন্দর হয়ে উঠছে। ছবিটা অসমাপ্ত হয়ে যেন আর একটা মাত্রা পেয়েছে। মা যেন স্বপ্নে হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিশাল খাটে তাকে বসিয়ে, বললুম, 'আমার মা।' সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিশাল ক্যানভাসটার দিকে। আর সেই অবসরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলুম। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমি পাপী। পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা আমায় ভর করেছে। ফিরে এসে তার গায়ে গা লাগিয়ে বসে বেশ জমিয়ে সেই অতিনাটকীয় গল্পটা বলতে লাগলুম। বাবার ফাঁসি আমি দেখিনি; কিন্তু মেজবাবুর অবৈধ বউয়ের দড়িতে ঝোলা দেহটা আমি দেখেছিলুম। সেইটাকেই চালিয়ে দিলুম এই গল্পে। এমনই আশ্চর্য বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল। এরা কেউই আমার নয়, তবু গলা ধরে এল। জল গড়াল। মেয়েটি চোখের জল সহ্য করতে পারে না, সেই প্রমাণ পেলুম আর একবার। আঙুল দিয়ে জল মোছাতে গেল। আমি আর ক্ষণবিলম্ব না করে, তাকে শুইয়ে দিলুম সেই শিল্পীদম্পতির বিছানায়। তার মুখের ওপর আমার মুখ। চোখে দু'-এক ফোঁটা জল। এই পর্যন্ত কোনও প্রতিবাদ ছিল না। এরপরই সে ক্রমান্বয়ে বলতে লাগল, আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে, ভীষণ শীত করছে। সেই মুহূর্তে কে যেন আমার কানে কানে বললে, কথা কম কাজ বেশি। সে কি আপনি প্রভু! নরদেহ বড় স্পর্শকাতর। ইন্দ্রিয়াদি বড় প্রবল। একবার জাগলে মন, বিচারবুদ্ধি , ভয়ভাবনা সব ভেসে যায় বানের জলে।

দুটো ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে গেল। মনে হল নিমেষ। আপনার যেমন পলকে কোটি বছর। মেয়েটি খাটের একপাশে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার লজ্জা এসেছে। বিচারবুদ্ধি ফিরে এসেছে। ব্যক্তিত্ব ফিরে এসেছে। সে একটু একটু করে নিজেকে গোছাবার চেষ্টা করছে আর নিজেকেই নিজে বলছে, 'ছি ছি, এসে আমার এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল!' কথাটা বড় মনে লাগল আমার। আমি আবার বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লুম তার ঘাড়ে! প্রবল শক্তি আর প্রবল ঘৃণায় সে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইল, না, না, আর না। ব্যর্থ হল তার প্রতিরোধ। যতটা গুছিয়েছিল, আবার সব এলোমেলো। এবার যেন সে আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি হরণ করতে করতে সব দান করতে লাগলুম, একে একে,

এই বাড়ি তোমার, গাড়ি তোমার, গাড়ি দুটো তোমার, যেখানে যা আছে সব তোমার। আমি তোমার। তোমাকে আমি বিয়ে করব।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। দারোয়ানের গলা। ওস্তাদের বাড়ি থেকে খবর এসেছে ওস্তাদের অবস্থা খুব খারাপ, আমাকে একবার ডাকছে। প্রথমে মনে হল— ওস্তাদ মরুক। আমি যে এখন বিশেষভাবে বাঁচছি। কে ওস্তাদ, কার পৃথিবী! কোথায় মানুষ। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। জানি না, মেয়েটি আমার সঙ্গে না জানার অভিনয় করছে কিনা! পরমুহূর্তেই মনে ফুটে উঠল অতীত। অতীত এসে উঁকি মারলেই আমি পাথর হয়ে যাই। আমার অতীত তো মোটেই সুখের ছিল না। আমাকে তো ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতের কোলে। ধীরে ধীরে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্লথ হয়ে এল। মেয়েটিকে ছেড়ে আমি উঠে বসলুম। সেই ওস্তাদ। রাস্তার দিকের একতলা ঘর। টিফিন ক্যারিয়ার। মোগলাই খানা। ওস্তাদ মুখে এক-একটা বোলের কলি ছাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তবলায় বাজিয়ে শোনাচ্ছি। ওস্তাদ অমনি বলে উঠছে, শাবাশ! শাবাশ! বাঁয়ার লগগি মারার কায়দা শেখাচ্ছে। আমার আঙুল দেখে বলছেস আরও কড়া পড়বে, আরও।

আমার ওই ভাব দেখে মেয়েটি যতটা দূরে চলে গিয়েছিল মনে মনে, ঠিক ততটাই সরে এল কাছে। আমার কাঁধে হাতের কনুই রেখেছে। শরীর তার নিরাবরণ; কিন্তু আর কোনও লজ্জা নেই। তার অনাবৃত বুক আমার পিঠ ছুঁয়ে আছে। আমার সমস্ত আসক্তি তখন ঢুকে গেছে সাপের মতো গর্তে। সে বলল, 'আবার কী হল?'

আমরা দু'জনেই গেলুম ওস্তাদের বাড়ি। মেঝেতে বিছানা। পরিষ্কার চাদর। পরিষ্কার বালিশ। মনেই হচ্ছে না মৃত্যুশয্যা। আমার ওস্তাদ বড় শৌখিন লোক ছিল। বড় মেজাজি। বহুত আমিরি। মৃদু আলো। দেয়ালে ওস্তাদের গুরুর ছবি। ছবিতে টাটকা মালা। সারা ঘরে ফুলের গন্ধ। ঘরে তিন-চারজন। সবাই ওস্তাদের শাগরেদ। মাথার কাছে গিয়ে আস্তে ডাকলুম, 'ওস্তাদ! আমি এসেছি।' আর কোনও কথা বেরোল না। গলা বুজে এল। চোখে জল। সামান্য, সামান্য ভালবাসা যাদের কাছে পেয়েছিলুম, তারা একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওস্তাদ ইশারায় আর সবাইকে বাইরে যেতে বললে। মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছিল, ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?' আমি একটুও দ্বিধা না করে বললুম, 'আমার বউ।' ওস্তাদ তার মুখটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করলে। ফিসফিস করে বলল, 'বাঃ সুন্দর মেয়ে। কবে বিয়ে করলি, আমি কিছুই জানি না।' বললুম, 'করিনি করব।' ওস্তাদ আমার হাত আর মেয়েটির হাত একসঙ্গে করে তার বুকে চেপে ধরল। ওস্তাদের শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমাদের হাত দুটো যেন চাটুর ওপর পড়ে আছে। মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ প্রেমিকার নয়। অভিজ্ঞ একজন সিস্টারের। ওস্তাদ তখন আচ্ছন্ন চোখে আড়ষ্ট গলায় বলছে, 'খুব সুখের হোক, খুব আনন্দের হোক তোমাদের জীবন।' দূরের কারওকে যেন অনিশ্চিত প্রশ্ন করছে, কবে বিয়ে জানো কি? আমি তো থাকতে পারব না? বেনারসিটা কে দেবে! হিরের দুল। নাকছাবি। টায়রা! কে তদারকি করবে! ওস্তাদ ক্রমশই অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে। হাত দিয়ে আমাদের মাথা খুঁজছে। মেয়েটি বাবা বলে বুকের ওপর মাথা রাখল। ওস্তাদের হলুদ মুখ আর ফ্যাকাশে ঠোঁটে একচিলতে হাসি। মাঝি যেমন দাঁড়ের ঝিকি মেরে নৌকো ঘাটে ভেড়ায়, সেইভাবে ঝিকি মেরে বললে, 'হ্যাঁ মা।' তারপর অতি কষ্টে বললে, বালিশের তলা। মেয়েটি বললে, 'বালিশের তলায় তোমার জন্যে কিছু আছে।' লম্বাটে বড় একটা খাম বেরোল। তখন আর দেখার সময় নেই। ওস্তাদ তখন তলিয়ে গেছে। কিছু করতেই হবে, যত টাকা লাগে। মেয়েটি বললে, 'কিচ্ছু করার নেই। ইউরেমিয়া। কিডনি দুটো একেবারে গেছে। আরও আগে হলে অনেক কিছু করার ছিল। এ একেবারে শেষ মুহূর্ত।' আমার মনে হচ্ছিল নিজেকে নিজে জুতো মারি।

ওস্তাদ হঠাৎ ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি নাড়িতে হাত রাখল। সেই এক খেলা। দম ফুরিয়ে গেল ঘড়ির। মেয়েটি বাবা বলেছিল, আমার মনে হল, আরে

এতদিন আমি চিনতে পারিনি! এই তো আমার পিতা। শাসন করতে চেয়েছিলেন বলে সরে গিয়েছিলুম আমি। আমরা দু'জনে বাইরের অন্ধকারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপচাপ। সমাধিতে বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের। লম্বা খামটা তখনও খুলিনি। সেইটাই ছিল পুত্র আর পুত্রবধূকে নিঃসঙ্গ শিল্পীর দেওয়া যৌতুক।

এত বড় শবযাত্রা শহরে খুবই কমই হয়। আপনার পৃথিবীতে একটা গান আছে, জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে তারে কেন দিতে এলে ফুল। তাই তো হয়। হলওই তাই। সেদিন বাজারে আর ফুল রইল না। আমিই সৎকার করলুম। শ্রাদ্ধও আমি করলুম। ওস্তাদের নিজের বংশের কেউ ধারেকাছে ঘেঁষল না। তাদের ভীষণ রাগ; কারণ ওস্তাদ তার সব কিছু আমাকে দিয়ে গেছে। সবচেয়ে আদরের যা, তা হল শিল্পীর দু'জোড়া তবলা। মানুষের ছোট ছোট কিছু ইচ্ছে থাকে। ওস্তাদের ইচ্ছেটা আমাকে জানিয়ে গিয়েছিল, প্রতি বছর তার মৃত্যুদিবসে যেন বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে একটা সংগীতানুষ্ঠান হয়।

ওরই মধ্যে আপনার বলতে যারা ছিল সবাই গেল। আর কী? অত বড় একটা বাড়িতে একা রাত কাটাতে ভীষণ ভয় করে। কানাঘুসো খবর এল আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে আমার বঞ্চিত আত্মীয়রা। মানুষ কত নোংরা হয় শুনবেন প্রভু: তারা, সেই মুশকো মুশকো ছেলেগুলো রটাতে শুরু করেছে, আমি নাকি আমার ঠাকুরদার সন্তান। কায়দা করে বুড়ো পাপীটা আমাকে সম্পত্তিটা দিয়ে গেছে। চেষ্টা হচ্ছে যাতে আমাকে পৃথিবী থেকে সরানো যায়। সেই মেয়েটিকে বললুম, চলো, তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে যাই। বিয়েটা চটপট সারি। সে হেসে বললে, তুমি জানো না, আমার তো কেউ কোথাও নেই। থাকলেও আমি জানি না। অনাথ আশ্রম থেকে হাসপাতাল, থাকি নার্সেস কোয়ার্টারে। কে আমায় বিয়ে দেবে বল, কে আমাকে সাজাবে। আমি তো স্বয়ংবরা।

বিয়েটা আমরা ইংরেজি মতেই সেরে নিলুম। বউকে বাড়িতে তোলার পরই নানারকম উড়ো চিঠি আসতে লাগল। নানারকম তার বক্তব্য। কোনওটা আমার বউয়ের পূর্ব-প্রেমিক লিখছে। কোনওটা লিখছে আমার শুভানুধ্যায়ী। কোনও চিঠি সরাসরি আমার বউয়ের কাছে। কত মেয়ের আমি সর্বনাশ করেছি, তার ফিরিস্তি। আমরা দু'জনেই পথ থেকে প্রাসাদে এসে উঠেছি। আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরানো মুশকিল; কিন্তু আমার মন বললে, চোটটা আসবে আমার বউয়ের ওপর। যে-কোনও পুরুষের পক্ষেই সে এক গর্ব। মাঝে মাঝেই তবলা বাজাবার জন্যে ডাক আসে বাইরে থেকে। তিনটে দরোয়ানের ভরসায় বউটাকে ফেলে যেতে ভয় করে। আমার বউ বললে, একটা জ্ঞানের কথা শোনো, চিল যখন আকাশে খাবার মুখে করে ওড়ে, তখন কাকের ঝাঁক পেছনে তাড়া করে। চিলটা তখন ঠোঁট থেকে খাবারটা ফেলে দেবার কথা ভাবে। যতক্ষণ না ফেলছে ততক্ষণ নিস্তার নেই। তুমিও ফেলে দাও। কী হবে বড়লোক হয়ে! আমার বউয়ের কথায় প্রথমে বেশ একটা ভাব এল মনে। বাউল বাউল ভাব। একতারা নিয়ে ঘুরছি দু'জনে। তারপরে মনে হল, সে কী ভয়ে পালাব। লম্পট নয়, একজন ভাল বড়লোক হতে আপত্তি কীসের। ওস্তাদজির নামে প্রথম সংগীত সম্মেলনটা হল ওই বাড়ির সামনের লনে। বড় বড় ওস্তাদ যাঁরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ওই বাড়িতে রইলেন। এই ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় সহায় হল আমার বউ। তার ওই হাসপাতালের শিক্ষা ভীষণ কাজে লেগে গেল। সেবা। ওস্তাদরা তো বেজায় খুশি। তিনজন বাবুর্চি দেখিয়ে দিলে রান্নার কেরামতি। যে বাড়ি জাগত ঝগড়ায় আর খিস্তিতে, সেই বাড়ি জাগল সংগীতে। কণ্ঠশিল্পী ধরেছেন ভৈরবী। সেতারি ধরেছেন ললিত। গুলশান বাই নাচছেন একতলার পাথর বাঁধানো উঠোনে। ধ্রুপদীয়া উদাত্ত আলাপ জুড়েছেন চিলেকোঠায়।

সারা কলকাতার জ্ঞানীগুণী মানুষের টনক নড়ে গেল। সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। ভারতের একনম্বর ওস্তাদের সঙ্গে আমি সংগত করলুম। আসরে বসে শুনলেন আমার গুরু। পরের দিন কাগজ ধন্য ধন্য করে উঠল। আমার খেতাব হল পণ্ডিত। রাস্তার লোফার থেকে সম্মানিত ব্যক্তি। ওস্তাদদের

মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল এই বাড়ির কথা। শহরের সংগীত অনুষ্ঠানে বাইরের শিল্পীরা এসেই খোঁজ করেন এই বাড়ি। হোটেল নয়, থাকবেন এই বাড়িতে। পণ্ডিতজির বাড়িতে। অর্থ নয়, জীবনের সুখ এল সংস্কৃতি থেকে। দেখলুম চরিত্র হারানোর চেয়ে না হারানোই ভাল। অনেকে ভাবে, ভোগ বুঝি তেমন হল না। দেহ নিয়ে বেশিদিন ভোগ কবা যায় না। মন দিয়ে সারাজীবন ভোগ করা যায়। দেহকে না খাইয়ে মনকে খাওয়াও। পৃথিবীতে আর একটা জিনিস দেখে এলুম কিছু করার না থাকলেই মানুষ বদমাইশি করে। ভাল কাজের স্বাদ পেলে কাম চলে যায়। মদ, মেয়েমানুষ এসব হল এক ধরনের অসুখ। পেটের অসুখ বাতের ব্যামোর মতো। নিজেকে কোনওরকমে একটু তুলতে পারলেই সবাই তাকে তুলে ধরে। এমন একটা দিন এল যখন লাটসায়েবও শ্রী ও শ্রীমতী বলে আমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করেন। ওই জন্মে আমি সাচ্চা হীরার মতো একটা বউ পেয়েছিলুম। বুঝলেন ঈশ্বর, পথে অনেক সময় মণি মুক্তো পড়ে থাকে।

দেখতে আমার চেহারাটা বেশ ভারিক্কি হয়ে উঠল। চুলে পাক ধরল। ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল। পণ্ডিতদের যেমন হওয়া উচিত। বেশ একটা ব্যক্তিত্বও এসে গেল। আসলে মানুষ কোনও একটা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলে তার ভেতর থেকে আত্মবিশ্বাসী একটা মানুষ বেরিয়ে আসে। আমি নতুন করে আমার বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করলুম। লিখে ফেললুম তালবাদ্যের ওপর একটা বই। সেই বই খুব সুখ্যাতি অর্জন করল। সকালে যখন পাজামা পাঞ্জাবি পরে বাড়ির চারপাশে বেড়াতুম তখন আমার হাতে থাকত সুদৃশ্য একটা লাঠি। সেই লাঠিটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন নেপালের রানা। একবার ইয়োরোপ ঘুরে এলুম সস্ত্রীক। বিদেশিরা আমার বাজনা শুনে ছাত্র হবার জন্যে ঝুলোঝুলি। মাঝে মাঝে বাড়ির নির্জন লনে বসে বসে ভাবতুম, কোন জীবন থেকে কোন জীবনে চলে এলুম। সবটারই প্রয়োজন ছিল। বাইজি বাড়ির অভিজ্ঞতা ছাড়া চুটকি বাজনা খুলত না। তবে বিয়ে আর বউ আর আমার ওস্তাদ, জীবনের বড় দুটো স্তম্ভ। এতে মানুষের হাত আছে না সবটাই আপনার খেলা। যেমন ধরুন, মা যদি আমাকে নিয়ে যেত, ওস্তাদের সঙ্গে পরিচয় হত না। পরিচয় না হলে আমার প্রতিভা ধরা পড়ত না। জীরাবাই সোলাপুরে না চলে গেলে বাইজির মোহে জীবনটা নষ্ট হত। মোক্ষদার দুর্ঘটনা না হলে দেখা হত না আমার বউয়ের সঙ্গে। ওস্তাদ দুম করে মারা না গেলে জীবন নাড়া খেত না। শত্রুরা ভয় না দেখালে রোখ চাপত না। এইবার আপনি হিসেব করুন।

হঠাৎ একদিন বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তখন আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে রয়েছেন ভারতের এক বিখ্যাত কণ্ঠসংগীত শিল্পী। সময়টা সকাল। শিল্পী আহীরভায়রোঁতে আলাপ ধরেছেন। সারা বাড়িটা সুরে ভাসছে। আমি আর আমার বউ লনে বসে চা-পান করছি। দেবদারুর পাতা সকালের প্রথম রোদ ধরেছে। গেট খুলে দিল দারোয়ান। প্রৌঢ়া এক মহিলা। পরনে দামি সিল্কের শাড়ি। খাটো করে ছাঁটা চুল। সুন্দর রং। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। হাতে ধবধবে সাদা একটা ব্যাগ। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে পারলুম। আমার মা। কেন জানি না, চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান জানাতে ইচ্ছে করল না। বসে বসেই বললুম, 'একী মা? তুমি হঠাৎ!'

আমার বউ কাপ রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল— 'মা।'

মেলাবার চেষ্টা করছে। ছবির সেই তরুণী প্রৌঢ়া হয়ে হেঁটে আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। আমার বেশ মজা লাগছে। আমার বউকে এখন এত সুন্দর দেখতে হয়েছে, যে-কোনও গর্বিতা মহিলা ম্লান হয়ে যাবে তার সামনে। মা আমাদের দেখতে এসেছে। ভাল আছি, না মরে গেছি। আমার বউ হাত ধরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিল। চা ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিল।

মা বললে, 'বাড়িটা কী সুন্দর হয়েছে। কে এখন মালিক!'

অহংকারে মানুষ যেমন ঘুরিয়ে কথা বলে আমি সেইভাবে বললুম, 'ভগবান মালিক।'

মা বললে, 'বুঝেছি। কে গান গাইছে। অসাধারণ গলা।'

ওস্তাদের নাম বললুম। মা অবাক হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। মা জিজ্ঞেস করলে,

'এ নিশ্চয় বউমা। বেশ হয়েছে। ভারী সুন্দর।' আমরা তিনজনে লন ছেড়ে এগিয়ে চললুম বাড়ির দিকে। মা অবাক হয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। মুখে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা। যে ঘরে থাকত সেই ঘরে ঢুকে নিজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। চশমাটা বারকতক খোলা-পরা করল। নিজের অতীত দেখলে সকলেই একটু বিষণ্ণ হয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আচমকা প্রশ্ন— 'তুমি হঠাৎ কী মনে করে এলে?' সারা ঘর নিস্তব্ধ। শুধু সংগীতের আলাপ বয়ে আনছে বিষণ্ণ সুর। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মহিলা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। নিজেরই ঘর, সামনে নিজেরই প্রতিকৃতি; কিন্তু অপরাধী। যে-জল চোখে চিকচিক করছিল শুকনো বালির মতো, সেই জল হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল গালের দু'পাশ বেয়ে। চোখের জল আমাকে কাবু করতে পারল না। আমার অনেকদিনের ক্ষোভ বৃদ্ধ বাঘের মতো বসে আছে বুকের গহ্বরে। আমি বললুম, 'যদি তুমি বলো ভালবাসা, আমি বলব এর চেয়ে মিথ্যা আর হয় না। ভালবাসা জানতে হলে মোক্ষদা হতে হবে। যাদের মানুষ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে মানুষকে তারাই বেশি ভালবাসে।'

আমার বউ বললে, 'তুমি এখন এ-ঘর থেকে যাও।' আমার মা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন এক অন্ধ মানুষ জনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। আমার বউ কেমন করে বুঝবে, যে-মা ছেলেকে ফেলে রেখে সুখের সন্ধানে পালিয়ে যায় সে কত স্বার্থপর! সেইদিন রাতে, আমার মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। আমার বউ তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। বুঝলুম ভালবেসে ফেলেছে। সবাই জীবনে একজন মা চায়। কিছু না। কিছু পাওয়া না গেলেও মা বলে ডাকতে পারার কত আনন্দ! আমি প্রতিজ্ঞাই করেছিলুম সহজে টলব না। অবশেষে মায়ের আগমনের কারণটা জানা গেল। তিন লাখ টাকা চাই। কেন চাই! সেই রাঙামুলো ব্যারিস্টার, তার কেতা যতই হোক প্র্যাকটিস জমেনি। আর সায়েবিয়ানা করতে গিয়ে মদই তাকে খেয়ে ফেলেছে। রেসের ঘোড়া মেরেছে চাঁটি। পাওনাদারে খুবলে খাচ্ছে। সব বাঁধা পড়ে গেছে। একটা ছেলে বিদেশে। মেম বিয়ে করে বসে আছে। কে তার বাবা, কে তার মা।

আমি কোনও কথা না বলে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেলুম। তাই বলো! স্বার্থ ছাড়া তো তোমার জীবনে কিছু নেই। টাকা আমি দোব কেন! তোমার বাপের বাড়ির তো পয়সার অভাব ছিল না। তোমার বাপ তো এক শাহেনশা লোক। হ্যাট-কোট পরে সায়েব তেলিয়ে খান দুয়েক বাড়ি হাঁকিয়েছে। দুর্গাপুজোয় জীবনে নাতিকে একটা জাঙিয়াও উপহার দেয়নি। বারান্দায় পায়চারি করছি আর ভাবছি। তোমার চেয়ে মোক্ষদা অনেক উঁচুতে। সে এই আস্তাবলকে মন্দির করে দিয়ে গেছে। আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এসে আসন পাতে। সংগীত নিয়ে অর্চনা করে। এ বাড়ি আজ সংগীত সরস্বতীর পীঠস্থান। আমি উঠে আসায় মহিলা আর একবার অপমানিত হল। আমার কিছু করার নেই। আমি সহ্য করতে পারছি না।

রাতে আমার বউ আমার বুকে হাত রেখে বললে, 'আমরা নিঃসন্তান। ঈশ্বর আমাদের অনেক দিয়েছেন। তুমি টাকাটা দিয়ে দাও। যতই হোক তোমার মা। আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে আমার মাকে। এখনও কী সুন্দর চেহারা। বাবা যাঁর ছবি আঁকতেন তিনি ভিক্ষে করবেন, তা কি হয়! অতীত অতীত। আমার অতীত যখন ভাবি, বর্তমানটাকে স্বপ্ন মনে হয়।'

এই একটা জায়গায় আমি ভীষণ দুর্বল। আমার বউ। আমার জীবন তো সে-ই তৈরি করেছে। সুস্থ জীবনের স্বাদ সে-ই তো আমাকে দিয়েছে। সেই ব্রিফলেস ব্যারিস্টার তো তিন লাখ টাকা তিন বছরে ফুঁকে দেবে! তা দিক। সে তোমার দেখার দরকার নেই। মা চাইলে ছেলে সক্ষম হলে দিতে হয়। তোমার অত বিচারে দরকার নেই। তুমি মনে করো দেবসেবায় টাকাটা দিচ্ছ। প্রতিদান হল আশীর্বাদ! বেশ তাই হবে।

পরের দিন ভোরবেলা লনে বেড়াচ্ছি। ভেসে আসছে গুণকেলির আলাপ। একটু পরেই তবলা নিয়ে বসব রেওয়াজে। সন্ধেবেলা কনফারেন্স। ক'দিন থেকেই শহর জমজমাট। আমার বউ বারান্দা থেকে ডাকল, 'শিগগির ওপরে এসো।' ওপরে গেলুম। মায়ের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা ভাঙা হল।

বিশাল খাটে মহিলা চিত হয়ে শুয়ে আছে। চশমাটা একপাশে। একটা বই, হাত দুটো বুকের ওপর জোড়া। চোখের কোল বেয়ে কোনও এক সময় জল বেরিয়েছিল। ফরসা গালে জলের দাগ শুকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু গ্যাঁজলা। নিজের ছবি মাথার কাছে রেখে মহিলার চিরবিদায়। যার যেখানে মাটি কেনা থাকে। হঠাৎ মনে হল এই মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে আমিই দায়ী। ওইভাবে মনে আঘাত না করলেই হত। এই ঘরে একা শুতে দেওয়াও ঠিক হয়নি। যে ঘরে স্মৃতি বসে আছে বিচারকের আসনে।

সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক এল না। যে ফোন ধরেছিল সে বললে, তিনি তো শয্যাশায়ী। হাঁটা-চলা করতে পারেন না। আপনারাই পুড়িয়ে দিন। আমার বউ বললে, 'তোমার অসীম পুণ্য। মায়েরও অসীম পুণ্য। ছেলের হাতে জল পাবে।' তিন লাখ টাকায় আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মৃতি পদকের ব্যবস্থা করে দিলুম। তবু আমার অপরাধ-বোধ গেল না। আমার অপরাধী মা আমাকেও অপরাধী করে রেখে গেল। মৃত্যু কি তার হাত-ধরা ছিল!

এইবার একটা গল্প শুনুন প্রভু। আমারই মতো একটা লোক। তার অবস্থা তেমন খারাপ না। মোটামুটি এক জীবনে যা পাবার সবই সে পেয়েছে। তবু তার মনে হয় সে সুখী নয়। সে তখন এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললে, মহারাজ, আমার জীবনে তেমন কোনও বৈষয়িক অভাব নেই; কিন্তু কেবলই মনে হয় আমার কিছু হল না। যেন আরও কিছু হলে ভাল হত। নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। শান্ত করতে পারছি না। আমি একটু সুখ চাই।

সাধু বললেন, তুমি বেরিয়ে পড়ো। বসে থাকলে চলবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটাকে খুঁজে বের করো। যেই পাবে তার কাছ থেকে তার জামাটা চেয়ে নেবে।

লোকটি বেরিয়ে পড়ল। জনে জনে জিজ্ঞেস করে, ভাই তুমি কি সুখী। প্রত্যেকেই বলে, হ্যাঁ আমি সুখী তবে আমার চেয়েও আরও সুখী আছে ভাই।

লোকটি দেশ থেকে দেশান্তরে এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক জঙ্গলে এসে হাজির হল। সকলেই বললে এই জঙ্গলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোকটি বাস করে। সেই কথা শুনে লোকটি জঙ্গলে ঢুকল। ঢোকামাত্রই তার কানে এল হাসির শব্দ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছে সেই হাসি। হাসির উৎসের দিকে লোকটি ছুটল। অবশেষে দেখলে ঝোপের ওপর বসে আছে একটি লোক।

সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্ন করলে, তুমিই কি পৃথিবীর সেই সবচেয়ে সুখী মানুষ, লোকে যার কথা বলে।

অবশ্যই তাই। তুমি ঠিক শুনেছ। আমিই সেই সুখী লোক।

সেই লোকটি বললে, আমার এই নাম। আমার এই সমস্যা। আমাকে এক সন্ন্যাসী বলেছেন, তোমার জামাটা চেয়ে নিয়ে পরতে। তোমার জামাটা দয়া করে আমাকে দাও, যা লাগে তোমাকে আমি দোব, আমার যা আছে, যা আছে, সব নিয়ে তোমার জামাটা আমাকে দাও।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটি এক নজরে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে তাকিয়ে হেসে উঠল। হাসছে তো হাসছেই, হাসছে তো হাসছেই। হাসি সামান্য থামতেই লোকটি মহা বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি তো ভাই আচ্ছা লোক! এইরকম একটা গুরুতর প্রস্তাব শুনে হেসেই চলেছ। হেসেই চলেছ। তুমি কি পাগল?

সুখীতম লোকটি বলল, তা হতে পারে ভাই। হয়তো পাগল! তবে তুমি যদি একটু মাথা ঠান্ডা করে আমার দিকে তাকাতে, তা হলে দেখতে যে আমার গায়ে কোনও জামা নেই। জামা কাকে বলে আমি জানি না রে ভাই।

লোকটি বলল, তা হলে আমি এখন কী করব?

কী করবে? তোমার করার কিছু নেই। তবে যা কখনই পাওয়া যাবে না, তার খোঁজে তো অনেক ঘুরলে, এই পরিশ্রমের একটা পুরস্কার অবশ্যই আছে। যেমন ধরো যে নদী লাফিয়ে পার হওয়া যায় না, প্রচুর মনোবল নিয়ে লাফ মারলে হয়তো পার হওয়া যায় কী বলো।

সুখীতম মানুষটির মুখের একটা পাশ এতক্ষণ ঢাকা পড়েছিল তার পাগড়ির ঝালরে। সে হঠাৎ পাগড়িটা খুলে ফেলল। লোকটি অবাক হয়ে গেল, আরে এ তো সেই সাধু! সেই মহাপুরুষ, যার পরামর্শে সে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোকটি তখন বললে, আশ্চর্য মানুষ আপনি। এই কথাটা তো আপনি সেই প্রথমদিনেই আমাকে বলতে পারতেন। অনর্থক এই এত বছর আমাকে আর ঘুরে বেড়াতে হত না, যা নেই, যা পাওয়া যায় না তার জন্যে।

মহাপুরুষ বললেন, বাবা, তখন বললে তুমি হয়তো মেনে নিতে কিন্তু বিশ্বাস করতে না। তোমার এই অভিজ্ঞতাটার প্রয়োজন ছিল। কিছু জ্ঞান আসে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

লম্বা একটা কাঁচি দিয়ে লনের ঘাস ছাঁটতে ছাঁটতে আমার বউ আমাকে এই গল্পটা বলছিল। আমার বউ আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী ছিল। প্রভু, জীবনের অঙ্কটা একবার দেখুন। আপনার জীবনকাহিনির ছকটা:

বুড়ো কর্তার অনেক পয়সা। বিশাল বাড়ি। সুখের খোঁজে একপাল ছেলেমেয়ে।

সুখ হল না। সুখ খুঁজতে ছুটে গেল ইতর এক মহিলার শরীরে। খ্যাতি আর সম্মানে। সুখ হবে ভেবে সরকারি পুরুষদের ভজনা। নেশায় সুখ ভেবে মদ্যপ। বেতাল। পরিণতি অপঘাতে মৃত্যু।

বড় ছেলে, বীরত্বে সুখ আছে ভেবে ফাঁসিকাঠে।

বড় ছেলের বউ বিলিতি ব্যারিস্টারে যত সুখ আছে ভেবে ভিখারি। মৃত্যু।

মেজ বউ অবৈধ প্রেমে সুখ আছে ভেবে বেশ্যালয়ে।

মেজ ভাইয়ের পিসতুতো বোন পুরুষের কামনার হাড়িকাঠে ছাগি-বলী।

বুড়োকর্তার কামসঙ্গী বিশাল সম্পত্তির মালিক। চলে গেল ট্রামের চাকার তলায়।

ওস্তাদ ভাবলে অভিমানে সুখ। দগ্ধে দগ্ধে মৃত্যু। নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

তা হলে দেখুন ঈশ্বর, মৃত্যু ছাড়া আপনার গল্পে আর কিছু নেই। মানুষ এল, মানুষ ভুগল, মানুষ মরল। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় মান, কোথায় সম্মান, যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি। পুরো ব্যাপারটা একটা গোল গোল্লা। আপনি হলেন স্বপ্নের কারবারি। মানুষ হল ন্যাকড়ার পুতুল।

সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই লনে একটা কাঠের আসনে বসে আমি তাকিয়ে থাকি আমার বউয়ের দিকে। দেহ দেখে এগিয়ে মন নিয়ে ফেলা। সে কুচুর কুচুর ঘাস ছাঁটে হাসি হাসি মুখে। আর আমি আড়ষ্ট হয়ে ভাবি, কে যাবে আগে? আমি না, আমার তুমি!

॥ ৮ ॥

এর পরের জন্মটা প্রভু অতি সুন্দর। একেবারে অবসরভোগী সরকারি কর্মচারীর মতো। জন্মালুম এক কাগজব্যাবসায়ীর ঘরে। তাদের পয়সাকড়ির তেমন অভাব ছিল না। একটা বেশ চকমেলানো বাড়ি ছিল। একটা ভ্যাঁক ভ্যাঁক গাড়ি ছিল। পরিবারে বেশ লপেটা ধরনের কয়েকটি ছেলে ছিল। সারাদিনই গ্যাজোর-ম্যাজোর। বেশ লাল লাল মেঝে ছিল। ছাদে পায়রা ছিল। বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। খুব খাওয়াদাওয়ার ধুম ছিল। মেয়েরা সারাদিনই রান্নাঘরে থাকত। সবাই খাওয়াদাওয়ার পর ভুড়ুক ঢেকুর তুলত। পান চিবোত চ্যাকর চ্যাকর।

আমি জন্মালুম। এক মাস, দু' মাস, তিন মাস, বড়ই হচ্ছি, বড়ই হচ্ছি, বড়ই হচ্ছি। বেশ গোদা মতো শরীর। কথা ফোটার সময় এল, চলে গেল। কোনও কথাই বেরোল না। শুধু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। হামা টানার সময় এল চলে গেল, আমি হয় বসে না হয় শুয়েই কাটিয়ে দিলুম। যে বয়েসে শিশুরা টলে টলে হাঁটতে শেখে সে বয়সও চলে গেল। তখন সকলের নটক নড়ল। এ কে রে! এইভাবেই সারাটা জীবন কাটাবার তালে আছে নাকি! মায়ের ভীষণ দুঃখ। বড় ছেলেটা এইরকম সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকবে নাকি? শায়িত বুদ্ধের মতো? সেই বাড়িতে আধশোওয়া এক বুদ্ধমূর্তি ছিল পাথরের। কে যেন এনেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে। প্রথমে এল অ্যালোপ্যাথ। সুবিধে হল না। আমি যেমন শুয়ে ছিলুম তেমনি শুয়ে রইলুম, আর ডানহাতের বুড়ো আঙুল চুষতে লাগলুম চাগলাম চাগলাম করে। রাতে মা আমাকে কোলের কাছে শুইয়ে কতভাবে অনুরোধ করত, ও বাবা ও মানিক, একটু কথা বলো বাবা। কিছু না পারো, শুধু মা বলো, শুধু বাবা। একটু হাঁটতে শেখো বাবা। সারাদিন শুয়ে শুয়ে থাকলে চলবে বাবা? তুমি তো মহাদেব নও বাবা। উঠে, হেঁটে করে কর্মে খেতে হবে তো বাবা। মা যখন এইভাবে আমারে রিকোয়েস্ট করত, তখন বাবা আর এক পাশে শুয়ে শুয়ে বলত, ছি ছি, এ তুমি কী করলে। মা যেন একটা অপকর্ম করে ফেলেছে।

বারবার একই কথা শুনতে শুনতে, মা একসময় রেগে গিয়ে বলত, আমি করেছি না, তুমি করেছ। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, হেকিমি, টোটকা, তারকেশ্বরে হত্যা সবই হয়ে গেল। কিছুই কিছু হল না। আমি শুয়ে শুয়েই বড় হতে লাগলুম। শুয়ে শুয়েও বড় হওয়া যায় প্রভু। সব সময় ওপর দিকেই যে মাথা ঠেলতে হবে এমন কোনও কথা নেই। জমি ধরেও বাড়া যায়। ছোট খাট ছাপিয়ে বড় খাটে প্রোমোশান পেলুম। ততদিনে সকলেই বুঝে গেছে এ হল লতানে মানুষ। শুয়ে শুয়ে বড় হওয়ার ফলে চেহারাটা হয়ে দাঁড়াল দৈত্যের মতো। যেমন কুম্ভকর্ণ। গোঁফ বেরোল, দাড়ি গজাল। খোকাবাবুর বদলে সবাই বলতে লাগল বড়বাবু। সকলেই বললে, এ যদি দাঁড়াতে পারত, তা হলে ঠিক ময়দানের স্ট্যাচুর মতো দেখাত।

সেই বাড়ির রাস্তার ধারে একতলায় একটা ছোট ঘর ছিল। রাস্তার দিকে লম্বাটে একটা জানলা ছিল। লম্বা লম্বা গরাদ। সকালবেলা মুখটুখ ধুইয়ে, পেট পুরে খাইয়ে, সেই ঘরের জানলার ধারে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হত। দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুটঘুটে একটা গরিলার মতো বসে থাকতুম। আদুড় গা, নিম্নাঙ্গে খাটো একটা ধুতি। তখন আমি আপনার কৃপায় একটাই মাত্র কথা বলতে শিখেছি, কোতা দাত্তিস।

রাস্তা দিয়ে যেই যায় তাকেই জিজ্ঞেস করি কোতা দাত্তিস?

ঈশ্বর, আমি ঠিক মানুষ ছিলুম না, আমি ছিলুম মূর্তিমান জীবনদর্শন। সকলেই যাচ্ছে। কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। বাজারে, স্কুলে, অফিসে। কিন্তু আসলে যাচ্ছে কোথায়? সেই প্রশ্নই করতুম। বাজার যাচ্ছ, যাও। কাছারিতে যাচ্ছ, যাও। শেষমেষ কোথায় যাবে? ধরো বিশাল বড় একটা জাহাজ। সেই জাহাজে অনেক লোক। কেউ এদিকে যায়, কেউ ওদিকে যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে, কেবিনে যাচ্ছি, কি ডেকে যাচ্ছি। উত্তরটা ঠিক হল না। জাহাজটা যাচ্ছে কোথায়? লিভারপুল। যে যেখানেই যাও, আসলে যাচ্ছ লিভারপুল।

সারা দিন জনে জনে এক প্রশ্ন— কোতা দাত্তিস।

কেউ তাকায়, কেউ তাকায় না। কেউ গাল দেয়। একসময় আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম। আমার মায়ের ধারণা হয়েছিল, আমি এক মহাপুরুষ। এক গুপ্ত যোগী। স্বরূপ লুকিয়ে এসেছি। মাঝে মাঝে আমাকে হাত জোড় করে বলত: আর কত ছলনা করবে প্রভু? তুমি যে আমার বরাহ অবতার। কৃপা করো প্রভু! মুখ তুলে চাও। ব্যাবসার অবস্থা খুব ভাল নয় প্রভু।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতুম— কোতা দাত্তিস!

আমার ওই এক কথা। ওই এক বাণী— কোথায় যাচ্ছ একবার ভাবো, মূঢ় মানব। আপনি গিরিশ

ঘোষ নামক এক নট, পরম রামকৃষ্ণ ভক্তকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখে এসেছিলেন গান। কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

ভাবো, ভাবো। কোথায় যাচ্ছ। কোতা দাত্তিস?

প্রভু এইবার মজাটা শুনুন। বাবার তখন ব্যাবসা প্রায় লাটে ওঠার অবস্থা। মা একদিন কাতর কণ্ঠে আমাকে বলছে, প্রভু! তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি। রূপ গোপন করলেই কি মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়! করুণাময় মুখ তুলে চাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, কোতা দাত্তিস?

মায়ের এই প্রার্থনা শুনেছিল ঝি। সে সাতবাড়িতে কাজ করে। প্রথমে কথাটা সাতবাড়িতে ছড়াল। অবতারের আবির্ভাব। ধর্মের যা গ্লানি হয়েছে, অবতার আসার সময়ও হয়েছে বটে। আমাদের ঝি বেশ রং চড়িয়ে বলেছে— মা যখন আমার সামনে এইরকম বলছে তখন হঠাৎ আমি হাঁ করলুম। সেই বিশ্বরূপ দর্শন হল। অবতার মা, অবতার। চেহারা তো দেখোনি। দেখলে কেঁপে জ্বর আসে।

খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল পাড়ায়। বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করল। কোতা দাত্তিস বললে হঠাৎ কেউ আর ভেংচি কাটে না। একজন আর একনজকে বোঝায়, বোঝার চেষ্টা করো। বোঝার চেষ্টা করো। জীবনের সার কথা— যাচ্ছ কোথায়? কোথা থেকে এলে, যাবে কোথায়? এ তোমার দত্তবাড়ি থেকে চৌধুরিবাড়ি যাওয়া নয়। পৃথিবীতে ঢুকলে কেন? আর বেরিয়ে যাবে কোথায়? আর একজন ব্যাপারটাকে আর একটু ফলাও করলে— এ তোমার মুখ দিয়ে খাবার ঢুকে মল হয়ে তোমার পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়। এ একেবারে আঁতে ঘা মারা প্রশ্ন। সে অমনি আমাকে জোড় হাত দেখিয়ে ভক্তিভরে ডেকে উঠল— প্রভু।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভদ্দরলোকের এক কথা— কোতা দাত্তিস?

তুমিই বলো না প্রভু, কোতা দাত্তি।

দেখতে দেখতে একটা শোরগোল পড়ে গেল চারপাশে। এক মহামানব এসেছে। জানলার ধারে বসে আছে উদোম। এই এতখানি তার শরীর, মুখটা শিশুর মতো। লিঙ্গটি কচি বালকের মতো। ইচ্ছে করলেই দাঁড়াতে পারে। দাঁড়ালে, মাথাটা ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকবে। লোকে চমকে যাবে। তাই বাবা নিজেকে সংবরণ করে রেখেছে। বালকভাবে ঘরে হামা টানে। এখনও মায়ের স্তনাপান করে। দেয়ালা করে। বাজারে বিরাট মাপের দোলনা নেই। থাকলে শুয়ে শুয়ে বুড়ো আঙুল চুষত।

অবশেষে আমার চৌকি হল। ফরাস হল। তাকিয়া হল। সেবক-সেবিকা হল। ঘরে ধূপ-ধুনো পড়ল। সারাদিন আমি তাকিয়ায় শরীর এলিয়ে পড়ে থাকি, আর প্রশ্ন করি কোতা দাত্তিস? সকলে বিমূঢ়ের মতো বসে থাকে। ভীষণ ভাবনা কোথায় কে যাচ্ছে? কেউ কেউ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে। গড়গড় স্বীকারোক্তি— আর যাব না বাবা। এই তোমার পায়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করছি। কেউ বেশ্যালয়ে গিয়েছিল, কেউ শ্যালিকাকে নিয়ে পুরী গিয়েছিল। কেউ শুঁড়িখানায় গিয়েছিল। হাহাকার পড়ে গেল চতুর্দিকে। অফিসের কাজে দাদা সাতদিনের জন্যে বাইরে ছিল। ঠাকুরপো বউদির ঘরে ঢুকেছিল।

এক কবি ভক্ত লিখে ফেললে আমার বন্দনাগীত। মৈনাক সম বিশাল বপু, শিশুর মতো মুখ। দুধের দাঁতে আদো হাসি তার এলিয়ে পড়েছে তনু। তুমিই চন্দ্র, তুমিই সূর্য, তুমিই বিশ্বতারিণী। কৃপা করো দেব তোমার চরণে স্থান চায় এই মূর্খ। জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় হে।

ওইভাবে বসে থাকতে থাকতে আমার মাথায় ভিটকেমি করার বুদ্ধি চাগাত। হঠাৎ সামনের দিকে পা ছুড়ে পেছনে চিতিয়ে পড়তুম, আর আমার গোদা পায়ের লাথি খেয়ে সামনের তিন-চার জন উলটে পড়ে যেত। সবাই অমনি চিৎকার করে উঠত— কৃপা কৃপা। ওই লাথিতে অনেকের নাকি

দুরারোগ্য অসুখ ভাল হয়ে যেত। আমি যে কখন অমন করব তার তো কোনও ঠিক ছিল না। প্রভু, ল্যাথি ছোড়ো, বললেই যে আমি ছুড়ব, তেমন তো নয়। সবাই তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত। সামনের দিকে বসার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যেত। ভোর থেকেই বাড়ির সামনে লাইন। প্রচার হয়ে গেল, বাবার লাথি। আমি আবার বসে থাকতে থাকতে আর এক কাণ্ড করতুম, তেমন পছন্দসই কোনও মেয়েকে হাতের নাগালের মধ্যে পেলে খপ করে তার চুল খামচে ধরে কিশকিশ করে টানতে শুরু করতুম। সে অমনি উলটে পড়ে যেত আমার জগৎ জোড়া কোলে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত ভজন, ভবসাগর তারণ কারণ হে।

আমি তাকে খানিক ধামসে ছেড়ে দিতুম। এটা ছিল বাবার পরমকৃপা। এতে নাকি অগতির গতি হয়, দুর্গতির দূর হয় দুর্গতি। বিয়ে হল ভাল ঘরে, সন্তান লাভ হয়, স্বামীর উন্নতি হয়, পরপুরুষ ভেড়া হয়।

বিকেলে বসত আলোচনার আসর। নানা পণ্ডিতজন এসে ব্যাখ্যা করতেন— কোতা দাত্তিস? দুটি মাত্র অস্ফুট বাক্য। ওইতেই দোল খাচ্ছে মহাসিন্ধু-ভাব-তরঙ্গ। কো অর্থ কোদণ্ড, তা হল তাগ। দা হল দাতা, ত এত এ মানে সৃষ্টি, ঈশ মানে ঈশ্বর। জীব, তোমার ধনুক তাক করো সেই স্রষ্টার দিকে, ছোড়ো ইচ্ছার বাণ। সৃষ্টি আর স্রষ্টার মধ্যে তির ছোড়াছুড়ি, এই তো হল জীবলীলা।

সবাই অমনি বাহ বাহ করে উঠল। অনেকে চোখ মুছল। কেউ কেউ আমার পা খামচে দিলে। ব্যাখ্যাকার বললেন, ভাগবতে আছে, বালক গুরু আর বৃদ্ধ শিষ্য। বৃক্ষতলে বালক গুরুকে ঘিরে আছে বৃদ্ধ শিষ্যেরা। এই তো সেই লীলা। বিশাল বালক আমাদের সামনে, পরমপুরুষ ওই, আমরা তাঁর পদতলে সমবেত। ভাগবত আবার ফিরে এসেছেন। জয় বাবার জয়। জয় বালযোগীর জয়।

কোতা দাত্তিস— এই নামে টীকা টিপ্পনী সংবলিত এক বই প্রকাশিত হল। মহাপুরুষের মায়ের খাতির বেড়ে গেল। মহাপুরুষের জনক আর জননীকে বলে না, এ কী করলে! বরং বলে, তোমার পেটে পেটে এত ছিল, হ্যাঁগো। ব্যাবসা লাটে গেল। অঢেল জিনিসে ঘরদোর উপচে পড়ল। ফল আর সন্দেশ খেতে খেতে সব অরুচি ধরে গেল। বলতে লাগল, আর পারা যায় না বাপু! চোদ্দোখানা বেনারসি নিয়ে মায়ের তখন হিমসিম অবস্থা। সকলের গায়ে তখন মাছি পিছলে যাচ্ছে। দিগ্বিদিক থেকে লোক আসছে কাতারে কাতারে। কী না, বাবার লাথি। বড় বড় লোক। এম এল এ, মন্ত্রী, ধনকুবের ব্যাবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবী। যে যত বড়, লাথি খাবার আকাঙ্ক্ষা তারই সবচেয়ে বেশি। এক লাথিতে এম এল এ, মন্ত্রী হতে চান। মন্ত্রী চান মুখ্যমন্ত্রী হতে। মুখ্যমন্ত্রী চান প্রধানমন্ত্রী। কোটিপতি হয়ে চায় অর্বুদপতি। ডাক্তার চায় বিশাল বড় নার্সিংহোম। আইনজীবী হতে চায় প্রধান বিচারপতি। সবাই হতে চায়, পেতে চায়। আরও, আরও, আরও। তাকিয়ায় হেলে পড়ে আমি মনের আনন্দে বুড়ো আঙুল চুষি। সকলের আকুল প্রার্থনা, বাবা মারো লাথি। বাবা ক্যাঁত করে একবার লাথি মেরে করুণা করো।

হঠাৎ আমার শরীর খারাপ হল। আমার মাথা লটকে পড়ল ঘাড়ে। আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমার অত বড় নিটোল শরীর চুপসে গেল। শুকনো আমের মতো। আমার যে জনক প্রথম প্রথম বলত, এ কী করলে! এ তো মরলেই বাঁচা যায়। সে-ই দেখি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডাক্তারের পর ডাক্তার। এক আসে আর এক যায়। হাহাকার পড়ে গেল। মরে গেলে সর্বনাশ হয়ে [illegible], [illegible] জোগ, সব বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা তুমি বাঁচো। বাঁচো বাবা [illegible] বললেন, আশা খুবই কম। ভাইরাসে ধরেছে। [illegible]গান। [illegible] না। [illegible] না। মারো লাথি, লাথি মারো, লাথি তোমার [illegible]।

[illegible] গেল। [illegible] হজম। মাথার [illegible]। [illegible] কত সেবাই না করেছে [illegible] প্রশ্ন করেছিলুম— মা, [illegible]

কোতা দাত্তি? সেই আমার প্রথম মা ডাক। সেই আমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন— কোথায় আমি যাচ্ছি। মায়ের চোখে আমার চোখ। দুটো চোখ যেন দুটো প্রস্রবণ। জল নামছে হু হু করে। আর দেখা হল না। আমার চোখ দুটো মরে গেল।

॥ এই শেষ ॥

সেই অন্ধকার অন্ধকার বাগান বাগান জায়গাটাকে পেছনে ফেলে, কালো পিচের রাস্তা ধরে ট্যাক্সি চিড়চিড় শব্দ তুলে ছুটতে লাগল। ড্রাইভার একটু আড় হয়ে বসেছে। চালাতে চালাতেই সে বললে, একস্ট্রা লাগবে। ছেলেটি বললে, হবে হবে, আপনি চলুন না। প্রভু ওই শহরের চালকরা গাড়িতে এইরকম জুটি তুললেই দুটি কাণ্ড করে, চাপ দিয়ে বাড়তি কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে, আর একটু কোনা মেরে বসে, যাতে সামনে আর পেছনে দু'দিকেই চোখ রাখা যায়। পেছনে সাধারণত একটু সিনেমা মতো হয়।

হচ্ছিলও তাই। প্রেমিক প্রেমিকাকে কোলের দিকে টেনে নিল। যেন বড়ই স্থানাভাব। একটু চঞ্চুতে চঞ্চুতে চকাচকি হতে লাগল। হাতের দুরূহ অভিযান ইত্যাদি নানা কলাকৌশলও চলতে লাগল। প্রেমিক বলতে লাগল, তোমার মুখটা ঝালঝাল, টকটক। ফুচকার অনুপান লেগে আছে। প্রেমিক ভাবাবেগে বলতে লাগল, আমরা আজ পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত চলে যাব এইভাবে। প্রেমিকা কুঁকড়োর মতো কুঁক করে একটা শব্দ করলে। প্রেমিকের হাত বড় বাড়াবাড়ি করছে। মানুষের সমস্ত প্রত্যঙ্গই বড় ক্ষুধাতুর। প্রেমিক বললে, এই শহরে যদি একটা যমুনা থাকত! বললে, যদি থাকত একটা কুঞ্জবন? বললে, আমরা যদি মৃগ আর মৃগী হতুম, চখা আর চখী!

অনেক, অনেক দূর যাবার পর একটা রাস্তার মুখে নেমে পড়ল আমার মা। ভিড় কাটিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল। সিক করে কোথা থেকে কে একটা সিটি মারলে। আমার মা। নিজের মনেই বললে— জানোয়ার। পৃথিবীতে একটা বয়েস পর্যন্ত মানুষের ছেলেদের বড় কষ্ট। মেয়েদের চোখে চোখে রাখতে হয়, পেছন পেথন ল্যাং ল্যাং করে ঘুরতে হয়। সাজতে হয় গুজতে হয়। ঘনঘন সিগারেট খেতে হয়। ঝিনুকের মতো চোখ করে আড়ে আড়ে তাকাতে হয়। তেলেভাজার কড়ায় পেঁয়াজি যেরকম চুলবুল করে, সেইরকম একটা চুলবুলুনি অস্থির অস্থির করে রাখে। একটা অসুখ। যার কোনও ওষুধ নেই। সবাই একটা মেয়ে চায়। ওই যে আপনার বদমাইশি। না ছেলে, না মেয়ে কেউ তো সম্পূর্ণ নয়। এর আধখানা, ওরও আধখানা। একটা প্লাস, একটা মাইনাস। জলে ভাসমান কর্পূরের দানার মতো। ছটফট। ছটফট। জোড়া লাগল তো শান্তি।

আমার মা নতুন একটা বাড়ির লোহার গেট খুলে ঢুকে পড়ল। চলার গতি মন্থর। যেমন কবিরা বলেন ভীতা সচকিতা হরিণীর মতো। সে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। দরজা বন্ধ। ইতস্তত করে কলিংবেল টিপল। একটি মেয়ে দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল— ও মা দিদি এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষ থেকে এল তীব্র ঝংকার, যে চুলোয় ছিল, সেই চুলোয় ফিরে যেতে বল।

হঠাৎ আমার মায়ের যেন সাহস ফিরে এল। চটিটা একপাশে খুলে তড়বড় করে এগিয়ে গেল দোতলার সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ আদেশ হল— 'দাঁড়াও।' আমার মা দাঁড়িয়ে পড়ল; কিন্তু ফিরে তাকালে না। একতলার ডানপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মধ্যবয়সি এক মহিলা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। চোখে চশমা। হাতে একটা কলম।

'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?'

'যমের বাড়ি।'

সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে মত্ত মাতঙ্গ, মহিলা সেইভাবে ছুটে এসে আমার মায়ের অত সুন্দর

পিঠে গুম গুম করে কিল মারতে লাগল। আর বলতে লাগল— 'আজ তোকে আমি যমের বাড়িই পাঠাব। তাতে আমাকে জেলে যেতে হয় যাব।'

আচমকা পিঠে জোরে কিল পড়ায় আমার মায়ের দম বন্ধ হয়ে গেল। সে আঁক করে একটা শব্দ করে মাটিয়ে শুয়ে পড়ল। আমার মায়ের বোন, 'দিদি রে' বলে চিৎকার করে উঠল। সরষের মতো আমিটা ভয়ে মরি— এই রে ভবলীলা বুঝি সাঙ্গ হল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এল এক ভদ্রলোক। এসেই মায়ের নিপীড়নকারীকে মারল এক ধাক্কা। মহিলা ছিটকে পড়ে গেল দরজার কপাটে। সাংঘাতিক শব্দ। আমার মায়ের বোন অমনি চিৎকার করে উঠল 'মা গো!'

আমার মা তখন শ্বাস খুঁজে পেয়েছে। আমার মায়ের মা নিঃশব্দে উঠে, ঘরে গিয়ে দরজাটা ধীরে বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। ছিটকিনি তোলার শব্দ হল। পরক্ষণেই একটা ফোঁপানির শব্দ। ভদ্রলোক এইবার চিৎকার করে বললে, 'কত বার বলেছি, মেয়ে বড় হয়েছে। খবরদার গায়ে হাত তুলবে না। গায়ে হাত তোলা কী? এটা কি ছোটলোকের বাড়ি? হঠাৎ আত্মহত্যা করলে তখন কী হবে? তখন তো কেঁউ কেঁউ করে কাঁদবে। আর আমার কোমরে দড়ি পড়বে। প্রতিদিন, প্রতিদিন এই এক ব্যাপার! এই পাড়ায় আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। আকাট মূর্খটা তা বুঝবে?'

ছোট মেয়ে দরজায় টোকা মারছে আর ডাকছে 'ও মা, দোর খোলো। কোথায় তোমার লাগল দেখি।'

কোনও উত্তর নেই। ভদ্রলোক ছোট মেয়েকে ইশারায় কাছে ডেকে চাপা গলায় বললে, 'নজরে রাখিস বলা যায় না। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লেই হল। আমাকে জব্দ করার জন্যে। বধূ হত্যায় দায়ে দশ বছর।'

ভদ্রলোক আমার মায়ের কাঁধে হাত রেখে বললে, 'আমাকে না মারতে পারলে হচ্ছে না, না? বড় অসুবিধে হচ্ছে? উদয়াস্ত খেটে, তোদেরই জন্যে একটা বাড়ি করলুম। যতটা সম্ভব সুখে রাখা যায় সেই চেষ্টা করলুম। সহ্য হচ্ছে না। ভাল লাগছে না। পথে তোমাদের নামতেই হবে। আমরা একটা ভাল ছেলে, ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলে কী এমন অসুবিধে হয়? তাতে জীবনটা সুখের হতে পারে, এই অসুবিধে। তাই না! প্রেম, প্রেম, প্রেম, প্রেমের নিকুচি করেছে। একটু সবুর কর না মা। দেখেছিস তো প্রেমের পরিণতি পাশের বাড়িতে। নাচতে নাচতে গেল, এক বছরের মাথায় ফিরে এল, কোলে একটা নিয়ে। হয়ে গেল। প্রেম যমুনার ঢেউ উঠল আর পড়ল। সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে নিত্য এই অশান্তি, আমার আর ভাল লাগে না। হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়, না হয় আমাকে চলে যেতে হয়।'

আমার মা ওপরের ঘরে গিয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল। বোকা মেয়ে জানে না, এদিকে তার যা সর্বনাশ হবার হয়ে বসে আছে। বাড়ি থমথমে। ছোট মেয়ে ডাকতে এল, 'দিদি খাবি চল।'

'খাব না যা।'

ছোট মেয়ে বললে, 'বাবা খাবে চলো।'

'খাব না যা।'

দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে বার পনেরো বললে, 'মা ওঠো, খাবে এসো।'

সাড়া শব্দ নেই। ছোট মেয়ে তখন বললে, 'আমার কী? আমিও সব জল ঢেলে রেখে দিই। এই এক হয়েছে বাবা। এ-বেলা খাওয়া হবে তো, ও-বেলা হবে না, ও-বেলা হবে তো এ-বেলা হবে না। সব ইয়ারকি পেয়ে গেছে।' অনেক পরে কর্তা নেমে এল নীচে। কর্তার মনে একটাই ভয় ছিল, কেউ না আত্মহত্যা করে বসে! বন্ধ দরজায় মৃদু চড়চাপড় মারতে মারতে বলতে লাগল, 'তুমি কি আজ একা এই ঘরেই শোবে? তোমার তো আবার ভূতের ভয় আছে! বেরিয়ে এসো।'

নিস্তব্ধ ঘর থেকে উত্তর এল, 'তোমার চেয়ে ভূত ভাল।'

কর্তা অমনি, ওঃ বলে ঘরের বাইরের চেয়ারে বসে পড়ল। ছোট মেয়ে বললে, 'যাও তুমি শুয়ে

পড়ো তোমাকে তো ভোরবেলা উঠতে হয়।' কর্তা কপাল টিপে বসে রইল। মা আর বড় মেয়ে দু'জনেই হুমকি দিয়ে রেখেছে, ঝুলে পড়বে। মা বলেছে, আমার অমতে মেয়ে কিছু করলে আমার মৃতদেহ। মেয়ে বলেছে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে এলেই আমার ডেডবডি। দু'জনের সম্মানের লড়াই, মাঝখানে অসহায় বাপ ছোট মেয়েটা দর্শক। সারারাত কর্তা একবার করে ওপরে যায়, একবার করে নেমে আসে নীচে। একবার মেয়ের ঘরের দরজায় কান পাতে, একবার বউয়ের ঘরে।

প্রভু, আমি যেন ঝুলির মোহর। একটি মাত্র মোহর। প্রথম এক মাস কেউ টেরই পেল না। আমি পড়ে আছি একপাশে। প্রথমে সন্দেহ হল আমার মায়েরই। আমার মা তো তখন ওই বাড়িতে প্রায় একঘরে। কারও সঙ্গেই তেমন বাক্যালাপ নেই। নিজের ঘরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে গান গায়, বই পড়ে, গান শোনে, আর চিঠি লেখে। আমার মা মনে হয় তার বাবাকে খুব ভালবাসত। বাবাও মেয়েকে। তবে মায়ের শরীরে যে পরিবর্তনটা আমি ভেতর থেকে ঘটিয়েছি, তার আলোচনা বাবার সঙ্গে করা যায় না।

আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার দেখা হল। নির্জন পার্ক। গাছতলা। আমার বাবা মাকে পেয়ে অতিশয় ছটফট করছিল, কিন্তু মায়ের মনে ভীষণ ভয়, 'শোনো, ওসব পরে হবে। আমার মনে হচ্ছে বেঁধে গেছে।'

'হ্যাঃ, বেঁধে গেছে! বেঁধে গেলেই হল। এ যেন মগের মুল্লুক। দেশে কোনও আইনকানুন নেই?'

'আরে, আমার বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ঘোড়ার ডিম হয়েছে। ও অমন হয়। আর যদি হয়েই থাকে ভয়ের কী আছে! আমার জায়গা জানা আছে। যাব, পনেরো মিনিট লাগবে। লাইন আবার চালু। আজকাল সায়েন্সের যুগ। কত সুবিধে! কৌটো ঝেড়ে ফেলার মতোই সহজ সরল।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?'

'কেন করব না? তবে এখনই না। আমার একটু অসুবিধে আছে বুনু।' প্রেমিকের প্রেম বাড়লে প্রেমিকাকে নানারকম আদুরে নামে ডাকে। বুনু, গুনু, শুনু।

'কী অসুবিধে?'

'প্রথমে একটা ভাল চাকরি চাই। তোমাকে বিয়ে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললে, হুমদো ও হুমদি দুটোতে মিলেই তোমাকে টরচার করবে। আমার মাকে তুমি চেনো না। আমার বউদির লাইফটা একেবারে হেল করে দিয়েছে। বাবাটা মেনিমুখো। আমার ধাপটা শোনো— চাকরি, ফ্ল্যাট, তারপর তুমি তারপর আমার টুঙ্কুসোনা।'

আমার বাবা ঘোঁতর ঘোঁতর করে মাকে সাপটে ধরার তালে ছিল। আমি বললুম ভেতর থেকে— 'মা সাবধান! সুবিধের মনে হচ্ছে না।' মা এক ধাক্কায় বাবাকে সরিয়ে দিল।— 'দাঁড়াও তোমার মতলবটা কী!'

'যাঃ, এইসব শব্দ ব্যবহার করছ কেন? মতলব। মতলব আবার কী. প্রেম আর বিয়ে দুটো আলাদা ব্যাপার। বিয়ে হলে প্রেমের সমাধি। প্রেমের ফাউ হল ছেলেমেয়ে ট্যাঁভ্যাঁ। আমরা আসলে কারবারি, ফাউ সব ফেলে দেব। আপাতত। তুমি আমার সঙ্গে চলো। পনেরো মিনিটে সুয়েজ ক্যানেল খুলে দেব। সে ব্যবস্থা আছে। এর আগে আমি তিনটে কেস করিয়েছি।' আমার মা যে কারওকে এত জোড়ে চড় মারতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমার মা হনহন করে হাঁটছে। মায়ের পেটব্যাগে ছোট্ট আমি, তিড়িক তিড়িক করছি। এতটুকু একটা মানুষ। মায়ের উত্তেজনা আমি ধরতে পারছি। মায়ের ভয় আমাকে স্পর্শ করছে।

আমার মা সোজা গিয়ে তার মায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল। মহিলা অবাক। শুয়ে ছিল খাটে। আমার মা তার মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দু'হাতে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারল— 'মা।'

মহিলা দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললে— 'কী হয়েছে মা? কতদিন পরে আমার বুকে এলি?'

'তুমি আমাকে বাঁচাতে হয় বাঁচাও। মারতে হয় মারো।'

মহিলা উঠে বসলেন। বুঝতে পারলেন সব। স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'ওইজন্যেই সাবধান করেছিলুম। সেইজন্যই এত অশান্তি। আমার মেয়েকে ব্যবহার করে গেল একটা লোফার! তুই কি জেন্টস টয়লেট?'

পনেরোটা দিন আমার ভীষণ ভয়ে কাটল। শুনতে পাচ্ছি বাইরের আদালতে আমার ভাগ্য নিয়ে খেলা চলেছে। আমি মায়ের মূল নাড়ি ধরে ডুবুরির মতো তলিয়ে আছি গর্ভসলিলে। শেষে রায় বেরোল রাত দুটোর সময়। জুরিরা একমত। অবাঞ্ছিতের প্রাণদণ্ড।

শহরের পয়ঃপ্রণালী বেয়ে ছোট্ট এতটুকু একটা জিনিস তার তিন দিনের যাত্রাপথ পেরিয়ে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায়। সেখানে রুপালি একটা ইলিশ কপ করে আমাকে গিলে জড়িয়ে গেল জেলের জালে। জাল থেকে হাইকোর্টের ধারে। আশি টাকা কেজি। খাস গঙ্গার ইলিশ। এক উকিলের হাত ধরে তার গৃহিণীর হাতে। উল্লাস, ইলিশ এসেছে, ইলিশ গঙ্গার ইলিশ।

॥ শেষ কথা ॥

সেই প্রায় দু'মাসের জীবন শেষ করে আবার আপনার দরবারে হাজির। প্রভু শেক্সপিয়ারকে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীতে। তিনি মানুষকে বলে এসেছিলেন— আপনি একটা ইডিয়েট। তবুও আপনার চেতনা হয় না। না না, সেলফ ডিফেন্সে কোনও কথা বলবেন না। ও বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ভাগবতে আপনার হয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তাতে মানুষের দুঃখ ঘোচেনি। মেয়ের বিয়ে দেবার আগে, মানুষ ঘর দেখে। আর আপনি জন্ম দেবার আগে চোখ কান বুজিয়ে যেখানে সেখানে বীজ ফেলবেন? আপনার মডেল ডিফেক্টিভ, পুরো প্ল্যান ডিফেক্টিভ। স্বার্থপর আপনি। নিজের সৃষ্টির স্বার্থে কাম দিয়েছেন মানুষকে। জানি, সেই রিপুটিকে আপনি খুলে নেবেন না; কিন্তু মানুষকে এই নিশ্চয়তাটা তো আপনি দিতে পারেন যে পিকদানিতে পিক ফেললেই একটা মানুষ নরকে মাথা তুলবে না।

ঈশ্বর পাশ ফিরলেন— তা হলে তুমি আর যেতে চাইছ না?

বুকটা কেমন করে উঠল। সত্যিই কি যেতে চাইছি না। ওই নদ নদী, বনানী, জনপদ, দুঃখ সুখ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, ভোগ দুর্ভোগ মা বাবা ভাই বোন বন্ধুবান্ধব, সাধু সজ্জন, ত্যাগী ভোগী, তস্কর লম্পট।

উত্তর দাও।

মাথা নিচু করে বললুম চাই প্রভু। বারবার আসার আগে তাই তো বলি আবার আসিব ফিরে ধরণীর ধূলিতলে।

টক মিষ্টি ঝাল নুন এই আমার মশলা। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাঁচা এই আমার রসায়ন। জীবন হল ঘোড়ায় চড়া। তুমি এর পরিবর্তন চাও?

না প্রভু। যা আছে তাই থাক। তা না হলে আপনাকে ভুলে যাব।

একে একে

সন্ধে হয়ে আসছে। সব পাখি ফিরে এসেছে গাছে। এই সময়ে তারা খুব কচরমচর করে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সারাদিন কে কী করেছে, সব বলাবলি করে। কে কত দূর উড়ে গেছে। নতুন কী জায়গা দেখেছে। কোন গাছে কী ফুল ধরেছে। কী ফল ধরেছে কোন গাছে। কত কথা! একটু তর্কাতর্কিও হয়। কেউ আবার দল ছেড়ে এক পাশে সরে এসে একঝলক গান গেয়ে নেয়। দিনের শেষ গান। পশ্চিমের গোলাপি আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন শেষের প্রার্থনা। পশ্চিমে গঙ্গা। বিশাল বিশাল গাছের ফাঁক দিয়ে জল দেখা যাচ্ছে চিকচিকে। সূর্য অস্ত যাবার সময় এই জলেই গলে যায় সোনা হয়ে। বেলুড় মঠের বিশাল চূড়া ক্রমেই কালো হয়ে আসছে, আরও কালো। তারও দূরে একটা কারখানার লম্বা কালো চিমনি আকাশের গায়ে ধূসর ধোঁয়া ছেড়ে লিখছে— রাত এসে গেল, রাত। দূরে কোনও এক বাড়িতে বেজে উঠল সন্ধ্যার প্রথম শাঁখ। গাছের ডালে প্রায় সব পাখিই নীরব হয়ে গেছে, কেবল একটা পাখিই ফড়ফড় করছে। মনের মতো জায়গা পায়নি ঘুমোবার।

বিলু পশ্চিমের জানলার খাঁজ থেকে নেমে এল। সব তার দেখা হয়ে গেছে। আর কিছু দেখার নেই। রাতের প্রথম বাদুড়টাও গাছের ডাল ছেড়ে হুশ করে উড়ে গেছে গঙ্গার দিকে। পশ্চিমের প্রথম তারাটার সঙ্গেও তার চোখাচোখি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় নিমগাছের ডাল নাচিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা যে বাতাসটা আসে সেটাও এসে গেছে। দিন তার সব গল্প বলে রাতের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দক্ষিণের বড় রাস্তায় সেই মজার ঘুগনিঅলার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। লোকটার বিশাল বড় গোঁফ। ঠোঁটের ওপর ঝুলঝুল করে ঝোলে। গায়ে খাকির জামা। তার আবার চারটে পকেট। লোকটা নাকি যুদ্ধে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে। ছুটি হয়ে গেছে। মন ভাল থাকলে যুদ্ধের গল্প বলে। ট্যাঙ্ক, কামান, প্লেন, বোমা— প্যারাসুট।

বিলুকে দরজার দিকে এগোতে দেখে তাদের বাড়ির সর্বক্ষণের রাঁধুনি বামুনদি দরজা আগলে দাঁড়াল, 'কোথায় যাবে?'

ছ'বছরের ছেলে বিলু পশমের মতো মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বড় বড় নীল চোখ তুলে বললে, 'কেন, আমার মায়ের কাছে যাব। এখন তো আমার পড়ার সময়।'

বামুনদি বিলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আজ তোমার পড়ার ছুটি। আজ আর তোমাকে পড়তে হবে না। আজ তুমি আমার সঙ্গে বসে লুডো খেলবে, সাপলুডো খেলবে। তোমাকে আমি গল্প বলব। গান শোনাব। সেই তাড়কা রাক্ষুসির নাচটা নেচে দেখাব। তারপর আবার বাঘবন্দি খেলব। তারপর গরম গরম ফুলকো লুচি, কড়কড়ে আলুভাজা খাওয়াব। পরেশের দোকানের বড় বড় শাঁখ সন্দেশ খাওয়াব।'

বিলু নিজেকে জোর করে সেই বলিষ্ঠ মহিলার হাত থেকে কোনওক্রমে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'আমি মায়ের কাছে যাব। যাবই যাব। তোমার কোনও কথা শুনব না। সেই দুপুর থেকে তোমরা আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছ। হু আর ইউ।'

বিলু মাঝে মাঝে রেগে গেলে ইংরিজি বলে। ইংরিজি গালাগালও দেয় যখন ভীষণ রেগে যায়। যেমন এন ই এস টি নেস্ট, পাখির বাসা। আর এ এম র‍্যাম, ভেড়া। স্লাই ফক্স। এইচ ই এন, হেন, মুরগি। তার ফার্স্ট বুকের যত কিছু সব গলগল করে বলে যায়। বিলুদের বাড়ি লেখাপড়ার বাড়ি। তার ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত মানুষ। সুপণ্ডিত। নামী প্রধান শিক্ষক। বিলুর বাবা, জ্যাঠামশাই দু'জনেই ইংরেজিতে সুপণ্ডিত। বাড়ির চালচলনও সাহেবি কেতার। ব্রাহ্ম না হয়েও ব্রাহ্মধারার। সব

বেদান্তবাদী। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী নয়, এক ঈশ্বর। সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে বসে প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থনা। ভোরবেলা পুব দিকে হাত জোড় করে সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ। ইংরেজের ভাল দিক আর রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই বাড়ির সংস্কৃতি। শ্রেষ্ঠ বাঙালি পরিবার হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

বামুনদি বিলুকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'ছিঃ, তুমি কত বুঝদার ছেলে! অমন রাগ করতে আছে। তুমি তো জানো মায়ের অসুখ করেছে। ডাক্তার বদ্যি এসেছে। তুমি এখন ওখানে গিয়ে কী করবে! কত লোক ওখানে গিজগিজ করছে। ওষুধের গন্ধ, ইঞ্জেকশান দিচ্ছে। তোমার ভাল লাগবে না ওখানে!'

বিলুকে বুঝদার ছেলে বললে, তার ভীষণ ভাল লাগে। তখন সে সত্যিই বুঝদার হয়ে যায়। বিলু শান্ত হয়ে বললে, 'সেই সকালে আমি একবার মাত্র গেছি। মা হাত তুলে কী আমাকে বলতে গেল, তুমি অমনি আমাকে তুলে নিয়ে চলে এলে। তুমি বিচ্ছিরি। তুমি আমাকে এই ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছ না কেন? আমি তা হলে জ্যাঠাইমার কাছে যাব। কখন সন্ধে হয়ে গেছে, প্রার্থনা করতে হবে তো! ঠাকুরঘরেও যেতে দেবে না!'

'কেন দেব না? ঠাকুরঘরের পাশেই তো দক্ষিণের ঘর, সেই ঘরে মা। অনেক লোকজন। তারা ঠাকুরঘরেও ভিড় করে আছে। জ্যাঠাইমা এখন মায়ের কাছে। সবাই চলে গেলেই তোমাকে আমি নিয়ে যাব।'

কথা বলতে বলতে জল আসছিল বামুনদির চোখে। চৈত্র সংক্রান্তি আজ। গাজনের সন্ন্যাসীরা দূরে কোথাও ঢাক বাজাচ্ছে। ন'পাড়ায় চড়কের মেলা বসেছে। মেলা থেকে সব ফিরছে। শিশুর দল ভেঁপু বাজাচ্ছে। সকালে মেজবাবু বাজার থেকে বেল কিনে এনেছিলেন। কথা ছিল বিকেলে পানা হবে। বরফ দিয়ে। সব ভেস্তে গেল। ছোট বউদির অবস্থা খুব খারাপ। আজ টানা তিন মাস ছোট বউদি বিছানায় পড়ে আছেন। সকালে ঝকঝকে গাড়ি চেপে এসেছিলেন সবচেয়ে বড় ডাক্তার। গম্ভীর মুখ। তাঁর জুতো জোড়াও গাড়ির মতো ঝকঝকে। অনেকক্ষণ দেখলেন। ঘরের বাইরে এলেন। মাথা নাড়লেন। গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নীচে।

বিলু বামুনদির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'হ্যাঁগো, সবাই যদি যেতে পারে আমি কেন পারব না। তুমিই বলো। ওই দেখো, ওদিকে কত কত লোক। আমি একবারটির জন্যে যাই না বামুনদি। আমি মাকে বিরক্ত করব না। বুকের ওপর পড়ব না। আঙুল ধরে টানব না। কিচ্ছু করব না। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখেই চলে আসব।'

'এখন নয় বাবা। আর একটু পরে আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।'

বাড়িটা বিশাল। উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত। দক্ষিণটা সদরের দিক। বিশাল এক বারান্দা ঘুরে চলে গেছে পুব থেকে পশ্চিম হয়ে উত্তরে। এক মহল থেকে আর এক মহলের দূরত্ব এত বেশি যে এ মহল ও মহলের খবর পায় না। বিলুর কানে আসছে অস্পষ্ট গুঞ্জন। অনেক লোকের সাবধানে চলাফেরা। বিলু একঝলক তার জ্যাঠাইমাকে দেখতে পেল। এক গামলা গরমজল নিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেলেন। বিলুর খুব অভিমান হল— এত ভালবাসেন জ্যাঠাইমা, একবারও কি আসতে পারছেন না।

বিলুর বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, প্রাণের বন্ধু অসিতবাবুর দুই ছেলে, সুমন আর কল্যাণ। সুমন ছোট, বিলুর সমবয়সি, কল্যাণ দু'বছরের বড়। দু'জনেই এল। বিলুকে বামুনদির কোলে দেখে কল্যাণ গম্ভীর চালে বললে, 'অ্যাস, কোলে উঠেছিস কেন? নেমে আয়, নেমে আয়। লুডো খেলি।'

বিলু বললে, 'ধ্যাস, লুডো খেলতে ভাল লাগে না।'

'তুই নেমে আয় তো। হাতির দাঁতের নতুন ছক্কা এনেছি। যতবার চালবি ততবার ছয় পড়বে।'

বামুনদি আশ্চর্য হবার ভান করে বললে, 'হাতির দাঁতের ছক্কা। বাবা, সে তো রাজা মহারাজরা খেলে। কই দেখি কই দেখি!'

বিলুর মনটা সামান্য ঘুরল। সুমনের চেয়ে কল্যাণকে তার বেশি ভাল লাগে। ফরসা রং। গাঁট্টা গোট্টা চেহারা। একমাথা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ভীষণ কালো সেই চুল। বড় বড় চোখ। বড় বড় চোখের পাতা। বিলু কল্যাণকে ভীষণ পছন্দ করে। কল্যাণেরও অনেক গুণ। সে গাইতে পারে, নাচতে পারে। ভীষণ ভাল খেলতে পারে। নানা কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। অন্যকে নকল করে দেখাতে পারে। ভীষণ চটপটে। ভীষণ সাহসী। আরশোলা মাকড়সা দেখলে একটুও ভয় পায় না। ভূতকেও ভয় করে না।

কল্যাণ বেশ বড় মাপের একটা ছক্কা লুডোর বোর্ডের ওপর ফেললে। হাতির দাঁতের যেমন রং হয়। সামান্য হলদে। তার ওপর নিকষ কালো ফুটকি। বিলু ঝুঁকে পড়ল। জিনিসটা সত্যিই সুন্দর দেখতে। এমন একটা ছক্কা পেলে সত্যিই লুডো খেলতে ইচ্ছে করে। শুরু হল লুডো খেলা।

ওদিকে দক্ষিণে রাস্তার দিকের বড় ঘরে চলেছে যমেমানুষে টানাটানি। মেজবউ চপলা, ছোটবউ আরতির পায়ে গরমজলের সেঁক দিচ্ছেন। বাড়ির ডাক্তার নাড়ি টিপে বসে আছেন। ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এ বাড়ির আদরের বউ। মেজকত্তা বড় ঘর দেখে, স্বভাব দেখে, শিক্ষা দেখে, রূপ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের। সংসারে কোনও ভাবেই ঢোকার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি প্রথমে চেয়েছিলেন স্বামীজির আদর্শে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। সংসার বড় ছোট জায়গা। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট মন, ছোট লোক, সবই ছোট ছোট। ছোটকত্তা পাহাড় ভালবাসেন। আকাশের গায়ে পাহাড় দেখলে ধরতে ছোটেন। একসময় ইচ্ছে হয়েছিল এভারেস্টে উঠবেন। ইচ্ছাটা প্রকাশ করামাত্রই বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন জনে জনে এসে কেউ হাত জোড় করে, কেউ পায়ে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল— পাহাড় পাহাড়ের জায়গায় থাক না, তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ। ছোটকর্তা অচল, অটল। নিজেকে সেই দুরূহ কাজে ট্রেনিং দেবার জন্যে চল্লিশ ফুট লাকলাইন দড়ি কিনে এনে ছাদের আলসেতে বেঁধে পশ্চিমের বাগানে ঝুলিয়ে দিলেন। বাড়ির সবাই হাঁ করে দেখছে। ব্যাপারটা কী হতে চলেছে। ছোটকত্তা দড়ি ধরে দেয়ালে পা দিয়ে দিয়ে তিনতলা থেকে নেমে আসবেন বাগানে। আবার দড়ি বেয়ে উঠে যাবেন ছাদে।

মেজকত্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই উদ্ভট ইচ্ছেটার কারণ জানতে পারি কি। সবকিছুর তো একটা কারণ থাকবে?'

ছোটকত্তা ছাদে মালকোঁচা মারতে মারতে বললেন, 'মেজদা, তোমার কমন সেন্স সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ছিল। ক্লাইম্ব শব্দটার সঙ্গে পরিচিত আছ?'

'আছি।'

'মাউন্টেন ক্লাইম্ব করতে হয়। এ তোমার বাড়ির সিঁড়ি নয় যে ধাপে ধাপে উঠে যাবে। এটা সেই ক্লাইম্বিং প্র্যাকটিস।'

'তুমি প্র্যাকটিস করার আগে এই দড়িতেই আমি গলায় দড়ি দোব। তুমিও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত দেখি কে হারে কে জেতে?'

'তুমি একটা কাওয়ার্ড।'

'তুমি একটা ডেয়ার ডেভিল। তোমার কাছে তোমার নিজের জীবনের দাম না থাকতে পারে, আমাদের কাছে আছে।'

'আমি করবই।'

'আমি তা হলে ঝাঁপ দোবই।'

সেদিন কী যে হত, বলা কঠিন। অচলাবস্থা ভাঙার জন্যে এগিয়ে এলেন মেজবউদি। ছোটকত্তা

বউদিকে খুব মান্য করেন। তিনি নিজেই পছন্দ করে মেজভাইয়ের বিয়ে দিয়েছেন। প্রবাসী বাঙালি। মেজ বউয়ের জন্ম, বড় হওয়া, লেখাপড়া সবই শ্যামদেশে। বাবা ছিলেন রেঙ্গুন হাইকোর্টের নামকরা আইনজীবী। নারী স্বাধীনতার দেশের মেয়ে। চালচলনে পাকা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম মেয়েদের মতো থ্রি-কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ পরেন। সাদা সিল্কের শাড়িই পছন্দ করেন। সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে মাথায় লম্বা। মেজকত্তাও বেশ লম্বা। সাধারণ বাঙালি মেয়ের মাথা তাঁর বুক ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। সামান্য নারীবিদ্বেষী ছোটকত্তার সমস্ত পরীক্ষা তুড়ি মেরে পাশ করে চপলা এই বাড়ির বউ হতে পেরেছিলেন। লম্বা কিন্তু কোল কুঁজো নয়। নাকটা আর্যদের মতো। চোখ দুটো দেবীর মতো। ছোটকত্তা চোখের মণির উজ্জ্বলতাও মেপেছিলেন। বলেছিলেন, 'ল্যাকলাশ্চার' নয়। মানুষের 'কমন সেন্স' নাকি চোখে ঝিলিক মারে। ভেটকি মাছের মতো চোখ হলে ভোঁদা হয়। মানুষের জন্মের এক 'জার্মান থিয়োরি' ওঁর মতে 'ক্ল্যাসিক্যাল থিয়োরি' কোথা থেকে রপ্ত করেছেন। প্রচুর পড়াশোনা তো! যত রাত বাড়ে ততই জ্বর বাড়ার মতো, যত রাত বাড়ে ততই ছোটকত্তার পড়ার ধুম বাড়ে। এই বই নামাচ্ছেন। হাতের তালুতে ভটাস ভটাস শব্দ করে ধুলো ঝাড়ছেন। টেবিলে বইয়ের পাহাড় জমতে জমতে একসময় টেবিল ল্যাম্পটাই চাপা পড়ে যেত। লাজুক মেয়ের হাসির মতো কোনও এক ফাঁক দিয়ে একটু আলোর চুমকি ছুড়ত। মেজকত্তা থেকে থেকে পরীক্ষার হলের ইনভিজিলেটারের মতো এসে পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু স্নেহের গলায় বলতেন, 'রাত কাকে বলে তুমি বাই এনি চান্স জানো কি?'

'জানি!'

'রাতের ব্যবহার জানো? হাউ টু ইউস এ নাইট।'

'জানি!'

'তা হলে দিনের মতো ব্যবহার করছ কেন? সামান্য একটু ঘুমের তো প্রয়োজন আছে?'

'প্রয়োজন মানুষ তৈরি করে। ঘুম একটা বদ অভ্যাস। এলেই যখন শুনে যাও একটু ভাল ইংরেজি How do people go to sleep. I am afraid I have lost the knack. I might try busting myself smartly over the temple with the night light. এই দেখো জ্ঞানের মন্দিরে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে মধ্যরাতের পূজারি।'

'এদিকে দেহমন্দির যে গেল। দয়া করে আমার কথা শুনে একটু ঘুমোও।'

সেই ছোটকত্তার ধারণা, ছেলেরা সব মায়ের দিকে যায়। তেজি, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মহিলা সুসন্তানের জন্ম দেয়। চপলার মুখ বাদামের মতো। গায়ের রং ইহুদিদের মতো। কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। রাগী নয় ঋজু। ছোটকত্তার মনে হয়েছিল, মেয়েটি তরুণী ইরানি-বালা। শিক্ষিতা। মুক্তোর মতো হাতের লেখা। ইংরেজি ভীষণ ভাল জানে। ঘোড়ায়ও নাকি চাপতে পারে। মেজর মতো একজন মৃদু স্বভাবের মজলিশি মানুষের জন্যে ভাল একজন প্রশাসকের প্রয়োজন। সেই সর্ব অর্থে ভাল প্রশাসক এখন ছোটকেও স্নেহের শাসনে বেঁধে ফেলেছেন। গুণ আর বিদ্যার দিক থেকে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমানে সমানে।

চপলা এসে দড়িটা তুলে নিতে নিতে বললেন, 'ছোটঠাকুর এই বিদ্যায় তুমি বড়জোর একটা ভাল হাউসব্রেকার হবে, মাউন্টেনিয়ার হতে পারবে না কোনওদিন। এটা থাক শীতকালে আমরা যখন পাহাড়ে যাব চেঞ্জে, সেই সময় ক্লাইম্বিং হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

ছোট আর মেজ দু'জনেই সে-যাত্রায় প্রাণে বাঁচলেন।

এরপরেই তাঁর সামনে উদয় হলেন ডক্টর ডেভিড লিভিংস্টোন। অবশ্যই মাঝরাতে। বললেন, বীর, সাহসী, জ্ঞানী এই গৃহকূপে বসে তোমার জীবন নষ্ট করছ? তুমিই আমার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, ভুল করে বাংলাদেশে জন্মে গেছ। আসলে তুমি জাত ব্রিটিশ। সেই দিব্যদর্শনে ছোটকত্তা ভূপর্যটক হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ব্যাপারটা যাতে কোনও ভাবেই অসম্পূর্ণ

থেকে না যায়, তার জন্যে খ্রিস্টান হবেন বলে একটা ফতোয়া জারি করলেন। আবার লেগে গেল মেজর সঙ্গে।

মেজ প্রশ্ন করলেন, 'ভূপর্যটনের সঙ্গে ধর্মের কী রিলেশান?'

'একজন ভাল মিশনারিই একজন ভাল ভূপর্যটক হতে পারেন। বাইবেল আর ক্রুশ, একটা মানচিত্র, বন্দুক, জাঙ্গল নাইফ আর এক ফাইল কুইনিন, এই হল ফোর্স, ইনস্পিরেশান। সেন্টপলস ক্যাথিড্রালে আমার খবর নেওয়া হয়ে গেছে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। ফার্স্ট আই উইল বি এ ক্রিশ্চান। ডিসাইপল অফ লর্ড খ্রাইস্ট, দি এপিটোম অফ লাভ অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস। আথার্টনে বন্দুক আর নাইফ দেখে এসেছি। নিউম্যান অ্যাটলাস।'

মেজ সাহস করে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের গীতা কী দোষ করল রে!'

'গীতা হল কুরুক্ষেত্রের সঙ্গী মেজদা, ভূপর্যটনের নয়। আবার যদি কখনও কুরুক্ষেত্র হয়, তখন ট্যাঙ্কের টারেটে বসে গীতা পড়ব। তুমি চার্চ দেখেছ? দেখে এসো সেন্টপলস। চূড়া উঠে গেছে আকাশে। চার্চ-বেল যখন বাজে, মনে হয় জীবনের কথা বলছে— লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। তোমার গীতা নয়— মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। চার্চের ভেতরে গেলে মনে হয় স্বর্গে গেছি। আর বিশ্বনাথের মন্দিরে যাও! হরিবল। অ্যাজ গুড অ্যাজ নরক। পচা ফুল, বেলপাতা, প্যাচপেচে কাদা, গোবর। এই পরিবেশ ছাড়া তোমার ভগবান অ্যাট ইজ ফিল করেন না। মনে আছে বৈদ্যনাথধামে তুমি মরতে মরতে বেঁচেছিলে। বাঁচিয়েছিলুম আমি। তা না হলে বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় হাজার খানেক ভীম ভবানীর ঠেলায় যেভাবে উপুড় হয়ে পড়েছিলে, বুকের খাঁচা ভেঙে দম আটকে মরতে। চার্চে যাও, দেখে এসো ডিসিপ্লিন কাকে বলে। তকতকে ফ্লোর, ঝকঝকে ফার্নিচার, স্টেইনড গ্লাস উইন্ডো। অরগ্যানের উদাত্ত সুর। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে সব লাইন দিয়ে প্রার্থনা করছে। আমেন শব্দটা একবার ভাবো! কী সুন্দর। আর তোমার ভক্তরা! গামছা পরে ঘটি ঘটি দুধ ঢালছে শিবের মাথায়। তোমাদের পুরোহিত! ইয়া ভুঁড়ি, আদুড় গা, তেলচিটে পইতে, হেঁটের ওপর কাপড়, গলায় গামছা, কপালে এক থাবড়া কালি, জবাফুলের মতো চোখ। তোমাদের আরতির শব্দ! স্ট্যান্ড করা যায় না।'

'তোমাদের তোমাদের করছ, তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ?'

'ফর্মালি হইনি, ইনফর্মালি আমি তো অহিন্দুই। মসজিদও আমার ভাল লাগে। নামাজের কী ডিসিপ্লিন।'

সেই রাতেই মেজকত্তা আর মেজবউ পরামর্শে বসে গেলেন। ছোট ক্রমশই রোমান্টিক হয়ে উঠছে। এক্ষুনি ওর বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিবাহেই এর সমাধান। রাতটাই ওর কাছে সাংঘাতিক। যেই আমরা দু'জনে দরজা বন্ধ করি তখনই ও সবচেয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তখনই আসেন আমুন্ডসেন-লিভিংস্টোন-শিপটন পার্টি। বলা যায় না, ও যে-মেজাজের ছেলে, হয়তো সত্যি সত্যিই খ্রিশ্চান হয়ে গেল। কেবলই বলে বিলেত চলে যাব। এদিকে রোমান্টিক ওদিকে ঘোরতর নারীবিদ্বেষী।

মেজবউ বললেন, 'তোমরা নিজেদের কিছুমাত্র চেনো না। ছোটঠাকুর মোটেই নারীবিদ্বেষী নয়। সৌন্দর্যের পূজারি। শিশুর মতো সরল। তা না হলে তোমার সামনে আমার প্রশংসা করতে পারে। গ্রাম্য মহিলাতে ওর বিদ্বেষ। ওর চাই বিলিতি ধরনের মেয়ে। তা না হলে বলে, বউদি তোমাকে একটা গাউন তৈরি করিয়ে দোব।'

'ওইরকম একটা ভাই পাওয়া গর্বের। আমি তো সব পরীক্ষায় গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ করেছি। ও কিন্তু সব পরীক্ষায় ফার্স্ট। কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি। একবার অঙ্কে একশোর মধ্যে নিরানব্বই পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল পরীক্ষক টোটালে ভুল করেছেন। ও হল আমাদের গর্ব।'

পাশের পাড়াতেই বর্ধিষ্ণু মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। একসময় বিশাল বনেদি পরিবার ছিল। ভেঙেচুরে একটু ছোট হয়ে গেলেও ধনী, অভিজাত, সুসংস্কৃত। সবচেয়ে বড় কথা সবাই সুন্দর। সব

চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং। মুকুজ্যে মশাইয়ের একেবারে পেশোয়ারি শরীর। ছ'ফুট লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে যখন রাস্তায় বেরোতেন, মটোর গেলে লোক যেমন সরে দাঁড়ায়, সেইরকম সরে দাঁড়াত। পাঞ্জাবির তলা থেকে দেহের রং ফুটে বেরোচ্ছে। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। খাড়া নাক। খাঁটি পেশোয়ারি নাক। মিহি ধুতি, চওড়া পাড়। লোকে একটু গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসত। তিনি পাত্তা দিতেন না। গম্ভীর মুখে রাজহাঁসের মতো সবার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে বেরিয়ে যেতেন। এত রক্ত গায়ে, ফরসা ভরাট গাল দুটো গোলাপি দেখাত। বড়লোক, কিন্তু নোংরা বড়লোক নন। বাজে কোনও ব্যাপারে থাকতেন না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত। কনফারেন্সে প্রথম সারির মাঝের আসন তাঁর জন্যে বাঁধা। নিজেও একজন গাইয়ে। ধ্রুপদ আর ধামারে ওস্তাদ। বড় বড় শিল্পীরা আসরে বসে তাঁকে না দেখলে মনমরা হয়ে যেতেন। সমঝদার শ্রোতা। শিল্পী ঝট করে একটা ভাল কাজ করে ফেললেই মুকুজ্যেমশাই হায় হায় করে উঠতেন। কেউ সামান্য একটু বেপরদা লাগিয়ে ফেললেই তিনি ঠিক ধরে ফেলতেন আর চুকচুক করে উঠতেন।

খবরে খবর এসে গেল। মুকুজ্যেমশাইয়ের সংসারে শোকের ছায়া নেমেছে। বলা নেই কওয়া নেই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী দুম করে চলে গেলেন; যাকে বলে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে। স্ত্রীকে বড় ভালবাসতেন। সংসারে থাকল এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে বড়। ঘটকি চপলাকে রূপের বর্ণনা দিচ্ছে— মনে করো পূর্ণিমার রাতে তোমাদের ছাদে আকাশ থেকে একটা পরি নেমে এল, তুমি তোমার বড় কাঁচিটা দিয়ে রুপোর ডানা দুটো কেটে দিলে। একটা চুমকি বসানো শাড়ি পরিয়ে দিলে। তা মা যা হল মেয়েটি হল তাই। আমি মেয়েমানুষ, তা রূপ দেখে মা আমারই মাথা ঘুরে যায়। ইচ্ছে করে ছেলে হয়ে যাই। এইবার তুমি বলবে রূপ তো হল, গুণ! তা নাও, ফিরিস্তিটা একবার মেলাও। বাপ গান ভালবাসে মেয়ের একেবারে ব্যায়লার মতো গলা। সামনে দিয়ে তোমার চলে যাবে মনে হবে ভেসে চলে গেল তুলোর মতো। লেখাপড়া জানে। সব কাজকর্ম জানে। হাতের কাজ দেখলে চোখ ঠিকরে যাবে তোমার। সুগন্ধী, মানে অঙ্গ দিয়ে সব সময় সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। বুঝতেই পারছ, সুলক্ষণা, পদ্মগন্ধা। এইবার গড়নপেটন, অবিকল যেন তুমি।

সেই আরতি মাত্র বছর দশেকের মতো সংসার করে ফিরে যাচ্ছে। ঘরের এককোণে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন মুকুজ্যেমশাই। মেয়ের পাশে রাত জাগছেন পরপর কয়েকদিন। রাজা ক্যানিয়ুটের মতো বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে পেশোয়ারি মানুষটিকে। স্ত্রীকে ভালবাসতেন, চলে গেলেন তিনি। মেয়েটি বড় আদরের। প্রায়ই বলতেন, বুক দিয়ে প্রদীপ আগলাবার মতো করে এই মেয়েকে আমি মানুষ করেছি। বুকের আর সে ক্ষমতা নেই। এ যা বাতাস প্রদীপ নিববেই। বিয়ের পর বাপ মেয়েতে সম্পর্কটা আরও মধুর হয়েছিল। নিজের সংসার বলে তো কিছুই ছিল না। রাজার মতো মানুষটি মেয়ের সংসারে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। একটা প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন এই পরিবারে। গানে, গল্পে, মজলিশে। বাইরের ঘরের চেয়ার জুড়ে বসে থাকতেন মনে হত বাড়িটা একেবারে ভরে গেছে। ছোটকত্তা বলতেন, এ সিগনিফিক্যান্ট প্রেসেন্স। একটা উপস্থিতি।

মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে মুকুজ্যেমশাই কী না করেছেন। শ্মশানে গিয়ে রাত জেগেছেন। তান্ত্রিকের কাছ থেকে কবচ এনেছেন। লাইন দিয়ে টোটকা ওষুধ। কবিরাজ এনেছেন। হেকিম এনেছেন। এনেছেন হোমিওপ্যাথ। তিনি ছুটেছেন দেশি পথে। বিদেশি পথে যা করার সবই করেছেন মেজ আর ছোট। দিন ফুরোলে, সন্ধে হলে, তেল ফুরোলে কেই বা কী করতে পারে। যে রোগ হয়েছে, সে রোগের কোনও ওষুধ বেরোয়নি। যাঁরা টোটকা দিয়েছিলেন মুকুজ্যেমশাই তাঁদের তুলোধোনা করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, এ বোঝাই যাচ্ছে। এ রোগ শিবেরও অসাধ্য।

মুকুজ্যেমশাই ইষ্টনাম জপ করছেন। একটা টান অনুভব করছেন, কে যেন টানছে তাঁর মেয়েকে ধরে। মেজকত্তা জানলা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন ওই জানলাটাই বিপজ্জনক জায়গা। ওই

পথেই বেরিয়ে যাবে আরতি। দরজা আগলে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এই পরিবারের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। জোয়ান ছেলে। লেখাপড়ায় একটু খাটো। মেজকত্তা একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে বাড়ি। এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। যেমন খাটিয়ে, তেমনি বিনীত ভদ্র। মেজকত্তা ছোটকত্তার সঙ্গে তার মামার সম্পর্ক। দুই বউই দীনুকে ভীষণ ভালবাসে। দীনু ভেতরে ভেতরে অনবরত কেঁদে চলেছে। চোখ দুটো লাল। জল টলটলে। দীনু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইখান থেকে ছোট মাইমার ধবধবে সাদা পা দুটো দেখতে পাচ্ছে। পাতলা পায়ের পাতা। ছোট মাইমার সবই সুন্দর। হাত দুটো কত লম্বা ছিল। দাঁড়ালে প্রায় হাঁটুর কাছে নেমে আসত। আঙুলগুলোও লম্বা লম্বা। দুল পরা কান দুটো কী সুন্দর দেখাত। আর চোখ! তার তো কোনও তুলনা ছিল না। বড় বড় চোখের পাতা, সব সময় যেন ভিজে ভিজে। মেজ মাইমা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন।

ছোটকত্তা ঘরের বাইরে। পেছনে হাত মুড়ে সমানে পায়চারি করছেন। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। আরতি এই সাংঘাতিক খেয়ালি মানুষটিকে একেবারে বশ করে ফেলেছিলেন তাঁর ছেলেমানুষি দিয়ে। মেয়ে যেমন পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে ঠিক সেইভাবে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন নিজেকে। দুটো মাত্র কথাতেই ছোটকত্তা জল হয়ে যেতেন, 'বুঝতে পারিনি গো,' 'ভুল হয়ে গেছে গো।' ছোটকত্তা পায়চারি করছেন ঘরে। সবাই তাই দেখছে। মনে মনে তিনি চলে গেছেন ডার্কেস্ট আফ্রিকায়। নিঃসঙ্গ এক পথিক। দুর্গম অরণ্য। ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে আরতির জীবনের নানা মধুর ঘটনা, মধুর ভঙ্গি ভেসে আসছে। বাইরে নিজেকে যতই কঠিন-কঠোর দেখাবার চেষ্টা করুন, ভেতরে বসে আছে মস্ত বড় এক প্রেমিক। পরিচ্ছন্ন প্রেমিক। ছোটকত্তা মাঝে মাঝে আবার জাপানিদের মতো হয়ে যেতেন। চন্দ্রমল্লিকা ফুল, চাঁদের আলো, ফোয়ারা, ঘর জোড়া মাদুর। চিনেমাটির বাটিতে খাবার। এক টুকরো জমিতে জাপানি কায়দার বাগানের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটা নদী থাকবে, সাঁকো থাকবে, নকল পাহাড়, গাছ। এইসব ব্যাপারে আরতির ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ ছিল। যেসব ব্যাপারে কল্পনা আছে, মায়া আছে, জগৎছাড়া সব ব্যাপার আছে সেইসব ব্যাপার পেলে আরতিকে আর দেখে কে! আরতি রোজ রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মেজকত্তার কাছে ঘণ্টাখানেক গল্প শুনতেন। মেজকত্তার অসীম প্রতিভা। মুখে মুখে এমন গল্প তৈরি করতে পারতেন শ্রোতার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকত না। বেশির ভাগই উদ্ভট, কিন্তু বলার গুণে সত্যের চেয়েও সত্য। মাঝে মাঝে আরতি মেজকত্তার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। চপলা এসে আদর করে তাকে তুলে ধরে ধরে ছোটকত্তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ঘুমিয়ে পড়লে আরতি শিশু। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকত না। কোন দিকে দরজা, কোন দিকে জানলা সব বেঠিক। কখনও খাবার আগে ঘুমিয়ে পড়লে খেতে বসিয়ে চপলাকে খাইয়ে দিতে হত। খাবার বলে বলে খাওয়াতে হত, তা না হলে পরের দিন সকালেই আরতি অভিমান— তোমরা কাল রাতে রাবড়ি খেলে আমাকে দিলে না।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ নাড়ি ছেড়ে দিলেন। ব্যস্ত হয়ে কনুই থেকে গলায় হাত রাখলেন। তাড়াতাড়ি স্টেথো বসালেন বুকে। সোজা হলেন। স্টেথোটা গলায় ঝোলালেন। খুব চাপা গলায় বললেন, 'আর দরকার নেই। চলে গেছেন।' ডাক্তারবাবু প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন। বড় একটা খেলা শেষ হলে রেফারি যেভাবে বাঁশি বাজান, সেইভাবে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, অ্যাম সরি। সোজা বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। টেবিলে বসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখলেন। কাগজটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। দীনুর কানে কানে বললেন, 'রইল'। জুতোর কোনওরকম শব্দ না তুলে নেমে গেলেন নীচে।

ঘর নিস্তব্ধ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। চপলা না হয়ে অন্য কোনও মেয়ে হলে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেত। চপলা মাথা হেঁট করে নেমে এলেন খাট থেকে। হাতে এনামেলের জলের গামলা। সেই জলে টপটপ করে কয়েক বিন্দু জল পড়ল চোখ থেকে। ছোটকত্তাকে ছ'বছর আগে এই ঘর

থেকে বেরিয়ে একটা শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন, তোমার ছেলে হয়েছে। আজ সেই ঘর থেকেই বেরিয়ে ছোটকত্তাকে বললেন, 'যাও দেখা করে এসো।'

ছোটকত্তা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত শব্দ করে একবার হাসলেন। কান্নাটাকেই হাসিতে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুডবাই।' তারপর বললেন, 'চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে একটু পরিপাটি করে দিলে বেশ হত। কেউ আজ টিপ পরিয়ে দেয়নি?' ফিরে তাকালেন। মেজকত্তাকে বললেন, 'কাঁদছ কেন? মৃত্যু তো শোকের নয় আনন্দের। মুক্তির আনন্দ। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥'

মেজকত্তা দুঃখেও অবাক, ছোট গীতা আওড়াচ্ছে। বাইবেল নয়।

হঠাৎ বিলু লুডোর ঘুঁটি, ছক, সব এলোমেলো করে খাড়া উঠে দাঁড়াল। কল্যাণ হাত ধরে টেনে বসাতে বসাতে বললে, 'এ কী রে! কোথায় যাবি তুই!'

'মা আমাকে ডাকছে।'

'আমরা শুনতে পেলুম না, তুই শুনতে পেলি। মা এখন ঘুমোচ্ছেন।'

'ধ্যাত।' হাত ছিনিয়ে নিয়ে বিলু দরজার দিকে ছুটল। বামুনদি কোনওরকমে তাকে চেপে ধরল। বিলু দু'হাতে বামুনদির খাটো চুল ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার শুরু করল, 'ওরে বাবা রে! এরা আমাকে মা'র কাছে যেতে দিচ্ছে না রে! ও মা, আমি তোমার কাছে যাব মা।'

কল্যাণ নাচ দেখাতে শুরু করেছে, বাঁদর নাচ, ভালুক নাচ, একের পর এক। বিলু দেখছেই না। চপলা ছুটে এলেন। ওরা খাট আনতে গেছে, ফুল আনতে গেছে। শবযাত্রা হবে নিঃশব্দে, যথোচিত আড়ম্বরে, বিলিতি স্টাইলে। ছোটকত্তার চোখে হিন্দুর শবদাহ একটা পৈশাচিক ব্যাপার। তিনি বলেন বেরিয়াল ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ডিগনিফায়েড।'

চপলা এসে, বিলুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়ালেন। চপলাকে বামুনদির চুল ছেড়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললে, 'জ্যাঠাইমা গো, আমি একবার মাকে দেখব।'

চপলার কঠিন পরীক্ষা। নিজেকে অচল অটল রাখার পরীক্ষা। চপলা জানে, বিলু তাকে যেমন ভয় পায় সেইরকম ভালও বাসে। এখন কোন মূর্তি সে দেখাবে, ভয়ের না ভালবাসার!

চপলা বললেন, 'তুমি না বুঝদার ছেলে। তুমি এইরকম করলে হয় বাপি! মা এই সবে একটু ঘুমিয়েছে। তুমি গেলেই ঘুম ভেঙে যাবে। মায়ের আবার সেই যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। তুমি একটু এদের কাছে থাকো। আমি চান করে সব পালটে তোমার কাছে আসব। এখন তোমাকে আমি কোলে নিতে পারছি না বাপি। তোমার সেই দম দেওয়া মটোর গাড়িটা কোথায়!'

কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, সত্যিই তো! দম দেওয়া সেই টুকটুকে লাল রঙের গাড়িটা বিলুর ভীষণ প্রিয়। কল্যাণ খাটের তলায় নিচু হল। চপলা বললেন, 'দেখ তো বাবা।' বামুনদিকে ইশারা করে চপলা বেরিয়ে গেলেন। কল্যাণ খাটের শেষ মাথা থেকে শুধু গাড়িটা নয়, আরও একটা মজার জিনিস বের করে আনল। বিলুর জ্যাঠামশাই বিলুকে দিয়েছিলেন এই বছর তার জন্মদিনে। ভারী সুন্দর একটা কলের পুতুল— 'ফ্যাটি কুক।' মোটা ভুঁড়িঅলা একটা লোক। তার মাথায় সাদা লম্বা রাঁধুনিদের টুপি। তার ডান হাতে একটা হাতা, বাঁ হাতে একটা চামচ। দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই সে অমনি হেলেদুলে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সারা ঘরে ঘুরে বেড়ায়। যেন কতই ব্যস্ত। একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়।

বিলুকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে রাখারই আপ্রাণ চেষ্টা চলছে এই তিন মাস। আরতির অসুখটা তো ধরা গেল না কিছুতেই। কেউ বললেন, সূতিকা, কেউ বললেন অন্ত্রে যক্ষা। দুটো রোগেরই এখনও তেমন কোনও ওষুধ বেরোয়নি। যা গবেষণা চলছিল তাও আপাতত বন্ধ। ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আজ আর কাল, এদিকে এল বলে। খবরকাগজ এলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

লাল মটোর গাড়ি একবার এদিক থেকে ওদিক যায়, একবার ওদিক থেকে এদিক। কল্যাণ নানাভাবে চেষ্টা করছে বিলুকে আনন্দ দেবার। ফ্যাটি কুক টলে টলে ঘুরছে সারা ঘরময়। বিলুকে দেখলেই মনে হয় বসে আছে উদভ্রান্তের মতো। উপায় নেই বলেই বসে আছে। সে যে বুঝদার ছেলে। চপলাই এই বিশেষণ বের করেছেন। মানুষের সামনে মানুষের একটা ভাল ছবি এঁকে দিতে পারলে, মানুষ তখন নিজেকেই নিজে অনুকরণ করে। ছোটদের ভেতরে একটা গর্বের বীজ পুঁতে দিতে হয়। সেটাও ক্রমে ছোট থেকে বড় হতে থাকে। চপলা যখনই সময় পান বিলুকে বিলুর ভবিষ্যৎ দেখাতে থাকেন। তুমি বিজ্ঞানী হবে। ব্যায়াম করে তখন তোমার সুন্দর চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে প্যাশনে। বাড়ির সামনে গাড়ি। বিলুবাপি জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ড যাবে। বিজ্ঞানীদের সভায় পেপার পড়বে। কী হাততালি! কত প্রশংসা! একটু একটু করে বিলুর মনে বড় হবার স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতেন। বিলুর মনে সূর্য ওঠাতেন। মনের আকাশ ভরে দিতেন রঙে। বিলুর জ্যাঠামশাইও বিলুকে বিলুরই গল্প শোনাতেন। তাঁর গল্প আরও বিশাল। কখনও বিলু বিরাট ফুটবল প্লেয়ার। একটা খেলায় কত গোলই যে দেওয়াতেন বিলুকে দিয়ে! কোনও গল্পে বিলু সেন্টার ফরোয়ার্ড। কোনও গল্পে আবার গোলকিপার। বিলুর গোলে কেউই বল ঢোকাতে পারছে না। বিলু তখন চাইনিজ ওয়াল। শুনতে শুনতে বিলুর চোখ বড় বড় হয়ে যেত। একটু থামলেই বিলু অমনি ছটফট করত, তারপর তারপর। বিলু তাই আজ এমন কাজ করবে না যাতে নাম খারাপ হয়ে যায়! বিলু যে শ্রেষ্ঠ ছেলে।

চপলা পরিপাটি করে আরতির চুল বাঁধলেন। চুল ছিল বটে মেয়েটার। খোলা চুল নেমে যেত একেবারে পায়ের কাছে। সেই চুল! ছোটকর্তা এই চুলের ঢল দেখে অবাক হয়ে যেতেন। যাকে বলে থ মেরে যাওয়া। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ আঁকলেন ভোরের সূর্যের মতো করে। সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বললেন, 'বেশ কেমন চলে গেলি বল? আমাকে একলা ফেলে। তোর তো আশার অন্ত ছিল না! কী হল! আমি এখন কাকে নিয়ে সংসার করব।' ফরসা ফুলের মতো শরীরে লাল একটা বেনারসি পরানো হল। সোনার জরির কাজ করা।

মুকুজ্যেমশাই সহজ সরল মানুষ। তিনি একবার চপলার পাশে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'হ্যাঁ বউমা, কোনও ভাবে কিছু করা যায় না, না? কোনও সাধুসন্ত মহাপুরুষ! আমি এখনও বেঁচে আর এমন মেয়েটা আমার চলে যাবে!'

কিছু করা যায় না। 'এ এক অচিন পাখি, কমনে আসে কমনে যায়।'

পায়ে আলতা পরানো হল সুন্দর করে। বউভাতের দিন আরতিকে ঠিক যেভাবে সাজানো হয়েছিল ঠিক সেইভাবে সাজালেন চপলা। যতক্ষণ সঙ্গ পাওয়া যায়। ছেড়ে দিলেই তো চলে যাওয়া। চির যাওয়া। এ এমন নয় যে মাঝেমধ্যে বেড়াতে আসবে। গেল তো গেল তো গেলই। কিন্তু কোথায়?

সমস্ত কিছু হচ্ছে নিঃশব্দে। বিলুকে জানানো চলবে না। সবাই বলে নাড়ি কাটা হলেও, অদৃশ্য একটা নাড়ির যোগ থেকেই গিয়েছিল। জানতে পারলে বিলুকে আর সামলানো যাবে না। একসময় ফুলে ফুলে ঢাকা একটা খাট জনশূন্য পথ ধরে যাত্রা করল। গঙ্গাকে ডান দিকে রেখে, দু'সার বাগানবাড়ির মধ্যে দিয়ে। এই পথে দুই বউ রোজই সেজেগুজে বিলুর হাত ধরে পাখি ডাকা ভোরে বেড়াতে বেরোতেন। বড় বড় পাঁচিলের গা বেয়ে উঁকি মারা ঝুমকোলতা. মাধবীলতা, জুঁই ফুল ফুটিয়ে রাখত। অবাক হয়ে ভাবত সুন্দরী দু'জন কে! ভোরকে আরও বিভোর করতে পথে বেরিয়ে পড়েছে! বিলু ছুটে ফুল কুড়োত। আরতি এক ঝুমকো মাধবীলতা ছিঁড়ে দিদির খোঁপায় গুঁজত। চপলা আরতির খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বলতেন, চুল করেছিস বটে! মেয়ের চেয়ে মেয়ের খোঁপা ভারী! রাতের অন্ধকারে গাছে গাছে চলেছে ফুল ফোটার আয়োজন। সকালে সব অপেক্ষায় থাকবে! কখন আসবে সেই দুই বউ। সঙ্গে সেই ফুল শিশু। দুই বউয়ের এক বউ যাচ্ছে। যাচ্ছে; কিন্তু ফিরবে না আর!

বিলু একসময় নিরুপায় হয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। চপলাই ঘুম পাড়ালেন। শুনতে পাচ্ছেন দক্ষিণের ঘরে ধোয়াধুয়ি চলেছে। মণি আর নিরঞ্জন এই পরিবারের দুই পুরনো ভৃত্য ঝাড়ু, বালতি আর ফিনাইল নিয়ে লেগে গেছে কাজে। আরতি সকলের ভালবাসার হলেও তার অসুখটা মোটেই ভাল ছিল না! খুবই সংক্রামক। দুঃখের হলেও সত্য, আরতিকে দেখতে আসতে অনেকেই ভয় পেতেন। ওই দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে চলে যেতেন। এই পরিবারেরই এক আত্মীয় ডাক্তার নিয়মরক্ষার মতো, ঘরের বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে একনজর দেখে শুধুমাত্র একটি প্রেসক্রিপশন করেছিলেন মুখে, প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিয়োর।

জানলার বাইরে বাতাস লাগা নিমগাছ চামরের মতো দুলছে। শব্দটা যেন প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাসের মতো। এই অঞ্চলটা ফাঁকা ফাঁকা। বিশাল বিশাল মাঠময়দান আর বড় বড় পুকুর। ধারে ধারে জমিদারবাড়ি। কলকাতার বাবুদের বাগানবাড়ি। এই বাড়িটাও প্রায় সেইরকম। কেবল এর একটা বাড়তি' অতীত ইতিহাস আছে। বাড়িটা ছিল ওলন্দাজ রাজকর্মচারীদের কুঠিবাড়ি। সেই কায়দায় তৈরি। সামনের দিকে একটা কাঠগড়া মতো করা আছে। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই। মনে হয় আদালতও বসত। একতলায় একটা গুমঘর আছে।

আজ রাতে চপলার পক্ষে ঘুমোনো অসম্ভব। অকাতরে শেয়াল ডাকছে দূরের মাঠে। গাছের ডালে ভারী একটা কিছু এসে নামল। হয় প্যাঁচা, না হয় বাদুড়। বিলু অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চপলা এক ফাঁকে উঠে চোরের মতো পা টিপে টিপে দক্ষিণের ঘরে গেলেন। সারা ঘর তকতকে করে ধোয়া। সমস্ত জানলার খড়খড়ি বন্ধ। খাঁ খাঁ শূন্য একটা খাট। খাটের মাঝখানে একটা পদ্মফুল। বিশাল পিলসুজে বড় একটা প্রদীপ। স্থির শিখায় জ্বলছে। তিন মাসের লড়াই শেষ।

চপলা পেছন ফিরে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। দরজার সামনে বিলু। বড় বড় চোখ। কপালের ওপর চুল। ফুলের মতো মুখ। চপলা তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন। বিলু তাকিয়ে আছে, যেন স্বপ্ন দেখছে, 'আমার মা কোথায়? নেই তো!'

চপলা দু'হাতে বিলুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলেন।

বিলু আবার বললে, 'আমার মা কোথায়? নেই তো!'

গলা ধরে এসেছে। গলা দিয়ে করুণ চিৎকারের মতো একটা শব্দ বেরোল, 'মা।'

চপলা বিলুকে কোলে নিয়ে বসে পড়লেন ঘরের লাল মেঝেতে। কান্না এসে গলার কাছে দলা পাকাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলা খুবই কঠিন কাজ; তবু বিলুর জন্যে হাসতে হবে।

চপলা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে দোল খেতে খেতে বললেন, 'মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে বাবা। দেখবে এইবার একেবারে ভাল হয়ে, আগের মতো সুন্দর হয়ে ফিরে আসবেন।'

ধরাধরা গলায় বিলু বললে, 'মা কী বলে গেল?'

'বলে গেল, বিলু যেন লক্ষ্মী হয়ে থাকে। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে, লেখাপড়া করে। বিলুবাপি আমার তোমার কাছে রইল।'

চপলা বড় করে ঢোঁক গিললেন। আর পারছেন না মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকতে।

'কাল তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে?'

'হাসপাতালে যে ছোটদের যেতে নেই বাপি।'

চপলা মনের চোখে দেখতে পেলেন, শ্মশানে চিতা প্রায় নিবে আসছে। আরতি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক মুঠো ছাই হয়ে যাবে। ভোরের প্রথম পাখি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। ঘুম ছাড়েনি। আলোর চিড় ধরছে পুব আকাশে। সময়টা খুবই বিপজ্জনক। এখুনি সব এসে পড়বে শ্মশান থেকে। তার আগেই বিলুকে সরাতে হবে।

চপলা বললেন, 'চলো বাপি আমরা আর একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর একটু বেড়াতে যাব।' বিছানায় শুইয়ে বিলুর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। বড় বড় চোখ খুলে শুয়ে আছে ছেলেটা। আরতির মুখখানা একেবারে কেটে বসানো। হঠাৎ দপ করে বিলুর চোখ বুজে গেল। শিশুরা এইভাবেই ঘুমোয়। বিলুর পাশ থেকে উঠে যেতে চপলার আর সাহস হল না। চিন্তা শিশুদেরও রেহাই দেয় না। যতই বোঝাবার চেষ্টা করা হোক, সন্দেহ যাবার নয়। মায়ের মৃত্যু রেখাপাত করবেই।

ভোর হতেই বিলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন চপলা। ভাগ্য ভাল, বাড়িটার দু'প্রান্তে দুটো সিঁড়ি। সদর দক্ষিণে, খিড়কি উত্তরে। ওলন্দাজ জলদস্যুরা অনেক মাথা খাটিয়ে নকশাটা করেছিল। সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হলে পেছনের দরজা দিয়ে সদলে পালাবে। আবার সামনের দিক দিয়ে মানুষ ধরে এনে, গুম ঘরে পিটিয়ে লাশ করে, পেছনের দরজা দিয়ে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়। পেছনের দরজা খুললে একটা সুঁড়ি পথ চলে গেছে গঙ্গায়। ভিজে ভিজে, অন্ধকার অন্ধকার। ঘাসে ঢাকা। বর্ষায় বড় বড় শামুক ঘুরে বেড়ায়। রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় সাবু গাছ। গ্রীষ্মে মাথার দিকটা ব্যেপ ফুলে ওঠে, গর্ভবতী রমণীর মতো। তখনই বুঝে নিতে হবে সাবু ধরেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কখন একদিন ফট করে ফেটে ঝরতে থাকবে দানা। শুরু হয়ে যাবে কাঠবেড়ালিদের মহোৎসব। নেমে আসবে বুলবুলির ঝাঁক। শালিক আসবে দর্শকের ভূমিকায়। সে এক মহা বনমহোৎসব। পথের শেষে কচ্ছপের পিঠের মতো একখণ্ড জমি। বিশাল বিশাল অর্জুন, মেহগিনি আর কৃষ্ণচূড়া গাছ। গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরাপাতার গালচে বিছিয়ে রেখেছে তলায়। শুকনো ভাঙা ডাল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পোড়া কঙ্কালের হাত। গাছের মাথা সেই আকাশসীমায়। বসে আছে দু'-একটি ধ্যানী শকুন। কখন কোন শুভক্ষণে অদূর গঙ্গায় ভেসে আসবে মৃতদেহ। গাছের ডাল কাঁপিয়ে বিশাল ডানা মেলে ছায়ার মতো উড়ে যাবে। মাঠের শেষটা গড়িয়ে নেমে গেছে গঙ্গায়। আলো-ছায়া থেকে হঠাৎ আলো। গেরুয়া জল ছুঁয়ে নেমে এসেছে বৈরাগী আকাশ। ভিজে বাতাসে জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। দোল খাচ্ছে জেলে নৌকো। আঁশটে জাল উড়ছে। কাদায় পোঁতা লম্বা লম্বা বাঁশ। পিটুলি গাছের ঝোপ। ভৌতিক পাকুড়।

চপলার এই দিকটায় আসতে ভালই লাগে। বেশ একটা বিদেশ বিদেশ, মৃত্যু মৃত্যু, কোথাও একটা যেতে হবে যেতে হবে ভাব আছে। অদৃশ্য বাউল যেন একতারা হাতে নাচে। এই মাঠে এলেই চপলার গাইতে ইচ্ছে করে:

> এ পরবাসে রবে কে হায়!
> কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
> হেথা কে রাখিবে দুখভয়সংকটে—
> তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে ॥

আরতি আসতে চাইত না ভয়ে। আরতির কল্পনার খুব জোর ছিল। কত কী অসম্ভব অসম্ভব যে ভাবতে পারত, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। আরতি বলত, দিদি এই জমিটা যদি কেউ খোঁড়ে, দেখবে অনেক তলায় একটা নৌকো আছে। আর সেই নৌকোটায় বসে আছে সতেরোটা কঙ্কাল। তাদের গলায় সোনার চেন। হাতে সোনার বালা আর তাগা, কানে দুল, নাকে নাকছাবি। ওরা ছিল সব তীর্থযাত্রী। কাশী থেকে গঙ্গাসাগর যাবার পথে পাঁচশো বছর আগে ডুবে গিয়েছিল। তার ওপর পলি পড়ে পড়ে এখন জমি। গঙ্গা সরে গেল পশ্চিমে। আরতি এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলত যে চপলার একসময় মনে হত, হয়তো সত্যই বা। একদিন হঠাৎ বললে, দিদি শুনতে পাচ্ছিস? পড়ন্ত বেলার হুহু বাতাস, বহুরকম গাছের পাতার শব্দ, পাখির ডাক ছাড়া চপলা আর কিছুই শুনতে পেল না। আরতি বললে, ঝুমুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না। সিরাজ কলকাতা যাবার পথে এইখানে নৌকো বেঁধেছিল। আর নাচ দেখাতে এসেছিল এই গ্রামেরই এক বাইজি। সেই বাইজি আজও সন্ধের ঝোঁকে আসে। রোজ আসে। স্পষ্ট ঝুমুরের শব্দ। কান খাড়া করে শোন।

বিলুর ডান হাতটা ধরতেন চপলা, আর বাঁ হাতটা ধরতেন আরতি। আর বিলু ধেই ধেই করে নেচে নেচে চলত। কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত। কখনও পেছনে। কখনও ঝুলত। তার আনন্দ দেখে কে? মা আর জ্যাঠাইমার নির্ভয় আশ্রয়ে একটি শিশুর যত ধরনের চপলতা। আরতির চেয়ে চপলা অনেক সবলা। ধকলটা তাঁরই হত বেশি। বিরক্তি শব্দটা চপলার অভিধানে নেই। নেই অসহিষ্ণুতা। তাঁর মনে হত স্বর্গের উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিশুগাছের শিকড়ে বসে যখন গান ধরতেন, এ পরবাসে রবে কে হায়, আরতি মুখ চেপে ধরতেন— এই গানটা এই জায়গায় বসে গাসনি ভাই, আমার কান্না পায়। চপলা সঙ্গে সঙ্গে গান বদলে গাইত:

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে,
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি
লহো লহো করুণ করে ॥

চপলা এক হাত দিয়ে পাশে বসা আরতিকে বুকের কাছে টেনে নিত। দু'জনে গলা মিলিয়ে গাইত

যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদন ভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥

এই লাইনে আসামাত্রই আরতির গলা ভারী হয়ে আসত। চপলাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলত, দিদি তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাসনি, তা হলে আমি কেমন করে বাঁচব! তুই আমার জন্মজন্মান্তরের দিদি। আর ঠিক ওই সময় বিলু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দু'জনের কোলে। তখন তিনজনেই উঠে পড়ে খানিক ছোটাছুটি করে নিত। একসময় আলো জ্বলে উঠত ওপারে, টিপটিপ। আরতি গেয়ে উঠত, ওই দেখ দিদি, নিশি এল দেখে চোখেরই পলকে শূন্য কে সাজাল দীপমালায়। তারপরেই বলত, দিদি চল ভাই চলে যাই, ছেলেটার গায়ে বাতাস লেগে যাবে। আরতির একটু-আধটু মেয়েলি কুসংস্কার ছিল, যেটা চপলার একেবারেই নেই।

আজ বিলুর আর একটা হাত ধরার জন্যে কেউ নেই। বিলুর বাঁ হাত চপলার ডান হাতের মুঠোয়। বৃদ্ধ ভ্রমণকারীর মতো দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সেই আনন্দ নেই। গান নেই। গল্প নেই। হাসি নেই। বিলুর সেই চপলতা নেই। বিশাল বিশাল গাছ মাথা তুলে প্রথম সূর্যের আলো ধরছে। সেই আলো গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে নীচে। গঙ্গার জলে কাচভাঙা ঢেউ। বিলু গুটগুট করে হাঁটছে চপলার পাশে পাশে। বেড়ানো নয় একটা দায়িত্ব। বিলুকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে দূরে রাখা। পাড় থেকে একে একে নৌকো খুলে চলে যাচ্ছে মাঝ গঙ্গার দিকে। ভরা গঙ্গায় জাল ফেলবে জেলেরা। চপলা বিলুকে নানারকম গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তেমন মন লাগছে না। বিলুও কেবল শুনে যাচ্ছে। কোনও প্রশ্ন নেই।

চপলা বিলুকে নিয়ে একপাশে বসলেন। মুক্ত বাতাস, জলের শব্দ, লাল নীল সবুজ পালতোলা নৌকো, পাখির ডাক, সবই আছে সেই আগের মতো, কিন্তু প্রাণটাই নেই। আনন্দের হাটবাজার সব ভেঙে দিয়ে অসময়ে চলে গেল আরতি।

গায়ে গা লাগিয়ে, ঘন হয়ে বসে আছে বিলু। বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে তার মাথার চুল। কাচের মতো বড় বড় দুটো চোখ। বিলুকে দেখিয়ে ছোটকত্তা বলতেন, আমার থিয়োরি একবার মিলিয়ে নাও, ছেলেরা মায়ের দিকে যায় কি না? আরতির খুব ছেলেপুলের শখ ছিল। কী হল!

চপলা উঠে পড়বেন ভাবছিলেন, হঠাৎ বিলু মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার মা মারা গেছে তাই না বড়মা!'

চপলা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত চেষ্টা সব ব্যর্থ! গঙ্গার ধারে বসে এই প্রসন্ন সকালে এক

নিষ্পাপ শিশুকে তার সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে কীভাবে মিথ্যে কথা বলবেন! চপলা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মরে যাওয়া কাকে বলে তুমি জানো বাপি?'

বিলু ঠিক জানে না। এই তো কয়েক বছর হল পৃথিবীতে এসেছে। শুনেছে মানুষ মরে যায়। চলে যাওয়াকেই কি মরে যাওয়া বলে! 'কাকে বলে বড়মা?'

চপলা আবার বিপদে পড়লেন। এইবার কী উত্তর দেবেন? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'মানুষ মরে না বাপি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়।'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে, 'তা হলে চলে যাওয়াকে মরে যাওয়া বলব?'

চপলা অবাক হয়ে গেলেন। এইটুকু ছেলের কী কথা! এখন কী বলবেন!

বিলু এইবার উদাহরণ দিল, 'তুমি রেঙ্গুনে চলে গেলে, বলব তুমি মরে গেলে?'

চপলার আর কোনও কথা বলার ক্ষমতা নেই। এ কী? এ তো অসম্ভব ছেলে। তিনি উত্তর হাতড়াতে লাগলেন।

বিলু বললে, 'তা হলে সেদিন যে আমাদের বেড়ালটা মরে গেল, কই সে তো চলে গেল না। বারান্দার ছোট ছাতে পড়েই রইল। মণিদা তখন বস্তায় ভরে এই গঙ্গায় নিয়ে এল। মাকে কি তা হলে তোমরা গঙ্গায় ফেলে দিলে? কই কাল তো, বাবা, জ্যাঠামশাই, দাদু, দিনুদা, নিরঞ্জনদা কেউ বাড়ি ছিল না। আজও নেই। আমরা তো উত্তরের ঘরে ঘুমোই না; কাল তবে কেন তুমি আমাকে নিয়ে উত্তরের ঘরে ঘুমোলে! তুমি রেঙ্গুনে গেলে তোমার ঘরে তো পিদিম জ্বলে না। মায়ের ঘরে জ্বলছিল কেন? আমাদের রাস্তা দিয়ে যখন বলো হরি যায়, তোমরা কেন বলো মড়া যাচ্ছে! মরে গেলেই তো মড়া হয়; তখন তাকে পোড়ানো হয়। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ কেন বড়মা?'

বিলু চপলার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি সব জানি, আমি সব জানি। মা ওই বেড়ালটার মতো মরে গেছে। ওরা সব রাত্তিরবেলা পোড়াতে নিয়ে গেছে। আমি সব জানি। তাই তুমি সকালবেলা আমাকে এখানে বেড়াতে এনেছ! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ।'

চপলা এইবার নিজেই কেঁদে ফেললেন। একটা অপরাধবোধে ভেতরটা ছেয়ে গেল। ভীষণ বুদ্ধিমান এই শিশুটির প্রতি অবিচার করা হল। শেষ সময়ে আরতির কাছে একবার আনলেই হত। দুপুরের দিকে যখনও তার সামান্য জ্ঞান ছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে এপাশে ওপাশে বিলুকে খুঁজছিল। একবার যখন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'দিদি, বিলু,' তখন সবাই ফিসফাস করে বাধা দিয়েছিল, বড় ছোঁয়াচে রোগ, বড় ছোঁয়াচে রোগ। বড় দুঃখ পেয়েছিলেন চপলা, ছোঁয়াচের ভয়ে মানুষটাকে এইভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বেশি বুঝে ফেললে মানুষের এই অবস্থাই হয়। হৃদয়হীন পণ্ডিত। এই শিশুটির কাছে সে আজ মিথ্যাবাদী হয়ে গেল।

বিলুকে নিয়ে কী করবেন যখন চপলা বুঝতে পারছেন না, ঠিক সেই সময় ওপার থেকে একটা নৌকো এসে ভিড়ল এপারে। খুব চেনা একজন কেউ নামছেন। ভদ্রলোকের ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। চপলা চোখ মুছে তাকালেন, নারাণ ঠাকুরপো। তাঁদের পরিবারের এক বন্ধু। আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়। সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে এমন সাহায্যকারী মানুষ আর হয় না। ছোটকত্তা কী সাহসী! ইনি তার ওপর যান। মাথায় সামান্য ছিট আছে। মাঝে মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যান। বিয়ে থা করেননি। কখনও আমির, কখনও ফকির! কখনও রাজবেশ, কখনও নাঙ্গাবাবা। নিজের কোনও স্থায়ী আস্তানা নেই। আরতির অসুখের প্রথম দিকটায় ইনি খুব করছিলেন। কী একটা সামান্য ব্যাপারে মুকুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায়, রাত বারোটার সময় অভিমানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যাতে যেতে না পারেন, চপলা জুতো লুকিয়ে ফেলেছিলেন। খালি পায়েই বেরিয়ে গেলেন গটগট করে। থাকব না তো থাকব না। এমনই খেয়ালি মানুষ। আরতি বাবাকে বলেছিল, তুমি মানুষ চিনলে না। তা পরমুহূর্তে মুকুজ্যেমশাইও বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য মিনিট পনেরোর মধ্যেই জুতো বগলে ফিরে আসতে হল। গোটা সাতেক লেড়িকুকুর এমন তাড়া করেছিল,

চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা বলে জুতো কোলে দৌড়। ফিরে এসে স্বীকার করেছিলেন, আমি একটা বেটপ রামছাগল।

চপলা দেখছেন নারাণ ঠাকুরপো পাড়ে উঠছেন। পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতি। সামনে লুটোনো কোঁচা। গায়ে দুধ সাদা পাঞ্জাবি। একেবারে রাজবেশ। পেছন পেছন আসছে নৌকোর মাঝি দু'জন। তাদের মাথায় বিশাল এক কাঠের বাক্স। চপলাকে তিনি প্রথমে লক্ষ করেননি। হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন— 'মেজবউদি আপনি এখানে?' উত্তরটা নিজেই দিলেন, 'অ বুঝতে পেরেছি।' ভীষণ আবেগ প্রবণ, স্পর্শকাতর মানুষ। চোখে জল এসে গেছে। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। মাথায় বাক্স নিয়ে মাঝি দু'জন নড়বড় করছে।

চপলা বললেন, 'চলো। বাড়ি যাই।'

নারান বিলুর হাত ধরে বললেন, 'যারা বীর, তারা কখনও কাঁদে না। মেয়েরা কাঁদে।'

চপলা জিজ্ঞেস করলেন, 'সিন্দুকে কী?'

'জ্যোতিষের বই। যা ছিল সব নিয়ে চলে এলুম।'

বিলুর নারাণকাকু। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। বিশাল সিন্দুকটা নীচের একটা ঘরে ঢুকল। জানলাহীন ঘুপচি একটা ঘর। অনেকটা বন্দি নিবাসের মতো। ধবধবে পাঞ্জাবিটা একটানে খুলে পেয়ারাগাছের শুকনো ডালে ঝুলিয়ে দিলেন। বাতাসে সেই পাঞ্জাবি পতাকার মতো পতপত করে উড়তে লাগল।

চপলা বললেন, 'এটা কী হল? হ্যাঙারে ঝুলিয়ে আলনায় রাখলে ক্ষতি কী? ছিঁড়ে যাবে। কাকে নোংরা করে দেবে!'

'এটা হল সন্ধির শ্বেত পতাকা। আমি ক্যালকুলেশান করে দেখলুম, তেইশ বছর সময় খুব খারাপ। ওয়ান বাই ওয়ান। একে একে সব যাবে। দৃষ্টি পড়ে গেছে। মহারিষ্টি যোগ। তাই একটু সাদা দেখাই। সারেন্ডার। হাত তুলে দিয়েছি। এইবার তুমি কী করবে করো।'

'এইটা আমি ঠিক বুঝি না ঠাকুরপো।'

'বোঝার দরকার নেই। যা হচ্ছে হদ্দাও, যা যাচ্ছে যেদ্দাও।'

ফাঁ ফাঁ করে বিশাল দু'টিপ পরিমাণ নস্যি দু'নাকে গুঁজে দিলেন। পায়ের ঝকঝকে দু'পাটি গ্রিসিয়ান জুতো একটা ডাব্বার মধ্যে ফেলে দিয়ে মালকোঁচা মেরে চলে গেলেন দক্ষিণের ঘরে। সেখানে যেন প্রথম দিনের যুদ্ধের পর পাণ্ডবসভা বসেছে।

ছোটকত্তা শুধু একটি কথাতেই অভ্যর্থনা জানালেন, 'জাস্ট ইন টাইম।'

নারাণ আরতির খাটে বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে বসে রইলেন নিশ্চল হয়ে। আদুড় গা। চওড়া পইতে পিঠের ওপর দিয়ে খেলে গেছে। নধর সাত্ত্বিক চেহারা। যখন আমিরি ভাবে থাকেন তখন চেহারায় বেশ একটা কান্তি আসে। ওইভাবে বসে থাকতে থাকতে নারাণ খাটের কাঠের খাঁজ থেকে লম্বা এক গুছি চুল টেনে বের করে আনলেন। ঘরের সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কার কাণ্ড! এ তো দেখছি তুকতাকের ব্যাপার। ছোটবউদির চুল। এর সঙ্গে তো আরও কিছু থাকার কথা। চুনের মোড়ক, জবাফুল, পায়ের নখ।'

ছোটকত্তা ছাড়া সবাই ঝুঁকে পড়লেন বিষম কৌতূহলে।

মেজকত্তা বললেন, 'সে আবার কী? তুকতাক কে করবে? এসব করার তো কেউ নেই এ বাড়িতে!'

'আপনাদের এই বাড়িতে বাইরের লোকই তো বেশি। এটা তো ধর্মশালা। মেজবউদি বলতে পারবেন।'

ঠিক সেই সময় বিলুকে নিয়ে চপলা ঘরে এলেন। বিলুকে দেখে সবাই প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এ কী?'

চপলা বললেন, 'আর লুকোবার প্রয়োজন নেই, ও সবই জানে। অনেক আগেই জানে। বুঝদার ছেলে তো!'

বিলুর ভেতরটা আবেগে ফুলছিল। বুঝদার শব্দটা তার কান্না থামিয়ে দিল। বিলু ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। প্রসঙ্গটা ঘুরে গেল সদ্য আবিষ্কৃত চুলের বিষয়ে।

ছোটকর্তা নীরব ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'অপরাধী আমি। ওটা তুকতাক নয়। একটা সেন্টিমেন্ট। চুলের ডগা থেকে আমিই একটু কেটে রেখেছি। পরে ঠিকমতো সংরক্ষণ করব বলে। আমার কাছে একটা কিছু স্মৃতি থাকা চাই তো। আমি তখনই বলেছিলুম, মেজদা, সংসারে আমাকে ঢুকিয়ো না। আমার আকাশ পাহাড় নদীই ভাল। এরা কখনও ছেড়ে যায় না। যে যায় সে তো যায়, যে থাকে তার হোঁচটটা একবার ভাবো! জীবনে যে মানুষ কাঁদেনি সেও কাল কেঁদেছে। না না, দ্যাটস ভেরি ব্যাড। ডিসগ্রেসফুল। কী করব! কেঁদে ফেললুম। আর এই যে কান্না একবার আমার ভেতরে ঢুকল, এ কি আর সহজে বেরোবে। রয়েই গেল। তোমরাই আমার স্বভাবটা খারাপ করে দিলে। আই ফল আপঅন দি থর্নস অফ লাইফ! আই ব্লিড! দেখছ! আমার চোখে জল আসছে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন আই অ্যাম ক্রাইং! হোয়েন দি ল্যাম্প ইজ শ্যাটার্ড। দি লাইট ইন দি ডাস্ট লাইজ ডেড।'

ছোটকর্তা মুখ নিচু করলেন। একটু সামলে বললেন, 'আমি জানি ছেলেটাকে দেখিয়ে তোমরা আবার ষড়যন্ত্র করবে পিঁড়েতে বসাবার। আমি অ্যাম দি লাস্ট পার্সন। ভুল একটা করিয়েছ, বিশ্বাসঘাতক করতে পারবে না। আমি বাকি জীবনটা বাঁচব স্মৃতিতে কল্পনা নিয়ে। তোমাদের জীবন পরিকল্পনা ইউসলেস, ফুল অফ ব্লান্ডার্স অ্যান্ড পিটফলস। মেজবউদি আছেন, মেজদা আছে ছেলেটার জন্যে আমি ভাবি না। যে অপরাধ করেছি তাব প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।'

'ছোড়দা আপনার অপরাধটা কী?' নারাণ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মুখে বলতে পারব না, তবে আমি লিখে রেখে যাব। আমি শুধু আমার জাজমেন্টটা কত ভুল তাই দেখছি। মুকুজ্যে মশাইয়ের অমন শরীর স্বাস্থ্য দেখে ভেবেছিলুম, তাঁর যখন মেয়ে নিশ্চয় দীর্ঘজীবী হবে। এ তো দেখি তিরিশের চৌকাঠও পেরোতে পারল না। মানুষের বাইরের অ্যাপিয়ারেনসের কোনও দাম নেই। মিসলিডিং।'

মুকুজ্যেমশাই অধোবদন। হাতের ফরসা ফরসা আঙুল নিয়ে খেলা করছেন আত্মস্থ হয়ে। ছোটকর্তা শ্বশুরমশাইকে কখনও বাবা বলে সম্বোধন করেননি। ওটা বড় বাঙালি ব্যাপার। ছোটকর্তা কখনও শ্বশুরবাড়ি যাননি। ওটা ভীষণ ইডিয়োটিক। পমেটম টমেটম মেখে বেনারসি বউ নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, না শ্বশুর বাড়ি। একেবারে মেয়েলি ব্যাপার।

মুকুজ্যেমশাইকে দেখলে করুণা হয়। তাঁর হয়ে মেজকর্তা বললেন, 'ওঁর কী দোষ! আরতির তো এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়, আনন্যাচারাল। কোথা থেকে একটা ইনফেকশান এসে গেল। এমন ইনফেকশান, যার কোনও ওষুধ নেই। মুকুজ্যেমশাই বা কী করবেন, আর আরতিই বা কী করবে! এভরি থিং ইজ ভাগ্য।'

'নট ইয়োর ড্যাম ভাগ্য। এভরি থিং ইজ ইমিউনিটি। আর ইমিউনিটি আসে পার্সোন্যাল হেলথ থেকে। ইনফেকশান ধরবে কেন? ইমিউনিটি শুড কিল ইট। এই তো এত বছর বেঁচে আছি একবারও আমার ফ্লু হয়েছে? হয়নি, হবে না কোনওদিন। আমার বাবা আমাকে সেই ইমিউনিটি দিয়ে গেছেন।'

চপলা বললেন, 'আজ এইসব আলোচনা থাক না। স্থান কাল পাত্র ভুলে গেলে চলে! ভাগ্য আমিও মানি না, কিন্তু ভাগ্য তৈরি হয়ে যায়। আরতির মৃত্যুর জন্যে দায়ী ইংরেজ সরকার। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াও। অন্ধকার থেকে এই সমাজকে আলোতে নিয়ে যাও, আরতিরা আর মরবে না। ছোটঠাকুর ব্যাপারটা তুমি পরে একটু ভেবে দেখো ঠান্ডা মাথায় বিলুর জন্মই আরতির মৃত্যুর কারণ।'

নারাণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার ক্যালকুলেশান একেবারে অভ্রান্ত। আমি বলেছিলুম। ও যদি আর একটা মাস পরে জন্মাতে পারত তা হলে আর কোনও ভয় ছিল না।'

ছোটকত্তা বললেন, 'স্টপ ইট। বউদি ঠিক বলেছে। আমরা স্থান কাল পাত্র ভুলেছি। অসভ্যতা করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের নর্মাল কাজকর্মে ফিরে যাব। আরও কাজ, আরও কাজ। ওয়ার্ক কনকার্স অল।'

॥ ৩ ॥

বিলুর জন্মই আরতির মৃত্যুর কারণ। সেই ছয় কি সাত বছর বয়সে শোনা এই কথাটি আমার মনে আজও গেঁথে আছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। পরিত্যক্ত জীর্ণ একটি কুটিরের মতো। আমার এই খাঁচায় অনেক পাখি ছিল। বা আমিই ছিলাম এক সোনার খাঁচায়। অনেক পাখির মেলায়। একে একে সবাই উড়ে চলে গেছে। প্রত্যেকেই ফেলে রেখে গেছে বহু বর্ণের স্মৃতির পালক। আশ্চর্যের ব্যাপার পৃথিবীর এত কিছু বদলাল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে শহরের জোয়ার উপচে এসে সত্তর বছর আগের সাবেক শান্ত পল্লিটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; কিন্তু উত্তরদিকটি আজও পড়ে আছে সেই অতীতে। বর্তমান সেখানে প্রবেশপথ পায়নি। উত্তরের খিড়কির দরজা খুললেই সেই সুঁড়ি পথ। ঘাসের স্বভাবে অদ্ভুত এক পরিমিতি বোধ আছে। বাড়ে আবার নিজেরাই ছোট হয়ে যায়। অজস্র ফার্নের জটলা। আপনা থেকেই জন্মেছে পাতাবাহার। সেই শামুকের দল। জানি না, এগুলো সেই সত্তর বছর আগের শামুক কি না। পথ হেঁটে হেঁটে গিয়ে উঠেছে সেই কূর্মাকৃতি ভূমিখণ্ডে। সার সার সাবু গাছ এখনও আছে। জ্যৈষ্ঠে তাদের গর্ভসঞ্চার হয় যথারীতি। সেই মেহগিনি, শিশু, কৃষ্ণচূড়া আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্তরের বৃদ্ধ যখন তিনকদম হেঁটে এক দমক নিশ্বাস নেবার জন্যে দাঁড়ায়, গাছেরা বলাবলি করে, আরে বিলু নাকি! কেমন আছ হে! বৃক্ষরাজ জানি না কেমন আছি, তবে তোমার তলায় বসে চৌষট্টি বছর আগে শেখা একটি গান শোনাতে পারি। আমি এই যে-জায়গাটায় বসছি এখানে দুই সুন্দরী রমণী পাশাপাশি বসে গেছেন। পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে। তাঁরা ছিলেন আমার মা আর বড়মা। তাঁরা এই গান গাইতেন, তুমি শুনেছ। সেই বড়মা এই গান আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বলে। কেমন আছি? তাই তো? দম নেই; তবু সুরেই শোনাই:

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সংকটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে।

হঠাৎ আমার বয়েস যেন কমে এল। দেহ খাটো হয়ে গেল। আমি সেই বিলু। এ গলা আমার বড়মায়ের। দুখ ভয় সংকটে এই প্রান্তরে তাঁরাই আমাকে রেখেছিলেন। দেখো, তুমি আছ, ওই গঙ্গাও আছে, এই মাটি তোমাদের সত্তর বছর ধরে ঝরানো সব পাতা বুকে ধরে আজও রয়েছে। আমিও হয়তো আছি আরও কিছু দিন। শুধু তাঁরাই নেই। কিন্তু গাছ, বয়স এমন জিনিস, সময় যত এগোয় মন তত পেছোয়। দু'জনেই পথিক, একজন এগোচ্ছে সামনে, একজন যাচ্ছে পেছনে। তুমি এক বালতি জলে একটা টাকা ফেলো। এইবার জলটাকে নাড়িয়ে দাও। টাকাটা আর দেখতে পাবে না। জল শান্ত হলেই দেখবে বালতির তলায় চকচক করছে টাকা। স্মৃতি হল ওই টাকা, যৌবন হল অশান্ত জল। যৌবনের ঘোড়া জীবনের মাঠ পেরিয়ে চলে গেছে। প্রশান্ত বার্ধক্যের তলায় একে একে খুঁজে পাওয়া যায় স্মৃতির খণ্ড। আমি এখন ইচ্ছে মতো বড় হতে পারি, ছোট হতে পারি। যা

আমার মনে পড়ার কথা নয় তাও মনে পড়ে। স্পষ্ট। যেন এই তো সেদিন। আমি তোমার অজস্র শিকড়ের গুপ্ত কন্দর থেকে অটুট একটি বাদাম বের করে আনতে পারি। চপলা আরতির ঠোঁটে গুঁজে দিচ্ছিল, হঠাৎ পড়ে গেল। পড়ল ডোরা টানা পামশুর ওপর। পড়েই গড়িয়ে গেল। গাছ, তোমার মনে আছে, সে যুগের মেয়েরা এক ধরনের মুখ চাপা জুতো পরতেন। সাদা ডোরাকাটা। কালোর ওপব সাদা ডোরা। কী অপূর্ব দেখাত! দুধের মতো পা। কুচকুচে কালো জুতো। সিল্কের শাড়ির চওড়া পাড় তার একটু ওপরে। আবার পুরো হাতা সাদা ব্লাউজ। কুচকুচে কালো চুল। বিলু ছুটছে। বিলু গাছের শুকনো ডাল দিয়ে ঝরা পাতায় খোঁচা মারছে। যেই কোনও পোকা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছে সাহসী বিলু অমনি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দু'জনের কোলে। তাঁরা খুব সুন্দর একটা গন্ধ মাখতেন গায়ে। সেই গন্ধটাও আমার নাকে লেগে আছে। গঙ্গার বাতাসে চুল উড়ছে। উড়ছে শাড়ির আঁচল। তখন দিন হত স্বপ্ন নিয়ে, রাত নামত কল্পনার ডানা মেলে। ঘুম যেন নীল সমুদ্রে দোল খাওয়া ফুল। জীবন যেন বৃষ্টি ধোওয়া ঘাসের মতো সবুজ। তখন মনে হত প্রতিদিন বাঁচি, এখন মনে হয় প্রতিদিন মরি। তখন মনে হত এক-একটা দিন প্রজাপতির মতো উড়ে যাচ্ছে। এখন মনে হয় এক-একটা দিন মরা শ্যাওলার মতো শরীরে লেপটে যাচ্ছে। রোজ সকালে চোখ মেলে দেখি দিন এল। রাতে চোখ বোজবার সময় ভাবি, দিন গেল।

মৃত্যু আমার জীবনে প্রথম ছাপ মেরে গেল সেই বাল্যকালেই। জানিয়ে দিয়ে গেল, আমার অদৃশ্য হাত তোমায় ঘিরে আছে। জীবন যেন এক মেলার মতো। সবাই বেশ বসে ছিলুম গাছের তলায়। একজন একজন করে সবাই উঠে চলে গেল। 'আচ্ছা আমি তা হলে আসি, তোমরা রইলে।' শেষে আর তোমরা নয়, কেবল তুমিই রইলে।

আমি সেই শিশুগাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। ভোরের আলোয় চারপাশ ভেসে যায়। সেই সত্তর বছরের পুরনো আকাশ মাথার ওপর উপুড় হয়ে আছে। সেই সত্তর বছরের পুরনো বাতাস। ধীরে ধীরে সব ফিরে আসতে থাকে। বুঝতে পারি জীবন এমন এক খেলা, যে খেলায় জেতা যায় না। সময় বড় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাটকে সবাই 'এক-অঙ্কের-অভিনেতা'। ফিরে আসার উপায় নেই। তবু চেষ্টা করি, মানুষ যদি ঝিকি মেরে ওপরের জিনিসের নাগাল পেতে পারে, তা হলে ঝুঁকে পড়ে নীচের জিনিসের নাগাল পাবে না কেন?

ওই আলো-আঁধারি মাঠে আমাকে ওইভাবে ঘুরতে দেখে একদিন ছোট্ট একটি মেয়ে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কী করছ দাদু?'

'খেলা করছি মা।'

'কী খেলা গো?'

'চোর চোর।'

'তুমি বুঝি চোর?'

'হ্যাঁ মা।'

'ওরা বুঝি সব লুকিয়ে আছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'কোথায়?'

'ওই যে গাছের আড়ালে আড়ালে।'

'শোনো, তুমি কি একটা পাগল? কেউ তো কোথাও নেই!'

মেয়েটি ছুটে পালাল। সত্যিই তো। কেউই তো নেই কোথাও। একা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রেতাত্মার মতো। ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে ঘুরছি নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ। গঙ্গার ধারের সেই জায়গাটায় গিয়ে বসলুম, রোজই যেমন বসি। পাশে হেলান দেবার মতো কেউ নেই। পাড়ে একটা নৌকো এসে ভিড়ল। দেখি, সেই নারাণকাকু নেমে আসেন কি না! একজন ফিরে এলে, বাকি সবাই আসবেন। না তা হয় না।

রিলে রেসের মতো বিলু এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে এল। চপলাই তার মা। আরতি ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। বিলুর মতোই। বিলু আর আরতি যেন ভাইবোন। বিছানায় শুয়ে দু'জনে মারামারি। সব বালিশ ছিটকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। চাদর এলোমেলো হয়ে গেল। খাটের পাশের টেবিল উলটে গেল। চপলা দৌড়ে এলেন, 'এ কী কুরুক্ষেত্র!' বিলু তখন মায়ের বুকের ওপর পড়ে সমানে কাতুকুতু দিয়ে চলেছে। আরতি চিৎকার করছে, 'দিদি বাঁচা। দিদি বাঁচা।' আরতি আর বিলুর দুপুরটা ছিল বড় আনন্দের, মুক্তির, স্বাধীনতার। বাড়ির দুই কর্তাই বাইরে। ছেলেকে নিয়ে আরতি ফিরে যেত তার শৈশবে। দু'জনেই তখন সমবয়সি। ঘুপচি ঘাপচিতে ভরা বিশাল বাড়ি। বারান্দার ঘোর প্যাঁচ। দু'দিকে দুই সিঁড়ি। সিঁড়ির ঘর। ছাতের সিঁড়ি। শুরু হল আরতি আর বিলুর চোর চোর খেলা। এ বলে টুকি, ও বলে টুকি। চপলা বলেন, 'ওরে এই ঠিক দুপুরবেলা দুটোতে একটু লক্ষ্মী হয়ে শো না। সন্ধের দিকে শরীরটা একটু ঝরঝরে লাগবে।' কে কার কথা শোনে! বিলু একদিন 'টুকি', বলে এমন লুকোল যে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। শেষে আরতির কান্না। 'ও দিদি ছেলে আমার পাতালে চলে গেছে।'

চপলার বিশাল বিশাল দুটো খাতা ছিল। মোটা বালি বালি কাগজ দিয়ে বাঁধাই করা। রেঙ্গুনের সঙ্গী। সেই খাতায় আঁকা যত নকশা আর ডিজাইন। বিলু দেখত আর অবাক হয়ে যেত। ফুল লতা পাতার কত ঘোর প্যাঁচ। টোপা টোপা ফুলের পাপড়ি আর মাঝখানের বুটি কী সুন্দর! বিলু স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছে তো দেখছেই। চপলা বলতেন, 'তোমার কেন এত ভাল লাগছে জানো বাপি, এর মধ্যে আছে জ্যামিতি। আর একটু বড় হলেই তুমি শিখবে জ্যামিতি। প্রকৃতির সবেতেই আছে নিখুঁত জ্যামিতি।'

চপলা দুপুরবেলা সেই নকশার খাতা নিয়ে বসতেন। ছুঁচ সুতো কুরুশ কাঁটা নিয়ে এমব্রয়ডারি করছেন, আরতি এসে নাড়া দিচ্ছে, 'দিদি চল, বিলু পাতালে তলিয়ে গেছে।'

বিলু আর পারল না। সে এতক্ষণ চপলার পেছনে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ছিল। পাতলা নীল আঁচলের ভেতর দিয়ে দেখছিল নীল জগৎ। কুঁক কুঁক করে হেসে উঠল। বিলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আরতির কান্না, 'ওরে তুই যদি সত্যিই পাতালে তলিয়ে যেতিস!'

চপলা হাসতে হাসতে বলতেন, 'তুলি, তোর পাতাল কোথায় আছে?'

চপলা আরতির একটা আদুরে নাম রেখেছিলেন তুলি। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো দেখতে তাই তুলি। আরতির বিশ্বাসে পাতাল ছিল। কল্পনায় সে দেখতে পেত পাতাল। সর্পরাজ বাসুকির রাজত্ব। থরে থরে সাজানো সোনার ঘড়া। মোহরের পাহাড়। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে বড় বড় হিরের টুকরো।

বারান্দার একটা দিক পুবে বেঁকে একটা চৌকো মতো অংশে শেষ হয়েছে। সেটা বাগানের দিক। থাম বেয়ে বাগান থেকে লতিয়ে এসেছে মাধবীলতা। আরতি ওই জায়গাটায় বিলুকে চান করাত। বড় সুন্দর জায়গা। অনেকটা কুঞ্জবনের মতো। রোদ ঝলমল। হঠাৎ একটা পাখি উড়ে এল। প্রজাপতির ঝাঁক দোল খেয়ে গেল মাধবীলতায়। আরতির কল্পনা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত। ছেলেকে বললে, 'আয় তোকে একটা যমুনা তৈরি করে দিই।' নর্দমার মুখ বন্ধ করে ঢালা হল বালতি বালতি জল। পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মতো হল। তার বেশি আর করা যেত না। জল বেরিয়ে যেত। ভাসিয়ে দেওয়া হল মাধবী ফুল। ভাসল বিলুর রাজহাঁস। গাটাপার্চারের তৈরি। কাগজের নৌকো। পরিপূর্ণ যমুনা। বিলুর তেলমাখা শরীর সেই যমুনায় পিছলে বেড়াত। হাত ছুড়ছে, পা ছুড়ছে। জল ছিটকে আরতিও ভিজছে। ফরসা কপালে জড়িয়ে আছে ভিজে চুল। সারা মুখে মুক্তোর দানার মতো জলের বিন্দু। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ির প্রায় সবটাই ভিজে। খাড়া নাক।

যেন মোম দিয়ে তৈরি। নর্তকীদের মতো দুই হাত। সেই হাতে মাঝে মাঝে নিজেই জলখলবল করে দিচ্ছে। ছেটকানো জলে সূর্য পড়ে নীল লাল হলুদ গোলাপি রঙের বর্ণ বিভঙ্গ। মাঝে মাঝে আলুর হাঁসটাকে ঠেলে দিচ্ছে। দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে এ মাথা থেকে ও মাথায়। এরই মাঝে বারে বারে নৌকাডুবিও হচ্ছে।

পাশেই রান্নাঘর। চপলা বামুনদিকে রান্নার তালিম দিচ্ছেন। চপলা বহুরকম রাঁধতে জানেন এবং অসম্ভব ভাল রাঁধেন। বামুনদি আধা-শহরের মেয়ে। রাঁধতে প্রায় জানতই না, ক্রমশই পাকা হয়ে উঠছে। শেখার ইচ্ছে আছে, বয়েস আছে, উৎসাহ আছে, শরীর আছে, শক্তি আছে। চপলা অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলেন মা আর ছেলের কলরবলর। খুন্তি নিয়ে তেড়ে এলেন, 'ওঠ, শিগগির ওঠ। একঘণ্টা হয়ে গেল বুড়ির হুঁশ নেই। দুটোতেই এবার জ্বরে পড়বে।' আরতি অমনি বলবে, 'তুইও আয় না দিদি আমাদের যমুনায়।'

'তোর যমুনা আমি বের করছি। আজ ছোটঠাকুর আসুক। আমি যদি না বলেছি।'

চপলা কেমন করে আরতি হবে! আরতির মতো সুন্দর একটা শিশুর মন পাবে কোথা থেকে! সারাটা দিন বিলুর সঙ্গে সমানে কে ছেলেমানুষি করবে। বিলু তাকে একটু ভয় ভক্তি করে। চপলার চেহারায় একটা মেমসায়েব মেমসায়েব ভাব আছে। এক মাস রেঙ্গুনে থেকে, প্রথম বাড়িতে ঢোকামাত্রই বিলু ভয়ে দৌড় মারবে। রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ারঘর। সেই ঘরে বিশাল বড় একটা জালা আছে। জালায় থাকে রান্নার আর খাওয়ার জল। বিলু তার আড়ালে গিয়ে লুকোবে। চপলাকে দেখে ভীষণ ভয়। দুধে আলতা রঙে লালের ভাগ আরও বেড়েছে। তেমনি সাজ পোশাক। তেমন চুল। কেমন যেন অচেনা। পাতলা ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। হাতের আঙুলগুলো যেন বিদ্যুতের মতো। বড়মা যেন আরও লম্বা হয়ে গেছে। বিলু যেন আগুন দেখছে। জালার আড়ালে চোখ বুজিয়ে চুপটি করে বসে থাকত। আর বাড়ি এসে চপলার প্রথম কাজই ছিল বিলুকে কোলে নেওয়া। একমাস না দেখে আছেন। এই অদর্শনই ছিল ভীষণ কষ্টের। পুতুলের মতো ছেলেটা। কোথাও গেলে ওর কথাই বেশি মনে পড়ে। নিজের তো ছেলেপুলে হল না। সে আর কী করা যাবে! চপলা সোজা সেই জালাটার কাছে এগিয়ে যেতেন। মাথা নিচু করে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে আছে বিলু। চোখ বুজিয়ে। কোনও দিকে তাকাবে না। শুধু ভয় নয়, অভিমানও আছে। চপলা সোজা তাকে কোলে তুলে নিতেন; তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত ভাব করার পালা। চপলার ট্রাঙ্ক থেকে বেরোত নানা জিনিস একে একে। সবই বিলুর জন্যে। প্রোমের পাথরের বুদ্ধমূর্তি। পেনাং-এর প্যাগোডা। রেঙ্গুনের বাঁশের বাক্স। বিলুর জ্যাঠামশাই পাশে বসে বলতেন, বাবা, সবই বিলুর জন্যে, আমাদের জন্যে কিছুই নেই। বিলু সেই বিস্ময়কর ট্রাঙ্কটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। চারদিকে জাহাজ কোম্পানির সিল মারা। জাহাজের ছবি। ধোঁয়া ছেড়ে ভেসে যাচ্ছে। বিলু জাহাজের ভোঁ বাজাবার শব্দ শুনতে পেত। সমুদ্রের গর্জন। ট্রাঙ্কের ভেতরটা ঝকঝকে নীল। সব শেষে বেরিয়ে আসত একটা হাত পাখা। ভাঁজে ভাঁজে খুললেই যেন একটা ময়ূর পেখম। তেমনি তার কারুকার্য। বাতাস করলেই চন্দনের গন্ধ। গতবার চপলা আরতির জন্যে এনেছিলেন রুবির নেকলেস। আরতি পরবে কী! তার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতেই দিন চলে গেল।

সেই দুপুর। নিস্তব্ধ বাড়ি। আরতিই তো মাতিয়ে রাখত। এতখানি চুল এলো করে একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর। পৃথিবীর খবর নিয়ে তার কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। সে তো বিরাট জায়গা। আরতির পৃথিবী তার বাড়ি, দিদি, ছেলে, স্বামী, মেজঠাকুর, বামুনদি, বেড়াল, পাখি, গাছ, আকাশ, নদী। আর একটা গানের খাতা। খাতাটা ছিল তার মায়ের। গুটি গুটি অক্ষরে ভাল ভাল গান লেখা। সেই খাতায় আরতিও কিছু গান যোগ করেছিল। চপলা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনেক গান। পা ছড়িয়ে সেই খাতাটা নিয়ে বসত। প্রথমে একটু হুঁহুঁ করেই যে-কোনও একটা গান ধরে ফেলত। গাইত অসাধারণ। একেবারে ফ্লুটের মতো গলা ছিল। আরতির মা ছিলেন অসাধারণ

গায়িকা। আসল খাওয়ার চেয়েও টুকটাক খাওয়ার দিকেই আরতির মন ছিল বেশি। আচার, আলুকাবলি, আর ভালবাসত দই। অসুখের সময় দই বারণ হয়ে গিয়েছিল। কেবলই বলত, দিদি, সেরে ওঠার পর আমাকে দই খাওয়াবি তো! পরেশের দই।

চপলা সেই বিখ্যাত খাতা নিয়ে বসেছেন। ভীষণ জটিল এক নকশা। যত জটিল হবে মনের ছটফটানি তত কমবে। উত্তরের বারান্দায় কর্কশ স্বরে কাক ডাকছে। রোদ ঘুরছে। শীত আসছে। আর কিছুদিন পরেই কমলালেবুর মতো হয়ে যাবে। ডোরাকাটা একটা সিল্কের প্যান্ট আর সিল্কের গেঞ্জি পরে বিলু নিজের কাজে ব্যস্ত। কিছুদিন আগে কল্যাণ কোথা থেকে কিছু ফাউন্ড্রি টাইপ এনে বিলুকে দিয়েছিল। বড় বড় বাংলা অক্ষর। কালি মাখিয়ে কাগজে চেপে ধরলেই ছাপার মতো বর্ণ। সেইগুলো দিয়ে বিলুর নামও লেখা যেত। লেখা যেত আরতি, চপলা। ওই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকত বিলু।

চপলা ভেবে দেখলেন ছেলেটা নকশা, রেখা, ত্রিকোণ, সমান্তরাল-রেখা, বৃত্ত, এইসব ভীষণ ভালবাসে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন অন্য এক জগতে চলে গেছে। সৌন্দর্যের জগৎ, নিয়মের জগৎ, বিন্যাসের জগৎ। ছোটঠাকুর গণিতে সুপণ্ডিত। জ্যামিতি ভীষণ ভালবাসেন। সেই বীজ ঢুকেছে ছেলের ভেতর। চপলা বিলুর মাথায় ঢুকিয়েছেন, ওইরকম ছাপার অক্ষরের মতো হাতের লেখা করতে চাও!

বিলুর মহা উৎসাহ। বিলু একটা কিছু হতে চায়। সবাই তাকে জানবে, প্রশংসা করবে। একজন বড় খেলোয়াড়, কি শিল্পী, কি অভিনেতা, কি বিশাল বড় এক বিজ্ঞানী, একজন বড় কেউ। বড় হবার নেশা চপলাই ঢুকিয়েছেন।

'তা হলে তুমি এই ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে লেখো, একঘর লেখা।'

একঘর শব্দটা ভীষণ ভাল লেগেছে বিলুর। এক পাতা দু'পাতা নয় একঘর লেখা। চপলা একে একে সব অক্ষর পেতে দিয়েছেন। বিলুর কাজ হল ঠিক ওইরকম করে লেখা। বাঁদিক থেকে ডানদিক প্রায় দশফুট খোলা জায়গা। অক্ষর দিয়ে ভরে দাও। লাইন যেন সোজা থাকে। একেবারে রেললাইনের মতো। বিলু একেবারে মশগুল হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে, হাঁটু মুড়ে সামনে ঝুঁকে লিখছে।

চপলা এমব্রয়ডারি করছেন। অদূরে বামুনদি বসে বসে ছোটবউদির কথা বলছে। বিলু শুনছে। ছোটবউদির আংটি হারানোর গল্প। হিরের আংটি। ছোটবউদি রান্নাঘরে লুকিয়ে বসে আছে। ছোটবাবুর সামনে যাবে না। মেজবাবু এসে বোঝাচ্ছেন, তুমি কতদিন লুকিয়ে বসে থাকবে। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আমি বুঝিয়ে বললে, ও আর রাগ করবে না।

ছোটবউদি বলছেন, বাকি জীবনটা আমি না হয় নীচের একটা ঘরেই থাকি।

তা তো থাকবে, সেখানে যে হাজার হাজার আরশোলা।

তা হলে না হয় ছাতের চিলেকোঠায়।

দিনের বেলাটায় তোমার তেমন কোনও অসুবিধে নেই। সমস্যা রাতের বেলায়। একটা-দুটো ভূত যে-কোনও সময় বেড়াতে আসতে পারে।

তা হলে মেজদা আমি কী করি?

ছোটবাবু শুনে বললেন, কোনও জিনিস হারানো অসাবধানতা। সংসারীর অসাবধানী হলে চলে না। তবে হারিয়ে গেলে আর কী করা যাবে! হারায়নি। নিশ্চয় কোথাও আছে। খাটের মাঝখানে বাবু হয়ে বোসো। চোখ বোজাও। তারপর ধীরে ধীরে গোনো, এক থেকে একশো, একশো থেকে এক। তারপর নিজেকে অনুসরণ করো। কোথা থেকে কোথায় গেলে, কোথায় কী করলে। বাড়ির জিনিস বাড়িতেই আছে।

মেজকত্তা আর এক ছেলেমানুষ। ছোট বউয়ের ওপরে যায়। দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে

মেরে দেখছেন আরতি ধ্যানস্থ। যেন ধ্যানীবুদ্ধ। নড়ছেও না চড়ছেও না। মোমের মতো চকচকে মুখ। টিকলো নাক। কান পর্যন্ত টানা টানা ভুরু। বড় বড় চোখের পাতা। ডগাগুলো ওপর দিকে অল্প বাঁকা। মেজকত্তা এক টুকরো কাগজ গুলি পাকিয়ে ছুড়ে দিলেন। কোলে গিয়ে পড়ল। বুঝতেই পারল না। মেজকত্তা আর একটা কিছু তাক করে ছুড়বেন ভাবছিলেন। এমন সময় আরতি ধড়মড় করে নেমে সোজা ছুটে এল দরজার দিকে। মেজকর্তা সরে যাবার অবকাশ পেলেন না। আরতি সোজা তাঁর বুকে। মেজঠাকুর শিগগির চলুন বাগানে। টর্চ নিয়ে দু'জনে নেমে গেলেন বাগানে। জুঁই গাছের তলায় সেই আংটি। আলো পড়ে ধকধক করে জ্বলছে। পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে এক কোলা ব্যাং। আরতি কিছুতেই এগোতে দেবে না। ব্যাং যদি লাফ মারে!

দুপুরে দুই বউয়ে বাগান করার সময় মাটি চালাচালি হচ্ছিল। সেই সময় আংটিটা খুলে রেখেছিল ছোটবউ। বামুনদি অতীত থেকে এক-একটা ঘটনা তুলে আনছে। বিলু শুনছে আর লেখা দিয়ে ঘর ভরছে। চপলা মাঝে মাঝে দেখছেন কেমন হচ্ছে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে কোণ, ত্রিকোণ ঠিক করে দিয়ে আসছেন। বিলুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বামুনদিকে বলছেন, 'দেখবে বিলু কত ভাল ছেলে হবে! লেখাপড়ায় ওর চেয়ে ভাল ছেলে কেউ হতে পারবে না। সব পরীক্ষায় প্রথম হবে। কত সোনার মেডেল পাবে, কত বই পাবে ভাল ভাল। প্রাইজের বই দিয়েই ওর একটা ভাল লাইব্রেরি হয়ে যাবে। দেশ-বিদেশ থেকে ডাক আসবে। প্লেনে চেপে বিলেত যাবে। কাগজে কাগজে ওর ছবি ছাপা হবে বড় বড় করে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলোয়। তেমনি গানবাজনায়। তেমনি ছবি আঁকায়। দেখবে তোমরা কী একখানা ছেলে ও হবে।

শুনতে শুনতে বিলুর ভেতরে অদ্ভুত একটা ভাব হত। একটা আনন্দ। বিলু বড় হচ্ছে। কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। কোনও কিছুতেই না। সবাই হেরে যাচ্ছে। সে জিতে যাচ্ছে সব ব্যাপারে। সব্বাইকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যেত মায়ের কথা। এই যে এত সব হবে মা কী করে জানতে পারবে!

খড়ি ফেলে দিয়ে বড়মার পাশে এসে বসল। চোখ দুটো ছলছলে। চপলা বিলুকে কোলে টেনে নিলেন, 'বড়মা! মা কি এখন তারা হয়ে গেছে?'

বিলুকে সবাই বলেছে, 'তোমার মা আকাশে চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে একটা নতুন তারা হয়েছেন। সেই তারার চোখে তোমাকে তিনি দেখছেন।'

চপলা বললেন, 'হ্যাঁ রে। ঠিক আকাশের মাঝখানে একটা নতুন তারা।'

'আমি যখন বড় হব, বি: ত যাব, তখন মা আমাকে দেখতে পাবে? সব জানতে পারবে?'

'এখনই সব জানতে পারছে। মা তো আমার ভেতরে ঢুকে গেছে। ছোটমা তো বড়মার ভেতরেই থাকে। কেউ কি যেতে পারে। থেকে যা‌য় কারও না কারও ভেতরে। মা বাবা কখনও মরে না। মরে গেলে পৃথিবীতে বিরাট একটা ভূমিকম্প হবে, সমুদ্রের সব জল ছুটে আসবে। সবাই মরে যাবে।'

বিলুকে খুব সুন্দর করে সাজান চপলা। নিজেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজগোজ করে থাকতে পছন্দ করেন। তাতে মন ভাল থাকে। মনে ভাল ভাব আসে, চিন্তা আসে। তিনি বিশ্বাস করেন, মন্দির বাইরে নেই, আছে মানুষের ভেতরে। দেহই এক মন্দির। বিলুর সাজ শেষ করে, তার দাড়িটা নেড়ে দিয়ে বললেন, 'বিলুবাবু। বিলুবাবু এইবার জলখাবার খেয়ে আমার সঙ্গে খেলতে যাবে।'

'বড়মা, আমি এখন খাব না।'

'তা তো হয় না বাপি। বড় হতে হলে তোমাকে যে খেতে হবে। যে সময়ের কাজ ঠিক সেই সময়েই যে করতে হবে। যাদের কাজ এলোমেলো তারা তো বড় হতে পারে না। শরীরে শক্তি চাই, তা না হলে তো তুমি হেরে যাবে বাপি। আমার বাপি তো কারও কাছে হারতে পারে না। তুমি হারতে চাও, না জিততে চাও?'

'জিততে।' বিলুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

বিলুর হাত ধরে রবারের একটা বল নিয়ে চপলা বেরিয়ে পড়লেন। সে-যুগের মেয়েদের এই স্বাধীনতা ছিল না। চপলার ছিল। তিনি কারও তোয়াক্কা করতেন না। আমার কাজ আমার কাজ, আমার জীবন আমার জীবন। অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। চপলা বলতেন, 'আহা, ওদের তো কোনও কাজ নেই।'

চপলা বিলুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। সুমনদের বাড়ির পেছনে বেশ বড় একটা মাঠ আছে। মাঠের একপাশে গড়ের মতো একটা ভাঙা বাড়ি আছে। সবাই বলে হানাবাড়ি। বড় বড় খিলান। দরজা জানলা খুলে নিয়ে গেছে কবে! বাড়িটার কিছুটা আকাশ, কিছুটা অন্ধকার। একটা ইতিহাস পড়ে আছে মাঠের একপাশে। ছোটঠাকুর বাড়িটার ইতিহাস জানে। কোনও এক ঐতিহাসিক পুরুষের বাড়ি ছিল। তারপর খুনজখম, আত্মহত্যা। সব ছারখার। বাড়িটার ভেতরটা বিশাল। সত্যিই গড়ের মতো। আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। খুব ডাকাবুকোরাও সাহস করে ঢোকে না। শেয়ালের পান্থশালা। ভেতরে নাকি একটা ময়াল সাপ আছে। চপলার খুব ইচ্ছে করে ঢুকতে। ঢুকে দেখতে। ইতিহাসে ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে।

এই মাঠের দুটো জিনিসে তাঁর আকর্ষণ। মাঠের শেষ মাথায় আছে একটা বেলগাছ। সেই বেলগাছও তাঁর কৌতূহলের জিনিস; কারণ ওই গাছে নাকি এক ব্রহ্মদৈত্য থাকেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে। কী করে তা সম্ভব হবে! আর এই দুটো জিনিসেই বিলুর ভীষণ ভয়। বিলুর সেই ভয়ও কাটাতে হবে! কোনও ভয় নিয়ে বড় হলে, সেই ভয়টাই পরে অন্যভাবে চেপে ধরে। আর সব ভয়েরই উৎস মৃত্যুভয়।

সুমন, কল্যাণ, বিলু, আরও কয়েকটি ছেলে, সব মিলিয়ে চপলার স্পোর্টিং ক্লাব বেশ জমজমাট। আর সবেরই পেছনে বিলু। বিলুই উদ্দেশ্য। মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। মৃত্যুর দিক থেকে মনটা ঘোরাতে হবে। সবুজ মাঠে রোদ ঝলমলে আকাশের তলায় না ফেললে মন মরে যায়। কল্যাণের হুইসল চপলার ঠোঁটে। চপলা এখন পুরোপুরি রেফরি। শিশুরা তাকে ভীষণ ভালবাসে। তারা এমন মা তো দেখেনি। ছেলেদের সঙ্গে ছুটছে, হইহই করছে। খেলা শুরুর আগে তাদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্যায়াম করিয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে বিলুর ভীষণ প্রতিযোগিতা। কল্যাণের মধ্যে বড় হবার অনেক গুণ আছে। বয়েসে সামান্য বড় হলেও বিলু কল্যাণকে ধরে ফেলবে। কল্যাণই বিলুকে ছোটাবে। সামনে একটা জীবন্ত প্রতিযোগিতা রাখতে হয়। তা হলে কাজ ভাল হয়।

খেলা শেষ হবার পর চপলা সেই বেলগাছটার কাছাকাছি বসলেন, সকলকে নিয়ে গোল হয়ে। গুজব যে সত্য নয়, নেহাতই মিথ্যা রটনা, সেইটা প্রমাণ করে দিতে হবে। বসলেন, গল্প বলতে। মানুষের সাহসের গল্প, বীরত্বের গল্প, ছোট থেকে বড় হবার গল্প। রবার্ট ব্রুসের গল্প বলছেন চপলা। একটা মাকড়সা মানুষকে কত শক্তি দিতে পারে। পলাতক পরাজিত ব্রুস পরিত্যক্ত দ্বীপে জীর্ণ কুটিরে ছিন্ন বসনে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা মাকড়সা, এক বাঁশ থেকে আর এক বাঁশে যাবার চেষ্টা করছে, নিজের লালা থেকে সুতো বের করে। ছ'বারই সে পারল না। ঝুলে পড়ল। সাতবারে পারে কি না! যদি পারে তা হলে ব্রুস শেষ চেষ্টা করবেন ইংরেজদের কবল থেকে নিজের দেশ স্কটল্যান্ডকে উদ্ধার করতে। ছ'বার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ওই মাকড়সাটারই মতো। সাতবারের বার মাকড়সা সফল হল।

চপলা বলতে লাগলেন, ব্রুস কীভাবে ফিরে এলেন। গড়ে তুললেন নিজের বাহিনী। কীভাবে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হল। শেষ যুদ্ধে কীভাবে তিনি ইংরেজের এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জিতে স্কটল্যান্ডকে আবার স্বাধীন করলেন! ব্রুসের বুদ্ধি সাহস বীরত্ব ছেলেদের মনে কেটে কেটে বসিয়ে দিলেন।

অন্ধকারে সব অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বেলগাছের শীর্ণ ডালপালা অন্ধকার আকাশে যেন মন্ত্র লিখছে। গড়ের মতো বাড়িটার ভেতরে শেয়াল ডেকে উঠল সমস্বরে। একপাল ফুলের মতো শিশু

চপলাকে ঘিরে বসে আছে। বড় বড় চোখ। রেশমের মতো চুল। ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ। মাটির গন্ধ। ঘাসের গন্ধ। বন তুলসীর গন্ধ। রাতের প্রাণীরা বেরোবার জন্যে মুখিয়ে আছে। আধবোজা দিনের চোখ পুরো বুজে গেলেই সব বেরিয়ে পড়বে। রাতের রহস্য শিশুরা ঠিক বোঝে না। কেমন যেন হয়ে যায়। চপলা আবৃত্তি করলেন:

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাংলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে, যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য— মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান...

প্রত্যেককে বাড়ি পৌঁছে দিতে দিতে চপলা বিলুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। গরমজলে গামছা ভিজিয়ে বিলুর গা মোছালেন, হালকা করে পাউডার মাখালেন। পরিয়ে দিলেন পরিষ্কার নরম ইজের নরম জামা। নিজেও গা ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বিলুকে নিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে। পেতলের বড় প্রদীপ থিরথির করে জ্বলছে। দেয়ালে কাঁপছে ছায়া। পুব মুখে হাত জোড় করে বসে শুরু হল স্তবপাঠ।

তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যংময়ি ধেহি।
বলমসি বলংময়ি ধেহি।

মেজকত্তা অফিস থেকে ফিরলেন। এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখলেন কিছুক্ষণ। কোনওরকম শব্দ না করে, পা টিপে টিপে চলে গেলেন নিজের ঘরে। এইবার হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটি গান হবে

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।

সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল সেই সুর। ঘর থেকে ঘরে। প্রদীপের শিখা কাঁপছে থিরথির করে। একটি কণ্ঠের অভাব। আরতির কণ্ঠ! বিলু সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। পাকা গাইয়ের মতো। সুর তাল দুটোই আছে। ভাবও আছে। কিছু দূরেই জমিদারবাড়ির মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। জগঝম্প, কাঁসর ঘণ্টা সব বাজছে একসঙ্গে।

বিলুর একটা প্রিয় খাবার হল মূলচাঁদের দোকানের মুচমুচে ঝুরিভাজা। খাঁটি ঘিয়ের জিনিস। চিচ্চিড়ে মরিচের ঝাল। নোনতা। সামান্য হিঙের গন্ধ। মেজকত্তা রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে বস্তুটি কিনে আনেন। বড় শালপাতার ঠোঙায় মোড়া। রুমালে বেঁধে নিয়ে আসেন। গন্ধে চারপাশ ম ম করে। আকুল করা গন্ধ। বাজারের এইসব ভাজাভুজি খাওয়ায় চপলার ঘোরতর আপত্তি। লিভার খারাপ করে। মেজকত্তা মূলচাঁদকে একেবারে ভগবানের পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন। মূলচাঁদের খাস্তা কচুরি খেলে মোক্ষলাভ হয়। ফাঁসির আসামিকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বলো তোমার শেষ খাওয়ার ইচ্ছেটা কী? সে বলে, মূলচাঁদের হিঙের কচুরি। এরপর আর বলার কিছু থাকে না। বাঙালির বাচ্চা বাঙালির ধারায় মানুষ হবে। এটা সেটা খাবে। একটু পেট খারাপ হবে। পরের দিন সুস্থ হয়ে ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল খাবে। একেবারে সায়েব বাচ্চা করে দিলে জীবনের চার্মটাই তো চলে গেল। সবকিছু খেতে শিখুক। খেয়ে সহ্য করুক।

বিলু জ্যাঠামশাইয়ের কোলের কাছে বসে একটা একটা করে ঝুরিভাজা খাবে। মেজকত্তা আগে অফিস থেকে ফিরেই একটা নীল লুঙ্গি পরতেন। চপলা রাগারাগি করে বন্ধ করিয়েছেন। লুঙ্গি-কালচার চলবে না। একটা মানুষের সমস্ত শোভা নষ্ট করে দেয়। মেজকত্তা এখন ফেরতা দিয়ে ধুতি পরেন। বেশ বাঙালি বাঙালি দেখায়। পরদাঘেরা ঘর। ইজিচেয়ারে মেজকর্তা। কোলের পাশে ছোট মোড়ায় বিলু। ফুল তোলা কাপে চা। খাটে পরিপাটি বিছানা। কেমন একটা সুখ সুখ ভাব।

রাত দেড়টার সময় মেজকর্তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। কে কাঁদছে? নাকি কেউ কারওকে খুন করছে। মেজকর্তার পাশে বিলু তার পাশে চপলা। চিত হয়ে শুয়ে আছে কপালে একটা হাত ফেলে। এইভাবেই শোয়। মেজকত্তা চপলাকে তাড়াতাড়ি জাগালেন, 'শুনতে পাচ্ছ? কেউ মনে হয় আত্মহত্যা করছে। কেউ কারওকে গলা টিপে হত্যা করছে।'

চপলা শুনলেন, 'এ তো ছোটঠাকুর। এসরাজ বাজাচ্ছেন।'

'এসরাজ এল কোথা থেকে?'

'ও, তুমি জানো না বুঝি! ছোটঠাকুর জমিদারবাড়ির মেজ ছেলেকে অ্যানাটমি পড়িয়েছিল ডাক্তারি পরীক্ষার আগে। সে ভালভাবে পাশ করে ছোটঠাকুরকে খুব দামি একটা এসরাজ উপহার দিয়েছে।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ও তো ডাক্তার নয়। ও অ্যানাটমির জানেটা কী?'

'তোমার কোনও ধারণা নেই। যে-কোনও বিষয় তুমি ছোটঠাকুরকে দাও, আর দিন সাতেক সময়, ছোটঠাকুর তোমাকে পড়িয়ে দেবেন। দেখোনি তুমি, মোটা কাগজ কেটে গোল গোল করে জুড়ে কী সুন্দর দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড় তৈরি করেছিলেন! হাতের পায়ের মেরুদণ্ডের ঘাড়ের। হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল। সে তো ওই ওকে পড়াবার জন্যে। কম খেটেছিল। আর সেই সব যা হয়েছিল না! যত্ন করে রেখে দেবার মতো।'

'তা, এত জিনিস থাকতে এসরাজ কেন? ও তো এসরাজ বাজাতে জানে না।'

'জানে না তো কী হয়েছে। শিখে নেবে। ছোটঠাকুরের কাছে জানি না বলে কোনও শব্দ নেই।'

'যাই, একটু উৎসাহ দিয়ে আসি তা হলে।'

ঘর অন্ধকার। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে। চাঁদের আলোয় চরাচর একেবারে ভেসে যাচ্ছে। নিদ্রাহীন বাতাস গাছের পাতা নিয়ে খেলছে। ছোটকত্তা দরজার দিকে পেছন আর জানলার দিকে মুখ করে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছেন তার নিংড়ে একটু সুর বের করার। মাঝে মধ্যে একটু-আধটু বেরোচ্ছে না যে তা নয়, তবে বেশির ভাগ সময়েই অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ বেরোচ্ছে। যেন কারও গলায় গামছা দেওয়া হচ্ছে।

মেজকর্তা সামনে এসে ওত পেতে বসলেন। মেঝে থেকে ঠিকরে ওঠা চাঁদের আলোয় ছোটর মুখ চকচক করছে। মেজ খুব আস্তে বললেন, 'তুমি কী করছ বলে মনে হয়?'

ছোট তার থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে বললেন, 'সাধনা।'

'সুর বেরোচ্ছে, না অসুর?'

'একটা দুটো স্ট্রোক মিস করছে ঠিকই; তবে তোমাকে বলে দিচ্ছি, সূর্যোদয়ের আগেই পারফেক্ট সা রে গা মা শুনিয়ে দোব।'

'সময়টা খেয়াল আছে? তুমি না ঘুমোও, অন্য মানুষ তো ঘুমোবে।'

'ঘুমোক না, আমার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক?'

'মাঝে মাঝে তোমার এই ক্ষুদ্র যন্ত্র থেকে আতঙ্কজনক শব্দ বেরোচ্ছে।'

'দেখো মেজদা যে ঘুমোতে জানে সে ঠিকই ঘুমোবে। রেলগাড়িতে লোক ঘুমোয় না! জুটমিলের ধারে লোক ঘুমোয় না! আমি সংগীত সাধনা করছি, তোমরা নিদ্রার সাধনা করো। ভোরবেলা তোমাকে আমি ভৈরবী দিয়ে তুলব।'

'তুমিও তোমার এই অস্ত্রশস্ত্র রেখে আজকের মতো শিবিরে একটু শান্তি আনো না!'

ছোট আর একটিও কথা না বলে তারে ছড়ি টানতে শুরু করলেন। সা রে গা অবধি এসে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'গুড নাইট মেজদা। হ্যাভ এ পিসফুল স্লিপ। দরজাটা ভেজিয়ে দাও, কানে আর শব্দ যাবে না।'

চাঁদ যখন আকাশের পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় নেমে পড়েছে নীচে পাণ্ডুর হয়ে, ছোটকর্তা এসরাজ শুইয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বড় একা লাগছে। বিশাল বিছানা পড়ে আছে নিভাঁজ ময়দানের মতো। জানলার সামনে দাঁড়ালেন। শীত আসছে। শেষ রাতের বাতাসে ঠান্ডার কামড়। মনে পড়ল ঋতুর এই সময়, রাতের এই মুহূর্তে, আরতির শরীরে পাতলা একটা চাদর টেনে দিত। মেয়েটার ঠান্ডা লাগার ধাত ছিল। মা মরা মেয়ে, পিতার সংসার ঠেলতে ঠেলতে এই সংসারে এসেছিল। প্রথমটা সে একটু উপেক্ষার ভাবই দেখিয়েছিল। সংসারের প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না; কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আবার সে যদি পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেয় তা হলে তো কথাই নেই।

ফিরে এসে বিছানার এক ধারে শুলেন। শুয়ে শুয়ে ভাবলেন, দুঃখ নিয়ে বাঁচারও একটা আনন্দ আছে। মুকুজ্যেমশাই একটা গান করেন ইমন-পূরবী মিশিয়ে, তখন তেমন গ্রাহ্য করিনি, এখন যেন তার অর্থটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হচ্ছে। গানটা বাণী হয়ে ফিরে আসতে চাইছে। আচ্ছা, দেখি গাওয়া যায় কি না।

ছোট আপন মনে গাইতে লাগলেন গুনগুন করে:

দুঃখ আশীষ দিতে যে চাও দয়া তব!
ব্যথার পরশমণি ছোঁয়াও দয়া তব ॥
ভেবেছিলেম রইব সরে তোমা হতে অনেক দূরে,
সে অভিমান রাখলে না মোর— দয়া তব ॥

বাঃ, বেশ পারছি তো! অনেক সময় আরতি মাঝরাতে গুনগুন করে গান শোনাত। এবার থেকে নিজেই নিজেকে গান শোনাব।

একটু মনে হয় ঘুমোনো উচিত, এই ভেবে ছোটকর্তা চোখ বুজোলেন।

অনেক দিন পরে মুকুজ্যেমশাই এলেন সকালে। ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার কথাই ভাবছিলুম।'

অবাক হলেন, জামাই তো তাঁকে তেমন পছন্দ করে না। ভাল লাগল। এত দিনে করুণা হয়েছে।

'কেন বলো তো! তোমাকে আমি ভয় পাই।'

'আপনার মানসিক দুর্বলতা। আমি কি কখনও আপনাকে ভয় দেখিয়েছি?'

'না তা নয়, তবে তোমার ভেতর বেশ একটা রাগী রাগী ভাব আছে।'

'ছেড়ে দিন বাজে কথা। কাজের কথায় আসা যাক। গুরু চাই।'

'গুরু! ঠিক শুনলুম তো! তুমি গুরুর অনুসন্ধান করছ! খুব আনন্দের কথা। তা তান্ত্রিক, না শৈব, না বৈষ্ণব...।'

'উঁ হুঁ, ওসব না, সংগীত গুরু।'

'সংগীত? তা রবীন্দ্র, না উচ্চাঙ্গ!'

'এসরাজ শিখব।'

'এসরাজ! বহুত আচ্ছা! খুব ভাল এক ওস্তাদ আছেন।'

'বাঙালি?'

'হ্যাঁ বাঙালি।'

'তা হলে আজই। এখনই।'

'একটু তো সময় দিতে হবে। যাব, কথা বলব। আমাকে যখন বলেছ, কোনও ভাবনা নেই। তোমার এসরাজ আছে?'

'এসেছে কাল।'

'যদি রাগ না করো একবার দেখতে পারি।'

'রাগ করব কেন? আমি গুলিখোর না গাঁজাখোর!'

মুকুজ্যেমশাই ঝকঝকে যন্ত্রটা দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন।

'একেবারে সেরা জিনিস। তা, আমি একবার হাত দিতে পারি? আমার হাত পরিষ্কার। কোনও ধুলোবালি ময়লা নেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন না।'

মুকুজ্যেমশাই যন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ছড় টানলেন। পা থেকে সা, এমন কায়দায় টানলেন ছোটকর্তা আহা করে উঠলেন, 'আপনার তো পাকা হাত।'

মুকুজ্যেমশাই চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন। ধরলেন একটা ভৈরবী ঠুংরি। বাবুল মেরা। সুরে সুরে ঘর ভরে গেল। মুকুজ্যেমশাই বেশ কিছুক্ষণ বাজিয়ে এসরাজ নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন।

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনিই তো আমার গুরু।'

মুকুজ্যেমশাই জিভ কাটলেন, 'তোমাকে শেখাবার সাহস আমার নেই। তোমার জন্যে আমি আরও অনেক বড় গুরু আনব।'

'আমার বড় গুরুর দরকার নেই। দু'জনেই আমরা মশগুল হয়ে থাকব। আমি তিনটে জিনিস নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাব, গণিত, সংগীত আর সন্তান। হঠাৎ আপনি আসা বন্ধ করেছিলেন কেন?'

'বুঝলে, আমার বুকটা কেমন করে? চোখের সামনে দিয়ে মেয়েটা চলে গেল!'

'আসা-যাওয়ার পৃথিবীতে অত মন খারাপ করলে চলে। এই আছি, এই নেই। আপনি না ধার্মিক মানুষ! সংসারে এসেছেন, মনটাকে একেবারে দুর্গের মতো করে ফেলুন। মৃত্যু কত গোলা মারবে মারুক। মনের দেয়াল ভাঙবে না কিছুতেই। যত হিঁ হিঁ করবেন ততই রোগ-শোক-জরা পেয়ে বসবে। যাবেই যখন যাক। কাচের গেলাস, আজ হোক কাল হোক পড়বে আর ভেঙে চুরমার হবে। এ আপনার প্যানপ্যানানির জায়গা নয়। বলুন:

ভেঙেছ ভেঙেছ, ভালই করেছ আমার সুখের ঘর।

পেয়েছি, নয় পাব, সয়েছি, নয় সব, আরও দুঃখ দুঃখের উপর।

আমার বলিতে কিছু না রাখিবে, পথের ভিখারি করে ছেড়ে দিবে।

তবু কিছু কি বলিব? আর কি কাঁদিব?

তুমি করে যেয়ো, যা ইচ্ছা করো ॥'

'আরে বাবা, এ তো কালীনাথ ঘোষের গান। তুমি কোথা থেকে পেলে? যদি অনুমতি করো তা হলে বড় গাইতে ইচ্ছে করছে গাই।'

'আমাকে যে বেরোতে হবে।'

'রবিবারেও বেরোবে?'

'ও আজ রবিবার! তা হলে হয়ে যাক। বাজত ঝাঁঝ-মৃদঙ্গ।'

'বাঃ এটা তো ভাল গান। তোমার গানের স্টকও তো বেশ ভাল।'

'সবই আপনার মেয়ে আর আমার বউদির কাছে শেখা।'

'তা হলে আজ একটু আসর হয়ে যাক। আমাদের সেই তানপুরাটা গেল কোথায়!'

আসর জমে উঠল। মুকুজ্যেমশাই গান ধরলেন:

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়!

জগৎ শিশুর মতো চরণে ঘুমায়ে রয়।

মেজকর্তা চপলাকে বললেন, 'ভালই হয়েছে। সুরের নেশায় মেতে থাক, তা না হলেই নানা খেয়াল এসে চেপে ধরবে। ছুটবে পাহাড় ধরতে। নদীর উৎস সন্ধানে। ছুটবে জঙ্গলে। মানুষকে ঘরছাড়া করবার তিনটে বিরাট আকর্ষণ।'

গান এমন জিনিস আরও তিন-চারজন এসে গেলেন। গান-পাগল কিছু গাইয়ে বাজিয়ে সে-যুগে

ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন গানের সন্ধানে। কোনও বাড়ি থেকে একটু সুর বেরোলেই তাঁরা ঢুকে পড়তেন। এতে কোনও লাজলজ্জা ছিল না। মান সম্মানের হানি হত না। এঁদের মধ্যে কেউ তবলা বাজান, কেউ বেহালা, কেউ ভাল গান করেন। আসরে এসে গেলেন এক তবলিয়া। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল। পেটানো চেহারা। সবাই তাঁর নাম জানেন, ঘনেন ওস্তাদ। তবলায় খই ফোটাতে পারেন। বোল যেন কথা বলে। আর একজন এলেন খুব মানী মানুষ, নিউ থিয়েটার্সের অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'দেখলে, ফুল ফুটলে ভ্রমর আসবেই। মধুর এমন আকর্ষণ!'

সাড়ে তিনটের সময় ছোটকর্তা স্নানে গেলেন। মেজকর্তা বললেন, 'আর ভয় নেই, এই নিয়মে চললে বেশি দিন আর নীচে থাকতে হচ্ছে না। ওপরের পোস্টে প্রোমোশান হয়ে যাবে।'

'শোনো মেজদা, নিয়ম মানুষই তৈরি করে, মানুষই ভাঙে। মাঝেমধ্যে একটু অ্যাডভেঞ্চার করবে। সব এলোমেলো করে দেবে। তবেই না জীবন।'

'তোমার জন্যে সবাই বসে আছে। ছেলেটাও খায়নি কিছু।'

'ওকেও আমি আমার দলে টেনে নোব। নিয়ম ছাড়া নিয়মে মানুষ হবে মানুষ হবে। আমরা সব শিবের চেলা।'

'যাক তুমি তা হলে সায়েব থেকে বাঙালি হলে।'

'বাঙালিরও অনেক ভাল দিক আছে মেজদা। জীবন ধরে জীবনের ঊর্ধ্বে ওঠা।'

বিকেলের দিকে নারাণ এল। বেশিরভাগ সময়েই সে নীচের ঘরে আত্মগোপন করে থাকে। কয়েক শো জ্যোতিষীর বই আর এক ডিবে নস্যি। নারাণের হাতে একটা কোষ্ঠী, 'ছোড়দা বিলুর কোষ্ঠীটা কমপ্লিট হল, বিচারটিচার সব হয়ে গেছে। খুব একটা ভাল কিছু পাচ্ছি না। ছেলেটা পথে বসবে। দারিদ্র্য, হীনস্বাস্থ্য, খেয়ালি, শত চেষ্টাতেও বিদ্যার্জনে বাধা।'

'তার মানে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কই দেখি?'

ছোটকর্তা কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন খণ্ড খণ্ড করে।

'এ কী করলেন ছোড়দা? আমার এত দিনের পরিশ্রম!'

'ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিলুম। নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি করে দোব। তুমি কিছু ভেবো না। গ্রহ-নক্ষত্র অনেক দূরে আছে, আমরা বিলুর অনেক কাছে আছি। মানুষই মানুষকে তৈরি করে। মেজবউদিই বিলুকে তৈরি করে দিয়ে যাবেন।'

'মেজবউদি কি থাকবেন?'

'তোমার ওই বইগুলো সব পুড়িয়ে দাও না। ভবিষ্যৎ যদি বর্তমানটাকে নষ্ট করে, তা হলে সেই ভবিষ্যৎকে পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল। ভবিষ্যৎ বর্তমান তৈরি করে, না বর্তমান ভবিষ্যৎ তৈরি করে! গাড়ির আগে ঘোড়া, না ঘোড়ার আগে গাড়ি!'

নারাণ মাথা নিচু করে চলে গেল। নারাণ আবার খুব স্পর্শকাতর। সামান্য আঘাতেই চোখে জল। বিলুর কোষ্ঠীটা করার পর থেকেই বিলুকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। পাপীর কোষ্ঠী। চরিত্রহীনের কোষ্ঠী। একটা বখা ছেলের কোষ্ঠী। নারাণের জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। এ বাড়িতে আর না। তাকে অপমান। অপমান জ্যোতিষ শাস্ত্রকে।

চপলা বললেন, 'তুমি তো কারও কথা শুনবে না ঠাকুরপো, বলা বৃথা; তবে ছোটঠাকুরের কথায় আমরা রাগ করি না। ছোটঠাকুর ওইরকম। পুরুষকারটা বেশি।'

'বউদি, আমার এখন খুব মনে লেগেছে। কিছুদিন ঘুরে আসি আবার। মনটা শান্ত করে আসি।'

ছোটকর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক দাবড়ানি লাগালেন, 'আবার সেই মেলোড্রামা। তুমি মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে! এই ফুলকো লুচি আর সিল্কের পাঞ্জাবি এই জাতটার সর্বনাশ করে দিলে! তোমার মতে আমাদের কী করা উচিত বলে মনে হয়! বেড়াল ছেড়ে দিয়ে আসার মতো ওকে নিয়ে গিয়ে বহুদূরের কোনও তেপান্তর মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ওর জলে ডুবে, না হয় আগুনে পুড়ে মৃত্যুর যোগ প্রবল, এই এক বছরের মধ্যেই।'

'তা হলে তো হয়েই গেল। আর ভাবনা কী? তা হলে তো পরের খারাপগুলো আর হতেই পারছে না!'

'না, যদি বেঁচে যায়!'

'এখানে আর যদি আসে কী করে! দুটো বিরাট শত্রু, জল আর আগুন।' বাঁচার কোনও চান্স নেই। শোনো ওকে আমি সাঁতার শেখাব, জল পরাজিত। আর আগুন! গায়ে জল ঢেলে দোব। মৃত্যুই হবে ওর রক্ষাকবচ। শোনো, বড় বড় যুদ্ধেও দেখা যায়, বাঁচার কৌশল আছে। কখনও হার, কখনও জিত। জীবন হল হারজিতের খেলা। এটাকে যে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তার মরাই ভাল। তুমি একটা কিছু কাজের কাজ খুঁজে বের করো, তা না হলে নিজেই মরবে। তোমার দুর্ভাগ্য কী জানো, তুমি ভাগ্যটাকেই জীবন বলে মনে করো। আর একটা কী জানো? তুমি ঠিক পুরুষ নও। তোমার অনেক গুণ এক দোষেই মারা পড়েছে। নাও ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে, মালকোঁচা মেরে এসো। দু'জনে মিলে দেহটাকে খাটাই। জড় দেহেই জড় মনের বাস।'

চপলা বললেন, 'যাও! কেন অমন করো! যা হবে তা হবে। মিছে কেন ভেবে মরো! যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

নারাণ বললেন, 'কীভাবে দেহটাকে খাটাব ছোড়দা?'

'চলো, তকতকে করে তিনতলার ছাদটা ঝাঁট দিই। চন্দ্রমল্লিকার সিজন এসে গেল। কাল সকালেই শ দুয়েক টব এসে যাবে।'

'মাটি?'

'কাল সকালে খুব ভোরে আমরা উঠে পড়ব। নীচের বাগান থেকে মাটি তুলব দু'জনে।'

'একটা কপিকল লাগালে কেমন হয়।'

'আ, দ্যাটস এ গুড আইডিয়া।'

'চাকা?'

'হ্যাঁ চাকা। চাকাই একটা সমস্যা।'

'তা হলে বলি। ছাত কালই পরিষ্কার করা যাবে। আমার তো জামাকাপড় পরাই আছে, আপনি পরে নিন। দু'জনে বেরোই চাকার সন্ধানে।'

'যুক্তিটা মন্দ নয়। চাকা যদি না-ও পাই, মাইল চারেক হাঁটা তো হবেই। অবেলায় খাওয়া হয়েছে।'

মেজকত্তা বিলুকে নিয়ে ছাতে হাওয়া খাচ্ছিলেন মাদুর পেতে বসে। খুব গল্প চলেছে দু'জনে। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির আঁতাত ঘুচে গেছে। জাপান জার্মানির দলে পূর্ব রণাঙ্গনে জোর লড়াই। জাপান সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মার দিকে এগিয়ে আসছে। নেতাজি সিঙ্গাপুরে। বিলুকে যুদ্ধ বোঝাচ্ছেন মেজকর্তা। বিলু কোনও কিছুই বোঝে না; কিন্তু দুটি জিনিস তাকে খুব নাড়া দেয়, নেতাজি আর স্বদেশি আন্দোলন। ইংরেজ আমাদের শত্রু। নেতাজি লড়াই করছেন ইংরেজের সঙ্গে। আজাদ হিন্দ বাহিনী। আই এন এ। সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা হেরে গেছে। বড়দের কী আনন্দ! দেশ এবার স্বাধীন হবেই হবে।

সন্ধে প্রায় হয়ে আসছে। হঠাৎ দক্ষিণের আকাশে বিলুদের প্রায় মাথার ওপরে একের পর এক কামানের গোলা ফাটতে লাগল। কালো বলের মতো একটা করে দূর আকাশে ধোঁয়ার রেখা টেনে উঠে যাচ্ছে, তারপরেই বুম করে শব্দ। ধোঁয়ার পুঁটলি। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে। বিলু ভয়ে জ্যাঠামশাইয়ের কোলে মুখ লুকোল।

মেজকত্তা বললেন, 'ভয় নেই বাপি, যুদ্ধের মহড়া হচ্ছে। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে গান অ্যান্ড শেল

ফ্যাক্টরি। ওইখানে গঙ্গার ধারে অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট কামান বসিয়েছে। গোলা ছুড়ে দেখছে কেমন হয়। জাপান যদি বোমা ফেলতে আসে, ওই কামান দিয়ে মারবে। দেখো না কী সুন্দর! আকাশে কেমন গোলা ফাটছে বাজির মতো!'

বেশিক্ষণ আর মজা দেখা হল না। চপলা এসে দু'জনকেই ছাত থেকে নামিয়ে দিলেন। মজা আর দেখতে হবে না, গোলার টুকরো গায়ে এসে পড়লে কী হবে। ধূসর আকাশে আগুনের গোলা বেশ ভালই লাগছিল দেখতে।

চপলা নামতে নামতে বললেন, 'কী যে হবে জানি না। বাবা মা বোন সব বর্মায়। জাপানি আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। মাসের পর মাস কোনও চিঠি নেই।'

উত্তরের বারান্দায় ঝাঁকড়া নিমগাছের দিকে তাকিয়ে মেজকর্তা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। খবরের কাগজে ইংরেজের পরাজয়ের খবর ছাপছে না। সেনসার করছে। বাঁড়ুজ্যেমশাইরা রেঙ্গুনে কী অবস্থায় আছেন কে জানে! গোটা পরিবারটাই হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোনওভাবেই কিছু করার নেই।

ছোটকর্তা আর নারাণ পুলির খোঁজে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরছেন, এমন সময় কামানের গোলা ফাটার শব্দ। দোকানদার বলছেন, 'একে এই দুর্দিন। চারপাশে বোমা ফাটছে, আর জিনিস পেলেন না, পুলি? ওসব বিক্রি হয় না, তৈরি করিয়ে নিতে হয়। সহজ কোনও জিনিস চান দিয়ে দিচ্ছি। বাজার থেকে মালপত্র সব উধাও হয়ে যাচ্ছে, পারেন তো বেশ কিছু চাল-ডাল-আলু পেঁয়াজ কিনে খাটের তলায় মজুত করে রাখুন।'

রাস্তাঘাটে থমথমে আলো। সমস্ত আলোর মুখে কালো ঠুলি, ল্যাম্পপোস্ট পায়ের কাছটুকুতেই খালি আলো ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সব যেন ভুতুড়ে। রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছোটকর্তা বললেন, 'পরামর্শটা ভালই দিয়েছে। চলো আজই আমরা আলু কিনে ফেলি। এক বস্তা তো কেনা যাক।'

'সঙ্গে এক বস্তা বালিও কিনতে হবে। খাটের তলায় বালি বিছিয়ে তার ওপর আলু ছড়াতে হবে।'

'বালি তোমার কাল হবে। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না।'

'আজ একটু রাবড়ি কিনলে কেমন হয়। এরপর তো রাবড়িও আর পাওয়া যাবে না।'

'অ্যায়, তোমার এই আর এক দোষ মিষ্টান্ন প্রীতি। অত খাব খাব করো কেন! খাওয়া হবে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি। তুমি না আধ্যাত্মিক লাইনের মানুষ। কভি ছানা, কভি চানা, কভি ও ভি মানা। চলো চলো। আকাশে গোলাগুলি চলছে।'

দু'জনে ঘর্মাক্ত কলেবরে এক বস্তা আলু নিয়ে রিকশা চেপে বাড়ি ফিরলেন। সকলেই অবাক। এত আলু! ছোটকর্তা বললেন, 'তিরিশ বস্তা আলু, তিরিশ বস্তা চাল, তিন বস্তা পেঁয়াজ আমার টার্গেট। হ্যাঁ তিন বস্তা ডালও। বাজারে খবর পেলুম সব উধাও হল বলে।'

মেজকর্তা বললেন, 'দু'পেটি চা আর দশ বস্তা চিনিও যোগ করো; কারণ জাপানিরা চা-বাগান মাড়িয়েই আসবে। চা ছাড়া যুদ্ধের চার্মটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

গভীর রাত। জ্যাঠাইমা আর জ্যাঠামশাইয়ের মাঝখানে বিলু শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না। ব্ল্যাক আউটের ভুতুড়ে রাস্তায় পাহারাঅলা ঘুরছে লাঠি ঠুকে ঠুকে। একটু আগেই জ্যাঠামশাই বাঘা যতীনের গল্প বলছিলেন। বিলু চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে। পাশের ঘরে বিলুর বাবা এসরাজ বাজাচ্ছিলেন। পাহারাঅলা হাঁক মেরে গেল, 'শুয়ে পড়ুন।'

চপলা মেজকর্তাকে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি খুব ভাল বুঝছি না।'

'রেঙ্গুনের খবর?'

'ও তো আছেই। যা হবার তাই হবে। আমাদের হাতের বাইরে। আমি অন্য একটা ব্যাপার বলছি। কয়েকদিন ধরে কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে। খুব কষ্ট দিচ্ছে।'

'খ্যাঁচকা-ট্যাচকা লেগেছে। ভারী কিছু তুলেছিলে?'

'না তো?'

'তা হলে কাল একবার ডাক্তারবাবুকে কল দিই।'

'না না, আর কয়েকদিন দেখি। এখন আর ডাক্তার বদ্যি নয়। আরতির চিকিৎসায় অনেক খরচ হয়েছে। আগে আমরা একটু সামলাই।'

বিলু এই পর্যন্ত শুনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেলে চপলা বিলুকে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। মাঠটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক গাদা লোক মাঠ খুঁড়ছে।

'কী ব্যাপার গো! এটা যে ছেলেদের খেলার মাঠ!'

'আর খেলা মাইজি! যে খেলা শুরু হয়েছে ওদিকে। খবর এসেছে শিগগির বোমা পড়বে। এখানে আমরা দুটো ট্রেঞ্চ খুঁড়ব। সাইরেন বাজলেই আপনারা এসে ঢুকে পড়বেন। বোমা পড়লেও প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন।'

গভীর একটা গর্ত সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশ। চওড়ায় প্রায় ফুট ছয়েক তো হবেই।

চপলা বিলুর হাত ধরে গঙ্গার ধারে বটগাছের তলায় বসলেন। উঠতে বসতে হাঁটা চলা করতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কী হল কে জানে! বেশ তো চলছিল।

বিলু বললে, 'বড়মা, তোমার কোমরে ব্যথা হয়েছে তো, আমি রোজ রাত্তিরে তোমাকে টিপে দোব।'

চপলা বিলুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ওরে আমার ছেলে। তোমাকে কে বললে বাপি?'

'তুমি কাল রাত্তিরে জ্যাঠামশাইকে বলছিলে।'

'ও সেরে যাবে। দু'দিন ভোগাবে, তিন দিনের দিন সেরে যাবে।'

গঙ্গায় আর শুধু জেলে নৌকো, যাত্রীবাহী নৌকো নয়। নতুন ধরনের জলযানের আবির্ভাব হয়েছে। যারা জানে তারা বলাবলি করছে, ওগুলো হল ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট। কোনওটায় জোড়া জোড়া কামান, কোনওটায় মেশিনগান। তিরবেগে সব ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। শক্ত সমর্থ চেহারা। লালমুখো সায়েব সৈন্যরা বসে আছে। ভয়ে জেলে নৌকোগুলো পাড়েই বাঁধা। ওদের ছোটাছুটির মাঝখানে পড়ে গেলে চুরমার করে দিয়ে চলে যাবে।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চপলাকে বললেন, 'তুমি মা বাড়ি চলে যাও। দিনকাল ভাল নয়। গঙ্গার ধার মিলিটারিরা নিয়ে নিয়েছে। ওদিকে জেটি তৈরি করছে। কী দরকার! এখন রাস্তাঘাটে না বেরোনোই ভাল।'

চপলা উঠে চলে এলেন। পরিবেশ বেশ থমথমে। পথেঘাটে উটকো-অচেনা লোকের ভিড়। রাতে খেতে বসে ছোটকর্তা আবার একটা বোমা ফাটালেন। এবার আর পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল সমুদ্র নয়, এবার তিনি যুদ্ধে যাবেন। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন, 'আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু অফার মাই সার্ভিস টু দি কজ অফ দি নেশান।'

মেজকর্তা বললেন, 'শোনা যাক তোমার প্ল্যানটা। বেশ খুলেই বলো। তুমি না জানো বন্দুক চালাতে, তোমার কোনও মিলিটারি ট্রেনিং নেই। তোমার যুদ্ধটা হবে কী করে। ঘুসোঘুসি, না বাঙালির ল্যাং মারামারি।'

'যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধে অনেক কাজ থাকে মেজদা। আমি যাব সাইন্টিফিক অফিসার হিসেবে। সোজা ফ্রন্টে। এই সুযোগ। আবার কবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে তার কোনও ঠিক নেই। তখন আমি থাকব কি না তাও জানি না। এই হল সুযোগ। গোল্ডেন অপারচুনিটি। নাও অর নেভার। যুদ্ধ শুধু বইয়েই পড়েছি, এইবার সামনাসামনি দেখব। ট্যাঙ্কে চড়ব। সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ব। ম্যান অফ ওয়ারের ডেকে ঘুরব। সিপ্লেনে করে সমুদ্রে নামব। গোলাগুলি, বোমা, মেশিনগান, পয়জন গ্যাস। জীবনে

জীবনের মতো অভিজ্ঞতা। আমার ফর্মটর্ম সব এসে গেছে। অফিস লিস্টে আমার নাম উঠে গেছে। এখন এশিয়ান ফ্রন্টে দেবে, কি ইয়োরোপিয়ান ফ্রন্টে সেইটাই হল কথা।'

'সে যাদের কথা তারা ভাবুক। তুমি এখন বোঝাও, এর মধ্যে সায়েন্সটা কোথায় আছে!'

'যুদ্ধে আর্ট আছে, সায়েন্স আছে, লিটারেচার আছে। ইউনিভার্সিটির মতো। তুমি জানো, যুদ্ধে বড় বড় আর্টিস্টরা যায় যুদ্ধের ছবি আঁকতে।'

'তুমি ওখানে কেমিষ্ট্রি করবে? না ফিজিক্স।'

'কেমিস্ট্রি। পিয়োর কেমিস্ট্রি। ধোঁয়ার রং দেখে বলে দোব কীসের ধোঁয়া। গন্ধ শুঁকে বলে দোব কীসের গন্ধ। বোমার মশলা অ্যানালিসিস করে বলে দোব...'

'ধনে, জিরে, মৌরি।'

'অ্যাকাডেমিক ব্যাপার নিয়ে রসিকতা কোরো না। দিস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ কুরুক্ষেত্র। ফিরে এসে আমি একটা বই লিখব।'

'তোমার সাধের এসরাজ?'

'সঙ্গে যাবে। ট্রেঞ্চে বসে বাজাব। সারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে দোব রবীন্দ্রসংগীতের সুর।

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে ॥'

'আবার সেই অসুখটা ফিরে এল, অবাস্তবকে বাস্তব ভাবা। ছেলেটার কী হবে! মা মরা ছেলে।'

'এক মা মারা গেলেও আর এক মা আছেন। আর সত্যি কথা বলতে গেলে তোমরাই তো ওর মা বাবা। আমার সঙ্গে ওর কতটুকুই বা দেখা হয়! আমি গেলেই বা কী, থাকলেই বা কী!'

'তোমার মাথায় যুদ্ধটা কে ঢোকালে! নেশান নেশান করছ? কার নেশান? আমাদের নিজেদের কিছু আছে কি। ইংরেজ লড়াই করছে তাদের সাম্রাজ্যের জন্যে। ইংরেজ এই যুদ্ধে হারুক, সেইটাই তো আমরা চাই। তবেই তো আমরা মুক্ত হব।'

'এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার মতান্তর আছে। পরে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দোব। যুদ্ধে আমি যাবই। লাইফস লাস্ট চান্স।'

'তা হলে তোমাকে আমি একটা খারাপ খবর দিই। ছায়া ঘনাইছে ধীরে।'

'কীসের ছায়া? যুদ্ধের ছায়া!'

'তোমার বউদি বিছানা নিয়েছে। তাকে আমাদের ত্রিসীমানায় দেখতে পাচ্ছ? আমাদের খাওয়ার সময় সে নেই, এইরকম হয়েছে কোনওদিন?'

'তাও তো বটে! কী হয়েছে বউদির?'

ছোটকর্তা উঠে চলে গেলেন। শেষ পাতের সব কিছু পড়ে রইল। চপলা বিছানায় শুয়ে আছেন। যা আগে কখনও হয়নি। চপলা অসময়ে বিছানায়। সূর্য ওঠার আগে চপলা বিছানা ছাড়েন। জমিদারবাড়ির পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলে চপলা আলো নেবান।

'একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি ছোটঠাকুর।' চপলা খুবই যেন লজ্জিত।

'কী জ্বর নাকি?' ছোটকর্তা সাবধানে চপলার কপালে হাত রাখলেন। চুলে ঘেরা ছোট্ট ঢালু কপাল। মাঝখানে গোল চাঁদের মতো টিপ। হাতটা রেখেই তুলে নিলেন, 'কই না, জ্বর তো নেই।'

'জ্বর নয়, কোমরে ভীষণ ব্যথা। উঠতে পারছি না।'

'সে কী, বাত হল নাকি?'

'কী জানি? কী যে হল হঠাৎ।'

'হট ব্যাগ নিলে কেমন হয়!'

'হট ব্যাগের ওপরেই তো পড়ে আছি।'

'তুমি যদি পড়ে যাও, আমাদের কী হবে বউদি?'

'অত সহজে পড়ব না ঠাকুরপো। আমার মনের জোর আছে।'

ছোটকর্তা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ঠিক সেই সময় সাইরেন বেজে উঠল।

ছোটকর্তা বললেন, 'সর্বনাশ, এয়ার রেড।'

॥ ৫ ॥

মোটামুটি ভালই শীত পড়েছে। মেজকর্তা তাঁর তুলতুলে নরম কাশ্মীরি আলোয়ানখানি গায়ে দিয়ে উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের প্রকৃতি দেখছিলেন। এমন সময় সাইরেন। মেজকর্তা ঘরে ঢুকে বললেন, 'মনে হচ্ছে সাইরেন বাজছে।'

'মনে হচ্ছে কেন? সাইরেনই।'

'তা হলে এ আর পি-র নির্দেশ অনুসারে আমাদের তো নীচের শেল্টারে যেতে হয়।'

'তা তো হয়ই।'

'চপলা তো উঠতেই পারছে না।'

চপলা বললেন, 'তোমরা বিলুকে নিয়ে চলে যাও না। আমি বেশ আছি।'

ছোটকর্তা বললেন, 'তোমার মনে হচ্ছে বেশ আছ, আমাদের তা মনে হচ্ছে না। মেজদা তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি বউদিকে দু'হাতের ওপর শুইয়ে নীচে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমার আপত্তি! আমার আপত্তি হবে কেন? তোমার কি মনে হয় আমার মনে কোনও পাপ আছে! আমার একটাই ভয়, তুমি পারবে তো!'

'বাগানে যে বারবেলটা পড়ে আছে, সেটার ওজন জানো?'

মেজকর্তা ঘাড় নাড়লেন। জানেন না। ছোটকর্তা খাটের ধারে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বউদি অনুমতি দাও।' একখণ্ড শোলার মতো ছোটকর্তা অক্লেশে বউদিকে তুলে ফেললেন পাঁজাকোলা করে। পাশেই নারাণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে বললেন, 'বিছানা থেকে নরম তোশকটা তুলে নাও। পেতে শোয়াতে হবে বউদিকে।'

গুনগুন করে ভ্রমরের মতো শব্দ হচ্ছে। এক ঝাঁক জাপানি প্লেন ঢুকে পড়েছে কলকাতার আকাশে। নীচের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত ঘরে সবাই বসে আছে। বিলু বোমার ভয়ে নয়, আরশোলার ভয়ে জ্যাঠামশাইয়ের নরম চাদরের তলায় ঢুকে আছে। ড্যাম্প ঘর। পিঠ বেয়ে ঠান্ডা উঠছে শিরশির করে। ভিজে ভিজে দেয়াল। খেজুরের মতো আরশোলায় দেয়াল ছেয়ে আছে। জাপানি বিমানেব উৎসাহে সারা ঘরে তাদের ওড়াউড়ি। বোমার অভাবে তারা নিজেরাই ঘাড়ে এসে পড়ছে। মিটমিট কবে একটা বাতি জ্বলছে।

ছোটকর্তা হঠাৎ বললেন, 'আরতির জীবনে এই অভিজ্ঞতাটা হল না। মোস্ট থ্রিলিং। মনে হচ্ছে. ইয়োরোপে আছি।'

বাইরের রাস্তায় এ. আর. পি.-র বাঁশি বাজছে। চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'ঘরে ঘরে আলো নেবান।'

চপলা ছোটকর্তাব কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মশা আর আরশোলা থেকে বাঁচবার জন্যে ছোটকর্তা অনবরত হাত নাড়ছেন।

মেজকর্তা বললেন, 'এর চেয়ে জাপানি বোমা অনেক ভাল ছিল।'

ছোটকর্তা বললেন, 'তা যা বলেছ।'

নারাণ বললেন, 'ছাতে উঠে দেখে আসব কোথায় বোমা পড়ল। বোম পড়া আমি জীবনে দেখিনি।'

বলতে না বলতেই পাথর ফাটার মতো আওয়াজ হল পরপর কয়েকবার। কোথায় পড়ল বোঝা গেল না। কত দূরে! বাড়িটা কেঁপে উঠল। ওপরে কোথাও একটা আলগা কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। ছোটকর্তা বললেন, 'কাজ বাড়ল। সমস্ত কাচে কাগজের ফালি সাঁটতে হবে। খুব কাছাকাছি কোথাও পড়ল মনে হচ্ছে। ইংরেজদের অবস্থা একেবারে ন্যাজে-গোবরে। এম্পায়ার গেল।'

অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গানের শব্দ আসছে, একের পর এক।

মেজকর্তা বললেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বোমা ফেলার আগেই তো কামান ছোড়া উচিত ছিল।'

'দাঁড়াও, টার্গেট ঠিক না করে ছোড়ে কী করে! আগে রেঞ্জের মধ্যে আসবে, তারপর তো ছুড়বে।'

অল ক্লিয়ার হয়ে গেল। পোঁ পোঁ বাঁশি বাজছে এ আর পি-র। ছোটকর্তা মেজবউদিকে এনে খাটে শুইয়ে দিলেন। চপলা কাঁদছেন, 'এই দুঃসময়ে আমি তা হলে পঙ্গুই হয়ে গেলুম।'

'বউদি তোমার তো প্রায় আমারই মতো মনের জোর। তুমি কেন ভেঙে পড়ছ।'

'ওদিকে বাবা, মা, বোন, সবাই বার্মায় পড়ে আছেন। বেঁচে আছেন, না সব শেষ হয়ে গেছেন কে জানে! খবর যাবেও না, খবর আসবেও না।'

'প্রকৃতই ভাববার কথা। দেখি, কাল আমি চেষ্টা করব খবর নেবার।'

চপলা ছোটকর্তার ডান হাত বুকের কাছে চেপে ধরে বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবে? তুমি যুদ্ধে যেয়ো না। একা আমি সবকিছু সামলাতে পারব না।'

'তোমাকে একা ফেলে আমার যাবার উপায় নেই। তুমি আমার জীবনের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছ। যুদ্ধের চেয়ে তোমার সেবাই আমার কাছে এখন বড়। একসময় ভেবেছিলুম, একেবারেই হারিয়ে যাব হঠাৎ। জীবনটাকে একটু অন্য চ্যানেলে বওয়াব। অর্থহীনকে অর্থবহ করব। একটা পাহাড়। অলকানন্দার নীল জল। তুষার শীর্ষে সূর্যোদয়। ক্ষুদ্র জীবন থেকে বৃহৎ জীবনে বেরিয়ে যাব। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ভালবাসার চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই।'

'তোমার কোথাও লাগেনি তো!'

'আমার লাগবে! তোমাকে মনে হল ফুলের মতো।'

ছোটকর্তা আর নারাণ দু'জনেই নিশাচর। সেই মধ্যরাতে দু'জনেই ছাতে গিয়ে উঠলেন। আকাশে এত বড় একটা ডামাডোলের পর চাঁদের আলোয় সব যেন থমথম করছে। তারারা মিটিমিটি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। দু'জনে বহুক্ষণ ধরে এ পাশে ও পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যদি কিছু নজরে পড়ে। বোম পড়লেই আগুন লাগবে। আকাশের কোনও দিকে কোনও আগুনের চিহ্ন আছে কি না! শেষে হতাশ হয়ে দু'জনেই বসে পড়লেন। আকাশ একেবারে ফাঁকা।

নারাণ বললেন, 'যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রটা অভ্রান্ত। এই যুদ্ধ যে হবে তা কিন্তু বিচারে পরিষ্কার পাওয়া গিয়েছিল। আপনি তখন রেগে গেলেন, বিলুর কোষ্ঠী বলছে ওর আপনজন বলতে কেউ থাকবে না। সবাই একে একে চলে যাবে ওকে ছেড়ে।'

'আবার তুমি সেই কোষ্ঠী আনলে। শোনো, ওসব আমি বিশ্বাস করি না। ওতে কিছু থাকলেও আমি বিশ্বাস করব না; কারণ ওতে বিজ্ঞান নেই। ওটা কোনও শাস্ত্রই নয়। অনুমান মাত্র। বিলুর যদি আপনজন কেউ না থাকে, ও সাফার করবে। পর ওর আপন হবে। এই পৃথিবীতে কেউ ভোগে, কেউ ভোগায়। কেউ জেতে, কেউ হারে। কেউ রাজা হয়, কেউ ভিখিরি। ভেবে তুমি যখন কিছুই করতে পারবে না, স্টপ অল ভাবনা। কর্ম আর কর্মফলে বিশ্বাস করো। অন্ধকার একটা ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে ছেলেটাকে অকেজো করে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ। ও যদি চরিত্রহীন হয় বুঝতে হবে আমি চরিত্রহীন। ও যদি গবেট হয় বুঝতে হবে আমি গবেট। ও যদি নীচ হয়, বুঝতে হবে আমি নীচ। কারণ ও আকাশ থেকে পড়েনি, আমারই বীর্যে ওর জন্ম হয়েছে। আমগাছে কি আমড়া হয়! একটা মানুষকে বড় করার কী উপায় জানো! সব সময় তাকে স্মরণ করাবে, তুমি কার ছেলে!

তুমি কোন বংশের ছেলে! খুঁটিটা চেনাতে হয়। সিংহশাবক ভেড়ার দলে পড়ে স্বরূপ ভুলে গিয়েছিল। একদিন এক সিংহ এসে তাকে দল ছাড়া করে নিয়ে গেল জলার ধারে। দু'জনের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বললে, দেখ, তোতে আর আমাতে কোনও তফাত আছে? বংশ হল সেই আয়না, মিরার। বারে বারে তুলে ধরতে হয় মুখের সামনে। আত্মবিস্মৃতিই হল ধ্বংসের কারণ। রবীন্দ্রনাথের একটা গান শুনবে,

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া ॥

'একটা গল্প শোনো, ঘুম তো আর হবেই না। এক রাজার এক ছেলে। রাজার ছেলে, বুঝতেই পারছ, তার সেইরকম বেশভূষা। সারা গায়ে সোনার গয়না। ছেলেটির বয়স এই ছয় কি সাত। আমাদের বিলুর বয়সি। রোজই সে রাজভৃত্যের সঙ্গে বিশাল বাগানে বেড়াতে যায়। একদিন হল কী বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূরে চলে গেল। নির্জন অন্ধকার অন্ধকার একটা জায়গায়। একদল ডাকাত তক্কে তক্কে ছিল। তারা অমনি ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। নিয়ে গিয়ে তার সব গয়নাগাঁটি খুলে নিল। এইবার ভাবছে ছেলেটাকে কী করবে, মেরেই ফেলবে কি না। ডাকাত সর্দারের ছেলেপুলে ছিল না। তার খুব মায়া হল। সে বললে ছেলেটাকে আমি মানুষ করব।

'কুড়ি বছর পার হয়ে গেল। রাজা প্রায় বৃদ্ধ। এক দৈবজ্ঞ এসে বললেন, মহারাজের জয় হোক। রাজা বললেন, আর জয় হোক। আমার আর কী জয় হবে দৈবজ্ঞ! ভাগ্যের হাতে আমি পরাজিত। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল আমার ছেলে নিরুদ্দেশ। কোথাও তার সন্ধান নেই। দৈবজ্ঞ বললেন, মহারাজ, আমি দৈবজ্ঞ, আমি বলছি আপনার সন্তান জীবিত আছে। আছে সে এক ডাকাতের দলে। মহারাজ বললেন, তাই নাকি? কোথায় সেই ডাকাতের দল? দৈবজ্ঞ বললেন, ব্যস্ত হবেন না। আমি জানি আপনার সে ক্ষমতা আছে। এখুনি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারেন। সে কিন্তু আপনাকে চিনতে পারবে না। আপনার ছেলেকে আমিই এনে দোব, আপনি শুধু আমাকে একটা আয়না দিন।

'দৈবজ্ঞ একটি আয়না নিয়ে ডাকাতদের অঞ্চলের দিকে চললেন। যা আশা করেছিলেন ঠিক তাই হল। ডাকাতরা দৈবজ্ঞকে ধরল। যা আছে সব কেড়ে নেবে। দৈবজ্ঞ বললেন, 'বাবা, আমার কাছে একটি আয়না ছাড়া আর কিছুই নেই।' ডাকাতরা বললে, 'তা হলে ব্যাটাকে মেরে ফেল।' 'আমাকে মারবে, তা মারো; কিন্তু তোমার তো আজ হাঁড়ি চড়েনি। আর তুমি, তোমার তো আজ বউয়ের সঙ্গে ধুম ঝগড়া হয়েছে। আর ওই যে তুমি, তোমার তো বাবা পেটের ব্যথা সহজে সারার নয়। আর ওই যে ওপাশের তুমি, তোমার ছেলে যায় যায়।'

'ডাকাতরা অবাক। সকলের সব কিছু মিলে যাচ্ছে। ডাকাতরা বললে, 'আপনি কে প্রভু?' 'আমি দৈবজ্ঞ'। 'আচ্ছা কোন দিন কোন দিকে গেলে ভাল ডাকাতি হবে আপনি বলতে পারেন?' 'কেন পারব না।' 'তা হলে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন না।' 'যেতে পারি একটি শর্তে, তোমাদের সর্দারকে বলা চলবে না।' 'বেশ তাই হবে।'

'দৈবজ্ঞ ডাকাতদের ডেরায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। রোজই তাদের বলে দেন আজ এই দিকে যাও। আজ ওই দিকে যাও। আর ঠিক ঠিক মিলে যায়। ডাকাতদের বিশ্বাস বাড়ে। দৈবজ্ঞ একদিন বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের সর্দারের কোনও ছেলে নেই?' 'হ্যাঁ আছে তো। ভারী সুন্দর এক ছেলে।' 'তাকে আসতে বলোনি?' 'আপনি যে বলছিলেন সর্দারকে কিছু না জানাতে।' 'সে তো সর্দারকে। তার ছেলে কেন আসবে না? তাকে নিয়ে এসো কাল।'

'পরের দিন ছেলে এল। রাজপুত্রের মতো চেহারা। ছেলে বললে, 'আমার কিছু বলুন।' 'যা বলব

তা বিশ্বাস করবে?' 'কেন করব না! আপনি তো সকলের সব কিছু মিলিয়ে দিচ্ছেন।' 'না, তুমি আজ রাতটা ভাল করে ভাবো। ভেবে এসে বলো।'

'ছেলেটি পরের দিন এসে বললে, 'ভেবেছি। যা বলবেন, বিশ্বাস করব।' দৈবজ্ঞ তখন বললেন, 'শোনো বাবা, তুমি ডাকাতের ছেলে নও। তুমি রাজার ছেলে। তোমার বাবা আর মা দু'জনেই সুন্দর। বিশাল রাজবাড়ি তোমার। বিরাট সিংহাসন। দাসদাসী। সব একেবারে ঝলমল করছে।' 'কী বলছেন আপনি? আমি রাজার ছেলে?' 'হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না! এই নাও আয়না। নিজের মুখ দেখো। এটা তুমি নিয়ে যাও। রাতে তোমার এই বাবা-মা যখন ঘুমোবে, তোমার নিজের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।'

'পরের দিনই ছেলেটি এসে বললে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার তো তা হলে ফিরতে হবে নিজের বাবা-মায়ের কাছে!' 'আচ্ছা, তোমাদের এই পথটুকু পেরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছোতে ক'ঘণ্টা লাগবে?' 'ছ'ঘণ্টা।' 'তুমি এক কাজ করো, রোজ, এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা করে বাড়ির বাইরে থাকা অভ্যাস করো, ক্রমে সইয়ে সইয়ে সেটাকে আট ঘণ্টায় তোলো। যখন আট ঘণ্টা বাইরে থাকলেও ওরা আর উতলা হচ্ছে না দেখবে তখন তুমি আমার কাছে আসবে। তার আগে নয়।'

'ছেলেটি একটু একটু করে তার ডাকাত পিতামাতাকে অনেকক্ষণ না থাকাটা অভ্যাস করিয়ে দিল। তারা ধরেই নিল ছেলে বড় হয়েছে, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারতেই পারে। ছেলেটি এইবার দৈবজ্ঞের কাছে এসে বললে, 'হয়ে গেছে।' 'আচ্ছা, তুমি অস্ত্র চালাতে পারো?' 'খুব ভাল পারি!' 'তা হলে চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'সেই ছ'ঘণ্টার পথে কিছু দুরে দুরেই ডাকাতদের চৌকি। পাহারাদার বসে আছে। রাজপুত্র সব কাটতে কাটতে পৌঁছে গেল প্রাসাদে।'

'কী বুঝলে গল্পটার?'

'আজ্ঞে ওই আয়না।'

'হ্যাঁ, আয়না, মানে দর্পণ, মানে দর্শন। নিজেকে তুমি চিনলে। জানলে তুমি কার সন্তান! অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর ওই রাজপুত্রের তরোয়াল হল জ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান। ওই চৌকি আর পাহারাদার হল বাধা, মায়া। সময় নাও। সংকল্পে দৃঢ় হও, তারপর সব কাটতে কাটতে এগিয়ে যাও। বিলুকে ওই দর্পণটি দেখাও। দৈবজ্ঞের ভূমিকা, ভূত-ভবিষ্যৎ নয়। দৈবজ্ঞ আসলে গুরু। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটান। তোমার উচিত হবে সেই কাজটি করা। তা যদি না পারো, তুমি ফেলিওর।'

চাঁদ মরে গেল পশ্চিম আকাশে। শেষ রাতের দীর্ঘশ্বাসে এল ভোরের ভিজে বাতাস। দু'জনে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। শিশিরে সব ভিজে গেছে। ছোটকর্তার লোহার শরীর। তিনি হিম ঠান্ডা গ্রাহ্য করেন না। ছোটকর্তার পায়ের শব্দ পেয়ে মেজ বললেন, 'এইবার তুমিও বিছানায় পড়ো। যা হিম লাগালে!'

'তুমি এখনও জেগে?'

'তোমার জন্যে কি ঘুমোবার উপায় আছে?'

'সরি মেজদা।'

চপলা বেশ ভালভাবেই পড়লেন। শুধু ব্যথা নয়, সঙ্গে জ্বর। বড় ডাক্তার এলেন। গম্ভীর মুখে নানা পরীক্ষা করে রায় দিলেন, স্পাইনাল কর্ডে টিবি। টিবি যে-কোনও জায়গায় হতে পারে। এ বাত নয়, হাড় সরে যাওয়া নয়। তা হলে জ্বর হত না। ধীরে ধীরে রুগি মৃত্যুর দিকে এগোবেন। কোনও ওষুধই নেই। থাকলে বিলেতে। জার্মানির বোমায় ইংল্যান্ড তো ধ্বংসস্তূপ। আর এদিকে তো জাপান খেলা দেখাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু চপলার কোমরে বিশাল এক প্ল্যাস্টার করে দিয়ে গেলেন। অসুখটা কী তা আর চপলাকে বলা হল না। বিছানাই হল চপলার ঘরবাড়ি। সেইখানেই বসে শুয়ে সারাদিন বিলুর তদারকি। বিলুর চান হল কি না। জলখাবার খেল কি না!

দুপুরে চপলা খাটে, মেঝেতে বিলু। সেই এক ঘর লেখা। চপলা খাট থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, বিলুর হাতের লেখা কত সুন্দর হচ্ছে। 'আমার এই আঁকার খাতার মতো তোমাকে এইবার বড় বড় দুটো খাতা তৈরি করিয়ে দোব, একটা ইংরেজির, একটা বাংলার। পালকের কলম। তুমি লিখবে ঝুল কালো কালি দিয়ে।'

'বড়মা আমাকে তোমার মতো ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে?'

'দোব বাপি।'

'আমি পারব?'

'কেন পারবে না? তুমি সব পারবে। সব, সব।'

'নারাণকাকু বলছিলেন, আমি নাকি খারাপ ছেলে হব।'

'ওসব কথায় একদম কান দেবে না। সব বাজে।'

থাক থাক বালিশে পিঠ দিয়ে চপলা আধশোয়া। কোমরটা প্ল্যাস্টার করা। একমাথা কালো কুচকুচে চুল বাতাসে উড়ছে। পেছনের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। দেবীর মতো দেখাচ্ছে। কোলের ওপর একটা বোনা। বিলুর জন্যে গাঢ় নীল রঙের একটা সোয়েটার বোনা হচ্ছে। অদৃশ্য ভাগ্যদেবী দেখছেন, বোনা আগে শেষ হয়। না জীবন শেষ হয় আগে। মৃত্যুর সঙ্গে কম্পিটিশান। চপলা সব ব্যাপারেই বামুনদির গুরু! গুরুর জন্যে বামুনদি খুব করছে। একেবারে পাকা নার্সের মতো সেবা। ঘরের মেঝেতে শীতের রোদ শিশুর মতো হামা দিচ্ছে। গাছের মাথায় মাথায় রোদ। যাবার আগে উঁচু থেকে দেখে নিচ্ছে দিনের পৃথিবীকে।

শীতের সেই মনমরা বিকেলটা এসে গেল। চপলার নির্দেশে বামুনদি বিলুকে সাজগোজ করাচ্ছে। সেই এক গেলাস দুধ, যা খেতে গেলে বিলুর কান্না পায়। খেতেই হবে। বড়মা বলেছে, দুধ খেলে তবেই গায়ে জোর হবে। এদিকের গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে বলে শুট করলে ওদিকের গোলপোস্টে গোলার মতো ঢুকে যাবে। এত জোর সামনে যদি একটা পাঁচিলও পড়ে, ভেঙে বেরিয়ে যাবে।

'ওকে একবার চট করে মাঠ থেকে ঘুরিয়ে আনো বামুনদি। বেশি দেরি কোরো না। সন্ধে হবার আগেই ফিরে আসবে। বড় রাস্তায় যাবে না। মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে একের পর এক।'

বিশাল খেলার মাঠটার অবস্থা দেখে বিলুর কান্না পেয়ে গেল। গভীর দুটো সুড়ঙ্গ অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ভেতরে বিলুর মতো কেউ দাঁড়ালে তাকে আর দেখা যায় না এত গভীর গর্ত। মাঠের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বেলগাছ। শীতে ঝরে গেছে সব পাতা। গড়ের মতো সেই বাড়িটার ভেতরের সব আগাছা সাফ করে ফেলেছে। সেখানে এ আর পি-র ঘাঁটি হবে। গোটা কতক র‍্যাফল ওয়াল তৈরি হয়েছে। লাল রঙের পোস্টার পড়েছে। হেলমেট মাথায় সৈনিক। পিঠে বেয়নেট লাগানো রাইফেল। তলায় লেখা, যুদ্ধে যোগ দিন। সৈনিকের মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। একগাদা লাল বালতি, স্টিরাপ পাম্প পড়ে আছে। বস্তা বস্তা বালি।

কল্যাণ একটা লাল রঙের সোয়েটার পরে একদল বড়, ছোট মেয়ের সঙ্গে ট্রেঞ্চের ভেতর হুড়োহুড়ি করছিল। বিলুকে দেখে কল্যাণ উঠে এল, 'আয় খেলবি আয়। বড়মা এলেন না?'

'বড়মার অসুখ করেছে।'

'বড়মায়েরও অসুখ! এত অসুখ করলে ভাল লাগে! রোজ রোজ, অসুখ।'

কল্যাণ প্যান্টের পকেট থেকে একগাদা কাচের মার্বেল বের করে বিলুকে দিল। সুন্দর সুন্দর রং। 'নে বাড়িতে গিয়ে খেলবি।' কল্যাণ লাফ মেরে ট্রেঞ্চে নেমে গেল। ফুল ফুল ফ্রক পরা সুন্দর মতো একটা মেয়ে কল্যাণের মাথায় চাঁটা মেরে মেরে ছুটে পালাচ্ছে, কল্যাণ তাকে ধরার চেষ্টা করছে। কিছুতেই পারছে না। সে এই লাফিয়ে ওপরে ওঠে তো, এই লাফিয়ে নীচে নামে। মেয়েটাকে বিলুর খুব ভাল লেগে গেল। তারও ইচ্ছে করছিল, খেলা করতে। সেই মেয়েটাকে সবাই গীতা গীতা বলে ডাকছিল।

বামুনদি বিলুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। বড় বড় বেলুন উড়িয়েছে মিলিটারিরা। ডানাকাটা প্লেনের মতো দেখতে। একজন বললেন, 'দেখো খোকা, একে বলে বেলুন ব্যারেজ। বোমারুরা তো খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসে বোমা ফেলে, এইগুলো থাকলে খুব নিচুতে আর নামতে পারবে না। ডানা কি চাকা আটকে পড়ে যাবে। আর ওই যে দেখছ লতাপাতার আড়ালে সার সার সব কামান। বিমান মারা কামান। গোলা মেরে সব মাটিতে ফেলে দেবে। কত বড় বড় সার্চলাইট ফিট করেছে দেখো। রাতের বেলায় আকাশে আলো ফেলবে, একেবারে মেঘের গায়ে গিয়ে লাগবে। রাত্তিরবেলা দেখবে কী মজা। আজকালের মধ্যে এখানেও বোমা পড়বে। দু'কানে খুব করে তুলো গুঁজবে, আর ছোট একটুকরো কাঠ দাঁতে চেপে রাখবে। দেখবে বোমা পড়লেও তোমার কিছু হবে না। মাটিতে শুয়ে পড়বে।'

গঙ্গার ধারটা খুব জমজমাট হয়েছে। সিপ্লেন ওঠানামা করছে। যখন উঠছে আর নামছে জলটা যেন ধোঁয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। বিলুর মনে হচ্ছিল সারাদিন বসে থাকে গঙ্গার ধারে। কালো রঙের সৈন্য, লাল রঙের সৈন্য, সাদা রঙের সৈন্য। লাল খাকি পোশাক। সাদা ধবধবে পোশাক। কত রকমের জিনিস, লোহা-লক্কড়, ক্রেন। নানা ভাষায় চিৎকার, চেঁচামেচি। ভারী বুটের শব্দ। হঠাৎ এক আমেরিকান সৈন্য এসে বিলুর হাতে বিলিতি একটা চকোলেটের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। বিলুর একটুও ভয় করল না। ভয়ে মরল বামুনদি। সে অমনি বিলুকে কোলে নিয়ে তরতর করে হাটতে লাগল। আমেরিকান সৈন্যটি হা হা করে হাসছে।

বিলু বাড়ি ফিরে এসে দেখলে, বড়মার ঘরে দু'জন ডাক্তারবাবু। জ্যাঠামশাই, বাবা, দীনু কাকা। কত কথা বলার ছিল। চকোলেটের সুন্দর খাপটা দেখাবার ছিল। কিছুই হল না। কারওই সময় নেই তার সঙ্গে কথা বলার। বড়মা শুয়ে আছেন। বিলুর মনে হল তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। নারাণকাকা খুব ব্যস্ত হয়ে সাইকেলে চেপে কোথায় চলে গেলেন।

মুকুজ্যেমশাই গম্ভীর মুখে বসে আছেন ঘরের বাইরে। মাঝে মাঝে চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। বিলুকে দেখে বললেন, 'কী হবে বলো তো! এক-এক করে সবাই অসুখে পড়ছে। অসুখের আর শেষ নেই।'

দাদুকে দেখলেই বিলুর ভীষণ ভয় করে। সাদা পাথরের মূর্তির মতো। ঠাকুর-ঠাকুর দেখতে। বড় বড় চোখ। এতখানি ভুরু। গলাটা গমগম করছে। বিলু ছুটে পালাল। সেই উত্তরের ঘরে। পুবের জানলায় ঝুঁকে আছে নিমগাছ। কনকনে শীত। প্রদীপ জ্বেলে কেউ প্রার্থনায় বসাল না। মন্ত্র পড়া হল না। গান হল না। কেউ খাওয়ার কথাও বলছে না। বামুনদি একটু করে রান্না করছে, এক-একবার ছুটে চলে যাচ্ছে বড়মার ঘরে। ফিরে এসে মাথা নাড়ছে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। দুধ উথলে উনুনে পড়ল। পোড়া পোড়া গন্ধ।

সেই রাত থেকে বিলুর শোয়া আরও হল বাবার বিছানায়।

'শোয়ার আগে জল খেয়েছ?'

বিলু ঘাড় নাড়ল। না, খায়নি।

ছোটকর্তা বললেন, 'ঘাড় নাড়বে না। তোমার মাথার দিকে তাকিয়ে কেউ বসে নেই। মুখে বলবে, হ্যাঁ কি না। যাও জল খেয়ে এসো। শোবার আগে জল খেতে হয়।'

বাবাকে ভীষণ ভয় করে বিলু। সেই দিন থেকে। সে এক ঘটনা। ছোটকর্তা মেঝেতে বসে জল খাচ্ছেন কাচের গেলাসে। বিলু ছুটে এসে ছোটকর্তার ঘাড়ে পড়ল আচমকা, বাবা বলে। গেলাসটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। ছোটকর্তা চোখ লাল করে বললেন, স্টুপিড। সেই মুখ, সেই চোখ, ইংরিজি শব্দ। বিলু আর কোনওদিন বাবার ঘাড়ে পড়ে আদর জানাবার চেষ্টা করেনি। তার যত আবদার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। বুকের ওপর শুয়ে পড়ে গল্প শোনা। চুল নিয়ে খেলা করা। কানে কানে ফিসফিস করে কোনও কিছু বায়না করা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা তামিল হয়ে যাওয়া।

বিলু বিছানার একধারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। এই সময় রোজই তার মায়ের কথা মনে পড়ে। আজ তার মনে হচ্ছে জ্যাঠাইমার কথা। আর গায়ে সেই সুন্দর গোল হাতটা এসে পড়ল না। চুড়ির সেই কিনকিনে আওয়াজ কানে এল না। নাকে সেই সুন্দর গন্ধটা লাগল না। তার একটা পা জ্যাঠাইমার নরম পেটের ওপর তুলে দিতে পারল না। বালিশ ছেড়ে জ্যাঠাইমার হাতের ওপর মাথা রাখার উপায় নেই। চোখ বুজিয়েও বিলু দেখতে পাচ্ছে অসীম আকাশ। একটা ঘুড়ি উড়ছে চাঁদের আলোয়।

অনেক রাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। অল্প একটু চোখ মেলে দেখল পাশে বাবা। আধশোয়া হয়ে খুব হালকা হাতে তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছেন। বাবার মুখ তার মুখের দিকে নেমে আসছে। বাবা তাকে চুমু খেলেন খুব আলতো করে। হাত দিয়ে তার শরীরটা চেপে ধরলেন। দু'-তিনবার বললেন তার আদুরে নাম, মানু, মানু, মানু।

॥ ৬ ॥

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায় ॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় ॥

নির্জন দ্বিপ্রহরে গান ঘুরছে ঘরে ঘরে। ভাঙা হাটে চাঁদের আলো। আর কত দিন তা জানি না। যেতে পারিনি বলে একা রয়ে গেছি আমি। পূরবীতে গাওয়া সেই গানটার মতো, ভরা হাটের হেটো যারা, একে একে গেল তারা। আমি কর্মদোষে রইনু বসে শিরে ধরি পাপের বোঝা। ইংরেজরা বলেন বৃদ্ধ হয়েছ তো কী হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাঁচতে শেখো। ভোগী বিষয়ীরা তা পারে। যে বেড়ে উঠেছে অবিষয়ে, যে বাঁচতে শিখেছে দেহে নয় মনে তার পক্ষে কি সম্ভব! একটা বয়সের পর চোখ দুটো ঘুরে যায় পিছনে।

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়—
জানি নে তো কখন এল বিস্মরণের বেলা ॥

উত্তরের বারান্দায়, যে জায়গাটায় যমুনা তৈরি করে মা আমাকে চান করাতেন সেই জায়গায় আমার ইকমিক কুকারের বাটিগুলো পড়ে আছে। একটু পরেই কাজের মেয়েটি এসে মেজে দিয়ে যাবে। তারপর সে-ই দু'কাপ চা করবে। এক কাপ আমার, এক কাপ তার। আমার সামনে মেঝেতে বসে সিপসিপ করে খাবে, আর যত রাজ্যের গল্প করবে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাবে অন্য বাড়ির কাজের কথা। সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে তার সেই অলস ভাব। কাপ দুটো ঝটপট ধুয়ে, মুখে একটু খইনি ফেলেই ধড়ফড় করে ছুটবে। বয়স কম। বাঁচার বাসনা প্রবল। সেই কুকারের বাটিগুলো নিয়ে একটা কাক এখন বাজনা বাজাচ্ছে।

আমি মনে মনে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করি। মালা হতে ফুল ঝরে যাবার কাহিনি। বালি বালি কাগজের ডবল ডিমাই মাপের দুটি খাতা, আর বার্মার বাঁশের অপূর্ব কাজ করা একটি গয়নার বাক্স আর ট্রে, সমস্ত ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে জীবনের এতটা পথ। খাতা খুললেই সেই সব সুন্দর সুন্দর লতা-পাতা আর ফুল। আর একটা জিনিসও আমি সযত্নে রেখেছি।

প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া, হাতে বোনা গাঢ় নীল রঙের একটা সোয়েটার। প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসা একটা বাড়ির মতো। এর প্রতিটি ফোঁড়ে আমার জ্যাঠাইমার হাতের স্পর্শ। যার সোয়েটার সে এখন বৃদ্ধ। কোন আকার থেকে কোন আকারে চলে এসেছে। অতীত কীভাবে বড় হয়। ছিলুম একটা পাখি, হয়ে গেলুম বৃদ্ধ এক জরদ্গব। গয়নার বাক্সে কোনও গয়নাই আর নেই। সব উড়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে দেনা মেটাতে। নীচের তলায় পাতা আছে লাল রঙের নরম এক টুকরো কাপড়। বাক্সর ভেতরটা পাখির ঠোঁটের মতো লাল। প্রাচীন গন্ধ। বাক্সটার ভেতরে আছে স্বপ্ন। জীবনের উষ্ণতা। সম্পন্ন এক পরিবারের স্মৃতি।

খাটের পরমায়ু মানুষের আয়ুর চেয়ে অনেক বেশি। ওই তো সেই খাট। সময়কে একটু পেছনে সরাতে পারলেই দেখতে পাব আমার সেই জ্যাঠাইমাকে। বড় অসহায় মুখচ্ছবি। চারপাশে ছড়ানো সংসার। কত কাজ। নিয়তি বেঁধে রেখেছে বিছানায়। বালিশের পাশে সংসারের হিসেবের খাতা। বামুনদি থেকে থেকে ছুটে আসছে। নিয়ে যাচ্ছে আদেশ। শুয়ে শুয়েই সংসার পরিচালনা করছেন জ্যাঠাইমা। নিরঞ্জনদাকে বলছেন, যাও বিলুর চুল কাটিয়ে আনো। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর কাছে একবার নিয়ে যাও। খুব কাশি হয়েছে। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে। নিয়ে এসো। বোতাম বসাতে পারি কি না দেখি। ঘুম নেই। যন্ত্রণায় ঘুম আসে না। কোমরে পুরু প্ল্যাস্টার। গোল্ড ইঞ্জেকশান করা হয়েছে। সর্ব অঙ্গে ব্যথা। তবু তিনি পরাজিত হতে রাজি নন। মৃত্যু তাঁর জীবননিষ্ঠার কাছে ম্লান।

যে ক'বছর তাঁকে পেয়েছিল এই বিলু, কত জ্বালাতনই না করেছে। শনিবারে মাঝে মধ্যে ভাল ছবি এলে সিনেমায় সদলে যাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। সেই দিনের সেই ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে। সিনেমার মাঝপথে বিলুর বড়বাইরে পেয়ে গেল। সামান্যতম বিরক্তি নেই। ঘৃণা নেই। বিলুকে নিয়ে চলে এলেন বাইরে। ছবিটা ভালভাবে দেখাই হল না। বিলু লজ্জায় অধোবদন। তিনি কেবলই বলেন, এতে লজ্জার কী আছে। এ তো হতেই পারে। সিনেমা কী এমন জিনিস যে পুরোটাই দেখতে হবে!

ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি কমে আসছে তাঁর; আর খেলায় হেরে যাওয়া মানুষের মতো, ছোটকর্তা আর মেজকর্তা ছটফট করছেন। মৃত্যু গোল দেবেই আর তাঁরা চেষ্টা করছেন গোলপোস্ট আটকে দাঁড়িয়ে থাকার। ছোটকর্তা মেঝেতে বসে এসরাজ বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। মেজকর্তা পড়ে শোনাচ্ছেন বই। ছোটকর্তা বীরের ভঙ্গিতে বলছেন, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি ভাল হয়ে যাবে। দেখি কার ক্ষমতা আছে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তবু কিছু হল না। খাট ঘিরে সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ঠিক সেই প্রথম রাতে মৃত্যু এসে ঈগলপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল আমার বড়মাকে, যেমন তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমার মাকে। বাইরে তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে চাঁদের আলো। আর ঠিক সেই সময়ে কলকাতার আকাশে উড়ে এল এক ঝাঁক জাপানি প্লেন। সাইরেন বেজে উঠল। কারওরই খেয়াল রইল না সেদিকে। বোমা পড়ল হাতিবাগানে। জ্যাঠাইমার ঘরের দেয়াল আলমারির সমস্ত কাচ চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কেউ গ্রাহ্যই করল না। গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল। রাস্তার সমস্ত আলো নিবে গেল। জ্যাঠামশাই শিশুর মতো বাবাকে বললেন, 'যাঃ চলে গেল যে রে!'

বাবা বললেন, 'আরও একবার পরাজিত হলুম।'

এইসব দৃশ্য, কথা, আমার মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সব ফিরে আসছে স্পষ্ট হয়ে। যে-কোনও সময় আমার চোখের সামনে আনতে পারি। সময়, চরিত্র, পরিবেশ সবই যেন আমার নিয়ন্ত্রণে। বয়স এমনই এক জাদুকর। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব একাকার।

নিস্তব্ধ ঘর। শেষ নিশ্বাস ফেলে আমার জ্যাঠাইমা নিথর নিস্পন্দ। সাইরেন থেমে গেছে। অল ক্লিয়ার হয়নি। আকাশ শত্রুবিমানের দখলে। কোথায় বোমাটি ফেলবে তারই সন্ধান চলেছে। অস্পষ্ট

গুঞ্জন। মৃত্যুকে ঘিরে মৃত্যুরই পরিমণ্ডলে বসে আছে সবাই। লক্ষ্যচ্যুত সবাই। লক্ষ্যচ্যুত একটি বোমা এই বাড়ির ছাদেও পড়তে পারে। মৃত্যুকে সেই মুহূর্তে কেউ আর পাত্তা দিচ্ছে না; কারণ বেঁচে থাকার অর্থটাই তখনকার মতো হারিয়ে গিয়েছে।

অল ক্লিয়ারের সাইরেন বাজল একটানা সুরে। সেই বাঁশির আলাদা অর্থ হয়ে রইল আমার কাছে। বিমান নয়, আকাশ নয়, আমার জীবনটাই অল ক্লিয়ার হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

সব কাজকর্ম মিটে যাবার পর মেজকর্তা ছোটকে বললেন, 'ভালই হয়েছে। আমাদের দু'জনেরই এক অবস্থা। কে বলে ভগবানের বিচার নেই! দু'জনকেই দেখো কেমন সমান করে দিলেন! তুমি আমাকে দেখবে, আমি তোমাকে দেখব।'

'তা যা বলেছ। দু'দিনকা মেলা। কারওই আর কোনও ক্ষোভ রইল না। সংসার চেনা হয়ে গেল। প্রেম ভালবাসা জানা হয়ে গেল। এইবার তুমি তোমার কাজে, আমি আমার কাজে। বাবা যখন এই বাড়িটা কিনছিলেন, তখন অনেকেই বারণ করেছিলেন। অভিশপ্ত বাড়ি। অনেক পাপকাজের সাক্ষী। সহ্য হবে না। একে একে সব যাবে। একটু একটু যেন মিলছে! কথা হল, এবার কে? কে যাবে এবার? তুমি, না আমি?'

'তুমি তো এমন হতাশার কথা আগে বলতে না? তোমার তো প্রচণ্ড জীবনীশক্তি আছে বলেই আমি জানি।'

'শোনো, বারে বারে আশা ভাঙলেই মানুষ হতাশ হবে। বুঝলে, ভগবান টগবানে বিশ্বাস আমার একেবারেই টলে গেছে। কোনওকালে ছিল না। ইদানীং একটু আনার চেষ্টা করছিলুম। বউদির মৃত্যুতে সেটা একেবারেই চলে গেল। তুমি জানো, রাতের পর রাত আমি প্রার্থনা করেছি। সিনসিয়ার প্রার্থনা। এখন বুঝে গেছি, পৃথিবী আর কিছুই নয় কারণ, কায, পরিণতি। পৃথিবী হল শক্তি আর তার প্রতিক্রিয়া। সময় যৌবন ধরে টানছে, জরা জীবন ধরে টানছে, মৃত্যু রোগ বীজাণু হয়ে নাচছে। ভগবান থাকলেও হেল্‌পলেস।'

'যাক, তুমি একটা জীবনদর্শনে পৌঁছেছ। ভাবনা হল ছেলেটাকে নিয়ে।'

'ভেবে কোনও লাভ নেই মেজদা। ভাবনায় কিছু হয় না। এইসব অবস্থায় তোমাকে নিয়তি মানতে হবে। নিয়তি ফ্যাক্টর। দর্শকের ভূমিকা নিতে হবে। দেখা যাক, কী হয়!'

'সারাদিন আমরা দু'জনেই বাড়ির বাইরে, সেটা খেয়াল করেছ?'

'বামুনদি আছে।'

সে-তো একেবারেই পর।'

'পরই আপন হবে। আপন করে নিতে হবে।'

'কিন্তু ছোটবউ যে একটা গান গাইত, আপনার জন সতত আপন, পর কি কখনও হয় রে আপন!'

'আবার আর একটা গান, দু'জনে মিলে গাইত, কী ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়। সর্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত করুণাময়। একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে। সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়। তা তুমি আর আমি তাঁকে কম ব্যাকুল হয়ে ডেকেছি? দেখা দিয়েছেন তিনি? সেই দীনবন্ধু! গান কখনও মেলে না। মৃত্যু ভয়, বিচ্ছেদ বেদনা, হতাশা থেকে মানুষ গান লেখে। সর্বশক্তিমানের একটিই শক্তি মানুষ মারা, সংসার ভাঙা। সেই ভয়ে মানুষ তাঁকে তোষণ করে। ওসব একেবারে বিশ্বাস কোরো না। সত্যের সংজ্ঞা অনবরত পালটাচ্ছে। সত্য একটাই, বাঁচো আর মরো।'

'নাঃ, তুমি খুবই রেগে আছ। পরে আলোচনায় বসা যাবে।'

পাঠ্ঠা দু'জন কাজের লোক মণি আর নিরঞ্জন আর অতি বিশ্বাসী বামুনদি, এই দাঁড়াল সংসার। সঙ্গে খামখেয়ালি নারাণ। বিলুর বড় বড় চোখ আরও বড় বড় হয়ে গেল। না পারে মা বলে ডাকতে, না পারে বড়মা বলে। সকাল আর রাত যদিও বা চলে, সকাল ন'টার পর থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সময় যেন আর চলতেই চায় না। বাগানের এক কোণে পড়ে আছে জ্যাঠাইমার কোমর থেকে খুলে নেওয়া বিশাল এক প্ল্যাস্টারের ছাঁচ। শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে কেটে খোলা হয়েছিল। খুলেছিলেন নারাণকাকু। সেই দৃশ্যটা বিলুর কেবলই মনে পড়ে। ছোটকর্তার সেই বড় ছুরিটা নিয়ে চচ্চড় করে কাটছেন। বিলু দমবন্ধ করে বসে আছে একপাশে। কেবলই মনে হচ্ছে, জ্যাঠাইমার অমন সুন্দর শরীরটা না কেটে যায়!

সকাল ন'টার পর গোটা বাড়িতে বিলুর ঘুরে ঘুরে বেড়াবার অপার স্বাধীনতা। সব বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। কেউ বলার নেই। দেখার নেই। শাসন নেই কোনও। বামুনদি সারা বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মণি আর নিরঞ্জন কর্তারা বেরিয়ে যাবার পর নিজ মূর্তি ধারণ করে। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া। খিস্তি চালাচালি। নারাণকে তারা পাত্তাই দেয় না। ধমক-ধামক দিলেই ইংরেজিতে বলে, হু আর ইউ। জানে না কাকে ঘাঁটাচ্ছে। যেদিন রেগে যাবেন, সেদিন আর রক্ষে নেই। নারাণ খেপে গেলে মানুষ খুন করতে পারেন। তখন তাঁর শরীরে অসীম শক্তি ভর করে।

বিলুর এইসব পছন্দ হয় না। সে নেমে যায় একতলার বাগানে। মা আর জ্যাঠাইমার পোঁতা গাছের কোনওটায় নতুন পাতা ছাড়ছে। কোনওটায় কুঁড়ি এসেছে। কোনওটায় ফুটেছে লাল একটি ফুল। বিলু তাদের সঙ্গে কথা বলে। পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলে যায় কাঠবেড়ালি। টুনটুনি দোল খায় লতার ডগায়। প্রজাপতি ভাসে কাগজের টুকরোর মতো। ঝোঁটন বুলবুলি ঘাড় কাত করে দেখে। সবুজ পাতার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রোদের আভা। পাতাগুলো হয়ে উঠেছে আরও সবুজ। ব্লটিং পেপার যেমন কালি শুষে নেয়, পাতাও সেইরকম রোদের সবুজ শুষে নিয়েছে। বাগানে ঘুরছে ঠান্ডা-গরম বাতাস। কতরকমের পোকা সোনালি মাছি। কোনও কোনও পাতার উলটো দিকে ধরেছে পোকা। বিলু ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখে, ভেতরে কী করছে বিশাল সেই পোকাটা। ডানায় যেন সোনার গুঁড়ো লেগে আছে। বিলু ভাবে সত্যিই হয়তো সোনা! এমন সময় একটা মাছরাঙা পাখি বাগান চিরে উড়ে যায় ডাকতে ডাকতে। বিলু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওপর দিকে। ওই পাখিটা যেন পাখিদের ডাকহরকরা।

বিলু এইবার এগিয়ে যায়। লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা সেই প্ল্যাস্টারের ছাঁচটার দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ঠিক যেন মানুষের কোমর। জিনিসটার কাছে বসে থাকে উবু হয়ে। এই তো তার বড়মা। শুয়ে আছেন ঘাসের বিছানায়। যেন রাজা, যুদ্ধ শেষে বর্মটি খুলে রেখে চলে গেছেন। ভেতরে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের বিন্দু। রাত কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছে দিনের বিছানায়। বিলু ভয়ে ভয়ে জিনিসটায় একবার হাত দিল। হাত দেওয়ামাত্রই একপাশে কাত হয়ে পড়ল। ছোট্ট একটা ব্যাং তিড়িং করে লাফ মেরে বিলুর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

নীচের তলার আলো-বাতাসহীন অন্ধকার অন্ধকার সব ঘর, মালপত্রে ঠাসা। কোনও ঘরে ঘুঁটে, কয়লা, কাঠ। কোনও ঘরে শুধুই ভাঙা ভাঙা ফার্নিচার। হাতল ভাঙা চেয়ার, পায়া ভাঙা টেবিল। বিলু উঁকি মেরে মেরে দেখে। একটা ঘরে পড়ে আছে, বড়মায়ের সেই বিশাল জাহাজি বাক্সটা। জাহাজ কোম্পানির নানারকম লেবেল মারা। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে জ্যাঠাইমার সঙ্গে বাক্সটা এল জাহাজে চেপে। ভেতর থেকে বেরোতে লাগল একের পর এক নানা জিনিস। বিলু বাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এত বড় যে বিলু বাক্সটার ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না। তারপর যদি কেউ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, ভেসে ভেসে চলে যাবে জ্যাঠাইমার দেশে। যেখানে আকাশের গায়ে প্যাগোডা। প্যাগোডার ভেতরে শুয়ে আছেন

পাথরের তৈরি বিশাল বুদ্ধমূর্তি। বাঁশবাগানের পাশে সেই ইংরেজি স্কুল। সাদা রঙের সেই সুন্দর বাড়িটা। হলুদ রঙের কার্নিশ। জ্যাঠাইমার কাছে কত গল্প শুনেছে ওই স্কুলের। ওই স্কুলের মেমসায়েব দিদিমণির। স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে হাতি চলেছে, গলায় বাজছে ঘণ্টা। কিছু দূরেই সমুদ্র। নীল আকাশের গায়ে সবুজ ঢেউ। রাতের বেলা আলোর মালা পরে আছে রেঙ্গুন। ইংরেজদের ক্লাবে বাজনা বাজছে। ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে গুন্ডারা। বাক্সটার ডালা খুললেই বেরিয়ে পড়বে সেই জগৎ। ঢাকনাটা সে সাহস করে খোলার চেষ্টা করল। সে জানে ভেতরটা নীল। চন্দনের গন্ধ। খুলতে পারল না। ভীষণ ভারী।

আর ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে বামুনদি এসে তাকে কোলে তুলে নিল। 'চান করতে হবে না? খেতে হবে না!' মা জ্যাঠাইমার নরম কোল নয়। এ কোল খুব শক্ত। সবাই বলে, বামুনদি ছেলেবেলায় বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করত মনে হয়। যেন পাথবকোঁদা শরীর। মণি অসভ্য অসভ্য কথা বলছিল সেদিন, এক চড়ে চোয়াল ঝুলিয়ে দিয়েছিল বামুনদি।

বামুনদি বিলুকে রোদে দাঁড় করিয়ে তেল মাখাতে লাগল ডলে ডলে। উত্তর থেকে বাতাস আসছে, ফরফর করে, শীত মেখে। ছাতের দিকে তাকালেই উঁকি মারছে নানা রঙের বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা। ছোটকর্তার সবচেয়ে প্রিয় ফুল। ছোটকর্তার জীবনসাধনা। মাঝে মাঝে বলেন, পৃথিবী তিনটে জিনিস নিয়ে, ফুল, কবিতা আর বন্দুক।

দুপুরবেলা জ্যাঠাইমার সেই ঘর। স্লেট পাথরের মতো মেঝে। খাটে নিভাঁজ বিছানা। পরপর দুটো মাথার বালিশ। কেউ নেই। মেঝেতে গড়াচ্ছে কমলালেবু রঙের রোদ। ঘুলঘুলিতে তিনটে চড়াই। কাচ্‌কাটা গলায় থেমে থেমে ডাকছে। বিলু উপুড় হয়ে লিখছে, এক ঘর লেখা। মাঝে মাঝে খাটের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে বড়মা বসে আছেন, কখনও মনে হচ্ছে নেই। বিলু লিখছে, থামছে, সোজা হয়ে বসছে। একটু অপেক্ষা করছে। বড়মায়ের দেখা হয়ে যাক, তারপর আবার লিখবে। একটু চেষ্টা করলেই সে চপলাকে দেখতে পায়। সমুদ্রের মতো নীল চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চপলার গলাও সে শুনতে পায়, বাপি, তুমি পারবে পারলে সব পাবে। বিলু তার সব বই খাতা বড়মায়ের বালিশের পাশে সাজিয়ে রেখেছে। পেনসিল, ইরেজার। বড়মা পড়া দেবেন। বিলুর সঙ্গে বড়মায়ের কথাও হয়— 'তুমি বলেছিলে বালি কাগজের বড় একটা খাতা করে দেবে। পালকের কলম। ঝুল কালো কালি।'

'সময় হল না বাপি। ট্রেন এসে গেল যে! ভোঁ বাজিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ফিরে আসি, যদি দেখা হয় তখন, যা যা বলেছিলুম, যা যা করতে পারিনি, সব করে দোব, সবার আগে।'

রোদ নেমে গেল। নেমে গেল গাছের মাথা থেকে। দক্ষিণের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের ছায়া লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। আয়েশি দৈত্যের মতো। মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে বিকট শব্দে। লোক-জন-জীব-জন্তু কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে না। ট্রাকের মাথায় নানা দেশের সৈন্য। জানলার দিকে, বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে। সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েদের দেখলেই চিউইং গামের প্যাকেট, সিগারেটের প্যাকেট ছুড়ছে। বামুনদি দাঁড়িয়ে ছিল। তার বুকে প্লেয়ার্স সিগারেটের একটা প্যাকেট এসে লাগল। লালমুখো এক সৈনিক চিৎকার করছে—কাম ডারলিং, কাম। ওয়ার ইজ অন। পরক্ষণেই বামুনদি একটা সিগারেট ধরিয়ে এক টান মেরে ভয়ংকর কাশতে লাগল। দৃশ্যটা বিলুর মোটেই ভাল লাগল না। জ্যাঠাইমার শূন্য খাটের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল, নেই তাই খাচ্ছ। বামুনদি খুব অসভ্য। জামা পরে না। কেমন যেন। নিরঞ্জনদার সঙ্গে মারামারি করে। পান খায় দোক্তা দিয়ে। সিদ্ধি আর কুচলা একসঙ্গে বেটে খায়। চপলা খুব বকতেন। এখন চপলা নেই, কেউ নেই। তাই যা খুশি তাই করে। দুপুরেই এক দলা সিদ্ধি খেয়ে ধেই ধেই করে নাচে। খিলখিলিয়ে হাসে। কাপড়টাপড় সব খুলে ফেলে। সাহস কত! শুয়ে পড়ে জ্যাঠাইমার খাটে। বিলুকে বলে, আয় আয়, আমার বুকে আয়, বোকা ছেলে। খোলা বুক দেখে বিলু ভয়ে ছুটে পালায়। লুকিয়ে থাকে রান্নাঘরের জালার আড়ালে।

আবার অন্য সময় বামুনদি কত সুন্দর! যখন সে স্বাভাবিক থাকে। যখন সে নেশা করে না। তখন সে যেন এক কঠোর প্রশাসক। তখন তার সামনে কারও দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সে নেশা করবেই। বিয়ে হল। বিধবা হল এক বছরের মধ্যেই। তিন দিনের মধ্যেই রাস্তার ভিখিরি। সাতঘাটের জল খেয়ে শেষে এই আশ্রয়ে। এক তন্ত্রসাধক জীবনের দুঃখ ভোলাবার জন্যে এই নেশা ধরিয়েছিলেন। ভগবান যতটা দূরে ছিলেন ততটা দূরেই রয়ে গেলেন, নেশাটাই ধরে গেল। সবচেয়ে ভয়ের কথা ছোটকর্তা একদিন এক দলা সেই বিচিত্র বস্তুটি খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে ছিলেন। নেশা কেটে যাবার পর বলেছিলেন, সর্ব দুঃখহর। সাধে মহাদেব এর ভক্ত। সেই থেকে বামুনদির সাহস ভয়ংকর বেড়ে গেছে। এক দিনের জন্যে হলেও ছোটকর্তাকে তো দলে ভেড়াতে পেরেছে। ছোটকর্তাকে সেই থেকে আর আগের মতো ভয়ও পায় না। মেজকর্তা ছোটকে একদিন বলেছিলেন, 'কাজটা তুমি ভাল করোনি। সমাজে মানুষের নানা স্তর। স্তর বুঝেই মেলামেশা করা উচিত। তা না হলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।' তাতে ছোটকর্তা বলেছিলেন, 'সুযোগের অভাবেই এই স্তরভেদ। সমান সুযোগ পেলে মানুষের মধ্যে এই ছোট বড় ভেদাভেদটা থাকত না।' বলেই আবৃত্তি করলেন :

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মেজকর্তা বললেন, 'আমাদের সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে। দেখো কোনও স্ক্যান্ডাল যেন না হয়। অশিক্ষিতা মহিলারা প্রশ্রয় পেলে সব লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষেরই একটা দুর্বল দিক আছে। সেইটা খেয়াল রেখো।'

'তোমার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছি।'

'ভুলে যেয়ো না, বড়দার মতো দেবতুল্য মানুষেরও হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল। শেষে পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার ফলে বাবার মতো মানী মানুষকে প্রায় অকালেই চলে যেতে হল। এ দেশটা বিলেত নয়। তুমি সায়েবি মেজাজের মানুষ, সেরকম হলে তুমি তোমার লেভলে বসে মাত্রা ঠিক রেখে ড্রিঙ্ক করো। সে তোমার অনেক ভাল। এ কেমন কথা, সে তোমার বিছানায় শুয়ে বিলুকে ঘুম পাড়ায়। বিলু একাই ঘুমোতে পারে। ওটা একটা ছুতো। বিছানা একটা পবিত্র সামথিং। এটা তোমার সোশ্যালিজমের চূড়ান্ত।'

ছোটকর্তা গম্ভীর মুখে সরে গিয়েছিলেন। মেজকর্তা যেভাবে ভেবেছেন, সেভাবে তিনি ভাবেননি। তিনি কিঞ্চিৎ ভিন্নতর পথে ভেবেছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি মেয়েরা হীন স্বাস্থ্য। অল্পেই কাতর। শ্রম বিমুখ। সুখই তাদের যত অসুখের কারণ; কিন্তু খাটিয়ে মেয়েরা স্বাস্থ্যবান। তাদের মন অনেক পরিষ্কার। বিশ্বাসী। কর্তব্যপরায়ণ। বাঙালির সংসার তারাই চালায়, লাথি ঝ্যাঁটা খায়। এদের সম্পর্কে সংস্কৃতিবান বাঙালির উদার হওয়া উচিত! না হওয়াটাই নীচতা। অমানবিকতা। মেজকর্তার পছন্দ হচ্ছে না যখন, যখন অন্যরকম মানে করছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

ছোটকর্তা সিদ্ধি কিন্তু ছাড়তে পারলেন না। কনফেশানস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার পড়ে খানিকটা নৈতিক সমর্থন পেয়েছে। দা কুইনসে লিখছেন, Thou hast the keys of Paradise, Oh just, subtle and mighty opium। মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যায়। একটা ঘোরের মধ্যে। তখন পড়তে ভাল লাগে, লিখতে ভাল লাগে, এসরাজ আরও ভাল বাজানো যায়। গান আসে। আবার এত দুঃখের মধ্যেও প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করে। পরিবেশকে বেশ রঙিন

মনে হয়। আরতি চপলা আসতে পারে। এসে বসতে পারে সামনে। সুন্দর শাড়ি পরে। ফুল হাতা ব্লাউজ। খোঁপায় কাঞ্চন ফুল গুঁজে। টুকটুকে দুই সুন্দরী। ছোটকর্তার এসরাজের সঙ্গে তাঁরা গান গাইবেন—অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর।

মেজকর্তাকে ধরল মাছ ধবার নেশা। ব্যাপারটা মন্দ নয়। বিশাল পুকুর। একটু ঘাসে ঢাকা জমি। সারাদিন বসে থাকো ছিপ ফেলে। সবুজ জলে উঁচিয়ে আছে সাদা ফাতনা। বাতাসের মেজাজে তৈরি হচ্ছে জলেব ওপর তরঙ্গ। কখনও বাতাস সরু শ্বাসের তুলিতে গিলে করা পাঞ্জাবির মতো ঢেউ আঁকছে। কখনও লাঙলের ফলার মতো কুদলে দিচ্ছে। কখনও স্থির আয়নার মতো। নীল আকাশের ছায়া, ধারে ধারে গাছের ছায়া। স্তব্ধ প্রকৃতিতে হাতুড়ি ঠুকছে কাঠঠোকরা। চাতক চিৎকার করছে, জল দে, জল দে.। ডাহুক ধমকাচ্ছে, চুপ চুপ। মেজকর্তা বসে আছেন ছিপ ফেলে। পাশে পানেব ডিবে, দোক্তার কৌটো। মাঝেমধ্যে হাতির দাঁতের পাইপে গুঁজে দামি একটা সিগারেট। কেউ কোথাও নেই। অনেক দূরে আকাশের আঁচলে একটা নিঃসঙ্গ চিল, ক্লিপের মতো; কিংবা একটা বোমারু বিমান। বসে থেকে থেকে মনে হয়, যেন একটা মুক্তো হয়ে গেছেন ঝিনুকের পেটে। কণ্ঠস্বর, যেন আরতি পাশ থেকে জিজ্ঞেস করছে—মেজঠাকুর মাছ পেলেন? চপলার হাসি, ছোট তুইও যেমন, ছিপ ফেললেই কি আর মাছ ওঠে। এ হল মাছের ধ্যান। বলেই এক চরণ গান, যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর। ছুটির দিনের দুপুরটা পুকুরে ফেলে দেওয়াই ভাল। বাড়ি মানেই অজস্র স্মৃতি। দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর।

এদিকে দেশের পরিস্থিতি অতিশয় জটিল। ডিংডং ব্যাটল চলেছে। জাপান ব্রহ্মদেশ দখল কবে নিয়েছে। আন্দামান-নিকোবর ইংরেজের হাতছাড়া। ইম্ফলে এসে থেমে আছে জাপানি অগ্রগতি। কলকাতার আকাশে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ছে জাপানি বিমান। ড্যালহাউসি স্কোয়ারে বোমা পড়েছে। শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ। ব্ল্যাকআউটের কলকাতাব পথে পথে জীবন্ত কঙ্কালের মতো ধুঁকছে। ফ্যান দাও, ফ্যান। আর হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা ঠিকাদার আর সৈনিকরা মদের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। জাঁকিয়ে উঠেছে দেহব্যাবসা। সংসারের হাল ধবেছেন ছোটকর্তা। চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা, কেরোসিন বাজার থেকে উধাও। দূরপাল্লার কোনও জিনিসই আসছে না। এলেও ঢুকে পড়ছে মজুতদারদের অন্ধকার গুদামে। গঙ্গাব ধারে সৈনিক ব্যারাকের আশপাশে দেহব্যাবসায়ীদের ছাউনি পড়েছে। হেঁজি-পেঁজি যে-কোনও মেয়েই মুখে পাউডার ঘষে দাঁড়িয়ে পড়ছে লাইনে। লোভে লোভে ছুটছে নিম্নবিত্তের ভদ্রমেয়েরা। বাগানবাড়িতে জুয়াড়িদের আখড়া। দু'-চারটে খুনখারাবিও হয়ে গেল। উত্তাল উতলা পরিবেশ।

ছোটকর্তা পোস্টাব দেখেছেন, গ্রো মোর ভেজিটেবল। বাড়ির সামনে পেছনের দু'খণ্ড জমি চৌরস করে ফেলেছেন। বিশাল জালায় খোল পচছে। দুর্গন্ধে তিষ্ঠোনো দায়। ফলগাছ উপড়ে ফেলেছেন। নিমগাছটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে চিচিঙ্গার লতা। হাড়েগোড়ে ফল ধরেছে। ডুমুর গাছের মাথায় চড়েছে তরুকলা। মোটা মোটা আঙুলের মতো ঝুলছে ফলের থোকা। পাঁচিলের গায়ে তেড়ে উঠেছে মাখম সিম। ছোটকর্তার সহকারী নারাণ। রান্নাঘরের মেনু সামলাচ্ছেন। দু'বস্তা ভেলিগুড় কিনে এনে দেয়ালের গায়ে ঘুঁটের মতো দিয়ে রেখেছেন।

মেজকর্তা বললেন, 'এটা আবার কী কায়দা নারাণ।'

'মেজদা এ হল গুড় ঘুঁটে।'

'পিঁপড়েতেই তো ফাঁক করে দেবে।'

'আলপিনের মতো পেট। কত খাবে। তার আগে আমবাই ফাঁক করে দোব।'

সুস্থ আর অসুস্থ দুই মাথা মিলে ভূতের নৃত্য। বিলুর কখনও মজা লাগে। কখনও ভয়। এরই

মাঝে নারাণকাকু সম্মোহন বিদ্যা অভ্যাস করছেন। বিলুকে দুপুরবেলা একটা চেয়ারে বসিয়ে বলেন, 'এক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাও।'

বিলু তাকিয়ে থাকে। নারাণকাকুর কটমটে দুটো চোখ তার নাকের সামনে। গালে এসে ছোবল মারছে গরম নিশ্বাস। কাকু ফিসফিস করে বলছেন, 'চলে এসো, চলে এসো, বেরিয়ে এসো। মেসম্যারাইজড, মেসম্যারাইজড।' দু'হাতের আঙুলগুলো জন্তুর থাবার মতো তার মুখের দু'পাশে। ধীরে ধীরে বিলু আচ্ছন্ন হতে থাকে। তার চোখের সামনে নেমে আসে সাদা অস্বচ্ছ একটা পরদা। মাথা ঝিমঝিম করে। চোখ বুজে আসে। শরীর ভারী হয়। তখন নারাণকাকু প্রশ্ন করেন, 'তুমি কোথায়?'

বিলু বুঝতে পারে না, সে কোথায়। উত্তর দেয়, 'আমি কোথাও।'

নারাণ অমনি ধমকে ওঠেন, 'ভাল করে দেখো। ভাল করে।'

বিলু অমনি বানিয়ে বানিয়ে বলে, 'আমি একটা বাক্সর মধ্যে।' নীচের ঘরের সেই বিশাল বড় জাহাজি বাক্সটার কথা তার মনে পড়ে যায়। যে বাক্সটার ভেতর সে ঢুকতে চায়।

নারাণ ধমকে ওঠেন, 'ওখানে কী করছ? বেরিয়ে এসো। আমি ভবিষ্যৎ ধরে টানছি। বলো কী আছে? কী দেখছ সেখানে?'

নারাণ মুখে একটা শব্দ করতে থাকেন, যেন সত্যিই প্রাণপণে একটা কিছু ধরে টানছেন, সময় ধরে টানা, চারটিখানি কথা।

'সামনের বছর, বলো কী দেখছ?'

'সাদা রঙের একটা বাড়ি।' বিলুর কল্পনা দৌড়োতে থাকে,

'কে আছে সেই বাড়িতে?'

'লম্বা মতো একজন লোক। ধুতি পাঞ্জাবি পরা। চোখে চশমা।'

'গায়ের রং?'

'ফরসা। ঠোঁটে সিগারেট।'

'আর কে?'

'সামনে আপনি।'

'লোকটা কী করছে?'

'আপনাকে অনেক টাকা দিচ্ছে।'

'লোকটার আঙুলে কী?'

'হিরের আংটি।'

'তার পরের বছর। আমি টানছি। টেনে ধরে আছি। বলো কী দেখছ?' বিলুর কল্পনা ফুরিয়ে গেছে। ভাবছে। সময় নিচ্ছে। নারাণ ধমকে উঠলেন, 'আমি ধরে রাখতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। শিগগির বলো, কী দেখছ!'

বিলু মরিয়া হয়ে বললে, 'মাথা ফেটে গেছে।

'কার মাথা'

'একটা ছেলের।'

'ছেলেটা কে?'

'আমি।'

দু'ঘণ্টা ধরে এই চলল। বিলু যা খুশি তাই বলে গেল। শেষে নারাণ নিজের দিক থেকে বিলুর দিকে হাত চালাতে চালাতে বলতে লাগলেন, 'জেগে ওঠো। ওঠো জেগে। জাগো জাগো।' বিলু চোখ খুলল। নারাণ অমনি বিলুর পায়ের পাতায় পাউডার ঘষতে লাগলেন। পা নাকি ঠান্ডা হয়ে গেছে। বড় বড় রসগোল্লা খাওয়ালেন। বিলু ভবিষ্যৎ ঘুরে এসেছে। কম পরিশ্রম।

'এতদিনের সাধনা আমার সফল হয়েছে। তুমি হলে আমার মিডিয়াম। এরপর একদিন তোমার নাম পালটে দোব। ধরো তোমার নাম রাখব বোঁদে। সাতদিন সেই নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকলে তুমি উত্তরই দেবে না। দিতে পারবে না। একদিন তোমাকে এমন খাইয়ে দোব, তিন দিন আর খেতেই হবে না। আমার শক্তি তোমাকে আমি দেখাব। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব বিশ্বপরিক্রমায়।'

কল্যাণ প্রায়ই ছুটে ছুটে আসে। সঙ্গে আসে গীতা। মেয়েটা ভারী সুন্দর। গোল চাঁদের মতো মুখ। কপালে কাচপোকার টিপ। দুপাশে দুই বিনুনি। রিবন বাঁধা। ঠিক যেন খরগোশ। নীল রঙের ফুল ছাপ ফ্রক। গোল, নিটোল দুটো পা। উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল; কিন্তু অসভ্য নয়। বিলু তখন সব ভুলে যায়। বিলুর করুণ মুখে হাসি ফোটে।

আহা, মা মরা ছেলে, আহা, মা মরা ছেলে বলে বলে বিলুকে কেউ আর ভুলতেই দিচ্ছে না মায়ের কথা। জ্যাঠাইমার কথা। গীতা এলে বিলু সব ভুলে যায়। ভেবেই পায় না তাকে কী দেবে। কীভাবে খুশি করবে। রং-বেরঙের পেনসিল দিচ্ছে। ইরেজার দিচ্ছে। ছবির বই দিচ্ছে। গুলি লজেন্স দিচ্ছে। গীতা কিন্তু কিছুই নেয় না। সে কেবল বলে, 'আয় ভাই, আমরা খেলি' তার পুতুলের বাক্সটা সঙ্গে আনে। বিলুদের সামনের বাগানে দোকান দোকান খেলা হয়। গাছের নানারকম পাতা, তেলাকুচো ফল, বালি, মাটি, কল্পনার জোরে রূপান্তরিত হয় অন্য জিনিসে। গীতার পুতুল হল এক-একটা দোকানের দোকানদার। পেটমোটা একটা পুতলের নাম গজা। সে হল মুদি। রোগা একটা পুতুল হল ফটিক। তার চায়ের দোকান। ফেলে দেওয়া চায়ের পাতা আর চুন গোলা দিয়ে চায়ের রঙের খেলাঘরের চা তৈরি হয়। একটা মেয়ে পুতুলের নাম বীণা। সে বিক্রি করে আনাজপত্তর। বাসের টিকিট, গোল রাংতা, খোলামকুচি হল পয়সা। কল্যাণ মাঝে মাঝেই হয়ে যায় চৌধুবী জমিদার। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে আসে। কিছু বদমাইশ খরিদ্দারও আছে। ধারে জিনিস কিনে টাকা দেয় না। সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি হয়। সত্যিকারের। ছোট ছোট ফুলকো লুচি ভাজে গীতা। আলুর ছেঁচকি কালো জিরে দিয়ে। বামুনদি তখন সাহায্য করে। মেজকর্তা এসে ভিড়ে যান ছোটদের দলে। কচুপাতায় সে এক অসাধারণ ভোজ। বিলুর মনে হয় স্বর্গে বসে খাওয়াদাওয়া করছে। গীতা সরস্বতী। কল্যাণ কার্তিক। জ্যাঠামশাই মহাদেব। বিলুর যে কী আনন্দ। গীতা যত তাকে হুকুম করে ততই তার আনন্দ বাড়ে। গীতাব কোনও কিছু পছন্দ না হলে ভারী মিষ্টি গলায় কেবল বলতে থাকে, না, ভাই, না ভাই অমন করে না। গীতা কখনও আবার সমস্ত চপলতা ভুলে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে গাছের দিকে। তখন সে যেন অনেক দূরের কোনও দেশে চলে যায়। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তখনই তার চমক ভাঙে। পুতুলের বাক্স গুছোতে গুছোতে বলে, 'আমি এইবার যাই।' খেলা ভেঙে যায়।

গীতার জীবনেও একটা দুঃখ আছে। তার বাবা নেই। মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। কল্যাণদের বাড়ির পাশেই বাড়ি। মামারা লোক ভাল। নেহাত গরিবও নয়। গীতার দাদু বেঁচে আছেন। গীতাকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তবু বাবা না থাকাব দুঃখ সে ভুলতে পারে না। মেজকর্তাকে তার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। মেজকর্তা বলেন, 'বিলুর তো বোন ছিল না, ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটাকে একেবারে দেবীর মতো দেখতে। ভীষণ সুলক্ষণা।'

বিলু হঠাৎ বলে বসল, 'জ্যাঠামশাই, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!'

মেজকর্তা বললেন, 'তা হতে পারে বাপি। তুমি বড় হও। লেখা পড়া শেখো। চাকরি-বাকরি করো। তখন আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দোব গীতার সঙ্গে।'

বিলুর একটু লজ্জা লজ্জা ভাব এল। মেজকর্তার কোলের কাছে বসে ছিল। ফিসফিস করে বললে, 'কাউকে বলবেন না কিন্তু!'

'না, বাপি! এ কথা শুধু তোমার সঙ্গে আমার হয়ে রইল। তুমি খুব পড়াশোনা করে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে নাও। স্কুল শেষ করে কলেজ। কলেজ শেষ করে চাকরি।'

'কল্যাণ যদি বিয়ে করে ফেলে?'

'তুমি নিজেকে এমন করে ফেলো, যাতে তোমাকে ছাড়া গীতার আর কারওকে না ভাল লাগে!'

বিলুর জীবনে আলাদা একটা গতি এসে গেল। বিয়ের সে তেমন কিছুই বোঝে না। এইটুকুই বোঝে, একটা মেয়ে খুব আপন হয়ে যায়। সব সময় কাছে-কাছে থাকে। পুতুলের বাক্স নিয়ে আর বাড়ি চলে যেতে পারে না কোনওদিন।

ছোটকর্তা ঠিক করেছেন, সব সময় কাজ। নিজেকে সব সময় কোনও না কোনও কিছুতে ব্যস্ত রাখো। মনের ফাঁকফোকর দিয়েই হতাশা ঢোকে। ধোঁয়ার মতো ঢুকে পড়ে স্মৃতি। জীবনে ঝিম ধরে। অতীত নিয়ে ভাবনা মূল্যবান এক বিলাসিতা। ভবিষ্যৎ-ভাবনা দুর্বলতা, কুসংস্কার। বর্তমানটাকেই ঘর্মময় কর্মময় করে তোলো। একসময় কুকুর-ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়ো। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ছিদ্র নিদ্রা।

বিলু এখন সেই কায়দায় মানুষ হচ্ছে। বাগানের ফাঁকা জায়গায় গলদঘর্ম ছোটকর্তা। শ'খানেকবার মুগুর ভাঁজা হয়ে গেছে। পাঁচশো বার বৈঠক মারা শেষ। পায়ের কাছে ভারী বারবেল। পায়তাড়া চলছে তোলার। শরীরের সমস্ত পেশি ঠেলে উঠেছে। ছোটকর্তার কিছুটা দূরে বিলু। তার অতিশয় করুণ অবস্থা। ছোটকর্তা ছোট একটা ল্যাঙট করে দিয়েছেন। উদোম গা। সেই ল্যাঙট পরে বিলু দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'হাতে ধরা লাফাবার একটা দড়ি। স্কিপিং করতে হবে। প্রথমবারের চেষ্টায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কপালে মাটি। ঠোঁটে ঘাস।

ছোটকর্তার এক পশলা ধিক্কার-বর্ষণ হয়ে গেছে, 'তুমি একটা ওয়ার্থলেস। তোমার বয়সের সামান্য একটা জিনিস তুমি পারো না। মেয়েদেরও অধম।'

ছোটকর্তা যখন বিলুকে ধরেন, মেজকর্তা খুব সজাগ থাকেন। ব্যাপারটা কতদূর যাবে কেউ জানে না। ঠিক সময়ে উদ্ধার কর্তার ভূমিকায় না নামতে পারলেই বিপদ।

মেজকর্তা দোতলার বারান্দা থেকে বললেন, 'একেবারেই কি আর হয় ব্যাপারটা একটু একটু করে হবে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'যার হয়, তার একবারেই হয়। যার হয় না, তার জীবনে হয় না। নার্ভাস, ভিতু।'

'তুমি ট্রেনার। ধৈর্য হারালে চলে! দেখিয়ে দাও।'

'ওটা ওই বয়সের। আমাদের বয়সের নয়। তুমি আমাকে নাচালেও সহজে আমি নাচছি না।'

ঠিক ওই সময় গীতা এসে হাজির। তার হাতে একটা মোচা। বিলুকে ওই অবস্থায় দেখে জিভ কাটল। বিলুর ইচ্ছে করছিল ছুটে পালায়। উপায় নেই। ছোটকর্তার অনুমতি ছাড়া এক পা-ও নড়া যাবে না, তা হলেই কথা বলা বন্ধ করে দেবেন। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ছোটকর্তার শাসনের এ এক অদ্ভুত ধারা। মারধর নয়, কথা বন্ধ। একদিন, দু'দিন, এমনকী এক মাসও।

ছোটকর্তা গীতাকে দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললেন, 'গীতা, এসেছিস। নেমে আয়।'

গীতা মোচাটা মেজকর্তার হাতে দিয়ে বললে, 'মা, মোচাটা পাঠিয়ে দিলে।'

মেজকর্তা মোচাটা নিয়ে তার আকার আকৃতির খুব তারিফ করলেন। একেবারে ফ্রেশ মোচা।

গীতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি নীচে যাব জেঠু। কাকু ডাকছেন।'

'তুমি এখনও যাওনি মা! যাও যাও, গিয়ে ছেলেটাকে উদ্ধার করো।'

বাগানে গীতা। বাগানটা যেন আলো হয়ে গেল। ছোটকর্তা বললেন, 'এসেছিস! তুই একে স্কিপিংটা দেখিয়ে দে তো। সামান্য জিনিস পারছে না।'

গীতা লাফাবার দড়িটা বিলুর হাত থেকে নিয়ে অনায়াসে লাফাতে শুরু করল। ছোটকর্তা তারিফের চোখে তাকিয়ে রইলেন, আর বলতে লাগলেন, 'বাঃ বাঃ। বিলু দেখ, কত ইজি।'

গীতা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বিকেলে আমি ওকে ভাল করে শিখিয়ে দেব।'

বিলু মুক্তি পেয়ে ছুটে পালাল।

গীতা বললে, 'মা আজ বিলুকে আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেতে বলেছে। ওকে নিয়ে যাব কাকু?'

গীতা এমন মিষ্টি করে বললে, ছোটকর্তা আর আপত্তি করতে পারলেন না। তবু একটা ফ্যাঁকড়া বের করলেন। 'বাড়ির মেজকর্তার অনুমতি নাও।'

গীতা চলে গেল। বেলা বারোটার সময় বিলুকে আবার নিতে এল। মেজকর্তা অনুমান করেছিলেন গীতার আজ জন্মদিন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে কিনে এনেছিলেন, কমলালেবু, মিষ্টি আর সুন্দর একটা ফ্রক। নিরঞ্জন সেইসব নিয়ে আগে আগে চলেছে। পেছনে গীতা আর বিলু। তার পেছনে একটা ছাগল। এই ছাগলটা গীতার বন্ধু। গীতার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে চায় না। গীতার এইরকম অনেক বন্ধু আছে। ছাগল, গোরু, বেড়াল, কুকুর, পাখি। তাদের আবার সব সুন্দর সুন্দর নাম আছে। ছাগলটা নেচে নেচে চলেছে। তার গলায় একটা ঘণ্টা। টুং টাং বাজছে। খুব আনন্দ ছাগলটার।

গীতার মা বিলুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'কী সুন্দর ছেলেটা। মেজঠাকুর কেমন করে জানলেন আজ গীতার জন্মদিন। আমি তো কিছু বলিনি। অন্তর্যামী।'

বাড়িটা খুব সুন্দর। গীতার প্রমাতামহ একজন মস্তবড় ডাক্তার ছিলেন। মাতামহও খুব নামী মানুষ। মামারা সবাই বড় বড় চাকরি করেন। বড়মামা শিকারি। শিকার কাহিনি লিখে খুব নাম করেছেন। দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় শিংঅলা হরিণের মাথা আটকানো। বিলু এই প্রথম এল। অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তিন-চারটে বড় বড় বন্দুক খাড়া করা রয়েছে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের বন্দুক দেখল বিলু।

গীতা বললে, 'এসব আমার একেবারে ভাল লাগে না। বড়মামাটা ভীষণ নিষ্ঠুর। তুমি এসব দেখো না। দেখলেই মন খারাপ হবে।'

সুমন আর কল্যাণ এসে গেল। সবাই খেতে বসেছে। বিলুর মহা সমস্যা। সে মাছের কাঁটা বাছতে পারে না। গীতা তার পাশেই বসেছিল। সে বিলুর মাছ বেছে দিতে লাগল। একটু আবার খাইয়েও দিল। খাওয়াতে খাওয়াতে বললে, 'এটা আমার ভ্যাবলা ছেলে। কিচ্ছু পারে না।'

বিলুর চোখে জল এসে গেল। মা আর জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়ে গেল।

গীতা বললে, 'কাঁদছিস নাকি?'

বিলুর কান্না আরও বেড়ে গেল।

'তোকে আমি আদর করে ভ্যাবলা ছেলে বলেছি। তুই কাঁদছিস কেন?'

বিলু কিনকিনে গলায় বললে, 'ওর জন্যে কাঁদিনি।'

'তবে?'

বিলু চুপ করে রইল।

'বুঝেছি। তুই কাকিমার জন্যে কাঁদছিস। আমি আমার মাকে বলব তোরও মা হতে। তা হলে তো আর দুঃখু নেই। এখন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে খেয়ে নাও তো।'

বিলু কিছুতেই জল সামলাতে পারছে না।

গীতা তখন বললে, 'আমারও তো বাবা নেই রে, আমি কাঁদছি?'

বলতে বলতে গীতাও কেঁদে ফেলল।

গীতার মা বললেন, 'কে আগে কান্না শুরু করেছে?'

কল্যাণ বললে, 'কাকিমা, আগে কেঁদেছে বিলু। তারপর বিলুকে থামাতে গিয়ে গীতা।'

'ওরে, তোরা পুরনো কথা ভেবে কাঁদছিল কেন? আজ এমন একটা দিন। জন্মদিনে কেউ কাঁদে। আজ তো আনন্দের দিন। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা সব ওপর থেকে দেখছেন। তোমরা যদি কাঁদো তাঁরা দুঃখ পাবেন। আজ এমন একটা দিন।'

বলতে বলতে গীতার মায়ের পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। টুকটুকে ফরসা এক মহিলা। অনেকটা মীরাবাইয়ের মতো দেখতে। গীতার বাবার খুব বড় ব্যাবসা ছিল। খুবই ভাল অবস্থা। হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। ভাইয়ে ভাইয়ে ঘোর লড়াই। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা মকর্দমা। যাকে বলে উড়ে পুড়ে যাওয়া, তাই হল। ভদ্রলোকের হঠাৎ মৃত্যুটাও স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তাও জানা গেল না। গীতার মাকে মেয়ের হাত ধরে সব ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল এলাহাবাদ থেকে। গীতার বাবা ছিলেন প্রথম পক্ষের সন্তান। সব ভাইদের তাণ্ডব নৃত্যে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে ভাবলেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

গীতার মা বললেন, 'এত সব রাঁধলুম, তোরা সব আনন্দ করে খা।'

চোখে আঁচল চাপা দিলেন। অতীতের বিশ্রী এক স্বভাব। থেকে থেকে সামান্য পথ পেলেই বর্তমানের ঘাড়ে এসে চাপে। বর্তমানকে বিষণ্ণ করে তোলাই অতীতের কাজ। গীতার মা দ্রুত উঠে গেলেন। মৃত্যুর চেয়েও বড় আঘাত মানুষের সমবেত অত্যাচারের জবাব দিতে না পারা। রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গীতার মা জোরে নাক টানলেন। তাঁর শ্বশুরমশাই ছিলেন এক অতি বদলোক। বুড়ো বেঁচে আছে এখনও, তার সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে।

গীতার মন ভার হয়ে রইল। বিলুরও সেই একই অবস্থা। সুমন আর কল্যাণ চলে গেল। ট্রেঞ্চ খোঁড়া মাঠে আজ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হবে। কল্যাণের আবিষ্কার। খেলাটা খুব জমে। ঠোঙার ভেতর বালি ভরে বোমা তৈরি হয়। ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কামান। দুটো কাঠের বন্দুক। সাইরেন বাজবে। বোমা পড়বে। গীতা থাকলে রেডক্রসের ডাক্তার হয়। আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে।

গীতার মামার বাড়ির চিলেকোঠাটা ভারী সুন্দর। সোজা গঙ্গা দেখা যায়। দু'জন সেই ঘরে গিয়ে হাজির হল। মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা। দুটো আলমারি। বই ঠাসা। ভাল ভাল বই। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ মহাভারত, রামায়ণ। কনানডয়েল। বিলু আর গীতা সেই চিলেকোঠায় এসে হাজির হল। এই ঘরেই গীতার জগৎসংসার। তার পুতুলের বাক্স। খেলাঘরের রান্নাপাতির সাজসরঞ্জাম। এতটুকু একটা তোলা উনুন। কড়া, হাতা, খুন্তি, ঘটি, বাটি, থালা। পুতুলকে পরাবার জামা কাপড়। শোয়াবার বালিশ-বিছানা-খাট। গীতা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। বিলুকে বললে, 'আয় আমার পাশে শুয়ে পড়। গল্প করি। মনটা তেমন ভাল নেই। তুই আমাকে একটা গল্প বল।'

বিলু তার জ্যাঠাইমার গল্প বলতে লাগল। বিলু কখনও রেঙ্গুনে যায়নি; কিন্তু রেঙ্গুনের গল্প শুনেছে জ্যাঠাইমার কাছে। সেই গল্পই বলতে লাগল। সন্ধে হলে সমুদ্রের বাতাস বয়ে আসে। ঠান্ডা-ঠান্ডা। চন্দনের গন্ধ আসে চন্দন বন থেকে। হাতিরা দল বেঁধে চান করতে নামে নদীতে। চাঁদ ওঠে পাহাড়ের মাথায়। সিল্কের জামাকাপড় পরে সুন্দরী মেয়েরা বেড়াতে বেরোয়। আলোর মালা পরা প্যাগোডা। নাচঘর থেকে উপচে পড়ে গান আর ঘুঙুরের শব্দ। অনেক রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট যখন একেবারে খালি, তখন ভীষণ ভয়। সরু সরু ছুরি হাতে বেড়াতে বেরোয় গুন্ডারা। বিলুর গল্প শুনে গীতা খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বিলুর দিকে পাশ ফিরে তার বুকে একটা হাত রাখল। বিলু গীতার হাতের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছিল। কী সুন্দর আঙুল! কোনও গাঁট নেই ফরসা ধবধবে। যেন মোম দিয়ে তৈরি।

গীতা বললে, 'তারপর, তারপর।'

'ওই সময় যদি কেউ রাস্তায় বেরোয় তার আর রক্ষে নেই। ওই সময় যদি কারও বেরোবার দরকার হয় তো সে হাতির পিঠে চেপে বেরোয়। গুন্ডারা হাতিকে কিছু করতে পারে না। হাতি একেবারে পা দিয়ে থেঁতো করে দেয়।'

'তুই আর আমি বেরোলে গুন্ডারা কিছু বলবে?'

'আমাদের ধরে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে তো যাবেই আমরা বন্দুক চালিয়ে সব্বাইকে মেরে পালিয়ে আসব।'

গীতা এবার উঠে বসল, 'তা হলে আমরা বড়মামার দোনলা বন্দুকটা সঙ্গে নেব। আর একটা ছুরি।'

বিলু বললে, 'চলো, তা হলে বন্দুকটা দেখে আসি।'

'সে তো কাচের আলমারিতে চাবি দেওয়া। বড়মামা আসাম থেকে ফিরে আসুন, তারপর চেয়ে নেব।'

গীতা হঠাৎ উঠে পড়ল, 'দাঁড়া ভাই, কাঠবেড়ালিদের খাওয়ার সময় হয়েছে, বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে আসি।' বিলু অবাক হয়ে দেখছে, গীতা বাদাম ছড়াচ্ছে আর চারটে বড় বড় কাঠবেড়ালি কোথা থেকে ছুটে এসে কুটুর-কুটুর করে খেতে লাগল। একটা আবার গীতার পিঠ বেয়ে উঠে কাঁধ বেয়ে নেমে গেল।

একটু পরেই দু'জনে নেমে গেল বাগানে। প্রচুর ফুল। শীতের নরম রোদে তুলতুল করছে। একটা হলদে প্রজাপতির যেন নেশা হয়েছে। ফুলের ওপর বসে থাকতে থাকতে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। গীতা একটা ঝারি এনে জল দিতে শুরু করল। একটা গাছে বেশ একটু বেশি জল দিতে দিতে বললে, 'তুমি তো আবার একটু বেশি জল খাও।'

সব গাছের সঙ্গেই গীতা কথা বলতে লাগল। একটা গাছকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জ্বর কমেছে? আজ আর বেশি চান কোরো না।'

গীতা বিলুর জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া গোলাপি রঙের ফ্রকটা পরে, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে লাগল। নিজে নিজেই চুল আঁচড়াল, টিপ পরল। বিলু দেখছে। জ্যাঠামশাই পরির গল্প বলেন। গীতা যেন সেই পরি।

নিজের সাজগোজ শেষ করে গীতা বিলুকে সাজাতে বসল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে বললে, 'তোর কানের পাশে ময়লা জমেছে। চান করার সময় গামছা দিয়ে রগড়াবি। চুলেও সাবান দিবি, চটচট করছে।' বিলু বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

সন্ধে হবার আগেই গীতা বিলুকে বাড়ি পৌঁছে দিল। ঘরে ঘরে মশা ভনভন করছে। তখনও আলো জ্বলেনি। বামুনদি শুয়ে আছে। নেশা করেছে কি না কে জানে! অদ্ভুত দৃশ্য। নিরঞ্জন বামুনদির পা টিপছে। নিরঞ্জনও নেশা করেছে।

গীতা আর বিলু দরজার ওপাশ থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছে। আর ঠিক সেই সময় ছোটকর্তা অফিস থেকে ফিরলেন। কোনও কথা নয়, পা থেকে জুতো খুলে নিরঞ্জনকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে, পটাপট মার।

নিরঞ্জন মার খাচ্ছে আর বলছে— 'সেবাই পরম ধর্ম, সেবাই পরম ধর্ম।

বামুনদি উঠে বসে নেশার ঘোরে খিলখিল হাসছে। বলছে— 'খা, খা, জুতো খা।' তারপরে এমন একটা অশ্লীল কথা বললে, ছোটকর্তার হাত থেকে জুতো খসে পড়ে গেল। বিলু আর গীতার হাত ধরে ছোটকর্তা সোজা বাড়ির বাইরে। এ-দৃশ্য ছোটদের দেখা উচিত নয়। ভরা যৌবনা অশিক্ষিতা এক রমণী। অর্ধ উলঙ্গই বলা চলে। মাঝবয়সি এক পুরুষ। ছোটকর্তার বাকিটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না। বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করেছে ওই দুই ক্ষুধার্ত মানব মানবী। তাঁর ইচ্ছে করছিল দুটোরই গলা টিপে শেষ করে দেন। তাই তড়িঘড়ি স্থানত্যাগ। মেজকর্তা ফেরামাত্রই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। নারাণের ভরসায় থাকলে হবে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদ। ঘি আর আগুন পাশাপাশি রেখে সে তার খেয়ালে বেরিয়েছে। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

গীতা ছোটকর্তাকে এমনিই ভয় পায়। তার ওপর আজ এই রুদ্র মূর্তি। 'আমি তবে আসি কাকু'

বলে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বিলু বসে আছে। অফিসের জামাকাপড় ছাড়া হয়নি ছোটকর্তার। তিনি পেছনে হাত মুড়ে পায়চারি করছেন। বাড়িটা বেদখল হয়ে গেছে। এ এক ঘোর সমস্যা। চিৎকার চেঁচামেঁচি করলে লোক জড়ো হবে। স্ক্যান্ডাল ছড়াতে বেশি সময় নেয় না। শয়তান দুটো শেষে হয়তো তাঁকেই জড়িয়ে ফেলবে।

সাতটা বাজল। হিলহিলে ঠান্ডা। মেজকর্তা এখনও ফিরছে না কেন! কালো ঠুলি পরানো রাস্তার আলো অন্ধকারের রহস্য তৈরি করেছে। ছায়া ছায়া লোকজন। দেখতে দেখতে আটটা বাজল। ছোটকর্তা অধৈর্যের শেষ সীমায়। এই ভীষণ দুঃসময়ে তার পাশে কেউ নেই। মিশকালো আকাশে ট্যাপা ট্যাপা তারা জ্বলছে। আলোর খই ফুটছে।

কে একজন বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামল। নারাণ নাকি! ছোটকর্তা এগিয়ে গেলেন। আধো-অন্ধকারে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে লোকটিকে। একটু ইতস্তত করে লোকটি বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দিতে চাই; কিন্তু পারছি না।'

ছোটকর্তা অসন্তুষ্ট হয়েই ছিলেন। বেশ উষ্ণ হয়ে বললেন, 'তা হলে এলেন কেন?'

লোকটি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

'আপনি কাঁদছেন কেন?'

অন্ধকার সদর। চারপাশে বড় বড় ছায়া। দূর পথে মিলিটারি ট্রাকের গর্জন। আকাশ ফেঁড়ে ফেলছে সার্চলাইট শত্রু বিমানের সন্ধানে। লোহার ওপর হাতুড়ি ঠোকার ধাতব শব্দে রাত কাঁপছে। ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করে বললেন, 'আপনার মেজদা নেই।'

'নেই মানে?' ছোটকর্তার চাপা গর্জন।

''আমি দেখেছি। বিটি রোডে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। মিলিটারি কনভয় ছাতু করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।' ছোটকর্তা বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ বলে কী!' অবিশ্বাসের হাসি, 'জলজ্যান্ত একটা মানুষ চাপা পড়ে গেল! এ কখনও হয় না, হয়েছে! এ বলে কী?'

ভদ্রলোক বসে পড়লেন, 'বিশ্বাস করুন। সে দৃশ্য ভাবা যায় না। আজ সারাদিনে ওই রাস্তায় সাতজন চাপা পড়েছে। খুনে মিলিটারি ট্রাক। চাপা দেওয়াটাই ওদের আনন্দ। আমার কোনও দোষ নেই ছোড়দা। মেজদা হঠাৎ রাস্তা পার হতে গেলেন।'

ছোটকর্তা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর হা হা করে হেসে বললেন, 'এই তো চাই। এই তো চাই। এই তো চেয়েছিলুম। সব ছারখার। সব ছারখার। প্রভু! তোমার কী খেলা!'

ছোটকর্তা এই প্রথম উচ্চারণ করলেন প্রভু শব্দ।

বিলু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার জ্যাঠামশাই নেই! এই তো সকালে ছিলেন। দাড়ি কামালেন। চান করলেন। পরিষ্কার ধবধবে জামাকাপড় পরলেন। গীতার জন্যে বাজার থেকে জামা আর মিষ্টি কিনে আনলেন। অফিসে বেরোবার সময় বিলুর গালে চুমু খেলেন। জ্যাঠামশাই নেই। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে বিলুর। বাবা যে বকবেন।

নারাণ কোথায় গিয়েছিলেন বেশ সেজেগুজে। ফিরে এলেন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

ছোটকর্তা বললেন, 'বাঃ বেশ জামাই সেজেছ তো! ফুর্তিটুর্তি হল!'

নারাণ বললেন, 'আপনি এখানে?'

'শুনেছ? তুমি শুনেছ? মেজদা নেই।'

'কী বলছেন আপনি? মেজদা কোথায়?'

সময় যেন গতি হারাল। সারা পৃথিবীতে নেমে এল নৈঃশব্দ্য। নারাণ ফড়ফড় করে নিজের দামি পাঞ্জাবিটা ফালা ফালা করে ফেললেন উন্মাদের মতো একবার এদিক গেলেন, একবার ওদিক গেলেন। মেজদা নেই।

ছোটকর্তা দোতলায় উঠে এলেন। চপলার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ কেমন কাছে

টেনে নিলে বউদি। তুমি ভাবছ আমি ভেঙে পড়ব! ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করব! কখনই না। আমি শয়তানের হাত ধরব তবু ভগবানের নয়।'

নারাণের দিকে ফিরে ছোটকর্তা বললেন, 'বিলুকে আজকে রাতের মতো গীতাদের বাড়ি রেখে এসো। আমাদের বেরোতে হবে।'

'বামুনদি!'

'নিরঞ্জন আর বামুনদি দুটোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। মণিকে বলো দরজায় চাবি দিতে। একজন ধরেছে বোতল, আর একজন কাঁচা সিদ্ধি।'

বিলু গুটিগুটি গীতাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। বাড়িতে যেন আনন্দের হাটবাজার বসেছে। আলোয় আলো গীতার দুই মামা কেমন গল্প করছেন মুখোমুখি বসে। লুচির গন্ধ। রেডিয়োতে খেয়াল গান হচ্ছে। নারাণ যেই ঘটনার কথা বললেন, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ছোটমামা উঠে গিয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দিলেন। গীতা রান্নাঘরের সামনে থুবড়ি হয়ে বসে লুচি খাচ্ছিল। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। গীতার দুই মামা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। সারা বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া। বিলু গিয়ে গীতার পাশে বসল। এতক্ষণ সে কাঁদতে পারেনি। এইবার কান্না ঠেলে উঠল বিপুল বেগে। গীতার মা রান্না ফেলে ছুঠে এলেন। এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন মেজকর্তা। সকলেই তাঁর ভক্ত। পরোপকারী, উদার, মজলিশি এক মানুষ। গীতা আর বিলু, দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন দু'পাশ থেকে। একটা কথাই বলতে পারলেন, 'কী হচ্ছে এসব।' উনুনের কয়লা ছাই হয়ে গেল পুড়ে পুড়ে। রাত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আর একটি দিনের দিকে।

॥ ৮ ॥

ছোটকর্তা এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, সেই রাতে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। ওইরকমই ছিলেন তিনি, হেসে কাঁদতেন। জ্যাঠামশাইয়ের শতচ্ছিন্ন দেহটির সৎকার শেষে, উত্তরের বারান্দায় এই স্থানটিতে এসে তিনি বসলেন পরের দিন দ্বিপ্রহরে। বিধ্বস্ত চেহারা। উসকোখুসকো চুল। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। বারান্দার ওপাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নারাণকাকু। বামুনদি নিয়ে এল শরবত। ছোটকর্তা তাকে কিছুই বললেন না। প্রতিবেশীরা থমকে আছে দূরে দূরে। শোক শুধু বাড়ির নয়, গোটা পাড়ার। এক চুমুক খেয়ে গেলাসটা পাশে নামিয়ে রেখে, অদৃশ্য কোনও মহাশক্তিধরকে উদ্দেশ করে ছোটকর্তা বললেন, 'তারপর?'

'কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে।

* * *

যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥'

নারাণকাকু বলেছিলেন, 'এইবার আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। একটু ঘুম।'
'একটু ঘুম! ঘুম আসবে নারাণ? ঘুম নয়, আই লিভ এ লং ওয়াক।'
এরপরই তিনি আবৃত্তি করেছিলেন ফ্রস্টের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন,

The woods are lovely/ dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে। আমার রবীন্দ্রনাথ আছেন, আছেন শেক্সপীয়র, ফ্রস্ট। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। ... তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে। কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।'

সারা বাড়িতে এলোমেলো একটু ঘুরে বেড়ালেন। মেজকর্তার ছিপ। যে ছিপ তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন। চারটে হুইল। মেজকর্তার সোনার সিগারেট কেস। পর পর সিগারেট সাজানো। হাতির দাঁতের সিগারেট হোল্ডার। বাড়িতে পরার বার্নিশ করা চটি। রিডিং গ্লাস। নরম পশমের কাশ্মীরি আলোয়ান। ধরছেন ছেড়ে দিচ্ছেন, তুলছেন ফেলছেন। ভেন্টিলেটারে চড়াই পাখি চিকচিক করে ডাকছে।

কিশোর বিলুর হাত ধরে পথে নেমে এলেন ছোটকর্তা। জীবনে অনেক ভ্রমণ হয়েছে। সেই ভ্রমণের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে। হনহন করে হাঁটছেন ছোটকর্তা। ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছেন আমার বাঁ হাতের কবজি। আমার তখন ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত। এতটুকু একটা বুক। বুঝতেই পারছি না, কী ঘটছে আমাকে ঘিরে! চলার বেগে বুকটা হাঁসফাঁস করছে। জ্যাঠামশাই নেই, ভাল করে ভাবতেই পারছি না। থেকে থেকে কান্না আসছে, কাঁদতেও পারছি না। সামনে শুধু পথ আর পথ। দু'সার গাছ। রোদ আর ছায়া। হঠাৎ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ঝাঁকুনিতে ছোটকর্তার হাত থেকে ছেড়ে গেল আমার হাত। হাঁটু দুটো ঘষড়ে গেল কাঁকুরে পথে।

ছোটকর্তা হাত ধরে তুললেন আমাকে। উবু হয়ে বসলেন আমার সামনে। থেঁতলানো ক্ষত দুটো দেখলেন। চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। রাত জাগা লাল দুটো চোখ। রাগ, দুঃখ বিষণ্ণতা মাখা। এক মুখ দাড়ি। থমথমে গলায় বললেন, 'হায়! তুমি কি কিছুই পারো না!'

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। দুটো হাঁটুরই ছাল চামড়া উঠে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে। মুখটা কিন্তু স্বাভাবিক করে রাখার চেষ্টা করছি। আমি কিছুই পারি না, এই লজ্জা আমার যন্ত্রণাকে ঢেকে দিয়েছে।

ছোটকর্তা মুখে চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'কে আছে তোমার? আর কে আছে তোমার? এত আদুরে ননির পুতুল হলে চলবে বিলু! কল্যাণকে দেখো, সুমনকে দেখো। কী সব স্বাস্থ্য, কেমন সব চটপটে! তুমি একটা নড়বড়ে ভূত।'

ছোটকর্তা উঠে গেলেন পথের ধার থেকে দূর্বাঘাস ছিঁড়ে আনতে। হঠাৎ আমার পেছনে ঘোড় দৌড়ের শব্দ। কানে এল ছোটকর্তার চিৎকার, 'সরে যাও, সরে যাও।' হতভম্ব আমি! আমার আর সরা হল না। বিশাল বড় এক ভাগলপুরি গোরু আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। একটা পুঁটলির মতো তালগোল পাকিয়ে আমি গড়িয়ে গেলুম এক ধারে। তখনই শুনলুম ছোটকর্তার চিৎকার, 'হা ভগবান'। নাস্তিক, কর্ম ও পুরুষকারে বিশ্বাসী মানুষটি সেই প্রথম ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

বহুক্ষণ আমার আর কিছু মনে ছিল না। হয়তো অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলুম, নয়তো ভয়। যখন আবার ঘটনায় ফিরে এলুম, তখন আমি চলছি! ছোটকর্তা পাঁজাকোলা করে আমাকে নিয়ে চলেছেন। আমাদের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বাঁ পা-টা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সামান্য নড়লেই চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপতে গিয়ে দেখি হড়হড় করছে। নোনতা স্বাদ। নীচের ঠোঁট ছিঁড়ে ঝুলে গেছে।

ছোটকর্তা আমাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে। শাঁখের শব্দ নেই। ঘরে ঘরে আলো নেই। তিনতলার ছাদে নারাণকাকু পায়চারি করছিলেন। ছোটকর্তা নিজের মনেই বললেন, 'কে আছে আমার পাশে। সবাই তো চলে গেছে। কাকেই বা ডাকব! ভগবানই তা হলে মানুষের একমাত্র ভরসা!' ছোটকর্তা ডাকলেন, 'নারাণ।'

সবার আগে ছুটে এল বামুনদি। বামুনদির আসল নাম ছিল ললিতা। তার সেই সুন্দর নাম সারা জীবন হারিয়ে রইল 'বামুনদি' নামের তলায়। ছোটকর্তা নামটা জানতেন। তিনি বললেন, 'ললিতা, তুমি?'

ললিতা যখন প্রকৃতিস্থ, তখন সে এক সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব। ছোটকর্তাও তখন তার কাছে নিষ্প্রভ।

ললিতা আমাকে ছিনিয়ে নিল ছোটকর্তার কোল থেকে। প্রায় ধমকের সুরে বলেছিল, 'কেন বেরিয়েছিলেন একে নিয়ে। মেজবাবু, মেজবউদি, ছোটবউদি, সবাই একে ভালবাসত। একে টেনে নেবার চেষ্টা হবে, আপনি জানেন না।'

সেই ধমকের সামনে ছোটকর্তা যেন কুঁকড়ে গেলেন। ডাক্তার এলেন। বাঁ পা-টা নেড়েচেড়ে বললেন, 'মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান ভেঙে গেছে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'বহত আচ্ছা! এই তো চাই।'

গাড়ি এল। ছোটকর্তা যাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিতে চেয়েছিলেন, সেই বসল পেছনের আসনে। তার কোলের ওপর আমার ভাঙা পা। সাবধানে ধরে আছে। ঝাঁকুনি লাগলেই জল আসছে চোখে। চিৎকার করলেই ছোটকর্তা বকবেন। ছোটকর্তা সামনের আসনে, ড্রাইভারের পাশে। যুদ্ধের কলকাতা, দুর্ভিক্ষের কলকাতা, কালোবাজারি, ঠিকাদারের কলকাতার রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে মেডিকেলের দিকে। ভুসো পড়া লণ্ঠনের মতো কলকাতার চেহারা। এক-একটা মিলিটারি গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ছোটকর্তা বলে উঠছেন, 'জয় মা, দেখো মা।'

মাকে ডাকতে শিখছেন ছোটকর্তা। না ডেকে উপায় নেই। মানুষের হাতের বাইরে চলে গেছে সব কিছু। রাতের বেলায় মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না। মিলিটারিরা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিন-চারদিন পরে ফিরতেও পারে, নাও পারে। সিনেমা হাউসে মিলিটারি, রেস্তোরাঁয় মিলিটারি।

যন্ত্রণার চোখে দেখা যন্ত্রণাকাতর কলকাতার ছবি আজও মনে আছে। দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল ছায়ান্ধকারে বসে আছে সার সার। বিশ্রী চেহারার গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মৃতদেহ। এরই মাঝে হুডখোলা গাড়িতে বসে চলেছে সুন্দরী মহিলা। চুল উড়ছে। দু'পাশে দুই সৈনিক, জাপটে ধরে আছে। যে গাড়ি চালাচ্ছে, সে শিস দিচ্ছে তীব্র সুরে। মজা করার জন্যে গাড়িটাকে একবার করে নিয়ে যাচ্ছে বাঁয়ে, একবার ডাঁয়ে। আমাদের চালক বলছেন, 'মানুষ তা হলে পশুই হয়ে গেল।'

শহর পরিক্রমার সেই ভয়ংকর স্মৃতি ভয়ের ক্যালেন্ডারের মতো আজও দুলছে হৃদয়ের দেয়ালে। চড়া হেডলাইট জ্বেলে ঝাঁ ঝাঁ করে মিলিটারি জিপ আসছে উলটো দিক থেকে। এক চুল এদিক ওদিক হলেই আমরা ছাতু হয়ে যাব। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যাবার সময় ইংরিজি গালাগাল ছুড়ে দিচ্ছে। আমাদের গাড়ি-চালকের নাম ছিল শরৎবাবু। পাথরকোঁদা চেহারা। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। তিনি বলছেন, 'আমিও বাঙালির বাচ্চা। সহজে মারতে পারবি না ব্যাটারা।' মাঝে মাঝে মিলিটারি পুলিশ ছুটে যাচ্ছে মটোর সাইকেলে।

সবই দেখছি। দেখছি যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। ললিতা থেকে থেকেই বলছে, মুখপোড়া।

ইংরেজের হাসপাতাল। বাইরে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার, ভেতরে ঝলমলে আলো। সেইদিন দেখেছিলুম বাংলার গ্রামের মেয়ে ললিতার সাহস। তার চেহারা ছিল ইউরোপের সমুদ্রের রোদে পোড়া মেয়েদের মতো। একালের সর্বাধুনিকাদের মতো বয়কাট চুল। তেমনি সুন্দর ফিগার। তার ওপর ধবধবে সাদা কাপড়। হাসপাতালের চওড়া সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ভেঙে আমাকে কোলে নিয়ে যখন উঠছে, তখন সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সায়েব ডাক্তার, মেমসায়েব নার্স। আর্মির লোক ভেতরে গিজগিজ করছে। বর্মার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের বেশ কিছু চলে এসেছে এই হাসপাতালে।

আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিচ্ছিল। ললিতা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'তার মানে?'

বোধহয় শোনাল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

আর্মির এক অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ললিতার পাতলা ঠোঁট, খাড়া নাক, তামাটে গায়ের রং,

আর ওই শরীরের মোহে পড়ে গিয়েছিলেন মনে হয়। ছোটকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইজ শি ইয়োর ওয়াইফ।'

ছোটকর্তা কিছু বলার আগেই যোগ করলেন, 'সপ্লেনডিড।'

সেইসব কথা ভাসা ভাসা বুঝেছিলুম। ওয়াইফ মানে তো স্ত্রী! সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমার কেমন যেন একটা অনুভূতি হয়েছিল। ললিতা, আমার এই বামুনদি, সে আমার মা।

আর্মি-অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবলেন কে জানে, চিৎকার করলেন, 'ডক্টর।' সেই চিৎকার আমার আজও মনে আছে। আর মনে আছে ললিতা সুস্পষ্ট ইংরেজিতে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' মেজবউ তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন বিলিতি রান্না, বিলিতি সহবত। ললিতা শুনে শুনেও অনেক কিছু শিখেছিল। সেই রাতে সেই হাসপাতালে ললিতার কাণ্ডকারখানা দেখে ছোটকর্তা অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি এর কিছুই আশা করেননি। বাঁ পায়ে বিশাল এক প্লাস্টার নিয়ে মাঝরাতে আমরা ফিরে এলুম।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ছোটকর্তা কেন, কারওই কোনও দানাপানি জোটেনি। ললিতার কী অসীম ক্ষমতা ছিল, নিমেষে তৈরি হয়ে গেল লুচি আর শুকনো আলুর দম। হাতে তার ধরা ছিল রান্নার জাদু। খিদের কাছে মৃত্যুশোক পরাভূত! রাত দুটো। সুপ্ত পৃথিবী, আমরা কয়েকটি প্রাণী নেকড়ে বাঘের মতো লুচি আর আলুর দম খেতে লাগলুম। কী তার স্বাদ!

অত পরিশ্রম অত ঝঞ্ঝাটের পর ওই গভীর রাতে ছোটকর্তা কাঁধে এসরাজ নিয়ে বাজাতে বসছিলেন। ললিতা ছড়িটা কেড়ে নিল। মশারি ফেলে, ছোটকর্তাকে কড়া আদেশের গলায় বললে, 'শুয়ে পড়ুন। আমি এই ঘরেরই মেঝেতে শোব। উঠে উঠে বিলুকে দেখব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।'

ছোটকর্তা একটু ইতস্তত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তার কি কোনও প্রয়োজন হবে?'

'হতে পারে।'

ললিতার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, যে-কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারত। যে-কোনও জিনিস খেতে পারত। যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত। আর, কোনও ঘেন্না ছিল না। মেঝেতে একটা মাদুর ফেলে সে শুয়ে পড়ল। প্লাস্টার করা পা নিয়ে আমি জেগে পড়ে রইলুম। স্থির হয়ে। যেন কতই ঘুমোচ্ছি! ছটফট করলেই ছোটকর্তার ঘুম ভেঙে যাবে। একেই তাঁর ঘুম ছিল খুব পাতলা, সূক্ষ্ম কাপড়ের মতো।

ছোটকর্তার ভেতরে সেদিন অসহ্য কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল। থেকে থেকেই তিনি বলতে লাগলেন, 'উঃ, প্রভু! হায় প্রভু! এ কী করলে প্রভু!' তাঁর এই প্রভু কে, আমার জানা হয়নি তবে এই প্রভু সেই থেকে এক পাকাপাকি আসন করে নিয়েছিলেন তাঁর অন্তরে।

ছোটকর্তার ঘুম আসছে না দেখে ললিতা উঠে পড়ল। মশারি তুলে বিছানায় এসে ছোটকর্তার কপালে হাত রাখল। ছোটকর্তা চমকে উঠে বললেন, 'না, না। তুমি শুয়ে পড়ো।'

'আগে আপনাকে ঘুম পাড়াই।'

'না না, কে কী ভাববে।'

'কেউ নেই ছোটবাবু। কেউ আর নেই।'

আমি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম আমার দশ সের ওজনের পা নিয়ে। ললিতা ছোটকর্তার মাথার দিকে বিছানায় উঠে বসেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে মাথা টিপছে। জিজ্ঞেস করছে, 'ভাল লাগছে না?'

মানুষের কিছু কিছু বোধ কত অল্প বয়সেই না জাগে! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল পাশে যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে না। এইভাবে বসার অধিকার একমাত্র আমার মায়েরই ছিল। আমি যে জেগে আছি আমি যে ঘুমোইনি এটা জানতে পারলে ওরা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম ঘুমিয়ে পড়ার। ছোটকর্তা একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'ও বোধহয় ঘুমিয়েছে?'

ললিতা বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুমিয়েছে।'

সেই রাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম, এই সংসারে আমার স্থান কোথায়। আমার কেউ নেই। আমি ঘুমোলেই অন্যের আনন্দ। আমাদের খেলার মাঠের বেলগাছটার মতোই আমি নিঃসঙ্গ। ললিতা তার আঁচলের গেরো খুলে, কুচলা আর সিদ্ধির গুলি বের করল।

ছোটকর্তা অসহায় মানুষের মতো বললেন, 'আমার ঘুম আসবে, এমনিই আমি ঘুমোতে পারব। ওসব আমাকে দিয়ো না। মেজদা খুব রাগ করত।'

ললিতা খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল, ভূতের মতো। হাসি শুনেই বুঝেছিলুম ললিতা খেয়েছে। হাসতে হাসতে বললে, 'ছোটবাবু, মেজবাবু কোথায়! মেজবাবু এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি খাও, দেখবে সব দুঃখ ভুলে গেছ।'

ললিতা ছোটকর্তাকে তুমি বলছে। সে উঠে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এল। ছোটকর্তা কোঁত কোঁত করে খেলেন। আমার মনে হচ্ছিল গড়িয়ে বিছানা থেকে পড়ে যাই। একটা পা ভেঙেছে, না হয় আর একটাও ভাঙবে।

ছোটকর্তা জড়ানো গলায় বললেন, 'নীচে নেমে শুই।'

ললিতা বললে, 'সেই ভাল।'

দু'জনে নামতে গেলেন, আর ঠিক সেই সময় ভীষণ একটা শব্দ হল। দেয়ালে আমার মায়ের একটা বড় ছবি ঝুলছিল খুলে পড়ে গেল। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ল ছবির কাচ।

ছোটকর্তা আতঙ্কের গলায় বললেন, 'কী হল! ছবিটা পড়ে গেল কেন? আলো জ্বালো, আলো জ্বালো।' লাফিয়ে উঠল আলো। আমি পিটপিট করে তাকাচ্ছি। ছোটকর্তা ছবিটার সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, 'পড়ে গেলে, তুমি পড়ে গেলে। পড়ে গেলে কেন?'

ললিতা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। সেই বয়সেই জেনে গিয়েছিলুম, মেয়েদের অনেক কিছুই দেখতে নেই। দেখলে পাপ হয়।

ললিতা বলছে, 'ও অমন পড়ে যায়। তুমি শোবে এসো। কাল সকালে পরিষ্কার করে দোব।'

ললিতা ছোটকর্তাকে জড়িয়ে ধরল। ছোটকর্তা হু হু করে কেঁদে উঠলেন, 'আমি পাপ করেছি। আমি পাপ করে ফেলেছি। তুমি দেখেছ। তুমি দেখতে পেয়েছ।'

এই তো আমার সামনে আমার মায়ের সেই ছবিটা ঝুলছে। পড়ে যাবার সময় ধারালো কাচের খোঁচায় একটা জায়গা একটু চিরে গিয়েছিল। সেই ক্ষতটা আজও আছে সেইভাবে। সেই ভয়ংকর রাতটা আমাকে নিয়ত স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। প্রলোভন দাঁড়িয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত এক মানুষের পাশে। হাত ধরে টানছে। আমার পূর্বপুরুষদের শেষ প্রতিনিধি। আত্মিক সংকটে দোদুল্যমান। ললিতা হয়তো বন্ধুর কাজই করছিল, দেহের আকর্ষণ দিয়ে মৃত্যুকে ভোলাতে চাইছিল। ললিতার মতো দেহ ক'জনেরই বা থাকে, দীর্ঘ সুঠাম, সুললিত। চাপা একটা আগুন। ছোটকর্তা তার সেবার কাছে ঋণী। সে-ঋণ তো শুধু টাকায় শোধ হবার নয়।

ললিতা ছোটকর্তাকে হাত ধরে তুলতে গেল।

ছোটকর্তা নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, মুখ-চোখ থমথমে। চাপা গলায় বললেন, 'গেট আউট। গেট আউট। আউট আই সে।'

বলতে বলতে তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। ললিতা মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে আমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। সেই বুক সেই দেহ আমার মায়ের নয়। আমার ঘেন্না করছিল, ভয় করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল। ভেতরে এমন একটা অনুভূতি জাগছিল, যা একেবারেই অন্যরকম। আমার মুখটা ঢুকে গিয়েছিল তার বুকের ভেতর। নরম, তুলতুলে। আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলুম না। আমার গরম হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি পুড়ে যাব। ললিতা আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'তুই আমার ছেলে। তুই আমার ছেলে।' আমাকে যেন পিষে

ফেলতে চাইছিল। আমার প্রথম দিকের ঘেন্নাটা একসময় ভাল লাগায় পরিণত হল। কেন হল, আমার মনই জানে, যে মনের তল আজও আমি খুঁজে পাইনি।

সেই সকাল। নারাণকাকা জামাকাপড় পরে ছোটকর্তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোটকর্তা তখন জুতো বুরুশ করছিলেন, 'আমি চললুম ছোড়দা।' ছোটকর্তা মুখ তুললেন। কোনও ভাব নেই সে-মুখে। নির্বিকার। শান্ত গলায় বললেন, 'চললে? বেশ এসো।'

এরপর নারাণকাকার চলে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু চলে যাওয়ার কারণটা তো জানাতে হবে। ওই যাওয়া তো প্রতিবাদের যাওয়া। তিনি বললেন, 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কোনও অশ্রদ্ধা এসে যাক আমি তা চাই না।'

ছোটকর্তা বললেন, 'অ।'

নারাণ ভেবেছিলেন ছোটকর্তা বেশি কিছু বলবেন। একটা ঝগড়াঝগড়ি, তর্কাতর্কি হবে। তা হল না। হতাশ হলেন। নিজেকে খোলসা করতে পারলেন না। তখন বললেন, 'ছেলেটার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবার চান্স আছে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'দেখা যাক।'

'ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল করবেন।'

'ভেবে দেখি।'

'ছেলে মানুষ করা খুব কঠিন। নিজেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ। সেইরকমই শুনেছি।'

'এই বাড়িতে পাপ ঢুকেছে।'

'হয়তো।'

ছোটকর্তা নির্বিকার।

নারাণ বললেন, 'আপনাকে আর প্রণাম করলুম না।'

'ভালই তো।'

'প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

'প্রয়োজন হবে কি?'

প্রশ্ন ঠোঁটে নিয়ে নারাণ উড়ে গেলেন ফড়ফড় করে, সাদা একটা পায়রার মতো। ছোটকর্তা ফিরেও তাকালেন না। একটা কাপড়ের টুকরো ঘষে ঘষে জুতোয় পালিশ তুলতে লাগলেন। সেই কোঁচ কোঁচ শব্দটা আমার আজও মনে আছে। একজন অপমানিত মানুষ, একজোড়া জুতো। জুতোটাকে প্রাণপণে চকচকে করছেন। চকচকে। আরও চকচকে। জুতোও যেন মাঝে মাঝে প্রাণ পায়। অবশেষে জুতোটাকে একপাশে রেখে নেমে গেলেন নীচের বাগানে। সেই বারবেল। বারবেলের চাকাগুলো এখনও আছে, মানুষের ক্ষয় আছে। লোহার তো ক্ষয় নেই। পড়ে আছে নীচের ঘরে। ডান্ডাটা কোথায় গেছে কে জানে! ছোটকর্তা বারবেলটার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দৃশ্যটা আমি এখনও দেখতে পাই। নিচু হয়ে এক ঝটকায় তুলে নিলেন বারবেল। মাথার ওপর তুলছেন, বুকের কাছে নামাচ্ছেন ক্ষিপ্র গতিতে। দেখতে দেখতে শরীরের সমস্ত পেশি ঠেলে উঠল। ঘাম ঝরছে। বারবেল রেখে মুগুর ধরলেন। ঘুরিয়েই যাচ্ছেন, ঘুরিয়েই যাচ্ছেন। শেষ নেই। বুক আরও চওড়া হয়ে গেল। হাতের গুলি ঠেলে উঠল। পায়ের কাছে জমি ভিজে গেল ঘামে। রাগী সিংহের মতো ঘুরতে লাগলেন বাগানে। দৃশ্য দেখে পাখিরাও যেন নীরব হয়ে গেছে। ছোটকর্তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, দু'হাতে পৃথিবীটাকে ধরে গুঁড়ো করে দিতে পারেন।

সেই মূর্তির সামনে নিরঞ্জন গিয়ে দাঁড়াল। বগলে একটা পুঁটলি। ভয়ে ভয়ে বললে, 'ছোটবাবু, আমিও যাচ্ছি।'

ছোটকর্তা একবার তাকালেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। একটি মাত্র কথা, 'যাও।'

নিরঞ্জন তবুও একটু ইতস্তত করল। চোখে জল। ভেবেছিল ছোটকর্তা বলবেন, 'কেন যাচ্ছিস.' কিছুই বললেন না, সে নীচে থেকে ওপর দিকে তাকাল। বারান্দায় আমি। ভাঙা পা নিয়ে বসে আমি মোড়ায়। চোখাচোখি হল। ধরা গলায় বললে, 'যাচ্ছি, খোকাবাবু।' ঘাড় নাড়লুম। আমারও গলা ধরে গেছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'যেয়ো না নিরঞ্জনদা।' সাহস হল না। ছোটকর্তা তখন একটানে একটা বুনো গাছ শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছেন। নিরঞ্জন পায়ে পায়ে চারপাশে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল।

নিরঞ্জন চলে যাবার বেশ কিছু পরে, ছোটকর্তা সেই অদ্ভুত হাসিটা হেসে বললেন, 'যাও যাও সব একে একে যাও। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

ললিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর না, অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

নরম গলায় বললেন, 'সময় নষ্ট কোরো না। পড়ো, পড়ো। এগিয়ে যাও। জোর কদমে। ঝিঁকি মারো।'

সেই আদেশ আজও আমার মনে আছে। 'এগিয়ে যাও।' আমার সেই বয়সে এই কথার অর্থ ছিল, জীবনের দিকে এগিয়ে যাও। এখন এই কথার অর্থ হল, ঝিঁকি মেরে এগিয়ে যাও মৃত্যুর দিকে।

আমার সেই ভাঙা পা বাতে ধরেছে। আমার দু'চোখে ছানি। আমার বুকে দম নেই। যৌবনে জীবনটাকে বেশি খরচ করে ফেলেছি। সঞ্চয় শূন্য। বেঁচে আছি মহাকালের দয়ায়। একটা ব্যাগ নিয়ে একটু পরেই আমি বেরোব। চশমার খাপ থেকে একটা দশ টাকার নোট নেব। আয়ু, অর্থ দুটোরই পুঁজি খুব কম। অর্থ আমি খরচ করি। তাই আমি হিসেব করে করি। আয়ু হরণ করে মহাকাল। সেই তস্করের ওপর আমার তো কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

সেদিন বাজার করে ফিরছি। পেছনে পেছনে আসছিল বাচ্চা একটা মেয়ে। লাফাতে লাফাতে। তাজা জীবনের উল্লাসে। আমি বোধহয় তার পথ আটকেছিলুম। বিরক্ত হয়ে সে বললে, 'দাদু, তুমি হাঁটতে পারো না কেন?' অবাক হয়ে তাকালুম। ঠিক আমার সেই বাল্যসঙ্গিনী গীতার মতো দেখতে। এক গীতা যায় আর এক গীতা আসে। এক বিলু যায়, তো আর এক বিলু আসে।

॥ ৯ ॥

বিরাট এক যৌথ পরিবার কর্পূরের মতো উবে গেল। মুকুজ্যেমশাই তাঁর ওলটানো চুলে আঙুলের চিরুনি বোলাতে বোলাতে বললেন, 'ধুস হয়ে গেল। সব ফুস। বুঝলে, তোমারও গেল আমারও গেল।'

ছোটকর্তা সুর করে বললেন, 'উই আর অন দি সেম বোট ব্রাদার।'

'তোমার একটা ছেলে আমারও একটা ছেলে। কোনওরকমে মানুষের মতো মানুষ করাই আমাদের সাধনা।'

'আপনার ছেলের তো কোনও তুলনা হয় না, যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেমন লেখাপড়ায় সেইরকম গানে।'

'আমার নাতিও হবে। ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'ভয়ে না নির্ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

'তুমি তো এখনও যুবক। সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য। তোমার সংসারও তো ফাঁকা মাঠ। ছেলেটার জন্যে অন্তত আর একটা বিয়ে করলে কেমন হয়?'

ছোটকর্তা দপ করে জ্বলে উঠলেন, 'খুব খারাপ হয়। চাটনি আর পাঁপড়ভাজা খাওয়া হয়ে যাবার পর লোক হাত ধোয়ার জন্যেই প্রস্তুত হয়। আবার গোড়া থেকে শুরু করে না। আপনি বিয়ে করলেন না কেন?'

'মুক্তির পর কেউ বন্ধন খোঁজে?'

'সেই একই কথা আমার।'

'আমার নাতিটা যে ছোট!'

'আর একটা মা এলে দেখবে? সৎমা কী জিনিস আপনি জানেন না?'

'খুব জানি। আমারই তো সৎমা ছিল। তা, সে আর মা বলতে ইচ্ছে করত না।'

'তবে? এখন আমিই মা হব, আমিই বাবা হব।'

'বাঃ বাঃ, মনটা একেবারে ভরে গেল। কিন্তু, হ্যাঁগো, বদনাম-টদনাম হবে না তো।'

'বদনাম! কীসের বদনাম?'

'তোমাদের ওই বামুনদি। বয়স তো বেশি নয়, আবার সুন্দরী। আবার খোলামেলা। কেউ তো নেই! এক তুমি আর এক ও। লোককে তো তুমি চেনো!'

'লোক না পোক!' ছোটকর্তা তাঁর বিশাল বুক চিতিয়ে দিলেন, 'আমি গ্রাহ্য করি না। আপ সাঁচ্চা তো জগৎ সাঁচ্চা।'

'কেয়া বাত। আমি তোমার দলে। চলো, দেখা যাক কোথায় গিয়ে গিয়ে শেষ হয়।'

সৌম্য চেহারার প্রবীণ এক মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। ইনি কুমুদবাবু। সাত্ত্বিক শিক্ষক। অবসরভোগী। নিরালম্ব এক মানুষ। বিলুকে পড়াবেন। সারাদিন থাকবেন। রাত্তিরে বাড়ি যেতে পারেন আবার নাও পারেন। যেমন ইচ্ছে।

কুমুদবাবু বললেন, 'আমি এসে গেছি। রাত আটটার পর আমি চলে যাব। মেয়েটা একলা থাকে তো।'

'মেয়েটির বিয়ে দিতে পারলেই আপনি ঝাড়া হাত-পা।' মুকুজ্যেমশাই বললেন।

'বিয়ে? বিয়ে তো হয়ে গেছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কী? তিনি আবার বিবাহ করেছেন।'

'আপনি মামলা করুন।'

'মামলা করে কি আর হৃদয় জোড়া যায় মুকুজ্যেমশাই? যায় না। অকারণ অশান্তি, অর্থ ব্যয়। সহ্য করি। সহ্য করার নামই তো জীবন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, তিন, স, শ, ষ। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর।'

সেই ঋষির মতো মানুষটি বিলুর দায়িত্ব নিলেন। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। এক মাথা ফুরফুরে চুল। চোখ দুটো যেন কোন সুদূরে আটকে আছে। লম্বা লম্বা আঙুল। বাদামের মতো নখ। সাজানো দাঁতের সারি। হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে।

দোতলায় ঘরের সংখ্যা অনেক। লোকজন তো নেই। শোয়ার মানুষ নেই। টান টান পড়ে আছে দশাসই খাট। সমুদ্রের মতো বিছানা। কুমুদবাবু উত্তরের ঘরটাই বেছে নিলেন। পুব দিকের জানলা খুললেই গাছপালা। পশ্চিমের জানলা খুলে দিলেই প্রাচীন প্রাচীন গাছের ফাঁক দিয়ে থিরথিরে গঙ্গা।

কুমুদবাবু বললেন, 'দাঁড়াও আগে আসন করে বসি। তুমিও বোসো। এসো দু'জনে মিলে চুপচাপ বসে থাকি বেশ কিছুক্ষণ। তোমার আর আমার মধ্যে বসে থাকার প্রতিযোগিতা। কে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে!'

বিলুর খুব মজা লাগছে। দু'জনে মুখোমুখি। সামনে মাস্টারমশাইয়ের পকেট ঘড়ি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু বসে থাকো। নড়াচড়া চলবে না। বসার আগে মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন, নিজেকে ভাবো প্রদীপের স্থির শিখা। বিলু তাই ভাবছে। নড়ছেও না চড়ছেও না। প্রথমে তার মন ছটফট করছিল। একসময় মন বসে গেল। বিলুর কেবলই মনে হতে লাগল, সে একটা প্রদীপের শিখা। কোথা দিয়ে একটা ঘণ্টা কেটে গেল।

কুমুদবাবু বললেন, 'আমি তোমার কাছে হেরে গেলুম বাবা। তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে।'

বিলুর মুখ চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কুমুদবাবু বললেন, 'আরও একটা খেলা আছে।' গাঢ় নীল রঙের একখণ্ড কাগজ বের করে বিলুকে বললেন, 'যতক্ষণ পারো তাকিয়ে থাকো, দেখবে কেমন ভাল লাগবে।'

বিলু তাকিয়ে রইল। নীল, ঘন নীল। কুমুদবাবু একসময় সেই কাগজের ওপর ছোট ছোট তিন টুকরো সাদা কাগজ ফেলে দিলেন। বিলু অবাক হয়ে গেল; যেন গভীর নীল আকাশে তিনটে সাদা বক উড়ছে। একসময় বিলুর মনে হল, সে খুব ঠান্ডা পরিষ্কার জলে চান করে উঠল। এক কথায় মাস্টারমশাইকে তার অসম্ভব ভাল লেগে গেল। সাধুর মতো মুখ। মিষ্টি হাসি। গায়ে ফুলের মতো গন্ধ। যখন বসে থাকেন তখন মনে হয় 'ঋষি মশাই বসেন পূজায়' সেই প্রথম ভাগের ছড়াটা।

কুমুদবাবু বিলুকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাগানে নেমে যান। ইট আর ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে তৈরি করলেন পাহাড়। তৈরি হল পথ। গিরিসংকট, খাইবার পাস, বোলান পাস। বিদেশিরা এই পথেই ভারতে এসেছিল। চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লং। কুমুদবাবু বিলুকে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। সেই ইতিহাস যেন ওই বাগানেই নেমে এল। গাছের ডালে পাখি। গুঁড়ি জাপটে ধরে কাঠবেড়ালির ওঠানামা। রোদ ঝুলছে ছেঁড়া কাপড়ের মতো। দু'জনে যেন বসে আছে হিমালয়ের কোলে। ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাস দেখা। বিলু নিজেই সেই ইতিহাসের চরিত্র। মাস্টারমশাইয়ের হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বিলু তন্ময় হয়ে শুনছে।

তছনছ হয়ে যাওয়া বাড়ির পরিবেশ এক কথায় বদলে দিলেন কুমুদবাবু। ছোটকর্তাকে বললেন, 'মানুষ মানে শুধু জ্ঞান ও শিক্ষা নয়, চরিত্র, সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতা। আপনি ভোরে ওঠা অভ্যাস করুন। খুঁজে পাবেন উপনিষদের সকাল। উনুনের ধোঁয়াকে ভাবুন ঋষির আশ্রমের হোমের ধোঁয়া। অত দেরিতে বিছানা ছেড়ে দিনটাকে নষ্ট করেন কেন? ছেলে মানুষ করা সহজ কাজ নয়। মশালের মতো তার সামনে তুলে ধরতে হবে নিজের জ্বলন্ত চরিত্র। প্রকৃতি যেমন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, নিজের জীবনকেও সেইরকম শৃঙ্খলে বাঁধতে হবে। আপনার নিজের জীবনটাকে আপনি এলোমেলো করে ফেলেছেন। নিজেকেই নিজে শাসন করুন।'

ছোটকর্তা লজ্জা পেলেন। তাঁর জীবনে সব আছে নেই নিয়ম। ঠিক করেছিলেন সময়ের নিয়মে তিনি চলবেন না, সময় চলবে তাঁর নিয়মে। সকালে ছোটকর্তা যখন বিছানায়, উত্তরের ঘরে পুবের জানলা খুলে কুমুদবাবু উদাত্ত গলায় স্তোত্র সংগীত শুরু করেন। সারা বাড়ি গমগম করে ওঠে। সেই সুরে ছোটকর্তা বিছানায় উঠে বসেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছি ছি করে ওঠেন। ইস আজও হেরে গেলুম নিজের কাছে।

কুমুদবাবু একদিন ছোটকর্তাকে একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'মৃত অতীত নিয়ে আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। পরিবারের অতীত, দেশের অতীত, দুটোকেই দেখবেন ইতিহাসের মতো করে। শিক্ষা নেবেন, বিষণ্ণ হবেন কেন? যা ঘটে গেছে যাক। যা ঘটেনি তার জন্যে প্রস্তুত হন।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার মধ্যে আমার বাবাকে যেন আবার ফিরে পেলুম।'

'সব পিতাই এক, যে সাজতে পারে। যেমন রাজার চরিত্র। যে-কোনও অভিনেতাই সাজতে পারে। নিজেকে সাজাতে হয়। আপনিও পিতা। পিতার অভিনয় শিখুন। নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন কেন!'

মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে কুমুদবাবু সেইরকম বিলুকে ছেয়ে ফেললেন। একসঙ্গে খাওয়া, বসা, শোয়া, বেড়ানো, খেলা, গল্প।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'এ আমাদের ভাগ্য! দুর্ভাগ্যের পেছন পেছন সৌভাগ্য। বিলুকে ভেঙেচুরে একেবারে নতুন করে গড়ে দিলেন।'

ললিতা কুমুদবাবুকে বাবা বলে ডাকতে শুরু করেছে। প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল, অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। অসভ্যতাও ছিল। কুমুদবাবু একদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার দিকে তাকাও।'

তার আগের রাতে ললিতা সিদ্ধি খেয়ে সারারাত গান গেয়েছে। বারান্দায় নেচে নেচে বেড়িয়েছে। ছোটকর্তা তাকে শাসন করতে এসেছিলেন। ললিতা দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'এসো না মাইরি দু'জনেই নাচি।'

বিলু কী ভাববে এই ভয়ে ছোটকর্তা দৌড়ে ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছিলেন। ললিতাকে সংযত করার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিজের দুর্বলতা একবার কারও কাছে প্রকাশ করে ফেললে তাকে আর শাসন করা যায় না।

ললিতা কুমুদবাবুর দিকে তাকাল। ললিতার সেই ঘোরলাগা চোখ। যে ঘোরে তার স্বভাবচরিত্র সবই বদলে যায়। কুমুদবাবু তাঁর শীতল চোখ দিয়ে ললিতাকে একেবারে ফালাফালা করে ফেললেন, 'তুমি সিদ্ধি খাও?'

ললিতা মাথা নিচু করল। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঋষিতুল্য মানুষটির সামনে ললিতার মতো রমণীও কেঁচো হয়ে গেছে।

'সিদ্ধি খেলে কী হয় জানো? মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমার মেয়েও তোমার বয়সি। তুমিও আমার মেয়ে। এমন একটা সুন্দর আশ্রয়ে আছ, নিজের জীবনটাকে নষ্ট কোরো না মা। তোমার বয়স কম, এখনও অনেক বছর বাঁচতে হবে, নিজেকে শোধরাও। তোমার সিদ্ধি কোথায় আছে? নিয়ে এসো।'

ললিতা গুটিগুটি গিয়ে তার বাক্সটা নিয়ে এল। টিনের একটা চারচৌকো বাক্স।

কুমুদবাবু বললেন, 'দাও, আমার হাতে দাও।'

এক বাক্স সিদ্ধির গুলি। বেটে, গোল গোল করে রোদে শুকোনো। একা সিদ্ধি নয়, সঙ্গে কুচলা। নেশা যাতে আরও মারাত্মক হয়। কুমুদবাবু গোটা বাক্সটাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে, গুলিগুলোকে একটা গর্তে ঢেলে প্রথমে জল দিলেন, তারপর মাটি চাপা।

ললিতাকে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করো, আমি ভাল হব, ভাল হব, ভাল হব।'

ললিতার মুখ তখনও লাল টকটকে হয়ে আছে। চোখের দু'কূলে জল এসে গেছে। তার সেই তেজীয়ান গলায় বললে, 'বাবা, তুমি ভাল হবার কথা বলছ। পুরুষরা ভাল থাকতে দেয় না দেবে? সেসব কথা তোমার মতো দেবতার না শোনাই ভাল। আমি ভালও দেখেছি মন্দও দেখেছি। যাকে ভাল ভেবেছি সে মন্দ হয়েছে, যাকে মন্দ ভেবেছি সে ভাল হয়েছে। আমার জীবনে কী না হয়েছে বাবা! আমাকে সবাই মিলে ছিঁড়ে খেয়েছে।'

'মা, তুমি তো এখন ভালটাই দেখছ!'

কুমুদবাবুর মা বলার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটল, ললিতা তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। মুখ নিচু করে বললে, 'কেউ কোনওদিন আমাকে মা বলেনি।'

'আমি বলছি। তুমি আমার মা। তুমি আমার আর এক মেয়ে।'

কুমুদবাবু ললিতার মাথায় ডান হাতটা রাখলেন। ঠোঁট নড়ছে। কিছু একটা বলছেন। জপ করছেন। শেষে বললেন, 'নাও, ওঠো। মনে রেখো, এ সংসার তোমার। এদের সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জানবে, বিলু তোমার ছেলে। তুমি ওর মা। ওর নিজের মা

যেমন ছিলেন, তোমাকেই ঠিক সেইরকম হতে হবে। তুমি পারবে মা। তোমার ভেতর সেই শক্তি আছে। পারো তো, আমার কাছে একটু লেখাপড়ো শেখো।'

'মেজবউদি আমাকে শেখাতেন বাবা। তিনি তো চলে গেলেন।'

'আমি তো আছি। একটু পড়তে শিখলে তোমার জীবনে আলো আসবে, আনন্দ আসবে। একটু মন দিলেই সেটাও তুমি পারবে। তোমার বুদ্ধি আছে।'

ছোটকর্তা রাতে এসরাজ নিয়ে গান ধরলেন,

কোন খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই ॥

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'চাকা ঘুরছে। বাড়িটা একটু একটু করে আশ্রমের মতো হয়ে উঠছে। রবিঠাকুরের গান! মানেটা একবার দেখো! কোন খেলা যে খেলব কখন! যেমন তিনি খেলাবেন। তাই না! আমি এর সঙ্গে দু'লাইন শ্যামাসংগীত মিশিয়ে দিই, তোমার আপত্তি নেই তো।'

সকলি তোমারই ইচ্ছে, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি ॥

কুমুদবাবু বিলুকে নিয়ে আসরে এলেন। আনন্দের হাটবাজার বসে গেল। কুমুদবাবু বললেন, 'বেহাগে একটু আলাপ ধরুন না মুখুজ্যেমশাই। আপনার গলা তো তপোবনের গলা। ওই গলায় বেদপাঠ হত।'

বিলু এখন রোজ গলা সাধে। ছোটকর্তা বিলুকে গান শেখাচ্ছেন। একটা গান বিলুর আয়ত্ত হয়ে গেছে। একেবারে চড়া থেকে ধরতাই কাঁহারে ভেইয়া, প্রাণ কানহাইয়া, নদেবাসী, বলে দে রে আসি। বিলুর সুরেলা গলা। বড়রা বলতে থাকেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ বেশ।'

কুমুদবাবু ছোটকর্তাকে আনন্দে বাঁচার তালিম দিচ্ছেন। সুখ আর দুঃখ মনের অবস্থা ভেদ। সুখে থাকার অভ্যাস করলেই সুখ। যতক্ষণ আলো নেই ততক্ষণই অন্ধকার। আলো এলেই অন্ধকার পালাবে। আনন্দ ছড়িয়ে বাঁচতে শিখুন।

মুকুজ্যেমশাই সারা জীবনই এক ছেলেমানুষ শিক্ষার্থী। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সারাদিন আমি বেশ আনন্দে থাকি। প্রথম রাতটাও চলে বেশ; কিন্তু এই বারোটা-একটা নাগাদ হঠাৎ একটা দমকা কান্না আসে; তখন মনে হয়, কী ছাই বেঁচে আছি এতখানি একটা শরীর নিয়ে। জীবনে কিছুই তো হল না। এটা মনে হয় ঠিক নয়। কী বলুন। তার মানে আনন্দটাকে ঠিক ধরতে পারিনি।'

'বারোটা একটা পর্যন্ত কে আপনাকে জাগতে বলেছে? এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন।'

'ঘুম তো আসে না।'

'তা হলে মনে রাখুন, যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। রাতকে কাজে লাগান। কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে কাঁদুন। ধ্যান-জপ করুন।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আমি তো সারারাত অঙ্ক কষি। কী করব? ঘুমের তোষামোদ কাঁহাতক করা যায়। অঙ্কের মতো মজা আর কীসে আছে।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'তোমার শরীর খারাপ হয় না?'

'না, একটুও না।'

'তা হলে তুমি যোগী।'

একদিন বিকেলে গীতা এল। খুব অভিমান। বিলুকে বললে, 'তুই তো আর যাবি না। তাই আমিই দেখা করে গেলুম তোর সঙ্গে। আর তো আমাকে দেখতে পাবি না।'

বিলু গীতার হাত দুটো ধরে বললে, 'তোর কাছে আমার তো খুব যেতে ইচ্ছে করে! আমার মাস্টারমশাই যে বিকেলে আমাকে অনেক দূরে দূরে বেড়াতে নিয়ে যান। কী করব বল ভাই?'

গীতা ঠোঁট উলটে বললে, 'আর কবে দেখা হবে তা তো জানি না। ভাল করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ। সাবধানে থাকিস। সময় মতো খাওয়াদাওয়া করিস।'

বিলু কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস ভাই?'

'সে অনেক দূরে। দেরাদুন বলে একটা জায়গা আছে জানিস?'

'জানি তো। হরিদ্বার, দেরাদুন। হিমালয়ের কাছে। সেখানে যাচ্ছিস কেন?'

'যেতেই হবে। বড়মামা চলে যাচ্ছেন। ওইখানেই থাকবেন তো। আমাকে আর মাকে নিয়ে যাচ্ছেন। শুনেছি জায়গাটা নাকি খুব ভাল।'

'তুই চলে যাবি? আর কোনওদিন আসবি না?'

'কেন আসব বল? এখানে আমাদের কে আর আছে।'

বিলু কেঁদে ফেলল। বিলুর কান্না দেখে গীতাও কাঁদল। ছাতে ফুলগাছের টবের পাশে বসে দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে খুব খানিক কাঁদল।

চোখদুটো মুছে বিলু জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাবি?'

'কাল রাত্তিরের ট্রেনে।'

বিলু আবার ফোঁসফোঁস করে উঠল।

গীতা বলল, 'আমার বড়মামাটা ভীষণ বিচ্ছিরি।'

বিলু বললে, 'তুই আমাদের বাড়িতে থাক না। আমার মাস্টারদাদুর কাছে পড়বি। সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হবি। দাদু আর বাবা আমাকে গান শেখাচ্ছেন। খেয়াল গান। তুইও শিখবি। বেশ মজা হবে। আমরা কেমন দু'জনে থাকব। তোর কেউ নেই, আমার কেউ নেই।'

'মা থাকতে দেবে না রে। মেয়ে মেয়ে করে মা একেবারে পাগল হয়ে গেল। মেয়ে যেন কারও হয় না।'

গীতা একটা পুতুল বের করে বিলুর হাতে দিল। দিয়ে বলল, 'এই পুতুলটা তোর খুব পছন্দ ছিল। এটা তুই নে বিলু।'

লাল টুকটুকে একটা বউ। মেলার পুতুল, কেষ্টনগরের তৈরি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিলু অবাক হয়ে বললে, 'এইটা তুই আমাকে দিয়ে দিলি?'

'হ্যাঁ, ওটা তোর। অনেক অনেক দিন তুই রাখবি। ভাঙবি না, ভাঙলেই আমি মরে যাব।'

'মরে যাবি?'

'হ্যাঁ রে, আমার তাই মনে হল।'

বিলুকে বিলুর জ্যাঠাইমা ছোট্ট একটা আয়না দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনের জিনিস। খুব সুন্দর কাজ করা। হাতলে, ফ্রেমে। ডিমের মতো দেখতে।

'এইটা তুই রাখ ভাই। তোর যখন মনে পড়বে আমার কথা, মাঝ-রাত্তিরে চুপিচুপি এইটার দিকে তাকিয়ে, তিনবার ফিসফিস করে বলবি, বিলু বিলু, অমনি আমার মুখ দেখতে পাবি।'

গীতা বললে, 'কী সুন্দর জিনিসটা রে!'

গীতা চলে গেল।

॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ বয়সটা এমন ওঁচা বয়েস, সকলে তো ঘেন্না করেই, আমিই আমাকে ঘেন্না করি। প্রথম বয়সের ভুল, নীচতা, স্বার্থপরতা সব মনে পড়ে যায়। স্কুলের গণ্ডি টপকে যাবার পর কুমুদবাবু বললেন, 'আমার কর্তব্য শেষ হল বিলু। আমার বিদায় নেবার পালা। বয়সের ভারে আমি স্থবির হয়ে পড়েছি।

এখন আমার সময় হল, যাবার দুয়ার খোলো খোলো। ...আকাশ ভরে দূরের গানে, অলখ দেশে হৃদয় টানে। একটাই কথা শেষ উপদেশ আমার, চরিত্রটা ঠিক রেখো। তোমার কেউ নেই। তোমার শুধু তুমি আছ। স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে সতেজ উন্নত শোভাতে।'

আমার গুরু চলে গেলেন। সব ফাঁকা হয়ে গেল। বাঁধন গেল আলগা হয়ে। তিনি আমাকে তেল মাখিয়েছেন, স্নান করিয়েছেন। জ্বরে সেবা করেছেন। পরীক্ষার সময় পাশে বসে রাত জেগেছেন। সে কতকাল আগের কথা। আজ আমি তাঁর বয়সকেও ছাড়িয়ে গেছি। যে জায়গায় তাঁর মাঠকোঠাটি ছিল, সেখানে আজ সুন্দর ঝকঝকে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাটো কোনও এক শিল্পপতির। গ্যারেজ আছে। গাড়ি আছে। ঘরে ঘরে আলো, গান। নতুন সভ্যতার মানুষের জটলা। কোথাও আমার মাস্টারমশাইয়ের কোনও চিহ্ন নেই। টিনের চালে হুমড়ি খেয়ে থাকা সেই আমড়া গাছটার কথা মনে পড়ে। সেই দালান। একটা জলচৌকি। পেতলের একটা ঘটি। তারে পাট করে ঝোলানো সাদা একটা গামছা। নিজের বেঁচে থাকার টালমাটালে দীর্ঘকাল এই দৃশ্যটুকু হারিয়ে ছিল। এখন আবার স্পষ্ট। বর্তমান যত থিতোচ্ছে অতীত তত স্পষ্ট হচ্ছে।

স্মৃতির দরজা খুলে রোজই একবার করে মাস্টারমশাইয়ের শবযাত্রা বেরিয়ে আসে। নিদ্রাই হল মহানিদ্রা। যে-ঘুম ভাঙল না। দিনের শুরুতেই দিন শেষ হয়ে গেল। তেমন সমারোহ কিছু হল না। সামান্য ফুলে ঢাকা একটি খাট। সবার আগে আমি। খই ছড়াতে ছড়াতে চলেছি। কয়েকজন প্রবীণ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত, গভীর গম্ভীর হরিধ্বনি। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে, আমার দিদির সেই দাঁড়িয়ে থাকা। চাঁদের আলোয় তারে ঝোলা সাদা থানকাপড়ের মতো। আজও দেখতে পাই তার সেই দাঁড়িয়ে থাকা। এত বড় একটা ভয়ংকর পৃথিবীতে মেয়েটিকে সম্পূর্ণ একা ফেলে রেখে আমার সাধক শিক্ষাগুরু হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তাঁর মুখে সত্যই একটা হাসি লেগে ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জীবনের অঙ্কে বিশেষ কোনও ভুল করিনি। একটা ভুলই করেছি, মেয়ের বিয়ে। আমার আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের নাম ছিল অমলা। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। আমার সেই উঠতি বয়সে তার দিকে তাকাতে ভয় করত। মনে যদি পাপ এসে যায়। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর পর আমার মনে হল, অমলাদিকে দেখাশোনা করা আমার কর্তব্য। আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে তার আর আছে কে! পরে আবিষ্কার করেছিলুম, আমার ভেতরে একটা ভয়ংকর ধরনের শয়তান তৈরি হচ্ছে। আমার তখন গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। গলায় বয়সা লেগেছে। মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারি না। ভিজে কাপড়ে মেয়েরা সামনে দিয়ে চলে গেলে কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়ি। ছাতে উঠে পাশের বাড়ির যে জানলাটার দিকে তাকানো উচিত নয়, সেই জানলাটার দিকে বারে বারে তাকাই। কোনও একটা বিশেষ দৃশ্য দেখার জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু কন্দর্পকান্তি কল্যাণ তখন আমাকে পাকাচ্ছে। মেয়েদের জগৎটা তখন তার ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। ওই ব্যাপারে কল্যাণেরও গুরু ছিল। সে একটা আধ দামড়া লোক। তার নানারকম ব্যাবসা ছিল। ফুক ফুক সিগারেট ফুঁকত। পয়সা ছিল প্রচুর। কালো, মুশকো মতো দেখতে। সিল্কের পাঞ্জাবি পরত। কানে আতর লাগাত। কল্যাণ তাকে বিশুদা বলত। বিশুদা বলতে অজ্ঞান। বিশুদার পয়সায় মোগলাই আর কষা মাংস খেত। বিশুদার পয়সায় ইংরিজি সিনেমা দেখত। সেই লোকটাই ছিল আসল শয়তান। এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পৃথিবীটা ঈশ্বরের নয় শয়তানের। শয়তানদেরই বিশাল বড় বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হয়। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি হয়। তারা খায়দায় আর পৃথিবীটাকে পাপে ভরে দেয়। আর পুণ্যের চেয়ে পাপের আকর্ষণই বেশি। আমার অবস্থা হয়েছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্পের সেই দুই বন্ধুর এক বন্ধুর মতো। দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে চলেছে। তা এক জায়গায় ভাগবত পাঠের আসর বসেছে। এক বন্ধু বললে, 'চ ভাই, বসে

পড়ি। ভাগবত শুনি।' আর এক বন্ধু বললে, 'কী ব্যাজোর বাজোর শুনব। আমি একটু ডালিমের বাড়ি যাই। এমন সন্ধে, ফুর্তিটুর্তি করে আসি।' ও বন্ধু চলে গেল বেশ্যালয়ে, এ বন্ধু বসল ভাগবতের আসরে। ভাগবত শুনছে আর ভাবছে, ধ্যাত কী সব শুনছি? আমি একটা পাঁঠা। বন্ধু কেমন মজা মারছে! আর ডালিমের ঘরে বসে সেই বন্ধু ভাবছে, এ আমি কী করছি! আমার বন্ধু কেমন ভাগবত শুনছে! ঠাকুর বলছেন, মৃত্যুর পর যে ডালিমের ঘরে ছিল, সে গেল স্বর্গে. আর ভাগবতের আসরের বন্ধু গেল নরকে।

গল্পটা বলছি এই কারণে, বৈদান্তিক ব্রাহ্মধারার পরিবারের ছেলে আমি, কুমুদবাবুর ছাত্র আমি, আমার পিতা তখন গৃহী সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাচ্ছেন. আমি সেই ধারার ছিটে ফোঁটাও গ্রহণ করতে পারলুম না। বিশুদার আকর্ষণই প্রবল হল। একা কল্যাণ মজা মারবে? বিশুদার ঠেকে আমিও হাজির হলুম। লোকটা বাড়িতে একটা চেক চেক লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, বিশাল একটা চৌকিতে আড় হয়ে শুয়ে থাকত। গলায় একটা ভরি দুই সোনার হার। বড় একটা বিলিতি ছবির বই খুলে আমাদের নগ্ন মেয়ের ছবি দেখাত। শরীরে আগুন ধরে যেত। কী যে জাদু. তা বুঝতে পারতুম না। মানুষের শরীর, তাও জীবন্ত নয়, ছবি। কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়তুম। বিশুদা বলত, 'জ্যান্ত দেখতে চাস? একদিন তোদের নিয়ে যাব।' রাতে আমার ঘুম হত না! বিশুদা একদিন প্যাকেট খুলে, কমলালেবু রঙের সিল্কের একটি শাড়ি বের করে তার ওপর একটা বক্ষবন্ধনী রাখল। বললে, 'দেখ, জিনিসটা দেখ। আমার মেয়েমানুষকে উপহার দেব।' তারপর কী হবে আমাদের বলতে লাগল। কান লাল হয়ে গেল। অপরাধীর মতো তাকাতে লাগলুম এদিক ওদিক।

বিশুদা একদিন বললে, 'তোর কোনও সাহস নেই। তোর হাতে অমন একটা জিনিস রয়েছে অথচ উপোস করে মরছিস।'

'কী বলছ তুমি?'

লোকটা কত বড় শয়তান। অমলাদির কথা বলছে। এ পাড়ার গ্রেটা গার্বো। তার দেহের বর্ণনা দিতে লাগল। আমার কী করা উচিত শেখাতে লাগল। শেষে চোখ দুটো ছোট ছোট করে বললে, 'তুমি বলটা আমার কোর্টে কায়দা করে ফেলে দাও না, গোল দিয়ে দোব। একে অভাবী. তায় উপোসি। কতদিন আর শুকিয়ে থাকবে। আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো? আমরাও তো সমাজসেবী।' আমার মনে হচ্ছিল, লোকটার মুখে এক থাবড়া মারি। জানোয়ার নাকি? আমাকে হতভম্ব হয়ে বসে থাকতে দেখে জানোয়ারটা যেন উৎসাহ পেয়ে গেল। বললে, 'তোকে এত ভালবাসে কেন জানিস? তুই তো একটা কচি পাঁঠা। তোর হাড় মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। তুই একদিন কী করবি জানিস, পেছন থেকে জাপটে ধরবি। খাবলাখাবলি করে দিবি। ছাড়বি না।'

লোকটা ভয়ংকর রকমের একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। বললুম, 'বিশুদা মুখ সামলে।'

আমাকে একটা খিস্তি করে বললে, 'নিজের বাপকে দেখে শেখ। হুগলি থেকে কেমন একটা সেরা মাল এনে ফুর্তিতে আছে। কারও পরোয়া করে, না করবে! মুরগির এন্ডা মারছে, বারবেল ভাঁজছে আর লড়ে যাচ্ছে। একেই বলে বাপের বেটা।'

আমি উঠে চলে আসছি, বিশু খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলেছিল, 'নাদান। জিনিসের ব্যবহার জানে না। সবই মিলে একটু ফুর্তি করা যেত, এখন একাই করব। তুই দেখবি হাঁ করে, জালের বাইরের বেড়ালের মতো। তোকে আমি দেখাব, টাকায় সব হয়। একশোতে না হলে এক লাখে হবে। ওই অমলা আমার রক্ষিতা হবে। যার ওপর আমার নজর পড়ে সে আর পালাতে পারে না। তুই লিখে রাখ। ভোগের পর একটু প্রসাদ পেতিস, তা আর হল না।' এরপর বিশুর ধারেকাছে আর যাইনি। না গেলেও লোকটা পাপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল মনে। চরিত্রে একটা দাগ ফেলে দিয়েছিল। কাঠে যেমন উইপোকা ধরে সেইরকম পোকা ধরিয়ে দিয়েছিল। অমলাদির দিকে আর সেই পরিষ্কার মনে

তাকাতে পারতুম না। যখন তখন যেতুম, ঠিকই, এমন এমন সময় যে সময়ে অমলাদি হয়তো চানে যাচ্ছেন; কি একেবারে সংক্ষিপ্ত পোশাকে বাসন মাজছেন, ঘর পরিষ্কার করছেন। খুবই খোলাখুলি। আমাকে তিনি ভাই ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। মানুষের সমস্যা হল, মানুষ মানুষের মন দেখতে পায় না। অমলাদি আমার মন দেখতে পাচ্ছেন না, সেখানে ঢুকে আছে বিশু-শয়তানের তালিম। আর এক শয়তান উঠতি বয়েস। প্রবল রিপুর জাগরণ। বিশু ব্যাটা আমার চোখে একটা লাল চশমা পরিয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলায় পবিত্র সুন্দর পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মন্দিরে যেন আবর্জনা ছড়িয়ে গেছে। নৌকো যাচ্ছিল সুবাতাসে পাল তুলে, হঠাৎ পালে ধরেছে কুবাতাস। বিশু আর কল্যাণ আমার মনটাকে ভেঙে দু'খণ্ড করে দিয়েছে। একটা মন পবিত্র আর একটা অপবিত্র। অপবিত্র মনটার জোরই বেশি। সে যেন এই দেহের সম্রাট। যা বলবে তাই করতে হবে। পবিত্র মনটা বড়ই দুর্বল। সরাইখানার রাহির মতো। তার আদর্শের পবিত্র সাত্ত্বিক পুঁটুলিটি নিয়ে বসে আছে একপাশে। বসে বসে দেখছে প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্যকলাপ। বলছে না কিছুই, শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। শিশুর মতো। কী করছ তুমি. এ কী!

নিজের পরিবর্তনে নিজেই অবাক। অমলাদির পায়ের গোছের দিকে তাকিয়ে মনে হত, একদিন যাকে শুধুই পা ভেবেছি, সে তো শুধু পা নয়, আরও কিছু। বিশেষ কিছু। অমলদি যখন কুয়োতলায় উবু হয়ে বসে বাসন মাজছে, ঠিক তখনই আমার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করত। একটা অলৌকিক অনুভূতি। চওড়া পিঠ। বর্তুল নিতম্ব। আমি বুঝতে পারতুম না কী হচ্ছে আমার! ভেতরে বসে বিশু যেন বলছে, জড়িয়ে ধর। কল্যাণ হাসছে। কেউ কোথাও নেই। দুপুরের ঝলমলে আলো। গরমকাল। ফিকে নিশ্বাসের মতো বাতাস। এই তো সময়! ঘোর লাগছে আমার চোখে। চওড়া পিঠ। আলগা খোঁপা। অমলাদিকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। অপবিত্র মন বলছে, এতে তো পাপের কিছু নেই! তুমি তো খুন করছে না! তুমি তো চুরি করছ না! আমার বাল্যের স্মৃতি এসে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল। ললিতা মশারির ভেতর বিছানায় ছোটকর্তার মাথার কাছে। ছটফট করছে। আনচান করছে। পা-ভাঙা বিলু মটকা মেরে দেখছে। মানুষের মন কতভাবে ছেঁদা হয়! ছোট্ট একঝলক দৃশ্য। কারও একটা কথা। একটা ছবি। একটা বর্ণনা। একটা গল্প! মনের চেহারা পালটে দিতে পারে। আমার সামান্য অসাবধানতায় আমি নষ্ট হয়ে গেলুম। আমি যদি কল্যাণের কথায় বিশুর আড্ডায় না যেতুম তা হলে আমার এই অবস্থা হত না।

অমলাদিকে আমি প্রায় অপবিত্রই করে ফেলতুম। মনে খুব জোর এনে নিজেকে ছিটকে ফেলে দিলুম বাইরে। অমলাদির বাড়িতে যাওয়াই ছেড়ে দিলুম। একজন মহিলাকে একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া দিদি আর ভোগের বস্তু ভাবা যায় না। উত্তরের নির্জন ঘরে শুয়ে আমি কেঁদে ফেললুম— আমি জীবনে কোনও মেয়েকে আর ভালবাসতে পারব না। শুধু ভোগের কথাই ভাবব। প্রেম নয় ভোজ। বিশু আমার ভালবাসাকে হত্যা করেছে। আমার রক্ত খারাপ করে দিয়েছে ব্যাটা।

ছোটকর্তা তখন পুরোপুরি যোগী। ছোটকর্তার ছোটমামা ছিলেন শবসাধক। দুর্গের মতো চরিত্র। স্ফটিকের মতো চেহারা। মানুষ হাসে। মানুষকে হাসতে হয়। এই সাধকের মুখটাই ছিল হাসি। সেই ছোটমামার তত্ত্বাবধানে ছোটকর্তা তখন ইন্দ্রিয়জয়ী এক সাধকের মতো। বহু রকমের সাধনশক্তির অধিকারী হয়েছেন। মানুষের দিকে তাকিয়ে তার ভেতরটা তিনি পড়তে পারতেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি একদিন বললেন, 'তোমার ভেতর পাপ ঢুকেছে। খুব সাবধান! নারাণ তোমার কোষ্ঠী দেখে বলেছিল, জীবনটা তোমার নষ্ট হবে। তখন আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম বংশ, শিক্ষা, পরিবেশ তোমাকে বাঁধন দেবে ঘোড়ার লাগামের মতো। হল না। প্রবৃত্তি তোমাকে টেনে নিয়ে গেল কুসঙ্গে। জীবন-সিগারেটে কাম হল আগুন, যত টানবে তত পুড়বে। পড়ে থাকবে ছাই। তোমার দিকে আজকাল আমি তাকাতে পারি না। ছবির মতো দেখতে পাই, তুমি কী করছ! তোমাকে একটা কথা বলতে পারি কাম জয় করা যায় না। মুখটা ঘুরিয়ে দিতে হয়। নিজেকে

বোঝাতে হয়, আমি পশু নই মানুষ। নিজেকে খাটাও। ব্যায়াম করো, ঘাম ঝরাও। দেহকে ভালবাসো, মনকে ভালবাসো। ঘনঘন চান করো।'

বড় লজ্জা পেয়েছিলুম সেদিন। অমলাদি একদিন আমাকে ডেকে পাঠাল। ভয়ে ভয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আসো না কেন? জানো আমি একা থাকি। বাবা তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসতেন।'

মাথা নিচু আমার। তিনি আমাকে ছেলে ভাবলে কী হবে। আমি যে অমলাদিকে বোন ভাবতে পারি না। বিশু ঢুকে গেছে আমার মনে। অমলাদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক হাত দূরে। আমি তাকাতে পারছি না। ওই মুখ। ওই শরীর। ওই খোঁপা। পাগল হয়ে যাব আমি। ফিকে নীল শাড়ি। সাদা ব্লাউজ।

আমি ঢিপ করে একটা প্রণাম করলুম। দুধের মতো সাদা পাতলা পায়ের পাতা। আমার মাথাটা পায়ের আঙুল ছুঁয়ে রইল। মনে মনে ছত্রিশবার দিদি বললুম, তুমি আমার দিদি, তুমি আমার দিদি।

অমলাদি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে তুলে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'এ কী করলে! আমাকে প্রণাম!'

আমার পাশে বসে অমলাদি কাঁধে একটা হাত রাখল।

'তোর কী হয়েছে বল তো! শুকনো মুখ। চোখের কোণে কালি।'

আমার পেটে কথা থাকে না। সবই বলে ফেললুম। অকপটে। এমনকী অমলাদিকে দেখলে আমার মনে কী হচ্ছে, তাও বললুম। আমার কাঁধ থেকে হাত না সরিয়ে অমলাদি অনেকক্ষণ বসে রইলেন নীরবে। মনে মনে ভাবছি, অমলাদি এইবার আমাকে জানোয়ার বলে দূর করে দেবে। বলবে, তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস বিলু, ঠিক সেইসময় দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আড়মোড়া ভাঙল। তারপর খুকখুক করে হেসে বললে, 'এইজন্যে আসিস না। পাগল ছেলে! তোর কি মনে হয় আমরা দেবতা! আমরা মানুষ। আমাদের অনেক কিছুই মনে হতে পারে।'

অমলাদি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আরও জোরে। তার শরীর আরও ঘন হয়ে এল আমার শরীরে। গভীর গলায় বললে, 'তোর বিকার আমি দূর করে দেব বিলু। তুই কিছু জানিস না বলেই তোর এত ভয়!' অমলাদি আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। অবশিষ্ট ঘটনা আমার চির বিস্ময়। কোনও এক আশ্চর্য পৃথিবীর দরজা খুলে যাওয়া। চির কৌতূহলের অবসান। প্রথমে ভয়, পরে অপার বিস্ময়, তারপরে একেবারে বুঁদ হয়ে যাওয়া। বহুক্ষণ পরে অমলাদি বললে, 'তুইও পাপী, আমিও পাপী। জানিস তো বিলু, ম্যালেরিয়া হলে কুইনিন খেতেই হয়।' সব শেষে বললে, 'এইবার তুই কেমন না এসে পারিস দেখি।'

পৃথিবীকে আজও আমার চেনা হল না। সব মানুষই সব মানুষকে ব্যবহার করতে চায়। অমলাদি আমাকে ব্যবহার করেছিল। আমি বোকা, আমি সরল, ভিতু আমি, কিন্তু অসংযমী, ইন্দ্রিয়পর. আমাকে নরুনের মতো, কান খুশকির মতো ব্যবহার করেছিল অমলাদি। আমি তার দাস হয়ে গেলুম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গল্প বলতেন— একটা টিয়াকে পরপর তিনদিন আফিম খাওয়ানো হল, এমনই মৌতাত, সে আর না এসে পারে না! রোজ একই সময়ে পাখিটা উড়ে আসে। আমার আফিম হল কৃষ্ণকথা নয়। যৌবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পবিত্র এক পরিবারের পবিত্র রমণী। যার পিতা ছিলেন ঋষিতুল্য সর্বত্যাগী এক তাপস। আর কী সুন্দর এক আবরণ! কুমুদবাবু এক সাধক, ছোটকর্তাও এক সাধক। তাঁর মাতুল এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় তান্ত্রিক। বিলু ছিল কুমুদবাবুর ছাত্র, সন্তানতুল্য। এত সুন্দর এক পরদা! পুরাকালে ঋষিরা ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করে রমণীসম্ভোগ করতেন। যোগ আর ভোগ দুটোই চলত সমান তালে। ঈশ্বর আরাধনা, মানবী বন্দনা।

পাকাপাকি একটা বিকৃত রুচি আমার মধ্যে ঢুকিয়ে গিয়েছিল তিনজন, ললিতা, বিশু আর অমলাদি। আর এটা যে বিকৃতি, সেটা বোঝার মতো বোধ তৈরি করে গিয়েছিলেন আমার মা আর বড়মা।

আমি তখন কলকাতার এক নামী কলেজের ছাত্র। মিশনারি কলেজ। সেই কলেজে পড়েছেন আমার পিতামহ, পিতৃব্য, পিতা। আমার একমাত্র মাতুল। অধ্যয়নং তপঃ প্রায় ভুলেই গেছি। অমলাদির চেনে বাঁধা এক যুবক। মেয়েরা বোয়াল মাছের মতো ইচ্ছে করলেই যে-কোনও মানুষকে গিলে ফেলতে পারে। আমার নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা হতে লাগল। লোকে কুকুর পোষে, অমলাদি আমাকে পুষেছিলেন। তাঁর দুটো ব্যক্তিত্ব ছিল। এক ব্যক্তিত্বে স্নেহময়ী, মমতাময়ী দিদি। অন্য ব্যক্তিত্বে সাংঘাতিক ভোগী এক প্রভু। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বইতে লাগল।

সব কিছুরই শেষ আছে। ভাল জিনিসের ভাল শেষ। খারাপ জিনিসের খারাপ শেষ। দেশটা বিলেত হলে অমলাদিকে বিয়ে করা যেত। হোক না বয়সের পার্থক্য। তা তো হবার উপায় ছিল না। আজ এই বৃদ্ধ, কুমুদবাবুর অতীত ভিটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় অতীত হয়ে গেছে। নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। নতুন জীবনের মিছিল। কেউ বুঝতে পারে না, বুড়োটা কেন থমকে দাঁড়ায়। ওই জমিতে পোঁতা আছে আমার প্রথম জীবনের পাপ।

এক ভোরে ঘুম ভাঙল। সারা পাড়া উত্তাল। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সংবাদ। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। আরও কেলেঙ্কারি, অমলা ছিল অন্তঃসত্ত্বা। সেই মুহূর্তে আমারও উচিত ছিল গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া; কিন্তু নিজের জীবনের অধিক প্রিয় আর কী থাকতে পারে! সেই সকালের মতো ভয় জীবনে আর কখনও পাইনি। আত্মহত্যার আগে মানুষ কিছু লিখে যায়। কী লিখে গেছে অমলাদি! যদি লিখে গিয়ে থাকে, আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী বিলু। একটা খুনি আসামির মতো বসে আছি আমি। আমি তো জানি কার সন্তান! অমলাদি আমার প্রথম প্রেম। আমার বউ। আমি পিতা।

সেইদিন দেখেছিলুম, মানুষ চিনতে আমাদের কীরকম ভুল হয়! জগৎ এক বিচিত্র চরিত্রের মেখলা। কল্যাণ এল উদ্ভ্রান্তের মতো। কানে কানে বললে, 'এ তুই কী করেছিস! ছি ছি। তোর বদনাম। তোর পরিবারের বদনাম। কাকাবাবুকে তো আত্মহত্যা করতে হবে। দাগি পাপীদের লজ্জা থাকে না। তোদের যে পুণ্যাত্মার বংশ।!'

মাথা নিচু করে বসে রইলুম আমি। আগের দিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সকালের আকাশ বিষণ্ণ, মেঘলা। আগের রাতের সব ঘটনা মনে পড়ছে। অমলাদির সঙ্গে আমার জীবনের শেষ রাত। বেশ হাসিখুশিই তো ছিল। বলেছিল, 'ভাবছ কেন? তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না। কাক-পক্ষীও টের পাবে না। ঠিক সময়ে দেখবে আমি নেই। তোমার বদনাম মানে আমার বাবার বদনাম।' সে রাতে আমাদের খাওয়া হয়েছিল চমৎকার খিচুড়ি আর তেলেভাজা।

কল্যাণ বললে, 'আমাকে তুই বললি না কেন? আমি তোকে এমন মেয়েছেলের কাছে নিয়ে যেতুম, জীবনে ভুলতে পারতিস না। তখন ভাল ছেলে সেজে নাক সিঁটকে বসে রইলি। আর এমন একটা কাণ্ড বাধালি, যার ফল কী হবে কেউ জানে না।'

কল্যাণ বলেছিল, 'সবার আগে তোরই যাওয়া উচিত, তা না হলে লোকে আরও সন্দেহ করবে। শয়তানি করেছিস, এইবার একটু অভিনয় কর। তোর ওই ছেলেমানুষের মতো সরল মুখে এইবার ভীষণ একটা শোকের ছায়া নামা। পাগলের মতো কাঁদ। চিৎকার কর, আমার দিদি। দেয়ালে মাথা ঠোক। হাত মুঠো করে বল, কোন শালা আমার দিদির সর্বনাশ করেছে, আমি তাকে দেখে নেব।'

মানবচরিত্রের আমি অ আ ক খ-ও জানি না। আমি এক আহাম্মক। অমলাদি দুটো চিঠি লিখেছিল। একটা পুলিশের জন্যে। তাতে লেখা ছিল, স্পষ্ট ভাষায়, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এক লম্পট শয়তান। তার নাম বিশ্বনাথ মাইতি। একসময় সে আমার বাবার ছাত্র ছিল। সেই সুবাদেই এ-বাড়িতে তার অবাধ যাওয়া আসা ছিল। গত আশ্বিনে বিজয়া দশমীর দিন বিশু বিজয়া করার অছিলায় এসে আমাকে একটা লাড্ডু খাইয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার শরীর ঝিম মেরে এল। যখন আমার জ্ঞান হল তখন দেখলুম বিশু আমার সর্বনাশ করে পালিয়েছে। তারপর বিশু আমাকে

পরপর তিনটে চিঠি লেখে, কিছু দামি উপহার পাঠায়, সবই দেরাজে আলাদা করে রাখা আছে। বিশুর অত্যাচারে আমাকে চলে যেতে হল।'

দ্বিতীয় চিঠিটার কথা আমি জানতে পারলুম তিন দিন পরে। চিঠিটা ডাকে এল আমার কাছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি কার লেখা! ভালভাবে দেখে চমকে উঠলুম। মৃত্যুপারের চিঠি। যে নেই তার চিঠি। হাতে ধরে বসে রইলুম দীর্ঘক্ষণ। অমলাদির মৃত্যু বিশাল একটা গোলার মতো আমার অস্তিত্বের দুর্গ ধসিয়ে দিয়েছিল। একই সঙ্গে একটা মানুষকে শ্রদ্ধা করছি আবার তাকে উপচারের মতো ভোগ করছি, এমন ঘটনা বিরল। এমন সম্পর্ক সহসা গড়ে ওঠে না। নিজেকেই নিজে পুজো করার মতো অনুভূতি। কী বিচিত্র এক সম্পর্কের অবসান! লোকে হয়তো বলবে পাপ, আমি বলব পূজা। মনে মনে হিসেব করলুম অমলাদি এখন কত দূরে গেছেন, কত যোজন দূরে! মানুষ নেই অথচ তার শেষ চিঠি আসছে ডাকে।

স্নেহের বিলু,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে, তখন আমি অনেক দূরে। এ-যাত্রা একমুখী। এ শুধুই যাওয়া। চলে যাওয়া। ফিরব না কোনওদিন। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়েই গেলুম। তোমার দিদি, আবার তোমারই সন্তানের জননী। পাপ। অবশ্যই পাপ। তবে নিজেকে পাপী ভেবো না। এর পেছনে আমার একটা গভীর পরিকল্পনা ছিল। একটা চক্রান্তই করেছিলুম বলতে পারো। তোমাকে আমি বুঝতে দিইনি। সে কৃতিত্ব আমারই। তোমাকে নয়, তোমার সহজাত প্রবৃত্তিকে আমি ব্যবহার করেছি। একদিকে তুমি, একদিকে আমি। আমি জানতুম তুমি ভয়ংকর রকমের পাপবোধে ভুগছ। আমি কিন্তু নিষ্পাপ। একটা গল্প বললে ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। গোপীরা যমুনা পার হবে। কুঞ্জ থেকে তাদের সময়ে ফিরতে হবে, নয়তো সবই ছিছি করবে। কলঙ্ক রটবে। কিন্তু পারাপারের নৌকো যে নেই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমরা এক কাজ করো, যমুনাকে গিয়ে বলো, যমুনা, কৃষ্ণ যদি ভোগ না করে থাকে, তা হলে তুমি দু'ভাগ হয়ে আমাদের পথ করে দাও। গোপীরা দুষ্টু হাসি হেসে বললে, সখা! তুমি আমাদের ভোগ করোনি? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সে-বিচার পরে হবে। তোমরা আগে যাও। গিয়ে বলো, দেখো না কী হয়। গোপীরা হাসতে হাসতে যমুনার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে বলেছিলেন তাই বললে, আর যমুনা অমনি দু'ভাগ হয়ে গেল। তারা তো অবাক! এত ভোগের পরেও ভোগ হয়নি! না হয়নি। ভোগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেহটাকে ছেড়ে রেখেছিলেন ঠিকই; কিন্তু মন ছিল নিরাসক্ত। তিনি গ্রহণ করেননি। আমি একেবারে গ্রহণ করিনি, বললে মিথ্যা বলা হবে। আমি দেবী নই মানবী। সুস্থ দেহের চাহিদা পুরোদস্তুরই ছিল। তবে চেপে রাখা যেত। বাঙালি মেয়ে সংযম জানে। তারা মেমসাহেব নয়। তোমাকে আমার অতীতটা বলি। আমার বাবা ঋষিতুল্য ছিলেন বলেই আমার মা ছিলেন অসংযমী। আমার মায়ের দেহবাসনা ছিল প্রবল। নিজের মাকে চরিত্রহীনা বলতে নেই। আমার মায়ের অনেক কুকারখানার আমিই ছিলুম সাক্ষী। তোমার মতোই আমার ছেলেবেলাটাও খুব একটা সুখের ছিল না। মা তাড়াতাড়ি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন, সে লোকটা একটা চরিত্রহীন, লম্পট। আর সে এখন কার সঙ্গে আছে জানো? ওই বিশুর বড়বোনের সঙ্গে। লোকটার বিপুল পয়সা। আর বিশুর বোন! বুঝতেই পারছ! বিশুর বাবার তিনটে মেয়েমানুষ। এইসব ভাষা ব্যবহার করছি বলে আমাকে ক্ষমা কোরো। অবশ্য অনেক কারণেই একাধিকবার তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। মায়ের ওপর আমার অনেক কারণে রাগ। মা আমার বাবার আদর্শ গ্রহণ করেনি। যতদিন ছিল, বাবাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। অপমান করেছে। ভণ্ড বলেছে। বাবাকে যোগ থেকে ভোগের দিকে টেনে নামাতে চেয়েছে। যতই না পেরেছে ততই নিজেকে খারাপ করেছে। মা ছিল লোভী। আমাকে সরাবার জন্যে তুলে দিয়েছিল একটা বড়লোক জানোয়ারের হাতে। আর এই বাড়িতে বসেই সেই জানোয়ারটা যখন বিশুর বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, মা তখন বলেছিল প্রকৃত পুরুষের ওইটাই লক্ষণ। তোর বাবার মতো

যারা মেনিমুখো তারাই ঘরবন্ধ করে সারাদিন ব্যাজরং ব্যাজরং করে। বড়লোকের বউ ছাড়া অন্য মেয়েমানুষ থাকাটাই আভিজাত্য। তুমি যদি তাকে ফূর্তিতে না রেখে থাকো, সেটা তোমারই অক্ষমতা। ছলা, কলা, ছেমো মেয়েদের এই তিন অস্ত্র। বাপসোহাগি মেয়ে তুমি, তোমার স্বভাব তো আলোচালের মতোই হবে। এই ছিল আমার পূজনীয়া মা। ওই বিশু তার বোনকে দিয়ে আমার জীবন নষ্ট করল। বিশু সেই লোকটার ঘাড় ভেঙে নিজের আখের ফিরিয়ে নিল। বিশুর বোন লোকটার যৌবন ছিবড়ে করে দিলে। আর বিশুর চোখ পড়ল আমার দিকে। সন্ধেবেলা বাড়ির সামনে এসে হল্লা করত। যাকে তাকে দিয়ে অশ্লীল চিঠি পাঠাত। ডাকে অশ্লীল ছবি পাঠাত। সব শেষে ধরল তোমাকে। একটা জানোয়ারকেও যদি উচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি আমার জন্ম সার্থক। আমি খুন করতে পারব না, আমি মারতে পারব না। এমন একটা পরিকল্পনা আমাকে নিতে হবে, যা আমার মতো। বাবা আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। নিজের মা বাধা না হয়ে দাঁড়ালে আমার জীবনটা অন্যরকম হত। দুঃখ করে লাভ নেই। ভাগ্যকে মানতেই হয়। বাবার মুখে গল্প শুনেছিলুম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যেরা একটা কৌশলে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করত। তাকে বলা হত কামিকাজে। ব্যাপারটা কীরকম জানো, ছোট একটা উড়োজাহাজ বোমটোম সমেত পাইলট সুদ্ধ জাহাজের চিমনির মধ্যে ঢুকে যেত। সেই গল্পটা আমার জীবনে কাজে লেগে গেল। আমিও কামিকাজে করে গেলুম। নিজেকে মেরে আর একজনকে মারা। সেই আর একজনকে একটু শিক্ষা না দিলে সে আমার সাংঘাতিক ক্ষতি তো করতই, আরও অনেকের ক্ষতি করত। মরবই যখন, তখন আর পাপ-পুণ্য কী। সবই তো এক মুঠো ছাই। তোমাকে আমি ভালবেসেছিলুম। বেসেছিলুম বলেই মনে হল তোমার একটা কৌতূহল না মেটালে, তোমাকে খুব সহজেই বিপথে নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। অদ্ভুত এক গোপনীয়তা, একটা অজানা রহস্য। আমি তোমার শিক্ষক হতে চেয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমার জৈব সত্তা জেগে উঠল। একটা আলোড়ন। সম্পর্ক, বয়েস সব ভুল হয়ে গেল। রিপু বড় প্রবল। বন্যার নদীর মতো সব বাঁধ ভেঙে ফেলে। মুহূর্তের অসাবধানতা। সন্তানসম্ভবা। তখনই আমার পরিকল্পনা আরও জোরদার হল। তোমাকে বাঁচাতে বিশুকে মারতে আমাকে মরতে হবে।

খিচুড়িটা কেমন রেঁধেছিলুম বলো! তেলেভাজা মুচমুচে হয়েছিল তো! প্রবল ঝড় বৃষ্টি। বিদ্যুতে চমকাচ্ছে ইঙ্গিত। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। পরান সখা, বন্ধু হে আমার। আকাশ কাঁদে হতাশ সম, নাই যে ঘুম নয়নে মম/ দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার ॥

শোন বিলু, তুই পাপ-পুণ্য নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাস। শোন, নিজের ক্ষতি আর অন্যের ক্ষতি না করে যে কাজ, সে কাজ তুই নির্ভয়ে করে যাবি। নিজের বিচারই বিচার! এগোনোই ধর্ম, পেছোনোই অধর্ম। নিজেকে ছোট ভাবাটাই পাপ।

আমি যাচ্ছি। আগেই যাচ্ছি। তোর সময় হলে আসিস।

পড়ামাত্রই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলিস। পোড়ানোর সময় ভাববি অমলাদির সৎকার করছিস।

ইতি, অমলা।

কল্যাণ চিঠিটা দেখল। তার ফরসা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'বিলু, চিঠিটা খুব মারাত্মক। পুলিশের হাতে পড়লে বিশুর কেস ফেঁসে যাবে। শয়তানটাকে আমি ডবল প্যাঁচে ফেলব। পুলিশ তো ধরেইছে, টাকা খাইয়ে যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে সে ব্যবস্থাও করব। চিঠিটা পোড়ানোই সবচেয়ে ভাল, আবার এও ভাবছি, এমন একটা চিঠি, চিরটা কাল কাছে রাখার মতো, পুড়ে যাবে! তুই এটাকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখ, যেন কারও হাতে না পড়ে যায়। বিশটা বছরের মতো এটাকে গুপ্তধন করে রেখে দে।'

বড়মায়ের দেওয়া সেই সুন্দর বর্মি বাক্সের একেবারে নীচের তলায় সাত পাট কাগজে মুড়ে চিঠিটাকে রেখেছিলুম। সেই অবিস্মরণীয় চিঠি আজও আমার সঙ্গী। কালো কালির লেখা বাদামি

হয়ে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে। মাঝে মাঝে দেখি আর মনে ভেসে উঠে মির্জা গালিবের একটি দীবান:

সীনে কা দাগ হৈ বহ নালা কা লব তক না গয়া।
খাক কা রিজক হৈ বহ কতরা তো দরিয়া ন হুয়া ॥

মুখে যে আর্তনাদ ফোটে না, সেই আর্তনাদ বুকে দাগ কেটে বসে। যে জলকণা সমুদ্রে যায় না, মাটি তা শুষে নেয়।

কল্যাণ একটা জনমত তৈরি করে ফেললে। মাস্টারমশাইয়ের সুনাম, বিশুর দুর্নাম, মাঝে এই ঘটনা। অমলাদির দেরাজ থেকে বেরিয়েছে বিশুর যত অপকীর্তি। পুলিশ কী করল আর না করল দেখার দরকার নেই, পাড়ার সমস্ত লোক মারমার করে বিশুর পরিবারকে উৎখাত করে ছাড়ল। কফিনে শেষ পেরেকটা মারল কল্যাণ। মামলাটাকে তদ্বির তদারকি করে পেছনে লেগে থেকে, সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে বিশুকে জেলে পাঠাল। অমলাদির কেউ ছিল না। মামলা ধামা চাপা পড়ে যেত কল্যাণ না থাকলে।

কল্যাণ তারপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। বলা নেই কওয়া নেই সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে মিশনে চলে গেল। পাপের জগৎটাকে আগে ভাল করে দেখে নিলে। দেখলে, নেই কিছু। আর পিছু ফিরে তাকানো নয়, একটা তিরের মতো সোজা লক্ষ্যে। কল্যাণের সঙ্গেই ছিল আমার প্রতিযোগিতা। কল্যাণ এক কথায় আমাকে মেরে বেরিয়ে গেল। সে এখন আলমোড়ায়। বিরাট এক সন্ন্যাসী। কী তার উজ্জ্বল কান্তি! মাঝে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমাদের আশ্রমে এসেছিল বক্তৃতা দিতে। মুখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে! গম্ভীর মুখচ্ছবি। ভক্তরা প্রণাম করছে। কুড়ি বছর আমেরিকায় ছিল। কল্যাণের জীবন আর আমার জীবনে অনেক ফারাক হয়ে গেছে। কল্যাণ অসীম এক সমুদ্র, আমি একটা ডোবা। দুষ্কর্মের কচুরিপানায় সামান্য যেটুকু জল তাও দেখা যায় না। জীবনের দিন মশার মতো জন্মেছে, ভনভন করেছে, মরেছে চপেটাঘাতে। সভার একপাশে দীন-হীনের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি। টকটকে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আমাকে চিনতে পারেনি। কল্যাণ বলত, মিনমিনে ধার্মিকের চেয়ে ডাকাবুকো পাপী অনেক ভাল। মিটমিটে আলোর চেয়ে অন্ধকার শ্রেয়। কল্যাণ বলত জীবনের সিদ্ধান্তে এক কথায় আসতে হয়। জীবন সংসারীর হিসেবের খাতা নয়। পিটপিটে অক্ষরে চাল-ডাল-তেল-নুনের হিসেব। একজনের বউ কর্তাকে বললে, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। দেখো গে যাও অমুকের সাতটা বউ, এক এক করে সব ত্যাগ করছে। এইবার সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে। কর্তা বললে, পাগলি! ওভাবে কেউ সংসার ত্যাগ করতে পারে না। সংসার কী করে ত্যাগ করতে হয় দেখ! কর্তা তখন কাঁধে গামছা ফেলে চান করতে যাচ্ছিল। গামছাটা পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেই যে গেল আর ফিরে এল না। ঠাকুরের গল্পের জীবন্ত উদাহরণ কল্যাণ। বিকেলবেলা আড্ডা মারছিল আমাদের সঙ্গে, হঠাৎ পকেট থেকে সমস্ত পয়সা বের করে টেবিলের ওপর ফেলল। আমাকে বললে, বিলু গোন। সেই পয়সায় চা আর ওমলেট খেলুম আমরা সবাই। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে কল্যাণ বললে, তোরা বোস আমি একটা কাজ সেরে আসি। কল্যাণ আর ফিরে এল না। কল্যাণ হয়ে গেল স্বামী প্রমথানন্দ। সন্ন্যাসী হবার কথা ছিল আমার। আমি হয়ে রইলুম অঘোরানন্দ, সংসারের অচেতন ঘুমে।

ঝড় বয়ে গেল জীবনের ওপর দিয়ে। ছোটকর্তা একদিন ভারাক্রান্ত মনে বললেন, 'তোমাকে কঠিন কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তোমার মুখটা এত করুণ! তবু আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। কোনও কোনও মানুষের কাম একটু বেশি হয়, তুমি সেই দলেই পড়ো। তা পড়ে যখন গেছ করার কিছু নেই। তোমার কাছে আমার একটাই শুধু অনুরোধ, লেখাপড়ায় অবহেলা কোরো না। পরে বিপদে পড়ে যাবে। নিজেকে গড়ে তোলো। শিক্ষা আর উপার্জন ছাড়া জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। নিজেকে বোঝাও। মনে মনে বলবে আমি কোন বংশের ছেলে। প্রশ্ন করবে

নিজেকে। নারাণকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলুম, বিলু ভাগ্যের হাত থেকে বেরিয়ে আসবে পুরুষকারের জোরে। তা যদি না পারো, তোমার পরাজয় মানে আমার পরাজয়। আমি তো তোমার সামনে আমার চরিত্র রেখেছি। সেই চরিত্র তো খুব মলিন নয়। চরম হতাশার দিনে পতনের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, মনের জোরে কেটে বেরিয়ে এসেছি। মনই সব। মনকে অহংকারী করো। শক্ত করো। নিষ্ঠুর হও। স্বার্থপর হও। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দাও।'

অমলাদির মৃত্যুর পর সব সময় মনে হত আমি একটা খুনি। সম্পর্ককে আমি অপবিত্র করেছি। মাস্টারমশাইয়ের ঋণ শোধ করেছি তাঁর বংশ লোপাট করে। কল্যাণ নেই যে আমাকে মেরামত করবে। বড় হয়ে গেছি, যুবক হয়ে গেছি। ছোটকর্তার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। খুব একটা ডাকেন না। একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে এসরাজের সঙ্গে গান। আগেকার দিনে মানুষ যেমন পতিত হত অপকর্মের জন্যে, আমিও যেন সেইরকম পতিত হলুম।

কী হত বলা মুশকিল! হয়তো একটা মদ্যপ লম্পট হতুম। অকালে মারা যেতুম রাস্তার কুকুরের মতো। কেউ একজন তাঁর অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাকে বাঁচালেন। রেবা আমাদের সঙ্গে পড়ত। আমি তখন মেয়েদের ভয় পাই। শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করি। আমি দুর্বল চরিত্রের ছেলে। কখন কী করে বসব, এই আমার ভয়। অনার্স কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল করে বেরোচ্ছি। গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে রেবা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলুম মেয়েটি অহংকারী। নিজের ডাঁটে থাকে। রূপের অহংকার, বংশের অহংকার। রেবার সঙ্গে ভাব করার জন্যে অনেকেই পাগল। রেবা পাত্তা দেয় না। ফলে সকলেই খেপে আছে।

রেবা একেবারে আমার সামনে। কেউ কোথাও নেই। আমি ভয়ে পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইছিলুম। আমাকে হয়তো অপমানই করবে। কাল আমার প্রাণের বন্ধু অমল আমার পাশে বসেই কাগজের গুলি পাকিয়ে রেবাকে মারছিল। কোনওটা ঘাড়ে, কোনওটা পিঠে কোনওটা চুলে গিয়ে লাগছিল। দুটো ক্লাসের মাঝের ফাঁকটুকু সে এইভাবে ভরাট করছিল। খুব খারাপ লাগছিল ভয়ও করছিল। আমার ঘাড়ে দোষ না পড়ে। অমলকে বলেছিলুম, 'এটা কী ধরনের অসভ্যতা!'

'আমি ডেসপ্যারেট হয়ে গেছি। রেবাকে আমার চাইই চাই। হয় প্রেম, নয় মৃত্যু।'

'লেখাপড়া করার জন্যেই তো কলেজে এসেছিস?'

'প্রেমে পড়ে গেলে কী করব?'

'রেবা তো তোর প্রেমে পড়েনি!'

'পড়তে হবে পারতে হবের মতো, পড়াতে হবে। সেইটাই আমার সাধনা।'

যে পড়বে না তাকে জোর করে পড়াবি?'

'যে ছেলে পড়ে না, তাকে জোর করে বাপ-মা পড়ায় কি না?'

'তোর জীবনের উদ্দেশ্য কী?'

'রেবার প্রেমে পড়া।'

সেই রেবা একেবারে আমার সামনে। একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে পড়লে মানুষ যেমন তাড়াতাড়ি সরে পালাতে চায়, আমিও সেইরকম পালাতে চাইলুম। রেবা আমার পথ আটকে দাঁড়াল। আমি হাত জোড় করে বললুম, 'বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি।'

রেবা খিলখিল করে হেসে বললে, 'জানি। ও সব অমলের কাজ। আপনার অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি নোটসগুলো দিন-কয়েকের জন্যে দেবেন! তা না হলে আমি ফেল করে মরব।' আমার বুকে সেতার বেজে উঠল। রেবার মতো অহংকারী মেয়ে আমার নোটস চাইছে। অর্গ্যানিকে আমার সুনাম আছে। রোজ রাতে ছোটকর্তা দু'-তিন ঘণ্টা করে আমাকে তালিম দেন। আমি একেবারে গলে গিয়ে বললুম, 'নিশ্চয় দোব।'

হাতের আঙুল তুলে রেবা বললে, 'একটা শর্ত। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। কেউ যেন জানতে না পারে। কাল কলেজ ছুটির পর নকুড়ের দোকানের সামনে একা দাঁড়াবেন। আমি ঠিক সময়ে এসে যাব।' এখনও মনে আছে, সারাটা রাত আমার স্বপ্নে কেটে গেল। এই তো প্রেম। প্রেমই তো! কিছুদিন আগে বিলেত থেকে একটা বই আনিয়েছিলুম, ফেনারের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি। মোড়ক খুলে পাতা ওলটাচ্ছি। মাঝামাঝি জায়গায় সাদা পাতার ওপর শুয়ে আছে লম্বা সোনালি একটা চুল। তখন রাত প্রায় দশটা। ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে গেলুম। মন চলে গেল ইংল্যান্ডে। নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরা এক রূপসি। মাথা ভরতি সোনালি চুল। সেই চুলের একটা উড়ে এসেছে এই সাগরপারে। চুল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে শিল্পীর দক্ষতায় আমি এক নারীমূর্তি তৈরি করে ফেললুম। সে হাঁটছে, চলছে। কথা বলছে, হাসছে। নীল নয়না এক বিদেশিনি। বইটার মূল্য বেড়ে গেল। নীরস কেমিস্ট্রি নয় সরস কাব্য। মন এক অদ্ভুত বস্তু। সেই সোনালি চুল আজও আমার সংগ্রহে আছে। কোথায় সেই রমণী আর কোথায় আমি। বয়ে গেছে অর্ধশতাব্দী। সে কোনওদিন জানল না পৃথিবীর একপ্রান্তে তার একটি চুল কবিতা হয়ে আছে। সে হয়তো কবরে, সাসেক্স কি এসেক্সে।

রেবা আমাকে একান্তে ডেকেছে। নিজেকে এতদিন পাপী এক লম্পট বলে মনে হচ্ছিল। আমি আমার পবিত্রতা আবার ফিরে পেলুম। রেবা আমার প্রেমে পড়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। ওই সুন্দরী খ্রিশ্চান কন্যার পেছনে তখন লাইন লেগে গেছে। প্রেম আর মাছ ধরা তো প্রায় এক জিনিস। যারা ভাল খেলাতে পারে, দামি হুইলে যাদের অনেক সুতো তারাই খেলিয়ে তুলতে পারে বড় মাছ। যে-কোনও কারণেই হোক আমাকে ভাল লেগেছে রেবার। সেই রাতে ভাবতে বসেছিলুম, এই ভাল লাগাটা কী করে স্থায়ী করা যায়! আরও ভাল কী করে লাগানো যায়! লেখাপড়ায় আরও ভাল হতে হবে। ফার্স্টক্লাস পেতে হবে। অদ্ভুত সুন্দর রোমান্টিক একটা চরিত্র তৈরি করতে হবে। আর আর যা গুণ মানুষ ভালবাসে সেই সব গুণ অর্জন করতে হবে। একটি মাত্র আহ্বানে রেবা আমার প্রকৃত সুর ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেতারের ঠিক তারটি সে স্পর্শ করেছিল। আমি তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ। সে আমাকে এই দয়াটুকু না করলেও পারত। কোনও প্রয়োজনই ছিল না। একেই বলে কৃপা।

যথা সময়ে নকুড়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। জীবনের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ভয়, উৎকণ্ঠা, লজ্জা। যে-সময়ের কথা বলছি, প্রেম সেসময়ে একালের মতো এমন ছ্যা-ছ্যা হয়ে যায়নি। আমাদের ইয়ারে তখন সাতটি মাত্র মেয়ে। তাদের মধ্যে একজন আবার বিবাহিতা। কড়া পাহারায় কলেজে আসে, কড়া পাহারায় বাড়ি ফেরে। জমিদার বাড়ির বউ। পাইক-বরকন্দাজের ব্যাপার। একটা গাড়ি আসে। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকে পাগড়ি বাঁধা এক পালোয়ান।

রেবা সেদিন কলেজে আসেনি। ধরেই নিয়েছিলুম আমাকে তাপ্পি দিয়েছে। মেয়েরা অমন করতেই পারে। ছেলেরা নিজেদের যতই চালাক ভাবুক আসলে তারা বোকাপাঠা। প্রেমের টোপ গিলে শেষ পর্যন্ত দড়ির আগায় ঝোলে। তবু গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার পেছনে কলকাতার বিখ্যাত দোকানের শোকেস। বড় বড় সন্দেশ সাজানো। দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। অমলের বন্ধু আমি। আমাকে দিয়ে অমলকে শিক্ষা দিচ্ছে রেবা। লোভনীয় সন্দেশের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শোকেসের সন্দেশ। পয়সার জোর থাকলে কিনে খাও। আগে অর্থ পরে ভোগ। আমার এক পাড়ার বন্ধু, আমাদেরই পাড়ার এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাবা ছিলেন গর্ভনারের এ-ডি-কং। যেমন চেহারা, তেমন ডাঁট, তেমন ক্ষমতা। একদিন খপ করে আমার বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি আমার জামাই হতে চাও?' সে তো ঘাবড়ে গেছে। ভয়ে ঢোক গিলছে। 'আমার মেয়ের এই শাড়িটা দেখেছ? কত দাম জানো? সাতশো। এইটা ওর আটপৌরে শাড়ি। আজ কী খেয়েছ? বলো, বলো, চুপ করে থেকো না।'

আমার বন্ধু ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'ডাল, ভাত, পোস্ত।'

'আমার মেয়ে সারাদিনে কী খায় জানো? ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার।'

গড়গড় করে তিনি একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললেন, 'নজরটা বড় উঁচুতে তুলেছ। তোমার স্তরেই থাকার চেষ্টা করো। যাও।'

অপমানে আমার বন্ধু কেঁদে ফেলেছিল। মেয়েটা কিন্তু তাকে ভালবেসেছিল। হাবভাবে আমাদের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। ছেলেটাও অসম্ভব ভাল ছিল। একেবারে খাঁটি সোনা। জীবনে সে অনেক বড় হয়েছিল। তার সময়ের সে একটা নাম। ওই এ-ডি-কং কে মনে রেখেছে! কে খবর রেখেছে তার মেয়ের! আমার সেই বন্ধুকে লোকে এক নামে চিনবে। সে বিয়ে করেছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়েকে। ভীষণ সুখী হয়েছিল।

যখন অধৈর্য হয়ে চলে যাব ভাবছি রেবা এল হন্তদন্ত হয়ে। চুল উড়ছে। মুখ বিষণ্ণ। রেবার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রোগশয্যা পৃথিবীর কত প্রেমকে পাকা করেছে তার কোনও ইতিহাস আছে!

রেবা সেদিন আর আপনি বললে না, বললে, 'চলো, আমরা কোথাও যাই। মনটা ভীষণ ভারী হয়ে আছে।'

'মায়ের অসুখের জন্যে?'

'আরও অনেক কারণ আছে। সে সব তোমাকে পরে একটু একটু করে বলব। তোমাকে আমি বলতেই চাই।'

তখনও সিনেমার বিকেলের শো শুরু হতে দেরি ছিল। আমরা দুটো টিকিট কেটে ঢুকে পড়লুম। সেই সন্ধ্যায় রেবার পাশে বসে যে ছবি দেখেছিলুম মনে আছে আজও। মধুর স্মৃতি মূল্যবান অলংকারের মতো স্মৃতির লকারে চলে যায়। ছবিটা ছিল 'হাঞ্চ ব্যাক অফ নোতরদাম'। বিখ্যাত অভিনেতা লন চ্যানি। হাফটাইমে রেবা সলটেড বাদাম খেতে চাইল। সিনেমার লবিতে বেরিয়েই পড়ি কি মরি করে ফিরে যেতে হল। অমলও এসেছে সিনেমা দেখতে। আমাদের অনুসরণ করে কি না, কে জানে!

রেবা বললে, 'জানতুম, ও আমাদের ফলো করবে। উন্মাদ হয়ে গেছে। নিজেরই ক্ষতি করবে।'

'তোমাকে তো প্রায় এক ডজন ছেলে ভালবাসে। তুমি কারওকেই পাত্তা দিলে না, আর আমার সঙ্গে বসে সিনেমা দেখছ। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।'

'আমারও আসছে না। তবে বিজ্ঞানের ছাত্র আমরা। ভাইব্রেশান থিয়োরি দিয়ে বুঝতে গেলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়, তোমার আর আমার মনের বোধহয় একই ওয়েভলেংথ। ওই এক ডজনের একটাকেও আমার ভাল লাগে না। সব ক'টা হল বুল।'

রেবা ঘাড় দুলিয়ে হাসল। ওর খোলা চুল আমার মুখ ছুঁয়ে গেল।

এতখানি বয়েস হল আমার তবু মনের বয়েস বাড়ল না। এখনও আমি পঞ্চাশ সালের পথ ধরে হাঁটছি! কোথায় আমার পরকালের চিন্তা করব, তা নয়, সুন্দরী রেবা পাশে বসে এলো চুলের ঝাপটা মারছে। জীবনের গদ্য জীবনের কবিতাকে ছারপোকার মতো টিপে মারতে পারছে না। রেবা যে স্বপ্ন বুনে গিয়েছিল, সেই স্বপ্ন থেকে জীবনের বাস্তবে বেরোতে পারছি না কেন! স্বপ্ন নিয়েই মরব নাকি, আর এক স্বপ্নে জেগে উঠতে!

সিনেমা ভাঙার পর আলোকিত কলকাতার পথ ধরে আমাদের ফেরার পালা। ট্রাম তখন প্রায় যাত্রীশূন্য হয়ে এসেছে। রাতের আর এক কলকাতা তখন চোখ খুলছে। ময়দানে পাক মারছে স্বপ্নের ফিটন গাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের দামি রেস্তোরাঁর বাইরে শৌখিন স্ত্রী পুরুষের ভিড়। ক্রাইসলার আর বুইক গাড়ি তখনও ছিল। রাতের মহিলারা তাদের এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছে। ফুলঅলা ফুল বিক্রি করছে। হাতে মালা জড়িয়ে রূপসি রাত ধরছে। এই সবের মধ্যে দিয়ে ঘোরলাগা চোখে ভেসে

চলেছি রেবা আর আমি। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আমাদের দু'জনের হয়ে গেছে। আমরাই মালিক। সৃষ্টি-স্থিতির বিধাতা।

পরের দিন রেবার মাকে দেখতে গেলুম। সুন্দর স্বপ্নময় একটা বাড়ি। জানলার কাচে কারুকাজ করা ছবি। নানান রং। যীশুর জীবনকাহিনি। গোটা বাড়িটায় খেলা করছে গির্জার পরিবেশ। চেনে বাঁধা সাদা, মুখ ভোঁতা একটা কুকুর গমগম করে ডাকছে। ধবধবে সাদা বিছানায় তিন থাক সাদা বালিশে পিঠ রেখে শুয়ে আছেন রেবার মা। দেখেই চমকে উঠলুম। অবিকল আমার বড়মায়ের মতো দেখতে। আর সেই একই অসুখ। মেরুদণ্ডের মজ্জা শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এ অসুখ তো আমার চেনা, এর পরিণতিও তো আমার জানা।

অসম্ভব রকমের ফরসা দুটো হাত তুলে মহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'এসো। রেবার মুখে তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

আমারও কথা ছিল। এখন ভাবি আর অবাক হই। শুকনো মেঘেও তা হলে জল ছিল দু'-চার ফোঁটা।

রেবার বাড়িতে যতবারই গেছি তার বাবাকে দেখিনি। রেবার মাকে ঘিরে বসেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা গল্প করেছি। রেবাদের আয়া আমাদের খাবার দিয়ে গেছে। নিউ টেস্টামেন্ট পড়া হয়েছে; রেবাদের এক পারিবারিক বন্ধু এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যাজিক দেখিয়েছেন। রেবার বাবা কোথায়। জিজ্ঞেস করার সাহস হত না।

একদিন বিকেলে ঘোর ঘনঘটা বৃষ্টি নামল। কলকাতা ভেসে গেল। বিদ্যুৎ চলে গেল। রেবাদের বাড়িতেই থেকে যেতে হল সে-রাতে। অন্ধকারে বসে আছি দু'জনে। বাতিটা নিবে গেছে জ্বলে জ্বলে। জানলার কাজ করা কাচের ওপারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। যতক্ষণ বাতি জ্বলছিল ততক্ষণ আমরা পড়েছি। রেবা আমাকে ক্যালকুলাস পড়িয়েছে। আমি রেবাকে পড়িয়েছি কেমিস্ট্রি। দু'জনেই তখন ক্লান্ত। ডাক্তার এসে রেবার মাকে ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছেন। তিনি ঘুমোচ্ছেন।

রেবা টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলে বললে, 'একটা গল্প শুনবে?'

'কার গল্প। পরানদিল্লোর?'

'আমার গল্প। আমার জীবনের গল্প।'

জীবনের গল্প যে কত রকমের হতে পারে! সেই রাতে জেনেছিলুম রেবার পিতার রহস্য। রেবার বাবা তখন যাবজ্জীবন কারাবাসে। ফাঁসিই হত। কলকাতার এক বড় ব্যারিস্টার টেম্পরারি ইনস্যানিটির ফাঁক দিয়ে আসামিকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যে ঘরে বসে ছিলুম ঘটনাটা নাকি সেই ঘরেই ঘটেছিল। আমি যে চেয়ারটায় বসে ছিলুম, নিহত ব্যক্তি নাকি সেই চেয়ারেই বসেছিল। রেবা যে চেয়ারে বসে ছিল রেবার বাবা বসেছিলেন সেই চেয়ারে।

রেবা যখন বললে, 'ইট ওয়াজ ব্লাড অ্যান্ড অল ব্লাড'। তখন আমি রেবাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম। বাতি নেবা অন্ধকার ঘর। বাইরে দুর্যোগ ভরা আষাঢ়ের আকাশ। থেকে থেকে বিদ্যুতের নীল হাসি। ভয় তো করবেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি আমি। একপাশে একটা ডিভান ছিল সেইখানে গিয়ে বসলুম দু'জনে।

রেবার বাবা যাকে খুন করেছিলেন সে ছিল রেবার গৃহশিক্ষক। রেবা তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। ভদ্রলোক একজন স্কলার ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রভূত সুনাম ছিল। রেবা তখন বিলিতি কাটের ফ্রক পরে। দেখতে সুন্দরী। রেবার বাবা উন্মাদ হয়েছিলেন, না শিক্ষকমশাই! কোনও কোনও মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না। ভদ্রলোক ছিলেন সেইরকম এক বেসামাল মানুষ। পড়ানো ছেড়ে তিনি রেবার শরীরের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ভেবেছিলেন খ্রিশ্চান পরিবার। তার এই স্বাধীনতা এরা মেনে নেবে। রেবা পুরোপুরি না বললেও ঠারে ঠোরে তার বাবা-মাকে বলেছিল। তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি ভেবেছিলেন, রেবার বুঝতে ভুল হচ্ছে। ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকের একটা

স্নেহ থাকতেই পারে। মেয়েকে তাঁরা বকেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার মধ্যে পাপ জাগছে। প্রে টু গড। ব্যাপারটা বাড়তেই লাগল। ঘটনার দিন শিক্ষকমহাশয় রেবাকে একেবারে জাপটে ধরেছিলেন। সেদিন তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ। আর ঠিক সেই সময় মাইনের টাকা দেবার জন্যে রেবার বাবা হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছেন। শিক্ষক মহাশয়ের তখন ক্ষিপ্ত অবস্থা। রেবার ফ্রকের সমস্ত বোতাম খুলে ফেলেছেন। চোখের সামনে নিজের মেয়েকে বিড়ম্বিত হতে দেখলে কোন পিতার মাথার ঠিক থাকে। ড্রয়ারের ওপর ছিল ভারী এক বাতিদান। এক আঘাতেই মাথা চুরমার। ভদ্রলোক মিনিট পনেরো ছটফট করে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চিরবিদায় নিলেন। ওই সময়ে রেবার বাবার আসার কথা নয়, নিয়তি তাঁকে টেনে এনেছিল। তিনি না এলে কী হত! রেবাকে একটু সহ্য করতে হত। মেয়েদের জীবনে এই ধরনের বিড়ম্বনা আসবে না, এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না। একটি মানুষের ক্ষণ আবির্ভাবে দুটো পরিবার বিপর্যস্ত হল। সেই শিক্ষক নিজের পরিবারের মুখে চুনকালি মাখিয়ে অপঘাতে মারা গেলেন। রেবার বাবা সোজা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। একটা স্কাউন্ড্রেলকে আমি খুন করে এসেছি। অ্যারেস্ট মি। ইন ডিফেন্স আমার কিছু বলার নেই। আই হ্যাভ ডান ইট।

রেবার গলা ধরে এল, 'আমার জন্যে আমার বাবার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। যখন টার্ম শেষ করে বেরিয়ে আসবেন, তখন একেবারে বৃদ্ধ। বেস্ট পার্ট অব হিজ লাইফ ইজ গন। বাই দ্যাট টাইম আমার মা-ও চলে যাবেন। সেই থেকে আমার একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি এসে গেছে। ছেলেদের দেখলেই মনে হয় ষাঁড়। একটা বুল। যদি কোনও ছেলে আমার মনকে ভালবাসে তবেই আমার মরুভূমিতে ফুল ফুটবে। চোখের সামনে সেই খুন দেখে আমার রক্তেও খুনের নেশা ঢুকে গেছে। জানো তো সেই লোকটার থেঁতলানো মাথা আমার খোলা বুকে ঢলে পড়েছিল।'

রেবা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সে কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, 'তুমি আমাকে ভালবাসো। প্লিজ লাভ মি। আমি রক্তে চান করেছি। আমি উইচ। আমি ডাইনি।' সেই অন্ধকার ঘর। নীল বিদ্যুৎ। জানলার কাচে বাইবেলের চরিত্র স্পষ্ট হয়েই পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে আঁধারে। বহুবর্ণের আলোর ঝলকে রেবার মোমের মতো সুন্দর মুখ শেক্সপিয়ারের নাটকের চরিত্রের মতো থেকে থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। তখন আমরা ম্যাকবেথ পড়ছি, হ্যামলেট পড়ছি, কিং লিয়ার পড়ছি। রেবার হাত আমার শরীর খাবলাচ্ছে। তার আঙুলগুলোকে মনে হচ্ছে থাবা। অমন ভয়ের রাত আমার জীবনে আর আসেনি। সাইকোলজি আর সেক্স দুটো শব্দকেই আমি ভয় পাই। এই দুইয়ের খেলায় মানুষ কী না করতে পারে!

রেবার হাবভাব হঠাৎ পালটে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। এক পুরুষের অপরাধে আর এক পুরুষকে হত্যা করবে না তো! আবার রক্ত! আমার গলায় আঙুলের লম্বা লম্বা নখ বসে যাচ্ছে। কাপালিক নরবলি দেয়। আমি কি কাপালিকের পাল্লায় পড়লুম! শেষে প্রায় কেঁদেই ফেলি, 'রেবা আমার ভীষণ ভয় করছে।'

রেবার শরীর শিথিল হল। ঘামে শরীর ভিজে ভিজে। আমার গলায় নখ বসে গেছে। জ্বালা করছে ভীষণ। রেবা উঠে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিল। একঝলক ভিজে বাতাস ঢুকে পড়ল ঘরে। রেবা আমার কাছে সরে এল, 'খুব ভয় পেয়েছ?'

'পেয়েছি। মনে হয়েছিল তুমি আমাকে খুন করছ। তোমার নখ গভীর হয়ে আমার গলায় বসে গেছে।'

কেউ যদি কারও মৃত্যুর কারণ হয় আর সেই মৃত্যু যদি তার চোখের সামনে ঘটে তা হলে তার মনের সুস্থতা বোধকরি এইভাবেই হারিয়ে যায়! ক্ষণে ক্ষণে তার মনের রূপ পালটায়। সেই শয়তান শিক্ষকের কি এতটুকু বোধবুদ্ধি ছিল না! আমার সেই গবেষণার প্রয়োজন নেই।

রেবা ছিল অসাধারণ ভাল ছাত্রী। আমি তার নখেরও যোগ্য ছিলুম না। আমার মধ্যে সে একটা

প্রতিযোগিতার ভাব এনে দিয়েছিল। রেবার কাছে যেন আমি হেরে না যাই। রেবার মা বলতেন, 'তোমার মতো আমার যদি একটা ছেলে থাকত!'

রেবা বলত, 'সান ইন ল' করবে নাকি?'

বেশ বুঝতে পারতুম রঙ্গ-রসিকতা করছে, বই পড়া হচ্ছে, ম্যাগাজিন আসছে, রেকর্ডপ্লেয়ারে গান বাজছে। প্যাটবুনের গলা: কিন্তু! একটা পুতুল ভেঙে যাবার পর আঠা দিয়ে জোড়া লাগালে যা হয় পরিবারের সেই অবস্থা। অবচেতনে সেই বোধ লেগে আছে। মুছে ফেলা যাচ্ছে না যাবেও না। ভুল করে বা বন্ধুভাবেও রেবার কাঁধে হাত বাখলে চমকে ওঠে। এক ঝটকায় কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দেয়। মুখের চেহারা কঠিন হয়। একমাত্র রেবার যখন নিজের ইচ্ছে হবে, যখন তার মুড আসবে তখন সে আমার ঘাড়ে পড়বে। পিঠে হেলান দিয়ে বসবে। আমার আঙুল মটকে দেবে, আমার আঙুলে মায়ের দেওয়া যে-আংটিটা ছিল সেটা খুলে নিয়ে নিজের লম্বা ফরসা আঙুলে পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে আর বলবে, বেশ মানিয়েছে তো। হঠাৎ একটা চিরুনি এনে আমার হাতে দিয়ে বলবে, চুলটা আঁচড়ে দাও তো দেখি কেমন পারো। বিশাল লম্বা লম্বা চুল ছিল রেবাব। মনে হয়েছিল, এ কী অদ্ভুত আবদার। দুপুরবেলা। চড়া রোদে ঝিম মেরে আছে বাইরেব প্রকৃতি। দোতলার ঘরে আমি আর রেবা। নীচের ঘরে শুয়ে আছেন রেবার মা। আমাদের সামনে বর্মাকাঠের লম্বা একটা টেবিল। ছড়ানো রয়েছে আমাদের বই খাতা পেনসিল। কোনওদিকে মন না দিয়ে কম করে দু'ঘণ্টা সাংঘাতিক লেখাপড়া হয়েছে। এইবার রেবা একটু সাজবে। তারই প্রাথমিক পর্যায় চুলের পরিচর্যা। চকচকে সিল্কের মতো চুল। চিরুনির হাতল রুপো। মোড়া। ঝাউগাছের পাতায় বাতাস বইলে যেমন শব্দ হয়, চুলের চিরুনি চালানোর সময় সেইরকম শব্দ হচ্ছে। কবিতার মতো এমন অভিজ্ঞতা জীবনে আর কখনও হয়নি। এক-একটা করে দিন যাচ্ছে আর ক্রমশই আমি রেবার দিকে সরে আসছি। রেবার ভাল লাগার কারণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বিষণ্ণ প্রকৃতির নরম একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল তার জীবনে। যাকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। আমি সেইরকম এক চরিত্র ছিলুম। পালিশ করা দেয়ালে রেবার বাবার একটা ছবি ঝুলত। সেইদিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতুম। সুন্দর চেহারার এক পুরুষ। কোট পরা। গলায় নেকটাই। বিলিতি ধাঁচের চুল। রেবা আর তার মায়ের কথায় মনে হত মানুষটি এদের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। অতটা ক্ষিপ্ত না হলেও চলত। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যতই হোক, তরতাজা একজন মানুষকে একেবারে মেরে ফেলাটা বেঠিক কাজ হয়েছে। মানুষটি খুনি। ভদ্রলোকের জায়গায় নিজেকে ভাবার চেষ্টা করি আমি। আমার সামনে আমার মেয়েকে যদি কেউ জোর করে ভোগ করার চেষ্টা করত, ত হলে আমি কী করতুম!

রেবাদের বাড়িটা ছিল ছবির মতো। মনে হত সারাদিন থাকি। আমাদের বাড়ি তখন সব ছিরিছাঁদ হারিয়ে ফেলেছে। কখনও তার আশ্রমের চেহারা, কখনও ধর্মশালার। ললিতার কর্তৃত্ব, ছোটকর্তার উদাসীনতা, দুয়ে মিলে লন্ডভন্ড অবস্থা। ছোটকর্তার জীবনদর্শন; যা অনিত্য তার জন্যে সময় নষ্ট করা অর্থহীন। ললিতার দর্শন, আমি কে? আমার তো কোনও অধিকার নেই। একটা অধিকার জন্মাবার চেষ্টা করেছিল সে, ছোটকর্তাকে অধিকার করে। যা হবার নয়, তা হয় কী করে। আমার ওপর তার রাগ ভীষণ। বাড়া ভাতে আমিই নাকি ছাই দিয়েছি। আমি না থাকলে নতুন একটা সংসারের পত্তন হত। তার ভীষণ রাগ মাতামহের ওপর। কথায় কথায় বলত, বুড়োটা। ভোগীটা। কৃপণটা। ভণ্ডটা। মাতামহ ছিলেন দেবতার মতো। কিছুই গ্রাহ্য করতেন না তিনি। আমার আর ছোটকর্তার প্রতি ছিল তাঁর অসীম স্নেহ। ছোটকর্তাকে নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

এইরকম একটা ছন্নছাড়া অবস্থায় রেবাদের বাড়িটা আমার মনে হয়েছিল মরূদ্যানের মতো। এই এত বয়সে এসে পেছন ফিরে যখন তাকাই তখন মনে হয় এতটা পথ আমি এসেছি ছায়াহীন এক মরুভূমির পথ ধরে। সাদা রেখার মতো পড়ে আছে আমার অতীত। সন্ধেবেলা আমি আর রেবা

বিছানায় মায়ের দু'পাশে বসে। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গল্প চলত। হঠাৎ চলে আসতেন রেবার ম্যাজিশিয়ান মামা। প্রচুর খাবারদাবার নিয়ে। তাঁর নিশ্বাসে হালকা মদের গন্ধ। ঘরে একটা অর্গান ছিল। রেবা সেটা বাজাত, আর তিনি গান গাইতেন। ভারী গলায় ইংরেজি গান। এমন খোলা পরিষ্কার মনের মানুষ আমি আর দেখিনি।

রেবা মাঝে মাঝে আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেত। খাওয়া নয়, পরিবেশটা উপভোগ করার জন্যে। দামি রেস্তোরাঁর নরম আলো। সাদা টেবিল ক্লথ ঢাকা কোণের টেবিল। একটা কাটলেট। খুব সুগন্ধী এক কাপ চা। ঝকঝকে কাঁটা আর চামচ। চারপাশে সুখী সুখী মানব-মানবী। তুলতুলে চেহারা। মুখে আভিজাত্য। জগতের খামে আর এক গোপন জগৎ।

ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর অমল একদিন আমাকে চেপে ধরল, 'বলতে পারিস তোর মধ্যে কী এমন আছে, যা আমার মধ্যে নেই?'

'পারি। আমার মধ্যে একটা বোকা আছে যা তোর মধ্যে নেই। তুই অনেক বেশি উজ্জ্বল বুদ্ধিমান।

'আমি যে রেবাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।'

'রেবা জানে।'

'তা হলে আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না কেন?'

'কী করে বুঝলি দেয় না। আমার সঙ্গে মেশে কেন জানিস! আমাকে করুণা করতে চায়। আমি হলুম রেবার খেলার পুতুল। প্রেমিক নয়।'

অমল আমার কথায় প্রায় বিশ্বাস করেই ফেলেছিল, হঠাৎ রেবা এসে আমার হাত ধরে বললে, 'কী বাজে সময় নষ্ট করছ? আজ আমাদের নিউমার্কেটে যাবার কথা না।'

আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। অমল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গাছতলায়। আমি সেই মুখ কোনওদিন ভুলতে পারব না। অমল ছিল প্রকৃত সুন্দর। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বাঁশির মতো নাক।

পরের পরের দিন সেই যুগের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। ভোরবেলা এক প্রবীণ মানুষ হেদোতে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, একটা বেঞ্চে একটি যুবক বসে বসে ঘুমোচ্ছে। ভারী সুন্দর চেহারা। ভদ্রলোক তিন-চার পাক মারার পর ভাবলেন, ছেলেটিকে জাগানো উচিত। এমন একটা সকাল, বেড়াতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা। তিনি কয়েকবার ডাকাডাকি করে সাড়া পেলেন না। তখন মৃদু ধাক্কা দিলেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ে গেল।

আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে গেল সেদিনের জন্যে। ডক্টর মিত্রের অতি প্রিয় ছাত্র অমল আত্মহত্যা করেছে। ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্সে অমল ছিল সেরা। ডক্টর মিত্র কেঁদেই ফেললেন। প্রিয় ছাত্র চলে গেল। তিনি শোকসভায় বললেন, 'একেই বলে ভাইস অফ কো-এডুকেশন'। অমল কোনও কিছু লিখে যায়নি। স্রেফ চলে গেল। কোথা থেকে একটু পোটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করেছিল। শেষ দেখা অমলের মুখচ্ছবি আজও আমার মনে ভাসে। বার্ধক্যে অতীত আবার ফিরে আসে ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে। একটা মানুষের পায়ের তলা থেকে হঠাৎ জমি সরে গেলে যে নিরালম্ব ভাব হয় অমলের মুখে সেদিন আমি ওই ভাবই দেখেছিলুম।

রেবা বলেছিল, 'এইটাই আমি চেয়েছিলুম। আমি দেখতে চাই আমার জন্যে ক'জন মরে! দু'জন হল। এক ডজনে আমি তুলব। এক-একটা মৃত্যু আমার এক-একটা পালক। এক-একটা ট্রফি। এক-একটা শিকার।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলুম রেবার মুখের দিকে। আশ্চর্য নারী চরিত্র!

ক্লাসে অমল আমার পাশে বসত। তার থাকার চেয়ে না থাকাটাই আমার জীবনে স্পষ্ট হয়ে আছে আজও। অমল নেই। সংক্ষিপ্ত একটা জীবন শেষ করে চলে গেল। অমলের জীবন-পরিকল্পনাটা

ছিল বিরাট। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে আমেরিকায় যাবে। সেখানে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়বে। বিদেশের-বিশ্ববিদ্যালয়ের একগাদা প্রসপেক্টাস তার সঙ্গেই ঘুরত। সেইগুলো ওলটাতে ওলটাতে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনায় চলে যেত সেই সব জায়গায়। পিটসবার্গ, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া। আমি এখনও দেখতে পাই, পার্কের বেঞ্চে অমল শুয়ে আছে। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা হাত ঝুলে আছে ঘাসে ঢাকা জমি ছুঁয়ে। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের এককণা হাসি। পুলিশের কালো গাড়ি এসে অমলকে নিয়ে চলে গেল। অমল হস্টেলে থাকত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভক্ত ছিল। কোনও একটা দুর্বল ফোকর দিয়ে রেবা ঢুকে পড়েছিল তার মনে। রেবার এক সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল। কয়েকজন অধ্যাপকও টাল খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলেন। অমলকে আমরা নিমতলায় নিয়ে গেলুম সেই সন্ধ্যায়। অমল পুড়ছে। রেবার আগুনে পুড়ে গেল সম্ভাবনাময় এক যুবক। হাহাকার করতে করতে ফিরে গেলেন তার বাবা আর মা। সারা কলকাতার ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ল রেবার খ্যাতি। রেবা এক নায়িকা। রেবার ওই মন্তব্যের পর আমার মনে অদ্ভুত একটা ভয় এল। রেবাদের সেই ঘর, যে-ঘরে সেই খুনটা হয়েছিল, সেই ঘরটাই ছিল রেবার সবচেয়ে প্রিয় আস্তানা। সন্ধ্যার পর ওই ঘরে বসতে আমার গা ছমছম করত। মাঝেমধ্যে লেখা-পড়ার ফাঁকে রেবা যখন কিছুক্ষণের জন্যে উঠে চলে যেত, তখন মনে হত উলটো দিকের চেয়ারে রক্তাক্ত এক মানুষ বসে আছে। বসে বসে হাসছে। বলছে, পড়ো, পড়ো, প্রেমে পড়ো। বর্ষার এক প্রবল রাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি। আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ওই ঘরেরই ডিভানে। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। রেবা বলেছিল, 'আমিও তোমার সঙ্গে শোব। ভয় নেই।' রেবা আর আমি এক ঘরে সারারাত! সে তো আরও গা ছমছমে ব্যাপার। কত কী হতে পারে! নিজেদে যদি ধরে রাখতে না পারি! রেবা যদি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে খুন করে! সম্ভব অসম্ভব অদ্ভুত সব চিন্তা খেলে গেল মনে। এখন যখন একান্তে বসে বসে ভাবি, দেখি আমার জীবন ভয়ে ভরা। সারাটা জীবন ভয়ে ভয়েই কেটে গেল।

নীল কাচের জানলাঘেরা সেই ঘরটাকে মাঝে মাঝে মনে হত বিষাক্ত ঘর। রেবা আসার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। রাতের কোনও এক সময়ে ছম করে ঘুম ভেঙে গেল। একটা অস্বস্তি। ভয়ে ভয়ে একপাশ ওপাশে তাকাতে গিয়ে আঁতকে উঠলুম। আমার মাথার কাছে সাদা একটা মূর্তি। চোখ, মুখ, কান, হাত-পা কিছুই নেই। সাদা একটা অবয়ব। সমস্ত শরীর হিম অবশ। মূর্তিটা ক্রমশই ঝুঁকে আসছে আমার দিকে। আমি মা বলে চিৎকার করতে চাইলুম। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা স্বর বেরোল মাত্র। সাদা মূর্তি সটান আমার শরীরে এসে পড়ল। ফিসফিস কণ্ঠস্বর, 'সত্যিই তুমি ভীষণ ভিতু।' রেবার গলা। আমি ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলুম। পারলুম না। 'আমি ভূত' বলে রেবা আমাকে বিছানায় চেপে ধরল।

অমলের আত্মহত্যার পরেই আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। এইসময় রেবা আমাকে হঠাৎ একদিন একটা কথা বললে, 'তুমি আমার রিভলবারের গুলি। তোমাকে দিয়ে অমলকে মেরেছি। বাবাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি না। বাবাই আমার প্রেমিক।' ওই কথাটা শোনার পর ক্রমশই আমি দূরে সরতে লাগলুম। পরীক্ষা কিছুটা সাহায্য করল। রেবা-মুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলুম। তখন আমার সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। রেবার প্রতি আর কোনও আকর্ষণ নেই, আছে ভয়। অবিকল এক লেডি ম্যাকবেথ। রেবা রাতে ঘুমোতে পারত না। অনিদ্রার রোগী। মেয়েটার সবই অসাধারণ ছিল, কেবল মনটারই তল পাওয়া যেত না। কী সে ভাবছে! কী সে করতে চাইছে। মাঝে মাঝেই বলত, আমাকে যে বউ করবে, সে মরবে।

জীবনের সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ পর্ব ছেড়ে জীবন আজ কোথায় কত দূরে চলে এসেছে! ইন্দ্রিয় মরে গেছে। এই দুটো হাত কত কী ধরতে চেয়েছে। এই দুটো চোখ কত কী দেখতে চেয়েছে। এই শরীর কত স্পর্শ চেয়েছে! আজ সব ফাঁকা। সেদিন কী মোহে জানি না, রেবাদের বাড়ির সামনে

গিয়েছিলুম। পড়া বই যেমন পড়তে ইচ্ছে করে, সেইরকম ইচ্ছে করেছিল জীবনের পুরনো দৃশ্যে ফিরে যেতে। বাড়ির অদূরের সেই ছোট্ট চার্চে বহুদিন পরে রং পড়েছে। দুপুরের রোদে জ্বলজ্বল করছে। রেবাদের বাড়িটা ঠিক সেই রকমই আছে। তবে অসংস্কারে মলিন। কত বর্ষার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে! জানলার একাধিক স্টেইন্ড গ্লাস ভেঙে গেছে। সেখানে লাগানো হয়েছে বেসুরো কাচ। সেই দরজা। আগের মতো পালিশ নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপচাপ। একজন ফেরিঅলা চলে গেল হাঁকতে হাঁকতে। 'প্রানা কাগজে'। বাড়ির সামনে লাল রঙের একটা মটোর সাইকেল শীতের রোদ পোহাচ্ছে। কার কে জানে! কোনও উত্তর পুরুষের দখলে গেছে ওই বাড়ি! নাকি বিক্রিই হয়ে গেছে! বাড়িটার ভেতর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। করিডর। সিঁড়ি। ঘরের পর ঘর। খাওয়ার ঘর। ওক কাঠের পার্টিশান। বিশাল বাথটাব লাগানো বাথরুম। কেউ কিছু ভাবতে পারে বলে চলে আসছিলুম, এমন সময় দোতলার ঝুল বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। খুব সুন্দরী একটি মেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অলস ভঙ্গিতে। চোখে আর সে দৃষ্টি নেই, তবু যেন চমকে উঠতে হল। এ তো সেই রেবা!

॥ ১১ ॥

বিলুকে একেবারেই বসে থাকতে হল না। সায়েন্স কলেজ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাকরি পেয়ে গেল। প্রাচীন নামী এক ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কেমিস্টের চাকরি। ছোটকর্তা খুশি হয়ে বললেন, 'এবার আমার ছুটি। এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা ও করবী!/ তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥ যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে/ ঝরে পাতা ঝরোঝরো ॥'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'অনেক ঝড়ঝাপটা গেল। ধরো বিরাট একটা যুদ্ধ গেল। শুধু যুদ্ধ নয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার। তারপরে তোমার স্বদেশি আন্দোলনের চরম পর্যায়। এই তার কাটা, পোস্টাপিস পোড়ানো, ট্রাম জ্বালানো। তারপর তোমার দুর্ভিক্ষ। সেইসঙ্গে সাইক্লোন। সব শেষে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ছেচল্লিশের দাঙ্গা। আমরা যে বেঁচে আছি এইটাই আশ্চর্য। কী বলো? তা ধরো বেঁচেই যখন আছি, আর বিলু যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই গেল, তখন চলো, এইবার আমরা দু'জনে একটু বেরোই। কতকাল কোথাও যাওয়া হয়নি। তুমি তোমার এসরাজ নেবে, আমি আমার তানপুরা। তুমি বাজাবে আমি গাইব। প্রথমে বেনারসে গিয়ে বিশ্বনাথকে গান শোনাব। তারপর কনখলে বসে হরিকে। আর আমাদের পায় কে? আমরা মুক্ত পুরুষ।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনি আমার মনের কথাটা টেনে বের করে আনলেন। উত্তর ভারতে যাবার আগে, আমরা সাঁওতাল পরগনার কয়েকটা জায়গায় যাব। যাব এই কারণে, সেখানে অনেক স্মৃতি আছে। স্মৃতি কুড়োতে যাব।'

'উত্তম। উত্তম প্রস্তাব। তা হলে সব গোছগাছ করো নিই।'

ললিতা আর নেই। সে তার নতুন জীবন ধরতে বেরিয়ে গেছে। বৈষ্ণবী হয়েছে। চৈতন্যমঠের সাধিকা। সারাদিন নামসংকীর্তন করে। বিলু একদিন গিয়ে দেখে এসেছে। মনের আনন্দে আছে। শরীরে মেদ জমেছে। ডাঁটো নাকে তার নিখুঁত রসকলি। নিপাট সাদা কাপড়। হাতের ঝুলিতে জপের মালা। ললিতা বিলুকে সন্দেশ খাইয়েছিল বড় বড়। নির্জনে নিয়ে গিয়ে। গাল টিপে আদর করেছিল। বাৎসল্য ভাবটা আরও বেড়েছে। বলেছিল, সময় পেলেই চলে আসবি। তোর জন্যে খুব ভাল একটা মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে, খুব ভক্ত পরিবার।

ছোটকর্তা ললিতাকে বাধা দেননি। মহিলাবর্জিত নাটকের মতো, মহিলাবর্জিত পরিবারই তাঁর

পছন্দ। নিজে যখন সবই পারি তখন অকারণে কেন অশান্তি! স্বপাকই শ্রেষ্ঠ পাক। নিরামিষ রান্নার তো কোনও ঝামেলা নেই।

ছোটকর্তা রান্নার আয়োজন করছেন, বিলু জোগাড় দিচ্ছে। রবিবার। বিলুর অফিসের তাড়া নেই। মুকুজ্যেমশাই তানপুরায় তার চড়াচ্ছেন। ভাগ্যিস মেতে আছেন, নয়তো ছোটকর্তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতেন। সেদিন পোস্ত বাটতে গিয়ে শিল দু'-আধখানা করে ফেলেছিলেন। একসময় মুগুর ভাঁজতেন। কুস্তি করতেন স্কুলের দারোয়ান রামখেলোয়ানের সঙ্গে। পাকা ছ'ফুট লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। নোড়ার চাপটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। কুসংস্কার আছে নানারকম। শিল ভেঙে যাওয়া সংসারের পক্ষে অশুভ। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ছোটকর্তা উৎসাহ দিলেন, 'ভাবছেন কেন? এ তো আনন্দের ব্যাপার। শরীরে এখনও শিল-ভাঙা জোর আছে।'

মুকুজ্যেমশাইয়ের মন শান্ত হল না। কালীমন্দিরে ছুটলেন পুজো দিতে।

সিঁড়িতে কাঠ ঠোকার শব্দ হল। খটাস খটাস করে কে যেন খড়ম পায়ে উঠছে। ওপরে উঠে এল নারাণ। ক্রাচে ভর দিয়ে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। পাজামার বাঁ পা-টা গোটানো। এক জায়গায় জড়ো করে গাঁট বাঁধা।

ছোটকর্তা, বিলু, মুকুজ্যেমশাই তিনজনেই স্তম্ভিত। মুকুজ্যেমশাইয়ের হাত থেকে তানপুরার তার ফসকে গেল। ছটাং করে শব্দ হল। ছোটকর্তা ডালে জল ঢালছিলেন। জল কড়ার কানা বেয়ে উনুনে পড়ে ফোঁস করে উঠল। বিলু আলু কাটছিল। আলু গড়িয়ে চলে গেল ঘরের কোণে।

ছোটকর্তা বললেন, 'নারাণ।'

ক্রাচটা দেয়ালে হেলিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'শুধু নারাণ নয়, এক ঠেঙো নারাণ। আর দ্বিপদ নই, এখন একপদ প্রাণী।'

নারাণ একপায়ে নাচতে নাচতে এসে মেঝেতে বসে পড়ল।

ছোটকর্তা বললেন, 'সর্বনাশটা কেমন করে হল!'

'মাত্র পাঁচমিনিট সময় লাগল। চলে গেল, আর হয়ে গেল।'

'তার মানে? কী চলে গেল?'

'ট্রাম চলে গেল। চলন্ত ট্রামে উঠতে গেলুম। মিস করলুম। পড়ে গেলুম স্লিপ করে। বাঁ পা-টা টেনে নিলে। ঝুলছিল ঝুলঝুল করে। হসপিটালে নিয়ে গেল। এক কোপে সাবাড়।'

'একটা খবর দিলে না।'

'খবর দেবার জন্যেই তো এলুম। মেরামতের আগে দিইনি। দিলে কী হই বা হত! কষ্ট করে দেখতে যেতেন। চুকচাক করতেন। তাই একেবারে ক্রাচ ফিট করে চলে এলুম। একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম ছোড়দা। না চলেও চলা।'

'সে আবার কী?'

'আমাকে তো এখন আর চলতে হয় না। আপনিই চলে যাই। বলা যায় হাতে চলি। হেঁটে হেঁটে আর পারি না, এই কথাটা আর বলার উপায় নেই। আমি এখন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অক্লেশে চলে যেতে পারি।'

নারাণ হাসছে। ছোটকর্তার চোখে জল এসে গেছে। মুকুজ্যেমশাই হাঁ হয়ে গেছেন। বিলুর বুকের ভেতরটা কেমন করছে। এই মানুষ ঝকঝকে নিউকাট পরে গটগটিয়ে হাঁটতেন। মশমশ শব্দ হত অহংকারী পদক্ষেপে। পা-টা চলে গেল মুহূর্তের অসাবধানতায়!

ছোটকর্তা বললেন, 'তাই তুমি আসোনি এতদিন?'

'আমি একেবারে সাজা নিয়ে সেজে চলে এলুম। আপনার মতো মহামানবকে চিনতে না পেরে অপমান করেছিলুম। যা-তা বলে চলে গিয়েছিলুম। তারই ফল হাতে হাতে পেলুম। দুঃখ করার কিছু

নেই। ইট উড অ্যান্ড রিফিউজ অ্যাশ। এখন ভালই হল। হিল্লি-দিল্লি ঘুরে মরতে হবে না, এক জায়গায় বসে বসে মনের আনন্দে জ্যোতিষী করব। ফিউচারটা একবার ভাবুন! ব্রাইট! ভেরি ব্রাইট!'

'তোমার নিজের কোষ্ঠীটা একবার বিচার করে দেখো না।'

'কোনও লাভ নেই ছোড়দা। অনেকবার দেখেছি। এ কীরকম মেঘ জানেন, এক ফোঁটাও জল নেই। সন্ন্যাসী হতে পারলে বেঁচে যেতুম। হল না। ভোগবাসনা। ভাল খাব, ভাল পরব। মতিরও স্থির নেই। এইভাবেই কাটবে। একটা আত্মহত্যার যোগ আছে। ফলে যায় ভাল। না ফলে তো গভীর দুঃখ।'

অনেকদিন পরে নারাণ এসেছেন, বিলুর মনে হল প্রণাম করা উচিত। সেইটাই হল কাল। নারাণ না না করে উঠল! বিলু একটা পা স্পর্শ করে, অভ্যাসবশত আর একটা পা খুঁজতে লাগল। নারাণ বললে, 'ওই যে আর একটা পা দেয়ালে হেলানো।' নারাণের চোখ দুটো জলে চিকচিক করে উঠল। বিলু আর দাঁড়াতে পারল না, সরে গেল সামনে থেকে। মুকুজ্যেমশাই তখনই গান ধরলেন, 'তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘমেয়াদে সংসার গারদে থাকি মা বল।'

নারাণ বললে, 'রান্নার কাজটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন ছোড়দা। আপনার সময়ের অনেক দাম। আমি খুব একটা খারাপ রাঁধি না। মনে করুন আমি আপনাদের বাড়ির এক পা কাটা রাঁধুনি। তেমন লেখাপড়া তো জানি না, তার ওপর বিকলাঙ্গ, যে ক-বছর বাঁচি আমাকে তো এইভাবেই চালাতে হবে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'তোমার পা গেল, কিন্তু অহংকার গেল না। প্রবল অহংকার। মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো না কিছুতেই। তোমাকে আমি আমার ছোট ভাই বলেই ভাবি, তুমি আমাকে কিছুতেই দাদা বলে ভাবতে পারো না। বাঁকা-বাঁকা কথা বলো। মনটাকে বেশ গঙ্গাজলের মতো করার চেষ্টা করো না, দেখবে জীবনের সবকিছু ধুয়ে গেছে।'

নারাণ এক হাত আর এক পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়াল কোনওক্রমে। দেয়ালে হেলানো ক্রাচটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে। বড় অসহায়। বিলু পেছন পেছন এল। নারাণ চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'মাঝে মাঝে কী মনে হচ্ছে জানো, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। কত পরাধীন হয়ে গেলুম একবার ভাবো! আমি কি এক জায়গায় বসে থাকার মানুষ! আজ এখানে, কাল সেখানে, এই তো আমার জীবন!'

বিলু বললে, 'আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো এখন চাকরি করছি। আপনার আর ঘোরাঘুরির কী প্রয়োজন?'

'শোনো প্রত্যেক মানুষেরই উপার্জন করা উচিত। অন্যের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। যা টাকাপয়সা আছে সব দিয়ে ভাবছি একটা দোকান করব। তুমি ভাল জায়গায় আমাকে একটা ঘর দেখে দাও তো।' উদাস দৃষ্টিতে নারাণ তাকিয়ে রইল বাইরের আকাশের দিকে। বহু বহু দূরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ কি সত্যিই আছেন, যাঁর কাজই হল মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

সাতদিনের মধ্যেই বিলুরা বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে। বিলু কোনওক্রমে পনেরো দিনের ছুটি জোগাড় করতে পেরেছে। নারাণ রয়ে গেল বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে। ছোটকর্তা বললেন, 'নিঃসংকোচে, নিজের বাড়ি ভেবেই থাকো। একটু সাবধানে থেকো। হঠাৎ সব ফেলে পালিয়ে যেয়ো না। তুমিই ভরসা।'

নারাণ বললে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। পালাব মনে করলেও আমার পালাবার উপায় রাখেননি ভগবান।'

হাওড়া স্টেশানে মুকুজ্যেমশাই চলেছেন আগে আগে। পেছনে বিলু আর ছোটকর্তা।

মুকুজ্যেমশাইয়ের সম্রাটের মতো চেহারা। রাজর্ষির মতো চালচলন। বিলুর খুব গর্ব হচ্ছিল। ছোটকর্তাকে বিদেশি বৈজ্ঞানিকের মতো দেখতে। তিনজনের সেই দলটিকে সকলেই বেশ সমীহ করছিল। ট্রেন ছেড়ে দিল। বিলুদের উলটোদিকের আসনে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। বেশ অভিজাত চেহারা। সঙ্গে দুই মেয়ে। ছোটটি ফ্রক পরা। বড়টি শাড়ি।

ভদ্রলোকই আলাপ করলেন, 'যাবেন কোথায়?'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আপাতত মধুপুর।'

'আরে আমরাও তো মধুপুর। কোথায় উঠবেন?'

ট্রেন চলছে। আলাপ চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি পরিবারই যেন একটি পরিবার হয়ে গেল। ভদ্রলোক কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। মধুপুরে বাগানবাড়ি আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই। দুই মেয়ে। দুই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে চলেছেন। হাতে কেস কম থাকলেই কলকাতা ছেড়ে আসেন মধুপুরে। গিরিডিতেও পূর্বপুরুষদের বিরাট বাড়ি, সম্পত্তি আছে। এক ভাই গিরিডিতেই থাকেন। মাইকা মাইনস আছে তাঁর।

ছোটকর্তা প্রথমে একটু চুপচাপ ছিলেন। মাপছিলেন ব্যারিস্টার কতটা অহংকারী। দেখলেন, একেবারেই অহংশূন্য দিলখোলা মানুষ। তখন তিনিও আলোচনায় নামলেন। দু'-চার কথার পরেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার তো সাংঘাতিক লেখাপড়া।'

মুকুজ্যেমশাই গর্বের হাসি হেসে বললেন, 'আমার এই ছেলেটি বিশ্বকোষ। আর আমার ওই নাতি এই অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে এখন কেমিস্ট হয়েছে। ও আর এক প্রতিভা।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনজনের প্রশংসা না করাই ভাল। মৃদু অসভ্যতা।'

মুকুজ্যেমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখেছ! তুমি আমাকে যত সভ্য করতে চাইছ, ততই আমি অসভ্য হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো শালিক আর কী শিখবে বলো! তায় মুকুজ্যে। মুকুজ্যেরা মনে হয় একটু অহংকারী হয়।'

ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মশাই, যা বলেছি সব প্রত্যাহার করে নিলুম।'

মেয়ে দুটি ফিক ফিক করে হাসল। ব্যারিস্টার বললেন, 'চাটুজ্যেমশাই একেবারে পুরোপুরি সায়েবি চরিত্রের মানুষ। কী করে এমন হলেন। বিশ বছর বিলেতে থেকেও আমার কিছু হল না।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'ও যে সেই ছেলেবেলা থেকে নিজেকে একেবারে আটঘাট বেঁধে তৈরি করেছে। এমন দেখেছেন! যেমন সায়েন্সে, তেমনি আর্টসে। আসলে ও তো ব্যায়ামবীর।

ছোটকর্তা বললেন, 'আবার শুরু করলেন সেই আত্মজনের প্রচার।'

'আমি কী করি বলো তো! আমার যে কেবল বলতে ইচ্ছে করে! মানুষের ভাল কিছু দেখলেই মনে হয় ঢাক পেটাই। তোমার মতো যে আমি কম কথার মানুষ নই। আমার খুব লম্বা-চওড়া বাত। সারাটা জীবন হয় বকলুম, না হয় বকুনি খেলুম। আমি কী করব! আমি কী করতে পারি!'

মেয়ে দুটি আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। ব্যাগ থেকে একগাদা লজেন্স বের করে মুকুজ্যেমশাইয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'আপনি তখন থেকে কেবল বকুনি খাচ্ছেন। এইবার লজেন্স খান।'

মুকুজ্যেমশাই মোড়ক খুলে একটা লজেন্স মুখে ফেলে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর প্রত্যেককে একটা করে লজেন্স বিতরণ করলেন। লজেন্স চুষতে চুষতে বললেন, 'শৈশব আবার ফিরে পেলুম। ছেলেবেলায় ভাবতুম বড় হই। নিজে যখন রোজগার করব তখন খুব লজেন্স খাব। হাতে ঝোলানো থাকবে জপের মালার ঝুলির মতো একটা ঝুলি। তাইতে থাকবে শুধু লজেন্স। বেশ! বড় হলুম। রেল কোম্পানিতে বড় চাকরি হল। অঢেল টাকা। লজেন্স কিন্তু আর খাওয়া হল না। ছেলেবেলায় যখন ঘুড়ি ওড়াতুম, বাবা লাটাই ভেঙে ঘুড়িটুড়ি সব ছিঁড়ে দিয়ে বলতেন, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও তারপর ঘুড়ি উড়িয়ো। ছেলেবেলা চলে গেল, মানুষও হতে পারলুম না,

মাঝখান থেকে ঘুড়ি ওড়ানোটা হল না। আবার সেই কবে আসব, শৈশব ফিরে পাব, আবার আমার লাটাই হবে ঘুড়ি হবে। নীল আকাশে আমার মন লাট খাবে। ব্যাপারটা কত অনিশ্চিত হয়ে গেল!'

ট্রেন ছুটছে হু হু করে। মুকুজ্যেমশাই লজেন্স চুষছেন অপস্রিয়মাণ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ বললেন, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়াটাও কি অসভ্যতা? না না আমি আপনাদেরই জিজ্ঞেস করছি।'

ছোট মেয়ের নাম শরমা, বড়র নাম পরমা।

পরমা হাসতে হাসতে বললে, 'না' না. অসভ্যতা হবে কেন? আপনি বলুন। যা মনে আসছে বলুন। আপনার কথা শুনতে আমাদের ভীষণ ভাল লাগছে।'

'বুঝলে মা, আমার একটা গোঁপ ছিল। এখন দেখো নেই। নির্মূল হয়ে গেছে। কেন জানো! আমার বাবার গোঁপ দেখে আমার গোঁপ লজ্জা পেয়ে গেল। আমার বাবার গোঁপ ছিল কাইজার-গোঁপ। বাবা একদিন বললেন, তোমার গোঁপের টেক্সচার ভাল নয়। বিদ্রোহী গোঁপ। নির্মূল করে দাও। আমাকে অনুকরণ করার চেষ্টা কোরো না। তোমার গোঁপের সে-প্রতিভা নেই। গোঁপটা ফেলেই দিলুম। আবার যখন ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ শিখতে গেলুম তখন তিনি বললেন বেটা, গোঁপ ছাড়া ধ্রুপদ হয়! সুর ছাড়বে, গোঁপে ভাইব্রেশন হবে, তবেই না তুমি ওস্তাদ। গোঁপ লাগাও, গোঁপ লাগাও। তামিল চলছে, ওদিকে গোঁপ গজাচ্ছে। হল কী, আমার এই বুকে এত বাতাস, হাঁক ছাড়লেই লোকে ভাবে হাবিলদার হাঁক পাড়ছে মাঝরাতে। দরদ দিয়ে গান গাইছি, বাইরে সবাই হাঁকছে ওরে দমকল ডাক দমকল ডাক, ঘোড়ার আস্তাবলে আগুন লেগে গেছে। ধ্রুপদের কানটাই নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের। ওই, আয় রে অলি, কুসুমকলি শুনে শুনে। শেষে পিতৃদেব একদিন হাত জোড় করে বললেন, হ্যাঁ, হে, তোমার জন্যে কি পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে দেশত্যাগী হতে হবে। তখন আমি খেয়াল আর ঠুংরির দিকে গেলুম। গলাটাকে মিহি করে গাইতে লাগলুম। যমুনাকি তীর! ভাবলুম, মন্দ হবে না। তখন বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। নতুন বউকে চাঁদের আলোয় বারোঁয়া রাগে ঠুংরি শুনিয়ে একেবার মোহিত করে দোব। ধ্রুপদের লম্বা গলায় ঠুংরির মোচড় আসবে কেন! গুরু বললেন, গলায় কেয়ারি আনার চেষ্টা করো। মিহিদানা করো, সব তো লাড্ডু মেরে যাচ্ছে। অনেক ধস্তাধস্তি হল, হাল ছেড়ে গুরু বললেন, ব্যাটা ভজন লাগা। ভজনটা গলায় বেশ বসে গেল। আর সেই ভজনের ধাক্কায় স্ত্রী মুক্তি পেয়ে গেল। আমি পড়ে রইলুম।'

মুকুজ্যেমশাই সুরেলা গলায় গান ধরলেন,

'তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত তশিল করে যত দারাসুত পায়ের শৃঙ্খল ॥
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে ফেলেছ বিপদে, হারালেম সম্পদ মোক্ষপদ।
এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসার-বাসনা প্রবল ॥'

ট্রেন চলেছে। মুকুজ্যেমশাইয়ের গান চলেছে। একেবারো বিভোর। ফরসা মুখ জবাফুলের মতো লাল। দু'চোখে জলের ধারা। ব্যারিস্টার সোজা হয়ে বসেছেন। শরমা আর পরমা স্তম্ভিত। ছোটকর্তার চোখও ছলছল করছে। মুকুজ্যেমশাই গানের শেষ পদে হৃদয় নিংড়ে দিচ্ছেন.

'আনি ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধরে খাই হলাহল ॥'

মুকুজ্যেমশাই কেঁদে ফেললেন। গান ভাব হয়ে গলায় আটকে গেল। শরমা পরমা মুকুজ্যেমশাইয়ের হাঁটুর ওপর রাখা হাত দুটো ধরে বললেন, 'কী সুন্দর গান! কী অপূর্ব গলা আপনার!'

ব্যারিস্টার বললেন, 'আপনি তো মহাসাধক! নিজেকে এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন! আমাদের মধুপুরের দিনগুলো এবার মধুর হবে।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আপনার কতবছর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে?'

ছোটকর্তা সঙ্গে সঙ্গে উঁহুঁ উঁহুঁ করে উঠলেন, 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা অসভ্যতা।'

শিশুর মতো সরল মুখে মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'তাই নাকি? তা হলে করব না।'

ব্যারিস্টার বললেন, 'না না, আমি কিছু মনে করছি না। আজ এই বছর দুয়েক হল। মেয়ে দুটিকে রেখে তিনি চলে গেছেন।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আমাদের দু'জনেরও ওই একই অবস্থা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোটকর্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অসভ্যতা হল না তো! এটা কিন্তু প্রশ্ন নয়, উত্তর।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার হাল আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'তুমি আমার হাল ছেড়ে দিলে আমি তো ভেসে যাব মাঝদরিয়ায়।'

পরমা বললে, 'আপনাদের আমার ভীষণ ভাল লাগছে। কী সুন্দর মানুষ আপনারা।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'তাও তো তুমি এখনও আমার ছেলের এসরাজ শোনোনি আর নাতির গান! এটা কিন্তু আত্ম-প্রচার নয় মা। এটা হল সংবাদ। কেউ আমার ওপর রেগে যাক, তা আমি চাই না। রাগারাগি জিনিসটা খুব খারাপ।'

পরমা বললে, 'আপনার ওপর কেউ কখনও রাগতে পারে? না পারবে! আমরা এইবার একটু চা খাই।'

'পরের ইস্টিশানে ট্রেন থামুক। চা-অলা ধরব।'

ছোটকর্তা বললেন, 'ইস্টিশান নয় স্টেশান।'

'জানি গো জানি, কিন্তু ইস্টিশান বলতে ভীষণ ভাল লাগে। বলে দেখো, আলাদা টেস্ট পাবে।'

পরমা বললে, 'চা আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'সে তো তোমাদের হিসেবের চা।'

'ভাগ করে খাব।'

মধুপুরে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সবাই গুড়মুড় করে নেমে এল। ছোটকর্তার বগলে এসরাজ। অন্য মালপত্র বিশেষ কিছুই নেই। সে হত, যখন দুই বউকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ হত। পুরো একটা সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলত। শিল-নোড়া থেকে শুরু করে প্রাইমাস স্টোভ।

পরমা এতক্ষণে বিলুর সঙ্গে কথা বললে, 'সবাই মিলে আমাদের বাড়িতে অবশ্য অবশ্যই আসবেন। বাহান্ন বিঘা। 'গীতবিতান।'। কেমন! আসবেন তো!' পরমা বিলুর হাতটা একবার ছুঁয়ে দিল। বিলুর মনে হল, এতদিনে সে মালিককে খুঁজে পেয়েছে। ফিনারের অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে যে চুলটাকে সে সযত্নে রেখেছে, সেই চুল এই মাথার। একেবারে বিলিতি মুখ। বাদামের মতো চোখ।

রেলের কামরার আলাপ সাধারণত প্ল্যাটফর্মেই শেষ হয়ে যায়। মালপত্র নিয়ে যে যার গন্তব্যে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যারিস্টার ভদ্রলোক তা করলেন না। তিনি বেশ গুছিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কোন দিক?'

ছোটকর্তা বললেন, 'নরেন্দ্রঘটক রোড।'

'ও পাথরোলের দিকে! আমাদের উলটোদিক, বাহান্ন বিঘা। কীভাবে যাবেন?'

'টাঙ্গা।'

'আমরাও টাঙ্গাই নেব। এখানে আছেন ক'দিন?'

'হয়তো দিন পনেরো।'

'আশা করব রোজই একবার দেখা হবে।'

'তা হতে পারে। আমরা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হব।'

'আমরাও আসব। আমাদের বাড়িটার নাম মনে রাখুন, গীতবিতান। আপনাদের?'

'আমাদের হল আনন্দধাম।'

পরমা বিলুর কাছাকাছি সরে এসে বললে, 'আপনি খুব কম কথা বলেন, তাই না! আপনার গান কিন্তু শুনব। সহজে ছাড়ব না।'

পরমার শরীর থেকে বিদেশি সেন্টের গন্ধ উঠছিল। কেশরের মতো চুল। চৌকো চোয়ালের দৃপ্ত একটি মুখ। একটু পুরুষালি ভাব। মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি। সিল্কের দামি শাড়ি।

বিলু বললে, 'বড়দের সামনে মুখ খুলতে আমার ভয় করে। আর দাদু বললেন বটে, তেমন গান কিন্তু আমি জানি না।'

পরমা হাসল। অদ্ভুত চোখে বিলুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনার চুলই বলে আপনি একজন আর্টিস্ট। এই নিন, যেতে যেতে লজেন্স খান।'

পরমা এক মুঠো লজেন্স ধরিয়ে দিল বিলুর হাতে। ওরা চলে গেল। মুকুজ্যেমশাই বিলুর কানে কানে বললেন, 'মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমন বলিষ্ঠ। ভাবছি কথাটা পাড়ব। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাদের ষাঁড়ের সংসারে এইবার এক মহিলার প্রয়োজন। একেবারে ম্যাস্কুলাইন জেন্ডার ভাল লাগে না। র লিকার হয়ে আছে। এইবার একটু দুধ আর চিনি মেশাতে হবে।'

বিলু কোনও উত্তর দিতে পারল না। দূরে ছোটকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে। সামনেই একটা কাঠের বেঞ্চ। সেইদিকে তাকিয়ে আছেন ভাবস্থ হয়ে।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'কী দেখছ বলো তো?'

'অতীত। তারা বসে আছে। বিলুর মা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই, নারাণ। আর পাঁচ বছরের বিলু ওই জায়গাটায় ঘুরছে। সাদা হাফপ্যান্ট লাল সোয়েটার। আঠারো বছর আগের একটা দিন বসে আছে এই আসনে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ছোটকর্তার পাশে মুকুজ্যেমশাই দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। আসনটা যেন সমাধি। একসময় বললেন, 'কিছু ফুল থাকলে ছড়িয়ে দিতুম।'

ছোটকর্তা হঠাৎ বললেন, 'চলুন, এইবার আমরা যাই। ওদের বসতে দিন। কোন ট্রেনের অপেক্ষায় আছে কে জানে!'

টাঙ্গা ছুটল নরেন্দ্রঘটক রোডের দিকে। তিনজনে বসে আছে। পায়ের কাছে মালপত্র। ডাকবাংলোর মাঠে এসে ছোটকর্তা টাঙ্গাঅলাকে বললেন, 'একটু আস্তে করো তো।'

টাঙ্গার গতি ধীর হল। ছোটকর্তা এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবই ঠিক আছে, সেই আগের মতো। ওই তো সেই বিশাল দেবদারু। ওই তো সেই পাথর। ওই তো সেই অ্যাংলোভিলা। বারান্দায় সেই ছোট্ট খাটটাও রয়েছে। তিনটে কুকুর ওখানে শুত মশারির ভেতর। ভোরবেলা বেড়াতে এসে দুই বউ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। ম্যালকম সায়েব বলতেন, আই অ্যাম এ ডগলাভার। ম্যালকম সায়েব নিশ্চয় আর নেই। তখনই তাঁর অনেক বয়েস হয়েছিল।'

ছোটকর্তা বললেন, 'চালাও।'

সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গা ছুটল। নরেন্দ্রঘটক রোড সোজা ফিতের মতো সামনে পড়ে আছে ঢেউ খেলে। কখনও উঁচু কখনও নিচু। দু'পাশে রুক্ষ অনুর্বর পাথুরে জমি। গাড়ি যখন ঢাল বেয়ে নীচে নামছে তখন তার দুরন্ত গতি। তিনজনে নাচের পুতুলের মতো ঢলে ঢলে, টলে টলে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। হঠাৎ ছোটকর্তা বলছেন, 'রোককে রোককে।'

গাড়ি থামল। ঢালু একটা জায়গা। ছোট্ট একটা সাঁকো। ছোটকর্তা নেমে পড়েছেন। সাঁকোর নীচে উঁকি মেরে দেখলেন। এপাশে-ওপাশে কী যেন খুঁজলেন। তিনজনেই নেমে এসেছে। মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'কী খুঁজছ বলো তো?'

'সেই অতীত। সবই সেই আগের মতো আছে। কেবল টিয়াগুলো আজ আর নেই। শীতের শেষ

দুপুরে আমরা এই জায়গাটায় এসে বসতুম। কমলালেবু খাওয়া হত। গল্প হত। গান হত। একদিন আরতির সিল্কের স্কার্ফটা উড়ে গিয়ে ওই জায়গাটায় পড়েছিল।'

'তুমি সেইটা খুঁজছ। সে আর থাকে?'

'স্কার্ফটা নেই; কিন্তু স্মৃতিটা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা সবাই এখানে বসে আছে বায়ুর শরীর নিয়ে। আমিই শুধু এক স্থূল চরিত্র। চুপ করে দাঁড়ান। কান খাড়া করে শুনুন হাসির শব্দ, কণ্ঠস্বর।'

হঠাৎ এক ঝাঁক টিয়া তিব্রস্বরে ডাকতে ডাকতে সাঁকোর এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছোটকর্তা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'ওই তো ওই তো এসে গেছে!'

॥ ১২ ॥

এই ভ্রমণের স্মৃতি আজও মনে আছে। তিনজনে একসঙ্গে সেই শেষ ভ্রমণ। অতীত যেখানে যেখানে স্পর্শ করেছে, সেই জায়গাগুলোই ছোটকর্তার কাছে হয়ে উঠেছে তীর্থের মতো। এমন তীর্থভ্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। অমন মনই বা ক'জন পায়! অমন ভালবাসা! ছোটকর্তা সবকিছু হৃদয়ে গ্রহণ করতেন। হৃদয়ে নিয়ে কৌটোর মতো ঢাকনা বন্ধ করে দিতেন। আর বেরোবার উপায় থাকত না। বেঁচে থাকার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল তাঁর। কেউ নেই, অথচ তিনি নিঃসঙ্গ নন। ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেলে মানুষ বোধহয় ওইরকমই হয়ে যান। তাঁর আর কোনও কিছু হারাবার প্রশ্ন থাকে না।

ছোটকর্তা সেইবার তিনখানা ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। আরতি, চপলা আর মেজকর্তার। মধুপুরের বাড়ির বিপুল বৈঠকখানার তিন দেয়ালে ছবি তিনটি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির দেখাশোনা করত বিপিন মালি। তখনই সে বেশ প্রবীণ। ছোটকর্তাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করত। আমরা যেদিন পৌঁছোলুম, সেদিন ছিল শুক্লা দ্বিতীয়া। আকাশে ফটফট করছে চাঁদ। বাগানে একটা সিমেন্ট বাঁধানো বড় বেদি ছিল। সামনেই পাশাপাশি তিনটে গন্ধরাজ গাছ। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। ছোটকর্তা বেদিতে বসে এসরাজ বাজাচ্ছেন। গানটা ছিল, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গন্ধরাজ গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ছোটকর্তার এসরাজ সুরের জাল বুনে চলেছে। আমি আর মুকুজ্যেমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। রান্নাঘরে কাঠের জ্বালে বিপিন মালি রান্না করছে। রান্নার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। চাঁদের আলোয় আমাদের তিনজনকেই কালো দেখাচ্ছে।

ছোটকর্তা একসময় ছড়ি নামিয়ে বলেছিলেন, 'সময় সময় আমি কেঁদে ফেলতে পারি, আবার হাসতেও পারি। আপনারা কিছু মনে করবেন না। ভাবের রাজ্যে এইটুকু স্বাধীনতা আমার থাকবে। আমি কখন কোন সময়ে থাকব, আমি নিজেই জানি না।'

মুকুজ্যেমশাই বলেছিলেন, 'আমরা এখন সংসারের বাইরে, সংসারের নিয়মকানুনের বাইরে। যেমন ধরো আমি নাচতেও পারি।'

'নিশ্চয় পারেন।'

যখন সবাই ছিলেন, যখন ভরা হাট, তখন ওই বাড়িতে কী হয়েছিল আমার স্মৃতিতে না থাকারই কথা। তখন আমার জ্ঞান হয়নি। আমি আমার গল্পই শুনেছি। কোন জায়গায় বসে মা আমাকে দুধ খাওয়াতেন। কোন জায়গায় বসে মা আমাকে তেল মাখাতেন। সকালের রোদ কোনখানটায় গড়িয়ে আসত। দুপুরের রোদে বাগানের কোন জায়গাটায় আমি খেলা করতুম। দুপুরে খাবার ঘরে খেতে বসে ছোটকর্তা স্তব্ধ হয়ে যেতেন। অনেকটা জায়গা শূন্য পড়ে আছে। অনেকেই নেই। একটা

প্রত্যাশা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ছোটবউ মেজবউ যদি বেরিয়ে আসেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে। হাতে খাবারের থালা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাওয়া শুরু করতেন। আহারাদি শেষ হয়ে যাবার পর বলতেন, 'এই মুহূর্তে একটা শব্দের বড়ই অভাব, মেজদার পরিতৃপ্তির ঢেকুর। ওই ঢেকুর আমরা কেউ তুলতে পারব না।'

আহারের পর আমরা যখন বিশ্রামের জন্যে একটু গড়িয়ে পড়তুম, ছোটকর্তা তখন বাগানে চলে যেতেন। বাগানের শেষ মাথায় নিচু একটা পাঁচিল। তারপরেই জমি হঠাৎ নিচু হয়ে গেছে। অনেকটা নিচু। শুরু হয়ে গেছে চায়ের জমি। বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে পাথরোল নদীর দিকে। ছোটকর্তা চলে যেতেন ওই দিকে। দুপুরে। দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন চুপ করে। বাঁধের ওপর দিয়ে রেল চলে যেত ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে। বাঁশির উদাস করা সুর।

একদিন বিকেলে দুই মেয়েকে নিয়ে ব্যারিস্টার ভদ্রলোক এলেন। এসেই বললেন, 'খুব গেলেন! আমরা বসে রইলুম পথ চেয়ে!'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমরা যাবার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম। আমাদের সাজ দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী সেজেছি একবার দেখেছেন!'

'তা হলে চলুন। আমরা আজ গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সেদিন আমাদের আর যাওয়া হয়নি পরমার জন্যে। পরমা এসরাজ শুনবে, গান শুনবে। পরমা রাঁধবে। রেঁধে আমাদের খাওয়াবে। পরমার মুকুজ্যেমশাইকে ভীষণ ভাল লেগেছিল। মুকুজ্যেমশাইয়ের কাছে আসন প্রাণায়ামও শিখবে! দাদুর গর্বে আমারও বেশ গর্ব হচ্ছিল। শরমা সেই প্রথম সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। মেয়েটা ভারী সরল ছিল। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে বাগান দেখল।

এরই মধ্যে একটা কার্পেট পাতা হয়ে গেল বাগানের বেদিতে। এসরাজ এসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে উঠল গানের আসর। মুকুজ্যেমশাই বেহাগে গান ধরলেন, 'তারা পরমেশ্বরী মা গো।' গাইতে গাইতে কেঁদে ফেললেন, 'অজ্ঞান জ্ঞানদায়িনী, ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী'। গান শেষ হয়ে যাবার পরেও সুর ঘুরে বেড়াতে লাগল বাগানে। আমার পালা এল। লজ্জা, ভয়, সংকোচ। গলা বুজে আসছে। পরমার সামনে গান গাওয়া যায়! গান কেমন হয়েছিল জানি না, পরমা কিন্তু খুব প্রশংসা করেছিল। এইটুকু মনে আছে, গানটা ছিল স্বামীজির। বাগেশ্রীতে, নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও-রূপরাশি। গানটি স্বামীজি গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা। মাঝে মাঝে মাতামহ আমাকে গলা দিয়ে সাহায্য করছিলেন। জায়গায় জায়গায় একটু বাগেশ্রীর আলাপ জুড়ে দিচ্ছিলেন। বাগেশ্রী এমনই রাগিণী, যার গলায় সুর আছে তাকে স্থির থাকতে দেবে না। টেনে নামাবেই। পরমা ওই সুরেই গেয়ে উঠল স্বামীজির রচনা, নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর। ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর। একসময় গানটা আমরা তিনজনেই গাইলুম। 'কী গুণী মেয়ে রে' বলে মাতামহ পরমাকে জড়িয়ে ধরলেন। শিলার মতো বুক পেয়ে পরমা বহুক্ষণ এলিয়ে রইল। ছোটকর্তা তখন এসরাজে দরবারি ধরেছেন। সুরের মোচড়ে চাঁদ যেন আলোর জল ঝরাচ্ছে।

অমন গানের আসর আর জীবনে বসেনি। ছোটবউ আর মেজবউ যেন শরমা আর পরমা হয়ে ফিরে এসেছিল। ব্যারিস্টার ভদ্রলোক যেন মেজকর্তা। সংখ্যায় ঠিক মিলে গিয়েছিল সেই ছ'জন। আমাদের পাড়ায় সবাই বলাবলি করত, 'ফেমাস সিক্স'।

মুকুজ্যেমশাই সেই রাতেই ব্যারিস্টারসায়েবকে বলেছিলেন, 'আপনার আপত্তি আছে, এই সোনা মেয়েটাকে যদি আমাদের আদরের মেয়ে করে নি? আমার একমাত্র নাতি।'

বেদির ওপর ছোটকর্তার এসরাজ শুয়ে আছে। পাশে পড়ে আছে ছড়ি। চাঁদের আলো চমক মারছে তারে তারে।

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে খুব করুণ গলায় বলেছিলেন,

'আমারও খুব মনে ধরেছিল; কিন্তু উপায় নেই। বড় অসহায়। ব্যবস্থাটা আমার স্ত্রী করে রেখে গেছেন।' সেই রাতে মুকুজোমশাইয়ের অহমিকা আহত হয়েছিল। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর নাতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। তাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। হায় বৃদ্ধ! পৃথিবী অনেক বিশাল, অতিশয় জটিল। পরমাকে আমারও ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তার ইয়োরোপিয়ান মুখ। তার একটু পুরুষালি চালচলন। নিঃসংকোচ ব্যবহার। মুক্ত মন। কেন জানি না, সেই একরাতেই আমি তার প্রেমে একেবারে ডুবে গিয়েছিলুম। অনেক রাতে আমাদের বাড়ির সামনের পাথুরে পথ ধরে, ছড়ছড় শব্দ তুলে তাদের টাঙ্গাটা যখন চলে গেল, মনে হল একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। পরমা বলেছিল, 'আপনার কর্মস্থল থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে। যখনই সময় পাবেন আসবেন! আমরা দু'বোন একা থাকি।'

লেবরেটারিতে টেস্টটিউব নাড়তে নাড়তে কতবার উদাস হয়ে ভেবেছি, পরমা এখন কী করছে! একবার গেলে কেমন হয়। পরক্ষণেই ভীষণ এক অভিমান জড়ো হয়েছে মনে। সে তো অন্যের স্ত্রী হবে। আমার সঙ্গে সে শুধু গল্প করবে। নিঃসঙ্গতা কাটাবে। নিজের স্বার্থ। আমার স্বার্থ কিছুই নেই। ভাগ্যবিশ্বাসী দুর্বল মানুষ আমি। একবারও মনে হল না নিজের পৌরুষ দিয়ে মেয়েটাকে আমি জিতে আনব। মা আমাকে একরাশ অভিমান দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠোঁট ফুলিয়েই জীবনটা কেটে গেল। আমি যেন স্মৃতির ব্লাডব্যাঙ্ক। বোতল বোতল লাল স্মৃতির হিমোগ্লোবিন সাজিয়ে বসে আছি। স্মৃতির প্লাজমা।

একদিন ইথারের বোতলে আগুন ধরে গেল। নিজের অসাবধানতায় পুড়েই মরতুম। বেয়ারা সুধীর চিৎকার করছে, 'বেসিনে ফেলে দিয়ে সরে আসুন, সরে আসুন।' গোটা ল্যাবরেটারিটাই জ্বলে যেতে পারত। সুধীর আমাকে ভীষণ ভালবাসত। তাড়াতাড়ি বালি এনে আগুন চাপা দিয়ে দিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা টুলে বসিয়ে দিয়ে সুধীর প্রায় কেঁদে ফেলেছে, 'এখুনি যে আপনি পুড়ে যেতেন! এত অনামনস্ক কেন?' হাত দুটো ঝলসে গেছে। সুধীর স্পিরিট ঢালছে হুড়হুড় করে। ইনচার্জ বোসদা ছুটে এসেছেন। অভিজাত চেহারা। এত আস্তে কথা বলতেন, যে কান পেতে শুনতে হত। সাদা অ্যাপ্রন পরা দীর্ঘ শরীর। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলছেন, 'তুমি তো খুব সাবধানী! এই ভুলটা করলে কেন?'

বলতে পারিনি সেদিন, 'এ আগুন বোসদা, পরমার আগুন।'

হাত দুটো বেশ কিছুদিন কালো হয়ে রইল। দেখতুম আর ভাবতুম, পাপীর হাত। এইরকমই তো হবে। বোসদা একদিন ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি লেখো?'

'না বোসদা। কোনওদিন চেষ্টা করিনি।'

'আমার মনে হয় তোমার ভেতর বেশ বড় রকমের একটা দুঃখ জমে আছে। দুঃখই সৃষ্টির উৎস। অবসর সময়ে একটু চেষ্টা করে দেখো না! সারাজীবন কি এই একঘেয়ে অ্যানালিসিস করে কাটাবে! একই স্যাম্পল বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসবে।'

বোসদা আমার আর এক পরম প্রিয়জন। আমার জীবনকে অন্য এক ধারায় প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের নির্জন চিলেকোঠায় বসে একটা কিছু লেখার চেষ্টা চলল। এক-এক পাতা লিখি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিছুতেই পছন্দ হয় না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দেশে লেখক হওয়া অতই সোজা! একের পর এক মৃত্যু আর কিছু মেয়ের দেওয়া আঘাতে প্রতিভা খুলে যাবে, আমার বিশ্বাস হল না। তখন একদিন আমি হাসতে শুরু করলুম। চিলেকোঠায় বসে আপনমনে হাসছি। এই একটা চরিত্র! আপনজনেরা যেমন ভাবে, ছেলে আমাদের বিশাল বড় হবে। কল্পনায় যখন যা হতে চেয়েছি, তারা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, হ্যাঁ, তুমি তাই হবে। নর্তক হবে, সিঙ্গার হবে, সায়েন্টিস্ট হবে, এক্সপ্লোরার হবে, অ্যাক্টর হবে, পাইলট হবে, ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরবে। ভীষণ সুখের জীবন হবে। দরজায় হাতি বাঁধা থাকবে। কোথায় কী! কল্পনার প্রাসাদ কল্পনাতেই ভেঙে গেল। কী

শীত, কী গ্রীষ্ম, ভোর পাঁচটায় উঠি। সাড়ে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। লেবরেটারিতে ঢুকি আটটায়। আট ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি। ভবিষ্যৎ! কোম্পানিতে যে শ-পাঁচেক জিনিস তৈরি হয়, তাই পরীক্ষা করে যেতে হবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ভাত ডালের অভাব মিটবে। দেহ বাঁচবে। মনের কী হবে! মন কী নিয়ে বাঁচবে।

অবশেষে একটা ক্লাউনের গল্প লিখলুম। সার্কাসের ক্লাউন নয়, সংসারের ক্লাউন। যে-সব কিছু চেষ্টা করে পারে না কিছুই। এক-একটা হার আসে, তারপরেই সে টানা সাত দিন ঘুমোয়। আবার জেগে ওঠে নতুন এক পৃথিবীতে। নবীন উদ্যমে লেগে পড়ে আবার। আবার হারে। সে আবার প্রেমও করেছিল। সেই প্রেমিকা তারই হাত দিয়ে চিঠি পাঠাত আর এক প্রেমিককে। সেই প্রেমিকার বাড়িতে তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত গৃহভৃত্যের মতো খেটে গেছে। বিয়ের বাজার করেছে। ড্রামে বালতি বালতি জল ভরেছে। পেয়েছে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি। শেষে একদিন দেখলে, দেশলাইয়ে আর কাঠি নেই। খোলটাই পড়ে আছে। দু'পাশের বারুদ বারবার কাঠির ঘষায় উঠে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার গল্পটা একটা ছোট পত্রিকায় বেরোল। খুবই লজ্জা করছিল, তবু বোসদাকে পড়তে দিলুম। এ যেন নিজের ঢাক নিজে পেটানো। পরের দিন আমি একমনে কাজ করছি, বোসদা আমার পাশে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার হবে।'

ভীষণ একটা আনন্দ হল। খুব ভাল খেলে যা হয় না। তোমাকে আমি ভালবাসি, শুনলে যা হয় না। দুশো টাকা মাইনে এক কথায় বেড়ে গেলে যা হয় না। যেমনই হোক আমি পেরেছি। একজনও যিনি বোঝেন, তিনি বলেছেন তোমার হবে। প্রথম উৎসাহ তিনিই দিয়েছেন আমাকে। সেই আমার প্রথম অনুভব, আধ্যাত্মিক আনন্দের।

কিছু দিন পরেই বোসদা অন্য এক প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন। কেমিস্টের চাকরির এই এক মজা। যত পালটাবে ততই মাইনে বাড়বে। বোসদা চলে যাবার পর বড় অসহায় বোধ করতে লাগলুম। মনের মানুষ প্রাণের মানুষ চলে গেলে সেখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না। এও আমার এক রোগ। একা থাকতে পারি না। ছায়ার স্বভাব। গাছ আর গাছের ছায়া। তলায় লুটিয়ে থাকে। একদিন চিফ কেমিস্টের সঙ্গে ধুম ঝগড়া হয়ে গেল একটা জানলা খোলা নিয়ে। সেদিন কলকাতায় অসহ্য গরম। লেবরেটারির ভেতরে জোড়া জোড়া বার্নার জ্বলছে, অ্যাসিড আর অ্যামোনিয়ার ফিউমস। টেকা যাচ্ছে না। একটা জানলা খুলে দিলুম। সেই জানলার সামনে কাচের কেসে একটা দামি ব্যালেন্স ছিল। জিনিসটার মূল্য আমি জানতুম; কিন্তু কাচে ঢাকা তো! সেদিন খুব একটা বাতাসও ছিল না, যে ধুলো এসে ব্যালেন্সটাকে নষ্ট করে দেবে! চিফ কেমিস্ট গটগট করে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি আবার গিয়ে জানলাটা খুলে দিলুম। এইরকম বার কয়েক হবার পর সেই প্রবীণ মানুষটি আমার সামনে এসে হাত পা নেড়ে বললেন, 'তোমার কত হাওয়া চাই? অত হাওয়া দিতে পারব না। তোমার চেয়ে ওই ব্যালেন্সটার দাম বেশি।'

মনটা খিচড়ে গেল। একেই তা হলে বলে দাসত্ব! নোকর! চাকরি করব না। পকেটে তখন আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আরও ভাল চাকরি। সঙ্গে সঙ্গে একটা রেজিগনেশান লেটার লিখে চলে গেলুম ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে। সুন্দর সাত্ত্বিক চেহারার মানুষ। প্রথম দিন থেকেই কেন জানি না এই মানুষটি আমাকে ভালবেসেছিলেন। আমাকে লাঞ্চ খাইয়েছিলেন। প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। দু'-দশটা কাজের কথার পর অন্য আত্মিক কথা হত। নানা আলোচনা। ফরসা টুকটুকে চেহারা ছিল তাঁর। তিনি মুখ নিচু করে কাজ করছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে ইস্তফাপত্রটা রাখলুম। চোখ তুলে বললেন, 'বোসো। রেজিগনেশান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন? কারও সঙ্গে গোলমাল?'

ঘটনাটা বললুম। একবারও বললুম না আর একটা চাকরি আমার পকেটে ঘুরছে। এখানে আমার সুখের অন্ত নেই। ফ্রি চা, লাঞ্চ, কোম্পানির তৈরি সমস্ত কসমেটিক্স ফ্রি, বোনাস। ছাড়ার মতো কোনও কারণ নেই।

তিনি বললেন, 'প্রবীণ মানুষ। আলসারের রোগী। যদি কিছু বলেই থাকেন, ঝেড়ে ফেলে দাও। মানুষটি খারাপ নন। অ্যানালিসিসে তোমার এত ভাল হাত! তোমাকে দিয়ে আমি নতুন কাজ করাব। যাও রাগ কোরো না। তোমার মাইনে আমি আরও দুশো টাকা বাড়িয়ে দিলুম। এখুনি আমি অ্যাকাউন্টসে নোট পাঠাচ্ছি।'

উঠে এসেছিলুম মানুষটিকে মনে মনে প্রণাম করে। সারাটা রাত লড়াই চলল মনে। চাকরিটা খুব আচ্ছা। মালিক সহৃদয়; কিন্তু ভীষণ অভিমান আমার। সেই কথাটা বারে বারে কানে বাজছে, কত হাওয়া চাই তোমার? অত হাওয়া দিতে পারব না।

পরের দিনই আমার নতুন চাকরিতে গিয়ে যোগ দিলুম। ভালই হল, পরমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে সরে যেতে পেরেছি। মানুষের ছোঁকছোঁকানির কথা আমি আর কী বলব! একদিন ছুটির পর সন্ধের মুখে খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলুম ওদের বাড়ির সামনে। সে এক পেল্লায় ব্যাপার। বিশাল বড় গেট। গাড়িবারান্দা। পেতলের ফলকে নাম। ভেতরে কুকুরেব ডাক, ঘাং, ঘাং। পরমা, তুমি তোমার প্রাসাদেই থাকো। মধুপুরের ওই একটা রাতই আমার স্মৃতিতে থাক: আমার মাতামহ রেলগাড়িতে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলেন! স্ট্যাটাস দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

নতুন অফিসে আর টেস্টটিউব নাড়ানাড়ি নেই। কাগজপত্রে কাজ। ফাইল নাড়ানাড়ি। সরকারি ব্যাপার। লেখো। শিল্প প্রচার করো। দেশকে জাগাও। এই অফিসে পেয়েছিলুম আমার সেই মানুষটিকে। তাঁর নাম ছিল অমূল্যদা। ঢালাই-করা শরীর। কত বয়স, চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না। একমাথা সাদা ধবধবে চুল। পাহাড়ি মানুষদের মতো ফাটাফাটা মুখ। চোখে গোল রুপোলি চশমা। মোটা ধুতি। মোটা কাপড়ের সাদা শার্ট। পায়ে টায়ারের চটি। তিনি ছিলেন দপ্তরের কেরানি। দশটায় তাঁর ঢেঁকি কাঠের চেয়ারে এসে বসতেন, আর ঠিক পাঁচটা বাজলেই উঠে চলে যেতেন। কাজের কথা ছাড়া কোনও কথাই বলতেন না।

তিনি আজ কোথায়! কোন লোকে! আমার মনের পালকিতে চড়ে আমার সঙ্গেই ঘুরছেন। সেইদিন মৃত্যু হবে তাঁর যেদিন আমি মরব। আমার পৃথিবী মরলে তবেই আমার মানুষগুলো মরবে। সামান্য একজন কেরানি। সামান্য আয়। বিশাল সংসার, অথচ কী বিশাল মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। আমার বসার টেবিল-চেয়ারের তদারকি করলেন। চেয়ারটা তেমন আরামদায়ক ছিল না। স্টোর থেকে বদলে আনালেন। চৌকো একখণ্ড কাচ এনে টেবিলে বসালেন। যাবতীয় আয়োজন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করালেন। অবশেষে দু'কাপ চায়ের হুকুম করলেন। পয়সা দিতে গেলুম। ঘোরতর আপত্তি। কিছুতেই দিতে দিলেন না। টিফিনের সময় বললেন, 'আমার তো টিফিন জোটে না, আপনি কিছু খেয়ে আসুন।' ওই মানুষটি আমাকে সরকারি জীবনের সমস্ত ঘাঁচঘোঁচ সেই প্রথম দিনেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কোন সহকর্মী কেমন। কী কী পলিটিক্স হয়। ঘুষঘাষ কেমন চলে। তেল কাকে বলে। তেলের ফল কী! সততার পরিণাম কী? শেষে বললেন, আগের চাকরিটা ছেড়ে এই চাকরিতে আসা ঠিক হয়নি। চালে ভুল হয়েছে। এই মানুষটি বয়সের তফাত সত্ত্বেও আমার একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠলেন। মাঝে মধ্যে আমার জন্যে কাগজে মুড়ে পুজোর প্রসাদ আনতেন। একটা গুঁজিয়া বা একটা পেঁড়া। কোনওদিন শুধুই একটা বাতাসা। একদিন একটা তাগা এনে আমার ডান হাতের ওপর বাহুতে বেঁধে দিলেন। একদিন এক অবিবাহিতা মহিলা টাইপিস্ট আমার সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছিলেন শেষবেলায়। একটু রঙ্গরসিকতার ধরনের। অমূল্যদা একান্তে বললেন, খুব সাবধান। ও অনেকের কেরিয়ার নষ্ট করেছে।

শীতের শনিবার। অমূল্যদা আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খিদিরপুর অঞ্চলে। মাঠকোঠা

বস্তি। দুটো মাত্র ঘর। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। একটা তেঁতুল গাছ। একপাল ছেলেমেয়ে। স্ত্রীর সাজপোশাক পণ্ডিত গৃহিণীর মতো। লালপাড় সাদা শাড়ি। স্ত্রীর বয়স অনেক কম। কৈফিয়ত দেবার মতো করে অমূল্যদা বললেন, 'ভাবছেন কেন আমি বিয়ে করলুম। যখন করেছিলুম তখন আমি ওপার বাংলার এক সচ্ছল মানুষ। এ বাংলায় এসে আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হল। সঙ্গে ছিল তার বোন। একেবারেই অসহায়। আমিও অসহায়, সেও অসহায়। শেষে আবার আমাকে বিয়ে করতে হল। বলা তো যায় না, কোন ছেলে কেমন হবে। একজনও তো ভীষণ ভাল হতে পারে। বড় হতে পারে। সে-ই আমার নাম রাখবে।'

সন্ধের প্রায়ান্ধকারে বসে আছি দু'জনে। ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেন জ্বলছে। ওই অবস্থার মধ্যেও আতিথেয়তার ত্রুটি হল না। অল্প দূরেই একটা মেলা চলছিল। অমূল্যদা আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর সেই ছেলেমানুষের মতো আনন্দ ভোলার নয়। মাটির পুতুল। গেরস্থালির জিনিসপত্র। গরম জিলিপি। চিনেবাদাম। কাচের চুড়ি। ম্যাজিক। পুতুল নাচ। অমূল্যদা কিনছেন না কিছুই। কেনার পয়সাই নেই। নাগরদোলার কঁ্যাচোর-কোঁচোর শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, শৈশব ফিরে আসছে। নিজেও কিনবেন না, আমাকেও কিনতে দেবেন না। অসাধারণ তাঁর যুক্তি, অবস্থা সমান সমান হলে হত উপহার। তাঁর ছেলেমেয়েকে কিছু কিনে দিলে হবে দয়া। তা ছাড়া কেনার কিছু নেই। মেলার মজাটাই হল আসল। কত রং, কত গন্ধ, আলো, শব্দ। কত মানুষের গা-ঢালা চলাফেরা।

অমূল্যদার বড় মেয়েটিকে একেবারে মা লক্ষ্মীর মতো দেখতে ছিল। একদিন নিজেই নিজের সম্বন্ধ করে ফেললুম। অমূল্যদাকে বললুম। বলতেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'খুবই ভাল মেয়ে। লেখাপড়াতেও ভাল। গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। একগাদা টিউশানি করে; কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমারই বিপদ হবে। প্রথমত, তোমার বাবা মেনে নিতে পারবেন না। মেয়েকে মেনে নিলেও, আমাকে আমার পরিবারকে মেনে নিতে পারবেন না। তোমাদের ঘর আলাদা। দ্বিতীয়ত, আমার মৃত্যুর পর এই বিশাল পরিবার তোমার দ্বারস্থ হবেই। তখন তুমি সামলাতে পারবে না। তৃতীয়ত, আমার মেয়ে আমার কাছে একেবারেই পর হয়ে যাবে। কোনও সম্পর্কই থাকবে না। বিয়েটা বিয়ে হবে না, হবে অনুগ্রহ। মাঠকোঠার মেয়ে মাঠকোঠাতেই আশ্রয় পাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

আমি কিছু মনে করিনি। একটা দুঃখ আমার হয়েছিল। আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, সংসার আমার হবে না। আমি ভাঙা সংসারের ফাটা বাঁশি। আমার মন আমি দেখাতে পারলুম না কারওকে। যখনই আমার মন কেঁদেছে, তখনই শুনতে হয়েছে, ওটা তোমার দুঃখ নয়, করুণা অনুগ্রহ বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছা।

কয়েক বছরের মধ্যেই অমূল্যদা রিটায়ার করে চলে গেলেন। তাঁর সেই ঢেঁকি-কাঠের চেয়ারে এক তরুণী এসে বসলেন। আমাদের বড়বাবুর বড়মেয়ে। অমূল্যদাকে বলেছিলুম, আপনার মেয়ের জন্যে একবার চেষ্টা করুন না। তিনি বলেছিলেন, পরিবেশ ভাল নয়। শিক্ষকতাই ভাল। ভদ্রলোক তাঁর আদর্শ নিয়ে ফিরে গেলেন বিশাল বিক্ষিপ্ত সংসারে। এক স্নেহময়ী সেই চেয়ারে এসে বসলেও, সেই স্নেহময় মানুষটির অভাব রয়েই গেল।

হঠাৎ একদিন মনে হল, অমূল্যদাকে একবার দেখে আসি। সেদিন শনিবার। একটা ট্রাম ধরে খিদিরপুর চলে গেলুম। ট্রামে রেসুড়েদের ভিড়। অনবরত ঘোড়ার কথা শুনতে শুনতে স্টপেজে গিয়ে নামলুম। অনেকদিন দেখিনি অতিশয় সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে। বুকের ভেতরটা কেমন করছিল। গলিঘুঁজি পেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছোলুম। সামনেই সেই মাঠকোঠা। দালানে বসে আছে অমূল্যদার মেয়ে। সামনে একদল ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। আমাকে একদিনই দেখেছিল, তবু চিনতে পারল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললে, 'বাবা তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

তার চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ল। বুঝতে পারলুম কোথায় গেছেন! দাওয়ার একপাশে বসে পড়লুম। শুধু চা খেয়ে একজন মানুষ আর কত দিন বাঁচতে পারে! মেয়ের মা এসে বললেন, 'আপনার কথা রোজই বলত। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা জিনিস রেখে গেছে।' ভদ্রমহিলা মেয়েকে বললেন, 'নিয়ে আয় তো!' কাগজের মোড়ক খুলতেই পুরনো আমলের একটা পার্কার কলম বেরোল। কলমটা জড়ানো ছিল একটা চিঠি দিয়ে। সুন্দর হাতের লেখা, 'যদি তুমি আসো কোনওদিন তাই রেখে গেলুম। এটি আমার প্রাচুর্যের দিনের সাক্ষী। একমাত্র তুমিই এর মর্যাদা দিতে পারবে। এ পরিবারে তেমন কেউ নেই। এই কলমে তুমি আমাকে একটি চিঠি দিয়ো, যে-চিঠি আমি পাব না কোনওদিন। আমি হেরে গিয়ে হারিয়ে গেলুম। জেনে রাখো, তোমাকে আমি আমার ছেলে বলেই মনে করতুম। মনে করায় তো কোনও বাধা নেই। মনের তো কোনও দারিদ্র্য থাকে না। পার্থিজগতে দেখা হবার কোনও আশা নেই, পরলোক বলে যদি কিছু থাকে দেখা হবে।'

চিঠিটা পড়ে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলুম। পুত্রের কর্তব্য তো পালন করিনি। সরকারি অফিসের সাধারণ একজন কর্মচারী। অবসর নিয়ে চলে যাওয়া মানেই মরে যাওয়া। অনেকের একজন। কে আর তার খবর রাখে! অমূল্যদার শেষ শয্যাটা একবার দেখতে চেয়েছিলুম। সে তো ভূমিশয্যা। ভদ্রলোকের একটা ছবি পর্যন্ত ছিল না। একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অনেক সংকোচে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলুম। অমূল্যদার স্ত্রী নিলেন না। অমূল্যদার নির্দেশ ছিল দান গ্রহণ করবে না। উপবাস সাত্ত্বিক, দান তামসিক।

চিরকালের জন্যে ফিরে এসেছিলুম সেই বাড়ি থেকে। সে অনেক দিন আগের কথা। জানি না, সেই মাঠ, মাঠকোঠা আজও আছে কি না, বৃহৎ কলকাতার একপাশে। অমূল্যদার বংশধরেরাই বা কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল! কোথায় গেল সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা। তারও তো বয়স হল অনেক।

আমার সেই সাবেক বাড়ির সামনের ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে যখন বাজারের দিকে যাই, তখন একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াই। বন্ধ একটা দোকানের সামনে একটু উঁচুতে বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড হেলে আছে। দু'-একটা অক্ষর বোঝা যায় মাত্র। এই সেই নারাণকাকুর দোকান। ক্রাচটা দেয়ালে হেলিয়ে রেখে একটা টুলে সোজা হয়ে বসে থাকতেন খদ্দেরের আশায়। কোথায় খদ্দের! মনিহারি দোকান দিয়ে শুরু করেছিলেন। সারাদিনে সাতটাকা বিক্রি। পরে যোগ করলেন ইলেকট্রিক মেরামতি। তখন একটু খদ্দেরপাতি দেখা গেল। গেলে কী হবে, ইলেকট্রিকের কাজের জন্যে যে বন্ধুকে এনেছিলেন, তিনিই সব টাকা নিয়ে নিতেন। দোকান বন্ধ করে নারাণকাকু রাতে বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমরা সবাই খেতে বসেছি। হঠাৎ ছোটকর্তার নজরে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'নারাণ তোমার কপালের মাঝখানে ওটা কী?' নারাণকাকুর কপালের মাঝখানে একটা ফুটো। ভুসভুস ছাই ঝরছে। নারাণকাকু অম্লান বদনে বললেন, 'দেখলুম আমার কপালে কী আছে! তাতাল দিয়ে পোড়ালুম। কপালে শুধু ছাই আছে। ছাই। মুঠো মুঠো ছাই।' ছোটকর্তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা সরল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি সেদিন চোখের জল চাপতে পারিনি। নারাণকাকুকে আমি বলেছিলুম, 'আপনিও ব্যাচেলার আমিও ব্যাচেলার, অত ভাবছেন কেন? আমাদের ঠিকই চলে যাবে।' বড় বনেদি ঘরের ছেলে। বড় মন, লম্বা খরচের হাত। শীতে কেউ কষ্ট পাচ্ছে, দামি শালটা নিজের গা থেকে খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। পরের দিনই সে সেটা বিক্রি করে দিয়ে আবার উদোম হয়ে গেল। কার সংসার চলছে না। পকেট ঝেড়ে সব টাকা দিয়ে এসে নিজে তিন দিন উপোস করে রইলেন। পৃথিবীর কিছু মানুষ থাকে দেওয়ার দিকে, আর কিছু থাকে নেওয়ার দিকে। আর এই দেওয়া-নেওয়ার মাঝখানে একদল টেনিস খেলার নেটের মতো ঝুলে থাকে। থেকে থেকে মরে যায়। আমার কথা তাঁর ভাল লাগল না। কারও কাছে তিনি নত হবেন না।

দোকান বন্ধ হয়ে গেল। কিছু টাকা গেল জলে। একদিন সকালে দোকানের সামনে বিশাল লাইন। ক্রেতার নয়, গ্রহীতার। সব জিনিস বিলিয়ে দেবেন। লাইনটা মিনিট পনেরো ছিল,

তারপরেই সব লুটপাট। শ দুয়েক লোক দোকানটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল। শোকেস, দেয়ালের র‍্যাক, চেয়ার, টেবিল সব হাওয়া। মেঝেতে নারাণকাকু চিতপাত। কপাল থেঁতো। ছেঁড়া জামা। ক্রাচটা একপাশে পড়ে আছে। আমরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলুম। সামনের দুটো দাঁতও ভেঙে গেছে।

নারাণকাকু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন, 'আমি আসছি। এই আকাশের তলায় তো কিছু হল না, দেখি অন্য আকাশের তলায় কী হয়।' সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। সিন্দুক ভরতি জ্যোতিষীর বই পড়ে রইল আমাদের নীচের ঘরে। চৌবাচ্চার ভেতর থেকে আবিষ্কার করলুম তাঁর একজোড়া প্রায় নতুন নিউকাট। জানলা আর বাক্সর মাঝের খাঁজ থেকে বেরোল তালগোল পাকানো সাধের সিল্কের পাঞ্জাবি। একটা নোটবুক। তাইতে রাজ্যের হিসেব। যত লোক তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছিলেন তাঁদের নাম। যোগ দিয়ে দেখেছিলুম সে অনেক টাকা। ভীষণ মন খারাপ হত। আমাকে কত কী শেখাবেন বলেছিলেন—সম্মোহন, জ্যোতিষী। বলেছিলেন, তোমার জন্মসময়ে ভুল আছে। আমি একটা করকোষ্ঠী করে দেখব, কেন ফল এমন উলটাপালটা হচ্ছে!

ছোটকর্তা ছিলেন মায়ামুক্ত, বৈদান্তিক পুরুষ। তিনি কোনও কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। আমি একদিন খুঁজে খুঁজে তাঁর শ্রীরামপুরের বাড়িতে গেলুম। শীতের দুপুর। পুকুরের পাড় দিয়ে আম জামরুলের ছায়ায় ছায়ায় নারাণকাকুর সাবেক বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর দাদা উঠনে বসে সাইকেলের চাকায় এক-এক ফোঁটা তেল দিচ্ছেন আর বাঁইবাঁই করে ঘোরাচ্ছেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। একটা চকরবকর লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি পরেছিলেন। ফরসা পাতলা চেহারা। বার্মিজদের মতো দেখতে। শুনেছিলুম ভদ্রলোক রঙমহলে অভিনয় করেন। এই বেশি বয়েসে এক সহঅভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন। উঠোনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা তার টাঙানো। একাধিক। সেই তারে পরপর ছোট বড় কাঁথা ঝুলছে। উঠোনের ডানপাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি। সিঁড়ির হাতলে রবার ক্লথ আর কাঁথার সারি। এক লহমায় সব দেখে নিলুম। ওই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোকের ওপর আমার আর কোনও শ্রদ্ধা রইল না। অমন একটা শীতের শীতোষ্ণ দুপুর মূত্রগন্ধী হয়ে বসে আছে।

ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, 'কী চাই?'

আমার সামান্য পরিচয় দিয়ে নারাণকাকুর কথা জিজ্ঞেস করলুম। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, দেওয়া হল না। দোতলায় সানাই বেজে উঠল। জোড়া পোঁ। ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়াও ভাই।' তিরবেগে দৌড়োলেন দোতলায়। দোতলায় একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক এ-কোলে একটা ও-কোলে একটা শিশু নিয়ে সামনেটায় বেরিয়ে এসে নানারকম শব্দ করে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তারা নানা সুরে খেলিয়ে খেলিয়ে কাঁদতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার হ্যাঁচকা মারছে। মাছের মতো পিছলে যেতে চাইছে। ভদ্রলোক ওই অবস্থায় সিঁড়ির মাথায় এসে বললেন, 'নারাণের খবর আমরা কিছু জানি না, জানতে চাইও না।'

আমি সেই অপূর্ব দৃশ্য আর নাকে সেই দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে এলুম। এক অভিনেতাকে দেখলুম বটে। কোলে ব্যাগপাইপ নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন দোতলায়। তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী কোন সুরলোকে বায়ুবদলে গেছেন কে জানে? নেতাজির অন্তর্ধানের মতো নারাণকাকুর অন্তর্ধানও এক রহস্য হয়ে রইল। নারাণকাকুর পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব ছিল না। একবার কয়েক ভরি আফিম খেয়ে ট্রেনের কামরার ওপরের বাঙ্কে শুয়ে ছিলেন। হরিদ্বারে মড়া ভেবে দেরাদুনে চালান করে দিয়েছিল। হঠাৎ চোখ পিটপিট করে উঠে বসে বললেন, 'আমি কোথায়?' তিনটে লোক ভূত ভেবে চোঁচাঁ দৌড় মারল। আত্মহত্যায় তিনবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথমবার গলায় দড়ি দিয়ে হুকসুদ্ধ উপড়ে, পুরনো ছাতের খানিকটা খুলে নিয়ে মাটিতে নেমে এসেছিলেন। গাঁটের কড়ি খরচ করে সেই ছাত মেরামত

করতে হয়েছিল পরের দিনই। আর একবার রেললাইনে মাথা দিয়ে চোখ বুজিয়ে শুয়ে ছিলেন, হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। রেলগাড়ি বেরিয়ে গেল পাশের লাইন দিয়ে। একজন লোক লাইন পেরোতে পেরোতে বলেছিল—খুব বাঁচা বেঁচে গেলে দাদা। আত্মহননের একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলই। শেষবার হয়তো সফল হয়েছিলেন। কোথাও কোনও পাহাড়ে, পাথরের পাশে তাঁর ক্রাচটিকে শুইয়ে রেখে গড়িয়ে পড়েছিলেন খাদে। পড়ার সময় হা হা করে হাসাটাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র ছিল না। অনেকের অনেক রকম আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনওরকমে মরা।

ছোটকর্তা চারপাশে তাকিয়ে একদিন বললেন, 'একে বলে গুড ট্রিমিং। সব ছেঁটেছুঁটে একটি কাণ্ড আর একটি শাখা। তুমি আর আমি। আর মুকুজ্যেমশাই। সংসারটা এতদিনে একটা স্থায়ী চেহারা নিয়েছে। কোনও ঝামেলা নেই। সাধনভজন, জ্ঞানান্বেষণ।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'হাইটাইম। বিলুর একটা বিয়ে।'

'কেন, ও কি আর সামলাতে পারছে না!'

লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থানত্যাগ। ছোটকর্তা মাঝে মাঝে বড় আঁতে ঘা মেরে কথা বলেন। বিয়ের তেমন কোনও প্রয়োজন আমি কখনই বোধ করিনি। সবই তো সেই পণ্ডিতমশাইয়ের, তদ্রূপ। পণ্ডিতমশাই কৌতূহল চাপতে না পেরে চাদর মুড়ি দিয়ে বেশ্যালয়ে গমন করেছিলেন। ফিরে আসার সময় ধরা পড়ে গেলেন। প্রশ্ন করা হল, কেমন অভিজ্ঞতা। পণ্ডিতমশাই বললেন তদ্রূপ, তদবর্ণ, তদগন্ধ। হয়ে গেল সার কথা।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'কার কাছে রেখে যাব ছেলেটাকে?'

ছোটকর্তার জবাব, 'ঈশ্বরের কাছে। রাখনেঅলা, আর মারনেঅলা সেই এক ঈশ্বর।'

মুকুজ্যেমশাই ছিলেন মজলিশ মারা মানুষ। তিনি বললেন, 'ওয়া ওয়া।'

আমাকে তখন নাস্তানাবুদ করে মারছে আমাদের অফিসের সেই মহিলা টাইপিস্ট। অমূল্যদা যার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে গিয়েছিলেন। সে তখন অতিশয় বিবাহকাতর। ওড়াউড়িতে ক্লান্ত। একটা ডাল চাইছে বসার। পাখির বয়েস বাড়ছে। পাখির পালকের জেল্লা কমছে। পাখির ঝোঁটন কমছে। পাখির চোখের চমকানি স্থির হয়ে আসছে। পাখি দেখছে রাত নামছে, এইবার বাসা চাই। সে বসে আমার উলটো দিকে; কিন্তু তার চিঠি আসে আমার কাছে ডাকে। চিঠির পর চিঠি। অভিযোগ, কাব্য, কান্না, সমর্পণ, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, গালি, অন্তহীন প্রলাপ। সে আসে। আমার দিকে পেছন ফিরে বসে। সারাদিন টাইপ করে। দিনের শেষে ফড়ফড় করে চলে যায়। একটা করুণ চিঠিতে সে লিখলে, 'ওই বুড়োটা (অর্থাৎ অমূল্যদা) আপনাকে যা-তা বলে গেছে আমার সম্পর্কে। বলতেই পারে। চাকরিটা পাবার জন্যে আমাকে একটু কেরামতি দেখাতে হয়েছিল। ওটা আমার স্বভাব নয়, আমার অভিনয়। আমি আপনাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করুন আমার সব আছে।'

চিঠিটা হাতে আসার পর খুব ইচ্ছে হয়েছিল একটা জবাব দিই। কেউ এইভাবে কাঁদলে স্থির থাকা যায় না। চিঠি শুরুও করেছিলুম, অমূল্যদার কণ্ঠস্বর, সাবধান! তুমি ছাড়া আরও অনেকে আছে। ইশ্বর আমাকে অন্যভাবে বাঁচালেন। আমার চাকরিটা বদলে গেল। সরকারি থেকে হয়ে গেল বেসরকারি। মনে কিন্তু একটা ক্ষত রয়ে গেল। একটা প্রাণ, একটা অনুভূতি, এমন একটা আত্মনিবেদনের আমি কোনও মর্যাদা দিলুম না। আমাকে যাঁরা চালালেন, তাঁরা আমার চলাটুকু রেখে হাত ছেড়ে পালালেন। বললেন, আমাদের সময় হয়ে গেছে, আমরা আসি। তোমার পথটুকু তুমি চলে এসো।

আমার তো এখন সময় কাটে না। বৃদ্ধ গোরুর মতো টুকটুক করে এখানে ওখানে যাই। সেদিন ধুঁকতে ধুঁকতে দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। দক্ষিণেশ্বর তো শুধু মন্দির নয়। ইতিহাস। গেলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। মনে হয় একটা সঙ্গে পড়েছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমি আর একা নই। উজ্জ্বল অতীত

এসে আমার হাত ধরেছে। সকালবেলা। জ্বলজ্বলে রোদে দিনটা যেন গলে গলে পড়ছে। নাটমন্দিরের লম্বা সিঁড়িতে। পাশাপাশি দুটি মূর্তি। এক প্রবীণ আর এক প্রবীণা। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি, পরে মনে হল প্রবীণাটি যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছি। মনে হওয়ামাত্রই আর একবার তাকালুম। মহিলাটি হেসে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি আমার সেই শ্লথ গতিতে দু'জনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন চিনতে পারিনি। মনে হচ্ছে চেনা। খুবই চেনা। অসম্ভব বড় বড় দুটো চোখ। বকফুলের মতো নাক। মুখটেপা সেই হাসি।

প্রবীণা জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পেরেছেন?'

গলাটা শোনামাত্রই চিনতে পারলুম। সেই টাইপিস্ট ভদ্রমহিলা। আগের মতো আমি আর চটপটে নেই। তড়বড় করে কথা বলতেও পারি না। আমার বুঝতে সময় লাগে, আমার ধরতে সময় লাগে। আমার চোখ গেছে, দাঁত গেছে, স্মৃতিটাই কেবল আছে। বললুম, 'মনে হয় চিনতে পেরেছি। একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি আমরা একই অফিসে।'

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ধাপে ধাপে নেমে এলেন নীচে। আমার হাত দুটো দু'হাতে ধরে সেই প্রবীণের দিকে ফিরে বললেন, 'জানো এর প্রেমে আমি একদিন পাগল হয়েছিলুম।' আমার দিকে ফিরে একমুখ হেসে বললেন, 'কী গো, বলো না, হইনি? অন্তত কমসে কম একশো চিঠি লিখেছি।'

আমি উদাসভাবে বললুম, 'তা হবে।'

প্রবীণ মানুষটি বললেন, 'আপনি মশাই আমাকে সারাটা জীবন বহুত জ্বালিয়েছেন। কোথায় আপনি, কোথায় আমি, জানতুম না কিছুই। শুধু বুঝতুম আমার সহধর্মিণীকে কেউ অধিকার করে আছে। আজ চর্মচক্ষে তাকে দেখার সৌভাগ্য হল। আপনিই সেই ভাগ্যবান! আসুন, বসে পড়ুন আমাদের পাশে। আমরা তো সব পারের যাত্রী!'

আমার সেই প্রেমিকা হাত ধরে ধরে সোপান শ্রেণি উত্তীর্ণ করালেন। বসলুম তাদের পাশে। হঠাৎ মনে হল মেয়েটি সেবিকা। হঠাৎ মনে হল, সেই সময় আমি যদি সাহস করে সিদ্ধান্তে আসতে পারতুম, তা হলে জীবনটা এমন নিঃসঙ্গ মরুভূমি হত না।

মহিলা বললেন, 'তোমার কথা কিছু বলো, আমার কথা কিছু বলি।'

আকাশের দিকে তাকালুম। বড় নীল। ভীষণ আলো। আকাশের বয়েস বাড়ে না। কী কথা বলব? বলার কী আছে! সবই তো সেই এক কথা। নিজের হাতের দিকে তাকালুম। বহুবছর আগে ইথারে পুড়ে গিয়েছিল। কোঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকে গেছে। হঠাৎ দুটো লাইন আমার মাথায় এসে গেল। হঠাৎ হঠাৎ আসে যৌবনের অনুধ্যান,

Men have died from time to time and worms have eaten them/but not for love.

মহিলা বললেন, 'আজ একটা সত্য কথা বলবে, তুমি আমাকে কী ভেবেছিলে?'

চুপ করে বসে রইলুম। সত্যিই কি কিছু ভেবেছিলুম। হয়তো ভেবেছিলুম। বললুম, 'তখনকার ভাবনা এখন আর নেই। সে মন হারিয়ে গেছে।'

'বিয়ে তো করোনি বলেই মনে হচ্ছে!'

'করেছিলুম, বালক বয়সে।'

'কোথায় তিনি?'

'সে আমার হাতে একটা পুতুল ধরিয়ে দিয়ে এই পৃথিবীতেই হারিয়ে গেছে।'

'তুমি যে আমাকে অপমান করেছিলে, তা কি মনে আছে?'

'আমি তোমাকে অপমান করিনি, আমি একজনের নির্দেশ পালন করেছি।'

'কে সে? বুড়ো অমূল্য?'

'না। গোয়েন্দা-গল্পে যাকে খুনি মনে হয়, সে যেমন খুনি হয় না, এও সেইরকম। তিনি আমার পিতা। তিনি পছন্দ করতেন না আমি বিয়ে করি।'

মেয়েটি হা হা করে হাসতে হাসতে জীবনের শেষ আঘাতটি হেনে গেল। বললে, 'রামভক্ত হনুমান শোনা ছিল, বাপ ভক্ত গাধা এই একবারই দেখলুম।'

আমি আমার নড়বড়ে শরীর আর ছানিপড়া দৃষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম। ওরা পেছন থেকে দেখল। আবার আমার মনে পড়ল দুটি লাইন। আমার পিতার মানে ছোটকর্তার নোট খাতায় আছে,

He that is down need fear no fall

He that is low no pride.

লাইন দুটির পাশে ছোট্ট নোট, শ্রীচৈতন্যর উক্তি, তৃণাদপি সুনীচেন-র প্রতিধ্বনি। সব মহামানবেরই সমচিন্তা।

রাতে আজকাল আমাকে জাগতে হয়। আমার সঙ্গী বড় অসুস্থ। সে আমার বন্ধু, সে আমার গুরু, সে এক ব্রহ্মচারী। ছোটকর্তা জীবনের শেষদিকে বাড়ি এলেন একদিন কোলে একটি কুকুরছানা নিয়ে। বাদামি রং। মিষ্টি মুখ। প্রথম থেকেই সে আমার কাছে শুত। লেপের তলায় কোলের কাছে। ভাবত আমিই তার মা। সারারাত আমার পাজামার দড়িটা চুষত। সেই কুকুর ক্রমে বড় হল। বড় মানে বিশাল বড়। তেমনি তার তেজ। আমাদের দুঃখসুখের সাথী। একটু এ পাশ, ও পাশ হবার উপায় ছিল না। ছোটকর্তাকে বার সাতেক কামড়েছিল আমাকে বার তিনেক। তার মধ্যে একবার প্রবলভাবে। কুকুর বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, বড় মুডি কুকুর। কুকুরটি ছিল পুরুষ। জীবনে স্ত্রী সঙ্গ করেনি। আজীবন ব্রহ্মচারী। শেষটায় সন্ন্যাসীব মতো হয়ে গিয়েছিল। কুকুরটার নাম রেখেছিলেন টম। টম তিনবার তিনতলার ছাত থেকে লাফ মেরেছিল বাগানের গোরু তাড়াতে। প্রথমবাব লাফ মারায় সামনের পা ভেঙে গেল। মুখে এমন লাগল, একমাস স্বরবন্ধ। কম্বল জড়িয়ে তাকে তুলে এনে বিছানায় শোয়ালুম। কারওকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, এমনকী ডাক্তারকেও নয়। ডাক্তারবাবু দূর থেকে চিকিৎসা করে গেলেন। ওই অবস্থায় ছোটকর্তাকে সামনে দেখে বিছানা থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোচ্ছে। বুকের ওপর দু'পা তুলে আদর জানাবে। সে-যাত্রা সেরে উঠল। ছাতের পাঁচিল উঁচু করা হল। বছর না ঘুরতেই আবার লাফ। এবার পড়ল গাছের ডাল ভেদ করে। কম লাগল; কিন্তু চোট লাগা পা-টা আর একটু জখম হল। পাঁচিল আরও একটু উঁচু করা হল। লাফও তেমনি বড় হল। তৃতীয়বার পড়ল বারান্দার ছাতে। এই শেষ পতনে সে খুবই কাবু হয়ে গেল। উচ্চতার বোধ এল। তার আর লাফাবার ক্ষমতা রইল না। ছোটকর্তা ঠাকুরঘরে পুজো করতেন, টম বসে থাকত দরজার বাইরে। প্রসাদ খাবে। শাঁখ বাজলে টমও শাঁখ বাজাত মুখে। টম ছিল ছোটকর্তার অতন্দ্র প্রহরী।

ছোটকর্তা অসুস্থ হলেন। জীবনের প্রথম ও শেষ অসুস্থ। তাঁর খাটে উঠে স্থির হয়ে বসলেন। নৌকো যেন ঘাটে বাঁধা হল। তিনি আসন করে বসলেন। দুরারোগ্য ক্যান্সার। খাদ্যনালিতে। নাকে একটা নল পরানো হল। সেই নলে চালান হত তরল খাদ্য। ঘর ভরে আছে গুণমুগ্ধ মানুষে। সেই সমাবেশে আছেন সাধু-সন্ত, গায়ক-গায়িকা, আছেন চিকিৎসক। গান হচ্ছে, পাঠ হচ্ছে। রঙ্গ রসিকতা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে, বিতর্ক হচ্ছে। আর ছাতের সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে আছে টম। সেইখান থেকে স্পষ্ট দেখা যেত ছোটকর্তার ঘর। ডগ-গেট দিয়ে আটকানো না থাকলে সে সোজা নেমে আসতে পারত। ওইখানে বসে বসেই সে ছোটকর্তার চলে যাওয়া দেখল। ছোটকর্তাকে যখন ধরাধরি করে নীচে নামানো হল, টম তখন তার নাকটা গেটে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। দু চোখে জলের ধারা। ধীরে ধীরে ছাতে উঠে গিয়ে শাঁখ বাজাতে লাগল আকাশের দিকে মুখ তুলে। ছাতই হল তার আশ্রয়। নির্জন নিরালা ছাতে একা একা ঘোরে। সূর্যাস্তের সময় চুপ করে বসে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ঠাকুরঘরের সামনে পাহারা দেয়। মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকে। নীচে নামাতে চাইলেও নামে না। একদিন কী খেয়াল হল, নেমে এল ছোটকর্তার ঘরে। সারা ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখল। ঘরের মাঝখানে বসে তাকিয়ে রইল শূন্য খাটের দিকে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল ছাতে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সেইদিন ছিল ছোটকর্তার মৃত্যুদিবস।

সেই টম আজ মৃত্যুশয্যায়। সামনের দুটো পা পড়ে গেছে। উঠতে পারে না। সব দাঁত পড়ে গেছে। তার তীক্ষ্ণ কান নষ্ট হয়ে গেছে। চোখ দু'টো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পা দুটো পড়ে যাবার আগে তার ঘাড়টা বেঁকে গিয়েছিল। সেই বাঁকা ঘাড় নিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, চারপাশে কী হচ্ছে! পৃথিবী তাকে ফেলে কেমন করে এগিয়ে যাচ্ছে! হাঁটার শক্তি ছিল না, তবু চেষ্টা করত হাঁটার আর উলটে উলটে পড়ে যেত। আমি তাকে তুলে দাঁড় করাতে করাতে বলতুম, 'টম আস্তে, আস্তে, অত তাড়াহুড়ো করে! তোমার বয়স হয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর চলে গিয়েছিল। সে করুণ চোখে তাকাত আমার দিকে অজস্র প্রশ্ন নিয়ে। আমি যে ছ'ফুট পাঁচিল অক্লেশে লাফিয়ে পার হয়েছি। আমি যে ঝড়ের বেগে একসময় ছুটেছি। ভারী গলায় কত ধমকেছি! এখন কেন পারছি না! এমনকী, তোমাকে দেখে আনন্দে আমার যে লেজ নাড়া, সেটাও তো আসছে না! আমি এক নীরব নির্বাক সময়ের স্তূপ।

দুঃখ কোরো না টম। এইরকমই হয়। সব প্রাণীরই শেষটা এইরকম। জরা এসে যৌবনের গলা টিপে ধরে। তোমার আয়ু তো তুমি শেষ করে বসে আছ টম। তোমার ষোলোবছর হয়ে গেছে। এ তো তোমার বর্ধিত বাঁচা। তুমি ব্রহ্মচারী ছিলে বলে এ তোমার আয়ুর পুরস্কার।

একটা রবার ক্লথে টম শুয়ে আছে মুখ থুবড়ে। সামনের অবশ পা দুটো পেতে রেখেছে। বৃহৎ একটা গিরগিটির মতো পড়ে থাকার ভঙ্গি। একটা ইউরিন ব্যাগ এনে লাগিয়ে দিয়েছি। তরল ছাড়া কিছুই সে খেতে পারছে না। কখনও স্যুপ খাওয়াচ্ছি, কখনও দুধে সন্দেশ গুলে দিচ্ছি। আগে মুখের কাছে ধরলে মাথাটা অতি কষ্টে তুলে খেতে পারছিল। এখন আর তাও পারে না। চামচে করে খাওয়াতে হচ্ছে। গলা পড়ে গেলেও একটা শব্দ করতে পারে। কান্নার শব্দ। অস্বস্তি হলেই মানুষের মতো কাঁদে। কখনও আচ্ছন্ন, কখনও সজাগ। মানুষ হলে বুঝতে পারত, কী হতে চলেছে! টম বুঝতে পারে না। কপালের দিকে চোখ তুলে তাকায়। নীরব প্রশ্ন কী হল বলো তো! কোথায় গেল আমার সেই দিন! আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। কোথায় গেল আমার সেই দিন।

রাতে টম বার কতক কাঁদে। হয় জল তেষ্টা পায়। নয়তো তার মনে পড়ে যায় অতীত দিনের কথা! নয়তো তার প্রয়োজন হয় বেডপ্যানের। এক বৃদ্ধের সেবায় আর এক বৃদ্ধ! মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকলেও সময় চলছে। একটু আগেই টমকে পাউডার মাখিয়েছি। দু'চামচ গ্লুকোজ খাইয়েছি। এখন আমার একটু বিশ্রাম।

বুকে হাত রেখে শুয়ে আছি। হঠাৎ চোখ চলে গেল সেই পুতুলটার দিকে। যত্নে রেখেছি। একটা স্মৃতি। সেই কোন শৈশবে আমার বাল্যসঙ্গিনী এটি উপহার দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কয়েক দিন ঝাড়া মোছা হয়নি। তাক থেকে পুতুলটিকে নামিয়ে আনলুম। ফাঁপা একটা পুতুল। রঙের জেল্লা অনেক কমে এসেছে। তা পুতুলটারও তো কম বয়স হল না! হঠাৎ নজরে পড়ল পুতুলটার ভেতরে একটা কাগজ গোঁজা। তলার ফাঁপা ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। আশ্চর্য! এতদিন কেন নজরে পড়েনি। আঙুল ঢুকিয়ে কাগজটা বের করে আনলুম। এক টুকরো কাগজ। মাটির আবরণে থাকার ফলে কাগজটা বয়সের হাত এড়াতে পেরেছে। কিছু একটা লেখা আছে। চশমাটা চোখে লাগিয়ে পড়ার চেষ্টা করলুম। গোটা গোটা অক্ষরের একটি মাত্র লাইন—'আমি গীতা।'

পুতুলটা একসময় ছিল লাল টুকটুকে একটা বউ। ঝুলনের মেলা থেকে গীতা কিনেছিল। 'আমি গীতা।' কোথায় সে? কোন আকাশের তলায়! বহুকাল আগে এ-পাড়ার বসবাস গুটিয়ে তার মামারা চলে গেছেন। তারও আগে চলে গেছে গীতা তার মায়ের সঙ্গে। আর তো তার কোনও খোঁজ রাখিনি। মেজকর্তাকে আবদার করেছিলুম গীতাকে আমি বিয়ে করব। কাগজটা সাবধানে আবার ঢুকিয়ে রাখলুম। 'আমি গীতা।' 'আমার গীতা।' রংচটা পুতুলটার মূল্য আরও বেড়ে গেল। আমার শৈশব প্রেমের মনুমেন্ট।

ঝেড়ে মুছে পুতুলটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলুম। টম এখন ঘুমোচ্ছে। আবার আমি ফিরে এলুম আমার বিছানায়। আমি এখন সত্যিই একটা গোরু। রোমন্থন করি। আমার গলকম্বলে জমা আছে জীবনের যত ঘটনা। মনের দাঁতে সেই সব স্মৃতি আমি চিবোই। গীতাকে খুঁজে বেড়াই মনে মনে।

কোথায় কার ঘরে সুগৃহিণী হয়ে বসে আছে। রাখালের মতো সংসার চালাচ্ছে! কি ছবি হয়ে দেয়ালে ঝুলছে। যদি কোনওভাবে একবার দেখা হত তার সঙ্গে? সে আর হবার নয়। এ জীবনটা এইভাবেই গেল। কোথায় আমার বোসদা!

সে বেশ হল! গোটা পনেরো গল্প আমি লিখেছিলুম। আদর্শবাদী বেহিসাবি এক প্রকাশকও পেয়েছিলুম। নতুন লেখককে সাহিত্যের আকাশে তিনি নক্ষত্র করবেন। একটা সংকলন বেরোল। বইটা উৎসর্গ করেছিলুম বোসদাকে। বই, মিষ্টি, ফুলের মালা নিয়ে খুঁজে খুঁজে গেলুম। সে এক বাড়ির ভেতর বাড়ি পদ্মপুকুরে। বেল বাজালুম। বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণী দরজা খুলল। চোখে সোনালি চশমা। বোসদার কথা জিজ্ঞেস করলুম। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি বোধহয় অনেক দিন পরে আসছেন?'

'আমি তাঁর সঙ্গে একসময় কাজ করতুম।'

'জ্যাঠামশাই তিন বছর হল মারা গেছেন।'

সময়টা সন্ধে সন্ধে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

মেয়েটি বললে, 'ভেতরে আসবেন?'

'আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?'

'তিনি যে বিয়ে করেননি।' মেয়েটি অসহায়ের মতো বললে।

'আচ্ছা, তাঁর কোনও ছবি আছে?'

'তা আছে।'

দেয়ালে বোসদার একটি বড় ছবি। সেই মুখ টেপা হাসি। ফিসফিস কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম, 'তোমার বই বেরোল বুঝি?'

আমি মালাটা ছবিতে পরিয়ে দিলুম। বই আর মিষ্টির প্যাকেটটা টেবিলে রেখে প্রণাম করলুম। মেয়েটি বইয়ের মলাটে আমার নামটা পড়েছে। সে বললে, 'জেঠু আপনার নাম প্রায়ই করতেন।'

'কী হয়েছিল তাঁর?'

'লাং-ক্যান্সার।'

আমি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলুম। জানা থাকলে বোসদার নামের আগে ঈশ্বর বসাতুম। বোসদার উচিত ছিল আমাকে একটা চিঠি লেখা। পর মুহূর্তেই মনে হল, আমার ঠিকানা তো তাকে দেওয়া হয়নি। আমি এক মূর্খ! ভেবে বসে আছি, আমাকে যাঁরা ভালবাসতেন তাঁরা সব অমর।

ওই এক বইয়েতেই আমার সাহিত্য অপকর্ম শেষ। এই বোকা লেখকেরও বোকা পাঠক ছিল। পঁচিশ কপি বিক্রি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এক পাঠিকা প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। এখন ভাবলে হাসি পায়। বিশাল জগৎ সময় সময় কেমন ছোট হয়ে আসে!

রাত প্রায় দুটো বাজল। বৃদ্ধরা কেন যে রাতে ঘুমোতে পারে না! আরও একটা দিন চলে যাবার ভয়ে কি? মহামূল্য গুটিকয় দিনের মোহর আগলে বসে আছি এক যক্ষ। তস্কর মহাকাল রোজ একটি করে তুলে নিয়ে যাবে তা কি হয়! সামান্য সঞ্চয় আমার! শরীরে শক্তি থাকলে একবার মধুপুরে যেতুম। সেই বাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ। সামনের দিকটা আছে। জঙ্গলাকীর্ণ। পেছন দিকটা ধসে গেছে। শেষবার গিয়ে ছোটকর্তা আর মুকুজ্যেমশাইয়ের ছবি ঝুলিয়ে এসেছিলুম। শক্তি থাকলে সায়েবগঞ্জেও একবার যেতুম। দুটো পাহাড়ের মাঝে শীত শুকনো সেই অজানা নদীর মোরাম বিস্তার। ছোটকর্তা ডাকছেন, বিলু। পাহাড়ে পাহাড়ে খেলা করছে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। যেতুম মান্দারহিলে। সেই বাড়ি। সামনে খোলা প্রান্তর। দাওয়ায় বসে সকালে গান ধরেছে হৃষ্টপুষ্ট এক বালক তীব্র সুরে। ছোটকর্তা ধরেছেন এসরাজ। শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, মুরলি বাজাকে আও। দেহাতি মানুষেরা সামনে বসে পড়েছে। অবাক কাণ্ড। বাচ্চা ছেলে গান গাইছে। কত জায়গায় যে যাবার ছিল! পুরীর সমুদ্রসৈকতে গিয়ে পদচিহ্ন খুঁজতুম। যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের পদচিহ্ন।

কালো পালিশ করা ছোটকর্তার এসরাজ শুয়ে আছে ছোটকর্তার খাটে। প্রাণহীন ছড়ি তার পাশে। ওই তারে শেষ যে-গান বেজে নীরব হয়ে গেছে,

দিন ফুরাল হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী ॥
ভোলো সব ভব ভাবনা,
হৃদয়ে লহো হে শান্তিবারি ॥

একবার উঠলুম। দেখি আমার টম কী করছে! অন্যদিন সে এইসময় একটু জলের জন্যে কাঁদে। এ কী! তার দীর্ঘ-শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কোথায়! এত নিথর কেন? জোর আলোটা জ্বালালুম। ধীরে ধীরে চাপাটা সরালুম। টম চলে গেছে নিঃশব্দে। দরজা না খুলে, পাঁচিল না টপকে চলে গেল। ঘষা কাচের মতো চোখ দুটো স্থির। শেষ জলটুকু আর দেওয়া হল না। দুটো সন্দেশ কাল ভোরে দোব বলে রেখেছিলুম। পড়েই রইল। পায়ে একটা বেডসোর হয়েছিল। সন্ধেবেলা ড্রেস করে বেঁধে দিয়েছিলুম। সেইটা খুলতে লাগলুম। আমার গলা বুজে আসছে। জীবনের শেষ সঙ্গী চলে গেল। এই শিথিল পায়ে একদিন কত শক্তি ছিল। এই কণ্ঠে একদিন কত গর্জন ছিল! এই চোখে কত ভালবাসা ছিল! এই মনে কত বিশ্বস্ততা ছিল! এই দেহে কত উত্তাপ ছিল! এখন বরফ শীতল!

ইউরিন ব্যাগটা খুলে নিলুম। কিছু ফুল এনে ছড়িয়ে দিলুম দেহে। দুটো ধূপ জ্বালালুম। তুমি যাও বিশ্বাসী বন্ধু আমার! আমি আসছি। শেষ রাত। আকাশ আলোয় ফাটছে। প্রথমে ভাবলুম কবর দোব। একটা টগরের গাছ লাগাব তার ওপর। পরে মনে হল, না, দিয়ে আসি গঙ্গায়। তুলতে পারব কি! না, ভুগে ভুগে না খেয়ে খেয়ে হালকা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা হলে চলো।

বহুকাল পরে পেছনের দরজাটা খুললুম। ক্যাঁচ শব্দ করে একটা পাল্লা ঝুলে পড়ল। ফুল ফোটার মতো ভোর ফুটেছে। দিনের কুঁড়ি ক্রমশই খুলছে। এই সেই পথ, যে পথে বড়মা, ছোটমা, আর বিলু বেড়াতে যেত। রবার ক্লথ জড়ানো টম আমার বুকে। আমার মাথার পাকা চুল বাতাসে উড়ছে। আমি হাঁটছি। একটা দোয়েল শিস দিচ্ছে। দূরে সেই মাঠ। গাছের জটলা। ভোরের গঙ্গার জল চিকচিক করছে। ভ্রমণার্থী, স্নানার্থী কেউই নেই। সব আসবে একটু পরে। পারঘাটের ঘুমন্ত নৌকো ঢেউয়ের কোলে দুলছে। জোয়ার এসেছে। টমকে ধীরে শুইয়ে দিলুম জলের বিছানায়। কয়েকটা বুদবুদ তুলে সে তলিয়ে গেল। খরস্রোতে ভেসে গেল রবার ক্লথ। বিশাল একটা ফরমানের মতো। আমি সেই পাথরটার ওপর বসলুম। পৃথিবীর কলরব ফুটছে। মন্দিরের প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠল।

একটু জ্বর জ্বর লাগছে। পাথরটা কী শীতল!

ভোরের পাখির মতো ফুটফুটে একটা মেয়ে এল তার মায়ের হাত ধরে। কাচের মতো চোখ। মেয়েটা এপাশে ওপাশে খানিক দৌড়োদৌড়ি করে, হঠাৎ আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, 'হ্যাগো, তুমি এখানে চুপটি করে বসে বসে কাঁদছ কেন? তোমার মা বকেছে বুঝি?'

'কই, আমি তো কাঁদিনি মা।'

'তা হলে তুমি হাসছ বুঝি!'

মেয়েটি ছুটে চলে গেল ফুলপরির মতো। যাঁরা আমাকে বলেছিলেন তুমি সব পারবে, তাঁরা তো সব একে একে আমাকে ফেলে চলে গেলেন। ছোটকর্তা ছাড়া কেই বা হাসতে হাসতে যেতে পারলেন। তাঁরা তো বলেছিলেন সব পারবে, এ কথা কি বলেছিলেন, তুমি হাসতে হাসতে শান্তির কোলে ঢলে পড়তে পারবে। পারলুম কি সেই মহাবাণী অনুসরণ করতে,

তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হাসে তোম রোয়।
অ্যায়সে কর্ণি কর্‌চলো কি, তোম্ হসো জগ রোয় ॥

কামিনী কাঞ্চন
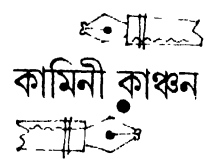
আমার নাম তারক সরকার। সবাই আমাকে বলে গুছাইত। কেন বলে তা আমি জানি। আমি গোছানোর মাস্টার। যেখানেই যাই, সেখান থেকে বেশ গোছগাছ করে আনি। নিজের ফিউচার ছাড়া কিছুই বুঝি না, বুঝতেও চাই না। যেখানেই ধান্দা, সেখানেই এই বান্দা। এই যে আমাকে গুছাইত বলে, আমার কোনও লজ্জা নেই। আদর্শ! গুলি মারো। চরিত্র! ফেঁড়ে ফেলো। সম্পর্ক! মারো কিক। নিজের স্বার্থ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই নেই। গোছগাছ করো ভাই, চুটিয়ে বাঁচো ভাই।

মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, আমি কোনও মহাপুরুষ নই তো! অবতার-টবতার। আমার শৈশবের যে সব লীলা, মানে বাল্যলীলার কথা লোকমুখে শুনতে পাই, সে তো সাংঘাতিক কথা। লো-ভল্টেজের শ্রীকৃষ্ণের মতো। পুতনা বধ, অঘাসুর বধ, দামবন্ধন, গিরি গোবর্ধন ধারণের মতো না হলেও, প্রায় কাছাকাছি যায়। আমার বাবা-মাকে সব সময় অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম। স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ হবার সুযোগ দিইনি। সেটা শুরু হয়েছিল আমার হামার কাল থেকে।

আমার বাবার কিছু বিটকেল নেশা ছিল। তার মধ্যে একটা হল মাছ ধরা। সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। সারা সপ্তাহ দশটা পাঁচটা। রবিবারটা ছিল তাঁর মাতনের দিন। মারকাটারি করার বার। বাড়ির কাছেই একটা ডোবা ছিল। বাবা বলতেন সরোবর। ১৯০৫ সালে দয়ারাম ঘোষের আমলে ওটা ছিল পদ্মদিঘি। ইতিহাস বলছে। অতএব এখন ডোবা হলেও ওর চরিত্রটা সরোবরের। সেই সময় ওতে কালবোস মাছ ঘাই মারত। গভীর রাতে একটা গাইয়ে মাছ সাঁ সাঁ করে বাঁশি বাজাত। পূর্ণিমার গভীর রাতে মাঝপুকুরে অনেকের কমলে কামিনী দর্শন হয়েছে। দর্শনের পর তাদের ভাগ্য ফিরে গেছে। অপুত্রের পুত্র হয়েছে। নির্ধনের ধন।

বাবা সেই ডোবায় মাছ ধরতে বসতেন। মন্দ লোকে বলত বিশ্বনাথ সরকার মাছ ধরার নাম করে অন্য জিনিস ধরত। ধরত চোখ দিয়ে। ডোবার ওপারে একদল খারাপ মেয়েমানুষ থাকত। তাদের সাজপোশাক খোলামেলা। কেউ কেউ সিগারেট টানত। ধেনো খেয়ে টালমাটাল নৃত্য করত। নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি খেস্তাখিস্তি করত, আর বিশ্বনাথ হাঁ করে দেখত। সরকারদের নাকি ওইটাই ছিল ট্র্যাডিশান। দু'পুরুষ আগে বাঘা সরকার নিজের জমিতে ওদের বসিয়ে ছিলেন। পা বাড়ালেই পান ভোজন, খেমটা নাচের আসর। রঙ্গরস। লোকে তো কত কী বলে! কান দিলে চলে।

এ হল সাইড টক। আসল কথায় আসি। আমার হামার কথা। হামালীলা। টোপগাঁথা বঁড়শি পড়ে আছে। মাছ ধরতে যাবেন তিনি। শিশু তারক গলগলে হামা দিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে টোপসুদ্ধ বঁড়শিটা গিলে ফেলল। ছোটদের স্বভাব হল, সব জিনিস চেখে দেখা চাই। আচ্ছা, দেখলি, টোপসুদ্ধ মালটা গিলে ফেললেই পারতিস। তা তো হবে না। তারক সরকারের সব কাজই বেশ গুছিয়ে। এইবার সে সুতো ধরে মারল টান। বঁড়শিটা আটকে গেল টাগরায়। এইবার শুরু হল তার হামা দিয়ে গৃহ প্রদক্ষিণ। চার হাত পায়ে তারক চলেছে, পেছন পেছন চলেছে সুতোয় বাঁধা সরু ছিপ। খড়খড় করে আসছে। ঝাঁটা, জুতো, পাপোশ সব নিয়ে আসছে টানতে টানতে। তারকের পেছন পেছন যেন মিছিল চলেছে। অবশেষে দরজার খাঁজে চলমান ছিপ আটকে গেল। ছিপে মাছ ধরে। এ যেন মাছে ছিপ ধরেছে। সুতোর টানে বঁড়শি বেশ গদগদে হয়ে গলায় গেঁথে গেল। তখন তারক তার বিখ্যাত গলায় কেঁদে উঠল।

তারক তারস্বরে অষ্টপ্রহর চেল্লাবে, এ আর নতুন কথা কী। একালের প্রেশার কুকার যেমন তিনবার সিটি না মারলে মেয়েরা ছুটে আসে না, সেইরকম তারকের কমপ্রেসড কান্নায় যতক্ষণ না

বাইরের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই উদাসীন। তারকের মা একটু ল্যাদাডুস মতো ছিলেন। নির্ভেজাল ভালমানুষ। কাছা-কোঁচার ঠিক থাকত না। এই আঁচল খুলে পড়ছে। সায়া নেমে যাচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে ঘটি ওলটাচ্ছে। বাটি ঠিকরোচ্ছে। তেলের জায়গা কাত মারছে। সারাদিনে তিন-চারবার জানলায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে। বঁটিতে আঙুলের মাথা কেটে যাচ্ছে। ভুলে গরম চাটু খালি হাতে ধরতে গিয়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। ফ্যানে পা পড়ে কাটা কলাগাছের মতো উলটে পড়ে যাচ্ছে। সারাদিনই এক উস্তমখুস্তম ব্যাপার তারকের মায়ের। সেই আত্মভোলা মায়ের ছেলে তারক। শোনা যায়, তেরো বছর বয়সে তারকের মা চম্পার ভর হত। শনিবার, মঙ্গলার মা মঙ্গলচণ্ডী ঘাড়ে এসে চাপতেন। পাড়ার লোক একেবারে ভেঙে পড়ত। মা-মাগো! ক্যাঁত করে আমার স্বামীটার মুখে বাঁ পায়ের একটা লাথি মারো মা, জন্মের মতো ধেনো খাওয়া ঘুচে যাক। মা, আমার ছেলেটার রেলে চাকরি লেগে যাবে মা! শত শত বায়না। চম্পা হেলছে, দুলছে। ফুল ছুড়ছে। চোখ জবা ফুল। গায়ে ফুল পড়লেই অভীষ্ট লাভ। পটলার মা বড় জ্বালাচ্ছে জননী। কাছে গেলেই ঘেয়ো কুত্তার মতো কামড়াতে আসে। বশীকরণের একটা জবা দে মা। বিলেত ফেরত ডাক্তার বললেন, পিউবার্টি। মেয়ে আপনাদের সঙ্গীর অভাবে অমন করছে। আপাতত কিছুদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখুন। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আর নো ডিম। ডিম ছুঁতে দেবেন না।

সবাই বলে, ওই উঠতি বয়সে, গাদা গাদা ঘুমের বড়িই চম্পাকে অমন হুঁশো করেছে। এক করতে আর এক করে। উত্তর-পশ্চিম জ্ঞান নেই। সেই চম্পা এসে দেখলে, ছেলের মুখে মাছধরা সুতো। দরজার ফাঁকে আটকে আছে ছিপ। ছেলে পরিত্রাহি চেল্লাচ্ছে। সুতোর মাথাটা চলে গেছে গলার ভেতরে।

এ কী রে! কী সর্বনাশ!

মা যত চেল্লায়, ছেলেও তত চেল্লায়। হইহই, দক্ষযজ্ঞ। তারকের বাবা তখন টিনের চালায় লাউগাছ তোলার কাজে ব্যস্ত। তিনি ভাবলেন, তাঁর করিতকর্মা বউ তেলের শিশির মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বসে আছে। সম্প্রতি এই কাণ্ডটি চম্পার জীবনে ঘটে গেছে। আঙুল ঢুকেছে বেরোচ্ছে না। তারকের বাবা বলছেন, তবলাবাঁধা হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকে ভেঙে বের করে আনো। তারপর, সেই সেইরকম, টিংচার আইডিন লাগিয়ে দাও।

শেষে হড়কে নেমে এসে দেখলেন, মামলা অন্যরকম। একেবারে ক্যাডাভ্যারাস কেস। খুব চিন্তার বিষয়। এদিকে, গ্রামে গ্রামে বার্তা রটি গেল ক্রমে। তারকের বাবা মাছের বদলে ছিপে ছেলে ধরেছে। ডোবার ওপারের ডবকা মেয়েরা ছুটে এসেছে। তাদেরই মধ্যে একজন বুদ্ধি করে কাঁচি দিয়ে আগে সুতোটা কেটে দিলে। ছিপ থেকে ছেলে আলাদা হল। সামান্য একটুকরো সুতো মুখের বাইরে লকলক করতে লাগল সাপের জিভের মতো। এইবার আসল সমস্যার কী হবে! বঁড়শি তো গলায়।

তারকের বাবা কিছুক্ষণ কী হবে, কী হবে, কী করা যায়, বলে দাপাদাপি করে সিদ্ধান্তে এলেন—জলে মাছ অনেক সময় গলার বঁড়শি খুলে পালায়। তা একে জলে ফেলে দেখলে কেমন হয়!

যে মেয়েটি এতক্ষণ কসরত করছিল, সে বললে, 'আহা বাপের কী বুদ্ধি! যেন বৈকুণ্ঠের ষাঁড়। দুটো চামচে আনো। উঠনময় ভৈরবের মতো দাপিয়ে না বেড়িয়ে।'

চামচে এল। সেই মহিলা তার ডুরে শাড়ি পরা কোলে তারককে ফেলে হাঁ করাল। একটা চামচে দিয়ে ঠেলে রেখে, আর একটা চামচের হাতল দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় টাগরা থেকে সেই বঁড়শিটা তুলে নিয়ে এল। ছেলের চিল চিৎকার। মায়ের কোলে ছেলেকে তুলে দিয়ে মহিলা হেঁকে বললে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে মাইটা মুখে গুঁজে দাও না। সব ফ্যাশানের মা হয়েছে!'

কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে তারকের বাবাকে বললে, 'ছেলে তো এখুনি কেলিয়ে যেত। তোমার ওই ডোবার মাছ ধরা আর কতদিন চলবে!'

তারকের বাবা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললেন— 'আমার সাক্ষাৎ জগদম্বা।'

মহিলা বললেন— 'মরণ আমার।'

তারকের ফ্যামিলি সার্কলে এই কাহিনিটি প্রায়ই ঘুরে ঘুরে আসে। যারা সাহস করে আর এক ধাপ এগোতে পারে, তারা বলে, তোর বাবা একটা মাছ ধরেছিল বটে! সেই জগদম্বার সঙ্গে সেই রাত থেকেই হলায়গলায়। হরির দোকানের কাটলেট, ভজুয়ার দোকানের মালাই। কেবল বাজি পোড়ানোটা বাকি ছিল। গোলাপি সিল্কের শাড়ি, শাটিনের কাঁচুলি। ঝুমুক ঝুমুক ঝুমুর বাজে, পাছা দুলিয়ে ডালিম নাচে।

এ তোমার কী অধঃপতন বিশ্বনাথ।

ওই তো তারকের আসল মা। ভিক্ষে মা। জীবন ভিক্ষে দিয়েছে।

চম্পা সরকার ফ্যালফ্যাল করে দেখে। আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। মায়ের শুভানুধ্যায়ীরা যখন বলতেন, একটা দক্ষযজ্ঞ লাগাতে পারছ না। মেয়ে হয়ে জন্মে করলেটা কী! তোমার না আইবুড়ো বেলায় মঙ্গলচণ্ডীর ভর হত! এক ছেলেতেই আশ মিটে গেল!

মা বলত, ভৈরব, ভৈরবী নিয়ে সাধন ভজন করছে করুক না। যার যাতে সুখ।

প্রতিবেশিনীরা বিরক্ত হয়ে চলে যেত। যে নিজের ভাল চায় না, তার সর্বনাশ কে আটকাবে!

বিশ্বনাথ সরকার রেল কোম্পানির গুদোমের বড়বাবু। হেড গুডস ক্লার্ক। কাঁচা পয়সা। এদিকে উড়ছে, ওদিকে উড়ছে। সবাই বললে, তারক বেটা অবতার। বঁড়শি গেলাটা ছিল ওর ছল। আসলে ওটা ওর কৃপা। এক পতিতাকে কৃপা করতে চেয়েছিল। ও হল মঙ্গলচণ্ডীর ছেলে। ওর গলার বঁড়শি খুলে একজনের কপাল খুলে গেল। বিশ্বনাথ সরকার তাকে আলাদা বাড়িতে রেখে পুষছে। মদ ধরেছে। ভুঁড়ি নেমেছে। আবার কেউ কেউ বললে, ছেলেটার জন্যে বাপটা বখে গেল। ডোবার এপারে বসে দেখত, ওপারে যাওয়ার সাহস ছিল না। সে বরং ছিল ভাল, এখন তো বাড়িতেই থাকে না।

তারক এইবার তার দু'নম্বর লীলা দেখাল। বেশ চড়কো হয়েছে। পাকা পাকা বুলি শিখেছে। হুটোপাটির প্রতিভা বেড়েছে। কড়াধাতের মানুষ বলছে, ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে গেল। একটা এঁচোড়ে পাকা অসভ্য ধরনের জীব তৈরি হচ্ছে। ধ্যাসকা মা, চৌঘুড়ি বাপ। দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। ইট ছুড়ছে, জল ছিটোচ্ছে, কেড়েবিগড়ে খাচ্ছে, লাথি মেরে সব উলটে দিচ্ছে। কারও বাড়িতে গেলে সবাই তটস্থ। দেখ-তো না-দেখ সব লন্ডভন্ড। সেদিন চাটুজ্যের অলওয়েভ রেডিয়োটার দফারফা করে এসেছে। মানুষরূপী জানোয়ার।

এ কথাটা অবশ্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া সহজ নয়। কেউ কেউ বললে, দাঁড়াও আমরা একটু শাস্ত্র-পুরাণ ঘেঁটে দেখি। না, আমরা মানতে পারছি না। মহাপ্রভুও শৈশবে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। আচ্ছা বউমা, এই পুত্রটি তোমার গর্ভে আসার আগে তোমার কোনও স্বপ্নদর্শন হয়েছিল?

একটা গন্ডার তেড়ে আসছিল।

গন্ডার? ষাঁড় নয়! ষাঁড় মহাদেবের বাহন। গন্ডার কোন দেবতার বাহন?

ডিকশেনারি দেখতে হচ্ছে। ডিকশেনারি নয়, দেখতে হবে অমরকোষ। না, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

মাথা নেড়ে সুপণ্ডিত বললেন, পাশ্চাত্য প্রাচ্যের এই সমস্যায় আলোকপাত করতে পারবে না। সমাধান আমার কাছে। গন্ডার আর কচ্ছপে বিশেষ তফাত নেই। কচ্ছপ উঠে দাঁড়াতে পারলেই গন্ডার। কচ্ছপের পিঠ আর গন্ডারের পিঠ প্রায় একই রকম। চালের মতো। গন্ডারকে থেবড়ে বসাতে পারলেই কচ্ছপ। কচ্ছপ মানে কূর্ম। কূর্ম অবতার। কূর্মাবতার। সরকার বংশে সেই কূর্মাবতার আবির্ভূত হয়েছে। ইনি সৃষ্টিকে রক্ষা করবেন।

বলো কী ভায়া! এ তো সাক্ষাৎ প্রলয়! যেখানে যাচ্ছে সব লন্ডভন্ড করে চলে আসছে।

তাই তো হবে। প্রলয়ের পর সৃষ্টি। সৃষ্টির পর প্রলয়। পড়োনি, প্রলয়পয়োধি জলে, কূর্মাবতার খেলা করে।

মহামানব তার দ্বিতীয় লীলাখেলাটি দেখাল ঘোষালদের বাড়িতে। বড়লোক। সাজানো গোছানো ঘরদোর। বিশাল শোওয়ার ঘর। জামদানি খাট। ঝালর ঝোলর চাদর। টেবিলে কাজকরা টেবিলক্লথ। দেয়ালে বড় বড় ছবি। তারক সরকার তখন নানারকম হাতের কাজ শিখেছে, তার মধ্যে একটা হল দেশলাই জ্বালানো। ঘরে কেউ কোথাও নেই। টেবিলের ওপর একটা ভরতি দেশলাই। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডিঙি মেরে দেশলাইটা নিলুম। একটা কাঠি বের করে খস করে ঘষামাত্রই দপ করে জ্বলে গেল। এইবার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। আগুনের দাহিকা শক্তি পরীক্ষা করার বাসনা। চাদরের ঝোলা অংশে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলুম। ধুস করে ধরে গেল। এইবার শিশু তারক নাচতে নাচতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নীচে মহিলামহল। খুব গল্পগাছা হচ্ছে। খিলখিল হাসি। পানের খিলি ঘুরছে হাতে হাতে। তাস খেলবে বড়লোকের বউরা। তাস ভাঁজাই হচ্ছে। শিশু তারক তখন ঝকঝকে রং করা দেয়ালে নখের আঁচড়ে নকশা কাটার চেষ্টা করছে। হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে চিৎকার— আগুন, আগুন। দোতলার ঘরে আগুন।

শিশু তারককে নিয়ে যে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, সে বললে, পালা, পালা। উলটো দিকের মাঠে দাঁড়িয়ে কূর্মাবতার প্রলয়ের দৃশ্য দেখছে। দোতলার খোলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লকলকে জিভ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল এসে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে। কূর্মাবতারের কী আনন্দ! ধেই ধেই নাচ। আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল। দোতলাটা বেশ লাগদাঁই ভাবে পুড়ে গেল। নীচেরতলা জল থইথই। পাড়ার সবাই বলতে লাগল— অনেকদিন পরে একটা হল বটে। জবরদস্ত একটা কাণ্ড। সেই দশ বছর আগে একবার যাত্রার প্যান্ডেলে আগুন লেগেছিল। এরই মধ্যে ঘোষাল বাড়িতে কিছু লুটপাটও হয়ে গেল। দেয়াল ঘড়ি, দামি মূর্তি। সাহায্য করার নাম করে সব ঢুকল, বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে যা পারলে নিয়ে গেল হাতিয়ে।

কিছুদিন শিশু তারক লীলা সংবরণ করে রইল। তারপর ছোট একটা কেরামতি দেখাল। খেলা করতে এসেছিল পাড়ার একটা মেয়ে। টিনের কৌটো, রান্নাবাড়ার জিনিস, পুতুল, আয়নার টুকরো। উঠনে বসে খেলা হচ্ছে। শিশু তারক কিছুটা চুন গুলে এনে বললে, এই নে খা, মিছিমিছি দুধ। মেয়েটা ঢক করে খেয়েই লাফাতে শুরু করল। ছুটে এল তার বাড়ির লোকজন। ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারকাট ব্যাপার। প্রতিবেশীরা চম্পা সরকারের পিন্ডি চটকে দিলে। ছেলের বাপের তুলো ধোনা হল। দুশ্চরিত্র, ঘুসখোর, চোর। ছেলে নয় তো সিন্ধুঘোটক। এমন ছেলেকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত। মেয়েটাকে কাপে করে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানো হল। সবাই চলে যাওয়ার পর চম্পা সরকার হাউ হাউ করে কান্না জুড়ল। ভগবান এখনও কেন নিচ্ছে না আমাকে। এত লোক যায় আমি কেন যাই না। তখন কূর্মাবতার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল— কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। একটু ছানা খেয়ে নে।

মায়ের জন্যে একটা ভয়ংকর দুঃখ সেই বয়েস থেকেই আমার মনে দানা বেঁধেছিল। মা'র চোখে জল দেখলে আমার মাথায় খুন চেপে যেত। আর সেইজন্যে আমি আমার বাবাকে একদম সহ্য করতে পারতুম না। একটা ভুঁড়িঅলা লোক। পাড়ার সবাই বাবার নিন্দে করত। মেয়েরা সামনে আসতে ভয় পেত। বলত, লোকটার চোখের নজর ভাল নয়। লোকটা নিজের বউকে দেখে না। একটা খারাপ মেয়ের সঙ্গে থাকে। আমার সামনেই বলত। আর আমার চোখে জল এসে যেত। সকলের বাবা কত ভাল। আমার বাবা কেন অমন। ছোট ছোট ইট নিয়ে আমি একটা জায়গায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, আর বাবাকে আসতে দেখলেই ছুড়ে ছুড়ে মারতুম। একটা-দুটো লেগেও যেত। আমার মনে হত, লোকটা একটা দৈত্য। আমাকে ধরার জন্যে তেড়ে আসত। পারবে কেন, আমি পনপন করে ছুটে পালাতুম। আমার ওপর খুব যে একটা ভালবাসা ছিল তাও নয়। দু'-চারবার

ডাকত। তারপর বলত, ধুস্ শালা! আসলে লোকটা নিজেকে ছাড়া কারওকে ভালবাসত না। গপগপ করে খাব, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোব, আর বড় বড় কথা বলব। আমার বাবা যতটা খারাপ ছিল, আমার মা ঠিক ততটাই ভাল ছিল।

শিশু তারক হল কিশোর তারক। তখন জানতে পারল, তার বাবার আর একটা ছেলে হয়েছে। একটা ভয় এল, কবে আমাদের বাড়ি থেকে দূর করে দেয়। মা বলত, খোকা, এইবার আমাদের পথে বসাবে। লোকের বাড়ি ঝিগিরি করে আমাদের খেতে হবে। এই ছিল বরাতে! তুই তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে যা তো!

সেই সময় থেকেই আমার সরকার টাইটেলটা গুছাইতের দিকে বদলাতে শুরু করল। সকালবেলা বেরিয়ে পড়তুম বনেবাদাড়ে। মাকে সাহায্য করতে হবে। কলমিশাক গিমেশাক, ডুমুর, কালো কচু, যেখানে যা পাওয়া যায়, সব ঘাড়ে করে নিয়ে আসতুম। একদিন দেখি বড়লোকের বাগানের বাইরে কলাগাছ কেটে ফেলে দিয়েছে। ভীমের গদার মতো কাঁধে করে নিয়ে এলুম। থোড় হবে। মায়ের মুখে হাসি ফুটত। আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল, আমাদের মতোই দুর্ভাগা। মা সেই শাকপাতা দু'ভাগ করে বলত— যা একটা ভাগ সরলাকে দিয়ে আয়। সরলাকে আমি মাসি বলতুম। স্বামী হঠাৎ মারা গেছেন। কেউ কোথাও নেই। আমার হাত থেকে ওইসব নিতে নিতে সরলামাসির চোখে জল আসত, বলতেন, তোর মা কী রে! দেবী। দেবী না হলে কেউ অন্যের জন্যে এত ভাবে!

সেই বয়েস থেকেই আমার মনে একটা ভরসা এসে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে না দিলে পৃথিবীতে যেভাবেই হোক দিন চালানো যায়। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকলে হবে না খাটতে হবে, ধান্দা বুঝতে হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। গুছাইত হতে হবে। সেই বয়সেই এই শিক্ষাটা আমার হয়ে গিয়েছিল। শরীর ঠিক রাখার ওষুধও শিখে গিয়েছিলুম আমাদের গ্রামের প্রাচীন কালীবাড়ির পুরোহিতের কাছে। তুলসীপাতা, শিউলিপাতা, কালমেঘ আর তেলাকুচো। সেই পূজারি আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। ছ'ফুট দীর্ঘ শরীর। টকটকে ফরসা রং। খাড়া নাক। ভরাট, গমগমে গলা। তাঁর নাম ছিল চন্দ্রবাবু। মন্দিরে পুজোর আসনে বসে যখন মন্ত্র পড়তেন তখন সব কেঁপে উঠত। গমগম করত চারপাশ। আমি বলতুম, চন্দ্রদাদু। চন্দ্রদাদুর কাছেই আমার সময় কাটত। একটু-আধটু ফাই ফরমাশ খাটতুম। ফুল তুলে আন, বেলপাতা পাড়, পুজোর বাসনগুলো একটু ধুয়ে দে। চিঠিটা ফেলে দিয়ে আয় পোস্টবক্সে। ছোটখাটো সব কাজ। ভীষণ ভালবাসতেন বলে ভালও লাগত তাঁর কাজ করতে। অনেক সময় বলতেন, 'শিব, আজ আমার সঙ্গে প্রসাদ খেয়ে যা।' আমার নাম রেখেছিলেন শিব। আমি বলতুম, 'চন্দ্রদাদু, একা তো খেতে পারব না, আমার মা।' আমার চোখে তখন জল। চন্দ্রদাদু বলতেন, 'জীবনে তোর কোনও ভয় নেই রে শিব। তুই যে মাতৃভক্ত। ঠিক মতো ধরে থাক। তোর মায়ের জন্যে প্রসাদ বেঁধে দোব। আয়, হাত লাগা।'

চন্দ্রদাদুর কেউ ছিল না। নিজেই উনুন ধরিয়ে, সব জোগাড়যন্ত্র করে ভোগ রাঁধতে বসতেন। আমাকে যেদিন বলতেন, সেদিন আমি সাহায্য করতুম। ভাঙ কয়লা, নিয়ে আয় গঙ্গাজল। চাল বাছ। মা কালী কলমিশাক খেতে ভালবাসেন। মনে হত পিকনিক হচ্ছে। বিশাল একটা ঘেরা জায়গায় মন্দির, নাটমন্দির, বাগান, গেস্ট হাউস, কোয়ার্টার। কী ভাল লাগত। মনে হত আর বাড়ি ফিরব না। কালীবাড়িতে অনেক শাড়ি পড়ত। চন্দ্রদাদু মাকে সেই শাড়ির একটা-দুটো দিতেন। সবাই বলত, ছেলেটা এই বয়স থেকে ভিক্ষে শিখে গেল! আমার তখন হাসি পেত। কেউ ঘুসখোর, কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ বড়লোকের উমেদার, তারা বলছে ছেলেটা ভিক্ষের লাইনে গেল। তোমরা আমার মাকে খেতে দেবে!

কালীবাড়িতে রবিবার রবিবার অনেক বড় বড় লোক আসতেন। চন্দ্রদাদু খুব ভাল কোষ্ঠী-বিচার করতে পারতেন। নাটমন্দিরে কালীকীর্তন হত। আসত রবিবাবু। খুব নামকরা মানুষ। সবাই বলতেন স্কলার। জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি। বেশ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ ভাব। কালীবাড়িতে

অনেক সুন্দরী বেড়াল ছিল। তাদের বাচ্চারা ছোটাছুটি করে বেড়াত। রবিবাবু তাদের একটা-দুটোকে কোলে নিয়ে বেশ জমিয়ে বসে সকলের সঙ্গে দেশ বিদেশের গল্প করতেন। কেন জানি না, আমাকে বলতেন, বসে বসে শোনো। জীবনে বড় হতে হবে তো। আমি চুপ করে তাঁর পাশে বসে শুনতুম দেশ-বিদেশের কত গল্প, আর মনে মনে ভাবতুম, রবিবাবু যদি আমার বাবা হতেন। চন্দ্রদাদু একদিন রবিবাবুকে বললেন, 'এই চটপটে বুদ্ধিমান সুন্দর ছেলেটাকে আপনার স্কুলে ভরতি করে নিন না। মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই। ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার স্কুল তো এ-পাড়ায় নয়।'

'সে আর কী করা যাবে। একটু কষ্ট করবে। হাঁটবে। ছেলেটা খাটিয়ে আছে।'

'সে আমি ফ্রি করে দিতে পারি, রোজ কিন্তু দু'মাইল হাঁটতে হবে।'

'আপনার কাছে থাকলে ছেলেটা মানুষ হয়ে যাবে।'

'ছেলেটাকে আমারও ভাল লেগে গেছে।'

রবিবাবু হেডমাস্টার। তাঁর স্কুলে ভরতি হয়ে গেলুম। খুব কায়দার স্কুল। ঝকঝকে, তকতকে। অন্য ছেলেরা সব স্কুলের গাড়িতে আসে। আমি ট্যাং ট্যাং করে হাঁটি। খারাপ লাগে না। কত কী দেখতে পাই। কোথাও নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কাঠের গোলায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। ফার্নিচার তৈরি হচ্ছে। কাঠের কুচোর স্তূপ। মেয়েরা বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে। উনুন ধরাবে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মালিককে জিজ্ঞেস করলুম,' আমাকে দেবেন।' আমার বগলে বইখাতা।

মালিক বললেন, 'তুমি কী করবে খোকা।'

'আমার মা তো খুব গরিব। উনুন ধরাবে।'

মোটাসোটা চেহারার মালিক। আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কীসে নেবে?' মনে হল, হাতে যেন স্বর্গ পেলুম। মায়ের কয়লা আর ঘুঁটের খরচ কত বেঁচে যাবে। আমি বললুম, 'তা হলে একটা বস্তা নিয়ে আসি। '

'তুমি কোথায় থাকো খোকা?'

'তা দু'মাইল দূরে।'

'তুমি যাবে এতটা, আসবে এতটা, আবার মোট নিয়ে যাবে এতটা? দাঁড়াও আমি তোমাকে একটা বস্তা দিচ্ছি। কালকে ফেরত দিয়ে যেয়ো।'

আমি অনেকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এত ভাল ব্যবহার করছেন কেন আমার সঙ্গে! বস্তায় কাঠের কুচো তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করলেন কেন?'

মালিক বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। জানো তো আমার ছেলেবেলাটাও তোমার মতোই ছিল। খুব গরিব ছিলুম আমরা। আমি একটা পাঠশালায় পড়তুম। আর সকাল বিকেল একটা গমকলে চাকরি করতুম। লোকের মোট বয়ে দিতুম। যা দু'-চার পয়সা হত, মায়ের হাতে তুলে দিতুম। তাইতেই মা আমার সংসার চালাত। একটু বড় হয়ে রেলের কুলি হলুম। জানো তো, আমার বাড়ি ছিল বিহারে। তোমাকে দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল।'

'তারপরে আপনি কী করে এত বড় হলেন?'

'রামজি আমাকে দয়া করেছিলেন। আমি খুব ভাল কুস্তি করতে পারতুম। খুব ছোলা খেতুম আর ডন বৈঠক মারতুম। তারপর কুস্তির কম্পিটিশানে জিততে শুরু করলুম একের পর এক। মহাবীর প্রসাদ ছিলেন আমার গুরু। কোথাও টাকা দিত, কোথাও সোনার মেডেল। সেইসব মেডেল বিক্রি করে আর জমানো টাকা এক করে চলে গেলুম আসামে। প্রথমে কাঠ চিনলুম, তারপর এই ব্যাবসা।

ছোট থেকে বড়। বড় হতে চাইলে বড় হওয়া যায়, তবে তোমাকে খাটতে হবে। আরাম করলে চলবে না।'

বস্তার মধ্যে কাঠের কুচি, তার মধ্যে আমার বই। হাঁটছি। চড়চড়ে রোদ। মনে মনে গাইছি— কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ভাবছি, মায়ের খুব আনন্দ হবে। দুটো পয়সা বাঁচা মানে, পুজোর জামাকাপড়।

মাথায় চটের বস্তা। কাঠের কুচোর তেমন ওজন থাকে না। হাতে একটা লাঠি। ছপটি মতো। কাঠের কুচোর মধ্যে থেকে পেয়ে গেছি। চলেছে তারক গুছাইত। রেলকোম্পানির মালবাবুর ছেলে। তার একটা ভাই হয়েছে। বাবার ছেলে তো ভাইই হবে। মা সে যেই হোক। সেই ছেলেবেলায় যে বয়েসে আমার গলা থেকে বঁড়শি বের করেছিল, সেই সময়ের কথা আমার তেমন মনে নেই। তবে নানা লোকে যা বলে, আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনেছি— চম্পা, তোমার সব আছে, কেবল একটারই অভাব, তুমি কোনওদিন ওদের মতো বেহায়া হতে পারবে না। অসভ্য হতে পারবে না। মদ খেয়ে মাতলামো করতে পারবে না।

যখন আমি নিজের মনে পথ হাঁটি, আমার মাথায় তখন সব নানারকম ভাবনা আসে। কাঠকলের বিহারীবাবু, আমার মাথায় চিন্তা ঢুকিয়েছেন— বড় হতে চাইলে হওয়া যায়। গরিবও বড় হতে পারে। হেরে গেলে হেরে যাবে। মনের জোর থাকলে জিত। কষ্টকে কষ্ট মনে করলে চলবে না। মনে করতে হবে, কষ্টের পরেই আসে সুখ।

বেলা পড়ে এলেও রোদের তেজ কমেনি। গলগল ঘাম। বাক্স আইসক্রিম যাচ্ছে। ঢগাঢগ শব্দ করে। কখনও কখনও খেতে ইচ্ছে করে। হয়তো একটা-দুটো পয়সাও থাকে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। একা একটা আইসক্রিম খাব। কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্গে আর একটা ছেলে জুটে গেল। তার পিঠে বস্তা। ছেঁড়া কাগজ কুড়োয়। সে আবার বিড়ি ফুঁকছে ফুকফুক করে। সে বললে, 'কাঠের চেয়ে কাগজ ভাল। তুই কাগজ কুড়োবি আর পিচবোট কলে বেচে দিবি। কাঠের কুচিতে কোনও লাভ নেই। কাঠের গুঁড়ো হলে বরফ কল নিত।'

ছেলেটা সমানে বকবক করলেও, চোখ পড়ে আছে রাস্তার দিকে। একটুকরো কাগজ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এও আর এক গুছাইত। দু'জনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ হাঁটার পর ছেলেটা বললে, 'আয় একটু বসি। একটা বিড়ি আছে— তোর হাফ, আমার হাফ।'

আমি একটু দূরে বসলুম। ছেলেটার জামা-প্যান্ট নোংরা। লাল চুলে জট। গায়ে গন্ধ। বিড়ি ধরিয়ে বললে, 'সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করতে পারলে হেভি লাভ।' বিড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নে টান।'

'আমি বিড়ি খাই না।'

ছেলেটা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুই তা হলে ভদ্দরলোক। লাইনে নতুন এসেছিস।'

'আমরা গরিব ভদ্দরলোক।'

'তা হলে তো শালা না খেয়ে মরবি। কোনওদিন লোহা পেতলের লাইন যেতে পারবি না।'

'সেটা কী?'

'পার্কের রেলিং, লোকের বাড়ির দরজার কড়া, কলের মুখ, নর্দমার ঢাকা, এসব গেঁড়াতে পারবি? মটোর গাড়ির লাইন আরও ভাল। পেট্রলের ক্যাপ, ওয়াইপার, হাবক্যাপ, সব খোলা যায়। হাতে হাতে দাম। জুতোর লাইন আছে। মন্দিরে মা মা করছে, জুতো নিয়ে চম্পট। গঙ্গার ঘাটে পেতলের ঘটি রেখে ডুব মারছে। চোখ রাখবি। যেই ডুব মারবে ঘটিটা তুলে নিয়ে মার হাওয়া। একটা ঘটি হাপিস করতে পারলে একদিনের কামাই। তারপর বড় হয়ে যেই সাইকেলের প্যাডেলে পা পাবি, তখন সাইকেল চুরির লাইনে চলে যাবি। শালা ভদ্দরলোক! লেখাপড়া ধরেছিস?'

'হ্যাঁ। স্কুলে পড়ছি।'

'তবে তো মরেছিস। পড়বি এক আর করবি এক। নে বিড়ির শেষ টানটা টান। তোর নাম কী?'

'তারক।'

'আমার নাম মদন। তোর মায়ের কোনও রোজগার আছে?'

'না।'

'আমার মা রাত্তিরে রোজগার করে। এদিকে আয়। একটা মাল দেখে যা।'

মদন একটা ছোট্ট চার চৌকো কৌটো বের করল। পিচবোর্ডের। তার ওপর ল্যাংটো মেয়েছেলের ছবি। একেবারে অসভ্য একটা মেয়েছেলে। আমাদের ডোবার ওপারে এইরকম একটা অসভ্য আছে। জল থেকে উঠে এইভাবে চুল ঝাড়ে। যত ভাবি দেখব না, তাও দেখি। কীরকম ভাল লাগে। সারা শরীর কেমন করে। ঠিক যেন সেই মেয়েটাই বাক্সটায় ছবি হয়ে গেছে।

ছেলেটা বললে, 'এসব জ্যান্ত দেখেছিস? শালা ভদ্দরলোক। রাত্তিরবেলা ভদ্দরলোকরা আসে। আর এই যে দেখছিস জিনিসটা এইটা পরে...'

আর কোনও কথা নয় বস্তাটা মাথায় তুলে দে দৌড়। ছেলেটা একটা আধলা ইট তুলে ছুড়েছিল। পায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল। গায়ে লাগলে হাসপাতাল। দৌড়োতে দৌড়োতে অনেকটা এসে, একটা বেড়ার ধারে বসে পড়লুম। হাঁপ ধরে গেছে। ভীষণ তেষ্টা। বেড়ার ওপাশে ফুলের বাগান। বড় বড় জবা বাতাসে দোল খাচ্ছে। মনে হল, ভেতরে গিয়ে একটু জল চাই। এমন সময় ফ্রক পরা ছোট্ট একটা মেয়ে বেরিয়ে এল।

'খুকি এক গেলাস জল খাওয়াবে?'

'খুকি! খুকি আবার কী! আমার নাম জানো না। আমার নাম অঞ্জনা!'

'অঞ্জনা! কী সুন্দর নাম!'

'আমার দাদি রেখেছে। তোমার নাম?'

'বিচ্ছিরি নাম, তারক।'

'খুব খারাপ নয়। আমাদের বেড়া বাঁধে যে ঘরামি, তার নামও তারক। তুমি কী করো?'

'আমি স্কুলে পড়ি।'

'বাবা, তাই বুঝি এক বস্তা বই তোমার। আবার কুচিকুচি বই। তুমি বুঝি দাঁত দিয়ে কেটে কেটে ইঁদুরের মতো পড়ো?'

মেয়েটাকে খুব আপন আপন মনে হচ্ছিল। যেন আমার অনেক কালের চেনা। বেড়া ধরে কথা বলছে। শরীর দোলাচ্ছে। একটা পা থেকে থেকে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছে। একটু ছটফটে। শেষে বললে, 'অমন অসভ্যের মতো ঘেমেছ কেন? তোমাদের স্কুলে পাখা নেই?'

'আমি যে এইটা মাথায় করে সেই কোথা থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। আবার সেই কত দূরে যাব।'

'তুমি হতে চাইছ পথিক!'

'আমি তো পথিকই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা, আর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা...'

'ওরে বাবা, হয়েছে, হয়েছে, আমার আর মাথাটা খারাপ করে দিয়ো না। তোমারও দেখছি আমার মায়ের মতো বকবক করা স্বভাব।'

'একটু জল খাওয়াবে?'

'ঘাম মরেছে? তা না হলে অসুখ করবে।'

'মরেছে।'

'আমাদের বাগানে টিউবয়েল আছে। আমি ঘ্যাচং ঘ্যাচং করছি। তুমি জল খাও। পারবে তো!'

বাগানটা একেবারে ছবির মতো। কত রকমের ফুল। কেয়ারি করা গাছ। মাঝে মাঝে ফলের গাছ। সবুজ ঘাস। পেয়ারা গাছে বড় বড় পেয়ারা ঝুলছে। বাতাবি লেবুর গাছ। বাগানের মাঝখানে একটা গোল বাঁধানো জায়গা। সেইখানে হ্যান্ডপাম্প। মেয়েটা হ্যাঁচ হ্যাঁচ করছে, আমি জল খাচ্ছি। হঠাৎ মেয়েটা পাম্প করা ফেলে গেটের দিকে বাবা বাবা করে ছুটল। ভদ্রলোককে দেখেই আমার গা হিম হয়ে গেল— আমাদের হেডমাস্টারমশাই রবিবাবু। সট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। হয়তো ভাববেন, ফ্রি করে দিয়েছি, তাতেও হল না, আবার বাড়িতে এসে ঢুকেছে। লুকিয়ে থাকা গেল না, অঞ্জনা চিৎকার করল, 'পথিক এদিকে এসো,' সামনে গিয়েই নমস্কার, ঢিপ করে—

'আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল, তাই।'

'তুমি আমার বাড়ি জানতে না?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমাদের তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে, এতক্ষণ কী করছিলে!'

'বিহারিদের কাঠকল থেকে কাঠের কুচি নিচ্ছিলুম।'

'কী করবে?'

'মা গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে ঘুঁটে দেবে আর উনুন জ্বালাবে।'

'বাইরের ওই বস্তাটা তোমার?'

'আজ্ঞে।'

'ওইটা মাথায় করে এতটা পথ যাবে? এসো ভেতরে এসো।'

'স্যার! আমি যাই। আমি খুব নোংরা হয়ে আছি।'

'তাতে কী হয়েছে? ভেতরটা পরিষ্কার আছে তো!'

কী করে বলি নেই। কিন্তু সত্যিই নেই। সেই মদনা ব্যাটা যা-তা একটা জিনিস দেখিয়েছে। আমার বাবা কেন মাকে ছেড়ে চলে গেছে, মেয়েদের দুপুরের মজলিশে তার হরেক ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। ডোবার ওপারের কুলগাছে কুল পাড়তে গিয়ে আমি বুকখোলা মেয়ে দেখেছি। শীতের রোদ খাচ্ছে। আমি ছোট বলে কেউ গ্রাহ্য করেনি। বরং কমবয়সিরা এসে বলেছে— তোকে তুলে ধরছি, ওপরের ডালে অনেক পাকা পাকা আছে। সত্যিই তুলে ধরত, কারণ তারা জানত, আমার বাবা এই এদের মহল্লার জামাই।

ছবিতে আঁকা বাড়ির মতো বাড়ি। এত পরিষ্কার মেঝেতে পা রাখতে ভয় করছিল। একটা ঘর, তার দেয়াল নেই বললেই হয়। বড় বড় কাচ ফিট করা জানলা। মাঝখানে ঝকঝকে মেহগিনি কাঠের টেবিল। এক মাপের চেয়ার। ঘরের কোণে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। হালকা ফুলের গন্ধ। সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাকে একটা রোগে ধরেছিল, ভাল কিছু দেখলেই কেঁদে ফেলা। আমার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে— স্যার বললেন, 'কী হল? কান্না কীসের?'

ফট করে বলে বসলুম, 'আপনি যদি আমার বাবা হতেন!'

'আমি তো তোমার বাবার মতোই। তা না হলে তোমার লেখাপড়া, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার তো কোনও কারণ ছিল না। আমার এই একটাই মেয়ে। পাকা বুড়ি। তুমি আমার একটা ছেলে। তবে কথা দিতে হবে, শিক্ষায় চরিত্রে তুমি আমার মুখ রাখবে।'

'স্যার, আমি তা হলে আসি।'

'কোথায় যাবে। লুচি বেগুনভাজা খেয়ে যাবে।'

'না স্যার। আমার মাকে না দিয়ে ভাল কিছু খেতে পারব না।'

'তোমার মায়ের জন্যে বেঁধে দেওয়া হবে আলাদা করে।'

'না স্যার, মা খুব রাগ করবেন। আমি যাই। আমার জন্যে পেঁয়াজ পান্তা আছে।'

অঞ্জনার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে?'

ততক্ষণে আমি রাস্তায়। আমার মাথায় সেই বিরাট বোঝা। কাঠের গন্ধ। আমার হাতে সেই লাঠি। মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। বড়লোকের বাড়ির সাজগোজ করা ছেলেরা ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে সুন্দর সুন্দর মায়েদের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। চতুর্দিকে সুখ তার মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। আমার সুখ একটাই— এত কাঠ দেখে মায়ের খুব আনন্দ হবে। সরলামাসি বলবেন, উঃ, তারক একটা ছেলে বটে।

সেই রাতে এক কাণ্ড হল। সারাজীবন বয়ে বেড়াবার মতো একটা ঘটনা। রাত আটটা-সাড়ে আটটা। বাবা এল, প্রচণ্ড মদ খেয়ে। এসেই বললে, 'কিছু জিনিস আমি আমার ও-বাড়িতে নিয়ে যাব।' মা বললে, 'নিয়ে যাও।'

ভাল ভাল কাঁসার যেসব বাসন ছিল, টেনে হেঁচড়ে বের করল খাটের তলা থেকে। দেয়াল ঘড়িটা চেয়ারে উঠে টলবল টলবল করে নামাল। এই সময় সরলামাসি মাকে তরকারি দিতে এলেন। জিনিসপত্র টানা হ্যাঁচড়া দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে, বাবা সরলামাসির দিকে ঢুলুঢুলু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আজ তোমাকে কী দেখাচ্ছে মাইরি। কোথায় রাখবে তোমার যৌবন।' সরলামাসি বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলুন। আপনার লজ্জা করে না। নিজের বাচ্চা ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে।'

'তোমার বুক সামলাও, তা হলে চেষ্টা করব মুখ সামলাবার।'

'আপনার এত অধঃপতন। কোথা থেকে কোথায় নেমেছেন আপনি!'

'তোমাকে নিয়ে আমি নরকেও যেতে পারি, পিয়ারি।'

কথা শেষ করেই সেই মাতাল অসভ্য লোকটা সরলামাসিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল মেঝে থেকে। সরলামাসির পায়ের দিকে কাপড় ঝুলে গিয়ে একেবারে বেআবরু। বুকের কাপড় সরে গেছে। তাঁকে খাটের দিকে নিয়ে চলেছে জানোয়ারটা। সরলামাসি চিৎকার করার চেষ্টা করছেন। ভয়ে গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যত হাত পা ছুড়ছেন, ততই সব খুলে যাচ্ছে। হাত দিয়ে লোকটার মুখ আঁচড়াবার চেষ্টা করছেন। পারবেন কেন? বিশাল বলশালী একটা লোক। মা ছুটে এসে লোকটার জামার পেছন দিকটা ধরে টানছেন, আর বলছেন, একটা কিছু কর খোকা।

লোকটা বলছে, 'অনেকদিন তুমি দেখিয়ে বেড়াচ্ছ! আজ তোমার শেষ দিন।'

মা চিৎকার করছেন, 'এ কী সাংঘাতিক কাণ্ড। ওরে খোকা! ডাক না, লোকজনকে ডাক না।'

সরলামাসিকে বিছানায় ফেলেছে। ছেঁড়া খোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। মাসি কাঁদছে। আমি রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করতেই লোক জড়ো হয়ে গেল। শুরু হল লোকটার বেধড়ক ধোলাই। মা সরলামাসির গায়ে একটা চাদর টেনে দিলেন। সেই লোকটা, জানি না সে আমার বাবা কি না, মার খেতে খেতে মার খেতে খেতে একসময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একবার শুধু করুণ কণ্ঠে বললে, 'দেখ খোকা আমাকে কী মার মারছে।'

যারা মেরেছিল, তাদেরই কয়েকজন মুখে-চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে একটা রিকশায় তুলে দিয়ে বললে, 'যা, জানোয়ারটাকে ওই পট্টিতে ফেলে দিয়ে আয়।'

মাকে একজন কানে কানে বলে গেলেন, 'ভদ্রমহিলাকে ঘিরে বসে থাকবেন, তা না হলে সকালে দেখবেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। খুব সাবধানে রাখবেন। একেবারে একলা রাখবেন না। তা হলে কিন্তু বিপদ হবে।'

হঠাৎ চন্দ্রদাদু এসে গেলেন। যেন ভগবান পাঠিয়ে দিলেন। সব শুনে বললেন, 'ছি ছি, সঙ্গদোষে মানুষ কোন অধঃপাতে যায়! যাই ডাক্তার ডেকে আনি। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। এসব লোককে সমাজে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। নিজের বউ ছেলের সামনে এ কী দুর্মতি!'

মা কাঁদছেন আর আমাকে ফিসফিস করে বলছেন, 'দেখ না, তোর বাবাকে কোথায় নিয়ে গেল।

মদ খেলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে! দোষ তো সরলার। এই সময় এল কেন? ও তো জানে, ও যেখানেই যায় লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে চন্দননগরে গিয়েছিল জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে। তিনটে মাতাল ওকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সে কী কেলেঙ্কারি।'

'বাবা, না জানোয়ার।'

'মানুষটা খুব সরল রে, যা ভাবে তাই করে।'

'হ্যাঁ পাইখানা পেলে পাইখানা, পেচ্ছাপ পেলে পেচ্ছাপ।'

ডাক্তারবাবু এসে সরলামাসিকে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন। আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে লোকটা ওই অল্প সময়ের মধ্যে। বাইরে কিছুক্ষণ জটলা হয়ে যাবার পর যে যার সরে পড়ল। কেউ কেউ আবার বলে গেল— বউটাও তো সুবিধের নয়, গস্তানি মাগি। তা না হলে স্বামীকে বাজারে মেয়েছেলে ধরে এনে দেয়! আড়কাটি। নিজের বউ-ছেলের সামনে কেউ ওসব করার সাহস পায়। হাতের কাছে তো চেলাকাঠ ছিল। খাটের পায়া ছিল। মজা দেখছিল, মজা।

বাবাকে ছেড়ে মাকে ধরে টানাটানি। এক সময়ে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। পাড়া একেবারে শুনশান। সেই সময় আমার মনে হল, একবার দেখলে হয় রিকশায় করে লোকটাকে কোথায় পাচার করে দিল। সেই প্রথম ডোবার ওপারের নিষিদ্ধ পল্লিতে গেলুম। সবাই তো মানুষ। মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়, তবু আমার কী ভয়! মাঝখানে একটা মাত্র ল্যাম্পপোস্ট। চারপাশে ছড়ানো বস্তি। সরু সরু গলি। কোনওটা ছ্যাঁচা বেড়া, কোনওটা টিন দরমা টালির ঘর। এর মধ্যেও অবস্থার তারতম্য। দিশি মদের গন্ধ, নর্দমার গন্ধ। পোস্টের আলোটার কাছে সুতোর মতো ধোঁয়া পাক মারছে। বেশ রাত। তাই বাইরে আর কেউ নেই। সব ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাসি-কাশির শব্দ। মাসিরা বাইরে বসে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছে। একটা ঘরে একটা মেয়ে গুমরে কাঁদছে। মাঝে মাঝে চড়চাপড়ের শব্দ। শুধুমাত্র বুকের কাছ থেকে সায়া পরা একটা মেয়ে মদে চুর, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বললে, 'তোর প্যাঁচার ঘুগনি আজ আর কেউ খাবে না রে ছোঁড়া, আজ রক্ষেকালী পুজো।' বলেই আমার এক ইঞ্চি দূরে থুতু ছিটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আর এক পা এগোতে ইচ্ছে করল না। ভেতরে অনেকটাই ঢুকেছিলুম। ফিরে আসছি, এক মোটা মাসি খ্যানখ্যানে গলায় ডাকল— 'এই ছোঁড়া, চোরের মতো ঘুরঘুর করছিস কেন রে! তোর ধান্দাটা কী?' ছুটে পালালে চিল্লে পাড়া মাত করবে। তাই কাছে গিয়ে মিষ্টি করে বললুম, 'আমার বাবাকে খুঁজতে এসেছি।' মাসি একটা গালাগাল দিয়ে বললে, 'সব বাবারা ন্যাংটো হয়ে মাকে নিয়ে শুয়ে আছে। বদমাইশ ছেলে, ঘাড় টিপলে দুধ বেরোবে, এখানে বাবা খুঁজতে এয়েছেন।'

গালাগাল, গন্ধ, ধোঁয়া, অসভ্য দৃশ্য, সব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলুম। একটাই আশার কথা কোথাও কোনও মৃতদেহ দেখতে পাইনি। তার মানে তিনি মরেননি। সে কথা মাকে জানালুম। মা বললেন, 'এক কাজ কর, তুই খাটে তোর মাসির পাশে শো, আমি মেঝেতে শুচ্ছি। দু'জনেই একটু সজাগ থাকব কেমন! বলা তো যায় না।'

আলো নিবে গেল। ঘুম আর আসে না। বসে আছি চুপ করে। সব থিতোবার পর সব যেন আবার ফিরে আসছে একে একে। দগদগে রগরগে হয়ে। তখন অতটা বুঝিনি, এই নিঝুম রাতে শামুকের মতো সব খোল থেকে শুঁড় বের করে তেড়ে আসছে। কালো পরদায় সাদা ছবির মতো। ডোবার ওপারে সেই বস্তি। মাসিদের বিশ্রী পোশাক, বসার ধরন, পিপের মতো চেহারা। সেই মেয়েটা। বুকে বাঁধা কালো সায়া। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পা। মদে মুখটা খসখসে লাল, মাথার এলোমেলো চুল উড়ছে। জড়ানো গলায় বলছে, এই ছোঁড়া। সেই মাসিটা বলছে এখানে খদ্দের খুঁজছিস। হিন্দুস্থানি পাড়ায় যা। ওখানে ছোঁড়াদের ডিম্যান্ড। সে আবার কী! আমি পালাচ্ছি। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। একজন পুলিশ চোরের মতো ঢুকছে। সব দেখতে পাচ্ছি আবার।

একেবারে পাশে চিত হয়ে শুয়ে আছেন সরলামাসি। ধারালো মুখ, নাক, একমাথা চুল। দীর্ঘ

নিশ্বাসে ভারী বুক উঠছে পড়ছে। টান টান। ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে। শাড়ি উঠে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। ননির মতো দুটো পা। ভারী কোমর। সেই লোকটা যখন পেটুকের মতো সরলামাসিকে পাঁজাকোলা করে তুলছিল তখন আমি অনেক কিছু দেখেছি। একটা পুরুষ মানুষ জানোয়ারের মতো কী ভোগ করতে চায় আমার জানা হয়ে গেছে। ভীষণভাবে জানা। সরলামাসি আর যেন আমার কাছে মাসি নয়। ডোবার ওপারে বস্তির সেই রাতজাগা মেয়েটার মতো। গলায় একটা তাগা। বুকটা খোলা। চওড়া পিঠ। ভারী কাঁধ।

হঠাৎ মনে হল, বিশ্বনাথ সরকার আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারক সরকার, তুমি বিশ্বনাথ সরকারেরই ছেলে। পালাবে কোথায়। সব মানুষেরই জন্মবৃত্তান্তে আগুনের আঁচ। সেসব একই মনের ব্যাপার। মা চম্পা সরকার ঘুমকাতুরে। মেঝেতে মড়ার মতো ঘুমোচ্ছেন। আমি সরলামাসির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লুম। পাতলা ঠোঁটের নীচেরটা ফুলে আছে, রক্তাক্ত। মুখে লাগছে গরম নিশ্বাস। মিষ্টি আরকের মতো গন্ধ। আমার হাত কাঁপছে। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে আমার। রবিবাবু বলছেন, তারক, শিক্ষা আর চরিত্র। চন্দ্রদাদু বলছেন, পুজো, ধ্যান, জপ। আমার হাত সরে এল। আস্তে আস্তে বালিশে মাথা রাখলুম। রাস্তার আলোর এক চিলতে বিছানায় এসে পড়েছে। ঘুম আয়, ঘুম আয়! আমার বাঁ গালে লম্বা চুলের গুছি সাপের মতো নড়াচড়া করছে। হঠাৎ সরলামাসির ভারী বাঁ পা-টা ভাঁজ হয়ে আমার পায়ের ওপর উঠে পড়ল।

তারকের ভেতর যে গুহ্যইতটা চিরকাল খেলা করছে, সে বললে, তারক জ্ঞান বাড়া, অভিজ্ঞতা বাড়া। কেউ কিছু বলবে না। কেউ জানতেও পারবে না। এই তো তোর জানার বয়েস। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত নেমে এল। এত, এত, এত সুন্দর! সারাটা রাত আমি ঘুরে বেড়ালুম।

ভোরবেলা আবিষ্কার করলুম— তারক সরকার পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে। এমন কিছু এসেছে শরীরে যা একমাত্র পুরুষেই আসে; কিন্তু মনে হল, বড় পাপ, বড় লজ্জা, বড় গোপনীয়।

॥ দুই ॥

বলেছিল। আমার অনেক গুরুর এক গুরু বলেছিল ভায়া! আর্টই বলো আর কালচারই বলো, সেরা আর্ট হল, ধরা না পড়া। সেরা টেলার কাকে বলবে, যে তোমার শরীরের সমস্ত ডিফেক্ট মেরে জামা কোট-প্যান্ট তৈরি করতে পারে। পরামাত্রই তোমার ভোল পালটে যাবে। শোনো বৎস! জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতজন, মহাজন সব হল দোতলা— উদর আর শিশ্ন। বুং বুং আ বুং, বুং বুং আ বুং। মনটা আমার ফসর ফসর করে ভোলা মন। কেন করে? এ, বি, সি, ডি, এক্স, ওয়াই, জেড, কেউ সত্যি কথা বলবে না। এই আসল কথাটা না বলাই হল আর্ট। বাইরে মহাত্মা, দরদী, মরমি, ভেতরে কুকুর, বেড়াল, হায়না, হাড়গিলে ছারপোকা, তেলাপোকা। ভেতরে খাব খাব, বাইরে খাওয়াব খাওয়াব। বুকে হাত দিয়ে বল শালা, অন্যের ভাল হলে, উন্নতি হলে তোর আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করে। সুন্দরী মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালে ভেতরটা রামছাগলের মতো ম্যা ম্যা করে ওঠে? না ভেতর থেকে একটা কালপুরুষ বেরিয়ে এসে কাঁকড়া বিছের মতো নাচতে থাকে। যা হয়, তা চেপে যাওয়াটাই আর্ট। কেউ কারও নয়। যতক্ষণ স্বার্থ, ততক্ষণ সানাইয়ের প্যাঁপোর পোঁ। স্বার্থ শেষ, মালেরা হাওয়া। দুনিয়া এক আজব জায়গা ভাই। বলি দেওয়ার জন্যে একটা ছাগলকে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গলায় জবার মালা। ছাগলটা সেই মালা খাদ্য ভেবে মনের আনন্দে চিবিয়ে যাচ্ছে। সাপে ব্যাং ধরেছে পেছন দিক থেকে। একটু একটু করে ঢুকছে মুখে। ব্যাংটার মুখের কাছ দিয়ে একটা পোকা উড়ে যাচ্ছিল, সেই অবস্থাতেও কপাক করে গিলে খেয়ে ফেললে? বেদির ওপর খোদাই করা পাথরের সাপ। সর্প দেবতা। সবাই বাটি বাটি দুধ ঢালছে। যেই জ্যান্ত সাপ

কিলবিলিয়ে এল, চিৎকার— মার, মার। মন্দিরের সেবকের কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ খেতে চাইলে। বললে, ভাগো ভাগো। যেহেতু দেবতা খান না, সেই হেতু তাঁর সামনে নৈবেদ্যর পাহাড়। এই তো তোমার জগৎ ভাই! এখানে আর কত কপচাবে বড় বড় বমবাস্টিক বুলি— লোকহিতায়, জগদ্ধিতায়। কাঠকুড়ুনির মতো ভাগ্য, কুড়িয়ে বাঁচো। ফাঁসার দিন এলে ফেঁসে যাও। এসেছিলে, সেটাও যেমন কোনও ঘটনা নয়, চলে গেলে, সেটাও কোনও ঘটনা নয়। বিষয়সম্পত্তি ব্যাঙ্কব্যালেন্স কী রেখে গেলে। সেইটাই হল পরবর্তীকালের মোদ্দা কথা। আমার বাবা কিছু রেখে গিয়েছিলেন। মনটা বেশ মজে ছিল। আর্টিস্ট ডাকিয়ে একটা অয়েল পোর্ট্রেট করে একটু অয়েল দেবার চেষ্টা করেছিলুম। লোকে বললে, ছেলে দেখেছ, রামভক্ত জাম্বুবান। আবার এও বললে, বাপের পয়সায় লপচপানি, তাই একটু শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে। যেই নিজের হিম্মতে একটু রোজগারপাতি বাড়ল, মনে হল বুড়োটা সিঁড়ির মুখে ঝুলে আমার ক্রেডিটে ভাগ বসাচ্ছে। হাটাও। একেবারে ঠাকুরঘরে চালান করে দাও। সিঁড়ির মুখে এখন সিনারি ঝুলছে। ইয়ে হায় জিন্দেগি।

আমার এই গুরু এক বহুতল বাড়ির টপ ফ্লোরে বসেন। অফিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড়বাবু। আষ্টেপৃষ্টে টেলিফোন। ভদ্রলোকের খুব হর্সপাওয়ার। মন্ত্রীদের গলা টেলিফোনে অনবরতই ক্যাঁক ক্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক করছে। ম্যানেজমাস্টার। যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। ডোবা নৌকোকে ঠেলে ভাসাতে পারেন। চোপসানো বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে পারেন। একটা হাত টেবিলের ওপরে আর একটা হাত নীচে। নীচের হাতে কিছু না ঠেকালে ওপরের হাত সচল হয় না। বলেন, প্যারালিসিস আছে। ফাইলপত্তর অচল হয়ে থাকে। বেশি ট্যান্ডাইম্যান্ডাই দেখালে পাকা ঘুঁটি কাঁচা করে দেন। সাপলুডো দেখেছ চাঁদু! সাপের দুটো দিক ন্যাজা আর মুড়ো। ন্যাজায় নৈবেদ্য দিলে মুড়োয় প্রোমোশান। আর মুড়োয় খোঁচা মারলে ন্যাজে ডিমোশান।

হাসতে হাসতে সর্বনাশ করবে। আহা! সত্যিই তো, সত্যিই তো! বড্ড সাফার করছেন! দেখছি দেখছি কী করা যায়। মন্ত্রীর টেবিলে ফাইল গেছে। ওপর দিকে তুলে দেব। ভাববেন না। তলা থেকে টেনে ওপরে প্লেস করে দিলেই হয়ে যায়।

কিন্তু করব না। কেন করব না! কেসটা সোজা আমার হাতে আসেনি। এক মুরুব্বি ধরেছিল। সে ফোন করছে, গম্ভীর গলা, শৈলেন বিশ্বাসের কেসটা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করে দেবেন। যেন আমি তার বাপের চাকর! সারা জীবন ঘুরে মরো। যদি প্রপার চ্যানেলে আসত। সেটা কোন চ্যানেল? কেন ইংলিশ চ্যানেল। টুলে বসে আছে মোহন। মোহনকে ধরো। সে ভালমানুষের মতো মুখ করে হাতের পাঁচটা আঙুল দেখাবে। ফাইভ। ব্যস আর কোথাও কোনও বাধা নেই। ফাইল যেন সকালের বুড়ো। পার্কে ছড়ি হাতে তড়বড়িয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

আমার গুরুর আবার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। বলতেন, পান খেলে মানুষকে খুব ফ্রেন্ডলি দেখায়। লোকে মনে করে সহৃদয় আপনজন। কথা বলতে বলতে পেছনের জানলায় উঠে গিয়ে পিক ফেলে এলেন। তাম্বুল রস নামছে— বারো থেকে ভূমিতলে। ওদিকে রাস্তা। অনবরত লোক চলেছে।

ফেলছেন? কারও মাথায় পড়লে?

পড়লে পড়বে। এই তোমার ভগবানকে দেখো না। প্রতি সেকেন্ডে একটা করে ইট ফেলছেন হেভন থেকে। ভূমণ্ডলে লোক পাস করছে। যার মাথায় পড়ল তার হয়ে গেল। বলো হরি। কিছু করার নেই তারক। এইটাই হল খেলা।

আমি দেখলুম নতুন কিছু শেখার নেই। নিজের জীবন দিয়েই মোটামুটি সব শেখা হয়ে গেছে। সেই রাত— ধোলাইয়ের রাত, সরলামাসিকে দেখার রাত, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের রাত। আমার জীবনের একটা ঘুরপাকের রাত।

সেই সকাল আগের আর পাঁচটা সকালের মতো ছিল না। ভোর হচ্ছে। সরলামাসিকে জড়িয়ে

শুয়ে আছি। দেহটা কিশোরের, মনটা সমর্থ এক পুরুষের। মনে একটা ভয়, আবার ভীষণ একটা ভাললাগা। তার নাম প্রেম কি না, তখনও বোঝা হয়নি। সে এমন এক আবিষ্কার যা মুখ ফুটে কারওকে বলা যাবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, কেন নেশার ঘোরে সব বাঁধন হারিয়ে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেন এ-পাড়ার কিছু লোক সরলামাসির বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করে। গভীর রাতে কেন সিটি মারে। কেন সেদিন স্কুলের উঁচু ক্লাসের একটা ছেলে সরলামাসি যখন নিচু হয়ে কল থেকে জল নিচ্ছিল, তখন মাল বলে ছুটে পালিয়েছিল। শরীরে যা আছে তা বলার নয়। আমি আমার বাবাকে ক্ষমা করে দিলুম। ও ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

নিজেকে সামলে সাবধানে ঢেকে মা উঠে পড়ার আগে নামতে যাচ্ছি খাট থেকে সরলামাসি বললে, 'এখনও সকাল হয়নি, আর একটু শো। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

সরলামাসি আমাকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেললে, 'বল, তুই আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যাবি না! বড় সুখ রে! তোকে নিয়ে আমি ভুবনেশ্বরে যাব, পুরীতে যাব। তুই আমার। তুই শুধু আমার।'

জীবন এক বিচিত্র খেলা। যেন মাছ ধরা। সাহস করে ছিপ ফেললে কিছু না কিছু উঠবেই। চন্দ্রদাদু মানুষের ভেতরটা দেখতে পান। একটা কথাতেই আমার সেইরকম মনে হল। পুজোর ফুলে হাত দিতে যাচ্ছি, বললেন, 'আজ আর স্পর্শ কোরো না, তুমি অপবিত্র হয়ে গেছ। তোমার ক্ষয় হচ্ছে। তুমি অসৎ সঙ্গে পড়েছ। তোমার চোখের নীচে কালি। তুমি আগের মতো সোজা আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তোমার পতন অনিবার্য। তোমাকে পেতনিতে ধরেছে। তুমি আর আমার ত্রিসীমানায় এসো না। বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে তাকে আর ফেরানো যায় না।'

আমি কেঁদে ফেললুম। একমাত্র মানুষ, যাঁকে আমি ভালবাসি। যাঁর নির্দেশে আমি আমার জীবন চালাতে চাই। আবার একটু স্বার্থও আছে। চন্দ্রদাদুর দানে আমাদের সংসার চলে। এসো না মানে চাকরি চলে যাওয়া। শাড়ি, চাল, ডাল, আনাজ, সন্দেশ, ফল, সব বন্ধ হয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নাটমন্দিরে গিয়ে বসলুম। যেন একটা কুকুর! চন্দ্রদাদু আমার পাপ জেনে গেছেন।

কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর আমার ভেতর থেকে একটা শয়তান বেরিয়ে এল। ঠিক আছে, মানুষ যাকে পাপ বলে অন্যায় বলে আমি তা করব, কিন্তু পুণ্যবানের মতো। কেউ ধরতে পারবে না। মুখই হল মনের আয়না। সেই আয়নাটাকে নির্মল রাখতে পারলেই তো হল। আর তক্কে তক্কে থাকব অন্যের গোপন-জীবনের কথা কিছু জানা যায় কি না। এই যে চন্দ্রদাদু, এঁর কি কোনও গোপন দিক নেই।

চোখে জল। চন্দ্রদাদুর সামনে গেলুম। একটা একটা করে বেলপাতা বাছছেন।

'বলো, কী বলতে চাও?'

'অন্যায় করে ফেলেছি। আর করব না। মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তোমার বয়েস কম। ইন্দ্রিয়ের ঘুম ভাঙছে। শিব তুমি সাবধান হও।'

'আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।'

'আমিও ওই বয়েস পেরিয়ে এসেছি। সৎভাব, সৎগ্রন্থ, সৎজীবন, ব্রহ্মচর্য, সমস্ত সাফল্যের এই হল মন্ত্র। মনে রাখবে, তোমার বীজ তেমন ভাল নয়। মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে। এই বয়েস বড় সাংঘাতিক বয়েস। ভাল করে লেখা-পড়া করো। মানুষ হও। মায়ের দুঃখ দূর করো।'

একটা জোড়াতালি হল। ভবতারিণীর সামনে হাপুস হুপুস খানিক কান্না হল। চোখের জলের বেশ একটা পাওয়ার সেই বয়েসেই বুঝে গিয়েছিলুম। মা, বলে কাঁদতে পারলে সবাই ভাবে— ব্যাটার ভেতর ভগবৎ প্রেম মিছরি হচ্ছে। ব্যাটা পবিত্র তপস্বী। চন্দ্রদাদু বললেন, চোখের জলে পবিত্র হও। যত কাঁদবে তত তাঁর কাছে যাবে।

এই চন্দ্রবিন্দুযুক্ত তিনিটা কে? ব্যাকরণে আছে, জীবনে আছে কি? আমার মায়ের ভর হত। সেটা

হিস্টিরিয়া নয়। ভৌতিক আবেশ অথবা ঈশ্বরীয় আবেশ। মা সেই থেকেই ভাবালু। সেজে-গুজে গুছাইত হতে পারলেন না বলে, অধম ডালিম পেট দেখিয়ে পিঠ দেখিয়ে রেল কোম্পানির মালবাবু বিশ্বনাথ সরকারকে বগলদাবা করে সরে পড়ল। এর মধ্যে এল প্রবল নিম্নচাপ সরলামাসি। লে হালুয়া, বিশ্বনাথ সরকারকে তা হলে কে বেশি টানছে! কে ফার্স্ট! ডালিম না সরলামাসি! তা সেই তিনি করলেনটা কী! কাঁচকলা করলেন। উপোসের ব্যবস্থা পাকা। সেটা আরও পাকা করে দিল সরলামাসি। বিশ্বনাথ সরকার আপাতত এ তল্লাটে ভিড়ছে না। দু'-চার পয়সা যা ঠেকাত তাও হয়ে গেল।

উপদেশ খুব উপকারী। আর সব উপদেশই প্রায় একরকম। গোটাকতক অবাস্তব প্রস্তাবের মধ্যে ঘোরা ফেরা— সদা সত্য বলিবে। আবার ধর্মের উঁচু থাকে উঠে মহাপুরুষ বলছেন---- জগৎ মিথ্যা। গান গাইছেন, এ সংসার ধোঁকার টাটি, খাই দাই আর মজা লুটি। তা সবটাই যদি ধোঁকা হয়, তা হলে সত্য কথা বলে লাভটা কী! সত্য বলে তো কিছু নেই। মিথ্যের সংসারে বসে সত্য কথা বলবে। এজলাসে দাঁড়িয়ে সাক্ষী বলছে, সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না, আগাপাশতলা মিথ্যে বলে চলে গেল। তার মানে প্রথম উপদেশ ক্যানসেল। ধোপে টেকল না। দ্বিতীয় উপদেশ সৎপথে থাকবে। তার মানে পথে থাকবে পেটে কিল মেরে। এই আমরা যেমন আছি। যেমন সরলামাসি আছে। পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে টেনে নামাবার জন্যে রাতের ঘুম ছেড়ে দিয়েছে। এপাড়ার তিনজনকে জানি, যারা দোতলার জানলায় দূরবিন ফিট করেছে। তেনারা আবার খুব জ্ঞান দেন। কথায় কথায় বলেন--- অমুক লোফার, তমুক লুজ ক্যারেক্টার। তাঁরাই সবার আগে এসে বিশ্বনাথ সরকারকে ঠেঙিয়েছিল। নরেন সাধু এ পাড়ার মুরুব্বি। সবাই জানে জাল ওষুধের কারবারি। সবাই গিয়ে তার উমেদারি করে! আগাপাশতলা তেল মাখায়। এমনকী খাটালের মালিক মতিয়া। তারও কী দাপট! নাও সৎ পথে থাকো, আর ডোবার কলমি তুলে এনে বোগড়া চালের ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ করে খাও। ইয়ারকি মারার জায়গা পাওনি! সৎ পথে থাকো!

মা দেখি বসে বসে কাঁদছে। ব্যাপারটা কী? দত্তগিন্নি এসে বলেছে, বড় বউয়ের ছেলে হয়েছে। বাচ্চা কোলে সংসারের কাজকর্ম তেমন করতে পারছে না, তা তুমি তো বসে না থেকে আমাদের রান্নার কাজটা তুলে দিতে পারো। গতর যখন আছে মা, সেটা খাটাও। স্বামী তো ওইরকম। এক চ্যাংলাকে নিয়ে মজায় আছে।

'সুযোগ যখন পেয়েছে, তখন তো বলবেই মা। আরও কতজন কত কী বলবে। ও নিয়ে মাথা খারাপ কোরো না। এই যে ' সরলামাসির নামে যা-তা বলছে। বলছে, সরলামাসি ডোবার ওপারের বস্তিতে গিয়ে ব্যাবসাটা খোলাখুলি শুরু করলেই পারে। যাও তো, তুমি তোমার কাজে যাও।'

'আমার আবার কাজ। এই দাওয়াটাই সকাল থেকে ছ'বার ঝাঁট দিয়েছি। রান্নাবান্নার পাট তো উঠেই গেছে।'

পাড়ায় আমার আর এক গুরু ছিল কিশোরীদা। তাঁর থিয়োরি হল, মেলা কথা খরচ করিসনি। দু'খানা আগে কষিয়ে দে থোবনায়! যদি ফেরত দেবার হিম্মত দেখাতে পারে, তা হলে দু'-চার রাউন্ড আরও লড়িয়ে দাও। তারপর থানা-পুলিশ যা হয় হবে। কোর্টে গিয়ে উকিলে উকিলে তাল ঠুকবে। বড়লোকের ছেলে ছিল। মালকড়ি পাঁচভূতে চৌপাট করে দিয়েছে। এখন মেজাজটাই আছে। মটোর মেরামতি শিখে, নিজেদের পোড়োবাড়ির বাগানে একটা গ্যারেজ করেছে। রোজগার নেহাত খারাপ নয়।

কিশোরীদা বললে, 'চল তা হলে। আমার লঝঝড়টা বের করি। তোর বাপকে দু'রদ্দা ঝেড়ে আসি। মাগিবাজি মাথায় তুলে দিচ্ছি। বউ ছেলে ফেলে ইল্লি মারছে। কলার ধরে টেনে এনে তোর মায়ের পায়ে ল্যান্ড করিয়ে দিচ্ছি। চম্পুটাকে বিয়ে করেছে? তা হলে আপেলটার কী হবে!'

'হাত-ফাত চালিয়ো না, শুধু একটু কড়কানি। খরচপত্তর দেওয়া স্টপ করে দিয়েছে।'

'ম্যাডাগাস্কার। চালাচ্ছিস কী করে? গয়না বেচে?'

'সব নিয়ে গেছে।'

'অ, সেই মালটাকে ডেকরেট করেছে। তা চল ইঞ্জিন থেকে পার্টস খুলে আনি। এসে, আমরা ফেড়ে দিই। মাসিমা আর কত উপোস করবে!'

বড়লোকের ছেলে। লাল টুকটুকে চেহারা। চকলেট রঙের গেঞ্জি। কালো কোঁকড়ানো চুল। ধারালো মুখ। পাড়ার হিরো। মেয়েরা সুর তুলে ডাকে, কিশোরীদা।

'তুই ডেরাটা জানিস?'

'হালসিবাগান।'

'হালসিবাগান! হালসিবাগান বললে লোকেট করা যাবে? কে চিনবে? '

'লালপাড়া থেকে জেনে আসব?'

'তুই? তুই যাবি? কার কাছে যাবি? দাঁড়া আমি যাই। আমার একটা ঠেক আছে। তুই এখানে বোস।'

'তোমার গ্যারেজের চালায় লাউগাছটা বেশ লতিয়েছে। দু'-একটা ডগা তুলব? আজকের দিনটা তা হলে হয়ে যাবে।'

'গোটা গাছটাই তুই উপড়ে নিয়ে যা।'

কিশোরীদা বেরিয়ে গেল। ফিরে এল পাক্কা দেড়ঘণ্টা পরে। মুখে মদের গন্ধ ভক ভক করছে।

'তুমি এই সাতসকালে টেনে এলে?'

'মন্দিরে গেলে চরণামৃত খেয়ে আসে, লাল মহল্লায় গেলে মাল খেতে হয়। একটু হাই হয়ে এলুম। পেটাপিটি করতে হবে তো!'

'ঠিকানা পেয়েছ?'

'পেয়েছি। তোর বাপ তো বউভাতের ভোজ খাইয়ে গেছে। তন্দুর, চাঁপ, বোতল। তোর বাপ একটা জিনিস!'

কিশোরীদার বারে বারে বাপ বলাটা আমার ভয়ংকর খারাপ লাগছিল। যতই হোক আমার বাবা তো। প্রেমিক বাবা। হালসিবাগানে সামান্য খোঁজপাতেই আস্তানাটা পাওয়া গেল। মাঠকোটা বস্তি। দোতলা। বেশ মজার ঘর। পাহাড়ি বাংলোর মতো। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় বাইরে থেকে। রেলিং-এ দুটো সায়া ঝুলছে। কিশোরীদা বললেন, 'বুঝলি, এই হল সিগন্যাল। পাড়ার মেয়ে, সে যেখানেই যাক তার একই ধারা। ভেতরটা বাইরে ঝোলাবেই। রং দেখেছিস? যেন মটোর গাড়ি। ডিপ ব্লু, ডিপ রেড। ব্রেসিয়ারটা ঝুলছে দেখ। সাইজ দেখেছিস? কেন মানুষ ম্যাড হবে না! এদের শালা ফাঁদই আলাদা, আর আমাদের চরিত্র হল টিকটিকির ডিম। ফিনফিনে খোলা, একটু চাপ, মুচ মুচ মুচ। আমারই কেমন করছে। তিনটে পার্টস দেখেই ভেতরের ইঞ্জিন গড়গড় করছে। তোকে বলে রাখছি তারক, দামড়াটা যদি বাইরে থাকে আর মাল যদি একা থাকে আমি ইঞ্জিন ভিড়িয়ে দেব। আমার কথা হল সুযোগের সদ্ব্যবহার। ফলটি দেখিলে হাতের কাছে, পাড়িয়া খাইবে সাথে সাথে। সরে আয়, সায়াটা গায়ে লাগছে।' শরীর খারাপ হতে আর বাকি আছে কী। রাতে আমাকে সরলামাসির কাছে থাকতে হয় পাহারা দেবার জন্যে। বাইরের আঁচড় কামড়ের দাগ প্রায় মিলিয়ে গেলেও, মনের ঘা শুকোয়নি। সকলের তাই ধারণা। আমার ধারণা অন্য। আমার ধারণা, বাবা সরলামাসিকে খোঁচা মেরে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার আছে, তোমার ভয়ংকর আছে। তুমি মানুষকে পোকার মতো পুড়িয়ে মারতে পারো। সরলামাসি নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। সে আর মরতে চায় না, মারতে চায়। রাতের বেলা মনে হয় সরলামাসির খিদে পেয়েছে। ওরই মধ্যে একটু সাজে। কেমন একটা আনন্দ। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথমে মনে করছে ছেলে চম্পা সরকারের ছেলে। আমারও ছেলে। রোজ সকালে এটা ওটা দিয়ে যায়, কলমিশাক, লাউশাক,

পুঁইশাক, ডুমুর, কাঠকুটো। কিছু পরেই আমি ভাই। ছেলেবেলার কথা, নানা ভালবাসার কথা, মৃত স্বামীর কথা। ছোট্ট একটা প্রেমের কথা, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা। ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখার কথা। মায়ের প্রবল শাসন। গল্প করতে করতে যাচ্ছে, হাই উঠবে। সরলাদি হঠাৎ আড় হয়ে শুয়ে পড়বে। শরীরের ভাঁজ, পেছন, পা, বুক। সরলামাসি চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে, ভয়ংকর হয়ে উঠছে। ক্রমশ যেন স্বপ্নে চলে যাচ্ছে। আমার দিকে তাকানোর চেহারা বদলে যাবে। ভালবাসা নেই। একটা উদ্দেশ্য ছিল। যেন কচি পাঁঠার দিকে তাকাচ্ছে অজগর। মদ না খেয়েও মাতাল। জড়ানো গলায় বলবে, এসো এদিকে। কোথায় গেলে! সরলামাসি বিছানায় টানটান। দুটো পা নানা কায়দায় খেলছে। ভীষণ একটা যন্ত্রণা! যেন কাটা ছাগল। প্রথম দিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। কী হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুকে ডাকব নাকি। সাপ যেভাবে খপ করে ব্যাং ধরে সরলামাসি খপ করে আমাকে ধরল। তখন আমি তারক নই। সরলামাসির যন্ত্র। যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি, আমার আগের আমিটা আর নেই। দুটো আমি হয়ে গেছি— সকালের আমি মাঝরাতের আমি। চন্দ্রদাদুর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বেজে গেল। দরজা বন্ধ হল। দেবতা ঘুমোলেন। জেগে উঠল আমার দ্বিতীয় আমি। সেই আমিটাও ক্রমশ পাকছে। সে আর সরলামাসির হাতেব আমি নয়। সে আমির হাতে সরলা। তার কল্পনা আছে, আবিষ্কার আছে।

কিশোরীদা বললে, 'কী হল? তোকে কী বললুম! সরে আয়। চল ওপরে।'

'তুমি আগে চলো, আমার ভয় করছে!'

'আমার প্ল্যান হল আমি ঘাপটি মেরে পেছনে থাকব, যেই দরজা খুলবে, তোকে নিয়ে দড়াম করে ঢুকে পড়ব। তারপর আমার খেল।'

ক্যাঁচ কোঁচ করে সিঁড়ি ভাঙছি। একটা বেড়াল তরতর করে নীচে নেমে এল। মুখে একটা কী রয়েছে। দরজার কড়া ধরে বার কতক টুক টুক শব্দ করে দাঁড়িয়ে আছি। দরজা আর খোলে না। আবার কড়া নাড়তেই পায়ের শব্দ। গলা পাওয়া গেল— এখন হবে না। এখন হবে না। পরে পরে।

মেয়ের গলা। কিশোরীদার মুখের দিকে তাকালুম।

ফিসফিস করে বললে— 'বল, আমি তোমার ছেলে।'

'তোমার ছেলে, দরজাটা খোলো।'

'সে আবার কে?'

'ওই যে বঁড়শিগলায় ছেলে।'

ধড়াং করে দরজা খুলে গেল। সেই মহিলা। পাতলা বিস্কুট রঙের শাড়ি। ভেতরে শুধু ব্রেসিয়ার। মহিলা আরও সুন্দরী হয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ও আমার সোনা, কত বড় হয়ে গেছিস। তোর বাবাকে কতবার বলেছি— একবার নিয়ে এসো না, আমার ছেলেটাকে দেখি। তা বলে কী, ওরা না আমাকে ঝ্যাঁটা পেটা করবে!'

মহিলা নিচু হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলেন। কিশোরীদা পেছন থেকে বললে, 'ডালিম, এদিকে তাকাও। চিনতে পারছ? তোমার এক সময়ের নয়নতারা।'

মহিলা আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সরলামাসি আমাকে শেষ করে না দিলে, এই জড়িয়ে ধরায় আমার কিছুই হত না। মহিলা জানতেও পারলেন না আমার কী হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতেই বুকের ফিনফিনে আঁচল এক ঝলকের জন্য খসে পড়ে গেল। আমার ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

'আমার এখন আর মনে পড়ে না।'

'তা অবশ্য অনেকদিন হল, তখন আমার বয়েসটাও অনেক কম ছিল। তবে তোমার শরীরটাও বেশ তোয়াজে আছে। বিলিতি চলছে বুঝি!'

'সে খবরে কী দরকার! কেন এসেছ বলো।'

'তোমার সেই বুড়ো কাত্তিকটার খোঁজে।'

'কেন, তার খোঁজে কী দরকার?'

'তার আসল সংসার তো তোমার জন্যে ভেসে গেল।'

'তার আমি কী করব। যাকে দেখে মজে মন কী বা হাড়ি, কী বা ডোম। মেয়েছেলে একটু গরম না হলে পুরুষদের ঘরে ধরে রাখা যায় না। সে তো নিজেও জানো। অমন খ্যাসখ্যাসে বউয়ের সঙ্গে তো আর রাত জমে না। আর রাতই যদি না জমল বিয়ে করে লাভ কী হল।'

ডালিম এরপর এক বেধড়ক খিস্তি করল। কিশোরীদা আমাকে এক ধমক মেরে বললে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিস কী? নীচে যা। আমি কথা বলে আসছি।' ডালিম বললে, 'ওর আর পাকতে দেরি কী? আমার দিকে কোন নজরে তাকাচ্ছে দেখেছ? ছেলে নয় তো, ছেলের বাপ।'

'ওর আর দোষ কী। অমন জিনিস দেখালে দেখবে না! ছেলে তো!'

তরতরিয়ে নীচে নেমে এলুম। রাস্তায়। গলিটা পাক মেরে মেরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। একপাল বাচ্চা একটা প্যান্ডেলে খেলা করছে। বিয়েটিয়ে আছে মনে হয়। লোকজন আসা-যাওয়া করছে। নাকে ভাল মন্দ রান্নার গন্ধ আসছে। কতদিন ভাল খাওয়া হয়নি। মাছের কালিয়া, মাংসর কোপ্তা। গরম লুচি। কত বছর হয়ে গেল। আমরা তো হাঘরে গরিব, তাই কাজে কম্মে কেউ আর আমাদের বলে না। রাস্তার কল থেকে অনেকটা জল খেয়ে নিলুম। কিছু নেই বলে এত খিদে পায়। হাঁটছি, তবে বেশি দূর যেতে সাহস হয় না, যদি হারিয়ে যাই!

রোজ মাইলের পর মাইল হেঁটে পা দুটো এমন হয়েছে, পথ পেলেই চলতে থাকে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কিশোরীদা এসে আমায় ধরে ফেললে। জোরে হেঁটেছে। তাই হাঁপাচ্ছে।

'একা একা যাচ্ছিস কোথায়? তুই কলকাতার রাস্তাঘাট চিনিস?'

'আমি তো যাইনি কোথাও, একটু বেড়াচ্ছি। বেশ নতুন জায়গা।'

'চল, সার্কুলার রোডের কোনও রেস্তোরাঁয় বসে একটু ভালমন্দ খাওয়া যাক।'

'তুমি তো জানো, আমি মাকে না দিয়ে কিছু খাই না।'

'তার মানে?'

'আমি ভাল খাব মা খাবে না, এ আমি ভাবতে পারি না।'

কিশোরীদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে তাকালুম। চোখে সামান্য নেশা। জল ছলছল করছে।

'কী বললি রে তুই। শালা, আমার নাম কিশোরী ঘোষ। বেপরোয়া চরিত্রহীন লম্পট, আমার চোখে জল এসে গেল। বাবা দেনার দায়ে সুইসাইড করার পর, আমাকে মানুষ করার জন্যে কী না করেছে। আমার মা সুন্দরী। বাড়িটা বাঁচাবার জন্যে বোথরার বিছানায় শুয়েছে। আমার কাকার চরিত্র নষ্ট করেছে। আমি আর আমার দিদি যাতে ভিখিরি না হয়ে যাই। সে মায়ের জন্য আমি কী করেছি। শালা কিশোরী, তুই কী করেছিস। মায়ের গয়না বেচে মাগির ফাঁদ দেখতে গেছিস। সেই মা আমার কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে পড়ে মারা গেল। বেওয়ারিশ লাশ!'

'তুমি কাঁদছ কেন?'

'পায়ের ধুলো দে।'

'কী করছ কী? রাস্তার লোক দেখছে।'

কিশোরীদা হিপ পকেট থেকে চকচকে চ্যাপটা মতো একটা কৌটো বের করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'যাঃ, শালা মদের বাচ্চা। আজ থেকে মেয়েছেলেও শেষ। কালীবাড়িতে গিয়ে বুড়োদের মতো বসে থাকব সেও ভি আচ্ছা, তবু মেয়েছেলে, মাই, পাছা এসবের লোভে আর লাল পাড়ায় যাব না। কিশোরী! মেয়েছেলে দেখতে হলে লিঙ্গ শিবের কাছে বন্ধক রেখে ন্যাংটা মা জগদম্বার দিকে তাকিয়ে থাক। শালা, শুয়ারকি বাচ্চে! চল শালা কালীঘাট যাব।'

টানতে টানতে নিয়ে গেল যেখানে গাড়িটা রেখেছিল সেইখানে। অনেক গাড়ির মাল-মশলা

দিয়ে গাড়িটা তৈরি। নিজের কাজ জানে, নিজেই করেছে। একেবারে চাবুকের মতো। গাঢ় চকোলেট রং। ঝকঝকে পালিশ। ঝকঝকে হাতল। ঝকঝকে হেডলাইট। আমার পেছনে এক থাপ্পড় মেরে বললে, 'ওঠ।' গাড়ি স্টার্ট নিল। ঠিক সুতোর মতো সূক্ষ্ম শব্দ, যেন ইঞ্জিনে তির চলে গেল। গাড়ি চালায়ও তেমনি। যেন জলে নৌকো চলেছে। ফরসা মুখ, গোলাপি গাল। একটা লোক এত সুন্দর হতে পারে! তারক সরকারের ইচ্ছে ছিল সুন্দর হবে। বাবা বিশ্বনাথ সরকারের কুৎসিত মনের জন্যে সুন্দর হওয়া গেল না। তা না হলে মাকে তেমন কুৎসিত দেখতে ছিল না। যাক সেসব চাওয়া-পাওয়ার কথা। গেরিলার মতো দেখতে মহাপুরুষ আছেন। উটপাখির মতো দেখতে বিলিতি সুন্দরী। তেনার এই সৃষ্টিতে সবই আছে। সেই মহাকাশনিবাসী চিরজাদুকর। ছুঁচের ভেতর দিয়ে যিনি হাতি গলাতে পারেন। চামচের ওপর পাহাড় ধরতে পারেন।

মন্দিরের এক পাশে গাড়িটাকে জুতোর মতো ফেলে দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। সব চেনা। সবাই চেনা। কেউ বলছে, দাদা। কেউ বলছেন, কিশোরী। নমস্কার, কেমন আছেন। কিশোরীদা চলেছে মা ভবতারিণীর দরবারে।

'তুমি বুঝি প্রায়ই আসো?'

'পাপীদের প্রায়ই আসতে হয়। জেনে রাখ, ভগবান পাপীর। পুণ্যাত্মারা পাত্তা দেয় না। তারা নিজেরাই ভগবান।'

বিকেলবেলা। সবে মন্দির খুলেছে। তেমন ভিড় নেই। মায়ের পূর্ণ দর্শন হল নির্বিঘ্নে। কিশোরীদা শুয়ে পড়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এদিকে আয়।' মন্দিরের পেছনের গলিতে নিয়ে গিয়ে বললে, 'হাত দে এই দেয়ালে, বল, যে মাকে এত ভক্তি করে, সে কোন কুসঙ্গে পড়ে মায়ের বয়সি মেয়েদের বুক টেপার শিক্ষা পেয়েছে? ডালিম যখন ছেলে ভেবে তোকে আদর করছিল, তখন তুই ও কুকাজ করেছিস? বল শালা! তা না হলে তোকে ওই হাড়িকাঠে বলি দেব।'

'কেউ তো শেখায়নি কিশোরীদা, নিজে নিজেই শিখে গেছি।'

কিশোরীদা হা হা করে হেসে উঠল, 'বেশ বলেছিস, ঠিক বলেছিল, এসব শেখাতে হয় না। যেমন কথা বলা শেখাতে হয় না। যেমন খেতে শেখাতে হয় না। বহুত আচ্ছা বলেছিস। তুই আমার গুরু। নে চল চন্নামেত্তর খাই।' বাইরে এলুম। শুরু হল কিশোরীদার দু'হাতে দানধ্যান।

গাড়িতে বসে বললে, তোর বাবা তো এখানে নেই। মোগলসরাইতে বদলি করে দিয়েছে। তেড়ে ঘুস নিয়েছিল। হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। চাকরিটাই চলে যেত, তোর এই দুশমনর মা এনকোয়ারি অফিসারের মুন্ডু ঘুরিয়ে, উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান দিয়ে চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে এইবার চাকরিটা যাবে।' কিশোরীদার গাড়ি বিদ্যুতের মতো স্টার্ট নিল-- 'চল, কেওড়াতলাটা ঘুরে যাই।'

'বাবার চাকরিটা এবার কী করে যাবে?'

'আমরা যাওয়াব। তোর মাকে দিয়ে একটা দরখাস্ত ঠুকে দোব রেলের হেড অফিসে।'

'তা হলে বাবার সংসার চলবে কী করে?'

'সে ভাবনা তোমার আমার নয়, ডালিম চালাবে।'

'ওসব করে লাভ কী? তা ছাড়া মা দরখাস্ত করবে না।'

'কেন?'

'মা বাবাকে ভালবাসে।'

'সে কী রে? মেয়েরা কী জিনিস মাইরি।'

শ্মশানে গিয়ে কিশোরীদা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চিতা জ্বলছে। একটু করে এগোয়, আবার পিছিয়ে আসে। এতই যখন ভয় তখন আসার কী দরকার ছিল!

'ভয় করছে তো এলে কেন?'

'সে তুই বুঝবি না, এখানে আসার একটা ব্যাপার আছে।'

'বলোই না।'

'আমার যখন কুড়ি বছর বয়েস তখন আমি পঁচিশ বছর বয়সের একটা মেয়ের প্রেমে পড়ি। তার নাম ছিল উমা। সেও আমাকে ভীষণ ভালবাসত। সেই উমা এই শ্মশানে আছে। আমি তাকে অনুভব করতে আসি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পাগলামি।'

'তা হলে ভয় পাও কেন?'

'মৃত্যুর কথা ভেবে। সেটা কীভাবে হবে। বাবার মতো আত্মহত্যা, না মায়ের মতো ঘাটে পড়ে! আমি রাজার মতো মরতে চাই, আর ফকিরের মতো বাঁচতে চাই। তোকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি— প্রেম করবি না, বিয়ে করবি না। তোর বাবা মোগলসরাইতে, আর ডালিম তোর বাপের বিছানায় এক মক্কেলকে শুইয়ে রেখেছে। কোনও দরকার নেই সংসারের। এই যে তোর বাবা আর মা প্রেম করল আর তুই এলি, এসে কী সুখে আছিস! তোর জীবনের ল্যাঠা তো তোকেই সামলাতে হবে। কার ফূর্তির শাস্তি কে পাচ্ছে। আমি সেইজন্যে সংসার করিনি।'

আমাদের কাজ শেষ। আমরা ফিরে চলেছি রাতের কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে। আবার সেই গন্ধ।

কিশোরীদা বললে, 'পাচ্ছিস? চল, গোটা দশেক কিনে স্যালাড সমেত প্যাক করে বাড়ি নিয়ে যাই। তুই মায়ের সঙ্গে বসে সাঁটাবি, আমার তো কেউ নেই। আমি বসব বোতলের সঙ্গে।'

'সে কী গো! এই যে বললে ছেড়ে দিলুম।'

'ধ্যাস শালা, নেশার ঘোরে মানুষ ধরে-ছাড়ে। নেশা কেটে গেলে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। নেশা কেটে গেছে, এখন নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিশোরীমোহন ঘোষ, বয়েস তেত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, যা হয় হবে। পিতা এক্স জমিনদার, মাতা সুরবালা দু'জনেই স্বর্গত। একজন ঝুললেন, আর একজন কাশীর ষাঁড়ের গুঁতোয় সোজা বৈকুণ্ঠে। একজন নরকে, আর একজন স্বর্গে। কিশোরীমোহন গাড়ির ডাক্তার। ইঞ্জিন এক্সপার্ট। সে শালা মাল খাবে না, মেয়েছেলে করবে না, তা কখনও হয়! ট্রাক ডাইভার গঙ্গাজল খেয়ে স্টিয়ারিং ধরতে পারবে! ঘুস না খেয়ে পুলিশ থাকতে পারবে! মড়া না খেয়ে শকুন পারবে! ওইসব ঝোঁকের কথা নেশার কথা একদম বিশ্বাস করবি না। লম্পট যখন মা বলে সম্বোধন করে, তখন বুঝবি ল-টা উহ্য আছে। মুখে বলছে মা-মা, মনে বলছে, মাল। এই পৃথিবীর কারওকে বিশ্বাস করবি না। এমনকী নিজেকেও না। ডান হাত বাঁ হাতকে বিশ্বাস করবে না, বাঁ হাত ডান হাতকে। শোন, তুই নিজেকে সোজাসুজি কোনওদিন দেখতে পাবি না। আয়নার সামনে দাঁড়া— ডানটা বাঁ। অলওয়েজ উলটো।'

গাড়িটা রাস্তার একপাশে খিচ করে থামল। বাঁ দিকে বিলিতি মদের দোকান। নামতে নামতে বললে, 'আজ নিজেকে পুরস্কার দেব এক বোতল, না দু'বোতল মদ। টু বটলস অফ ডেলিকেট স্কচ। কেন? অন্তত একবারের জন্যেও বলতে পেরেছি— মদ, তোমাকে ছাড়লুম। সাবধানে বোস। ফট করে নেমে মর্নিং ওয়াকে যাসনি। কেউ ডাকলেও গাড়ি ছেড়ে নড়বি না। মনে রাখবি— এর নাম কলকাতা। আমার একটু দেরি হবে।'

সামনের সিটে বসে আছি। আমার পায়ের একটু ওপরে একটা খোপ। চাপ মারতেই খুলে গেল। যন্ত্রপাতি। ছোট মতো একটা বই। হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা রিভলভার। ভয়ে তাড়াতাড়ি রেখে দিলুম। বন্ধ করে দিলুম খোপটা। পাশ দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা। বাস যাচ্ছে তেড়েফুঁড়ে। ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। সেজেগুজে মেয়েরা চলেছে। কমলা শাড়ি, নীল শাড়ি, গোলাপি শাড়ি। দু'পাশে সুখের স্রোতে টগবগে ঘোড়া। কাচের ঘরে বসে চিড়িয়াখানা দেখছি।

কিশোরীমোহন ঘোষ দু'হাতে দুটো বিশাল প্যাকেট নিয়ে ঘামতে ঘামতে ফিরে এল। ধরিয়ে

দিল আমার হাতে। 'দু'মক্কেলকে একটু সাবধানে ধর। একটা আমার, আর একটা যে আজ আমার সঙ্গে রাত কাটাবে তার।' বোতল দুটো টিং শব্দ করে উঠল— ঠিক বলেছ কিশোরীমোহন। আর একটা প্যাকেট গরম আগুন, জবরদস্ত গন্ধ— চিংড়ির কাটলেট। গান গাইতে গাইতে কিশোরীদা স্টার্ট দিল— আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে।

কিশোরীদা গাড়ি চালাচ্ছে আর বকবক করছে— 'সেই গল্পটা জানিস, এক ব্যাটা পাপী, আমার মতোই তার চরিত্র, নরকে যেতে গিয়ে স্বর্গে চলে গেল। শোন তা হলে, মজার গল্প। একটা লোক আমার মতোই রোজ লাল পাড়ায় যেত। সেখানে তার একটা ডালিমের মতোই মেয়েমানুষ ছিল। লোকটার খুব পয়সা ছিল। সারা জীবন ধরে সেই মেয়েমানুষটাকে দিতে দিতে সব ফুরিয়ে ফেলেছে। শেষ বয়সে একেবারে নিঃস্ব, ফকির। এতকাল সে যখনই গেছে একটা না একটা দামি উপহার দিয়ে গেছে। আজকে হিরের নেকলেস, কালকে সোনার নেকলেস, যা ছিল পরপর সবই দিয়ে গেছে। আমার মতোই তার কোনও সংসার নেই। একটাই তফাত, তার অনেক সম্পত্তি ছিল অনেক টাকা। দিতে দিতে বয়স হয়েছে, বৃদ্ধ হয়েছে— কিন্তু নেশা তার কাটেনি। শেষের দিনে তার আর কোনও সম্পত্তি নেই, পড়ে আছে মাত্র একটা টাকা। তখন সে ভাবছে— যাচ্ছি তো, আজ এই একটা টাকায় আমার প্রিয়ার জন্যে কী নিয়ে যাব। এক টাকায় কী আর পাওয়া যাবে! চিন্তা করছে আর হাঁটছে। হঠাৎ দেখলে এক ফুলঅলা। গোলাপ ফুল সাজিয়ে বসে আছে এক জায়গায়। বেশ বড় গোলাপ। আর দাম বলছে, টাকায় একটা। তা বেশ তাই হোক। এত কাল তো অনেক দিয়েছি, আজ না হয় শেষ টাকায় শেষ গোলাপটা দিয়ে যাই। বৃদ্ধ চলেছে তার প্রিয় বেশ্যার ঘরে, হাতে একটা লাল গোলাপ। একটা নালা পেরোতে হয়, বেশ বড় নালা, পেরোতে হবে লাফিয়ে। এক হাতে ফুল, কোঁচাটা সামলে বৃদ্ধ মেরেছে লাফ, কিন্তু টাল সামলাতে পারেনি। হাত থেকে ফুলটা নালায় পড়ে গেছে। যাঃ, ফুলটা তো প্রিয়াকে দেওয়া গেল না। বৃথাই নষ্ট হল। তা নষ্টই যখন হল, তখন বলি না কেন— কৃষ্ণায় নমঃ। অনেকটা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ-র মতো হল আর কী। বৃদ্ধ বললে, কৃষ্ণায় নমঃ। সেই রাতেই সে বেশ্যার ঘরে মারা গেল। যমদূতেরা নিয়ে গেল যমালয়ে। যমরাজ বলছেন, চিত্রগুপ্ত, এর পাপ-পুণ্যের হিসেবটা দেখো তো। চিত্রগুপ্ত পাতা উলটে উলটে বললেন, মহারাজ এর পুণ্যটুন্য কিছু নেই, কেবল পাপ আর পাপ। সারা জীবনটা শুধু পাপ। ধর্মরাজ বললেন, হতেই পারে না, ভারতবর্ষে যে জন্মেছে, তার একটুও পুণ্য নেই এ আমি বিশ্বাস করি না। দেখো দেখো, ভাল করে দেখো। আবার সব গোড়া থেকে দেখো। চিত্রগুপ্ত আবার দেখছেন। হঠাৎ বললেন, মহারাজ, টেনেটুনে একটু, এক ছিটে পুণ্য বের করা যায়। সেটা হল, বেশ্যার জন্যে গোলাপ নিয়ে যাচ্ছিল, সেটা নালায় পড়ে যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন অগত্যা বলেছিল, কৃষ্ণায় নমঃ। যমরাজ তখন সেই পাপীকে বললেন দেখো, এই যে তুমি কৃষ্ণায় নমঃ বলেছিলে, তাতে তোমার সামান্য পুণ্য হয়েছিল, এর জন্যে এই যমালয়ের গোলাপ বাগানে পাঁচ মিনিট খুশি মতো বেড়াতে পারবে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। পাঁচ মিনিট পরেই কিন্তু অনন্ত নরকভোগ। কোনটা আগে ভোগ করবে। পাপী বললে, খুচরোটাই তা হলে আগে সেরে যাই। এরপর গল্পটার আরও অনেকটা আছে, সে খুব মজার। এইটুকু বললুম কেন জানিস— ওই যে একটু আগে মদ ছেড়ে দিলুম। বিলিতি হিপকেস ছুড়ে ফেলে দিলুম গাড়ির চাকার তলায়। পুণ্য হল। ভগবান তো আর আসবেন না। সিনেমা ছাড়া কেউ কোনওদিন ভগবান দেখেছে। তুই দেখেছিস! তাই নিজেই ভগবান হয়ে নিজেকে পুরস্কার দিলুম— দু'বোতল দিশি বিলিতি মাল। কুমকুমের স্বর্গে বসে ওড়াব। অনন্ত নরকভোগ তো বরাতে নাচছেই।'

'পথ তো এখনও পড়ে আছে অনেকটা, বাকি গল্পটা বলো না।'

'সে বেশ বড়, আর একদিন বলব। রবিবার আসবি। কাবাব তৈরি করব। গল্পটা শেষ করব। আজ অনেক বকেছি।'

'তোমার রিভলভার আছে?'

'জানলি কী করে।'

'এর মধ্যে রেখেছ কেন?'

'খুলেছিলিস? নিজের সেফটির জন্যে রাখি। অনেক বেয়াদবকে পেটাই তো। দিনকাল ভাল নয়। কখন ঝপ করে ঝেড়ে দেবে। মৃত্যুটা আমার অপঘাতেই হবে।'

গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে কিশোরীদা বললে, 'যা, কাটলেটের একটা প্যাকেট বাড়ি নিয়ে যা।'

'কেন? আমাকে ভিখিরি ভেবেছ নাকি?'

'পাছায় এক লাথি। মুখ থুবড়ে ঘাসের ওপর— শালা, পাকা পাকা কথা। অশিক্ষিত, পেছন পাকা, ডেঁপো। নিজের ভাবি বলে সব কাজ ফেলে তোর বাপের সঙ্গে লড়তে গেলুম। তুই শালা মনে ভিখিরি, তাই তোর এত ভড়ং। বল তুই ডালিমের মাই টিপেছিলিস কেন? সে তোর মায়ের বয়সি। কে তোকে এই শিক্ষা দিয়েছে? চল তোর মায়ের কাছে। কিশোরীমোহন ঘোষকে অপমান। তুই আমার ভায়ের মতো, এত বড় অপমান আমাকে করতে পারলি।' কিশোরীদা কেঁদে ফেলল। একটা প্যাকিং বাক্স পড়ে ছিল। কিশোরীদা বসে পড়ল তার ওপর।

আমার খুব খারাপ লাগল। ভয়ও পেলুম। মাকে যদি বলে দেয়। তবে আমি হলুম তারক সরকার। সেই বয়স থেকেই শিখে গিয়েছিলুম, কখনও বোকা হবে, কখনও চালাক, কখনও সাধু, কখনও শয়তান। সেই গানের মতো— কভু প্রেমানন্দে রহি যে আনন্দে, কখনও নয়নে বহে অশ্রুধারা। ধড়াস করে কিশোরীদার পায়ে পড়ে গেলুম। 'হঠাৎ বলে ফেলেছি। অনেকেই আমাকে দয়া করতে আসে, বলে, তোর বাপ তো থেকেও নেই। কেউ বলে, রোজ আমাদের দুধটা এনে দিলেও তো দু'পয়সা রোজগার হয়, কেউ বলে, র‍্যাশানটা সপ্তায় সপ্তায় তুলে দিস না। তাই আমি বলে ফেলেছি।'

কিশোরীদা আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, 'দয়া আর স্নেহ বুঝতে শেখ। প্রেম আর কাম বুঝতে শেখ।'

॥ তিন ॥

রবিবাবু, মানে আমাদের হেডমাস্টারমশাই একদিন আমাকে বললেন ছুটির পর বাড়িতে দেখা করতে। সেই একবারই গিয়েছিলুম। পরে আর যাইনি। দরকারও পড়েনি। তাঁর মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল; কিন্তু আমার সময় কোথায়। ছুটির পর সাঁই সাঁই করে বাড়ি চলে আসি। সরলামাসির প্রবল আকর্ষণে। অনেকরকম ছল-ছুতো মাসি আমাকে শিখিয়েছিল, বলেছিল মাকে বলবি মাসি আমাকে পড়াবে। মা বিশ্বাস করেছিলেন। সরলামাসি মায়ের চেয়ে অনেক বেশি লেখা-পড়া জানে। মাসি অনেক টাকা পেয়েছে। মেসোর অফিসের টাকা, ইনশিয়োরেন্সের টাকা। আমাকে বেশ নাদুস-নুদুস করেছে হাঁস মুরগি খাইয়ে। নতুন একটা নেশা ধরিয়েছে সিদ্ধি। নিজেই বাটে মিহি করে। নানারকম মশলা মেশায়। সন্ধের মুখেই আমরা দু'গেলাস মেরে দিই। তারপর ক্ষীর। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অন্য চেহারা। তখন আর মাসি বোনপো সম্পর্ক নয়। যেন দুই সমবয়সি নারী-পুরুষ। অশ্লীল, ইতর। সেই সব কাণ্ড-কারখানা পৃথিবীর কেউ কোথাও কখনও লিখবে না। লেখা যায় না। ইন্দ্রিয়চর্চার নিত্য-নতুন আবিষ্কার। সে-খেলায় নারীই প্রধান। শক্তির অধীন পুরুষ। কেন, খারাপ কী? ছি ছি করার কোনও কারণ নেই। কালী কেন শিবের বুকে? বিপরীত রতাতুরা। তান্ত্রিক জানে, জানে ফকির বাউল। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন। তারক সরকারের অনেক উপকার করেছিলেন সেই ভয়ংকর মহিলা।

রবিবাবু ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। গম্ভীর মুখ। সেই হাসিখুশি ভাব আর নেই।

'শোনো তারক, আমাদের এই স্কুলের একটা সুনাম আছে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের প্রথম দশজনের মধ্যে নাম থাকে। আমি তোমাকে ফ্রি করেছিলুম, আমার আশা ছিল তুমি ভাল হবে লেখাপড়ায়, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। তখন তোমাকে আমি ভালবাসতুম, এখন তোমাকে আমি ঘৃণা করি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত সাধারণ মানের। তখন তোমার মধ্যে একটা সংগ্রামের ভাব ছিল, এখন তোমাকে দেখলে মনে হয় একটা ভোগী বখাটে ছেলে। কৈশোরেই যৌবন এসে গেছে। অনেক বছর ধরে ছেলে চরাচ্ছি, চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি কে কেমন, বুঝতে পারি কে পবিত্র কে অপবিত্র, অভ্যাসে চিন্তায়। তুমি হস্তমৈথুন করো? এবারে পরীক্ষায়, তোমার উত্তর আর স্বদেশের উত্তর এক হয়ে গেছে। তুমি স্বদেশের টুকেছ— প্রুভড বিঅন্ড ডাউট। এই স্কুলে তোমাকে আর রাখা গেল না।'

চেয়ারটাকে উলটে দিয়ে বেরিয়ে এলুম। যে মানুষ ধরে ফেলে তাদের ত্রিসীমানায় থাকতে নেই। এই শিক্ষাটা আমার সেই বয়সেই হয়ে গিয়েছিল। কিছু মানুষ যেন আয়নার মতো। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই নিজের আসল মুখটা ফুটে ওঠে। তখন ভয় করে। মনে হয়, একটা গাড়ি ফুল স্পিডে এমন একটা রাস্তায় ছুটছে, যার শেষে খাদ। পড়ব আর মরব। যেসব মানুষ জ্ঞান দেয়, তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। পুকুরের মাছ যদি সমুদ্রের মাছকে জ্ঞান দিতে যায়, সমুদ্রের মাছ হাসবে। আরে জ্ঞানের পুকুরের বাইরে জ্ঞানের সমুদ্র আছে ম্যান। সেখানে বিশাল ঢেউ, তিমি হাঙর। বেড়ার গাছ আর বিশাল গাছে অনেক তফাত। আমি তারক সরকার। আমার বয়েস যখন দুই, আমার বাবা বিশ্বনাথ কুড়ি বছরের এক চ্যাংলাকে নিয়ে নিজের প্রাইভেট বেশ্যালয় করেছিলেন। জ্ঞানের জোরে নয় প্রবৃত্তির জোরে টাকার জোরে ঘুসের জোরে। আমি বলব চরিত্রের জোরে। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি করেছি। কারও পরোয়া করি না। তোমরা লুকিয়ে করো, আমি খোলাখুলি করি। আমি বাঘের বাচ্চা। মানুষের ঘাড়ে আমি ভগবানকে চাপাতে চাই না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন, বাস, এই হল জীবনের রয়্যাল রোড। গোটাকতক অসুস্থ নপুংসক কী বলেছে আমার জানার দরকার নেই। নর চায় নারী, নারী চায় নর। তালা চায় চাবি, চাবি চায় তালা।

আমার আর এক গুরু দুলিচাঁদ গ্যাংস্টারকে যখন আমার জীবনের এই কাহিনি বলেছিলুম তখন সে বলেছিল, তুমি আর তোমার বাবা যথেষ্ট প্রচার পেলে অন্য আর এক জাতের মহাপুরুষ তৈরি হতে। ধরো হরিণের ছেলে অহিংসার গল্প পড়বে, বাঘের ছেলে পড়বে? বাঘের ছেলে হরিণের পাঠশালায় পড়তে এলে হরিণ পণ্ডিত ছপটি মেরে মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করবে— অহিংসা পরম ধর্ম। তাতে বাঘের ছেলে অহিংস হয়ে যাবে? মাটন কাটলেট ছেড়ে ভেজিটেবল কাটলেট খাবে? পনির মটর খাবে? কুকুরের ছেলেকে যদি বলা হয় ভাদ্র মাসে অমন অসভ্যতা করিস কেন? এই নে পড়— সংযমই সাধনা, দেখবি কুকুরেশ্বর এসে সিদ্ধাই দিয়ে যাচ্ছে, তোর ন্যাজ জ্যোতি খেলছে। লক্ষবার জপ কর। নেহাত না পারলে সদারা সহবাস করো মাঝরাতে কুকুরপ্রকোষ্ঠে। তোমাদের সরকারের এই লিফলেট পড়ো— ওয়ান কেঁউ, টু কেঁউ, নট মোর দ্যান থ্রি কেঁউ। প্ল্যানড ফ্যামিলি ইজ হ্যাপি ফ্যামিলি, তোমাকে তেড়ে কামড়াতে আসবে। জ্ঞানদাতা ছুটছে, পেছনে একলাখ কুকুর। আরে ম্যান যিশুকে তার চ্যালারাই ঝুলিয়ে দিলে। বুদ্ধদেবকে দিলে বিষ।

আমি যেমন সরকার থেকে গুছাইত, দুলিচাঁদ তেমনি শা থেকে গ্যাংস্টার। অরিজিন্যালি ভাগলপুরের মাল, কলকাতার টিকি ধরে নাড়ছে। পুলিশের বড়কর্তা তার সঙ্গে অরেঞ্জ কালারের সখী নিয়ে গঙ্গায় প্রমোদ ভ্রমণ করেন। একটু একটু পান করেন, একটু একটু নাড়াচাড়া করেন। দুলিচাঁদ দুটো থ্রিস্টার হোটেল আর বিশাল এক বার-কাম-রেস্তোরাঁয় মালিক। রিয়েল এস্টেটের ব্যাবসা আছে। দুটো অ্যাপার্টমেন্ট আকাশে ঢুঁ মারছে। তিন নম্বরে আটকেছে। কলকাতার একটা

বহুতল পাশ ফিরে শুয়ে পড়ায়, সে যতটা উঠতে চেয়েছিল ততটা উঠতে পারছে না। কোই হর্যা নেহি। ওপরে না উঠতে পারি, পাতালে আবগারি আর ক্যাসিনো চালাব। সো ওয়ান ক্যান ইস্টপ মাই পোরোগরেস। সিভিলাইজেশানের ফার্স্ট বলে মহাপুরুষদের উইকেট ছিটকে যাচ্ছে— ফিরে আসছে, গাঁজা, গুলি, ভাং, চরস। সমাজ একেবারে চৌরস। চৌরঙ্গির এভরি থার্ড ওম্যান ইজ এ কলগার্ল।

আমি গুছাইত— দুলিচাঁদ বাঘ, আমি তার ফেউ। যা প্রসাদ-টসাদ পাই, তা কম নয়। আমাকে লাইক করে। বলে, বাঙালি হলেও তোমার অতীতটা একেবারে বিলিতি। তোমার কোনও দুঃখ আছে নাকি? থোড়া কুছ আফশোস? একটাই, বাপ তো ছেলেকে সুশিক্ষা দেয়, চোদ্দো বছরের ছেলেকে তার বাপ শিখিয়ে দিয়ে গেল— হাউ টু রেপ। এই আর কী! ব্যাড এগজাম্পল। লোকে বলে।

লোকে বলে! বুদ্ধুরাম। আরে লোক না পোক। লোক দেখবে তুমি?

হিউম্যান বিইংস! কাম উইথ মি ম্যান।

দুলিচাঁদ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রথমে তার বারে। একটা কোণে আমাকে নিয়ে বসল। বেয়ারা মালিককে দেখে সসম্মানে এগিয়ে এল। আমার জন্যে স্কচের ফরমায়েশ গেল। সে খাবে না। তার মদ খাওয়ার সময়টা উলটো। যখন মহাবীরের পুজোয় বসবে, তখন পেট টইটম্বুর মালে। বলে নিজেকে ভুলতে না পারলে অলৌকিক উদ্ভট জিনিসে বিশ্বাস আসে না। মহাবীর। বীরের বীর। জাস্ট লাইক অরণ্যদেব। আমার বরফভাসা স্কচ এসে গেল। শুরু হয়ে গেল কোমর দোলানো গান। দুলিচাঁদ বললে, 'মেয়েটাকে দেখো, আর টেবিলে-টেবিলে যারা বসে আছে তাদের দেখো।' মেয়েটা যাচ্ছেতাই একটা হিন্দি গান গাইছে। বললুম, 'গানটা অশ্রাব্য।' দুলি বললে, 'গানটা কোনও ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হল মেয়েটার শরীর। গান না গেয়ে কুকুর ডাকলেও কিছু এসে যেত না। আবার শরীরটাই সব নয়, অনেকেরই ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে। কিন্তু তারা শরীর দেখাবার, সেক্স থ্রো করার আর্টটা জানে না। এখানে যারা এসেছে তারা বেশিরভাগই ইমপোটেন্ট। কোনও সুস্থ সবল স্বাভাবিক মেয়ে এসে যদি বলে, হ্যালো মিস্টার, কাম অ্যান্ড স্যাটিসফাই মি— সবাই বলবে— ও, নো সরি; কারণ? কারণ একটাই তুমিও জানো, আমিও জানি। মেয়েটা ওদের দেখাচ্ছে দুটো জিনিস— ব্রেস্ট অ্যান্ড জেনিট্যাল। সিভিলাইজেশান ইজ নাথিং বাট হায়েস্ট ডিগ্রি অফ পারভার্শান। অ্যান্ড দ্যাট উয়োম্যান ইজ রিয়েল বিচ, অ্যান্ড হার ক্যাপিটাল— টু স্পঞ্জি বালজ, থ্রি টায়ার ওয়েস্ট, মিড ডিপ্রেশান অ্যান্ড এ সাউন্ড, নো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, রিসার্চ, ডক্টরেট। নাথিং নাথিং। অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড— দাস সেয়েভ দি হোলি বাইবল— আউট অফ নাথিং কামস সামথিং। এইবার ওই কোণের টেবিলে দেখো— সিটস এ গ্রেট পোয়েট— নোবেল ছাড়া সব পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেছে। ওই দেখো, এই শহরের চারজন গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল। আর্ট, কালচার, সিনেমা, পলিটিক্স, ড্যান্স, ড্রামা, লিটারেচার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ধর্ম, অধর্ম সম্পর্কে যাঁদের কথাই শেষ কথা। ওই দেখো শেয়ার মার্কেটের কিং পিন। ওই দেখো, সিটিং দেয়ার আয়রন কিং, বুলিয়ান কিং, পলিটিক্যাল লিডার। রাত বাড়বে। বাইবেল উলটে যাবে— আউট অফ কসমস উইল কাম ক্যায়স। মেয়েটা নেমে আসবে। টেবিলে টেবিলে ঘুরবে। কেউ চাপড় মারবে পাছায়, কেউ ব্রেসিয়ারের ঝুমকোটা দুলিয়ে দেবে, কেউ লাল ঠোঁটে চুমু খেতে যাবে, কেউ বুকে নোট গুঁজে দেবে। মেয়েটা মাছের মতো পিছলে পিছলে যাবে। দে উইল ফাইট, আরগু, ক্রাই। সব এক-একটা গার্বেজের মতো যে যার বাড়িতে চলে যাবে। প্রতিদিন এই এক দৃশ্য। দিস মেটিরিয়াল ওয়ার্লড ইজ আন্ডার দেয়ার কন্ট্রোল। দে ফ্যাশান আওয়ার লাইফ, ডিক্টেট আওয়ার কালচার, শেপস আওয়ার ইকনমি।'

আমরা সেই নিশাচরদের জগৎ থেকে বেরিয়ে এলুম। দুলিচাঁদ বললে, 'চলো আমার হোটেলে অ্যাসপারাগাসে। সেখানে দেখবে সেক্স বাজার, ক্লেভার ম্যানিপুলেশন, সাইলেন্ট রেপ। রেপ ফর

প্রোমশন, রেপ ফর কন্ট্রাক্ট, রেপ ফর ফিল্ম কেরিয়ার, অল শর্টস অফ রেপ। দিস ইজ রেপিস্টস ওয়ার্লড মাই ম্যান। মিস্টার রে, ডিরেক্টার অফ এ মালটি ন্যাশন্যাল, মিসেস সেনকে কামড়াচ্ছে। মিস্টার বাজাজ, মিস দফাদারের দফারফা করছে। কারণ দফাদার ইস্টার্ন রিজিয়ানের পি আর ও হবেন। পাবলিক রিলেশানস-এর আগে পার্সোনাল রিলেশানস। সব বেনাম। আসল নাম আসল জায়গায়। নকল নাম, নকল ঠিকানা, আসল কাম। কত কী চাই আমাদের? কালার টিভি, ভি সি আর, বিলিতি পারফিউম, কসমেটিক্স, মাইক্রোওভেন, ফ্ল্যাট, গাড়ি, ছেলেমেয়েদের এক্সপেনসিভ এডুকেশান। বাংলা গান শুনেছিলুম— তোমার আছে ভাষা, আমার আছে সুর। আমার আছে মানি, তোমার আছে হানি। আমার আছে ফেভার, তোমার আছে ফিগার।'

দুলিচাঁদ গ্যাংস্টার মজার মানুষ। বলে, আমি হলুম নরকের চৌকিদার। তোমার স্বর্গেও তো মদ মেয়েমানুষের অভাব নেই। সেখানে সংস্কৃত ভাষায় সেক্স হয়। দুলিচাঁদ আবার পড়ুয়া লোক। তন্ত্র থেকে শ্লোক আউড়ে দিলে:

আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনং তথা।
দর্শন স্পর্শনং স্পর্শনং যোনোধিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম ॥

একদিকে হোমের আগুন, আর একদিকে কামের আগুন। বিশ্বরূপে সবই আছে। দুলি বললে, 'তোমার মানব জন্মের ভিতটা বেশ পাকাই হয়েছে বন্ধু।' মনে মনে ভাবি, তা অবশ্য ঠিক। সেই রবিবাবু আর চন্দ্রদাদুর শেষটা তো আমি জানি! নকশালরা রবিবাবুর গলা কেটে নর্দমায় ভাসিয়ে দিলে। আর চন্দ্রদাদু ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে ঝিয়ের কোলে মাথা রেখে মারা গেলেন। স্বর্গ থেকে রথ এল না, জগদম্বা পুষ্প বৃষ্টি করলেন না। বাজার থেকে খাটিয়া আর নারকোল দড়ি এল। সম্পদের মধ্যে রইল এক জোড়া খড়ম, একটা জপের মালা, আর একটা বই স্তবমালিকা। মিটে গেল ঝামেলা।

কিশোরীদাকে বললুম, 'স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'জানতুম। লেখাপড়া তোর হবে না। তুই book থেকে বুকের লাইনে চলে গেছিস।'

'কী করব?'

'কী করবি, তাই তো! ফ্রিশিপ ছিল যখন, তখন পড়াটা চালালে কী হত?'

'হচ্ছে না, আসছে না। অঙ্কে দশ, ইতিহাসে তিরিশ। রেজাল্ট দেখে হেডমাস্টার মশাইয়ের চোখ কপালে। এদিকে ইংরেজিতে সত্তর, বাংলায় আশি।'

'তার মানে তুই আর্টসের লাইনের।

'রইল না তো শূন্য হয়ে গেল। আমাদের থার্ড বয়কে টুকেছিলুম। দুটো খাতা এক। আমারটা ক্যানসেল।'

'বহুত আচ্ছা। তুই পড়িস না? সারাদিন ঘাস কাটিস।'

'অনেক কাজ তো! ঠিক সময় পাই না।'

'তা হলে সেই কাজই কর। রোজগার হয় তো!'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সে কাজে খুব খেতে পাই। গায়ে ভাল জামা উঠেছে। আগে মা সরলামাসিকে খুব অভাব ভেবে জিনিসপত্তর পাঠাত। অভাব অবশ্য কোনও সময়েই তেমন ছিল না। এখন তো যথেষ্ট বড়লোক। এখন মাকেই জিনিসপত্তর পাঠায়, যতই হোক শাশুড়ি তো। আমাদের নিতাই ঘোষ রোডের অনিলবাবু বড় ইঞ্জিনিয়ার, একটা টুকটুকে ফরসা ছেলে পুষেছেন। সে রোজ তিনটের সময় খাটালে গিয়ে একটা গেলাস নিয়ে বসে থাকে। দুধ দোয়া হলেই গরমাগরম ফ্যানা ফ্যানা পাঁচপো দুধ চোঁ চোঁ করে খায়। পাড়ার লোক ইংরেজি বই পড়ে শিখেছে, অনিলবাবু হোমো। কথাটার মানে আমিও শিখেছি ডিকশেনারি দেখে। সরলামাসি আমাকেও সেইরকম পুষেছে। আমি যে জগতের মহাপুরুষ, সে জগতের বৈচিত্র্য বেশি, লোকসংখ্যা বেশি, প্রচুর আনন্দ,

খানাপিনা, কেবল আলো কম। সবটাই অন্ধকার। তা ছেলেবেলায় আমাকে তিমির পণ্ডিত বলেছিলেন কূর্মাবতার। কূর্ম তো জলের তলাতেই থাকে। গায়ে শ্যাওলা। জলের নীচে থেবড়ে পড়ে আছে। কিশোরীদা বললে, 'ঠিক আছে, অত চিন্তার কিছু নেই। তোর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা ওভার অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। অনেকেরই অমন হয়। তাই তোর চেহারাটা বয়েসের তুলনায় ভোঁদকা মতো দেখায়। তাড়াতাড়ি গোঁফ দাড়ি গজায়। বর্ষার ব্যাং হয়ে যায়।'

'সেই গ্ল্যান্ডটা আছে কোথায়? নীচে?'

'তোমার মাথায়। গাধা কোথাকার। ঘাড়ের পেছনে, আমার কাছে একটা বই আছে তোকে দেখিয়ে দেব। নিজের শরীরটাকে চেনা দরকার। মটোরের ইঞ্জিন আর মানুষের ইঞ্জিন দুটোই জানতে হবে। মানুষ বস্তুত জটিল। সমঝা?'

'তা হলে আমি এখন কী করব?'

'ভ্যারেন্ডা ভাজবে।'

'সব সময় অমন কোরো না কিশোরীদা।'

'তুই আমার সঙ্গে আমার গ্যারেজের কাজে লেগে যা। যদি শিখতে পারিস তোর আর অভাব থাকবে না। যদি শিখিস, আমি তোকে পাকা মিস্ত্রি করে দোব। তবে একটা কথা, বাবুগিরি চলবে না। তেল-কালি মাখতে হবে। চব্বিশটা ঘণ্টা খাটতে হবে। আগে ভেবে নাও।'

'ভাবাভাবি নেই। আজই।'

'তবে চল। আমি একটা পুরনো গাড়ি কিনতে যাচ্ছি। এনে ভোল পালটে ডবল দামে ঝাড়ব।'

খটখটে এক ভদ্রলোকের টাইট একটা বাড়ি। এপাশে ওপাশে সেপাশে, চারপাশে কোল্যাপসেবল গেট। চকোলেট রঙের বাড়ি। ইটের খাঁজে খাঁজে হালকা সাদা রুল টানা। জানলায় জানলায় নেটের পরদা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। সেই সাহেব আমলের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসেরই একটা জবরদস্ত বাংলো, টালি দেওয়া বারান্দা। অ্যালুমিনিয়াম রং করা ওভারহেড ট্যাঙ্ক। আইভিলতা। জেসমিন ট্রেলিস। নেমপ্লেটে লেখা পি সি চ্যাটার্জি। এক্স চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাবকক অ্যান্ড সাইমন।

কার্পেট বিছানো ঘর। তেমনি সাজানো। জুতো! জুতো পরে! জুতো খুলে? এগোই-পেছোই।

কিশোরীদা বললে, 'হর্নস অফ ডাইলেমার মতো এই হল মধ্যবিত্তের ডাইলেমা। জুতোসুদ্ধ ট্যাকট্যাক করে চল। সোজা সোফায়। পায়ের ওপর পা। তুই কিনতে এসেছিস, সব সময় ডাঁটে থাকবি।'

ভদ্রলোক এলেন। এতখানি একজোড়া পাকা গোঁফ। মাথায় কিন্তু টাক। মুখে একটা পাইপ। তিনি এলেন, তাঁর বউ এলেন, লোমআলা কুকুর এল, তবলার মতো দেখতে নাতি এল, ঝুলঝাড়ুর মতো দেখতে ছেলে এল।

কিশোরীদা ফিসফিস করে বললে, 'আর কেউ নেই। নেচে নেচে আয় মা শ্যামা। সব চলে আয়. হাতা, খুন্তি, ডেও ডেকচি।'

ভদ্রমহিলা শুরু করলেন— 'গাড়িটা আমাদের ঠিক বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল না। আমার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আমেরিকায়, আমার মেজ মেয়ের ইংল্যান্ডে, ছোট মেয়ের আফ্রিকায়। আর আমার বাবা আছেন ভিয়েনায়, আমার কাকা আছেন কানাডায়, আমার বড় ভাই কুয়ালালামপুরে, আমার মেজ ভাই গ্লাসগোতে, কেবল এদের বংশের কেউ কখনও বিলেত যায়নি। শ্বশুরবাড়ির পরিচয় দিতে আমার লজ্জা করে। আমাদের ফ্যামেলিতে কেউ বাংলা বলে না, কেবল এদের জন্যে আমাকে বাংলা বলতে হয়। আমরা আসলে সায়েবের জাত।'

কিশোরীদা বললে, 'আমরাও তাই। আমার জন্ম তো আকাশে।'

'আকাশে মানে?'

'সে এক কেলেঙ্কারি। আমার বাবা তো পাইলট ছিলেন। মাকে বললেন, টলস্টয় বলেছেন, আকাশে গর্ভযন্ত্রণা একেবারে টের পাওয়া যায় না। তুমি শুধু আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে বোলো। আমার মা ঘড়িতে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেন। মাকে অ্যাটেন্ড করছিলেন মিস ম্যাগনোলিয়া আর গাইনি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ডক্টর ব্রুহাম। অ্যালার্ম বাজামাত্রই সব হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন ডি-এ-ওয়ান নাইন নাইন ফ্লাইটে। টি এ মানে ট্রান্স অ্যাটলান্টিক। প্লেন যখন আর্জেন্টিনার আকাশে, তখন আমি মায়ের পেট থেকে, মালাইয়ের খোল থেকে যেভাবে কুলফিমালাই বেরোয়, সেইভাবে স্মুথলি মিস ম্যাগনোলিয়ার কোলে। সেই কারণেই আমার ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশন্যালিটি। আমার বিশ্ব নাগরিকত্ব। কোথাও যেতে আমার কোনও পাসপোর্ট ভিসা লাগে না।'

ভদ্রলোক কোনও কথা বলছেন না। পাইপ চিবোচ্ছেন। রাগী রাগী কাঠের খড়মের মতো মুখ।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার ছেলেটাকে টেক্সাসে পাঠাচ্ছি।'

'কোন ছেলে?'

'ওই তো আমার এক ছেলে। ছেলের নাম আমি চিন থেকে আনিয়েছি। ডিনসুস।'

'চিন থেকে একমাত্র কালি আসে, চাইনিজ ইঙ্ক।'

'সে আসে আসুক। যখন আমার ছেলে হচ্ছে, বাবা তখন চিনে। গবেষণার কাজে ব্যস্ত। চাইনিজ ওয়ালে কত ইট লেগেছে। সে কাজটা অবশ্য শেষ হয়নি।'

'ওটা আমি শেষ করে এসেছি। আকাশে যত তারা আছে তত ইট আছে। চিন সরকার খুশি হয়ে আমাকে ডক্টরেট অফ ওপিয়াম করেছেন। আপনার ছেলে খুব লম্বা। নাম রাখা উচিত ছিল ওয়ালনাট।'

'ও আমার ছেলে হবে কেন? আমার ভাই হর্যক্ষ, মানে সিংহ। আমাদের ফ্যামিলি হল লম্বার ফ্যামিলি। আমার ঠাকুরদা নামকরা ডাক্তার ছিলেন। লোকে বলত ডক্টর টল। টেলার টুলে উঠে কোটের মাপ নিত।'

'আপনার ছেলে তো খুব ছোট, তাকে এখনই ওই মারাত্মক জায়গায় পাঠাবেন?'

'ছোট কোথায়! ওর বয়েস হল পঁচিশ। ও খাটের মতো পাশের দিকে বেড়েছে। এইটাই তো একটা অসাধারণ ব্যাপার। সায়েবদের কাণ্ড। ওরা কীভাবে জেনে ফেলেছে। ডালাসে ওকে নিয়ে এখন রিসার্চ হবে। ও সামনের মাসেই যাবে।'

'ফিরবে তো?'

'তার মানে?'

'রিসার্চ মানেই তো কাটা-ছেঁড়া। অপারেশন।'

'তাই নাকি?'

'জানেন না আপনি, গিনিপিগ নিয়ে ডাক্তাররা কী করে?'

'হ্যাঁ তাই তো! ডিম শুনলে? তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ভাল করে খবর নাও।'

বাজখাঁই গলায় ডিমের কুসুম বলে, 'মাম্মি! যাবই আমি যাবই। বিনা পয়সায় আমাকে যমালয়ে যেতে বললেও যাব। টাইড অ্যান্ড টাইম উয়েট ফর নান।'

কিশোরীদা বললেন, 'কোটেশানটা এখানে যাবে না। বলতে হবে, চান্স নেভার কামস টোয়াইস।'

ভদ্রলোক ছড়ির মতো উঠে দাঁড়ালেন। মহিলা বললেন, 'কী পেট ব্যথা। তখনই বলেছিলুম, ইলিশ তোমার সহ্য হয় না। অত খেয়ো না।'

'আমি আর খেলুম কই। সিংহভাগ তো তোমার সিংহই খেয়ে ফেললে। আমি উঠে যাচ্ছি ডিসগাস্টেড হয়ে। আমার সময়ের দাম আছে কাবলি। বিলেতের ল্যানসেট পত্রিকার আর্টিকালটা আজই আমাকে শেষ করতে হবে। রোজ রাত আড়াইটের সময় ডক্টর ডেভিড আমাকে ফোন করছেন।'

'হ্যাঁগো, তোমার সেই লেখাটা অ্যাটলান্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছ! কী সুন্দর!'

'কোনটা?'

'জাম্পিং জ্যাকফ্রুট।'

'জাম্পিং নয় থাম্পিং। জ্যাকফ্রুট নয় জাগুয়ার। কেন, ওই লেখাটার কথা বলো, যেটা আমি ব্যাসাচ্যুসেটস টাইমসে পাঠালুম— ড্রিপিং ডিগবয়।'

এইবার কিশোরীদা উঠে দাঁড়ালেন— 'আর তো সময় দেওয়া গেল না। আমার যে গভর্নারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' ভদ্রলোক বললন, 'দ্যাটস গুড; কারণ গাড়িটা আজ দেখানো যাবে না। তবে একটা ছবি দেখাতে পারি হোয়েন আই পারচেজড নিউ। আসলে হয়েছে কী হর্যক্ষ কাল একটা অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছে। লাইসেন্স-মাইসেন্স অ্যান্ড কার পুলিশ আটকে রেখেছে। ডিসিকে ফোন করেছিলুম। নাম শুনেই লাফিয়ে উঠেছে। অ্যাপলজি, অ্যাপলজি অ্যান্ড অ্যাপলজি। বললে, ইয়োর কার! আমি বেয়ারা দিয়ে কালই পাঠাচ্ছি।'

'কী পাঠাচ্ছেন? ওয়ারেন্ট।'

'না না, দ্যাট কার।'

'বায়োলজি কেমন আছে?'

'মানে?'

'মানে গাড়িটার অবস্থা কী?'

'ও তো বলছে চেনা যায়। সামনেটা নেই, পেছনটা আছে। আপনি হাফ দাম দেবেন।'

রাস্তায় নেমে কিশোরীদা বললেন, 'এদের কী বলে জানিস, শ্যাওলা ধরা বড়লোক। শ্যাওলা ধরা বাথরুমের মতো। বাথরুমটা খুব কায়দায় করা হয়েছিল, সেরামিক টাইলস, বেসিন, কমোড, শাওয়ার, ঝকঝকে ফিটিংস, সব শ্যাওলা ধরে গেছে। পেচ্ছাপ করে জল ঢালে না দুর্গন্ধ। এদের সঙ্গে মিশলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। বড়লোক ছোটলোক হওয়ার চেয়ে, ছোটলোক বড়লোক হওয়া ঢের ভাল।'

'তুমি যা দিলে, ওরা বুঝতে পেরেছে।'

'পারবে না, রতনে রতন চেনে। ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। এরা লোক ডেকে এনে বড় বড় কথা শোনায়। নিজেদের গল্প, যার ষোলো আনাই অসত্য। চল, আগে আমরা এক কাপ করে চা খাই। আজ আর মা দেখাবি না শালা। চাকরি খেয়ে দেব। চাকরির নিয়ম কী বল তো? বল ডান্স দেখিছিস?'

'মানে বল নাচানো!'

'তোমার মাথা। জোড়া গির্জার মতো, জোড়া নাচ। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। এ ওর কোমর ধরবে, ও এর কোমর, হাতে হাত, ঝিমকুড়ি ঝিমকুড়ি বিলিতি বাজনা। এ যেভাবে পা ফেলছে ওকেও সেইভাবে পা ফেলতে হবে। একবার এদিক যায়, একবার ওদিক। প্রভুর তালে তাল মিলিয়ে পা ফেলার নাম চাকরি। গানটা কী বল তো, সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী প্রভু তুমি। যেমন নাচাও তেমনি নাচি, যেমন নাচো তেমনি নাচি ॥ প্রভু যদি মদ ভেবে অ্যাসিড খায় তোমাকেও তাই খেতে হবে, তবে প্রভু যাবেন দামি নার্সিংহোমে, তুমি যাবে হাসপাতালে। প্রভু আর ভৃত্য দু'জনেই রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। দু'জনে একই সঙ্গে যমালয়ে। যমরাজ বলছেন, বোসো। আগের পার্টির পেমেন্ট, মানে পাপপুণ্যের পাওনা মিটে যাবার পর চিত্র তোমাদের ডাকবে। প্রভু চেয়ারে বসেছে, ভৃত্য খাড়া। যমরাজ বলছেন, কী হল? কানে খাটো নাকি? আলো আটকে দাঁড়িয়ে আছ, বসতে বলেছি না! ভৃত্য বলছে, আজ্ঞে! শুনেছি, তবে সারাটা জীবন যাঁর কথায় ওঠ-বোস করেছি, তিনি না বললে বসি কেমন করে! যমরাজ বলছেন, জানো, আমি যম! ভৃত্য বলছে, মানছি, তবে মরে যাবার পর কে যম, কে ঈশ্বর, আমার জেনে কী হবে! মরেই তো

গেছি। যতদিন বেঁচে ছিলুম, ততদিন উনিই আমার যম ছিলেন। ওঁর চুমকুড়িতেই আমার আলো, আমার ফোয়ারা, আমার হররা। বউ নিয়ে বিদেশ গেছি, ছেলেকে ইংলিশ স্কুলে পড়িয়েছি, বিলাইতি উড়িয়েছি, মানুষকে দাবড়েছি। উনি তো আমাকে বসতে বলেননি। যমরাজ বলছেন, বসতে বলো। প্রভু বলছে, বসতে বলব! ওর চাকরি খাব! ওর কথা শুনেই আজ আমার এই চিঁড়েচ্যাপটা অবস্থা। ও বললে, ক্রস, যেই রাস্তা পার হতে গেলুম ট্রাকের তলায়। যমরাজ বলছেন, তুমি বলেছিলে? ভৃত্য বলছে, প্রভুর কথায় হ্যাঁ, না বললে প্রোমোশান আটকে যায়। যমরাজ বলছেন, তুমি না বললে কী হবে, আমার খাতা থেকে তো এখুনি জেনে যাব।— সে আপনি জানুন গে। আমি কোনও প্রতিবাদ করব না। প্রতিবাদ করে বিশ্বনাথ, রমাকান্ত, সূর্য, স্বয়ম্ভু, এদের যা অবস্থা হয়েছে জানি। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন, দেখা যাচ্ছে, ও যাকে প্রভু বলছে, সেই বলেছিল ক্রস। যমরাজ ভৃত্যকে বলছেন, তুমি সত্য স্বীকার করলে না কেন? ভৃত্য বলছে, প্রভু! মরার পর আর সত্য-মিথ্যে করে লাভ কী! দু'জনেই তো মরেছি। যমরাজ বলছেন, সেই জ্ঞানই যখন হয়েছে, তখন প্রতিবাদ করছ না কেন?— প্রভু? মরলে কী হবে! আমার যে ভৃত্যের আত্মা। পৃথিবীতে দেখেছি— প্রতিবাদ করলেই মানুষের জীবন্মৃত অবস্থা হয়। তাই ভয়ে আমি ভৃত্য। আমি ভৃত্য আমার পরিবার-পরিজন ভৃত্য, আমার আত্মা ভৃত্য। যমরাজ বলছেন, প্রভু, হল না কেন?— আজ্ঞে ক্যাপিট্যালের অভাব। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাও! এদের ওঠ-বোস ঘরে পুরে দাও। দু'জনেই ওঠবোস করুক তেত্রিশ কোটি বছর।'

কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন চায়ের দোকান। কড়া টোস্ট, ডবল ওমলেট, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কার কুচি চোবানো। ডবল হাফ চা। মুখের তার ফিরে গেল। গরিবদের সুবিধে, সামান্য জিনিসই অসামান্য লাগে। অবশ্য সরলামাসি এখন আমাকে খুব খাওয়ায়। সেটা কোনও স্নেহ ভালবাসা নয়। ছোলা খাওয়ার ছাগলকে, শুয়োরকে খাওয়ায়, মুরগিকে খাওয়ায় গোরুকে খাওয়ায়, সব স্বার্থে। একটা কিছু পাওয়ার জন্যে। সরলামাসি নধর একটা ছেলে চায়, তার ব্যামোর চিকিৎসার জন্যে। সেসব ভয়ংকর ব্যাপার। কিশোরীদাকে বললে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে!

কিশোরীদা টোস্টে কড়কড় কামড় মারছে আর বলছে— 'জীবনটা বেশ কাটাচ্ছি, কী বল? কোনওদিন খাওয়া জোটে, কোনওদিন জোটে না, চেহারাটা টসকায়নি। জানিস তো, কলেজে পড়ার সময় নিজেকে বিবেকানন্দ ভাবতুম। বড় বড় চোখ, বিশাল ছাতি, বড় বড় চুল, চৌকো চোয়াল। ভাবতুম শিকাগোয় যদি আর একটা বিশ্ব ধর্মসভা হয়, তা হলে গিয়ে হাজির হব, স্বামীজির বক্তৃতাটাই আর একবার ঝাড়া মুখস্ত বলে আসব। হইহই পড়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ব্রত কী জানিস? ব্রহ্মচর্য। যেই মীনাকুমারি মাথায় ঢুকল, স্বামীজি বেরিয়ে গেলেন। দর্জিপাড়া দিয়ে হাঁটছি দুপুরবেলা। এই পুজোর আগেটাতে হবে। তখনও ছাত্র। কলেজে মাইনে বাকি পড়ে গেছে। পরীক্ষায় বসতে দেবে না। মা একটা সোনার বালা দিয়ে বলেছে সাবধানে নিয়ে যা, দরদস্তুর করে বেচে দে। টাকাটা সাবধানে পেটকাপড়ে করে আনবি। একগাদা টাকা পেটের কাছে। পাশ বালিশের খোলে ভরে বেঁধেছি। হঠাৎ দেখি উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে অবিকল মীনাকুমারি। সোনালি পাড় বসানো সাদা সিল্কের শাড়ি, ফুরফুরে চুলে এলো খোঁপা। কানে দুটো বড় সাইজের দুল। গোল কবজিতে সোনার ঘড়ি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিচিক করে চোখ মেরে গেল। আমার ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে গেল। মেয়েটা হাতদশেক গেছে, আমি অমনি ঘুরে গেলুম। ফলো করছি। কী অসাধারণ হিপ, পায়ের গোছ। আমি যেন একটা ছাগল, অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা বাঁদিকের গলিতে ঢুকল। চমকে উঠলুম, লালপাড়া। দরজায় দরজায় সেই সব। একেবারে ভিন্ন জগৎ। এখন আর ফিরতে পারছি না। নেশা লেগে গেছে। শরীর কেমন করছে। ভাবছি সঙ্গে এত টাকা। আবার প্রশ্ন ভাবছি, যথেষ্ট টাকার জোর আছে, লড়ে যেতে ক্ষতি কী! প্রেমে-কামে-কবিতায় একেবারে আচারের মতো অবস্থা আমার। একেবারে চপচপ করছি। মেয়েটা আর একটা

গলিতে ঢুকল। এটা আর একটু সরু। মেয়েটা জানে আমি পেছনেই আসছি। কোমরের বদমাইশি শুরু করেছে। হঠাৎ দোতলা একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তিন হাত তফাতে আমি থেমে পড়েছি। উঃ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবার সে কী ভঙ্গি! ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি— আসবে! বিশ্বাস কর, একদম ভেড়া। ভেড়ার মতো মেয়েটার সঙ্গে সোজা উঠে গেলুম দোতলায়। গলায় সরু একটা সোনার চেন চিকচিক করছে। একটা ঘরের সামনে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। সুন্দর সাজানো একটা ঘর। বিশাল একটা খাট। খাটের ওপর কমসে কম গোটা দশেক বালিশ। সিল্কের মতো বেডকভার বিছানো। বিরাট একটা আয়না খাটের মাথায়। দেয়ালে দেব-দেবীর ছবি! ঘরটা নির্জন, ঠান্ডা, আলো আঁধারী। মেয়েটি পাখা চালিয়ে খাটে এলিয়ে বসে বললে, কী হচ্ছিল শুনি? দিনদুপুরে মেয়ের পিছু নেওয়া। এইবার পুলিশ ডাকি? তুই জানিস তারক, আমার ভয়-ডর চিরকালই কম। বললুম, আমার কাকা পুলিশের বড় অফিসার। আমাকে ধরাতে হলে মিলিটারি ডাকতে হবে। মেয়েটা সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, কাছে এসো। কাছে যেতেই দুটো হাত, দুটো পা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর! তারক, স্বামীজির বদলে গিরিশ হয়ে গেলুম। মাইনাস হিজ প্রতিভা, মাইনাস শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝলি কথামৃত পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন— নারী জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। কাছাকাছি গেছ কী মরেছ। শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হল। হাজার হাজার নরনারী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। সুন্দরী মেয়েরা দলে দলে বেঞ্চি টপকে ছুটে আসছে স্বামীজিকে স্পর্শ করবে, কথা বলবে। স্বামীজি তখন মনে মনে বলছেন, দেখো বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারো তো তুমি সত্যিই ভগবান। স্বামীজি ভগবান ছিলেন। আমরা ফাঁদে পড়ার জন্যেই পৃথিবীতে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটা সুন্দর গল্প বলছিলেন— হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্যে বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়েই আছেন। কিছু ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে বেশ আনন্দেই আছেন। দেবতাদের মহা ভাবনা, ঠাকুর যে আসতে চাইছেন না। সবাই গেলেন শিবের কাছে, একটা তো কিছু করতে হয়। মহাদেব গেলেন দেখতে। অনেক জেদাজেদি করলেন। বরাহ পাত্তাই দিলেন না। ছানা-পোনাদের মাই দিচ্ছেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। নারায়ণ হি হি করে হেসে স্বধামে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।'

কিশোরীদা চা খাচ্ছে আর গল্প বলছে। নিজের জীবনের গল্প। লেখা-পড়াও যথেষ্ট করেছে। কখন করে তা জানি না। সারাদিনই তো খাটে গাধার মতো। তারক সরকার জীবনে একটা লোককেই ভালবেসেছিল, তার নাম কিশোরী। লোকটা সোনার মতো খাঁটি ছিল গোল্ড প্লেটেড নয়। চোদ্দো নয় চব্বিশ ক্যারেট। কিশোরীদার প্রেম। ওই মেয়েটির নামই ছিল উমা। উমা প্রথম দেখাতেই কিশোরীদার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে ভোর। একটা টাকাও নেয়নি উমা। উলটে চর্বচুষ্য খাইয়েছিল। সেই উমা মারা গেল ভাইরাস ফিভারে। উপায় থাকলে কিশোরীদা ভগবানের কাছে যেত। তিনটে বছর গুম মেরে বসে রইল। মা ছেলেকে ভুল বুঝে হলেন কাশীবাসী। সেইখানেই মৃত্যু।

দোকানের বাইরে এসে কিশোরীদার অন্য চেহারা। আবার আগের মতো।

'চল, এইবার এক মহিলাকে দেখবি। অনেক টাকা পাওনা। তিন বছর ঘোরাচ্ছে।' রাস্তাটার নাম গর্চা রোড। মহিলা কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। একটা হিট করেছিল। বাকি সব ফ্লপ। ফ্ল্যাটের দরজা তিনি নিজেই খুললেন। এমন সাজপোশাক, যেন এখনি কোথাও বেরোবেন! ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। মুখ মোম চকচক, আঁকা ভুরু। মাকড়সার জালের মতো পাতলা শাড়ি। ব্লাউজের সামনেটা অস্বস্তিকর নিচু। সেন্টের গন্ধ গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে পড়ে থাকা এক ঝুড়ি জুঁই ফুলের গন্ধের মতো। মহিলা কিশোরীদার গায়ে এলিয়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন, 'আপনিই! কী

অদ্ভুত! ক'দিন কেবল আপনার কথাই ভাবছি, আর আপনি সশরীরে আমার সামনে! ভাবা যায়! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।' কিশোরীদা ঢুকে গেলেন! মহিলা আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে মিষ্টি করে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এসো ভাই, এসো। ভারী মিষ্টি ছেলেটি। এ আপনার কে হয় কিশোরী?'

'ভাই।'

খুব সাজানো-গোছানো বসার ঘর। সরকার থেকে গুছাইত হওয়ার পর জেনেছি—সাজগোজটাই সব। ধাপ্পা যাদের মূলধন তাদের সাজগোজটাই আসল। কিশোরীদা বলত, কিছু চাপা দিতে হলেই সাজতে হবে। একমাত্র শয়তান আর ভগবানের সাজের প্রয়োজন হয় না। তারা আসল। দেবদেবীর মূর্তি আছে, ভগবান আর শয়তানের কোনও মূর্তি নেই। মানুষের মনে ভাব হয়ে বসে আছেন।

আমরা বসলুম। মহিলা আমাদের উলটো দিকে বসলেন। বাঁ পায়ের ওপর ডান পা-টা তুলে দিলেন একটু উঁচু করে, যাতে শাড়ির তলার দিকটা বেশ খেলতে পারে। নরম নরম সোফা। মহিলার বাঁ হাতটা সোফার পেছনে লম্বা হয়ে আছে। বেশ দীর্ঘ, ঢলঢলে শরীর। অনেকটা সরলামাসির মতো। একটা পিঁপড়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে বেশ সময় লাগবে। কিশোরীদা উপভোগ করছে।

'কী খাবেন? হুইস্কি, বিয়ার, জিন, রাম?'

'আজ একেবারে একলা?'

'বোধহয় আপনি আসবেন বলে। আমার একটা ব্যাপাব হচ্ছে আজকাল। যা ভাবছি, তাই হচ্ছে। কাল ভাবছি সতুর ছবিটা যদি খুলে পড়ে যায়! মনে হওয়ামাত্রই হাওয়া নেই কিছু নেই, ছবিটা খুলে পড়ে গেল। যার সঙ্গে সেপারেশন হয়ে গেছে তার ছবি কেন থাকবে! লাউটস। সে তো এখন কৌশিকের বউকে নিয়ে আছে— এ পারফেক্ট বিচ। বলুন কী দোব?'

'কৌশিকবাবুর বউ তো আপনারই বোন। ড্যান্সার।'

'হ্যাঁ ড্যান্সার। লোকের বুকে উঠে নাচে। বোন? বোন এখন সতিন। সতু একটা ডান্স। আমার মনে হয় না ওখানে ও আমাব চেয়ে বাড়তি কিছু পাবে! স্টিল আই অ্যাম ইয়াং। ফাইভ ফিট নাইন ইঞ্চেস। আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স আর ম্যারিলিন মনরোর স্ট্যাটিসটিক্স সেম। হিন্দি ছবি অফার দিয়েছিল। চেয়েছিল আমার শরীর দেখিয়ে ব্যাবসা করবে। বেডরুম সিন, বেদিং সিন, রেপ। আমি রাজি হইনি। আই বিলিভ ইন অভিনয়। বাংলা ছবিতে অভিনয় ছিল। প্রবলেম হল আমার হাইট। এমন নায়ক নেই যে আমার অ্যাগনস্টে অভিনয় করতে পারে। সব বেঁটে বেঁটে। সতু আমার পড়তি বাজার দেখে কেটেছে। কেতকী এখন কোমর দুলিয়ে পাছা দুলিয়ে খুব ইনকাম করছে। ওর নীচের দিকটা বেশ ভারী। আর দেশটা লম্পটে ভরে গেছে। লাখ লাখ পারভার্ট। আমার অসুবিধে হল আমি আনকালচার্ড, ভালগার লোকদের সেক্সে সুড়সুড়ি দিতে পারব না। সেক্স ফর মানি, দ্যাটস প্রস্টিটুউশান। সেক্স ফর লাভ আমি রাজি। আপনি বলুন, রাইট নাও উইথ ইউ আই ক্যান গো টু বেড। কিশোরী, আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। বলা যায়, আই লাভ ইউ।'

'আমারও মনে হয় আপনার ওপর একটা দুর্বলতা আসছে। আপনি ভাবছেন টাকার তাগাদায় এসেছি, তা নয়, এসেছি আপনার আকর্ষণে। অসাধারণ হলিউড ফিগার।'

'ব্যঙ্গ নয় তো! প্লিজ মিথ্যেকে সত্যির মতো করে বলবেন না। আমি খুব অসহায়। একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, বোথ স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড ইকনমিক।'

'আমাকে ভালবাসেন কেন?'

'ফর ইয়োর মাইন্ড, ফর ইয়োর ব্যবহার, স্ট্রাগল, ভদ্রতা, আদর্শ, সংবেদনশীলতা।'

'তা হলে কেমন করে ভাবলেন, আমি ব্যঙ্গ করছি?'

মহিলার চোখে চিকচিকে জল। ভাগ্য কাঁদালে জ্ঞানী-গুণী-বড়লোক-ছোটলোক সকলকেই কাঁদতে হবে।

'আমি খুব একা হয়ে গেছি কিশোরী। গ্যারেজে পড়ে থাকা আমার গাড়িটার মতো। রোজ সকালে একবার করে যখন ইঞ্জিনটাকে চালু করতে যাই, তখন শব্দ আমার সঙ্গে কথা বলে। সেই ঝলমলে দিনের কথা। নির্জন গ্যারেজ। অন্ধকার অন্ধকার। ইঞ্জিন স্টার্ট করে ক্লাচে পা রেখে বসে আছি। গাড়ি যেন পেছনে ছুটছে। রাস্তা পিচের নয়, কালের রাস্তা, টাইম। সাফল্যের দিন, খ্যাতি প্রতিপত্তির দিন, আনন্দের উৎসবের রাত। প্রথম ছবি, প্রিমিয়ার, হিট, অ্যাওআর্ড, পার্টি, কনট্রাক্ট, স্টুডিয়ো, মেকআপ, আউটডোর, সতুর সঙ্গে প্রেম। বিয়ে। হনিমুন। টায়ার ফাটার শব্দ। সামহোয়্যার সামওয়ান বেসুরে গেয়ে উঠল বি ইন দি বনেট। মেয়েটা উচিত প্রণামী না দিয়ে টপে উঠে যাবে? শিক্ষিতা তো হয়েছে কী। অন্ধকারে বিছানায় শিক্ষিতা অশিক্ষিতায় নো ডিফারেন্স। বডি দ্যাট মেটার্স। নট ইভন কেস। দুটো বুক, পাছা, গলা, পা অ্যান্ড ফাইন্যালি দ্যাট ইটারন্যাল ট্র্যাঙ্গল। নো শেলি, নো কীটস, নো শেক্সপিয়ার, নো বায়রন। ওনলি গ্রোনিং অ্যান্ড ড্রোনিং অ্যান্ড ড্রেনিং দি ভালগার লাস্ট। মোস্ট পাওয়ারফুল ডিস্ট্রিবিউটারের নজর লাগল। একের পর এক প্রস্তাব, তোমাকে আমি এক নম্বর হিরোয়িন বানিয়ে দেব যদি আমার রক্ষিতা হও। আমার তিন তারা হোটেলের একটা সুইট তোমার, তোমার জন্যে একটা আলাদা ইম্পালা গাড়ি। আর টাকা! সে তুমি যত চাইবে। পা থেকে মাথা জ্বলে গেল। বাবা অক্সফোর্ডের এম এ। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু। আমার মা শান্তিনিকেতনের। আমি একটা পেটমোটা ব্যাবসাদার কালোয়ারের রক্ষিতা হব। তখন এল ছোট ছোট অফার, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে বিদেশে চলো। তাও না? তা হলে হোটেলে একটা ঘর থাকবে, সপ্তাহে একটা-দুটো রাত দু'জনে একসঙ্গে লাইফ এনজয় করব। তাও না। তা হলে দেখো আমি তোমার কী করতে পারি। সেকেন্ড বইটা হিট। দারুণ চলছে। সার্কিট থেকে তুলে নিল। বললে, মিনিমাম সেল নেই। 'বেশ' পাচ্ছে না। থার্ড বই এক চক্রান্তে। ডিরেক্টররা বললেন, সিনেমায় অত চরিত্র দেখালে সাকসেস আসে না। আমার চাই না সাকসেস; কিন্তু আমি যে সিনেমা করতে ভালবাসি। স্টুডিয়োর প্রেমে পড়ে গেছি। টাকার কাছে আমার প্রতিভা পরাজিত।'

কিশোরীদা গুম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভীষণ নরম মানুষ। চোখে জল এল বলে। কিশোরীদা বললে, 'আমি হাজার তিনেক টাকা পেতুম। এখন আর পাই না। ওটা নিয়ে অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। আর বলে যাই, কেউ না থাক আমি আপনার পাশে আছি। অবশ্য আপনি যদি পাশে থাকতে দেন তবেই।'

অমন সুসজ্জিত এক মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিছু একটা বলতে চাইছেন, বলতে পারছেন না। কিশোরীদা উঠে পড়ল, মহিলার সামনে এসে বললে, 'আজ আমি যাচ্ছি। আবার আসব। প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। নম্বর দেওয়া আছে আপনার কাছে। গাড়ির কোনও প্রবলেম আছে?'

মহিলা দু'হাতে কিশোরীদার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। বসে পড়তে হল কিশোরীদাকে মহিলার পাশে। আমি প্রায় ছিটকে চলে গেলুম ঘরের বাইরে; একেবারে রাস্তায়। কিশোরীদা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল। চোখ মুখের চেহারা বদলে গেছে। কোনও কথা না বলে আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগল হনহন করে।

অনেকটা হাঁটার পর কিশোরীদা বললে, 'যাক, এতদিনে নৌকো একটা ঘাট পেল বুঝলি? মানুষের সব স্বপ্নই কি স্বপ্ন থেকে যায়! একটা-দুটো পূর্ণ হবেই, তা না হলে ভগবানকে মানুষ মানবে কেন? ধর আমি গ্যারেজটা দেখব আর ও দেখবে আদার সাইড। জনসংযোগ। লেখাপড়া জানা কালচার্ড মেয়ে। গ্যারেজটা আরও বড় হবে। কতলোক চাকরি পাবে। সেটাও তো একটা সারভিস টু দি নেশান।'

'তুমি ওই ভদ্রমহিলাকে চাকরি দিলে?'

'না রে, আমি ওই ভদ্রমহিলার চাকরি নিলুম। পোস্টটা হল স্বামী।'

'তুমি বিয়ে করবে?'

'তোর আপত্তি আছে?'

'খুব সুন্দর দেখতে। যাই বলো সাংঘাতিক দেখতে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাকেও ভালবেসেছেন। পিঠে হাত রেখে ঘরে নিয়ে গেলেন এসো ভাই বলে! কে এমন করে গো আজকাল! যাক আমার একজন ভাল বউদি হবে। কবে বিয়ে করবে? বেশ সানাইটানাই বাজিয়ে হবে তো! ফুলকো লুচি!'

'ধ্যাস, হাই সোসাইটির বিয়েতে সানাই মানাই হয় না। রেজিস্ট্রি। তারপর ছোট্ট একটা পার্টি। সেইভাবেই হবে। তবে পার্টিটা বাদ। মটোর মিস্ত্রির বিয়েতে বড়লোক আঁতেল সাঁতেল কেউ আসবে না। আমাদের তিনজনের পার্টি হবে আমাদের ভাঙা হলঘরে। বাবার আমলের ঝাড়টা আবার ঝোলাব। ওইটাই তো আছে, আর তো সব ঝাড়তিস। না, একটা কার্পেটও আছে। হাজার আলোর ঝাড়বাতি। চোখ ঠিকরে যাবে তোর। মনে হবে স্বর্গে বসে আছিস ভগবানের জলসাঘরে।'

'কী খাওয়াবে!'

'চানাচুর, চা।'

'থাক তোমাকে খাওয়াতে হবে না। আমি নিজেই কিনে খেয়ে নোব।'

'কী মুশকিল, এইসব বিয়েতে এর বেশি করা যায় না। ইচ্ছে থাকলেও যায় না। যে পুজোয় যে নৈবেদ্য! এককালে আমাদের পাড়ায় এক জমিদার মন্ত্রী থাকতেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে। পাড়ার বিশিষ্ট প্রবীণরা নিমন্ত্রিত হলেন। রমণবাবু ছিলেন তাঁর বড় পেয়ারের। নির্বাচনের সময় তিনি কোমর বেঁধে নেমে পড়তেন। রমণবাবু দু'দিন আগে থেকে জোলাপ খেতে শুরু করলেন। এইবার বিয়ের দিন সন্ধ্যায় রমণবাবু ধুতি পাঞ্জাবি পরে মাঞ্জা দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। পাঁড় কংগ্রেস ফিরে এলেন পাঁড় কমুনিস্ট হয়ে। ব্যাপারটা কী। টেরিফিক আলোফালো দিয়ে সাজানো বিয়েবাড়ি। সানাই বাজছে। আতর গোলাপের পিচকিরি। বড় বড় রং-বেরঙের গাড়ি। লনে গার্ডেন চেয়ারে বসে আছেন রথী-মহারথীরা। হাতে হাতে শরবত। প্লেটে প্লেটে চানাচুর। রমণবাবু ওসব ফালতু জিনিস ছুঁলেন না। পেট ভার হয়ে যাবে। হাঁ করে বসে আছেন। ঘণ্টাখানেক পরে অধৈর্য হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কখন খেতে ডাকবে?— খাওয়া! কেন শরবত, চানাচুর খাননি? শালা, বলে উঠে এলেন। পরের নির্বাচনে রমণবাবু কমুনিস্ট ক্যাম্পের অ্যাক্টিভ কর্মী।'

'কবে লাগাচ্ছ তা হলে?'

'শুভস্য শীঘ্রং। দেখি সামনের মাসেই লাগিয়ে দেব। এর তো দিনক্ষণ কিছু নেই। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবেন। সই সাবুদ হবে, বিয়ে পাকা। আমি জানতুম ফিল্মস্টারের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। মীনাকুমারীকে ভালবেসেছিলুম সাধে! তাঁর কৃপা রে ভাই! তাঁর কৃপা!'

কিশোরীদা তার এক পঞ্জাবি বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল। গাড়ির স্পেয়ার্সের ব্যাবসা। বিক্রম সিং। আমাকে বললে, এই লাইনটা মাথায় রাখ। বাঙালি বেশি নেই। খুব লাভের ব্যাবসা। দেখ না, এখুনি তিনদিস্তে নোট নিয়ে কীরকম খুশ মেজাজে হাসবে দেখবি। লাখ লাখ টাকা কামাই. দু'হাতে রোজগার। বাঙালি হলে উড়িয়ে ফাঁক করে দিত। এ খুব টাইট লোক। আরে ভাই কিশোরীবাবু, বিক্রম সিং হইহই করে উঠল, আরে ইয়ার! আমরা বসলুম গদি আঁটা চেয়ারে। এসে গেল পঞ্জাবি চা। মোটা দুধে তৈরি। দু'জনে ব্যাবসার কথা হল খানিক। তিন বাণ্ডিল টাকা এ-হাত থেকে ও হাতে চলে গেল। বিক্রমের স্ত্রী এসে গেলেন, সালোয়ার কামিজ পরা, লম্বা চাবুকের মতো শরীর। ধারালো মুখ। গায়ে বিলিতি সেন্ট। কিশোরীদা কানে কানে বললে, 'পাঞ্চালী। দ্রৌপদীর বোন। মহাভারত পড়েছিস তো।' মহিলা হেসে কিশোরীদাকে বললেন, 'হাউ আর ইউ।' বিক্রমের পেছনে দাঁড়িয়ে

দু'কাঁধে হাতের ভর রেখে নিজেদের ভাষায় কী বললেন মহিলা। এক বান্ডিল নোট হাতিয়ে চলে গেলেন। বিক্রম বললেন, 'ভেরি এক্সপেনসিভ ওয়াইফ। এভরি ডে শি উইল গো আউট ফর মার্কেটিং, অ্যান্ড পারচেজ অল সর্টস অফ রাবিশ। ওর বাবা সেন্টারের আই. এ. এস. অফিসার। আমার বিজনেসে একটু হেল্‌প হয়। তা না হলে বউ আমার ব্যাবসায় লালবাতি জ্বেলে দিত। একটু তোয়াজ করি। লাইসেন্স-টাইসেন্সের সুবিধে হয়। শি ইজ মাই ক্যাপিট্যাল। ভাই এই বাজারে যেভাবেই হোক করে খেতে হবে। কম্পিটিটিভ মার্কেট। রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটছে। গুড জকি না হলেই লুজ দি রেস।'

রাস্তায় এসে কিশোরীদা বললেন, 'দুনিয়াটা কী কায়দায় চলছে মাইরি। যেন মাছ ধরা। যে যেখানে পারছে টোপ ফেলে বসে আছে। মাছ ঠোকরালেই মারছে টান। বিক্রম প্রথম বউটাকে বিদায় করে দিয়েছে। গ্রামের মেয়ে পছন্দ হল না। যেই পয়সা হল, এসে গেল হাল কেতার বউ। ড্রেস দেখেছিস! পাঁচ-ছ'হাজারের কমে হবে না। গোটাটাই সিল্কের। তবে হ্যাঁ, ফিগার একখানা। বাঙালি মেয়েরা ধারে কাছে যেতে পারবে না।'

কিছু হেঁটে কিছুটা ট্রামে বাসে মানে কলকাতা ঘোরা হচ্ছে সারাদিন। সব শেষে চোরা মার্কেট। মাছের তেলে মাছ ভাজার জায়গা। কিশোরীদা বললে, 'কলকাতার একটা বড় ব্যাবসা হল মটোর গাড়ির পার্টস চুরি। তোরই গাড়ির পার্টস তুই এখান থেকে কিনে নিয়ে যাবি! তোরটা খুলে এনে এখানে ঝেড়ে গেল, তুই এসে আবার সেটাকে কিনে নিয়ে গেলি। এই চলল সারা জীবনভর। তবে হ্যাঁ জবরদস্ত বাজার। যা চাইবি সব পাবি, দিশি বিলিতি। আমার সঙ্গে কাজ করলে তোকে এখানে প্রায়ই আসতে হবে। জায়গাটা চিনে রাখ। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব। আমি একটা হাউড্রলিক ফ্লোর জ্যাক আর সেফটি স্ট্যান্ড কিনব। তুই শুধু দেখ। জ্যাক দিয়ে গাড়ি ঠেলে তোলা হয়। মাটি থেকে অন্তত আট-দশ ইঞ্চি ঠেলে তুলতে হবে। তুলে ধরে রাখতে হবে। স্লিপ করে পড়ে গেলেই খেল খতম।'

আলু পটল ঢেঁড়শের মতো গাড়ির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢালাও বিক্রি হচ্ছে। দোকানে দোকানে জোরালো আলো। নিকেলের ঝলকানি। কিশোরীদা একজনকে খুব খাতির করে বললে, 'মিঞাভাই।' দু'জনেরই গদগদ ভাব। ভেতর থেকে কিশোরীদার জিনিসটা বেরিয়ে এল। বেশ ওজনদার। একেবারে বিলিতি মাল। একটা ট্যাক্সি ডেকে তোলা হল। কিশোরীদা বললেন, 'তোর মা কিন্তু খুব দুঃখ পাবেন, যখন শুনবেন, তুই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গ্যারেজের কাজে ঢুকছিস। সব মায়েরই তো আশা থাকে, ছেলে বড় হবে মানুষ হবে।'

পেছনের সিটে দু'জনে বসে আছি। আরামে। কিশোরীদাকে যতই দেখছি, ততই যেন প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। কী অদ্ভুত একটা মানুষ। পাশে বসে আছে, কত সাহস কত আপন! যেমন চেহারা, তেমন মন। হঠাৎ মনে হল, কিশোরীদাকে বলেই ফেলি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার কথাটা। একটা ছেলের ফাঁদে পড়ার বিচিত্র কাহিনি।

'কিশোরীদা, তুমি সেদিন কোথায় ছিলে, যেদিন আমার বাবাকে পাড়ার লোকে ঠেঙিয়েছিল?'

'পানাগড়ে। মিলিটারি অকশানে মাল কিনতে গিয়েছিলুম।'

'তুমি জানো কী হয়েছিল?'

'কিছু কিছু। তোদের ফ্যামিলিতে এই রোগটা সকলেরই ছিল। মেয়েরোগ। ও নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করিসনি। একপাশে ফেলে দে। মানুষের ভেতরে অনেক পোকা থাকে। এও এক পোকা। ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়। কিছু করার নেই। ক্যান্সারের মতো। ভেতর থেকে কুরে কুরে খায় মানুষকে।'

'আমি সেটা ভাবছি না। আমি ভাবছি অন্য কথা। ওই ঘটনার রাতে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা তোমার জানা দরকার। তুমি সরলামাসিকে দেখেছ?'

'বহুবার। এখন আর দেখতে পাই না। শুনেছি বিভাসের টাকাপয়সায় অবস্থা বেশ ফিরে গিয়েছে। ভালই আছে।'

'কেমন ভদ্রমহিলা?'

'ওই একরকম। একটু এদিক সেদিক ছিল না যে তা নয়। একবার ওদের বাড়ির বাচ্চা চাকরকে নিয়ে খুব একটা কাণ্ড হয়েছিল। সেসব তোর না শোনাই ভাল।'

'তা হলে শোনো, আর একটা কাহিনি। সেই রাতে সরলামাসিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাদের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে, সবাই বলে গেল একটু নজরে রাখা দরকার। এইসব কেসে মেয়েরা আত্মহত্যা করে। রাতে মশারির মধ্যে আমি আর মাসি। পাশাপাশি। মাসি চিত হয়ে শুয়ে আছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বাবার আক্রমণে টানাটানিতে ব্লাইজ শাড়ি সব ছেঁড়াখোঁড়া। ঘুম আসছে না। পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে। একটা লোমঅলা বিশাল চেহারার লোক। চোখ দুটো ঢ্যালা ঢ্যালা, ওইরকম চেহারার একটা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে। শাড়ি ঝুলে ওপরে উঠে গিয়ে শরীরের ঢাকা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। গোল গোল পা। উরু। ব্লাউজ ফাঁসা বুক। ছটফট করছে। হাত কামড়ে খামচে মুক্তি খুঁজছে।'

'অত বর্ণনা দিচ্ছিস কেন?'

'প্রয়োজন আছে কিশোরীদা। সবটা আমাকে বলতে দাও।'

'বেশ, বলে যাও।'

'কিছুতেই আর ঘুম আসে না। বসে আছি। মনে একটা বিশ্রী কুভাব আসছে। মনে হচ্ছে আমি সেই জানোয়ার যে আমার বাবা। কিশোরীদা বিশ্বাস করো, বয়েসটয়েস সব ভুলে আমি সেই রাতে যা করে ফেলেছি তা একজন বয়স্ক মানুষই হয়তো করে, যে অসভ্য, যে পশু, নরাধম। ভোর হয়ে গেল, বিছানা থেকে নামছি বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো পালাব বলে, লম্বা দু'খানা হাত আমাকে টেনে নিল বুকের ওপর, ভারী উরু দিয়ে আমাকে চেপে ধরল বেড়ালের মতো। ঘুম জড়ানো মুখে মা দুর্গার অসুর বধের হাসি। কিশোরীদা সেই থেকে আমি ওই মহিলার পোষা কুকুরের মতো হয়ে আছি। সারারাত আমাকে নিয়ে যা-তা খেলা করে। আমার ঘুমোবার উপায় নেই। দিনের বেলা স্কুলে বসে বসে ঢুলি। আমার আর পড়ায় মন নেই। আমি কিছু মনে রাখতে পারি না। আমার চেহারা ছিল রোগা-প্যাংলা, ভালমন্দ খাইয়ে মোটা করেছে। রোজ মালাই দিয়ে সিদ্ধির শরবত খাওয়ায়। নিজেও গেলাস গেলাস খায়। নেশা হয়ে গেলে উদ্দাম নাচে। পাগলির মতো খিলখিল করে হাসে। বলে, আমি ভৈরবী, তুই আমার কাল ভৈরব। ভেতরের ঘরে সব দরজা জানলা বন্ধ করে এইসব হয়। কোনওরকমে সকাল সাড়ে ছ'টা-সাতটার সময় আমি উঠে আসি। মহিলা তখনও সিদ্ধির নেশায় অসভ্যের মতো পড়ে থাকে চিত হয়ে।'

'তোর মা কিছু বলেন না?'

'চেহারা দেখে আমার সহজ সরল বোকা মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, সারারাত কী করিস! সরলার সঙ্গে যুদ্ধ। মা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না, ছেলের বয়সি একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের এমন বিশ্রী কিছু হতে পারে!'

'তার মানে তোর সর্বনাশ হয়ে গেল। তুই তো আর কোনওদিন স্বাভাবিক হতে পারবি না। তুই যদি না যাস!'

'না গিয়ে আমি থাকতে পারব না। আমি আর মানুষ নেই কিশোরীদা, কুকুর হয়ে গেছি।'

'ধর ওই মহিলাকে যদি বেপাত্তা করে দিই। আমার সে ক্ষমতা আছে। তা হলে?'

'তা হলে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, না হয় আত্মহত্যা করব। আমার নেশা হয়ে গেছে।'

'পাগল তো হবিই সিদ্ধির ঠেলায়। পাগল হবি, ইমপোটেন্ট হয়ে যাবি। সিদ্ধিতে তাই হয়। শিবের বুকে কালী নাচে, চিতার কাঠে হাঁড়ি চাপে। পাগলা ভোলা ষাঁড়ের পিঠে, শ্মশান কালী অট্টহাসে।'

'কী করা যায় বলো না?'

'হ্যাফ প্যান্ট আছে?'

'আছে।'

'স্যান্ডো গেঞ্জি?'

'আছে।'

'গামছা?'

'আছে।'

'কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় হাফপ্যান্টটা পরবি, গেঞ্জিটা গায়ে চাপাবি, কোমরে গামছাটা বাঁধবি, সোজা চলে আসবি গ্যারেজে। তারপর পেতনি কী করে ছাড়াতে হয় আমি দেখছি। তোকে পেতনিতে ধরেছে।'

'সরলামাসি কি খারাপ মেয়ে?'

'সরলামাসি খারাপ মেয়ে নয়, সরলা ভীষণ অসুস্থ। যখন ছোট ছিল তখন আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ, সে ভাই হতে পারে, দাদু হতে পারে, বাবা হতে পারে, মামা হতে পারে, পরিবারের নিকট কোনওজন, গৃহশিক্ষক, এমনকী কোনও মহিলাও ওকে নিয়ে খারাপ কিছু করত, যার ফলে মেয়েটা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। যতদূর জানি ওর স্বামী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত, ওকে সহ্য করতে পাবত না। মনের জোরে বেরিয়ে আসতে পারলে পারবি না পারলে মরবি। আর তোর আমার মৃত্যুতে কারও কিছু যায় আসে না।'

কিশোরীদার গ্যারেজের সামনে গাড়ি থামল। মাল নামাবার জন্যে সাহায্য কবতে গেলুম, বললে, 'উঁহু আজ না, কাল থেকে তুই আমার এমপ্লয়ি, আমি তোর এমপ্লয়ার। আজ আরামসে বাড়ি চলে যা।'

'তোমাব যত অদ্ভুত কথা। আজ আব কালে কী আছে। আজও তুমি আমার দাদা, কালও তুমি আমার দাদা। আমার মাথার ওপর কেউ নেই, তুমি ছাড়া।'

তারক সরকার কাজ গুছোবার জন্যে এইরকম কথা অনায়াসে বলতে পাবে. কিন্তু মনেব তলানিতে সব সময় ধান্দা, ছলে-বলে-কৌশলে কাজ গুছোতে হবে। তুষ্ট করে ইষ্ট লাভ। মানুষেব হরেক জাত। কেউ ভোলে মিষ্টি কথায়, কেউ চায় টাকা, কেউ ছোঁকছোঁক করে মদ আর মেয়েমানুষের জন্যে, কেউ দেখতে চায় চোখেব জল। কেউ তুষ্ট গঙ্গাজলে. কেউ তুষ্ট প্রশংসায়। কেউ চায় গুণ, কেউ চায় খুন, কেউ চায় বড মানুষের সঙ্গ। সেই গান আছে, তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে, মানুষের অহংকারকে বেশ ভালভাবে দলাই মলাই কবতে পারলেই কাজ হাসিল। ময়দা যত ঠাসবে ময়ান দিয়ে, লুচি তত ফুলবে, তত খাস্তা হবে। সংসার হল হারমোনিয়াম। এক-একটা রিং এক-এক বকম সুর ছাড়ছে। খেলিয়ে বাজাতে যে জানে, সে এর থেকেই আহামরি সংগীত বের করে আনবে। যে জানে না, তার হাতে বেসুরো প্যাঁ-পোঁ।

মালদুটোকে ধরাধরি করে নামানো হল। কিশোরীদা বললে, 'তুই এবাব যা। আমি এই গাড়িতেই আর এক জায়গায় যাব, তোর সঙ্গে কাল দেখা হচ্ছে, সকাল সাড়ে আটটা তোর অ্যাটেনডেন্স। আট ঘণ্টা ডিউটি।'

॥ চার ॥

সেই সময়ের কাগজে একটা ভয়ংকর খুনের মামলার উল্লেখ আছে। হাইকোর্টের সেশানস পর্যন্ত পৌঁছে আইনের প্রবল লড়াই, চম্পা সরকার মার্ডার কেস। আততায়ী কে?

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম? ভয় পেয়ো না। যা জিজ্ঞেস করছি ঠিক ঠিক

জবাব দেবে, ভেবে বলবে, সত্য গোপন করবে না। তোমার স্টেটমেন্ট কোর্টে পেশ হবে; তখন অস্বীকার করলে সাজা হয়ে যাবে।'

'আমার নাম তারক সরকার।'

'বয়েস?'

'ষোলো বছর পাঁচ মাস।'

'বাবার নাম?'

'বিশ্বনাথ সরকার।'

'পেশা?'

'রেলে চাকরি করেন।'

'মৃতা মহিলা তোমার কে হন?'

'মা।'

'তোমার বাবা তোমাদের সঙ্গে থাকেন না?'

'না।'

'কেন? বলো। আটকে গেলে কেন? মায়ের সঙ্গে বনিবনা হত না?'

'না, তা নয়। মানে বাবার একজন ইয়ে আছে।'

'ইয়ে মানে? আর একজন স্ত্রী?'

'স্ত্রী নয় স্ত্রীলোক।'

'তাই বলো, রক্ষিতা আছে। চরিত্রহীন। লুজ ক্যারেক্টার। তোমাদের ফেলে তিনি বেশ্যা রমণে ব্যস্ত। দিস থিংগস আই ওন্ট টরালেট, নো, টলারেট। এই ল আর র-এর আগে পরে আমার জীবনে যাবে না। শোনো ছোকরা, চরিত্রহীনতা আমি একেবারে সহ্য করব না। ক্যারেক্টার ফার্স্ট অ্যান্ড ক্যারেক্টার লাস্ট। ফুটো চৌবাচ্চায় যতই জল ঢালো সব বেরিয়ে যাবে। এই মার্ডার তো সেই লোকটার কাজ, আমি তাকে ফাঁসিতে লটকাব। তবেই আমার নাম বিপিন বোস। বি বোস, টেরার অফ দি ক্রিমিনালস। তুমি তো দেখেছ। তোমার মুখ বলছে তুমি দেখেছ। তোমার বাবা তোমার মাকে খুন করে দৌড়ে পালাচ্ছে। তুমি বাবা বলে পেছন পেছন ছুটছ। তোমার বাবা একটা গাড়িতে উঠে পালাচ্ছে।'

'আমার বাবা মোগলসরাইতে থাকেন স্যাব।'

'যে খুন করবে সে একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকে, থাকতে পারে। এ আমাদের অভিজ্ঞতা। কেন মিথ্যে বলার চেষ্টা করছ। যে লোকটাকে পালাতে দেখলে, তার চেহারার বর্ণনা দাও।'

'কোনও লোককে আমি পালাতে দেখিনি। দেখলে কেন বলব না। খুন হয়েছেন আমার মা। যে খুন করেছে সে ধরা পড়ুক এইটাই তো আমি চাইব।'

'ঠিক। এ কথা জজেও মানবে। তোমার বাবার কলকাতার ঠিকানা?'

'হালসিবাগান।'

'বাড়ির নম্বর বলো।'

'সে কিশোরীদা জানে।'

'সেই মহাপুরুষটি কে?'

'জমিদারবাড়ির ছেলে, একটা গ্যারেজের মালিক।'

'কিশোরী, মটোর মেকানিক! সে জানবে কেন? সে এই খুনের মধ্যে আছে বুঝি!'

'আমাকে ব্যাপারটা বলতে দেবেন স্যার? তখন রাত হবে সাড়ে ন'টা কি দশটা। কিশোরীদার গ্যারেজ থেকে বাড়ি ফিরছি। ভয়ে ভয়ে, রাত হয়ে গেছে। সদর দরজা হাট খোলা, কোথাও কোনও আলো নেই। বাড়ি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভাবলুম, মা হয়তো হরিসভায় গান শুনতে গেছে। পাশেই তো

হরিসভা। কিন্তু দরজা খোলা কেন? সব অন্ধকার। হাতড়াতে হাতড়াতে ঢুকলুম ভেতরে। উঠন, দালান, খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। এমনকী আমাদের বেড়ালটাও অদৃশ্য। শোবার ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা, আর একটা ভেজানো। মেঝেতে সাদা মতো একটা কী। ডাকলুম মা মা। সাড়া নেই। ছুটে বেরিয়ে এলুম। সোজা সরলামাসির বাড়ি। শরবত খাচ্ছিলেন। শোনামাত্রই হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল। তখনও নেশা জমেনি তেমন। টর্চ নিয়ে আমার সঙ্গে এল। আলো জ্বালানো হল। আমার মায়ের নিষ্প্রাণ দেহ মেজেতে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। গলায় একটা সিল্কেব দড়ির ফাঁস একেবারে খাপ হয়ে বসে গেছে। হাত দুটো মুঠো করা। পায়ের পাতা দুটো সিঁটিয়ে আছে। মেঝেতে মায়ের মুখের কাছে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসেছে।

'বিছানার চাদরের একটা কোণ ঝুলে মেঝেতে চলে এসেছে। আলমারির ডালা ভাঙা। মায়ের গয়নার বাক্সটা নেই। যাঁরা অনুসন্ধানে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুরু হল আলোচনা।'

'উদ্দেশ্য চুবি না খুন! চুরি কবতে এসে খুন করেছে, না খুন করতে এসে চুরি!'

'মাইন্ড ইট দিস দড়ি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? দিস ইজ দি ওনলি ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মার্ডার। এই দড়ি ধবে টানলেই খুনি এসে যাবে।'

'সার্চ দি রুম থরোলি।'

'সমস্ত লন্ডভন্ড হয়ে গেল চোখের সামনে। আসল ডাকাত যেন পুলিশ। খাটের পেছন দিক থেকে দেয়াল আর পায়ের দিকেব পায়ার ঘুপচিতে পডে আছে একটা চশমা!'

'তোমার মা চশমা পরতেন?'

'না।'

'তোমাব বাবা?'

'বাবার চোখ ভীষণ ভাল।'

'তোমার সরলামাসি?'

'না।'

'এই চশমা তুমি আগে কখনও কারও চোখে দেখেছ? মনে পড়ে?'

'আজ্ঞে না।'

'দিস ইজ সেকেন্ড অবজেক্ট। খুনি একজন অথবা দু'জন। বিছানা থেকে গলায় দডির ফাঁস আটকে টেনে নামানো হয়েছে। দরজা অবদি টানতে টানতে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই পর্যন্ত গিয়ে তবেই ভিকটিম মরেছে। দরজা বন্ধ করে এই অপরাধ কবা হয়েছে। দরজার একটা পাল্লা খুলে অপরাধী অন্ধকারে সরে পড়েছে। দরজা বন্ধ করেছে যখন তখন বুঝতে হবে আততায়ী মৃতার খুব পরিচিত। তোমার মায়ের চরিত্র কেমন ছিল?'

'দেবীব মতো।'

'তোমাদের আর কোনও আত্মীয়-স্বজন আছে?'

'না তেমন কেউ নেই।'

'এই যে মাসি মাসি করছ। মাসির স্বামী নেই?'

'পাতানো মাসি, বিধবা।'

'তাকে একবার ডাকো।'

'এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। পুজোয় বসেছেন। সারারাত পুজো করেন।'

'বাবা! একদিকে ধর্ম যেমন বাড়ছে, অধর্মও সেই হারে বাড়ছে। তাজ্জব দুনিয়া। তুমি এখন পাড়া ছেড়ে কোথাও যাবে না। পুলিশের অনুমতি ছাড়া।'

ঘর সিল করে ডেডবডি নিয়ে পুলিশ চলে গেল। অন্ধকারে বসে রইলুম দাওয়ায়। তারক সরকারের ভুতের ভয় ছিল খুব। ভূত পালিয়েছে। জীবন একেবারে আকাশের মতো শূন্য হয়ে

গেল। পরিষ্কার। কেউ কোথাও নেই। একটা কথা পুলিশের কাছে আমি চেপে গেছি, ঘরে ঢুকেই আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, মাথার তেলের। জুঁইফুলের গন্ধ। এই তেলটা আমার বাবা বরাবর মাথায় মাখেন। এখনও হয়তো এই তেলই ব্যবহার করেন। তা হলে!

কিশোরীদার গ্যারেজে দৌড়ালুম। রাত ঝিঁঝি করছে। রাস্তায় মানুষ নেই। কুকুরের খেয়োখেয়ি। কিশোরীদা ফুর্তিবাজ মানুষ। কোথায় গিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে আছে, কে জানে! দিনে সে একরকম, রাতে আর একরকম। অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল জমিদারবাড়ির কঙ্কাল। একপাশে ভেঙে ঢিপির মতো হয়ে আছে। আর একপাশ সারিয়েসুরিয়ে নতুন করা হয়েছে। বিরাট একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঝিমঝিম করছে। দিনের বেলা পাতা খুলে ছড়িয়ে থাকে! সুন্দর শোভা। রাতে দু'ভাঁজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন যেন ভয় ভয় করে। গ্যারেজের বড় লোহার গেট বন্ধ। একটা কুকুর গেটটার সামনে আরামে শুয়ে আছে। নিজেকে মনে হচ্ছে, আমিও একটা কুকুর। একটা জিনিসেরই অভাব, সেটা হল একটা ন্যাজ। ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর শরীরে একটা টান অনুভব করলুম। কেউ যেন দূর থেকে আমাকে দড়ি ধরে টানছে। সবলামাসির টান। সাদা নগ্ন একটা দেহের টান। শরীর নিয়ে খেলা করার আনন্দ। মা মারা গেছেন তো কী হয়েছে। তারক গুছাইতের মনটা চিরকালই এইরকম। কোনও কিছুই তার মনে রেখাপাত করে না, একমাত্র দগদগে রগরগে ভোগ ছাড়া। সে বোঝে নিজের ভোগ, নিজের শরীর। দেহ কাল দুপুরের আগে পুলিশ ছাড়বে না। তা হলে হাঁ করে এখানে বসে থেকে আমার লাভটা কী হবে। আমার মা ফিরে আসবেন? লোকে আমার প্রশংসা করবে? মানুষের নিন্দে প্রশংসার আমি ধার ধারি না। টাকা থাকলে লোক খাতির করবে, টাকা না থাকলে ধাক্কা মেরে খানায় ফেলে দিয়ে চলে যাবে। মানুষকে দিতে পারলেই ভাল, না পারলেই খারাপ। আমার বাবার মতো মক্কেলকে বিয়ে করলে মরতেই হবে, হয় না খেয়ে অথবা খুন হয়ে। এর একটাই হয়েছে। আর পৃথিবীতে আমাকে আনা! এর চেয়ে সহজ কাজ কিছু নেই। একটা গবেট নিরেট আধপাগলাকেও একজন মহিলা দিলে এক ডজন ছেলে মেয়ে করে দেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। এর জন্যে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে গদগদ হওয়ার কিছু নেই। কিশোরীদা আষ্টেপৃষ্টে বিষয় সংক্রান্ত মামলার চাপে মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে বলে, ছেলেমেয়ে হল প্রেমের বাইপ্রোডাক্ট। মানুষ করা হয় স্বার্থে-- বুড়ো বয়েসে ছেলে আমাকে দেখবে। রোজগার করে খাওয়াবে। বাপ-মাকে তীর্থে নিয়ে যাবে। যে বাপ মাল খেয়ে বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকে তাকেও নিয়ে যাবে। যে মা সারাজীবন ছেলেকে লাথিয়ে গেল তাকেও নিয়ে যাবে। আর মেয়েকে চালান করে দেবে প্রেমের ফ্যাক্টরিতে-- যাও বাছা! শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নিজের পাওনা বুঝে নাও। বাপের বাড়িতে তোমার খাতির নেই। তুমি নেবে, দেবে না কিছুই। তাই বিদেয় হও। শাঁকের ফুঁ মেরে 'যদিদং হৃদয়ং করে' এক যণ্ডেশ্বর জুটিয়ে দাও। এই তো জীবন, যেদিকে তাকাও। বেয়ারা হুইস্কি লাও। আমার নাম তারক সরকার। লোকে আমাকে গুছাইত বলে।

হঠাৎ মোড় ঘুরে একটা সাইকেল রিকশা আসছে। ক্লান্ত চালক। ক্লান্ত আরোহী। সাদা ট্রাউজার গাঢ় রঙের পোলো শার্ট পরা কিশোরীদা বাঁ দিকে হেলে আসছে। চালক আর আরোহী দু'জনেই টেনে আছে। কিশোরীদার অদ্ভুত কিছু বন্ধু আছে। রিকশাঅলা, ভুজাঅলা, ঠেলাঅলা, চৌকিদার, বাজারের আনাজঅলা, মাছঅলা, মাছউলি। ভদ্দরলোকের সঙ্গে মেলামেশা মানেই এক পরচর্চা, নিত্যদিন। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা বাস্তব, জীবনবিশ্বাস খাঁটি। পরিশ্রমের ভাত খায়, মাল খায়, মারামারি করে, যে বউকে পেটায়, পরক্ষণেই সেই বউকেই বিছানায় জড়িয়ে ধরে প্রেম করে। এরা দেয়, ভদ্দরলোক একমাত্র জ্ঞান আর উপদেশ ছাড়া কিছু দেয় না। কিশোরীদা নামছে। এক মাতাল আর এক মাতালকে সাহায্য করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। কিশোরীদা ধমকাচ্ছে, সহ্য হয় না যখন অতটা টানলি কেন?

'কিশোরীদা?' ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

'তুই? সাড়ে আটটা বেজে গেছে? এত অন্ধকার। মেঘ করেছে বুঝি! ঝড় আসছে?'

'তোমাকে কখন থেকে খুঁজছি। আমার মা খুন হয়েছে। ডেডবডি থানায় নিয়ে গেছে।'

'খুন। এ পাড়ায় খুন? নেশা করেছি বলে ইয়ারকি করছিস?'

'বিশ্বাস করো। গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে গেছে।'

'এ শালা সেই বিশ্বনাথ সরকারের কাজ। সেদিন গিয়ে ডালিমকে তড়পে এসেছিলুম, তোমার পিরিতের নাঙের পে অ্যাটাচ করা হবে। হাতে আর তোমার ওই দুটো নয় হ্যারিকেন ধরতে হবে। শালা মাতাল মাগিবাজ ঘুসখোর। পাপে চুর হয়ে আছে। এইবার তোর পেছনে লাথি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। দাঁড়া, আগে চৌবাচ্চার ক্যাংলা জলে ডুবে আসি। নেশাটা মাথায় চড়ে গেছে। তুই আয়। তোর খাওয়া হয়নি। স্যান্ডউইচ আর হাফ পেগ ব্র্যান্ডি চালিয়ে দে।'

কিশোরীদার বাড়িতে জমিদারি আমলের মার্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চাটা আর দু'-একটা সাবেক জিনিসের মতো অটুট ছিল। কিশোরীদা আন্ডারওয়্যার পরে ঝপাং করে সেই জলে তলিয়ে গেল। একসময় ভিজে শরীরে উঠে এল। মাথায় বড় বড় ভিজে চুল বার কয়েক ঝাঁকিয়ে নিল।

'একটা তোয়ালে টোয়ালে দেখ না!'

'কোথায় আছে বলো?'

'ভেতরের ঘরে দেখ না!'

লম্বা বারান্দা অনেক দূর চলে গেছে। সবে ভোর হচ্ছে। গোলাপি আলো খেলছে পাথরের মেঝেতে। একেবারে শেষ মাথায় একটা পাথরের স্ট্যাচু। নেই নেই করেও কিশোরীদার অনেক আছে। অনেক ঘর। সব ঘরই তালা মারা। একটা ঘরই খোলা। ঢুকতেই সামনের দেয়ালে বেশ বড় একটা ছবি। দেবীর মতো সুন্দরী এক মহিলা। নিশ্চয় কিশোরীদার মা— মেম বউ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ দরজার চৌকাঠে। হঠাৎ মনে হল, তোয়ালে। নিখুঁত সাজানো ঘর। আলনায় ধবধবে সাদা তোয়ালে। লোকটার কি সবই সুন্দর? কে একজন কানের কাছে বলে উঠল— তারক সরকার! তুমি কোনওদিনই এইরকম একটা মানুষ হতে পারবে না! তুমি শুধু দেখে যাও।

'কী রে শালা? তোয়ালে কি বুনে আনছিস?'

তোয়ালে হাতে দৌড়ালুম, ভোর মাড়িয়ে। উষসী আলোর জমজমায় প্রকৃতি জাগছে। প্রথম পাখির টিটির টিটির ডাক। ভিজে বাতাসে দুলছে মাধবী, মালঞ্চ। এক মা ছবি হয়ে দেয়ালে দুলছে, আর এক মা শুয়ে আছে মর্গে। একটু পরে হৃদয়হীন কিছু লোক ধারালো ছুরি দিয়ে দেহটা ফেঁড়ে ফেলবে। ওই যে দিন এলে আমার দুঃখ আসে রাত এলেই আসে ভোগ। চোখে জল এল। বুকের হাপর তোলপাড়। উনুন নিবে গেল চিরতরে। রান্নার সময় চুড়ির কিনিকিনি শব্দ নীরব হল চিরতরে। চিরতরে নিস্তব্ধ হল আমাকে ডাকার কণ্ঠস্বর। পাহাড় থেকে পড়ে গেছি মহাশূন্যে। একটুকরো ছেঁড়া কাগজ।

তারক সরকার গুচ্ছাইত হলেও তার তো একটা মন আছে। সে মনে সাজানো আছে একের পর এক ঘটনা। বিশ্বনাথ সরকার চম্পা সরকারের বদলে পেলেন ডালিম। ডালিম নামিয়ে দিলে একটা বাচ্চা বিশ্বনাথ। তারক সরকার চম্পা সরকারের বদলে পেয়ে গেল সরলামাসি। চম্পা সরকারের বরাতে শূন্য নয় মহাশূন্য। আমাদের পাড়ায় লক্কা রেস খেলত, আরও একজন খেলত, ফক্কা। লক্কা ভাইসরয় কাপে একলাখ পেয়ে গেল। ফক্কা বরাত ঠুকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছিল। সব চৌপাট। সেই রাতেই ফক্কা উন্মাদ হয়ে নেমে পড়ল পথে— একটাই বুলি— যাক শালা, লক্কা লাক, ফক্কা ফাঁক॥ ডালিম লাখ, চম্পা ফাঁক। তারক সরকার কাঠগড়ায়।

কিছুকাল শহর কলকাতায় মহা উত্তেজনা। সকলের মুখে মুখে ফিরছে— চম্পা সরকার মার্ডার কেস। বটতলার কবি লিখে ফেললেন পাঁচালি— এক আনা দাম:

শোনো শোনো কী আশ্চর্য কলির কাহিনি।
রেল কোম্পানির মালবাবু মারলে বউরানি ॥
পিরিতের মেয়েমানুষ পুকুরপাড়ে ঘোরে।
ছিপ ফেলে মালবাহী মালের আশায় বসে ॥
সতী সাবিত্রী এয়োরানি মুখ বুজে দেখে।
কর্তামশাই পিষছে ডালিম বুকের ওপর বসে ॥
বাংলার ঘরে ঘরে কুলবধূ খুন।
এদেশের পুরুষের কতই না গুণ ॥

হাইকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো! অভীরামের দ্বীপ চালান মা, ক্ষুদীরামের ফাঁসি।

জমজমাট আদালত কক্ষ। পাবলিক প্রসিকিউটার যেন নাটক করছেন!

মি লর্ড! আসামি বিশ্বনাথ সরকার একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি। ইস্টার্ন রেলের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। কলকাতায় ছিলেন। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে মোগলসরাইতে বদলি করা হয়। এই যে দায়িত্বে অবহেলা, মি লর্ড! এটা খুব নরম শব্দ, ভদ্র শব্দ, ইংরেজি ভাষায় স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ, গ্রস নেগলিজেন্স ইন ডিউটিস। সোজা বাংলায়, লোকটা চোর। পাকা চোর। একা চুরি করে না, পাঁচজনকে নিয়ে চুরি করে। পাপের বলয়ে সবাইকে জড়িয়ে নেয়, তার মধ্যে অবশ্যই একজন বড় কেউ থাকে, ফলে পানিশমেন্টটা সব সময় মাইলড হয়, একস্ট্রিম হয় না। এইবার আমি একটা গ্রাম্য গল্প বলব— মেয়ের বিয়ে দেবেন এক ভদ্রলোক। পাত্রের খোঁজ করছেন। ঘটক বলছেন, ছেলেটি খুব ভাল, তবে একটাই একটু আপত্তির হতে পারে, মাঝে মধ্যে পেঁয়াজ রসুন খায়। না, রোজ খায় না, যেদিন মাংস- টাংস খায় সেইদিন খায়। মাংস রোজ খায় না, যেদিন মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ি যায় সেইদিন। এও রোজ নয়, যেদিন রেসের মাঠে মোটা কামাই হয় সেইদিন যায়। ছেলে মশাই খুব ভাল। ধর্মাবতার। আসামি বিশ্বনাথ সরকার রোজ চুরি করে না, মাঝে মাঝে, যখন তার পোষা মেয়েমানুষ গয়নার আবদার ধরে। বিশ্বনাথ সরকার নিজের সতীসাধ্বী স্ত্রী ও তার একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে, তাদের অসীম দারিদ্র্যে ভাসিয়ে ডালিম নামক এক ডাঁশা বেশ্যাকে নিয়ে আলাদা ফুর্তির সংসার পেতেছে। এতেও সে তৃপ্ত হতে পারেনি, এমনি তার দুর্বার কাম। একদিন সে তার বিবাহিত স্ত্রী শ্রীমতী চম্পা সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসে তার সাবেক পৈতৃক বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল, যাবতীয় গহনাপত্র, দামি জিনিস সরিয়ে নিয়ে যাবে তার রক্ষিতার সেবায়। এমন সময় প্রতিবেশিনী বিধবা যুবতী সরলা চৌধুরী নিত্য যেমন আসেন, এসেছিলেন অভাগিনী চম্পা সরকারের খোঁজখবর নিতে। আসামি বিশ্বনাথ সেই সময় মদে চুর হয়ে ছিল। দুর্ভাগ্য সরলার। বিধবা হলেও যুবতী, অতীব আকর্ষণীয় তাঁর চেহারা। আসামি বিশ্বনাথের চরিত্র এমনই, এমনই সে কামপীড়িত, যে স্ত্রী ও উত্তীর্ণ-কৈশোর পুত্রের সামনেই, আলোকোজ্জ্বল ঘরে সরলা চৌধুরীকে ধর্ষণ করে। সেই রাতে যে-ডাক্তার সরলার চিকিৎসা করেন, মি লর্ড, তাঁর লিখিত বিবরণ আপনার সমুখে পেশ করা হয়েছে। পেশ করা হয়েছে আসামির সার্ভিস রেকর্ড, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামতসহ। সেই রাতে পল্লির সমাজসচেতন কিছু মানুষ আসামিকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে স্থানীয় পতিতা পল্লিতে পাচার করে দিয়ে আসেন। অসীম ভদ্রতাবশত তাঁরা আসামিকে পুলিশের হেফাজতে তুলে দেননি, কারণ এর সঙ্গে অসহায় এক বিধবার সম্ভ্রম ও সম্মান জড়িত ছিল। সাক্ষী হিসাবে এই মামলায় তাঁদের তিনজন উপস্থিত আছেন। তাঁদের জবানবন্দি থেকে স্পষ্ট হবে আসামির জঘন্য সমাজবিরোধী চরিত্র। হি ইজ নো রেসপেক্টার অফ মরালস, অ্যাবসলিউটলি লাইসেনসাস অ্যান্ড লেচেরাস। মানুষকে সময়ে আইনের দ্বারা সংযত করতে না পারলে সে কত সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, আসামি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ত্রী এবং পুত্রের ভরণপোষণে উদাসীন আসামি বিশ্বনাথ সরকার তার সমস্ত উপার্জন ও চুরির অর্থ রক্ষিতার বিলাসে ব্যয় করেছে। প্রমাণ তার ঐশ্বর্য। তার

অ্যাসেটের একটি তালিকা মহামান্য বিচারকের অনুধাবনের জন্যে পেশ করা হয়েছে। একদিকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন পুত্র-পরিবার, অন্যদিকে মদ্য ও মাংস সহযোগে এই ঘৃণ্য অপরাধীর চলছে রক্ষিতা বিলাস। আইন সমাজ এই অপরাধ কখনও ক্ষমা করবে না। পৃথিবীর কোনও দেশই ক্ষমা করবে না মানুষের এই নৈতিক অধঃপতনকে। ক্রিমিন্যাল জাস্টিস সম্পর্কে ইংরেজদের নীতি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, সাম্যহীন। মহামান্য বিচারপতি সবই জানেন, তবু স্মরণ করাতে আপত্তি নেই ব্রিটেনের ক্রাউন কোর্ট, যেখানে এই ধরনের মামলার বিচার হয়, সেখানে লর্ড চ্যানসেলারের সতর্ক নির্দেশ হল— দ্য গভর্নমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফর ডিলিং উইথ ক্রাইম ইজ প্রিভেন্ট ইট, হোয়ার পসিবল, টু ডিটেক্ট সাসপেক্টস টু কনভিক্ট দ্য গিল্টি অ্যান্ড অ্যাকুইট দ্য ইনোসেন্ট, টু ডিল উইথ দোজ ফাউন্ড গিল্টি, অ্যান্ড টু প্রোভাইড মোর এফেক্টিভ সাপোর্ট ফর দ্য ভিক্টিমস অফ ক্রাইম। ইট ইজ অলসো কনসার্নড টু মেইনটেইন পাবলিক কনফিডেন্স ইন দ্য ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অ্যান্ড এ প্রপার ব্যালান্স বিটুইন দ্য রাইটস অফ দ্য সিটিজেন অ্যান্ড দ্য নিডস অফ দ্য কমুউনিটি অ্যাজ এ হোল। আইন হবে নিরপেক্ষ, ক্ষমাহীন। নাগরিক অধিকার রক্ষায় যেমন সজাগ তেমনি নাগরিক প্রয়োজনের প্রতি রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। নৈতিক অবক্ষয় আমাদের অস্তিত্বকে সর্বাধিক বিপন্ন করে। ক্রাউন কোর্টে হেনরি ভারসাস ট্র্যাসি মামলার রায় দিতে গিয়ে অনারেবল জাস্টিস ম্যাককিনলি বলেছিলেন: Moral degradation grows into the vital of human existence মি লর্ড। এই নৃশংস, জঘন্য, সুপরিকল্পিত হত্যাকারীকে Who murders for pleasure for sex যদি আইন অনুযায়ী extreme punishment দেওয়া না যায়, তা হলে মানুষ আদালতের উপর বিশ্বাস হারাবে, অপরাধীরা আরও সাহসী হয়ে উঠবে। to prevent crime আমাদের ভূমিকা হবে হাস্যকর।

আমি আমার চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি, অপরাধী বিশ্বনাথের Modus operandi একজিবিট নাম্বার ওয়ান, একটা সিল্ক কর্ড which is the instrument of the murder. মহামান্য ধর্মাবতার এই সিল্কের কর্ড বিশেষ ধরনের কর্ড। সহসা হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই কর্ড রেল কোম্পানির সম্পত্তি। এতে গার্ড সাহেবরা হুইসল বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। এই বস্তু অপরাধীর সহজে আয়ত্ত; কারণ সে রেলের মালবাবু। এই সিল্ক কর্ড প্রাণহীন, কিন্তু ভাষাহীন ভাষায় দুটো জিনিস ইন্ডিকেট করে, এক বিশ্বনাথ সরকার শুধু খুনি নয়, সে একজন পাকা চোর। রেলের ছোটবড় যাবতীয় সম্পত্তি অপহরণই তার সম্পদের উৎস। ঘটনার রাতে বিশ্বনাথ সরকার কাগজে-কলমে মোগলসরাইতে থাকলেও আসলে সে ছিল কলকাতায়। একই সঙ্গে একজন মানুষ দু'জায়গায় থাকে কী করে। এইখানেই অপরাধী প্রোফেশনাল মার্ডারারের মতো কাজ করেছে। হুইচ প্রুভস বিয়ন্ড ডাউট, হিজ ইনটেনশন টু কিল দ্য ভিক্টিম মেথডিকালি অ্যান্ড প্রফেশনালি। ক্রাইমের দু'দিন আগে জেনারেল হসপিটালে অ্যাডমিশন নেয়। পেটের কমপ্লেন। নামটা তার, লোকটা আর একজন। বিশ্বনাথের প্রয়োজন ছিল, অ্যাডমিশন অফ ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটুকুর in the meantime he safely came to calcutta killed his wife and went silently back to Mogol Sorai। রেল তার হাতে, যে-কোনও সময়, যে-কোনও ট্রেনে সে চলা ফেরা করতে পারে। ধর্মাবতার ক্রাইমে তিনটি এমের খেলাই প্রধান— ম্যান, মার্ডার, মবিলিটি। আততায়ী চট করে আসবে, কাজ হাসিল করে চটজলদি সরে পড়বে। এই অপরাধী সরকারি পদ, সুযোগ-সুবিধে ক্রাইমের কাজে লাগিয়েছে— দ্যাটস অ্যানাদার অফেনস। ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড। ঘটনা যেদিন ঘটবে এক বিশ্বনাথ সরকার হাসপাতালে অ্যাডমিশন নিয়েছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। আর এক বিশ্বনাথ সরকার নিয়েছিল সিকলিভ। দু'জন এক নয়। দেহের বাক্স মোটামুটি এক হলেও, দু'জন আলাদা লোক। যদিও ঠিকানা একই। ধর্মাবতার, আমাদের হাসপাতাল পেশেন্টদের আইডেন্টিটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কার চিকিৎসা করলুম। কাকে ভরতি করলুম, কাকে রিলিজ করলুম। There must be an identity card with a passport size photograph. বিশ্বনাথ সরকার হাসপাতালে ছিল না ছিল

কলকাতায় তার রক্ষিতার বাড়িতে। সেখান থেকে রাত সাড়ে আটটার সময় বেরিয়ে প্রথমে যায় হোটেল রয়ালে। সেখানে দু'পেগ রাম খেয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সে আসে নিজের পাড়ায়। অন্ধকারে তাকে কেউ না চিনলেও মোড়ের পানবিড়ির দোকানের মালিক তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। বিশ্বনাথ সরকারের চোখে চশমা ছিল। ইদানীং লেখাপড়ার সময় চশমা ব্যবহার করতে হচ্ছিল, কারণ বাঙালির চোখে চল্লিশের পর থেকেই চালশে ধরতে শুরু করে। বিশ্বনাথ সরকার চশমা পরেই পাড়ায় ঢুকেছিল। সামান্য ভোল পালটাবার চেষ্টা। যথেষ্ট জোরেই হাঁটছিল হনহন করে। প্রদর্শিত চশমার পাওয়ার আর অভিযুক্তের চোখের পাওয়ারে মিল পাওয়া গেছে। পাওয়ার হয়তো একই হতে পারে একাধিক লোকের। এক হয় না অ্যাকসিস। এ ক্ষেত্রে অ্যাকসিসও মিলে গেছে। এই কেসে অ্যাকসিস একটা বড় পয়েন্ট। সেই ভয়ংকর রাতের গা-হিম করা নাটকে আমরা উপস্থিত না থাকলেও আততায়ী যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখে গিয়েছিল, সেই জড়প্রমাণই দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরদা তুলে আমাদের দর্শকের আসনে বসিয়ে দেয়। আততায়ী অনুতপ্ত স্বামীর ভূমিকায়। স্ত্রী চম্পা সরকার স্বামীর যাবতীয় বদগুণ থাকা সত্ত্বেও আদর্শ হিন্দু রমণীর মতোই সেই মদ্যপ লম্পট মানুষটাকে তাঁদের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘর, সেই পালঙ্ক, সেই বিছানা, সেই মধুযামিনীর স্মৃতি। বিপথগামী স্বামী ফিরে আসতে চাইছে পরিত্যক্তা স্ত্রীর কাছে। দীর্ঘ স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা রমণীর মনে প্রেম জাগতেই পারে মি লর্ড। বহুকাল পরে দু'জনেই বিছানায়। বাড়ি শূন্য, নির্জন। রাত তখন ন'টা। পুত্র বাইরে। আসামি দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে রমণ ক্রিয়ায় রত হল। শয়তান। মারার আগে ভোগ করে নিতে চায় সহধর্মিণীকে— আঁচড়ে, কামড়ে, যন্ত্রণা দিয়ে। এসব সে নতুন শিখেছে বাজারি মেয়েছেলেদের কাছ থেকে। সেক্সোলজির পরিভাষায় যাকে বলা হয় Pleasure in pain। মহামান্য ধর্মাবতার, দা সাদের জাস্টিন ও বেডসাইড স্টোরির কথা স্মরণীয়। যৌন বিকৃতি মানুষকে পশুতে পরিণত করে। তাদের তখন আর কোনও ধর্ম থাকে না। They turn into beast beastility in sexuality বহুকাল পরে স্বামীসহবাস। হতভাগ্য মহিলা যন্ত্রণা পেলেও সহ্য করে যাচ্ছেন, স্বামীকে ফিরে পাবার বাসনায়। আসামি সোহাগের ছলে গলায় সিল্কের দড়ির ফাঁস লাগাচ্ছে। আর এক যৌন খেলা, হঠাৎ টান। হতভাগ্য রমণী ভাবছেন— এ বুঝি স্বামীর নতুন কোনও আনন্দ। আসামি টানছে। টানতে টানতে খাটের কিনারায়, সেখান থেকে মেঝেতে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। জিভ ঠোঁটের ফাঁকে, অসীম জীবনীশক্তি। খাট থেকে দরজার ব্যবধান দশ ফুট। ন'ফুটের মাথায় হার সোল ওয়াকড আউট। ঘড়িতে তখন ঠিক রাত দশটা। সেদিন ছিল অমাবস্যা। মহামান্য বিচারপতির সামনে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। মহিলার গালে, বুকে, উরুসন্ধিতে দংশনের চিহ্ন ছিল। কয়েকটি বেশ গভীর। সেখানে দাঁতের যে মাপ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আসামির দাঁতের মাপের মিল আছে। নিহত মহিলার যোনীদেশে একটি পুরুষের পিউবিক হেয়ার পাওয়া গিয়েছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে আসামির যোনীকেশের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। পরীক্ষার রিপোর্ট মহামান্য বিচারপতির সামনেই আছে। যৌন অপরাধে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার সময় গ্লাসগো আদালতের মহামান্য বিচারপতি লর্ড ক্যামেরন বলেছিলেন— A man may be very bad without being mad পাগল না হয়েও মানুষ বীভৎস রকমের খারাপ হতে পারে। আসামি বিশ্বনাথ সরকার তার উদাহরণ। সব খুনেরই একটা মোটিভ থাকে। লাভবান হবে বলেই মানুষ খুন করে, খুন করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। পয়সা নিয়েও খুন করে। Murder for gain, murder to take revenge professional murder Murder for sexual pleasure বিশ্বনাথ সরকার স্ত্রীকে খুন করেছে একটি মাত্র কারণে, একটা সম্ভাবনার আতঙ্ক। চম্পা সরকার আদর্শ হিন্দু রমণী, পতি অপদেবতা হলেও তাঁর কাছে দেবতা। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ি যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। পতিদেবতার সমস্ত অপকর্ম সহ্য করাই ছিল তাঁর আদর্শ, তাঁর স্ত্রীধর্ম। তা হলে? ছেলে লায়েক হচ্ছে। নিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে

বাবার ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠছে। পাড়ার সমাজসেবী যুবক, শিল্পমালিক, আদর্শপরায়ণ উচ্চ বংশজাত কিশোরীমোহন ঘোষকে সে দাদা বলে। তারা দু'জনে গিয়ে বিশ্বনাথ সরকারের অনুপস্থিতিতে তার রক্ষিতাকে শাসিয়ে এসেছিল— চম্পা সরকারকে দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে বিশ্বনাথের পে-অ্যাটাচ করাবে। এ ছাড়া সরলা কেলেঙ্কারির রাতে পাড়ার লোক ডেকে বিশ্বনাথকে প্রহার করা হয়েছিল। প্রতিশোধ ও প্রমোদের পথের কাঁটা সরাবার জন্যে নিরীহলম্পট, সাহসীখুনির ভূমিকায়। বিশ্বনাথ সরকারের রোজগার বেশ ভালই ছিল, সেই রোজগার বন্ধ হলে রক্ষিতা বিলাসও বন্ধ হয়ে যাবে। আসামি তাই বেপরোয়া। সারা পৃথিবী মজে আছে কাম আর প্রেমে। অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, গৃহ, রমণী। চাই শুধু চাই। বিজ্ঞাপনে কাম, সাহিত্যে কাম, ধর্মে কাম, সিনেমা থিয়েটারে কাম? পোশাক পরিচ্ছদে কাম। সমস্ত মন পড়ে আছে দেহসঙ্গ বাসনায়। সমস্ত গ্রন্থি একই ধরনের বাসনায় টনটন করছে। ঘোর অসুস্থ এই সমাজ। সেই উদাহরণ এই খুনি বিশ্বনাথ সরকার।

ধর্মাবতার জীবনের বিনাশী পরিণতির কথা শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাত সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়াত ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি থেকে কাম, কাম প্রতিহত হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিবেকনাশ, বিবেকনাশ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, উচিত অনুচিত বোধ লুপ্ত, বিচারবুদ্ধির লোপ মানেই বিনাশ। দি মোস্ট সাইকোলজিক্যাল একসপ্ল্যানেশান অফ ক্রাইম। এই পারভার্ট ওয়ার্লডের বলি আপনার সামনে, স্ত্রী হত্যাকারী বিশ্বনাথ সরকার। আইনের কাছে প্রার্থনা, চরম সাজার দৃষ্টান্ত রেখে ভবিষ্যৎ অপরাধের পথ বন্ধ করুন। অপরাধ প্রবণতাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম। শাসন আর অনুশাসন ছাড়া মানুষ এক দ্বিপদ পশু।

পাবলিক প্রসিকিউটার বসলেন। উঠলেন আসামিপক্ষের বাঘা ব্যারিস্টার। কাঠগড়ায় সরলা চৌধুরী। খুব চুল মাথায়। ঘাড়ের কাছে চুবড়ির মতো খোঁপা। সাদা ব্লাউজ, সাদা শাড়ি। দীর্ঘ শরীর। স্বাস্থ্যের ঝিলিকে ঝকমক করছে। নাম ধাম সব হয়ে যাওয়ার পর, শুরু হল সওয়াল:

ব্যারিস্টার: সরলাদেবী! আপনি বিধবা?

সরলা: স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের যদি বিধবা বলা হয় তা হলে আমি তাই।

ব্যা: তা হলে এত সেজেছেন কেন?

স: আপনার মন ভোলাব বলে।

বাঘা ব্যারিস্টার থতমত খেয়ে গেলেন। আদালত কক্ষে গুঞ্জন উঠল। বিচারক বললেন অর্ডার অর্ডার। ভারতের নামকরা ব্যারিস্টার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে প্রশ্ন করলেন:

ব্যা: আই সে...

স: বাংলা। ইংরিজি বুঝি না।

ব্যা: আপনি তেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন?

স: আপনার মনে আছে দেখছি।

ব্যা: এটা কোর্ট, যা জিজ্ঞেস করছি এককথায় তার উত্তর দিন।

স: হাতে শাঁখা নেই সিঁথিতে সিঁদুর নেই তবু অবান্তর প্রশ্ন, আপনি বিধবা? কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বিধবাকে বিধবা বলতে নেই, তারা দুঃখ পায়।

দর্শকরা বললেন, বাঃ বাঃ। জজসাহেব বললেন, অর্ডার, অর্ডার।

ব্যা: তেরো বছর বয়সে পালিয়েছিলেন কেন?

স: পালাব কেন? উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলুম। পালালে কেউ ফিরে আসে?

ব্যা: সঙ্গে কে ছিল?

স: সঙ্গে কিছু টাকা ছিল আর ছিল আমার সাহস।

ব্যা: সঙ্গে একটা ছেলে ছিল না?

স: একটা কেন, অনেক ছেলে ছিল। ট্রেন ভরতি ছেলে।

ব্যা: বিশেষ একজন। বয়সে বড়, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়!

স: সঙ্গে যদি বয়স্ক আত্মীয়ই থাকল তা হলে পালানো বলছেন কেন? পালানো আর বেড়ানো এক হল!

ব্যারিস্টার হোঁচট খেলেন। দু'বার গাউন ঠিক করলেন। সহকারীর দিকে একবার তাকালেন। সরলা চৌধুরী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

স: যা বলবেন, ভেবে বলবেন।

ব্যা. [রেগে গেছেন] সেই আত্মীয়র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল আপনার!

স: তেরো বছরেই অবৈধ!

ব্যা: আপনার বাড়ন্ত চেহারা ছিল।

স: বাড়ন্ত চেহারার কোনও মেয়ের বয়স্ক কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা অবৈধ। আমার জানা ছিল না। চেহারা ভাল হওয়াটা যে অপরাধ, এ কথাও তো আগে শুনিনি!

ব্যা: এটা কী? [একটা পুরনো খবরের কাগজ]

স: পুরনো খবরের কাগজ।

ব্যা: এই ছবিটা কার?

স: মনে হয় আমার কম বয়সের ছবি।

ব্যা: কেউ বেড়াতে গেলে তার অভিভাবকরা নিরুদ্দিষ্ট কলামে বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখেন না— সরলা, ফিরে এসো, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। মি. লর্ড [বিচারপতির দিকে তাকিয়ে] এই সরলা চৌধুরী তেরো বছর বয়েস থেকেই লুজ মর‍্যাল লাইফ লিড করায় অভ্যস্ত। সম্পর্কিত এক মামার প্রলোভনে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তার ফলে তেরো বছর বয়সেই সরলা চৌধুরী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। গর্ভপাত করিয়ে সে যাত্রা উদ্ধার পেতে হয়েছিল এঁর মাতাপিতাকে।

স: গল্পের গোরু গাছে ওঠে শুনেছি। তবে সে-গোরু যে আদালতে থাকে আমার জানা ছিল না। আপনার বোধহয় জানা নেই আমি জন্ম বাঁজা। যে কারণে আমার বিয়ে দিতে মা-বাবাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছিল। আপনি যদি আমাকে একটি সন্তান উপহার দিতে পারেন, তা হলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সন্তানহীনা মহিলার বেদনা আপনি বোঝেন! আমাকে কলঙ্কিত মহিলা প্রমাণ করে আপনার লাভ! হতভাগ্য এক নারীকে নিয়ে সাধারণের সামনে এই তামাশা নারীজাতির ওপর পুরুষের চিরকালের অত্যাচারের উদাহরণ।

আদালতে রব উঠল, ঠিক, ঠিক।

ব্যা: পাবলিক সেন্টিমেন্ট উসকে চরিত্রের কলঙ্ক চাপা দেওয়া যায় না। গর্ভপাতের ফলেই আপনি বাঁজা হয়েছিলেন।

স. এ কথা আপনার চেয়ে একজন ডাক্তারই ভাল বলতে পারবেন। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে লাভ কী। আমার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টই প্রমাণ করবে, আপনার সিদ্ধান্ত ভুল ও অপমানজনক। তা ছাড়া আমার স্বামী এতটা উদার ছিলেন না যে একজন কুলটাকে বিয়ে করবেন।

ব্যা: আপনার বাবা চাকরি করে দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

স: এইবার আমি আর হাসি চাপতে পারছি না। ব্যারিস্টার হলেন কী করে! আমার স্বামী আমার বাবাকেই চাকরি করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। হাই ভোল্টেজ কারেন্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সবাই বললেন, সাবাশ! সাবাশ।

ব্যা: মি লর্ড! আমি সরলা চৌধুরীর গৃহশিক্ষক বিনোদ বসুকে জেরা করতে চাই।

বিচারক: ইয়েস ইউ ক্যান।

বিনোদ বসু এজলাসে এলেন। প্রায় প্রৌঢ়। স্বাস্থ্য ভাল। চোখে চনমনে দৃষ্টি।

ব্যা: আপনি সরলা চৌধুরীকে পড়াতেন?

বি: আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যা: তখন সরলা চৌধুরীর বয়স কত হবে?

বি: বারো-তেরো।

ব্যা: আপনার?

বি: কুড়ি!

ব্যা: সরলা চৌধুরী কেমন মেয়ে ছিল?

বি: ফ্লার্টিং টাইপ। গায়ে পড়া ধরনের। একবার মামার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সে এক কেলেঙ্কারি। ফিরে আসার কয়েক মাস পরে সরলাকে নিয়ে সরলার মা বেশ কয়েক মাসের জন্যে বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনরা তখন বলেছিল— সরলার শরীর খারাপ। ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছেল সরলা প্রেগনান্ট। ফিরে যখন এল, তখন খুব রোগা ও দুর্বল দেখাচ্ছিল।

ব্যা: তারপর আপনার কাছে পড়েছিল? আর কি পড়িয়েছিলেন?

বি: হ্যাঁ, এরপর আরও দু'-তিন বছর পড়েছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিই। ভীষণ সেক্সি মেয়ে। পাড়ায় যথেষ্ট বদনাম। পাছে আমাকে বিপদে ফেলে দেয় তাই ছেড়ে দিয়েছিলুম। পরে দেখলুম ভালই করেছিলুম; কারণ একের পর এক স্ক্যান্ডাল করে বেড়াতে লাগল মেয়েটা। আমাদের পাড়ার অনেককে ও নষ্ট করেছিল। সরলা চৌধুরী কিছু বলার আছে?

স: বলার তো নেই। দেখাবার আছে। বিনোদের কীর্তিকাহিনি। গোটা পঁচিশ প্রেমপত্র আছে। অশ্লীল সব ইঙ্গিত। আর আছে আমার অঙ্কের খাতা— যে খাতায় ছবি এঁকে বিনোদ আমাকে বোঝাতে চাইত নর-নারীর মিলন কাকে বলে! এই হল সাক্ষী বিনোদ। এরপর বিনোদ তার পিসতুতো বোনকে বিয়ে করে নিজেই এক কেচ্ছা বাধিয়ে বসল। সেই বিনোদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের যথেষ্ট দাম আছে।

প্রসিকিউটার: ধর্মাবতার! আমার লার্নেড ফ্রেন্ডের কেস তো দাঁড়াচ্ছে না। বারে বারে ফেঁসে যাচ্ছে। আসামিকে সওয়াল করার অনুমতি চাইছি।

ব্যা: মাই লার্নেড কলিগ অফ দি প্রফেশান— হি লাফস ওয়েল হু লাফস লাস্ট। ধর্মাবতার, আমি এখন তারক সরকারকে জেরা করার অনুমতি চাইছি।

বিচারক: ইয়েস গো অন।

তারক সরকার হাজির!

ব্যা: তোমার নাম?

তার: তারক সরকার।

ব্যা: বয়েস?

তার: প্রায় সতেরো।

ব্যা: তুমি এই মহিলাকে চেনো!

তা: হ্যাঁ চিনি!

ব্যা: কীভাবে চেনো?

তা: আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। আমি মাসি বলি। আমাকে খুব ভালবাসেন।

ব্যা: খুব ভালবাসেন, তাই না? আদর-টাদর করেন?

তা: যখন ছোট ছিলুম, এখন আমি বড় হয়ে গেছি।

ব্যা: যখন ছোট ছিলে তোমার মাসি তোমাকে আদর করবার সময় তোমার শরীরের কোন জায়গায় বেশি হাত দিতেন।

প্রসিকিউশান: অবজেকশানে মি লর্ড! আমার লার্নেড মেম্বার ভালগারিটির দিকে চলে যাচ্ছেন। হি ইজ ফিশিং অ্যানসার্স। আই অবজেক্ট।

ব্যা: মি লর্ড, আমার বন্ধুর ইরিটেশানের যথেষ্ট কারণ আছে। আমি এখুনি প্রমাণ করে দোব, খুনি বিশ্বনাথ সরকার নয়। খুনি সরলা চৌধুরী অ্যান্ড তারক সরকার পার্টি। দিস ইজ এ সেক্সচুয়াল ক্রাইম। প্রি-প্ল্যানড অ্যান্ড ওয়েলটাইমড। এই সরলা চৌধূরী একটা সাইকোলজিক্যাল কেস। ওভার সেকসড। সাফারিং ফ্রম বুল ফ্যাড। আউট অ্যান্ড আউট এ পারভার্ট। সরলা চৌধুরীর স্বামী ছিলেন সিকলি। স্ত্রীর লাস্ট স্যাটিসফাই করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সদা সর্বদা অদ্ভুত একটা হীনম্মন্যতা. একটা টেনশানে ভুগতেন। একদিন অন্যমনস্ক থাকার ফলে হাই ভোল্টেজ হ্যান্ডল করতে গিয়ে. মেট হিজ এন্ড। মি লর্ড। দ্যাটস এ মার্ডার। ইনডাইরেক্ট মার্ডার। সরলা চৌধুরী লাইক্স টু বি রেপড। বিশ্বনাথ সরকার তার পূর্বপরিচিত। একবার সদলে বিদেশ গিয়েছিলেন। চোদ্দো আগস্ট রাত্তিরে বিশ্বনাথ সরকারকে উত্তেজিত করার জন্যেই সরলা চৌধুরী চম্পা সরকারের বাড়িতে গিয়েছিল। মি লর্ড ইংরেজিতে বলে সেক্স থ্রো করা। সরলা চৌধুরী সেই ব্যাপারে এক্সপার্ট। পুরুষকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে আনন্দ পায়। বৈধর চেয়ে অবৈধ সম্পর্কেই তার উৎসাহ। নিজের ক্ষমতা সে পরীক্ষা করতে চায়। হার্ড বোলার। উইকেট ফেলাতেই তার তৃপ্তি। বিশ্বনাথ চৌধুরী ইনোসেন্ট ভিক্টিম। মদের ঘোরে ছিল। আর তার পরিবারের ভূমিকাটা হল প্রতিশোধপরায়ণের। পাড়ার লোক জড়ো করে বেধড়ক পেটানো হল বিশ্বনাথকে। ঘটনাটা সরলা চৌধুরী ইচ্ছে করে ঘটাল এক কিশোরের সামনে। কারণ সে কামবিকৃতিতে ভুগছে। এইবার সে ছেলেটাকে গ্রাস করল। ছেলের বয়সি ছেলের সঙ্গে গড়ে তুলল যৌন সম্পর্ক। দিস কেস ইজ এ পারফেক্ট এগজাম্পল অফ প্যারাফিলিয়া। ছেলেটা সবে পিউবার্টি অ্যাটেন করছে সেই সময় এই ফ্যালিক ওম্যান তাকে বুল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। তারক সরকার ওয়াজ এক্সপেলড ফ্রম স্কুল। লোকে কুকুর পোষে, ছাগল পোষে, সেই কায়দায় এই মহিলা ছেলেটিকে পুষতে লাগল টু স্যাটিসফাই হার লাস্ট, ডিজায়ার, ফর হার কারনাল প্লেজার। ছেলেটাকে ভাল-মন্দ খাইয়ে মালাই আর সিদ্ধি দিয়ে তাগড়া করে তুলল ফর হার ইউস। দুম্বা তৈরি হল। সরলা চৌধুরী আপনি সিদ্ধি খান?

স: হ্যাঁ খাই।

ব্যা: কেন খান?

স: যে কারণে আপনি মদ খান। জীবনের ব্যর্থতা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকতে।

ব্যা: মি লর্ড সিদ্ধি হল অ্যাফ্রোডিসিয়াক, সেক্স স্টিমুলেন্ট। সন্ধের পর ছেলেটাকে গেলাস গেলাস খাওয়ানো হত. অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ ওভিয়াস. টু মেক হার বুল মোর পাওয়ারফুল। মোর পাওয়ারফুল র‍্যামরড।

প্রসিকিউশান: মি লর্ড, আমার লার্নেড ফ্রেন্ড নিজের মক্কেলের স্বার্থে মেডিকেল ট্রুথকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। সিদ্ধির অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস হল, টেটরা হাইড্রো ক্যানাবিনলস, ইন শর্ট টি এইচ সি, সেক্স স্টিমুলেন্ট নয় সেক্স ডিপ্রেসেন্ট। যে কারণে মহাদেব খেতেন, সাধু-সন্ন্যাসী কুস্তিগিররা খান ব্রহ্মচর্য রক্ষা করার জন্যে। সেন্ট্রাল-নার্ভাস-সিস্টেমের ওপর চেপে বসে। ইউফোরিয়া হয়, কামোত্তেজনা হয় না।

ব্যা: ইফ দ্যাট বি দ্য কেস, সরলা চৌধুরী সেইটাই চাইত। ছেলেটার সেলফ ডেস্ট্রয় করে দিয়ে, নিজের ইচ্ছেমতো ছেলেটাকে ব্যবহার করা. ফর ম্যাসোচিস্টিক প্লেজার।

তারক সরকার, যাকে সবাই বলে তারক গুছাইত, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। একপাশে প্রসিকিউশান আর একপাশে ডিফেন্স। সামনে সরলা চৌধুরী। কিশোরীদা বলেছিল, সরলাকে ফাঁসা যদি বাঁচতে চাস। যতই হোক বাপ। বাপটাকে বাঁচা। সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছিল আমাকে। হঠাৎ মনে হল, অর্ধেক রাজত্ব আর বড়মাপের একটা রাজকন্যা আমার হাতে। রাজকন্যারও সম্পদের অভাব নেই। এক ঢিলে মারো দু'পাখি। বিশ্বনাথ সরকারকে না ফাঁসালে বাড়ি, জমি-জায়গা ডালিম এসে ভোগ করবে। সিনেমার নায়িকার মতো সরলা চৌধুরী আমাকে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম চারটেই দেবে। ধর্ম আর মোক্ষ কে চায়। অর্থ আর কামই সব।

ব্যা: মি লর্ড! ছেলের মা সেইদিন থেকেই বুঝতে পারলেন ছেলে এক বদ মহিলার পাল্লায় পড়েছে, যেদিন ছেলে এসে বললে, তার লেখাপড়া গোল্লায় গেছে। তিনি বললেন ওই ডাইনিটার ত্রিসীমানায় তুই যাবি না! এই কথা সরলা চৌধুরীর কানে গেল। শুরু হল ছেলের অধিকার নিয়ে দুই মহিলার লড়াই। মি লর্ড আপনি জানেন-- Hell hath no fury like a woman scorned. কিশোর প্রেমিক বয়স্কা প্রেমিকা সিদ্ধান্তে এল---- পথের কাঁটা মাটিকে সরাতে হবে। কবে! বিশ্বনাথ সরকার মাঝেমধ্যে আসে। কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। এইবার যেদিন আসবে, সেদিন চলে যাওয়ার পরই কাজ হাসিল করতে হবে। চশমাটা বিশ্বনাথ সরকারের, দড়িটা চম্পা সরকারের সায়ার দড়ি। বিশ্বনাথ সরকারই এনে দিয়েছিল। তারক সরকার তুমি ঘটনার রাতে সরলা চৌধুরীর ঘরে ছিলে। ছিলে তো!

তা: না, আমি কিশোরীদার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াচ্ছিলুম।

ব্যা: তুমি সেদিন সরলা চৌধুরীর বাড়িতে যাওনি? গিয়ে, সিদ্ধি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়োনি!

তা: না। একই সময় একজন দু'জায়গায় থাকতে পারে না।

ব্যা: প্রমাণ কী, তুমি ছিলে না!

তা: কিশোরীদা। আমি বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখি আমার বাবা বিশ্বনাথ সরকার চুলে যে গন্ধ তেল মাখেন, সেই উগ্র গন্ধ ঘরে ঘুরছে, মা মরে পড়ে আছে।

প্র: সেই তেলের শিশি আমরা আসামির ডেরা সার্চ করার সময় সিজ করে এনেছি। সাক্ষী সেই গন্ধ শনাক্ত করেছে।

ব্যা: গন্ধ শনাক্ত করা যায় না। স্মেল একটা পার্সোন্যাল ফ্যাক্টার, পার্সোন্যাল এক্সপিরিয়েন্স। হাউ ক্যান ইউ প্রুভ, সাক্ষী মিথ্যে কথা বলছে না। ইফ আই সে দিস স্মেল ইজ নট দ্যাট স্মেল অর দেয়ার ওয়াজ নো স্মেল অ্যাট অল। কিংবা সে পেয়েছিল চম্পা সরকারের মাথার তেলের গন্ধ। আমরা কংক্রিট প্যালপেবল ট্রুথ চাই।

প্র: মাননীয় বিচারপতি, সাক্ষীর সাক্ষ্যের তো তা হলে কোনও দরকারই থাকছে না, উইটনেস ফর প্রসিকিউশান শব্দটা বাতিল করে দেওয়া হোক। নতুন পদ্ধতির বিচার চালু হোক।

বিচারক: তারক সরকার কার সাক্ষী!

প্র: হি ইজ এ উইটনেস ফর প্রসিকিউশান। তারক সরকার মা মা, করে অন্ধকার ঘরে ঢুকছে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে নাকে একটা তেলের গন্ধ পাচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট তেল।

বিচারক: তেলের গন্ধ ঘরে কতক্ষণ ঘুরতে পারে?

প্র: মি লর্ড দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ইনটেনসিটি অফ দ্য স্মেল, অন দ্য কন্ডিশান অফ দ্য প্লেস। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। দে ওয়্যার অন দ্য অ্যাক্ট অফ কয়টাস। নট ওনলি দ্যাট, মৃতার ভ্যাজাইনা থেকে সিমেন স্যাম্পল নিয়ে আসামির সিমেনের সঙ্গে ম্যাচ করানো হয়েছে। স্পার্ম কাউন্ট সেম, এর পর আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। তেলের উগ্র গন্ধ, সিমেন ইন দি ভ্যাজাইনা, পিউবিক হেয়ার, সিল্ক কর্ড, চশমা।

ব্যা: তারক সরকারের সিমেন অ্যানালিসিস রিপোর্ট চাই।

প্র: আপনি কী বলতে চাইছেন?

ব্যা: এই সিদ্ধিখোর পাকা ছেলের মা-মাসি জ্ঞান নেই। ক্রিমিন্যাল হিস্ট্রিতে অজস্র ইনসেস্টের ঘটনা আছে। বাপ মেয়ের সঙ্গে, ছেলে মায়ের সঙ্গে, ভাই বোনের সঙ্গে। এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি। তারক সরকারের পক্ষে তার মাকে মারার যুক্তি অনেক জোরালো। কারণ, সে সরলা চৌধুরীতে আসক্ত। একটা ইলিসিট ব্যাপারে লিপ্ত। এই মহিলা তাকে পুষছে, ফর এ পারপাস। সেক্সচুয়াল পারপাস। এই বয়সের একটা ছেলের কাছে সেক্স কী জিনিস তা আমরা জানি। অ্যান্ড ফর সেক্স মার্ডার ইজ এ ন্যাচারাল এন্ড। এর ওপর আছে ড্রাগ অ্যাডিকশান।

দিনের পর দিন একই লড়াই। সরলামাসি সাংঘাতিক খেল দেখালেন। সরলামাসিকে লেখা বিশ্বনাথ সরকারের তিনখানা চিঠি আদালতে পড়া হল— সরলা, তোমার জন্যে আমি কি পাগল হয়ে যাব! তোমার মতো অমন বুক কোমর পাছা আমি কারও দেখিনি। তোমার কোনও অভাব আমি রাখব না। খ্যাসকা ধ্যাসকা চম্পা আমার গলায় যেন পাথরের বোঝা। সরলা চলো আমরা কোথাও গিয়ে নতুন সংসার পাতি। তোমার অমন যৌবন হেলায় নষ্ট কোরো না। দু'দিনের এই পৃথিবীতে সুখের সন্ধান করা কি খুব অন্যায় হবে! তোমার যা দরকার আমার তা আছে। বেশ বেশিই আছে! তোমার কোনও ধারণা নেই। তুমি যেমন খাইয়ে, আমি সেইরকম খাওয়াতে ভালবাসি। বিশ্বনাথ আমার নাম, ষাঁড় আমার বাহন।

তিনখানা চিঠি ও যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণে বিশ্বনাথ সরকারের যাবজ্জীবন হয়ে গেল। বিশ্বনাথ সরকার কোর্টে স্বীকারোক্তি করলেন— আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি। খুন করেছি নিজের বিবেককে। মেয়েছেলে আমার কাছে মদের নেশার মতো। নিতনতুন শরীর চাই আমার। আমি জানি, এ এক কঠিন অসুখ। কঠিন অসুখেই তো মানুষ মরে।

॥ পাঁচ ॥

পাপ করলে তবেই মানুষের ভাগ্য ফেরে। এই টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি ভোগ-সুখ এসব শয়তানের সম্পত্তি। আমার আর এক গুরু, গ্রেট দালাল ভানু বোস আমাকে বলেছিল, তারক সরকার কখনও পেছন দিকে তাকাবে না। গো হুয়া, সো হুয়া। সব মানুষেরই অতীত আছে। অতীতকে যে কবর দিতে পারে সেই সুখী। আর ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। চললে যেমন পথ ফুরোয়, বাঁচলে তেমনি কাল ফুরোয়। ভাল হতে চাইলেই ভাল হওয়া যায় না, খারাপ হতে চাইলেই খারাপ হওয়া যায় না। যে যা হয়ে আসে, সেইভাবেই চলে যায়। জীবন হল আখ। নিংড়ে নিংড়ে শেষ বিন্দু রস বের করে নাও।

ভানু বোস চোখে মুখে কথা বলে। যখন যেমন তখন তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন। একদিন দেখি খুব তিলক সেবা করেছে, গলায় তুলসীর মালা।

'দীক্ষা নিলে?'

'চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।'

'তার মানে?'

মানে, বেশ বড় একটা দাঁও মারতে যাচ্ছি। যার কাছে যাচ্ছি সে হল ঘোর বৈষ্ণব। জয় ঠাকুর, বলে দাঁড়াব গিয়ে, কথার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দোব, সবই প্রভুর ইচ্ছে, কাজ হাসিল। বাড়ি তৈরির সময় ইট গাঁথা দেখেছ— একটা ইট, খানিকটা মশলা, আবার একটা ইট। সব প্রভুর ইচ্ছে, সেই মশলা। বিষয় কথা হল থান ইট। তিন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তিনজনেরই অনেক চেলা। সব ধর্মেই আমার গাদা গাদা গুরুভাই। কারও ফ্ল্যাট চাই, কারও গাড়ি, কারও পাম্প। কেউ বেচবে কেউ

কিনবে, মাঝখানে ভানু বোস। জয় প্রভু, জয় ঠাকুর। ফ্রাই ইয়োর ফিশ ইন ফিশ অয়েল। জগতের দিকে তাকাবে শিকারির চোখে। উদ্দেশ্য একটাই, কাকে বধ করা যায়। এ কীরকম জানো— ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, রোটারি ক্লাবের মেম্বার হওয়ার মতো। জাল কাঁধে ঘোরো, জবরদস্ত মাছ দেখলেই ঝপাত করে ছোড়ো।'

এই ভানু বোসের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কিশোরীদা। ভানু বোস এস্কিমোদের দেশে গিয়ে ফ্রিজ বিক্রি করতে পারে। সাহারা মরুভূমিতে টিকে। লোকটাকে কপি করো, জীবনে উন্নতি হবে। ভানু বোস বলেছিল— 'শোনো ছোকরা, একটা ছবি সব সময় চোখের সামনে দেখবে, এক বুড়ি, একটা চরকা আর তুলো। ঘাড় গুঁজে চরকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, তুলো সুতো হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে চাকায়। ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই, নিজের চরকায় তুলো দাও।'

ঝড় চলে গেল। বাড়িটা ভূতের বাড়ি হল। রোজই মাকে দেখতে পাই। ভাল অবস্থার বিশ্বনাথ সরকারকে মনে পড়ে। বারান্দার চালায় লাউগাছ লতাচ্ছে। কিশোরীদার গ্যারেজের প্রথম দিনেই আচমকা এক লাথি নিতম্বে। গ্রিজ মোবিল জল কতকতে মেঝেতে গড়াগড়ি। বললে, 'দীক্ষা হল। চরিত্রে কালি না মাখলে জগৎ চেনা যায় না। সর্বাঙ্গে কালি না মাখলে মটোর মেকানিক হওয়া যায় না। সন্ধেবেলা বোতল, ছোলা আর পেঁয়াজ নিয়ে বসবি, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটবি। ইঞ্জিনের সঙ্গে কথা বলবি খিস্তির ল্যাঙ্গোয়েজে। পৃথিবীর অনেক জিনিস খিস্তিতে চলে। মানুষের মধ্যেও এইরকম আছে, যাদের বলা হয়, কী জিনিস মাইরি, ডাইনে যেতে বাঁয়ে যায়। কখনও ঝেড়ে কাশে না। পেটে আদ্দেক মুখে আদ্দেক। প্রথমে ফাইফরমাশ খাট। এটা ওটা নিয়ে আয়, যন্ত্রপাতি পার্টস চেন, তারপর হাত লাগাবি ইঞ্জিনে, ওয়ারিং এ। মটোর গাড়ি তোমার দেহ নয়, এর অনেক হ্যাপা। দুটো চোখ, দুটো কান, একজোড়া হাত আর পা, একটা ডাম্বেল একটা বারবেল, মানুষ ফিনিশ। গাড়ির? কারবুরেটার, ইগনিশান কয়েল, হোস, স্টার্টার, জাম্পার কেবল টার্মিনাল, অ্যাসকল, যত এগোবি ততই নয়া নয়া চিজ পাবি।'

হাতল ভাঙা কাপে চা, থেকে থেকে সিগারেট, কখনও গাড়ির বনেটে কখনও গাড়ির তলায়। আর আমরা তিনটে ছেলে। আসল নাম লোপাট। আমাদের গ্যারেজের নাম— জগাই, মাধাই, নিতাই। আমি জগাই। একজন হিসেববাবু আছেন, তিরিক্ষি চেহারা। সব সময় হিসেবি কথা। কেউ কিছু চাইলেই প্রথম প্রশ্ন— কেন, কী হবে! তবে খুব কড়া হিসেব। খাতায় না লিখে একটা পয়সাও ছাড়েন না। কিশোরীদা নাম রেখেছে, চিত্রগুপ্ত। কথায় বলে, খোড়ার পা ই গর্তে পড়ে। যার যেমন বরাত! হলটা কী? আবার কেচ্ছা। চিত্রগুপ্তদার একটি মেয়ে ছিল। একটিই মাত্র মেয়ে। তখন আবার বাজারের হিটগান জল ভরো কাঞ্চন কন্যা জলে দিয়া মন। সেই কাঞ্চন কন্যা। ভাবাই যায় না, অমন বাপের অমন সুন্দর মেয়ে হতে পারে! বয়েস বারো-তেরো। পিঠে ঝুলছে চওড়া মোটা বিনুনি। সুন্দর একটা ফ্রক। সরু কোমর। ভারী পাছা। মোমের মতো পা দুটো। দুর্গা ঠাকুরের মতো মুখ। চিত্রগুপ্তদাকে দুপুরে খাবার দিতে আসত। আয় মা আয় মা বলে, চিত্রগুপ্তদা যেন দেবী দুর্গাকেই আবাহন করছেন।

কিশোরীদার কাশীর পেয়ারা গাছের ডালে বসে হনুমানের মতো পেয়ারা চিবোচ্ছিলুম। মেয়েটিকে প্রথম দেখামাত্রই হাত থেকে পেয়ারা পড়ে গেল। ভাগ্য ভাল মাথায় পড়েনি। তা হলেই আমার যে রেপুটেশান— কিশোরীদা মুখে করে জুতো বইয়ে ছাড়ত। সেই প্রথম মনে হল, মেয়েরা কত সুন্দর! কত শান্তি! কত নির্ভরতা! গাছের মতো, ফুলের মতো, ঘাসের মতো। মনে আমার কোনও কুভাব এল না। গাছের ডালে বসে চোখে জল এসে গেল। এত সুন্দর জীবন নষ্ট করে ফেললুম! আমার সেই স্কুল, বাগান, ক্লাস, ব্ল্যাকবোর্ড কলেজে যেতে পারতুম, বন্ধু-বান্ধব, ঘাস-সবুজ মাঠ। খেলাধুলো গান গল্প। এইরকম একটা মেয়ের বন্ধুত্ব। সব গেল। এরই নাম বরাত।

ভানু বোস, দালাল দি গ্রেট, আমাকে বলেছিল, 'ভায়া! শুরুতে জীবনটাকে ওইরকম মনে হয়। কত সুন্দর!' স্কুলে আবৃত্তি করতুম রবীন্দ্রনাথ:

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোব।

কানের কাছে হেঁড়ে গলায় সংসার বললে, ভানু বোস, ফুলবাগানে কোয়েল বোলে আব কৌয়া বোলে টিন্দেপ চালে। প্রাণ তো আছে, তবে প্রাণের কল চালাচ্ছে উদবের ইঞ্জিন। অতএব উদরের ঔদার্যের জন্যে ফিল্ডে নেমে পড়ো। সেখানে ছুটছে ঘোড়া ছুটছে গাধা ছাগল ভেড়ার পাল। নো কবিতা ভায়া, সবই নিদারুণ প্রবন্ধ। সেখানে ঘুরছে চাকা ঘসর ঘসর, পিষছে মানুষ, কাযদা হল বাঁচা, সকাল বিকেল কুইক মার্চ, ডন বৈঠক, হাতের কাজ। জীবনের বাইরে পড়ে আছে প্রেম, আলো, গান। জীবনে প্রেম নেই বিয়ে আছে। নাবকোল গাছের পাতায় কত কাব্য। শুকোলেই খ্যাংরা। বিয়ে হল প্রেমের খ্যাংরা। ওসব নিয়ে অত আফশোস কোরো না। তোমার বাপের তো উইন্ড মিল নেই। থাকলে ঘাস চাঁদ লতাপাতা কবিবাজি করতে পারতে। এখন যা তোমাকে কবতে হবে, তা হল দুরমুশ। আমাব একবার একটা প্রেম হয়েছিল। অবশ্যই ছাত্রজীবনে। ওই যেমন চিকেন পক্স, হুপিং কাফ হয়, সেইরকম আর কী! একটু চেষ্টা করতেই হয়ে গেল। এ তো প্রেমেব দেশ। প্রথম তিন দিন যাবতীয় ন্যাকা ন্যাকা কথা। চতুর্থদিনে বেশ নির্জনে একটু ইটিং কাম মিটিং। সেই চাঁদ-তারা-লতা-পাতা-কচু-ঘেঁচু দিয়ে শুরু হল, তিন মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা হটিকালচার থেকে ফিজিক্যাল কালচারের দিকে চলে গেল। শোনো ভায়া দেহ ছাড়া নাই কিছু। দেহহীন মানে ভূত। ভূতেদের সেইজন্যে ফিজিক্যাল কালচার নেই, শুধু ভয়েস কালচাব— এই কোথায় যাচ্ছিস। নেতাদের মতো এক মাইল দেড় মাইল লেকচার শুধু লেকচার। জীবনটা কী — লেডো বিস্কুট। যতক্ষণ তোমাব দাঁত আছে কুড়ুর মুড়ুর চিবিয়ে খাও। দাঁত মানে তোমাব যৌবন, তোমার বোজগারের ক্ষমতা। গোল চাকতির জগৎ, সিলভার লাইনিং। বাকি সব ফালতু। নাকে কাঁদ ব জায়গা এটা নয়। যার মুরোদ নেই সে মুরুব্বি ধরে ভগবানকে। তিনি দুঃখ ছাড়া কাবওকে কখনও কিছু দেননি। কাবণ তিনি আকাশ, তিনি বাতাস, তিনি অনন্ত, পদ-হস্ত বর্জিত জগন্নাথ। মহিমা ছাড়া তাঁব কিছুই নেই। যাঁরা ভগবানেব মহিমা শোনান, তাঁদের পথ্য হল সন্দেশ-ক্ষীর-ছানা মালপো-মালাই, আর যাঁবা শোনেন তাঁদের ছাতু। যখন দাঁত যাবে, তখন তাঁকে ধোরো। সহ্যশক্তি বাড়বে। যদ্দিন দাঁত আছে কড়র মড়র চিবিযে খাও। বৃদ্ধের ভগবান, যৌবনের শয়তান। শুধু দেখবে যা করছ, তাতে তোমার লাভ হচ্ছে কি না! দুটো শব্দ, লাভ আর লোকসান। লাভের দিকে থাকার চেষ্টা করবে। Love-এ যদি লাভ হয় তা হলে অলরাইট। পেঁয়াজ ছাড়ানো প্রেম কোরো না, খোসা ছাড়িয়েই গেলে, শেষে ফক্কা।

ভানু বোস ভোলাতে চাইলে কী হবে, মেয়েটা দাগা মেরে গেছে। পৃথিবীর ভেতর আর একটা পৃথিবী আছে আমরা ধরেও ধরতে পারি না। নদীর গান, ঝরনার নাচ, চাঁদের আলোর রেশমি শাল, সবুজে সোনা রোদ্দুরের অভ্র চূর্ণ, ফরসা কপালে লাল টিপ, গোল হাতে সোনার কাকন, নীল আকাশের কোলে সমুদ্রের ঢেউ— বালকের লাফালাফি, এসব কী একেবারেই অর্থহীন। এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে ফুলের মাথায়। যখন রবীন্দ্রনাথের ওই গান কানে আসে মনটা কেমন হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় একটা কোলা ব্যাং—

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলো—
কোথা সে পথের শেষ কোন সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে।

পেয়ারা গাছের ডাল থেকে নেমে এলুম। নীল ফ্রক পরা সেই মেয়েটি চলেছে। টিফিন ক্যারিয়ার এক হাতে দুলছে। মাধাই পেছন থেকে এসে কাঁধে আলতো হাত রেখে বললে— 'ওস্তাদ! একদম কুনজর দেবে না. বস জানতে পারলে ওপর নীচ দু'পাটিই খুলে নেবে।' সে তো জানি. তবু প্রাণ করে আনচান। আমার নাম তারক সরকার, লোকে আমাকে গুছাইত বলে। মনে ধরলে সহজে আমি ছাড়ি না। শেষ পর্যন্ত আমি খাবই। চিত্রগুপ্তদার খেঁকুরে চেহারার কারণ দিশি মাল। আমার মতোই কেস। সঙ্গদোষ, শাসনের অভাব। গামছা মুড়ে লুকিয়ে দাদাকে রোজ একটা করে বোতল সাপ্লাই করতে লাগলুম। মহা খুশি। তোমার মতো ছেলে হয় না গো। দাদা গলছেন। মালের সঙ্গে টাল দিয়ে দাদাকে একেবারে টাল খাইয়ে দিলুম। দাদার বাড়িতে যাওয়ার পথ খুলে গেল। বউদি একেবারে মাটির মানুষ। মুখ দেখে মন পড়ার ক্ষমতা নেই। আমি আবার গিরগিটির মতো রং পালটাতে পারি। মুখ নির্বোধের মতো, চোখ ফ্যালফ্যালে। মেয়েরা এইরকম শিশু শিশু ভাব ভীষণ পছন্দ করে। মেয়েটির নাম অনুরাধা। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। ব্যাপারটা যখন বেশ এগিয়েছে, যখন ভাবছি একদিন দু'জনে কেটে পড়ব সুদূর কোনও নদীর ধারে। স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর বাঁধব ভালবেসে। প্রেমের মঞ্জিল। কিশোরীদা ঠেসে একটা চড় কষিয়ে বললে. 'শালা! যেখানে সেখানে হাত! তাজমহলে আলকাতরা মাখাতে গেছ। ওর জন্যে আমার ছেলে ঠিক করা আছে। ওখানে ওস্তাদি করতে যেয়ো না। মেরে লাশ করে দোব।' কিশোরীদার সাক্ষীর জোরে হাজতবাস থেকে বেঁচেছি। গাড়ির কাজকর্ম ভালই শিখছি। কিশোরীদা বললে, 'মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা কর। পেটিকোটম্যান হোসনি। শুদ্ধ প্রেম তোর ধাতে সইবে না। তোর ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে গেছে। হাঁড়ি থেকে কলসি হয় না, আবার মাটিতে ফিরে যেতে হয়।'

অনেক ভেবেছি। নর্দমা থেকে উঠে ধবধবে সাদা চাদর পাতা বিছানায় যাওয়া যায় না। সরলামাসির সঙ্গে আমার মেলামেশাটা যে নির্দোষ নয় তা অনেকেই বলতে শুরু করেছে। মুখরোচক মুচমুচে কাহিনি ঘরে ঘরে ঘুরছে। পাড়া থেকে তুলে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। পারছে না কিশোরীদার দাপটে। তারক সরকার খারাপ বদ লোচ্চা একেবারে ছাপ মারা হয়ে গেছে। ক্ষমতা নেই বেরিয়ে আসার। যেমন একজন বারবণিতা সুস্থজীবনে ফিরতে পারে না। কিশোরীদা বললে, 'তোর সামনে দুটো পথ। হয় বিশাল বড়লোক হয়ে যাওয়া, নয় আমার ডেরায় থেকে মন-প্রাণ লড়িয়ে কাজে ডুবে যাওয়া। তৃতীয় পথও আছে. নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করা।' তিন কাঠা জমির ওপর একতলা বাড়ি। তারক সরকার সহজে যেতে পারে কোথাও! সরলা মাসির সম্পত্তিও হয়তো বরাতে নাচছে। এত সেবা করলুম তার পুরস্কার কি পাব না! মহিলার তো কেউ কোথাও নেই আমি ছাড়া।

গাড়ির ইঞ্জিনের প্রেমে পড়ে গেলুম। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকছি। চালানোটাও শিখে গেছি। এইবার লাইসেন্সটা হলেই হয়। তখন আমি একাই দেশ-দেশান্তরে ঘুরব। গাড়ির অভাব নেই গ্যারাজে। মেরামতের সময় ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে কিশোরীদা বলে— 'জগা, শব্দ শুনে বল, ট্রাবলটা কোথায়! গাড়ির লাইনে কান একটা মস্ত জিনিস। আগে কানে শুনবি, তারপর চোখে দেখবি। ডাক্তার স্টেথিসকোপ দিয়ে আগে বুক পরীক্ষা করে। হৃদয়ের শব্দ শোনে। ফুসফুসে শোনা বাতাসের বাঁশি। জিজ্ঞেস করে, খিদে কেমন? ইঞ্জিন তুমি তেল কি বেশি টানছ? তা হলে তোমার শরীরের টিউনিং ঠিক নেই বাছা। ইঞ্জিন চালিয়ে শব্দ শোন।'

সামনেই একটা গাড়ি ছিল। কিশোরীদা লাফিয়ে উঠে স্টার্ট দিলে। একবার সামনে এগোল, একবার পেছনে। এক জায়গায় দাঁড়াল। ইঞ্জিন বন্ধ করল না— 'জগা, এদিকে আয়, শব্দ শুনে বল?'

কিশোরীদা আমাকে শিখিয়েছিল, গাড়ি চলছে না কিন্তু ইঞ্জিন চলছে, তখন যদি শব্দ শুনিস, বুঝবি গড়বড়িটা ইঞ্জিনে। হয় কোনও বেল্টে, না হয় এগজস্টে।

'কিশোরীদা, গোলমালটা এগজস্টে।'

'শালা! বলেছিস ঠিক। অল্প দিনেই পেকে গেলি। এলেম আছে। আয় উঠে আয়, একটা রাউন্ড মেরে আসি।'

কিশোরীদা বাঘের বাচ্চার মতো গাড়ি চালায়। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে। স্টাইলে ঘোরায়। যেন বাজনা বাজাচ্ছে।

'আর একটা শব্দ পাচ্ছিস?'

'পাচ্ছি। পিং।'

'শালা! গুরু মারা চেলা। তোর অনারে আজ দু'পেগ বেশি খাব। পিং কেন হয়!'

'ইগনিসান টাইমিং অ্যাডভান্স কন্ট্রোলে গোলমাল আছে। ইজিআর ভালভে কোনও গন্ডগোল থাকতে পারে।'

'সাবাশ! চল আজ তোকে পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াব। আজ তোর ডে অফ ডেকরেশান। কেউ কিছু শিখলে কী যে আনন্দ হয়! জেনে রাখ জগা— পৃথিবীর একটা সত্যই সত্য, সেটা হল শিক্ষা। একটা সম্পর্কই সম্পর্ক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক।'

আরও কিছুটা ঘোরার পর কিশোরীদা বললে, 'চল, আমার সেই প্রেমিকার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। অনেকদিন যোগাযোগ করিনি, হয়তো অভিমান করেছে। ভাল প্যাস্ট্রি কিছু কিনে নিয়ে যাই, একটা মদ আর ফুল। ওমর খৈয়ামের মতো। কবির মতো, কবিতার মতো।'

'বিয়েটা করবে কবে?'

'শীতটা আর একটু জমুক। তারপর বিয়েটা জমাব।'

'তুমি কি বিয়ের কথা বলেছ!'

'আমি তোমাকে বিয়ে করব, এইভাবে কেউ বলে নাকি? বলতে হয় তোমার জীবনের দায়িত্ব আমি নিলুম। তোমার পাশে আমি আছি। কায়দা করে বলতে হয়। সেইভাবে বলে এসেছি।'

ফুল ফল বোতল কেক সব নিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল সেই অভিনেত্রীর বাড়ির সামনে। কিশোরীদার চোখ-মুখ একটু লালচে দেখাচ্ছে। আর তো পাওনাদার নয়, আজ সে প্রেমিক। আমার হাতে বাস্কেট। বাস্কেটে সাজানো সব জিনিস। ফুল লটর পটর। কিশোরীদা কলিংবেল টিপছে। তিন-চারবারের পর এক বৃদ্ধা দরজা খুললেন — 'কী চাই?'

'মাধুরীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মাধুরী বোম্বাই চলে গেছে।'

'বোম্বাই গেছে কেন?'

'ছবির কাজে।'

'ছবির কাজে। ছবি করবেন না বলেছিলেন।'

'আপনি কে? ডিরেক্টার?'

'আমি গাড়ির মিস্ত্রি।'

'সে গাড়ি তো বিক্রি করে দিয়েছে।'

'আপনি কে?'

'আমি তার শাশুড়ি।'

কিশোরীদা আমার দিকে ফিরে বলল, 'অ্যাবাউট টার্ন। কুইক মার্চ।'

অনেকটা পথ কোনও কথা না বলে কিশোরীদা গাড়ি চালিয়ে এল। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। গুম মেরে আছে। হঠাৎ নিজেই বললে 'জানিস যারা অভিনয় করে তারা

পরদার বাইরেও অভিনয় করে। তাদের জীবনটাই অভিনয়ের। একে কী বলে জানিস— গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া। হাই সোসাইটির মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করবি না।'

'বুঝেছি।'

'বিয়ে করলে সব সময় সাধারণ ঘর থেকে মেয়ে আনবি। তারা কোনওদিন তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ছত্রিশবার স্বামী পালটাবে না। সবচেয়ে ভাল বিয়ে না করা।'

'বুঝেছি।'

'সে তো আমিও বুঝেছিলুম। বুঝেও ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। মোহিনী মায়া। মহিষাসুর মা দুর্গাকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো মা, এই নাও আমার বুক। আমি নিহত হতে চাই। তা না হলে এখুনি আমি বলব এসো আমার বিছানায়। আমরা সব অসুরের জাত। যতক্ষণ না মরছি ততক্ষণ নারীর মোহ ঘুচবে না। বলব এক, করব আর এক।'

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ওল্ড এজ হোমের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটা বাড়ি। রাস্তা থেকেই দোতলার বারান্দা দেখা যাচ্ছে। দু'-তিনটে খালি ইজিচেয়ার পাতা। এক বৃদ্ধ সামনে কুঁজো হয়ে পায়চারি করছেন। ঢোলা প্যান্ট, ডোরাকাটা জামা গায়ে।

'এখানে কী করবে?'

'ফুল কেক আর বোতলটা উপহার দিয়ে যাই। কত খুশি হবে। মাঝে মাঝে আমি উপহার দিয়ে যাই। একদল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবনের সব কাজ শেষ করে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। নে সব নামা।'

কিশোরীদা আগে আগে, আমি পেছনে মালপত্র নিয়ে। পরিষ্কার উঠন পেরিয়ে অফিস ঘর। সেখানে একজন মিষ্টি চেহারার নান টেবিলে বসে আছেন। সন্ন্যাসিনী কিশোরীদাকে চেনেন। ভাঙা বাংলায় বললেন, 'গ্রেটম্যান, আজ পিটারের জন্মদিন। তোমার উপহার পেয়ে সে খুব খুশি হবে। তাকে ডেকে পাঠাই।' পিটার এলেন, চোখে পুরু লেনসের চশমা। একসময় খুব শক্ত সমর্থ চেহারা ছিল। শরীরের ফ্রেম দেখলেই বোঝা যায়।

'আই ওয়াজ ইন দ্য আর্মি জেন্টলম্যান, নাও আই অ্যাম অ্যান ওল্ড রেক।'

উপহার পেয়ে বৃদ্ধ খুব খুশি। কিশোরীদা ডোনেশান দিলেন কিছু। সন্ন্যাসিনী একটা লাল গোলাপ দিলেন কিশোরীদার হাতে। আমরা বেরিয়ে এলুম। আবার গাড়ি চলল। কিশোরীদা এইবার গান ধরেছেন— এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি, সব সত্যি।

'একটা কথা জেনে রাখ জগা, ভাল কাজে মনটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। চেষ্টা করবি কিছু কিছু ভাল কাজ করার। মনে কর ভাল কাজ করাটাই মানবধর্ম।'

আমি তারক সরকার লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমার জীবনের সবটা না জেনেই বলে। কোনও ভাল কাজ করিনি, তা কি হতে পারে! সরলামাসি একদিন সকালে আবিষ্কার করলেন, চলতে গিয়ে পা এলোমেলো পড়ছে। যেদিকে ফেলতে চাইছেন, পড়ছে তার বিপরীত দিকে। দৃষ্টি ঝাপসা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। শুয়ে-বসে শান্তি নেই। নায়িকার মতো যার শরীর তার এ কী দুর্দশা। ডাক্তারবাবু এলেন, দেখলেন। বাইরে এসে আমাকে চাপা গলায় বললেন, 'খুবই দুঃখের কথা, মনে হচ্ছে ব্রেন টিউমার। মাথাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করাও।'

আমি পালিয়ে যেতে পারতুম, অস্বীকার করতে পারতুম আমার দায়িত্ব। যা ফুর্তি তা তো লোটা হয়েই গেছে। টাকা পয়সা যা বাগাবার বাগিয়ে নিয়েছি। এইবার নিজে নিজে মরুক না। পাপী তো। পাপীরা তো কষ্ট পেয়েই মরবে। সেইরকমই তো বিধান ঈশ্বরের। আমি তা পারিনি। সরলাকে আমি ভালবেসে ছিলুম। বয়সের বিরাট তফাত সত্ত্বেও। মানুষ যা বলে বলুক। মনের বয়স নেই। আমাদের হাতে যা ছিল সেইটাই আমরা নাড়াচাড়া করেছি, ভোগ করেছি। ভোগের আর দুর্ভোগের, দুটোরই কোনও বয়েস নেই।

আমার কিশোরীদা অগতির গতি। সরলামাসিকে নিয়ে স্পেশ্যালিস্টের কাছে। দেখে পরীক্ষা

করে বললেন, ব্রেন টিউমার। অপারেশন খুব কঠিন কাজ। বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত। সরলামাসি বললে, 'আমাকে মরতে দাও। আর কদিন। একটা কাজ তোমার কিশোরীদাকে দিয়ে করিয়ে নাও। একজন উকিল, আমার যা আছে সব তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ। আমার আর দেওয়ার কিছু নেই।'

গুছিয়ে নিতে পারি বলেই আমার নাম গুছাইত। তবু এই পাওয়াটা আমার কাছে স্মৃতি আগলানোর মতো। যে ঘরে, যে বিছানায় আমাদের রাত কাটত, সেই বিছানায় দীর্ঘ রেখার মতো পড়ে আছে সরলামাসি। আলো সহ্য করতে পারছে না বলে জানলায় ভারী পরদা। চোখ দুটো ক্রমশই ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক ধরনের দুষ্টু দুষ্টু চোখ ছিল সরলামাসির। রাতের দিকে জ্বলজ্বল করত। সেই চোখ আগুনের ঢেলার মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অসহ্য যন্ত্রণার বিন্দু বিন্দু ঘাম অনবরতই ফুটছে কপালে। নরম ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দিই। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে তখন আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে সহ্য করার চেষ্টা করে। শরীরের সবই ঠিক আছে, কেবল চুলে ভরা মাথাটার মধ্যেই অদৃশ্য এক গোলোযোগ। এর কোনও ওষুধ নেই। একটাই ওষুধ— সহ্য করা। বেডপ্যান আমি নিজেই লাগাই। নিজেই পরিষ্কার করি। রাত যখন গভীর হয়ে কালো থকথকে হয়ে যায়, মানুষ যখন ঘুমের অতলে অচৈতন্য, আমি শুনি হাপরের মতো নিশ্বাসের শব্দ। ভোগ ভাগ করা যায়, দুর্ভোগ একা একা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। পূর্বজন্ম বলে যদি কিছু থাকে তা হলে সরলামাসি নিশ্চয় আমার কেউ ছিল। সেই রাত আর এই রাত। সে রাতে এক কিশোর এই শরীরের দিকে তাকিয়েছিল তার নতুন জেগে ওঠা কৌতূহলের দৃষ্টিতে। তার ভেতরে তখন এক পুরুষের ঘুম ভাঙছিল। এই রাতে এক যুবক অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজনের দিকে, যে ছিল তার প্রেমিকা। আদালতে এক বাঘা ব্যারিস্টারকে যে ঘায়েল করে দিয়েছিল নিজের বুদ্ধিতে, তীক্ষ্ণতায়, তেজে। ভালবাসার মতো অজস্র উপাদান ছিল এই শরীরে। বেঁচে থাকার গরমমশলা। যাও, তুমি যাও, তোমার যন্ত্রণাটা আমাকে দিয়ে যাও।

শেষটা এল শেষ রাতে। রাত যখন দিনে গিয়ে মিশছে। পৃথিবী যখন জাগছে, তখন একজন ঘুমিয়ে পড়ল। যে ঘুম কখনও ভাঙে না। কিছু একটা বলার ছিল, বলা হল না। একটা হাত ধরার ছিল ধরা গেল না। মৃত্যুর পরই রূপ যেন আরও খুলে গেল। রংটা কালচে হয়ে গিয়েছিল, সেটা আরও ফুটে উঠল। যন্ত্রণার অবসানে মুখ প্রশান্ত। সবচেয়ে প্রিয় সিল্কের শাড়িটা পরিয়ে দিলুম। বেশ করে সাজালুম, যেন পুতুল সাজাচ্ছি। একবার মনে হল, সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দিই। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিশোরীদা বললে, চল, আমরা চারজনে নিয়ে যাই। আর কেউ কাঁধ দেবে না। জগাই মাধাই, নিতাই, কিশোরী, সঙ্গে চলেছে আমাদের পাড়ার ভানুপাগল— সে গাইছে ভবাপাগলার গান, বারে বারে আর আসা হবে না। পথের একপাশ দিয়ে কারওকে বিরক্ত না করে চলে গেলেন সরলামাসি। একটা মানুষ অনেক মানুষের মধ্যে বাঁচে না। একজন-দুজনের মধ্যে বেঁচে থাকে। পুড়ে গেল দেহ। পাগলের সেই গান আজও আমার মনে আছে:

বারে বারে আর আসা হবে না,
মানুষ জনম তো আর পাবে না।
ভেবেছ মনে, এই ভুবনে,
তুমি যাহা করে গেলে কেউ জানে না ॥
তুমি যাহা করে গেলে, আসিয়া হেথায়,
চিত্রগুপ্ত লিখে ভরিল খাতায় ॥
বিচার করিবেন ওই বিধাতা,
ফাঁকি ঝুঁকি তাঁর কাছে কিছু চলে না ॥

আমার গুরু ভানু বোস বলেছিল. সব সময় হিসেব করবে, যদি লাভ হয় তা হলে ঠিক করেছ। যদি লোকসান হয় তা হলে ভুল করেছ। দুটো কাজে আমি সেই হিসেবে ঠিকই করেছি. এক নম্বর, পিতা বিশ্বনাথ সরকারকে ঝুলিয়ে দেওয়া, দুই সরলামাসির খেলায় খেলুড়ে হওয়া। একেবারে নিট লাভ। পাড়ার লোকের টনক নড়ে গেল। একটা ছেলে, বদ শয়তান ছেলে, দু'-দুটো সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। আমার জাতভায়েরা একটা জিনিস খুব বোঝে, সেটা হল সম্পত্তি।

কিশোরীদা বললে, 'স্ত্রী আর সম্পত্তি এ দুটো জিনিস থাকা ভাল তবে আয় দেয় না, সার্ভিস দেয়। মটোর গাড়ির মতো। গাড়ি বাড়ি স্ত্রী। রোজগারের, ক্যাশ রোজগারের ধান্দাটা রেখে যেয়ো। সেটা আসবে তোমার গতর থেকে। তোমার বুদ্ধি থেকে। ওড়ালে বিষয়সম্পত্তি তিন রাত্তিরে উড়ে যাবে। খুব সাবধান।'

সাবধান তো বটেই। উড়তে চাইলে পরের ডানায় উড়ব। নিজের ডানা ব্যাঙ্কে থাকবে।

মাঝে মাঝে মনে হত আমি এক যক্ষ। যকের মতো আগলে বসে আছি দুই মৃতের সম্পত্তি। সরলামাসির আলমারি খুললেই বেরিয়ে পড়ে বিয়ের বেনারসি। রেশমি সায়া। গোল ডাব্বায় সাজিয়ে রাখা গয়না। পৃথিবী যখন ঘুমোয়, আমি খাটের কিনারায় শাড়ি সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার সব সাজিয়ে ঝুলিয়ে, কল্পনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি সরলাকে। যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক প্রেমিক-প্রেমিকার ছিল না। ছিল. প্রভু-ভৃত্যের। দেহদাস। তার মধ্যে শাসন ছিল, আদর ছিল, স্নেহ ছিল। কিশোরীদার হাতে গাড়ির ইঞ্জিনের মতো. সরলার হাতে আমি। সারারাত বসে বসে মালকিনের কথা ভাবতুম। প্রভু মরে গেলে কুকুরের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা সেইরকম হয়ে গেল।

কিশোরীদা বললে, 'তোর ঝামেলাটা আমি বুঝেছি। রাতটা খুব একা লাগছে। তাই না! তোর এই সময় একটা বিয়ে দরকার। চিত্রগুপ্তের মেয়েটাকে পেলে মন্দ হত না। বড় কচি। সৎ. নিরীহ, পবিত্র। তোর হাতে দেওয়া মানে বেড়ালের হাতে পায়রা দেওয়া। তোর জন্যে চাই পাকা দজ্জাল মেয়েমানুষ।'

'ভুল করছ। বাঘিনির দুধ আমি খেয়েছি, পদসেবা করেছি। মেয়েরাই আমার নিয়তি। উলটোটাই হবে। আমিই হয়ে যাব পায়রা। সংসার আমি করব না। সংসার আমার করা হয়ে গেছে। বরং সন্ন্যাসের কথা বলো।'

অন্য কেউ হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত। আরে বে, তুই হবি সন্ন্যাসী। বারো বছর বয়স থেকেই যে পেকে ঝিবকুট! কিশোরীদা বললে. 'হতে পারে। এখন তুই সন্ন্যাসী হতে পারিস। জীবনের গর্ভকোষ দেখা হয়ে গেলে ত্যাগ আসে. বৈরাগ্য আসে। পুরীর মন্দিরের বাইরে, কোনারকে মৈথুন দৃশ্য। নরনারীর হরেক কামকলার মূর্তি। এসব পেরিয়েই ধর্মজীবনের শুরু। যত রকমের ভোগের পরেই সব ত্যাগ— পা নেই, মানে চঞ্চলতা নেই, নেই বৃথা ভ্রমণ, স্থির সুস্থির। হাত নেই, মানে ভোগাদি কর্ম নেই, প্রভুর হাতই তোমার হাত। বিশাল দুটি চোখ— আত্মপুরুষকে দর্শন— জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে। চেষ্টা করে দেখ যদি জীবনের অন্য কোনও মানে খুঁজে পাস। এই পেঁয়াজ-রসুন মার্কা জীবনের কোনও মানে নেই রে, দিন আসে দিন চলে যায়।'

হঠাৎ একটা ঝোঁক চাপল, যেভাবেই হোক লেখাপড়াটা করতে হবে। দু'-একটা ছাপ না থাকলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। মানুষের সামনে বড় অপ্রস্তুত হতে হয়। আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। মুখ চোখের চেহারা পালটেছে। চোখের কোণে কালি নেই। সবল সুস্থ একজন মানুষের মুখ। তা হলে তো রবিবাবুর কাছে একবার যাওয়া যায়। কতদিন হয়ে গেল। রাগে অভিমানে যাইনি। আমাকে ভালবাসতেন। ভালবাসাটাই ঘৃণা হয়েছিল। অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। বিকেলের দিকে গেলুম একদিন। পুজো এসে গেল। বাতাসে ঠান্ডা ধরেছে। আকাশে ছেলেবেলার মেঘ. যে-মেঘে হাতি দেখতুম ঘোড়া দেখতুম উট দেখতুম। যে-মেঘকে মনে হত বিদেশের চিঠি। পূর্ণিমার চাঁদ ঠেলা

মারছে পুব আকাশের তলা থেকে। আমার হাতে মিষ্টির বাক্স। যে সময় চলে গেছে সেই সময়ের জন্যে দুঃখ হচ্ছে। নিজের হাত নিজে ধরলে মানুষের ক্ষতিই হয়। যেমন আমার হয়েছে। আমার বয়েস বেড়েছে, মন বাড়েনি। আমার বুদ্ধি আছে শিক্ষা নেই। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বাগানটা আর আগের মতো নেই। এলোমেলো হয়ে গেছে। আগাছা এসে গেছে। বুকটা ছাঁত করে উঠল। মাস্টারমশাই যে-রুচির মানুষ, তাতে তো এইরকম হওয়া উচিত নয়। নিশ্চয় কোনও গোলমাল। দরজার কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। এই সেই অঞ্জনা। কত বড় হয়ে গেছে। একদম একটা মেয়ে। চোখ দুটো বাদামের ফালির মতো ধারালো।

'মাস্টারমশাই আছেন?'

'কে আপনি?'

'আমার নাম তারক সরকার। আমি ওঁর ছাত্র ছিলুম। ছেলেবেলায় আপনি দেখেছেন আমাকে।'

'বাবা তো খুব অসুস্থ। প্যারালিসিসে পড়ে আছেন।'

'কতদিন?'

'প্রায় একবছর।'

'মা আছেন?'

'মা তো মারা গেছেন দু'বছর হয়ে গেল।'

'আমি স্যারকে একবার চোখের দেখা দেখতে পারি!'

'আসুন।'

ভেতরটা মোটামুটি আগের মতোই আছে। জেল্লা একটু কম। শোবার ঘরে খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছেন রবিবাবু। নাকে একটা নল পরানো। আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন। সেই ধারালো নাক-মুখ। মাথা ভরতি ফুরফুরে সাদা চুল। আরও ফরসা লাগছে। ধীরে পাখা চলছে ঘরে। হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। মিষ্টির বাক্সটা আগেই রেখে দিয়েছি ডান দিকের টেবিলে।

'আপনার নাম ছিল অঞ্জনা।'

'এখনও তাই আছে।'

'আপনি সেদিন টিউবওয়েল পাম্প করছিলেন, আমি জল খাচ্ছিলুম। আপনিও ছোট আমিও ছোট, আপনার চেয়ে একটু বড়। স্যার আমাকে স্কুলে ফ্রি করে দিয়েছিলেন। অমনোযোগী ছিলুম বলে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেদিন আমার ব্যবহারে তাঁকে একটু অপমান করে ফেলেছিলুম। আজ ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম। এসে কী দেখছি।'

চোখে জল এল। সত্যি জল অভিনয় নয়। তারক সরকার কাজ আদায়ের জন্যে যে-কোনও সময় চোখে জল আনতে পারে। কায়দাটা এসে গেছে। বুকের কাছটা ভেতর থেকে একটু মালিশ করে দিই। ঘরের মেঝেতে মা পড়ে আছেন দৃশ্যটা ভেবে নিই। বাস, চোখে জল। এ জল সে জল নয়। আসল জল।

'সে তা হলে অনেক আগের কথা!

'অনেক, অনেক, তখন আমি কাঠ কুড়িয়ে সংসার চালাতুম।'

'বাবা রিটায়ার করলেন, মা মারা গেলেন, বাবা সেই আঘাত সহ্য করতে পারলেন না।'

'আপনি একা সামলাচ্ছেন কী করে?'

'এম এ-টা করেছিলুম। সকালের স্কুলে মাস্টারি করি। সেই সময়টুকুর জন্যে বাবাকে দেখাশোনার একজন নার্স রেখেছি। এইভাবেই চলছে। আপনি কী করছেন?'

'আমার লেখাপড়া হয়নি। মটোর মিস্ত্রি। একটা গ্যারেজে কাজ করি। আজ আমি এসেছিলুম মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ে প্রাইভেটে পরীক্ষা দোব বলে। আপনি আমাকে পড়াবেন? আমি মাইনে দোব, যা চাইবেন।'

'একটা মেয়ের কাছে একটা ছেলে পড়বে?'

'আমার চরিত্র ভাল, স্যার আমাকে ভালবাসতেন। মাঝে চরিত্র একটু খারাপ হয়েছিল এখন খুব ভাল হয়ে গেছে। কিশোরীদা, মানে আমার গ্যারেজের মালিক আমাকে ভাল করে দিয়েছেন।'

'আমি তাঁকে চিনি। আগে বাবার কাছে আসতেন। আপনার প্রস্তাব আমাকে ভেবে দেখতে হবে। কয়েকটা দিন সময় চাইছি।'

'সেদিন আমাকে জল খাইয়েছিলেন। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। আজ আমার মনের খিদে।'

'আমি ভেবে দেখি। সাতদিন পরে আসুন।'

এই একটা কাজ তুমি খুব ভাল করেছিলে তারক সরকার। ইট পেতে খাড্ডা থেকে গাড়ির চাকা তোলা। অনেকটা সেইরকম। জানি মেয়েদের প্রতি তোমার খুব আকর্ষণ। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সিরাজউদ্দৌলার ডায়ালগের মতো— আলেয়া! জীবনে আমি নারী চেয়েছি, নারী পেয়েছি। নারীকে গুরু করে শক্তিরূপিণী নারীকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে। নারী ভোগের সামগ্রী নয়। জগদ্ধাত্রী। তুমি গুছাইত হতে পারো, সেটা তোমার বৈষয়িক দিক। আধ্যাত্মিক দিকে তুমি শক্তির উপাসক। শক্তিকে তুমি প্রেমিকা ভাবতে পারো, প্রভু ভাবতে পারো, মাতা ভাবতে পারো। তিনটেকে তুমি এক করে ফেলতে পারো। প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সখা আমার।

সেই প্রাচীন কালীবাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। সবাই বলাবলি করছে অসীম তাঁর শক্তি। যাকে স্পর্শ করছেন তার চৈতন্য হচ্ছে। চৈতন্য জিনিসটা কী আমার জানা নেই। একজন বললে, চৈতন্য হলে মানুষ সবেতেই ঈশ্বর দর্শন করে। ঘটি ঈশ্বর, বাটি ঈশ্বর, চটি ঈশ্বর, সব ঈশ্বর। আমাদের গ্যারেজের মাধাইকে স্পর্শ করেছিলেন, সে রামধোলাই খেয়ে গ্যারেজে ফিরে এল। কিশোরীদা তাঁর আধসেরি মগে চা খাচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন,

'কেসটা কী! তোর জিয়োগ্রাফি তো পালটে দিয়েছে রে। একটা চোখ তো দেখাই যাচ্ছে না।'

'সামনের দুটো দাঁত ঢকঢক করছে।'

'কী, সমাধি অবস্থায় বকুলবাগানের খানায় পড়ে গিয়েছিলিস।'

'সন্ন্যাসী সেতার বাজিয়ে ভজন করেন। আমি আমার ভাগ্য জানতে গিয়েছিলুম। মেলা ভিড়।'

'তোর ভাগ্য, তুই নিজে বুঝতে পারিস না!'

'ভাগ্য কি সহজে জানা যায়। মহাপুরুষদের কাছে জেনে নিতে হয়। তিনি সকলের মাথায় হাত রেখে বলছেন— চৈতন্য হোক। আর সকলেরই নেশার মতো হয়ে যাচ্ছে। বলছেন, দেখো সবাই ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চিল চিৎকার ছাড়ছে— প্রভু, প্রভু। আর বৃষ্টির মতো বাতাসা পড়ছে। হঠাৎ আমাকে কাছে ডেকে বললেন, গাড়ি কীসে চলে রে! আমি তো অবাক! কেমন করে জানলেন আমি গাড়ির কাজ করি। বললুম, ইঞ্জিনে চলে। তিনি আমার মাথায় ভারী একটা হাত রেখে বললেন, পাগল! শুধু ইঞ্জিনে গাড়ি চলবে? পেট্রোল চাই। পেট্রোল হল আত্মা। সেইরকম মানুষ। মানুষ চলে আত্মজ্ঞানে— তোর চৈতন্য হোক। যেন একটা শক খেলুম। ভেতরটা কেমন হয়ে গেল। পাশেই নাদুদার বোন ছিল— মা, বলে হনুমানের মতো জড়িয়ে ধরলুম, তারপর তোমার ধোলাই কাকে বলে। চৈতন্য ঠিকরে বেরিয়ে গেল।'

'তোর অনেকদিন ধুসঘুসে জ্বরের মতো ওই ইচ্ছেটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল কী বল?'

'সে তুমি যদি বলো, দাদা যখন বউদিকে আদর করে। দু'-একদিন দেখে তো ফেলেছি। সোজাসুজি তো দেখিনি লুকিয়ে দেখে ফেলেছি। শব্দটব্দ শুনেছি। বউদির আবার লজ্জা কম। খোলামেলা। চান করে, গা ধোয়। আমি কী করব বলো! আমার তো একটা ভেতর আছে!'

'এখন ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে আয় চৈতন্যের স্পটগুলো অচৈতন্য করে দিই। তারপর চল আজ রাত্তিরে তোকে সার্ভিসিং-এ নিয়ে যাব। তোর দরকার হয়েছে। তোর চৈতন্য নয়, তোর ডোবায় ব্যাং ডেকেছে। মত্ত দাদুর ডাকে, ডাকে ডাহুক-ডাহুকি।'

সেই সন্ন্যাসীর কাছে আমিও গেলুম। রাত সাতটা হবে। নাটমন্দিরে কালী কীর্তন হচ্ছে সন্ন্যাসীকে শোনাবার জন্যে। তিনি বসে আছেন মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে। অন্তরঙ্গ যাঁরা বসে আছেন গা ঘেঁষে। প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। জীবের দুঃখমোচনের ফর্মুলা বেরোচ্ছে। সংসারে থেকেও সংসার বন্ধন মোচনের উপায়। বিষয়-সম্পত্তি অর্থ থাকা সত্ত্বেও মনকে কীভাবে দীন-দুঃখীর মতো করে রাখা যায়। মনগরিবি। ওদিকে কীর্তনীয়ারা তারস্বরে চিৎকার করছেন— পাবি না, খ্যাপা মায়েরে খ্যাপার মতো না খেপিলে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধ আসছে নাকে। ভাবছি, উঁচু দরের ধর্ম কী অসাধারণ। সুন্দরী মেয়ে বড়লোক ভক্ত। গেরুয়া গদি। নাদুদার বোনকে দেখছি। সন্ন্যাসী চৈতন্য হোক বলার আগেই আমার একটু একটু চৈতন্য হওয়ার মতো হচ্ছে। মাধাইয়ের ভাগ্য যেন না হয়। ছাগলটার দড়ি ধরে বসে আছি। বেড়ার গাছ খাবার জন্যে ছটফট করছে। দীনদয়াল ঘোষাল বলছেন, 'প্রভু! আমার অভাব নেই, শান্তির বড় অভাব। ছেলের বিয়ে দিয়ে বিপাকে পড়ে গেছি। শ্বশুরবাড়ির ভেড়া হয়ে গেছে। বউয়ের কথায় ওঠবোস। আমার বউয়ের সঙ্গে ছেলের বউয়ের একেবারেই সদ্ভাব নেই। নিত্য অশান্তি, কাকচিল বসতে পায় না। নবগ্রহের স্তব পড়ে পড়ে মুখে ফেকো পড়ে গেল। পলা গোমেদ ধারণ করলুম। কিছুতেই কোনও সুরাহা নেই।'

'এটা কোন কাল স্মরণে আছে?'

'কলিকাল মহাত্মা, ঘোর কলি।'

'কী বলেছেন মহাত্মা তুলসীদাস। মনে আছে তোমার?'

'প্রভু! ওসব তো পড়া হয়নি আমার। কেমিস্ট্রি ফিজিক্স পড়েই আমার দিন গেছে।'

'শোনো, তোমরাও শোনো তুলসী কী বলছেন! গোউয়া দোকে কুত্তাপালে ওসকি বাছুর ভুখা— গোরুর দুধ চ্যাকচোক দুয়ে নিলে, বাঁটে এক ফোঁটাও রইল না, বাছুর মরছে খিদেতে। সেই দুধ খাচ্ছে বাবুর অ্যালসেশিয়ান। বাছুর মরে মরুক। আর কী? শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা। শালাকে খুব কালিয়া-পোলাও খাওয়াবে, আর পরমারাধ্য পিতৃদেবের বরাতে শুকনো রুটি জুটল কি না জুটল। আর কী! ঘরকা বহুরি প্রীত না পাওয়ে চিত চোবাওয়ে দাসী। মায়েরা যারা এখানে বসে আছ, কিছু মনে কোরো না বাপ— কথাটা হল এই — নিজের বউকে মনে ধরে না, পানসে, বাড়ির ঝাঁঝালো ঝি-মাগির সঙ্গে আড়ালে-আবডালে খুনসুটি। লুকিয়ে টাকা দিচ্ছে, এটা ওটা উপহার। বউ বাপের বাড়ি— একেবারে বিছানাতেই নিয়ে গিয়ে তুললে— চিত চোরাওয়ে দাসী। এদের গ্রাম্য ভাষায় বলে ঝিচো। তাই তুলসী বলছেন, ধন্য কলিযুগ তেরি তামাশা দুখ লাগে ঔর হাঁসি। হে কলিযুগ। তুমি ধন্য! তোমার তামাশা দেখে দুঃখ হয় হাসিও পায়।'

'প্রভু! কলির খেলা তো বুঝতেই পারছি, তবু লেখাপড়া জানা একটা ছেলে!'

'তোমার পিতা জীবিত আছেন?'

'গত বছর গত হয়েছেন।'

'তিনিও এই এক অভিযোগ নিয়ে গেছেন। তাঁর পিতাও। এইটাই কলির তামাশা। নারী কত শক্তি ধরে রে বাপ। এই যে সব মায়েরা বসে আছেন, এক একটি আদ্যাশক্তি, মহামায়া। পুরুষকে পশু করে দিতে পারে, আবার দেবতা। কেউ বিদ্যারূপিণী, কেউ অবিদ্যারূপিণী। বিদ্যারূপিণী শিবের সংসার করে। দোষ তো তোমাদের পুরুষদের, সব কামকীট। মায়েদের তো দোষ নেই। তোমরাই তাদের ভোগী স্বার্থপর করে তোলো, আদর্শ সংসারী হতে দাও না।'

'প্রভু! সবই তো হল, উদ্ধারের পথ!'

'আছে। যিনি অসুখ দেন, তিনিই ওষুধ দেন। সেই বিশ্বাসটা নিয়ে এসো তৈরি করো। ভক্তির ভিয়েন দিয়ে বিশ্বাসকে পাক করো। একটা গল্প শোনো, চৈতন্যোদয়ের গল্প। যাদের চেতনা হয়েছে তারা কী দেখে জানো, ঈশ্বরই সব করেছেন। এক জায়গায় একটা মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী করতে যায়। একটি সাধু একদিন ভিক্ষে করতে করতে দেখে যে, গ্রামের জমিদার একটা

লোককে বেধড়ক পেটাচ্ছে। সাধু বড় দয়ালু। সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এক পথচারী গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে শোয়াল। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস করছে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে। সাধু আস্তে আস্তে বলছে, ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। বুঝলে কিছু? সব তিনি। তিরস্কারও তাঁর, পুরস্কারও তাঁর। অশান্তি যিনি দিচ্ছেন, শান্তিও তিনি দিচ্ছেন। এইভাবে সংসারে চলে দেখো, কোনও দুঃখ থাকবে না। তোমরা বিষয়ের জন্যে পাগল, ভোগ সুখের জন্যে পাগল। জ্ঞানোন্মাদ হয়ে দেখো কী আনন্দ। একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন। কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না। লোকে বলত পাগল। একদিন লোকালয়ে এসে কিছু ভিক্ষে করে এসে একটা কুকুরের পিঠে বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন আর কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। মজা দেখার জন্যে একগাদা লোক জড়ো হয়ে গেল। উপহাস করছে, হাসছে। সাধু তখন বলছেন -- তোমরা হাসছ কেন? তারপর একটা শ্লোক বলছেন—

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

'এর নাম জ্ঞান। সব বিষ্ণু। বিষ্ণুর ওপর বিষ্ণু, বিষ্ণুই বিষ্ণুকে খাচ্ছেন। বিষ্ণুই হাসছে। গোটা জগৎ বিষ্ণুময়। তোমরা সবাই চেষ্টা করো সেই অবস্থায় পৌঁছোতে। দেখবে পৃথিবী কত আনন্দের।' এতক্ষণ আমি বেশ চুপচাপ ছিলুম। হঠাৎ মুখস্লিপ করে বেরিয়ে গেল।

'কী করে পৌঁছোব মহারাজ!'

'পৌঁছেই আছ, ঘুমোচ্ছে বলে জানতে পারছ না। জেগে ওঠো।'

'কী করে জাগব?'

'গুরু তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।'

বলতে চেয়েছিলুম-- আপনি আমার গুরু হবেন। পর মুহূর্তেই মনে হল, বড় গোলমেলে ব্যাপার। ধর্মের জগতে কথা ছাড়া কিছু নেই। অজস্র কথা। কুমিরে পা কেটে নিয়ে গেল, ভাবতে হবে বিষ্ণু বিষ্ণুর পা কেটে নিয়ে গেল। আমার ভাবনা অতদূর যাবে না।

'মহারাজ, মা বলে ডাকামাত্রই আমার মা সাড়া দিতেন, মা কালী কি সাড়া দেবেন?'

'ডাকার মতো ডাকতে পারলে নিশ্চয় সাড়া দেবেন। রামপ্রসাদকে দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। তোমাকেও দেবেন।'

'সেই ডাকার মতো ডাকাটা কেমন?'

'এ ছোকরার একটু এঁড়ে তর্কের স্বভাব। তিন টান এক করতে হবে। কীরকম--- সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে, বিষয়ীর বিষয়তে। যদি পারো তবেই তোমার ভগবানলাভ হবে।'

'মহারাজ পাপ কাকে বলে?'

'যে কাজে মনে চাপ সৃষ্টি হয়। চাপই পাপ। কর্মেরই পাপ পুণ্য। সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করে দিলে আর পাপ-পুণ্য থাকে না। তা হলে আবার একটা গল্প শোনো— ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন,

গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর! এখন কী হবে? ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা, তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সব খেলেন। গোপীরা বললে, ঠাকুর পারের কী হল? ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দু'ভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বলতে না বলতে জল দু'ধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক, ভাবতে লাগল— উনি এইমাত্র এত খেলেন, আবার বলছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি?' এই হল দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ. তিনি খেয়েছেন। এই বোধ এলে কর্ম থাকে কর্মফল থাকে না। এ বড় কঠিন অবস্থা। একমাত্র সাধকই পারেন সেই অবস্থায় পৌঁছোতে। দেহ শুদ্ধ হওয়া চাই, মন, বুদ্ধি, চিন্তা শুদ্ধ হওয়া চাই। শোনো বাবারা আমি জানি, যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিষয়ে মন, কামিনীকাঞ্চনে মন, সে লোককে আমি বলি ধিক; আর যার কামিনী কাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায় তাকে বলি ধন্য। এ কথা আমার নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের। অতএব ছোকরা নিজের ভেতরের দিকে তাকাও। বাইরে কিছু নেই বাবা। তিনি বসে আছেন তোমার ভেতরে। যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

কালী কীর্তনিয়ার দল গাইতে লাগলেন— পাবি না খেপা মায়েরে, খেপার মতো না খেপিলে। গরম গরম লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, মায়ের ভোগ নাকের পাশ দিয়ে গর্ভমন্দিরে ঢুকে গেল। ভিড় কমে আসছে। সাধুজি এইবার সাধনে বসছেন। উসখুস করছি আমি। কী যে চাই নিজেই জানি না। সাধুজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে তো করে, বড়বাবুর খাস দপ্তরে গিয়ে বসি। বাবাজি ছাড়পত্র একটাই শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ মন। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। এটা তোমার লাইন নয়। নিজেকে অন্য রসে মজিয়ে ফেলেছ বাছা। ফাঁসকলে পড়ে আছ।'

'বেরোতে চাই মহারাজ।'

'এবারে হবে না। ধান্দা করেই কাটবে।'

'কাদের হয় মহারাজ?'

'যাদের পূর্বজন্মের সংস্কার আছে।'

কিশোরীদা সব শুনে বললে, 'তোর যেমন কাণ্ড। ধর্মের লাইন শক্ত লাইন রে। অনেক বড় বড় কথা বলতে হয়। সংস্কৃত ছাড়তে হয়। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে হয়। চারপাশে গাদা গাদা মেয়ে থাকবে, কারও দিকে কুনজরে তাকানো চলবে না। মা জননী, এইসব বলতে হবে। ব্যাপারটায় খুব ভজঘট আছে। আমাদের লাইন, আমাদের লাইনেই থাক। মটোরে মোবিল আর গ্রিজ চালাও। সন্ধেবেলা বোতল খুলে বোসো, মাংসের মাজ্জা মারো, মেয়েদের প্রেমে বিশ্বাস কোরো না, দেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারিস।'

কিশোরীদা একসময় ওস্তাদের কাছে গান শিখত। বড়লোকের ছেলে তো। বিরাট স্কেলচেঞ্জ, কাপলার ফিটিং হারমোনিয়াম। মাদার অফ পার্লের রিড। এত ভারী একজনে তোলা যায় না। সেই মাধুরীদেবী ল্যাং মারার পর কিশোরীদা রাত দশটার সময় গানে বসছে। প্রথমেই গাইবে ভবাপাগলার গান। বলে, এইটাই আমার থিম সং—

গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।
লাগে না ফুল-চন্দন

মন্ত্রতন্ত্রও লাগে না।

এর পরেই চলবে ঠুংরি। বাংলা ঠুংরি— মিছে ভান করে কাঁদিনি সজনী, অভিমান ভরে কেঁদেছি। আমার ওপর গেলাসে মদ ঢালার ভার। খেতে খেতে, গাইতে গাইতে নেশা জাঁকাবে। কিশোরীদার মতো কড়া ধাতের মানুষও কেঁদে ফেলবে। দেয়ালে মায়ের অয়েল পেন্টিং। আমাকে

বলবে, চেয়ারে উঠে কাপড় ঝুলিয়ে মায়ের মুখটা ঢেকে দে। কিশোরী মাল খাচ্ছে। মায়ের মনে দুঃখু হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস না শালা। কিশোরীদা গাইয়ে হলেও নাম করতে পারত। টেবিলে পঞ্চাননের কাবাব-রুমালি রুটি। যেই বারোটা বাজবে, বলবে ভোগ নামা। তন্ত্রমতে সেবা হবে। একটার সময় কিশোরীদা বিছানায় চিত। হাত দুটো বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়া হয়ে আছে। অল্প অল্প নাক ডাকছে। মাথার কাছের দেয়ালে গাড়ির একটা হর্ন ঝুলছে। পরির মূর্তি লাগানো একটা টেবিল ল্যাম্প। একসময় আমিও শুয়ে পড়ব। হঠাৎ কোনওদিন বৃষ্টি আসবে জোরে। ভাঙা গাড়ি, নতুন গাড়ি সব ভিজতে থাকবে। ধাতুর চাদর থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো ঠিকরোবে। তখন মনে হবে, কী ভয়ংকর একা আমি। একজন মানুষকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। সংসার টংসার চুরমার করে জেলখানায় সারা জীবন। মানুষটা এতই নিরেট দুঃখ-টুঃখ কিছু আছে বলে মনে হয় না। চালাক মানুষ সংসার ভাসিয়ে ফুর্তি করে না। বিশ্বনাথ সরকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেট।

এইরকম এক রাতে ঘুম যখন আর কিছুতেই আসছে না, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বর্ষার বৃষ্টি পড়েই চলেছে ঝিরঝির করে, আলোর বিপরীতে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আলপিন ঝরছে। একটা নতুন গাড়ি এসেছে সার্ভিসিং-এ। পেল্লায় গাড়ি। বেগুনের মতো ঝকঝকে রং। তারই আড়ালে সাদা একটা মূর্তি টলছে। আসার চেষ্টা করছে সামনে, পারছে না। ভাল করে দেখে মনে হল আমাদের চিত্রগুপ্তদা। দরজা খুলে দৌড়োলুম। তলপেটের কাছের জামাটা রক্তে লাল। গাড়ির বনেটে লোকটা ঝুলে পড়ল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললে, 'কিশোরী!'

চিত্রগুপ্ত পড়ে রইলেন, দৌড়োলুম কিশোরীদার কাছে। ধাক্কা মেরে তুললুম। মাঝরাতে ভূতের মতো একটা মানুষ। অত রক্ত। কিশোরীদা এসে নাড়ি টিপে বললে, 'প্রাণ আছে এখনও, বের কর বড় গাড়িটা।' পেছনের সিটে শোয়ানো হল। পেটে ছুরি ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারণটা তখনও জানা যাচ্ছে না। পেটটাকে বেশ করে গামছা দিয়ে বাঁধা হয়েছে। মাঝরাতের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমি পেছনে বসে আছি চিত্রগুপ্তদার মাথা কোলে নিয়ে। রক্তেরও একটা গন্ধ আছে আঁশটে আঁশটে। কিশোরীদা বললে, 'পুলিশের পেট্রল-ভ্যান ধরতে পারে। আমি কোনও কথা বলব না, মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ। তুই বলবি, বাবার হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে যাচ্ছি।'

কিশোরীদা যা বলেছিল, তাই হল সার্কুলার রোডে। পুলিশ-ভ্যান গাড়ি থামাল, কী আছে!

কাঁদোকাঁদো গলায় বললুম, 'আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

টর্চ ফেলে ভেতরটা একবার দেখা হল। চিত্রগুপ্তদার মাথা আমার কোলে, গামছা দিয়ে পেটের কাছটা কষে বাঁধা। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ির কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। অফিসার বললেন, 'যাও, যাও, নিয়ে যাও দেখে তো মনে হচ্ছে, শেষ অবস্থা।'

ভাগ্য ভাল, গাড়িটা একজন ডাক্তারের। পেছনের কাচে ক্রস মারা।

মাঝরাতের ঝিম মারা হাসপাতাল। কিশোরীদা বললে, 'কোন শালা মারলে, এমন একটা নিরীহ মানুষকে। যে শালাই মারুক, এখন বাঁচলে হয়। সংসার তো পথে বসবে।'

আমাদের হাসপাতালকে জাগিয়ে তোলা এক কঠিন কাজ। কুম্ভকর্ণকে জাগানোর মতো। সুন্দর চেহারা খুব কাজ করে। কিশোরীদাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল আপেলের মতো সুন্দরী নার্সের। সমস্যার শেষ নেই। পুলিশ না পাঠালে হাসপাতাল কেস নেবে না। সেও এক হাতে পায়ে ধরা। এমার্জেন্সির টেবিলে তোলা হল। এইবার রক্ত। কিশোরীদার গ্রুপ মিলল না। মিলে গেল আমার। কে বলেছে, তারক গুছাইত কেবল নিতেই জানে। সেই রাতে পরিষ্কার এক বোতল রক্ত দিয়ে দিল। লাল, তাজা রক্ত। কিশোরীদাই যেন ডাক্তার। বললে, 'আপাতত মাল পেটে প্যাক করে সেলাই করে দিন।'

'সেলাই করলেই হয়ে যাবে, ভেতরে সাত জায়গায় পাংচার।'

কিশোরীদা বললে, 'চল, ডাক্তাররা যা পারেন করুন। আমাদের অন্য কাজ আছে।' হাসপাতাল

থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে বললে, 'ইনভেস্টিগেশান, আমাদেরই করতে হবে। কোন শালার হাতের কাজ!'

'কী করে করবে?'

'আমাদের কাছাকাছিই হয়েছে। জয়সওয়ালের মদের দোকানের কাছাকাছি। তা না হলে হেঁটে এল কী করে! আমার মনে হয়, কেসটা এতদূর গড়িয়েছে অনুরাধার জন্যে।'

'কেন? অনুরাধা এর মধ্যে আসে কী করে!'

'আসে কী করে বুঝিস না। বাংলাদেশে জন্মেছ বোঝো না, মেয়ে হল ভোগের বস্তু। অনুরাধাকে খাবলে খাবার জন্যে অনেকে তৈরি। বেশ কিছু মাস্তান পেছনে লেগেছিল। আমাদের প্রথম কাজ চিত্রগুপ্তর চশমাটা খুঁজে বের করা। চশমা ছাড়া লোকটা অন্ধ। চশমাটা পেলেই ঘটনাস্থল পাওয়া যাবে। ভোর হওয়ার আগেই স্পটটা বের করতে হবে। তা না হলে পুলিশ কিছুই করবে না। যে করেছে তাকে ধরতেই হবে।'

'আগে আমরা বাড়িতে যাব না! বউদি জেগে বসে আছে।'

'আগে চশমা। স্পটটা আমি দেখতে চাই। তারপর খবর, কান্না, শ্মশান, যা হয় হবে। পুলিশ কিছু না করলে বদলাটা আমাকেই নিতে হবে।'

জয়সওয়ালের মদের দোকানের কাছটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডানদিক দিয়ে ঘুরে গেলেই বেশ্যাপল্লি। উলটোদিকে একটা রিকশাস্ট্যান্ড। তার ওপারে রাস্তা খোঁড়া। জলের পাইপ বসছে। ঘোষ ডাক্তারের চেম্বার। একটা সোনাঝুরি গাছ। অনেক দূরে গাড়িটা রেখে, আমরা জয়সওয়ালের দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই। এমনকী একটা কুকুরও নেই। কিশোরীদা বললে, 'চিত্রগুপ্ত মাল খেয়ে বেরোল। একটা সিগারেট কি বিড়ি ধরিয়ে সে বাড়ি যাবে। তার মানে রাস্তা পার হয়ে, রিকশাস্ট্যান্ডের ধার দিয়ে, ঘোষ ডিসপেনসারির সামনে দিয়ে, সোনাঝুরির তলা দিয়ে নন্দলাল মুখার্জি রোডে ঢুকবে। ডানপাশে মোহিনীর তেলেভাজার দোকান। পেছন দিকে একটা খালি জমি। আচ্ছা চল, চিত্রগুপ্তের পথ ধরে চল। রাস্তার দিকে নজর রাখবি।'

'অন্ধকারে কী দেখবে?'

'টর্চ আছে আমার হাতে।'

বেশ গা ছমছম করছে। শেষ রাতের আকাশে ঢ্যালা ঢালা তারা। সোনাঝুরি গাছটাকে মনে হচ্ছে তুলি দিয়ে আঁকা। রিকশাস্ট্যান্ডটা পেরোতেই চোখে পড়ল একপাটি চটি। কিশোরীদা টর্চ জ্বেলে দেখে বললে, চিত্রগুপ্তর পায়ে চটি ছিল?'

'খেয়াল করিনি।'

'এগো।'

কিছু দূরেই সেই খোঁড়াখুঁড়ি। গভীর একটা গর্ত। মাটির ঢিপির পাশেই সেই চশমা। চোখ থেকে ছিটকে আড় হয়ে পড়ে আছে। কিশোরীদা চশমাটা তুলে নিল। কী খেয়াল হল, টর্চের আলোটা গর্তের মধ্যে ফেলল, এ কী। সাদা একটা মূর্তি গর্তের মধ্যে গোঁত খেয়ে পড়ে আছে। দু'ধাপ নেমে, আলো ফেলেই কিশোরীদা বললে, 'সর্বনাশ! এ তো আমাদের মাধাই!'

এরপর আমাদের পালাবার পালা। চশমা আর জুতোটা আমরা তুলে নিলুম। কোনও ভাবেই যেন পুলিশের হাতে না পড়ে। চিত্রগুপ্ত মেরেছে, না মাধাই আগে মেরেছে! কিশোরীদা বিড়বিড় করছে। গজটা পেটে কে পুরেছে! তৃতীয় আর একজন! মাধাই অবশ্য দুর্দান্ত ছেলে। অনুরাধার ওপর নজর ছিল। প্রেমট্রেম করছিল কিনা কে জানে! ইদানীং খুব মাঞ্জা চড়াচ্ছিল, হিন্দি গান গাইত গুনগুন করে। পেয়ার, মোহব্বতের গান।

চিত্রগুপ্তদার বাড়ি গিয়ে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। বউদি জেগে বসে আছে। অনুরাধা, মাধাই মানে আমাদের মহেন্দ্র বিশ্বাস আর চিত্রগুপ্তর আসল নাম অনাথবন্ধু চক্রবর্তী, তিনজনে

বেরিয়েছিলেন অনুরাধার চোখ দেখাতে ডাক্তারের কাছে। রাত ভোর হতে চলল, কেউ ফেরেনি। মহেন্দ্র অনাথদার পাড়াতেই থাকে। কিশোরীদা বললে, 'শিগগির দরজায় তালা লাগান। থানায় যেতে হবে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' বউদি মেয়ের মতোই সুন্দরী। রাতজাগা আর উদ্বেগে মুখটা থমথমে। দরজায় তালা দিলেন। হাত কাঁপছে।

সোনাঝুরির পাতায় ভোরের আলো আর বাতাস লেগেছে। আমরা সেই ভয়ংকর গর্তটার উলটোদিক দিয়ে এলুম, পাছে বউদি মহেন্দ্র বিশ্বাসের লাশটা দেখে ফেলেন। দূর থেকে দেখছি, জয়সওয়ালের দোকানের বুকে কে একজন বসে আছে ঝুপড়ি মেরে। আর একটু এগোতেই দেখা গেল, বসে আছে অনুরাধা। বউদি আগে ছুটলেন, পেছনে আমরা। পরনে শাড়ি নেই। কালো সায়া ফালা ফালা। ব্লাউজ টুকরো টুকরো। ব্রেসিয়ার নেই। ঠোঁট দুটো কামড়েছে কে, রক্ত জমাট। সারা শরীর চিরুনি আঁচড়ানো। কপালের ডানপাশ থেঁতলানো। বুক দু'হাতে ঢেকে জড় মূর্তির মতো বসে আছে অনুরাধা।

বউদি ওইখানেই ফিট হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। অনুরাধা কোনও কথা বলতে পারছে না। কিশোরীদা ফট করে নিজের জামাটা খুলে মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিলে। দু'পায়ের ভেতর দিক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে। আমরা ধরাধরি করে গাড়ির পেছনের আসনে মেয়েকে বসিয়ে দিলুম। বউদি অঝোরে কাঁদছে। অনুরাধার সারা শরীর দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। মনে হয় গায়ে মদ ঢেলেছিল। মুখ চেপে ধরে খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল। বুকের খোলা অংশে সিগারেটের আগুনের ছেঁকার দাগ। ভেতরে আরও কত আছে কে জানে! মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বউদি কাঁদছে, 'আমার এ সর্বনাশ কে করলে।' কিশোরীদা বললে, 'কান্নার পৃথিবী আর নেই। এখন মারের পৃথিবী, খুনের পৃথিবী। ভগবানের কাছ থেকে পৃথিবীর ইজারাদারি শয়তান কিনে নিয়েছে। কেঁদে কী হবে! কে শুনবে আপনার কান্না!'

ঘোষ ডাক্তারকে টেনে তোলা হল। প্রবীণ মানুষ। শরীরের সাধারণ মামলায় এই অঞ্চলের অদ্বিতীয়, এই মামলাটা আধুনিক কালের। সম্প্রতি মানুষের পরিচয় ঘটছে এই সবের সঙ্গে। মা, মেয়ে আর ডাক্তার ঘরে। আমরা বাইরে। কিশোরীদা গুম মেরে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর আদর্শ। যাঁর পূর্বপুরুষ নিজের বৈঠকখানায় বসে মানুষের বিচার করতেন। নিজের তালুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নিজের লেঠেল প্রয়োজনে বুকে বাঁশ ডলে মানুষকে যমের বাড়ি পাঠাত। সেই রক্ত কিশোরীদার শরীরে টগবগ করে ফুটছে।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, 'রিপিটেড রেপ, গ্যাং রেপ। যা আজকাল হচ্ছে। ভেতরটা বেশ ড্যামেজ হয়েছে। সতেরোটা বার্ন স্পট। বাইটিং। ল্যাসিরেশান। ব্রেস্ট দুটো বেশ ড্যামেজ হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। পোড়া জায়গাগুলোয় ক্যালেন্ডুলা লাগান। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। মেয়েটা মরে যেত। নেকড়ে বাঘে ধরেছিল। পুলিশে যাবেন না?'

'পুলিশ! স্বাধীনতার পর পুলিশের ভূমিকা পালটে গেছে। উলটে এমন কাণ্ড করবে মেয়েটা হয়তো মরেই যাবে। আর অপরাধীকে ধরা! এদের দাদারা আছে, কিছুই হবে না। মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।'

নাটক অন্য রাস্তায় মোড় নিল। ন'টা-সাড়ে ন'টার সময় অনাথবন্ধু পরিবারকে অনাথ করে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। হাসপাতালে হাসপাতাল, ডাক্তারে ডাক্তার থাকলে চিত্রগুপ্তদা বেঁচে যেতেন হয়তো। পেটে বালতিটাক রক্ত জমে গিয়েছিল। পুলিশ এসে মহেন্দ্রর লাশ তুলল। গলাটা ফাঁক করে দিয়েছিল। হাতের মুঠোয় এক খামচা চুল। গর্তের মধ্যে বিলিতি একটা লাইটার। একটা ক্যাশমেমো, একপাটি দামি জুতো পাওয়া গেল। পুলিশ আমাদের গ্যারেজে এল। ওসি কুতুবুদ্দিন সব শুনলেন— 'মেয়েটার একটা এজাহার নেওয়া দরকার।'

'চারটে ছেলে ছিল, একজনকে সবাই কালুদা কালুদা বলছিল।'

'কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল?'

'নতুন যে ফ্ল্যাটবাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে তারই একটায়। একজন সব সময় আমার বুকে ছুরি ঠেকিয়ে রেখেছিল। মহেন্দ্রদাকে মেরে গর্তে ফেলে দিল। বাবা খুব চেষ্টা করেছিল বাঁচাবার। কী হয়েছিল জানি না। আমার নাকে একটা রুমাল ধরেছিল।'

অনুরাধা কেঁদে ফেললে। অফিসার বললেন, 'সরকারি একজন ডাক্তারকে দিয়ে মেডিকেল টেস্ট না করালে কেস তো টেকবে না। এ তো মনে হচ্ছে কালু কালোয়ারের কাজ। এর আগে ময়না বলে একটা মেয়েকে সেম ব্যাপার করেছিল। এ তল্লাটের আদ্দেক তো ওদের দখলে। চোরাই লোহালক্কড়ের কাঁচা পয়সা। দিনে ব্যাবসা রাতে রেপ। দেশটার কী অবস্থা করে ছাড়লে আমাদের দাদারা।'

কিশোরীদা বললে, 'আমাদের টেস্টফেস্ট দরকার নেই। জল ঘোলা। মেয়েটার জীবন একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। ময়না কেসে, ময়নার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল পায়খানার পিট থেকে। সে কেসে আপনারা একজনকেও ধরতে পারেননি।'

'ধরেছিলুম। ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাঁচাতে হয়েছিল।'

'এ কেসেও তাই হবে সায়েব।'

পুলিশের খবর পুলিশ জানে। আমি জানি আমার কিশোরীদার খবর। লোকটা তিন দিন গুম মেরে রইল। একেবারে অন্য লোক। চার দিনের দিন মাঝরাতে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুই আমাকে ভালবাসিস।'

'একজনকেই বাসি, সে তুমি।'

'যা বলব, শুনবি?'

'মরতে বললে মরব।'

'তোর সঙ্গে অনুরাধার বিয়ে দোব।'

'লোকে যা তা বলবে।'

'দেখ জগা, তুই মার্কা মারা। খুনের মামলায় কাঠগড়ায় চড়েছিস। তোর সামনে তোর মাতাল বাবা মাসিকে রেপ করেছে। তুই সেই রাতেই নিজের পশুটাকে আবিষ্কার করেছিস। তোর ডবল বয়সি সেই মেয়েটার সঙ্গে পাপ করেছিস। তুই বেশ্যালয়ে গেছিস।'

'বেশ্যালয়ে যাইনি।'

'আলবাত গেছিস, আমার সঙ্গে গেছিস। তোর বাপের মেয়েমানুষের কাছে। তুই দু'কান কাটা। এক কানকাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দু'কানকাটা যায় ভেতর দিয়ে। তুই আমাকে বলছিস, লোকে কী বলবে। তোর লোকভয় আছে! তুই একটা অসহায় মেয়ের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারবি না?'

'কিশোরীদা, আমার যে একটা অন্য ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার!'

'সেই হেডমাস্টারমশাইয়ের মেয়ে অঞ্জনা, সে তো আমাকে পড়ায়!'

'পড়বি।'

'আমি যে তার প্রেমে পড়েছি।'

'সে না মারলেও, আমি তোর নিতম্বে একটি লাথি কষাব। তারক, প্রেম জিনিসটা দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া নয়। এই মেয়েটাকে বিয়ে কর, জীবনে সুখী হবি।'

'আমার বরাতটাই সেকেন্ড হ্যান্ডের। যেমন অনেকে সারাজীবন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি চাপে।'

'হ্যাঁ তাই। তোর রুচিটাই সেইরকম। জেনে রাখ সেকেন্ড হ্যান্ড তারের যন্ত্রেই বাজনা খোলে। মনে নেই তোর, সরলামাসিকে সেই রাতে দেখে তোর কী হয়েছিল? তোর স্বভাবটাই তো ফেউয়ের স্বভাব। বাঘের পেছনেই ফেউ আসে।'

'একটু ভাবতে দাও।'

'একটা দিন।'

'বেশ, কাল তোমাকে বলব।'

চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিশোরীদার গাড়িটা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত রইলুম গ্যারেজে। সাদা রং হঠাৎ কালো করা হচ্ছে। কারণ জানা নেই। রং তুলতে তুলতে জীবন বেরিয়ে যাবার দাখিল। একটা হ্যান্ড শর্ট। মাধাই মরে গেছে। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল। তা না হলে তিনজনে চোখ দেখাতে যাবে কেন! রাত আটটা নাগাদ কিশোরীদা ওস্তাদের মতো সেজেগুজে, আতর টাতর মেখে গান গাইতে বসে গেল। আমি গেলুম অঞ্জনার কাছে পড়তে। তার সাংসারিক কাজে সাহায্যও করি। বেশ লাগে। আটা মেখে দিলুম, কি আনাজ কেটে দিলুম। কি বাজার করে এনে দিলুম। তার ফাঁকে ফাঁকেই পড়া চলে। বুদ্ধিটা আমার খারাপ ছিল না, চরিত্রটা নষ্ট হয়ে গিয়েই সব হেজে গেল। অঞ্জনা বলেছে লেগে থাকতে পারলে আমার হবে। মাঝেমধ্যে মাস্টারমশাইকে বেডপ্যান দিই বা ইউরিন্যাল ধরি। অঞ্জনা রাঁধতে রাঁধতে আমাকে পড়ায়। আমি কি পাগল? অঞ্জনা আমাকে বিয়ে করবে কেন? তার এক ইঞ্জিনিয়ার প্রেমিক আছে। দু'জনে ইংরিজিতে কথা বলে। আমি একটা মিস্ত্রি মার্কা ছেলে। কালচারের তফাত হয়ে যাচ্ছে। আমি পড়ি ভৃত্যের শ্রেণিতে, অঞ্জনারা হল বাবু।

রাতে ফিরে এসে দেখি, কিশোরীদা তখনও গান গেয়ে যাচ্ছে— কার তরে নিশি জাগো রাই। তুমি যার আসার আশায় আছ, তার আসার আশা নাই। একা একাই আসর জমিয়ে ফেলেছে। কিশোরীদার মদ খাওয়াটা ক্রমশই কমে আসছে। আমাকে বললে, 'খানা লাগা।' সেই পুরনো আমলের মার্বেল পাথরের টেবিল। মাথার ওপর ছোট একটা ঝাড়বাতি। বেলোয়াড়ি ঝাড়। বেলজিয়ামের কাট গ্লাসে আলো ঠিকরোচ্ছে। পূর্বপুরুষদের ছায়া পড়ছে যেন দেয়ালে।

রাত দুটো। ঘুম আর আসে না। নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করছি অনবরত। কোথায় আমার স্থান। সমাজের কোন স্তরে। আমি কি ভদ্দরলোক! অঞ্জনার মনে হয় একজন চাকরের প্রয়োজন ছিল। ছাত্র-কাম-চাকর। আর আমারও দুর্বলতা। মেয়েদের দাস হতে আমি ভালবাসি। কোনও এক জন্মে বোধহয় হাবসি খোজা ছিলুম। অনুরাধাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অসহায় বসে আছে। ফালা ফালা সায়া। এখানে ওখানে দুধ সাদা উরু বেরিয়ে আছে। ভরাট কাঁধ। ভারী বুক। নির্বোধ পশুর দৃষ্টি। মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত। পতিতালয়ে পাচার করে দিতে পারত। কালু কালোয়ারের রমরমা ব্যাবসার নাম পাপ। অনুরাধা ক্রমশই আমার মনে চেপে বসছে। কী সুন্দর মেয়েটা।

পাশের বিছানায় কিশোরীদা চিত। লোকটার গুণ হল, শোয়ামাত্রই গভীর ঘুম। ঠেলে তুললুম। মুহূর্তটা হারিয়ে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে। ঘুম চোখে বললে, 'কী হল আবার!'

'শোনো, অনুরাধাকে আমি বিয়ে করব। তোমাকে আমি বারো ঘণ্টা আগেই জানিয়ে দিলুম।'

কিশোরীদার বালিশের পাশে আতরের শিশি ছিল। আমার গায়ে মাখিয়ে দিলে।

'আমি জানতুম, তুই আমার কথা রাখবি। মেয়েটা ভীষণ ভাল। পায়রার মতো। শিকারি বেড়ালের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর মায়ের অবস্থাটা একবার ভাব। যদ্দিন আমি আছি— তারপর কী হবে! তুই একটু দেখিস মাকে।'

'ধরো ওর যদি ছেলে এসে যায় এরই মধ্যে।'

'তার মানে?'

'মানে সে-রাতে যা হয়ে গেল তার ফলে যদি...'

'সে সব হবে না। আর যদি হয়ও তার দায়িত্ব নিবি। তবেই না তুই মানুষ। যে আসবে, তার কী দোষ। সে কী জানে। অবশ্য তা হবে না। যা, রাত এখনও একটু পড়ে আছে। ঘুমিয়ে নে। সকালে অনেক কাজ।'

সাদা গাড়িটা কুচকুচে কালো হয়ে গেল। অন্ধকারে দাঁড়ালে বোঝা যাবে না। পালিশটালিশ মেরে একেবারে ঝকঝকে। সাদাটাই তো ভাল ছিল। কিশোরীদা বললে, 'কারণ আছে। গাড়িটা একটা পাপ করবে।' একটা ফল্‌স নাম্বার প্লেট লাগানো হল। আসলটা খুলে রাখা হল ভিতরে। 'এটা কার নম্বর লাগালে?'

'সে গাড়িটা অনেক আগে মারা গেছে। এটা সেই গাড়ির ভূত। নে মালটাকে চোখের আড়ালে রেখে আয়। এমন জায়গায় রাখ, কেউ যেন দেখতে না পায়।'

কিশোরীদা একটা গাড়ির তলায় ঢুকে গেল। রাতের কিশোরী দিনের কিশোরী দুটো আলাদা লোক। কিশোরীদার ঠাকুরদার আমলের লাইব্রেরিটা আজও আছে। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-ইংরেজি সাহিত্য সবই আছে। চামড়ার বাঁধাই। সোনার জলের লেখা। প্রায়ই সেখানে ঢুকে পড়ে, তখন কিশোরীদা আবার আলাদা এক মানুষ। লাইব্রেরির দেয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং। পাগড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজার মতো এক মানুষ। ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই পরিবারের সমস্ত বোলবোলার নায়ক। বাড়িটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এলোমেলো হয়ে অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে। একটা অর্গান আছে। ধুলো মাখা। একটা বীণা আছে। কিশোরীদার মা বাজাতেন। একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আছে— কিশোরীদার ভাইয়ের। ন'বছর বয়সে মারা যায়। পুরনো জমানার ওপর একটা নতুন জমানা খাড়া হয়েছে।

॥ ছয় ॥

রাত এগারো। জয়সওয়ালের মদের দোকানের সামনে, ঘোষ ডাক্তারের চেম্বারের ধারে, ঘন অন্ধকারে আমাদের কালো অ্যাম্বাসাডার শিকারি বাঘের মতো ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরীদা স্টিয়ারিং-এ ঘাপটি মেরে আছে। আমি পাশে। দোষীর বিচারের ভার, সাজার ভার কিশোরীদা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কালু কালোয়ারকে এমনভাবে মারা হবে আইনের ক্ষমতা নেই আততায়ীকে ধরে। আমরা সাত দিন ধরে ওয়াচ রেখেছি। কালু কী করে! কালুর স্বভাব। বারোটা নাগাদ জয়সওয়ালের ঠেক থেকে কালু তিনজন চামচাকে নিয়ে বেরোবে। বেরিয়ে, কালু সামনে দশ-বারো হাত ডাঁটিসে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকের নালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করবে, ততক্ষণে চামচারা রাস্তা ক্রশ করে সোনাঝুরি গাছের দিকে এগোতে থাকবে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। গাছটার তলায় এসে একজন নেশা জড়ানো গলায় ডাকবে, ওস্তাদ। তখন কালু গর্ভবতী গাভীর মতো রাস্তা পেরোবে সিগারেট ধরাতে ধরাতে। ঠিক এই পয়েন্টে অ্যামবাসাডার স্টার্ট নেবে। সেলফ আর ব্যাটারি এমন করা হয়েছে, হাত ছোঁয়ালেই ইঞ্জিন লাফিয়ে উঠবে। অ্যাম্বাসাডারের পার্কিং থেকে কালুর দূরত্ব কুড়ি থেকে তিরিশ গজ। তার মধ্যেই গাড়ি আশি কিলো স্পিড পেয়ে যাবে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। কালু স্ম্যাশড। গাড়ির কোনও আলো জ্বলবে না। আমরা সোজা টপ স্পিডে এগিয়ে যাব। আসল নাম্বার প্লেট পালটে কিশোরীদা চলে যাবে ঝাড়গ্রাম। আমি নেমে ফিরে আসব গ্যারেজে।

কালু বেরোল। এগিয়ে গেল সামনে। চামচা তিনটে রাস্তা পেরোল। কালু জলবিয়োগ করে ঘুরছে। কিশোরীদা সেলফ মারবে, এমন সময় পেছন দিক থেকে এগিয়ে এল পুলিশের জিপ। আমরা দু'জনেই পাশে হেলে পড়লুম। পুলিশ যেন ভাবে, কার গাড়ি পার্ক করা আছে কে জানে! জিপটা এগিয়ে গিয়ে কালুর পাশে থেমে পড়ল। ওসির মোটা উরু বেরিয়ে এল। দু'জনের অন্তরঙ্গ রসিকতা হল কিছুক্ষণ। কালুর হাত থেকে কিছু একটা ওসির হাতে চলে গেল। জিপ বেরিয়ে গেল। আমাদের কাজ হল না। কিশোরীদা বললে, 'শালা! বাঁচ গিয়া।'

ওরা হইহই করতে করতে চলে গেল। কে একজন সিটি মারল। সিটিটার মানে আছে। সতেরো নম্বরের দোতলায় ছোট এক পরিবার ভাড়া এসেছে। স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচ্চা। স্ত্রী আধুনিকা। বেশ দেখনাই যৌবন। লাল ব্লাউজ লাল শাড়ি পরে স্বামীর বাইকের পেছনে চেপে যখন যায়, তখন দিনের দাদারা চিৎকার করে— আগুন! লেগেছে লেগেছে আগুন। মহিলার গর্ব বেড়ে যায়। তিনি আবার শখের থিয়েটারে অভিনয় করেন।

রাতের সিটিটা সেই মহিলার উদ্দেশে। কালু যেন কংস। সব মহিলাকেই তার চাই। এই দুনিয়াটা যেন তার পিতার সম্পত্তি। কিশোরীদা বললে, 'আবার কাল। পরমায়ু এখনও আর একদিন আছে।' আমরা গ্যারেজে ফিরে এলুম।

'এই ঝুঁকি নিজের ওপর না নিয়ে, এ পাড়ার নেতাকে বলো না?'

'দুটো দামড়া। কালু দুটোকেই হাতে রেখেছে। আমাকে জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেবে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী-ধর্ষণ হয়ে আসছে। মেয়েরা লোভ দেখায় কেন? আগুনে ঘি ঢাললে আরও জ্বলবে, না নিববে! আর পুলিশকে তো দেখলি! হাত সাফাই করে চলে গেল। এ কাজটা আমাকেই করতে হবে। তা না হলে আমার রক্ত ঠান্ডা হবে না। আমার পূর্বপুরুষরা নিজেরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।'

'যদি কিছু হয়ে যায়?'

'নার্ভাস না হলে কিছুই হবে না।'

'কালু যদি বেঁচে যায়!'

'বাঁচতে পারে না। অসম্ভব ব্যাপার। আমি ব্যাক করে এসে আবার পিষে দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'চ্যালারা যদি বোম চার্জ করে!'

'করবে না। প্রথমত, অ্যাকশানের সময় ছাড়া ওদের কাছে বোমা থাকে না, দ্বিতীয়ত, যদিও থাকে, ওরা কালুর জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমার সব ভাবা হয়ে গেছে তারক। আজ ওই পুলিশের জিপটা না এলে হয়ে যেত।'

দ্বিতীয় দিন। রাত এগারো। আমরা ঠিক আছি। কালু বেরোল। সঙ্গে বেরোল জয়সওয়াল। কালুর কাঁধে হাত। কালু আর নালার দিকে গেল না। চামচা তিনটে সোনাঝুরির তলা দিয়ে চলে গেল বস্তির দিকে। বিশগজ দূরে আমাদের শিকার। কথা বলছে মদের দোকানের মালিকের সঙ্গে। কিশোরীদা টান টান। সামনে পেছনে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। শীত আসছে। বাতাস শুকনো। জয়সওয়াল দোকানে ঢুকে গেল। কালু সামনে এগোচ্ছে। তার হাত থেকে কী একটা টং করে পড়ে গেল রাস্তায়। কালু নিচু হচ্ছে। আমাদের ইঞ্জিন লাফিয়ে উঠল প্রায় নিঃশব্দে। ডবল পিক আপ। গোলার মতো গাড়িটা সামনে ছুটে গেল। আঁক করে একটা শব্দ। গাড়িটা লাফিয়ে উঠল। ঘযড়ানোর শব্দ। দেহটা জড়িয়ে গেছে। আশি থেকে একশো। ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকানি, খুলে গেছে। ঝড়ের বেগে সামনে। পেছনে দূরে একটা লরি আসছে টপ স্পিডে। ততক্ষণে আমরা অনেকটা এসে গেছি। এতক্ষণ দম বন্ধ ছিল। পেট্রল পাম্প পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। কিশোরীদা ঘামছে।

'নাম্বার প্লেটটা পালটা।'

লরিটা বড় রাস্তা ধরে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল। কিশোরীদা বললে, 'বুঝলি কিছু?'

'কী বলো? লরিটা থামেনি তো?'

'রাইট, ডবল রানওভার। আমাকে আর সেফটির জন্যে ঝাড়গ্রাম পালাতে হবে না। শালা! দুটো খুন আর একটা রেপের বদলা।'

আমরা গ্যারেজে চলে এলুম। কিশোরীদা বললে, 'সাবধানের মার নেই। গাড়িটা ওয়াশ করব।'

হোস দিয়ে গাড়িটার আগা-পাশতলা ওয়াশ করা হল। রক্তের দাগ যদিও থাকে সব মুছে গেল। ভাল করে মুছে, ওপর ওপর পালিশ মেরে একপাশে রেখে দেওয়া হল। কিশোরীদা কোথা থেকে একটা বোর্ড এনে ঝুলিয়ে দিল— ফর সেল।

'চল, বাকি রাতটা এক পেগ ব্র্যান্ডি মেরে তোফা একটা ঘুম।'

সেই প্রথম ব্র্যান্ডি খেয়েছিলুম। সবাই বলে তারক গুছাইত নিজের পয়সায় মাল খায় না। কথাটা বহুত ঠিক। মালের পেছনেই মানুষের সব মাল চলে যায়। মাল ধরার চেয়ে একজন বড়লোক ধরা বুদ্ধিমানের কাজ। সন্ধেটা ভালই কাটে। তালে তাল দিয়ে চলতে পারলে— আহার-ওষুধ দুইই হয়। একটু বোকা বড়লোক হতে হবে। যে মনে করে, পৃথিবীর সব ব্যাপারে তার কথাই শেষ কথা। চালাক তাঁবেদারকে শুধু বলতে হবে, ঠিক বলেছেন। এরপরে আর কোনও কথা নেই। একেবারে খাঁটি কথা। এরপর আর কোনও কথা চলে না।

বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে কিশোরীদা বললে, 'কাল সকালেই আমাদের একটা কাজ হবে, গাড়িটার কালো রং তুলে আবার সাদা করা।'

'তোমার নিতাই-ফিতাই সন্দেহ করবে না?'

'আমি বলব, জগা, কাল এক জ্যোতিষী বলেছে, আমার কালো রং চলবে না।'

সাতসকালেই জয়সওয়ালের দোকানের দিকে একবার গেলুম। অঞ্চলটা রোজ যেমন জেগে ওঠে সেইরকমই জেগে উঠেছে। ঠেলা, রিকশা, লরি, বাস ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চলেছে। দুধের গাড়ি, খবরের কাগজঅলা। বাড়তি কিছু চোখে পড়ল না। জায়গাটার ওপর দিয়ে প্লেন একবার হেঁটে গেলুম হনহন করে। ফিরে আসতেই কিশোরীদা বললে. 'কিছু অস্বাভাবিক!'

'কিছু না। রোজ যেমন, সেই রকমই।'

'মাথাটা নেমে গেছে এইবার ধড়টা আপনিই কাবু হবে, যতদিন না আর একটা মাথা উঠছে।'

গাড়িটাকে আবার ওয়ার্কসাইটে টেনে এনে রং তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল। নিতাই বললে, 'বসের হেডগিয়ার ফেঁসে গেছে। তখনই বলেছিলুম, কুচকুচে কালো রং কোরো না। আরে শালা, আমিও এক জ্যোতিষী।'

সারাটা দিন উদ্বেগে কেটে গেল— এই বুঝি পুলিশ আসে। পুলিশ আর এল না। সন্ধের পরেই জলুস বের হল। কালু কালোয়ার শ্মশানে চলেছে। ঢোল-সহরত করে। নেতা-টেতা দু'-একজন আছে। চ্যালারা শোক ভোলার জন্যে একটু টলমলে হয়েছে। কালুর আত্মীয়-স্বজনরা ভুঁড়ি ফুলিয়ে, দুনিয়া কাঁপিয়ে চলেছে। কালুর কালু-জন্ম শেষ হয়ে গেল। আবার স্লোগান দিচ্ছে— কালু কালোয়ার অমর রহে। ব্যান্ড পার্টি ব্যান্ড বাজাচ্ছে— মুকেশের গান পিকলুতে— মেরা নাম রাজু— প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক— প্যাঁক।

তিন-চার রাত একটু ঘুমের অসুবিধে হল। মনে হত, বিছানাটা একটা গাড়ি। তলায় আস্ত একটা লোক। হাড়গোড় ভাঙার শব্দ। প্যাচ করে মাথা থেঁতলানোর শব্দ। কিন্তু যেই অনুরাধার ছবিটা ফুটে উঠত একটু শান্তি পেতুম। খুনকা বদলা খুন। সে রাতে যে-ক'টা ছিল, সব ক'টাকে শেষ করা যেত!

এক রাতে কিশোরীদা বললে, 'যে-কোনও একটা বাড়ি বেচে দে। দুটো বাড়ি রাখার কোনও মানে হয় না।'

'চোদ্দো বছর পরে বিশ্বনাথ সরকার ফিরবে।'

'ডালিম খুব কষ্টে আছে। একদিন গিয়ে কিছু টাকা দিয়ে এসেছি। বাড়িটা তাকে ছেড়ে দে। ও-পাড়ার কিছু বিহারি তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

'এই পাড়ায় ওই জিনিস বসাবে?'

'সে-ডালিম আর নেই। পুজো-আচ্চা করে। গলায় কণ্ঠি নিয়েছে। হরি নাম করে। হরি নামে সব শুদ্ধ। ওই পাপের বাড়িটা ওকে দিয়ে দে। যতই হোক, একদিন তোর জীবন বাঁচাবার জন্যে নিজে থেকেই ছুটে এসেছিল। আর, যে পেটেই জন্মাক, বাপের ছেলে ভাইই হয়। সেটা মানুষ না হলে আর একটা কালু কালোয়ার তৈরি হবে। সরলার বাড়িটা অনেক ভাল। সেইটায় তুই অনুরাধাকে নিয়ে সুখে সংসার কর। ডালিম পাশে থাকলে তোদের দেখাশোনার সুবিধে হবে।'

'অনুরাধাকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে। বাবু ধরে এনে দেবে।'

'তুই বড় উলটোপালটা ভাবিস। জানবি, বেশ্যারা শেষ জীবনে খুব ভক্ত হয়। ধার্মিক হয়। পাপ না করে এলে ঠিক ঠিক পুণ্য হয় না। পাপীদের কখনও ভয় পাবি না। ভয় হল পুণ্যাত্মাদের। মুখে বলি হরি। কাজে অন্য করি। সেই সাধু আর বেশ্যার গল্প। সাধুর ডেরা থেকে বেশ্যার ঘর দেখা যেত। সাধু একদিন বেশ্যাকে ডেকে বললেন, পরকালের কথা মনে আছে তো! এই যে এত পাপ করছিস। বেশ্যা বললে, ঠিকই বলেছেন মহারাজা! কিন্তু আমার যে উপায় নেই। সাধু বললেন, আস্তে আস্তে কমাও। ঈশ্বরে একটু মন লাগাও। বেশ্যা চলে গেল। সাধু সব ছেড়ে নজর রাখলেন বেশ্যার ঘরের দিকে। এক-একটা খদ্দের ঢোকে আর তিনি একটা করে ইট রাখেন। ইট জমতে জমতে ছোট একটা টিলার মতো হয়ে গেল। একদিন বেশ্যাকে ডেকে বললেন, এই দেখো তোমার পাপের পাহাড়। ভগবান বললেন, ওটা ওর পাপের পাহাড় নয়। তোমার পাপের পাহাড়। ও ওর জীবিকা নির্বাহের জন্যে নিরাসক্ত কাজ করেছে, আর তুমি সাধন ভজন ছেড়ে ও কী করছে তাই দেখেছ। এ হল তোমার অতৃপ্ত কামের প্রকাশ। বেশ্যা একদিন সব ছেড়ে বসে গেল ভজনায়। নিমেষে সিদ্ধিলাভ। আর সাধু ঘষটাতে লাগল সারাজীবন। কিছুই হল না তার।'

'আজ সেই গল্পটা শেষ করো না। সেই বুড়োর গোলাপ ফুল।'

'তোর মাথায় এখনও সেই গল্প ঘুরছে? তা হলে জমিয়ে বোস। যমালয়ের গোলাপবাগানে সেই বেশ্যাসক্ত বৃদ্ধ নরকে যাওয়ার আগে মাত্র পাঁচ মিনিট বেড়াতে পারবে। যমদূতরা সেখানে তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। বলেছে, এখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, কোনও আপত্তি নেই। তবে পাঁচ মিনিটের পরে আর নয়। এইবার সেই পাগলা বুড়ো করেছে কী, বাঁশকে চেঁচে চেঁচে দুটো ধারালো কাঠি করেছে। দু'পাশে গোলাপের সারি আর মাঝখানে সরু পথ, এখন বৃদ্ধ সেই কাঠি দিয়ে দু'পাশের গোলাপের বোঁটা কেটে কেটে ফেলছে। ফুলগুলো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে, আর ছুটছে কী বলে? কৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ বলে। অজস্রবার বলছে আর ফুলগুলো কেটে কেটে পড়ছে। পাঁচ মিনিট পরে দূত এসে বলছে, এসো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বৃদ্ধের দূতের কথায় কান দেওয়ার সময় কোথায়— সে ফুল কাটতে কাটতে ছুটছে আর বলছে, কৃষ্ণায় নমঃ। দূত ফিরে এসে যমরাজকে রিপোর্ট দিচ্ছে— মহারাজ। ভয়ানক ব্যাপার— এই পাপী গোলাপবাগানের যত ফুল সব বাঁশের কাঠি দিয়ে কেটে কেটে ফেলছে, আর অজস্র কৃষ্ণায় নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ বলছে। ধর্মরাজ ঘাবড়ে গেছেন, এখন এই পাপীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করানো চলবে কি না! যম চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, বিধাতা, আপনি তো সব জানেন। এই পাপী যমালয়ে এসে অনেকবার কৃষ্ণায় নমঃ বলেছে। এখন একে নরকযন্ত্রণা ভোগ করানো যাবে কি না? ব্রহ্মা বললেন, তাই তো হে, ভারতবর্ষে ধর্মযাজন করবার কথা আছে, যমালয়ে ধর্মযাজন করার ফলের কথা তো নেই। একটা কাজ করি চলো, দু'জনে মিলে যাই চলো। যাঁর নাম তাঁর কাছে। যম আর ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গেলেন ভগবানের কাছে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষেই ধর্মকর্ম, তার ফলভোগ, তবে আমার নাম সর্বত্র। যে কোনও জায়গায় আমার নাম নেওয়া যায় আর তার ফল পাওয়া যায়। চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সেই পাপীর কাছে। ভগবান যমালয়ে গেলেন। তখন শ্রীভগবানকে দেখে পাপী বললে, আপনি কে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মন তৃপ্তিতে ভরে গেছে। এখন যদি আমাকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা দেয়, আমার কোনও দুঃখ নেই। ভগবান বললেন, যন্ত্রণা ! যন্ত্রণা দেবার আর কোনও উপায় নেই। তুমি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গেছ। আমি যে তোমার জন্যে বহুদিন চিন্তা করেছি। সারাটা জীবন শুধু পাপ কাজ করে চলেছ। এর কী গতি হবে? যখন শেষের দিন তুমি ফুল নিয়ে যাচ্ছিলে বেশ্যাকে দিতে, তখন তোমার হাত থেকে গোলাপ ফুলটা আমিই ফেলে দিয়েছি। আর তুমি, যে গোটা জীবন বেশ্যাসক্ত সে কখনও কৃষ্ণায় নমঃ বলতে পারে? বলতে পারে না। আমিই তোমাকে বলিয়েছিলাম, কৃষ্ণায় নমঃ। যমালয়ে এসে তোমাকে যে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল এরা, সেই

সময়ের মধ্যে তুমি যে প্রতিটি ফুল কেটে কেটে পাঁচ মিনিটে অজস্র ফুল কেটেছ আর কৃষ্ণায় নমঃ বলে অর্পণ করেছ— এ বুদ্ধি তোমায় কে দিয়েছিল? আমিই দিয়েছিলাম। সব আমার কৌশল। অতএব তোমার আর কোনও পাপ নেই। এসো আমার সঙ্গে। পাপীকে গরুড়ের পিঠে তুলে নিয়ে ভগবান চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। গল্পটা তোকে বলার উদ্দেশ্য— আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী। কালু কালোয়ারের মরণ এসেছিল। ব্যাপারটা কত সহজ করে দিলে জয়সওয়াল। আরও সহজ করে দিলেন ভগবান নিজে। কালুর হাত থেকে চাবির রিংটা পড়ে গেল। কালু নিচু হল, যেন মরণটাকে মাথা পেতে বরণ করে নিলে। পাপ কর— করবি পুণ্য মিশিয়ে। অনুরাধাকে বিয়ে করাটা তোর সেই পুণ্য। এই নে চাবি। ওই আলমারিটা খোল।'

সেকালের বিশাল আলমারি। লতাপাতার নকশা তোলা অপূর্ব শিল্পকর্ম। পাল্লাটা খোলামাত্রই পাখির মতো ঝাপটা মেরে উড়ে গেল অতীতের চন্দন গন্ধ। ভেতরে থরে থরে সাজানো শাড়ি। পরপর গয়নার বাক্স। কিশোরীদা বললে, 'তোর আর অনুরাধার বিয়েতে আমার যৌতুক। বেনারসি আছে সাচ্চা জরি বসানো। বালুচরি আছে, সিল্ক আছে, টাঙ্গাইল আছে। গয়নার কেসগুলো নিয়ে আয়।'

মাঝরাতে গা ছমছমে পৃথিবীতে যেন গুপ্তধন দেখছি। নেকলেস, চুড়ি, আংটি, টায়রা।

'সব তুমি আমাদের দেবে কেন?'

'যক্ষের মতো আগলে বসে আছি, আর কী হবে! তোরা আমার প্রিয়।'

'তা বলে এত টাকার সম্পত্তি। ব্যাবসায় লাগাও।'

'আমার মায়ের জিনিস আমি বেচতে পারব না তারক। আমার বউও আর আসছে না। ইঞ্জিন নিয়েই থাকব। আর আমার বোতল। আর একটু একটু ভগবান।'

লেতা হুঁ মকতব-এ গম্-এ দিল-মেঁ সবক হুনূজ,
লেকিন য়েহী কেহ্ 'রফৎ' গয়া, অওর 'বূদ' থা ॥
হৃদযন্ত্রণার পাঠশালায় শিক্ষানবিশি করছি এখনও,
দুটি মাত্র পাঠ বপ্ত হয়েছে— 'ছিল' আর 'গেল' ॥

নিতাইয়ের চালচলন আমার সুবিধের মনে হচ্ছিল না। এর আগে আমাকে দু'-তিন দিন জিজ্ঞেস করেছে, 'ব্যাপারটা কী বল তো! গাড়িটা সাদা ছিল কালো হল, আবার সাদা হয়ে গেল!'

'কিশোরীদার খেয়াল। খেয়ালি লোক। জ্যোতিষী বলেছে কালো রং সহ্য হবে না।'

'অন্য কোনও ব্যাপার আছে।'

'তুই খুঁজে বের কর।'

এরপর একদিন রাতে দেখি নিতাই জয়সওয়ালের দোকানের পাশে ঘাপটি মেরে আছে। কালু কালোয়ারের এক শাগরেদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর দু'জনেই ঢুকে গেল মদের দোকানে। নিতাইয়ের একটা বোন চরতে শিখেছে। ছেলে ধরে আর ছাড়ে। কিছু মেয়েকেও লাইনে টেনে এনেছে। সঙ্গে কালু কালোয়ারের চেলাদের কয়েকজন আছে। লরি ভাড়া করে হিন্দি গান বাজাতে বাজাতে পিকনিকে যায়। কালীঠাকুর বিসর্জনে নিতাইয়ের বোন লরির মাথায় দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে নাচে। নিতাইয়ের বাবা মারা গেছে। শাসন করার কেউ নেই মাস্তানরাই মাথা খাচ্ছে। নিতাই মদ ধরেছে।

কিশোরীদাকে বললুম, 'তুমি একটু সাবধান হবে নাকি? নিতাই ও দলে গিয়ে ভিড়েছে। সন্দেহটা ঢুকিয়ে দিলে তোমার ওপর বদলা নিতে পারে। ধরো যদি আড়াল থেকে গুলি মেরে দেয়, কি গ্যারেজে আগুন লাগিয়ে দেয়!'

'পারবে না, আমি চম্পাকে হাত করে ফেলেছি।'

'চম্পা আবার কে গো!'

'কালুর পরে যেটা উঠছে। যার সঙ্গে তুই নিতাইকে দেখেছিস, ওটার নাম ফকির। নিতাইয়ের বোনের বাবু। নিতাইয়ের বোন এখন সোনাগাছিতে ব্যাবসা করছে। তোর চেয়ে অনেক বেশি খবর আমার কাছে আছে। নিতাই এখন পাতার নেশা ধরেছে। পারিস তো ওটাকে বাঁচার রাস্তা দেখা। মাথার ওপর তিন-তিনটে বোন। বিধবা মা।'

'ও যে রাস্তা ধরেছে, সে রাস্তা থেকে কেউ ফেরে না কিশোরীদা। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। ঘরের শত্রুকেই ভয়।'

'তোর বিয়েটা হয়ে যাক তারপর দেখবি আমার কী লাইন! তার আগে কালই চল ডালিমকে নিয়ে আসি। সে আমাদের লোক। দরকার হলে কোমর বেঁধে খিস্তি করতে পারবে।'

আমার নাম তারক সরকার লোকে আমাকে গুছাইত বলে। বলে বলুক। আমি কিন্তু ইট কাঠ পাথরের মর্ম তেমন বুঝি না। সে বোঝে ভানু বোস, আমার গুরু। জমি-বাড়ি কিনছে আর বেচছে, আর চেহারাটা দিনকে দিন লাল থেকে আরও লাল হচ্ছে। ডালিম সরকারের ডেরায় গিয়ে মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। রেল কোম্পানির মালবাবুর পেয়ারের মেয়েমানুষ। চেহারাটা টসকায়নি তবে চেকনাই নেমে গেছে। গয়নাগাটি চলে গেছে। খোঁপার ঝুমকো গেছে। কিশোরীদা বললে, 'তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। বিশ্বনাথ সরকারের বাড়িতেই তুমি থাকবে। তারক তো সম্পর্কে তোমার ছেলেই হল। সে তোমার দেখাশোনা করবে। এখানে পড়ে আছ, কে তোমাকে দেখবে!'

ডালিম বললে, 'ভাগাড়ে মড়া পড়লে শকুনির অভাব হয় না কিশোরীবাবু। আমাকে আর একজন ধরেচে।'

'সে আবার কে?'

'বিশ্বনাথবাবুর প্রাণের বন্ধু ভোলানাথবাবু। লোক ভাল। মালকড়ি আছে। রুগ্‌ণ। হাঁপানির টান আছে। তুমি যেতে বলছ। লোভ লাগছে। কিন্তু ভোলাবাবু আমাকে ছাড়বে না। ব্যারাকপুরে একটা বাগানবাড়ি আছে। বউটা খুব ভুগছে। এখন তখন। বলেছে, মরলেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। দু'জনে বারান্দায় বসে বসে গঙ্গাদর্শন করব। আর গোপালসেবা। মারি তো গন্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।'

'তোমাদের স্বভাব বুঝি পালটায় না!'

'আর জ্ঞান দিয়ো না কিশোরীবাবু। জ্ঞানী, মূর্খ, ছেলে বুড়ো সব এক চক্করে ঘুরছে। সব পাশ বালিশ আর কোল বালিশের খদ্দের।'

'মাল টাল ছেড়েছ।'

'ধরলে ছাড়া যায়! তোমরা আমাকে ভদ্দর পাড়ায় তুলবে। সেখানে সবাই আমাকে জানে। রাতে এসে উৎপাত করবে। রাস্তায় বেরোলে জ্বালাবে। অত বড় একটা খুন হয়ে গেছে ও বাড়িতে। ওটা তো ভূতের বাড়ি। মাঝরাতে এসে গলা টিপবে।'

'খুনটা তুমি করিয়েছিলে?'

'আমরা কারওকে খুন করতে বলি না কিশোরীবাবু। আমাদের জন্যে পাগল হয়ে গিয়ে লোকে খুন করে। মেয়েছেলে কী জিনিস সে তো তুমিও জানো। তুমিও তো পাল্লায় পড়েছিলে। তবে তোমরা হলে আলাদা জাতের। জাতে মাতাল, তালে ঠিক। তোমাদের মধ্যে ত্যাগ আছে।'

'তুমি তো গোঁপে তেল দিয়ে বসে আছ। ডালিম, তোমার কাঁঠাল কবে খসবে! তোমার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ি!'

'কিশোরীবাবু, একটা জায়গায় মানুষ খুব দুর্বল, সেই জায়গাটা যদি চেপে ধরা যায়, মানুষ আর পালাতে পারে না। আমরা সেই জায়গাটা চিনি। যখন যৌবন ছিল তখন তোমরা ছিলে, এখন বুড়োরা আছে। আমাদের কাছে ভালবাসা কিনতে আসে। তখন আমাদের হাতে চেন তাদের গলায় বকলশ।'

কিশোরীদা রাস্তায় নেমে এসে বললে, 'শুনলি! কথা শুনলি! সত্যি কথা শুনতে কী বিশ্রী লাগে। যাক ও ভূতের বাড়িতে ভূতই থাক। আচ্ছা তারক, তোর বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে না!'

'একদিন তো গিয়েছিলুম দেখা করার জন্যে। দেখাই করলে না।

'লজ্জায়।'

'ও মানুষের লজ্জা নেই। রাগে দেখা করেনি। ওই যে আমি সাক্ষী দিয়েছিলুম। মাথার তেলের গন্ধ।'

'তোর মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী।'

'তুমি কেন দায়ী হবে।'

'ওই যে বলে এসেছিলুম তোর মাকে দিয়ে দরখাস্ত করাব।'

'সরলামাসির ওপর সন্দেহ হয় না?'

'মেয়েছেলের কাজ নয়, তা ছাড়া অন্য সব প্রমাণ।'

'বিশ্বনাথ সরকারের কাজ। গয়নাগুলোর দরকার ছিল। নিতে পারছিল না। মালের ঘোরে লোকটা তো অন্যরকম হয়ে যেত।'

কিশোরীদা আমাকে নিয়ে অনুরাধাদের বাড়িতে এল। সাধারণ একটা বাড়ির নীচেরতলায় ভাড়া থাকে। বিষণ্ণ পরিবেশ। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। উগ্র একটা কিছু রান্না হচ্ছে। ঝাল টক পেঁয়াজ ছ্যাঁচড়াই হল গরিবের সম্বল। ওই দিয়েই ভাত ওঠে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন অনুরাধার মা। মাথায় ঘোমটা তুলে বললেন, 'আসুন, আসুন।' একটাই ঘর। অনুরাধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। মেয়েটা আরও বড় হয়েছে, আরও সুন্দর হয়েছে। পুরুষের ছোঁয়া লাগলে মেয়েদের অমন হয়।

'অনু এঁদের জন্যে দু'কাপ চা করো।'

'আমরা চা খাব না। এইমাত্র খেয়ে আসছি। কাজের কথা আছে, বসুন।'

ঘরে দুটো টিনের চেয়ার ছিল, আমরা বসলুম। মহিলা তক্তপোশে পেছন ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'অনুরাধার সঙ্গে তারকের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারতে চাই। ছেলেটি ভাল।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভাল। কালু গাড়িচাপা পড়ার পর, কিছু বাজে ছেলে ওদেরই দলের, বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছে। রাত হলেই আমার ভয় করে। মেয়ের তো বাইরে বেরোনো বন্ধই হয়ে গেছে। বাড়িঅলার বড় ছেলেটাও পেছনে লেগেছে। বিচ্ছিরি চোখে তাকায়। শুনিয়ে শুনিয়ে যা-তা গান গায়। আবার যদি মেয়েটাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ওরা সব পারে।'

'সেইজন্যেই এসেছি। আমিও সেই ভয়ই করছি। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই বিয়ে হবে। মেয়েকে ডাকুন।'

অনুরাধা ঘরে এল। নীল শাড়ি। অনেক চুল মাথায়। খোঁপাটা বিশাল হয়েছে। চওড়া পিঠ। একনজর দেখেই মাটিতে চোখ নামালুম। সেদিন সন্ন্যাসী মহারাজা বলছিলেন, মেয়েদের পায়ের দিকে তাকালে আর মনে কাম আসে না। অনুরাধার পা দেখছি। অতই সহজ মহারাজ! আপনি তো বলেই খালাস। মন যে কত বেয়াড়া, সে একমাত্র তারক সরকারই জানে। পা বেয়ে মন ওপরে উঠছে সাপের মতো কিলবিলিয়ে। তারক সরকারের মতো জঘন্য আদমি আর দুটো নেই। কিশোরীদা অনুরাধার অনামিকায় একটা আংটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, সুখী হও। অনুরাধা প্রণাম করার জন্যে নিচু হল। আমার মনে হল, বিয়েটা আজ রাতে হলেই ভাল হয়। সন্ন্যাসী মহারাজ সেদিন বলছিলেন, বিচার! তোমরা সব বিচার করবে। বস্তুবিচার। যেমন, এই দেখো, টাকাতেই বা কী আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কী আছে। বিচার করো. সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি মল, মূত্র— এইসব আছে। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

মহারাজ! কেন যাবে না! ঈশ্বর তো কোনওদিন সামনে এলেন না। ধ্যানে তাঁকে ধরতে হবে। মূর্তি যে সব আছে, কারও চারটে মাথা, কারও মাথা যদি বা একটা হল, হাত হয়ে গেল চারটে।

আর এই যে কিশোরীদার সামনে হেঁট হয়ে আছে কামিনী, চওড়া পিঠ, পাতলা ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের ফিতে, হাড় মাংস চর্বি বলে তো চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। অত বড় খোঁপা! চুল খুলে দিলে পিঠ ছাপিয়ে কোমরে। ভালবাসা আপনি এসে যাচ্ছে গুড়গুড়ে বানের মতো। অনুরাধাকে অনেকটা মা সরস্বতীর মতো দেখতে।

মহারাজ! সরি! আমার বিচার আসছে না। আমার কাঞ্চন চাই। এইরকম এক কামিনীর জন্যে। প্রেম আর কাম, ভোগ আর দুর্ভোগ সব মিলিয়ে জীবনটা হয়ে যাবে গামলার রসগোল্লা। একদিন মৃত্যু এসে টপ করে তুলে খেয়ে ফেলবে। তারপর যো হোগা, সো হোগা।

ফেরার পথে কিশোরীদার আর এক চেলা গোপাল বললে, 'গ্যারাজের পেছনে কালুর দলের তিনটে ছেলে ঘাপটি মেরে আছে অনেকক্ষণ।' গোপালকে, 'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে কিশোরীদা গাড়ি ঘোরাল।

'যাবে কোথায়?'

'ফেস টু ফেস হলে আমাকে রিভলভার চালাতেই হবে। তিনটে কেন তিরিশটা ছুঁচোর মহড়া আমি নিতে পারি। কেসে জড়িয়ে যাব। এখন ঠান্ডা মাথা চাই। চল থানায় গিয়ে আড্ডা মেরে আসি।'

'থানা তো তোমাকে সাহায্য করবে না।'

'সাহায্যের তো প্রয়োজন নেই। ওসি আজ রাতে আমাদের আসরের প্রধান অতিথি। এক বোতল বিলিতি আছে।'

'তার চেয়ে চলো চম্পাকে নিয়ে আসি।'

'মন্দ বলিসনি। আজই ওকে আমার সাদা গাড়িটা প্রেজেন্ট করে দিই।'

'সে কী?'

'তারক। গিভ অ্যান্ড টেক এই হল নিয়ম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবি।'

চম্পার মাকে দেখলে মনেই হবে না, ভদ্রমহিলার গর্ভ থেকে মাস্তান বেরোতে পারে। বাড়িতে নতুন রং পড়েছে। ভেতরে কোথাও কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। বেশ জমিয়ে পুজো হচ্ছে। চম্পা রোজ নিজেই পুজো করে। সে বিষ্ণুর উপাসক। নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে ঠাকুরঘরে। আমরা বসে রইলুম। গোপালের মতো একটি বালক কোলে কোলে ঘুরছে। বেশ সম্পন্ন একটি পরিবার। সবাই বেশ হাসিখুশি। আধঘণ্টা বসে থাকার পর চম্পা এল। কপালে চন্দনের টিপ। পেছন পেছন এল প্রসাদ। কিশোরীদা বলল, 'তোমাকে যে গাড়িটা দেব বলেছিলুম, সেটা রেডি। আজ দিন ভাল, তোমার হাতে দিতে চাই। নাও রেডি হয়ে নাও। আমার ওখানে চলো, নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে আসবে। একেবারে চাবুকের মতো গাড়ি।'

'কোনও শরবত খাবেন?'

'শরবত আমার ওখানেই হবে।'

'আমি তা হলে রেডি হয়ে আসি।'

চম্পা ড্রেস পালটে এল। একেবারে বোম্বে ছবির হিরো। বড় বড় চুল। খাড়া নাক। যখন পুজো করে তখন ভক্ত সাধক, যখন মাল খায় পাঁড় মাতাল, যখন অ্যাকশান করে পাকা ভিলেন। চম্পা মেয়েদের শ্রদ্ধা করে। নিজের মাকে দেবী বলে মানে।

গ্যারেজের গেট খুলে কিশোরীদা সোজা গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল নির্ভয়ে। সামনের সিটে কিশোরীদার পাশে চম্পা। আমি পেছনে আধশোয়া। কোথায় কে ঘাপটি মেরে আছে কে জানে। কিশোরীদার আগেই চম্পা নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে তিনটে ছায়ামূর্তি নেকড়ের মতো এগিয়ে এল। চম্পা হল শিকারি বাঘ। ডান পা-টা সোজা উঠে গেল ডানপাশে। ফকির ছিটকে পড়ল। বাঁ হাতটা বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল বাঁপাশে, সনাতন ছিটকে পড়ল গাড়ির বনেটের ওপর। তৃতীয় ছায়াটা ছিল নিতাইয়ের। পালাচ্ছিল, চম্পা ডান পা-টা নাচের ভঙ্গিতে সামনে ঠেলে দিল।

এক গাদা কুচোকাচা মরচে ধরা লোহা পড়েছিল একপাশে। নিতাই মুখ থুবড়ে পড়ল তার ওপর। চম্পা ফকিরকে ঘাড় ধরে তুলল, 'বল, কীভাবে মরতে চাস! কুত্তার মতো, না গোরুর মতো!'

'গুরু! সেমসাইড হয়ে গেছে।'

'সেমসাইডেও তো গোল হয়। টিম হেরে যায়।'

এক ধাক্কায় ফকির গিয়ে পড়ল মরচে ধরা লোহার গাদায়। সনাতন তুই কোথায় যাবি লেড়িকুত্তা। লেড়িদের ঠ্যাংটাই আগে যায়। চম্পা বুটপরা পায়ে একটা লাথি কষাল। সনাতন কুকুরের মতোই আর্তনাদ করে উঠল। নিতাইয়ের চোখে লোহা ঢুকে গেছে।

'এখানে তোরা কীসের ধান্দায় এসেছিলিস!'

ফকির চিঁচিঁ করছে।

'কালুর বাপের ক্ষমতা নেই তোদের বাঁচায়। কিমা করে দেব। কিমা।'

'আমরা কিশোরীদাকে মারতে চেয়েছিলুম।'

'তা তো মারবেই। একটা ভাল মানুষকে না মারলে চলবে কী করে। লোকটা যে আর পাঁচটা লোককে খাওয়াচ্ছে। তোদের পাকাপাকি ব্যবস্থা কাল হবে। তোদের ওই পেঁচোটাকে হাসপাতালে নিয়ে যা, বাকি জীবন একটা চোখেই চলুক। ওরে ফোকরে লিডার হতে গেলে কিছু এলেম লাগে। মদ মেয়েমানুষ আর পাতায় হয় না রে। যাঃ শালা ফোট।'

চম্পা এমনভাবে হাত দুটো ঝাড়ল, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। মশাটশা মেরেছে। কিশোরীদা আর চম্পার আড্ডা চলল কিছুক্ষণ। দু'-তিন পেগ আরক উড়ে গেল। নিতাইয়ের বোনটা পাড়াটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে— সে কথাও এল। ওঝার মৃত্যু সাপের ছোবলে, বলে চম্পা হাসতে লাগল হা হা করে। কিশোরীদা বললে, 'চম্পা, তুমি একটু দেখবে তো ছেলে আর মেয়েটাকে?'

'কোন ছেলে, কোন মেয়ে?'

'এর নাম তারক, মটোরের কাজ ভালই শিখেছে, এর সঙ্গে ওই অনুরাধার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।'

'কেয়া বাত হায়। দিয়ে দিন। কোনও শালার ক্ষমতা হবে না চম্পার রাজত্বে মেয়ে তুলে নিয়ে যায়। চম্পা মরে গেলে কী হবে সে কথা পরে। আজ উঠি কিশোরীদা। গাড়িটার দাম নিতে হবে কিন্তু।'

'এখুনি দিয়ে দাও, তোমার বুক পকেটেই আছে। দোস্তি। পারবে দিতে!'

'আলবত পারব।'

দু'জনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন দুই মায়ের পেটের ভাই। চম্পা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'তোমার প্রাণের গাড়িটা দিয়ে দিলে?'

'ওটা খুনি। জোড়াতালি দিয়ে আর একটা করে নিতে কতক্ষণ, সেটা হবে প্রেমিক। রংটা হবে আকাশের মতো হালকা নীল। আমার স্টকে দশটা গাড়ির মালমশলা আছে। গাড়ির ভাবনা আমার নেই। আমি কিং অফ কারস।'

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। অমাবস্যা। কালীঘাটের মন্দিরে জবরদস্ত ভিড়। পুজো চলছে দাপটে। আমরা বসে আছি পূজারির ঘরে। অনুরাধা লাল বেনারসিতে লাল। অনুরাধার মা সাদা কাপড়ে সাদা। অনুরাধার মুখে টিপ টিপ চন্দনের ফোঁটা। পূজারির স্ত্রী সাজিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে। সামান্য আয়োজনে বিয়েটা হয়ে গেল। সম্প্রদান করলেন কিশোরীদা। হৃদয়ে হৃদয়দান হয়ে গেল। দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। পূজারি বললেন, 'মেয়েটি সর্ব সুলক্ষণা। এর কল্যাণে স্বামীর কল্যাণ হবে।' কিশোরীদা বললেন, 'আজকে তোদের বাসর হবে আমার ঘরে। কাল থেকে নিজেদের সংসার।'

না, আমার বিয়েতে সানাই বাজেনি। নিমন্ত্রিতরা গভীর রাত পর্যন্ত আসেনি উপহার হাতে। টিপ

টিপ আলোর ঝালর ঝোলেনি বাড়ির সামনের দেয়ালে। ভিয়েন বসেনি। কেউ দেয়নি কো উলু কেউ বাজায়নি শাঁখ। অন্ধকার রাতে শান্ত বিয়ে, মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা। পূজারির বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ। কিছু ফুল ছিল। সুগন্ধ ছিল।

সঙ্গে এসেছিল মন্দিরের শাক্ত ভোগ। তাই খাওয়া হল ফলাও করে। কিশোরীদা গান শোনালেন। প্রাণখোলা গান। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে দড়ির মই নেমে এসেছে। সুরের মই। ধরে ধরে উঠে যাচ্ছি মেঘলোক ছাড়িয়ে চন্দ্রলোকে, গন্ধর্বলোকে। শেষ গান গাইলেন, হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ চিনি না। হঠাৎ গান থামিয়ে, 'রাত ঢলে যায়। যাও তোমরা বাসরে চলে যাও। প্রিয়া! মোছো আঁখিজল, মধুরাত বয়ে যায়।'

ঘরটা ছিল কিশোরীদার মায়ের ঘর। খুব উঁচু ছাত। এই ঘরটা আগে কখনও খোলা হয়নি। দেয়ালে কিশোরীদার বাবার বড় ছবি। একপাশে বাঘথাবা বিশাল খাট। কাঠের গায়ে লতাপাতার কাজ। মার্বেল পাথরের মেঝে। দেয়াল আলমারিতে পোর্সিলিনের বিলিতি পুতুল। দু'কোণে দুটো কর্নার টেবিল। দেয়ালে সোনার জলের কাজ ছিল। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। বড় বড় জানলা। দরজার মাথার ওপর আধা গোলে নানা রঙের কাচ। ঘরটার পাশ থেকেই বাড়িটার ভাঙন শুরু হয়েছে। ওই দিকেই ছিল নাচমহল, চণ্ডীমণ্ডপ, অতিথিশালা। ছবি আঁকার স্টুডিয়ো। বিলিতি চিত্রকররা এসে ছবি আঁকতেন। একটা স্টাডি ছিল। সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার এখানে বসে নাটক লিখেছিলেন। মেবারপতন। সেইসব দিনের নাচ, গান, বাজনা, হাসি, গল্প, উৎসব, স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে একপাশে। কিশোরীদা বললেন, 'আমি তোমাদের পাশেই আছি। দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা করে নাও।'

অনুরাধা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঝরাতের দেবীর মতো। বার্মা কাঠের দরজার পাল্লা বন্ধ করে সেইখানেই বসে পড়লুম দরজায় পিঠ রেখে। আমি তারক সরকার বা গুছাইত যাই হই না কেন, এই বুদ্ধিটুকু ঈশ্বর আমাকে সেই রাতে দিয়েছিলেন— তুমি যদি একটা দু'পেয়ে জন্তুর মতো ওই সজীব সবুজ ঢলঢলে লাল মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাও, ওর মনে পড়ে যাবে সেই রাতের আতঙ্কের কথা। তিনটে কি চারটে মদ্যপ পশু। আধা-খেঁচড়া একটা ঘর। চুন বালি সিমেন্টের ছড়াছড়ি, গন্ধ, ছাদ ঢালাইয়ের কাঠ, গজাল পেরেক, ধেনো মদের বোতল। একে একে জামাকাপড় টেনে টেনে খুলছে, ছিঁড়ছে, ফাঁড়ছে, খাবলাচ্ছে, খোবলাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে।

'অনুরাধা, যাও শুয়ে পড়ো, তোমার ভয় নেই, আমি তোমার বন্ধু।'

'আপনি শোবেন না।'

'আমি এইখানেই শুয়ে পড়ব।'

'কেন, আমার পাশে শুতে আপনার ঘেন্না করছে?'

এই কথাটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলুম। দরজার কাছ থেকে উঠে অনুরাধার কাছে গিয়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। নরম একটা শরীর।— 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি অনুরাধা। সেই প্রথম দিনেই পেয়ারাগাছের ডালে বসে তোমাকে ভালবেসেছিলুম।' অনুরাধা মাথাটা আমার বুকে গুঁজে দিল। ঘোমটা খুলে পড়ল। টান খোঁপার দু'-একটা চুল একটু উসকো হয়ে গেল। পেছন থেকে আলো পড়ে চকচক করছে। অনুরাধা কাঁদছে। চিবুকের তলায় আঙুল রেখে মুখটা তুলে ধরলুম। পানপাতার মতো মুখ। কপালের টিপে ঘষা লেগেছে। তরমুজের ফালির মতো ঠোঁট। তিরতির করছে পাখির পেটের মতো। সারা দুপুর রোদে ঘোরা তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো আমি আকণ্ঠ পান করলুম। কিছু কিছু দেখা আছে, যা মানুষ কোনও দিনই ভুলতে পারে না। বিশ্বনাথ সরকার দু'হাতে সরলা চৌধুরীকে তুলছে। এগিয়ে যাচ্ছে। খাটে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। অসহায় সরলা পা দোলাচ্ছে। আমি দু'হাতে অনুরাধাকে মেঝে থেকে তুলে ফেললুম। অনুরাধা এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। সেই বিশাল খাট, মখমল ঢাকা বিছানা। এই খাটেই হয়তো কিশোরীদার জন্ম হয়েছিল।

পাপ আর পুণ্য কাকে বলে? মহারাজের কাছে ছুটতে হবে না। আমি নিজেই তার উত্তর জানি। সমাজ, ধর্ম আর সংসারের সমর্থন থাকলে আর পাপ হয় না। সরলামাসিও এইভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরত। আমার ভয় করত। আমি ছোট হয়ে যেতুম, কুঁকড়ে যেতুম। কানের কাছে অনবরত কেউ বলত, তারক, এ গোপনীয়, এ পাপ, এ কেউ সমর্থন করবে না। জানাজানি হলে সবাই নিন্দে করবে। যা-তা বলবে। একটা শব্দ, বিয়ে, সামান্য একটা অনুষ্ঠান, একটু সিঁদুরের ছোঁয়া, অপরিচিত একটা মেয়ে আর মেয়ে রইল না, হয়ে গেল স্ত্রী, আমি তার সর্বস্বের মালিক। সেও আমার সর্বস্বের মালিক। সমাজ আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছে।

তারক সরকারের এত প্রেম কোথায় ছিল, এত চোখের জল! যা যা হারিয়ে গেছে সব ফিরে আসছে আজ রাতে। সব তুমি নাও অনুরাধা, দুঃখ সুখ সাফল্য অসাফল্য। কাম থেকে এইভাবে প্রেম আসে। ধর্ষণ হয়ে ওঠে সোহাগ, আদর। অনুরাধা ফিসফিস করে বললে, 'কী হচ্ছে তোমার পাগলামি। তুমি আমার পায়ে মাথা রাখছ কেন? মাথায় যে ভগবান থাকেন।'

মনে মনে বললুম, শয়তানও থাকেন। মুখে বললুম, 'এমন পা আমি দেখিনি।' সমুদ্রের ফেনার মতো পিচ্ছিল একটা শরীর। অভ্রের মতো চকচকে। ঘাসের মতো গন্ধ। বাতাসের মতো শীতল, শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো গড়ন। মেঘের মতো জড়িয়ে ধরে, বিদ্যুতের মতো হাসে। যার পেটে মাথা রাখলে মনে হয় মন্দিরের বেদিতে মাথা রেখেছি। অন্ধকারে যার চোখ দেখলে মনে হয় কালো দিঘিতে নাইতে নেমেছি। যার কাছে চিরকালের মানুষের চির প্রশ্ন তুমি কে? তুমি রাত, না তুমি দিন? তুমি উদয়, না তুমি অস্ত? নারীশরীর আমি খুব দেখেছি। উলটে-পালটে দেখেছি। এ-চোখে কোনওদিন দেখিনি। প্রেমের চোখ। অপবিত্র করার চোখে দেখেছি, পূজার চোখে এই প্রথম দেখা। একটা রাতেই কীভাবে আমি পশু থেকে মানুষ হয়ে গেলুম।

ভোরের প্রথম আলোটা লাগল দরজার মাথার ওপর বসানো বাহারি কাচে। পাশের ঘরে কিশোরীদার হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কী একটা রাগ ভাঁজছে ভরাট সুরেলা গলায়। দরজা খুলে আমরা দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। কিশোরীদা একটা সুটকেস গুছোচ্ছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল — 'বা' বেশ মানিয়েছে। দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেছে তো!'

'তুমি ভোরবেলা সুটকেস গুছোতে বসেছ।'

কিশোরীদা সুটকেস ফেলে গাইতে লাগল,

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয় পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

চোখের কোনায় একটু জল। আকাশে ফটফট করছে সকাল। কিশোরীদা বললে, 'আমার সামনে দু'জনে বোস। সকালের আলোয় ভাল করে দেখি।

'তুমি কি কোথায় যাচ্ছ?'

'তা হলে শোন, একটা গল্প বলি। কোনও এক মায়ের কাহিনি। সুন্দরী। সেকালের মাপে শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আর সেই মায়ের স্বামী ধনী। স্বভাবটা ছিল মৃদু। উদার। লোকে বলত স্ত্রৈণ। যথেষ্ট

লেখাপড়া জানতেন। ছবি আঁকতে পারতেন। গান-বাজনার ভক্ত ছিলেন। অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত করতেন। লেখার বাতিকও ছিল— গল্প, কবিতা। তাঁকে ঘিরে রেখেছিল স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী একদল চাটুকার। বড়লোকের যা হয়। এই দলের কয়েকজনের লক্ষ্য ছিল ওই সুন্দরী মহিলার ওপর। এর মধ্যে একজন ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মহিলাটিকে নিয়ে সরে পড়ার। কর্তামশাই স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভূতের নৃত্য শুরু হল। একা মহিলা সামলাতে লাগলেন সব দিক। মহিলার চরিত্রে কোনও দুর্বলতা ছিল কি না, যে এই কাহিনি বলছে তার জানা নেই। তবে অনেক পুরুষের আসা যাওয়া ছিল সেই বাড়িতে। মহিলা তাদের কাজে লাগাতেন। একের পর এক মামলা। মামলা সামলাতে জলের মতো টাকার খরচ। কিছু কিছু ক্ষমতাশালী মানুষকে রূপের চটকে ভোলাবার চেষ্টা। মহিলার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল— ছেলে। ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে, বিলেত যাবে। ছেলে কলেজে ভরতি হল, মদ খেতে শিখল, মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে শিখল। প্রেমে পড়ল এক বেশ্যার। মহিলার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। একদিন সেই ছেলে বসে বসল, চরিত্রের বড়াই কোরো না। বয়েস যখন ছিল, তখন তুমি কী না করেছ! তোমার জন্যেই তো বাবা মারা গেলেন। সাতদিনের মধ্যে মহিলা সব ছেড়ে চলে গেলেন কাশী। ছেলে আর কোনও খবরই রাখল না। মনে মনে মায়ের চরিত্রে কালির পোঁচ মাখাতে মাখাতে, ঘৃণার পরদা ফেলতে ফেলতে এমন একটা ব্যবধান তৈরি করে ফেলল, যেন তার মা বলে কেউ ছিল না। একদিন খবর এল দশাশ্বমেধ ঘাটে পড়ে গিয়ে সেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। চলে যাওয়ার পর মানুষের মূল্য বাড়ে। বেঁচে থাকার তিক্ততা ঘুচে যাওয়ার পর প্রকৃত রূপ দেখা যায়। মানুষটি তখন চলে গেছে সমস্ত অনুশোচনার ঊর্ধ্বে। তখন আর ক্ষমা চাইবার, সেবা করার অবকাশ থাকে না। থাকে শুধু প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ। জীবনে কিছু অপরাধ থাকে তারক যা জীবন দিয়ে শোধ করতে হয়। সেই মায়ের মৃত্যুদিন এসে গেল। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে দাঁড়াব। ওই কি সেই পইঠা, যেখানে আমার মা মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। পাথরে লেগে কপাল ফেটে গেছে। লোকে জল দিচ্ছে মুখে। কাঞ্চনবর্ণা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ খুঁজছেন। তাঁর ছেলের মুখ। ছেলে তখন লাল পাড়ায় মদের বোতল খুলে মেয়েমানুষের কোলে উঠে বসে আছে। তারক, নিশ্বাস বাতাসে পড়ে, আপশোস কোথায় পড়ে? অন্তরে। আগুনের হলকার মতো। ভেতরটা পুড়ে যায়। অনুরাধা, তুমি একটু চা করবে মা। আমাকে সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে।'

'ক'দিনের জন্যে যাচ্ছ শুনি।'

'কয়েকদিন। তুই এখন তৈরি হয়েছিস। তোর ওপর নির্ভর করা যায়। ঘোষ ডাক্তারের গাড়ির মোবিলটা চেক করে ডেলিভারি দিয়ে দিস। নতুন কোনও গাড়ি সার্ভিসে এলে ফেরত দিবি। ছোটখাট মেরামতির কাজ করে দিস। এই বাড়িতেই তোরা হনিমুন কর। চাবিটাবি সব রইল. সাবধানে থাকিস। কোনও বিপদ এলে চম্পার সাহায্য নিস। যাও, দেখছ কী। চা চাপাও। উনুন নেই মা, স্টোভ আছে—'

> আমার মনের কোণের বাইরে
> আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে ॥
> কোন অনেক দূরে উদাস সুরে
> আভাস যে কার পাই রে—
> আছে আছে নাই রে ॥
> আমার দুই আঁখি হল হারা,
> কোন গগনে খোঁজে কোন সন্ধ্যাতারা
> কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে যে যায়,
> কাঁপে হৃদয় তাই রে—
> গুনগুনিয়ে গাই রে ॥

'অনুরাধাকে গান শেখাস। ওর ভেতর গান আছে।'

'তোমাকে যেতেই হবে? আমাদের ফেলে চলে যাবে?'

'ডাক এসেছে আমার সে-দেশ থেকে, বিদায় নেব একটিবার শুধু তোমায় দেখে।'

ঘণ্টাখানেক পরেই কিশোরীদা সুটকেস হাতে বেরিয়ে চলে গেল। পেছন ফিরে একবারও তাকালও না।

॥ সাত ॥

তারক সরকারের সংসার হল। তারক সরকারের প্রেম এল। অনুরাধা চান করে চুল ঝাড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। চান করে পাখি যখন ডানা ঝাড়ে, সেই দৃশ্য দেখলে যেমন মনে হয়, জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়, সেইরকম একটা ঘোর লাগছে চোখে। পিঠের দিকটা চওড়া হয়ে ঢালু কাঁধে গিয়ে মিশেছে। শক্ত কোমর গোল হয়ে নেমে গেছে গোড়ালির দিকে। ইট রঙের নতুন তাঁতের শাড়ি কোমল শরীরে খড়খড় করছে। এই আমার বউ। শেষ পর্যন্ত তারক সরকারের মতো এক পাপী বাজি জিতল। খুব যত্নে রাখতে হবে এই বউকে। রোদে পোড়ানো জলে ভেজানো চলবে না। আমার মা দেখতে পেল না এই যা দুঃখ। লোকে মনে করে খুনির ছেলে খুনি হবে, পাগলের ছেলে পাগল, সাধুর ছেলে সাধু, ডাকাতের ছেলে ডাকাত। এইবার সকলের চোখ ঠিকরে যাবে। এই আমি তারক সরকার, কার মেকানিক।গাড়ির শব্দ শুনে বলে দিতে পারি, অসুখটা কী! এম. এ. বি.এ হবে না। কিন্তু বিয়েটা কেমন হল! আর রোজগার! যত লেবার দোব তত চাঁদি আসবে। মাই নেম ইজ তারক সরকার। লোকে আমাকে কড়ি কপালে বলে হিংসে করে।

অনুরাধা বললে, 'কিশোরীদার তো রান্নাঘর বলে কিছু নেই। উনুন চাই, কড়া চাই, চাটু চাই, থালা, বাটি, হাতা খুন্তি সবই তো চাই।'

'সব তো বাড়িতে আছে, চলো নিয়ে আসি। একটা গাড়ি নিয়ে যাই। সব বোঝাই করে নিয়ে আসি।'

'এই বাড়িতেই কি চিরকাল থাকবে?'

'না, তা কেন? কিশোরীদা এলেই আমরা চলে যাব।'

'তা হলে রান্নাটা ও-বাড়িতেই হোক, শোয়াটা এ-বাড়িতে।'

'তুমি সারা দিন একা একটা বাড়িতে থাকবে!'

অনুরাধার মুখ শুকিয়ে গেল। বারান্দার ওপাশ থেকে আমার পাশে চলে এল। পুরনো কথা মনে পড়ে গেছে। কালু কালোয়ার, ফকির, সনাতন, নিতাইও হয়তো ছিল। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে নেকড়ে বাঘের মতো। অনুরাধা কেমন যেন হয়ে গেল। যেন আবার তারা তেড়ে আসছে।

'ভয় নেই অনুরাধা। তোমাকে একা রেখে আমি কোথাও যাব না। ভয় আমারও আছে। তোমাকে আমি পেয়ে হারাতে চাই না, তা হলে আমি আর বাঁচব না। রান্না এইখানেই হবে। তোমাতে আমাতে যাই চলো। তুমি দেখেশুনে সব আনবে।'

'আমি বলব, তুমি একসেট নতুন কেনো। কিশোরীদার কাজে লাগবে। একটা তোলা উনুন, দুটো স্টিলের থালা বাটি গেলাস, একটা পেটা কড়া। তুমি আমাকে নিয়ে চলো, সব গুছিয়ে আনছি।'

'চলো। এ বাজার থেকে কিনব না। আমরা নতুন বাজার থেকে কিনব।'

'একটু সাজব?'

'একেবারে না। তুমি বেশি সাজলে তোমাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কালুর দলের কেউ কেউ বদলা একটা নেবেই। আমার মন বলছে।'

নতুন বাজারে অনুরাধাকে ছেড়ে দিলুম— 'নাও কী কিনবে কেনো!'

অত জিনিসপত্র, তার মাঝে অনুরাধা। মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সংসার মেয়েদের স্বপ্ন। সাজাবে গোছাবে কাটবে কুটবে বেলবে বাটবে। তোমার যা মন চায় কেনো। আমার কাছে অনেক টাকা। চুরির টাকা নয়, মেহনতের টাকা। অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। বড় থেকে ছোট হতে হতে ওপর দিকে উঠে গেছে। ঝকঝকে থালা। বড় ছোট কৌটো। গেলাস বাটি। অনেক সংসার যেন এক জায়গায় এসে জমেছে। অনুরাধা এপাশে যাচ্ছে, ওপাশে যাচ্ছে। দোকানদারও মুগ্ধ। দোকানের বাইরে শীতকালের কমলালেবু রঙের রোদ। শহরের উত্তাপ কমে যাওয়ায় মানুষ বেশ খুশি খুশি। ট্রাম যাচ্ছে ময়দানের দিকে মন্থর গতিতে। এখন সব চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সময়। ছেলেদের ময়দানে ক্রিকেট খেলার মরশুম। অনুরাধা ক্লান্ত হয়ে উঁচু একটা টুলে উঠে বসেছে। ফরসা বুকে ছোট্ট একটা লকেট দুলছে। কানের গোল রিং দুটো যেন কথা বলছে। দুলে দুলে। দোকানদার হিন্দুস্থানি চা আনিয়ে আমাদের খাওয়ালেন। রাজস্থানের মানুষ, বেশ হাসিখুশি আলাপী লোক। অনুরাধাকে বললেন, এই হাতে মেহেন্দি বেশ মানাবে। আমাদের মেয়েরা অনেক ডিজাইন জানে। খালি দুটো প্যাকিং বাক্সে আমাদের মাল প্যাক হয়ে গেল। দশটা একমাপের কৌটো কেনা হল। রান্নাঘরের তাকে পাশাপাশি থাকবে। চা চিনি, মশলা, সুজি। আমি একটা ট্যাক্সি ধরে আনলুম। ট্যাক্সিতে উঠে একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে, 'উঃ, কত জিনিস বলো, সব নতুন, ঝকঝক করছে। আমি নিজে হাতে মাজব, কারও হাতে দোব না। তোমার অনেক খরচ হয়ে গেল!'

'একটা গাড়িকে হাঁ করাব, ঝরঝর করে টাকা পড়বে।'

'তা হলে আইসক্রিম খাওয়াবে!'

'ক'টা আইসক্রিম খাবে তুমি?'

'বেশ বড় একটা, সব ফলটল দেওয়া থাকবে।'

'চলো, সাউথ-এ যাই, বেশ ভাল একটা জায়গায় গিয়ে জমিয়ে খাব। আজ আমাদের দিন।'

সারাটা দিন আমরা ঘুরে বেড়ালুম। কলকাতার সব স্বপ্নময় জায়গা। অনুরাধা কখনও আমার কাঁধে মাথা রেখে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তার হাতের মুঠোয় আমার হাত। কখনও সামনে ঝুঁকে পড়ল। বলতে লাগল, সব কেমন সত্যি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সিনেমা হচ্ছে। একসময় আমরা ফোর্টের পাশ দিয়ে পশ্চিম গঙ্গায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ফিরে এলুম।

অনুরাধার নতুন উনুনে আগুন পড়ল। ভুসভুস করে ধোঁয়া উঠছে, আকাশের দিকে। অন্ধকারে গ্যারেজের টিনের চালাটা অদ্ভুত সাদা দেখাচ্ছে। গাড়ির ভাঙা বডি পড়ে আছে। গোটাকতক বড় ড্রাম। একখণ্ড খোলা জায়গায় উনুনটা। এলোমেলো ধোঁয়া। বাতাসে শীত শীত। বসে আছি চুপ করে। মনে হচ্ছে, কলকাতার বাইরে বেড়াতে এসেছি। এই দিকটা বড় ফাঁকা। কিছু দূরে ঝিল। হিন্দুস্থানি বস্তি। বাড়িটাব ভাঙা অংশ। কিটকিট করে পোকা ডাকছে নানারকম। চিলের ছাতে পেঁচা ডাকল তিনবার। অনুরাধা নিজের মনে দালানে বসে রাঁধছে। গনগনে আগুনে মুখটা যেন পেতলের মুখ।

কিশোরীদা নেই। আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু মাধাই নেই। নিতাইটার চোখ থাকবে না যাবে বোঝা যাচ্ছে না। হেড মেকানিক দাসবাবু আর তাঁর আসিস্টেন্ট বলাই কাজ সেরে চলে গেছে। চারপাশ থেকে ভীষণ একটা ভয় চেপে আসছে। রাতের শিকারি জন্তুর মতো আমার চোখ জ্বলছে। বেশি সুখ কি সহ্য হবে! অসুখটাই তো আমার সুখ। অনুরাধা দু'বার তাগাদা মেরেছে— বাইরে হিমে বসে থাকার মানেটা কী। অসুখ হলে কী হবে! অনুরাধা জানে না আমি কেন বসে আছি। পাহারাদার, চৌকিদার। যদি তারা আসে। কিছু দূরেই ঘাসের ওপর একটা স্প্যানার পড়ে আছে। ওটা দিয়ে অনুরাধাকে বাঁচাতে পারব। হিন্দুস্থানি বস্তির দিকে পালানো যাবে না। মাঝে ঝিল। রাস্তা ধরে সাত মিনিট হাঁটলে প্রথম দোকান বৈশালী। সেইটুকু যেতে যেতেই ওরা টুকরো টুকরো করে

দেবে। কালো বিশাল গেটটা বন্ধ। দু'পাশে দুটো কনকচাঁপার ঢ্যাঙা গাছ। পেঁচাটা আবার ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। কিশোরীদা বলত ও আমার লক্ষ্মী পেঁচা। অনুরাধা লুচি ভাজছে। একাই বেলছে, একাই ভাজছে। অনুরাধা লুচি ভালবাসে। বাতাসে সুরেলা গন্ধ।

সব দোরতাড়া বন্ধ করে আমরা ঘরে এলুম। পাথরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে খোঁপাটা এলো করে মাথাটা দু'-তিনবার ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকাল। চুল ভেঙে পড়ল পিঠের ওপর। ঘাড়ের কাছের চুল বাঁ হাতে মুঠি করে ধরে একটু উঁচুতে তুলে ঘাড়ের কাছটা আঁচল দিয়ে মুছল। অনেকক্ষণ একভাবে আগুনের কাছে বসে ছিল।

'আমার রান্না কেমন?'

'চমৎকার।'

'পেট ভরে খেয়েছ তো!'

'পেট ভরে? পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম।'

'মায়ের কাছে রান্না শিখেছি। কিছু উল কিনে দিয়ো তো। তোমাকে একটা সুন্দর সোয়েটার বুনে দোব।'

'দোব। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একজন কাজের লোক দরকার।'

'দু'জনের সংসারে আবার কাজের লোক!'

অনুরাধা চুলের ফিতে খুলে একটা আলগা খোঁপা করল। ভেতরের জামাটা খুলে রেখে দিল। লেপের তলায় ঢুকে বললে, 'কী আরাম।' রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। শীতটা বেশ জাঁকাচ্ছে। দূরে, ঝিলের ধারে কুকুর কাঁদছে। অনুরাধা দু'হাতে আমাকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরল। ভয়, ভীষণ ভয়! ওই বুঝি আসছে তারা।

'কুকুর কাঁদছে কেন গো!'

'কুকুর তো রোজই কাঁদে মানুষের অবস্থা দেখে।'

অনুরাধা আরও গভীর হয়ে এল আমার শরীরের সঙ্গে। আমার ভেতরে সে ঢুকে পড়তে চাইছে। দূরে একপাল কুকুর, যেদিকটায় হিন্দুস্থানি বস্তি সেদিকটায় বুকফাটা কান্না কাঁদছে। ওরা অনেক কিছু দেখতে পায়, যা মানুষ দেখতে পায় না। অনেক সময় আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমরা দিন দিন কতটা উচ্ছন্নে যাচ্ছি।

ঘরটা আমাদের তুলনায় বিশাল বড়। বড় মানেই ভয়। থইথই অন্ধকারে একটা ভেলায় ভেসে আছে দুটি প্রাণী। মনে হচ্ছে কিশোরীদার মা ছবি থেকে নেমে এসে বলছেন, তোরা কে? কেন এসেছিস আমার ঘরে! বাইরে অত বড় একটা দালান। দৌড়ে চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেখান থেকে পাক মেরে পশ্চিমে। এই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার কথা ভাবা যায় না। ওখানে কিশোরীদার অশরীরী পূর্বপুরুষরা পায়চারি করছেন। কিশোরীদা কী শাস্তি দিয়ে গেল! দিনের বেলা বুঝিনি। বুঝছি এই গভীর রাতে।

কুকুরগুলো বাড়িটার পোড়ো অংশে চলে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ভুউউ করে কাঁদছে। মনে হয় ওরা কারওকে অনুসরণ করে আসছে। কালু কালোয়ারের প্রেতাত্মা। এক চোখো নিতাই। হাত ভাঙা ফকির। ধার্মিক চম্পা। অন্ধকারকে যারা খুব ভাল চেনে তাদেরই কেউ ঝিলের ওপার থেকে এপারে এসে গেছে। বাইরের দালানে হাঁটু ভাঙার শব্দ। অস্পষ্ট খসখস। বিছানায় দু'জনেই উঠে বসলুম। অনুরাধা দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। দরজার মাথার ওপর কাচে একটা আলোর আভা ফুটেই মিলিয়ে গেল। অনুরাধা থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত জানলা বন্ধ। একটা ঝিঁঝি পোকা অবিরাম ডেকে চলেছে। গ্যারেজের চালে একটা ইট পড়ল।

অনুরাধা বললে, 'ওরা এসে গেছে। ওরা ধরার আগে তুমি আমাকে মেরে ফেলো।'

'মরলে দু'জনেই মরব। আমি আজ একটা ছুরি কিনেছি।'

আমরা কাঠ হয়ে দু'জনে বসে আছি। মাঝরাতের মেঠো ঠান্ডা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি দরজার দিকে। খোলবার চেষ্টা করলেই স্প্যানারটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সেটাকে ঘাস থেকে তুলে এনে মাথার কাছে রেখেছি। ফাইট একটা দোবই। ঘরের দেয়াল ঘড়ির স্প্রিং-এ খড়ড় করে একটা শব্দ হল। তিনটে বাজল। শীতকাল, দিনের আলো ফুটতে এখনও পাক্কা তিন ঘণ্টা। অনুরাধা ঘড়ির শব্দে চমকে উঠে আরও জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মনে হল, পশ্চিমের জানলার বাইরে কেউ শিস দিল।

একসময় মনে হল এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কোথাও ভোরের একটা পাখি ডাকল। সে যে কী সান্ত্বনা! দুটো শরীর শিথিল হয়ে এল। পাখি যখন ডেকেছে, তখন পাখি দিন দেখতে পেয়েছে। আমাদের আতঙ্কের রাত শেষ হয়ে এল। পাখিটা আরও দু'বার ডাকল। কোনও ছোট পাখি। খুব কচি গলা। আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লুম। যেন আমরা একটা মানুষ, দুটো রুটির মতো সেঁটে গেছি।

খুব আলো এসে আমাদের যখন জাগাল, তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। তখনও দরজা খুলতে ভয় করছে। যদি কেউ থাকে। দরজা অল্প ফাঁক করে বাইরে তাকালুম। কেউ কোথাও নেই। ধবধবে সাদা দালান। দু'জনে বেরিয়ে এলুম। দালান থেকে রক। রক থেকে জমি, মাঠ, বাগান, গ্যারেজ। কাল খুব শিশির পড়েছিল। গ্যারেজের কাছে একটা বেল পড়ে আছে। এই বেলটাই কাল টিনের চালে পড়েছিল। অনুরাধা আনন্দে একটু ছুটে নিল। বেঁচে যাওয়ার আনন্দ; একটা খাঁচায় অনেক মুরগি। রোজই কিছু ভোগে যায়। যে ক'টা বেঁচে গেল গেল। আবার একটা দিন ক্যাঁচোর ম্যাচোর, খুঁটে খুঁটে খাবার খাওয়া। আমাদেরও সেই অবস্থা। দু'জনে খুব ছোটাছুটি করলুম। অনুরাধা বললে, 'কী সুন্দর লাগছে, যেন স্বর্গে আছি।'

দিন একটু গড়াতেই মনে হল— আজ রাতে আর এ বাড়িতে থাকা যাবে না। মানুষের ভেতর থেকে বলে দেয় কোন জায়গাটা নিরাপদ আর কোন জায়গাটা নিরাপদ নয়! শুনলে ভাল না শুনলে মরবে। বড় বিপদে ফেলে গেল কিশোরীদা। রাতে বাড়ি পাহারা দেবে কে! এত জিনিসপত্তর। ওদিকে অনুরাধাকে ও বাড়িতে রাখলে, তাকে কে পাহারা দেবে রাতে!

তারক সরকার জীবন যদি অত সহজই হবে তা হলে বেঁচে থাকার আনন্দটাই যে থাকে না! গোলাপে তা হলে কাঁটা থাকত না। লঙ্কা তা হলে ঝাল হত না। দাসবাবুকে বললুম, রাতে এ-বাড়িতে থাকুন না। তিনি বললেন, 'মাল খেয়ে রাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি করব সেটা ভাল হবে। তুমি বলাইকে বলো। বাড়িতে ওর জায়গা হয় না। রাজি হয়ে যাবে।' বলাই বললে, 'রাতে যে আমি একটু তবলা সাধি, তোমাদের অসুবিধে হবে না তো!'

বলাই এসে গেল ধুমসো একজোড়া তবলা নিয়ে। বলাই খুব ডাকাবুকো সাহসী ছেলে। নেশাভাঙ করে না। একটা দুশ্চিন্তা গেল। কিশোরীদার ঘরের মেঝেতে তার বিছানা হবে। খেলাটা জমে গেল রাত দশটার পর। শুরু হল বলাইয়ের তবলার রেলা। বাঘের মতো হাত। মুখে বোল বলছে, আর হাতে খই ফুটছে। কৎ তা গদি ঘেনে ধা। সারা বাড়িতে তবলার বোল দামাল একপাল শিশুর মতো ছোটাছুটি করছে। তা ধিন ধিন তা। অনুরাধা রাঁধছে। বলাইও খাবে। বলাইয়ের খাবার চাপা থাকবে। সাধনা শেষ হলে খাবে, সে কখন কে জানে। বলাই আহম্মদজান থেরকুয়ার মতো তবলিয়া হবে। তার হাতে নাকি গুপোর কাজ খুব ভাল খোলে— গুপগুপাগুপ। গবগবাগব। রাত বারোটা, বলাই থামে না, রাত একটা বলাই খেপে গেছে। মাঝে মাঝে তবলা ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পঞ্চাশ-যাটটা ডনবৈঠক মেরে নিচ্ছে। তারপর আবার তবলা। সে এক প্রলয় কাণ্ড। গলগল করে ঘামছে। মুখচোখের চেহারা অন্যরকম। থামার কথা বলতে গেলে আমাকেই তবলা করে দেবে। তালের এমন মজা, আমাদের সব কিছুতে একটা তাল এসে গেল। হাঁটা চলা খাওয়া শোয়া। সব তালে তালে। একটা মানুষ তবলার ভেতর এমনভাবে ঢুকে যেতে পারে— না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

তারক সরকার আমার নাম, লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমি কিছুই গুছোই না। ভাগ্যই আমার সব গোছগাছ করে দিয়েছে। একদিকে কেড়ে নিয়েছে আর একদিকে ভরে দিয়েছে। সেই কিশোরীদার বুড়োর গল্পের মতো। যে রোজ একটা না একটা উপহার নিয়ে বেশ্যাবাড়ি যেত। শেষের দিনের গোলাপফুল নর্দমায় পড়ে গেল— বললে, কৃষ্ণায় নমঃ। যমালয় থেকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগবান বললেন, আমিই তোমাকে দিয়ে সব করিয়েছি। বেশ্যাসক্ত করিয়েছি, কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়েছি। যমরাজের বাগানে গোলাপ ফুল কেটে কেটে ফেলার বুদ্ধি জুগিয়েছি। সবই আমি করিয়েছি, তুমি করেছ। বুদ্ধি আমার, কর্ম তোমার।

বলাই দাসও আমার অনেক গুরুর এক গুরু। একদিন দু'-দিন নয়, তিন-তিনটে বছর কিশোরীদার পাত্তা নেই। না চিঠি, না খবর। আমি, বলাই, অনুরাধা, অনুরাধার মা, চারজনে কাশী গেলুম। বাঙালিটোলার কাছে একটা হোটেলে উঠলুম আমরা। মন্দির মসজিদ আশ্রম ঘাট কোনও জায়গাই খোঁজার বাকি রইল না। সবাই আছে, কিশোরীদা নেই। সকাল বিকেলে বসে রইলুম মন্দিরে। সাধু-সন্ত, ভক্ত-ভণ্ড সবাই এল গেল, কিশোরীদার মতো একজনকেও মনে হল না। দোকান হোটেল সব অনুসন্ধান করা হয়ে গেল। কেউ আসেনি ওই নামে। এক প্রবীণ বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, বিন্ধ্যেশ্বরী মায়ের কাছে খোঁজ করো, কলকাতার সন্ন্যাসিনী। অনেক দিন কাশীতে আছেন। খুব শক্তি তাঁর। হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে তাঁর ছোট্ট ডেরা। দেখলে মনে একটা ভাব আসে। কিশোরীদার ঘরের দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার আছে। মহাপুরুষের মুখের ছবি, তার তলায় ইংরিজিতে বড় বড় করে লেখা আছে—

LO, We have looked upon the face of God.
Our life has opened with divinity

বিন্ধ্যেশ্বরী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সেই কথাই মনে হল। দেবীর মতো মুখ। মনে হল বয়েসকালে অনুরাধার মুখেও ওইরকম একটা ভাব আসবে। পাথরের মেঝেতে আমরা বসে পড়লুম। ঘরটা গুহার মতো। বেশ ঠান্ডা। ঘরে একটি শিবলিঙ্গ ছাড়া কিছুই নেই। সুন্দর একটা গন্ধ। আমরা প্রণাম করতে গেলুম, প্রণাম নিলেন না। অনুরাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সংসারে ঢুকলি কেন? তুই তো হরিণ। বাঘে ধরবে যে। বেশি রূপ থাকলে সংসার করতে নেই। মদনের অভিশাপ। 'মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি!' কে শুনেছিলেন! 'শুনি তাই আজি।' রবীন্দ্রনাথ।'

'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের

ঘরটা ঝনঝন করে উঠল— 'সাবধানে থাকিস মেয়ে যুগটা খুব খারাপ পড়েছে।'

কিশোরীদার একটা ছবি দেখিয়ে বললুম, 'মা, ইনি কি কখনও এসেছিলেন আপনার কাছে?'

'এ তো কিশোরী! একবার কেন অনেকবার এসেছে। কিশোরীর মা তো আমার কাছেই থাকত।'

'শেষ কবে আপনার কাছে এসেছিলেন?'

'তা হবে, বছর তিনেক হল। তিন-চার দিন ছিল আমার কাছে। সে তো আমার ছেলের মতো।'

'তিন বছর নিরুদ্দেশ।'

'তখনই দেখেছিলুম কড় ধরেছে। কড় ধরা জানো? দু'-চার পাত্তর মদ পেটে পড়লে, চোখ লালচে হয়, অল্প অল্প নেশার আমেজ, একেই বলে কড় ধরা। কিশোরীর মনে সেই ভগবৎ নেশা ধরেছিল। ভারতবর্ষ ভক্তের দেশ, ভক্তির দেশ। ডাকাবুকো ছেলে। দেখো কোথায় নিজেকে হারিয়েছে।'

'আপনি কিছু বলতে পারেন, কোথায় গেলে দেখা পাব?'

'না বাবা, সে আমি বলতে পারব না, আমার সে ক্ষমতা নেই।'

আমরা হতাশ হয়ে উঠে এলুম। ফিরে এলুম কলকাতায়। কিশোরীদার কত কী হতে পারে— কিশোরীদার কোনও দুর্ঘটনা হতে পারে, কিশোরীদা আত্মহত্যা করতে পারে, কিশোরীদা সন্ন্যাসী হতে পারে— এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তবু যা হয়েছে তা তো হয়েইছে। বলাই বললে, 'তা হলে এই ভূতের সম্পত্তি আগলে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তুমি খেটেখুটে করবে, আর কোনও এক শরিক এসে পেছনে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। এইসব বনেদি বংশের অনেক কাজিয়া আছে। এসব নিজের নামে কোনওদিন করতেও পারবে না, তোমার হাতে কোনও কাগজ নেই। চেক এলে তুমি ভাঙাতে পারবে না। এ কারবার করে লাভ কী!' দু'জনে মিলে অনেক জল্পনা-কল্পনা হল। এ সম্পত্তি তা হলে কার! কিশোরীদার কেউ না থাকলে এ-সম্পত্তি সরকারের। সব ফেলে রেখে আমরা যাই কী করে। কোথায় দলিল, কোথায় পরচা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর। চোদ্দো বছর না গেলে একজন মানুষকে মৃত বলা যাবে না।

গ্যারেজটা শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে গেল। স্মৃতি হিসেবে পড়ে রইল একটা ভাঙা মটোর গাড়ি। বলাই দাস বললে, 'দেখবে, একদিন সব দখল হয়ে যাবে। এত বড় একটা সম্পত্তি।' যায় যাবে, আমরা আর কী করতে পারি। তবে সহজে দখল ছাড়া হবে না। বাড়িটায় তবলার বোল খুব খেলে ভাল, যেন একশো নর্তকী নাচছে। একটা কিছু করতে তো হবে। পেট চলবে কী করে।

বলাই বললে, 'ভাই, আমার দু'হাতের দশটা আঙুল ছাড়া কোনও মূলধন নেই।

'আমার একটা বাড়ি বেচে দিই।'

'তারপর?'

'তারপর, যে কাজটা আমরা জানি সেই গ্যারেজের কাজই শুরু হোক।'

'তারক! মিস্ত্রির লাইনটা ভাল নয়। তেল-কালি-মোবিল ডিজেল। লোকে রেসপেক্ট করবে না। ছেলে মেয়ে মানুষ হবে না। মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারবে না। লোকে বলবে, তারক মিস্ত্রি।'

বেশ কিছুদিন ভাবনাচিন্তা চলল। বলাই মাঝরাতে তবলা সাধে। আমি আর অনুরাধা পরামর্শ করি। যত রাত বাড়ে তত লোভ বাড়ে। এত বড় একটা সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে চলে যাবে। গ্যারেজের ব্যাবসা খুব লাভের। মিস্ত্রি তা কী হয়েছে! সমাধানে আসার আগেই আমরা ঘুমিয়ে পড়তুম। বলাইয়ের তবলার বোল ঘোড়ার খুরের শব্দের মতো ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে যেত।

অনুরাধা হঠাৎ একদিন বললে, 'বলাইদার মতো তবলাটাকে বেশ একটু টানটান করে বাঁধো না। ঢ্যাবঢ্যাবে হয়ে যাচ্ছ কেন? পরের জিনিসে লোভ কেন? নিজে উপার্জন করো। এই সম্পত্তিটার ওপর এত নির্ভর করছ কেন। দেখার কথা দেখো। এখানে নতুন কিছু না করাই ভাল। নতুন কিছু করতে হলে অন্য কোথাও, অন্য কিছু করো। নতুন ভিতের ওপর দাঁড়াও।'

এক উপদেশেই তারক সরকারের জীবন ঘুরে গেল। সেদিন সন্ন্যাসী মহারাজ বলেছিলেন স্ত্রী হলেন শক্তি। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে। অবিদ্যা— যা থেকে কামিনী কাঞ্চন মুগ্ধ করে। বিদ্যা— যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করলে বিদ্যার আবির্ভাব। মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। তাই শক্তির পূজাপদ্ধতি। দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। বীরভাব মানে রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে— অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। অনুরাধা আমার সেই মায়াপাশ ছেদন করে দিল। বলাই কোথা থেকে খবর নিয়ে এল — সাত-আট বছর কোনও একটা জায়গায় বসবাস করলে অধিকার জন্মে যায়, তখন আর তাকে সে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। দরকার কী অত সবে। যা আছে থাক, আমরা সরে যাই।

যে আলমারির জিনিস কিশোরীদা অনুরাধাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা খোলা হল। অনুরাধা

টেনে টেনে সব নামাচ্ছে। অনেক শাড়ি। কিশোরীদার মায়ের আমলের জিনিস। কিছু পিঁজে গেছে। একটা গয়নার বাক্স। তার মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। একটা হার। গোটাকতক আংটি। সোনার জেল্লা কমে গেছে। সোনার ফ্রেমের ভারী পাওয়ারের একটা চশমা। লেডিজ শাল। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। একটা ছোট্ট খাতা বেরোল। কিশোরীদার হাতের লেখা। অনেক কিছু লেখার মধ্যে একটা নাম ঠিকানা পাওয়া গেল— পরেশনাথ ভট্টাচার্য, প্লিডার, গ্যালিফ স্ট্রিটের ঠিকানা।

আমি আর বলাই খুঁজে খুঁজে সেই ঠিকানায় গেলুম। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বাইরের ঘরে এক তরুণ বসে আছেন, সামনে কয়েকজন মক্কেল। চতুর্দিকে আইনের বই। ভদ্রলোক পরেশবাবুর ছেলে। 'বাবা অসুস্থ। সন্ধের পরেই বিছানায় চলে যান।

আমরা যে একটা পুরনো মামলার খোঁজে এসেছি। দু চারটে কথা যে বলতেই হবে।'

'কার মামলা?'

'কিশোরী ঘোষ। একবার দেখা করিয়ে দিন। বড় বিপদ।'

উত্তর কলকাতার এঁদো বাড়ি। নোনা ধরা দেয়াল। ড্যাম্প ড্যাম্প গন্ধ। আমাদের একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বিশাল উঁচু চৌকাঠ, একটা আসন ছেঁড়া পাপোশ। মাঝারি মাপের ঘর, ফার্নিচার ভরাট। দেয়াল ঘেঁষে একটা জামদানি খাট। সেই খাটে বালিশে পিঠ রেখে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। ভীষণ ফরসা। মুখে একটাও দাঁত নেই, গাল দুটো অদৃশ্য। মুখে কী একটা চিবোচ্ছেন। আমি আর বলাই দুজনে দুটো মোড়া নিয়ে বসলুম। ঘরের আলোটার তেমন তেজ নেই। দেয়ালে মাকালীর মস্ত বড় একটা ছবি। পাখার বাতাসে ক্যালেন্ডারের ছবিটা অল্প অল্প দুলছে।

বৃদ্ধ আমাদের দেখে বললেন, 'এরা কারা? চিনতে পারছি না তো। চোখে কম দেখি।'

'আমাদের চিনবেন না। একটা পুরনো মামলার ব্যাপারে এসেছি।'

'মামলা! মামলা মোকদ্দমা আমি আর করি না বাবা। এখন আমার ছেলেই সব করে।'

'মামলা আপনাকে করতে হবে না।'

'ত[illegible] সেছ কী।'

'আপনি দ[illegible]বাগানের কিশোরীমোহন ঘোষকে চিনতেন?'

'কিশোরীমোহন! হ্যাঁ চিনতুম। চিনতুম কী, এখনও চিনি।'

'তার বিষয় সম্পত্তির দলিল উইল কিছু আছে?'

'তোমাদের বলব কেন?'

'[illegible] বলবেন। আজ তিন বছর তিনি নিরুদ্দেশ। আমরা তার সম্পত্তি গ্যারেজ সব সামলাচ্ছি। আর পারছি না। যদি কোনও ওয়ারিশান থাকে বলুন তার হাতে ভার দিয়ে আমরা চলে যাই।'

'তিন বছর বললে? হুঁ, তিন বছরই হবে। তিন বছর আগে সে উইল করে তার সমস্ত সম্পত্তি মেয়েকে দিয়ে গেছে।'

'মেয়ে! কিশোরীদার মেয়ে আছে? কী নাম?'

'অনুরাধা সরকার, স্বামীর নাম তারক সরকার।'

বলাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমার বুক টিপটিপ করছে। তা হলে অনুরাধার বাবা অনাথবন্ধু চক্রবর্তী নয়। কিশোরীমোহন ঘোষ। তা হলে মা কে? অনাথবন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কিশোরীদার অবৈধ ব্যাপার ছিল। আমরা উঠে পড়লুম। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে গুম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ।

বলাই বললে, 'তোর মতো ভাগ্য মাইরি দেখা যায় না। শুয়ে শুয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছিস।'

'অনুরাধা কার মেয়ে?'

'যারই হোক, এখন সে তোর বউ।'

'কিশোরীদা আমায় আগে বলেনি কেন?'

'খুব সহজ। ব্যাপারটা অনুরাধা যাতে জানতে না পারে।'

'অনুরাধার মা চরিত্রহীন।'

'চরিত্রের কী দাম আছে! সুখটাই তো জীবনের সব। একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে পেট ভরবে। তুই তারক সরকার, তোর বউয়ের নাম অনুরাধা সরকার, শ্বশুরের নাম কিশোরীমোহন ঘোষ এর বেশি তোর জানার দরকারটা কী! কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। এরপর আর পেছনের পাতা উলটে লাভ কী!'

'অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করব?'

'লাভ নেই। সে এর কিছুই জানে না।'

'অনুরাধার মাকে?'

'সেটা একটা কত বড় অভদ্রতা! রহস্যটা রহস্যই থাক না তারক! সব কিছু জানতে গেলে মানুষের দুঃখ বাড়ে। যত কম জানবে তত সুখে থাকবে।

লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমি কিন্তু নিজে কিছুই গুছোইনি। আমার ভাগ্যই আমাকে গুছিয়ে দিয়েছে। লোকে বলে— তারক? ও তো লোহা ধরলে সোনা হয়ে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে একটা লোকের ছবি ভেসে ওঠে— বেশ মোটা সোটা। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখ দুটো ধূর্ত শৃগালের মতো। গলকম্বলটা স্ফীত। যেন ঢোক গিলে কিছু একটা ধরে রেখেছে সেখানে চিরজীবনের মতো! একটা প্রশ্ন— অনুরাধা! তুমি কার মেয়ে! কিশোরীদার এক প্রেমিক ছিল, তার নাম উমা। অনুরাধা! তুমি কি উমার মেয়ে? উমা মারা যাওয়ার পর ছোট্ট মেয়েটাকে অনাথবন্ধুর স্ত্রীর কোলে তুলে দিয়েছিল! অনুরাধা যাকে মা বলে, তাকে প্রশ্নটা করলেই হয়। তবু করিনি কোনওদিন। তারক সরকার জীবন-রহস্যের মধ্যে থাকতে ভালবাসে ব্যর্থ একজন গোয়েন্দার মতো। উত্তর চিরকালে লীন হয়ে গেছে। অনুরাধা যাঁকে মা বলত তিনি মরে গেছেন। সমস্ত উত্তরের সমাধি। তা থাক এতে আমার সুখের কোনও কমতি হয়নি।

কিশোরীদার সেই গ্যারেজ এখন বিশাল হয়ে গেছে। বলাই এখন ফোরম্যান। একটা চোখ গচ্চা দিয়ে নিতাই এখন ভাল ছেলে। ইঞ্জিনের টিউনিং-এর কাজ খুব ভাল রপ্ত করেছে। ফকির অ্যাকশান করতে গিয়ে রিঅ্যাকশানে ঝাঁঝরা হয়ে মরেছে। পাশাপাশি আর একটা ব্যাবসা আমি খাড়া করেছি— এ টু জেড সাপ্লাই এজেন্সি। মাছের তেলে মাছভাজা। এর মাল নিয়ে ওকে দেওয়া, ওর মাল নিয়ে একে দেওয়া। মাঝখানে বসে বোয়াল মাছের মতো প্রফিটটা খেয়ে নেওয়া। পুরনো লজঝড় গাড়ি মেরামত করে ডবল দামে ঝেড়ে দেওয়া। দালাল দি গ্রেট ভানু বোস আমার অনেক গুরুর এক গুরু। ভানুদা বলেছিল, মানুষকে হিপনোটাইজ করে ফেলবি। চেহারায় কথায় চোখের চাহনিতে। এরই নাম ঐশী শক্তি। কাজ গুছোবার কায়দাই হল কথা। জলের মতো গলগল করে ঢুকবি, হলহল করে কথা বলবি। একেবারে আপনজন হয়ে যাবি। মাল ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবি। খদ্দের ধরা আর মাছ ধরা এক জিনিস। বেশ চার করে, টোপ মেরে খেলিয়ে তুলবি। জানবি, বোকা বোকা ভোঁতা ভোঁতা চেহারার অনেক অ্যাডভান্টেজ। বাইরে ভোলে ভালে, ভেতরে মিচকেপটাশ। এই হল সাফল্যের চাবিকাঠি।

বলাই শিল্পীদের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখেছে। দৈত্যের মতো চেহারা হয়েছে। হাত দুটো মুগুরের মতো। সকালে হাতুড়ি পেটে কাহারবা তালে, তবলা সাধে তিনতালে। তেহাই মারার সময় পেছনের চুল সামনে ঝাঁপায়, সামনের চুল পেছনে। অনুরাধাকে সেতার ধরিয়েছে। রাতে আমাদের ময়ূরমহল জমজমাট।

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ। যাই করি না কেন, একটা অনুসন্ধান তো ভেতরে রয়েছে। লোকে ঈশ্বরকে খোঁজে। আমি একটা মানুষকে খুঁজছি— কিশোরীদা। যেখানেই সন্ন্যাসীদের জমায়েত, সেইখানেই

আমি আর বলাই। আখড়ায় আখড়ায় বাইরে কিশোরীদাকে খুঁজি। এবারের প্রয়াগেও আমাদের একই কাজ। একদিন দুপুরে সন্ন্যাসীদের পঙ্গতে একজনকে মনে হল অবিকল কিশোরীদা। গোঁফ দাড়ি জটা বাদ দিলেই কিশোরীদা। সন্ন্যাসীকে চোখে চোখে রেখে সুন্দর মুখে তার কুঠিয়ায় চড়াও হলুম। লম্বায় চওড়ায় কিশোরীদার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল। সন্ন্যাসী আসনে বসে ছিলেন। আমরা প্রণাম করলুম। তিমি মৃদু মিষ্টি গলায় বললেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা। মহারাজ! আপনি আমাদের চিনতে পারছেন?'

'নিশ্চয় পারছি।'

'কে বলুন তো?'

'তোমরা দুই ভক্ত। মুমুক্ষু। সাধুসঙ্গের বাসনা হয়েছে।'

'আমাদের আগে কোথাও দেখেছেন?'

'অবশ্যই। হৃদয় মন্দিরে।'

না, এইভাবে পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। গলার স্বর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খুব আস্তে কথা বলছেন। মুখে কোনও ভাবের পরিবর্তন নেই। চোখ স্থির। বাইরের লক্ষণ দেখে ধরার উপায় নেই। বলাই দুম করে প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি আমাদের কিশোরীদা?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমাদের ভুল হয়েছে বাবা। আমার পূর্বাশ্রমের নাম কিশোরী নয়।'

আমরা চলে এলুম। পরের দিন সেই কুঠিয়ায় গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই. এক মুঠো ছাই পড়ে আছে। সন্দেহটা বেড়ে গেল। নিশ্চয় কিশোরীদা, তা না হলে চলে যাবেন কেন! গোটা মেলাটা তন্নতন্ন করে খুঁজলুম; কোথায় কিশোরীদার মতো দেখতে সেই সাধু! বেপাত্তা। বলাই বললে, 'পেয়েও পেলুম না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল।'

সেই দিন বিকেলবেলা আমরা একটা দোকানে বসে চা-সামোসা খাচ্ছি, দেখি এক বৃদ্ধ বাঙালি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন, ঢুকব কি ঢুকব না। বলাইয়ের ঝাল লেগেছে, আধচোখ বুজিয়ে উ হা করছে। হঠাৎ আমার মনে হল, লোকটিকে আমি চিনি। চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে দোকানের বাইরে এসে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি বিশ্বনাথবাবু না?' ভদ্রলোক ঘোলাটে মৃত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক চিনতে পারছি না তো!'

'না পারারই কথা। অনেক বছর আগে আপনার একটা সুখের সংসার ছিল।

'তা ছিল। আপনি জানলেন কী করে?'

'জানি আমি। আপনার স্ত্রীর নাম ছিল চম্পা সরকার। আপনি রেলে চাকরি করতেন। আপনার একটা ছেলে ছিল। তার নাম তারক। আমি সেই তারক সরকার। কবে ছাড়া পেলেন আপনি?'

বিশ্বনাথ সরকার পালাতে চাইছিলেন। বলাই এসে হাত চেপে ধরেছে— 'আপনি পালাতে চাইছেন কেন? বসুন। চা, শিঙাড়া খাবেন বসুন।' বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে! শেষে একটা বেঞ্চিতে বসলেন আড়ষ্ট হয়ে।

'কবে ছাড়া পেলেন?'

'এই মাস তিনেক হল।'

'এখানে কীভাবে এলেন?'

'যেভাবে সবাই আসে। আমি যাকে রেখেছিলুম সেই আমাকে এখন রেখেছে। একটা কথা আছে— যাকে রাখো সেই রাখে।'

'আপনার বাড়িতে আপনি ফিরে যেতে পারেন।'

'পাগল হয়েছ। ও তো পাপের বাড়ি। সব ক'টা ইট আমার পাপের সাক্ষী। ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। আমার এক চোখে ছিল কামিনী, আর এক চোখে কাঞ্চন। দুটো চোখই আমার চলে গেছে তারক। আমি এখন জরদগব এক বৃদ্ধ। এই তীর্থে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলে যাই দুটো

জিনিস— কামিনী আর কাঞ্চন। তোমার মায়ের মন ছিল আর ডালিমের ছিল শরীর। দুটো এক জায়গায় মিলল না। তাই এই দুর্ভোগ। তোমার অনেক টাকা হয়েছে তারক। সাবধান।'

'চলুন, আপনাকে আপনার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কোনও দরকার নেই। মনে করো তোমার বাবা বিশ্বনাথ সরকারের মৃত্যু হয়েছে।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'পুরুল্লি রোড।'

বিশ্বনাথ সরকার, রেলের মালবাবু, সন্ধ্যার অন্ধকারে জনসমুদ্রে মিশে গেলেন। গায়ে একটা খেরো আলোয়ান। এক মাথা পাকা চুল। আমি আর বলাই দাঁড়িয়ে দেখলুম, একটা মানুষ নয় প্রয়াগের সোনালি অন্ধকারে, ত্রিবেণীর দিকে এগিয়ে চলেছে সময়ের পুলিন্দা, আটাত্তরটা বছরের একটা পুরিয়া। সব কিছু ছাপিয়ে কানে আসছে, বটতলায় পাঁচালিকারের সেই ছড়া, মূল্য, ছ'পয়সা।

শোনো শোনো কী আশ্চর্য কলির কাহিনি।
ঘরকা বহুরি প্রীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তোমার তামাশা, দুখ লাগে আবার হাসি ॥